সাপ্তাহিক বসুমতী

নবভারত গঠনের এঁরাও অংশীদার

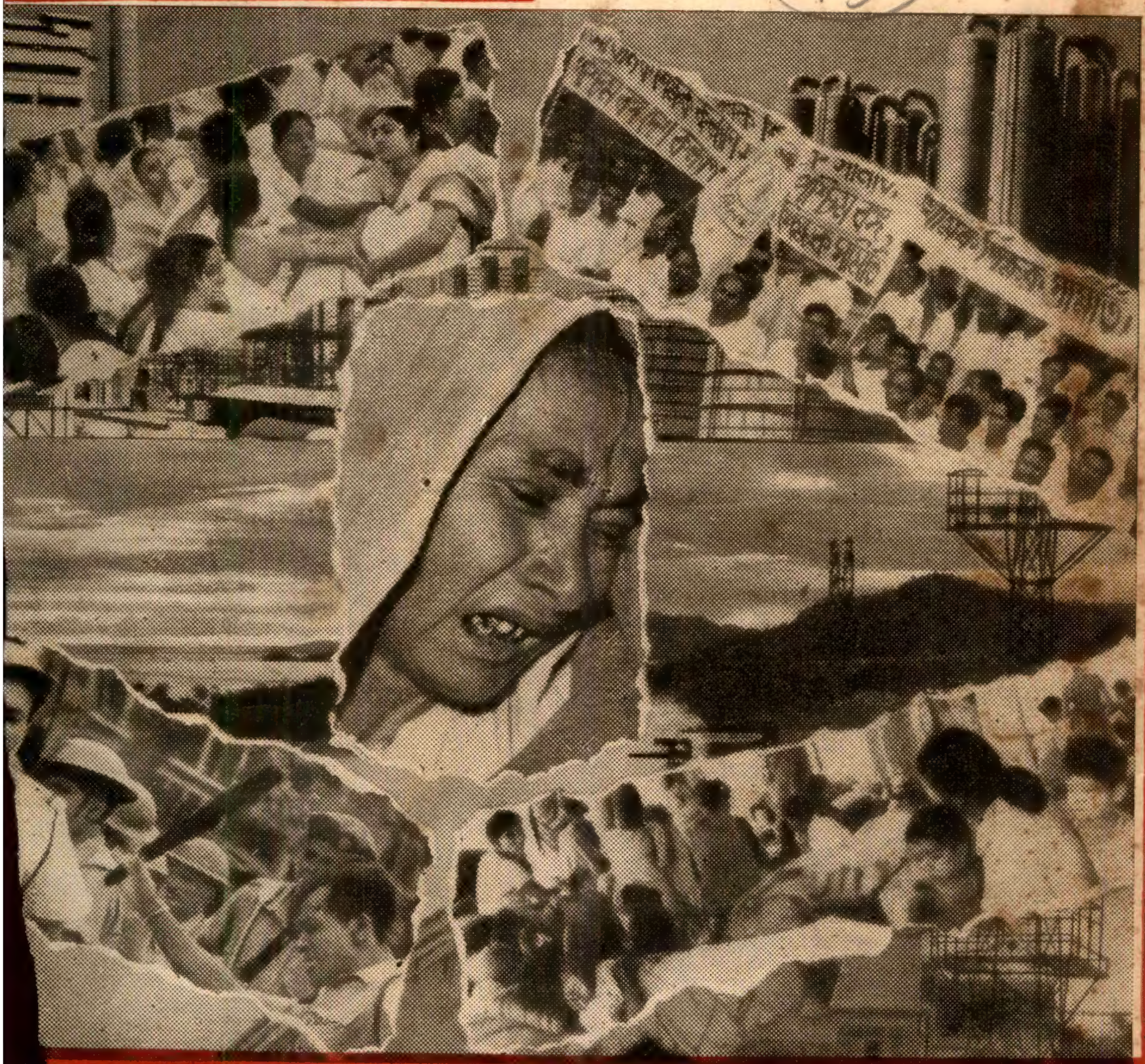

া, বৃহস্পতিবার, ১লা ভাদ্র, ১৩৭৩ বংগাব্দ ★ 18th Aug., 1966 * Vol. 71, No. 11

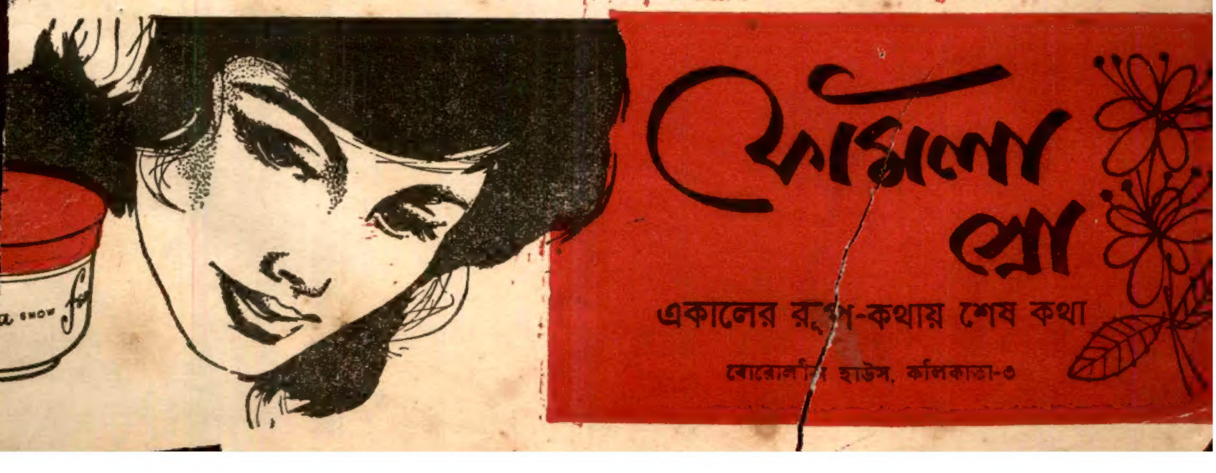

272356

CUK-H01992-13-272356

সূচী

13

বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা
সম্পাদকীয়		৬৪৩
বড়ই বিচিত্র (কবিতা)	— বিষ্ণু দে	৬৪৪
আমাদের হাতে (কবিতা)	— সুভাষ মুখোপাধ্যায়	৬৪৪
আই সি এস-এর রূপান্তর	— শৈবালকুমার গুপ্ত	৬৪৫
স্বাধীন ভারতে পত্রপত্রিকার স্থান	— পান্নালাল দাশগুপ্ত	৬৫২
স্বাধীন ভারতের সাহিত্য	— চিত্তরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়	৬৫৪
একালের গল্প (কবিতা)	— দুর্গাদাস সরকার	৬৫৬
স্বাধীন ভারতে বিজ্ঞান	— ডঃ শান্তিময় চট্টোপাধ্যায়	৬৫৭
ভারতীয় অর্থনীতির গতি	— ডঃ নরেন ভট্টাচার্য	৬৬০
স্বাধীন ভারতে আধুনিক চিকিৎসাবিজ্ঞান	— ডাঃ অমূল্যধন মুখোপাধ্যায়	৬৬৩
দুগ্ধ সরবরাহ ও কয়েকটি প্রশ্ন	— বহ্নি রায়	৬৬৬
নবভারতের শিল্পচিন্তা : অনিশ্চিত ভবিষ্যৎ	— মিত্রেন	৬৬৮

ডক্টর পঞ্চানন ঘোষাল এম, এস, সি প্রণীত

আমার দেখা মেয়েরা

(রহস্য রোমাঞ্চের স্বর্ণখনি)

'রক্তনদীর ধারা', 'অপরাধ বিজ্ঞান' ও 'বিখ্যাত বিচার
াহিনী' নামক সুপ্রসিদ্ধ গ্রন্থগুলির লেখকের সত্যঘটনামূলক
ভিন্ন ও বিচিত্র নারী-চরিত্রের রহস্য উদ্ঘাটন ও যথাযথ
পদান। মেয়েদের মন আর মতি স্বয়ং দেবা ন জানন্তি।
ভিজ্ঞ ও দক্ষ লেখকের রচনার বৈশিষ্ট্যে বাংলা দেশের
রী-সমাজের এক অজানা অংশ সাধারণের চোখে সুস্পষ্ট
ভাত হয়েছে। পড়তে পড়তে বই শেষ না করে ওঠা যায়
বইয়ের আদ্যোপান্ত রুদ্ধশ্বাস উদ্বেগ ও অনিশ্চয়তা।
উপন্যাসের চেয়েও সুখপাঠ্য।

মূল্য চার টাকা

মাইকেল মধুসূদন দত্তের

মাইকেল গ্রন্থাবলী

ভাগ :—মেঘনাদবধ কাব্য, বীরাঙ্গনা কাব্য, পদ্মাবতী
নাটক, বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রোঁ, একেই কি বলে
সভ্যতা? —তিন টাকা।
ীয় ভাগ :—কৃষ্ণকুমারী নাটক, শর্মিষ্ঠা নাটক,
তিলোত্তমা-সম্ভব কাব্য, ব্রজাঙ্গনা কাব্য, চতুর্দশপদী
কবিতাবলী, বিবিধ কাব্য, মায়া কানন, হেক্টর বধ।
—দুই টাকা।

উপন্যাস-সাম্রাজ্যের রত্নমুকুট,—সেই সর্বজনপ্রমোদন—অমর-
কীর্তি ঔপন্যাসিক—লব্ধপ্রতিষ্ঠ নাট্যকার—শক্তিমান রস-শিল্পী
'ভারতী' সম্পাদক শ্রীযুক্ত সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়ের—

সৌরীন্দ্র গ্রন্থাবলী

৫ম ভাগে :—বাদলা, মমতা, নির্ঝর, অতঃপর, পরদেশী
সুরা, যবনিকার অন্তরালে, লেখার গলদ, পারিবারিক উপন্যাস,
প্রগতি, অনাগত যুগ, আদর্শ এডিটোরিয়াল, আদর্শ
সমালোচনা, সম্পাদকের দপ্তর, সংবাদপত্রের দৌলতে, মো :
কাশ্মীর, এক যাত্রায়, কুলকাটা, দুঃখীরাম, পান-সুপারি।
মাত্র ১৸৹ টাকায়।

ডঃ মতিলাল দাশ প্রণীত

মতিলাল গ্রন্থাবলী

মূল্য—দুই টাকা

—ইহাতে আছে—

১। চলার পথে (উপন্যাস)
২। মনীষা (উপন্যাস)
৩। বিদ্যুৎশিখা (১১ খানি গল্প সমষ্টি)
৪। দীপশিখা (কবিতা সঙ্কলন)
৫। চার্বাক (নাটক)

বসুমতী প্রাইভেট লিমিটেডঃ ১৬৬, বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী স্ট্রীট, কলি-১২

বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা
কি ফল লভিনু হায়	— শ্রীহলধর পটল	৬৭৩
ফাগুন ফোটে ঝড়ে, দুর্গাপুরে (কবিতা)	— আবুলকাশেম রহিমউদ্দীন	৬৮১
সেকাল ও একাল	— লীলা মজুমদার	৬৮২
স্বাধীন ভারতে নদ-নদী পরিকল্পনা	— কপিল ভট্টাচার্য	৬৮৫
স্বাধীনতা লাভের পর ভারতের শিক্ষাব্যবস্থা—তার উৎকর্ষ অপকর্ষ	— রাজকুমার চক্রবর্তী	৬৮৭
আইন ও স্বাধীনতা	— অজিতকুমার দত্ত	৬৯০
ভারতের বৈদেশিক নীতি	— নির্মল বসু	৬৯২
স্বাধীনতা-উত্তরপর্বে বাংলার রঙ্গমঞ্চ	— অশোক সেন	৬৯৫
স্বাধীনতা-উত্তরকালে সঙ্গীত সমীক্ষা	— নীহাররিন্দু চৌধুরী	৬৯৮
অর্ধ শতাব্দীর অভিজ্ঞতা ঃ চলচ্চিত্রের আঠারো বছর	— কল্পতরু সেনগুপ্ত	৭০২

কলিকাতার ভূতপূর্ব মেয়র—প্রসিদ্ধ আইনবিদ

শ্রীসনৎকুমার রায়চৌধুরী প্রণীত

হিন্দুধর্ম্ম পরিচয়

দ্বিতীয় সংস্করণ—মূল্য দেড় টাকা

বাংলার বিদ্যালয়গুলিতে হিন্দু সংস্কৃতি প্রতিষ্ঠা যেদিন লুপ্ত হইল, সেইদিন হইতে হিন্দুর ব্যক্তিগত, পারিবারিক ও সামাজিক জীবনের ভিত্তি নষ্ট হইয়া গেল। তাহারই সুযোগ লইয়া আমাদের গৃহসমাজ ধ্বংস করিয়াছে য়ুনানী সভ্যতা। বাংলার অন্যতম শ্রেষ্ঠ হিন্দু নায়ক বাংলার বালগোপালদের কচি করকমলে যে পবিত্র-নৈবেদ্য তুলিয়া ধরিয়াছেন, তাহাতে জাতি কৃতার্থ হইয়াছে

প্রতি বিদ্যালয়ে এই গ্রন্থ অবশ্যপাঠ্য হওয়া উচিত।

কয়েকটি বিশিষ্ট অভিমত—

বিহারের প্রাক্তন প্রদেশপাল শ্রীমাধব শ্রীহরি অণে লিখিয়াছেন—

"চমৎকার বই। ঋষিদের প্রচারিত হিন্দুধর্ম সম্বন্ধে স্পষ্ট ধারণা হবে বইখানি পড়লে। প্রত্যেক কিশোর ও কিশোরীদের হাতে এই রকমের একখানি করে বই শোভা পাক, এ আমার বড় ইচ্ছে।"

সুবিখ্যাত মাসিক পত্রিকা 'প্রবাসী'র অভিমত—

"স্বধর্মের মূল ও সার কথার সঙ্গে পরিচিত না হওয়ায় সন্তান-সন্ততিগণ ক্রমে বিভ্রান্ত ও আদর্শভ্রষ্ট হইয়া উঠে। ইহার ফল ইদানীং আমরা বিশেষভাবে প্রত্যক্ষ করিতেছি। এ সময় এইরূপ একখানি পুস্তকের প্রয়োজনীয়তা আছে।"

কিশোর-সাহিত্যের অভিনব আকর্ষণ

হেমেন্দ্র রায়ের গ্রন্থাবলী

শ্রীহেমেন্দ্রকুমার রায় প্রণীত

যাঁহার চাঞ্চল্যকর কাহিনীগুলি পাঠ করিয়া বাংলার কিশো[র] কিশোরীরা আতঙ্কে, বিস্ময়ে ও কৌতূহলে হতবাক হয়, আ[জ] বাংলার সেই প্রখ্যাত প্রবীণ কথাশিল্পী শ্রীহেমেন্দ্রকুমার র[ায়ের] শ্রেষ্ঠ রচনাগুলি চয়ন করিয়া এই গ্রন্থাবলী প্রকাশ করি[লাম]

—গ্রন্থাবলীতে আছে—

১। যকের ধন, ২। প্রদীপ ও অন্ধকার, ৩। রহস্যের আলোছা[য়া] ৪। ক্ষুদিরামের কীর্তি, ৫। যেসা দেওগে তেসা পাও[গে] ৬। বুড়োর খামখেয়ালী, ৭। গোয়েন্দা কাহিনীর সঞ্চয়ন চাবি ও খিল, একরত্তি মাটি, চোরাই বাড়ি, ছেলেবেল[া] একদিন ও বন-বাদাড়ে। ৮। ভৌতিক কাহিনী সঞ্চয়ন—এ রাতের ইতিহাস, কংকাল সারথি, বিজয়ার প্রণাম, কাণকা হচি, শয়তান, ভেলকির হুমকী, ভূতের রাজা, শয়তানী জায় ৯। নতুন বাংলার প্রথম কবি, ১০। জগন্নাথদেবের গুপ্তক[থা] ১১। হলিউডের টাকার পাহাড়।

মূল্য তিন টাকা।

বসুমতী প্রাইভেট লিমিটেডঃ ১৬৬, বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী স্ট্রীট, কলি-১২

সাপ্তাহিক বসুমতী
• স্বাধীনতা সংখ্যা •
সম্পাদিকা-জয়ন্তী সেন

৭১ বর্ষ ঃ ১১শ সংখ্যা—মূল্য ২৫ পয়সা | বাংলা ভাষায় দ্বিতীয় সর্বাধিক প্রচারিত | Price : 25 Paise
বৃহস্পতিবার, ১লা ভাদ্র, ১৩৭৩ বঙ্গাব্দ | সাপ্তাহিক পত্রিকা | Thursday, 18th August, 1966

স্বাধীনতা দিবস

আমাদের স্বাধীনতার আঠারো বছর পার হোল। এই স্বাধীনতা কেমন? এর অখণ্ড রূপটি এখন জনমানসে কি রকম প্রতিফলিত? স্বাধীনতা সংগ্রামের সুদীর্ঘ ইতিহাসের পর যে স্বাধীনতা আমরা লাভ করেছি—তা আমাদের কতোটা সুখ, শান্তি বা স্বাচ্ছন্দ্য দান করতে পেরেছে?

স্বাধীনতা লাভের আঠারো বছরে দেশের সাধারণ মানুষের যে হাল হয়েছে, তাতে সহজেই অনুমান করা যায় যে, বিদেশী প্রভুরা বিদায় নিলেও স্বদেশের কিছু স্বার্থপর জীব নিয়মিত শোষণ চালিয়ে যাচ্ছে। আমাদের রাষ্ট্র লোকায়ত্ত হলেও, যেন কোন অলক্ষ্য ইঙ্গিতে বিত্তবানদের বিধান মেনে নেওয়া ছাড়া গত্যন্তর থাকে না। এর কারণ, এরা হচ্ছে পুঁজিপতি। উৎপাদনের সর্বক্ষেত্রে এদের হস্ত সম্প্রসারিত থাকায় এবং মুনাফা সঞ্চয়ই এদের একমাত্র লক্ষ্য হওয়ায়—সবাই আজ এদের শিকার।

আমাদের রাষ্ট্রের মূল আদর্শ হচ্ছে, জনগণের সামগ্রিক কল্যাণ সাধন করা। এই আদর্শ অবলম্বন করে সমাজতন্ত্রের দিকে অগ্রসর হওয়া সম্ভব। আমাদের স্বাধীনতার আঠারো বছরের মধ্যে রচিত সংবিধানে সেই আদর্শ স্বীকৃত। এতদ্‌সত্ত্বেও একথা রাষ্ট্রের স্বার্থেই এখন আর না বলে উপায় নেই যে, স্বাধীন ভারতে জনগণের কল্যাণ নামমাত্র হয়েছে। এই কল্যাণ সাধিত না হবার কারণ, রাষ্ট্র পরিচালনার হাল যাঁরা ধরে থাকেন তাঁদের মধ্যে কিংকর্তব্যবিমূঢ় ভাব। সোজা কথায় বলা যায়, দায়িত্বশীল মন্ত্রীরাও এখন অনেক দুর্নীতির কথা বলে থাকলেও সেই দুর্নীতি দূর করতে তাঁরা অসমর্থ হন। দুঃখের সঙ্গেই বলতে হচ্ছে যে, জনস্বার্থে সত্যিকারের যদি কেউ কিছু করতে চান তখন তাঁকে বিপদাপন্ন হতে হয়। সুতরাং জনগণের ক্লেশ দূর হওয়ার কথা থাক। কারণ তা দূর করার মতো মানুষ ভারতরাষ্ট্রে প্রায় বিলীয়মান। এই অবস্থায় দার্শনিকশ্রেষ্ঠ রাষ্ট্রপতি শ্রীরাধাকৃষ্ণণের ব্যথা ক্ষোভ মাঝে মাঝে শোনা গেলেও—দূর থেকে তা করুণ কান্নার মতোই শোনায়। মনে হয় তখন, তবে তিনিও কি অসহায়! তাহলে সাধারণ মানুষের দুর্দশার কি শেষ আছে?

সাধারণ মানুষ আজ অর্ধভুক্ত, ছিন্ন বস্ত্র পরিহিত, নিরাশ্রয় ও রোগাক্রান্ত। সাধারণ মানুষ রাজনৈতিক স্বাধীনতা লাভ করলেও মুনাফালোভীদের অক্টোপাসের দৃঢ় বেষ্টনে হাঁস-ফাঁস করছে। সুতরাং স্বাধীনতা তাদের কোথায়?

যে কোনো স্বাধীন রাষ্ট্রে জনবল এবং প্রাকৃতিক সম্পদ থাকলে সেই দেশ একদিন না একদিন সমৃদ্ধ হয়ে ওঠে। আমাদের এই ভারতরাষ্ট্রে ঐ দুই শক্তির অভাব নেই। ইংরেজ যখন এদেশ লুণ্ঠন করেছে তখন দু'হাতে তা করেছে এবং যাবার কালে এ দেশকে দারিদ্র্যে পরিণত করে গেছে, তবু এ দেশের মানুষদের তারা দীন প্রমাণিত করতে পারে নি। বরং স্বাধীন ভারতেই এদেশের মানুষ দীন ও দরিদ্র। এবং তাদের দারিদ্র্যের নামে বিদেশ থেকে ঋণ করা হচ্ছে কোটি কোটি ডলার। শুধু তাই নয় এদের সম্পদ বৃদ্ধি করার নামে গড়ে তোলা হয়েছে রাষ্ট্রায়ত্ত ভারী শিল্প। যাঁরা বুদ্ধিমান তাঁরা জানেন, এই সব ভারী শিল্প থেকে জনগণ যে পরিমাণ উপকৃত হয়েছেন, তার বহুগুণ বেশি সেই সব শিল্প স্বার্থরক্ষা করেছে মাঝারি শিল্পের পুঁজিপতিদের। সত্য কথা বলতে কি, দেশের উন্নতির জন্যে আমাদের দেশে জনবল ও প্রাকৃতিক সম্পদকে তেমনভাবে কাজে লাগানো হয় নি। তা যদি করা হোত, তা হলে অন্তত আধা-শহুরে সমস্ত জায়গাতেও বিদ্যুৎ গিয়ে পৌঁছত এবং চাষবাসে মধ্যযুগীয় ব্যবস্থা অবলম্বন করা হোত না। বেকারীদের যে সংখ্যা এখন দাঁড়িয়েছে তা আধা-সভ্য রাষ্ট্রগুলিকেও হয়তো হার মানায়। দেশের সমস্যা শুধু একদিকেই নয়, চারিদিকেই। 'প্রভাতী' সংবাদপত্রের পৃষ্ঠা অধুনাকালে তাই বিক্ষোভ, মিছিল, আন্দোলন, অনশন, লাঠিচালনা, গুলীচালনা প্রভৃতি সংবাদেই পরিপূর্ণ। স্বাধীন ভারতে কে এই সব কামনা করে? কে কামনা করে যে নিত্য প্রয়োজনীয় পণ্যের ন্যায্যমূল্য দেশ থেকে তুলে দিয়ে কালোবাজারীরাই বাজার দখল করবে এবং সরকার নিরুপায় অবস্থায় নীরব দর্শকের ভূমিকা অবলম্বন করবেন?

আসলে মৌলিক গলদগুলি দূর করা সম্ভব না হলে দেশের উন্নতিসাধন অসম্ভব। দলগত স্বার্থ, পুঁজিপতিদের কাছে আত্মবলিদানই এখন স্বাধীন ভারতের মর্মকথা হয়ে দাঁড়িয়েছে।

কিন্তু এই অবস্থা চিরকাল চলতে পারে না। ভারতের মানুষ তাই যেন ধীরে ধীরে বেপরোয়া হয়ে উঠেছে। অথচ স্মরণ করুন, সেই ১৯৪৭ সালের পনেরই আগস্টের কথা। সেদিনকার আনন্দিত, হর্ষোৎফুল্ল নব-স্বাধীনতালব্ধ মানুষের কথা ভেবে আজকের মানুষগুলির দিকে তাকালে—দুঃখ হয় না কি? দুঃখ হয় এই কথা ভেবে, এইজন্যে কি চলেছিল দেড়শত বছরের অধিক স্বাধীনতার সংগ্রাম? সেই সংগ্রামের কি যবনিকাপাত হয়েছে?

সম্পাদকীয়

বড়ই বিচিত্র

বিষ্ণু দে

ঐ বড় বিচিত্র দেশ, সেলুকাস, এ কালেও বড়ই বিচিত্র।
কালবৈশাখীর বৃষ্টি আসে তবু রিমঝিম,
শুনি, পড়ি, আশেপাশে
আকাশে হাওয়ায়;
ভাবে ক্ষ্যাপা কান্নার শিলায় ঝড়ে নামবে
আকালের হিমে ভেজা
ঘামে ভেজা পরশপাথুরে হিম:
কিন্তু গোটা মাটিই যে ঝুরাঝারা,
ভূতপত্রীর বালি, উড়ু-উড়ু, ধূলিসার,
শুষ্ক, দগ্ধ, ছায়াশূন্য, ছিন্নমূল,
কোনোটি বা স্কন্ধকাটা, নিষ্পল্লব, যত খাল
কাণানদী পচা হাজা শত শব, আর নদী নদীর কঙ্কাল;
ফ্যাকাশে হাওয়ায়
অস্থিসার
মেঘমাশ্রিত সানু, অয়শ্চক্র সমুদ্রও হেরে যায়,
শ্মশানে বিরাট দাহে
পৃথিবীর মানদণ্ডহীন
যেমন গাঙ্গেয় গণ্ডূষে শান্তিজল বৃথা ঝরে,
যেখানে স্বয়ং জীবনই জঞ্জাল
ক্ষুড়ায় ও দেশে দেশে ক্ষৌর করে আর
দগ্ধপত্র হতাহত হিমশিম
অন্তহীন অন্ত্যেষ্টির অন্তে অবশেষে হৃদয়ের
প্রত্যন্তপ্রদেশে-দূর রামধনু
আশ্রমে পালায়,
বিরাট শ্মশান-রাজ্য, অগ্নির অশান্ত ভোজ!
এ খাণ্ডবে কেবা শত্রু কেবা মিত্র!
অথচ তাকাও, ঐ ভীত্‌-নামে নামে
প্রাণের অশ্রান্ত বৃষ্টি মুক্তির জ্বালায়
বীরত্বের অলৌকিক প্রতিক্ষণে প্রাণদানে শ্মশান নেভায়,
পাহাড় কন্দর
মাঠ বাট ধানক্ষেত তৃণাদপি
সুনীচেন দুর্জয় অশ্রুতে আহা মৃত্যুতে
মৃত্যুকে হেনে হেনে।
এখানে কোথায় বৃষ্টি, এখানে কেন বা বৃষ্টি আসবে!
এখানে শুধুই
সৃষ্টিছাড়া ভূতপ্রেত বেচে আর কেনে!
চাল নেই চুলো নেই ধান নেই মান নেই!
এ দেশ বিচিত্র দেশ
আর বিচিত্র এ রাজধানী, অলীক সুন্দর॥

আমাদের হাতে

সুভাষ মুখোপাধ্যায়

মার্কিনী গমের আগমনিগমে
কায়কল্প শেখায়
ওদের সদ্‌গুরু।

পয়সা দিয়ে ময়দানে ভিড় জমিয়ে
ওদের কালো-চশমা
দিনকে রাত করে।

ওদের বাঁধানো-দাঁতের কথাগুলো
বন্দুকের অনর্গল ধোঁয়ায়
বিলক্ষণ পরিষ্কার—
দুর্গাপুরে ফিন্‌কি-দেওয়া রক্তের ধারায়
ঠিক
জলের মত সহজ।

আমাদের চোখ যত খোলে
মুঠো তত শক্ত হয়।

ওরা বেচতে চেয়েছিল ডলারে,
আমরা বুকের রক্ত দিয়ে
কিনে নিয়েছি

ওরা ফেলে দিয়েছিল,
আমরা তুলে নিয়েছি

স্বাধীনতার পতাকা, দেখ—
এখন
আমাদের হাতে।

কারণ খুঁজে পাই না। ইংরাজ
যা শ্রেষ্ঠ অবদান তা ঊনবিংশ
শেষ দশকেই—প্রায় শে
এসেছিল, বিংশ শতাব্দীতে যে অফিসারবর্গের সাক্ষাৎ আমরা পাই তাদের মধ্যে ভাল, মন্দ ও মাঝামাঝি সকল রকমেরই সংমিশ্রণ ঘটেছিল—অদ্ভুতকর্মা অফিসারের বিশেষ কোন অস্তিত্ব বা আধিক্য দেখা যায় নি। বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় বা তৃতীয় দশক থেকে যে ইংরাজ আই সি এস অফিসারেরা স্বেচ্ছায় নিজের আত্মাবলুপ্তির পথ পরিষ্কার করে ভারতের উপর নিজেদের 'অভিভাবকত্ব' সানন্দে ভারতীয় সহকর্মীদের হাতে তুলে দিয়েছে একথা সর্বৈব মিথ্যা এবং এটা শুধু তারাই বিশ্বাস করে যাদের জাতীয় অভিমানের পোষকতার জন্য ভারতের উপর বৃটিশ কর্তৃত্বের অবসানের ইতিহাসটা একটা মোহাঞ্জনের ভিতর দিয়ে দেখা দরকার। তা না হলে উদারপন্থী ইংরাজদের কাছে এতদিনকার স্বৈরতন্ত্রের কোন সাফাই থাকে না। ১৯১৩ সনে Islington Commission-এর সামনে বাংলাদেশের ইংরাজ ও বাঙালী সিভিলিয়ানেরা যে পরস্পর-বিরোধী সাক্ষ্য দিয়েছিলেন তাতে স্পষ্ট বোঝা যায়, ভারতীয় অফিসারদের কাছে সত্যিকার ক্ষমতা হস্তান্তর করতে তখনকার ইংরাজ অফিসারগোষ্ঠীর কতখানি অনিচ্ছা ছিল, এবং কতখানি আগ্রহ তাদের ছিল নানা অজুহাতে ভারতীয় আই সি এস অফিসারদের প্রশাসনিক ব্যাপারে অযোগ্য প্রমাণ করে তাদেরকে বিচার বিভাগে ঠেলে দেবার।

কিন্তু এ প্রসঙ্গ এক্ষেত্রে অবান্তর। অধ্যাপক বার্কারের উক্তি আসলে যে কারণে উদ্ধৃত করেছি সেটা হল এই কথা প্রমাণ করবার জন্যে যে আই সি এস গোষ্ঠীর দ্বারা গঠিত রাজ্যশাসনের যে কাঠামো ভারতবর্ষে প্রচলিত ছিল সাধারণভাবে আইন ও শৃঙ্খলা বজায় রাখার ব্যাপারে এবং আনুষঙ্গিক অন্যান্য বিষয়ে তার একটা অনস্বীকার্য কর্মদক্ষতা ছিল। এই কর্মদক্ষতা ভারতবর্ষকে স্বাধীনতার পথে অগ্রসর করে দেবার চেষ্টায় প্রকাশ পায় নি, তাকে শিল্পে সমৃদ্ধ, শিক্ষায় উন্নত ও ব্যবহারিক বিজ্ঞানে কুশলী করবার দিকেও হয়ত নয়। প্রকাশ পেয়েছিল এই বহুবিচ্ছিন্ন নানা ভাবধারাপুষ্ট নানা ঐতিহ্যবাহী বিভিন্ন জনসমষ্টিকে এক শাসনযন্ত্রের আয়ত্তে আনা,

সোজা ছিল না,
পক্ষে। প্রথম দিকে
একান্তভাবে শ্বেতাঙ্গ আই
অফিসারদের করায়ত্ত।
শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে অতি
আই সি এস-এর সংরক্ষিত
ভারতীয় অনুপ্রবেশ সুরু হয়
সেটা আস্তে আস্তে বেড়ে গিয়ে প্রাক-স্বাধীনতা বৎসরে শ্বেতাঙ্গ ও অশ্বেতাঙ্গের সংখ্যা প্রায় সমান সমান দাঁড়ায়। দেশ স্বাধীন হবার অব্যবহিত পরে, ইংরাজ সিভিলিয়ানদের অন্তর্ধানের সঙ্গে সঙ্গে আই সি এস-এর ভারতীয়করণ সম্পূর্ণ হয়। অধ্যাপক আর্নেস্ট বার্কারের ভাষায়,

"There is no longer any room for 'guardians' (as the members of the British service had been called) in the work of today and tomorrow. India and Pakistan bear on their own shoulders the vast orb of their fate as in right and justice they should." [Preface by Sir Ernest Barker to B. J. Gould's The Jewel and the Lotus' 1957]

ভারতীয়করণ সম্পূর্ণ হল বটে, কিন্তু দায়িত্ব যাদের হাতে এল তাদের যোগ্যতা সম্বন্ধে কিছু সংশয় প্রথমে যে ছিল না একথা বলা চলে না। যে সকল ইংরাজ ভারতের স্বাধীনতাকে প্রসন্ন মনে গ্রহণ করে নি তারা ত' সাগ্রহে প্রতীক্ষাই করছিল তাদের অভিভাবকত্ববর্জিত ভা র ত ব র্ষে র শাসনযন্ত্র কখন বিকল হয়ে পড়ে। কেউ কেউ এ আশঙ্কাও করেছিলেন যে, ভারতীয় সিভিলিয়ানেরাও শ্বেতাঙ্গ সিভিলিয়ানদের অনুকরণে মোটা পেন্সন নিয়ে অবসর গ্রহণ করতে চাইতে পারে, বিশেষত যদি তারা মনে করে যে ভবিষ্যতে যারা রাজনৈতিক ক্ষমতা পরিচালনা করবে তাদের সঙ্গে বনিয়ে কাজ করা সম্ভব হবে না। এরকম সম্ভাবনা যে ছিল না তা নয়। বৃটিশ আমলে আসল শাসনক্ষমতার কলকাঠি যদিও ছিল ভাইসরয়, গভর্নর ও উচ্চপর্যায়ের শ্বেতাঙ্গ সিভিলিয়ানদের হাতে, তবু ক্ষমতার ছিটেফোঁটা অশ্বেতাঙ্গ সিভিলিয়ানদের ভাগ্যে যে

তা
কারণ
যেতে না হয়
বা দরবারের অন্ত ছিল
সালে 'ভারতছাড়' আন্দোলনে
যখন চার্চিল বিদ্রূপ করে প্রকা
পার্লিয়ামেন্টে ঘোষণা করলেন যে মুষ্টিমেয় কংগ্রেস দল যাই করুক না কেন ভারতের অগণিত সৈন্যবাহিনী, দেশের প্রকৃত জননায়ক ভারতের নৃপতিবৃন্দ ও আই সি এস গোষ্ঠীর ভারতীয় অফিসারগণ সকলেই ইংরাজের পক্ষে তখন বাংলার একটি জিলা শহর থেকে একজন বাঙালী আই সি এস অফিসার কলকাতায় এসে অনেক কয়টি বাঙালী অফিসারকে ডেকে চার্চিলের উক্তির প্রতিবাদের জন্য আহ্বান জানান। তাঁর বক্তব্য ছিল শুধু এই যে, যদিও সরকারী কর্মচারী হিসাবে রাজনৈতিক মতামত ব্যক্ত করবার তাদের অধিকার নেই এবং অভিপ্রায়ও নেই, তবু অপর কেউ যদি এমন একটা মত তাদের মত বলে জাহির করে, যেটা তাদের মত কিনা সে সম্বন্ধে কোন অনুসন্ধান হয় নি—তবে নিশ্চয়ই তাদের প্রতিবাদ করবার অধিকার আছে। তাদের মতামত জিজ্ঞাসা না করে বৃটেনের প্রধানমন্ত্রীর কোন অধিকার নেই একথা বলবার যে সমস্ত ভারতীয় আই সি এস অফিসারই দেশের স্বাধীনতার বিরোধী। শেষ পর্যন্ত মাত্র একজন ছাড়া কেউ প্রতিবাদে সই করতে রাজী হল না। একজন ত' স্পষ্টই বলে ফেললে, "তা হলে আমাদের সবাইকে জব্দ করে দেবে।" অর্থাৎ বিচার বিভাগ এড়াবার এবং প্রশাসনিক বিভাগে কায়েম হয়ে থাকবার একমাত্র ছাড়পত্র হচ্ছে গভর্নমেন্টকে ঘুণাক্ষরেও জানতে না দেওয়া যে তার কোন 'বিপজ্জনক' মতামত আছে।

এই সব কারণে যে সব ভারতীয় অফিসারের হাতে কিছু কিছু দায়িত্বপূর্ণ

...কুমার গুপ্ত

...র ...ারদের ...ত্যন্ত মুখর ...বাংলাদেশের একটি ...সাপ্তাহিক দিল্লীর অভিজাত ...ই সি এস গোষ্ঠীর নাম দিয়েছে 'বিষচক্র'। আর একটি স্পষ্টবাদী নিরঙ্কুশ সাপ্তাহিক বাংলাদেশের সাম্প্রতিক ঘটনাবলী ও তার নিয়ন্ত্রণের ত্রুটি-বিচ্যুতি উল্লেখ করে পশ্চিমবঙ্গের মহাকরণকে জরদ্গব আখ্যা দিয়ে তার ললাটে অযোগ্যতার পঙ্কতিলক এঁকে দিয়েছে। এমন কি, কিছুদিন আগে পয়লা জুলাই তারিখে, স্টেটস্‌ম্যানের মত আইন ও শৃঙ্খলা ঘেঁসা দৈনিকেও একটি সুলিখিত স্বাক্ষরিত প্রবন্ধে বলা হয়েছে যে শিক্ষা, দীক্ষা, ঐতিহ্য ও পদমর্যাদার জন্য আই সি এস অফিসারদের কাছ থেকে যে সততা ও তথ্যনিষ্ঠ দৃষ্টিভঙ্গী লোকে আশা করেছিল, সে সব এখন অন্তর্হিতপ্রায়—তার পরিবর্তে দেখা যাচ্ছে রাজনীতির দ্যূতক্রীড়া, মন্ত্রিবর্গের মনোরঞ্জন করে নিজের বা স্বকীয় গোষ্ঠীর স্বার্থে আসর জমানো এবং কোন মন্তব্য লিপিবন্ধ করবার আগে তার যৌক্তিকতা বিচার না করে সেটা মন্ত্রীর মনঃপূত হবে কিনা জানবার আগ্রহে মন্ত্রীর অভিপ্রায় বা পছন্দ-অপছন্দ নির্ণয়ের চেষ্টা। বিভিন্ন মন্ত্রীর বিশেষ অনুগৃহীত সচিব আছেন যাঁকে ছাড়া তাঁর চলে না, দপ্তর বদল হলেও যাঁকে না নিয়ে তিনি এক পা নড়তে চান না। ফলে, আগে যে একটা অলিখিত নিয়ম ছিল যে প্রশাসনিক ত্রুটি-বিচ্যুতির জন্য পার্লিয়ামেন্টে বা অন্যত্র কোন অফিসারের নাম করে তাঁর বিরুদ্ধে সমালোচনা হবে না সেটা এখন ভেঙে পড়ছে। আগে আগে প্রশাসনিক যে কোন কাজের জন্য নিন্দা এবং প্রশংসা দুই-ই মন্ত্রীর প্রাপ্য ছিল—পার্লিয়ামেন্টের অশান্ত ঝটিকাক্ষুব্ধ সমালোচনা...কে অমৃতই উঠুক আর বিষই ...সেটা একা তিনিই পান করতেন। ...এখন মন্ত্রিবর্গের সঙ্গে শীর্ষস্থানীয় অফিসারেরও বাদ পড়েন না। হরিদাস মুন্দ্রার ক্ষেত্রে যেটা প্রথম দেখা গিয়েছিল শ্রীযুক্ত ভূতলিঙ্গমের ব্যাপারটি তারই সর্বশেষ উদাহরণ মাত্র।

এই সব সমালোচনা যে সর্বাংশে সত্য একথা বিশ্বাস করতে প্রবৃত্তি হয় না, কারণ অভিজাত আমলাগোষ্ঠীর মধ্যে যে সত্যিকার সৎ ও দক্ষ অফিসার নেই একথা অতি বড় নিন্দুকেও হয়ত বলবে না। কিন্তু অভিযোগ যখন উঠেছে তখন তার কতখানি সত্য এবং যেটুকু সত্য তার জন্য আসল গলদ কোথায় সেটা অনুসন্ধান করা দরকার, কারণ একটি সুসংহত, নিয়মানুগ সক্ষম, কর্তব্যনিষ্ঠ সিভিল সার্ভিস বা আমলাগোষ্ঠী যে কোন দেশের সুশাসনের পক্ষেই অপরিহার্য, তা সে গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতেই শাসিত হোক, বা ডিক্টেটারি পদ্ধতিতেই হোক। লয়েড জর্জ একবার ইন্ডিয়ান সিভিল সার্ভিসকে স্টিল ফ্রেম বলে আমাদের কাছে অনাবশ্যক গালাগালি খেয়েছিলেন, কিন্তু তাঁর উপমাটা মিথ্যা নয়। শাসনযন্ত্রকে খাড়া করে রাখবার জন্য একটি স্টিল ফ্রেমের দরকার এবং সিভিল সার্ভিস হচ্ছে সেই স্টিল ফ্রেম। সেটা যদি নড়বড়ে হয় এবং নতুন নতুন ভার বহনে অক্ষম হয়, তবে শাসনব্যবস্থা ভেঙে পড়তে বাধ্য। স্বাধীনতার পর আমরা যে সিভিল সার্ভিসের কাঠামো উত্তরাধিকারসূত্রে পেয়েছিলাম বিদেশী শাসকদের হাত থেকে, সেটা যদি আমলাবর্গের উচ্চাকাঙ্ক্ষা বা ভোগাকাঙ্ক্ষার দরুণ বা দেশের নতুন ভাগ্যবিধাতাদের দুর্বুদ্ধি বা খামখেয়ালির দরুণ নীতিভ্রষ্ট বা আদর্শচ্যুত হয়ে যায় তবে সেটা রীতিমত উদ্বেগের কারণ হয়ে দাঁড়াবে। ঠিক যে সময়ে দেশের ক্রমবর্ধমান সমস্যার সমাধানে তার প্রয়োজন সর্বাপেক্ষা জরুরি, যখন স্বার্থলুব্ধ ব্যবসায়ীদের হাত থেকে পরিত্রাণের উপায় হিসাবে বিভিন্ন বিষয়ের রাষ্ট্রায়ত্তকরণের কথা লোকে ভাবতে সুরু করেছে, তখন যদি ধরা পড়ে যে এই সার্ভিসের আদর্শনিষ্ঠা লুপ্তপ্রায়, তার নৈতিক ভিত্তি শিথিল, তার কর্মদক্ষতা ক্ষীয়মাণ, তবে দেশের দুর্ভাগ্য ঠেকাবার ক্ষমতা কারুর থাকবে না, যদি না আর একটি বৈপ্লবিক প্লাবনে নতুন জীবনের অভ্যুদয় হয়, নতুন শাসকগোষ্ঠী গড়ে ওঠে। কিন্তু সেই প্লাবনে আমাদের এতদিনকার সংস্কৃতি, আমাদের চিন্তা ও কর্মের স্বাধীনতা, আমাদের শিক্ষা, দীক্ষা ও ঐতিহ্য সবই ভেসে যাবার আশঙ্কা আছে।

সুতরাং যে প্রশাসনিক কাঠামো আমরা ইংরাজদের কাছ থেকে পেয়েছিলাম, সেটার যদি একটা মোটামুটি কর্মক্ষমতা থাকত তবে, তাকে কাজে না লাগানো নির্বুদ্ধিতার কাজ হতো। আই সি এস-দের যে মোটামুটি একটা কর্মক্ষমতা ছিল সেটা কেউ অস্বীকার করে না। বেশির ভাগ ইংরাজ ত' আই সি এস-এর প্রশংসায় পঞ্চমুখ। যদিও আই সি এস বলতে তাঁরা শুধু এর শ্বেতাঙ্গ অংশটুকুই বোঝেন। এঁদের কর্মদক্ষতা তাঁদের কাছে একটা প্রবাদ-বাক্যের মত, ইংরাজ-প্রতিভার এক অত্যাশ্চর্য বিকাশ। শুধু কিপলিং প্রমুখ গোঁড়া সাম্রাজ্যবাদীরাই নয়, স্বৈরতন্ত্র-বিরোধী উদারনৈতিক বুদ্ধিজীবীরাও এই মোহ থেকে মুক্ত ছিলেন না। স্যার আর্নেস্ট বার্কারের মত বিশিষ্ট অধ্যাপকও লিখছেন যে তাঁর এবং অন্যান্য অধ্যাপকদের হাত দিয়ে ইংল্যান্ডের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে যে সব ছাত্র বেরিয়ে গিয়ে ভারতশাসনের গুরুভার নিজের হাতে তুলে নিয়েছে, সেই সব অক্লান্তকর্মা ইংরাজ আই সি এস গোষ্ঠীর ভারতের চাষীর উন্নতিকল্পে নিরলস সাধনা এবং সর্বশেষে তাদের স্বার্থলেশহীন আত্মবলুপ্তির কাহিনী ইংল্যান্ডের ইতিহাসের একটি গৌরবময় অধ্যায়। আমরা যারা ইংরাজ অফিসারদের ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শে এসেছি, তাদের শাসনের ফলভাগী হয়েছি, তাদের ভাল ও মন্দ

প্রশাসনিক কাজ এসে পড়েছিল, তাঁরা স্বেচ্ছায় হোক বা অনিচ্ছায় হোক এমন সব কাজ করতে বাধ্য হয়েছিলেন যেটা স্বাধীনতা আন্দোলনের বিরোধী, এবং দমননীতির সমর্থক; এমন সব লোককে কারাপ্রাচীরের অন্তরালে রেখেছিলেন, যাঁরা স্বাধীনতা প্রাপ্তির সঙ্গে সঙ্গে ক্ষমতার আসনে এসে অধিষ্ঠিত হলেন। এঁদের মধ্যে কেউ কেউ বিদেশী শাসক সম্প্রদায়ের সঙ্গে এতখানি একাত্মতা অনুভব করেছিলেন যে, তাঁদের উৎসাহের কাছে এমন কি খাঁটি ইংরাজ অফিসারের উৎসাহকেও প্রাণহীন মনে হতো। এটাই স্বাভাবিক, কারণ রোদের চেয়ে বালির তাত বেশিই হয়। মেদিনীপুরে লবণ আইন আন্দোলনের সময় কয়েক মাস দমন-নীতি চালাবার পর ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেট মিঃ পেডি যখন বললেন, 'যথেষ্ট দমন-নীতি চালিয়েছে, এবার conciliation-এর পথ অনুসরণ করে দেখি কি হয়', তখন তাঁর সহকর্মী একজন বাঙালী সিভিলিয়ান বলে উঠল, 'No, Peddie, we shall then be undoing all the good work we have done so far.' এই সব ভারতীয় অফিসার যারা মাসী হয়ে মা'র চেয়েও বেশি দরদ দেখাত, তাদের পক্ষে একথা মনে হওয়া স্বাভাবিক যে স্বাধীন ভারতের প্রশাসনিক কাঠামোতে তাদের আস্থা অসহনীয় হতে পারে; সুতরাং 'স্থানত্যাগেন দুর্জনং' নীতি অবলম্বন করাই ভাল। (আমাদের ভাগ্য ভাল যে এরকম বাঙালী অফিসার সংখ্যায় অতি নগণ্য ছিল।)

সেটা হয় নি, এবং হয় নি যে তার অনেক কারণ ছিল। প্রথমত ভারতীয় সিভিলিয়ানেরা জানত না যে সর্দার প্যাটেল গোড়াতেই ঠিক করে রেখে-ছিলেন এবং লর্ড মাউন্টব্যাটেনকে জানিয়েও দিয়েছিলেন যে, বৃটিশ সিভিলিয়ানদের বেলায় তিনি যে অবসর গ্রহণ ও পেন্সনের সুবিধা দিতে রাজী আছেন সেটা তিনি ভারতীয় সিভিলিয়ানদের বেলায় দেবেন না, বড় জোর তাদের বর্তমান সুযোগ ও সুবিধা যাতে ক্ষুণ্ণ না হয় শুধু সেইটুকুর প্রতিশ্রুতি দিতে পারেন। আই সি এস-এর স্থলে বিকল্প কোন বৃত্তি যে তৎক্ষণাৎ জুটে যাবে এমন কোন সম্ভাবনাও তখন দেখা যায় নি। এখন যেমন বিভিন্ন শিল্পসংস্থায় অবসর-প্রাপ্ত আই সি এস অফিসারদের চাহিদা দেখা যায়, তখন তেমন ছিল না। কারণ, যে লাইসেন্স বা পারমিট প্রাপ্তির পথ সুগম করে দেওয়ার জন্য সংযোগকারী হিসাবে প্রাক্তন আই সি এস-দের আদর ভারতীয় রাজনীতি ও অর্থনীতি তখনো সেই লাইসেন্স পারমিটের যুগে এসে পৌঁছায় নি। তা ছাড়া আই সি এস-এর পদমর্যাদা তখনো অক্ষুণ্ণ ছিল, বেতনের হারও ভারতের মত দরিদ্র দেশের পক্ষে একেবারে তুচ্ছ ছিল না। শ্বেতাঙ্গ আই সি এস-দের অপসারণের পরে উপরের দিককার পদগুলিও সহজলভ্য হয়ে উঠেছিল অনেকের পক্ষে, যেটা আগে হয়ত তাঁরা আশা করতে পারেন নি।

সুতরাং ভারতীয় আই সি এস অফিসারেরা যে স্বাধীনতার সঙ্গে সঙ্গে অবসর গ্রহণের কথা ভাবেন নি এতে আশ্চর্য হবার কিছু নেই। কিন্তু শুধু এই কথা বলেই যদি ক্ষান্ত থাকি তবে ভারতীয় সিভিলিয়ানদের উপর অবিচার করা হবে। তাঁদের মধ্যে সবাই যে কেবল চাকুরীর মোহে বা অর্থ কিংবা পদবৃদ্ধির লোভেই জড়িয়ে পড়ে-ছিলেন তা নয়, অনেকে ছিলেন যাঁদের দেশপ্রীতি এবং দেশের সর্বাঙ্গীণ উন্নতিকল্পে জীবনের সমস্ত শক্তি নিয়োগ করার ইচ্ছা কারুর চেয়ে কম ছিল না। স্বাধীনতার অল্প কয়েক দিন পরেই মহাকরণের অলিন্দের এক কোণে দাঁড়িয়ে আমার প্রায় সমবয়স্ক এক সহকর্মী আমাকে বলেছিলেন, 'এতদিন পরে আমাদের সুযোগ এসেছে আমাদের দেশটাকে সুন্দর করে গড়ে তোলবার।' কতখানি আবেগ মনের মধ্যে সঞ্চিত হলে যৌবনের প্রায় শেষ-প্রান্তে উপনীত একটি মিতবাক অফিসারের মুখ থেকে এমন কথা বেরোয় সেটা সহজেই অনুমেয়। এটা শুধু তাঁর কথাই ছিল না, ছিল অনেকেরই মনের কথা। ভারতের অন্যান্য প্রদেশে বা দিল্লীতে কি হয়ে-ছিল জানি না, কিন্তু তখনকার পশ্চিম বাংলার খবর রাখি। এখানে মহাকরণেই হোক আর মফস্বলেই হোক সর্বস্তরের অফিসারদের মধ্যে একটা মানসিক পরিবর্তন যে এসেছিল সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। তখন দিনের মধ্যে বোল সতের ঘণ্টা একাদিক্রমে কাজ করে যাওয়াটাকে অস্বাভাবিক মনে হয় নি। তখন পুলিশের মধ্যে যে জনসাধারণের সঙ্গে সহযোগিতার ভাব দেখা গিয়ে-ছিল তা আগে দেখা যায় নি। দুর্নীতিও অনেক কমে গিয়েছিল বলে শোনা যায়। একজন উচ্চপদস্থ আই বি পুলিশ অফিসার ত' একটা প্রদর্শনীরই আয়োজন করে ফেলনেন সন্ত্রাসবাদীদের ব্যবহৃত রিভলভার, বন্দুক, রাইফেল ইত্যাদি দেখিয়ে বিপ্লববাদকে কৌলীন্য মর্যাদা দেবার জন্য।

হতে পারে এর মধ্যে সবটাই খাঁটি নয়। স্বাধীনতার পূর্বে যে সিভি-লিয়ান উৎকট সাহেবিয়ানার জন্য প্রসিদ্ধ ও ডাণ্ডাবাজিতে সিদ্ধহস্ত ছিলেন তিনি যদি রাতারাতি ভোল বদলে খদ্দরের পাতলুন ও শেরওয়ানী পরে ও মাথায় গান্ধী টুপি চড়িয়ে 'অতিভক্তি' প্রকাশ করেন তবে দুষ্টলোকে তাঁর বিরুদ্ধে তস্করতার অপবাদ দিতে পারে। যিনি গান্ধিজীকে গালাগাল না দিয়ে জল-গ্রহণ করতেন না, তিনি যদি ফাইলের প্রত্যেক মন্তব্যে "জাতির জনকের" উদ্দেশে স্বস্তিবাচন করে বক্তব্য সুরু করেন, তবে তাঁর হঠাৎ পাওয়া গান্ধি-ভক্তি সন্দেহের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। এরকম আরো উদাহরণ আছে কিন্তু তার উল্লেখ নিষ্প্রয়োজন। আসল কথা এই যে মেকি ও ভেজাল বাদ দিলেও বাকী যা ছিল তার সংখ্যাও অনেক। পশ্চিম বাংলা (এবং ভারত-বর্ষের অন্যান্য প্রদেশেও) এমন সব সিভিলিয়ান ও নিম্নপদস্থ অফিসার ছিলেন যাঁদের কার্যক্ষমতা, উদ্যম ও দেশপ্রীতির উপর নির্ভর করে একটা সৎ সুষ্ঠু ও কর্মদক্ষ প্রশাসনিক কাঠামো গড়ে তোলা যেত। প্রথমে মনে হয়েছিল সেটা সম্ভবপর হবে। কিন্তু ক্রমশ সে আশা বিলীন হয়ে গেল। যারা সৎ ও কর্মক্ষম কিন্তু 'বেতসীবৃত্তি' বা চাটুবাদে অভ্যস্ত নয় তারা ক্রমশ পড়ে গেল আড়ালে। কংগ্রেসী রাজনীতিতে ও দলে স্বাধীনতার পরে যে স্বার্থলোভী-দের ভিড় দেখা গিয়েছিল, প্রশাসনিক কাঠামোতেও তার পুনরাবৃত্তি ঘটল।

১৯৪৭ সালে যখন ক্ষমতা হস্তান্তরিত হল, তখন উচ্চপর্যায়ের অফিসারদের মধ্যে বেশির ভাগ ছিল আই সি এস অথবা আই এ এস ক্যাডারভুক্ত এবং কিছু ছিল প্রাদেশিক ক্যাডার থেকে প্রমোশন প্রাপ্ত অফিসার। তাদের যা অভিজ্ঞতা ছিল তাতে পুরানো ধরণে শাসনযন্ত্র চালাতে তাদের বিশেষ কোন অসুবিধা হবার কথা নয় এবং হয় নি। শাসনক্ষমতায় নতুন কর্ণধারেরা আগে যাই বলে থাকুন না কেন, রাজ্যশাসন প্রণালীতে বা অর্থনৈতিক সংগঠনে হঠাৎ কোন বৈপ্লবিক পরিবর্তন আনবার কথা তাঁরা ভাবেন নি, কারণ কংগ্রেসের মধ্যেই দুই প্রবল পরস্পর-বিরুদ্ধ মতবাদ প্রচলিত ছিল যার একটির প্রবক্তা ছিলেন পণ্ডিত নেহরু, অন্যটির সমর্থক ছিলেন সর্দার প্যাটেল। প্রধানত

যে কয়টি ব্যাপার নিয়ে গোড়ার দিকে শাসনযন্ত্রকে ব্যস্ত থাকতে হয়েছিল সেটা হচ্ছে দেশবিভাগের বিষময় ফল থেকে কোন রকমে আত্মরক্ষা করা, আইন ও শৃঙ্খলা যাতে ভেঙে না পড়ে সেটা দেখা, হিন্দু-মুসলমান বিরোধকে সংযত করে আনা, এবং আরো কয়েকটি ছোটখাট বিষয় কিছু অদলবদল করা বা নতুন ব্যবস্থা করা। প্রাথমিক শিক্ষাকে বুনিয়াদী পদ্ধতিতে ঢেলে সাজাবার নিষ্ফল চেষ্টা হোল, গ্রামীণ হেলথ সেন্টারের সংখ্যাবৃদ্ধি হোল, ট্রেড ইউনিয়নের স্বীকৃতি ও শক্তি বৃদ্ধি হোল, শিল্প ট্রাইব্যুনালের মাধ্যমে শ্রমিক-মালিকের বিরোধ নিষ্পত্তির প্রয়াস হোল, তা ছাড়া পূর্বেকার গভর্নমেন্টের অসমাপ্ত কাজগুলি আবার হাতে নেওয়া হোল—কিন্তু এমন কিছু করা হোল না যাতে শাসনব্যবস্থার প্রকৃতিগত কোন পরিবর্তন প্রয়োজন হয়।

এই অবস্থাতে যে সমস্ত অফিসার পুরাতন পদ্ধতিতে শাসনব্যবস্থা পরিচালনা করতে অভ্যস্ত ছিলেন তাঁদের কোন অসুবিধা হোল না। প্রভুর পরিবর্তন হলেও পদ্ধতির কোন পরিবর্তন হয় নি। ঔষধের রং বদলালেও যদি তার উপকরণ ও অনুপান না বদলায় তবে মিক্সচার একই থাকে। এ ক্ষেত্রেও তাই হোল। শাসক সম্প্রদায় ও আমলাতন্ত্রের মধ্যে সম্বন্ধের কোন পরিবর্তন হোল না, শুধু যে আনুগত্য আগে বিদেশী কর্তৃপক্ষকে দেখান হতো সেটা এখন দেখান হতে লাগল কংগ্রেসের রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দকে যাঁরা নির্বাচনে জয়লাভ করে জনগণের প্রতিনিধি হিসাবে শাসনক্ষমতার অধিকারী হয়ে বসলেন। এই আনুগত্যের মধ্যে আন্তরিকতার অভাব ছিল না। কংগ্রেসের যে সব নেতৃবৃন্দের দেশভক্তিতে ভেজাল ছিল না, তাঁরা মন্ত্রিত্ব গ্রহণ করবার পরেও নিজ চরিত্র ও অতীত ত্যাগস্বীকারের দ্বারাই অফিসারদের আনুগত্য অর্জন করেছিলেন; যাঁদের পিছনে সেরকম ত্যাগস্বীকারের ইতিহাস ছিল না তাঁরাও কংগ্রেসের নাম-মাহাত্ম্যে এবং মন্ত্রিত্বের পদমর্যাদার জোরে অফিসারদের শ্রদ্ধা থেকে বঞ্চিত হন নি। কিন্তু আস্তে আস্তে কোন কোন ক্ষেত্রে শ্রদ্ধা প্রদর্শনের স্থান নিল এমন একটি ব্যবহার যার সঠিক বর্ণনা শুধু রবীন্দ্রনাথের ভাষায়ই বলা চলে

'হাস্য মুখে, দাস্য সুখে
বিনীত জোড়কর
প্রভুর পদে সোহাগ মদে
দুদোল কলেবর'

মন্ত্রিমণ্ডলী ও শীর্ষস্থানীয় আমলাবর্গের মধ্যে পরস্পরের যে সম্বন্ধ থাকা উচিত সেটা ক্রমশ বিকৃত হয়ে গেল, এবং উভয়ক্ষেত্রেই আদর্শচ্যুতি ঘটল। আমার বিবেচনায় আই সি এস এবং তার সমপর্যায়ের ঊর্ধ্বতন আমলামহলে যে ঘুণ ধরল তার প্রথম আরম্ভ এইখানে।

সমপর্যায়ের ঊর্ধ্বতন আমলাদের কথা বলছি এই জন্যে যে আর কিছুদিন পরে ক্ষীয়মাণ আই সি এস গোষ্ঠীর অস্তিত্বও থাকবে না, কিন্তু প্রশাসনযন্ত্র টিকে থাকবে, আর থাকবে সেই সব টেকনিক্যাল বা অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ অফিসারবর্গ যারা আই সি এস অফিসারদের স্থান গ্রহণ করবে। এদের মধ্যে যারা প্রতিযোগিতা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে এসেছে তাদের প্রারম্ভিক যোগ্যতা আই সি এস অফিসারদের অপেক্ষা কম হওয়ার কথা নয়। কিন্তু সিভিল সার্ভিসের যে গুণ অপরিহার্য সেটা শুধু বিদ্যা বা বুদ্ধির উপর নির্ভর করে না, করে একটা ঐতিহ্যের উপর, একটা সর্বজনস্বীকৃত নৈতিক মানদণ্ডের উপর, কেরিয়ারের চেয়েও কর্তব্যকে উপরে স্থাপন করবার নিঃস্বার্থবুদ্ধির উপর। প্রাক্তন আই সি এস-দের মোটামুটি একটা ঐতিহ্য ছিল, যদিও সেটা ক্রমশ বিলুপ্তপ্রায় হয়ে গেছে। নতুন প্রবেশকারীদের বেলায় কোন ঐতিহ্যই হয়ত গড়ে ওঠবার সম্ভাবনা হয় নি। চাকুরীর প্রথম কয়েক বৎসর মফস্বলের বিভিন্ন জেলায় এবং ছোট বড় শহরে বিচক্ষণ জেলাশাসকের চোখের সামনে কাজ করে যে বিচিত্র অভিজ্ঞতা আগেকার যুগের আই সি এস অফিসারদের হয়েছিল এখন আর সেটা হয় না। এতটা সময়ও পাওয়া যায় না এবং সেরকম বিচক্ষণ জেলাশাসকও নেই। চাকুরীতে দ্রুত উন্নতির ফলে সবাই এসে কলকাতায় ভিড় করে, আর ফিরে যেতে চায় না। জিপের কল্যাণে বাইরে রাত্রিবাসেরও প্রয়োজন হয় না। অথচ এখন কল্যাণব্রতী রাষ্ট্রের কর্মপরিধি এত অধিক পরিমাণে প্রসারিত হয়েছে যে, ভবিষ্যতের জন্য উপযুক্ত অভিজ্ঞতা অর্জন করতে হলে আরো বেশি দিন ধরে দেশের সজীব ও নির্জীব প্রাণকেন্দ্রগুলির সঙ্গে সংযোগ স্থাপন করা দরকার।

কিন্তু অভিজ্ঞতাই প্রশাসনিক সুব্যবস্থার একমাত্র উপাদান নয়। তার জন্য চাই আমলাবর্গের মধ্যে অভিজ্ঞতার সঙ্গে নৈতিক সাহস এবং বুদ্ধি ও চিন্তার সজীবতা এবং আমলাবর্গ ও মন্ত্রিমণ্ডলীর মধ্যে একটা সুস্থ সম্পর্ক স্থাপন। সে সম্পর্কটা কি রকম হওয়া উচিত সে সম্বন্ধে ঠিক তেরো বছর আগে স্টেটসম্যান কাগজে আমি যে প্রবন্ধটা লিখেছিলাম তার অংশবিশেষ এখানে উদ্ধৃত করলে হয়ত অপ্রাসঙ্গিক হবে না।

"The ideal relation between the superior civil servant and his Minister should be one of mutual trust and frankness. To say that the responsibility of the Minister is to formulate policy and of the civil servant to implement it is not even to state of half-truth. If the secretary is worthy of his job he may render valuable assistance even in the formulation of policy. He is presumed to have a large stock of knowledge and experience which should be at the disposal of his Minister. He can bring to bear on the consideration of a question a critical and neutral judgment which is not bound by any previous commitment, and he may point out snags in a proposed scheme or restrain the optimism of an impetuous Minister when the scheme is defective or the optimism is based on inadequate data or unproved assumptions. * * * * The snags are not to be pointed out for stonewalling reforms but only to ensure that reforms follow the right track after a careful assessment of all the pros and cons. To avoid stating his views fully and frankly and pressing for their acceptance during discussion because the Minister may not like them, or, were still, to anticipate what would please the Minister and put it down as his own views in his notings is the worst disservice that a secretary may do to the Minis-

ter he is serving. A secretary who is afraid of saying politely what he considers to be the correct step will probably will the confidence of the Minister in the end, but even if he does not he is not permitted to deviate from the code which is in the best tradition of the civil service in U. K.'

আমি 'আই সি এস'-এর রূপান্তরের কথা লেখবার জন্য লেখনী ধারণ করেছি। সুতরাং যে সব অফিসার পুরানো ভাবধারা বজায় রাখবার চেষ্টা করেছিলেন তাঁদের কথা বেশি বলব না। কিন্তু স্বল্পসংখ্যক অফিসার অথবা মন্ত্রীর কথা বাদ দিলে একথা বললে বোধ হয় ভুল হবে না যে এই-রকম সুস্থ সম্পর্ক মন্ত্রিমণ্ডলী ও উচ্চপর্যায়ের আমলাবর্গের মধ্যে সুদৃঢ়-ভাবে গড়ে ওঠে নি। পাশাপাশি দুইটি আপাতবিরুদ্ধ মনোভাবের আভাস পাওয়া যায় এই উভয়ের সম্পর্কের মধ্যে। একদিকে মন্ত্রিমণ্ডলী অথবা কোন বিশেষ মন্ত্রীর সম্পর্কে আমলা-বর্গের স্পষ্ট ভাষণের সাহসের অভাব এবং তার প্রত্যেকটি মত বা খেয়ালের সংগে নির্বিচারে নিজের মত মিলিয়ে দেবার চেষ্টা; অপর দিকে আমলা-বর্গকে তাদের বিভাগ পরিচালনে অবাধ স্বাধীনতা প্রদান এবং চাকুরীর বেতন বা ভাতা বা বদলীর ব্যাপারে তাদের সমস্ত কিছু আবদার প্রসন্ন স্মিত হাস্যে মেনে নেওয়া। দুটির কোনটিই আমলাতন্ত্রকে সুস্থ ও সক্রিয় রাখবার পক্ষে অনুকূল নয়।

হঠাৎ কি করে স্বাধীনতার অল্প পরেই সমস্ত পর্যায়ের আমলাবর্গের মধ্যে নৈতিক সাহসের অভাব দেখা দিল এবং সত্যভাষণ অপেক্ষা প্রিয়ভাষণই শ্রেয়ঃ বলে বিবেচিত হোল, তার কোন সংগত কারণ খুঁজে পাওয়া যায় না, যদি না মনে করা যায় যে, যাঁরাই বৃটিশ আমলেও চাকুরীর ব্যাপারে মোটামুটি ন্যায়বিচারের আশা করতেন তাঁদের আর সেই ভরসা রইল না, তাঁদের ধারণা হোল যে প্রভুর মনস্তুষ্টিই হোল উন্নতির একমাত্র পথ, 'নান্যঃ পন্থা'। দু-একটি জেলায় জেলাশাসক এমনভাবে নিজেকে স্থানীয় কংগ্রেস কমিটির প্রেসিডেন্টের আজ্ঞাবহ করে তুললেন যে লোকে ঠাট্টা করে বলত যে, প্রেসিডেন্টই হলেন জেলাশাসক, আর জেলাশাসক হলেন তাঁর অতিরিক্ত অফিসার। মহাকরণে প্রখর ব্যক্তিত্বসম্পন্ন মুখ্যমন্ত্রী বা অপর মন্ত্রীর মুখ থেকে যদি কোন বিষয়ে বিশেষ আগ্রহ প্রকাশ পেতো, তবে তাঁদের সামনে 'না' বলবার সাহস আস্তে আস্তে লোপ পেতে লাগল। হয়ত ভবিষ্যৎ উন্নতির পথে বাধা সৃষ্টি হতে পারে এই ভয় ছিল; হয়ত নিজের বিভাগীয় কাজে যতটা তীক্ষ্ম দৃষ্টি রাখা দরকার ততটা দেওয়া হয় নি বলে প্রচুর বিনয় ও অবিরত সম্মতিসূচক ঘাড়নাড়ার আড়ালে গাফিলতিকে ঢাকবার প্রয়োজন হয়ে পড়েছিল। আই সি এস, আই এ এস বা আই ই এস গোষ্ঠীর বহির্ভূত যে দুজন অফিসারকে বাইরে থেকে আমন্ত্রণ করে এনে দুইটি প্রধান বিভাগের সচিবের পদে বসান হোল তাদের নির্জলা চাটুবাদের অত্যুজ্জ্বল আদর্শ ও সংগে সংগে ফলশ্রুতির মহিমা অপরাপর সচিবের ঈর্ষার উদ্রেক করলেও তাঁরা বুঝলেন যে জিহ্বাগ্রে যদি প্রিয়ভাষিণী সরস্বতী বিরাজ করেন, তবে চাকুরীতে স্থায়িত্ব, উন্নতি ও একাধিকবার পুনর্নিয়োগের জন্য আর কিছুরই দরকার হয় না। যাদের সেই সম্বল নেই সেই সব বর্ষীয়ান উচ্চপদস্থ অফিসারদের অনেকেরই যে মুখ্যমন্ত্রীর ঘরে ঢোকবার আগে হৃৎস্পন্দনের ক্রিয়া একটু দ্রুততর হোত তাতে কোন সন্দেহ নেই। 'কর্তার মেজাজ কেমন আছে' সেটা একান্ত সচিবের কাছে জিজ্ঞাসা না করে একজন উচ্চপদস্থ আই সি এস অফিসার ও আর একজন বিভাগীয় সচিব যে ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়ের কামরাতে ঢোকবার সাহস পান নি সেটা আমার স্বচক্ষে দেখা ঘটনা। আর একজন সুযোগ্য আই সি এস সচিব নিজের মুখ্যমন্ত্রীর মতের বিরুদ্ধাচরণ করবার সাহস না পেয়ে ফিনান্স ডিপার্টমেন্টের অতিরিক্ত সচিবের শরণাপন্ন হয়েছিলেন এই বলে যে, যদি ফিনান্স সম্পর্কে আপত্তি তোলা হয় ও সেটা কেবিনেটে আসে, তবে তাঁর পক্ষে সুবিধা হবে মূল আপত্তিটি আবার নতুন করে তোলবার। যথাকালে ব্যাপারটি কেবিনেটে এল ও ফিনান্সের আপত্তিও আলোচিত হোল, কিন্তু বিভাগীয় সচিবের ক্ষীণতম কণ্ঠও শোনা গেল না। শুধু একটা চিরকুট টেবিলের অন্তরালে অতিরিক্ত ফিনান্স সচিবের হাতে এসে পৌঁছল, যাতে লেখা ছিল, 'ভুলে যেয়ো না, সচিবই হই আর যাই হই আমার পাকাপাকি পদ হচ্ছে জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের, যার বেতন হচ্ছে সাকুল্যে ১৮০০ টাকা মাত্র।' নিজেদের সম্বন্ধে আত্মবিশ্বাসের এতখানি অভাব কি করে এল সেটা আমার বুদ্ধির অগোচর।

এ ত' গেল ব্যক্তিত্বসম্পন্ন মন্ত্রীদের সম্পর্কে আমলাবর্গের ব্যবহারের কথা। যাঁরা সেই শ্রেণীতে পড়েন না এবং মন্ত্রিত্বের আসনে না বসলে যাঁদের কোন বৈশিষ্ট্যই চোখে পড়ত না তাঁদের প্রতি উচ্চপর্যায়ের আমলাদের ব্যবহার ছিল একটু ভিন্ন ধরণের। সেখানে ভক্তি-বিনম্র সদাসঙ্কুচিত ভাব ততটা ছিল না, যতটা ছিল শ্রদ্ধাপ্রদর্শনের একটু আতিশয্য, বাকভংগী ও প্রচ্ছন্ন খোসা-মোদের সাহায্যে তাদের সুপ্ত অভিমানে সুড়সুড়ি দিয়ে তাদেরকে হাতের মুঠোয় আনবার চেষ্টা। চেষ্টা যে কোথাও নিষ্ফল হয়েছে এমন কথা শোনা যায় নি, কারণ যাদের কেতা-দুরস্ত ব্যবহার ও বিশুদ্ধ ইংরাজী উচ্চারণের সামনে প্রাক-মন্ত্রিত্ব যুগে আপনা আপনিই একটা হীন-মন্যতার ভাব এসে পড়ত তারা যদি সব সময়ে উঠে দাঁড়ায়, কারণে অকারণে 'স্যার' বলে, পেন্সিলটা মাটিতে পড়ে গেলে তুলে দিতে পারলে কৃতার্থ হওয়ার ভাব দেখায়, তবে কার এমন পাষাণ প্রাণ যে কৃতজ্ঞতায় বিগলিতচিত্ত না হয়ে পারে? আমলাবর্গের বিভাগীয় পরিচালনায় যে নিরঙ্কুশ স্বাধীনতার কথা আগে উল্লেখ করেছি তার মূল কারণ হচ্ছে এই কৃতজ্ঞতা; সংগে হয়ত আরো দু' একটা কারণ ছিল।

বিরুদ্ধ মত প্রকাশ করলেই বা 'কর্তার ইচ্ছায় কর্ম' না করলেই যদি চাকুরীর স্বাভাবিক উন্নতি ব্যাহত হয়, তবে সে বড় ভয়ের কথা। বৃটিশ আমলেও যে এতখানি ভয় ছিল না বা ভয়ের কারণ ছিল না তার প্রমাণ আছে। সে প্রসংগে দুটি কাহিনীর উল্লেখ করছি যার সংগে আমার ব্যক্তিগত কোন সম্পর্ক ছিল না।

প্রথম ঘটনাটি ঘটেছিল একটি মহকুমা শহরে। একজন তরুণ বাঙালী আই সি এস অফিসার যখন সেখানে মহকুমার ভারপ্রাপ্ত হয়ে এলেন তার আগে থেকেই সন্ত্রাসবাদ দমনের নাম করে সেখানে পুলিশী রাজত্ব কায়েম হয়ে বসেছে এবং লোকের লাঞ্ছনা ও উৎপীড়নও মাত্রা ছাড়িয়ে গেছে। জেলার ইংরাজ ম্যাজিস্ট্রেট, ইংরাজ পুলিশ সুপার এবং ইংরাজ জজ সকলেরই ধারণা পুলিশের দৃঢ়মুষ্টি একবার শিথিল হলেই বিস্ফোরণ ঘটবে, কিছুতেই ঠেকানো যাবে না। অফিসারটি সামান্য কিছুদিন সময় নিলেন অবস্থাটা ভাল করে বুঝতে, তার পরেই নিজের দায়িত্বে তিনি সমস্ত

ব্যবস্থা উল্টে দিলেন, অতিরিক্ত পুলিশ বাহিনী সদরে ফেরত পাঠিয়ে দিলেন, স্পেশ্যাল আইনের প্রয়োগ বন্ধ করলেন ও শান্তি ফিরিয়ে আনলেন। এ সব সত্ত্বেও সন্ত্রাসবাদের পুনরভ্যুত্থানের কোন লক্ষণ দেখা গেল না। জেলা ম্যাজিস্ট্রেট রেগে আগুন, তিনি রিপোর্ট করলেন চীফ সেক্রেটারীর কাছে, মিঃ—সন্ত্রাসবাদীদের উস্কানি দিচ্ছে, তাকে অবিলম্বে সরিয়ে নেওয়া দরকার। চীফ সেক্রেটারীর কাছে যখন সেই তরুণ অফিসারটির ডাক পড়ল, তখন তিনি খুব খানিকটা উপদেশবর্ষণের পর তাঁকে বললেন তাঁকে অবিলম্বে সরিয়ে এনে জুডিসিয়াল ট্রেনিং-এর জন্য পাঠান হবে, কোন মহকুমা আর তার হাতে নিরাপদ নয়। তখন স্যার উইলিয়াম প্রেন্টিস হোম মেম্বার। বারান্দা দিয়ে যাবার সময় তাঁর ঘর সামনে পড়াতে অফিসারটি বিশেষ কোন উদ্দেশ্য না নিয়ে শুধু সম্মান দেখাবার জন্য একবার তাঁর ঘরে ঢুকলেন। দু' একটা কথার পর স্যার উইলিয়াম হঠাৎ জিজ্ঞাসা করলেন, 'মনে হচ্ছে, একটা কোন ঘটনা ঘটেছে যাতে তুমি একটু বিচলিত বোধ করছ? কি হয়েছে?' অফিসারটি তখন চীফ সেক্রেটারীর ঘরে যা ঘটেছিল সব খুলে বললেন। স্যার উইলিয়াম তাঁকে বললেন,

'well—you have my fullest support for what you have done, Don't worry. If anything happens come straight to me.'

অফিসারটিকে অবশ্য স্যার উইলিয়াম প্রেন্টিসের কাছে আর আসতে হয় নি—তার বদলীর প্রস্তাবটা যখন অনুমোদনের জন্য স্যার উইলিয়াম প্রেন্টিসের কাছে গেল তখন তিনি নিজের হাতে নীল পেন্সিল দিয়ে অর্ডারটি কেটে বড় বড় অক্ষরে লিখে দিলেন, 'মিঃ—এক্সিকিউটিভ লাইনে থাকবেন। তাকে—তে এস ডি ও করে পাঠাও' বলে এমন একটি মহকুমার নাম করলেন যে ইংরাজ বা বাঙালী যে কোন তরুণ আই সি এস অফিসারের পক্ষে লোভনীয় পোস্টিং।

আর একজন বাঙালী আই সি এস অফিসার কোন বিভাগে ডেপুটি সেক্রেটারী থাকাকালে কোন বিষয় সম্বন্ধে এমন একটা মন্তব্য লিপিবদ্ধ করেছিলেন যেটা ভারতীয় স্বার্থের পক্ষে হানিকর, কিন্তু ইংরাজের স্বার্থের অনুকূল। কিছুক্ষণ পরে সচিবের ঘরে তাঁর ডাক পড়ল, সচিব জিজ্ঞাসা করলেন, 'তুমি যা লিখেছ এটাই কি তোমার সত্যিকার মত?' বাঙালী অফিসারটি একটু অপ্রস্তুত হয়ে বললেন, না তবে আমি ভেবেছিলাম এটা তোমার মত এবং এইটাই তোমার পছন্দ হবে।' সেক্রেটারী বললেন, 'দেখ, আমরা কি চাই সেটা আমরা জানি, কিন্তু ভারতীয়েরা কি চায় সেটা আমাদের জানা প্রয়োজন। তোমরা যদি খোলাখুলিভাবে তোমাদের মতামত আমাদের না জানাও, তবে তোমাদের মত ভারতীয় অফিসারের মূল্য আমাদের কাছে অনেক কমে যায়।'

আমার এ কথা বলার উদ্দেশ্য এই নয় যে, এরকম দৃষ্টিভঙ্গী বা উদারতা সব ইংরাজের ছিল। হয়ত বেশির ভাগ ইংরাজেরই ছিল না। কিন্তু কারুর কারুর যে ছিল সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। যে সমস্ত ভারতীয় অফিসারকে বিপজ্জনক মনে করে তারা এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় বদলী করেছিলেন তাদের সম্পর্কেও কারুর কারুর মনে যে কিছুটা শ্রদ্ধার ভাব ছিল এমন প্রমাণ পাওয়া গেছে।

সেই শ্রদ্ধার ভাব আজকাল স্বাধীনতা-উত্তর যুগে এদেশের রাজনৈতিক নেতাদের মনে আছে কি না সন্দেহ এবং নেই বলে অফিসারদের চিন্তায় ও কর্মে স্বাধীনতার চিহ্নটুকুও অবলুপ্তির মুখে। যে সব মন্ত্রীর কিছুমাত্র ব্যক্তিত্ব আছে, তিনি মত চান না, সম্মতি চান এবং আমলাবর্গের কাছ থেকে সেটা পাওয়াও তাঁর পক্ষে কিছু শক্ত নয়। সেক্রেটারিয়েটের ফাইল ঘাঁটলে এর ভূরি ভূরি দৃষ্টান্ত মেলে, আমি মাত্র একটি ঘটনার উল্লেখ করছি। কয়েক বছর আগে কোন বিশিষ্ট মন্ত্রীর একটি প্রস্তাবে ফিনান্স ডিপার্টমেন্ট থেকে আপত্তি তোলা হয়। যিনি আপত্তি তুলেছিলেন সেই আমলাটিকে ডেকে মন্ত্রী মহাশয় বললেন, 'এটা যে নিয়মানুসারে করা চলে না সে কথা আমি জানি। কিন্তু আমি এটা করতে চাই। কি করে করা যায় তার উপায় বের করাই তোমার কাজ।' বলা বাহুল্য উপায় বেরিয়েছিল।

দুইটি প্রধান কারণ সিভিল সার্ভিসকে একই দিকে ঠেলে নিয়ে যাচ্ছে এবং সেটা অবনতির দিক। প্রথমটি হচ্ছে আমলাবর্গের উচ্চাকাঙ্ক্ষা অথবা কেরিয়ার প্রীতি, দ্বিতীয়টি হচ্ছে মন্ত্রীবর্গের নিজেদের অভিপ্রায় সিদ্ধিতে অতিরিক্ত আগ্রহ ও পরমত-অসহিষ্ণুতা। আর একটি কারণও আছে যেটা শুধু ক্ষেত্রবিশেষে প্রযোজ্য—সেটা হোল কোন কোন মন্ত্রীর অযোগ্যতা। শেষোক্ত কারণটির বিশদ ব্যাখ্যার দরকার হয় না। যেখানে মন্ত্রীর এমন কোন বিদ্যাবুদ্ধি বা ধৈর্য নেই যাতে তিনি বিভাগীয় কাগজপত্র বা মন্তব্য হৃদয়ঙ্গম করতে পারেন, এমন কোন দূরদৃষ্টি নেই যাতে কোন পথে দেশের কল্যাণ হবে সেটা বুঝতে পারেন, এমন কোন মনীষা নেই যাতে নতুন কোন নীতি উদ্ভাবন করতে পারেন, অথবা এমন কোন উদ্যম নেই যাতে বিভাগটিকে নতুন উৎসাহে সঞ্জীবিত করতে পারেন, সেখানে আমলাবর্গ কোন ভাল কাজ করলেও উৎসাহ পায় না এবং কিছু না করলেও বা মন্দ কাজ করলেও তিরস্কৃত হয় না। এমন অবস্থায় বিভাগের ক্রমাবনতি রোধ করা দুঃসাধ্য হয়ে পড়ে—যদি না উচ্চপর্যায়ের আমলারা অন্তরের তাগিদ থেকে এই ক্রমাবনতি রোধ করতে বদ্ধপরিকর হন। কিন্তু নিরাসক্তভাবে এতখানি কর্তব্যের প্রেরণা হিত এবং মনোহারী বাক্যের মতই দুর্লভ। সোজা কথায় বলা চলে যে ভাল আমলা তৈরি করতে হলে ভাল মন্ত্রী হওয়া দরকার।

প্রথম ও দ্বিতীয় যে দুটি কারণকে প্রধান কারণ বলে উল্লেখ করেছি তাদের মধ্যে একটা অঙ্গাঙ্গী সম্বন্ধ আছে। প্রশাসনিক কাজে লিপ্ত থেকে উচ্চাকাঙ্ক্ষা (এবং ভোগাকাঙ্ক্ষা) চরিতার্থ করবার একটা প্রধান উপায় হচ্ছে বিশিষ্ট মন্ত্রীবর্গের প্রীতি বা প্রসাদ অর্জন করা, কারণ শেষ পর্যন্ত তাদের হাতেই সবরকম প্রসাদ বিতরণের ভার। তাদেরই পরোক্ষ সমর্থনের বলে আমলাবর্গের সঙ্গে বিশেষ বিশেষ পুঁজিপতিদের হৃদ্যতা হয় এবং দৃশ্য অদৃশ্য নানারকম অনুগ্রহ বিতরণের পালা আরম্ভ হয়। career-এর কথাই যদি ধরা যায় তবে আজকাল অনেক বেশি এবং অনেক বিচিত্র রকমের career-এর দ্বার উন্মুক্ত হয়েছে—অবসর গ্রহণের পূর্বে বা পরে যেটা আগে কল্পনা করা যায় নি। ক্রমবর্ধমান শাসনযন্ত্রের মধ্যে কত যে উচ্চ বেতনের নতুন পদ সৃষ্টি হতে পারে তার ইয়ত্তা নেই। নিয়মবিরুদ্ধভাবে অবসরের সময় বিলম্বিত করে দেওয়া এখন আর ব্যতিক্রম নয়, বিশেষ অনুগৃহীত আমলাদের বেলায় সেটা এখন নিয়মের মধ্যে দাঁড়িয়েছে। অবসর গ্রহণের পরেও এদের উন্নতির দ্বার রুদ্ধ হয় না। শ্রীযুক্ত ভূতলিঙ্গমের বেলায়, অবশ্য ব্রাসেলস-এর European Common Market-এর

দরজা আপাতত বন্ধ আছে কিন্তু ভবিষ্যতে সেটা যে খুলবে না এটা কেউই শপথ করে বলতে পারে না। তাছাড়া ভাগ্যবান ব্যক্তিদের জন্য গভর্নরের পদ আছে, বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যের পদ আছে, বিভিন্ন পাবলিক সেক্টরে সর্বাধ্যক্ষের পদ আছে, বৃহত্তর মেট্রোপলিটান বোর্ডের চেয়ারম্যানের পদ আছে—আর কিছু না জুটলে অন্তত একটা উপদেষ্টার পদ সৃষ্টি করতে কোন বাধা নেই। কাজের কি অভাব আছে? যোগ্য ব্যক্তির সন্ধান পেলেই পার্কিনসনের নীতি অনুসারে নতুন পদ আপনা-আপনি সৃষ্টি হতে থাকে, যার প্রস্তুতিপর্বের অনেকটাই অবসর গ্রহণোন্মুখ অফিসার আগে থেকেই তৈরি করে রেখে গিয়েছেন।

কিন্তু এ 'যোগ্যতার' একটা বিশেষ সংজ্ঞা আছে। তার অনেকটাই হচ্ছে কর্মজীবনে থাকাকালে মন্ত্রী বা তার পারিষদবর্গ বা তার দলভুক্ত বিশেষ বিশেষ লোকের মন যুগিয়ে চলা বা তাদের বিশেষ সুবিধা করে দেওয়া। কিন্তু তাই যদি যোগ্যতার বিচারের মাপকাঠি হয় তবে সেটা প্রশাসনিক ব্যবস্থার স্বাস্থ্যের লক্ষণ নয়। তাতে মন্ত্রীরা তাদের খেয়াল চরিতার্থ করতে পারেন কিন্তু সদুপদেশ পেতে পারেন না। তাতে আমলাবর্গের মেরুদণ্ড সোজা থাকে না, 'কর্তার ইচ্ছায় কর্ম' করাটাই প্রধান কর্তব্য হয়ে দাঁড়ায়। তাতে তাঁরাই শুধু দ্রুতগতিতে ধাপে ধাপে উন্নতির শিখরে উঠে যান যাঁদের মূলনীতি হল 'সদা প্রিয় কথা বলবে, কদাচ অপ্রিয় সত্য বলবে না'। কিন্তু যাঁরা দেশের কল্যাণ বিধানকেই নিজেদের দায়িত্বশীল পদের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ বলে মনে করেছিলেন, তার জন্য যেখান থেকে যতটুকু জ্ঞান আহরণ করা দরকার তা করতে ত্রুটি করেন নি, পরিশ্রমে কাতর হন নি, কারুর কাছে বিবেককে বাঁধা দেন নি, এবং সত্যি যেটা দেশের পক্ষে মঙ্গলজনক তা প্রকাশ করতে কুণ্ঠিত হন নি তাঁদের জন্য কোন স্বীকৃতি নেই। তাঁরা হঠাৎ একদিন অবাক হয়ে দেখেন যে যখন তাঁরা কর্তব্যের প্রেরণায় career-এর কথা ভাবেন নি তখন প্রিয়ম্বদ কর্তাভজার দল অলক্ষিতে তাঁদের ডিঙিয়ে রাজদরবারে আপন স্থান পাকা করে নিয়েছে, নিম্নশ্রেণীর মুদ্রা যেমন করে উচ্চশ্রেণীর মুদ্রাকে স্থানচ্যুত করে সারকুলেশনের আসর জাঁকিয়ে বসে। গ্রেশামের আইন যদি প্রশাসনিক ব্যাপারেও প্রভাব বিস্তার সুরু করে তবে সমগ্র শাসনব্যবস্থা ওলট-পালট হতে বেশি দিন লাগে না।

কিন্তু আরও একটা ভয়ের কারণ হচ্ছে এই যে, 'কর্তার ইচ্ছায় কর্ম' করা যাদের স্বভাব তাদের হাতে গণতন্ত্রের সমাধি রচনা হতে বেশি দিন লাগে না। আজ যদি শুধু—কোন মন্ত্রীর ব্যক্তিগত বা গোষ্ঠীগত স্বার্থে কোন একটা প্রকল্প রচনা করতে একটি আমলার বিবেক বিদ্রোহ না করে তবে কাল তিনি সেই মন্ত্রীর রাজনৈতিক দলগত স্বার্থে এবং সেই দলকে নির্বাচন বৈতরণী পার করে দেবার উৎসাহে—এমন কিছু করতেই কুণ্ঠিত হবেন না যেটা বেআইনি ও ন্যায়নীতিবিরুদ্ধ হলেও নির্বাচনে জয়লাভ করার একমাত্র উপায়। সমস্ত সভ্য দেশে গণতান্ত্রিক প্রথায় নির্বাচন টিকে আছে দুটি অবলম্বনের উপর—এক, আমলাবর্গের সততা, দুই, বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের মধ্যে নির্বাচনের বিশুদ্ধি রক্ষার জন্য আগ্রহ এবং আমলাবর্গ যাতে নির্বিঘ্নে তাদের কর্তব্য সম্পাদন করতে পারে সেইদিকে সতর্ক দৃষ্টি রাখা। আমাদের দেশে দ্বিতীয়টির অভাব আছে, কারণ আমি অন্তত দুটি ঘটনার কথা জানি যেখানে কংগ্রেসের পরলোকগত দুজন প্রভাবশালী মন্ত্রী দুটি বাই-ইলেকশনে অনুরোধ করেছিলেন যে জেলার কর্তৃপক্ষ নির্বাচনের ব্যাপারে যেন তাঁদের সাহায্য করেন অথবা নির্বাচনের পরে এক ব্যালট বাক্সের কাগজ অন্য বাক্সে চালান করে দেন। সৌভাগ্যের বিষয় আমলাবর্গের বিবেক তখনো সজীব ছিল এবং এই অনুরোধ পালিত হয় নি। কিন্তু যদি ধীরে ধীরে বশংবদ আমলাবর্গেরই প্রাধান্য ঘটে এবং তারই সরকারী অনুগ্রহের প্রধান অংশীদার হয়ে ওঠে তবে নির্বাচনে কারচুপি করাও একেবারে অসম্ভব হবে না। হিটলার যে ভোটের মাধ্যমেই আত্মকর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করেছিলেন একথা মনে রাখা দরকার।

যতদিন না মন্ত্রী ও উচ্চপর্যায়ের আমলাদের মধ্যে নীতির ভিত্তিতে একটা সুস্থ সহজ সম্পর্ক গড়ে উঠবে ততদিন প্রশাসনিক ব্যবস্থা ও গণতন্ত্রের স্থায়িত্ব সম্পর্কে যে অনিশ্চয়তা ও সম্ভাব্য বিপদের কথা উল্লেখ করেছি তা দূর হবে না। শুধু মন্ত্রীরাই নন একটি সৎ, সুস্থ, সক্ষম, বুদ্ধিমান ও অক্লান্তকর্মী আমলাগোষ্ঠীও যে দেশের একটা সম্পদ সেকথা বিনা দ্বিধায় স্বীকার করে নেওয়া উচিত।

বৈষ্ণব-সাহিত্যের অমূল্য অবদান

ভক্তিজগতের কৌস্তুভরত্ন, ভগদ্ভক্তগণের সাধনার ধন, ভক্তের তুলসী-মালা সদৃশ মহাপবিত্র ভক্তিশাস্ত্র সমন্বয়।

বৈষ্ণব গ্রন্থাবলী

শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রলাপ ও শিক্ষাষ্টক

শ্রীচৈতন্যদেবের শ্রীকৃষ্ণলাভের জন্য যে উৎকণ্ঠা, এই 'প্রলাপে' তাহা অভিব্যক্ত। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শ্রীমুখনিঃসৃত 'শিক্ষাষ্টক শ্লোকই' তাঁহার একমাত্র রচনা। শ্রীল কৃষ্ণদাস গোস্বামীর সুললিত পদ্যানুবাদে এই অমিয় মাধুরী লীলায়িত।

নরোত্তম বিলাস

বৈষ্ণবগণের পরম উপভোগ্য উপজীব্য ভক্তিচরিতামৃত।

দুর্লভসার

শ্রীচৈতন্যমঙ্গল-রচয়িতা শ্রীল লোচনদাস বিরচিত, বৈষ্ণবগণের সংপূজিত।

আত্মতত্ত্ব

বৈষ্ণব দর্শনের সূক্ষ্মতম অনুসরণ।

মনঃশিক্ষা

শ্রীপ্রেমানন্দ দাস ঠাকুর বিরচিত। বৈষ্ণব-সিদ্ধান্ত সাধন-ভজনের নিগূঢ় মর্মসমাহিত।

শ্রীচমৎকার চন্দ্রিকা

পরম পণ্ডিত শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী প্রণীত সংস্কৃত গ্রন্থ হইতে তাঁহার সুযোগ্য শিষ্য পরম বৈষ্ণব শ্রীল কৃষ্ণদাসের সুললিত পদ্যানুবাদ।

পাষণ্ড-দলন

মূর্তিমান বৈরাগ্য শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর বিরচিত প্রেমভক্তির লহর-লীলা।

ভক্তিতত্ত্বসার

হাটপত্তন, শ্রীশ্রীগুরুবন্দনা, নামসংকীর্তন, চৌত্রিশ পদাবলী, শ্রীকৃষ্ণের অষ্টোত্তর শতনাম, নরোত্তম দাসের প্রার্থনা, প্রেমভক্তি চন্দ্রিকা। সুলভে নামমাত্র মূল্যে বিতরিত।

মূল্য ঃ ৩. টাকা।

বসুমতী প্রাইভেট লিমিটেড ঃ ১৬৬, বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী স্ট্রীট, কলি-১২

স্বাধীন ভারতে পত্রপত্রিকার স্থান / পান্নালাল দাশগুপ্ত

হাতের কাছে আমার কোন তথ্য নেই, সংখ্যার দিক থেকে স্বাধীন ভারতে পত্র-পত্রিকা কত বেড়েছে। বেড়েছে তো নিশ্চয়ই, প্রতিটি খবরের কাগজের সারকুলেশন দেখলেই বোঝা যায়। প্রচার বৃদ্ধি পাবে এটা খুবই স্বাভাবিক। কেন না আমাদের দেশে কেবল স্বাধীনতাই এলো না—গণতন্ত্রও এলো। গণতন্ত্রের চতুর্থ স্তম্ভ বা fourth estate হলো খবরের কাগজ। কাজেই গণতান্ত্রিক স্বাধীন ভারতে খবরের কাগজের সংখ্যা ও পত্র-পত্রিকার বৃদ্ধি হওয়া অত্যন্ত স্বাভাবিক কথা।

কেবল গণতন্ত্র হয়েছে বলেই পত্র-পত্রিকার সংখ্যা বেড়েছে, তাই নয়, দেশটা অগণতান্ত্রিক থাকলেও হয়তো পত্র-পত্রিকার সংখ্যা বাড়তো। কেন না এটা কেবল গণতন্ত্রেরই যুগ নয়, প্রচারেরও যুগ। mass-media বলতে যে কর্মকাণ্ডটি বোঝায়, তার উদ্দেশ্য সর্বদাই সাধু নয় এবং গণতান্ত্রিকও নয়। একনায়ক রাষ্ট্রগুলির প্রচার ও mass-media ধূমটাও কম নয়। তাছাড়া যে সব বৃহৎ শিল্প-বাণিজ্য গড়ে উঠছে—তার পণ্যদ্রব্যের বিক্রয়ের স্বার্থে তুমুল প্রচারিকতার দরকার—আমেরিকার নিউ-ইয়র্ক টাইমের রবিবাসরীয় সংখ্যার পৃষ্ঠাসংখ্যা নাকি শ'দেড়েক পাতার! এতে এই বোঝায় যে, ঐ কাগজ বিজ্ঞাপনেরই জন্য—আর আমেরিকার কাগজশিল্পের প্রাচুর্য। আমাদের দেশের খবরের কাগজগুলি দেখলেই বা কী দেখি। হিসেব করে দেখেছি সবচেয়ে সর্বজনমান্য যে খবরের কাগজ—অর্থাৎ Statesman তাতে সবচেয়ে খবর কম—এবং বিজ্ঞাপন বেশি—অর্ধেকের উপরে স্থান বিজ্ঞাপনই গ্রহণ করে থাকে। অন্যান্য কাগজেরও লক্ষ্য একই। একথাও শুনেছি teleprinter-এর মারফৎ পি-টি-আই প্রতিদিন যত সংবাদ দেয় তার শতকরা ৯০ ভাগই নাকি ব্যবহৃত হয় না। অতএব কী সংবাদ পাই জানি, আর কী সংবাদ পাই না—ভগবান জানেন। সম্পাদকেরা জানেন, কী ধরণের সংবাদ পাঠকেরা পড়তে চান—পাঠকদের রুচি চিন্তা চৈতন্য বেশ তৈরি বা conditioned করে রাখা হয়েছে—যেমন চা, কফি, সিগারেট কোম্পানীকে প্রথমে একটা টেস্ট বা রুচি তৈরি করতে হয়েছে নানা ধরণের প্রচারের সাহায্যে। সংবাদও এ জগতে একটা পণ্য বা comodity এই সংবাদ-পণ্যের ব্যবসায়েও লাভ-লোকসান আছে—কোন ধরণের নেশা যদি পাঠকদের মধ্যে তৈরি না থাকে—তবে এ ব্যবসা চলবে কেমন করে? আর এত সহস্র ধরণের সংবাদ আজ নানাদিক থেকে এসে হাজির হচ্ছে—তাতে চতুরতার সংগে বাছাই করতে পারলে সংবাদপণ্য নিয়ে পাঠকদের কাছে চমক লাগানো হয়। হয়তো দেখা যায় সংবাদটা সর্বশেষ বটে, কিন্তু নতুনত্ব বিশেষ কিছু নেই—কিন্তু দিনের পর দিন তাই দিয়ে পাঠকদের নেশাগ্রস্ত মনে বেশ রসদ জুগিয়ে দেওয়া যায়।

বিপ্লবী জননেতা প্রবীণ সাংবাদিক শ্রীপান্নালাল দাশগুপ্তের হাসপাতালে অস্ত্রোপচার হয়েছে। এই সংবাদ কোনো পত্রিকায় প্রকাশিত না হলেও বর্তমান প্রবন্ধের পাঠকদের পক্ষে সে খবর জানা দরকার। কারণ, ঐ অবস্থার মধ্যেই তিনি পূর্ব-প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী নির্দিষ্ট দিনেই রচনাটি আমাদের কাছে পাঠিয়েছেন। —সম্পাদিকা

গণতান্ত্রিক ভারতে খবরের কাগজ বা পত্র-পত্রিকা ছাপানো আজকাল এমনই ব্যয়-সাপেক্ষ হয়ে পড়েছে যে সাধারণ লোক উদ্যোগী হয়ে কিছু করবেন এমন উপায় নেই। কিসে কিসে খরচ বেড়েছে তার ফিরিস্তি দিতে বসব না।—সাধারণ কাগজের পক্ষে বিজ্ঞাপন মারফৎ আয়ের রাস্তা বাড়ানো এত দুরূহ হয়ে পড়েছে—যে এই চতুর্থ এস্টেটে সাধারণ লোকদের স্থান ক্রমশ অন্তর্হিত। যে সব যুবক-যুবতীরা সংবাদপত্রের মারফৎ দেশসেবা করবেন মনে করেন, অথবা যাঁদের সাংবাদিক প্রতিভা আছে—তাঁরা বড় বড় প্রতিষ্ঠানে আত্মবিক্রয় করে বসে থাকতে বাধ্য। সাংবাদিক হিসাবে আদর্শবাদের সেবা করার যখন আর সুযোগ নেই, তখন পেশাদার সাংবাদিক হয়ে পারিবারিক জীবনের সার্থকতার সাধনাই করে থাকেন। আবার যেহেতু এটা প্রচারের যুগ, রাজনীতিও যেখানে প্রচারজীবী, যেখানে প্রচারকেদের বা সাংবাদিকদের দামটা হঠাৎ বেড়ে গেছে। প্রেস কনফারেন্সের ধূম দেখলেই তা বোঝা যায়। কারো বক্তৃতা—জনসভাতেই হোক; আর আইনসভা-লোকসভাতেই হোক—যদি খবরের কাগজে একটু ঠাঁই না পায়—তবে

বক্তৃতা করার কি মানে! ফলে সম্পাদক ও সাংবাদিকের দিকে একচোখ রেখেই সবসময় বক্তৃতা করতে হয়।

পত্র-পত্রিকা সম্বন্ধে বলতে গেলে সম্পাদক ও সাংবাদিকের কথা বাদ দিয়ে কেবল সংখ্যাতত্ত্ব দিয়ে কতটুকু বোঝা চলে। এখানে সবটা মিলিয়ে সম্পূর্ণ ছবিটা যখন দেখি তখন দেখা যায় সম্পাদক, (যদি তিনি মালিকও না হন) সাংবাদিক, পাঠক-পাঠিকা—সবাই যেন দিন দিন অসহায়-ভাবে—অন্য কারো আদর্শ, অন্য কারো রাজপ্রসাদের সেবা করে যাচ্ছেন। তবে রাজপ্রাসাদে ভূরিভোজনের সময় আশপাশের ইতরজনেরাও যেমন কিঞ্চিৎ পেয়ে থাকেন—সেভাবে আমরাও কিছু কিছু পাই। সংবাদপণ্যের ক্ষেত্রেও বৃহৎ পুঁজির এই সদম্ভ অনুপ্রবেশ ও আগ্রাসী সর্বাধিকার সম্বন্ধে সবাই নালিশ করেন—মায় ভারত সরকার পর্যন্ত—কিন্তু ভারত সরকারও নাকি অসহায়। মুখে ছোট ছোট কাগজ-গুলিকে সাহায্য করবেন বলেন—বলেন ছোট পত্র-পত্রিকাগুলিই নাকি গণতন্ত্রের বাহন কিন্তু কার্যত ছোট কাগজগুলি—ছোট পত্র-পত্রিকাগুলির কী হাল তা তো আমরা সবাই জানি।

স্বাধীনতা সংগ্রামের যুগের সংবাদ-পত্র স্বাধীনতার আদর্শ দ্বারাই নিয়ন্ত্রিত হতো। স্বাধীনতার পরে দেশবাসীরা সবাই যেন একটু গা ঢিলে দিলেন—অর্থাৎ ভাবনাটা হলো এই, "বহু সংগ্রাম ও সাধ্য সাধনা" (?) করে তো স্বাধীন হয়েছি—এবারে একটু 'রিল্যাক্স' করি না কেন? স্বাধীনতার পরে গণতন্ত্র, সমাজতন্ত্র ও দেশ গঠনের আদর্শগুলি অবশ্য এজেন্ডাতে ছিল—কিন্তু ওটা নিয়ে কোন ইমার-জেন্সী বোধ ছিল না—না হলেই নয় এবং এখনই না করলে নয়—এমন বোধ জাগাতে পারা যায় নি—হবে, হচ্ছে হবে—মূল জিনিসটা হাতে আছে তো—দেশটা আমাদের হাতের মুঠোর মধ্যেই এসেছে, এখন একটু ব্যক্তিগত সুখসুবিধার দিকে নজর দিলেই বা দোষ কি—অত তাড়া কিসের! কাজেই আদর্শবাদটা একটা মতবাদের তর্ক-বিলাসে পরিণত হতে দেখা গেল। মতামত প্রত্যেক নরনারীরই একটা আছে—তাই বলেই ঐ মতামতের জন্যই তারা বিশেষ বিশেষ মতাদর্শী এমন মনে করার বিন্দুমাত্র কারণ নেই। যে কোন চোরেরও একটা মত আছে—তাই বলে তার আদর্শ আছে কি? মতামতটা মতবাদের মধ্য দিয়ে তখনই বিশেষ আদর্শবাদে পরিণত হয়—যখন তার জন্য মানুষ আত্মত্যাগ করতে পারে—এমন কি প্রাণ দিতেও পারে। মনে হবে স্বাধীন ভারতে মতবাদের ছড়া-ছড়ি—পত্র-পত্রিকা আর খবরের কাগজের মারফৎ তা সর্বত্র অল্পবিস্তর ছড়িয়েছে—অন্তত যারা স্বাক্ষর বা লিটেরাট তাদের মধ্যে—কিন্তু আদর্শের সৃষ্টি কখনও পত্র-পত্রিকা দিয়ে হয় না—হয় প্রাণ দিয়ে, রক্ত দিয়ে। অতএব খবরের কাগজগুলি কেন আদর্শহীন হলো—এ জাতীয় অভিযোগ কর্মীদের পক্ষে বোধহয় খুব সমীচীন হয় না। অবশ্য কর্মীরা যেখানে প্রত্যক্ষ সংগ্রামে প্রাণ-পাত করেছেন—তাঁদের ব্যথা-বেদনা, আদর্শ ও বক্তব্যকে খবরের কাগজ যখন প্রকাশ করে না—নীরবতার ষড়যন্ত্র দিয়ে মেরে দেয়—তখন তাদের অপ-রাধটা সামান্য নয়—সাংঘাতিক।

আর একটা কথা। যাই ঘটে থাকুক, আবার কিন্তু দেশে একটা অনিশ্চয়তার আবহাওয়া উপস্থিত। যা পেয়েছি বলে দৃঢ়প্রত্যয় হয়েছিল, অর্থাৎ স্বাধীনতা—সেটাও বিপন্ন—গণতন্ত্রও ক্রমশ ক্ষীয়মাণ, আর সমাজ-তন্ত্র একটা স্বপ্নমাত্র। আর জীবন-ধারণ প্রাণান্তকর—সমাজ দূষিত আব-হাওয়ায় সকলের জন্যই শ্বাসকষ্ট সৃষ্টি করে চলেছে। এখানে আবার আদর্শ-বাদের প্রয়োজন হয়েছে—কেবল মত-বাদের নয়। তার জন্য পত্র-পত্রিকা-গুলির একটা বিশেষ ভূমিকা আছে—বিশেষ করে অসংখ্য ছোট পত্র-পত্রিকা-গুলির। এগুলির বড় কাগজের সঙ্গে কোন প্রতিযোগিতার প্রয়োজন নেই, প্রতিযোগিতা করেও লাভ নেই। এগুলিই পারে নতুন ধরণের রুচি ও বিচার-বিবেচনাবোধ সৃষ্টি করতে। খবরের কাগজের (mass-media বৃহৎ কাগজগুলি) প্রভাব সাধারণত কয়েক ঘণ্টার জন্য—অফিসজীবীর পক্ষে হয়তো আধঘণ্টাখানেক। কিন্তু সাপ্তাহিক ও মাসিক পত্র-পত্রিকাগুলির জীবন তার চেয়ে বেশি। সপ্তাহ ভর ঘরে পড়ে থাকে কেউ কেউ বাঁধিয়েও রেখে দেন। তাছাড়া পৃথিবীর চারো তল্লাট থেকে নিত্যদিন যে হাজার হাজার সংবাদ এসে পৌঁছচ্ছে তাদের সমীক্ষিত তাৎপর্য যদি সাপ্তাহিকগুলি না করে দেয় তবে দৈনিক কাগজগুলির সংবাদ বুঝে ওঠাও শক্ত হয়। এরা খবরের কাগজের Guide হতে পারে। এরা নতুন ধরণের রুচি সৃষ্টি করতে পারে। প্রস্তুত বা তৈরি পাঠক-পাঠিকাদের প্রচলিত রুচির পরিতুষ্টি করতে যাওয়া, এবং তাই নিয়ে ব্যবসায় করাটা, আমার মতে একটা পাপ বিশেষ। কুরুচির চরিতার্থ করে যে সাংবাদিকতা তা জঘন্য পাপব্যবসার চেয়ে বড় কিছু নয়। আর তা ছাড়া চটকদারী খবর, আর গোপনীয় scoop খবর প্রকাশ করে কাগজ চালাবার দৃশ্যটাও অত্যন্ত হাল্কা জিনিস। চানাচুর খেতে ভাল—কিন্তু চানাচুর দিয়েও পেট ভরা যায় না বা স্বাস্থ্যরক্ষা করা যায় না। পাঠকদের রুচি পরিবেশন করা আমা-দের কাজ নয়, সমাজে অবস্থার (দুরবস্থা) বর্ণনা দিয়েই আমাদের কর্তব্য শেষ হয় না। আমাদের কাজ হবে পাঠকদের রুচি পরিবর্তন করা, পাঠক সৃষ্টি করা, সমাজের পরিবর্তন করা—স্রোতে গা ভাসিয়ে দিয়ে চলা নয়—উজানে সাঁতার দেওয়া—যত শক্তই হোক সে কাজ—যত ক্ষতিকরই হোক সে কাজ।

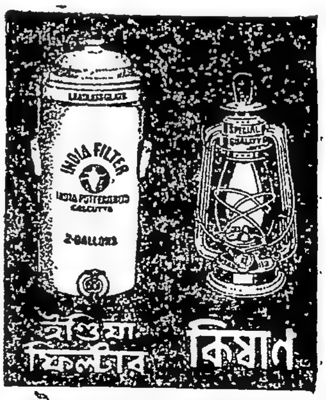

গৌর মোহন দাস এণ্ড কোং
২৩৩, ওল্ড চীনা বাজার স্ট্রীট,
কলিকাতা-১
ফোন: ২২-৬৫৮০

স্বাধীন ভারতের সাহিত্য

চিত্তরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়

সাহিত্য তো চিরকালের। সাহিত্যের মৌলিক সত্তাটিকে স্বাধীনতা অথবা পরাধীনতার পরিবেশ গভীর-ভাবে প্রভাবান্বিত করতে পারে না। সাহিত্যের যা শাশ্বত ধর্ম, সময়ের পরিবর্তনের সঙ্গে তার রূপান্তর ঘটবার আশঙ্কা নেই। সেই জন্য বাল্মীকি, হোমার, কালিদাস ও শেক্সপীয়রের রচনা এখনও সমাদৃত হয়। অবশ্য এ কথা বলা যেতে পারে যে, প্রাচীন ও মধ্যযুগের সাহিত্য ছিল প্রধানত অবজেকটিভ, সুতরাং সমকালীন ঘটনাধারার ছায়া তার উপর সামান্যই পাওয়া যায়। কিন্তু আধুনিক সাহিত্য ব্যক্তিকেন্দ্রিক, অতএব সমাজ ও ব্যক্তিমানসের বিবর্তন সাহিত্যকেও স্পর্শ করে। এ স্পর্শ হয়তো গভীর নয়, মৌলিক সত্তাকে বদলে দেবার ক্ষমতা হয়তো নেই; কিন্তু তথাপি জীবনের মতো সাহিত্যের বাতাবরণও আজকাল বদলায়। পরাধীন ভারতের এবং স্বাধীন ভারতের লেখক-দেব কাছ থেকে তাই আমরা দুই শ্রেণীর সাহিত্য আশা করে থাকি।

পরাধীন ভারতের লেখকদের মধ্যে ছিল মাতৃভাষায় নবসৃষ্টির আনন্দোচ্ছল প্রেরণা। হিন্দু আমলে ছিল সংস্কৃত; মুসলমান যুগে এল ফার্সীর প্রাধান্য; ইংরেজ রাজত্বে যদিও ইংরেজী ভাষার একাধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হল শিক্ষার ক্ষেত্রে এবং দপ্তরের কাজে, তবু হৃদয়ের গভীর সুখ-দুঃখের অনুভূতি প্রকাশের জন্য ইংরেজীতে পারদর্শী লেখকও মাতৃভাষাই গ্রহণ করলেন। মাতৃভাষাকে ভাবের উপযুক্ত বাহন করে তুলতে ঊনবিংশ শতকের প্রথম ষাট বছর প্রায় কেটে গেল। ঐ শতকের লেখকরা নানাভাবে ভাষাকে তৈরি করেছেন। আজকের মতো অর্থপ্রাপ্তির আশা তখন ছিল না, কিন্তু নতুন কিছু গড়ে তোলবার যে উদ্দীপনা ছিল, এখন তা নেই। নতন বিষয়, নতুন দৃষ্টিভঙ্গী এবং নতন আঙ্গিকের পরীক্ষা-নিরীক্ষায় সাফল্যটাই ছিল তখনকার লেখকের প্রধান পুরস্কার।

পরাধীন ভারতে আঞ্চলিক সাহিত্যগুলির মধ্যে ভাবগত যে ঐক্য দেখা যায় তা এসেছে সংস্কৃত সাহিত্যের ঐতিহ্য থেকে। ভারতের ধর্ম দর্শন সাহিত্য বিজ্ঞান শিল্পকলা ইত্যাদি সব কিছুই সংস্কৃত ভাষায় রচিত গ্রন্থাবলীর মধ্যে সংরক্ষিত আছে। দেশের সকল অঞ্চলের লোকই এই সব সম্পদের সমান অধিকারী। আধুনিক আঞ্চলিক সাহিত্য-গুলি তাদের নতুন যাত্রাপথে ঐতিহাসিক ও সাংস্কৃতিক পটভূমিকা হিসাবে সংস্কৃত সাহিত্যের সম্পদ ব্যবহার করেছে অকুণ্ঠভাবে। এ ছাড়া পাশ্চাত্যের ভাবধারাও সমানভাবেই সব সাহিত্যকে প্রভাবান্বিত করেছে। কংগ্রেস প্রতিষ্ঠার পর থেকে ভারতের সকল অঞ্চলের লেখকের মধ্যে আর একটি ঐক্যসূত্র গড়ে উঠল। সেটি হল স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষা এবং স্বাধীনোত্তরকালের ভারতের রূপকল্পনা। কবিতায়, গানে, কথাসাহিত্যে এবং নাটকে ১৯৪৭ সাল পর্যন্ত ভারতের লেখকরা প্রত্যক্ষ অথবা পরোক্ষরূপে স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষা প্রচার করেছেন এবং স্বাধীন ভারতের রূপ ফুটিয়ে তুলতে উদ্যোগী হয়েছেন। সাহিত্যে যে শুধু স্বাদেশিকতাই ছিল একথা বলা অবশ্য যথার্থ হবে না। কিন্তু স্বদেশপ্রীতি যে প্রধান বৈশিষ্ট্য ছিল সে কথা প্রমাণের অপেক্ষা রাখে না। প্রত্যক্ষরূপে যেখানে স্বাদেশিকতার কথা বলা হয় নি সেখানেও দেশপ্রীতির এবং স্বজাতিপ্রীতির একটি পরিবেশ উপলব্ধি করা যেত।

স্বাধীনতার পরে পাঠকের মনে উদ্দীপনা সৃষ্টির এই প্রধান অবলম্বনটি লেখকদের আর রইলো না। দেশ স্বাধীন হয়েছে। সফল হয়েছে স্বাধীনতার জন্য ব্যাকুলতা। কয়েক বছরের মধ্যেই দেখা গেল স্বাধীন ভারতের যে স্বপ্ন দীর্ঘ ষাট বছর যাবৎ লেখকরা তাঁদের রচনায় লালন করেছেন, বাস্তবের রূঢ় আঘাতে তা বিপর্যস্ত হতে বসেছে। তারপর থেকে উনিশ বছর পার হয়ে গেল; নবসৃষ্টির প্রেরণা এখনো উপলব্ধি করা যায় না; নতুন পথে নতুন আদর্শ সামনে রেখে চলবার মতো ঐকান্তিকতা লেখকদের কর্মসাধনায় এখনো লক্ষণীয় হয়ে ওঠে নি। কেন এমন হল? দীর্ঘকালের আকাঙ্ক্ষা সফল হবার পর লেখকরা কি সাময়িক আলস্য উপভোগ করছেন? অথবা স্বাধীন ভারতের যে স্বপ্ন কেন্দ্র করে লেখকের মনে সৃষ্টির প্রেরণা জেগে উঠত বাস্তবে তা সফল হয় নি দেখে এসেছে গভীর অবসাদ?

জানি না। তবে এ বিষয়ে সন্দেহ নেই যে, স্বাধীন ভারতের উনিশ বছরে উল্লেখযোগ্য সাহিত্য সৃষ্টি তেমন কিছুই হয় নি। ভারতীয় সাহিত্যের যা কিছু গৌরবের তা আমরা পরাধীনতার যুগেই পেয়েছি। পেয়েছি মধুসূদন, বঙ্কিমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ, প্রেমচাঁদ, ভাই বীর সিং, ভল্লাথোল ও ভারতীর মতো লেখক। চিত্তবিনোদনের জন্য জাতিকে উদ্বুদ্ধ করবার জন্য এখনও আমাদের এঁদের রচনাবলীর উপরেই নির্ভর করতে হয়। সাহিত্যে এখনও যাঁরা নেতৃত্ব করছেন, তাঁদের প্রায় সকলেই স্বাধীনতালাভের পূর্বেই প্রতিষ্ঠা লাভ করেছেন। একমাত্র ব্যতিক্রম বিমল মিত্র; যিনি এই ক'বছরের মধ্যেই বাংলায় এবং বাংলার বাইরে প্রভূত জনপ্রিয়তা অর্জন করেছেন।

অথচ স্বাধীনতাপ্রাপ্তির অব্যবহিত পর থেকেই এমন পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছে যাকে বাইরে থেকে মনে করা যেতে পারে সাহিত্য সৃষ্টির অনুকূল। সাহিত্যের পৃষ্ঠপোষকতা করবার জন্য স্থাপিত হয়েছে সাহিত্য আকাদেমি; নানা বিষয়ের উপর বই প্রকাশ করে সাহিত্যের ভাণ্ডারকে সমৃদ্ধ করবার উদ্দেশ্য নিয়ে কাজ করছে ন্যাশনাল বুক ট্রাস্ট; শিশু-সাহিত্য উন্নয়নের জন্য স্থাপিত হয়েছে শিশু-সাহিত্য সংস্থা। কেন্দ্রে এবং বিভিন্ন রাজ্যে এমনি নানা প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছে সাহিত্যের ও লেখকদের পৃষ্ঠপোষকতার জন্য। হিন্দী সাহিত্যের উন্নয়নের জন্য আয়োজনের প্রাচুর্যের কথা কারো অজানা নেই।

স্বাধীনতার পরেই ডঃ প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ লেখকদের উৎসাহিত করবার জন্য রবীন্দ্রস্মৃতি পুরস্কার প্রবর্তন করেন। এর পরে সাহিত্য আকাদেমি এবং বিভিন্ন রাজ্য সরকার ও

সাহিত্য সংস্থা নিয়মিত পুরস্কার দেবার ব্যবস্থা করেছেন। এ ছাড়া নানা বিষয়ের উপর বই ছাপবার জন্য টাকা দিয়ে ও বই কেনার জন্য গ্রন্থাগারগুলিকে অনুদান দিয়েও সরকার লেখকদের উৎসাহিত করছেন।

সুতরাং দেখা যাচ্ছে স্বাধীনতার পরে সাহিত্যচর্চার পরিবেশ অনেক বেশি অনুকূল হয়েছে। প্রেরণা দেবার মতো বিষয়বস্তু নেই: এমন অভিযোগও করা চলে না। আমাদের স্বাধীনতা লাভের কাহিনীটিই মহাকাব্যের এবং এপিক উপন্যাসের বিষয়বস্তু হতে পারে। দেশবিভাগ এবং উদ্বাস্তুদের ট্র্যাজেডি যে কেন আজ পর্যন্ত কোনো মহৎ সৃষ্টির প্রেরণা দিতে পারে নি, তার কারণ বোঝা যায় না। কোনো মর্মান্তিক ঘটনার সঙ্গে যাঁরা প্রত্যক্ষরূপে জড়িত তাঁরা কিছু সৃষ্টি করতে পারেন না, এমন কথা শোনা যায়। যেমন, ফরাসী বিপ্লবে যাঁরা অংশ গ্রহণ করেছেন তাঁরা বিপ্লবের আদর্শ প্রচার তেমন করে করতে পারেন নি, যেমন পেরেছেন ওপারের ইংরেজ কবিরা। হয়তো ঠিক কথা। বাঙালী কিংবা পাঞ্জাবী লেখকরা লিখতে না পারলেও দক্ষিণ ভারতীয় লেখকরা, মহারাষ্ট্র ও গুজরাটের লেখকরা, কেন উদ্বাস্তুদের মর্মান্তিক বেদনাকে শিল্পমণ্ডিত সৃষ্টির মধ্যে রূপায়িত করতে পারলেন না?

স্বাধীন ভারতের লেখকদের মধ্যে এই যে অবসাদ তার কারণ কি? হয়তো স্বাধীন দেশের যে স্বর্ণকল্পনা এতদিন লালন করা হয়েছে বাস্তবে তার ব্যর্থতাই তাঁদের হতাশাক্লিষ্ট করেছে। যার ফলে সৃষ্টির স্বতঃস্ফূর্ত প্রেরণা ব্যাহত হয়েছে অনেকাংশে। কিংবা হয়তো আমাদের সকল সৃষ্টি-প্রতিভা ব্যবহৃত হচ্ছে প্রযুক্তিবিদ্যার ক্ষেত্রে। দীর্ঘকাল আমরা বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যায় পিছিয়ে ছিলাম: শহর গড়েছে, রেলপথ পেতেছে, বাঁধ ও পুল তৈরি করেছে ইংরেজ। আমাদের অবলম্বন ছিল মাতৃভাষা, লেখনী ও তুলি: সাহিত্য ও চারুকলার ক্ষেত্রেই সৃষ্টিপ্রতিভা বিকাশের ছিল একমাত্র অধিকার। এখন সে অধিকার জীবনের সকল বিভাগেই ছড়িয়ে পড়েছে। গত উনিশ বছরের মধ্যে ভারতীয় বৃত্তি-কুশলীরাই গড়ে তুলেছেন কত ফ্যাক্টরি, ল্যাবরেটরি, বিরাট বিরাট সৌধ: আর তৈরি করছেন কত যন্ত্রপাতি, এরোপ্লেন, জাহাজ, রেলের ইঞ্জিন, পুল, বাঁধ ইত্যাদি। দেশের সকল সৃষ্টিপ্রতিভা যেন মিলিত হয়েছে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যার দানে দেশকে সমৃদ্ধ করে তোলবার জন্য। এতদিনের অবহেলার মূল্য দিয়ে দেশের অগ্রগতি নিশ্চিত করতে হবে। এই উনিশ বছরে প্রতিভাবান ছাত্রদের প্রায় সকলেই পঠনীয় বিষয় হিসাবে এবং জীবিকার্জনের ক্ষেত্র হিসাবে বিজ্ঞান এবং প্রযুক্তিবিদ্যাকে গ্রহণ করেছে। এ পথে অর্থ ও প্রতিষ্ঠা আছে: সাহিত্যপাঠ বা সাহিত্যচর্চায় সেই সুযোগের আশ্বাস খুবই দুর্বল। স্কুলে-কলেজেও বৃত্তিকরী শিক্ষার উপর জোর দেবার ফলে সাহিত্যের প্রতি আকৃষ্ট হবার সুযোগই হয় না ছাত্রদের। তাই নতুন নতুন প্রতিভার দানে সাহিত্য সমৃদ্ধ হয়ে উঠতে পারবে তেমন উজ্জ্বল সম্ভাবনা দেখা যায় না।

পূর্বেই বলেছি: স্বাধীনতা লাভের পর থেকে সরকার গ্রন্থাগারগুলিকে বই কেনার জন্য অনুদান দিয়ে আসছেন। এর ফলে বইয়ের চাহিদা হঠাৎ বৃদ্ধি পেয়েছে। কোন্ শ্রেণীর বই? গল্প, উপন্যাস ও রম্যরচনা; যে সব বই গ্রন্থাগারের সভ্যদের চিত্তবিনোদনের জন্য দরকার। সভ্যদের নতুন নতুন বই দিতে না পারলে তারা সন্তুষ্ট থাকে না। অথচ ভালো বই বছরে ক'টি বের হয়? প্রকাশকরা এই সুযোগ গ্রহণ করেছেন পূর্ণমাত্রায়। মোটামুটি পাঠযোগ্য একটি কাহিনী পেলেই প্রকাশক ছাপতে আগ্রহান্বিত। কারণ এ ধরণের বইয়ের চাহিদা আছে। রচনাটি শিল্পমণ্ডিত হয়েছে কিনা সেটা দেখবার দরকার নেই, ব্যবসায়ের পণ্য হবে কিনা সেটাই বিচার্য। গত উনিশ বছরের মধ্যে অনেক তরুণ লেখকের মধ্যে প্রতিভার স্ফুরণ দেখা গেছে; কিন্তু তার পূর্ণ বিকাশ হয় নি। কারণ কথাসাহিত্যের চাহিদার যোগান দিতে গিয়ে এঁরা শিল্পীর পক্ষে অত্যাবশ্যক সাধনাকে উপেক্ষা করেছেন। নগদ প্রাপ্তির আশায় যে করে হোক একটা কাহিনী শেষ করে তুলে দিয়েছেন পাঠকের হাতে। পূর্বে বই ছাপানো এত সহজ ছিল না। সাহিত্যপত্রে লিখে লিখে হাত পাকা করতে হত। সৃষ্টির আনন্দটা ছিল তখন বড় কথা; লেখা থেকে অর্থ পাওয়া ছিল গৌণ। এখন লেখার সঙ্গে অর্থের সম্পর্ক, বিশেষ করে কথাসাহিত্যিকদের ক্ষেত্রে, অচ্ছেদ্য হয়ে দাঁড়িয়েছে। লেখা হয়েছে অনেকের কাছে উপার্জনের উপায়। সাধনার জন্য যে সময় ও পরিশ্রম প্রয়োজন তার জন্য অপেক্ষা করতে নবীন লেখকরা প্রস্তুত নন। অনেক সময় আর্থিক অবস্থা অপেক্ষার অনুকূল হয় না। তা ছাড়া তাঁদের যুক্তি হল, যত্ন করে অনেক সময় নিয়ে একটি বই লিখলেও বিক্রির পরিমাণ অনিশ্চিত। বই খুব ভালো হলেও এত বেশি বিক্রি হবে না যে, সেই টাকা দিয়ে দু'তিন বছর সংসার চালাবে এবং লিখবে আর একটি বই। কারণ আমাদের দেশে ক্রেতার সংখ্যা খুবই সীমিত। সুতরাং যত বেশি বই লেখা যাবে ততই আয়ের পরিমাণ বাড়বে। রচনার মানের কথা ভেবে কি হবে? নগদ টাকার প্রয়োজন অনেক বেশি।

লেখকদের সমর্থনে বলা যেতে পারে যে, তাঁরা যদিও পূর্বের তুলনায় বেশি টাকা পাচ্ছেন, তবু ভদ্রভাবে বাঁচবার জন্য প্রাপ্তির পরিমাণটা যথেষ্ট নয়। উপযুক্ত পরিমাণ অর্থ যাঁরা পান তেমন লেখকের সংখ্যা খুবই কম। লেখক তাঁর রচনার মূল্যের উপর জীবিকার জন্য নির্ভর করতে না পারলে লেখাকে জীবনের একমাত্র সাধনা হিসাবে গ্রহণ করতে পারেন না। অনেক ছোট দেশেও লেখকরা লেখাকে পেশা হিসাবে গ্রহণ করে জীবনযাপন করতে পারেন। আমরা স্বাধীনতা পাবার পরও যে লেখকদের এ সম্বন্ধে আশ্বাস দিতে পারি নি, তার কারণ ভারতের আঞ্চলিক সাহিত্যগুলি এখনো আমাদের দৈনন্দিন জীবনের ভাষা হয়ে উঠতে পারে নি। গল্প-উপন্যাস-রম্যরচনা-কবিতা-সমালোচনা ইত্যাদি বিশুদ্ধ সাহিত্য,—তাদের স্থান সকলের উপরে। নীচে ভিত্তি রচনা করবে দৈনন্দিন জীবনে প্রয়োজনীয় বই। যেমন, পাঠ্যপুস্তক, বিজ্ঞান, প্রযুক্তিবিদ্যা, সমাজবিদ্যা, ইতিহাস, ইত্যাদি বিষয়ের উপর বই। আমাদের সাহিত্যের ভিত্তি অত্যন্ত দুর্বল। ভিত্তির এই দুর্বলতার জন্য উপরতলার সাহিত্যের উন্নতি ও বিকাশ ব্যাহত হয়। বাংলা বই প্রধানত আমাদের চিত্ত-বিনোদন করে। জীবিকার্জনের এবং দেশ গঠনের কাজে ইংরেজী বইয়ের সহায়তা গ্রহণ করতে হয়। অন্যান্য দেশে সব প্রয়োজনই যেমন মাতৃভাষার বই মেটায়, আমাদের দেশেও তা হলে সাহিত্যের সর্বাঙ্গীণ উন্নতি হত। স্কুল-কলেজে পড়বার জন্য এবং জীবিকার জন্য যদি ইংরেজী শিখতে হয়, তাহলে বিশ্বসাহিত্যের দ্বার আমাদের সামনে উন্মুক্ত হয়ে পড়ে। হোমার থেকে আরম্ভ করে পাশ্চাত্যের আধুনিকতম লেখক সেই দ্বার দিয়ে আমাদের সামনে এসে দাঁড়ান। তাঁদের উপেক্ষা করে ফিরিয়ে দেওয়া সম্ভব নয়। তাই মধ্যবিত্ত পরিবারের বই কেনার সামান্য বাজেটের অধিকাংশ দিয়ে ইংরেজী বই কিনি, আর বিশ্বসাহিত্যের সেরা লেখকদের রচনার সঙ্গে বাংলা সাহিত্যের তুলনা করে ক্ষুব্ধ হই।

আমাদের বইয়ের দৈনন্দিন প্রয়োজন মেটায় বৃটিশ প্রকাশকরা। স্বাধীনতার পর থেকে জাতিগঠনমূলক বইয়ের

একালের গল্প

দুর্গাদাস সরকার

এক যে ছিল শিশু।

অন্ধকারে চুপটি করে মায়ের কাছে
সে শুনতো গল্প...
সে-গল্প রূপকথা বা উপকথা নয়...
একেবারে একালের কথা।

...তারপর রাজা মশায় পাততাড়ি গুটালেন।
কামারশালায় আগুন নিভিয়ে কামার গেল ধান বুনতে,
চাষীদের ডাক পড়লো শহরের রাজপথে বাতি জ্বালাতে।

খোকন সোনাও চোখ মেললো আকাশে।
আস্তে আস্তে সে বড় হয়...
লড়াই করতে শেখে ক্ষুদিরাম, সূর্য সেন আর নেতাজীর মতোই।

হাতে তার সব সময় একটা খেলনা-বন্দুক;
কাঠের ঘোড়ার উপর বসে তাক করে
একটা মাছির উপর।
স্বাধীন ভারতের বীর যোদ্ধার খেতাব দেন গুরু মশায়।
পরাধীন ভারতে কেটেছে যাঁর জীবনের বারো আনা ভাগ
সেই মায়ের গলা তবু ভারী হয়...
ছড়া কেটে শেষ করেন গল্প—
"আচ্ছা বিচার করলে সাহেব মুচকি মুচকি হাসি'
চোরের গলায় ফুলের মালা, সাধুর গলায় ফাঁসি।"

সেই শিশু বড় হয়ে যখন পা নামালো মাটিতে—
দেখলো, পায়ের তলার মাটি গেছে কখন সরে!
ঘোড়া ফেটে চৌচির ছাতিফাটা তেষ্টায়;
বন্দুকের নলে ফুঁ দিচ্ছে খোকন উনুনে।
স্কুলের সীমানায় পা দেবার নিষেধ না থাকলেও
ভর্তি হবার আদেশ নেই।
তবু হার মানে না সেই ছেলে;
স্বাধীন দেশের হাওয়া নেয় সে বুক ভরে।
আস্তে আস্তে কখন কেটে গেল আঠারোটা বছর।
কলকাতায় কুকুরের মাংস বিক্রির খবরটা
তার কাছে তেতো মনে হয় না, মুখরোচক।
এক পেয়ালা চা পাঁচ টাকা, আর
এক জোড়া জুতো একশ' টাকা হলেও
অবাক হবার কারণ কি?

সেদিনের সেই শিশু এখন ছেঁড়া সার্ট গায়ে দিয়ে
তালিমারা চটি ফাটা পায়ে বেঁধে
আপিসের দরজায় দরজায় ঘোরে
অন্তত যদি একটা দিন মজুরীর চাকরি জোটে।
রাস্তায় ঘুরতে ঘুরতে অবশ কণ্ঠে উচ্চারণ করে
মায়ের মুখের সেই ছড়া—
"আচ্ছা বিচার করলে সাহেব মুচকি মুচকি হাসি'
চোরের গলায় ফুলের মালা, সাধুর গলায় ফাঁসি।"

আমদানী ক্রমেই বেড়ে চলেছে। নীচের হিসাব থেকে আমাদের ক্রমবর্ধমান পরনির্ভরতার ছবিটি ফুটে উঠবেঃ

বছর		আসদানীকৃত বইয়ের মূল্য
১৮৬৯-'৭০	টাকা	১০,৫৯,৮১২
১৮৮৯-'৯০	,,	২১,৫০,২৬৬
১৯২০-'২১	,,	৬৫,৯৯,৯৮৯
১৯৩০-'৩১	,,	৬০,৯১,৪০৫
১৯৪৬-'৪৭	,,	৪৮,৪২,৪৯২
১৯৬১-'৬২	,,	২,৮৯,৭৮,৬৮২
১৯৬২-'৬৩	,,	৩,৪৫,০০,০০৫
১৯৬৩-'৬৪	,,	৩,৩৫,৯১,১৩৫

এই সাড়ে তিন কোটি টাকার ভারতীয় বই যদি কেনা হত তা হলে এ দেশের লেখক ও প্রকাশক উপকৃত হতেন এবং পরোক্ষে সৃষ্টিধর্মী সাহিত্য লাভবান হত। শুধু যে দুষ্প্রাপ্য বৈদেশিক মুদ্রা বাধ্য হয়ে ব্যয় করতে ইচ্ছে তা-ই নয়; বিদেশী বই এনে চাহিদা মেটাবার ফলে আমাদের সাংস্কৃতিক পরাধীনতা ক্রমশ দৃঢ় হচ্ছে। মুদ্রা মূল্য হ্রাসের পরে অত্যন্ত বেদনার সংগে তা উপলব্ধি করছি।

কিন্তু শুধু যে বিদেশী বইয়ের বেলাতেই ইংরেজী ভাষার দ্বারস্থ হয়েছি, তা নয়। আমরা নিজেদের দেশেও ক্রমশ ইংরেজীতে বেশি বই প্রকাশ করছি। নীচের হিসাব থেকে তা বোঝা যাবেঃ

বছর	ভারতীয় ভাষার প্রকাশন	ইংরেজী ভাষার প্রকাশন	মোট
১৮৮৯-'৯০	৮,৪৬১	২,৯১৭	১১,৩৭৮
১৯২০-'২১	১০,১০৫	৩,৬৯০	১৩,৭৯৫
১৯৩০-'৩১	১৪,০৭৪	৪,৩৫৩	১৮,৪২৭
১৯৫০-'৫১	১৩,১০৪	৫,১৬৩	১৮,২৬৭
১৯৬১-'৬২	১১,৭১৫	৯,৩৬১	২১,৭৬০
১৯৬৪-'৬৫	১০,৮২৭	১০,৪৩৮	২১,২৬৫
১৯৬৫-'৬৬	৯,৮৩৮	১০,৩৪৭	২০,১৮৫

এই হিসাব থেকে দেখা যাচ্ছে ইংরেজী বইয়ের সংখ্যা বাড়তে বাড়তে মোট প্রকাশনের প্রায় অর্ধেক হয়েছে। সুতরাং রাষ্ট্রভাষা নিয়ে যতই কলহ চলুক, ইংরেজী সকলের অলক্ষ্যে আপন প্রাধান্য বিস্তার করে চলেছে। আর একটা জিনিসও উপরের তালিকা থেকে স্পষ্ট হয়ে ওঠে। স্বাধীনতার পূর্বে মোট যত বই বের হত, এখন তার চেয়ে মাত্র দু'তিন হাজার বেশি বই বের হয়। ভারত এখনও প্রতি ২০,৫০০ জন নাগরিকের জন্য মাত্র একটি করে বই দিতে পারে (মোটামুটি হিসাব)। যে কোনো জাতির পক্ষেই পুস্তকের অপ্রতুলতা উন্নতির পথে মস্ত বড় অন্তরায়। স্বাধীনতার পরে আমাদের আশা যে-সব ক্ষেত্রে এখনো সফল হয় নি, সাহিত্য তার মধ্যে একটি।

স্বাধীন ভারতে বিজ্ঞান

শান্তিময় চট্টোপাধ্যায়

কয়েক বছর আগে এক ইংরাজ লেখক ভারত ভ্রমণে এসেছিলেন। ট্রেনে তাঁর সংগে এক শিক্ষিত এদেশীয় ভদ্রলোকের আলাপ হয়। ভারতীয় ভদ্রলোকটি স্বাধীন ভারতের সমস্ত কিছুর প্রতিই অত্যন্ত বিরূপ। তিনি বিরস স্বরে বললেন, শুনতে পাবেন রেলওয়ে শতবার্ষিকী হচ্ছে, ডাকবিভাগের শতবার্ষিকী হচ্ছে, টেলিগ্রাফ শতবার্ষিকী—আরো কত কি? বলুন তো মশায় কার রেল, কার ডাকবিভাগ আর কারই বা টেলিগ্রাফ।

মন্তব্য নিষ্প্রয়োজন। তবে স্বাধীন ভারতে যে কোন প্রগতি সম্বন্ধে বিচার করতে গেলেই মনে রাখতে হবে ভারত স্বাধীন হয়েছে মাত্র কুড়ি বছর আগে। বিজ্ঞানের প্রগতি আলোচনা করতে হলে ভারতে বিজ্ঞান চর্চার আনুপূর্বিক ইতিহাস না হলেও একটা মোটামুটি ইতিহাস জানা প্রয়োজন। প্রাচীন ভরতে বিজ্ঞানচিন্তা ছিল দর্শনের একটি অংগ। খৃস্টজন্মের বহু বছর আগে হিন্দু বৌদ্ধ দার্শনিকেরা এবং খৃস্টজন্মের অল্প সময় পরে জৈন দার্শনিকেরা পরমাণুতত্ত্বে যে অসাধারণ ব্যুৎপত্তি দেখিয়েছিলেন তা বিস্ময়কর বললেও খুব কম করে বলা হয়। সৃষ্টি ও স্থিতির মূল প্রশ্নগুলি তাঁরা গভীরভাবে চিন্তা করেছিলেন। অতি প্রাচীনকাল থেকে সুরু করে প্রায় ১০০০ খৃস্টাব্দ পর্যন্ত ভারতে বিজ্ঞানের কয়েকটা শাখা বিশেষ করে গণিত, জ্যোতিষ ও রসায়ন বিশেষ সমৃদ্ধি লাভ করেছিল। কিন্তু অতি দুর্ভাগ্যের বিষয় যে তারপর আমাদের দেশে বিজ্ঞানের চর্চা প্রায় লোপ পায়। এটা বিশেষ লক্ষ্য করার বিষয় আমাদের প্রাচীন বিজ্ঞানীরা দার্শনিকচিন্তায় যতটা উৎকর্ষ লাভ করেছিলেন বিজ্ঞান ধারণার পরীক্ষা-নিরীক্ষায় তাঁরা ছিলেন ততটাই অনুৎসাহী।

আধুনিক শিক্ষার ভারতে আগমন পশ্চিম থেকে, আধুনিক বিজ্ঞানও তাই। পশ্চিমে বিজ্ঞান ঠিক কবে থেকে আধুনিক হয়েছে সে কথা বলা বড় কঠিন। তবে সাধারণত রেনেশাঁসের যুগকে আধুনিকতার আরম্ভ বলে ধরা হয়। আধুনিক বিজ্ঞানের জনক বলা হয় ইতালীর গ্যালিলিওকে, কারণ তিনিই প্রথম তত্ত্বের যাথার্থ্য প্রমাণের জন্য এক্সপেরিমেণ্ট বা হাতেনাতে পরীক্ষার গুরুত্ব অনুধাবন করেছিলেন। ভারতবর্ষে আধুনিক বিজ্ঞানের আত্মপ্রকাশ ঘটেছে বড় বিচিত্র পরিবেশে। একথা আগেই বলা হয়েছে যে ১০০০ খৃস্টাব্দ থেকে বর্তমান কালের সূচনা পর্যন্ত প্রাচীন ঐতিহ্য প্রায় লুপ্ত হয়েছিল এবং বিজ্ঞান চর্চা লোপ পেয়েছিল। ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর আমলে ইংরাজ শাসকরা তাদের উন্নত বিজ্ঞান ধারণার সাহায্যে সহজেই বুঝতে পারেন যে ভারতে অপরিসীম প্রাকৃতিক সম্পদ বিদ্যমান। সেই সম্পদের সঠিক পরিমাপ ও তার নিষ্কাষণের জন্যই শাসকরা ভারতে প্রথম আধুনিক বিজ্ঞান ও বিজ্ঞানী আমদানী করেন। এর ফলে গড়ে ওঠে বিভিন্ন সংস্থা ট্রিগোনোমেট্রিক সার্ভে, এগ্রিকালচারাল ও বটানিকাল সার্ভে, মাইনিং ফেডারেশন, জিওগ্রাফিকাল সার্ভে, প্লাণ্টার্স অ্যাসোসিয়েশন, চেম্বার অফ কমার্স প্রভৃতি। অবশ্য এ সবেরই মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল নিজেদের স্বার্থসিদ্ধির জন্য ভারতীয় সম্পদের ব্যবহার। কিন্তু এদেরই তৎপরতায় রাণীগঞ্জে কয়লা, আসাম ও ব্রহ্মদেশে খনিজ তেল, মহীশূরের কোলারে সোনা প্রভৃতি আবিষ্কৃত হয়। রেলপথ ও অন্যান্য পরিবহন ব্যবস্থা চালু হয় কেবল কোম্পানীর সুবিধার জন্য। এই সব তথ্য ভারতীয়দের কাছ থেকে গোপন রাখা হত এবং বহুদিন পর্যন্ত এই সব কাজে ভারতীয় নিয়োগ করা হত না। ল্যাম্বটন, এভারেস্ট, ভয়সি, ওল্ডহ্যাম প্রমুখ বেশ কয়েকজন প্রথম শ্রেণীর বৈজ্ঞানিক যদিও ভারতে এসে কাজ করেছিলেন কিন্তু তাঁদের প্রচেষ্টা ছিল ভারতীয়দের সঙ্গে সম্পর্কবর্জিত, তাই বিজ্ঞানের শিকড় তখনও ভারতবর্ষের মাটিতে প্রবেশ করতে পারে নি। অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথম দিকে রাজা রামমোহন প্রথম আধুনিক শিক্ষাবিস্তারের প্রয়োজনীয়তা বুঝতে পারেন। গণিত, ভৌতবিজ্ঞান, রসায়ন, শারীরবিদ্যা প্রভৃতি প্রয়োজনীয় বিজ্ঞান বিষয়ে শিক্ষা প্রসারের জন্য তিনি তৎকালীন গভর্নর জেনারেলকে অনুরোধ করেন। কিন্তু তখনও পর্যন্ত কর্তৃপক্ষ ভারতীয়দের ইংরাজী শিক্ষার বিরোধী ছিলেন। ঠাকুর পরিবার ও রাজা রামমোহন নিজেদের চেষ্টায় ইংরাজী শেখেন। ১৭৮১ সালে হিন্দু কলেজ স্থাপিত হয়, তবে বিশ্ববিদ্যালয়গুলির প্রতিষ্ঠা হতে হতে উনবিংশ শতাব্দীর অর্ধেক অতিক্রম করে গিয়েছিল। ১৮৫৪ সালের উডের ডেসপ্যাচ অনুযায়ী বিশ্ববিদ্যালয়গুলির প্রতিষ্ঠা হয়। রামমোহন রায়ের সময় থেকে দেশে শিক্ষা অর্জনের যে প্রয়াস দেখা দিয়েছিল তা ক্রমে শাখা-পল্লবে বিস্তৃত হতে লাগল। আশ্চর্যের বিষয় গত শতাব্দীর শিক্ষা ছিল বিজ্ঞানবিমুখ। অথচ বিশুদ্ধ বিজ্ঞানের চর্চা ছাড়া দেশে যে প্রয়োগধর্মী বিজ্ঞান ও শিল্প গড়ে উঠতে পারে না এ কথা বলায় অপেক্ষা রাখে না। ইংরাজদের শিক্ষানীতি যাই থাক ভারতীয়দের মধ্যে বিজ্ঞানচেতনা জাগরূক হয়ে ক্রমে আধুনিক বিজ্ঞানের প্রবর্তনে কর্তৃপক্ষকে বাধ্য করায়। এ কথা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য যে সরকারী আনুকূল্য ছাড়া ভারতে প্রথম বিজ্ঞান গবেষণাগার স্থাপিত হয় কলকাতায় ১৮৭৬ খৃস্টাব্দে—ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন ফর দি কালটিভেশন অফ সায়েন্স—প্রতিষ্ঠাতা ডঃ মহেন্দ্রলাল সরকার। এই পরিপ্রেক্ষিতে গত শতাব্দীর শেষ ভাগে তিন দিকপাল বিজ্ঞানীর আবির্ভাব হয়—জগদীশচন্দ্র, প্রফুল্লচন্দ্র ও রামানুজম। প্রকৃতপক্ষে এই তিন মনীষীই ভারতবর্ষে আধুনিক বিজ্ঞানের ঐতিহ্য স্থাপনা করলেন।

জগদীশচন্দ্র জন্মগ্রহণ করেন ১৮৫৯ সালে, প্রফুল্লচন্দ্র দু বছর পরে এবং রামানুজ ১৮৮৭ সালে। জগদীশচন্দ্র ও প্রফুল্লচন্দ্র উভয়েই বিদেশে উচ্চশিক্ষা লাভ করে কলকাতার প্রেসিডেন্সী কলেজে অধ্যাপনা সুরু করেন। আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু ছিলেন মূলত পদার্থবিজ্ঞানী। উদ্ভিদ জীবন ও অতি হ্রস্ব তরংগ বেতার পর্যবেক্ষণের জন্য অতি সূক্ষ্ম যন্ত্র নির্মাণ করে এদেশে এক নতুন ইতিহাসের সূচনা করেন। জগদীশচন্দ্রের আগে এদেশে

এক্সপেরিমেণ্টের কোন অস্তিত্বই ছিল না। তাঁকে ভারতের গ্যালিলিও আখ্যা দিলে কিছুমাত্র অত্যুক্তি হয় না। আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় ছিলেন রসায়নী। তাঁর জীবনে বিজ্ঞান জন-সেবা ও স্বদেশপ্রেমের এক আশ্চর্য সমন্বয় ঘটেছিল। বিশুদ্ধ বিজ্ঞানের গবেষণার সঙ্গে সঙ্গে মানব-কল্যাণে বিজ্ঞানের প্রয়োগে তিনিই পথ প্রদর্শন করেন। শ্রীনিবাস রামানুজমের জন্ম মাদ্রাজের এক অতি দরিদ্র পরিবারে। তাঁর লেখাপড়ার বিশেষ সুযোগও ছিল না। তবু গণিতে তাঁর প্রতিভা পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ গাণিতিকদেরও চমৎকৃত করে। অতি দুঃখের বিষয় মাত্র ৩৩ বছর বয়সে ইনি মারা যান।

বর্তমান শতাব্দীর গোড়াতেই দেখা যায় যে ইংরাজী শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে প্রাচীন ভারতের ঐতিহ্য সম্বন্ধেও দেশবাসী সচেতন হয়ে উঠেছেন। ভারতবর্ষে সত্যিকার বিজ্ঞানের নব-জাগরণ আরম্ভ হল। এই ঐতিহাসিক ঘটনার জন্য বহুকাল ধরে প্রস্তুতি চলছিল কেবল কয়েকটি বিশেষ সুযোগ সমাবেশের অভাবেই এটা ঘটতে এত দেরি হল। একথা অস্বীকার করে লাভ নেই যে এই নব জাগরণের জন্য অনিচ্ছাকৃতভাবে হলেও বৃটিশরাই দায়ী। একথা ভাবলে আজ অবাক লাগে যে, বিশ্ববিদ্যালয়ে বিজ্ঞান শিক্ষণের জন্য স্নাতকোত্তর বিভাগ সুরু হয়েছে মাত্র ১৯১৩ সালে স্যার আশুতোষের অদম্য উৎসাহে। তবে জমি প্রস্তুত ছিল। আধুনিক বিজ্ঞানের ফসল ফলতে দেরি হল না। এই শতাব্দীর প্রথম পঁচিশ বছরের মধ্যেই হল কয়েকটি উল্লেখযোগ্য আবিষ্কার—সাহার তাপ আয়নন তত্ত্ব, বোস সংখ্যায়ন ও রমণ এফেক্ট। রসায়নে জ্ঞানচন্দ্র ঘোষ, জ্ঞানেন্দ্রনাথ মুখার্জি, শান্তিস্বরূপ ভাটনগর, উদ্ভিদ বিজ্ঞানে বীরবল সাহানি ও অন্যান্য অনেকে প্রতিষ্ঠা লাভ করলেন। ১৯৩০ সালে রমণের নোবেল পুরস্কার অর্জনের পর বিশ্বের বিজ্ঞানসভায় ভারতীয় মেধা ও যোগ্যতা সম্বন্ধে আর কোন সন্দেহের অবকাশ রইল না। আবার ঠিক ঐ সময় স্বাধীনতা সংগ্রামে দেশের প্রায় সমস্ত মনীষা আকৃষ্ট হল ফলে বিজ্ঞান তার প্রাপ্য মনোযোগে বঞ্চিত হয়। অন্য সব কিছুই অপেক্ষা করতে পারে, কিন্তু স্বাধীনতা কিছুতেই নয়। কাজেই বিজ্ঞানের বহুমুখী প্রসারকে অপেক্ষা করতে হল ১৯৪৭ সালের ১৫ই আগস্ট অবধি।

বর্তমান শতাব্দীতে পাশ্চাত্য জগতে বিজ্ঞান প্রগতির ধারা আলোচনা করলে তিনটি বিশিষ্ট পর্যায় দৃষ্টি আকর্ষণ করে। প্রথম পর্যায়টিকে রোমাণ্টিক বা আদর্শবাদের যুগ বলা চলে। এই সময়ে বিজ্ঞানের গবেষণা সমৃদ্ধি লাভ করেছে ব্যক্তিবিশেষের চারিপাশে। রন্টগেন, বেকারেল, কুরিদম্পতি, রাদারফোর্ড, আইনস্টাইন প্রভৃতি দিকপালকে ঘিরে বিজ্ঞান ইতিহাস রচনা করেছে। তখনকার কালে যে সব যন্ত্রপাতি ব্যবহার হত তা এখনকার তুলনায় নেহাৎই মামুলি। বৃত্তি হিসেবে বিজ্ঞান চর্চা মোটেই লোভনীয় ছিল না। আর্থিক সুখের আশায় জলাঞ্জলি দিয়ে কোন সরকারী আনুকূল্য ছাড়াই কঠিন পরিশ্রম করতেন বৈজ্ঞানিকরা নতুন সত্যের সন্ধানে। হঠাৎ বিদ্যুৎ চমকের মত এক একটি নতুন আইডিয়া থেকে হয়েছে এক একটি যুগান্তকারী আবিষ্কার। বিজ্ঞান সাধনার এই স্বর্ণযুগ বেশিদিন থাকে নি। একটি নতুন পর্যায় সুরু হল প্রথম মহাযুদ্ধের পর থেকে। প্রতিরক্ষা ব্যবস্থাকে বিজ্ঞানের সঙ্গে যুক্ত করলে যে প্রভূত ফললাভের সম্ভাবনা সেটা অনুমান করতে বিভিন্ন রাজ সরকারের দেরি হল না। সুরু হল অস্ত্র গবেষণার যুগ। প্রচুর পরিমাণ সরকারী অর্থ বিনিয়োগ করা হতে লাগল বিশুদ্ধ ও ফলিত গবেষণায়; কেন না বিজ্ঞানের প্রয়োগ বিশুদ্ধ তাত্ত্বিক গবেষণার উপর একান্তই নির্ভরশীল। যুদ্ধের যত অশুভ ফলই থাক না কেন দুইটি মহা-যুদ্ধ যে বিজ্ঞানের অকল্পনীয় অগ্র-গতিতে সাহায্য করেছে সে বিষয়ে সন্দেহের কোন অবকাশ নেই। পরমাণু শক্তির আবিষ্কারের কথা বাদ দিলেও বিজ্ঞানের বহু শাখা-প্রশাখায় যে সব যুগান্তকারী পরিবর্তন এসেছে তা সাধারণ অবস্থায় হলে এক শতাব্দী লেগে যেতে পারত। দ্বিতীয় পর্যায়ের সূত্র ধরেই বিজ্ঞান প্রগতির বর্তমান পর্যায়ে সুরু হয়েছে শান্তির কাজে বিজ্ঞানকে সংঘটিত করার প্রয়াস। শিল্পোন্নত দেশগুলি রাষ্ট্র ও বৃহৎ শিল্পগুলি বিপুল অর্থ সাহায্য দিয়ে বিশুদ্ধ এবং ফলিত গবেষণার ভার নিজেরাই নিয়েছেন। গবেষণার ক্ষেত্র এখন অত্যন্ত ব্যাপক, বিস্তৃত এবং ব্যয়সাপেক্ষ। আকস্মিক আবিষ্কারের সম্ভাবনা যে এখন একেবারেই নেই তা নয়, কিন্তু বিজ্ঞানে এখন দলগত কাজের প্রাধান্য। বহু বিশেষজ্ঞদের একত্র করে বিশিষ্ট উদ্দেশ্য সাধনের জন্য এখন গবেষণার কাজে অর্থ ব্যয় করা হয়। আজকালকার গবেষণায় ব্যবহৃত যন্ত্রপাতি এত জটিল, সূক্ষ্ম ও মূল্যবান যে ব্যক্তিগত প্রচেষ্টা এখন বিজ্ঞানের জগতে প্রায় অসম্ভব হয়ে দাঁড়িয়েছে। বৃত্তি হিসেবে বিজ্ঞান এখন খুবই লোভনীয়। শিল্পসংস্থার কথা ছেড়ে দিলেও মার্কিন দেশে অধ্যাপকদের মাইনে বছরে তিরিশ-চল্লিশ হাজার এমন কি এক লক্ষ ডলার পর্যন্ত দেওয়া হচ্ছে।

স্বাধীন ভারতে বিজ্ঞানের প্রগতি আলোচনা এবার সুরু করা যেতে পারে। বলাই বাহুল্য দেশ স্বাধীন হবার সময় আমাদের বিজ্ঞানীদের না ছিল লোকবল না ছিল অর্থবল। দেশের অগণিত নরনারীর কাছে বিজ্ঞান শিক্ষা দূরে থাক প্রাথমিক শিক্ষারই সুযোগ ছিল না। উচ্চাশা ও প্রতিভাকে সম্বল করে কয়েকজন দুঃসাহসী বৈজ্ঞানিক ব্যক্তিগত প্রচেষ্টায় জগৎ সভায় ভারতবাসীর পক্ষ থেকে বৈজ্ঞানিক শিখা জ্বালিয়ে রেখেছিলেন। ভারতীয়দের কাছে গবেষণার রোমাণ্টিক যুগ ১৯৪৭ পর্যন্ত চলে এসেছে। দেশ স্বাধীন হওয়ার সঙ্গে দেশের পরিচালকদের সামনে এসে পড়ল এক বিরাট চ্যালেঞ্জ। শিল্পোন্নয়ন ও আধুনিকীকরণ আমাদের দেশে আরম্ভ হল এত দেরিতে যে, রূপকথার দৈত্যের মত একলাফে সাত মাইল অগ্রসর না হলে আমাদের পক্ষে অন্যান্য দেশের সমকক্ষ হওয়া অসম্ভব। দেশ স্বাধীন হলে কি করতে হবে তার জন্য জাতীয় পরিকল্পনা সমিতি ১৯৪১ সালে যে খসড়া প্রস্তুত করেছিলেন তারই উপর ভিত্তি করে সুরু হল যাত্রা। প্রাথমিক, মাধ্যমিক, উচ্চমাধ্যমিক, স্নাতক ও স্নাতকোত্তর সকল স্তরেই শিক্ষাব্যবস্থার সংস্কার ও দেশব্যাপী তার বিস্তারের ব্যবস্থা হল। বিশ্ব-বিদ্যালয়গুলির সংখ্যাবৃদ্ধি হল। বিশুদ্ধ বিজ্ঞানের গবেষণার জন্য বিশ্ববিদ্যালয়গুলিকে সরকারী সাহায্য দেওয়া সুরু হল। সরকারী পরি-চালনায় স্থাপিত হল জাতীয় গবেষণা-গার বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখায়।

দেশ স্বাধীন হবার কুড়ি বছর পার হয়েছে। একটা দেশ বা জাতির ইতিহাসে কুড়ি বছর সময় খুব বেশি নয়। কুড়ি বছর কাটবার পর পিছন ফিরে যে ছবি দেখা যাচ্ছে তা অবশ্য অসম্পূর্ণ তবু তার আকৃতিতে এখনই কয়েকটা বৈশিষ্ট্য লক্ষণীয়। এগুলি হল: (১) একসঙ্গে আমরা অনেকগুলি বিরাট বৈজ্ঞানিক উদ্যমে নেমে পড়েছি; (২) অন্যান্য দেশের মত এগুলি প্রচণ্ড

ব্যয়সাপেক্ষ, কাজেই সরকারী অর্থ-পুষ্ট; (৩) এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের সংখ্যাবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে সারা দেশে গবেষণাকেন্দ্রেরও প্রসার হয়েছে। এ সব লক্ষণই আশাপ্রদ। এখন প্রশ্ন উঠতে পারে আমাদের এই কুড়ি বছরের প্রগতি তবে কেন সর্বসাধারণের জীবনে অনুভব করা যাচ্ছে না। তার উত্তরে বলতে হবে আমাদের টেকনোলজি বা কারিগরী শিক্ষা আরম্ভ হয়েছে বহু পরে। অথচ বিজ্ঞান ও কারিগরী বিদ্যা এতই পরস্পর নির্ভরশীল যে একটির অনগ্রসরতার জন্য অন্যটিকেও পিছিয়ে পড়তে হচ্ছে। কারিগরী বিদ্যায় গত কুড়ি বছরে যে কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে তার মধ্যে স্পষ্ট তিনটি পর্যায় লক্ষ্য করা যাবে। (১) বিদেশী যন্ত্র ও বিদেশী শিক্ষকের সাহায্যে কলকারখানা স্থাপন, কারিগরী প্রশিক্ষণ ও বিদেশে গিয়ে শিক্ষাগ্রহণ। (২) বিদেশী যন্ত্রের সাহায্যে দেশে যন্ত্র তৈরি করা। (৩) সমস্ত বিদেশী যন্ত্র ও যন্ত্রাংশ আমদানী বন্ধ করে দেশীয় যন্ত্রে যন্ত্র ও যন্ত্রাংশ তৈরি করা।

আমরা এখন সবে তৃতীয় পর্যায়ের গোড়ায় এসে উপস্থিত হয়েছি। এই পর্যায় অতিক্রম করতে পারলে শিল্পে স্বাবলম্বিতা অর্জন করতে পারব। বিজ্ঞানীকে যখন তাঁর প্রতিটি যন্ত্রের জন্য বিদেশের ও বিদেশী মুদ্রার মুখ চেয়ে বসে থাকতে হবে না তখনই এদেশে প্রকৃত শিল্পোন্নয়ন হবে। এই লক্ষ্য সামনে রেখে আমরা অগ্রসর হচ্ছি। তবে এ পথ কুসুমাস্তীর্ণ নয়, আমরা প্রত্যেকেই আজ সে কথা মর্মে মর্মে জানি।

সাধারণভাবে শিল্প ও বিজ্ঞানের এই পরিবেশ এখন দেশে বর্তমান। এবার দেখা যাক বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় আমরা এই কুড়ি বছরে কতদূর সাফল্যলাভ করতে পেরেছি। সবগুলি শাখার কথা এখানে স্থানাভাবে আলোচনা করা সম্ভব নয়। বর্তমানকালের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা—শক্তি-সমস্যা। যে সামগ্রিক শিল্পোন্নয়ন আমাদের উদ্দেশ্য তাকে কার্যকর করতে গেলে আমাদের ক্রমক্ষীয়মাণ কয়লা ও পেট্রোলিয়ম ছাড়াও চাই নতুন শক্তির উৎস। পারমাণবিক শক্তি উৎপাদনের কাজ এখনই আরম্ভ করে তাই দেশের কর্ণধাররা যথেষ্ট দূরদৃষ্টির পরিচয় দিয়েছেন। পরমাণুবিজ্ঞানে ভারত এই অল্পদিনের মধ্যে যে দক্ষতার পরিচয় দিয়েছে তার ফলে আজ পৃথিবীর উন্নত দেশগুলি ভারতের পরমাণু বোমা তৈরির ক্ষমতা সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ। অপরদিকে কৃষিবিজ্ঞানে প্রয়োজনীয় উদ্যমের অভাবে আজকের দুরবস্থা আর কারো অবিদিত নেই।

এতদিন ভারতে প্রতিরক্ষা বিজ্ঞানের উপর বিশেষ কোন জোর দেওয়া হয় নি, কারণ কোন যুদ্ধেই আমরা সরাসরিভাবে জড়িত হই নি। সম্প্রতি এদিকে বিশেষভাবে মনোযোগ দিতে হয়েছে। যে কোন দেশেরই স্বাধীনতা বজায় রাখতে প্রতিরক্ষা বিজ্ঞান অপরিহার্য। এখন ভারতের বিভিন্ন স্থানে অনেকগুলি প্রতিরক্ষা গবেষণাগার চালু হয়েছে। এইসব গবেষণাকেন্দ্রে যে কেবল মারণাস্ত্র তৈরি করার চেষ্টা চলেছে এ কথা মনে করা ভুল। বহুক্ষেত্রেই এই জাতীয় গবেষণার বহু জনহিতকর প্রয়োগ আছে।

প্রাক স্বাধীনতাযুগে প্রতিকূল পরিবেশের মধ্যেও যে সব দিকপাল বিজ্ঞানীর আবির্ভাব হয়েছিল আজকাল প্রচুর সুযোগ-সুবিধা সত্ত্বেও তাঁদের তুলনায় বিজ্ঞানীরা কিছুই দিতে পারেন নি—অতএব আমাদের এই প্রচেষ্টাগুলির মধ্যে নিশ্চয় কোন গলদ আছে—এই জাতীয় মনোভাব অনেকে পোষণ করেন। অনেকে একথাও বলেন যে, ভারতীয় বিজ্ঞানীরা বিদেশে গিয়ে যতটা কৃতিত্ব দেখাতে পারেন দেশে এসে তা আর পারেন না। এই প্রসঙ্গে মনে রাখতে হবে যে, গত তিরিশ বছরে বিজ্ঞানের চেহারা আমূল বদলে গেছে। এখন বিজ্ঞান সম্পূর্ণরূপে যন্ত্রনির্ভর এবং যে যন্ত্রগুলি মহামূল্য ও মহাশক্তিশালী। আমাদের বিজ্ঞানীদের মেধা আছে, ধারণা আছে কিন্তু যন্ত্র কোথায়। শিল্পে আমাদের অনগ্রসরতার কথা আগেই বলা হয়েছে। যতদিন না দেশের শিল্প তাঁদের সঙ্গে সহযোগিতা করছে, গবেষণার যন্ত্র দেশের কাঁচা মাল দিয়ে দেশেই তৈরি হচ্ছে ততদিন তাঁদের হাত-পা বাঁধা। এর দ্বারা তাঁদের অযোগ্যতার প্রমাণ হয় না।

কোন দেশে বিজ্ঞানের প্রগতি কি দিয়ে বিচার করা হবে? সে দেশে কতজন বিজ্ঞানী আন্তর্জাতিক সম্মানে ভূষিত হলেন; কতজন নোবেল পুরস্কার পেলেন, তাই দিয়ে? আমার মনে হয় আমাদের মত অনগ্রসর দেশের বৈজ্ঞানিক সমৃদ্ধি নিরূপণের যথার্থ মানদণ্ড তা নয়। বিজ্ঞানের দ্বারা সাধারণ মানুষ কতটা উপকৃত হল, দৈনন্দিন জীবনে তার দারিদ্র্য ও কষ্ট কতটা লাঘব হল—এইগুলিই বিজ্ঞানের সাফল্যের প্রকৃত চিহ্ন। এই লক্ষ্য থেকে এখনও আমরা বহুদূরে। আমাদের দেশে এখনো পর্যন্ত বিজ্ঞানের প্রকৃত ভূমিকা সম্বন্ধে ভ্রান্ত ধারণার অবধি নেই। বহু চিন্তাশীল ব্যক্তি মনে করেন বিজ্ঞান বড়জোর সভ্যতার বাইরের দিকটা বদলাতে পারে এবং যা বদলেছে তাতে সুফলের চেয়ে কুফলই ফলেছে বেশি। তাঁরা মনে করেন যে, বিলাসের উপকরণ যুগিয়ে বিজ্ঞান মানুষকে করেছে অপদার্থ, ঈশ্বরবিমুখ এবং বিজ্ঞাননির্ভর যান্ত্রিক সভ্যতার থেকে যত দূরে থাকা যায় ততই ভাল। ভারতবর্ষ এখনও দারিদ্র্য দুর্দশার যে অতলে পড়ে আছে তাতে আমাদের পক্ষে এই সব যুক্তি হাস্যকর। যতক্ষণ পর্যন্ত কোটি কোটি ভারতবাসীর জীবনযাত্রার মান একটা সুস্থ ও উন্নত পর্যায়ে আনা না যায় ততদিন বিজ্ঞান ও বিজ্ঞানীর কাজ শেষ হবে না। বহু শতাব্দীর অন্ধকার ভেদ করে এগোতে হবে তাঁদের। ইচ্ছা ও উদ্যমের সামনে সমস্ত বাধা দূর হবে বলেই আমরা বিশ্বাস করি।

সালফার
গায়েমাখা সাবান

গন্ধক চর্মরোগে বিশেষ উপকারী। সেজন্য এই সাবান নিত্য ব্যবহারে, বিশেষতঃ গরমের দিনে, খোস, ফোড়া, চুলকানি, ঘামাচি প্রভৃতি চর্মরোগ নিবারণ করে।
বেঙ্গল কেমিক্যাল

ভারতীয় অর্থনীতির গতি

নরেন ভট্টাচার্য

ভারতের বর্ণভিত্তিক সমাজ-ব্যবস্থার কাঠামোটা মোটামুটি একই ধরণের ছিল যুগের পর যুগ ধরে। এই দেশে শিল্পায়নের কাজ শুরু হলেও এই কাঠামোটির বহিরঙ্গের কিছু পরিবর্তন হয়েছে বটে, কিন্তু সমগ্র ভারতবর্ষকে হিসাব করে দেখলে লক্ষ্য করা যাবে যে, ভিতরটা একেবারেই বদলায় নি।

হয়ত এ কথাটাতে কেউ কেউ আপত্তি তুলতে পারেন, কেননা শহর ও শিল্পাঞ্চলে পরিবর্তনের লক্ষণটা সুস্পষ্ট—চোখের সামনে দেখা যাচ্ছে যে, কল-কারখানা গড়ে উঠছে, রুজি-রোজগারের ধান্ধায় এক পরিবারের ছেলেরা চারদিকে ছড়িয়ে পড়ছে, যার ফলে যৌথ পরিবারের প্রাচীন আদর্শ ভেঙে যাচ্ছে ; মেয়েরা স্কুল-কলেজে পড়ছে, অফিস-আদালতে কাজকর্মও করছে, পুরুষের সঙ্গে মেলামেশার সুযোগ বর্ধিত হবার ফলে অসবর্ণ বিবাহের প্রচলন বাড়ছে—এগুলিই তো পরিবর্তনের লক্ষণ! কিন্তু সমগ্র দেশের নিরিখে এ পরিবর্তন কতটুকু? গ্রামময় ভারতের অর্থনীতির মূল উৎস আজও কৃষি, যার উৎপাদন পদ্ধতি সুপ্রাচীন বৈদিক যুগের উৎপাদন পদ্ধতির চেয়ে কিছুমাত্র ভিন্ন নয়। উৎপাদনের পদ্ধতিগত পরিবর্তনের উপরেই সামাজিক পরিবর্তন নির্ভর করে। কৃষিগত উৎপাদন ক্ষেত্রে তেমন কোন মৌলিক পরিবর্তনের পরিচয় নেই, এমন কি স্বাধীনতা-উত্তর যুগেও সে রকম কোন পরিবর্তন ঘটাবার প্রয়াস নেই।

অর্থাৎ আমাদের অর্থনীতির মূল শক্তিটিকে আমরা উৎপাদন পদ্ধতির মধ্যযুগীয় স্তরে রেখে দিয়ে গৌণ শক্তিগুলিকে সর্বাধুনিকতার স্তরে উন্নীত করতে চাইছি। স্বাধীন ভারতের অর্থনীতির এটাই বোধ হয় সবচেয়ে বড় ট্রাজেডি।

আমাদের দেশের শতকরা সত্তর ভাগ মানুষ আজও কৃষিজীবী, এবং এটাও খুব সত্য কথা যে, উৎপাদন পদ্ধতির আদিমতার জন্য এই সত্তর ভাগ মানুষ যা উৎপন্ন করে, কৃষি-ক্ষেত্রে যান্ত্রিকতার প্রবর্তন হলে তার দশ শতাংশ লোকের দ্বারা একই পরিমাণ উৎপন্ন হবে। তাহলে দেখা যাচ্ছে যে, উন্নততর উৎপাদনব্যবস্থা প্রচলিত হলে, আজ যে পরিমাণ লোক কৃষিকর্মে নিযুক্ত রয়েছে, আগামীকাল তত লোকের প্রয়োজন হবে না, বর্তমানে নিযুক্ত লোকেদের এক সামান্য ভগ্নাংশ দিয়েই কাজ চলে যাবে, সত্তর ভাগের জায়গায় দশ ভাগ। তাহলে বাকি ষাট ভাগ যাবে কোথায়? নিশ্চয়ই তাদের শিল্পক্ষেত্রে নিয়ে আসতে হবে। এ ছাড়া আছে ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার চাপ। এতগুলি মানুষকে শিল্পে পুনর্বাসন দিতে কতকাল সময় লাগবে? নিশ্চয়ই কয়েক শো বছর। মানে, কোনদিনই তা সম্ভব হবে না। এই বিষয়টি আমাদের পরিকল্পনাকারেরা ভেবে দেখেন নি।

ইতিমধ্যেই আমাদের ভূমিব্যবস্থার অকার্যকারিতার জন্য দিনের পর দিন ব্যক্তিগত জমির পরিমাণ যেভাবে সীমাবদ্ধ হয়ে আসছে, তাতে সামান্য দু-এক বিঘা জমির মালিকদের পক্ষে কৃষিকার্য লাভজনক বলে বিবেচিত হচ্ছে না, ফলে তারা কৌলিক পেশা ত্যাগ করে শ্রমশিল্পে নিযুক্ত হবার চেষ্টা করছে। পক্ষান্তরে শহরাঞ্চলেও জনসংখ্যার আধিক্যের দরুণ কর্মহীন ব্যক্তিদের সংখ্যা যে হারে বেড়ে যাচ্ছে তাতে প্রতিটি পরিকল্পনার শেষেই বেকারের সংখ্যা প্রাক্-পরিকল্পনা সংখ্যার দ্বিগুণের বেশি হয়ে পড়ছে। তাহলে একটা সিদ্ধান্ত অনিবার্য হয়ে পড়ে যে, যেভাবে পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনাগুলি করা হচ্ছে, তার ফলে অদূর বা সুদূর ভবিষ্যতে বেকার সমস্যা মেটবার কোন সম্ভাবনা নেই। এ ছাড়া আরও একটি গুরুতর সঙ্কট জনজীবনে দেখা দিয়েছে, সেটি হচ্ছে বৃত্তিচ্যুতির সঙ্কট। আমাদের সমাজ অনেকগুলি ক্লাস-গ্রুপে বিভক্ত, প্রতিটি গ্রুপ এক একটি কৌলিক পেশাবলম্বী এক একটি জাতি, যেমন ময়রা, স্যাকরা, তাঁতী ইত্যাদি। আধুনিক ইন্ডাস্ট্রিয়াল সামাজিক কাঠামোর মধ্যে এদের প্রবেশ লাভের সুযোগ ঘটে নি, সপরিবারে কৌলিক পেশা আঁকড়ে ধরে এরা কোনক্রমে টিকে আছে। পরিবারের প্রত্যেকটি সদস্যই পরিশ্রম করে বলেই যা হোক তা হোক করে এরা কায়ক্লেশে মুখ গুঁজে পড়ে আছে। কিন্তু সরকারী নীতির খামখেয়ালির ফলে এরা জাত কে জাত বৃত্তিচ্যুত হচ্ছে। স্বর্ণ নিয়ন্ত্রণ আইন, মিষ্টান্ন নিয়ন্ত্রণ আইন প্রভৃতি এক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য। পুরুষানুক্রমে যে পেশায় তারা অভ্যস্ত, সেই পেশা ত্যাগ করে, অন্য পেশায় যাওয়াও তাদের পক্ষে দুঃসাধ্য, আর যেতে চাইলেই বা যাবার উপায় কি?

ফলে ব্যাপারটা দাঁড়িয়েছে কি? দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার লক্ষ্য ছিল ১ কোটি লোকের কর্ম-সংস্থান, পরে সেই টার্গেট কমিয়ে ৮০ লক্ষে আনা হয়, কিন্তু পরিকল্পনার মেয়াদ অন্তে দেখা যায় যে, ৯০ লক্ষ লোক বেকার থেকে গেছে। তৃতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় ১ কোটি ৪০ লক্ষ লোকের কর্মসংস্থানের পরিকল্পনা করা হল, আর চতুর্থ পরিকল্পনায় কর্মপ্রার্থীর সংখ্যা ২ কোটিকেও ছাপিয়ে গেল। অর্থাৎ আমরা আগে যা বলেছি, প্রতিটি পরিকল্পনার শেষেই বেকারের সংখ্যা প্রাক্-পরিকল্পনা সংখ্যার দ্বিগুণ হয়ে পড়ছে, এই কথার মধ্যে কোন অতিরঞ্জন নেই। স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে, যে পথে পরিকল্পনা এগোচ্ছে, তাতে অনন্তকালের মধ্যেও বেকার সমস্যা সমাধান হবার কোন আশা নেই।

এটা খুবই সত্য কথা যে, রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা যে শ্রেণীর করায়ত্ত থাকবে সেই শ্রেণী নিজেদের স্বার্থের উপযোগী আইন প্রণয়ন করবে। সম্প্রতি এমন

কতকগুলি লক্ষণ দেখা যাচ্ছে; যা থেকে আগামী দিনের কৃষিব্যবস্থার একটা আপত্তিজনক রূপ স্পষ্ট উপলব্ধি করা যাচ্ছে।

বহুবিঘোষিত ভূমিসংস্কার, যার ঢক্কানিনাদ শোনা গেছে ১৯৩৫ সাল থেকে, আজও পর্যন্ত আইনে পরিণত হয় নি। স্বাধীনতা লাভের বিশ বছরের মধ্যে যা হয় নি, তা ভবিষ্যতেও হবে না, একথা হলফ করেই বলা যায়। ভূমিহীন শ্রমিকের বরাতে ভূমির মালিকানা লাভ কোনদিনই হবে না।

আমাদের কৃষিব্যবস্থার একদিকে আছে বড় বড় জোতদার, যারা স্বনামে-বেনামে অপরিমিত জমির অধিকারী। আর আছে অল্প পরিমাণ জমির অধিকারী অসংখ্য মানুষ, যারা কেউ স্বহস্তে চাষ করে, কেউ বা জমি ভাগে দেয়। আমাদের উত্তরাধিকার আইনের ত্রুটির জন্য বহুবিভাগের ফলে জমির পরিসর যত ক্ষুদ্র হয়ে যাচ্ছে, ততই সাধারণ কৃষকের নিকট কৃষিকাজটা অলাভজনক ব্যাপারে পরিণত হচ্ছে। ফলে অনেকেই জমি বিক্রি করে দিচ্ছে, অনেকে চাষবাস না করে অন্যত্র কর্ম-সংস্থানের সুযোগ খুঁজছে। আর এর ফলে কৃষিজ উৎপাদনের হারও দিনের পর দিন কমে যাচ্ছে।

এই অবক্ষয়ের হাত থেকে বাঁচার জন্য সামবায়িক কৃষিব্যবস্থার পরিকল্পনা করেছিলেন স্বর্গত প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহরু। কিন্তু কায়েমী স্বার্থের বাধায় এ প্রচেষ্টার বাস্তব সাফল্য ঘটে নি। এই বিশেষ ইস্যুটিকে কেন্দ্র করে শাসকদলের মধ্যে ভাঙন দেখা গেছল, রাজাগোপালাচারীর নেতৃত্বে কয়েকজন তো কংগ্রেস থেকে বেরিয়েই গেল। শেষ পর্যন্ত অবশ্য সামবায়িক কৃষির ব্যাপারটা ধামাচাপা পড়ে গেল। একটি প্রত্যাশার অপমৃত্যু ঘটল।

কিন্তু ইতিমধ্যে আর একটি শ্রেণী নিঃশব্দে দাবার চাল দিয়ে যাচ্ছিল যারা হচ্ছে ভারতের পুঁজিবাদী শ্রেণী। এরা উপলব্ধি করতে পেরেছে যে, দেশে মুদ্রাস্ফীতির জন্য যেভাবে মুদ্রার মূল্য ধাপে ধাপে হ্রাস পাচ্ছে, তাতে সম্পদের কিছু শাশ্বত অধিকার তাদের বজায় রাখা প্রয়োজন এবং সেই শাশ্বত সম্পদ হচ্ছে ভূমি। কমবেশি যাই হোক, ভারতের ভূমির মালিকানা বহুলোকের হাতে আছে। এই মালিকানাকে সরিয়ে দিয়ে দেশের সমগ্র কৃষিযোগ্য ভূমিকে কয়েকটি পুঁজিপতিগোষ্ঠীর অধীনে আনতে হবে। এদের পরিকল্পনা হচ্ছে যে, মার্কিনী ধরণে এরা বৃহৎ বৃহৎ ফার্ম তৈরি করবে, অর্থাৎ ভূমির ক্ষেত্রেও জয়েন্ট স্টক কোম্পানি প্রবর্তিত হবে। শাসনযন্ত্রের উপর এই শ্রেণীর যথেষ্ট প্রভাব থাকার দরুণ নিজেদের অনুকূলে কিছু আইন ইতিমধ্যেই তৈরি করে নিয়েছে। শিল্পের দোহাই দিয়ে এরা অপরের জমি, সেই জমির মালিকের অনিচ্ছাতেও গ্রাস করার অধিকারী। জমির সর্বোচ্চ সীমা আইন এদের ক্ষেত্রে প্রযুক্ত হয় না। চাষের জন্য বিড়লারা হাজার হাজার একর জমি পেয়েছে পাঞ্জাবের রূপারে, যেখানে আপনার আমার জমির সর্বোচ্চ সীমা কত? মার্কিনী কায়দায় গঠিত এই বিশাল ফার্মের দাবি মেটাতে গিয়ে অনেকগুলি গ্রামকে ধুলায় মিশিয়ে যেতে হয়েছে।

সারা ভারতবর্ষের সমগ্র জমির মালিকানার জন্যই এই বিশেষ শ্রেণীটি ভূমিসংস্কার আইন প্রণয়ন করতে বাধা দিচ্ছে। কেননা প্রচলিত উত্তরাধিকার আইনের কল্যাণে অতি অল্প সময়ের মধ্যেই জমিগুলির বহুবিভাগ হতে হতে সেগুলি অলাভজনক উৎপাদনের স্তরে পৌঁছে গেলেই এদের পক্ষে সেগুলি কিনে নিতে সুবিধা হবে।

এই বিপজ্জনক সম্ভাবনাটির দিকে আজ থেকে বহুবর্ষ আগে যিনি আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলেন, তিনি কিন্তু অর্থনীতিবদ্ ছিলেন না। তিনি হলেন কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ।

আমাদের খাদ্যের ক্ষেত্রে স্বাবলম্বী না হওয়ার পিছনে উক্ত শ্রেণীটির হাত আছে, উপরি-উক্ত অনুচ্ছেদটির নিরিখে এ কথা বলা যেতে পারে। বিদেশ থেকে ক্রমাগত খাদ্যশস্য আমদানী করে চলতে পারে না, অতএব দেশের কৃষি উৎপাদন পদ্ধতির পরিবর্তন প্রয়োজন—এই যুক্তিতে কৃষিক্ষেত্রে ধনতান্ত্রিক উৎপাদন পদ্ধতি প্রয়োগের দাবি তোলা হবে। আমাদের আশঙ্কা হয় যে, শেষ পর্যন্ত এই দাবিই রক্ষিত হবে। তাতে অবশ্য কিছু উৎপাদন বাড়বে, হয়ত অনেকটাই বাড়বে, কিন্তু দেশের সমগ্র ভূমি-সম্পদের অধিকারী হবে মাত্র কয়েকটি পরিবার।

এবং এটাও ধরে নেওয়া যেতে পারে যে, সমাজতান্ত্রিক আদর্শের সঙ্গে যা সঙ্গতিপূর্ণ—অর্থাৎ ভূমিহীন ভূমিশ্রমিকের ভূমিলাভ তথা সামবায়িক ও রাষ্ট্রায়ত্ত কৃষির আদর্শ ধাপে ধাপে পরিত্যক্ত হবে।

প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার যুগে কৃষিগত উৎপাদন সন্তোষজনক হয়েছিল, তার মধ্যে অবশ্য পরিকল্পনা-কারদের কোন কৃতিত্ব নেই, কৃতিত্ব সুবৃষ্টির। কিন্তু তার পর থেকেই উৎপাদনের শোচনীয় অধঃপতন; যদিও কৃষিখাতে যে ব্যয় করা হয় নি, তা নয়। আমার মনে হয়, বিষয়টিকে পরিসংখ্যানের ভিত্তিতে না দেখে অভিজ্ঞতার নিরিখে যাচাই করে নেওয়া ভাল। আমি এ বছরের কথাই বলছি, কেননা এ বছরটি অনাবৃষ্টির বছর। ব্যান্ডেল থেকে বর্ধমান অভিমুখে যদি আপনি যান, তাহলে দুপাশের কৃষিক্ষেত্রগুলির এক অদ্ভুত চিত্র আপনি দেখবেন। দেখবেন কোন কোন স্থানে ধানের চারাগুলি ইতিমধ্যেই দেড় হাত লম্বা হয়ে গেছে আর সেগুলির গোড়ায় জল টলমল করছে। আর তার পাশেই দেখবেন জমি রুক্ষ বন্ধ্যা হয়ে পড়ে আছে মাইলের পর মাইল। স্থানীয় লোকেদের জিজ্ঞাসা করলেই এই পার্থক্যের কারণটা বুঝতে পারবেন। যে সব সঙ্গতিসম্পন্ন চাষী পয়সা দিয়ে সরকারী জল কিনতে পারছে তাদের কোনই অসুবিধা নেই, তাদের ক্ষেতে চাষের কাজ ঠিকই হচ্ছে। পক্ষান্তরে সে অবস্থা যাদের নেই, তাদের মাঠ খালিই পড়ে আছে, কবে বৃষ্টিদেবতার দয়া হবে সে আশায় হাঁ করে বসে থাকা ভিন্ন তাদের আর কোন গতি নেই। এ বছরে বৃষ্টি-দেবতা কৃপা করবেন বলে মনে হচ্ছে না। অথচ দেশে খাদ্যসংকট সীমাহীন, কিন্তু বিনামূল্যে জল পাওয়ার উপায় নেই, অথচ কৃষিখাতের ব্যয়-বরাদ্দ বড় কম নয়।

আমাদের অর্থনৈতিক শক্তিসমূহের মূল উৎস কৃষি এই বাস্তব সত্যটিকে অস্বীকার করে পরিকল্পনাকারেরা দেশের সমগ্র কৃষিব্যবস্থাকে এমন একটা অবস্থায় এনে দাঁড় করিয়েছেন যে, আগামী কয়েক বছরের মধ্যে খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা লাভের কোন সম্ভাবনাই নেই।

আমাদের পরিকল্পনাগুলির মধ্যে সবচেয়ে বিভ্রান্তিকর বিষয় হচ্ছে সমাজতান্ত্রিক প্যাটার্ন। আবাদী কংগ্রেসের পর থেকেই কথাটা সাধারণ মানুষের কানের কাছে এত বেশি শোনানো হয়েছে, এ বিষয়ে কিছুটা আলোচনা অনিবার্য হয়ে পড়ে। এটাও লক্ষ্য করার বিষয় যে, বর্তমানে এই শব্দটির ব্যবহার বিস্ময়জনকভাবে কমে গেছে।

কার্ল মার্ক্স কথিত যে সমাজতন্ত্রের কথা আমরা জানি, তার উদ্ভব হয়েছে

মূলত শ্রম ও মূলধনের বিরোধ থেকে ধনতান্ত্রিক দেশগুলির উৎপাদন ও বণ্টনব্যবস্থার সংকট, তথা শ্রম ও মূলধনের যোগানদারদের শ্রেণীসংঘর্ষ প্রভৃতির ফলে ধনতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থা ভেঙে খান খান হয়ে যাবে—এবং তার জায়গায় গড়ে উঠবে বিশুদ্ধ শ্রমিকরাষ্ট্র—যেখানে উৎপাদনের উপাদানসমূহের উপর ব্যক্তিগত মালিকানার পরিবর্তে সামাজিক মালিকানা প্রতিষ্ঠিত হবে, বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রের এই হচ্ছে মূল কথা।

কিন্তু ভারতে নেতৃস্থানীয় লোকেদের মুখ থেকে হঠাৎ সমাজতন্ত্রের কথা শোনা যাবার পর একটা সন্দেহের উদয় মনে হওয়া স্বাভাবিক যে, তাঁরা সমাজতন্ত্র শব্দটির ধ্বনিগত আবেদনটির দিকেই নজর রেখেছিলেন। কেননা সমাজতন্ত্র, সাম্যবাদ প্রভৃতি কথাগুলির একটা নিজস্ব আবেদন আছে। দাড়ি কামালে সকল লোকের মুখই একরকম দেখায় না, সেই রকম সকল সমাজতান্ত্রিক সমাজের চেহারা একরকম হয়ত নাও হতে পারে। কিন্তু সমাজতন্ত্রের কোন নির্দিষ্ট রূপ না থাকলেও কতকগুলি বিশেষ লক্ষণ আছে, তার মধ্যে সবচেয়ে প্রধান লক্ষণ হচ্ছে উৎপাদনের মূল উপাদানসমূহের রাষ্ট্রীয়করণ। আমাদের আমলাতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থায় ও শ্রেণীবিভক্ত সমাজে এ নীতি কতদূর সার্থক হতে পারে, সেটা ভিন্ন প্রশ্ন, কিন্তু এক্ষেত্রে জিজ্ঞাস্য এই যে, সমাজতন্ত্রের ঘোষিত নীতির প্রতি কতটুকু বিশ্বস্ততা রাখা গেছে? সরকারী উদ্যোগে কিছু কিছু ভারী শিল্প স্থাপিত হওয়াটাই সমাজতন্ত্রের লক্ষণ নয়, কেননা বিশুদ্ধ ধনতান্ত্রিক দেশগুলিতেও সরকারী উদ্যোগ অপরিচিত নয়।

বস্তুত বেসরকারী উদ্যোগের ক্ষেত্র দিনের পর দিন যেভাবে প্রসারিত হচ্ছে, তা থেকে নিঃসন্দেহে এই সিদ্ধান্ত করা চলে যে, নেহরুর আমলে যে সমাজতন্ত্রের আদর্শ ঘোষণা করা হয়েছিল, সে আদর্শের অপমৃত্যু ঘটেছে। প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় শিল্পোন্নয়নের ভার মোটামুটি বেসরকারী উদ্যোগের উপর অর্পিত হয়েছিল এবং বিনিয়োগের পরিমাণ ছিল মোট ১৮০০ কোটি টাকা। দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় বেসরকারী বিনিয়োগের পরিমাণ বেড়ে হয়েছিল ৩৩০০ কোটি টাকা ও তৃতীয় পরিকল্পনায় ৪৩০০ কোটি টাকায় তা দাঁড়িয়েছিল। চতুর্থ পরিকল্পনায় এই বিনিয়োগের পরিমাণ আরও বেড়ে তা ৭০০০ কোটি টাকারও বেশি অঙ্কে দাঁড়াবে।

যেভাবে বেসরকারী বিনিয়োগের হার বাড়ছে তাতে উৎপাদনের ক্ষেত্রে সমাজতান্ত্রিক নীতি প্রচলিত হতে চলেছে একথাটা চিন্তা করা ক্রমশ হাস্যকর হয়ে উঠছে।

অতি উচ্চাকাঙ্ক্ষী পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনাগুলির ব্যয়নির্বাহের জন্য যে পদ্ধতিতে মূলধন সংগ্রহ করা হয়েছে তার কুফল আজ জনজীবনে মারাত্মক আকার গ্রহণ করেছে। দ্বিতীয় পরিকল্পনার মঞ্জুরীকৃত ব্যয়ের মধ্যে প্রায় ৮০০ কোটি টাকার কাছাকাছি সংগ্রহ করতে হয়েছিল বিদেশ থেকে চড়াসুদে ঋণ করে এবং আরও ১২০০ কোটি টাকা ঘাটতি ব্যয় পদ্ধতিতে অর্থাৎ নোট ছাপিয়ে কিন্তু এইভাবে মুদ্রাস্ফীতির যে সূচনা করা হল তার ফলে যে মূল্যবৃদ্ধির ঝোঁক দেখা দিল, তা আর আয়ত্তে আনা গেল না। প্রথম পরিকল্পনার সময় দ্রব্যমূল্য মোটামুটি স্থিতিশীল ছিল, কিন্তু দ্বিতীয় পরিকল্পনার গোড়া থেকেই তা বৃদ্ধি পেতে লাগল এবং জীবনযাত্রার সূচকসংখ্যা বেড়ে গেল শতকরা ৩০ ভাগ। এই যে শুরু হল বৈদেশিক ঋণ গ্রহণ এবং ঘাটতি ব্যয়, তা আজ দেশের দ্রব্যমূল্য এমনভাবে বাড়িয়ে দিয়েছে যে, দেশবাসীর ধৈর্যের বাঁধ আজ ভেঙে পড়তে বসেছে। ঘাটতি ব্যয়, বা মুদ্রাস্ফীতি বা বেহিসাবী নোট ছাপানোর জন্য দিনের পর দিন টাকার মূল্য ধাপে ধাপে কমেছে, বিদেশের বাজারে ভারতীয় টাকার চাহিদা নষ্ট হয়ে গেছে। তারই বাস্তব স্বীকৃতি এই সাম্প্রতিক ডিভ্যালুয়েশন। বিদেশের কাছে টিকি বাঁধা পড়ে যাবার দরুণ টাকার মূল্য কমিয়ে পূর্বকৃত ঘাটতি ব্যয়ের প্রায়শ্চিত্ত করতে হচ্ছে। ভারতীয় ডিভ্যালুয়েশনের পরিপূর্ণ সুযোগ নিচ্ছে পশ্চিমের ধনতন্ত্রী দেশগুলি, কেননা ভারতের রপ্তানী বাণিজ্য মূলত কাঁচামালের উপর নির্ভরশীল, ডিভ্যালুয়েশনের ফলে ভারতীয় কাঁচামাল আরও অনেক সস্তাদরে বাইরের বাজারে বিক্রি হতে বাধ্য হচ্ছে। সেই সকল দেশের পক্ষেই ডিভ্যালুয়েশনের কিছুটা মূল্য থাকতে পারে, যাদের সম্পূর্ণভাবেই রপ্তানী বাণিজ্যের উপর নির্ভর করতে হয়। কোন শিল্পে উন্নত দেশের পণ্য যদি বাইরে তেমন ভাল বিক্রয় না হয়, তাহলে ডিভ্যালুয়েশন করে বিদেশের বাজারে মাল সস্তায় বিক্রি করে বাজার রাখার চেষ্টা করা যেতে পারে। কিন্তু ভারতের রপ্তানীপণ্য বলতে কাঁচামাল। প্রকৃতপক্ষে চা, পাট, তুলা এবং কাঁচা চামড়া ব্যতীত রপ্তানীযোগ্য সামগ্রী আর কিছু এদেশে নেই। ডিভ্যালুয়েশনের ফলে এগুলি বাইরের বাজারে আরও সস্তায় বিক্রি হবে, আর বাইরের শিল্পজাত সামগ্রী আমাদের দেড়গুণ বেশি দাম দিয়ে কিনে আনতে হবে। আমাদের এখানে এমন বহু শিল্প আছে যেগুলির উৎপাদনের পক্ষে প্রয়োজনীয় অনেক উপাদানই বাইরে থেকে আনতে হয়। ফলে এই সকল পণ্যের উৎপাদনব্যয় বৃদ্ধি পেয়েছে। ডিভ্যালুয়েশন জনিত মুদ্রাস্ফীতির ফলে বাজারদর আরও বেড়েছে। এই কারণে সর্বত্রই বেতন ও দুর্মূল্যভাতা বৃদ্ধির দাবি উঠছে, যার কিয়দংশ মেটাতে গেলেও আরও নোট ছাপাবার প্রয়োজন হবে। ফলে টাকার বাস্তব মূল্য আরও হ্রাস পাবে, এবং দেশের মধ্যে টাকার বাস্তব মূল্য আরও হ্রাস পেলে ভারতের উত্তমর্ণ দেশগুলি আবার ডিভ্যালুয়েশন করার জন্য চাপ দেবে।

বি, সি, মাইতি এণ্ড কোং

—ইলেকট্রো প্লেটিং সামগ্রী—

নিকেল ভ্যাট ও ব্যারেল * ডাইনামো * পলিশিং মেসিন এবং পলিশিং করিবার জন্য যাবতীয় সামগ্রীর আদি সরবরাহক।

শো রুমঃ—৯৪, প্রেমচাঁদ বড়াল স্ট্রীট, কলি-১২। ফোন ঃ ৩৪-৩১৭৩
৩, রাধামোহন পাল লেন, কলি-১২ ঃ অফিস-ফোন—৩৪-৪৮৪৬

স্বাধীন ভারতে আধুনিক চিকিৎসা বিজ্ঞান

অমূল্যধন মুখোপাধ্যায়

স্বাধীনোত্তর ভারতবর্ষে আধুনিক চিকিৎসা বিজ্ঞানের প্রগতির ক্ষেত্র প্রশস্ত করার চেষ্টা হইলেও অনেক-ক্ষেত্রে আবার বিরূপ ভাবেরও প্রকাশ দেখা যাইতেছে। আনন্দের কথা কয়েকজন এদেশীয় চিকিৎসক স্বাধীন ভারতে পূর্ব আরোপিত বাধা হইতে মুক্তি পাইয়া নিজেদের চেষ্টায় চিকিৎসা বিজ্ঞানের গবেষণায় মৌলিক উপাদান সংগ্রহ করিয়া সাফল্য অর্জনের দ্বারা আন্তর্জাতিক স্বীকৃতিলাভ করিয়া ভারতবর্ষের গৌরব বৃদ্ধি করিয়াছেন।

চিকিৎসা বিজ্ঞানের নানা বিভাগের মধ্যে অল্প সময়ে অস্ত্রচিকিৎসা-বিদ্যা বিশেষ অবদান সরবরাহ করিয়াছে। হৃৎপিণ্ডের কবাটের দোষ মেরামত, দূষিত ফুসফুস অস্ত্রোপচার করিয়া বাদ দিবার ব্যবস্থা মানবজীবনের ক্ষেত্রে অত্যদ্ভুত উন্নতির পথ প্রশস্ত করিয়া দিয়াছে। পাশ্চাত্য দেশে ইহা বহু পূর্বে হইলেও আমাদের দেশে প্রথমে মাদ্রাজের ভেলোরের মেডিক্যাল কলেজে আরম্ভ হইয়া এখন প্রায় অধিকাংশ রাজ্যের বড় বড় শহরে বিশেষজ্ঞগণ এই প্রকারের অস্ত্রোপচারে বিশেষ সাফল্য অর্জন করিয়াছেন। ইহার সহিত সংজ্ঞালোপ করার ব্যবস্থারও প্রভূত উন্নতি সাধিত হইয়াছে। "হার্ট ও লাঙস" নামক বিশেষ যন্ত্রের সাহায্যে কৃত্রিম উপায়ে রোগীর শরীরে বায়ু ও রক্ত চলাচলের ব্যবস্থা প্রবর্তন করিয়া কয়েক ঘণ্টা যাবৎ বিশেষ জটিল অস্ত্রোপচারসমূহ করা হইতেছে। শল্য চিকিৎসায় অগ্রগতির সহিত সংজ্ঞালোপ করার ক্ষেত্রেও যুগান্তর আনীত হইয়াছে বলা যাইতে পারে।

মস্তিষ্ক ও স্নায়ুতন্ত্রের উপর অস্ত্রোপচার করিয়া মানবজীবনে নূতন আলোকপাত করা হইতেছে। যে সব রোগীর এই প্রকারের রোগ হইলে পূর্বে কিছু করা যাইত না তাহাদিগের মস্তিষ্কে অস্ত্রোপচার করিয়া অর্বুদ বা দূষিত তন্তুকোষ বাহির করিয়া দেওয়া হইতেছে। আমাদের দেশে এই প্রকারের অস্ত্রোপচারও বহু জীবন রক্ষা করিতে সমর্থ হইয়াছে। এদেশের তরুণ চিকিৎসকগণ নিজেদের অধ্যবসায় ও কঠোর নিষ্ঠার মাধ্যমে যে সব অভিজ্ঞতা লাভ করিয়া এই সব অস্ত্রোপচারে সাফল্য অর্জন করিতেছেন তাহা বিশেষ প্রশংসার্হ।

ভারতবর্ষে এক সময় সামাজিক কারণে গ্রাম পঞ্চায়েতের বিচারে নাসিকা ও কর্ণ কর্তন করিয়া শাস্তি দেওয়ার ব্যবস্থা প্রচলিত ছিল। এইভাবে নাসিকা ও কর্ণ কাটা ব্যক্তিগণ তদানীন্তন চিকিৎসকগণের দ্বারা চিকিৎসিত হইয়া এই সব অঙ্গ সুন্দরভাবে মেরামত করাইয়া লইত। এই প্রকারের অস্ত্রোপচার "প্লাস্টিক সার্জারী" আখ্যাপ্রাপ্ত হইয়াছিল ও ভারতীয় প্রথায় এই সব অস্ত্রোপচার সারা পৃথিবীতে গৃহীত ও সমাদৃত হইলেও দীর্ঘকাল ভারতবর্ষে উহার প্রচলন একপ্রকার বন্ধ ছিল বলা যায়। বিগত তিন দশকে এই সব অস্ত্রোপচারের পুনঃপ্রবর্তন করিয়া এদেশের কয়েকজন বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক ভারতবর্ষের নষ্ট গৌরব পুনরায় ফিরাইয়া আনিয়া যশস্বী হইয়াছেন ও আমাদের জাতির মর্যাদা বৃদ্ধি করিয়াছেন। ভারতবর্ষের কয়েকটি কেন্দ্রে এই সব অস্ত্রোপচার বিশেষ জনপ্রিয়তা লাভ করিয়াছে।

ক্যানসার রোগের কারণতত্ত্ব ও আধুনিক চিকিৎসাব্যবস্থায় উন্নতির চেষ্টাও অব্যাহত আছে। উচ্চশক্তি-সম্পন্ন রেডিয়াম, কোবাল্ট, প্রভৃতির ব্যবহার বাড়িয়াই চলিয়াছে। এই রোগ হইতে নিষ্কৃতির জন্য বিশেষ ধরণের অস্ত্রোপচার ব্যবস্থাও আমাদের দেশের কয়েকজন চিকিৎসক প্রবর্তন করিয়া খ্যাতি অর্জন করিয়াছেন।

সূক্ষ্ম ভাইরাস বাহিত অপর রোগ বিষয়েও গবেষণার জন্য ইলেকট্রন অণুবীক্ষণযন্ত্র সংগ্রহ করিয়া গবেষণা কয়েকটি কেন্দ্রে পরিচালিত হইতেছে।

আধুনিক ঔষধিবিজ্ঞান নিত্য নতুন অ্যান্টিবায়োটিক ও শরীরের গ্রন্থি ও ছত্রাক হইতে সংগৃহীত নানা প্রকারের ঔষধের সাহায্য দিতেছে। ফলে নতুন নতুন রোগ দেখা দিলেও তাহাদের সহিত প্রত্যক্ষভাবে মোকাবিলা করার মত নির্ভরযোগ্য ঔষধেরও সন্ধান পাওয়া যাইতেছে। এই সব আবিষ্কারে ভারতীয় চিকিৎসকগণও অনেক ক্ষেত্রে বিশেষ অবদান সরবরাহ করিতেছেন ও গবেষণায় তাঁহারা পিছাইয়া নাই।

আধুনিক বিজ্ঞানসম্মত চিকিৎসা-ব্যবস্থা বর্তমানে যে কত জনপ্রিয় হইয়াছে তাহার প্রত্যক্ষ প্রমাণ হাসপাতালে ভর্তির ও চিকিৎসার জন্য অসম্ভব রকমের ভিড় হইতে অনুমান করা যায়। অবশ্য জনসাধারণের দুর্গত অর্থনৈতিক অবস্থার জন্যও অনেকে বাধ্য হইয়া এই সব কেন্দ্রে চিকিৎসার নামে যাহা পাওয়া যায় তাহাতেই মানসিক সন্তোষলাভের চেষ্টাও করেন তাহা ঠিক। তথাপি এই সব কেন্দ্রের জনপ্রিয়তা চিকিৎসা বিজ্ঞানের স্বীকৃতির পরিচায়ক সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। আধুনিক চিকিৎসা বিজ্ঞানের প্রতিষ্ঠা ও জয়যাত্রার জন্য চিকিৎসকগণের সমষ্টিগত চেষ্টা কম নহে। অবশ্য এই সব কেন্দ্রের চিকিৎসাব্যবস্থায় আমূল সংস্কারের প্রয়োজন অনস্বীকার্য।

বিদেশী শাসনের ভেদনীতি এদেশে চিকিৎসক সৃষ্টির ক্ষেত্রেও প্রতিফলিত হইয়া সহায়-সঙ্গতিপন্ন লোকেদের জন্য মেডিক্যাল কলেজের পাশ করা ডাক্তার ও দেশের শতকরা ৮০ জন অধ্যুষিত পল্লীগ্রামের দুর্গত আর্থিক অসঙ্গতিতে আপন্ন জনগণের জন্য মেডিক্যাল স্কুলের পাশ করা ডাক্তার সৃষ্টির প্রয়াস স্থায়ী হইয়াছিল। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের প্রাক্কালে কয়েকটি

রাজ্যে কংগ্রেসী মন্ত্রিসভা গঠিত হওয়ায় মাদ্রাজ ও যুক্তপ্রদেশের মন্ত্রিসভা মেডিক্যাল স্কুলের বিলোপ-সাধন করিয়া বিদেশী শাসকদের আমলেই একই শ্রেণীর ডাক্তার সৃষ্টির দৃষ্টান্ত স্থাপন করেন। স্বাধীনোত্তর ভারতবর্ষের সর্বত্র কয়েক বৎসরের মধ্যে চিকিৎসার ক্ষেত্রে উচ্চ ও নিম্নবিত্তদের জন্য দুই প্রকারের চিকিৎসাব্যবস্থা প্রবর্তনের ব্যবস্থা নির্মূল করিয়া আজ সর্বভারতে ৮৩টি পূর্ণাঙ্গ মেডিক্যাল কলেজ চালু হইয়াছে। প্রতি বৎসর এই সব কলেজে প্রায় ১০,৫০০ ছাত্র-ছাত্রী ভর্তি হইতেছে। বর্তমানে ভারতবর্ষে প্রায় ৮৮ হাজার অনুমোদিত শিক্ষিত ও পরীক্ষোত্তীর্ণ ডাক্তার আছেন। গড়ে জনপ্রতি চিকিৎসকের অধীনে প্রায় সাড়ে পাঁচ হাজারজনের চিকিৎসার দায়িত্ব থাকে, কিন্তু শহরাঞ্চলে অধিক চিকিৎসক নানা কারণে থাকায় এই হারের ইতর-বিশেষ যথেষ্ট দেখা যায় ও গ্রামাঞ্চলে অনেক অধিক সংখ্যক ব্যক্তির জন্য একজন করিয়া ডাক্তার পাওয়া যায়। গ্রামের লোকেদের অর্থনৈতিক অবস্থার উল্লেখযোগ্য উন্নতি সাধিত হইলে ও আরও অধিক সংখ্যক স্বাস্থ্যকেন্দ্র স্থাপিত হইয়া অধিক বেতন ও গ্রাম্যভাতার ব্যবস্থা করিয়া সরকারী পর্যায়ে চিকিৎসক নিয়োগ করিতে পারিলে গ্রামে চিকিৎসকের অপ্রতুলতার হার হ্রাস পাওয়া সম্ভবপর।

এই প্রসঙ্গে বলা চলে যে, চিকিৎসা-কার্যে সাহায্যের জন্য, সেবিকা, ধাত্রী, স্বাস্থ্যপরিদর্শিকা, স্বাস্থ্যকর্মী, টীকাদাতা প্রভৃতি সহায়ক শ্রেণীর সংখ্যা স্বাধীন ভারতে বাড়িলেও প্রয়োজনের তুলনায় তাহা অনেক কম। এই শ্রেণী-সমূহের জন্য আরও অধিক সংখ্যক কর্মীকে শিক্ষা দিবার সুব্যবস্থা ব্যাপকভাবে করা অত্যন্ত আবশ্যক।

নানা প্রচেষ্টার মাধ্যমে বর্তমানে কেবলমাত্র জনগণের রোগের চিকিৎসাই একমাত্র লক্ষ্যরূপে গ্রহণ না করিয়া ব্যাধিসমূহের প্রতিরোধের প্রতি বিশেষ দৃষ্টি স্বাধীনতার পরে দেওয়া হইতেছে। এমন এক সময় ছিল যখন রোগের চিকিৎসা অগ্রাধিকার পাইত কিন্তু রোগের উৎসের অনুসন্ধান করিয়া তাহাদের দূরীকরণের দিকে বিশেষ দৃষ্টি পূর্বে পড়ে নাই। নিবার্য অনেক ব্যাধি যেমন ম্যালেরিয়া, কলেরা, যক্ষ্মা প্রভৃতির দমনে স্বাধীন ভারতে উল্লেখযোগ্য চেষ্টা দেখা গিয়াছে। গত ১৫ বৎসর কালের মধ্যে ম্যালেরিয়া-জর্জরিত গ্রামসমূহে ব্যাপকভাবে ম্যালেরিয়া বীজাণুবাহী এনোফেলিস মশককুলকে বিনাশ করার জন্য যে, ডি, ডি, টি অভিযান চালিত হইয়াছে তাহার কল্যাণে গ্রামাঞ্চলে আজকাল রক্তহীন, অস্থিচর্মসার, পেটমোটা প্লীহাভরা বালক-বালিকা দেখা যায় না। ম্যলেরিয় ভরতবর্ষ হইতে নির্মূল হইয়াছে বলা যাইতে পারে। এই রোগের কবলে পড়িয়া কত জনপদ যে শ্মশানে পরিণত হইয়াছিল তাহা অনেকেরই স্মরণপথে আছে।

বিশুদ্ধ পানীয় জলের সুব্যবস্থা এখনও সর্বত্র না হওয়ায় জলের দোষে পেটের নানা অসুখ কলেরা, উদরাময়, টাইফয়েড, আমাশয় প্রভৃতির সহিত সঠিকভাবে মোকাবিলা করা যায় নাই। তবে কলেরা রোগের বিস্তার রোধের জন্য কলেরার মরশুমের প্রাক্কালে কলেরার প্রতিরোধক টীকাদান করিয়া অনেকের শরীরে এই রোগের বিরোধী রক্ষাকবচ দেওয়া সম্ভবপর হইয়াছে। অশার কথা যে কলিকাতা তথা পশ্চিমবঙ্গের গাঙ্গেয় উপত্যকা কলেরার প্রধান উৎস বলিয়া নিরূপিত হওয়ায় ও কলিকাতায় দমদম হাওয়াই বন্দর বর্তমানে পৃথিবীর অন্যতম বৃহৎ যাত্রী বন্দররূপে গণ্য হওয়ায় এখান হইতে পৃথিবীর সর্বত্র এই রোগ ছড়াইয়া পড়ার সম্ভাব্যতা মনে রাখিয়া বিশ্ব-স্বাস্থ্য সংস্থা কয়েকটি আন্তর্জাতিক সংস্থার ও ভারত সরকারের সহযোগিতায় কলেরা রোগ স্থায়িভাবে দমনের জন্য বিশেষ পরিকল্পনা রচনা

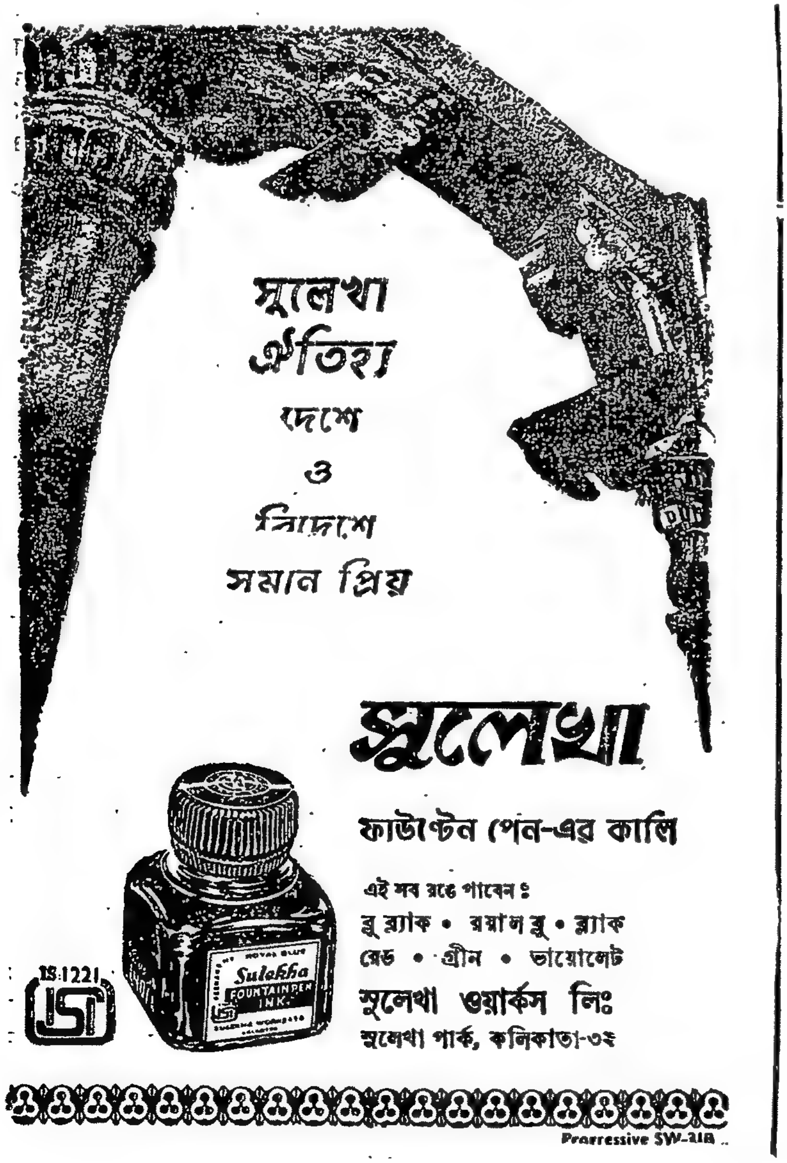

করিয়া রূপদানের চেষ্টায় নিযুক্ত আছেন।

জনগণের মধ্যে অপর যে রোগ আতঙ্কের সৃষ্টি করিয়াছে, তাহা হইতেছে যক্ষ্মা। সাধারণের দুর্গত অবস্থার জন্য জীবিকা অর্জনের উদ্দেশ্যে অনেককে গ্রাম ছাড়িয়া শহরের জনাকীর্ণ, অস্বাস্থ্যকর, আলো-বাতাসবিহীন ঘিঞ্জি বস্তিতে বা বাটীতে বাস করিতে বাধ্য হওয়ায় অতি সহজেই এই রোগের কবলে পড়িতে দেখা যাইতেছে। চিকিৎসা বিজ্ঞানের অগ্রগতিতে প্রধান যে সব ঔষধ এই রোগের বিরুদ্ধে সাফল্য অর্জন করিয়াছে, যথা স্ট্রেপটোমাইসিন, পি এ এস ও আইসোনিয়াজিডের কল্যাণে এই রোগের কবলে আর আজকাল লোকে মৃত্যুমুখে পতিত হয় না। এই রোগের প্রতিরোধ জন্য শৈশবকালে বি-সি-জি ভ্যাকসিন দেশের সর্বত্র গত কয়েক বৎসর যাবৎ দিবার ব্যবস্থা হইয়াছে। যক্ষ্মারোগীর সংখ্যা অনেক হওয়ায় সকল রোগীকে হাসপাতালে স্থান দেওয়া সম্ভবপর না হওয়ায় রোগীদের বাটীতে চিকিৎসক পাঠাইয়া বিনা ব্যয়ে চিকিৎসার ব্যবস্থা কয়েকটি কেন্দ্রে চালু আছে। যক্ষ্মা-নিবারণী সমিতি এইরূপ কয়েকটি কেন্দ্র ও ভ্রাম্যমাণ চিকিৎসাব্যবস্থা ও তাঁহাদের কলিকাতার কেন্দ্রীয় দপ্তরে শিশু যক্ষ্মারোগীদের সুচিকিৎসার ব্যবস্থা করিয়াছেন। প্রতি বৎসর "টি বি সীল" বিক্রয় করিয়া এই সংস্থা যে অর্থ সংগ্রহ করেন, তাহাও এই রোগের বিরুদ্ধে সংগ্রামে নিয়োজিত হয়।

এ দেশের জনগণের মধ্যে মৃত্যুহার কমাইবার চেষ্টা বিশেষ সার্থক হইয়াছে। ইহা প্রতি হাজারে ১৬·৩ সংখ্যায় নামিয়াছে ও জনগণের পরমায়ুর গড় প্রায় ৫০ বৎসর হইয়াছে। অকালে শিশু ও মাতৃমৃত্যুর হারও উল্লেখযোগ্যভাবে হ্রাস পাইয়াছে।

প্রতি বৎসরই চিকিৎসা ও স্বাস্থ্য খাতে অধিক অর্থ ব্যয় করা হইতেছে। তৃতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় এই খাতে ৩৪৫ কোটি টাকা ব্যয় করা হইয়াছে। জনগণের সাধারণ স্বাস্থ্যের উন্নতিকল্পে এবং তাহাদিগকে সুস্থ রাখিয়া শিল্প ও কৃষিকার্যে অধিক দ্রব্য উৎপাদনে সাহায্যের জন্য বলিষ্ঠ জাতি গঠনের উদ্দেশ্যে নিবার্য ব্যাধির বিরুদ্ধে সংগ্রামের ক্ষেত্রে অগ্রাধিকার পাইতেছে। জনগণের পারিপার্শ্বিক স্বাস্থ্যের উন্নতিবিধান করিয়া গ্রামাঞ্চলে আরও অধিক স্বাস্থ্যকেন্দ্র ও প্রসূতি ও শিশুমঙ্গল কেন্দ্র স্থাপন করিয়া এই সব কেন্দ্রে নিযুক্ত চিকিৎসক ও সহায়কগণের সাহায্যে জনগণের মধ্যে স্বাস্থ্য-বার্তা ও পুষ্টির বিষয়ে জ্ঞান দিবার চেষ্টা আরও নিষ্ঠার সহিত চালিত হওয়া উচিত।

এ দেশীয় সনাতন ও পুরাতন আয়ুর্বেদীয় চিকিৎসা শিক্ষণ ও গবেষণার জন্যও ভারত সরকার অধিক অর্থ বরাদ্দ করিয়া নানাভাবে উৎসাহ দিতেছেন। ভারতবর্ষীয় আয়ুর্বিজ্ঞানের পুনঃপ্রবর্তনের চেষ্টাও বহুক্ষেত্রে দেখা যাইতেছে।

একদিকে যেমন সকল ক্ষেত্রে প্রগতির চেষ্টা চলিতেছে, অপরদিকে খাদ্যদ্রব্য ও ঔষধ মধ্যে ভেজাল দিয়া হঠাৎ ধনী হওয়ার প্রয়াসও স্বাধীন ভারতে অত্যন্ত বৃদ্ধি পাইয়াছে। রাষ্ট্রীয় কাঠামো কঠোর হস্তে ভেজাল দমনে আত্মনিয়োগ না করিলে পরিণাম যে কিরূপ শোচনীয় হইয়া উঠিবে তাহা সকলকেই চিন্তান্বিত করিতেছে। স্বাধীনতার সুযোগে কিছুসংখ্যক অর্থলিপ্সু অসৎ ব্যক্তির মানবের নিত্য-প্রয়োজনীয় ঔষধ ও খাদ্য লইয়া ছিনিমিনি খেলার ব্যবস্থা অবিলম্বে দমন করা প্রয়োজন। এজন্য যে সব আইন আছে, তাহার পরিবর্তন ও সংশোধন করিয়া দুষ্কৃতকারীর জন্য কঠোর শাস্তির ব্যবস্থা থাকা উচিত।

দুঃখের সহিত বলিতে হয় যে, অনেক ক্ষেত্রে সময় সময় সস্তায় জনপ্রিয়তা অর্জনের প্রয়াসও ক্ষমতাসীন ব্যক্তিদের মধ্যে দেখা দিয়া জটিলতা বৃদ্ধি করে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় যে, অতি সম্প্রতি কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় এ দেশের অশিক্ষিত চিকিৎসকগণকে (যাঁহারা হাতুড়ে পর্যায়ে পড়েন) ইনজেকসন দেওয়া, প্রসব করানো ও কয়েকটি ঔষধ ব্যবহার বিষয়ে নিষেধাজ্ঞা দিয়া সরকারী স্বীকৃতি দিবার জন্য বিলের (আইনের) খসড়া রচিত করিয়াছেন। কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রী সংবাদপত্রের এক সাক্ষাৎকারে বলেন যে, এই সব ব্যক্তিদের জ্ঞানের ও শিক্ষার মান এত নিম্নস্তরের যে তাঁহাদিগকে কোনওরূপ শিক্ষার সুযোগ দিয়া চিকিৎসা বিভাগে সহকারীর কার্য দেওয়ার উপযুক্ত তাঁহারা নহেন। অথচ এই সব তথাকথিত চিকিৎকদের আইন করিয়া কিছুটা স্বীকৃতি দিয়া তালিকাভুক্ত করিলে জনসাধারণের মধ্যে বিভ্রান্তির সৃষ্টি করিতে বাধ্য বলিয়া অনেকে মনে করিতেছেন। হঠাৎ কয়েক লক্ষ এই শ্রেণীর লোককে স্বীকৃতি দিলে চিকিৎসা বিজ্ঞানের অগ্রগতির পথে বাধা সৃষ্টি করাই হইবে বলিয়া মনে করি। বিজ্ঞানের বিকাশ ও উন্নতিতে যেরূপ শিক্ষা ও বিদ্যার প্রয়োজন তাহার প্রতি দৃষ্টি না দিয়া এক শ্রেণীর মধ্যে জনপ্রিয়তা অর্জনের প্রয়াস এযাবৎ চিকিৎসা বিজ্ঞানের যে অসাধারণ উন্নতি ঘটিয়াছে তাহার বিপরীত ব্যবস্থার দিকেই জাতিকে লইয়া যাওয়ার যেন পথ করিয়া দেওয়া হইতেছে। চিকিৎসা বিজ্ঞানের ধারক অনুসরণকারিগণকে সচেতন হইয়া চিকিৎসা বিজ্ঞানের প্রগতির প্রতিটি ক্ষেত্রের প্রতি সজাগ দৃষ্টি রাখিয়া নিজেদের চেষ্টায় বিজ্ঞানের জয়যাত্রায় অংশভাগী দুর্গত ও রোগাক্রান্ত মানবগোষ্ঠীর সহায়তায় আত্মনিয়োগের যে ব্রত বিজ্ঞানী চিকিৎসকগণ গ্রহণ করিয়াছেন সরকারী ব্যবস্থায় বিচলিত না হইয়া তাহার অনুশীলনের পথে নিষ্ঠার সহিত অগ্রসর হইলে আমাদের জাতির তথা দেশের মর্যাদা পৃথিবীর চিকিৎসা বিজ্ঞানে সুপ্রতিষ্ঠিত হইতে বাধ্য বলিয়াই মনে করি।

৩ মাসের জন্য বিনামূল্যে উপহার

স্ত্রীলোকের সৌন্দর্য, কাশ্মীর আর্ট শাড়ী। সর্বাধুনিক মনোরম ডিজাইন এবং রং লইয়া মরশুমের নূতন নূতন মাল আসিয়াছে। আমাদের কাছে কেবলমাত্র বড় সাইজের কাপড় পাওয়া যায়। ১টি ডিল্যাক্স শাড়ীর মূল্য ১১৲ টাকা; ২টি ২০৲ টাকা; ৩টি ২৮৲ টাকা; ৪টি ৩৬৲ টাকা। দুইটি বা তদধিক শাড়ীর অর্ডারের সহিত বিনামূল্যে ব্লাউস পীস। পোস্ট পার্শেলযোগে অর্ডারের মাল পাঠান হয়।

Arvind Agencies (DBM-22)
Post Box 1408, Delhi-6.

দুগ্ধ সরবরাহ ও কয়েকটি প্রশ্ন

বহ্নি রায়

... আমার সন্তান যেন থাকে দুধে ভাতে।' নবজাত শিশুর মুখের দিকে চেয়ে প্রতি জননীই এ সাধটুকু বোধহয় মনে মনে আজো পোষণ করেন। বাস্তব কিন্তু বড় রূঢ়। সন্তান বড় হবার সঙ্গে সঙ্গেই শতকরা ৮০ ভাগ বাঙালী জননীর ঐ সাধটুকু ক্রমে ভেঙে খান-খান হয়ে যায়। চাল-ডাল, তেল-নুন, বাড়িভাড়া আর জামা-কাপড় কিনতেই ফতুর। স্কুলের বেতন, ডাক্তার ওষুধ অব্দি গেলেই পকেট ফাঁকা। তারপর সব বিলাসিতা—দুধ কেনা বিলাসিতা (সে শিশু আর বৃদ্ধ যার জন্যই হ'ক), মাছ-মাংস কেনা বিলাসিতা, বই ও আসবাবপত্র তো বটেই। সরকার ধরেই নিয়েছেন যে, ৩০০৲ টাকার নিচে যে সব পরিবারের মাসিক আয় তারা দুধ কিনতে যাবে না। সরকার ঠিকই ধরেছেন—সাধ থাকলেও সাধ্যে কুলোয় না।

দুধের প্রয়োজন সম্বন্ধে চিকিৎসকদের অভিমত কি এবার দেখা যাক। তিন বছর বয়স পর্যন্ত শিশুর স্বাস্থ্য ও পুষ্টির জন্য দুধ একান্ত প্রয়োজন। ছ' মাস বয়স পর্যন্ত শিশুর ওজন ও প্রয়োজন মাফিক প্রতিদিন আধ সের থেকে এক সের দুধ লাগে। মাতৃস্তন থেকে হয়ত তার অর্ধেক পূরণ হয়। ক্ষেত্রবিশেষে মাতৃস্তনে তেমন দুধ নাও থাকতে পারে। কিন্তু দেখা যাচ্ছে শতকরা প্রায় ৮০ ভাগ শিশু প্রয়োজনমত দুধ খেতে পায় না। আর দুধের অভাবের জন্য শিশুদের শোথ রোগ ও 'শুকনো রোগ' হয়। পথে-ঘাটে দরিদ্র শিশুদের মধ্যে এই রোগ প্রায়ই চোখে পড়ে। তাছাড়া প্রয়োজনমত দুধ না পেলে শিশু বড় হবার পর তার রোগ প্রতিরোধের ক্ষমতা যেমন কমে যায়, তেমনি ছোঁয়াচে রোগ তাকে অনায়াসে আক্রমণ করতে পারে। জনৈক বিশেষজ্ঞের মতে পশ্চিমবঙ্গে প্রতি ১০০ জন শিশুর মধ্যে অন্ততঃ একজন শিশু দুধের অভাবজনিত কারণে ছোঁয়াচে রোগ আক্রমণ প্রতিরোধে ব্যর্থ হয় এবং রোগের শিকার হয়।

নিম্নবিত্ত, দরিদ্র ও সাধারণ বাঙালী পরিবারের শিশু ও বৃদ্ধদের অবস্থা, তাদের ক্রয়ক্ষমতা এবং তাদের দুধের প্রয়োজন ও চাহিদার বিষয়টি একদা ডাক্তার বিধানচন্দ্র রায়ের সহানুভূতি আকর্ষণ করেছিল। প্রয়োজন ও চাহিদার কতকটা পূরণ করার জন্যই তিনি 'বৃহত্তর কলকাতা দুগ্ধ সরবরাহ প্রকল্প' হাতে নিয়েছিলেন এবং তার রূপদানে সচেষ্ট হয়েছিলেন।

কিন্তু স্বাধীনতা লাভের উনিশ বছর পরেও কি ডঃ রায়ের অভিলাষ পূর্ণ হয়েছে? জনসাধারণ (শিশু ও বৃদ্ধরা) কি দুধ খেতে পাচ্ছেন, কিনতে পারছেন? কলকাতা থেকে খাটাল কি সত্যই অপসৃত হয়েছে?

রাজ্য সরকারের প্রচার বিভাগ থেকে প্রকাশিত সাপ্তাহিক 'কথা-বার্তায়' (২২শে জুলাই '৬৬) বলা হ'চ্ছে ঃ 'বর্তমানে প্রতিদিন এক লক্ষ লিটারের বেশি দুধ সংগ্রহ হ'চ্ছে এবং মোট প্রায় ১,৩২,০০০ লিটার দুধ বণ্টন করা হচ্ছে। এর মধ্যে পুরোপুরি গরুর দুধ ৪০,০০০ লিটার, স্ট্যান্ডার্ড দুধ ৭৩,০০০ লিটার এবং দুবার টোন করা ১৯,০০০ লিটার।' এই সঙ্গে আরো বলা হ'চ্ছে ঃ 'দুধ উৎপাদনের এই মন্দার মেয়াদ আগস্ট মাস থেকে অক্টোবর।' অর্থাৎ অক্টোবর মাসের পর দুধের সরবরাহ বাড়বে এমন একটা আশা দেওয়া হচ্ছে।

গত কয়েক বছর সরকারী দুগ্ধ সরবরাহ প্রকল্প কতটুকু সাফল্য অর্জন করেছে তা সরকারী হিসাবের মাধ্যমেই পাঠক-সাধারণের কাছে স্পষ্টতর করার চেষ্টা করছি। হরিণঘাটায় গরু ও মহিষের সংখ্যা; দুধ উৎপাদন, সংগ্রহ ও সরবরাহের পরিমাণ এতে উল্লেখ করা হয়েছে। কয়েক বছর আগে রাজ্যের দুগ্ধমন্ত্রী দুধের সরবরাহ সম্পর্কে জনসাধারণকে যে আশা ও আশ্বাস দিয়েছিলেন সে প্রসঙ্গও এরপর উল্লেখ করছি।

	১৯৬৩-৬৪		১৯৬৪-৬৫	
৩১শে মার্চ পর্যন্ত গরু ও মহিষের সংখ্যা	গরু	১,১৪৪	গরু	১,০২১
	মহিষ	৪,৭৪১	মহিষ	৩,৬৩৯
গড়ে প্রতিদিন দুধের উৎপাদন (কেজি হিসাবে)	গরুর	১,৫৭২	গরুর	১,৭৮৬
	মহিষের	২৩,০৮০	মহিষের	১৬,৬৪৬
গড়ে প্রতিদিন সংগৃহীত অতিরিক্ত দুধ (কেজি হিসাবে)	১৪,৯৭০			১১,১৬৮

উৎপাদন ও সংগ্রহ চেষ্টা সমভাবে চালিয়ে যাওয়া সত্ত্বেও সামগ্রিকভাবে দুধের জোগান কমে গেল। ১৯৬৩-৬৪ সালে যেখানে দুধের জোগান ছিল গড়ে প্রতিদিন ৩৯,৯৯২ কেজি সেখানে ১৯৬৪-৬৫ সালে তা কমে গিয়ে দাঁড়াল গড়ে ২৯,৬০০ কেজিতে।

রাজ্য সরকার 'যত দোষ নন্দ ঘোষ' বলে ১৯৬৫ সালের ১৮ই নভেম্বর 'পশ্চিমবঙ্গ দুগ্ধজাত দ্রব্যাদি নিয়ন্ত্রণ আদেশ ('৬৫)' জারি করলেন। দুগ্ধ দপ্তর থেকে আজকাল সাংবাদিকদের শোনান হচ্ছে যে, হরিণঘাটায় সম্প্রতি ৫,০০০ দুগ্ধবতী গরু-মহিষ কেনার কাজ শুরু হ'য়েছে।

এবার দেখা যাক রাজ্য সরকারের দুগ্ধ বণ্টন ব্যবস্থার মাধ্যমে সম্প্রতি কত কার্ডে কত দুধ দেওয়া হয়েছে। অবশ্য এটিও সরকারী হিসাব।

	৭.১১.৬৫	৭.১২.৬৫	৭.১.৬৬
প্রদত্ত কার্ডের সংখ্যা			
ব্যক্তিবিশেষকে	১,২৯,৩০৯	১,৩৩,২০৮	১,৩৪,৮৫৮
সংস্থাকে	৪২৯	৪২৯	৪২৯
দুধ সরবরাহ করা হয়েছে (লিটার হিসাবে)	৮৮,৮০০	৯৬,৬০০	১,১৪,৪০০

১৯৬৩ সালের 'পশ্চিমবঙ্গ' সংখ্যায় দুগ্ধমন্ত্রী শ্রীফজলুর রহমান বলেছেন ঃ "বর্তমান বৎসরে ('৬২-'৬৩) বেলগাছিয়ায় একটি বড় দোহশালার কাজ শুরু হয়েছে। এখানকার দৈনিক উৎপাদনের পরিমাণ হচ্ছে এখন ৮২,০০০ লিটার দুধ। তৃতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার শেষাশেষি আমাদের উৎপাদনের লক্ষ্য বাড়িয়ে দৈনিক ১,৮৬,০০০ লিটার করতে সক্ষম হব।

"বর্তমানে হরিণঘাটা দুগ্ধ কলোনীতে ৭,০০০ দুগ্ধবতী ও ২,০০০ অন্যান্য পশুর স্থান সংকুলান হচ্ছে। বর্তমানে এখানে ১২,০০০ গবাদি পশুর স্থান সংকুলানের ব্যবস্থা আছে। দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনাকালে আমরা যে সব কাজ করেছি ঃ (১) কলকাতা শহরে ১৯৬১ সালে মাখনতোলা দুধ বিক্রির পরিমাণ ৫০,০০০ লিটার পর্যন্ত বৃদ্ধি করা হয়েছে। (২) কলোনীগুলিতে রক্ষিত গবাদি পশুর সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ৫,০০০।

"তৃতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার লক্ষ্য স্থির করা হয়েছে ঃ (১) প্রায় ২,৭০,০০০ লিটার প্রক্রিয়াসিদ্ধ দুধ প্রতিদিন বণ্টন করা। (২) কলকাতা থেকে ২২,০০০ দুগ্ধবতী গবাদি পশুকে হরিণঘাটা ও কল্যাণীতে স্থানান্তর।"

তৃতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা শেষে প্রতিদিন ২,৭০,০০০ লিটার প্রক্রিয়াসিদ্ধ দুধ সরবরাহের যে আশ্বাসবাক্য শ্রীরহমান সেদিন শুনিয়েছিলেন আজ তা পরিহাসে পরিণত হয়েছে। বর্তমানে এর অর্ধেক দুধও বণ্টন করা সম্ভব হয় নি।

কিন্তু যাঁরা দুধ কেনেন তাঁদের মধ্যে থেকে সরকারী দুধের গুণাগুণ ও মূল্য সম্পর্কে নানা অভিযোগ ও প্রশ্ন উত্থিত হয়েছে। পূর্বে গরুর দুধের দাম ছিল ৪০ পয়সা পাউণ্ড আর স্ট্যাণ্ডার্ড দুধের দাম ২৮ পয়সা পাউণ্ড। বর্তমানে দুধের দাম অনেক বাড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। ফলে সরকারী দুধ অনেকের ক্রয় ক্ষমতার বাইরে চলে গেছে এবং সরকার তার মূলনীতি থেকে ভ্রষ্ট হয়েছেন। তাছাড়া দুধ কেটে যাওয়া, দুধ থেকে মাখন তুলে নিয়ে তাতে গুঁড়ো দুধ মেশানো ও দুধের কটু স্বাদ ইত্যাদি অভিযোগও রয়েছে। দৃষ্টান্তস্বরূপ স্টেটসম্যান কাগজে সম্প্রতি প্রকাশিত দুটি চিঠির উল্লেখ করছি। প্রথমটি লেখা হয়েছে গত ৭ই জুলাই; লিখেছেন শ্রী আর জি বিশ্বাস। দ্বিতীয়টি লেখা হয়েছে গত ১৮ই জুলাই; লিখেছেন শ্রীমতী মঞ্জুলিকা গুহ।

"কিছুদিন থেকে কলকাতা দুগ্ধ সরবরাহ প্রকল্পের কর্তৃপক্ষ খাঁটি গরুর দুধ সরবরাহের কথা সগর্বে ঘোষণা করছেন এবং তার দামও ধার্য করেছেন খুব বেশি, ১ টাকা ৪৪ পয়সা লিটার। যদিও পরে দাম কমিয়ে ১ টাকা ৩৬ পয়সা করা হয়েছে তবু সাধারণ লোকের পক্ষে দাম বেশিই থেকে গেছে। প্রথমদিকে মনে হয়েছিল এই দুধ বেশ ভাল; কিন্তু এখন দেখা যাচ্ছে এ দুধও ক্রমশই খারাপ হচ্ছে। আজকাল সামান্যই মাখন ওঠে। প্রায়ই সোনালী ক্যাপের বোতলে মোষের দুধ দেওয়া হয়, এটা কি কেউ লক্ষ্য করেছেন?"

দ্বিতীয় চিঠি ঃ "গত চার বছর আমরা হরিণঘাটার দুধ নিচ্ছি। আজকাল দেখা যাচ্ছে গরুর দুধে তেমন মাখন নেই। যদিও কর্তৃপক্ষ বলছেন গরুর দুধ থেকে মাত্র শতকরা ৩ ভাগ ক্রীম তোলা হয়, কিন্তু মনে হয় তার চেয়ে বেশিই তোলা হচ্ছে। আগে বাচ্চাদের জন্য ছানা কাটতে গেলে পাত্রে ক্রীম লেগে যেত এবং পাত্র পরিষ্কার করতে বেগ পেতে হোত, কিন্তু এখন পাত্র ধুতে কোন অসুবিধাই নাই। গরুর দুধের উৎকর্ষ ক্রমশই যেন নেমে যাচ্ছে।"

সারা পশ্চিমবঙ্গে এবং কলকাতায় দুধের অভাব যে তীব্র এবং প্রয়োজনের তুলনায় সরবরাহ যে সীমিত সে বিষয়ে সরকার বা জনসাধারণের কারো কোন মতভেদ নেই। পশ্চিমবঙ্গে দুধের চাহিদা ও সরবরাহ সম্পর্কে বঙ্গীয় জাতীয় বণিক ও শিল্প সঙ্ঘের একটি রিপোর্ট থেকে কিছুটা তথ্য ও বক্তব্য তুলে ধরছি ঃ

ভারত সরকারের নিউট্রিশন উপদেষ্টা কমিটির মতানুযায়ী মাথা পিছু (পূর্ণ বয়স্ক) প্রতিদিন ১০ আউন্স করে দুধের প্রয়োজন। শিশু, বৃদ্ধ সর্ব বয়সের গড়ে যদি ৮ আউন্স করে দুধ লাগে তবে পশ্চিমবঙ্গের ৪ কোটি ২ লক্ষ মানুষের (বর্তমান জনসংখ্যা) প্রয়োজন বছরে প্রায় ৮ কোটি ৮০ লক্ষ মণ দুধ। কিন্তু গরু, মহিষ ও ছাগলের সব দুধ মিলিয়ে এই রাজ্যে দুধের মোট উৎপাদন বছরে ২ কোটি ১৪ লক্ষ মণ। এর মধ্যে শতকরা ৩০ ভাগ আবার ছানা, মাখন, ঘি, দৈ ইত্যাদি ভাবে ব্যবহৃত হয়। অর্থাৎ মাথাপিছু ৮ আউন্স দুধের জায়গায় প্রকৃতপক্ষে দুধ মেলে ২½ আউন্স মত। কিন্তু মনে রাখা প্রয়োজন যে, পশ্চিমবঙ্গের অধিকাংশ মানুষই দুধ কিনতে পারে না। দুধ তাদের ক্রয় ক্ষমতার বাইরে।

সায়ান্স ক্লাব জার্নাল-এ (ফেবরুয়ারী'৬৬) শ্রী এস সি রায়ের একটি প্রবন্ধে উল্লিখিত তথ্য থেকে বলা যায় ঃ কলকাতা শহরে খাটালগুলিতে (আনুমানিক হিসাব) যে ১৮,০০০ গরু ও ২১,০০০ মহিষ রয়েছে তা থেকে প্রতিদিন মোট ১,৮৩,০০০ কেজি দুধ পাওয়া যায়। বৃহত্তর কলকাতার সকল লোককে তাদের প্রয়োজনমত দুধ সরবরাহ করতে গেলে প্রতিদিন মোট ২৩ লক্ষ ২২ হাজার কেজি দুধ দরকার। কিন্তু সারা পশ্চিমবঙ্গে দুধের উৎপাদন যেখানে ১৭ লক্ষ ১৫ হাজার কেজি (প্রতিদিন) সেখানে সকলকে দুধ সরবরাহ করা অসম্ভব।

বৃহত্তর কলকাতার জনসংখ্যার হিসাবে দেখা যায় ঃ ১৪ বছর বয়স অব্দি শিশুদের সংখ্যা ২৪·০৯ লক্ষ (এদের প্রতিদিন আধ লিটার দুধ প্রয়োজন)। মা হয়েছে অথবা মা হবে এমন মেয়েদের সংখ্যা প্রায় ৫·৭৯ লক্ষ (এদেরও আধ লিটার করে দুধ প্রয়োজন)। তাছাড়া বয়স্ক লোকের সংখ্যা ৫৩·৮৮ লক্ষ (যাদের প্রয়োজন ¼ লিটার দুধ)।

বয়স্ক লোকেদের বাদ দিলেও বৃহত্তর কলকাতায় শুধু শিশু ও মায়েদের জনাই প্রতিদিন ১৪·৯৫ লক্ষ লিটার দুধ প্রয়োজন।

এই সব হিসাব-নিকাশ, চাহিদা-জোগানের কথা আপাতত শেষ করি। সাধারণ মানুষ স্পষ্টভাবে যা দুগ্ধ দপ্তরের কাছে জানতে চায় তা হচ্ছে ঃ (১) পয়সা দিয়ে খাঁটি দুধ মিলবে কি না? (২) স্বল্প আয়ী লোকেরা সামান্য দামে (ডবল টোন) দুধ ঠিকমত পাবে কি না? (৩) মিল্ক-পাউডার গোলা ও নষ্ট দুধ সরবরাহ বন্ধ করা হবে কিনা?

ডাক্তার রায় চেয়েছিলেন কলকাতার সাধারণ মানুষ ন্যায্য দামে যেন একটু দুধ খেতে পায় আর শহর থেকে নোংরা খাটালগুলো যেন দূর হয়। আজ স্বাধীনতার উনিশ বছর পরে সরকারী দুগ্ধ দপ্তর জনসাধারণকে ন্যায্য দামে দুধ সরবরাহ করতে তো ব্যর্থ হলেনই, তারপর তাঁরা এখন পরোক্ষভাবে সাধারণ মানুষকে খাটালের দিকেই পথ দেখাচ্ছেন।

নব ভারতের শিল্পচিন্তাঃ অনিশ্চিত ভবিষ্যৎ

মিত্রেন

[*Self-help is the first condition of success for a nation, no less than for an individual.*
—জওহরলাল নেহরু]

আত্মনির্ভরশীলতাই জাতীয় উন্নতির প্রথম শর্ত।

দার্শনিক বলেন, নিজেকে জান। বস্তুবাদী বলবেন, নিজেকে গঠন কর। নিজেকে গঠন করার জন্যই মানুষ ইতিহাসের বন্ধুর পথ যুগ যুগ অতিক্রম করে এগিয়ে চলেছে। পথিমধ্যে স্খলন, পতন, ত্রুটি পেছনদিকে বার বার আকর্ষণ করে বটে, কিন্তু সম্মুখের আহ্বান কোনদিন তাকে হাল ছেড়ে দেওয়ার পরামর্শ দেয় নি। বাধাকে অপসারণ করে এগিয়ে যাওয়াই তাই মানবিক। এই এগিয়ে চলার নেশাতেই অধিকতরভাবে গ্রামীণ সামন্তযুগকে পেছনে রেখে সভ্যতা ধনবাদী শহুরে শিল্পায়নের দিকে এগিয়েছে, সেখান থেকে আর এক পদক্ষেপ হয়েছে সমাজবাদী সমাজে, যেখানে শিল্পায়নের দ্বারা ব্যক্তিগত মুনাফার সঞ্চয়শিকারী প্রবৃত্তিকে দমন করে সমাজের সামগ্রিক কল্যাণকে সবার মধ্যে বিলি-বন্দোবস্তের প্রয়াস করেছে প্রগতিশীল সভ্যতা। এই পর্যন্ত ইতিহাস এগিয়েছে; এখানেই থমকে দাঁড়াতে হয়েছে। ঠিক এই মোড়ের মাথায় ইতিহাস পুরুষের পদক্ষেপকে বিভ্রান্ত করার জন্য চক্রান্তের জাল বিস্তৃত হচ্ছে। একটি অতিকায় মাকড়সা তার একাধিক বলবান বাহুতে সে জাল আপ্রাণ টেনে রাখার চেষ্টায় অবিরত শশব্যস্ত আছে।

ভারতবর্ষ আপাতত এই বিচিত্র খেলার দর্শকমাত্র। কেননা যে স্তর পার হয়ে এলে দর্শকের গ্যালারি থেকে মল্লযোদ্ধার ক্রীড়াভূমিতে এসে দাঁড়ানো যায়, সে স্তর পর্যায়ে তার পূর্ণ বিচরণ অদ্যাবধি ঘটে ওঠে নি (অবশ্য এক্ষেত্রেও উল্লম্ফন যে অসম্ভব এমন কোন লেখাজোখা নেই; তবে ভারত ক্রমবিকাশের ধারাটি গ্রহণেরই পক্ষপাতী)। এখন দেখা যাক, কৃষিনির্ভর ভারতবর্ষ সামন্ততান্ত্রিক নাগপাশের গ্রন্থিমোচনে কেমনভাবে অগ্রসর হয়ে সমাজতান্ত্রিক ধাঁচের সমাজ গঠনের প্রতিজ্ঞাটি একাগ্রচিত্তে পালন করে যাচ্ছে।

প্রথম পরিকল্পনা

১৯৪৮ সালের স্বাধীনতা দিবসে নব ভারতের নেতা প্রধানমন্ত্রী নেহরুজী জাতির উদ্দেশ্যে ঘোষণা করলেনঃ ভারতবাসীর স্বাধীনতার স্বপ্ন কি ছিল? আমরা শুধু এই স্বপ্নই দেখি নি যে, বৃটিশ ভারত ছাড়বে এবং আমরা আগের মতই অনুন্নত অবস্থায় দিন কাটাব। আমরা যে ভারতের স্বপ্ন দেখেছি, সে দেশের মানুষ দরিদ্র এবং বেকার থাকবে না।

ভারতের দ্রুত উন্নতির জন্য ভারত সরকার সেদিন চিন্তা করেছিলেন পরিকল্পিত উপায়ে দেশের শ্রীবৃদ্ধি সাধনের কথা। তারই ফলশ্রুতি ১৯৫০ সালের পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা। প্রতি পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার মাধ্যমে দেশকে তার স্বপ্ন সম্ভবের পথে এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে। ১৯৫০ সালের প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা অবশ্য কোন চটক বা চমক নিয়ে শিল্প প্রসারের ক্ষেত্রে উপনীত হতে পারে নি। প্রথম পরিকল্পনার নজর ছিল প্রধানত কৃষির ওপর। তৎসত্ত্বেও শিল্পোন্নয়নের ক্ষেত্রে শোণিতপ্রবাহস্বরূপ বিদ্যুৎ শক্তির উৎপাদন ২·৩ মিলিয়ন কিলোওয়াট, ৩ দশমিক ৪ কিলোওয়াটে এবং সামগ্রিকভাবে শিল্পোৎপাদন ৩৮ শতাংশ বৃদ্ধি পায়। প্রথম পরিকল্পনার আয়তন ছিল ৩,৩৬০ কোটি টাকা, যার প্রায় চুরানব্বই শতাংশই দেশীয় লগ্নী। কিন্তু শিল্প প্রসারের ক্ষেত্রে প্রথম প্রচেষ্টা একটা প্রাথমিক উদ্যোগের প্রয়াসমাত্র। দেশের শিল্পোন্নয়নের ক্ষেত্রে যাকে যুগান্তকারী কোন পদক্ষেপরূপে চিহ্নিত করা কঠিন। মোট ৯৮৮ কোটি টাকা বরাদ্দের মধ্যে খরচ করা সম্ভব হয়েছে মাত্র একশ কোটি টাকা। শিল্পোন্নয়নের আশা মোট আয়তনের আট শতাংশও স্পর্শ করতে পারে নি।

স্বাধীনতার আগে জাতীয় আন্দোলনের স্বপ্ন ছিল দ্রুত শিল্প প্রসার এবং সমগ্রভাবে শিল্পক্ষেত্রের জাতীয়করণ। কিন্তু স্বাধীনতার পরই সে স্বপ্ন ভঙ্গ হল। সরকার জাতীয়করণের শপথ কার্যে পরিণত করতে পারলেন না। বরং ১৯৪৮ সালের শিল্পনীতিতে বেসরকারী উদ্যোগকে অবাধ সুযোগ দিয়ে একচেটিয়া সরকারী উদ্যোগ হিসেবে রাখা হল অস্ত্রাদি নির্মাণ, রেলসামগ্রী এবং আণবিক শক্তি প্রকল্পকে। লোহ, কয়লা, ইস্পাত, বিমান ও জলপোত নির্মাণ, টেলিফোন, টেলিগ্রাফ ও বেতার যন্ত্র, খনিজ তেল প্রভৃতির ক্ষেত্রে বেসরকারী উদ্যোগকে দশ বছরের ছাড়পত্র দেওয়া থাকল ব্যবসা করার সুযোগ হিসেবে। বিদেশী মূলধন প্রবেশের সুযোগও রইল। অবশ্য সঙ্গে সঙ্গে প্রয়োজনবোধে যে কোন শিল্পসংস্থাকে সরকারী নিয়ন্ত্রণাধীনে আনারও ব্যবস্থা রাখা হয় এবং নূতন শিল্প প্রতিষ্ঠান স্থাপন করতে হলে লাইসেন্স গ্রহণের আবশ্যকতা আছে বলেও ঘোষণা করা হয় ১৯৫১ সালের শিল্প, উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণ আইনে।

তথাপি ভারতের তিমিরাচ্ছন্নতা কি অপসারিত হল, নাকি তার কিছু মাত্র সম্ভাবনা দেখা গেল?

এর উত্তর ১৯৫০ সালে নেহরুজীর স্বাধীনতা দিবসের ভাষণ। নেহরুজী সক্ষোভে বললেনঃ আমাদের প্রত্যেকেরই এক গভীর উদ্বেগের কারণ হলেন এক শ্রেণীর লোক, যাঁরা অন্যের কষ্টের ভিত্তিতে অর্থ আত্মসাৎ করে যাচ্ছেন। তিনি শিশুর মত আবেগের সঙ্গে বললেনঃ আমি নিজেও এজন্য লজ্জিত। যাঁরা মুনাফা সঞ্চয় এবং মজুতদারির অপরাধে অপরাধী তাঁদের বিরুদ্ধে কেন আমরা কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারি না? আমি বিস্মিত হই এই ভেবে যে, কেমন করে আমরা এতদূর দুর্বল হয়ে পড়লাম!

নেহরুজীর ঐ দুঃখের দাহন আজও রাবণের চিতার মতই জ্বলছে। তবে তাঁর মত সে দুঃখকে প্রকাশ করা দূরে থাক, অনুভবও কেউ বড় একটা করেন না।

বেসরকারী উদ্যোগ ও বিদেশী

বিদেশে বাণিজ্য (৯)

লিথো : ওয়েস্ট ইণ্ডিজের অন্যতম লোকনৃত্য

ওয়েস্ট ইণ্ডিজ ১৯৬৫ সালে
ভারতীয় বাটা প্রতিষ্ঠান থেকে
মোট ২১৮,০০০ জোড়া
জুতো কিনেছেন ***Bata***

মূলধন খাটানোর মৃদু নিয়ন্ত্রিত সুযোগ জাতির ভাগ্যে সামগ্রিকভাবে কোন উল্লেখ্য পরবর্তন সৃষ্টি করে না। জাতীয় আয়ের আঙ্কিক বৃদ্ধি গণনার মধ্যেই ধরা থাকে, সর্বসাধারণের হাতে এসে পৌঁছায় না

প্রথম পরিকল্পনার আওতায় জাতীয় আয়ের বৃদ্ধি অবশ্যই লক্ষ্য অতিক্রমে সফল হয়েছিলঃ লক্ষ্য ছিল এগার শতাংশ, বৃদ্ধি দেখা যায়, সাড়ে সতের শতাংশ। কিন্তু অবাধ বাণিজ্যের অথবা মিশ্র অর্থনীতির (ভারতের বর্তমান অবস্থা) দেশে জাতীয় আয়ের আঙ্কিক হিসেবটা সমাজের সকল স্তরকে স্পর্শ করে না, যদিও ভাগ-বাটোয়ারার সময় অঙ্ক কষতে সকলের মাথা যোগ করেই গড় হিসেব টানা হয়। সুতরাং জাতীয় আয়ের আঙ্কিক ঊর্ধ্বগতিতে জনসাধারণের পুলকিত হওয়ার প্রশ্ন জাগে না। দেশ-পরিচালকদের মনে বরং উদ্বেগ দেখা দিতে পারে, নেহরুজীর কণ্ঠে সেই উদ্বেগ আমরা পরিকল্পনার প্রারম্ভেই শুনেছি। ভারতের শিল্পনীতির হের-ফের করার প্রয়োজন সে কারণে দেখা দিয়েছিল তখনই।

প্রথম পরিকল্পনায় শিল্প সম্প্রসারণের আয়োজন ছিল না বটে, তবে বিশেষ ক্ষেত্রে লক্ষ্য-সীমা অতিক্রমণের সাফল্য লক্ষিত হয়েছে। উৎপাদন লক্ষ্য ছাপিয়েছিল মিলজাত বস্ত্র, চিনি, সেলাই কল, সাইকেল, কাগজ ও কাগজে তৈরি বোর্ড। যন্ত্রপাতি, সিমেণ্ট ও রাসায়নিক দ্রব্যাদির ক্ষেত্রে অধিক উৎপাদন সম্ভব হয়েছে। কয়েকটি নূতন শিল্প স্থাপনাও উল্লেখযোগ্য। কিন্তু পরিকল্পনার লক্ষ্যই ছিল অল্পায়াসসাধ্য, সুতরাং এক্ষেত্রে উদ্যোগকে কৌশলী করার পরীক্ষা দিতে হয় নি। যে সব ক্ষেত্রে উদ্যোগের কোন বালাই ছিল না, তেমন অব্যবহৃত উৎপাদন ক্ষমতার ব্যবহার করা হয়েছে। ফলও পাওয়া গেছে। এ কৃতিত্ব পরিকল্পনার যত না হোক, অবহেলিত ক্ষেত্রকে কার্যকরী করে তোলার জন্যই তা সফলকাম হয়েছে। স্বয়ং নেহরুজী ১ম পরিকল্পনা সম্পর্কে মন্তব্য করেছেনঃ আমাদের কোন বিশিষ্ট উদ্যোগ (Particular effort) প্রয়োগ করতে হয় নি। আমরা যা ছিল তাকেই নাড়াচাড়া করেছি; তাকেই বলেছি, পরিকল্পনা।

সমাজতান্ত্রিক ধাঁচের সমাজ

প্রথম পরিকল্পনার শেষ প্রান্তে এসে সমাজতান্ত্রিক ধাঁচের সমাজব্যবস্থা গড়ে তোলার সিদ্ধান্ত গৃহীত হলে শিল্পোন্নয়ন তথা সামগ্রিকভাবে অর্থনৈতিক কাঠামোকে নতুন অবয়ব দান করার প্রয়োজন দেখা দেয়। অর্থাৎ অবাধ বাণিজ্যকে কল্যাণবাদী রাষ্ট্রীয় অর্থনীতির ওপর আরও কতক পরিমাণে সমাজবাদী রাষ্ট্রের অনুরূপ নিয়ন্ত্রণাধীন করার প্রয়াস কাগজে কলমে দেখানোর দরকার হয়ে পড়ে।

সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রে শিল্পোন্নয়নের ওপর সর্বাধিক গুরুত্ব আরোপ করা হয়ে থাকে। তার মানে অবশ্যই এই নয় যে কৃষিকে অবহেলা করা হয়। বরং কৃষিজাত পণ্যের অধিক উৎপাদনের জন্য কৃষিকাজে প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি নির্মাণ ও বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির ব্যবহার হয়। সেজন্য ক্রমশ কৃষিকাজ ও মান্ধাতার আমলের হলাকর্ষণ ত্যাগ করে, বৈজ্ঞানিক সারের ব্যবহার করে, উৎপাদন বৃদ্ধিকে প্রথাবদ্ধ সামন্ততান্ত্রিকতা থেকে মুক্ত করে। সুতরাং দ্রুত শিল্পায়নই সমাজতান্ত্রিক সমাজের প্রধান লক্ষ্য। শিল্পোন্নতি ব্যতিরেকে জাতীয় উন্নতি কখনই তীব্রতা লাভ করতে পারে না। সেই কারণেই কৃষিপ্রধান ধনতান্ত্রিক দেশগুলিতেও আজ কৃষিজ উন্নতির পাশাপাশি শিল্পোন্নতির প্রতি দৃষ্টি রাখা হয়েছে। অনুন্নত অর্থনীতির নিগড় বাঁধন ত্যাগ করতে হলে চাই দ্রুত শিল্পোন্নতি এবং সেই উন্নতির ফসলকে সামগ্রিক কল্যাণের উদ্দেশ্যে ব্যবহার করতে হলে প্রয়োজন, বেসরকারী মুনাফা উত্তোলনের সুযোগ উত্তরোত্তর সংকুচিত করে শিল্পে সরকারী উদ্যোগকে প্রসার্যমান করে তোলা।

১৯৫৪ সালে ভারতীয় সংসদ সমাজতান্ত্রিক ধাঁচের রাষ্ট্র গঠনের নীতি গ্রহণ করলে স্বভাবতই উপরোক্ত পন্থায় নতুন করে পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা রূপায়ণের আবশ্যকতা অনুভূত হয়। ফলে নতুন শিল্পনীতি গ্রহণ করতে হয়েছে ১৯৫৬ সালের এপ্রিল মাসে।

এই নীতি অনুসারে (১) সম্পূর্ণভাবে রাষ্ট্রীয় দায়িত্বের আওতায় আনা হল ১৭টি শিল্পকেঃ আণবিক শক্তি, জলস্থল অন্তরীক্ষের পরিবহন, লৌহ ও ইস্পাত, খনিজ তৈল ইত্যাদি। সরকারী ও বেসরকারী উদ্যোগ সমভাবে চালু থাকবে দ্বিতীয় শ্রেণীর শিল্পে; সরকার ক্রমশ তাঁর নিয়ন্ত্রণাধিকার প্রসৃত করবেন সেখানে। বারটি এই জাতীয় শিল্পের মধ্যে উল্লেখ্য হল, সারোৎপাদন, মেসিনটুল, অ্যান্টিবায়োটিক্স, অ্যালুমিনিয়ম, জলস্থলের পরিবহন। তৃতীয় ক্ষেত্রে, যেমন, সিমেণ্ট, বস্ত্রাদি চিনি উৎপাদন প্রভৃতির ক্ষেত্রে বেসরকারী উদ্যোগের পাশাপাশি সরকারী উদ্যোগ রচনারও অধিকার থাকবে।

দ্বিতীয় পরিকল্পনাকালে (১৯৫৬-৬১) শিল্পের সম্প্রসারণে নূতন শিল্পনীতি অনুসারে নজর রাখা হয়েছিল। কয়েকটি ক্ষেত্রে উৎপাদনও তাই উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি লাভ করে। শতকরা হিসাবে ইস্পাত একশত এবং অ্যালুমিনিয়ম দেড়শত ভাগ বৃদ্ধি পায়; মেশিনটুলসের উৎপাদন বৃদ্ধি হয়েছে শতকরা পাঁচশত ভাগ এবং বৈদ্যুতিক শক্তি উৎপাদন ৬৮ শতাংশ।

শিল্পোৎপাদনের ক্ষেত্রে সামগ্রিক উন্নয়নের হার ছিল চল্লিশ শতাংশ। তিনটি ইস্পাত উৎপাদন কারখানা স্থাপিত হল ভিলাই, দুর্গাপুর এবং রূঢ়কেলায়। সরকারী উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত এই তিনটি ইস্পাত উৎপাদক কারখানা ছাড়াও বেসরকারী অপর দুটি প্রতিষ্ঠানেও বিনিয়োগ প্রসৃত করা হয়েছে। প্রধানত ভারী শিল্প বা শিল্পে বিনিয়োগযোগ্য উৎপাদক দ্রব্য উৎপাদনের প্রতি নজর রেখে দ্বিতীয় পরিকল্পনা অনুন্নত অর্থনৈতিক অবস্থায় দূরদৃষ্টির পরিচয় দিয়েছে। যন্ত্রপাতি নির্মাণ শিল্পের উন্নতিকে দ্রুততর করার প্রতি আগ্রহ শিল্পায়নের আগ্রহই প্রকাশ করে। কিন্তু এ কারণেই দেশের ঘাড়ে যে প্রকাণ্ড আর্থিক বোঝা চেপে বসে পরিকল্পনাকালে সে বোঝা বহন করার মত সাধারণ শক্তি অর্জনের জন্যও উপযুক্ত অবস্থা সৃষ্টির প্রয়োজন ছিল।

দ্বিতীয় পরিকল্পনাকালে বিনিয়োগের পরিমাণ প্রথমটির দ্বিগুণ হয়েছে। বৈদেশিক সাহায্য হিসেবে গ্রহণ করা হয়েছে মোট বিনিয়োগের একুশ দশমিক এক শতাংশ। লক্ষ্য ছিল জাতীয় আয় বাৎসরিক হারে পাঁচ শতাংশ বৃদ্ধি; বেকারীর পরিমাণ সঙ্কোচন; মূল ও ভারী শিল্পে গুরুত্ব আরোপ; ও আয়বৈষম্য হ্রাসের দ্বারা সমাজতান্ত্রিক সমাজের দিকে অগ্রগতির পথ প্রশস্ত করা।

তৃতীয় প্রকল্পে জের

তৃতীয় পরিকল্পনায়ও শিল্পের ওপর গুরুত্ব হ্রাস করা হয় নি। ইস্পাত, রাসায়নিক শিল্প, শক্তি উৎপাদন এবং যন্ত্র শিল্পোৎপাদন তৃতীয় পরিকল্পনারও লক্ষ্য। বাৎসরিক আয় বৃদ্ধির লক্ষ্য শতকরা ছয় ভাগ। এই পরিকল্পনায় স্বনির্ভরশীল উন্নয়নের স্তরে পৌঁছানোর উচ্চাশাও রাখা হয়েছিল।

তৃতীয় পরিকল্পনার সঙ্গে সঙ্গে সামগ্রিক উন্নয়নের চিন্তাও ছিল। যেমন কৃষি ও জনসম্পদের ব্যবহারকে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ বলে স্বীকার করা, এবং মাটি ও মানুষের পূর্ণতম বিকাশের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের প্রকল্প রচনা করা।

চতুর্থ যোজনা

পরিকল্পনামন্ত্রী সম্প্রতি চতুর্থ পরিকল্পনার চূড়ান্ত রূপ প্রকাশে বিলম্বের হেতু স্বরূপ যে সমুদয় কারণ উল্লেখ করেছেন তাতে দেখা যাচ্ছে, (১) বৈদেশিক সাহায্যের অনিশ্চয়তা, (২) ২৬ শতাংশ দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি এবং (৩) মুদ্রামূল্য হ্রাসজনিত অবস্থায় যন্ত্রপাতি ও ভোগ্যপণ্যের বেসামাল অবস্থা অন্যতম।

অর্থাৎ তিন তিনটি পরিকল্পনার পর দেশের ওপর কী জাতীয় আর্থিক বিপর্যয় নেমে এসেছে পরিকল্পনা-মন্ত্রীর বিলম্বিত নয়া প্রকল্পই তার প্রমাণ। সংসদে প্রশ্ন উঠেছে যে (৪) উপরোক্ত চাপ ছাড়াও দেশীয় পুঁজিপতি সমাজের চাপেও কি চতুর্থ যোজনা নিয়ে পরিকল্পনামন্ত্রীকে ফিরে ফিরে ভাবতে হয় নি?

বিচিত্রগামিনী প্রকল্পের গতিরহস্য

বলা বাহুল্য, উপরোক্ত চার দফা কারণের মধ্যেই আমাদের সমগ্রভাবে অর্থনৈতিক গতি-অগতির মূল রহস্য লুকিয়ে আছে, শিল্পোন্নয়ন প্রচেষ্টায় আমরা কী পেলাম তার উত্তরও ঐখানেই।

গত ফেব্রুয়ারী মাসে সংসদে ১৯৬৫-৬৬ সালের অর্থনৈতিক সমীক্ষার যে খসড়া পেশ করা হয় তাতে জাতীয় আয়ের উন্নতি দূরের কথা ক্রমাবনতির চিহ্নই মেলে ধরা হয়েছে। তিন তিনটি যোজনাকাল অতিক্রম করে এসে ভারতবর্ষ পৃথিবীর অন্যতম দরিদ্র দেশের পরিচয়ই বহন করছে। ১৯৫৪ থেকে ১৯৬২ সালের প্রকৃত আয় গণনা করলে অন্যান্য দেশের তুলনায় ভারতের স্থান অনেক নিচে। বাৎসরিক হারে প্রকৃত আয়ের ঊর্ধ্বগতি কোন দেশে কেমন; নিচের তালিকাটি লক্ষ্য করলেই দেখা যাবে, তাতে ভারতের স্থান তিমির গহনেঃ

অস্ট্রিয়া, ১·৫৪%; জাপান, ১০%; ওয়েস্ট জার্মান, ৬·৪%; ফ্রান্স ৪·৯%; বর্মা, ৫%; পাকিস্তান, ২·৭% (১৯৫৩-৬১) কিন্তু ভারত, গড়ে ২·৫% এর বেশি নয়।

উন্নতি কি টাকার অঙ্কে

ভারতের পরিকল্পনাগুলির চরিত্র লক্ষ্য করলে একটি প্রশ্ন স্বভাবতই জাগতে পারে। তা হল, দেশের উন্নতি কি কেবলমাত্র টাকার অঙ্কে? টাকার অঙ্কে উন্নতি-অবনতির হিসাবে প্রকৃত উন্নতির বা সামগ্রিক উন্নতির তাৎক্ষণিক পরিচয় মেলে কি? জাতীয় আয় গণনার বিচিত্র ব্যবস্থার কথা ভাবলেই এর একটা তাৎক্ষণিক জবাব আছে। জাতীয় আয় মাথা গুণতির গড় আয়ের হিসেব। কিন্তু প্রকৃত আয় মাথা গুণতির ধার কাছ ঘেঁষেও অগ্রসর হয় না। সমাজের বিশেষ সুবিধাভোগী শ্রেণীর মধ্যে সেই বর্ধিত আয়ের সর্বাধিক অংশ কুক্ষিগত হয়। ছিটে-ফোঁটা পাঁচ অঙ্গুলের ফাঁক দিয়ে গড়িয়ে আসে সাধারণের কাছে।

সেজন্য পরিকল্পনার মূল নীতিতেই এই আয় বণ্টনের চিন্তা অগ্রাধিকার লাভ করা উচিত। বলা বাহুল্য, সমাজতান্ত্রিক নীতিতে প্রয়োজনের দিকে লক্ষ্য রেখে প্রয়োজন-ভিত্তিক শিল্পপ্রসার না করা হলে, ব্যক্তি মুনাফার প্রাঙ্গণকে ক্রমাগত সংকুচিত করে না আনতে পারলে এবং শ্রমিক সহযোগিতার ওপর উন্নয়ন কর্মসূচীকে প্রতিষ্ঠা দিতে না পারলে শিল্পোন্নয়ন তথা সামগ্রিক জাতীয় কল্যাণ সাধিত হয় না।

ভারতের প্রকল্পগুলি এদিকে দৃষ্টি রেখে শিল্পোন্নয়নে নজর দিলে আজকের অর্থনৈতিক বিপর্যয়ের অনেকগুলি কারণই সাবধানে এড়ান যেত। তা হয় নি। অন্য পক্ষে টাকার মাপে পরিকল্পনার পরিমাপ করা হয়েছে। এদিক থেকে দেখলেও অর্থ-নৈতিক সমীক্ষায় ভারতের জাতীয় আয়ের যে তুলনামূলক অঙ্ক তৃতীয় যোজনাকাল অবধি উল্লেখ করা হয়েছে অগ্রবর্তী অনুচ্ছেদে, তাও আমাদের অগ্রগতির আস্ফালনকে ম্লানভাবেই উপস্থাপিত করে।

প্রথম পরিকল্পনাকালকে যদি বিশেষ কোন নীতিহীন আয় ব্যয়ের খতিয়ান হিসেবে ধরা যায়, তবে দ্বিতীয় পরিকল্পনাকাল থেকেই প্রস্তাবিত 'সমাজতন্ত্রের ধাঁচে' আমরা আমাদের অগ্রগতিকে কিভাবে পরিচালিত করেছি তার আলোচনা সুরু করতে হয়।

কার অগ্রগতি

বহু স্বার্থের সংঘাতে জর্জরিত হয়ে দ্বিতীয় যোজনা অগ্রগতির ইতিহাসে যে অধ্যায় সংযোজিত করল তাকেও নিতান্ত আর্থিক ভিত্তির হিসাবে গৃহীত পরিকল্পনা ছাড়া অন্য কিছু বলার সুযোগ কম।

বেসরকারী ক্ষেত্রকে সংকুচিত করার ক্ষমতার অভাব এই সময়ও প্রকট হয়েই আছে। দুটি যোজনাকালের পরও দেখা যাচ্ছে ব্যক্তিগত মুনাফা ও ফাটকাবাজি করে যে কোন মুনাফাশিকারী অনায়াসে "অপরের কষ্টের" ওপর নিজের সুখের বনিয়াদ রচনার অবাধ সুযোগ ভোগ করছেন। সমাজতান্ত্রিক দূরের কথা, এ অবস্থা কেমনতর সমাজতান্ত্রিক "ধাঁচের" পরিচায়ক তার জবাব মেলে না।

চতুর্থ যোজনাকালেও দেখা যাবে দেশের জনসম্পদকে তো কোন রকম কাজে লাগান হয়ই নি, বেকার সমস্যা চক্রাকারে বেড়েই চলেছে। অর্থাৎ শ্রমিক সাহায্য পর্যাপ্ত পরিমাণে গ্রহণ করে উৎপাদন বাড়াবার প্রচেষ্টায় সততা বজায় না রাখাই বহু-প্রচারশীল পরি-কল্পনাকে পুঁজিতন্ত্রের পথের ওপরই বসিয়ে রেখেছে।

আমাদের পরিকল্পনা সাধারণ মানুষকে কৃচ্ছ্রসাধনায় যে পরিমাণ আহ্বান জানিয়েছে, সাধারণ মানুষের হাতে ভোগ্য সামগ্রী সে পরিমাণে তুলে দেয় নি। ফলত সাধারণের ওপর চাপ দুতরফা হয়ে সমাজতান্ত্রিকতার বুলি মাইকবক্তৃতার মাধ্যমে যত উচ্চাভিলাষীই শোনাক আসলে তা শিল্প প্রসারের দরুণ কোন অতিরিক্ত সুবিধা জনগণের হাতে তুলে দিতে পারে নি। আয়-বৈষম্য ও সম্পদ বণ্টনের বৈষম্যের ওপর আগ্রাসী করনীতি মুদ্রাস্ফীতি রোধে সহায়ক না হয়ে বিশেষ শ্রেণীর হাতে টাকার পাহাড় তুলে দিয়ে মুদ্রাস্ফীতিকে ঘনীভূত হওয়ার সুযোগ করে দিয়েছে। সুতরাং যে জনসহযোগিতা ব্যতিরেকে দ্রুত শিল্পায়ন অসম্ভব সেই গণ-সহযোগিতা দূরের কথা দেশে প্রকৃত পক্ষে গণচেতনা গড়ে তোলারও কিছুমাত্র চেষ্টা হয় নি। ফলত দেশজোড়া পরি-কল্পনায় গণভূমিকা বাদ হয়ে গেছে। কৃচ্ছ্রসাধনার আহ্বানে গণমানস তাই সন্দিহান, আগ্রহী নয়।

সোভিয়েট নীতির আলোকে

অথচ স্বাধীনতা পরবর্তী ভারতীয় শিল্পের অবস্থা [illegible] অন্যতম শ্রেষ্ঠ উন্নতিশীল মহাদেশ সোভিয়েট রাশিয়ার অঙ্কুরাবস্থার চেয়ে নিঃসন্দেহে ভালই ছিল। সেই সোভিয়েট দেশে প্রথম পরিকল্পনাকাল থেকেই সাধারণ মানুষের মনে যে উৎসাহ ও উদ্দীপনার সঞ্চার হয়েছিল তা পৃথিবীর ইতিহাসে অভূতপূর্ব। প্রথম যোজনার প্রথম বছরেই সেখানে

ব্যাপক আকারে ভারী শিল্পোৎপাদনের কাজ সুরু হয়েছে। কৃষির উন্নতি বলতে সেখানে বৈজ্ঞানিক উপায়ে কৃষি উন্নতিকেই বোঝা হয়েছিল। তাই দেখা যায়, প্রথম বছরেই সোভিয়েট জনগণ কৃষিযন্ত্রাদি উৎপাদনের ওপর সবিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেছিলেন। সেই সংগে বৈদ্যুতিক শক্তি উৎপাদন, লৌহ এবং ইস্পাত উৎপাদন ও পরিবহন ব্যবস্থার উন্নয়নের দিকেও জোর দেওয়া হয়েছিল এই কারণেই যে এ সমস্তই দ্রুত শিল্পায়নের পক্ষে অপরিহার্য সহায়ক উপকরণ।

আমরা প্রথম যোজনাকাল হেলায় ব্যবহার করেছি। শিল্পায়নের চিন্তা তৎকালে আদৌ আমলই পায় নি। যদি বলা যায় মূলধনের অভাবই তার অন্যতম কারণ তবে সে যুক্তির প্রতিপক্ষে প্রত্যক্ষ যুক্তি, সোভিয়েট অগ্রগতি। মূলধন ছিল না তাদের, এমন কি সামন্ততান্ত্রিক দুরবস্থা নতুন মানুষদের হাতে তুলে দিতে পেরেছিল শুধু যন্ত্র হিসেবে কোদাল আর হাতে-টানা মালবাহী শকট। আশ্চর্যের কথা, এই আদিম যন্ত্রাদি নিয়েই তারা দেশ গঠনের কাজে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল পরিকল্পনাকে নিজের কাজ ভেবে, সম্পদ বৃদ্ধিকে আপন সম্পত্তি ভেবে। ছিল না হতাশা অথবা সন্দিগ্ধ মনোভাব। বলা বাহুল্য, কেবলমাত্র বক্তৃতায় এই অত্যাশ্চর্য কর্মোদ্দীপনা দেখা দেয় নি সে দেশে।

গণ-আস্থার প্রয়োজনীয়তা

সুতরাং পরিকল্পনা রূপায়ণে সার্থকতা তখনই সম্ভব যখন জনগণ অর্জিত জাতীয় সম্পদকে আপন সম্পত্তি বলে গণ্য করতে এবং আশা করতে পারবে।

জন-উদ্যোগকে পূর্ণ বিকাশের সুযোগ থেকে অনেকাংশে মিশ্র অর্থনীতি নিজেই বঞ্চিত করে। ব্যক্তি-উদ্যোগ বজায় থাকায় রাষ্ট্রীয় উদ্যোগের সংগে তার টানাপোড়েন চলে, ফলত জন-উদ্যোগ ব্যাহত হয়। এদেশে তার ব্যতিক্রম হয় নি। মুনাফা ও অতিরিক্ত মুনাফার আগ্রহ মূল্যস্তরকে চড়িয়ে দিয়েছে সংগে সংগে সৃষ্টি করেছে কালোবাজারের। প্রচুর কালো টাকা বিনিয়োগযোগ্য শিল্পে খাটানো যাচ্ছে না অথচ যে অর্থ মূলধন হিসেবে বিনিয়োগ করা যেত তা মুষ্টিমেয়ের হাতে আটক পড়ছে। শিল্পোন্নয়নের ফলে যে সামান্য আয়বৃদ্ধি তা ঐ পথেই অপসৃত হলে কল্যাণমূলক করনীতি খাটিয়ে রাষ্ট্রীয় শিল্পকে গড়ে তোলা সম্ভব হয় না, হচ্ছেও না। করনীতি সাধারণের ওপর উত্তরোত্তর চাপ সৃষ্টি করে রাষ্ট্রীয় উদ্যোগকে জনসহযোগ থেকে বরং বঞ্চিতই করছে। পরোক্ষ করের চাপে দরিদ্রের দারিদ্র্য বৃদ্ধিই হয়েছে পরিকল্পনার একটি প্রত্যক্ষ ফল।

ব্যক্তি-উদ্যোগের প্রতিক্রিয়া

তাছাড়া রাষ্ট্রীয় উদ্যোগ ও ব্যক্তি-উদ্যোগের পারস্পরিক অবস্থানে অন্যভাবেও পরস্পর-বিরোধী শক্তির প্রতিঘাতে কল্যাণমূলক শিল্পায়ন ব্যাহত হয়। এখানেও তার ব্যত্যয় হয় নি। উৎপাদন, বন্টন ও মূলধন পুনঃসংগ্রহের নীতিতে উভয় ব্যবস্থা পরস্পর-বিরোধী পন্থায় অগ্রসরমান। উৎপাদনের ক্ষেত্রে ব্যক্তি-উদ্যোগ মুনাফা লক্ষ্য করে অগ্রসর হচ্ছে। ফলত সাময়িক দৃষ্টিতে ভোগ্যবস্তু উৎপাদনের দ্বারাই দ্রুত মুনাফা তোলার সহজ প্রক্রিয়ায় সেক্ষেত্রে সমধিক নজর আছে। অতি-মুনাফার অভিলাষ এই ভোগ্যবস্তুও সমাজের সকল স্তরে বন্টনে কিছুমাত্র আগ্রহী নয়। রাষ্ট্র পণ্য বন্টনে কোন নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা চালু করেন নি, যাতে অতি-মুনাফার কুফল অপসারিত হয়। চতুর্থ পরিকল্পনাকালে উপনীত হয়েও আজ তাই সাধারণ মানুষ যে তিমিরে ছিলেন সেখানেই রইলেন উপরন্তু উত্তরোত্তর করভার ও মূল্যস্তরের চাপে তাঁদের শ্বাসকষ্ট উপস্থিত হল। এই সর্বনাশা পথ থেকে সরে দাঁড়ানোর প্রয়োজন আছে, নীতিগতভাবে এ-চিন্তা আমাদের মনকে বারবার সচেতন করলেও সংশিলষ্ট স্বার্থ (ভেস্টেড ইণ্টারেস্ট) সে ক্ষেত্রে কোন রকম রাষ্ট্রীয় হস্তক্ষেপকে অগ্রসর হতে দিচ্ছে না।

ব্যক্তি-উদ্যোগের অশুভ পরিণাম

আশংকার কারণ এই যে, ব্যক্তি মালিকানার উপস্থিতি ক্রমে সরকারী যন্ত্রও গ্রাস করে উদ্যোগের অংকুরকেও উৎপাটিত করবে এবং মিশ্র অর্থনীতির দুর্বলতার পূর্ণ সুযোগ গ্রহণ করে শিল্পায়নকে ধনতান্ত্রিক শোষণ-ব্যবস্থায় ধরে রাখতেই সাহায্য করবে। ভারতে অবাধ বাণিজ্যের স্বপক্ষে বক্তা, গোষ্ঠী ও নেতৃত্বের অভাব নেই। তাঁরা সমাজতান্ত্রিক ধাঁচের সমাজ গঠনের পথে কেবলই নীতিগত ও সক্রিয় বাধা সৃষ্টি করতে বিরত থাকবেন না। নেহরুজীর স্বপ্নও হঠাৎ ভেঙে যেতে সময় লাগবে না। এ-বিষয়ে সরকারের পক্ষে সচেতন থেকে কড়া নিয়ন্ত্রণ-মূলক শিল্পনীতি রচনা করে জাতীয় উন্নয়নমূলক কার্যসূচী গ্রহণ করার প্রয়োজন, যা একই সংগে উৎপাদন বন্টন ও মূলধন পুনঃসংগ্রহের দ্বারা আয়বৈষম্যকে ক্রমশ হ্রাস করে শিল্পায়নকে যথার্থ সমাজ কল্যাণের ধারায় গঠন করে তুলবে।

আত্মনির্ভরতার পথে কতদূর

শিল্পোন্নয়নের ক্ষেত্রে আত্মনির্ভর হতে হলে ভারী শিল্পের উৎপাদনে লক্ষ্য সমধিক রাখতে হয়। সুখের বিষয় পরিকল্পনা কমিশন সেদিকে দৃষ্টিপাত করেছেন।

সরকারী উদ্যোগে তিন তিনটি ইস্পাত কারখানা, ইস্পাতের কাঁচামাল নিয়ে যন্ত্রোৎপাদন কারখানা, বিদ্যুৎ-শক্তি উৎপাদনের জন্য বৈদ্যুতিক প্রকল্প নির্মাণ, সারোৎপাদনের জন্য সার কারখানা, মেশিনটুলস কারখানা, অ্যালুমিনিয়ম, সিমেণ্ট, রাসায়নিক দ্রব্যাদি, কয়লা, পেট্রোল প্রভৃতি উৎপাদনের ক্ষেত্র প্রস্তুতিকরণে সরকারী উদ্যোগ জাতীয় শিল্পায়নকে আত্মনির্ভরতার পথে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে ঠিকই। আজ আমরা অনেকাংশে আমদানি-নির্ভরতা ত্যাগ করে রপ্তানীযোগ্য (যদিও স্বল্পাকারে) বস্তু প্রস্তুতেও সক্ষম হচ্ছি। প্রতিরক্ষার জন্য সামগ্রী উৎপাদনেও অনেক ক্ষেত্রে সাফল্য অর্জন করেছি। একটি উদাহরণই যথেষ্ট যে, ১৯৫০-৫১ সালে যেক্ষেত্রে যন্ত্রপাতি উৎপাদনের আর্থিক পরিমাণ ছিল চৌত্রিশ লক্ষ টাকা, ১৯৬০-৬১ সালে সে পরিমাণ বেড়ে দাঁড়িয়েছে পাঁচশত পঞ্চাশ লক্ষ টাকায়।

সততা এবং সতর্কতা

কিন্তু তৎসত্ত্বেও উপরে আলোচিত অবস্থা বর্তমান থাকায় ধনতান্ত্রিক পুঁজিবাদের প্রসার্যমানতার হাত থেকে আমাদের শিল্পায়ন বিমুক্ত নয়। গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা বজায় রেখে সমাজতান্ত্রিক ধাঁচে শিল্পায়নের অভিলাষ চরিতার্থ করতে হলে দীর্ঘসূত্রতা, দুর্বলতা এবং শ্লথ-পন্থার একেবারে ইতি করতে হবে; অন্যথা উৎপাদনের উপাদান করায়ত্ত করে সরকারী স্তরে প্রভাব বিস্তারের দ্বারা সাধের স্বপ্ন বানচাল করতে অপরের দারিদ্র্যের ওপর যাঁরা সুখের প্রাসাদ নির্মাণ করেন, তাঁরা কার্পণ্য করবেন না। ধনতান্ত্রিক দেশের সহায়তা গ্রহণ করার সময়ও মনে রাখতে হবে যে, সে সহায়তা যেন কোনক্রমেই আমাদের দ্রুত শিল্পায়নকে অবরুদ্ধ করে আমাদের মিষ্টি কথায় কৃষিনির্ভরতার দিকে পশ্চাদগামী না করে; এবং ভোগ্যবস্তু উৎপাদনের দিকে অধিকতরভাবে নজর আকর্ষণ করে উৎপাদনের উপাদান সৃষ্টির পথে বাধা হয়ে না দাঁড়ায়।

কি ফল লভিনু হায়!

শ্রীহলধর পটল

১৯৪৭ সালের ১৫ই আগস্ট যেদিন দিল্লীর লালকিল্লার শিখরে উড়েছিল স্বাধীন ভারতের পতাকা সেদিন সারা জাতি ভেবেছিল এবার একটা কিছু আমরা পেয়েছি। হাতে পেয়েছি একটা প্রকাণ্ড কিছু যাকে হাতে ছোঁয়া যায় না, কিন্তু যার ছোঁয়ায় সারা ভারতবর্ষের কল-কারখানা খেত-খামার সব কলকলিয়ে হেসে উঠতে পারে আনন্দে; সারা জাতি ঝলমল কোরে উঠতে পারে স্বচ্ছলতায়, সুখে, শান্তিতে, প্রাণ প্রাচুর্যে। সেদিন ভেবেছিল যাক না আর ক'টা দিন দেখাবো আমরাও পৃথিবীর মানুষকে আমাদের সুখের উল্লাস। স্বাধীনতা-উত্তর ভারতবর্ষের কল্পনার রঙীন চিত্রখানি কি সুন্দর কোরে কুয়াশার রঙে শিশিরের তুলি দিয়ে আঁকা হোয়েছিল মনে মনে। স্বশাসনের সুশাসনে ভারতের কত উন্নতি হবে। প্রাচ্যের যে সম্পদ আহরণের জন্য ইতিহাসের মধ্যযুগ থেকে পাশ্চাত্য দেশ লালায়িত হোয়েছে সেই সম্পদ আমরা বহুগুণ বাড়িয়ে তুলবো। আমাদের বহির্বাণিজ্যের ময়ূরপংখী নাও আবার মসলিন, দারুচিনি আর বিভিন্ন শিল্পসামগ্রীর পসরা সাজিয়ে বিদেশের সাগর বন্দরের ঘাটে ঘাটে বিকিকিনি জমজমাট কোরে তুলবে। সুজলা সুফলা শিল্পের মেখলা পরা ভারতবর্ষের ছবি বিদেশের ঈর্ষা জাগাবে।

প্রথম স্বাধীনতা উৎসবের ঊনিশ বছর পরে ভারতীয়দের সেই রঙীন কল্পনার ছবিটা যেন কার অভিশাপে সম্পূর্ণ আলাদা কোরে আঁকা হোয়েছে। হল্যাণ্ডের গির্জাতে ঘণ্টা বাজছে অবিরত—গির্জার সামনে ভিখারিণী ভারতের ছবি আঁকা। ভিখারিণী ভারতের জন্য হল্যাণ্ডের গির্জায় গির্জায় সাহায্য চাওয়া হোচ্ছে। সে দেশের লোকেরা নিজেদের বাজে খরচ বাঁচিয়ে, বিদ্যালয়ের ছেলেমেয়েরা টিফিনের পয়সা বাঁচিয়ে ভারতের দুর্ভিক্ষের মোকাবিলা করার জন্য চাঁদা দিচ্ছে। আর ভারতবর্ষ হাপুস নয়নে কাঁদতে কাঁদতে সেই চাঁদার থলি হাতে নিয়ে কৃতার্থ হোচ্ছে। শুধু হল্যাণ্ড নয়, এক প্রান্তে অস্ট্রেলিয়া থেকে অন্য প্রান্তের আমেরিকা, মধ্যে ইউরোপের দেশে দেশে আজ ভারতবর্ষের চেহারা বলতে যা সে দেশের নাগরিকদের মনশ্চক্ষে ভেসে ওঠে তা হোল অত্যন্ত কুৎসিত কঙ্কালসার একটা প্রতিমূর্তি। তাদের কাছে ভারতবর্ষ মানেই "বেগারস" ও "স্মাগলারস"দের দুটি পাশাপাশি ছবি। একটি অতি শীর্ণকায়, পরিদৃশ্যমাণ কঙ্কালসমষ্টি, অন্যটি স্ফীতোদর নধরকান্তি। একজন অনাহারী অন্যজন অমিতাহারী। ভারতবর্ষ সামাজিক বৈষম্যের বিষ রঙে নীল।

স্বাধীনতার যে নীট ফললাভের আশায় একদিন ভারতবাসী মেতে উঠে নেহেরু দ্যাট ইজ ভারত সম্রাটের সামনে হাত পেতে দাঁড়িয়েছিল, আজ ইন্দিরা দ্যাট ইজ ভারত সম্রাজ্ঞী সেই প্রসারিত হাতে একটি মাকাল ফল ধরিয়ে দিয়েছে। ফলটি দেখতে বেশ সুন্দর—কিন্তু ওতে ক্ষুন্নিবৃত্তি হয় না। ভারতবাসী সেই ফলটি এতদিন ঠুকরে ঠুকরে খাবার চেষ্টা কোরে শেষবেশ নিঃসর্তে নিঃসাড়ে পরের দুয়ারে হাত পেতে দাঁড়িয়েছে—ওগো পাশ্চাত্যের "ফাদারগণ!" তোমরা আমাদের খাবার দাও। আমাদের সব নাও। আমাদের স্বাধীনতা সে তো গত ঊনিশ বছরে বন্ধ্যা হোয়ে গেছে। ওই ভাব—স্বাধীনতার শুকনো বুলিতে খেতে ফসল ফলে না। আমাদের সামনে দুর্ভিক্ষের আতঙ্ক।

আজ ভারতবর্ষের এ অবস্থা হোল কেন? শুধুমাত্র দুমুঠো অন্নের জন্য কেন আজ ভারতবর্ষের স্বাধীনতার সকল দম্ভ বিদেশী বণিকের, রাজনীতিকের পায়ের তলায় আজ ভেট দিতে হোচ্ছে? তার কারণ অনুসন্ধানের জন্য যেতে হবে, অন্য কোথাও নয়—যেতে হবে কৃষকের খেতে খামারে। রুগ্ন-শীর্ণ অস্থিচর্মসার ঐ যে কৃষক সকাল থেকে ভরদুপুর পর্যন্ত ততোধিক রুগ্ন-শীর্ণ একজোড়া বলদ দিয়ে প্রাণান্তকর পরিশ্রমে ঠুকরে ঠুকরে বসুমতীর বুক চিরছে নরুণের মত প্রাগৈতিহাসিক লাঙলের ফলা দিয়ে ওরই কাছে গেলে ভারতের দুর্ভিক্ষের আসল কারণ জানা যাবে। রাণী ভারত আজ ভিখারিণী হোয়েছে ওরই অভিশাপে। কৃষকের বঞ্চনার নোতুন অধ্যায় সুরু হোয়েছে ভারতবর্ষের স্বাধীনতা প্রাপ্তির পরের দিন থেকে। একদিন প্রবঞ্চকের দলে ছিল ভূম্যধিকারী ও মহাজন আর এখন স্বাধীনতা উত্তর ভারতবর্ষে তার সঙ্গে যুক্ত হোয়েছে সমাজতান্ত্রিক সরকার ও তার আমলাবর্গ। প্রতারণা, বঞ্চনা, ঔদাসীন্য, অত্যাচার, ঘৃণা দীর্ঘদিন ধরে কৃষক মাথায় বয়েছে। প্রতিবাদ করে নি, করলেও অতি সামান্য। কিন্তু নিজের কাজ সে কোরে যাচ্ছে অত্যন্ত নিষ্ঠার সঙ্গে।

কিন্তু এই দুর্ভিক্ষ কি স্বাধীনতা-উত্তর যুগে সত্যই অবধারিত ছিল? নিশ্চয়ই নয়। খাদ্য ও কৃষি নিয়ে রাজনীতির বাড়াবাড়ি কোরতে গিয়ে ভারতবর্ষের আজ এই হাল হোয়েছে। মুখে রাজনীতিকদের সদম্ভ আস্ফালন—ম্যারিকান গম খাব না খাব না। ম্যারিকান গমের বাপান্ত কোরে সভায় হাততালি কুড়িয়ে বাড়ি ফিরে আবার যদি সেই ম্যারিকান গমের রুটি চিবুতে হয় তার থেকে আত্মবঞ্চনাময় জীবনধারণের গ্লানি আর কিছুই নেই। অথচ স্বাধীন ভারতের রাজ্য শাসনের চাবিকাঠিটি যে দলের ট্যাঁকে গত ঊনিশ বছর ধরে সদর্পে গোঁজা আছে তাদের প্রতিটি প্রতিনিধি মন্ত্রিত্ব করতে এসে গ্লানিময় জীবনধারণের এই ঐতিহ্যই সৃষ্টি করেছেন। মাঝে মাত্র রফি আমেদ কিদোয়াই সাহেব ছিলেন এর কিছুটা ব্যতিক্রম।

যদিও যে কোন দেশের খাদ্যনীতিতে সেই দেশের ক্ষমতাসীন রাজনৈতিক দলের রাজনীতি প্রতিবিম্বিত হবেই এবং তা পার্টি পরিচালিত রাজ্য শাসন ব্যবস্থার অবশ্যম্ভাবী ফল, তবুও সেখানে সততা, নিষ্ঠার স্থান নিশ্চয়ই আছে। ভারতবর্ষের খাদ্য রাজনীতির নামে মিথ্যার বেসাতি এত জমজমাট যে আজ নিরপেক্ষভাবে বিশ্লেষণ করতে বসলে ভারতীয় কেন্দ্রীয় খাদ্যমন্ত্রককে একটা ধাপ্পাবাজীর আসর বোললেও অত্যুক্তি হওয়ার সম্ভাবনা নেই। আবার সব ধাপ্পাবাজীকে ছাপিয়ে গেছেন বর্তমানে দক্ষিণী খাদ্যমন্ত্রী শ্রীসুব্রাহ্মণিয়ম।

শ্রীসুব্রাহ্মণিয়ম তাঁর মন্ত্রিত্বে চাতুরীর পরাকাষ্ঠা দেখিয়েছেন এই হাল ১৯৬৬ সালেই। দেশের প্রয়োজনীয় খাদ্যের পরিমাণ যে কত আজ পর্যন্ত তার কোন সঠিক স্থিতিশীল

সংখ্যাতত্ত্ব নেই। খাদ্যমন্ত্রীর বক্তৃতার মর্জিমেজাজ অনুযায়ী তা বাড়ে-কমে। শ্রীসুব্রহ্মণিয়ম এবারে লোকসভায় সংখ্যাতত্ত্বের সপিণ্ডকরণ কোরে ছেড়েছেন। তিনি সকালে একরকম সংখ্যাতত্ত্ব, দুপুরে একরকম ও বিকালে একরকম সংখ্যাতত্ত্ব পেশ কোরেছেন। সংখ্যাতত্ত্বের প্রেতিনী নাচিয়ে খাদ্যমন্ত্রী দুর্ভিক্ষের দৈত্যকে আবাহন কোরেছেন ১৯৬৫/৬৬-র লোক-সভার শীতকালীন অধিবেশনে। তিনি ভারতবর্ষের খাদ্য ঘাটতির হিসেব দিয়েছেন নানারকম। ৬০ লক্ষ টন থেকে তিনি সুরু কোরেছিলেন তারপর ৮০ লক্ষ টন, ১ কোটি টন, ১ কোটি ২০ লক্ষ টন পর্যন্ত ঘাটতির ফর্দ দিয়েছিলেন। শেষবেশ, ২০শে জুলাই নয়াদিল্লিতে তিনি হিসাব দিয়েছেন যে, "পূর্বে ধারণা করা গিয়াছিল যে, ঘাটতির পরিমাণ দাঁড়াইবে ১৪ মিলিয়ন টন (১ কোটি ৪০ লক্ষ টন) কিন্তু কার্যত উহা ১৬ মিলিয়ন টনে (১ কোটি ৬০ লক্ষ টন) দাঁড়ায়।" এই প্রসঙ্গে তিনি ঐ দিনই অত্যন্ত আত্মতৃপ্তির উল্লাসে বলেছেন যে, "খাদ্য আমদানী করিয়া ইতিহাসের বৃহত্তম বিপর্যয় এড়াইয়াছি।" বিবৃতিসার মানুষ সকল ক্ষেত্রেই উপহাসের পাত্র হোয়ে ওঠেন। কিন্তু যে মানুষ মানুষের মুখের খাদ্য নিয়ে অসত্য বিবৃতি দিয়ে আত্মসুখে ডগমগ হোয়ে উঠতে পারেন তিনি শুধুমাত্র উপহাস নয় তিনি ঘৃণার পাত্রও হোয়ে ওঠেন।

ভারতবর্ষ নামত সমাজতান্ত্রিক দেশ। কার্যত এই দেশ "নিয়ন্ত্রণ তান্ত্রিক"। সে নিয়ন্ত্রণ সর্বস্তরে। খাদ্য নিয়ে নিয়ন্ত্রণের আবার অতি বাড়াবাড়ি। নিয়ন্ত্রণের শিকলে সারা জাতির পেট বাঁধা। কিন্তু নিয়ন্ত্রণের নিগড়ে দুর্ভিক্ষকে বাঁধা যায় নি। পরন্তু খাদ্যবস্তুর নিয়ন্ত্রণের কড়াকড়ি যত বেড়েছে অনাহারের দাপট তত বেশি সহ্য কোরতে হোয়েছে ভারতবাসীকে। শুধু তাই নয়, দুর্ভিক্ষের যে ছবিখানির কথা এই নিবন্ধের গোড়াতে আমি লিখতে বাধ্য হোয়েছি সেই ছবি মুখ্যত কেন্দ্রীয় খাদ্যমন্ত্রকের নিজস্ব সৃষ্টি। যদিও কেন্দ্রীয় কৃষি মন্ত্রণালয়ের হারাহারি দায়িত্ব সেখানে আছে। এখন দেখা যাক কেন্দ্রীয় খাদ্যমন্ত্রী মতান্তরে খাদ্য সংগ্রহ মন্ত্রী কেমন কোরে ১৯৬৫/৬৬তে ভারতবর্ষে দুর্ভিক্ষ সৃষ্টি করালেন। তারও আগে একটি প্রশ্নের জবাব দিতে হবে যে, ভারতবর্ষে সত্যই কি দুর্ভিক্ষ আছে? এর জবাব—না নেই। অনাহার আছে। অনাহার ও দুর্ভিক্ষ এক জিনিস নয়। দুর্ভিক্ষ হবে তখনই যখন ভিক্ষা পাওয়াও দুরূহ হোয়ে উঠবে। অর্থাৎ ফসল উৎপাদনে ব্যাপক ঘাটতিই হোল দুর্ভিক্ষের মৌল কারণ। ভারতবর্ষের এ অবস্থা এখনও হয় নি। মন্ত্রী ও প্রশাসনিক পর্যায়ের হাজারো অপদার্থতাতেও ভারতের মাটি এখনও এত বন্ধ্যা হোয়ে ওঠে নি। অন্যদিকে অনাহার নিশ্চয়ই আছে। তার কারণ দুর্ভিক্ষ নাও হোতে পারে। ক্রয়ক্ষমতার অভাব ও নিয়ন্ত্রণজনিত কৃত্রিম খাদ্যাভাব অনাহারের কারণ। নিঃসন্দেহে ঘোষণা করা যেতে পারে যে, ভারতবর্ষে কংগ্রেসীদের সামগ্রিক কুশাসনে ভারতবাসীর ক্রয়ক্ষমতার অভাবও কেন্দ্রীয় খাদ্য মন্ত্রণালয়ের চূড়ান্ত অবিমৃষ্যকারিতায় ফল নিয়ন্ত্রণজনিত অভাবে এই দুটি অভাব যুক্ত হোয়ে ভারতবর্ষ অনাহারের চিরস্থায়ী লীলাক্ষেত্র হোতে চলেছে। সামগ্রিক কুশাসনের ব্যাপারটি আলোচনার ক্ষেত্র এ নয়। সুতরাং, ক্রয়ক্ষমতার অভাব এই নিট ফলটুকুই মেনে নিয়ে আমি অন্যটি অর্থাৎ অহেতুক নিয়ন্ত্রণজনিত অভাবের প্রসঙ্গটি বিস্তৃতভাবে সংখ্যাতত্ত্ব সহযোগে উল্লেখ করছি।

অনাহার বা খাদ্য ঘাটতির একমাত্র কারণ যে সরকারী দুর্বুদ্ধি এবং অক্ষমতা তা লোকসভায় প্রদত্ত হিসাব থেকেই বোঝা যাবে। বোঝা যাবে নিয়ন্ত্রণের নামে সারা দেশব্যাপী বণ্টন ব্যবস্থা যে এলোমেলো বিশৃঙ্খলতা তা-ই ভারতের শোচনীয় অবস্থার জন্য দায়ী। খাদ্যোৎপাদনের পরিমাণ ক্রমহ্রাসমান ও জনসংখ্যার আত্যন্তিক বৃদ্ধি এই দুটি বুলি ভারতের সর্বনাশ কোরেছে। কারণ খাদ্য ঘাটতির জন্য জনসংখ্যার অজুহাত বিশ্লেষণের ধোপে টেকে না। সুতরাং খাদ্য নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার যুক্তিও অচল। লোকসভায় প্রদত্ত হিসাবের পাশাপাশি বর্ধিত জনসংখ্যার হিসাব ও জনপ্রতি প্রাপ্তব্য খাদ্যের পরিমাণের অঙ্ক থেকে বোঝা যাবে যে, জনসংখ্যা বৃদ্ধির তুলনায় খাদ্যের উৎপাদন বৃদ্ধি কম নয়, বরং তা বেশি।

১৯৫১ সাল থেকে ১৯৬৪ পর্যন্ত হিসাব নেওয়া যাক।

বৎসর	জনসংখ্যা	জনপ্রতি প্রাপ্তব্য খাদ্য
১৯৫১	৩৬ কোটি	১১'৮ আউন্স
১৯৫২	৩৭ "	১১'৫ "
১৯৫৩	৩৭'৬ "	১২'৩ "
১৯৫৪	৩৮'৩ "	১৩'৬ "
১৯৫৫	৩৯ "	১৩'১ "
১৯৫৬	৩৯'৮ "	১২'৭ "
১৯৫৭	৪০'৬ "	১৩'২ "
১৯৫৮	৪১'৪ "	১২'৩ "
১৯৫৯	৪২'৩ "	১৩'৮ "
১৯৬০	৪৩'৩ "	১৩'৫ "
১৯৬১	৪৪'৩ "	১৪ "
১৯৬২	৪৫'৩ "	১৪'১ "
১৯৬৩	৪৬'৪ "	১৩'১ "
১৯৬৪	৪৭'৫ "	১৩'৯ "

এইবার দেখা যাক উৎপাদন কত ছিল—আমদানীর পরিমাণই বা কত এবং নীট প্রাপ্তব্য খাদ্যের পরিমাণ বিভিন্ন বৎসরে কি দাঁড়ায়। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে নীচেকার হিসাবে নীট উৎপাদন বোলে যা দেখানো হোচ্ছে, তা মোট উৎপাদনের পরিমাণ থেকে ১২·৫ শতাংশ বাদ দিয়ে। যদিও মোট উৎপাদন থেকে বীজের পরিমাণ বাদ দিলেই নীট উৎপাদন পাওয়ার কথা কিন্তু সরকারী হিসাব-নিকাশই আলাদা। সরকারের হেপাজতে সব থেকে বড় খরচ হোল অপচয়ের খরচ। কোটি কোটি ইঁদুর ভারতবর্ষের সরকারী খাদ্য গুদামের চারপাশে রোয়েছে আস্তানা গেড়ে। তাদের মুখের গ্রাস তো আর কেড়ে নেওয়া যায়/না। তাই প্রকৃত প্রস্তাবে যে মোট খাদ্য উৎপাদনের থেকে মাত্র শতকরা ২·৫ ভাগ বীজ ও ২·৫ ভাগ অপচয় বাদ দিলেই নীট উৎপাদন পাওয়া উচিত হোত তা হয় না। অবশ্য আগে তাই ছিল। ৫ শতাংশই বাদ দেওয়া হোত। পরে সেটি ধাপে ধাপে বাড়তে থাকে রেশন ও নিয়ন্ত্রণের হাত সাফাই-এ। দুর্ভিক্ষের পরবর্তী রেশনের সময় বাদ দেওয়া হোত ১০ শতাংশ—বর্তমানে ১২·৫ শতাংশ। সরকারী হিসাব মেনে নিয়েই নীট উৎপাদন, নীট আমদানী ও নীট প্রাপ্তব্যের—ও মাথা পিছু প্রাপ্তব্যের হিসাব কষা যাক।

বৎসর	নীট উৎপাদন (লক্ষ টন)	নীট আমদানী (লক্ষ টন)	নীট প্রাপ্তব্য (লক্ষ টন)	মাথাপিছু প্রাপ্তব্য আউন্স হিঃ
১৯৫১	৪০০	৪৮	৪৪২	১১'৮
১৯৫২	৪০৬	৩৯	৪৩৯	১১'৫
১৯৫৩	৪৫৪	২০'৪	৪৭৯	১২'৩
১৯৫৪	৫৩৪	৮'৪	৫৪১	১৩'৬
১৯৫৫	৫১৬	৬	৫২৯	১৩'১
১৯৫৬	৫০৩	১৩'৯	৫২৩	১২'৭
১৯৫৭	৫২৭	৩৬'৩	৫৫৪	১৩'২
১৯৫৮	৪৯৩	৩২	৫২৮	১২'৩
১৯৫৯	৫৭৩	৩৮'৬	৬০৭	১৩'৮
১৯৬০	৫৬৮	৫১'৩	৬০৫	১৩'৫
১৯৬১	৬০৭	৩৪'৯	৬৪৩	১৪
১৯৬২	৬২১	৩৬'৪	৬৬১	১৪'১
১৯৬৩	৫৮৬	৪৫'৫	৬৩২	১৩'১
১৯৬৪	৬০৯	৬২'৭	৬৮৫	১৩'৯
১৯৬৫ (রেকর্ড উৎপাদন)	৮৯০	৬০	৯৫০	---?
১৯৬৬	৭৩০	??	??	??

(নীট উৎপাদন+নীট আমদানী+সরকারী মজুত ভাণ্ডার হইতে গ্রহণ—সরকারী মজুত ভাণ্ডার গঠন=নীট প্রাপ্তব্য)।

একটু বিশ্লেষণ করা যাক। ১৯৬৪ সালে লোক-সংখ্যা ৪৭·৫ কোটি। নীট খাদ্য ছিল ৬৮৫ লক্ষ টন—জন পিছু প্রাপ্তব্য হোল প্রতিদিন ১৩·৯ আউন্স। সে বছর দুর্ভিক্ষ বা অনাহার হোল না। ১৯৬৫ সালে নীট উৎপাদন ৮৯০ লক্ষ টন—নীট আমদানী হোল ৬০ লক্ষ টন সেখানে দুর্ভিক্ষ হোল অর্থাৎ ১৯৬৫ সালে মানুষের প্রতিদিনের জন্য—১৩·৯ আউন্সের সংস্থান করা গেল না। তাহলে লোকসংখ্যা এই ১৯৬৫ সালে কত হোয়েছিল যে, বাড়তি ২৬৫ লক্ষ টন খাদ্যও বাড়তি লোকসংখ্যার মোকাবিলা করতে পারলো না। অথচ হিসাব নিলে ধরা পড়বে যে ১৯৬৪ সালের জনসংখ্যার সংগে ১৯৬৫ সালের জনসংখ্যার বৃদ্ধি মাত্র ১ কোটি ১০ লক্ষ জনের। ১ কোটি ১০ লক্ষ মানুষের জন্য ২৬৫ লক্ষ টন খাদ্য কার বা কাদের কেরামতিতে ঘাটতি বোলে বিবেচিত হোল? এইখানে উল্লেখযোগ্য যে একজন মহাখাদ্য বিশেষজ্ঞ বঙ্গসন্তান শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র সেন যিনি পশ্চিম-বাংলার প্রচণ্ড ক্ষমতাশালী উনসত্তর বছরের বৃদ্ধ মন্ত্রী, তিনি ভারতবর্ষের জন্য রেশন ও কর্ডনের বিধান দিয়েছিলেন এবং নিজ রাজ্য পশ্চিমবাংলা ১৯৬৫ সালের ৫ই জানুয়ারী থেকে কুখ্যাত স্ট্যাটুটারী রেশন ও কর্ডন বসিয়েছিলেন। এবং স্বয়ং দক্ষিণী কেন্দ্রীয় খাদ্যমন্ত্রী কলকাতায় সেদিন নিজে দাঁড়িপাল্লা ধরে প্রফুল্ল সেন মশাইকে রেশন ওজন কোরে দিয়ে পেটশাসনের উদ্বোধন করেছিলেন। তারপর সারা ভারতবর্ষেই ১ লক্ষ জন-অধ্যুষিত শহর মাত্রেই স্টাটুটারী রেশনিং-এর দাওয়াই নীতি গৃহীত হোয়েছিল। সাম্প্রতিক ভারতে অনাহারের দুর্ধর্ষ সাধনার সেই হোল সূত্রপাত।

খাদ্য বিশেষজ্ঞ অ্যাক্রয়েডের হিসাব মেনে নিয়ে দেখা যাক ১৯৬৫/৬৬তে ভারতের খাদ্য প্রয়োজন ও ঘাটতি কতটা থাকবে। অ্যাক্রয়েডের হিসাব হোল প্রাপ্ত অপ্রাপ্ত বয়স্ক মিলিয়ে প্রতি পাঁচজনের জন্য পূর্ণবয়স্ক চারজনের খাদ্যই যথেষ্ট। এই হিসাব সামাজিক সংসার ও রাষ্ট্রীয় সংসার দুই-এর বেলাতেই খাটবে।

প্রতিটি প্রাপ্ত বয়স্ক ব্যক্তির জন্য প্রতিদিন যদি ১৬ আউন্স বরাদ্দ ধরা যায়, তাহলে প্রতি এক কোটি জনসংখ্যার জন্য খাদ্য লাগে বছরে মোটামুটি ১৩ লক্ষ টন। (১২ লক্ষ ৮৪ হাজার ২৫০ টন।)

বৎসর	জনসংখ্যা	খাদ্য প্রয়োজন	উৎপাদন	আমদানী	ঘাটতি	উদ্বৃত্ত
১৯৬৫	৪৮'৬ কোটি	৬৩১ লক্ষ টন	৮৯০ লক্ষ টন	৬০ লক্ষ টন	নাই	৩১৯ লক্ষ [illegible]
১৯৬৬	৫০ কোটি (অতিবৃদ্ধি হোলেও)	৬৫০ লক্ষ টন	৭৩০ লক্ষ টন	??	??	

উপরের হিসাব দেখলে কি বোঝা যায় না যে, খাদ্য ঘাটতির চিত্রটি নেহাৎ নকল। ১৯৬৫তে আগামী ছমাসের খোরাকী উদ্বৃত্ত। ১৯৬৬তেও উৎপাদন অনুযায়ী ঘাটতি থাকার কথা নয়, বরং বাড়তি হওয়ারই কথা। তাহলে কেন ভারতের খাদ্য নিয়ে সারা বিশ্বে এত কলরব? আসলে ভারতবর্ষের খাদ্য ঘাটতি ভারত সরকারের খাদ্য মন্ত্রণালয়ের একটা প্রচণ্ড প্রাণসংহারী ধাপ্পা। আমার এই সিদ্ধান্ত যে নেহাতই স্বকপোলকল্পিত নয় তার প্রমাণ হিসাবে আমি উল্লেখ কোরবো ১৯৫৬ সালের নজীর।

১৯৫৬ সালে যখন নীট প্রাপ্তব্য ছিল ৫২৩ লক্ষ টন, মাথা পিছু প্রাপ্তব্য ছিল ১২·৭ আউন্স, তখন তদানীন্তন খাদ্য-মন্ত্রী স্বর্গত রফি আমেদ কিদোয়াই ভারতবর্ষের কন্ট্রোল দাওয়াই তুলে দিয়েছিলেন। কন্ট্রোল তোলার কয়েক মাসের মধ্যেই প্রমাণিত হোয়েছিল যে, দেশে খাদ্যাভাব নেই। চাল ও গমের দাম দেশে ভীষণভাবে পড়ে গেল। ১৯৫৪, ১৯৫৫, ১৯৫৬ এই তিন বছরই খাদ্য আমদানী অত্যন্ত কম হোল। ঠিক এই সময়েই ভারতবর্ষের যে সমস্ত ব্যক্তিকে আমেরিকায় গম কিনতে পাঠান হোয়েছিল, তাদের সংগে আমেরিকান রপ্তানীকারক ও জাহাজী বেপারীদের সংগে যোগাযোগ ঘটল। ভারতের দুর্ভাগ্য যে, রফি আমেদ কিদোয়াই এন্তেকাল করলেন এবং খাদ্যমন্ত্রকে এসে অধিষ্ঠিত হোলেন স্বনামধন্য শ্রীঅজিতপ্রসাদ জৈন। জৈন সাহেবের পিছু পিছু আবার এল কন্ট্রোল। এল আমেরিকান আমদানীর বন্যা। আমদানী বজায় রাখার জন্য ঘাটতির ধুয়া ভারতের আকাশ বাতাস কাঁপিয়ে তুলল।

ওদিকে আমেরিকার মার্কিন কংগ্রেসের ৮৩তম অধি-বেশনে ১৯৫৪ সালে "দি এ্যাগ্রিকালচারাল এণ্ড ট্রেড ডেভেলপমেন্ট এণ্ড এ্যাসিস্ট্যান্স এ্যাক্ট" নামে এক আইন বিধিবদ্ধ হোল। শান্তিকালীন কর্মসূচী হিসাবে আমেরিকার বাড়তি খাদ্যশস্য যা "প্রাইসপ্যারিটি" বা মূল্যমান সমতা রাখার জন্য সবটাই সরকারকে কিনে নিতে হয় তা আমেরিকার মিত্রদেশগুলিতে বিক্রীর জন্য আইনানুগ ব্যবস্থা হিসাবে এটি আত্মপ্রকাশ করে। ১৯৫৪ সালের পাবলিক ল' ৪৮০র মুখবন্ধে সুস্পষ্ট ভাষায় বলা হোল, "An act to increase the consumption of United States agricultural commodities in foreign countries to improve the foreign relation of the United States and for other purposes." অর্থাৎ বিদেশের

বাজারে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কৃষিপণ্যের চাহিদা বৃদ্ধি কোরে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বৈদেশিক সম্পর্কের উন্নতিবিধান ও অপরাপর উদ্দেশ্যেই এই আইন রচিত হোল।

ভারতবর্ষের দুর্ভাগ্য যে এই পি এল ৪৮০র সব থেকে অসহায় শিকার হোল ভারতবর্ষের জনসাধারণ। অপদার্থ খাদ্যমন্ত্রীরা আমেরিকা সফর করতে লাগলেন আর ভারতের ক্ষুধামুক্তির দায়িত্ব আমেরিকার "নিও কলোনাইজেশনের" হাতে তুলে দিয়ে নিশ্চিন্ত হোয়ে বসলেন। ভারতের খাদ্য সমস্যার ট্রাজিক ইতিহাস সুরু হোল মার্কিনী রাজনীতির ফাঁদে পড়ে। সুতরাং স্বাধীন ভারতে খাদ্য-কথা কিছু লিখতে হোলে পি এল ৪৮০র নোংরা ঘাটতেই হবে। ভারতের প্রত্যেকটি মানুষের জানা দরকার যে, ভারতের কৃত্রিম খাদ্য সমস্যা আমেরিকান পি এল ৪৮০র কৃষিপণ্য বেচার জন্য জীইয়ে রাখতে হোয়েছে অপদার্থ কংগ্রেসী মন্ত্রীদের। তারও কারণ আছে।

দরিদ্র দেশ ভারতবর্ষে রাজনীতিতে সফল হোতে হোলে জ্ঞান চাই না, বুদ্ধি চাই না, দেশপ্রীতি চাই না, শুধু চাই টাকা, অঢেল টাকা। আমেরিকা পি এল ৪৮০র মাধ্যমে ভারতীয় রাজনীতিতে মার্কিন টাকার খেলা চালিয়ে যাচ্ছে। একটু বিস্তৃত কোরে আলোচনা করলেই তা বোঝা যাবে।

পি এল ৪৮০র জন্য ভারত ও আমেরিকার মধ্যে মোট ৯টি প্রধান চুক্তি হোয়েছে ১৯৬৪ সালের ৩০শে সেপ্টেম্বর পর্যন্ত। তার মধ্যে ১৯৫৬ সালের ২৯শে আগস্ট, ১৯৫৮ সালের ২৬শে সেপ্টেম্বর, ১৯৫৯ সালের ১৩ই নভেম্বর, ১৯৬০ সালের ৪ঠা মে ও ২৯শে জুলাই, ২৩শে সেপ্টেম্বর, ১৯৬১ সালের ১লা মার্চ, ১৯৬২ সালের ১লা মে, ২৬শে নভেম্বর ও ৩০শে নভেম্বর তারিখের চুক্তিগুলি উল্লেখ্য। এর ফলে ভারতবর্ষ আমেরিকার কাছ থেকে ১৩৮৬·৪ কোটি টাকার জিনিস কিনেছে। তার মধ্যে ১২৯·৯ কোটি টাকার তুলা; ৬·৬ কোটি টাকার তামাক; ৪·৭ কোটি টাকার চর্বিও কিনতে হোয়েছে।

কারণ এগুলি সবই "এ্যাগ্রিকালচারাল কমোডিটি।"

আমেরিকা এই কৃষিপণ্য নিঃস্বার্থভাবে বা দয়াপরবশ হোয়ে দেয় না। দেয় নিজের জাতীয় স্বার্থে। কারণ নিজেদের এই কৃষিপণ্য বিদেশের বাজারে বিক্রী করতে না পারলে তার কৃষি অর্থনীতি তথা জাতীয় অর্থনীতি ক্ষতিগ্রস্ত হবে। প্রতি বছর উদ্বৃত্ত গম কেনা ও মজুতের জন্য আমেরিকা সরকারকে প্রায় ৬০০ কোটি ডলার নিয়োগ করতে হয়। এই গম বিক্রী না হোলে আমেরিকা নিজেই মুস্কিলে পড়বে। সেই মুস্কিল আসান করল ভারতীয় মন্ত্রিসভার সভ্যপীরগণ পি এল ৪৮০র হাঁড়িকাঠে স্বেচ্ছায় মাথা গলিয়ে দিয়ে।

এইবার দেখা যাক পি এল ৪৮০র টাকা ভারতীয় রাজনীতি ক্ষেত্রে কিভাবে খেলা চালাচ্ছে। পি এল ৪৮০ অনুযায়ী গম বা অন্যান্য আমদানী কৃষিপণ্যের দাম টাকায় দেওয়া যায়। এই টাকা ভারতবর্ষেই খরচ করার জন্য আমেরিকা মনস্থ করে। ম্যারিকান রাজনীতি দরায় টইটুম্বুর। ভারতের উন্নতিকল্পে এই টাকা খরচ হবে এটা সদরমহলের কথা। কিন্তু অন্দরমহলের কথা অন্য। এই কোটি কোটি টাকা খরচ হয় ঘুষের ব্যাপারে। আমেরিকা ঘুষ দেয় সর্বস্তরে অপরের দেশের নিজেদের দালাল তৈরি করার জন্য। ঘুষ দেয় খবরের কাগজের সম্পাদককে, সাধারণ সাংবাদিককে, রাজনীতিককে, সরকারী আমলাবর্গকে। অপরের দেশে ব্যাপক "এস্পিয়োনেজের" চক্রান্ত এই টাকায় পাকিয়ে তোলা হয়। শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, ও তার "আঁতেলেকচুয়ালদের" হাত করার কাজেও এই টাকা যথেচ্ছভাবে ব্যবহার করে আমেরিকান দূতাবাস। এবং ভারতীয় মন্ত্রীমহলে এ বস্তু অজানা নয়। কিন্তু যে জিনিস নিজেদের স্বার্থেই সুরু করতে হোয়েছে, চালিয়ে যেতে হোচ্ছে তা বন্ধ করার নৈতিক সাহস আজ ভারতীয় মন্ত্রিসভার নেই। আর সেই সাহস দেখাতে গেলে ঐ আমেরিকান টাকায় আবার "কাউন্টার এস্পিয়নেজ" চালিয়ে মন্ত্রিসভাতেই হয়ত টান মেরে ভারত মহাসাগরে ফেলে দিতে পারে আমেরিকা। সেই ভয়ে কেউ রা কাড়ে না। অবস্থা দিনে দিনে এমন সঙ্গীন হোয়ে উঠছে যাতে ভারতবর্ষে দ্বিতীয় ভিয়েৎনাম সৃষ্টি হওয়াও আদৌ বিচিত্র নয়। যদি কোন কারণে নির্বাচনে আমেরিকার মনঃপুত মন্ত্রিসভা গঠিত হবার সুযোগ না থাকে, তাহলে আমেরিকা ভারতেও "ভিয়েতনামী কৌশল" যে দেখাবে না এমন কথা বলা যায় না। কিছুদিন আগে ৩০০ মিলিয়ন ডলার ব্যয়ে ইন্দো-আমেরিকান ফাউণ্ডেশনের টোপ ভারতবর্ষে ফেলা হোয়েছে। সেই টোপ স্বয়ং শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী মার্চ মাসে আমেরিকা সফরের সময় নিজে গিলেছেন এবং ভ্যানিটি ব্যাগে পুরে ভারতেও এনেছেন। ভারতবর্ষের নিরপেক্ষ বুদ্ধিজীবী-মহল এ নিয়ে তুমুল প্রতিবাদ কোরেছেন। দিল্লীতে মন্ত্রিসভার নাকের ডগায় একদল অধ্যাপক বিবৃতি দিয়েছেন এর বিরুদ্ধে এবং তাঁরা এই মার্কিন ফাঁদ সম্বন্ধে বুদ্ধিজীবী মহলকে হুঁশিয়ার করার জন্য দিল্লীতে রীতিমত "Terch in" ক্লাস চালিয়েছেন। নেহেরুর জীবিত অবস্থায়েই কুখ্যাত "ভোয়া" (Voice of America) চুক্তি নিয়ে আমেরিকা ভারতবর্ষের আকাশবাণী ইজারা নিতে চেয়েছিল। চুক্তি সই হোয়েছিল। তবে নেহাৎ নেহেরুজীর প্রবল ব্যক্তিত্বের ফলে ম্যারিকান চক্রান্তের পাকা ঘুঁটি কেঁচে গিয়েছিল। নেহেরু নিজের ঘাড়ে দোষ চাপিয়ে নিয়েছিলেন চুক্তি খেলাপের। দেশবাসী জেনেছিল যে নেহেরুর ভুলেই "ভোয়া" চুক্তি সম্পন্ন হোয়েছিল। আসলে কিন্তু তদানীন্তন তথ্য ও বেতার দপ্তরের বড় বড় আমলারাই এটি কায়দা কোরে নেহেরুকে দিয়ে সই করিয়ে নিয়েছিলেন। এই সবই হোচ্ছে বেহিসাবী আমেরিকান টাকা খরচের কেরামতিতে। এই টাকা আমদানীর একটি সুযোগ হোচ্ছে পি এল ৪৮০। ভারতের ক্রনিক কৃত্রিম ঘাটতিমন্যতার সুযোগ নিচ্ছে আমেরিকা এইভাবে।

শুধু তাই নয়, খাদ্য বিক্রীর নাম কোরে আমেরিকা ভারতের "ডলার ড্রেনেজের" সুড়ঙ্গ পথটিও সংরক্ষিত কোরে রেখেছে। অতি মূল্যবান বিদেশী মুদ্রা ভারতের রাজকোষে যাতে না জমে তারই জন্য এ ব্যবস্থা।

পি এল ৪৮০র আমদানীর অন্তত শতকরা ৫০ ভাগ আমেরিকান জাহাজে বইতে হবে। পৃথিবীর মধ্যে আমেরিকান জাহাজ ভাড়ার হার সবচেয়ে বেশি। আন্তর্জাতিক জাহাজ ভাড়ার হারের তুলনায় আমেরিকান ভাড়া শতকরা ২৫ থেকে ৩০ ভাগ বেশি। এই ভাড়া টনে ১৫ ডলার। ১৯৬১-৬২ ও ১৯৬৩-৬৪ এই সময়ের মধ্যে ভারতের ডলার সঞ্চয় বেরিয়ে গেছে আমেরিকান জাহাজীদের হাতে ৭১ কোটি টাকার। আবার ১৯৬৫ সালের মে মাসে ঠিক হোয়েছে যে ভারতবর্ষে আমেরিকান ট্যুরিস্ট বাবদ ডলার উপায়ের রাস্তাটিতেও কাঁটা দেওয়া হবে। যুক্তরাষ্ট্রে সরকার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন যে, ভারতে আমেরিকান ভ্রমণকারীদের কাছে দূতাবাসের মাধ্যমে ডলার বিনিময় করবেন। তা ছাড়া, দূতাবাসের ব্যয়, দূতাবাসের কর্মচারীদের বেতন, ইনফর্মেশন সার্ভিসের ব্যয় সবই হবে খাদ্যবেচা টাকায়। অথচ এর পরেও ১৯৬৫ সালের ইন্দো-পাক সংঘর্ষের সময়ে আমেরিকা খাদ্য বন্ধ করার হুমকি দিয়ে ভারতের নাভিশ্বাস তুলে দিয়েছিল। আমাদের মন্ত্রীমশাইরা তখন কি নিদারুণ অভিমানে ফুলতে

ফলতে যাচ্ছেতাই সব বিবৃতি ছেড়েছিলেন। শেষ পর্যন্ত অভিমানিনী ভারতরাণী দ্যাট ইজ ইন্দিরা গান্ধী মার্চ মাসে আমেরিকা গিয়ে আবার পি এল চুক্তি ঝালাই করার ব্যবস্থা করলেন। তবে তার জন্য তাঁকে বাঁধা দিতে হোল ভারতের অর্থনীতি—শুধুমাত্র কৃষি অর্থনীতিই নয়। তিনি প্রায় আটশ মার্কিন ব্যবসায়ী ও শিল্পপতিদের আয়োজিত একটি ভোজসভায় লজ্জা-সম ও সকল "সভরেন প্রেস্টিজের" মাথা খেয়ে বললেন,—

In India we welcome private foreign investment not only for the capital it brings but also for transfer of modern technology and the managerial and technical skill's private investment fecilities.

তিনি মার্কিন পুঁজিকে আশ্বাস দিলেন—

India would continue to treat foreign investors completely on par with national investors. Full repatriation of profits and capital would continue to be allowed.

খাদ্য ঘাটতির কৃত্রিম দায় মেটাতে আমরা মার্কিন পুঁজির কাছে সব বাঁধা দিয়ে দিলাম ইন্দিরাজীর বকলমে।

তারপর ১৯৬৬র জুন মাসে ভারতে ঘটেছে "ডলারক্যুপ" ডিভ্যালুয়েশনের নামে। ডিভ্যালুয়েশনের পরেই ঝটিতি দৌড়ে এসেছেন মার্কিন কৃষি সেক্রেটারী মিঃ ফ্রিম্যান। এসেছেন পি এল ৪৮০র মৃত্যুর কথা শোনাতে। আমেরিকান সেনেটে "স্বাধীনতার জন্য খাদ্যের" কর্মসূচীকে কেন্দ্র কোরে এক বিল উত্থাপিত হোয়েছে। এই বিল সিনেটে পাশ হোলেই যুক্তরাষ্ট্র পাবলিক ৪৮০র ব্যবস্থা রদ কোরে দেবে।

'স্বাধীনতার জন্য খাদ্য' (food for freedom or "Freedom for food") অনুযায়ী এর পরে খাদ্য কেনার জন্য ডলার মূল্য দিতে হবে। টাকায় তা পরিশোধ করা যাবে না। খাদ্যসংগ্রহমন্ত্রী সুব্রাহ্মণিয়ম ও "পরিকল্পনা-মন্ত্রী" অশোক মেটা ফ্রিম্যানকে ধরে বসলেন—এখন থেকে ১৯৬৭ সালের মার্চ মাস পর্যন্ত যেন যুক্তরাষ্ট্র সরকার পি এল চুক্তি অনুযায়ী ভারতবর্ষকে ৪০ লক্ষ টন খাদ্যশস্য সরবরাহ করে। "স্বাধীনতার জন্য খাদ্যের" একটি অনুচ্ছেদে আছে যে, যুক্তরাষ্ট্র ইচ্ছা কোরলে আরও পাঁচ বছর খাদ্য আমদানীকারক দেশে প্রচলিত মুদ্রায় দাম নিতে পারে। অবশ্য ভারতের এ নিয়ম ব্যতিক্রমের সুযোগ পাওয়ার কোন আশাই নেই—আর সুবিধা পাওয়ার কোনও প্রশ্নই উঠতে পারে না। (Statesman the 16th July 1966) তবে আমেরিকার দয়ার শরীর। এই ব্যবস্থায় যুক্তরাষ্ট্র প্রথম দশ বছর খাদ্য-শস্যের দাম নেবে না। তা ছাড়া যুক্তরাষ্ট্র দামশোধের মেয়াদ ৪০ বছর পর্যন্ত করবে আর খাদ্যশস্যের বকেয়া দামের জন্য সুদের হার ধার্য করবে অত্যন্ত কম। সুতরাং এ ব্যাপারে আমাদের মন্ত্রীদের আর ঝামেলা কোথায়? জয় দুর্গা—জয় বাবা লিন্ডন জনসন বোলে তাঁরা ঝুলে পড়ুন।! বুড়ো বয়স সকলেরই। অতদিন বেঁচে থেকে ম্যারিকান ঋণশোধের বায়নাক্কা আর পোয়াতে হবে না। সুতরাং মাভৈঃ! "পস্টারিটি" একটা বোগাস্টার্স। ওর জন্য চিন্তা করার কোনই প্রয়োজন নেই।

অথচ এই নিবন্ধেই আমি দেখিয়েছি যে, বিদেশ থেকে খাদ্য আমদানীর কোনও প্রয়োজন ভারতের নেই। এই ঘাটতি কৃত্রিম, ঘাটতির চীৎকার আরও কৃত্রিম এবং এই কৃত্রিমতার চীৎকার একটা "ক্রিমিন্যাল অফেন্স"। কারণ এই চীৎকারে দারাজাত আটলান্টিকের ওপারে বাঁধা পড়ছে। ভারতের লোকসংখ্যার প্রয়োজনায় চাহিদা ভারতের মাটির ফসলে মেটানো যেত এবং এখনো দীর্ঘদিন। যাবে।

তবে তার জন্য সর্ব প্রথমেই খাদ্য চলাচলে বিধিনিষেধ তুলে দিতে হবে। আর না হোলে ভারত সরকারকে পুরো-পুরি রাষ্ট্রায়ত্ত খাদ্য ব্যবসার ঝক্কি হাতে নিতে হবে। যদিও সে ঝক্কি সার্থকভাবে ঘাড়ে নিতে হোলে ভারতের ইতিহাসে স্বাধীনতা-উত্তরকালে প্রথম এবং সর্বপ্রথম একটা বৈপ্লবিক কর্মধারা রূপায়িত হবে। তবে তারও আগে সরকারের প্রশাসন কাঠামোতে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব আনতে হবে। নইলে বৃটিশ লিগ্যাসীর ভাগশেষ বর্তমান ব্যুরোক্রাটিক প্রশাসন কাঠামোর চোরাবালিতে সরকারের অনেক সদিচ্ছা ডুবে যাবে।

সমগ্র দেশ হবে একটি খাদ্যাঞ্চল। খাদ্যাঞ্চল ভাগ কোরে দেশকে আর ভাগাভাগি না করাই উচিত। মুখে জাতীয় সংহতির চীৎকার আর কার্যত হাজারগণ্ডা সীমানা ভাগ আসলে দেশের সংহতির পক্ষে মারাত্মক ক্ষতিকর। তা না কোরে কেন্দ্রের উচিত হবে একটি মজুত ভান্ডার গঠন যাতে যে কোন রাজ্য সরকার প্রয়োজন মাফিক খাদ্য পেতে পারেন। আর সংগে সংগে প্রকৃত খাদ্যবিজ্ঞানী দিয়ে, প্রকৃত সংখ্যাতত্ত্বানিরূপণকারী দিয়ে যথার্থ খাদ্য উৎপাদনের হিসাব ও প্রয়োজনের হিসাব আগে করতে হবে। কারণ দেখা গেছে যে প্রত্যেকটি রাজ্য সরকার খাদ্য উৎপাদন কম দেখিয়ে খাদ্যের প্রয়োজনের পরিমাণের হিসাবকে ফাঁপিয়ে কেন্দ্রের কাছে খাদ্যের জন্য দাবি জানায়। না পেলে রাজ্য সরকার নিজেদের অপদার্থতার দায় কেন্দ্রীয় সরকারের ঘাড়ে চাপিয়ে রাজ্যের অধিবাসীদের কাছে সাধু সাজে। আর খাদ্য পেলে তাকে নিয়ে প্রথমত রাজনীতি করে—দ্বিতীয়ত নষ্ট করে যেটি মারাত্মক অপরাধ। গত কয়েক বৎসরে পশ্চিমবংগে যে পরিমাণ খাদ্য সরকার ছেলেখেলা কোরে নষ্ট কোরেছে তা পশ্চিমবঙ্গের অন্তত তিন মাসের ক্ষুন্নিবৃত্তির সংস্থান করতে পারতো।

ভারতবর্ষ খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণ যে ১৯৬৫/৬৬ সালে ছিল আমার এই সিদ্ধান্ত আমি এই নিবন্ধে দেখিয়েছি। এবং ভারতবর্ষ দীর্ঘদিন এখনও স্বয়ংসম্পূর্ণ থাকবে খাদ্যের ব্যাপারে আমার এই সিদ্ধান্তের পিছনে যুক্তি নিশ্চয়ই প্রয়োজন। নইলে এমন বেমক্কা উল্টা পুরাণের কথা লোকে মানবে কেন? আবার যখন দেশের প্রত্যেকটি নেতা, উপনেতা, সহনেতা, মায় প্রধানমন্ত্রী থেকে দেশের পঞ্চায়েতের রাম ই কৈবর্ত, হাসিম সেখ পর্যন্ত তার স্বরে বলছে ঘাটতি, ঘাটতি সে ক্ষেত্রে আমার উপরোক্ত সিদ্ধান্ত স্বকপোলকল্পিত বোলে ধিক্কৃত হোতে বাধ্য।

সুতরাং এই প্রসংগে স্বাধীন ভারতবর্ষের কৃষির কথা কিছু বলতে হয়।

স্বাধীন ভারতের কৃষির উন্নতি বোলতে কিছু হয় নি একথা বলা যাবে না। কারণ পরিমাণগত উন্নতি হোয়েছে বৈকি! নইলে ১৯৫১ সালের ৪০০ লক্ষ টন নীট উৎপাদন ১৯৬৫তে ৮৯০ লক্ষ টনে দাঁড়াল কেমন কোরে? আসলে কৃষিপণ্যের পরিমাণগত উন্নতি হোলেও পরিমাণগত উৎকর্ষ কিছু হয় নি। যদিও তার জন্য হাজার হাজার কোটি টাকা নয়-ছয় করা হোয়েছে। দামোদর ভ্যালি প্রোজেক্ট, কোশী প্রোজেক্ট, ভাকরা নাঙ্গাল প্রোজেক্ট, সেতুর প্রোজেক্ট, কোশী প্রোজেক্ট, কৃষ্ণা, কাবেরী, গোদাবরী গঙ্গা, মহানদী, বুড়ী-বালাম, দামোদর, ব্রহ্মপুত্র প্রোজেক্ট হোতে কোথাও বাকী নেই। কিন্তু সব প্রোজেক্টেরই এক হাল। চাষীকে এখনও আল্লা মেঘ দে, পানি দে, বোলে উর্ধ্বমুখ চাতকের মত আকাশের দিকে তাকিয়ে থাকতে হয়। বৃষ্টিপাত ভিন্ন ভারতবর্ষের

কৃষির উৎপাদন এখনও সম্পূর্ণ বন্ধ্যা। অথচ পরিমাণগত উৎকর্ষ অনেক বেড়েছে। তার কারণ বহু অনাবাদী জমিতে স্বাধীনতা উত্তর কালে চাষবাস হোয়েছে। আবাদী জমির একর পরিমাণ বাড়ার জন্যই কৃষির উৎপাদন বেড়েছে। উৎপাদনের হার বিশেষ উৎকর্ষ লাভ করে নি। প্রোজেক্টের খরচের সংখ্যাতত্ত্ব দিয়ে যদিও উন্নতি মাপার চেষ্টা সরকারী-ভাবে করা হোয়ে থাকে তবুও সে চেষ্টা নেহাতই জনসাধারণের বিভ্রান্তি উৎপাদনের জন্য। প্রোজেক্টগুলি তৈরি হোয়েছে মনে হয় কন্ট্রাক্টারদের কন্ট্রাক্ট পাওয়াবার জন্য—কৃষির উন্নতির জন্য নয়। তা যদি হোত তাহলে দামোদর, ময়ূরাক্ষী পরিকল্পনায় বাংলাদেশে চাষের জল জুটতো। ভাকরা নাঙ্গালের কল্যাণে পাঞ্জাব, রাজস্থান, উত্তরপ্রদেশের চেহারা অন্যরকম হোত। তা হয় নি। ঠিকাদারদের ঠিকাদারীর সুযোগ দেবার জন্যই যেন এগুলির সৃষ্টি হোয়েছে। আর এই সব ঠিকাদারীর কল্যাণেই বিদেশে ভারতের পরিচয় Contracters' Paradise, ঠিকাদারদের স্বর্গ।

বেশি জমি চাষ করিয়ে বেশি কৃষিপণ্য উৎপাদনের হিসাব দেখিয়ে কেন্দ্রীয় কৃষিমন্ত্রীর চাকরি বজায় হয়—কৃষির উন্নতি হয় না। এবারেও এপ্রিল মাসে দিল্লীতে যখন মুখ্যমন্ত্রী সম্মেলনে খাদ্যমন্ত্রী আগামী বর্ষের কৃষির উন্নতির চিত্র আঁকছিলেন তখন তিনি উৎপাদন হার বাড়ানর কথা বলেন নি। যা বোলেছেন তা হোল—"বর্তমান বছরে আরও ৬০ লক্ষ একর জমিতে চাষের ব্যবস্থা কোরতে হবে এবং পরের বছর অতিরিক্ত দেড় কোটি একর জমিতে চাষের ব্যবস্থা কোরে মোট অতিরিক্ত দু' কোটি দশ লক্ষ একর জমি ফলকর করা হবে। এই পরিকল্পনা অনুযায়ী ভারত খাদ্যে স্বয়ম্ভর হোয়ে উঠবে।" মুখ্যমন্ত্রীরা খাদ্যমন্ত্রীর এই মনোগ্রাহী পরিকল্পনায় নিশ্চয়ই গদগদ হোয়ে হাততালি দিয়েছেন। সুব্রাহ্মণিয়ম এর পরে হিসেব দিয়েছেন যে—"এইভাবে ভারতবর্ষে ৯ কোটি ৭০ লক্ষ টন উৎপাদন হবেই হবে।" মুখ্যমন্ত্রীরা এবার নিশ্চয়ই সাধু সাধু কোরে উঠে বৈঠক ছেড়ে স্ব স্ব রাজ্যের উদ্দেশ্যে উড়োজাহাজে চেপেছেন।

কৃষি উৎপাদন বাড়ানর জন্য বাড়তি জমি ভেঙে আবাদী করার মত বাড়তি জমি আর কতদিন থাকবে সেটি সন্দেহের। তার উপর বাড়তি জমি চাষাবাদী করার অতি উৎসাহী অদূরদর্শিতায় আমরা ভারতের বনাঞ্চলের অনেক ক্ষতিসাধন এরই মধ্যে কোরে ফেলেছি, যার ফলে ভারতবর্ষে বৃষ্টির পরিমাণ উল্লেখযোগ্য ভাবেই কমেছে। এর পরে আরও আরও জমি থেকে বনাঞ্চল উচ্ছেদের চক্রান্তকে ভূমি-প্রকৃতি নিশ্চয়ই অভিশাপ দেবে। অভিশাপ দেবে ক্রনিক অনাবৃষ্টির। তাতে সব বিদ্যাবুদ্ধিই শেষ হবে। অনাবৃষ্টির এই চেতাবনী উল্লেখ করতে হোত না, যদি সত্যিকারের অনাবাদী জমি যেমন রাজস্থানের মরুভূমি, মধ্যপ্রদেশের, হিমাচল প্রদেশের, বিহারের, উত্তরপ্রদেশের পাথুরে জমি আবাদ করা হোত। নূতন আবাদ করা হোচ্ছে সেই সব জমি, যে জমিতে গাছগাছালি, বনাঞ্চল অন্যান্য ফলকর বৃক্ষকুঞ্জ আছে সেগুলিই। অথচ বর্তমানের আবাদী জমির বৃষ্টি আকর্ষণের জন্যই ঐগুলির প্রয়োজন ছিল। পশ্চিমবাংলার সুন্দরবনের জংগল কেটে আবাদী জমির হিসাব বাড়ালে, কেরালার নারকেলকুঞ্জ, কাজুবাদামের বাগান কেটে আবাদী জমির হিসাব বাড়ালে হিসাব বাড়ে সত্য, কিন্তু তা ভবিষ্যতের জন্য বাংলার কি কেরালার মংগলজনক হয় না।

ভারতে এই বৃক্ষকুঞ্জের অধিকৃত জমি যে সাফাই হোয়েছে তার প্রমাণ হোল—

১৯৫০/৫১ সালে যেখানে ৪ কোটি ৯০ লক্ষ একরে বৃক্ষকুঞ্জ ছিল সেখানে ১৯৬০/৬১তে তা দাঁড়িয়েছে মাত্র ১ কোটি ৩২ লক্ষ একর। আবার অন্যদিকে কৃষি জমিকে বিভিন্ন কাজের জন্য অকৃষি করা হোচ্ছে দ্রুততালে—বাসস্থান, রাস্তা, কলকারখানা ইত্যাদির গর্ভে সেগুলি বিলীন হোচ্ছে। তার পরিমাণ—১৯৫০/৫১ সালে যা ২ কোটি ৭৭ লক্ষ একর, ১৯৬০/৬১তে তা ৩ কোটি ৪৭ লক্ষ একর। কোন কোন রাজ্যে গোচারণভূমি কমলেও সামগ্রিক ভারতবর্ষে স্থায়ী গোচারণভূমি বেড়ে গেছে। ১৯৫০/৫১ সালের ১ কোটি ৬৫ লক্ষ একর ১৯৬০/৬১তে ৩ কোটি ৫৭ লক্ষ একরে দাঁড়িয়েছে। ফলে নিরীহ বৃক্ষ উৎপাদন কোরেই বাড়াতে হোচ্ছে মোট কৃষি জমির আবাদী পরিমাণ। সে পরিমাণও বেড়েছে বড় কম নয়। ১৯৫০/৫১য় ২৯ কোটি ৩৪ লক্ষ একর ১৯৬০/৬১তে ৩২ কোটি ৮০ লক্ষ একর দাঁড়িয়েছে। আপাত দৃষ্টিতে এই বৃদ্ধি—

৩২ কোটি ৮০ লক্ষ একর
২৯ কোটি ৩৪ লক্ষ একর
৩ কোটি ৪৬ লক্ষ একর

৩ কোটি ৪৬ লক্ষ একর হোলেও কৃষি ভিন্ন অন্য কাজে ব্যবহৃত জমির বৃদ্ধি ও স্থায়ী চারণভূমি বৃদ্ধি দুটিই ওর সংগে যোগ হোয়ে প্রায় ৬কোটি একরে দাঁড়াবে।

এখন দেখা যাক মূল খাদ্যবস্তুর জন্য ভারতবর্ষের কত জমি কাজে লাগান হয় এবং সেখানে কৃষিপণ্য কিভাবে বেড়েছে। একথা ঠিক আবাদী জমির পরিমাণ বাড়লেও কৃষিপণ্য উৎপাদনের হার বাড়ানর জন্য সরকারী প্রচেষ্টা বিবৃতি সার হোলেও ভারতের উৎপাদনহার বিভিন্ন রাজ্যে বেড়েছে কৃষকের ব্যক্তিগত প্রচেষ্টায় বাঁচার তাগিদে। লোক-সংখ্যা বৃদ্ধির জন্য কৃষকের জমির পরিমাণ মাথা পিছু যত কমেছে কৃষিতে আত্যন্তিক প্রচেষ্টা ততই বেড়েছে কৃষকের। কেন না কৃষককে সামান্য কৃষিজমির মোহ ত্যাগ করিয়ে উপায়ের অন্য রাস্তা দেখান যায় নি। সেই রাস্তা দেখানো যেত ভারতে শিল্পবিপ্লব ঘটাতে পারলে। শিল্পের অগ্রগতি এমন কোন পর্যায়ে আসে নি যে, কৃষক লাঙল কোদাল ছেড়ে শিল্প শ্রমিক হবার জন্য সুযোগ পাবে। তাই বাধ্য হোয়ে কৃষককে জমি সামান্য হোলেও তাতেই পড়ে থাকতে হোয়েছে। অবশ্য কৃষকের পুত্রেরা অনুৎপাদক সরকারী, বেসরকারী কাজের সুযোগ পেয়েছে সামান্য পরিমাণে। সেই কাজের পারিশ্রমিক কোন কোন ক্ষেত্রে কৃষির জমিতে মূলধন যোগান দিয়ে কৃষিপণ্য বাড়ানর মদত যুগিয়েছে। সুতরাং উৎপাদনের হার বেড়েছে মানে এই নয় যে, সরকার তা বাড়াতে বিশেষ কিছু সাহায্য কোরেছে।

এখন একটু হিসাব দেখা যাক—

উৎপন্ন দ্রব্য	১৯৫০-৫১ সালের		১৯৬০-৬১ সালের	
	চাষজমির পরিমাণ	ফলন	চাষজমির পরিমাণ	ফলন
চাল---	৭,৬১,৩৫০০০ একর	২,২২,৫১,০০০ টন	৮,৫৯,৬১০০০ একর	৩,১৫,১২০০০ টন
গম---	২,৪০,৮২০০০ একর	৬৩,৬০,০০০ টন	৩,৩২,৫৫০০০ একর	১,০৯,৫৬০০০ টন
সমস্ত তণ্ডুল জাতীয় খাদ্যবস্তু মিলিয়ে	১৯,৩৩.১৪০০০ একর	৪,১৭,৪৪০০ টন	২২,৫৬,৯০০০০ একর	৬,৬০,৪১০০০ টন
অন্যান্য খাদ্যবস্তু—	২৪.০৪.৮৯০০০ একর	৫,০০২২০০০ টন	২৮,৩১,৩০০০০ একর	৭,৭৫,০৭০০০ টন

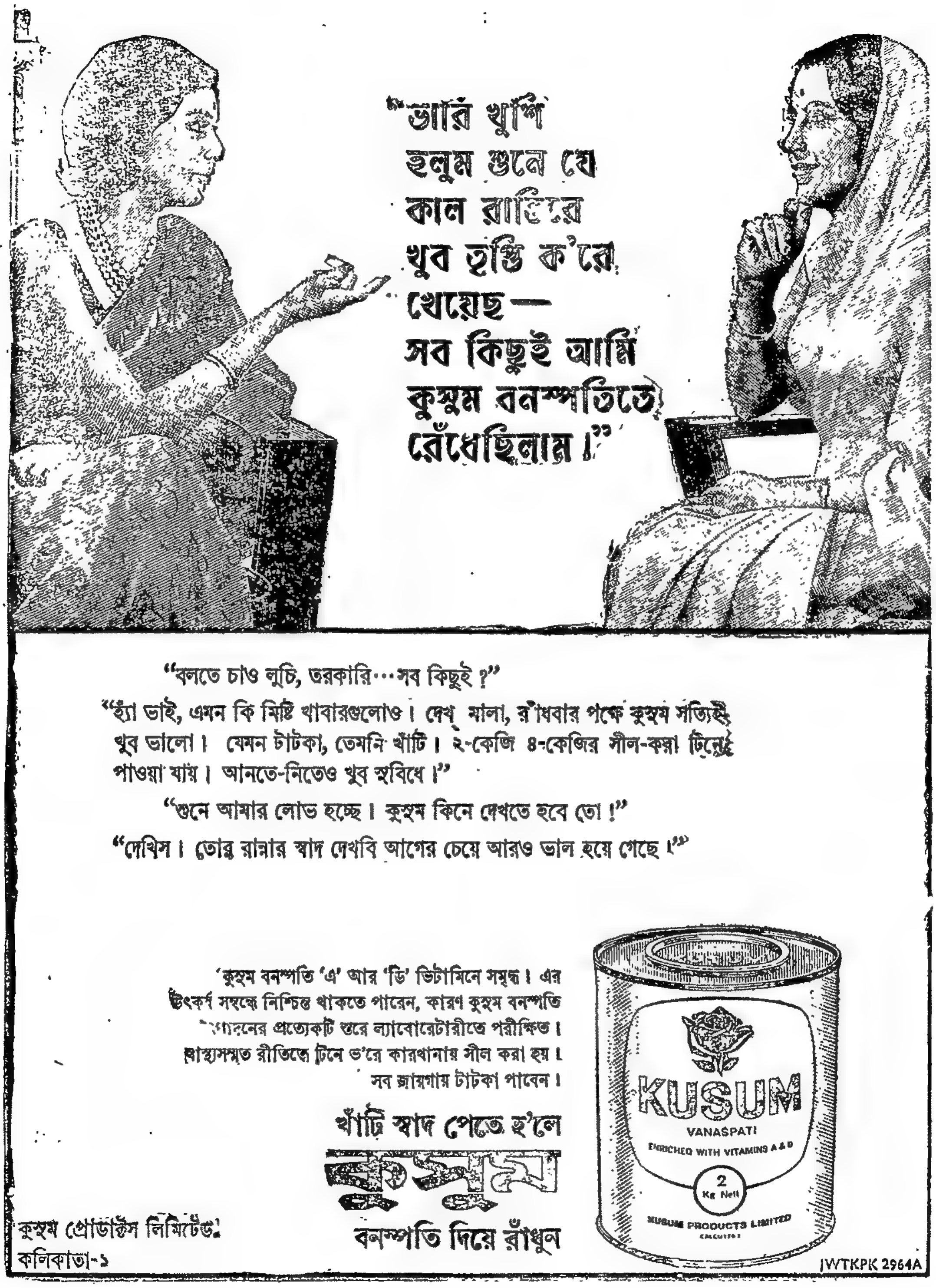
"ভারি খুশি
হলুম শুনে যে
কাল রাত্তিরে
খুব তৃপ্তি ক'রে
খেয়েছ—
সব কিছুই আমি
কুসুম বনস্পতিতে
রেঁধেছিলাম।"
"বলতে চাও লুচি, তরকারি···সব কিছুই ?"
"হ্যাঁ ভাই, এমন কি মিষ্টি খাবারগুলোও। দেখ্ মালা, রাঁধবার পক্ষে কুসুম সত্যিই খুব ভালো। যেমন টাটকা, তেমনি খাঁটি। ২-কেজি ৪-কেজির সীল-করা টিনেই পাওয়া যায়। আনতে-নিতেও খুব সুবিধে।"
"শুনে আমার লোভ হচ্ছে। কুসুম কিনে দেখতে হবে তো!"
"দেখিস। তোর রান্নার স্বাদ দেখবি আগের চেয়ে আরও ভাল হয়ে গেছে।"
'কুসুম বনস্পতি 'এ' আর 'ডি' ভিটামিনে সমৃদ্ধ। এর
উৎকর্ষ সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত থাকতে পারেন, কারণ কুসুম বনস্পতি
উৎপাদনের প্রত্যেকটি স্তরে ল্যাবোরেটারীতে পরীক্ষিত।
স্বাস্থ্যসম্মত রীতিতে টিনে ভ'রে কারখানায় সীল করা হয়।
সব জায়গায় টাটকা পাবেন।
খাঁটি স্বাদ পেতে হ'লে
কুসুম
বনস্পতি দিয়ে রাঁধুন
KUSUM
VANASPATI
ENRICHED WITH VITAMINS A & D
2
Kg Nett
KUSUM PRODUCTS LIMITED
কুসুম প্রোডাক্টস লিমিটেড
কলিকাতা-১
JWTKPK 2964A

হিসাবটি থেকে বোঝা যাবে যে, ১৯৫০/৫১ সালের ২৪ কোটি একর জমি ১৯৬০/৬১ সালে বেড়ে হোয়েছে ২৮ কোটি ৩১ লক্ষ একর। বৃদ্ধির পরিমাণ মোটামুটি ১৮ শতাংশ। অন্যদিকে উৎপাদনের পরিমাণ ১৯৫০/৫১তে ৫ কোটি টন ১৯৬০/৬১তে ৭ কোটি ৭৫ লক্ষ টন দাঁড়িয়েছে। এখানে বৃদ্ধির পরিমাণ ৫০ শতাংশের বেশি। এই অগ্রগতি স্বাধীন ভারতে কৃষকের অধিক ফলন মানসিকতার অগ্রগতি প্রচেষ্টার নয়।

সরকারের প্রচেষ্টা বলা যেত যদি আজ সারা ভারতবর্ষে কৃষিক্ষেত্রে ধমনীর মত বইত খাল, সার তৈরি হোত প্রয়োজন মাফিক—চাষের কাজে বিদ্যুৎকে শ্রমিকের পর্যায়ে কাজে লাগানো যেত। ভারতবর্ষের বহু ঢক্কানিনাদিত সেচখাল অতি সামান্য। মোট সেচপ্রাপ্ত জমির মধ্যে মাত্র ⅓ ভাগ পায় খালের জল অন্যান্য ⅔ অংশে এখনও অন্য উপায়ে সেচ চালাতে হয়। নীচের সংখ্যাতত্ত্ব দেখলেই তা বোঝা যাবে।

সেচপ্রাপ্ত সমস্ত জমিকে ১০০ ধরে—

খালের সেচ	৩২'৩১
পুকুরের ,,	১৪'৫৭
কূপের ,,	৩২'৮৬
অন্যান্য উপায়ে	১৫'৬৫
অস্থায়ী জলাশয় হোতে—	০'৬১
	১০০

কৃষিতে "এন পি কে" বা রাসায়নিক সারের ব্যবহার কৃষক বাড়াতে চাইলেও সে চাহিদা পূরণ করা যায় নি, যদিও ব্যবহার অনেক বেড়েছে।

	১৯৬০-৬১তে ব্যবহৃত সারের পরিমাণ	১৯৬৩-৬৪তে ব্যবহৃত সারের পরিমাণ	শতাংশ বৃদ্ধি
এন,	২৩১'৮ হাজার মেট্রিকটন	৪৩৯'৯ হাজার মেট্রিকটন	৮৯'৮
পি,	২০৫ ৫৩'৮ ,, ,,	১৩০'৬ ,, ,,	১৪২'৭
কে,	২০ ২৯'৬ ,, ,,	৫৬'৫ ,, ,,	৯১'০

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য এই সারের অনেকখানিই আমদানী যে জন্য বিদেশী মুদ্রার অভাবে চাহিদা পূরণ করা যায় নি। চাহিদা অনুযায়ী সরবরাহ ঘটাতে পারলে প্রতিটি ক্ষেত্রেই শতাংশ বৃদ্ধি ঘটতে পারতো ৪০০ থেকে ৫০০ পর্যন্ত।

তৃতীয় পরিকল্পনাতেও দেখা যাচ্ছে যে শতকরা ৮০ ভাগ মাত্র শুধু নাইট্রোজেনসে সার উৎপাদন করা গেছে আসল লক্ষ্যমাত্রার তুলনায়। যেখানে ২৯·৪৭ মিলিয়ন একরে সেচের জল পৌঁছানর কথা ছিল সেখানে পৌঁছাবে মাত্র ২৩·১৬ মিলিয়ন একরে। কোন পরিকল্পনাতেই সরকার লক্ষ্যমাত্রায় পৌঁছুতে পারেন নি। চারিদিকেই শুধু অপূর্ণতার গ্লানি।

স্বাধীনতার পূর্ববর্তী যুগে চাষে উৎপাদনের পরিমাণ স্বাধীনতার পরবর্তী যুগে উপযুক্ত কৃষকের হাতে বেড়েছে দেড়গুণ থেকে দু'গুণ পর্যন্ত সেখানে ভারতের কৃষিতে সামগ্রিকভাবে ঐ উন্নতি ঘটাতে পারলে ১৯৬৭তেই প্রায় ১৩ কোটি টন খাদ্য উৎপন্ন করান যায়। যদিও উন্নতির ধূয়া তুলে টাকা খরচ করা হোয়েছে। কিন্তু কৃষি জন্য বরাদ্দ টাকা বণ্টন ব্যবস্থা ও অদূরদর্শিতার ফলে অনুৎপাদক কাজে ব্যবহার হোয়েছে।

প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায়
কৃষি ও কম্যুনিটি ডেভেলপমেণ্টের খাতে—

প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় কৃষি ও কম্যুনিটি ডেভেলপমেণ্টের খাতে—	৫৪৯'০	কোটি টাকা
দ্বিতীয় পরিকল্পনায় ঐ খাতে—	৮৩৫'০	,, ,,
তৃতীয় ,, ,,	১০৬৮'০	,, ,,
	২৪৫২'০	,, ,,
সেচের জন্য—		
১ম পরিকল্পনায়	১৯৭'৫	,, ,,
২য় ,, সেচ ও বিদ্যুৎ খাতের ৫০% সেচ বাবদ ধরলে	৪৪১'৫	,, ,,
৩য় ,, ,, ,, ,,	৬৫০'০	,, ,,
মোট	৩৭৪১'০	,, ,,

ভারতবর্ষের সামগ্রিক কৃষি উৎপাদনের ক্ষেত্রে এমনিতেই এই টাকা অত্যন্ত অপ্রতুলতার আবার এই টাকা খরচ হোয়েছে অকৃষক বা কৃষিতে অনভিজ্ঞ, কৃষিকে অবহেলাকারী আমলাতন্ত্রের হাত দিয়ে। সেই টাকা কৃষির জমিতে পৌঁছায় নি। মাঝপথেই অদৃশ্য হোয়েছে।

তার উপর জমির মালিকানার প্রশ্নে ভারত সরকার স্বাধীনতা উত্তর যুগে কোন নূতন পদক্ষেপ ঘটাতে পারেন নি। যদিও প্রায় এক যুগ আগে ভারতবর্ষে ভূমি সংস্কার আইনের চূণকাম বুলিয়ে ভূম্যধিকারী ফিউডাল প্রথার কায়েমী ইমারতের ভোল বদলানর ভেল্কি দেখানো হোয়েছে। তবুও মালিকানায় আজও প্রাক স্বাধীনতাকালীন ফিউডালদেরই বেনামী আধিপত্য। কোটি কোটি চাষী এখনও ভূমিহীন তাই স্বতই কৃষির উন্নতিতে অনাগ্রহী। সরকারী খামারের পরিকল্পনা যা বলা হোয়েছিল ১৯৫৯ সালের নেহেরুর উদ্যোগের স্পেশাল কমিটিতে তার কটি এ পর্যন্ত তৈরি হোয়েছে! সরকার যুক্তি দেন যে এ ধরণের বড় খামারে সরকারী টাকার লোকসান হয়। অথচ রাজস্থানের সুরতগড় খামারের আয়ব্যয় লক্ষ্য করলেই দেখা যাবে এ লোকসানের অজুহাত শুধু দায়িত্ব এড়ানর জন্য। ১৯৬২/৬৩ সালে সুরতগড় খামার থেকে নিট মুনাফা হোয়েছে ১২ লক্ষ ৬৫ হাজার। তবু সরকার খামারের দায়িত্ব নেবে না। এই প্রসঙ্গে বহু বিলম্বিত সুন্দরবন প্রকল্পের কথা উল্লেখ্য। ১৯৫৬ সালেই সোভিয়েট-এর কাছ থেকে প্রস্তাব আসে সুন্দরবন উন্নয়ন প্রকল্পের জন্য। কিন্তু সেই প্রস্তাব চুক্তিতে পরিণত হয় ১৯৬৪ সালের ৭ই জুন। প্রস্তাব ও চুক্তির মধ্যে দীর্ঘ আট বছরের বিলম্বিত প্রতীক্ষা। রাজস্থানের সুরতগড়ের মতই একটি সরকারী খামারের জন্য চুক্তি হোয়েছে দুই দেশের মধ্যে। ঠিক হোয়েছে ২৯ হাজার ৬৪০ একর জমি নিয়ে যে সরকারী খামার তৈরি হবে তাতে আধুনিক পদ্ধতিতে চাষের জন্য যে সব যন্ত্রপাতি লাগবে তা সবই আসবে সোভিয়েট সরকারের দান হিসাবে। এই চুক্তি রূপায়িত হোতে কত বছর লাগবে কে জানে। কারণ সুন্দরবনকে মেছোঘেরী হিসাবে রাখাই কায়েমী স্বার্থের পক্ষে লাভজনক। এবং এই কায়েমী স্বার্থের প্রতিনিধিরা রাজ্যের বিধানসভায়, ভারতের লোকসভায় সগৌরবে অধিষ্ঠিত থেকে ক্রমাগত বাধা দিয়ে চলেছেন। নেহেরু ভারতকে খাদ্য স্বয়ম্ভর করার কথা ভেবেছিলেন অনেকবার। তিনি ভেবেছিলেন যে,

ফাগুন ফোটে ঝড়ে, দুর্গাপুরে

আবুলকাশেম রহিমউদ্দীন

কালো ত্বকের অন্তরালে আগুন,
আগুন ছিল অভয় দেহজুড়ে,
সে-আগুনেই ফাগুন ফোটে ফাগুন
ফাগুন ফোটে ঝড়ে দুর্গাপুরে!
এবং সেই ফাগুনে ফুলদল
নানা পথের বাহুতে প্রান্তরে
রক্তমুখ প্রচন্ড উজ্জ্বল
অনুরাগের বৃন্তে তুলে ধরে!
রঙে এবং রক্তে মধুমাসে
ইস্পাতের জঙ্ঘা তোলে ঢেউ,
হামুখ ঘরে কেউ
নীরব নয় শপ্ত কারাবাসে।

দুর্গাপুরে ফাগুন ফোটে ফাগুন,
শহরে তারই সৌরভের দোলা,
ফুটপাথের পাথরে-পায়ে আগুন—
সে-আগুনেই জ্বলছে তালতলা!
স্বয়ং দেশ আশিস-জব্বার
অথবা তারা দেশের বরাভয়,
হাসি তাদের কাটে অন্ধকার,
কারণ তারা বসন্তেরই জয়!
সারাদেশের উজ্জীবন তাই
পথে পায়ের হাতুড়ি ঠুকে ঠুকে
কী উদ্ধত বুকে
একই ডাকের শিখরে খোঁজে ঠাঁই।

জননী তুমি মধুর হেসে এবার
রাখো চরণ যমের কালো বুকে,
দাও গো আরও, যা আছে আজ দেবার,
জননী তুমি দাঁড়াও হাসিমুখে।
যৌবনের জয়ধ্বনি আসে
অকাল মেঘে বজ্রে সাধা গলা,
ফুলের মুখে গানের কলি ভাসে—
গানে গানেই মুখর তালতলা!
ভেবো না দিন মলিন দুর্দিনে,
এ-দুর্দিনে তোমারই মহাদান
অমৃত সন্তান
সবার ঘরে স্বর্গ দেবে কিনে॥

ভারতবর্ষে অন্তত একশটি সরকারী খামার যদি প্রতিষ্ঠা করা যায় ৩০ থেকে ৪০ লক্ষ একর জমি নিয়ে তাহলে ভারতকে স্বয়ম্ভরতার পথে অনেকখানি এগিয়ে নিয়ে যাওয়া যাবে। কিন্তু তা হয় নি।

ভারতের কৃষি গবেষণা অনুন্নত শ্রেণীর নয়। সরকার কৃষি গবেষণার জন্য কৃষিবিজ্ঞানী রেখেছেন—কোটি কোটি টাকা ব্যয়ে তাঁদের গবেষণা কেন্দ্র পোষণ হোচ্ছে। কিন্তু গবেষণালব্ধ ফল জমিতে কাজে লাগান যাচ্ছে না—ভারতীয় কৃষির সেইটিই সব থেকে বড় ট্র্যাজিডি। এ পর্যন্ত যে গবেষণা হোয়েছে শুধু সেইটুকুই যদি কৃষিতে প্রয়োগ করা যায় তাহলেই ভারতের কৃষিপণ্য উৎপাদনের পরিমাণ দ্বিগুণ হোয়ে যাবে এ কথাটি নিজের চাষের অভিজ্ঞতা থেকে নিঃসন্দেহে লিখতে পারি। ১৯৬৫ সালে যিনি কৃষিপন্ডিত হোয়ে রাষ্ট্রপতির পুরষ্কার পেয়েছেন যার ফলন বিঘা প্রতি প্রায় ৩২ মণ ২৮ সেন তিনি যে পদ্ধতিতে চাষ কোরেছেন (তার বিস্মৃত দৈনন্দিন তথ্য আমার সংগ্রহে আছে) তা এমন কিছু রাশিয়ান, আমেরিকান বা জাপানী মার্কা নয়। সাধারণ লাঙল, একটু ভালজাতের বীজ, যথাযথ সারপ্রয়োগ ও সময় মত জলের সরবরাহ কৃষির যে মৌল উপাদান প্রাগৈতিহাসিক যুগ থেকেই স্বীকৃত তাই দিয়েই তিনি কৃষি জমিতে বিপ্লব ঘটিয়ে দিয়েছেন। সাধারণভাবে তাঁর অর্ধেক, কিংবা একতৃতীয়াংশ ফলনও যদি সব ক্ষেতে সম্ভব হয়, তাহলেই ভারতের খাদ্যসমস্যা বহুদিনের মত মিটবে। চাই কি আমরা খাদ্য রপ্তানী করতেও সক্ষম হবো।

আরও, ভারতে কৃষিপণ্যের বাজার—সরকারীবাজার অকৃষক, অদরদী ব্যক্তিদের হাতে পড়ে যেভাবে মার খেতে সুরু হোয়েছে তাতে কৃষি সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল মহল অত্যন্ত আশঙ্কিত হোয়ে পড়েছেন। কৃষিতে সম্পূর্ণ মূলধন সরকারের পক্ষে সরবরাহ করা ভারতবর্ষে এখনও বহুদিন সম্ভব হবে না। তার বিকল্প হিসাবে কৃষকের অর্থনীতি শক্ত ও মজবুত কোরতে হবে কৃষিপণ্য বিক্রয়ের মূল্য লাভজনক হারে নির্ধারণ কোরে। উৎপাদন খরচের সমান সমান কিংবা তার থেকে সামান্য একটু বেশি কোরে কৃষিপণ্যের বিক্রয় মূল্য ধার্য কোরে জোর কোরে লেভীর নাম কোরে কৃষিপণ্য লুঠ কোরলে কৃষকও জমিতে উন্নত কৃষির জন্য অনাগ্রহী হোয়ে পড়বে—কৃষিতে মূলধন যোগান দিতে পারবে না। ভারতবর্ষের কৃষি বন্ধ্যা হোয়ে যাবে। চিরকাল ভারতবর্ষকে বিদেশের গমের মুখ চেয়ে কাল কাটাতে হবে।

বিদেশী যান্ত্রিক প্রথায় ভারতের কৃষির জন্য ভারতের নেতাদের আগ্রহের যেন কিছু বাড়াবাড়ি আছে। যান্ত্রিক চাষের মর্যাদা ভারতীয়রাও বোঝে। সেই "বোঝা"টাকে কাজে লাগানর জন্য চাই যন্ত্রের know-how নয়—যন্ত্র। সেটিকে তৈরি করলেই তো কাজ মেটে।

তা ছাড়া ভারতের কৃষিক্ষেত্রের পরিচালনা ব্যাপারে রাজনৈতিক এলার্জিও কাজ করে। সাজসরঞ্জাম সংগ্রহের ক্ষেত্রে এই রাজনীতি কাজ করেছে, খামার প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে করেছে, সমবায় প্রসারের ক্ষেত্রে করেছে—এমন কি সেচখাল খননের ক্ষেত্রেও চলেছে। প্রথম তিনটি পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় কৃষি ও কৃষিভিত্তিক শিল্পগুলিকে যে জন্য অগ্রাধিকার দেওয়া হয় নি। এই প্রসঙ্গে "লউ রয়েড অর" যিনি রাষ্ট্রপুঞ্জের কৃষি ও খাদ্য সংস্থার এককালে কর্মকর্তা ছিলেন। তাঁর মন্তব্য হোল—ভারতে কৃষির উন্নতির জন্য দরকার ছিল "Less political idealism and more business realism."

ভারত কৃষিপ্রধান—কৃষিতেই তার উন্নতির মূলমন্ত্র এই সহজ সত্যটি ভারত সরকার দীর্ঘদিন অবজ্ঞা কোরেছেন, তাই স্বাধীনতার উনিশ বছর পরে কৃষিতে উল্লেখযোগ্য উন্নতি না হওয়ায় আজ ক্ষোভ প্রকাশ কোরতে হোচ্ছে "কি ফল লভিনু হায়!" কিন্তু তবু এই নিবন্ধের লেখক নিরাশার রোগী নয়। এখনও অনেক আশা আছে। এখনও সময় আছে। একটু দরদ, একটু বাস্তবতা, একটু কম রাজনীতি, এই নিয়ে ভারত সরকার চাষের ব্যাপারে কোমর বাঁধলে ভারতের ভিখারিণী ছবি আমরা ছিঁড়ে ফেলে দিয়ে আবার রাজরাণীর ছবি প্রতিষ্ঠা করতে পারবো।

সেকাল ও একাল

লীলা মজুমদার

শেষ পর্যন্ত রান্নাঘরটাকেও তুলে দিয়েছি। মনীষীরা বলেন, বুদ্ধিমান লোকে সর্বদা কালের চাকার সঙ্গে তাল ঠুকে চলে; আমিও তাই করতে চেষ্টা করি। এই নতুন ব্যবস্থায় অনেকখানি অর্থের আনুকূল্য হবে। কে না জানে যে সভ্যতা ও স্বাধীনতার ক্রম-উন্নয়নের সঙ্গে সঙ্গে আমাদের বহুবিধ সুখ-সুবিধার ব্যবস্থা হয়েছে. বায়ু নিয়ন্ত্রণ, বিজলি-রেল, বেতার-দর্শন ইত্যাদি, হয় নি শুধু গ্রাসাচ্ছাদনের বন্দোবস্ত। আমি এবার সেইটেও করে ফেলার তালে আছি। এ কথা শুনে সহসা উৎফুল্ল হয়ে উঠে যেন আবার দাক্ষিণাত্য ভ্রমণের টিকিট কেটে বসবেন না, কারণ আমি শুধু নিজের—বড় জোর নিজের পরিবারের গ্রাসাচ্ছাদনের কথা বলছিলাম। তবে এই একই উপায়ে আপনারাও যদি যে যারটা গুছিয়ে নেন, আমার বিন্দুমাত্র আপত্তি নেই, এ কথা বলা বাহুল্য।

ভাঁড়ার ঘরটিকে আগেই বাতিল করেছি। কোনো রকম অপব্যয় আজকাল আমার অসহ্য; সেকালে অবিশ্যি অন্য রকম ছিলাম, তখন আমার আলাদা আলাদা বসার, খাওয়ার ও পড়ার ঘর ছিল এবং মাঝে মাঝে অ-নিমন্ত্রিত বন্ধু-বান্ধব ও আত্মীয়স্বজন সপরিবারে শেষোক্ত ঘরটিতে আট-দশ দিন কিম্বা দু-তিন মাসও কাটিয়ে যেত। তাতে আমরা এতটুকু বিরক্ত হতাম না। এ-ভাবে কত বর্গ গজ ও চালের মাপ নষ্ট করেছি তার ইয়ত্তা নেই।

সে যাই হোক গে, কয়েক মাস হল ভাঁড়ার ঘরটাকে তুলে দিয়েছি। ভাঁড়ার নেই যখন, তখন মিছিমিছি একটা ঘর নষ্ট করা কেন; কে কাকে আজকাল অত ঘর দিচ্ছে! ঘরটাকে নিয়ে কি করব ভাবছিলাম; জানলা না থাকাতে দিব্যি অন্ধকার ঘরটা, উঁচুতে অবিশ্যি স্কাইলাইট আছে, তাতে জাল লাগানো; ইঁদুর বা বেড়াল বা পাখি ঢুকতে পারে না, কিন্তু প্রচুর হাওয়া ঢোকে। সেকালে হলে একটা ক্যামেরা ও ফটো ডেভেলপ করার সরঞ্জাম কিনে ফেলে. এখানে খাসা একটা ডার্করুম করে ফেলতাম। তার পর ম্যানুয়েল দেখে ফটো তোলাটি রপ্ত করে নিয়ে, বিনি পয়সায় সকলের চমৎকার চমৎকার ছবি তুলে, যারা আমাকে হিংসে করে তাদের চোখ ট্যারা করে দিতাম।

এখন তো আর তা হবার জো নেই, প্রথমত ক্যামেরাই পাওয়া যায় না; আর যদি বা তা যায় তো ফিল্ম পাওয়া যায় না; তা ছাড়া সত্যি কথা বলতে কি ম্যানুয়েল পড়ে ছবি তোলা শেখার আমার সময়ও নেই এবং ম্যানুয়েলের খটমট ভাষার মানেও অনেক জায়গায় বোঝা যায় না, তা ছাড়া আমার প্রিয় ফটো-বিশারদ দাদা পরিমল গোস্বামীর কাছে সে কথা স্বীকার করতেও লজ্জা পাই। উপরন্তু রান্নাঘরটাই যখন তুলে দিচ্ছি, তখন ভাঁড়ার ঘরে ডার্করুম করলে রান্না কোথায় হবে শুনি?

শুনেছি শীঘ্রই এমন দিন আসবে যখন একটা বড়ি গিলে ফেললেই খিদে মিটে যাবে। তাতে রান্না করার দরকার না থাকলেও, আমি কিন্তু একটুও খুশি হব না। তাছাড়া তাতে দেশের জিনিসের অপচয় হবার সম্ভাবনা বাড়বে। অত ভালো ভালো পুঁই ডগা, সজনে ডাঁটা, মুখি কচু, কুঁচো চিংড়ি দিয়ে তখন হবেটা কি? তাছাড়া এসব বিহনে বেঁচে থেকেই বা কি হবে?

আমার ব্যবস্থা আপনাদের পছন্দ না হলেও যে সেটা মেনে নিতেই হবে এমন কোনো বাধ্যবাধকতা নেই, আপনাদের যা ইচ্ছে তাই করতে পারেন। আর তাই যদি বলেন, আমার ইচ্ছে মতন পৃথিবীর কোন ব্যবস্থাটাই হচ্ছে আজকাল? ওসব যেতে দিন। আমার কথা মতো সবাই চলবেন এতটা আমি আশাও করি না; আপনাদের কপালে যা আছে তাই হবে, আমি কিছু বলতেও যাব না।

যাই হোক, আমার ভাঁড়ার ঘরে একটা বিজলি উনুন থাকবে; আজকাল আমি রন্ধন-প্রণালীর যে নতুন পরিকল্পনা করেছি, তাতে দু ঘণ্টার মধ্যে বাড়ির সকলের সারা দিনের রান্না হয়ে যাবে। অথচ সেকালে আমাদের বাড়িতে যারা রাঁধাবাড়া করত, তাদের রান্নাঘরের বাইরে বড় একটা দেখা যেত না। এখন আর তার উপায় থাকবে না। বাড়িতে দু-একজন লোক খেটেখুটে পয়সা কামাবে, তারাই কাজকর্ম করার জন্য মাইনে দিয়ে চাকরবাকর রাখবে আর বাকি সবাই খাবে দাবে নবেল পড়বে, এ হবার এখন আর জো নেই। কারণ বেলা সাড় দশটা থেকে সাড়ে চারটে অবধি ওখানে আমাদের হাঁড়ি-চিত্র সমবায়ের কারখানা বসবে। জানেন তো আজকাল কোনো কিছু ফেলে দিতে হয় না। সেকালে শুনেছি আমার খুড়শ্বশুরের দোতলার নিরামিষ রান্নাঘরের জানলা দিয়ে বছরের পর বছর এত মাটির খুরি, সরা, হাঁড়ি,

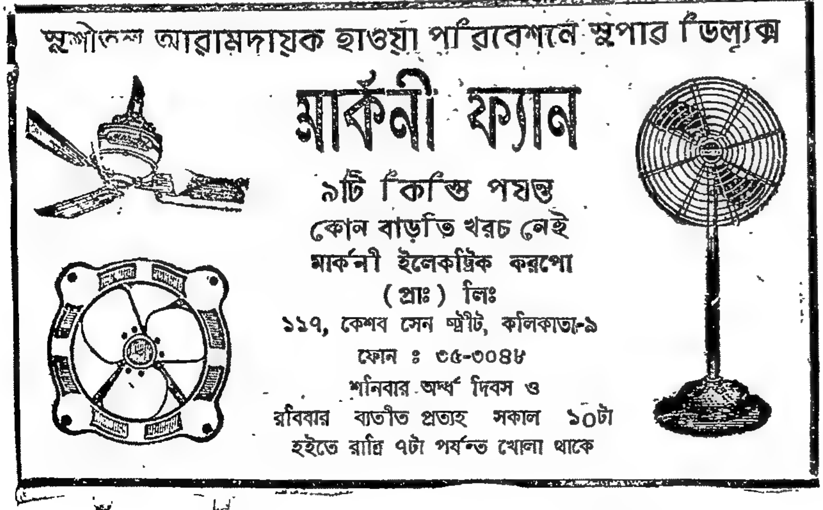

পাশের পোড়ো জমিতে ফেলা হত যে দশ বছর আগে যখন পাশের জমির মালিক ছোট পুকুরটা বোজালেন, এক পয়সা খরচ হল না। খুড়োদের ফেলা মাটির বাসন দিয়েই পুকুর এ'টে বুজে তো গেলই, উপরন্তু ওঁদের জমি খুড়োর জমির চেয়ে ছয় ইঞ্চি উ'চু হয়ে গেল এবং এখন বেশি বৃষ্টি হলেই ওঁদের নালা-নর্দমার জল তাদের প্রণালী উপচে খুড়োর বাড়িতে জমা হয়।

আমি ব্যবস্থা করেছি যাতে প্রত্যেকটি খুরি, সরা, হাঁড়ি, জালা—এমন কি তাতে ছোটখাটো ফুটো থাকলেও ক্ষতি নেই—সবটাতে দিব্যি করে প্রলেপ লাগিয়ে, তার ওপর খাসা রং দিয়ে নক্সা করা হবে। এগুলো এই শহরের একটা নামকরা দোকান পাইকিরি দরে, নিজেদের টেম্পো পাঠিয়ে প্রতি সপ্তাহে কিনে নেবে। এতে শুধু যে পয়সার সাশ্রয় হবে তা নয়, কুটির-শিল্পের উন্নয়ন, বেকার ব্যক্তির চাকরি পাওন—দুজন কারিগর মাস মাইনেতে না খাটলে ব্যবসা লাটে উঠবে—পারিবারিক কু'ড়েদের চরিত্র সংস্করণ ও অযাচিত অতিথি নিবারণ, সবই হবে। সেকালে যে এটা সম্ভব হত না সে বিষয়ে আশা করি কারো মনে কোনো সন্দেহ নেই।

রান্নাঘরটাকে ভাবছি সাংসারিক জীবনের উন্নয়নকল্পে লাগাব। অর্থাৎ মেয়েদের সাংসারিক জীবনের, কারণ পুরুষরা তো বহুদিন ধরেই নিজেদের উন্নয়নকল্প করেছেন। আপনারা কি কখনো ভেবেছেন যে বর্তমান সমাজ-ব্যবস্থায় যে জিনিসটার সব চাইতে বড় অভাব, সেটি হল বিবাহিত মেয়েদের রাগ ঝাড়বার একটা নিরাপদ জায়গা? সেকালে এত অসুবিধা ছিল না; বেশি রাগ হলে দুমদুম করে বাপের বাড়িতে চলে যাওয়া যেত। এখন সেখানে ফালতু জায়গা তো নেই-ই, বরং মেজদার ছেলেরা বাইরের ঘরের তক্তাপোসে রাতে শোয়, এবং সেইজন্যই কোচকেদারা বিদেয় করে ওঁরা যে স্বদেশী শিল্পানুরাগী হয়েছেন এটা আমার দৃঢ় বিশ্বাস। উপরন্তু রেশন কার্ডের অসুবিধা আছে; তা ছাড়া আগে যেমন রেগেমেগে বাপের বাড়ি গেলে, দু-চারজন জা ননদ ও বিধবা পিসি-শাশুড়ি অমনি এসে ঠেলা সামলাতেন এখন তার উপায় নেই। জা'রা যে যার নিজের সংসার আগলাচ্ছেন, ননদ হয়তো বিলেত গেছেন মণ্টেসরি পড়তে এবং পিসিমা যদিও ম্যাট্রিক পাশও নন, তবু তিনি সেণ্ট্রাল ক্যান্টিনের সুপারিন্টেন্ডেন্ট, সাড়ে তিন শো মাইনে, ফ্রি রেশন, ফ্রি কোয়ার্টার। বিবাহিত মেয়েদের রাগ-মাগ করার যথেষ্ট কারণ আছে। রান্নাঘরকে বারোয়ারি গোঁসাঘর করলে দেশের একটা বড় অভাব দূর হবে এবং সেই ফাঁকে মাসে পঞ্চাশ পয়সা মেম্বার-শিপ করলেই ও ঘরটাকে সাজিয়ে-সুরিয়ে রং করেও নেওয়া যাবে এবং পুজোর ছুটিতে গোঁসা-পার্টির জন্য সম্ভবত বিশেষ রেল কনসেসনের ব্যবস্থা করে পুরী যাওয়াও যাবে।

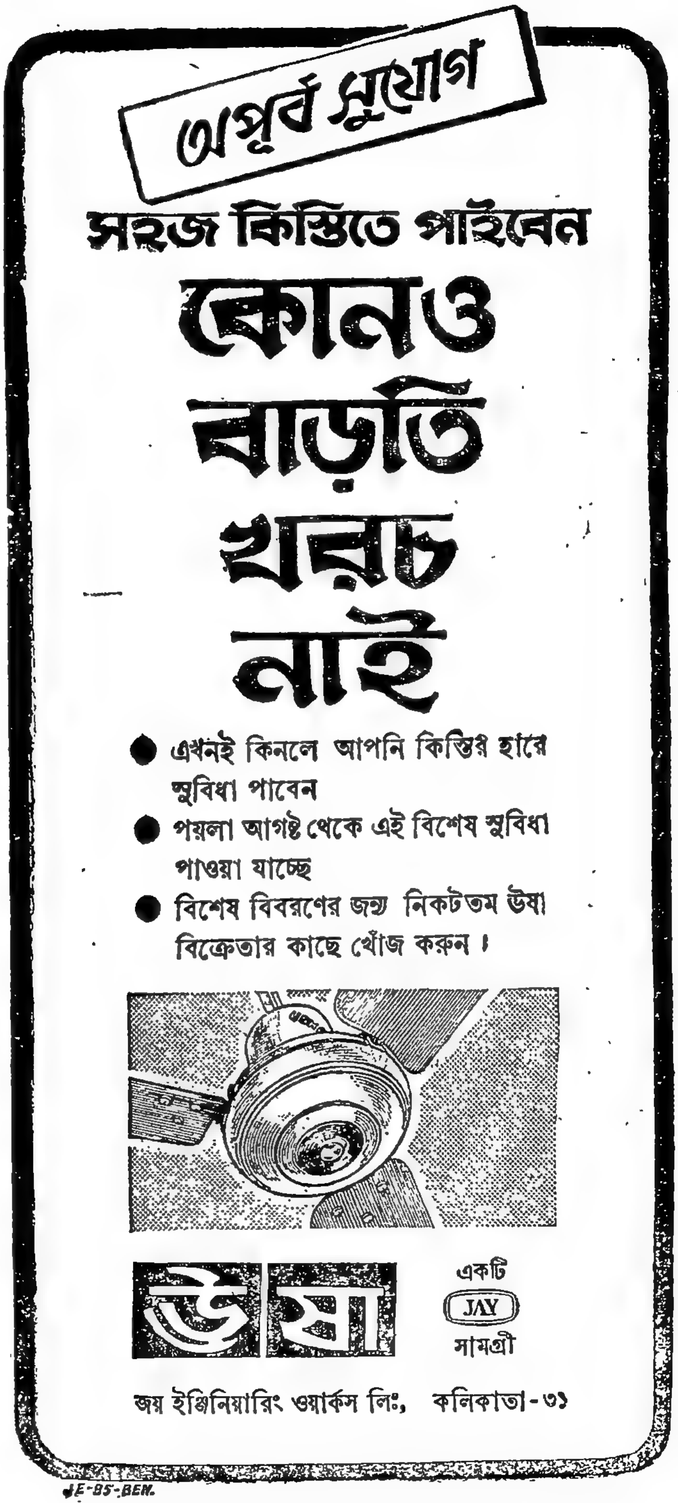

JE-85-BEN.

বর্ষশ্রী ঃ ১৯৬৬

জল দাও ঠাকুর
সেচ ব্যবস্থা
অধিক খাদ্য ফলাও
পি-এল ৪৮০
খাদ্য পরিকল্পনা
হিন্দী না আংরেজী
জাতীয় সংহতি
হুঁশিয়ারী
হুঁশিয়ারী
মূল্যবৃদ্ধি রোধ
সমাজতন্ত্র
সমাজতন্ত্র
বার্ষিক অধিবেশন
ত্যাগ করুন
জনসংযোগ

স্বাধীন ভারতে নদ-নদী পরিকল্পনা

কপিল ভট্টাচার্য

প্রধানত সেচকার্যের জন্যে নদ-নদীতে আড়াআড়ি বাঁধ নির্মাণ অতি প্রাচীনকাল থেকেই পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে প্রচলিত হয়েছে। ভারতবর্ষেও এর ব্যতিক্রম হয় নি।

শস্য উৎপাদনে সহায়তার জন্যে শুধু বৃষ্টি ও তুষারপাতের উপর নির্ভর না করে বিকল্প উপায়ে সেচ-ব্যবস্থা একটি সুপ্রাচীন পদ্ধতি। ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, সেচব্যবস্থা সমন্বিত দেশে সভ্যতার অভ্যুত্থান হয়েছে; আবার সেচব্যবস্থাই অনেক সভ্যতা ধ্বংসের কারণ। প্রাচীন ব্যাবিলনীয় সভ্যতা সেচব্যবস্থার জন্যই ধ্বংস হয়েছিল। দক্ষিণ ভারতের হিন্দু রাজত্বের প্রাধান্যও নষ্ট হয়েছিল, সেচব্যবস্থায় নদ-নদীর সমুদ্র-সঙ্গমে নাব্যতা ধ্বংস হওয়ার জন্যে, সমুদ্রপথে বহির্বাণিজ্য ব্যাহত হওয়ায় আর কৃষিনির্ভর, আয়াসবিহীন সমাজব্যবস্থা গড়ে ওঠায়।

ভারতবর্ষ ও চীনের মত প্রাচীন দেশের তুলনায় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও কানাডায় সেচ প্রয়োগ ব্যবস্থা অত্যাধুনিক, এখনও পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর্যায়ে বললেই চলে। পশ্চিমবঙ্গের দামোদর, দ্বারকেশ্বর, রূপনারায়ণ প্রভৃতি নদের বন্যায় উপচানো জলের সেচব্যবস্থা চলন কয়েক শতাব্দী পূর্বেই প্রচলিত হয়েছিল। উইলকক্স প্রভৃতি পণ্ডিতগণের মতে কানা নদীগুলি ক্যানাল বা খালেরই রূপান্তরিত নাম। জলাঙ্গী, চূর্ণী প্রভৃতি নদীও বোধ হয় সেচের জন্যেই পদ্মা থেকে কাটা খাল।

ভারতের ভূভাগের আয়তন ৩২৭·৬ মিলিয়ন হেক্টার (এক হেক্টার=২·৫ একর)। এর মধ্যে ৫৬·১ মিলিয়ন হেক্টার ভূমি অরণ্য। রাস্তা, রেল, হ্রদ ও জলাশয়, শহর ও গ্রামের বসতি ৪৮·৬ মিলিয়ন হেক্টার জুড়ে রয়েছে যেখানে চাষাবাদ হতে পারে না। কিছু জমি ফলবাগান, গোচর অথবা অনুর্বর। তাই মাত্র ১৩২·৭ মিলিয়ন হেক্টার জমিতে চাষাবাদ হয়। অর্থাৎ ভারতের সমগ্র ভূভাগের কিঞ্চিদধিক এক-তৃতীয়াংশ জমিতে কৃষিকার্য করা হয়। এই ১৩২·৭ মিলিয়ন হেক্টার কৃষি-যোগ্য ভূমির মধ্যে ১১৫·৮ মিলিয়ন হেক্টার ভূমিতে খাদ্যশস্য উৎপাদিত হয় আর বাকি জমিতে পাট, তুলা, তৈল-বীজ প্রভৃতি উৎপাদিত হয়। সমগ্র কৃষিযোগ্য ভূমির মধ্যে মাত্র এখন পর্যন্ত ২০ মিলিয়ন হেক্টার জমি সেচ-ব্যবস্থার আওতায় আনা হয়েছে। সরকারের ইচ্ছা যে আগামী ১৯৬৯ গান্ধীজয়ন্তী বর্ষের মধ্যে ৪০·৫ মিলিয়ন হেক্টার জমি সেচব্যবস্থার আওতায় আনীত হোক। বর্তমানে আমাদের দেশে ৮০।৯০ মিলিয়ন টন খাদ্যশস্য উৎপাদিত হচ্ছে; ১৯৬৯ বর্ষের সেচব্যবস্থা লক্ষ্যে পৌঁছাতে পারলে, এক-তৃতীয়াংশ কৃষিজমিতে দুই ফসল উৎপাদন করতে পারলে, পর্যাপ্ত সার ব্যবহার করলে এবং প্লাবন প্রভৃতির কবল থেকে ফসল রক্ষা করতে পারলে, ওই সময়ের মধ্যে দেশে শতকরা ৩০ থেকে ৪০ ভাগ শস্য উৎপাদন বৃদ্ধি সম্ভবপর হবে।

বর্তমান খাদ্যসংকটের পরিপ্রেক্ষিতে স্বাধীন ভারতে নদ-নদী পরিকল্পনা ও সেচব্যবস্থা একটা অভিনব গুরুত্ব অর্জন করেছে। অথচ, একথা ভোলা উচিত নয় যে ভ্রান্ত নদ-নদী পরিকল্পনা ও সেচব্যবস্থার কুফল, অপর দিকে, দেশের প্রভূত ক্ষতিসাধনও করে। বিশেষত খাল মারফৎ সেচ-ব্যবস্থার সঙ্গে সঙ্গে যদি সুষ্ঠু জল-নিকাশ ব্যবস্থা না থাকে এবং নদীর জলপ্রবাহ অপহরণের পর যদি নদী-শাসন ব্যবস্থায় তার জল নিকাশ ক্ষমতা পর্যাপ্তভাবে বজায় রাখা না হয় এবং তার নাব্যতা ধ্বংস করা হয়, তা' হলে কুফলের আধিক্যই বেশি হয়। খাল মারফৎ সেচব্যবস্থার কুফলে, পাঞ্জাব ও পশ্চিম-উত্তর প্রদেশে প্রায় ১ মিলিয়ন হেক্টার জমি অনুর্বর হয়ে গিয়েছে, সুষ্ঠু জলনিকাশ ব্যবস্থার অভাবে। সেখানে ভূগর্ভস্থ জলপৃষ্ঠ উচ্চতর হয়ে, জমিকে লবণাক্ত করে ঊষর করে ফেলেছে। ভ্রান্ত দামোদর উপত্যকা পরিকল্পনার ফলে নিম্ন উপত্যকায় এক বিস্তীর্ণ ভূভাগ অনুর্বর হয়ে যাচ্ছে, বন্যার জলের অভাবে। নিম্ন হুগলী নদীর নাব্যতা ধ্বংস হয়ে গিয়েছে, কলিকাতা বন্দর ধ্বংসের পথে, হলদিয়ায় বন্দর পত্তনের পরিকল্পনা করতে হচ্ছে, শত কোটি টাকা অর্থব্যয়ে ফরাক্কা বাঁধের পরিকল্পনা কার্যকর করতে হচ্ছে (অথচ তার ফলে কেনও সুফল হবে কিনা, তাতে সন্দেহ আছে, বরং আরও কুফলের আশঙ্কাই আছে)।

ভারতবর্ষের প্রাচীন ও মুসলমান রাজত্বের আমলের নদী পরিকল্পনা প্রধানত সেচব্যবস্থার জন্যেই করা হয়েছিল। ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ ভাগে যমুনা ও গঙ্গা খাল পরিকল্পনাও উত্তর প্রদেশে সেচের কাজে ব্যবহৃত হয়েছে। কিন্তু দক্ষিণ ভারতের মহীশূর রাজ্যেই প্রথম বহুমুখী নদী পরিকল্পনা প্রবর্তিত হয়—প্রসিদ্ধ ইঞ্জিনিয়ার বিশ্বেশ্বরায়ার প্রয়াসে। সিন্ধু নদের ওপর সক্কর ব্যারেজ উইলকক্সের কীর্তি, প্রধানত তুলা চাষের ক্ষেতে জলসেচের জন্যে।

কিন্তু ভারতবর্ষ স্বাধীন হওয়ার পরে অনেক বহুমুখী নদ-নদী পরিকল্পনা রূপায়িত হয়েছে এবং রূপায়িত হতে যাচ্ছে। নিম্নের তালিকায় তাদের মধ্যে প্রধান বহুমুখী নদ-নদী পরিকল্পনাগুলির সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেওয়া হচ্ছেঃ—

(১) দামোদর উপত্যকা পরিকল্পনা। (বিহার ও পশ্চিমবঙ্গে) কোনার, তিলাইয়া, মাইথন ও পাঞ্চেতের উচ্চ বাঁধ। ২·৮ মিলিয়ন একর ফিট জলাশয়। দুর্গাপুরের আড়াআড়ি বাঁধ। ১৫৫০ মাইল খাল, তার মধ্যে দুর্গাপুরের নাব্যখাল প্রায় ৮০ মাইল। ১ মিলিয়ন একর জমি সেচের আওতায়। ১৯৩,০০০ কিলোওয়াট বিদ্যুৎসরবরাহ।

(২) হিরাকুদ (ওড়িশায়)। মহানদী জলাধার ৬৬ লক্ষ একর ফিট। ৬·৭ লক্ষ একর জমিতে জল-সেচ। ১,২৩,০০০ কিলো-ওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদন।

(৩) ভাকরা-নাঙ্গল পরিকল্পনা। (পাঞ্জাব)। শতদ্রু নদে ভাকরা বাঁধ ৭৪০ ফিট উঁচু। জলাধার ৫৬ মাইল লম্বা ও ৪ মাইল চওড়া। নাঙ্গল বাঁধ ভাকরা থেকে নদীপথে ৮ মাইল দূরে। ৯৫ ফিট উঁচু। জলাধার ২৪০০০ একর ফিট। প্রায় ৬ লক্ষ কিলোওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদন। ৩০০০ মাইল খাল-

পথ। ৩৬ লক্ষ একর জমিতে জলসেচ।

(৪) কাকরাপার। (বোম্বাই)। তাপ্তি নদীতে। ৬·৫২ লক্ষ একর জমিতে জলসেচ।

(৫) ময়ুরাক্ষী (বিহার ও পশ্চিমবঙ্গ)। বিহারে ২৫ হাজার ও পশ্চিমবঙ্গে ৭·২ লক্ষ একর জমিতে জলসেচ। ৪০০০ কিলোওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদন।

(৬) কুশী। (নেপাল ও বিহার)। প্রধানত বন্যা নিয়ন্ত্রণের জন্যে। প্রায় ১৪ লক্ষ একর জমিতে জলসেচ। ২১০০০ কিলোওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদন।

(৭) চম্বল উপত্যকা। (মধ্যপ্রদেশ)। রাজস্থানে ও মধ্যপ্রদেশে ১৪ লক্ষ একর জমিতে জলসেচ করতে চম্বলের উপনদীতে তিনটি বাঁধ ও চম্বলের উপর ব্যারেজ। ২ লক্ষ ১০ হাজার কিলোওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদন।

(৮) নাগার্জুন সাগর। (অন্ধ্রপ্রদেশ) কৃষ্ণা নদীতে। ২১ লক্ষ একর জমিতে জলসেচ। ৭৫০০০ কিলোওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদন।

(৯) তুঙ্গভদ্রা। মহীশূরে ও অন্ধ্রে ৮ লক্ষ একর জমিতে জলসেচ। ৯৯,০০০ কিলোওয়াট বিদ্যুৎ।

(১০) কোয়না। বোম্বাই-এর সাতারা জেলায় কৃষ্ণার উপনদীতে বাঁধ। ২,৪০,০০০ কিলোওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদন।

(১১) রিহান্দ। উত্তর প্রদেশের মির্জাপুর জেলায় রিহান্দ নদীতে বাঁধ। ২ লক্ষ কিলোওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদন।

(১২) সারদা পাওয়ার হাউস। উত্তরপ্রদেশে হিমালয়ে নৈনিতাল জেলায় খাতিমার কাছে। ৪১,০০০ কিলোওয়াট বিদ্যুৎ কুমায়ুন, রোহিলখন্দ ও আউধে সরবরাহ করবে।

(১৩) মাচকুন্ড। অন্ধ্র ও ওড়িশায় ১,২০,০০০ কিলোওয়াট বিদ্যুৎ সরবরাহ করবে।

(১৪) মাতাটিলা। বুন্দেলখন্দের বেতোয়া নদীতে। উত্তরপ্রদেশ ও মধ্যপ্রদেশের ৪ লক্ষ একর জমিতে জলসেচ। ১০,০০০ কিলোওয়াট বিদ্যুৎ।

(১৫) কংসাবতী। (পশ্চিমবঙ্গ)। ৮ লক্ষ একর জমিতে জলসেচ।

(১৬) জলঢাকা। উত্তরবঙ্গে প্রধানত বিদ্যুৎ উৎপাদনের জন্যে।

(১৭) শরবতী। নীলগিরি পর্বতে, শরবতী নদীতে প্রায় ১,৮০,০০০ কিলোওয়াট জলবিদ্যুৎ উৎপাদনের জন্যে।

এ ছাড়া আরও কয়েকটি পরিকল্পনা রূপায়িত হ'তে চলেছে, তার মধ্যে গন্ডক নদের পরিকল্পনা উল্লেখযোগ্য।

পানীয় জল সরবরাহ ও নিছক জলবিদ্যুৎ উৎপাদনের জন্যে পার্বত্য নদীতে বাঁধ দেওয়ার রীতি গত শতাব্দী থেকেই প্রচলিত। কিন্তু বড় বড় নদ-নদীতে বৃহদায়তন বাঁধ নির্মাণ করে তাদের জলসম্পদের বহুমুখী ব্যবহার বিংশ শতাব্দীর অবদান। সোভিয়েট দেশে বহুমুখী নদ-নদী পরিকল্পনা উন্নত ও সার্থক সমাজতান্ত্রিক জীবন গঠনে সাহায্য করতে সমর্থ হয়েছে। অবশ্য সোভিয়েট দেশের নদ-নদীর উৎস পার্বত্য-তুষারময় অঞ্চলে বৃষ্টিপাতও সারা বছর ধরে হয়, তাই প্রায় সারা বছরই নদ-নদীতে জলপ্রবাহের পরিমাণে খুব বেশি তারতম্য থাকে না। তাই, সেখানকার নদ-নদীকে শাসিত ও নিয়ন্ত্রিত করে সুফল আদায় করা যতটা সহজসাধ্য হয়েছে, ভারতবর্ষে. বিশেষত উত্তর ভারতে তেমন নয়। যদিও গলিত তুষার সিন্ধু-গঙ্গার ও তাদের বহু উপনদীর কিছুটা জল সরবরাহ করে, কিন্তু বর্ষার ৩।৪ মাসই এদেশের নদ-নদীর জলপ্রবাহে বন্যা নামে। অপর সময়ে তারা হয় শুষ্ক না হয় ক্ষীণপ্রবাহ। এই সব নদ-নদীর বন্যা নিরোধকল্পে বাঁধ দিলে. নিম্নাংশের জলপ্রবাহ অপহরণ করা হয়। ফলে নিম্নাংশ মজে যায়। নিম্ন উপত্যকায় অকস্মাৎ অত্যধিক বারিপাত হ'লে, ওই মজা নদ-নদী আর সেই বৃষ্টির জল ত্বরিতে নিকাশ করতে পারে না। ফলে প্লাবনের প্রবলতা বৃদ্ধি পায়। দামোদর উপত্যকা **পরিকল্পনার পরের ১৯৫৬ ও ১৯৫৯-এর প্লাবনের প্রবলতা এই কারণেই দেখা গিয়েছিল। ভবিষ্যতের প্লাবন নিম্নবঙ্গে আরও প্রবলভাবে দেখা দেবার আশঙ্কা রয়েছে।**

গঙ্গা ও তার উপনদীগুলির পরিকল্পনা, মূল গঙ্গার জলপ্রবাহ অপহরণ করে গঙ্গাকে মজিয়ে দিচ্ছে। ফলে গঙ্গার নাব্যতা ধ্বংস হ'য়ে যাচ্ছে। গঙ্গায় প্লাবন প্রবণতা বৃদ্ধি পাচ্ছে, বিশেষত বিহারে। গঙ্গার গর্ভে পোস্তা গেঁথে সেতু নির্মাণ করার ফলেও গঙ্গার জলপ্রবাহ ব্যাহত হচ্ছে। **ফরাক্কা বাঁধ নির্মিত হয়ে গেলে বিহারে প্রতি বৎসরই ভয়ঙ্কর প্লাবনের সম্ভাবনা আমাদের আশঙ্কিত করে। অথচ ফরাক্কা বাঁধ নির্মাণ করে হুগলী নদীর যে উন্নয়নের আশা পোষণ করা হচ্ছে, তাও বৈজ্ঞানিক যুক্তিসঙ্গত নয়। বহু স্থানে বহুবার আমরা সে কথার উল্লেখ করেছি। যে মে-জুন মাসে কলিকাতার কাছে হুগলী নদীর জল জোয়ারের জলের প্রভাবে অত্যধিক লবণাক্ত হয়ে যায়, সেই মে-জুন মাসে মূল গঙ্গায় অতি ক্ষীণ জলধারা। সুতরাং ফরাক্কা-পরিকল্পনার সাহায্যে সে-সময়ে হুগলী নদীতে কিছুই গঙ্গা-জল আনা যাবে না বলেই আমাদের আশঙ্কা।**

বহুমুখী নদী পরিকল্পনা ত্রুটিহীনভাবে রূপায়িত না হলে তার কুফল অবশ্যম্ভাবী। ভাকরা-নাঙ্গল পরিকল্পনায় খালের জলের ফলে মরুময় রাজস্থানে যেমন একদিকে সেচব্যবস্থায় ফসল উৎপাদন সম্ভব হচ্ছে, অপরদিকে সুষ্ঠু জলনিকাশী ব্যবস্থার অভাবে, সেই মরুভূমিতেই আবার প্লাবন দেখা দিচ্ছে।

ত্রুটিপূর্ণ দামোদর উপত্যকা **পরিকল্পনায় সুফলের চেয়ে কুফলেরই আধিক্য। কিছু কিছু শিল্পায়নের সম্ভাবনায় সাহায্য করলেও, সেচকার্যে ও প্লাবন প্রতিরোধে যে বর্তমান দামোদর পরিকল্পনা ব্যর্থ হয়েছে, সে কথা আজ আর গোপন নেই। ফলে পশ্চিমবঙ্গে কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি না হয়ে, কমে গিয়েছে। পশ্চিমবঙ্গ চির দুর্ভিক্ষ রাজ্যে পরিণত হয়েছে।**

পনেরো বছর আগেই আমরা যখন বোঝাতে **চেষ্টা করি যে এই ত্রুটিপূর্ণ দামোদর উপত্যকা পরিকল্পনার ফলে কলিকাতা বন্দরে সমুদ্রগামী জাহাজ আনা যাবে না, তখন কর্তৃপক্ষ আমাদের কথায় কর্ণপাত করেন নি। নিম্ন-হুগলী (ডায়মন্ডহারবার থেকে সাগরদ্বীপ) যে দামোদর-রূপনারায়ণেরই নিম্নাংশ, এবং বন্যা নিরোধ করলে এই নিম্নাংশ ধ্বংস হয়ে যাবে—যদি না বিকল্প পদ্ধতি অবলম্বিত হয়। সেই বিকল্প পদ্ধতির ইঙ্গিতও আমরা যথাসাধ্য কর্তৃপক্ষের সমক্ষে উপস্থিত করেছি। কিন্তু তাঁরা ভুলের পর ভুলই করে চলেছেন। কলিকাতা বন্দর রক্ষার সুষ্ঠু ব্যবস্থার পদ্ধতি অবলম্বন না করে তাঁরা ফরাক্কা পরিকল্পনার মরীচিকায় হাত দিয়েছেন।**

স্বাধীনতা লাভের পর ভারতের শিক্ষা ব্যবস্থা-তার উৎকর্ষ অপকর্ষ

রাজকুমার চক্রবর্তী

পরীক্ষা-নিরীক্ষার যুগ

ইংরাজ ভারতে ছিল শাসন ও শোষণ করবার জন্য—ভারতে জ্ঞান-বিজ্ঞান বিস্তার তাদের উদ্দেশ্য ছিল না। সুতরাং কতকগুলি ইংরাজীজানা কেরানী সৃষ্টিই ছিল তাদের মুখ্য উদ্দেশ্য, যারা ইংরাজের শাসনকার্যে সাহায্য করতে পারত। সুতরাং স্বাধীনতালাভের পর শিক্ষার নানা দিকে শিক্ষাবিৎ ভারতবাসীর দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়েছে। যারা এ যাবৎ শিক্ষার কোন আলো পায় নি, তাদের শিক্ষার বন্দোবস্ত করাও জাতীয় সরকারের লক্ষ্য হয়েছে। এ কাজে সরকার কতটা সফল হয়েছেন, তাতে সন্দেহের অবকাশ আছে। কিন্তু সরকার বহুব্যয়ে কতকগুলি কমিশন নিযুক্ত করে শিক্ষার গতি ও প্রগতি নির্ধারণ করতে চেষ্টা করেছেন। এ প্রসঙ্গে রাধাকৃষ্ণ কমিশন (১৯৪৮), মুদালিয়র কমিশন (১৯৫২), দে কমিশন (১৯৫৪) উল্লেখযোগ্য। স্বাধীনতার পর এ উনিশ বছরে শিক্ষাব্যাপারে সামান্যই করা হয়েছে; এখনও অনেক করবার আছে। সত্য বলতে গেলে, এই সময়টা সরকার পরীক্ষা-নিরীক্ষার কাজ করেছেন। এইমাত্র সর্বভারতীয় শিক্ষা কমিশনে (১৯৬৫-৬৬) দীর্ঘ রিপোর্ট ষোল লক্ষ টাকা ব্যয়ে প্রকাশিত হয়েছে। তাতেও শিক্ষার বর্তমান ও ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে বিশেষ আলোচনা ও সুপারিশ আছে। যথা, ১৯৫০-৫১ সনে ভারত সরকারের শিক্ষাব্যয় হয়েছিল ১১৪ কোটি টাকা; ১৯৬৫-৬৬ সনে তা' হয়েছে ৬০০ কোটি টাকা এবং কমিশনের সুপারিশ কার্যকরী করলে বিশ বছরে (অর্থাৎ ১৯৮৫-৮৬ সনে) ব্যয় হবে ৪০০০ কোটি টাকা। ভারত সরকার এতদিন একটা মূল কথা সম্পূর্ণ উপলব্ধি করতে পারেন নি; উক্ত কমিশনের সুপারিশগুলিই তার প্রমাণ। কথাটা এই—স্বাধীন ভারতের রূপায়ণে শিক্ষার খাতেই সর্বাধিক অর্থ ব্যয় করা উচিত। (Investment in education is the best of all investment) কারণ শিক্ষা ভিন্ন গণতন্ত্র অচল; শিক্ষা ভিন্ন কল-কারখানা বা নতুন শিল্প বাণিজ্যে কর্মী ও শ্রমিকদের কাছে সুষ্ঠু কাজ পাওয়া যাবে না। দক্ষ কারিগর ও শিল্পী হতে হলে শিক্ষা অত্যাবশ্যক। শিক্ষাই সব কাজের গোড়ার কথা। পূর্বেই বলেছি এই নীতি স্বাধীন ভারতের নতুন সরকার বুঝতে পারেন নি। তাই সরকারের প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় শিক্ষা খাতে ব্যয় ধরা হয়েছে মোট ব্যয়ের সাত দশমাংশ; দ্বিতীয় পরিকল্পনায় ৬·৪ দশমাংশ ও তৃতীয় পরিকল্পনায় ৪·৮ দশমাংশ। ক্রমশ শিক্ষা খাতে ব্যয় না বাড়িয়ে কমান হয়েছে। তাই ইদানীন্তন সর্বভারতীয় কমিশন শিক্ষা খাতে ১৯৮৫-৮৬ সনে ৪০০০ কোটি টাকা ব্যয় বৃদ্ধি হওয়া উচিত বলে সুপারিশ করেছেন। অর্থাভাবে তাঁরা বলেছেন—বর্তমানে মাথা পিছু শিক্ষার জন্য বার টাকা খরচ হচ্ছে। ১৯৮৫ সনে তা হওয়া উচিত বছরে ৫৪্ টাকা। শিক্ষা বিষয়টি প্রাদেশিক; কেন্দ্রীয় ব্যাপার নয়। সত্যের খাতিরে এ কথা উল্লেখযোগ্য যে, গত তিনটি পরিকল্পনায় (পনর বছরে) কোন কোন প্রাদেশিক সরকার শিক্ষার খাতে কিছুটা ব্যয় বৃদ্ধি করেছেন। ১৯৫১-৫২ সনে বিহার সরকার মোট ব্যয়ের শতকরা ২০ অংশ ব্যয় করতেন শিক্ষা খাতে; ১৯৬৫-৬৬ সনে তা হয়েছে শতকরা ত্রিশ। কেরালায় ছিল শতকরা ৩৫; গত সন হয়েছে পঞ্চাশ। মধ্যপ্রদেশে ছিল শতকরা ৩১; গত সনে হয়েছে তেতাল্লিশ। পশ্চিমবঙ্গে ১৯৫১-৫২ সনে ছিল শতকরা বিশ; গত সন হয়েছে একত্রিশ। এ হচ্ছে গত পনর বছরের অগ্রগতি। কিন্তু সর্বভারতীয় কমিশনের দৃষ্টিতে এ ব্যয় নিতান্তই সামান্য।

শিক্ষায় উৎকর্ষ

এবার কোন্ কোন্ বিষয়ে শিক্ষার উন্নতি হয়েছে, তা দেখা যাক। ভারতে শিল্পায়নের জন্য ও ভারতীয় দক্ষ এন্‌জিনিয়র সৃষ্টির জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের পরিচালনায় নতুন নতুন এন্‌জিনিয়রিং কলেজের প্রতিষ্ঠা হয়েছে, যথা খড়্গপুরে, কানপুরে, বোম্বাইতে, মাদ্রাজে ও দিল্লীতে। সঙ্গে সঙ্গে প্রতি প্রদেশে অনেকগুলি পলিটেক্‌নিক্ স্কুল সরকারী দায়িত্বে স্থাপিত হয়েছে। বাংলায় ২২টি এরূপ পলিটেক্‌নিক্ স্কুল নতুন হয়েছে। মুদ্রণ শিল্পের উন্নতির জন্য যাদবপুরে স্কুল অফ্ প্রিণ্টিং টেকনোলজি সরকারের ব্যয়ে চলছে। বাণিজ্য বিষয়ে শিক্ষার উন্নতির জন্য স্কুল অফ্ বিজ্‌নেস্ ম্যানেজ্‌মেণ্ট্ স্থাপিত হয়েছে। নানারকম কলেজ অফ্ কমার্সও দেখা যাচ্ছে। আগে বিশ্ববিদ্যালয়গুলির অনেক কলেজে শুধু আর্টস (কলাবিদ্যা) শেখান হত। এখন প্রতি কলেজে বিজ্ঞান ও কমার্স শাখা পরিপুষ্ট। আর্টস শিক্ষার দুর্দিন উপস্থিত। তার বদলে ছাত্রদের ও তাদের অভিভাবকের ঝোঁক দেখা যায় প্রথমে বিজ্ঞানের জন্য; না হলে অগত্যা কমার্স। ছাত্রসংখ্যা বৃদ্ধির কোন তুলনা নেই। অখণ্ডিত বাংলায় প্রায় পঞ্চাশ হাজার ছেলে প্রবেশিকা পরীক্ষা দিত। এখন সে স্থলে পশ্চিমবঙ্গেই অন্তত দেড় লক্ষ ছাত্র-ছাত্রী পরীক্ষার্থী। অখণ্ডিত বাংলায় ছিল ৫০।৬০টি কলেজ। এখন সে স্থলে সর্বপ্রকমের কলেজ ২৪৬টি ১৯৬৪-৬৫ সনের রিপোর্টে দেখতে পাই শুধু পশ্চিম বাংলায়। এস্টিমেট কমিটির ১৯৬৫-৬৬ সনের রিপোর্টে আরও দেখা যায়, ১৯৫৩-৫৪ সনে সারা ভারতে ছিল ৮৫১টি কলেজ; আর ১৯৬৪-৬৫ সনে সে স্থলে ২৩৬০টি। কলেজী ছাত্রসংখ্যাও খুব বেড়ে গেছে। ১৯৫০-৫১ সনে সারা ভারতে তাদের সংখ্যা ছিল ৩·৭৩ লক্ষ; ১৯৫৫-৫৬ সনে ৬·৩৪ লক্ষ; ১৯৬০-৬১ সনে প্রায় ৯ লক্ষ। এস্টিমেট্ কমিটি মনে করেন তৃতীয় পরিকল্পনার শেষে ঐ সংখ্যা দাঁড়াবে প্রায় ১৩ লক্ষ। সুতরাং ছাত্রসংখ্যা

বিবেচনা করলে উন্নতি বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

এ অভূতপূর্ব ছাত্রসংখ্যাকে কি রকম নানাভাবে কাজে লাগানোর চেষ্টা হচ্ছে, এবার তার একটু আভাস দেব। কলেজের ছাত্রসংখ্যা বিবেচনা করলে সহজেই বুঝা যায় স্কুলগুলির ছাত্রসংখ্যা এর চেয়ে কতগুণ বেশি। এবং কত বেশি সংখ্যক সরকারী, বে-সরকারী বা সাহায্যপ্রাপ্ত স্কুল স্থাপিত হয়েছে, তা সহজেই অনুমেয়। অনেক কলেজে ও কোন কোন বিশ্ববিদ্যালয়ে সান্ধ্য ক্লাস খোলা হয়েছে। কোথাও কোথাও রীতিমত পড়ান হয়; আবার কোথাও কোথাও করেস্পণ্ডেন্স্ কোর্স দ্বারা অনুপস্থিত ছাত্র-ছাত্রীগণকে বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষার উপযুক্ত করা হয়। বাংলা দেশে ও অন্য কোন কোন প্রদেশে বহিরাগত ছাত্রের পরীক্ষা দেবার বন্দোবস্ত আছে। স্বাধীনতার পূর্বে এ ব্যবস্থা ছিল না। শুধু শিক্ষক ও মেয়েরা এরূপ পরীক্ষা দিতে পারত। ১৯৬৬ সনে প্রায় ১০০০০ ছাত্র কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে বহিরাগত ছাত্র হিসাবে পরীক্ষা দিয়েছে। এরা হয় দরিদ্র ছাত্র, অর্থব্যয় করে পড়াশুনা করতে পারে না বা দিনের বেলা কোন অফিস-আদালতে জীবিকা অর্জন করে। স্বাধীনতার পর স্কুলে ও কলেজে ছাত্রীসংখ্যা অসংখ্যরূপে বেড়েছে। কিছুদিন সহ-শিক্ষা দ্বারা তাদের শিক্ষার চাহিদা মেটাবার চেষ্টা হয়েছে। কিন্তু তাতে সকলের শিক্ষা-ব্যবস্থা হত না। তাই আজ মেয়েদের অসংখ্য স্কুল, কলেজ ও হোস্টেলের প্রতিষ্ঠা হয়েছে। বাংলা দেশে উচ্চ শিক্ষার ফল বের হলে দেখা যায়, অনেক ছাত্রী গুণানুসারে উচ্চতম স্থানগুলি দখল করে। স্বাধীনোত্তর যুগে শিক্ষা সম্বন্ধে নতুন ধারণা আজ ভারতকে পেয়ে বসেছে। 'শিক্ষা' অর্থে শুধু পরীক্ষা পাশ বুঝায় না। যে শিক্ষা ছাত্র-ছাত্রীদের ব্যক্তিত্ব পরিস্ফুট করে তোলে, তাদের শারীরিক, মানসিক ও বুদ্ধিবৃত্তির উৎকর্ষ সাধন করে, তাই আজ প্রকৃত শিক্ষা বলে গণ্য করা হয়। অতএব আজ স্থানে স্থানে নৃত্য, সংগীত ও নাটক শিক্ষা দেবার জন্য প্রতিষ্ঠান, কলাকেন্দ্র ও বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হয়েছে। এমন কি, চলচ্চিত্র শিল্পেও পারদর্শী ছাত্রগণকে সরকার বৃত্তি দিচ্ছেন। গুণী ও মেধাবী ছাত্র-ছাত্রীগণের যাতে উচ্চ শিক্ষা ব্যাহত না হয়, তজ্জন্য সরকার আজ জাতীয় মেধাবৃত্তির ব্যবস্থা করেছেন এবং যে কোন ছাত্র-ছাত্রী সরকারী পরীক্ষায় শতকরা ৫০ নম্বর পেলে এবং দ্বিতীয় বিভাগে পাশ করলে সরকার "জাতীয় লোন" শিক্ষাকালের জন্য দিয়ে থাকেন। এদের বেলা অভিভাবকদের আয় মাসিক ৫০০্-র কম হবে। শিক্ষা সমাপ্তির পর সহজ কিস্তিতে কিছু কিছু করে ঐ ঋণ শোধ করার কথা। অনেক মেধাবী ছাত্র আজ ঐ সুযোগ পাচ্ছে। স্বাধীনতার পূর্বে এরূপ সুবিধা অভাবনীয় ছিল। সরকার ভারতীয় "বিশ্ববিদ্যালয়ে গ্রাণ্টস্ কমিটি" সৃষ্টি করে কলেজী শিক্ষার উন্নয়ন ও মান বাড়াবার চেষ্টা করছেন। ইদানীন্তন "ভারতীয় শিক্ষা কমিশন" (১৯৬৫-৬৬) স্কুলগুলির উন্নয়নের জন্যও অনুরূপ এক "ভারতীয় মাধ্যমিক শিক্ষাবোর্ড" স্থাপনের সুপারিশ করেছেন। আজ আমাদের যুবকেরা সেনা-বিভাগ, নৌ-বিভাগ ও বিমান-বিভাগে শিক্ষার্থী ও কৃতী ছাত্র। স্বাধীনতার পূর্বে এটা সম্ভবপর ছিল না। ধাত্রীবিদ্যা ও চিকিৎসা-বিদ্যায়ও শত শত যুবক-যুবতী আজ গৌরবজনক স্থান লাভ করছে। আগে এ সবের উচ্চপদগুলি ইংরাজদের একচেটিয়া অধিকারে ছিল। আজ বাংলার মফস্বলে হাইস্কুলে অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত ছাত্রীদের শিক্ষা অবৈতনিক করা হয়েছে। পূর্বোল্লেখিত "সর্বভারতীয় কমিশন ১৯৮৫ সন মধ্যে সর্বস্তরে শিক্ষা অবৈতনিক করবার সুপারিশ করেছেন। বাংলা দেশে তার প্রথম পদক্ষেপ হয়েছে উপরে কথিত মেয়েদের শিক্ষা ব্যাপারে। কেরালায় অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত সকল ছাত্রছাত্রীর শিক্ষা অবৈতনিক। কিন্তু কাশ্মীর, মাদ্রাজ ও পাঞ্জাবে সকলস্তরে মাধ্যমিক শিক্ষায় বেতন দিতে হয় না। বঙ্গদেশ এ বিষয়ে পশ্চাৎপদ। মাতৃভাষার মাধ্যমে শিক্ষাদান স্বাধীন ভারতের অন্যতম লক্ষ্য। ইতিমধ্যে সব প্রদেশে হাইস্কুল স্তর পর্যন্ত আবশ্যিকভাবে মাতৃভাষার মাধ্যমে উচ্চশিক্ষা দেওয়া হচ্ছে। কলিকাতা প্রভৃতি কোন কোন বিশ্ববিদ্যালয়ে স্নাতক-ক্লাসেও ঐচ্ছিকভাবে মাতৃভাষা আজ শিক্ষা ও পরীক্ষার মাধ্যম। শুধু অনার্স ক্লাসে এ সুযোগ দেওয়া হয় না।

শিক্ষায় অপকর্ষ

এতক্ষণ ভারতের শিক্ষাব্যবস্থায় অল্প কিছু যা উৎকর্ষ হয়েছে, তা বলেছি। এবার অপকর্ষের কথা ধরা যাক। ভারতীয় সংবিধানে বলা হয়েছে সংবিধান প্রবর্তনের দশ বছর মধ্যে ১৪ বছর বয়স্ক পর্যন্ত সব বালক বালিকাদের অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক শিক্ষার বন্দোবস্ত করতে হবে। এ লক্ষ্য সব প্রদেশে এখনও অনেকটা অপূর্ণ আছে। বাংলা দেশে এখনও শতকরা প্রায় ৭০ জন লোক নিরক্ষর। বাংলার ১৪৫২৬টি গ্রামে এখনও প্রাথমিক স্কুল নেই। শহরাঞ্চলে অবৈতনিক প্রাথমিক শিক্ষার কোন বন্দোবস্ত এখনও হয় নি। বেসিক প্রাথমিক শিক্ষার নামে আর এক ব্যয়-বহুল গাল-ভরা শিক্ষাব্যবস্থা এখানে-ওখানে করা হয়েছে; কিন্তু এ বুনিয়াদী শিক্ষার অন্যতম জনক ভারতের বর্তমান ভাইস প্রেসিডেণ্ট জনাব জাকির হোসেনের মতে এটা এক বঞ্চনা মাত্র। এরূপ একটি স্কুলের ব্যয়ে দুটি সাধারণ প্রাথমিক স্কুল চলে। কিন্তু সরকার মহাত্মাজীর নাম ভাঙিয়ে এখনও ঐ ব্যবস্থা চালাচ্ছেন। মাধ্যমিক স্কুলগুলির শিক্ষার গোড়ার কথা হচ্ছে—একে জীবিকা-ভিত্তিক বা বৃত্তিমূলক করতে হবে। সর্বভারতীয় কমিশনও ঐ কথাই বলেছেন। কতগুলি অকৃতকার্য ছাত্র অষ্টম শ্রেণীর পর নানা বৃত্তিতে চলে যাবে। আবার দশম শ্রেণীর পর অপর কতগুলি ছাত্র কারিগরী শিক্ষায় চলে যাবে বা দক্ষ কারিগর হয়ে নতুন জীবিকা অবলম্বন করবে, এটাই অনেক সভ্য দেশে ব্যবস্থা। সকল ছাত্রকে বিশ্ববিদ্যালয়ে আসতে দেওয়া হয় না। আমাদের দেশে প্রবেশিকা পরীক্ষায় অকৃতকার্য ছাত্রদের জন্য কোন বিশেষ বিকল্প ব্যবস্থা নেই। ফলে কলেজে কলেজে ভর্তির ভিড়; ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে দারুণ অসন্তোষ, নৈরাশ্য ও চাঞ্চল্য। পরে তাদের বেকার অবস্থা। যতদিন না এর বিকল্প ব্যবস্থা হয়, ততদিন ছাত্রদের মধ্যে উচ্ছৃংখলতা ও অশান্তি চলতে থাকবে। স্বাধীনতার পর ছাত্রদের এ অশান্ত ভাব বর্তমান শিক্ষা-ব্যবস্থার এক প্রধান কলঙ্ক। তারপর কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রকের এক খামখেয়ালের ফল হচ্ছে, হাই স্কুলগুলিতে একাদশ শ্রেণীর সংযোগ এবং তার পরই তিন বছরের ডিগ্রি কোর্স। আজ অধিকাংশ শিক্ষাবিদ স্বীকার করছেন, এ ব্যবস্থা সফল হয় না। কারণ স্কুলগুলিতে বড় বড় দালান-কোঠা হয়েছে, কিন্তু উপযুক্ত শিক্ষক বা লেবরেটরী নেই অর্থাৎ দোয়াত আছে কালি নেই। গত ৩।৪ বছরের হাই স্কুলের ছাত্রছাত্রীরা শিক্ষামন্ত্রকের এ খেয়ালের যূপকাষ্ঠে বলি স্বরূপ হয়েছে। ইদানীন্তন "সর্বভারতীয় শিক্ষা কমিশন" এ ব্যবস্থার অনেকটা পরিবর্তন সুপারিশ

করে পূর্বেকার ইণ্টারমিডিয়েট কোর্সের মত একটা ব্যবস্থার কথা সুপারিশ করেছেন। যত শীঘ্র নয়া ব্যবস্থা হয়, ততই ভাল। অগণিত ছাত্রছাত্রী বাঁচবে। কলেজী শিক্ষার অপকর্ষের কথা না বলাই ভাল। অনন্যোপায় হয়ে ছাত্ররা কলেজে কলেজে ভিড় করে। সংখ্যাধিক্যের জন্য ছাত্র ও অধ্যাপকের মধ্যে অন্তরঙ্গতা নেই। ঐ কারণেই ছোট ছোট ক্লাস, বা সুষ্ঠু টিউটরিয়ালের ব্যবস্থা করা সম্ভব হচ্ছে না। দু-একটি কৃষি কলেজ বা বিশ্ববিদ্যালয় হয়েছে। কিন্তু তাতে কৃষির প্রাণ নেই। এমন কি, যে কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়কে কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় করবে বলে সরকার মনস্থ করেছিলেন, তাও আজ অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয়ের মত আর্টস ও বিজ্ঞান পড়াচ্ছে। তার কৃষি বিভাগ ক্ষীয়মাণ। স্বাধীন ভারতে অনেক নতুন বিশ্ববিদ্যালয় হয়েছে। কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিবেশ তাতে নেই। উপযুক্ত অধ্যাপক নেই—আরও কত কি অভাব আছে।

কি প্রাথমিক, কি মাধ্যমিক, কি কলেজী শিক্ষা—সর্বত্রই উভয়ত সরকার পক্ষে ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের পক্ষে একই অভিযোগ বা বক্তব্য—অর্থের অভাব। ভাল শিক্ষক বা অধ্যাপক স্কুল কলেজে থাকে না। কারণ মাহিনা কম; জীবিকা চলে না। তাঁরা অন্য বৃত্তি গ্রহণ করতে সর্বদা ব্যস্ত। শিক্ষাখাতে সরকারী ব্যয় বরাদ্দের কথা প্রথমেই বলেছি। শিক্ষা বিভাগ হচ্ছে সরকারের বিমাতার ছেলে। এ দৃষ্টিভঙ্গী না বদলালে চলবে না। দু-দশটা বড় বড় পরিকল্পনা আগামী কয় বছর স্থগিত রাখলে তেমন ক্ষতি হবে না। কিন্তু সব পরিকল্পনার গোড়ার কথা শিক্ষা। তা না হলে দক্ষ শ্রমিক, কারিগর ও কর্মী মিলবে না এবং সমস্ত বড় পরিকল্পনা ভণ্ডুল হতে বাধ্য। স্বাধীনতার পর কংগ্রেসী সরকারের একটা দলগত দুর্বলতা ও প্রবণতা লক্ষ্য করে আসছি, যা প্রকৃত শিক্ষার পরিপন্থী। তাঁরা শিক্ষাকে দলের ঊর্ধ্বে রাখতে পারেন নি। তাই সরকার কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বাধীনতা নতুন "কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় আইনে" হরণ করেছেন এবং বাংলাদেশে যে অপর কয়েকটি নতুন বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হয়েছে, তাতেও একই অবস্থা—সরকারের একনায়কত্ব। মাধ্যমিক শিক্ষার জন্য যে মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড প্রতিষ্ঠা করেছেন, তাও নিতান্ত অগণতান্ত্রিক এবং রাইটার্স বিল্ডিং-এর এক শাখা মাত্র। ইদানীং প্রাথমিক শিক্ষাকেও নতুন আঞ্চলিক পঞ্চায়েতের কর্তৃত্বে ছেড়ে দিচ্ছেন—যদিও অনেক আঞ্চলিক পঞ্চায়েতের শিক্ষা-দীক্ষার কথা না বলাই ভাল। স্বায়ত্তশাসনের নামে প্রাথমিক শিক্ষার এক সুষ্ঠু কবরের ব্যবস্থা হয়েছে। কংগ্রেস সরকার যদি কখনও ক্ষমতাচ্যুত হন, তখনই এ দলীয় নীতির অপকারিতা বুঝতে পারবেন।

পরিশেষে, শিক্ষাখাতে যে সামান্য সরকারী ব্যয় বরাদ্দ আছে, তারও সদ্ব্যবহার হচ্ছে না। কারণ, আজ যে সব সরকারী শিক্ষা বিভাগের কর্মচারী প্রকৃতপক্ষে শিক্ষাব্যবস্থা পরিচালনা করছেন এবং যাঁদের মন্তব্যের ওপর কোন কোন মন্ত্রী অন্ধের মত 'হুঁ' বা "ইয়েস" লিখছেন, তাঁদের অনেকেরই পূর্বকার আমলাতান্ত্রিক ইংরাজ সরকারের কাছে হাতেখড়ি। তাঁদের পূর্বের ন্যায় আমলাতান্ত্রিক মনোভাব ও দৃষ্টিভঙ্গী। শিক্ষা বা শিক্ষকের প্রতি তাঁদের শ্রদ্ধা বা দরদ নেই। শুধু জীবিকা ও প্রমোশন পাওয়াই তাঁদের একমাত্র লক্ষ্য। উদাহরণস্বরূপ ইদানীং বাংলাদেশের শিক্ষা বিভাগে এমন একজন সরকারী পদস্থ কর্মচারী আছেন, যিনি কলেজগুলির টুঁটি চেপে ধরে আছেন। কোন কলেজে ন্যায্য হলেও তিনি কোন নতুন অধ্যাপক মঞ্জুর করেন না। নিজে উদ্ধত ও বদরাগী। বিশ্ববিদ্যালয়ের নাম শুনলে তিনি নাক সিটকান। কলেজগুলিতে উপযুক্ত সংখ্যক অধ্যাপক না দিয়ে তিনি সরকারের টাকা বাঁচাতে সর্বদা আগ্রহশীল। শিক্ষামন্ত্রী শিক্ষাসচিব ও ডি পি আই একজন অধ্যাপকের পক্ষে সপ্তাহে ১৮।১৯ পিরিয়ড কাজ যথেষ্ট মনে করলেও, তিনি ইউ জি সির আইন অর্থাৎ "অধিক পক্ষে" ২৪ পিরিয়ড কাজ, আদায় করতে তাঁর সমস্ত ক্ষমতা ব্যবহার করেন। তিনি আইন মানেন, কিন্তু আইনের স্বরূপ বুঝেন না। ফলে আজ কলেজে কলেজে অধ্যাপকদের অভাব বা পদ খালি পড়ে আছে। সরকারী কলেজেও এর ব্যতিক্রম নেই। এরূপ অনভিজ্ঞ, অদূরদর্শী ও সংকীর্ণচিত্ত পদস্থ আমলার দ্বারা আজ শিক্ষা বিভাগ পরিচালিত। শিক্ষাখাতে স্বল্প ব্যয় বরাদ্দ সত্ত্বেও এরূপ শিক্ষাপরিচালকের হাতে পড়ে স্বাধীনোত্তর ভারতের শিক্ষাব্যবস্থা আজ বিপর্যস্ত। এর প্রতিকার না হলে শিক্ষার উন্নতির আশা নেই। শিক্ষা ও শিক্ষকের ভবিষ্যৎ ভেবে সরকারকে দেয়ালের লেখন পাঠ করতে অনুরোধ করছি।

দেশ সেবায় নিয়োজিত,

এ্যালবার্ট ডেভিড লিমিটেড

কলিকাতা—৫০

নীতি ও বিজ্ঞানানুযায়ী ঔষধ প্রস্তুতকরণের অগ্রণী

—ব্রাঞ্চ সমূহ—

বোম্বে - মাদ্রাজ - দিল্লী - নাগপুর

বেজওয়াড়া - শ্রীনগর - গোহাটী

আইন ও স্বাধীনতা

অজিতকুমার দত্ত

ইংরাজ রাজত্বের অবসান ঘটেছে এবং আন্তর্জাতিক আইনের দৃষ্টিতে আমরা একটা স্বাধীন জাতি। কিন্তু চিন্তায়, রাষ্ট্র পরিচালনায়, অর্থনৈতিক পরিকল্পনায়, শিক্ষার ব্যবস্থাপনায় আমাদের পরবশ্যতা ও পরনির্ভরতা এত বেশি প্রকট হয়ে উঠেছে যে আমরা যে একটা স্বাধীন জাতি এই সত্যটি উপলব্ধি করাই কঠিন হয়ে পড়েছে।

বহুদিনের পরাধীনতার গ্লানি ও বন্ধন থেকে মন এখনও মুক্ত হয় নি। ক্ষুদ্র স্বার্থপরতা ও লঘু বাতবিতণ্ডায় ব্যবস্থাপনা সভাগৃহগুলি মুখরিত। ব্যক্তিগত উচ্চাভিলাষ, ঈর্ষা ও দ্বন্দ্বে দেশের নেতৃত্ব হীনবীর্য হয়ে পড়েছে। দেশের সাধারণ মানুষের মন বিভ্রান্তি ও হতাশায় ক্লান্ত। সাধারণ মানুষের মনেও প্রশ্ন জেগেছে—আমরা সত্যই কি স্বাধীন হয়েছি? স্বাধীন হয়ে আমরা কি পেলাম?

এই স্বাধীনতার স্মরণোৎসবের দিনে আমাদের আজ তাই স্বাধীনতা-উত্তর বৎসরগুলিতে আমরা কি চেয়েছি আর কি পেয়েছি তার হিসাব-নিকাশ করার সময় এসেছে।

আমি আমাদের জাতীয় জীবনের একটি সমস্যার কথাই আজ বিশেষভাবে আলোচনা করব কারণ স্বাধীনতার সঙ্গে আইন ও বিচারের অঙ্গাঙ্গী সম্বন্ধের ব্যাপারে আমাদের অনেকের সুস্পষ্ট ধারণা নেই।

আমাদের সংবিধানে ব্যক্তিস্বাধীনতা, সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র ও সমাজতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থাকে প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে। সংবিধানের তৃতীয় খণ্ডে যে মৌলিক অধিকারের প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছে, সেই প্রতিশ্রুতি কার্যকরী করার অপরিহার্য অঙ্গ হল বিচার বিভাগ। বিচারালয় ও বিচারপতির স্বাধীনতা ও মর্যাদার উপর গণতান্ত্রিক ও সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রব্যবস্থার স্থায়িত্ব নির্ভর করে। আমাদের সংবিধানে আইন পরিষদ, বিচার বিভাগ ও শাসন বিভাগের মধ্যে ক্ষমতার ও অধিকারের সুসম বণ্টন ব্যবস্থা সন্নিবেশিত হয়েছে। এই তিনটি বিভাগের মধ্যে ক্ষমতার প্রতিদ্বন্দ্বিতার কোনও সুযোগ বা প্রয়োজন নেই। বিধানসভার অধিকার ও ক্ষমতা যেমন বিধানসভার অভ্যন্তরে নিরঙ্কুশ, বিধানসভারও বিচারালয়ের আভ্যন্তরীণ বিচারপ্রক্রিয়ার ব্যাপারে হস্তক্ষেপের অবকাশ নেই।

ইদানীং বিধানসভার সদস্যদের মধ্যে একটা বিশেষ শ্রেণীসুলভ অভিমানের উদ্রেক হয়েছে লক্ষ্য করা যাচ্ছে। একটি রাজ্যের বিধানসভা হাইকোর্টের জজদের বিরুদ্ধে গ্রেপ্তারী পরোয়ানা জারীর উদ্যোগ করেছিল এবং শেষ পর্যন্ত সুপ্রীম কোর্টের হস্তক্ষেপের ফলে একটি অপ্রীতিকর সংঘর্ষের সমাপ্তি ঘটে। উক্ত ঘটনার মধ্যে যে প্রশ্নটি গুরুত্বপূর্ণ তা হচ্ছে বিধানসভার চৌহদ্দির বাইরে কোনও ভারতীয়ের বিরুদ্ধে যদি বিধানসভার অবমাননার অভিযোগে বিধানসভার সভাপতি গ্রেপ্তারী পরোয়ানা জারী করেন, সেই ভারতীয় ব্যক্তির সংবিধানসম্মত অধিকার প্রয়োগে হাইকোর্টে হেবিয়াস কর্পাসের দরখাস্ত দাখিলের অধিকার আছে কিনা, এবং হাইকোর্ট যদি উক্ত ব্যক্তির দরখাস্ত গ্রহণ করেন তবে হাইকোর্ট বিধানসভার অবমাননার অপরাধে অভিযুক্ত হতে পারেন কিনা। সুপ্রীম কোর্টের বিচারে ব্যক্তিস্বাধীনতা ও হাইকোর্টের স্বাধীনতা ও মর্যাদা রক্ষিত হয়েছে বলে আমি মনে করি।

আমাদের সংবিধান মৌল স্বাধীনতার শুধু সংজ্ঞাই নির্দেশ করে নি, তার অপরিহার্যতার তত্ত্বটিকেই সংবিধানের মূল তথ্য বলে ঘোষণা করেছে। আমরা কোন স্বাধীনতার জন্য সংগ্রাম করেছি, দুঃখবরণ করেছি এই প্রশ্নের জবাবে দেশের সাধারণ মানুষকে আজ তাই বারবার করে বোঝান প্রয়োজন হয়ে পড়েছে যে সংবিধানে যে মৌল স্বাধীনতার কথা আমরা ঘোষণা করেছি মানুষের সেই সর্বাঙ্গীণ স্বাধীনতাই আমাদের কাম্য ছিল। সেই স্বাধীনতা যাতে খর্ব না হয়, ব্যাহত না হয় তার জন্যে সংবিধানে আমাদের উচ্চ বিচারালয়গুলিকে নিরঙ্কুশ ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে এবং স্বাধীনতার প্রহরী হিসাবে অনুক্ষণ জাগ্রত থাকবার দায়িত্বও বিচার বিভাগকে দেওয়া হয়েছে। আমাদের বিচার বিভাগ যদি এই ক্ষমতা এবং এই দায়িত্বের বিষয়ে সজাগ এবং সতর্ক থাকেন স্বাধীনতার একটি ফল অন্তত সাধারণ মানুষ উপলব্ধি করবে।

যে সংখ্যাগরিষ্ঠ দল আজ শাসন ক্ষমতায় প্রতিষ্ঠিত তাদের মধ্যে একটা প্রবণতা আমরা উদ্বেগের সঙ্গে লক্ষ্য করছি—সেটা হচ্ছে বিচার বিভাগের প্রতি একটা অসহিষ্ণুতা, একটা বিরোধিতা, একটা উপেক্ষার ভাব তাদের বাক্যে, ব্যবহারে, কর্মে প্রকট হয়ে উঠছে। তাদের এটা উপলব্ধি করা উচিত—গণতন্ত্রে পৃথিবীর ইতিহাসে একই দল ক্ষমতায় আসীন থেকে চিরকাল শাসনযন্ত্রের পরিচালনা করেছেন তা কখনও হয় নি এবং হওয়া সম্ভব নয়। আজ ক্ষমতার গর্বে যদি তাঁরা বিচারালয়ের মর্যাদা ও ক্ষমতাকে ক্ষুণ্ণ করেন একদিন একান্ত অনুশোচনায় তাঁরাই পরিতাপ করবেন যে অবিচার ও ক্ষমতার অপব্যবহার থেকে তাঁদের রক্ষা করবার হাতিয়ারগুলো তাঁরাই ভেঙে অকেজো করে রেখে গেছেন।

বিচার বিভাগের প্রতি উপেক্ষা ও বিমাতৃসুলভ ভাব বর্তমানে অশোভনীয় ভাবে আত্মপ্রকাশ করেছে। বিচার বিভাগের প্রয়োজনে টাকা নেই। বিচারগৃহের মেরামতের টাকা নেই। বিচারপতিদের মাইনে জীবনধারণের পক্ষেও পর্যাপ্ত নয়, বিচার বিভাগের কর্মীদের মাইনে বাড়াবার টাকা নেই। বিচারালয়গুলিতে আইনপুস্তকের ব্যবস্থা নেই। বিচার বিভাগীয় কর্মচারীদের বাসগৃহের ব্যবস্থা নেই। বিচারালয়ের প্রধানদেরও বাসস্থানের ব্যবস্থা নেই। বলা হয় টাকার অভাব।

অধিকাংশ রাজ্যে বিচার বিভাগ ও শাসন বিভাগ পৃথকীকরণের কার্য সম্পন্ন হয় নি—অজুহাত টাকার অভাব। অথচ শাসন বিভাগের অজস্র অপচয় ও কর্মচারীর অপরিমিত সংখ্যাবৃদ্ধির সময়ে টাকার অভাবের অজুহাত শোনা যায় না। বিচার বিভাগের খুবই উপরতলার কর্তৃস্থানীয় ব্যক্তিদের মুখেই অভিযোগ শুনেছি বিচারগৃহগুলির আবশ্যকীয়

মেরামতের টাকা পাওয়া যায় না, কিন্তু কম্যুনিটি ডিভেলপমেণ্টের নামে অজস্র অর্থের অপচয় হচ্ছে।

আমাদের সংবিধান "স্ট্যাটিক" নয়। সংবিধান অচলায়তন হবে আমি সে কথাও বলছি নে, কিন্তু দেশের সংহতির প্রয়োজনেই সংবিধানকে সাধারণ মানুষের চোখে শ্রদ্ধার আসনে বসান প্রয়োজন। সংবিধানের প্রতি অনুরক্তি দেশের প্রতি অনুরাগের পরিচায়ক। কিন্তু যদি গোষ্ঠী বা শ্রেণী বা দলের স্বার্থে সংবিধান নিয়তই সংশোধিত হতে থাকে—সাধারণ মানুষের দেশের প্রতি আনুগত্যের মূলে তা আঘাত করে। আমাদের দেশের শাসনের দায়িত্ব যাঁদের উপর ন্যস্ত হয়েছে তাঁদের এ বিষয়ে অবহিত হওয়া দরকার।

কারও বিরুদ্ধে অভিযোগ জানাবার উদ্দেশ্যে আমি বিচার বিভাগের প্রতি ঔদাসীন্যের ইতিবৃত্ত আলোচনায় প্রবৃত্ত হই নি। এই ঔদাসীন্যের মধ্যে যে বিপদের ইঙ্গিত আমি দেখতে পাচ্ছি, স্বাধীনতার উপর আঘাতের যে সম্ভাবনা পরিস্ফুট হয়ে উঠছে—সেই বিপজ্জনক সম্ভাবনার দিকেই আমি দেশের শিক্ষিত বুদ্ধিমান মানুষদের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।

মানুষের মধ্যে একটা আইনের প্রতি অশ্রদ্ধা, একটা উচ্ছৃংখল হিংস্রতা যেন ক্রমেই প্রবল হয়ে উঠছে। অতি তুচ্ছ কারণে মানুষ নীতি-ভ্রষ্ট হয়ে উঠছে, হিংসার আশ্রয় নিচ্ছে, ধ্বংসের মাদকতায় নীতিজ্ঞানহীন পশুর মত নিষ্ঠুর হয়ে উঠছে। কিন্তু কেন? রাজনৈতিক দলের প্রশ্রয়ে বা উস্কানীতে মানুষ অমানুষ হয়ে উঠছে এবং আইন ও শৃংখলার প্রতি বিশ্বাসহীন হয়ে উঠছে এ সব সস্তা ও সহজ বাক্যে এই প্রশ্নের জবাব মিলবে না।

ক্ষমতাশীল দল যদি নিজেদের স্বার্থে আইন ও বিচারের প্রতি অশ্রদ্ধা দেখাতে আরম্ভ করেন, সাধারণ মানুষ আইনানুগ হবে এরকম আশা করা মূর্খতা।

আইনের শাসন বা "রুল অফ ল" আমাদের রাষ্ট্রীয় ও সমাজজীবনে মূল নীতি হিসাবে যদি প্রতিষ্ঠিত না হয় তবে স্বাধীনতা অর্থহীন ও মূল্যহীন হয়ে দাঁড়াবে।

যে সমাজব্যবস্থা ও রাষ্ট্রব্যবস্থা আমরা গড়ে তুলতে চাই, যার পরিকল্পনা আমাদের সংবিধানে রয়েছে—আইনানুগত্য হচ্ছে তার ভিত্তি। এই আনুগত্য আমাদের সমাজ ও রাষ্ট্র-জীবনের মূল নীতি এবং অনুশাসন হিসাবে আমরা যদি গ্রহণ না করি, যে সংহতি ও শৃংখলা আমাদের স্বাধীনতাকে রক্ষা করতে পারে সেই সংহতির অভাবে ভারতবর্ষের স্বাধীনতা আবার বিপন্ন হবে। স্বাধীনতার একমাত্র রক্ষাকবচ হচ্ছে আইনের শাসন—এই তথ্য এবং তত্ত্ব জনসমাজে প্রচারিত করার প্রয়োজন আজ বিশেষভাবে উপলব্ধি করার সময় এসেছে।

ভারতের বৈদেশিক নীতি

নির্মল বসু

ভারতের বৈদেশিক নীতি সম্পর্কে সম্পূর্ণ বিপরীতমুখী মন্তব্য শোনা যায়। অনেকেই বলেন, আমাদের আর সব নীতির ক্ষেত্রে যাই হোক, অন্তত বৈদেশিক নীতি সফল হয়েছে। আবার বহু সমালোচকের মতে এই নীতি সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়েছে। স্বাধীনোত্তর ভারতের বৈদেশিক নীতির বস্তুনিষ্ঠ আলোচনা করে দেখা প্রয়োজন, এই দুই সিদ্ধান্তের মধ্যে কোনটা কতখানি সত্য।

মনে রাখা প্রয়োজন, কোন দেশের বৈদেশিক নীতি তার আভ্যন্তরীণ নীতি থেকে বিচ্ছিন্ন নয়। কোন সরকারের অনুসৃত মৌলিক জাতীয় নীতি যা হবে, বৈদেশিক নীতিও সেই অনুসারেই পরিচালিত হবে। ভারত রাজনৈতিক ক্ষেত্রে গণতন্ত্র, এবং অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে মিশ্র অর্থনীতি গ্রহণ করেছে। ভারতের বৈদেশিক নীতির পর্যালোচনায় এর প্রভাব দেখা যাবে। একনায়কতন্ত্রী রাষ্ট্রের সঙ্গে ভারতের যোগ কম, আবার সমাজতন্ত্রী শিবিরের চেয়ে পশ্চিমী গণতন্ত্রের দেশগুলির সঙ্গেই আমাদের সম্পর্ক বেশি। যদিও বর্তমানে সমাজতন্ত্রী দেশগুলির সঙ্গে সম্পর্কবৃদ্ধির চেষ্টা চলছে।

নানা কারণে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে ভারত প্রভাব বিস্তার করতে সক্ষম হয়েছে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর ভারতের স্বাধীনতাপ্রাপ্তি এশিয়া তথা বিশ্বের এক উল্লেখযোগ্য ঘটনা। উপনিবেশবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রামরত এশিয়ার দেশগুলির কাছে ভারতের মর্যাদা তখন খুব বেশি। সেই সময় দিল্লীতে এশীয় সম্পর্ক সম্মেলনের অনুষ্ঠান বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। সমগ্র এশিয়া নেতৃত্বের জন্য দিল্লীর দিকে তাকিয়ে। নেহরুর প্রভাব আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে ভারতের মর্যাদা বৃদ্ধি করেছে। কমনওয়েলথে নেহরুর বিশেষ স্থান, অন্যান্য রাষ্ট্রের নেতারা নেহরুর সঙ্গে পরামর্শ করছেন। রাষ্ট্রসঙ্ঘেও ভারতের মর্যাদার আসন। বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সমস্যার সমাধানে ভারতের উদ্যোগী ভূমিকা স্বীকৃতি লাভ করেছে। ইন্দো-চীন, প্যালেস্টাইন, কঙ্গো, সাইপ্রাস. এই সব জটিল আন্তর্জাতিক সমস্যার সমাধানে রাষ্ট্রসঙ্ঘ ভারতের সহায়তা গ্রহণ করেছে, কোথাও বা আন্তর্জাতিক সম্মেলন থেকে ভারতের ওপর দায়িত্ব অর্পণ করা হয়েছে। বোমাবর্ষণ বন্ধ এবং নিরস্ত্রীকরণের জন্য যারা বিশেষভাবে চেষ্টা করছে, তাদের মধ্যেও ভারত আছে। বান্দুং সম্মেলন ও পঞ্চশীল নীতির প্রবর্তনে অন্যতম প্রধান ভূমিকা ভারতের। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে জোট-নিরপেক্ষতার আদর্শ উদ্ভাবন ও এই আদর্শের বিকাশেও ভারতের অবদান অনেকখানি।

বৈদেশিক নীতির ক্ষেত্রে ভারতের আদর্শ পঞ্চশীল ও জোটনিরপেক্ষতা। প্রত্যেকটি রাষ্ট্রের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্বকে স্বীকার করা হবে। দুই রাষ্ট্রের মধ্যে কোন বিষয়ে বিরোধ দেখা দিলে যুদ্ধের পরিবর্তে শান্তিপূর্ণ উপায়ে সেই বিরোধের নিষ্পত্তি করতে হবে। সকল রাষ্ট্র পাশাপাশি শান্তিতে বাস করবে। বিশ্বের বিবদমান দুই শিবির, পশ্চিমী জোট বা ইঙ্গ-মার্কিন গোষ্ঠী, কিংবা সমাজতন্ত্রী জোট অর্থাৎ সোভিয়েট ইউনিয়ন প্রভাবিত কমিউনিস্ট রাষ্ট্রগোষ্ঠী, এর কোনটির সঙ্গেই যুক্ত না থেকে স্বতন্ত্র স্বাধীন জোট-নিরপেক্ষ নীতি অনুসরণের দ্বারা শান্তি ও নিরাপত্তার স্বার্থকে রক্ষা করা ভারত তথা অন্যান্য জোটনিরপেক্ষ রাষ্ট্রের আদর্শ। ভারত জোট-নির্বিশেষে বিশ্বের সকল রাষ্ট্রের সঙ্গে মৈত্রী সম্পর্ক স্থাপন করতে চায়। এ ছাড়া, উপনিবেশবাদ ও বর্ণবৈষম্যের বিরুদ্ধে সংগ্রামের প্রতিও ভারতের পূর্ণ সমর্থন রয়েছে। মোটামুটি এই হল ভারতের বৈদেশিক নীতির মূল ভিত্তি।

সমালোচকদের মতে, ভারত বৈদেশিক নীতির ক্ষেত্রে সাফল্য অর্জন করতে পারে নি। নেহরু তাঁর পরিচিতি ও ব্যক্তিত্বের জোরে আন্তর্জাতিক দরবারে সম্মানের স্থান পেয়েছেন (শেষ দিকে সে সম্মানও অনেকখানি নষ্ট হয়েছিল), কিন্তু তাই বলে ভারতের মর্যাদা বৃদ্ধি পায় নি। আন্তর্জাতিক রাজনীতির গতি নির্ধারণে ভারত কোন প্রভাব বিস্তার করতে পারে নি। এক রাষ্ট্র কর্তৃক অপর রাষ্ট্র আক্রমণ বন্ধ কিংবা বিদেশী শাসনের হাত থেকে জাতির মুক্তি-সংগ্রামের সমর্থনে ভারত উল্লেখযোগ্য কোন ভূমিকা গ্রহণ করতে পারে নি। সবচেয়ে বড় কথা, আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে ভারত তার নিজস্ব স্বার্থও রক্ষা করতে পারে নি।

আরও স্পষ্ট করা যাক। আন্তর্জাতিক সমস্যা সমাধানের ক্ষেত্রে ভারতের আজ আর ডাক পড়ে না। ভিয়েতনাম, লাওস ইত্যাদি বিষয়ে আন্তর্জাতিক নিয়ন্ত্রণ কমিশনের সভাপতিপদে এখনও ভারত থাকলেও এই ব্যাপারে আসল ক্ষমতা রয়েছে জেনেভা সম্মেলনের যুগ্ম সভাপতি সোভিয়েট ইউনিয়ন ও বৃটেনের হাতে। ডোমিনিকান রিপাবলিকের সঙ্কটের সময় কেউ ভারতের খোঁজ করে নি। আফ্রিকায় একের পর এক সংকট দেখা দিয়েছে, কোথাও ভারতের কোন ভূমিকা নেই। রাষ্ট্রসংঘ, কমনওয়েলথ, আফ্রো-এশীয় গোষ্ঠী, কোথাও নেতৃত্বের আসনে ভারত নেই। সম্প্রতি ভারত নিজে দুই প্রতিবেশীর দ্বারা আক্রান্ত হয়েছে। এখনও তার বিস্তীর্ণ অঞ্চল বিদেশীদের দখলে। ভারতীয় অধিবাসীরা বিদেশে অবাঞ্ছিত, তাদের স্বার্থ বিপন্ন। এই হল বাস্তব অবস্থা।

ভারতের বৈদেশিক নীতির কয়েকটি প্রধান সমস্যা নিয়ে একটু বিস্তৃত আলোচনা করা যেতে পারে। প্রথম নেয়া যাক কাশ্মীরের বিষয়। স্বাধীনতাপ্রাপ্তির প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই এই সমস্যাটির সৃষ্টি হয়েছে, এবং দীর্ঘ উনিশ বৎসর পরেও এটি একটি সমস্যা হয়েই রয়েছে। সাংবিধানিক ও অন্য দিক থেকে আমরা যতই বলি, কাশ্মীর ভারতের অবিচ্ছেদ্য অংশ, পাকিস্তান এই অবস্থা কখনও মেনে নেয় নি। বিশ্বের অধিকাংশ দেশের মানুষও মনে করে, কাশ্মীরের ওপর ভারতের চেয়ে পাকিস্তানের দাবি বেশি জোরদার। ইঙ্গ-মার্কিন রাষ্ট্রগোষ্ঠী

বরাবর এ ব্যাপারে আমাদের বিরুদ্ধে, জোটনিরপেক্ষ রাষ্ট্রগুলি বলতে গেলে নিরপেক্ষ। একমাত্র সোভিয়েট ইউনিয়নের সমর্থন ভারত বরাবর পেয়েছে। তবে এই সমর্থনও প্রধানত সোভিয়েট ইউনিয়নের নিজস্ব কূট-নৈতিক স্বার্থে, ভারতের দাবির যৌক্তিকতা স্বীকার বা ভারতের প্রতি দরদবশে খুব বেশি নয়। ইদানীং কাশ্মীর সম্পর্কে সোভিয়েট ইউনিয়নের মনোভাব পরিবর্তন সম্পর্কে যে সব আশঙ্কার কথা শোনা যাচ্ছে, তা সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন বলে উড়িয়ে দেয়া শক্ত। ভারত প্রথম থেকেই কাশ্মীরের ব্যাপারে ভুল করে আসছে। কাশ্মীর থেকে হানাদারদের সম্পূর্ণ বিতাড়ন না করে মাউণ্টব্যাটেনের পরামর্শে যুদ্ধবিরতি সীমারেখা মেনে নেয়া ও রাষ্ট্রসংঘের দ্বারস্থ হওয়া বড় রকমের ভুল হয়েছে। কাশ্মীর যদি ভারতের অংশ হয় তবে এ ব্যাপারে অন্য কারও মধ্যস্থতা স্বীকার করা সার্বভৌমত্ব বিরোধী কাজ।

পাকিস্তানের সংগে ভারতের সম্পর্ক কিছুতেই ভাল হচ্ছে না। সাম্প্রদায়িক ভিত্তিতে ভারত ভাগ হয়েছে, এবং ধর্মভিত্তিক রাষ্ট্ররূপে পাকিস্তান গড়ে উঠেছে। তাছাড়া এখানে গণতন্ত্রের বিলোপ ও এক-নায়কতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা হয়েছে। সুতরাং পাকিস্তানের সংগে ধর্মনিরপেক্ষ ও গণতান্ত্রিক ভারতের সম্পর্ক সহজ হওয়া শক্ত। বিভিন্ন সময়ে পাকিস্তান ভারতের প্রতি অবিচার করেছে। পাকিস্তান ভারতীয় জমি দখল করেছে, পাকিস্তানী হানাদাররা ভারতের অভ্যন্তরে প্রবেশ করে সম্পত্তি নষ্ট করেছে—লোকজন, গরুবাছুর কেড়ে নিয়ে গেছে, ভারতীয় নাগরিকদের ওপর গুলীবর্ষণ করেছে। অথচ ভারত এ সব ব্যাপারে কখনও কঠোর মনোভাব গ্রহণ করতে পারে নি। অনেকটা ক্ষমার দৃষ্টিতে ভারত এগুলি দেখেছে। বন্ধুত্বপ্রতিষ্ঠার আগ্রহেই ভারত এ ব্যাপারে নরম মনোভাব গ্রহণ করেছে। কিন্তু ফল হয়েছে উল্টো। প্রশ্রয়নীতির ফলে পাকিস্তানের সাহস বেড়েছে, যার চরমতম প্রকাশ গত বৎসরের আক্রমণের মধ্যে দেখা গেছে। কাশ্মীর আর বেরুবাড়ি উপঢৌকন দিয়ে পাকিস্তানের ক্ষিদে মেটানো যাবে, এ যদি কেউ মনে করে থাকেন তবে তিনি ভুল করবেন।

ভারত চীনের প্রতি শ্রেষ্ঠ বন্ধুর মত ব্যবহার করা সত্ত্বেও চীন ভারত আক্রমণ করে বিশ্বাসঘাতকতার পরিচয় দিয়েছে। ভারত কলম্বো প্রস্তাবের ভিত্তিতে চীনের সংগে আলোচনায় প্রস্তুত, কিন্তু চীন তাতে রাজী নয়। এদিক দিয়ে ভারতের নীতি যুক্তি-সংগত ও শান্তির সপক্ষে। কিন্তু, তিব্বতের প্রশ্নে ভারত যে ভুল করেছে, তারই খেসারত আজ তাকে দিতে হচ্ছে।

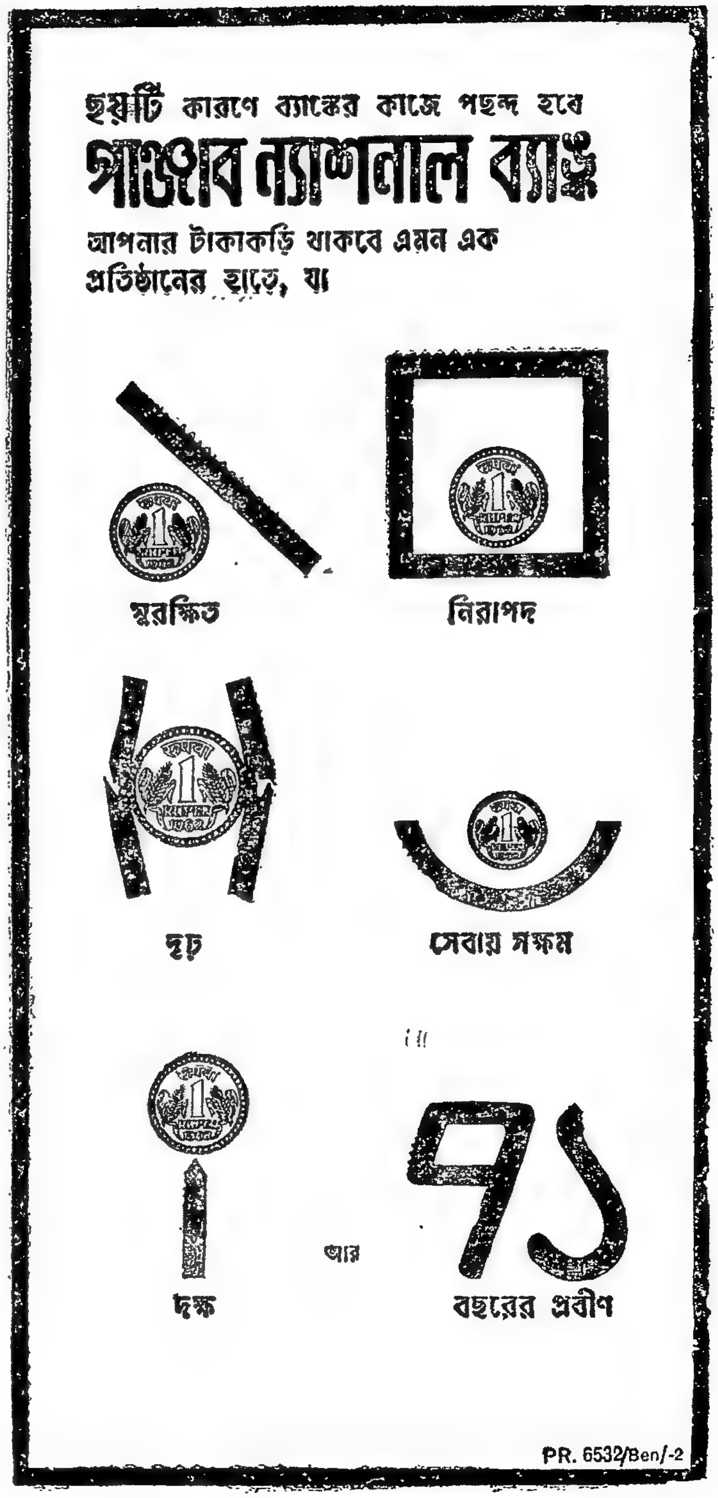

তিব্বত পেয়ে চীনের লোভ বেড়েছে, ভারতের দিকে নজর পড়েছে। ভারত ও চীনের মাঝে তিব্বতের দেয়াল থাকায় ভারত নিরাপদ ছিল, তিব্বত চীনের অন্তর্ভুক্ত হবার পর সে দেয়াল ভেঙেছে। ক্ষমতাবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে চীনের মনোভাবের যে পরিবর্তন হয়েছে, ভারত সে সম্পর্কে খবর রাখে নি, এবং সময় থাকতে সাবধান হয় নি। '৬২ সালে বড় রকমের আক্রমণ সুরু হবার আগে চীনারা ভারতের ওপর যে ছোটখাটো হামলা চালিয়েছে, ভারত সে সম্পর্কেও যথেষ্ট তৎপর হয় নি।

কমনওয়েলথের মধ্যে ভারতের থাকা সম্পর্কে দেশবাসীর অনেকের মনেই যথেষ্ট বিক্ষোভ আছে। বৃটেনের প্রভাবাধীন কমনওয়েলথে থাকার ফলে ভারত বৃটিশ স্বার্থ-সম্পর্কিত বিষয়ে স্বাধীন নীতি গ্রহণ করতে পারছে না, এই সমালোচনা করা হয়। কিন্তু এ কথা ছেড়ে দিলেও, কমনওয়েলথে যখন আফ্রিকা ও এশিয়ার বিভিন্ন রাষ্ট্র প্রভাব বিস্তার করতে সক্ষম হয়েছে, ভারত তখন কোন প্রভাব স্থাপন করতে পারে নি, অপ্রিয় হলেও এ সত্য স্বীকার করা প্রয়োজন। কমনওয়েলথে আজ কেনিয়া, তানজানিয়া, ঘানার (নক্রুমা) যা প্রভাব, পুরোনো সদস্য ভারতের তা নেই। উইলসন কেনিয়াট্টা-নিয়েরেদেরই ভয় করেন, ইন্দিরা গান্ধীকে নয়।

ওলন্দাজ শাসনের অবসানের বিরুদ্ধে ইন্দোনেশিয়ার অধিবাসীদের মুক্তি সংগ্রামে ভারত যেভাবে সাহায্য করেছে, তা আজ ইতিহাসের বিষয়। কিন্তু দুঃখের বিষয়, পরবর্তীকালে ভারত এই ঐতিহ্য রক্ষা করতে পারে নি। আলজিরিয়ার মুক্তি সংগ্রামের ব্যাপারে ভারতের ঔদাসীন্য আরব জগতে ক্ষোভের সঞ্চার করেছে। আফ্রিকার বিভিন্ন দেশের স্বাধীনতা আন্দোলনেও ভারত বিশেষ উৎসাহ নেয় নি। দক্ষিণ আফ্রিকার বর্ণবৈষম্যের বিরুদ্ধে ভারতের মনোভাব যথেষ্ট দৃঢ় হলেও, রোডেশিয়ার ব্যাপারে ভারত বৃটেনের ওপর সাধ্যমত চাপ দেয় নি, এই অভিযোগ রয়েছে।

ভিয়েতনামের প্রশ্নে ভারত যথেষ্ট দৃঢ়তার সঙ্গে মার্কিন আক্রমণের নিন্দা করতে পারে নি, আজ প্রকাশ্যেই এই সমালোচনা হচ্ছে। শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী এবার মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সফরের সময় ভিয়েতনামে মার্কিন নীতির বিরুদ্ধে কথা বলতে পারেন নি। ভিয়েতনামে শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য ইন্দিরা-প্রস্তাব শেষ পর্যন্ত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রেরই স্বার্থরক্ষা করবে, এ সমালোচনা হয়েছে। সোভিয়েট ইউনিয়ন, এমন কি সংযুক্ত আরব প্রজাতন্ত্র ও যুগোস্লাভিয়াও ইন্দিরা-প্রস্তাব অগ্রাহ্য করেছে। ভারতের আভ্যন্তরীণ রাজনীতি ও অর্থনীতিতে মার্কিন নির্ভরতার ফলেই এই অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে।

বিভিন্ন ক্ষেত্রে ভারতের বৈদেশিক নীতি ব্যর্থ হলেও, ভারতের অনুসৃত বৈদেশিক নীতির মূল আদর্শ কিন্তু অভ্রান্ত বলে প্রমাণিত হয়েছে। পঞ্চশীল ও জোটনিরপেক্ষতার আদর্শ আজ সর্বত্র স্বীকৃতিলাভ করেছে। ভারত জোটনিরপেক্ষ না হয়ে ইংগ-মার্কিন কিংবা সোভিয়েট শিবিরে যোগ দিলে অবস্থা আরও খারাপ হত। তাহলে ব্যর্থতার কারণ কি? আদর্শ ঠিক, অথচ সর্বত্র ব্যর্থতা?

কারণ, বৈদেশিক নীতির আদর্শকে ঠিকমত কার্যে পরিণত করা হচ্ছে না। স্বাধীনতার পর প্রথম দিকে যে সম্ভাবনা দেখা দিয়েছিল, পরবর্তীকালে তা নষ্ট হয়েছে। সরকারের নিষ্ঠা ও দৃঢ়তার অভাবই প্রধানত এর জন্য দায়ী। জোটনিরপেক্ষতার আদর্শ তখনই সফল হতে পারে যখন রাষ্ট্র আত্মনির্ভর হতে পারে। খাদ্যের জন্য মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের দয়ার ওপর নির্ভর করব, আর ভিয়েতনামের ব্যাপারে মার্কিন নীতির নিন্দা করব, এ বেশিদিন চলে না। সুতরাং ভারত যদি সম্পূর্ণ নিজের পায়ে দাঁড়াতে পারে, বা দাঁড়াবার জন্য চেষ্টা করে, এবং এই ব্যাপারে কেবল ইংগ-মার্কিন গোষ্ঠীর ওপর নির্ভর না করে সোভিয়েট সাহায্যের ওপরও নির্ভর করে, তবে সার্থকভাবে জোটনিরপেক্ষতার প্রয়োগ সম্ভব।

সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে যেখানে যে সংগ্রাম হবে দ্বিধাহীনভাবে ভারতকে তার প্রতি সমর্থন জানাতে হবে। না হলে নবজাগ্রত দেশগুলির বন্ধুত্ব হারাতে হবে।

নিজেদের স্বার্থরক্ষা করতে হবে। আর শক্তি সঞ্চয় করতে হবে। বারে বারে দেখা গেছে, যার শক্তি আছে, আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে তারই প্রভাব রয়েছে। দুর্বল দেশরক্ষাও করতে পারে না, তার বৈদেশিক নীতিরও কোন দাম নেই।

যাঁরা কার্যক্ষেত্রে বৈদেশিক নীতির রূপায়ণ করবেন, কূটনীতিক পদাধিকারী ও কর্মচারীমণ্ডলী, তাঁদের দক্ষতা ও নিষ্ঠার ওপর এর সাফল্য অনেকখানি নির্ভর করে। ভারতের কূটনীতিক দপ্তরের সুনাম একেবারেই নেই। এদিকে সর্বাগ্রে নজর দেয়া প্রয়োজন।

গণতন্ত্র, সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধিতা ও শান্তির সপক্ষে বৈদেশিক নীতি; নীতি সম্পর্কে স্বচ্ছ ও স্পষ্ট ধারণা; এবং নীতিকে কার্যকরী করার জন্য নিষ্ঠা সহকারে চেষ্টা—এই তিনের সংমিশ্রণ হলে ভারতের বৈদেশিক নীতি নিশ্চয়ই সফল হবে।

যোগসাধনার নিগূঢ় রহস্য সুপ্রকাশ—যোগসাধনায় দীর্ঘজীবন লাভের নির্দেশ

যোগশাস্ত্র

সিদ্ধযোগিগণপ্রদত্ত পুঁথিদৃষ্টে সুসংস্কৃত বড় অক্ষরে মূল—সরল বিশদ বঙ্গানুবাদ সংযুক্ত পরিবর্ধিত প্রামাণ্য অষ্টম সংস্করণ দীর্ঘকাল পরে বহু সাধনায় প্রকাশিত। ১। শিবসংহিতা, ২। ঘেরণ্ডসংহিতা, ৩। ব্রহ্মসংহিতা, ৪। অষ্টাবক্রসংহিতা, ৫। ষটচক্রনিরূপণম্, ৬। দত্তাত্রেয় যোগরহস্যম্, ৭। পরাশরপ্রোক্ত যোগোপদেশ। অতি দুষ্প্রাপ্য সাতখানি যোগগ্রন্থের অভাবনীয় সমাবেশ। যে সকল গুহ্য সাধনতত্ত্ব এতদিন হিমালয়ের নিভৃত গুহায় নিহিত ছিল—যে সকল মহাপুরুষের উপদেশ—সাধন নির্দেশ উপেক্ষা—অবহেলা করিয়া আমরা দিন দিন ক্ষীণ, নানা রোগাক্রান্ত স্বল্পজীবী, অল্পভোগী হইতেছি, একমাত্র যোগশাস্ত্র পাঠে—অনুশীলনে—সাধনায় তাহার প্রতিকার সম্ভব। হিন্দু সন্তান আবার আর্যগণের বলবীর্য, প্রতিভা-দীর্ঘায়ুর অধিকারী হইয়া নীরোগ, সুস্থ শরীরে জীবনসংগ্রামে সাফল্য লাভ করিয়া মোক্ষসাধনায় আত্মনিবেদন করিবে। যোগের প্রভাবে মানুষ দেবতা হয়। প্রথমে সহজ ক্রিয়া, সংযম, নিয়ম, আসন, প্রাণায়াম, প্রত্যাহার, ধ্যানধারণা, ধৌতি, শুদ্ধি, শৌচাচার, দেহতত্ত্ব অবগতি, মনঃশুদ্ধি, বাহ্য ও অন্তরশুদ্ধি প্রভৃতি সকল প্রক্রিয়ার অনুষ্ঠানের পর জ্যোতিঃ ধ্যানে—দর্শনে আত্মার সহিত পরমাত্মার সংযোগ সাধনে সিদ্ধিলাভ সুনিশ্চিত। অশেষ মঙ্গলনিলয় দেবাদিদেব মহাদেব উপদিষ্ট—সিদ্ধঋষিগণ অনুষ্ঠিত যোগশাস্ত্র অনুশীলনে—সাধনায় যোগের অজস্র বিভূতিলাভ সম্ভব হইবে। তুলট কাগজে সুন্দর নির্ভুলভাবে মুদ্রিত প্রামাণ্য অষ্টম সংস্করণ। মূল্য ঃ তিন টাকা।

বসুমতী প্রাইভেট লিমিটেড ঃ
১৬৬, বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী স্ট্রীট, কলিকাতা-১২

স্বাধীনতা-উত্তরপর্বে বাংলার রঙ্গমঞ্চ

অশোক সেন

নাট্যাচার্য শিশিরকুমার বলেছেনঃ 'সর্বদেশে, সর্বকালে—গ্রীস, প্রাচীন ভারত, সেক্সপীয়রের ইংলন্ড, গ্যায়টে শিলারের জার্মানী,—যে দেশে যখন কর্ম-প্রেরণা জাগিয়াছে, তখন তাহাই মূর্ত্ত হইয়া উঠিয়াছে সেই দেশের নাট্য-সাহিত্যে এবং সজীব হইয়া উঠিয়াছে সেই দেশের রঙ্গমঞ্চে নটের অভিনয়ে। ক্ষীরোদপ্রসাদের 'প্রতাপাদিত্য,' 'নন্দকুমার', 'পলাশীর প্রায়শ্চিত্ত', গিরিশচন্দ্রের 'সিরাজদ্দৌলা', 'মীরকাশেম', 'ছত্রপতি',—বাংলাদেশে একদিন যে বাণী বহন করিয়া আনিয়াছিল—তাহা সারা ভারতবর্ষের রাষ্ট্রীয় আকাশকে আজও পর্যন্ত উদ্ভাসিত করিয়া রাখিয়াছে।' গিরিশ-যুগের রঙ্গমঞ্চ বা শিশির-যুগের রঙ্গমঞ্চ (প্রাক্ স্বাধীনতা পর্বের) উন্নতির চরমশীর্ষে উঠতে পেরেছিল এই কারণে যে, তখন পরাধীনতা সত্ত্বেও জাতির ভেতর ছিল প্রাণবন্ততা, ছিল কর্মপ্রেরণা। এ সবেরই প্রতিফলিত রূপ দেখা যেত রঙ্গমঞ্চে অর্থাৎ নাটকে, অভিনয়ে, এবং দর্শকদের ভাল জিনিষ গ্রহণ করবার ক্ষমতায়। স্বাধীনতা পর্বের শুরু থেকেই তো বাঙালী জাতটাকে নানাভাবে পিষে মেরে ফেলা হচ্ছে। প্রথমে হল পার্টিশন—দেশের অন্যান্য অংশের উপকারের জন্য পূর্ব বাংলাকে কেটে পাকিস্থানকে উপহার দেওয়া হোল। কিন্তু বিগত ১৮ বছর ধরে ক্রমাগত উদ্বাস্তুর দল বাধ্য হয়ে পূর্ব বাংলা ত্যাগ করে পশ্চিম বাংলায় আশ্রয় নেবার জন্য এসে ভিড় জমাচ্ছে। এ ছাড়া তাদেরই বা উপায় কি?

ভারত যখন স্বাধীন হয় তখন আমাদের ইংরাজ তহবিলে জমা ছিল প্রায় তিন হাজার কোটি টাকা। তাছাড়া ঋণ বাবদ এবং নানাধরণের সাহায্যের খাতেও বহু টাকা আমরা ইওরোপ-আমেরিকার কাছ থেকে পেয়েছি। এ সব টাকা বিগত আঠারো বছরে সম্পূর্ণে উড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। শিক্ষা, কৃষি এবং শিল্পের ক্ষেত্রে আমরা কতদূর এগোতে পেরেছি? আজ শুধুমাত্র নাম-সই-করা শিক্ষিতের সংখ্যা সারা ভারতে শতকরা ২৪/২৫ জন। কৃষির উন্নতি যা হয়েছে তা তো দেশের খাদ্যের অবস্থা থেকেই বোঝা যায়। সারা পৃথিবীর কাছে আজ আমাদের এই কারণে ভিক্ষাপাত্র নিয়ে ঘুরে বেড়াতে হচ্ছে।

আর ইন্ডাস্ট্রিয়াল ডেভলপ্মেন্টের দিক থেকে বিচার করলে এখনও আমরা আণ্ডার-ডেভেলপ্ড্ জাতি বলেই বিবেচিত।

দেশের লোকের ক্ষুধার অন্ন নেই, পরবার বস্ত্র নেই, মাথা গোঁজবার ঠাঁই নেই। এ অবস্থায় আমাদের দেশে এ সময় কর্মপ্রেরণা জাগবে কোথা থেকে? তাই মঞ্চের অবস্থাও অতীব শোচনীয়—গিরিশ-যুগে বা শিশির-যুগে মঞ্চ যেমন সর্বদিক থেকেই উন্নতির চরমশীর্ষে উঠেছিল আজ তা আমরা আশাও করতে পারি না।

আমার অনেক সময়েই মনে হয় যে আজকের দিনের ভারতের জনসাধারণের অবস্থা অনেকটা 'ওয়েটিং ফর গোডো' নাটকের ট্র্যাম্প দুটির মত। কোথা থেকে যে আমরা এসেছি এবং কোথায় যাব তার কোন নির্দেশ নেই আমাদের জীবনে। জীবনের এমন একটা অবস্থায় আমরা এসে দাঁড়িয়েছি যেখানে সামনের দিকে তাকাবার আমাদের কিছুই আর নেই। মরুভূমিতে মরীচিকা যেমন পথিককে

শিশিরকুমার ভাদুড়ী

প্রতারিত করে তেমনি এক মিথ্যা আশা নিয়ে আমরা আত্মপ্রতারণা করে চলেছি যে একদিন সুদিন আসবে। প্রতিদিনই এইভাবে সেই অনাগত সুদিনের প্রতীক্ষায় কাটছে এবং একদিনও সে-সুদিন আসছে না। আর এই আশার দীর্ঘ প্রতীক্ষাটাই আমাদের সমাজব্যবস্থার সমস্ত নোংরামিকে চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিচ্ছে।

সমাজ এবং দেশের যখন এই অবস্থা সে সময় বহুরূপীর ইডিপাস নাটকটি মঞ্চস্থ করা নিয়ে যথেষ্ট প্রশ্ন উঠতে পারে বিদগ্ধ দর্শকদের মনে। ইডিপাস পৃথিবীর নাট্যসাহিত্যের মধ্যে অন্যতম শ্রেষ্ঠ নাটক বলে বিবেচিত। এ নাটকের অভিনয় বা প্রযোজনা বহুরূপী কতোটা সার্থকতার সঙ্গে করেছেন সে নিয়ে আমি এখানে আলোচনা করতে চাই না। কিন্তু নাটকের যা মূল বক্তব্য—অর্থাৎ মানুষ ভাগ্যের হাতের ক্রীড়নক মাত্র তা ঠিক এই সময়ে জনসাধারণের সামনে তুলে ধরাটা বিধেয় হয় নি। আজকের দিনে সেই ধরণের নাটক দর্শকদের কাছে অভিনয় করা উচিৎ যার অনুপ্রেরণায় মানুষের মনের সুপ্ত পুরুষকার আবার জেগে উঠে তাকে কর্মের পথে পরিচালিত করে—তার মোহনিদ্রা ভাঙিয়ে দেয়, তাকে বুঝতে শেখায় যে ভাগ্যের চেয়ে পুরুষকারের স্থান অনেক উচ্চে।

শুনতে পাচ্ছি এতদিনে ক্যাথিড্রেল রোডে রবীন্দ্রস্মরণী ভবনে ন্যাশনাল থিয়েটার প্রতিষ্ঠিত হবে। এ সম্বন্ধে শিশিরকুমারের বিখ্যাত উক্তিটি আজ মনে পড়ছে। তিনি বলেছিলেন—'আমি জীবনে যা কিছু করেছি, দেশমাতৃকার সেবার জন্যই করেছি। ......আমি চেয়েছি নাটকের মাধ্যমে, মঞ্চের মাধ্যমে দেশের সেবা করতে, দেশের মুখে হাসি ফোটাতে।......আমি চেয়েছিলাম জাতীয় নাট্যশালা গড়ে তুলতে। কিন্তু তা পারি নি।'

জাতীয় নাট্যশালা প্রতিষ্ঠা হলে সত্যিই সরকারের তরফ থেকে একটা কাজের মত কাজ করা হবে। কিন্তু সেই সঙ্গে এটাও মনে রাখা দরকার যে, অযোগ্য কোন ব্যক্তিকে এর ডিরেক্টর নিযুক্ত করলে জাতীয় নাট্যশালা স্থাপনের আসল উদ্দেশ্যই ব্যর্থ হয়ে যাবে। যাঁরা সত্যিকার ভাল ভাল প্রডাকসন করে প্রতিষ্ঠা এবং যশ অর্জন করেছেন—তাঁদের ভেতর থেকেই কাউকে নির্বাচন করা দরকার। কোন তথাকথিত প্রডিউসার অর্থাৎ যাঁর নাটকগুলো দিনের পর দিন ফ্লপ করেছে এবং দর্শকদের বিদ্রূপ ছাড়া কিছু পায় নি—ডিরেক্টর নিযুক্ত হলে নাট্যশিল্পের কোনদিক থেকেই কোনোরকম উন্নতিসাধন করা সম্ভব হবে না।

তাছাড়া জাতীয় নাট্যশালা প্রতিষ্ঠিত হলে সুযোগ্য পরিচালকের অভাব তো কলকাতা শহরে হবার কথা নয়। এই মুহূর্তে যে তিনটি নাম আমার স্মরণে আসছে—রঙ্গমঞ্চ এবং ছায়াচিত্র জগতে এঁদের তো আর নতুন করে পরিচয় দেবার কিছু নেই।—আমি প্রবীণ এবং সর্ববিষয়ে মঞ্চ এবং চিত্রজগতের অভিজ্ঞ শ্রীযুক্ত প্রফুল্ল রায়, শ্রীমধু বসু ও শ্রীযুক্ত রাধামোহন ভট্টাচার্যের কথাই বলছি—এ ছাড়া বয়স হলেও এখনও নরেশবাবু বেঁচে আছেন, আরও অনেক সুযোগ্য ব্যক্তি আছেন। যেমন শ্রীঅর্দ্ধেন্দু মুখার্জী এবং নবীনদের মধ্যে শ্রীযুক্ত উৎপল দত্ত। যেসব নাম করলাম তাঁদের যে কোন একজনকে কলকাতার ন্যাশনাল থিয়েটারের পরিচালক নিযুক্ত করলে এখানকার জাতীয় রঙ্গমঞ্চ সর্বদিক দিয়ে সুন্দরভাবে বিকশিত হয়ে ফুটতে পারে।

কিন্তু তা তো হবার নয়—যতদিন অবধি বাংলার রাজনীতিক্ষেত্রে শুম্ভ-নিশুম্ভের পালা-কীর্তন চলেছে ততদিন কোনদিক থেকেই বাংলা দেশের কোন রকম উন্নতির সম্ভাবনা নেই। সুতরাং পূর্ববর্ণিত ঐ অযোগ্যতম ব্যক্তিটি জাতীয় রঙ্গমঞ্চের পরিচালকরূপে নিযুক্ত হবেন এবং গিরিশচন্দ্র, শিশিরকুমারের ঐতিহ্যমণ্ডিত বাংলা নাট্যমঞ্চকে জাহান্নমের পথে পরিচালিত করবার প্রয়াস পাবেন। তবে একমাত্র আশার কথা—বাংলা নাট্যমঞ্চের জন্মকাল থেকে বহু বাধা-বিঘ্ন এবং ঝড়-ঝাপ্টার সামনাসামনি তাকে দাঁড়াতে হয়েছে এবং আজও পর্যন্ত বাংলা রঙ্গশালা সগৌরবে নিজ দায়িত্ব বহন করে চলেছে। সমাজের অবস্থার বিপর্যয়ে গিরিশচন্দ্র-শিশিরকুমারের পরিচালিত অগ্রগতি কিছুটা হয়ত বর্তমানে ব্যাহত হয়েছে তবে একথা অকুণ্ঠিতচিত্তে আমি বলব যে গিরিশচন্দ্র শিশিরকুমারের উত্তরসাধকের আবির্ভাবের দিন আসবেই আসবে এবং শত সরকারী প্রতিকূলতাসত্ত্বেও বাংলা রঙ্গমঞ্চ আবার পূর্বেকারমত অব্যাহতগতিতে জোর কদমে এগিয়ে চলবে।

স্বাধীনতা-উত্তর বাংলা রঙ্গমঞ্চের নানাদিক বিশ্লেষণ করে যে কথাগুলো আমার মনে হয়েছে তা হচ্ছে এই—

বর্তমানে বাংলা স্টেজকে দুটি শ্রেণীতে ভাগ করা

এক, যাঁরা নিয়মিতভাবে বৃহস্পতি, শনি ও রবিবার নিজস্ব মঞ্চে অভিনয় করে থাকেন, যেমন বিশ্বরূপা, স্টার, রঙমহল, মিনার্ভা ও এই কিছুদিন আগে পর্যন্ত শৌভনিক-দল—বর্তমানে সৌভনিকের মঞ্চটি আগুনে ভস্মীভূত হবার পর পুনর্গঠন করা হচ্ছে।

দুই, যাঁরা অনিয়মিতভাবে অন্যের স্টেজ ভাড়া নিয়ে প্রায়ই অভিনয় করেন এবং বাংলার বর্তমান নাট্য আন্দোলনকে যাঁরা দ্রুতগতিতে সর্বদিক দিয়ে এগিয়ে নিয়ে আসছেন।

বিশ্বরূপা, স্টার এবং রঙমহল ব্যবসার দিক থেকেই প্রধানত থিয়েটার করেন বলে এসব মঞ্চে নাটক বিষয়ে বিশেষ পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালানো সম্ভব হয় না। সাধারণ লোককে 'এন্টারটেন্ট' করে নাটক যাতে ভালো হাউস পায় সে সম্বন্ধে এঁদের সজাগ থাকতে হয় সব সময়ে। অবশ্য আঙ্গিকের দিক দিয়ে কিছু কিছু নতুনত্বের চেষ্টা বিশ্বরূপা থিয়েটার মাঝে মাঝে করেন।

নাটক এবং প্রডাকসনের অভিনবত্বের জন্য সর্বদিক দিয়ে আজ এগিয়ে এসেছেন মিনার্ভা থিয়েটার। এঁদের কল্লোলকে আমি ঠিক প্রচারধর্মী নাটক বলতে রাজী নই। এ নাটককে এতটা অন্তর থেকে গ্রহণ করেছেন দর্শকেরা এই কারণে যে গভীর দেশাত্মবোধের দিকটাই সব কিছুকে ছাপিয়ে উঠেছে কল্লোলে। বৃটিশ আমলে পরাধীন ভারতীয়দের কি অবস্থা ছিল, তা অতি সুক্ষ্মভাবে দেখানো হলেও দর্শকদের অন্তরে গিয়ে স্পর্শ করেছে।

দ্বিতীয় শ্রেণীর নাটুকে দলেরাই অর্থাৎ যাঁরা অন্যের স্টেজ ভাড়া নিয়ে অভিনয় করেন, নাটক সম্বন্ধে বহু রকমের পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে চলেছেন কয়েক বছর থেকে। এঁদের দ্বারা অভিনীত নাটককে সাধারণত চারটি শ্রেণীতে ফেলা যায়। যথা,—

১। বিদেশী নাটকের বাংলা অনুবাদ—যেমন বহুরূপীর 'ইডিপাস,' সন্ধ্যানীড়ের 'এ ডলস হাউস', 'আই হ্যাভ বীন হিয়ার বিফোর' ইত্যাদি।

২। বিদেশী নাটকের বাংলা রূপায়ণ—সৌমিত্র চ্যাটার্জির 'বিধি ও ব্যতিক্রম', (রেখট) চতুর্মুখের 'জনৈকের মৃত্যু', বহুরূপীর 'পুতুলখেলা', নান্দীকারের 'নাট্যকারের সন্ধানে ছটি চরিত্র' ইত্যাদি।

৩। মৌলিক বাংলা নাটক—রূপকারের 'ব্যাপিকা বিদায়', 'মুক্তধারা,'

'রথের রশি', ক্যালকাটা থিয়েটারের 'মরা চাঁদ', প্রাচীতীর্থের ঋত্বিক ঘটক লিখিত 'সাঁকো', লোকসংস্কৃতি সংঘের 'চরকা-শেম'। শেষ দুটি নাটকে শ্রীহেমাঙ্গ বিশ্বাসের সংগীত অতি উচ্চাঙ্গের হয়েছে।

৪। উপন্যাসের বাংলা নাট্য-রূপায়ণঃ—যেমন, গোরা, ঘরে-বাইরে, প্রভৃতি বিখ্যাত উপন্যাসের নাট্যরূপ অনেকেই মঞ্চস্থ করেছেন।

নান্দীকারের 'নাট্যকারের সন্ধানে ছটি চরিত্র' যথেষ্ট সুখ্যাতি এবং যশ অর্জন করেছে। একথা নাট্যরসিকদের আজ আর অবিদিত নেই। এ'দের 'মঞ্জরী আমের মঞ্জরী'-ও জনপ্রিয়তা লাভ করেছে বটে, কিন্তু এই প্রসঙ্গে আমাদের একটা কথা ভেবে দেখা দরকার। মূল নাটক চেখভের 'দি চেরী অর্চার্ডের টাইটল পোজে বলা হয়েছে নাটকটি হচ্ছে 'এ কমেডি ইন ফোর এ্যাক্টস।' মঞ্জরী আমের মঞ্জরীতে এই কমেডির মূল ভাবটা অভিনয়ে ফুটে উঠেছে কি? এদিক দিয়ে কতোটা সাফল্য লাভ হয়েছে তারই ওপর নির্ভর করে নাটকটির সার্থক মঞ্চরূপায়ণ সম্বন্ধে বিচার করতে হবে।

চতুর্মুখের 'জনৈকের মৃত্যু' (মূল নাটক ঃ ডেথ অভ এ সেলসম্যান) এবং 'নীল রংয়ের ঘোড়া' সর্বশ্রেণীর দর্শক-দের অকুণ্ঠ প্রশংসা অর্জন করেছে।

তা ছাড়া নক্ষত্রের 'মৃত্যুসংবাদ' এবং চতুরঙ্গের 'বাবু'-ও নাম করেছে। ক্যালকাটা থিয়েটারের 'মরা চাঁদ' প্রডাক-সনটি ভাল হয়েছে।

রূপকারের 'ব্যাপিকা বিদায়'-ও আধুনিককালের একটি সেরা প্রডাক-সন হিসাবে প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে। এদের 'কালের যাত্রা'র অভিনয় আমার তেমন ভালো লাগে নি। রাবীন্দ্রিক নাটকের মূল সুর এর মধ্যে ঠিক মত ফুটে ওঠে নি।

শৌভনিকের মুক্তাঙ্গন রঙ্গমঞ্চটি গত ২২শে মে আগুন লেগে একেবারে ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়েছে। এই মঞ্চটি ছিল সাম্প্রতিক বাংলা নাটকের পরীক্ষা-নিরীক্ষা করবার একমাত্র রঙ্গালয়। বেশির ভাগ প্রোগ্রেসিভ নাট্যসংস্থাই মুক্তাঙ্গনকে অভিনয় করবার জন্য বেছে নিতেন। কারণ এখানকার স্টেজ ভাড়া অন্যান্য স্টেজের তুলনায় অনেক কম এবং গত ছ' বছরে ক্রমে ক্রমে এখানে একটি দর্শকশ্রেণী গড়ে উঠেছিল তাঁরা নিয়মিতভাবে এখানে থিয়েটার দেখতে আসতেন।

শৌভনিক দলের অভিনয় দেখে 'আহা মরি' করবার মত কিছু আমি পাই নি। তবে একথাও ঠিক এ'দের অভিনয়ের একটা স্ট্যান্ডার্ড আছে, যাকে সহজ কথায় বলা যেতে পারে 'Just up to the strated'. তাছাড়া আর একটা কথা—যে সব নাটক এ'রা মঞ্চস্থ করেন বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই সেগুলিকে 'গুড ড্রামা' হিসাবে অভিহিত করা যায়। নিয়মিতভাবে রবীন্দ্রনাথের নাটক এক এ'রাই বোধ হয় মঞ্চস্থ করেছেন।

শৌভনিকের নিজস্ব প্রডাকসনের ভেতর আমার সবচেয়ে ভাল লেগেছিল 'যা নয় তাই' এবং ল'ল'না।

এ'দের 'ঝাঁসীর রাণী' সত্যিকার একটি ঐতিহাসিক আবহাওয়ার সৃষ্টি করেছিল সারা প্রেক্ষাগৃহে। দৃশ্যসজ্জা হয়েছিল সাংকেতিক ধরণের এবং তার জন্য নাটকীয় গতি কোন সময়েই এতটুকু ব্যাহত হয় নি।

শৌভনিকের 'গোরা' নাটকের সমগ্র নাট্যরূপায়ণ আমার ভাল লাগে নি। কিন্তু নাম ভূমিকায় শ্রীসুব্রত সেনশর্মার অভিনয়ে 'গোরা' চরিত্রের ব্যক্তিত্ব সুন্দরভাবে ফুটে উঠেছিল। 'তাসের দেশ' নাটকটিকে এ'রা অভিব্যক্তিবাদী ভঙ্গীতে মঞ্চস্থ করেছিলেন বলে অনেকে এই অনভ্যস্ত স্টাইলের অভিনয় ঠিক মত গ্রহণ করতে পারেন নি। কিন্তু আমার মনে হয় নাটকের মূল ভাবটি ভারী স্পষ্টভাবে ব্যক্ত হয়েছিল এই এক্সপ্রেসোনিস্টিক স্টাইলের প্রডাক-সনে।

শৌভনিকের মুক্তাঙ্গন মঞ্চটি পুনর্গঠিত না হওয়া পর্যন্ত পশ্চিম-বাংলার নবনাট্য আন্দোলন বিশেষভাবে ব্যাহত হবে এ কথা বলাই বাহুল্য। দক্ষিণ কলকাতার বড় রাস্তার ওপর এবং সস্তা ভাড়ায় এই একটিমাত্র রঙ্গমঞ্চ ছিল যেখানে ভাল ভাল নাট্য-সংস্থা এই কয়েক বছর ধরে নানাধরণের নাটক দেখিয়ে গেছেন নাট্যবোদ্ধা দর্শকদের।

আধুনিক বাংলা নাটক সম্বন্ধে একটা অভিযোগ প্রায়ই শোনা যায়। আজকাল নাকি মৌলিক নাটক রচনা প্রায় বন্ধ হয়ে গেছে। যে-সব নাটক আজকাল রচিত হয় তার বেশির ভাগই নাকি হয় বিদেশী নাটকের অনুবাদ না হয় তার বেশির ভাগ বিদেশী নাটককে অবলম্বন করে লেখা। কিন্তু তাতে দোষের কি আছে? আজকের দিনের নাট্যবিদেরা প্রায় সবাই বুঝতে পারছেন যে, পুরানো দিনের ভঙ্গীতে আর নাটক লেখা চলবে না। কি ফর্মে এখন নাটক লেখা হবে তাও আবিষ্কৃত হয় নি। সুতরাং নতুন ফর্মের আবিষ্কারের জন্য যদি ইয়োরোপীয় নাটকের অনুবাদ বা ভাবানুবাদ করে আমরা নিজেদের পাকাপোক্ত করে তুলতে পারি তবে, ভবিষ্যতে আপনা থেকেই মৌলিক নাটক রচিত হতে থাকবে। তা ছাড়া নাটকের ব্যাপারে এখনও ইয়োরোপের কাছ থেকে অনেক কিছু আমাদের শেখবার আছে।

সেক্সপীয়রের নাটক সাগরবৎ, কালিদাসের নাটক নন্দনকাননতুল্য।
—বঙ্কিমচন্দ্র

গল্পাংশের সংক্ষিপ্ত অনুবাদ নহে। মহাকবির নাট্য-মাধুর্যের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া অনুবাদ।

সেক্সপীয়র গ্রন্থাবলী

(প্রথম ভাগ)

—এই ভাগে আছে—

১। ম্যাকবেথ—অনুবাদক মনীন্দ্রনাথ ঘোষ।
২। মনের মতন (As You Like It)—অনুবাদক সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়।
৩। আণ্টনী ক্লিওপেট্রা—অনুবাদক দেবেন্দ্রনাথ বসু।
৪। রোমিও জুলিয়েট—অনুবাদক হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।
৫। ভেরোনার ভদ্রযুগল—অনুবাদক সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়।
৬। জুলিয়াস সীজার—অনুবাদক জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর।

একত্রে মূল্য সাড়ে তিন টাকা

(দ্বিতীয় ভাগ)

—এই ভাগে আছে—

১। ওথেলো—অনুবাদক দেবেন্দ্রনাথ বসু। (নটকবিচূড়ামণি গিরিশচন্দ্র ঘোষ সংশোধিত)
২। মার্চেণ্ট অব ভেনিস—অনুবাদক সৌরীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়।
৩। মেজার ফর মেজার—অনুবাদক ঐ
৪। সিম্বেলিন— অনুবাদক ঐ
৫। কিং লিয়র—অনুবাদক যতীন্দ্রমোহন ঘোষ।
৬। টুয়েলফথ নাইট—অনুবাদক পশুপতি ভট্টাচার্য।

একত্রে মূল্য সাড়ে তিন টাকা

বসুমতী প্রাইভেট লিমিটেড
১৬৬, বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী স্ট্রীট, কলি-১২

স্বাধীনতা-উত্তরকালের সঙ্গীত সমীক্ষা

শ্রীঅরবিন্দু চৌধুরী

ভারতের ইতিহাস সুপ্রাচীন। এর সভ্যতা ও সংস্কৃতি মহান ঐতিহ্যবাহী ও প্রাচীনত্বের গৌরবে গরীয়ান। বহু যুগ ও বহু বাধা-বিঘ্ন অতিক্রম করে ভারতীয় কৃষ্টি প্রগতির পথে প্রধাবিত হচ্ছে। যুগ-যুগান্ত কাল থেকে ভারতীয় সংস্কৃতির বিচিত্র ধারা প্রবহমাণ। রাষ্ট্র বিপর্যয়, বিদেশী শাসন-শোষণ ও কালানুক্রমণ সত্ত্বেও ভারতীয় শিল্পকলার প্রবাহ এগিয়েই চলেছে; যদিও এই ধারা মাঝে মাঝে রুদ্ধ ও ব্যাহত হয়েছে।

অন্যান্য কলা-ক্ষেত্রের ন্যায় সংগীত-কলা সম্পর্কেও এই পর্যবেক্ষণ যুক্তিযুক্ত। মুশিলম আমলে ভারতীয় সংগীতের নবজাগরণ ঘটেছিল। মুঘল-পাঠান আমলে যুদ্ধ-বিগ্রহ ও রাজত্বের উত্থান-পতন হলেও সামগ্রিকভাবে সংগীতের শতদল বিকাশ সাধিত হয়েছিল। কোন কোন সংগীত সমালোচক ভারতেতিহাসের মুশিলম যুগকে সংগীতের স্বর্ণযুগ রূপে আখ্যা দিয়ে থাকেন।

ইংরেজ আমলে ভারতীয় সংগীতের বিকাশ নানাভাবে বাধাপ্রাপ্ত হয়েছিল। কারণ বণিকের মানদণ্ড রাজদণ্ডরূপে প্রকটিত হলে পর—শুধু সংগীতকলাই নয় ভারতের সব কিছুই পরাধীনতার নিগড়ে শৃঙ্খলিত হয়েছিল। নিপীড়ক সাম্রাজ্যবাদী বৃটিশ-কুশাসনে ভারতীয় সংগীত তথা ভারতীয় শিল্প-সংস্কৃতির উন্নতি সার্বিকভাবে বিঘ্নিত হয়েছিল। অবশ্য বৃটিশ আমলে—বিশেষ করে উনবিংশ শতাব্দীর রেনেসাঁসের সময় বাংলায় সংগীতের চিন্তাধারায় নবচেতনা সঞ্চারিত হয়েছিল। ঐ সময় যে প্রতিভাবান সংগীতজ্ঞের আবির্ভাব হয়েছিল তার মধ্যে রাজা সৌরীন্দ্র-মোহন ঠাকুর, ক্ষেত্রমোহন গোস্বামী, কৃষ্ণধন বন্দ্যোপাধ্যায়, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, দ্বিজেন্দ্রলাল রায়, অতুলপ্রসাদ সেন, পণ্ডিত ভাতখণ্ডে প্রমুখ বিদ্বজ্জনমণ্ডলীর নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

মুশিলম যুগের পর বৃটিশ যুগ—তারপর এলো আমাদের ভারতের স্বাধীনতা। এই স্বাধীনতা বা স্বরাজোত্তর যুগের সাংগীতিক পরিক্রমাই আমাদের আলোচনার মুখ্য বিষয়। একথা সকলের জানা আছে যে, আমাদের স্বাধীনতা বিপ্লবের মাধ্যমে অর্জিত হয় নি। হয়েছে আপোষ আলোচনার মাধ্যমে। দেশ বিভাগের অভিশাপ মাথায় নিয়ে সমস্যা জর্জরিত ভারত তার দ্বিখণ্ডিত পঙ্গু দেহ নিয়ে খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে চলেছে।

সংগীতালোচনার মধ্যে এসব প্রসঙ্গের অবতারণা নিশ্চয় অযৌক্তিক নয়; কেন না সংস্কৃতি সমাজদেহের কোন বিচ্ছিন্ন অংগ নয়। সামাজিক ও রাজনৈতিক প্রভাব শিল্প-সংস্কৃতির সংগে অংগাংগিভাবে জড়িত। শিল্পকলা তথা সংগীতকলা সমাজ-সম্পর্ক শূন্য কোন বিমূর্ত বস্তু নয়। রাষ্ট্রনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিবেশ স্বভাবতই শিল্পকে প্রভাবান্বিত করে। ইতিহাসের এটাই নিয়ম।

আমাদের দেশ স্বাধীন হবার পর—সকলেই আশা পোষণ করেছিলেন যে, শিল্প-সংস্কৃতির ক্ষেত্রে—বিশেষ করে সংগীতের ক্ষেত্রে এক বিপুল পরিবর্তন ঘটবে। কিন্তু দুঃখের সংগে বলতে হচ্ছে যে, তার কিছুই হয় নি বা হবার লক্ষণও নেই।

উপর উপর দেখলে মনে হতে পারে যে, স্বদেশী আমলে আমাদের সংগীতের কতই না উন্নতি হচ্ছে! ব্যবসাদারী সংগীত-সম্মেলন, নিম্নরুচির চলচ্চিত্র-সংগীতের ছড়াছড়ি, অগণিত সংগীত - প্রতিযোগিতা ইত্যাদির ডামাডোলে জনসাধারণের মনে হতে পারে যে, সংগীতের কতই না উন্নতি হচ্ছে!

প্রকৃতপক্ষে যারা অন্যান্য দেশের সংস্কৃতি-বিকাশের খোঁজখবর রাখেন তাঁরা জানেন যে, কেবল হৈচৈ ও সংখ্যাধিক্যের জোরে কোন শিল্পকলার স্ব-উন্নতি সাধিত হতে পারে না। এ কথা সত্যি যে, সংগীতের সাধারণ চর্চা কিছুটা বেড়েছে; কিন্তু তা সংখ্যাগত—গুণগত নয়।

স্বার্থ সংশ্লিষ্ট রাজনৈতিক ব্যক্তিবর্গ ও আমলাতান্ত্রিক সংখ্যালঘু সুবিধাভোগী শ্রেণী ব্যতীত সবাই স্বীকার করবেন যে, আমরা আজ এক ভয়াবহ সামগ্রিক সঙ্কটের ঘূর্ণাবর্তের মধ্যে নিমজ্জিত হয়ে রয়েছি। সমগ্র দেশ আজ এক গভীর সংকটের সম্মুখীন। শিল্পকলা বা সংগীত কোন কিছুই এই সঙ্কটজনিত অক্টোপাসের পাপ-বন্ধন থেকে মুক্ত নয়।

আলোচ্য নিবন্ধে অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক সমস্যা বা সংকটের আলোচনার অবকাশ নেই। জাতীয় সংস্কৃতির বিপর্যয়ের স্বরূপও আমাদের আলোচ্য বিষয় নয়। আমাদের আলোচ্য বিষয় সংগীত-সমীক্ষা। শুধু ঐ পরিপ্রেক্ষিতেই অন্যান্য সংশ্লিষ্ট বিষয়ের প্রসংগ টেনে আনতে হল। আধুনিক সমীক্ষায় আজকের দিনে রাজনৈতিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক সমস্যাকে বাদ দিয়ে কোন চারুশিল্পের আনুপূর্বিক আলোচনা সুষ্ঠু ও সম্পূর্ণ হতে পারে বলে আমরা মনে করি না।

সংগীতের স্রষ্টা, সমঝদার ও শিক্ষার্থী হচ্ছে দেশের আপামর জনসাধারণ। কিন্তু দুঃখের বিষয় আজ সমগ্র জনগণের সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ অবর্ণনীয় দারিদ্র্য, অন্যায় অবিচার ও খাদ্যাভাবে জর্জরিত। শিল্পীর স্বাধীনতাও আজ সঙ্কুচিত। এই অপ্রীতিপদ পরিবেশে সংগীত-সরস্বতীর আরাধনা যে নির্বিঘ্নে হতে পারে না—তা যে কোনও বুদ্ধিমান ব্যক্তিই স্বীকার করবেন। জাতি আজ অন্নহীন—বস্ত্রহীন—স্বাস্থ্যহীন ও সর্বোপরি বলহীন। একনিষ্ঠ সংগীত সাধনা ও সংগীত-প্রসারের সুযোগ বা সুপরিবেশ আজ কোথায়? অনাচার-অবিচার—দুঃখ-দারিদ্র্যের ভারে আজ মানুষের সুকুমার বৃত্তি লাঞ্ছিত ও অপমানিত—এ হেন অবস্থায় সংগীতের মত ললিত শিল্পের সুস্থ বিস্তারের প্রশস্ত রাজপথ আজ কোথায়? নিরুপদ্রব জীবনযাপন করে বিশুদ্ধ সংগীত চর্চার অবকাশ আজ কোথায়?

কালোবাজারীর প্রেতাত্মা ও অর্থ-দাপট আজ শিল্পকলালক্ষ্মীর শ্বাসরোধ করতে উদ্যত। সমাজজীবন আজ একচেটিয়া পুঁজিবাদী অর্থনীতির নাগপাশে আবদ্ধ। সমগ্র দেশ আজ এক বিরাট অবক্ষয়ের মধ্য দিয়ে চলেছে। শিক্ষা, সংস্কৃতি, শিল্প, সাহিত্য সংগীত প্রভৃতি চারুকলার

উপর আজ এক অশুভ শক্তির করাল ছায়া বিরাজমান। চারুশিল্প-জগৎ আজ এক ভয়াল দৌরাত্ম্যে নিষ্পেষিত। শিক্ষা-সংস্কৃতির উপরতলায় আজ অযোগ্য ও মাঝারির মেলা। দুর্নীতি, স্বজন পোষণ ও আমলাতান্ত্রিক অপদার্থতা আজ একে অপরের হাত ধরাধরি করে চলেছে।

বাংলার সংগীত আজ তার নিজস্ব ঐতিহ্য ভুলতে বসেছে। আত্মবিস্মৃত বাঙালী আজ কাঞ্চন ফেলে দিয়ে কাচের জন্য লালায়িত। বাংলার প্রিয় সুরকার দ্বিজেন্দ্রলাল, অতুলপ্রসাদ, কান্তকবি রজনীকান্ত ও নজরুলের চিত্তহারী সুরাবলী আজ অবহেলিত ও স্বল্পশ্রুত। রবীন্দ্র সংগীতের কিছুটা সমাদর থাকলেও—তা' লঘুসংগীত রূপে রেডিও কর্তৃপক্ষের কৃপাভাজন হয়ে রয়েছে।

সচরাচর আধুনিক বাংলা গান যগীয় যে জগাখিচুড়ি মিশ্রিত সংগীত নিয়ে আজ বাঙালী মেতেছে—অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তা'তে মৌলিক সৃষ্টির নিদর্শন ও বাংলার স্বকীয়তা নেই। সেগুলি প্রায়শই সস্তা পাশ্চাত্য সংগীতের ব্যর্থ অনুকরণ বা মার্কিনী উত্তেজক গ.নের সুলভ সংস্করণ মাত্র। সৃষ্টিশীলতার মুন্সীয়ানা বর্জিত আধুনিক বাংলা গানের উপর বোম্বের ফিল্মী গানের বিকৃত ছায়া বর্তমান।

বাংলা সংগীতের প্রাঙ্গণে আজ টুইস্ট, চা-চা-চা, রক এন রোল, সুইংগ, বুগিউগি মিউজিকের তান্ডব নৃত্য সুরু হয়েছে। বাংলার অক্ষম বন্ধ্যা সুরকারবৃন্দ আজ সকরুণ সতৃষ্ণ নয়নে বোম্বের দিকে তাকিয়ে আছে। বাংলাদেশে আজ আবার এক নতুন সংস্কৃতির (আপদও বলতে পারেন) আমদানী হয়েছে। এর নাম 'ড্রেন-পাইপ' সংস্কৃতি বা 'লারেলাপ্পা' সংস্কৃতি। একে কালচার না বলে ভালচারই বলা যুক্তিসংগত। এই অশালীন কুরুচিপূর্ণ ইয়াংকি সংস্কৃতি নিয়েও আবার আমাদের কত বড়াই ও জাঁক। দেশে আজ অশালীন ও অশ্লীল সংগীতের ছয়লাপ। কুরুচিসম্পন্ন হিন্দি গানে আজ বাংলার আক.শ-বাতাস মুখরিত। তরল-লঘু যৌন আবেদনমূলক গানের প্রভাবে আজ তরুণমন বিষাক্ত। আধুনিক কবিরাও আধুনিক সুরকারদের বস্তাপচা মালের জোগানদার। অবশ্য দু-একজন যে উজ্জ্বল ব্যতিক্রম নেই সে কথা আমরা বলছি না।

এ প্রসংগে স্পষ্টভাবে ঘোষণা করা দরকার যে, আমরা সংগীতের আধুনিকীকরণের বা নবসৃষ্টির কোন মতেই বিরোধী নই। আমাদের আপত্তি শুধু নির্বল কথা ও সুরের বিরুদ্ধে। নতুনত্বের নামে ও মোহে স্থূলরুচির কথা ও সুরের আমরা পক্ষপাতী নই। আমাদের মনে রাখতে হবে যে, ভারতীয় সংগীত তথা বাংলার সংগীত সব সময়ই সৃষ্টিশীলতার ঐতিহ্য বহন করে এসেছে। এই মহামূল্য ঐতিহ্য থেকে যেন আমরা বিচ্যুত না হই। পরিতাপের বিষয়—বাংলার কাব্যসংগীত ও গীতিকাব্য সম্পদ সারা দুনিয়ায় সমাদৃত; কিন্তু আজ আমরা তার মহান ঐতিহ্য থেকেও ভ্রষ্ট হয়ে পড়েছি।

ভারতের রাগ-রাগিণী আমাদের অমূল্য উত্তরাধিকার। এর বিকাশ সাধন—এর সমৃদ্ধিকরণ আমাদের পবিত্র কর্তব্য। কিন্তু সে কর্তব্য আমরা পুরোপুরি পালন করছি বলে মনে হয় না। উচ্চাংগ বা রাগসংগীতের ক্ষেত্রে আমরা গতানুগতিকতার জাবর কেটে চলেছি। নিখিল ভারত সংগীত সম্মিলনের নামে সংগীতের ন্যক্কারজনক কালোবাজারী ব্যবসা চলেছে। আমাদের উচ্চাংগ সংগীতশিল্পীরা সংগীতের ভবিষ্যৎ নিয়ে মাথা ঘামাবার মত নির্বোধ নয়; তেল-ডাল-নুনের ব্যবসার মুনাফার মত সংগীত সম্মিলনীর স্ফীত অর্থ লাভ করেই তারা মহাখুশি। একই শহরে একই সময়ে (শীতের মরসুমে) পঞ্চদধিক নিখিল ভারত বা অখিল ভারত নামধারী সংগীত-জলসা অনুষ্ঠিত হয়; কিন্তু আশ্চর্যের বিষয়—এতে বিদগ্ধ সংগীত সমালোচকবৃন্দ কৌতুক বোধ করলেও মহফিলের উদ্যোক্তা ও তাদের অনুগ্রহ লাভে ধন্য সর্বভারতীয় শিল্পীরা বিন্দুমাত্র লজ্জাসরম বোধ করেন না। বাংলার সংগীত সম্মিলনে সুখ্যাত বাঙালী শিল্পীরা কৃপার পাত্র ও প্রোগ্রামের উমেদার মাত্র।

বিগত যুগের এনায়েত খাঁ, গিরিজাশংকর চক্রবর্তী, জ্ঞানেন্দ্রপ্রসাদ গোস্বামী, ভীষ্মদেব চট্টোপাধ্যায়, তারাপদ চক্রবর্তী প্রমুখ গুণীর ন্যায় একটি গায়ন শিল্পীও আজ বাংলায় আবির্ভূত হচ্ছে না কেন এটা নিশ্চয়ই ভেবে দেখার প্রয়োজন রয়েছে। শিল্প বাংলামাতৃকা কি আজ বন্ধ্যা? যদি তাই হয়ে থাকে; তবে এর দায়িত্ব বা দোষ কার? দু-একজন আত্মবিক্রিত শিল্পী আজ প্রচুর অর্থের অধিকারী হয়েছেন বটে; কিন্তু সমগ্র সংগীতশিল্পী সমাজ আজ বুভুক্ষু ও নিঃস্ব। অনেকে বলে থাকেন আমাদের সদাশয় সরকার সংগীতের জন্য অনেক কিছু করেছেন ও করছেন। কেন্দ্রে 'সংগীত নাটক আকাদেমী' স্থাপিত হয়েছে বটে—কিন্তু তাদের উল্লেখযোগ্য অবদান নেই বললেই চলে। মাঝে মাঝে তাঁরা পদ্মভূষণ, পদ্মশ্রী ইত্যাদি খেতাব বিতরণ করেন। কিন্তু এ'দের উপর প্রকৃত শিল্পীদের কিরূপ আস্থা বর্তমান তা স্বর্গত নাট্যাচার্য শিশিরকুমার ভাদুড়ী ও ওস্তাদ বিলায়েৎ খাঁ সাহেবের উপাধি প্রত্যাখ্যানের মধ্য দিয়েই সুস্পষ্টভাবে ফুটে উঠেছে। 'রবীন্দ্র ভারতী বিশ্ববিদ্যালয়' ও 'কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়' সংগীতের উন্নতির জন্য ডিগ্রী ও ডিপ্লোমা কোর্সের প্রবর্তন করেছেন সত্য—কিন্তু এদের উল্লেখ্য অগ্রগতি সম্পর্কে ওয়াকিবহাল মহল খুব উচ্চ ধারণা পোষণ করেন না। কুলোক ও ভুক্তভোগীরা বলেন সরকার পরিচালিত অন্যান্য জনহিতকর সংস্থার ন্যায় এগুলিও অনাচার, দুর্নীতি ও স্বজনপোষণের ঘাঁটি মাত্র।

সংগীত প্রচার প্রসারের মাধ্যমরূপে আধুনিক যুগে রেডিওর প্রভাব ও প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য। কিন্তু অল ইন্ডিয়া রেডিওর কর্তৃপক্ষ বিজ্ঞানের এই বিস্ময়কর অবদানকে সার্থকভাবে প্রয়োগ করতে পেরেছেন বলে মনে হয় না। আমাদের আকাশবাণীর সংগীত পরিবেশন সম্পর্কে যত কম বলা যায় ততই ভাল। সকলেই জানেন আকাশবাণী সরকার পরিচালিত। আকাশবাণীর সংগীত দক্ষতা ও অনুষ্ঠান পরিচালনা বিষয়ে সরকারের সমর্থক কাগজগুলির তীব্র কঠোর সমালোচনা যাঁরা পড়েন—তাঁরা ঐ জনপ্রতিষ্ঠানের কেরামতি সম্পর্কে বিশেষভাবে অবগত আছেন।

আকাশবাণী কর্তৃপক্ষের সংগীতপ্রীতি সম্পর্কে একটি মাত্র রীতির কথা উল্লেখ করলে বুঝতে পারবেন যে, আকাশবাণী সংগীতের কত বড় পৃষ্ঠপোষক। কলিকাতা বেতার কেন্দ্রের সংগীতের প্রোগ্রাম যাঁরা নিয়মিত শোনেন—তাঁরা নিশ্চয়ই লক্ষ্য করেছেন যে, ঘোষক মহাশয় গীতিকার, প্রযোজক, গ্রন্থনাকারী, রূপদাতা ইত্যাদি আরও প্রত্যেকের নাম ঘোষণা করেন—কিন্তু সংগীতের প্রোগ্রামে সংগীতস্রষ্টার অর্থাৎ সুরকারের নামটি (বোধ হয় সুরকারকে কৃতার্থ করার জন্যই) দয়া করে ঘোষণা করেন না। এ বিষয়ে মন্তব্য নিষ্প্রয়োজন—তবু প্রাণ খুলে বলতে সাধ হয়ঃ ধন্য রাজার পুণ্য দেশ। তথ্যাভিজ্ঞ মহলের নিকট

রেডিওর অব্যবস্থা সম্পর্কে অসংখ্য অভিযোগ স্তূপীকৃত হয়ে রয়েছে। রেডিও কর্তৃপক্ষের কুব্যবস্থা সম্পর্কে লিখতে গেলে সপ্তকাণ্ড রামায়ণও বুঝি অল্পায়তন বলে মনে হবে। সুতরাং অলমতি বিস্তরেণ।

এবার আসছি আমরা লোক-সংগীতের কথায়। সংস্কৃতির সংকট যখন ঘনীভূত হয়—তখন তা' সংস্কৃতির প্রত্যেক শাখাকেই স্পর্শ না করে থাকতে পারে না। সামগ্রিক সঙ্কট থেকে মুক্ত হয়ে বা বিচ্ছিন্ন হয়ে সংগীত-শিল্পের কোন বিভাগই নিরাপদ পদচারণা করতে পারে না। লোক-সংগীতের ক্ষেত্রেও তাই হয়েছে।

দেশ বিভাগের ফলে পল্লীবাংলার জনজীবন চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে গেছে। লোকসংগীত বা পল্লীসংগীত গায়ক-স্রষ্টারা আজ ছিন্নমূল উদ্বাস্তু। তাঁদের স্বাভাবিক সাংগীতিক ক্ষমতা জীবিকার্জনের অন্ধগলিতেই আজ নিঃশেষিত। আধুনিক গানের বিকৃত প্রভাব আজ বাংলার অতুল সম্পদ লোকসংগীতকে গ্রাস করতে উদ্যত। সংস্কৃতির পাণ্ডারা ও সরকারের সংস্কৃতিবিশারদ আমলারা এদিকে দৃষ্টি দেবার মত সময় করে উঠতে পারেন না।

লোকসংগীত বা পল্লীগীতি বাংলার একান্ত নিজস্ব বিভব। মহামতি গ্যেটের ভাষায়ঃ

"Folk tale is the father of all fictions and folk-song is the mother of all poetry.."

প্রকৃতপক্ষে পল্লীর জনগণই লোক-সংগীত স্রষ্টা। পল্লীর সৌন্দর্যমণ্ডিত প্রকৃতি-ভাণ্ডার থেকেই 'সুরের সুরধুনী বহিয়া যায়।' তাই অন্যতম রুশ সুরকার গ্লিঙ্কা বলেছেন ঃ "It is the people who create music, we only arrange it."

বস্তুত লোকসংগীতই জাতীয় সংস্কৃতি বিকাশের প্রধান মাধ্যম ও বাহন। কিন্তু ক্ষোভের বিষয়—স্বাধীন ভারতে লোকসংগীত ও লোক-শিল্পীরা আজ অবহেলিত—নির্যাতিত ও মর্যাদাহীন। আর্থিক নিষ্পেষণে আমাদের লোকশিল্পীরা আজ সাধনা-চ্যুত হ'তে বসেছে।

স্বদেশী আমলে সংগীত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা অবশ্য কিছু বেড়েছে এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই—কিন্তু বাস্তব অভিজ্ঞতায় মনে হয় না যে, এতে সংগীতের উৎকর্ষ বহুল পরিমাণে সাধিত হচ্ছে। আজ আমাদের ডিগ্রী ও ডিপ্লোমার মোহের আর অন্ত নেই। একই ব্যক্তি 'সংগীতপ্রভাকর' ও 'সংগীত বিশারদ' উপাধিতে ভূষিত হয়েও না পারছেন জীবিকার্জন করতে না পাচ্ছন প্রকৃত শিল্পীর মর্যাদা—না পারছেন সুষ্ঠুভাবে একটি রাগ রূপায়ণ করতে। সংগীত বিদ্যালয়ের ব্যবসা খুলে কেউ কেউ অবশ্য দু'পয়সা করে নিচ্ছেন বটে; কিন্তু তাতে সংগীতের সামূহিক উন্নতি হচ্ছে অতি অল্পই। অবশ্য সব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানই যে ব্যর্থ হয়েছে বা সবই যে নিম্নমানের এমন কথা আমরা বলছি না। কিছু কিছু ভাল শিক্ষক ও শিক্ষার্থী এই প্রতিকূল অবস্থার মধ্যদিয়েও তাঁদের নিজ নিজ দায়িত্ব যথাসম্ভব পালন করে যাচ্ছেন।

সংগীতের জগতে আজকাল বেশ কিছু সাংস্কৃতিক বিনিময় (cultural exchange) হচ্ছে। এতে ভারতীয় সংগীত পাশ্চাত্য দেশে প্রচারিত হ'বার সুযোগ পাচ্ছে এবং পাশ্চাত্য সংগীত এ দেশের সংগীতা-মোদী জনসাধারণের নিকট পেঁছে দেবার একটা সুযোগ এসেছে। আমরা মনে করি এ ধরণের সংগীত-বিনিময়ের একটা নিশ্চিত সুফল ফলার দিক রয়েছে। কিন্তু এগুলি সচরাচর সরকারী পর্যায়ে অনুষ্ঠিত হয় ব'লে এবং সংশ্লিষ্ট শিল্পে অজ্ঞ ও অযোগ্য আমলাদের উপর ভার দেয়া হয় ব'লে এতে সত্যিকারের সুফল আদৌ পাওয়া যায় না। তথাকথিত উপরতলার লোকেরাই এর সুযোগ গ্রহণ করে থাকে। জনসাধারণ বা প্রকৃত সংগীত-শিল্পীদের সংগে এ ধরণের অনুষ্ঠানের কোনও যোগাযোগ ঘটে না। আমলা-তান্ত্রিক ধৃষ্টতা আমাদের দেশে কতদূর অবাধ হ'তে পারে তার একটি জাজ্বল্যমান উদাহরণ দিয়ে এ প্রসংগের শেষ করছি।

কিছুদিন আগে সরকারী ব্যবস্থা-পনায় 'নিউ এম্পায়ার' রংগমঞ্চে বিশ্ববিখ্যাত সোভিয়েট ব্যালের অনুষ্ঠান হ'য়ে গেল। সেখানে সরকারী জাঁক-জমক ও আমলাতান্ত্রিক খবর-দারির কোন কিছুই কমতি ছিল না। কিন্তু সহৃদয় পাঠকবর্গ বিশ্বাস করতে চাইবেন না যে, সে অনুষ্ঠানে অনেক হোমরাচোমরা নিমন্ত্রিত হ'বার সুযোগ লাভ করলেও আন্তর্জাতিক খ্যাতি-সম্পন্ন নৃত্যবিদ শ্রীউদয় শঙ্কর (যিনি বর্তমানে কলিকাতাবাসী) সেই অনুষ্ঠানে আমন্ত্রিত হন নি। আর কর্তাব্যক্তিদের যোগসাজসে ওখানে যে টিকিটের চালাও চোরাকারবারের ব্যবস্থা

শ্রীরামচরিত-মানস

ভক্তকবি তুলসীদাস

অধ্যাপক শিবপ্রসাদ গঙ্গোপাধ্যায় কর্তৃক বংগানুবাদ

শ্রীরামচন্দ্রের বন্দনা-গানে ভারতবর্ষের বহু গুণী ও জ্ঞানীজন লেখনী ধারণ করিয়া আত্মোৎসর্গ করিয়াছেন। সেই সকল অমর লেখনীর প্রতিভা-নির্ঝরে ভারতবর্ষের মহাকাব্য পৃথিবীর সাহিত্যে স্বীয় বৈশিষ্ট্যে সমুজ্জ্বল। ভক্তকবি গোস্বামী তুলসীদাস তন্মধ্যে অন্যতম—যিনি সহজ সরল ভাষায় পতিতপাবন সীতা-রামের চরিত্র বর্ণনা করিয়াছেন সুমধুর সংগীতের মাধ্যমে। তুলসীদাসের জীবনসর্বস্ব মহামানব শ্রীরামচন্দ্রের সেই বন্দনা-গানের সুললিত বাংলা অনুবাদ এই প্রথম—বসুমতী সাহিত্য মন্দিরের অপূর্ব কীর্তির নূতন এক পরিচয় এই শ্রীরামচরিত-মানস। বহু রঙীন চিত্রে সুশোভিত।

মূল্য—১ম খণ্ড দুই টাকা, ২য় খণ্ড দুই টাকা।

বসুমতী প্রাইভেট লিমিটেডঃ ১৬৬, বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী স্ট্রীট, কলি-১২

হয়েছিল তা'র উল্লেখ না করাই হয়ত ভাল।

বর্তমানে সংগীতের নানা দিক নিয়ে আলোচনা হ'লেও সংগীত-সমালোচনার মান আমাদের দেশে নিম্নগামী রয়েছে ব'লে মনে হয়। উনিশ শতকে কৃষ্ণধন বন্দ্যোপাধ্যায় সংগীতালোচনার দুরবস্থা নিয়ে খেদ প্রকাশ করেছিলেন—আজ বিংশ শতকের শেষার্ধেও এদেশে সংগীত সমালোচনার মান খুব অগ্রসর হয়েছে এমন কথা জোর দিয়ে বলা চলে না।

বিংশ শতকের প্রথমার্ধে রবীন্দ্রনাথ, লালা কন্নোমল, কুমারস্বামী, পণ্ডিত ভাতখণ্ডে, অর্ধেন্দ্রকুমার গঙ্গোপাধ্যায়, ধূর্জটিপ্রসাদ, দিলীপকুমার রায়, স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ, সুরেশ চক্রবর্তী, অমিয়নাথ সান্যাল, নারায়ণ চৌধুরী, রাজ্যেশ্বর মিত্র প্রমুখ প্রবীণ ও নবীন সংগীত সমালোচকগণ যে একটি সমালোচনার উচ্চমান ও ধারা গড়ে তুলেছিলেন—আজ যেন তা'ও আমাদের সংগীত-জগৎ থেকে বিদায় নিতে বসেছে। তাঁদের প্রবর্তিত নবধারাও যেন আজ আমাদের সংগীত-সাহিত্যে অনুপস্থিত।

অতি প্রাচীন একমাত্র সংগীত পত্রিকা 'সংগীত বিজ্ঞান প্রবেশিকা'কেও আমরা বাঁচিয়ে রাখতে পারি নি। এটা সংগীতপ্রিয় বাঙালীর পক্ষে মোটেই গৌরবের বিষয় নয়। এর দ্বারাই প্রমাণিত হয় যে, সংগীতচিন্তায় যেন আমরা পিছিয়ে পড়েছি। অবশ্য এ যুগে কয়েকটি ভাল সংগীত গ্রন্থ যে প্রকাশিত না হয়েছে এমন কথা আমরা বলছি না। আমাদের সংগীত সাংবাদিকতাও খুব দুর্বল। সারা বাংলায় মাত্র দু'খানি সংগীত বিষয়ক মাসিক পত্রিকার ক্ষীণ শিখা জ্বলছে। এই অবস্থা আমাদের সংগীত জগতের পক্ষে মোটেই সুখকর নয় এ কথা বলাই বাহুল্য। যে দু'টি পত্রিকার কথা উল্লেখ করলাম তাদের নাম যথাক্রমে নীলরতন বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত 'সুরছন্দা' ও শচীন মিত্র সম্পাদিত 'তৌর্যত্রিক।'

স্বাধীনতার পরবর্তী যুগের সংগীত-সমীক্ষায় আমরা অনেক অপ্রিয় সত্য ও নিরাশার কথা বললেও মূলত আমরা আশাবাদী। ভারতীয় সংগীত তথা বাংলার সংগীত তার উত্থান-পতনের মধ্য দিয়েই এগিয়ে যাবে। সংগীতের প্রগতি-প্রবাহ হয়ত সাময়িকভাবে বাধাপ্রাপ্ত হচ্ছে। সংগীত-চর্চার অনুকূল পরিবেশ না থাকলেও এই বিপর্যস্ত মানসিকতার মধ্যেও কিছু কিছু খাঁটি শিল্পী সংগীত-সরস্বতীর সাধনা করে যাচ্ছে। আজ চারিদিকে যে নতুন সমাজ গড়বার প্রস্তুতি চলেছে—তা'তে সংগীত ও সংগীতশিল্পীরাও তাদের যোগ্য ভূমিকা পালন করবে ব'লে আমরা বিশ্বাস করি। সংগীতবাগে আগাছা উৎপাটিত করেই বাংলার মরণ-বিজয়ী বিপ্লবী সংগীতগুণীরা সংগীত-সংস্কৃতির সুরম্য উদ্যান রচনা করবে।

সরকারী ও বেসরকারী সকল শুভপ্রচেষ্টাকেই স্বাগত জানান হবে ব'লে আমাদের আন্তরিক বিশ্বাস। যে কোন প্রকারের গঠনমূলক কর্মোদ্যমই অভিনন্দনযোগ্য হবে। এভাবেই সুধা-নির্ঝর ঝরা সুরনদীর দু'কূল প্লাবিত হ'বে বলে আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস।

অর্ধশতাব্দীর অভিজ্ঞতাঃ চলচ্চিত্রের আঠারো বছর

কল্পতরু সেনগুপ্ত

ভারত স্বাধীনতা লাভ করার পূর্বে এদেশে চলচ্চিত্র শিল্পের বিকাশ ঘটেছিল। সাম্রাজ্যবাদী শাসনের মধ্যে এদেশে ধনতন্ত্রের বিকাশ ঘটেছে, ধনতন্ত্র ও সামন্ততন্ত্র পাশাপাশি রয়েছে। এই অদ্ভুত অর্থনৈতিক কাঠামোর মধ্যে চলচ্চিত্র শিল্প গড়ে উঠেছে। সম্ভবত এশিয়াতে এত বড় চলচ্চিত্র শিল্প আর কোন দেশে গড়ে ওঠে নি। ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ দিকে কলকাতায় স্বল্পদৈর্ঘের চলচ্চিত্র নির্মিত ও প্রদর্শিত হয়েছিল। ১৯১৩ সালে বোম্বাইতে পূর্ণাঙ্গ কাহিনীচিত্র "হরিশ্চন্দ্র" নির্মিত ও প্রদর্শিত হয়েছিল। তারপর থেকে এদেশে চলচ্চিত্র এবং স্থায়ী সিনেমার সংখ্যা বাড়তে থাকে। ১৯১৮ সালে সিনেমাটোগ্রাফ আইন পাশ হয়। ১৯১২ থেকে ১৯৩১ সালের মধ্যে প্রায় ১৫০০ ছবি নির্মিত হয়েছিল। ১৯৩৫ সালে ২৪০টি ছবি নির্মিত হয়েছিল। ত্রিশ-দশকে বাংলাদেশে, বোম্বাইতে এবং মাদ্রাজে অনেক প্রতিভাবান পরিচালক ও শিল্পীর পরিচয় পাওয়া যায়। এঁদের কারো কারো খ্যাতি ভারতের বাইরে বিস্তার লাভ করেছিল। বাঙালী পরিচালক হিমাংশু রায়ের ছবি ইংল্যাণ্ডে মুক্তিলাভ করেছিল, তাঁর স্ত্রী দেবিকারাণীর খ্যাতি ছিল সারা ভারতে। বাংলাদেশে নিউ থিয়েটার্স সারা ভারতের এক বিশিষ্ট প্রতিষ্ঠান হয়ে উঠেছিল। ভি শান্তারাম পরিচালিত 'সন্ত তুকারাম' ১৯৩৭ সালে ভেনিস চলচ্চিত্র উৎসবে প্রশংসিত হয়েছিল। চল্লিশদশকে ভারতে স্থায়ী সিনেমার সংখ্যা ছিল ২০৯০।

সুতরাং স্বাধীনতালাভের পূর্ব থেকে ভারতে চলচ্চিত্র শিল্পের বিরাট ঐতিহ্য গড়ে উঠেছিল। ছবি নির্মাণে পরিণত অভিজ্ঞতা, বহু প্রতিভাবান শিল্পী ও টেকনিশিয়ান ভারতীয়দের নিজস্ব ছবিঘর, পরিবেশক এবং স্টুডিও ইত্যাদি ছিল। অন্য কোন বৃটিশ শাসিত দেশের অবস্থা এরূপ ছিল না। সাম্রাজ্যবাদী শাসনের অবসানে যাঁরা দেশশাসনের দায়িত্ব গ্রহণ করলেন, তাঁরা এমন এক শিল্প লাভ করলেন, যে শিল্পে আজ ৮৪ কোটি টাকা মূলধন খাটছে। এক লক্ষের উপর মানুষ কর্মে নিয়োজিত আছে। স্থায়ী সিনেমার সংখ্যা দাঁড়িয়েছে প্রায় ৪ হাজার। এ ছাড়া ভ্রাম্যমাণ সিনেমা প্রায় দেড় হাজার। সারা ভারতে গড়ে উঠেছে ৫৯টি স্টুডিও এবং ৩৯টি প্রসেসিং ল্যাবরেটরি। হিন্দী, বাংলা, তেলেগু, তামিল, মালয়ালম, কানাড়ি, ওড়িয়া, মারাঠি প্রভৃতি ভাষায় কাহিনীচিত্র নির্মিত হচ্ছে। ১৯২০ সালে ভারতে প্রথম ডকুমেন্টারী ছবি নির্মিত

হীরালাল সেন

হয়েছিল, সেই ছবিটি ছিল লোকমান্য তিলকের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া। ১৯২০ সাল থেকে ১৯৪০ সালের মধ্যে দেড় হাজারের বেশি ডকুমেন্টারী ছবি তৈরি হয়েছিল, এবং মহাযুদ্ধের সময় সাপ্তাহিক সংবাদ চিত্র তৈরি শুরু হয়। বলা বাহুল্য এসব সাম্রাজ্যবাদী আমলের কথা।

বিংশশতাব্দীর মধ্যকাল সমাজতন্ত্রের যুগ। একালে সদ্য মুক্তি লব্ধ প্রত্যেক জাতি ও দেশের সমাজতন্ত্রের পথে অগ্রসর হওয়া স্বাভাবিক। ভারতের জনগণ স্বাধীনতার অর্থে শুধুমাত্র বিদেশী শাসনের অবসান নয়, সমাজতান্ত্রিক অর্থ ব্যবস্থা শাসন পদ্ধতি বুঝে এসেছে। স্বাধীন ভারতে যাঁরা দেশের শাসন ক্ষমতা গ্রহণ করলেন তাঁরা সমাজতান্ত্রিক ধাঁচের কথা বলে জনগণের আস্থা অর্জন করতে চাইলেন। কিন্তু কার্যত এমন কোন কিছু করেন নি, যা সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার সহায়ক। উপরন্তু দেশে ধনী ও দরিদ্রের বৈষম্য খুব বেশি বেড়ে গেছে। চলচ্চিত্র শিল্পে তার প্রতিফলন স্পষ্ট। সমাজতন্ত্রের দোহাই দিয়েও শাসকরা এমন কোন ব্যবস্থা করলেন না যাতে চলচ্চিত্র শিল্প মুনাফার ফাঁদ, ব্যবসায়ীদের ব্যক্তিগত রুচিবিকৃতি, কালো টাকাকে সাদা করার মধ্যবর্তী উপায় এবং প্রতিক্রিয়াশীল ভাবধারার বাহন হতে না পারে। সমাজতন্ত্রের কথা উঠলে রাশিয়ার কথা এসে যায়। ১৯১৭ সালে রাশিয়ায় সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব ঘটেছিল। ১৯১৯ সালে নবগঠিত সোভিয়েত সরকার আইনজারী করে চলচ্চিত্র শিল্পকে প্রাইভেট ক্যাপিটলের হাত থেকে শিক্ষামন্ত্রক দপ্তরের অধীনে নিয়ে আসেন। চলচ্চিত্র শিল্পকে জাতীয় সম্পত্তিতে পরিণত করেন। সে সময় লেনিন বলেছিলেনঃ 'সকল শিল্পের মধ্যে আমাদের কাছে সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে চলচ্চিত্র শিল্প'। পরবর্তী ঘটনা জগতের মানুষ জানে। সোভিয়েত রাশিয়ায় যৌনতাকে পণ্য করে ছবি নির্মাণ অপরাধ বলে গণ্য হয়। সোভিয়েত ছবির শিক্ষামূলক ভূমিকা বিশেষ মর্যাদা লাভ করে আসছে। কথায় এবং কাজে এক না হলে এই মর্যাদা লাভ সম্ভব হত না।

দেশ স্বাধীন হবার পর থেকে গত আঠারো বছরে ভারতীয় চলচ্চিত্র আন্তর্জাতিক উৎসবগুলিতে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা গ্রহণ করেছে। অনেকগুলি ভারতীয় ছবি আন্তর্জাতিক পুরস্কার জয় করে এনেছে। একা সত্যজিৎ রায় এনেছেন তেরটি পুরস্কার। ভারতে আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসব হচ্ছে। ভারতে রাষ্ট্রপতি

চলচ্চিত্র প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা করা হয়েছে। পুণায় ফিল্ম ইনস্টিটিউট গঠিত হয়েছে এদেশে রঙিন ছবি নির্মিত হচ্ছে। বার্ষিক ছবি নির্মাণের সংখ্যা প্রায় যাড়ে তিন শ'। ভারতীয় ছবি বছরে প্রায় দেড় লক্ষ টাকার মত বিদেশী মুদ্রা অর্জন করে আনছে। ফিল্ম ফাইনান্স কর্পোরেশন গঠিত হয়েছে। এই চিত্রটা যে উৎসাহজনক এতে দ্বিমতের অবকাশ নেই। কিন্তু এই উৎসাহজনক চিত্রের ওপিঠে বড়ই উদ্বেগজনক, কিছুটা বিপজ্জনক বলা চলে। ভারতীয় চলচ্চিত্রের এই যে উৎসাহজনক চিত্র দেখা যাচ্ছে তা গত পঞ্চাশ বছরের অভিজ্ঞতার পরিণতি, এতে স্বাধীন সরকারের বাহাদুরী নেবার মত কিছু নেই। কারণ চলচ্চিত্র শিল্পে আজো যা কিছু ঘটছে তার অধিকাংশ বিদেশী শাসনকালের নীতিতেই। ছবি নির্মাণ থেকে সেন্সর পর্যন্ত সেই পুরাতন ধারায় চলেছে।

গত আঠারো বছরের মধ্যে ভারতে ফিল্ম ক্যামেরা বা প্রজেক্টর তৈরি হয় নি। কাঁচা ফিল্ম থেকে—রাসায়নিক পর্যন্ত সব কিছু বিদেশ থেকে আমদানী করতে হয়। এক কথায় এত বড় চলচ্চিত্র শিল্প সম্পূর্ণভাবে বিদেশের উপর নির্ভরশীল। বিদেশীরা যদি হাত গুটায় তা হলে এদেশে একটি ছবিও নির্মিত হতে পারে না। বছরে সাড়ে তিন শ' ছবি করে পৃথিবীতে দ্বিতীয় স্থানের গর্বে যারা স্ফীত—মুহূর্তে তারা চুপসে যেতে পারে বিদেশের সমর্থন না পেলে। এ কারণে ভারতের চলচ্চিত্র শিল্প আকারে বিরাট হয়েও আজ পর্যন্ত নিজের পায়ে দাঁড়াতে পারল না। এই পরনির্ভরতার জন্যই বিদেশী ছবির বাজার ভারতে এখনো তেজী। বছরে প্রায় তিনশ'র মত বিদেশী ছবি মুক্তিলাভ করে, তার মধ্যে দু-শ'র মত মার্কিন ছবি। ভারতের প্রধান প্রধান শহরগুলিতে বিদেশীদের নিজস্ব ছবিঘর রয়েছে। আমাদের শাসকরা মুখে সমাজতন্ত্রের দোহাই দিলেও এদেশে সমাজতান্ত্রিক দেশের ছবি প্রদর্শন একরকম নিষিদ্ধ হয়ে রয়েছে। এদেশের চলচ্চিত্র সম্পর্ক ধনতান্ত্রিক দেশের সঙ্গে, সমাজতান্ত্রিক দেশ উপেক্ষিত। সরকারী নীতির পরিচয় পাওয়া যায় উগ্র যৌনধর্মী ও অপরাধমূলক পশ্চিমী ছবির ব্যাপারে উদারতা প্রদর্শনে। বিদেশী অর্থ ব্যয়ে যেভাবে নাইট ক্লাবের ছবিগুলি প্রদর্শিত হয়েছে—কোন গণতান্ত্রিক দেশের পক্ষে এটা লজ্জার কথা। সাম্রাজ্যবাদী প্রচারমূলক মার্কিন ও বৃটিশ ছবি এদেশে প্রদর্শিত হয়—সরকারী সেন্সরের ছাড়পত্র বুকে এঁটে। ভিয়েৎনামের মুক্তিযুদ্ধের বিরুদ্ধে, আফ্রিকার মুক্তি-আন্দোলনের বিরুদ্ধে, সাইপ্রাসের স্বাধীনতার বিরুদ্ধে, সোভিয়েত রাশিয়ার বিরুদ্ধে ছবি এদেশে বিনা আপত্তিতে প্রদর্শিত হয়েছে। চীনাদের হেয় করে তো হচ্ছেই। অথচ সরকার সব সময় আস্ফালন করে বলে, ভারত নিরপেক্ষ দেশ। নিরপেক্ষ, তবে এদেশে সমাজতান্ত্রিক দেশ বিরোধী সাম্রাজ্যবাদী প্রচারে কোন বাধা নেই! সম্প্রতি 'ডাঃ জিভাগো' ছবির ব্যাপারে ভারত সরকারের দুর্বলতা আরো পরিষ্কার বোঝা গেছে। পৃথিবীর প্রত্যেক গণতান্ত্রিক মানুষ, প্রত্যেক প্রগতিশীল মানুষ নবেম্বর বিপ্লবের প্রতি শ্রদ্ধাশীল। নবেম্বর বিপ্লব পৃথিবীতে পরাধীনতার শৃংখল ভাঙার পথ করে

দেবিকারাণী

দিয়েছে, মানুষ কর্তৃক মানুষ শোষণের অবসান ঘটাবার ডাক দিয়েছে। সেই নবেম্বর বিপ্লবের বিরুদ্ধে লেখা বইয়ের চিত্ররূপ 'ডাঃ জিভাগো' ভারতে প্রদর্শনের জন্য অনুমতি দিতে সরকার বাধ্য হয়েছে মার্কিনদের চাপে, সোভিয়েত-বিরোধিতা সত্ত্বেও। অথচ আরব যুক্তরাষ্ট্রে প্রেসিডেণ্ট নাসের সাম্রাজ্যবাদী দেশের ছবি প্রদর্শন এক-রকম বন্ধ করে দিয়েছেন। সর্ত করেছেন ঃ আরবে যেসব বিদেশী ছবি নির্মিত হবে সে ছবিই মাত্র দেখান চলবে। এই দৃষ্টান্তের পাশাপাশি আমাদের সরকারের নীতি ও মানসিকতার তুলনা করলে সরকারের স্বরূপ প্রকাশ হয়!

সাম্রাজ্যবাদী দেশের ছবিগুলিকে আদর্শ করে আমাদের দেশে, বিশেষ করে বোম্বাইতে ছবি নির্মিত হয়। তার ফলে বোম্বাইয়ের অধিকাংশ ছবি সপরিবারে দেখা চলে না। তরুণ-তরুণীদের বিপথে চালিত করার সহায়ক। বুদ্ধিদীপ্ত ও শিল্পবুদ্ধির অভাবে স্থূল। লক্ষ লক্ষ টাকার কাঁচা ফিল্ম নষ্ট করে এই ছবিগুলি তৈরি হচ্ছে। সরকার নির্বিকার। এসব ছবির নোংরা প্রচারচিত্র শালীনতা-বিরোধী। বছরে নির্মিত সাড়ে তিন শ' ছবির মধ্যে দু-শ' ভারতীয় ছবির এই চেহারা। এবং এসব ছবির দাপটে বোম্বাইয়ের শান্তারাম, মেহবুবদের সঙ্গে দাঁড়াতে হয়েছে, বাংলায় সত্যজিৎ রায়-দের নির্দিষ্ট দর্শকের উপর নির্ভর করে বাঁচতে হচ্ছে। আঞ্চলিক ছবি-গুলি মাথা তুলে দাঁড়াতে পারছে না। মারাঠি ছবির গৌরব শেষ করে দেওয়া হয়েছে, বাংলার গর্বও লুপ্ত হবার পথে। পশ্চিম বাংলায় বাংলা ছবি মুক্তির জন্য প্রেক্ষাগৃহ পায় না, সব হিন্দীওয়ালারা দখল করে রয়েছে। প্রতিভাসম্পন্ন বাঙালী পরিচালক ও

সত্যজিৎ রায়

সাহসী প্রযোজকরা ছবি করার জন্য টাকা পায় না। কালোবাজারীদের পেছনে ঘুরতে হয় টাকার জন্য। এই দুর্বলতার সুযোগে কালোবাজারীরা ফিল্মে টাকা লগ্নী করছে সাদা টাকায় রূপান্তরিত করার জন্য। এই পথে বোম্বাইয়ের শিল্পীরা বাংলা ছবিতে আসছে, বাঙালী শিল্পীদের পথ রোধ করে দেবার জন্য। বাংলার স্টুডিও-গুলি জীর্ণশীর্ণ, টেকনিসিয়ানরা কাজ না পেয়ে বসে থাকেন। এই শিল্পে রুজিরোজগারের নিশ্চয়তা বলে কোন কথা নেই। এই নৈরাজ্যের জন্য চলচ্চিত্র শিল্পে ভাগ্য পরীক্ষার খেলা চলেছে, তার সঙ্গে প্রতারণা। এটাই চলচ্চিত্র শিল্পে স্বাধীন ভারতের আঠারো বছরের অবদান।

মুমূর্ষু বাংলা চলচ্চিত্র শিল্পকে বাঁচবার জন্য দেশের শিল্পদরদী মানুষরা সরকারের কাছে বহু আবেদন নিবেদন করেছেন। তাঁরা পরামর্শ দিয়েছেন (১) প্রতিভাবান পরিচালক প্রযোজকদের সরকারী অর্থ সাহায্য দেবার জন্য, (২) পশ্চিমবঙ্গে প্রদর্শিত বিদেশী ও অবাংলা ছবির টিকেটের উপর টাকায় দু-পয়সা হিসাবে লেভি ধার্য করার জন্য এবং (৩) লেভি হতে অর্জিত অর্থ বাংলা ছবি নির্মাণে দাদন করা এবং ফ্লপ ছবির প্রযোজকদের সাহায্য দেবার জন্য, (৪) পশ্চিমবঙ্গে প্রত্যেক প্রেক্ষাগৃহে বছরে অন্তত তিন মাস বাংলা ছবি প্রদর্শন বাধ্যতামূলক করার জন্য। কিন্তু এযাবৎ সরকার এসব প্রস্তাবে কর্ণপাত করা প্রয়োজন বোধ করে নি। তার পরিণতিতে বাংলা ছবির নির্মাণসংখ্যা যেমন কমছে, তেমনি ছবির মান নেমে আসছে নিচের দিকে।

৮

গত পঞ্চাশ বছরের অভিজ্ঞতা ও ঐতিহ্যকে স্বাধীন দেশের সরকার আঠারো বছরে নৈরাজ্য, প্রতিক্রিয়াশীল ভাবধারা এবং পরনির্ভরশীলতার পথে ঠেলে দিয়েছে।

সম্পাদিকা—জয়ন্তী সেন

বসুমতী (প্রাঃ) লিঃ-এর পক্ষে ১৬৬, বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী স্ট্রীটস্থ কলিকাতা-১২
বসুমতী প্রেস হইতে শ্রীসুকুমার গুহমজুমদার কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

সাপ্তাহিক বসুমতী

স্বর্ণ নিয়ন্ত্রণ আইন প্রত্যাহারের দাবিতে
স্বর্ণশিল্পী পরিবারের মা, বোন, স্ত্রী
ও ছেলেমেয়েদের মৌন বিক্ষোভ

১ বর্ষ ঃ ১২শ সংখ্যা, বৃহস্পতিবার, ৮ই ভাদ্র, ১৩৭৩ বঙ্গাব্দ ★ 25th Aug., 1966 * Vol. 71, No.

সূচীপত্র

বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা
সম্পাদকীয়		৭০৭
আজকের মানুষ		৭০৮
ভারতদর্শন		৭০৯
আন্তর্জাতিক		৭১২
মৃতের জন্য জীবন	— আশিসকুমার সিংহ	৭১৪
সুবর্ণলতা (ধারাবাহিক উপন্যাস)	— আশাপূর্ণা দেবী	৭১৬
বেদব্যাস-এর রম্যরচনা ঃ অমৃত সমান		৭২১
ভিয়েৎনাম (কবিতা)	— পঞ্চানন চট্টোপাধ্যায়	৭২৪
অস্ট্রেলিয়া থেকে লিখছি	— সুরেশচন্দ্র সাহা	৭২৫

সর্বপুরাণ, সর্বতন্ত্র, সর্ব উপনিষদ, সমস্ত ভক্তিগ্রন্থ হইতে সংকলিত

স্তবকবচমালা

(পঞ্চম সংস্করণ)

যে ঋষির যে স্তবে যে দেবতা আকৃষ্ট হইয়া বর প্রদান করিয়াছিলেন—পুরাণ, উপনিষদ, তন্ত্র, ভক্তিগ্রন্থরাশি মথিত করিয়া সেই সকল শ্রেষ্ঠ ভক্তিনিবেদন অতি যত্নে সুনির্বাচন—সংকলন করিয়া স্তবকবচমালারূপে গ্রথিত। স্তব—ভক্তির উচ্ছ্বাস—দেবতার বন্দনাগীত। আত্মনিবেদিত প্রাণে তন্ময় হইয়া স্তব পাঠে যে লাভ হয়—জাগতিক শক্তি তাহার নিকট অতি তুচ্ছ। স্তবকবচমালায় প্রায় ৫০০ দেব-দেবীর স্তব-সন্নিবেশিত।

মূল্য পাঁচ টাকা।

পৃথিবীর তরুণ-সমাজের হৃদয়জয়ী

স্যর ওয়াল্টার স্কটের গ্রন্থাবলী

দ্বিতীয় ভাগ

শরৎচন্দ্র মিত্র অনূদিত

আইভ্যানহো, হাইল্যাণ্ড উইডো, ফেয়ার মেড অফ পার্থ, সার্জনস্ ডটার

মূল্য—২·০০

তৃতীয় ভাগ

সরোজনাথ ঘোষ অনূদিত

দি ব্রাইড অব ল্যামারমুর, লিজেণ্ডস অব মনট্রোজ, দি এ্যাণ্টিকোয়ারি

মূল্য ১৷৷০ টাকা।

সাহিত্য-জগতের গৌরবপ্রভা—হাস্যরসাবতার—নাট্যসাহিত্যের প্রবর্তক—রস-সাহিত্যের স্রষ্টা—রায় দীনবন্ধু মিত্র বাহাদুরের

দীনবন্ধু মিত্রের গ্রন্থাবলী

১ম ভাগে—জীবনী ও কবির সমালোচনা, নীলদর্পণ, জামাই বারিক, বিয়ে পাগলা বুড়ো, নবীন তপস্বিনী, কমলে কামিনী।

২য় ভাগে—সধবার একাদশী, যমালয়ে জীবন্ত মানুষ, পোড়ামহেশ্বর, কুঁড়ে গরুর ভিন্ন গোঠ, লীলাবতী, সুরধুনী কাব্য, দ্বাদশ কবিতা, পদ্য সংগ্রহ।

প্রতি ভাগ দুই টাকা

কবি বিহারীলাল চক্রবর্তীর গ্রন্থাবলী

রবীন্দ্রনাথ বলেন—"আধুনিক বঙ্গসাহিত্যে প্রেমের সংগীত এরূপ সহস্রধারে উৎসের মত কোথাও প্রোৎসারিত হয় নাই। এমন সুন্দর ভাবের আবেগ, কথার সহিত এমন সুরের মিশ্রণ আর কোথাও পাওয়া যায় না।"

বাঙ্গালার নব গীতিকবিতার এই প্রবর্তক, রবীন্দ্রনাথ, অক্ষয় বড়াল, রাজকৃষ্ণ রায় প্রভৃতির এই কাব্যগুরু ঋষি কবি বিহারীলাল চক্রবর্তীর রচনার সমাবেশ।

কবির জীবনী, সুবিস্তৃত সমালোচনা সহ সুবৃহৎ গ্রন্থ

মূল্য তিন টাকা

বসুমতী প্রাইভেট লিমিটেড, ১৬৬ বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী স্ট্রীট, কলিকাতা—১২

সূচীপত্র

বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা
ব্যর্থ নীতি বাতিল হোক	— অলকানন্দা সেন	৭২৯
গ্রন্থমেলা	— জয়ন্তী সেন	৭৩১
রঙ্গদর্শন		৭৩৩
চোমংলামার চোখে উত্তরবঙ্গ		৭৩৭
অগ্নিযুগের একটি অধ্যায়	— অনন্ত সিংহ	৭৪১
মল্লিকা-সংবাদ (গল্প)	— শঙ্কর চক্রবর্তী	৭৪৭
গোলমেলে ফানোস (অনুবাদ-গল্প)	— রত্না গঙ্গোপাধ্যায়	৭৫২
রঙ্গমঞ্চ ওদেশে এবং এদেশে	— শিলাদি	৭৫৪
পাঠকমন		৭৫৮
রঙ্গজগৎ		৭৫৯
খেলাধুলা	— শ্রীঅমিতাভ	৭৬৫

শ্রীমদ্ভাগবত

প্রাচীন ভক্তদের রচিত সুললিত বাংলা পয়ারে

মূল্য পাঁচ টাকা মাত্র

এই সুবৃহৎ গ্রন্থে আছে—শ্রীল সনাতন গোস্বামীর 'ভাগবতামৃত' গ্রন্থের কবিচন্দ্রের বঙ্গানুবাদ এবং শ্রীগৌরাঙ্গের প্রিয়তম ভাগবতাচার্য্য রঘুনাথ পণ্ডিতের প্রেমতরঙ্গিনী।

ইহাতে আছে দুইখানি অমূল্য গ্রন্থ

শ্রীল সনাতন গোস্বামীর ভাগবতামৃতের অনুবাদ কবিচন্দ্রের

শ্রীবৃহদ্ভাগবতামৃত

এবং

ভাগবতাচার্যের বিশ্বপ্রসিদ্ধ

শ্রীকৃষ্ণ প্রেমতরঙ্গিনী

সমগ্র ভারতে প্রথম বঙ্গানুবাদ

"...শুনিয়া তাহার ভক্তিযোগের পঠন।
আবিষ্ট হইল গৌরচন্দ্র নারায়ণ॥"

ইহা কৃত্তিবাসী রামায়ণ এবং কাশীরাম দাসের মহাভারতের ন্যায় বাংলার প্রতি গৃহস্থের অবশ্যপাঠ্য হউক, এই নিবেদন। এই মূল্যবান গ্রন্থ বাংলার প্রতি ঘরে প্রতিষ্ঠিত করুক।

সাহিত্য-সম্রাট—বন্দেমাতরম্ মন্ত্রের ঋষি

বঙ্কিমচন্দ্রের গ্রন্থাবলী

—উপন্যাস—

প্রথম খণ্ড :—রাজসিংহ, বিষবৃক্ষ, যুগলাঙ্গুরীয়, মৃণালিনী, রজনী। [সচিত্র] মূল্য—৩, টাকা।

দ্বিতীয় খণ্ড :—দুর্গেশনন্দিনী, কৃষ্ণকান্তের উইল, ইন্দিরা, রাধারাণী, সীতারাম। মূল্য—২, টাকা।

তৃতীয় খণ্ড :—আনন্দমঠ, চন্দ্রশেখর, কপালকুণ্ডলা, দেবী চৌধুরাণী। [সচিত্র] মূল্য—৩, টাকা।

—সাহিত্য—

প্রথম খণ্ড :—কৃষ্ণচরিত্র, লোকরহস্য, বিবিধ প্রবন্ধ (১ম)। মূল্য—২, টাকা।

দ্বিতীয় খণ্ড :—(১ম ভাগ অনুশীলন), মুচিরাম গুড়, বিবিধ প্রবন্ধ (২য়), বিজ্ঞান রহস্য। মূল্য—২, টাকা।

তৃতীয় খণ্ড :—শ্রীমদ্ভগবদগীতা, কমলাকান্ত, সাম্য, সাহিত্য-প্রসঙ্গ, মানস, ললিতা। মূল্য—২, টাকা।

বসুমতী প্রাইভেট লিমিটেডঃ ১৬৬, বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী স্ট্রীট, কলি-১২

৭১ বর্ষ ঃ ১২শ সংখ্যা—মূল্য ২৫ পয়সা | বাংলা ভাষায় দ্বিতীয় সর্বাধিক প্রচারিত | Price : 25 .
বৃহস্পতিবার, ৮ই ভাদ্র, ১৩৭৩ বঙ্গাব্দ | সাপ্তাহিক পত্রিকা | Thursday, 25th August, 1966

আন্দোলনের পথে

সমাজের মধ্যবিত্ত জীবন দুঃসহ অবস্থার মধ্যে এখন জীবনযাপন করছে। বর্তমানে দ্রব্যমূল্য এমন এক স্তরে পৌঁছেছে—যেখানে সামান্য রুজি-রোজগার করা মানুষের হাত পৌঁছায় না। এই অবস্থায় তাদের পক্ষে নির্বিকার থাকাও সম্ভব নয়। অন্তত চোখ মেললেই যে সংসারে অভাব ছাড়া কিছু দেখা যায় না এবং সেই সংসারে বাস করা ছাড়া গত্যন্তর নেই—তখন রোজগারস্থলে ঘা দেওয়া ছাড়া অন্য উপায় থাকে না। তাই দেখা যাচ্ছে সমাজের সর্বস্তরে বুভুক্ষার সংগে মরীয়ার মতো আন্দোলন। মরীয়া বলার কারণ এই যে, যাঁদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম চালিত হয়, তাঁরা সহজে ছেড়ে দেবার পাত্র নন। তাঁদের হস্তে থাকে মারাত্মক রকম বিভিন্ন অস্ত্র। যেমন সাসপেনসন, ছাঁটাই, য়ুনিয়নকে বেআইনী-করণ, আরো কতো কী। এতৎসত্ত্বেও আন্দোলন কোথাও বন্ধ হচ্ছে না। ন্যায়সংগত দাবি আদায় করতে গিয়ে কর্মচারীরাও গণতন্ত্র-সম্মত যাবতীয় বিক্ষোভের আশ্রয় গ্রহণ করেন। নেহাৎ নিরুপায় না হলে যে, তথাকথিত ছা-পোষা কেরানীদের পক্ষে এই পথ গ্রহণ ছাড়া উপায় থাকে না, তা বলাই বাহুল্য।

এই অবস্থার শেষ হবে কি না তাও বলা সহজ ব্যাপার নয়। কারণ, সরকার দ্রব্যমূল্য স্থির রাখতে অসমর্থ হয়েছেন। গোণাগুণীত রোজগারের দ্বারা একালের চড়া দরের বাজারে কোনো মানুষ বেঁচে থাকতে পারে না, বাঁচিয়ে রাখতে পারে না তার পোষ্যদের। স্বভাবতই তাকে কর্মস্থলে সামান্য বেতন ও মহার্ঘভাতা বৃদ্ধির দাবিতে করতে হয় আন্দোলন। এই ধরণের আন্দোলন উচিত-না-অনুচিত আমরা সেই প্রশ্নের মধ্যে যেতে চাই না। তবে আন্দোলন বা বিক্ষোভের কারণগুলি কি—সে সম্বন্ধে সরকারের পক্ষে ওয়াকিবহাল থাকা দরকার। কিন্তু ওয়াকিবহাল রাখবে কে? যে সরকার দু-চার হাজারী আমলাদের দ্বারা পরিচালিত, সেই সরকারের কনিষ্ঠ কেরানী বা পিওনদের জন্যে হৃদয় বিগলিত হবে কার?

সুতরাং এই হৃদয়হীনতার জন্যে সরকারী নীতির আমূলে পরিবর্তন না হলে ভবিষ্যৎ অত্যন্ত বেদনাদায়ক হবে, ভারতের গণ-তান্ত্রিক সমাজতন্ত্রের প্রতিশ্রুত নীতিও সাফল্যলাভ করবে না।

পশ্চিমবংগ সরকারের কর্মচারিগণ পুনরায় আন্দোলনে নামছেন। আমরা আশা করবো, সরকার তাঁদের দাবি-দাওয়ার ব্যাপারে সহানুভূতিসম্পন্ন হবেন যাতে আন্দোলনের পথে তাঁদের পা বাড়াতে না হয়।

প্রসংগত আমরা বে-সরকারী কলেজের অ-শিক্ষক কর্মীদের কথাও উল্লেখ করতে বাধ্য হচ্ছি। এই কর্মিগণ দীর্ঘকাল ধরে স্বল্প বেতনে চাকরি করছেন—একথা অস্বীকার করার উপায় নেই। নিরুপায় অবস্থায় তাঁরা গত দশই আগস্ট থেকে ধর্মঘট সুরু করেছেন। ফলে বে-সরকারী কলেজের কর্তৃপক্ষ কলেজ-গুলি বন্ধ করে রেখেছেন। এ বছর কলেজ-গুলি মোট কতদিনই বা খোলা আছে? কিছুকাল আগে কলেজের শিক্ষকগণও ধর্মঘট করেছিলেন। শেষ পর্যন্ত কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী শ্রীচাগলার হস্তক্ষেপের ফলে তাঁদের দাবি দাওয়ার কিছুটা মীমাংসা হয়।

সরকার মীমাংসার পক্ষপাতী নন একথা কেউ বলবে না। তবে মীমাংসা তাঁরা করেন যখন কেউ শেষ পর্যন্ত আন্দোলনের পথে পা বাড়ায়। বে-সরকারী কলেজ কর্মীদের আন্দোলন অযৌক্তিক নয়। কিন্তু ধর্মঘটের ফলে ছাত্রদের যে ক্ষতি স্বীকার করতে হচ্ছে তার জন্যে দায়ী কর্তৃপক্ষই কারণ তাঁদের কাছেই তারা বেতন দেয়। গত বছর যে ক'মাস তাদের ক্লাস হয় নি তার জন্যে কি কলেজ কর্তৃপক্ষ ছাত্রদের মাইনে ফেরৎ দেবেন? যতদূর জানা গেছে, বে-সরকারী কলেজের অ-শিক্ষক কর্মীদের দাবির ব্যাপারে কলকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয়ের উপাচার্য কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রীর সংগে কথাবার্তা চালাচ্ছেন। কিন্তু ফয়সালা কিছুই হয় নি। কবে হবে তাও বলা কঠিন। কারণ তাঁদের ব্যাপার নাকি ইউ-জি-সি-র আলোচ্য বিষয় নয়, কেন্দ্রীয় সরকারের সিদ্ধান্তের উপর নির্ভর করছে তাঁদের মাহিনা বৃদ্ধির প্রশ্ন। অতএব ছাত্রদের যে কি হাল হবে, তা শিক্ষাবিদরা সম্যক উপলব্ধি করছেন। কিন্তু আর একটি প্রশ্ন উপেক্ষণীয় নয়। কলেজে ছাত্রদের ভর্তির শেষ তারিখ বিশ্ব-বিদ্যালয় কর্তৃক ঘোষিত হয়েছে। আমরা আশা করবো, বিশ্ববিদ্যালয় বর্তমান পরিস্থিতির কথা বিবেচনা করে ছাত্রদের ভর্তির শেষ তারিখ কলেজগুলি খোলার পর জানিয়ে দেবেন। আরও একটি প্রশ্ন এই যে, ছাত্রদেব সিলেবাস কি কলেজে সম্পূর্ণ পড়ানো সম্ভব হবে? তা যদি না হয়, তাহলে বিশ্ববিদ্যালয়ের উচিত হবে, পরীক্ষার প্রশ্ন তৈরির সময় প্রশ্ন-কর্তাকে সেইভাবে নির্দেশ করা। তার আগে কলেজে কলেজে জানাতে হবে ছাত্রদের পাঠ্য-বিষয় কতোটা নির্দিষ্ট থাকবে। অবশ্য এই ব্যাপারে প্রথমেই অভিজ্ঞ অধ্যাপক ও শিক্ষা-বিদদের সহযোগিতা ও পরামর্শ একান্ত দরকার।

কিন্তু শেষ পর্যন্ত সেই একটি প্রশ্নেই বিচলিত না হয়ে উপায় নেই। অ-শিক্ষক কর্মীদের দাবি কতোটা স্বীকৃত হবে এবং অধ্যাপকরা অন্যান্য দাবি নিয়ে আন্দোলন করবেন কি না? বিশেষত সরকার ছিটেফোঁটা দাবি মেনে নিলে কোনো সমস্যার সমাধান হবে না—যেমন হয় নি বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের অনু-ল্লেখ্য মাহিনা বা মহার্ঘভাতা বৃদ্ধিতে। যতদূর জানা গেছে, সেপ্টেম্বর মাসে তাঁরাও আন্দোলনে নামছেন। সুতরাং ধরা যেতে পারে, শিক্ষার জগতে তালা-চাবি পড়লো। কিন্তু এর জন্যে দায়ী শিক্ষক বা অ-শিক্ষক কর্মীরাই নন—দেশকে যাঁরা অন্ধকারে রাখতে চান তাঁরাই একমাত্র দায়ী। তা নইলে বহু প্রতিশ্রুত ও প্রকাশিত শিক্ষা কমিশনের রিপোর্ট সম্পর্কে সরকার এখনো নীরব কেন?

সম্পাদকীয়

আজকের মানুষ

একদিন ভারত সরকারের কাছে যে-সম্পদ আদায়ের জন্যে নিজের প্রাণকে বাজী রেখেছিলেন, দিনের পর দিন অনাহারে-অনিদ্রায় বনে-জংগলে পালিয়ে বেড়িয়েছিলেন, আজ ঠিক সেই সম্পদই যেন ভারত সরকার 'হাত ছাড়া' না করেন তার জন্যে অনুরোধ-উপরোধের শেষ নেই। এর কারণ অবশ্য আর কিছুই নয়, ভুল ভেঙেছে, সত্যকে উপলব্ধি করতে পেরেছেন আংগামি, সমস্যাক্লিষ্ট নাগাল্যান্ডের নতুন মুখ্যমন্ত্রী শ্রী টি এন আংগামি।

বিদ্রোহী নাগানেতা ফিজোর অভিন্ন হৃদয় সুহৃদ ছিলেন একদিন আংগামি, সবল বাহু ঊর্ধে তুলে শ্লোগান দিয়েছিলেনঃ নাগাদের ফেডারেল রিপাবলিক চাই! আজ সেই আংগামি ওই শ্লোগান শুনলে কানে আঙুল দেন, অবাস্তব, ছেলেমানুষী প্রস্তাব বলে বিদ্রুপ করতে ছাড়েন না বিদ্রোহী নাগাদের স্বাতন্ত্র্যের দাবিকে।

কিন্তু স্বাতন্ত্র্যবোধ বাসা বেঁধেছে যাঁর মনের ভেতর, বিদ্রোহী নাগাদের সংগে গোলে হরিবোল তিনি বেশিদিন দিতে পারবেন কেন? আত্মগোপন করে, সমাজ থেকে বাইরে, তস্কর-জীবন আর কাঁহাতক চালানো যায়? কত সেতু ওড়ানো যায়, কত নিরীহ লোকের ওপর অত্যাচার চালানো সম্ভব একজন বিবেক-বুদ্ধিসম্পন্ন মানুষের পক্ষে? তাই তাঁর মতান্তর থেকে মনান্তর ঘটলো ফিজোর সংগে, বিদ্রোহীর কালিমা মুছে ফেললেন তিনি বিদ্রোহী নাগাদের সখ্যতায় পূর্ণচ্ছেদ টেনে, নাগা ন্যাশনালিস্ট পার্টিতে যোগদান করে।

জাতীয়তাবাদী দলের পক্ষে আংগামিকে পাওয়া বিদ্রোহীদের বিরুদ্ধে একটা বিরাট জয় বলতে হবে। কারণ সাধারণ নাগাদের মধ্যে আংগামির প্রভাব-প্রতিপত্তি বহু নেতার কাছেই স্বপ্ন সমান। সংখ্যার দিক থেকে ক্ষুদ্র অথচ রাজনৈতিক দিক থেকে প্রভাবশালী আংগামি উপজাতীয়দের তিনি অবিসম্বাদী নেতা। ফল হয়েছে এই যে, আংগামির দল ছাড়ার সংগে সংগে বহু আংগামি উপজাতীয় তরুণ বিদ্রোহীদের সংগ ত্যাগ করে ন্যাশনালিস্ট দলের শক্তি বৃদ্ধি করেন।

ন্যাশনালিস্ট পার্টিতে যোগ দিয়েই আংগামি গঠনমূলক কাজে আত্মনিয়োগ করেন, নাগাদের কল্যাণ ও উন্নতির জন্যে সচেষ্ট হন। তাঁর অক্লান্ত সেবা ও কর্মনিষ্ঠার জন্যে তিনি

টি এন আংগামি

অচিরেই নাগা জনসাধারণের অকুণ্ঠ শ্রদ্ধা অর্জন করলেন। ১৯৫৪ সালে ফিজোর অক্টোপাশ-শৃংখল থেকে নিজেকে মুক্ত করে আংগামি ১৯৫৯ সালে নাগা পিপলস্ কন্‌ভেন্‌শনে যোগ দেন। সরকার গঠনের আগে তিনি পরামর্শ সংস্থার সদস্য ছিলেন এবং নির্বাচনের আগে পর্যন্ত অন্তর্বর্তী সংস্থার চেয়ারম্যানের পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন।

১৯৬৩ সালে নাগাল্যান্ডের প্রথম নির্বাচনে জয়লাভ করতে আংগামিকে মোটেই বেগ পেতে হয় নি। নাগাল্যান্ডের প্রথম বিধানসভার প্রথম স্পীকার হিসেবে তাঁর নির্বাচনও বিনা বাধায় অনুষ্ঠিত হয়েছে। গত তিন বছর ধরে তিনি যে অপূর্ব কর্মদক্ষতা এবং নিরপেক্ষ দৃষ্টিভংগী নিয়ে বিধানসভার কাজ চালিয়েছেন তাতে তাঁর সম্মান এবং মর্যাদা আরো বেড়ে গিয়েছে। বিনা বাধায় এবং সর্বসম্মতিক্রমে নাগাল্যান্ডের মুখ্যমন্ত্রীর গদীলাভ তো তারই একটা অভ্রান্ত প্রমাণ।

অবশ্য একথা স্বীকার করতেই হবে যে, শ্রীআংগামি স্বাভাবিক পন্থায় ওই উচ্চপদ লাভ করেন নি, একজন নেতাকে অপসারণ করায় যে-শূন্যতার সৃষ্টি হয়েছে আংগামিকে তাই পূর্ণ করতে হয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী শ্রীশিলু আও-এর বিরুদ্ধে তাঁরই অর্থমন্ত্রী শ্রীজোমিকে সেমা অনাস্থা প্রস্তাব এনেছিলেন, বিধানসভায় সে-প্রস্তাব ৩২—৬ ভোটে পাশও হয়েছে। তবে বিরোধটা ব্যক্তিগতভাবে শিলু আও-এর বিরুদ্ধে ততটা নয়, যতটা ছিল আও উপজাতির বিরুদ্ধে। সংখ্যায় নগণ্য হলেও নাগাল্যান্ড রাজনীতিতে আও উপজাতীয়রা প্রভূত প্রভাব বিস্তার করেছিল, যাকে সংখ্যাগরিষ্ঠ সেমা উপজাতীয়রা উদার চক্ষে দেখতে পারে নি। আও-বিরোধী অভিযানে আংগামি উপজাতীয়রাও সেমাদের সংগে হাত মিলিয়েছিল। শিলু আও মন্ত্রিসভার পতন তো ওই সেমা-আংগামি আঁতাতেরই অনিবার্য ফলশ্রুতি।

আংগামি মন্ত্রিসভার সামনে দায়িত্ব বিরাট। বৈরী নাগাদের সংগে বিবাদের কোনো ফয়সলা আজো হয় নি, বিদ্রোহীরা ফেডারেল রিপাবলিকের বায়না এখনো ছাড়ে নি, ভারতীয় সংহতির প্রতি তাদের কোনো শ্রদ্ধা নেই, ভারত-দেহ থেকে বিচ্ছিন্নতাই তাদের কাম্য। ক্ষুদ্র ও কুটিরশিল্পের দিকে থেকে নাগাল্যান্ডের সম্ভাবনা প্রচুর। নতুন মুখ্যমন্ত্রীকে এ সমস্ত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে হবে। ধীর, স্থির, স্বল্পভাষী ও ধৈর্যশীল এই নেতার পক্ষে সমস্যা উওরানো কিছু কঠিন কাজ নয়, বিশেষ করে একদিন বিদ্রোহী নাগাদের সংগে ঘর করে ওদের মনের খবর আংগামি ভালোই জানেন।

রাষ্ট্রপতি ডঃ রাধাকৃষ্ণণের সংগে শুভেচ্ছা বিনিময়রত জাম্বিয়ার উপরাষ্ট্রপতি

স্বাধীনতার স্বপ্ন

এক এক করে ঊনিশটা বছর কেটে গেছে। স্বাধীন ভারতের ঊনিশ বছর। অর্থাৎ বৃটিশের ভারতব্যাপী প্রকাণ্ড পিঞ্জর থেকে শাসনতান্ত্রিক মুক্তির পর ঊনিশ বছর। অর্থাৎ শতাধিক বছরের তিল তিল সঞ্চয়ে সম্ভব স্বাধীনতা-শতদল ভারত মহাসাগরের বুকে আজ থেকে ঊনিশ বছর আগে স্ফুরিত পাপড়ি নূতন সূর্যের আলোকে মেলে ধরেছিল। আমাদের কণ্ঠে ‘বন্দেমাতরম্’ এবং ‘জয় হিন্দ’ ধ্বনির নূতন তাৎপর্য লাভ ঘটেছিল সেইদিনই। একদিন আমরা মন্দিরের সিংহদুয়ারের বাইরে দাঁড়িয়ে প্রগাঢ় আবেগের সংগে সমবেত কণ্ঠে অন্তরে বেদনামথিত শ্রদ্ধা-ভক্তি উজাড় করে গেয়েছি ‘বন্দেমাতরম্’। আজ মন্দিরের প্রবেশদ্বার উন্মুক্ত। বর্ণাবর্ণ নির্বিশেষে আজ মাতৃপূজার সম্পূর্ণ অধিকারী। কিন্তু আমাদের কণ্ঠে মন্ত্রোচ্চারণে সে আবেগ, সেই রক্তস্রোত-উদ্বেল-করা সংকল্প-দৃঢ় মাতৃবন্দনার সুর ফুটে উঠছে না, নির্বিশেষ সমবেত কণ্ঠের একত্র মন্ত্রোচ্চারণ তো এক বিস্মৃত অধ্যায়ের কীর্তি মাত্র। ঊনিশটা বছর; এরই মধ্যে সমস্ত আবেগের মূর্ছনা, উৎস কি শুকিয়ে গেল। সেদিনের বেদনার মধ্যে ছিল আত্মত্যাগের সুমহান প্রতিজ্ঞা। আজকের বেদনা অথর্বের হতাশায় ন্যুব্জ, অসুস্থ। (প্রসংগত উল্লেখ করব কি, আজকের ‘দেশাত্মবোধক সংগীত’ও, যা আকাশবাণীর প্রভাতী অনুষ্ঠানে একটা আনুষ্ঠানিক সূচীর অন্তর্ভুক্ত হয়ে কর্তব্য পালন করছে, তারই মধ্যে আমি যেন প্রতিদিন আমাদের আবেগের মৃত্যুর সংবাদ পাই। কী আশ্চর্য মেকীঃ কী বোবা শব্দসমষ্টিঃ কী অদ্ভুত আবেগহীন! কণ্ঠনালীর ওপর কৃত্রিম চাপ সৃষ্টি করে সেগুলি যখন গাওয়া হয়, বুঝতে পারি, ‘ভূতের মুখে রাম নাম’ কথাটির বিশিষ্টার্থ। আন্তরিকতার অপমৃত্যুই কি এর দ্বিতীয় নাম?)

কিন্তু আজ ঊনিশ বছর ধরে মাতৃবন্দনার এবং পূজারতির অধিকার ভোগ করার পরও আমাদের কণ্ঠে স্বাভাবিক আবেগ শ্রুত হ'ল না কেন?

স্বাধীনতা দিবস উদ্‌যাপনের কালে এ সমস্ত হতাশাপূর্ণ প্রশ্নই জাগা স্বাভাবিক। অবশ্য এর মানে এই নয় যে, ঊনিশ বছর ধরে আমরা শুধু কড়িকাঠ গুণে দিন কাটিয়েছি। বড় বড় পরিকল্পনা, বড় বড় বাণী এবং বড় বড় কল্পনাও করেছি আমরা। কিন্তু আমাদের ‘ভারত জমিনে’ যতটুকু সফল আবাদ হয়েছে তার সোনার ফসল সকলে মিলে ভোগ করার সুযোগ পাই নি। নেতারা সমবেত প্রয়াসের ডাক দিয়েছেন, কিন্তু সমবেতভাবে প্রাপ্তির আশায় দেশের লোকের মন পুলকিত ও উজ্জ্বল হয়ে ওঠে নি। সুতরাং প্রতি বছরের মতো এ বছরও নেতৃবৃন্দের কণ্ঠে হতাশার সুর বেজে উঠেছে। রাষ্ট্রপতি, কংগ্রেস সভাপতি অনেক স্পষ্ট কথায় আমাদের হতাশার উৎস সন্ধান করেছেন; প্রধানমন্ত্রী একটি প্রথাগত উপায় অবলম্বন করে সূক্ষ্ম প্রশ্ন এড়িয়ে যাওয়ার চেষ্টা করেছেন জনগণের প্রতি দেশ গঠনের আহ্বান জানিয়ে। অর্থাৎ যথাকর্তব্য জনগণে বিলি করে খুশি হয়েছেন।

স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী এবং প্রতিরক্ষামন্ত্রী চীন ও পাকিস্তান থেকে বিপদাশঙ্কার কথা বলে ঐক্যবদ্ধ প্রতিরোধের সংকল্পে দেশবাসীকে অটুট থাকার আহ্বান জানিয়েছেন। আর রেলমন্ত্রী ভয় দেখিয়েছেন এই বলে যে, আগামী সাধারণ নির্বাচন ডামাডোলের বাজারে শান্তি পরিবেশে অনুষ্ঠিত হবে কি না সন্দেহ।

এবারকার স্বাধীনতা দিবস কেবলমাত্র প্রাকৃতিক ভূকম্পনই সংগে করে আনে নি, সাধারণ মানুষের জন্য হৃৎকম্পনও এসেছে তারই সংগে। মুদ্রামূল্য হ্রাসের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে আর্থিক বিপর্যয় রোধ করা হ'ল বলে ক্ষমতাসীন নেতৃবৃন্দ আমাদের সাড়ম্বরে আশ্বাস দিয়ে আসছেন; মুদ্রামূল্য হ্রাসজনিত বিপর্যয়েই সাধারণ মানুষকে কিন্তু প্রমাদ গণতে হয়েছে। মূল্যান্তরে শুধু যে মর্জিমাফিক ফাঁপ ধরিয়ে অল্পবিত্ত মধ্যবিত্ত নিশ্চিহ্নকরণ যজ্ঞই শুরু করে দিয়েছেন দেশের মালতো মালতো ব্যবসায়িবৃন্দ তাই নয়, সরকারও ব্যয়-হ্রাস সিদ্ধান্তটির বোঝা সরাসরি সাধারণ মানুষের কাঁধে চাপিয়েই পরিতৃপ্ত হতে চাইছেন। স্বাধীনতার স্বপ্ন সম্ভব হয়েছে, সম্ভব হল না দরিদ্রের জীবনে দারিদ্র্যমুক্তির আশা। কেন্দ্রীয় সরকারের অনুরোধে নাকি কোন কোন রাজ্য সরকারের মূল্যবান সিদ্ধান্তে স্থির করা হচ্ছে যে, চাকুরিক্ষেত্রে যাবতীয় উন্নতি এবং আয়বৃদ্ধির ক্ষেত্রে যাবতীয় সম্ভাবনাকে দ্বার বন্ধ করে দিয়ে একই প্রকোষ্ঠে আটক রাখা হবে। (সংবাদ—দৈঃ বসুমতী) দাম চড়ুক, আয়ের পথ রুদ্ধ থাক। বেকারের কর্মসংস্থান বন্ধ হ'ক, উন্নতির আশায় ছাই চাপা থাক, স্বাধীনতার সুখ কৃচ্ছ্রসাধনার মধ্যেই লব্ধ। মহাজনের যুক্তি কস্মিনকালেও যেহেতু তর্কসাপেক্ষ নয়, এবং জনগণের বিশ্বস্ত প্রতিনিধিদের হাত-তোলা ভোট যেহেতু জনতারই রায় সুতরাং ঐ সমস্ত সুব্যবস্থায় একগাল মাছি নিয়ে একগাল হাসতে হবে। আমরাও তাই হাসছি, বিকৃত, বিকারগ্রস্তের হাসি।

আমাদের প্রধানমন্ত্রী সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার নূতন সংকল্প নিয়ে আমাদের

বুক ফুলিয়ে দাঁড়াতে বলেছেন, আমরাও বুকে ধূলিধূসরিত করে বলছি, যথা আজ্ঞা! স্বাধীনতার স্বপ্ন সার্থক করে তুলতেই হবে।

মাত্র ১৯৪৮ সালে প্রধানমন্ত্রী নেহরুর স্বাধীন ভারতের স্বপ্ন ছিল, বেকার ও দারিদ্র্যবিহীন ভারতবর্ষ। ১৯৬৬ সালে প্রধানমন্ত্রী নেহরুকন্যা আমাদের এই বলে স্বপ্ন দেখাচ্ছেন যেঃ ঐক্য ও দৃঢ়তার সঙ্গে বৃহৎ সমস্যার সম্মুখীন হয়ে দেশবাসী যদি মহৎ নেতৃবৃন্দের প্রদর্শিত পথে অনুগামী হ'ন তবে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার আশা অবশ্যই পূর্ণ হবে। অর্থাৎ আশা পূরণের সমগ্র দায়িত্ব দেশবাসীর।

প্রধানমন্ত্রী যে মহাজনী পথের নির্দেশ দিয়েছেন সংক্ষেপে তা হ'লঃ পূর্বসূরীদের দেশাত্মবোধে উদ্বুদ্ধ হয়ে, মহাত্মার অহিংসা সত্য ও স্বদেশীর মন্ত্র নিয়ে, শিল্পী শিক্ষক, বুদ্ধিজীবী, কৃষক ও শ্রমিকদের উৎপাদনের ক্ষেত্রে সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণ করতে হবে।

মহৎ নেতৃবৃন্দের এমত আদেশ অবশ্যই শিরোধার্য। কিন্তু তথাচ একটি প্রশ্ন না করে উপায় কি (দায়িত্ব ঘাড়ে নিতে হলে বুঝে শুনে নেওয়ার দরকার)। প্রশ্ন হ'ল, ঢাল নেই, তলওয়ার নেই নিধিরাম সর্দার মূলধন-হীন জনগণ (যাঁদের বিরাট একটি অংশ বেকার এবং ভবিষ্যতেও সরকারী সিদ্ধান্ত অনুসারে বেকার থাকতেই বাধ্য) কেমন করে শ্রীমতী গান্ধীর ভাষায় 'স্বদেশী' করবেন অর্থাৎ উৎপাদন বাড়াবেন? তেমন কিছু করতে গেলে তাঁদের পক্ষে কি বাড়াবাড়ি হয়ে যাবে না?

কিন্তু ছোট মুখে বড় কথা বলে অপরাধ বাড়িয়ে লাভ কি আমার। আমি তো আদার ব্যাপারী। বরং জাহাজের খবর যাঁরা রাখেন ও সৃষ্টি করেন বা তৎসংক্রান্ত সৃষ্টিমূলক কাজের সঙ্গে যাঁদের দায়িত্ব বিজড়িত, তাঁদের স্বাধীনতা দিবসের ভাষণ উদ্ধার করেই বরং আমাদের অবস্থাটা (দুরবস্থা) বুঝতে চেষ্টা করা যাক।

উনবিংশতি স্বাধীনতা বার্ষিকী দিবসের প্রাক্কালে জাতির উদ্দেশ্যে প্রচারিত বাণীতে ভারতের পণ্ডিতশ্রেষ্ঠ রাষ্ট্রপতি ডঃ এস রাধাকৃষ্ণ বলেনঃ ক্ষেত-খামার, কল-কারখানা, সরকারী দপ্তর আর শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, সব জায়গায়ই সৎ এবং কর্মঠ ভারতবাসী আজ বঞ্চনা ও অমর্যাদাবোধে পীড়িত উত্তেজিত। এই অবস্থা তাঁদের নৈতিক চরিত্রকে শিথিল করছে এবং এই উত্তেজনা জাতীয় সম্পদ বিনষ্টিকরণের কারণ হচ্ছে।

লক্ষণীয় এই যে রাষ্ট্রপতি মানুষের অন্তর্চেতনার উৎসটি অনুভব করেছেন এবং তারপর আহ্বান জানিয়েছেন সংহতি ও সংযমের। শুধু সাধারণের ওপরই দায়িত্ব চাপিয়ে দিয়ে তাঁর মহৎ নেতৃত্বের কর্তব্য সমাপন করেন নি; বলেছেনঃ আমাদের প্রতিনিধিবর্গও, যাঁরা জাতির তরফে বক্তব্য পেশের অধিকারী, তাঁদেরও (একই সঙ্গে) হতে হবে পরিশীলিত, নিঃস্বার্থ, জনহিতৈষী। (কেন না) আমাদের ভবিষ্যৎ আমাদের নেতৃবৃন্দের শিক্ষার মানদণ্ডের ওপরই নির্ভরশীল।

রাষ্ট্রপতি তথাকথিত মহৎ নেতৃবৃন্দকে অপরের ঘাড়ে দায়িত্ব চাপিয়ে নিরাপদ আশ্রয় গ্রহণের কিঞ্চিন্মাত্র সুযোগ দেন নি।

বরং মুদ্রামূল্য হ্রাসের মোকাবিলার উপায় সম্পর্কে রাষ্ট্রপতির বক্তব্য যথার্থ দেশনেতৃসুলভ। তিনি বলেছেন, আমাদের প্রভূত আয়াস বর্জন করে জীবনযাত্রা নির্বাহ করার

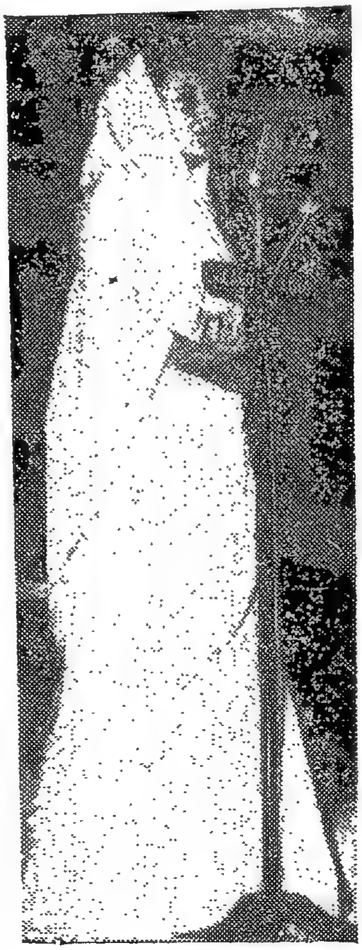

প্রধানমন্ত্রীর বক্তৃতা

শিক্ষা গ্রহণ করতে হবে, স্বীকার করতে হবে কৃচ্ছ্রসাধনা। (কিন্তু কোনখান থেকে সুরু হবে?) রাষ্ট্রপতি বলছেন, সুরু করতে হবে সমাজের উপর স্তর থেকে, কেন না এদেশের সংখ্যা-গরিষ্ঠ মানুষই কণ্টকণ্টকিত জীবন নির্বাহ করছেন।

অর্থাৎ কৃচ্ছ্রসাধনার ক্ষমতাও নিঃশেষিত যে সাধারণ দরিদ্র শ্রেণীর মধ্যে, রাষ্ট্রপতি তাঁদের বাস্তব অক্ষমতাকে কৃত্রিম অস্বীকৃতির দ্বারা অস্বীকার করেন নি।

ঃ যখন দেখা যায় শতকরা সত্তর-জনেরও বেশি লোক কৃষিকার্যে নিযুক্ত থাকা সত্ত্বেও আমরা খাদ্যবস্তুর আমদানি করি, রাষ্ট্রপতি বলেন, তখন বোঝা যায় আমরা অদ্যাবধি আদিম সমাজেই বাস করছি যেখানে কৃষিভূমি সামগ্রিকভাবে আকাশের জলেরই মুখাপেক্ষী।

কারণস্বরূপ জনসাধারণকে দোষারোপ না করে প্রশাসনিক ব্যবস্থার কঠোর সমালোচনা করেছেন ভারতীয় শাসনব্যবস্থার সর্বোচ্চ পদাধিকারী রাষ্ট্রপতি। বলেছেনঃ প্রাচুর্যের সময় সংগ্রহশালা ভরে রাখার দিকে আমরা যথেষ্ট নজর দিই না। অপেক্ষাকৃত অভাবের দিনে উত্তম বণ্টনব্যবস্থা গ্রহণেও অপারগ হয়েছি আমরা।

অভাবকে আরও বাড়িয়ে দিয়েছেন যাঁরা রাষ্ট্রপতি তাঁদেরও সরাসরি চিহ্নিত করেন ঃ মজুতদারী ফাটকাবাজী এবং প্রশাসনিক ব্যবস্থায় গলদই কারণ বলে উল্লেখ করেছেন। স্বীকার করেছেন সরকার এই অপব্যবস্থা থেকে দেশকে উদ্ধার করতে সদিচ্ছা প্রকাশ করেন নি। "একটি সৎ ও দৃঢ়প্রতিজ্ঞ সরকারের কর্তব্য দুর্নীতি দমনে সাগ্রহী থাকা।"

সংসারের পক্ষপাতহীন জ্ঞানবৃদ্ধ বয়োজ্যেষ্ঠের মতই স্বাধীনতা বার্ষিকী উপলক্ষে রাষ্ট্রপতি দোষগুণের যে বিচার করেছেন তা তাঁকে সাধারণ নেতৃগোষ্ঠীর মধ্যে স্বতন্ত্র উজ্জ্বল ও সত্যাশ্রয়ীরূপে জনগণের সামনে প্রতিষ্ঠিত করেছে। ভারতের জনগণ তাঁর ন্যায় নেতা লাভ করে গর্বিত এবং ধন্য।

যে ক্ষমতাসীন দল ভারতবর্ষ শাসন করছেন সেই দলের সর্বোচ্চ পদাধিকারী সভাপতি শ্রীকামরাজও তাঁর বিদেশ সফরের পর দেশে প্রত্যাবর্তন করে আমাদের অনেক হক কথা শুনিয়েছেন। শ্রীকামরাজই কংগ্রেসী নেতৃবৃন্দের মধ্যে একান্তভাবে সমাজতান্ত্রিক সমাজের ধুয়াটি আরও দৃঢ়ভাবে ধরে রাখবার চেষ্টা করছেন। এ-পর্যন্ত তিনি যখনই সুযোগ পেয়েছেন তখনই বিস্মরণশীল জাতিকে নেহরু-পন্থায় সমাজতন্ত্রবাদ

প্রতিষ্ঠার প্রতিজ্ঞার কথা স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন। বিদেশ সফরকালে শ্রীকামরাজ সমাজতান্ত্রিক দেশগুলির দ্রুত উন্নয়ন লক্ষ্য করে সমাজতান্ত্রিক সমাজের বাস্তব সাফল্যের গভীর বিশ্বাস নিয়েই প্রত্যাবর্তন করেছেন। এবং যেহেতু শ্রীকামরাজ আগাগোড়াই সমাজতান্ত্রিক সমাজ গঠনের প্রতিজ্ঞা দেশবাসীকে ক্রমান্বয়ে স্মরণ করিয়ে আসছেন, তার বিবৃতিকে তাই বিদেশের প্রতি সৌজন্যমূলক বক্তব্য কিম্বা মনে-এক মুখে-এক পেশাদার রাজনীতিক বক্তৃতা বলে আমরা এক কথায় চিহ্নিত করতে পারি না। সমাজতন্ত্রের প্রতি আকর্ষণ ও আবেগ তিনি অনুভব করে থাকেন। এইটুকু না হলে সমাজতন্ত্র দূরে থাক, নেহরু মিশ্র অর্থনীতি পর্যন্ত বেমালুম যাঁরা ভুলিয়ে দেওয়ার নিয়ত চেষ্টা করছেন; কামরাজ তাঁদের সংগে অন্তত এক বিষয়ে পাঞ্জা লড়ে আসছেন ক্রমান্বয়ে। তা হ'ল তিনি ব্যাপারটা স্মরণপথে এনে দিচ্ছেন। বলা বাহুল্য, তাঁর পদমর্যাদার কথা চিন্তা করে এটুকুও অনেক ভেবেই আনন্দিত হতে পারি আমরা। সে সংগে একথাও অবশ্যই বলব যে, কামরাজ যখন নেহরু মিশ্র নীতির প্রসংগে কথা বলেন তখন তা তাঁর অন্তরের আবেদনেই বলেন, আসন্ন নির্বাচনের আগ্রাসী ছায়া দেখে বলে ফেলেন না।

কামরাজের সাম্প্রতিক বক্তৃতায় বলিষ্ঠ কণ্ঠস্বর শোনা গেছে যখন তিনি বলছেনঃ যে দরিদ্র জনসাধারণ অর্ধাশনে দিনাতিপাত করছেন তাঁদের প্রতি আর কোনরকম কৃচ্ছ্রসাধনার আহ্বান জানানো সম্ভব নয়। উচ্চবিত্তদেরই বরং ভোগ্যসামগ্রীর সংখ্যা হ্রাস করতে বলা উচিত। আর এ সমস্ত ব্যাপারে দৃঢ় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে, তাতে ধনিককুল যতই "চেঁচামেচি" (shouts) করুন না কেন।

তিনি আরও বলেছেন, নেহরু সমাজতন্ত্রকেই জনগণের উন্নতির একমাত্র পথ হিসেবে উপলব্ধি করেছিলেন। কিন্তু আজ অনেকের সংগে অনেক কংগ্রেসী সদস্যও নেহরু নীতির গদল নিয়ে উচ্চবাচ্য করে যাচ্ছেন। কিন্তু...শ্রীকামরাজ প্রশ্ন করেন, দ্রব্যমূল্যের অকস্মাৎ ঊর্ধ্বগতি কি নেহরু আমলের ঘটনা, না কি তার পরবর্তী কালের?

বস্তুত নেহরুজীর জীবৎকালে কালোবাজারী দুঃসাহস আজকের মত এমন ঔদ্ধত্য প্রকাশের সাহস পায় নি। কামরাজ তাই যথার্থই বলেছেন, অপরের ঘাড়ে (এইভাবে) দোষ চাপানোর অভ্যাস "কাপুরুষতা"।

শ্রীকামরাজ

দুঃখের বিষয় আমাদের মধ্যে এই কাপুরুষটি নির্বিঘ্নে বসবাস করছে এবং সেই কাপুরুষরাই বুক ফুলিয়ে সমাজের 'ভেরি ইম্পর্টেণ্ট পারসনস' হয়ে নির্ভয়ে বিচরণ করছেন।

শ্রীকামরাজ নেহরু নীতির প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে রদবদলকেও মেনে নিতে রাজী আছেন তবে ঘোষণা করেছেন, —সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার পথে যে কোন বাধা-বিপত্তিই আসুক, সে বাধা ভেঙে ফেলতে হবে তা সে যত শক্তিশালী বাধাই হোক না কেন।

শ্রীকামরাজ সমাজতান্ত্রিক দেশগুলি ভ্রমণ করে এসে যে বস্তুতই অভিভূত হয়ে পড়েছেন তা তাঁর বক্তব্যেই পরিস্ফুট। এ সম্পর্কে মাদ্রাজের শিল্পমন্ত্রী শ্রীভেংকটরমনও জানিয়েছেন যে, সমাজতান্ত্রিক দেশে জনগণের জন্য প্রদত্ত প্রভূত সুযোগ-সুবিধাগুলি দেখে তিনি গভীরভাবে বিচলিত হয়েছেন। হবারই কথা। সারা দুনিয়ার নিপীড়িত মানুষও ঐ পথেই মুক্তি খুঁজছেন, সাক্ষাৎ পরিচয় লাভে শ্রীকামরাজ যে অভিভূত হবেন এটাই স্বাভাবিক। তবে অনেকে তা হন না, সেজন্যই শ্রীকামরাজের সফর শুধু যে সফল হয়েছে তাই নয়, এ সফর ভারতের সমাজতান্ত্রিক সমাজ প্রতিষ্ঠার নিভন্ত আশার প্রদীপের সলতেও উসকে দিয়েছে।

সব কথার শেষে অবশ্য শ্রীকামরাজ আসল কথাটিও বলেছেনঃ বলেছেন, কংগ্রেস দলে ভুলভ্রান্তি প্রচুর আছে, তা থাক কংগ্রেসই একমাত্র সরকার গঠন করায় সক্ষম।

সমাজতান্ত্রিক সমাজ গঠন এবং কংগ্রেসের সরকার গঠনের মধ্যে তবে কী যোগসূত্র শ্রীকামরাজ আরোপ করলেন? হয়ত তিনি বলতে চাইলেন, ত্রুটি-সমৃদ্ধ কংগ্রেসই একমাত্র সমাজতন্ত্রবাদের প্রতিষ্ঠা দিতে সক্ষম। সমাজতন্ত্রবাদ-বিরোধিগণকে তবে কি কংগ্রেস এবার কংগ্রেস সভাপতির কড়া বক্তব্য অনুসারে 'র‍্যাশনালাইজ' বা সম্মার্জিত করবে?

স্বাধীনতা উৎসবের কালে প্রাকৃতিক রোষ

নয়াদিল্লীতে প্রচণ্ড বর্ষণ ও ভূকম্পনজনিত প্রাকৃতিক বিপর্যয় মাথায় নিয়েই যথারীতি স্বাধীনতা বার্ষিকী পালিত হয়েছে। ভূকম্পনে প্রাণহানি হয়েছে সতেরজনের। দিল্লীর জুম্মা মসজিদের কাছে একটি তিনতলা বাড়ি ভূমিসাৎ হলে চোদ্দজন নিহত এবং একত্রিশজন আহত হন। পাহাড়গঞ্জ, হরিৎনগর এবং সদরবাজারেও তিনটি বাসগৃহ ধ্বসে পড়ে। নিহত হন তিনজন এবং আহত চারজন।

স্বাধীনতা বার্ষিকী উৎসবে দিল্লীতে দমকল ও সেনাবাহিনীকে দৌড়-ঝাঁপ করতে হয়েছ। বলা বাহুল্য সেদিন এরা প্রাকৃতিক রোষেরই মোকাবিলা করেছে।

জাম্বিয়া প্রজাতন্ত্রের অতিথি

জাম্বিয়া প্রজাতন্ত্রের একটি প্রতিনিধিদল নূতন দিল্লীতে রাষ্ট্রপতি ডঃ রাধাকৃষ্ণণ ও প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীর সংগে সাক্ষাৎ করেন। প্রতিনিধিদলের নেতৃত্ব করেন জাম্বিয়ার উপরাষ্ট্রপতি শ্রীরুবেন সি কামাংগা।

ভারতের প্রতি সুহৃৎ মনোভাবাপন্ন শ্রীরুবেন সি কামাংগাকে রাষ্ট্রপতি শ্রীকেনেথ কাউণ্ডা এ্যাফ্রো-এশীয় দেশগুলি পরিভ্রমণ করে দক্ষিণ রোডেশিয়ায় শ্বেতাংগ সংখ্যালঘু শাসন সম্পর্কে বিভিন্ন রাষ্ট্রকে অবহিত করে তোলার জন্য প্রেরণ করেছেন।

শ্রীকামাংগার নেতৃত্বে জাম্বীয় প্রতিনিধিদলের ভারত সফর উভয় রাষ্ট্রের মৈত্রীবন্ধনকে দৃঢ়তর ভূমিতে প্রতিষ্ঠিত করবে। শ্রীকামাংগার চারদিনব্যাপী ভারত সফর উভয় দেশের মৈত্রী ও বিশ্বাসেরই পরিচায়ক।

মালয়েশিয়া-ইন্দোনেশিয়া শান্তিচুক্তি স্বাক্ষর

ইন্দোনেশিয়া ঃ

আনুষ্ঠানিকভাবে ইন্দোনেশিয়া-মালয়েশিয়া সংঘর্ষের অবসান ঘোষণা করা হয়েছে। ১১ই আগস্ট জাকার্তায় ইন্দোনেশীয় সরকারের পররাষ্ট্র বিভাগের অফিসে দুই দেশের প্রতিনিধি শান্তি চুক্তিতে স্বাক্ষর করেন। ইন্দোনেশিয়ার পক্ষে পররাষ্ট্রমন্ত্রী ডঃ আদম মালিক ও মালয়েশিয়ার পক্ষে পররাষ্ট্রমন্ত্রী টুন্ আবদুল রেজ্জাক চুক্তিপত্রে স্বাক্ষর দেন। স্বাক্ষরের সময় ইন্দোনেশীয় সরকারের প্রেসিডিয়ামের চেয়ারম্যান জেনারেল সুহার্তো এবং অন্যান্য পদস্থ ব্যক্তিরা উপস্থিত ছিলেন। টুন্ আবদুল রেজ্জাক এই উপলক্ষে রাষ্ট্রপতি সোয়েকার্নোর সঙ্গেও সৌজন্য-সাক্ষাৎ করেন।

শান্তি চুক্তিতে বলা হয়েছে, দুই দেশের মধ্যে সংঘর্ষের অবসান হল। উভয় দেশের মধ্যে অবিলম্বে কূটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপন করা হবে। আর, সাবা ও সারাওয়াকের ব্যাপারে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে, এই দুইটি অঞ্চলে সাধারণ নির্বাচনের মাধ্যমে স্থির করা হবে, এরা মালয়েশিয়ার ভেতরেই থাকবে, না পৃথক ও স্বাধীন হবে।

এইভাবে প্রতিবেশী দুই দেশের মধ্যে তিন বৎসরব্যাপী সংঘর্ষ শেষ হ'ল। দুই দেশের নেতারাই সৌহার্দ্য-সম্পর্ক গড়ে তোলার জন্য বিশেষভাবে আগ্রহী। শান্তি চুক্তি স্বাক্ষরের পূর্বে ডঃ আদম মালিক কুয়ালালামপুর গিয়েছিলেন, সেখানকার নেতাদের সঙ্গে কথাবার্তা বলার জন্য। কুয়ালালামপুরে সাংবাদিকদের কাছে তিনি বলেন, উভয় দেশের মধ্যে সহযোগিতার ফলে উভয়েরই সমৃদ্ধি বৃদ্ধি পাবে। তিনি অত্যন্ত স্পষ্টভাবে বলেন, নির্বাচনের মধ্য দিয়ে সাবা ও সারাওয়াকের জনসাধারণ যে মত প্রকাশ করবে তাঁরা তা মেনে নেবেন।

সাবা ও সারাওয়াকের প্রশ্ন নিয়েই গোলমাল ছিল সবচেয়ে বেশি। এর পূর্বে যখন রাষ্ট্রসঙ্ঘের তত্ত্বাবধানে এ দু'টি অঞ্চলে নির্বাচন হয়, তখন ইন্দোনেশিয়া এই নির্বাচনের ফল মেনে নিতে অস্বীকার করেছিল। অবশ্যই নির্বাচনের ফল মালয়েশিয়ার পক্ষে গিয়েছিল। এবারও মনে হচ্ছে, নির্বাচন হলে তার ফল মালয়েশিয়ার অনুকূলেই যাবে। তবু ইন্দোনেশিয়া এই বিষয়ে সম্মতি জানিয়েছে। শান্তিপ্রতিষ্ঠার ঐকান্তিক আগ্রহেই ইন্দোনেশিয়ার নতুন নেতারা এই পথে অগ্রসর হয়েছেন।

'মালয়েশিয়া ধ্বংস' অভিযানের নায়ক রাষ্ট্রপতি সোয়েকার্নো মালয়েশিয়ার সঙ্গে এভাবে আপোষ-মীমাংসা পছন্দ না করলেও, তাঁর পক্ষে আজ এই অবস্থা মেনে না নিয়েও উপায় নেই। কারণ, সোয়েকার্নোর প্রকৃত ক্ষমতা বলতে আজ আর কিছুই নেই। সকল ক্ষমতা এখন জেনারেল সুহার্তো ও তাঁর মন্ত্রিমণ্ডলী এবং দেশের সর্বোচ্চ আইনসভা 'পিপলস্ কনসালটেটিভ কাউন্সিলের' হাতে। তাঁরা সবাই শান্তিপ্রতিষ্ঠার জন্য ব্যগ্র।

কিন্তু তা সত্ত্বেও সোয়েকার্নো সাধ্যমত মীমাংসায় বাধা দিয়ে যাচ্ছেন। ১৭ই আগস্ট ইন্দোনেশীয় স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষে জাকার্তায় 'ফ্রিডম স্কোয়ারে' দশ লক্ষ লোকের এক বিরাট সমাবেশে বক্তৃতা দেবার সময় সোয়েকার্নো বলেন, সাবা ও সারাওয়াকের নির্বাচনের ফলাফল প্রকাশ না হওয়া পর্যন্ত তাঁরা মালয়েশিয়াকে স্বীকার করবেন না। এই বক্তৃতাতেও তিনি মালয়েশিয়ার বিরুদ্ধে বলেন। এ ছাড়া দেশের 'দক্ষিণপন্থী প্রতিক্রিয়াশীলদের' আচরণের সমালোচনা করে তিনি কিছু মন্তব্য করেন। রাষ্ট্রসংঘের বিরুদ্ধে বিষোদ্গার করতেও তিনি ছাড়েন নি।

সোয়েকার্নোর এই বক্তৃতায় সর্বত্র ক্ষোভ ও বিস্ময়ের সৃষ্টি হয়েছে। সরকারী সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে সোয়েকার্নো এভাবে কাজ করছেন কেন? সুহার্তো-মালিক মোটেই এ ব্যাপার পছন্দ করছেন না। জাকার্তার ছাত্ররা সোয়েকার্নোর বক্তৃতার প্রতিবাদ করলে আদম মালিক তাদের উদ্দেশ্য করে বলেন, রাষ্ট্রপতির এই বক্তৃতার প্রতি কোনরূপ গুরুত্ব আরোপ করার প্রয়োজন নেই।

সোয়েকার্নো কর্তৃক প্রকাশ্যে এই সব মন্তব্য করার ফলে ইন্দোনেশিয়ায় আজ এক অদ্ভুত পরিস্থিতির উদ্ভব হয়েছে। জনসাধারণের মধ্যে সোয়েকার্নোর প্রভাব এখনও যথেষ্ট আছে। তাছাড়া শত নির্যাতন সত্ত্বেও কমিউনিস্টরা একেবারে নিশ্চিহ্ন হয় নি। তারা সোয়েকার্নোর বক্তৃতার ফলে উৎসাহ পেয়েছে। ১৯শে আগস্ট বান্দুং-এ সোয়েকার্নোর সমর্থনে এক দল ছাত্র বিক্ষোভ প্রদর্শন করে। তারা বান্দুং বিশ্ববিদ্যালয় ও সোয়েকার্নো বিরোধী ছাত্রসঙ্ঘ কামি'র দপ্তর আক্রমণ করে। এর ফলে সোয়েকার্নো-বিরোধী ৬জন ছাত্র নিহত হয়। এর পর স্বাভাবিক ভাবেই সোয়েকার্নো-বিরোধী ছাত্ররাও এগিয়ে আসে, এবং দুই দলের মধ্যে প্রবল সঙ্ঘর্ষ সুরু হয়। এই সংঘর্ষ বর্তমানে কেবল আর ছাত্রদের মধ্যে আবদ্ধ নেই। সোয়েকার্নো সমর্থক ও সোয়েকার্নো-বিরোধী জনসাধারণের মধ্যে পশ্চিম ও মধ্য জাভার বিভিন্ন অঞ্চলে এই সঙ্ঘর্ষ ছড়িয়ে পড়েছে। সৈন্যদলকেও এ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করতে হয়েছে। আশঙ্কা হচ্ছে, ইন্দোনেশিয়ার অন্যত্রও গোলযোগের বিস্তার হবে।

জাকার্তায় মোতায়েন সৈন্যবাহিনীর অধিনায়ক মেজর জেনারেল আমির মাকসুদ ইন্দোনেশিয়ার কমিউনিস্ট

পার্টির বিরুদ্ধে এই অভিযোগ করেন যে, তারা আগামী মাসে রাজধানীতে গৃহযুদ্ধ সুরু করার ষড়যন্ত্র করেছিল।

জাকার্তায় বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের নেতারা সোয়েকার্নোর বিরুদ্ধে অভিযোগ করেছেন যে, তিনি গৃহযুদ্ধে উস্কানি দিচ্ছেন। বান্দুং-এ এক দল নেতা বলেছেন, তাঁরা সোয়েকার্নোকে আর রাষ্ট্রপতি বলে স্বীকার করেন না।

অবস্থা দেখে মনে হচ্ছে, ইন্দোনেশিয়ার গোলমাল এখনও মেটে নি। গৃহযুদ্ধের বিপর্যয়ের পথে এগিয়ে চলেছে ইন্দোনেশিয়া।

রাষ্ট্রসংঘ :

১৩ই আগস্ট রাষ্ট্রসংঘের উপনিবেশবাদ সংক্রান্ত বিশেষ কমিটিতে বক্তৃতা করার সময় সোভিয়েট প্রতিনিধি পোভেল সাপভ বৃটেনের বিরুদ্ধে ভারত মহাসাগরে সামরিক ঘাঁটি স্থাপনের অভিযোগ করেছেন।

বৃটেন ভারত মহাসাগরে মউরিটাস ও সিচেল্স দ্বীপপুঞ্জে সামরিক ঘাঁটি স্থাপন করেছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের যোগসাজসে বৃটেন এই ঘাঁটিগুলি রক্ষা করছে। এই সব ঘাঁটিতে পরমাণু শক্তিবিশিষ্ট সাবমেরিন রয়েছে। তাছাড়া ক্ষেপণাস্ত্র নিক্ষেপের ব্যবস্থাও করা হয়েছে। সাপভ অভিযোগ করেন, এশিয়া ও আফ্রিকার বিরুদ্ধে ব্যবহারের জন্য বৃটেন এই সামরিক ঘাঁটিগুলি রেখেছে। এই কারণেই মউরিটাস ও সিচেল্সের স্বাধীনতা বৃটেন স্বীকার করছে না।

দক্ষিণ আতলান্তিকেও বৃটেন সেন্ট হেলেনা দ্বীপে সামরিক ঘাঁটি স্থাপন করেছে। অস্ট্রেলিয়াও ঘোষণা করেছে, নিউগিনি ও পাপুয়ায় সামরিক ঘাঁটি স্থাপন করা হবে।

অবিলম্বে এই সব সামরিক ঘাঁটির বিলোপ প্রয়োজন। কারণ, এই ঘাঁটিগুলি থাকার জন্য উপনিবেশবাদের অবসান ঘটছে না, অপর দেশের স্বাধীনতা বিপন্ন হচ্ছে, এবং বিশ্বের শান্তি ও নিরাপত্তা বিঘ্নিত হচ্ছে। তাই সাপভ উপনিবেশবাদ সংক্রান্ত কমিটির সম্মুখে চার দফা প্রস্তাব রেখেছেন : (১) সকল বিদেশী সৈন্যের অপসারণ করতে হবে; (২) সর্বপ্রকার সামরিক ঘাঁটির বিলোপ ঘটাতে হবে; (৩) এক মানুষ, এক ভোট—এই নীতিতে সব ক'টি উপনিবেশে অবিলম্বে নির্বাচনের ব্যবস্থা করতে হবে; এবং (৪) কোন দেশের অখণ্ডত্ব ও স্বাধীনতা নষ্ট হতে পারে, এমন কোন কাজ করা চলবে না।

এশিয়া ও আফ্রিকার অন্যান্য প্রতিনিধিরা সাপভের বক্তব্যের প্রতি পূর্ণ সমর্থন জানিয়েছেন।

চীন :

চীনা কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির বারো দিন ব্যাপী পূর্ণাঙ্গ অধিবেশন বা প্লেনারি সেশন ১৩ই আগস্ট থেকে পিকিং-এ সুরু হয়েছে। ১৯৬২ সালের সেপ্টেম্বর মাসের পর এই প্রথম কমিটির পূর্ণাঙ্গ অধিবেশন হ'ল। পার্টির চেয়ারম্যান মাও-সে-তুং অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন।

অধিবেশনে চীনের আভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিকনীতি নিয়ে দীর্ঘ আলোচনা হয়, এবং সরকারের নীতি অনুমোদিত হয়। সম্প্রতি দলের বহু বিশিষ্ট নেতাকে বহিষ্কার করা হয়, এ বিষয়টিও আলোচনায় প্রাধান্য লাভ করে।

যথারীতি সোভিয়েট ইউনিয়নের বিরুদ্ধে বিষোদ্গার করা হয়। কেন্দ্রীয় কমিটির রিপোর্টে পরিষ্কার বলা হয়, সোভিয়েট ইউনিয়নের সঙ্গে 'এক যোগে কাজ করা অসম্ভব'। সোভিয়েট ইউনিয়নের বর্তমান নেতৃবৃন্দ মার্কস-লেনিনের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করেছেন। তাঁরা আবার পুঁজিবাদকে ফিরিয়ে আনার জন্য চেষ্টা করছেন। ভিয়েতনামের ব্যাপারে সোভিয়েট নীতির তীব্র সমালোচনা করে বলা হয়, সোভিয়েট নেতারা দুমুখো নীতি অনুসরণ করছেন। তাঁদের আচরণের ফলে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদেরই লাভ হচ্ছে, ভিয়েতনামের মুক্তি-সংগ্রামের প্রতি তাঁরা বিশ্বাসঘাতকতা করছেন।

দীর্ঘ চার বৎসর পর চীনা কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃত্বের পূর্ণাঙ্গ বৈঠকে সোভিয়েট ইউনিয়ন সম্পর্কে এই মূল্যায়ন করা হয়েছে। সুতরাং অদূরভবিষ্যতে চীন-সোভিয়েট সম্পর্কের উন্নতির কোন আশা নেই

বৃটেন :

পাকিস্তানের প্রাক্তন পররাষ্ট্রমন্ত্রী জুলফিকার আলি ভুট্টো মুখ খুলেছেন। আয়ুব খাঁ কর্তৃক মন্ত্রিসভা থেকে 'অপসারিত' হবার পর এতদিন তিনি স্পষ্ট করে কিছুই বলেন নি। গত ১৪ই আগস্ট লণ্ডনে পাকিস্তানী ছাত্রদের এক সভায় তিনি তাঁর ক্ষোভ কিছুটা প্রকাশ করেছেন।

সপ্তাহখানেক পূর্বে ভুট্টো লণ্ডনে এসেছেন। পাক ছাত্র ফেডারেশনের আহ্বানে ছাত্রদের এক সভায় ১৪ই আগস্ট ভুট্টো বক্তৃতা করেন।

ভুট্টোর বক্তব্য, পাকিস্তানী সরকার সম্পূর্ণভাবে বৃটেন ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কর্তৃত্বাধীন। এদের নির্দেশমত পাকিস্তানকে কাজ করতে হয়। পাকিস্তানের স্বাধীনতা বলে কিছু নেই। তিনি হুমকী দিয়েছেন, প্রয়োজন হলে এ ব্যাপারে ভবিষ্যতে তিনি অনেক তথ্য ফাঁস করবেন।

পাকিস্তান চীনের সঙ্গে যতই দোস্তি করুক, শেষ পর্যন্ত যে সে বৃটেন বিশেষ করে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নির্দেশে পরিচালিত হয়, এ কথা নতুন নয়। তবে পাকিস্তানী পররাষ্ট্র নীতির অন্যতম নিয়ামক ভুট্টো স্বয়ং চাকরি যাবার পর গায়ের জ্বালায় এ কথা বলে ফেললেন, এ নিশ্চয়ই উল্লেখযোগ্য।

কমনওয়েলথের বিরুদ্ধে ভুট্টো অনেক কড়া কথা বলেছেন। তাঁর মতে, কমনওয়েলথ একটি প্রহসন মাত্র। বৃটেন কমনওয়েলথের মধ্য দিয়ে এক সদস্যের বিরুদ্ধে অপর সদস্যকে ব্যবহার করে। লণ্ডনে কমনওয়েলথ প্রধানমন্ত্রীদের আসন্ন সম্মেলনের পটভূমিকায় ভুট্টোর এই মন্তব্য লক্ষণীয়।

রাজনৈতিক পর্যবেক্ষকদের ধারণা, ভুট্টোর এই বক্তৃতা আয়ুব-পিরজাদা নেতৃত্বের প্রতি পরোক্ষ চ্যালেঞ্জ-স্বরূপ। খাস পাকিস্তানে এই মন্তব্যের কি প্রতিক্রিয়া হয়, ভুট্টো তা সাগ্রহে লক্ষ্য করবেন। তবে ভুট্টোর পক্ষে আবার পাকিস্তানী রাজনীতিতে প্রবেশ করা খুব সহজ হবে বলে মনে হয় না।

এই বক্তৃতায় ভুট্টো তাঁর স্বভাবসিদ্ধ ভঙ্গীতে ভারতের বিরুদ্ধে বিষোদ্গার করেছেন। কাশ্মীর প্রসঙ্গ তুলে তিনি ভারতের সমালোচনা করেন, এবং বলেন, ভারতকে অবশ্যই কাশ্মীর ছাড়তে হবে।

মৃতের জন্য জীবন

॥ আশিসকুমার সিংহ ॥

গত ২৩শে জুলাই-এর সংবাদপত্রে একদল বৃটিশ ডাক্তারের একটি আশ্চর্য কাজের বিবরণ হয়তো আপনাদের চোখে পড়েছে। আশি মিনিট ধরে মৃত একজন রোগীকে পুনরায় তাঁরা জীবন দান করেছেন। ৩৯ বৎসর বয়সের এই রোগীকে বুকের যন্ত্রণায় কাতর অবস্থায় হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয় এবং কয়েক মিনিট পরেই তাঁর হৃৎপিন্ডের স্পন্দন যায় থেমে। ডাক্তারেরা তখন "পেস্-মেকার" নামে একটি যন্ত্রের সাহায্যে চামড়ার ওপর থেকে বন্ধ হৃৎপিন্ডে খুব ঘন ঘন বৈদ্যুতিক শক্ দিতে থাকেন। আশি মিনিট পরে হৃৎপিন্ডটা চলতে সুরু করে আবার।

কাজটা খুবই আশ্চর্যের, কিন্তু বাঙালীর কাছে নতুন নয়। চার-পাঁচ বছর আগে খোদ কলকাতাতেই বিজ্ঞান কলেজে অনুরূপ একটি ঘটনার কথা অনেকের হয়তো মনে আছে। শারীর-বৃত্ত বিভাগের ভূতপূর্ব প্রধান ডঃ বি বি সরকার গবেষণার কাজে ঐ বিভাগে এসে হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়েন। হৃৎপিন্ডের স্পন্দন নেমে আসতে থাকে দ্রুত। তিনি জ্ঞান হারান। সৌভাগ্যের কথা, বিভাগের গবেষণাগারে গবেষণার জন্য আনীত "পেস্-মেকার" যন্ত্রটি তখন প্রস্তুত ছিল। সঙ্গে সঙ্গে সেটিকে ব্যবহার করা হয়। কিছুক্ষণের মধ্যেই ডঃ সরকারের হৃৎপিন্ড আবার তার স্বাভাবিক স্পন্দন ফিরে পায়; তিনি জ্ঞান লাভ করেন এবং সুস্থ হয়ে ওঠেন ধীরে ধীরে।

হৃৎপিন্ডের এই পুনর্জীবন-লাভের বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যাটি কি সেটি সংক্ষেপে আলোচনার জন্যেই এই প্রবন্ধের অবতারণা। মনে রাখা দরকার যে শুধু মানুষেরই নয়, মনুষ্যেতর প্রাণীর হৃৎপিন্ডেরও আবার বেঁচে-ওঠার এই ক্ষমতাটি আছে। বস্তুত, যে-জ্ঞানের পরিপ্রেক্ষিতে কলকাতা বা লন্ডনের ডাক্তারেরা হৃৎপিন্ডকে ওভাবে সচল রাখার কথা ভাবতে পেরেছিলেন সেই জ্ঞান ইতর প্রাণীর ওপরে পরীক্ষার ফলেই অর্জিত।

আর এ পরীক্ষা করা এমন কিছু কঠিন নয়। একটি নিজস্ব অভিজ্ঞতার গল্প বলি। আমি এবং আমার দুজন সহপাঠিনী একবার স্নাতকোত্তর শারীর বিজ্ঞানের বায়োফিজিক্স ক্লাসে ইঁদুরের দেহতাপের সঙ্গে তার কয়েকটি দেহযন্ত্রের ক্রিয়ার সম্বন্ধ পর্যবেক্ষণ করছিলাম। একটি সুস্থ সবল ইঁদুরকে ঈথারে অজ্ঞান করে একটি ট্রেতে করে শুইয়ে দেওয়া হল, তার পাগুলিকে সংযুক্ত করা হল ইলেকট্রোকার্ডিয়োগ্রাফ নামে একটি যন্ত্রের সঙ্গে হৃৎস্পন্দন মাপবার উদ্দেশ্যে, এবং দেহতাপ কমানোর জন্যে তার বুকে পেটে চাপিয়ে দেওয়া হল কয়েকটি বরফ ভর্তি আইসব্যাগ। দেখা গেল, যত তার দেহতাপ নেমে যাচ্ছে ততই কমে যাচ্ছে হৃৎস্পন্দন। কমতে কমতে দেহতাপ যখন ১৮° সেঃ, তখন হৃৎপিন্ডটি একেবারেই থেমে গেল। এ অবস্থায় ইঁদুরটাকে আমরা রেখে দিলাম কয়েক মিনিট। তারপর আবার তাকে গরম করা সুরু হল একটি বৈদ্যুতিক বালবের সাহায্যে। অল্প পরেই তার হৃৎস্পন্দন ফিরে এল। ইঁদুরটি বেঁচে গেল এবং বেঁচে থাকল ঠিক আগের মতই।

মানুষ এবং ইঁদুর উভয়েই চলিত কথায় উষ্ণ রক্তের প্রাণী। ব্যাঙ, সাপ প্রভৃতি শীতল রক্তের প্রাণীর হৃৎপিন্ড মানুষ বা ইঁদুরের হৃৎপিন্ডের চেয়ে আরও মজবুত। তাদের পুনর্জীবন লাভের ক্ষমতা আরও অনেক বেশি। অনেকটা এই কারণে শারীরবৃত্তের পরীক্ষাগারে হৃৎপিন্ড-সংক্রান্ত নানারকম পরীক্ষা-নিরীক্ষার কাজে, যাতে হৃৎপিন্ডকে অনেক ধকল সইতে হয় তাতে, ব্যাঙের হৃৎপিন্ডই ব্যবহৃত হয়। সেই সব পরীক্ষা সম্বন্ধে একটি সংক্ষিপ্ত আলোচনা আমাদের মূল আলোচনাকে সাহায্য করবে।

ব্যাঙের হৃৎপিন্ডের প্রধানত তিনটি ভাগ। একটি সাইনাস্ ভেনোসাস্ (সংক্ষেপে সাইনাস্), দুটি অরিক্‌ল্ বা অলিন্দ, এবং একটি ভেন্‌ট্রিক্‌ল্ বা নিলয়। দক্ষিণ অলিন্দের পেছনে অবস্থিত হৃৎপিন্ডের আর একটি অংশের নাম বাল্‌বাস্ আরটারিওসাস্—এর থেকে দুটি মহাধমনী নির্গত হয়েছে। শরীরের দূষিত রক্ত তিনটি শিরাপথে সাইনাস্ ভেনোসাসে এসে পড়ে, তারপরে যায় দক্ষিণ অলিন্দে। বাম অলিন্দ ফুসফুসে পরিষ্কৃত শুদ্ধ রক্ত গ্রহণ করে। তারপরে বাম ও দক্ষিণ অলিন্দের রক্ত এসে পড়ে নিলয়ে। নিলয় বাল্‌বাস্ আরটারিও-সাস্-এর মাধ্যমে সেই রক্ত মহাধমনী পথে সমস্ত শরীরে পাঠিয়ে দেয় এমন-ভাবে যাতে বিশুদ্ধ রক্ত প্রধানত মস্তিষ্কের দিকে প্রবাহিত হয়।

হৃৎপিন্ডের স্পন্দনশীলতা রক্তে বিভিন্ন প্রকার লবণের একটি নির্দিষ্ট অনুপাতে উপস্থিতির ওপরে নির্ভর-শীল। জলে এই সব লবণগুলি ঠিক ঠিক অনুপাতে মিশিয়ে একটি দ্রবণ বা "সলিউশান" তৈরি করলে রক্তের পরিবর্তে সেই দ্রবণ ব্যবহার করেও হৃৎপিন্ডকে সচল রাখা সম্ভব হয়। রিঙ্গার নামে এক বিজ্ঞানীর নামে এই দ্রবণের নাম হয়েছে রিঙ্গারের দ্রবণ। কোন একটি শিরাপথে এই দ্রবণ যদি অবিরাম প্রবাহে ব্যাঙের সাইনাস্ ভেনোসাসে প্রবেশ করান হতে থাকে এবং মহাধমনী দুটি কেটে দেওয়া হয় তবে হৃৎপিন্ডের সব কটি কক্ষ থেকেই সব রক্ত ধুয়ে গিয়ে ক্রমে কক্ষগুলি সাদা হয়ে পড়ে। লক্ষণীয় যে, এখন কিন্তু মহাধমনীগুলি কাটা থাকায় রক্ত আর ব্যাঙটির শরীরের অন্যান্য কোষে পৌছতে পারছে না। ফলে কিছু-ক্ষণের মধ্যে ধীরে ধীরে সমস্ত ব্যাঙটি মারা যেতে থাকে, যদিও তার হৃৎপিন্ড তখন পূর্ণ মাত্রায় স্পন্দনশীল।

দ্রবণ-প্রবাহ ঠিক রেখে হৃৎপিন্ড-টিকে শরীর থেকে কেটে আলাদা করে আনলেও তার স্পন্দন অক্ষুণ্ণ থাকে। এর থেকে নিশ্চয়ই এ কথাটিই স্পষ্ট হয় যে, হৃৎপিন্ডের মধ্যেই কোন এক জায়গায় তার স্পন্দনের উৎস, তার বাইরে শরীরের অন্য কোথাও নয়।

এ-কথাও অবশ্য মনে হতে পারে যে, হৃৎস্পন্দন তাহলে ব্যাঙটির শরীরের বাইরের কোন অলৌকিক

জৈবশক্তির থেকে উৎসারিত। কিন্তু যে-জৈবশক্তি ব্যাঙটিকে বাঁচাতেই পারল না সে হঠাৎ মৃতদেহটিকে ছেড়ে পরীক্ষক যেখানে দৃষ্টি দিচ্ছেন ঠিক সেখানেই এসে কাজ দেখাবে এটা খুব অদ্ভুত বলে মনে হয়। আসলে ব্যাপারটা তা নয়। সাইনাস্ ও অলিন্দ দুটির মাঝখানে সুতো দিয়ে খুব শক্ত একটা গিঁট দিন; সাইনাসের স্পন্দন ঠিক থাকবে, কিন্তু অলিন্দ ও নিলয়ের স্পন্দন থেমে যাবে তৎক্ষণাৎ। তার মানে সাইনাস্ থেকেই হৃৎ-স্পন্দনের বিশেষ প্রেরণা জন্ম নিয়ে ছড়িয়ে পড়ে সমস্ত হৃৎপিণ্ডে, বাইরের কোন অলৌকিক শক্তির থেকে তা আসে না। তাই ব্যাঙের সাইনাস্ ভেনোসাস্‌কে বিজ্ঞানীরা নাম দিয়েছেন পেস্-মেকার বা নিয়ামক। পাঠক নিশ্চয়ই বুঝেছেন, এরই অনুকরণে পূর্বোক্ত যন্ত্রের নামও পেস্-মেকার রাখা হয়েছে।

মানুষের হৃৎপিণ্ডে এই নিয়ামকের অবস্থান ঊর্ধ্ব ও নিম্ন মহাশিরা পথে সমস্ত শরীরের দূষিত রক্ত যেখানে দক্ষিণ অলিন্দে প্রবেশ করে ঠিক সেই প্রবেশমুখে। আসলে কিছু হৃৎপেশী-কোষই বিশেষভাবে পরিবর্তিত হয়ে এই নিয়ামকের জন্ম দিয়েছে। নিয়ামক থেকে এক ধরণের প্রেরণা উদ্ভূত হয়ে আর এক ধরণের বিশেষ হৃৎপেশী-কোষের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হয় এবং ছড়িয়ে পড়ে সমস্ত হৃৎপিণ্ডে। সাধারণ হৃৎপেশীকোষ সেই প্রেরণায় সংকুচিত ও প্রসারিত—এক কথায় স্পন্দিত হতে থাকে। যে কোষগুলি প্রেরণাকে বয়ে নিয়ে যায় নিয়ামক থেকে সমস্ত হৃৎপিণ্ডে আবিষ্কর্তার নামে তাদের একযোগে বলা হয় "হিজের বাণ্ডিল" বা (বাণ্ডিল অফ হিজ)। কোন কারণে নিয়ামকের বা এই "বাণ্ডিলে"র সাময়িক বৈকল্য হেতু হৃৎস্পন্দন কমে আসতে পারে। তাড়াতাড়ি আবার স্পন্দন ফিরিয়ে আনতে না পারলে সমূহ বিপদের সম্ভাবনা। সে সময় যদি বাইরে থেকে বৈদ্যুতিক শক্ দেওয়া যায় তাহলে হৃৎপেশী সেই শকেই স্পন্দিত হতে থাকে। ইতিমধ্যে নিয়ামক বা "বাণ্ডিল" আবার সুস্থ হয়ে ওঠে; এবং হৃৎ-স্পন্দন চালু হয় বাইরের কোন সাহায্য ব্যতিরেকেই। বৈদ্যুতিক শক্ এদের সুস্থ হওয়ার ব্যাপারে সম্ভবত কিছুটা সাহায্য করে। অবশ্য, এরা যে সুস্থ হয়ে উঠবেই এমন কোন কথা নেই। আর, এরা একেবারেই যদি সুস্থ না হয়ে ওঠে, দায়িত্ব না যদি গ্রহণ করতে পারে আবার, তাহলে কি হয়? তাহলে কি মৃত্যুই অবধারিত?

কিছুদিন আগেও এ প্রশ্নের উত্তর ছিল হ্যাঁ। কিন্তু সম্প্রতি সে অবস্থারও পরিবর্তন ঘটেছে। "সায়েন্স টুডে" নামক পত্রিকার আগস্ট সংখ্যায় (পৃঃ ৯) একটি যন্ত্রের সংবাদ হয়তো দেখে থাকবেন। যন্ত্রটি সাইজে একটি ওভারকোটের বোতামের মত, ওজনে ১০ গ্রামের কম। বুকে হৃৎপিণ্ডের ওপরে এটা বসালে বাম নিলয়ের সঙ্কোচনের শক্তির কিছুটা ধরে নিয়ে এই যন্ত্র তাকে রূপান্তরিত করবে বিদ্যুৎ-শক্তিতে। এই বিদ্যু-শক্তি তখন আবার ব্যবহৃত হবে হৃৎপিণ্ডকে পুনরায় স্পন্দনের প্রেরণা যোগাতে। অর্থাৎ হৃৎপিণ্ড একবার স্পন্দিত হলে আর একবার হবেই। এর আর শেষ হবে না। আবিষ্কর্তারা জানিয়েছেন সাইজে ও ওজনে একে অর্ধেক করে ফেলা যাবে অদূর ভবিষ্যতেই। তার মানে, প্রাকৃতিক নিয়ামক বা "বাণ্ডিলে"র অসুস্থতা বেঁচে থাকার পক্ষে প্রতিবন্ধক নয় আর; কৃত্রিম নিয়ামক দিয়েই কাজ চলে যাবে ভালভাবে।

তবে উপরোক্ত রোগীদের ক্ষেত্রে কৃত্রিম নিয়ামকের এই ছোট সংস্করণটির প্রয়োজন হয় নি। কারণ তাঁদের স্বাভাবিক নিয়ামক বা "বাণ্ডিল"—যেই অসুস্থ হয়ে থাকুক না কেন, অসুস্থতা ছিল সাময়িক। পরে তারা আবার নিজ দায়িত্ব গ্রহণ করেছে। মনে রাখা দরকার যে লণ্ডনের পুনর্জীবিত ব্যক্তি কিন্তু জীববিজ্ঞানের বিচারে সম্পূর্ণ মারা যান নি। কেন না, তাঁর সমস্ত দেহকোষ মারা যায় নি তখনও। সমস্ত কোষের মৃত্যু হলে তবেই একটি প্রাণী মারা গেছে বলা যায় জীববিজ্ঞানের দৃষ্টিতে। আর, সে রকম মৃত্যুর পরে পুনর্জীবন লাভের সম্ভাবনা এখনও সুদূরপরাহত।

তবে জীববিজ্ঞানসম্মত সম্পূর্ণ মৃত্যু না হোক, সাদা চোখে একেই আমরা মৃত্যু বলি। এবং এই মৃত্যুর পরেই মানুষের পুনর্জীবন লাভের আকাঙ্ক্ষাও কমদিনের নয়। যখন মানুষ অক্ষম ছিল, তখন এই আকাঙ্ক্ষা পূরণের জন্য অনেক ভেল্কি আর দৈবের কল্পনা সে করেছে। আর এখন বিজ্ঞান তার সেই আকাঙ্ক্ষা মিটিয়ে দিচ্ছে এমন এক জড়শক্তির শক্ দিয়ে জড়বিজ্ঞানের পদ্ধতিতে আমরা যাকে প্রায় হাতের মুঠোয় এনে ফেলেছি।

আর, এ কাজ করতে গিয়ে বিজ্ঞান আর একটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের প্রতি অঙ্গুলিনির্দেশ করছে। কৃত্রিম-জীবন-সৃষ্টি আজকের জীববিজ্ঞানের সামনে অন্যতম প্রধান চ্যালেঞ্জ। জীব-বিজ্ঞানীরা ভাইরাস্ নামে এক ধরণের অত্যন্ত সরল প্রাণীর ওপরে পরীক্ষা চালাচ্ছেন যারা প্রতিকূল পরিবেশে জড়বৎ আচরণ করে অথচ পরিবেশ অনুকূল হলেই তাদের মধ্যে জীবনের প্রকাশ দেখা যায়। ভাইরাসের এই আচরণ থেকে জীববিজ্ঞানীরা বলতে চান যে জড় আর জীবন পরস্পর-বিরোধী নয়, জড়জগৎটাই আসলে জীবনের ভিত্তি; আর সেইজন্যে জড়-বিজ্ঞানের পথেই জীবন সৃষ্টি করা যাবে একদিন। মানুষের জীবন ভাইরাসের চেয়ে নিঃসন্দেহে অনেক বেশি জটিল। তাই মৃতের জন্যে জীবনের আয়োজন করে বিজ্ঞান জীবনের জড়-ভিত্তিটাকেই জটিল জীবনের ক্ষেত্রেও প্রমাণ করে দিচ্ছে এবং জড়বিজ্ঞানের পথে জীবন সৃষ্টির সম্ভাবনাকে সমর্থন জানাচ্ছে দৃঢ়ভাবে।

স্বরাজ—স্বাধীনতার দীপ্তিবিষাণ—বাংলা জাতীয়-জীবন সংগঠনে নিবেদিত প্রাণ স্বদেশ-প্রেমিক মনীষী—
যোগেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণের

যোগেন্দ্র গ্রন্থাবলী

প্রথম ভাগে ঃ—ম্যাটসিনী, গ্যারিবল্ডী, বীরাঙ্গনা অ্যানিটা।

যে মহাপুরুষদ্বয়ের জ্বলন্ত উদ্দীপনা, প্রাণপণ প্রয়াস—আত্মসুখ, ঐশ্বর্য-বিলাস উপেক্ষা-ত্যাগে সমুজ্জ্বল আদর্শের প্রভাবে পদদলিত—নিদ্রিত ইটালী রণোন্মাদনায় অধীর হইয়া স্বাধীনতা-সংগ্রামে বিজয়ী হইয়াছিল—সেই স্বাধীনতার সূর্য—রাজনীতিক্ষ চিরজাগ্রত দেবতা—ম্যাটসিনী ও গ্যারিবল্ডীর জাতীয় জীবনের সংঘর্ষ—রাজনৈতিক তরঙ্গ-ভঙ্গময় তেজোদ্দীপ্ত মহাজীবনী এই মহাগ্রন্থত্রয় মাত্র ১ টাকায়।

দ্বিতীয় ভাগে ঃ—কীর্তিমন্দির, হৃদয়োচ্ছ্বাস, বীরপূজা, প্রাতঃস্মরণীয় চরিতমালা, চিন্তাতরঙ্গিণী, জন ষ্টুয়ার্ট মিল। শক্তিমন্ত্রসমাহিত গ্রন্থরাজি ১ টাকা।

বসুমতী প্রাইভেট লিমিটেড
১৬৬, বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী স্ট্রীট,
কলিকাতা—১২

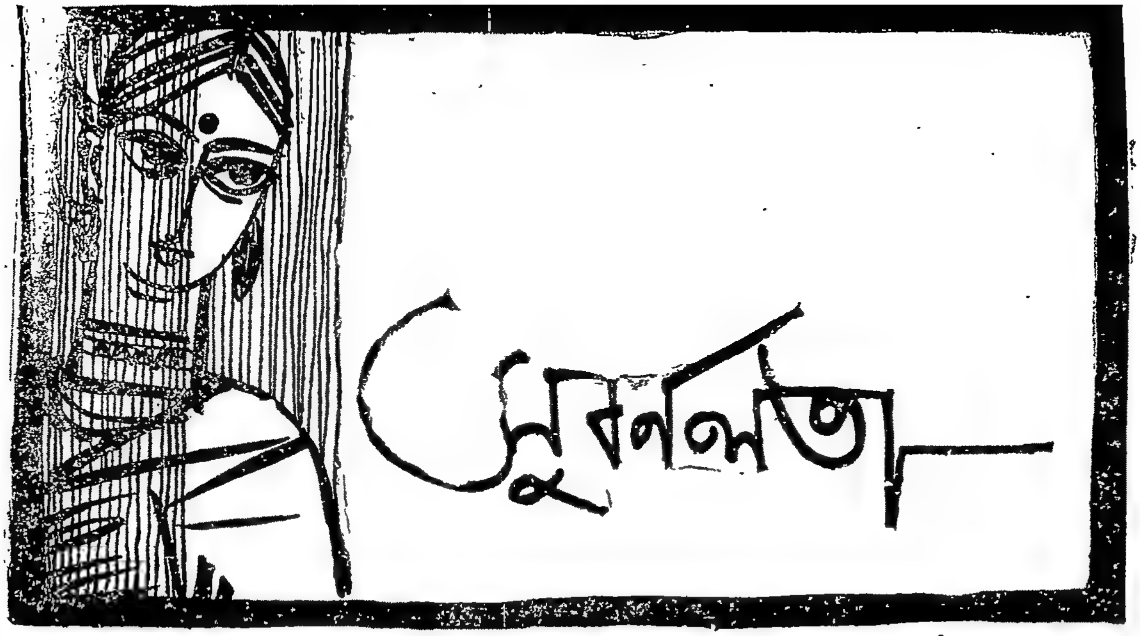

ধারাবাহিক উপন্যাস

আশাপূর্ণা দেবী

(পূর্ব-প্রকাশিতের পর)

অন্যভুবন।

সুবর্ণলতার কাছে এ এক আশ্চর্য নতুন ভুবন। অন্যভুবন। এ ভুবনে শুধু আকাশেই উদার উন্মুক্ত আলো নেই, মানুষগুলোর মধ্যেও রয়েছে সেই আলো। উদার উন্মুক্ত উজ্জ্বল।

পাড়ার লোকের কথা জানে না সুবর্ণলতা, জানে না সেখানে আলো না অন্ধকার, সে শুধু এই সংসারটাকেই জানছে। দেখছে আর জানছে।

ভেবে অবাক হয় সুবর্ণ সুবালাকে বরাবর সবাই 'গরীব' বলে এসেছে! এই সেদিনও ভাসুর গিয়ে বললেন, 'গরীবের সংসার বটে, তবে অমূল্যটা পরিশ্রমী আছে তো? খেটে পিটে সংসার করে। গোয়ালে গরু, পুকুরে মাছ, বাগানে ফল তরকারি, গায়ে-গতরে খেটে সব বজায় রেখেছে। তাতেই চলে যায় এক রকম করে।'

চলে যায় এক রকম করে।

গরীব।

কিন্তু সুবালা যদি গরীব তো ঐশ্বর্যবতী কে? হোক আড়ম্বরহীন টানাটানির সংসার, তবু এই সংসারখানির সম্রাজ্ঞী তো ওই সুবালা। এ সংসার পরিচালিত হচ্ছে সুবালার ইচ্ছানুসারে, সুবালার নির্দেশে। শাশুড়ী নির্লিপ্ত কিন্তু নির্মায়িক নয়। যথাসাধ্য খাটেন তিনি, কিন্তু সে খাটুনীর বেশির ভাগ ছেলে বৌ নাতি-নাতনীদের যত্ন পরিচর্যা বাবদ।

সুবালা যদি বলে, 'খাক গে বাবা ঠাণ্ডা দুধ—' ফুলেশ্বরী ব্যস্ত হয়ে বলেন, 'ওমা কেন? জ্বালানীর ঘরে অত নারকেল পাতা, আমি একটা বুড়ি বসে রয়েছি, ঠাণ্ডা খাবে কেন? ঠাণ্ডা খেলে শ্লেষ্মা বৃদ্ধি বৌমা।'

সুবালা দিব্যি উত্তর দেয়, 'শ্লেষ্মা বৃদ্ধি হয় না হাতী বৃদ্ধি হয়! ও কেবল আপনার নাতি-নাতনীদের সোহাগ করা।'

ফুলেশ্বরী রেগে উঠে যাচ্ছেতাই করেন না, হেসে উঠে বলেন, 'তো তাই! তোমার নাতি-পুতিকেও তুমি করবে সোহাগ!'

'আমার বয়ে গেছে—'

'হুঁঃ দেখবো!'

সুবালা স্বচ্ছন্দ গলায় বলে, 'দেখবেন তো সেই স্বর্গে বসে, কী দেখলেন, তা নিয়ে কে তর্ক করতে যাবে?'

রাগারাগি নয়, কড়া কথা নয়, সহজ হাস্য পরিহাস! আশ্চর্য! সুবালার কী সাহস! সুবর্ণলতা তো 'দুঃসাহসের' জন্য বিখ্যাত, কিন্তু এ সাহসের সঙ্গে তুলনা হয়? সুবর্ণলতার দুঃসাহস হচ্ছে তিক্ততার শেষ সীমানায় পৌঁছে তীব্রতায় ফেটে পড়া।

আর সুবালার?

সুবালার সাহস আদরিণীর সাহস, বিজয়িনীর সাহস, প্রশ্রয়ের সাহস।

সুবালার শাশুড়ী সুবালার কাছে আত্মসমর্পণ করে বসে আছে, কারণ তাঁর 'বৌমা বোঝে বেশ, জানে বেশি, বৌমার বিবেচনা ভালো।'

এ কথা স্বীকার করা মানেই তো তাকে অর্ঘ্য দেওয়া।

সুবালার সংসার সুবালাকে সে অর্ঘ্য দিয়েছে। কারণ শুধু ফুলেশ্বরীই নয়, ফুলেশ্বরীর ছেলেও সেই সমর্পিত-প্রাণ। ফুলেশ্বরীর ছেলে খাটো ধুতি পরে, খালি পায়ে মাঠে ঘাটে ঘুরে বেড়ায়, কাঁধে করে ধামা বয়ে আনে, আর কথায় কথায় বলে, 'অতসব বুঝি না বাপু মুখ্যু চাষা বৈ তো নই।'

তবু সে 'শহুরে চাষার' মত ভাবে না 'মেয়েমানুষকে শাসনে না রাখলেই সে মাথায় ওঠে। মেয়েমানুষের জায়গা হচ্ছে জুতোর নিচেয়।' ভাবে না, তাই সে প্রতি পদে বলে, 'মহারাণীর যা ইচ্ছে......তুমি যা বলবে,......যা বোঝো করো।'

পুজোর মন্ত্রের চাইতে কি কিছু কম এটা?

কিন্তু সুবর্ণলতা তার এতখানি বয়সে যা দেখেছে, তা হচ্ছে এই—'তোমার বুদ্ধি আছে, স্বীকার করবো এ কথা? হুঁঃ। গায়ের জোরে প্রতিপন্ন করে ছাড়বো না তুমি নির্বোধ, তুমি মুখ্যু!...তোমার বিবেচনা আছে, মানবো এ কথা? বরং ভুল পথে গিয়ে লোকসান খাবো, তবু তোমার কথা শুনবো না।......তোমার ইচ্ছানুসারে চলবো? গলায় দিতে দড়ি নেই

আমার? তোমার ইচ্ছার বিরুদ্ধাচরণই জীবনের ব্রত হোক।...ভারী তুমি আত্মসম্মানী তোমায় পেড়ে ফেলে তবে কাজ আমার!'......

কারণ?

কারণ তুমি মেয়েমানুষ!

তুমি বৌ মানুষ।

তোমার যে এ হেন বাড়িতে বিয়ে হয়েছে, এই তোমার ভাগ্য।

এই দেখেছে সুবর্ণলতা!

কারণ জীবনে একটা বৈ দুটো সংসার দেখে নি সে।

পিতৃগৃহের ছবি তার কাছে অস্পষ্ট। তা ছাড়া তার মা ভিন্ন আর কোনো মেয়েমানুষ ছিল না সে বাড়িতে, তার বাবা ভিন্ন আর কোনো পুরুষ। সে সংসারে অন্যকে টেক্কা দিয়ে পৌরুষ দেখানোর চেষ্টা ছিল না; অন্যকে খেলো করবার জন্যে বাহাদুরী দেখানোর।

সুবর্ণলতাদের সংসারে ভাইয়ে ভাইয়ে চলে সেই বাহাদুরীর প্রতিযোগিতা।

সেই প্রতিযোগিতার বলি মেয়েমানুষরা।

যথেচ্ছ অবজ্ঞা করো তাদের, পৌরুষের প্রশংসাপত্র পাবে। নিষ্ঠুর হতে পারলে আরো ভালো, অত্যাচারী হতে পারলে কথাই নেই। ভাইরা বুঝুক, আমি পুরুষ, আমি স্ত্রী-বশ নই।

মা-বাবার সংসারে এটা ছিল না।

তবু—

মায়ের সেই একলার সংসারেই বালিকা সুবর্ণলতার চোখেও ধরা পড়তো, তার মায়ের মধ্যে কোথায় যেন একটা তীব্র জ্বালা, মানে বুঝতে পারত না। হয়তো এখনো সঠিক বোঝে না। মাঝে মাঝেই ভাবে 'কেন? বাবা অত ভালমানুষ—'

আবার ভাবে, 'হয়তো শুধুই 'ভালমানুষ'। কিন্তু তাকে দিয়ে কি একটা 'মানুষের' হৃদয় ভরাট হয়?'

সুবর্ণলতার স্বামীও তো এক এক সময় বশ্যতা স্বীকার করে, সুবর্ণলতা যদি তার মনের মত হতে পারতো, যদি সুবর্ণলতা কৃপণ হতো, যদি সংকীর্ণচিত্ত হতো, যদি স্বার্থপর হতো, যদি স্বামীর কাছে মধুময়ী এবং অন্যের সম্পর্কে মুখরা হতো, হতে পারতো, হয়তো সে বশ্যতা স্থায়ী হতো!

যাতে আর পাঁচজন আখ্যা দিত 'স্ত্রৈণ।'

কিন্তু অমূল্য কি স্ত্রৈণ?

না।

স্ত্রীর প্রতি অমূল্যর যে মনোভাব, তাকে বলা যায় সম্ভ্রম ভাব।

এ কথাটা শুনলে দর্জিপাড়ার গলি হয়তো হাসিতে ফেটে পড়বে। বলবে 'আহা তাই তো, জগতে ভক্তি সম্ভ্রমের যুগ্যি আর কে আছে? গুরু গোঁসাই তুচ্ছ করে, পাদ্য অর্ঘ্য দাও গিন্নীকে।'

বলবে, নিশ্চিত এই কথাই বলবে।

কারণ দর্জিপাড়ার সেই গলি 'সম্ভ্রম' কথাটার অর্থ জানে না। কারণ নিজেকে কোনোদিন সম্ভ্রম করে নি সে।

এ সংসার 'সম্ভ্রম' শব্দটার অর্থ জানে।

এ সংসারে কোথাও কোনো 'জ্বালা' নেই।

যদিও সুবালা প্রতি পদে বলে, 'কী জ্বালা!'

বলে। ওটাই ওর মুদ্রাদোষ। সবাইকে বলে। সুবর্ণকে বলে, 'কী জ্বালা, মাত্তর ওই ক'টা মুড়ি খাবে তুমি? ওই আধ-ছটাকী বাটিতে?'

ভাইপো-ভাইঝিকে বলে, 'কী জ্বালা চাষাভুষোর মত রোদে বেড়াতে শিখলি যে।'

শাশুড়ীকে বলে, 'কী জ্বালা, আবার আপনি এখন কাঁথা পেড়ে বসলেন? খাওয়া-দাওয়া হবে না?'

বরকে বলে, 'কী জ্বালা! তোমার জ্বালায় জ্বলে পুড়ে মরলাম যে! এই ভর সন্ধ্যেয় আবার বেরোচ্ছো তুমি?'

অমূল্যর বেরোনো অবশ্য বন্ধ হতো না তাতে, হাসতে হাসতে বলে যেত, 'তা আমার জ্বালায় জ্বলবে না তো কি পাড়ার গয়লা বুড়োর জ্বালায় জ্বলবে? একজন আমার জ্বালায় আজন্ম জ্বলবে বলেই তো বিয়ে করে ঘরে পরিবার আনা!'

সুবালা হাড় বার করা মুখে হেসে ওঠে।

ওই ভয়ঙ্কর সত্যটা নিয়ে কৌতুক ওর। এইভাবে ওদের জ্বালার গল্প।

সুবর্ণ কি তবে ঈর্ষায় জ্বলবে?

না না সুবর্ণ এত নীচ নয়। সুবর্ণ এদের সুখ দেখে সুখী। তবু বুকের মধ্যে কোথায় যেন চিনচিন করে ওঠে।

আবার আহ্লাদও হয়। সুবালা যখন তার বাউণ্ডুলে দ্যাওরটাকে বলে ওঠে, 'কী জ্বালা এই এতখানি বেলায় এলে তুমি? ভাত যে পান্তো হয়ে উঠলো!'

আর অম্বিকাও ওর সুরটা নকল করে বলে ওঠে, 'কী জ্বালা! ভাত পান্তো হয়ে উঠলো বলে দুঃখ? ঘরে ভাত থাকলে তবে তো সে পান্তো হবার অবকাশ পাবে?'

তখন ভারী একটা আহ্লাদে মনটা খুশি খুশি হয়ে ওঠে সুবর্ণর।

অথচ এতেও ঈর্ষার কারণ ছিল।

দ্যাওর-ভাজের মধ্যে যে অনাবিল প্রীতির সম্বন্ধ, সেটাই বা কবে দেখলো সুবর্ণ? দেবররা ভ্রাতৃজায়াদের 'ব্যাখ্যানা' করবে, এটাই তো মুক্তকেশীর বাড়ির নীতি। তারা ব্যঙ্গ করবে, হুল ফোটাবে, নিন্দে করবে, এই তো নিয়ম। কে জানে এ নিয়ম শুধুই মুক্তকেশীর বাড়ির, না আরো অনেক অনেক বাড়ির।

কিন্তু এদের বাড়িতে—

সুবালার বাড়িতে অন্য নিয়ম!

তাই না অন্যভুবন।

এই অন্যভুবনে অম্বিকা তার বৌদির কথায় বলে ওঠে, 'নাও কোথায় তোমার পান্তো-টান্তো আছে বার করো দেখি, পেটকে শান্তো করি। খাণ্ডবদাহন হচ্ছে সেখানে।'

বসে পড়ে নিজেই পীঁড়ি পেতে।

সুবালা পরম যত্নে ভাত বেড়ে দিয়ে বলে, 'ভারী তো ছিরির রান্না, ভাতটা গরম থাকতে খেলে তবু—'

অথচ এ ছাড়া আর কিছু হয়ও না।

ঝি চাকরের তো পাট নেই, সুবালাকেই বাসন মাজতে হয়, রান্নাঘর নিকোতে হয়, এতক্ষণ অবধি আলাদা গরম ভাতের তদ্বির নিয়ে বসে থাকলে সময়ে কুলোয় না।

গৌর মোহন দাস এণ্ড কোং
২৩৩, ওল্ড চীনা বাজার স্ট্রীট,
কলিকাতা-১
ফোন: ২২-৬৫৮০

অম্বিকা বলে, 'ছিরির মানে? মেজবৌদি, আপনার কি আপনার ননদের রান্না বিচ্ছিরী লাগে?'

সুবর্ণর হঠাৎ খুব ভালো কোনো কথা জোগায় না, তাই তাড়াতাড়ি বলে ওঠে, 'কী যে বলেন! আমার তো অমৃত মনে হয়।'

'হুঁ দেখুন! আমিও তো তাই বলি, অমৃততুল্য আহা! যখন জেলের লপসি খেয়ে দিন কাটবে, তখন আপনার ননদিনীর হাতের এই মৌরলা মাছের ঝালের স্মৃতিতে মনটা কেঁদে কেঁদে উঠবে।'

'থামো তো!' সুবালা বকে ওঠে, 'সব সময় জেল জেল করো না।'

'আহা! সইয়ে রাখছি! নচেৎ আচমকা ঘায়ে আবার মূর্ছা টুর্ছা যাবেন।'

সুবালা বোঝে সব, তবু বলে, 'বলি তুমি কি চোর ডাকাত, না খুনে গুন্ডা যে, জেলে যাবে?'

'তার থেকে কিছু কমও নয়।'

অম্বিকা কড়াই ডাল মাখা ভাতটা শপ শপ করে মুখে তুলতে তুলতে বলে, 'বরং বেশি! মাতৃভূমিকে 'আমার জিনিস' বলা তো গুন্ডামীর অধিক।'

সুবালা বলে, 'এই হলো সুবু! মেজবৌ তুই শোন বসে বসে। তোর মনের মতন প্রসঙ্গ। আমি বরং ততক্ষণ ওই রাবণের গুষ্ঠির জলপানিগুলো গোছাই!'

সুবর্ণ আহত গলায় বলে, 'ওকি মেজ ঠাকুরঝি নিজের ছেলেদের ওই সব বলতে আছে?'

সুবালা হেসে হেসে বলে, 'সত্যি কথা বলতে দোষ কি? রাবণের গুষ্ঠি ছাড়া আর কি? ভগবান এক মনে দিয়েছে, আমি এক মনে নিয়েছি, গোণাগুণতি করি নি। জ্ঞানচক্ষু উন্মীলন হতে দেখি আধ কুড়ির কাছাকাছি।'

উঠে চলে যায়।

সত্যিই কাজের তার অবধি নেই।

আর সুবর্ণ বসে বলে স্বস্তি থাকে একটু। বেটাছেলে একা বসে খাচ্ছে এটা তো আর হতে পারে না।

সুবালা চলে যায়, অম্বিকা সুবর্ণর দিকে তাকিয়ে বলে, 'এই একটি মহিলা, একেবারে নির্ভেজাল!'

সুবর্ণ বলে, 'আপনার মত মানুষের ধারে কাছে থাকতে থাকতে আপনিই বিশুদ্ধ হয়ে যায় মানুষ।'

হ্যাঁ। প্রবোধের সন্দেহকে অমূলক করে এইভাবেই একটা অপর পুরুষে বিমোহিত হচ্ছে সুবর্ণ।

রোদে পোড়া রুক্ষ কালো শীর্ণ একটা ছেলে, তবু তাকে দেখলে সুবর্ণর মনটা আহ্লাদে ভরে ওঠে। তাকে অনেক উঁচু স্তরের মানুষ মনে হয়। মনে হয় কী সুন্দর।

প্রশস্তি গাইতে ইচ্ছে করে তার।

অম্বিকা বলে, 'সেরেছে। পুলিশে ধরে নিয়ে যাবে আপনাকে।'

একদিন হঠাৎ বলে বসলো, 'আচ্ছা শুনেছি তো আপনার ন' বছর বয়সে বিয়ে হয়েছিল, আর মনে করবেন না কিছু দাদার শ্বশুরবাড়িটাই যখন আপনার শ্বশুরবাড়ি, এত সুন্দর করে কথা বলতে শিখলেন কেমন করে বলুন তো?'

সুবর্ণ বিমূঢ়ভাবে বলে, 'সুন্দর করে?'

'হ্যাঁ তাই তো দেখি। যা কিছুই বলেন, বেশ বিদুষী লাগে।'

সুবর্ণ হেসে উঠে বলে, 'ওঃ 'লাগে'। যেমন পেতলকেও অনেক সময় সোনা সোনা লাগে।'

অম্বিকা বলে, 'আপনার মত পেতল যদি আমাদের এই সোনার বাংলার ঘরে ঘরে থাকতো, দেশ উদ্ধার হয়ে যেত, বুঝলেন উদ্ধার হয়ে যেত।'

দেশ উদ্ধার!

ব্যস এই খাতে এসে পড়ে আবেগের বন্যা!

সুবর্ণর চোখে এসে যায় জল, মুখে ফুটে ওঠে দীপ্তি।

সুবর্ণ খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে জিগ্যেস করতে বসে স্বদেশী ছেলেদের কথা। কী তাদের কার্যকলাপ, কী তাদের পদ্ধতি, কী বা তাদের সাফল্য।

অম্বিকা হাসে।

গলা নামিয়ে বলে, 'এই মেজবৌদি, টিকটিকি পুলিশের মত অত জেরা করবেন না, সব কথার উত্তর দেওয়া সম্ভব নয়। দেয়ালেরও কান আছে।'

সুবর্ণ লজ্জিত হয়।

বলে, 'বড্ড ইচ্ছে করে সব জানি।'

'তার মানে আপনি অনুভব করেন জিনিসটা।' অম্বিকা বলে, 'বুঝতে পারেন পরাধীনতার গ্লানি কি। সেটাই আশ্চর্য করে আমাকে।'

সুবর্ণ উদ্দীপ্ত হয়, বলে, 'আশ্চর্যর কি আছে? পরাধীনতার যন্ত্রণা আমরা মেয়েমানুষরা তো আরো বুঝবো! আমরা যে চাকরেরও দাসী।'

'রাণী হতে হবে।' অম্বিকা জোর দিয়ে বলে, 'মেয়েদেরও এসে হাত মেলাতে হবে।'

'নেবেন? নেবেন আপনারা?' সুবর্ণ আরো উদ্দীপ্ত হয়, 'মেয়েমানুষকে নিতে রাজী আছেন আপনাদের দলে?'

'দলে?'

অম্বিকা ধীর গলায় বলে, 'বলে কয়ে টিকিট কেটে দলে নেওয়া তো নয় মেজবৌদি, যে আসতে পারবে সে এসেই যাবে। বিষ্টি যখন পড়ে, হাজার হাজার গাছের একটা পাতাও শুকনো থাকে না, কিন্তু পাতা ধরে ধরে ভেজাতে গেলে?...দেশ জাগবে, মেয়েদের মধ্যে আসবে সেই প্রবল প্রেরণা, আপনিই দলে এসে পড়বে। করছে বৈ কি, অনেক মেয়েই দেশের কাজ করছে—'

'আর তোমাদের এই বোমার কাজে?' খুব ফিসফিস করে বলে সুবর্ণলতা, 'ওতেও এসেছে।'

অম্বিকা আস্তে বলে, 'এসব কথা আলোচনা করতে নেই বৌদি—'

সুবর্ণ হতাশ গলায় বলে, 'আলোচনাটুকুও যদি করতে নেই তো কি করে এগিয়ে যাবে মেয়েরা? আমি যদি আজ বলি সে প্রেরণা আছে আমার—'

অম্বিকা আরো আস্তে বলে, 'বুঝতে পারছি। অনুভব করছি আছে, কিন্তু আপনার পক্ষে অসম্ভব। আপনার ছেলেমেয়ে রয়েছে—'

সুবর্ণ হতাশ গলায় বলে, 'জানি জানতাম! আমার যে সব দিক থেকে হাত পা বাঁধা তা জানি।'

অম্বিকা ব্যথিত দৃষ্টিতে তাকায়।

তারপর সহসাই হেসে উঠে বলে, 'আপনাকে দলে নিই আর আমাদের মেজদা পুলিশ লেলিয়ে দিয়ে আমাদের জন্যে ফাঁসির ব্যবস্থা করুন। ওনাকে তো দেখেই ভয় করছিল।'

সুবর্ণ ব্যঙ্গ হাসি হাসে।

বলে, 'কেন? খুব তো সুকান্তি সুপুরুষ!'

'সে কথা কোনো কাজের কথা নয়,' অম্বিকা বলে, 'বাইরে ভেতর এক, এ আর ক'জনের হয়? আমাদের সঙ্গে একটা ছেলে আছে তাকে দেখলে মনে হবে, দাঁড়কাক, কিন্তু তার ভিতরটা চাঁদের মত শাদা সুন্দর।'

সুবর্ণ খপ্ করে বলে বসে, 'আচ্ছা, আমাকে দেখলে আপনার কী মনে হয়? বাইরে ভিতর দু রকম?'

অম্বিকা মাথা নিচু করে বলে, 'আপনার মত মেয়ে আমি আর দেখি নি মেজবৌদি। শুধু এই ভেবে দুঃখ হয়, আমাদের দেশের কত সম্পদের অপচয় হচ্ছে সর্বদা! আপনি যদি দেশের কাজে আসতে পারতেন—'

সুবর্ণ অভিমানে ফেটে পড়া মুখে

...থা। ...লেন। ...ছে, সে ...হ, এই তো

...াড়া দিতে হলে যে ...ণ করতে হয় মেজবৌদি, ...ব ত্যাগ করতে হয়।'

'তুমি কি ভাবো—'

...আবেগের মাথায় হঠাৎ 'তুমি' বলে ...স সুবর্ণ, 'তুমি কি ভাবো মেয়েরা ...রে না তা? আমি এই বলে রাখছি, ...ই মেয়েদের কাছেই একদিন মাথা হেঁট করতে হবে তোমাদের।...... বলতে হবে, 'এতদিন যা করেছি অন্যায় করেছি। সত্যিই তোমরা শক্তিরূপিণী।'

অম্বিকা এবার মাথা তুলে বলে, 'আপনার কথা বেদবাক্য হোক। দেশ ...দন একথা বলতে পারবে, ...ন দেশ এই অপমানের কুণ্ড ... ঝেড়ে উঠবে।...সত্যি ভাবুন, ...পমান, কী অপমান। সমুদ্রের ...থেকে হাজার হাজার মাইল পথ ... দিয়ে এক মুঠো লোক এসে এই ...শ কোটি লোকের উপর প্রভুত্ব ...রছে, তাই দেখছি বসে বসে আমরা, আর নিশ্বাস ফেলছি। এক সঙ্গে সবাই যদি রুখে উঠতে পারতো! মেয়ে বলে নয় ছেলে বলে নয়, দেশের সন্তান বলে—'

সুবর্ণ আরো ব্যগ্রভাবে কী বলতে যাচ্ছিল, অমূল্য এসে হাজির হয়। বলে, 'এই হয়েছে তো? জুটেছেন দুটি পাগলে!'

সুবর্ণর তো এখানে এসে খুব বাড় বেড়েছে। অমূল্যর সঙ্গে মুখোমুখি কথা বলে সে।

বলে, 'পৃথিবীতে যা কিছু মহৎ কাজ তা ওই পাগলেরাই করে। যা কিছু বড় ঘটনা ঘটেছে তার মূলে মানুষই হচ্ছে পাগল, বুঝলেন?'

অম্বিকা সপ্রশংস দৃষ্টিতে তাকায়।

অমূল্য হেসে উঠে বলে, 'বুঝলাম! ...কিন্তু অম্বু, তুই যেন আবার তোর ওই মহৎ কাজের মধ্যে এই পাগলটিকে টেনে নিয়ে যেতে চেষ্টা করিস নি, তাহলে আমার সেই গুণ্ডা শালা এসে তোর মাথা ফাটাবে।'

অম্বিকা বোঝে দাদা তাকে সাবধান করছে। অম্বিকা জানে দাদার তাকে নিয়ে স্বস্তি নেই। তাই মৃদু হেসে বলে, 'সেই কথাই তো বোঝাচ্ছিলাম মেজবৌদিকে।...তবে দেশের কাজ তো মাত্র একটাই নয়। বাইরে থেকে যেমন এই দুশো বছরের পাপ ধ্বংস করতে হবে, ভেতর থেকে তেমনি আরো অনেক বছরের পাপ ধুয়ে সাফ করতে হবে। ...মেয়েদের মধ্যে চেতনা জাগানোও একটা মস্ত কাজ মেজবৌদি, সে চেতনা জাগান, তাদের বোঝান কোনটা সম্মান, কোনটা অসম্মান। বোঝান শুধু খেয়ে পরে সুখে থাকাই মানুষের ধর্ম নয়, বোঝান, কেউ খেয়ে উপচে বসে থাকবে, আর কেউ না খেয়ে মরবে, এটা ভগবানের নিয়ম নয়। এই পৃথিবীর অন্ন সবাই সমান ভাগ বাঁটোয়ারা করে খাবে, সবাই পৃথিবীর সন্তান।'

অমূল্য প্রশংসার গলায় বলে, 'বললি তো ভালো, শুনলামও ভালো, কিন্তু শুনছে কে?'

সুবর্ণও বলে, 'হ্যাঁ সেই কথাই বলছি, শুনবে কে? পাথরে কি সাড় আসে?'

'আসতে হবে।' অম্বিকা বলে, 'অসাড় পাথরে প্রাণ সঞ্চার করতে হবে। মাটি-পাথরের বিগ্রহে যেমন প্রাণ প্রতিষ্ঠা!'

সুবর্ণ আস্তে মাথা নাড়ে।

বলে, 'চন্দ্র সূর্য মুখ দেখলে রসাতল, পর্দার মধ্যে জীবন, তারা আবার কাজ করবে। শিক্ষা নেই দীক্ষা নেই—'

'ঠিক!' অম্বিকা বলে, 'এই জন্যেই আপনাকে আমার এত ভাল লাগে। আপনি সব বুঝতে পারেন। এই দেখুন গলদের ঠিক মূলটি বুঝেছেন আপনি। শিক্ষা, সকলের আগে চাই শিক্ষা। এই হতভাগা দেশের সব আছে, নেই খালি চোখের দৃষ্টি। সেই দৃষ্টি এনে দিতে হবে। আমার কোনো সুবিধে

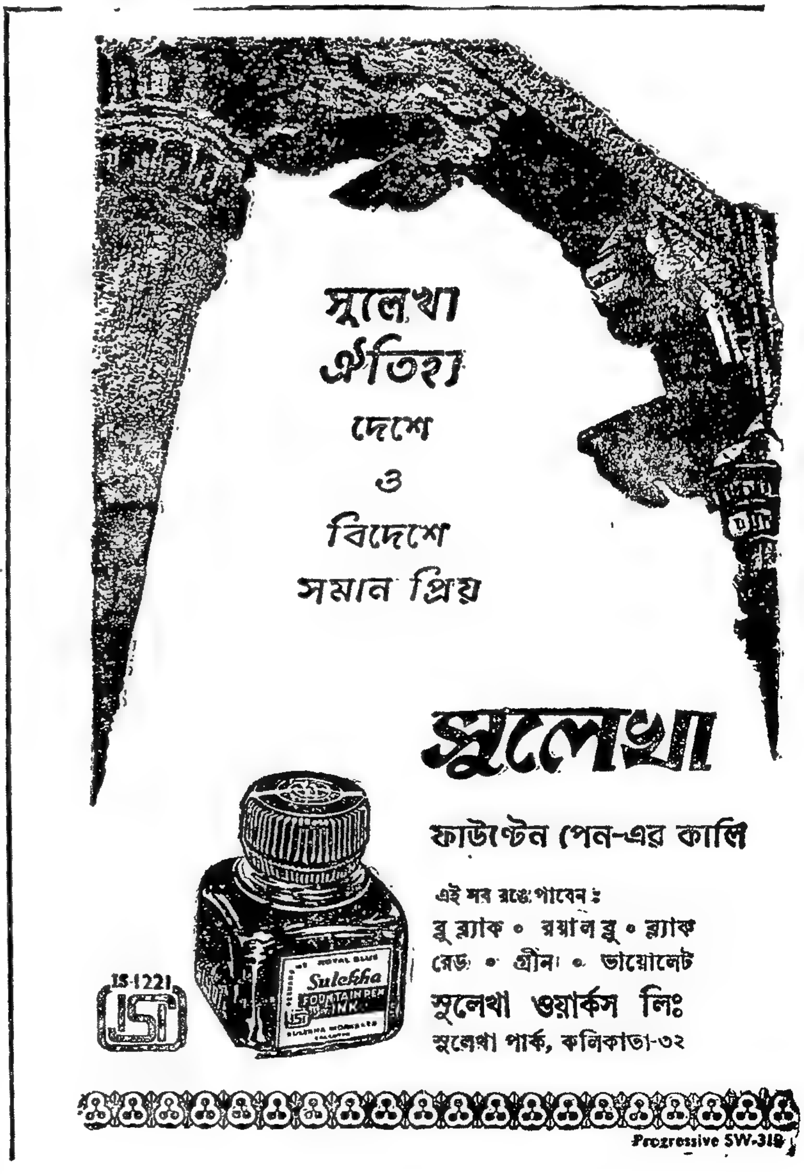

সেই, আমার দ্বারা হবে কি করে, বললে চলবে না। মাটি কাটতে হয়, পাথর ভাঙতে হয়, তবে তো রাস্তা তৈরি হয়, তবে তো সেই রাস্তা দিয়ে জয়রথ চলে।'

'ঠাকুরপো!' সুবর্ণলতা ব্যাকুল গলায় বলে, 'জানো একথা আমার মা'র কথা।'

'আপনার মা'র কথা!'

অম্বিকা একটু আশ্চর্য হয়ে তাকায়।

সুবর্ণ তেমনিভাবে বলে, 'হ্যাঁ। মা'র স্মৃতি আমার কাছে ক্রমশই ঝাপসা হয়ে আসছে, তবু এ কথাটা মনে আছে। মা বলতেন এ কথা! আমি জন্মাবার আগে মা মেয়েদের পাঠশালায় পড়াতে যেতেন।'

'পড়াতে যেতেন! আপনার মা?' অম্বিকা অবাক গলায় বলে, 'তাজ্জব তো! সে তো আরো আগের ব্যাপার! সমাজ আরো কড়া ছিল। তবু নিশ্চয়ই তিনি আরো শক্তিমতী ছিলেন।...কতদিন হলো মারা গেছেন?'

সুবর্ণ শিউরে ওঠে।

সুবর্ণ তাড়াতাড়ি বলে, 'মারা যান নি। আছেন, কাশীতে থাকেন।... আমার মায়ের কথা বলবো আপনাকে। আপনিই পারবেন বুঝতে।'

অম্বিকা ধীরে বলে, 'বুঝেছি, এই মন আপনি কোথায় পেলেন ভেবে অবাক হতাম। এখন বুঝতে পারছি।'

অমূল্য বুদ্ধিমান।

অমূল্য সমাজ সংসারের জীব।

অমূল্য তার এই 'স্বদেশী' ভাইটার জন্যে সর্বদাই চিন্তিত। তাই দুজনের এই বিমুগ্ধ ভাবটা তাকে অস্বস্তিতে ফেলে। সন্দেহ নেই এই মুগ্ধতা অতি পবিত্র, অতি নির্মল, তথাপি এ থেকেও বিপদ আসতে পারে। আসা অসম্ভব নয়। সুবর্ণ 'স্বদেশী' করে ক্ষেপে উঠলেই তো সর্বনাশ! সুবর্ণ তার বাড়ির অতিথি।

সুবর্ণ সম্পর্কে তাকে বেশি অবহিত হতে হবে।

তাই অমূল্য বলে ওঠে, 'হ্যাঁ মেজবৌদির মা অন্য ধরণের ছিলেন! আমিও জানি কিছু কিছু বলবো পরে। মা ভাল না হলে কি আর 'ছা' ভাল হয়। কিন্তু বসে বসে গল্প করছিস, আজ তোর কাজ নেই?'

'নাঃ আজ আর বেরুব না। আজ শরীরটা একটু ইয়ে আছে।'

অমূল্য আর একটু বাঁধ দেয়।

অন্তত ভাবে বাঁধ দিচ্ছি।

বলে, 'তবে আর কি কোটরে বসে কবিতা লিখ গে।'

কিন্তু ফল বিপরীত হয়।

এই উল্টো বাঁধে উপচে ওঠে নদীস্রোত। 'কবিতা! কবিতা লেখেন আপনি?' চমকে ওঠে সুবর্ণ।

'আপনি নয়, আপনি নয়, একটু আগে তুমি বলেছেন—'

'ওমা কখন আবার?'

'বলে... সেটাই বহাল...

'আচ্ছা থা... বড়ই। কিন্তু কথা... তুমি কবিতা লেখো? ক... তো?'

অম্বিকা হেসে ওঠে, 'মাইকেলে... থেকে সামান্য কম, তাই আর বলি নি... দাদার যেমন কাণ্ড! কবিতা লেখে...

অমূল্য বলে, 'আহা কেন! লিখিস তো বাপু সেই ছেলেবেলা থেকে। বুঝলেন মেজবৌদি বারো তেরো বছরের ছেলে দেশমাতা নিয়ে ইয়া বড় এক পদ্য!...তা আপনার ননদিনী তাঁর গুরুদেব দ্যাওরটির গুণগরিমার কথা সব বলেন নি? তোলা আছে বোধ হয় সে পদ্য আপনার ননদের কাছে! দেখবেন।'

'আমি সব কবিতা দেখ... ঠাকুরপো তোমার কবিতার ... দেখাতে হবে।'

'খাতা!'

অম্বিকা হেসে ওঠে।

'খাতা কোথায় পাবো। ছেঁড়া কাগজের ফালি হচ্ছে আমার ভাবের বাহন। হাতের কাছে যা পেলাম!'

'তা তাই দেখবো।'

'কে তুলে রেখেছে!'

'দেখো, তুমি আমায় ঠকাচ্ছো! বেশ তো, নতুন একটা লেখো।'

'এই সেরেছে! দাদা বুঝতে পারছো? বিশ্বাস করছেন না আমার বিদ্যে? হাতে হাতে প্রমাণ চান।'

'মোটেই না। আমি শুধু দেখতে চাই।'

'তবে তো লিখতেই হয়—' অম্বিকা হেসে ওঠে, 'দাদা, আবার মাতালকে মদের বোতলের কথা মনে পড়িয়ে দিলেন।'

অমূল্য বলে, 'তবে যা ঘরে বসে মাতাল হগে যা। চললাম আমি। ভীষণ কাজ।'

দুজনকে বিভোর হয়ে গল্প করতে দিতে অস্বস্তি বোধ করে অমূল্য পাড়ার লোকের চোখের জন্যে। চোখগুলি তো ভাল নয়। সুবালার মত সরল আর ক'জন আছে?'

ভাইকে এই ইঙ্গিতটা দিয়ে কাজে চলে যায় অমূল্য।

অনুমান করতে পারে না, খাল কেটে কুমীর এনে গেল।

অনুমান করতে পারল না, ইঙ্গিতের মর্ম বুঝবে না এরা। তার পাগলী শালাজ, অম্বিকার সেই 'কোটরে' গিয়ে উঠবে কবিতা হাতড়াতে। (ক্রমশঃ)

দেশ সেবায় নিয়োজিত,

এ্যালবার্ট ডেভিড লিমিটেড

কলিকাতা—৫০

নীতি ও বিজ্ঞানানুযায়ী ঔষধ প্রস্তুতকরণের অগ্রণী

—ব্রাঞ্চ সমূহ—

বোম্বে - মাদ্রাজ - দিল্লী - নাগপুর

বেজওয়াড়া - শ্রীনগর - গৌহাটী

অমৃতসমান

বেদব্যাস

স্বাধীনতা দিবসের চিন্তা

'ইয়ে আজাদী ঝুটা হ্যায়' যাঁরা বলেন দয়া করে আমাকে সে-দলে ফেলবেন না। ইংরেজ শাসকেরা বিদায় নিয়েছে এ সত্য প্রমাণ করতে যেমন ইউক্লিডের ওপর সমন জারী করার প্রয়োজন নেই, তেমনি পরাধীনতার গ্লানি ঘোচার সঙ্গে সঙ্গে আমাদের মন থেকে যে হীনতা-দৈন্যও ধুয়ে মুছে বিলকুল সাফ হয়ে গিয়েছে—বিশ্ববাসীকে তা দেখাবার জন্যেও আমাদের বুকের এক্স-রে প্লেট নেবার প্রয়োজন দেখি না।

স্বাধীন ইজ স্বাধীন, ব্যস! এবং পনেরোই আগস্ট যে সেই স্বাধীন হবার দিন একথা আমরা ভুলি কেমন করে? আপনিই কি মশাই, আপনার বিয়ের তারিখটি কখনো ভুলতে পারেন? এবং যাঁরা পারেন তাঁদের দার্শনিক আখ্যা দিতে আমার মন নারাজ। যেমন বংশীদাকে কিছুতেই আমি দার্শনিক বলবো না তা লতু বৌদি যতই আমার ওপর ব্যাজার হোক না কেন। লতু বৌদিকে দেখতাম ফি বছরই ক্যালেণ্ডারে লাল পেন্সিল দিয়ে পরম নিষ্ঠাভরে দাগিয়ে রাখতে। বছর তিনেক আগে একদিন বংশীদার বাড়িতে রেলের টাইম টেবল্ চাইতে গিয়ে দেখি যে বৌদি গলায় আঁচলের খুঁট জড়িয়ে ক্যালেণ্ডারে রঙীন পেন্সিল বুলোচ্ছে। মাথায় আধ-হাত ঘোমটা টানা, কপালে ইয়া বড়া একখানা সিঁদুরের টিপ। আমার আকস্মিক আবির্ভাবে লতু বৌদিকে একটু সলজ্জ ও অপ্রস্তুত হতেই দেখা গেল, অনেকটা কৈফিয়তের সুরেই বললেঃ আর বলেন কেন ঠাকুরপো, আমাদের বিয়ের তারিখটি দাগ দিয়ে রাখছি। জানেনই তো দাদাটি আপনার একেবারে সাক্ষাৎ ভোলা মহেশ্বর, আমাকেই সব মনে করিয়ে দিতে হয়......। বেশি লোককে বলতে পারবো না ভাই এবার, আপনি শ্রীমতীকে নিয়ে যেন আসবেন।

বাড়ি এসে শ্রীমতীর কাছে লতু বৌদির পাতিব্রত্য সবিস্তারে বর্ণনা করছিলাম এবং সেই সঙ্গে ওর পতিভক্তির ঘরে যে কোন কালে ঢ্যারা পড়ে গিয়েছে সে কথাও এই ফাঁকে জানিয়ে দিচ্ছিলাম। তা শ্রীমতী তো শুনে ঠোঁট উল্টে এক বিচিত্র ভঙ্গীতে বলে উঠলেঃ পতিভক্তি না আরো কিছু, ও দীপুর মায়ের ঢং। তুমি কি মনে করো বংশীবাবুর মনে পড়িয়ে দেবার জন্যে ক্যালেণ্ডারে আঁকিবুকি কাটছিল তোমার লতু বৌদি, না নিজেরই ভুলো মন প্রমাণ হয়ে পড়ে সেজন্যে ক্যালেণ্ডারের বুকে দাগ কাটা?

সমগোত্রীয়ার প্রশংসা করতে গিয়ে এমন বিপদে পড়বো জানলে আমি লতু বৌদির ন্যাকামী দিয়েই গল্প সুরু করতাম। কিন্তু যে যাই বলুক, বিশেষ দিনগুলিকে জীবনের পদ্মপাতায় অমন করে চিহ্নিত করে রাখার মধ্যে আমি দোষের কিছু দেখি নে। পৃথিবীতে এত দ্রুত এত অসংখ্য ঘটনা ঘটে যাচ্ছে যে সব মনে রাখা কারুর পক্ষে সম্ভব নয়, ক্যালেণ্ডারওয়ালারা বিশেষ দিনগুলিকে লাল অক্ষরে ছেপে মানুষের কী উপকার যে করে! সত্যি, আমি যদি শিক্ষা অধিকর্তা হতাম তবে সমাজ-বন্ধু হিসেবে স্কুলপাঠ্য সোশ্যাল স্টাডিজ-এ ক্যালেণ্ডারওয়ালাদের স্থান দিতাম সব্বার আগে। অতই যদি লতু বৌদির প্রতি তোমার দরদ হয় তো ক্যালেণ্ডারওয়ালাদের গিয়ে বলে এসো না বংশীবাবুর জন্মদিনটা যেন লাল কালিতে ছাপে।

কিন্তু ক্যালেণ্ডারে সুস্পষ্ট নির্দেশ থাকা সত্ত্বেও কি লোকের ভুল হয় না? তাছাড়া প্রতিটি রেড লেটার ডে-র তাৎপর্যই বা কে আর মনে করে রেখে দিয়েছে কিম্বা যথাযথ কর্তব্য পালন করছে? করে না হয়তো কিন্তু না করাটা যে অপরাধ, ভোর না ফুটতেই দোতলার স্বাগতার চড়া পর্দায়-বাঁধা স্টেটমেণ্টে তাই বোঝা গেলঃ ইটস এ ক্রাইম, জানো, রাশ্যায় হলে তোমাকে সাইবেরিয়ায় নির্বাসনে পাঠানো হতো, আমেরিকায় হলে ইলেকট্রিক চেয়ারে বসতে হতো এ অপরাধের জন্যে। বেচারা অভিজিৎ বোধ হয় ভুলে গিয়েছিল যে আজ ফিফটিনথ অগাস্ট। মৃদু কৈফিয়তের সুরে ও বলছিলোঃ আমি কি করে জানবো যে খুকুর আবার ন্যাশনাল ফ্ল্যাগের দরকার হবে এ বছর, গেল বছরে তো এ বায়না ছিল না।

—বায়না! বায়না বলছো তুমি কাকে? স্বাধীনতা দিবসে জাতীয় পতাকা উত্তোলনকে তুমি বায়না বলছো। উফ, ইমপসিবল অভিজিৎ! আর, তা ছাড়া গেল বছরে আমরা ঠিক এতটা—

—কি, এতটা স্বাধীন ছিলাম না?

—ননসেন্স! না, আমি তা বলি নি। কিন্তু খুকু এখন প্রভাতফেরীতে বেরুবে কী নিয়ে? নদেদা' কী বলবেন! ইস লজ্জায় আমার মাথা কাটা যাচ্ছে। না, আমিই ব্লাণ্ডার করেছি তোমার মতো একটা এ্যাণ্টি-ন্যাশনাল এলিমেণ্টকে বিয়ে করে।

ভুল তো স্বাগতা করেইছে। বড়লোকের মেয়ে সে, বাপের কোলিয়ারী আছে দুটো, একটা পেট্রোল পাম্প। কিন্তু এম এ পড়ার সময় অভিজিতের পুরুষোচিত রূপ ও ব্যক্তিত্ব দেখেই মজে গিয়েছিল, ব্যাঙ্ক ব্যালান্সের খোঁজ নেবার ফুরসুৎ সে পেলে কোথায়? তার আগেই ছুটতে হয়েছিল তাকে ম্যারেজ রেজিস্ট্রারের কাছে অভিজিৎকে বগলদাবা করে।...

খুকু কোথায় গেল? বাজার থেকে এসে অভিজিৎ জানতে চেয়েছিল, তালটা সে খুকুর হাতেই দিয়ে ওর হাসিমুখ দেখতে চায়। 'তালের বড়া খেয়ে নন্দ নাচিতে লাগিল' বলে খুকু যখন নাচতে সুরু করে সে দৃশ্যটা দেখতে অভিজিতের ভারি ভালো লাগে। খুকু প্রভাতফেরীতে গিয়েছে শুনে অভিজিৎ একটু অবাক হলো, পতাকা সে পেলো কোথায়?

—থাক, দু'হাত জোড়া করে ক্ষমা প্রার্থনার ভঙ্গীতে স্বাগতা ঝাঁঝিয়ে ওঠে, তোমার আর সে খোঁজে কাজ নেই। সেই সিক্সটি টু-এর ইলেকশন হয়ে গেলে বাচ্চু একটা ফ্ল্যাগ যেন কোন ইলেকশন অফিস থেকে নিয়ে এসেছিল। ভাগ্যিস ওটা তখন নষ্ট না করে বাক্সোর কাভার করেছিলাম!

শ্রীমতী এসে ঝপ করে দুটো থলে ফেলে দিয়ে স্মরণ করিয়ে দিল যে, অভিজিৎবাবুর বাজার হয়ে গিয়েছে, আর আমি কিনা আজ স্বাধীনতা

দিবসেও বেয়াকুফের মতো খবরের কাগজে আকণ্ঠ ডুবে রয়েছি। শান্তু ওর মায়ের পায়ে পায়ে জড়িয়ে কি যেন বলতে চাইছে, শ্রীমতী ওকে সামলাতে পারছে না। বাজার যাবো কি, ক'দিন ধরে দমদম দাওয়াই-এর দৌলতে বাজারে মাছ পাবার জো নেই। মাছের দোকানে ভিড় রয়েছে যথাপূর্বং, তবে সে মাছ কেনার জন্যে, না কেনা বন্ধ করার জন্যে কাঁচকলার দোকান থেকে বোঝার উপায় নেই। 'আর আছ খায় না, বাবুরা দমদম কালিয়া খেয়েই পেট ভরান—বলে এক মাছওয়ালা একগাল সিগারেটের ধোঁয়া ছেড়েছিল ওর মাছের পেটিতে বসে। ওই দ্যাখ, দ্যাখ, আ, দাঁড়া না, শোন বাপী কী বলছে, মাছের বাজারে নাকি দমদম দাওয়াই—

—আমি ডন্‌ডন্ ডায়াই ঠারো, বাপী।

নাঃ, এরা কিছু খেতে দেবে না—বাজারে দেববাবু বিরক্তির সুরে সিগারেটের শেষাংশটি সজোরে মাটিতে নিক্ষেপ করে বলছিলেন। ইন্ডিপেণ্ডেন্স ডে-তে কোথায় একটু মাছে-মাংসে ভাল-মন্দ চাট্টি খাবো তা আর কপালে নেই আমাদের। এদের জ্বালায় আর থাকা যাবে না দেখছি দেশে—

—এদের বলতে আপনি কাদের বোঝাচ্ছেন মিঃ দেব? স্থানীয় মণ্ডল কংগ্রেসের সেক্রেটারী পঞ্চু সেন ভুরু কুঁচকে শুধোন। ইউ ডোণ্ট মীন দ্য গাভমেণ্ট, আই বিলিভ, আপনি গভর্নমেণ্টকে মীন করছেন না তো?... তোরা কণ্ট্রোল তুলে দিতে বললি, বেশ, তাই তুলে দেওয়া হলো। এখন দাম কমাচ্ছিস না কোন আক্কেলে কি, ছাত্তররা মাছ বেচবে? ব্যাচো না, আড়ৎদাররা তোমাদের মাছ দেবে না—বলে পঞ্চুবাবু ডান হাতের বুড়ো আঙুলটা বার কয়েক ঘুরিয়ে দিলেন। তারপর যেন রিপোর্টারের প্রশ্নের জবাব দিচ্ছেন তেমনি ভঙ্গীতে বলতে লাগলেন, সল্যুশন কোথায় আমি জানি নে, তবে আমি পার্সোনালি মনে করি, ড্যাম ড্যাম ড্যাওয়াই ইজ নো সল্যুশন। পঞ্চুবাবুর কথা বিশেষ কেউ শুনছে না, বাজারের বাইরে কোথায় নাকি মাংসের দোকানে লাইন পড়ে গিয়েছে, সবাই ছুটেছে সেদিকে, পঞ্চু সেন তখনো বাঙালীর ঐতিহ্য সম্পর্কে বক্তৃতা দিয়ে চলেছেন। শ্রীসেন নাকি শেষের দিকে খাদ্যাভ্যাস বদলানো সম্পর্কেও কিছু বলতে গিয়েছিলেন ওই মাছের স্টলের প্ল্যাটফর্মে দাঁড়িয়ে, কিন্তু কোন্ এক ফচকে ছোঁড়া নাকি বেনের দোকানের মসলাপাতি ঝেড়ে ফেলে দেওয়া বিশ-পঁচিশটা মরা আরশোলা দিয়ে মালা গেঁথে এনে বলেছিলঃ এই যে আসুন দাদা, খাদ্যাভ্যাস পাল্টে নিন। সবাই স্থানত্যাগ করলে পঞ্চুবাবু গুটি গুটি ওই সিগ্রেট পানরত মাছওয়ালার কাছে গিয়ে তার হাত ধরে ফেললেনঃ দে নারে, কিলোটাক তেলাপিয়া, ঘরে মেয়ে-জামাই এসেছে কিনা—

এই এক ফ্যাশন হয়েছে ভালো। বাংলা বন্ধ্, বিহার বন্ধ্, বোম্বাই বন্ধ্—মাংস না পেয়ে রমণীবাবু গজরাচ্ছিলেন। সবই যদি বন্ধ্ করবি তো আর মুখটিকে খোলা রাখা কেন, ওটিও বন্ধ্ করে দাও না, আমিই তখন ঝাণ্ডা উড়িয়ে দেবো। আমার মনে পড়লো সেই দিনগুলোর কথা যখন সমগ্র দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ায় রব উঠেছে সাম্রাজ্যবাদ ধ্বংস হোক। স্কুলে-কলেজে ছেলেরা দিনের পর দিন ধর্মঘট করে ফেস্টুন-ফ্ল্যাগ হাতে বেরিয়ে আসছে ক্লাশ থেকে। সেণ্ট পলস কলেজ থেকে এক দল ছেলে বেরিয়ে রিপন কলেজের দিকে স্লোগান দিতে দিতে এগিয়ে চলেছে। কলেজের গেট থেকে খানিক দূরে একটা ল্যাম্পপোস্টের নিচে একটা ছেলে, পরণে তার হাফ প্যাণ্ট ও সাদা ফুল শার্ট, হাতে বায়োলজি বক্স সহ খান কয়েক বই। ছেলেটাকে অমন ফুঁপিয়ে কাঁদতে দেখে কৌতূহল দমন করতে পারলাম না। পাশে গিয়ে দাঁড়াতেই সে যেন কোলরিজের সেই এ্যানসেণ্ট মেরিনারের মত আমাকে জাপটে ধরলো। আচ্ছা বলতে পারেন এর কী মানে হতে পারে? সাম্রাজ্যবাদ ভারত ছাড়ো, সাম্রাজ্যবাদ ইন্দোচীন ছাড়ো, সিংগাপুর ছাড়ো, ইন্দোনেশিয়া ছাড়ো, বার্মা ছাড়ো—সবই যদি ছেড়ে দিতে হয় তো সে বেচারা কোথায় যায়? —বলেই ছোকরাটি প্রায় হাউ হাউ করে কেঁদে ফেললো।

আ রে, বেদব্যাসবাবু যে! আপনিই মশাই সঠিক খবর দিতে পারবেন—হাজার হোক খবরের কাগজের লোক আপনারা। তারপর বেঁটে অচিন্ত্য হোড় পায়ের আঙুলের ওপর দাঁড়িয়ে কানের কাছে মুখ এনে ফিস্ ফিস্ করে বললঃ আজকে কি 'বার্'-ও বন্ধ? 'বার্' খোলা কি বন্ধ এ খবর আমার জানা ছিল না, জানার আগ্রহও বিন্দুমাত্র নেই। আর যারা এ পথের পথিক, তাদের কাছে খোলা আর বাঁধা নাকি দুই-ই প্রায় সমান, দু-চার আনা বেশি যা দিতে হয়। তবে সুব্রটো স্যানিয়েল-এর বন্ধুভাগ্যে যারা ধন্য হয়েছে, তাদের কি-বা বেস্পতি কি-বা স্বাধীনতাদিবস। সুব্রত সান্যালের বৈঠকখানাকে একটা ছোটখাট 'বার' বললেই চলে। স্ত্রী, একটি ছেলে ও একটি মেয়ে নিয়ে সুব্রতের ছোট্ট পরিবার, বন্ধু-বান্ধব গেলে সুব্রত তাদের পরম যত্নে এণ্টারটেন করে, এক টেবিলে বৌ, ছেলে, মেয়ে নিয়ে ড্রিঙ্ক করে। ছেলে-মেয়েদের হুইস্কি খাওয়াকে মিঃ স্যানিয়েল কখনই এনকারেজ করে না।

শ্রীরামচরিত-মানস

ভক্তকবি তুলসীদাস

অধ্যাপক শিবপ্রসাদ গঙ্গোপাধ্যায় কর্তৃক বঙ্গানুবাদ

শ্রীরামচন্দ্রের বন্দনা-গানে ভারতবর্ষের বহু গুণী ও জ্ঞানীজন লেখনী ধারণ করিয়া আত্মোৎসর্গ করিয়াছেন। সেই সকল অমর লেখনীর প্রতিভা-নির্ঝরে ভারতবর্ষের মহাকাব্য পৃথিবীর সাহিত্যে স্বীয় বৈশিষ্ট্যে সমুজ্জ্বল। ভক্তকবি গোস্বামী তুলসীদাস তন্মধ্যে অন্যতম—যিনি সহজ সরল ভাষায় পতিতপাবন সীতা-রামের চরিত্র বর্ণনা করিয়াছেন সুমধুর সঙ্গীতের মাধ্যমে। তুলসীদাসের জীবনসর্বস্ব মহামানব শ্রীরামচন্দ্রের সেই বন্দনা-গানের সুললিত বাংলা অনুবাদ এই প্রথম—বসুমতী সাহিত্য মন্দিরের অপূর্ব কীর্তির নূতন এক পরিচয় এই শ্রীরামচরিত-মানস। বহু রঙীন চিত্রে সুশোভিত।

মূল্য—১ম খণ্ড দুই টাকা, ২য় খণ্ড দুই টাকা।

বসুমতী প্রাইভেট লিমিটেডঃ ১৬৬, বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী স্ট্রীট, কলি-১২

ওদের জন্য মার্টিনী—ভারমুথ রয়েছে। বোম্বাই থেকে ট্রান্সফার হয়ে এসেছে সম্প্রতি। সেখানে নাকি ঘরে-ঘরে এ রীতি চালু হয়েছে মোরারজী দেশাইয়ের প্রতি সম্মান দেখানোর জন্যে।

পাজামা ছেড়ে ট্রাউজার পরতে যাব, এমন সময় শ্রীমতী জানাল যে, বিনয় নাকি ফোন করে আমাকে থাকতে বলেছে বিশেষ জরুরী কাজে। কাজটা অবশ্য ওরই। থানা থেকে ট্রান্সফারের অর্ডার এসেছে ওর। মারপিটের অভিযোগ পেয়ে কোন্ এক চোলাই মদের আড্ডায় হানা দিয়ে তিন-জন দাগী ব্যক্তিকে ধরেছিল ওর এক-জন এস-আই। জি-ডি, এমন কি, এফ-আই-আর সব লেখার পর বিনয় জানতে পারে যে, সেমসাইড হয়ে

টাটার ইস্পাত কর্মীদের 'শ্রমবীর' জাতীয় পুরস্কার লাভ

১৯৬৬ সালের মার্চ মাসে ভারত সরকার দিল্লীতে এক অনুষ্ঠানে আজকের ভারতের শিল্পজগতের 'নয়া জওয়ান'—টেকনিশিয়ান ও কারিগরদের 'শ্রমবীর' জাতীয় সম্মানে ভূষিত করেছেন। শ্রমশিল্পে খরচ কমিয়ে উৎপাদন বাড়ানোর উপায় যাঁরা দেখাতে পারবেন তাঁদের প্রতিবছর এই সম্মান ও পুরস্কার দেওয়া হবে।

এ বছর মোট ২৭টি পুরস্কারের মধ্যে সর্বোচ্চ দুটি পুরস্কার সমেত পাঁচটি টাটা স্টীলের কর্মীরা পেয়েছেন—এ দেশে আর কোনো শিল্পপ্রতিষ্ঠান এত বেশী পুরস্কার পাননি।

জামশেদপুরে গত বিশ বছরে কর্মীরা ছোটখাটো নানারকম ব্যবস্থার দ্বারা যাতে উৎপাদন বাড়ানো যায় এরকম ১২,০০০ প্রস্তাব পেশ করেছেন, তার মধ্যে ১০০০টি কাজে লাগানো হয়েছে। এই প্রস্তাবগুলি উৎপাদন বৃদ্ধি ছাড়া কারখানার কাজকর্মে নিরাপত্তা এনেছে আর দেশজ মালমসলা ও কর্মকুশলতাকে কাজে লাগিয়ে দেশের শিল্পকে আত্ম-নির্ভরতার পথে এগিয়ে নিয়ে যেতে সাহায্য করেছে।

কারখানার যাবতীয় শ্রমিকদের অভিজ্ঞতাপ্রসূত উদ্ভাবনী ক্ষমতাকে কাজে লাগানোর জন্যে 'সাজেশ্চন বক্স' স্কীম আজ আমাদের দেশের শ্রমশিল্পে প্রচলিত হয়ে গেছে। এই স্কীমের প্রবর্তক হিসেবে টাটা স্টীলের গৌরব বড় কম নয়।

আর. সি. ভকৎ : সর্বোচ্চ পুরস্কার ২০০০৲ পেয়েছেন।

এম. এম. মজুমদার : সর্বোচ্চ পুরস্কার ২০০০৲ পেয়েছেন।

টাটা স্টীল

কে. বি. দুবে : ৫০০৲ টাকা পুরস্কার পেয়েছেন।

বলবন্ত সিং : ৫০০৲ টাকা পুরস্কার পেয়েছেন।

আফজল হুসেন : ৫০০৲ টাকা পুরস্কার পেয়েছেন।

The Tata Iron and Steel Company Limited

IWTTN 3274A

ভিয়েৎ-নাম

পঞ্চানন চট্টোপাধ্যায়

কামানের গোলা ছুটছে অবিশ্রাম,
বোমারুর ঝাঁক নেমে আসে জনপদে,
সভ্যতা তার মুখোস ফেলেছে খুলে।
তবু দুর্বার প্রতিরোধ সংগ্রাম,
অসম যুদ্ধ—অত্যাচারীকে রোধে,
ঢেউ ভেঙে পড়ে অসীম সাগরকূলে।

বর্বরতার অনেক উপাখ্যান,
পাশবিকতার কদর্য ছবি কতো—
অত্যাচারীরা এঁকেছে ভিয়েৎ-নাম।
প্রতিবেশী দেশ বিবর্ণ আর ম্লান,
বক্ষে তাদের তোমার বুকের ক্ষত,
রক্তের স্রোত উত্তাল উদ্দাম।

জলস্থল আর আকাশেতে হানাদার,
প্রতিরক্ষায় হাজারে হাজারে জড়ো—
আবাল-বৃদ্ধ-বনিতার মহাব্রত।
বনে জঙ্গলে ঘরে প্রান্তরে আর
হাটে ঘাটে গ্রামে শপথ কঠিনতর—
স্বাধীনতাস্পৃহা আজকে অসংযত।

ইতিহাস তুমি গড়েছ ভিয়েৎ-নাম,
আমিও তোমার সৈনিক একজন,
রক্তে আমার আগুনে ধরানো জ্বালা।
অহরহ আমি জপ করি ওই নাম।

গিয়েছে, যুবক তিনটি জনৈক এম-এল-এ'র একান্ত বিশ্বস্ত লোক। বিনয় সব কিছুই উইথড্র করে নিতে রাজী ছিল, কিন্তু বাগড়া দিচ্ছে আই-ও ছোকরাটি। নতুন পাশ করে ঢুকেছে কিনা, সুজিতের মন এখনও তাই তৈরি হয় নি, টেম্পারামেন্ট-এর দিক থেকে ও পুলিশ লাইনে একেবারে আনফিট।

অসহায়ের মত বিনয় কেঁদে পড়েছিলঃ মরে যাব বাসুদা, এখন ট্রান্সফার হয়ে গেলে। মাসে চা'র হাজার টাকার মত আসে। আমার থানার আন্ডারে একটা বাজার, গোটা ছয়েক চোলাই ভাঁটিখানা, একটা পতিতালয়ও গড়ে উঠেছে। না, আমাকে তো কিচ্ছু করতে হয় না, সিনিয়র জমাদার রামসুরতই সব দেখাশুনো করে, হপ্তায় হপ্তায় ওপরে আমার কোয়ার্টারে গিয়ে টাকাটা পেঁাছে দেয়। কোনও ঝামেলা ছিল না, এই সুজিৎ ছোঁড়াটা এসেই, ব্যাটা নিশ্চয়ই ভেতরে ভেতরে পলিটিক্স করে। শ্রীমান বিনয়ের বক্তব্য ঃ এখনই যদি সে অন্য থানায় ট্রান্সফার হয়ে যায়, তো তার 'মৃত্যু' অনিবার্য। গড়িয়ার সাড়ে বারো কাঠা জমির ওপর সে সবে বাড়ি করতে আরম্ভ করেছে, বড় মেয়েটিকে শান্তিনিকেতনে এবং ছেলেটিকে দার্জিলিঙের সেন্ট জোসেফস-এ দিয়েছে। 'আপনার বৌমা মাত্তর গত রোববার কাগজে বিজ্ঞাপন দেখে ওর ভাইকে নিয়ে একটা সেকেন্ড-হ্যান্ড গাড়ি দেখে এসেছে। এ অবস্থায় ট্রান্সফার হলে......। আ রে, অন্য থানায় গুছিয়ে বসতেও তো আমার কিছু না হোক ছ' মাস সময় লেগে যাবে, তা ছাড়া এ ছিল আমার গোল্ডেন অথচ পীস-ফুল এম্পায়ার। কালকেই আমি বলে দিয়েছিলাম, আমার পক্ষে কমি-শনারের কাছে এ নিয়ে তদ্বির করা সম্ভব হবে না, রাইটার্সে গিয়ে কোন মন্ত্রীর কাছেও না। সবাই খাতির করলে হবে কী?

আবার কাগজটা টেনে নিয়ে বসতে যাচ্ছিলাম, এমন সময় পাড়ার একটা ছোকরা জানলা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে 'বৌদি' বলেই আবার আমায় দেখে থেমে গেল। তারপর অত্যন্ত অপ্রতিভ ঢঙে বললঃ ও, আপনি রয়েছেন। ও হ্যাঁ, আজ তো খবরের কাগজেরও ছুটি। দাদা, একটা টেলিফোন করতাম। ছোকরাটিকে প্রায়ই পাড়ায় দেখতে পাই, নাম জানি নে যদিও। টেলিফোনের ও প্রান্তের লোকের কাছে সে যার সঙ্গে কথা কইতে চাইল, তাতে আমি বিস্মিত না হয়ে পারলাম না। দেখলাম, ছোকরা কাজের ছেলে, কোন বাজে ভূমিকা না করে সটান বললে আমার ফ্ল্যাট কি হলো অমুকদা? ......হ্যাঁ, আমি কালীঘাট থেকে নদের চাঁদ কথা বলছি......আমাকেই খুঁজছিলেন?......না, দুখানায় হবে না, আরও অন্তত দুটো......না বললে চলবে কেন অমুকদা, একটা ফ্ল্যাটে তো আপনারই লোকজন এসে মজা মারে......কি......মাছ?......মাছ কোথায় পাব এখানে? দমদম দাওয়াই ......লোকজন খাবে? ...... কী ব্যাপার, আমরা বাদ দাদা?......তা অন্য বাজারে ......হ্যাঁ, দাম কিন্তু বেশি পড়বে...... ভেড়ার মাংস......নিউ মার্কেটে যেতে হয় তাহলে......তা বারো-চোদ্দ টাকা তো কিলো নেবে......তিন কিলো? ......জিন? ও, দুটো রাম, একটা জিন?......ঠিক আছে......যা বলেছেন দাদা, তা নইলে আর কিসের স্বাধীনতা....

অস্ট্রেলিয়া থেকে লিখছি

সুরেশচন্দ্র সাহা

আরকেডিয়ার ডেয়ারী ফার্মে (২)

আরকেডিয়ার চারদিকে গোচারণ-ভূমি আর ফলের চাষ। আট মাইল দূরে ছোট শহর শেপারটন। ব্রেকফাস্ট খেতে বসে অনেক কথাই হল সরিগামদের সঙ্গে। সে কি খাওয়া, যত্নে ও পরিবেশনে সে কি আন্তরিকতা। বিরল বসতি আরকেডিয়ার দূর গাঁয়ে থাকার ব্যবস্থা কাজের সুবিধা ঠিক বড় শহরের মতই। মেলবোর্ন বা সিডনির মতই এখানে ফোন আছে, হিটার কুকার টোস্টার আছে, টেলিভিশন আছে। এরাও কমোড পায়খানা ব্যবহার করে, বাথরুমে ঠাণ্ডা ও গরম জলে স্নান করে, কার্পেট-পাতা ঘরে নরম বিছানায় ঘুমায়। আর এরা যা খায়, শহরের লোকেরা পয়সা দিয়েও খাওয়ার সে আরাম, সে প্রাচুর্য কল্পনা করতে পারে না। দুধ ফল ডিম মাংস আনাজপাতি সবই বাড়ির জিনিস। বিকেলে দোয়ানো দুধ থেকে পাঁচ-সাত সের এনে রেফ্রিজারেটরে রেখে দেয়, আর পরদিন বিকাল পর্যন্ত ব্যবহার করে। বলক দেওয়ার বালাই নেই। দুপুর ও সন্ধ্যায় খাওয়ার শেষে ননী-ঘন দুধের আইস-ক্রীম। সঙ্গে দুধের সরে ঘন প্রলিপ্ত ফ্রুট স্যালাড। এই সরকে ওরা বলে ক্রীম—আচ্ছা-করে-ফোটানো পাতলা ক্ষীরের মত। অস্ট্রেলিয়ানরা রসগোল্লা সন্দেশ তৈরি করে না, ছানা কাটে না—পায়স তকতী রসমালাই কিছুই তৈরি করতে জানে না। গেলাস গেলাস কাঁচা দুধ জলের মত খায়। শুধু ক্রীম নামক পদার্থটি নিয়ে যত কাড়াকাড়ি।

ব্রেকফাস্টের শেষে মিঃ সরিগাম ঘরের পাশের উঠান থেকে ১৪।১৫টি মিঠেকুমড়ো তুলে আনলেন। আমাদের দেশের মিঠেকুমড়োর মত সুডৌল নয়। কেমন যেন এবড়ো থেবড়ো চ্যাপ্টা মত। ঘন গজানো ঘাসের মধ্যে মিঠেকুমড়োর নিস্তেজ লতানো গাছের পাতাও টসটসে নয়। অবাক হয়ে দেখলাম বাড়ির সীমানার বেড়া ঘেঁষে আঙুর গাছে থোকা থোকা আঙুর পেকে আছে। মনে হল কতদিন যেন চোখ তুলে এদিকে কেউ দেখে নি। পাখী ঠোকরানো কত আঙুর গাছতলায় পড়ে আছে। মিঃ সরিগাম বললেন—এ সব কে আর কত খাবে বল। যার যখন খুশি তুলে মুখে দেয়। কখনও শুকিয়ে কিসমিস করা হয়। বেশির ভাগ পাকা আঙুর যায় টার্কী আর মুর্গীর পেটে। থোকা থোকা আঙুর তুলে আমরা তখন খুব খাচ্ছিলাম, গোখলে বেশির ভাগ ছড়িয়ে দিচ্ছিল মুর্গীগুলোর দিকে; তারপর বিস্ময়কর সুরে মুর্গী-ডাক ডেকে তাদের ক্ষেপিয়ে তুলছিল। সেদিন গাছে যত পাকা আঙুর ছিল সবাই মিলে তুললাম আর লাঞ্চের সময় জলের বদলে গেলাস-ভরা আঙুর-রস খেলাম। সরিগামদের বাড়িতে যে কটি গাছ আছে, তাতে আপেল আঙুর পীচ পেয়ার্স এবং কমলালেবুর সারা বছরের প্রয়োজন মিটেও অনেক উদ্বৃত্ত হয়। অথচ খুচরো বিক্রির উপায় নেই—কারণ সব বাড়িতেই যে ফলের গাছ আছে। বিক্রি করতে হলে এলাহি চাষের ব্যবস্থা করতে হয় আর শুধু তখনই ফ্যাক্টরীর মালিক বা বড় মহাজনরা এসে লরী লরী ফল কেনে। তারপর জ্যাম তৈরি করে অথবা প্যাক করে পাঠায় শহরের দোকানে দোকানে। বাড়ির ফল বিক্রির উপায় না থাকলেও পাশের বাগানের এপ্রিকট বেচে বছরে হাজার পাঁচেক টাকা সরিগামদের ঘরে আসে।

আরকেডিয়ার ডেয়ারীতে দুধ-দোয়া কলের এবং বাড়ির বিদ্যুৎ আসে শেপারটন থেকে তামার তারে, জমিতে ঘাস চাষের জল আসে গোলবার্ন নদী থেকে—পাম্প করা পাইপে। অস্ট্রেলিয়ায় জলের বড় দাম; গ্যালন-গ্যালন জল তোলা-তোলা সোনার মত মূল্যবান। কারণ নদীর সংখ্যা কম, প্রতি নদীতে জলের পরিমাণও বেশি নয়। মাটি খুঁড়ে দুই হাজার ফুট গভীরেও জল মেলা ভার। নদী খাল-বিলহীন অন্তর্বর্তী অঞ্চলে ডেয়ারী কৃষকের সংখ্যা খুবই কম। সেখানে সবাই আকাশের দিকে চেয়ে থাকে আর

আরকেডিয়ার গোলবার্ন নদী। দু'দিকে গাম গাছের (ইউক্যালিপটাস)

গাম গাছের অরণ্য

আকাশের দেবতা মুখ তুলে না চাইলে দুর্গতির সীমা থাকে না। তাই মারে গোলবার্ন ডার্লিং নদীর ধারে ফল গম ঘাস চাষের মানুষেরা জলের মূল্য বোঝে—জলের মূল্যেই সম্পদ গড়ে তোলে। অস্ট্রেলিয়া পৃথিবীর শুষ্কতম মহাদেশ। তিরিশ লক্ষ বর্গমাইলের এক চৌথেরও কম জমি খাদ্য বা ঘাস বুনানির জল পায়। এমন দেশে ষোল কোটি ভেড়া এবং দুই কোটির গো-সম্পদ কম কথা নয়।

ভাবতে অবাক লাগে হাজার হাজার বিঘা জমিতে ঘাসের চাষ করা আছে আর গরু ভেড়ার দল চরে বেড়াচ্ছে। আমরা জমির মূল্যমান বিচার করি বিঘা প্রতি কতমণ ধান কত মণ আলু ফলে তারই হিসেবে। অস্ট্রেলিয়ানরা হিসেব করে বিঘা প্রতি ঘাসের জমিতে ক'টা গরু ভেড়া ঘাস খেতে পারে, আর তা থেকে কত আয় হয়।

পশ্চিমবাংলার মাঠেও গরু চরে; সে একের গরু, অপরের জমিতে। মাঠে মাঠে যখন ধানের শীষ বের হয়, মটরের ফুল ফোটে, মসুরী খেসারী ছোলা কলাই দামাল হয়ে ওঠে, কৃষকের আনন্দ ধরে না। ঠিক তখনই দিনের আলোয় অথবা রাতের আঁধারে সেই সোনা ফলা মাঠ গরু মোষ দিয়ে খাইয়ে উজাড় করে দেয় এক গোপালক সম্প্রাদায়। কৃষক মাথায় হাত দিয়ে বসে। এই দলবদ্ধ গুণ্ডামীর বিরুদ্ধে সে অসহায়। আইন অপ্রযোজ্য। যুদ্ধের দিনে জরুরী অবস্থা আয়ত্তে আনার মত এই অনাচার, এই শস্যহানিকর উৎপাত বন্ধ হওয়া উচিত।

বাড়ির কাছের নদীর জল বলে কৃষকদের কিন্তু ইচ্ছামত ব্যবহার করার উপায় নেই। গোলবার্নের জল নিয়ন্ত্রণ করে শেপারটনের ওয়াটার কমিশন। মারে লডন, ডার্লিং—সব নদীর জল সরবরাহের ব্যবস্থাই এমনি কতগুলি কমিশনের হাতে। প্রতি একর ফুট অর্থাৎ এক একর জমিতে এক ফুট গভীর করে যতটা জল দাঁড়াতে পারে তারই দক্ষিণা টাকা চারেক। বৃষ্টির অভাবে নদীর জল কমে গেলে এই জল সরবরাহের পরিমাণেও তারতম্য ঘটে।

নদী থেকে পাম্প করা জল প্রথমে এসে জমা হয় কমিশনের রিজার্ভিয়রে—সেখান থেকে পাইপযোগে জমিতে, দুধ-দোয়া কারখানায়, কৃষকের বাড়িতে। বাড়িতে কিন্তু সে জলের বারমিশালী ব্যবহার, কলকাতার বাড়িতে ছাদের ট্যাঙ্কে গঙ্গাজলের মত—ঘর মোছায় আর পায়খানায় তার প্রয়োজন। ডেয়ারীর প্রতি টুকরা জমিতে একটি কাটা-ডোবা থাকে। গরুর দল চরে চরে ঘাস আর তৃষ্ণা পেলে সেই ডোবায় জল খায়। ডেয়ারী কৃষককে সতর্ক থাকতে হয় যাতে অসাবধানে নির্ধারিত পরিমাণের চাইতে বেশি জল এসে জমিতে জমা না হয়। তা হলে কমিশন শাস্তি দেবে, হয়ত জল সরবরাহ বন্ধ করেই দেবে। জমির বর্ডারে বর্ডারে কাটা-নালায় জল এসে জমা হয়, সেই জল দিয়েই ঘাসের চাষ হয়। সুতরাং পাঁচশ গরুকে ঘাসবিচুলি কেটে জাবনা তৈরি করে খাওয়াতে হয় না, গামলা ভরা ফেন জল দিতে হয় না। কৃষককেও গোপালনে বৌ-ছেলেকে জড়িত করে হিমসিম খেতে হয় না।

অস্ট্রেলিয়ায় অল্প জলের নদী থেকে গ্যালনের হিসেবে জল নিয়ে জমি চাষের ব্যবস্থা শুধু আজ থেকে নয়। বহু যুগ আগে থেকে চালু হয়েছে। নদী খাল থেকে পাম্প করা জল নিয়ে এমনি জলসেচের ব্যবস্থা আমাদের দেশে এখনও হয় নি। অবশ্য বড় বড় ড্যাম আমাদের অনেক হয়েছে। তার জলে বাংলার জমি যে কোথায় চাষ হয় সে খবর অনেকেই রাখে না। সেখানে মাছের চাষও হয়, টুরিস্টরা নৌকো-বাইচও খেলে; আর প্রলয়ংকর

সাঁরগামদের পরিবার সামনে গোথলে বসে আছে

বন্যার দিনে সে জল বাঁধ ভেঙে এসে আমাদের ফসল-ফলা জমি ডোবায়।—আমরা বাড়ি ঘর ছেড়ে পালাই, যখন জল এসে ঘরে ওঠে। অস্ট্রেলিয়ার অনেকে আমাদের এক অদ্ভুত প্রশ্ন করে—হিমালয়ে এত বরফ; সে বরফ গলা জল বাঁধে সঞ্চয় করে জমি চাষ করে তোমরা ফসল বাড়াতে পার না? অথচ এরা অনেকেই জানে না, শ্যামল বাংলা নদী খাল বিলের দেশ; আর আমরা গর্বভরে বলি নদীমাতৃক দেশ। এখন অবশ্য নদী বৈমাতৃক দেশ।

লাঞ্চের শেষে আমরা বেরিয়ে পড়লাম গোলবার্নের উপত্যকায়। আরকেডিয়ার আকাশে মধ্যদিনের সূর্য তখন সোনার আলো ছড়িয়ে দিয়েছে। ঝকঝকে পরিষ্কার দিন। মিষ্টি মিষ্টি শীত। প্রচণ্ড শীত আছে অস্ট্রেলিয়ার আল্পসে, টাসমেনিয়ার পাহাড়ে পাহাড়ে বরফও পড়ে। তবে বরফ পড়া দিনে সারাটি দেশ উত্তর ইউরোপের মত আলোহীন নয়, বৃটেনের বৃষ্টি পড়া কালো কুয়াসা ঢাকা শীতের দুপুরের মত অন্ধকারময় নয়। অস্ট্রেলিয়ার কনকনে শীতের মধ্যে সূর্যালোকের দাক্ষিণ্য অনুপম।

গোলবার্ন ছোট নদী। অপরিসর। খাড়া তীর। কঙ্করগর্ভ। কচুরিপানা-পচা জলের মত আবিল জল। জুন মাসের শীতে শীর্ণ হয়ে আছে। এঁকে বেঁকে চলতে গিয়ে স্রোতবতী হয়েছে উপলবিষম বাঁকে বাঁকে। অজস্র বাঁকের বঙ্কিম ভঙ্গী নিয়ে গোলবার্ন মিশেছে মারে নদীতে। মানবসভ্যতার আদ্যিকাল থেকে মানুষ বসতি স্থাপনের আগে খুঁজে ফিরেছে

সরিগামদের ফার্মে ক্রেসিয়ান গরুর দল। লক্ষ্য করার বিষয় সবগুলির শিং ভাঙা

সুপেয় জল, শস্য ফলানো মাঠ। অস্ট্রেলিয়ার উপনিবেশেও প্রথম অভিযাত্রীরা তাই খুঁজেছেন। তবে তাঁদের প্রধান লক্ষ্য ছিল গরু ভেড়া চরার মত বড় বড় মাঠের দিকে। সে-মাঠের সন্ধান মিলেছে গোলবার্নের ধারে, মারিমবিজির পারে। লিভারপুল প্লেনস ডার্লিং ডাউন্‌স তাদের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করেছে। তাই অস্ট্রেলিয়ায় সরিগামরা দুধ মাখন মাংস পশমের কারবার করে পয়সা করেছেন।

আরকেডিয়া-শেপারটনের নদী জলের অঞ্চলে এক কালে ছিল আদিম অধিবাসীদের বাস। কত যুগ আগে গোলবার্ন ছেড়ে যে তারা কোথায় গেছে সে খবর কেউ রাখে না।

পৃথিবীতে মানবসভ্যতা বিকাশের পর কত হাজার বছর চলে গেছে। সেই সভ্যতা বিকাশের দিনে অনাবিষ্কৃত অস্ট্রেলিয়া অনুর্বর নিষ্ফলা ভূমি আর পাহাড় পর্বত নিয়ে একা একা ঘুমিয়ে ছিল। সেখানে শুধু কিছু আদিম অধিবাসী অতি আদিম অবস্থায় যাযাবরের জীবনযাপন করছিল। অথচ সে আদিম অধিবাসীরাও নাকি অস্ট্রেলিয়ার মাটির মানুষ নয়। সেই অতি অতীত কালে এই মহাদেশের সঙ্গে সংযুক্ত ছিল এশিয়ার কিছু ভূভাগ এবং সেই সংযোগবিন্দু দিয়েই নাকি এশিয়া থেকে এই কৃষ্ণকায় মানবদের অস্ট্রেলিয়ায় আগমন ঘটে। অনেকের মতে দক্ষিণ ভারতীয় দ্রাবিড়ী শাখার লোকেরাই সাগর পাড়ি দিয়ে এশিয়া-অস্ট্রেলিয়ার সংযোগবিন্দু দিয়ে এদেশে এসেছিল। তারাই আদিম অধিবাসী—কয়েক সহস্র বছর পরে অস্ট্রেলিয়ায় আগত শ্বেতকায় মানুষদের ভাষায় ব্ল্যাকস। পৃথিবীর এককালের গুহামানবেরা গৃহবাসী হয়েছে, অরণ্যচারীরা নগর পত্তন করেছে, নীল সিন্ধু গঙ্গা ইউফ্রেটিসের তীরে তীরে মানবসভ্যতার ইতিহাস রচিত হয়েছে। অস্ট্রেলিয়ার আদিম অধিবাসীদের মধ্যে কোন পরিবর্তন আসে নি।

১৩০ বছর আগে ১৮৩৫ সালে আয়র্ল্যান্ড থেকে সরিগামের ঠাকুর্দা এসেছিলেন অস্ট্রেলিয়াতে তখনও খুব বেশি আইরিশ লোকের এদেশে আগমন হয় নি, যেমন হয়েছিল ১৮৫৩ সালের আয়র্ল্যান্ডে আলুর দুর্ভিক্ষের বছরে। আয়র্ল্যান্ডের শহর

শেপারটন থেকে দুধের গাড়ি এসে সরিগামদের ফার্ম থেকে দুধ নিয়ে যাচ্ছে

পা ঝেঁটিয়ে আইরিশরা সেদিন অস্ট্রেলিয়ায় এসেছিল শুধু দুটি খেয়ে বেঁচে থাকার জন্য। ইংরেজরা তখন আইরিশদের মুরুব্বী। ১৯৪৩ সালের ভাতের দুর্ভিক্ষের বছরে কোন বাঙালী অস্ট্রেলিয়ায় আসার সুযোগ পায় নি এবং চায় নি। অস্ট্রেলিয়ার মানুষ আর জি কেসি বৃটিশ প্রতিনিধি হিসেবে তখন বাংলা শাসন করছেন।

সরিগামের ঠাকুর্দা এসে মেলবোর্ন শহরের উত্তরে একটি ডেয়ারী ফার্ম খুলেছিলেন। ১০৮ বছর বয়সে তাঁর মৃত্যু হলে সে ফার্মের মালিক হলেন মিঃ সরিগামের পিতা। তখন তাঁর সাত ছেলে চার মেয়ের অভাবী সংসার। ছেলেগুলি একটু বড় হয়েই যে যার মত ছড়িয়ে পড়ল আপন আপন দুর্ভাগ্য নিয়ে। উঠতি যুবক ফ্র্যান্সিস ড্যানিয়েল সরিগাম সুরু করলেন দিন মজুরের কাজ। তারপর মেলবোর্নে এসে কাগজের হকারী থেকে দ্বারে দ্বারে কারখানার দুধের বোতল পৌঁছে দেওয়ার কাজ করলেন। হাজার পাঁচেক টাকা জমলেই কাগজের এজেন্সি কিনলেন। তারপর বিয়ে করলেন। মিসেস সরিগাম তখন মেলবোর্নের এক আপিসে মহিলা কেরানী।

চোদ্দ বছর বিবাহিত জীবনের শেষে সরিগামরা দেড় লাখ টাকার একটি ডেয়ারী ফার্ম কিনলেন উডস্টকে। মেলবোর্নের ঊনিশ মাইল উত্তরে। শুরু হল ফার্মারের জীবন। পাথুরে জমি। তাতে আবার আরকেডিয়ার মত জলসেচের ব্যবস্থা ছিল না। কঠোর পরিশ্রম করতে হয়েছে, আকাশের দিকে চেয়ে থাকতে হয়েছে। তবু উডস্টকের ফার্মে মাঠ ভরা গরু ট্যাঙ্ক ভরা দুধ ঘর ভরা সম্পদ নিয়ে তাঁরা দিন কাটিয়েছেন। পনের বছর উডস্টক বাসের পর আরকেডিয়ায় এসেছেন আজ চার বছর। গোলবার্নের জলসেচপুষ্ট ফার্ম কিনেছেন চার লক্ষ টাকায়। আজ আরকেডিয়ার ফার্মে যে গো-সম্পদ আছে শুধু তারই দাম দশ লক্ষ টাকা।

আজ আর মাঠে মাঠে গরু তাড়িয়ে ঘাস গজিয়ে ফার্ম গড়ে তোলার জন্য কায়িক শ্রমের বালাই নেই। ধনী হওয়ার আকাঙ্ক্ষা নেই—নামজাদা ফার্মার হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার স্বপ্ন মিঃ সরিগামের জীবনে সার্থক হয়েছে। আরকেডিয়ার দুধের কারখানায় সকালবেলার কাজের শেষে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে গল্প শুনছিলাম। তখন শেপারটনের দুধ কেনা কোম্পানী থেকে শাদা রঙের গাড়ি এসে ট্যাঙ্ক থেকে দুধ টেনে নিচ্ছে? মোটর গাড়িতে পেট্রোল নেওয়ার মত। সেদিকে সরিগামের দৃষ্টি ছিল না। গাড়ি চলে যেতেই জিজ্ঞেস করলাম—শেপারটনের গাড়ি কতটা দুধ নিয়ে গেল দেখলে না? একটি চিরকুট এগিয়ে দিয়ে মিঃ সরিগাম বললেন—দেখাদেখির কোন দরকার নেই। দুধের গাড়ির ড্রাইভারই ত' মিটার দেখে লিখে দিয়ে গেল।

মিসেস সরিগাম সদা তৃপ্ত মহিলা। জগৎ-সংসারে কোন কিছুর বিরুদ্ধে তাঁর যেন কোন অভিযোগই নেই। মেলবোর্ন শহরের তুলনায় এই প্রায়-নির্জন গ্রামে কৃষক-বধূর জীবন তাঁর কেমন লাগে জিজ্ঞেস করেছিলাম। মিসেস সারগম বললেন—স্বামী আর দুটি ছেলে নিয়ে আমার বড় সুখের সংসার। ওরা সিগারেট খায় না, মদ ছোঁয় না। একেবারে হীরের টুকরো ছেলে। আই য়্যাম রিয়ালি থ্যাঙ্কফুল।

মেয়েদের বিরুদ্ধে ফিনল্যাণ্ডীয় যুবক ডিলহেনের শত অভিযোগ শুনে, এলথামের বীয়ার-খাওয়া মানুষ দেখে আরকেডিয়ায় এসে মনে হল—এ কোন্ অস্ট্রেলিয়া'

আলোকচিত্র লেখক কর্তৃক গৃহীত

হেল্প ! হেল্প !!

ব্যর্থ নীতি বাতিল হোক !

অলকানন্দা সেন

সোনা নিয়ে সোনা কথা কিছু বলবো না, নিজের জীবনের ওপর দিয়ে বয়ে-যাওয়া প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা থেকে বিবৃত করবো স্বর্ণ নিয়ন্ত্রণ আইন বলবং করার ফলাফল।

অর্থাৎ আজ যে দলে দলে লোক মিছিল-শোভাযাত্রা করছেন, কারাবরণ করছেন গুচ্ছে গুচ্ছে, পালায় পালায় অনশন ধর্মঘট করে মৃত্যুকে তুচ্ছ করছেন—এ করুণ ঘটনাচিত্রের পেছনে যে-কাহিনী রয়েছে—তা যেমন অবাস্তব-বুদ্ধিসম্মত তেমনি হৃদয়-হীন। অর্থাৎ বছর চারেক আগে কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী শ্রীমোরারজী দেশাই যখন স্বর্ণ নিয়ন্ত্রণ বিল আনেন তখনই তার বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ ধ্বনিত হয়েছিল, এবং এ-জনবিরোধী আইন প্রত্যাহার করে নেবার জন্যেও বিভিন্ন দায়িত্বশীল মহল থেকে দাবি উচ্চারিত হয়। কিন্তু চৈনিক আক্রমণের ফলে যখন আমাদের দেশের দেউলিয়া অর্থ-নীতির নগ্নচিত্রটি ইয়োরোপ-আমেরিকার কাছে প্রকাশিত হয়ে পড়ে তখন পাছে সেসব দেশ থেকে সাহায্য-লাভে আমরা বঞ্চিত হই সেজন্য দেশের অর্থনৈতিক বনিয়াদ রচনার তাগিদ অনুভব করেন সরকার। সে-বনিয়াদ গঠনের অন্য কোন পন্থা তদানীন্তন অর্থমন্ত্রীর মনঃপূত হলো না, তিনি স্বর্ণ নিয়ন্ত্রণ বিল পাশ করে দেশের সোনার গহনা তৈরি করা, সোনা মজুত করা বে-আইনী ঘোষণা করলেন। সোনার সঙ্গে ভারতবাসীর সম্পর্ক শত-শতাব্দী ধরে—এ-কথা যখন বলা হলো তখন মোরারজীভাই ২২ ক্যারেট সোনার বদলে ১৪ ক্যারেটের সোনা ব্যবহারের অনুমতি দিলেন। জন-সাধারণ বিশেষত স্বর্ণশিল্পীদের কাছ থেকে প্রবল চাপ আসার ফলে সরকার আর একটু নিচে নেমে পুরোনো ২২ ক্যারেটের সোনা ভেঙে নতুন ২২ ক্যারেটের গহনা নির্মাণের অনুমতি দিলেন। কিন্তু এ সবই আত্মপ্রবঞ্চনা ছাড়া আর কিছু নয়, কারণ স্বর্ণ নিয়ন্ত্রণ বিধির দ্বারা কয়েক লক্ষ লোকের জীবনে সর্বনাশ ডেকে আনা ছাড়া সরকারের অবদান কিছুই নেই, যে-উদ্দেশ্যে ওই আইন রচিত হয়েছিল তা সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়েছে।

কারণ, স্বর্ণ নিয়ন্ত্রণের প্রাথমিক উদ্দেশ্যে ছিল দেশ গঠনের কাজে সোনা নিয়োগ করা। কিন্তু যেহেতু (১) এদেশে সোনার দর আন্তর্জাতিক বাজার দরের চেয়ে বেশি, (২) এদেশে প্রচুর সোনার চোরাই আমদানী হয় এবং (৩) গহনা ইত্যাদি তৈরি হবার ফলে সোনা ব্যক্তিগত সম্পদ থেকে যায়—অর্থাৎ দেশের কাজে না এসে তার অপচয় হতে থাকে সেহেতু সোনার প্রচলন একেবারে বন্ধ করে দেবার জন্যে সরকার বদ্ধপরিকর হন। সোনার বিনিময়ে যাতে সরকার কামান-বন্দুক বা অন্যান্য অস্ত্র কিংবা প্রতিরক্ষার অন্য ব্যবস্থাদি অবলম্বন করতে পারেন, সে জন্য সরকার দেশবাসীর কাছে আবেদন জানালেন—সরকারের হাতে মজুত সোনা জমা দেবার জন্যে। স্বর্ণবন্ড কেনার জন্য। সোনার গয়না তৈরি করা, সোনা বেচা-কেনা করা, সোনা মজুত করা, বে-আইনীভাবে সোনার আমদানী (Smuggling) করা বে-আইনী ঘোষিত হলো। দেশের যত সোনা সরকারী কোষাগারে জমা করে সরকার স্বর্ণ-ডিম্ব প্রসব করতে চাইলেন।

কিন্তু দুঃখের বিষয়, সরকারী আশায় বেলুন আঁচরেই ফেঁসে গেল, সোনা যা জমা পড়লো, স্বর্ণবন্ড যা বিক্রি হলো তা গরীব মধ্যবিত্তের ঘর থেকেই গিয়েছে, মজুত সোনা তিল থেকে তাল হলো। অর্থাৎ সরকারী হিসেবেই এখানে মোট চার হাজার কোটি টাকার সম-পরিমাণ সোনা রয়েছে বলে বলা হয়ে থাকে, কিন্তু গত চার বছরে মাত্র কয়েক কোটি টাকার সোনা সরকারী তহবিলে জমা পড়েছে, যার বেশির ভাগ আবার নতুন আমদানী করা সোনা যা ধরার জন্য আগে থেকেই আইন এ দেশে বলবৎ ছিল। দ্বিতীয়ত বে-আইনী সোনার আমদানী তো দেশে একরতিও কমে নি, যে চোরা পথ দিয়ে এদেশে বাইরে থেকে সোনা আসতো সে-পথ 'সীল' করে দিতে সরকার ব্যর্থ হয়েছেন। তৃতীয়ত, আন্তর্জাতিক মানদণ্ডে সোনার দাম একটি পয়সাও কমে নি, বরং তা বেড়ে গিয়েছে। এর মূলে কারণ হচ্ছে সরকার আইনের ডান্ডা দেখিয়ে মানুষের মন শাসন করতে চেষ্টা করেছেন, অথচ তার মনকে পরিবেশ অনুযায়ী তৈরি করার কোন প্রচেষ্টাই সরকারী তরফে করা হয় নি। সোনার সঙ্গে মানুষের সম্পর্ক অবিচ্ছেদ্য, কেবল গয়নার জন্যেই মানুষের কাছে সোনার দাম এত বেশি নয়, সোনাই হলো সাধারণ মানুষের আপদ-বিপদের

প্রকাশিত হয়েছে

রবীন্দ্র ভারতী পত্রিকা

৪র্থ বর্ষ, তৃতীয় সংখ্যা

সম্পাদক : ধীরেন্দ্র দেবনাথ

হিরণ্ময় বন্দ্যোপাধ্যায়, সুখরঞ্জন রায়, ডঃ অজিতকুমার ঘোষ, শ্রীদেবীপ্রসাদ রায়চৌধুরী, ডঃ সাধনকুমার ভট্টাচার্য, ডঃ শীতাংশু মৈত্র, ডঃ অরবিন্দ পোদ্দার, শ্রীভুপেন্দ্রনাথ সরকার, শ্রীসমর ভৌমিক প্রভৃতি।

বার্ষিক গ্রাহক চাঁদা—চার টাকা (হাতে ও সাধারণ ডাকে)

রেজেস্ট্রীযোগে—সাত টাকা

রবীন্দ্র ভারতী বিশ্ববিদ্যালয়

৬/৪ দ্বারকানাথ ঠাকুর লেন, কলিকাতা-৭

মধ্য। সাধারণ লোকের কাছে এখনো ব্যাঙ্ক, ইন্স্যুরেন্স-এর বিশেষ আবেদন নেই, সোনাই তার দুর্দিনের সাথী, সোনার গয়না বন্ধক দিয়েই সে দুর্দিনে ডাক্তার ডাকে, পথ্যি যোগাড় করে, খেয়ে বাঁচে। এমন কি চাষীরা পর্যন্ত এতদিন তাদের উদ্বৃত্ত শস্য বেচে তাই দিয়ে সোনা কিনে রাখতো যাতে প্রয়োজনের সময় সেই সোনা আবার বেচে বীজধান থেকে সুরু করে বলদ লাঙল পর্যন্ত কিনতো। এখন আগেকার মতই তারা কিছু শস্য বেচে দিচ্ছে বটে যাতে তা পচে না যায়, নষ্ট না হয়, কিন্তু সোনা কিনতে পারছে না বা সঞ্চয়ের অন্য কোন সহজ পন্থা তাদের জানা নেই বলে কিম্বা গ্রামাঞ্চলে পোস্ট অফিস বা ব্যাঙ্কের অনুপস্থিতি কিম্বা দূরত্বের জন্যে, বাকী শস্যটা মজুত থেকে যাচ্ছে বলে খাদ্যশস্যের দাম চড়া থাকে। হ্যাঁ, সোনার প্রতি জনসাধারণের কোন মোহই থাকতো না যদি সোনার বদলে তারা যা পায় তা সরকার যোগাবার গ্যারাণ্টী দিতে পারতেন। সরকার কি লোকের মনে সেই নিরাপত্তাবোধ সৃষ্টি করতে পেরেছেন যখন লোকের অসুখ হলে তার চিকিৎসা পথ্যের জন্য সরকার এগিয়ে আসবেন, যখন পরিবারের একমাত্র উপার্জনক্ষম ব্যক্তির মৃত্যু হয় বা অশক্ত হয়ে পড়ে তখন তার গোটা পরিবার যাতে খড়কুটোর মত ভেসে যেতে না পারে তার জন্য সরকার কি ওই পরিবারের পাশে এসে দাঁড়াতে পারেন? সরকার যদি দেশবাসীর ক্ষুধার অন্ন, বিনামূল্যে চিকিৎসা, শিক্ষা তাদের সকল দায়-দায়িত্ব নিতে রাজী হন, যদি জনসাধারণ নিরাপত্তা বোধ করতে পারে তবে দেখবেন তাবৎ সোনা সরকারের ঘরে জমা পড়েছে, সোনার বালা তখন মেয়েদের কাছে বন্ধন-বাহুল্য ছাড়া আর কিছুই মনে হবে না।

কিন্তু সে নিরাপত্তার গ্যারান্টী না থাকায় আজ লক্ষ লক্ষ স্বর্ণশিল্পীর পরিবারে ঘোর অন্ধকার নেমে এসেছে। সোনার গয়না তৈরি করেই যাদের জীবিকা নির্বাহ করতে হয় সে-জীবিকা বন্ধ করে দেওয়া কি কল্যাণব্রতী রাষ্ট্রের ধর্ম না দেশবাসীর প্রতি সুবিচার? আজ ভারতের বিভিন্ন রাজ্যে ৫০ লক্ষ স্বর্ণশিল্পী বেকার, কর্মচ্যুত, দীর্ঘদিন এ ব্যবসায়ে জড়িত থাকার ফলে, ব্যবসাটি বংশগত হওয়ার জন্য তাঁরা অন্য বৃত্তিতে যেতেও পারছেন না। তাছাড়া সরকার বেকার স্বর্ণশিল্পীদের জন্যে ঢাকঢোল পিটিয়ে বিকল্প কর্মসংস্থানের কথা বললেও কার্যকরী কিছুই করেন নি। স্ত্রী-পুত্র পরিবারের মুখে দিনের পর দিন ক্ষুধার অন্ন জোটাতে না পেরে সারা ভারতে ২৫০ জনেরও বেশি স্বর্ণশিল্পী আত্মহত্যার পথ বেছে নিতে বাধ্য হয়েছেন। এভাবে অমূল্য জীবনের অপচয় ঘটিয়ে সরকার কিভাবে স্বর্ণ সঞ্চয় করবেন তা আমার জানা নেই।

বস্তুত সরকারের অনেক নীতির মতোই এই স্বর্ণনীতিও ভ্রান্ত। এবং ভ্রান্ত বলেই দেশের চার প্রান্ত থেকে দাবি উঠেছে স্বর্ণ নিয়ন্ত্রণ আইন প্রত্যাহারের জন্যে। কিন্তু সরকারের আবার আজকাল টনক নড়ে না শুধু কথায়, প্রত্যক্ষ আন্দোলন ছাড়া অন্য ভাষা সরকার বোঝেন না। তাই স্বর্ণশিল্পীরা, শত শত মহিলা রাজপথে, রাজভবনের সামনে অবস্থান ধর্মঘট করেছেন, রাজ্যপালের কাছে স্মারকলিপি দিয়েছেন তিনি যেন কেন্দ্রীয় সরকারের ওপর তাঁর প্রভাব বিস্তার করতে পারেন। গণ-অনশন সুরু করেছেন তাঁরা, হয়তো সরকারী অনমনীয় মনোভাবের সঙ্গে মোকাবিলা করার জন্যে অন্য পন্থার কথাও হয়তো চিন্তা করেছেন তাঁরা। সরকারের পক্ষ থেকে অবশ্য স্বর্ণ নিয়ন্ত্রণ আইনটি নতুন করে বিবেচনা করে দেখার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। শ্রীশচীন চৌধুরীর মত একজন বাঙালী অর্থমন্ত্রীর পদ পেলে স্বর্ণশিল্পীরা তাঁর কাছে সুবিচারের আশা করেছিলেন। এখন তিনজন সদস্যবিশিষ্ট যে বিশেষজ্ঞ কমিশন গঠিত হয়েছে তার রায় যদি স্বর্ণশিল্পীদের অনুকূলে না যায়, তবে দেশের অন্যত্র যে ধরণের আন্দোলন চলছে স্বর্ণশিল্পীরাও সে স্বর্ণপথ ধরবেন কি না তা ভেবে দেখবেন।

স্বর্ণশিল্পীরা আইন অমান্য করছে

গ্রন্থমেলা

বাংলার পল্লীগীতি—চিত্তরঞ্জন দেব
পরিবেশক ঃ ন্যাশনাল বুক এজেন্সী। ১২, বঙ্কিম চাটুজ্যে স্ট্রীট, কলিকাতা-১২। মূল্য ঃ আট টাকা।

বাংলার প্রাণের সুর পল্লীগীতির মধ্যেই প্রবাহিত। আমরা একালে যে গল্প উপন্যাস বা কবিতা পড়ি, তাকে শহুরে সাহিত্যই বলা যায়। এতে যতোটা চমক আছে, ততোখানি চমৎকারিত্ব নেই। চমৎকারিত্ব আছে পল্লীগীতিতে। রবীন্দ্রনাথ পল্লীগীতির দ্বারা এমনভাবে আবিষ্ট হয়েছিলেন যে, কোনো কোনো পল্লীগীতিকে নতুন রূপে ও নতুন ভাবনায় ঋদ্ধ করে প্রকাশ করেছিলেন। প্রসঙ্গত, "ঢাকীরা ঢাক বাজায় খালে বিলে" ছড়াটি স্মরণীয়। আবার রবীন্দ্রনাথই আমাদের মনকে পল্লীগীতির দিকে আকৃষ্ট করে গেছেন। পরে আমরা অনেককেই পেয়েছি। পল্লীগীতিগুলি সংগ্রহ করার পর বাংলা সাহিত্যই শুধু সমৃদ্ধ হয় নি, বাংলা দেশের সামাজিক ইতিহাস পুনরাবিষ্কৃত হয়েছে। না জানি এখনো কতো পল্লীগীতি সংগ্রহ করা সম্ভব হয় নি। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছিটে-ফোঁটা সাহায্যেই ডক্টর আশুতোষ ভট্টাচার্য এই ব্যাপারে অসাধারণ কাজ করেছেন। বিশ্ববিদ্যালয় ও বাংলা সরকারের এ ব্যাপারে আরো সচেষ্ট হওয়া দরকার। ভারত সরকারের পক্ষেও নির্বিকার থাকার কোনো কারণ নেই। যা হোক উপর্যুক্ত গ্রন্থটির প্রকাশনার ব্যাপারে লেখক সরকারী আর্থিক সাহায্য পেয়েছিলেন। এই সাহায্য যথেষ্ট নয়। অবিলম্বে অসংগৃহীত পল্লীগীতি-উদ্ধারের ব্যবস্থা করা দরকার। নচেৎ ঐসব গীতি শহুরে আবহাওয়ার দ্রুত অনুপ্রবেশের ফলে অচিরাৎ হারিয়ে যাওয়া অসম্ভব নয়।

শ্রীচিত্তরঞ্জন দেব স্বকীয় চেষ্টায় বহুদিন আগে থেকেই পল্লীগীতি সংগ্রহের কাজে নিযুক্ত আছেন। এটা তাঁর পেশা কি না জানি না। তবে এ ধরণের কষ্টকর নেশা যাঁর থাকে, তিনি সত্য সত্যই বাংলাদেশ ও বাংলা ভাষাকে-ভালোবাসেন। হৃদয় দিয়ে ভাল না বাসলে এমন কঠিন কাজে কে আত্মনিয়োগ করে? আর, কজনই বা এমন করেছে? শ্রীদেবের অন্য প্রকাশিত গ্রন্থ হচ্ছে "পল্লীগীতি ও পূর্ববঙ্গ।" বর্তমান আলোচ্য গ্রন্থটিতেও শ্রীদেবের অসাধ্য প্রয়াস লক্ষণীয়। তিনি শুধু সংগ্রহই করেন নি। সংগ্রহ করার পর বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গীতে গীতিগুলিকে এক একটি বিভাগের অন্তর্ভুক্ত করে তাদের কাব্যমূল্য, ঐতিহাসিকতা, আঞ্চলিক বৈশিষ্ট্যের বিচার করেছেন। এছাড়া, গীতিগুলি কিভাবে সমাজজীবনের কথা প্রকাশ করতে পেরেছে সংগ্রাহক তারও বিচার বিশ্লেষণ করেছেন। ৫৪২ পৃষ্ঠার এই গ্রন্থটি মোট পাঁচটি খণ্ডে বিভক্ত। প্রথম খণ্ডে "লৌকিক ধর্ম-উৎসব ও অনুষ্ঠান" (যথা, গম্ভীরা, গমীরা, গাজন নীল, মেছেনীর গান, ঝাপান ও ভাসান, জারি, আগমনী ও বিজয়া পৌষ উৎসব ইত্যাদি), দ্বিতীয় খণ্ডে "বহিঃপ্রকৃতি" (যথা, ভাওয়াইয়া, দেহতত্ত্ব, সারি ও ভাটিয়ালী, সাঁওতালী, পালাগান, কবিগান ইত্যাদি) তৃতীয় খণ্ডে "অন্তর ধর্ম" (যেমন, বাউল, কীর্তন ইত্যাদি) চতুর্থ খণ্ডে "সাময়িক গীতি (যথা, দেশাত্মবোধক ও স্বদেশী গান, যন্ত্রশিল্প বনাম কুটিরশিল্প ইত্যাদি) পঞ্চম খণ্ডে "ছড়া ও প্রবচন।" এছাড়া আছে ধাঁধা, ঠারের কথা, বাংলার লোকবাদ্য, বাংলার লোকনৃত্য। সংগ্রহ কার্যেই শ্রীদেব শুধু অমানুষিক পরিশ্রম করেন নি, সংগ্রহ করার পর সেগুলি পাঠকদের কাছে যেভাবে তুলে ধরেছেন তদ্দ্বারা তিনি অবশ্যই প্রশংসার দাবি করতে পারেন। সব চেয়ে বড় কথা অযথা তত্ত্বের দ্বারা সরল পল্লীগীতিগুলিকে তিনি কোথাও ভারাক্রান্ত করে তোলেন নি। শব্দ প্রয়োগে শ্রীদেব কোথাও কোথাও অমনোযোগী হয়েছেন। তাই ব্যাকরণ-দুষ্ট 'উৎকর্ষতা' 'অনেকগুলি' ব্যবহার করা উচিত হয় নি।

জয়ন্তী সেন

বেঙ্গলী লিটারেচার—সম্পাদক ঃ আশিস সান্যাল। ৫৩ বিধান পল্লী, যাদবপুর, কলিকাতা-৩২। মূল্য ঃ এক টাকা পঞ্চাশ পয়সা।

বাংলা ভাষায় রচিত হয়ে আসছে যে সমৃদ্ধ সাহিত্য—দেশবিদেশের অবাঙালী পাঠক তার খবর কতটুকু পান —এ প্রশ্ন স্বাধীন ভারতে জাগা অস্বাভাবিক নয়। কেন্দ্রীয় সরকার ত' হিন্দী নিয়েই মাতোয়ারা, পশ্চিমবঙ্গ সরকারের আঠারো মাসে বছর, আর সাহিত্য আকাদেমি অকাজের কাজী। সুতরাং সমৃদ্ধ ভাষা হয়েও বাংলা-সাহিত্য আজ বড়ই বিপন্ন। তাই তার খবর বিশ্বের গুণিজনের গোচরে আনা অবশ্যই প্রয়োজন। সেই প্রয়োজন সাধনের উদ্দেশ্যে ইংরেজী ভাষায় প্রকাশিত হয়েছে ত্রৈমাসিক সাহিত্য পত্রিকারূপে 'বেঙ্গলী লিটারেচার'। এতে আছে এবং নিয়মিত থাকবে বাংলা থেকে ইংরেজীতে অনূদিত গল্প, কবিতা ও প্রবন্ধ। বাংলা সাহিত্য সংক্রান্ত মৌলিক ইংরেজী প্রবন্ধও এর উপজীব্য।

বলা বাহুল্য, এই জাতীয় কর্তব্য সম্পাদন করা কোনো সম্পাদকের পক্ষে এককভাবে সম্ভব নয়। প্রথম কথা হচ্ছে, পত্রিকাটিকে যথোচিত সাহসে সম্পাদক প্রথম প্রকাশ করলেও প্রতিটি বাঙালী লেখকের এর সঙ্গে যোগ রাখা দরকার। কোনো দল বা গোষ্ঠীর প্রভাব সম্পর্কে সম্পাদককে সতর্কও থাকতে হবে। আর, সত্যিকারের ভালো লেখা কোথাও বের হলে পাঠকদের

কর্তব্য হবে, সে বিষয়ে সম্পাদকের দৃষ্টি আকৃষ্ট করা। বর্তমান সংখ্যায় আছে একটি ছোটগল্প ও কুড়িটি কবিতার অনুবাদ। এ ছাড়া আছে কবিতা ও গল্প নিয়ে দুটি পৃথক প্রবন্ধ; সাহিত্য-সংবাদ বিভাগটি তেমন আকর্ষণীয় হয়ে ওঠে নি। মনে রাখা উচিত, এই সংবাদ নিজেদের স্বার্থে রচিত নয়। পুস্তক সমালোচনা বিভাগটি এমন হওয়া দরকার যাতে অবাঙালী পাঠক যে কোনো গ্রন্থ ও তার লেখক সম্পর্কে একটা মতামত গড়ে তুলতে পারেন। আমরা আশা করি, শ্রীসান্যালের সম্পাদনার গুণে পত্রিকাটি উত্তরোত্তর দেশবিদেশের গুণিজনের আগ্রহ সৃষ্টি করবে।

ওয়েস্ট বেংগল ইলেকসন—১৯৬২ ঃ অ্যান অ্যানালিসিস—আর, কে ভাসিল। ইনস্টিটিউট অফ পোলিটিক্যাল এণ্ড সোস্যাল স্টাডিজ, ৩৫৭—১ সি, প্রিন্স আনোয়ার শা রোড, কলিকাতা—৩১। দাম ঃ আট টাকা।

এই গ্রন্থটিতে বিগত দুইটি সাধারণ নির্বাচনের পরিপ্রেক্ষিতে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলগুলির অবস্থা নিখুঁতভাবে পর্যবেক্ষণ তথা সমীক্ষা করা হয়েছে। অসংখ্য তালিকা সহযোগে বিভিন্ন নির্বাচন কেন্দ্রে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের প্রাপ্ত মোট ভোট ও আসনের সংখ্যা, বিভিন্ন অঞ্চলে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের শক্তি ও দুর্বলতার পটভূমি, নির্বাচন যুদ্ধের কৌশল, সাফল্য ও ব্যর্থতার মূল কারণ প্রভৃতি বিষয় অত্যন্ত পরিশ্রমের সংগেই তথ্য সহকারে সন্নিবেশিত করা হয়েছে। প্রতিটি রাজনৈতিক কর্মীরই এই বইটি হাতের কাছে রাখা উচিত। রাষ্ট্র বিজ্ঞানের ছাত্রদের নিকটও বইটি উপকারে আসতে পারবে বলে মনে হয়। আমরা লেখকের সময়োচিত উদ্যমের প্রশংসা করি।

COURANT—Editor: Satya R. Biswas, Journalism Students' Association, Dept. of Journalism, Calcutta University. Price: Rs. 1.50.

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাংবাদিক ক্লাসের ছাত্রছাত্রীগণ কর্তৃক প্রকাশিত এই বিশেষ সংখ্যাটি শুধু রচনাগৌরবেই সমৃদ্ধ নয়, তবে ছাত্রছাত্রীদের বাস্তব বক্তব্য এই পত্রিকার মাধ্যমে মুখর হয়ে উঠেছে। ছাত্র হিসেবে কিংবা পাশ করার পর সংবাদপত্রের জগতে শিক্ষার্থীদের কি রকম দুরবস্থার সম্মুখীন হতে হয় তার বিশদ বর্ণনা দিয়েছেন সম্পাদক স্বয়ং। তিনি দুরবস্থার সম্মুখীন হবার কারণও সাহসের সংগে জানিয়েছেন। সত্যি কথা বলতে কি, এদেশের বহু সংবাদপত্রই পুঁজিপতিদের কুক্ষিগত—সুতরাং তারা ধামাধরা লোক ছাড়া যোগ্যতা-

---

সবিনয় নিবেদন

১৮ই আগস্ট '৬৩তে প্রকাশিত সম্পাদকীয়তে স্বাধীনতা লাভের যে আঠারো বছরের উল্লেখ করা হয়েছে, তা হবে উনিশ বছর। অনবধানতাবশতঃ এই ত্রুটির জন্য আমরা দুঃখিত। —সম্পাদিকা

সম্পন্ন সাংবাদিকদের নেবে কেন? আমরা মনে করি, এই অবস্থার অবসান যাতে হয়, তার জন্যে সামগ্রিকভাবে ছাত্ররাই এগিয়ে আসবেন। এগিয়ে আসা উচিত বুদ্ধিজীবীদের। পত্রিকাটিতে ইংরেজি ও বাংলা ভাষায় প্রবন্ধ লিখেছেন সর্বশ্রী দক্ষিণারঞ্জন বসু, মোহিতকুমার মৈত্র, চঞ্চল সরকার, সুনীতিকুমার মুখোপাধ্যায়, ভি গুর্গেনভ, অলোক গুহ, নীরোদ ভট্টাচার্য, অজিতকুমার দাস, শান্তিকুমার মিত্র, চণ্ডী লাহিড়ী, ইরা পাইন প্রমুখ লেখক, শিল্পী ও সাংবাদিক। উপর্যুক্ত প্রবন্ধকারগণ তাদের ক্ষুদ্রাকার প্রবন্ধে এক-একটি বড় সমস্যাকেই তুলে ধরেছেন এবং কেউ কেউ সেই সমস্যার সমাধানের পথেরও ইংগিত দান করেছেন। বিশেষত "সাংবাদিকতায় রবীন্দ্রনাথ", "সোভিয়েত প্রেস সম্বন্ধে কয়েকটি কথা" প্রভৃতি রচনা পাঠ করলে সতর্ক পাঠকদের চোখ খুলে যাবে; এবং সহজেই তাঁরা সাদৃশ্যমূলক তুলনা অনুমান করে বুঝতে পারবেন এই দেশে সংবাদপত্রের জগৎ কাদের ইংগিতে চলে। আমরা আশা করবো সাংবাদিক ছাত্রগণ যে চেষ্টার দ্বারা পত্রিকাটিকে আদর্শমণ্ডিত করে তুলেছেন—তা ব্যর্থ হবে না।

স্বরবর্ণ—সম্পাদক ঃ সমর বন্দ্যোপাধ্যায়। ১৬সি, শান্তি ঘোষ স্ট্রীট, কলিকাতা-৩। মূল্য ঃ এক টাকা।

বাংলা দেশে বাংলা ভাষায় এখনো পর্যন্ত "" বিন্দু নামে কোনো পত্রিকা বের হয়েছে কি না জানি না। তবে সেখানে পৌঁছতে আর বাকি নেই। এমন সময় সুরু থেকে 'স্বরবর্ণ' বেরু হতে দেখলে তাজ্জব বনে যেতে হয়। যা হোক সম্পাদকীয় মন্তব্যে কিছুটা আশ্বস্ত হলাম। মোট কথা, 'বলিষ্ঠ কণ্ঠস্বরের বর্ণস্বাক্ষর এই পত্রিকাটি জীবন-যন্ত্রণার কথা যেমন উচ্চারণ করবে, আবার তেমনি শিল্পধর্মের প্রতি সততাটুকুও রক্ষার চেষ্টা করবে।' বলা বাহুল্য, ঘোষিত নিয়মাবলী অনুযায়ী তা করা হবে তিন মাস অন্তর। বর্তমান সংখ্যাটি প্রথম বর্ষের অকৃত্রিম আদি সংখ্যা। এতে আছে প্রবন্ধ, কবিতা, গল্প, আলোচনা (সমাজচিন্তা, সংগীত, চলচ্চিত্র, চিত্র, সাহিত্য, ভাস্কর্য, পুস্তক)। বীরেন্দ্র মিত্রের 'মৃত্যুর দর্পণে মুখ' গল্পে তাঁর স্বকীয় রীতির সংগে বর্তমান গল্প লেখার শিল্পরীতির সমন্বয় লক্ষ্য করলাম। ভাগ্যের কথা, গল্পটিতে গল্প আছে। সিরাজ চৌধুরী ও সুখেন্দ্র ভট্টাচার্যের গল্প সুলিখিত তবে আরো সমাজধর্মী হলে পত্রিকার উদ্দেশ্য সার্থকতর হোত। সংগৃহীত প্রমথেশ বড়ুয়ার প্রবন্ধটিতে আছে সিনেমা ও সমাজের সংযোগের মূল্যবান কথা। অন্যান্য রচনা ও কবিতা লিখেছেন সুশান্ত দে ঘটক, প্রদ্যোৎ ঘোষ, রাম বসু, ধ্রুব গুপ্ত, চিত্তপ্রসাদ, সমর বন্দ্যোপাধ্যায়, রাম বন্দ্যোপাধ্যায়, নারায়ণ হালদার প্রভৃতি।

বঙ্গদর্শন

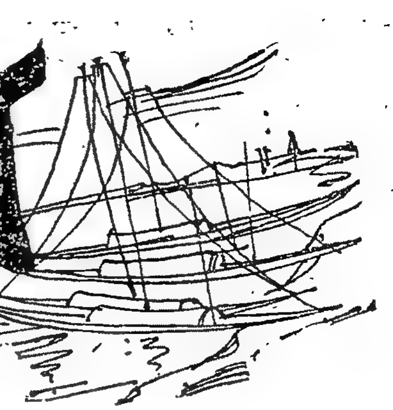

চটশিল্পে সঙ্কট

ভারতবর্ষের পাট ও পাটশিল্পই বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনের একটি প্রধান অবলম্বন। কিন্তু যে গরু দুধ দেয় তার দিকে যতটা মনোযোগ দেওয়া উচিত তা বোধ হয় সরকারী বা বেসরকারী কোন তরফ থেকেই দেওয়া হয় না।

চটকলই বোধ হয় পশ্চিমবঙ্গের আদিমতম যন্ত্রশিল্প। সারা বাংলার (তদানীন্তন পূর্ব বাংলার) কৃষকের রক্ত জল-করা পরিশ্রমের ফল যে পাট, তা নামমাত্র মূল্যে কিনে হুগলী নদীর দুই তীরে অজস্র চটকল একদা চালিয়েছিল স্কচ সাহেবেরা, আর সেই পাটজাত সামগ্রী বিক্রি করে মুনাফা কামিয়েছিল কোটি কোটি টাকা। এখন অবশ্য স্কচ সাহেবদের সেদিন আর নেই, তারা বেশির ভাগই পাততাড়ি গুটিয়েছে, তার জায়গায় জেঁকে বসেছে মারোয়াড়ী।

হুগলী নদীর দুই তীরে অজস্র পাটকলের শ্রমের-যোগান আসত বিহার ও উত্তরপ্রদেশ থেকে, নামমাত্র মূল্যে শ্রমিকের শ্রম কেনা যেত। নারী ও শিশুকে নির্বিচারে কারখানার কাজে লাগানো হত, ফ্যাক্টরী আইনের কোন ধারাই মানা হত না। অত্যল্প মূল্যে কেনা এই দেহাতী শ্রমজীবীর দল কোন গতিকে কায়ক্লেশে জীবনধারণ করত (এখনো করে) কারখানার আশেপাশের বস্তীতে, পঙ্কিল কদর্য পরিবেশে। দেশ স্বাধীন হবার পরেও আজও পর্যন্ত এ ট্রাডিশনের কোন পরিবর্তন হয় নি। আজও চটকল সন্নিহিত বস্তীর দুর্গন্ধ পথচারীকে নাকে কাপড় দিতে বাধ্য করে।

দেশ স্বাধীন হবার পরেও চটকলের নতুন মালিকদের দৃষ্টিভঙ্গীর কোন পরিবর্তন হয় নি। ফ্যাক্টরী আইন আজও বোধ হয় এই শিল্পে প্রযুক্ত নয়, যদিও এই শিল্প ভারতের বহু আকাঙ্ক্ষিত বৈদেশিক মুদ্রার অন্যতম প্রধান যোগানদার। এত অল্প বেতনের হার পৃথিবীর আর কোন শ্রমশিল্পে আছে কিনা জানি না। কিছুকাল আগে পর্যন্ত এই শিল্পে শ্রমিকদের ট্রেড ইউনিয়ন গড়ে তোলা অসম্ভব ব্যাপার ছিল, তার কারণ চটকল মালিকদের একাত্মতা। একই ম্যানেজিং এজেন্টের অধীনে থাকার দরুন চটকল শ্রমিকদের ধর্মঘট প্রভৃতি প্রচেষ্টার সার্থকতা ছিল সুদূরপরাহত, কেন না একটি ফ্যাক্টরীতে লক-আউট ঘোষিত হলে তার উৎপাদনের কোটা অপরাপর চটকলগুলির দ্বারা পূর্ণ হত। এ সব কাহিনী খুব বেশিদিনের পুরনো নয়।

পূর্ব-পাকিস্তান ভারত থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবার পরেও কাঁচামালের অভাবে চটকলগুলিকে বিশেষ ঝামেলায় পড়তে হয় নি। বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনকারী এই শিল্পটির প্রতি সরকারের আন্তরিক দুর্বলতা ছিল, তাই পশ্চিমবঙ্গের উর্বর ধানজমিগুলিকে রাতারাতি পাট চাষের জন্য নির্দিষ্ট করা হল, ধানের উৎপাদন চুলোয় যাক আপত্তি নেই, তার জায়গায় পাটের চাষ শুরু হল। মোটামুটি পাট উৎপাদনে আমাদের দেশ প্রায় স্বয়ংসম্পূর্ণ বলেই আমাদের বিশ্বাস।

কিন্তু চটকল শ্রমিকদের মূল্যবান শ্রম নামমাত্র মূল্যে কিনে নিয়ে পর্বতপ্রমাণ মুনাফা করেও পাটকল মালিকদের তৃষ্ণার শান্তি হয় নি। তারা চায় আরও বেশি লাভ, কাজেই তার জন্য আর এক অভিনব দাওয়াই বেরুল যার নাম র‍্যাশনালাইজেশন। নতুন নতুন যন্ত্রপাতি বসাবার পরিকল্পনা হল, আগে দশজন শ্রমিকে যে কাজ করত, এই সব নতুন যন্ত্রে সেই কাজ একজনকে দিয়েই হবে। তা নিয়ে কিছুটা হৈ-চৈ মাত্র হয়েছিল, আর কিছু নয়। নিঃশব্দে কত লোকের রুজি যে মারা পড়েছে তার অবশ্য কোন হিসাব পাওয়া যায় নি, হয়ত পাওয়াও বর্তমানে আর সম্ভব নয়।

সম্প্রতি আবার চটকল মালিকেরা নতুন উপদ্রব শুরু করেছে যার ফলে হাজার হাজার শ্রমিকের অন্ন মারা যেতে চলেছে। সংবাদে প্রকাশ যে, এরা শতকরা পনের ভাগ তাঁত বন্ধ করে দিয়েছে। এই বন্ধ করার তেমন কোন সন্তোষজনক কারণ চটকলওয়ালারা দেয় নি। মামুলি অজুহাত কিছু অবশ্য আছে, যেমন ডিভ্যালুয়েশন ইত্যাদি। আজকাল সব শেয়ালেরই এক রা। বাঁধা বুলিই হচ্ছে ডিভ্যালুয়েশন! আরও একটি উৎপাদকের তরফ থেকে যত্রতত্র শোনা যায়, বিশ বছর ধরে শুনে আসছি, সেলস্-ট্যাক্স। এবং সেই ট্যাক্সটা যে বাস্তবে ক্রেতার পকেট থেকেই যায়, উৎপাদকদের সোনার দেহে তার ছোঁয়াটি লাগে না, এ তত্ত্বটি কিন্তু বেমালুম চেপে যাওয়া হয়।

আসল কথায় আবার ফিরে আসা যাক। এই পনের ভাগ তাঁত বন্ধ হবার ফলে সারা পশ্চিমবঙ্গে বেকারের সংখ্যা কত বাড়বে সে হিসেবটা এই মুহূর্তে দেওয়া সম্ভবপর নয়। তবে আমার চোখের সামনে যা পড়েছে, এই গত ১লা আগস্ট গৌরীপুর ও নদীয়া মিল থেকেই শত শত শ্রমিক ছাঁটাই হয়েছে। এই হিসাবে সারা বাংলাদেশে চটশিল্পে নিযুক্ত কত শ্রমিক যে ছাঁটাই হয়েছে এবং আরও কত যে হবে, তার ইয়ত্তা নেই।

এ বিষয়ে কি পশ্চিমবঙ্গ সরকার শুধুমাত্র উদ্বেগ প্রকাশ করেই ক্ষান্ত থাকবেন? তাঁদের কি কিছুই করণীয় নেই?

ব্যাটারী সঙ্কট

শহরের লোক, বিশেষ করে কলকাতা শহরের লোক, এই বস্তুটির

গুরুত্ব সহজে বুঝতে চাইবেন না। পশ্চিমবঙ্গের মফস্বল ও পল্লীগ্রামে বিদ্যুৎশক্তির ব্যবহারের সুযোগ খুবই অল্প। রাত্রিতে ঘরের জন্য কেরোসিনের হ্যারিকেন এবং রাস্তায় বেরুবার জন্য টর্চলাইটের একান্তই প্রয়োজন। বাংলাদেশের প্রতিটি পল্লীতেই সন্ধ্যার পর সূচীভেদ্য অন্ধকার, রাস্তায় কোন আলো নেই, তেমন রাস্তাও নেই। অথচ বাইরে যাবার প্রয়োজন প্রত্যেকেরই। এবং সেই কারণেই টর্চ-লাইটই একমাত্র অবলম্বন।

অথচ যাতে এই টর্চলাইট জ্বলে সেই ব্যাটারী নিয়ে যেন সঙ্কটের শেষ নেই। বছরের পর বছর খোলাবাজারে ন্যায্য দামে ব্যাটারী পাবার উপায় নেই। তা পেতে হলে যেতে হবে কালোবাজারে, যেখানে একজোড়া ব্যাটারীর দাম আড়াই টাকা থেকে তিন টাকা।

বিশ্বাস করার সঙ্গত কারণ আছে যে, ব্যাটারীর এই কৃত্রিম অভাব সৃষ্টির জন্য এভারেডী ব্যাটারীর উৎপাদক কোম্পানী, ওই ব্যাটারীর এজেন্টবৃন্দ এবং খুচরো দোকানদারদের প্রত্যক্ষ দায়িত্ব আছে। আমার নিজের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা থেকেই একথা বলছি।

আমার নিজের একজোড়া ব্যাটারীর প্রয়োজন ছিল। আমি যে শহরে বাস করি, সেখানে শতাধিক স্টেশনারী দোকানের মধ্যে মাত্র একটি দোকানে পুরনো ব্যাটারী জমা দিলে ন্যায্য দামে নতুন ব্যাটারী পাওয়া যায়, এমন খবর পেয়েছিলাম। কিন্তু অধিকতর অনুসন্ধানে জানা গেল যে, সেভাবে কেনবার সুযোগের অধিকারী মাত্র মুষ্টিমেয় ক'জন ভাগ্যবান, যারা দোকানদারের হয় পেয়ারের লোক, না হয় সেই জাতীয় লোক যাদের খাতির করাটা দোকানদারের পক্ষে প্রয়োজনীয়, যথা বড় বড় সরকারী কর্মচারী, পুলিশ ইত্যাদি। আমাদের মত রামা-শ্যামাকে কিনতে হবে বেশি দাম দিয়ে। শহরের সব দোকানেই ব্যাটারী আছে, কিন্তু মূল্য আসল মূল্যের দ্বিগুণ। অগত্যা ন্যায্যমূল্যে ব্যাটারী সংগ্রহের আশা আমাকে ত্যাগ করতে হল।

একটি দিন পুরো ব্যয়িত হল ব্যাটারীতত্ত্বের মহিমা বুঝতে। এভারেডী ছাড়াও অন্য ব্যাটারী আছে, অথচ কোন দোকানদার তা রাখবে না। অন্য একটি কোম্পানীর এজেন্টকে সেইদিনই দোকানে দোকানে ফেরি করতে দেখেছিলাম, কিন্তু কোন দোকানদারই তা রাখল না। সেই ভদ্রলোকের মুখে শুনলাম যে, যদি দোকানদারেরা পাঁচ সিকের মাল আড়াই টাকায় বিক্রি করার সুযোগ পায়, তা হলে কেন অন্য কোম্পানীর মাল তারা রাখবে?

সেই ভদ্রলোকের কৃপায় আমার প্রয়োজনীয় ব্যাটারী পেলাম, এভারেডী নয়, কিন্তু তাতে কাজের কোন অসুবিধা নেই। গুণের দিক থেকে ভাল বই মন্দ মনে হল না।

তাহলে ব্যাপারটা দাঁড়াচ্ছে কি? ব্যাটারীর অভাব নেই (এভারেডীরও নয়, কেন না তা সব দোকানেই পাওয়া যায়, তবে পেতে গেলে দাম লাগে দ্বিগুণের বেশি, আমার নিজের অভিজ্ঞতা থেকে যা বুঝলাম, প্রতিটি স্টেশনারী দোকানদার "ইনভেরিয়েবলি" ব্ল্যাকমার্কেট করে), **ব্যাটারীর প্রস্তুতকারকেরও অভাব হয়ত নেই, অথচ একটি বিশেষ কোম্পানী খুচরো দোকানদারদের ব্ল্যাকমার্কেট করার মত অফুরন্ত সুযোগের ঘুষ দিয়ে এমনভাবে করায়ত্ত করে রেখেছে যে, অন্য কোম্পানীর অনুপ্রবেশও রীতিমত কঠিন ব্যাপার এই শ্রীক্ষেত্রে। কোন সভ্য সমাজে যে এইরকম একটা নোংরা ব্যাপার দিনের পর দিন চলতে পারে, তা কল্পনাতেও আনা যায় না, অথচ এদেশে তা দিনের পর দিন চলছে।**

দুর্গাপুর ও ঘাটালের কথা

গত ২২শে শ্রাবণ কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের তিরোধান দিবসে সংবাদপত্রের পাতা খুলেই দুটি গুলী চালানোর সংবাদ পাওয়া গেল, একটি দুর্গাপুরে, অপরটি ঘাটালে। পুলিশ উভয় স্থানেই গুলীবর্ষণ করেছে। পরদিন আবার সংবাদ পাওয়া গেল, কাশীপুরে গুলী চলেছে।

এই গুলীচালনার ঘটনাবলী থেকে একটি বিষয় পরিস্ফুট হয়ে উঠেছে যে, সরকারের প্রশাসনিক কর্তারা মানসিক ভারসাম্য হারিয়ে ফেলেছেন। গুলী চালানোর মূলেই আছে হত্যা করার প্রবৃত্তি এবং হত্যাই যখন সমস্যা সমাধানের একমাত্র উপায় হয়ে দাঁড়ায় তখন তাকে বিকৃত মানসিকতা ভিন্ন আর কোন আখ্যা দেওয়া যায় না। সেক্সপীয়রের ম্যাকবেথের কাহিনী স্মরণ করুন।

দেশের হাওয়ায় আজ একটা উৎপীড়ন চলছে। তার ভঙ্গীটা হচ্ছে, 'কোন প্রশ্ন তুল না। যা বলছি, তা মেনে নাও। প্রতিবাদ কর না, বিক্ষোভ জানিও না। আমরা একালের দেবতা, বরং পুজো করে, স্তব-স্তুতি করে, আমাদের করুণা উদ্রেকের চেষ্টা কর। তা যদি না করে দেবতার ইচ্ছায় বাধা দাও, তাহলে তাদের রোষ বজ্রের আকারে (একালে অবশ্য গুলীর আকারে) নেমে আসবে।'

এই নতুন দেবতাশ্রেণী কারা? একালের যারা রুলিং ক্লাস, সমাজের সেই অংশ, যাদের ইংরাজীতে বলে ব্যুরোক্রাট, বাংলায় আমলাতান্ত্রিক গোষ্ঠী। বৃটিশ সরকার নিজেদের শাসন ও শোষণ অব্যাহত রাখার জন্য সারা দেশের জনসমাজের একটা অংশকে নিজেদের পোষ্যপুত্র বানিয়ে তাদের দিয়েই দেশের লোককে হাতে এবং ভাতে মেরেছে। সাধারণের থেকে পৃথক পরিবেশে দেশের এই হৃদয়হীন রোবট শ্রেণীকে তারা সযত্নে পুষে রেখেছিল।

এই আমলাতান্ত্রিক শ্রেণীটির সমূল উৎপাটন যিনি চেয়েছিলেন, তিনি হচ্ছেন মহাত্মা গান্ধী। গান্ধীজীর দৈহিক হত্যার চেয়ে গান্ধী-মানসের হত্যা আরও বেশি অপরাধমূলক। তাঁর স্বপ্নের জনতারাজের জায়গায় আজ দেশজোড়া সৃষ্টি হয়েছে এক আজব আমলাতন্ত্র, বৃটিশ যুগে ইংরেজ শাসকদের হুকুম তামিলকারীরা আজ দেশের ভালমন্দের একমাত্র জিম্মাদার। বুফে ডিনার, ককটেল পার্টি আর নাইট ক্লাবের আবহাওয়ায় এরা গড়ে তোলে দেশোদ্ধারের পরিকল্পনা। দেশের নাড়ীর সঙ্গে যোগাযোগবিহীন এই আমলাতান্ত্রিক শ্রেণীটির উত্তরোত্তর শ্রীবৃদ্ধি ঘটছে। একজন বি ডি ও পর্যন্ত মনে করে যে, সে বাদশা আলমগীরের ভায়রাভাই। বেসরকারী প্রতিষ্ঠানসমূহের উচ্চপদস্থ কর্মচারীরাও ঐ একই আমলাতান্ত্রিক মেজাজের শরিক।

এই প্রচ্ছদে এবার দুর্গাপুরের ঘটনাটির বিচার করা যাক। মূল বিষয়টি একটি শ্রমবিরোধের বিষয়। ইস্পাত কারখানার কর্মীরা তাঁদের দাবিদাওয়া সম্বলিত একটি স্মারকলিপি জেনারেল ম্যানেজারের কাছে পেশ করতে চেয়েছিলেন এবং তাঁদের কয়েকজন প্রতিনিধি জেনারেল ম্যানেজারের সঙ্গে দেখা করতে চেয়েছিলেন। দাবিদাওয়া পেশ করার অধিকার নিশ্চয়ই সংবিধানবিরোধী নয়, কাজেই ইস্পাতকর্মীরা কোন বে-আইনী কাজ করেন নি।

কিন্তু বোধ হয় ইস্পাতকর্মীরা একটা জিনিস ভুলে গেছলেন। তাঁরা ভুলে গেছলেন যে, স্বাধীন ভারতে তাঁদের অধিকারের সীমা কতটুকু,

ভুলে গেছলেন যে, বৃটিশ আমলের সাহেবদের চেয়েও স্বদেশী ব্যুরোক্রাটরা ভারতের সাধারণ মানুষকে আরও বেশি ঘৃণা করে। গান্ধীজী দেশের চিরাচরিত অস্পৃশ্যতা দূর করতে চেয়েছিলেন, কিন্তু স্বাধীন ভারতে আর একটি নতুন ধরণের অস্পৃশ্যতা প্রচলিত হয়েছে, যা মহাত্মার কল্পনার বাইরে ছিল। মনে পড়ে মানবেন্দ্রনাথ রায় একবার বলেছিলেন, ইউ ক্যান ফাইট উইথ হোয়াইট ব্যুরোক্রাসী, বাট ইউ কান্ট ফাইট উইথ ব্রাউন ব্যুরোক্রাসী বিকজ ইট ইজ ইয়োর ইন্টার্নাল এনিমি। অর্থাৎ সাদা আমলাতন্ত্রের সঙ্গে লড়াই চলতে পারে, কিন্তু বাদামী আমলাতন্ত্রের সঙ্গে তা চলা দুষ্কর, কেন না তা বর্ণচোরা শত্রু। একথা রায় বলেছিলেন বৃটিশ যুগে।

দুর্গাপুর কারখানার কর্তাব্যক্তিরা ইস্পাত কর্মীদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে রাজী হলেন না কিন্তু কর্মীরাও নাছোড়বান্দা, তাঁরাও দেখা না করে ছাড়বেন না। কাজেই লাঠি চলল, টিয়ার গ্যাস চলল, গুলী চলল, বিনষ্ট হল দুটি অমূল্য প্রাণ।

ঘাটালের ঘটনাটিও সেই একই মনোভাবের অভিব্যক্তি। এক্ষেত্রে জনসাধারণের অপরাধ ছিল যে, তাঁরা সরকারী কর্মচারীরা যে পরিমাণ চাল দোকান থেকে পাচ্ছিলেন, সেই পরিমাণ চাল দাবি করেছিলেন। এ যেন শূদ্রের বেদ পাঠের দাবি! আর তারই পরিণামে শেষ পর্যন্ত ঢালাও বন্দুকবাজির ব্যবস্থা।

গণতন্ত্রের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে মুসোলিনী লিঙ্কন প্রদত্ত সংজ্ঞাটির একটু হেরফের ঘটিয়েছিলেন। লিঙ্কন বলেছিলেন, গণতন্ত্র বলতে বোঝায় জনগণের জন্য, জনগণের দ্বারা, জনগণের সরকার। আর মুসোলিনীর সংজ্ঞায় গণতন্ত্র হচ্ছে জনগণের জন্য, কিন্তু জনগণের ওপরে, এবং যদি প্রয়োজন হয় জনগণের বিরুদ্ধেও। সরকারী আমলারা বোধ হয় মুসোলিনীর এই সংজ্ঞাটিই মর্মে মর্মে গ্রহণ করেছেন।

খাদ্য-নীতির পরিবর্তন

অবশেষে পশ্চিমবঙ্গ সরকার খাদ্যনীতি পরিবর্তনের কথা চিন্তা করছেন। রাজ্য মন্ত্রিসভা খাদ্যশস্যের পাইকারী ব্যবসা কেন্দ্রীয় খাদ্যশস্য কর্পোরেশনের হাতে তুলে দেবার সিদ্ধান্ত করেছেন। এই সিদ্ধান্তের ফলে খাদ্যদপ্তর ১৯৬২ সালের নীতিতে ফিরে যাচ্ছেন। অতঃপর লেভি ও কর্ডন তুলে নেওয়া হবে, খোলাবাজার থেকেই চাল সংগ্রহ করা হবে, যদিও রেশন ব্যবস্থা পূর্বের মতই অটুট থাকবে। বলা হচ্ছে যে, ধান-চালের পাইকারী ব্যবসায়ে ব্যবসায়ীরা আর ফিরে আসতে পারবে না।

বলতে নেই, লেভি ও কর্ডনের কৃপায় সারা পশ্চিমবঙ্গের গ্রামাঞ্চলের মানুষদের স্মাগলার বানানো হয়েছে, অল্পবয়সী বালকদের দুর্নীতির পথে জোর করে ঠেলে দেওয়া হয়েছে। গত এক বছরে বে-আইনী কর্মে তারা যে পাঠ নিয়েছে তার কুফল আগামী একশো বছর জাতির জীবনে প্রতিফলিত হবে।

আপাতদৃষ্টিতে সরকারের এই সিদ্ধান্তটিকে নির্দোষ মনে হলেও, একটু ভেবে দেখলে মনে হবে যে, এ ব্যবসায় পশ্চিমবঙ্গের খাদ্য-সমস্যার সমাধান হবে না, জনসাধারণকে তপ্ত কড়া থেকে জ্বলন্ত চুল্লীতে নিক্ষেপ করা হবে মাত্র। কেন না, কেন্দ্রীয় খাদ্যশস্য কর্পোরেশনের সম্বন্ধে আশাবাদী হবার কোন কারণ নেই। এদের কার্যকলাপ কয়েক বছর ধরেই লক্ষ্য করা গেছে, এক কথায় যাকে বলা যায় রাবিশ।

যাঁরা বঙ্গদর্শনের পাতাগুলি নিয়মিত পড়েন, তাঁরা বোধ হয় লক্ষ্য করে থাকবেন যে, নীতিগতভাবে আমরা পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রীর খাদ্যনীতির প্রতি বিমুখ নই। আমাদের সমালোচনা মূলত খাদ্যনীতির টেকনিক্যাল ত্রুটি-বিচ্যুতিগুলিকে নিয়েই। আমরা এতাবৎকাল যা বলে এসেছি, এখানে সংক্ষেপে তার কিছুটা পুনরুল্লেখ করছি, এবং কতকগুলি প্রস্তাব রাখছি যেগুলির দিকে সরকারের দৃষ্টি আকৃষ্ট হবার প্রয়োজনীয়তা আছে বলে আমরা মনে করি।

যাঁরা বলেন, কন্ট্রোলের অবসান হোক, আবার খোলাবাজার চালু হোক তাঁরা মূর্খের স্বর্গরাজ্যে বাস করছেন, কেন না দু বছর আগেও কন্ট্রোল ছিল না খোলাবাজার ছিল, কিন্তু ব্যবসায়ীদের কেরামতিতে সকল ধান-চাল বাজার থেকে অদৃশ্য হয়েছিল। খোলাবাজার চালু হলে লেভি ব্যবসায়ীর দল গলাকাটা দাম আদায় করবে এবং জনসাধারণ যদি সে দামে চাল কিনতে রাজী না হয়, যদি দমদম দাওয়াই প্রয়োগ করে, তাহলে মাছের মতই চাল বাজার থেকে অদৃশ্য হবে। চীন-ভারত সংঘর্ষের সময় যারা চীনে চাল পাঠাতে পারে তাদের পক্ষে সবই সম্ভব। অথচ এমনই মজা এদের গায়ে আঁচড়টি পর্যন্ত কাটতে পারা যায় না।

বর্তমান খাদ্যনীতিতে পুলিশ এবং হোমগার্ড দিয়ে চালের চোরাচালান যে বন্ধ করার চেষ্টা সরকার করছেন সেটাই ভ্রান্ত। অথচ সরকার যদি চোরাচালানের মূল কারণটি বন্ধ করার চেষ্টা করতেন তাহলে কোনই ঝামেলা হত না। চোরাচালান হয় কেন? রেশন এলাকায় যে চাল মাথাপিছু দেওয়া হয় তাতে কুলোয় না বলেই লোকে বাইরের থেকে চাল কেনে, কেন না, সবাই চালই খায়, মুখ্যমন্ত্রীর কথামত কাঁচকলা খায় না। এই চালের যোগান কোথা থেকে আসে? সহজ উত্তর—চোরাচালান। চোরাচালান বন্ধ হবে কিসে? সহজ উত্তর—যদি রেশনের বরাদ্দ বাড়িয়ে দেওয়া হয় তাহলে কারুরই বাইরে থেকে চাল কেনার দরকার নেই। বাইরে থেকে কারুর চাল কেনার দরকার না থাকলে কি হবে? সহজ উত্তর—চোরাইচালান বন্ধ হবে।

তাহলে রেশনের বরাদ্দ বাড়ানো দরকার। সরকার বলবেন, কোথা থেকে বাড়াবো? চাল কোথায়? চাল নিশ্চয়ই গ্রামে আছে নতুবা অফুরন্ত চোরাচালানের যোগান আসে কোথা থেকে? গ্রামের থেকে পর্যাপ্ত পরিমাণ চাল পাওয়া যাবে কিভাবে? সহজ উত্তর—ভাল দর দিলেই। যে দামে সরকার ধান কেনেন, তার চেয়ে আর একটু দাম বেশি দিলেই চাষী আগ্রহের সঙ্গে সরকারকে ধান বেচবে।

কিন্তু যারা বড় বড় জোতের মালিক তারা যদি তাদের চাল স্টক করে রাখে? এরও উত্তর সহজ। রেশনে যদি পর্যাপ্ত পরিমাণে চাল দেওয়া হয়, তাহলে চোরাচালানের প্রয়োজন থাকবে না। কাজেই জমানো চাল নিয়ে তারা করবে কি? তাদের মধ্যে অধিকাংশই বেশি ঝামেলা না বাড়িয়ে সরকারকেই বেচে দেবে। কিন্তু যারা অধিকতর দুঃসাহসী তারা তখন অন্য রাজ্যে চোরাচালান করতে শুরু করবে। এর প্রতিবিধান কি? ধানকলগুলির জাতীয়করণ। ঢেঁকি তো আগেই বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। বাছাধনদের ধান তো ভাঙাতে হবে। তখন যাবে কোথায়? এই সঙ্গে সীমান্তে কড়া পাহারার ব্যবস্থা করলে পশ্চিমবঙ্গের বাইরে ধান পাচার বন্ধ হবে। আর তাছাড়া বিহার উড়িষ্যার বাজার পশ্চিমবঙ্গের মত তেজী নয়।

খাদ্যশস্যের পাইকারী ব্যবসা কেন্দ্রীয় খাদ্যশস্য কর্পোরেশনের হাতে না দিয়ে পশ্চিমবঙ্গ সরকার তা নিজে

[illegible] রাখলেই ভাল হবে বলে আমাদের বিশ্বাস।

বিচিত্র সিদ্ধান্ত

সরকার স্থির করেছেন, তাঁরা ব্যয় সংকোচ করবেন, কাজেই ফতোয়া দিয়েছেন যে, অতঃপর সরকারী চাকুরীতে আর লোক নেওয়া হবে না। বিচিত্র সিদ্ধান্তই বটে, বিশেষ করে যে রাজ্যে বেকারের সংখ্যা সীমাহীন। সরকার কি এটা ভুলে গেছেন যে, দেশে পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা বলে একটা বস্তু চালু আছে যার তিনটে দফা শেষ হয়েছে এবং চতুর্থ দফা শুরু হয়েছে? সরকার কি এটা অবগত আছেন যে, প্রতিটি পরিকল্পনায় অধিকতর কর্ম-সংস্থানের একটা করে টার্গেট থাকে, অর্থাৎ বেকার সমস্যার সমাধানই পরিকল্পনার উদ্দেশ্য? তাহলে পশ্চিমবঙ্গ সরকার যে আর লোক নিয়োগ করবেন না বলে স্থির করেছেন সেটা কি খোদ রাষ্ট্রীয় নীতিরই বিরোধী হচ্ছে না? মানবিক দিক থেকে বিচার করলে বেকার সমস্যা সংকুল একটি রাজ্যে এটা কি খুব একটা অভিপ্রেত নীতি গ্রহণ করা হচ্ছে?

ব্যয় সংকোচের আরও অনেক রাস্তা আছে। সরকারের একদিনের অপব্যয় কত তা কি হিসাব করা হয়েছে? মন্ত্রী এবং ভি-আই-পিদের মোগলাই জীবনযাত্রায় অপব্যয় নেই? একটা ফিতে কাটার অনুষ্ঠানে কত অপব্যয় হয় তার হিসাব কি করা হয়েছে? মন্ত্রী এবং তস্য আমলাদের বিদেশ ভ্রমণ বাবদ প্রতি বছর কত টাকার শ্রাদ্ধ হয়? প্রতিটি সরকারী ভোজসভার ব্যয় কত? সরকারী গৃহ-সজ্জায় প্রতি বছর কত করে যায়? মন্ত্রীদের এয়ার কন্ডিশন্ড ঘরগুলির রক্ষণব্যয় কত? তাঁদের ব্যয় জোগাতে দেশবাসীর কতখানি পকেট কাটা যায়?

আসলে সরকারী কর্তারা আজ নিজেরাই একটা সুবিধাভোগী শ্রেণীতে পরিণত হয়েছেন এবং নিজেদের সুবিধাগুলির সূচ্যগ্র অংশ ত্যাগ করতে তাঁরা রাজী নন। কাজেই হাজার হাজার লোকের ভবিষ্যৎ কয়েক বছরের জন্য রুদ্ধ করে দিয়ে তাঁরা ব্যয়সংকোচ ও দেশপ্রেমের নমুনা দেখাতে চান। তা ছাড়া শুরু থেকে আজ পর্যন্ত যেখানে রাষ্ট্রনীতি ঋণং কৃত্বা ঘৃতং পিবেৎ নীতির দ্বারা চালিত হচ্ছে সেখানে অকস্মাৎ এই ব্যয়সংকোচের কথাটাই কেমন যেন খাপছাড়া শোনায়।

স্বাস্থ্যমন্ত্রীর প্রতি

অনুরাধা করানি তার নাম। পেশায় শিক্ষার্থী নার্স। বিধবা মায়ের বড় মেয়ে। গত ১০ই আগস্ট সে মারা গেছে মেডিক্যাল কলেজে একরকম বিনা চিকিৎসায়।

গত ফেব্রুয়ারী মাসে তার ডিপথিরিয়া হয়েছিল। তারপর থেকেই তার বুকে একটা অদ্ভুত ধরণের যন্ত্রণা হত। প্রায়ই তাকে সিক রিপোর্ট করতে হত। তার এই যন্ত্রণার কথা সে ডাক্তারদের জানিয়েছিল, কিন্তু ডাক্তাররা গ্রাহ্যই করেন নি। যন্ত্রণা-নাশক সাধারণ কোন মিক্শ্চার বা ট্যাবলেট খেয়েই তাকে থাকতে হত।

১০ই আগস্ট তারিখে সে এম-এল-শীল ওয়ার্ডে ডিউটিরত ছিল। বেলা ১০টার সময় তার বুকে বেদনা শুরু হয়। যন্ত্রণায় অস্থির হয়ে সে তখন ওয়ার্ড ছেড়ে নার্সদের কোয়ার্টারে চলে আসে। সেখানে ইউনিফর্ম ছেড়ে সে বাথরুমে যায় এবং সেখানেই সে অজ্ঞান হয়ে যায়।

সেই অবস্থায় বেলা সাড়ে দশটার সময় তাকে ইমার্জেন্সি ওয়ার্ডে নিয়ে আসা হয়। ভারপ্রাপ্ত চিকিৎসক বিষয়টিকে বিশেষ গ্রাহ্য করার প্রয়োজন বোধ করেন না। অবশেষে শেষ পর্যন্ত তাকে এজরা ওয়ার্ডে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। শেষ পর্যন্ত ধরা পড়ল যে কেসটি নাকি মাইওকার্ডিয়াল ইনফেকসন। অক্সিজেন দেওয়া শুরু হল। কিন্তু ততক্ষণে তার দুনিয়ার মেয়াদ ফুরিয়ে গেছে।

তার মৃত্যুর কারণ হচ্ছে নাকি কার্ডিও রেসপেরেটরি ফেলিওর ফলোইং অ্যাকিউট মাইওকার্ডিনাল ইনফেকসান। সে ছ'মাস ধরে চিকিৎসা চেয়েও পায় নি। তার বুকের মারাত্মক যন্ত্রণা সত্ত্বেও নাকি কোন ইলেক-ট্রোকার্ডিওগ্রাফ করা হয় নি। অথচ সে আগা-গোড়াই মেডিক্যাল কলেজের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট।

একে শুধুমাত্র কি ভাগ্যের পরিহাস বলে উড়িয়ে দেওয়া যায়? অনুসন্ধানে যা জানা গেছে, শিক্ষার্থী নার্স ইত্যাদি প্রোটো-মেডিক্যাল সার্ভিসে যাঁরাই আছেন, চিকিৎসার ক্ষেত্রে তাঁদের এই রকমই হৃদয়হীনতার সম্মুখীন হতে হয়। তাঁদের অপরাধ এই যে, তাঁরা মেডিক্যাল সার্ভিসের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট। অর্থাৎ নার্সদের অসুখ করতে নেই, অসুখ করলে চিকিৎসা পেতে নেই—এই জাতীয় মনোভাবেরই বলি-হয়েছে হতভাগিনী অনুরাধা করানি।

যাতে এই হৃদয়হীনতার পুনরাবৃত্তি না হয় তার জন্য স্বাস্থ্যমন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।

সংবাদ—মহীশূর সরকার কর্তৃক নীলামে বিক্রীত জিনিসের মধ্যে জাতীয় পতাকাও ছিল।

অনুশোচনা?

চৌম্বংলামার চোখে উত্তরবঙ্গ

(পূর্ব-প্রকাশিতের পর)

বিংশ শতাব্দীর মালদহ জেলাকে দেখতে হবে নানা দৃষ্টিকোণ থেকে। অবশ্যই প্রাচীন ইতিহাসের আলোতে এই বিশেষ জেলাকে বিচার করতে হলে যথেষ্ট সময়সাপেক্ষ। তবুও আধুনিক যন্ত্রবিজ্ঞানের যুগে এই জেলা বর্তমানে যে স্তরে এসে পৌঁছেছে— ইতিহাসের পশ্চাৎপট থেকে তাকে বিচ্ছিন্ন করে দেখলে চলে না।

গৌড়ে পালযুগ শেষ হয়ে যখন অন্য এক রাজবংশ প্রতিষ্ঠা হল—তখন থেকে তো বটেই, তার পূর্ব থেকেও গৌড়ে বহিরাগতদের আগমন অব্যাহত ছিল। অবশ্য সেটা সম্ভব হয়েছিল—পাল রাজন্যবৃন্দের রাজ্যবিস্তৃতির ফলে। সেই সুদূর অতীতে পাল রাজাগণের অধীনস্থ হয়ে এবং সখ্যতা-সূত্রে যে সব বহিরাগত এসে স্থায়িভাবে গৌড়ে বসবাস সুরু করেছিল—আজও তাদের ক্রমবিবর্তিত ধারাটি এই জেলাতে বহমান। অবশ্য সেই ক্ষীণ এবং প্রায় অবলুপ্ত ধারার উৎস-সন্ধান অনুসন্ধিৎসু ঐতিহাসিকের গবেষণার বিষয়। এই নিবন্ধে শুধুমাত্র জেলার সামগ্রিক সংস্কৃতির ক্ষেত্রে পরিচয়ের জন্য তার কিছু পরিমাণ আভাষ দেওয়া সম্ভব হবে মাত্র।

পালযুগ যখন শেষ হয়ে সেন রাজবংশ গৌড়ে প্রতিষ্ঠা লাভ করে—তখন বঙ্গদেশ এক নিদারুণ অরাজকতার সম্মুখীন। অত্যাচারী এবং অপরিণামদর্শী দ্বিতীয় মহীপাল থেকে পাল রাজবংশের পতন সুরু হয়। অবশ্য গণ-অভ্যুত্থান দমন করা সম্ভব হলেও—বহির্ভাগে আর পাল রাজাদের অধীনস্থ থাকতে চাইল না সামন্ত নৃপতিগণ। তখন অন্তর্দ্বন্দ্ব এত প্রবল যে বহির্রাজ্য সম্পর্কে আর চিন্তা করার সময় ছিল না। তখন শুধুমাত্র পতনকে রোধ করাই ছিল পাল রাজাদের একমাত্র কর্তব্য। আর এই সময়ে কর্ণাট থেকে সামন্ত সেন নামে একজন বিচক্ষণ ব্যক্তি গৌড়ে আসেন তাঁর অবসরজীবন অতিবাহিত করার জন্য। সামন্ত সেন নিঃসন্দেহে বিচক্ষণ ব্যক্তি ছিলেন। তিনি পালবংশের অবনতির বিষয় বুঝতে পেরেই রাজসভাতে পুত্র বিজয় সেনকে প্রেরণ করেছিলেন। আর সেই হল পতনের সূত্রপাত। বিজয় সেনই শেষ পাল রাজা গোবিন্দ পালের নিকট থেকে গৌড়ের শাসনভার স্বহস্তে গ্রহণ করেন। সেন রাজবংশের সূত্রপাত হল বঙ্গদেশে। রাজধানী—মধ্যবাংলার নদীয়া। বিজয় সেনের পর বল্লাল সেন এবং বল্লাল সেনের পর লক্ষ্মণ সেনের হাত থেকে বঙ্গদেশ মুসলমান অধিকারে চলে যায়।

এই ধরণের বিবর্তন এবং অধীনস্থ বিদেশাগত অধিবাসীদের আগমনের ধারাটির কিন্তু কোনরূপ পরিবর্তন হয় নি। বহু পূরাকালে মালদহ জেলা বলতে মহানন্দা ও পদ্মা নদীর মধ্যবর্তী অঞ্চলটুকুই বোঝাতো। জেলা হিসাবে মালদহের পরিচিতি কিন্তু দীর্ঘদিনের নয়। মাত্র এই শতকের প্রথম ভাগ থেকে। মালদহকে যখন জেলা হিসাবে স্বীকৃতি দেওয়ার প্রয়োজন দেখা দেয়—তখন নিঃসন্দেহে এর আয়তন বৃদ্ধির কথা চিন্তা করা হয়েছিল। ১৮১৩ খৃস্টাব্দে পূর্ণিয়া, দিনাজপুর এবং রাজসাহী জেলা থেকে কিছু কিছু অঞ্চল নিয়ে আয়তন বৃদ্ধি করা হলেও ১৮৩২ সালে মালদহকে পুরোপুরি জেলা হিসাবে স্বীকৃতি দেওয়া হয়। প্রকৃতপক্ষে মালদহ অঞ্চল বা বরেন্দ্রভূমির বেশির ভাগই তখন জঙ্গল ও বন্যপ্রাণীতে পরিপূর্ণ ছিল। জনসংখ্যা ছিল মুষ্টিমেয়। মহানন্দা ও পদ্মার তীর দিয়ে দিয়ে কোচ, মালো, পলিয়া প্রভৃতি আদিবাসীদের বাস ছিল এবং তাদের একমাত্র উপজীবিকা ছিল রেশমকীট বা পলুর চাষ। রেশমকীটের চাষের আধিক্য ও প্রাধান্যের জন্যই মালদহকে 'কোষকারীর দেশ' বলে অভিহিত করা হত কোনও এক সময়ে।

বর্তমান সময়ে নাগর, ধানুক, চাঁই, ভূইয়া প্রভৃতি ছোট ছোট যে সব খণ্ড-জাতির সাক্ষাৎ মালদহ জেলায় পাওয়া যায়—তাদের আগমন ও বসবাসের ইতিহাস খুঁজতে গেলে পালযুগ পর্যন্তও ফিরে যেতে হয়। আর এইসব জাতির আগমন ঘটেছিল বিহার, পূর্ণিয়া, রাজমহল, ছোটনাগপুর প্রভৃতি অঞ্চল থেকে। এই সব বহিরাগতরা তাদের স্ব স্ব ধর্ম ও সংস্কৃতির গোঁড়ামি নিয়ে এদেশে বসবাস সুরু করলেও গৌড়ীয় সংস্কৃতির প্রভাবে যে নিজেদের অভিষিক্ত করে নিতে পেরেছিল—তার সাক্ষ্য মালদহের নবীন ও প্রবীণ ইতিহাসে রয়েছে। শুধু পাল বা সেন রাজবংশের যুগেই নয়—মুসলমান আমলেও এই অঞ্চলে বহিরাগত আগমনের সংখ্যা নেহাৎ কম নয়। যদিচ তাদের মধ্যে বেশির ভাগই সুফী সম্প্রদায়ভুক্ত মুসলমান এবং তাদের আগমন ঘটেছিল বিহার এবং উত্তর ভারতের বিভিন্ন স্থান থেকে। মাঝি, মলহার, কুঞ্জরা, পাঝরা প্রভৃতি সম্প্রদায় এই মুসলমান শ্রেণীর বিবর্তিত ধারা।

বৃটিশ আমলের প্রথম যুগ থেকে এই জেলার অর্ধেক অধিবাসীকে মুসলমান বলে লিপিবদ্ধ করা হতে থাকে এবং বাকী অর্ধেক হিন্দুকে বিভিন্ন অংশে বহিরাগত বলে চিহ্নিত করা হয়। ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ ভাগেও মালদহের মগহিভাষী লিপি হিসাবে বাংলা লিপি ব্যবহার করলেও এবং সর্বক্ষণের কাজে বাংলা ভাষা ব্যবহার করলেও পরিবারের অন্য লোকজনের সঙ্গে হিন্দীতে আলাপ করত। ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে সমগ্র মালদহ জেলাতে মোট বাইশ প্রকার ভাষার প্রচলন ছিল বলে জানা গিয়েছে।

এই বিভিন্নমুখী সংস্কৃতি, ভাষাগত অবদান, আচার-অনুষ্ঠানের সংমিশ্রণ ঠিক কোন সময় থেকে সুরু হয়—তার কোনও ইতিবৃত্ত নেই বলেই মনে হয়। তবে অনেকে অনুমান করেন নবম বা দশম শতাব্দীতে পাল রাজবংশের সময়ে অন্য কোন প্রকার না হোক্ বিভিন্ন ধর্মমতের যে সংমিশ্রণ এই জেলায় ঘটেছিল—তা বিভিন্ন লোকসংস্কৃতির অনুশীলনকারীদের কীর্তিগাথার মধ্যে জানা যায়। পাল রাজত্বের সময়ে গৌড়ীয় জনগণের উপর বৌদ্ধ ধর্মের প্রভাব যে অপরিসীম

ছিল সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। তৎকালে গৌড় ও পাণ্ডুয়া অঞ্চলে বহু বৌদ্ধমন্দির সংঘারাম প্রভৃতি প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। একাদশ শতাব্দীতে গৌড়বঙ্গে বৌদ্ধ ও শৈব দুই ধর্মমতের অবাধ প্রসার ছিল। উক্ত সময়েই দীপঙ্কর অতীশ-এর ধর্মমতই যে গৌড়বঙ্গে প্রভাব বিস্তার করেছিল এ বিষয়েও ইতিহাসে দৃষ্টান্ত আছে। দীপঙ্কর অতীশ পাল রাজ-বংশের সঙ্গেও জড়িত ছিলেন এবং কোনও কোনও সময়ে পাল রাজাগণকে পরামর্শ দিয়ে রাজকার্য পরিচালনায় সহায়তা করতেন। কৃতজ্ঞতাস্বরূপ—পাল রাজাগণ দীপঙ্কর অতীশকে তার ধর্মমত প্রচারের স্বাধীনতা ও ধর্ম-চর্চার কেন্দ্র স্থাপনে অনুমতি দিয়েছিলেন বলে অনুমান করবার যথেষ্ট কারণ আছে। এই সময়ে রামাই পণ্ডিত প্রণীত 'শূন্য পুরাণ' ও ধর্ম-পূজা পদ্ধতির মাধ্যমে শৈব ও বৌদ্ধ ধর্মের মধ্যে যে একটি আপোষ মীমাং-সার চেষ্টা হয়েছিল—তা উক্ত গ্রন্থেই প্রমাণিত।

গৌড়বঙ্গে বৌদ্ধধর্মের প্রভাব অবশ্য পাল রাজাগণের আমল থেকেই নয়—তারও বহু পূর্ব থেকে। মহারাজ শশাঙ্ক যখন কর্ণসুবর্ণের সম্রাট এবং থানেশ্বরের অধিপতি হর্ষবর্ধনের সঙ্গে সংগ্রামে লিপ্ত, জানা যায় সেই সময়, কিম্বা তার অনতিকাল পূর্ব থেকেই বঙ্গদেশে বৌদ্ধধর্মমতের প্রচলন। মহারাজ শশাঙ্ক একবার ঘোরতর বৌদ্ধ-বিদ্বেষী হয়ে ওঠেন—বৌদ্ধ শ্রমণদিগকে নানারূপে নির্যাতন করেন এবং মগধে বৌদ্ধ সংঘারাম ধ্বংস করে সেখানে শিবমন্দির প্রতিষ্ঠার আদেশ দেন। ইতিহাস যদিও মহারাজ শশাঙ্ককে বৌদ্ধ-বিদ্বেষী বলে চিহ্নিত করেছে—তথাপি মনে হয়—কোনও কার্যকারণবশত তিনি শুধুমাত্র মগ-ধের বৌদ্ধদের প্রতিই বিরূপ হয়ে উঠেছিলেন নচেৎ বৌদ্ধধর্ম সম্পর্কে তাঁর সহনশীলতা ছিল। কেন না—তাঁর রাজত্বকালে মূল কর্ণসুবর্ণেই বৌদ্ধগণ ধর্মচর্চা প্রভৃতি করতে বাধা-প্রাপ্ত হয় নি। পরবর্তী সময়ে হিন্দু দেবদেবী ও বৌদ্ধধর্মের আচরিত ধর্মমতের সঙ্গে সংমিশ্রণের ফলে এমন এক জটিলতার সৃষ্টি হয়—এই গৌড় অঞ্চলেই একটি নতুন ধর্মমতের উত্থান সম্ভব হয়ে উঠেছিল।

কথিত আছে, বঙ্গদেশের শেষ হিন্দু রাজা লক্ষ্মণ সেন মুসলমান আক্রমণ প্রতিহত করতে না পেরে—গৌড়ে পালিয়ে আসেন এবং গৌড়ে থেকেই নতুন রাজ্য গঠন করেন। এক-সময় লক্ষ্মণ সেনের নামানুযায়ী গৌড়কে লক্ষ্মণাবতী নামেও অভিহিত করা হত। লক্ষ্মণ সেনের সময় থেকেই এই অঞ্চলের শিল্প, সাহিত্য প্রভৃতির উৎকর্ষতা সাধিত হয়। লক্ষ্মণ সেন নিঃসন্দেহে শিল্পানুরাগী ছিলেন—এবং তিনি নিজেও সাহিত্য, শিল্প প্রভৃতি রচনায় 'সমধিক পারদর্শী ছিলেন। লক্ষ্মণ সেনের পিতা বল্লাল সেনও এ বিষয়ে উল্লেখযোগ্য। বল্লাল 'অদ্ভুত সাগর' নামে একটি গ্রন্থ রচনা করে 'দানসাগর' নামে অপর একখানি গ্রন্থ রচনাকালে দেহত্যাগ করেন। বল্লাল সেনের আদেশে পুত্র লক্ষ্মণ সেন 'দানসাগর' গ্রন্থ সমাপ্ত করেন। এই গ্রন্থ দু'খানি থেকেই তৎকালীন হিন্দুসমাজ, হিন্দুসংস্কৃতি প্রভৃতি জানা যায়। বল্লাল সেন প্রবর্তিত হিন্দুসমাজের বিধান প্রভৃতিও এই গ্রন্থে উল্লেখ করা হয়েছে।

বর্তমানকালের 'মালদা নামের কোনও ব্যুৎপত্তিগত অর্থ বিশেষ কিছু পাওয়া যায় না। অনেকে অনুমান করেন 'বিষয় সম্পত্তি' শব্দের অপভ্রংশ থেকে বর্তমান মালদা নামের উৎপত্তি। বর্তমান মালদহ নামের কোনও ঐতি-হাসিক পটভূমিকাও নেই। মালদহ জেলা সাহিত্য ও সংস্কৃতিচর্চায় একদা বঙ্গদেশে যে অগ্রণী ভূমিকা গ্রহণ করেছিল—সে বিষয়ে ঐতিহাসিকগণ একমত। আনুমানিক ১২২০ খৃস্টাব্দ থেকে মালদহ মুসলমান অধিকারে আসে। মুসলমান শাসকগণের মধ্যে বঙ্গসাহিত্য ও সংস্কৃতির প্রতি শ্রদ্ধা-শীল এবং প্রচারে উৎসাহী বলে যাদের নাম সর্বাগ্রে মনে আসে—তাঁরা হলেন ইলিয়াস শাহ ও সুলতান সিকন্দার আলাউদ্দিন হোসেন শাহ। এঁদের রাজত্বকালে নতুন সংস্কৃতি-ভাবনায় সমগ্র বঙ্গদেশই প্রভাবিত হয়েছিল।

মালদহকে এখনও পুরাকীর্তির দেশ বলে অভিহিত করা চলে। সমগ্র জেলাতেই প্রাচীন কীর্তিসমূহের ভগ্নাবশেষ—হিন্দু রাজগণ প্রতিষ্ঠিত দীপাধার—জলাশয়, মন্দির প্রভৃতি এখনও জেলার অনেকাংশে বিদ্যমান। দ্বাদশ শতাব্দীতে মহারাজ লক্ষ্মণ সেন সাগরদীঘি নামে এক বৃহৎ জলাশয় খনন করেন—যা জেলার মধ্যে অন্যতম বিস্ময়কর বস্তু হিসাবে দ্রষ্টব্য। সাগর-দীঘি বর্তমান ইংরাজ বাজার থেকে সামান্য কিছু দূরে শহীদুল্লাপুরের নিকট এখনও বিদ্যমান। এই দীঘি দৈর্ঘ্যে অনুমান দেড় হাজার গজ এবং প্রস্থে সাড়ে সাত শ' গজ। দীঘিতে স্নানাদির জন্য ছয়টি সোপানশ্রেণী নির্মাণ করা হয়েছিল এবং তার ভগ্নাবশেষ এখনও বিদ্যমান। ইংরাজ বাজারের কাছেই বল্লাল সেনের দুর্গ ছিল। অনুমান বিশ ফুট উঁচু পাঁচিল দিয়ে ঘেরা এক মাইল করে দৈর্ঘ্য-প্রস্থে

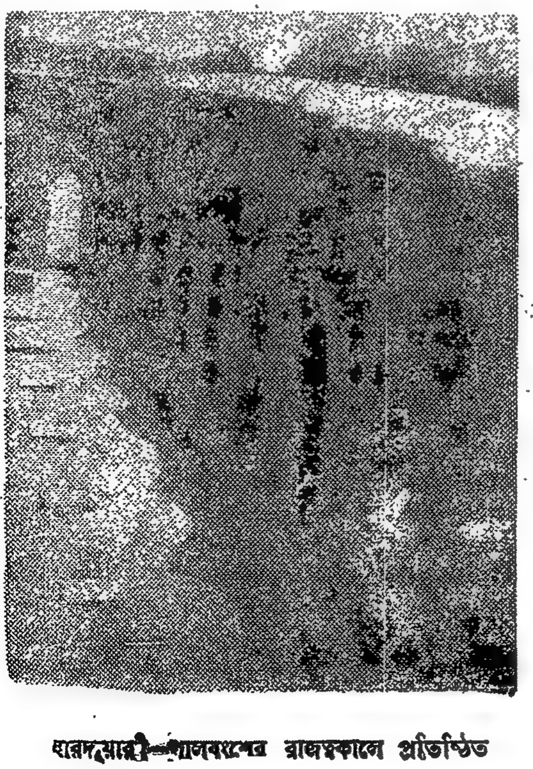

বারেদুয়ারী—পালবংশের রাজত্বকালে প্রতিষ্ঠিত

এই দুর্গপ্রাকার হিন্দু স্থাপত্যের এক অপূর্ব নিদর্শন ছিল বলে অনুমান। গৌড় ও পান্ডুয়ার পুরাকীর্তির মধ্যে মুসলমান আমলের মসজিদ এবং গেট-গুলি নির্মাণকৌশলের মধ্যে এমন এক বাস্তু বিজ্ঞানের পরিচয় বহন করে—যা আধুনিক বাস্তুকাররা সহজে চিন্তা করতে পারেন কিনা সন্দেহ। এর মুসলমান স্থাপত্যের মধ্যে উল্লেখ-যোগ্য হল—বড়সোনা মসজিদ, দখল দরওয়াজা, লোটন মসজিদ, চামকানো মসজিদ, প্রভৃতি। তাহলেও এই অঞ্চলের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য হল আদিনা মসজিদ। পান্ডুয়াতে বড় দরগা বিখ্যাত পীর হজরত শা জালাল পরবেজীর স্মৃতি-মন্দির। সেলামী দরওয়াজা, জাম মসজিদ, কুতুবশাহী মসজিদ, একলাখী মসজিদ প্রভৃতি অসংখ্য দর্শনীয় বস্তু এখনও রয়েছে। আদিনা মসজিদই এগুলির মধ্যে সর্বাপেক্ষা বৃহৎ। দৈর্ঘ্যে ও প্রস্থে অনুমান পাঁচশো ফুট ও তিনশো ফুট। চতুর্দশ খৃস্টাব্দে সিকান্দার শাহ মসজিদটি তৈরি করেন। এই মসজিদের বৈশিষ্ট্য হল যে —মসজিদের বাইরে এবং ভিতরে প্রায় সর্বত্রই যে অলঙ্করণ এবং নানা মূর্তি রয়েছে—তা হিন্দু দেবদেবীর মূর্তি এবং হিন্দু পুরাণের নানা কাহিনী উৎকীর্ণ। মুসলমানগণ কর্তৃক নির্মিত মসজিদ, দুর্গপ্রাকার ইত্যাদির মধ্যে আদিনা একটি উল্লেখযোগ্য ব্যতিক্রম। এ ছাড়াও হিন্দু ও মুসল-মান আমলে শত্রুসৈন্য প্রতিরোধ করবার জন্য বিভিন্ন স্থানে নানা দুর্গ নির্মাণ করা হয়েছিল। তার মধ্যে অনেকগুলি এখনও এই জেলায় বিদ্যমান এবং দর্শনীয় হিসাবে বিশেষ আকর্ষণ-যোগ্য।

বর্তমান মালদহ জেলার আয়তন ১৯৩২ বর্গমাইল। লোকসংখ্যা ১৯৬১ সালের জনগণনা অনুযায়ী ১২ লক্ষ ২১ হাজার ৯ শত ২৩ জন। মালদহের গঠন প্রকৃতি ও অর্থনীতির বৈশিষ্ট্যের জন্য কমবেশি একলক্ষ লোক মাত্র শহরবাসী। তাছাড়া সবই গ্রামের অধিবাসী। জেলা কৃষিপ্রধান তো বটেই এবং ৩২·৭২ জনই কৃষি-কর্মে নিযুক্ত। ধান প্রধান উৎপন্ন ফসল এবং সমীক্ষা অনুযায়ী বলা হয়েছে সাড়ে চার লক্ষ একর জমিতে ধান উৎ-পন্ন হয়। জেলার অন্যতম প্রধান ফসল আম উৎপন্ন হয় ৫৪ হাজার একর জমিতে। এ ছাড়াও উৎপন্ন ফসলের মধ্যে যব, আখ এবং পাটও উল্লেখ-যোগ্য। তবে জেলার অর্থনীতি প্রধানত ধান, আম ও রেশমকীটের চাষের উপর নির্ভরশীল।

মালদহ জেলা নদীপ্রধান। প্রধান নদী গঙ্গা। এছাড়া মহানন্দা ও কালিন্দী নদীকেও যথেষ্ট পলিমাটি-বহনকারী নদী হিসাবে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া প্রয়োজন। মহানন্দা ও কালিন্দী নদীর দাক্ষিণ্যযুক্ত উর্বর জমিগুলিতে সাধারণত মালদহের বিখ্যাত আমের সারিবদ্ধ বনসমূহ তৈরি হয়েছে। বছরের একটি উল্লেখযোগ্য সময়ের অর্থ সংস্থান এই আমের ব্যবসা থেকে। সাধারণত আমের চালান দেওয়া হয়

Full Food with a flair...

মোহনের
নিউ লাইফ
কর্ণ ফ্লেক্স

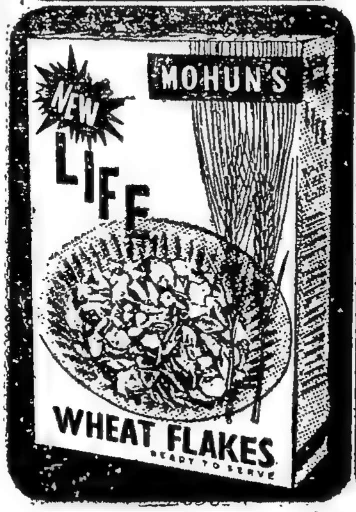

মোহনের
নিউ লাইফ
হুইট ফ্লেক্স

মোহনের "নিউ লাইফ" প্রাতঃকালীন খাদ্য সারা পরিবারের পক্ষে পূর্ণ পুষ্টিকর। এইগুলি প্রাত্যহিক অত্যাবশ্যকীয় ও অপরিহার্য প্রোটিন, কার্বোহাইড্রেট, মিনারাল সল্ট এবং ভিটামিনের সারবান উৎস। এইগুলি খাইতে ভাল।

আমাদের জিনিষগুলি ১১০ বৎসরেরও বেশী কালের অভিজ্ঞতাপুষ্ট
ডায়ার মীকিন ব্রুয়ারীজ লিঃ, স্থাপিত—১৮৫৫
মোহন নগর (গাজিয়াবাদ) ইউ, পি,
সোলান ব্রুয়ারী - লক্ষ্মৌ ডিস্টিলারী - কশৌলী ডিস্টিলারী

DMB-NP 818

কলকাতায়। সম্প্রতি ভারতীয় আমের বিদেশে যে চাহিদা সৃষ্টি করা হয়েছে বা এখনও হচ্ছে—তা প্রধানত এই মালদহের আমের উপর নির্ভর করে। পাকা আম ছাড়াও আমজাত তৈরি নানা প্রকার খাবার পার্শ্ববর্তী প্রদেশগুলিতে চালান দেওয়া হয়ে থাকে ইদানীং। তাহলেও মালদহ জেলার এই বিশেষ উৎপন্ন ফসলের দীর্ঘদিন সংরক্ষণযোগ্য কোনওপ্রকার বৈজ্ঞানিক উপায় এখনও নির্ধারিত হয় নি। কয়েক বৎসর পূর্বে সম্পূর্ণ বেসরকারী উদ্যোগে একটি প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলা হয়েছিল— সংরক্ষণযোগ্য আম এবং আমের দ্রবণজাতীয় খাদ্য দ্বারা আমের একটি লাভজনক ব্যবসায়ের সৃষ্টির উদ্দেশ্যে। কিন্তু উদ্যম ও উৎসাহের অভাবে প্রতিষ্ঠানটি বিলুপ্তির মুখে। জমি সাধারণত দো-ফসলী। ধান ছাড়াও মালদহের কোন কোনও অঞ্চলে কলাই উৎপন্ন করা হয়ে থাকে।

স্বাধীনতা প্রাপ্তির পর—জেলার শস্য উৎপাদনের দিকে বিশেষভাবে নজর দেওয়া হয়েছে। তৃতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার শেষ ভাগ পর্যন্ত জেলায় একটি কেন্দ্রীয় কৃষি-ফার্ম এবং গোটা দশেক আঞ্চলিক ফার্ম গঠন করা হয়েছে। ব্লক উন্নয়ন দপ্তর থেকে কৃষকদের মধ্যে উন্নত ধরণের চাষের যন্ত্রপাতি সরবরাহ করা হয় যদিও—কিন্তু খুব কম কৃষকই সে সুযোগ পেয়ে থাকেন।

মালদহের অন্যতম প্রধান কৃষি হল রেশম চাষ। বহু প্রাচীন কাল থেকে এই জেলায় রেশম উৎপন্ন হয়ে আসছে। সম্ভবত মধ্যযুগে ভূমিকৃষি অপেক্ষা রেশমের চাষ দ্বারাই জেলার অধিবাসিগণ তাদের জীবিকা নির্বাহ করত। সাধারণ মানুষের মধ্যে—রেশম চাষকে বলা হয় পলুর চাষ। আর এই জনাই মালদহের অনুন্নত শ্রেণীর মধ্যে এক শ্রেণীকে 'পলু' বা 'পলুয়া' বলা হয়ে থাকে। শোনা যায়—সেই প্রাচীন যুগেই মালদহের রেশম বহির্বঙ্গ তো বটেই, ভারতের বাইরে, বিশেষ করে পূর্ব এশিয়ার দেশগুলিতে রপ্তানী করা হত। এক সমীক্ষায় জানা গিয়েছে—জেলার দক্ষিণ ও মধ্যভাগের জল-হাওয়া এই চাষের পক্ষে অত্যন্ত অনুকূল। রেশম-কীটের খাদ্য হিসাবে তুঁতের চাষ—এ জেলার অর্থনীতির ভিত্তিস্বরূপ। বর্তমানে পশ্চিমবঙ্গে যত রেশমজাত বস্ত্রাদি উৎপন্ন হয়— তার শতকরা পঁচাশি ভাগই মালদা জেলায় উৎপন্ন হয়। অনুমান এই উৎপন্নের পরিমাণ হল বছরে ৪ লক্ষ থেকে ৫ লক্ষ পাউন্ড পর্যন্ত।

ওলন্দাজ ও ইংরাজগণের লুব্ধ দৃষ্টি এই রেশম শিল্পের উপর পড়তে দেরি হয় নি। ওলন্দাজরা বর্তমান পুরনো মালদার রেশমকুঠি নির্মাণ করে এবং রেশমজাত সুতার ব্যবসায়ে অনুপ্রবেশ করে। সপ্তদশ শতাব্দীতে ইংরাজরা মকদুমপুরের জনৈক ভূস্বামীর নিকট একটি মৌজা কিনে নিয়ে রেশমের ব্যবসার সূত্রপাত করেছিল। রেশমকীট উৎপাদন, রেশমকীট পালন, কাঁচা রেশম তৈরির মাধ্যমে জেলার একটি বৃহৎ অংশের অধিবাসীদের জীবিকানির্বাহ হয় এখনও।

রেশম শিল্পের বিভিন্ন স্তরের কাজের জন্য পশ্চিমবঙ্গ সরকার কয়েক স্থানে স্থায়ী সংস্থা নির্মাণ করেছেন। কয়েকজন অভিজ্ঞ ব্যক্তিও নিযুক্ত করা হয়েছে রেশম শিল্পের বিভিন্ন কাজের জন্য। বিশেষ করে তাঁরা উন্নত ধরণের রিলিং শিক্ষা দিয়ে থাকেন।

এই শিল্পের সর্বাঙ্গীণ উন্নতির জন্য তৃতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় অনেকগুলি স্কীম চালু করা হয়েছে। উদ্দেশ্য মহৎ, রেশমকীট, ও কাঁচা রেশমের মান উন্নয়ন এবং উৎপাদন খরচ কমানো। সরকারী স্কীমগুলির পুঙ্খানুপুঙ্খ বিশ্লেষণ থেকে জানা গেল—রেশমকীটের নার্সারী, বর্তমানে পুরনো ধরণের যে নার্সারী রয়েছে তার পুনর্গঠন, রেশমকীট কেন্দ্র স্থাপন, তুঁত চাষ সম্পর্কে আরও উন্নত ধরণের শিক্ষাদান ব্যবস্থা স্কীমগুলিতে রয়েছে।

রেশম চাষে যে পরিমাণ কর্মী নিযুক্ত রয়েছেন তার মধ্যে অর্ধেকের বেশিই মহিলা বলে অনুমান করা যেতে পারে। একমাত্র কালিয়াচক থানায় বিশ হাজার কর্মীর মধ্যেই রয়েছেন বারো হাজারের উপর মহিলা।

রেশমকীটের খাদ্য হল তুঁত গাছের পাতা। কাজেই মালদহ জেলায় তুঁত-এর চাষ একটি উল্লেখযোগ্য কৃষি। রেশমকীটের চাষের সঙ্গে যুক্ত জনৈক বেসরকারী অভিজ্ঞ ব্যক্তির মত হল—পূর্বে মালদহের রেশমকীট উৎপাদনকারী সাধারণ মানুষ এবং 'পলুয়ারা' তুঁত গাছের রোপণ ও গাছের চাষ সম্পর্কে বিশেষ কোন অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করতে পারত না। বর্তমানে সরকারী উদ্যোগে রেশম চাষের উন্নয়ন হওয়ার ফলে তুঁত গাছের চাষ সম্পর্কেও হাতে-কলমে শিক্ষা দেওয়া হয়ে থাকে।

মালদার রেশম শিল্প অত্যন্ত প্রাচীন ঐতিহ্যমণ্ডিত। পূর্বে হিন্দু রাজারা এর পৃষ্ঠপোষক ছিলেন এবং মালদার পট্টবস্ত্র একদা বিদেশে রপ্তানী করা হত। মুসলমান আমলে এই প্রাচীন শিল্পের অবনতি ঘটে। ষোড়শ শতাব্দীতে ইওরোপীয় জাতিসমূহের আগমনের ফলে পুনরায় রেশম চাষের প্রবর্তন এবং উন্নয়ন ঘটে।

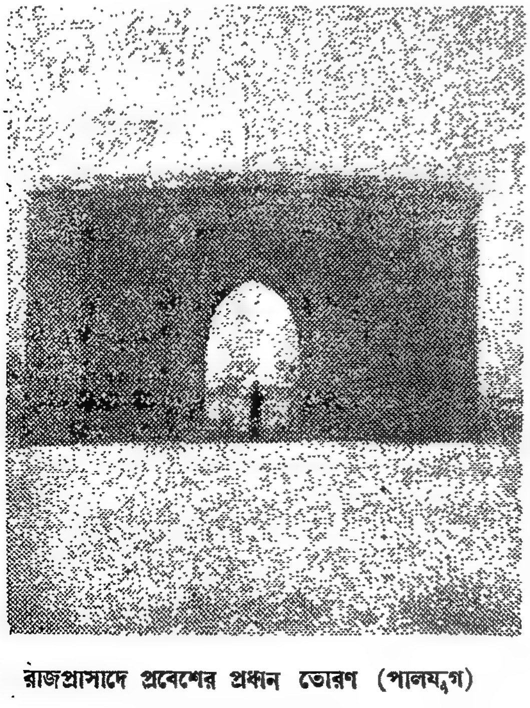

রাজপ্রাসাদে প্রবেশের প্রধান তোরণ (পালযুগ)

আলোকচিত্র : পূর্ণেন্দু পালচৌধুরী

অগ্নিযুগের একটি অধ্যায়

অনন্ত সিংহ

যুগধর্ম

এখন একটি খুব গুরুতর বিষয় অবতারণার প্রয়োজন মনে করছি। প্রথমেই আমার সরল ও বিনীত অনুরোধ এই বিষয়ে কেউ যেন আমাকে ভুল না বোঝেন। প্রত্যেকেরই নিজস্ব স্বাধীন মত ব্যক্ত করার অধিকার আছে। আমার নিজস্ব বিচার বুদ্ধি বিশ্লেষণ ও দৃষ্টিভঙ্গী দিয়ে যা দেখেছি বা বুঝেছি তাই মাত্র ব্যক্ত করব। কাউকে আঘাত দেওয়া বা কারো ভগবৎ ভক্তির প্রতি কটাক্ষ করা বা কারো আধ্যাত্মিকতাকে ক্ষুণ্ন করার উদ্দেশ্য আমার বিন্দুমাত্র নেই। ধর্ম, ভগবৎ বিশ্বাস, প্রতিমা পূজো বা নিরাকার ব্রহ্মে আস্থা, প্রভৃতি একেবারে ব্যক্তিগত ব্যাপার—এর ওপর না চলে কোন অনধিকার চর্চা, না থাকা উচিত বৃথা অভিযোগ। আমার এ বিষয়ে কারো প্রতি কোন অভিযোগও নেই বা এই আধ্যাত্মিক বিচার আমার আলোচনার বস্তুও নয়।

আজ ইতিহাস লিখতে গিয়ে আমায় পরিবেশন করতে হচ্ছে বাংলার বিপ্লবীদের সন্ত্রাসবাদ অধ্যায়ের আধ্যাত্মিকতার তথ্য যা চট্টগ্রামের সশস্ত্র যুব-অভ্যুত্থানের সময়ে নতুন ধারায় পরিচালিত হয়েছিল। সাধারণভাবে দেখতে গেলে শ্রীঅরবিন্দের সময় হতে আরম্ভ করে আমাদের যুগে, ১৯১৮ থেকে প্রায় ১৯২৭ বা ১৯২৮ পর্যন্ত বিপ্লবী সভ্যদের মানসিক প্রস্তুতি ও চরিত্র গঠনের প্রধান শিক্ষার ধারা ছিল—জপ-তপ ধ্যান-ধারণা গীতা পাঠ ব্রহ্মচর্য পালন—কৌপীন বা লেংগুট পরিধান করা ইত্যাদি...... ইত্যাদি। এ বিষয়ে আমি আগে উল্লেখ করেছি।

আধ্যাত্মিকতার এই বিশেষ রূপটিকে আমরা—(শুধু আমরাই, সবার কথা জোর দিয়ে বলতে পারব না) ক্রমেই সমালোচকের দৃষ্টি দিয়ে দেখেছিলাম। আমার আগেই এবং আমার চেয়েও তীব্রভাবে এই ব্যাপারটা উপলব্ধি করেছিল আমার বন্ধু গণেশ। বাংলার যে কয়টি বিপ্লবী সংগঠনের সংগে আমরা প্রত্যক্ষভাবে সংযুক্ত ছিলাম, তাদের মধ্যে আধ্যাত্মিকতার প্রচার ও প্রয়োগের অন্তরালে কতখানি মিথ্যা ভান ও আত্মপ্রতারণা বাসা বেঁধেছিল তা আমরা বিশেষভাবে উপলব্ধি করেছিলাম। আমরা আমাদের নিজস্ব সংগঠনের যুবককর্মীদের কাছে খোলাখুলি ও তীব্রভাবে সমালোচনা করেছি প্রাক্তন নেতা ও বিপ্লবী কর্মীদের, যাঁরা আত্মপ্রতারণার জন্য মিথ্যার আশ্রয় নিতেন। যে নৈতিক শক্তির ওপর নির্ভর করে আমরা অন্যদের সমালোচনা করেছি, সেই ভিত্তির ওপর দাঁড়িয়ে আমরা আমাদের নৈতিক বা যে কোন মানসিক দুর্বলতার কথা গোপন না করে প্রকাশ করতে দ্বিধাবোধ করতাম না। বলতে পারি আমাদের বলিষ্ঠ চিন্তা ও পদ্ধতি সাহায্য করেছে যুবক সভ্যদের আত্মপ্রত্যয় বাড়াতে ও আমাদের প্রতি তাদের অনেক বেশি আকৃষ্ট করতে।

ব্রহ্মচর্য পালন, কৌপীন পরা, চোখ কপালে তুলে মায়ের ধ্যানে নিমগ্ন হওয়া, নাক টেপা, হরীতকী চিবান ও কাছা খুলে কাপড় পরে ব্রহ্মচারী সাজা—আমাদের কাছে যুব-অভ্যুত্থানের প্রস্তুতির সময় থেকে অত্যন্ত হাস্যকর বলে মনে হোত। ব্রহ্মচর্যের বিচ্যুতি, দুর্বলতা, স্খলন, পতন, প্রভৃতির বিভীষিকা সৃষ্টি করে একজন বিপ্লবী যুবককে সবল সুস্থ না করে দুর্বল করেই ফেলা হয়। বাস্তবতাকে উপেক্ষা করে অবাস্তব কল্পনাবিলাস আমাদের মনে স্থান পায় নি। আমরা চেয়েছিলাম সবল সুস্থ একদল যুবক যারা মিথ্যাচারী হবে না—যারা আত্মপ্রতারণার ঊর্ধ্বে থাকবে। মিথ্যার আশ্রয় নিয়ে কোন নৈতিক বল অর্জন করা যায় না, বিবেকের কাছে কিছুই গোপন থাকে না, বরং সেই মিথ্যাচারের স্বরূপ উদ্ঘাটিত হয় বলে তথাকথিত নৈতিক চরিত্রের সমাধি রচনা হয় গোপন অন্তরে।

বিপ্লবী প্রেরণা, বিদেশী শত্রুর বিরুদ্ধে স্বাধীনতার আপোষহীন সংগ্রামের জন্যে মানসিক প্রস্তুতি ও বৈপ্লবিক নৈতিক চরিত্র এক আলাদা জিনিস। নাক টিপে আরাধনায় বসে ও হরীতকী চিবিয়ে, কাছা খোলা বিশেষ পরিধানে ব্রহ্মচারী সাজলে বৈপ্লবিক নৈতিক চরিত্র গঠন করা যায় বলে আমরা মনে করি নি, তার চেয়েও বেশি প্রয়োজন ছিল, নিয়মানুবর্তিতা, সময়ানুবর্তিতা, শারীরিক ও মানসিক শক্তির।

আমরা মনে করেছি বিপ্লবী সভ্যরা একাগ্রতার সংগে শরীরচর্চা করে অসীম শক্তির অধিকারী হবে; আমরা চেয়েছি—একদল যুবকের সুদৃঢ় মাংসপেশী আর বলিষ্ঠ বাহু; আর চেয়েছি তারা মুষ্টিযুদ্ধ,

যুযুৎসু, প্রভৃতিতে দক্ষতা অর্জন করবে। গীতা পাঠ, ব্রহ্মচর্যের অবাস্তব মহড়া থেকে রক্তাক্ত ভয়াবহ বৈপ্লবিক বাস্তব চিত্রের পর্যালোচনা ও অনুধাবন অনেক বেশি শ্রেয় ও একান্ত প্রয়োজন বলে মনে করেছিলাম। বিশেষ করে আইরিশ বিপ্লবের রক্তাক্ত ঘটনাবলী, সশস্ত্র আক্রমণ, দারুণ উত্তেজনা ও বিভীষিকাপূর্ণ মরণজয়ী যুদ্ধের বিচিত্র বাস্তব চিত্র আমাদের সাহায্য করেছিল বৈপ্লবিক subjective preparation-এর জন্য। সিনেমাতে যুদ্ধের ছবি, পাঁঠা বলি, হসপিট্যালে বড় বড় অস্ত্রোপচার দেখবার সুযোগ নিতে আমরা সভ্যদের উৎসাহিত করেছি। গীতা পাঠ ও তথাকথিত ব্রহ্মচর্য পালন প্রভৃতি যে অনেক সভ্যকেই আসন্ন সশস্ত্র আক্রমণের সম্মুখীন হওয়ার শক্তি দিতে ব্যর্থ হয়েছে, সেইরূপ দৃষ্টান্ত অন্তত আমাদের কাছে বিরল নয়।

শক্তিশালী বৃটিশ রাজশক্তির বিরুদ্ধে সশস্ত্র আক্রমণ করার প্রস্তুতি ও বাস্তবে আক্রমণ চালানো তখনি সম্ভব হবে বলে মনে হয়েছিল, যখন তরুণ বিপ্লবীদের মনে বৃটিশ ইম্পিরিয়ালিস্ট শত্রুর বিরুদ্ধে ক্রোধ ও ঘৃণার সঞ্চার করতে পারবো। গীতা পাঠ ও মা কালীর চরণে মাথা খুঁড়ে কখনই প্রত্যক্ষভাবে এই ক্রোধ বা ঘৃণার সঞ্চার হওয়া সম্ভব নয়। কাজেই ঐভাবে শক্তি সঞ্চয় করে অত্যাচারী রাজশক্তির বিরুদ্ধে সশস্ত্র আক্রমণের জন্য প্রস্তুত হওয়া বিপ্লবীদের পক্ষে পরোক্ষ বা খুব ঘোরানো পথ বলে আমার মনে হয়েছিল। রক্তাক্ত বিপ্লবে অংশ গ্রহণ করার অদম্য সাহস ও বিক্রম অনেক বেশি সঞ্চয় করা যায় যদি বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদী শত্রুর বিরুদ্ধে সোজা পথে (directly) তাদের প্রতিভূদের প্রতি তীব্র ক্রোধ ও ঘৃণা অন্তরে প্রজ্বলিত করতে পারি।

সামান্য একটি ঘটনার উল্লেখ করছি। খুব সম্ভব ১৯২৭ সালে চট্টগ্রামের জেলা ম্যাজিস্ট্রেট, বোধহয় তাঁর নাম মিঃ ডেভিস্, একজন সাধারণ "আধা-পাগল" মুসলমানের দ্বারা ছুরিকাঘাতে নিজ বাংলোতে নিহত হন। শোক-বিহ্বল চট্টগ্রাম শহর। জেলাশাসক কত ভাল ছিলেন—কত দরদী—কত ন্যায়বান। অনেকের দুর্ভাগ্য যে সেইদিনই সন্ধ্যায় টাউন হলে আমাদের পূর্বপ্রচারিত সভা অনুষ্ঠিত হবার কথা। অনুরূপদার মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষে এই সভার আয়োজন। অনুশীলন দল, কংগ্রেস নেতা—ত্রিপুরা চৌধুরী, মহিম দাস প্রভৃতিদের সঙ্গে একসঙ্গে মিলিতভাবে আমরাও এই সভার ব্যবস্থা করেছি।

আমরা সভায় যোগ দিলাম সময়-মত। 'হল' ভরে গেল তবু সভা আরম্ভ হয় না। ত্রিপুরাবাবু, মহিম দাস প্রভৃতি চট্টগ্রামের বিখ্যাত কংগ্রেস নেতারা ম্যাজিস্ট্রেট সাহেবের শবদেহের সঙ্গে গেছেন সমাধিক্ষেত্রে শেষ শ্রদ্ধা জানাবার জন্য। কাজেই অনুরূপদার মৃত্যু-বার্ষিকী সভার কাজে বিলম্ব ঘটবে তাতে আর দোষের কি?

আজও আমার মনে আছে, অনুশীলন দল এমন কি আমাদের বন্ধুদের মধ্যেও অনেকে ঐ "মর্মান্তিক ঘটনার" পরিপ্রেক্ষিতে সভা বিলম্বে সুরু করা ন্যায়সঙ্গত বলে মনে করেছিলেন। আমি তখন একেবারে একা পড়ে গেলাম, কারণ মাস্টারদা আর গণেশ তখন জেলে, আর অম্বিকাদা ও নির্মলদা হয়ত সেখানে উপস্থিত ছিলেন না। তখন আমি একাই সেই সভাস্থলে ঘোর প্রতিবাদ জানালাম। তার পরের ব্যাপারটিতে আমি আরও বেশি উত্তেজিত হয়েছিলাম, কারণ নেতৃস্থানীয় প্রায় সকলেই, বিশেষ করে কংগ্রেস নেতারা এই সভাতেই ম্যাজিস্ট্রেট সাহেবের তিরোধানের জন্য এক শোক প্রস্তাব আনা উচিত বলে মনে করছিলেন।

ম্যাজিস্ট্রেট হত্যা বা সাহেবের অকাল মৃত্যু প্রভৃতি যাঁদের শোক-বিহ্বল করবে তাঁরা আলাদা সভা ডেকে তাঁর মৃত আত্মার প্রতি যত খুশি সম্মান দেখাতে পারেন এবং শোক-সন্তপ্ত পরিবারবর্গের প্রতি সমবেদনা জানাতে চাইলেও কোন বাধা নেই; তবে আমি একাই ঘোষণা করলাম যে, এই সভায় তা' চলবে না। আমার অনমনীয় ভাবকে প্রভাবান্বিত করবার জন্য চারুবাবু (অনুশীলনের চারু দত্ত) ও অন্যান্যরাও বোঝাতে চেষ্টা করলেন ঃ—"দেখ, এ তো আর রাজনৈতিক হত্যা নয়—এর পেছনে তো কোন রাজনৈতিক উদ্দেশ্য নেই; তবে কেন আমরা এই হত্যাকে অন্য উদ্দেশ্যপ্রণোদিত হত্যা বলে নিন্দাসূচক প্রস্তাব নেব না ......ইত্যাদি।"

আমি আরও উত্তেজিত হলাম—ক্ষিপ্ত হলাম—ঘৃণা ও ক্রোধের তপ্ত শিখা উদ্গীরণ করে বললাম ঃ

"আশ্চর্য! আপনারা বলছেন কি? শত সহস্র নারী ও নিরীহ শিশু হত্যায় কলঙ্কিত বৃটিশ শাসনের ইতিহাস যে আমাদের উপহাস করবে! জালীয়ানওয়ালাবাগের নিষ্ঠুর হত্যালীলার করুণ চিহ্ন যদি ভারতবাসীর হৃদয় থেকে এত শীঘ্র মুছে যায় তবে কি তা' বিপ্লবী মন ও নিষ্ঠাকে ধিক্কার দেবে না? সাহেবের বুটের লাথিতে চা-বাগানে যখন-তখন গর্ভবতী মা' প্রাণ হারাচ্ছে, দুধের শিশুরা অহরহ বৃটিশের বুটের তলায় নিষ্পেষিত হচ্ছে, বর্বর অত্যাচার, নিষ্ঠুর অভিযান, চির উদ্ধত বৃটিশ সঙ্গিন ভারতবাসীর রক্তে বন্যা বইয়ে দিচ্ছে। তবে কেন অযথা দরদে প্রাণ উথলে উঠছে ম্যাজিস্ট্রেট সাহেবের হত্যা ব্যাপারে? হোক না অরাজনৈতিক কারণে হত্যা। যদিও এই হত্যার পেছনে কোন রাজনৈতিক উদ্দেশ্য নেই তবু এটা তো সত্যি যে একজন ভারতবাসী তার ব্যক্তিগত কারণে হলেও ফিরিঙ্গী জেলাশাসককে নিহত করেছে। এতে আমাদের মাথা ঘামাবার কি আছে? কারণে-অকারণে যে ইংরেজ শাসকগোষ্ঠী দু' শ' বছর ধরে নিরীহ ভারতবাসীকে হত্যা করতে বিন্দুমাত্র দ্বিধাবোধ করে নি, তাদের একজনকে যদি বিনা কারণেও একজন ভারতবাসী হত্যা করে থাকে তাতে আমরা কেন বিচলিত হব—কেন আমরা ভাববো এই হত্যা নিন্দনীয়?......"

সভা আরম্ভ হবার পূর্বে এইরূপ একটা পরিস্থিতির জন্য আগে থেকে কেউ প্রস্তুত ছিল না। আমার আপোষহীন মতের বিরুদ্ধে কেউ এগোতে সাহস করল না। আমার নিজ দলের বন্ধুরাও তাদের সাময়িক ভুল চিন্তাধারার জন্য অনুতপ্ত হোল। সতীদার সঙ্গে আমি যখন সভার শেষে বাড়ি ফিরছিলাম—তখন বুঝেছিলাম যে তিনি আমাকে ভুল বোঝেন নি।

আজও এই বৃত্তান্তটি পড়বার সময় কারো কারো মনে হতে পারে ঐরকম জেদ আমার পক্ষে শোভা পায় নি। তাঁরা ভাবতে পারেন অরাজনৈতিক কারণে জেলাশাসকের হত্যা ব্যাপারে সমবেদনা প্রকাশ করলে বিপ্লবী চরিত্রকে ক্ষুন্ন করা হয় না বরং মর্যাদা দেওয়াই হোত। সেই যুগের বাস্তব অবস্থা থেকে দূরে সরে গিয়ে ভাবলে তাই মনে হবে। কিন্তু সেই যুগে আমরাও ছিলাম ঘরের ভাল ছেলে—চুরি-ডাকাতি, মারামারি আমাদের পেশা ছিল না। ঘরের শান্তিপূর্ণ ও মর্যাদাসম্পন্ন আবহাওয়া ছেড়ে "ক্ষেপার দলের" অনেক অস্বাভাবিক পথ নিতে হয়েছে। তারপর সেই যুগে যখন রক্তের বদলে রক্ত, চোখের বদলে চোখ, দাঁতের বদলে দাঁত, হত্যার বদলে হত্যাই একমাত্র পথ বলে মনে

হয়েছে, তখন কি আমাদের পক্ষে শোভা পায় প্রতিশোধ নেওয়ার মনোভাবের সঙ্গে আপোষ করা! আমাদের সংগঠনের কর্মীরাও আর দশজনের মতই ভাল ছেলে,—বিনয়ী, নম্র ও শান্ত স্বভাবের, তাই সে যুগে ইংরেজ সরকারের বিরুদ্ধে ক্ষমাহীন সশস্ত্র সংগ্রাম বাস্তবে পরিণত করতে হলে প্রত্যেকটি বিপ্লবী যুবককে অন্তরে যে দারুণ ক্রোধ ও ঘৃণার সঞ্চয় করতে হবে তাতে কোনই সন্দেহ ছিল না। চট্টগ্রামের যুব-অভ্যুত্থানের পেছনে এই-রূপ মনস্তাত্ত্বিক শিক্ষার বৈশিষ্ট্য ছিল।

এই প্রসঙ্গে আমার নিজের কথা আরও একটু খুলে বলতে হবে। "মা কালীর" প্রতি আমার কী অগাধ বিশ্বাস ছিল, তা আমার প্রথম দিকের লেখায় সকলেই হয়তো লক্ষ্য করেছেন।

করুণাময়ী মায়ের খেলা দেখে কত যে মুগ্ধ হয়েছি—তিনবার সামনা-সামনি গুলী ছুটেছে, তবু লাগে নি। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ রাখাল বালক সেজে পুলিশ বেষ্টনী থেকে আমাদের উদ্ধার করে নিয়ে গেলেন; হরিণ পথ দেখালো, বিষাক্ত সাপ আমাদের ইংগিত দিল শত্রুর কবল থেকে বাঁচতে; মায়ের প্রেরিত বৃদ্ধ আমাদের আশ্রয় দিল; মাস্টারদা, অম্বিকাদা ও রাজেন দাস বিষ খেয়েও বেঁচে রইলেন; আমাদের কারো মামলায় সাজা হোল না, ইত্যাদি......ইত্যাদি। এত সব ঘটনা জীবনে ঘটেছে—তখন তো তার অন্য উত্তর পাই নি। একমাত্র উত্তর পেয়েছিলাম ভগবানের খেলা, করুণাময়ী মায়ের আশীর্বাদ,—আমাদের শক্তিতে কিছুই হয় নি—আমরা নিমিত্ত মাত্র—যা হয়েছে সব শ্রীঅরবিন্দ বা জ্যোতিষদার ইচ্ছায় ঘটেছে। আমার লেখায় দেখেছেন সব সময় আমি উল্লেখ করেছি "তখনকার যুগে" "তখনকার দৃষ্টিভঙ্গীতে" "তখন আমার" মনোভাব তাই ছিল—ভগবান, মা কালী, শ্রীঅরবিন্দ, তারাচরণ সাধুজীর কৃপা।

মনে হবে এত গাঢ় ভক্তি—যা তখন জীবনের মর্মে মর্মে জড়িয়ে ছিল তা কি একেবারে সব ধুয়ে মুছে চলে যেতে পারে? বুদ্ধি দিয়ে বিচার না করে সমস্ত ঘটনাগুলিকে যে ভক্তি দিয়ে ব্যাখ্যা করতাম, সেই অতি-বিশ্বাসী মন কি একেবারে নাস্তিক হয়ে যেতে পারে? সত্যিই চট্টগ্রামের যুব-অভ্যুত্থানের প্রস্তুতির সময় থেকেই মা কালী, ভগবান, শ্রীঅরবিন্দ কিম্বা আর কোন সাধু মহাত্মার অলৌকিক বা ঐশ্বরিক ক্ষমতা প্রভৃতির ওপর কোন আস্থা ও নির্ভরতা আমার ছিল না। আমি আমার কথাই বললাম কারণ মা কালীর প্রতি আমার অন্ধ বিশ্বাস ছিল। পাগলের মত, ক্ষেপার মত বিশ্বাস করেছি এবং সেই অন্ধ বিশ্বাসের আশ্চর্য ও অসাধারণ ফল পেয়েছি জীবনের বহু ক্ষেত্রে। তবু আমার মত গোঁড়া অন্ধ বিশ্বাসী একজন লোকের মন থেকে কি করে ভগবত বিশ্বাস একেবারে নির্মূল হয়ে গেল? হয়ত অবাক বিস্ময়ে অনেকের মনে এই প্রশ্ন উঠবে এবং কেউ কেউ হয়ত এই প্রশ্নের সহজ সমাধান খুঁজে পাবেন যদি একবার আমাকে কমিউনিস্ট আখ্যা দিতে পারেন। কিন্তু এই সমস্যার এত সহজ সমাধান একেবারেই সম্ভব নয়। কারণ যখনকার কথা বলছি (১৯২৮-৩০ সাল) তখন আমাদের কমিউনিজম সম্বন্ধে কোন ধারণাই ছিল না। সেই সময় বাংলার তরুণ বিপ্লবীদের সাম্যবাদের সমাজ-বিজ্ঞান স্পর্শ করে নি। কার্ল মার্ক্স বা এঙ্গেলসের নামও শুনি নি। লেনিন ও ট্রটস্কির জীবনী—বাংলাতে ছাপানো দুটি ছোট বই আমি দেখেছিলাম—পড়ি নি। তার আরও দু-তিন বছর পরে দ্বীপান্তরের সাজা হয়ে যাওয়ার পরে, যখন আন্দামান জেলে ১৯৩৩ সালে মলাটের ওপর সোনালী হরফে বড় বড় লেখায় STALIN নামের একটি বই দেখি তখন আমার মনে প্রশ্ন উঠেছিল—STALIN আবার কে? LENIN তো শুনেছি। হয়ত LENIN-ই হবেন—STALIN হয়ত LENIN-এর আর কোন নাম। এই ছিল আমার ১৯৩৩ সালে কমিউনিজম সম্বন্ধে জ্ঞান। কাজেই একথা বুঝতে কোন অসুবিধে নেই যে, ১৯২৮-৩০ সালে কমিউনিজমের প্রভাব আমার ওপর একেবারেই পড়ে নি। তবু কি করে আধ্যাত্মিকতার প্রভাব থেকে মুক্ত হোলাম?

যুক্তিপূর্ণ মন ছিল আমার, ফাঁকি কখনও সহ্য করতে পারতাম না, বুজরুকী অসহ্য মনে হোত, আত্মপ্রতারণাকে ঘৃণার চোখে দেখতাম। অলৌকিক, ভৌতিক, ঐশ্বরিক শক্তি প্রভৃতির মরীচিকা আমার যুক্তিপূর্ণ অনুসন্ধিৎসু মন থেকে ক্রমেই বিলীন হয়ে গেল। পুরুষকারে বিশ্বাসী হতে লাগলাম। মা কালী বা পরম ব্রহ্মের আকার বা নিরাকারের সন্ধানে জীবনপাত অযৌক্তিক ও নিরর্থক বলে মনে হতে লাগলো। প্রথম প্রথম যখন গণেশ বলত, 'ভগবান মানি না। পুরুষকারে বিশ্বাস করি,' তখনও আমার মন থেকে সংস্কার যায় নি।

ভারতের
আদিতম
রসায়ন

চ্যবনপ্রাশ

আয়ুর্ব্বেদোক্ত বিশুদ্ধ উপাদানে প্রস্তুত

চ্যবনপ্রাশ নূতন ও পুরাতন সর্দ্দি কাশি, স্বরভঙ্গ ও শ্বাসযন্ত্রের পীড়ায় বিশেষ উপকারী।

টনিক হিসাবে নিয়মিত ব্যবহারে দেহের দৌর্ব্বল্য ও রুগ্নতা দূর করে ও শরীরের পুষ্টি সাধন করিয়া স্বাস্থ্যশ্রীর পুনরুদ্ধার করে।

বেঙ্গল কেমিক্যাল

কলিকাতা বোম্বাই কানপুর

আমি বলতাম ঃ "মুখে তুমি যাই বল না কেন নিশ্চয়ই তুমি গোপনে ভগবানকে ডাক!" ভগবানকে ডাকবে না, মা কালীর আশীর্বাদ চাইবে না— তাও কি কখনও হতে পারে? কাজেই বুঝে নিন্ সংস্কারপূর্ণ মন একটি ইলেক্‌ট্রিক বাতি নয় যে সুইচ্ টিপ্‌লেই জ্বলবে আর উল্টো টিপলেই তক্ষুণি নিভে যাবে।

আমারও মা কালীর প্রতি অগাধ ও অন্ধ বিশ্বাস সুইচ টেপার সংগে সংগে নির্মূল হয়ে যায় নি। ভগবান বা নিরাকার ব্রহ্মের অস্তিত্ব নেই বলে যুক্তি দিয়ে বুঝলেও তক্ষুণি তক্ষুণি তা' মন থেকে সম্পূর্ণ মুছে ফেলা যায় না। প্রথম প্রথম অভিমানভরে আমার মনের অভিযোগ জানাতাম মা কালীর কাছে। তার একটু নমুনা দিচ্ছি ঃ "মা, তোকে তো তোর ভক্তবৃন্দরা জানে তুই সর্বশক্তিময়ী! তোরই ইচ্ছায় নাকি সব হয়! মানুষের ক্ষমতা কিছুই নেই। যতসব বৈজ্ঞানিক উন্নতি হয়েছে —রেল, স্টীমার, মোটরগাড়ি, আকাশচারী বিমান, বৈদ্যুতিক শক্তির বিকাশ, বেতার-বিজ্ঞানের প্রয়োগ—সবই নাকি তোরই ইচ্ছায় সংঘটিত হয়েছে; এতেও নাকি মানুষের কোন হাত নেই। তাই যদি সত্যি হয় তবে তোকে প্রাণ দিয়ে ডাকার প্রয়োজন কি—তোর মুখের দিকে তাকিয়ে থাকতে হবে কেন? তোর ইচ্ছায় যখন সব হচ্ছে তখন তাই হোক্ —আমরা ছুটি নিলাম। যখন যাকে দরকার, প্রয়োজনমত তাকে দিয়ে তো তুই সব করিয়ে নিবি! তোর গরজেই যখন তুই তা' করবি তখন তোকে বোকার মত ডাকব কেন?"

মনে কঠিন প্রশ্ন জেগেছে। অন্ধ বিশ্বাসের স্তম্ভ নড়ে উঠেছে। প্রশ্নের সঠিক উত্তর পাওয়া চাই। তবু উত্তর চাইব কার কাছে? তখনও যে মায়ের মুখের দিকে তাকিয়ে আছি—যদি মা আমার প্রশ্নের সমাধান করে দেন! প্রশ্নের সমাধান তো পেলাম না বরং জিজ্ঞাসু মন মায়ের কাছেই আরো অভিযোগ জানালো ঃ "মা গো! তোর ভক্তবৃন্দরা আবার বলে থাকেন মানুষ তোরই সৃষ্ট জীব। তারা কর্ম করবে—তারা ইতিহাস সৃষ্টি করবে। তাই যদি হয় তবে তোর পূজার প্রয়োজন কি? তুই হয়ত বলবি—মানুষ কাজ করে যাবে। যে যেমনটি কাজ করবে সে তদনুরূপ ফল পাবে। আমি তবে তোকে প্রশ্ন করি—আমাকে বলে দে—'যে যত বেশি ভক্তিভরে সাধনা করবে বা একাগ্রতার সংগে কর্মযোগী হবে, সে যখন তদনুরূপ ফল পাবে তবে কি সাধনা বা একাগ্রতার ক্ষেত্রে মানুষ তোর তথাকথিত সর্বশক্তির আওতার বাইরে? মানুষ তাহলে নিজ শক্তির ওপর নির্ভর করে সফল কর্মী হতে পারে! আবার যদি বলিস—কে কিভাবে তোকে ডাকবে, কার কত সাধনার গভীরতা তাও তোর সর্বশক্তির কৃপাদান—মানুষের সাধনাও তোর নিয়ন্ত্রণাধীনে; তবে তোকে আর তোর ভক্তবৃন্দকে জিজ্ঞাসা করি, কেন তবে তোর ইচ্ছায় কেউ বেশি বা কেউ কম ক্ষমতার অধিকারী সাধনার ক্ষেত্রে? কেন তোর এইরূপ এক চোখো পক্ষপতিত্ব তুইও তবে favouritism, nepotism, Corruption (পক্ষপাতিত্ব, স্বজনপোষা, দুর্নীতিগ্রস্ত) ব্যাধিমুক্ত হতে পারিস নি?"

আস্থা যেন আর থাকছে না। যুক্তির কাছে ভেজাল ও মেকী জিনিস ধরা পড়ে যাচ্ছে। অন্তরে আলোড়ন সৃষ্টি হলো। ঝড় উঠল। অন্ধ বিশ্বাস তবু আস্থা রাখবার জন্য আশ্রয় খুঁজে বেড়াতে লাগল। উৎকণ্ঠিত পিপাসু মন আবার মায়ের কাছেই অভিযোগ জানালো ঃ

"মা! তোকে পক্ষপাতিত্ব ও স্বজনপোষার দুর্নীতিগ্রস্তা বলে কত কটু কথা বলেছি! তুই হয়ত রাগ করেছিস্। আমি কি করব বল? তুই তো জবাব দিতে পারছিস্ না; কিন্তু তোর ভক্তবৃন্দরা তোর প্রশংসায় পঞ্চমুখ। তোর সাফাই গাইবেই। যখন তাদের আর কোন যুক্তি থাকে না তখন জটিল প্রশ্নের সহজ সমাধান হিসাবে প্রচার করে—সবই তোর লীলাখেলা। আমরা সব তোর ছোট ছোট পুতুল—তোর খেলার সামগ্রী! তাই যদি হয় তবে বলে দিচ্ছি, শুনে রাখ, তোর খেলার সামগ্রী হোতে আমি পারব না। যুক্তি দিয়ে আমাকে বোঝাতে হবে তোর—কেন তোকে ডাকার মত ডাকতে একজনে পারে আর আরেকজন পারে না? গভীর ভক্তিভরা মনে যখন একজন সার্থক সাধনার সুফল পায় কেন তবে আর একজন তা' পায় না? যখন সধনার ক্ষেত্রে আর একজনের মত উন্নত হতে পারলুম না—তখন তুই ও তোর ভক্তবৃন্দ "বুঝিয়ে" দিলি—'ডাকার মত ডাকিস্ নি তাই তোর হয় নি।' তোরই তো নাকি আমরা সৃষ্ট জীব। তবে এই তারতম্য কেন মেনে নেব? কেন আমিও অন্যের মত তোকে 'ডাকার মত ডাকতে' পারলাম না? তোকে উত্তর দিতে হবে; পাশ কাটিয়ে গেলে চলবে না।"

ক্রমেই মন শক্ত হচ্ছে। তবু সংস্কার কাটে না। বিশ্বাস হারিয়ে ফেলছি। মনে হচ্ছে ভগবান নেই—ঈশ্বর নেই। দুর্বলের বেঁচে থাকার সম্বল একমাত্র যুক্তিহীন অর্থহীন ভগবানে অন্ধ বিশ্বাস। দুর্বলের ভগবানকে আমি চাই না—তাকে আমি পূজো করতে অস্বীকার করি। আমার অন্তরে সংস্কার ও বাস্তবতা, যুক্তি ও ভাবপ্রবণতা, জিজ্ঞাসু মন ও অন্ধ বিশ্বাস —এই পরস্পর বিরোধী দুই শত্রুর সংঘাত বাধল—নিরন্তর দ্বন্দ্ব চলল। তবু যুক্তি দিয়ে ভগবানের অস্তিত্ব নেই বলে বুঝলেও এতদিনের অন্ধ বিশ্বাস গিয়েও যায় না। ভগবান মিথ্যা—পরম ব্রহ্ম মিথ্যা—দুর্বল মনের বিকৃতি প্রলাপই হোল ভগবানের অস্তিত্বের স্বীকৃতি। সবই বুঝলাম, তবুও নিজের অজান্তে মা'র ওপরই নির্ভতা—যদি তবু কোন আলোর সন্ধান পাই—যদি উত্তর পাই কেন এরূপ তারতম্য! জিজ্ঞাসু মনে উত্তর পেলাম ঃ "গত জন্মের কর্মফল—তাই এই তারতম্য। এই কথাও তোর খাটে না মা। একেবারে আদিকালের আদি সৃষ্টি দুটি মানুষ যদি তোরই সৃষ্ট হয়ে থাকে তবে তারা কেন প্রথম থেকে একেবারে ভিন্ন চরিত্রের? মানুষ ও শয়তানের সৃষ্টি যদি একই সংগে হয়ে থাকে তবে শয়তানকেও কি তুই সৃষ্টি করেছিস? তা যদি হয় তবে শয়তান যা করছে বা তার ক্রিয়াকলাপের জন্য যা ঘটছে সবই তোর দায়িত্ব। তোর ভক্তরা বলছে তুই নাকি দেখতে চাস্ শয়তান ভাল হয় কি না? তোর ইচ্ছার ব্যতিরেকে শয়তান কি নিজ শক্তির জোরে ভাল হতে পারে? তা যদি হয় তবে তোকে তার প্রয়োজন কি? না কি তোর ভক্তবৃন্দ বলবে—যেটুকু মা ইচ্ছে করে আশীর্বাদ করবেন তাই শয়তানের ভাগ্যেও ঘটবে। তাহলে আবার সেই কথা আসে কিছুই যখন মানুষ বা শয়তান করতে পারে না—সবই তোর ইচ্ছেতে ঘটে এবং তুই সবই আগে থেকে ঠিক করে দিয়েছিস ও নিয়ন্ত্রণ করছিস, তবে আমাদের আর করার কি রইল—তোকে ডাকলেও যা হবে না ডাকলেও তাই হবে। কে কতটুকু তোকে ডাকবে তাও যখন তোরই নিয়ন্ত্রণাধীনে তখন রইলি তুই পড়ে— তোকে আমার ডাকার প্রয়োজন নেই— তোর যুক্তিহীন খেলার সামগ্রী আমি হব না। তোর অর্থহীন যুক্তিহীন অলৌকিক শক্তির পূজারী আর যেই হোক না কেন, আমি নই। মানুষের

শরীর যদি ভাল থাকে তাহলে প্রত্যেকের মন মানুষ আনন্দে মেতে ওঠে প্রকৃতির সৌন্দর্য উপভোগ করবার জন্য।

আপনিও স্বাস্থ্য ভাল রাখার জন্য সাধনার অব্যর্থ মহৌষধ প্রতিদিন আহারের পর দুইবার করে দু'চামচ মৃতসঞ্জীবনীর সঙ্গে চার চামচ মহাদ্রাক্ষারিষ্ট (৬ বৎসরের পুরাতন) খাবেন। এতে ক্লান্তি দূর করে, খিদে ও হজমশক্তি বাড়ে, সর্দি কাশি থেকে রেহাই পাবেন।

সাধনা ঔষধালয় ঢাকা

অধ্যক্ষ ডাঃ যোগেশ চন্দ্র ঘোষ, এম-এ, আয়ুর্বেদশাস্ত্রী, এফ,সি,এস, (লণ্ডন), এম,সি,এস, (আমেরিকা), ভাগলপুর কলেজের রসায়ণ শাস্ত্রের ভূতপূর্ব্ব অধ্যাপক।

কলিকাতা কেন্দ্র ডাঃ নরেশ চন্দ্র ঘোষ, এম-বি, বি-এস, আয়ুর্ব্বেদাচার্য্য।

৩৬, সাধনা ঔষধালয় রোড
সাধনা নগর, কলিকাতা ৪৮

শক্তি বুঝি—পুরুষকার বুঝি। তোকে ডেকে ডেকে পুরুষকারকে বিন্দুমাত্র খর্ব করতে চাই না। পরম ব্রহ্ম বুঝি না, আত্মা বুঝি না, পরজন্ম বুঝি না। যদি বর্তমান না বুঝি—পরাধীনতার বেদনা না বুঝি—মানুষের সংঘবদ্ধ শক্তির ওপর আস্থা না রাখতে পারি—বিদেশী সরকারের জোয়াল মুক্ত হওয়ার জন্য কেবল ব্যক্তিগতভাবে নয়, সংঘবদ্ধভাবে চেষ্টা না করি—তবে 'তোর ইচ্ছাই পূর্ণ হবে' এই বলে চোখ বন্ধ করে পরমার্থ লাভের আশায় বসে থেকে আত্মপ্রবঞ্চনা করতে রাজী নই। যদি তুই কোন দিন তোর favouritism, nepotism ছাড়তে পারিস, যদি তোর লীলা খেলার বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা দিতে পারিস, যদি ভক্তবৃন্দের দুর্বল মনকে 'সবই তোর পুতুল খেলা'—এই মিথ্যার শেষ আশ্রয় থেকে মুক্তি দিতে পারিস, যদি গতজন্ম বা পরজন্ম দিয়ে বর্তমানকে গোঁজামিল দিয়ে মিথ্যা বোঝাবার প্রয়াস ছাড়িস, তবে আমার কাছে আসিস—আবার আমি তোর সাধক হব—আবার আমি নিরাকার ব্রহ্মের উপাসক হব; নইলে আজ থেকে তোর সঙ্গে আমার সমস্ত সম্পর্ক শেষ হল।"

করুণাময়ী মায়ের প্রতি কি অভিমান—কত অন্তরের অভিযোগ! অনুসন্ধানী মন, যুক্তি দিয়ে মায়ের অস্তিত্ব বুঝতে চায়—নিরাকার সর্বশক্তিময় ব্রহ্মের আকারে বা সাকারে তাঁর শক্তির যুক্তিপূর্ণ বাস্তব চিত্র পেতে চায়। শেষ পর্যন্ত দেখা গেল—"লীলা খেলা," "সর্বশক্তিময়ের ইচ্ছা", "পরজন্ম", "গতজন্ম", "আত্মা" প্রভৃতির বৈজ্ঞানিক যুক্তি মা কালী আর আমাকে দিতে পারলেন না। কাজেই ধীরে ধীরে, যা আগে অভিমান ও অভিযোগ ছিল "মায়ের" প্রতি, তার রূপ বদলাল। যুক্তির কাছে অভিমান বা অভিযোগের স্থান থাকতে পারে না। প্রকৃত বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গীকে আশ্রয় করে যুক্তিহীন ভাববিলাসের জগৎ থেকে মুক্তি নিলাম। মানুষের কর্মশক্তির ওপর অসাধারণ বিশ্বাস জন্মাল। মানুষ ইতিহাস গড়বে। মানুষকে—অন্তত আমাদের যুবক বিপ্লবী দলকে, অলৌকিক বা ঐশ্বরিক শক্তির উপাসক তৈরি করে তাদের পুরুষকারকে দুর্বল করে দেওয়া আমরা তখন বিবেক-বিরুদ্ধ মনে করলাম।

আমাদের মধ্যে কে কি ভেবেছিলেন বা এই সম্বন্ধে তার কিরূপ অভিমত তা' বিশ্লেষণ করে বলতে পারব না। কারণ যেভাবে আমার অন্তরে আধ্যাত্মিকতার ক্রমবিকাশ ও বিবর্তন হয়েছিল, যার খানিকটা ধারণা দিতে এখানে চেষ্টা করেছি, সেইরূপ কোন আলোচনাই আর কারো সঙ্গে আমার তখন হয় নি। মাস্টারদা আমার এই আধ্যাত্মিকতার ক্রমবিকাশের ইতিহাস জানতেন। কোনদিন কোন প্রতিবাদ করেন নি। তবে তিনি কতখানি ভগবানে বিশ্বাসী ছিলেন তার ঠিক হদিস তিনি আমাদের দেন নি; ভগবানে বিশ্বাস একেবারে একান্ত নিজের ব্যাপার। ১৯২৮-৩০ সালে আমাদের সংগঠনে সভ্যদের জন্য ১৯১৮-২৪ সালের মত কঠোর ব্যবস্থা রাখি নি। আমার ও গণেশের মত বোধহয় এ বিষয়ে অভিন্ন ছিল। "বোধহয়" বলার কারণ আনুষ্ঠানিকভাবে আমাদের মধ্যে এই বিষয়ে কখনও আলোচনা হয় নি; তবে একসঙ্গে কাজ করেছি, যুবক সভ্যদের কাছে প্রায় সময় একসঙ্গে কথা বলেছি, তা' থেকে গণেশের আধ্যাত্মিক মতামত সম্বন্ধে একটা ধারণা করা আমার পক্ষে খুব সহজ হয়েছিল। আমার অন্ধবিশ্বাস থেকে বৈজ্ঞানিক যুক্তিপূর্ণ দৃষ্টিভঙ্গীতে উত্তরণের ইতিহাস খুব সংক্ষেপে বিবৃত করলাম। সর্বশেষে আমার বিনীত নিবেদন, এ আমার একান্ত নিজস্ব ধারণা ও অনুভূতি, কারো ভক্তিভাব, ভগবানে বিশ্বাস, পরব্রহ্মে আস্থা প্রভৃতির ওপর কটাক্ষ করবার ইচ্ছায় এই অধ্যায়টি লিখি নি। ইতিহাসের একটি অতি প্রয়োজনীয় অংশ মনে করেই এই প্রসঙ্গে আমায় আসতে হয়েছে। আমার মত একজন অন্ধ গোঁড়া ভগবৎ বিশ্বাসীর আধ্যাত্মিক বিবর্তন কিভাবে পুরুষকারের মধ্যে আত্মপ্রকাশ করে এবং বিপ্লবী সৈনিক হিসাবে ১৯৩০ সালের চট্টগ্রামের যুব-বিদ্রোহে কিভাবে প্রস্তুতি ও আক্রমণপর্বে আমি অংশ গ্রহণ করি সেই তথ্য প্রকাশ করবার জন্য যে সত্যি ঘটনা বলার প্রয়োজন তাই মাত্র বললাম। এর মধ্যে কোন উদ্দেশ্যমূলক প্রচারের চেষ্টা খুঁজে বেড়ালে ভুল হবে। আমার বাস্তব জ্ঞানে বেশ বুঝতে পারি যে মাত্র এইটুকু লিখে কোন ভগবান বিশ্বাসী মনকে যে বিন্দুমাত্র টলাতে পারে এমন ক্ষমতা কারো নেই। আমার ঈশ্বর বিশ্বাসের যুগে যদি আমাকে কেউ হাজারটা যুক্তি দিয়েও মা কালীর অস্তিত্বের বিরুদ্ধে বোঝাতে চাইত তবে কি আমি তা' মন থেকে মেনে নিতে পারতাম? যুক্তিতে ঠেকে গেলেও মন থেকে অন্ধ বিশ্বাস মুছে ফেলা যায় না। যুক্তির কাছে অন্ধ ভগবৎ বিশ্বাস পরাস্ত হবে কি না তা' কেবল সে নিজেই বলতে পারে। আধ্যাত্মিকতার বিরাট শাস্ত্র নিয়ে আমি কখনই মাথা ঘামাতে চাই না। আমি কারুকে আমার কথায় শিক্ষা দেওয়ারও প্রয়োজন মনে করি না। বর্তমান নিয়ে আমার কাজ—যা' স্পষ্ট বুঝি, দেখি, জানি, শুনি, তাই নিয়েই চলতে চাই। অলৌকিক বা ঐশ্বরিক শক্তির অস্তিত্ব কোন যুক্তিপূর্ণ ভিত্তি ছাড়া আমি মেনে নিই নি—এখনও নিই না। দুর্বল মনের ভক্তি আমার উপসনার বস্তু নয়। কোনমতে বেঁচে থাকার জন্য যখন আর কোন উপায় থাকে না তখন নিঃস্ব দরিদ্র মনকে সান্ত্বনা দেওয়ার জন্য ভগবৎ ভক্তি ছাড়া আর উপায় কি? এই বিষয়টি এত sensetive (অনুভূতিশীল) যে এই নিয়ে সর্বদাই বিতর্কের সৃষ্টি হয়। আমার সেই বিতর্কে যাওয়ার প্রয়োজন নেই, কারণ, আমি কারুকে আমার মত গ্রহণ করতে অনুরোধও করছি না বা কারো কাছ থেকে ভগবৎ বিশ্বাসের মত গ্রহণের জন্য প্রস্তুত নই।

[ক্রমশঃ]

David Hare

Peary Chand Mittra

মূল্যঃ এক টাকা মাত্র

প্যারীচাঁদ মিত্র ওরফে টেকচাঁদ ঠাকুরের ১৮৭৭ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত মূল্যবান ইংরাজী ভাষায় লিখিত গ্রন্থখানি বসুমতী সাহিত্য মন্দির জাতির পূর্ণাঙ্গ ইতিহাসের অন্যতম প্রামাণ্য বিবরণী হিসাবে পুনঃ প্রকাশ করিয়াছেন।

বসুমতী প্রাইভেট লিমিটেড

১৬৬, বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী স্ট্রীট, কলিকাতা—১২

অথচ এমন ছিল না। হৃদয় অপিস থেকে ফিরলে মল্লিকাই ছুটে আসত সর্বাগ্রে। বলত—'চৌকির ওপরে চুপটি করে বস ত'।' তারপর, জুতো টাই কোট হাত-ঘড়ি—সব এক-এক করে খুলে যার যার জায়গায় রেখে দিত। জুতো খোলার ব্যাপারটায় প্রথমটা আপত্তিই করেছিলেন হৃদয়। কাজটা কেমন যেন অবমাননাকর আর

মল্লিকা-সংবাদ

শঙ্কর চক্রবর্তী

অসম্মানজনক বলে মনে হয়েছিল। তবু বাধা দেন নি। এই আন্তরিক সেবাপরায়ণতার মনোভাবটা আনন্দই দিত হৃদয়কে। ঠোঁটের ডগায় এক ঝলক হাসি ঝুলিয়ে মল্লিকা বলত—'খুব কষ্ট হয়েছে আজ, তাই না?' 'না, কিছু মাত্র না।' হেসে উড়িয়ে দিতেন তিনি স্ত্রীর এ সন্দেহ। এক ঝলক অকারণ হাসিতে মল্লিকার মুখখানা ঝিকমিক করে উঠত। বলত—'একটু বিশ্রাম কর, সরবৎ নিয়ে আসছি।'

'আহা, একটু দাঁড়াও না—'

'এখুনি আসছি।' হরিণীর মত দ্রুতপায়ে বেরিয়ে যেত মল্লিকা। চাকর আছে রঘু। ওকে বললে সরবৎটা ওই করে আনতে পারে। এ বাড়ির খুনসুটি সবই ওর নখদর্পণে। তবু, নিজেই যেত মল্লিকা। একটু পরেই ফিরে আসত সরবৎ নিয়ে।—'শরীরটা আগে ঠান্ডা কর ত'।' সরবৎ খেয়ে গ্লাসটা নামিয়ে রাখলে জিজ্ঞাসা করত ও—'ওদিকের কদ্দূর? সিমেন্টের পারমিটটা বের করা গেল?'

'হ্যাঁ। অনেক ধরা-পড়া করতে হল। কিছু টাকারও খয়রাতি—'

'বাড়ির নতুন প্ল্যান কিন্তু আমিই করব। ওদিকের ঘর দুটো ভেঙে—'

'বেশ ত', বেশ—; তাই না হয় হবে—'

'তুহিনাদের কান্ডটা একবার দেখেছ? দোতলা তুলেছে! আমরা কিন্তু অন্তত আর একটা তলা বাড়াব। এটা প্রেস্টিজের প্রশ্ন। আর হ্যাঁ, মধ্যযুগীয় আর্ট কিন্তু চলবে না। যাকে বলে—'

হো হো করে হেসে উঠতেন হৃদয়।—

'আর্ট? ওসব বাপু আমি বুঝি না। আমার যা আর্ট সে তুমি—গোটা জীবনটাই ত' একেবারে আর্ট-গ্যালারি বানিয়ে ফেলেছ।'

'হুঁ, যাও। মাথা খাও, কথাটা যেন মনে থাকে।'

মনে ছিল। ঠিক দু' দিন বাদে সিমেণ্ট এলো। বালি এলো। ইঁট। ঘড়-ঘড়-খুট্-খাট্-ঠনাঠন — বিচিত্র শব্দে সুরু হল ভাঙা ও গড়ার কাজ। সে যুগের আলাদিনের আশ্চর্য প্রদীপ ছিল। এ যুগের নেই বলে এরা কিছু কম যাদু জানে না। দেখতে দেখতে গাঁথনি শেষ। এর পরে মল্লিকা বলল —'এ ঘরে আর তোমার থাকা চলবে না। নতুন ঘরে যেতে হবে। ওপরের উত্তর দিকের ঘরখানা—'

'আমি কেন? তোমরাই ত' আছ?' প্রস্তাবটা এড়িয়ে গিয়েছিলেন তিনি।

'না না, সে হবে না!' বলেছিল মল্লিকা—'একটা ঘরে তুমি থাকবে। ওদের কাছে নইলে আমার প্রেস্টিজ থাকবে না। এ ঘরে থাকাটা তোমার মানায় না। এ ম্যান অব পজিশন—'

এই ওদেরটা যে কাদের, এবং প্রেস্টিজ-এর কথাটা কেন বার বার করে বলছে মল্লিকা—ঠিক বুঝতে পারেন নি হৃদয়। মল্লিকার মুখের দিকে তাকিয়েছেন। কিছুক্ষণ দৃষ্টি অপলক রেখেও কিছু আঁচ করতে না পেরে বলেছেন—'এই ত' আমি বেশ আছি। এই পুরোন ঘরখানার সঙ্গে একটা নাড়ীর সম্পর্ক গড়ে উঠেছে। একে চট করে ছাড়তে গেলে—'

'এসব কিন্তু তোমার বাজে সেণ্টিমেণ্ট।' অসন্তোষের মেঘ ঘনিয়ে এসেছে মল্লিকার সারা মুখখানা জুড়ে। এসব তবু ভ্রূক্ষেপ করেন নি হৃদয়। হেসে উঠেছেন।

মল্লিকার অসন্তুষ্ট ক্ষুণ্ণ ভাবটা মুখের ওপরে দানা বেঁধেছে। আহত দৃষ্টিতে জরিপ করেছে সে হৃদয়ের মুখখানা। তবু, একে খুব বেশি গুরুত্ব দেন নি তিনি। ঘরোয়া জীবনে এমন কতই ত' মেঘ ঘনায়। কিন্তু সবই তাৎক্ষণিক। প্রসন্নতার উত্তুরে বাতাস বইতে বেশি সময় লাগে না। কিন্তু এই প্রেস্টিজের ব্যাপারটা একটু দুর্বোধ্যই মনে হল। চাকরী-জীবনে হৃদয়ের উন্নতি হয়েছে যথেষ্ট। মিস্টার দত্ত থেকে মিস্টার ডাট্—গুণলেও ধাপগুলো নেহাৎ কম হবে না। প্রতিষ্ঠা সম্মান প্রতিপত্তি বিত্ত—জীবনে আকাঙ্ক্ষণীয় যা—বলতে গেলে তার সব কিছুই পেয়েছেন তিনি। কোট-প্যাণ্ট আর টাই পরে ঘড়ি ধরে অপিস যাওয়া, কাজকর্মের ও দায়িত্বের চাপ বৃদ্ধি—সবই এ কর্মজীবনের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। তবু, মল্লিকার এই প্রেস্টিজ-বোধটা কেমন খাপছাড়াই মনে হয়েছে। ওর পোশাক-আসাকের অতি-মার্জিত সূক্ষ্মত্বটুকু আজকাল নজরে পড়ে বটে—স্নো পাউডার লিপস্টিক ক্রীম থেকে সুরু করে প্রসাধনী সামগ্রীর প্রায় সব কিছুই আজকাল বাড়িতে মজুত করা হয়েছে। জুতোর হিলটা উঠেছে, পোশাকের দৈর্ঘ্য-প্রস্থ কমেছে কিছুটা। একটা অকারণ চটক ও অহেতুক স্মার্টনেস লক্ষ্য করা যায় কথাবার্তা ও চালচলনে। তবু, সবটাই যে হৃদয়ের ব্যক্তিগত উন্নতির জন্য—এ কথা ভাবতে পারেন না তিনি।

এই ভাবেই আরও কয়েকটা বছর পার হয়ে গেলেন হৃদয়। চাকরী-জীবনে আরও ক-ধাপ উন্নতি হল। মল্লিকার বায়নাক্কাগুলো প্রথমটা খুব মধুরই মনে হত। ওর চাহিদার যোগান দেওয়াটা গৌরবের মনে করতেন হৃদয়। গহনার 'আর্ট' ও 'আধুনিকতা'র দিকে নজরটা একটু বেশিই ছিল মল্লিকার। কাজেই কোন গহনাই দীর্ঘ-দিন একনাগাড়ে টিকতে পারত না। গহনার ডিজাইন, আর্টের অভিনবত্ব, আলট্রা মডার্ন শিল্পচিন্তার বৈশিষ্ট্য ইত্যাদি নিয়ে নানা তর্ক উঠত। ধীরে ধীরে সব কেমন যেন বোঝার মত চেপে বসছিল চিন্তার ওপরে। মল্লিকা যে একাধিক মহিলা প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত—এ তথ্যটি উদ্ঘাটিত হতে কিছু দিন সময় লাগল। জানবার পর একদিন জিজ্ঞাসা করেছিলেন হৃদয়—'কথাটা কি সত্যি?'

'হুঁ—' ঘাড় ঝাঁকিয়েছিল মল্লিকা —'এটা মহিলা প্রগতির যুগ; বাইরের সঙ্গে যোগাযোগ ত' রাখতেই হবে।'

'কি কাজ?'

'কাজের কি কিছু অন্ত আছে?' মল্লিকার ঠোঁটে উচ্ছল হাসি।—'মিস্টার চাকলাদার ত' আমাদের এ প্রচেষ্টাকে খুব প্রশংসা করেছেন। উনি বলেন, এ যুগে আমাদের কাজও কিছু কম নয়।'

কিছুক্ষণ কেমন গুম হয়ে থাকেন হৃদয়। কি যেন ভাবেন। চোখ দুটো ভাবলেশহীন আর শূন্য হয়ে যায়। মনের মধ্যে স্ত্রীর কথাগুলো ঘুরিয়ে ফিরিয়ে আলোচনা করেন। শেষ অবধি হেসেই জবাব দেন—'হুঁ, ভালই ত'। ভেরী গুড।'

এর পরে উত্তরোত্তরই মল্লিকার এ তল্লাটে আসাটা কমে আসছিল। নিজে না এসে পাঠিয়ে দিত রঘুকে। জিজ্ঞাসা করলে জবাব দিত রঘু—'মা খুব ব্যস্ত। তাই—'

সরবৎ বিস্বাদ লাগত অতঃপর। এক চুমুকে—যেন তিক্ত অস্বস্তিকর কিছু পান করতে বাধ্য হচ্ছেন—এমনি-ভাবে গেলাসের সরবৎটুকু নিঃশেষ করে সেটি ফিরিয়ে দিতে দিতে একটি দীর্ঘশ্বাস ফেলেছেন হৃদয়। মল্লিকার সাড়া পেলে জিজ্ঞাসা করেছেন—'তুমি কি আজকাল সময় একেবারেই পাচ্ছ না?'

'কই আর—কাজ একবার ঘাড়ে চাপলে—' চোখ তুলে, হৃদয়কে আপাদ-মস্তক জরিপ করার ভঙ্গিতে তাকিয়েছে মল্লিকা।—মুখে জোর করে হাসি টেনে এনে বলেছে—'তুমি কিছু মনে করবে না তা আমি জানি।'

মনে করতে চান নি হৃদয়। তবু মনে হয়েছে। আর ঠিক সেই সময়েই বুকের ভেতরটা চিনচিন করে উঠেছে। বুঝতে কষ্ট হয় নি যে, যে-ভূমিকম্পটা সুরু হয়েছে তাতে এই ছোট চিড়টাই ধীরে ধীরে ফাটলে পরিণত হবে। তারপর গহ্বর। বুকের ভেতরে ধড়াস করে উঠেছে। ভয় পেয়েছেন হৃদয়। সব কেমন যেন অর্থহীন—শূন্যগর্ভ মনে হত। মান সম্মান, প্রতিষ্ঠা প্রতিপত্তি, যশ—এতদিনকার সব কিছুই অকস্মাৎ বিদ্রূপের মত লেগেছে। জীবনযাপনে সে নিষ্ঠা, সে উৎসাহ এবং ঐকান্তিকতা কমে আসছিল ধীরে ধীরে। উদ্যমেও ভাটা পড়ছিল। তবু, দম দেওয়া স্প্রিংয়ের পুতুলের মত কাজ করছিলেন তিনি।

সেদিন অপিসের জরুরী কাজকর্ম শেষ করে বাড়ি ফিরতে বিলম্ব হয়েছিল কিছুটা। কাছেপিঠে কাউকেই না দেখে রঘুকেই চিৎকার করে ডাকলেন হৃদয়। রঘু কর্তব্যনিষ্ঠ। একটু পরেই ছুটে এলো। 'তোর মা কোথায়?' ওর মুখের দিকে তাকালেন তিনি।

কুণ্ঠিত গলায়, ইতস্তত করে জবাব দিল রঘু।—'কোথায় গেলেন তা ত' জানি না। এখনও ত' ফিরে আসেন নি।'

'অ্যাঁ!' ভৃত্যের কাছে নিজের স্ত্রীর খবর নেওয়াটা শোভনতা নয়। কথাটা মনে হল। বার কয়েক ঢোক গিলে, কি একটা অপরাধ করছেন যেন —এমনি গলায় জিজ্ঞাসা করলেন— 'কখন বেরিয়েছে?'

'তখন দুপুরবেলা হবে। হ্যাঁ, দালানের ঘড়িটায় ত' তখনি একটা বাজল।'

'দুপুরবেলা?' প্রথমটা হৃদয় ধাক্কা খেলেন। আঁৎকে উঠলেন।

চোখ দুটো কপালে উঠল। কিছুক্ষণ আর একটি কথাও বেরুল না মুখ দিয়ে। তালুটা শুকিয়ে উঠছিল। জিভ দিয়ে বার কয়েক সেটা ভিজিয়ে নিতে প্রয়াস পেলেন। সেই গহ্বরটা চোখের সামনে অকস্মাৎ দুলে উঠল। তোতলার মত কোনমতে উচ্চারণ করলেন—'ও—'

'আপনার সরবৎ—' ইতস্তত করছিল রঘু। ঘন ঘন হৃদয়ের মুখের দিকে তাকাচ্ছিল। মুখখানা যে ব্লটিং-য়ের মত ফ্যাকাশে নিষ্প্রভ হয়ে গেছে —তা স্পষ্ট দেখতে পেয়েছে ও।

হৃদয় বাধা দিলেন—'না থাক। তুই যা।'

গুটি গুটি পায়ে বেরিয়ে গেল রঘু। নিষ্প্রাণ পাথরের স্তূপের মত ইজিচেয়ারের ওপরে পড়ে রইলেন হৃদয়। একটা সিগারেট বের করলেন কেস থেকে। মুখে পুরে দেশলাইটা হাতে নিলেন। তারপর কি মনে হতে হাত বাড়িয়ে টেবিলের ওপরে রেখে দিলেন সেগুলো। কোন উৎসাহ পাচ্ছেন না। চোখের সামনে কেমন যেন ধোঁয়া ধোঁয়া। বাকী ভবিষ্যৎটা এই মুহূর্তে দেখতে পাচ্ছেন তিনি। তিক্ততা—দুর্বিষহ তিক্ততা! গহ্বরটা আরও বিস্তৃত হয়েছে। কালো কুৎসিত ভয়ঙ্কর গর্তটা স্পষ্ট হয়ে উঠেছে চোখের সামনে। বুক ঠেলে একটা দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে এলো। জানলাগুলো কি বন্ধ? তবে এমন গরম বোধ হচ্ছে কেন? চোখ চালিয়ে চারিদিকটা এক-বার দেখে নিলেন হৃদয়। রুমাল বের করে গাল-গলার ঘাম মুছতে গিয়েই বুঝতে পারলেন—অপিসের পোশাক এখনও খোলা হয় নি। অবসন্নের মত উঠে দাঁড়ালেন তিনি। কোট খুললেন। টাইটা খুলতে গিয়ে অন্য-মনস্কতার জন্য গলায় টান লাগল। আজ আর ব্রাকেট নয়। দু পা এগিয়ে যেতেও ইচ্ছা করছে না এই মুহূর্তে। টেবিলের ওপরেই ছুঁড়ে দিলেন সেগুলো। জুতো জোড়া খুলে অব-হেলায় চৌকির নিচে গড়িয়ে দিলেন। ভেতরে একটা জ্বালা অনুভূত হচ্ছে। সূচীমুখ অস্বস্তি। মল্লিকার এত-দিনকার ব্যবহার—আচার-আচরণের প্রতিটি দিক—স্পষ্ট হয়ে উঠেছে চোখের ওপরে। ছলনা দিয়ে, অন্যায় দিয়ে, মায়াবী অত্যাচার দিয়ে যে সে এমনই কিছু একটা অনিবার্য করে তুলছিল— এতদিন কেন তা বুঝতে পারেন নি হৃদয়? মানুষের সততা, মানুষের শিক্ষা-দীক্ষা, স্নেহ-প্রেম-প্রীতিকে কি তিনি অকারণে অতিমাত্রায় বিশ্বাস করে বসেছিলেন? তারই সুযোগ নিয়ে মল্লিকা—

দু মুহূর্ত স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন তিনি। হাত-ঘড়িটা খুলতে গিয়ে ঘড়িটার ডায়ালের ওপরে চোখ পড়ল। ন'টা বাজতে মিনিট তিনেক। এত রাত হয়ে গেছে? তাই হবে। কেন না, ও-বাড়ির ছোট ছেলেটা আর চিৎকার করে পড়ছে না। ন'টার কিছু আগে পর্যন্তও ওর গলা শুনতে পাওয়া যায়। রোজ অপিস থেকে ফেরার পরও প্রায় ঘণ্টা দুয়েক পড়ার শব্দ শুনতে পান হৃদয়। আজ পান নি। ফিরতে আজ দেরি হয়েছে। আধ ঘণ্টার বেশি কানে আসে নি শব্দটা। চারিদিক কেমন যেন থমথম করছে। গুমোট ভারী একটা অসহনীয় স্তব্ধতা আচ্ছন্ন করে রেখেছে সব কিছু। ঘেমে উঠছিলেন হৃদয়। বুক ভরে বাতাস টানবার জন্যই হয়ত দরজার দিকে এগিয়ে এলেন ক' পা। তারপর কি মনে হতে পিছিয়ে গিয়ে ফ্যানের সুইচে হাত দিলেন। 'অঃ—' একটা অস্ফুট ধ্বনি বের হল মুখ দিয়ে। ইজিচেয়ারের ওপরে ধপ করে বসে পড়লেন তিনি। ডান দিকের জানলাটা খোলা। নীলাভ পাতলা পর্দা ভেদ করে বাইরের দৃশ্য আবছা চোখে পড়ে। ঠিক ওপাশেই সদর দরজা। সংলগ্ন বড় রাস্তা থেকে গাড়ি-ঘোড়ার আনাগোনার শব্দ ভেসে আসে। নানা চিন্তা জট পাকাচ্ছিল মনের ভেতরে। তারই মাঝে ক্লান্তিতে কখন বুঝি চোখের পাতা দুটো বুজে এসেছিল হৃদয়ের। অস্পষ্ট চেতনার মাঝেই এক সময় মনে হল রাস্তার ওপরে একটি ট্যাক্সি এসে দাঁড়াল। সচেতন হয়ে উঠল স্নায়ুগুলো। বার কয়েক চোখ পিটপিট করে ঝাপসা ভাবটা কাটিয়ে দৃষ্টি তীক্ষ্ণ করে তাকালেন হৃদয়। ট্যাক্সি থেকে নেমে এসেছে একটি পুরুষ। শালপ্রাংশু দেহ। দূর হতে যতটা আন্দাজ করা যায়—তাতে প্রৌঢ় বলেই মনে হয়। তবু, বাঙালী সমাজে অমন দৈর্ঘ্য সচরাচর নজরে পড়ে না। চোখে চশমা। পরণে স্যুট-প্যাণ্ট। মুখে চুরুট। 'চাকলাদার'! বিড়বিড় করলেন হৃদয়। নেমে দরজা খুলে ধরতেই বেরিয়ে এল মল্লিকা। ও কি হাসছে? হাসির উচ্ছ্বাসে কি ফেটে পড়ছে মল্লিকার দেহটা? দাঁড়িয়ে দু মুহূর্ত কি যেন কথা হল ওদের ভেতরে। শুনতে পেলেন না হৃদয়। পুরুষ কণ্ঠের গম্ভীর অস্পষ্ট আওয়াজটা শুধু কানের পর্দায় এসে ধাক্কা মারল।—'গুডনাইট।'

একটুক্ষণ পরেই সমস্ত পরি-স্থিতিটা কেমন অসুস্থ মনে হল হৃদয়ের। উসখুস করলেন তিনি। উঠে একবার ঘড়িটার দিকে তাকালেন। তারপর 'রঘু-রঘু—' চিৎকার করে ডেকে উঠলেন। রঘু এসে দাঁড়াতেই জিজ্ঞাসা করলেন।

'তোর মা কি ফিরল?'

'হুঁ—' নিরীহভাবে ঘাড় ঝাঁকাল রঘু। শানের ওপরে দৃষ্টি নিবদ্ধ করল।

'একবার ডেকে দে ত'—'

'আচ্ছা—' পা বাড়াচ্ছিল রঘু।

'এখনি আসতে বলবি।' বাধা দিলেন হৃদয়।

'হুঁ—' বেরিয়ে গেল ও।

চোখের ডগায় সমস্ত একাগ্রতা জড় করে খোলা দরজার দিকে তাকিয়ে রইলেন হৃদয়। ঝিমুনি এসেছিল। এখন চোখ দুটো জ্বলছে। দৃষ্টি ঝাপসা মনে হচ্ছে। হাই উঠছে থেকে থেকে। ঘুম না এলে এমনি হয়। মুহূর্ত পরেই ফিরে এলো রঘু। গুটি গুটি পায়ে সন্ত্রস্তের মত সামনে এসে দাঁড়াল।—'মা এখন আসতে পারছেন না।'

'কেন?' যেন ওকেই ধমকে উঠতে গিয়ে নিজেকে সামলে নিলেন হৃদয়।

বিড়বিড় করে রঘু বলল— 'বললেন ক্লান্ত।'

'ও!' ফাটা বেলুনের মত চুপসে গেলেন হৃদয়। একটি দীর্ঘশ্বাস পড়ল। —'আচ্ছা, তুই যা।'

একটু ইতস্তত করল রঘু। নখ খুঁটল। পায়ের নখ দিয়ে আঁচড় কাটল শানের ওপরে। ডান হাতের আঙুল-গুলো রুক্ষ চুলের মধ্যে চালিয়ে অস্পষ্ট গলায় জিজ্ঞাসা করল—'রাত ত' অনেক হল। খাবারটা কি—'

'আজ আর খিদে নেই। যা—'

'কিন্তু—'

'আঃ—, বিরক্ত করিস না।' এতক্ষণে হৃদয়ের মেজাজটা রুক্ষ হয়ে উঠল। স্থৈর্যের বাঁধ ভেঙে গেছে। চোরের মত বেরিয়ে গেল রঘু।

সকালবেলা যে মল্লিকা নিজেই এসে পড়বে তা স্বপ্নেরও অগোচর ছিল হৃদয়ের। যথারীতি ঘুম হতে উঠে প্রাতঃকৃত্য শেষ করে খবরের কাগজের পাতার ওপরে দৃষ্টি স্থির করেছেন তিনি। মনের ভেতরটা তিক্ত। অস্বস্তিটা সারা দেহ-মনে তরল আগুনের মত ছড়িয়ে গিয়ে এক ক্লান্তি-কর জ্বালার সৃষ্টি করেছে। একটা সিগারেট ধরিয়েছিলেন—কিন্তু টান দিতেই বিস্বাদ লাগায় সেটি রেখে

দিয়েছেন এ্যাসট্রের মধ্যে। পায়ের শব্দটা সম্মুখে এসে থামতে মুখ তুললেন তিনি। পরক্ষণেই দৃষ্টি নামিয়ে নিয়ে কাগজের ওপরে নিবদ্ধ করলেন। দু মুহূর্ত মল্লিকা স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। তারপর তার গলার স্বর শোনা গেল।—'কাল রাতে বড় টায়ার্ড ফিল করছিলাম। তাই—' কোন জবাব দিলেন না হৃদয়। কাগজটা উল্টাতে গিয়ে একটু শব্দ হল শুধু।

'ফিরতে কাল একটু দেরি হয়ে গেল। মিঃ চাকলাদার বিশেষভাবে অনুরোধ করলেন তাঁর পার্টিতে যাওয়ার জন্য। ভেরি গুড ম্যান। না গেলে হয়ত মনঃক্ষুন্ন হতেন। তাই—' এবারেও ও-তরফ হতে কোন জবাব না পেয়ে একটু ঝাঁঝাল হয়ে উঠল মল্লিকা।—'বাঙালী জাতটার এই স্ত্রী-জাতিটাকে একটা ব্যক্তিগত সম্পত্তি মনে করাটা একটা ফিলদি সেন্টিমেন্ট! ডিসগাস্টিং—'

'তার মানে?' চোখ তুললেন না হৃদয়। কথাগুলো তাঁর মুখ থেকে যেন ছিটকে বেরিয়ে এলো।

'তা নয় ত' কি?' মল্লিকার গলা উঠল দু পর্দা—'কাল ফিরতে একটু বেশি রাত হল। অমনি আর কি! সম্পত্তি না ভাবলে কেউ এমন মনে করতে পারে?'

'তোমার কথা ত' আগে এমন বাঁকা ছিল না?' এতক্ষণে চোখ তুললেন হৃদয়। মল্লিকার আপাদমস্তক একবার জরিপ করে নিলেন।—'এসব বুঝি তোমার ঐ অরগানাইজেশনের দৌলতে?'

'অর্গানাইজেশনের নামে কাদা ছিটিও না। এমন একটা প্রতিষ্ঠান—বিশেষ করে মিঃ চাকলাদারের মত লোক যার পৃষ্ঠপোষক—তার নামে—'

'মিঃ চাকলাদার! হুঁ—তা তিনিই বোধ করি গত কাল বাড়ির দোরগোড়া পর্যন্ত পৌঁছে দিয়েছিলেন তোমাকে?'

'হুঁ। নইলে কি যে অসুবিধা হত! ওঁর ভরসায়ই ত' পার্টিতে যেতে রাজী হয়েছিলাম।'

আর কোন কথা বললেন না হৃদয়। কাগজটা ভাঁজ করে উঠে দাঁড়ালেন। চকিতে এরই মধ্যে একবার টেবিলে-রক্ষিত হাত-ঘড়ির দিকে নজর পড়ল। সময় হয় নি। তবু ঘরের হাওয়াটা অসহ্য ঠেকছিল হৃদয়ের। এখুনি বেরিয়ে পড়বার জন্য ভেতরে ভেতরে ছটফট করছিলেন তিনি। ও'কে উঠতে দেখে কি যেন—বলতে যাচ্ছিল মল্লিকা। কিন্তু কোন কথা না শুনেই বাইরে বেরিয়ে গেলেন হৃদয়। ডাকতে লাগলেন—রঘু রঘু, জল দে—আমি এখুনি স্নান করব।'

মল্লিকা বলল—'আমার আরও কিছু কথা ছিল।'

'কি কথা?' পেছন ফিরে তাকালেন না হৃদয়। নিস্পৃহের মত কথাটা ছুঁড়ে দিলেন।

'আজকেও একটা ফাংশন আছে আমাদের অর্গানাইজেশনের। কাজেই—বাকীটা অনুমেয়। এক মুহূর্ত দাঁড়ালেন হৃদয়। তারপর হন্ হন্ করে কলতলার দিকে এগিয়ে গেলেন।

এমনি করেই সম্পর্কের ভেতরে চিড়টা ক্রমশ ফাটল এবং ফাটল থেকে গহ্বরে পরিণত হচ্ছিল। কদাচিৎ দু-একটা কথা-বার্তা হত উভয়ের মধ্যে। উভয়েই চাইত উভয়কে এড়িয়ে যেতে। অপিস থেকে ফিরে সরবতের প্রয়োজনটাও ক্রমেই কমে আসছিল। টুকি-টাকি দু-একটা কাজ রঘুই করে দিত। সরবতের কথা জিজ্ঞাসা করলে হৃদয় বলতেন—'না, দরকার নেই।' ধড়া-চূড়া ছেড়ে কলঘরে ঢুকে গালে-গলায় চোখে-মুখে অনেকক্ষণ ধরে জল ছিটাতেন তিনি। বেরিয়ে এসে ঢোলা পায়জামাটা পায়ে গলিয়ে গা-এলিয়ে দিতেন ইজি-চেয়ারে। সারা ঘরের আলো নিভিয়ে দেওয়া হ'ত। টেবিলের ওপরে স্বল্প-পাওয়ারী ঈষৎ নীলাভ আলোটা জ্বলত শুধু। আলোর বৃত্তের নিচে একখানা বই খুলে আধ-শোয়া হ'য়ে ব'সে থাকতেন হৃদয়। পড়া নয়। নতুন করে সে-অভ্যাসটিকে আর ঝালিয়ে নিতে চান না। তার দরকারই বা কি এমন? শুধু বিক্ষিপ্ত বিপন্ন মনটাকে গুটিয়ে আনা। মনটা ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকলে ব্যথার অনুভূতিটা তীব্র হ'য়ে ওঠে। চারিদিকের অন্তহীন শূন্যতার ভারটা চেপে বসে বুকের ওপরে। নিজের দিক থেকে কি কোন ত্রুটি ছিল হৃদয়ের? কোন গাফিলতি? যেখানে বাঁধন, যেখানে মাধুর্য—সেই সন্তানের প্রয়োজনটা একেবারে হেসে উড়িয়ে দিয়েছিল মল্লিকা। হৃদয় ভেবেছিলেন—চিরকাল এ-ভ্রান্তি থাকবে না। একদিন সংসারটা...মল্লিকার ছোট-খাট প্রেম-ভালবাসার খেলাটাও ত' প্রথমে অভিনয় বলে, অন্তঃসারশূন্য বলে ভাবেন নি হৃদয়। সব বরং মুগ্ধই করেছিল তাকে। পৃথিবীতে এখনও যে এমন মাধুর্য আছে—এমন নিষ্ঠা আর ঐকান্তিকতা আছে এ-কথা ভাবতে পেরে খুশিই হ'য়েছিলেন তিনি। কিন্তু কি যেন ঘটে গেল!

অপিস থেকে ফিরে চোখের ওপরে বই খুলে রেখে তাই আত্মগোপন করেন হৃদয়। সাড়া শব্দ নেই। টেবিলে-রক্ষিত হাত-ঘড়িটার ধুকপুকানির শব্দ কানে আসে। অবসন্নভাবে একটি সিগারেট ধরান হৃদয়। টানেন। আগে রাতের আহারটা ওদিকের ঘরেই সেরে আসতেন। এখন আর তা করেন না। সব থেকে কেমন বিচ্ছিন্ন করে ফেলেছেন তিনি নিজেকে। দশটা বাজলে খাবার দিয়ে যায় রঘু। কয়েকটি সিদ্ধ মাখন রুটি। ছানা। হাল্কা খাবারই খাচ্ছেন তিনি দীর্ঘদিন। শরীর ও মনের প্রফুল্লতার জন্যই এই ব্যবস্থা। খাওয়ার পরও ঘুম আসতে দু-ঘণ্টা। আগে এ সময়টা পায়চারী করতেন। এখন বই নিয়েই বসে থাকেন আলোর সামনে। এ-সবই এক রকম নিয়মে দাঁড়িয়ে গেছে। মল্লিকা বাড়ি থাকে কি না, কখন বের হয়, কখনই বা বাড়ি আসে—এসব খবর আজকাল আর নেন না। শুধু অনুমান করেন—বেশির ভাগ দিনই অনেক রাত করে বাড়ি ফেরে ও। একটি মোটরই ওকে পৌঁছে দিয়ে যায়। একটিমাত্র ভদ্রলোকই সঙ্গে আসেন রোজ।—মিস্টার চাকলাদার।

কখনও রাস্তায় দাঁড়িয়ে কিছু কথা হয়। কখনও হয় না। যেদিন মেয়েদের কোন পুরুষের ব্যক্তিগত মালিকানার কথাটা উল্লেখ করে অত্যন্ত অযৌক্তিকভাবে আঘাত করেছিল মল্লিকা—সেই-দিন থেকেই অতিমাত্রায় গম্ভীর হয়ে গেছেন হৃদয়। আয়নায় যেমন মানুষের মুখ দেখা যায়—তেমনি এক একটি হঠাৎ আচরণের মধ্য দিয়ে তার অন্তরটা উদ্ঘাটিত হয়ে পড়ে। মল্লিকার ভেতরটা স্পষ্ট দেখতে পেয়েছিলেন হৃদয়। কিন্তু এ নিয়ে তর্ক করা, বচসা করা—তাঁর অর্থহীন এবং ঘৃণ্য বলেই মনে হয়েছে। তবু, মল্লিকা ভদ্রঘরের মেয়ে। বাবা প্রফেসর। নাম-ডাক আছে। লোকে একাধিক গুণের জন্য সম্মান করে তাঁকে। শিক্ষা-দীক্ষা রুচি—সবদিক থেকেই ত' প্রফেসর পরিবারটি সমাজে শীর্ষস্থানীয়। মল্লিকার চিন্তাধারা এমন অসুস্থ হয়ে উঠল কি করে? এমন ভাঙা-চোরা অন্ধকার পথে পদক্ষেপ করল কেন ও? এমন বিকারগ্রস্ত হয়ে উঠল কেমন করে? ইদানীং যে নেশায়ও অভ্যস্ত হয়ে উঠেছে মল্লিকা—তাও যেন বুঝতে পেরেছেন হৃদয়। ক'দিনই রঘুর ওপরে টলে পড়েছে মল্লিকা। ব্যাপারটা বুঝতে না

পেরে ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়েছে রঘু। মল্লিকা হেসেছে—'পা-টা হড়কে গেল!' সবই লক্ষ্য করেছেন হৃদয়। ঘৃণায় ভেতরটা রি রি করে উঠেছে।

সেদিন রাত বারটার পর একটি ট্যাক্সি এসে দাঁড়ানর অস্পষ্ট শব্দ কানে এলো হৃদয়ের। গ্রাহ্য করলেন না। এ ত' অভ্যস্ত ঘটনা। মল্লিকা ফিরেছে নিশ্চয়ই। সঙ্গে মিঃ চাকলাদার। পেশছে দিতে এসেছেন তিনি। একবার মনে হল উঠে ব্যাপারটা দেখেন। ভেতরে ভেতরে উস্‌খুস্‌ করে উঠলেন। কিন্তু উঠতে ইচ্ছা করল না। কেমন যেন নিশ্চেষ্ট হয়ে আধ-শোয়া অবস্থায় পড়ে রইলেন তিনি। বিড় বিড় করে কি যেন উচ্চারণ করলেন আপন মনেই। একটু পরেই সম্পূর্ণ অপরিচিত কণ্ঠস্বর কানে এলো।—'বাড়ি আছেন? এটা হৃদয় দত্তের বাড়ি না?'

'কে?' উঠে দাঁড়াতে হল। না, এ-কণ্ঠস্বর ত' ইতিপূর্বে শোনেন নি। মনে মনে ভাবতে চেষ্টা করলেন হৃদয়। প্রণব? উঁহু—ওর গলার আওয়াজ আরও একটু ভারী। গমগমে। অপিসে যখন কথা বলে ছেলেটা চারিদিক তখন ঝম্‌ঝম্‌ করে ওঠে। সুবিনয়? না, সে ত' এখানে নেই। বাইরে চ'লে গেছে। দিদির অসুখের খবর পেয়ে চলে গেছে ও। অনিমিখ? কিন্তু তার গলার আওয়াজ ত' এমন ভারী নয়। কি একটা ভয়ংকর অসুখের পর থেকেই আওয়াজটা তার সরু আর মিন্‌মিনে হয়ে গেছে। আরও অনেকের মুখচ্ছবি ভেসে উঠল চোখের ওপরে। আরও অনেকের কণ্ঠস্বর যেন শুনতে পেলেন হৃদয়। ভাবলেন, সে সব থেকেই এ-আওয়াজ একটু যেন স্বতন্ত্র। এর ভেতরে কোথায় যেন কেমন একটা উৎকণ্ঠার বাষ্প আছে। কি ব্যাপার? রাস্তার দিককার খোলা জানলার নীল পর্দাটা দ্রুত হাতে সরিয়ে ফেললেন হৃদয়। সদর দরজা আজকাল আর বন্ধ থাকে না। বেশ কিছু দিন হল এ রেওয়াজ চালু হয়েছে। মল্লিকার জন্যই এই ব্যবস্থা। সদর দরজা পেরিয়ে লম্বা লম্বা পা ফেলে ছিপছিপে কে একজন এগিয়ে আসছে। মাথায় ব্যাক্‌-ব্রাশ করা একরাশ চুল। ধুতি পরা। পাতলা পাঞ্জাবীর হাতা দুটো গোটান। চোখে চশমা। ত্রস্ত-ব্যস্ত ভাব-ভঙ্গি। চোখে-মুখে উৎকণ্ঠা।

'আপনি?' বিনীতভাবে প্রশ্ন করলেন হৃদয়। যুবকটির আপাদমস্তক দেখলেন।

'আপনার স্ত্রী হঠাৎ অ্যাক্সিডেন্টে—' যুবকটির গলায় উৎকণ্ঠা।

'কোথায়?' ঝড়ের মত প্রশ্ন করলেন হৃদয়। যুবকের মুখের দিকে তাকালেন। ওর উৎকণ্ঠিত ত্রস্ত-চোখ দুটো দেখলেন দু-মুহূর্ত।

'ইডেন-গার্ডেন থেকে একটু দূরে—' একটা ঢোক গিলল যুবকটি। দম নিল। তারপর বলল—'একটি ট্যাক্সিতেই আসছিলেন। হঠাৎ ট্যাক্সিটা পাশ থেকে একটি পোস্টের গায়ে ধাক্কা খায়। তার ফলে—'

'আর কেউ ছিল মোটরে? চালক? কোন ভদ্রলোক?' নিঃশ্বাস ঘন হ'ল হৃদয়ের। দ্রুত। ভেতরে ভেতরে কি তিনি উত্তেজিত হয়ে উঠলেন? উদ্বেল?

'ছিল নিশ্চয়ই, কিন্তু দেখা যায় নি। হয়ত সামান্য আঘাত লেগেছিল। মল্লিকাদেবীকে ফেলে রেখেই—'

'হুঁ। কিন্তু মল্লিকাকে চিনতে পেরেছেন?'

'পেরেছি। নানা জায়গায় দেখেছি কিনা ও'কে। তাছাড়া—'

'ও। চলুন।'

'চলুন—'

এর পরে হৃদয় দিন কয়েক নিয়মিত যাতায়াত করলেন হাসপাতালে। চোট নেহাৎ মন্দ লাগে নি। মাথায় আঘাত লেগেছে। ডান হাতের কব্জিতে চোট লেগেছে প্রচণ্ড। পায়ের গিঁটে গিঁটে, পিঠে—সর্বত্রই আঘাত লেগেছে অল্প-বিস্তর। সম্পূর্ণ সুস্থ হতে সময় লাগল অনেক। মোটামুটি সুস্থ হ'তে একদিন জিজ্ঞাসা করলেন হৃদয়।—'মিঃ চাকলাদার অমন ফেলে রেখে পালালেন কেন তোমাকে?'

'কাপুরুষ বলে।' বিষণ্ণ নিঃশ্বাস ত্যাগ করল মল্লিকা।

'এমন হবে—আগে জানতে না?'

'না। মুখোসের ভেতরটা দেখতে পাই নি।'

'একেবারেই না?'

'না'—

'এখন কি করবে?'

'ভাবছি।' চোখ তুলে তাকাল মল্লিকা। পরিপূর্ণ দৃষ্টি মেলে কিছুক্ষণ নিষ্পলক তাকিয়ে রইল হৃদয়ের দিকে। মুখ দেখল। চোখ দেখল। নিষ্প্রভ দৃষ্টি, কঠিন চোয়াল, খোঁচা খোঁচা দাড়ি—শেষে বলল—'তুমি কি বল?' ভঙ্গিটা কি সমর্পণের? দীর্ঘ অন্ধকার পথপরিক্রমার পর মল্লিকা কি হঠাৎ আশ্চর্য কিছুর সন্ধান পেয়েছে? স্বপ্ন চোখ দুটোতে জীবনের কোন নতুন ছবি—সার্থক সুন্দর নিটোল পরিপূর্ণতার ছবি—ভেসে উঠেছে কি এই মুহূর্তে? দু-মুহূর্ত স্তব্ধ হয়ে রইলেন হৃদয়। তারপর মৃদু গলায় অনেকটা নিজের সঙ্গে নির্জনে কথা বলার মত বললেন 'আমি?' নারী-জাতিকে আমি পুরুষের ব্যক্তিগত সম্পত্তি বলে মনে করি—এই ত তোমার ধারণা? সে-ধারণা থেকে আমি যেটা বলব তা কি তেমন আলট্রা-মডার্ন হবে? মনঃপূত হবে তোমার? ইচ্ছা করলে আজ তুমি অনায়াসেই ডিভোর্সের কাগজে আমাকে দিয়ে সই করিয়ে নিতে পার।'

'ডিভোর্স?' অনেক দিন পরে মল্লিকার প্রশস্ত চোখ দুটোতে আজ কয়েক বিন্দু জল টলমল করে উঠল। হারানর বেদনা ও ফিরে-পাওয়ার আশ্বাসের সম্মিলনে যে-সপ্তবর্ণের সৃষ্টি হয়েছে মল্লিকার চোখ দুটোতে—তারই মাঝে যেন নতুন করে নিজেকে, নিজের স্বামীকে—অব্যবহিত পরিবেশকে আর একবার আবিষ্কার করলেন হৃদয়। তাঁর প্রশস্ত বুকের মধ্যে মুখ লুকিয়ে প্রাণহীনের মত পড়ে রইল মল্লিকা। হৃৎপিণ্ডের দ্রুত ধুকপুকানির একটানা প্রচণ্ড শব্দটা সমস্ত প্রতিবন্ধকতা ভেদ করে এক দুর্লভের হাতছানির মত কানের কাছে আছড়ে পড়তে লাগল হৃদয়ের।

৩ মাসের জন্য বিনামূল্যে উপহার

স্ত্রীলোকের সৌন্দর্য, কাশ্মীর আর্ট শাড়ী। সর্বাধুনিক মনোরম ডিজাইন এবং রং লইয়া মরশুমের নূতন নূতন মাল আসিয়াছে। আমাদের কাছে কেবলমাত্র বড় সাইজের কাপড় পাওয়া যায়। ১টি ডিলাক্স শাড়ীর মূল্য ১১্ টাকা; ২টি ২০্ টাকা; ৩টি ২৮্ টাকা; ৪টি ৩৬্ টাকা। দুইটি বা তদধিক শাড়ীর অর্ডারের সহিত বিনামূল্যে ব্লাউস পীস। পোস্ট পার্সেলযোগে অর্ডারের মাল পাঠান হয়।

Arvind Agencies (DBM-22)
Post Box 1408, Delhi-6.

গোলমেলে ফানোস

হোভানেস থুমানিয়ান

অনেকদিন আগেকার এক গরীব লোকের কথা। তার নাম ফানোস। সে খুব দয়ালু। কিন্তু হলে কি হবে, যে কোন কাজই সে করতে যেত, তাই যেন কেমন গোলমেলে হয়ে পড়তো। কোন কাজই ঠিকমত হোত না। এই-জন্য সবাই তার নাম দিয়েছিল "যাখোর্দ ফানোস", মানে গোলমেলে ফানোস। তার সম্পত্তির মধ্যে ছিল একজোড়া বলদ, একখানা বলদে-টানা গাড়ি, আর একটি কুড়ুল।

একদিন গাড়িখানায় বলদ জুড়ে, কুড়ুল নিয়ে সে কাঠ কাটতে চললো জঙ্গলে। বনে এসে সে ভাবতে লাগলো, কাটা-গাছটা একবার মাটিতে পড়ে গেলে সেটাকে আবার গাড়িতে টেনে তোলা খুব কঠিন হবে। অতএব, গাড়িখানাকে যদি গাছের তলায় নিয়ে এসে তারপরে গাছটা কাটা যায়, তাহলে সেটা সোজা গিয়ে গাড়ির ওপর পড়বে; তাতে বেশ সুবিধে হবে।

চিন্তা করার সংগে সংগেই কাজ। সে গিয়ে বলদ-সুদ্ধ গাড়িখানাকে বেশ একটা বড়গোছের গাছের তলায় এনে হাজির করলো। নিজে গিয়ে উঠলো একটা উঁচু জায়গায়। তারপর কুড়ুল দিয়ে আরম্ভ করলো জোরে-আস্তে নানারকম ভাবে গাছে আঘাত করতে। একটু পরেই ভয়ংকর আওয়াজ করে গাছটা পড়ে গেল। পড়বি তো পড় গিয়ে বলদ-সুদ্ধ গাড়িখানার ওপরে। বলদ দুটো তো মরে গেলই, গাড়িখানাও একেবারে চূর্ণ-বিচূর্ণ। এসব দেখে ফানোস অবাক হয়ে দাঁড়িয়ে রইলো। কি করবে কিছুই বুঝতে পারছে না। একটু পরে কুড়ুলখানা কুড়িয়ে নিয়ে, গলায় হাত বুলোতে বুলোতে কি আর করবে, বাড়ির দিকেই চললো।

যেতে যেতে পথে একটা হ্রদের পাশ দিয়ে যাচ্ছে। দেখতে পেল কতকগুলো হাঁস মনের আনন্দে জলে সাঁতার কাটছে। সে ভাবলো, যা হবার তা তো হয়েই গেছে; আবার নতুন করে সব কিছু আরম্ভ করতে হবে। আপাতত একটা হাঁস মেরে যদি গৃহিণীর জন্য নিয়ে যাই, তাহলে বেশ হবে। আবার যেমন ভাবা তেমনি কাজ—কুড়ুলখানা ঘোরাতে ঘোরাতে হাঁসগুলোর দিকে ছুঁড়ে দিল। ইচ্ছে, অন্তত একটা মরুক। হাঁসগুলো প্যাঁক্ প্যাঁক্ শব্দ করে উড়তে উড়তে পালিয়ে গেল। কতকগুলো গিয়ে লুকোলো আশে-পাশের ঝোপ-ঝাড়ে; আর বাকীগুলো সব উড়ে চলে গেল অনেক দূরে। কুড়ুলখানাও গিয়ে পড়েছে হ্রদের গভীর জলে। আবার ফানোস জলের ধারে দাঁড়িয়ে ভাবতে লাগলো—এরপর কি করা উচিত, আর কি উচিত নয়, কিছুই ভেবে উঠতে পারছে না। তারপর সে এক অদ্ভুত কাজ করলো। সমস্ত জামা-কাপড় খুলে হ্রদের তীরে রেখে জলে ঝাঁপিয়ে পড়লো কুড়ুলখানা তুলে আনবার জন্য। সাঁতরে সে জলের ভেতরে যাচ্ছে; আরও যাচ্ছে। যতই ভেতরের দিকে যাচ্ছে, জল যেন ততই গভীর হচ্ছে। একটু পরেই সে বুঝলো, আর গভীরে যাওয়া ঠিক হবে না। কি আর করে, কুড়ুলখানার মায়া ত্যাগ করেই সে উঠে এলো।

এখন হয়েছে কি, ফানোস যখন গভীর জলে কুড়ুল খুঁজে বেড়াচ্ছে, সেই সময়ে হ্রদের পাশ দিয়ে একজন লোক যাচ্ছিলো। সে হঠাৎ দেখে কতকগুলো জামা-কাপড় জলের ধারে পড়ে আছে। সে তো আর ফানোসকে দেখতে পাচ্ছে না, ফানোস তো তখন জলের তলায়! সে মনের আনন্দে কাপড়-জামাগুলো নিয়ে সরে পড়লো।

এদিকে ফানোস জল থেকে উঠে এসে দেখে জামা-কাপড়ের চিহ্নও নেই। এরকম অবস্থায় পড়লে সাধারণত মানুষ হতভম্ব হয়। ফানোসও ঐ অবস্থায় দাঁড়িয়ে ভাবতে লাগলো—হে ভগবান, এ তুমি কি করলে? এ অবস্থায় এখন আমি কি করবো? কোথায় যাবো?...মাথায় বুদ্ধি এলো—অন্ধকার হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে। সন্ধ্যে হয়ে আসতেই সে উঠে পড়লো। তারপর গাঁ-এর উদ্দেশ্যে হাঁটতে সুরু করলো। মনে মনে চিন্তা করছে—এ অবস্থায় আমার নিজের বাড়িতে যাওয়া চলে না। তার চেয়ে বরং ভাই-এর বাড়ি যাই; সেখান থেকে কিছু পোশাক নিয়ে তারপর বাড়ি গেলেই হবে!

কাজেই সে ভাই-এর বাড়ির দিকেই যেতে আরম্ভ করলো।

এদিকে ভাই-এর বাসায় সেদিন একটা উৎসব চলছে। অনেক অতিথি

এসেছেন ভোজসভায়। উৎসবের যখন জমজমাট অবস্থা সেই সময়েই ফানোস সেখানে গিয়ে হাজির হল। ভেতরে কে কে আছে, জানবার জন্য দরজাটা একটু ফাঁক করতেই একজন অতিথির নজরে পড়লো তা। তিনি ভাবলেন, কোন কুকুর বুঝি এসেছে মাংসের গন্ধ পেয়ে। তাই যে বড় হাড়খানা তিনি চুষছিলেন, সেখানাই কুকুরের উদ্দেশ্যে জোরে ছুঁড়ে দিলেন দরজার দিকে। এমনই কপাল, হাড়খানা সোজা গিয়ে সজোরে লাগলো ফানোসের চোখে। তার একটা চোখ গলে একেবারে অন্ধ হয়ে গেল।

ভীষণ যন্ত্রণায় ফানোস বিকট চিৎকার করে চেঁচাতে সুরু করলো। গোলমালে কুকুরগুলো জেগে উঠে চারদিক থেকে তাকে তাড়া করলো। এই হট্টগোলে সব লোক বাইরে বেরিয়ে এসে দেখে মানুষের মত একটা কি, অথচ জামা-কাপড় নেই, দৌড়ে পালাচ্ছে। আর কুকুরগুলো তাকে তাড়া করছে। তারা কিছুমাত্র চিন্তা না করেই ঠিক করলো, ওটা নিশ্চয়ই একটা ভূত।

এবার লোকগুলোও ফানোসের পেছনে দৌড়তে আরম্ভ করলো। ফানোস যত দৌড়চ্ছে, তারাও তত ছুটছে আর ভূতটাকে গালি-গালাজ করছে, ইঁট-পাটকেল ছুঁড়ছে। এক সময়ে কুকুরগুলো ফানোসের পা কামড়ে ধরলো। ক্ষত-বিক্ষত, লাঞ্ছিত ফানোস একচক্ষু হারিয়ে অবশেষে বনের ভেতরে লুকিয়ে এদের হাত থেকে রেহাই পেল।

পরের দিন গ্রামে খবর ছড়িয়ে [illegible] ফানোস জঙ্গলে কাঠ কাটতে গিয়ে আর ফিরে আসে নি। গাঁ-এর সমস্ত লোক একসঙ্গে জঙ্গলে চললো। ফানোসকে খুঁজছে তারা। মৃত বলদ-দুটো আর চূর্ণ-বিচূর্ণ গাড়িখানাকে তারা গাছের তলায় দেখতে পেল। কিন্তু ফানোসের কোন হদিসই তারা পেল না।

অনেক খোঁজ করা হল। কিন্তু কোথাওই পাওয়া গেল না ফানোসকে। এরপর তারা ফানোস সম্বন্ধে আশে-পাশের লোকের কাছে সন্ধান নিতে লাগলো। অবশেষে একজন লোকের কাছে ফানোসের জামা-কাপড়গুলো পাওয়া গেল। এগুলো সে কোথায় পেয়েছে জিজ্ঞেস করায় সে সত্যি কথাই বললো। হ্রদের পাশে এই পোশাক-গুলো পাওয়া গেছে জানতে পেরে সবাই মিলে জলের ধারে গিয়ে ফানোসের নাম ধরে কত ডাকলো। কিন্তু কোথাও কোন সাড়া-শব্দ নেই। শেষে তারা ধরে নিল ফানোস জলে ডুবে মারা গেছে।

সবাই গাঁ-এ ফিরে এলো। ফানোস তো মরেই গেছে, অতএব তার পর-লোকের কাজগুলো তো করা চাই! চার্চে গিয়ে ফানোসের আত্মার শান্তি কামনা করে তারা প্রার্থনা করলো। ফানোসের অনেক প্রসংশা করলো। ফানোস যে একজন ভালো লোক ছিল, একথা সবাই বললো। চার্চে ফানোসের শেষকৃত্য হয়ে গেল।

স্বামী হারানোর শোক ফানোসের স্ত্রীরও লেগেছিল খুবই প্রথমটায়। কিন্তু কিছুদিন একলা কাটাবার পরেই তাঁর মনে হতে থাকে যে আর একজন ভদ্রলোককে বিয়ে করে সংসার করলে মন্দ হয় না! এ ব্যাপারে তিনি ফানোসের উপযুক্ত স্ত্রীর মতই কাজ করলেন। অর্থাৎ যেমন ভাবা, অমনি খুব তাড়াতাড়ি আর একজনকে বিয়ে করে ফেললেন।

(মূল আরমেনিয়ান গল্পের অনুবাদ)

অনুবাদঃ রত্না গঙ্গোপাধ্যায়

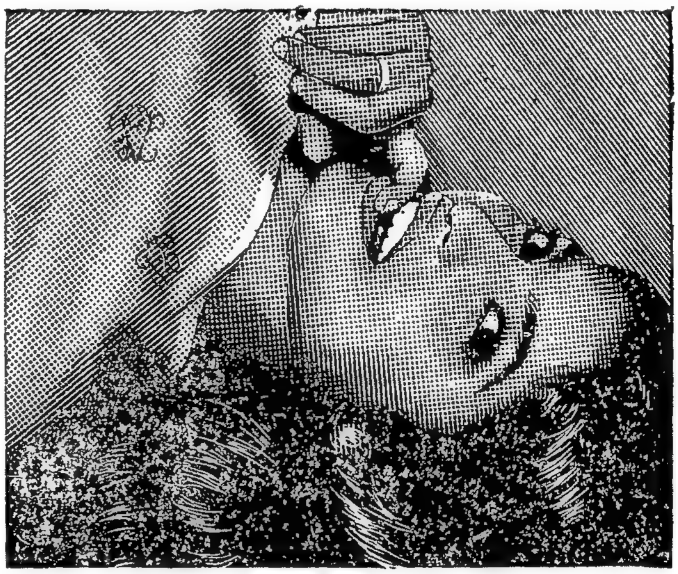

চুল কখনো চটচটে হয়না,
কখনো শুকনো বা রুক্ষ দেখায় না

কি ক'রে আমার চুলের চট্‌চটে ভাব চলে গেল,—চুলে এমন কমনীয় আভা ফুটলো? আর এমন সুন্দর চুলই বা হোল কি ক'রে?
আমি যে নিয়মিত কেয়ো-কার্পিন তেলই মাখি।
কেয়ো-কার্পিন ব্যবহার করলে চুলের গোড়া শক্ত হয় আর মাথাও ঠাণ্ডা থাকে। আজই একশিশি কিনুন।

কেয়ো-কার্পিন
একটি বিশিষ্ট কেশ তৈল

দে'জ মেডিকেল ষ্টোর্স প্রাইভেট লিঃ
কলিকাতা • বোম্বাই • দিল্লী • মাদ্রাজ • পাটনা • গৌহাটি
কটক • জয়পুর • কানপুর • সেকেন্দ্রাবাদ • আম্বালা • ইন্দোর

রঙ্গমঞ্চ ওদেশে এবং এদেশে

শিলালি

আবার ষোড়শীর কথায় ফিরে আসি। শিশিরকুমার বলতেন, জীবানন্দ ঠিক অত্যাচারী জমিদার নয়—কারণ অত্যাচার করে যে একটা স্যাডিজ স্যাটিশফ্যাকসন পাবে এ ধরণের মনোবৃত্তি তার ছিল না। আসলে তার দরকার টাকার—টাকা পাবার জনাই অন্যায়কে অন্যায় বুঝেও সে সেদিকে মন দিত না—তবে টাকার প্রতি তার কোনরকম মায়াও ছিল না। সোনার ঘড়ির ওপর বিনা দ্বিধায় সে ছাই ফেলতো—বিছনায় দামী শাল পেতে রাখতো—ভাল চাদরে হাত মুছতো। আসলে তার মনটা ছিল সন্ন্যাসীর মত। ওর একমাত্র টান পড়ে গিয়েছিল অলকার ওপর। শেষ পর্যন্ত এই আকর্ষণও তার চলে গিয়েছিল। জীবানন্দের এই ত্যাগী রূপটাই পাঠক এবং দর্শকদের মনে তার প্রতি অদ্ভুত সহানুভূতি জাগায়।

ষোড়শী সে যুগে বা এ যুগে আর কখনও পেশাদারী মঞ্চে অভিনীত হয় নি। এ নাটকের প্রত্যেকটি চরিত্রকেই ফুটিয়ে তোলার জন্য সুদক্ষ অভিনয়-শিল্পীর দরকার। আর জীবানন্দের কথা ছেড়ে দিন—শিশিরকুমার ছাড়া অন্য কাউকে কল্পনাতেও জীবানন্দরূপে ভাবা যায় না। তখনকার অন্যান্য নামকরা দলও ষোড়শী মঞ্চস্থ করতে সাহস পান নি। আর আজকালকার কথা তো ছেড়েই দিন—বিরাট, বিরাট সব নাট্যাচার্য সেজে বসেছেন—কণ্ঠস্বরে নেই মডুলেশন, অভিনয়ের সময় চোখের কোন কাজ নেই, দেহের কোন ফ্লেক্সিবিলিটি আছে বলে মনে হয় না—এদের দ্বারা ষোড়শী মঞ্চস্থ হলে সমস্ত ব্যাপারটাই একটা ফার্সে পরিণত হবে। দু-একটি দলের অবশ্য কাগজের বিরূপ সমালোচনার ভয় নেই—কারণ কোন বই মঞ্চস্থ করলেই তাদের তোষামোদতুষ্ট নাট্য সমালোচকেরা তাদের অভিনয়কে আন্তর্জাতিক খ্যাতির মর্যাদার যোগ্য বলে সার্টিফিকেট দিয়ে বসে। এ ধরণের সমালোচনাতেও অবশ্য দর্শকদের বেশি দিন ভাঁওতা দেওয়া চলে না—দর্শকরা অতি সহজেই কাচ আর কাঞ্চনের তফাৎটা বুঝে ফেলে।

এ কথা অবশ্য আমি কখনই বলব না যে, শিশির ভাদুড়ী অমুক নাটক মঞ্চস্থ করেছেন বলে আর কেউ সে নাটকের অভিনয়ের ব্যবস্থা করবেন না। তবে একটা কথা ভেবে দেখা দরকার—ষোড়শী বা প্রফুল্ল জাতীয় নাটকে অভিনয় করবার মত অভিনেতা বা অভিনেত্রী কি আজ বাংলা রঙ্গমঞ্চে আছে! পদ্য রচনা করলেই যেমন রবীন্দ্রনাথ হওয়া যায় না, কালো চশমা পরে রাজনীতিক বক্তৃতা দিলেই রাজাগোপাল আচারী বলে লোকে ভুল করে না। তেমনি জীবানন্দের ভূমিকায় সংলাপ বললেই জীবানন্দ চরিত্র সৃষ্টি করা সম্ভব হয় না—জীবানন্দকে রূপায়িত করবার জন্য শিশিরকুমারের মত অদ্বিতীয় প্রতিভার দরকার হয়।

আমাদের পাড়ার গ্যান্দাদা দুর্গাপুজোর সময় গঙ্গার ঘাটের প্যান্ডেলে হিরো সেজে অভিনয় করতেন—কোন বছর তাঁকে দেখতাম সাজাহানে ঔরঙ্গজীব সেজেছেন, পরের বছর হয় তো প্রফুল্লর যোগেশ, আর এক বছর চাঁদা বেশি উঠতে একটি সিনেমা হাউস ভাড়া নিয়ে দিগ্বিজয়ী করা হয় —বলা বাহুল্য গ্যান্দাদা নাদিরশা হয়ে শিশিরবাবুর অনুকরণে দিল্লী পোড়ানোর দৃশ্যে "কোতোল," "কোতোল" করে একদিক থেমে আর একদিকে দৌড়ঝাঁপ করলেন।

প্রত্যেকবারই পুজোর পরেও কয়েক মাস ধরেই এই থিয়েটার নিয়েই পাড়ার ক্লাবে আলোচনা চলতো। গ্যান্দাদা মাঝে মাঝে উপস্থিত থাকতেন—বেশির ভাগ অন্যের কথা শুনতেন—দু-এক সময় হয়তো নিজের শিল্পীজনোচিত গাম্ভীর্য ত্যাগ করে বলতেন—"আমি শুধু দুটি রোলের জন্য প্রসিদ্ধ—ঔরংগজেব আর জীবানন্দ।" দুর্গা পুজোর সময় পাড়ার মঞ্চে যে গ্যান্দাদাকে ভাল লাগতো তিনি পেশাদারী মঞ্চে ঐ সব ভূমিকায় নামবেন একথা সে আমলে ভাবা যেতো না। আজকাল ঐ ধরণের কান্ডই ঘটছে—সুতরাং কোনো কিছুই আজকাল আর অসম্ভব বলে মনে হয় না।

আর আজকাল রঙ্গমঞ্চে অভিনয়ের ব্যাপারটা তো বড় কথা নয়—কোথা থেকে কিভাবে কি অর্থ সাহায্য পাওয়া যায় সে কৌশলটা জানা থাকলেই হল —তারপর দরকার মত কংগ্রেসী, সুযোগ অনুসারে মার্কিনী এবং তারও পরে রুশী বনে গেলেই তো বাজীমাৎ। এমন দলকেও পেশাদারী হিসাবে থিয়েটার করতে দেখেছি যাদের অভিনয়ের মান ঐ গ্যান্দাদা পরিচালিত পাড়ার এ্যামেচার থিয়েটারের থেকেও কোন অংশে উঁচু নয়। দর্শক কি করে এ জাতীয় থিয়েটারকে সহ্য করছে? সে প্রশ্নই ওঠে না—কারণ দর্শক এসব থিয়েটারে কখনো অভিনয় দেখতে যায় না। মঞ্চাভিনয়ের খরচ চলছে কি করে? সরকারের কাছ থেকে নানা খাতে এরা টাকা আদায় করছে—তাছাড়া মালিক বাদে কেউ তো টাকা পাচ্ছে না। সাধারণ অভিনেতা বা অভিনেত্রীদের মাসের পর মাস মাইনে দেওয়া হয় না—প্রতিবাদ জানালে থিয়েটার থেকে তাদের চলে যেতে বলা হয়।

এই প্রসঙ্গে সরকারের কাছে আমাদের প্রশ্ন হচ্ছে এভাবে আর কতকাল জনসাধারণের অর্থ জলে ফেলে দেওয়া হবে? অন্নাভাবে দেশের লোকের প্রায় নাভিশ্বাস উঠেছে, ইউরোপ আমেরিকার ভিক্ষান্ন না পাওয়া গেলে দেশে এতদিনে দুর্ভিক্ষ দেখা দিত—সেক্ষেত্রে এইভাবে সরকারী অর্থের অপচয় করবার কোন জাস্টিফিকেশন আছে কি?

ভারতের নানা জায়গায় জাতীয় রঙ্গমঞ্চ প্রতিষ্ঠার উদ্যোগপর্ব চলেছে। সরকারী অর্থ ব্যয় করতে হলে সেই জাতীয় রঙ্গমঞ্চকে সুদৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠার জন্যই টাকা খরচ করা উচিত। সঙ্গে সঙ্গে ওপরে বর্ণিত সমস্ত বেসরকারী নাট্য প্রতিষ্ঠানের অর্থ সাহায্য সম্পূর্ণভাবে বন্ধ করে দেওয়া দরকার—কারণ এতকাল ধরে এ জাতীয় সব প্রতিষ্ঠান জনসাধারণের বহু অর্থের অপব্যবহার করেছে, কাজের কাজ করে নি কিছুই।

ন্যাশনাল থিয়েটারকে কার্যকরী করতে হলে ভাল ডিরেক্টরের দরকার একথাও বলেছি, আবার এখনও বলছি শ্রীযুক্ত মধু বোসের মত লোক থাকতে এ সম্বন্ধে আর কোন চিন্তারই কারণ থাকতে পারে না সরকারের। ইংলণ্ডে ওল্ড ভিক্‌কে ন্যাশনাল থিয়েটার করা হলো—ডিরেক্টর নিযুক্ত হলেন স্যার লরেন্স অলিভিয়ার—ওদেশের অন্যতম শ্রেষ্ঠ অভিনেতা। আর যোগ্যতার মান বিচার করেই তো এ পদে লোক নিতে হবে। সরকারী কর্তাদের নেকনজরে থাকবার জন্য কে কত কংগ্রেস ভবনে হাজিরা দিচ্ছেন সেটা তো যোগ্যতা নিরূপণের মাপকাঠি নয়।

এ-বিষয়ে দিল্লীর সরকারী মহলের অকুণ্ঠিত প্রশংসা না করে পারা যায় না—ওখানকার সরকারী নাট্য

বিদ্যালয়টির কার্যধারা দেখে আমার বারবার মনে হয়েছিল সরকারী অর্থের সার্থক ব্যবহার হচ্ছে এই প্রতিষ্ঠানটিতে—অবশ্য এই স্কুলটির সুপরিচালনার মূলে রয়েছে এর ডিরেক্টর শ্রীআলকাজী। ইনি সত্যিকার গুণী পরিশ্রমী এবং নাট্যশাস্ত্র সম্বন্ধে (থিওরি ও প্র্যাকটিস) বিদগ্ধ ব্যক্তি। মাঝে মাঝে যখনই দিল্লী গেছি, এঁর ছাত্রদের নিয়ে রিহার্সাল করবার সময় আমাকে ইনভাইট করে নিয়ে গেছেন, এর শিক্ষণপদ্ধতি আমার সত্যিই ভাল লেগেছে। অবশ্য নাট্যাভিনয়ে বা নাট্যপরিচালনা সম্বন্ধে শ্রীমধু বসু, শ্রীপ্রফুল্ল রায় বা শ্রীরাধামোহন ভট্টাচার্যের মত লোক আজ সারা ভারতবর্ষে ক'জনই বা আছেন। তবে সবচেয়ে বড় গুণটিরই এঁদের অভাব—কংগ্রেস ভবনে গিয়ে হাজিরা দিতে শেখেন নি এত বয়স হওয়া সত্ত্বেও।

আর একটা কথাও এখানে বলা অপ্রাসঙ্গিক হবে না। সেটা হচ্ছে ইউরোপ, আমেরিকা প্রভৃতি দেশে আমাদের সাংস্কৃতিক দল পাঠানো সম্বন্ধে। এক সময় এমন ছিল যে, ভারতীয় শিল্পীরা ওসব দেশে গেলে মোটেই ভালভাবে accepted হতেন না। শ্রীযুক্ত উদয়শংকরের একটি লেখাতে একবার পড়েছিলাম যে, প্যারিসের কোন হোটেলে তাঁকে একবার নাচবার জন্য এন্‌গেজ করা হয় এবং দু-একদিন নাচবার পরই এন্‌গেজমেণ্ট ক্যানসেল করে দেওয়া হয়। তখনও অবিশ্যি শিল্পী হিসাবে তাঁর নাম হয় নি। কিন্তু আসল কথা হলো তাঁর নাচ বোঝবার মত ক্ষমতা ও-দেশের দর্শকদের সে সময় ডেভেলপ করে নি। পরে নাম করবার পর একবার দল নিয়ে শ্রীযুক্ত উদয়শংকর ইউরোপের কোন জায়গায় প্রদর্শনী করছিলেন। শ্রীযুক্ত শংকরের বোন শ্রীমতী কনকলতা লিখেছেন যে, এই শো'তে শ্রীযুক্ত তিমিরবরণের কিছুক্ষণের জন্য একক ইন্সট্রুমেণ্টাল মিউজিক করার কথা ছিল—বাজনা আরম্ভ হতেই এমন গোলমাল শুরু হলো যে, বাধ্য হয়ে তিনি বাজানো বন্ধ করলেন। এখন অবশ্য ওসব দেশে ভারতীয় ইন্সট্রুমেণ্টাল মিউজিকের কিছুটা কদর শুরু হয়েছে—এইজন্যই শ্রীযুক্ত রবিশংকর এবং শ্রীযুক্ত আলি আকবর খাঁ ইউরোপে যন্ত্রশিল্পী হিসাবে-এতোটা পপুলার হয়ে উঠেছেন। তারপর ছবির জগতেও শ্রীসত্যজিৎ রায় বিশ্বের দরবারে ভারতীয় চিত্রের শ্রেষ্ঠত্ব অবিসংবাদিতভাবে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। কিন্তু যাঁদের নাম করলাম তাঁরা স্ব স্ব বিভাগে অসীম প্রতিভার অধিকারী। শিশিরোত্তর যুগে আমাদের দেশের রঙ্গমঞ্চের যা অবস্থা তাতে কোন কারণেই বর্তমানের কোন নাট্যসংস্থাকে বিদেশে অভিনয় করতে পাঠানো উচিত নয়। ওসব দেশ থেকে নিমন্ত্রণ পেলেও নয়—কারণ রাজনীতিক কারণে বিদেশে হয়তো বাহ্যিক ভদ্রতা রেখে কিছুটা প্যাটিং করে দেবে। কিন্তু পরে তারা হাসবে।

ইউরোপীয়দের এ ধরণের মনোভাবটা শিশিরকুমারের খুব ভালভাবে জানা ছিল। ১৯৫৬ সালে আমি ছিলাম লণ্ডনে সে সময় নাট্যাচার্য আমাকে একটি চিঠিতে লিখেছিলেন—

"......এতদিনে Lake থেকে নিশ্চয় ফিরে এসেছো। ফিরবার পথে Switzerland হয়ে এসো। ইংরাজী সাহিত্যে Lake Country-কে খুব glorify করা হয়েছে। Switzerland ও North Italyর Lake Country দেখলে বুঝতে পারবে সেখানে প্রকৃতি অনেক বেশি রমণীয়। আমাদের দেশের কাশ্মীর ইউরোপীয়দের কাছেই ভূস্বর্গ। যাক আমার একটি কাজ করো—Sybil Thorndike একখানা কাগজে নাম Plays and Players তাঁদের World Tour সম্বন্ধে লিখেচে। প্রবন্ধটির নাম Our World Tour—তাতে তাঁদের ভারতবর্ষ, বিশেষতঃ কলিকাতার থিয়েটার সম্বন্ধে কিছু যদি লিখে থাকে আমাকে জানিও আমাদের রঙ্গমঞ্চ থেকে Sybil বলেছিলেন, Irish Abbey Theatre ছাড়া আর কোথাও তিনি এমন সুচারু অভিনয় দেখেন নি। আরও অনেক বড় বড় কথা। আমার সন্দেহ ছিল এটা নিছক Complimentary কথা। আমাদের ভোলাবার জন্য। এখন ছাপার অক্ষরে কি বলছেন জানতে কৌতূহল হয়। June মাস থেকে বোধ হয় articleটা বেরুচ্চে। সাদা চামড়ার লোক কাল আদমির প্রশংসা নিজের দেশে বড় একটা করে না। কবে ফিরবে? বিজয়ার স্নেহাশীর্বাদ গ্রহণ করো। ইতি—

নিয়ত মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী
শিশিরকুমার ভাদুড়ী।"

শিশিরকুমারকে জানিয়েছিলাম যে, তাঁর ধারণাই ঠিক—দেশে ফিরে সিবিল থর্নডাইক স্মৃতি ধারণ করেছেন—কলকাতার থিয়েটার সম্বন্ধে উল্লেখযোগ্য তেমন কিছুই লেখেন নি। একথাও লিখেছিলাম যে, ইউরোপ এবং আমেরিকাতে নিজের দেশের থিয়েটার ছাড়া অন্য দেশের থিয়েটার সম্বন্ধে জানবার বোঝবার বিশেষ কৌতূহলও নেই। প্রথম বিশ্ব মহাযুদ্ধের সময় আইভর নোভ্যালো ছিলেন লণ্ডন স্টেজের অত্যন্ত জনপ্রিয় অভিনেতা, নাট্যকার এবং সংগীত রচয়িতা। ঐ সময় Keep the Homefires burning গানটি লিখেই তিনি কয়েক লক্ষ পাউণ্ড রোজগার করেছিলেন। তাঁর The Rat ছবির নাম তখন সারা বিশ্বে ছড়িয়ে পড়েছে। নোভ্যালো আত্মজীবনীতে লিখেছেন যে, তিনি যখন হলিউডে ছবির কাজ করতে যান, তখন আমেরিকার থিয়েটারের লোকেদের কাছে ইংলণ্ডের সে সময়কার যশস্বী অভিনেতা-অভিনেত্রীদের (যথা গ্ল্যাডিস কুপার) নামোল্লেখ করে দেখেন যে, মার্কিনীরা তাদের ভাল করে চেনেনই না। ১৯৫৬ সালে আমেরিকান স্টেজ এ্যাকট্রেস হেলেন হেজ ইংলণ্ডের মঞ্চাভিনয় সম্বন্ধে বিরূপ মন্তব্য করে বলেন, এ ধরণের স্লিপসড এ্যাকটিং আমেরিকাতে দর্শকেরা বরদাস্ত করতো না। এ নিয়ে তুমুল ঝড় উঠেছিল লণ্ডনের থিয়েটার মহলে।

১৯৫৭ সালে আমেরিকান অভিনেতা টাইরন পাওয়ার এলেন লণ্ডনে বার্নার্ড শ'য়ের 'দি ডেভিল্‌স-ডিসাইপল্‌' নাটকটির মঞ্চাভিনয় দেখাতে। দর্শকদের মন্তব্য শুনে বুঝলাম এ সব বই গিলগুড্‌, অলিভিয়ার করলে একটা মানে হোত। আমেরিকান এ্যাক্টর এ সব নাটকে কি অভিনয় করবে। ইউরোপ, আমেরিকার এ্যাক্টরদের নিজেদের ভেতরই যখন এত মতদ্বৈধ তখন তারা ভারতীয় অভিনেতাদের কিভাবে গ্রহণ করবে সহজেই অনুমান করা যায়। তবে রাজনীতিক কারণে ইংলণ্ড বা আমেরিকাতে রাম, শ্যাম, যদুর আগমনকেও ফলাও করে কাগজে ফ্ল্যাস্ করতে এদের বাধে না। কিন্তু সেটা তো বড় কথা নয়। এইসব কারণেই আমাদের দেশ থেকে কোন থিয়েটার পার্টি ইউরোপ, আমেরিকাতে পাঠানো কিছুতেই উচিত নয়। বিশেষত বর্তমানে আমাদের নাট্যমঞ্চের অভিনয়ের মান যখন অত্যন্ত নিম্নস্তরের। প্যারিস স্টেজ ফেস্টিভালে যদি কোন ভারতীয় পার্টি কখনও পাঠাতে হয় তবে প্রথমে একজন সত্যিকার কর্মদক্ষ পরিচালক নিযুক্ত করা দরকার—যেমন ধরুন

নরেশবাবু বা শ্রীপ্রফুল্ল রায় বা শ্রীমধু বসু জাতীয় কোনো একজন—তারপর দরকার বাছাই করা অভিনেতা-অভিনেত্রীর সংযোগে একটি দল গঠন করে নিয়মিতভাবে পরিচালকের নির্দেশ অনুসারে অনেকদিন ধরে রিহার্সাল দেওয়া। এমনটা করা সম্ভব হলেই ভারতীয় নাট্যদল বিদেশে পাঠানো যেতে পারে—নচেৎ নয়।

গত ২৯শে জুলাই ভেনেস বিখ্যাত ইংরাজ নাট্যবিদ, স্টেজ ডিরেক্টর এবং নট এডওয়ার্ড গর্ডন ক্রেগ ৯৪ বছর বয়সে মারা গেছেন।

মঞ্চশিল্প-জগতে ক্রেগের বিরাট অবদানের কথা ভবিষ্যতে আলোচনা করবার ইচ্ছা রইল। এখানে শুধু এই কথাটাই জানাতে চাই যে, বিগত পঞ্চাশ-ষাট বছর ধরে ক্রেগের নির্দেশিত পথেই ইউরোপের মঞ্চ অগ্রগতির পথে এগিয়ে চলেছে। এমন কি ১৯১০ সালে মস্কো আর্ট থিয়েটার যখন চরম খ্যাতির শীর্ষে গিয়ে উঠেছে, তাদের বিশ্ববিখ্যাত ডিরেক্টর কনস্ট্যানটিন স্ট্যানিসলাভস্কি ক্রেগকে আমন্ত্রণ করে নিয়ে যান তাঁদের হয়ে একটি নাটক প্রডিউস করবার জন্য—ক্রেগ হ্যামলেট নাটকটি মঞ্চস্থ করেন এবং স্ট্যানিসলাভস্কি তাঁর সহকারীরূপে কাজ করেন।

শিশিরকুমার চিরকালই ক্রেগের ভক্ত। ১৯৩৭-৩৮ সালে আমি তাঁর লাইব্রেরীতে ক্রেগের বিখ্যাত বইগুলি—The Art of the Theatre, On the Art of the Theatre, Towards a New Theatre—দেখি। তখন তিনি কর্নওয়ালিস স্ট্রীটের পাশে একটি গলিতে থাকতেন—এটা হচ্ছে স্টার রঙ্গমঞ্চে নবনাট্যমন্দিরের যুগ।

এরপর শিশিরকুমারকে কয়েকবার বাড়ি বদল করতে হয় এবং সে সময় তাঁর অনেক বই হারিয়ে যায়। সেই সঙ্গেই বোধ হয় তাঁর ক্রেগের বইগুলো খোয়া যায়।

১৯৫৬ সালে আমি যখন প্রবাসে সে সময় ১-৯-৫৬-তে শিশিরবাবু আমাকে একটি চিঠিতে লেখেনঃ

"তোমার পাঠানো Prospectus ও চিঠি পেয়েছি প্রায় এক মাস হোল। শারীরিক ও সাংসারিক অসুবিধা থাকাতে উত্তর দিতে দেরি হোল। চোখের অসুখও একটা কারণ। লিখতে বড়ই কষ্ট পাই।

তুমি এক বছরের মধ্যে শিখে নেবার যে বিপুল আয়োজন করেছো ও যদি খানিক অংশেও সফল করে তুলতে পারো, তাহলে দেশে ফিরে এলে দেশের নাট্যশালার অনেক উপকার করতে পার। Formগুলির দিকে বেশি নজর দিও না। ওগুলো চিন্তা-বিলাসী রসিক জনের জন্য। নাটকগুলো শিক্ষকদের সাহায্যে পোড়ো।

Bertolt Brecht সম্প্রতি অল্প বয়সে মারা গেছেন। তাঁর বই এখানে পাওয়া যায় না। যদি দু-একখানা আনতে পারো সঙ্গে এনো। Three Penny Opera-র খুব নাম। Claudel-এর ইংরাজী অনুবাদ আমি পাই নি। Tolstoi-এর চারখানি বড় নাটক—তার মধ্যে একখানির শেষ অঙ্কের dialogue নেই, শুধু synopsis আছে—অমূল্য।

আর একটা কথা—Foyles-এর দোকানে (119-125 Charing Cross) একবার খোঁজ নিতে পার যদি, খোঁজ নিও Gordon Craig-এর 'The art of the Theatre' ও 'Books and Theatre' out of print হয়েছে কি? পুরাতন কপি ওদের দোকানে পাওয়া গেলে দাম কত পড়বে?

আশা করি ভাল আছ।

মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী শিশিরকুমার ভাদুড়ী।

পুঃ একটু সুস্থ হলে খুব বিস্তৃত চিঠি দিতে পারব।

ইতি—শিঃ"

সে সময় ক্রেগের বইটি লণ্ডনে পাওয়া যায় নি—আউট অভ প্রিন্ট ছিল। পুরানো কপিও দেখতে পাই নি। আমি ক্রেগের 'আর্ট অভ দি থিয়েটার' এবং ফ্লোরেন্স থেকে তাঁর প্রকাশিত- মাস্ক পত্রিকা থেকে exhaustive নোট করে এনেছিলাম। দেশে ফেরবার বছর দুয়েক বাদেই ক্রেগের বইটির রি-প্রিন্ট বের হয় এবং শিশিরবাবুর বইটি পেতে অসুবিধা হয় নি।

ক্লডেলের কয়েকটি নাটকের ইংরাজী অনুবাদ বৃটিশ ড্রামা লীগ লাইব্রেরীতে পরে আমার ভাল লেগেছিল—তাই শিশিরকুমারের মতামত জানতে চেয়েছিলাম। টলস্টয়ের নাট্যগ্রন্থাবলীর একটি পুরানো কপি পেয়েছিলাম ফয়েলসের দোকানে শিশিরবাবুর চিঠি পাবার পর। সত্যিই এ-শ্রেণীর বাস্তববাদী নাটক সহসা চোখে পড়ে না—বিশেষভাবে আমাকে মুগ্ধ করেছিল টলস্টয়ের 'পাওয়ার অভ ডার্কনেস' নাটকটি।

নাট্যাচার্যের চিঠিতে ব্রেখটের নাটকের উল্লেখ দেখে খুবই আশ্চর্য হয়েছিলাম—কারণ তখনও ব্রেখট ইংলণ্ডের নাট্যসমাজে বিশেষ পপুলার হন নি। আমি দেশে ফেরবার সময় শিশিরকুমারের জন্য ব্রেখটের 'মাদার কারেজ' এবং 'ককেশিয়ান চক সারকল' নাটক দুটি নিয়ে এসেছিলাম। তখনও ব্রেখটের নাটক এদেশে পাওয়া যেত না। অবশ্য দু-এক বছর বাদে ব্রেখটের নাটক কলকাতায় আসতে শুরু হয় এবং নাট্যাচার্য খুব খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে ব্রেখট-প্লেজ পড়তে শুরু করেন। ব্রেখটের 'থ্রী পেনী ওপেরা' বৃটিশ কবি জন গে'র 'বেগারস ওপেরা'র নবরূপায়ণ—ইউরোপে 'থ্রী পেনী ওপেরা' অত্যন্ত জনপ্রিয়। তবে বই পড়ে এই ওপেরাটির ঠিকমত রস গ্রহণ করা যায় না—মঞ্চরূপায়ণ দেখতে হয়। 'ককেশিয়ান চক সারকেলের' আলোচনা প্রসঙ্গে শিশিরবাবু একদিন বলছিলেন যে তাঁর মনে হয় এটি যাত্রা ফর্মে অভিনয় করলে ভাল হয়। আমি তাঁকে জানালাম যে ঠিক সেইভাবেই ব্রেখট পার্টি নাটকটি মঞ্চস্থ করেছিলেন।

এ সব কথা এই কারণেই লিখছি যাতে পাঠকরা জানতে পারেন শিশিরকুমার পৃথিবীর কোন দেশে কে কখন সত্যিকার মঞ্চ বা নাটকের ক্ষেত্রে কি বড় কাজ করছেন সে সব বিষয়ে ভালভাবে অবহিত থাকবার চেষ্টা করতেন। ইংলণ্ডের মত দেশেও তাদের নিজস্ব রঙ্গমঞ্চের একজন শ্রেষ্ঠ প্রতিভা অর্থাৎ গর্ডন ক্রেগকে বুঝতে সময় লেগেছে। ব্রেখট সম্বন্ধেও তাদের appreciation-এর ভাবটা অনেক পরে দেখা দিয়েছে। অবশ্য একথাও ঠিক রঙ্গমঞ্চের অগ্রগতির ব্যাপারে ইংলণ্ডের থিয়েটার সব সময়েই কণ্টিনেণ্টাল থিয়েটারের থেকে বেশ খানিকটা পেছিয়ে থাকে।

ব্রেখটের মৃত্যুর পর বৃটিশ ড্রামা লীগ থেকে প্রকাশিত ড্রামা পত্রিকায় (Autumn 1956, Number 42), এইভাবে ওবিচুয়ারী লেখা হয়ঃ

"Bertolt Brecht died on the eve of the first visit of his Berliner Ensemble to London. Brecht has, suddenly it seems, become a world figure in the theatre, on the basis of work mostly created in the twenties. This has led many people to question whether he is a great man or only a fashionable one. But in truth the emergence of his international fame has been retarded by the Second

World War and by the thickness of the Iron Curtain. It is only now, however, that we can judge whether we British have once more, as with Gordon Craig, been the last to take our heads out of the sand when a great new wind is blowing. But, whether Brecht is a supreme genius or no, his was certainly a creative talent of the first order. It is a real loss to us that we cannot at last make contact with him; and to our art that it should be deprived of him at the early age of fifty-eight."

ক্রেগের সম্বন্ধে আলোচনা প্রসঙ্গে শিশিরকুমার এলেন টেরী, আরভিং এবং শ' সম্বন্ধেও অনেক কথা বলতেন। নাট্যাচার্যের মতে ক্রেগের মা এলেন টেরীর মত জনপ্রিয়া অভিনেত্রী রঙ্গমঞ্চের ইতিহাসে খুব কম দেখা গেছে। লাইসিয়াম থিয়েটারে লোকে দল বেঁধে এলেন টেরীকে দেখবার জন্যই ভিড় জমাতো। অবশ্য হেনরী আরভিং খুব উচ্চদরের অভিনেতা ছিলেন—তিনি ট্রেনিং-ও দিতেন ভাল—ক্রমাগত রিহার্সাল করার পক্ষপাতী ছিলেন আরভিং। বয়স হবার সঙ্গে সঙ্গে এলেন টেরী অভিনয়ের সময় প্রায়ই পার্ট ভুলে যেতেন। পোরসিয়ার চরিত্রে নেমে হয়তো সংলাপ বলতে পারছেন না—দর্শকরা বিরক্ত না হয়ে তাঁকে সংলাপ মনে করিয়ে দিতে সাহায্য করতো। বার্নার্ড শ' আরভিং-এর আমলে কিছুকাল স্যাটার ডে রিভিউ পত্রিকার নাট্যসমালোচক ছিলেন। তিনি ক্রমাগত তাঁর লেখায় আর্ভিং-এর নিন্দা এবং এলেন টেরীর উচ্চপ্রশংসা করতেন। আর্ভিং-এর প্রতি শ'র রাগের একটা কারণ ছিল। হেনরী শ'-র 'আর্মস এণ্ড দি ম্যান' নাটকটির মঞ্চাভিনয়ের স্বত্ব কিনে নিয়েছিলেন, কিন্তু নাটকটি স্টেজ করেন নি। গর্ডন ক্রেগ আবার আর্ভিং-এর নিন্দা করার জন্য শ'-এর ওপর খড়্গহস্ত ছিলেন। ক্রেগ মনে করতেন স্যার হেনরী আরভিং সর্বকালের শ্রেষ্ঠ অভিনেতা। ক্রেগ পরিষ্কার লিখে গেছেন যে বার্নাড শ' তাঁর মা'র উচ্চপ্রশংসা করছেন এমনভাবে যাতে তুলনায় হেনরী আরভিং-কে ছোট বলে প্রতিপন্ন করা যায়। ক্রেগ এবং শ'র লিখিত বাদানুবাদ, এলেন টেরী এবং বার্নার্ড শ'-র পত্রাবলী, আরভিং সম্বন্ধে ক্রেগের প্রবন্ধাবলী এবং জীবনী রঙ্গমঞ্চ এবং অভিনয় সম্বন্ধে অনেক কিছু গুরুত্বপূর্ণ তথ্য এবং তত্ত্ব আমাদের সামনে তুলে ধরে।

আরভিং রাতারাতি নিজেকে পৃথিবীখ্যাত অভিনেতা হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন 'দি বেলস' নাটকে ম্যাথিয়াসের ভূমিকায় অভিনয় করে। এই নাটকটির শ্রীভূপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় কৃত ভাবানুবাদ 'শঙ্খধ্বনি' নাটকটি শিশিরকুমার নাট্যমন্দিরে মঞ্চস্থ করেছিলেন এবং নিজে কেতনলালের (ম্যাথিয়াস) রোলে অতুলনীয় অভিনয়-প্রতিভা প্রদর্শন করে দর্শকদের মুগ্ধ করেন। আসল কথা সারা পৃথিবীর থিয়েটার মুভমেণ্ট এবং নাটকের বিষয়ে সব সময়েই প্রত্যক্ষভাবে খোঁজখবর রাখবার চেষ্টা করতেন নাট্যাচার্য শিশিরকুমার ভাদুড়ী।

গর্ডন ক্রেগ নাট্যমঞ্চ এবং অভিনয়-কলার উন্নতি সাধনের উদ্দেশে ফ্লোরেন্সে গিয়ে তাঁর নাট্যবিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন এবং ১৯০৮ সাল থেকে তাঁর বিখ্যাত মাস্ক পত্রিকা প্রকাশ করতে শুরু করেন। যদিও কয়েক বছর বাদে এই বিদ্যালয় এবং পত্রিকাটি বন্ধ হয়ে যায়, তবুও ইউরোপীয় রঙ্গমঞ্চের ওপর এদের প্রভাব হয়েছিল সুদূরপ্রসারী। আজকের দিনেও ইউরোপের নাট্যবিদেরা মাস্ক পত্রিকার পুরানো কপি পেলে মূল্যবান সম্পদ হিসাবে সংগ্রহ করবার চেষ্টা করেন। বৃটিশ ড্রামা লীগ লাইব্রেরী থেকে পুরানো মাস্ক পত্রিকার আমি এক সময় নোটস তুলে নিয়েছিলাম। এখানে ঐ পত্রিকার ফোরওয়ার্ড (ক্রেগ লিখিত) থেকে কিছুটা তুলে দিচ্ছিঃ Foreward—By Gordon Craig

The popularisation of Ugliness, the bearing of false witness against Beauty—These are the achievements of the Realistic Theatre. I wish my School and Journal to stand as my protest against this anarchistic tendency of the modern Theatre.

The modern Realistic Theatre, forgetful of all the Laws of Art, sets out to reflect the times. It reflects a small particle of the times. it drags back a curtain and exposes to our view an agitated caricature of Man and his Life, a figure gross in its attitude and hideous to look upon.

This is true neither to life nor to art. It has never been the purpose of art to reflect and make uglier the ugliness of things, but to transform and make the already beautiful more beautiful,

সেক্সপীয়রের নাটক সাগরবৎ, কালিদাসের নাটক নন্দনকাননতুল্য।
—বঙ্কিমচন্দ্র

গল্পাংশের সংক্ষিপ্ত অনুবাদ নহে।
মহাকবির নাট্য-মাধুর্যের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া অনুবাদ।

সেক্সপীয়র গ্রন্থাবলী

(প্রথম ভাগ)

—এই ভাগে আছে—

১। ম্যাকবেথ—অনুবাদক মনীন্দ্রনাথ ঘোষ।
২। মনের মতন (As You Like It)—অনুবাদক সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়।
৩। আণ্টনী ক্লিওপেট্রা—অনুবাদক দেবেন্দ্রনাথ বসু।
৪। রোমিও জুলিয়েট—অনুবাদক হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।
৫। ভেরোনার ভদ্রযুগল—অনুবাদক সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়।
৬। জুলিয়াস সীজার—অনুবাদক জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর।

একত্রে মূল্য সাড়ে তিন টাকা

(দ্বিতীয় ভাগ)

—এই ভাগে আছে—

১। ওথেলো—অনুবাদক দেবেন্দ্রনাথ বসু। (নটকবিচূড়ামণি গিরিশ-চন্দ্র ঘোষ সংশোধিত)
২। মার্চেণ্ট অব ভেনিস—অনুবাদক সৌরীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়।
৩। মেজার ফর মেজার—অনুবাদক ঐ
৪। সিম্বেলিন— অনুবাদক ঐ
৫। কিং লিয়র—অনুবাদক যতীন্দ্রমোহন ঘোষ।
৬। টুয়েলফথ নাইট—অনুবাদক পশুপতি ভট্টাচার্য।

একত্রে মূল্য সাড়ে তিন টাকা

বসুমতী প্রাইভেট লিমিটেড
১৬৬, বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী স্ট্রীট, কলি-১২

পাঠক মন

১১ই আগস্ট-এর 'সাপ্তাহিক বসুমতী' পূর্বাপর পাঠ করে বিস্মিত হলাম। গত সপ্তাহে প্রায় সমগ্র পূর্ব-ভারত জুড়ে ন্যূনতম বেতনের দাবিতে, খাদ্য ও অন্যান্য দ্রব্য-মূল্যবৃদ্ধি প্রতিরোধ আন্দোলনে যে বিরাট গণ-বিক্ষোভ ফেটে পড়েছে এবং তার বিরুদ্ধে যে বীভৎস নিষ্ঠুর অহিংস তাণ্ডব সুরু হয়েছে এ সপ্তাহের বসুমতীতে তার পরিচয় নেই। না সংবাদ, না প্রতিবাদ। নির্দলীয় গণ-তান্ত্রিক পাঠক-পাঠিকারা যে সাপ্তাহিক বসুমতীকে অন্যান্য সাপ্তাহিক পত্রিকাগুলোর সমগোত্র মনে করে না, তা বোধহয় বসুমতী কর্তৃপক্ষের অজানা নয়। সুতরাং এ সপ্তাহের বসুমতী পাঠ করে বঙ্গভাষী পাঠক-পাঠিকাগণের প্রত্যাশা নিরাশায় পরিণত হয়েছে তা বলাই বাহুল্য।

এ সপ্তাহের **বঙ্গদর্শনে** স্কুল-ফাইনাল ও হায়ার সেকেণ্ডারী পরীক্ষাদ্বয়ের পাঠ্যসূচীর তুলনামূলক আলোচনা, স্কুল ফাইনাল পাঠ্য-সূচীর আপেক্ষিক দুরূহতা, তৃতীয় বিভাগে উত্তীর্ণের সংখ্যাধিক্যের কারণ নির্ণয়, তৃতীয় শ্রেণী বিলোপ প্রভৃতি প্রস্তাবের জন্য আন্তরিক ধন্যবাদ। এ সম্বন্ধে সংশ্লিষ্ট শিক্ষকমণ্ডলীর আলোচনা আহ্বানের জন্য অধিকতর ধন্যবাদ। ব্যক্তিগতভাবে আমি শিক্ষক নই, কিন্তু আত্মীয়-স্বজন, সহকর্মী-প্রতিবেশী নানান ছাত্র-ছাত্রীকে পরীক্ষা সংক্রান্ত সহায়তা করতে গিয়ে যেটুকু অভিজ্ঞতা অর্জন করেছি তাতে আপনাদের মন্তব্যকে দ্বিধাহীনচিত্তে সমর্থন করছি। প্রসঙ্গত একটি তথ্য-গত ত্রুটির প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। হায়ার সেকেণ্ডারীর ন্যায় স্কুল ফাইনালেরও যে হিউম্যানিটিজ, সায়েন্স ও কমার্স তিনটি স্ট্রীমের কথা লিখেছেন তা ঠিক নয়। উপরোক্ত দুটি পরীক্ষাতেই আরো কয়েকটি স্ট্রীম আছে। যেমন—টেকনিক্যাল, হোম সায়েন্স (কেবলমাত্র মেয়েদের জন্য) এবং আর্ট অ্যাপ্রেশিয়েশন।

চিত্তরঞ্জন দাস
৭২-বি, শ্রীগোপাল মল্লিক লেন,
কলিকাতা—১২

---

and in following this purpose, art shields us with sweet influences from the dark sorrows of our weakness.

The Modern Realistic Theatre helps to stir up in the people that nestlessness which is the enemy of all things.

The duty of the Theatre (both as Art and as Institution) is to awaken more calmness & more wisdom in mankind by the inspiration exhaling from its beauty.

Photographic and Phonographic Realism injure the minds of the people. They thrust upon them a grotesque and inaccurate depresentation of the outward and visible life, with the divine essence—the spirit—the beauty of life left out.

Unimportant is it what subject the artist turns to—his pleasure is to illumine all that he touches so that its hall shine brightly. A momentary glance at the works of the Masters will endorse the truth of the statement.

But this modern Realistic Theatre pays no heed to the masters, even if be aware of the existence of their works.

Realism contains the seeds of Revolt, and however much the heart of the man may lean with pity towards those whom fate seems to follow relentlessly, the artist must never lend his art, with its terrible power of appeal, towards the destruction of that just Balance which it is the aim of mankind to create and preserve. For there is no poison more swift than that which eats into the mind. This false witnessing Realism—This traitor of the Imagination—This idolatry of ugliness to which the Realistic Theatre would compel us.

This thing first appeared in Paris, but only after 1789! For a time it flourished, but while exciting the mob it revolted the intelligent.

It then passed into Russia, into Germany, into Portugal and other restless places.

Neither in England nor America, nor yet in Ireland has it ventured—in these lands the Theatre often succeeds in its vulgarities without the aid of Realism.

Daring and Dangerous—it is a Revolt against the very Laws of the Art of the Theatre.

Daring, because to represent nature is an impossibility.

Dangerous, because it is a threat against the well-ordered life of the citizen. Each whisper of Revolt finds and echo in the Theatre of Realism—the gloomy expressions, the shuffling movements—the dark and closed-in scenes—the spasmodic exclamations of the actors—the strange muffled atmosphere—all these things lend themselves to form one sinister impression.

Alas! all this is false and unworthy of the theatre, both as an institution of the realm and as an Art.

With the Freedom of the Theatre—free to select what it shall show—free from the tutorship of the other arts as to how it shall show—comes new hope. Only by its freedom can its health be restored.

[ক্রমশঃ]

রঙ্গজগৎ

পর্বতের মূষিক প্রসব

অবশেষে পর্বত মূষিক প্রসব করেছে। বহু আবেদন-নিবেদন, বহু আন্দোলন-বিক্ষোভ ইত্যাদির পর রবীন্দ্র-সদনের (স্মরণী) পরিচালকমণ্ডলী গঠিত হয়েছে চোদ্দ জন সদস্য নিয়ে। রবীন্দ্র-সদন বা স্মরণী নিয়ে কম কাণ্ড ঘটে নি। জন্ম-শতবার্ষিকী পালনের জন্য যে ভবন নির্মাণের কথা তা শেষ হলো ছয় বছর পরে। সত্বর শেষ করার দাবিতে শিল্পীদের পথের সামনে বসে গান, আবৃত্তি করতে হয়েছে, কাগজে-কাগজে কত লেখালেখি করতে হয়েছে, সঙ্গে সঙ্গে প্রশ্ন উঠেছে এই ভবন জাতীয় নাট্যশালা হবে, না আর দশটির মত ভাড়া খাটার বাড়িতে পরিণত হবে। তারপরে প্রশ্ন উঠেছে যদি জাতীয় নাট্যশালা হয় তবে পরিচালক-মণ্ডলী কিভাবে গঠিত হবে। তার জন্য বিকল্প প্রস্তাবও দেওয়া হয়েছে। এই বিকল্প প্রস্তাব দিতে এসে শহরের শিল্পীরা মৃদু (?) লাঠি খেয়ে ফিরে গেছেন। ভবনের নাম নিয়েও প্রশ্ন উঠছে, স্মরণী আর সরণি উচ্চারণের দরুণ ভবন আর পথ একাকার হয়ে যাওয়ার কথা। শেষ পর্যন্ত অনেক কাঠখড় পোড়াবার পর স্মরণী হয়েছে সদন, আর চোদ্দ জনের একটা পরিচালকমণ্ডলী গঠিত হয়েছে। এই চোদ্দ জনের মধ্যে শ্রীসুনীতি চট্টোপাধ্যায়, বিশ্বভারতী ও রবীন্দ্র-ভারতীর দুই উপাচার্য রয়েছেন। অন্যদের আমরা পরম ভাগ্যবান ব্যক্তিই বলব; কারণ অধিকাংশ সরকারী কমিটির আসন এঁরা উজ্জ্বল করে থাকেন। এঁদের মধ্যে এমন একজন নাট্যকার ও অভিনেতাও যুক্ত হয়েছেন যাঁর সঙ্গে রবীন্দ্র-নাটকের সম্পর্ক নেই। দর্শক ও সমালোচকদের তাঁর সম্পর্কে ধারণা বড় দুর্বল। এক দিকে সরকারী মহলে আর এক দিকে মার্কিন মহলে তাঁর তদ্বিরের জোর বড় বেশি। লোকে তাঁকে মার্কিন-প্রেমিক বলেই জানে। কিছুদিন আগেও দুই মার্কিন নাট্য-বিশারদকে সঙ্গে নিয়ে তিনি কলকাতার সাংস্কৃতিক জগৎকে জ্ঞান দেবার চেষ্টা করেছেন। যখন দেশের সকল মানুষ আমেরিকার সাম্রাজ্যবাদী নীতির বিরুদ্ধে বিক্ষোভ জানাচ্ছে, তখন এই সংস্কৃতিজ্ঞ আমেরিকান রিপোর্টারের কৃতার্থ হয়ে ছবি ছাপাচ্ছেন। আর একজন আছেন সংগীতজ্ঞ। তিনি ফিল্মি গানের জগতে নাম করেছেন। পাঁচ মিশালী সুরে, জগাখিচুড়ি কথায় তাঁর কিছু কিছু গান অপূর্ব! ড্রেন পাইপ আর টাইট সালোয়ার কামিজেরা তাঁর বড় ভক্ত। তিনি রবীন্দ্র-সঙ্গীত জগতের না হোন, ফিল্মি গানের ভক্তদের প্রতিনিধি বটে! কয়েকজন জী-হ্যাঁ সাহিত্যিকও কমিটি অলঙ্কৃত করেছেন। এঁদের একজনের সাহিত্য-প্রতিভায় এক-জন প্রথম শ্রেণীর কবি আবিষ্কৃত হয়েছে, দেশের মানুষ যাঁকে এতকাল দুর্নীতি ও দুর্ভাগ্যের জন্য সকাল-সন্ধ্যা শাপান্ত করে আসছে।

এই কমিটিতে নরেশ মিত্র, সরযূ দেবীর মত প্রবীণ অভিনেতা নেই, রবীন্দ্র-সংস্কৃতি জগতের সৌম্যেন ঠাকুর নেই, উদয়শংকর ও মন্মথ রায় নেই, পেশাদার নাট্যমঞ্চের এবং নাট্য আন্দোলনের প্রতিনিধিরা নেই। এই কমিটির চরিত্র দেখে মনে হয় না রবীন্দ্র-সদনকে জাতীয় নাট্যশালা করা হচ্ছে। দেশের নাট্যসংস্থাগুলি বিভিন্ন সম্মেলন থেকে দাবি তুলেছিল রেজিস্ট্রিকৃত এবং রবীন্দ্র-ভারতীর অনু-মোদিত প্রত্যেক নাট্যসংস্থার প্রতিনিধিদের ভোটে কমিটি নির্বাচিত হোক। এই কমিটি গঠনে সেই দাবি প্রত্যাখ্যাত হল।

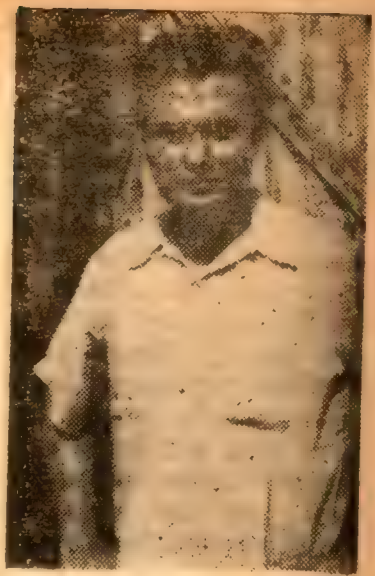

অনিল চ্যাটার্জী

চিত্র আলোচনা

পাড়ি

নিউ ইণ্ডিয়া পিকচার্স
জগন্নাথ চট্টোপাধ্যায়

'পাড়ি' ছবিটি কাহিনীর দিক থেকে হৃদয়স্পর্শী। এই কাহিনী দুই দশকেরও অধিককাল পূর্বের হলেও আজও এই পটভূমির পরিবর্তন হয় নি। এখনও এমন অনেকে দণ্ডভোগ করে থাকে যারা সত্যের দিক থেকে নিরপরাধ কিন্তু আইনের দিক থেকে অপরাধী সাব্যস্ত হয়। কি পরিস্থিতি ও কিরূপ ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে অপরাধ ঘটেছে তা তলিয়ে দেখার দায়িত্ব বিচারালয় বা সমাজ কেউ গ্রহণ করে না। সমাজের এই অন্ধত্বের দরুণ বহু নিরপরাধ অপরাধী হয়ে যায়। যে জীবন প্রস্ফুটিত ফুলের মত সুন্দর হয়ে উঠতে পারত, সে জীবন ধিক্কারের অন্ধকারে চাপা পড়ে। জীবনের এই অন্ধকার দিকটিকে নিয়ে দেশে-বিদেশে বহু সাহিত্য ও চলচ্চিত্র সৃষ্টি হয়েছে, মনীষীরা সমাজের কাছে এই দিকটি তুলে ধরেছেন। কিন্তু যতদিন সমাজের আমূল পরিবর্তন না হচ্ছে, সর্বপ্রকার বঞ্চনা ও শোষণের অবসান না ঘটছে এবং জনসাধারণের

স্বার্থে আইন ও বিচারের পরিবর্তন না হচ্ছে ততদিন এই দুর্ভাগ্যের দিকটি থেকে যাবে।

'পাড়ি'র মূল কাহিনীকার 'জরাসন্ধ'। অপরাধী জীবনের মধ্য থেকে তিনি মানবিকতার দিকটি তুলে ধরতে চেয়েছেন তাঁর বিভিন্ন সাহিত্যে। জন্মসূত্রে মানুষ অপরাধী হয় না, সমাজই মানুষকে অপরাধী করে। এই কাহিনীর নায়ক-নায়িকা তারা ও ঘনশ্যাম বাল্যবন্ধু, একসঙ্গে প্রকৃতির কোলে তারা মানুষ হয়েছে। কৈশোরে তাদের ছাড়াছাড়ি হয়েছিল, কিন্তু যৌবনে আবার তারা মিলবার সুযোগ পেয়েছিল। এ সময় কলকাতা থেকে আগত দাদার এক বন্ধুর বিশ্রী ব্যবহারে তারার নামে অপবাদ রটে এবং এই সুযোগ গ্রহণ করে গ্রাম্য মাতব্বর কুচক্রী জগদীশ। সে সহায়তা গ্রহণ করে লম্পট বাদল দারোগার। জমিদারবাড়িতে পুজোয় বলি আটকে যাবার ঘটনাকে কেন্দ্র করে অপমান থেকে তারার সম্মান বাঁচাতে গিয়ে ঘনশ্যামের লাঠিতে জগদীশ নিহত হয়। ঘনশ্যাম ও তারার বাবা অনন্ত নায়েককে পুলিশ গ্রেপ্তার করে। তাদের বাঁচাবার জন্য তারা বাদল দারোগার বিয়ের প্রস্তাবে রাজী হয়। অনন্ত নায়েক মুক্তি পেলেও ঘনশ্যামের যাবজ্জীবন কারাদণ্ড হয়। কিছুকাল অসুখী

উত্তমকুমার প্রযোজিত 'গৃহদাহ' ছবিতে সুচিত্রা সেন ও উত্তমকুমার

অরবিন্দ মুখার্জী পরিচালিত 'নতুন জীবন' ছবির একটি দৃশ্যে অনিল চট্টোপাধ্যায় ও সন্ধ্যা রায়

[illegible] জীবন যাপন করার পর একদিন এক কুমারী কন্যার সম্মান বাঁচাতে গিয়ে তারার হাতুড়ীর আঘাতে খাদল দারোগার মৃত্যু হয়। বিচারে তারার জেল হয় এবং অনেক সাধ্য-সাধনা করে সে আন্দামানে বদলি নিয়ে চলে আসে ঘনশ্যামকে দেখার জন্য। জেলে বসে সে বার বার ভেবেছে নিরপরাধ ঘনশ্যাম তার সম্মান বাঁচাতে গিয়ে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড ভোগ করছে। অবশেষে তারা আন্দা-মানে এল এবং ঘনশ্যামের সাথে তার সাক্ষাতের ব্যবস্থা হল। কিন্তু জেলার যখন বলল, তোমরা দু'জনে বিয়ে করে জেলের বাইরে বাস কর, তখন দুজনের কেউ সেই প্রস্তাবে রাজী হতে পারল না। তারা পরস্পরের জন্য আকর্ষণ বোধ করলেও যে সমাজে বড় হয়েছে সে পরিস্থিতিতে ভালবাসার কথা ভাবতে পারে নি। শেষ পর্যন্ত তারা জেল থেকে পালিয়ে ঘনশ্যামের ঘরে এসে উঠল এবং অপরাধী জীবনের চিহ্ন নিয়েও নতুন করে জীবন শুরু করল, যেখানে অর্থ নয়, বংশ-পরিচয় নয়, প্রেমই একমাত্র দু'টি জীবনকে এক করার সূত্র।

ছবিটি দর্শকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে, কাহিনীর চেয়েও বোম্বাইয়ের দু'জন বিখ্যাত শিল্পীর অংশ গ্রহণের জন্য। সুপরিচিতা প্রণতি ভট্টাচার্য প্রযোজিকা হিসাবেও সম্প্রতি দর্শক-দের আস্থা অর্জন করেছেন। পরি-চালক জগন্নাথ চট্টোপাধ্যায় সাহিত্যের গল্পটিকে মোটামুটি পর্দায় উপস্থিত করে গেছেন। পরিচালক হিসাবে তেমন কৃতিত্বের পরিচয় এতে নেই, বরঞ্চ শেষের দিকে কিছুটা ঘোলাটে করে বিশ্বাস্য পরিবেশ নষ্ট করেছেন। যেমন আন্দামান সেলুলার জেল থেকে তারার পালিয়ে যাওয়া, গ্রাম্য মেয়ে তারার জেলারের সাথে ইংরেজীতে কথা বলার চেষ্টা করা। দারোগার মাতলামি ও বাঈজীর বাড়িতে রাত্রিযাপন ইত্যাদিতে কিছু গতানুগতিক স্থূল দৃশ্যের অনুকরণ রয়েছে। ছবিটির সংলাপ মোটেই সাহিত্যবুদ্ধির পরি-চায়ক নয়; স্থানে স্থানে মাত্রাজ্ঞান-হীন। আজকাল বোম্বাইয়ের অবাঙালী শিল্পী নিয়ে আসর জমাবার একটা অপচেষ্টা চলছে বাংলা ছবিতে। এরূপ চেষ্টায় সাময়িক আকর্ষণ হয়ত বাড়ে, কিন্তু শেষ পর্যন্ত প্রশংসা লাভ করা যায় না। এ ছবিতে নায়ক হিসাবে ধর্মেন্দরকে দেখতে বেমানান নয়, কিন্তু যখনই মুখ খুলেছেন তখনই নাট্য পরিবেশ রচনা ব্যর্থ হয়েছে। ঢালির

'বাহারে' ভির ভী আয়েগী' ছবিতে তনুজা

ছেলে ঘনশ্যামের মুখে আঞ্চলিক প্রভাব-মুক্ত শুদ্ধ বাংলা—তার সঙ্গে হিন্দীর টান, হাস্যকর ব্যাপার। দিলীপকুমার জেলার হিসাবে এত ইংরেজী না বলে হিন্দীতে বললেই স্বাভাবিক হত। অন্যান্য চরিত্রে অভি ভট্টাচার্য, বিকাশ রায়, সত্য বন্দ্যোপাধ্যায়, পদ্মা দেবী, রেণুকা রায়, আশা দেবী, বিদ্যারাও, দিলীপ রায়, শীলা পাল, নৃপতি চ্যাটার্জী প্রমুখ যথাযথ। তারার ভূমিকায় প্রণতি ভট্টাচার্য অভিনয়ের দিক থেকে সার্থক, তবে প্রথমাংশে তাঁর মুখে বয়সের ছাপের জন্য বেমানান মনে হয়েছে।

সঙ্গীত পরিচালনা ও গীত রচনার দায়িত্ব ছবির চরিত্র অনুযায়ী যথাযথ করেছেন সলিল চৌধুরী। চিত্রগ্রহণের কাজ মোটামুটি সন্তোষজনক।

নতুন জীবন

রাধারাণী পিকচার্স
অরবিন্দ মুখোপাধ্যায়

গজেন্দ্রকুমার মিত্র রচিত কাহিনী অবলম্বনে 'নতুন জীবন' ছবির চিত্র-নাট্য লিখিত হয়েছে। ধনীর সন্তান নির্মল ও অরুণা। সুখে-ঐশ্বর্যে ভাই-বোন লালিত-পালিত। অরুণার

লেখাপড়ার দিকে উৎসাহ আছে, নির্মল আড্ডা মেরে বাপের টাকা উড়িয়ে পাঁচ বছর যাবৎ এম-এ পড়ছে। তাদের ধারণা টাকাই সুখের মূল। এমন সময় বাড়িতে আশ্রয় পেল গরীব ছাত্র বিজয়। তার কাছে অরুণা শুনল—সুখ বিত্তে নয়, চিত্তে। ক্রমে অরুণা ভালবাসল বিজয়কে। কিন্তু অরুণার বাবা গরীব ছেলের সাথে মেয়ের বিয়ে দিতে কিছুতেই রাজী হল না। অরুণা বাবার মত অগ্রাহ্য করে বিজয়কে বিয়ে করে এক গরীব পাড়ায় গিয়ে ঘর নিল, চরম দারিদ্র্যের মধ্যেও মনের সুখে সংসার পাতল। ওদিকে নির্মলকে তার বাবা বিয়ে করাল পাস-করা বিলেতফেরৎ মেয়ে। কিন্তু সে সংসারে স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক কেবল এক বাড়িতে বাস করা ছাড়া তার বেশি কিছু নয়। নির্মলের স্ত্রী সারা-দিনরাত পুরুষ বন্ধুদের নিয়ে আড্ডা দিয়ে সময় কাটায়। অরুণা-নির্মলের বাবা এই চিত্র সহ্য করতে পারল না। বাবার মৃত্যুর পর নির্মল দু-হাতে টাকা উড়িয়ে ফতুর হয়ে গেল। তার দেউলিয়া অবস্থা দেখে আধুনিকা স্ত্রী বিবাহ-বিচ্ছেদ ঘটিয়ে চলে গেল। নির্মল এসে আশ্রয় নিল অরুণাদের বাড়িতে। সেখানে প্রথম প্রথম অনভ্যস্ত জীবনের জন্য অসুবিধা অনুভব করলেও—এত দারিদ্র্যের মধ্যে অরুণাদের সুখ এবং তার প্রতিবেশী পারুলের আত্মসম্মানবোধ দেখে সে বিস্মিত হল। ক্রমে পারুলকে বিয়ে করে সেও অরুণাদের প্রতিবেশী হল এবং নিজের মুখে বলল, এতদিনে সে সুখের নাগাল পেয়েছে।

সাধারণ পণ্যচিত্রের ছকে-বাঁধা এই ছবিতে ঐশ্বর্য ও দারিদ্র্য—দুটি জীবন পাশাপাশি দেখিয়ে উপরোক্ত বক্তব্য প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। এই বক্তব্য দরিদ্র জনসাধারণের মনে কিছুটা আত্ম-বিশ্বাস জাগাবার এবং অর্থকে যাঁরা সুখের একমাত্র মূল মনে করেন তাঁদের ভ্রান্তি দূর করায় সহায়ক। আটপৌরে জীবনের পাশে পশ্চিমী অনুকরণে জীবনের কৃত্রিমতা ও প্রাণহীনতা পরি-চালক স্পষ্ট করে তুলেছেন। সাধারণ দর্শকদের খুশি করার জন্য ছবিতে গান এবং কৌতুককর সংলাপ সংযোজিত হয়েছে।

অভিনয়ে সর্বাধিক প্রশংসনীয় অনিল চট্টোপাধ্যায় ও সন্ধ্যা রায়। অন্যান্য চরিত্রে আছেন অনুপকুমার, পাহাড়ী সান্যাল, শোভা সেন, সুমিতা সান্যাল, দীপিকা দাস, জহর রায়, গঙ্গাপদ বসু, হরিধন মুখার্জী, বাণী গাঙ্গুলী প্রমুখ। রাজেন সরকার পরিচালিত সঙ্গীত চিত্তসুখকর পরি-বেশ রচনার সহায়ক হয়েছে, গানগুলি সুগীত।

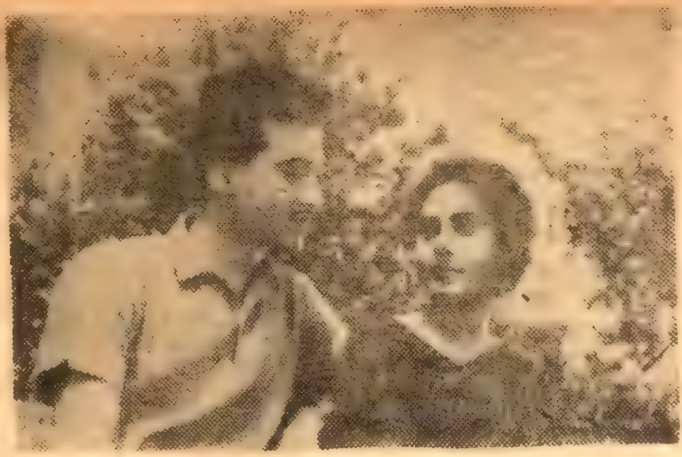

প্রফুল্ল চক্রবর্তী পরিচালিত 'শেষ তিন দিন' ছবির একটি দৃশ্যে বিজয় ভাওয়াল ও সুব্রতা চ্যাটার্জী।

দো-বদন' হিন্দী ছবির একটি দৃশ্যে মনোজকুমার ও আশা পারেখ

নাটকের কথা

লোকরঞ্জনের নাট্যোৎসব

গত ১৫ই আগস্ট নবনির্মিত রবীন্দ্র-সদনে (স্মরণী) পশ্চিমবঙ্গ সর-কারের তথ্য ও জনসংযোগ বিভাগের লোকরঞ্জন শাখার আয়োজিত নাট্যোৎসব উদ্বোধন হয়েছে। উদ্বোধন করেছেন ডাঃ প্রতাপচন্দ্র গুহরায়। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেছেন মন্ত্রী শ্রীবিজয়সিং নাহার। লোকরঞ্জন শাখার শিল্পীরা উদ্বোধন সঙ্গীতের পর শ্রীসৌরেন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য লোক-রঞ্জন শাখার দ্বাদশ বছরের কার্যাবলী বর্ণনা করেন। এই প্রচেষ্টাকে

অভিনন্দন জ্ঞাপন করেন শ্রীউদয়শঙ্কর, শ্রীনরেশ মিত্র এবং মন্ত্রী শ্রীশৈলকুমার মুখোপাধ্যায়।

প্রথম রজনীতে অভিনীত হয় নাট্যকার শ্রীমন্মথ রায় রচিত 'মহা উদ্বোধন'। স্বামী বিবেকানন্দের জীবন অবলম্বনে নাটকটি রচিত হয়েছে। ১৬ই মঞ্চস্থ হয় নৃত্যনাট্য 'ভারতের সাধক কবি'। এই নৃত্যনাট্যে শঙ্করাচার্য থেকে রবীন্দ্রনাথ পর্যন্ত এগারজন মনীষীর জীবন ও শিক্ষা বর্ণনা করা হয়। ১৭ই মঞ্চস্থ হয়েছে সামাজিক নাটক 'জাগরী'। ১৮ই রবীন্দ্রনাথের নৃত্যনাট্য 'চণ্ডালিকা'। ১৯শে পৌরাণিক নাটক 'কুরুক্ষেত্র'।

'রোশনাই' পত্রিকার উৎসব

গত ১২ই আগস্ট, মহাজাতি সদনে ছোটদের মাসিক পত্রিকা 'রোশনাই'-এর ষষ্ঠ বর্ষপূর্তি উৎসব হয়ে গেল। উৎসবে গ্রাহক-গ্রাহিকাদের নাচ, গান, নৃত্য এবং যন্ত্রসঙ্গীতের পরিচালনা করে গ্রাহিকা টিয়া বসু। শিল্পী শ্রীশৈল চক্রবর্তীর পরিচালনায় অবাক-করা 'পুতুল-রঙ্গ'-এর বেহালাবাদক, পুজোর বাজার এবং নকুড়বাম্বা সবাইকে অবাক করেছে। শিশু রংমহল (সি-এল-টি) পরিচালিত নৃত্য-নাট্য 'জিজো' সুনাম অনুযায়ী দর্শক-দের আনন্দ দিতে পারে নি সেদিন। এ ছাড়া উৎসবটি পরিচ্ছন্ন হয়েছে সবদিক থেকে।

আন্তঃঅফিস নাটক প্রতিযোগিতা

আনন্দমের উদ্যোগে অনুষ্ঠিত আন্তঃঅফিস নাটক প্রতিযোগিতায় (১৯৬৬) নিম্নোক্ত সংস্থাগুলি যথাক্রমে প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্থান অধিকার করেছে।

প্রথম—ন্যাশনাল গ্রিন্ডলে ব্যাঙ্ক কর্মচারী সমিতির (মেইন অফিস) 'ইঙ্গিত'। নাট্যকার কালীপ্রসাদ রায়-চৌধুরী।

দ্বিতীয়—ইস্পাত ক্লাবের 'তমসার তীরে'। নাট্যকার রমেন লাহিড়ী।

তৃতীয়—ডানকান ব্রাদার্স স্পোর্টস এসোসিয়েশনের 'বিকল্প'। নাট্যকার লোকনাথ দেবশর্মা।

শ্রেষ্ঠ স্ক্রিপ্ট, শ্রেষ্ঠ পরিচালনা, দলগত কাজ এবং শ্রেষ্ঠ অভিনেতার পুরস্কার পেয়েছেন যথাক্রমে রমেন লাহিড়ী, সুবোধ বন্দ্যোপাধ্যায়, ইস্পাত ক্লাব, লোকনাথ চক্রবর্তী।

সত্যেন বসু পরিচালিত 'মেরে লাল' ছবিতে ইন্দ্রাণী মুখার্জী ও দেবকুমার

স্টুডিও খবর

হাটে বাজারে

তপন সিংহের নতুন ছবি হবে 'হাটে বাজারে'। বনফুল রচিত এই কাহিনী তিনি গ্রহণ করেছেন এবং গত ১১ই আগস্ট মহরৎ সম্পন্ন হয়েছে। এই ছবিতে অভিনয় করবেন বৈজয়ন্তীমালা। তিনি মহরৎ অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন। সংগীত পরি-চালনা করবেন হেমন্তকুমার।

চিড়িয়াখানা

শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় রচিত কাহিনী অবলম্বনে 'চিড়িয়াখানা' ছবির পরিচালনার দায়িত্ব নিয়েছেন "নায়ক" গোষ্ঠী। বিভিন্ন ভূমিকায় আছেন উত্তমকুমার, জহর গাঙ্গুলী, শৈলেন মুখার্জী প্রমুখ। চিত্রনাট্য রচনা ও সংগীত পরিচালনা করছেন সত্যজিৎ রায়।

বাজীকর

আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের 'বাজী-কর'-এর চিত্ররূপ দিচ্ছেন বিমল রায়। ছবিতে অভিনয় করবেন উত্তমকুমার, সুপ্রিয়া চৌধুরী, এবং বোম্বাইয়ের জনৈকা অভিনেত্রী।

মেজদিদির হিন্দীরূপ

শরৎচন্দ্রের 'মেজদিদি' হিন্দীতে রূপায়িত হতে চলেছে হৃষিকেশ

মুখার্জীর পরিচালনায়। প্রধান দুটি ভূমিকায় থাকবেন মীনাকুমারী ও ধর্মেন্দ্র। সংগীত পরিচালনায় থাকবেন হেমন্তকুমার।

শিশুনাট্য প্রতিযোগিতা

বিশ্বরূপা নাট্য-উন্নয়ন পরিকল্পনা পরিষদ আয়োজিত গিরিশ নাট্যপ্রতিযোগিতার শিশুনাট্য বিভাগে ১৯৬৬ সালের প্রতিযোগিতার ফলাফল প্রকাশিত হয়েছে। এ বছর বারটি সংস্থা প্রতিযোগিতা করে।

প্রতিযোগিতায় প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় পুরস্কার পেয়েছে যথাক্রমে (১) সবপেয়েছির আসরের নাটকঃ কানাই বলাই; (২) সবুজসাথীর নাটকঃ বুদ্ধি যার বল তার; (৩) চাঁদনী সংঘের নাটকঃ উমা হৈমবতী। শ্রেষ্ঠ অভিনেতা ও অভিনেত্রীর পুরস্কার পেয়েছে যথাক্রমে রানা গুহ (লঙ্কা দহন) ও শ্বেতা ব্যানার্জী (উমা হৈমবতী)। শ্রেষ্ঠ টাইপ অভিনেতার পুরস্কার পেয়েছে তাপস মল্লিক (বুদ্ধি যার বল তার)।

বাঘনখ

গত ৭ই আগস্ট বালিকা শিক্ষা-সদন মঞ্চে 'বলাকা'র উদ্যোগে 'বাঘনখ' মঞ্চস্থ হয়েছে। এই তাঁদের প্রথম নাট্য প্রয়াস। 'বাঘনখ' একটি রহস্য-নাটক। অভিনয়ে বিভিন্ন ভূমিকায় অংশ গ্রহণ করেছে অমিতাভ সেন, সুব্রত সেন, স্বপন চৌধুরী, অসিত পাত্র, শঙ্কর নায়ক, সুধীর পাত্র, মুকুল দে। নাটকের পরিচালনা চন্দনসই।

সঙ্গীতকথা

শিল্পী পান্নালাল স্মৃতি অনুষ্ঠান

পান্নালাল ঘোষের ৫৫তম জন্ম-বার্ষিকী উপলক্ষে গত ৭ই আগস্ট ১০।১, হিন্দুস্থান রোডে এক মনোজ্ঞ সংগীতানুষ্ঠান হয়েছে। অনুষ্ঠানের প্রারম্ভে স্মৃতিরক্ষা সমিতির সম্পাদক শ্রীসুনীল ঘোষ বলেন, দিল্লী, বোম্বাইতে স্মৃতিরক্ষার ব্যবস্থা হয়েছে, মাদ্রাজে স্মৃতিরক্ষার ব্যবস্থা হচ্ছে কিন্তু শিল্পী পান্নালালের জন্মভূমি বাংলাদেশে এখনও কোন ব্যবস্থা হয় নি। সংগীতানুরাগিবৃন্দ যদি উৎসাহ দেখান তবে এখানে যথার্থভাবে স্মৃতি-রক্ষা সম্ভব হতে পারে।

এর পরে গৌর গোস্বামী বাঁশীতে মারবা রাগ বাজিয়ে শ্রোতৃবৃন্দকে মুগ্ধ করেছেন, সঙ্গতে ছিলেন হরিপদ দত্ত। পরে দ্বৈত সংগীতে দুলাল রায় জলতরঙ্গ এবং চিত্তরঞ্জন মুখার্জীর সেতার ও সংগতে ছিলেন অমর দে। এই ত্রয়ী অনুষ্ঠানটি খুবই উপভোগ্য হয়েছিল। উদীয়মান গায়ক গৌতম রায় মালকোষ রাগ এবং পাহাড়ী ঠুংরী গেয়ে প্রশংসা অর্জন করেছেন। সংগতে ছিলেন অমর দে। ওস্তাদ বাহাদুর খাঁ সরোদে এবং অনিল ভট্টাচার্য তবলায় খুবই গাম্ভীর্যপূর্ণ পরিবেশের সৃষ্টি করেছিলেন। তিনি চার্যকী মল্লার রাগে আলাপজোড় এবং মেঘ-রাগে গৎ বাজিয়ে অনুষ্ঠানের শেষাংশে অতি চমকপ্রদ পরিবেশ সৃষ্টি করে সকলের মনে আলোড়ন সৃষ্টি করেছিলেন।

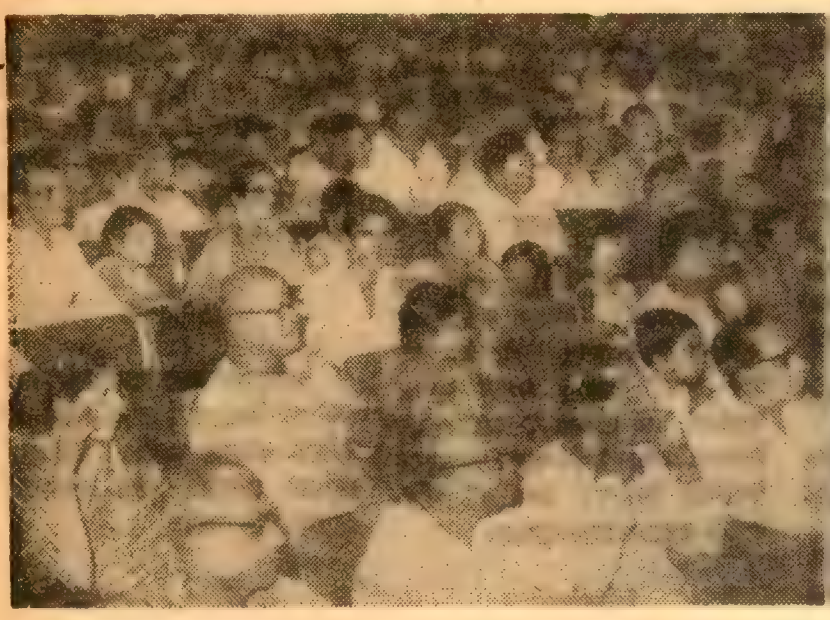

'রোশনাই' পত্রিকার উৎসবে সমাগত দর্শক ও পাপেটের দৃশ্য

খেলাধূলা

কিংসটনে কমনওয়েলথ গেমসে ফ্লাইওয়েট মল্লযুদ্ধে পদক বিজয়ী তিনজন প্রতিযোগী

কিংসটনের কমনওয়েলথ গেমস

জ্যামাইকার কিংসটনে শেষ হ'ল এবারের কমনওয়েলথ গেমস। পদক প্রাপ্তির দিক থেকে এই অষ্টম কমনওয়েলথ গেমসে শ্রেষ্ঠত্বের মর্যাদা লাভ করেছে ইংলন্ড ; ইংলন্ড স্বর্ণপদক লাভ করেছে তেত্রিশটি, রৌপ্যপদক চব্বিশটি এবং ব্রোঞ্জপদক তেইশটি। ভারত দখল করেছে মাত্র তিনটি স্বর্ণপদক, চারটি রৌপ্যপদক এবং তিনটি ব্রোঞ্জপদক। এবারের কমনওয়েলথ গেমসে ভারতীয় প্রতিনিধি দলের মধ্যে মল্লযোদ্ধারাই ভারতের গৌরব বৃদ্ধি করেছে। ভারত তিনটি স্বর্ণপদকই লাভ করেছে মল্লযুদ্ধে। ব্যান্টম ওয়েট লাইট ওয়েট এবং হেভী ওয়েটে ভারত লাভ করেছে স্বর্ণপদক। মল্লযুদ্ধে ভারত লাভ করেছে আরও দুটি রৌপ্যপদক এবং দুটি ব্রোঞ্জপদক। এবার কমনওয়েলথ গেমসে মল্লযুদ্ধে সুপ্রতিষ্ঠিত প্রাধান্য ছিল ভারত এবং প্যাকিস্তানের। মল্লযুদ্ধের আটটি বিষয়ের মধ্যে ভারত তিনটি স্বর্ণপদক এবং পাকিস্তান চারটি স্বর্ণপদক লাভ করে। ভারতের পক্ষে প্রথম পদক লাভ করেন ভারোত্তোলনের ফেদার ওয়েট এম এল ঘোষ দ্বিতীয় স্থান লাভ করে রৌপ্যপদক লাভ করেন। এশিয়ান ব্যাডমিন্টন চ্যাম্পিয়ান দীনেশ খান্না তৃতীয় স্থান অধিকার করে ব্রোঞ্জপদক লাভ করেন। ভারতের তরুণ অ্যাথলেট পরভীন কুমার হ্যামার থ্রোয়ে রৌপ্যপদক দখল করেন।

কেনিয়ার অখ্যাত এ্যাথলেট তেইশ বৎসর বয়স্ক সৈন্যবিভাগের সদস্য নাফতালী টেমু অস্ট্রেলিয়ার বিশ্ববিখ্যাত দূরপাল্লার দৌড়বীর রন ক্লার্ককে ছয় মাইল দৌড়ে পরাজিত করে স্বর্ণপদক লাভ করেন। রন ক্লার্কের পুনরায় পরাজয় ঘটে তিন

শ্রীঅমিতাভ

মাইল দৌড়ে। তিন মাইল দৌড়ে কেনিয়ার খ্যাতনামা দৌড়বীর কিপচিগো কিনো রন ক্লার্ককে পরাজিত করে প্রথম স্থান লাভ করেন। এক মাইল দৌড়েও বিজয়ী হয়ে কিনো দুটি স্বর্ণপদক লাভের কৃতিত্ব অর্জন করেন।

এবারের কমনওয়েলথ গেমসের ম্যারাথন রেসটি বোধ হয় বহুদিন স্মরণীয় হয়ে থাকবে। স্কটল্যান্ডের জিম অল্ডার যেভাবে স্বর্ণপদক লাভ করেন তা সত্যই উল্লেখযোগ্য। স্টেডিয়ামে প্রবেশের পূর্বে অল্ডার দ্বিতীয় এ্যাথলেট ইংলন্ডের বিল এ্যাডকের চাইতে অনেক এগিয়ে ছিলেন। স্টেডিয়ামে প্রবেশের মুখে ভুল পথে চলে যাবার ফলে অল্ডার প্রায় পঞ্চাশ গজ অতিরিক্ত দৌড়ান এবং শেষের ৪৪০ গজে অল্ডার আঠারো গজ পেছিয়ে যান, কিন্তু প্রাণপণে দৌড়ে শেষ পর্যন্ত দশ গজ এগিয়ে থেকে ২ ঘণ্টা ২২ মিনিট ৭·৮ সেকেন্ডে জয়ী হন তিনি।

শীল্ডের শুরুতে

শীল্ডের খেলা শুরু হয়েছে, কিন্তু এখনও ক্রীড়ামোদীদের আকর্ষণলাভে

শ্যামল ব্যানার্জী

সমর্থ হয় নি শীল্ডের আসর। কারণ শীল্ডের আসরে বড় দলগুলির আবির্ভাব এখনও হয় নি। বড় দলগুলির নির্ভরযোগ্য কয়েকজন খেলোয়াড় বর্তমানে কুয়ালালামপুরে মার্ডেকা ফুটবল প্রতিযোগিতায় ভারতের পক্ষে প্রতিনিধিত্ব করছেন। সেপ্টেম্বর মাসের প্রথম দিকে শীল্ডের আসর জমে উঠবে মনে হয়।

এবার আই-এফ-এ শীল্ডের উদ্বোধনী খেলায় কলকাতার বাটা স্পোর্টস ক্লাব পরাজিত করে হাওড়া জেলা একাদশকে ৫-১ গোলে। উদ্বোধনী খেলায় শীল্ডের প্রথম হ্যাট্‌ট্রিক করার কৃতিত্ব অর্জন করেন অমিয় ভট্টাচার্য। তিনি একাই পাঁচটি গোল করেন। বাটা দলের রক্ষণভাগের আর একজন খেলোয়াড়ের খেলা এই মরশুমে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে, তিনি হলেন তরুণ খেলোয়াড় শ্যামল ব্যানার্জী। শ্যামল ব্যানার্জী বাটার রক্ষণভাগের একজন সত্যিকারের নির্ভরযোগ্য খেলোয়াড়। শীল্ডে অন্যান্য খেলাগুলির মধ্যে উয়াড়ী দলের সঙ্গে চন্দননগর জেলা দলের খেলাটি গোলশূন্যভাবে শেষ হয়। রাজস্থান দল ৩-১ গোলে ২৪-পরগনা জেলা দলকে পরাজিত করে এবং পশ্চিমবঙ্গ পুলিশ ও স্পোর্টিং ইউনিয়ন দলের খেলাটি ২-২ গোলে অমীমাংসিতভাবে শেষ হয়।

* * *

কুয়ালালামপুরে অনুষ্ঠিত মার্ডেকা ফুটবল প্রতিযোগিতার প্রাথমিক পর্যায়ের খেলায় ভারত ২-০ গোলে পরাজিত করে হংকং দলকে। ভারতের পক্ষে গোল দুটি করেন অশোক চ্যাটার্জী এবং রাজেন্দ্রমোহন। অশোক চ্যাটার্জী একক প্রচেষ্টায় বল নিয়ে দর্শনীয়ভাবে প্রথম গোলটি করেন।

ক্লে'র কাছে লণ্ডন পরাজিত

ক্লে এবং ব্রায়ান লণ্ডনের লড়াই যেন এক আকর্ষণহীন পরিবেশে শেষ হল। ক্যাসিয়াস ক্লে'র কাছে যেভাবে ব্রায়ান লণ্ডন পরাজিত হয়েছেন, তাতে লণ্ডন নিজেও অত্যন্ত লজ্জিত হয়েছেন আর লণ্ডনবাসী দর্শকরাও তাঁদের দেশের মুষ্টিযোদ্ধার এই পরাজয়ে ক্ষুব্ধ হয়ে লণ্ডনকে টিটকারী দিয়েছেন লড়াইয়ের শেষে লণ্ডন রিং ছেড়ে যাবার সময়।

লড়াইয়ের শেষে ব্রায়ান লণ্ডন অনেক দুঃখে বলেছেন যে, দৈহিক আঘাতের চেয়ে তাঁর বেশি আঘাত লেগেছে সম্মানে। তিনি স্বীকার করেছেন যে, বিরাট মুষ্টিযোদ্ধা তিনি নন বটে কিন্তু ক্লে'র বিরুদ্ধে এইভাবে ব্যর্থ হবেন এ ছিল তাঁর কল্পনাতীত। ব্রায়ান লণ্ডন আজ প্রায় দীর্ঘ এগারো বছর মুষ্টিযুদ্ধ করছেন এবং জীবনে শুধু একবার নক-আউট হয়েছিলেন সাতবছর আগে আর ক্লে তাঁকে তৃতীয় রাউণ্ডেই নক-আউট করলেন।

ক্লে-লণ্ডনের বিশ্বহেভীওয়েট মুষ্টিযুদ্ধ প্রত্যক্ষ করার জন্য ইণ্ডোর স্টেডিয়ামে উপস্থিত ছিল মাত্র আঠারো হাজার দর্শক এবং প্রায় অর্ধেক দর্শকাসন ছিল শূন্য। একে ক্লে ইতিপূর্বে লণ্ডনে লড়েছেন মাত্র মাস দুয়েক আগে হেনরী কুপারের সঙ্গে আর একবার তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বী ব্রায়ান লণ্ডন তেমন নামী মুষ্টিযোদ্ধা নন। তারপর ইংলণ্ডবাসীরা এই সময় প্রথম জুলে রিমে কাপ জয়ের আনন্দোৎসবে ছিল আকণ্ঠ নিমগ্ন। অন্যদিকে ছিল ইংলণ্ড ওয়েস্ট ইণ্ডিজের টেস্ট খেলার আকর্ষণ তাই মুষ্টিযুদ্ধের আসরটা ঠিক জমে ওঠে নি।

ব্রায়ান লণ্ডন এই লড়াই থেকে পেয়েছেন চল্লিশ হাজার পাউণ্ড। লড়াইয়ের পূর্বে ব্রায়ান লণ্ডন একটি মূল্যবান রোলস চড়ে আসেন, কিন্তু লড়াইয়ের শেষে টিউব ট্রেনে করে ঘরে ফেরেন এবং পরের দিন ব্ল্যাকপুলের পথে ব্রায়ান লণ্ডনকে ট্রেনে দ্বিতীয় শ্রেণীর কামরায় দেখা যায়।

ক্যাসিয়াস ক্লে

মহম্মদ আলি ক্লে বর্তমানে দেশে ফিরবেন এবং কিছুদিন অনুশীলনের পর তিনি পশ্চিম জার্মানীর পথে পা বাড়াবেন। কারণ ক্লে'র আগামী প্রতিদ্বন্দ্বী হলেন পশ্চিম জার্মানীর শ্রেষ্ঠ হেভীওয়েট মুষ্টিযোদ্ধা কার্ল মিল্ডেনবার্জার।

ব্রায়ান লণ্ডনের সঙ্গে জয়ী হবার ফলে ক্যাসিয়াস ক্লে তাঁর অপেশাদার জীবনের ২৫টি লড়াইয়ে অপরাজিত আখ্যা অক্ষুণ্ণ রাখলেন।

একটি নির্বাচনী প্রহসন

খেলার নামে ছেলেখেলার এক অত্যাশ্চর্য খেলা দেখার দুর্ভাগ্য আমার কিছুদিন আগে হয়েছিল কলকাতার কাছে অবস্থিত একটি খ্যাতনামা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইণ্ডোর স্টেডিয়ামে। সেদিন ছিল এই বিশ্ববিদ্যালয়ে ইঞ্জিনীয়ারিং বিভাগে প্রবেশের জন্য খেলোয়াড় বাছাইয়ের ট্রায়াল। যখন ইণ্ডোর স্টেডিয়ামে প্রবেশ করলাম তখন সমস্ত ব্যবস্থা দেখে সত্যই খুব ভাল লাগছিল। ট্রায়াল সুরু হল, একে একে খেলোয়াড়রা নেটে আসতে লাগলেন, কিন্তু অল্প কিছুক্ষণ পর বেশ অনুভব করলাম যে, ট্রায়াল গ্রহণের গুরুদায়িত্ব যাঁদের ওপর অর্পিত হয়েছে তাঁরা এই ঐতিহ্যশালী বিশ্ববিদ্যালয়ের মর্যাদা ক্ষুণ্ণ করছেন শ্রেফ নিজেদের স্বার্থসিদ্ধির জন্য।

আমি অবশ্য এই বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষের প্রশংসা করব। কারণ, তাঁরা গুণীর মর্যাদা দিতে জানেন। ভাল খেলোয়াড় হলে তাঁরা তাঁকে সাদরে গ্রহণ করেন যা বোধ হয় অনেক বিশ্ববিদ্যালয় করেন না।

কিন্তু যাঁদের ওপর ট্রায়াল গ্রহণের ভার অর্পিত হয়েছে তাঁদের ক'জন যে ট্রায়াল গ্রহণের যোগ্য তা জানি না। এছাড়া অনেক মাতব্বরের সমাগমে খেলার নামে ছেলেখেলাটি বেশ জমে উঠেছিল। ট্রায়াল পরিণত হয়েছিল প্রহসনে। এই বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন প্রাক্তন খেলোয়াড় এবং বর্তমানে এখানকার অধ্যাপক ছিলেন ক্রিকেট ট্রায়ালের বড় মাতব্বর। ছেলেদের নেটে ডেকে দুটো ব্যাটের বাড়ি মারতে দিতে আর চারটে বল করতে দিয়েই তাদের চলে যেতে বলছিলেন, অবশ্য সঙ্গে

অশোক চ্যাটার্জী

একটি করে সৌজন্যসূচক ধন্যবাদ দিতে ভুলছিলেন না। এই ভদ্রলোক এমন কি সর্বজ্ঞ ক্রিকেট বিশেষজ্ঞ যে এত অল্প সময়েই বুঝে যাচ্ছিলেন যে, ছেলেগুলির কোনটি অচল এবং কোনটি সচল। দেখে মনে হচ্ছিল যে আগে থেকেই সব ঠিকঠাক করা আছে। অবশ্য একথা অস্বীকার করব না যে, বেশ কয়েকটিকে দেখেছি যারা ব্যাটই ভাল করে ধরতে জানে না। কিন্তু কয়েকজন খেলোয়াড় ভাল খেলেও এই মাতব্বরদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে সক্ষম হন নি। যেখানে কয়েকটি কাঁচ ছেলে আশা-ভরা বুকে ট্রায়ালে এসেছে তারা নিশ্চয়ই নিরপেক্ষ নির্বাচন আশা করে—যেখানে নির্ভর করছে এই ছেলেগুলির জীবনের অনেক কিছুই, সেখানে এই ধরণের আচরণ সমর্থন করা যায় না। ফুটবলের ট্রায়াল বলতে গেলে ভালভাবেই হয়েছে, হকিতে যদিও দোষমুক্ত নির্বাচন হয় নি কিন্তু তাও সেখানকার ত্রুটি-বিচ্যুতি অবহেলা করা যায়। ক্রিকেটের কথা বিশেষভাবে উল্লেখ করলাম কারণ খেলার রাজা ক্রিকেট নিয়ে ছেলেখেলা খুবই দৃষ্টি-কটু লেগেছে।

সমাচার দর্পণ

ঝাড়গ্রাম স্পোর্টস এ্যাসোসিয়েশন পরিচালিত সাবিত্রী স্মৃতি চ্যালেঞ্জ কাপের ফাইন্যালে দক্ষিণ কলকাতার শান্তাফোকিয়া ক্লাব কসবা স্পোর্টিং দলকে ২-০ গোলে পরাজিত করে বিজয়ীর গৌরব অর্জন করেছে। শান্তাফোকিয়া ক্লাবের পক্ষে গোলদুটি করেন প্রতুল ঘোষ এবং বি মুখার্জী।

* * *

ইংলণ্ড ওয়েস্ট ইণ্ডিজের আগামী শেষ টেস্টে ইংলণ্ডের অধিনায়কত্ব করবেন ব্রায়ান ক্লোজ। চতুর্থ টেস্টে

গ্যারিফিল্ড সোবার্স

অধিনায়ক ছিলেন কলিন কাউড্রে। পঞ্চম ও শেষ টেস্টে কাউড্রে শুধু অধিনায়কের পদই হারান নি, দল থেকেও বাদ পড়েছেন। এবার ক্রিকেটার কলিন কাউড্রেকে দেখা যাবে ফুটবল পরিচালকের ভূমিকায়। ফুটবল অনুরাগী এবং চার্লটন ফুটবল দলের সমর্থক কলিন কাউড্রে শীঘ্রই চার্লটন এ্যাথেলেটিক ফুটবল ক্লাবের ডিরেক্টর নির্বাচিত হবেন।

* * *

ইংলণ্ড বিশ্বকাপ জয়ের কিছু দিনের মধ্যেই ইংল্যাণ্ডের বিশ্বকাপ-দলের ফরোয়ার্ড এ্যালান বল দল পরিবর্তন করলেন। ছিলেন ব্ল্যাকপুলে দলে, এবার তাঁকে খেলতে দেখা যাবে এবারের এফ-এ কাপ জয়ী এভার্টনের পক্ষে। এ্যালানের এই দল পরিবর্তনের মূল্য দিতে হয়েছে এভার্টনকে এক লক্ষ দশ হাজার পাউণ্ডের কাছাকাছি মানে ভারতীয় অর্থ মূল্য যার তেইশ লক্ষ দশ হাজার টাকা।

* * *

ইংলিশ চ্যানেল এবং পক-প্রণালী অতিক্রমকারী সাঁতারু মিহির সেন এবার ইউরোপ এবং আফ্রিকার বিভেদকারী চোদ্দ মাইল দীর্ঘ জিব্রাল্টার প্রণালী অতিক্রমের জন্য ভারত ত্যাগ করেছেন। বসপরাস প্রণালী এবং ডারডানেলিস প্রণালী অতিক্রমের পরিকল্পনাও তাঁর আছে এবং এই বিষয়ে তিনি প্রাথমিক ব্যবস্থাদি করবেন কিছুদিনের মধ্যেই। সামুদ্রিক আবহাওয়া বিশারদদের মতে আগামী ২৩শে থেকে ২৭শে আগস্টের মধ্যে দিনগুলি ভাল। সাঁতারের সময় আটলান্টিক হাঙরের হাত থেকে রক্ষা করার জন্য মিহির সেনকে জিব্রাল্টারের সরকারীমহল বৃহদাকার ছাদহীন এক ইস্পাতের জালের মধ্য থেকে সন্তরণ দিতে বলেছেন।

হেডিংলেতে বাজীমাৎ

গ্যারী কি আমাদের মত মানুষ! মাঝে মাঝে মনে হয় সে অতি মানুষ। বিশ্ব ক্রিকেটের ইতিহাসে

গীবস্

ঝাড়গ্রামে সাবিত্রী স্মৃতি কাপ বিজয়ী শান্তাফোকিয়া ক্লাব

অনেক রথী-মহারথীর আবির্ভাব ঘটেছে, কিন্তু মর্যাদার মানদণ্ডে বহুমুখী প্রতিভা যাচাই করলে একথা নিঃসন্দেহে বলা যায় যে, দ্বিতীয় গ্যারফিল্ড সোবার্স জন্মগ্রহণ করে নি। সোবার্স হলেন এক এবং অদ্বিতীয়। প্রতিভার আদরের দুলাল গ্যারী ব্যাট হাতে নিলে ছোটে রানের ফোয়ারা। বল হাতে নিলে সোবার্সের দুই রূপ। নতুন বলে জোরে বল করে বোলিং আক্রমণের সূচনা করা—সোবার্সের সঙ্গে অনেক তফাৎ সেই সোবার্সের যাঁর নিপুণ হাতের কুটিল স্পিনে ভরা বল ব্যাটসম্যানদের দুঃস্বপ্ন। ফিল্ডিংয়ে সোবার্স নিঃসন্দেহে পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ ফিল্ডারের মর্যাদা দাবি করতে পারেন। টেস্ট ম্যাচের বহু শক্ত এবং অসম্ভব ক্যাচ আশ্রয় পেয়েছে ফিল্ডার সোবার্সের করতলে। এখন সোবার্সের ওপর অর্পিত হয়েছে এক বিরাট গুরুদায়িত্ব। অধিনায়কত্বের গুরুদায়িত্ব কাঁধে নিয়ে সাফল্যের সঙ্গে এগিয়ে চলেছেন সোবার্স। সবচেয়ে আশ্চর্যের কথা যে নেতৃত্বের এই বিরাট ভার কিন্তু সোবার্সের ব্যক্তিগত নৈপুণ্যকে এতটুকু ম্লান করতে পারে নি।

বেচারা ইংলণ্ড বিশ্বকাপ জয়ের পরই, লীডসের চতুর্থ টেস্টে হেডিংলের মাঠে সোবার্সের দলবল তৃতীয় পরাজয়ের কঠিন আঘাতে ইংলণ্ডকে সত্যই ধরাশায়ী করেছে। একজন মন্তব্য করেছে যে, ফুটবলের ইংলণ্ডের ম্যানেজার র‍্যামসের মত ইংলণ্ডের ক্রিকেটের দৈন্যদশা মোচনের জন্য একজন অ্যালফ র‍্যামসের খুবই প্রয়োজন।

এই প্রসঙ্গে মনে পড়ে যাচ্ছে কয়েক বছর আগে ইংলণ্ডের কয়েকটি দম্ভোক্তি। সেদিন বড় গলায় অনেক ঢাক-ঢোল পিটিয়ে ইংলণ্ড সারা ক্রিকেট জগৎকে জানিয়েছিল যে, ভারতের মত দেশকে তিনদিনের বেশি টেস্ট খেলতে দেওয়া উচিত নয়। কিন্তু ভাগ্যদেবী বোধ হয় সেদিন অলক্ষ্যে শুধু মৃদু হেসেছিলেন। ভাগ্যের নিষ্ঠুর পরিহাসে চাকা ঘুরে গেল। যে ইংলণ্ড ভারতকে পাঁচটি টেস্টে পরাজিত করে বুক ফুলিয়ে অনেক কথাই বলেছিল, সেই ইংলণ্ডই টেড ডেক্সটারের নেতৃত্বে ভারতে এসে পরাজিত হয়ে রাবার খুইয়ে মাথা নিচু করে দেশে ফিরল, তার পরের সফর হল অমীমাংসিত। কিন্তু এবার দুর্ধর্ষ ওয়েস্ট ইণ্ডিজ দল ইংলণ্ডের মান-সম্মানকে একেবারে ধুলায় মিশিয়ে দিয়েছে।

হেডিংলের চতুর্থ টেস্টের পূর্বে অনেক দুরাশাবাদী ইংলণ্ড সমর্থক বলেছিলেন এখনও রাবার ড্র করার সুযোগ ইংলণ্ডের আছে, একমাত্র পথ হল আগামী দুটি টেস্টে ওয়েস্ট ইণ্ডিজকে পরাজিত করা। কিন্তু এই সব আশাবাদীদের দুরাশা শূন্যে মিলিয়ে গেল তামাশার মত। ইংলণ্ড আবার পরাজিত হল এক ইনিংস এবং ৫৫ রানে।

লীডসের চতুর্থ টেস্টে ওয়েস্ট ইণ্ডিজের অধিনায়ক গ্যারফিল্ড সোবার্সের আছে এক বিরাট অবদান। কারণ ব্যাট বলে সোবার্স ছিলেন এই টেস্টের শ্রেষ্ঠ খেলোয়াড়। রান করেছেন তিনি ১৭৪ এবং প্রথম ইনিংসে পাঁচটি উইকেট আর দ্বিতীয় ইনিংসে তিনটি উইকেট।

অধিনায়ক সোবার্স টসে জয়ী হয়ে প্রথমে ব্যাট করার সুযোগ গ্রহণ করেন। প্রথম ইনিংস সমাপ্তি ঘোষণা করে ওয়েস্ট ইণ্ডিজ দল ৯ উইকেটে ৫০০ রান সংগ্রহ করে। এই বিরাট রান সংখ্যার মধ্যে ছিল দুটি সেঞ্চুরী একটি সোবার্সের এবং একটি সেমুর নার্সের। নার্স সংগ্রহ করেন ১৩৭ রান।

ইংলণ্ড প্রথম ইনিংসের শুরুতেই দারুণ ব্যাটিং-বিপর্যয়ের সম্মুখীন হয়। মাত্র দলীয় ৮৩ রানে এক এক করে তাঁদের দুটি উইকেট খসে যায়। ত্রাণকর্তার ভূমিকা গ্রহণ করেন সাউথ আফ্রিকান খেলোয়াড় বেসিল অলিভিয়েরা ৮৮ রান সংগ্রহ করে এবং হিগসের ব্যক্তিগত ৪৯ রান ইংলণ্ডের দলীয় রান সংখ্যাকে তবুও কিছুটা সম্মানজনক সংখ্যায় পৌঁছতে সাহায্য করে। কিন্তু ২৪০ রানে প্রথম ইনিংস শেষ হবার ফলে ইংলণ্ড ফলো অনের সম্মুখীন হয়। সোবার্স ৪১ রানে ৫টি উইকেট, হল ৪৭ রানে ৩টি উইকেট এবং গ্রীফিথ ৩৭ রানে ২টি উইকেট সংগ্রহ করেন।

দ্বিতীয় ইনিংসেও ইংলণ্ডের আরও শোচনীয় ব্যাটিং-বিপর্যয়ের সম্মুখীন হতে হয়। গীবসের স্পিনের ঘূর্ণিপাকে ইংলণ্ডের ব্যাটসম্যানদের অবস্থা কাহিল হয়ে ওঠে। গীবস একাই সংগ্রহ করেন ৬টি উইকেট মাত্র ৩৯ রান এবং সোবার্স ৩৯ রানে তিনটি উইকেট দখল করেন। ইংলণ্ডের ইনিংস মাত্র ২০৫ রানে শেষ হবার ফলে ওয়েস্ট ইণ্ডিজ এক ইনিংস এবং ৫৫ রানে জয়ী হয়। চারটি টেস্টের তিনটি টেস্টে জয়ী হয়ে রাবার ওয়েস্ট ইণ্ডিজই দখলে নিল।

—সুদর্শন

সম্পাদিকা—জয়ন্তী সেন

বসুমতী (প্রাঃ) লিঃ-এর পক্ষে ১৬৬, বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী স্ট্রীটস্থ কলিকাতা-১২
বসুমতী প্রেস হইতে শ্রীসুকুমার গুহমজুমদার কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

সাপ্তাহিক
বসুমতী

ভিয়েতনাম যুদ্ধের নৃশংসতা

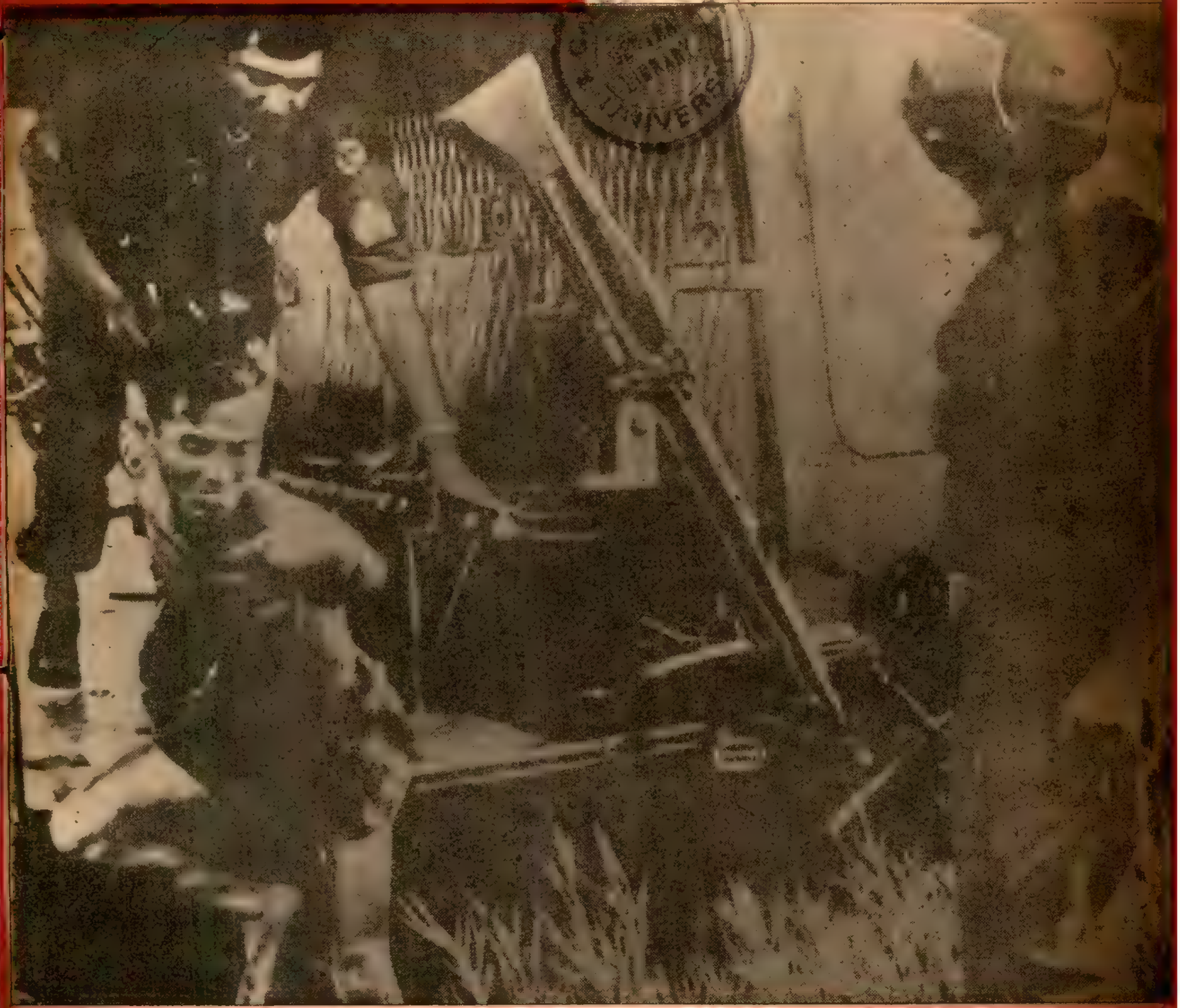

৭১ বর্ষ : ১৩শ সংখ্যা, বৃহস্পতিবার, ১৫ই ভাদ্র, ১৩৭৩ বঙ্গাব্দ 1st Sept., 1966 * Vol. 71, No. 1

সূচীপত্র

বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা
সম্পাদকীয়	...	৭৭১
আজকের মানুষ	...	৭৭২
ভারতদর্শন	...	৭৭৩
আন্তর্জাতিক	...	৭৭৭
বিশ্বসাহিত্যের আদিপর্ব	— ডঃ নরেন ভট্টাচার্য	৭৮০

বেনারসী
সিল্ক ও তাঁত বস্ত্র
ছিট কাপড়

শৈললাল মনিলাল
বহুবাজার
ফোন-৩৪-২১২৬
শ্যামবাজার
ট্রামডিপোর দক্ষিণে

লেপ তোষক
বিছানা
শাল ও আলোয়ান

কালকাতার ভূতপূর্ব মেয়র—প্রসিদ্ধ আইনবিদ
শ্রীসনৎকুমার রায়চৌধুরী প্রণীত

হিন্দুধর্ম্ম পরিচয়

দ্বিতীয় সংস্করণ—মূল্য দেড় টাকা

বাংলার বিদ্যালয়গুলিতে হিন্দু সংস্কৃতি প্রতিষ্ঠা যেদিন লুপ্ত হইল, সেইদিন হইতে হিন্দুর ব্যক্তিগত, পারিবারিক ও সামাজিক জীবনের ভিত্তি নষ্ট হইয়া গেল। তাহারই সুযোগ লইয়া আমাদের গৃহসমাজ ধ্বংস করিয়াছে য়ুনানী সভ্যতা। বাংলার অন্যতম শ্রেষ্ঠ হিন্দু নায়ক বাংলার বালগোপালদের কচি করকমলে যে পবিত্র নৈবেদ্য তুলিয়া ধরিয়াছেন, তাহাতে জাতি কৃতার্থ হইয়াছে।

প্রতি বিদ্যালয়ে এই গ্রন্থ অবশ্যপাঠ্য হওয়া উচিত।

কয়েকটি বিশিষ্ট অভিমত—

বিহারের প্রাক্তন প্রদেশপাল শ্রীমাধব শ্রীহরি ইনি লিখিয়াছেন—

"...চমৎকার বই। ঋষিদের প্রচারিত হিন্দুধর্ম সম্বন্ধে স্পষ্ট ধারণা হবে বইখানি পড়লে। প্রত্যেক কিশোর ও কিশোরীদের হাতে এই রকমের একখানি করে বই শোভা পাক, এ আমার বড় ইচ্ছে।"

সুবিখ্যাত মাসিক পত্রিকা 'প্রবাসী'র অভিমত—

"স্বধর্মের মূল ও সার কথার সঙ্গে পরিচিত না হওয়ায় সন্তান-সন্ততিগণ ক্রমে বিভ্রান্ত ও আদর্শভ্রষ্ট হইয়া উঠে। ইহার ফল ইদানীং আমরা বিশেষভাবে প্রত্যক্ষ করিতেছি। এ সময় এইরূপ একখানি পুস্তকের প্রয়োজনীয়তা আছে।"

কিশোর-সাহিত্যের অভিনব আকর্ষণ

হেমেন্দ্র রায়ের গ্রন্থাবলী

শ্রীহেমেন্দ্রকুমার রায় প্রণীত

যাঁহার চাঞ্চল্যকর কাহিনীগুলি পাঠ করিয়া বাংলার কিশোর-কিশোরীরা আতঙ্কে, বিস্ময়ে ও কৌতূহলে হতবাক হয়, আমরা বাংলার সেই প্রখ্যাত প্রবীণ কথাশিল্পী শ্রীহেমেন্দ্রকুমার রায়ের শ্রেষ্ঠ রচনাগুলি চয়ন করিয়া এই গ্রন্থাবলী প্রকাশ করিলাম।

—গ্রন্থাবলীতে আছে—

১। যকের ধন, ২। প্রদীপ ও অন্ধকার, ৩। রহস্যের আলোছায়া, ৪। ক্ষুদিরামের কীর্তি, ৫। যেসা দেওগে তেসা পাওগে, ৬। বুড়োর খামখেয়ালী, ৭। গোয়েন্দা কাহিনীর সঞ্চয়ন—চাবি ও খিল, একরত্তি মাটি, চোরাই বাড়ি, ছেলেবেলার একদিন ও বন-বাদাড়ে। ৮। ভৌতিক কাহিনী সঞ্চয়ন—এক রাতের ইতিহাস, কঙ্কাল সারথি, বিজয়ার প্রণাম, কাণকাটা হচি, শয়তান, ভেলকির হুমকী, ভূতের রাজা, শয়তানী জায়া। ৯। নতুন বাংলার প্রথম কবি, ১০। জগন্নাথদেবের গুপ্তকথা, ১১। হলিউডের টাকার পাহাড়।

মূল্য তিন টাকা।

বসুমতী প্রাইভেট লিমিটেডঃ ১৬৬, বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী স্ট্রীট, কলি-১২

সূচীপত্র

বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা
গ্রন্থমেলা	জয়ন্তী সেন	৭৮৩
ইতিহাসের উপাদান	ভূপেন্দ্রকুমার দত্ত	৭৮৪
নেলস্যাস-এর রম্যরচনা : অমৃত সমান	...	৭৮৭
স্বয়ংদীপ্ত জীব জগৎ (প্রবন্ধ)	আশিসকুমার সিংহ	৭৯০
ভিয়েতনাম : ভারতবর্ষ (কবিতা)	ডঃ কল্যাণকুমার দাশগুপ্ত	৭৯২
দুই আমি (কবিতা)	নমিতা বসুমজুমদার	৭৯২
রঙ্গদর্শন	...	৭৯৩
অগ্নিযুগের একটি অধ্যায়	অনন্ত সিংহ	৭৯৮
ফেরা (গল্প)	প্রীতি চক্রবর্তী	৮০৫
সুবর্ণলতা (ধারাবাহিক উপন্যাস)	আশাপূর্ণা দেবী	৮০৮
বিবর্ত (অনুবাদ-গল্প)	শান্তনু চট্টোপাধ্যায়	৮১২
অস্ট্রেলিয়া থেকে ফিরেছি	সুরেশচন্দ্র সাহা	৮১৮
রঙ্গমঞ্চ ওদেশে এবং এদেশে	শিল্পী	৮২২
রঙ্গজগৎ	...	৮২৪
খেলাধূলা	শ্রীঅমিতাভ	৮২৯

ডক্টর পঞ্চানন ঘোষাল এম, এস, সি প্রণীত

আমার দেখা মেয়েরা

(রহস্য রোমাঞ্চের স্বর্ণখনি)

'রক্তনদীর ধারা', 'অপরাধ বিজ্ঞান' ও 'বিখ্যাত বিচার কাহিনী' নামক সুপ্রসিদ্ধ গ্রন্থগুলির লেখকের সত্যঘটনামূলক বিভিন্ন ও বিচিত্র নারী-চরিত্রের রহস্য উদ্ঘাটন ও যথাযথ রূপদান। মেয়েদের মন আর রীতি স্বয়ং দেবা ন জানন্তি। অভিজ্ঞ ও দক্ষ লেখকের রচনার বৈশিষ্ট্যে বাংলা দেশের নারী-সমাজের এক অজানা অংশ সাধারণের চোখে সুস্পষ্ট প্রতিভাত হয়েছে। পড়তে পড়তে বই শেষ না করে ওঠা যায় না। বইয়ের আদ্যোপান্ত রুদ্ধশ্বাস উদ্বেগ ও অনিশ্চয়তা।

উপন্যাসের চেয়েও সুখপাঠ্য।

মূল্য চার টাকা

মাইকেল মধুসূদন দত্তের

মাইকেল গ্রন্থাবলী

প্রথম ভাগ :—মেঘনাদবধ কাব্য, বীরাঙ্গনা কাব্য, পদ্মাবতী নাটক, বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রোঁ, একেই কি বলে সভ্যতা? —তিন টাকা।

দ্বিতীয় ভাগ :—কৃষ্ণকুমারী নাটক, শর্মিষ্ঠা নাটক, তিলোত্তমা-সম্ভব কাব্য, ব্রজাঙ্গনা কাব্য, চতুর্দ্দশপদী কবিতাবলী, বিবিধ কাব্য, মায়া কানন, হেক্‌টর বধ। —দুই টাকা।

উপন্যাস-সাম্রাজ্যের রত্নমুকুট,—সেই সর্বজনপ্রমোদন—অমর-কীর্তি ঔপন্যাসিক—লব্ধপ্রতিষ্ঠ নাট্যকার—শক্তিমান রস-শিল্পী 'ভারতী' সম্পাদক শ্রীযুক্ত সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়ের—

সৌরীন্দ্র গ্রন্থাবলী

৫ম ভাগে :—বাদলা, মমতা, নির্ঝর, অতঃপর, পরদেশী সুরা, যবনিকার অন্তরালে, লেখার গলদ, পারিবারিক উপন্যাস, প্রগতি, অনাগত যুগ, আদর্শ এডিটোরিয়াল, আদর্শ সমালোচনা, সম্পাদকের দপ্তর, সংবাদপত্রের দৌলতে, মোটর কাশ্মীর, এক যাত্রায়, ফুলকাটা, দুঃখীরাম, পান-সুপারি।

মাত্র ১৷৷৹ টাকায়।

ডঃ মতিলাল দাশ প্রণীত

মতিলাল গ্রন্থাবলী

মূল্য—দুই টাকা

—ইহাতে আছে—

১। চলার পথে (উপন্যাস)
২। মনীষা (উপন্যাস)
৩। বিদ্যুৎশিখা (১১ খানি গল্প সমষ্টি)
৪। দীপশিখা (কবিতা সংকলন)
৫। চার্বাক (নাটক)

বসুমতী প্রাইভেট লিমিটেড : ১৬৬, বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী স্ট্রীট, কলি-১২

৭১ বর্ষ ঃ ১৩শ সংখ্যা—মূল্য ২৫ পয়সা
বৃহস্পতিবার, ১৫ই ভাদ্র, ১৩৭৩ বঙ্গাব্দ

বাংলা ভাষায় দ্বিতীয় সর্বাধিক প্রচারিত
সাপ্তাহিক পত্রিকা

Price : 25 Paise
Thursday, 1st Sept., 1966

স্টেট বাস বনাম প্রাইভেট বাস

রাষ্ট্র পরিবহন কর্পোরেশনের ব্যবস্থাপনায় ৩২টি প্রাইভেট বাস চলবে কি না, সে ব্যাপারে কোনো সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা সম্ভব হয় নি। অবশ্য কয়েক মাস ধরে সীমিত প্রাইভেট বাস কর্পোরেশনের দ্বারা চালানোর কথা চললেও এতোদিন পরেও কোনো সিদ্ধান্ত নেওয়া সম্ভব না হওয়ার কারণ হয়তো এই যে, আমাদের সরকার কলকাতার ভেঙে-পড়া যান-বাহন ব্যবস্থা সম্পর্কে বিন্দুমাত্র সচেতন নন এবং সত্যিকার সচেতন যখন হবেন, তখন হয়তো দেখা যাবে রাজপথে আর স্টেট বাস নেই। এর কারণ, যে বাসগুলি এখন চলছে, সেগুলি তখন জরাজীর্ণ হয়ে পড়বে; বৈদেশিক মুদ্রার অভাবে নতুন গাড়ি পথে নামানোও সম্ভব হবে না। আমরা এ কথা বলছি এই কারণে যে, এখন পর্যন্ত মেরামতির জন্যে যে সব বাস অচল হয়ে রয়েছে, সেগুলি অচল হয়ে থাকার কারণ নাকি বৈদেশিক মুদ্রার অভাব। ঐ মুদ্রার অভাবেই বিদেশী যন্ত্রপাতি ক্রয় করা সম্ভব হচ্ছে না। জানি না, স্টেট বাসের কর্তৃপক্ষের মতো প্রাইভেট বাসের মালিকরাও কবে এই মর্মে নোটিশ জারি করবেন যে, তাঁরাও বিদেশী মুদ্রার অভাবে গাড়ি চালাতে অক্ষম। আনন্দের কথা, প্রাইভেট বাসের কর্তৃপক্ষ এমন কথা এখনো উচ্চারণ করেন নি। সরকারী ব্যবস্থাপনায় পরিবহন আমাদের কাছে যতোই কাম্য হোক না কেন সেখানে বহু রকম গলদের দরুণ আমাদের যাবতীয় উচ্চাশা তিরোহিত হতে বসেছে, এবং যাত্রীরাও এখন নিত্যানিয়মিত গাড়ির অভাবে মাথায় হাত দিয়ে পথে বসার সামিল হয়েছেন।

রাষ্ট্র পরিবহন ব্যবস্থা প্রাইভেট বাস ধার করে অনুক, আর আমরা তাতে চড়ি—এও আমাদের কাম্য নয়। তবু অযোগ্যদের হাতে পড়ে স্টেট বাস যখন পথ থেকে ধীরে ধীরে তিরোহিত হতে সুরু করেছে, তখন ধার-করা প্রাইভেট বাসের জন্য অপেক্ষা করা ছাড়া অন্য উপায় নেই।

কিন্তু বাদ সেধেছেন কর্পোরেশনের কর্মী সংস্থা। তাঁদের ছড়ানো পোস্টার ইতস্তত কার না চোখে পড়েছে। তাঁদের মতে, স্টেট ট্রান্সপোর্ট কর্তৃপক্ষ প্রাইভেট বাস চালাবার যে ব্যবস্থা করতে যাচ্ছে তা অভিসন্ধিমূলক। এও তাঁরা জানিয়েছেন যে, এগারো শত স্টেট বাসের মধ্যে যে চারিশত বাস অচল হয়ে রয়েছে, সেগুলি অচল হয়ে থাকার কারণ নেই। তাঁদের আরো বক্তব্য এই যে, যে স্পেয়ার পার্টসের অভাবের কথা প্রচার করা হচ্ছে, তার অভাব নেই, বরং সেগুলি গুদাম-জাত হয়ে আছে।

কর্মী সংস্থা তাঁদের এই বক্তব্য জানিয়ে বলেছেন, কর্মী ছাটাই করাই হচ্ছে কর্তৃপক্ষের উদ্দেশ্য।

স্টেট ট্রান্সপোর্ট কর্তৃপক্ষ অবশ্য স্পেয়ার পার্টসের অভাবের কথা এখনো জানাচ্ছেন এবং কর্মী ছাটাই করা হবে না, তাও তাঁরা জানিয়েছেন। তাঁরা স্টেট বাসের মোটামুটি একটা হিসেবেও দিয়েছেন। তাঁদের হিসেব অনুযায়ী স্টেট বাসের সংখ্যা ১০৯৬। এর মধ্যে ঝড়তি পড়তি বাদ দিয়ে চলছে গড়ে দৈনিক ৭২০টি এবং ৯১টি বাস সাজসরঞ্জামের অভাবে মেরামত করা সম্ভব না হওয়ায় অচল হয়ে রয়েছে। কর্তৃপক্ষ এ কথাও বলেছেন যে বাস বাড়ালেও রয়েছে গ্যারেজের অভাব।

পশ্চিমবঙ্গের পরিবহনমন্ত্রী শ্রীশৈলকুমার মুখোপাধ্যায় বিধান সভায় স্টেট বাসের একটা হিসেব দিয়েছেন। অবশ্য সে হিসেবের সঙ্গে উপর্যুক্ত হিসেবের মিল নেই। তিনি বলেছেন যে, ১১০২টি স্টেট বাসের মধ্যে ১৬৩টি বাস একেবারেই বৃদ্ধের দশায় পৌঁছেছে সুতরাং তাদের চালু করা সম্ভব নয়। ১১২টি বাস সাজসরঞ্জামের অভাবে চালু করা সম্ভব হচ্ছে না এবং আপাতত পথে চলার মতো বাস রয়েছে ৮২৭টি; কিন্তু প্রত্যহ গড়ে চলছে ৭৩৫টি বাস, কারণ চলনযোগ্য গাড়িগুলিও ছোটখাটো মেরামতির জন্য চালানো সম্ভব হচ্ছে না।

রাষ্ট্র পরিবহন কর্পোরেশনের আওতায় প্রাইভেট বাস চালাবার ব্যবস্থা সম্পর্কে এখনো কথাবার্তা চলছে এবং তা চালু করা হলে সে ব্যবস্থা হবে সাময়িক একথা তিনি জানিয়েছেন।

উপরে উল্লিখিত স্টেট বাসের একটা সুনির্দিষ্ট হিসেব পাওয়া না গেলেও একথা মনে হয় যে, সীমিত প্রাইভেট বাসগুলি যদি কর্পোরেশনের আওতায় চালানো হয় তাতে যাত্রীদের কিছুটা কম দুর্ভোগ সহ্য করতে হবে। আর কর্মীদের যখন প্রতিশ্রুতি দেওয়া হচ্ছে যে, তাদের স্বার্থে ঘা দেওয়া হবে না তখন তাদের পক্ষ থেকে কোনো বাধার সৃষ্টি করা উচিত নয়। বরং তাদের এই দেখা উচিত যে, তাদের জিদের ফলে যাতে যাত্রী-দের অনর্থক অসুবিধার সৃষ্টি না হয়। কারণ যাত্রীদের সঙ্গে কর্মীদের ব্যবহারের আদানপ্রদান নানা কারণে এমনিতেই খুব মধুর নয়।

এ ছাড়া আমাদের বক্তব্য রয়েছে কর্পোরেশনের কাছে আপাতত যে বাস চলছে সে-গুলিকে সুনির্দিষ্ট নিয়মে চালাবার মতো বন্দোবস্ত তাঁরা করতে পারছেন না কেন? ঘন ঘন বাস চালানো ও ডিপো থেকে প্রতিটি বাস যথা নির্দিষ্ট সময়ে ছাড়া হবে এ সম্পর্কে একটা কড়া নিয়ম থাকা উচিত। এতে যাত্রীদের দুর্ভোগ সহ্য করতে হবে কম এবং গোণাগুণতি বাস নিয়েও কোনোমতে কাজ চালানো সম্ভব। আশা করি, রাষ্ট্র পরিবহন কর্তৃপক্ষ এই ব্যাপারটিকে অগ্রাধিকার দিয়ে মুস্কিলের যৎকিঞ্চিৎ আসান করবেন।

সম্পাদকীয়

আজকের মানুষ

এবার মিছিল রাজপথে নয়, মিছিল গেল পার্লামেন্টে! জনতার মিছিল নয়, মিছিল অভিযোগের। এবারকার পার্লামেন্ট অধিবেশন দীর্ঘকাল স্মরণীয় হয়ে থাকবে এ-অভিযোগ-বন্যার জন্যে। একজনের পর একজনের বিরুদ্ধে অভিযোগ এসেছে—অধিকার ভঙ্গের অভিযোগ। আর তার প্রায় প্রত্যেকটিতে যে সুনিপুণ তীরন্দাজের স্বাক্ষর ছিল তিনি হলেন এস-এস-পি সদস্য শ্রীমধু লিমায়ে। পার্লামেন্ট বার বার প্রকম্পিত হয়েছে, মাননীয় সদস্যেরা মন্ত্রমুগ্ধ হয়ে লক্ষ্য করেছেন মধু লিমায়ের অব্যর্থ শরসন্ধান।

এত উচ্চদরের বাগ্মিতা, এত ক্ষুরধার যুক্তি শ্রবণের ও প্রত্যক্ষ করার জন্যে কোন পক্ষই যেন প্রস্তুত ছিল না, সরকারীপক্ষ তো নয়ই। এর কারণ অবশ্য অন্য কিছু নয়, মধু লিমায়ে ইতিপূর্বে পার্লামেন্টে বিশেষ সুবিধে করতে পারেন নি; তাঁর বক্তব্য অস্পষ্ট থেকে গিয়েছিল, আক্রমণে তীব্র ধার ছিল না। সেদিন মধু লিমায়ের বক্তব্যে যুক্তির চেয়ে উচ্ছ্বাসই ছিল বেশি, সারবত্তার চেয়ে উত্তাপ-উত্তেজনা। কিন্তু ক্রুদ্ধ মধু লিমায়ের মনের ভেতরে যে আরেকজন যুক্তিবাদী, সহনশীল এবং চিন্তাশীল মানুষ রয়েছে তার পূর্ণ প্রকাশ ঘটলো এবারকার অধিবেশনেই।

না ঘটার অবশ্য কোনো কারণ দেখি না, বরং এ-দীপ্তির প্রকাশ আরো আগে ঘটলো না কেন পার্লামেন্টারী প্রোসিডিওস-এর ছাত্রেরা তাই নিয়ে গবেষণা করবেন। রাজনীতিতে তাঁর নতুন হাতে খড়ি হয় নি, ছাত্রাবস্থা থেকেই মধু লিমায়ে এ-লাইনে রয়েছেন। এবং সেদিন ওই তরুণের বুকে যে বামপন্থার আগুন জ্বালানো হয়েছিল, আজো তা অম্লান, অনির্বাণ রয়েছে। কংগ্রেস সোস্যালিস্ট পার্টিতে যোগদান করেছিলেন মধু লিমায়ে, পুনার স্থানীয় কমিটির সেক্রেটারীও হয়েছিলেন তিনি তরুণ বয়সে। ১৯৪০ সালে ব্রিটেন যখন দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে মেতে গেল, তখন নিরন্ন ভারতবাসীকেই তার রসদ যোগাতে বাধ্য করা হলো। তরুণ লিমায়ে প্রতিবাদ করেছিলেন, যে-যুদ্ধে ভারতবাসীর কোনো স্বার্থ নেই সে-যুদ্ধের মদৎ যোগাতে তিনি রাজী হলেন না, আবেদন করলেন ভারতবাসীর কাছে যেন তাঁরা কামানের খাদ্য না হন। ব্রিটিশরাজ অবশ্য লিমায়ের গরম বক্তৃতার পুরস্কার দিতে দেরি করেন নি, যুদ্ধ-বিরোধী প্রচার চালানোর জন্যে তাঁকে গ্রেপ্তার করা হলো।

তাতে কি ক্ষতিটা হলো মধু লিমায়ের? তিনি তো মনে করলেন কষ্টিপাথরে যাচাই হলো তাঁর দেশের প্রতি, জাতির প্রতি আনুগত্যের। জেল থেকে নিখাদ নিখুঁত প্রমাণিত

মধু লিমায়ে

হয়ে বেরিয়ে এলেন তিনি। ঝাঁপ দিলেন বৃহত্তর আন্দোলনে: কুইট ইণ্ডিয়া, ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ, ভারত ছাড়ো এই শ্লোগান কণ্ঠে নিয়ে মধু লিমায়ে আবার কারাগারে গেলেন, হাজার হাজার ভারতবাসী যেমন সেই বিয়াল্লিশের আগস্টের অগ্নিঝরা দিনগুলিতে মিছিল করে কারাবরণ করেছিলেন—সেদিনই তিনি সাক্ষাৎ পেয়েছিলেন তাঁর রাজনৈতিক গুরুর: ডঃ রামমনোহর লোহিয়া।

লোহিয়া-মেহ্‌তা বিবাদ কি শুধু ওই দুজনের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল—দুজনেই নেতৃত্বের আসনে অধিষ্ঠিত ছিলেন বলে অবশ্য অন্য সকলেই নিষ্প্রভ হয়ে পড়েছিলেন। কিন্তু [illegible]য়েই সেদিন অবিচ্ছেদ্য কমরেডের মত ডঃ লোহিয়ার পাশে পাশে ছিলেন। সেদিন ডঃ লোহিয়া এবং শ্রীঅশোক মেহতাও দেখেছিলেন লিমায়ের অন্য মূর্তি, সে-মূর্তি তাত্ত্বিকের। আর যখন সোস্যালিস্ট পার্টি দ্বিধাবিভক্ত হলো, এবং ভাঙনের পরে সোস্যালিস্ট পার্টি নতুন উদ্যম নিয়ে গড়ে উঠলো তখন মধু লিমায়ের প্রাথমিক পরিচয়ই ছিল পার্টির থিয়োরেটিশিয়ান হিসেবে। তাঁর বুদ্ধি, তাঁর তত্ত্বজ্ঞান ও নেতৃত্ব লিমায়েকে এনে দিল পার্টির চেয়ারম্যানের সম্মানীয় পদটি। সাল তখন ১৯৫৮।

মধু লিমায়ের সংগ্রাম ক্লান্তিহীন, আপোষহীন। গোয়ার ভারতীয়দের ওপর পর্তুগীজ সাম্রাজ্যবাদের অকথ্য অত্যাচারের নীরব সাক্ষী হয়েই লিমায়ে ক্ষান্ত থাকতে পারেন নি, গোয়া মুক্তি অভিযান পরিচালনা করে তিনি গোয়ার মাটিতে পা রেখেছিলেন। সাম্রাজ্যবাদের আঘাতও এলো অবশ্য অনিবার্যভাবেই—বারো বছরের সশ্রম কারাদণ্ড। বরাত ভালো, কুড়ি মাস সালাজারের জেলে থাকার পর মুক্তি পেলেন লিমায়ে।

ইতিহাস সৃষ্টি হয়েছে এবার পার্লামেন্টে, এবং সে-ইতিহাসের নায়ক হিসাবে যদি মধু লিমায়েকে চিহ্নিত করা হয়, তবেই সত্যকে স্বীকৃতি দেওয়া হবে। ভূতলিঙ্গম প্রসঙ্গ, পাবলিক এ্যাকাউণ্টস কমিটি রিপোর্ট প্রসঙ্গ, আমিনচাঁদ প্যারেলাল প্রশ্নগুলি তুলে তিনি প্রথমে পার্লামেন্টকে সচকিত করে তোলেন। তারপর একে একে সুব্রহ্মনিয়ম, শচীন চৌধুরী, স্পীকার হুকুম সিং, গুলজারীলাল নন্দা প্রভৃতি লোকসভা-সদস্যদের বিরুদ্ধে অধিকার ভঙ্গের অভিযোগ এনে মধু লিমায়ে কার্যত পার্লামেন্টে অভিযোগের মিছিল-শোভাযাত্রাই পরিচালনা করলেন। সরকার ও বিরোধী দলের ঝানু পার্লামেন্টারীয়ানরা পর্যন্ত অবাক মানলেন এই বিয়াল্লিশ বছরের "উগ্র-মস্তিষ্ক" সদস্যের আক্রমণ রচনার কলাকৌশল দেখে। শুধু অধিকার ভঙ্গের অভিযোগ তুলেই লিমায়ে পার্লামেণ্টভবন কাঁপালেন না, পি-এ-সি রিপোর্ট, কর্নেল অমৃত সিং, আমিনচাঁদ প্যারেলালের অন্যতম অংশীদার জিৎ পল, জয়ন্তী শিপিং ইত্যাদি বিষয়ে বিকল্প মোশন এনেও মধু লিমায়ে পার্লামেণ্টে এবং সমগ্র দেশে রীতিমতো চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করেছেন। মধু লিমায়ে আজ সরকারী দলের কাছে দুর্জয় আতঙ্ক।

কি কেন্দ্র কিবা রাজ্য সরকার, অসম্ভব দ্রুততার সঙ্গে স্মরণকালের মধ্যে যদি কোন সিদ্ধান্ত নিয়ে থাকেন, তবে তা ছিল সাধারণ শ্রমজীবীদের অন্ন বন্ধের সিদ্ধান্ত। সহস্র সহস্র স্বর্ণকার সহস্রাধিক মিষ্টান্ন কারিগর এবং তাঁদের লক্ষ লক্ষ পরিবারবর্গ সর্বৈব অনশনের মুখে পতিত হয়েছেন সরকারী সিদ্ধান্তে। বেকার সমৃদ্ধ ভারতবর্ষে বংশপরম্পরায় এঁরা যে কারিগরী বিদ্যা অর্জন করে দুবেলা দুমুঠো জুটিয়ে নিচ্ছিলেন, সরকার কোন বিকল্প আয়ের পথ সৃষ্টি না করেই তা বন্ধ করে দিলেন। এঁদের সামনে নেমে এলো অনন্ত অন্ধকার, অকল্পনীয় আর্থিক দুরবস্থা।

দুরবস্থার চাপ কাউকে করল রিক্ত সর্বহারা, কেউ হলেন জীবন সম্পর্কে বিমুখ, কেউ করলেন আত্ম-হত্যা।

স্বর্ণকারগণ এই অসহনীয় আর্থিক পরিবেশে উপায়ান্তর বিহীন হয়ে আজ সংসদ ভবনের সামনে অনশনব্রতী, তাঁদের বিক্ষোভ রাজধানী থেকে বিভিন্ন রাজ্যে বিস্তৃতিলাভ করেছে। তাঁরা অবস্থার প্রতিকার চাইছেন।

সরকারের স্বর্ণনিয়ন্ত্রণ আদেশ সম্পর্কে আলোচনার দাবি উঠেছিল কংগ্রেসী অকংগ্রেসী দুতরফ থেকেই। সে আলোচনার সময় আগামী সেপ্টেম্বরের আগে মিলছে না। ইতিমধ্যে কংগ্রেস কার্যনির্বাহক কমিটির একটি বৈঠকে প্রসঙ্গটি আলোচিত হয়। কমিটি বিগত বৃহস্পতিবার প্রশ্নটি কেন্দ্রীয় ক্যাবিনেটেরই বিবেচনাধীনে পুনঃ প্রেরণ করেছেন। অর্থাৎ লক্ষ লক্ষ স্বর্ণকারের ভাগ্য নির্ধারণে তাঁরাও স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হতে সক্ষম হলেন না।

কেন্দ্রীয় ক্যাবিনেটের একটি সংক্ষিপ্ত বৈঠকেও ব্যাপারটি বিবেচিত হয়। প্রকাশ আলোচ্য বৈঠকে স্বর্ণ নিয়ন্ত্রণ বিধি প্রত্যাহারের পক্ষে ক্যাবিনেট বৈঠকেও যথেষ্ট মত গুরুত্ব লক্ষিত হয়েছে। কংগ্রেস কার্যনির্বাহক কমিটির অধিকাংশ সদস্যও নিয়ন্ত্রণ বিধি রদ করারই পক্ষপাতী। সরকার এ বিষয়ে কোন সিদ্ধান্তে উপনীত হবেন তার সুস্পষ্ট কোনও আভাস এ পর্যন্ত পাওয়া যায় নি বটে, তবে বর্তমান অর্থমন্ত্রীর মনোভাব জানা গেছে। শ্রীশচীন চৌধুরী বিধি প্রত্যাহারে গররাজী, তবে বিধির প্রয়োজনীয় রদবদল করতে সম্মত আছেন। এই সাম্মতির লক্ষণও আজ অকস্মাৎ দেখা দিয়েছে। সমস্যার জটে গিঁট না-পড়া

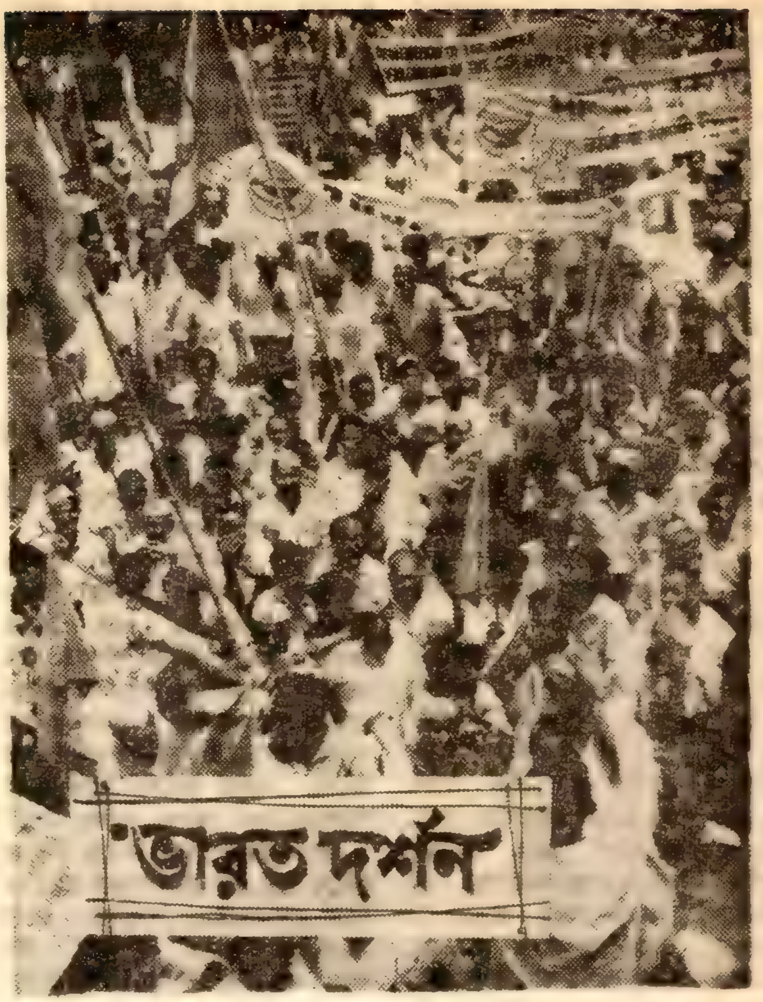

নয়াদিল্লীতে সংসদ ভবনের সামনে জনসঙ্ঘ দলের বিক্ষোভ

পর্যন্ত গ্রন্থীমোচনে প্রথাবদ্ধভাবে এক্ষেত্রেও সরকারী অপেক্ষাও দর্শনের নীতিই কার্যকরী হয়েছে। আজ যখন বুভুক্ষু স্বর্ণকারগণ অনাহার অপেক্ষা কারাগারকেই শ্রেয় হিসেবে বেছে নিতে বদ্ধপরিকর। যখন কয়েকটি ভয়াবহ স্বেচ্ছামৃত্যু অবধারিত মৃত্যুকে ফাঁকি দিয়ে মরণ আলিঙ্গনে স্বকীয় চেষ্টাকে ফলবতী করেছে এবং কংগ্রেসের ঘরে বাইরে এ প্রশ্নে চাপ সৃষ্টি হয়েছে তখনও সংসদে ব্যাপারটি উত্থাপনের সিদ্ধান্তই গ্রহণ করায় গড়িমসি। সুতরাং স্বর্ণকারদের দুর্ভাগ্য আরও কতকাল জিইয়ে রাখা হবে তাও কেউ অনুমান করতে পারছেন না। অথচ বিভিন্ন ক্ষেত্রে স্বর্ণনিয়ন্ত্রণ বিধির সাফল্যহীনতা যেভাবে প্রমাণিত হয়ে গেছে, তাতে এই বিধির পরিবর্তন, পরিমার্জন অথবা প্রত্যাহার যে আসন্ন তা যেন এক রকম হাওয়ার কানে ফিস ফিস করছে।

অবশ্য এক কথায় যেমন দেশে বেকার সৃষ্টি করা যায়, এক কথায় তেমনি সরকারী সিদ্ধান্তের রদবদল করা সম্ভব নয়। এজন্য একটা পরিবেশ রচনার প্রয়োজন। না হলে বিলকুল হার হল। স্বর্ণকারদের দুর্ভাবনায় সরকার ব্যগ্রতার সঙ্গে স্বসিদ্ধান্তে হার স্বীকার করবেন এতটা আশা একটু আগ বাড়িয়ে ভাবনা বৈকি। কিন্তু প্রশ্ন তবু রয়ে যাচ্ছে, এ ব্যাপারে হার স্বীকারে কি আর দেরি আছে! এই বিধির অসাফল্যই তো যথেষ্ট হার, তথাচ সরকারী বিবেচনার এই ধীরগতি স্বর্ণকারগণের দৈনন্দিন সমস্যাকে জটিলতর করে তুলেছে যার শোচনীয় পরিণামে দেখা যাচ্ছে, সমগ্র ভারতব্যাপী আজ স্বর্ণকার অসন্তোষের তীব্রতা বৃদ্ধি পেয়েছে।

স্বর্ণনিয়ন্ত্রণের পক্ষে যুক্তি ছিল প্রচুর। সোনাকে অর্থবানের ঘরে

পর্বতপ্রমাণ হয়ে গা ঢাকা দিতে সাহায্য করা হোক এমন কথা কেউ বলছেন না; এ বিধির প্রচলনকালেও তাই অনেকে ভেবেছিলেন সোনার তাল ঘরে জমানোর সুযোগ বুঝি ঐ বিধি বলেই অন্তর্হিত হবে। কিন্তু কার্যত তা সম্ভব হয় নি। সোনার তাল মজুতকরণ, সোনার দাম তুলে ধরে রাখা এবং সোনা নিয়ে চোরাবাজারী, কোনটাই কমে নি। স্বর্ণ নিয়ন্ত্রণের দ্বারা যদি এই অন্ধকারের মধ্যে আলো জ্বালাবার ব্যবস্থা হত, তাহলে হয়ত বা মৃত্যুপথযাত্রী স্বর্ণকারগণ অন্তত নিজেদের মহৎ ব্রতের শহীদ ভেবেও শান্তি পেতেন। কিন্তু প্রশাসনিক তৎপরতায় তাও সম্ভব হয় নি। এহেন পরিস্থিতিতে প্রশ্নটির আশু পুনর্বিবেচনা একান্ত প্রয়োজন। কেন না এই প্রশ্নের ওপর কয়েক লক্ষ পরিবারের রুজিরোজগারের প্রশ্নও দাঁড়িয়ে আছে।

ইউ এন আই-এর সাম্প্রতিক সংবাদে প্রকাশ (২৭।৮।৬৬) আগামী ৩রা সেপ্টেম্বর (বর্তমান রচনার তারিখ ২৭।৮।৬৬) একটি সরকারী ঘোষণায় স্বর্ণকারদের নাকি বাইশ ক্যারেট গহনা তৈরির অনুমতি দেওয়া হবে। হাল্কা চোদ্দ থেকে সরাসরি বাইশ। স্বর্ণ নিয়ন্ত্রণ আদেশের যে সংশোধন আশা করা হয়েছে সে সম্পর্কে তথ্যাভিজ্ঞমহলের ধারণা, সরকার সোনার বাটের রাষ্ট্রীয় ব্যবসায় চালু করবেন ও ২২ ক্যারেট স্বর্ণালঙ্কার তৈরির আদেশ দেবেন।

সোনার চোরাই চালান বন্ধের অভিপ্রায়েই না কি সোনার বাটের বেচাকেনা সরকার নিয়ন্ত্রিত ও অনুমোদিত ব্যাংকগুলির মারফৎ চালু রাখা হবে। স্বর্ণকারগণ ঐ ব্যাঙ্কের মাধ্যমেই স্বর্ণ ক্রয় করবেন। প্রকাশ, আশা করা হচ্ছে, স্বর্ণ রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার ফলে সোনার দামও কমবে।

বর্তমান গুরুতর পরিস্থিতির পরিপ্রেক্ষিতে এ প্রস্তাবে অনেকেই আশান্বিত হয়ে উঠবেন। এ সম্পর্কে আশু মন্তব্য সময়োচিত হবে না আমাদের ক্ষেত্রে। কেন না, এই সংবাদের বস্তুবিশেষ যখন ঘোষিত হবে তখন 'ভারত দর্শন' পাঠকের চক্ষের সামনে।

সংকটময় ভারত

পাবলিক এ্যাকাউন্টস কমিটির প্রতিবেদন সম্পর্কে বিতর্ককালে শ্রীমতী গান্ধী বলেছেন, দেশ আজ ইতিহাসের সর্বাপেক্ষা সংকটময় অবস্থার ভেতর দিয়ে অগ্রসর হচ্ছে। এই সময় বিরোধী আন্দোলন দেশকে আরও গোল্লায় গড়িয়ে দিচ্ছে এবং গোটা দেশকে একটা দুর্নীতির ঘাঁটিরূপে মেলে ধরছে। তিনি বলেছেন, যে যাই বলুক, তিনি ও তাঁর সরকার এ জাতীয় উক্তিসমূহে মোটেই বিচলিত নন। সমস্যার মোকাবিলা কেমন করে করতে হয় তা তাঁর জানা আছে এবং তা তিনি করবেনও। কিন্তু সমস্ত প্রশাসকবর্গের মধ্যে বিরোধী দোষারোপে যে নিদারুণ আশঙ্কার সৃষ্টি হয়েছে তা প্রশাসক দক্ষতাহানির কারণ হয়েছে। বিরোধীরা যেন এ বিষয়ে সচেতন হন।

প্রধানমন্ত্রী খুব যুক্তিপূর্ণ কথাই বলেছেন বলতে হবে।

গোটা দেশটাই আজ ত্রাসিত শঙ্কিত। একদিকে সরকারী ডিসিপ্লিনারী এ্যাকসনের ভয়ে নিচের শ্রেণীর মানুষ সর্বদা শঙ্কিত হয়ে আছেন। অন্যদিকে বিরোধী দোষারোপের আশঙ্কায় ওপরওয়ালারা সতর্ক হয়েছেন ও হচ্ছেন। এই ত্রাসিত অবস্থা একটি জাতির পক্ষে খুবই স্বাস্থ্যহানিকর অবস্থা সন্দেহ নেই।

প্রধানমন্ত্রীর বক্তব্যে আমরা সাধারণ মানুষ শুধু এই ভেবে হতাশ হচ্ছি যে তিনি প্রশাসকদের অসুবিধা যেমন সহানুভূতির সঙ্গে বিবেচনা করে বক্তৃতা করেছেন, দেশব্যাপী সন্ত্রাসের সংবাদ তেমন করে মেলে ধরেন নি।

সমগ্র জাতি আজ সভয়ে শঙ্কিত হয়ে আছে। অন্ন-বস্ত্র-চাকুরী-আশ্রয় এমন কি নিরাপত্তা পর্যন্ত কোনটাই আজ জাতির জীবনে প্রতিশ্রুত সত্যকে প্রমাণিত করছে না।

সুতরাং এই ঐতিহাসিক সংকটকালে হতাশায় ন্যুব্জ সমগ্র জাতিই কি আজ তার দক্ষতা ক্রমশ হারিয়ে ফেলছে না! হচ্ছে না কি যথেষ্ট যুবশক্তির অপচয়! হতাশাগ্রস্ত জাতির নৈতিক বল কি অধঃপাতে যাচ্ছে না! এই সংকট থেকে উত্তরণের পথনির্দেশ কে করবে? কে এই আকণ্ঠ নিমজ্জমান জাতির দু'হাত ধরে তাকে সম্মুখের ধ্রুবতারাটি চিনিয়ে দেবে? সাধারণে তো সরকারেরই মুখাপেক্ষী। কিন্তু সরকারের সুবিচার কি সব ক্ষেত্রে সমান? সাম্প্রতিক নজির সৃষ্টি করেছেন উত্তরপ্রদেশ সরকার। স্মরণ আছে বোধহয় যে, সেখানে সমস্ত আন্দোলনের পর সরকার যে নামমাত্র পারিশ্রমিক বৃদ্ধির সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন হৃত-দরিদ্র কর্মীদের ক্ষেত্রে সেখানে জনৈক মন্ত্রীই আবেদন রেখেছিলেন অপেক্ষাকৃত দুঃস্থদের প্রতি সুবিচারের জন্য। সরকারী তরফেই তার উত্তর পাওয়া গেছল, অসম্ভব। তা করলে ওপরওয়ালারা, যাঁরা সাধারণের স্বার্থে মুখ ফিরিয়ে থাকেন, তাঁরা প্রশাসকের দায়িত্ব পালন করবেন কেন?

এই প্রশাসকগণ তবে কোন্ দিকে দৃষ্টি দিয়ে দেশকে অগ্রগতির পথে নিয়ে যাচ্ছেন? তাঁদের মুষ্টিমেয় ব্যক্তিস্বার্থই কি বড় কথা নয়! আর যেমন করে পুরোনো ইতিহাসের রাজারাজড়া এবং বিদেশী শাসক তার প্রশাসনকে খাড়া রেখেছিল এই ব্যক্তিস্বার্থে ইন্ধন যুগিয়ে, উত্তরপ্রদেশের ঐ ঘটনা কি সেই দিনের শাসন ব্যবস্থার ছবিটিই সুস্পষ্ট করে তোলে নি? হায়, যে প্রশাসকবৃন্দ অধিকতর না পেলে প্রশাসনিক কাজে শৈথিল্য সৃষ্টি করবেন বলে সরকারী বিশ্বাস, তাঁদের দক্ষতা সরকার কেমনভাবে বৃদ্ধি করবেন। উপর্যুপরি তাঁদের স্বার্থরক্ষা করে! উত্তরপ্রদেশ সেই জবাবই দিয়েছে। প্রধানমন্ত্রীর বক্তৃতায় সাধারণ মানুষ অন্যতর আশার বাণীই শুনতে চায়। শুধু বাণীই নয়, কাজও। একথা স্বাধীনতা বার্ষিকী উপলক্ষে রাষ্ট্রপতির সহানুভূতিপূর্ণ বাণীতে আমরা শুনেছি। তিনি সমগ্র দেশের কর্মী মানুষকেই দেশ গঠনের শরিক বলে চিহ্নিত করেছেন। এই সমস্ত উল্টোপাল্টা কথায় একটি ধারণাই ক্রমশ বদ্ধমূল হচ্ছে এই যে, আমরা হয়ত অন্ধকারেই হাতড়াচ্ছি। আমাদের সামনে আরও পরিষ্কার এবং সপ্রতিজ্ঞ নিশ্ছিদ্র বীক্ষণযন্ত্র থাকা দরকার, যার মাধ্যমে সমস্ত ভুল-ত্রুটি সংশোধন করে আমরা এই বিরাট মহান জাতিকে সুসংগঠিত করে মহাভারতকে মনোমত রচনা করে তুলব।

রেলে কলিসন হয়

শুধু কি সন নয়, বছরে একাধিকবার রেলে কলিসন হয়। রেলপথে ভ্রমণ আজ যে কী মারাত্মক ঘটনা হয়ে উঠেছে, স্বয়ং কেন্দ্রীয় রেলমন্ত্রী যখন লোকসভায় এই মর্মে এক ঘোষণা করেন যে, রেল দুর্ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে রেলযাত্রীদের বীমা করার একটি প্রশ্ন বর্তমানে সরকারের বিবেচনাধীন আছে, তখন সেকথা আর একবার স্মরণপথে এসে পড়ে।

খুব ভাল প্রস্তাব। দুর্ঘটনার জন্য এবার বীমা ব্যবস্থা চালু করাই একটা উপযুক্ত ব্যবস্থা হয়েছে বটে। এ ছাড়া উপায়ই বা কি? রেলমন্ত্রী জানিয়েছেন,

এই দুর্ঘটনাগুলির কয়েকটির মূলে নাশকতামূলক কার্যকলাপ আছে। বস্তুত সেক্ষেত্রে রেল প্রশাসন আর কি করবেন। নাশকতামূলক কার্যকলাপ যদি চলতেই থাকে তবে তার আর কি-ভাবেই বা মোকাবিলা করা যাবে! রেল-যাত্রীদের বীমা করা থাকলে না হয় "নাকের বদল নরুন" প্রাণের বদল বীমার টাকা পাওয়া যাবে। আর যেহেতু প্রাণের নিরাপত্তাও টাকায় সুতরাং প্রস্তাবটি বিবেচনাপ্রসূত।

দুর্ঘটনা এড়াবার জন্য কর্মচারী বৃদ্ধির প্রস্তাবটা রেলমন্ত্রী অগ্রাহ্য করেছেন। তিনি মনে করেন লোক বাড়িয়ে সমস্যার সমাধান হবে না। কেন না তাঁর মতে, অন্য দেশে একজনে যে কাজ করে, এদেশে দশজনে করে তা-ই।

কর্মচারী বাড়লেই যে দুর্ঘটনা এড়ান যাবে এমন গ্যারান্টি অবশ্য কেউ দিতে পারেন না, বিশেষত নাশকতা-মূলক কার্যকলাপের সন্ধান যে ক্ষেত্রে অনেকাংশেই পাওয়া গেছে। কিন্তু দশ-জন ও একজনের আনুপাতিক হিসাবটা যথার্থ হৃদয়ংগম করা শক্ত হচ্ছে।

অন্য দেশে মানুষের কাজ যন্ত্রই করে। এদেশে যন্ত্রও সর্বদা বিদ্রোহ করে। অন্য দেশে জনসম্পদের ক্ষেত্রে মা ষষ্ঠীর আশীর্বাদ অপ্রতুল, এদেশে যন্ত্রের স্থান পূরণের জন্য বুভুক্ষু মানুষ সতৃষ্ণ হয়ে আছে। অন্য দেশে নাশকতামূলক কার্যকলাপ দমনে সুদক্ষ ও সতর্ক প্রহরী আছে, এদেশে আমাদের সতর্কতামূলক ব্যবস্থা প্রহৃত হয়েই আসছে। এক্ষেত্রে রেলে কলিসন নিবারণে আরও কর্মী সংস্থানের উপায়টা একবার বরং পরখ করে দেখলেও ভাল হ'ত। অধিকতর কর্মচারী অস্থায়িভাবে নিযুক্ত করে চেকিং ব্যবস্থা আরও জোরদার করা এবং এই চেকিং কর্মীদের চাকুরী স্থায়ী থাকবে কিনা তা তাঁদের কর্মদক্ষতার ওপর নির্ভরশীল রাখা। বিষয়টি পুনর্বিবেচিত হলে মনে হয় রেলযাত্রীদের জীবনবীমার টাকা খুব কমই গ্রহণ করতে হ'ত।

বীমা ভাল। মরতেই যদি হয়, বিনিময়ে একটু প্রাপ্তি নিয়ে মরাই ভাল। কিন্তু তারও থেকে ভাল রেলের টিকেট পিছু দু'পয়সা বর্ধিত ব্যয় করেও এবং বীমা থাকা সত্ত্বেও পৈতৃক প্রাণটা যদি রক্ষা পায়। রেলমন্ত্রী আরও জানিয়েছেন যে, টিকেটের মূল্যও কিছু বাড়বে। তা বাড়ুক, সব কিছুই যখন অগ্নিমূল্য তখন রেলের টিকেটই বা কেন স্বল্পমূল্যে বিকোবে পরন্তু যখন বীমার সুযোগই থাকছে। কিন্তু জীবনটা টাকার বশ হলেও, প্রাণ বেচে কে আর পরিবারবর্গকে এককালীন সাহায্য দিয়ে যেতে চায়। সুতরাং মনে হয়, ব্যাপারটা আর একবার ভেবে সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া দরকার।

অবশেষে জনসঙ্ঘও!

পৃথিবীতে অনেক আশ্চর্য ঘটনা ঘটে, ভারতবর্ষে ততোধিক। কিন্তু জন-সঙ্ঘ সম্প্রতি যে রকম অবাক করছেন, এমন হতবাক স্মরণকালে হই নি। প্রকাশ, নয়াদিল্লীতে সংসদভবনের সামনে জনসঙ্ঘও হাজার দশেক লোক ভিড়িয়ে বিক্ষোভ প্রদর্শন করেছেন। বলা বাহুল্য, দশ হাজার মানুষ (যার অর্ধাংশই মহিলা), জড় করা একটা অবাক-করা কোন ব্যাপার নয়। কিন্তু জনসঙ্ঘ অকস্মাৎ মূল্যবৃদ্ধি, মুদ্রামূল্য হ্রাস, স্বর্ণনিয়ন্ত্রণ আদেশ প্রত্যাহার প্রভৃতি বিষয়ের ওপর বিক্ষোভ মিছিল সংগঠন করবেন এমন বিচিত্র ব্যাপার বর্তমান লেখকের আক্কেল গুড়ুম করে দিয়েছে। অবশ্য প্রাক নির্বাচনের গরম আবহাওয়ায় হাজার দশেক মানুষ নিয়ে খবর কাগজের পাতা অধিকার করাটা জনসঙ্ঘেরও প্রয়োজন আছে। বিশেষ 'বন্ধ' প্রবাহ যখন অবাধে চলছে। কিন্তু গোলমাল ঠেকছে বোম্বে. বন্ধের ব্যাপারে জনসঙ্ঘের নিষ্ক্রিয়তায়। বোম্বে বন্ধের ক্ষেত্রে জনসঙ্ঘকে স্বতন্ত্র ও পি এস পি-দের সংগে পাংক্তেয় হয়ে বসে থাকতে দেখা গেছে। বোম্বে বন্ধের উদ্যোক্তারা ২৫শে আগস্টের 'বন্ধ'কে 'সর্বাত্মক সাফল্য' হিসেবে বর্ণনা করেছেন এবং কমসে কম দশ লক্ষ প্রতিবাদী জনতা মূল্যবৃদ্ধির প্রতিকারের জন্য দুর্বার প্রয়াস পেয়েছেন বলে ঘোষণা করছেন। জনসঙ্ঘ, স্বতন্ত্র, পি এস পি সেক্ষেত্রে রায় দিয়েছেন এই বলে যে, 'বন্ধ' সফল হয় নি। এটা একটা 'রাজনৈতিক চাল' ভিন্ন অন্য কিছু নয়। অথচ ঐ একই দিনে জন-সঙ্ঘ রাজধানীসহ বিভিন্ন রাজ্যের রাজ-ধানী ও শহরে 'আপনি কোপান' নিয়ে বিক্ষোভ প্রদর্শন করে বেড়িয়েছেন। 'বন্ধ' ও বিক্ষোভের উৎস যেহেতু মূল্য-বৃদ্ধিজনিত সংকটজনক পরিস্থিতির প্রতিবাদ জ্ঞাপন সেজন্য জনসঙ্ঘের একক অভিযানের পেছনে যে 'রাজ-নৈতিক চাল' ক্রিয়াশীল তা যে 'নির্বাচনী চাল' তা আজকের "কত ধানে কত চাল" সম্পর্কে সচেতন মানুষ বেশ উপলব্ধি করতে পারছেন। জন-দুরবস্থাকে নিয়ে এজাতীয় দল-ব্যবস্থায় এবার জনসাধারণ কিংকর্তব্য-বিমূঢ় হয়ে পড়বেন। বলা বাহুল্য, নির্বাচনী জগন্নাথের রথ তাতে সহজে গড়িয়ে চলার আবহমানের সুযোগ অবশ্যই ভোগ করবে।

মহারাষ্ট্র :

মহারাষ্ট্রে ক্ষ্যাপা হাওয়া

জনজীবনের নিরাপত্তা ব্যবস্থায় কঠিন পুলিশী ব্যবস্থা কেন গ্রহণ করা হয় নি এই ছিল অভিযোগ। অভিযোগ ছিল মহারাষ্ট্রের সতের জন কংগ্রেসী সদস্যসহ দু'জন মন্ত্রী মহাশয়ের। আর যা কখনো হয় না, অকস্মাৎ এঁদের জন-দরদে সেই ইতিহাস সৃষ্টি হ'ল মহারাষ্ট্রে। একসঙ্গে উনিশজন পদত্যাগ করলেন, 'বম্বে বন্ধ' ও 'ঘেরা ডালো' দিবস পালনের সময় (গত ২৪শে ও ২৫শে তারিখে) বৃহত্তর বোম্বাইয়ে কেন কঠোরতম পুলিশী ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয় নি এই বিচিত্র অভিযোগে।

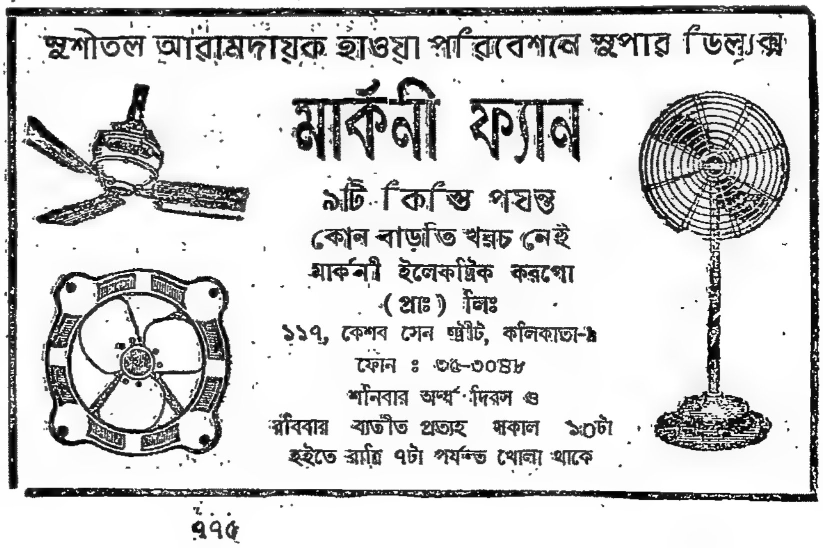

বিচিত্র অভিযোগ। ঐতিহাসিক পদ-ত্যাগ।

দিল্লীর একটি দৈনিক পত্রিকার বিশেষ প্রতিনিধি এই অপ্রত্যাশিত ঘটনা সম্পর্কে লিখছেন : The development is the result of the Swatantra lobby within the Congress feeling "let down" by the administrative wing's soft policies on the Ghera Dalo and Bombay Bandh days.

প্রকাশ, পদত্যাগের সংবাদে নাকি স্বতন্ত্র দল এবং কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভার জনৈক মহারাষ্ট্রীয় মন্ত্রীর বিরুদ্ধবাদিগণ সানন্দে পুলকিত হয়েছেন।

পদত্যাগকারিগণের মধ্যে আছেন দুজন মন্ত্রী, শ্রীশান্তিলাল শা এবং শ্রীতলোয়ার খাঁ এবং স্বয়ং বোম্বে প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি শ্রী পি জি খের। শিক্ষাদপ্তরের উপমন্ত্রী ডঃ এন এন কৈলাসও নাকি কংগ্রেস বিধানসভা দল থেকে পদত্যাগের জন্য অমরাবতী যাত্রা করছেন। বি পি সি সি সভাপতি শ্রীখের বলেন, ২৪।২৫ তারিখে ফোর্ট এলাকায় আইন ও শৃঙ্খলা 'সম্পূর্ণরূপে ভেঙে পড়ে' আর তারই জন্য এই পদত্যাগ।

এদিকে মুখ্যমন্ত্রী ও স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী এই পদত্যাগে বিস্মিত এবং মর্মাহত। তাঁরা বলছেন, পদত্যাগের পক্ষে বিশেষ কি কারণ ঘটেছিল তা তাঁদের সম্পূর্ণ অজ্ঞাত। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আলোচ্য দুই দিবস সম্পর্কে বলেছেন, রাজনৈতিক বিক্ষোভকারিগণ যতক্ষণ শান্ত, ততক্ষণ তাঁদের ওপর কোনরকম হস্তক্ষেপ করা হবে না বলেই মন্ত্রিসভার গৃহীত নীতি অনুসারে সরকার কাজ করেছেন। কারো ব্যক্তিগত নিরাপত্তার অভাব হলে সেকথা স্বতন্ত্র। তেমন নিরাপত্তা রক্ষা করা "অসম্ভব"।

এদিকে মহারাষ্ট্রের এই অপ্রত্যাশিত সংকট মোচনের জন্য রাজনৈতিকমহল তৎপর হয়ে উঠেছেন। একদিকে শ্রীতলোয়ার খাঁ অন্যদিকে মুখ্যমন্ত্রী স্বয়ং কেন্দ্রীয় রেলমন্ত্রী শ্রী এস কে প্যাতিলের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপনে তৎপর হয়ে উঠেছেন। শ্রীপাতিল বর্তমানে বোম্বাই-এ অবস্থানরত। কোন কোন সূত্রে প্রকাশ, পদত্যাগীদের প্রতি শ্রীপাতিল অসন্তুষ্ট নন।

শ্রীশান্তিলাল শা প্রমুখ বিশিষ্ট মহারাষ্ট্রীয় নেতারা কিছুদিন যাবৎই বিরোধিগণ আয়োজিত আন্দোলনগুলির মোকাবিলায় "আহমেদাবাদ জাতীয়" শক্ত পথ গ্রহণের সুপারিশ করে আসছিলেন। কিন্তু বৃথাই। বিক্ষোভ এজন্য তাঁদের মধ্যে বহুগুণিত হয়ে উঠেছিল। আজ সেই আক্রোশ মহারাষ্ট্রের শাসনতান্ত্রিক সংকটকে ঘনীভূত করে তুলেছে।

বিগত ১৯শে আগস্ট ঠিক বোম্বে বন্ধের প্রাক্কালে আই এন টি ইউ সি ও কংগ্রেসী সদস্যবর্গের একটি সভায় কয়েকটি প্রস্তাব গৃহীত হয় এবং রাজ্য স্বরাষ্ট্রদপ্তরের মন্ত্রীর নিকট প্রস্তাবগুলি প্রেরিত হয়েছিল। প্রস্তাবগুলি : (এক) বৃহত্তর বোম্বাই-এ সমাজবিরোধীদের ব্যাপক গ্রেপ্তার (দুই) 'বন্ধ' আয়োজনকে স্বেচ্ছাসেবক তৎপরতার ওপর নিষেধাজ্ঞা প্রয়োগ (তিন) বাধ্য গাড়িচালক ও কণ্ডাক্টরদের নিরাপত্তার ব্যবস্থা প্রভৃতি।

শ্রী এস কে পাতিল

বি পি সি সি সভাপতি শ্রীখের সখেদে বলেছেন, এসব প্রস্তাবের কোনটাই গ্রাহ্য করা হয় নি এবং সরকারী শৈথিল্যে আইন শৃঙ্খলা ভেঙে পড়ে।

বোম্বে বন্ধের পরিপ্রেক্ষিতে মারাত্মকভাবে আইন-শৃঙ্খলা ভেঙে পড়ার অবশ্য কোন সংবাদ সংবাদপত্র মারফৎ প্রকাশিত হয় নি। যতদূর সাধারণে জানেন, তাতে দেখা যাচ্ছে 'বন্ধ' আহ্বানকারিগণ বোম্বে বন্ধকে সর্বাত্মক সফল প্রতিবাদ বলে ঘোষণা করেছেন। প্রায় দশ লক্ষ কর্মী-মানুষ বিরোধী দল আয়োজিত এই বন্ধকে সফল করার জন্য ব্যাপকভাবে সাড়া দিয়েছিলেন। প্রতিবাদের উদ্দেশ্য ছিল জনগণের ওপর ক্রমাগত আর্থিক চাপ সৃষ্টি হচ্ছে এই বক্তব্য তুলে ধরা।

এই ঘটনায় পুলিশকে মাত্র দুটি ক্ষেত্রে বন্দুক দাগতে হয় যদিও কেউ নিহত হন নি। সরকারী হিসাবে মাত্র একচল্লিশ জন আহত। ছ'জন হাসপাতালে এবং সত্তরজন পুলিশী হেপাজতে আছেন। বড় রকম গোলমালেরও কোনও দেখা মেলে নি। বৃহত্তর বোম্বে ছিল মৃতের মত নিশ্চুপ। এহেন অবস্থায় অকস্মাৎ ১৯ জন আইনসভা সদস্যের (২জন মন্ত্রী সহ) পদত্যাগ সত্যই আশ্চর্যজনক।

এবার নিয়ে তৃতীয় বোম্বে বন্ধ। গত দুটিও আগস্ট মাসেই হয়েছিল।

প্রকাশ, নাগপুর মহারাষ্ট্র আইনসভার অধিবেশনেও পদত্যাগী মন্ত্রীদ্বয় সহ বৃহত্তর বোম্বে থেকে নির্বাচিত কংগ্রেসী সদস্যগণ যোগদান করবেন না বলে জানিয়ে দিয়েছেন।

উত্তর প্রদেশ :

উত্তর প্রদেশ কংগ্রেস কমিটির সভাপতি শ্রীকমলাপতি ত্রিপাঠীর নেতৃত্বে বিরুদ্ধবাদী দল এবং শ্রী সি বি গুপ্তের নেতৃত্বাধীন গুপ্ত দলে প্রাক্‌ নির্বাচনী মীমাংসার পথ প্রায় রুদ্ধ হয়ে এলে মুখ্যমন্ত্রী শ্রীমতী কৃপালনী হয়ত সাময়িকভাবে স্বস্তির নিশ্বাস ত্যাগ করলেন। কেন না গুপ্ত দল তাঁর মন্ত্রিসভার বিরুদ্ধে যে অনাস্থা আনয়নের উদ্যোগ করছিলেন বোধহয় তা চাপা পড়ে যাচ্ছে।

সংবাদের বিবরণে প্রকাশ, গুপ্ত দলের সংযুক্তি সংক্রান্ত প্রস্তাব শেষ পর্যন্ত বিরুদ্ধবাদিগণ মেনে নিতে পারেন নি। যদিও একথা আজ সুস্পষ্ট যে শ্রী সি বি গুপ্তের বিরুদ্ধাচরণের জন্যই উত্তর প্রদেশের বিরুদ্ধবাদী দলের উৎপত্তি, বর্তমান রাজ্য রাজনীতির প্রেক্ষাপটে দুই দল একটা সমঝোতায় উপনীত হওয়ার জন্য মুখোমুখি এগিয়ে আসছিলেন। বিরুদ্ধবাদীরা শ্রীগুপ্তকে রাজ্য কংগ্রেসের সভাপতি পদটি প্রদান করতেও স্বীকৃত ছিলেন কিন্তু শ্রীগুপ্তের তা পছন্দ হয় নি। তাঁর লক্ষ্য মুখ্যমন্ত্রীর আসনটি। কিন্তু বিরুদ্ধবাদীরা চেয়েছেন শ্রীত্রিপাঠীকে ঐ পদে বসাতে। ফলত স্বার্থের সংঘাত সমঝোতাকে দূরে সরিয়ে দিয়েছে। মাঝখান থেকে দুই চাপে চাপা-পড়া বর্তমান মন্ত্রিসভা বেশ হাল্কা বোধ করছেন।

সাংবাদিকদের সঙ্গে সুহার্তো ও সোয়েকর্ণো।

ইন্দোনেশিয়া ঃ

ইন্দোনেশীয় রাজনীতির অনেক নাটকীয় ঘটনার মত আর একটি নাটকীয় ঘোষণা করা হয়েছে। ২৫শে আগস্ট ইন্দোনেশীয় সরকারের তথ্য দপ্তরের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, রাষ্ট্রপতি সোয়েকার্নো তাঁর শারীরিক অসুস্থতার জন্য শীগগিরই ছুটি নেবেন। সম্ভবত তিনি দু' মাসের ছুটি নিয়ে য়ুরোপ যাবেন।

গত অক্টোবরের ব্যর্থ অভ্যুত্থানের পর থেকেই সামরিক নেতাদের সংগে সোয়েকার্নোর বনিবনা হচ্ছিল না। মালয়েশিয়ার সংগে বিরোধের অবসানের প্রশ্নে এই মতভেদ খুবই তীব্র হয়েছে। সোয়েকার্নোর আপত্তি অগ্রাহ্য করে ইন্দোনেশিয়ার বর্তমান সরকারী নেতারা মালয়েশিয়ার সংগে শান্তি চুক্তি স্বাক্ষর করেছেন।

ছাত্ররাও আবার সোয়েকার্নোর বিরুদ্ধে বিক্ষোভ সুরু করেছে। ১৭ই আগস্ট ইন্দোনেশিয়ার স্বাধীনতা দিবসে সোয়েকার্নো যে বক্তৃতা করেন, তার বিরুদ্ধেই ছাত্রদের বিক্ষোভ। সোয়েকার্নো আবার কমিউনিস্টদের সমর্থন করছেন, সুতরাং তাঁর অপসারণ চাই। ২৫শে আগস্ট জাকার্তায় পাঁচ হাজার ছাত্র বিক্ষোভ প্রদর্শন করেছে। সোয়েকার্নোর পদত্যাগের দাবিতে ধ্বনি দিতে দিতে তারা পার্লামেণ্ট ভবনের সম্মুখে উপস্থিত হয়, এবং পার্লামেণ্ট অবরোধ করে বসে থাকে।

পার্লামেণ্ট বা 'পিপলস কনসালটেটিভ কংগ্রেসের' অভ্যন্তরেও সদস্যরা সোয়েকার্নোর বিরুদ্ধে তীব্র সমালোচনা করে বক্তৃতা করছিলেন। ইন্দোনেশিয়ার প্রভাবশালী নেতা ডঃ নসরুই বলেন, এখন সোয়েকার্নোর অবসর গ্রহণের সময় উপস্থিত হয়েছে। জনসাধারণের স্বার্থের বিরুদ্ধে সোয়েকার্নো কাজ করছেন। তাঁকে অপসারণ করে জেনারেল সুহার্তোকে রাষ্ট্রপতি পদে নির্বাচিত করার জন্য তিনি দাবি জনান।

ইন্দোনেশিয়ার সাম্প্রতিক রাজনীতির পর্যবেক্ষকদের কাছে এই সমস্ত ঘটনাই এখন গতানুগতিক বলে মনে হবে। সোয়েকার্নো তাঁর সরকারের সিদ্ধান্তের সমালোচনা করবেন, তারপর ছাত্ররা পথে বিক্ষোভ প্রদর্শন করবে, পরে সৈন্যবাহিনীর কেউ একজন রাষ্ট্রপতির সমালোচনা করবেন, এবং তারপর একটি সংবাদ প্রকাশিত হবে সোয়েকার্নো পদত্যাগ করবেন বা অবসর গ্রহণ করবেন বা ছুটি নেবেন। সর্বশেষে মন্ত্রিসভার নেতারা ঘোষণা করবেন, সোয়েকার্নো তাঁর পদেই থাকবেন, তবে ক্ষমতা থাকবে মন্ত্রীদের হাতে। গত কয়েক মাস ধরে ইন্দোনেশিয়ার রাজনীতি এই একই ধারায় চলেছে।

এবারের সোয়েকার্নোর ছুটি নেবার সংবাদ সেই পুরোনো গতানুগতিক ব্যাপার, না সত্যি নতুন কিছু, তা এখনই জোর করে বলা শক্ত। তবে সত্যি যদি সোয়েকার্নো দু' মাসের জন্য বিদেশ যান, তবে তাঁর পক্ষে আর ইন্দোনেশিয়ায় ফেরা সম্ভব হবে ত'?

ভিয়েতনাম ঃ

ভিয়েতনামের সমস্যা সমাধানের উদ্দেশ্যে একটি 'এশীয় পরিকল্পনা'

মার্কোস

গ্রহণের জন্য থাইল্যাণ্ডের পররাষ্ট্রমন্ত্রী থানাট খোমান উদ্যোগ গ্রহণ করেছিলেন। এই বিষয়ে আলোচনার জন্য সম্প্রতি ব্যাংককে থাইল্যাণ্ড, ফিলিপাইন ও মালয়েশিয়ার পররাষ্ট্রমন্ত্রীদের এক বৈঠকও হয়ে গেছে। ফিলিপাইনসের পররাষ্ট্রমন্ত্রী রামোস ও মালয়েশিয়ার পররাষ্ট্রমন্ত্রী টুন আবদুল রেজ্জাক থানাট খোমানের সংগে একযোগে প্রস্তাব করেছেন, এশিয়ার রাষ্ট্রসমূহের প্রধানেরা মিলিত হয়ে এই সমস্যা সমাধানের জন্য চেষ্টা করুন। এই উদ্দেশ্যে ১৭টি রাষ্ট্রের কাছে আহ্বান জানানো হয়েছে। ফিলিপাইনসের রাষ্ট্রপতি ফার্ডিনাণ্ড মার্কোস ম্যানিলায় এই সম্মেলনের ব্যবস্থা করতে আগ্রহের সংগে সম্মত হয়েছেন।

কিন্তু তিন পররাষ্ট্রমন্ত্রীর এই এশীয় সম্মেলনের প্রস্তাবে বিশেষ কেউ সাড়া দেয় নি। অনেকেরই ধারণা, থানাট খোমানের এই প্রচেষ্টার পেছনে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র রয়েছে। জেনেভা সম্মেলনের প্রস্তাবের ভিত্তিতে ভিয়েতনাম সমস্যার সমাধানের যে আন্তর্জাতিক দাবি, তা বানচাল করার জন্যই এই নতুন এশীয় সম্মেলনের প্রস্তাব করা হয়েছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র জেনেভা সম্মেলনের সিদ্ধান্ত কার্যকরী করতে চায় না। তাই এশীয় সম্মেলন থেকে একটা পাল্টা প্রস্তাব তোলার জন্যই এই চেষ্টা। তাছাড়া বর্তমানে রাষ্ট্রসংঘে কয়েকটি এশীয় প্রতিনিধি দল ভিয়েতনাম থেকে মার্কিন সৈন্য অপসারণের দাবিতে রাষ্ট্রসংঘ সাধারণ পরিষদে একটা প্রস্তাব আনার জন্য চেষ্টা করছেন। এই

প্রচেষ্টায় বাধা সৃষ্টি করাও সম্ভবত প্রস্তাবিত এশীয় সম্মেলনের উদ্দেশ্য।

ভিয়েতনামের ব্যাপারে মীমাংসায় উদ্যোগী হবার কোন নৈতিক অধিকার থাইল্যান্ড, ফিলিপাইনস ও মালয়েশিয়ার আছে কিনা, এই নিয়েও প্রশ্ন উঠেছে। কারণ, এই তিনটি দেশই প্রত্যক্ষ অথবা পরোক্ষভাবে উত্তর ভিয়েৎনামের বিরুদ্ধে দক্ষিণ ভিয়েৎনাম ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে সমর্থন করছে। থাইল্যান্ডে মার্কিন সামরিক ঘাঁটি রয়েছে। এই ঘাঁটি ভিয়েৎনামের যুদ্ধের জন্য ব্যবহার করা হয়। ফিলিপাইনসের পাঁচ হাজার সৈন্য ভিয়েৎনামের মুক্তি সংগ্রামীদের বিরুদ্ধে লড়াই করছে। মালয়েশিয়ার কোন সৈন্য দক্ষিণ ভিয়েৎনামে না থাকলেও, মালয়েশিয়া এখানে মেডিক্যাল মিশন প্রেরণ করেছে, এবং মালয়েশীয় চিকিৎসকরা দক্ষিণ ভিয়েৎনামের সৈন্যদের সাহায্য করছে। এই অবস্থায় এরা কোন উদ্যোগ গ্রহণ করলে, উত্তর ভিয়েৎনাম বা তার সমর্থকরা তাতে সাড়া দেবে কেন?

চীন ও উত্তর ভিয়েৎনামের পক্ষ থেকে এই তথাকথিত শান্তি প্রচেষ্টার তীব্র সমালোচনা করে বলা হয়েছে, মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের স্বার্থেই এই প্রস্তাব করা হয়েছে। সোভিয়েট ইউনিয়নের সরকারী মুখপত্র 'প্রাভদা'তেও একইরূপ মন্তব্য করা হয়েছে।

কলাম্বিয়াঃ

গত সপ্তাহে কলাম্বিয়ার রাজধানী বোগোটায় পাঁচটি ল্যাটিন আমেরিকান রাষ্ট্রের প্রধানদের এক 'ক্ষুদে শীর্ষ সম্মেলন' অনুষ্ঠিত হয়ে গেছে। কলাম্বিয়ার নবনির্বাচিত রাষ্ট্রপতি কার্লোস লেরাস রেসট্রেপোর আমন্ত্রণে চিলি, পেরু, ভেনিজুয়েলা ও ইকুয়েডরের রাষ্ট্রপ্রধানরা এই সম্মেলনে মিলিত হয়েছিলেন। চিলির রাষ্ট্রপতি এডুয়ার্ডো ফ্রেই, ভেনিজুয়েলার রাষ্ট্রপতি রাউল লিওনি ইকুয়েডরের নতুন রাষ্ট্রপতি গালো প্লাজা লাসো এবং পেরুর প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী ও বর্তমানে অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি ফারনান্দো শোয়াল্‌ব রেসট্রেপোর সঙ্গে মিলিত হয়ে ল্যাটিন আমেরিকার বিভিন্ন সমস্যা নিয়ে আলোচনা করেছেন।

ব্রেজিল ও আর্জেন্টিনার সামরিক শাসকরা ভেবেছিলেন, বোগোটার বৈঠক থেকে এই রাষ্ট্রপ্রধানরা বোধ হয় সামরিক শাসনের বিরুদ্ধে অভিমত প্রকাশ করবেন। কারণ, এই পাঁচটি দেশেই মোটামুটি নির্বাচন ব্যবস্থা ও গণতান্ত্রিক কাঠামো বজায় আছে। কিন্তু তা নয়। বোগোটা বৈঠকে পঞ্চ রাষ্ট্রপ্রধান ল্যাটিন আমেরিকার অর্থনৈতিক ও সামাজিক সমস্যা নিয়ে আলোচনা করেছেন। মধ্য আমেরিকার দেশগুলি নিজেদের মধ্যে একটি 'কমন মার্কেট' গড়ে তুলেছে। দক্ষিণ আমেরিকার অপর নটি দেশ 'ল্যাটিন আমেরিকান ফ্রি ট্রেড এ্যাসোসিয়েশন' বা 'ল্যাফ্‌টা' (L A F T A) নামে একটি সংস্থা গড়ে তুলেছে। তবে এটি নামেমাত্র—এর দ্বারা কোন কাজ হয় না। বোগোটা বৈঠকের পর প্রকাশিত 'বোগোটা ঘোষণায়' এই সংস্থাকে কার্যকরী সংস্থায় পরিণত করা, এবং ল্যাটিন আমেরিকার জন্য ব্যাপক একটি শিল্প ও কৃষি পরিকল্পনা প্রণয়নের কথা বলা হয়। এই সংস্থার মাধ্যমে ল্যাটিন আমেরিকার ঐক্য ও রাজনৈতিক সংহতি গড়ে তোলার কথাও বলা হয়।

এই বৎসরের শেষে লিমাতে ল্যাটিন আমেরিকার সকল রাষ্ট্রপ্রধানের যে সম্মেলন হবে, সেখানে বোগোটা বৈঠকের প্রস্তাব উত্থাপন করা হবে। মেক্সিকো, ব্রেজিল ও আর্জেন্টিনার মত বড় রাষ্ট্রের প্রভাবের বিরুদ্ধে জোরের সঙ্গে দাঁড়াবার মত শক্তি সংগ্রহের জন্য এই পাঁচটি রাষ্ট্র নিজেরা মিলিত হবার চেষ্টা করছে।

মোটামুটি এই সব রাষ্ট্রই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রভাবাধীন। কিন্তু সব দেশেই আজ মার্কিন কর্তৃত্বের বিরুদ্ধে একটা বিক্ষোভ সুরু হয়েছে। মার্কিন পরিকল্পনা 'আলিয়ান্‌জা' বা অ্যালায়েন্স ফর পীসের মধ্যে আরও বেশি ক্ষমতা লাভের জন্য বোগোটা বৈঠক থেকে পাঁচটি রাষ্ট্র দাবি জানিয়েছে।

চীনঃ

পিকিং-এ সোভিয়েট দূতাবাসের সম্মুখে চীনা ছাত্ররা ব্যাপকভাবে বিক্ষোভ প্রদর্শন করেছে। ঘটনাটি ঘটেছে ২২শে আগস্ট। জাম্বিয়ার উপ-রাষ্ট্রপতি রুবেন কামাঙ্গা চীন সফর শেষ করে সেদিন মস্কো রওনা হচ্ছিলেন। বিমানঘাঁটিতে কামাঙ্গাকে কূটনৈতিক শিষ্টাচারসম্মত বিদায় সম্বর্ধনা জানাবার জন্য সোভিয়েট দূতাবাসের চার্জ দ্য অ্যাফেয়ার্স ইউ-আই রাজদুখভ যাতে যেতে না পারেন, তার জন্যই এই বিক্ষোভ। হাজার হাজার ছাত্র দূতাবাস ঘিরে থাকে, এবং দূতাবাস থেকে কোন গাড়ি বের হতে দেয় নি। ছাত্ররা সোভিয়েট ইউনিয়নের বিরুদ্ধে অনেক কটূক্তি বর্ষণ করে। উৎসাহী ছাত্ররা দূতাবাসের সম্মুখের রাস্তার নামটি পাল্টে দিয়ে রাস্তার নতুন নামকরণ করেছে "শোধনবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রামের রাস্তা"।

সোভিয়েট দূতাবাসের পক্ষ থেকে এই ঘটনার তীব্র প্রতিবাদ জানানো হয়, এবং চীনা সরকারের পররাষ্ট্র দপ্তরে একটি কড়া নোট পাঠানো হয়। আশ্চর্যের বিষয়, পররাষ্ট্র দপ্তরের কর্মচারী এই প্রতিবাদ পত্রটি নিতে অস্বীকার করেন এবং বলেন, এই ঘটনার পুনরাবৃত্তি বন্ধ করার কোন দায়িত্ব তাঁদের নেই। এইরূপ বিক্ষোভ প্রদর্শনের অধিকার ছাত্রদের আছে এবং

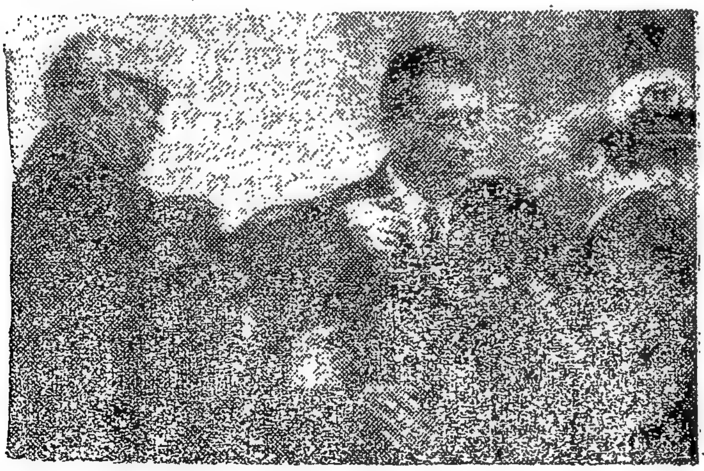

লেরাস রেসট্রেপো (ডানে) লিওনি ও ফ্রেইকে সম্বর্ধনা জানাচ্ছেন

ভবিষ্যতেও প্রয়োজন হলে আবার তারা বিক্ষোভ জানাবে।

পররাষ্ট্র দপ্তরের মুখপাত্রের এই বক্তব্যে বিস্মিত হবার কিছু নেই। চীনা কমিউনিস্ট পার্টি ও সরকারের সমর্থন ছাড়া নিশ্চয়ই ছাত্ররা এই বিক্ষোভ প্রদর্শন করে নি।

আশ্চর্যের বিষয় হল, পুঁজিবাদী ও সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্রের দূতাবাসের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ প্রদর্শনের যে কৌশল গ্রহণ করা হয়, চীনে সোভিয়েট ইউ-নিয়নের বিরুদ্ধে ঠিক একই কৌশল গ্রহণ করা হয়েছে। উভয় দেশের মধ্যে সম্পর্ক আজ কোন পর্যায়ে গিয়ে পৌঁছেছে, এর থেকেই তা বোঝা যাবে।

কম্বোডিয়াঃ

কম্বোডিয়ার সংগে মার্কিন যুক্ত-রাষ্ট্রের সম্পর্কের গুরুতর অবনতি ঘটেছে। অনেক দিন ধরেই এই সম্পর্ক খারাপ যাচ্ছে, সম্প্রতি কম্বোডিয়ার গ্রামে মার্কিন বোমাবর্ষণের ঘটনাকে কেন্দ্র করে এই সম্পর্ক আরও খারাপ হয়েছে। মার্কিন রাষ্ট্রপতি লিনডন জনসনের বিশেষ ভ্রাম্যমাণ দূত অ্যাভে-রাল হ্যারিমানের গত সপ্তাহে নমপেন আসার কথা ছিল। কিন্তু কম্বোডিয়ার রাষ্ট্রপ্রধান প্রিন্স নরোদম সিহানুক অ্যাভেরালের এই সফর বন্ধ করে দিয়েছেন।

দক্ষিণ ভিয়েৎনাম ও কম্বোডিয়ার সীমান্ত অঞ্চলে কম্বোডিয়ার গ্রামে মার্কিন বোমাবর্ষণের প্রতিবাদ করার পর কম্বোডিয়া আশা করেছিল, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ত্রুটি স্বীকার করবে, এবং

সিহানুক ও দ্য গল

হ্যারিমান

ভবিষ্যতে বোমাবর্ষণ থেকে বিরত থাকবে। কিন্তু ত্রুটি স্বীকার দূরের কথা, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এই গ্রাম-গুলিকে 'বিরোধীয় এলাকা' বলে চিহ্নিত করার চেষ্টা করেছে। আন্ত-র্জাতিক নিয়ন্ত্রণ কমিশনের পক্ষ থেকে এখানে তদন্ত করতে এলে মার্কিন সৈন্যরা তাঁদের কাজেও বাধা দেয়। স্বাভাবিকভাবেই কম্বোডিয়া এতে ক্ষুব্ধ।

পেন্টাগন অনেক দিন থেকেই কম্বোডিয়ার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য চেষ্টা করছে। তাদের বক্তব্য, কম্বোডিয়ার এই সব গ্রাম থেকে ভিয়েৎ-কংদের জন্য সাহায্য আসছে। উত্তর ভিয়েৎনাম থেকে যেমন কল্পিত 'হো-চি-মিন সড়ক' ধরে সাহায্য আসে, কম্বোডিয়া থেকেও তেমনি একটি 'সিহানুক সড়কের' কল্পনা করেছে পেন্টাগনের কর্তারা। ভিয়েৎনামের যুদ্ধকে পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে ছড়িয়ে দেবার জন্য মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের এই তত্ত্ব।

হ্যারিমানের সফর বন্ধ হয়েছে। অপর দিকে কিন্তু ফ্রান্সের রাষ্ট্রপতি চার্লস দ্য গল আসছেন কম্বোডিয়ায়। তাঁর জন্য অপেক্ষা করে আছে বিপুল সম্বর্ধনা। ইন্দো-চীন এলাকা একদিন ফ্রান্সের দখলে ছিল, অথচ আজ ফ্রান্সের প্রতি এই অঞ্চলের লোকেদের মনোভাব অত্যন্ত অনুকূল। কারণ, দ্য গল ইন্দো-চীন এলাকা থেকে মার্কিন সৈন্যের বিনা সর্ত অপসারণ, ও সমগ্র অঞ্চলের নিরপেক্ষতার বিশেষ সমর্থক।

বর্তমান অবস্থায় প্রিন্স নরোদম সিহানুকের কাছে ফ্রান্সের নৈতিক ও বৈষয়িক সাহায্যের মূল্য খুবই বেশি

বিশ্বসাহিত্যের আদিপর্ব

ডঃ নরেন ভট্টাচার্য

॥ ১ ॥

প্রাচীন গ্রীক সাহিত্য ঃ হোমার থেকে পারসিক যুদ্ধ পর্যন্ত

ইউরোপীয় সভ্যতার উদ্ভব হয়েছে গ্রীক দেশ থেকে এবং সে হিসাবে ইউরোপের প্রাচীনতম সাহিত্যের উৎপত্তিস্থলও হচ্ছে গ্রীস। প্রাচীন গ্রীক সংস্কৃতি বলতে আমরা যা বুঝি তার চরিত্র ছিল মিশ্র। মূলত দুইটি ধারার সমন্বয়ে গ্রীক সংস্কৃতি গড়ে উঠেছিল। একটি ছিল আর্য ভাষা-গোষ্ঠী প্রভাবিত হেলেনীয় ধারা, অপর ধারাটি ছিল প্রাক্-হেলেনীয়, যার উৎপত্তিস্থল ছিল ক্রীট এবং এশিয়া মাইনর। প্রত্নতাত্ত্বিক অনুসন্ধানের ফলে আজ প্রমাণিত হয়েছে যে, গ্রীক সংস্কৃতির এই প্রাক্-হেলেনীয় ধারাটি অপেক্ষাকৃত সরল এবং গ্রীক পৌরাণিক কাহিনীসমূহের উৎসমূল গ্রীস ভূখণ্ডে অনুসন্ধান না করে ক্রীট ও তার নিকটবর্তী অঞ্চলগুলিতে অনুসন্ধান করতে হবে। দেবতা জিউস, দেবী ডিমিটার ও তৎকন্যা পার্সিফোন, দেবতা ডাওনিসাস, রাজা মিনোস প্রভৃতি কাহিনীগুলির উদ্ভব সম্ভবত ক্রীট দ্বীপ থেকেই হয়েছিল।

আদিমতম গ্রীক সাহিত্যের কোন লিখিত নজীর নেই। সেগুলি লোকগাথা পর্যায়ের, লোকমুখে সর্বদা গীত বা কথিত হত। পৌরাণিক কাহিনী, বিশেষ করে দেবদেবীদের কীর্তিকলাপই ছিল সেগুলির উপজীব্য বিষয়। মূল গ্রীক ভূখণ্ড ছাড়াও এই কাহিনীগুলি এশিয়া মাইনরের বহুস্থানেই জনপ্রিয় ছিল।

হোমার

আনুমানিক ৯০০ খৃস্টপূর্বাব্দকেই গ্রীকদের আদিকবি হোমারের কাল বলে ঐতিহাসিকরা মনে করেন। হোমার নামে আদৌ কোন কবি ছিলেন কি না এ নিয়ে অবশ্য পণ্ডিতদের মধ্যে বিতর্ক আছে। হোমারের জন্মভূমি হিসাবে সাতটি স্থানকে দাবি করা হয় —এথেন্স, স্মার্না, রোডস, কলোফোন, সালামিস, চিওস এবং আর্গোস। আধুনিক ঐতিহাসিকরা বলেন যে, হোমারের কাব্য রচিত হয়েছিল এশিয়া মাইনরের পশ্চিম উপকূলে, এবং তাঁর জন্মস্থান ছিল স্মার্না। কেউ কেউ বলেন যে, হোমার আসলে ছিলেন আইয়োনীয়, ভাগ্যের সন্ধানে তিনি দেশান্তরে এসেছিলেন। কথিত আছে, হোমারের পিতার নাম মেলেস, হোমার শেষ জীবনে অন্ধ হয়ে গিয়েছিলেন এবং তাঁর মৃত্যু হয়েছিল আইওস দ্বীপে, যেখানে তাঁর নামে একটি সমাধি আছে।

হোমারের **ইলিয়াড** এবং **অডিসি** উভয় গ্রন্থই চব্বিশটি করে অধ্যায়ে বিভক্ত। ইলিয়াড মহাকাব্যটি দশ বছর ব্যাপী ট্রয় যুদ্ধের শেষ একান্ন দিনের কাহিনী অবলম্বনে রচিত। অ্যাকিলিসের ক্রোধ থেকে কাহিনীর শুরু এবং হেক্টর বধেই কাহিনীর সমাপ্তি, মূল কাহিনীটি কিন্তু এরই মধ্যে সংক্ষেপে বলা আছে। অডিসির কাহিনী ইলিয়াডেরই উত্তরসূরী, ট্রয় যুদ্ধের প্রত্যাবর্তনকারীদের মধ্যে দলছাড়া বীর অডিসিউসের কাহিনী।

ট্রয় যুদ্ধের কাহিনী অবলম্বন করেই হোমারের মহাকাব্যদ্বয় গড়ে উঠেছিল, কিন্তু যুগে যুগে এই যুদ্ধের কাহিনী বিভিন্ন রচয়িতার হাতে পড়ে বিভিন্ন প্রকার রূপ পরিগ্রহ করেছিল এবং যে ঘটনাগুলি আমাদের আলোচ্য মহাকাব্যদ্বয়ে বর্ণিত হয়েছে, সেগুলি পরবর্তীকালের লেখকগণ কর্তৃক অপরাপর লৌকিক জনশ্রুতির সঙ্গে সমন্বিত হয়েছিল, অথবা তাঁরা স্বকপোলকল্পিত অনেক কাহিনী মূল বিষয়ের ওপর আরোপ করেছিলেন। যেমন হোমারের বর্ণনা অনুযায়ী হেলেনের অপহরণই হচ্ছে ট্রয় যুদ্ধের মূল কারণ, এবং এই অপকর্মটি ট্রয়ের রাজকুমার প্যারিস করেছিলেন নিজের প্রবৃত্তির তাড়নায়, যেখানে পরবর্তী লেখকগণ প্যারিসের কাজের সমর্থনে একটি আষাঢ়ে গল্প ফেঁদেছেন যে, একদা তিনজন বিখ্যাত দেবী—হেরা, আথেনী ও আফ্রোদিতি—নিজেদের মধ্যে সৌন্দর্য প্রতিযোগিতায় প্যারিসকে বিচারক খাড়া করেন এবং প্যারিস আফ্রোদিতিকে বিজয়মাল্য দিলে আফ্রোদিতির করুণাতেই সে সুন্দরীশ্রেষ্ঠা হেলেনের ওপর অধিকার স্থাপনে সমর্থ হয়, অপর পক্ষে হেরা এবং আথেনী প্রতিহিংসাবশত প্যারিসের সর্বনাশ সাধনের যে চক্রান্ত করেন তারই পরিণতি হচ্ছে ট্রয় যুদ্ধ। হোমারের বর্ণনা অনুযায়ী হেলেনের অপহরণের পর তার স্বামী মেনেলাউস ও ভাসুর অ্যাগামেমনন অন্যান্য গ্রীক রাজাদের নিকট হেলেনকে উদ্ধারের জন্য সাহায্যের আবেদন করেন, এবং সেই আবেদন গ্রাহ্য হয়। পরবর্তীকালে এইরকম কাহিনীর সৃষ্টি হয়েছে যে, হেলেনের বিবাহের পূর্বে যারা তার প্রেমের প্রার্থী ছিল তারা ঘটনাচক্রে হেলেনের নিকট প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয়েছিল যে, হেলেনের বিপদে তারা এগিয়ে আসবে। হোমার লিখেছেন যে, গ্রীকবাহিনী সোজাসুজি ট্রয়ে গিয়ে পৌঁছেছিল। এই ব্যাপারটিকে পরবর্তী কাহিনীকাররা সহজে ঘটতে দেন নি, তাঁরা গ্রীক কাহিনীকে ভুলপথে নিয়ে গিয়ে একেবারে মাইসিয়া দ্বীপে হাজির করিয়েছিলেন, এবং অনেক ঝামেলার পর, অ্যাগামেমননের কন্যা ইফিজেনিয়াকে বলি দিয়ে দেবী আর্টেমিসের করুণায় শেষ পর্যন্ত ট্রয়ে গিয়ে হাজির হয়। ট্রয়-ভরসা হেক্টরের মৃত্যুর পর আমাজোনদের এক নারীবাহিনী ট্রোজানদের সাহায্যার্থে রণক্ষেত্রে এগিয়ে আসে এবং শেষ পর্যন্ত তারা অ্যাকিলিসের হাতে নিহত হয়। এ কাহিনী হোমার বলেন নি, এই রকম ব্যাপার অডিসি মহাকাব্যেও প্রচুর আছে। পরবর্তী লেখকগণ অডিসিউসকে হেলেনের অন্যতম প্রাক্তন প্রেমিক বানিয়ে ছেড়েছেন, কিন্তু এ বিষয়ে হোমার নীরব। অডিসিউসের সঙ্গে তাঁর পুত্র টেলেগোনাসের যুদ্ধের কাহিনীও হোমারে

উল্লিখিত নেই। অডিসিউসের আরও দুই পুত্র—আগ্রিয়াস ও লাটিনাস সম্বন্ধেও হোমার নীরব, কিন্তু পরবর্তী কবিগণ এদের বিষয়ে সোচ্চার।

সেকালের পেশাদার গায়কদের বলা হত রাপসোডোই (ইং, রাপসোডিস্ট)। পথে-প্রান্তরে বীরগাথা গাওয়াই যাদের পেশা ছিল। এদেরই প্রচেষ্টায় হোমারের কাহিনীগুলি অতি দ্রুত পশ্চিম এশিয়া ও মূল গ্রীক ভূখণ্ডে ছড়িয়ে পড়ে। স্পার্টায় লাইকারগাস হোমারের কাব্য আমদানি করেন, এবং ৭৫৩ খৃস্টপূর্বাব্দে অলিম্পিক খেলা সূত্রপাত হবার ২৩ বছরের মধ্যে হোমারের কাব্য সমগ্র গ্রীসের জাতীয় সম্পত্তি হয়ে দাঁড়ায়।

ইতিমধ্যে বহুস্থানে গীত ও কথিত হওয়ার জন্য হোমারের কাব্যের বিশুদ্ধি নষ্ট হতে থাকে, ফলে হোমারের কাব্যের বিশুদ্ধি রক্ষার জন্য বিশেষ চেষ্টা শুরু হয়। এ বিষয়ে প্রথম উদ্যোগী হন সোলোন, এবং তারপর পিসিস্ট্রেটাস (৫৩৫ খৃঃ পূঃ) যিনি কবি অনোমাক্রিটাসকে সভাপতি করে হোমারের কাব্য সংক্রান্ত একটি বোর্ড গঠন করেন।

ইলিয়াড এবং অডিসি ছাড়াও হোমারের নামে আরও কিছু রচনা প্রচলিত আছে। সেগুলি হচ্ছে, (১) স্তোত্রমালা, মোট চৌত্রিশটি কবিতার সমষ্টি; (২) ষোলটি ছোট কবিতা নিয়ে একটি গ্রন্থ, যার নাম এপিগ্রামাটা; এবং (৩) ইলিয়াডের প্যারোডি হিসাবে একটি কাব্য যার নাম বাট্রাচোম্যোমাচিয়া, অর্থাৎ ব্যাং এবং ইঁদুরের যুদ্ধ। হোমারের নামে চললেও এগুলি নিশ্চয়ই হোমারের লেখা নয়, অন্তত শেষ গ্রন্থটির লেখক হিসাবে জনৈক পিগ্রেসের নাম পাওয়া গেছে।

প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য, হোমার নামক আর একজন কবি খৃস্টপূর্ব তৃতীয় শতকে আবির্ভূত হয়েছিলেন।

হেসিওড

প্যাটারকুলাস মন্তব্য করেছিলেন যে, "হোমার যে ভুল করেছিলেন হেসিওড তা করেন নি, অর্থাৎ তিনি তাঁর স্বদেশ এবং পিতামাতার নাম উল্লেখ করেছেন।" হোমারের পর প্রাচীনত্বের দিক থেকে একমাত্র হেসিওডেরই নাম করা যায়। প্রাচীনকালের কোন কোন পণ্ডিত হেসিওডকে হোমারেরও পূর্বসূরী বলে ঘোষণা করেছিলেন। তবে একথা ঠিক নয়। আনুমানিক ৭৭৬ খৃস্টপূর্বাব্দকে হেসিওডের কাল বলে মনে করা যেতে পারে।

হেসিওড সম্বন্ধে যতদূর জানা যায় তা হচ্ছে যে, তাঁর পিতার নাম ডিয়োস এবং তাঁর জন্মস্থান বিওসিয়া। তাঁর পিতা ইওলিয়ার অন্তর্গত কুমা থেকে বিওসিয়ায় গিয়ে বসতি স্থাপন করেন। কোন কারণে তাঁর সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত হয়ে যাওয়ার ফলে তিনি নৌপ্যাকটাসে বসতি স্থাপন করেন। একটি আকস্মিক দুর্ঘটনায় হেসিওডের মৃত্যু হয়। তিনি এবং আর একজন মিলেশীয় পথিক একত্রে একটি বাড়িতে আশ্রয় নিয়েছিলেন। সেই মিলেশীয় লোকটি কোন কারণে গৃহকর্তার মেয়েকে অপমান করায় গৃহকর্তা দুজনকেই নিহত করে।

এ পর্যন্ত হেসিওডের রচিত তিনটি গ্রন্থ আবিষ্কৃত হয়েছে। প্রথমটি হচ্ছে **ওয়ার্কস এন্ড ডেজ**। ওয়ার্কসের শ্লোক সংখ্যা ৪৯০টি এবং ডেজ-এর মাত্র ৭৫টি। এই গ্রন্থে আছে উপকথা ও প্রবাদবাক্যের সংকলন, তা ছাড়া আছে কৃষি, গার্হস্থ্য অর্থনীতি এবং নৌবিদ্যা সংক্রান্ত অনেক উপদেশ। হেসিওডের এই গ্রন্থটি নিঃসন্দেহে অতি প্রাচীন, কেন না, পজেনিয়াস লিখেছেন যে, তিনি হেসিওডের **ওয়ার্কস**-কে একটি সীসার ফলকে উৎকীর্ণ দেখেছেন। হেসিওড সম্বন্ধে প্লিনি লিখেছেন যে, তিনিই প্রথম কৃষিকার্যের মূল নিয়মগুলি লিপিবদ্ধ করেছিলেন।

হেসিওডের দ্বিতীয় গ্রন্থ হচ্ছে **থিওগোনি** যে গ্রন্থটি প্রাচীন গ্রীসের ধর্ম ও দেবতাদের সম্বন্ধে বিভিন্ন তথ্যাবলীর জন্য অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। পজেনিয়াস এই গ্রন্থটি সম্বন্ধে আলোচনা করেছেন, ঐতিহাসিক হেরোডোটাস এই গ্রন্থ থেকে তথ্যাদি সংগ্রহ করেছেন। থিওগোনি হচ্ছে দেবগণের জন্মবৃত্তান্ত। গ্রন্থের শুরু হয়েছে সঙ্গীতের অধিষ্ঠাত্রী দেবীদের বন্দনা দিয়ে। তারপর কবি জগৎ সৃষ্টির কাহিনী বলেছেন। আকাশরূপী ইউরেনাস ও পৃথিবীরূপী গেইয়ার দ্বন্দ্ব, গেইয়া ও তাঁর পুত্র ক্রোনাসের চক্রান্ত এবং ইউরেনাসের নিবীর্যকরণ, শিশু জিউসকে স্থানান্তরকরণ, প্রমিথিউসের শাস্তিভোগ, প্যান্ডোরা অথবা নারীর সৃষ্টি, দেবতা ও টাইটানদের যুদ্ধ, জিউসের সঙ্গে দৈত্য টাইফোসের যুদ্ধ—এইগুলি হচ্ছে থিওগোনির বিষয়বস্তু। থিওগোনির শ্লোকসংখ্যা ১২৬০।

হেসিওডের তৃতীয় রচনা হচ্ছে **শীলড অফ হেরাক্লেস**। যতদূর মনে হয় এর মূল রচনাটি লুপ্ত হয়ে গেছে, তার জায়গায় পরবর্তীকালে কোন অল্পশক্তিসম্পন্ন কবি নতুন করে এই কাহিনীটি লিখেছিলেন। আসলে এটি ইলিয়াডে বর্ণিত শীলড অফ অ্যাকিলিসের অক্ষম প্যারোডি। এখানে হেরাক্লেসের বিখ্যাত ঢালের বর্ণনা আছে যা হিফেস্টাস তাঁকে তৈরি করে দিয়েছিলেন আরেসের পুত্র সাইকনাসের সঙ্গে যুদ্ধ করার জন্য। সমগ্র কাহিনীটি তিনটি পর্বে বিভক্ত। প্রথম পর্বে আছে থিবসে তার নির্বাসিত স্বামীর সঙ্গী হিসাবে আলক্মেনার আগমন, টেলিবোয়ানদের বিরুদ্ধে অ্যামফিট্রায়োনের অভিযান। জিউসের রণকৌশল এবং হেরাক্লেসের জন্ম। দ্বিতীয় পর্বে আছে হেরাক্লেস ও সাইকনাসের সাক্ষাৎকার এবং হেরাক্লেসের ঢালের বর্ণনা। এবং তৃতীয় পর্ব আছে উভয়ের যুদ্ধ, সাইকনাসের মৃত্যু ও সমাধি।

কুইন্টিলিয়ান লিখেছেন, "হেসিওডের উত্থান কদাচিৎ, তাঁর অনেকটা অংশ কেবল নামেই বর্তমান, তথাপি তিনি প্রয়োজনীয় অনুশাসন রচনার জন্য বিশিষ্টতায় মণ্ডিত, তাঁর দৃষ্টিভঙ্গীর প্রশংসনীয় মাধুর্য, শব্দাবলীর রচনাভঙ্গী তাঁকে যথেষ্ট মর্যাদা দিয়েছে।" কিকেরো হেসিওডকে নীতিবাদী বলেছেন, এবং একথাও বলেছেন যে, মানুষ যেন হেসিওডের কাছ থেকে এই শিক্ষাই লাভ করে যে "দেবতারা পুণ্যের পূর্বে মাথার ঘাম রেখে দিয়েছেন।" ভলটেয়ার তাঁর দার্শনিক অভিধানে যথার্থই বলেছেন যে, হেসিওড রচিত অনেক বাক্যই আজ প্রবচনমূলক স্বতঃসিদ্ধ হয়ে গেছে।

গ্রীসের আদি গীতিকবি সম্প্রদায়: মহাকাব্যের পাশাপাশি গীতিকবিতারও বহুল প্রচলন প্রাচীন গ্রীসে ঘটেছিল। এই গীতিকবিতাগুলির ধরণও ছিল বহুরকম, যেমন—পেয়ান্স, হাইপোরচেমাটা, প্রোসোডিয়া, পার্থেনিয়া, ডিথাইরাম্বস, এনকোমিয়া, হাইমেনিয়া, এপিথলামিয়া ইত্যাদি। প্রেম, বিরহ, শোক, হাসি, নারী, সুরা, প্রকৃতির শোভা ইত্যাদি ছিল প্রাচীন গ্রীক গীতিকবিতার বিষয়বস্তু।

আদিমতম গ্রীক গীতিকবিতা নিয়ে আলোচনার ক্ষেত্রে একটি বড় অসুবিধা হচ্ছে এই যে, কবির নাম ও পরিচয় খুঁজে পাওয়া গেলেও, তাঁদের রচনার নিদর্শন বড় একটা পাওয়া যায় নি। গ্রীক গীতিকবিগণ মূলত তিনটি শ্রেণীতে বিভক্ত ছিলেন—আইওনীয়, ইওলীয় এবং ডোরীয়। আইওনীয় গোষ্ঠী অধিকতর প্রাচীন। এই গোষ্ঠীর মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিলেন ক্যাল্লিনাস, আর্কিলোকাস, টাইরটেয়াস, সামোসের

সাইমনিডেস, চিওসের সাইমনিডেস, সেলন, থিওগনিস এবং হিপ্পোনাক্স।

প্রথম গীতিকবি হিসাবে আমরা ক্যাল্লিনাসের উল্লেখ করতে পারি, যিনি আনুমানিক ৭০০ খৃস্ট-পূর্বাব্দে জীবিত ছিলেন। তাঁর একটিমাত্র গীতিকবিতা এ পর্যন্ত পাওয়া গেছে যে কবিতায় তিনি লিডীয়দের বিরুদ্ধে তাঁর স্বদেশবাসীকে যুদ্ধের জন্য উৎসাহিত করেছেন। ক্যাল্লিনাসের সমসাময়িক ছিলেন আর্কিলোকাস, যাঁর জন্মস্থান ছিল প্যারোস, পিতার নাম টেলেসিক্লেস, মাতা একজন ক্রীতদাসী, দারিদ্র্যের জন্য যিনি থ্যাসোসে বাস করতেন। ধারালো ব্যঙ্গকবিতার জন্য আর্কিলোকাস বিখ্যাত ছিলেন, আইয়াম্বিক ছন্দে তাঁর দক্ষতা ছিল বিস্ময়কর। তাঁর কবিতাকে পরবর্তীকালে হোরেস আদর্শ হিসাবে গ্রহণ করেছিলেন। কবি টাইরটেয়াসের কাল হচ্ছে ৬৮০ খৃঃ পূঃ, পিতা আর্কেম্ব্রোটাস, জন্মস্থান এথেন্স। দ্বিতীয় মেসেনীয় যুদ্ধে ব্যর্থতার পর স্পার্টার মনোবল ফিরিয়ে আনার জন্য এই আইওনীয় খঞ্জ কবিকে নিয়ে যাওয়া হয়। টাইরটেয়াসের কবিতায় স্পার্টাবাসীরা এতই উৎসাহিত হয়েছিল যে তাদের বিভেদ দূর হয়ে গিয়েছিল। তাঁর যে ক'টি কবিতার অবশেষ এখনো আছে সেগুলির নাম যথাক্রমে **ইউনোমিয়া**, **মার্চ** এবং **হাইপথেকাই**। সামোসের সাইমনিডেসও ছিলেন এঁদের সমকালীন, যাঁর রচিত ১১৮ লাইনের একটি কবিতার অংশমাত্র পাওয়া গেছে।

পরবর্তী আইওনীয় কবিদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিলেন সেলন (মৃত্যু খৃঃ পূঃ ৫৫৯) যিনি ছিলেন এথেন্সের বিখ্যাত আইনপ্রণেতা। তাঁর রচিত গীতিকবিতাগুলির মোট লাইনের সংখ্যা ৫০০০। তাঁর কবিতার বহু অংশ ডিমস্থেনিস ও অ্যারিস্টটেলের গ্রন্থে উদ্ধৃত আছে। কবি থিওগনিস (মৃত্যু খৃঃ পূঃ ৫০০) মেগারার একটি সম্ভ্রান্ত পরিবারে জন্মগ্রহণ করেছিলেন এবং রাজনৈতিক কারণে তিনি দেশ থেকে নির্বাসিত হন। তাঁর বেশির ভাগ কবিতাই সাইর্নাস নামক এক তরুণকে উদ্দেশ্য করে লেখা এবং এইসব কবিতায় তিনি যুবকদের নৈতিক চরিত্র উন্নত করার জন্য আহ্বান জানিয়েছেন। চিওসের সাইমনিডেস পারসিক যুদ্ধের সময় অজস্র কবিতা লিখে দেশবাসীকে শত্রুর বিরুদ্ধে উৎসাহিত করেছিলেন। তিনি ৫৬ বার কবিতা প্রতিযোগিতায় জয়ী হয়েছিলেন। তাঁর প্রেমের কবিতা পিন্ডারের চেয়েও আদৃত হত, একথা লিখেছেন কুইন্টালিয়ন। কবি হিপ্পোনাক্স ছিলেন এফিসাসের অধিবাসী, কোলিয়াম্বাস বা স্কাজোন নামক ছন্দের তিনি ছিলেন আবিষ্কর্তা।

গীতিকাব্যের বিবর্তনের প্রাথমিক পর্যায়টি যাঁদের মারফৎ গড়ে উঠেছিল তাঁরা ছিলেন আইওনীয় কবিগোষ্ঠী। কিন্তু প্রকৃত লিরিক, যা সুরে গাওয়া হত, গড়ে উঠেছিল ইওলীয় এবং ডোরীয়দের মধ্যে; কেন না, ঐ দুই জাতিরই সংগীতের প্রতি মানসিক প্রবণতা ছিল। এই উভয় ধারারই মুখ্য প্রবক্তা ছিলেন টেরপাণ্ডার এবং তাঁর সমকালীন মিমনারমাস। টেরপাণ্ডারের নিবাস ছিল লেসবসের অন্তর্গত এন্টিসানগর। তিনি **নোমোস** নামক একটি বিশেষ ধরণের গীতিকবিতার সূত্রপাত করেছিলেন, যেগুলি ছিল অ্যাপোলোদেবের উদ্দেশ্যে বন্দনা। ইওলীয় গীতিকবিতার মূল সুরটি বিষাদের, এবং কবি অ্যালকেয়াসের হাতে এই ইওলীয় গীতিকবিতাব ধারাটি পূর্ণতালাভ করেছিল। তাছাড়া তাঁর সমকালীন কবি স্যাফো ও তৎশিষ্যা এরিন্না ইওলীয় ধারাটিকে জনপ্রিয় করেন। টিওসের অ্যানাক্রেয়ন প্রেম ও সুরা নিয়ে গীতিকবিতা লিখেছিলেন। এঁরা সকলেই ৬৫০ থেকে ৪৫০ খৃস্ট পূর্বাব্দের মধ্যেই আবির্ভূত হয়েছিলেন। ডোরীয় গীতিকবিতার ঐতিহাসিক বিবর্তন সংক্ষেপে এইরূপ ঃ আনুমানিক ৬০০ খৃস্ট পূর্বাব্দে লীডিয় কবি আলকমান স্পার্টায় টেরপাণ্ডারের আদর্শ অনুযায়ী গীতিকবিতা লিখতে শুরু করেন। তাঁকে অনুসরণ করেন হিমেরার স্টেসিকোরাস। তাঁরই সমকালীন আরিয়নের হাতে ডোরীয় গীতিকবিতার চরম উৎকর্ষ ঘটে। খৃঃ পূঃ ষষ্ঠ শতকের আর একজন গীতিকবির নাম ইবাইকাস, নারীদেহ এবং প্রেমই ছিল যাঁর সংগীতের বিশেষত্ব। পরবর্তী ডোরীয় গীতিকবিদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিলেন চিওসের বাক্কাইলিডেস, এবং সর্বোপরি থীবসের পিন্ডার। এ ছাড়া ছিলেন ইলাইসাসের টিমোক্রেয়ন ও চারজন মহিলা কবি—মাইরটিস, কোরিন্না, প্র্যাকসিল্লা এবং টেলিসিল্লা।

গদ্যসাহিত্য

যেমন আইওনীয়দের মধ্যে কবিতার প্রথম বিকাশ হয়েছিল, গদ্যের ক্ষেত্রেও তাই। প্রথম গদ্যলেখক হিসাবে যাঁর উল্লেখ পাওয়া যায় তিনি হচ্ছেন সাইরসের ফেরেসাইডিস, যদিও এঁর কোন রচনার চিহ্নমাত্র নেই। এর পরেই আসে ঈশপের কথা যাঁর ফেব্‌ল্ বা গল্প জগদ্বিখ্যাত। ইনি আসলে ফ্রিজিয়ার লোক ছিলেন, ক্রীতদাস অবস্থায় গ্রীসে আনীত হয়েছিলেন। শোনা যায় সক্রেটিস তাঁর বন্দীজীবনের শেষ দিনগুলিতে ঈশপের গল্পগুলির পদ্যানুবাদের চেষ্টা করেছিলেন। ঈশপের গল্পগুলি প্রথম সংকলিত হয় ফ্যালেরামের ডিমিট্রিয়াসের চেষ্টায়, ৩০০ খৃস্ট পূর্বাব্দে।

অপরাপর গদ্যরচনাকারদের মধ্যে ছিলেন মিলেসাসের থ্যালেস (মৃত্যু ৫৫০ খৃঃ পূঃ) যিনি ছিলেন দার্শনিক, যিনি জলকেই সমস্ত কিছুর উদ্ভবের আদি কারণ বলে উল্লেখ করেছেন। তাঁর রচনার কোন চিহ্নই এখন নেই। পরবর্তী দার্শনিক অ্যানাক্সিমাণ্ডার (মৃত্যু ৫৪৭ খৃঃ পূঃ) জগতের মূল কারণ হিসাবে গুণবর্জিত এক অনির্বচনীয় সত্তাকে নির্দেশ করেছেন যা বিপরীতধর্মী দুইটি শক্তির দ্বারা চালিত। তাঁর রচনার মাত্র কয়েকটি লাইন এ পর্যন্ত পাওয়া গেছে। তাঁর বয়োকনিষ্ঠ সমকালীন অ্যানাক্সিমেনেস বায়ুকেই জগতের আদি কারণ হিসাবে গণ্য করেছিলেন যা বিভিন্ন অবস্থায় আগুন, মেঘ, জল ও মাটিতে রূপান্তরিত হয় বলেই তাঁর ছিল বিশ্বাস। এই দার্শনিকের রচনাও এখন লুপ্ত। দার্শনিক হেরাক্লিটাস আগুনকেই আদি সত্তা বলে ঘোষণা করেছিলেন। আইওনীয় ভাষায় লেখা তাঁর গ্রন্থ **অন নেচার** তিন খণ্ডে বিভক্ত, রচনার ভাষা কর্কশ এবং রীতিতেও কোন বাঁধুনি নেই। সামোসের পিথাগোরাস দর্শনকে বাস্তব জীবনের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করার চেষ্টা করেছিলেন। তাঁর রচনার উল্লেখ তাঁর অনুগামীদের লেখার মধ্যে পাওয়া যায়, এবং তাঁর নামে প্রচলিত **দি গোল্ডেন সেয়িংস** তাঁর লেখা নয় বলেই পণ্ডিতদের বিশ্বাস।

ইতিহাসধর্মী রচনার প্রচেষ্টাও প্রথম আইওনীয়া থেকে শুরু হয় যার নাম লোগোগ্রাফি। এই আদি ইতিবৃত্তকারগণ তাঁদের রচনা অবশ্য গদ্যেই লিখেছিলেন, এবং তাঁদের রচনাবলীর অতি অল্পই বর্তমানে টিকে আছে। এঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছেন মিলেসাসের ক্যাডমাস, ডাওনিসাস, হেকাটেথাস, সার্ডিসের জ্যানথাস, লেসবসের হেল্লানিকাস, ল্যাম্পসাকাসের চারেন, লেরসের ফেরেসাইডেস প্রভৃতি। অবশ্য এঁরা পারসিক যুগের পবতী।

গ্রন্থমেলা

রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টিতে : মৃত্যু—ডঃ ধীরেন্দ্র দেবনাথ। রবীন্দ্র ভারতী, ৬/৪, দ্বারকানাথ ঠাকুর লেন, কলিকাতা-৭। দাম ঃ ছ' টাকা।

উপর্যুক্ত গ্রন্থটি একটি গবেষণা নিবন্ধ। বর্তমানকালে যা হোক একটা কিছু লিখে দিলেই ডক্টর লেখা যায় নামের আগে ; সে চেষ্টার বশবর্তী হয়ে ডক্টর ধীরেন্দ্র দেবনাথ উপর্যুক্ত বইটি লেখেন নি। একটি বহু বিতর্কিত বিষয়কে অবলম্বন করে যুক্তিসিদ্ধ রীতিতে তিনি তাঁর বক্তব্য প্রকাশ করেছেন। অবশ্য আসল বক্তব্য স্বয়ং রবীন্দ্রনাথের, কিন্তু সেই বক্তব্যকে সহজ সরল ও স্পষ্ট করে দেওয়া কম সহজ কথা নয়। দ্বিতীয়ত রবীন্দ্র-দর্শনের অধিকারী না হলে রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টিতে মৃত্যু বিষয়ক একটি জটিল এবং কুহেলিকাচ্ছন্ন বিষয়কে অবলম্বন করে গবেষণা নিবন্ধ রচনা করা এক অতীব দুঃসাহসের কাজ। আনন্দের কথা ধীরেন্দ্র দেবনাথ সিদ্ধিলাভ করেছেন। কিন্তু তিনি কি পেয়েছেন সেটাই বড় কথা নয়, আমরা তাঁর আলোচিত বিষয়বস্তু থেকে কি পেলাম, সেটাই বড় কথা। একথা সত্য যে, রবীন্দ্রসাহিত্য পাঠকদের কাছে রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টিতে মৃত্যুর বিভিন্ন স্বরূপ একটা ধাঁধার সৃষ্টি করে এবং অনেক সময় বিভিন্ন রকম উক্তির জন্যে মনে হয় কোথাও যেন সেই সব বক্তব্য সামঞ্জস্য হারিয়ে ফেলেছে। পর পর তিনটি উক্তির তাই উল্লেখ করছি ঃ—

(ক) মরণ রে, তুহুঁ মম
শ্যাম সমান।
(খ) মরিতে চাহি না আমি
সুন্দর ভুবনে।
(গ) আয়না দেখে চমকে উঠে
মুখ হয়ে যায় ফ্যাকাশে,
বেশীদিন আর বাঁচবে না সে
বয়স যে তার একাশে।
ইত্যাদি।

তিনটি পংক্তি স্বসম্পর্কিত। তবু মৃত্যু বিষয়ক। যা হোক শ্রীদেবনাথ রবীন্দ্ররচনার পরিণতির স্বরূপ দেখিয়ে রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টিতে মৃত্যুর সামঞ্জস্য বিধানের চেষ্টা করেছেন। তিনি সমগ্র রবীন্দ্রসাহিত্যের ক্রম-পরিণতি দেখিয়ে কবির দর্শন ও অভিজ্ঞতার মাপকাঠিতে রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টিতে মৃত্যুর রহস্যটিকে বিমোচন করার প্রয়াস পেয়েছেন। অবশ্য এই বিষয়টি যতোটা অবজেকটিভ, ততোটা সাবজেকটিভ। সুতরাং এই দুয়ের টানাপোড়েনে এর সম্যক স্বরূপ প্রকাশ করা অত্যন্ত কঠিন ব্যাপার। কারণ অজানাকে চোখে না দেখে তার অজ্ঞাত স্বরূপ সম্পর্কে বিশ্বাস স্থাপন করা বাস্তববাদীদের পক্ষে কঠিন। তবু ভারতীয় দর্শন এ ব্যাপারে নীরব নয়। সবাক ছিলেন তাই ঐতিহ্যবাদী কবি রবীন্দ্রনাথও। এই কারণে শ্রীদেবনাথ গ্রন্থের প্রথমেই আলোচনা করেছেন, "প্রাচীন ভারতীয় ধর্ম ও দর্শনে মৃত্যু চিন্তা" সম্পর্কে। দ্বিতীয় অধ্যায়ে তিনি আলোচনা করেছেন "কবি-জীবনে মৃত্যুর অভিজ্ঞতা ও তার প্রতিক্রিয়া" নিয়ে, তৃতীয় ও চতুর্থ অধ্যায়ের যথাক্রমে আলোচ্য বিষয় হচ্ছে, "বিচ্ছিন্ন দৃষ্টিতে মৃত্যুর স্বরূপ" এবং "সামগ্রিক দৃষ্টিতে মৃত্যুর স্বরূপ" পরিশেষে, "সমালোচনা"। এখানে মৃত্যু বিষয়ক কবির নিজস্ব চিন্তাধারার আলোচনা করা হয়েছে। গ্রন্থের ভূমিকা তাৎপর্যপূর্ণ ও সুলিখিত। গ্রন্থ-পরিচিতিতে হিরণ্ময় বন্দ্যোপাধ্যায় গ্রন্থটির সুষ্ঠু মূল্যায়নই করেছেন। এই গ্রন্থ রচনার জন্যে শ্রীদেবনাথ অশেষ ধন্যবাদার্হ। জিজ্ঞাসা-ব্যাকুল পাঠক এই গ্রন্থটি ঔৎসুক্যের সঙ্গে পাঠ করে পরিতৃপ্ত হবেন।

জয়ন্তী সেন

জীবজন্তুর অলিমপিয়াড
অনুবাদকঃ কানাইলাল গাঙ্গুলী
মনীষা গ্রন্থালয় প্রাঃ লিঃ
৪/৩বি, বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রীট, কলকাতা-১২

পুতুলবনের জন্তুদের খেলার উৎসব। সেখানে জড়ো হয়েছে এরিথ আর আণ্টন বাঁদর, ছোট্ট পিকিনিজ কুকুর চিং, জুম্বো হাতী, ই-আ গাধা, রোসি গরু, ধূর্ত শেয়াল জোড়া, কিটি হরিণ, লম্বকর্ণ খরগোস, শুয়োর, জিরাফ আর অন্য সব জন্তু-জানোয়ার। লাল, সাদা প্যারাসুটে লেখা আছে একটা পোস্টারে 'অলিম্পিয়া'। এই শব্দটার অর্থ বের হতেই পুতুলবনেও শুরু হলো চার বছর পর পর অলিমপিয়াড। কতো। রকম খেলা, দৌড়ঝাঁপ, হাজার রকম কসরৎ। প্রথমেই জন্তুচালিত ট্রাক্টর, ক্রেন, স্টীমরোলার দিয়ে তৈরি হোল খেলার মাঠ। তারপর গ্যালারীতে বসে গান শুরু করলো জন্তুরা—

'আমরা পশু পুতুলবনবাসী,
অলিমপিয়ার করব খেলা এ—বার,
মাতলো তাতে সবাই হেথায় আসি,
দুঃখ হবে নইলে যে রে স—বার।'

প্রথমেই ঘোড়ার ওপর বাঁদর দেখাল কী ভয়ঙ্কর কসরৎ! এরপর হাই জাম্প, বক্সিং খেলা, এমন কি ফুটবল খেলা পর্যন্ত। কিন্তু জন্তুদের হাত-পা চেনা ত মুস্কিল অথচ গোলকিপার ছাড়া বল কেউ হাতে ছুঁতে পারে না। যা-হোক শেষ পর্যন্ত খেলা শেষ হল ৩ঃ৩ তে। এই সব খেলায় যারা হেরেছে তাদের দুঃখও কম নয়। তখন ছোট্ট পিকিনিজ চিং বললে যে, সে সব খেলাতে হেরে গেলেও তার কতো ভালো লেগেছে ঐ সব খেলা! তার কথা শুনে সবারই দুঃখ যেন ঘুচে গেল। খেলা হচ্ছে খেলা। আনন্দই বড় কথা। খেলা দেখাতে গিয়ে পুতুলবনে লোহার বল লেগেছিল আরেক জন্তুর মাথায়। মাথা ফেটে গিয়েছিল। জুম্বো হাতী তাকে নিয়ে গেছল হাসপাতালে। সেখানে তার মাথায় বাঁধা হোল ব্যাণ্ডেজ। তারও খেলবার কথা ছিল। তার বদলে রোসি গরুকে হঠাৎ আনা হোল রেসের মাঠে। হঠাৎ আনা হলেও সেও তৃতীয় স্থান অধিকার করলো। এবং বিজয়ীরা পেল পুরস্কার। এই ধরণের বই কার না ভালো লাগবে? বিশেষ করে ছেলেরা ত লুফে নেবে। তারপর পাতায় পাতায় রঙ-বেরঙের সুন্দর ছবি দেখেই খেলা দেখার আনন্দ পাওয়া যায়। এবং খেলার মধ্যে পশু জগতেও বিবাদ নেই,—এটাও শিক্ষণীয় বিষয়।

ইতিহাসের উপাদান

ভূপেন্দ্রকুমার দত্ত

(পূর্ব-প্রকাশিতের পর)

নতুন অভ্যুত্থান প্রসঙ্গে (২)

কিন্তু বক্সার কথা স্বতন্ত্র। ওখান থেকে খবরাখবর করা দুরূহ ছিল। তা ছাড়া, সেটা গান্ধী-আরউইন চুক্তির সূচনার যুগ। এই চুক্তি বিপ্লবীদের উপেক্ষা করে। আমাদের বিপ্লবীদের তরফ থেকেও সেই কারণে এর বিরুদ্ধে প্রচার চলে। এতে নেতৃত্ব নেন হরিদা [চক্রবর্তী] ও সাহিত্যিক শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। শরৎবাবুর সঙ্গে প্রথম যোগাযোগ ডাঃ অমিয় বসু, উমাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, ডাঃ নারায়ণ রায় প্রমুখের। সে ১৯২৩-২৪ সালের কথা। ওখানেই "পথের দাবী"র কল্পনা ও কাহিনীর সূত্রপাত। তখনও আমরা জেলে। অমিয়র কাছে আমার কথা তিনি শোনেন এবং ১৯২৮ সালে আমি খালাস পাবার পরেই সুভাষের বাড়িতে আমার সঙ্গে আলাপ করেন। এই আলাপ কলকাতা কংগ্রেসের সময় আরো ঘনিষ্ঠভাবে চলে। সুভাষও মাঝে মাঝে তাতে অংশ নিয়েছে। শরৎবাবু আমাকে এবং আমাদের বন্ধু-বান্ধবকে বিশেষ স্নেহের চোখে দেখতেন। দেউলটির বাড়িতেও অরুণদা [গুহ] ও আমি মাঝে মাঝে যেতাম। বিপ্লবের পন্থা নিয়ে তাত্ত্বিক আলোচনায় তিনি বিশেষ আগ্রহী এবং তেমন আলোচনার সুযোগ ওখানেই বেশি। ভূপেনবাবুও [রক্ষিত-রায়] আমাদের সঙ্গে এবং কখনও-সখনও একাই যেতেন।

হরিদা [চক্রবর্তী], শরৎবাবু [চট্টোপাধ্যায়] এবং অন্য বন্ধুরাও যেমন গান্ধী-আরউইন চুক্তির বিরুদ্ধে প্রচার চালাতেন, জেলের ভেতর বসেও আমাদের কিছু করার তাগিদ আসে. তার বিশেষ জরুরী কারণ, ভগৎ সিং-দের তিনজনের তখন ফাঁসির হুকুম হয়ে গেছে। ওদিকে অনন্ত [সিং], গণেশ [ঘোষ], লোকনাথ [বল] প্রভৃতি চাটগাঁর অস্ত্রাগার লুণ্ঠন মামলার আসামী। আমাদের আশঙ্কা, তাদেরও ফাঁসির হুকুম হয়ে যাবে। আমরা তখন পরামর্শ করে চিঠি দিই গান্ধীজী, কংগ্রেস প্রেসিডেন্ট নেহরু ও তেজবাহাদুর সাপ্রুর (সাপ্রু এবং জয়াকর চেষ্টা করে গান্ধী ও আরউইনের ভেতর আলোচনার সূত্রপাত করিয়ে দেন) কাছে। চিঠিতে বলা হয়, এই সব নেতা এবং অন্যান্য বিপ্লবীদের যদি ফাঁসি হয়, অন্তত বিপ্লবী ভারত এই চুক্তি মেনে নেবে না। তার দরুণ যে অশান্তির সৃষ্টি হবে এবং চলতে থাকবে, তার জন্যে দায়ী হবেন চুক্তির দুইপক্ষেরই নেতারা।

বিপ্লবীরা চুক্তির বিরোধিতা করে। কিন্তু জাতীয় চুক্তি হিসাবে গোড়াতেই এর বিরুদ্ধে প্রতিবাদে কোনো অশান্তির সৃষ্টি করতে চায় নি। তার প্রমাণ ১৯৩০ সালের ৮ই ডিসেম্বর রাইটার্স বিল্ডিং আক্রমণের (যাতে কারা-বিভাগের কর্তা সিমপসন নিহত হয়) পর থেকে বিপ্লবীদল আর কোনো আক্রমণাত্মক চেষ্টা করে নি। পূর্বে বলেছি, এই সময়ে বিপ্লবাত্মক কাজের চেষ্টা যে সব জেলা বা গ্রুপের তরফ থেকে হয়েছে, তার ভেতর অনেক দলই বিশেষত ১৯১৪-১৫ সাল থেকেই সন্দেহভাজন ছিল। যারা ছিল না, তাদের ভেতর ভূপেনবাবুদের [রক্ষিত-রায়] দল অন্যতম। চট্টগ্রামের দল আংশিকভাবে। অন্য কারণের ভেতর বিশেষত এই কারণে এই দুইটি গ্রুপের পক্ষে যেভাবে এবং যতদিন আক্রমণাত্মক কাজ চালিয়ে যাওয়া সম্ভব হয়েছে, অন্য গ্রুপগুলি একটানা তেমন পারে নি। তা ছাড়া, চট্টগ্রাম বা অন্য যেসব জেলা বা গ্রুপের কর্মীরা ১৯৩০-এর এই আন্দোলনের সামিল হয়েছিল, তাদের ভেতর কারও ভূপেনবাবুর মতো জেল থেকে নিজেদের active field leaders-দের সঙ্গে যোগাযোগ রাখা সম্ভব হয় নি। প্রথমত এপ্রিলে চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠনের পর, তারপর আগস্টে ডালহৌসি স্কোয়ারে টেগার্টের ওপর বোমা পড়ার পর থেকে বহু নেতা ও কর্মী ধরা পড়ে যাওয়ায় অনেক যোগ-সূত্র ভেঙে যায়। এই সব কারণে বক্সা ক্যাম্প থেকে বাইরের সঙ্গে যা কিছু যোগাযোগ সে সব ব্যাপারে ভূপেনবাবুর সঙ্গে আমি সর্বদা সংবাদ ও মত-বিনিময় করতাম। বাইরের সঙ্গে যোগাযোগের সুযোগ ছিল অরুণদার [গুহ] ও আমার। গান্ধীজী প্রভৃতির কাছে এই চিঠিগুলি যদিও আমাদের দলের যে ষাটজনের মতো তখন আমরা বক্সায় ছিলাম তাদের সকলের মত নিয়ে পাঠানো হয় তবু প্রথম যাঁদের মত নিয়েছিলাম, তাঁদের মধ্যে ভূপেনবাবুও একজন। এবং সকলের মত মেনে নিয়ে আমরা চারজন ওতে সই করি—মধুদা [সুরেন্দ্রমোহন ঘোষ], অরুণদা [গুহ], ভূপতিদা [ভূপতি মজুমদার] ও আমি। চিঠি পৌঁছে দেওয়া হয় কলেজ স্ট্রীট মার্কেটে মনোমোহন ভট্টাচার্যকে। মনোমোহন ও কিরণশঙ্কর রায় ঐ চিঠি নিয়ে এলাহাবাদে যান। তেজবাহাদুর সাপ্রু তাঁদের কাছ থেকে চিঠি নিয়ে লর্ড আরউইনকে দেন। লর্ড আরউইন জিজ্ঞেস করেন, এঁদের হয়ে কথা বলতে পারেন কে? তেজবাহাদুর বলেন, তিনি জানেন না, সম্ভবত সুভাষ বসু। আরউইন বলেন, তাঁরা বোসের সঙ্গে কোন কথা বলতে রাজী নন। এসব খবর বক্সায় পাঠায় মনোমোহন।

অপরপক্ষে, আমাদের চিঠিতে যে threat-এর ভাব ছিল, সেটা ফাঁকা কথায় না দাঁড়িয়ে যায় এবং সমস্ত বিপ্লবী আন্দোলনটা নেতাদের এবং ইংরেজ সরকারের চোখে হেয় না হয়ে দাঁড়ায়, সেদিকে দৃষ্টি রাখবার আমাদের প্রয়োজন ছিল। কারণ, তাতে পরে যাঁরা আছেন, যেমন চট্টগ্রাম মামলার ধৃত বন্দীরা এবং সূর্যবাবু [সেন] প্রভৃতি যাঁরা তখনও পলাতক—তাঁদের

ফাঁসি দিয়ে যেতে ওরা বিন্দুমাত্র ইতস্তত করবে না। ভূপেনবাবুকে এই জন্য বলি, যদি এই সব চিঠি সত্ত্বেও ভগৎ সিং-দের ফাঁসি হয়, তাহলে যেন তার পনের দিনের মধ্যেই তার উপযুক্ত জবাব দেবার ব্যবস্থা হয়। ভূপেনবাবু সেইভাবেই সংবাদ পাঠান। গোপন আয়োজনের কাজ। তার উপদেশ, নির্দেশ, প্ল্যান এবং তা হাতেকলমে সুসিদ্ধ করা এর ভেতর ব্যতিক্রম কিছু না কিছু হতে বাধ্য। কিন্তু এক্ষেত্রে সেই ব্যতিক্রম একেবারে হয় নি। ভগৎ সিং, রাজগুরু ও সুখদেওয়ের ফাঁসি হয় ১৯৩১ সালের ২৩শে মার্চ। আর, মেদিনীপুরের জেলা ম্যাজিস্ট্রেট পেডি হত্যা দিয়ে ঐ যুগের বৈপ্লবিক আক্রমণাত্মক কাজের পরবর্তী পর্ব সুরু হয় ঐ বছরেরই ৭ই এপ্রিল।

চুক্তি সই করে গান্ধীজী সিমলা ছাড়ার আগে বিবৃতি দিয়ে যান যে ঐ চুক্তি যদি দেশে সর্ববাদিসম্মতভাবে গৃহীত হয় তা হলে তিনি আশা করেন যে, এমন কি সহিংস কাজের জন্য যাঁদের ফাঁসির হুকুম হয়ে আছে তাঁরাও মুক্তি পাবেন। বিবৃতি দিয়ে তিনি করাচি কংগ্রেসের পথে রওনা হন। তিনি করাচি পৌঁছাবার আগেই ভগত সিং-দের ফাঁসি হয়ে যায়। ফলে, যুগান্তর ও নওজোয়ান ভারত সভার নেতৃত্বে দেশের জাগ্রত জনগণ যে বিক্ষোভ দেখায় তাতে গান্ধী-নেতৃত্ব দেশের লোকের কাছে অনেকখানি প্রতিষ্ঠা হারায়।

কয়েক বছর পরে ১৯৩৭-৩৮ সালে গান্ধীজী যখন রাজনৈতিক বন্দীদের মুক্তির জন্য বাংলায় নাজিমুদ্দিন সরকারের সংগে কথা বলছেন, তখন বিভিন্ন জেলে গিয়ে এই সব বন্দীদের সংগে আলোচনা করেন। আমাদের ষোলজন স্টেট প্রিজনারকে তখন বাংলার বিভিন্ন জেল থেকে এনে হিজলীতে রেখেছে। ভূপেনবাবুও তার ভেতর ছিলেন। আমাদের সংগে আলোচনা করতে গান্ধীজী যখন যান, তখন আমাদের আন্দোলনের কথায় আমি তাঁকে বলি, আপনি যদি বিপ্লবীদের উপেক্ষা না করতেন তাহলে অন্তত পেডি হত্যা দিয়ে এই নাটকের শেষ অংক অভিনীত না-ও হতে পারতো। গান্ধীজী মাথা নীচু করে গভীর দুঃখে বলেন, "then the blood of all these people is on my head!" তাঁর রক্তের চাপ অত্যন্ত বেড়ে গেছে—আমাদের জানান তাঁর সেক্রেটারি মহাদেও দেশাই। সেবারের মতো গান্ধীজী আমাদের কাছে বিদায় নিয়ে যান। বলে যান, আবার দেখা করবেন, হিজলী এসে দু'দিন আমাদের সংগে কাটাবেন। দেখা হয়েছিল। কিন্তু হিজলীতেও নয় এবং দু'দিন একত্র কাটানও নি। আমাদের একদিনের জন্য প্রেসিডেন্সি জেলে নিয়ে আসে। সেখানে দেখা হয়। কিন্তু আর তো বাদানুবাদে ফল কিছু হত না।

এ যা বলেছি, সে প্রসংগক্রমে—কয়েক বছর পরের এবং অন্যপ্রকার কথা। আমাদের বক্তার জীবন সম্পর্কেই আরো কিছু কিছু ঘটনার উল্লেখের প্রয়োজন আছে। পেডি হত্যা ছাড়া, আরও একটি অনুরূপ কাজের পরামর্শও বক্তা থেকে বাইরে পাঠানো হয়। এরও আলোচনার ভেতর ভূপেন-বাবু ছিলেন। সে-কাজটি গার্লিক হত্যা। খবর পাঠাই মনোমোহনেরই কাছে। কাজটি করান সাতুদা—চব্বিশ পরগনার সাতকড়ি ব্যানার্জি, আর করে কানাই ভট্টাচার্য। সাতুদাদের সংগে ও-সময়ে ভূপেনবাবুদেরও বাইরের কাজের ক্ষেত্রে যোগাযোগ ছিল। কিন্তু সে সব কথা এ চিঠিতে আসবে না।

ঘটনাগুলি লক্ষ্য করলে দেখবে, ও-যুগের ঐ আন্দোলনে আমরা পরস্পরের সংগে কতখানি অবিচ্ছিন্নভাবে জড়িয়ে ছিলাম। যুগান্তর দল প্রথম থেকে শেষ অবধি এইভাবে এক এক প্রোগ্রামের ভিত্তিতে গ্রুপ, জেলা সব ভুলে কাজ করে স্তরের পর স্তর বিপ্লবান্দোলনকে বিস্তৃতি দিয়েছে।

যাক্ সে কথা। বক্তার জীবন সম্পর্কে আরও যা যা বলবার আছে বলে যাই। একবার আমাদের গান্ধী-আরউইন চুক্তির ভেতর টানবার চেষ্টা হয়। কিন্তু সে বিরুদ্ধপক্ষ থেকে। তখন দ্বিতীয় রাউন্ড টেবিল কনফারেন্সের তোড়জোড় চলছে। এই উপলক্ষে বাংলার প্রতিনিধি হিসাবে দেশপ্রিয় লণ্ডন যাবার ঠিক আগে হঠাৎ বক্সায় আসেন। আগেই গভর্নমেন্টের কাছ থেকে খবর এসেছে, তিনি কিছু সংখ্যক ডেটিনিউয়ের সাথে দেখা করবেন। আমরা তিন-চারজন যাই, অনুশীলনেরও তিন-চারজন ছিলেন। সেনগুপ্তের তখন রক্তের চাপ অত্যন্ত বেশি, শুধু কিছু ফল ও সেদ্ধ তরকারি খেয়ে কাটাচ্ছেন। তাঁর সংগে অহেতুক বাদানুবাদ আমরা করতে চাই নি। তিনিই কথা পাড়লেন, ওরা (ইংরেজ কর্মচারীরা) ভীষণ ভয় পেয়ে গেছে, সর্বদা সশস্ত্র এবং লৌহবর্ম পরে চলাফেরা করে, সংগে সশস্ত্র প্রহরী। সেইভাবে হাচিংস (বাংলা সরকারের Political Secretary) এসেছিল ও'র বাড়িতে। এসে জানায় বিপ্লবী-দের গান্ধী-আরউইন চুক্তির ভেতর আনতে চায়। কিভাবে সম্ভব, আমাদের কাছে জেনে সেনগুপ্ত যেন বিলেত রওনা হবার আগে দার্জিলিংয়ে গভর্নরকে জানিয়ে যান। আমার মনে আসে ১৯১৪-১৫ সালে যেমন যতীন্দ্রনাথ ছিলেন সম্মিলিত যুগান্তর দলের নেতা, এ যুগে তেমনি দাঁড়িয়ে গেছেন সূর্য সেন। একমাত্র তিনিই অর্জন করেছেন এই আন্দোলনের সামনে দাঁড়িয়ে

দেশ সেবায় নিয়োজিত,

এ্যালবার্ট ডেভিড লিমিটেড

কলিকাতা—৫০

নীতি ও বিজ্ঞানানুযায়ী ঔষধ প্রস্তুতকরণের অগ্রণী

—ব্রাঞ্চ সমূহ—

বোম্বে - মাদ্রাজ - দিল্লী - নাগপুর

বেজওয়াড়া - শ্রীনগর - গৌহাটী

আদেশ দেবার অধিকার—"Halt". তাঁকে ছাড়া গভর্নমেন্টের সঙ্গে কোনো আলোচনা অর্থহীন। কিন্তু এ কথা ওদের বলা চলে না। আমি দেশপ্রিয়কে বলি, একমাত্র দায়িত্বশীল নেতা এখন বাইরে আছেন সূর্যবাবু। তাঁকে ছাড়া কোনো আলোচনা চলে না। কাজেই কথা বলতে হলে তাঁকে নির্বাচারে বাইরে আসতে এবং ফিরে যেতে দিতে হবে। সেনগুপ্ত এ কথার যৌক্তিকতা স্বীকার করলেন এবং আশা প্রকাশ করলেন, ওরাও এটা মেনে নেবে।

ক্যাম্পে ফিরে আমাদের দলের সবাইকে ডেকে যখন সব বলা হল সকলেরই আন্তরিক সমর্থন পাওয়া গেল। সরকারী জবাব কয়েক দিনের ভেতরই এল। বেশ নরম সুর। লিখিত-ভাবে আমাদের প্রস্তাব ব্যাখ্যা করে জানানোর জন্য অনুরোধ। আমরা জানিয়ে দিলাম। এর পর জবাব আসতে বেশ দেরি হল। ইতিমধ্যে ইংরেজের কাগজগুলোতে সুর তুলেছে এবং ইউরোপিয়ান অ্যাসোসিয়েশন ও বেঙ্গল চেম্বার অব কমার্সও সরকারকে কড়া মেজাজের উপদেশ দিল, "No track with the terrorists". ইংরেজ ... ত ওদের একটা নীতিবাক্য মেনে চলে Give the dog a bad name to hang him. এই নীতির অনুসরণে ওরা তখন এদেশের revolutionist-দের সম্পর্কে terrorist ছাড়া আর কোনো শব্দ ব্যবহার করত না। আর আমাদের নির্বোধ রাজনীতিকরাও চোখ বুজে ওদের অনুকরণ করতো। এরপর আমাদের চিঠির যা জবাব এল তার অর্থ in sack cloth and ashes ওদের সংগে কথা কইতে হবে। কথা শেষ হয়ে গেল। আমাদের কয়েকজনকে অল্পদিনের ভেতরই বাংলার বাইরে বিভিন্ন জেলে পাঠিয়ে দিল।

বক্সা ক্যাম্প সম্বন্ধে আর একটা কথা বলে এ প্রসংগ শেষ করব। সত্যবাবুর কথা আগে বলেছি—মেজর সত্যগুপ্ত। ইনি ছিলেন ভূপেনবাবুর একান্ত অন্তরঙ্গ বন্ধু। জেলের বাইরে এঁর সংগে আমার যোগাযোগের কথা আগের এক চিঠিতে বলেছি। সেখানে উল্লেখ করেছি মিলিটারি প্যারেডে এঁর গভীর অনুরাগ ও যোগ্যতার কথা। আইন-অমান্য আন্দোলনের কালে এঁর কিছুদিনের কারাবাস হয়। মুক্তির পর এঁকে ডেটিনিউ করে বক্সা ক্যাম্পে পাঠায়। সেখানে তাঁরা দুই বন্ধু আমাদের সঙ্গেই থাকতেন। ওখানে ক্রমাগত আমাদের বিভিন্ন গ্রুপের অল্প-বয়স্ক অনেক কর্মী আসে। সত্যবাবুর নেতৃত্বে তাদের ওখানকার মাঠে প্যারেড শেখার এবং পরে গেরিলা যুদ্ধ শিক্ষা দেবারও ব্যবস্থা হয়। এই উপলক্ষে ছেলেদের সঙ্গে ওঁর বিশেষ অন্তরঙ্গতা গড়ে ওঠে। এর পর ক্রমে "বালেশ্বর দিবস" এবং অন্যান্য শহীদ দিবস উদ্‌যাপনও হত। শহীদ বেদী তৈরি করা, জাতীয় পতাকা উত্তোলন, মার্চ পাস্টের কুচকাওয়াজ, ভাবগম্ভীর সভা কোনও অনুষ্ঠানই বাদ যেত না। আর এগুলি যা হত, প্রাণহীন অনুষ্ঠান নয়। সে কি দিনকাল, তা একটু কল্পনা করতে চেষ্টা কোরো। আদর্শপ্রীতি তখন সকলেরই প্রবল এবং একনিষ্ঠ। সত্যবাবুরও উৎসাহদীপ্ত চরিত্র এই সব প্রাণচঞ্চল উৎসবের সঙ্গে বেশ খাপ খেত। ক্রমে কর্তৃবুদ্ধি ফিনে এগুলোতে গুরুত্ব দিতে সুরু করল—বিশেষত যখন ক্যাম্পের পেছনের পাহাড়ে আমবাগানে গেরিলা যুদ্ধের প্রশিক্ষণ চললো।

গভর্নমেন্ট ফিনের রিপোর্ট পেয়ে সত্যবাবুর বদলির আদেশ পাঠালো। একলা গিয়ে তাঁকে দিনাজপুর জেলে কাটাতে হবে—দিনাজপুরে ছোট জেল, সঙ্গী পাওয়ার সম্ভাবনা কম। আমাদের হিসাবে সমস্যা দাঁড়ালো, আমরা সকলে যে কাজের জন্য দায়ী, তার জন্য একলা সত্যবাবুকে শাস্তি ভোগ করতে দেওয়া হবে কেন। যুগান্তরের আমরা যে ষাটজনের মত একত্র থাকতাম, স্থির করলাম সত্যবাবুর বদলিতে বাধা দিতে হবে। ওরা লাঠি মেরে যদি আমাদের কাছ থেকে সত্যবাবুকে ছিনিয়ে নিতে পারে, তবেই কেবল তিনি যাবেন। আমাদের তরফ থেকে মনোরঞ্জনদা ফিনেকে আমাদের সিদ্ধান্ত জানিয়ে এলেন। ফিনে ওস্তাদ লোক। সে বললো, নিরস্ত্র আমি আপনাদের লাঠি পেটা করব না। লাঠি ব্যবহারের প্রয়োজন দেখা দিলে আপনাদের হাতেও লাঠি দেব। যাই হোক, আপনারা লিখিতভাবে আপনাদের সিদ্ধান্তের কথা গভর্নমেন্টকে জানিয়ে দিন, আমি সেটা পাঠিয়ে দেব।

ভূপেনবাবু সত্যবাবুদের বন্ধু করেছেন—যাঁরা ও যুগের আক্রমণাত্মক কাজের যোগাযোগে আমাদের সংগে ছিলেন না তাঁরা ভিন্নভাবে থাকতেন। অনুশীলন দলের লোকেরাও আলাদা ছিলেন। এটা সহজেই অনুমেয়—ক্যাম্পের ভেতর কর্তৃপক্ষের সংগে একটা মারামারি লাগলে তাঁরাও জড়িয়ে পড়বেন। এঁরা দুই দলই আমাদের সাক্ষাতে পরোক্ষে জানিয়ে দিলেন, এঁরা আমাদের সিদ্ধান্ত অনুমোদন করেন না। তবু আমরা সিদ্ধান্ত বদলাই নি। গভর্নমেন্টের কাছে যা লিখবার তার মুসাবিদার ভার পড়ল আমার ওপর। বেশ মনে আছে, লেখাটার শেষ দিকে বোমন্ট ও ফ্লেচারের "সী ভয়েজ" থেকে জুলেটা ও বন্দী নাবিকদের Master-এর কথাটুকু তুলে দিইঃ

Juletta—"Why, slaves, 'tis in
our powers to hang ye."
Master—"very likely,
'Tis in our powers, then,
to be hanged, and scorn
ye."

এর জবাব এল দীর্ঘকাল বাদে। তখন কলকাতা থেকে টেগার্ট প্রভৃতি জাঁদরেল অফিসারদের দীর্ঘ ছুটিতে যাওয়ার হিড়িক লেগেছে। পলিটিক্যাল সেক্রেটারি হাচিংস যাবার আগে জবাব দিল, সত্যবাবুর বদলির আদেশ নাকচ করা যেতে পারে, যদি ডেটিনিউরা এই দরখাস্ত ফিরিয়ে নেন। ফিনেকে বলে দেওয়া হল, ফিরিয়ে নেব না।

সত্যবাবুরও বদলি হল না। কিছু-দিন বাদে, একদিনেই আমাদের কয়েক-জনকে ১৮১৮ সালের তিন নং রেগুলেশনে মাদ্রাজে ও পাঞ্জাবে পাঠিয়ে দেয়। পাঞ্জাবে যাই মনোরঞ্জনদা [গুপ্ত], অরুণদা [গুহ], সত্যবাবু [মেজর সত্য গুপ্ত] ও আমি। এই সময়ে অন্য কথার প্রসংগে মনোরঞ্জন-দাকে ফিনে জিজ্ঞেস করে, "এবারেও কি আপনারা বাধা দেবেন?" মনোরঞ্জনদা বলেন, "তা কেন দেব? সেবারে তোমরা আমাদের একজনকে বদলি করেছিলে শাস্তি দেবার মতলবে। আর এবারকার বদলি সরকারি নীতি হিসাবে। এতে কিছু করবার থাকলে দেশবাসীই করবে।"—ওরা কিন্তু প্রস্তুত ছিল,—পরে বুঝতে পারি। অফিসারের দল ছাড়া আমাদের প্রত্যেকের রক্ষীদলে পাঁচটি করে পুলিশ তো ছিলই। তারা পাহাড়ে ওঠবার পরেই দেখা গেল হডসনের নেতৃত্বে আরও ষাটজন পুলিশ। সবাই সশস্ত্র। আর, এই জন-দশেকের বদলি উপলক্ষে তিনজন আই পি এস অফিসার—ফিনে আর হডসন ছাড়া সঙ্গে কট্রাগ। পরে আমাদের চারজন যান মধ্যপ্রদেশে। আরও পরে ভূপেনবাবু [রক্ষিতরায়] আর রসিক [রসিকলাল দাস] পেশোয়ার জেলে। [ক্রমশঃ]

পরবর্তী সংখ্যায় : 'জেলের অভ্যন্তরে'

অমৃতসমান

বেদব্যাস

'চালাও পান্‌সি—' আচমকা মেদিনী-কাঁপানো চিৎকারটি শুনে আমরা সকলেই কম-বেশি চমকে উঠেছিলাম। সকলের দৃষ্টি গিয়ে পড়েছিলো সামনের দুটো রো ছেড়ে কোণের সীট-এ-বসা যুবকটির ওপর। সবচেয়ে বিরক্ত হয়েছিলেন যুবকটিরই পেছনের আসনের বৃদ্ধ ভদ্রলোকটি। হাতজোড়া তাঁর কপালে প্রোজেকসন রচনা করেছিল, চক্ষু মুদ্রিত। পাশেই দেবমন্দির ভুললে তো চলবে না। সামনের সীট-এর প্রৌঢ় ভদ্রলোকটি চশমার ফাঁক দিয়ে যুবকটিকে একপলক দেখে নিয়েই বাঁহাতখানা আল্‌তো করে বাসের গায়ে রাখলেন। বোঝা গেল না, বাসটির গায়ে চিড় ধরলো কি না তাই পরীক্ষা করলেন, না বাহনটির চোট্‌ লেগেছে ভেবে সমবেদনায় তার গায়ে হাত বুলিয়ে দিলেন।

বিবেকানন্দ রোডের স্টপেজ ছাড়িয়ে বাসটি একদমে ঠনঠনে এসে পড়েছিল। শ্যামবাজার টার্মিনাসে যখন বাসে চাপছি, তখন আকাশে 'সাজো, সাজো' ভাব থাকলেও আক্রমণ তখনো সুরু হয় নি। পাঁচ-সাত মিনিটেই জলতরঙ্গ।

—কেনিয়ার আমদানী নাকি? এ জিনিস দেখে-দেখে তো আমাদের চোখে ছানি পড়ে গেল। তার জন্যে এত চেল্লাচেল্লি কেন? সিঁড়ির মুখ থেকে এক ভদ্রলোক বিদ্রুপবাণ বর্ষণ করেছিলেন যুবকটির উদ্দেশ্যে।

ডাবলডেকারটা এগুতে পারছিল না, গলদঘর্ম হয়ে যাচ্ছিল ড্রাইভার বেচারা। পারতপক্ষে ব্রেক কষছে না, পাছে ব্রেক-ডাউন হয়ে অচল-অটল হয়ে পড়ে বাসটা। লোক নামবেই বা কোথায়, চারদিকে জলে-জলাকার, ফুটপাথের দোকানপাটগুলি গঙ্গাঘাটের উড়ে পাণ্ডাদের 'গদীর' চেহারা নিয়েছে। আমার কিন্তু ভালোই লাগছিল এই নন-স্টপ ড্রাইভ—চলেছি তো চলেইছি, যেন নোয়াস্‌ আর্কের যাত্রী আমরা।

ইলিশ মাছটা হাতে সঁপে দিয়ে অনেকটা যেন বিজয়ী বীরের পোজে শ্রীমতীকে চায়ের ফরমাইস করেছিলাম, কোত্থেকে বুলবুল দৌড়ে এসে বললে: 'অলিম্‌প্রিক কি, বাপী?' ভিজে জামা-কাপড় ছাড়তে ছাড়তে অলিম্পিকের কথা বলছিলাম মেয়েকে কিন্তু জাপান-মেক্সিকোর নাম শুনেই বুলবুল ক্যাঙারুর মত এক লাফ দিল: আমার মা জাপান যাবে, আমেরিকা যাবে, কী মজা— বলতে বলতে সে ছুটে বেরিয়ে গেল।

দুটো লুচি দিয়ে ফুলকপিটাকে স্যাণ্ডউইচ করে সবে মুখে পুরেছিলাম, এমন সময় মিসেস ঘটক এসে হাজির; কোলে শম্পা। মিসেস ঘটক এ-বাড়িতে বড় একটা আসেন না, ওপর থেকে খুব একটা নামতেই দেখি না ভদ্রমহিলাকে! এ কি, তারপর দেখি, গীতুর মা, ডক্টর সেনের ওয়াইফ, অভিজিতের বৌ স্বাগতা, মিসেস্‌ বরাট, পলিটিক্যাল সায়েন্স-এর ছাত্রী সুজাতা ও তার বোন সুস্মিতা, বসন্তবাবুর ক'টা ছেলে অরুণ, বরুণ, তরুণ একে একে সব যেন লাইন দিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়লো। এরা কার অতিথি, না অনাহূত জানি নে, তবে আমি মোটেই প্রস্তুত ছিলাম না এ'দের অভ্যর্থনার জন্যে।

'কই, অ-বুলবুলের মা, কোথায় গেলি রে? তুই নাকি জাপান যাচ্ছিস?' মিসেস ঘটকই প্রথমে বললেন।

—আপনি নাকি ভাই আমেরিকা যাচ্ছেন?—গীতুর মায়ের প্রশ্ন।

—দেশ দেখে আসুন বৌদি। এ্যাজ্‌টেকসের রাজ্য মেক্সিকো; দেখে আমাদের গল্প বলবেন এসে। সুজাতা এক নিশ্বাসে বলে গেল।

আমি বেচারা কিছুই বুঝতে না পেরে একবার শ্রীমতীর দিকে একবার প্রশ্নকর্ত্রীদের মুখের দিকে ফ্যাল ফ্যাল করে চেয়ে থাকি। কেন জানি না, শ্রীমতীর আমার ফর্সা (ওর মা বলতেন, দুধে-আলতা রঙের—ভদ্রমহিলার বাড়াবাড়ি।) মুখখানি লাল টুকটুক করছিল। কারুর কথার কোন জবাব কিন্তু ও দিচ্ছিল না, শুধু রুদ্ধ আক্রোশে যেন কাকে খুঁজে বেড়াচ্ছে ওই ভিড়ের মধ্যে।

—আপনি কোন্‌ ইভেন্টের জন্যে সিলেক্টেড হয়েছেন বৌদি? এবার তরুণের প্রশ্ন। হিউম্যানিটিজ নিয়েছে ক্লাশ নাইনে, খুব ভাল বক্সিং লড়ে নাকি।

—কনগ্র্যাচলেশনস বেদব্যাসবাবু, খাইয়ে দিন মশাই আমাদের, বৌ আপনার অলিম্পিকে যাচ্ছে। হিমাংশুবাবু এসে একগাল হেসে বলে ফেললেন। তা কবে যাচ্ছেন, খেলা তো সেই সিক্সটি-এইটে, নাকি?

আমি কিছুই বুঝতে পারছিলাম না। তবে হিমাংশুবাবুর আবির্ভাবে মেয়েরা সবাই সরে পড়েছিল হুড়মুড় করে যেমনি করে এসেছিল, শ্রীমতীও রান্নাঘরে অন্তর্ধান করলো।

ব্যাপারটা খোলসা হলো অনেক দেরিতে। বুলবুলের ওপর তখন চড়-চাপড়টা হয়ে গিয়েছে। ও কার কাছ থেকে যেন অলিম্পিকের বিষয় সম্পর্কিত একখানা এ্যালবাম চেয়ে এনেছিল, সেটিও মাটিতে গড়াগড়ি যাচ্ছিল।...বুলবুলকে নিয়ে গড়িয়াহাট থেকে কেনাকাটা করে ফিরছিল শ্রীমতী। জল জমেছিল বলে ট্যাক্সি গলির ভেতরে আসতে রাজী হয় নি, গলির মুখে তাকে ছেড়ে দিয়ে হেঁটেই আসছিল। ঢাকাই জামদানীটা বাঁচাবার কোনো উদ্দেশ্যই তার ছিল না, নেহাৎই হাঁটুজল বলে কাপড়টা হয়তো গোড়ালি থেকে ইঞ্চি তিনেক উঁচুতে উঠে গিয়েছিল। ব্যস, আর যায় কোথায়। রোয়াকের একটা ছেলে বলে উঠেছিলঃ বাহবা, বাহবা,...অলিম্পিকে পাঠাবো এবার...

জল তো দাঁড়াবেই, অত যন্তরপাতি কর্পোরেশানের কোথায় বল তো দিদি? ঘোষ-গিন্নি কলতলায় হাবুলের মাকে পেয়ে বোঝাচ্ছিল। ওদের কি দু-পাঁচটা কাজ নাকি, ও তো আর চাল ফুটোনো আর মাছের ঝোল করা নয় যে উনুনে চাপিয়ে দিলুম আর নামালুম! হাবুলের মা মাথা নেড়ে সায় দিয়ে জানালো যে কাজটা জব্বরই বটে। তারপর আবার সুরু করে ঘোষ-গিন্নিঃ আমার সেজ জামাই বলে একশোটা কারখানার কাজ আর একা কর্পোরেশানের কাজ সমান। তা অবিশ্যি পয়সা আছে, ও তো আবার লাইসেন ডিপার্টে কাজ করে—দুশো টাকা মাইনে আর সাত-আটশো টাকা উপরি। এক-একদিন তো ফিরতে ফিরতে রাত বারোটা-একটা হয়ে যায়। কত্তো কাজ করতে হয় ওদের, বাব্বা!

এই যে সাপের খেলা—কার যেন সুউচ্চ চীৎকারে কানা তালা লাগার দাখিল। কি দিনকালই মানুষের পড়েছে, বেলা আটটা না বাজতেই বেদেনীরা সাপের খেলা দেখাতে বেরিয়ে পড়েছে, আগে বেলা ন'টা অবধি ওদের ঘুমিয়েই কাটাতে

দেখেছি। গলির দিকের জানালাগুলো সব পটাপট খুলে গেল শ্রীমতীও রান্নাঘর থেকে রাস্তার দিকে একঝলক দৃষ্টি নিক্ষেপ করলো দেখলাম। পড়ার ঘর থেকে কিট্টু দৌড়ে এসে ড্রয়ার থেকে পয়সা নিয়েই আবার ছুট। সরীসৃপ শ্রেণীর প্রাণীরা আমার কাছে কেন জানি না আপীল করে না,.. ছেলেকে সামলাবার জন্য আমাকে রাস্তায় নামতে হলো। কিন্তু কোথায় কে, রাস্তা বিলকুল ফাঁকা। বুড়ো মুচিটা ঘোষেদের রোয়াকে বসে যথারীতি জুতো সেলাই করছে, কয়েকটি ছেলে-মেয়ে তাকে ঘিরে সাগ্রহে বাটালি দিয়ে নিপুণ হস্তে চামড়া-কাটা দেখছে। কিট্টু ওখানে নেই। ফিরে আসতেই সোরগোল শোনা গেল অন্দরমহলে। এ্যামা কী ঘেন্না—কার যেন গলা শুনলাম।

ও মশাই, ও বেদব্যাসবাবু, মশাই এগুলো নিয়ে একটু লিখুন-টিখুন. আর তো পারা গেল না। কলতলা থেকে জানালা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে শৈলেশবাবু বলছিলেন। ভদ্রলোক কি পারছেন না বা আমি কি লিখবো জানার আগ্রহ একটু দেখাতেই হলো। কলতলায় গিয়ে দেখি ১৬টি ফ্ল্যাটের ভাড়াটে ছেলে বুড়ো নারী পুরুষ সব গিস্‌গিস্ করছে। ভট্‌চাযদা'র ছোট ছেলেটির হাতে একটা কালো সুতোর মত সাপ। বাচ্চু কি কায়দায় জানি নে, সেটিকে টোন সুতো দিয়ে বেঁধে একবার এই ছেলের দিকে একবার ওই মেয়ের দিকে ছুঁড়ে ছুঁড়ে দিচ্ছে আর মাঝে মাঝে সায়গলী ঢঙে চিৎকার পাড়ছে, খেলবি আয় আয়, কালনাগিনীর খেলা—

কলের জল থেকে নেমে এসেছেন ওই মনসা-কন্যাটি। কলকাতার পাড়ায়-পাড়ায় এ-রকম প্রায়ই এসে থাকে ওরা, বোতল-বন্দী হয়ে আমাদের অফিসেও মাঝে-মধ্যে আসে, আমরা ফটো ছাপি, শহরের সরকারী-বেসরকারী অফিসে গল্পের খোরাক হয়, বড়বাবুর কাছে রসিয়ে গল্প জমিয়ে ছোকরারা ছুটি আদায় করে খেলার মাঠে লাইন দিতে ছোটে। বড়বাবু বলছিলেন ঃ রাখুন তো মশাই, বেহুলা সতীই ফেল মেরে গেল আর ওঁরা কিনা মা মনসার পথ বন্ধ করবেন—দু'দিন বাদেই আবার স্বাভাবিক অবস্থা ফিরে আসে।

—জল, জল করছেন কেন মশাই, আপনি কি চাতকপাখী না কাউন্সিলর? একটা বালতি ভরে নিয়ে আয় একটা বালতি কলে বসিয়ে ছোকরাটি যেন খেঁকিয়ে উঠলো এক ভদ্রলোককে তাঁর ঘটিটা কলে বসাতে উদ্যত হতে দেখে। ভদ্রলোক কাঁচুমাচু হয়ে বলতে গিয়েছিলেন যে বাড়ির কলে একফোঁটা জল আসছে না, বড় মেয়েটা কলেজে যেতে পারে নি রাস্তার কলে জল ধরার জন্যে।

—জল কোত্থেকে থাকবে আপনার কলে, কাউন্সিলরবাবু যে ওয়াটার সাপ্লাইয়ের ইঞ্জিনীয়ারকে ধমক দিয়ে তাঁর বাড়ির কলের জলের প্রেসারটি বাড়িয়ে নিয়েছেন। ওঁর হাই প্রেসার হলেই আমাদের লো—

আমাদের কলতলায়ও সেদিন হৈচৈ। দাসের মেজছেলে চেঁচামেচি সুরু করে দিয়েছে, নির্ঘাৎ চার নম্বর নল পাল্টেছে, কারুর কলে জল নেই, আর চার নম্বর বাথরুমে নায়েগ্রা বয় কেমন করে? চার নম্বর ফ্ল্যাটের বিধু হাজরা বেরিয়ে আসেন, ওপর থেকেই বলতে থাকেন ঃ পাল্টেইছি তো। ওয়াটার ওয়ার্কস-এর ইন্সপেক্টরের হাতে পঁচিশটি টাকা গুঁজে দিয়ে নতুন মোটা ফেরুল এনে লাগিয়েছি। তা, ওই তো পথ বাৎলে দিলুম, গাঁটের পয়সা খরচা করে এখন তোমরাও দিতে পারো গোপাল—

কিন্তু শ্রীমান গোপাল সে-প্রস্তাবে সায় দিতে পারলো না, তিন ভায়ে মিলে তারা হাজরাবাবুর বাথরুমে ঢুকে কলের মুখে ছিপি এঁটে দিল। মিঃ হাজরাকে একথা বলতেও তারা ভুললো না যে, বেশি ট্যাণ্ডাই-ম্যাণ্ডাই করলে নাকি ফল ভালো হবে না, টাকার গরম যেন উনি ঘোড়দৌড়ের মাঠে গিয়েই দেখান ইত্যাদি।

—আজ ক'টা টাকা রেখে যেয়ো তো, ছুঁচ-ফুটোনি আসবে বলেছিল দুপুরে। বেরুবার মুখে শ্রীমতীর অনুরোধ ছিল। পার্স থেকে দশ দেবো না পাঁচ দেবো ভাবতে ভাবতে জিজ্ঞেস করে বসেছিলাম, টিকে দেবার জন্যে কি আবার টাকা দিতে হয় নাকি? তা এ-বাবদে শ্রীমতী যে-সংবাদ পরিবেশন করলো তাতে জ্ঞানভাণ্ডার আমার বিলক্ষণ ফুলে-ফেঁপে উঠলো বলতে হবে।

ডাক্তার ডাকলেই তো কড়কড়ে করে ষোলোটি টাকা গুণে দিতে পারেন, আর আমাদের দুটো-একটা টাকা দিতে গেলেই ব্যথায় আপনাদের বুক টন টন করে ওঠে দিদি? কর্পোরেশনের হেল্‌থ এ্যাসিস্টান্ট নাকি শ্রীমতীর মুখের ওপরেই বলে দিয়েছিল।

আর একটা শিশিতে কি একটা ওষুধ দিয়ে গিয়েছে, তোমাদের মানে জার্নালিস্টদের নাকি খুব কাজে লাগে, কোন্ একটা কাগজের রিপোর্টার নাকি ওষুধটির বাঁধা খদ্দের, মাসে আট-দশ শিশি নেন ওর কাছ থেকে। সেন্ট পার্সেন্ট নাকি খাঁটি মাল। বলে আলমারী খুলে সত্যি একটা শিশি বার করে নিয়ে এলো। এর দরুণ দিতে হবে ওকে পাঁচ টাকা। নাকের কাছে শিশিটাকে ধরতেই বুঝতে বাকী রইলো না যে রেক্টিফায়েড স্পিরিট, খাঁটি এ্যালকহলই বটে। আর তা ছাড়া, শ্রীমতী বলেই চলেছিল, ওই ছুঁচে ইনোকুলেশন নিতে আমার ভরসা হয় না বাপু, হাজার লোকের গায়ে ফুঁড়েছে ওটাকে, কার শরীরে কী রোগ আছে—দুটো ছুঁচও আনতে বলে দিয়েছি। কি গো ভালো করি নি?... কেন দুপুরে আসবে না? ব্যাটাছেলেরা তো বাড়ি থাকলেই ইঞ্জেকশন নিতে দেয় না...ও-ই বলছিল।

শুক্রবার সারা বিকেলটা বসেছিলাম অরিন্দমের জন্যে, কিন্তু সে যখন এলো তখন রাত ন'টা বেজে গিয়েছে, বাড়ি ফেরার উদ্যোগ করছি আমি। কী একটা কেস আছে নাকি ওর, সাহায্য চায় আমার। আমাদের চীফ রিপোর্টার একবারটি বলে দিলেই নাকি ঝামেলা মিটে যায়। গেল হপ্তায় এসেছিল সে, কিন্তু চীফ রিপোর্টার ভয়ানক ব্যস্ত থাকা সত্ত্বেও সে নাটকীয় ভঙ্গীতে বলে ফেলেছিল ঃ দাদা সবংশে ধ্বংস হয়ে গেলুম, একেবারে কোল্যাপ্স মেরে যাচ্ছে বৌ-ছেলে সব—সুবোধদা নাকি টেবিল থেকে মাথা না তুলেই বলেছিলেন ঃ কোনো ভয় নেই, কেরামিন খাইয়ে দিন দশ ফোঁটা—তারপর অরিন্দমের দিকে মোটে দৃষ্টিপাত না করেই খেঁকিয়ে উঠেছিলেন ঃ আরে এটা কী লিখেছেন অজিতবাবু! এ কি এখনো নাক টিপে আছেন যে, নাক দিয়ে কি আপনার দুধ গলছে মশাই? রিপোর্টারী করতে এসেছেন না বিউটি কনটেস্ট দেখতে এসেছেন? তারপর চীফ-সাব গণেশবাবুকে সাক্ষী মেনে সুবোধবাবু আরো বললেন ঃ সেই কখন মশাই নীলরতন হাসপাতালের পাশ দিয়ে হেঁটে এসেছেন তিনটের সময় এখনো ওঁর নাকে গন্ধ রয়েছে, যত্ত সব। ওখানে রাস্তায় কর্পোরেশনের জঞ্জাল জড়ো করা রয়েছে, তা জঞ্জাল-ময়লা কোথায় নেই মশাই, বলতে পারেন? যদ্দিন সুগন্ধ আছে তদ্দিন দুর্গন্ধও থাকবে, আলোর পাশে অন্ধকারের মতো, বুঝলেন? বলাই বাহুল্য এই প্রচণ্ড ঝড়-তুফানের পর

অরিন্দমের সাহসেহ কুলোচ্ছিল না কথাটি পাড়বার।

সে নমস্কার করেই উঠে পড়তে যাচ্ছিল এমন সময় সুবোধবাবু আবার কামান দাগা সুরু করলেন ঃ 'কই রিপোর্টটা ঠিক করে দিয়ে যান, আপনারা দেখছি আমার চাকরীটা খাবেন। একেই কাউন্সিলররা খবরের কাগজয়ালাদের গালাগাল দিয়ে ভূত ভাগিয়ে দিচ্ছে তার ওপর আবার এ-রিপোর্ট লিখলেন মশাই আপনি? তাও আবার কাউন্সিলরের নাম করে? কাটুন নাম, কেটে দিন চোখ বুজে। হু, আচ্ছা ইয়ে তো মশাই আপনি। আরে মশাই ও কাউন্সিলরের ধাগড় লিস্টে ১৫ জনের নাম থাকলেই বা আপনার কি, আর পাঁচ জনের ফিজিক্যাল প্রেজেন্স থাকলেই বা আপনার কি? বাকী দশ জন লোককে মাননীয় কাউন্সিলরের ঘোস্ট এমপ্লয়িজ এবং সে টাকাটা উনি নিজের পকেটে পুরছেন—একথা বলবারই বা আপনার কোন হক্‌টি আছে? কাটুন কাটুন, গোটা প্যারাটা কেটে দিন—শুনুন মশাই, আপনারা ছেলে-ছোক্‌রা মানুষ বোঝেন না তো কিছুই। অবজেকটিভ জার্নালিজ্‌ম মানেই এই নয় যে'—বলে চীফ রিপোর্টার যা বলে-ছিলেন শ্রীমান অরিন্দম তা হজম করতে পারে নি বলে আর 'কোট্‌' করতে পারলো না, তবে এটুকু বুঝতে তার কষ্ট হলো না যে কর্পোরেশনের কর্তাদের প্রসন্ন দৃষ্টি রয়েছে সুবোধ-বাবুর ওপর।

—একটু দেরি হয়ে গেল রে। তুই কি বেরুচ্ছিলি নাকি? চ' তোকে চাউ-চাউ খাইয়ে দিই—খুশিতে অরিন্দম ফেটে পড়ছিল। আজ শুক্র-বারের ওপ্‌ন কাউন্সিল পেয়ে গিয়ে-ছিল ও, কে একজন কাউন্সিলরের গুরুতে কাজ করে নিয়েছে। —হবি তো দুটো কাজই একদিনে হয়ে গেল। বিল্ডিং ইন্সপেক্টরকে দিতে হলো সাড়ে তিনশো, এ্যাসেসমেন্ট ইন্সপেক্টরকে দুশো। এত লাগতো না রে, ওই কাউন্সিলরকে নাকি বখরা দিতে হবে দুজনকেই। না, আমার তো কোনো লস্‌ নেই। বাড়ির ভ্যালুয়েশন আশি হাজার থেকে পঞ্চাশ হাজারে নামিয়েছি আর তেতলার আনঅথরাইজড কনস্ট্রাকশনটাও স্যাংশন করিয়েছি। ও ফ্লোরটি আমার খুব পয়মন্ত হয়েছে রে, মাস গেলে দুটি হাজার টাকা আসে। সত্যি বাসু, আমাদের মতো গরীব লোকের মা-বাপ হলো ওই লাল কুঠিই। পেন্নাম করে নিই বাবা আরেকবার।

না না না—পাশের কেবিন থেকে উত্তেজিত মেয়ে কণ্ঠ শুনে সচকিত হতে হয়—এ-বিরে হতে পারে না কমল। ছি, ছি তুমি ওখানে কাজ করো, লোকে যাকে চোরপোরেশন বলে? ছিঃ—

পরী-কল্পনা—

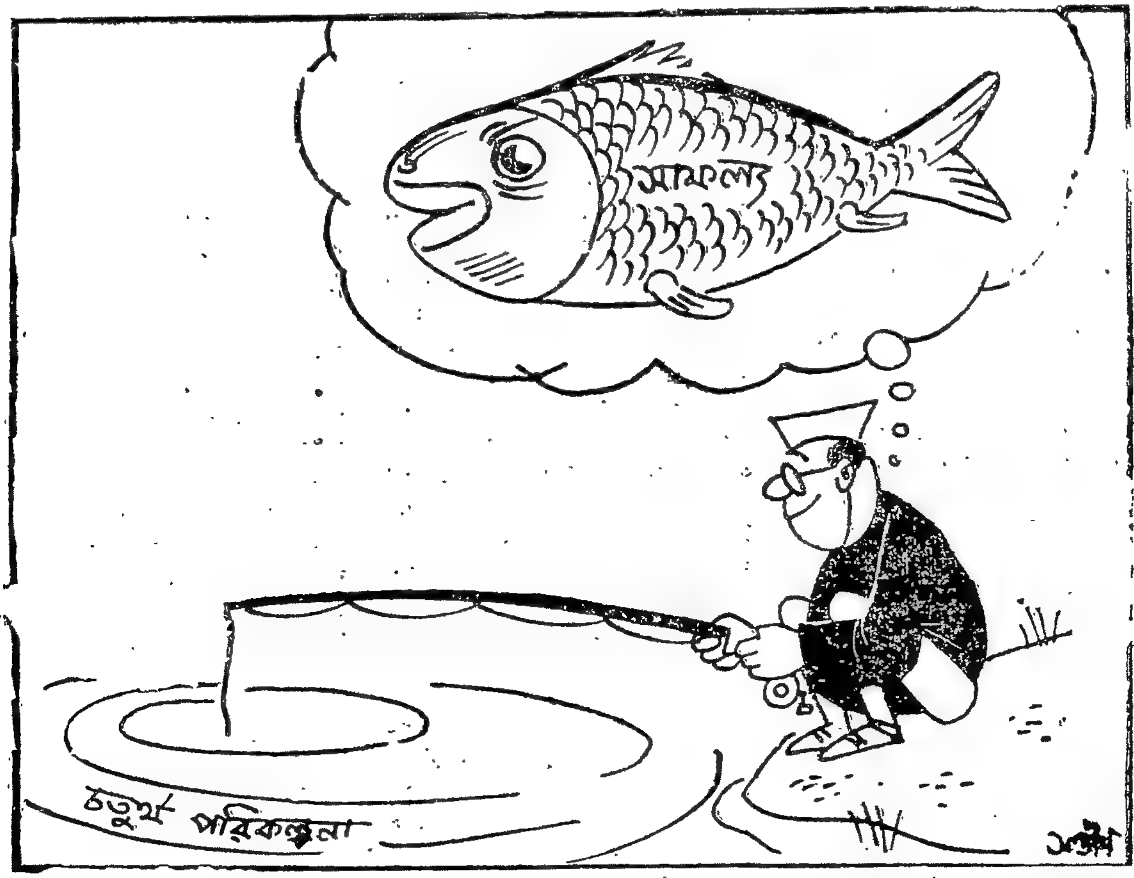

স্বয়ংদীপ্ত জীব-জগৎ

আশিসকুমার সিংহ

জীবনেরও একটা আলো আছে। না না, আমি কোন দুরূহ দার্শনিক তথ্যের উত্থাপন করছি না। নেহাতই জীব-বিজ্ঞানের দপ্তর থেকে বলছি। "জোনাকি, আমরা এবং বৈদ্যুতিক মাছ" নামক প্রবন্ধে জোনাকির আলো নিয়ে সামান্য আলোচনা করেছিলাম। কিন্তু ব্যাকটিরিয়া থেকে সুরু করে এত বিপুল সংখ্যক জীবের মধ্যে নিজস্ব আলোর সন্ধান পাওয়া গেছে যে সে-সম্বন্ধে একটি পূর্ণাঙ্গ প্রবন্ধ খুব অযৌক্তিক হবে না। বর্তমান প্রবন্ধে আমরা এই বিষয়েই আলোচনা করব।

অনেক দিন ধরে—তা প্রায় কয়েক শতাব্দী হবে—মানুষ কিছু কিছু অদ্ভুত আলোর সঙ্গে পরিচিত ছিল। সপ্তদশ শতকে রবার্ট বয়েল "দীপ্তিমান মাছ-মাংস" (shining fish and flesh") নিয়ে অনেক গবেষণা করেছেন। রাঁধা মাংস রেখে দিলে অনেক সময় তাতে আলোর আবির্ভাব হত। এই বিজ্ঞানী সেই মাংস খেয়ে প্রমাণ করেছিলেন যে আলোর আবির্ভাবে মাংস ক্ষতিকর হয়ে যায় না। এই আলোর জন্যে বাতাস (তথা অক্সিজেন) যে অপরিহার্য এটা তাঁর অন্যতম আবিষ্কার। রাঁধা মাংস ছাড়া দোকানে বাসি মাংসে, মৃত জীবজন্তু ও মানুষের দেহে, পচা কাঠে, আলু, বীট কিংবা ফলমূলেও আলো দেখা দিত সময় সময়।

এই আলো আর দেখা দিত সমুদ্রে জাহাজের নাবিকদের কাছে, এই একই ধরণের আলো। তাঁরা অনেকে এর বিবরণ লিখে গেছেন। এক মার্চেন্ট জাহাজের ক্যাপটেনের বিবরণ উদ্ধৃত করা যাকঃ

"প্রথমে মনে হয়েছিল দীপ্ত জলের একটি রেখা যেন পূব থেকে পশ্চিম দিগন্ত পর্যন্ত শুয়ে আছে। জাহাজ এগোলে সেই রেখাটি অদ্ভুতভাবে মিটমিট করতে সুরু করল। পেরুবার সময় দেখলাম প্রায় আধ মাইল চওড়া একটি স্থানের জলের নিচ থেকে খুব শক্তিশালী অনেক আলোকরশ্মি ওপরের দিকে উঠে আসছে—২০ থেকে ৩০ বর্গগজ স্থান আলোকিত করছে তারা প্রত্যেকে। প্রত্যেকে নিরপেক্ষভাবে ক্রমাগত জ্বলছে আর নিভছে। এই জ্বলা-নেভা, লক্ষ্য করে দেখলাম, খুব নিয়মিত পর্যায়ক্রমে প্রায় ১ থেকে ১½ সেকেন্ড পরপর সংঘটিত হচ্ছে।"

স্বভাবতই এই আলোর কারণ নিয়ে অনেক দিন মাথা ঘামাচ্ছিল মানুষ। অবশেষে অষ্টাদশ শতকে বেকার বলেন যে, এই সব আলো আসছে ছোট ছোট কীটপতঙ্গের শরীর থেকে। পরবর্তী কালের গবেষণা তাঁকে মোটামুটি সমর্থন করেছে। সমুদ্রের আলো বা "দীপ্তিমান মাছ-মাংসের আলোর পেছনে আছে এক ধরণের ব্যাকটিরিয়া যারা স্বয়ংদীপ্ত (self-luminous), আর মৃত উদ্ভিদের আলোর জন্যে দায়ী এক ধরণের স্বয়ংদীপ্ত ফাঙ্গাস্। পচনশীল জীবদেহকে এই ব্যাকটিরিয়া ফাঙ্গাস আক্রমণ করে, ছোটখাট একটা উপনিবেশ তৈরি করে সেই দেহে, কিংবা সমুদ্রের জলে ঐ ব্যাকটিরিয়া ছড়িয়ে থাকে কোটি কোটি—তাই এই আলো।

আজ পর্যন্ত যত স্বয়ংদীপ্ত জীবের কথা জানা গেছে তার মধ্যে ব্যাকটিরিয়া হল জীববিজ্ঞানের বিচারে সরলতম প্রাণী। এরা যেমন পচনশীল জীবদেহকে "দীপ্তিমান" করে তেমনি অনেক সময় আবার জীবিত মাছ বা অন্য ছোট প্রাণীকে আক্রমণ ক'রে তাদের শরীরে রোগ বাধায়। আক্রান্ত প্রাণীটি মারা যায় কয়েকদিনের মধ্যে, তবে, সন্দেহ নেই, বেশ উজ্জ্বলভাবেই!

স্বয়ংদীপ্ত ব্যাকটিরিয়ার পরের দেহে আলো জ্বালানর আর একটা অতীব চমকপ্রদ দৃষ্টান্ত হাজির করেছেন জীববিজ্ঞানীরা। গভীর সমুদ্রের কয়েক রকমের মাছের চোখের নিচে একটা অদ্ভুত আকারের গ্ল্যান্ড অনেকদিন ধরে মাথাব্যথার কারণ ছিল তাঁদের। অবশেষে জানা গেল মাছগুলি ঐ গ্ল্যান্ডে স্বয়ংদীপ্ত ব্যাকটিরিয়া পোষে, নিজের রক্ত থেকে খাইয়ে-দাইয়ে বাঁচিয়ে রাখে—তাদের, আর তাদের আলোয় নিজের প্রয়োজনটুকু মিটিয়ে নেয়। বিবর্তনের ফলে দিনে দিনে একটা ঢাকনার ব্যবস্থাও হয়েছে গ্ল্যান্ডটার ওপরে। প্রয়োজন মিটলেই আলো ঢেকে ফেলতে পারে মাছগুলি, তাতে শত্রু বা খাদ্যপ্রাণী ওদের অবস্থিতি বুঝতে পারে না আর। একেবারেই পাকাপোক্ত ব্যবস্থা, কোন ফাঁক নেই।

সব মাছ কিন্তু এরকম পরের আলোর কারবারী নয়। স্বয়ংদীপ্ত মাছের সংখ্যাও অল্প নয় নেহাৎ। আর শুধু কি মাছ? আরো নানান রকমের প্রাণী আছে সমুদ্রের উপরি-তলে, মধ্যভাগে বা গভীরে—যারা নিজেরাই নিজেদের আলো জ্বালাতে সক্ষম। গভীর সমুদ্রের সূর্যহীন অন্ধকারে নামলে এইসব প্রাণীর জন্যে আপনার চারপাশটাকে মনে হবে যেন অমাবস্যার তারাখচিত আকাশ। তাছাড়া, ডাঙায় আছে মাটির তলার কেঁচো যে নিজের আলো জ্বালাতে পারে। অন্ধকারে বিছে মেরেছেন কখনো? এক বিশেষ ধরণের বিছেকে ঘসে দিলে যে-রস বেরোয় তার নীল দ্যুতি আপনার চোখে পড়ে নি? জোনাকি এবং তার দেশী-বিদেশী অসংখ্য জ্ঞাতিগোষ্ঠী আর তাদের শূককীটের কথা না হয় ছেড়েই দিলাম!

মাছ, শ্রাম্প্ বা স্কুইড্ প্রভৃতি সামুদ্রিক প্রাণীর আলো জ্বালবার যন্ত্রটি কোন কোন ক্ষেত্রে খুবই জটিল। প্রথমে আলোক উৎসারী কোষের একটি সারি, তারপরে আলোর প্রতিফলনের জন্যে আর একপ্রস্থ প্রতিফলক কোষ, তারপরে একটি তরল পদার্থে নির্মিত লেন্স্, আলো ঢাকবার জন্যে কালো রঙের একটা ঢাকনা আবার—কি নেই এ-যন্ত্রে? একটি পুরোদস্তুর লণ্ঠন বললেই হয়। লেন্সটাকে ঠিকমত অ্যাডজাস্ট করে নিয়ে আলোকে ইচ্ছামত দূরে কাছে ফেলতে পারে প্রাণীটি। চোখেও এ ধরণের তরল লেন্স আছে। তাতে গোলমাল বাধলে মানুষের হয় চশমার প্রয়োজন। মাছেদের লণ্ঠনের লেন্সে গোলমাল হলে কি করে তা অবশ্য জানা যায় নি। চশমা দেওয়া

যায় কি না, মাছের ডাক্তারেরা ভেবে দেখতে পারেন।

স্বয়ংদীপ্ত জীবজগৎকে সামনে রেখে একটু সতর্ক দৃষ্টিতে বিচার করলে একটা ব্যাপার আপনার চোখে পড়বেই। ডাঙার গুটিক'য় জীবের কথা ছেড়ে দিলে এই জীবজগতের যে বিপুল জলচর অংশ বাকী থাকে তাদের প্রায় সবগুলিই লোনা জলের বাসিন্দা। চার-পাঁচটি মাত্র জীব এই নিয়মের ব্যতিক্রম। আরো আশ্চর্য, একই প্রাণী লোনা জলে স্বয়ংদীপ্ত যদিও তার মিঠে জলের জ্ঞাতিরা নয় এমন দৃষ্টান্তও আছে। যেমন ধরুন কুচো চিংড়ি—এদের শুধু লোনারাই আলো দিতে পারে। বিজ্ঞানীরা এখনও এই অদ্ভুত ঘটনার কোন কারণ নির্দেশ করতে পারেন নি।

শুধু তাই নয়। পুরো জৈব আলো ব্যাপারটিরই কোন কারণই বলুন, আর তাৎপর্যই বলুন, সংশয়-হীনভাবে নির্ণয় করা যায় নি এখনও। কাজটা দুরূহও বটে। কেন না, যে প্রক্রিয়ায় এই আলো জ্বালবার পদ্ধতির উদ্ভাবন ও ক্রমিক উন্নতি সাধিত হয়েছে সেটি জৈব বিবর্তনের অন্তর্গত। আর, বিবর্তনের এক-একটি প্রক্রিয়া এত বিপুল সময় ধরে চলে যে পরীক্ষা-গারে তার পরীক্ষা করা অসম্ভব। ফলে এর তাৎপর্য সম্বন্ধে যা-কিছুই বলা হয়েছে সবই অনেকটা অনুমানের ওপর নির্ভর করে।

যেমন ধরুন, স্বয়ংদীপ্ত যে সব মাছের লণ্ঠনগুলি সার বেঁধে সাজানো থাকে শরীরের নিচের অংশে—তাদের সম্বন্ধে বলা হয়েছে এতেই এদের সুবিধে। জলের ওপর থেকে সূর্যের যে রশ্মিগুলি নেমে আসছে তাদের সাহায্যে মাছ তার ওপরে অবস্থিত শত্রু বা খাদ্যপ্রাণীর অবস্থিতি বুঝতে পারে, নিচ থেকে তাদের ছায়া দেখতে পায় সে। যদি তার লণ্ঠনগুলি দেহের ওপরে হত তবে নিজের আলোতেই এই ছায়াকে সে মুছে দিত। তখন তার ওপরে হত আলোয় আলোয় অন্ধকার, আর নিচে আলোকহীন অন্ধকার। লণ্ঠনের উপযোগিতাই বরবাদ হয়ে যেত একেবারে। বিশেষত এইসব মাছের শিশুকাল কাটে জলের উপরিতলে, যেখানে সূর্যের আলো খুব কম নয়। আর শিশুকালটাই ত' টিকে থাকার পক্ষে সবচেয়ে কঠিন সময়।

ভাষ্যটি একবাক্যে চমৎকার, কিন্তু প্রশ্ন থেকেই যায়। রাত্রে যখন সূর্যা-লোক থাকে না তখন এরা ওপরের দিকটা দেখে কি করে? কিংবা সমুদ্রের গভীর প্রদেশে, যেখানে জীবনের বেশির ভাগ সময় কাটায় এরা, সেখানে? এর কোন নির্দিষ্ট উত্তর নেই।

জৈব আলো কি করে জ্বলে তার উত্তর কিন্তু মোটেই এতটা অনুমান নির্ভর নয়। কারণ, সেটা পরীক্ষা-গারের পরীক্ষার আওতায় পড়ে। সাধারণভাবে বলা যায়, রাসায়নিক বিক্রিয়ার ফলেই এই আলোর উদ্ভব। এক কথায় তাই একে বলা যায় রাসায়নিক আলো। জোনাকির প্রসঙ্গে একথা আমরা আগের প্রবন্ধে বলেছি। খাদ্যের রাসায়নিক শক্তিকে এরা এক ধরণের পদার্থে পুরে রাখে। এক এক জীবে পদার্থটি এক এক রকম। এদের সাধারণ নাম লুসিফেরিন। অক্সি-জেনের উপস্থিতিতে আর একটি প্রোটিন জাতীয় পদার্থ—নাম লুসিফেরাজ—লুসিফেরিনকে ভেঙে ফেললে ঐ শক্তি বেরিয়ে আসে আলোরূপে। লুসিফেরিন এমনিতে হলদে, ভাঙবার পরে বর্ণহীন হয়ে যায়। মনে হয় এই হলুদ রঙটি আসে ফ্লেভিন নামক পদার্থের কোন যোগের জন্যে। ফ্লেভিন-এর একটি যৌগের, নাম রাইবোফ্লেভিন বা ভিটামিন বি ২,—দৌলতেই দুধ হয় ফিকে হলুদ। এখানেও খুব সম্ভব ব্যাপারটা সেই রকম।

এখন প্রশ্ন জীবজগতে আলো জ্বালাবার এই যে-বিচিত্র আয়োজন এর ব্যবহারিক তাৎপর্যটি কি? এর উত্তরেও আমাদের অনুমানের ওপরই নির্ভর করতে হবে। কেন না, আমরা কেউ ব্যাকটিরিয়া বা মাছ বা অন্য কোন স্বয়ংদীপ্ত প্রাণী নই। অতএব আমা-দের মত করেই আমরা বিষয়টিকে দেখতে বাধ্য; সে ব্যাখ্যা কিছুটা বাস্তবভ্রষ্ট হতেও পারে।

সম্ভবত এই আলো আত্মরক্ষা, খাদ্য শিকার, যৌন আকর্ষণ এবং সনাক্তকরণের কাজে লাগে। আলোয় তারা দেখতে পায় শত্রুকে কিম্বা খাদ্যকে; আর আলো দেখিয়ে তারা প্রেম-নিবেদন করে—এ দু'টো কাজ ধারণায় আনতে খুব অসুবিধে হয় না আমাদের। কিন্তু সনাক্তকরণের জন্যে এই আলোর উপযোগিতা ধারণায় আনা স্থলচর জীবের পক্ষে একটু দুরূহ। গভীর সমুদ্রে যেখানে দিনরাত নিঝুম অন্ধকার সেখানে এই আলো দেখেই স্ত্রী-পুরুষ চেনা যায়, বোঝা যায় কোন্‌টা কোন্ প্রাণী। বিভিন্ন প্রাণীর আলোর ধরণ আলাদা, একই জাতের প্রাণীরও আবার স্ত্রী-পুরুষ ভেদে তফাৎ আছে। দূর থেকে এই আলোর ধরণ দেখেই তাই কোন প্রাণী অন্য প্রাণীকে গভীর সমুদ্রে সনাক্ত করে।

আমার ধারণা যে-সব প্রাণীর লণ্ঠনে লেন্স আছে তারা আত্মরক্ষা বা খাদ্য শিকারে বেশি দক্ষ। কারণ আলোটাকে ঠিকমত অ্যাড্‌জাস্ট্ করে শত্রু বা খাদ্যের চোখে ফেলে ধাঁধা লাগিয়ে কাজ হাসিল করতে পারে তারা। অবশ্য পারলেও করে কি না সেটা পরীক্ষা ক'রে দেখা হয় নি। তাহলেও কিন্তু করার সম্ভাবনাই বেশি। কারণ বিভিন্ন উপায়ে ধাঁধা লাগিয়ে কাজ হাসিল করার দৃষ্টান্ত জগতে বিরল নয়, গভীর সমুদ্রে ত' নয়ই। আলোটাকে টোপ হিসেবে ব্যবহার করেও খাদ্য শিকার করে অনেক প্রাণী।

মানুষের কাছেও জৈব আলোর একাধিক ব্যবহার আছে। স্বয়ংদীপ্ত ছোট মাছকে টোপ হিসাবে ব্যবহার ক'রে বড় মাছ ধরা যায়। দ্বিতীয় মহা-যুদ্ধের সময় জাপানে আগর নামক একটি পদার্থে স্বয়ংদীপ্ত ব্যাকটিরিয়া জন্মিয়ে ব্ল্যাকআউটের রাত্রে রাস্তা, বা অন্য কিছুর সাইন হিসেবে ব্যবহার করা হত। আবার, সিপ্রিডিনা নামে এক জাতের ছোট স্বয়ংদীপ্ত প্রাণীকে গুঁড়ো ক'রে সেই গুঁড়ো জাপানী সেনাবাহিনীর অফিসারেরা কাছে রাখ-তেন। রাত্রে যখন হয়ত শত্রুশিবিরের কাছাকাছি আছেন তখন বেস্ ক্যাম্পের নির্দেশলিপি বা অন্য কোন সংবাদ পড়তে হলে সেই গুঁড়ো হাতে নিয়ে একটু ভিজিয়ে নিতেন তিনি; তারপর তার কমশক্তির আলোয় দিব্যি পড়ে নিতেন লিপি বা সংবাদ; ধরা পড়বার ভয় থাকত না একটুও। আর, দিনকাল যা পড়েছে, বলা যায় না, হয়ত অদূরভবিষ্যতে যে-সব ব্যাকটিরিয়া খেলে কোন ক্ষতি হয় না তাদের খাওয়ারও চল হবে ভিটামিন বি ২-এর যোগানদাররূপে।

এই যে সব স্বয়ংদীপ্ত প্রাণীর কথা আমরা আলোচনা করলাম তারা সকলেই মাছ বা তার নিম্নস্তরের জীব। প্রশ্ন উঠতে পারে এর ওপরের স্তরে কোন জীবের ক্ষেত্রে কি আলোর সন্ধান মিলছে? মানুষের ক্ষেত্রে? এর উত্তর দেওয়ার আগে বলা দরকার যে অতীতে যে দু-একটি ক্ষেত্রে এ-রকম আলোর কথা লিখিত আছে সেগুলি বিশ্বাস করার ব্যাপারে খুব সতর্ক হওয়া প্রয়োজন। যিনি দেখেছেন তিনি হয়ত ভুল করতে পারেন। যেমন ধরুন, অনেকেরই ধারণা বিড়ালের চোখ অন্ধকারে আলো দেয়। একেবারে ডাহা

ভিয়েতনাম ঃ ভারতবর্ষ

কল্যাণকুমার দাশগুপ্ত

মাঝে মাঝে প্রশ্ন জাগে কি জানি বাঁচব কতদিন,
দুঃখভারে মৃত্যুভয়ে এই ঘৃণ্য অসহ্য বাঁচায়
বাঁচার ভঙ্গীতে ক্লিষ্ট ক্লিন্ন এ জীবন পেতে চায়
জীবন্ত জ্বলন্ত মৃত্যু যে-মৃত্যু সহস্র হো-চি-মিন
প্রত্যহ প্রত্যক্ষ করে বীতভয় অজেয় হ্যানয়ে।

এ দেশের সাধারণও সংগ্রামে অনন্যসাধারণ,
সেকণ্ডে গণ্ডায় করে একই মনে মুক্তির গাহন,
ধন্বন্তরির স্তব করে ত্রিধারার পলির বলয়ে।

মনে দেখি ঃ ডঙডুয়োঙে তথাগত ক্রোধে নিষ্করুণ,
ধ্যানী শিব ঘোর মূর্তি মিশনের মন্দিরে মন্দিরে,
হ্যানয়ে আনামে সারা ভিয়েতনামে যখন আগুন
সহ্যের সংগ্রামের জ্বলে,
তখন এ দেশে নতশিরে
বুদ্ধিজীবী ব্যস্তবুদ্ধি ডলারের স্বপ্নের চূড়ায়
কিভাবে কমিউনিজম ডাস ক্যাপিটাল করা যায়!

দুই আমি

নমিতা বসুমজুমদার

আমার সময় নেই, এখন যাও না তুমি
আমি বললাম আমার আমিকে।
দিনরাত্রি নিভন্ত
জলধারা নিঃশব্দ
পাথরে পাথরে ছুটছে লাফিয়ে তবু নিঃ
দুঃখসুখ নিথর।
ও আকাশ রঙ্ কই তোমার
ও সকাল ও দুপুর ও সন্ধ্যা, আলোছায়া
ও ঢেউ তোমার চঞ্চলতা।
ওরা নিশ্বাস রাখল ঃ তোমার আমি নেই-
ও যদি না থাকে
কী সর্বনেশে আমার এই আমি
এসো তুমি, এসো তুমি, এসো এসো এসো

এসো তুমি, এসো তুমি, এসো এসো এসো।
পিনাকটংকার থরথর
আকাশ ঢেকেছে রাগী কালো বাঁকা চুলে
শব্দকে সুরকে ছাপিয়ে নীলশিরা হাত
আমার মন্ত্র-জপের জোরে অজগর
কোন্ ভয়াল অরণ্য থেকে বেরিয়েঃ ফুঁসছে
সূর্যকে মুচড়ে আছড়ে দিতে ইচ্ছে।

ভুল এটা। এটা আসলে আলোর প্রতিফলন ছাড়া কিছুই নয়। একেবারে পুরোপুরি অন্ধকারে দীপ্ত হতে পারে এমন চোখ পাওয়া যায় নি আজও।

সে-কথা যাক। বিশ্বাসযোগ্য সংবাদগুলি নিয়েই আমরা বসি আসুন। রবার্ট বয়েল, সপ্তদশ শতকে যিনি "দীপ্তিমান মাছ-মাংস" খেয়েছিলেন, উনিশ শতকে জানা গেল—তিনি নেহাৎ কপালজোরে বেঁচে গিয়েছিলেন। ১৮৯৩ খৃস্টাব্দে এক রকমের স্বয়ংদীপ্ত ব্যাকটিরিয়া পাওয়া গেল যারা কলেরা জীবাণুর সমগোত্রীয়। এর দু' বছর পরে স্বয়ং এশিয়াটিক কলেরার রুগীদের দেহ থেকে সত্যই এমন ব্যাকটিরিয়া পাওয়া গেল যারা মানুষের দেহে দীপ্তিহীন, কিন্তু পায়রার রক্ত স্বয়ংদীপ্ত। পায়রা মাছের চেয়ে উঁচুস্তরের জীব; তবে এটা অবশ্য তার ধার করা আলোর বিবরণ।

ধার করা আলোয় মানুষও আলোকিত হয়েছে। গত শতকে মিলিটারী ডাক্তারেরা অনেক দীপ্তিমান ক্ষতের কথা লিখেছেন। এই সব ক্ষত সাধারণ ক্ষতের চেয়ে সহজে সেরে যেত। অ্যান্টিসেপ্‌টিকের ব্যবস্থা ভালো হয় নি তখনও। সম্ভবত ঐ সব ক্ষতমুখে স্বয়ংদীপ্ত ব্যাকটিরিয়া বাসা বাঁধত। অ্যাণ্টিসেপটিক এবং স্যানিটারীর ব্যবস্থা ভালো হওয়ার সংগে সংগে ক্ষতমুখের বা "মাছ-মাংসে"র আলো মিলিয়ে গেছে।

এ-ছাড়া দীপ্তিমান ঘাম ও মূত্রের কথাও শোনা গেছে অনেকবার। প্রিস্ট্‌লি তাঁর History of Optics বইতে এক ব্যক্তির কথা উল্লেখ করেছেন যে, একবার দারুণ পরিশ্রমের পর অন্ধকারে যেতেই তার জামাটা এমনভাবে জ্বলজ্বল ক'রে উঠল যে, মনে হল যেন তাতে আগুন ধরে গেছে। লোকটি নুন খেত খুব বেশি, আর একটু বেতো রোগীও ছিল। হয়তো তার ঘামে কোন অস্বাভাবিক পদার্থ নির্গত হয়েছিল যা অক্সিজেনের সংস্পর্শে আলো দিতে পারে; তার ঘামের মামলায় স্বয়ংদীপ্ত ব্যাকটিরিয়ার বাসা বাঁধাও বিচিত্র নয়। মূত্রে অবশ্য ব্যাকটিরিয়ার চেয়ে অস্বাভাবিক পদার্থ থাকার সম্ভাবনাই বেশি। কারণ মূত্রে ব্যাকটিরিয়া ভাল জন্মায় না। একটি রোগে (অ্যালক্যাপ্টোনিউরিয়া) মূত্রে হোমোজেন্‌টিসিক্ অ্যাসিড নামে একটি অস্বাভাবিক পদার্থ থাকে। এই মূত্রকে ক্ষার জাতীয় পদার্থের যোগে ক্ষার ক'রে নিয়ে বাতাসের (অক্সিজেনের) সংস্পর্শে খুব জোরে নাড় দীপ্ত হয়ে ওঠে। স্বাভ এ-রকম ব্যবহার করে ন দীপ্তির জন্য এই সব পদার্থই দায়ী।

এবারে একটা বিষয় ভেবে দেখুন। এককোষী রিয়ার শরীর যেমন সরল তেমনি। তার আলো উৎপ যান্ত্রিক জটিলতা নেই, তে চক্ষুহীনতার কাছে জৈব কী যে মানে তা কেউ জা বা অন্য যে-সব প্রাণীর আলোর যন্ত্রও জটিল—তা ব্যবহারে বুদ্ধির পরিচয় প তার মানে জৈববিবর্তন যেভাবে তৈরি করেছে ত ব্যবহারেই বুদ্ধির পরিচয় যে বাইরের কোন দয় মানুষকে সবচেয়ে বুদ্ধিমান দিয়ে গেছে।

আর একটি প্রসঙ্গও উ মানুষ বলুন, আর ব বলুন সকলের আলোর পে রাসায়নিক বিক্রিয়া। জৈব মত অন্য সব জৈব ঘটনা শরীর কি তবে জড়যন্ত্র? এ নিয়ে বসা যাবে।

বঙ্গদর্শন

রাজ্য বেসরকারী কর্মচারীদের বিক্ষোভ

বঙ্গদর্শনের পাতাগুলি যে পাঠক-পাঠিকাদের ভাল লাগে তার প্রমাণ পেয়েছি তাঁদের দেওয়া কয়েকটি চিঠি-পত্রে, যেগুলি 'পাঠকমনে' প্রকাশিত হয়েছে। তাঁরা বঙ্গদর্শন-লেখককে সাধুবাদ জানিয়েছেন এজন্য তাঁরা অবশ্যই লেখকের কৃতজ্ঞতাভাজন।

এই প্রসঙ্গে বঙ্গদর্শন নামক ফিচারটির মূল চরিত্রটি কি তা আরও একবার জানানোর প্রয়োজন আছে। বঙ্গদর্শন কোন সংবাদ পরিক্রমা নয়। পশ্চিমবঙ্গের কোথায় কি ঘটছে তা' জানানো বঙ্গদর্শনের উদ্দেশ্য নয়। এখানে আমরা শুধু সেই সব ঘটনাগুলিকেই বিশ্লেষণ করি যেগুলি সমস্যামূলক, যেগুলির তাৎপর্য জাতির জীবনে গভীর।

বঙ্গদর্শনের আলোচনাপদ্ধতি সম্বন্ধেও কিছু বলবার প্রয়োজনীয়তা আছে। আমাদের বক্তব্য মানসকেন্দ্রিক (সাবজেক্টিভ) নয়, তা' সম্পূর্ণ বিষয়-কেন্দ্রিক (অবজেক্টিভ)। সমজাতীয় ঘটনাবলীকে একই সমতলে নিয়ে আসা, ইংরাজীতে যাকে বলে কো-রিলেশন, সেগুলির সাধারণ কারণগুলি বার করা, এবং সেগুলি থেকে যে সব সিদ্ধান্ত অনিবার্যভাবে নিঃসৃত হয় সেগুলিকে পাঠকদের সামনে তুলে ধরা। কোন পূর্বকল্পিত ধারণা নিয়ে বা বিশেষ কোন মতবাদের নিরিখে কোন ঘটনার বিচার বা বিশ্লেষণ এখানে করা হয় না।

আমাদের দৈনন্দিন জীবনের হাজার সমস্যার সুস্পষ্ট উপলব্ধি এবং তা' সমাধানের বাস্তব পদ্ধতি উদ্ভাবনের জন্য পাঠক-পাঠিকারা যাতে স্বাধীনভাবে কিছুটা চিন্তা করার প্রয়োজনীয়তা বোধ করেন সেই উদ্দেশ্যেই প্রতি সংখ্যায় 'বঙ্গদর্শনের' অবতারণা। এটুকু বিশ্বাস করার যথেষ্ট কারণ আছে যে, এমন কোন সমস্যা নেই যা সমাধানের অতীত। সেই জন্যই প্রয়োজন সমগ্র সমস্যার সঠিক উপলব্ধি এবং সার্বিক মূল্যায়ন। এই কাজটির দায়িত্ব পাঠক-পাঠিকার এবং বঙ্গদর্শনকারের কাজ হচ্ছে তার সূত্র যুগিয়ে যাওয়া।

দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি ও বিক্ষোভ

দ্বিতীয় পাঁচসালা পরিকল্পনার সময় থেকেই এদেশে দ্রব্যমূল্য যে-হারে চড়তে শুরু করেছে তার যেন বল্গাহীন ঘোড়ার মত দুর্বার গতি যার মুখে লাগাম পরানোর কোন উপায়ই আজ খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। এর জন্য সরকার ও পরিকল্পনা কমিশনকে দায়িত্বজ্ঞানহীনতার অপরাধে অপরাধী ঘোষণা করা চলতে পারে। 'অর্থনীতির' ছাত্রমাত্রেই একথা জানেন যে, টাকার মূল্য কমে গেলেই জিনিসের দাম বাড়ে। যেখানে একমণ চালের বিনিময়ে আগে কুড়ি টাকা পাওয়া যেত এখন সেখানে পাওয়া যায় আশী টাকারও বেশি। এ থেকে বোঝা যায় টাকার দাম সস্তা হয়েছে এবং জিনিসের দাম বেড়েছে। কিন্তু টাকার দাম হঠাৎ সস্তা হয়ে গেল কেন? এর উত্তরটিও সহজ। জিনিসের যোগান বাড়লে জিনিস সস্তা হয়, সেই হিসাবে টাকার যোগান বেড়েছে বলেই টাকা সস্তা হয়েছে। টাকার যোগান কেন বাড়ল এবং কিভাবে বাড়ল? এর উত্তরও সহজ। টাকার যোগান বেড়েছে পরিকল্পনার ক্ষুধা মেটাতে আর তা' মেটানো হয়েছে দেদার নোট ছেপে। অর্থনীতির ভাষায় এই নোট ছাপার অবশ্য গালভরা নাম আছে। কিন্তু সে নামে পেট ভরবে না। দেশবাসীর নীট লাভ এইটুকু যে তাদের দিনের পরদিন দ্রব্যমূল্যের বৃদ্ধির ধাক্কায় চোখের সামনে রাশি রাশি সর্ষপ পুষ্প দেখার মহা সুযোগ উপস্থিত হয়েছে।

সেই যে দ্রব্যমূল্যের বাড়বাড়ন্ত শুরু হল তাকে আর অধঃপাতিত করা গেল না। যে পাইকারীহারে নোট ছাপানো শুরু হয়েছিল সে তুলনায় পণ্যের উৎপাদন বাড়ে নি। তবে কিছু উৎপাদন অবশ্যই বেড়েছে, নইলে পরিকল্পনাকারেরা মুখ দেখাচ্ছেন কোন লজ্জায়, কিন্তু বণ্টনব্যবস্থার দোষে দেশবাসী এই বর্ধিত উৎপাদনের ফলভোগী হতে পারছেন না। উৎপাদিত পণ্যসমূহ গোপন পথে অন্তর্হিত হচ্ছে। সমগ্র দেশ জুড়েই তৈরি করা হয়েছে এক কৃত্রিম অভাব। সোজা পথে মাল কিনতে পারা দুঃসাধ্য। চোরাগোপ্তা পথে তা' কিনতে হয় কয়েকগুণ দাম বেশি দিয়ে। নিত্যব্যবহার্য প্রতিটি পণ্য বাজার থেকে অদৃশ্য হয়ে গেল, আর শুরু হল হাহাকার। আজ তেল পাওয়া যায় না, কাল ব্যাটারী পাওয়া যায় না, পরশু বেবীফুড পাওয়া যায় না, বিরামহীন এই হাহাকার সমগ্র জাতিকে একটা মানসিক উন্মত্ততার পথে ক্রমাগত টেনে নিয়ে যাচ্ছে।

দেশের মধ্যেই যেখানে টাকার কোন দাম নেই, বিদেশেও বিনিময়ের ক্ষেত্রে টাকা যে আরও মূল্যহীন হবে সে কথা বলাই বাহুল্য। কার্যত বিদেশের বাজারে ভারতীয় মুদ্রার কোন মূল্যই ছিল না। সরকার ডিভ্যালুয়েশন করে ভারতীয় মুদ্রার মূল্যহীনতার কথাই মেনে নিলেন কিন্তু টাকার মূল্য বাড়াবার কোন চেষ্টাই করলেন না। রোগ হয়েছে অতএব রোগীর চিকিৎসা না করে তাকে মেরে ফেলে দাও—এ-নীতির দ্বারাই সরকার চালিত হয়েছেন। যেখানে কর্তব্য ছিল মুদ্রাস্ফীতি সঙ্কোচনের দ্বারা দ্রব্যমূল্যের ঊর্ধ্বগতি কমিয়ে টাকার দাম বাড়ানো, সেখানে ঠিক উল্টো ব্যবস্থাই অবলম্বিত হল। টাকার দাম আরও কমল, ফলে জিনিসের দাম আরও বৃদ্ধি পেল। উৎপাদনের

সকল উপাদানের ক্ষেত্রেই আমাদের দেশ স্বাবলম্বী নয়, ডিভ্যালুয়েশনের ফলে দেখা গেল যে, উৎপাদনের বহু উপাদানই বাইরে থেকে আমদানী করতে হয় যার ফলে উৎপাদন ব্যয় বৃদ্ধি পাওয়ার ফলে আর একদফা মূল্যবৃদ্ধি হল। দুর্ভাগ্যক্রমে আমাদের দেশের ব্যবসায়ী ও উৎপাদকদের সততার কোন সুনাম নেই। এই মওকায় প্রত্যেকেই দাম এক এক পর্দা চড়িয়ে দিল। কোন কোন অতিচালাক প্রতিষ্ঠান আবার সংবাদ-পত্রে বিজ্ঞাপন দিয়ে সাধু সাজবার চেষ্টা করে জানালো যে তাদের উৎপাদিত পণ্যের দাম বাড়ে নি। কিন্তু কার্যক্ষেত্রে তাদের বিজ্ঞাপিত দামে বাজারে কোন জিনিসই পাওয়া যায় না, দোকানদারদের জিজ্ঞাসা করলে বলে যে, ওটা কোম্পানীর চালাকি।

এই অবস্থায় দেশের প্রতিটি লোকের মনেই বিক্ষোভ জমা হচ্ছে। যাঁরা বাঁধা রোজকার করেন তাঁদের অবস্থা শোচনীয়তম স্তরে এসে পৌঁছেছে। সর্বস্তর থেকেই বেতন ও দুর্মূল্য ভাতা বৃদ্ধির দাবি উঠছে। সরকার নিজেও স্বীকার করছেন যে, এই দাবিসমূহ অযৌক্তিক নয়—এবং এই দাবিগুলিকে ঠেকিয়ে রাখা যাবে না। কিন্তু যেভাবে ব্যাপারটা ঘটতে চলছে তাতে সমস্যার সমাধান হওয়া মুস্কিল। এদেশে অর্থনীতির ধারাটা এমন একটা বেয়াড়া পথ ধরেছে যে এখানে বেতন ও দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি একে অপরের সংগে প্রতিযোগিতা করতে করতে এগোবে, বেতনও বাড়বে দ্রব্যমূল্যও বাড়বে। অথচ দুটোরই স্থিতিশীল হবার প্রয়োজন। অর্থ যদি তার ক্রয়শক্তি দিনের পর দিন হারিয়ে ফেলে তাহলে সঞ্চয়েরও কোন মূল্য থাকে না। আজকের একশো টাকার মূল্য যদি কাল দশ টাকার মূল্যের সমান হয়ে যায়, তাহলে দেশ থেকে সঞ্চয়ের স্পৃহারও অবলুপ্তি ঘটবে ফলে মূলধন সৃষ্টির ক্ষেত্রেও যথেষ্ট বিঘ্ন দেখা যাবে। বেতন বৃদ্ধিতে সমস্যার সমাধান নেই, একমাত্র সমাধান হচ্ছে মূল্যস্তরকে নামিয়ে আনা, অন্তত দশ বছর আগেকার মূল্যস্তরে ফিরিয়ে নিয়ে আসা।

বিক্ষুব্ধ সরকারী কর্মচারী

বেতন বৃদ্ধি ও দ্রব্যমূল্য হ্রাসের দাবিতে রাজ্য সরকারী কর্মচারীরা গত ২০শে আগস্ট বিকাল পাঁচটা থেকে রবিবার বিকাল পাঁচটা পর্যন্ত চব্বিশ ঘণ্টা অবস্থান ধর্মঘট করেছেন। তাঁদের দাবিদাওয়াগুলি না মেটা পর্যন্ত তাঁরা নানাভাবে সংগ্রাম করে যাবেন বলে জানিয়েছেন। আগামী সেপ্টেম্বর মাসে তাঁরা একদিন সকলে একসংগে ক্যাজুয়াল লীভ নেবেন, এরকম ঘোষণাও তাঁরা করেছেন।

বেতন বৃদ্ধির দ্বারা দ্রব্যমূল্যের ঊর্দ্ধগতি রোধ করা সম্ভবপর হবে না একথা আমরা আগেই বলেছি। কিন্তু সরকারের পক্ষেও অধিকতর মূল্য-বৃদ্ধি রোধ এবং মূল্যস্তরকে জনসাধারণের ক্রয়ক্ষমতার উপযোগী স্তরে নামিয়ে আনাও সম্ভব নয় এবং সে যোগ্যতাও সরকারের নেই। সরকারও একথা স্বীকার করছেন যে, ডিভ্যালুয়েশন-জনিত মুদ্রাস্ফীতি রোধ তাঁরা করতে পারবেন না।

ফলে চিরাচরিতভাবে বেতন বৃদ্ধি না ঘটিয়ে উপায় নেই। কিন্তু সেই বেতনবৃদ্ধিটা নিশ্চয়ই এমনভাবে হওয়া উচিত যাতে লোকের ক্রয়ক্ষমতা স্বাভাবিক স্তরে থাকে। বেতনের স্কেলে ৫।৭ টাকা বৃদ্ধি করলে কর্মচারীর দুরবস্থা যে স্তরে ছিল সেই স্তরেই থাকবে।

কিছুদিন আগে সরকার সরকারী কর্মচারী ও শিক্ষকদের জন্য একটি সংশোধিত বেতনহার প্রবর্তন করেছেন। তাতে ফাঁক ও ফাঁকি দুই-ই আছে—প্রচুর পরিমাণে। সরকার যদিও বা কিছু দিতে রাজী হলেন, কিন্তু সে দেওয়ার ভঙ্গী এমন যে কেউই তাতে খুশি হতে পারেন নি। সরকারী কর্মচারীরা আশা করেছিলেন যে, তাঁদের নতুন পে-স্কেলে তাঁরা বুঝি একটু ভদ্রভাবে বাঁচার উপযোগী অবস্থার আশ্বাস পাবেন। কিন্তু তাঁদের সেই প্রত্যাশা ব্যর্থতায় পরিণত হয়েছে। তাঁদের সামনে ৫।৭ টাকা অথবা একটা ইনক্রিমেন্ট যেন বকশিস দেবার মত ছুড়ে দেওয়া হয়েছে, কিন্তু তাঁদের জীবনধারণের মৌলিক সমস্যা সমাধানের কোন ইঙ্গিতই বর্তমান স্কেলে পাওয়া যায় না। প্রাণ ও ভদ্রতা রাখতে প্রাণান্ত ঋণভারে জর্জরিত এই নিম্নমধ্যবিত্ত সম্প্রদায় তিলে তিলে আজ অবলুপ্তির পথে চলে যেতে বসেছে। বেসরকারী প্রতিষ্ঠানে নিযুক্ত যে কোন চাকুরিয়ার চেয়েও সরকারী কর্মচারীরা কম বেতন পান। অত্যল্প বেতন একদিকে, অপরদিকে প্রাণধারণের চাহিদা—এই দো-টানার মধ্যে পড়ে এঁদের মধ্যে কেউ কেউ আজ দুর্নীতি ও উৎকোচের শিকার হয়েছেন। আমি ব্যক্তিগত অনেককে জানি যাঁরা চাকুরি-জীবনের প্রারম্ভে ঘুষ নেওয়াকে ঘৃণা করতেন, চাকুরির প্রথম পাঁচ বছরে সুযোগ থাকা সত্ত্বেও তাঁরা ঘুষ নেন নি, কিন্তু শেষ পর্যন্ত অবস্থার চাপে পড়ে তাঁরা এই দুর্নীতিতে ধীরে ধীরে অভ্যস্ত হয়েছেন।

অসন্তুষ্ট কর্মচারীদের দিয়ে কোন কাজই হয় না। সরকারের পরিকল্পনা-সমূহ ভালভাবে কার্যকরী করতে হলে সর্বপ্রকার সরকারী কর্মচারীর সক্রিয় সহযোগিতা প্রয়োজন। এই কারণেই সরকারী কর্মচারীদের সুখ-দুঃখের দিকেও সরকারের দৃষ্টি রাখা উচিত। এটাই আশা করা সঙ্গত হবে যে সরকার তাঁর কর্মচারীদের অধিকতর বিক্ষুব্ধ করবেন না। সরকারী কর্মচারীদের দাবির বহর এমন কিছু প্রকাণ্ড নয় যা মেনে নিতে সরকারের আপত্তি হবে।

পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভার উদ্বোধন

বিধানসভার গতবারের অধিবেশন থেকে এটাই সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছিল যে এদেশে পার্লামেন্টারী গণতন্ত্রের দিন বোধ হয় ফুরিয়ে এসেছে। গতবারের বিধানসভার অধিবেশনে ক্ষমতাসীন দল বিরোধীপক্ষের ওপর যে রকম ব্যবহার করেছিল সে স্মৃতি দীর্ঘকাল লোকের স্মরণে থাকবে। নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতার ঔদ্ধত্য যখনই শাসক-দলকে পেয়ে বসে তখনই গণতন্ত্রের সমাধি রচিত হয়।

এবারে অবশ্য আবার নতুন করে বিধানসভার অধিবেশন বসেছে। এটাই এই টার্মের শেষ অধিবেশন। বিরোধী পক্ষের সদস্যগণ অভিযোগ করেছেন যে, এবারকার অধিবেশন সদস্যদের যথাবিহিত নোটিশ দিয়ে আহ্বান করা হয় নি, অস্বাভাবিক দ্রুততার সঙ্গে তা করা হয়েছে, তাড়াহুড়ো করে শাসক-দলের স্বার্থের অনুকূল কিছু আইন পাশ করিয়ে নেওয়াই যার উদ্দেশ্য।

এই বোধ হয় প্রথম বিধানসভার পুরোপুরি অধিবেশন বসেছে। এবারকার অধিবেশনে একটি নতুন জিনিস দেখা গেছে তা' হচ্ছে শ্রীঅজয়কুমার মুখোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে বাংলা কংগ্রেস দলের বিরোধী পক্ষের বেঞ্চে আসন গ্রহণ করা।

অধিবেশনের প্রথম দুদিন নিরাপদেই কেটেছে। দুর্গাপুর ও মেদিনীপুরে পুলিশী নির্যাতনের বিরুদ্ধে বিরোধী পক্ষ ধিক্কার তুলেছেন। প্রথম দিনের অধিবেশনে দুর্গাপুরে পুলিশের গুলী ও লাঠির আঘাতে নিহত শ্রীআশিস দাশগুপ্ত ও শ্রীজব্বারের স্মৃতির উদ্দেশ্যে শ্রদ্ধা নিবেদনের ব্যাপার নিয়ে বেশ কিছুটা হৈ-চৈ ও উত্তপ্ত আবহাওয়ার সৃষ্টি হয়েছিল।

যেখানেই পরিবহণ সেখানেই তেল

পরিবহণে তেলের প্রয়োজনীয়তা অপরিহার্য। যে ধরণেরই পরিবহণ হোক না কেন, তেলই তাকে সচল রাখে। ধীরগামী সাইকেল থেকে গর্জমান তীব্রগতি জেট পর্যন্ত সবেতেই তেলের প্রয়োজন, মৌল শক্তি যোগানোর জন্য অথবা লুব্রিকেশনের জন্য। পরিবহণ, কৃষিকার্য ও শিল্পের ক্রমবর্ধমান চাহিদা মেটাবার জন্য **ইণ্ডিয়ানঅয়েল** বহু রকমের পেট্রোলিয়ামজাত দ্রব্য সরবরাহ করে।

INDIANOIL

ইণ্ডিয়ান অয়েল কর্পোরেশন লিঃ

অবশ্য শেষ পর্যন্ত এই অধিবেশন চলবে কি না এখন থেকে তা' বলা সম্ভবপর নয়। দলীয় স্বার্থ যেখানে 'গণতন্ত্রের আদর্শের' চেয়ে বড় হয়ে দাঁড়ায় সেখানে আইনসভার অধিবেশনের কোন সার্থকতা থাকে না। আজ সারা দেশটাকেই এই দুর্ভাগ্যে পেয়ে বসেছে। সাম্প্রতিক রাজনীতির গতিপ্রকৃতি দেখে যাঁরা গণতন্ত্রে বিশ্বাসী তাঁরা হাল ছেড়ে দিয়েছেন।

তথাপি আমরা আশা করব যে, বর্তমানের অধিবেশন যেন সাফল্য-মণ্ডিত হয়। ক্ষমতাসীন দল এটুকু স্মরণ রাখতে হবে যে, বিরোধী পক্ষের বক্তব্যসমূহ যদি বিধানসভায় গুরুত্ব পেত, তাহলে বিরোধী দলগুলি সংসদীয় গণতন্ত্রে আস্থা হারিয়ে হয়তো প্রত্যক্ষ আন্দোলনের ক্ষেত্রে উপস্থিত হতেন না।

অশিক্ষক কলেজ কর্মচারী

'না ঘরকা না ঘাটকা'—এই প্রবচনটি যাঁদের ক্ষেত্রে বিশেষভাবে খাটে তাঁরা হচ্ছেন অশিক্ষক কলেজ কর্মচারী। এঁরা হচ্ছেন সেই জাতীয় পেশায় নিযুক্ত, যাঁদের কর্তব্য এবং দায়িত্ব অসীম, অথচ যাঁরা না পান স্বীকৃতি, না পান অর্থ, সব দিক থেকেই বঞ্চিত।

এঁদের বেতন বাড়ানো উচিত, এই ব্যাকরণের বিধিলিঙ্ দীর্ঘকাল ধরে শুনতে শুনতে দুকান ঝালাপালা হয়ে গেছে, কিন্তু বেড়ালের গলায় ঘণ্টা বাঁধবে কে? কলেজ কর্তৃপক্ষ বলেন, এঁদের যে মাইনে বাড়বে তার টাকা কোথায়?' বিশ্ববিদ্যালয় বলেন, 'হ্যাঁ তাঁদের বেতন অবশ্যই বাড়া উচিত, কিন্তু তাঁরা তো কলেজের খাস কর্মচারী কাজেই কলেজ কর্তৃপক্ষেরই কর্তব্য তাঁদের বেশি বেতন দেওয়া। আর আমরাই বা টাকা পাব কোথায়। যাই হোক মঞ্জুরী কমিশনের সঙ্গে আলাপ করে দেখি।' মঞ্জুরী কমিশন বলছেন, 'আমাদের কার্যক্রমের তালিকায় তো কলেজ কর্মচারী বলে কোন বস্তু নেই, বরং কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রীকে জিজ্ঞাসা করে দেখ।' চাগলা সাহেব বললেন, 'ব্যাপারটা সম্পূর্ণ রাজ্য সরকারের এলাকায়, কাজেই সেখানেই যাও।' রাজ্য সরকারের সাফ জবাব, 'আমরা ওই সব ব্যাপার নিয়ে মাথা ঘামাতে রাজী নই।'

কিন্তু পেটের জ্বালা বড় জ্বালা। অশিক্ষিত কলেজকর্মীরা চারদিক থেকে প্রত্যাখ্যাত হয়ে শেষ ব্যবস্থা অবলম্বন করলেন, ধর্মঘট। ফলে কলেজের ফটকেও তালা পড়ল। অভিভাবকেরা রুষ্ট হলেন, ছেলে-মেয়েদের পড়াশোনার ক্ষতি হচ্ছে। অধ্যক্ষেরা ক্রুদ্ধ হলেন কেন না ভর্তির সীজনে এই অঘটন ঘটল। এখন ছাত্র ভর্তি না হলে কলেজই বা কি করে চলবে? কেউ কেউ ক্রোধের বশে, সংবাদপত্রে বিবৃতিই দিয়ে বসলেন। অধ্যাপকমশাইদের মধ্যেও অনেকেই চটেছেন, কেন না এখন সব কলেজ বন্ধ। এই ঘাটতি পূরণ হবে পূজোর ছুটি কেটে নিয়ে।

অথচ কলেজ কর্মচারীদের অপরাধটা কোথায়? ধর্মঘটে নামা ভিন্ন তাঁরা আর কি করতে পারতেন? স্বাধীনতার উনিশ বছরের মধ্যে তাঁরা আগে কি ধর্মঘটে নেমেছিলেন? আজই বা নামলেন কেন? কার কথায় নির্ভর করে তাঁরা ধর্মঘট প্রত্যাহার করবেন? সেরকম বিশ্বাসযোগ্য ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান আছে কি?

আরও বড় কথা, তাঁরা প্রত্যক্ষভাবে ক্লাসে বক্তৃতা করেন না। কিন্তু শিক্ষার ক্ষেত্রে তাঁদের কাজগুলি কি আনপ্রোডাক্টিভ? শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে সকলেরই প্রয়োজন আছে। অধ্যাপক থেকে বাগানের মালী পর্যন্ত। এঁদের প্রত্যেকের কাজেরই শিক্ষামূল্য আছে। কিন্তু সরকারের কাছে শুধু শিক্ষক ও অধ্যাপকদেরই স্বীকৃতি আছে, তথাকথিত অশিক্ষক কর্মীদের কোন স্বীকৃতিই নেই।

কাজেই আর জল ঘোলা না করে, শিক্ষাক্ষেত্রে আরও অরাজকতা ডেকে না এনে সরকার এঁদের দায়িত্ব গ্রহণ করুন। তাছাড়া অধ্যক্ষ ও পরিচালক সমিতিগুলিকেও এঁদের দাবি মেটানোর চাপ দিন। কেন না ক্ষেত্রবিশেষে কলেজ শুধু শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানই নয়, সেই সঙ্গে লাভজনক প্রতিষ্ঠানও বটে।

চা-শ্রমিক ধর্মঘট

কোন গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে যদি কথায় কথায় পুলিশের গুলী চালানোর ঘটনা নিরবচ্ছিন্নভাবে ঘটে যেতে থাকে তাহলে সেই রাষ্ট্রের চরিত্র সম্বন্ধে সন্দেহ প্রকাশটাই স্বাভাবিক হয়ে ওঠে। বিশেষ করে সেই সব জায়গায় যেখানে আইন ও শৃঙ্খলা বিপন্ন হয়ে উঠেছে এমন কোন নজীর নেই, যেমন শ্রম-বিরোধের ক্ষেত্রে, পুলিশের পক্ষে নির্বিকার গুলী চালানো মানবতার বিরুদ্ধে একটা জঘন্য অপরাধ ভিন্ন আর কিছুই নয়। এই কিছুদিন আগেই দুর্গাপুরে একটি সাধারণ শ্রম-বিরোধের ব্যাপারকে উপলক্ষ করেই পুলিশের গুলী ও লাঠিতে দুজনের প্রাণ গেছে। সে দাগ না মুছতেই দার্জিলিং-এর চা-বাগানে অনুরূপ আর একটি ঘটনা ঘটল।

বেশ কয়েকদিন ধরেই সমগ্র উত্তরবঙ্গে বিশেষ করে ডুয়ার্স, তরাই ও দার্জিলিং অঞ্চলে চা-বাগানের শ্রমিকেরা বাঁচবার দাবিতে ধর্মঘট করছেন। তাঁদের ধর্মঘট করার কারণও সম্পূর্ণ ন্যায্য। স্বাধীনতার পূর্বে আমাদের দেশের চা-শ্রমিকদের যে অবর্ণনীয় দুর্দশাপূর্ণ জীবন যাপনের নজীর ছিল আজও তা সেই রকমই রয়ে গেছে। সেদিনকার নেতারা, চা-শ্রমিকদের দুরবস্থা নিয়ে তখন অনেক অশ্রুপাত করেছিলেন। এখন বোঝা যাচ্ছে তা' ছিল তাঁদের কুম্ভীরাশ্রু। নচেৎ দেশ স্বাধীন হবার পরেও এঁদের দিকে বিন্দুমাত্র দৃষ্টি দেওয়া হয় নি কেন। অথচ চা আমাদের দেশের একমাত্র পণ্য যা সর্বাধিক মাত্রায় বৈদেশিক মুদ্রা নিয়ে আসে।

অথচ আজও পর্যন্ত এই শিল্প থেকে বৈদেশিক মালিকানার উচ্ছেদ সম্ভবপর হয় নি, রাষ্ট্রীয়করণ তো সুদূর স্বপ্নমাত্র। এই কিছুকাল আগে পাক-ভারত সংঘর্ষের সময় জনৈক ইংরাজ চা-বাগানের মালিকের কার্যকলাপ দেশবাসীর মনে ঘৃণা ও বিস্ময়ের উদ্রেক করেছিল। জানি না তার ভারত বিরোধী কার্যকলাপের দণ্ড কি হয়েছিল, কিন্তু তাদেরই শ্রেণীর স্বার্থরক্ষার জন্য আজ সরকার দেশবাসীর ওপরই গুলী চালাচ্ছেন। একে ইতিহাসের পরিহাস না ভাগ্যের পরিহাস বলব?

আড়াই লক্ষ চা-শ্রমিক আজ দাবি আদায়ে দৃঢ়সংকল্প। তা' ছাড়া সমগ্র উত্তরবঙ্গই আজ বিক্ষুব্ধ। পশ্চিমবঙ্গ সরকার বাঙালী পুলিশ দিয়ে গোল ঠ্যাঙাতে সাহস পাচ্ছেন না, তাই বাইরে থেকে পুলিশ আনতে হয়েছে। আইনসভায় এই বিষয় নিয়ে সরকার ও বিরোধী পক্ষে তীব্র বাদানুবাদ চলছে। গুলী চালানোর ব্যাপারে মুখ্যমন্ত্রী কোন বিচার বিভাগীয় তদন্ত কমিশন বসাতে রাজী নন।

সারা দেশের সর্বস্তরেই শুধুমাত্র জীবনধারণের দাবিতে যে আন্দোলন ধূমায়িত হচ্ছে উত্তরবঙ্গের চা-শ্রমিকদের ধর্মঘট তা' থেকে কেন বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়। আমরা এটাই আশা করব যে, সরকার শ্রমিকদের স্বার্থরক্ষার জন্য চা-বাগিচার মালিকদের ওপর চাপ দেবেন এবং চা-শিল্প জাতীয়করণের

কথা বিশেষ করে চিন্তা করবেন। বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনকারী এই শিল্পটিকে গুটিকয় প্লাণ্টার্সের হাতে ছেড়ে দেওয়া যুক্তিযুক্ত নয়। এই ক'দিনের ধর্মঘটেই চা-উৎপাদন রীতিমত হ্রাস পেয়েছে।

স্বর্ণশিল্পীদের দাবি

স্বর্ণ-নিয়ন্ত্রণ আইনের উদ্দেশ্য সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়েছে, এ কথা সরকারী মহলে স্বীকৃত হওয়া সত্ত্বেও সরকার এই আইনটি কেন যে রদ করছেন না সেটা বুঝে ওঠা রীতিমত কঠিন ব্যাপার। এই আইন প্রত্যাহারের দাবিতে স্বর্ণশিল্পীরা আন্দোলন করছেন। আশ্চর্যের বিষয় এই যে এই আইন প্রত্যাহারের বিষয়টি সরকার বিবেচনা করবেন এমনতরো ঘোষণা করা সত্ত্বেও সেই ঘোষণাকে কার্যে পরিণত করার মত কোন প্রচেষ্টাই সরকারের তরফ থেকে করা হচ্ছে না। বিষয়টি অবশ্য কেন্দ্রীয় সরকারের এক্তিয়ারে। তবুও এই শিল্পের সঙ্গে পশ্চিমবঙ্গের সম্পর্ক সুগভীর এবং পশ্চিমবঙ্গের জনসমাজের একটা উল্লেখযোগ্য অংশ স্বর্ণশিল্পের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট।

যিনি স্বর্ণ-নিয়ন্ত্রণ আইনের প্রবক্তা, স্বয়ং সেই মোরারজী দেশাই পর্যন্ত প্রকাশ্যে বলেছেন যে, যেহেতু এই আইনের দ্বারা ঘোষিত উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয় নি সেহেতু অনাবশ্যক এই আইনটিকে দেশের গলায় ঝুলিয়ে রাখার কোন সার্থকতা নেই। কিন্তু ব্যাপারটা দাঁড়িয়েছে এমন যে, "জজ নড়ে তো রায় নড়ে না।" কংগ্রেস সভাপতি শ্রীকামরাজও আশ্বাস দিয়েছিলেন যে, এ বিষয়ে যথেষ্ট বিবেচনা করা হবে। কিন্তু কা কস্য পরিবেদনা।

চীনা আক্রমণজনিত অর্থনৈতিক সঙ্কট থেকে উদ্ধারলাভ এবং বাইরে থেকে ভারতে অবৈধভাবে সোনার চোরাচালান বন্ধ করবার প্রয়োজনে এই স্বর্ণ-নিয়ন্ত্রণ আইনের সৃষ্টি হয়েছিল। সেই সময় স্বর্ণবণ্ড চালু করা হয়েছিল যার দ্বারা সরকার মজুত লুকোনো সোনা সরকারী ভাণ্ডারে আনবার চেষ্টা করেছিলেন। সরকার লোভনীয় সর্ত দেওয়া সত্ত্বেও সোনার ভাণ্ডারীদের লুকোনো সোনার কিয়দংশও বার করতে পারলেন না। তাঁরা এটুকু খেয়াল করেন নি যে, এযুগে সোনাই একমাত্র সম্পদ যা স্থায়ী মূল্য বহন করে। আর যেভাবে দিনের পর দিন অর্থের মূল্য হ্রাস পাচ্ছে, এবং তা রোধ করতে সরকার যখন খোলাখুলিভাবেই অক্ষম, তখন কেউ ঘরের সোনা বার করে স্বর্ণবণ্ড কিনবে এটা কল্পনা করা যায় না। যাঁরা এই আইনের প্রণেতা তাঁরাও কেউ বিশ্বস্ততার সঙ্গে এই আইনের তাৎপর্য বোঝবার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেন নি। কেন্দ্রীয় ও রাজ্য মন্ত্রিসভা সমূহের সদস্যদের মধ্যে কে কি পরিমাণে স্বর্ণবণ্ড কিনেছেন তার যদি কোন হিসাব প্রকাশিত হয় তাহলেই ব্যাপারটা বোঝা যাবে। বরং বলা যেতে পারে স্বর্ণ-নিয়ন্ত্রণ আইন পাশ হবার সঙ্গে সঙ্গে সম্ভ্রান্ত সম্পন্ন লোকদের স্বর্ণতৃষ্ণা বৃদ্ধি পেয়েছে, বাইরে থেকে সোনার স্মাগলিং বন্ধ না হয়ে তার পরিমাণ আরও বেশি বেড়ে গেছে।

মাঝখান থেকে সর্বনাশ হয়েছে তাদের যারা স্বর্ণশিল্পী, সরকারী কলমের এক খোঁচায় ২২ ক্যারেট সোনা বে-আইনী হয়ে গেল, আর তার স্থান গ্রহণ করল ১৪ ক্যারেট। ১৪ ক্যারেটের নির্মিত গহনা পরার উপযোগী নয়, তা ছাড়া ২২ ক্যারেট সোনার গহনার গহনামূল্য ছাড়াও যে মূল্য ছিল, অর্থাৎ সাধারণ লোকের কাছে যা ছিল বিপদাপদের ভরসা, ১৪ ক্যারেটে তা হল অনুপস্থিত। ফলে ১৪ ক্যারেটের কোন বিক্রয় প্রসপেক্ট রইল না, বেকার হলেন সহস্র সহস্র স্বর্ণশিল্পী। এক কলমের খোঁচায় তাঁরা বংশানুক্রমিক উপজীবিকা থেকে বঞ্চিত হলেন। অথচ তাঁদের কোন বিকল্প ব্যবস্থা করা হল না। অনাহারে, অভাবের তাড়নায় এ পর্যন্ত সারা দেশে ২৫০ জনেরও অধিক স্বর্ণশিল্পী আত্মহত্যা করে জীবনের সব জ্বালা জুড়িয়েছেন।

আশ্চর্যের ব্যাপার হচ্ছে কি স্বর্ণ-নিয়ন্ত্রণ আইন বলবৎ থাকার পরেও কোন কোন অসাধু ব্যবসায়ী চোরা পথে প্রচুর সোনা আমদানী করে গোপনে ফলাও কারবার চালিয়ে আসছিল। তাদের খরিদ্দারদেরও অভাব ছিল না, কেন না ১৯৬৩-র পর থেকে তামাম বিবাহ উৎসবে ২২ ক্যারেটের গহনার ঘাটতি হয় নি, ১৪ ক্যারেট দিয়ে কনেকে অলংকৃত করেছেন এমন কন্যাকর্তার সন্ধান পাই নি, আর সে-রকম সালংকারা বধূকে গ্রহণ করেছেন এমন বরকর্তারও সন্ধান পাওয়া যায় নি। এই সব অসাধু ব্যবসায়ী আগে কাজ করত লুকিয়ে-চুরিয়ে কিন্তু কৃষ্ণমাচারীর আমলে পুরোনো গহনাকে নতুনে রূপান্তরিত করবার লাইসেন্স পাবার পর সে চক্ষুলজ্জার বালাই আর নেই। কিন্তু দেশে কোন স্থায়ী সোনার বাজার নেই। আর বাইরে থেকে স্মাগল করা সোনা কেনার সামর্থ্যই বা কজন ব্যবসায়ীর আছে? ফলে কতিপয় ধনশালী অসাধু ব্যবসায়ীর হয়েছে পোয়া বারো, তারা এই ডামাডোলের বাজারে লাল হয়ে যাচ্ছে। কিন্তু অধিকাংশ ব্যবসায়ী যাদের স্মাগল করা সোনা কেনার সামর্থ্য নেই, বা কেনাটা উচিত মনে করে না, বা সততার আদর্শকে জীবন থেকে এখনো বিসর্জন দেয় নি, যারা আজও বিশ্বাস করতে রাজী নয় যে বর্তমান ভারতবর্ষে সততা একটা অপরাধ, আইন মেনে চলাটাই বে-আইনী, তারা আজ সপরিবারে অনশনের সম্মুখীন। আর আছে সমগ্র ভারতে কয়েক লক্ষ হতভাগ্য স্বর্ণশিল্পী, যাদের সামনে বিস্তৃত হয়েছে দিগন্তব্যাপী অন্ধকার, বেঁচে থাকার অধিকারটুকু থেকে যারা হয়েছে বঞ্চিত, কাজ দেবার ক্ষমতা নেই অথচ কাজ কেড়ে নেবার বেলায় ষোল আনার জায়গায় আঠার আনা এমন এক সরকারের খামখেয়ালের বলি।

স্বর্ণ-নিয়ন্ত্রণ আইন ব্যর্থ হয়েছে, সরকারের তরফ থেকে এই কথাটার স্বীকৃতি পাবার পরেও সরকার কেন এই আইন তুলে নিতে এত গড়িমসি করছেন? তাহলে কি ধরে নিতে হবে যে সরকারের কোন কোন মহল সোনার সেই সব কালোবাজারীদের দ্বারা প্রভাবিত হয়েছে যারা স্মাগল করা সোনার কারবারে দিনের পর দিন মোটা দাঁও মেরে চলেছে? আর এরাই আইনটাকে তুলে নিতে বাধা দিচ্ছে?

অগ্নিযুগের একটি অধ্যায়

অনন্ত সিংহ

ঘোষণাপত্র

আমাদের অভ্যুত্থানের উদ্দেশ্য ব্যক্ত করে ও দেশবাসীকে আহ্বান জানিয়ে ঘোষণাপত্র লেখা এবং তা' ছাপিয়ে বিলি করা যে অত্যন্ত জরুরী কাজ তার সব ব্যাখ্যার প্রয়োজন করে না। তবুও আমাদের বিশেষ ত্রুটির কথা স্বীকার করতে হবে। এই ব্যাপারে আমরা সবাই একপ্রকার উদাসীন ছিলাম। শেষ পর্যন্ত অভ্যুত্থানের দিন পনেরো পূর্বে গণেশ আমাদের হেড কোয়ার্টারে প্রস্তাব আনলো এবং সেই অনুযায়ী স্থির হ'ল যে সশস্ত্র অভ্যুত্থানের সঙ্গে সঙ্গে আমরা ঘোষণাপত্র মারফৎ আমাদের উদ্দেশ্য প্রচার করব এবং দেশবাসীকে আহ্বান জানাব।

গোপনে বে-আইনীভাবে যেমন নানা ধরণের পুস্তিকা প্রভৃতি ছাপান আজকাল যেমন খুব সহজ হয়ে গেছে, সেই সময়ে আমাদের পক্ষে তা মোটেই এত সহজ ছিল না। প্রথমত আমাদের নিজেদের কোন প্রেস্ ছিল না বা কোন প্রেসে গোপনে বে-আইনীভাবে ছাপাবার বন্দোবস্ত করবার মত সুবিধেও ছিল না। এইরূপ অব্যবস্থা বা উদাসীনতার একমাত্র কারণ আমরা সেই যুগে আমাদের বাস্তব লিমিটেশনের জন্য উপলব্ধি করতে পারি নি যে প্রচার-সংগ্রামও সশস্ত্র প্রস্তুতি বা আক্রমণের চাইতে কোন অংশে কম প্রয়োজনীয় নয়। দ্বিতীয়ত বিলম্বে হলেও যখন প্রচারপত্রের প্রয়োজন অনুভব করলাম তখন ঘোষণাপত্র রচনার চাইতে ছাপাবার সমস্যা শতগুণে বেশি মনে হোল। গোপনে ছাপাতে গিয়ে ধরা পড়লে কয়েক মাসের জন্য সাজা হবে—এর বেশি তো নয়? ধরা পড়ে সাজা খাটবার প্রশ্ন আমাদের কাছে তখন বড় নয়। আমাদের কাছে প্রশ্ন ছিল যে কোনমতে ঘোষণাপত্রের একটি কপিও পুলিশের হাতে গিয়ে আগে-ভাগে পড়বে না। যদি পুলিশ একটিও হস্তগত করতে পারে তবে ঘোষণা-পত্রের বিষয়বস্তু থেকে ব্যাপক আক্রমণ সম্বন্ধে অনুমান করা তাদের পক্ষে কঠিন হবে না। সেইজন্য এক সময় এমনও মনে হয়েছিল যে, কাজ নেই আমাদের ঘোষণাপত্রের। অভ্যুত্থান যদি ভেস্তে যাওয়ার আশঙ্কা থাকে তবে তার চাইতে ঘোষণাপত্রের প্রয়োজনীয়তাকে বিসর্জন দেওয়া অনেকগুণে শ্রেয় বলে মনে হয়েছিল। এইরূপ মারাত্মক পরাজয়ের মনোভাব থেকে শেষ পর্যন্ত আমরা মুক্ত হলাম। কোন বাধাই আমাদের কাছে তখন আর বড় নয়। যে কোন উপায়ে ছাপাতে হবে। তাই বলে বাইরের যে কোন একটা প্রেসের সঙ্গে গোপনে সংযোগ-স্থাপন করে সহজে কাজ হাসিল করাটাও যুক্তিযুক্ত হবে বলে মনে করি নি।

তিনটি প্রচারপত্র বা ঘোষণাপত্র রচনা করার ভার ন্যস্ত হোল গণেশের ওপর। তিন ধরণের প্রচারপত্র গণেশ সুষ্ঠু ও সুন্দরভাবে রচনা করল। প্রত্যেকটির জন্য একটিমাত্র খসড়া এবং সেই তিনটি খসড়াই গণেশের কাছে রইল। তারপর প্রশ্ন এল—ছাপাবার। নীতিগতভাবে ঠিক করলাম অন্য কোন প্রেস বা প্রিণ্টারের সাহায্যে ছাপান হবে না। কাজ চলার মত ছোট 'হ্যাণ্ড প্রেস' আমাদের কিনতে হবে এবং আমাদের বিশ্বাসী বাছাই করা সদস্যদের দিয়ে ছাপাতে হবে। প্রেস কেনা, গুপ্ত স্থানে রাখা, গোপনে ছাপান এবং তারপর ছাপান ইস্তাহার-গুলি সযত্নে সবার চোখের অন্তরালে রাখা প্রভৃতির সব ভার স্বয়ং গণেশ নিল।

প্রেস কেনা হোল। সঙ্গে যা টাইপ ছিল তা' পর্যাপ্ত নয়। সেই হেতু গণেশ তার এক আত্মীয় যুবকের মারফৎ কোন এক প্রেস থেকে প্রয়োজন অনুযায়ী টাইপ সংগ্রহ করল। বলা বাহুল্য যে, গণেশের এই যুবক আত্মীয় কোন এক বড় প্রেসে কাজ করত।

গণেশ তার সঙ্গে দু'জন বিপ্লবী সাথীকে নিয়ে ছাপাতে গিয়ে এক সমস্যায় পড়ল। কত চেষ্টা করল কিন্তু কোনমতে কাগজে আর ছাপ পড়ে না। তারপর গণেশ তার যুবক আত্মীয়ের কাছে জানতে পারলো যে ছাপাবার পূর্ব মুহূর্তে কাগজ-গুলিকে একের পর এক ভেজা ন্যাকড়া দিয়ে একটু বুলিয়ে নিতে হয়। ঠিক তাই—তারপর ছাপাতে আর কষ্ট হোল না। তিন ধরণের ছাপাবার কাজ শেষ করে তিনটে প্যাকেটে ইস্তাহারগুলিকে বাঁধা হোল। গণেশ দাঁড়িয়ে স্বচক্ষে দেখল যেন একটি কপিও ভুলে পড়ে না থাকে।

নীচে তিনটি প্রচারপত্রের পূর্ণ কপি দিচ্ছি। প্রথম ঘোষণা ঃ—

"Indian Republican Army"

"The Indian Republican Army, Chittagong Branch.

hereby solemnly declares it intention to stand to-day aginst the agelong repression by the British people and their Government which they have followed as a cruel policy to keep the three hundred millions of Indian people subjugated for unlimited time and to eradicate the slightest trace of nationalism and their national originality amongst them.

The right of ownership of India and the control of her destiny belongs to the people of India only and the long usurpation of that right by a foreign people and Government has not extinguished that right nor it ever CAN. The Indian Republican Army proclaims to-day its intention of asserting this right in arms in the face of the world and thus put into actual practice the idea of Indian Independence declared by the Indian National Congress; and hereby pledges the life of everyone of its members to the cause of freedom, to the welfare and exaltation of the Mother Land amongst all other nations.

It remembers to-day with sorrowful indignation the inhuman massacre of the Indian people perpetrated by the British Government on the Indian soil, the blowing up of her womanfolk in the mouth of guns, the indiscriminate hangings and cold-blooded murders of her manhood, the crushing of her infants under the cruel British foot and the complete destruction of her trade and industries and takes up the sacred vow of retaliating and avenging the blood of her late wronged children.

The Indian Republican Army, is entitled to and hereby claims the allegiance of every Indian people for the upkeep of the national cause and honour and also prays that no person who reveres this cause will dishonour it by callousness, cowardice and inhumanity. In this supreme hour the Chittagong people must, by their valour and patriotism and by the readiness of her children to sacrifice themselves for the common good, prove themselves worthy of the august desting to which they are called.

By Order
President in Council
Indian Republican Army,
Chittagong Barnch."

[বৃটিশ ও তাহার সরকার বহু শতাব্দী ধরিয়া ত্রিশ কোটি ভারতবাসীকে চির পদানত করিয়া রাখিবার ও তাহাদের সামান্যতম জাতীয়তাবোধ ও জাতীয় ঐতিহ্য নিশ্চিহ্ন করিয়া ফেলিবার উদ্দেশ্যে নিষ্পেষণের যে নিষ্ঠুর নীতি অনুসরণ করিয়াছে তাহার বিরুদ্ধে আজ 'ভারতীয় গণতন্ত্র বাহিনীর চট্টগ্রাম শাখা' সশস্ত্র অভ্যুত্থানের অভিপ্রায়ে যথাবিধি গুরুত্ব সহকারে ঘোষণা করিতেছে।

ভারতের মালিকানাস্বত্ব ও ভাগ্য-নিয়ন্ত্রণের অধিকার একমাত্র ভারতের জনসাধারণেরই আছে; দীর্ঘকালব্যাপী বৈদেশিক রাজশক্তি সেই অধিকার খর্ব করিয়া আসিতেছে বলিয়া আমাদের স্বাধীনতা-স্পৃহাকে সে কখনও নির্বাপিত করিতে পারে নাই, কখনও পারিবেও না।

অস্ত্রের সংঘাতে সমগ্র জগতের সমক্ষে আজ ভারতীয় গণতন্ত্র বাহিনী এই অধিকার লাভের আকাঙ্ক্ষা উচ্চকণ্ঠে ঘোষণা করিতেছে এবং এইভাবে ভারতের জাতীয় কংগ্রেস-ঘোষিত স্বাধীনতার আদর্শ বাস্তবে কার্যে পরিণত করিতে সঙ্কল্প করিয়াছে। পৃথিবীর অন্যান্য জাতির মাঝখানে স্বাধীনতার মহান উদ্দেশ্য এবং মাতৃভূমির মর্যাদা অক্ষুণ্ণ রাখিতে প্রতিটি সভ্য আজ জীবনপণ শপথ গ্রহণ করিতেছে।

ঘৃণাভরে আজ তাহারা স্মরণ করিতেছে ভারতভূমিতে বৃটিশ সরকার অনুষ্ঠিত সেই সমস্ত হৃদয়বিদারক ঘৃণিত কার্যকলাপ—নৃশংসভাবে ও নির্বিচারে ভারতের তরুণদের হত্যা ও ফাঁ ভারতীয় নারীর অবমাননা, ক্রূর বৃটিশ বুটে দুগ্ধপোষ্য শিশুদের নিষ্পেষণ; এবং ব্যবসা ও শিল্পের সম্পূর্ণ ধ্বংসসাধন। সেই নিহত সন্তানদের রক্তের বিনিময়ে প্রতিহিংসা ও প্রতিশোধ গ্রহণের জন্য আজ তাহারা পবিত্র শপথ গ্রহণ করিতেছে।

ভারতীয় গণতন্ত্র বাহিনী আজ এই যোগ্যতার অধিকারী এবং জাতীয় স্বার্থ ও সম্মান রক্ষার প্রয়োজনে ভারতীয় জনগণের আনুগত্য দাবি করিতেছে; তাহাদের একান্ত অনুরোধ এই আদর্শে আস্থাবান কোন ভারতবাসীই নিজ শিথিলতা, ভীরুতা ও অমানুষিকতার দ্বারা ইহার অসম্মান না করে। এই মহাক্ষণে চট্টগ্রামবাসী নিশ্চয়ই বিক্রম, স্বদেশ-প্রেম এবং সর্বজনের কল্যাণার্থে আপন সন্তানদের আত্মাহুতির প্রেরণা যুগিয়ে নিজ যোগ্যতা প্রমাণ করিবে।"]

আজ থেকে ছাত্রিশ বৎসর পূর্বে এই প্রচারপত্র রচনা করা হয়েছে ভারতীয় গণতন্ত্র বাহিনী চট্টগ্রাম শাখার পক্ষ থেকে। এই পরিপ্রেক্ষিতে লক্ষ্য করবার আছে যে, সেই যুগেও আমরা অন্তরের বিপ্লবী প্রেরণা দিয়ে বুঝেছিলাম ঃ "ভারতের মালিকানা-স্বত্ব ও ভাগ্যনিয়ন্ত্রণের অধিকার এক-মাত্র ভারতের জনসাধারণেরই আছে।" এই প্রচারপত্রে আরও দেখা যায় যে আমরা ভারতের জাতীয় কংগ্রেস-ঘোষিত স্বাধীনতার আদর্শ, যা প্রথমে সুভাষবাবু কলকাতা কংগ্রেস অধিবেশনে বাংলার বিপ্লবী দলের মুখপাত্র হিসাবে প্রস্তাব করেছিলেন, সেই পূর্ণ স্বাধীনতা লাভের জন্য আমরা অহিংসা আন্দোলনের পরিবর্তে সশস্ত্র অভিযানের জন্য আহ্বান জানালাম চট্টগ্রামের সশস্ত্র যুব-অভ্যুত্থানের মাধ্যমে।

দ্বিতীয় ঘোষণা

দ্বিতীয় ঘোষণাপত্রটি চট্টগ্রামের ছাত্র ও যুব-সমাজকে সম্বোধন করে করা হয়েছিল। আমাদের মামলার জাজমেণ্ট কপির ৬১ পৃষ্ঠায় উল্লেখ আছে ঃ—

"The Indian Republican Army."

To the Students and Youths of Chittagong.

"Dear Brothers,

The Indian Republican Army has made an attempt to

assert its rightful claim to liberate the country from the cruel yoke and oppression of the British people and their Government and has kept up flying the ensign of free India.

The British Government during the last 200 years of their tyrannical reign in India, have crushed with very cruel hands the Indian every time they have tried to achieve freedom and this time also they will not spare any energy to restore their illegal establishment for predatory exploitation.

So brothers rise up to the situation, try to feel the anguish of subjugation, see to the sad plights your country youths and students of Germany, Russia and China are doing, Kindle up the fire of wrath and retaliation in your hearts. Enroll yourselves as soldiers under the Indian Republican Army and make an ardent attempt to save the Motherland from the abyss of misfortune and misery.

By Order
President in Council,
Indian Republican Army,
Chittagong Branch.

[বৃটিশ সরকারের নিষ্ঠুর বন্ধন ও উৎপীড়ন হইতে দেশকে মুক্ত করিবার জন্য 'ভারতের গণতন্ত্র বাহিনী' আজ একটা আঘাত হানিয়াছে এবং স্বাধীন ভারতবর্ষের প্রতীক পতাকা উড্ডীন করিয়াছে।

বৃটিশ সরকার, দুশ' বছরের অত্যাচারে জর্জরিত ভারত-আধিপত্য কালে, প্রত্যেকবারই ভারতবাসীর স্বাধীনতা অর্জনের চেষ্টাকে অতি নির্দয় হস্তে বিনষ্ট করিয়াছে এবং এবারও তাহারা তাহাদের দস্যুবৃত্তির বে-আইনী সংস্থা পুনঃ স্থাপিত করিবার জন্য কোন শক্তি ব্যয় করিতে পরাঙ্মুখ হইবে না।

অতএব, ভাই সব, ওঠ, পারিপার্শ্বিক অবস্থার দিকে তাকাও, পরাধীনতার নিদারুণ যন্ত্রণা উপলব্ধি কর, চাহিয়া দেখ তোমার মাতৃভূমি কি করুণ লাঞ্ছনায় লাঞ্ছিতা; জার্মানি, রুশ এবং চীনের যুবক ও ছাত্ররা যেরূপ অভিযান চালাইতেছে তোমরাও তাহাই কর, তোমার অন্তরে প্রতিশোধ ও প্রতিহিংসার আগুন প্রজ্বলিত কর। সৈন্য হিসাবে 'ভারতের গণতন্ত্র বাহিনী'তে ভর্তি হও এবং মাতৃভূমিকে দুঃখ দুর্ভাগ্যের অতল গহ্বর হইতে বাঁচাইতে চেষ্টা কর।]

এই প্রচারপত্রে স্পষ্টভাবে জানা যায় যে, আমরা আগে থেকেই জানতাম আমাদের সীমারেখা। বৃটিশ সরকার তার প্রচণ্ড শক্তির জোরে নৃশংসভাবে আমাদের ক্ষুদ্র যুব-অভ্যুত্থানকে সামরিক ক্ষেত্রে পরাভূত করবে। যুদ্ধে জয় হবে জেনে যুদ্ধ করা এক কথা আর নিশ্চিত মৃত্যু জেনেও সমর ক্ষেত্রের বীরত্বপূর্ণ অভীপ্সা সম্পূর্ণ আলাদা কথা। তবে ক্ষ্যাপার দলের ব্যর্থ প্রয়াস কেন? তারা জানত তাদের বীরত্বপূর্ণ আত্মত্যাগ কখনও ব্যর্থ হবে না—ভারতবাসী তাদের আত্মত্যাগ, সংগঠন ও বীরত্বপূর্ণ আদর্শে উদ্বুদ্ধ হবে এবং ভবিষ্যতে স্বাধীনতা অর্জন করবে।

তৃতীয় ঘোষণা

তৃতীয় প্রচারপত্রের ইংরেজী নকল জাজমেণ্ট কপি থেকে উদ্ধৃত করছি :—

"To the Citizens of Chittagong.

"The Indian Republican Army hereby directs and commands every man, woman and son of Chittagong to capture and produce dead or alive forthwith at the Head Qrs. of the Army all Englishmen and white-skinned Anglo-Indians who are hostile to our National aspirations. The Indian Republican Army anounces that every body who will produce the demanded persons will be amply rewarded.

By Order,
President-in-Council,
Indian Republican Army,
Chittagong Branch."

["চট্টগ্রামবাসীদের প্রতি—

"ভারতের সাধারণতন্ত্র বাহিনী" চট্টগ্রামের প্রত্যেক স্ত্রী, পুরুষ এবং তার সন্তানদের আদেশ দিতেছে যেন তাঁহারা সকল ইংরাজ ও শ্বেতাঙ্গ অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান, যাহারা আমাদের জাতীয় আশা-অকাঙ্ক্ষার প্রতিবন্ধক, তাহাদের জীবিত বা মৃত যে-কোন অবস্থায় হেড কোয়ার্টারে উপস্থিত করেন। 'ভারতের গণতন্ত্র বাহিনী' ঘোষণা করিতেছে যে, দাবি অনুযায়ী ঐ সমস্ত লোকদের যে কোন সামরিক দপ্তরে সমর্পণ করিতে পারিবে তাহাকে যথেষ্ট পরিমাণে পুরস্কৃত করা হইবে।

'ভারতের গণতন্ত্র বাহিনীর
চট্টগ্রাম শাখার
কাউন্সিলের সভাপতির
আদেশক্রমে।"]

ইউরোপীয়ান সাহেবদের হত্যা করা আমাদের প্রোগ্রামে গৃহীত হয়েছিল। সশস্ত্র আক্রমণ করে শত্রুর সব সামরিক ঘাঁটি দখল করে নেওয়া ঠিক ছিল। তবু আমরা ভেবেছিলাম বৃটিশ প্রতিভূদের নিজেদের রক্ত দিয়ে প্রায়শ্চিত্ত করতে হবে তাদের এতদিনের তাণ্ডব অত্যাচারের বদলে। তাই আমরাও তাদের মত নির্দয় নিষ্ঠুর। তাই এইরূপ নির্মম ও কঠোর আদেশ—জীবিত বা মৃত ফিরিঙ্গীদের চাই! আজ ছত্রিশ বছর পরে সেদিনকার এই ঘোষণা নিয়ে গবেষণা করা চলতে পারে; কিন্তু এতখানি ক্রোধ ও প্রতিহিংসার আগুন বুকে প্রজ্বলিত না হলে সেইদিন কি প্রবল শত্রুর বিরুদ্ধে নিশ্চিত মৃত্যু জেনেও যুদ্ধ করা সম্ভব হোত?

সংবাদ সংগ্রহ

সাধারণভাবে আক্রমণের মোটামুটি প্ল্যান আমাদের বেশ কিছু সময় আগে থেকেই ঠিক করা ছিল। প্ল্যানটি—স্থির করবার পর মাস্টারদার কাছে, গণেশ ও আমি তা' জানাই। এই বিষয় আগে উল্লেখ করেছি। জেনারেল (সাধারণ) প্ল্যান চোখের সামনে থাকা প্রয়োজন। কিন্তু জেনারেল প্ল্যান আর একটুও বাড়তে পারে না যতক্ষণ সেই জেনারেল প্ল্যানটিকে বাস্তব ক্ষেত্রে রূপ দিতে concretise (প্রত্যক্ষভাবে মূর্ত) করে তোলা না হয়। প্ল্যানকে বাস্তব রূপ দেওয়া তখনই সম্ভব যখন শত্রুর ঘাঁটিগুলির পূর্ণ ও যথাযথ সংবাদ পাওয়া যায়। নিজেদের শক্তি অনুযায়ী সংবাদের ওপর ভিত্তি করে সঠিক একটি আক্রমণের প্ল্যান করা সম্ভব।

আমাদের অস্ত্রশস্ত্র ও হাত বোমার সংখ্যা ও আয়োজন সম্বন্ধে হেড কোয়ার্টার নিশ্চয়ই অবগত ছিল। প্রথম আক্রমণের জন্য প্রথম সারির কতজন নির্ভরযোগ্য সভ্য ও শত্রুঘাঁটি বিধ্বস্ত করবার পরমুহূর্তে আর কতজন তৈরি যুবক আমাদের সংঘের সভ্য তার একটা সঠিক ধারণা আমাদের নিশ্চয়ই করতে হয়েছিল। কতজন সভ্য মোটর গাড়ি চালাতে পারে ও ক'টি প্রাইভেট গাড়ি আমাদের নিজ আওতায় আছে এবং ক'টি ট্যাক্সি আমরা বলপূর্বক হস্তগত করে আক্রমণের কাজে ব্যবহার করতে পারব তার একটা হিসেবও যে আগে থেকে আমাদের করা হয়েছিল তা বলাই বাহুল্য। এ ছাড়া আমাদের হাতে আর কতদিন সময় আছে তাও ভাবতে হয়েছিল। অর্থাৎ পুলিশ আমাদের বিরুদ্ধে যেভাবে সজাগ ও তৎপর হয়ে উঠল সেই পরিপ্রেক্ষিতে আমাদের আর কতদিন বিলম্ব করা উচিত? প্রথম initiative কে নেবে—পুলিশ না আমরা? দ্বিধাগ্রস্ততার কোন স্থান বা scope আমাদের ছিল না। আমাদের দ্বিধাগ্রস্ত মনোভাব যদি বিলম্বের কারণ হোত তবে স্থির বলা যায় যে, ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে চট্টগ্রামের যুব-বিদ্রোহের গৌরবময় অধ্যায় স্বর্ণাক্ষরে লিপিবদ্ধ হোত না।

এই সব উপকরণ ও অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে আমরা আমাদের আক্রমণের প্ল্যান চূড়ান্তভাবে (finalise) করতে পারি নি যতক্ষণ না আমরা শত্রুঘাঁটির বিশদ সংবাদ সংগ্রহ করতে পেরেছি। নিজেদের সৈন্যদের কিভাবে mobilise করব এবং কিভাবে তাদের deplay করব যদি নাকি শত্রুর অবস্থান ও শক্তি সম্বন্ধে সঠিক ধারণা না থাকে? সেইজন্য সংবাদ সংগ্রহের এই সুকঠিন কাজটি দায়িত্বপূর্ণভাবে সম্পন্ন করতে গণেশ ও আমি ভার নিয়েছিলাম।

চট্টগ্রামে দুটি প্রধান শত্রুঘাঁটি। একটি আসাম-বেঙ্গল রেলওয়ে বেটালিয়ান A.F.I.-এর হেড কোয়ার্টার; আর একটি হোল পুলিশ লাইন। তাছাড়া পাহাড়তলী ওয়ার্কশপে ও ডবল মুড়িং জেটিতে দুটি ছোট ছোট আসাম-বেঙ্গল রেল বেটালিয়ানের রক্ষী ঘাঁটি ছিল। শহরে ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্ক (ইংরেজ আমলে), জেল, কোতোয়ালী প্রভৃতির অবস্থান ছিল। গোটা তিনেক বন্দুকের দোকান—তার মধ্যে মাত্র একটি দোকানই বেশ বড় ও চালু ছিল। যুগপৎ ঝটিকা বেগে অতর্কিতে আক্রমণ করে চট্টগ্রাম শহর দখল করে নেওয়ার প্ল্যানের ছকটির সঙ্গে আরও দুটি strategic বিষয়ের সমাধান প্রকান্ত প্রয়োজন ছিল। প্রথমটি হোল টেলিফোন-টেলিগ্রাফ অফিস ধ্বংস করা এবং দুটি স্থানে রেললাইন উৎপাটন করে রেলগাড়ি লাইনচ্যুত করে বহির্জগৎ হতে চট্টগ্রামকে সাময়িকভাবে সব রকম যোগাযোগ থেকে বিচ্ছিন্ন করা। আর একটি বিষয়ে আমাদের লক্ষ্য স্বভাবতই ছিল। দু-একটা সমুদ্রগামী স্টীমার চট্টগ্রাম বন্দরে সব সময়েই থাকত। এইসব স্টীমারে বেতার সংবাদ চলাচলের যে ব্যবস্থা আছে তা' কারো কাছেই অজানা নেই—আমাদেরও এই প্রাথমিক জ্ঞানের অভাব হওয়ার কোন কারণ ছিল না।

আমাদের শক্তি ক্ষমতা ও ধার্য সময়ের মধ্যে প্ল্যানের রূপ দিতে হবে। যে-সমস্ত শত্রুঘাঁটি সম্বন্ধে সাধারণ ধারণা আমাদের ছিল আমাদের সীমাবদ্ধ শক্তিতে নির্ভর করে সেই সব ক'টি লক্ষ্যবস্তুর ওপর আক্রমণ চালান সম্ভব ছিল না। তাই বাছাই করতে হয়েছিল essentials first (প্রথমেই যা অপরিহার্য)। নিম্নলিখিত ক'টি অপরিহার্য বিষয় ও ঘাঁটি সম্বন্ধে সংবাদ সংগ্রহ করার জন্য আমরা এই ব্যবস্থা করলাম ঃ—

(১) টেলিফোন অফিস—

ত্রিপুরা সেনকে ভার দেওয়া হোল, সে টেলিফোন-টেলিগ্রাফ অফিসের পুঙ্খানুপুঙ্খ সংবাদ সংগ্রহ করবে: বিশদভাবে তাকে শেখানো হোল কি ভাবে সে সংবাদ নেবে ও কি কি বিষয় সে নিখুঁতভাবে লক্ষ্য করবে। কোন কোন সময় কতজন কর্মী বা অফিস বাবুরা থাকে: কখন তাদের shift; কোন shift-এ কতজন থাকে; কতগুলো দরজা, জানলা— তাদের আকার (size) কি? তাদের মধ্যে ক'টি কাচের, কাঠের এবং লোহার; ক'টি বারান্দা; প্রত্যেক ঘরের সঙ্গে অন্য ঘরের কিরূপ যোগাযোগ ব্যবস্থা; তাদের উচ্চতা; বিজলীর আলো, পাখা, বিভিন্ন ফার্নিচার, সিঁড়ি, লন, কোয়ার্টার ইত্যাদি, টেলিফোন এক্সচেঞ্জ ঘরের ও টেলিফোন ট্রান্সমিশন যন্ত্র প্রভৃতির বিশদ খবর ও ঐ সবের eye sketch করে আমাদের দেবে। যদি ফটো তোলা প্রয়োজন মনে করে তবে তাও করবে। বিশেষ করে শিখিয়েছিলাম যেন সে আপাতদৃষ্টিতে প্রয়োজন নেই মনে করে অতি সামান্য ও তুচ্ছ জিনিসেরও বিশদ সংবাদ দিতে গাফিলতি না করে। আমরা তকে ও অন্যান্য বন্ধুদের শিখিয়েছিলাম ও বোঝাতে চেষ্টা করেছি যে খুব তুচ্ছ ও সামান্য জিনিস ও অবস্থার সংবাদও বিশেষ প্রয়োজনে লাগতে পারে। একটি মাত্র ইট, ছোট একটি চারা গাছ, সিঁড়ির গা ঘেঁষে সরু একটি ছিদ্র একটা ফাটল তাও আমাদের বিশেষ ক্ষেত্রে প্রয়োজনে আসতে পারে—কে জানে সেখানে আমরা একটা ইলেকট্রিক সুইচ, ফাটল জুড়ে ইলেকট্রিক তার বা সরু ছিদ্রে ডিনামাইট বা গানকটন রাখার ব্যবস্থা করব না? আমাদের কি ধরণের বিশদ ও নিখুঁত সংবাদ প্রয়োজন ছিল তা ত্রিপুরার মত বিচক্ষণ যুবকের বুঝতে খুব সময় লাগে নি। তাকে সময় দেওয়া হয়েছিল পনেরো দিনের। এরই মধ্যে পূর্ণ সংবাদ সংগ্রহ করে দেওয়ার নির্দেশ ছিল।

(২) A. F. I. Hq.

সুবোধ চৌধুরীর ওপর দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল A. F. I. Hq. সম্বন্ধে সব রকম তথ্য নিখুঁতভাবে সংগ্রহ করবার এবং কি কি বিশেষ তথ্য আমাদের প্রয়োজন তা তাকে আমরা বলেছি। তাছাড়া যত সামান্য খুঁটিনাটি বিষয় বা ক্ষুদ্র কোন জিনিসের অস্তিত্ব থাকুক না কেন, সব কিছুরই নিখুঁত সংবাদ 'ম্যাপ' সহ দেওয়ার জন্য তার ওপর নির্দেশ ছিল। ফটো তোলার প্রয়োজন থাকলে এবং সম্ভব হলে ফটো তুলে আনবে। তারও সংবাদ সংগ্রহ করবার নির্দিষ্ট সময় ছিল পনেরো দিন।

A. F. I. Hq. সম্বন্ধে বিশেষ সংবাদের প্রয়োজন ছিল। তার আর্মারীর দুটি দরজার সবিস্তার রিপোর্ট আমাদের চাই। এই দুটি দরজা খোলা বা ভাঙবার ব্যবস্থা না করলেই নয়। বলিষ্ঠ অতিকায় পাঠান রক্ষীরা এই A. F. I. Battalion Hq. পাহারা দিত। তা সত্ত্বেও তাদের পরাস্ত করে সুরক্ষিত গার্ডরুম দখল করা খুব কঠিন ছিল না। কিন্তু গার্ডদের পরাস্ত করলেও আর্মারী খুলব কি করে? রাস্তা থেকে দেখে মনে হোত আর্মারীতে রক্ষিত ছিল কয়েকটি লুইস গান (এক ধরণের ছোট আগেকার দিনের মেশিন কামান, যা থেকে আড়াই সেকেন্ডে ৪৭টি ·৩০৩ ব্যাসের টোটা 'ফায়ার' করা যেত); দশ শটের ম্যাগাজিন রাইফেল ও অ্যামুনিশেন। ঐ অস্ত্রশস্ত্র আমাদের

নেওয়া চাই। তাই দরজা খোলার সমস্যা আমাদের কাছে খুব বড় করে দেখা দিয়েছিল। সেই জন্য দুটি দরজার পুঙ্খানুপুঙ্খ খবর পাওয়া আমাদের একান্ত প্রয়োজন ছিল। সুবোধ চৌধুরী রেলের ক্লাস কোয়ার্টারে থাকত এবং তার আসা যাওয়ার পথে এই Hq.টি পড়ত। কি করে এই Hq.টিকে অধিকার করবার জন্য প্ল্যান করা হোল বা ঐ দুটি লোহার দরজা খোলা বা ভাঙবার জন্য নানা ধরণের বিকল্প ব্যবস্থা করা হোল তার কারণ, সম্ভাব্য সবরকম তথ্য আমরা আগে সংগ্রহ করতে পেরেছিলাম।

(৩) পুলিশ লাইন—

পুলিশ লাইন—চট্টগ্রাম জেলার পুলিশ হেড কোয়ার্টার যেখানে ব্যারাকে বন্দুকধারী পুলিশ থাকত। পাহাড়ে ঘেরা জায়গা। আর্মারী, ম্যাগাজিন, গার্ডরুম, এলার্ম ঘণ্টি বাজাবার স্থান, সেপাইদের প্যারেড করবার মাঠ, অফিসার-ইন-চার্জের কোয়ার্টার প্রভৃতির বিস্তারিত সংবাদ গ্রহণের একান্ত প্রয়োজন। পুলিশ লাইনের অবস্থান একেবারে শহরের উপকণ্ঠে। কাজেই লোক চলাচল নেই বললেই চলে। পাবলিকের যাতায়াত থাকলে খবর নেওয়ার অনেক সহজ সুযোগ পেয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা ছিল। A. F. I. Hq. পাহাড়তলীর প্রধান রাস্তার ধারে মাঠের মধ্যে অবস্থিত বলে পথ চলার সময়েও সামরিক রক্ষীদের ঘোরাফেরা, position, আর্মারী, গার্ডরুম প্রভৃতি দূর থেকে লক্ষ্য করে একটা মোটামুটি আন্দাজ করা যেত। পুলিশ লাইনের সাধারণ আন্দাজ করাও সম্ভব ছিল না তার পাহাড়ে ঘেরা এলাকার মধ্যে প্রবেশ না করে। পুলিশ লাইন ও A. F. I. Hq. সম্বন্ধে আমাদের বিস্তারিত নিখুঁত তথ্যের প্রয়োজন তো ছিলই তবু ঐ দুটি স্থানের চারপাশের অবস্থার সংবাদের গুরুত্বও কম ছিল না। A. F. I. Hq. খুব সুরক্ষিত। তবে সেখানে ব্যারাক ছিল না। স্থায়িভাবে A. F. I. সৈন্যরা আর্মারী সংলগ্ন কোন স্থানে থাকত না। চারপাশের অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে A. F. I. Hq.টি পুলিশ লাইনের অবস্থান থেকে সুবিধের ছিল। অর্থাৎ, আকস্মিক আক্রমণ করবার সুযোগ ছিল অনেক বেশি।

পুলিশ লাইনের তথ্য সংগ্রহ করা অপেক্ষাকৃত দুঃসাধ্য বলে মনে হয়েছিল। গণেশ ও আমার এক সঙ্গে পুলিশ লাইনের সংবাদ সংগ্রহ করার ভার নিতে হোল। A. F. I. Hq.-এর ভার সুবোধ চৌধুরীর ওপর ন্যস্ত থাকা সত্ত্বেও আমাদের খুব ঘনিষ্ঠ তত্ত্বাবধানে সে কাজ করে গেছে।

যখন পুলিশ লাইনের সংবাদ সংগ্রহের ভার আমাদের ওপর এসে পড়ল তখন প্রথমে কাজ সুরু করবার আগে ব্যাপারটা দুরূহ ও প্রায় অসম্ভব বলে মনে হয়েছিল। যে কোন শক্ত ও বিপদসঙ্কুল কাজের প্রারম্ভে ঐরূপ সম্ভব-অসম্ভব, আপদ-বিপদ, ভাল-মন্দ; পারা-না-পারা, নানা ভাবনায় মন অস্থির হয়। এই অভিজ্ঞতা ছিল, তাছাড়া মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ করে অনুভব করেছিলাম—যুবক বন্ধুরাও এই দ্বিধা ও দ্বন্দ্বের সম্মুখীন হবে। তাই তাদের এইরূপ অবস্থার সম্মুখীন হতে প্রথম থেকেই psychologically (মনস্তাত্ত্বিকভাবে) প্রস্তুত হতে সাহায্য করি। বলা বাহুল্য যখন অন্যদের psychologically প্রস্তুত হতে বলছি তখন নিজেরাও মানসিক প্রস্তুতির দিক থেকে পিছিয়ে পড়তে চাই নি।

সংবাদ সংগ্রহ করতেই হবে। ভাবতে লাগলাম কি করা যায়! দুজনে মোটরগাড়ি করে ওয়াটার ওয়ার্কস কম্পাউন্ডের ও পুলিশ লাইনের টিলার মাঝখান দিয়ে যে রাস্তা উত্তর দিকে চলে গেছে তা দিয়ে এগিয়ে গেলাম। সেইরূপভাবে আগেও অনেকবার আমরা গিয়েছি। কিন্তু গাড়িতে বা হেঁটে যাওয়ার সময় যেটুকু দেখা যায় বা বোঝা যায়-তাতে পুলিশ লাইনের অস্তিত্বটাই অনুভব করা মাত্র সম্ভব। পুলিশ লাইনের মধ্যে ঢোকা প্রয়োজন এবং তাদের অফিস, গার্ডরুম, আর্মারী, ম্যাগাজিন, পুলিশের ব্যারাক প্রভৃতির খোঁজ না পেলে এবং পুলিশের গতায়াতের বিষয় জানতে না পারলে যে আক্রমণের ট্যাকটিক্স ঠিক করা যাচ্ছে না। হাতে সময়ও বেশি নেই। সবাইকে সংবাদ সংগ্রহের জন্য পনেরো দিন মাত্র সময় দেওয়া হয়েছে। একদিন দুদিন তিনদিন চলে গেল। আমরা অস্থির হয়ে উঠলাম। আগের দিন হলে হয়ত মায়ের কাছে কেঁদে প্রার্থনা জানাতাম, বলতাম—'মা তুমি মুখ ফিরিয়ে রইলে কেন? একটা উপায় কর মা!' কিন্তু এই সময়ে "মার" কথা মনেই পড়ে নি। এর আগেই আমি মা কালীর বিসর্জন দিয়েছি। বাধার সম্মুখীন হয়ে মায়ের কাছে কাঁদতে না বসে এবার নিজের পুরুষকারের ওপরেই নির্ভর করলাম। সমস্যার সমাধানের জন্য বাস্তব উপায় চিন্তা করতে লাগলাম।

মনে হতে লাগল যদি কোন সাধারণ কনেস্টবল বা ছোটখাট অ্যাসিস্টেন্ট সব-ইনস্পেক্টারকে হাত করতে পারি তবে হয়ত আমাদের সংবাদ সংগ্রহের কাজ সহজে হবে। জেলের সেপাইদের হাত করার অভিজ্ঞতা ইতিমধ্যে আমরা কিছুটা লাভ করেছি। গ্রামে অন্তরীণ থাকার সময় থানার পুলিশ কনেস্টবলদের সঙ্গেও মেলামেশা করেছি। তাই সুযোগ করে নিয়ে পুলিশ লাইনের কোন কনেস্টবলের সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারব না—তা মনে হয় নি। তা হয়ত খুবই সহজ ছিল; কিন্তু ভাবছিলাম—যাকে মনোনীত করে আমাদের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে প্রস্তাব করব সে যদি শেষ পর্যন্ত বাগ না মানে? সেই ক্ষেত্রে আমাদের প্ল্যানের আভাস সে বুঝে নিয়ে আমাদের বিপদে ফেলতে পারে। কেবল তাই নয়—জেলা কর্তৃপক্ষ তৎপর হবে ও আমাদের সুযোগ না দিয়ে তারাই আক্রমণ করবে প্রথমে।

অন্য উপায় ভাবতে লাগলাম। ভিন্ন পথে চিন্তা পরিচালিত করলাম। আমাদের সংগঠনের কোন সভ্যের আত্মীয় বা বন্ধুর সঙ্গে পুলিশ লাইনের কারো সঙ্গে আত্মীয়তা আছে কি না তার খোঁজ নিতে লাগলাম। সংগঠনের সভ্যদের কাছে নানা কথার ছলে জিজ্ঞাসাবাদ ও ব্যাপক অনুসন্ধান চালালাম। খোঁজ পেয়ে গেলাম কাজীমালী স্কুলের সপ্তম বা অষ্টম শ্রেণীর একজন ছাত্রের বাবা সঞ্জীববাবু পুলিশ লাইনের ইন-চার্জ। এই ছেলেটি আমাদের সংঘের কর্মী বীরেনের সঙ্গে পড়ত। বীরেনের কাছে খোঁজ নিয়ে জানলাম যে সে তার সঙ্গে প্রাথমিক বৈপ্লবিক কথাবার্তা বলেছে রিক্রুট করবার উদ্দেশ্যে। আমরা বীরেনকে বললাম সেই ছেলেটির সঙ্গে আমাদের পরিচয় করে দিতে।

সঞ্জীববাবুর ছেলের নাম আজ আমার মনে নেই। সপ্তম বা অষ্টম শ্রেণীর ছাত্র কি বা কি বা তার বয়স? ছোটখাট দেখতে। প্রথম দৃষ্টিতে খুব একটা আকর্ষণীয় বলে মনে হয় না। তবু যতটুকু আজ লিখতে গিয়ে মনে পড়ছে, সে বিনয়ী নম্র ও মিষ্টভাষী ছিল। খুব চঞ্চল বলে মনে হয় নি। বিপ্লবী হওয়ার সব সুলক্ষণ ছিল কিনা তার, সেই বিচার তখন আমরা করি নি; আমরা বুঝেছিলাম যে সে একটি ভাল ছেলে আর তাকে দিয়ে আমাদের কাজ হবে সাময়িক ও খুব

সামান্য। সে বিশ্বাসঘাতকতা করবে না, গোপন রাখবে এবং তার সঙ্গে নিয়ে যাবে আমাদের পুলিশ লাইনটি পরিদর্শন করতে। পুলিশ লাইনের বিভিন্ন অবস্থান স্বচক্ষে দেখতে চাই, সে আমাদের মাত্র সেইজন্য সাহায্য করবে।

সীমাবদ্ধ উদ্দেশ্য সফল করতে হলেও 'বালকের' মন তৈরি করতে হবে—তাকে নানাভাবে উদ্দেশ্য বুঝতে না দিয়ে প্রস্তুত করতে হবে। তাই তার মধ্যে প্রেরণা দিয়ে বিপ্লব বোঝাতে চেষ্টা করলাম। সে যুগের হিংসাত্মক বিপ্লব সীমাবদ্ধ চিন্তার গন্ডীতে আবদ্ধ ছিল। তাই সূক্ষ্ম যুক্তিতর্ক দিয়ে বিপ্লববাদ বোঝাবার মিথ্যা প্রয়াস আমাদের ছিল না। গণেশ ও আমি ভার নিলাম। আমাদের প্রথম কাজ হোল তাকে বুঝিয়ে বলা সে যেন বীরেনকে বিভ্রান্ত করে। বলবে—বৈপ্লবিক সঙ্ঘে সে বর্তমানে যোগ দিতে প্রস্তুত নয়। আগে লেখাপড়া করবে ও পরে বড় হয়ে বুঝেসুঝে জীবনের উদ্দেশ্য ঠিক করবে।

বীরেনকে যথা সময়ে ঐরূপ বলে বিভ্রান্ত করল; আর আমরাও বীরেনকে বললাম—'একেবারে বাজে ছেলে! পুলিশের ছেলে কি কখনও ভাল হতে পারে?' বাস্তবে কিন্তু সঞ্জীববাবু—লাইন ইন্সপেক্টর, অত্যন্ত ভাল লোক; একেবারে নিরীহ প্রকৃতির। যখন তাঁর ছেলের সঙ্গে আমরা ষড়যন্ত্রে লিপ্ত তখন সঞ্জীববাবু সম্বন্ধে কিছুই জানতাম না। আমাদের মামলায় তাঁকে সরকারপক্ষ সাক্ষী দিতে হাজির করেছিল। তখন তাঁকে স্বচক্ষে দেখেছি ও অভিভাবকদের কাছ থেকে তাঁর প্রশংসাই শুনেছি। তা' থেকে আমাদের তাঁর সম্বন্ধে খুব ভাল ধারণা হয়েছিল। সেই বেচারা কখনও জানতে পারেন নি যে ইংরেজ শাসনের বিরুদ্ধে চট্টগ্রাম যুব-অভ্যুত্থানে তাঁর ছেলের কতখানি অবদান আছে।

আমি আর গণেশ খুব গোপনে সঞ্জীববাবুর ছেলের সঙ্গে মিলতাম। বুঝতে চেষ্টা করতাম তার বাবার বা অন্য কোন পুলিশ বা পুলিশের বয়স্ক ছেলে বা আত্মীয়ের প্রভাব ওর ওপর আছে কি না! মনে হয়েছিল, না—একেবারে স্থির বুঝেছিলাম যে আমাদের প্রভাবই তখন তার ওপর সব চেয়ে বেশি কাজ করছিল। তবু তাকে আমরা আমাদের প্রকৃত উদ্দেশ্য বুঝতে না দিয়ে পুলিশ লাইন ঘুরে দেখবার প্রস্তাব করলাম। লাইনবাবুর ছেলে—তাকে সবাই চেনে যদি কেউ প্রশ্নও করে তবে তাদের আত্মীয় বলে সে আমাদের পরিচয় দেবে। এইভাবে "নাটকটি" ঠিক করা হোল। তারপর আমরা দুজনেই তার সঙ্গে রাত সাতটা-আটটার সময় পুলিশ লাইন দুই-তিন দিন ঘুরে ঘুরে পরিদর্শন করলাম। গার্ডরুম, আর্মারী ও ম্যাগাজিনের নানা প্রকার বিশদ খবর নিয়েছি তার কাছ থেকে। সে গণেশের হাতে পুলিশের ডিউটি চার্ট লেখা পাতা, খাতা থেকে

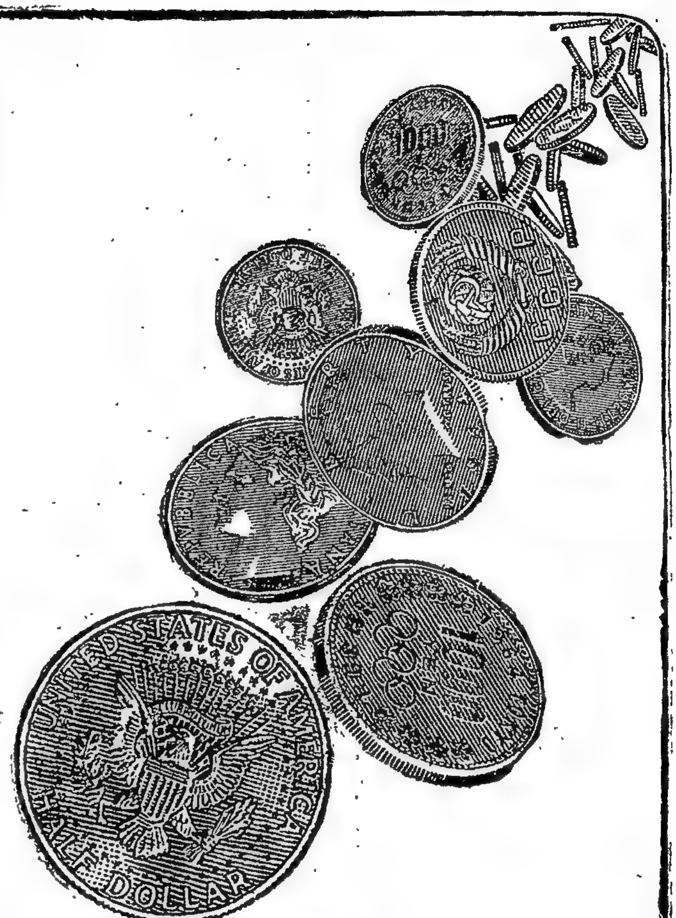

জাতীয় পরিকল্পনা ও
বহির্বাণিজ্যের প্রসার

সকল যুগেই, বিশেষতঃ এই জাতীয় পরিকল্পনার যুগে, দেশের সমৃদ্ধিসাধন বহুলাংশে বহির্বাণিজ্যের প্রসার সাপেক্ষ। কিন্তু বহির্বাণিজ্যের প্রসার বর্ত্তমানকালে নির্ভর করে দেশের উন্নত ব্যাঙ্ক ব্যবস্থার উপর। বহির্বাণিজ্যের ব্যাপারে ইউনাইটেড ব্যাঙ্ক অভিজ্ঞ কর্মচারী মারফৎ ব্যাঙ্ক সংক্রান্ত সর্ববিধ সাহায্যদানে পারদর্শী। পৃথিবীর যাবতীয় উল্লেখযোগ্য বাণিজ্য কেন্দ্রে ইউনাইটেড ব্যাঙ্কের নিজস্ব এজেণ্ট ও করেস্পনডেণ্ট আছে।

ইউনাইটেড ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়া লিঃ
রেজিষ্টার্ড অফিসঃ ৪, ক্লাইভ ঘাট ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১
আমরা সেবার সাথে দিই আরও কিছু

পশ্চিমবঙ্গে ৭৫টিরও অধিক শাখা আছে

ছিনিয়ে এনে দিয়েছে। কোন দিন কত পুলিশ লাইনে আছে তার খবরও তার কাছ থেকে পেয়েছি। সবই সে করছে তবু আমাদের আসল উদ্দেশ্য সে বুঝতে পারে নি। প্রথমত সে ছিল ছোট, তাই তার অজ্ঞানতার সুযোগ নেওয়া আমাদের পক্ষে সহজ ছিল। দ্বিতীয়ত তাকে বলা হোল ট্রেনিং-এর জন্য প্রত্যেক ছেলেরই সংবাদ সংগ্রহের কৃতিত্ব দেখাতে হবে। তাদের শিখতে হবে—কি করে সার্থকতার সঙ্গে সংবাদ সংগ্রহের কাজ করা যায়। এইরূপ কারণ দেখিয়ে তাকে কাজে লাগিয়েছি। তৃতীয়ত, কেউ বা কোন যুবকই সেদিন ভাবতে পারে নি যে বৃটিশের সৈন্য শিবির বা পুলিশ লাইন আমরা আক্রমণ করব। তাদের সাধারণ ধারণা ছিল—হয় আমরা বড় জোর ডাকাতি বা রাজনৈতিক হত্যা করব। এই কারণেই এই বালকটি আমাদের প্রকৃত উদ্দেশ্য সম্বন্ধে কিছুই বুঝতে পারে নি।

এই উপায়ে পুলিশ লাইনের সংবাদ সংগ্রহের কাজ আমরাও পনেরো দিনে সম্পন্ন করেছি।

(৪) বন্দুকের দোকান—

রজত সেনকে এই ভারটি দেওয়া হয়েছিল। শহরের সব কটি বন্দুকের দোকান সম্বন্ধে সে বিস্তারিত ও পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে সংবাদ সংগ্রহ করবে। দোকানের strong room (সুরক্ষিত কক্ষ) সম্বন্ধে খোঁজ দেবে, কোথায় বা কার কাছে চাবি থাকে, কটি তালা, কত বারুদ এবং বিভিন্ন বোরের কত কার্তুজ আছে, কতগুলো কি কি ধরণের বন্দুক সেখানে থাকে ইত্যাদির খবর নেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল। বন্দুকের দোকানের সব রকম খবরের প্রয়োজন ছিল। কারণ, যদি কোন কারণে আমাদের আক্রমণ ব্যর্থ হয়—যদি পুলিশ ও A. F. I. এর সৈন্য আমাদের প্রতি আক্রমণ করে তবে হয়ত আমাদের শেষ পর্যন্ত ব্রীচ-লোডার বন্দুকের ওপরই নির্ভর করতে হবে।

তাছাড়া আমাদের পরিকল্পনায় ছিল যে চট্টগ্রাম শহর দখল করে নেওয়ার পর আমরা সাময়িক বিপ্লবী গণতন্ত্র সরকার গঠন করব। এইরূপ অবস্থায় বিপ্লবী সৈন্য ভর্তি করা হবে। আমাদের যুবসমিতির ও ছাত্র-সংগঠনের যুবক ও ছাত্র দলে দলে এসে গণতন্ত্র সৈন্য বাহিনীতে যোগ দেবে—সেইরূপ ভরসা ছিল। যুব ও ছাত্র সমিতির Natural Leader যারা, তাদের সক্রিয় মনোভাব আমরা জানতাম। তারা আমাদের দলকে প্রাধান্য দিত এবং সব সময় দেখেছি আমাদের পক্ষে প্রকাশ্য আন্দোলনে অংশ গ্রহণ করেছে। এই পরিপ্রেক্ষিতে আমরা মনে করেছিলাম যে আমাদের আর্মারী আক্রমণের পরের দিন ১৯শে তারিখ সকাল থেকেই হয়তো সক্রিয় ছাত্র ও যুবকদল ভারতীয় গণতন্ত্র বাহিনীতে যোগ দিতে আসবে। সেই ক্ষেত্রে তাদের অস্ত্র সরবরাহের জন্য আমাদের প্রস্তুত থাকা দরকার। রাইফেল ও পুলিশ মাস্কেট আমাদের করায়ত্ত হলেও প্রয়োজন অনুপাতে তা দিয়ে বিপ্লবী নওজোয়ানদের চাহিদা হয়ত মেটানো যাবে না। সেই কারণে বন্দুকের দোকান তিনটির, বিশেষ করে শহরের এই বড় দোকানটির বিশদ খবর আমাদের প্রয়োজন ছিল। রজত সেনকে ভালভাবে দায়িত্ব বুঝিয়ে এই ভারটি দিই এবং পনেরো দিনের মধ্যে তাকে রিপোর্ট করবার জন্য নির্দেশ দেওয়া হয়।

(৫) রেল লাইনের খবর—

চট্টগ্রামকে বাংলার অন্যান্য জেলা থেকে সম্পূর্ণভাবে বিচ্ছিন্ন করবার জন্য আমরা রেল লাইন দুটি জায়গায় উপড়ে ফেলবার পরিকল্পনা করেছিলাম। এই অপরিহার্য পরিকল্পনাকে বাস্তবে পরিণত করবার জন্য সংবাদ চাই। সেই জন্য চট্টগ্রাম স্টেশন থেকে সুদূর করে লাকসাম জংসন পর্যন্ত, প্রায় আশি মাইল, ভালভাবে পরিদর্শন করার ব্যবস্থা করলাম। এই আশি মাইল রেল লাইনের বিস্তারিত ও বিশদ সংবাদ সংগ্রহ করবার পর সুবিধাজনক দুটি স্থান বেছে নেব ট্রেন লাইনচ্যুত করবার জন্য। এই উদ্দেশ্যে কোন বাধার সম্মুখীন না হয়ে ট্রেন লাইনচ্যুত করার জন্য তথ্য সংগ্রহের কাজ প্রথমে না হলেই নয়।

এই আশি মাইল রেল লাইন পরিদর্শন করার জন্য দুজন করে দুটি যুগ্ম-গ্রুপ গঠন করা হোল। একটি গ্রুপে শঙ্কর ও অর একজন, অন্যটিতে হারান ও তার সঙ্গী। এক গ্রুপকে অন্য গ্রুপের অসাক্ষাতে আমাদের প্রয়োজন বুঝিয়ে লাইন পরিদর্শন করবার নির্দেশ দেওয়া হোল। তারা পায়ে হেঁটে যাবে এবং দিনের ও রাত্রের অবস্থা কোন স্থানে কিরূপ থাকে সেই রিপোর্টটিও সংগ্রহ করবে।

তাদের পরিদর্শনের ফলাফল তাদের তৈরি নক্সা থেকে আমাদের বোঝাবে ট্রেন লাইনচ্যুত করবার জন্য কোন দুটি স্থান তারা সর্বাপেক্ষা সুবিধের বলে মনে করছে। ত
আলাদা আলাদাভাবে তাদের
বসে আলোচনা করার পরই চূড়ান্ত
স্থির করা সম্ভব—কোথায় রেল
ধ্বংস করা হবে। ট্রেন লাই
করে বিশেষ করে সৈন্যবাহী
গতিরোধ করাই ছিল প্রধান উ
আমাদের আকস্মিক আক্র
জয়ের শেষে সফলতার সঙ্গে প্রতি
ব্যূহ রচনা করবার স্ট্র্যাটেজীর অ
অঙ্গ ছিল ট্রেন লাইনচ্যুত করা
যাদের এই দায়িত্ব দেওয়া ঠিক হ
তাদের সামরিক স্ট্র্যাটেজীর গ
বুঝিয়েছি। তারা বুঝেছিল
তাদের সামনাসামনি বীরত্বপূর্ণ
অংশ গ্রহণ করবার সুযোগ নেই
এইটি হোল টোটাল স্ট্রা
(সামগ্রিক রণনীতি) অনিবার্য গ
পূর্ণ একটি অংশ।

আমাদের অভিজ্ঞতা থেকে বি
যুবকদের মনস্তত্ত্ব বুঝবার
করেছি সব সময়। তাদের ম
সম্বন্ধে উদাসীন থাকা চলে
বুঝেছিলাম তাদের আবেগভরা
সাড়া—'আগে কেবা প্রাণ করিবেক
তারই লাগি তাড়াতাড়ি!' কে
আগ্নেয় অস্ত্র নেবে, অর্থাৎ হে
অনুযায়ী কে ব্রীচলোডার বন্দু
পিস্তল বা রিভলভার ব্যব
সুযোগ পাবে? কে আক্রমণের
যাবে, কার দ্বিতীয় সারিতে
নির্দিষ্ট হবে—তাই নিয়ে
বিপ্লবীরা চিন্তা করত। যদি
রূপ কর্মক্ষেত্র বা অস্ত্র তার
নির্ধারিত না হোত, তবে তার ম
হতাশা আসবার সম্ভাবনা সে
আমরা সচেতন ছিলাম। এই
বাস্তবরূপেও দেখা দিয়েছিল।
অঙ্কুরে তার বিনাশ সাধন করবার
রণনীতি ও রণকৌশল সম্বন্ধে
মধ্যে সাধারণ ধারণা সৃষ্টি করতে
করেছি। তাছাড়া তাদের
সামরিক ট্রেনিং ও আমাদের
ট্রেনিং-পদ্ধতি অনুসরণ করে
মনে বিশ্বাস জন্মাতে পেরেছিল
ব্রীচলোডার বন্দুক, হকি স্টিক, এ
ঘুষি ও যুযুৎসু প্রভৃতির
প্রয়োগ করতে জানলে রিভলভ
পিস্তলের অভাব তারা অনুভব
না।

দায়িত্ব উপলব্ধি করে হা
তারা রেল লাইন পরিদর্শনে চলে
এবং সব তথ্য সংগ্রহ করে প
দিনের মধ্যেই রিপোর্ট দিয়েছে

আজকাল সামান্য কথাতেই প্রদোষের মনে বিরোধ দেখা দেয়। অফিসে সহকর্মীদের সঙ্গে আর বাড়িতে মা'র সঙ্গে রোজ একটা কিছু লেগে থাকে। সহকর্মীরা কাজ-পাগলা, সুতরাং কাজের বিষয় নিয়ে কিছু ঘটলে তাদেরকে দোষ দেয়া যায় না। কিন্তু মা তার অতি কাছের মানুষ। অথচ মা কিছুই যেন সহজে বুঝতে চান না। তাই মা'র কোন কথা সেও সহজভাবে নিতে পারে না। তার ধারণা, মা'র সব কিছুতেই একটা বৈষয়িক চিন্তা

লুকিয়ে আছে। যত বয়স বাড়ছে, মা বিষয়-চিন্তাগুলোকে নিখুঁতভাবে গুছিয়ে রাখছেন। মাকে এরকম হিসেবী দেখে প্রদোষ আস্তে আস্তে সাংসারিক অস্তিত্বকে গুটিয়ে ফেলতে লাগল।

অফিস যাবার আগে খাওয়া-দাওয়া সেরে বিছানায় গড়িয়ে নিতে নিতে সে-কথাই ভাবছিল সে। বাজার যাবার কথাটা প্রদোষ কিছুতেই সহ্য করতে পারে না। ওটা প্রদোষের কাছে একটা বিরক্তিকর ব্যাপার। আর বাজার করার কথা নিয়েই যত অঘটন ঘটল। খেতে বসে আজ আর তাই কোন কথা বলল না। একটা সংকোচ বার বার এসে গলা চেপে ধরল। শুয়ে শুয়ে প্রদোষ সে কথাই ভাবল এবং এক সময়ে আর অফিস যেতেও তার ইচ্ছা হল না।

ভাবনার পায়ে পায়ে এগিয়ে গিয়ে প্রদোষ সিগেরেটে টান দিতে ভুলে গেছে। সিগেরেটটা পুড়ে যাচ্ছিল। কাগজ পোড়ার উৎকট গন্ধ নিশ্বাস বায়ুকে ভার করে তুলল। হাতের ক্ষয়ে-যাওয়া সিগেরেটটা ছাইদানিতে রেখে দিয়ে প্রদোষ আর একটা সিগারেট ধরাল। পরপর কয়েকটা টান দিয়ে গুটিকয়েক রিং ভাসিয়ে দিয়ে সে তাকিয়ে থাকল। হাল্কা বাতাসে তাড়া খেয়ে রিংগুলো পালিয়ে যেতে লাগল। রিংগুলোর গতিপ্রকৃতি নিরীক্ষণ করতে করতে প্রদোষের মনে একটা হতাশা জাগল। আজকাল সে কিছুই লিখতে পারছে না। অর্থচ সেদিন সে 'নতুন ফসল'-এর সম্পাদকের কাছে প্রতিশ্রুতি দিয়ে এসেছে। কয়েকদিনের মধ্যে সে লেখাটা অবশ্যই পাঠাবে। সে লিখতেও বসেছিল, কিন্তু বসাই হল কিছু লিখতে পারল না। না লেখার ফলে মাথার ভেতর মরচে পড়ে গেছে। আবার সেটাকে ঘসে-মেজে পরিষ্কার করা সময়সাপেক্ষ। প্রদোষ নিজের এই অক্ষমতার জন্য কষ্ট পেল। এবং কিছু একটা করা দরকার মনে করে রিং-এর খেলা দেখতে লাগল। প্যারাসুটের মত ঢেউ খেলানো রিং-গুলোর দিকে নিষ্পলক তাকিয়ে থেকে চোখে একটা ক্লান্তি নেমে এল। প্রদোষ ঘুমুতে চেষ্টা করল। ঘুম মোটেই আসছিল না প্রদোষের। বার বার চোখের সামনে কতকগুলো আঁকিবুকি নেচে নেচে আসতে দেখল। সাধারণত সে দিন-দুপুরে ঘুমুতে পারে না। বিশেষ করে হেমন্তের দুপুরে ঘুমুলে শরীর ম্যাজ-ম্যাজ করে। অনেক চেষ্টা করেও যখন ঘুম এল না, প্রদোষ কয়েকটা চিঠি লিখতে বসল। স্বদেশ, রিনি ও প্রিয়নাথ কাকাকে। স্বদেশ তার বাল্যবন্ধু। ছোটবেলা থেকে এক সঙ্গে দুজনে লেখাপড়া করেছে। সব সময়ে স্বদেশ ক্লাশে প্রথম হয়েছে আর প্রদোষ হত দ্বিতীয়। ছোটবেলা থেকে অতি দারিদ্র্যের মধ্যে কেটেছে বলে স্বদেশ জীবনে প্রতিষ্ঠা পেতে চাইল। বর্তমানে সে সরকারী দপ্তরে উচ্চপদস্থ অফিসার। স্বদেশের প্রায় প্রতি চিঠিতেই এক অভিযোগ—জীবন-টাকে এখনও চিনতে শিখলি না। প্রথমে চাই নিজের ক্যারিয়ারের প্রতিষ্ঠা। তারপর সাহিত্য-টাহিত্য। তা না হলে এ যুগের সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলতে পারবি না। স্বদেশকে ভালবাসে প্রদোষ। কিন্তু এ সব অযাচিত উপদেশ সে সহ্য করতে পারে না। বিশেষ করে যেহেতু প্রদোষের চাকরীর প্রতি কোনদিনও আনুগত্য নেই। চাকরীর ব্যাপারে স্বদেশের চিঠি আরও ঘৃণা জাগাতে সাহায্য করল। এই চাকরী জীবনটাকে প্রদোষ যেন গোয়ালখানার গরুর মত মনে করে। এক নির্দিষ্ট আবেষ্টনীর মধ্যে থেকে এক বিষয়েই রোমন্থন। প্রদোষ স্বদেশের চিঠির জবাব লিখে এ বিষয়ে আর আলোচনায় নামতে চাইল না।

কিন্তু প্রিয়নাথ কাকার চিঠি। এ চিঠির কি উত্তর দেবে সে। প্রিয়নাথ-কাকা বাবার ঘনিষ্ঠ বন্ধু। বাবার মৃত্যুর পর তিনি সামাজিক ব্যাপারে তাদের অভিভাবক। প্রিয়নাথ কাকা ছোট বোনের বিয়ে সম্পর্কিত একটি প্রস্তাব দিয়েছেন এবং সে বিষয়ে তার মতামত জানতে চেয়েছেন। প্রদোষ এ চিঠির জন্য সন্তুষ্ট হতে পারল না। কেন যে প্রিয়নাথ কাকা এ সব কিছু মাকে লেখেন না প্রদোষ সেটা বুঝে উঠতে পারল না। সে একটু মনঃক্ষুণ্ণ হল এবং একটা অপ্রিয় জবাব লিখবে বলেও আর লিখল না। দলা পাকিয়ে চিঠিখানা ঘরের বাইরে ফেলে দিল।

রিনির চিঠিখানা হাতে নিল প্রদোষ। এবং কিছু পুরোনো স্মৃতিকে গুটিয়ে নিতে নিতে প্রদোষ চিঠিখানা কয়েকবার পড়ল। এক সময়ে রিনিকে খুব আত্মস্থ-প্রকৃতির মেয়ে বলে মনে হত তার। সে কারণে তার গর্বও ছিল। ইদানীং রিনির মধ্যে একটা চঞ্চলতা প্রকাশ পেয়েছে। এখন রিনি রীতিমত তাকে ভাবিয়ে তুলেছে। চিঠি লিখলে আজকাল খুব বিরত হয়ে পড়ে। যথাযথ জবাবও রিনির কাছ থেকে এখন পাওয়া যায় না। যা পাওয়া যায়, তার প্রায় সম্পূর্ণই নতুন অধ্যাপক অরবিন্দবাবুর গুণপনার তালিকায় ব্যয়িত হয়, রিনির চিঠি থেকেই জানতে পেরেছিল, অরবিন্দবাবু তাদের কলেজের ইংরেজী সাহিত্যের নতুন অধ্যাপক। ভদ্রলোক বয়সে নবীন। কিন্তু সাহিত্য বিষয়ে তাঁর নাকি দখল আছে। রিনি তার কাছে ইংরেজী শিখবে জেনে প্রদোষ খুব খুশি হয়েছিল। তাই সে রিনির আগ্রহকে অভিনন্দন জানিয়েছিল। কিন্তু পরবর্তী চিঠিগুলোতে রিনি অরবিন্দ-বাবুর বৈষয়িক জীবনেও যথেষ্ট আগ্রহ প্রকাশ করেছে বলে প্রদোষ সেটাকে উদারতার সঙ্গে গ্রহণ করতে পারে নি। প্রদোষ এতে অপমানই বোধ করল। প্রদোষ চিঠির জবাবে রিনিকে এবিষয়ে সচেতন করে দিতে চেয়েও আর চিঠি লিখল না। কেন না বৈষয়িক চিন্তার মধ্যে নিজকে সে আর জড়াতে চাইছে না। রিনিকে সে কিঞ্চিৎ তিরস্কার করবে ভেবেছিল, কিন্তু এখন সে নিজের প্রতি বিরক্ত হল। মনের মধ্যে কিছু অস্বস্তি জমে থাকার ফলে প্রদোষের আর ঘরে থাকতে ভাল লাগল না। প্রদোষ বেরিয়ে পড়ল।

রাস্তায় নেমে কিছুটা অস্বস্তি কেটে গেল। ট্রামে-বাসে উঠবার ইচ্ছা হল না দেখে প্রদোষ একটা সিগেরেট ধরাল। এবং কিছু প্রিয় কবিতার চরণ ভাবতে ভাবতে শেষ হেমন্তের রোদ গায়ে মেখে চলতে লাগল। লোকজন দোকান-পাট ইত্যাদি নানা কোলাহলকে পিছনে রেখে, একটি পরিচিত গানের সুর মনে রেখে একসময়ে সে ইডেন উদ্যানে এসে পড়ল। এবং একটা নিরালা কোণ খুঁজে নিয়ে ঘাসের ওপর পা ছড়িয়ে বসল। প্রজাপতির মত ভ্রাম্যমাণ তরুণীর দেহের উচ্ছলতাকে দেখে দেখে শরীরে উত্তাপ পেতে চাইল। এবং একসময়ে সে উঠে পড়ল। ঘুরে ঘুরে লেকের জলে মাছ, কিছু শীতের ফুল এবং দু-একটা অপ্রত্যাশিত পাখির আনন্দ-কেলি দেখল। তারপর সে এগিয়ে গেল মাঠের দিকে।

অনেকক্ষণ উদ্দেশ্যহীন ঘুরল প্রদোষ এবং ভাবল ক্লান্তির পায়ে পায়ে এগিয়ে গিয়ে বটগাছের নীচে কালভার্টের ওপর বসবে। বসে থাকতে ভাল লাগলে সময়টা ওখানেই কাটিয়ে দেবে। সন্ধ্যার পর যখন হিম পড়তে থাকবে বাড়ি ফিরে যাবে সে। বাড়ির কথা ভাবতেই মা'র কথা মনে পড়ল। রোজ সকালে মা সাতটা না বাজতেই এসে বলবেন—'মণ্টু, বাজারে যাবি না না কি?' রোজ সকালে মা

দন্ডের আমেজটাই মাটি করে দেন। মা'র ঘোর সাংসারিক মন দেখে প্রদোষ এক কথা দু-কথার পর ক্ষিপ্ত হয়ে বলে, 'রোজ রোজ একগুষ্ঠির বাজার করা আমার দ্বারা সম্ভব হবে না। তোমরা সব মরে গিয়ে আমায় একটু রেহাই দাও।'

মা তার কাছ থেকে এমন ব্যবহার আশা করেন নি। শুনে মা নির্বাক হয়ে গিয়েছিলেন। প্রায়শ মা তার সামনে এসে বলবেন—'তোকে দেখলে আমার বুক শুকিয়ে যায়। আমার যে কি পোড়া কপাল! তা না হ'লে তোর ওপর সংসারের ভার চাপিয়ে দিয়ে তিনি কি করে ফাঁকি দিয়ে চলে গেলেন।'

বলতে বলতে মা একবার আড়চোখে বাবার ফটোর দিকে তাকাবেন। এবং এভাবে বেদনা জাগিয়ে স্নেহে আর্দ্র করতে চাইবেন। প্রদোষ মা'র দিকে চেয়ে মুহূর্তের জন্য উদাস হত মাত্র। পরক্ষণে মা'র ঘোর সাংসারিক মনোবৃত্তির জন্য ঘৃণা বোধ করত। কিন্তু প্রদোষ এখন মা'র জন্য আন্তরিক দুঃখ বোধ করল।

অচেনা এক বিষণ্ণ মন নিয়ে প্রদোষ অফিস পাড়ায় বাসস্টপে এসে দাঁড়াল। এখন অকারণে অফিসের কারও চোখে ধরা দিতে চাইল না সে। কারণ চাকরীতে আসক্তি না থাকলেও আপাতত চাকরী খুইয়ে ঘরে বসে থাকা আত্মহত্যার সামিল হবে। এসব ভেবে সে সামনে যে বাসখানা পেল সেটাতেই উঠে বসল। বাসখানা স্টেশনের কাছে গেলে প্রদোষ নেমে পড়ল।

স্টেশনে প্রদোষ অনেকক্ষণ নানা রকমের যাত্রীদের চলাফেরা দেখতে লাগল। এখানে এলে মানুষের নানা ধরণের চেহারা দেখা যায়। কারও একটা তীব্র গতি, কেউ বা মন্থর। এখানে সেখানে বহু লোক জটলা করছে। বাজার দর—পলেটিক্স থেকে আরম্ভ করে ঘর-সংসার ডিঙিয়ে বেশ্যাবাড়ীর অভিজ্ঞতা পর্যন্ত তাদের আলোচ্য, এখানে এসে প্রদোষ উদ্দেশ্যহীন মনকে ঘুরে-ফিরে একটু হাওয়া খাইয়ে নেয়। সামনে একখানা ট্রেন দাঁড়িয়ে ছিল। তেমন ভিড় না থাকাতে প্রদোষের মাথার ভেতর চকিতে একটা ইচ্ছা খেলে গেল। দ্বিধাহীন মন নিয়ে সে ট্রেনে চেপে বসল। কিছুক্ষণ বাদে ট্রেনটা স্টেশন ছেড়ে গেল। প্রদোষের এখন আর কিছু করবার নেই। সে বাইরের দিকে চোখ মেলে রাখল। ক্রমশ আশে-পাশের বাড়িগুলো একে একে সরে যেতে দেখল। প্রদোষ সময় কাটাবার জন্য আপন মনে গান করল, কয়েকটি প্রিয় কবিতার স্তবক আওড়াল। মাঝে মাঝে ফেরিওয়ালার 'কথার বিজ্ঞাপন' শুনে সপ্রশংস দৃষ্টিতে সে দিকে চেয়ে তার বক্তব্য শুনল। অনেকগুলো স্টেশন ছেড়ে যাবার পর ট্রেনটি প্রায় যাত্রীশূন্য হয়ে এল। নানা কোলাহলের মাঝেও প্রদোষ টুকরো টুকরো স্বপ্ন দেখল। লাইনের পাশে ছোট ছোট খেলার মাঠ, গাছ, বাড়ি, মিল, চর আবার একটানা প্রান্তর ইত্যাদি দেখতে দেখতে একবার ভাবল, সবার অগোচরে, সে পালিয়ে যাবে। আর কখনও ফিরবে না। আবার এই পলাতক মনোবৃত্তির জন্য নিজকে খুব ঘৃণা করল।

সামনের সারিতে ক'জন বৃদ্ধ বসে পরস্পর অনেকদিনের অনেক কথা বলাবলি করছিলেন। প্রদোষের মনে হ'ল বৃদ্ধ ক'জন পাত্রী দেখবার জন্য কোথায়ও যাচ্ছেন। অন্তত প্রদোষ তাদের টুকরো কথা থেকে বুঝে নিতে পারল। তাদের মধ্যে একজন বৃদ্ধ যেন ক্ষোভ করেই বলছিলেন, 'আজকাল ছেলেরা বাপ-মা'র প্রতি যত কর্তব্যই করুক, কিন্তু কোন কথাতেই তারা বাপ-মাকে আমল দিতে চায় না। তাদের ধারণা......' বাকী কথাগুলো প্রদোষের কানে গেল না। একটা মাল-গাড়ি অতি কষ্টে ধুঁকতে ধুঁকতে পাশ দিয়ে যাচ্ছিল। সব কথা তখন ঢাকা পড়ে গেল। প্রদোষ আলতো-ভাবে বৃদ্ধ ক'জনের দিকে তাকাল এবং তাদের জন্য করুণা অনুভব করল। তার মনে হ'ল এ বৃদ্ধ ক'জনের সঙ্গে তার মা'র যেন অনেক মিল আছে।

একসময়ে বাইরের প্রান্তরের দিকে তাকাল প্রদোষ। এবং দেখল পশ্চিম আকাশে পীতবর্ণ সূর্যটা কুয়াশার স্তরে স্তরে ডুবে যাচ্ছে। একটা পীতাভ রক্ত কামরার ভেতরে কটু বেদনা রেখে গেল। আর একটু পরে কুয়াশার প্লাবন পশ্চিম দিক থেকে এগিয়ে আসবে। অন্যদিকে আলো-ছায়ার খেলা রচনা করে একটা চঞ্চলতা গাড়ির সঙ্গে ছুটছিল। রাস্তার পাশে একটা কুয়াশার পলেস্তরা ঝোপ-ঝাড়কে আশ্রয় করতে সুরু করেছে। প্রদোষের মনে কোথায়ও একটা ব্যথা আটকে ছিল। সে মা'র জন্য দুঃখ অনুভব করল। দূর দিগন্তে তখন একটা শ...টি পায়ে পায়ে একটা অন্ধকার গুহার দিকে এগিয়ে যাচ্ছিল। এই গুহার দিকে প্রদোষ যেন নিজেকে নেমে যেতে দেখল।

ফেরার পথে প্রদোষ নিজের কথাই ভাবল। সে কোনদিন কোন বিষয়ে এক মিনিটের জন্য নিজেকে নিয়োজিত করে নি। অথবা কোন কিছুকেই সহজভাবে বুঝতে চেষ্টা করে নি। সংসারের যা কিছু দায়-দায়িত্ব মা নিপুণভাবে চালিয়ে এসেছেন। সে শুধু কিছু স্বপ্ন, কিছু স্মৃতি আর একবুক হতাশা নিয়ে সবকিছু থেকে সরে এসেছিল। দাদা তাদের সঙ্গে যে ক'দিন ছিলেন, প্রদোষকে সংসারের কোন কাজ করতে হ'ত না। দাদা সবকিছু নিজের ঘাড়ে নিয়েও যেন একটু স্বতন্ত্র থাকতেন। প্রদোষের কিন্তু কেবলই মনে হত, দাদা পায়রার মত একটা মনোবৃত্তি পেয়েছে। সময় এবং সুযোগ বুঝে সে বাসা বদল করবে। দাদা যেদিন বাড়ি থেকে চলে যায়, মা সারাদিন বুকের মধ্যে কান্না ধরে রেখেছিলেন। মা'র বুকে অনেক দুঃখ আছে। অসময়ে বাবা মরে গিয়ে তাঁকে অবলম্বনহীন করে গেছেন। অকালে দিদির বৈধব্য তাঁকে স্তব্ধ করে দিয়েছে। দাদাও তাঁকে অনেক আঘাত দিয়ে গেলেন। আর সে?

প্রদোষ নিজেকে একজন অপরাধী মনে করল। খুন করলেও সে বুঝি অনেক আনন্দ পেত। এবং সে অপরাধের জন্য সে কখনও ক্ষমাপ্রার্থনা করতে পারত না। দুরন্ত অহংকারীর মত সে সব দোষকে অস্বীকার করে আইনের সব অনুশাসনের শাস্তি ভোগ করতেও দ্বিধা করত না। এখন কিন্তু তাকে একটা নিবিড় লজ্জা জড়িয়ে ধরল।

ট্রেনের গতি ক্রমশ কমে আসছিল। দূর থেকে স্টেশনটাকে মনে হচ্ছিল একটা সামুদ্রিক বন্দর, বুকের ওপর অনেকগুলো আলোকস্তম্ভ নিয়ে এক বিদেশী জাহাজের জন্য অপেক্ষমাণ।

অনেক কলরবের মধ্যে গাড়ি থামল। কর্মক্লান্ত যাত্রীদের ব্যূহ থেকে নিজকে মুক্ত করে প্রদোষ আবার বুক ভরে শহরের বাতাস নিতে পারল। এর আগে শহরের বাতাসে এত নীরব শৈত্য ছিল কি না, সে কখনও জানত না।

আশাপূর্ণা দেবী

ধারাবাহিক উপন্যাস

(পূর্ব-প্রকাশিতের পর)

চাঁপার ধারণা ভুল ছিল না।

বড় মেয়ে মল্লিকাকে স্রেফ ঘুস দিয়েই নিজের দিকে টেনে এনেছিল উমাশশী। পুরো আস্ত একটা টাকাই ঘুস দিয়ে বসেছিল। ঝুঁটি-বাঁধা মহারাণী মার্কা এই টাকাটি কবে থেকে যেন তোলা ছিল লুকনো একটি কৌটোয়, সেটি দেখিয়েছিল মেয়েকে।

ভীরু ভীরু গোপন অনুরোধ।

'চল না আমার সঙ্গে, দিয়ে দেব এটা।'

মল্লিকার লুব্ধ দৃষ্টি জ্বলে উঠেছিল বটে, তবু সে বেজার মুখে বলেছিল, 'আহা তোমার সঙ্গে যাই আর তোমার ছেলে বইতে বইতে প্রাণ যাক আমার।'

বলেছিল।

বলে দিব্যি পার পেয়েও ছিল।

সাধে কি আর চাঁপা আড়ালে বলে, 'আমি যদি জ্যেঠিমার মেয়ে হতাম, হাজার গুণে ভালো হতো আমার।'

চাঁপার জেঠিমা এ-হেন অপমানেও জ্বলে ওঠে না, বরং আরো মিনতির গলায় বলে, 'ওখানে গিয়ে ছেলে বইতে হবে কেন রে? ওখানে কি আমাকে হেঁসেল সামলাতে হবে? শরৎদির বাড়িতে ঠাকুর চাকর লোকজন।'

ঠাকুর চাকর লোকজন সমৃদ্ধ সেই বড়লোক মাসতুতো মাসীর বাড়ির লোভনীয় আকর্ষণে আর একবার মনটা টলে মল্লিকার, তবু অটল ভাব দেখায়, 'লোকজন তো লোকজন, তুমি তোমার সঙ্গে নিয়ে যেতে চাইলে ঠাকুমা তোমার গলা টিপে দেবে না?'

নিয়ে যেতে চাইলে!

উমাশশী শিউরে বলে, 'আমি চাইবো কি বল? তুই বলবি যে, মন কেমন করছে।'

'আহা রে! লোকে যেন বিশ্বাস করবে!'

এবার উমাশশীর চোখের কোণে জলের আভাস দেখা দেয়, 'লোকে বিশ্বাস করবে না? মা ভাই বোনেদের জন্যে মন কেমন করাটা অবিশ্বাসের?'

মল্লিকা ঈষৎ অপ্রতিভ হয়।

বলে, 'আর চাঁপি? চাঁপিকে যে তাহলে একলা যেতে হবে। চাঁপি আমার গায়ে ধুলো দেবে না?'

উমাশশী অতঃপর চাঁপির সম্পর্কে ঠাকুমার একদেশদর্শিতার উল্লেখ করতে বাধ্য হয়। বলে, 'চাঁপাকে তো মা বুকে করে রাখবেন। যত টান তো ওর ওপরেই দেখিস না? তোর অভাব ও টেরই পাবে না।'

চাঁপা সম্পর্কে যে মুক্তকেশীর কিঞ্চিৎ দুর্বলতা আছে, সে কথা এরা সকলেই জানে, কিন্তু এমন স্পষ্টাস্পষ্টি আলোচনা হয় না কোনো দিন। উমাশশী নিরুপায় হয়েই আজ সে আলোচনা করে। এক-একটা দিনের উদাহরণ দেখায়, যে উদাহরণে চাঁপা মল্লিকার ঝগড়া মেটাতে মুক্তকেশী মল্লিকাকে ধমক এবং চাঁপাকে পয়সা দিয়েছেন, এমন বর্ণনা আছে।

ঝগড়া?

তা' হয় বৈকি দু'জনের।

ভাবও যত, ঝগড়াও তত।

তা সে যাই হোক শেষ পর্যন্ত মেয়েকে রাজী করাতে সক্ষম হয়েছিল উমাশশী! এবং দশটি ছেলেমেয়ে নিয়ে রওনা দিয়েছিল চন্দননগরে।

মাসতুতো দিদি শরৎশশীর বাড়িতে। যে-সে দিদি নয়, দারোগা গিন্নী।

কিন্তু দশ-দশটা ছেলেমেয়েকে নিয়ে প্রায় অপরিচিত মাসতুতো ভগ্নীপতির সংসারে এল কি বলে উমাশশী? সুবোধই বা পাঠালো কোন লজ্জায়?

তা, জীবনমরণের কাছে আবার লজ্জা!

তাছাড়া—আপাতত উমাশশীর মা সুখদা বোনঝির বাড়িতেই বাস করছিলেন। অতএব মা যেখানে ছা সেখানে।

শরৎশশী অবশ্য হৃষ্টচিত্তেই গ্রহণ করেছে মাসীর মেয়েকে এবং তার বাহিনীকে। কারণ নিজের তার ষষ্ঠীর কৃপা নেই। অথচ ঘরে মা লক্ষ্মী উথলে পড়ছেন। এই উথলে ওঠা চেহারা আত্মজনকে দেখাতে পারাও তো একটা পরম সুখ।

অবশ্য উমাশশীর ওপর একটু অভিমান তার ছিল, কারণ উমাশশীর

যখন এ বছর আর বছর হচ্ছে, আর নিজে সে বন্ধ্যাই এ সত্য স্থিরীকৃত হয়ে গেছে, তখন ও মাসী মারফৎ প্রস্তাব করেছিল, 'উর্মি'র একটা ছেলেকে দত্তক নিতে।

উমাশশী রাজী হয় নি।

উমাশশী বলেছিল, 'এ প্রস্তাব শুনলে আমার শাশুড়ী আমায় বঁটি দিয়ে দুখানা করবেন।'

সুখদা বার বার বলেছেন, 'তা ভাবছিস কেন? লক্ষ্মীর ঘরে ছেলেটা সুখে থাকবে, রাজার হালে কাটাবে—'

'তুমি বল তবে?'

'আমি কেন বলে দোষের ভাগী হতে যাব বাছা। তোর শাউড়ী বলবে দুঃখী মাগী হয়তো বোনঝির কাছে ঘুস খেয়ে বলছে।'

অতএব প্রস্তাবটা হয় নি।

শরৎশশী তখন চিঠি লিখেছিল।

বলেছিল, 'পাকাপাকি দত্তক না দিস, মানুষ করতে দে আমায় একটিকে। তোর পাঁচটি আছে, আমার ঘর শূন্য।'

উমাশশী শিউরে উঠে 'ষাট ষাট' করেছিল এবং মা'র কাছে কেঁদে ফেলে বলেছিল, 'শাশুড়ী হয়তো রাজী হবেন, আমিই পারব না মা! যার কথা ভাবছি, তার জন্যেই বুক ফেটে যাচ্ছে।'

সুখদা বিরক্ত হয়েছিলেন।

বলেছিলেন, 'বুক তো ফাটছে। কিন্তু কি সুখেই বা রাখতে পেরেছ ছেলেপেলেকে? নেহাৎ মোটা চালের মধ্যেই আছে। অথচ শরতের পুষ্যি হলে—'

'তা হোক পারবো না মা! গেরস্তর ছেলে, গেরস্ত হয়েই থাক।'

ভগ্নদূতের বার্তা সুখদাকেই বহন করতে হয়েছিল, এবং মেয়ের দুর্মতিতে পঞ্চমুখ হয়েছিলেন তিনি বোনঝির কাছে। তদবধি শরৎশশী উমাশশীর প্রতি ক্ষুন্ন। অথচ 'মা ছেলে ছাড়ল না' এটাকে ঠিক অপরাধ বলেও ভাবতে পারে নি। তবে যোগাযোগও রাখে নি। এবারে যখন মান খুইয়ে নিজেই এল উমাশশী খুশিই হল শরৎশশী।

বলল, 'তবু ভালো যে দিদি বলে মনে পড়লো!'

তারপর খাওয়া মাখা আদর যত্নের স্রোত বহালো!...সুখদা আড়ালে বলেন, 'দেখছিস তো সংসার? তখন বুঝলি না, আখের খোয়ালি। এখন ওর মন বদলে গেছে। বলে, 'ভগবান না দিলে কার সাধ্যি পায়।' তবে—ফিসফিস করেন সুখদা, 'নজরে ধরাতে পারলে, মেয়ের বিয়েতেও কিছু সুরাহা হতে পারে।'

এ সব প্রসঙ্গ অস্বস্তিকর।

কিন্তু তদপেক্ষা অস্বস্তিকর জামাইবাবু করালীকান্তর পেশাটা।

পুরুষ মানুষ সকাল বেলা তাড়াহুড়ো করে স্নানাহার সেরে 'আপিস' কাছারী যায়, সন্ধ্যের মধ্যে বাড়ি ফেরে এই উমাশশীর জানা, মেজ দ্যাওর ব্যবসা না কি করে বটে, তবু তারও আসা-যাওয়া সুনিয়ন্ত্রিত। কিন্তু এ কী?

না আছে আসা যাওয়ার ঠিক, না আছে নাওয়া খাওয়ার ঠিক। অর্ধেক দিন তো বাড়া-ভাত পড়েই থাকতে দেখা যায় খাওয়াই হয় না। এসে বলে, 'অসময়ে আর ভাত খাব না, দুখানা লুচি দাও বরং।'

তখন আবার তাড়াহুড়ো পড়ে যায় লুচিরে আলুর দমরে করতে।

আর শুধুই কি দিনের বেলা?

হঠাৎ হঠাৎ রাত দুপুরে ঘুম ভেঙে দেখে আলো জ্বলছে, চাকর-বাকর ছুটোছুটি করছে, শরৎদি হাতে হাতে জিনিস নিয়ে ঘুরছে, আর জামাইবাবু পুলিশী ধড়াচুড়ো আঁটছেন!

চুপিচুপি দেখে, জামাইবাবু বেরিয়ে যাচ্ছেন, একটা লালমুখো গোরার গাড়িতে গিয়ে উঠছেন, হারিয়ে যাচ্ছেন ঝিম ঝিম করা নিকষ অন্ধকারের মধ্যে।

দেখে শুনে উমাশশীরও হাত পা ঝিম ঝিম করে আসে। খামোকা উঠে নিজের ঘুমন্ত ছেলেমেয়েগুলোর গায়ে হাত দিয়ে দিয়ে দেখে, হয়তো বা গোণে। যেন হঠাৎ দেখবে একটা কম।

বুকটা ছম্ছম্ করতে থাকে কি এক আশঙ্কায়।

কেন যে এমন হয়।

এমনিতে তো জামাইবাবু দিব্যি রসিক পুরুষ। 'শালী শালী' করে ঠাট্টা-তামাসাও করেন। মন ভাল থাকলে ডাক-হাঁক করেন, 'ওহে বিরহিনী গেলে কোথায়? একলা বসে শ্রীমুখচন্দ্র ধ্যান করছো বুঝি?'

কথা শুনে লজ্জায় মরতে হয়।

ছেলেমেয়ে বড় হয়েছে।

কিন্তু মন যখন ভাল থাকে না?

তখন কী রুক্ষ। মুখে কী কটু কুৎসিত ভাষা। চাকরদের গালাগাল দেওয়া শুনলে তো কানে আঙুল দিতে ইচ্ছে করে, শরৎশশীও বাদ যায় না। তাকেও কাঁদিয়ে ছাড়েন। তাছাড়া—এক এক সময়, বিশেষ করে রাতের দিকে সহসাই যেন বাড়ির হাওয়া বদলে যায়, বাইরে বৈঠকখানায় নানা রকম সব লোক আসে, দরজা বন্ধ করে কথাবার্তা হয়, কী যেন গোপন ষড়যন্ত্র চলতে থাকে, জামাইবাবু বাড়ির মধ্যে আসেন যান, স্ত্রীর সঙ্গে চাপা গলায় কী যেন কথা বলেন, হয়তো সেই লোকগুলোর সঙ্গেই বেরিয়ে যান, কোন রাত্তিরে যে ফেরেন, টেরই পায় না উমাশশী।

দিদি না খেয়ে বসে থাকলো না খেলো কে জানে।

এমন গোলমেলে সংসার ভাল লাগে না উমাশশীর। মনেই যদি স্বস্তি না থাকলো তো কী লাভ রাশি রাশি টাকায়, ভাল ভাল খাওয়া পরায়!

সেই কথাই একদিন বলে বসে উমা।

আর বলে মল্লিকার মুখে একটা কথা শুনে। মল্লিকা না কি দেখেছে মেসোমশাই বাগানের ধারে একটা লোককে মুখ বেঁধে চাবুক মেরে মেরে অজ্ঞান করে দিয়েছেন। আর সে না কি চোর ডাকাতের মতন মোটেই নয়, ভদ্রলোকের ছেলের মতন দেখতে।

উমাশশী বলে বসে, 'যাই বল দিদি, ও তোমার গেরস্তালী চাকরী-বাকরীই ভাল! টাকা গহনা কম থাকলেই বা কি, মনে শান্তি থাকে। জামাইবাবুর কাজটা বাপু ভাল নয়।'

সুখদা চমকে যান।

আড়চোখে বোনঝির মুখের দিকে তাকান, দেখেন সেখানে দপ্ করে আগুন উঠেছে জ্বলে।

হয়তো কথাটা বড় আঁতে ঘা লাগা বলেই।

হয়তো নিজেও শরৎশশী অহরহ

গৌর মোহন দাস এণ্ড কোং
২৩৩, ওল্ড চীনা বাজার স্ট্রীট
কলিকাতা-১
ফোন: ২২-৬০৮০

ওই কথাই ভরে। ধূ ধূ মরুভূমির মত জীবনের স্তব্ধ বালুভূমিতে যখন টাকার স্তূপ এসে পড়ে, তখন সে টাকাকে যে বিষের মতই লাগে তার।

বাড়িতে গোয়াল ভর্তি গরু, রাশি রাশি দুধের, ক্ষীর ছানা মিষ্টি খাবার তৈরি করে শরৎশশী, যদি তার দুটো খায় তো দশটা বিলোয়। কোথা থেকে কে জানে বড় বড় মাছ এসে পড়ে উঠোনে, কাটলে যজ্ঞি হয়, সেই মাছ চাকর-বাকরে খায় তিন ভাগ। কারণ পাড়ার লোককেও সর্বদা দিতে অস্বস্তি বোধ হয়।

বাগানের ফল আসে ঝুড়ি ঝুড়ি, আম কাঁঠাল কলা পেঁপে, এটা সেটা, এখন উমাশশী রয়েছে তাই আদর হচ্ছে সেই ফলেদের, নচেৎ তো ফেলাফেলি।

শরৎশশীর গায়ে এবং বাক্সে গহনার পাহাড়। কিন্তু সুখ কোথায় তার? তার বরের মাইনে জানতে না পারলেও, উমাশশীর বরের চেয়ে কম বৈ বেশি নয়, এ জ্ঞান শরতের আছে। তবে? কিসের টাকায় এত লপচপানি করালী-কান্তর?

উপরি আয়েই তো!

তার দারোগার উপরি আয় কোন মর্মপথ ধরে আসে?

ভিতরে জ্বালা আছে শরৎশশীর। তদুপরি জ্বালা আছে স্বামীর চরিত্র নিয়ে। কিন্তু সে সব তো প্রকাশের বস্তু নয়? উমাকে আর তার ছেলেমেয়েকে খাইয়ে মাখিয়ে দিয়ে থুয়ে চোখ ধাঁধিয়ে রেখে নিশ্চিন্ত ছিল, হঠাৎ দেখতে পেল নির্বোধ উমারও চোখ ফুটেছে। কিসে শান্তি, কিসে সুখ, সে সেটা ধরে ফেলেছে।

অতএব শরৎশশীর চোখে দপ্ করে আগুন জ্বলে উঠবে, এটাই স্বাভাবিক।

শরৎশশী সে আগুন চাপা দিতেও চেষ্টা করে না। বলে ওঠে, 'জামাই-বাবুর কাজটা ভাল নয়? ও! তবে ভালটা কার? চোর ডাকাত খুনে গুণ্ডাদের? ওলো এই 'খারাপ কাজ' করা লোকগুলো আছে বলেই এখনো রাজ্য চলছে বুঝলি? নচেৎ অরাজক হয়ে উঠতো!'

ভীতু উমাশশী ভয়ে কাঁটা হয়ে যায়, শিউরে উঠে বলে; 'তা বলি নি দিদি। বলছি—জামাইবাবুর পক্ষে ভাল নয়। সময়ে নাওয়া খাওয়া নেই, দিনে রাত্রে জিরেন নেই, সদাই ভয় ভয়—'

হঠাৎ নিজেকে সংবরণ করে নেয় উমা অলক্ষ্যে মা'র কাছে চিমটি খেয়ে। চিমটিটির সাহায্যে সতর্ক করে দিয়ে সুখদা নিজেই হাল ধরেন।

না ধরে করবেন কি।

বলতে গেলে শরৎশশীর সাহায্যেই মোটামুটি দাঁড়িয়ে আছেন তিনি, বছরে দু-চার মাস তো থাকেনই,—তার কাছে, তাছাড়া বাকী সময়টা যেখানেই থাকুন হাতখরচটা এখান থেকেই যায়।

নেহাৎ না কি বদলীর চাকরী করালীকান্তর তাই একনাগাড়ে থাকা হয় না। চন্দননগরে বদলী হয়ে এসে পর্যন্ত আছেন। এখানে যত বড় কোয়ার্টার্স, ততবড় বাগান, তত লোক-জনের সুবিধে, এলাহি কাণ্ড! এর অধিকারিণীকে চটাবেন? হাল অতএব ধরতেই হয়।

ধরেন। বলে ওঠেন, 'আগে কি এমন ভয় তরাস ছিল? না এত খাটুনীই ছিল? সোজাসুজি চুরি ডাকাতি খুন খারাপি হতো, সোজা-সুজি ব্যবস্থা ছিল। পোড়ারমুখো স্বদেশী ছোঁড়াগুলো যে উৎখাত করে মারছে! গুলী বারুদ তৈরি করে বৃটিশ রাজত্ব উড়িয়ে দেবে! ভদ্দর ঘরের ছেলে হয়ে ডাকাতি করবে! এই সব জ্বালাতেই বাছার নাওয়া খাওয়া নেই! লক্ষ্মীছাড়া ছোঁড়াদের যেন মা বাপ নেই, পুলিশ বেচারাদের তো ঘরে বৌ ছেলে আছে!'

'স্বদেশী, স্বদেশী' এই শব্দটা অনবরতই কানে আসে বটে উমাশশীর, কিন্তু স্বদেশী ছোঁড়াদের গুণাগুণ কি, তাদের কার্যকলাপ কি, তা নিয়ে মাথা ঘামাতে যায় নি কোনোদিন, তাই আজ একটু থতমত খায়।

ভয়ে ভয়ে বলে, 'রাগ কোর না শরৎদি, এত কথা তো জানি না। তাই বলছিলাম—'

'না রাগের কি আছে?' শরৎশশী উদাস গলায় বলে, 'আগেকার আমলে চোরের পরিবার ভয়ে কাঁটা হয়ে থাকতো বর কখন ধরা পড়ে, আর এখন পুলিশের পরিবারকে সশঙ্কিত হয়ে থাকতে হয়, বর কখন মারা পড়ে; এই আর কি! কাজটা ভাল নয়, একপক্ষে বলেছিসই ঠিক'. নিশ্বাস ফেলে শরৎ-শশী। হয়তো উমার কুণ্ঠা লজ্জা ভয় দেখে মায়া হয় তাই আগুনটা সামলে নেয়, বলে, 'প্রাণ হাতে করে থাকা! এই যে রাত-বিরেতে বেরিয়ে যাচ্ছে মানুষ, যাচ্ছে তো সাপের গর্তে হাত দিতে, বাঘের গুহা খোঁচাতে? ফিরবে তার নিশ্চয়তা আছে? তবু বুক বেঁধে থাকতেই হবে, কর্তব্য করতেই হবে। ইংরেজের রাজত্বটা তো লোপাট হতে দেওয়া চলে না।'

সুখদা ফোড়ন কেটে ওঠেন, 'কার অন্ন খাচ্ছিস? কার হাতে ধনপ্রাণ, তা ছোঁড়ারা ভারছে না গো? কই পারছিস গোরাদের সঙ্গে? শয়ে শয়ে তো জেলে যাচ্ছিস, পুলিশের লাঠিতে মুখে রক্ত উঠে মরছিস, তবু হায়া নেই!'

রক্ত ওঠার কথায় শিউরে ওঠে উমা। আস্তে বলে, 'জামাইবাবুর হাতে ধরা পড়েছে কেউ?'

'পড়ে নি?' শরৎশশী দৃপ্ত গলায় বলে, 'গাদা গাদা! তোর জামাইবাবু বলে, 'আমি গন্ধ পাই! সমুদ্দুরের তলায় লুকিয়ে থাকলেও টেনে বার করতে পারি।'

উমা একটা নিশ্বাস ফেলে।

জামাইবাবুর কর্মদক্ষতায় খুব বেশি উৎসাহ বোধ করে না। হলেই বা স্বদেশী ছোঁড়া, মা-বাপের ছেলে তো বটে! আর এই সূত্রে তার মেজ জায়ের কথা মনে পড়ে যায়।

'স্বদেশী' শব্দটার উপর যেন তার প্রাণভরা ভক্তি।

অথচ আসলে ওই শব্দটা যে ঠিক কি তাই ভাল করে জানে না উমা।

মানুষ?

না জিনিস?

না কি কোনো কাজ?

কে জানে।

মেজ বৌকে জিগ্যেস করতেও ভয় করেছে। ওসব কথায় এমন চড়ে ওঠে, এমন বিচলিত হয়, দেখলে ভয় করে। উমা ভাবে থাক গে, জেনেই বা কি হবে! আদার ব্যাপারী জাহাজের খবরে দরকার কি!

কিন্তু এখানে এসে জামাইবাবুর কার্যকলাপ দেখে মনে হচ্ছে, একটু বুঝি জানা-বোঝা ভালো। তা'হলে এমন অন্ধকারে থাকতে হয় না। বুঝতে পারা যায় কোনটা পাপ কোনটা পুণ্যি!

সুখদার কথায় শরৎশশী সচেতন হয়। বলে, 'থাক মাসী ওসব কথা! দেশের সর্বনাশ যে আসন্ন তা' বোঝাই যাচ্ছে! গোরারা একবার ক্ষেপলে কি আর রক্ষে থাকবে? তবে যারা কর্তব্য-নিষ্ঠ, যারা বৃটিশের নেমক খাচ্ছে, তারা মরবে তবু নেমকহারামী করবে না, এই হচ্ছে সার কথা! তাতে প্রাণ চলে যায় যাক।'

কিন্তু এইটাই কি শরৎশশীর প্রাণের কথা? না কি সে শাক দিয়ে মাছ ঢাকে? কথা দিয়ে দিয়ে মুখ রাখে! ওই নির্বোধ উমাটা একেই 'দশমাতা' হয়ে অহংকারে মরছে, তার পর যদি টের পায় শরৎশশীর যা কিছু

চাকচিক্য সবই ভূয়ো, যা কি— —া, জোনাকির আলো, তা' হলে আর রইলো কি ?

তা' যতই শরৎশশী তার ভাগ্যকে আড়াল করুক, ছোট ছেলে-মেয়েগুলোর চোখ এড়ায় না। তারা মহোৎসাহে খবর সন্ধান করতে থাকে।

তারা টের পেয়ে যায় মেসোমশাই যাদের সঙ্গে চুপি চুপি কথা কন, তারা হচ্ছে গোয়েন্দা, যেখানে যেখানে ওই স্বদেশী গুণ্ডারা লুকিয়ে আছে সেখানের সন্ধান এনে দেয় ওরা। মেসোমশাই তখন ছোটে সেখানে। সেই ছেলেদের চাবুক মারতে মারতে পিঠের ছাল তোলে, লাথি মারতে মারতে পেট ফাটায়, ধরে ধরে নিয়ে গিয়ে জেলে পোরে।

ভীষণ একটা উত্তেজনা অনুভব করে ওরা। নেহাৎ ছোট যার পাঁচটাকে বাদ দিলেও বাকি ক'জন আলোচনায় অংশ গ্রহণ করতে পারে। আর সেই সূত্রে পাকা মেয়ে টেঁপি একটা প্রখর সত্য দাদা-দিদিদের সামনে ধরে দেয়।

'মেজখুড়ি যদি টের পায় আমরা পুলিশের বাড়িতে আছি, মেজখুড়ি আর ছোঁবে না আমাদের। কথাই কইবে না।'

চমকে যায় তার দাদা-দিদিরা।

বলে, 'তাই তো রে, টেঁপি তো ঠিক বলেছে!'

'বাঃ আমরা বুঝি ইচ্ছে করে পুলিশের বাড়িতে আছি?' বললো একজন।

আর একজন চিন্তিতভাবে বলে, 'তা বললে কি হবে, মেজখুড়ির রাগ জানিস তো! তার ওপর আবার শুধু পুলিশ নয় স্বদেশী মারা পুলিশ।'

মেজখুড়ি রাগ করলো তো বয়ে গেল, একথা ওরা ভাবতেই পারে না, মেজখুড়ির অপ্রসন্নতা, সে বড় ভয়ংকর দুঃখবহ।

অবশেষে ওরা ঠিক করে, বলা চলবে না। দরকার কি রাগিয়ে মেজ-খুড়িকে।

মল্লিকা নিশ্বাস ফেলে বলে, 'মা'র জন্যেই এইটি হল আমার! চাঁপির সঙ্গে ঠাকুমার সঙ্গে চলে যেতাম, চুকে যেত! তখন বললো, 'ছেলে সামলাতে হবে না রে—' মা'র ভঙ্গীর অনুকরণ করে মল্লিকা, 'আমাকে তো আর হেঁসেল সামলাতে হবে না ওখানে—' এখন দেখছিস তো? রাতদিন, কাঁথা বদলা, ন্যাতা কেচে আন, দুধ খাইয়ে দে! কেনই যে এতগুলো ছেলে-মেয়ে হয় মানুষের! ছোটখুড়ির বেশ! শুধু বুদো ব্যাস!

হঠাৎ মল্লিকার ওপরের ভাই গৌর হেসে বলে ওঠে, 'তা'হলে তো তোকে আর জন্মাতেই হতো না। শুধু আমি, ব্যস! তুই, নিতাই, রামু, টেঁপি, টগর ফুটি, পুঁচকে, খোকা, খুকী সববাই পড়ে থাকতো ভগবানের ঘরে।'

এটা অবশ্য খুব একটা মনঃপূত হল না মল্লিকার! মল্লিকা জন্মায় নি, সেটা আবার কেমন পৃথিবী!

অনেক আলোচনান্তে অবশেষে কিন্তু স্থির হয় মেজখুড়ির কাছে কিছুই গোপন করা চলবে না, কারণ মেজখুড়ি পেটের ভেতরকার কথা টের পায়। পষ্টই তো বলে, 'আমার একটা দিব্যচক্ষু আছে, বুঝলি? তোরা কে কি লুকোচ্ছিস সব বুঝতে পারি।' মিথ্যে কথায় বড় ঘেন্না মেজখুড়ির অতএব বলা হবে, তবে এটাও জোর দিয়ে বোঝাতে হবে, তাদের কি দোষ? তারা তো ইচ্ছে করে মাসীর বাড়ি বেড়াতে আসে নি।

হঠাৎ এক সময় শরৎশশীর নজরে পড়ে সব কটায় মিলে কি যেন গোপন ষড়যন্ত্রে লিপ্ত। এসে ভুরু কুঁচকে বলে, 'কি করছিস রে তোরা?'

ওরা অবশ্য চুপ।

শরৎশশী বিস্মিত হয়, বার বার প্রশ্ন করে, এবং সহসাই বিশ্বাস-ঘাতক টেঁপি বলে ওঠে, 'মেসোমশাই পুলিশ তো, সেই কথাই হচ্ছে—'

দাদা-দিদিদের সব ইসারা ব্যর্থ হয়।

চিমটিকাটা বিফলে যায়।

শরৎশশী যখন কঠিন গলায় বলে, 'পুলিশ তো কি হয়েছে?' তখন টেঁপি বলে ওঠে, 'স্বদেশীমারা পুলিশ খুব বিচ্ছিরি তো! মেজখুড়ি যদি শোনে আমরা এ বাড়িতে আছি, তা'হলে আর ঘেন্নায় ছোঁবে না—আমাদের, তাই মেজখুড়িকে বলা হবে না।'

'মেজখুড়ি!'

শরৎশশী শুধু এইটুকুই বলতে পারে।

টেঁপি মহোৎসাহে বলে, 'হ্যাঁ মেজখুড়ি যে স্বদেশীভক্ত! জানো না? পুলিশকে ঘেন্না করে, সাহেবকে ঘেন্না করে!'

শরৎশশী মুহূর্তকাল স্তব্ধ হয়ে থাকে। তারপর সহসাই কঠোর গলায় বলে ওঠে, 'বেশ তবে থাকতে হবে না পুলিশের বাড়ি, চলে যা নিজেদের ভাল বাড়িতে। আজই যা।'

(ক্রমশঃ)

কেশ বিন্যাসে অপূর্ব্ব অবদান...
বেঙ্গল কেমিক্যালের
গোল্ডেন আমলা
হেয়ার অয়েল
এই আয়ুর্ব্বেদোক্ত কেশ তৈল মাথা ঠাণ্ডা রাখে ও ইহার নিয়মিত ব্যবহারে কেশের প্রাচুর্য্য ও মসৃণতা এনে দেয়।

হিরণকে নিয়ে কোনদিন যে আমি গল্প লিখবো একথা কখনও ভাবি নি। কিন্তু আজ যেন ও নিজেই আমার সামনে সেরকম একটা ইচ্ছের কথা প্রকাশ করে রেখে গেলো। বয়সের সঙ্গে সঙ্গে ওর মনটা বোধহয় ক্রমে দুর্বল হয়ে আসছে। এখন বোধ হয় ও চায় যে জগতের দশজন ওর কথা জানুক, ওকে সহানুভূতি জানাক।

কিন্তু সেই গল্প লিখতে গিয়ে আমি একটু অসুবিধেয় পড়েছি। কারণ ওর জীবনের ঘটনাপ্রবাহ এমন অসাধারণ নয় কিছু, আজকাল এ ধরণের ঘটনা অনেক মেয়ের জীবনেই ঘটে থাকে আর এই ধরণের গল্পও লেখা হ'য়েছে অনেক।

তবুও আজ আমি সেই একধাঁচের গল্পই একটা লিখতে বসেছি— কেন না হিরণের রিক্ত দুর্বল অন্তরের এটা একটা আকাঙ্ক্ষা। এই একটু আগে হিরণ চলে গেলো, ভেতরে আর ঢোকে নি। আমাদের সম্মুখের বারান্দা থেকেই ও চলে গেলো আমার থেকে বিদায় নিয়ে। আমি কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে ভেতরে চলে আসতে পারলাম না, অনেকক্ষণ স্তব্ধ হয়ে চেয়ারটাতে বসে রইলাম। তার পরে এখন এসে ঢুকলাম ভেতরে। কাগজ-কলম নিয়ে যদিও বসেছি কিন্তু এখন পর্যন্ত একটি কথাও লিখতে পারি নি—কি বলে আরম্ভ করবো আমি? ওর এত কথা আমি জানি, কিন্তু এখন দেখছি কলম দিয়ে কোন কথাই বেরোতে চাইছে না, বোধহয় খুব প্রিয় বন্ধুর কথা গল্প হিসেবে লেখা শক্ত।

সত্যি, হিরণ আমার খুব প্রিয় বন্ধু। আমার একমাত্র অন্তরঙ্গ বন্ধু। ছোটবেলা থেকে আমরা একই ক্লাসে পড়ে ম্যাট্রিক পাশ করলাম। একই কলেজ থেকে বি-এ। বি-এ পাশ করার পরে আমি গৌহাটীতে চলে গেলাম এম-এ পড়তে, কিন্তু হিরণ্ময়ীর মানে হিরণের পড়া আর হলো না। হঠাৎ ওর বাবা মারা গেলেন হার্টফেল হয়ে। অবশ্য ওর বাবা যদি বেঁচেও থাকতেন, তাহ'লেও ওর পড়াশুনো আর হতো না বোধ হয়। কারণ ওকে বিয়ে দিয়ে বিদায় করবার চেষ্টা যে ওর বাবা-মা অনেকদিন থেকেই করে আসছেন, সে কথা ও আমাকে জানিয়েছিলো। এতদিন যে ওর বিয়ে হয় নি সেইটেই আশ্চর্যের কথা কেন না ওর নিচে আরও সাতটি বোন ছিলো। সাধারণত এত বেশি কন্যাসন্তান থাকলে বিয়ে দিয়ে বিদায় করার চেষ্টা বাপ-মা অনেক আগে থেকেই করে থাকেন। আর যদি সেই মা-বাবার কোন পুত্রসন্তান না থাকে তবে তো কথাই নেই। হিরণের কোন ভাই ছিলো না। তবু ততদিনেও ওর বিয়ে না হওয়ার কারণ পড়াশুনোর প্রতি ওর ভীষণ আগ্রহ। বুদ্ধিও ছিলো ওর খুব প্রখর। সবসময়ই ও পড়াশুনো করেছে বৃত্তি পেয়ে। সেইজন্য, বাপ-মায়ের খুব ইচ্ছে থাকলেও হিরণের বিয়ে দিতে পারেন নি এতদিন। অন্তত বি-এটা পাশ করতে দিতে হবে বলে এমন জিদ্ ধরেছিলো হিরণ, যে মেয়ের ইচ্ছের বিরুদ্ধে যেতে মনে জোর পান নি ওঁরা।

কিন্তু আজ এখন ভাবছি—তখন যদি মেয়ের কথা না শুনে জোর করে বিয়েটা দিয়ে দিতেন! তখনকার সেই অভিশাপ আজ ওর জীবনে আশীর্বাদ হ'য়ে দেখা দিতে পারতো। কিন্তু যাক্ সে কথা—কি হ'তে পারতো সে কথা আমি লিখতে বসি নি, আমি লিখে যাবো কি হ'য়ে গেলো।

এইভাবে বি-এ পাশ করলো হিরণ—বিয়ে হ'তে গিয়েও হ'লো না। যখন ওর বিয়ের আয়োজন প্রায় সম্পূর্ণ, তখন হঠাৎ একদিন মারা গেলেন ওর বাবা।

অবশ্য একেবারে অনাথ করে উনি রেখে যান নি হিরণদের। শহরে বাড়ি করেছিলেন একটা, আর দশ হাজার টাকার ইনসিওরও করে রেখেছিলেন। কিন্তু তা সত্ত্বেও যার ঘরে এতগুলি মেয়ে আবার তার মধ্যে দু-তিনজন বিবাহযোগ্যা, তাদের বাপ-মায়ের মনে পুরোপুরি শান্তি কখনোই থাকতে পারে না। তদুপরি বাপের আকস্মিক মৃত্যুর জন্য, সমস্ত দুর্ভাবনার বোঝা যদি মায়ের মাথায় এসে পড়ে, তবে সেই মায়ের মানসিক অবস্থা কি হ'তে পারে, তা সহজেই অনুমেয়।

আমি এম-এ পড়তে চলে যাওয়ার পরেই হিরণদের এই দুর্ঘটনা ঘটেছিলো। মায়ের চিঠিতে খবর পেয়ে হিরণকে চিঠি দিয়েছিলাম, সান্ত্বনা দেবার, বোঝাবার বৃথা প্রয়াসের চেষ্টার চিঠি একটা। তারপর আরও একটা চিঠি দিয়েছিলাম, হিরণের পিতৃবিয়োগের একমাস পরে ওদের খবরাখবর জানতে চেয়ে। সেই চিঠির উত্তরও দিয়েছিলো হিরণ, জানিয়েছিলো শ্রাদ্ধ ভালোয় ভালোয় হ'য়ে গিয়েছে আর সৌভাগ্যক্রমে স্থানীয় হাইস্কুলে শিক্ষয়িত্রীর কাজও একটা পেয়েছে ও।

এর পরে একটা বন্ধের ছুটিতে বাড়ি এসে হিরণের কাছে গেলাম।

ওদের বাড়িতে ঢুকেই প্রথমে দেখা পেলাম কিরণের; হিরণের ঠিক পরের বোন। ওকে দেখে বা ওদের আগের মতোই পরিপাটী করে সাজানো-গোছানো ঘরে ঢুকে প্রথমে আমার ওদের হ'য়ে যাওয়া দুর্ঘটনা সম্বন্ধে কোন সচেতনতা জাগে নি, কিন্তু

যখনই আমি মাসীমা অর্থাৎ হিরণের মায়ের মুখোমুখি হ'লাম হঠাৎ যেন একটা বড় আঘাত পেয়ে থমকে দাঁড়ালাম। দু'মাস আগে এই বাড়িতে যে শোকাবহ ঘটনা ঘটে গিয়েছে তার সবটুকু ট্র্যাজেডির তাৎপর্য যেন অতি প্রকটভাবে ফুটে বেরিয়েছে কেবল এই ভদ্রমহিলার চেহারায়। তাঁর ভেতরের অবস্থা আমি জানি না কিন্তু বাইরের এই শুভ্র সাজসজ্জায় ভদ্রমহিলাকে দেখে আমার মন হঠাৎ একটা চমক খাওয়া বেদনায় টনটনিয়ে উঠলো। হিরণের মা অপূর্ব সুন্দরী, হিরণরাও দেখতে-শুনতে ভালোই, কিন্তু মায়ের চেহারা ওরা কেউই পায় নি। তিনি যেন নিজেও তাঁর এই অপরূপ সৌন্দর্য সম্পর্কে সজাগ ছিলেন, কারণ সব সময় দেখতাম নিজেকে একটু বেশি সাজিয়ে রাখতেন তিনি। রঙীন ব্লাউজ আর উজ্জ্বল রঙের পাড় লাগানো সেখলা তিনি সব সময় ব্যবহার করতেন। টকটকে লাল সিঁদুর লম্বা করে দিতেন সীমন্তে, যেন নতুন বিয়ে হওয়া মেয়ে একটি।

আর আজ এখন শুভ্র সীমন্ত আর তার চেয়েও শুভ্র বসনে তাঁকে দেখে আমার অন্তরটা ধ্বক্ করে উঠলো।

আমি উদ্‌গত নিশ্বাস রোধ করে ধীরভাবে শুধোলাম, "ভালো আছেন মাসীমা?"

"আমার আর ভালো থাকা মা—" একটু ম্লান হেসে বললেন মাসীমা আর তার পরেই রান্নাঘরের দিকে মুখ ফিরিয়ে একটু চেঁচিয়ে ডাকলেন, "হিরণ, এই হিরণ? বুড়ি এসেছে দ্যাখ্—"

মাসীমার ডাক শুনে শুধু হিরণই নয়, মিনুও রান্নাঘর থেকে এলো আর তার পরেই অন্যান্য ঘরগুলো থেকে চিনু, পুতলী, মীরা, হীরা, দুলু সবাই বেরিয়ে এলো একে একে। এক-ঝাঁক মেয়ে। তার মধ্যে হিরণ, কিরণ ছাড়াও মিনু, চিনুও বিবাহযোগ্যা হ'য়ে উঠেছে, পুতলী যদিও ফ্রক পরে এখনও তবু আগের হিসেবে তারও বিয়ে দেয়ার বয়স হ'য়েছে। নানা ধরণের পোশাক পরা সুন্দর সুন্দর মেয়েগুলি যেন একঝাঁক পাখী, এরা চোখকে হয়তো ক্ষণিক তৃপ্তি দিতে পারে কিন্তু মনটাকে যে কি অস্ব-স্তিতে ভরিয়ে দেয়। আমি এখন অন্তরে সামান্যা হ'লেও সেই অস্বস্তি অনুভব করছি, আর সারাদিন এদের চোখের সামনে রেখে মায়ের যে কি অবস্থা সেটা ভেবে আমি একটু শিউরে উঠলাম। ছেলে না হয়ে মেয়ে হয়ে জন্ম নেওয়ায় এদের সামান্যতম অপরাধ না থাকলেও সবসময় মনে অপরাধী ভাব নিয়ে থাকা বা ভবিষ্যতে নিজেদের সেরকম ভাবার সম্ভাবনা থাকা এই মেয়ে ক'জনের দিকে একবার মুখ তুলে চেয়ে, একটু মুচ্‌কি হেসে আমি অন্তরে একটা স্নেহ মেশানো মমতা অনুভব করলাম।

হিরণ এগিয়ে এসে শান্তভাবে শুধোলে আমাকে, "কখন এলি বুড়ি?"

"—আজ দুপুরে।"

মিনু রান্নাঘর থেকে বেরিয়ে এসে আবার ভেতরে ঢুকে গিয়েছিলো, একটু বাদে দেখলাম হাতে এক কাপ চা নিয়ে বেরিয়ে এলো, "নাও বুড়িদি।"

হিরণদের মধ্যে মিনুকে আমি সব থেকে বেশি ভালবাসি—ওর মধ্যে কি যেন একটা আছে, দেখলেই ভালো-বাসতে ইচ্ছে করে। দেখতেও ও সবাইয়ের চেয়ে সুন্দর, আর ওর মিষ্টি ডাকও আমার খুব ভালো লাগে। এমন কি ওর নামটাও। মৃন্ময়ী ও চতুর্থ কন্যা। হিরণ্ময়ী, কিরণ্ময়ী, চিন্ময়ী, মৃন্ময়ী, পুতলী, মীরা, হীরা, দুলু—এই আটটি বোনের যথাক্রমে এই ক'টি নাম। হিরণ্ময়ী হাসতে হাসতে আমায় একদিন বলেছিলো,—"জানিস বুড়ি, আমার জন্মের পর মা-বাবা বোধ-হয় খুব আনন্দে আর উৎসাহে গবেষণা চালিয়ে হিরণ্ময়ী নামটাকে খুব সুন্দর আর একটু অসাধারণ ভেবেই দিয়েছিলেন। তারপর কিরণের জন্ম হওয়াতে ততটা উৎসাহিত না হ'লেও আমার নামের সঙ্গে মিলিয়ে ওকে কিরণ্ময়ী নাম দিলেন। তারপর চিনু, মিনুর জন্ম হওয়ায় একটু বিরক্ত হ'লেও কবিতার মোহ তখনও ছাড়তে পারেন নি, কাজেই ওদের নামকরণ হ'লো চিন্ময়ী আর মৃন্ময়ী। তারপর পুতলী আর মীরা ওরা হওয়াতে মিল খোঁজার সেই মোহ-টুকুর কিছুই আর অবশিষ্ট ছিল না বোধহয়, নয়তো ওদের নাম পুতলী, মীরা না হয়ে, জ্যোতির্ময়ী, আনন্দ-ময়ী এই গোছের কিছু হতে পারতো। ওদের ভাগ্য ভালো বুড়ি, অসমীয়া ঘরে জন্মেছে, বাঙালীর ঘরে জন্ম হ'লে মীরা, হীরা নাম আর পেতে হতো না —হ'তো আন্নাকালী রক্ষাকালী এই গোছের কিছু!" কথা শেষে সেদিন হিরণ হেসেছিলো। কিন্তু আমি ওর হাসিতে যোগ দিতে পারি নি—ওটা হাসি হ'লে হয়তো পারতাম, এমন কি কান্না হ'লেও—কিন্তু কান্না কি হাসির বিকৃত রূপ নিয়ে ফুটে বেরোয়?

কিছু সময় হিরণের বাড়িতে কাটিয়ে আমি ফিরলাম, সম্ভব হ'লে আমাদের বাড়িতে আসতে বলে এলাম। এখন ওকে সুযোগ-সুবিধা বুঝে আসতে বলতে হবে, কেন না সারাটা দিন ওকে স্কুলে খাটতে হয় আর হয়তো বাবা মারা যাওয়ার পর আগের মতো ঘোরাটোরাও হ'য়ে ওঠে না ওর। আজ মনে হলো ও যেন আগের চেয়ে অনেক বদলে গিয়েছে, যদিও ওর সঙ্গে বেশিক্ষণ কথা বলার সুযোগ আমি পাই নি। অবশ্য আগেও হিরণদের বাড়িতে বসে হিরণের সঙ্গে একলা কথা কওয়ার বেশি সময় পেতাম না, কারণ এতগুলো বোন থাকতে কোথাও বিজনে বসে যে একটু কথা বলবো সে উপায় ছিলো না। কাজেই আমাদের অন্তরঙ্গ কথাবার্তা সাধারণত আমাদের বাড়িতে বসেই হ'তো। আমাদের বাড়িতে বড় ছেলে-মেয়ে কম। আমার নিজেরও একটা আলাদা ঘর আছে। কাজেই হিরণদের বাড়িতে আমার বেড়াতে যাওয়া শুধু হিরণের

বি, সি, মাইতি এণ্ড কোং

—ইলেকট্রো প্লেটিং সামগ্রী—

নিকেল ভ্যাট ও ব্যারেল * ডাইনামো * পলিশিং মেসিন এবং পলিশিং করিবার জন্য যাবতীয় সামগ্রীর আদি সরবরাহক।

শো রুম:—৯৪, প্রেমচাঁদ বড়াল স্ট্রীট, কলি-১২। ফোন : ৩৪-৩১৭৩
৩, রাধামোহন পাল লেন, কলি-১২ : অফিস-ফোন—৩৪-৪৮৪৬

সঙ্গে কথা বলতেই নয়, ওদের বাড়ির সঙ্গে আমার ভদ্রতার সম্পর্ক বজায় রাখতেই। কিন্তু হিরণ আমাদের বাড়িতে আসার অর্থ কেবল আমার জন্যই আসা।

আজ হিরণকে বলে এলাম, "যদি পারিস কাল একবার আমাদের বাড়িতে আসিস।"

সত্যি কথা বলতে গেলে হিরণের সঙ্গে একা দেখা করবার জন্য আমি ব্যাকুল হয়ে উঠেছিলাম। আমার এক-মাত্র প্রিয় বান্ধবী ও, ওর সুখে আমিও সুখী হই, ওর দুঃখে আমিও বেদনা অনুভব করি। আমার কাছে জীবনে বন্ধুত্বের মূল্য খুব বেশি। কৈশোর আর যৌবনের সন্ধিক্ষণে আমাদের কিছু কথা আমাদের কিছু সমস্যার একমাত্র ভাগ দিতে পারি একমাত্র বন্ধুকেই—মা-বাবা ভাই-দাদা কিংবা বোনকে নয়। সেই বন্ধুত্ব অতি ব্যাপক অর্থের, যদিও আমার আর হিরণের জীবনে তখনও কিন্তু তার অন্য দিকের বিস্তৃতি ঘটে নি অর্থাৎ আমা-দের দুজনের কারও কোনও অন্তরঙ্গ পুরুষ বন্ধু ছিল না, আমরা দুজন দুজনের একমাত্র অন্তরঙ্গ বন্ধু হ'য়েছিলাম। আজ হিরণের সঙ্গে দেখা করে ফিরে আসার সময় মনটা আমার ভারাক্রান্ত হ'য়ে পড়েছে। হিরণের কিছু একটা হ'য়েছে, উঁহু—সেই পরিবর্তন শুধু পিতৃবিয়োগের বেদনাই নয়, আরও কিছু একটা হ'য়েছে ওর। কি হ'য়েছে জানি না, কিন্তু আমার মনটা তখন থেকেই খারাপ হ'য়ে গেল। এখন আমার পরম কামনা ওর সঙ্গে যেন মন খুলে কথা বলে ওর কি হ'য়েছে বুঝতে পারি।

হিরণ ঠিক পরদিনই আমার কাছে এলো। স্কুলের থেকে বেরিয়েই সোজা আমাদের বাড়িতে এলো কারণ, বাড়ি গেলে আর সহজে বেরিয়ে আসা হবে না হয়তো। গরমে ঘেমে ভিজে, সারা দিনটা স্কুলে খেটে এসে ক্লান্ত হ'য়ে পড়া হিরণকে দেখে আমার মনটা আরও একবার ধ্বক্ করে উঠলো। এইসব যদিও পৃথিবীর নিত্য-নৈমিত্তিক অতি স্বাভাবিক ঘটনা তবুও আমি না ভেবে পারলাম না যে পড়া-শুনোয় ভালো হ'য়েও হিরণ আজ এম-এ পড়তে পারলো না, স্কুলে-মাস্টারী করতে হ'চ্ছে ওকে আর আমি পড়াশুনোয় তেমন ভালো না হ'য়েও কোনও চিন্তা, কোনও দায়িত্ব ছাড়াই এম-এ পড়ছি।

চা-টা খেয়ে হিরণ আমার সঙ্গে আমার ঘরে এলো।

"তোর শরীরটা যদি খারাপ লাগে আমার বিছানায় একটু গড়িয়ে নে না হিরণ।" আমি বললাম।

"অর্থাৎ ক্লান্তি?" হিরণ হাসলো একটু, "একমাস মাস্টারী করেই যদি ক্লান্ত হতে হয়, তবে বাকি তিরিশ চল্লিশটা বছর—মাস নয়, কি করে কাজ করবো বলতো বুড়ি?"

"কোন্ দুঃখে আরও তিরিশ চল্লিশটা বছর মাস্টারী করবি তুই?" হিরণের কথা শুনে আমি বেদনার সঙ্গে অস্বস্তিও অনুভব করলাম, কেন জানি না, হয়তো ওর আর আমার ভাগ্যের পার্থক্যটা অতি প্রকট হ'য়ে আমাদের মধ্যে ফুটে ওঠাতে, যেটা আগে কখনও কথাবার্তার মধ্যে অন্তত প্রকাশ পায় নি।

"কিসের দুঃখে তুই ভালো করেই জানিস্ বুড়ি—" আমার দুটো বালিশের একটা বালিশ বুকের মধ্যে চেপে ধরে উপুড় হ'য়ে শুয়ে আমার কথার উত্তর দিলো হিরণ, কারণ মুখে এসব কথা বললেও কাজের বেলায় কিছু আমার নির্দেশই পালন করে-ছিলো, অর্থাৎ আমার বিছানায় শুয়ে পড়েছিলো।

আমি বেতের মোড়াটা বিছানার কাছে টেনে এনে বসে পড়েছিলাম।

কিছুক্ষণ আমি কোনও কথা বলতে পারলাম না। তারপর আস্তে জিজ্ঞেস করলাম, "তোর বিয়ে একরকম ঠিক হ'য়ে গেছে শুনেছিলাম গতবার —" আমার কথাটা অর্ধসমাপ্ত করে রাখলাম।

"সেই বিয়ে ভেঙে গেছে।"

"কেন, ওরা কি অপেক্ষা করতে রাজী হয় নি?" পিতৃবিয়োগের পর এক বছরের মধ্যে বিয়ে হতে পারে না সে কথা ভেবেই আমি বললাম।

"তা নয়—" হঠাৎ হিরণ বিছানায় উঠে বসলো, তারপর আমার চোখের দিকে চেয়ে একটু হাসলো ও, "জানিস বুড়ি, আমাকে ভদ্রলোকের এত পছন্দ হ'য়েছিলো যে, একবছর কেন আরও কয়েক বছর অপেক্ষা করতে পারতেন। কিন্তু আমিই সেই অপেক্ষা করার রোমাঞ্চ সম্পূর্ণ ভঙ্গ করে বিয়ে ভেঙে দিলাম।"

"কেন?" আমি এবার খুব অবাক হ'য়ে জিজ্ঞেস করলাম ওকে। অন্তত মুহূর্তের জন্য হ'লেও আমি ওর জন্য বেদনা অনুভব করতে ভুলে গিয়ে খুব আশ্চর্য হ'য়ে প্রসন্ন দৃষ্টিতে ওর দিকে চেয়ে রইলাম।

"কেন আবার? এটা একটা জিজ্ঞেস করার মতোন প্রশ্ন হ'লো নাকি বুড়ি?" হিরণই যেন অবাক হ'লো বেশি, ঠিক তাও নয়, একটু যেন অধৈর্যও।

"আমি যদি বিয়ে করে বসি তবে বাকি সাতটি বোনের ভরণ-পোষণ, শিক্ষাদীক্ষা, বিয়ে-থার দায়িত্বের বোঝাটা কে মাথা পেতে নেবে বলতে পারিস?"

"তোর বাবার শুনেছি কি একটা ইন্সিওরেন্স......" আমাকে কথা শেষ করতে দিলো না হিরণ, একটু যেন বেশি অধৈর্য হ'লো, একটু জোরেই বলে উঠলো, "বোকার মতো কথা কস্নি, বাবা ইন্সিওরেন্সের যে কটা টাকা রেখে গেছেন, তাতে এতগুলো বোনের বিয়ের খরচ বাদ দিয়ে, খাওয়া-দাওয়া বসন-ব্যসন কোন কিছুরই খরচ চলে না। এমন কি আমি যে ক'টা টাকা পাই তাতেও চলে না, কাজেই সামনের মাস থেকে আমাদের বাড়ির কিছুটা ভাড়া দেবো।"

আমি হঠাৎ স্তব্ধ হ'য়ে গেলাম। হিরণও অনেকক্ষণ কথা বললো না। ও সামনের জানালাটা দিয়ে একদৃষ্টে চেয়ে রইলো বাইরের দিকে। তারপর আমার দিকে তাকিয়ে আবার একটু হাসলো ও, "আজকালকার মেয়েদের এই সমস্যা নিয়ে অনেক গল্প লেখা হয়, নারে?" সেই একই কাহিনী, পিতার অকালমৃত্যু বা দুরারোগ্য ব্যাধিজনিত পঙ্গু অবস্থা, কয়েকটি নাবালক ছেলে, না—মেয়ের সংখ্যাই বেশি। ছেলে দু-একটা যা থাকে হয় খুব ছোট নয়তো বখে যাওয়া, তার-পর সেই ভাসতে বসা সংসারের দায়িত্ব নিতে হয় পড়াশুনো জানা বড় মেয়েটিকে—তার সমস্ত জীবন, যৌবনের আশা-আকাঙ্ক্ষাকে জলাঞ্জলি দিয়ে, ভবিষ্যৎটাকে গভীর অন্ধকারের বুকে ঠেলে ফেলে দিয়ে"—এইবার একটু বেশি জোরেই হেসে উঠলো ও, "কিন্তু বুড়ি, এইসব গল্পের নায়িকাদের চেয়ে আমি বোধহয় একটু বেশি ভাগ্যবতী, তাদের ঘাড়ে আমার থেকে একটা বেশি বোঝা সচরাচর থেকে থাকে, প্রেমের বোঝা! কিন্তু ভাগ্য ভালো আমার, সেই বোঝা থেকে অন্তত রেহাই পেয়েছি। অবশ্য....." আমার চোখের দিকে আবার চেয়ে হাসলো হিরণ, "আমাকে বিয়ে করতে চেয়েছিলেন যে ভদ্রলোক, তাঁর বোধ-হয় আমাকে একটু বেশিই ভালো-লেগেছিলো। সেই যে কয়েক বছর অপেক্ষা করার কথা বললাম—সেসব ভদ্রলোক নিজেই লিখে জানিয়ে-ছিলেন আমাকে।"

"মাসীমা তোর আপত্তি নাকচ করতে চান নি, হিরণ?"

"ও, হ্যাঁ হ্যাঁ চেয়েছিলেন"—সম্মতিসূচক মাথা নাড়ালো হিরণ, "খুব বেশি করেই চেয়েছিলেন। এই বিষয়ে গল্পের নায়িকাদের-চেয়ে আমি একটু বেশি ভাগ্যবতী, আমার মা সত্যিই একটু স্বার্থপর নন্। মা এমন কথাও বলেছিলেন যে, কাপড় বুনে সংসার চালাবেন উনি। তারপর মাকে বুঝোলাম যে কাপড় বুনে পেট চালানোর দিন আর নেই। সস্তা অথচ সুন্দর জামা-কাপড়ে বাজার ছেয়ে গেছে, আগের মতন আর আমাদের অসমিয়া মেখলা-চাদর বিক্রি হয় না। মোটকথা মাকে আমি বিশ্বাস করতে বাধ্য করলাম যে, আমাদের মধ্যে কেউ চাকরি করে সংসার চালানো ছাড়া অন্য সম্মানজনক কোনও উপায় আর নেই। আর আমি যখন সবার চেয়ে বড়, সব থেকে বেশি পড়াশুনো করেছি, কাজেই আমি ছাড়া অন্য কারো জীবন উৎসর্গ করার প্রশ্নই ওঠে না"—আবার সেই হাসি নিয়ে বললো হিরণ, "অবশ্য 'উৎসর্গ' শব্দটা মার সামনে ব্যবহার করি নি।"

এর পরে আমার সব প্রশ্ন ফুরিয়ে গিয়েছিলো। এমন কি আমি মুখ তুলে হিরণের দিকে তাকাতেও পারছিলাম না। হাত দুটো কোলের ওপর নিয়ে মাথা নিচু করে বসে রইলাম আমি।

টের পেলাম হিরণ আবার বিছানায় শুয়ে পড়লো। "জানিস্ বুড়ি, মাস তিনেক আগে আমাদের বাড়িতে একদিন একটি মেয়ে এসেছিলো..." হঠাৎ আবার কথা শুরু করলো হিরণ: "বঙ্গালী রিফিউজি মেয়ে বোধহয়। মেয়েটির কাঁধে একটি ঝোলানো ব্যাগ, তাতে কিছু তেল-সাবান, পাউডার-স্নো, সিঁদুরের কৌটো ইত্যাদি নিয়ে 'দিদি, ও দিদি' বলে ডাকতে ডাকতে একেবারে আমাদের বাড়ির ভিতরে গিয়ে ঢুকেছিলো। আমরা তখন ভাত খেয়ে উঠে একটু জিরোচ্ছিলাম বসে, তাই ওভাবে হন্ হন্ করে ঢুকতে দেখে একটু রেগেই গেছলাম প্রথমে—শুধু ঢোকাই নয়, মেয়েটি নিজেই একটা মোড়া টেনে নিয়ে আমাদের সামনে বসে পড়লো। বোধহয় সারা দিনটা ঘুরে বেড়িয়েছিলো, কারণ দেখলাম মুখটি ঘামে ভরে গেছে আর রক্তিম হয়ে উঠেছে। মোড়ায় বসে মেয়েটি শাড়ির আঁচল দিয়ে মুখটা মুছে নিয়ে আমরা কিছু জিজ্ঞেস করার আগেই বক্তৃতা সুরু করলে। অতি নিষ্প্রাণ, চাবি টিপে যেন কেউ কথা বলছে। বক্তব্য হলো, মেয়েটি কোনও একটি প্রসাধন কোম্পানীর থেকে এই সব প্রসাধন দ্রব্য বিক্রি করতে এসেছে, আমরা নিশ্চয়ই তার থেকে কিছু-না-কিছু কিনবো। প্রয়োজন নেই একথা শুনতে চায় না। কারণ আমরা নাকি ভাইবোনের আব্দার রাখতে এসব ছাড়াও বহুবিধ খরচ করে থাকি ইত্যাদি ইত্যাদি। প্রায় চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে মেয়েটি অনেকক্ষণ ধরে ওসব বলে গেলো, আমি তখন কথার মধ্যেই জিজ্ঞেস করলাম, "আচ্ছা, তোমার বাড়ি কোথায় ভাই?"

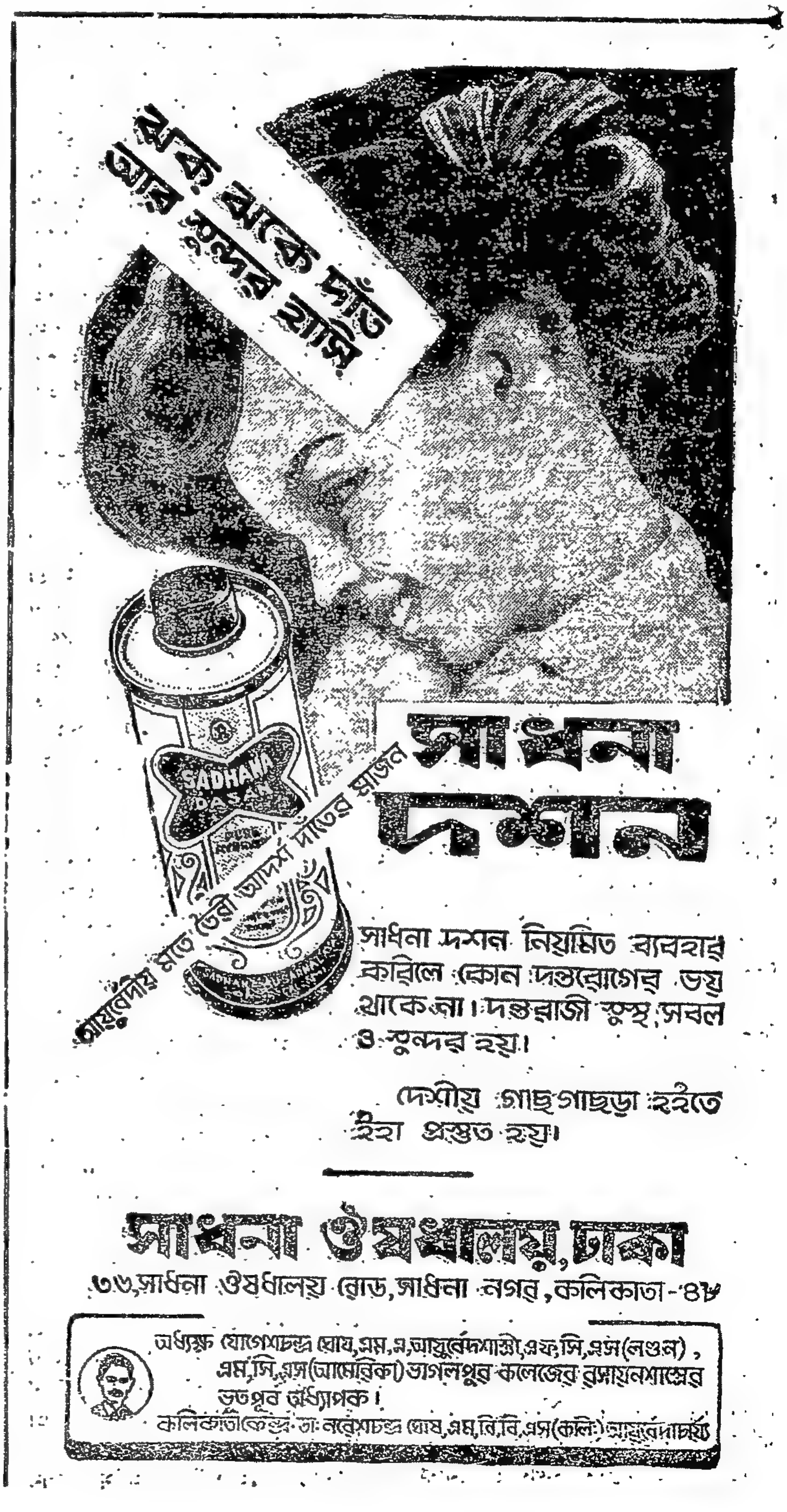

"মেয়েটি বললো—"কলকাতায়।" মা জিজ্ঞেস করলেন, "বাড়িতে তোমার কে কে আছেন?" ওর কণ্ঠস্বর প্রায় বসে গেলো এবার, বললে, "আমার মা-বাবা কেউ বেঁচে নেই।"

"তাহলে তুমি থাকো কোথায়?"

"হোস্টেলে"

"আমি বুঝতে পারলাম এসব কথা ও আলোচনা করতে চায় না। আমারও আর শুনতে ইচ্ছে করছিলো না। পূর্ববঙ্গ থেকে কিভাবে পালিয়ে এসেছে, মা-বাবাকে হারিয়েছে কিভাবে এইসব বহুশ্রুত কাহিনী আবারও শুনে অকারণ মনটা ভারাক্রান্ত করার ইচ্ছে ছিলো না।

"আমি মাকে বললাম, "তোমার প্রশ্ন রাখো তো মা, আমাদের বাড়িতে বসে থাকলেই তো ওর চলবে না, আরো কতো বাড়ি যেতে হবে, ওকে এখানে আটকে রেখে আমরা বরং ওর লোকসানই করছি।"

"ও তাই তো—" বলে মা তৎপর হয়ে উঠলেন। কিন্তু মা মেয়েটিকে আরও একবার জিজ্ঞেস না করে পারলেন না, তার ভাত খাওয়া হয়েছে কিনা। মেয়েটি বললে, তার ভাত খাওয়া হয় নি তখনও। মা তখন ওকে এককাপ চা খেয়ে যেতে অনুরোধ করে নিজেই রান্নাঘরে গেলেন আর আমাকে বলে গেলেন, আমি যেন পছন্দ করে ইতি-মধ্যে কিছু একটা কিনে নিই মেয়েটির কাছ থেকে। আমি আর কি কিনবো, ওসব জিনিসের কোন দরকার তখন ছিলো না, তবু মেয়েটিকে একটু সাহায্য করা হবে ভেবে একটা ট্যালকম্ পাউডার বেছে নিয়ে পয়সা আনতে ঘরে গিয়ে ঢুকলাম।"

হিরণ চুপ করে রইলো একটু। হাতের রুমালটা দিয়ে মুখটা মুছে নিয়ে একটু বাদেই আবার সুরু করলো, "জানিস বুড়ি, সেদিন পয়সা আনতে গিয়ে তোরঙ্গটা খুলে আমি কিছুক্ষণ স্থির হ'য়ে দাঁড়িয়ে পড়েছিলাম। তোরঙ্গটা আমার বিয়ের জন্য কেনা নতুন কাপড়-চোপড় ভর্তি ছিলো। সেই নতুন উজ্জ্বল কাপড়গুলো তখন আমার কাছে পরম আশ্রয় বলে মনে হ'য়েছিলো; আমি যেন কি একটা বিভীষিকা থেকে পালিয়ে এসে সেই সুন্দর সুন্দর কাপড়গুলোর মাঝখানে পরম নিরাপত্তা আর আশ্রয় খুঁজে পেয়েছিলাম। একটি আমার বয়সী মেয়েকে, একমাত্র জীবিকা—জীবন নয় যৌবন নয়,—একমাত্র জীবিকার জন্যেই বুড়ি, এই কষ্টকর জীবনযাপন করতে হ'চ্ছে, সেই সুন্দর কলকাতা থেকে এসে আসামের এই খ্যাত-অখ্যাত শহরে ঘুরে ঘুরে বেড়াচ্ছে, রোদে, জলে, অর্ধাহারে, দুঃখে-কষ্টে, অনেক বাড়ি থেকে প্রত্যাখ্যাত হওয়ার অপ-মানের জ্বালা সয়ে সয়ে। উঃ কি জীবন, জীবন তো নয়, জীবন নামের একটা বিড়ম্বনা মাত্র, যার ভবিষ্যৎ নেই, আশা নেই, ভরসা নেই। জানিস বুড়ি, সেদিন বিয়ের কাপড়-চোপড় ভরা বাক্সটার সামনে দাঁড়িয়ে আমার খুব স্বার্থপর সুখ আর একটা নিশ্চিন্ততার অনুভূতি জেগে উঠে-ছিলো। আগে নিজেকে খুব দুর্ভাগা ভাবতাম, ভাই কিংবা দাদা পাই নি একটা, পড়াশুনোয় ভালো হ'য়েও এম-এ পড়তে পারলাম না। কিন্তু সেদিন হঠাৎ নিজেকে খুব সৌভাগ্য-বতী মনে হয়েছিলো। অন্তত এই মেয়েটির মতো দুর্ভাগা তো নই, আমার একটা আচ্ছাদন একটা আশ্রয় আছে, ভবিষ্যতের সুখ নিরাপত্তার একটা প্রতিশ্রুতি আছে।"

হঠাৎ থেমে গেলো হিরণ। বিছানা থেকে আস্তে আস্তে নেমে অস্ফুট-ভাবে বললো, "আজকাল প্রায়ই আমার সেই মেয়েটির কথা মনে পড়ে বুড়ি।"

আমি তখনও স্থাণুর মতো বসেছিলাম চেয়ারটার ওপর। প্রায় সন্ধ্যে হয়ে এসেছিলো। সেই আলো-আঁধারির মধ্যে হিরণের দিকে চেয়ে ক্ষণিকের জন্য আমার মনে হলো—এ যেন হিরণ নয়, আমার সামনে দাঁড়িয়ে আছে হিরণদের বাড়িতে আসা সেই বাঙালি মেয়েটি।

"আসি তবে বুড়ি। বেশি দেরি হ'লে মা আবার ভাবতে বসবে—" আগের মতো আবার একটু হাসলো হিরণ—"এখন মা আছেন আমার জন্য চিন্তা করবার, ঘরে ফিরতে দেরি হ'লে বসে থাকবার......" কথাগুলো শেষ করলো না ও, কেবল আমার সামনে এসে একটু দাঁড়িয়ে গম্ভীর হ'য়ে বললো, "আজ তোকে অনেক দুঃখের কথা বললাম বুড়ি—তোকে দুঃখ দিলাম হয়তো, তুই-ই তো বলতিস বুড়ি,—মনে নেই "a sorrow is decreased when it is shared, but a happiness is increased when it is shared." তোর কাছে সব কথা খুলে বলতে পেরে নিজেকে আমার অনেক হাল্কা বোধ হ'চ্ছে, ভবিষ্যতে কখনোও সুযোগ হলে তোর সুখের ভাগ আমাকে দিবি, তোর সুখে আমিও সুখী হবো। আচ্ছা আসি তবে"

"দাঁড়া হিরণ," আমি প্রায় আর্তনাদ করে উঠলাম এবার, "তোর সিদ্ধান্তের কি কোনও নড়চড় হওয়ার উপায়ই নেই?"

"উঁহু।" খুব দৃঢ়ভাবে মাথা নাড়লো হিরণ—"কোনও উপায়ই নেই, বুড়ি। আচ্ছা আমি চলি—এমনিই একবার আমাদের বাড়িতে আসিস কালকে, তুই গেলে মা খুব খুশি হন। তোর মতন আন্তরিক সহানুভূতি নিয়ে দুঃখের কথা শুনবার কাউকে পান নি বলেই হয়তো—" কথা শেষে ম্লান একটু হাসলো হিরণ, তারপর দরজার পাশে দাঁড় করিয়ে রাখা ছাতাটা তুলে নিয়ে ধীর পায়ে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

এর পর দিন গেলো, মাস গেলো, বছর গেলো।

আমি এম-এ পাশ করলাম। আমার বিয়ে হয়ে গেলো—আর আমি এখন তিনটি সন্তানের জননী। একটি সুখের সংসারে আমি এখন একমাত্র অধিচ্ছত্রী।

এই বছরগুলোর মধ্যে আমি অনেকবার হিরণের দেখা পেয়েছি। ও এখন ওর স্কুলের হেড্‌মিস্ট্রেস। ইতি-মধ্যে কিরণ, চিনু আর মিনুর বিয়ে হয়ে গেছলো। আমি তার মধ্যে এক-মাত্র কিরণের বিয়েটাই দেখেছি, তখন আমার এম-এ পরীক্ষার এক মাস বাকী, হোস্টেলে না থেকে আমি বাড়িতে বসে পড়বো বলে এসেছিলাম। সেই সময় কিরণের বিয়ে হলো। আমি একদিন বিয়ের খবরাখবর নেবার জন্য হিরণদের বাড়ি যাওয়াতে, মাসীমা আমাকে একলা পেয়ে বলেছিলেন, হিরণের বিয়ের জন্য তৈরি করে রাখা গহনাই নতুন করে গড়িয়ে দেওয়া হয়েছে কিরণের বিয়েতে। হিরণ নিজেই নতুন করে গড়িয়ে আনলে।

চিনু মিনু কারোও বিয়েই কিন্তু আমি দেখতে পেলাম না। তখন আমার নিজেরই বিয়ে হয়ে গেছে। আসবো বললেই আসা হয়ে ওঠে না। দুজনকেই আমি উপহার পার্শেল করে পাঠিয়ে দিয়েছিলাম। তার মধ্যে মিনুকে দেওয়া উপহার একটু বিশিষ্ট ছিলো—ওর প্রতি ভালোবাসার পক্ষপাতিত্ব আমার কোনদিনই কমলো না।

মিনুর বিয়ের পরই আমি সেবার বাড়িতে গেছলাম—মায়ের হঠাৎ অসুখের খবর পেয়ে তাড়াহুড়ো করে চলে এসেছিলাম। অবশ্য মায়ের অসুখ গুরুতর ধরণের কিছু ছিলো না। আমি যাওয়ার দিন-দুয়েকের মধ্যেই উঠে-বসে হাঁটা-চলা করতে পেরে-

ছিলেন। আমি মায়ের অসুখের জন্যই তখনও পর্যন্ত কোথাও বেরোতে পারি নি। হিরণদের বাড়িতেও যাওয়া হয়ে ওঠে নি। হিরণ কিন্তু এসেছিলো, মায়ের অসুখের খবর নিতেও তাছাড়া আমি এসেছি শুনেও। মায়ের কাছে বসে তখন আমি গা-হাত-পা টিপে দিচ্ছিলাম। কাজেই হিরণের সঙ্গে বেশি কথা বলতে পারি নি। কেবল ওপর ওপর মিনুর বিয়ের খবরাখবর জিজ্ঞেস করলাম—বিয়েটা ভালোয় ভালোয় হয়ে গিয়েছে তবে—ছেলেটি ভালো তো? খুব সংক্ষিপ্ত আর নীরসভাবে ও আমার কথার উত্তর দিয়ে গেলো—'এই আর কি' 'হু' এই ধরণের সম্মতিসূচক দু-একটা কথায়। এইবার যেন হিরণকে খুব বেশি চিন্তিত, খুব বেশি ম্লান মনে হ'লো। অবশ্য এইভাবেই ও দিন দিন শুকিয়ে যাবে, হিরণের বেলায় আমি এছাড়া কি আর আশা করতে পারি। কিন্তু তবুও কেন জানি না আমার মনে হ'লো এইবার যেন হিরণ অস্বাভাবিক-ভাবে ম্লান আর ক্লান্ত হ'য়ে পড়েছে।

সেদিন একটু বসেই ও চলে গেলো। ও চলে যাওয়ার পর মা আমাকে আস্তে আস্তে বললেন, মিনুর বিয়েটা খুব ভালোই হ'য়েছে বলতে হবে। সৌভাগ্যক্রমে খুব ভালো ছেলে পেয়েছে ওরা। অবশ্য মিনুও খুব ভালো মেয়ে, রূপে, গুণে, পড়াশুনোয় ওর মতো ক'টা মেয়ে আছে এ শহরে।

তবুও বাপ-ভাই-দাদা কেউ নেই, ওর মতো সাধারণ ঘরের মেয়ের জন্যে রঞ্জিতের মতো ভালো ছেলে সচরাচর পাওয়া যায় না। আর রঞ্জিত নিজেই মেয়ে পছন্দ করে বিয়ে করেছে—হিরণদের ধরাধরি করতে হয় নি কিছু। আসল কথাটা হলো রঞ্জিত এখানে ই. এ. সি-র পোস্টে কাজ করতো, কি সূত্রে যেন ওদের বাড়িতে যাওয়া-আসা ছিলো। তারপর বোধহয় মিনুকে পছন্দ হলো, খোঁজ-টোঁজ নিয়ে বিয়ে করলো। ছেলেটিকে ওদের খুব পছন্দ হ'য়েছে, দেখতে শুনতে স্বভাব চরিত্রে খুব ভালো ছেলে। পড়াশুনোতেও নাকি খুব ভালো ছিলো।

মায়ের কথা শুনে সেদিন আমার খুব ভালো লেগেছিলো। মিনুর এই সৌভাগ্য আমার পক্ষে কম আনন্দের খবর নয়।

মায়ের শরীরটা একটু ভালোর দিকে, আমি একবার হিরণদের বাড়িতে যাবো বলে ভাবছি—এমন সময় হঠাৎ হিরণ একদিন সন্ধ্যের সময় আমাদের বাড়িতে এলো। আমি একটু অবাক হলাম—কারণ সাধারণত সন্ধ্যের পর কখনও ও বাড়ি থেকে বেরোয় না।

মায়ের খবর-টবর নেয়ার পর ও আমাকে হঠাৎ বললে, "ঘরের মধ্যে বড় গরম লাগছে, তোদের সামনের বারান্দায় একটু বসি গিয়ে চল্।"

আমি আরও একবার অবাক হলাম, কিন্তু সে ভাব গোপন করে শুধু বললাম "চল্।"

সামনের বারান্দাটা আমাদের সত্যিই খুব সুন্দর। খুব লম্বা। সামনে অনেক ফুলের গাছ আর লতা ঘেরা থাকায় বারান্দার একটা কোণকে একটা কুঞ্জের মতো লাগে। সেখানে কয়েকটা বেতের চেয়ার পাতা আছে।

হিরণ আর আমি দুটো চেয়ার টেনে নিয়ে বসে পড়লাম। সন্ধ্যে-বেলার আঁধার আর নীরবতা আমাদের দু-বন্ধুকে ঘিরে ধরলো।

হিরণই প্রথম কথা সুরু করলো। প্রথমে আমার খবর নিলো, স্বামীর খবর নিলো, ছেলে-মেয়েদের খবরও শুধোলো, ওদের রেখে এলাম কেন তাও জানতে চাইলো। তারপর হঠাৎই জিজ্ঞেস করলো, "তুই আজকাল বেশ নামকরা গল্পলেখিকা হ'য়ে উঠ্লি, না বুড়ি?"

"লিখি আর কি মাঝে মাঝে, কাজ-কর্ম নেই, সময় কাটানো!" হাল্কা-ভাবে উত্তর দিলাম।

কিছুক্ষণ নীরব থেকে হিরণ বললো, "একসময় তুই আমাকে নিয়ে একটা গল্প লিখিস্ বুড়ি। একটা করুণ গল্প, মধ্যবিত্ত পরিবারের একটা দুর্ভাগা মেয়ের গল্প। বাবা মারা গেলো তাই তার ঘাড়ে পড়লো একটা গোটা সংসারের বোঝা, সাতটি বোনের বোঝা, সেই বোঝা বয়ে বয়ে মেয়েটার ভবিষ্যৎ গেলো হারিয়ে—, একটা গল্প লিখবি না বুড়ি?"

কি বলবো আমি?

"তুই চাইলে আমি লিখতে পারি—" এক মুহূর্ত চুপ করে থেকে কেবল এই-ই বলতে পারলাম আমি।

"তুই লিখিস্ বুড়ি। অবশ্য কি লিখবি, কিভাবে লিখবি সেটা তুই-ই জানিস্। আমি শুধু তোকে এইটুকু বলতে চাই যে গল্পটা যদি তুই আরও বেশি করুণ করতে চাস্, আমি তোকে তার মসলা দিতে পারি। তুই তোর নায়িকার ঘাড়ে আরও একটা বোঝা চাপিয়ে দিতে পারিস।"

"আরও একটা বোঝা?" আমি আবার অনেকদিন আগের একটা দিনের মতো ক্ষণিকের তরে ওর জন্য দুঃখ অনুভব করতে ভুলে গিয়ে আশ্চর্য হ'য়ে প্রশ্নটা করলাম।

"হ্যাঁ বুড়ি, আরও একটা বোঝা। তুই লিখিস্, তোর নায়িকা একদিন ঘটনাচক্রে একটি সুদর্শন শিক্ষিত যুবকের সঙ্গে পরিচিত হ'লো, আর তাকে বাড়িতে যেতে আমন্ত্রণ জানালো। যুবকটি এলো। একদিন এলো, দু-দিন এলো, শেষে প্রায় রোজই আসতে লাগলো। তোর নায়িকা তখন সেই যুবকের প্রেমে আকণ্ঠ নিমজ্জমান হ'য়ে পড়েছে—কিন্তু যুবকটি তখন ভালোবেসে ফেলেছে নায়িকার ছোট একটি বোনকে—তার সব থেকে আদরের ছোট বোনটিকে। আর তারপর? তারপর আর কি? ইতিমধ্যে তোর নায়িকা তার সাতটি বোনের দুটিকে বিয়ে দিয়ে বোঝা একটু হাল্কা করেছিলো, এবার তৃতীয় জনকে বিয়ে দিয়ে সেই বোঝা আরও একটু কমালো। কিন্তু, কিন্তু—তার বিনিময়ে তাকে এবার সারা-জীবনের জন্য ভার নিতে হ'লো আর এক দুঃসহ বোঝার। সেইটে কিসের বোঝা বুঝিস্ নি বুড়ি? প্রেমের—প্রতিদান না পাওয়া এক নিষ্ফল ব্যর্থ প্রেমের।"

হিরণ থেমে গেলো আর হঠাৎ দু'হাতে মুখটা ঢেকে মাথা নিচু করে স্তব্ধ হ'য়ে বসে রইলো। আমিও স্তব্ধ হ'য়ে মাথা নিচু করে বসে রইলাম। তাছাড়া তখন আর আমার করণীয় কিছুই ছিলো না। কেবল সেই মুহূর্তে, কেন জানি না, আমার মন চাইলো রঞ্জিত নামের লোকটিকে এক-বার দেখতে। এইটে নিশ্চয়ই আমার মনের একটা বিকৃত ইচ্ছা হবে—নাহ'লে আমার সবিশেষ স্নেহের পাত্রী মিনুর স্বামীর এত প্রশংসা শুনেও তখন যাকে দেখার আগ্রহ হয় নি, সেই একই লোককে এখন একবার দেখার ইচ্ছে কেন হবে? আমার মরে যাওয়া বন্ধুর আরও একবার ভয়াবহ মৃত্যু ঘটালো যে মানুষটি, তাকে দেখতে কেন আমার মন চাইবে?

লেখিকা ঃ শ্রীমতী নিরুপমা বরগোহাঁই
অনুবাদ ঃ শান্তনু চট্টোপাধ্যায়

অস্ট্রেলিয়া থেকে লিখছি

সুরেশচন্দ্র সাহা

একটি ইটালীয় ফার্মারের সঙ্গে

মারে নদীর উপত্যকায় ঘুরে ফিরছিলাম। সঙ্গে জোসেফি পিতানি। ইটালীর লোক। খাস ইটালী হলে লোকে বলত জোসেফি পাতোনি। অস্ট্রেলিয়াতে ওর নামোচ্চারণের ব্যাকরণ-সম্মত কায়দার ধার কেউ ধারে না, সংক্ষেপে সবাই বলে জো।

ভেবেছিলাম মারে না জানি কত বড় নদী। দেখে কিন্তু মন খারাপ হল। পাশে বড় কম; মনে হল, না খেতে পেয়ে যেন শুকিয়ে কমজোরি হয়ে পড়েছে। মারের মহিমা তার দৈর্ঘ্যে। যেখানে আমাদের মারে দর্শন ঘটল সে হচ্ছে ভিক্টোরিয়া ও নিউসাউথওয়েলস রাজ্যের সীমারেখা—মাঝখানে মারে নদী পশ্চিমবাহিনী হয়ে এগিয়ে চলেছে। নদীতীরে নিউসাউথ-ওয়েলসের ছোট শহর তোকুমওয়াল। এইখান থেকে শ'পাঁচেক মাইল পশ্চিমে ডার্লিং নদী উত্তর থেকে এসে মারের সঙ্গে মিশেছে। তারপর উভয়ের মিলিত ধারা আরও সরে ক্রমে দক্ষিণ-বাহিনী হয়ে সাগরে পড়েছে এডিলেডের পূবে। মারে-ডার্লিং-এর মিলন রেখার কিছু আগে মিলডুরা শহর। তোকুমওয়াল থেকে মিলডুরা পর্যন্ত বিস্তীর্ণ উপত্যকায় যত ডেয়ারী পশম আর ফলের কারবার। অস্ট্রেলিয়ার মিলডুরা এক রোমান্টিক নাম। মধুচন্দ্র যাপনের বড় কেন্দ্র মিলডুরা—সাতদিনের ভাড়ায় জাহাজে উঠে নব-দম্পতীরা রাজার হালে মারের জলে ভাসে, মাছ ধরে আর আঙুরের রস খায়।

শুকনো ও টীনজাত ফল এবং চিনি উৎপাদক চারটি বড় দেশের মধ্যে অস্ট্রেলিয়া অন্যতম। পশম গম মাংস, দুধ এবং দুগ্ধজাত দ্রব্য রপ্তানীকারক দেশগুলির মধ্যেও অস্ট্রেলিয়ার বিশিষ্ট স্থান। মাত্র এক কোটি দশ লক্ষ লোকের দেশ অস্ট্রেলিয়া। সারাটি মহাদেশের লোক মিলে একটিমাত্র শহর টোকিওর লোকসংখ্যার প্রায় সমান। অথচ সারাটি দেশ জুড়ে কত বড় বড় শহর, শহরে শহরে বড় রাস্তা, বড় দোকান—দোকানে দোকানে মোটর গাড়ি টেলিভিশন ক্যামেরা গোশাক সৌখিন দ্রব্যাদি। এইসব দেখে দেখে খটকা লাগে। মাত্র এক কোটি দশ লক্ষ লোকের জন্যও কি দেশজোড়া এমন রাজসূয় আয়োজনের দরকার হয়।

সত্যি দরকার হয়। একটি লোক ত' সমাজেরই এক স্বয়ংসম্পূর্ণ ইউ-নিট। তার যেমন বাড়ি-গাড়ির প্রয়োজন তেমনি প্রয়োজন মাংস, ফল, ডিম, মাখন, দুধ, রুটির; ক্যামেরা টেলি-ভিশন, ধোলাই কলের। জীবনের মান উন্নত বলে সবাই সব জিনিস কেনে। তাই এত গাড়ি এত ঘাড়ি, এত দুধ, এত মাংস বিক্রি হচ্ছে; কোন দোকানের কোন জিনিসই অবিক্রিত থাকছে না। যে দেশের একজনের সামান্য আয়ে পাঁচ জনের পেট চলে, যেখানে নুন আনতে পান্তা ফুরোয়, সেখানে ত' ক্যামেরা কেনার প্রশ্ন আসে না—দুধ মাখন ফলের দোকানে ভিড় হওয়ার কথা ত' সেখানে নয়।

কোন অস্ট্রেলিয়াবাসী লোক গিজ গিজ করা শান্তিপুরের পবিত্র মাটিতে পদার্পণ করলে ক্যামেরার স্টোর মোটর

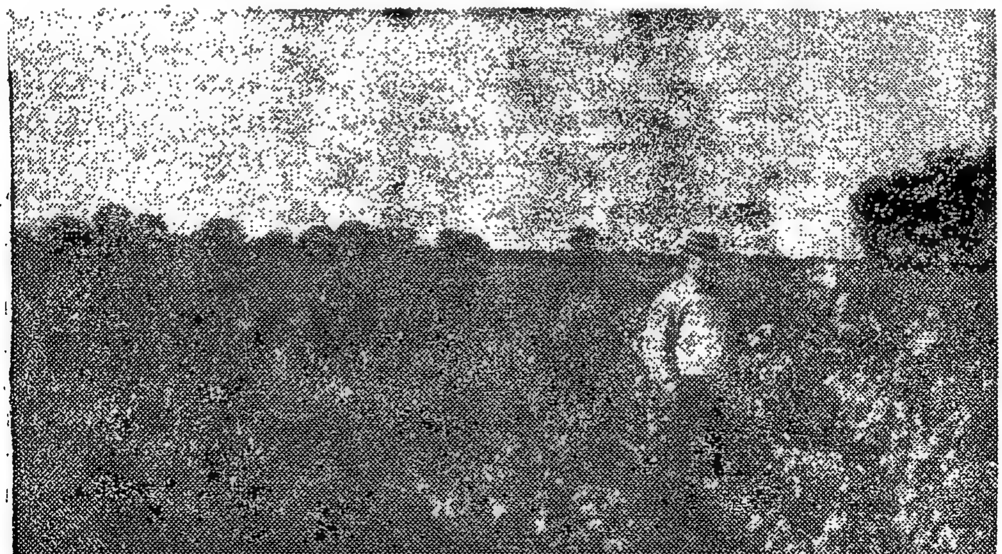

আঙুরের ক্ষেতে জোসেফি পাতোনি

গাড়ির দোকান না দেখে হয়ত অবাক হবে। কিন্তু শান্তিপুরবাসীদের পয়সা ত' মোটর গাড়ির জন্য নয়; তাদের চাল কিনতে হবে। সে চাল কেনার পয়সা যাদের নেই তারা দুর্ভাগা; আর যাদের সে পয়সা আছেও, তারা হতভাগা। কারণ পয়সা দিয়েও চাল তারা অনেক সময় পায় না!

মারে উপত্যকায় একটি বিশেষ জনপদ দেখলাম। নুমুরকা সোলজার্স সেটলমেণ্ট। বিগত বিশ্বযুদ্ধের শেষে যে সব সৈনিক ফার্মারের কাজ করতে চাইল তাদের এনে এইখানে বসান হল। জীবিকার্জনের জন্য জমি দেওয়া হল। মারে নদীর জলসিঞ্চনপুষ্ট তেষট্টি হাজার একর জমিতে বিগত দিনের সৈনিকেরা কৃষিকর্ম শুরু করল। শক্তিশালী পাম্পিং স্টেশন বসান হল জলসেচের জন্য। ৫২৬টি পরিবার দুধ ও ফলের ব্যবসা করে বছরে ৭০ লক্ষ টাকা উপার্জনের সুযোগ পেল। এক-একটি ফার্মের মূল্য দাঁড়াল আড়াই লক্ষ টাকা। ২০ বছর আগে ফার্মের এই জমিগুলি ছিল শূন্য মাঠ। ২০ মাইল দূরের অঞ্চলগুলি তখন মারে নদীর বন্যায় ভেসে যেত। এখন সে বন্যার নিয়ন্ত্রণ হয়েছে, সে অঞ্চল ধানের চাষে ধন্য হয়েছে। তোকুমওয়ালের কাছাকাছি এসে জো বলল—এই দিকটাতেও আমরা কিছুটা ধানের চাষ করি। ঐ দেখ ধানের ক্ষেত।

অস্ট্রেলিয়ার যত বড় বড় ক্যানারি, জ্যাম তৈরির কারখানা, কিসমিসের কারবার—সবই মারে উপত্যকায়, যেমন টাসমেনিয়ায় আপেলের কারবার। মারের জলে আছে ফলের রসের যোগান, দ্রাক্ষারসের মাদকতা, যদিও হামালদিস্তায় টুং-টাং করে পিষে কবরেজি-মতে সেখানে দ্রাক্ষারিষ্ট তৈরি হয় না। আর ধান? ধান দিয়ে কি করে পাউরুটিভোজী অস্ট্রেলিয়ানরা?

অস্ট্রেলিয়ায় ধানের উৎপাদন বেড়েই চলেছে আর তা নিয়ে সরকারী বিভাগের মাথাব্যথার অন্ত নেই। প্রচার জোরদার করে বলা হচ্ছে—এমন অন্নের অনাদর কি তোমরা করবে, যা অর্ধেক দুনিয়ার প্রধান খাদ্য? দোকানে দোকানে সুদৃশ্য স্বচ্ছ থলেতে চাল বিক্রির ব্যবস্থা হয়েছে। সুতরাং অস্ট্রেলিয়ানদের থলে হাতে লাইনে দাঁড়াতে হয় না। দোকানদারের সঙ্গে

একটি কৃষকের বাড়ি। বাঁদিকে বৃষ্টির জল ধরে রাখার ট্যাঙ্ক

বচসা করতে হয় না, কাঁকর-পাথর পচা গন্ধ নিয়ে সমস্যায় পড়তে হয় না।

অস্ট্রেলিয়া থেকে স্বল্প ছাঁটা পীতাভ চাল বাইরে চালান হচ্ছে। অন্নভোজী অঞ্চলে এমন চালের কদর বেশি। আমাদের ঢেঁকি ছাঁটা চালের মত। বেশি ছাঁটা প্যাকেট করা শুভ্র চালের আদর আপন দেশের লোকের কাছে; ক্যালোরি ভিটামিনের চুলচেরা হিসাবের ধার তারা ধারে না। সে অভাব মিটিয়ে নিতে মাংস, ফল, দুধের অভাব নেই। তবু সম্প্রতি অস্ট্রেলিয়ার কলে শাদা চাল এমন করে তৈরি হচ্ছে যে তার খাদ্যগুণ বজায় থাকছে, রান্নাতেও সময় লাগছে কম। এদের হিসেবমত আধ সের চালের ক্যালোরি মূল্য নাকি তিনপোয়া পাউরুটি, একসের মাংস, দেড় সের মটর শুটি অথবা আড়াই সের আলুর ক্যালোরি মূল্যের সমান। অস্ট্রেলিয়ান ডাক্তাররা আজকাল শিশু ও রোগীর জন্য চাউলজাত খাদ্যের ব্যবস্থা দিচ্ছেন। গবেষণাগারে চাউল উৎপাদনের নিত্য-নতুন পদ্ধতি, তার খাদ্যপ্রাণ এবং প্যাক করা, বিক্রি করার সহজ আর স্বাস্থ্যসম্মত কায়দা নিয়ে বিস্তর গবেষণা হচ্ছে, অস্ট্রেলিয়ার জলবায়ুর সঙ্গে খাপ খাইয়ে নতুন রুচি সৃষ্টির চেষ্টা চলছে।

অস্ট্রেলিয়ায় অত্যন্ত অভাবনীয়রূপে একদিন ধান চাষের প্রবর্তন হয়েছিল। নিউসাউথওয়েলসের ফল ব্যবসায়ী জন রেডি ফল ক্যানিং-এর কাজে ক্যালিফোর্নিয়ায় গিয়েছিলেন। ক্যালিফোর্নিয়ার যে মাটি, যে জল হাওয়ায় ধান জন্মে তার সঙ্গে মারিমবিজির জলপুষ্ট এলাকার মিল দেখতে পেলেন। কিছু বীজ ধান নিয়ে তিনি দেশে ফিরলেন। শুরু হল ধানের চাষ। সরকারী কৃষি-বিভাগ, নানাভাবে সাহায্য করলেন। ক্রমে মারে উপত্যকার বিভারিনা পর্যন্ত ধানের চাষ প্রসারলাভ করল। দক্ষিণ আমেরিকার ব্রাজিলের কয়েকটি রাবার চারা সিঙ্গাপুরের বোটানি বাগানে বংশ বৃদ্ধি করে যেমন সারা মালয়ে ছড়িয়ে পড়েছিল, উত্তর আমেরিকার ক্যালিফোর্নিয়ার ধানবীজ তেমনি অস্ট্রেলীয়াতে ধান চাষের যুগ প্রবর্তন করল। অবশ্য ভারতের আমের বীজ থেকেও অস্ট্রেলিয়ার কুইনসল্যাণ্ডে আম চাষের আরম্ভ। একটা মজার কথা ধান চাষের প্রবর্তনের কালে অস্ট্রেলিয়াতে ডেয়ারী ব্যবসায় বড়ই মন্দা চলছিল। আয়ের একটি বিকল্প ব্যবস্থা না হলেই নয়। ঠিক তখনই শুরু হল ধান চাষের কাজ।

শ' দুয়েক মাইল ঘুরে ধানের ক্ষেত, ফলের চাষ, জলের বাঁধ আর আদিম অধিবাসীদের ভাষায় নাম দেওয়া কতগুলি গ্রাম দেখে জোসেফি পিতানির বাড়িতে ফিরে এলাম। জো রসিক পুরুষ। বাড়িতে ফিরেই হাঁক দিল—বৌ! কেউ এগিয়ে এলো না। তখন জো কৃত্রিম উদ্বেগ আর আশংকার ভাষায় বলতে লাগল—সর্বনাশ হয়েছে, আমার বৌ হারিয়ে গেছে! মিসেস পিতানি তখন প্রায় সামনে এসে

পড়েছে। হাতে একটি লাল গোলাপ, বৌয়ের কাছে মাঠ-ফেরা জোসেফির নিত্য পাওনা ফুলটি। না দেখার ভান করে জো তখনও বলছে—কি হবে আমার। মিসেস পিতানি হেসে বলল—বৌ হারিয়ে এমন বিশেষ কিছু হারাও নি। (ইয়ু ডিড নট লুজ মাচ্)।

চল্লিশ বছর আগে মধ্য ইটালীর আব্রুচি থেকে জোসেফি অস্ট্রেলিয়ায় এসেছিল। ইটালীর এক কৃষক পরিবারে তার জন্ম। ভূমিহীন দরিদ্র কৃষক। দেশে থাকতে শুনেছিল অস্ট্রেলিয়ায় জমির অভাব নেই। কাজ জোটাবারও কষ্ট নেই। তাই আর দেরি না করে সেই প্রথম উদ্গত যৌবনে জোসেফি পিতানি অস্ট্রেলিয়ায় এলো। বিদ্যা অর্থ সম্বলহীন। শুরু করল কুলীর কাজ ও মিলজুরায় পরের বাগিচায় ফল তোলা মজুরের কাজ। কিছু টাকা জমতেই পথ খরচের পয়সা পাঠিয়ে ভাইকে নিয়ে এলো অস্ট্রেলিয়ায়। তারপর দুই ভায়ে মিলে শেপারটনের কাছে কিছু জমি ইজারা নিয়ে টমাটোর চাষ করল। আরও কিছু টাকা হল। বৌ ছেলে নিয়ে আরও তিন ভাই এলো, শেষ পর্যন্ত বেকার স্বামী নিয়ে এলো বড় বোন। সবার ভার আর ভাড়া বহন করল জো। খরচের চাপ বেড়ে চলতেই আয়ের নতুন পথ দেখতে হল। তখন প্রতিবেশী ইহুদী জোতদারের পড়ো জমি কিনে নিল দেড় লাখ টাকায়—তার সে নগদ টাকায় নয়, শ্রমের বিনিময়ে।

জোসেফির আঙুরক্ষেত, এপ্রিকট বাগান, পীচ গাছের জমি বসতবাড়ি থেকে বেশ দূরে। ঘরের সামনে উঠানে ফুলকপি, বাঁধাকপি, লেটুস, পেঁয়াজ, পালংশাক আছে। আর আছে লংকা গাছ। খুব বড় বড় লঙ্কায়

জোসেফির বাড়িতে কমলালেবুর বাগান। মাঝখানে সস্ত্রীক জো

গাছগুলি ভরা। দুটি লাল একটি কাঁচা লঙ্কা তুলে হাতে রেখেছিলাম। ভেবেছিলাম দেশে নিয়ে এমন লঙ্কার দু-চারটি করে বীজ একে-ওকে দিলে মন্দ হয় না। এমন লঙ্কা হলে ডালে যে আর অষ্টগণ্ডা লঙ্কা দেওয়ার হবে না। বললাম—তোমাদের সঙ্গে আমার পরিচয় অবশ্য এত গভীর নয় যে, তিন-তিনটি লঙ্কার ক্ষতি স্বীকার করার কথা বলতে পারি। তবে যদি লঙ্কা তিনটে—জো'র বৌ হাসতে লাগল। বলল—বেশ ত', তবে রান্নায় কেমন করে তোমরা লঙ্কা ব্যবহার কর শিখিয়ে দিতে হবে। আমি বললাম—নিশ্চয়। তারপর লঙ্কার ব্যবহার সম্বন্ধে অনেক কিছু বললাম। পদ্মার হে-পার, মাদ্রাজ আর সিংহলে লঙ্কার ঝাল খাওয়ার কথাও বাদ গেল না। শুধু ইস্টবেঙ্গল-মোহনবাগান খেলার দিনে শুকনো লঙ্কার মালার কথাটা বেমালুম চেপে গেলাম।

জো আমাদের প্রিয় লোক। বৌকে হাড় কেপ্পন স্কচ বলে ঠাট্টা করল, আর আমাকে তিন-তিনটি লঙ্কা দান করায় বিস্ময় প্রকাশ করল। স্কচ থেকে এলো ইহুদীর প্রসঙ্গ। ইহুদী জোতদারটির অনেক জমিই পড়ে ছিল। শ্রমের বিনিময়ে জমি নিয়ে জোসেফি ফলের চাষ করল। তিন বছরের ফসল থেকে ৭০ হাজার টাকা শোধ হয়ে গেল। আরও দুই বছর লাগল বাকী টাকা শোধ হতে। জমির মালিক হল জো। এই কথাটি বোঝাবার জন্য জো হাতে তুড়ি মেরে মুখে একটি বিশেষ ভঙ্গী করে বলল—এ্যাড দি য়ু ওয়ান্স আ-উ-ট। জেন জোসেফির আজন্মের অধিকার থেকে ইহুদীটা এতদিন তাকে বঞ্চিত করে রেখেছিল! পড়ো জমি থেকে মালিকের লাভ হল নগদ দেড় লাখ টাকা, আর জোসেফির একটি ফার্ম। মাথার ঘাম পায়ে ফেলে যা তিলে তিলে গড়ে তুলতে হয়েছিল। জমি বন্দোবস্তের প্রস্তাব নিয়ে জো ইহুদী মালিকের কাছে গেলে সে বলেছিল—তোমাকে জমি দেব কোন্ ভরসায়? জো তার লৌহশক্ত হাত দুটি উপরে তুলে বলেছিল—আমার এই বাহুবলের ভরসায়। পরিশ্রমী যুবকের আত্মবিশ্বাস দেখে ইহুদী খুশি হয়েছিল।

অস্ট্রেলিয়ার প্রথম উপনিবেশের যুগে জমি দখলের পশ্চাতে অনেক কাহিনী আছে। সিডনি থেকে উত্তর, দক্ষিণ এবং পূবে উপকূলীয় অঞ্চলে জনপদের প্রসার হল। পশ্চিমে যাওয়ার উপায় নেই—সামনে ব্লু মাউন্টেনের বাধার পাহাড়। পাহাড় অতিক্রমের চেষ্টা চলল। গভর্নর ম্যাকরি উৎসাহ দিলেন, অর্থ সাহায্য করলেন। বহু সাধ্যসাধনার পর অভিযাত্রীরা ওপরে গিয়ে দেখতে পেল

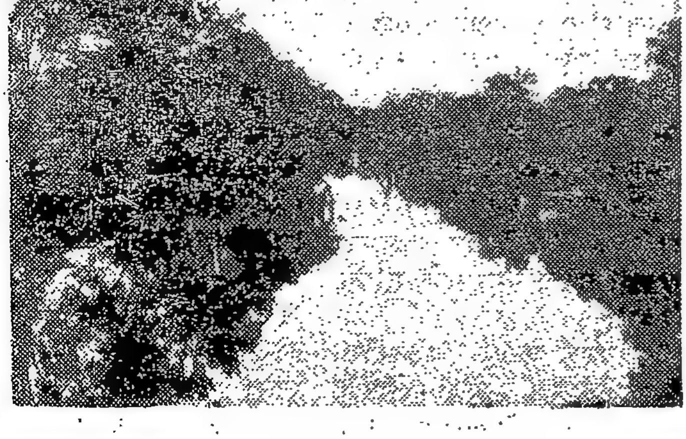

এই সেই মারে নদী

দূরে বিস্তীর্ণ সমভূমি; আবিষ্কার করল ল্যাচ ল্যান মারিম্বিজি ম্যাকোরি নদী। বলা বাহুল্য, নদী তখন জলস্রোত ছাড়া কিছুই নয়। আবিষ্কারের পর তাদের নামকরণ হল। নদী উপত্যকাগুলি দেখে নবাগত মানুষেরা সেদিন নতুন আশায় বুক বাঁধল। তারপর গ্রেট ডিভাইডিং রেঞ্জের পশ্চিমে ডারলিং ডাউন্স্ লিভারপুল প্লেনের মত সমভূমি যেদিন আবিষ্কৃত হল, সেইদিন থেকে আজকের সম্পদশালী অস্ট্রেলিয়ার ভিত্তিস্থাপন হল। ভিত্তিস্থাপন হল ডেয়ারী যুগের।

ইটালী থেকে অস্ট্রেলিয়ায় যত লোক এসেছে তাদের প্রধান লক্ষ্য ফার্মিং করা। কিছু লোক শহরে শহরে দোকান করে; তবে বেশির ভাগ মৎস্যজীবী। ইংলণ্ড থেকে সদ্য আগত ইংরেজগুলো গ্রীস ইটালীর লোকদের একটু বাঁকা চোখে দেখে; হামেশা বলে—যত সব ডার্ক পিপ্ল। ডার্ক লোকগুলো মনে মনে হাসে, খুব কষে টাকা কামায়, আর দেশে পাঠিয়ে দেয় জমি কেনার জন্য। এজন্য অবশ্য অস্ট্রেলিয়ার অনেক লোকই ওদের ওপর চটা। সম্প্রতিকালে এসে ধনী হওয়া ইটালীয়ানরা গাড়ি হাঁকিয়ে যাচ্ছে; ইংরেজ স্কচগুলো সুযোগ পেলেই টিপ্পনী কাটছে—যত সব উজবুক, গাড়ি চালাবার কানুন জানে না; ভুল করে বসলেই বলে—মি নো আন্দারস্ত্যান্দ্ ইংলিশ! দক্ষিণ ইটালীর লোকদের ওপরই যেন রাগটা একটু বেশি। ওরা একটু বেশি ডার্ক: চামড়া যথোচিত লাল নয়, যদিও আমাদের মতে গৌরবর্ণ।

যে ইটালীয়রা একদিন রোম সাম্রাজ্য স্থাপন করেছিল তারা কোন্ ইটালীর লোক? উত্তর, দক্ষিণ কি মধ্য ইটালীর জোসেফ পাতোনির জন্মভূমি আব্রুচির আশেপাশের লোক? যে রোমানরা কার্থেজের গৌরব ধূলিসাৎ করল, স্পেন গল বৃটেন জয় করল, গ্রীক গৌরব ধুয়ে মুছে রোমক নাম প্রতিষ্ঠা করল, কনস্টান্টিনোপোল পর্যন্ত সাম্রাজ্য বিস্তার করল, তাদের কথা অস্ট্রেলিয়ার ভূমিসেবী মৎস্যজীবী দোকানদার ইটালীয়ানদের অনেকেই জানে না। তারা জানে না, রোমকরা গ্রীকদের ধরে ধরে একদিন ক্রীতদাস বানিয়েছিল, ক্রীতদাসরা রোম রাজপুরুষদের আমোদ জুগিয়েছিল সদ্য পিঞ্জরমুক্ত ক্ষুধিত সিংহের সঙ্গে লড়ে আর মরে। সে কোন্ রোম, সে কোন্ গ্রীস? ক্লিয়োপেট্রার জন্য এদের রোমাঞ্চ নেই। সিজারকে ছুরিকাহত করার জন্য লজ্জা নেই। গ্যারিবল্ডী ম্যাৎসিনি এদের হিরো। মুসোলিনী অকাট্য ভুঁইফোঁড়।

ফলের চাষ দুধের ডেয়ারীর দুর্গপ্রাকার ডিঙিয়ে রোম গ্রীসের ইতিহাস ইটালীর পাতোনি আর তার স্কচ বৌয়ের কাছে মাথাচাড়া দিয়ে ওঠে না। সুযোগ পেলেই বৌ জো'কে বলে—তোমার চামড়া ত' ডার্ক। পাল্টা জবাবে পাতোনি বলে—হাড় কেপ্পন স্কচের মেয়ে, তোমার চামড়াও ত' লাল নয়! এই হচ্ছে নিঃসন্তান স্বামী-স্ত্রীর সুখের সংসারে মধুর কলহ।

সেদিন জো বৌয়ের সামনেই একটি গল্প বলল। এক রোগীর গল্প। হাসপাতালে আছে; রক্তের প্রয়োজন। বহু অর্থের বিনিময়ে একজন স্কচ তাকে রক্ত দিতে রাজী হল। প্রথম বোতল রক্তের দাম রোগী চুক্তিমত বিনা দ্বিধায় চুকিয়ে দিল। কিন্তু দ্বিতীয় বোতলের দাম দিল অর্ধেক। শত বচসায় বাকী পয়সাটা কিছুতেই সে দেবে না। জো প্রশ্ন করলে—বল ত' কেন? আমি বললাম—হয়ত রোগীর টাকার টানাটানি ছিল। জো বলল—তা নয় হে। প্রথম বোতল স্কচ রক্ত রোগীর রক্তে মিশে যেতেই তার ক্রিয়া শুরু হয়েছে, স্কচের কেপ্টামি তার রক্তের কণায় কণায় মিশেছে। তাই দ্বিতীয় বোতলের টাকা বের করতে এত কেপ্পনী!

আলোকচিত্র: লেখক কর্তৃক গৃহীত

M&H TUSSANOL

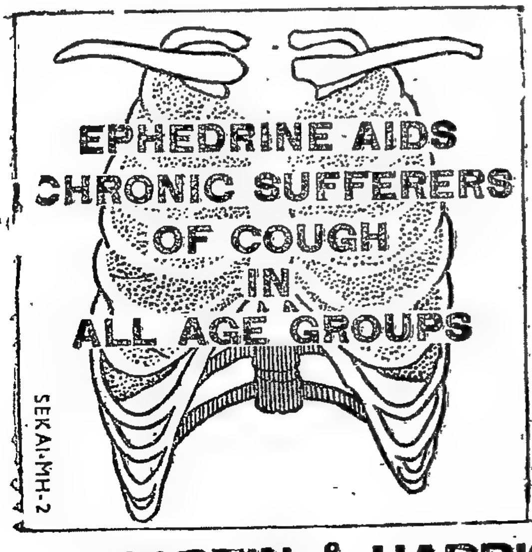

- গলার কষ্ট দূর করে
- শ্বাসনালীর কাজ সরল করে
- ঘন শ্লেষ্মা তরল করে
- শ্লেষ্মা বার করে দেয়
- শ্বাসপ্রশ্বাস সহজ করে

MARTIN & HARRIS PRIVATE LTD.
CALCUTTA-1

রঙ্গমঞ্চ ওদেশে এবং এদেশে

শিলালি

১৯৫১ সালের ১০ই ডিসেম্বর শিশিরকুমার একটি ভাষণের এক জায়গায় বলেছিলেনঃ

"থিয়েটার সমস্ত চারুশিল্পের মিলনকেন্দ্র—জাতির সাংস্কৃতিক দর্পণ, সুতরাং থিয়েটারকে বাঁচাতে হলে জাতিরই সেই দায়িত্ব গ্রহণ করতে হবে। বিদেশের বড় বড় থিয়েটার রাজশক্তির সহায়তায়ই গড়ে উঠেছে—কিন্তু এদেশের সরকার থিয়েটার সম্বন্ধে উদাসীন। আজ চাই জীবনে বিশ্বাসী, সংগ্রামে বিশ্বাসী নায়ক নিয়ে লেখা নতুন নাটক। যোগেশের মতন একটুতেই ভেঙে পড়ে, সুদিনে জমিদার সরকারে দেড়শো টাকা মাইনে পেয়েও পিতা কন্যার মৃত্যু কামনা করে, এমন সংগ্রাম বিমুখ নায়কের প্রয়োজন আজ নেই। সংগ্রাম করে যে জীবনকে প্রতিষ্ঠিত করতে চায় তাকেই এ যুগে নাটকের নায়করূপে চিত্রিত করতে হবে।

"যাত্রা থেকে যদি থিয়েটার গড়ে উঠতো তবে আজ তার রূপ হোত অন্য রকম; তা সত্যি হয়তো আমাদের জাতীয় নাট্যশালা হয়ে উঠতে পারতো। কিন্তু এ থিয়েটার গড়ে উঠেছে বিদেশীর প্রভাবে। যাই হোক, যা গড়ে উঠেছে তাকে ফেরাবার উপায় হয়তো নেই। আমি চেয়েছিলাম জাতীয় নাট্যশালা গড়ে তুলতে, কিন্তু তা পারি নি। আমার পক্ষে যা সম্ভব হয় নি, এ যুগের লোক তা সম্ভব করে তুলুক। এই আমার একান্ত অভিলাষ।"

হয়তো শিশিরকুমারের এই আজীবনের স্বপ্ন অদূর ভবিষ্যতে রূপ পরিগ্রহ করতে পারে ক্যাথিড্রেল রোডের রবীন্দ্র সদনে একটি স্থায়ী জাতীয় থিয়েটারের প্রতিষ্ঠায়। কিন্তু শুধু ন্যাশনাল থিয়েটার করে দিলেই তো হবে না—সেটাকে চালানোর মত সত্যিকার প্রতিভাশালী ডিরেক্টরের হাতে দায়িত্ব দেওয়া দরকার। বর্তমানে যে সামান্য কয়েকজন লোকের এ দায়িত্ব নেবার যোগ্যতা আছে তাঁদের মধ্যে শ্রেষ্ঠতম হচ্ছেন শ্রীযুক্ত মধু বোস এ কথা নাট্যরসিক মাত্রেই স্বীকার করবেন বলে আমার বিশ্বাস। সি এ পি সম্প্রদায়ের পরিচালক হিসাবে যে সব নাটক তিনি এক সময় প্রডিউস করেছেন কলকাতা এবং ভারতের অন্যান্য নানা জায়গায়—সে সবের বিরাট সাফল্যের কথা আর "নতুন" করে কিছু বলতে হবে না। মধুবাবু নিজেও এক সময় জাতীয় থিয়েটারের কথা নিয়ে খুব seriously-ই চিন্তা করেছিলেন—এই সময়টায় ক্যালকাটা আর্ট প্লেয়ার্স গৌরবের একেবারে শীর্ষদেশে উঠেছিল। তাঁর বন্ধুবান্ধব এবং সঙ্গী-সাথীরা তাঁর পরিকল্পনার কথা শুনে তাঁকে সব দিক দিয়ে উৎসাহ দেবার চেষ্টা করেছিলেন।

মধুবাবুর পরিকল্পনাটা ছিল এই ধরণেরঃ

১। আধুনিক বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে মঞ্চ ও প্রেক্ষাগৃহ নির্মিত হবে;

২। অভিনয়ের বিভিন্ন দিক সম্বন্ধে বিভিন্ন বিভাগ থাকবে;

৩। প্রধান বিভাগ হবে তিনটি—

ক ঃ নাটক

খ ঃ নৃত্য

গঃ সঙ্গীত

৪। এখানকার অভিনেতা অভিনেত্রীদের নিয়ে ফিল্ম করবারও পরিকল্পনা থাকবে;

৫। সি এ পি-র শিল্পীরা একটার পর একটা শো মঞ্চস্থ করবে;

৬। একটি শিল্প বিভাগ থাকবে—এদের কাজ হবে দৃশ্যপট নির্মাণ এবং পোষাকপত্র তৈরি করা;

৭। একটি আলোক বিভাগ থাকবে;

৮। ভাল লাইব্রেরী একটি যুক্ত রাখা হবে ন্যাশনাল থিয়েটারের সঙ্গে।

নানা কারণে তখন মধুবাবুর পক্ষে ন্যাশনাল থিয়েটারের প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব হয় নি। তবে আজ যদি সত্যি সত্যিই সরকার জাতীয় থিয়েটারের উদ্বোধন এবং তাকে সত্যিকার কার্যকরী প্রতিষ্ঠান হিসাবে গড়ে তুলতে চান তবে শ্রীযুক্ত মধু বোসকেই তাঁদের সাদরে আমন্ত্রণ করে আনা উচিৎ এই থিয়েটারের ডিরেক্টরের পদের জন্য। অবশ্য আমাদের বাংলা দেশে যে এ ধরণের একটি সৎকাজ কখনও করা হবে না সেকথা সবাই জানেন। নিশ্চয়ই নিয়ে আসা হবে সেই নিকৃষ্টতম তথাকথিত নাট্য পরিচালকদের কারোকে যাঁরা নাট্য উন্নয়নের নামে, গ্রন্থাগার বাবদ এবং নাট্যবিদ্যালয় চালানোর খরচ হিসাবে বছরের পর বছর ধরে দিল্লীর সঙ্গীত নাটক আকাডেমী থেকে হাজারে হাজারে টাকার গ্রাণ্ট নিয়ে প্রায় সমস্ত টাকাই আত্মসাৎ করেছেন। যাঁদের প্রতিষ্ঠানে লাইব্রেরীর জন্য সরকারী সাহায্যের এক পয়সাও ব্যয় হয় না বই কেনার বাবদে। এসব দেখেশুনে গিরিশচন্দ্রের সিরাজদ্দৌল্লার করিম চাচার একটি সংলাপ আমার বার বার মনে পড়ছে—

"কেন চাচা উল্টো বুঝলে কেন? আমার কি বাংলা দেশে জন্ম নয়, আমি কি মতলববাজ নই, আমি কি আপনি গাঁট দিতে জানি নি? আমি কি আপনার ভাল খুঁজি নি। যে পরের ভালোই খুঁজতে যাবো? প্রজার ভাল হলো না হলো, আমার কি বয়ে গেল? বাংলায় জন্মেছি, আমার আপনার ভালাই ভালো? প্রাণে বৈরাগ্য আছে—তাই মনে করি—কে কার, কার জন্যে ভাববো—আপনি গুছিয়ে নিই, পরকালে না হোক, ইহকালের তো কাজ বটে!"

করিম চাচার মুখ দিয়ে বাঙালী চরিত্রের একটা দিক ভারি সুন্দরভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন গিরিশচন্দ্র। বাঙালী জাতির বহু দিক থেকেই বহু মহত্ত্ব আছে যা অন্য প্রদেশের লোকেদের মধ্যে বিশেষ দেখা যায় না—তেমনি দোষও অগুন্তি। প্রতিষ্ঠানকে ডুবিয়ে দিয়ে নিজের আখের তৈরি করে নেওয়া এতো অহরহই চলছে কলকাতার নাট্য প্রতিষ্ঠানসমূহে। কেন্দ্রীয় সরকারের থেকে এ যাবৎ কম অর্থ সাহায্য তো করা হয় নি কলকাতার নাট্য সংস্থানগুলিতে। এ সব প্রতিষ্ঠানের কর্তাব্যক্তিরা প্রতি বছরে যে অর্থসাহায্য পান তার কতটুকু ব্যয় করেন নাট্য উন্নয়নের জন্য বা দরিদ্র অভিনেতা অভিনেত্রীদের বেতন হিসাবে? এমন কথাও আমার কানে এসেছে যে এই ধরণের এক থিয়েটারের মালিক তাঁর গরীব অভিনেতার দলকে মাসে ছ' মাসে ৪০।৫০ টাকা দিয়ে মিথ্যা পেমেণ্ট ভাউচার সই করিয়ে নেন ৩০০।৪০০-শ টাকার। ঐ সব ভাউচার দিল্লীতে পাঠিয়ে দেওয়া হয় হিসাব-নিকাশের জন্য। কোন একটি নাট্য-বিদ্যালয়ে শুনেছি বছরখানেক এক ভদ্রলোক মেক-আপের ক্লাস নিতেন। তিনি বিদ্যালয় ছেড়ে দেবার পরও বছরের পর বছর ঐ বিদ্যালয় থেকে দিল্লীতে হিসাব পাঠানোর সময় একাউন্টসে দেখানো হয় যে ঐ মেক্-আপের টিচারকে যেন এখনও মাইনে দেওয়া হচ্ছে। এসব গুজবের ভেতর হয়তো অতিশয়োক্তি থাকতে পারে, কিন্তু এর মূলে যে কতোটা সত্যি আছে সেটাও তো নির্ধারিত হওয়া দরকার। তার জন্য স্থানীয় সরকারী কর্মচারীদের সাহায্যে এখানকার সাহায্যপ্রাপ্ত সব

নাট্য প্রতিষ্ঠানের proper audit of accounts হওয়াটা বর্তমানে একটা গুরু কর্তব্য হিসাবে সরকারের বিবেচনা করা উচিত।

২৪শে অগাস্টের স্টেটস্‌ম্যানের নাট্যসমালোচক প্রস্তাব করেছেন রবীন্দ্রসদনের নাট্যমঞ্চে এক সিজনের জন্য বহুরূপী সম্প্রদায়কে অভিনয় করবার আমন্ত্রণ করতে। খুবই ভাল প্রস্তাব। সংগে সংগে উৎপল দত্তের মিনার্ভা থিয়েটারকেও ডাকা উচিত ওখানে অভিনয়ের জন্য—কারণ জাতীয় রংগমঞ্চে বামপন্থী বলেই তো শ্রীযুক্ত দত্তকে 'প্রবেশ নিষেধ' করে দূরে সরিয়ে রাখা চলবে না। তাছাড়া শিশিরোত্তর যুগের পেশাদারী মঞ্চের শ্রেষ্ঠ প্রডিউসার হচ্ছেন উৎপল দত্ত—এ'র পরিচালিত এবং অভিনীত মাইকেলের 'বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রোঁ' যাঁরা দেখেছেন তাঁরাই স্বীকার করতে বাধ্য হবেন যে উৎপল দত্তের রাজনীতিক মতবাদ আমাদের মতের সংগে মিলুক না মিলুক, থিয়েটারটা ভদ্রলোক সত্যিই ভাল করেন।

স্টেটসম্যানের নাট্যসমালোচক এক জায়গায় লিখেছেন—"It is also not difficult to find an experienced actor-director to do what Sir Laurence Oliver has been doing for the British National Theatre. The advice of Mr. Alkazi of the National School of Drama can always be sought." এখানে আমার কিছু বক্তব্য আছে। ঠিক অভিজ্ঞ নট ও পরিচালক বলতে আমি বলবো যে একজনমাত্রই আছেন এবং তিনি শ্রীমধু বোস। কারণ ক্যালকাটা আর্ট প্লেয়ার্সের তুল্য মানের নাটক আজকের দিনের কোন প্রডিউসার মঞ্চস্থ করতে পেরেছেন? ইউরোপে এবং এদেশে মঞ্চ এবং চিত্রনির্মাণ বিষয়ে মধুবাবু যে শিক্ষা এবং অভিজ্ঞতা লাভ করেছেন তারও তুলনা হয় না। ১৯২৮ সালে মধু বোসের প্রথম প্রোডাকশন হয় নিউ এম্পায়ার মঞ্চে 'আলিবাবা' নাটকের—সারা কলকাতার বিদগ্ধ মহলে একটা সাড়া পড়ে যায় এই নাটকের রূপায়ণ দেখে। প্রোডাকশনে কিন্ত মর্জিনার ভূমিকায় অভিনয় করেছিলেন শ্রীমতী সুনীতা রায়—মধুবাবুর ভাগ্নী। ১৯৩৮ সালে যখন আলিবাবা হয় তখনই মর্জিনার ভূমিকার নামেন শ্রীমতী সাধনা বসু। সাধনা বসু যে শুধুমাত্র ভারতবর্ষের শ্রেষ্ঠ নৃত্যশিল্পীদের মধ্যে অন্যতম

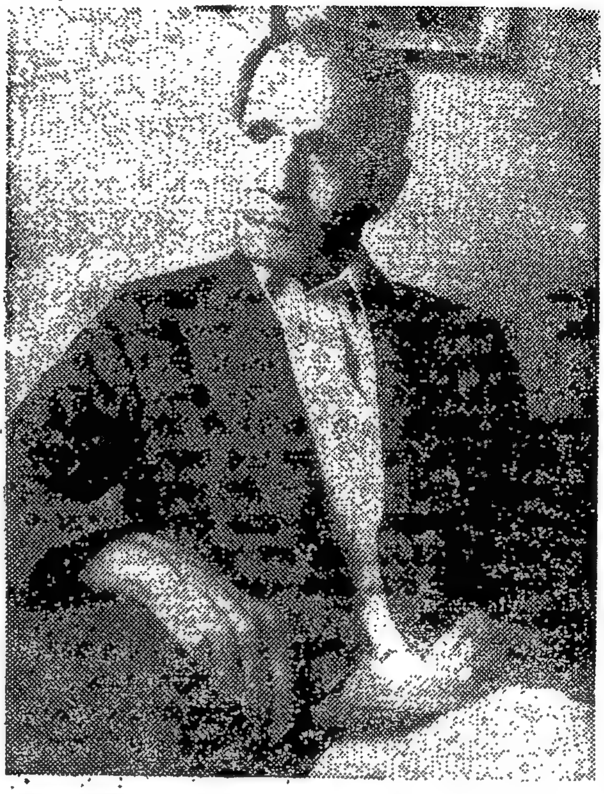

মধু বোস

ছিলেন তাই নয়, তাঁর মত অভিনেত্রী এদেশে বা ওদেশে আমি খুব কমই দেখেছি—যেমন অদ্ভুত চোখের কাজ, তেমনি এক্সপ্রেশেন্স এবং সাবলীল জেস্‌চারস্ বা হাতের কাজ। ১৯৩০ সালে মধুবাবু কবিগুরুর 'ডালিয়া'র মঞ্চ রূপায়ণ করেন। পরে—বোধহয় ১৯৩৫ সালে আর একবার ডালিয়া মঞ্চস্থ হয়েছিল এবং এ-প্রদর্শনীতে রবীন্দ্রনাথ নিজে উপস্থিত ছিলেন—কবি এ অভিনয়ের উচ্চ প্রশংসা করেছিলেন। ১৯৩৩-৩৪ সালে জোরিনা, বিদ্যুৎপর্ণা ও ওমর-খৈয়াম মঞ্চস্থ করেন বসু-দম্পতি। আমার মনে আছে এক শিশিরকুমার ছাড়া অন্য কোন প্রডিউসারের প্রোডাকশনে বিদগ্ধ দর্শকদের মাঝে এতোটা সাড়া জাগতে দেখি নি, যা দেখেছি মধু বসুর প্রোডাকশনের সময়ে। ১৯৩৫ সালে মন্দির, ১৩৩৬ সালে সাবিত্রী ও অমর-খৈয়াম, ১৯৩৮ সালে রাজনটী এবং ১৯৩৯ সালে রূপকথা মঞ্চস্থ হয়। সি এ পি সম্প্রদায়ের দ্বারা—প্রত্যেকটি প্রোডাকশনই অকুণ্ঠ প্রশংসা অর্জন করেছিল সুধীমহলে। মধু বসু-সাধনা বসুর দলের অভিনয় যেমন হোত প্রথম শ্রেণীর, তেমনি হোত দলগত অভিনয়, নৃত্য, সংগীত, মঞ্চসজ্জা এবং আলোকসম্পাত।

এইসব প্রোডাকশন করে যিনি একদিন সারা ভারতবর্ষের রংগজগতে বিরাট আলোড়নের সৃষ্টি করেছিলেন, আজও তিনি সম্পূর্ণ কার্যক্ষম। সুতরাং জাতীয় রংগমঞ্চের ডিরেক্টর করতে হলে মধুবাবুকেই আমন্ত্রণ করে আনা উচিত বরং তিনি এলেই সত্যিকার ন্যাশনাল থিয়েটার গড়ে তুলতে পারবেন।

শ্রীযুক্ত আলকাজীকে আমি জানি এবং তিনি সত্যিই কাজের লোক। কিন্তু কলকাতার ন্যাশনাল থিয়েটারের জন্য আলকাজী অপেক্ষাও অনেক বিষয়ে শ্রেষ্ঠ এবং অভিজ্ঞ ব্যক্তি এই কলকাতার শহরেই আছেন—যেমন ধরুন শ্রীপ্রফুল্ল রায়, বা নরেশবাবু, বা অর্ধেন্দু মুখার্জী, অথবা রাধামোহনবাবু।

শিশিরকুমারের জাতীয় রংগমঞ্চকে সার্থক আকৃতি দিতে হলে সত্যিকার বিদগ্ধ এবং অভিজ্ঞ পরিচালক নিযুক্ত না হলে জাতীয় রংগমঞ্চের সমস্ত পরিকল্পনাটাই ব্যর্থতায় পর্যবসিত হবে। আশা করি সরকার সব দিক ভেবেচিন্তেই এ বিষয়ে কাকে নিয়োগ করবেন সে সিদ্ধান্তে আসবেন। কংগ্রেস ভবনে নিত্য হাজিরা দেওয়া কোন ব্যর্থ পরিচালককে নিয়োগ করে জাতীয় রংগমঞ্চের পরিকল্পনাটিকে গোড়াতেই অসার্থক করে তুলবেন না।

[ক্রমশঃ]

রঙ্গজগৎ

সিনেমা বন্ধ হবার সম্ভাবনা

পশ্চিমবঙ্গের সিনেমা কর্মচারীদের মধ্যে বিক্ষোভ সৃষ্টি হয়েছে। যে-কোন সময় সিনেমাগুলি বন্ধ হয়ে যেতে পারে। জনসাধারণ আনন্দ উপভোগের যে সুযোগটুকু পান হয়ত অনির্দিষ্টকালের জন্য তা থেকে বঞ্চিত হবেন। সিনেমা কর্মচারীদের সঙ্গে হলের মালিকদের দেনা-পাওনার দ্বন্দ্ব সম্পর্কে আমরা ওয়াকিবহাল নই। আমাদের কথা সিনেমাগুলিকে চালু রাখার বিষয়ে। সিনেমাগুলি বন্ধ হলে দর্শকরা যেমন সিনেমা দেখা থেকে বঞ্চিত হবেন, কর্মচারীরা কাজের দিন খোয়াবেন, সেই সঙ্গে বহু প্রযোজক মাথায় হাত দিয়ে বসবেন। লক্ষ লক্ষ টাকা ব্যয়ে ছবি করেছেন, হাজার হাজার টাকা ব্যয়ে প্রচার করেছেন এখন যদি ছবি মুক্তিলাভ করতে না পারে তবে পাওনাদারের সুদের অঙ্ক বাড়বে। প্রযোজকের ঋণের অঙ্ক মোটা হবে। এই সঙ্গে সরকারের ঘরে প্রমোদকর বাবদ আয়ের টাকাও হ্রাস পাবে।

কোন লোক সখ করে ধর্মঘটে নামে না, নামতে বাধ্য করা হয়। শ্রমিক-কর্মচারীদের ধর্মঘট হচ্ছে শেষ অস্ত্র। এক্ষেত্রেও সিনেমা কর্মচারীরা বহু আবেদন-নিবেদন করেছেন, আলাপ-আলোচনা করেছেন কিন্তু বর্তমান পরিস্থিতি অনুসারে হলের মালিকরা মীমাংসার চেষ্টা করেন নি। বরঞ্চ হুমকী দিয়েছেন। সম্প্রতি হলের মালিকদের পক্ষ থেকে শ্রীজালান এক বিবৃতিতে বলেছেন, সিনেমা কর্মচারীরা ২৬শে আগস্ট প্রতীক ধর্মঘট করলে তাঁরা অনির্দিষ্টকালের জন্য সিনেমায় লক-আউট ঘোষণা করবেন। এই বিবৃতি প্ররোচনামূলক এবং অন্যায় জিদের প্রকাশ। এই বিবৃতিতে মালিকপক্ষের স্বরূপ প্রকাশ হয়ে পড়ে। সিনেমা মালিকরা কেবল কর্মচারীদের সুখ-সুবিধার বিষয়ে উদাসীন নয়, দর্শকদের ব্যাপারেও তাঁদের অবহেলার শেষ নেই। দর্শকরা অর্থব্যয় করে সিনেমায় যায় আনন্দ উপভোগ করতে, কিন্তু অধিকাংশ সিনেমায় ছেঁড়া গদী, ভাঙা আসন, মেঝেতে আবর্জনা এবং দুর্গন্ধময় পরিবেশ। ম্যাটিনী ও সান্ধ্য প্রদর্শনীর পর রাত্রির প্রদর্শনীতে বহু হল নরক সমতুল্য হয়ে থাকে। কোন কোন হলে ছারপোকার কামড়ে অস্থির হয়ে উঠে আসতে ইচ্ছা হয়। সিনেমাগুলিকে পরিচ্ছন্ন রাখা এবং রোগ বীজাণুমুক্ত রাখা যে অবশ্য কর্তব্য এ কথা বহু হলের মালিক কার্যত স্বীকার করেন না। অথচ বর্তমান সময়ে চলচ্চিত্র-শিল্পে একমাত্র প্রেক্ষাগৃহের মালিকরাই নিরাপদে লাভ করে যাচ্ছেন, এবং এঁদের লাভের অঙ্ক অবিশ্বাস্যরকম বেড়েছে।

এই অবস্থায় যদি কর্মচারীরা ধর্মঘট করতে বাধ্য হন তবে স্বাভাবিকভাবে জনসাধারণ কর্মচারীদের সমর্থন করবে। আমরা আশা করি পরিস্থিতি বিবেচনা করে প্রেক্ষাগৃহের মালিকপক্ষ কর্মচারীদের সঙ্গে আপোষের পথে অগ্রসর হবেন, লক-আউট অথবা ধর্মঘটের সম্ভাবনা-মুক্ত অবস্থা সৃষ্টি করবেন। —সুজন

বেবী গুপ্তা
'শুধু একটি বছর' ছবিতে অংশ গ্রহণের পর 'জয়-জয়ন্তী'তে অভিনয় করবেন।

চিত্র আলোচনা

শেষ তিন দিন
এম বি প্রোডাকসন্স
পরিচালনা—প্রফুল্ল চক্রবর্তী

'শেষ তিন দিন'-এর কাহিনী বাংলা চলচ্চিত্রের ক্ষেত্রে অভিনব। বাংলা চলচ্চিত্রের সংকীর্ণ ক্ষেত্রে এরূপ বিষয় নিয়ে ছবি তৈরির উদ্যোগ সাহসিক প্রচেষ্টা। গার্হস্থ্য জীবনের কথা ও তরুণ-তরুণীর হৃদয় বিনিময় ও মিলনের সমস্যাকে মুখ্যত কেন্দ্র করে গড়ে ওঠা কাহিনীকে ছাড়িয়ে এই ছবির গল্প রচিত হয়েছে আন্তর্জাতিক সমস্যাকে কেন্দ্র করে। যে সমস্যা আজকের দিনের সমগ্র মানবসমাজকে ভাবিয়ে তুলেছে। অর্থাৎ অস্ত্র-শক্তি বৃদ্ধির প্রতিযোগিতা, পারমাণবিক বোমা তৈরির উন্মাদনা। এই অস্ত্রবৃদ্ধি প্রতিযোগিতায় পৃথিবী বা মানবসমাজ এক ভয়ঙ্কর যুদ্ধের মুখোমুখী এসে উপস্থিত হয়েছে বলে একদল লোক প্রত্যহ প্রচার করছেন। ছবিটি হিরোসিমা নাগাসিকির নিহতদের স্মরণে উৎসর্গ করা হয়েছে।

এই ছবির কাহিনীর নায়ক গোপাল এক সংবাদপত্রের রিপোর্টার। বিমানে আসার পথে হঠাৎ বিমান এক মাঠে নেমে যায় এবং পাইলটরা পিস্তল তাক করে যাত্রীদের নেমে যেতে বাধ্য করে। সঙ্গে সঙ্গে পাইলটরা ঘোষণা করে নবাবিষ্কৃত যে আণবিক অস্ত্রগুলি অপহৃত হয়েছে সেগুলি এখন তাদের কাছে আছে। বিভিন্ন রাষ্ট্রের মধ্যে যে পারমাণবিক প্রতিযোগিতা শুরু হয়েছে তার প্রতিযোগিতায় আজ হোক কাল হোক পৃথিবী ধ্বংস হবে। তারা যুদ্ধবাজদের স্তব্ধ করে দেবার জন্য এই দিনটিকে আরো এগিয়ে আনতে চায়। আজ থেকে তিন দিন পরে তারা সেগুলি নিক্ষেপ করে পৃথিবীকে ধ্বংস করে দেবে। গোপালের প্রত্যক্ষদর্শীর বিবরণ ছেপে সংবাদপত্রের বিশেষ সংখ্যা প্রকাশ হয়। তার পরে এই শেষ তিন দিনের ঘটনা, বিভিন্ন

নির্মীয়মাণ 'গৃহদাহ' ছবিতে উত্তমকুমার ও সুচিত্রা সেন

ব্যক্তির ওপর তার প্রতিক্রিয়া, সমাজে ও ব্যক্তিমনে যে সব মূল্যবোধ ছিল একে একে সেই মূল্যবোধ কি করে শেষ হয়ে গেল ইত্যাদি। আর এই সঙ্গে চলছে রাষ্ট্রসঙ্ঘের বৈঠক; পাইলটদের কাছে আবেদন। পাইলটরা রাষ্ট্রনেতাদের আবেদন প্রত্যাখ্যান করলে জনতার প্রতিনিধিরা এগিয়ে গেল, এবং জনতার প্রতিনিধিদের আবেদনে পাইলটরা নিরস্ত হল। পৃথিবী রক্ষা পেল। এই কাহিনীর সঙ্গে গোপালের প্রণয় কাহিনী যুক্ত হয়েছে; আর তার সঙ্গে বিমানের সহযাত্রিণীর কথা।

ছবির শেষ মুহূর্তে জানা গেল—সমগ্র কাহিনী গোপালের স্বপ্ন মাত্র। বিমানে দিবানিদ্রার মধ্যে সে স্বপ্নলোকে বিচরণ করে এসেছে, আণবিক অস্ত্র সম্পর্কে একটি বই পড়ার প্রতিক্রিয়ায়।

এই স্বপ্ন দর্শনের কথা জেনে কিছুটা আশ্বস্ত হলাম। নতুবা যে-ভাবে কাহিনী উপস্থিত হয়েছে তার মধ্যে এত অসঙ্গতি ও চিন্তার দুর্বলতা আছে যে তা গ্রহণ করা সম্ভব নয়। স্বপ্নের দৌড় স্বর্গ, মর্ত, পাতালে অবারিত, সুতরাং এখানে অসঙ্গতির দোষ নেই। তবে স্বপ্নেরও একটা মনস্তাত্ত্বিক ধারা আছে। স্বপ্নের প্রত্যেকটি দৃশ্যে গোপালের উপস্থিত থাকবার কথা, অর্থাৎ গোপাল যা দেখছে দর্শকরা তাই গোপালের চোখ দিয়ে দেখছে। কিন্তু ছবিতে এমন অনেক দৃশ্য আছে যে সব দৃশ্যে গোপাল নেই, বা গোপালের জানবার কথা নয়। দ্বিতীয়ত কাহিনীর পরিধি আরো ছোটভাবে গ্রহণ করা উচিত ছিল। বিভিন্ন রাষ্ট্রের নেতাদের বৈঠক ইত্যাদির দৃশ্য দেখে মনে হয়—সারা বিশ্বের দায়িত্ব বুঝি বাংলার ওপর এসে পড়েছে, এবং রাষ্ট্র সভায় ভারতীয় বা কালো বর্ণের লোকদেরই আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। তৃতীয়ত শেষ তিনটি দিনের ঘটনা এমনভাবে একাকার হয়ে গেছে যে, প্রথম ও দ্বিতীয় দিনের অতিক্রান্তি ও তার প্রতিক্রিয়া স্পষ্ট হয়ে ওঠে নি।

কাহিনীটি যদি এরূপ এক চরম সংকট মুহূর্তে কলকাতার জীবনে কি কি প্রতিক্রিয়া ঘটছে সেভাবে উপস্থিত করা হত এবং চিন্তা আরো সংযত হত তা হলে বিশ্বাস্য পরিস্থিতি সৃষ্টি করতে হয়ত পারত।

মিহির সেন বিশেষ এক রাজনৈতিক চিন্তাধারা থেকে এই কাহিনী লিখেছেন। তাঁর চিন্তাধারা অনুযায়ী দুই দল যুদ্ধোন্মাদ একটা মহাযুদ্ধ ডেকে আনছে। তাঁর চোখে সমাজতান্ত্রিক শিবির আর সাম্রাজ্যবাদী শিবির একাকার হয়ে গেছে। তাঁর বক্তব্য একটা নিরপেক্ষ শক্তির উদ্ভবেই সংকটত্রাণ হবে। অথচ বাস্তবক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে নিরপেক্ষতার নামাবলী গায়ে দিয়ে কিছু কিছু দেশ সাম্রাজ্যবাদী শিবিরকেই জোরদার করছে। ভিয়েতনামের মুক্তি সংগ্রামের ব্যাপারে ভারত এবং যুগোশ্লাভিয়ার ভূমিকা কি? যে যুগোশ্লাভ দূতাবাসের সহায়তার জন্য প্রযোজক কৃতজ্ঞতা স্বীকার করেছেন! মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের ভিয়েতনামে নাপাম বোমা নিক্ষেপ এবং যুদ্ধকে জিইয়ে রাখা, আর ভিয়েত কংদের দেশরক্ষার সংগ্রাম কি একই পর্যায়ের? এবং ভিয়েত কংদের কি যুদ্ধোন্মাদ বলা যাবে? তা যদি না যায় ছবিতে শান্তির যে সর্ত দেওয়া হয়েছে তাতে ঔপনিবেশিক মুক্তি সংগ্রাম বা স্বাধীনতার যুদ্ধের সমর্থন করা হল না কেন? ছবিতে মিহির সেনরা যে রাজনীতি প্রচার করেছেন তার একটা উদ্দেশ্যমূলক দিক আছে। অথবা তা নেহাৎ চায়ের দোকানের আড্ডায় দায়িত্বহীন আলোচনার মত এত বড় একটা বিশ্ব সমস্যার জলবৎ তরলং সমাধান করে দিয়েছেন।

পরিচালক প্রফুল্ল চক্রবর্তী দীর্ঘদিন পরে এই ছবিটি নির্মাণ করেছেন। তাঁর পরিচালিত 'যমালয়ে জীবন্ত মানুষ' বিশেষ সাফল্য লাভ করেছিল।

এই ছবিতে তিনি নতুন বিষয়ের অবতারণা করেছেন, কিন্তু একক চিন্তায় এরূপ গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে যথেষ্ট মনস্তাত্ত্বিক ও রাজনৈতিক চিন্তা দক্ষতার পরিচয় দিতে পারেন নি। অনেক অপ্রয়োজনীয় চরিত্র ও দৃশ্যে ছবিটি কিছুটা ভারাক্রান্ত। এরূপ ছবিতে সংলাপের গুরুত্ব যথেষ্ট। এখানে সংলাপ দুর্বল এবং বক্তৃতাধর্মী হয়ে গেছে। কৌতুকরসের দৃশ্য সৃষ্টিতে তিনি দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন। তবে দুই ভোট প্রতিদ্বন্দ্বীর মধ্যে শান্তি প্রসঙ্গে বিরোধী প্রার্থীর স্বীকারোক্তিতে বিরোধীরা তিলকে তাল করে এমন উক্তি কি শাসকদলকে তুষ্ট করার জন্য?

ছবিতে প্রধান চরিত্রে রূপদান করেছেন অনুপকুমার। তাঁর অভিনয় প্রশংসনীয়। পরবর্তী দুটি চরিত্রে অভিনয় করেছে সুস্মিতা সান্যাল ও গীতালি রায়। অন্যান্য ভূমিকায় অভিনয় করেছেন বিপিন গুপ্ত, সুব্রতা চ্যাটার্জী, অপর্ণা দেবী, রেণুকা রায়, রাজলক্ষ্মী দেবী, জহর রায়, ভানু বন্দ্যোপাধ্যায়, জহর গাঙ্গুলী, তরুণকুমার, হরিধন, নৃপতি, শীতল, শ্যাম লাহা, প্রেমাংশু বসু, মণি শ্রীমানি, দ্বিজু ভাওয়াল, গীতা দে, আরতি দাস প্রমুখ আরো অনেকে। ছবির চিত্রগ্রহণ, সম্পাদনা ও সঙ্গীত পরিচালনা করেছেন যথাক্রমে দীনেন গুপ্ত, বৈদ্যনাথ চট্টোপাধ্যায় এবং অতীন চ্যাটার্জী।

মেরে লাল

এস এস চিত্রমন্দির

পরিচালনা : সত্যেন বসু

হিন্দী চলচ্চিত্র জগতের সাথে বাঙালী দর্শকদের বিশেষ মনের মিল নেই। মাঝে মাঝে কয়েকটি হিন্দী ছবি মুক্তিলাভ করে যা বাঙালী দর্শকদের কাছে সমাদৃত হয়। এস এস চিত্রমন্দিরের 'মেরে লাল' ওরকম একটি ছবি। এ ছবির কাহিনী অনেকের জানা। ডাঃ নীহাররঞ্জন গুপ্তের লেখা কাহিনী হয়ত বেশি লোকে পড়েন নি; কিন্তু বাংলা ছবি 'বাদশা' দেখেছেন বহু লোকে। 'বাদশা' ছবিটি বাংলা দেশে জনপ্রিয় হয়েছিল। এবার সেই একই কাহিনীর হিন্দীরূপ নির্মিত হয়েছে সত্যেন বসুর পরিচালনায়। ছবিটিকে সবশ্রেণীর মানুষের সপরিবারে দেখার যোগ্য করে শ্রীবসু পরিচালিত করেছেন। শিশুদের নিয়ে ছবি নির্মাণে তিনি সিদ্ধহস্ত। ইতিপূর্বে শিশুদের প্রধান ভূমিকা আছে এমন যে কয়টি ছবি তিনি করেছেন প্রত্যেকটি ছবি জনপ্রিয় হয়েছে। এবারও শ্রীবসু প্রথমে অতি ছোট এক শিশুকে দিয়ে, পরে এক কিশোরকে দিয়ে আশ্চর্য অভিনয় করিয়েছেন। হিন্দী চিত্ররূপে কিছুটা নতুন সংযোজন আছে। সম্ভবত হিন্দীর দর্শকদের চেতনা ও মেজাজের দিকে নজর রেখে এই সংযোজন হয়েছে। এক নর্তকীর সাথে বাদশার অন্তরঙ্গতা এবং সেই নর্তকীর মনে পরবর্তী প্রতিক্রিয়া নতুন সংযোজন, এই নর্তকীর ভূমিকায় অভিনয় করেছে ইন্দ্রাণী মুখার্জী। বাদশার চরিত্রে বাংলা ছবিতে অভিনয় করেছিলেন বিখ্যাত অভিনেতা কালী ব্যানার্জী। এখানে অভিনয় করেছেন নবাগত দেবকুমার। দীর্ঘদেহ দেবকুমার এতদিন শুল্ক বিভাগে চোরাকারবার ধরবার কাজে চাকুরি করতেন। এই ছবিতে অভিনয় করে তিনি চলচ্চিত্র অভিনেতা হলেন। নতুন হলেও পরিচালক তাঁকে দিয়ে প্রয়োজনমত কাজ করিয়েছেন। এবং তিনি ডাকাত বাদশাকে বিশ্বাসযোগ্যরূপে উপস্থিত করেছেন।

বাদশা এক ডাকাতের নাম। গঙ্গা দশেরা মেলায় গিয়ে সে এক শিশুকে কুড়িয়ে পেয়েছিল। সেই শিশুটিকে বড় করতে গিয়ে সে বাদশা থেকে প্যারেলাল হয়ে যায়। অর্থাৎ ডাকাতি ছেড়ে বাঁদর-ছাগলের খেলা দেখিয়ে জীবিকা অর্জন করে। প্যারেলাল অসুস্থ হলে ছেলেটি খেলা দেখিয়ে প্যারেলালের পথ্য জোগায়। এই অবস্থায় একদিন তার মা-বাবা তাকে খুঁজে পায়, আর প্যারেলালেরও পরমায়ু শেষ হয়।

ছবির ফটোগ্রাফির কাজ সুন্দর, এবং লক্ষ্মীকান্ত প্যারেলাল পরিচালিত গানগুলি উপভোগ্য। তবে হিন্দী

'অশ্রু দিয়ে লেখা' চিত্রের একটি দৃশ্যে আসিতবরণ ও জ্যোৎস্না বিশ্বাস

প্রতিরক্ষা মন্ত্রী শ্রীচ্যবনের আমন্ত্রণে বাংলা দেশের একদল সংগীত শিল্পী অগ্রবর্তী এলাকায় জওয়ানদের মনোরঞ্জনের জন্য সংগীতানুষ্ঠানে যোগদান করেন। লাদাকে 'চুসুল ইন্সটিটিউট'-এ জওয়ানদের সামনে সংগীতানুষ্ঠানের পূর্বে ভূপেন হাজারিকাকে বক্তৃতা করতে দেখা যাচ্ছে। (বামদিক থেকে)—মিণ্টু দাশগুপ্ত, ইলা বসু, নির্মলা মিশ্র, দ্বিজেন মুখোপাধ্যায় ও ভূপেন হাজারিকা। ফটো—অশোক বসু

ছবিতে যেরকম অতিনাটকীয়তা, অতি ভাবাবেগ ইত্যাদি থাকে এখানেও তাই রয়েছে। তাহলেও ছবিটি হিন্দীভাষীর সংগে বাঙালী দর্শকদের কাছেও সমাদৃত হবে।

অভিনয়ে হারানো শিশুর মায়ের ভূমিকায় যথাযোগ্য রূপ দিয়েছেন মালা সিন্‌হা। অভি ভট্টাচার্যের পাগলা ডাক্তার ও জগদেবের বংশি প্রশংসনীয়। পরিচালক সত্যেন বসু দু-জন পুলিশ অফিসারের ভূমিকায় একসংগে অভিনয় করেছেন; এবং রূপসজ্জার কেরামতিতে ভালভাবেই কাজটি করেছেন।

ব্যালে নৃত্যে চিত্রতারকা হোর্স্‌ট বুখহোলত্‌জ

চরিত্রাভিনেতা রূপে হোর্স্‌ট বুখহোলত্‌জের নাম আজ বিশ্বব্যাপী। চলচ্চিত্রে প্রায় সবরকম ভূমিকাতেই এই শিল্পীর অভিনয় দক্ষতার স্বাক্ষর আছে। মহাত্মা গান্ধীর জীবন-চিত্রে হোর্স্‌ট ঘাতক গোডসের চরিত্রে রূপদান করেছিলেন। জার্মান চলচ্চিত্রে তিনি বহুকাল কোন অংশ গ্রহণ করেন নি কারণ বিদেশের প্রতিষ্ঠানগুলি থেকে তিনি চড়া পারিশ্রমিক পেয়ে থাকেন। সম্প্রতি তিনি কিছুদিনের জন্য স্বদেশে ছিলেন। এই সময় তিনি টেলিভিশন অনুষ্ঠানসূচীতে চাইকোভস্কির "সোয়ান লেক" ব্যালে নৃত্যে রাজপুত্রের ভূমিকায় অপূর্ব কৃতিত্ব দেখিয়েছেন। এই গুণী অভিনেতা যে একজন দক্ষ নৃত্যশিল্পী, নিঃসন্দেহে তিনি তা প্রমাণ করেছেন এবং এই চরিত্রের প্রতি তিনি এতো আকৃষ্ট হয়েছিলেন যে শেষাংশ অভিনয়কালে গুরুতর অসুস্থ হয়ে পড়া সত্ত্বেও তিনি ক্ষান্ত হন নি। অভিনয় শেষ হবার সংগে সংগে সাজপোশাক পরিহিত অবস্থাতেই অস্ত্রোপচারের জন্য তাঁকে হাসপাতালে নিয়ে যেতে হয়। এখন অবশ্য তিনি আরোগ্যের পথে।

নাটকের কথা

'হিজিবিজি' গোষ্ঠীর অভিনয়

উত্তর কলকাতার নাট্যগোষ্ঠী "হিজিবিজি" অভিনয় করলেন বিমল রায়ের 'শেষের পরে' প্রতাপ মেমোরিয়াল রঙ্গগৃহে।

এদিনের অভিনয়ে লালু গঙ্গোপাধ্যায়, তপন ঘোষ, দীপক কড়ুরী ও অমিতাভ সেনগুপ্ত দর্শকদের প্রচুর প্রশংসা লাভ করেন। অন্যান্য ভূমিকায় সুঅভিনয় করেন সর্বশ্রী জয়দেব ঘটক, সমীর বন্দ্যোপাধ্যায়, হরিপদ

৩ মাসের জন্য বিনামূল্যে উপহার

স্ত্রীলোকের সৌন্দর্য, কাশ্মীর আর্ট শাড়ী। সর্বাধুনিক মনোরম ডিজাইন এবং রং লইয়া মরশুমের নূতন নূতন মাল আসিয়াছে। আমাদের কাছে কেবলমাত্র বড় সাইজের কাপড় পাওয়া যায়। ১টি ডিল্যুক্স শাড়ীর মূল্য ১১ টাকা; ২টি ২০ টাকা; ৩টি ২৮ টাকা; ৪টি ৩৬ টাকা। দুইটি বা তদধিক শাড়ীর অর্ডারের সহিত বিনামূল্যে ব্লাউস পীস। পোস্ট পার্শেলযোগে অর্ডারের মাল পাঠান হয়।

Arvind Agencies (DBM-22)
Post Box 1408, Delhi-6.

রায়, রাধাকান্ত মুখোপাধ্যায়, মিহির ভট্টাচার্য, শ্যামল গুহ, মদন মল্লিক, সোমনাথ গঙ্গোপাধ্যায়, বাবলু সেনগুপ্ত, প্রতাপ ঘোষ ও তপন রায়। স্ত্রী ভূমিকাটি সুন্দরভাবে রূপায়িত করেন আলপনা বন্দ্যোপাধ্যায়। সঙ্গীতাংশে সমীর শীলের বেহালার সুর প্রশংসনীয়।

'শেষ তিন দিন' চিত্রের নায়ক অনুপকুমার

সঙ্গীতকথা

সেনী সঙ্গীত সমাজের অনুষ্ঠান

গত ২০শে ও ২১শে আগস্ট রামমোহন লাইব্রেরী হলে সেনী সঙ্গীত সমাজের উদ্যোগে ৬ষ্ঠ ধ্রুপদ সম্মেলন এবং মিঞা মহম্মদ আলি খানের ১৩২তম জন্মবার্ষিক অনুষ্ঠান সম্পন্ন হয়েছে। মিঞা মহম্মদ আলি খান ছিলেন ভারত-গৌরব তানসেনের বংশধর। সারা ভারতব্যাপী তাঁর গুণমুগ্ধ সঙ্গীতানুরাগী ও শিষ্যবৃন্দ রয়েছেন, যাঁরা শ্রদ্ধার সাথে তাঁকে স্মরণ করেন।

প্রথমদিন ধ্রুপদ সম্মেলনে অংশ গ্রহণ করেন ওস্তাদ শওকত আলি খান, এফ আর ডাগর, জয়কৃষ্ণ সান্যাল, সিদ্ধেশ্বর মুখোপাধ্যায়, জগন্নাথ মুখোপাধ্যায়, কল্পনা মুখোপাধ্যায়, বীরেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী, শম্ভুনাথ ভট্টাচার্য প্রমুখ।

দ্বিতীয় দিনে খেয়াল সম্মেলনে শ্রোতাদের বিস্ময়-মুগ্ধ করেছেন শ্রীমতী অপর্ণা চক্রবর্তী। শ্রীমতী চক্রবর্তীর গানই এদিনের অনুষ্ঠানের সর্বাধিক উপভোগ্য হয়েছিল। তিনি বাগেশ্রী রাগে খেয়াল গাইলেন, যেমন তাঁর সুর, কিন্তার তেমন তাঁর গায়কী। তানে লয়ে তাঁর গান শ্রোতাদের অভিভূত করে এক সঙ্গীতমধুর পরিবেশ রচনা করেন। শ্রীমতী ক্ল্যাসিক্যাল সঙ্গীত জগতে সুপরিচিত শিল্পী। বহু অনুষ্ঠানে তাঁর গান শোনার সুযোগ আমাদের হয়েছে। কিন্তু এদিনের অনুষ্ঠানে তাঁর কণ্ঠে যে গান শুনলাম তা বহুদিন মনে রাখার মত।

এদিনের অনুষ্ঠানে আরো যাঁরা অংশ গ্রহণ করেছিলেন তাঁদের মধ্যে ছিলেন নওয়াবজাদী বেগম জব্বার (সুরবাহার), অনিলকুমার নন্দী (সেতার), পূর্ণিমা সেন (খেয়াল) প্রমুখ।

জার্মান চিত্রাভিনেতা হোর্স্ট বুখহোলৎজ 'সোয়ান লেক' ব্যালে নৃত্যে রাজকুমারের ভূমিকায়

ওভাল টেস্টে ইংলন্ড বিজয়ী

নবাগত ইংল্যান্ড দলপতি ব্রায়ান ক্লোজ রাতারাতি হীরো হয়ে গেলেন, অপরাজেয় সোবার্সের বাহিনীকে পরাজিত করে। ইংলন্ড সুরুতে অধিনায়কত্বের ভার অর্পণ করেছিল মাইক স্মিথের ওপর। কিন্তু স্মিথের ব্যর্থতা এবং দলের শোচনীয় পরাজয়ের ফলে দ্বিতীয় অধিনায়ক হলেন কলিন কাউড্রে। কিন্তু কাউড্রেও ইংলন্ডের সম্মান রক্ষা করতে পারলেন না, চারটি টেস্টের মধ্যে তিনটিতে জয়ী হয়ে ওয়েস্ট ইন্ডিজ রাবার করায়ত্ত করল। এরপর পঞ্চম ও শেষ টেস্টে বিদায় নিলেন কলিন কাউড্রে, এলেন ব্রায়ান ক্লোজ। পঞ্চম টেস্টের আকর্ষণ তেমন ছিল না, কারণ রাবার চতুর্থ টেস্টেই নির্ধারিত হয়েছিল।

ওভালের পঞ্চম ও শেষ টেস্টে ইংলন্ডের বিজয়ের পশ্চাতে প্রবীণ খেলোয়াড় টম গ্রেভনী, উইকেট রক্ষক মারে, হিগস এবং নবাগত টেস্ট খেলোয়াড় স্নোয়ের মূল্যবান অবদানের কথা ভুলে গেলে চলবে না। টম গ্রেভনী এবং মারে ইংলন্ডদলকে উপহার দিয়েছেন দুটি রানে ভরা সেঞ্চুরী এবং হিগস-স্নো জুটির রেকর্ড রান সংগ্রহ দলের জয়ের পথ সুগম করে দিয়েছে।

ওয়েস্ট ইন্ডিজ দল প্রথমে ব্যাট করার সুযোগ লাভ করে কিন্তু ইনিংসের সুরুতে রান তোলার পূর্বেই ব্যাটস্‌ম্যানেরা বিদায় গ্রহণ করতে সুরু করে। এই টেস্টে রোহান কানহাইকে তাঁর সুনাম অনুযায়ী খেলতে দেখা যায়, ওয়েস্ট ইন্ডিজের ব্যাটস্‌ম্যানদের ব্যর্থতায় মধ্যে তিনি সেঞ্চুরী করেন, এবং কানাহাইয়ের ব্যক্তিগত ১০৪ রানের পর উল্লেখযোগ্য অধিনায়ক গ্যারী সোবার্সের ৮১ রান। ওয়েস্ট ইন্ডিজ প্রথম ইনিংসে সংগ্রহ করে ২৬৮ রান। ইংলন্ডের বোলারদের মধ্যে বারবার তিনটি এবং ইলিংওয়ার্থ এবং স্নো যথাক্রমে দুটি করে উইকেট সংগ্রহ করেন।

ইংলন্ড প্রথম ইনিংসের খেলা সুরু করে কিন্তু প্রথমদিকের ব্যাটস্‌ম্যানরা ব্যর্থতা প্রদর্শন করায় প্রতিকূল অবস্থার সম্মুখীন হয় ইংলন্ড দল। মাত্র ১৬৬ রানের মধ্যে দলের সাতটি উইকেটের পতন ঘটে। কিন্তু এই অবস্থার মধ্য থেকেও দলকে জয়ের পথে টেনে আনেন গ্রেভনী, মারে, স্নো এবং হিগস। গ্রেভনী ১৬৫ রানে রান আউট হন, মারে সংগ্রহ করেন ১১২ রান হিগস এবং স্নো-এর ব্যক্তিগত সংগ্রহ ছিল যথাক্রমে ৬৩ রান এবং ৫৩ রান। হল এবং সোবার্স যথাক্রমে তিনটি করে উইকেট দখল করেন। ইংলন্ডের ইনিংস শেষ হয় ৫২৭ রানে।

ওয়েস্ট ইন্ডিজ দল দ্বিতীয় ইনিংসের খেলা সুরু করে কিন্তু তাদের অবস্থা প্রথম ইনিংসের চেয়েও শোচনীয় হয়ে পড়ে। এই ব্যর্থতার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল বুচারের ৬০ রান এবং সেমুর নার্সের ৭০ রান। ওয়েস্ট ইন্ডিজের দ্বিতীয় ইনিংস ২২৫ রানে শেষ হবার ফলে, ইংলন্ড ওভালের শেষ টেস্টে এক ইনিংস ৩৪ রানে জয়ী হয়ে তবু কিছুটা সম্মান রক্ষা করতে সক্ষম হল। ইংলন্ডের এই জয়ের ফলে সিরিজের ফলাফল হল ৩—১; ওয়েস্ট ইন্ডিজের স্বপক্ষে তিনটি জয় এবং ইংলন্ডের পক্ষে একটি জয়।

এক মাইল দৌড়ে বিশ্ব রেকর্ড করেছেন কানসাস বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র জিম রাইন

শ্রীঅমিতাভ

মিহির সেনের আর একটি বিজয়

দূরপাল্লার সন্তরণ বীর মিহির সেন এবার জয় করলেন জিব্রাল্টার প্রণালী। আট বছর পূর্বে ইংলিশ চ্যানেল অতিক্রম করে দূরপাল্লা সাঁতার দেবার যে প্রেরণা পেয়েছেন তাতে অল্প কিছুদিন পূর্বে তেত্রিশ বছরের ব্যারিস্টার মিহির সেন পক প্রণালী অতিক্রম করেই ক্ষান্ত না থেকে অতিক্রম করলেন জিব্রাল্টার প্রণালী—এর পরও তাঁর লক্ষ্য আছে আরও দুটি প্রণালী অতিক্রম করা।

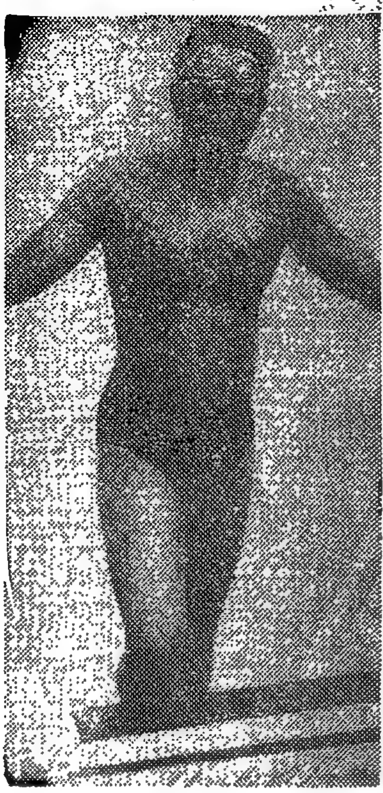

মিহির সেন

মিহির সেন স্পেনের দিক থেকে সমুদ্রে নামেন এবং আট ঘণ্টা এক মিনিট সাঁতার দিয়ে জিব্রাল্টার প্রণালী অতিক্রম করে মরক্কোর উপকূলে সেউটায় উপনীত হন।

মিহির সেন সকাল সাতটায় স্পেনের টারিকায় জলে অবতরণ করেন। বেলা এগারোটার সময় তিনি তিন মাইল দূরত্ব অতিক্রম করতে সক্ষম হন। তখনও তাঁকে অতিক্রম করতে হবে পাঁচ মাইল দূরত্ব। মিহির সেনকে স্রোতের বিপক্ষে সাঁতার কাটতে হয় এবং স্রোতের বেগ ছিল এলোমেলো।

মিহির সেনকে সঙ্গ দানের জন্য দুজন বৃটিশ টমী ছিলেন। কিন্তু সাঁতার কাটার ইচ্ছে থাকলেও শীতল জলে বেশিক্ষণ থাকতে সাহসী হন না দুজন টমীই। মিহির সেন যখন মরক্কোর উপকূলের নিকটবর্তী ঠিক সেই সময় কয়েকটি হাঙর দৃষ্টিগোচর হয়। সঙ্গে সঙ্গে তারের জালের খাঁচা তাঁর চারপাশে নামিয়ে দেওয়া হয়। আপত্তি সত্ত্বেও এই সময়টুকু এই খাঁচার মধ্যে থেকে তিনি সাঁতার দেন।

ছাত্রের কৃতিত্ব

কানসাস বিশ্ববিদ্যালয়ের উনিশ বছরের ছাত্র জিম রাইন এক মাইল দৌড়ে নতুন বিশ্ব রেকর্ড প্রতিষ্ঠিত করার গৌরব অর্জন করেছেন। ক্যালিফোর্নিয়ার বার্কলেতে অনুষ্ঠিত একটি ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় রাইন এই নতুন রেকর্ড সৃষ্টি করেন। পূর্বের বিশ্ব রেকর্ডটির অধিকারী ছিলেন ফ্রান্সের মাইকেল জ্যাজি, ১৯৬৫ সালে তিনি ৩ মিনিট ৫৩·৬ সেকেণ্ডে এক মাইল দূরত্ব অতিক্রম করে বিশ্ব রেকর্ডের অধিকারী হন।

বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র এই তরুণ এ্যাথলেট রাইন ইতিপূর্বে ন'বার চার মিনিটের কম সময়ে এক মাইল দূরত্ব অতিক্রম করেছেন। এবারের প্রচেষ্টা তাঁকে এনে দিল এত অল্প বয়সে

আলেখ্য ঘোষাল

বিশ্ব রেকর্ডের অধিকারী হবার দুর্লভ সম্মান। রাইনের রেকর্ড সময় হ'ল ৩ মিনিট ৫১·৩ সেকেণ্ড।

ভারত শেষরক্ষা করতে পারল না

ভারতীয় ফুটবল দলের দুর্ভাগ্য যে ভারত মার্দেকা ফুটবল প্রতিযোগিতার ফাইন্যালে উন্নীত হবার যোগ্যতা অর্জন করতে পারল না। বি গ্রুপে ভারত এবং দক্ষিণ ভিয়েতনাম সমান পয়েন্ট সংগ্রহ করে, কিন্তু গোলের গড়পড়তায় ফাইন্যালে উন্নীত হয় ভিয়েতনাম দল। এখানে উল্লেখযোগ্য যে ভিয়েতনাম দলকে ভারত পরাজিত করে ১—০ গোলে।

ভারত যে খেলায় সিঙ্গাপুরের কাছে পরাজিত হয়েছে সে খেলার পরিচালনা সম্বন্ধে অনেক অভিযোগ উত্থাপিত হয়েছে। মার্দেকা প্রতিযোগিতার পরিচালকদের সতর্ক হওয়া উচিত, কারণ এই ধরণের ত্রুটিপূর্ণ পরিচালনার ফলে একবার বদনাম হয়ে গেলে ভবিষ্যতে অনেক দেশই প্রতিযোগী হতে উৎসাহ পাবে না।

ভারত গ্রুপের প্রথম খেলায় জাপানকে পরাজিত করে ৩—০ গোলে। অশোক চ্যাটার্জী একাই দেন দুটি গোল, তৃতীয় গোলটি অশোক চ্যাটার্জীর প্রচেষ্টায় রচিত আক্রমণধারা থেকে অরুময় গোলটি করেন। দ্বিতীয় খেলায় ভারত পরাজিত হয় সিঙ্গাপুরের কাছে ১—০ গোলে। ফ্রি কিক থেকে সিঙ্গাপুর গোলটি করে। গুরুকৃপাল সিং একটি গোল করেছিলেন জটলার মধ্য থেকে, কিন্তু রেফারী ফাউলের জন্য গোলটি নাকচ করে দেন। এই খেলায় কিছুটা কম সময় খেলানোর অভিযোগ শোনা গিয়েছে। তৃতীয় খেলায় ভারত ১—০ গোলে তাইওয়ানকে পরাজিত করে। গোলটি করেন অরুময়নৈগম। তাইওয়ান একটি পেনাল্টি পায় কিন্তু গোলরক্ষক থঙ্গরাজ এই পেনাল্টি প্রতিরোধ করেন। আরও কয়েকটি নিশ্চিত গোল রক্ষা করেন থঙ্গরাজ। চতুর্থ খেলায় ভারত পরাজিত করে ভিয়েতনামকে ১—০ গোলে এবং এই বিজয়সূচক গোলটি করেন অরুময়।

ইস্টার্ন রেল এবং জামসেদপুরের খেলার একটি দৃশ্য।

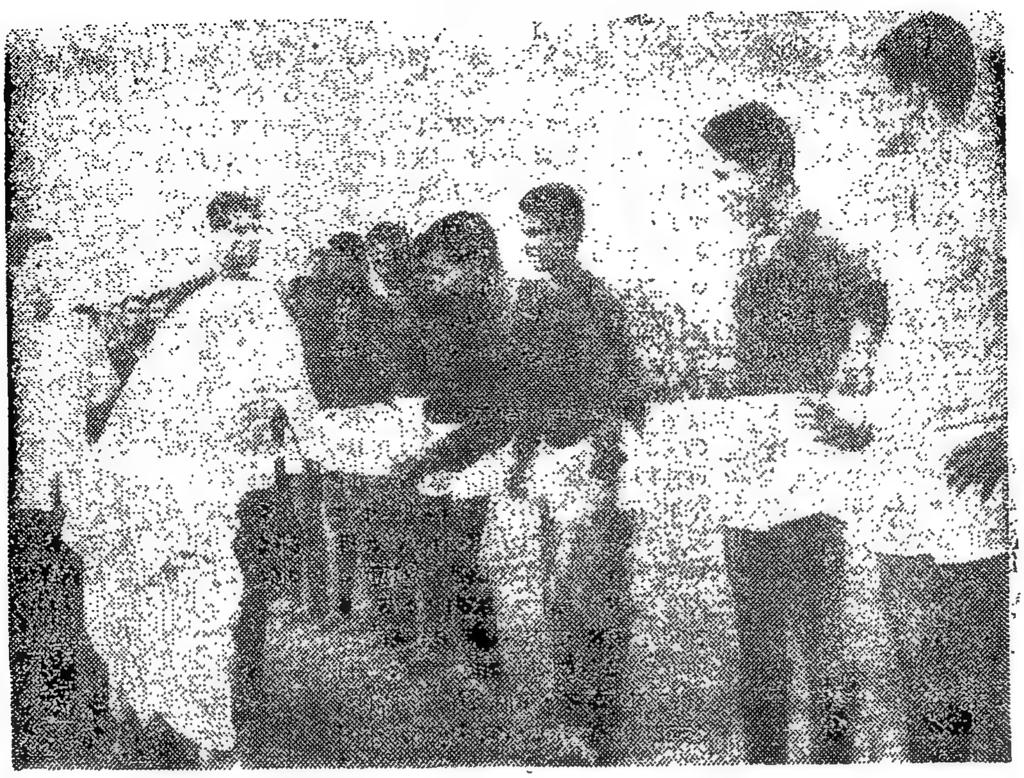

হরেন্দ্র [illegible] শীল্ড খেলার পূর্বে শিক্ষামন্ত্রী শ্রীরবীন্দ্রলাল সিংহের সঙ্গে মোহনবাগান দলের খেলোয়াড়দের পরিচয় করিয়ে দেওয়া হচ্ছে।

এই খেলার শেষে দুই দলের খেলোয়াড়দের মধ্যে হাতাহাতির উপক্রম হলে দর্শকরা মাঠের মধ্যে প্রবেশ করেন, কিন্তু সময়মত পুলিশের হস্তক্ষেপে অবস্থা আয়ত্তের মধ্যে আসে।

আই, এফ, এ, শীল্ড

আই এফ এ শীল্ডের খেলা এগিয়ে চলেছে সাধারণ গতিতে। এবার শীল্ডের প্রথম ভাগের লক্ষণীয় বিষয় হল আমাদের ময়দানের প্রথম বিভাগীয় দলগুলির একে একে বিদায় গ্রহণ। প্রথম রাউণ্ডের খেলায় হুগলী জেলা দলের কাছে ১—০ গোলে পরাজিত হয়ে জর্জ টেলিগ্রাফ বিদায় গ্রহণ করে। দ্বিতীয় ডিভিসনের পোর্ট কমিশনার্স দল ১—০ গোলে পরাজিত করে প্রথম ডিভিসনের কালীঘাট ক্লাবকে। প্রথম দিন খেলা ড্র করার পর দ্বিতীয় দিন স্পোর্টিং ইউনিয়ন ১—০ গোলে পশ্চিমবঙ্গ পুলিশকে পরাজিত করে।

প্রথম রাউণ্ডের খেলায় জামসেদপুর স্পোর্টিং ২—১ গোলে খিদিরপুর দলকে পরাজিত করে দ্বিতীয় রাউণ্ডে ইস্টার্ন রেলের কাছে ১—০ গোলে পরাজিত হয়। খিদিরপুরের সঙ্গে খেলায় জামসেদপুর প্রথমে এক গোল পেছনে ছিল। কিন্তু জামসেদপুর দলের দলীয় উন্নত ক্রীড়াধারা তাদের জয়ী হতে সাহায্য করেছে। খিদিরপুর দলের রক্ষণভাগে উল্লেখযোগ্য ক্রীড়ানৈপুণ্য প্রদর্শন করেন এ ঘোষ এবং আলেখ্য ঘোষাল এবং পুরোভাগে তপন দাস। বিশেষ করে স্টপার আলেখ্য ঘোষাল দর্শকদের দৃষ্টি আকর্ষণে সক্ষম হয়েছেন। জামসেদপুরের বিপক্ষে ইস্টার্ন রেলের বিজয়সূচক গোলটি করেন ইউ এস চৌধুরী।

এরিয়ান্স দল ৪—০ গোলে বাটাকে পরাজিত করে তৃতীয় রাউণ্ডে হায়দ্রাবাদ একাদশের সঙ্গে খেলার যোগ্যতা অর্জন করে। এরিয়ান্সের বিমান লাহিড়ী শেষ তিনটি গোল দিয়ে হ্যাটট্রিক লাভের কৃতিত্ব অর্জন করেন। প্রথম রাউণ্ডের খেলায় উড়িষ্যা একাদশের কাছে ১—০ গোলে পরাজিত হয়ে হাওড়া ইউনিয়ন দল বিদায় নেয়। উয়াড়ী দল কোনক্রমে ১—০ গোলে চন্দননগর জেলা দলকে পরাজিত করে দ্বিতীয় রাউণ্ডে মহামেডান স্পোর্টিংয়ের কাছে ৪—০ গোলে পরাজিত হয়। বালী প্রতিভা ক্লাব ৫—০ গোলে শোচনীয়ভাবে পরাজিত করে বার্ণপুর ইউনাইটেড দলকে।

* * *

মোহনবাগান এবং আই এফ এ একাদশের মধ্যে ডঃ হরেন্দ্র মুখার্জী স্মৃতি শীল্ডের প্রদর্শনী খেলাটি অমীমাংসিতভাবে শেষ হয়। খেলার পূর্বে উভয় দলের খেলোয়াড়দের পশ্চিমবঙ্গের শিক্ষামন্ত্রী শ্রীরবীন্দ্রলাল সিংহের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেওয়া হয়। স্বর্গত হরেন্দ্রচন্দ্র মুখার্জীর স্মৃতিতে এক মিনিট নীরবতা পালন করা হয়।

বর্মন

গোল নিয়েই গণ্ডগোল

বর্তমানে আমাদের সর্বভারতীয় ফুটবলের ক্ষেত্রে সবচেয়ে বড় সমস্যা হল গোলরক্ষকের। এখন আমাদের দেশে ভাল গোলরক্ষক নেই বললে ভুল করা হবে, কিন্তু গোলরক্ষকদের ভূমিকা সম্বন্ধে আমরা বর্তমানে যে মনোভাব গ্রহণ করেছি তার ফলে ভবিষ্যতে গোলরক্ষকের সমস্যা আরও প্রকট হয়ে উঠবে। আমরা মনে করি

পিটার থঙ্গরাজ

ভাল গোলরক্ষক মানে সেই যে একটি গোল খাবে না, একটি গোল খেলেই সেই গোলরক্ষক খারাপ আর কয়েকটি গোল খেলে তো কথাই নেই সে গোলরক্ষক অচল হয়ে পড়বে।

অবুঝ দর্শক বা অন্ধ দল-সমর্থকেরা যদি গোলরক্ষক সম্বন্ধে এই ধরণের মনোভাব পোষণ করেন তবে আশ্চর্য হবার কিছুই নেই। কারণ তাঁরা চান তাঁদের প্রিয় দল শুধু গোলই করবে গোল খাবে না। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই গ্যালারীর মনোভাব ধীরে ধীরে সংক্রামিত হচ্ছে আমাদের দেশের ফুটবল পরিচালক এবং বিভিন্ন ক্লাব কর্তৃপক্ষের মনে।

আশ্চর্যের ব্যাপার যে, আমরা চিন্তাও করে দেখি না একবারও ভাল করে যে একজন গোলরক্ষক একটি গোল রক্ষা করতে পারে নি কেন? এই গোলের জন্য সব দায়িত্ব তার ঘাড়ে চাপিয়ে দেওয়া খুবই অন্যায়, রক্ষণভাগের দায়িত্বের কথা ভুলে গেলে চলবে না।

সব সময় গোলরক্ষককে দায়ী করার অর্থই হল পুরোভাগের খেলোয়াড়দের যোগ্যতার ওপর কটাক্ষপাত করা। কারণ পুরোভাগের যে খেলোয়াড়টি গোল করার কৃতিত্বের অধিকারী তাকে যোগ্য মর্যাদা দেওয়া হবে না তার গোলের জন্য, যদি গোলরক্ষককে সব ক্ষেত্রে দায়ী করা হয়। অবশ্য একেবারে বাজে গোলের কথা আমি বলছি না।

ভাল দলের বিপক্ষে এবং ভাল গোলরক্ষকের বিপক্ষে গোল হওয়া একদিক থেকে অবশ্য শুভ লক্ষণ। কারণ বুঝতে হবে যে সাধারণ দলগুলির মানের উন্নতি হচ্ছে। সাধারণ দলগুলি এর ফলে অনেক উৎসাহও পাবে এবং ফলে তাদের আন্তরিক প্রচেষ্টা এবং উদ্যম ফুটবলের সাধারণ মান উন্নত করতে সাহায্য করবে। ফুটবলে উন্নত বিদেশী দলগুলির খেলার ফলাফল দেখলে বুঝতে পারব যে গোল খাওয়াই গোলরক্ষকের অযোগ্যতা নয়।

এই অল্প কয়েকদিন পূর্বেই ইংলন্ডে বিশ্ব কাপের খেলায় কোয়ার্টার ফাইন্যালে অখ্যাত উত্তর কোরীয় দল একে একে তিনটি গোল করে বসেছিল পর্তুগালের বিপক্ষে। এইভাবে পর পর তিনটি গোল আমাদের দেশের কোন নামী গোলরক্ষক খেলে তার খেলোয়াড়ী জীবনের বারোটা বেজে যেত, সে হয়ে যেত অচল!

এখন আমাদের কলকাতা ময়দানের কথায় আসা যাক। সর্বভারতীয় গোলরক্ষক সমস্যা পূরণ করছেন বর্তমানে কলকাতা ময়দানের গোলরক্ষকেরাই। একটানা কয়েক বছর পিটার থঙ্গরাজ ছিলেন ভারতীয় দলের এক নম্বর গোলরক্ষক। মাঝে দু' বছর আমাদের ফুটবল পরিচালকেরা আস্থা হারানোর ফলে তিনি দল থেকে বাদ পড়েছিলেন। আবার তিনি ভারতীয় দলে স্থান পেয়েছেন।

আমাদের কলকাতা ময়দানে বহু ভাল গোলরক্ষক আসল সময়ে হয়ে এসেছেন অবহেলিত। যেমন বর্তমানে মোহনবাগানের গোলরক্ষক কমল সরকার। কমল সরকার যখন তাঁর ক্রীড়ানৈপুণ্যের শীর্ষে তখন তিনি ভীষণভাবে উপেক্ষিত হয়েছেন। এখন তাঁর সামান্য ভুল-ত্রুটি বিরাট করে প্রকট করে তুলে ধরা হচ্ছে। অথচ আমার মনে হয় আরও সুযোগ দিয়ে গেলে কমল সরকার তাঁর ওপর অর্পিত আস্থার যোগ্য মর্যাদাদানে সমর্থ হবেন। প্রতিনিধিত্বমূলক খেলায় তাঁকে কেন যে সুযোগ দেওয়া হচ্ছে না তা বুঝতে পারছি না। এই প্রসঙ্গে এরিয়ান্সের তরুণ গোলরক্ষক কানাই সরকারের প্রতিও আমাদের ফুটবলের কর্তাব্যক্তিদের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।

এবার মার্দেকায় গিয়েছেন থঙ্গরাজ এবং মুস্তাফা। থঙ্গরাজ ভাল খেলেছেন, কিন্তু তিনি অনেক খেলেছেন এবং তাঁর দিন শেষ হয়েছে, এই সময়

কমল সরকার

কমল সরকার, সি আর দাস বা সেলিমের মত গোলরক্ষকদের সুযোগ দেবার কথা চিন্তা করতে হবে। আশা করি আমাদের ভারতীয় ফুটবলের কর্ণধাররা আগামী রাশিয়া সফর এবং এশিয়ান গেমসের পূর্বে এ বিষয়ে একটু চিন্তা করে দেখবেন।

—সমর পালচৌধুরী

সম্পাদিকা—জয়ন্তী সেন

বসুমতী (প্রাঃ) লিঃ-এর পক্ষে ১৬৬, বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী স্ট্রীটস্থ কলিকাতা-১২
বসুমতী প্রেস হইতে শ্রীসুকুমার গুহমজুমদার কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

সাপ্তাহিক
বসুমতী

ইন্দিরা গান্ধী-লী কুয়ান ইউ সাক্ষাৎকার

CALCU
CENTRA

১ বর্ষ : ১৪শ সংখ্যা, বৃহস্পতিবার, ২২শে ভাদ্র, ১৩৭৩ বঙ্গাব্দ ★ 8th Sept., 1966 * Vol. 71, No. 14

সূচীপত্র

বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা
সম্পাদকীয়		৮৩৫
আজকের মানুষ		৮৩৬
ভারতদর্শন		৮৩৭
আন্তর্জাতিক		৮৪১
বিপ্লবী নিবেদিতা	নন্দিতা ভৌমিক	৮৪৩
সুবর্ণলতা (ধারাবাহিক উপন্যাস)	আশাপূর্ণা দেবী	৮৪৮
ভিয়েতনাম (কবিতা)	বঙ্কিম গুহ	৮৫০
বেদব্যাস-এর রম্যরচনা : অমৃত সমান		৮৫১
আর এক সকালে (কবিতা)	রাধারমণ প্রামাণিক	৮৫৩
অগ্নিযুগের একটি অধ্যায়	অনন্ত সিংহ	৮৫৪
বঙ্গদর্শন		৮৬১
গ্রন্থমেলা	জয়ন্তী সেন	৮৬৪

শ্রীমদ্ভাগবত

প্রাচীন ভক্তদের রচিত সুললিত বাংলা পয়ারে

মূল্য পাঁচ টাকা মাত্র

এই সুবৃহৎ গ্রন্থে আছে—শ্রীল সনাতন গোস্বামীর 'ভাগবতামৃত' গ্রন্থের কবিচন্দ্রের বঙ্গানুবাদ এবং শ্রীগৌরাঙ্গের প্রিয়তম ভাগবতাচার্য্য রঘুনাথ পণ্ডিতের প্রেমতরঙ্গিনী।

ইহাতে আছে দুইখানি অমূল্য গ্রন্থ

শ্রীল সনাতন গোস্বামীর ভাগবতামৃতের অনুবাদ কবিচন্দ্রের

শ্রীবৃহদ্ভাগবতামৃত

এবং

ভাগবতাচার্যের বিশ্বপ্রসিদ্ধ

শ্রীকৃষ্ণ প্রেমতরঙ্গিনী

সমগ্র ভারতে প্রথম বঙ্গানুবাদ

"...শুনিয়া তাহার ভক্তিযোগের পঠন।
আবিষ্ট হইল গৌরচন্দ্র নারায়ণ॥"

ইহা কৃত্তিবাসী রামায়ণ এবং কাশীরাম দাসের মহাভারতের ন্যায় বাংলার প্রতি গৃহস্থের অবশ্যপাঠ্য হউক, এই নিবেদন। এই মূল্যবান গ্রন্থ বাংলার প্রতি ঘরে প্রতিষ্ঠিত করুক।

সাহিত্য-সম্রাট—বন্দেমাতরম্ মন্ত্রের ঋষি

বঙ্কিমচন্দ্রের গ্রন্থাবলী

—উপন্যাস—

প্রথম খণ্ড :—রাজসিংহ, বিষবৃক্ষ, যুগলাঙ্গুরীয়, মৃণালিনী, রজনী। [সচিত্র] মূল্য—৩, টাকা।

দ্বিতীয় খণ্ড :—দুর্গেশনন্দিনী, কৃষ্ণকান্তের উইল, ইন্দিরা, রাধারাণী, সীতারাম। মূল্য—২, টাকা।

তৃতীয় খণ্ড:—আনন্দমঠ, চন্দ্রশেখর, কপালকুণ্ডলা, দেবী চৌধুরাণী। [সচিত্র] মূল্য—৩, টাকা।

—সাহিত্য—

প্রথম খণ্ড :—কৃষ্ণচরিত্র, লোকরহস্য, বিবিধ প্রবন্ধ (১ম)। মূল্য—২, টাকা।

দ্বিতীয় খণ্ড :—(১ম ভাগ অনুশীলন), মুচিরাম গুড়, বিবিধ প্রবন্ধ (২য়), বিজ্ঞান রহস্য। মূল্য—২, টাকা।

তৃতীয় খণ্ড :—শ্রীমদ্ভগবদগীতা, কমলাকান্ত, সাম্য, সাহিত্য-প্রসঙ্গ, মানস, ললিতা। মূল্য—২, টাকা।

বসুমতী প্রাইভেট লিমিটেড: ১৬৬, বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী স্ট্রীট, কলি-১২

সূচীপত্র

বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা
আমি যাঁদের দেখেছি—		
(১২) বনবিহারী মুখোপাধ্যায়	পরিমল গোস্বামী	৮৬৫
আমরা সবাই নীরব (কবিতা)	শক্তি ঘোষ	৮৭৪
বিশ্বসাহিত্যের আদিপর্ব	ডঃ নরেন ভট্টাচার্য	৮৭৫
প্রতিরোধ (গল্প)	রাম রায়	৮৭৯
বিপ্লব প্রচেষ্টার একটি বিস্মৃত অধ্যায়	সত্যেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়	৮৮২
পৃথিবী দেখছে আজ (কবিতা)	মুকুলরঞ্জন সাহারায়	৮৮৪
রঙ্গমঞ্চ ওদেশে এবং এদেশে	শিলালি	৮৮৫
আঠকমল		৮৮৭
রূপজগৎ		৮৮৮
খেলাধূলা	শ্রীঅমিতাভ	৮৯৩

সর্বপুরাণ, সর্বতন্ত্র, সর্ব উপনিষদ, সমস্ত ভক্তিগ্রন্থ হইতে সংকলিত

স্তবকবচমালা

(পঞ্চম সংস্করণ)

যে ঋষির যে স্তবে যে দেবতা আকৃষ্ট হইয়া বর প্রদান করিয়াছিলেন—পুরাণ, উপনিষদ, তন্ত্র, ভক্তিগ্রন্থরাশি মথিত করিয়া সেই সকল শ্রেষ্ঠ ভক্তিনিবেদন অতি যত্নে সুনির্বাচন—সংকলন করিয়া স্তবকবচমালারূপে গ্রথিত। স্তব—ভক্তির উচ্ছ্বাস—দেবতার বন্দনাগীত। আত্মনিবেদিত প্রাণে তন্ময় হইয়া স্তব পাঠে যে লাভ হয়—জাগতিক শক্তি তাহার নিকট অতি তুচ্ছ। স্তবকবচমালায় প্রায় ৫০০ দেব-দেবীর স্তব-সন্নিবেশিত।

মূল্য পাঁচ টাকা।

পৃথিবীর তরুণ-সমাজের হৃদয়জয়ী

সার ওয়াল্টার স্কটের গ্রন্থাবলী

দ্বিতীয় ভাগ
শরৎচন্দ্র মিত্র অনূদিত
আইভ্যানহো, হাইল্যান্ড উইডো, ফেয়ার মেড অফ পার্থ, সার্জনস্ ডটার
মূল্য—২·০০

তৃতীয় ভাগ
সরোজনাথ ঘোষ অনূদিত
দি ব্রাইড অব ল্যামারমুর, লিজেন্ডস অব মনট্রোজ, দি এ্যান্টিকোয়ারি
মূল্য ১॥০ টাকা।

সাহিত্য-জগতের গৌরবপ্রভা—হাস্যরসাবতার—
নাট্যসাহিত্যের প্রবর্তক—রস-সাহিত্যের স্রষ্টা—
রায় দীনবন্ধু মিত্র বাহাদুরের

দীনবন্ধু মিত্রের গ্রন্থাবলী

১ম ভাগে—জীবনী ও কবির সমালোচনা, নীলদর্পণ, জামাই বারিক, বিয়ে পাগলা বুড়ো, নবীন তপস্বিনী, কমলে কামিনী।

২য় ভাগে—সধবার একাদশী, যমালয়ে জীবন্ত মানুষ, পোড়ামহেশ্বর, কুড়ে গরুর ভিন্ন গোঠ, লীলাবতী, সুরধুনী কাব্য, দ্বাদশ কবিতা, পদ্য সংগ্রহ।

প্রতি ভাগ দুই টাকা

কবি বিহারীলাল চক্রবর্তীর গ্রন্থাবলী

রবীন্দ্রনাথ বলেন—"আধুনিক বঙ্গসাহিত্যে প্রেমের সঙ্গীত এরূপ সহস্রধারে উৎসের মত কোথাও প্রোৎসারিত হয় নাই। এমন সুন্দর ভাবের আবেগ, কথার সহিত এমন সুরের মিশ্রণ আর কোথাও পাওয়া যায় না।"

বাঙ্গালার নব গীতিকবিতার এই প্রবর্তক, রবীন্দ্রনাথ, অক্ষয় বড়াল, রাজকৃষ্ণ রায় প্রভৃতির এই কাব্যগুরু ঋষি কবি বিহারীলাল চক্রবর্তীর রচনার সমাবেশ।

কবির জীবনী, সুবিস্তৃত সমালোচনা সহ সুবৃহৎ গ্রন্থ
মূল্য তিন টাকা

বসুমতী প্রাইভেট লিমিটেড, ১৬৬ বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী স্ট্রীট, কলিকাতা—১২

CALCU[TTA UNIVERSITY] CENTRAL LIBRARY

৭১ বর্ষ ঃ ১৪শ সংখ্যা—মূল্য ২৫ পয়সা
বৃহস্পতিবার, ২২শে ভাদ্র, ১৩৭৩ বঙ্গাব্দ

বাংলা ভাষায় দ্বিতীয় সর্বাধিক প্রচারিত
সাপ্তাহিক পত্রিকা

Price : 25 Paise
Thursday, 8th Sept., 1966

গণতন্ত্রের পরীক্ষা

ভারতে গণতন্ত্রের রীতিমতো পরীক্ষা চলছে—এমন ধরণের কথা হামেশাই শোনা যায়। মূলত কথা হচ্ছে, এদেশে গণতন্ত্র দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত হবে কি না। এদেশে দল যেমন একাধিক, মতামতও তাদের ভিন্ন। যারা চরম মতাবলম্বী তারাও বলপূর্বক রাষ্ট্র অধিকার করার পরিবর্তে ভালো ছেলের মতোই আইন সভায় যোগদান করে সম্পূর্ণ অহিংস মতেই রাষ্ট্রের শাসনতন্ত্রের প্রতি আনুগত্য জানিয়ে শাসনযন্ত্রের পরিবর্তন চায়।

আমাদের দেশের মৃত্তিকার মধ্যে এমন একটা গুণ আছে, যা মানুষকে—(সে চরমপন্থী হওয়া সত্ত্বেও)—নৈরাজ্য সৃষ্টির প্রেরণা দেয় না। এমন ব্যাপার আমরা একালেই দেখছি না। মধ্যযুগেও ছিল। আধুনিক যুগেও তা বজায় আছে, এটাই বরং বিস্ময়ের। তবে একথা ঠিক, জনগণের হিত সাধন করাই যাদের মৌল উদ্দেশ্য তারা অবিকৃত পথে যাবে কেন। বরং বিকৃত পথের পথিক তারাই হয় যাদের কাছে স্বীয় স্বার্থসিদ্ধি করাই বড় কথা। তারা কোন দেশে জন্মালো, বা, না জন্মালো সেটা বড় কথা নয়। তা নইলে আমাদের দেশে একদল সম্পূর্ণ অহিংস তত্ত্ব প্রচার করে কিভাবে ব্যবসায়ের গুপ্ত পথে সাধারণ মানুষের রক্ত শোষণ করে! এরা স্বাধীন ভারতে যেন তেন প্রকারেণ মুনাফার পাহাড় তৈরি করাকেই জীবনের মূলমন্ত্র জানে। আমরা আইন সভার দিকে তাকিয়ে থাকলেও এখনো পর্যন্ত এদের দয়ার উপর বেঁচে আছি বললেও খুব বেশি বলা হয় না। সুতরাং গণতন্ত্র, আইন সভার কথা আমরা বড় গলায় জাহির করলেও এই দুটি বস্তুর এখন রীতিমতো পরীক্ষা চলছে। কিছুকাল আগেই লোকসভার মাননীয় স্পীকার সর্দার হুকুম সিং-এর উক্তিও প্রসঙ্গত স্মরণ করা যেতে পারে। তিনি স্পষ্টত একথা বলেছিলেন যে, অর্থের জোরে এদেশে আইনসভার সদস্য হওয়া অসম্ভব নয়। কী মারাত্মক ব্যাপার!

আমাদের পশ্চিমবঙ্গ বিধান সভার দিকে তাকিয়ে মনে হয়, সেখানেও বরাবর যে সংকটের সৃষ্টি হচ্ছে, তা প্রমাণ করে, যেন গণতন্ত্রের ভরাডুবি হতে চলেছে। পশ্চিমবঙ্গ বিধান সভার প্রতি আমাদের ধ্যান-ধারণা ও মর্যাদার বিন্দুমাত্র নড়চড় হয় নি। কিন্তু সেখানে কি ঘটছে? বিগত অধিবেশনে বিরোধী পক্ষের বহু সদস্য কারান্তরালে থাকায় যোগদান করতে পারেন নি। আর যাঁরা যোগদান করতে পেরেছিলেন, তাঁরাও একের পর এক বহিষ্কৃত হয়েছিলেন। একথা ঠিক যে, বিধান সভায় কেউ বাধার সৃষ্টি করলে তার প্রতিবিধান হওয়া উচিত। কিন্তু একথাও সত্য যে, বিরোধীদলশূন্য বিধান সভায় গণতন্ত্রের মর্যাদা লাঞ্ছিত হয়। এসব ক্ষেত্রে সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের নেতার দায়িত্ব সর্বাধিক বলে আমরা মনে করি। কারণ বিরোধী পক্ষের নানা অভিযোগ, নানান প্রশ্ন থাকা স্বাভাবিক। আমাদের যতদূর মনে পড়ে মুখ্যমন্ত্রী শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র সেন ন্যায্য বিরোধিতাকে স্বাগতই জানিয়েছিলেন। তারপর আমরা আশা করেছিলাম, পুনরায় বিধান সভার অধিবেশন অনুষ্ঠিত হলে তা সুস্থ পরিবেশের মধ্যেই চলবে। স্বভাবতই নাগরিকরাও স্বস্তি বোধ করবেন।

গত ২৩শে আগস্ট বিধান সভার অধিবেশন সুরু হলে বিরোধীপক্ষ থেকে অভিযোগ করা হয়েছিল যে, এই অধিবেশনের কথা সুনির্দিষ্ট সময়ে সদস্যদের জানানো হয় নি। এমন কি অধিবেশনে যোগদানের সংবাদ কেউ কেউ ৪।৫ দিন পূর্বে পেয়েছিলেন। এই ব্যাপারে আইনের মারপ্যাঁচ যাই থাকুক না কেন—শেষ পর্যন্ত অধিবেশনের কাজ চলছিল এবং নির্দিষ্ট দিবস পর্যন্ত চলবে—এই আশা সকলেই করেছিলেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যের ব্যাপার এই যে, গত ২রা সেপ্টেম্বর অধিবেশন চলাকালেই তা অনির্দিষ্টকালের জন্য মুলতবী রাখা হয়েছে। অকস্মাৎ মুলতবী রাখার কারণ এই যে, ১লা সেপ্টেম্বর মুখ্যমন্ত্রী তাঁর বক্তব্য বিরোধী পক্ষের বাধা দানের ফলে শেষ করতে পারেন নি। স্বভাবতই পরদিন বিরোধী দলের নেতা যখন অনাস্থা প্রস্তাব স্পীকার মহোদয়ের নির্দেশে সুরু করতে যাবেন ঠিক তখনই তাঁকে সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের বাধার সম্মুখীন হতে হয়। এই বাধা এমন পর্যায়ে ওঠে যে, শেষ পর্যন্ত অধিবেশন অনির্দিষ্টকালের জন্য মুলতবী রাখা ছাড়া গত্যন্তর ছিল না।

এখন প্রশ্ন ওঠে যে, ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের বাধাদানের ফলে যদি বিধান সভা মুলতবী রাখতে হয়—তাহলে কি গণতন্ত্রের কাঠামো ভেঙে পড়ে না? বিধান সভা আবার কবে আহূত হবে জানা নেই এবং আহূত হলে তার কি পরিণতি হবে তা বলা মুস্কিল; কিন্তু এমন ঘটনা যদি বারবার ঘটে তাহলে শাসনযন্ত্রই যে অচল হয়ে যেতে পারে। বিশেষত মন্ত্রিসভার বিরুদ্ধে অনাস্থা প্রস্তাব এখনো রয়েছে এবং কয়েকটি অর্ডিন্যান্স বিল পাশ করিয়ে নেওয়ার নাকি সত্বর প্রয়োজন ছিল।

এতৎ সত্ত্বেও সমাধানের পথ যে নেই, তা ঠিক নয়। সমাধান হতে পারে যদি সব পক্ষ দলের নেতা এগিয়ে আসেন, বিশেষত বর্তমান অবস্থায় ক্ষমতাসীন তথা সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের নেতার দায়িত্ব সর্বাধিক। তাঁর সদিচ্ছার দ্বারাই এখনো বিধান সভা সচল হতে পারে। গণতন্ত্রের অস্তিত্ব যাতে বিপদাপন্ন না হয়, সে ব্যাপারে তাঁর তৎপরতা কামনা করি।

সম্পাদকীয়

আজকের মানুষ

ববি নিজে চেয়েছিলেন ধাপে ধাপে উঠতে, এক লাফে সমতল থেকে শীর্ষে ওঠার উচ্চাকাঙ্ক্ষা তিনি মনে পোষণ করেন নি। বড় জোর ১৯৭২-এর নির্বাচনে একবার চেষ্টা করে দেখার পরিকল্পনা তাঁর ছিল, তার আগে প্রেসিডেন্ট পদের দিকে হাত বাড়াবার কথা তিনি চিন্তাই করতে পারেন নি। কিন্তু আজকের আমেরিকায় ডেমোক্রাট দলের পক্ষে প্রেসিডেন্ট পদের জন্যে ববি কেনেডিই হট্ ফেভারিট।

এ-জনপ্রিয়তা রবার্ট কেনেডি জন্মসূত্রে পেয়েছেন, পরিশ্রমের মাধ্যমে, সেবার মধ্য দিয়ে তাঁকে কিছু অর্জন করতে হয় নি—এ-ধারণাগুলি করলে ভুল করা হবে। সত্যি বটে, ধনীর দুলাল রবার্ট, পূর্বতন জনপ্রিয় প্রেসিডেন্ট জন কেনেডিরই সহোদর রবার্ট—কিন্তু কেবল এ-কারণগুলিতেই আমেরিকার জনগণ ববির পেছনে এসে দাঁড়াতে রাজী ছিলো না। তারা ববির মধ্যে মানুষের যা চিরন্তন কাম্য সেই শান্তির সন্ধান লাভ করেছে, প্রেসিডেন্ট জনসনের নীতি ও কাজ আমেরিকাকে আজ যুদ্ধের মুখোমুখি এনে দাঁড় করিয়েছে; সাধারণ মার্কিনীরা মনে করে ববি কেনেডি ক্ষমতা পেলে আজকের অবস্থা রক্তের ও অর্থের অপব্যয়ের অবসান ঘটবে, Great Society বা মহান সমাজ আদর্শের রূপায়ণ ঘটার সত্যিকারের সম্ভাবনা দেখা দেবে।

আমেরিকান ইনস্টিটিউট অব পাবলিক ওপিনিয়ন সম্প্রতি যে গ্যালপ পোল নিয়েছে তাতে দেখা যাচ্ছে যে, গত ছ' মাসে জনপ্রিয়তার দিক থেকে রবার্ট কেনেডির অভাবনীয় উন্নতি ঘটেছে। ফেব্রুয়ারীর গ্যালপে দেখা গিয়েছিল যে, প্রেসিডেন্ট পদের জন্যে শতকরা ৫২ জন ডেমোক্র্যাট প্রেসিডেন্ট জনসনের মনোনয়ন সমর্থন করেন, আর কেনেডির পক্ষে মাত্র শতকরা ২৭ জন। অর্থাৎ তখন জনসনের কাছে কেনেডি কোন ভীতি সঞ্চার করতে পারেন নি, বরং সেদিন ভাইস প্রেসিডেন্ট হুবার্ট হাম্ফ্রের প্রতিই যেন কেনেডির চ্যালেঞ্জ ছিল। আর আগস্টে? রবার্ট কেনেডির জনপ্রিয়তার ডিগ্রি যেখানে চড়ে গিয়েছে শতকরা ৪০-এ, সেখানে প্রেসিডেন্ট জনসনের ডিগ্রি নেমে গিয়েছে শতকরা ৩৮-এ।

এতো গেল ডেমোক্র্যাটদের ঘরের কথা। যাঁরা ডেমোক্র্যাট নন, নির্দলীয় বলে যাঁরা সাধারণ্যের কাছে পরিচিত তাঁদের মধ্যে গ্যালপ নিয়েও দেখা গিয়েছে যে, প্রেসিডেন্ট জনসনের জনপ্রিয়তা শতকরা ৩০ জন থেকে ২৫%-এতে নেমেছে অথচ ববির সমাদরের মাত্রা চড়েছে ও'দের মধ্যে ২৭% থেকে ৩৮%-এ।

লিন্ডন বেইনস্ জনসন যিনি ১৯৬৪ সালের প্রেসিডেন্সিয়াল নির্বাচনে, ব্যারী গোল্ডওয়াটারকে রেকর্ড ভোটের ব্যবধানে পরাজিত করে জনপ্রিয়তার তুঙ্গে আরোহণ করেছিলেন, মাত্র দু-বছরের মধ্যে তাঁর এত দ্রুত "অবসান" ঘটলো কেমন করে? এ-প্রশ্নের জবাব একটি কথাতেই দেওয়া যায় : জনসনের ব্যর্থতা।

এবং সে-ব্যর্থতা, কোনোরই বিষয়, কোন একটি বিশেষ ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধ নেই, ব্যর্থতা

রবার্ট কেনেডি

ছড়িয়ে গেছে সবখানে। কী আভ্যন্তরীণ ক্ষেত্র, কী বৈদেশিক নীতি—প্রেসিডেন্ট জনসন ব্যর্থতার স্বাক্ষর রেখে যাচ্ছেন সর্বত্র। ভিয়েৎনামের যুদ্ধক্ষেত্রে তিন লক্ষ মার্কিন যুবক পাঠিয়ে তিনি যেমন কোটি কোটি মা-বাবা-বোনের অভিশাপ কুড়োচ্ছেন, কোটি কোটি ডলার সে-বাবদে খরচা করেও দেশের অর্থনীতিতে সংকট ডেকে নিয়ে আসছেন। সেনেটর রবার্ট কেনেডি প্রেসিডেন্ট জনসনের ভিয়েৎনাম নীতির তীব্র সমালোচনা করেছেন এবং অবিলম্বে এই সর্বনাশা নীতি পরিহার না করলে পৃথিবীকে তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধের বিনাশের মধ্যে ঠেলে দেবার জন্যে জনসনকেই দায়ী হতে হবে বলেছেন। ভিয়েৎনাম প্রসঙ্গ, দুস্থরেখা, অর্থনৈতিক সংকট, মুদ্রাস্ফীতি, নিগ্রোদের ভোটাধিকার ইত্যাদি বিষয় সম্পর্কে রবার্ট কেনেডি ইতিমধ্যে বিভিন্ন বক্তৃতা ভাষণে বা রচনা-প্রবন্ধে যে মত প্রকাশ করেছেন তার দ্বারা তিনি সহজেই উদারমতাবলম্বীদের মন জয় করেছেন—১৯৬৮-এর প্রেসিডেন্ট পদের জন্য ডেমোক্র্যাট দল যেন তাঁকেই মনোনয়ন দেন—এ দাবি সোচ্চার হয়েছে।

কিন্তু উদার বরাবর ছিলেন না ববি, বরং তাঁর পূর্ব জীবন অনুদারতা ও গোঁড়ামির ধোঁয়াটে অধ্যায়। কুখ্যাত ম্যাকার্থী কমিটির—যার কাজ ছিল কমিউনিস্ট উৎসাদন—তিনি ছিলেন উপদেষ্টা, শ্রমিক ইউনিয়নগুলির কার্যবিধি নিয়ন্ত্রণ করার জন্যে যে ম্যাককেলান কমিটি নিযুক্ত হয়েছিল। কিন্তু কেনেডি তাঁরও উপদেষ্টা ছিলেন। কিন্তু কিছু ভালো রেকর্ডও তাঁর ছিল যা উদারপন্থীদের তাঁর কাছাকাছি এনেছিল। ইস্পাতের দাম বাড়ানোর জন্যে শিল্পপতিদের প্রচেষ্টা ববি ব্যর্থ করে দিয়েছিলেন, মূল্যস্তর স্থির করে দিয়েছিলেন তিনি জিনিষপত্রের, অকেন্ট স্টক কোম্পানীর করপোরেট ট্যাক্স ফাঁকি দেবার পথও রুদ্ধ করেছিলেন ববি কেনেডি।

রবার্ট হলেন জোসেফ পি কেনেডির ৯টি সন্তানের মধ্যে সপ্তম। হার্ভার্ডে পড়াশুনো শেষ করে ববি ভার্জিনিয়া বিশ্ববিদ্যালয় থেকে আইন পাশ করেন। বড় ভাই জন এফ কেনেডির ১৯৬০ সালে প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে ববির অবদান অনেকখানি, অমন প্রচার-সংগঠক সমগ্র মার্কিন মুলুকেই নাকি দুর্লভ। জন কেনেডি ববিকে এ্যাটর্নি জেনারেলের পদ দিয়েছিলেন—দেশের বিচার বিভাগের ৩০ হাজার কর্মচারীর কর্তা। প্রেসিডেন্টের দপ্তরবিহীন মন্ত্রী হিসেবে রবার্ট কেনেডি সারা পৃথিবী ঘুরেছেন, সাধারণ মানুষের অবস্থা পর্যালোচনা করেছেন। ববির অভিজ্ঞতা অসামান্য।

ববি নিজে স্বপ্ন দেখতেন অন্য কিছুর। অর্থাৎ তাঁর হিসেবে ছিল জন কেনেডির পর ১৯৬৮ সালে লিন্ডন জনসন, তারপর যদি ভাগ্যদেবী সুপ্রসন্ন হন, তবে ১৯৭২ সালে দেখা যাবে। ইতিমধ্যে না হয় পররাষ্ট্র সচিব ডীন রাস্কের জায়গায় কিম্বা রবার্ট ম্যাকনামারার প্রতিরক্ষা সচিবের পদে। কিন্তু প্রেসিডেন্ট কেনেডির আকস্মিক অকাল মৃত্যুতে রবার্টের সমস্ত হিসেবই যেন গুলিয়ে গেল, আর প্রেসিডেন্ট জনসন-এর অনমনীয় মনোভাবের জন্যে তো বটেই।

রবার্ট ফ্রান্সিস কেনেডি যদি মনোনয়ন প্রার্থী হন, তবে ডেমোক্র্যাট দল কি তা প্রত্যাখ্যান করতে পারবে?

দিল্লীতে লক্ষ মানুষের মিছিলের একাংশ

বিক্ষোভ মিছিল

দিল্লীর রাজপথে এমন জনসমুদ্র বহুদিন দেখি নি। লক্ষ মানুষের মিছিল চলেছে পার্লামেন্ট স্ট্রীটের পঞ্চাশ ফুট চওড়া ব্যাপ্তি ডুবিয়ে ভাসিয়ে সশব্দে অথচ শান্তভাবে! সম্মুখে বারজন স্বেচ্ছাসেবী বহন করে নিয়ে যাচ্ছে সুবিস্তৃত প্রচার পতাকা যার ওপর দীর্ঘ হরফে লিখিত আছে ইন্দিরা সরকারের অবশ্যই পদত্যাগ চাই। শোভাযাত্রার দৈর্ঘ্য ছিল তিন মাইল। উদ্দেশ্য ছিল সরকারের অর্থনৈতিক ও বৈদেশিক নীতির প্রতি প্রতিবাদ জ্ঞাপন।

দেশের বিভিন্ন রাজ্য থেকে এই বিক্ষোভ মিছিলে যোগদানের জন্য সমবেত হয়েছিলেন অসংখ্য মানুষ। স্থান গ্রহণ করেছিলেন আক্ষরিক ক্রম-পর্যায়ে। অর্থাৎ অন্ধ্রপ্রদেশ থেকে আরম্ভ যোলটি সিল্কের পতাকা বারজন স্বেচ্ছা-সেবকবাহী প্রচার পতাকার পরে পত পত করে উড়ছিল। অন্ধ্র থেকে স্বেচ্ছাসেবক এসেছিলেন দুই সহস্রের মতো। উত্তর-প্রদেশ থেকে পনের হাজার আর সবাইকে ফেলে সংখ্যায় পুষ্ট পাঞ্জাব স্বেচ্ছাসেবকের সংখ্যা ছিল বিশ হাজার।

সি পি আই (দক্ষিণ-পন্থী) পরি-চালিত এই বিরাট গণ-সমাবেশ পয়লা সেপ্টেম্বরের দ্বিপ্রহরকে রাজধানী দিল্লীর মধ্যগগনে কী যেন এক প্রতিজ্ঞায় উজ্জ্বল ও প্রদীপ্ত করে তুলেছিল। দক্ষিণী কম্যুনিস্ট নেতাদের মাঝে এস এস পি নেতা ডঃ রামমনোহর লোহিয়া এবং মণিরাম বাগড়ীকে উপস্থিত থাকতে দেখা যায়। অনুপস্থিত ছিলেন উগ্র-পন্থী বামাচারী কম্যুনিস্টবৃন্দ এই অদ্ভুত গণ-সমারোহে। তাঁদের ঘরোয়া কোন্দলের বাইরে আকর্ষণ করে আনতে সক্ষম হয় নি এই আয়োজনও। তবে বামপন্থী নেতা শ্রীআনন্দন নাম্বিয়ারকে দর্শনের সৌভাগ্য হয়েছিল দক্ষিণী কমরেডবৃন্দের।

যোজনা ভবনের সামনে অদ্ভুত দৃশ্য। যে তিনজন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী শচীন চৌধুরী, সুব্রহ্মণিয়ম এবং অশোক মেহতার পদ-ত্যাগ দাবি ছিল এই বিক্ষোভ মিছিল-কারিগণের অন্যতম দাবি, সেই ত্রয়ীর অন্যতম শ্রীঅশোক মেহতা এই জনস্রোতের সামনে দিয়ে আকাশবাণীর ভবনের দিকে এগিয়ে যাচ্ছেন। জনতার চীৎকার শোনা যাচ্ছে; পদত্যাগ, অশোক-শচীন-সুব্রহ্মণিয়মের পদত্যাগ চাই

"আখিরী সালাম"

সি পি আই চেয়ারম্যান শ্রী এস এ ডাঙ্গে ঘোষণা করলেন, জনতা এসেছেন সরকারের প্রতি "আখিরী সালাম" অথবা শেষ সতর্কীকরণ জানাতে। তিনি বল-লেন, জনগণের সরকারকে সংসদীয় গণ-তান্ত্রিক নিয়মে দেশ শাসন করতে হবে, একচেটিয়া পুঁজি অথবা
দেখতে চান যদি তবে পদত্যাগ করুন।

শ্রীডাঙ্গে, শ্রীভূপেশ গুপ্ত, শ্রীহীরেন মুখোপাধ্যায় একবাক্যে অভিযোগ করেন যে, সরকার বিদেশের কাছে দেশকে বিক্রি করে দিতে চলেছেন। এই আশঙ্কা দূরীভূত না হলে দেশের সর্বত্র দেশের মর্যাদা রক্ষার জন্য জনগণ প্রতিরোধ সৃষ্টি করবে, অধ্যাপক মুখোপাধ্যায় প্রমুখ এই সতর্কবাণীও উচ্চারণ করেন।

শ্রীডাঙ্গে সুস্পষ্ট ভাষায় বলে দেন, কেন্দ্রীয় ক্যাবিনেটে রদবদল দাবির সঙ্গে এই সতর্কবাণীও রাখা হচ্ছে যে, ক্যাবিনেটে যেন মোরারজী দেশাইকে গ্রহণ করা না হয়। মন্ত্রীত্রয়ীর সঙ্গে শ্রীডাঙ্গে শ্রীপাতিলেরও অপসারণ দাবি করেছেন। অন্যতর একটি সাংঘাতিক অভিযোগ উত্থাপন করে তিনি বলেন, দেশের আই সি এস পদাধিকারী প্রশাসকবৃন্দের প্রায় অর্ধাংশই আজ মার্কিন সি আই-এ-র কুক্ষিগত। সুতরাং তিনি দাবি করেন, আই সি এস শাসন অবিলম্বে বন্ধ করা হোক।

শ্রীডাঙ্গের বক্তব্যে যে কটি মারাত্মক অভিযোগ ও সতর্কবাণী আছে সে সম্পর্কে অবিলম্বে সচেতন হওয়া প্রয়োজন। তিনি বলেছেন, দেশে উৎ-পাদনের উন্নতি হলেও জনগণের দারিদ্র্য কেবলমাত্র চক্রাকারে বেড়ে গেছে। সরকার পৃষ্ঠপোষণা করছেন জয়ন্তী শিপিং কোং-এর শ্রীতেজা এবং শ্রীগঞ্জুর

মত লোকদের। যাঁরা বহু অর্থ আত্মসাতের অভিযোগে অভিযুক্ত। তিনি জানিয়েছেন, রাজ্যওয়াড়ি, 'বন্ধ্' অভিযান একটি চূড়ান্ত পর্যায়ের বিক্ষোভের মহড়া মাত্র। গণ-অসন্তোষ এরপর প্রকাশিত হবে ভারত বন্ধের আয়োজন করে।

সৎ ও সরল ব্যক্তির লাঞ্ছনা

কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী শ্রীশচীন চৌধুরীকে ধন্যবাদ। তিনি কলকাতার একটি নামকরা এটর্নি প্রতিষ্ঠানে শুল্ক বিভাগীয় তল্লাসীতে ক্ষুব্ধ হয়েছিলেন। উক্ত প্রতিষ্ঠান অর, ডিগনাম এন্ড কোং এবং তার অন্যতম ডিরেক্টর শ্রী বি পি রায় এককালে শ্রীচৌধুরীর আইন ব্যবসার সহযোগী ছিলেন। শ্রীচৌধুরী তাঁর সাম্মানিক বাবদ অর্থাদি যথাযথ ঐ প্রতিষ্ঠানের কাছে পেয়ে এসেছেন এবং ডিরেক্টর শ্রী বি পি রায়কে তিনি অতি সৎ ও সরল ব্যক্তি বলেই জানেন। ভারতবর্ষে সৎ ও সরল ব্যক্তিদের ওপর কোনরূপ তল্লাসীজনিত অবমাননাকর অত্যাচার হোক কেন্দ্রীয় মন্ত্রী হিসেবে তা তাঁর পক্ষে সহ্য করা কি উচিত হ'ত। শ্রীচৌধুরীও তাই সরল কর্তব্যজ্ঞানেই খুব উত্তেজিত হয়ে উঠেছিলেন এবং তদন্তকারী অফিসারদের কাছে তদন্তের জন্য কৈফিয়ৎ তলব করেছেন। শুধু তাই নয়, সুবিচারকের মতই তিনি শ্রীরায়ের বাড়ি তল্লাসীর জন্য দুঃখ প্রকাশ করে পত্র দিতেও নির্দেশ দিয়েছেন।

ঘটনার বিবরণ শুনে দেশবাসীর

শ্রীশচীন চৌধুরী

আশান্বিত হওয়ার কথা, কেন না সাধারণ মানুষের ওপর যাতে লাঞ্ছনা করা না হয় সেজন্য অন্তত একজনও কেন্দ্রীয় মন্ত্রী হস্তক্ষেপ করেছেন।

কিন্তু লোকসভায় প্রশ্নটি উত্থাপন করে ও সংশ্লিষ্ট পত্রের প্রামাণ্য অনুলিপি পেশ করে এস এস পি সদস্য শ্রীমধু লিমায়ে যখন সকলকে বিস্মিত করে দেন তখন মাননীয় সদস্যবর্গের মধ্যে যে বিতর্কজাল বিস্তারিত হয়েছে তাতে শ্রীচৌধুরীর এমন কার্য অত্যন্ত গুরুতর বলে অভিযোগ করা হয়েছে। শ্রীচৌধুরী সাধারণের সম্মান রক্ষা করাটা তাঁর কর্তব্য বলে ধারণা করলেও লোকসভা এ যুক্তি দৃঢ়তার সঙ্গে খণ্ডন করেছেন। কেবল বিরোধী পক্ষই নন, কংগ্রেস পক্ষের একাংশও শ্রীচৌধুরীর কর্তব্যবোধকে সঙ্গত বলে মনে করেন নি।

ব্যক্তিবিশেষের, বিশেষত যাঁরা বাড়ি তল্লাসী করেছেন একটি আধাবিচার বিভাগীয় প্রকৃতির সরকারী সংস্থা (শুল্ক ও আয়কর সংক্রান্ত কর্তৃপক্ষ), তাঁর সদসৎ চরিত্রের প্রতি কোন মন্ত্রীর ব্যক্তিগত সহানুভূতি সঙ্গত কিনা অধ্যাপক শ্রীহীরেন মুখোপাধ্যায় সে কথা জানতে চেয়েছেন। ভূতলিঙ্গম সংক্রান্ত ব্যাপারের একটি রুলিং উল্লেখ করে শ্রীভগবৎ ঝা আজাদও বলেছেন, যাঁর বাড়ি তল্লাসী হয় তাঁকে ভালো সার্টিফিকেট দেওয়া কি যথার্থ ন্যায্য কাজ হয়েছে। শ্রীকামাথ বলেছেন, সরকারী পদাধিকার বলে ভিন্ন কোন ব্যক্তির পক্ষে মন্ত্রীদের কথা বলা অনুচিত। একারণ শ্রীচৌধুরীর কার্য অবৈধ এবং তাঁর ক্ষমা প্রার্থনা করা উচিত।

শ্রীলিমায়ের অভিযোগে প্রকাশ, শ্রীচৌধুরীর প্রস্তাবক্রমে কোম্পানী বিষয়ক বিভাগের সম্পাদক শ্রী আর সি দত্ত পত্র লিখেছিলেন। স্পীকারের নির্দেশে সে পত্রের অনুলিপি শ্রীলিমায়ে পেশও করেছেন।

শ্রী কে ডি মালব্য ঐ পত্র কেন লেখা হয়েছিল তার কৈফিয়ৎ শ্রীচৌধুরীর কাছে দাবি করেন এবং শ্রীমতী সুভদ্রা যোশী অভিযোগটিকে গুরুতর বলে অভিহিত করেন।

প্রশ্নটি সংসদের বিবেচনাধীন।

ইন্দিরা সকাশে লী কুয়ান

গত দোসরা সেপ্টেম্বর ভারতের বিশিষ্ট অতিথি সিঙ্গাপুরের প্রধানমন্ত্রী শ্রী লী কুয়ান ইউ প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীর সঙ্গে এক বৈঠকে মিলিত হন এবং দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার সমস্যাদি হৃদ্যতাপূর্ণ আবহাওয়ার মধ্যে এক ঘণ্টাব্যাপী আলোচনা করেন। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার দেশগুলি যাতে অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক চাপ সহ্য করে স্বদেশকে সংগঠিত করার জন্য তৈরি হতে পারে উভয় দেশের প্রধানমন্ত্রীদের আলোচ্য বিষয় প্রধানত সেই প্রশ্নকে কেন্দ্র করেই গড়ে উঠেছিল।

শ্রী লী কুয়ান ইউ-এর আগমনে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার দুটি উন্নতিশীল দেশের মধ্যে সৌহার্দ্যের সম্পর্ক বৃদ্ধি পাবে এবং উভয় দেশের মধ্যে রাজনৈতিক চিন্তার বিনিময় সম্ভব হবে।

দিল্লীতে আদম মালিক

সোয়েকার্নোর ক্র্যাশ প্রোগ্রামে ভারত অথবা মালয়েশিয়া ক্রাশড হয় নি, ইন্দোনেশিয়ার জনসাধারণই বরং সোয়েকার্নোর উত্তেজনাকে জনমতের চাপে দমন করে ইন্দোনেশিয়াকে নতুন ক্ষমতাশালী নেতৃত্বের হাতে সমর্পণ করে স্বস্তির নিশ্বাস ফেলেছেন। এখন ইন্দোনেশিয়া অকারণ শত্রুতার পথ ত্যাগ করে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় নবমৈত্রী স্থাপনার নীতি গ্রহণ করেছে।

ইন্দোনেশিয়ার পররাষ্ট্রমন্ত্রী ডঃ আদম মালিক ভারতবর্ষে পদার্পণ করলেন সেই শুভেচ্ছা সঙ্গে নিয়ে। তাঁর আগমন তাই বিশেষ রাজনৈতিক তাৎপর্যে বিশিষ্ট। ভারত তাঁকে স্বাগত জ্ঞাপন করে ভারতের মৈত্রী ও শান্তির আলিঙ্গনে আবদ্ধ করতে চায় এবং ইন্দোনেশীয় জনগণের প্রতি

ডঃ আদম মালিক

তার মৈত্রীবন্ধনকে পুনরুজ্জীবিত করতে চায়।

ডঃ সোয়েকার্নোর দুঃস্বপ্ন ভঙ্গ হয়েছে, ভারত-ইন্দোনেশীয় সম্পর্কেও যে ফাটল সৃষ্টি হয়েছিল এখন তাও দৃঢ়তর মৈত্রীবন্ধনে গ্রথিত হবে।

ডঃ মালিকের ভারত সফর তারই সূচনা স্বাক্ষর।

উত্তরপ্রদেশ ঃ

দণ্ড এক বছর অথবা এক হাজার মুদ্রা

সম্প্রতি উত্তরপ্রদেশ সরকার সরকারী কর্মচারীদের সাফল্যপূর্ণ ধর্মঘটের কাছে নতি স্বীকার করে যে আঘাত হজম করতে বাধ্য হয়েছিলেন, আগামী ছ মাসের জন্য যাবতীয় অত্যাবশ্যক রাষ্ট্রীয় কর্মস্থলে ধর্মঘট নিষিদ্ধ এবং শাস্তিমূলক বলে অর্ডিন্যান্স জারি করে তারই প্রত্যুত্তর দিতে চেয়েছেন।

ইউ পি সরকারের খতিয়ানে অত্যাবশ্যক কার্যাদি এই সূত্রে সংখ্যা বৃদ্ধি করেছে। অত্যাবশ্যক কর্মস্থল বলতে, পানীয় জল, ডাক বিভাগ, বিদ্যুৎ সরবরাহ, চিকিৎসালয়, শহর পরিমার্জনা, প্রভৃতিকেই আমরা বুঝতাম। ইউ পি সরকার কিন্তু এই তালিকায় যাবতীয় সরকারী কাজকেই অন্তর্ভুক্ত করে ঘোষণা করছেন যে, রাষ্ট্রের কার্যের সঙ্গে যা কিছু জড়িত তাই-ই অত্যাবশ্যকীয় কর্ম। স্থানীয় স্বায়ত্তশাসনাধীন প্রতিষ্ঠান এমন কি বিদ্যালয় ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলিকেও এই অর্ডিন্যান্সের আওতা থেকে বাদ দেওয়া হয় নি।

বেআইনী ধর্মঘটকারীরা ছয় মাস পর্যন্ত কারাদণ্ড কিম্বা পাঁচ টাকা জরিমানার শিকার হবেন। আর যাঁরা ধর্মঘট করার জন্য অপরকে প্ররোচনা দেবেন তাঁরা এক বছর পর্যন্ত কারাদণ্ড এবং এক হাজার টাকা জরিমানা অথবা একত্রে উভয় দণ্ডই ভোগ করবেন। এই অর্ডিন্যান্স বলে পুলিশ অফিসারদের ওপর ঢালাও ক্ষমতা প্রদান করা হয়েছে। তাঁরা যাঁকেই সন্দেহভাজন মনে করবেন, বিনা পরওয়ানায় তাঁকেই লক-আপে নিয়ে যাওয়ার অধিকার ভোগ করবেন।

বলা বাহুল্য এ সমস্তই জনস্বার্থে করা হবে।

'জনস্বার্থ' শব্দটি যেহেতু আপেক্ষিক সেজন্য বিরোধী দলগুলি আয়োজিত 'বন্ধ' 'ধর্মঘট' প্রভৃতিকে তাঁরাও 'জনস্বার্থে' আয়োজিত প্রতিবাদজ্ঞাপক কার্যকলাপ বলেই দাবি করবেন। গণতন্ত্রে সে অধিকার স্বীকৃত। সুতরাং উত্তরপ্রদেশ সরকারের জনস্বার্থের দাবি এই যুক্তি খুব একটা টেকসই বক্তব্য বলে বোধ হয় না। ডি আই আর জনস্বার্থ ও রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তা রক্ষার জন্যই চালু হয়েছিল। সাধারণ জনমত এবং ভারতের বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ কিন্তু তাকে জনস্বার্থ বিরোধী বলেই আওয়াজ তুলেছিলেন। অবশেষে সরকার ডি আই আর প্রত্যাহারে বা কোন কোন ক্ষেত্রে তার প্রয়োগ সঙ্কোচনে বাধ্য হয়েছেন। জনস্বার্থের যুক্তি সেখানে টেকে নি, পাক-চীন শত্রুতার আশঙ্কা থাকা সত্ত্বেও ডি আই আর-এর শাসানি প্রত্যাহার করে নিতে হয়েছে।

উত্তরপ্রদেশ পুলিশের হাতে এই অর্ডিন্যান্স বলে যে ক্ষমতা তুলে দেওয়া হচ্ছে তদ্দ্বারা জনস্বার্থ কতদূর রক্ষিত হবে তাই বা কে বলতে পারে। তাছাড়া দমনমূলক আইনের দ্বারা জন অসন্তোষকে ঠেকিয়ে রাখা যাবে, ধর্মঘট ইত্যাদি বন্ধ হবে (অন্তত ছমাস কালের জন্য। অবশ্য উত্তরপ্রদেশ

শ্রীনায়েক

সরকার প্রয়োজনবোধে এই অর্ডিন্যান্সের মেয়াদ বৃদ্ধিও করতে পারেন) এমন চিন্তা সুস্থ গণতান্ত্রিক সুবুদ্ধিপ্রসূত নয়। উত্তরপ্রদেশ সরকার এ সমস্ত প্রশ্নকে আমল দেন নি। সরকার ক্ষমতাসীন দল ও উপদলে যেখানে আজ যে শাসনতান্ত্রিক বিপর্যয়ের কালো ছায়া দেখা দিয়েছে তাতে সরকারের কার্যকলাপে কিছুটা অস্থিরচিত্ততা স্বাভাবিক। কিন্তু অস্থিরমতি শেষ পর্যন্ত অবিমৃষ্যকারিতার বশবর্তী হলে তার ফলাফল আশঙ্কাজনক হতে পারে একথাও একই সঙ্গে চিন্তা করার আবশ্যকতা আছে।

মহারাষ্ট্র ঃ

জনদরদের জরিমানা

বাজি ধরার সঙ্গে সঙ্গে ডিগবাজি খাওয়ার যে নজির বৃহত্তর বোম্বের কতিপয় আত্মতুষ্ট 'জনদরদী' কংগ্রেসী সদস্য (দুজন ক্ষমতাশালী মন্ত্রিত্বে আসীন নেতা ও স্বয়ং প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি সহ) স্থাপন করলেন গোটা ভারতবর্ষে তা এপর্যন্ত তুলনারহিত। 'ঘেরা ডালো' এবং 'বোম্বে বন্ধ' দিসে মহারাষ্ট্র সরকার নমনীয় নীতি গ্রহণ করে একটি অগ্নিগর্ভ সমস্যাকে শুধু যে কৌশলে নির্বাপিত করেছেন তাই নয়, উপরোক্ত জনদরদীদের জনদরদ লোকসমক্ষে ফাঁস হয়ে যাওয়ায় মুখ্যমন্ত্রী ও রাজ্য স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর ওপর সাধারণ মানুষের আস্থাও দ্বিগুণিত হয়েছে। সুতরাং পদত্যাগী সদস্যরা পদত্যাগের দ্বারা নায়েক মন্ত্রিসভার সঙ্গে বাজি ধরতে গিয়ে জোর চোট খেলেন। ঘরে বাইরে এখন তাঁদের কঠিন সমালোচনার সম্মুখীন হতে হচ্ছে। সমালোচনার দুরন্ত বর্ষণের মুখে এখন আর এঁদের রক্ষা করার জন্য কোনও কর্তাব্যক্তির পক্ষে ছত্রধর হওয়াও সম্ভব নয়। বর্ষণের তোড়ে তাঁর হাতের মূল্যবান ছত্রটিও ছিন্ন ভিন্ন হয়ে গেছে। সাধারণের কাছে আপন অপকর্মে তাঁদের মুখোশ এমনিই খুলে গেছে। গণ-অসন্তোষ এইভাবে জনদরদীদের মুখোস অন্যত্রও খুলে দিয়েছে। উত্তরপ্রদেশে সুচেতা মন্ত্রিসভা ধর্মঘটী সরকারী কর্মীদের সঙ্গে আপোষ করলে কতিপয় জনদরদী সরকারের নরম পন্থায় বিরক্তি প্রকাশ করেছিলেন। পশ্চিমবঙ্গেও ঐ তথাকথিত জনদরদীরা তৎপর আছেন। এঁরা জনদরদের নামাবলী থেকে একথা ঘোষণা করতে গেছলেন যে সরকারের নরম পন্থায় সাধারণের নিরাপত্তা ক্ষুণ্ণ হচ্ছে। বার্ধক্যে ভীমরতি এবং ক্ষমতায় যে মানুষ উন্মাদ হয় তথাকথিত জনদরদীদের কার্যকলাপ তার বাস্তব পরিচয় উপস্থাপিত করেছে।

মহারাষ্ট্রের কয়েকজন এম পি তথাকথিত জনদরদীদের তীব্র সমালোচনা করে একটি বিবৃতি প্রচার করে বোম্বে বন্ধ ও ঘেরা ডালো দিবসে মহারাষ্ট্র সরকারের গৃহীত নীতির প্রতি অকুণ্ঠ সমর্থন জ্ঞাপন করেন। সরকারী নীতির সমর্থনে তাঁদের বক্তব্য ঃ মহীশূর মহারাষ্ট্র সীমান্ত প্রশ্নে ও দ্রব্যমূল্যবৃদ্ধির পরিপ্রেক্ষিতে আহূত যথাক্রমে ঘেরা ডালো এবং বোম্বে বন্ধ দিবসের প্রতিবাদ ছিল সর্বাত্মক এবং শান্তিপূর্ণ। এমতাবস্থায় সরকার কোনরকম পিটুনী নীতি প্রয়োগ করলে তা চাপা আগুনকে কেবলমাত্র উস্কেই দিত। বলা বাহুল্য

তাতে ক্ষতি হত সর্বাধিক। তাঁরা এই প্রসঙ্গে একটি গুরুতর শাসনতান্ত্রিক প্রশ্নও উত্থাপন করেছেন ঃ বলছেন, জাতীয় নেতৃত্বের এখন বিবেচনা করে দেখা উচিত যে, প্রদেশ কংগ্রেসের মাতব্বরি অঙ্গুলী নির্দেশের দ্বারাই কি ক্যাবিনেট মন্ত্রীরা তাঁদের দৈনন্দিন কার্যাদি পরিচালনা করবেন। প্রসঙ্গত স্মরণযোগ্য, মন্ত্রিসভার বাইরে কংগ্রেসী হস্তক্ষেপে এবং স্বয়ং বি পি সি সির সভাপতির সঙ্গে যোগসাজসে মহারাষ্ট্রের দুজন মন্ত্রী পদত্যাগ পেশ করেন। উপ-শিক্ষামন্ত্রী ডঃ কৈলাসও পদত্যাগ করবেন বলে জানিয়েছিলেন, তবে করেন নি এবং না-করে বিশেষ সহকর্মিগণের বিরাগভাজন হতে হয়েছে তাঁকে।

পদত্যাগীদের নাটের গুরু বলে প্রকাশ কেন্দ্রীয় রেলমন্ত্রী শ্রী এস কে পাতিলও এখন কম বিড়ম্বনায় পড়েন নি। তিনি বলতে বাধ্য হয়েছেন যে, তাঁর পক্ষে পদত্যাগের ব্যাপারে কোনরূপ হস্তক্ষেপ করা সম্ভব ছিল না, কারণ, "তাঁরা (পদত্যাগীরা) যেটা উপযুক্ত পন্থা হিসেবে গ্রহণ করেছিলেন তার থেকে তাঁদের প্রতিনিবৃত্ত করা আমার পক্ষে সম্ভব ছিল না।" তা না থাক, তবে শ্রীপাতিল মহারাষ্ট্র সরকারের নমনীয় নীতিতে প্রচণ্ডভাবে ফুঁসে উঠেছিলেন এবং এখনও তাঁর উষ্মার অবসান হয় নি।

যাই হোক, তথাকথিত 'জনদরদী'দের শক্তি প্রয়োগের নেশা কী বিচিত্র পথে অগ্রসর হচ্ছে মহারাষ্ট্রের সাম্প্রতিক ঘটনা তারই ভয়াবহ মুখোস ঢাকা অবয়বকে চাক্ষুষ করে তুলেছে। গণ-তন্ত্রকে হত্যা করা হচ্ছে বলে আজ চতুর্দিকে যে সরব চীৎকার উঠেছে তা সাধারণত বিরোধী কার্যকলাপ [illegible] করেই করা হয়ে থাকে। সম্প্রতি মহা-রাষ্ট্রে যে নেতৃস্থানীয় কংগ্রেসীদের স্বরূপ ধরা পড়ল, তাঁদের গণতন্ত্র প্রীতি যে কোনপথে প্রবহমাণ তাও এবার প্রকৃত গণতন্ত্রীদের লক্ষ্য করার বিষয় হওয়া উচিত।

শ্রীপাতিল

মহারাষ্ট্রের ঘটনাবলী সব কিছুর ওপর একটি সত্যকে প্রমাণিত করেছে, তা হ'ল, সরকার যদি জনদাবিকে তার অসন্তোষ প্রকাশের পথে গায়ের জোরে বাধা না দেন তবে অবস্থাকে আয়ত্তের বাইরে চালান দিয়ে দেশে রক্তগঙ্গা ডেকে আনার দায়িত্বও ঘাড়ে নিতে হয় না। নায়েক মন্ত্রিসভা সেই জঘন্য দায়িত্ব গ্রহণ না করে প্রকৃত দায়িত্বশীলের মত শাসনতান্ত্রিক দূরদর্শিতার পরিচয় দিয়ে আজ প্রভূত প্রশংসার পাত্র হয়েছেন। বিরোধিগণও হাঙ্গামা নিবারণে সরকারী শুভেচ্ছার প্রশংসা করতে বাধ্য হয়েছেন।

আশা করা যাক, মহারাষ্ট্রের ঘটনা অন্যত্র ক্ষমতান্ধ নেতৃত্বকে সচেতন করবে। কেন না উত্তেজিত পদত্যাগীদের দুরবস্থায় ক্ষমতান্ধের দৃষ্টি স্বচ্ছ হওয়া দরকার। একমাত্র শ্রীশান্তিলাল সাহকে নিয়ে এখনও জটিলতার অবসান না হলেও অন্যান্যরা গুটি গুটি ফিরে এসেছেন বর্তমান রাজ্য সরকারের সঙ্গে "ভুল বুঝাপড়া" মিটিয়ে ফেলতে। এ'রা পদত্যাগ প্রত্যাহার করেছেন এবং সমস্ত আবহাওয়া উল্টো পথে বইতে শুরু করেছে। এখন রাজ্য জুড়ে "চাপা দে, চাপা দে" রব।

দু তরফই সাফাই গাইছেন এই বলে যে, পুলিশী তাণ্ডব সৃষ্টি করা কারও উদ্দেশ্য ছিল না। স্বয়ং মুখ্যমন্ত্রী শ্রীনায়েক উল্টো গাওনা গেয়ে বলেছেন, ব্যাপারটা আসলে কিস্যু না। একটা ভুল বোঝা-পড়াই গণ্ডগোলের মূল। পদত্যাগীরা কোন ক্ষমতার লড়াই-ও লড়তে চান নি। এমন কি এর মধ্যে রাজ-নীতিও নেই ("There is nothing political in it and no bargaining")।

বি পি সি সি সভাপতি শ্রীখেরও এখন বন্ধুত্বে গদগদ। বলেছেন, মুখ্য-মন্ত্রীর সঙ্গে আমাদের খুব খোলাখুলি আলোচনা হয়েছে। ভুল বোঝাবুঝির অবসান হল এখন। তিনি মুখ্যমন্ত্রীকে আন্তরিকভাবে ধন্যবাদও জানিয়েছেন।

যাক আমরাও স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে বাঁচলাম এবং বুঝলাম সত্যিই বড় বড় মানুষের পক্ষেই একমাত্র বড় বড় 'বাত' সম্ভব। এ'দের ভুল বোঝাবুঝি চতুর্দিক নাস্তানাবুদ করে ছাড়ে। ভি-আই-পিদের সবই ভীষণ বিভীষণ ব্যাপার।

কিন্তু শ্রী এস কে পাতিল যে কি বলবেন! উনিই তো রাজ্য সরকারের সমালোচনাটা বড্ড বেশিমাত্রায় করে ফেলে-ছিলেন এবং খুবই প্রকাশ্যে। সুতরাং পদত্যাগীদের মত সহজে তাঁর পক্ষে 'সা নি ধা পা মা গা রে সা' গাওনা সম্ভব হবে কি? হাজার হোক, তিনি একজন দায়িত্বশীল সর্বভারতীয় 'ফীগার'।

বিহার ঃ

বন্যার গ্রাসে লক্ষ লক্ষ মানুষ এবং জমি

আজও বন্যার করাল গ্রাসে লক্ষ মানুষ এবং লক্ষ লক্ষ একর জমির ফসল নষ্ট হয়। বহুতর বাঁধ পরিকল্পনা দিয়েও আমরা আগ্রাসী জলস্রোতকে বাঁধতে পারি নি।

বিহারের বন্যা পরিস্থিতি বর্তমানে ভয়াবহ রূপ ধারণ করেছে। ক্ষতিগ্রস্ত ছত্রিশ লক্ষ মানুষ ও প্লাবিত হয়েছে পনের লক্ষ একর ফসলী জমি।

প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী গান্ধী বন্যার্তদের সাহায্য হিসাবে তাঁর ত্রাণ তহবিল থেকে পঞ্চাশ হাজার টাকা মঞ্জুর করেছেন। কেন্দ্রীয় সেচমন্ত্রী সাহায্যের আশ্বাস দিয়েছেন এবং আকাশপথে বন্যাবিধ্বস্ত অঞ্চলসমূহ পরিদর্শন করেছেন। তিনি উত্তর বিহারের বন্যা প্রতিরোধ বাঁধগুলির রক্ষণাবেক্ষণের ওপর গুরুত্ব আরোপ করেন।

আসাম ঃ

বন্যা প্রতিরোধ

আসামকে বন্যার কবল থেকে রক্ষা করার জন্য কেন্দ্রীয় সেচমন্ত্রী শ্রীফকরুদ্দীন আলি আমেদ যে সচেতন হয়েছেন তা লোকসভায় তাঁর সাম্প্রতিক বিবৃতিতে প্রকাশিত হয়েছে। তিনি জানিয়েছেন, ইতিমধ্যেই ব্রহ্মপুত্রের ওপর বাঁধ নির্মাণের জন্য দুটি বিশেষজ্ঞ দল গঠন করা হয়েছে। বিশেষজ্ঞ দলের প্রতিবেদন হস্তগত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই সরকার কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন এবং বিষয়টি চতুর্থ যোজনার অন্তর্ভুক্ত করা হবে।

শুভস্য শীঘ্রম। তিন তিনটি পরি-কল্পনার পরও বাংলা বিহার আসাম একবুক জলে ভাসছে, লক্ষ লক্ষ একর জমি ফসল পচিয়ে কপালে করাঘাত করছে এ দৃশ্য আর সহ্য হয় না, এ ক্ষতি দেশকে আরও কতকাল বহন করে যেতে হবে কে জানে। প্রকৃতি-নির্ভর ভারত-বর্ষ প্রাকৃতিক রোষের হাত থেকে যত শীঘ্র মুক্ত হয় ততই মঙ্গল।

আন্তর্জাতিক

রাষ্ট্রপতি চার্লস দ্য গল উনিশ দিন ধরে সাতাশ হাজার মাইল বিশ্ব-পরিক্রমায় বেরিয়েছেন। এই সফরে তিনি আফ্রিকা, এশিয়া ও দক্ষিণ আমেরিকা এই তিন মহাদেশের সাতটি দেশে যাবেন। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে ফ্রান্সের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠা করা, এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের যুদ্ধবাজী নীতির পাল্টা ফ্রান্সের শান্তি ও নিরপেক্ষতার নীতি প্রচারের জন্যই তাঁর এই বিশ্ব সফর।

কিন্তু দ্য গলের যাত্রা বোধ হয় শুভ হয় নি। তা না হলে প্রথমেই তিনি বিরূপ সম্বর্ধনায় সম্মুখীন হবেন কেন? ২৫শে আগস্ট তিনি দুদিনের জন্য ফরাসী সোমালিল্যান্ড সফরের উদ্দেশ্যে জিবুতিতে এসে উপস্থিত হয়েছেন। আফ্রিকার উত্তর সীমান্তে লোহিত সাগরের তীরে ছোট্ট এই দেশ। ১৯৫৮ সালে গণভোটে দেশের ভোটদাতাদের তিন-চতুর্থাংশ ফ্রান্সের শাসনাধীন থাকার ইচ্ছা প্রকাশ করেছে। সুতরাং দ্য গল বেশ নিশ্চিন্তেই জিবুতি বিমানবন্দরে অবতরণ করেছেন। কিন্তু যারা তাঁকে সাদর সম্বর্ধনা জানাতে এসেছে, তাদের পেছনেই উপস্থিত কয়েক হাজার সোমালী দ্য গলের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ প্রদর্শনের জন্য। তারা ফরাসী শাসনের অবসান ও পূর্ণ স্বাধীনতার দাবি নিয়ে উপস্থিত হয়েছে। পুলিশ বিক্ষোভকারীদের সরিয়ে দেবার চেষ্টা করলে রীতিমত সংঘর্ষ সুরু হয়। এর পর শহরের সর্বত্র বিক্ষোভ ছড়িয়ে পড়ে, এবং বিক্ষোভকারীরা দলে দলে কালো পতাকা নিয়ে দ্য গল ও ফরাসী শাসনের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ প্রদর্শন করে। অবস্থা এমন হয়ে দাঁড়াল যে দ্বিতীয় দিন দ্য গলের নির্দিষ্ট বক্তৃতার কর্মসূচী বাতিল করতে হয়।

তবে দ্য গল খুশি হয়েছেন কম্বোডিয়া সফর করে। আদ্দিস আবাবা হয়ে তিনি কম্বোডিয়ার রাজধানী নম্‌পেন এসে পৌঁছন ১লা সেপ্টেম্বর। এখানে তিনি চার দিন ছিলেন।

নম্‌পেনের অলিম্পিক স্টেডিয়ামে ষাট হাজার মানুষের সম্মুখে বক্তৃতা দেবার সময় দ্য গল ভিয়েতনাম থেকে অবিলম্বে মার্কিন সৈন্য অপসারণের দাবি জানান। আলাপ-আলোচনার দ্বারা ভিয়েতনাম সমস্যার সমাধান করতে হবে। কিন্তু মীমাংসার পূর্বেই মার্কিন সৈন্যের অপসারণ চাই। দ্য গল বলেন, এতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মর্যাদা এতটুকু ক্ষুণ্ণ হবে না। সমগ্র ইন্দো-চীন এলাকার নিরপেক্ষতার দাবিও তিনি জানান।

ফরাসী সোমালিল্যাণ্ড সফরে দ্য গল

পরের দিন কম্বোডিয়ার রাষ্ট্রপ্রধান প্রিন্স নরোদম সিহানুক ও দ্য গলের নামে যে যুক্ত ইস্তাহার প্রকাশিত হয়, তাতে সোজাসুজি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নামোল্লেখ করা হয় নি, তার পরিবর্তে বলা হয়েছে, নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে ভিয়েতনাম থেকে সকল বিদেশী সৈন্যের অপসারণ চাই। তাছাড়া এই ইস্তাহারে উভয় রাষ্ট্রনেতা দাবি করেছেন, সমগ্র ইন্দো-চীন এলাকাকে নিরপেক্ষ বলে ঘোষণা করতে হবে, এবং আন্তর্জাতিক চুক্তির দ্বারা এই এলাকার রাষ্ট্রগুলির নিরপেক্ষতা রক্ষার ব্যবস্থা করতে হবে।

রাষ্ট্রসংঘ ঃ

রাষ্ট্রসংঘের সেক্রেটারী-জেনারেল ইউ থান্ট পরিষ্কারভাবে জানিয়ে দিয়েছেন, ৩রা নভেম্বর তাঁর বর্তমান কার্যকাল শেষ হবার পর তিনি আর দ্বিতীয়বার এই পদের জন্য দাঁড়াবেন না। গত ১লা সেপ্টেম্বর রাষ্ট্রসংঘের ১১৭টি প্রতিনিধিদলের কাছে প্রেরিত পত্রে তিনি তাঁর এই সিদ্ধান্তের কথা প্রকাশ করেছেন।

ইউ থান্টের এই সিদ্ধান্ত অপ্রত্যাশিত ছিল না। অনেকদিন ধরেই শোনা যাচ্ছিল, তিনি দ্বিতীয়বার সেক্রেটারী-জেনারেলের দায়িত্বভার গ্রহণ করবেন না। তাঁর বিভিন্ন উক্তি থেকেও এই আশঙ্কার আভাস পাওয়া গিয়েছিল।

কেন তিনি এই পদে থাকতে চাইছেন না, তাও তিনি অত্যন্ত স্পষ্টভাবে প্রকাশ করেছেন। ভিয়েতনাম সমস্যা সমাধানে রাষ্ট্রসংঘের অক্ষমতাই তাঁর হতাশা ও পদত্যাগের প্রধান কারণ। ঘটনার গতি বড় রকম যুদ্ধের দিকে আমাদের ঠেলে নিয়ে যাচ্ছে, অথচ তা প্রতিরোধ করার জন্য কিছুই করা সম্ভব হচ্ছে না, ইউ থান্টের এই কথা মনে হয়েছে। তাঁর নিশ্চিত বিশ্বাস, ১৯৫৪ সালের জেনেভা সম্মেলন ও রাষ্ট্রসংঘ সনদের ধারা অনুসারেই কেবলমাত্র ভিয়েতনাম সমস্যার সমাধান সম্ভব, যুদ্ধের দ্বারা এই প্রশ্নের মীমাংসা অসম্ভব। কিন্তু সংশ্লিষ্ট শক্তিসমূহ এ ব্যাপারে রাজী নয়। রাষ্ট্রসংঘের পক্ষ থেকে ভিয়েতনাম সমস্যার সমাধানের জন্য তিনি উদ্যোগ গ্রহণ করতে চেয়েছিলেন, কিন্তু এই কাজে তিনি প্রধান সদস্য-রাষ্ট্রগুলির কাছ থেকে কোন সহযোগিতা পান নি। শান্তিভঙ্গের আশঙ্কা রোধ ও শান্তি প্রতিষ্ঠা রাষ্ট্রসংঘের অন্যতম প্রধান কাজ। কিন্তু এই কাজ যদি করা না যায়, তবে শুধু শুধু সেক্রেটারী-জেনারেলের পদে থেকে লাভ কি?

ইউ থান্টের অভিযোগ, বৃহৎ রাষ্ট্রগুলি রাষ্ট্রসংঘকে ডিঙিয়ে কাজ করছে। ডোমিনিকান রিপাবলিকে মার্কিন সৈন্য প্রেরণের ব্যাপারে তিনি তীব্র আপত্তি জানিয়েছিলেন। অপর রাষ্ট্রের আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে এইরূপ হস্তক্ষেপ রাষ্ট্রসংঘের নীতির বিরোধী। অধিকাংশ আন্তর্জাতিক বিরোধ রাষ্ট্রসংঘের পরিবর্তে অন্যত্র ভিন্নভাবে মীমাংসার চেষ্টা হয়।

শান্তিপূর্ণ পন্থার পরিবর্তে বলপ্রয়োগের ওপর অনেক রাষ্ট্র নির্ভর করছে, এই পথে আন্তর্জাতিক রাজনীতি পরিচালনার চেষ্টা চলছে, ইউ থান্ট স্পষ্টভাবেই এই অভিযোগ

করেছেন। তাঁর ভাষায়, আমরা যে শান্তির পথে চলেছি, তা প্রকৃত শান্তি নয়, শান্তির মরীচিকা মাত্র।

রাষ্ট্রসঙ্ঘে সকলের যোগদান সম্ভব হয় নি, এবং এই সংগঠন আজও বিশ্বজনীন রূপ পায় নি, এই বিষয়েও ইউ থান্ট ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন।

অনুন্নত রাষ্ট্রগুলির বৈষয়িক উন্নতির জন্য রাষ্ট্রসঙ্ঘ তার ভূমিকা যথাযোগ্যভাবে পালন করতে পারছে না, এই ব্যর্থতার কথাও তিনি স্বীকার করেছেন।

ইউ থান্টের সমালোচনার মূল লক্ষ্য নিশ্চিতভাবে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র। কোন রাষ্ট্রের নাম না করলেও ভিয়েতনাম কিংবা বলপ্রয়োগের ইঙ্গিত যে তিনি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের দিকে তাকিয়েই করেছেন, এ বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ নেই। তবে কেবল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বা তার সহযোগী পশ্চিমী রাষ্ট্রগুলিই নয়, ইউ থান্টের বিক্ষোভ সোভিয়েট ইউনিয়নের বিরুদ্ধেও রয়েছে। বিভিন্ন প্রচেষ্টার ক্ষেত্রে তিনি সোভিয়েট ইউনিয়নের কাছ থেকেই প্রয় জনীয় সমর্থন পান নি। এতেই তাঁর মন আরও ভেঙে গেছে।

ইউ থান্টের বিদায় গ্রহণের সিদ্ধান্ত রাষ্ট্রসঙ্ঘে বড় রকমের সংকটের সৃষ্টি করেছে। প্রথমত, ইউ থান্টের উত্তরাধিকারী নির্বাচনের প্রশ্নে বৃহৎ রাষ্ট্রগুলির মধ্যে মতৈক্য হওয়া খুব শক্ত। রাষ্ট্রসঙ্ঘ সনদের ১৭ ধারায় বলা আছে, নিরাপত্তা পরিষদের সুপারিশ অনুসারে সাধারণ পরিষদ সেক্রেটারী-জেনারেলকে নিয়োগ করবে। ইউ থান্টের নামে সকলেই একমত— এ ব্যাপারে নিরাপত্তা পরিষদের প্রধান চার সদস্য মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, বৃটেন, ফ্রান্স ও সোভিয়েট ইউনিয়ন, কারও মধ্যে কোন মতভেদ নেই। কিন্তু ইউ থান্ট রাজী না হলে এদের সকলের পক্ষে গ্রহণযোগ্য অপর কোন ব্যক্তিকে খুঁজে পাওয়া সহজ হবে না। তাছাড়া আবার হয়তো সোভিয়েট ইউনিয়ন তার পুরোনো 'ত্রয়ী' বা 'ট্রায়মভারেট' পরিকল্পনা গ্রহণের জন্য চাপ দেবে। সোভিয়েট ইউনিয়নের 'ত্রয়ী' প্রস্তাব হ'ল, বর্তমান একজন সেক্রেটারী-জেনারেলের পরিবর্তে তিনজন সেক্রেটারী-জেনারেলের ব্যবস্থা করা হোক— পশ্চিমী গোষ্ঠী, সোভিয়েট গোষ্ঠী ও নিরপেক্ষ জোট, এই তিন পক্ষের প্রতিনিধিরূপে তিনজনকে নিয়োগ করতে হবে। হ্যামারশীল্ডের মৃত্যুর পর সোভিয়েট ইউনিয়ন এই প্রস্তাব গ্রহণের জন্য বিশেষ পীড়াপীড়ি করে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এর তীব্র বিরোধিতা করে। শেষ পর্যন্ত এই প্রস্তাব পরিত্যক্ত হয়, এবং সকলে একমত হয়ে ইউ থান্টকে নির্বাচন করে। এবারও তাই সমস্যা সমাধানের জন্য ইউ থান্টকে রাখার চেষ্টা চলছে। রাষ্ট্রসঙ্ঘে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের স্থায়ী প্রতিনিধি আর্থার গোল্ডবার্গ ইতিমধ্যেই ঘোষণা করেছেন, ইউ থান্ট যাতে আরও একটি বারের জন্য সেক্রেটারী-জেনারেল থাকতে রাজী হন, তার জন্য মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সর্বতোভাবে চেষ্টা করবে। আরও অনেকের সমর্থন পাবেন গোল্ডবার্গ এই প্রচেষ্টায়। সোভিয়েট ইউনিয়নও নিশ্চয়ই ইউ থান্টকে অনুরোধ করবে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত ইউ থান্ট রাজী হবেন কিনা বলা শক্ত।

বিদায় গ্রহণের কারণ বর্ণনা করতে গিয়ে ইউ থান্ট যেসব কথা বলেছেন, তাতে রাষ্ট্রসঙ্ঘের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে অনেকেই চিন্তিত বোধ করবেন। যুদ্ধের আশঙ্কা রোধে এই আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানের ব্যর্থতার যে রূপ প্রতিষ্ঠানের মুখ্য প্রশাসক তুলে ধরেছেন, তাতে 'জাতিসঙ্ঘের' (লীগ অব নেশনসের) পরিণতির কথাই স্মরণ করিয়ে দেয়। আবিসিনিয়ায় ইতালীর আক্রমণ প্রতিরোধে জাতিসঙ্ঘের ব্যর্থতার ফলেই এই প্রতিষ্ঠান ধ্বংস হয়েছিল, ভিয়েতনামে যুদ্ধ প্রতিরোধে ব্যর্থ রাষ্ট্রসঙ্ঘের অবস্থাও একই রকম হবে না ত'? বৃহৎ রাষ্ট্রগুলি সম্পূর্ণ তাদের নিজেদের স্বার্থে কাজ করছে, রাষ্ট্রসঙ্ঘের কোন নিয়মকানুনের ধার ধারছে না, এ অবস্থাই যদি চলতে থাকে, তবে একে দীর্ঘকাল টিকিয়ে রাখা যাবে না।

ইউ থান্ট

পাকিস্তান ঃ

সংযুক্ত আরব প্রজাতন্ত্রের রাষ্ট্রপতি আবদুল গামেল নাসেরের বিরুদ্ধে করাচীর ছাত্ররা বিক্ষোভ প্রদর্শন করেছে। ইসলামিক স্টুডেন্টস্ ফেডারেশনের উদ্যোগে আয়োজিত এই বিক্ষোভে নাসেরের বিরুদ্ধে 'ব্লাডি ডিক্টেটার', 'এ যুগের নিকৃষ্ট অপরাধী', 'ইসলামের পয়লা নম্বরের শত্রু' প্রভৃতি ধ্বনি দেয়া হয়।

নাসেরকে হত্যার অপরাধে অভিযুক্ত 'মুসলিম ব্রাদারহুডে'র তিনজনকে কায়রোর বিচারের পর ফাঁসি দেবার সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে এই বিক্ষোভ। করাচীর সংবাদপত্রগুলিতে বড় বড় করে এই ফাঁসির খবর প্রকাশ করা হয়।

যাদের ফাঁসি দেয়া হয়েছে, তারা আরব প্রজাতন্ত্রের অধিবাসী, রাষ্ট্রপ্রধানকে হত্যার অভিযোগে তাদের বিচার হয়েছে—এ ব্যাপারে পাকিস্তানের মাথা ব্যথা কেন? কারণ, এই 'মুসলিম ব্রাদারহুড' সংগঠনের পেছনে পাকিস্তানেরও অনেকে আছে। নাসের হত্যার চক্রান্ত যখন প্রকাশ পায় তখনই বলা হয়েছিল, কয়েকটি রাষ্ট্র এই চক্রান্তের সঙ্গে যুক্ত। পাকিস্তানও এ ব্যাপারে সন্দেহমুক্ত নয়। প্রতিক্রিয়াশীল ও সাম্প্রদায়িকতাবাদীরা প্রগতিশীল আরব জাতীয়তাবাদের বিরোধী। পাকিস্তানেও এই প্রতিক্রিয়াশীলদের সংখ্যা কম নয়। এদের প্রধান শত্রু নিঃসন্দেহে নাসের।

জাম্বিয়া ঃ

জাম্বিয়ার রাষ্ট্রপতি কেনেথ কাউন্ডা ঘোষণা করেছেন, কমনওয়েলথ প্রধান মন্ত্রী সম্মেলনে যোগ দেবার জন্য আগামী সপ্তাহে তিনি লন্ডন যাবেন.

কেনেথ কাউন্ডা

নির্মল বার সাবানে কাচলে
আপনার কাপড়-জামা হবে
ধবধবে ফরসা
হালকা সুগন্ধে ভরপুর
Nirmal
নির্মল
BAR SOAP
নির্মল বার সাবানে কাচা কাপড়-জামা দেখতে ঝকঝকে পরিষ্কার হয়, আর অঙ্গ ধোয়ার সুগন্ধে ভরে উঠে।
নির্মল
পূর্ব ভারতে এই বার সাবানই
কাটতিতে সবার ওপরে
কুসুম প্রোডাক্টস লিমিটেড, কলিকাতা-১

না। অন্য একজন মন্ত্রী এই সম্মেলনে জাম্বিয়ার প্রতিনিধিত্ব করবেন।

দক্ষিণ রোডেশিয়ার ব্যাপারে বৃটিশ সরকারের দুর্বল ও দ্বিধাগ্রস্ত নীতির প্রতিবাদেই কাউন্ডা এই সিদ্ধান্ত ঘোষণা করেছেন। এর পরেও যদি হ্যারল্ড উইলসনের সরকার আয়ান স্মিথদের সম্পর্কে নীতি পরিবর্তন না করেন, এবং বলপ্রয়োগের দ্বারা অবৈধ শ্বেতাঙ্গ শাসন উচ্ছেদে অগ্রণী না হন, তা হলে জাম্বিয়া হয়তো পুরোপুরিভাবেই কমনওয়েলথ ত্যাগ করবে।

কেনেথ কাউন্ডার দৃষ্টান্ত অনুসরণ করে আফ্রিকার আর কোন রাষ্ট্রপতি বা প্রধান মন্ত্রী লন্ডন সম্মেলন বর্জন করেন কিনা, তা লক্ষ্য করার বিষয়। প্রধান মন্ত্রী সম্মেলনে রোডেশিয়ার ব্যাপারে বৃটেনের ওপর প্রচণ্ড চাপ পড়বে, এ বিষয়ে সন্দেহ নেই।

বৃটেন কি করে দেখা যাক।

তবে জাম্বিয়া যদি শেষ পর্যন্ত সত্যি সত্যি কমনওয়েলথ ত্যাগ করে, তবে এখানকার সত্তর হাজার য়ুরোপীয় অধিবাসীর কি হবে? পুলিশ, সৈন্যবাহিনী, প্রশাসন, বিচার বিভাগ, শিল্প, ব্যবসা—বিভিন্ন ক্ষেত্রে এরা রয়েছে।

সিংগাপুর ঃ

সিংগাপুরের প্রধান মন্ত্রী লি কুয়ান ইউ সরকারীভাবে ভারত সফরে রওনা হবার পূর্বে একটি গুরুত্বপূর্ণ বিবৃতি দিয়েছেন।

লি কুয়ান ইউ-এর বক্তব্য, 'এশীয় মনরো নীতি'র ন্যায় একটা নীতি বের করতে হবে। অর্থাৎ, এশিয়ার ব্যাপার এশীয় রাষ্ট্ররা দেখবে—অপর কেউ এখানে প্রভাব বিস্তার করতে পারবে না, এবং এশিয়ার কোন রাষ্ট্র অপর অঞ্চলের ব্যাপারে নাক গলাতে যাবে না। অবশ্য শান্তি ও নিরাপত্তার ব্যাপারেই এই নীতি গ্রহণের কথা বলেছেন সিংগাপুরের প্রধান মন্ত্রী।

দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার জটিল পরিস্থিতির বিষয় নিয়ে লি কুয়ান ইউ ভেবেছেন, এবং ভেবেচিন্তেই তিনি এই রকমের একটা প্রস্তাব করেছেন। আঞ্চলিক নিরাপত্তার ব্যাপারে একটা সুস্পষ্ট পরিকল্পনা তিনি প্রস্তুত করেছেন কিনা, এবং এই পরিকল্পনা নিয়ে এশিয়ার অন্যান্য নেতাদের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা সুরু করেছেন কিনা, তা পরিষ্কার করে জানা যায় নি। দিল্লীতে ভারতের প্রধান মন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীর সঙ্গে তাঁর যে আলোচনা হয়েছে, তার মধ্যে এই বিষয় ছিল কিনা তাও প্রকাশ পায় নি।

আঞ্চলিক নিরাপত্তার ব্যাপারে সিংগাপুরের চিন্তিত হবার কারণ আছে। বর্তমানে বৃটিশ সৈন্য রয়েছে সিংগাপুর রক্ষার জন্য। কিন্তু চিরকাল বৃটিশ সৈন্য থাকবে না। সিংগাপুরের স্বাধীন সত্তার সঙ্গে আজ এই বিদেশী সৈন্যের অবস্থানের সংগতি রক্ষা করাও যায় না। তাই আজ না হোক কাল এদের যেতেই হবে। কিন্তু তখন ক্ষুদ্র সিংগাপুরকে রক্ষা করবে কে? এই কারণেই এই অঞ্চলের সকল রাষ্ট্রের কাছে গ্রহণযোগ্য একটা নিরাপত্তা পরিকল্পনার সন্ধান করছেন সিংগাপুরের প্রধান মন্ত্রী।

এশিয়ার ব্যাপারে এশিয়ার বাইরের কোন রাষ্ট্র থাকতে পারবে না, এ দাবি সবাই করবে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও বৃটেনকে এখান থেকে পাততাড়ি গুটোতে হবে, ফ্রান্স আগেই গেছে। কিন্তু তাতেই কি সমস্যার সমাধান হবে? চীন তো আছে!

লি কুয়ান ইউ ভারতের ভূয়সী প্রশংসা করেছেন। তিনি বলেছেন, ভারতের কোন সম্প্রসারণবাদী মনোভাব নেই। সুতরাং, এশিয়ার নিরাপত্তা সংক্রান্ত কোন প্রচেষ্টায় উদ্যোগ গ্রহণ করার ব্যাপারে ভারতই সব চেয়ে যোগ্য।

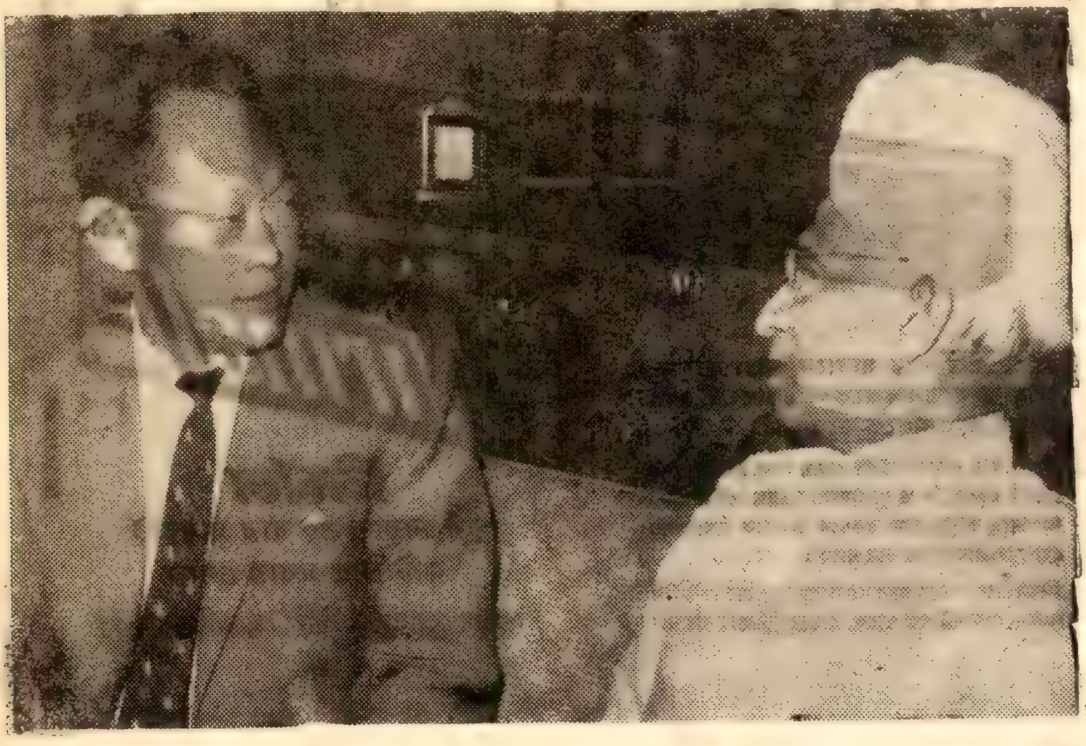

রাষ্ট্রপতি ডঃ রাধাকৃষ্ণণ সকাশে লি কুয়ান ইউ

বিপ্লবী নিবেদিতা

নন্দিতা ভৌমিক

ভারতবর্ষ স্বাধীন হয়েছে। এই রাজনৈতিক স্বাধীনতা শুধু অহিংস সত্যাগ্রহের দ্বারা লাভ করা যায় নি, এই স্বাধীনতা বহু বিপ্লবীর মরণপণ সংগ্রামের দ্বারা অর্জন করতে হয়েছে।

স্বাধীন ভারতে সরকারী প্রচেষ্টায় এই সব বিপ্লবীর সংগ্রাম কাহিনী রচনার কোনো চেষ্টা দেখা যায় নি। অবশ্য একদা এই সরকার এই বিপ্লবীদের কথা উচ্চারণ করতেও যেন কুণ্ঠিত হতেন। কিন্তু সাধারণ মানুষের মনে এই সব বিপ্লবীর জন্যে যে শ্রদ্ধা ও ভালবাসা রয়েছে তা অনুভব করেই বিপ্লবীদের নামে কিছু রাস্তার নামকরণ হয়েছে। এমন কি বিপ্লবীদের মূর্তিও সরকারের দায়িত্বশীল পদে অধিষ্ঠিত ব্যক্তিগণ নিঃসঙ্কোচে কোথাও কোথাও উন্মোচন করেছেন। এই সব বিচারে মনে হয় যে, বর্তমান সরকারী দলের ধ্যান-ধারণার কিছুটা পরিবর্তন ঘটেছে এবং তাঁরা বাস্তব সত্যের কিছুটা সম্মুখীন হতেও রাজী। এতৎসত্ত্বেও বলা দরকার যে, ডঃ রমেশচন্দ্র মজুমদার প্রমুখ খ্যাতিমান ঐতিহাসিকগণের অনুরোধ সত্ত্বেও একমাত্র দলীয় কারণে বিপ্লবীদের ইতিহাস সংগ্রহ করতে আমাদের সরকার পশ্চাৎপরায়ণ।

তবু বিপ্লবীদের ব্যক্তিগত জীবনকথা ও স্বদেশের স্বাধীনতার জন্যে পরাধীন ভারতে সংগ্রামের ইতিহাস এখন কেউ কেউ ব্যক্তিগত প্রচেষ্টায় রচনা করছেন। এই প্রচেষ্টায় যদি স্বাধীনচেতা পত্রিকাও নির্বাক থাকতো, তাহলে তার চেয়ে বেদনার আর কিছু ছিল না।

যাহোক, সেইরকম প্রচেষ্টার দ্বারা একদা গিরিজাশঙ্কর রায়চৌধুরী একজন বিপ্লবীর জীবনকথা আমাদের কাছে প্রকাশ করেছিলেন। তার আগে সেই বিপ্লবীর জীবন কথা আমরা পেয়েছিলাম একটি ফরাসী জীবনচরিত কথা থেকে। দুঃখের ও দুর্ভাগ্যের ব্যাপার, যিনি বিদেশিনী হয়েও স্বদেশী, এই দেশকে যিনি হৃদয় দিয়ে ভালবেসেছিলেন, ভালবাসতে বাসতে যিনি প্রাণ দিতেও কুণ্ঠিত হন নি—তাঁর কথা বাংলা ভাষায় খুব বেশি লিখিত হয় নি। আজ তাঁর জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষে তাঁকে যদি স্মরণ করতে না পারি, তাহলে বৃথা এই স্বাধীনতা, বৃথা এই স্বদেশসেবা। কারণ স্বাধীনতা অর্জন করার প্রকৃত শিক্ষার সঙ্গে স্বদেশ সেবার মন্ত্রে তিনিই ভারতীয়দের প্রথম উদ্বুদ্ধ করেছিলেন।

বিপ্লবী নিবেদিতা

১৮৬৭ খৃস্টাব্দের ২৮শে অক্টোবর উত্তর আয়ার্ল্যাণ্ডের আলস্টারে জন্মগ্রহণ করেন মিস মার্গারেট এলিজাবেথ নোবেল। আয়ার্ল্যাণ্ডে জন্ম, সুতরাং মার্গারেট বালিকাবস্থায় যে পরিবেশের মধ্যে বড় হয়ে ওঠেন সেই পরিবেশ অগ্নিগর্ভ ছিল বললেও অত্যুক্তি করা হয় না। কারণ স্বাধীনতা সংগ্রামে তাঁর পিতামহ আপ্রাণ সংগ্রাম চালিয়েছিলেন। মাতা পিতা উভয়েরই স্বদেশের জন্য উৎসর্গীকৃত প্রাণ। এই সব কারণে মিস মার্গারেটের চরিত্র ও চিন্তা দৃঢ়ভাবেই গড়ে উঠেছিল। আর তাঁকে যে দুইজন বিপ্লবী গভীরভাবে প্রভাবিত করেছিলেন, তাঁদের মধ্যে একজন হচ্ছেন আয়ার্ল্যাণ্ডের পার্নেল এবং অন্যজন রাশিয়ার প্রিন্স ক্রপাটকিন। ক্রপাটকিনের বিপ্লবী মতবাদ সে যুগে নানাদেশে ভয়ঙ্কর আলোড়নের সৃষ্টি করেছিল। মিস মার্গারেটের পিতা পার্নেলের অধীনে আয়ার্ল্যাণ্ডের স্বাধীনতার জন্যে লড়াই করেছিলেন। এই পার্নেলের মৃত্যুতে অরবিন্দ একটি কবিতা রচনা করেছিলেন। ক্রপাটকিন স্বামী বিবেকানন্দ ও বিজ্ঞানাচার্য জগদীশচন্দ্র বসুর সঙ্গে পরিচিত হয়েছিলেন। গিরিজাশঙ্কর রায়চৌধুরী বলেছেন, "পার্নেলের নিয়মতান্ত্রিকতা হইতে ১৮৯১ খৃস্টাব্দের পরে একাদিক্রমে ৪ বৎসর প্রিন্স ক্রপাটকিনের প্রভাবে আসিয়া নিবেদিতা সন্ত্রাসবাদ ও সশস্ত্র বিদ্রোহের দীক্ষা ও শিক্ষা পাইয়াছিলেন।" অতএব আমরা এই অভিমত পোষণ করতে পারি যে, অতি অল্প বয়স থেকেই মিস মার্গারেট যে সত্যকে গ্রহণ করেছিলেন, পরবর্তীকালেও তার বিন্দুমাত্র নড়চড় হয় নি।

স্বামী বিবেকানন্দের সঙ্গে মার্গারেটের প্রথম পরিচয় হয় লন্ডনে। মিস মার্গারেটের বয়স তখন ২৮। জীবনে অনেক দুঃখ দারিদ্র্য ও ব্যথা বেদনার পর শেষ পর্যন্ত কুমারীত্বের ব্রত তিনি গ্রহণ করেছিলেন। এমন সময় তিনি এমন একজন গুরুর দর্শন পেলেন, যিনি সত্যিকারের তাঁর পথপ্রদর্শক হতে পারে। ১৯০২ খৃস্টাব্দে তিনি ভারতের মৃত্তিকায় পদার্পণ করার সঙ্গেই এই দেশকে অন্তরের সঙ্গে গ্রহণ করেন। মঠজীবনে সত্যের সন্ধান লাভ করা সম্ভব নয়, একথাও তিনি ধীরে ধীরে অনুভব করতে থাকেন। স্বামী বিবেকানন্দের দেহত্যাগের পর গুরুর নির্দেশেই এই দেশের জন্যে নিজেকে তিনি সম্পূর্ণ ত্যাগ করেন। 'ভজন পূজন সাধন আরাধনা সমস্ত থাক্ পড়ে। রুদ্ধদ্বারে দেবালয়ের কোণে কেন আছিস, ওরে? নয়ন মেলে

দেখ্ দেখি তুই চেয়ে, দেবতা নাই ঘরে।' তাহলে এই দেবতা কোথায়? এই দেবতা বিরাজ করছে নগ্ন বুভুক্ষু ইংরেজ-পদানত কোটি কোটি ভারত-বাসীর মধ্যে। বিবেকানন্দের সেই বাণী —'জীবে সেবা করে যেই জন, সেইজন সেবিছে ঈশ্বর।'

এই সেবার কাজে আত্মনিয়োগ করলেন নিবেদিতা। আর এ শুধু আত্মনিয়োগ নয়, এ এক বিস্ময়কর আত্মত্যাগ। একজন বিদেশিনী, ভারত-মন্ত্রে উজ্জীবিত। এখন কোনো মঠের সঙ্গে নিবেদিতার যোগাযোগ রাখা সম্ভব নয়। এবং মঠের যাঁরা সাধক তাঁদের কাছেও নিবেদিতার কার্য-প্রণালী বাঞ্ছিত নয়। ১৯০২ খৃস্টাব্দে ১৯শে জুলাই বেলুড় মঠের সন্ন্যাসীরা ভগ্নী নিবেদিতার সঙ্গে যোগাযোগ ছিন্ন করলে কার্যত নিবেদিতা স্বাধীন-ভাবেই স্বীয় কাজে আত্মনিয়োগ করার সুযোগ লাভ করেন। এই সময় তিনি একটি বক্তৃতায় স্বামী বিবেকানন্দ সম্বন্ধে যা বললেন তাও কম চাঞ্চল্য-কর নয়, কারণ বিবেকানন্দকে বিচার বিশ্লেষণ করতে গিয়ে তিনি তাঁকে ধর্মের গণ্ডিতে টেনে এনে বিমূর্ত অবস্থায় না রেখে স্বামীজীকে তিনি বললেন—

"Swamiji is verily our great national hero."

এই ধরণের কথা বলা সে যুগে যে কতো ভয়ঙ্কর ব্যাপার ছিল তা একালে অনুধাবন করা সম্ভব নয়। এখনও অনেকেই বিবেকানন্দকে পাশ্চাত্যদেশে ভারতের প্রথম দূত হিসেবে আখ্যা দিতে গিয়েও বিবেকা-নন্দের মধ্যে ধর্মের গন্ধ ছাড়া আর কিছু পান না। হয়তো এই ধর্মের দোহাই দিয়ে এদেশে সব কিছু সম্ভব বলেই অনেক সময় অনেক রকম অবৈজ্ঞানিক কথা উচ্চারণ করে রেহাই পাওয়া যায়। কিন্তু একথা সত্য যে, ধর্ম হচ্ছে ব্যক্তিগত ব্যাপার এবং একান্তই অপার্থিব ও আধ্যাত্মিক। পার্থিব ব্যাপারে ধর্মকে টেনে আনা একেবারেই অসমীচীন।

যা হোক্ স্বামীজীকে নিবেদিতা 'ন্যাশেন্যাল হিরো' আখ্যা দেওয়ার পর নিজের কর্মপ্রণালী সম্পর্কে বললেন,—

"My role is to awaken the nation."

কিন্তু জাতিকে তিনি কিভাবে জাগাবেন? তিনি একথা মনে প্রাণে বুঝতেন যে, এই দেশের মানুষকে জাগাবার সঙ্গে সঙ্গে তাদের এমন কর্মে অনুপ্রাণিত করতে হবে, যাতে এই দেশ ইংরেজের শাসন ও শোষণ থেকে মুক্তি পায়। আর এই মুক্তি অনুনয় বিনয়ে লাভ করা সম্ভব নয়। তার জন্যে চাই বিপ্লব এবং সন্ত্রাসবাদের দ্বারা ইংরেজের মনে নিদারুণ ভীতি সৃষ্টি করা। এই উদ্দেশ্যে তিনি বেলুড় মঠের সঙ্গে সম্পর্ক ছেদ করার পর অরবিন্দের গুপ্ত-সমিতিতে যোগদান করেন। তাঁর বৈপ্লবিক কর্মে সেকালের প্রায় সমস্ত চরমপন্থী নেতাদের যোগা-যোগ লক্ষ্য করা যায়।

তারপর শিরে সংক্রান্তির মতো বিপদ যখন ঘনিয়ে এল তখনকার সেই বঙ্গভঙ্গে প্রতিবাদের দিন-গুলিতেও নিবেদিতার যে মূর্তি আমরা দেখি, তা কল্পনাতীত। ডন সোসাইটিতে প্রদত্ত নিবেদিতার বক্তব্য আরো চাঞ্চল্যকর এবং তদ্দ্বারা বোঝা যায় তিনি কোন পথের অনুগামিনী। তিনি বললেন,

"When will arise then the veritable fighter in the good cause again, when the Geeta in the one hand and the sword in the other ?"

এই দেশকে জাগাবার জন্যে নিবেদিতা একদিকে যেমন সেবা কাজ, স্কুল প্রতিষ্ঠা করেছেন এবং ইংরেজের যাবতীয় হীন প্রচেষ্টার বিরুদ্ধে লিখে-ছেন বা বক্তৃতা করেছেন, তেমনি ইংরেজ শক্তিকে হাতেকলমে শিক্ষা দেবার জন্য বিপ্লবীদের অসিধারণের জন্যেও দীক্ষা দিতে কসুর করেন নি। ফুলার বধ চেষ্টার যে কাহিনী আজো লোকমুখে শোনা যায় তার মূলে নিবেদিতাও ছিলেন একথা এখন প্রমাণিত। তাই ঐতিহাসিক সেই অজ্ঞাত ইতিহাস উন্মোচন করে বলেন,—"বরিশাল কনফারেন্সের মাত্র এক মাস পরেই নিবেদিতার সহিত পরামর্শ করিয়া অরবিন্দ ফুলার বধের চেষ্টায় ব্যাপৃত হইলেন।"

গিরিজাশঙ্কর রায়চৌধুরী লিখে-ছেন,—"এই নিবেদিতা ১৯০৭ খৃস্টাব্দের প্রথম ভাগে যুগান্তর দলের যুবকদের নিম্নলিখিত রূপ শিক্ষা দিলেনঃ—

(ক) ভারতব্যাপী একটি সশস্ত্র বিদ্রোহের পরিকল্পনা লইয়াই ছক কাটা হইল। গ্রামে গ্রামেই এই গুপ্ত সমিতি প্রতিষ্ঠার প্রস্তাব করা হইল। এবং কিছু চেষ্টাও হইল। সুতরাং বিপ্লবের কেন্দ্রগুলি প্রধানত পল্লীমুখী, শহর-মুখী নয়। এই সময়ে পূর্ব ও পশ্চিম-বঙ্গের প্রায় সব জেলাগুলিতেই অনেক-গুলি আধাবিপ্লবী আপনা হইতেই অঙ্কুরিত হইয়াছিল। এই সবগুলি গুপ্তসমিতিকেই নিবেদিতা একটা কেন্দ্রীয় পরিচালনাধীনে আনিবার চেষ্টা করিলেন। এই সকল শাখা সমিতি-গুলির মধ্যে যাহাতে দ্রুত বার্তা প্রেরণ করা যায় তাহার ব্যবস্থা করিলেন। যে বার্তা লইয়া যাইবে সে যদি বিশ্বাস-ঘাতকতা করে তবে তাহাকে তৎক্ষণাৎ হত্যা করা হইবে।

—'The couriers would get massacred rather than get cor-rupted.'

সমস্ত শাখা কেন্দ্রগুলি যেন সময় আসিলে একসঙ্গে বলিতে পারে, 'আমরা প্রস্তুত'। মেয়েরাও এই সব শাখা সমিতির সভ্য হইতে পারিবে। অনেক টাকার প্রয়োজন, নিবেদিতার হাতে যত টাকা সংগৃহীত হইয়াছিল তাহা তিনি সমস্তই গ্রামের কেন্দ্র-গুলিতে বারীন্দ্রের হাত দিয়া বিতরণ করিতে দিলেন।

(খ) এই কেন্দ্রগুলির মধ্যে হাতে ছাপা রাজদ্রোহমূলক কাগজ বিতরণ করিবার ব্যবস্থা হইল; নিবেদিতা এই কার্যে অগ্রসর হইলেন। কেন না, বাল্যকালে প্রেসে কি করিয়া এই গোপন পত্র ছাপা হইতে পারে তাহা তিনি শিখিয়াছিলেন। (ফরাসী জীবনচরিত পৃঃ ৩০২)

(গ) ইংরেজ সৈন্য যদি গ্রামে আসিয়া পড়ে? তাহারও যথাসম্ভব ব্যবস্থা নিবেদিতা দিলেন। সন্ত্রাস-বাদীরা গ্রাম ছাড়িয়া জঙ্গলে পলাইয়া যাইবে। এবং অন্য সকল গ্রামবাসীরা পলাতকের রক্ষার জন্য যাহা কিছু সম্ভব—টাকা, খাদ্য ইত্যাদি দিয়া গোপনে সাহায্য করিবে। মেয়েরা ধান ভানিতে লাগিয়া যাইবে। লুক্কায়িত বিপ্লবীদের খোঁজ গ্রামবাসীরা দিবে না।

(ঘ) প্রিন্স ক্রপটকিনের শিষ্যা নিবেদিতা নিজে বোমা তৈয়ারী করিতে জানিতেন ("She was not a stranger to the manufacture of explosives",—ফরাসী জীবন চরিত, পৃঃ ৩০৬)...ইতিমধ্যে উল্লাসকর দত্ত নিজের চেষ্টাতেই বোমা তৈয়ারীর একটা ফর্মুলা একদিন হঠাৎ আবিষ্কার করিয়া ফেলিলেন। সে কি আনন্দের দিন! নিবেদিতা আচার্য বসুকে বলিয়া তাঁহার বিজ্ঞানের গবেষণাগারে উল্লাস-করের কার্যকে নিপুণভাবে পরিসমাপ্তির জন্য তাঁহাকে এবং আরও একটি যুবককে ভর্তি করিয়া দিলেন। জগদীশচন্দ্র বসুর মাধ্যমে অন্যান্য যুবকদের তিনি বিখ্যাত রাসায়নিক পি

সি রায়ের গবেষণাগারে ভর্তি করিয়া দিলেন। পি সি রায় নিবেদিতার অনুরোধ অত্যন্ত আগ্রহের সহিত রক্ষা করিলেন।

নিবেদিতা নিজেই পি সি রায়ের নিকট যুবকদের লইয়া গিয়াছিলেন। পি সি রায় গবেষণাগারের চাবি ইচ্ছা করিয়াই ফেলিয়া যাইতেন, এবং অনেক রাত্রে একা আসিয়া শূন্য গবেষণাগার পর্যবেক্ষণ করিতেন। ইত্যাদি।”

নিবেদিতার দুঃসাহসিক কাজের প্রতি ইংরেজপালিত টিকটিকিদের নজর ইতোমধ্যে পড়েছিল। এই অবস্থায় অন্যত্র পালিয়ে যাওয়া ছাড়া গত্যন্তর ছিল না। কিন্তু বিদেশে পালিয়ে গিয়েও এদেশের বিপ্লবীদের সমস্ত খবর নিয়মিত পাবার পর সেখানে দীর্ঘদিন থাকা তাঁর পক্ষে সম্ভব হোল না। মিস মার্গট এই ছদ্মনামে তিনি জাহাজ থেকে এদেশের মাটিতে ১৯০৯ খৃস্টাব্দে আগস্ট মাসে পুনরায় অবতরণ করেন এবং বাগবাজারের পুরাতন আবাসে গিয়ে ওঠেন। অবশ্য এ সময় স্বীয় প্রভাবের গুণেই তাঁকে আর পুলিশের হাতে বিড়ম্বিত হতে হয় নি। কিন্তু স্বপ্রতিষ্ঠিত বিদ্যালয়টিকে তিনি আর রক্ষা করতে পারেন নি। রক্ষা করতে না পারার কারণ অবশ্য অন্য। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, “তিনি যে ইহার ব্যয় ভার বহন করিয়াছেন তাহা চাঁদার টাকা হইতে নহে, উদ্বৃত্ত অর্থ হইতে নহে, একেবারেই উদরান্নের অংশ হইতে—ইহা সত্য কথা।”

একদিকে সন্ত্রাসবাদের কার্যকলাপ, অন্যদিকে সাধারণ মানুষের সেবাকার্য—এই উভয়বিধ কাজেই নিবেদিতা অতুলনীয়া। পূর্ববঙ্গে ও উড়িষ্যায় দুর্ভিক্ষ প্রতিরোধে তাঁর কর্মপ্রচেষ্টা একালের মানুষের কাছে অজ্ঞাত থাকলেও, দুর্ভিক্ষের কারণ সম্বন্ধে তিনি যে সব কথা বলেছেন তা একালেও সত্য। দুর্ভিক্ষের মধ্যে তিনি চরম বাস্তববাদীদের মতো উক্তি করেছিলেন যে, লক্ষপতি যেমন ভিক্ষুকের সৃষ্টি, তেমনি ভিক্ষুক হচ্ছে লক্ষপতির সৃষ্টি।

নিবেদিতার জন্মশতবার্ষিকীতে আজ স্বাধীন ভারত অনেক কিছুই শিক্ষালাভ করতে পারে। স্বাধীনতাবোধ, দেশপ্রেম এবং সেবা—এই তিনের সমন্বয় একমাত্র নিবেদিতার মধ্যেই সম্ভব হয়েছিল। এ ছাড়া তিনি অন্য যে শক্তির অধিকারিণী ছিলেন তা হচ্ছে তাঁর লেখনীশক্তি। তাঁর সমস্ত রচনা একালের মানুষের কাছে তুলে ধরা দরকার। তাঁর জীবন ও কর্মপদ্ধতিকে বুঝতে হলে এখন তাঁর রচনার সাহায্য গ্রহণ ছাড়া উপায় নেই।

এখনো পর্যন্ত নিবেদিতা অনেকের কাছেই স্বামী বিবেকানন্দের ধর্মশিষ্যা হিসেবেই পূজিতা হচ্ছেন। কিন্তু বিবেকানন্দের কাছ থেকে যে ধর্মশিক্ষা তিনি লাভ করেছিলেন তা কোনো মন্দির বা মঠের শিক্ষার দ্বারা বিধিবদ্ধ ছিল না। দার্শনিকশ্রেষ্ঠ ডক্টর রাধাকৃষ্ণ নিবেদিতার ‘ধর্ম’ বোধ (রিলিজন) সম্পর্কে বলতে গিয়ে বলেছেন যে, তিনি সেই ধর্মবোধের অধিকারী ছিলেন—যা মানুষকে ‘রিয়েলিজেসন’ ও ‘রিনানসিয়েশন’-এর অধিকারী করে। আমরা বলবো, নিবেদিতার ‘রিলিজন’এ এই দুই-এর সম্যক প্রকাশ দেখলেও তাঁর ‘রিলিজন’ কোথাও তমসাচ্ছন্ন নয়। তাই নিবেদিতা আমাদের হৃদয়াসনে আজ প্রতিষ্ঠিত। তাঁর তিরোধানে রবীন্দ্রনাথ যথার্থই বলেছিলেন,—

“She was in fact a Mother of the People.”

নিবেদিতার আগামী জন্মশতবার্ষিকীতে এই লোকমাতার আদর্শে উদ্বুদ্ধ হতে আমরা কি পারবো?

পদস্খলন

ধারাবাহিক উপন্যাস

আশাপূর্ণা দেবী

(পূর্ব-প্রকাশিতের পর)

স্বাধীনতা-পরাধীনতা নিয়ে যে যেখানে মাথা ঘামাক, সত্যিকার স্বাধীনতা যদি কেউ পেয়ে থাকে তো পেয়েছে সুবর্ণলতার ছেলেমেয়েরা পিসির বাড়ি এসে।

রাতদিন অনেকগুলো রক্তচক্ষুর তলায় থাকতে থাকতে ওরা জানতো না মুক্তির স্বাদ কি, স্বচ্ছন্দচারণের সুখ কি। কারণে-অকারণে হঠাৎ আচমকা কেউ ধমকে উঠবে, এমন আশঙ্কা নিয়েই তাদের জীবন।

বিশেষ করে সেজকাকা!

ছেলেগুলোকে একবার একটু হুড়ো-হুড়ি করতে দেখলে, বা একবার তাদের একটু হেসে উঠতে শুনলেই তিনি সেই ছেলেগুলের পেটের পীলে চমকে দিয়ে হাঁক দেবেন, 'কে ওখানে? শুনে যা এদিকে!'

ব্যস, তাতেই এমন কাঁপুনি ধরে যায় যে, এদিকে আসবার ক্ষমতা আর থাকে না। অতএব সেই না আসার অপরাধেই 'বিরাশী সিক্কা', 'মোগলাই গাঁট্টা,' 'রাম চিমটি, শ্যাম চিমটি' ইত্যাদি করে অনেক কিছুরই স্বাদ পেতে হয়।

সুবর্ণলতা তার ছেলেদের মারে না বলেই বোধ করি সুবর্ণলতার ছেলেদের মারবার জন্যে এত হাত নিসপিস করে সেজকাকার।

মা ঠেঙায় না ছেলেদের, এমন 'মেমেলিয়ানা' অসহ্য বলেই হয়তো সেজকাকা মায়ের সেই মেমেলিয়ানার শোধ নেন।

ভাগ্নের গায়ে হাত তুললেই হাত কাঁপে, ভাইপোর গায়ে হাত তোলায় তো সে আশঙ্কা নেই?

সেই আবহাওয়া থেকে এসে মাঠে-ঘাটে ঘুরে বেড়াচ্ছে ওরা। কাদা, মাটি, খড়, বাঁশ, পাতা, লতা নিয়ে যতরকম খেলা যা সব খেলছে। পিসতুতো ভাই-বোনেরা সঙ্গী।

কিন্তু আসল মজা হচ্ছে, এখানে এসে অবধি শুধু পিসতুতো দাদা-দিদিরাই নয়, আরো একজন তাদের খেলার মহোৎসাহী সঙ্গী। তিনি হচ্ছেন মা।

হ্যাঁ, মা!

সুবর্ণলতা তার বয়েস এবং পদ-মর্যাদার ভার ফেলে সমবয়সীদের নেমে আসে, রীতিমত যোগ দেয় খেলায়। যেমন ছেলেরা উঠোনের মাঝখানে দুদিকে দুটো পুকুর কেটে, মাঝখানে একটা সাঁকো বানাবে, অথচ জুৎ করতে পারছে না। কঞ্চি আর বাঁখারি নিয়ে হিমসিম খেয়ে যাচ্ছে, সুবর্ণলতা এসে পড়ে এবং বসে পড়ে একগাল হেসে বলে ওঠে, 'আমায় যদি তোদের খেলায় নিস তো আমি করে দিতে পারি।'

মাকে 'নেওয়া না নেওয়া' আবার একটা কথা নাকি? ছেলেরা কৃতার্থমন্য হয়ে বল ওঠে, 'তুমি আসবে?'

'বললাম তো, যদি নিস।'

'নেবো, নেবো, এসো তুমি খেলতে।'

অতঃপর নেমেই আসে সুবর্ণলতা। নেমে আসে শিশুর খেলাঘরে। তোড়জোড় দেখে কে।

'এই কানু, একটা বাঁশ নিয়ে আয় দিকিন। এই একটা বড় দেখে গাছের ডাল নিয়ে আয় দিকি।...এই চারটি বুনো ফুলের চারা আনতে পারিস? আলাদা একটু বাগান করবো।'

এমন সব ফরমাস করে সুবর্ণলতা, আর সেই আদেশ পালন করে ধন্য হয় ছেলেরা।

মা একমুখ হাসছেন।

মা সহজ হালকা স্রোতে গা ভাসাচ্ছেন। এর থেকে আনন্দের আর কি আছে!

তা আজও সেই আনন্দ দিতে এল সুবর্ণলতা।

ওরা কৃতার্থমন্য হয়ে এগিয়ে আসে।

সুবর্ণলতা বড়ছেলের দিকে তাকিয়ে বলে, 'খেলবো! খেলবো তোদের সঙ্গে। কিন্তু একটা শর্তে।'

সুবর্ণলতার মুখটা আলো আলো দেখায়।

তারপর মাটি মাখতে মাখতে আসল কথাটি বলে সুবর্ণলতা, 'আমায় তোদের অম্বিকাকাকুর বাড়িতে একবার নিয়ে যাবি?'

অম্বিকাকাকুর বাড়ি!

পরস্পর দৃষ্টি বিনিময় করে হেসে ওঠে।

'অম্বিকাকাকুর বাড়ি? সে তো ওই

ওইটা। ওখানে আবার নিয়ে যাওয়া কি?'

অর্থাৎ ওটা আবার একটা নিয়ে যাবার জায়গা নাকি!

সুবর্ণলতাও কি তা জানে না?

তবু সুবর্ণলতা তার ছেলের সাহায্য প্রার্থনা করে।

একা ফট করে যেতে পারে না তো, শুধু একা একটা পুরুষ ছেলের নির্জন ঘরে যাওয়া।

ছেলে একটা সঙ্গে থাকাই ভাল।

তাই কৌতুক কৌতুক মুখ করে নিয়ে বলে, 'তা জানিরে বাপু, তবু চল না! মানে খেলার শেষে।'

আজকের খেলা একটা 'সত্যিকার বাড়ি' তৈরি। গতকাল অনেক মাটি মেখে ছোট ছোট চৌকো চৌকো ইট তৈরি করে রেখেছিল, আজ সেইগুলো জুড়ে জুড়ে সত্যিকার পাকা বাড়ি করা হবে।

প্ল্যান?

সে তো মাথাতেই আছে।

ছোট ছোট সেই 'ইট'গুলো রোদে ভাজা ভাজা হয়ে শক্ত হয়ে গেছে। সুবর্ণলতা সেগুলি নাড়তে নাড়তে বলে, 'এই ঠিক কাজ করেছিস। ইট তৈরি করে নিয়ে তবে বাড়ি বানানো খুব ভাল। মজবুত হয়। কারণ শুধু কাদার দেওয়াল নেতিয়ে পড়ে।'

তারপর ইটের পর ইট সাজিয়ে দেওয়াল তুলে দেয় সুবর্ণ ওদের। তৈরি হয় শোবার ঘর, খাবার ঘর, রান্নাঘর, ভাঁড়ার ঘর, ঠাকুরঘর।

ভানু পুলকিত গলায় বলে, 'মা!'

'কী রে?'

'তুমি আর জন্মে বোধ হয় মিস্ত্রি ছিলে।'

সুবর্ণ হেসে ওঠে, 'তা ছিলাম হয়তো।'

তারপর সুবর্ণ কাদামাটির হাত ধুতে ধুতে বলে, এইবার তবে চল।'

'চল।'

অকৃতজ্ঞ ভানু অনিচ্ছা-মন্থর গতিতে চলে। এইমাত্র মা তাদের বাক্যদত্ত করিয়ে নিয়েছে তাই, নচেৎ কে চায় এই খেলা ফেলে অম্বিকাকাকার বাড়ি যেতে?

যে অম্বিকাকাকাকে নিত্য দেখতে পাওয়া যায়।

তবু চলে।

সুবর্ণলতাও যায়।

সুবর্ণলতার বুকটা দুর দুর করে, মনটা ভয় ভয় উত্তেজিত উত্তেজিত।

যেন বিরাট এক অভিযানে বেরিয়েছে সে।

কবিতার সন্ধানে অম্বিকার বাড়িতে এসে হাজির সুবর্ণলতা।

সংসারজ্ঞানহীন অম্বিকাও কিঞ্চিৎ বিপন্ন না হয়ে পারে না। এতটা সেও আশা করে নি। বারে বারেই তাই বলতে থাকে, 'কী মুস্কিল বলুন তো! আপনি নিজে এলেন! হুকুম হলে গন্ধমাদন পর্বতটাই বয়ে নিয়ে যেতাম!'

তারপর হেসে ফেলে বলে, 'অবশ্য তারপর নিশ্চয়ই হতাশ হতেন; বিশল্যকরণীর চিহ্ন খুঁজে পেতেন না।'

কিন্তু কি পেত আর না পেত সেকথা ভাবতে বসছে না সুবর্ণলতা। সুবর্ণলতা রুদ্ধনিঃশ্বাসে আর দুরন্ত আবেগে একটা ধূলিধূসরিত সেলফের মধ্যে রাখা প্রায় জঞ্জালসদৃশ কাগজের স্তূপ হাতড়াচ্ছে।

প্রকাণ্ড সেলফটার তাকে তাকে 'নেই' হেন জিনিস নেই। খবরের কাগজের কাটিঙের ফাইল ইংরিজি-বাংলা নানা পত্রিকার সম্ভার, গোছা গোছা প্রবন্ধের পাণ্ডুলিপি, ক্যালেন্ডার, হ্যান্ডবিল, চিঠিপত্রের রাশি, কী নয়! এর মধ্যে থেকে কবিতা উদ্ধার করতে হবে! তাও খাতায় নয়, খুচরো কাগজে লেখা।

সুবর্ণলতা সব উল্টোতে থাকে।

অম্বিকা ব্যস্ত হয়ে বলে, 'দেখছেন তো কী অবস্থা। সৃষ্টির আদি থেকে ধুলো জমেই চলেছে। পর পর কেবল চাপানোই হয়, নামানো তো হয় না কোনোদিন।'

'পদ্য-টদ্য এই জঙ্গলের মধ্যে রাখো কেন?' ক্ষুব্ধ আবেগে বলে সুবর্ণলতা। 'পদ্যই' বলে। 'কবিতা' বলতে হয়, বললে ভাল শোনায়, অত খেয়াল করে না।

অম্বিকা হেসে বলে, 'রাখি না' তো, 'ফেলি'! কোনো কিছু ফেলার পক্ষে জঙ্গলই শ্রেষ্ঠ জায়গা।'

অম্বিকাদের এই বাড়িটি জ্ঞাতিদের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট বড়বাড়ির ভগ্নাংশ নয়, ছোট্ট একটু একতলা, সম্পূর্ণ আলাদা। অম্বিকার বাবা জ্ঞাতিদের থেকে পৃথক হয়ে আম-জাম-কাঁঠালের বাগানের ধারে এই ছোট বাড়িখানি করিয়েছিলেন। অম্বিকার মা বেঁচে থাকতে ছবির মত রাখতেন বাড়িটিকে, রাখতেন ধূলি-মালিন্য শূন্য করে। কিন্তু ছেলের ঘরের এই সেলফটিতে হাত দেওয়ার জো ছিল না তাঁর। হাত দিলেই নাকি অম্বিকার রাজ্য রসাতলে যেত।

এখন সারা বাড়িতেই ধুলো।

সুবালা অথবা তার মেয়েরা এক-আধদিন এসে ঝাড়ামোছা করে দিয়ে যায়, অম্বিকা বকাবকি এবং ঝাঁটা কাড়াকাড়ি করে, ব্যস।

কিন্তু সুবর্ণর তো ধুলোর দিকে দৃষ্টি নেই। সে ধুলোর আড়াল থেকে মাণিক খুঁজছে।

আর সেই খোঁজার সূত্রে পেয়ে যাচ্ছে অনেক মণিরত্ন। কত বই, কত পত্রিকা! ইস্ ভাগ্যিস এল সুবর্ণ এখানে!

'ঠাকুরপো, এত বই তোমার? কই বল নি তো?'

অম্বিকা অপ্রতিভহাস্যে বলে, 'বই দেখে এত খুশি হবেন, জানি না তো!'

'জানেন না, বাঃ!' সুবর্ণ বলে ওঠে, 'আমি কিন্তু এগুলো সব পড়বো! রয়েছি তো এখনো, পড়ে নেব তার মধ্যে।'

অম্বিকা হাসে, 'পড়লে তো বেঁচে যায় ওরা। ধুলোর কবরের মধ্যে পড়ে আছে, উদ্ধার হয় তার থেকে।'

সুবর্ণ দীপ্ত প্রসন্নমুখে বই বাছতে থাকে, এবং বেছে বেছে প্রায় গন্ধমাদনই করে তোলে। আলো-জ্বলা মুখে বলে, 'এই আলাদা করা থাকলো, কিছু কিছু করে নিয়ে যাব, আবার পড়ে পড়ে রেখে যাবো।'

অম্বিকা বলে, 'জিনিসগুলো এত অকিঞ্চিৎকর যে বলতে লজ্জা করছে, রেখে না গেলেও ক্ষতি নেই, নিয়েই রাখতে পারেন। রাখলে, ওই মলাট-ছেঁড়া ধুলোমাখা কাগজপত্রগুলো কৃতার্থ হয়ে যায়।'

সুবর্ণ এবার হাসিমুখে বলে, 'অতয় কাজ নেই, একবার পড়তে পেলেই বর্তে যাই। এতদিন রয়েছি, জানি কি ছাই! জানলে তো রোজ এসে হানা দিতাম! উঃ, আজও যাই ভাগ্যিস এসেছিলাম!'

আলোয় উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে সুবর্ণলতার চোখমুখ সর্বাবয়ব।

অম্বিকা সুবর্ণলতার মা সত্যবতীকে দেখে নি। দেখে নি তাই সহসা অনুভব

গৌর মোহন দাস এণ্ড কোং
২৩৩, ওল্ড চীনা বাজার স্ট্রীট
কলিকাতা-১
ফোন: ২২-৬৫৮০

ভিয়েতনাম

বঙ্কিম গুহ

শতাব্দীর অশ্রু নামে ভিয়েতনামে
বন্দর তারণ্য জুড়ে কান্না আত্মা আর্তনাদ করে?
সদ্য ফোটা সাদা গোলাপের রং
কেমন জমাট লাল
রক্ত দিয়েছে ভিয়েত কং,

পিচের মতন কালো রাত্রি অন্ধকারে
আতঙ্কিত ত্রাসে—
কারা যেন হামা দিয়ে হেঁটে চলে বন্দরের কাছে
স্তব্ধ রয় ক্ষণকাল, এখানে বন্দর ছিল,
এখন প্রেতের আত্মা কানাকানি করে।

আজ যার জন্ম হলো বারুদের গন্ধ মেখে গায়
ঐ তার কান্না শোন,
আর্তনাদ নবজাতকের,
হে মাটি তোমার কোলে
সেই শিশু শান্তি কেন পায়।

করতে পারে না এই আলোর উৎস কোথায়!

অম্বিকা অবাক হয়।

অম্বিকা বোধকরি অপ্রতিভও হয়।

যেন, সুবর্ণলতা যে এতদিন টের পায় নি অম্বিকার ঘরের সেল্‌ফে চারটি মলাট ছেঁড়া সেলাই ঢিলে পত্রিকা আছে, সেটা অম্বিকারই ত্রুটি। সেই অপ্রতিভ অপ্রতিভ মুখে বলে, 'আমারই উচিত ছিল আপনাকে দিয়ে আসা—'

সুবর্ণলতা সরল আনন্দে হেসে ওঠে।

'ওমা! তুমি কী করে জানবে যে তোমাদের মেজবৌদি এমন বই হ্যাংলা! কিন্তু তা' তো হলো, যার জন্যে এলাম তার কি? তোমার পদ্যর খাতা কোথায়?'

'কী মুস্কিল! বললাম তো খাতাটাতা নেই, কদাচ কখনো প্রাণে জাগলো কিছু, হাতের কাছে যা পেলাম তাতেই লিখলাম তারপর কোথায় হারিয়ে গেল।'

'কখনো না তুমি ঠকাচ্ছ!'

'আরে না বিশ্বাস করুন।'

অম্বিকা হাসে, 'এই যে তার সাক্ষী—'

হঠাৎ বালিশের তলা থেকে টেনে বার করে কয়েক টুকরো বালির কাগজ।

হেসে হেসে বলে, 'কাল রাত্রে হচ্ছিল খানিকটা কবিত্ব।'

'কই দেখি দেখি—'

সুবর্ণ পুলকিত মুখে হাত পাতে।

অম্বিকা চৌকীর ওপর রাখে।

হেসে বলে, 'যা হস্তাক্ষর তার ওপর আবার কাটাকুটি—'

সুবর্ণ অবশ্য ততক্ষণে টেনে নিয়ে দেখেছে, এবং হস্তাক্ষর সম্পর্কে যে অম্বিকা 'অতি বিনয়' করে নি তা' অনুভব করেছে। তাই কুণ্ঠিত হাস্যে বলে, 'বেশ তবে তুমিই পড়।'

সুবর্ণলতা অবোধ বৈ কি!

প্রস্তাবটা যে অশোভন, অসামাজিক, এ জ্ঞান হয় না কেন তার? হলেই বা পাঁচটা ছেলে-মেয়ের মা, তবু বয়েস যে তার আজো ত্রিশেও পৌঁছয় নি, এ খেয়াল নেই? একটা সম্পূর্ণ অনাত্মীয় যুবাপুরুষের একক গৃহে এসে বসে তার মুখে কবিতা শুনতে চাওয়ার কথা উচ্চারণ করলো সে কী বলে?

আর অম্বিকা?

সেও কি বাংলার গ্রামের ছেলে নয়?

হয়তো এ একটা নতুন উত্তেজনা বলেই লোভটা সামলাতে পারছে না। তা' লোভই। লেখে সে ছেলেবেলা থেকেই। কিন্তু তার কবিতা সম্পর্কে কে কবে আগ্রহ দেখিয়েছে? কে কবে এমন আলো-ভরা উৎসুক মুখ নিয়ে তাকিয়ে থেকেছে 'শোনাও' বলে।

তা' ছাড়া আর পাঁচজনের থেকে তফাৎ বৈ কি অম্বিকা। তার পরিমণ্ডলে একটা নির্মল পবিত্রতা, তার অন্তরে একটা অসঙ্কোচ সরলতা। তার কাছে সুবালা এবং সুবর্ণলতা একই পর্যায়ের গুরুজন! সুবালার প্রতিও তার যেমন একটি সশ্রদ্ধ ভালবাসা, সুবর্ণর প্রতিও তেমনি একটি সশ্রদ্ধ প্রীতি।

তাই সেই খুচরো কাগজ কটা গুছিয়ে নিতে নিতে হেসে বলে, 'শুনে বুঝবেন বৃথা সময় নষ্ট। এটা হচ্ছে দেশের এখনকার এই পরিস্থিতি নিয়ে—।'

'মা!' ভানু ডেকে ওঠে। 'আমি যাই।'

সুবর্ণলতা চমকে ওঠে।

ভানু যে এখনো এখানেই ছিল তা' খেয়ালই ছিল না। বই দেখেই পাগল হয়ে গিয়েছিল।

এখন ঈষৎ চঞ্চল হয়ে বলে, 'কেন চলে যাবি কেন? অম্বিকাকাকার লেখা পদ্য শোন না?'

'পদ্য' সম্বন্ধে ভানু যে বিশেষ উৎসাহী, ভানুর মুখ দেখে তা' মনে হল না। বললো, 'আমাকে দাদা দেরি করতে বারণ করেছে।'

'কেন? তুই আবার কী রাজকার্য করে দিবি দাদার?'

'এমনি।'

হঠাৎ সুবর্ণলতা ছেলের ভবিষ্যৎ চিন্তায় তৎপর হয়। 'লেখাপড়া তো সব শিকেয় উঠেছে, কর এবার? এরপর যেতে হবে না ইস্কুলে?'

অম্বিকা হেসে ওঠে, 'না আপনি বড় সাংঘাতিক। একে বেচারাকে জোর করে কবিতা গেলাবার প্রস্তাব তার ওপর আবার পড়ার কথা মনে পড়িয়ে দেওয়া। যেতে দিন ওকে। চলুন বরং ওবাড়ি গিয়েই পড়া যাক। আমার লাজ-লজ্জার বালাই নেই। দিব্যি ছাত ফাটাবো।'

অম্বিকা স্বাভাবিক বুদ্ধিতেই সুবর্ণলতার সঙ্কোচ বোঝে, তাই ওবাড়ির কথা তোলে।

কিন্তু সুবর্ণ সহসা লজ্জায় লাল হয়ে ওঠে।

ছি ছি কী মনে করলো অম্বিকা ঠাকুরপো!

মনে করলো তো, সুবর্ণ একা তার ঘরে বসতে ভয় পাচ্ছে। অস্বস্তি পাচ্ছে।

ছি ছি।

সুবর্ণলতা সেই অস্বস্তিকে কাটালো। সুবর্ণলতা দৃঢ় হলো।

বলে উঠলো, 'না না আবার এখন এবাড়ি-ওবাড়ি! পড় তুমি।...এই মুখ্যুটা যা তুই' পিসি জিজ্ঞেস করলে বলিস আমি এখানে আছি।'

(ক্রমশঃ)

অমৃতসমান

বেদব্যাস

বহু বিবাহ প্রসঙ্গে

পাঠকমশাই নেহাৎ কথাটা তুললেন বলে আমি বলছি, নইলে কী দায় পড়েছিল আমার খামোকা শাবলখানা হাতে নেবার? বেশ পরিপাটি করে গোরটি দিয়েছিলাম। সে-কবরের ওপর, ঘাস-দুব্বো কী বলছেন মশাই, আকন্দ বন হয়ে গিয়েছিল। তা প্রায় এক যুগ তো হলো, সেই পঞ্চান্ন সালে না হিন্দু ম্যারেজ বিল পাশ হয়েছিল? আজ যেমন, সেদিনও তেমনি আমাদের বোঝানো হয়েছিল যে সেকুলার স্টেটে কোন ধর্মের ওপর আঘাত করা ঘোরতর অন্যায়, সরকার এ-অন্যায়কে কিছুতেই বরদাস্ত করবেন না। আমরাও সুনাগরিকের মতো তাই মেনে এসেছিলাম, মুসলিম ভায়েদেরও ওই আইনের আওতায় আনার অর্থাৎ ইণ্ডিয়া ম্যারেজ এ্যাক্ট প্রণয়নের দাবি কোনো কোনো হিন্দু নেতা করলেও মহাপাতক হবার ভয়ে সে-দাবি নিয়ে আর পীড়াপীড়ি করেন নি বিশেষ কেউ। নেহরুজীর কথাই বহাল রইলো, মুসলমানরা শরিয়তের মর্যাদা রেখে যথারীতি চারটে বিবি ঘরে তুললো, আবার তে-রাত্তির না পোয়াতে তালাকও দিলো।

দিন তো বেশ কেটেই যাচ্ছিল, কিন্তু আইনমন্ত্রী পাঠকজীর বিবেকে আবার কে খচ্ খচ্ করে খোঁচা দিলো কে জানে, ভদ্দরলোক একটু সসেমিরা অবস্থায় পড়ে গেলেন। স্মৃতির কবর খুঁড়তে শাবল হাতে নিতে হলো আমায় আজ তাই।

বিশ্ব কবিরাজের কথা মনে পড়ে গেলো। হালি গেঁথে তিনটে বৌ ঘরে তুলেছিলেন। তিন বৌকে নিয়ে ভদ্রলোক তোফা ছিলেন। শিব ঠাকুরের মতো এক-চোখো ছিলেন না আমাদের কোবরেজমশাই, এক 'কন্যা' তেতে-পুড়ে রাঁধবে আর আরেক বৌ পা ছড়িয়ে খাবে—সে সব বিশ্ব কোবরেজের সংসারে নেহি চলেগা, নেহি চলেগা। ওঁর পাঠ পারফেক্ট ডিভিসন অফ লেবর-এর; একজন ঈশ্বরী মুল বাটলো, দ্বিতীয় জন আকন্দ পাতা শুকোলো, আরেক জনের ওপর ভার সেসব সেদ্ধ করে শুকোতে দেবার। দেখেছি, কোবরেজমশাই মকরধ্বজ মাপার মতো নিক্তিতে ওজন করে তিন বৌকেই তাঁর ভালোবাসা-টাসা ভাগ করে দিতেন। একটি বৌয়ের যদি কোন বিষয়ে ত্রুটি হলো তো কোবরেজমশায়ের লিকলিকে বেতখানা বাঁই বাঁই করে পিঠে পড়তো। বলেইছি তো, কোবরেজমশায়ের ঘরে অবিচারটি চলবে না. ড্যানিয়েলও বিশ্ব কোবরেজের কাছে নিতান্ত শিশু। যে-দোষ করেছে মার কি শুধু সেই খাবে, বাকী দু-সতীন দাওয়ায় বসে বসে তাই দেখবে আর রসিয়ে রসিয়ে মুড়ি-কাঁচালঙ্কা খাবে? নেহি চলেগা। কোবরেজমশাই চুলের মুঠি ধরে কোর্ট মার্শাল করার মতো তিনজনকেই সার করে উঠোনের মাঝখানে দাঁড় করিয়ে দিতেন, তারপর জলতরঙ্গ বাজানোর মতো সপ্ সপ্ সপাং করে তিন বৌকেই সমান শিক্ষা দিতেন। আবার তিনজনকে উপুড় করে ফেলে, পৃষ্ঠদেশে নাগকেশরের তৈলমর্দন করে দিতেন। তবে হ্যাঁ, মাঝেমধ্যে রাগ করে বাপের বাড়ি পালিয়ে যেতো এক-একটা বৌ, কিন্তু কোবরেজমশাই শ্বশুরালয়ে গিয়ে ছোটো বৌ বলে হাঁক পাড়লেই বৌ পথ পেতো না বোঁচকা নিয়ে সুড়্ সুড়্ করে পেছনে এসে দাঁড়াতে। অসুখী তো দেখি নি বিশ্ব কবিরাজকে, বৌদেরই বা ক্ষুব্ধ বলি কেমন করে, কই ডাইভোর্স বা স্বামী ছেড়ে দেবার কথা তো কোনো বৌ-এর মুখে শুনি নি।

তবে হ্যাঁ. বিপদে পড়েছিল যতীন গুপ্ত। স্বদেশী ধরপাকড়ের যুগে পার্ক সার্কাসের এক বাড়িতে আণ্ডার গ্রাউণ্ডে যেতে গিয়ে দেখলো গেটেই পুলিশ। ভয়ে পালিয়ে আসছিল, অপেক্ষমাণ বন্ধু অভয় দিয়ে বললো ঃ বহুর পিরীতি বালির বাঁধ, তোর ভয় নেই। আব্বাস মিঞার তিন বৌয়ে রোজ মারামারি লেগে আছে, তাই পুলিশ পোস্টিং।

তোমার আজ এত দেরি হলো? করুণা তোমার জন্যে বসে বসে এই মাত্তর উঠে গেলো। ঘরে পা দিতে-না দিতেই শ্রীমতীর অনুযোগ। করুণা, শ্রীমতীর ক্লাশমেট, তা ওর বান্ধবীকে ডিঙিয়ে আমার ওপর নজর পড়লো কেন বাপু? কিন্তু কৌতূহল চাপতেই হলো, নির্লিপ্তভাবে জুতোর ফিতে খুলতে খুলতে কী ব্যাপার, হঠাৎ জিজ্ঞেস করেছিলাম।—হ্যাঁ গো বাগবাজার স্কুলের সেক্রেটারীর সঙ্গে তোমার জানাশুনো আছে? বুঝুন, আবদার। কোথায় কালীঘাট, কোথায় বাগবাজার। তাও কোনো এম-এল-এ কাউন্সিলর নিদেনপক্ষে পুলিশের ডি-সি হলে বুঝতাম। স্কুল সেক্রেটারী,—ফু!

শ্রীমতীর মানে তস্য সহপাঠিনী বান্ধবী করুণার আর্জি হলো, বাগবাজারের কোন্ এক স্কুলে একটা মাস্টারনী নেবে করুণাকে আঁকশি দিয়ে পাকা আম পাড়ার মতো ওটা পেড়ে দিতে হবে। মার্চেণ্ট অফিসের জুনিয়র অফিসারের বৌ হঠাৎ মাস্টারী করার সখ হলো কেন জানতে চাওয়ায় শ্রীমতী আমাকে না-হক্ কতগুলি কথা শুনিয়ে দিলো ঃ তোমাদের পুরুষদের কথা আর বলো না। বলে স্বরগ্রাম সাধার মত গলাকে সেই যে আরোহী পর্দায় টেনে তুললো, আর তা সহজে অবরোহণ করতে দিলো না। তারপর যেন পদ ভুলে গিয়েছিল, তেমনি করে অন্তরায় ফিরে এসে জানালো যে, করুণা ওর স্বামীকে ডাইভোর্স করেছে।

আঃ, আমি বাঁচলাম রে। ও নাকি পরম সোয়াস্তি ভরে দীর্ঘশ্বাস ফেলে চোখ বুজে বলেছিল। সাতটি বছর ধরে মুখ বুজে ছিল ও। হিন্দু ম্যারেজ এ্যাক্টই নাকি ওর বাঁচার পথ বাৎলে দিয়েছে।—চামার. চামার জানো নামেই উচ্চশিক্ষিত অফিসার, আসলে অমুক মিত্তির একটা আস্তো চামার। বলে কি না, মেয়েরা হলো প্যারিসের ফ্যাশন, এ-বেলা সবাই মাথায় তুলে নিলো তো ও-বেলা থুথু ছিটোনো। ভেতরে-ভেতরে চার-পাঁচটা মেয়ে দেখাও হয়ে গিয়েছে নাকি।

শুনে সঙ্গে সঙ্গে অসিত রায়ের কথা ফ্ল্যাশ করলো আমার মনে। কাস্টমস-এ কাজ করতো অসিত। দেদার পয়সা কামাতো, আর খরচাও করতো তেমনি পয়সার মুখের দিকে না চেয়েই। কিন্তু তাই বলে কোনো বাজে নেশা আছে বলে কেউ জানতো না। তুখোড় ছেলে অসিত, এক হপ্তায় বাড়িতে টেলিফোন এনেছে, একদিনে দুই ছেলেকে গভর্নমেন্ট স্কুলে ভর্তি করিয়েছে। আসর জমিয়ে গল্প করতে পারতো বলে তার ভক্ত জুটে গিয়েছিল প্রচুর। এমনি একদিন বম্বে এয়ার-পোর্টে এক বিদেশিনী কেমন করে

রেশমের [illegible] সূক্ষ্ম সোনার মোজা পরে সোনা স্মাগল করতে গিয়ে অসিতের হাতে ধরা পড়েছিল ও রঙিয়ে-রসিয়ে তাই বলছিল। এমন সময় এক ভদ্রমহিলা এসে বাধা দিলো। সঙ্গে যে আবার বছর সাতেকের এক অর্বাচীনও। গল্পটা মাঠে মারা গেল দেখে যদিও শ্রোতাদের মধ্যে কিঞ্চিৎ উষ্মার উদ্রেক হয়েছিল, তবুও মেয়েটির রূপ ও স্বাস্থ্য দেখে সবাই মনে মনে উল্লসিতই হলো। মেয়েটি হঠাৎ অনেকটা স্বগতোক্তির মতো 'ওই তো' বলে ছেলেটিকে কানে কানে কী যেন বলে দিলো। আর সঙ্গে সঙ্গে ছোঁড়াটা হপ্ স্টেপ জাম্প দিয়ে 'ড্যাডি' বলে অসিতের কোলে গিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়লো। আমাদের পাপদৃষ্টি এতক্ষণ মেয়েটির ওপর বিঁধে থাকায় লক্ষ্যই করি নি, অসিত কখন উঠে দাঁড়িয়েছে। দেখলাম অসিত রায় পাকা অভিনেতা, কোথায় লাগে শিশির ভাদুড়ী দুর্গাদাস বাঁড়ুজ্যে। প্যান্টের দুই পকেটে হাত দিয়ে মেয়েটিকে সটান জিজ্ঞেস করলো: কাকে চাই আপনার? কোনো কেস্ আছে?

মেয়েটিরও এককালে থিয়েটার করার সখ ছিল মনে হলো ডায়ালগ শুনেঃ ও বাবা, একেবারে দুষ্মন্ত হয়ে গেলে যে, চিনতেই পারছো না শকুন্তলাকে! তা ওই তো অংগুরীয়, এবার মনে পড়ছে? বলে মেয়েটি তার টানাটানা চোখের বল দুটিকে বাঁ প্রান্ত থেকে ডান প্রান্তে দৌড় করিয়ে ছেলেটিকে দেখিয়ে দিলো। অসিত বিদ্রূপের এক বিশ্রী ভঙ্গী করতে যাচ্ছিল এমন সময় সুপারিন্টেণ্ডেন্ট এসে পড়েছিলেন ঃ অসিতবাবু, বৌমাকে বাড়ি নিয়ে যান। নিজের স্ত্রীপুত্রকে এ্যাদ্দিন বম্বে ফেলে রাখা আপনার উচিত হয় নি। হাজার হোক প্রথমপক্ষ, দুয়োরাণী হলেও উনি আপনার। যাও বৌমা, কোনো অসুবিধে হলেই আমায় খবর দিয়ো। তারপর, হ্যালো গুড ফেলা বলে অসিতের ছেলেকেও আদর করে নিষ্ক্রান্ত হলেন।

এর পরে আর অসিত রায়কে কখনো দেখি নি, মাঝখান থেকে আমার সংবাদের একটা ভালো সোর্স নষ্ট হলো।

অসিত যদি ব্যক্তিগত জীবনের ব্যাপারে চাপা হয় তো মহিউদ্দিন সাহেবকে বলতে হয় বোকা-হাঁদা; কেবল চুলই পাকিয়েছেন, রেখে-ঢেকে কথা বলতে শেখেন নি। চিকেন বিরিয়ানীর নাম শুনেই আমার জিভে জল এসে গিয়েছিল, আর জানতে আগ্রহ দেখাই নি উপলক্ষ্যটা কি। অনিচ্ছুক ঘোড়াকে জল খাওয়ানোর মতো সুলতানকে হিড় হিড় করে টেনে নিয়ে গেলাম, মুশলিম বাড়িতে সঙ্গে একজন মুশলিম দোস্ত না থাকলে ভরসা পাই কোথায়। যাবার সময় ট্রামে জিজ্ঞেস করছিলাম, হ্যাঁ রে মহিউদ্দিন সাহেবের বয়স কি এত কম হবে? চল্লিশ মোটে? দেখে তো মনে হয়—

—চল্লিশ হতে যাবে কেন রে, গরু।

—কেন, আমি গরু হতে গেলাম কিসে? উনি যে বলছিলেন ফরটিয়েথ—

—হ্যাঁ ফরটিয়েথই তো। তা তুই কি ও'র ফরটিয়েথ বার্থ এ্যানিবার্সারি ভেবেই গিলতে যাচ্ছিলি? আচ্ছা লোভী তো তুই। মহিউদ্দিন বুড়োর ফরটিয়েথ চাইল্ড হলো গেল জুম্মাবার। তা চারটে বিবি, চল্লিশটা ছেলে-মেয়ে তো হবেই—

জুলেখা মারা গেলে নুরুল আর সাদী করতে চায় নি, শহরে গিয়ে মাস্টারী করবে বলে ঠিক করেছিল ও। জুলেখার লেখাপড়া বেশি ছিলো না; কিন্তু ফিরদৌসীর মূল ওমর খৈয়ামটি যার মুখস্থ তার জানার আর বাকি ছিল কী? তাই ছেলে-মেয়ে তিনটি নিয়ে নুরুল শহরে পাড়ি জমাবার ধান্দাতেই ছিলো। খবর পেয়ে হাজী মোতালেব হাঁ হাঁ করে ছুটে এলেন ঃ তুই কি দোজখে যেতে চাস নুরুল, এতগুলো দুধের শিশুকে খতম করতে চাস? দুটো হালের বলদ কিনে নে, সাদী করে ওদের আম্মাজান এনে দে।...বেশ তো, আতাহার আলির মেয়েকেই নিকে কর্ না কেন পয়সার অভাব হবে না মোটে? রমজান আলি তো দুটো বেটি রেখে মাটি নিয়েছে, বিবিটা জোয়ানই আছে। তা আতাহার সওদাগর মানুষ, বেটির নিকেতে খরচা করবে বৈকি। আর তোকে পেলে তো পাঁচ হাজার চাঁদি না চাইতেই দেবে।

নুরুল শেষ পর্যন্ত দ্বিতীয়বার বিয়ে করেছিল কি না জানি না, কিন্তু ওর ইতিহাসের মাস্টার ইদ্রিস মিঞা এসে যখন ওকে বলছিলো ঃ ভুলে যেয়ো না নুরুল, তুমি শাজাহান নও কিম্বা জুলেখাও কিছু আসমান ফুঁড়ে মমতাজ নেমে আসে নি তোমার জন্যে —তখন নাকি ওর চোখ ফেটে পানি পড়েছিলো। বুড়ো ইদ্রিস নাকি আরো বলেছিলো, তা সম্রাট শাজাহানের মতো তোর হারেমটি কোথায় আছে শুনি, কোথায় একশো দাসী-বাঁদী? শরিয়তকে অমান্য করিস, তুই কি মোছলমান, না বেত্মিজ কাফের? বলে গজরাতে গজরাতে স্থান ত্যাগ করেছিল ইদ্রিস মিঞা।

যেমন ইদ্রিস তেমনি রফিক, একই মুদ্রার এ-পিঠ আর ও-পিঠ। শীত-কাল। দাওয়ায় রোদ পোয়াতে পোয়াতে খাচ্ছি বাবা, দিদি আর আমি। এমন সময় 'বাপজানরে' বলে একটা বৌ এসে দাওয়ায় বাবার পিঁড়িতে আছড়ে পড়লো। আমরা কিছু বুঝে ওঠার আগেই রফিক দৌড়ে এসে ডান হাতের তর্জনী তুলে ভূলুণ্ঠিতা বৌকে শুনিয়ে শুনিয়ে বললো ঃ এক তালাক, দুই তালাক, তিন তালাক। যা, দূর হয়ে যা, দোজখের পোক। শুনে বৌটি আরো হু হু করে কেঁদে উঠলো, এগারোটি সন্তান নিয়ে এখন সে কার দুয়ারে যাবে—এই ছিল তার প্রশ্ন। সোয়ামী ভাত চেয়েছিল, কিন্তু সে আগে মেজ ছেলেটিকে গোসল করাতে গেলে সোয়ামী পুকুরপাড় থেকেই তাকে মারতে মারতে তাড়া করে। তারপর ওই কাণ্ড।

নুরুলের কথায় কেন যেন চন্দ্রনাথদা'র কথাও মনে পড়ে গেলো। পাঁচ-ছ'বার ম্যাট্রিকে গাড্ডা মেরে চন্দ্রনাথদা' যেন কী রকমটা হয়ে গিয়ে-

"দাম্পত্য সুখ" (সেকাল)

আর এক সকালে

রাধারমণ প্রামাণিক

সৃষ্টির আলোর থেকে ওরা সময়কে যেন
আপন করে নেয় নি; তবু রাত্তিরের ঘন
মেঘলা অন্ধকারে যে আলো বিবরে বিপন্ন
সন্তর্পণে বেঁচে থাকে তার মতো অকলঙ্ক
ছড়িয়ে দিয়েছে ফুলকাটা হীরকের দীপ
আর হাওয়ার ফানুসে আঁকা বল্গাহীন নদী।

জলের ধারে যে সাদা হাঁস অস্থির উল্লাসে
হাওয়ায় উড়ছে, পীত ঘাসের ওপরে কাঁচা
ফড়িঙের রঙ যতোটুকু সত্য মনে হয়
তার মতো বন্দরের ব্যস্ত জাহাজের ভীড়
আর তার মাস্তুলের মূক মিনারের পর
মস্কো নুয়র্ক লণ্ডন বহুদূরে দেখা যায়
জীবনবীমার মতো জনাকীর্ণ তটভূমি।

জনতার শূন্যতার জনশূন্য পথে ওরা
জন্ম দেয় মৃত্যু দেয়, মুক্তি আর লজ্জাবাস
ছাড়ে না কখনো, সভ্য সমাজের বিদ্রূপের
প্রাত্যহিক ফল পচা ডিম ঘুঁটের ভিতরে,
বিলিতী মদের গন্ধ কুড়নো খাদ্যের গায়ে,
মাছিরা, আর মৃত্যুর পুরোধা কান্নার মতো
শিশুর কণ্ঠের স্বর বিচূর্ণ বালিশে মুখ তুলে
নির্গলিত প্রায় নগ্ন এক দুগ্ধহীন বুকে
লগ্ন হয়ে স্তব্ধ হয়ে যায়, সেখানেও সূর্য
আসে ভোরে, একবার, তারপর বহুবার
শিশুর কান্নার স্বর ফুটপাত শুনে যায়,
প্রতিবেশী সহৃদয় হলে পাঁশুটে রঙের এক
এ্যাম্বুলেন্স আসে আর দুটি শব্দহীন লোক,
মনে হয় একহাতে মৃত্যু ধুয়ে বীতশোক
অন্যহাতে প্রিয়জন পুনর্জন্ম ফিরে পায়।

হল। কারু সঙ্গে কথা বলে না। বার্তা বলে না, ঘর থেকে বেরোয়ই না। বিশেষ। কিন্তু খাওয়ার কামাই নেই, এক সের দুধ ও দুটো কাঁচা ডিম তার নিত্যকার জলখাবার। সারাদিন বই নিয়েই থাকতো, আর সময় পেলেই দুশো করে ডন-বৈঠক দিয়ে নিত। চৈত্র মাসের গাজনের সময় গণক ঠাকুর এসেছেন বাড়িতে, চন্দ্রনাথদা'র মা অনেক করে ছেলেকে রাজী করিয়েছেন হাত দেখাতে। গণক ঠাকুর চন্দ্রনাথদার ডান-হাত বাঁ-হাত, হাতের এ-পিঠ ও-পিঠ, হাতের ওপর থেকে নিচে, আবার নিচে থেকে ওপরে দেখে খ্যাঁচ খ্যাঁচ করে মাটিতে ছক কেটে ফেললেন। তারপর অনেকক্ষণ আপন মনে বিড় বিড় করে হঠাৎ বলে উঠলেন ঃ এ কি, তোমার যে দেখি দুটো বিয়ে চাঁদু! শুনে চন্দ্রনাথদা কী খুশি, যেন সব ব্যামোই সেরে গিয়েছে তার। সে বছরই পরীক্ষায় পাশ করলো ও।

গুণাহ হবে, গুণাহ হবে তোদের আমাকে ফাঁকি দিতে চাইলে। হাজী মোল্লার সঙ্গে বেইমানী করার অর্থ আল্লার সঙ্গে বেইমানী করা। আজানের পর মসজিদ প্রাঙ্গণেই বলছিলেন হাজী মোল্লা। লক্ষ্যস্থল যদিও ইনসাফ করিম তবুও বারো-চোদ্দজন শ্রোতা জুটে গিয়েছিল। তিনটে সন্তান হবার পর বৌকে ইনসাফ হেলথ সেন্টারে নিয়ে গিয়ে জন্ম নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা করে এসেছিল। শুধু হজ করে এসেছি বলেই নয়, গোটা মুশ্লিম দুনিয়ার খবর আমি রাখি, জন্ম নিয়ন্ত্রণ কোনো মুশ্লিম সমাজেই চালু নেই। আল্লার দোয়া যদি তোমরা পেতে চাও, যদি দোজখের শয়তান না হতে চাও, তবে ইশ্লাম-বিরোধী কোনো কাজ তোমরা করবে না। মনে রেখো আর্থিক সঙ্গতির সঙ্গে সন্তান উৎপাদনের সম্পর্ক যারা স্থাপন করতে চায় তারা খোদাতাল্লার ওপরে নয়, কাজেই—

ইনসাফের ধৈর্যচ্যুতি ঘটছিলো, ধুত্তোর সন্তান উৎপাদন। আল্লা কোথাও বলেন নি ছেলে-মেয়েকে না খাইয়ে রাখতে, কথায় কথায় বিবিকে তালাক দিতে। বেরিয়ে এলো সে ডাক্তার সুলেমানকে নিয়ে। হাজী মোল্লা নাকি তাতেও নিরুৎসাহ না হয়ে বলে চলেছিল ঃ প্যান ইশ্লামের শক্তি যদি বাড়াতে হয়, যদি তার দুনিয়ার শ্রেষ্ঠ ধর্মের মর্যাদা লাভ করতে হয়, তবে তার সংখ্যাগত শক্তি বাড়াতে হবে। সংখ্যালঘু হয়ে থাকাটা বেওকুফি।

আল্লার বাণীকে পুরাপুরি মেনে চললেই বেহেস্তে যাওয়া সম্ভব, নইলে দোজখে পচতে হবে। ইয়াদ রাখতে হবে, চারটে করে বিবি চাই, বাচ্চা পয়দায় কসুর নাই...

ছকু মিঞা বিড়ির দোকানটি নানীর জিম্মায় দিয়ে নামাজ পড়তে গিয়েছিল, দেরি করতে পারছিলো না সে। তা হাজী মোল্লার কথা শুনে ফস করে লতিফ সাহেবকে বলে উঠলো ঃ পয়দা তো করেছিলাম আটটা, তা ছ'টা না খেতে পেয়ে ম'লো। মোল্লাছাহেব কি তাদের খানা দিয়েছিলেন...

বৃদ্ধ লুৎফর দাড়িতে হাত বুলিয়ে বললো ঃ মোল্লাছাহেব কি আরেকটা পাকিস্তান বানাতে চান?

—মোল্লাসাহেব নয়, গভর্ণমেন্টই চান। হোয়াই নট ইণ্ডিয়া ম্যারেজ এ্যাক্ট, ফর একজাম্পল? ইকনমিক্সের ছাত্র সামসুল বলেছিল।

দাড়ি কামাবার উদ্যোগ করছিলাম, এমন সময় প্রায় হন্তদন্ত হয়ে জয়ন্ত এসে হাজির, এক মুখ দাড়ি ওরও। কিছুদিন পড়িয়েছিলাম ওকে, গেল বছর বিয়ে করেছে এক বড় ঘরে। বস্তুত বিয়ের পর ওর সঙ্গে এই প্রথম দেখা হওয়ায় আমি ওর সমাদরের জন্যে একটু ব্যস্ত হয়ে পড়েছিলাম। আরে দেখবে এসো, জয়ন্ত এসেছে। রান্নাঘরের দিকে গলা বাড়িয়ে আমি হাঁক দিয়েছিলাম। দেখি, জয়ন্তের অস্থিরতা এতে একটু বেড়ে গেলো। শ্রীমতী এসে বললো ঃ ওমা তাই তো, তা একা কেন?

—আর বলবেন না বৌদি। আমার আবার একটার সময় সিক্সথ ইয়ারের ক্লাশ—একটু চা হবে বৌদি?

বুঝলাম, শ্রীমতীর উপস্থিতি জয়ন্তের বাঞ্ছনীয় নয়। ও রান্নাঘরে চলে গেলে জয়ন্ত আমার পা দুটোকে প্রায় জড়িয়ে ধরে বললো ঃ আমি মুশ্লিম হবো, মাস্টারমশাই, আপনি ব্যবস্থা করে দিন, প্লীজ!

অত্যন্ত বিস্মিত হলাম। তাহলে ইউনিভার্সিটি রিপোর্টার ঘোষ জয়ন্তকেই মীন করছিলো সেদিন। ঘোষ বলছিলো ঃ ইকনমিক্স-এর এক ছোকরা প্রফেসর তাঁর এক ছাত্রীকে বিয়ে করার জন্য ইশ্লাম এমব্রেস করতে চাইছে। ভদ্রলোক মাত্র বছর-খানেক আগে বিয়ে করেছেন......

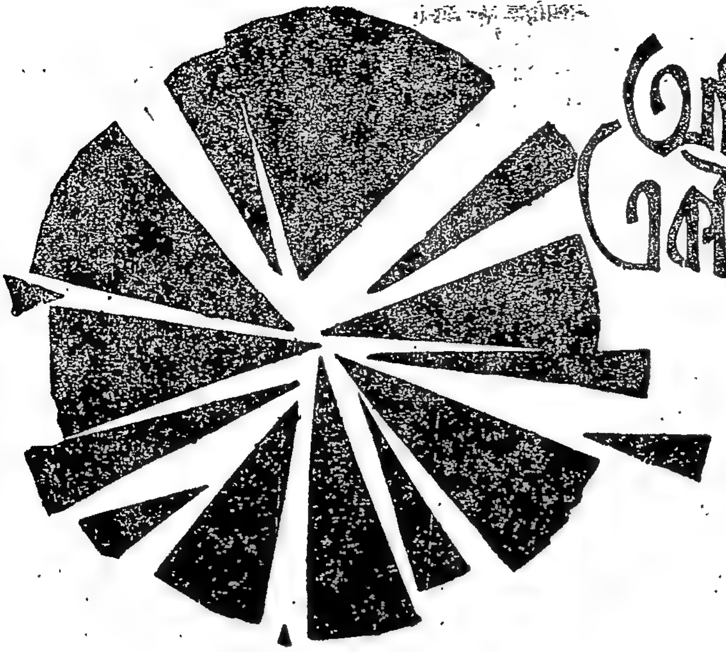

অগ্নিযুগের একটি অধ্যায়

অনন্ত সিংহ

(৬) অন্যান্য ঘাঁটি

অন্যান্য ঘাঁটি সম্বন্ধে বহু পূর্ব থেকেই আমাদের সাধারণ রিপোর্ট ছিল। জেল ও ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্ক সম্বন্ধে আমরা আর বিশেষ তথ্য সংগ্রহ করতে কাউকে নিয়োগ করি নি। তার কারণ, প্রথমত আমাদের লোকবল ও অস্ত্রবল যা' ছিল তার ওপর নির্ভর করে এই দুটি টার্গেট প্রথম আক্রমণের পর্যায় থেকে বাদ দিয়েছিলাম। দ্বিতীয়ত আমরা স্থির জানতাম যে এই দুটি স্থান থেকে সরকার কোনমতেই সশস্ত্র প্রহরী সরাতে পারবে না। তৃতীয়ত, আমাদের সুস্পষ্ট ধারণা ছিল যে যদি আমরা শত্রুর প্রধান দুটি ঘাঁটি সম্পূর্ণভাবে দখল করতে পারি তবে এই সব ছোট ছোট শত্রুকেন্দ্রগুলি বিনা বাধায় আত্মসমর্পণ করবে। আমরা মেগাফোনে আত্মসমর্পণ করবার আদেশ ঘোষণা করলে মুহূর্তে তারা যে তা পালন করবে তাতে আমাদের কোন সন্দেহ ছিল না।

এইরূপ বাস্তব ধারণার ওপর ভিত্তি করে ও আমাদের লোকবল ও অস্ত্রবলের বাস্তব পরিপ্রেক্ষিতে আমরা অন্যান্য ছোট ছোট কেন্দ্রগুলিকে প্রথম আক্রমণের লক্ষ্য বলে মনে করি নি।

কিন্তু পাহাড়তলী ওয়ার্কশপে ও ডবল মুরিং জেটিতে যে দুটি অস্ত্রাগার ছিল সে দুটি সম্বন্ধে আমরা উদাসীন ছিলাম না। সেই দুটি অস্ত্রাগারের নিখুঁত সংবাদ আমাদের আগে থেকে জানা ছিল। সুবোধ চৌধুরী রেলের ক্লাস কোয়ার্টারে থাকত তাই তার পক্ষে এই অস্ত্রাগার সম্বন্ধে জানা খুব সহজ ছিল। তা ছাড়া এই আর্মারীর তথ্য খুব ভালভাবে জানা ছিল। তার কারণ আমার দাদা, শ্রীনন্দলাল সিং, সেই ওয়ার্কশপে কাজ করতেন। তার কাছ থেকে অনেক আগেই সব তথ্যই সংগ্রহ করা হয়েছিল।

ডবল মুরিং জেটি সুপারিন্টেন্ডেন্টের ছেলে, ননী দেব আমাদের সশস্ত্র আক্রমণে অংশ গ্রহণ করেছিল; বহু আগে থেকেই তার মারফৎ আমাদের এই অস্ত্রাগার সম্বন্ধেও সব খবর জানা ছিল। অভ্যুত্থানের পর যখন আমাদের মামলা চলেছিল তখন ও পরে অনেকের কাছে মন্তব্য শুনেছি যে ডবল মুরিং জেটির অস্ত্রাগার সম্বন্ধে আমরা কোন খোঁজ রাখি নি তাই ১৮ই এপ্রিল রাত্রেই জেলাশাসকগোষ্ঠী প্রতি-আক্রমণ করবার সুযোগ পায়। যাঁরা এই দুটি বাস্তব তথ্য জানতেন না তাঁদের সেইরূপ ভুল ধারণা হওয়া খুবই সম্ভব। তাঁরা জানতেন না আমাদের অস্ত্রবল ও লোকবলের সঠিক অবস্থা—আর জানতেন না যে এই দুটি অস্ত্রাগারের খবর আমাদের একেবারে নখদর্পণে ছিল।

তারপর অনেকের ধারণা যে আমরা সমুদ্রগামী জাহাজের বেতারযন্ত্র সম্বন্ধে অজ্ঞ ছিলাম। সমুদ্রগামী স্টীমারের বেতার ব্যবস্থা সম্বন্ধে সাধারণ লোকও অবিদিত নন। চট্টগ্রাম বন্দরে সচরাচর ক'টি জাহাজ থাকে ও ক'টিতে বেতার যন্ত্র আছে তার সংবাদ সংগ্রহ সুকঠিন কাজ ছিল না। তা ছাড়া আক্রমণের ঠিক ধার্য সময়ে বেতারযন্ত্র ধ্বংস করা মোটেই একটা কঠিন কাজ নয়। প্রথম সারির একটি বিপ্লবী সৈন্যকে যদি এই কাজে নিযুক্ত করা সম্ভব হোত তবে মাত্র একটি হাত-বোমার সাহায্যে সে এই ছোট্ট কাজ সফলতার সঙ্গেই করত। স্টীমারে বেড়াতে যাওয়া খুব একটা কঠিন কাজ ছিল না। তবে কেন আমরা স্টীমারের বেতারযন্ত্র বিকল করতে কোন ব্যবস্থা করি নি?

থিওরীতে আমাদের সব জানা সত্ত্বেও সেইরূপ ব্যবস্থা না করতে পারার একটিমাত্র কারণ—আমাদের প্রথম পর্যায়ের শত্রুঘাঁটিগুলি আক্রমণের ব্যবস্থা করার পর ফার্স্ট র‍্যাঙ্কিং প্রথম সারির উপযুক্ত কর্মী আর কেউ বাকি ছিল না বা পর্যাপ্ত পরিমাণে অস্ত্রের ব্যবস্থাও আমরা করতে পারি নি।

(৭) ইউরোপীয়ান ক্লাব

নির্বিচারে ইংরেজ হত্যার প্রোগ্রাম। ঝটিকা বেগে আকস্মিক আক্রমণ করে চট্টগ্রাম শহর দখল করে অস্থায়ী বিপ্লবী সরকার গঠন করার যে রণ-নীতি, তার সঙ্গে এইরূপ নিষ্ঠুর প্রতিহিংসাপরায়ণ প্রোগ্রামের প্রত্যক্ষ যোগাযোগ ছিল না। তবু প্রতিহিংসার বদলে প্রতিহিংসা; নির্দয় নরহত্যার বদলে তাণ্ডব হত্যালীলা; ক্ষমাহীন দয়াহীন, মায়াহীন নরমেধ যজ্ঞে নির্মম প্রতিশোধ নেওয়ার প্রোগ্রাম আমাদের আক্রমণ প্ল্যানের অঙ্গীভূত হয়েছিল। এই সম্বন্ধে

চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত তখনও নেওয়া হয় নি।

তবু চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত সাপেক্ষে, 'ক্লাবগৃহ' ও সেখানে উচ্চপদস্থ সাহেবদের গতিবিধি সম্বন্ধে বিশদ সংবাদের আমাদের প্রয়োজন ছিল। ক্লাব গৃহটি ও তার পারিপার্শ্বিক অবস্থা ও অবস্থান পরিদর্শন ও সংবাদ সংগ্রহের জন্য আমরা বাছাই করে নরেশ রায়কে দায়িত্ব দিয়েছিলাম।

আমাদের পরিকল্পনা ছিল—পালাবার পথ রুদ্ধ করে বোমা, বন্দুক, রিভলভার প্রভৃতি দিয়ে আকস্মিক ক্ষিপ্রতার সঙ্গে ক্লাবে মিলিত ইংরেজদের ওপর আক্রমণ চালাবো। তারপর জালিয়ানওয়ালাবাগের পাশবিক নরহত্যার উপযুক্ত জবাব দেব। বড় ফলাওয়ালা কুঠার, ভোজালী ও তরবারি দিয়ে নির্বিচারে মরা-আধমরা সাহেবদের অতি নির্দয়ভাবে খণ্ড-বিখণ্ড করব। আজ শুনে সবাই হয়ত মনে করবেন এ আমাদের বড় বাড়াবাড়ি! এতটা আবার সভ্যতা বিরোধী। ভারতবর্ষ ধর্মের দেশ। ধর্ম, সংস্কৃতি, সভ্যতা ভারতবর্ষ কখনও বিসর্জন দিতে পারে না। এই নীতি-কথা শুনে শুনে আমাদের কান একেবারে ঝালাপালা হয়ে গিয়েছিল। আমরা বৃটিশ সরকারের নিষ্ঠুর নির্মম পাশবিক অত্যাচারের জবাবে যীশুখৃস্টের বাণী বা শ্রীচৈতন্যের প্রেম বা গৌতম বুদ্ধের 'জীবে দয়া' প্রচার করা নিষ্ফল মূর্খতা বলে মনে করেছিলাম। বৃটিশ, তাদের মিশনারী মারফৎ যীশুর ধর্ম প্রচার করে ভারতবাসীকে 'জীবে দয়া' ও প্রেমের বাণী শেখাতে চেষ্টা করছে: আর অন্য দিকে তারা বৃটিশ শাসন বজায় রাখার জন্য কামান, বন্দুক প্রভৃতি আমদানী করে নৃশংস হত্যাকাণ্ড চালিয়ে যাচ্ছে। প্রেম, ভালবাসা, মায়া প্রভৃতি ভারতবাসী যত পারে শিখুক কিন্তু যীশুর সেবক ইংরেজদের অবাধ অধিকার রইল ভারতবাসীর ওপর চরম নির্যাতন চালাবার।

ইংরেজ দস্যু ভারতবর্ষকে শাসন ও শোষণ করতে এসেছে। ভারতবাসীর ওপর প্রভুত্ব বজায় রাখবার জন্য সভ্যতার আদর্শের খাতিরে তারা কখনও চরম নৃশংসতা থেকে বিরত থাকে নি। 'চোরা না শোনে ধর্মের কাহিনী!' ধর্মের ভয়ে বৃটিশ শত্রুদের ক্ষমা করা আমাদের দুর্বলতা ছাড়া আর কিছুই নয়। 'কাকুতি' 'মিনতি' 'ধর্ম' 'ক্ষমা' প্রভৃতি আপন দুর্বল মনকে সান্ত্বনা দেওয়ার পক্ষে প্রযোজ্য, কিন্ত অত্যাচারী বিদেশী সরকারের নির্মম নিষ্পেষণের কাছে তা হাস্যাস্পদ—তারা অন্যের অগোচরে ভারতবাসীর মূর্খতার প্রশংসা করেছে; কিন্তু ধর্মভীরু ভারতবাসীর ধর্মপ্রাণের বিশালতাকে কখনও মর্যাদা দেয় নি। তাই প্রবল বৃটিশ শত্রু বুঝুক আমরা তাদের অত্যাচারের বিনিময়ে সনাতন ধর্মের বাণী প্রচারের জন্য আর প্রস্তুত নই—তাদের বুকের তপ্ত শোণিতে তর্পণ করব—তাদের মনে প্রাণেও বিভীষিকার সৃষ্টি করব!

এই দৃষ্টিভঙ্গীই সেই যুগে আমাদের উদ্বুদ্ধ করেছে নির্বিচারে ইংরেজ হত্যার সক্রিয় পরিকল্পনা গ্রহণ করতে। তাই ক্লাব গৃহটির সম্বন্ধে বিস্তারিত সংবাদ—দরজা, জানলা, বারান্দা, টেবিল, চেয়ার, ঘর, রান্নাঘর, স্নানের ঘর, লোকজন, ইলেকট্রিক বাতি ও পাখা সুইচ বোর্ড, আসা যাওয়ার বিভিন্ন পথ প্রভৃতির সব খবরই প্রয়োজন। তা ছাড়া জেলা-প্রধানরা কারা কখন আসে, কতক্ষণ থাকে, কে কোন গাড়ি ব্যবহার করে, কতজন লোক, পাহারার কিরূপ ব্যবস্থা, বডিগার্ড থাকে কি না, কেউ রিভলভার পিস্তল সঙ্গে রাখে কি না—ইত্যাদি অনেক খবর চাই।

আমাদের মত নরেশেরও বেশ অভিজ্ঞতা হোল। প্রথমে তার কাছে যেন সব অন্ধকার! ইউরোপীয়ান ক্লাব —শহরের এক প্রান্তে। বড় বড় ইংরেজ মার্চেন্ট ও জেলা-প্রধানদের সমাগম এই ক্লাবে। এই এলাকায় কোন বাঙালীর যাতায়াতের কারণ ছিল না। বিশেষত অপ্রত্যাশিত বাঙালী যুবকের গতিবিধি সহজেই সন্দেহের উদ্রেক করবে তাতে আর অনিশ্চয়তার কিছু ছিল না। তবু নরেশের সেখানে যেতে হবে—তথ্য সংগ্রহ করতে হবে।

হিন্দু যুবকের বেশে সেখানে যাওয়া নরেশ যুক্তিযুক্ত মনে করে নি। একজন সাধারণ মুসলমানের বেশে সে সন্ধ্যার সময় ক্লাবের কাছে গেল। বিভিন্ন মোটর গাড়ির ড্রাইভারদের সে দূর থেকে দেখতে পায়। তাদের মধ্যে একজনকে সে চিনতে পারে। সে কিন্তু হিন্দু। সেই ড্রাইভারের বাড়িও ময়মনসিং জেলার একটি গ্রামে—নরেশের বাড়ির কাছে। মুসলমান বেশে নরেশকে দেখলে তার পাছে সন্দেহ হয় তাই নরেশ দূরে সরে গেল।

নরেশ বুদ্ধি আঁটলো এই ড্রাইভারের সঙ্গে ব্যক্তিগতভাবে খাতির করে নেবে—অবশ্য মুসলমান পোষাকে নিশ্চয়ই নয়। দু-একদিনের মধ্যে সফলতার সঙ্গে নরেশ ড্রাইভারের সাথে মিশে গেল এবং উদ্দেশ্য গোপন রেখে সাহেবদের 'বল ডান্স' প্রভৃতি দেখল, দিনে ও রাত্রে ড্রাইভারের সঙ্গে ক্লাব ঘর ঘুরে ঘুরে দেখে সব তথ্য সংগ্রহ করল। পনেরো দিনের মধ্যে নরেশ তার রিপোর্টও দাখিল করল।

আমাদের প্রিন্টেড জাজমেন্ট কপির ৭৩ পৃষ্ঠা থেকে উদ্ধৃত করছিঃ

"Naresh Roy was wearing a khaki shirt, khaki shorts and stockings (Ex. CCLI series). In his pocket were found two plans of the European Club, Chittagong [Ex. LVIII and LVIII (I)] showing the position of all the rooms, doors and windows. Hem Gupta showed them on the hill to Mr. Lowis (P. W. 23) and Mr. Johnson (P.W. 21)."

হেম গুপ্ত সাব-ইন্সপেক্টার জালালাবাদ যুদ্ধে ধৃত নরেশ রায়ের পকেট হতে ইউরোপীয়ান ক্লাব ঘরটির দুটি নক্সা উদ্ধার করেছিল। তাতে বেশ দেখানো ছিল—ক'টি ঘর, দরজা ও জানলা আছে এবং ঐগুলির অবস্থান অর্থাৎ কোন ঘরটির সঙ্গে আর একটি কিভাবে সংলগ্ন এবং জানলা দরজা আক্রমণ করবার সময় কিভাবে সার্থকতার সঙ্গে ব্যবহার করা যায়, ইত্যাদির উল্লেখ ছিল। জজসাহেব সেই নক্সাই নরেশ রায়ের পকেটে পাওয়া গেছে বলে লিখলেন।

চূড়ান্ত প্ল্যান

চট্টগ্রাম শহর দখল করা ও সেখানে ভারতের প্রথম অস্থায়ী বিপ্লবী গণতন্ত্র সরকার স্থাপন করার প্ল্যানটি জেলে থাকার সময় থেকে সাধারণভাবে গণেশের মাথায় ছিল। তারপর যখন আমরা চূড়ান্তভাবে প্ল্যানটিকে কার্যকরী করে তুলতে চাইলাম, তখন অনিবার্য প্রয়োজনের তাগিদে প্রথমেই সমস্ত প্রধান প্রধান সামরিক ও পুলিশঘাঁটি এবং তৎসংশ্লিষ্ট ছোটখাটো পুলিশ ফাঁড়ি, বন্দুকের দোকান, ব্যাংক, জেল প্রভৃতির অত্যাবশ্যক বিশদ সংবাদ সংগ্রহের কাজে হাত দিলাম। পনেরো দিনের মধ্যেই এই সমস্ত সংবাদ সংগ্রহ করার জন্য বিভিন্ন গ্রুপকে দায়িত্ব দেওয়া হল, তা আগেই বলেছি। প্রয়োজনীয় সমস্ত তথ্য সংগৃহীত হয়েছে এবং সেই সঙ্গে আমাদের লোকবল ও অস্ত্রের সংখ্যাও জানা

আছে। 'লোকবল' বলতে বুঝতে হবে—

(ক) কতজন সভ্য প্রথম আক্রমণ করার জন্য প্রথম সারিতে অংশ গ্রহণের উপযুক্ত।

(খ) কতজন দ্বিতীয় সারির উপযুক্ত সভ্য।

(গ) কতজন আক্রমণের সময় খুব কাছাকাছি স্থানে রিজার্ভ ফোর্সে অংশ গ্রহণ করার জন্য তৃতীয় সারির উপযুক্ত সভ্য।

(ঘ) আর কতজন মিলিটেন্ট (তেজী) যুবক ও ছাত্র যুদ্ধ জয়ের পর প্রথম আহবানের সঙ্গে সঙ্গেই এসে বিপ্লবী গণতন্ত্র বাহিনীতে যোগ দেবার মত চতুর্থ সারির উপযুক্ত সভ্য।

প্ল্যানটিকে চূড়ান্ত রূপ দিতে প্রধানত প্রথম ও দ্বিতীয় সারির বিপ্লবী যুবকদের সংখ্যার উপর নির্ভর করতে হয়েছিল। গোপনে পর্যাপ্ত পরিমাণে অস্ত্র যোগাড় করার আর বেশি সময় ছিল না বলে তখন পর্যন্ত আমরা আর বেশি অস্ত্র যোগাড় করতে পারি নি। যা ছিল তার উপরই নির্ভর করে আমাদের গণতন্ত্র বাহিনীর সৈন্যদের মধ্যে কেবলমাত্র প্রথম ও দ্বিতীয় সারির যুবকদের সজ্জিত করা সম্ভব হয়েছিল।

তৃতীয় সারির যুবকদের আক্রমণ ও অস্ত্রাগার দখল করার আগে কোন প্রকার আগ্নেয় অস্ত্র দেওয়া সম্ভব হয় নি। কাছাকাছি স্থানে তাদের বিভিন্ন ছোট ছোট দলে ভাগ করে গোপনে তৈরি রাখার ব্যবস্থা করা হয়েছিল। এই সব গোপন স্থান ছিল আক্রমণ করার ঘাঁটির চারপাশে। তন্ন-তন্ন করে পরিদর্শন করার পরই চূড়ান্তভাবে স্থির করতে হয়েছিল কাদের বা কোন দলটিকে যোগ্যতা অনুযায়ী কোথায় থাকার ব্যবস্থা করা হবে।

চতুর্থ সারির যুবকদের সংখ্যা আমাদের আন্দাজে প্রায় পাঁচশত হবে বলে মনে হয়েছিল। কোন বাস্তব ভিত্তি ছাড়া এইরূপ আন্দাজ আমরা করি নি। সব সময়ে আমাদের সঙ্গে যুব সংগঠনে, শক্তিচর্চার ক্লাবে, প্রদর্শনীতে, ভলান্টিয়ারদের শিক্ষা-শিবিরে, কংগ্রেসের নির্বাচন দ্বন্দ্বে ও বিভিন্ন সমগ্র গুণ্ডাদমন ব্যাপারে যে সব ছাত্র ও যুবকদের সক্রিয় অংশ গ্রহণ করতে দেখেছি তাদের অগ্রণী অংশকে বিপ্লবী সৈন্যবাহিনীতে পাব বলে অনুমান করেছিলাম। তাই তাদের সংখ্যার আন্দাজ পাওয়াটাও আমাদের পক্ষে খুব কঠিন ছিল না। চট্টগ্রাম শহর দখল করার পর প্রথম দিন কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই এই সংখ্যার সৈন্য ভারতীয় গণতন্ত্র বাহিনীতে ভর্তি করা, অস্ত্রাদি দিয়ে তাদের সুসজ্জিত করা ও তাদের শিক্ষা দেওয়ার ব্যবস্থা করার দায়িত্ব প্রচুর ও খুব কঠিন কাজ। তার জন্যও আমাদের একটা মোটামুটি ধারণা ছিল ও মনে মনে তারও একটা খসড়া প্ল্যান করে রেখেছিলাম।

চূড়ান্তভাবে সামগ্রিক প্ল্যানটির রূপ দেওয়ার সময় আমাদের মধ্যে দুটি বিষয়ে মতভেদ দেখা দিল। প্রথম প্রশ্নটি উঠল স্ট্রাটেজী নিয়ে—সম্পূর্ণভাবে শহর দখল করার জন্য সমস্ত শক্তি নিয়োগ করব, না কি এই মূল স্ট্রাটেজীতে খুঁত রেখে দিয়েও, ইউরোপীয়ান ক্লাব আক্রমণ করবার জন্য একটি প্রবল শক্তিশালী নির্ভীক যুবক দল deploy (অন্যত্র নিযুক্ত) করা হবে?

আমার বক্তব্য ছিল স্ট্রাটেজিক প্ল্যান (চূড়ান্তভাবে শহর দখল) করার মধ্যে কোনরূপ খুঁত যেন না থাকে। আমার বন্ধু গণেশ নিজে স্ট্রাটেজিস প্ল্যানের স্রষ্টা। আমার চিন্তাধারা ছিল "গেরিলা যুদ্ধ" চালিয়ে যাওয়া ও যতদিন পারা যায় চট্টগ্রামের পর্বতশ্রেণী আমাদের Base (প্রধান ঘাঁটি) হিসাবে ব্যবহার করা। আজকের দিনে ভাবলে হয়ত শেষের প্রস্তাবটি অনেকের ভাল লাগবে। কিন্তু সেইদিন আমি গণেশের সঙ্গে আলোচনা করে তার প্রস্তাবেই একমত হয়েছিলাম। অস্থায়ী বিপ্লবী সরকার প্রতিষ্ঠা করা, যতদিন পারা যায় তাকে রক্ষা করা—এবং শেষ পর্যন্ত TO DIE AT THE POST (নিজের স্থানে দাঁড়িয়ে মরা) যখন গণেশের কাছ থেকে এই প্ল্যানটি শুনি, তখন আমি অভিভূত হয়ে পড়েছিলাম। কী চমৎকার! একসঙ্গে তৈরি হোলাম, একসঙ্গে আক্রমণ চালালাম, জয়ী হোলাম, বিপ্লবী অস্থায়ী সরকার স্থাপিত হোল, চট্টগ্রাম শাখার ভারতীয় গণতন্ত্র বাহিনী তাকে রক্ষা করবে যতদিন পারে—আর তারপর একসঙ্গে দাঁড়িয়ে মরবে তাদের নিজ নিজ POST-এ! একসঙ্গে এসেছিলাম—একসঙ্গে একটি দুর্ধর্ষ বিপ্লবী দল সৃষ্টি করেছিলাম—একসঙ্গে যুদ্ধে প্রাণ দিলাম, কেউ আর বেঁচে রইল না! বেঁচে থাকার প্ল্যান থাকলেই পেছু টান থাকবেই, তারপর কে জানে বেঁচে থেকে কে কি করবে? কে কোথায় যাবে? এই প্ল্যানে দুর্বলতার সুযোগ কারো থাকবে না! যার বিশ্বাসঘাতক হওয়ার সম্ভাবনা সেও মরবে একসঙ্গে! দুজনে একমত হয়ে মাস্টারদাকে গিয়ে গণেশের প্ল্যানটি বলেছিলাম। মাস্টারদাও বিনা দ্বিধায় তা' সর্বান্তঃকরণে সমর্থন করেছিলেন।

সেদিন গণেশ বলল,—ইউরোপীয়ান ক্লাব আক্রমণ করতেই হবে, এতদিনের বৃটিশ অত্যাচারের প্রতিশোধ নিতেই হবে। তারা যেন ভাবতে না পারে "কালা আদমীরা নিজেরা লড়াই করে মরছে—আমাদের গায়ে হাত তুলতে তারা সাহস পাবে না।" তাই গুরুত্ব, গণেশের দাবি ইউরোপীয়ান ক্লাব আক্রমণের পরিকল্পনাটিকেও আমাদের সামগ্রিক প্ল্যানের অংগীভূত করতে হবে। সেইজন্য আমরা যদি শত্রুঘাঁটি সবগুলিকে প্রথম চোটে আক্রমণ করতে না পারি তবুও আমাদের প্ল্যানে "ইউরোপীয়ান নিধন যজ্ঞ" যোগ করতে হবে।

আমার মতে এই "নিধন যজ্ঞ" আরম্ভ করব পরে—আগে নয়। সব শত্রুঘাঁটি আগে আক্রমণ করে দখল করব—স্ট্রাটেজিক প্ল্যানে কোন খুঁত রাখব না—যতদূর সম্ভব [illegible] সুনিশ্চিত করতে হবে প্রথমেই। [illegible] আমাদের সব চেয়ে [illegible] করা দশ বারো জনের সশস্ত্র একটি গ্রুপ ক্লাবে পাঠাতে হয় তবে আমরা আর ডবল মুরিং জেটি (চট্টগ্রাম সামুদ্রিক বন্দরের একটি অংশ) ও পাহাড়তলীর অস্ত্রাগার দুটি আক্রমণ ও দখল করার পরিকল্পনা প্রথম আক্রমণ তালিকার অংগীভূত করতে পারছি না। গণেশ এই দুটি অস্ত্রাগার আক্রমণের ব্যবস্থা পরে করতে রাজী তবু "ইউরোপীয়ান নিধন যজ্ঞ" প্রথম তালিকার অন্তর্ভুক্ত করার প্রয়োজন যুক্তি দিয়ে বোঝাতে লাগল।

প্রশ্ন খুব গুরুতর!

আমাদের দুজনের চিন্তা দুটি ভিন্ন ধারায় বইছে। মন থেকে কোনমতেই গণেশের যুক্তি মানতে পারছিলাম না। মাস্টারদা, অম্বিকাদা, নির্মলদা আমাদের এইরূপ গুরুতর প্রশ্নে মতভেদ দেখে খুব অস্বস্তি অনুভব করছিলেন। আমরা কেউই এই মূল প্রশ্নে আপোষ করতে চাইছিলাম না। এই প্রশ্ন নিয়ে আমাদের খুব গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা হোল তিন দিন ধরে অনেক সময় নিয়ে। আমাদের সঙ্গে এরূপ গুরুতর

মন আজ খুশীতে ভরা
শরীর যদি ভাল থাকে তাহলে ভ্রমণের জন্য মানুষ আনন্দে মেতে ওঠে প্রকৃতির সৌন্দর্য উপভোগ করবার জন্য।
আপনিও স্বাস্থ্য ভাল রাখার জন্য সাধনার অব্যর্থ মহৌষধ প্রতিদিন আহারের পর দুইবার করে দু'চামচ মৃতসঞ্জীবনীর সঙ্গে চার চামচ মহাদ্রাক্ষারিষ্ট (৬ বৎসরের পুরাতন) খাবেন। এতে ক্লান্তি দূর করে, খিদে ও হজমশক্তি বাড়ে, সর্দি কাশি থেকে রেহাই পাবেন।
সাধনা ঔষধালয় ঢাকা
অধ্যক্ষ ডাঃ যোগেশ চন্দ্র ঘোষ, এম-এ, আয়ুর্বেদশাস্ত্রী, এফ,সি,এস,.(লণ্ডন), এম,সি,এস, (আমেরিকা), ভাগলপুর কলেজের রসায়ণ শাস্ত্রের ভূতপূর্ব অধ্যাপক।
কলিকাতা কেন্দ্র ডাঃ নরেশ চন্দ্র ঘোষ, এম-বি, বি-এস, আয়ুর্বেদাচার্য্য।
৩৬, সাধনা ঔষধালয় রোড
সাধনা নগর, কলিকাতা ৪৮

আলোচনা ইতিপূর্বে বা পরে আর কখনও হয় নি। একেবারে শেষ সময়—আক্রমণের মাত্র কয়েকদিন আগে এই ধরণের স্ট্রাটেজী নিয়ে আমার ও গণেশের মতভেদ সবাইকে খুব বিচলিত করেছিল তাতে সন্দেহ নেই। তবু সমস্যার সমাধান না করলেই নয়। তাই আলোচনা চল্‌ল।

গণেশের প্রধান যুক্তি হোল—নিখুঁতভাবে, কোন বিচ্যুতি ছাড়া প্ল্যান অনুযায়ী সমস্ত ঘাঁটি ও শহর দখল করা যাবেই—এইরূপ নিশ্চিত ভবিষ্যদ্বাণী আমরা কেউই করতে পারছি না। একেবারে ত্রুটিহীনভাবে জয়ের নিশ্চয়তা সম্বন্ধে পূর্বাহ্নে যখন ভবিষ্যদ্বাণী করতে পারি না, তখন সেইরূপ অনিশ্চিত ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে দৃষ্টি রেখে প্ল্যানের প্রথম আক্রমণ তালিকা থেকে দুশ বছরের ইংরেজ নৃশংসতার 'উপযুক্ত প্রতিশোধ ব্যবস্থা' কোন মতেই বাদ দেওয়া যায় না। গণেশের মতে ধূর্ত ইংরেজ যদি একবার সচকিত হয়ে যায় তবে তাদের খুঁজে পাওয়া কষ্টসাধ্য হবে। তাই প্রথম চোটে আকস্মিক ও অপ্রত্যাশিত আক্রমণ করলে তাদের সবাইকে আমরা একসঙ্গে একস্থানে, ইউরোপীয়ান ক্লাব গৃহে পাবো। তবেই চারিদিক দেওয়ালে ঘেরা, বন্ধ-দুয়ার, জালিয়ানওয়ালাবাগের হাজার ভারতবাসীর হত্যার বদলা নিতে পারব ইংরেজের বুকের রক্তে!

এই প্রস্তাবে যেমন যুক্তি ছিল, তেমনি আবার ইংরেজের বিরুদ্ধে ক্রোধ ও প্রতিহিংসার sentiment-ও (ভাবপ্রবণতা) প্রকাশ পাচ্ছিল এ কথা সত্য। কিন্তু সে যুগের বাস্তব পরিপ্রেক্ষিতে ইংরেজের বিরুদ্ধে এই প্রতিশোধপরায়ণ ভাবপ্রবণতাও আর একটি যুক্তি; একে ভাবপ্রবণতা বলে আজ যাঁরা অস্বীকার করতে চাইবেন আমার মনে হয় তাঁরা ভারতের বিপ্লবী আন্দোলনের ক্রমবিকাশের ধারাটিকেই অস্বীকার করবেন।

তবু কিন্তু তখন আমার মন কোনমতেই গণেশের এই প্রস্তাবে সায় দিতে চায় নি। হতে পারে আমি একেবারে obsessed অর্থাৎ এই মনোভাবে আচ্ছন্ন ছিলাম যে আক্রমণ একেবারে ত্রুটিহীন হবে, সব ঘাঁটি দখল করতে পারব এবং শত্রুকে ঝটিকাবেগে আকস্মিক আক্রমণ করে প্রথম চোটেই পরাস্ত করতে পারব।

মাস্টারদা আমাকে বহুবার একান্তে ও আমাদের অনেকের সামনে জিজ্ঞাসা করেছেন—"তুই রেল কোম্পানীর অর্থ লুঠ করার সময় যেভাবে জোর দিয়ে বলেছিলি তেমন দ্বিধাহীনভাবে আমাদের সামগ্রিক আক্রমণের জয় সম্বন্ধে একবারও কি সুনিশ্চিতভাবে বলতে পারিস?" আমি প্রত্যেকবার মাস্টারদাকে বিশেষ জোরের সঙ্গে উত্তর দিয়েছি—"আমার নিজের মুখ যেমন স্পষ্ট দর্পণে দেখি, ঠিক তেমনি, চোখের সামনে দেখছি প্রথম আক্রমণে আমরা জয়ী হবই। প্রত্যেকটি শত্রু-ঘাঁটি আমরা দখল করতে পারবই—এতে আমার বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই। তবে আমি বলতে পারছি না এই প্রথম জয়ের পর ঘটনার গতি কি মোড় নেবে! পরের অবস্থা এখন থেকে সঠিক বলা যাচ্ছে না। কারণ আমাদের মধ্যে দুর্বল চিত্তের যুবকও আছে।"

মাঝে মাঝে গোপন বৈঠকে মাস্টারদা ও গণেশের কাছে আমাদের মধ্যেকার দুজন যুবক সভ্যের মানসিক দুর্বলতা সম্বন্ধে উল্লেখ করেছি। আমরা প্রত্যেকের সম্বন্ধে কষ্টিপাথরে যাচাই করে দেখেছি আক্রমণের ঘাঁটিগুলির গুরুত্ব অনুযায়ী কার কতখানি যোগ্যতা আছে। সেই সময় এই দুজন সম্বন্ধে আমার সুনিশ্চিত মত জানিয়েছিলাম যে জীবিত ধরা পড়লে তারা যে স্বীকারোক্তি দেবে না তা আমি বলতে পারছি না। তবে আমি খুব জোরের সঙ্গে প্রতিবারই মত জানিয়েছি যে বর্তমানে তারা পুলিশের চর নয় এবং আগে থেকে যে বিশ্বাসঘাতকতা করবে না সেই সম্বন্ধে আমি একেবারে নিঃসন্দেহ। আমাদের সবার কাছে সেই কথাটি ছিল প্রথম—আগে ধরা পড়ছি না তো?

ঘটনা ঘটে যাওয়ার পর এতজনের মধ্যে যদি কেউ জীবিত ধরা পড়ে তবে তখন যে যাই করুক না কেন তাতে সফলতার কোন ব্যাঘাত হওয়ার সম্ভাবনা নেই। পরের অধ্যায়ে এমনও হতে পারে যে কেবল তারা দুজন অথবা তাদের মধ্যে কেউ নয় বরং অন্য কেউ বিশ্বাসঘাতকতা করবে। বলা বাহুল্য সেইরূপ অবস্থার জন্য বিপ্লবী সংঘ বর্তমান ও ভবিষ্যতে সদা সর্বদা প্রস্তুত থাকবে। প্রশ্ন—আশু অভ্যুত্থানের, অর্থাৎ আকস্মিক ব্যাপক আক্রমণের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত আমরা পুলিশের তীক্ষ্ম দৃষ্টির অগোচরে সর্বতোভাবে প্রস্তুত হতে পেরেছি কি না এবং তাদের অজ্ঞতার সম্পূর্ণ সুযোগ নিয়ে সফলতার সঙ্গে প্রথম assault (আক্রমণ) পরিচালিত করা আমাদের পক্ষে সম্ভব হচ্ছে কি না? প্রথম ব্যাপক আক্রমণের সফলতা সম্বন্ধে আমি নিঃসন্দেহ ছিলাম। তাই বোধহয় গণেশের বা আর কারোও অনিশ্চয়তার আশংকা আমার মনে রেখাপাত করতে পারে নি এবং সেই কারণে গণেশের স্ট্রাটেজীর আংশিক পরিবর্তন প্রস্তাব আমার পক্ষে মেনে নেওয়া কোনমতেই সম্ভব হচ্ছিল না। অম্বিকাদা ও নির্মলদা তিন দিন ধরে আমাদের সুদীর্ঘ আলোচনার মাঝখানে খুব সামান্যই যোগ দিয়েছিলেন। মাস্টারদা এই তিন দিনই আমাদের দুজনের যুক্তি খুব মন দিয়ে শুনেছেন। একটিবারও তিনি আমাদের আলোচনার মাঝখানে হস্তক্ষেপ করেন নি—পাছে এই গুরুতর সমস্যার বাস্তব সিদ্ধান্তে পৌঁছতে আমরা বিভ্রান্ত হই। সর্বশেষে যখন মাস্টারদা বুঝতে পারলেন যে আমরা দুজনের কেউই নিজ মত পরিবর্তন করতে পারছি না তখন তিনি তাঁর মত জানালেন।

খুব ধীরে ধীরে অথচ বিশেষ জোরের সঙ্গে তাঁর বক্তব্য এইভাবে বললেনঃ—

"তিন দিন ধরে আমরা এই দীর্ঘ আলোচনা শুনলাম। এইরূপ গুরুতর রণ-নীতির প্রশ্নে তোমাদের দুজনের খোলাখুলি আলোচনা ও তোমাদের নিজ মতের পক্ষে যুক্তি শোনা আমাদের একান্ত প্রয়োজন ছিল। সবদিক ভেবে ও বিশেষ চিন্তা করে আমি বর্তমান অবস্থায় গণেশের পরিবর্তিত স্ট্র্যাটেজিক প্ল্যান পুরোপুরি সমর্থন করছি।

"আমার মনে হয় গণেশ যা বলছে তাতে যুক্তি আছে। একেবারে ত্রুটিহীনভাবে প্রথম আক্রমণ চালিয়ে সফল হবই—এইরূপ ধারণার ওপর নির্ভর করে কোন স্ট্রাটেজী গ্রহণ করা উচিত নয়। ভবিষ্যতের অনিশ্চিত ঘটনার জন্য প্রস্তুত থাকা একান্ত প্রয়োজন। তাই গণেশের বিকল্প প্ল্যানের যৌক্তিকতা আমাদের অস্বীকার করা উচিত নয়। আমার মনে হয় বিকল্প প্ল্যানের দুর্বলতা থাকা সত্ত্বেও এই যুগে বর্তমানে আমাদের প্রথম চোটে ইউরোপীয়ান ক্লাব আক্রমণ করবার ব্যবস্থা করতে হবে। আমরা কোনমতেই ইংরেজদের সুযোগ দেব না—পাছে তারা প্রথম আক্রমণের সংবাদ পেয়েই উধাও হয়, তাই প্রথম চোটেই 'ক্লাব' আক্রমণ করতে হবে।

"আমাদের অবর্তমানে ভবিষ্যৎ বিপ্লবী ভারতবাসীর কথা স্মরণ করেই আমি এই 'নিষ্করুণ ও নিষ্ঠুর' প্ল্যান সমর্থন করছি। ইংরেজের রক্তধারায়

চট্টগ্রামের রাজপথ প্লাবিত হউক। দু'শ বছরের পৈশাচিক হত্যা তাণ্ডবের প্রায়শ্চিত্ত তাদের করতেই হবে। দুষ্টের দমন চাই। বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের ইংরেজ অনুচরদের প্রতি কোন ক্ষমা, একটুও অনুকম্পা, সামান্যতম করুণা প্রকাশ বিপ্লবীদের পক্ষে অপরাধ। আমরা তো মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যদেবের আদর্শে উদ্বুদ্ধ হই নি। তাই আমাদের যুব অভ্যুত্থানের পর যদি চট্টগ্রামের ইংরেজ শাসকগোষ্ঠী বহালতবিয়তে বেঁচে গিয়ে নৃশংস অত্যাচারের সুযোগ পায় তবে বিপ্লবী সমাজ আমাদের ধিক্কার দেবে। কোনমতেই সে সুযোগ তাদের দেব না। মায়াহীন দয়াহীন এক বিভীষিকাময় ইংরেজ-হত্যা লীলার প্রয়োজন আছে। ইংরেজ দস্যুকে বুঝতে হবে চরম নিষ্ঠুরতার একচেটিয়া অধিকার কেবল তাদেরই নেই —আমাদেরও আছে। ইংরেজের সঙ্গে কোন আপোষ নেই। তাদের সঙ্গে বন্দী বিনিময় বা প্রাণ বিনিময়ের কথা ওঠে না। কে কাকে কত নৃশংসভাবে হত্যা করতে পারি তার প্রতিযোগিতা চাই। ইংরেজের পশু-শক্তির তাণ্ডব ক্ষমাধর্মে নির্বাপিত হবে না। সেই জঘন্য পাশবিক শক্তিকে একমাত্র চরম নিষ্ঠুরতা স্তব্ধ করতে পারে। দুর্বল মনের ক্ষমার বিলাস আমাদের বিপ্লবী অভিধানে স্থান পায়, তা' আমার ইচ্ছে নয়। আমরা চাই গান্ধীজীর অহিংসাবাদের বেদীতে রক্তক্ষরা বিপ্লবের ইতিহাস রচনা করতে। অবাস্তব গান্ধীবাদের অহিংস নীতি আমরা কৌশল হিসাবে ব্যবহার করেছি ও করবও। কিন্তু বিপ্লবী ভারতকে রাজনৈতিক ক্ষেত্রে অহিংসাবাদের অবাস্তব ও মিথ্যা প্রভাব থেকে মুক্ত করতে হবে...। আশা করি অনন্ত আমার মত সমর্থন করবে। আমার ইচ্ছা গণেশের এই বিকল্প স্ট্রাটেজী চূড়ান্তভাবে আমরা গ্রহণ করি।"

মাস্টারদা এইভাবে তাঁর বক্তব্য শেষ করলেন। নির্মলদা ও অম্বিকাদা মাস্টারদার প্রস্তাব মেনে নিলেন—কোন প্রতিবাদ করেন নি। আমারও আর কোন প্রতিবাদ করবার ইচ্ছা হ'ল না। মাস্টারদা যে দৃষ্টিভঙ্গী ও যুক্তিধারা গণেশের প্রস্তাবের পক্ষে অবতারণা করলেন তাতে নূতন কিছুই ছিল না, যা তিন দিন ধরে সুদীর্ঘ আলোচনার মধ্যে গণেশ বলে নি। তবু তাঁর ধীর স্থির সমর্থন বিকল্প প্ল্যানের প্রয়োজনীয়তা ও গুরুত্ব অনেকখানি বাড়িয়ে দিল। তাই এতক্ষণ গণেশের কথায় আমি রাজী না হলেও মাস্টারদার এই সন্ধিক্ষণের নির্দেশ দ্বিধাহীন চিত্তে মেনে নেওয়া বিপ্লবী দায়িত্ব বলে মনে করেছিলাম। আমি বিনা দ্বিধায় মত দিলাম—বিকল্প প্ল্যান মেনে নিলাম।

আক্রমণের স্ট্রাটেজী নিয়ে এই প্রথম প্রশ্ন সমাধান হওয়ার পর দ্বিতীয় প্রশ্নটি উঠল। এই দ্বিতীয় প্রশ্নটিকে সামগ্রিক আক্রমণের কৌশল সম্বন্ধীয় বিষয় বলে ধরা যায়। চট্টগ্রাম শহরটিকে প্রথম আক্রমণের সঙ্গে সঙ্গে বহির্জগৎ থেকে বিচ্ছিন্ন করার উদ্দেশ্য ছিল। বিশেষ করে সৈন্যবাহী ট্রেনের গতিপথ রুদ্ধ করে শত্রুপক্ষের প্রতি-আক্রমণকে যতদূর সম্ভব পেছিয়ে দেওয়া একান্ত প্রয়োজন বলে মনে করি। সেইজন্য Zero hour-এ (ঠিক ধার্য সময়টিতে), রেল লাইন উৎপাটন করে দুটি স্থানে ট্রেন লাইনচ্যুত করবার সব রকম ব্যবস্থা ঠিক হওয়ার পর প্রশ্ন উঠলঃ— আমাদের প্রথম আক্রমণের সঙ্গে সঙ্গে বা ঠিক পরের ট্রেন দুটিকেই যদি লাইনচ্যুত করা হয় তবে শিকার হবে দুটো যাত্রীবাহী ট্রেন। মালবাহী ট্রেন আমাদের সামগ্রিক আক্রমণের প্রায় দু'তিন ঘণ্টা পরে সেই দুটি স্থান দিয়ে (যেখানে রেললাইন উৎপাটিত হবে) অতিক্রম করবে। এখন আমাদের চূড়ান্ত সিদ্ধান্তে উপনীত হতে হবে —যাত্রীবাহী ট্রেন অতিক্রম করে যাওয়ার পর রেল লাইন উৎপাটন করে মালবাহী ট্রেন লাইনচ্যুত করবার নির্দেশ দেব, না কি সামগ্রিক আক্রমণের 'জিরো আওয়ার' অতি কঠোরতার সঙ্গে অনুসরণ করে যাত্রীবাহী ট্রেনই লাইনচ্যুত করা হবে?

সামগ্রিক আক্রমণের রণ-নীতির সঙ্গে জড়িত এই রণকৌশল নিয়েও আমার ও গণেশের মধ্যে মতভেদ দেখা দিল। গণেশ খুব কঠোরতার সঙ্গে 'জিরো আওয়ার' অনুসরণ করার সিদ্ধান্ত বহাল রাখতে দৃঢ় মত প্রকাশ করে। তার প্রধান যুক্তি হোল—

(১) হয়ত প্যাসেঞ্জার ট্রেন অতিক্রম করার পর সংক্ষিপ্ত সময়ের মধ্যে লাইন উৎপাটন করা নাও যেতে পারে।

(২) আমাদের সামগ্রিক আক্রমণের পরে জেলা-শাসকরা যে কোনভাবে টেলিগ্রাফ বা বেতারে বা মোটর যোগে কুমিল্লা প্রভৃতি সংলগ্ন জেলা থেকে কলকাতা সরকারী দপ্তরে খবর পাঠাবে।

(৩) ধরে নেওয়া যায় যে রেল-কর্তৃপক্ষ শহর অধিকৃত হওয়ার খবর শীঘ্রই পেয়ে যাবে। তেমন ক্ষেত্রে তারা সমস্ত ইঞ্জিন ড্রাইভারকে সতর্কতার সঙ্গে ট্রেন চালাবার নির্দেশ যে দেবে না সেরূপ ভাবা আমাদের উচিত হবে না।

(৪) এই সব অনিশ্চয়তা যখন আছে তখন আমাদের নিছক sentimental কারণে (ভাবপ্রবণতার জন্যে) যাত্রীবাহী ট্রেন লাইনচ্যুত করার সিদ্ধান্ত বাতিল করাতে কোন যৌক্তিকতা নেই। তা'ছাড়া লাইনচ্যুত হলেই যাত্রীদের সমূহ প্রাণহানির কথা আমরা ভাবছি কেন? দুই বিপরীতগামী চলন্ত ট্রেনের সংঘর্ষ বা ডিনামাইট প্রয়োগে ট্রেন বিধ্বংস যে ভয়াবহ ক্ষতি করে কেবল লাইনচ্যুত ট্রেনে সেরূপ ক্ষতির আশঙ্কা নেই। আমাদের সামগ্রিক প্ল্যান অনুযায়ী ট্রেন লাইনচ্যুত করাকে রণনীতি মনে না করে রণকৌশল ভাবা মূলত ভুল হবে। সৈন্যবাহী ট্রেনের গতিপথ রুদ্ধ করে শত্রুর প্রতি-আক্রমণের বিলম্ব ঘটানো সামগ্রিক প্ল্যানের 'রণ-নীতি'—'রণ-কৌশল' নয়। তাই সময় মত ট্রেন লাইনচ্যুত করাটা সুনিশ্চিত করতে হবে। ভাবপ্রবণতার কারণবশত কোন অনিশ্চয়তার মধ্যে আমাদের থাকা উচিত হবে না।

গণেশের এইসব যুক্তির তাৎপর্য এক কথায় উড়িয়ে দেওয়া যায় না। আমি তার সব যুক্তি বিচার করে দেখার পরও ভিন্ন মত ব্যক্ত করলাম। আমি কোনমতেই যাত্রীবাহী ট্রেন লাইনচ্যুত করবার পক্ষপাতী ছিলাম না। তবে ভাবপ্রবণতা আমার মনে কখনও প্রাধান্য লাভ করে নি। এই প্রশ্নে আমার অভিমত যা ছিল নিম্নে দিলাম ঃ—

ঠিক "জিরো আওয়ারে" অন্তত ট্রেন লাইনচ্যুত করাটা 'অতি অবশ্য প্রয়োজন' বলে মনে করা উচিত হবে না। সৈন্যবাহী ট্রেনের গতি রোধ করার পূর্বাহ্নে যদি লাইন উৎপাটন সম্ভব হয় তাহলেই আমাদের উদ্দেশ্য সফল হচ্ছে। তাই আমি হিসেব করে দেখলাম, আমাদের প্রথম আক্রমণের পর কর্তৃপক্ষ যত তাড়াতাড়িই করুক না কেন, যে কোন সৈন্যবাহী ট্রেনেরই লাকসাম পেঁছিতে খুব কম পক্ষে অন্তত চোদ্দ ঘণ্টা সময় লাগবে। তারপর বিনা বাধায় যদি লাকসাম জংসন থেকে চট্টগ্রাম পর্যন্ত রেল লাইন অতিক্রম করে আসতে পারে তবে তাদের কম পক্ষে আরও পাঁচ ঘণ্টা লাগবে। জেলা কর্তৃপক্ষ আমাদের প্রথম আক্রমণের পর ছত্রভঙ্গ ও বিহ্বল হয়ে পড়বে। তারা টেলিগ্রাম বা ট্রাঙ্ক-টেলিফোনে ঢাকা ও কলকাতার সঙ্গে সংযোগ স্থাপনের চেষ্টা করবে। কিন্তু প্রথম আক্রমণের পাঁচ মিনিট পূর্বেই আমরা টেলিফোন ও টেলিগ্রাফ অফিস

ধ্বংস করা সাব্যস্ত করেছি। যদি কোন আকস্মিক কারণবশত টেলিগ্রাফ অফিস ধ্বংস করা নাও হয় তবু আমরা শহরের কয়েক স্থানে টেলিগ্রাফ তার কাটার ব্যবস্থা করেছি। সেই ক্ষেত্রে ধরে নেওয়া যায় কর্তৃপক্ষ নিজেদের সামলে নিয়ে স্টীমারে রক্ষিত বেতারে খবর পাঠাবার চেষ্টা করলেও দু' ঘণ্টার আগে তা' করতে পারছে না। তারপর কলকাতার কর্তৃপক্ষ খবর পাওয়ার পর প্রদেশের শাসক প্রধানরা মিলিত হবে এবং খবর যাচাই করবে। খবর পেয়ে তাদের পরামর্শ বৈঠক শেষ হতে অন্তত আরও দু' ঘণ্টা সময় লাগবে। এই চার ঘণ্টা অতিবাহিত হওয়ার পর তাদের সৈন্যবাহিনীর দপ্তরে আদেশ পৌঁছবে। সেই আদেশ অনুযায়ী সৈন্যদের খুব তাড়াতাড়ি প্রস্তুত করে যাত্রা করতে হলে অন্তত আরও দু' ঘণ্টা লাগবে। তারপর গোয়ালন্দ পর্যন্ত যাওয়ার জন্য সঙ্গে সঙ্গেই সৈন্যদের স্পেশাল ট্রেন যোগাড় থাকবে কি না সে সম্বন্ধে খুবই সন্দেহ আছে। আর যদি ধরে নেওয়া যায় স্পেশাল ট্রেন প্রস্তুত থাকবে তবুও গোয়ালন্দ পৌঁছতে তাদের অন্তত আরও চার ঘণ্টা সময়ের প্রয়োজন। এই ভাবে যদি সব ব্যবস্থা তারা তড়িৎ-গতিতে সম্পন্ন করতে পারে তবুও দেখা যাচ্ছে দশ ঘণ্টা অতিবাহিত হওয়ার আগে তারা কোনমতে গোয়ালন্দ পর্যন্ত পৌঁছতে পারছে না। যদি ইতিমধ্যে কোন স্পেশাল স্টীমার গোয়ালন্দ ঘাটে প্রস্তুত রাখা তাদের পক্ষে সম্ভব হয় (যা সম্ভব নয়) তবু ট্রেন থেকে নেমে স্টীমারে ওঠার পর স্টীমার ছাড়া পর্যন্ত এক ঘণ্টা সময় কমপক্ষে লাগবেই। তারপর আরও এক ঘণ্টা লাগবে চাঁদপুর পৌঁছাবার পর স্টীমার থেকে কোন স্পেশাল ট্রেনে সৈন্যদের স্থানান্তরিত করতে। চাঁদপুর থেকে লাকসাম জংসন পৌঁছতে আরও দু' ঘণ্টা—এই মোট চোদ্দ ঘণ্টার আগে কোন সৈন্যবাহী ট্রেনই লাকসাম জংসন পর্যন্ত পৌঁছাতে পারছে না। তবে আমার সুনিশ্চিত ধারণা যে ভাবে আমি শত্রুর দ্রুত গতিবিধির হিসাব দিলাম তারা কোনমতে অতখানি যন্ত্রের মত কাজ করে যেতে পারে না। তবু যদি তর্কের খাতিরে ধরে নেওয়া যায় যে সৈন্যবাহী ট্রেন একেবারে তড়িৎ বেগে এসে পড়বে, তবু হিসাবে দেখা যাচ্ছে লাকসাম জংসন পর্যন্ত চোদ্দ ঘণ্টার আগে তাদের পৌঁছান কিছুতেই সম্ভব হচ্ছে না। এই কারণে লাইন উৎপাটনের জন্য 'জিরো আওয়ার' প্রযোজ্য নয়।

দ্বিতীয় যুক্তি—রেল কর্তৃপক্ষ শহরের ঘটনা জানতে পেরে সমস্ত ইঞ্জিন-ড্রাইভারকে পূর্বাহ্নেই সতর্ক করে দেবে। সেইক্ষেত্রে ড্রাইভারদের সতর্কতার জন্য ট্রেন লাইনচ্যুত হওয়া অনিশ্চয়তার মধ্যে থাকে। এই সম্বন্ধেও বিশ্লেষণ করে আমার মত জানালাম যে রেল কর্তৃপক্ষ বা সরকার বা সামরিক কর্তৃপক্ষ শহরের ঘটনা জানার পর বুদ্ধি খাটিয়ে আগাম ভেবে নেবে যে ট্রেন লাইনচ্যুত করা হবে এবং তাই ট্রেন-চালকদের সতর্ক করে দেবে, এইরূপ ধারণা হওয়ার সংগত কারণ আছে বলে আমার মনে হয় না। তা'ছাড়া যদি ধরেও নিই যে কর্তৃপক্ষ খবর পেয়ে আলোচনা সমাপ্ত করে সেইরূপ নির্দেশ ট্রেন-ড্রাইভারদের পাঠাবে, তবু তা' কি পাঁচ ছয় ঘণ্টার আগে সম্ভব?

এই প্রশ্নটি নিয়ে আমাদের প্রশ্নের মত সুদীর্ঘ আলোচনা হয় নি। প্রায় তিন ঘণ্টা আলোচনার পর আমার মতটি গণেশ মেনে নিল; মাস্টারদা, নির্মলদা ও অম্বিকাদাও সমর্থন করলেন।

এই প্রসঙ্গে আমার সামান্য একটু বলার আছে। জটিল প্রশ্নে ও রণনীতি সম্বন্ধে গুরুতর মতভেদ থাকা সত্ত্বেও যখন আলোচনার পর সিদ্ধান্ত নেওয়া হ'ল তখন মূল প্ল্যানটিকে সফল করার জন্য আমাদের কারও কোন শিথিলতা ছিল না। এইরূপ মতভেদ আমাদের কখনও দুর্বল করে নি। মরণপণ করা সক্রিয় বিপ্লবী পার্টির মধ্যে সমস্যা সমাধানের পথে প্রকৃত মতভেদ স্বাস্থ্যের লক্ষণ। ত্রুটিহীন সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়ার জন্য আমার ও গণেশের রণ-নীতি ও রণ-কৌশলের সাময়িক মত-পার্থক্য, সব বিষয়টি সব দিক থেকে দেখবার জন্য আমাদের সাহায্য করেছিল। তারপর সব বুঝে সুঝে গৃহীত চূড়ান্ত সিদ্ধান্তগুলি মনে অসীম আস্থা আনতে সাহায্য করল।

(ক্রমশঃ)

বৈষ্ণব-সাহিত্যের অমূল্য অবদান

ভক্তিজগতের কৌস্তুভরত্ন, ভগদ্ভক্তগণের সাধনার ধন, ভক্তের তুলসী-মালা সদৃশ মহাপবিত্র ভক্তিশাস্ত্র সমন্বয়।

বৈষ্ণব গ্রন্থাবলী

শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রলাপ ও শিক্ষাষ্টক

শ্রীচৈতন্যদেবের শ্রীকৃষ্ণলাভের জন্য যে কণ্ঠা, এই 'প্রলাপে' তাহা অভিব্যক্ত। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শ্রীমুখনিঃসৃত 'শিক্ষাষ্টক শ্লোকই' তাঁহার একমাত্র রচনা। শ্রীল কৃষ্ণদাস গোস্বামীর সুললিত পদ্যানুবাদে এই অমিয় মাধুরী লীলায়িত।

নরোত্তম বিলাস

...গণের পরম উপভোগ্য উপজীব্য ভক্তিচরিতামৃত।

দুর্লভসার

...তন্যমঙ্গল-রচয়িতা শ্রীল লোচনদাস বিরচিত, বৈষ্ণবগণের সংপূজিত।

আত্মতত্ত্ব

...নের সূক্ষ্মতম অনুসরণ।

মনঃশিক্ষা

শ্রীপ্রেমানন্দ দাস ঠাকুর বিরচিত। বৈষ্ণব-সিদ্ধান্ত, সাধন-ভজনের নিগূঢ় মর্মসমাহিত।

শ্রীচমৎকার চন্দ্রিকা

পরম পণ্ডিত শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী প্রণীত সংস্কৃত গ্রন্থ হইতে তাঁহার সুযোগ্য শিষ্য পরম বৈষ্ণব শ্রীল কৃষ্ণদাসের সুললিত পদ্যানুবাদ।

পাষণ্ড-দলন

মূর্তিমান বৈরাগ্য শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর বিরচিত প্রেমভক্তির লহর-লীলা।

ভক্তিতত্ত্বসার

হাটপত্তন, শ্রীশ্রীগুরুবন্দনা, নাম-সংকীর্তন, চৌত্রিশ পদাবলী, শ্রীকৃষ্ণের অষ্টোত্তর শতনাম, নরোত্তম দাসের প্রার্থনা, প্রেমভক্তি চন্দ্রিকা। সুলভে নামমাত্র মূল্যে বিতরিত।

মূল্য ঃ ৩ টাকা।

...তী প্রাইভেট লিমিটেড ঃ ১৬৬, বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী স্ট্রীট, কলি-১২

বঙ্গদর্শন

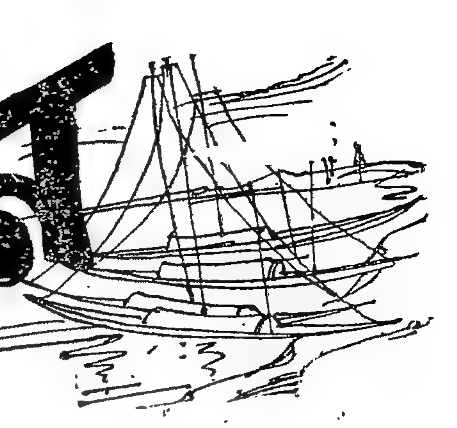

বিগত সপ্তাহটি অজস্র ঘটনার দ্বারা চিহ্নিত ছিল। ঘটনাগুলির চরিত্র অবশ্য সকল ক্ষেত্রেই এক। তা হচ্ছে বিক্ষোভ। গত উনিশ বছরের ইতিহাসে সমাজের নানান স্তরের মানুষের এমনতরো বিক্ষোভের সম্মুখীন সরকারকে আর কখনো হতে হয় নি।

বস্তুত সর্বস্তরেই বিক্ষোভ। অশিক্ষক কলেজ-কর্মীরা ধর্মঘট করেছেন। প্রাইভেট কলেজগুলির দুয়ার বন্ধ, ফলে ক্লাস বন্ধ, ভর্তি বন্ধ। এ ধর্মঘটের যে আশু সমাধান হবে তার কোন সম্ভাবনা নেই কেন না কলেজ-কর্মীদের দায়িত্ব কেউ নিতে চাইছেন না—না কলেজ কর্তৃপক্ষ, না বিশ্ববিদ্যালয়, না মঞ্জুরী কমিশন, না সরকার।

স্বর্ণশিল্পীরা দিনের পর দিন সত্যাগ্রহ চালিয়ে গিয়ে অবশ্য গত ৩রা সেপ্টেম্বরের ঘোষণায় কিছুটা স্বস্তিবোধ করছেন। যে আইনের উদ্দেশ্য সম্পূর্ণরূপে ব্যর্থ হয়েছে, সরকার আর ঝামেলা না বাড়িয়ে সেই আইন প্রত্যাহার করে নিয়ে কিছুটা সুবুদ্ধির পরিচয় দিয়েছেন।

ইতিমধ্যে মিষ্টান্ন ব্যবসায়ীরাও একদিন প্রতীক ধর্মঘট করেছিলেন। দুগ্ধ সংগ্রহের অজুহাতে সরকার এই শ্রেণীটিকে বৃত্তিচ্যুত করেছেন ফলে এই শিল্পে নিয়োজিত হাজার হাজার কারিগর বেকার হয়েছেন। অথচ সরকারের দুগ্ধ প্রকল্প মোটেই সাফল্যলাভ করে নি। বেলগাছিয়া কারখানায় প্রস্তুত সরকারী ঘৃতের চাহিদা প্রচুর হওয়া সত্ত্বেও প্রয়োজনীয় দুধের অভাবে সরকার উৎপাদনের পরিমাণ কমিয়ে দিয়েছেন। মিষ্টান্ন নিয়ন্ত্রণ আইনের সিদ্ধান্তটাই অবিবেচনা-প্রসূত, এ নিয়ে আমরা পূর্বেও বঙ্গদর্শনে বিস্তৃত আলোচনা করেছি।

অধ্যাপকেরা অবস্থান ধর্মঘট করলেন গত শনিবার ২৭শে তারিখে। তাঁদের দাবি সকলের জন্য সমান হারে বেতনক্রম। প্রস্তাবিত বেতনতালিকায় তাঁদের মধ্যে শ্রেণীভেদ করা হয়েছে ফলে অধ্যাপকেরা ক্ষুব্ধ হয়েছেন। তাঁরা বৃহত্তর আন্দোলনে নামবার কথা চিন্তা করছেন।

তার আগের সপ্তাহে শনিবার-রবিবার ২৪ ঘণ্টা সরকারী কর্মচারীরা অবস্থান ধর্মঘট করেছেন, কেন না সরকার প্রদত্ত নতুন স্কেলের ফাঁক ও ফাঁকি তাঁরা উপলব্ধি করতে পেরেছেন। তাঁরা জল চান মরীচিকা চান না। তাঁদের দাবি, বেতনক্রম এমন হোক যাতে খেয়ে-পরে বাঁচতে পারা যায়, কর্মক্ষমতা বজায় রাখা যায়।

উত্তরবঙ্গে দার্জিলিং, ডুয়ার্স ও তরাই অঞ্চলের চা বাগানের শ্রমিকদের ধর্মঘট অবশ্য প্রত্যাহৃত হয়েছে। গত সপ্তাহের বঙ্গদর্শনে এ নিয়ে কিছুটা আলোচনা করা হয়েছে। গত ২৯ তারিখ থেকে পরিবহন ধর্মঘট শুরু হয়ে গেছে—লরী, টেম্পো ইত্যাদি। মাধ্যমিক শিক্ষকেরা আগামী ১০ই সেপ্টেম্বর থেকে আন্দোলনে নামবেন বলে ঘোষণা করেছেন।

বস্তুত যাঁরা আজ বেঁচে থাকার দাবিতে বিক্ষোভ জানাচ্ছেন, ধর্মঘট করছেন, সত্যাগ্রহ করছেন তাঁদের দাবিগুলি এমন কিছু প্রকাণ্ড নয়। যাঁরা আন্দোলনে নেমেছেন তাঁদের কাছেও আন্দোলনটা খুব সুখাবহ ব্যাপার নয়, আর তাছাড়া এই ব্যাপারে ঝুঁকিও কম নয়। কিন্তু দ্রব্যমূল্য যেভাবে দিনের পর দিন বেড়ে চলেছে তাতে বাঁধা আয়ের লোকেরা জীবন-সংগ্রামে কিছুতেই টিকে থাকতে পারছেন না। নিরুপায় হয়ে তাঁরা চরম পথ অবলম্বন করতে বাধ্য হচ্ছেন।

আজ সরকারের সামনে দুটোমাত্র পথ পড়ে আছে, হয় দ্রব্যমূল্য কমিয়ে জনসাধারণের ক্রয়ক্ষমতা বাড়াতে হবে, না হয় বেতন বাড়াতে হবে, এবং বেসরকারী স্তরেও যাতে বেতন বাড়ে সে চেষ্টা করতে হবে। নতুবা এই সব বিক্ষিপ্ত ঘটনা থেকেই দেশব্যাপী যে আন্দোলন গড়ে উঠবে তার সংগে মোকাবিলা করা সরকারের পক্ষে দুষ্কর হবে। আগুন জ্বলে ওঠার আগেই তা নিভিয়ে ফেলা ভাল।

প্রাথমিক ও প্রাক প্রাথমিক শিক্ষাপ্রসারের শোচনীয় চিত্র

পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভার এস্টিমেট কমিটির অষ্টম রিপোর্টে রাজ্যের প্রাক্ প্রাথমিক, প্রাথমিক ও বুনিয়াদী শিক্ষাব্যবস্থার অগ্রগতির এক শোচনীয় চিত্র পেশ করে কমিটি দুঃখের সংগে বলতে বাধ্য হয়েছেন যে প্রাক্ প্রাথমিক শিক্ষার উপর যতটা গুরুত্ব আরোপ করা উচিত ছিল তা করা হয় নি এবং এই ব্যাপারে কোন সুস্থ নীতি অনুসৃত হচ্ছে না। প্রাথমিক শিক্ষা বিস্তারের চিত্রও অতীব শোচনীয় কেন না ১৯৬৩ সালের প্রাথমিক শিক্ষা আইন দ্রুত কার্যকর করার জন্য ব্যবস্থা অবলম্বন করা হয় নি। কর্পোরেশন পরিচালিত প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলির শিক্ষাধারার সংগে সরকারী শিক্ষাবিভাগের নীতির মধ্যে সমন্বয়ের অভাব বিদ্যমান। এ কথাটা অবশ্য জেলা পর্যায়ের প্রাথমিক শিক্ষা সম্বন্ধেও প্রযোজ্য। কমিটি বুনিয়াদী শিক্ষার অগ্রগতির ব্যাপারেও আদৌ সন্তুষ্ট নন।

আমাদের দেশের শিক্ষাব্যবস্থার সবচেয়ে বড় গলদ হল যে এ ব্যাপারে সরকারের তরফে কোন ঐকান্তিক আগ্রহ নেই। সরকার শিক্ষাক্ষেত্রে যে ব্যয় করেন না তা নয়, কিন্তু যথাযোগ্য পরিকল্পনার অভাবে শেষ পর্যন্ত তা অপব্যয়েই দাঁড়ায়। বিনা ব্যয়ে প্রাথমিক শিক্ষাদানের ব্যবস্থা আজও পর্যন্ত এ দেশে সম্ভব হল না। সরকারী পরিকল্পনাগুলিতে শিক্ষাখাতে বরাদ্দের পরিমাণ যৎসামান্য। যেটুকু বরাদ্দ আছে, তাও সার্থকভাবে ব্যয় করা হয় না। শিক্ষাক্ষেত্রে যেন একটা নৈরাজ্যবাদ চলছে। প্রাক্ প্রাথমিক, প্রাথমিক মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষাক্রমের মধ্যে কোন সামঞ্জস্য নেই। এত অবৈজ্ঞানিক সিলেবাস কোন সভ্যদেশে অনুসরণ করা হয় না। শিশুবয়স থেকেই শিক্ষা

শিক্ষার্থীর নিকট একটি ভীতিজনক বিষয়ে পরিণত হয়েছে। শিক্ষার যেটা মূল উদ্দেশ্য, শিক্ষণীয় বিষয়ের প্রতি শিক্ষার্থীর মনে আগ্রহ সৃষ্টি করা, সে রকম কোন ব্যবস্থা এদেশে নেই। বেশির ভাগ ছাত্রের কাছেই পড়াশোনা একটি বোঝাস্বরূপ।

পূর্বকথায় আবার ফিরে আসা যাক। কমিটির রিপোর্টে আরও একটি বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে। সেটি হচ্ছে একালের হঠাৎ হওয়া বড়লোকেদের জন্য বিলাতী কায়দার প্রাক প্রাথমিক ও প্রাথমিক বিদ্যালয়সমূহ। এখানে ছাত্রদের কাছ থেকে প্রচুর বেতন নেওয়া হয়। এই সব বিদ্যালয়গুলি সরকারের কাছ থেকে কোন আর্থিক সাহায্য গ্রহণ করে না বলে এগুলির উপর সরকারের কোন নিয়ন্ত্রণ নেই। কমিটি গভীর উদ্বেগের সঙ্গে লক্ষ্য করেছেন যে আজকাল উচ্চ আয়সম্পন্ন অভিভাবকেরা এই সব বিদ্যালয়ে ছেলে-মেয়েদের ভর্তি করে থাকেন। কোনরকম নিয়ন্ত্রণ ছাড়াই যদি এইভাবে চলতে থাকে, তাহলে ধনী ও দরিদ্রের জন্য দু রকম শিক্ষাব্যবস্থা চালু থাকবে।

বস্তুত বিলাতী কায়দার ইস্কুল খোলা আজ একটি লাভজনক কারবারে পরিণত হয়েছে। আগেও এই জাতীয় কয়েকটি বিদ্যালয় ছিল এবং এখনো আছে যেগুলি একটি নির্দিষ্ট পাঠক্রমের ভিত্তিতে উচ্চশিক্ষার সঙ্গে সঙ্গতি রেখে জুনিয়ার কেম্ব্রিজ ইত্যাদি স্বীকৃত পরীক্ষায় ছাত্র-ছাত্রীদের অবতীর্ণ করতে এবং বর্তমানে সেকেন্ডারী বোর্ড পরিচালিত উচ্চতর মাধ্যমিক কোর্সের সঙ্গে খাপ খাইয়ে নিয়েছে। এদের শিক্ষাদানের মাধ্যম ইংরাজী ভাষা। এসব জায়গায় ভর্তি হবার আগে অভিভাবকের পকেটের দিকটা ভাল করে যাচাই করা হয় এবং বর্তমান সমাজে অর্থকৌলিন্যে যারা নিখাদ কুলীন তাদের সন্তানাদি এই সব বিদ্যালয়ে পড়াশোনা করে। কিন্তু যাঁদের সে কৌলিন্য নেই তাঁরাও এই কুলীনদের দেখাদেখি এই জাতীয় কেতাদুরস্ত শিক্ষার দিকে আকৃষ্ট হচ্ছেন। এঁদের মধ্যে আছেন অধ্যাপক, পদস্থ সরকারী কর্মচারী, বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের কিছুটা স্বচ্ছল বেতনওয়ালা কর্মচারী, উকিল, ডাক্তার প্রভৃতি শ্রেণীর মানুষ। এবং এঁদের চাহিদার অনুপাতে ব্যাং-এর ছাতার মত গজিয়ে উঠছে অজস্র তথাকথিত কিন্ডার-গার্টেন ইস্কুল। আমি যে মফস্বল শহরে বাস করি সেখানে তিন মাইল এলাকার মধ্যে এইরকম তিনটি ইস্কুল গজিয়েছে। অনুসন্ধানে জেনেছি যে এ সব জায়গায় পড়ানো হয় ঘোড়ার ডিম, ছাত্রছাত্রীরা, বেশির ভাগ ক্ষেত্রে ছাত্রী, শুধু শেখে কিছু ইংরাজী বুকনি এবং সেই সঙ্গে ডিসিপ্লিনের নামে কিছু বিলাতী কায়দা, কথাবার্তায় কনফার্মড স্নবারি যা শুনলে পিত্তি পর্যন্ত জ্বলে যায়। একটি বিদ্যালয়ে শিক্ষকতা করার সময় এই জাতীয় কিছু কনভেন্ট ফেরত ছাত্রের সংস্পর্শে এসেছিলাম (বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই কনভেন্টগুলিতে প্রাথমিক পর্যায়ের পর শিক্ষাদানের কোন ব্যবস্থা নেই, কাজেই শেষ পর্যন্ত বাচ্চাদের সেকেলে গোয়ালেই আসতে হয়) যারা না শিখেছে মাতৃভাষা, না শিখেছে ইংরাজী, না শিখেছে অংক, শুধু তারা পেয়েছে কিছুটা কমপ্লেক্স যার ফলে তারা হয়েছে না ঘরকা না ঘাটকা।

সহজ কথায়, বিধান সভার এস্টিমেট কমিটির রিপোর্টে যা প্রকাশিত হয়েছে তাতে সমগ্র শিক্ষাব্যবস্থায়, বিশেষ করে প্রাথমিক ও প্রাক্ প্রাথমিক ক্ষেত্রে এক আজব নৈরাজ্যবাদী ব্যবস্থা চলছে। এখানে একটি প্যাটার্নের সঙ্গে আর একটি প্যাটার্নের কোন মিল নেই। বিলাতী এবং নকল বিলাতী কায়দার এক জাতীয় বিদ্যালয়, কর্পোরেশন ও মিউনিসিপ্যালিটি পরিচালিত আর এক জাতীয় বিদ্যালয়, জেলা স্কুল বোর্ড পরিচালিত অপর আর এক জাতীয় এবং সর্বোপরি নানান ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠান পরিচালিত বিভিন্ন ধরণের অজস্র বিদ্যালয়ের মধ্যে কোন সমন্বয়ই হয় নি, হবেও না। এই অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে একটি সার্বিক সুস্থ, কার্যকর এবং সর্বশ্রেণীর পক্ষে গ্রহণীয় প্রাথমিক ও প্রাক্ প্রাথমিক শিক্ষার পরিকল্পনা গড়ে তুলতে হবে। এ বিষয়ে শুধু সরকারেরই দায়িত্ব নেই, শিক্ষানুরাগী প্রত্যেকটি ব্যক্তিরই কিছু না কিছু দায়িত্ব আছে। সকলের জন্যই একই পাঠক্রমের ভিত্তিতে একই ধরণের প্রাইমারী ফাইনাল পরীক্ষা নেওয়া উচিত।

শোনা যায় পশ্চিমবঙ্গ ছাড়া অপরাপর রাজ্যে প্রাথমিক শিক্ষার উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি হয়েছে। কিন্তু পশ্চিমবঙ্গের এ ক্ষেত্রে পিছিয়ে থাকার কোন ন্যায়সঙ্গত কারণ নেই। আমরা আশা করব বিষয়টি পশ্চিমবঙ্গ সরকার বিশেষভাবে বিবেচনা করবেন, এবং বেতনভোগী আমলাদের উপর নির্ভর না করে প্রকৃত শিক্ষানুরাগী ব্যক্তিদের দ্বারা এই সমস্যা সমাধানের চেষ্টা করবেন।

বিধান সভায় খাদ্য বিতর্ক

গতবারের অধিবেশনে বিধান সভায় বিরোধীপক্ষের কোন সদস্য ছিলেন না। সেই অবস্থায় পশ্চিমবঙ্গ সরকার নিজেদের সুবিধামত আইন পাশ করেছেন এবং বিধান সভার কার্যক্রম থেকে বিরোধীদের বাদ দেবার ফলেই বিধান সভার বাইরে আন্দোলনের প্রচণ্ডতা বাড়ার সুযোগ করে দিয়েছেন। সুখের বিষয় এবার সেই ঘটনার পুনরাবৃত্তি হয় নি। এবারকার বিধান সভায় বিরোধীপক্ষের সকলেই আছেন এবং যথাশক্তি আলোচনায় অংশ গ্রহণ করে তাঁরা দেশের অবস্থা তুলে ধরার চেষ্টা করছেন।

—গত ৩১শে আগস্ট থেকে বিধান সভায় খাদ্য নিয়ে বিতর্কের সূচনা হয়েছে। আমরা এতাবৎকাল বঙ্গদর্শনের পাতায় সরকারী খাদ্যনীতি নিয়ে যে সব কথা বলেছি বিরোধীপক্ষের সদস্যদের মুখেও সেই এক কথা। বর্তমান খাদ্যনীতির পরিবর্তন প্রয়োজন। সরকারী তরফের বক্তব্য হচ্ছে খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধিই বর্তমান খাদ্য সংকটের প্রতিকারের উপায়। খাদ্যের উৎপাদন কি করে বাড়ানো যায় সে কথাই চিন্তা করা উচিত। তাছাড়া তাঁরা কেন্দ্রের উপরও অনেকটা নির্ভর করতে চাইছেন। জনৈক কংগ্রেস সদস্যের মতে কেন্দ্রের কাছ থেকে ১৯ লক্ষ টন খাদ্য পাওয়া উচিত, কিন্তু কেন্দ্রের কাছ থেকে প্রাপ্তির পরিমাণ অনেক কম। উদ্বাস্তু সমস্যা, অতিরিক্ত জমিতে পাট চাষের ক্ষতিপূরণ এবং বাংলার বাইরের লোক আসার সমস্যার পরিপ্রেক্ষিতেই পশ্চিমবঙ্গ সরকারের এই দাবি কেন্দ্রের গ্রহণ করা উচিত। সরকারী তরফ আরও দাবি করছেন যে, তাঁদের বৈপ্লবিক খাদ্যনীতি সফল হয়েছে।

পক্ষান্তরে বিরোধী সদস্যেরা অভিযোগ করেন যে গরীব চাষীদের উপর জুলুম করে খাদ্য সংগ্রহ করা হয়েছে, অপরদিকে কংগ্রেসীদের আশ্রিত বড় বড় জোতদার ও সম্পন্ন চাষীদের কাছ থেকে খাদ্য সংগ্রহ করা হয় নি। ফলে সরকারী লেভি ব্যবস্থা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়েছে, কৃষি ও কৃষকের প্রতি অবহেলার ফলে উৎপাদন বাড়ে নি। পশ্চিমবঙ্গের কয়েক কোটি লোককে আংশিক রেশনভুক্ত করেছেন, অথচ আংশিক রেশন এলাকার বহু স্থানে মাসে একবার কি দুবার রেশন পৌঁছাচ্ছে। দুঃস্থ ও অভাবগ্রস্ত চাষীদের নির্দিষ্ট দর অপেক্ষা কম দরে চাল বিক্রির দাবি জানিয়ে তাঁরা বলেন যে, সরকার চাষীদের কাছ থেকে ১৪ টাকা মণ দরে ধান কিনে ৪০ টাকা মণ দরে চাল বিক্রি করে নিজেই কালোবাজারী করছেন। কেউ কেউ তথ্যের সাহায্যে প্রমাণ করার চেষ্টা করেন যে, পশ্চিমবঙ্গে প্রয়োজনের তুলনায় খাদ্যের ঘাটতি নেই। কেন্দ্র থেকে প্রাপ্ত খাদ্য এবং রাজ্যে উৎপন্ন খাদ্য নিয়ে পশ্চিমবঙ্গে এ বছর প্রায় ৫৭ লক্ষ টন খাদ্য আছে পশ্চিমবঙ্গের ৩ কোটি ৪০ লক্ষ লোককে যদি সপ্তাহে সরকার নির্দিষ্ট

হয়ে দু' কেন্দ্র করে খাদ্য সরবরাহ করা হয় তাহলেও বছরে মোট ৩৯ লক্ষ টন খাদ্যের প্রয়োজন হবে। তাহলে উদ্বৃত্ত খাদ্য থাকা সত্ত্বেও খাদ্য নিয়ে এই হাহাকার কেন?

সকলেই এই অভিযোগ করেন যে সরকারী পৃষ্ঠপোষকতায় পশ্চিমবঙ্গে উৎপন্ন অধিকাংশ চাল বড় বড় জোতদার ও চাষীরা মজুত করে রেখেছে এবং বাজার দাম আকাশছোঁয়া হবার পর তারা একটু একটু করে সেই চাল বাজারে ছাড়ছে। কংগ্রেসী মন্ত্রী ও এম এল এ-দের প্রভাবে বড় চাষী ও জোতদাররা লেভি ফাঁকি দিয়েছে আর ছোট চাষীরা লেভির যাঁতাকলে পড়ে অনাহারে দিন কাটাচ্ছে। সরকার উৎপাদন বৃদ্ধির কথা মুখে বলেন, অথচ কৃষি পরিকল্পনা রূপায়ণ করেন না, বরাদ্দ অর্থ ব্যয় করতে পারেন না।

ঠিক এই কথাগুলিই আমরা এতকাল ধরে বলে এসেছি। বিরোধীপক্ষ যে অভিযোগ করছেন সেগুলির মূলে যথেষ্ট সত্য রয়েছে। কাজেই এই সকল সমালোচনার পরিপ্রেক্ষিতে খাদ্যনীতির সংশোধন হোক এটাই কাম্য।

একটি সামাজিক অন্যায়

সামান্ত (বর্ধমান) থেকে শ্রীপাঁচুগোপাল রায় গ্রামাঞ্চলে একটি বিশেষ অন্যায়ের প্রতি আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে জানাচ্ছেন যে গ্রামাঞ্চলের পঞ্চায়েৎ নিয়ন্ত্রিত রাস্তা-ঘাট, শ্মশান, ভাগাড় ইত্যাদি ক্রমে ক্রমে শক্তিশালী ব্যক্তিদের জবর দখল সম্পত্তি-রূপে পরিণত হচ্ছে—বারো ফুট রাস্তা রূপান্তরিত হচ্ছে ছয় ফুটে, শ্মশানের অংশবিশেষ হয়ে উঠছে ব্যক্তি-বিশেষের ধানী জমি। শক্তি, অর্থ ও প্রতিপত্তির জোরে কিছু স্বার্থপর মামলাবাজ লোক পঞ্চায়েতগুলিকে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ প্রদর্শন করে সম্পত্তিবান হচ্ছে। এদের বিরুদ্ধে আইনানুগ কোন ব্যবস্থা অবলম্বনের ক্ষমতা পঞ্চায়েতের নেই। তা ছাড়া বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই পঞ্চায়েতগুলির এই সব লোকেরই কবলিত। পত্র লেখক এ বিষয়ে একটি আইন প্রণয়ন করার জন্য সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করছেন।

পত্রলেখক সত্যই একটি গুরুতর বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। আমাদের দেশে বেআইনী কাজ করায় সুযোগ ধনী ও শক্তিশালী ব্যক্তিদের যথেষ্ট। আইনের আশ্রয়ে ন্যায়ের দাবি এখানে সুদূর পরাহত। কোন শক্তিমান লোক যদি কোন জমি বেআইনীভাবে দখল করে বসে তাহলে আইনের সাহায্যে তাকে উৎখাত করতে প্রচুর অর্থ ও সময় লাগে যা বহন করা অনেক ক্ষেত্রেই অসম্ভব হয়ে ওঠে।

আমাদের পঞ্চায়েতগুলির গঠন পদ্ধতি এতই বিচিত্র যে গ্রামের জন্য প্রকৃত কোন গঠনমূলক কাজ করা সেগুলির পক্ষে অসম্ভব। গান্ধীজী কথিত পঞ্চায়েৎ-রাজ আজ একটা নিছক কল্পনার বস্তু। এখনকার পঞ্চায়েতগুলিরও উদ্দেশ্য হচ্ছে নিছক রাজনৈতিক এবং সেই প্রয়োজনেই সেগুলির সৃষ্টি হয়েছে। এমতাবস্থায় পঞ্চায়েতগুলির পক্ষে এ বিষয়ে কোন সক্রিয় ব্যবস্থা অবলম্বন করা সম্ভব নয়।

আসলে গ্রামজীবনের নানা দিকের তথা গ্রামের সমস্যা এত বেশি যে তার সমাধান রীতিমত পরিকল্পনা ও সময় সাপেক্ষ। তা ছাড়া অন্যায়ের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানোর শিক্ষা ও চেতনা যতক্ষণ না পর্যন্ত গ্রামের সর্বত্র পরিব্যাপ্ত হচ্ছে ততক্ষণ পর্যন্ত অন্যায়কারীরা কিছুটা সুযোগ পেয়ে যেতে থাকবে।

আপাতত, এই বিশেষ সমস্যাটির সমাধান, পত্রলেখক যা বলেছেন তাই হওয়া উচিত। অর্থাৎ সরকার যেন এই বিষয়ে একটি "ঘোরপ্যাঁচহীন" আইন প্রণয়ন করেন। গ্রামের শ্মশান, রাস্তাঘাট ও অপরাপর পতিত অঞ্চলের জরিপ করে, এবং সেগুলিকে সরকারী সীমানা দ্বারা চিহ্নিত করে, এই মুহূর্তেই এই বিষয়ে কাজ শুরু হওয়া উচিত।

একটি দুর্নীতির কাহিনী

কোন বস্তুর একাংশে যদি পচন ধরে কালক্রমে তার সবটাই পচে যায় এটাই নিয়ম। স্বাধীনতার পর থেকেই সমাজের এক অংশে পচন ধরেছে দুর্নীতির ছিদ্রপথ দিয়ে আর উনিশ বছরেই তা সমগ্র রাষ্ট্রদেহকে বিষাক্ত করে তুলেছে। সর্বস্তরেই দুর্নীতি আজ এতই পরিব্যাপ্ত যে তার সমগ্র বিবরণ যদি কখনো সংগ্রহ করা সম্ভবপর হয়, তার তুলনা বোধ হয় আর কোথাও পাওয়া যাবে না।

সম্প্রতি আমাদের হাতে দুর্নীতির কয়েকটি নমুনা এসেছে। তার মধ্যে একটি স্বাস্থ্যদপ্তর সংক্রান্ত। যাঁকে ঘিরে এই দুর্নীতির অভিযোগ তিনি স্বাস্থ্য অধিকর্তার অধীনে কার্যরত একজন কর্মচারী। ইনি নাকি কিছুকাল সংযোগ-কারী কর্মচারীরূপেও কাজ করেছিলেন। সেই পদে অধিষ্ঠিত থাকার সময় তাঁর একজন খাস বেয়ারা ছিল। কিন্তু কিছু-কাল পরে সংযোগকারী কর্মচারীর পদটাই লুপ্ত হয়ে যায়, এবং আমাদের আলোচ্য ব্যক্তি পূর্বপদে আবার ফিরে আসেন। এখন সেই খাস বেয়ারাটিকে কিন্তু অন্য কোন বিভাগে পুনর্বাসিত করা হয় নি। সে এখন অধুনালুপ্ত পদের তথাকথিত কর্মচারীটির বাড়িতে পুনর্বাসন লাভ করেছে। সেখানে সে গৃহভৃত্যের কাজ করে। মাসে একবার শুধুমাত্র বেতন গ্রহণের দিনে তাকে অফিসে আসতে হয়।

এই ভদ্রলোকের কীর্তিকলাপ অবশ্য এইটুকুর মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়। মেদিনী-পুরের মুখ্য স্বাস্থ্যাধিকারিকের একজন নন্-ম্যাট্রিক কর্মীকে একটি টি' বি আরোগ্যোত্তর কলোনীতে অফিসার পর্যায়ের পদে নিয়োগের ব্যাপারে নাকি তাঁর অদৃশ্য হস্তের যোগাযোগ রয়েছে। আলোচ্য কর্মচারীর কৃপাবিতরণ (অবশ্য নিঃসর্তে নয়) আরও বহুক্ষেত্রে প্রসারিত। স্বাস্থ্যবিভাগের পরিবহন শাখার স্টোর সংক্রান্ত একটি পদের জন্য ৩০০-৬০০ টাকা স্কেলে একজন বয়স্ক নন্-ম্যাট্রিককে গ্রহণ করার পেছনেও এঁর শ্রীহস্তের কারুকার্য আছে। অথচ ওই পদটির জন্য পূর্বে বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়েছিল, কিন্তু যাঁকে নেওয়া হয়েছে তিনি পূর্বে ছিলেন নাকি সামরিক বিভা-গের একজন ফিটার। স্টোরসংক্রান্ত পদটির জন্য যোগ্যতর প্রার্থীর নিশ্চয় অভাব ছিল না, কিন্তু বোধ হয় তাঁদের পেছনে আলোচ্য কর্মচারীটির মত খুঁটি ছিল না। নিম্নশ্রেণীর কর্মচারীদের রিক্রিয়েসন ক্লাবের চেয়ারম্যান হিসাবে উক্ত প্রতিষ্ঠানের কিছু অর্থ আত্মসাৎ করার অভিযোগও এই কর্মচারী ভদ্রলোকের নামে আছে।

স্বাস্থ্য দপ্তরের সচিব এবং অধিকর্তা দুজনেই কাজের লোক। এই কারণেই আমরা আশা করব যে, এ বিষয়ে যেন যথোপযুক্ত তদন্ত করা হয়।

গ্রন্থমেলা

একটি আদিম অধ্যায়—বিভূতিভূষণ নিয়োগী, কল্প-কথামৃত প্রকাশনী, ৩, রমানাথ মজুমদার স্ট্রীট, কলিকাতা-৯। দাম ঃ দশ টাকা।

"একটি আদিম অধ্যায়" উপন্যাসটিতে সুজাতাকে অবলম্বন করে দেখানো হয়েছে আদি রিপুর তাড়না কি ভয়ংকর, কি নির্মম! অবশ্য ঔপন্যাসিকের ধর্ম হচ্ছে সেই রিপুর ওপর সংযম শক্তির প্রাবল্য দেখিয়ে রিপুকে শাসিত করা। কিন্তু সেই শাসনের জন্য প্রয়োজন লেখকের পরমাশ্চর্য হৃদয়, আবেগসঞ্জাত সহানুভূতি ও একান্ত আন্তরিকতা। শ্রীবিভূতিভূষণ নিয়োগী এই সব গুণের অধিকারী হওয়ার কারণেই তাঁর বৃহদাকার উপন্যাসের মধ্যে লিপ্সার লেলিহান শিখা সহানুভূতির বারিপাতে স্থৈর্য অবলম্বনের প্রয়াস পেয়েছে। তাই দেখা গেছে উপন্যাসের মূল চরিত্র সুজাতার মধ্যে এক বিরাট আত্মজিজ্ঞাসা। সেটা আত্মজিজ্ঞাসা, না, আত্মগ্লানি? যে গ্লানিতে দগ্ধ হলে নিখাদ হয় মানুষ। 'একটি আদিম অধ্যায়'-এ সুজাতাপর্ব উদ্ঘাটিত। ঔপন্যাসিক সাধারণ উপন্যাস রচনার রীতিতে এই উপন্যাসের বিষয়বস্তু ও চরিত্র পাঠকদের সামনে তুলে ধরেন নি। তিনি যে আঙ্গিক অবলম্বন করেছেন তার মধ্যে যেমন অভিনবত্ব আছে, তেমনি সুজাতাকে সুজাতার লেখনীর মধ্য দিয়ে আমাদের জানবার এক অপূর্ব সুযোগ দিয়েছেন। সেই কারণে সুজাতা চরিত্রের ক্রমবিকাশ যেমন আমাদের কাছে অত্যন্ত আকর্ষণীয় হয়ে উঠেছে তেমনি আমাদের কখনো বিস্মিত, কখনো অভিভূত, কখনো বা ক্রুদ্ধ করেছে। এই কারণে বলা যায়, উপন্যাসটি নানাগুণে পাঠকদের কাছে সুখপাঠ্য হয়ে উঠেছে। অপরপক্ষে, লেখকের যে উদ্দেশ্য, যে-উত্তরণসাধন তাও অত্যন্ত তৃপ্তিদায়ক।

প্রথমেই আমরা চমকে যাই 'নীলকান্ত' এই নামটি নিয়ে। সুজাতার পত্রাকারে আত্মকথা যার হাতে এসে পড়েছে, সে ত' সাহিত্যিক নীলকান্ত চৌধুরী নন, ইনি যে নামকরা নীলকান্ত চৌধুরী। এই ঘটনায় যেমন রোমাঞ্চ আছে, তেমনি আছে নাটকীয়তা। কিন্তু এই ঘটনা সম্ভব না হলে এই আত্মকথারূপে বিরাট সুজাতাকাহিনী আমাদের অজ্ঞাতই থেকে যেত। কারণ সাহিত্যিক নীলকান্ত চৌধুরী যিনি সুজাতার ব্যাপারে স্বয়ং পাপবিদ্ধ,—তাঁর কাছ থেকে এই কাহিনী পাওয়া কি সম্ভব ছিল? তারপর সুজাতার কুমারী জীবনের সমাপ্তিও এক করুণ, রোমহর্ষক এবং নাটকীয় ব্যাপার বলা চলে! অবশ্য, জ্যোতিঃপ্রকাশ সমাদ্দার যে "স্বার্থপর, স্থূলরুচিসম্পন্ন জানোয়ার ছাড়া কিছুই নয়, সে-ই অবলম্বন হোল সুজাতার। সুজাতাও যেন তাকে পেয়ে তৃপ্ত। কিন্তু সেখানেই শেষ নয়। জ্যোতি নিয়ে এল আপিসের সায়েবকে। আর সেই ঘটনার মাধ্যমে আত্মগ্লানিতে দগ্ধ হোল সুজাতা—"আমার ভবিষ্যৎ সন্তানের প্রয়োজনে গড়ে ওঠা সুধাভাণ্ডটা হয়ে উঠল, ঐ কামুকটার লালসার বস্তু" (পৃঃ ১৩৫)। অতএব ঠাঁইছাড়া হোল সুজাতা। মরতে সে চেয়েছিল, পারে নি। রক্ষক রামবিলাসের (নীচ ব্যবসায়ে যে রত) কাছে "নিজের নিরাবরণ দেহটাকে নিয়ে সে কী অসোয়াস্তি।" সত্যি কথা বলতে কি এখানেও সুজাতার হয়েছে অগ্নি-পরীক্ষা। অবশ্য রামবিলাস চরিত্রটিকে লেখক সুজাতার মুখ দিয়ে যেভাবে পরিস্ফুট করেছেন (পৃঃ ২৭৭), তা খুব একটা স্বাভাবিক বলে মনে হয় না। যদিও সুজাতা বলেছে, রামবিলাস আমার আশ্রয়দাতা, সে ছিল আমার আবিষ্কার। কিন্তু সুজাতার আত্মগ্লানিতে যে দহন তা অত্যন্ত স্পষ্ট। তাই তার বিবেক বলেছে, "শুধু শিকারীর শিকার হবার জন্য" সে? (পৃঃ ২৬৯)। পরীক্ষার পর পরীক্ষা আর বিড়ম্বনা! অবশেষে এতো ঘটনার পর জ্যোতির আত্মহত্যা উপন্যাসের উপসংহারের সূচনা করলেও সুজাতার জীবনের উত্তরপর্ব উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছে যেন তারই কথায়—"অতীতটাকে মুছে দিলাম।" সুজাতার অতীতের জীবন বিভীষিকাময় কিন্তু আঘাতের পর আঘাতে বর্তমান সুজাতার জীবন সত্য, অনবদ্য, আশ্চর্য সুন্দর! আমরা উপন্যাসটিতে একটি জীবনসত্য ও একটি আদর্শের পরিপূর্ণ বিকাশ দেখতে পেয়ে আনন্দিত। আশা করি এই সুখপাঠ্য উপন্যাস সমাদরে গৃহীত হবে।

জয়ন্তী সেন

টাপুর-টুপুর—শ্রীমোহিত ঘোষ। শ্রীভূমি পাবলিশিং কোং, ৭৯, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা-৯। মূল্যঃ ১·৫০।

চিকিমিকি—শ্রীমোহিত ঘোষ। সাহিত্য চয়নিকা, ৫৯, কর্নওয়ালিশ স্ট্রীট, কলিকাতা-৬। মূল্যঃ ১·২৫।

উপর্যুক্ত ছড়ার বই দুটি শিশুদের জন্য রচিত। প্রথম গ্রন্থটি পেয়েছে ১৯৬০ সালের শিশুসাহিত্যে রাষ্ট্রীয় পুরস্কার। বড়দের উপযোগী কবিতা লেখা যতটা সহজ, বড়দের পক্ষে শিশুদের উপযোগী কবিতা বা ছড়া লেখা ততটা সহজ নয়। কেন না, শিশু-মনের রহস্য উপলব্ধি করার মতো শক্তি থাকলেই, তাদের মনের মতন কবিতা লেখা যায়। বাংলা সাহিত্যে তাই শিশুসাহিত্যিকের সংখ্যা খুব বেশি নয়। আর অধিকাংশ যাঁরা তা লেখেন আমরা তাঁদের মনীষী-মঙ্গল রচয়িতা বললে—খুব ভুল বলা হবে না। আনন্দের কথা, শ্রীমোহিত ঘোষ জানেন, কিভাবে ছন্দের মধ্য দিয়ে শিশুর জগৎকে আবিষ্কার করে তা তাদের চোখের সামনে তুলে ধরা সম্ভব। তাই তিনি লিখেছেন—

আয় খোকা, আয় খুকু,
ঘুম-রথে চড়তে,
মাথা নেড়ে তাল ঠুকে
ছড়াগুলো পড়তে।
রথের চাকার সাথে
চোখ যাবে জড়িয়ে,
পথের দু' পাশে কত
হাসি রবে ছড়িয়ে।

(টাপুর-টুপুর ঃ ঘুমের দুয়ারে)

সেই হাসি ছড়িয়ে দিয়েছে রাজ্যের যত শালিক পাখি, হাঁস, মজার গরু, কাকাতুয়া, ময়না, চাঁদের পরী, আরো কত কী। সেই সঙ্গে খুব মজাদার হচ্ছে হুলোর বিয়ে, মেঘ গুড় গুড়, ফুলঝুরি। 'আমি হব কি'-তে শিশুর মানসজগতের আশা আকাঙ্ক্ষা সুন্দরভাবে ফুটে উঠেছে। টাপুর-টুপুর-এর এই সব মনকাড়া ছড়া পড়ার পর ভালো লাগে বেশ 'চিকিমিকি'র 'পুতুলের বিয়ে' নেমন্তন্ন, ফোকলা বুড়িকেও। সিংহরাজের রাজবাড়িতে জলসাও খুব মজার ব্যাপার। দুটি বইয়ের ৬২টি (৩৪+২৮) এমন ছড়া পেলে শিশু ও কিশোর দল খুশি হবেই। দুটি বইয়ের রঙিন ছবি এঁকেছেন খ্যাতিমান শিল্পী ধীরেন বল। প্রচ্ছদপট বোর্ড বাইন্ডিং হলে আরো ভালো হোত।

আমি যাঁদের দেখেছি

পরিমল গোস্বামী

[দ্রষ্টব্য : এই রচনার অংশ অন্য এক সাপ্তাহিকের বিশেষ সংখ্যায় প্রকাশিত হয়েছিল। সম্পূর্ণ রচনাটি পরিমার্জিত রূপে এই সঙ্গে মুদ্রিত হল।]

(১২) বনবিহারী মুখোপাধ্যায়

বনবিহারীর অসামান্য চরিত্র-বৈশিষ্ট্য এককালে আমাকে প্রবলভাবে আকৃষ্ট করেছিল। তাঁর ধারালো চেহারা, ধারালো ব্যঙ্গপূর্ণ কথা, প্রখর স্বতন্ত্র মতবাদ, চিত্তাকর্ষী যুক্তিবাদ, আমাকে মাঝে মাঝে চমকে দিত। এমন জীবন্ত প্রাণোচ্ছল মানুষ তার আগে আর আমি দেখি নি। এক এক সময় তাঁর প্রখর ব্যঙ্গ যেন তড়িৎ-গতি সাপের মতো তাঁর সমস্ত দেহে এঁকে বেঁকে খেলে বেড়াত, কাছে থাকতে ভয় হত। কিন্তু পরক্ষণেই মধুর হাসিতে সকল ভয় দূর করতেন।

গল্প উপন্যাস কবিতা কার্টুন ছবি তাঁর এমনই অনায়াস সৃষ্টি, এবং তা তাঁর সমস্ত জীবনের আচরণ, বিশ্বাস এবং কর্মধারার সঙ্গে এমনই অবিচ্ছেদ্যভাবে জড়িত যে, ব্যক্তিটিকে বাদ দিয়ে তাঁর রচনা যেন সম্পূর্ণ নয়। অবশ্য তাঁর সঙ্গে পরিচয় হলেই তবে একথা মনে আসে। তাঁর সমস্ত রচনার মধ্যে তিনি প্রবলভাবে আছেন, এবং তাঁর নিজের মধ্যে তাঁর সকল রচনার উপকরণ সংহত হয়ে আছে। তবু বিস্ময়ের বিষয় এই যে, তাঁর রচনা সেহেতু ব্যক্তিসর্বস্ব একেবারেই নয়। কারণ তিনি তাঁর জীবন-দর্শনকে ব্যক্তিসর্বস্ব করেন নি। তিনি যা কিছু চিন্তা করেছেন, যা কিছু রচনা করেছেন, তার মধ্যে তিনি আছেন সংস্কারকের ভূমিকায়। তাঁর বাক্যে ব্যবহারেও তা প্রকট ছিল, এবং বড় বিস্ময়ের কথা এই যে, তিনি প্রচারক ছিলেন না। ধর্ম নিয়ে গভীর চিন্তা করেছেন, কিন্তু ধর্মযাজক ছিলেন না, তিনি শুধু যুক্তির পথে চলার চেষ্টা করেছেন, অসহনীয় বেদনায় তিনি সমাজের মঙ্গল চিন্তা করেছেন, তাঁর জীবনে অন্য কোনো উদ্দেশ্য ছিল না। তাঁর সমস্ত সত্তাটি ছিল উচ্চস্তরের দার্শনিকের এবং তাঁর প্রকাশ ছিল প্রকৃত শিল্পীর। শিল্পী হিসাবে তিনি তাঁর রচনায় ব্যঙ্গের ফর্মটিকেই অথবা অনেক ক্ষেত্রে শুধু ব্যঙ্গের টোনটিকেই সবচেয়ে উপযোগী মনে করেছিলেন, কারণ এ ভিন্ন আমাদের সর্বজাতীয় অর্বাচীনতার বিরুদ্ধে তাঁর মনের ক্ষোভ অন্য কিছুতে এমনভাবে প্রকাশ পেত না।

তাই আমার মনে হয়, তাঁর রচনা সম্পর্কে সামান্য আলোচনা করতে গেলেও তাঁর নিজের সম্পর্কে আগে কিছু জানা থাকলে ভাল হয়। কিন্তু আমার সঙ্গে যখন তাঁর প্রথম পরিচয় সেই ১৯২৫ সালে, সে পরিচয় অল্প দিনের। তার প্রায় তেত্রিশ বছর পরে তাঁকে যখন পুনরায় পেলাম তখন আমাদের পরিচয় যথেষ্ট ঘনিষ্ঠ হবার সুযোগ পেয়েছিল, এবং আমার উপর তিনি অনেকখানি নির্ভরও করেছিলেন। তিনি লেক রোড থেকে উত্তর কলকাতায় আমার কাছে চলে আসতেন মাঝে মাঝে, অসুস্থ দেহ নিয়েও। তাঁর অনেক কথা আমাকে বলতেন, এবং তাঁর লেখা এবং তাঁর ব্যবহার আমি ঠিক অর্থে নিতে পেরেছি বলে, এবং তাঁকে কোনো কারণে আমি ভুল বুঝি নি বলে, এবং তার চেয়েও প্রধান কথা—তাঁর স্বভাবসিদ্ধ উদারতার গুণে তিনি আমার মধ্যে তাঁর সুরের অনুরণন খুঁজে পেয়েছিলেন বলে, তিনি আমাকে অত্যন্ত কাছে টেনে নিয়েছিলেন।

তাঁর চরিত্রে অনেক সময় অসহিষ্ণুতা প্রকাশ পেত, এবং হ্যাংলামি, নির্বুদ্ধিতা, এবং অন্যায়ভাবে সুবিধা আদায়কামীদের প্রতি তিনি নিষ্ঠুর হয়ে উঠতেন অনেক সময়। কিন্তু সেও তাঁর নিজস্ব ভঙ্গিতে। তার কয়েকটি দৃষ্টান্ত আমি স্মৃতিচিত্রণে দিয়েছি, তার সঙ্গে আরও একটি যোগ করলাম বলাইচাঁদের কাছ থেকে সম্প্রতি পেয়ে। সেটি অবশ্য বিশুদ্ধ কৌতুক—অদম্য হাস্যপরিহাসের প্রেরণা থেকে জাত।

আমি সবগুলোই বিবৃত করি—

একদিন এক ভদ্রলোক সার্জিক্যাল ওয়ার্ডে জানতে এসেছিলেন, বেড খালি আছে কি না, একটা রোগীকে তিনি ভর্তি করাতে চান। বনবিহারী তখন সার্জিক্যাল রেজিস্ট্রার, তিনি ভদ্রভাবে বললেন এখন খালি নেই, তবে মাঝে মাঝে খোঁজ করে যাবেন, খালি হলেই পাবেন। কিন্তু এই কথাটি ভদ্রলোকের পছন্দ না হওয়াতে তিনি অপর একজন ডাক্তারের কাছে গিয়ে ঐ একই অনুরোধ জানালেন। সে ডাক্তার তাঁকে পুনরায় বনবিহারীর কাছেই নিয়ে এলেন। বনবিহারী কাজে ব্যস্ত ছিলেন, তাঁকে দেখেই চকিতে সব বুঝতে পেরে বললেন বসুন। তার পর হাতের কাজ শেষ করে বনবিহারী হঠাৎ দাঁড়িয়ে উঠে ঐ ভদ্রলোকের কানের কাছে মুখ নিয়ে আগে যে সব কথা বলেছিলেন তার পুনরাবৃত্তি করলেন, এবং একবার এ কানে, একবার ও কানে। তিনি ক্রমাগত পালা করে দু কানে ঐ একই কথা বার বার বলতে লাগলেন। ভদ্রলোক স্তম্ভিত। বনবিহারী দু-একজন ছাত্রকে ডেকে বললেন, ইনি বাংলা ভাল বুঝতে পারেন না, কিন্তু এঁকে বোঝাতেই হবে যে এখন বেড খালি নেই।

আর একটি ঘটনা—এক রোগী আউট-ডোরের অন্যান্য অপেক্ষমাণ রোগীদের ভিড় ঠেলে আগে বনবিহারীর কাছে এগিয়ে এসে বললেন, আমি ডাক্তার "—" বসুর চিঠি এনেছি, আমাকে একটু আগে দেখে দিন। বনবিহারী এই ভদ্রলোকের আচরণে এমন চটে গিয়েছিলেন যে, সে ক্রোধ তাঁর স্বভাবসিদ্ধ ব্যঙ্গের ভিতর দিয়ে ভিন্ন অন্যভাবে তিনি প্রকাশ করতে পারতেন না। তিনি চিঠিখানা হাতে উঁচু করে ধরে হঠাৎ চিৎকার করে ছাত্রদের বলতে লাগলেন, ওহে ইনি ডাক্তার অমুক বোসের চিঠি এনেছেন, তোমরা এঁকে নিয়ে নাচতে আরম্ভ কর, আমিও আসছি কাজ সেরে।

তৃতীয় ঘটনা—বাইরের কোনো মহকুমা শহরে। সেখানে এক ভদ্রলোক বনবিহারীর কাছে অনেক বই দেখে ভেবেছিলেন তাঁর কাছ থেকে বই পড়ার বেশ সুবিধা হবে। তিনি এক দিন বই চেয়ে লোক পাঠিয়েছিলেন তাঁর কাছে। বনবিহারী রবীন্দ্রনাথের একখানা বই পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। ভদ্রলোক সেখানা পড়ে বড়ই হতাশ হয়ে ফেরৎ পাঠালেন, এবং জানালেন এবারে যেন ডাক্তার সাহেব একখানা ভাল বই পাঠিয়ে দেন। বনবিহারী তাঁকে একখানা বড় পঞ্জিকা পাঠিয়ে দিয়েছিলেন।

আর একটি ঘটনা—বনবিহারী সার্জিক্যাল

রেজিস্ট্রার হয়েছেন অল্পদিন। ছাত্র বলাইচাঁদ ছিল তাঁর ক্লার্ক। সে ভাগলপুর থেকে আমাকে সম্প্রতি লিখে জানাচ্ছে—

..."আমাদের কাজ ছিল দোতলার একটা ঘরে। সার্জ্জনদের সঙ্গে দেখা হত না। হঠাৎ এক দিন তাঁর সঙ্গে নিচে স্টীন সাহেবের দেখা। স্টীন তখন ওখানকার সেকেন্ড সার্জ্জন। তিনি বনবিহারীবাবুকে বললেন, 'বনবিহারী, আজকাল তোমার মুখ দেখতে পাই না, ব্যাপার কি?' বনবিহারী বললেন, 'এখন আমি রেজিস্ট্রার, সেই জন্যই দেখতে পাও না।' সাহেব বললেন, 'ও! আমি জানতাম না।'

"সাহেব চলে যাবার পরদিন বনবিহারী আমাকে বললেন, 'চল নিচে, আজ আর কাজ করব না।'

"নিচে গেলাম। স্টীন সাহেব ক্লাসে লেকচার দিচ্ছিলেন। বনবিহারী তাঁর দরজায় গিয়ে দাঁড়ালেন। তারপর স্টীন যেই একটু দরজার দিকে মুখ ফিরিয়েছেন, বনবিহারী সঙ্গে সঙ্গে তাঁর সামনে গিয়ে দাঁড়ালেন। এমনি কয়েকবার হতেই স্টীন জিজ্ঞাসা করলেন, 'কি ব্যাপার? তুমি আজ অফিসে নেই কেন?' বনবিহারী বললেন, 'তুমি অভিযোগ করেছিলে আমার মুখ দেখতে পাও না, তাই মুখ দেখাচ্ছি'।"

এটি অবশ্য প্রচ্ছন্ন ব্যঙ্গ, কৌতুক অংশ বেশি, তবু মেডিক্যাল কলেজের সার্জিক্যাল রেজিস্ট্রারের পক্ষে খুবই অস্বাভাবিক মনে হবে। কিন্তু বনবিহারী মুখোপাধ্যায়ের ব্যক্তিত্বই এখানে প্রধান, পারিপার্শ্বিক বা কৃত্রিম পদমর্যাদা ভেদ করে তা সময়ে অসময়ে বেরিয়ে পড়ে। কলমে যিনি ব্যঙ্গ সৃষ্টি করেন, হাতেও যে সেই একই ব্যক্তি ব্যঙ্গ করতে পারেন, সে দৃষ্টান্ত শরৎচন্দ্র পণ্ডিত দেখিয়েছেন। কিন্তু বনবিহারীর এই ব্যঙ্গের চেহারা উগ্র রকমের স্বতন্ত্র। এর আর জুড়ি নেই। বনবিহারীর হাতে-কলমে ব্যঙ্গ অধিকাংশই প্রকাশ্যত নিষ্ঠুরতার পরিচায়ক, কিন্তু মূলে মূঢ়তার প্রতি অসহিষ্ণুতা। ব্যঙ্গকারীকে কিছু নিষ্ঠুর হতেই হয়, যদিও তা নিজের স্বার্থে নয়। এবং বনবিহারীর ক্ষেত্রে এ সবই উচ্চস্তরের ব্যঙ্গ, যদিও এটি ব্যঙ্গ সাহিত্য নয়, পুলিসের লাঠি যেমন ব্যঙ্গ, কিন্তু ব্যঙ্গ সাহিত্য নয়।

বনবিহারীর চরিত্রের আর এক দিক ঠিক এর বিপরীত। সেখানে তাঁর মহান্ ত্যাগ, অসহায়ের জন্য বেদনা বোধ, আর্তকে সাহায্য করার স্বতঃপ্রবৃত্ত বাসনা। সেদিকের পরিচয় পেলে মন তাঁর প্রতি শ্রদ্ধায় ভরে উঠবে। নানা দিক থেকে তাঁকে দেখবার সুযোগ আমি পেয়েছি তাঁর ভাইদের এবং তাঁর অনুরক্ত বন্ধু ও পাঠকদের মধ্যস্থতায়। সে সব আমি একে একে বিবৃত করছি। গিরিডিবাসী বনবিহারীর চতুর্থ ভ্রাতা বিজনবিহারী আমাকে সাহায্য করেছেন, তা ভিন্ন তাঁর পুত্র কানাইলাল ও অন্যান্য যাঁরা আমাকে চিঠি দিয়েছেন তাঁদের সবার দেখা মিলিয়ে বনবিহারীর পরিচয় এতে সম্পূর্ণ হবে।

বিনোদবিহারী আমাকে জানাচ্ছেন—"আমি মেজদার চেয়ে কত ছোট যে তাঁর প্রথম জীবনের কোন কথাই জানা নেই। তাঁর কাছে আমি কিছু কিছু লেখাপড়া শিখেছিলাম। খুব ভাল পড়াতে পারতেন। তাড়াতাড়ি কোন কথা বুঝতে না পারলে তাঁর ধৈর্যচ্যুতি ঘটত। ইংরেজী অক্ষর পরিচয়ের পূর্বে ইংরাজী বই পড়ে শোনাতেন। রবীন্দ্রনাথের ইংরাজী সোপান বাড়িতে প্রথম আমি পড়েছি। আমার দাদাদের তিনি ইংরেজী বাংলা অঙ্ক ইত্যাদি আই-এ পর্যন্ত পড়িয়েছেন।......সাহিত্য সম্পর্কে আলাপ-আলোচনা করতে তিনি বেশি পছন্দ করতেন। সৈয়দ মুজতবা আলী ও অনিল চন্দের কাছে শুনেছি আমাদের সময় আপনি বিশ্বভারতীর (১৯২১) ছাত্র ছিলেন। আমাকে যেমন আপনার মনে নেই, আমারও আপনাকে মনে পড়ে না। আমার (চিত্র) প্রদর্শনী সম্পর্কে আপনার লেখা (যুগান্তর সাময়িকী, ২৪-৩-৪৬) দেখেছি। কানাইলালের পিতার সম্বন্ধে সব রেকর্ড কানাইলালকে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে, এই সঙ্গে তাকে আপনার প্রয়োজনের কথা জানিয়েছিলাম।"—বিনোদবিহারী মুখোপাধ্যায়।

এই রেকর্ড বিনোদবিহারীর অনুরোধে বিজনবিহারী লিখেছেন। তা থেকে আমি অংশ বিশেষ উদ্ধৃত করব। ঐ সঙ্গে বিজনবিহারী আমাকে যে চিঠি দিয়েছেন তা এই—

"আমার মেজদা বনবিহারীর বিষয় আপনার যে আলোচনা কিছুদিন পূর্বে (মৃত্যুর সপ্তম দিনে ১১-৭-৬৫ তারিখে) যুগান্তরে বেরিয়েছে তা আমি পড়েছি, কিন্তু সেটা অসম্পূর্ণ ছিল, তাই এ বিষয়ে আপনার আরও কিছু লেখার প্রস্তাবে আমি অত্যন্ত খুশি হয়েছি।...শারদীয় যুগান্তরে (১৯৬৫) সৈয়দ মুজতবার লেখাটি পড়েছি। তার লেখা ভালই হয়েছে, দু-একটা ছোটখাট ভুলভ্রান্তি আছে, তবু ভাল।...দূরে থেকে বনবিহারীবাবুকে কখনো কেউ বোঝে নি, বোঝা যেত না, এবং এটেই তাঁর চরিত্রের একটি বৈশিষ্ট্য। সৈয়দের লেখায় বনবিহারীবাবুকে ঘোরতর নাস্তিকরূপে চিত্রিত করা হয়েছে, কিন্তু আমি জানি সেটা তাঁর আসল রূপ নয়। তিনি জ্ঞানবুদ্ধি বিচার পথের পথিক ছিলেন। তিনি দয়া ক্ষমা করুণায় প্রকৃত সহৃদয় লোক ছিলেন। আবার ধৈর্য সহিষ্ণুতায় এবং সত্য পথে চলায় তিনি কঠিন কঠোর ও দুঃসাহসী বীর ছিলেন। তাঁর কোন কাজেই আড়ম্বর বা প্রচার ছিল না। এক দিক দিয়ে তিনি নীরব গোপন, কিন্তু অন্য দিক দিয়ে রঙ্গ-রসিকতায় ও ব্যঙ্গে তিনি উচ্ছল ও মুখর ছিলেন। ডাক্তার তুলসী ভট্টাচার্য তাঁর এই বাল্যবন্ধুর কথা বলতে বলতে প্রায় মাঝে মাঝে বলে ওঠেন 'সে একজন ক্ষণজন্মা লোক ছিল'। —কথাটি খুব মিথ্যা নয়। বনফুলের যে চতুর্দশপদীটি 'দেশ' পত্রিকায় বেরিয়েছিল সেটি বনবিহারীবাবুর একটি দিককে খুব সুন্দরভাবে প্রকাশ করেছে এবং বলার ভঙ্গিতে তাঁর মাস্টার মশায়ের রূপ ধরা পড়েছে।...

"সাংসারিক বা বৈষয়িক ব্যাপারে তিনি উদাসীন ছিলেন সত্য, কিন্তু সংসার ও সমাজপীড়িতদের জন্য তাঁর চোখের জল পড়তেও দেখেছি।.....তাঁর আর একটি বৈশিষ্ট্য তাঁর অসীম মনোবল। ছোট-বড় অনেক সাংসারিক দুর্যোগ দুর্ঘটনার মধ্যে এবং কর্মজীবনের অনেক জটিল সমস্যার মধ্যে তাঁকে সম্পূর্ণ অবিচল থাকতে দেখেছি।" —শ্রীবিজনবিহারী মুখোপাধ্যায়।

কিন্তু বনবিহারী প্রকৃতই নাস্তিক ছিলেন অথবা বিশ্বাসী ছিলেন, এ আলোচনা নিরর্থক। নাস্তিক কথাটাই এখন পুরনো এবং পরিত্যক্ত, অতএব ওটা পরিত্যাজ্য। সেহেতু মুজতবা আলী যা বলেছেন এবং বিজনবিহারী যা বলছেন, দুটোরই অর্থ এক। তবে বনবিহারী নিজে 'এথিক' ধর্মী ছিলেন। কতগুলি নীতি তাঁর স্থির করা ছিল, সমাজ বিধান সম্পর্কে তাঁর আচরণ এবং চিন্তাধারা ঐ নির্দিষ্ট নীতির পথেই চলত। তিনি নির্লোভ ছিলেন, স্বার্থহীন ছিলেন, সমাজের, ধর্মের, মূঢ়তায় তীব্র বেদনা বোধ করেছেন, চিন্তার সাহায্যে, সাহিত্যের ভিতর দিয়ে, ব্যঙ্গ চিত্রের ভিতর দিয়ে, জাতিকে (জাতিধর্ম নির্বিশেষে) ধর্মের মূঢ়তা থেকে উদ্ধার করতে চেয়েছেন, এটাই তাঁর বড় পরিচয়। ঈশ্বর বা কোনো সচেতন সৃষ্টিকর্তা কোথাও কেউ আছেন কি না তা মানুষের সীমাবদ্ধ জ্ঞানে যখন জানবার উপায় নেই, তখন কারো পক্ষে "আমি অবিশ্বাসী" বলাও যতটা মিথ্যা, "আমি ঈশ্বর মানি" বলাও ঠিক ততটা মিথ্যা। অথবা দুইই সমান সত্য। অতএব কেউ কিছু মানেন কি মানেন না, তাতে কারো জীবনে গৌরব বাড়েও না, গৌরবের হানিও হয় না। একদল লোক ভূত মানেন, আর একদল ভূত মানেন না, অথচ দুদলের মধ্যে কেউ ভদ্রলোক হতে চাইলে তাঁর সে পথ খোলা আছে। কেউ বাধা দেবে না, ভূতও না, অভূতও না।

বিজনবিহারী আরও জানাচ্ছেন—"...বনবিহারীর জীবনের প্রথম ভাগে তিনি দুটি উদার মহাপ্রাণ ব্যক্তির ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্য লাভ করেছিলেন এবং এঁরা দুজনেই এখন বাঙলা দেশের ....বিস্মৃত ব্যক্তি। একজন বৈদান্তিক পণ্ডিত শ্রীহেমচন্দ্র বিদ্যারত্ন, আমাদের জ্যাঠামশাই, যিনি মূল বাল্মীকি রামায়ণের অনুবাদ করেছিলেন, কালীপ্রসন্নের মহাভারত রচনাকালে যিনি সভাপণ্ডিত ছিলেন এবং যিনি মহর্ষির ব্রাহ্মধর্ম পুস্তকটি সংস্কৃত ভাষায় সঙ্কলন ও সম্পাদনা করেন।...আর

একজন সংস্কৃত কলেজের সহকারী প্রধান শিক্ষক, নববিধানসমাজভুক্ত, শ্রদ্ধেয় দেবেন্দ্রনাথ ঘোষ। ...তিনি আদর্শ পুরুষ ছিলেন।... তাঁর জন্ম শতবার্ষিকীতে (১৯৬৪) তাঁর বহু কৃতী ছাত্র যে শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন করেছিলেন, তার মধ্যে বনবিহারীও ছিলেন। দেবেন্দ্রনাথ ঘোষের পুত্র ডাঃ তারকনাথ ঘোষ তার টেপরেকর্ডিং করিয়ে রেখেছেন।...

"বাল্যকালে মেজদা জোড়াসাঁকো ঠাকুর বাড়ীতেও পরিচিত ছিলেন এবং শ্রদ্ধেয় দ্বিজেন্দ্রনাথের বিশেষ স্নেহপাত্র ছিলেন।

"পনেরো-ষোল বছর বয়সেই মেজদা সংস্কৃতে আদ্য মধ্য ও কাব্যতীর্থ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন এবং সংস্কৃত ভাষায় অনেক পদ্য লেখেন। তৎকালীন সংস্কৃত কলেজের শিক্ষক ও অধ্যাপকদের অতি প্রিয় বনবিহারী স্কুল কলেজ এবং ইউনিভারসিটি ইনসটিট্যুটে বহু নাটক অভিনয়ে ও আবৃত্তিতে পুরস্কার পেয়েছিলেন, এ বিষয়ে অন্য ছাত্রদের শিক্ষা দিতেও দেখেছি।

"প্রসংগক্রমে বলা যায় যে, আমাদের জ্যাঠতুতো বড় ভাই ইন্দুভূষণ মুখোপাধ্যায় (নিউ থিয়েটার্সের কমিক অভিনেতা, অধুনা মৃত) পাঠ্যাবস্থায় যখন আমাদের বাড়িতে থাকতেন তখন মেজদার সাহচর্যে তাঁর আবৃত্তি ও নাট্যকলা শিক্ষা হয়।

"ছবি আঁকা, মডেলিং করা, তাঁর 'হবি' ছিল। তিনি বহু কার্টুন চিত্র এ'কেছিলেন (ভারতবর্ষ, শনিবারের চিঠি প্রভৃতিতে প্রকাশিত)। শত শত কবিতা গান তাঁর মুখস্থ ছিল, অনেক সময় রবীন্দ্রসংগীত গুণগুণ করে গাইতেন। অনেক সময় উচ্চকণ্ঠেও গাইতে শুনেছি।

"ধর্ম, সমাজ, সভ্যতা ও স্বাধীনতা নিয়ে তিনি প্রায়ই আলোচনা করতেন। মনে হয় তাঁর প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্য দর্শন প্রায় সব পড়া ছিল। আলোচনার সময় তিনি উপনিষদ, গীতা, পাতঞ্জল দর্শন, রামায়ণ, মহাভারত, কালিদাস, ভবভূতি—সব থেকেই মুখেমুখে এমন উদ্ধৃতি দিয়ে বলতেন যে আশ্চর্য লাগত তাঁর পাণ্ডিত্য দেখে। আবার আমাকে ফিজিক্স, কেমিস্ট্রি, ট্রিগোনোমেট্রিও পড়িয়েছেন বই না দেখে। হিন্দু ধর্মচর্যার পদ্ধতি, রঘুনন্দনের বিধি বিধান, সামাজিক নির্যাতন এবং বর্বরতার প্রতি তাঁর কোন ক্ষমা ছিল না। এইখানে তাঁকে মনে হত যেন কালাপাহাড়"

তিনি তাঁর যৌবনকালে সমাজের বাধা ঠেলে নিজ পৌরোহিত্যে তাঁর বিধবা ভগ্নীর বিবাহ দেন, হিন্দু শাস্ত্র মতে। তখন সার আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের বিধবা কন্যার বিবাহের পর হিন্দু সমাজের একটি পরবর্তী বিধবা বিবাহ। এই বিবাহ বাসরে বহু শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিত এবং সার আশুতোষ স্বয়ং উপস্থিত ছিলেন। আমাদের মা যদিও বিদ্যারত্নের কন্যা, তবু তিনি এ বিবাহে মত দিয়েছিলেন। ১৯১৩-১৪ সালে মেজদার বিলেত যাওয়া নিয়েও এই রকম অনেক সামাজিক বাধা উপেক্ষা করে আমাদের দাঁড়াতে হয়েছিল। আমরা কিছুদিনের জন্য 'একঘরে' হয়েছিলাম।

"কর্মজীবনেও মেজদার এইরূপ চ্যালেঞ্জ বিরল নয়। তিনি যখন দিনাজপুরে সিভিল সার্জান, তখন সরকারের একটা সিভিল ডিজোবীডিয়েন্স বিরোধী অভিযান শুরু হয়, তাতে গভর্মেণ্ট সব জেলা অফিসারদের সহযোগ দাবী করে, কিন্তু একা মেজদা তাতে যোগ দেন নি, সেজন্য তাঁকে খারাপ জায়গায় বদলি করা হয়। মেজদা জেলের অনেক দণ্ডবিধির বদল ঘটিয়েছিলেন, কয়েদীদের খাওয়া থাকার উন্নতি করতে চেয়েছিলেন, সব পারেন নি, শেষে যথাসময়ের পূর্বেই অবসর গ্রহণ করেন। জেল পরিদর্শনের সময় একবার মেজদাকে ধরেকয়ে তাঁর সংগে জেল দেখতে গিয়েছিলুম। তখন জেলে রাজনৈতিক বন্দী অনেক ছিলেন। দেখে অবাক হলাম তাঁরা প্রত্যেকে হাসিমুখে মেজদার কাছে এগিয়ে এসে বন্ধুর মত অনেক কথাবার্তা কইলেন।...একজন তেলের ঘানি ঘোরাচ্ছিলেন, তিনি বললেন, সার, এ ঘানি দু-তিন জনে ঘোরাবার কথা, কিন্তু আমাকে একা ঘোরাতে হচ্ছে। মেজদা তাকে হাত ছেড়ে দিতে বলে নিজে সেটা ঘোরাবার চেষ্টা করলেন, কিন্তু পারলেন না। শেষে আমাকে দিলেন, ভাগ্যে ছিল ঘানি ঘোরালাম, এবং বললাম এ ঘানি এক ঘণ্টা ঘোরালেই শুয়ে পড়তে হবে। মেজদা তৎক্ষণাৎ তাকে সেই ঘানি টানা থেকে মুক্তি দিলেন।

"বেপরোয়া"র দল

পশ্চাতে: চারুচন্দ্র ভট্টাচার্য, তুলসীচরণ ভট্টাচার্য। সম্মুখে: বিষ্ণুচরণ ভট্টাচার্য, বনবিহারী মুখোপাধ্যায়

"মেজদা ছিলেন সত্যনিষ্ঠ নির্ভীক এবং দয়ালু লোক। তাঁর দান ছিল গোপনে, নিজের হাতে অর্থের ব্যবহার করেন নি। শুনতে আশ্চর্য লাগবে যে তিনি ছেলে-পুলেদের জন্যও একটা খেলনা বা লোজেঞ্জ কখনও কেনেন নি। আয় করেছেন অনেক ব্যয়ও করেছেন অনেক, কিন্তু নিজ হাতে করেন নি। ...নিজের পায়ে নিজে অপারেশন করেছেন দেখেছি, লোক্যাল অ্যানির্সার্থিসিয়াও ব্যবহার করেন নি।... তাঁর, অসীম মনের বল আরো অনেক ক্ষেত্রে দেখেছি। তাঁর বৃদ্ধ বয়সে তিনি জরাজীর্ণ দেহ নিয়ে স্বাবলম্বী থেকেছেন, ছেলে-মেয়ে কাউকে তাঁর ভার বইতে দেন নি।

"আত্মভোলা, স্বার্থহীন, নিরাসক্ত, নির্ভীক —তিনি নাস্তিক ছিলেন কি ঈশ্বরে বিশ্বাসী ছিলেন, তা কে বলতে পারে।...একটা কথা বলা হয় নি যে, মেজদার হাতে আমরা কখনো চাবি দেখি নি, পকেটেও পার্স দেখি নি, তাঁর নিজের বলে' কোন বাক্স, ট্রাঙ্ক, সুটকেস, আলমারি, দেরাজ কখনো ছিল না, শুধু বইয়ের আলমারি ছিল—কিন্তু চাবি ছাড়া।"

এ এক আশ্চর্য জীবনকথা।

বনবিহারীর মৃত্যু তারিখ ৫ই জুলাই সোমবার ১৯৬৫। সেইদিন সকালে টেলিফোনে আমি এই দুঃসংবাদ শুনে, তখনই তাঁর সম্পর্কে একটি ছোট রচনা লিখি, এবং তা ১১ই রবিবার যুগান্তর সাময়িকীতে ছাপা হয়। বিজনবিহারী এই প্রবন্ধের কথাই তাঁর চিঠিতে উল্লেখ করেছেন। সেই লেখাটি পড়ে বনবিহারীর পরিচিত এবং আমার অপরিচিত দুজন ব্যক্তি আমাকে যে চিঠি লেখেন তা বিশেষ মূল্যবান। সেই দুখানা চিঠির অংশ বিশেষ আমি প্রথমে এখানে উদ্ধৃত করছি।—

প্রথম চিঠি (জিতেন্দ্রনাথ চৌধুরী) জবলপুর, মধ্যপ্রদেশ ১২-৭-৬৫ ..."মাননীয় বনবিহারী মুখোপাধ্যায়ের কথা পড়িয়া আমার পূর্বস্মৃতি জাগিয়া উঠিল। কলিকাতা সংস্কৃত কলেজে পাঠকালে বনবিহারী ও তাঁর সতীর্থ পশুপতিনাথ শাস্ত্রী (শ্রীমান গৌরী-নাথ শাস্ত্রীর পিতা), সুরেন্দ্রনাথ মজুমদার শাস্ত্রী, তুলসী ভট্টাচার্য প্রভৃতির সংগে আলাপ হয়। আমার তিন শ্রেণীর উপরে উঁহারা পড়িতেন। ...তুলসীচরণের ছোট ভাই বিষ্ণুচরণ (অধ্যাপক) আমার সতীর্থ...।

"রেসিটেশনে ভাল ছিলাম, ও আমার শ্রেণীর প্রথম বিধায় আমি তাঁহাদের প্রিয়-পাত্র ছিলাম। আমি আলিপুরে ওকালতি করিতাম, ও মধ্যে মধ্যে হাইকোর্টে গেলে পশুপতি শাস্ত্রীর সহিত অনেক কথাবার্তা হইত।

"স্কুলের আবৃত্তিতে বনবিহারীদা শাইলকের পার্ট করেন, ও পশুপতিদা পোর্শিয়ার পার্ট করেন। বৈকালে আমি প্রায় রোজই গোলদীঘিতে ঘুরিতাম। একদিন বনবিহারীদা আমাকে দেখিয়াই বলিয়া উঠিলেন 'কি রাখাল কেমন আছ? অনেকদিন দেখি নি'। তা বেশ মোটা হয়েছ। কলাই ডাল বেশি খাচ্ছ বুঝি?' আমি ত অবাক। বলিলাম, 'আমাকে চিনতে পাচ্ছেন না? আমি জিতেন।'

" 'ও! তাই ত। রাখালের কথা ভাবছিলুম কি না? তা বেশ, কিন্তু তুমি তো রোগা হয়ে গিয়েছ দেখছি। উপোসটুপোস করছ বুঝি?'

"আমি খুব মোটা ছিলাম ও গোঁড়া বলে আমার অখ্যাতি ছিল। স্যাটায়রটা বুঝলেন ত?

"আমাদের শিক্ষক দেবেন্দ্রনাথ ঘোষ প্রত্যহ ছুটির পর দালানে দাঁড়াইতেন এবং আমরা তাঁহাকে ঘিরিয়া দাঁড়াইয়া......নানা বিষয়ে আলোচনা শুনিতম। পশুপতিনাথ, দক্ষিণারঞ্জন ভট্টাচার্য, বটুকনাথ ভট্টাচার্য ও আমি। তুলসীচরণ ও বনবিহারী দুজনে ডাক্তারি পড়িতে গেলে তাঁহাদের সংগে মধ্যে মধ্যে সাক্ষাৎ হইত। বনবিহারীর বিধবা ভগিনীর বিবাহে বিচারপতি আশুতোষ মুখোপাধ্যায় উপস্থিত থাকিয়া বিবাহ দেন। তে হি নো দিবসা গতাঃ।"

—জিতেন্দ্রনাথ রায় চৌধুরী।

দ্বিতীয় চিঠি (ব্যোমকেশ মজুমদার) ৬২ অখিল মিস্ত্রি লেন, কলি-৯ ২৬-৭-১৯৬৫ "সম্প্রতি যুগান্তর সাময়িকীতে প্রকাশিত আপনার 'স্যাটায়ারিস্ট বনবিহারী মুখোপাধ্যায়' নামক রচনাটি পাঠ করিয়া অত্যন্ত উপকৃত হইলাম—আমার একটা গভীর সংশয়ের নিরসন ঘটিল।

"কয়েক বৎসর পূর্বে পূজা-সংখ্যা 'বেতার-জগৎ'এ প্রকাশিত বনফুলের রচনা 'অগ্নীশ্বর' পাঠ করিয়া আমার মনে দৃঢ় বিশ্বাস জন্মে যে, অগ্নীশ্বর চরিত্রে নিশ্চয় বনবিহারী মুখোপাধ্যায়ের ছায়াপাত হইয়াছে। আমার ধারণা কতদূর সত্য সে সম্বন্ধে প্রশ্ন করিয়া বনফুলকে একখানা চিঠিও লিখি। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত তাহার কোনও জবাব পাই নাই। আজ দীর্ঘকাল পরে আপনার প্রবন্ধে অত্যন্ত অপ্রত্যাশিতভাবে সেই প্রশ্নের সঠিক জবাব প্রাপ্ত হওয়ায় বড়ই আনন্দ বোধ করিতেছি।

"স্রষ্টা বনবিহারী ও ব্যক্তি বনবিহারী উভয়ই আমাদের দেশে দুর্লভ। আমাদের দেশের মাটি হয় তো এইরূপ প্রতিভার পক্ষে অনুকূল নয়।

"আমার পূর্ব নিবাস মৈমনসিংহ জেলা। অতি শৈশবে বিগত ১৩০৮ সালে বনবিহারী-বাবুর সংস্পর্শে একবার আসিবার সুযোগ আমার হইয়াছিল। তিনি তখন সেখানকার লিটন মেডিক্যাল স্কুলের শিক্ষক ও সূর্যকান্ত হাসপাতালের ডাক্তার। মেডিসিন ও সার্জারি—চিকিৎসা শাস্ত্রের উভয় শাখাতেই তাঁহার সমান দক্ষতা ও সুনাম ছিল। তাঁহার লেখন-খ্যাতিও বয়স্কদের মুখে শুনিতে পাইতাম। ঐ ১৩০৮ সালের শীতকালে অন্য একটি বালকের সংগে খেলিতে খেলিতে হঠাৎ পড়িয়া গিয়া আমার ডান হাতখানা ভাঙিয়া যায়। সেই ভাঙা হাতের চিকিৎসার জন্যই আমাকে তাঁহার শরণাপন্ন হইতে হইয়াছিল। তাঁহার সেই উজ্জ্বল গৌরবর্ণ সুঠাম চেহারা ও সরস কথাবার্তা আজও আমরা ভুলিতে পারি নাই।

"পরবর্তীকালে তাঁহার সম্বন্ধে অনেক কথা তারাশঙ্কর, বনফুল, সজনীকান্ত ও আপনার লেখা হইতে জানিতে পারি। বোধ হয় সজনীকান্তেরই লেখা হইতে ইহাও জানিতে পারি যে, বনবিহারী সন্ন্যাস অবলম্বন করিয়া রামকৃষ্ণ মিশনে অবস্থান করিতেছেন।

"এক্ষণে আপনার কাছে আমার একটি প্রশ্ন আছে। দয়া করিয়া আমার এ প্রশ্নের উত্তর যদি দেন তাহা হইলে সদ্য পরলোকগত বনবিহারীর একজন অকৃত্রিম অনুরাগী অশেষ কৃতজ্ঞভাজন হইবেন।

"বনবিহারী সর্বমোহমুক্ত বাস্তববাদী দৃঢ়চেতা পুরুষ। কোন প্রকার ন্যাকামি বা ভণ্ডামি তাঁহার কাছে কখনও প্রশ্রয় পায় নাই। বিশ্বাসের সংগে আচরণের সামঞ্জস্য এইরূপ চরিত্রে সম্পূর্ণ স্বাভাবিক। ব্যক্তি-গত জীবনে তিনি আস্তিক নাস্তিক কিংবা অজ্ঞেয়বাদী কি ছিলেন, জানি না। তবে তাঁহার লেখা পড়িয়া যদি তাঁহার ধর্মমত সম্বন্ধে কোনও ধারণা করা সম্ভব হয়, তাহা হইলে তাঁহাকে নাস্তিক না বলিলেও অজ্ঞেয়বাদীর উপরে বোধহয় আর কিছুই বলা চলে না। কিন্তু তাহাই যদি হইবে, তবে সন্ন্যাস অবলম্বন করিয়া একটা ধর্ম-সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত হইতেই বা যাইবেন কিরূপে? তবে কি শেষ জীবনে তাঁহার মধ্যে কোনও পরিবর্তন আসিয়াছিল? অথবা বাহ্য কাঠিন্যের অন্তরালে ভক্তিরসের প্রচ্ছন্ন ফল্গুধারা বরাবরই প্রবাহিত ছিল—পরবর্তী জীবনে কোনও কারণে তাহাই বাহিরে প্রকট হইয়াছিল? ...বনবিহারীর মৃত্যু সংবাদ কোনও সংবাদ-পত্রে প্রকাশিত হইতে দেখিয়াছি বলিয়া মনে পড়ে না। বিস্মৃতির অন্ধকারে তিনি সম্পূর্ণ অবলুপ্ত। কিন্তু তাঁহার অসামান্য চরিত-কথা বাঙ্গালীকে শুনাইবার প্রয়োজন আছে। আপনাকে সেই মহৎ কার্যে অগ্রণী হওয়ার জন্য আহ্বান জানাই। তাঁহার রচনা-বলীর একখানা সঙ্কলন গ্রন্থও প্রকাশিত হওয়া উচিত।"— ব্যোমকেশ মজুমদার।

আমি এ চিঠির ব্যক্তিগত উত্তরে জানিয়েছিলাম যে তিনি আশ্রমে চাকরি করতে গিয়েছিলেন, বেতন নিতেন অবশ্য নামমাত্র। (শ্রীযুক্তা জ্যোতির্ময়ী দেবীর লেখা পরবর্তী পত্র দ্রষ্টব্য।) তবু এ চিঠির প্রশ্নগুলি নানা কারণে উল্লেখযোগ্য।

কিন্তু সন্ন্যাসজীবন তিনি বিশেষভাবে কোথাও জপাদিনের জন্য গ্রহণ করেন নি—

তিনি যৌবনকাল থেকেই প্রায় সন্ন্যাসজীবনে অভ্যস্ত ছিলেন। বিজনবিহারীর লেখা থেকে তা এতক্ষণ অবশ্যই জানা হয়ে গেছে। অতএব পত্রলেখক যা আগে বুঝেছিলেন তা সত্য। পরবর্তী সংবাদটাই সত্য নয়।

কোনো যুক্তিবাদী মানুষের পক্ষেই এ কথা কখনো বলা সম্ভব হয় না যে, 'আমি শেষ সত্য জানি।' অতএব এটা ধরেই নিতে হবে যে, তিনি ধর্মবিষয়ে ব্যক্তিগতভাবে কোনো দলে ভেড়েন নি, এবং ভক্তি নামক কোনো মানসিক রস যুক্তিবাদী মনে আশ্রয় পায় না। সম্প্রতিকালে শিক্ষিত ব্যক্তিদের অনেকের মধ্যেও দেখা যায় একদল বলেন, "জান, আমি ঈশ্বর মানি না?" আর একদল ঠিক একই দাম্ভিকতার সংগে বলেন "জান, আমি ঈশ্বর মানি?" যুক্তিবাদী এর কোনো দলেই নেই। তিনি এ সব বাদ দিয়েও শ্রেষ্ঠ ধার্মিক হতে পারেন, কারণ মাত্র পাঁচ-ছয়টি অতি সরল এবং সাধারণ নিয়ম মেনে চললেই ধার্মিক হওয়া যায়। ভদ্রলোক হতেও আটকায় না। এ বিষয়ে বনবিহারীর মত অনেকটা পাওয়া যাবে তাঁর 'দশচক্র' নামক উপন্যাসে। বারট্রাণ্ড রাসেল যাকে বলেছেন 'কালেকটিভ ইনস্যানিটি'—বনবিহারী সেই কালেকটিভ ইনস্যানিটির বাইরে ছিলেন।

আমি তাঁর জীবনের ছোট্ট একটি কাহিনীর সাহায্যে আমার বক্তব্য পরিষ্কার করি। কাহিনীটি সম্প্রতি জানিয়েছেন বনবিহারীর ছাত্র ডাক্তার ধীরেন্দ্র চৌধুরী, ক্রিস্টোফার রোড সি-আই-টি বিল্ডিং থেকে তিনি জানাচ্ছেন, "বনবিহারী যখন মৈমনসিংহে, তখন সুসং রাজবাড়িতে একটি কল পান। জায়গাটা দূরে, আসা যাওয়া বাদে তাঁকে এ জন্য তাঁরা পাঁচ শত টাকা ফী দেবেন স্থির হয়। যাবার কিছু পূর্বে দূর পল্লী থেকে এক অত্যন্ত গরিব ব্রাহ্মণ এসে কেঁদে পড়েন তাঁর পুত্রের টাইফয়েড, বাঁচবার কোনো আশা নেই, তবু শেষবারের জন্য বনবিহারীবাবু যদি একবার তাকে দেখেন, তবে তাঁর নিজের আর কোনো অনুতাপ থাকবে না। বনবিহারীবাবু কিছুক্ষণ চিন্তা করে বললেন, আপনার ছেলেকে দেখব। তিনি সুসং-এর ডাক বাতিল করে দিলেন, এবং নিজের খরচে দূর পাড়াগাঁয়ে গিয়ে ছেলেটিকে দেখলেন।"

এই যে কাজ তিনি করলেন, এটা শোনার পরেও কি জিজ্ঞাসা করতে ইচ্ছা হয় বনবিহারী কোন্ সম্প্রদায়ভুক্ত অথবা তাঁর ধর্মবিশ্বাস কি ছিল? যেটুকু করলেন এইটুকু কি তাঁকে জানবার পক্ষে যথেষ্ট নয়? কিন্তু এটি তো শুধু তাঁর একমাত্র কাজের দৃষ্টান্ত নয়। তিনি সমস্ত জীবন এ কাজ করেছেন।

'দশচক্র' নামক উপন্যাসের একটুখানি এই প্রসংগে উদ্ধৃত করি—"কিন্তু ধর্ম ত এত উপেক্ষার বস্তু নয়।' 'আমি যাহা বুঝি না তাহাই সত্য।' - ইহাই ধর্মের মূল কথা। 'আমার বুদ্ধিতে গলদ থাকিতে পারে, অতএব নিজের বুদ্ধিতে না চলিয়া হরি-নরির বুদ্ধি লইয়া চলিব' এ কথা যে না বলিতে পারে তাহার কোন স্থিরতা নাই।"

আর একটা উদ্ধৃতি (দশচক্র), "একজনকে ডুবিতে দেখিলে আর একজন জলে ঝাঁপাইয়া পড়ে তাহাকে উদ্ধার করিবার জন্য। যে সাঁতার জানে না সেও ঝাঁপাইয়া পড়ে, এমন ঘটনা প্রায় শোনা যায়। ধর্ম-প্রচারকেরা বলেন, মানুষের মনে এই প্রবৃত্তি দিয়াছে ধর্ম। হইতে পারে বিশ্বচরাচরে এমন মহাপুরুষ কেহ আছেন যিনি ধর্মপ্রণোদিত হইয়া আর্তত্রাণ করেন—স্বর্গের আশায়, ভাল অপ্সরার পাশে বসিবার লোভে, বা পরমেশ্বরের সাক্ষাৎকার কামনায় পরের দুঃখ দূর করিবার চেষ্টা করেন। কিন্তু সাধারণ লোক যে অনেক সময় নিজেদের বিপন্ন করিয়া পরকে বাঁচাইতে যায়, সে শুধু পরের দুঃখে তাহাদের প্রাণ কাঁদে বলিয়া।... পাড়ায় আগুন লাগিয়াছে, এমন সময় যদি দেখি একজন ব্যস্ত হইয়া উঠিয়াছেন, বাছিয়া বাছিয়া শুধু হিন্দু বা মুসলমানের ঘর বাঁচাইবার জন্য—তবে বুঝিতে পারি ইনি সহজ লোক নন। ইনি ধার্মিক।"

বিশুদ্ধ মানবিকতার জয়গান, অথবা মনুষ্যত্বের জয়গান, এর চেয়ে বেশি আর কি করা যাবে? ধর্মই যে বিকারগ্রস্ত হয়ে মনুষ্যত্বকে চেপে রাখে, এই বিশ্বাসের আরও দৃষ্টান্ত আছে ঐ বইতেই—সর্বত্র ছড়িয়ে আছে। আমি আরও কিছু উদ্ধৃত করি—"এত বড় দেশের মধ্যে এই ছোট মানুষটির দাঁড়াইবার স্থান কি কোথাও নাই? নিশি হিন্দু, মুসলমান, খৃষ্টান, সকল সমাজের লোকের সহিত...আলোচনা করিয়া এটুকু বুঝিয়াছে যে, সে যদি আজ মুখে বলে যে, খৃষ্ট বা মহম্মদ তাহাকে উদ্ধার করিতে পারেন, আর কেহ পারেন না, তবে হাজার হাজার লোক পাওয়া যাইবে যাহারা ছুটিয়া আসিয়া ইহাকে কোলে তুলিয়া লইবে। কিন্তু সে মানুষ, বিপদে পড়িয়াছে—কেবল এই কারণে কেহ তাহাকে আশ্রয় দিবে না। সে যদি আজ দেহ বিক্রয় করিতে প্রস্তুত হয়, ত ক্রয় করিবার লোকের অভাব হইবে না। সমাজের শিরোমণিরাও তখন দলে দলে আসিবেন, টং করিয়া টাকা ফেলিবেন, ইহার গা ঘেঁসিয়া বসিয়া যাইবেন। ইহাকে মাথায় করিয়া লইয়া গিয়া শ্রাদ্ধসভার বুকের উপর নাচাইবেন। ইহার রাঁধা ভাত...নিরুদ্বেগে উদরসাৎ করিবেন। কিন্তু এ যে দেহটাকে অস্পৃষ্ট রাখিতে চাহিতেছে! ভোগ্যবস্তুর এ স্পর্ধা সমাজ সহ্য করিবে কেন?..."

এই যে প্রশ্ন, এর মধ্যে বেদনা কি পরিমাণ ফুটেছে তা অতি স্পষ্ট। বনবিহারী এ দেশের মেয়েদের অসহায়তায় যে তীব্র বেদনা বোধ করেছেন, তার প্রমাণ তাঁর বহু রচনায়, কার্টুন ছবিতে। 'দশচক্র' উপন্যাসেও ঐ একই বেদনা এবং পুরুষের কাপুরুষতার বিরুদ্ধে তীব্র পরিহাস। আরও একটি অতি নির্মম পরিহাসের ছবি দেখা যাবে তাঁর 'সিরাজির পেয়ালা' (বঙ্গবাণী ৬ষ্ঠ বর্ষ, ১৩৩৩ আশ্বিন) নামক ছোট উপন্যাসে। মেয়েদের অসহায়ত্বের এমন বিপ্লবাত্মক ছবি বাংলাভাষায় এ পর্যন্ত রচিত হয় নি। শরৎচন্দ্র এমন স্যাটায়ার, লিখতে পারেন নি।

কিন্তু সিরাজির পেয়ালার কথা বলবার আগে সুবিখ্যাত লেখিকা শ্রীযুক্তা জ্যোতির্ময়ী দেবীর একখানি চিঠি উদ্ধৃত করা প্রয়োজন বোধ করছি। চিঠিখানা এই—

"আপনার প্রবন্ধে (যুগান্তর সাময়িকী ১১-৭-৬৫) জানতে পারলাম, প্রায় ৪০ বছর আগে আমাদের সেকেলেদের সমসাময়িক লেখক বনবিহারী মুখোপাধ্যায় পরলোকগমন করেছেন। আপনার ঐ লেখাটি না বেরুলে তাঁর অনুরাগী পাঠক-পাঠিকা, বন্ধুরা কেউই তৎকালীন বিশিষ্ট এবং এখনকার বিস্মৃত এই একটি লেখকের লোকান্তরের খবর জানতে পারতেন না। কোন না কোনো কাগজের একটি কোণেও মনে হচ্ছে এ খবর বেরোয় নি। সম্ভবত সাহিত্যক্ষেত্রেও তাঁকে মনে করার মত আর কেউ নেই।

"কিন্তু আজ থেকে চল্লিশ-পঁয়তাল্লিশ বছর আগে বঙ্গবাণী, শনিবারের চিঠি, প্রভৃতি পত্রিকায় তাঁর অনুরাগী ভক্ত পাঠক-পাঠিকা কম ছিলেন না। যাঁরা মাসের পর মাস বঙ্গবাণীতে দশচক্র পড়ার জন্য উৎসুক থাকতেন।...কোন এক সময়ে নরকের কীট পড়েছেন শনিবারের চিঠিতে। 'সিরাজির পেয়ালা'র কঠিন শাণিত ব্যঙ্গ পড়ে বিধবা-সধবা মেয়েরা কঠিন পাথর হয়ে গেছেন, ভাবনা আর বেশী এগোতে পারেনি তাঁদের ভীরু মনে। এবং আজও ভুলে যান নি তাঁর কঠিন উক্তিময় রচনা। তা হলে কি মাত্র আমরা দু-একজন মাত্র বেঁচে আছি?... আপনি তাঁর স্যাটায়ারধর্মী রচনার কথা নিয়ে তাঁকে স্মরণ করেছেন সেটাই তো কার্য্য 'নিত্য'। দশচক্রের শশী, নিশি, তাদের পিতৃমাতৃ-পরায়ণতা, আবার তাদের নিজস্ব ব্যক্তিমতবাদ পড়তে পড়তে লেখকের দুধারে কাটা শাণিত উক্তি ও যুক্তি, আর তাঁর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি ও বাচনভঙ্গিতে ও আজকালকার সমস্যামূলক গল্প-উপন্যাসের কথাবার্তার ভঙ্গিতে যে কত পার্থক্য তা বলে শেষ করা যায় না। দশচক্রের তীক্ষ্ণ সমাজদর্শনও যেমন আছে, তেমনি স্নিগ্ধ উক্তির উঁকি দিয়ে যায়...

"তাঁর গল্প উপন্যাস নাটকের যে ভাব-সংঘাত, তা বেশীর ভাগই শ্লেষ-ব্যঙ্গ-বিদ্রূপের মধ্যে ফুটে উঠলেও সমস্ত বক্তব্য, ও দেখার অন্তরে অন্তরে, তাঁর সহৃদয় মানব-সত্য দর্শনই প্রচ্ছন্ন রয়েছে। নিন্দা ধিক্কার দিতে গিয়েও সহসা আর এক দিক দেখতে পেয়ে থেমে গেছেন যেন। সিরাজির পেয়ালা আর নরকের কীট দুটি গল্পের ছত্রে ছত্রে

লেখকের মন আলোর মত দেখা যায়। ভণ্ডামি ভানের আড়ালে মানবমনের কি বেদনাময় দর্শন।

বছর চোদ্দ আগে (১৯৫১) একবার হরিদ্বার গিয়েছিলাম। কনখলে রামকৃষ্ণ মিশনে অতিথি হয়েছিলাম। সেখানে সহসা এক পরিচিত সাধু মহারাজ আমাকে বললেন, "মা, আমরা ডাক্তার বনবিহারী মুখোপাধ্যায় মহাশয়কে আমাদের ডাক্তার করে পেয়েছি এই ক' মাস হল। খুব চমৎকার লোক।"—তিনি জানতেন আমি একটু বাংলা সাহিত্য পড়ি। আমি খুব খুশি হয়ে বললাম, 'নিয়ে যাবেন তাঁর বাড়িতে?"

"সন্ধ্যাবেলা। গেলাম মহারাজের সঙ্গে। ...তিনি আমাকে চিনতেন না, চেনবার কথা নয়। ...বললাম তাঁর লেখার একজন ভক্ত পাঠিকা ছিলাম আমি। কোথায় গেছে কোন্ লেখা! কোনো মোহই আর তাঁর নেই। আমি তাঁর দু-একটি বইয়ের নাম করলাম। বললেন, 'নরকের কীট পড়েছেন?'...

"কোথায় কোনখানে একটু মোহ বোধ-হয় তখনও লুকনো ছিল দু-একটি লেখার জন্য। কিংবা আমার আগ্রহ দেখে বললেন।

"আপনার লেখায় দেখছি তিনি মুক্ত হয়ে গিয়েছিলেন লেখাসঞ্চয়ের মোহ থেকে।... সেই সময়েই কয়েকদিন পূর্বে তাঁর পুত্রের বিবাহ ঠিক হয়েছিল—তাঁর এই মিশনের কর্মভার গ্রহণের সময়েই। কিন্তু তিনি তা ছেড়ে এখানেই চলে এলেন। পঞ্চাশ টাকা বেতন এবং বাসস্থান। চলে এলেন পুত্রের শুভবিবাহের সময়?" "সে সেখানের সবাই দেবেন, অথবা যারা বিয়ে করবে, তারাই ব্যবস্থা করবে।" জ্ঞান মহারাজের কাছে শুনলাম ছেলে নতুন বৌকে নিয়ে পিতার কাছে এসেছিলেন, প্রণাম করে গেলেন।...

"আগে তাঁকে দেখি নি। তাঁর কথা মুগ্ধ হয়ে শুনলাম। দেখলাম চমৎকার সুন্দর দীর্ঘ ঋজুদেহ, তীক্ষ্ণ নাক মুখ চোখ। তখনো চুল কালো। পরিপূর্ণ কর্মক্ষম শিক্ষিত মানুষটিকে পেয়ে শিক্ষিত সাহিত্যরসিক সাধু-মণ্ডলীর মধ্যে নতুন আনন্দের পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছে।..." জ্যোতির্ময়ী দেবী।

বনবিহারী মুখোপাধ্যায়কে এইভাবে নারী-পুরুষ সবার দৃষ্টির সঙ্গে মিলিয়ে দেখতে চেষ্টা করলাম। শ্রীযুক্তা জ্যোতির্ময়ী দেবীর চিঠিতে একটি প্রশ্ন আছে—"তাহলে (তাঁকে স্মরণ করবার মতো) কি আমরা দু-একজন মাত্র বেঁচে আছি?"—এ প্রশ্ন নিয়ে পরে আলোচনা করব।

প্রথমেই একটা কথা পরিষ্কার হওয়া দরকার—বনবিহারী কি নৈরাশ্যবাদী ছিলেন? মনে হয় ছিলেন। তিনি সমস্ত জীবন যা বিশ্বাস করেছেন সেই মতো কাজ করতে চেয়েছেন, তাই তিনি নৈরাশ্যবাদী হয়েছেন। আমি একটি প্রাজ্ঞ উক্তি অনুসরণ করে এ কথা বলছি। মূল ইংরেজী কথাটি তর্জমা করলে এই রকম দাঁড়ায়, "যিনি এককালে দুর্দান্ত আশার সঙ্গে নিজের বিশ্বাস অনু-যায়ী কাজ করতে চেয়েছিলেন, তিনিই নৈরাশ্যবাদী।" এই সংজ্ঞা অনুযায়ী বন-বিহারী নৈরাশ্যবাদী। তাঁর রচনায় কৌতুক অংশ খুবই কম, শুধু ভাগ্যের পরিহাস ও ব্যঙ্গ—বিশুদ্ধ ব্যঙ্গ—এবং তা পাঠককে হাসিয়ে দিয়ে মজা সৃষ্টির জন্য নয়। তাঁর সমস্ত রচনা তাঁর মনের বেদনাময় আলোড়ন থেকে জাত, এবং তাঁর ব্যঙ্গের আক্রমণ কদাপি কোনো ব্যক্তি নয়। ল্যাম্পুন রচনা তিনি করেন নি। তাঁর আক্রমণ—(কথাটিকে যদি আক্রমণই বলতে হয়) তাহলে তা সমাজ ধর্মের মধ্যে (যে-কোনো সমাজ বা ধর্মের) যে অন্ধতা আছে, শুধু তার বিরুদ্ধে। ব্যঙ্গের ভঙ্গিতে পূর্ণ তাঁর যাবতীয় রচনা, এবং সব সময়েই তার লক্ষ্য এক। রচনা-গুলির দেহে যেন ব্যঙ্গের ইনট্রাভিনাস ইনজেকশন দিয়ে দেওয়া হয়েছে।

১৯২৫-এর পরে বহুকাল তাঁর সঙ্গে আর দেখা হয় নি। তাঁর সম্পর্কে খবর শুনতাম মাঝে মাঝে, আজ এখানে কাল সেখানে। শেষ পর্যন্ত তাঁকে "স্কলার জিপসি" ছাড়া আর কিছু ভাবতে পারি নি। কেউ তাঁকে সম্পূর্ণ পায় না, তিনি কোথাও স্থায়ী বাসস্থান গড়েন না, দেখা দিয়েই মিলিয়ে যান। তাই দেখা হওয়ার আশা ছেড়েই দিয়েছিলাম। এমন সময় ঠিকানা মিলে গেল।

তাঁকে পেলাম ত্রিশ বছর পরে। সে চেহারার বদল ঘটেছে, শুধু কণ্ঠস্বরটি তেমনি স্পষ্ট মধুর সঙ্গীতধর্মী। শুধু তা শুনলেও এতদিন পরে সেটি কার কণ্ঠ চিনে নিতে দেরি হত না। কৈলাস বসু স্ট্রীটে তখন থাকি, সেখানেই তিনি আসতেন, সঙ্গে থাকতেন তাঁর ভাই বঙ্কুবিহারী।

আমার 'স্মৃতিচিত্রণে' তাঁর কথা একটু-খানি লিখেছিলাম। সেই প্রথম পরিচয়ের কথা। দ্বিতীয় স্মৃতিতে লিখলাম একটি অধ্যায়। যখন লিখছি তখন 'স্কলার জিপসি' পালিয়ে গেছেন আন্দামানে। সেখানে গিয়ে চিঠি লিখেছেন। আবার ফিরে এসেই চলে এসেছেন আমার কাছে।

একখানি ব্যঙ্গ সংকলন গ্রন্থে (ব্যঙ্গমা-ব্যঙ্গমী) তাঁর নরকের কীট নামক ব্যঙ্গ গল্পটিকে বিস্মৃতির নরক থেকে উদ্ধার করে পুনর্মুদ্রিত করলাম। সেই হল কোনো সাহিত্য গ্রন্থে তাঁর প্রথম স্বীকৃতি। ভূমিকায় লিখেছিলাম (২য় সং ১৯৫৯) "যদি ইউ-রোপের রোজার বেকন বা এমন কি ভোলতেয়রের যুগেও আমাদের দেশের আধুনিক যুগের ব্যঙ্গ রচয়িতারা জন্মাতেন, তা হলে সংখ্যাগুরুর সমাজ ব্যবস্থার বিরুদ্ধে ব্যঙ্গ বর্ষণের দরুন বাংলা দেশে প্রথম শহীদ হওেন বনবিহারী মুখোপাধ্যায়।"

বনবিহারীর যত অপ্রকাশিত লেখা ছিল, (অন্যত্র যা ছিল তা তিনি উদ্ধার করতে পারেন নি, ছাপাও হয় নি) সমস্ত আমাকে দিয়ে নিশ্চিন্ত হলেন, একখানা চিঠি লিখে জানালেন আমাকে। লিখলেন—'তোমার যেমন ইচ্ছা এগুলির ব্যবস্থা করবে।' আমি অনেক জায়গাতেই সেগুলি ব্যবস্থা করে-ছিলাম, কিন্তু এখনও অপ্রকাশিত কিছু হাতে আছে। এই লেখাগুলির মধ্যে 'কর্মফল' নামক একটি রচনা আছে, তার প্রথম দিকটা আমি এখানে উদ্ধৃত করছি। এটি তাঁর স্বচ্ছ যুক্তির অন্যতম একটি নিদর্শন মাত্র।—

"কর্মফলে বিশ্বাস করেন? এ প্রশ্ন প্রায়ই শুনিতে পাওয়া যায়। রাম ঢিল ছুড়িল, এবং তাহাতে শ্যামের মাথা ফাটিল। রামের কর্মের ফল শ্যাম ভোগ করিতেছে। এ কথা কে না বিশ্বাস করে? কিন্তু এ বিশ্বাসে চলিবে না। বিশ্বাস করিতে হইবে শ্যামের মাথা ফাটা শ্যামেরই কর্মফল। ইহ-জন্মের না হউক পূর্ব জন্মের।

"ধরিয়া লওয়া যাক, ফল দিতেছেন একজন বিধাতা পুরুষ। তিনি রামকে নিমিত্ত করিয়া শ্যামের মাথা ফাটাইলেন, কোন্ অপরাধের দণ্ড হিসাবে ফাটাইলেন তাহা বুঝিতে দিলেন না। অর্থাৎ দণ্ড দিয়া কাহারও সংশোধন করা তাঁর উদ্দেশ্য নয়। উদ্দেশ্য শুধু নিজের হিংস্র প্রবৃত্তি চরিতার্থ করা।"......

পূর্ণাঙ্গ বক্তব্যের এটি আরম্ভ মাত্র। এটুকু আমি উদ্ধৃত করলাম আরও একটি বিশেষ উদ্দেশ্যে। আমার মনে হয়, এর মধ্যে স্যাটায়ারিস্টের ভূমিকা কি, তারও নিশ্চয় আভাস পাওয়া যাবে। তা হিংস্র প্রবৃত্তি চরিতার্থতার জন্য নয়, শিক্ষা দেবার জন্য। হিন্দুর বিধাতা পুরুষ স্যাটায়ারিস্ট ছিলেন না।

কিন্তু বনবিহারী স্যাটায়ারিস্ট ছিলেন। স্যাটায়ার কথাটা আমরা পেয়েছি ইংরেজী থেকে; ইংরেজরা পেয়েছে ল্যাটিন থেকে। বাংলায় ব্যঙ্গ ভিন্ন আর কিছু চলে না। অথচ স্যাটায়ারের মূল অর্থ যা ছিল কয়েক শতাব্দী ধরে তা বদল হতে হতে ইংরেজী স্যাটায়ার সাহিত্য বলতে একটা নির্দিষ্ট অর্থ বোঝায়, যদিও তার নির্দিষ্ট সংজ্ঞা রচিত হয় নি, এবং নির্দিষ্ট কোনো চেহারার মধ্যেও তা আবদ্ধ নেই। সাহিত্যের সব রূপই মাত্রাভেদে স্যাটায়ারের রূপ হতে পারে। আমাদের দেশে কিন্তু ব্যঙ্গ বলতে ঠিক কি বোঝায় সে সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা সাধারণ পাঠকের নেই। সাধারণ হিউমারকেও সেজন্য ব্যঙ্গ নামে চালানো হয় এদেশে। কিন্তু এ বিষয়ে আর কিছু বলার প্রয়োজন নেই। তবে আশা করা যায় যে, দূর ভবিষ্যতে কোনো দিন

ব্যঙ্গ শব্দটি আরও নির্দিষ্ট অর্থে ব্যবহৃত হতে পারবে।

দূর ভবিষ্যতের কথা বলছি এ জন্য যে, আমাদের পণ্ডিতেরা অনেকে বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস লিখেছেন, কিন্তু আমি যে ক'খানা বই দেখেছি তাতে ব্যঙ্গ যুগ বা ব্যঙ্গ সাহিত্য নামক কোনো অধ্যায় দেখি নি, এবং বনবিহারী মুখোপাধ্যায়ের নাম কোথাও নেই। ব্যঙ্গ দূরের কথা, উপন্যাস অধ্যায়েও তিনি লেখক রূপে কোথাও স্বীকৃতি পান নি।

বাংলা সাহিত্যে ব্যঙ্গ অপাংক্তেয় বলেই মনে হয়। কিংবা এর শক্তি সম্পর্কে পণ্ডিতেরা সচেতন নন। ইংরেজী সাহিত্যের ইতিহাসে স্যাটায়ার বিশেষভাবে স্থান ও মর্যাদা পায়, অনেক সময় সাহিত্যের না হলেও ঐতিহাসিক মর্যাদা পায়। কিন্তু বনবিহারীর রচনা শুধু ব্যঙ্গ নয়, তা উচ্চশ্রেণীর সাহিত্য এবং বাংলা কথা-সাহিত্যের ইতিহাসে তার উচ্চস্থান নির্দিষ্ট হওয়া উচিত ছিল, এবং সবচেয়ে বিস্ময়ের ব্যাপার এই যে, বনবিহারী তাঁর 'দশচক্র', 'যোগভ্রষ্ট' অথবা 'সিরাজির পেয়ালায়' যে সব চরিত্র সৃষ্টি করেছেন তেমন স্পষ্ট প্রবল এবং পূর্ণ মানবিক চরিত্র বাংলা সাহিত্যে খুব বেশি আছে বলে বোধ হয় না। এ সব উপন্যাস, উপন্যাসরূপে বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে শ্রেষ্ঠ গৌরবলাভ করতে পারত, কিন্তু চাপা পড়ে গেল।

বাংলা সাহিত্যে হাস্যরসের বিষয়ে গবেষণামূলক কয়েকখানা বই আমি দেখেছি, কিন্তু ব্যঙ্গ সাহিত্য নিয়ে কোনো বই নেই। এ এক দুর্জ্ঞেয় ঘটনা। বড় বড় পণ্ডিতেরা বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস লিখে দিগ্বিজয় করলেন বনবিহারীকে চেপে রেখে! কেউ তাঁর নামও শোনেন নি এমনই গবেষণা! তাঁর মৃত্যু সংবাদও কোনো কাগজে ছাপা হল না। ৬-৭-৬৫ তারিখের স্টেটসম্যানে ব্যক্তিগত কলমে মৃত্যু শিরোনামার নিচে টাকা দিয়ে সংবাদ ছাপানো হল—

On July 5, 1965 at 6-25 A.M. in Calcutta, peacefully Dr. Banbihari, M.B. retired Civil Surgeon aged 80. "Rest in peace".

এতবড় দুর্ভাগ্য সবার চোখের সামনেই ঘটল। তিনি কোথাও সভাপতিত্ব করেন নি, প্রধান অতিথি হন নি, জন্মদিন করেন নি, কিন্তু সে তাঁর অপরাধ নয়। তিনি তো তাঁর দান সাহিত্যজগতে রেখে গেছেন, তাঁর নিজের সম্পর্কে সাহিত্য ইতিহাসের অধ্যায় লেখা তাঁর কর্তব্য নয়, সে কর্তব্য ইতিহাস লেখকের।

ধর্মাচার বিষয়ে বা সমাজ বিষয়ে চরম রক্ষণশীলরা তাঁর লেখায় স্বভাবতই আহত হতে পারেন, সব ব্যঙ্গই কোনো না কোনো সম্প্রদায়কে আহত করে, ব্যঙ্গ সাহিত্যের উদ্ভবই এই উদ্দেশ্যে। উচ্চশ্রেণীর ব্যঙ্গ সাহিত্য সে জন্য সভ্য দেশে আদৃত। বিদেশী ব্যঙ্গ সাহিত্যের ইতিহাস পড়লেই তা বোঝা যাবে।

অতএব কোনো রক্ষণশীল সম্প্রদায় বা ব্যক্তি, বনবিহারীর সাহিত্যকে পছন্দ না করতে পারেন, এবং না করলে বলবার কিছু নেই। কিন্তু বিশুদ্ধ সাহিত্যের মূল্য বিচারে তাঁর দশচক্র, যোগভ্রষ্ট বা সিরাজির পেয়ালা নামক যে সব উপন্যাস উচ্চমূল্য পেতে পারত সেই উপন্যাসগুলি সাহিত্যের ইতিহাসে অস্পৃশ্য হল কেন? সাহিত্যের ইতিহাস পাঠকেরা ইতিহাসের এই শূন্যতা মেনে নিলেন কেন?

'দশচক্র' সব দিক দিয়ে উল্লেখযোগ্য। শুধু সফল ব্যঙ্গ সাহিত্য বলে নয়, সফল উপন্যাস বলে। এর পরিবেশ বাস্তব। যে যুগের পটে গল্পটি সাজানো হয়েছে সে যুগের যথার্থ চরিত্র এতে প্রকাশিত। যে জীবনচিত্র এতে আঁকা হয়েছে তা বাস্তব। প্রত্যেকটি মানুষ জীবন্ত, এবং শুধু জীবন্ত নয়, তারা প্রত্যেকেই এমন ব্যক্তিত্বপূর্ণ যে তাদের ভোলা যায় না। তদুপরি তারা হিউম্যান। মানবিক পূর্ণতা তাদের আছে, সবলতা দুর্বলতা মিলিয়ে তাদের চরিত্র হিউম্যান। তার পরে প্লট। প্লট এমনই চিত্তাকর্ষক যে শেষ পর্যন্ত প্রবল একটা আকর্ষণ পাঠককে টেনে নিতে থাকে। তারপর এর ভাষা। রসসমৃদ্ধ ভাষা যদি সাহিত্যের অন্যতম বড় পরিচয় হয়, তা হলে এরকম চরিত্রানুগ সরস জীবন্ত এবং ধারালো ভাষা অন্যত্র দুর্লভ মনে হবে। এর পাতায় পাতায় এমন চমৎকার সব উপমা এবং এপিগ্র্যাম আছে, যা গল্পকে গভীরতার দিকে অতি সহজে বিস্তার করে দিয়েছে। এর ভাষা ন্যাকামি-বর্জিত, কিন্তু সেন্টিমেন্ট-বর্জিত নয়। সর্বকালীন যুক্তিবাদী অথচ অতি সহৃদয় একটি স্রষ্টা মন আছে এর পিছনে, প্রতি পদে তার স্পর্শ বিস্মিত করে, চমকিত করে। এতে প্রচার আছে, কিন্তু কোথাও তা উপন্যাসের মূল বাঁধন থেকে পৃথক হয়ে যায় নি। যে অর্থে "এবার ফিরাও মোরে" নামক কবিতা প্রচার, "গোরা" উপন্যাস প্রচার, War and Peace প্রচার, ঠিক সেই অর্থে 'দশচক্র' প্রচার। এবং এ সব ছাড়াও এর মধ্যে এমন কিছু আছে যার জন্য এ বই একবার পড়া শেষ হলে আরও একবার পড়তে ইচ্ছা হয়। পিছনে যুক্তিবাদী আধুনিক মন, কিন্তু ভাষার ক্ল্যাসিক্যাল জৌলুশ। এর মধ্যে শিল্পীর একটি মেসেজ বা বাণী আছে। এই মেসেজ; সকল প্রথম শ্রেণীর উপন্যাসেই থাকে। তা সমস্তকে ধারণ করে থাকে, তা সমস্ত উপন্যাসের শিরায় উপশিরায় অদৃশ্যভাবে প্রবাহিত হতে থাকে, তার স্পন্দন অন্তরে এসে বাজে, সে বাণী পাঠকমনকে নতুন আলোয় ভরে তোলে।

পড়তে আরম্ভ করলে মনের মধ্যে সব সময় এ চেতনা জাগতে থাকে যে একখানি খাপে ঢাকা ধারালো ছোরা এর পাশাপাশি চলছে। এ ছোরা যে-কোন মুহূর্তে খাপ থেকে বেরিয়ে এসে আঘাত হেনে আবার খাপে গিয়ে ঢুকবে।

বনবিহারী ভাল সংস্কৃত জানতেন, সংস্কৃতে শাস্ত্রাদি সবই ভাল পড়া ছিল, লেখবার সময় তিনি তার সদ্ব্যবহার করেছেন। তাঁর উপমাপ্রয়োগ, যুক্তির কথা ও এপিগ্র্যামের সামান্য কয়েকটি দৃষ্টান্ত তুলে দিচ্ছি। দশচক্রের নানা স্থান থেকে।

১। এখনকার রাজনীতির মত ধর্মের পশুরাজ তখন সদ্য প্রসূত। তাই তাহার গায়ে অনেকগুলো দাগ ছিল—কৃশ্চান ব্রাহ্ম হিন্দু প্রভৃতি। (সদ্য প্রসূত সিংহশাবকের গায়ে চিতার মতো দাগ থাকে, পরে মিলিয়ে যায়, তাই উপমা সার্থক।—লেখক)

২। ধূমকেতু যেমন সোজাপথে আসিতে আসিতে গ্রহের আকর্ষণে বাঁকিয়া যায়, তেমনি

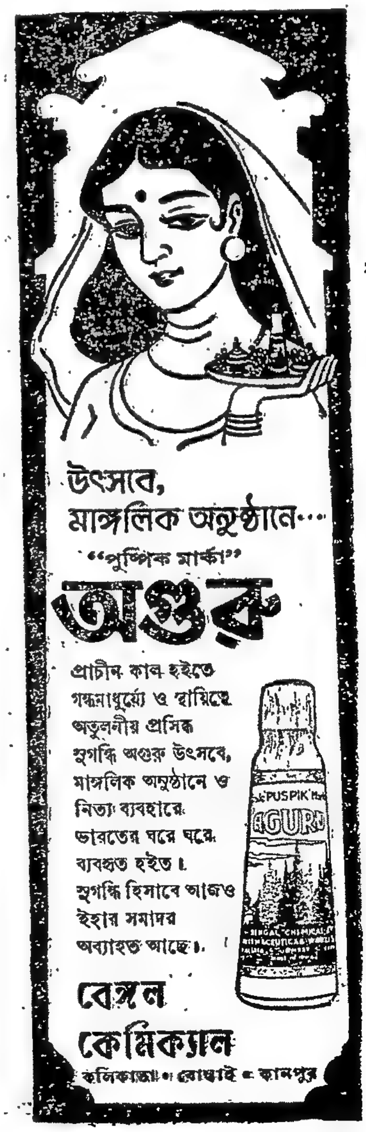

তাঁহার অনেক বড় বড় সংকল্প গৃহিণীর কাছাকাছি আসিয়া বাঁকিয়া যাইত।

৩। ... শুধু খান দূরের কথা, বৈধব্যের অব্যবহিত পরেই তাহার সমস্ত দেহ একটা লাবণ্যের বন্যায় কূলে কূলে ভরিয়া উঠিল... সকলেই অনুমান করিল, এই লাবণ্যের উৎস কোন একজোড়া পাতলা কাল গোঁফের পশ্চাতে লুকাইয়া আছে। কিন্তু লাঞ্ছিত কুলিরমণীর কণ্ঠলগ্ন শিশুর মত তাহার এই লাবণ্য কাহারও তোয়াক্কা না রাখিয়া নিশ্চিন্ত আনন্দে কারণে অকারণে হাসিতে লাগিল।

৪। চামড়া কাল...এইখানেই জগত্তারিণীর প্রধান ভরসা। তিনি জানিতেন মীনকেতুর ধারালো ধারালো শর কতবার চামড়ায় প্রতিহত হইয়া ফিরিয়া গিয়াছে...চামড়া ত তুচ্ছ নয়! চামড়ারই ত ঢাল হয়।

৫। কতকগুলো ছড়ান লোহার গুঁড়া একটা চুম্বকের সান্নিধ্যে আসিয়া যেমন সুসম্বদ্ধ, সুবিন্যস্ত হয়, গোরীর আবির্ভাবে রামময়ের সংসার সেইরূপ হইল...আমের মধ্যে মিষ্ট রসের মত গৌরী গৃহস্থালীর শিরায় শিরায় আপনাকে পরিব্যাপ্ত করিয়া দিল।

৬। কোথা হইতে এক সন্ন্যাসী উড়িয়া আসিলেন। শুধু ক্ষণিকের জন্য তিনি রামময়ের জীবনকে একবার স্পর্শ করিয়া আবার কোথায় উড়িয়া গিয়াছেন। ফলে কিন্তু রামময়ের মাথায় একটি শিখা গজাইল।

৭। বহুরূপী যখন গা বাহিয়া উঠিতে থাকে তখন তাহার রূপ দেখিতে পারে কয়জন?

৮। শশী যখন ফিরিয়া আসিল তখন সে বিছুটির মত কাঁটায় ভরা—কোন দিক দিয়া তাহাকে স্পর্শ করিবার উপায় নাই।

৯। "নিশি খৃষ্টান হতে গেল।"

"ধর্মে বিশ্বাস করে আজন্ম অবমানন.ই যদি করে, ত হিন্দু, জৈন, ব্রাহ্ম খৃষ্টান যে কোন ধর্ম গ্রহণ করতে পারে—

"অন্য ধর্মগুলো তবু একটু লিবারাল। বলে না যে তাদের দিক দিয়ে না গেলে একেবারে অনন্ত নরক।"

"ও বলাবলিতে কিছু এসে যায় না। রিলিজন হচ্ছে নিতান্ত বাইরের জিনিস—ওতে রূপ বদলায়, মন বদলায় না। মানুষ বর্বর অবস্থায় এটাকে ব্যবহার করে, সভ্য হলে ছেড়ে দেয়।"

১০। তিনি সাপ মারিবার জন্য নেউল পুষিলেন। সে দু-একটা সাপ মারিয়াছে সত্য, কিন্তু সংগে সংগে হাঁড়ির মাছ ও খোপের পায়রাও নিঃশেষ করিয়াছে।

১১। সকল জিজ্ঞাসার শেষে তিনি যে বস্তুবাদের দাঁড়ি টানিয়াছিলেন, "কিন্তু"র চাপে বাঁকিয়া তা একটি প্রকাণ্ড জিজ্ঞাসার চিহ্নে পরিণত হইয়াছে।

১২। সন্ন্যাসী দেখিলেন ভেড়ার মত ইহাদিগকে যতবার পিছনে ঠেলিয়া দেওয়া যাইবে, ততবার ইহারা ঘাড়ের উপর আসিয়া লাফাইয়া পড়িবে।

১৩। সাধারণ লোক যুক্তি হইতে মীমাংসায় উপনীত হয়, আর ধার্মিকেরা মীমাংসা হইতে যুক্তিতে অবতরণ করেন।

১৪। সমুদ্রগর্ভ হইতে ত্বরিতোত্থিত ডুবুরির ন্যায় এই আকস্মিক ভার লাঘবে তাহার চোখ ফাটিয়া রক্ত ঝরিতে লাগিল।

১৫। শাস্ত্রের প্ল্যাসেন্টা হইতে যাহাকে সত্য সংগ্রহ করিতে হয় অনায়াসে,...তাহার পক্ষে ফাঁকা হাওয়া একেবারে অনাবশ্যক।

১৬। গংগাজল দিয়া অ্যারোরুটকে গুলিয়া কাদা করা যায়, কিন্তু প্যারিস প্লাস্টারকে যায় না।

১৭। জলৌকার মত নিশির উদ্যত প্রেম চারুশীলার হৃদয়ে কোথাও একটা আশ্রয় খুঁজিতে খুঁজিতে যখন অতিদীর্ঘ হইয়া উঠে, ঠিক সেই সময়ে চারুশীলা দু-একটা বাক্যের নুন ছিটাইয়া তাহাকে নিরস্ত সংকুচিত করিয়া দেয়।

১৮। কেন সে এমন করিয়া তাহার হৃদয়-উপত্যকায় আসিয়া পৌঁছিল—একটি লীলা-চঞ্চল কৃষ্ণ ছাগশিশুর মত? তাহাকে লক্ষ করিল, তাহাকে পাছু পাছু ছুটাইয়া হয়রান করিল, এবং স্পর্শ করিবার পূর্বে লঘু ললিত-লম্ফে কোন অনধিগম্য অনির্দেশ্যতার মধ্যে অদৃশ্য হইয়া গেল!

১৯। তাহার উন্মুখ আশার মুখে এই অগ্নি-সংযোগের পর সে হাউইয়ের মত ছুটিতে না পারিলে, পটকার মত ফাটিয়া যাইত।

২০। "আপনি ওকে একা ছেড়ে দেন?"

"কেন বল দেখি? তোমার ভয় হচ্ছে এতে ওঁর দেহের পবিত্রতা রক্ষা না হতে পারে?"

"হাঁ।"

"দেহের পবিত্রতা রক্ষা করা তো ওঁর কাজ নয়।...নারীর পবিত্রতা রক্ষা করা পুরুষের কাজ! হয় সে সভ্য হয়ে তার সম্মান রক্ষা করবে, নয় সে সবল হয়ে তাকে অত্যাচার থেকে রক্ষা করবে। নারীর কাজ শুধু নিজেকে পবিত্র রাখার চেষ্টা করা।"

"তা ত বটে।"

"আমার স্ত্রী সে চেষ্টা করবে না মনে হচ্ছে?"

"না তা কেন বলব?"

"তিনি চেষ্টা করবেন, এর চেয়ে বেশী কিছু ত আমার জানবার দরকার নেই। চেষ্টা করে নিষ্ফল হলে আমার কাছে তাঁর দর কমবে না।"

"কিন্তু"—

"আর তাঁর বুদ্ধি পবিত্র থাকবার চেষ্টা বা ইচ্ছা না থাকে, তবে বেঁধে রাখলেই কি তিনি সাধু হবেন? তা যদি হয়, ত সকলের চেয়ে বেশী সাধু আছে জেলখানায়।"

"আমি বলছি...আমাদের দেশে নারীর সম্মান রাখতে শেখেনি এখনও লোকে।"

"তা যদি হয় ত সেই লোকগুলোকে দণ্ড দাও ঘরে বন্ধ রেখে, আমার স্ত্রীর উপর অত্যাচার করতে চাও কেন?"

২১। পা কাটিয়া বাদ দেওয়া হইল, এখনও অবর্তমান আঙুলের বেদনা সে ভুলিতে পারিল না।

২২। গৌরী নারী বলিয়া সেও কি সাধারণের মত তাহাকে প্রপার্টি মনে করে? পশ্চিমের বাগান বাড়ির মত ফেলিয়া রাখিবে, নিজে দেখিবে না, অপর কাহাকেও দেখিতে দিবে না, সময়ে অসময়ে নিজে গিয়া মাতলামি করিবে, অথচ অন্য কেহ বাস করিতে আসিলেই জিজ্ঞাসা করিবে, সে তামাক খায় কি না।

২৩। বৎসরান্তের ধ্বংসভ্রংশে ...কদলীকাণ্ড হইতে আরক্ত মোচার ন্যায় তাহার হৃৎপিণ্ড একটি প্রাণজোড়া বাসনার বৃন্তে বাহির হইয়া আসিতে চাহিল।

২৪। ধিক ধিক ... (দীর্ঘ অসুখের পর) দেবতার কাছে আর কি কিছু তোমার চাহিবার নাই? ভারতবর্ষের স্বাধীনতা, মানবজাতির মোক্ষ, জলাতঙ্ক রোগ নিবারণ, পতির দীর্ঘ জীবন...কিছুতেই কি তোমার প্রয়োজন নাই? শুধু ঝোলভাত?

২৫। শিক্ষা দিবার সময় তিনি ছাত্রদিগের মনের দিকে লক্ষ্য রাখিতেন, কানের দিকে নহে।

২৬। উৎকট আনন্দ-বিরহের তিক্ততার সহিত মিশ্রিত হইয়া স্যাকারিনের মত শশীর মনকে কিছুকাল তন্ময় করিয়া রাখিল।

এরকম উপমার ফুলঝুরি, এপিগ্রাম, সমাজচিন্তা, ধর্মচিন্তা এবং ধারযুক্ত অথচ সংকোচহীন ভাষায় মনের কথা প্রকাশের দৃষ্টান্ত প্রথম পৃষ্ঠা থেকে শেষ পৃষ্ঠা পর্যন্ত ঠাসা। সমাজচিন্তার শিকড় তাঁর মনের গভীরে হাজার শাখা মেলেছে।

১৯২৬ খৃষ্টাব্দে 'দশচক্র' প্রথমে বিজয়চন্দ্র মজুমদারের সম্পাদনায় বংগবাণীতে প্রকাশিত হয়। পরে পুস্তকাকারে, শনিরঞ্জন প্রেস থেকে। এই বংগবাণীতেই তাঁর সিরাজির পেয়ালা নামক ২৬ পৃষ্ঠার বড় গল্প (অথবা ছোট উপন্যাস) ১৯২৭ সালে প্রকাশিত হয়। সিরাজির পেয়ালা পড়তে গিয়ে মেয়েদের মনে কি প্রতিক্রিয়া হয়েছিল, তার আভাস জ্যোতির্ময়ী দেবীর চিঠিতেই পাওয়া গেছে।

এই গল্পটিতে দুটি মেয়ের মনের ভিতর দিয়ে তিনি সমস্ত নারী সমাজের অন্তরের বেদনা প্রকাশ করেছেন। এ গল্প (যেমন দশচক্র) সহ্য করার মত পাঠক খুব বেশি ছিলেন বলে মনে হয় না। কিন্তু এ যুগের বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস-লেখকদের হাতে যে এটি তাঁর অন্যান্য লেখার মতোই অবজ্ঞাত হয়েছে তার প্রমাণ তো তাঁদের থীসিসের

মধ্যেই আছে। শরৎচন্দ্রের নারীর মূল্য (প্রবন্ধ) ও তাঁর উপন্যাসের কয়েকটি বিখ্যাত নায়িকার সব কথা একত্র করলেও এ বইতে "নারীর মূল্য" যেভাবে প্রখর দিবালোকে উন্মুক্ত করে ধরা হয়েছে, তার কাছে দাঁড়াতে পারবে না। এত বড় অস্ত্র আর বাংলার মেয়েদের পক্ষ নিয়ে আর কেউ রচনা করেছেন বলে আমার জানা নেই। বন্ধ্যজীর্ণ ফসিল হয়ে যাওয়া মনের ভিতর এমন নির্মম অথচ স্বাস্থ্যকর ল্যান্সেট চালানো, ডাক্তার বনবিহারী মুখোপাধ্যায় ভিন্ন অন্য কারো সাধ্য ছিল কি না কল্পনা করতে কষ্ট হয়।

আমি সিরাজির পেয়ালা গল্পের আশ্চর্য সুন্দর ভাষা, উপমা, এপিগ্র্যাম ইত্যাদির উদ্ধৃতি থেকে বিরত রইলাম, এমন একটি অখণ্ড জিনিসকে কোনো ভাবেই খণ্ডিত করার ইচ্ছা আমার নেই। আমি শুধু একটি মেয়ের একটি প্রার্থনার একটুখানি অংশ উদ্ধৃত করছি—

"ওগো সকল কালের অন্তর্যামী, সৃষ্টির আদিম বসন্তোৎসবে, যে দিন অগণিত সূর্য-চন্দ্র গ্রহনক্ষত্রকে মুঠা মুঠা আবীরের মত আকাশে ছড়াইয়াছিলে, সেদিন এই উৎক্ষিপ্ত কণিকাগুলির মধ্যে কি কোন জাতিভেদ ছিল? সেদিন কি জানিতে, ইহাদের দু-একটা কণা, তোমার বিরাট ব্যোমরাজ্য হইতে বিচ্যুত-বিক্ষিপ্ত হইয়া ধ্বস্ত-বিগলিত-দেহে ধরণীর মাটীর মাঝে মুখ লুকাইয়া আত্মলোপ করিবে? যদি জানিতে, তবে দুদিনের জন্য তাহাদিগকে চন্দ্র-সূর্যের কোঠায় স্থান দিলে কেন? তাহাদের অন্তরে ধূমকেতুর অনন্ত গতিবেগই বা কেন দিয়াছিলে?"

সিরাজির পেয়ালা পড়ে সমগ্র লেখাটির সম্পর্কে আমার মনে একটি মাত্র ছবি জেগেছিল—পর্বতের গা বেয়ে প্রচণ্ড বেগে ধস নামার ছবি। বৃষ্টিতে, ভূমিকম্পে, তুষারপাতে এবং অন্যান্য অনেক কারণে পর্বতের গায়ে ফাটল ধরে। তারপর একদিন হঠাৎ হুড়মুড় করে সেই ধস বা ল্যান্ডস্লিপের বোঝা নিচে ছুটতে থাকে। গাছপালা মানুষ বাড়িঘর তার পথে চূর্ণবিচূর্ণ হয়ে যায়, বাধা দেবার শক্তি কারো থাকে না। এই বেগ আমি অনুভব করেছি তাঁর এই গল্পে। বহু দিনের বহু গড়ে তোলা জিনিস ভেঙে পড়েছে তার মুখে। তাঁর কলমে সত্য বাক্য 'খরখড়্গ সম' ঝলকিত হয়ে উঠেছে। তবু বাংলা দেশে বনবিহারী অবহেলিত? না, শুধু সেই কারণেই? তাঁর লেখা পড়তে বসলে মনে হবে একজন প্রকৃত শিক্ষিত উচ্চরুচিসম্পন্ন এবং অতি গভীরে প্রসারিত চিন্তার অধিকারী ব্যক্তির সম্মুখে বসে আছি, তাই কি তিনি অবহেলিত?

কার্টুন ছবি, ছন্দোরচনা এবং গল্প উপন্যাস প্রবন্ধ রচনা—এই তিনটি বিভাগেই অসাধারণ শক্তির অধিকারী বনবিহারী। এবং এই তিনটি শক্তির সাহায্যেই তিনি সমাজের ইষ্ট করতে চেয়েছেন। বাঙালীর চিন্তার দুর্বলতা ভেঙে দেওয়া এবং সামাজিক অন্যায় অন্ধকারের স্থানে প্রখর আলোকপাত এই ছিল তাঁর সমস্ত শিল্প প্রেরণার মূলে। তিনি কৌতুক সৃষ্টিতে হাসানোর চেষ্টা করেন নি, ব্যঙ্গ সৃষ্টি করে ভাবাতে ও কাঁদাতে চেষ্টা করেছেন। তাঁর আঁকা কার্টুন ছবি যদি কেউ দেখে থাকেন, তবে এ ব্যাপারেও তিনি যে অদ্বিতীয় ছিলেন তা বোঝা যাবে। বাংলা দেশে দুজন মাত্র শক্তিশালী কার্টুনিস্টের আবির্ভাব ঘটেছিল গত যুগে—বনবিহারী মুখোপাধ্যায় ও গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুর। গগনেন্দ্রনাথের বিরূপ বজ্র বই আকারে প্রচারিত হয়েছিল, যদিও তার প্রতিও গোঁড়া মহলের বিরূপতা প্রসিদ্ধ। তখন তা অর্ধদগ্ধ জ্বলন্ত উল্কাপিণ্ডের মতোই এসে পড়েছিল সমাজের মাথায়। বনবিহারীর কার্টুনও বজ্র, কিন্তু লাইটনিং অর্থে। মাথার উপর কয়েক হাজার কোটি ভোল্টের আঘাত এসে লাগে। বনবিহারীর কার্টুনগুলি নানা মাসিকপত্রের পাতায় ছড়িয়ে পড়ে আছে। কোনো সদাশয় ব্যক্তি যদি কার্টুন ছবির মূল্য কখনো বোঝেন, তবে তিনি হয় তো তা সংগ্রহ করবেন। কার্টুন ছবির বর্ণনা হয় না, দেখতে হয়। তবু বঙ্গবাণী (আশ্বিন, ১৩৩৪) মাসিকে প্রকাশিত তাঁর পাঁচখানি "স্বরাজ" কার্টুনের পরিচয়ের কিছু নমুনা দিচ্ছি। সেগুলি পদ্যে লেখা। ছবির সঙ্গে মেলালে তবে তার পুরো সৌন্দর্য বোঝা যেত। তবু সর্বনাশে সমুৎপন্নে—একটি ছড়ার কিছু অংশ ও একটি পুরো উদ্ধৃত করছি—তাঁর ব্যঙ্গ কবিতার নমুনা হিসাবে।—

(এক)

স্বরাজ, স্বরাজ!
স্বরাজ বিহনে জীবন মোদের
সব সুখআশা-'মিরাজ'!...

(দুই)

স্বরাজ না হলে এ দীন দেশের
বিভব বাড়াবে কে?
নিরুদ্যমীর নিদ্রা ছাড়াবে কে?
বাঁশের বাগিচা অক্ষত রেখে
মশক তাড়াবে কে?
স্বরাজ মোদের বিকল-রাষ্ট্র-মোটর-
বাসের 'গারাজ'।
সকল জীর্ণ চূর্ণ তাহার
পূর্ণ করিবে স্বরাজ।

বাংলার মেয়েদের অসহায়তা স্মরণ করে তিনি বেদনা বোধ করেছেন, তাঁর হৃদয় থেকে রক্ত ঝরেছে এবং তাঁর অনেক স্যাটায়ারের প্রেরণাই এই বেদনা থেকে, এ কথা আগে বলেছি।

বনবিহারী ১৯২৩ খৃষ্টাব্দে 'বেপরোয়া' নামে একখানা পত্রিকা প্রকাশ করেন। বেপরোয়া একটি দল ছিল (সে দলের গ্রুপ ফোটোগ্রাফ এই প্রবন্ধের সঙ্গে ছাপা হল, এই দলের বিজয়চন্দ্র মজুমদার, এই ফোটোগ্রাফে অনুপস্থিত)। দলের অন্যান্যরা—চারুচন্দ্র ভট্টাচার্য, তুলসীচরণ ভট্টাচার্য ও বিষ্ণুচরণ ভট্টাচার্য। বিষ্ণুচরণ ছিলেন সম্পাদক। এই কাগজে বনবিহারীরই সবচেয়ে বেশি স্থান অধিকার করে আছেন। তাতে সন্দেহ থাকে না যে, এর পরিকল্পনা তাঁরই। (বিজয়চন্দ্র মজুমদার ছিলেন বঙ্গবাণীর সম্পাদক। বঙ্গবাণী ৭৭ আশুতোষ মুখার্জি রোড থেকে স্বত্বাধিকারী রমাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের পরিচালনায় প্রকাশিত হত, এ কাগজের একজন প্রধান লেখক ছিলেন বনবিহারী।)

এই বেপরোয়াতেও বনবিহারী মেয়েদের অসহায়তার কাহিনী ব্যঙ্গের ভিতর ফুটিয়ে তুলেছেন। (বেপরোয়া, ১৩২৯, ইং ১৯২৩ তৃতীয় সংখ্যা) এই সময় প্রবাসীতে একটি খবর বেরিয়েছিল—বাঁকুড়া জেলার দুটি হিন্দু বালিকাকে কুষ্ঠরোগীর সঙ্গে বিয়ে দেওয়াতে তারা আত্মহত্যা করেছিল।

এই ঘটনায় বিচলিত বনবিহারী 'কলির ফের' নামক ব্যঙ্গ কবিতা লিখলেন। এটি গল্পের আকারে পদ্যে লেখা। প্লটটা এই—এক মেয়ে নাকখসা কুষ্ঠরোগীর সঙ্গে বিয়ে হবে শুনে আপত্তি করেছিল, তাতে মেয়ের বাবা তার উপর চটে গিয়ে বলল—

নাক নিয়ে কি ধুয়ে খাবে?
কর্তা বললেন চটে।
শালগ্রাম যে দেবতা, তার ও
নাক নেই ক মোটে।

বিয়ে ঠেকানো গেল না। কিন্তু মেয়ে স্বামীর ঘরে থাকতে অস্বীকার করল, তখন পিসি-মাসিরা এসে বোঝাতে লাগল—

পতিই হলেন দেবতা
নারীর পরম তীর্থ, পতি...
পতি পরম গুরু, এমন
চিরুণীতেও লেখে।
পতিভক্তি শিখলি না ক
আজও এ সব দেখে!

বনবিহারী ৫-১২-৫৯ তারিখে আমাকে একখানা চিঠিতে লিখেছিলেন, "......আমি কিছু সঞ্চয় রাখি না। রাখবার আধারও নেই। অফিশিয়াল খামের পিছনে অর্ডিনারি কালি কলম দিয়ে ছবি এঁকে ছড়িয়ে দিয়েছি। পয়সা চাই নি, অ্যাপ্রিসিয়েশনও ভরসা করি নি।" এর এক সপ্তাহ পরে ৯ই ডিসেম্বর তারিখে লিখছেন—"তোমার লেখা পড়ে তোমাকে আমার সগোত্র বলে মনে হয়েছে। তোমার মতামতকে আমি অত্যন্ত মূল্যবান মনে করি। আমার সমস্ত লেখা (অতীত, বর্তমান ভবিষ্যৎ) তোমার হাতে দিয়ে নিশ্চিন্ত হলুম। এদের সম্বন্ধে তুমি যা করবার করো। কোনটা ছাপবে, কোনটা ফেলবে তা তোমার বিচারের উপর ছেড়ে দিলুম।"

আমরা সবাই নীরব—

শক্তি ঘোষ

রাতের অন্ধকারে কিছু দেখা
যায় নাই, ভোরের আলোর রেখা
দেওয়ালের ফাঁক দিয়ে প্রবেশের সাথে
দেখা দিল এক শব।

মৃত, গলিত, খসে খসে গেছে অঙ্গ তার,
বীভৎস—তবু করুণতার
দাহ আছে। আর আমরা সবাই নীরব।

ভোরের পাখীর গান, ঊষার আলোক,
রাতের কুহক আর গলিত এই শব,
উধাও—উধাও করে ভাবালোক।

কতদিন রেখে দেওয়া যায়—
খুঁজে আন! রসায়ন শাস্ত্রে কিবা আছে
কি সে আরক!
গবেষণা চলে নানা—চিন্তা ভয়ানক।
প্ল্যান আসে, চারিদিকে সাজ সাজ রব
আর আমরা সবাই নীরব।
নদীর স্রোতে ভাসিয়ে দাও।
কিংবা আগুনে জ্বালাও,
কেউ বলে 'না'—
এ যে হাজার বছরের কল্পনা।
বিমূর্ত আমার এই ত সব
আমরা সবাই নীরব।

তেহে

আমাদের সম্পর্কের মধ্যে কোনো কৃত্রিমতা ছিল না বলেই আমাদের পরস্পরের অন্তরঙ্গতা এতখানি গাঢ় হওয়া সম্ভব হয়েছিল। বাংলা সাহিত্যে এই একমাত্র ব্যঙ্গ রচয়িতাকে কাছে পেয়ে আমি ধন্য হয়েছিলাম। আমার কাছে তাঁর মনের কথা সবই বলতেন। একবার লিখেছিলেন, "আমার বিশ্বাস, আমার মত করে আর কেউ বলে নি—নিছক সংসারের মঙ্গলকামনায়।"

একথা সম্পূর্ণ সত্য। ব্যঙ্গ রচনা আরও অনেকে করেছেন, কিন্তু তা অনেক সময়েই পরীক্ষামূলকভাবে অথবা বৈচিত্র্য সৃষ্টির জন্য। যকে সাধারণত আমরা ব্যঙ্গ রচনা বলি, তাতে ব্যঙ্গ অংশ কম, হিউমার অংশ বেশি। কিন্তু প্রকৃত ব্যঙ্গ স্রষ্টা, এবং ব্যঙ্গই যাঁর ধর্ম, তিনি বনবিহারী মুখোপাধ্যায়। এই তাঁর নিজস্ব প্রকাশ রূপ। এরই ভিতর দিয়ে তিনি সংস্কারকের ভূমিকা নিয়েছিলেন। ব্যঙ্গও যে উচ্চ সাহিত্য হতে পারে, তার প্রমাণ একমাত্র তিনি। তিনি নিজের বিশ্বাসের সঙ্গে জীবনধারণের সামঞ্জস্য করেছিলেন বলে তিনি পপুলার ছিলেন না, এবং নিজের বিশ্বাস ও মত ব্যঙ্গ সাহিত্যে বা চিত্রে ফুটিয়েছেন বলে তাঁর রচনাও পপুলার নয়। কারণ সভ্য দেশের তুলনায় এদিক থেকে আমাদের এখনও কিছু ত্রুটি রয়ে গেছে। আশা করি এতক্ষণে জ্যোতির্ময়ী দেবী তাঁর প্রশ্নের উত্তর পেয়েছেন।

এই চিরসন্ন্যাসী পরম স্নেহশীল দুর্দান্ত মানুষটির কথা বলতে বিস্তৃততর জায়গা প্রয়োজন।

তবে আমার একটি গর্ব এই আছে যে, এই মোহমুক্ত মানুষটিকে আমি আন্তরিকতা দিয়ে পরাজিত করেছিলাম। আমি তাঁর লেখা বা তাঁকে পুনরায় পাঠকসমাজে আনায় রাজি করিয়েছিলাম। তিনি স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছেন যে, এতে তিনি আনন্দ পেয়েছেন, আমার কাছে ঋণী হয়েছেন। প্রথমে তাঁকে না জানিয়ে তাঁর নরকের কীট পুনর্মুদ্রিত করি, এবং তাঁর লেখা প্রচার যে অন্তত সমাজের কল্যাণের জন্য দরকার এ কথা শেষ পর্যন্ত তিনি স্বীকার করে নেন। তিনি বেঁকে দাঁড়িয়েছিলেন মাঝপথে। কিন্তু এজন্য তাঁকে চোখের জল ফেলতে হয়েছিল, সে কথা তিনি লিখে জানিয়েছিলেন।

তিনি হলিডে'স ইন, কারবাইন'স কোভ ম্যারিন ড্রাইভ পোর্ট ব্লেয়ার থেকে ১৩-৪-৬১ তারিখে লিখছেন; পরিমল, ঠিকানা বদলেছি। এবার ফেরার। তুমি ইদানীং আমার জন্য যা করেছ তার জন্য অত্যন্ত ঋণী আছি। ঋণী লোকের ফেরার হওয়া দেখতে খারাপ। তাই ঠিকানা জানালুম।

ঠিকানা জমকালো। জমকালো ছিল হয় তো পঞ্চাশ বছর আগে। এখন যা অবশিষ্ট আছে তা হচ্ছে একটি টিলার ওপরে একটি পোড়ো কাঠের বাড়ি। ঘর ও বারাণ্ডায় দরাজ space, তবে সকালে চোখ খুলেই সামনে সমুদ্রের ওপর সূর্যোদয় দেখি। ডাইনে বাঁয়ে পাহাড়। আর চারপাশে নারকোল গাছের দল "stand at ease"-এ দাঁড়িয়ে আছে।

আমি কুনো মানুষ। মনের মত কোণ পেয়েছি।

উত্তর দেবার চেষ্টা কোরো না। কারণ উত্তর আমার হাতে পৌঁছবে কি না, সন্দেহ। আমিও সহজে চিঠি লিখছি না। তোমার মঙ্গলকামনা করি। আশীর্বাদক বনবিহারী মুখোপাধ্যায়।

পুঃ আমার সঙ্গে আছে আমার ভাই —চিরসহচর।

এই "চিরসহচর" ভাইয়ের নাম শ্রীবঙ্কুবিহারী মুখোপাধ্যায়। বনবিহারী যখনই আমার কাছে এসেছেন তখনই তিনি সঙ্গে এসেছেন। ভাইদের মধ্যে বনবিহারী দ্বিতীয়, ইনি তৃতীয়।

কিন্তু আরও একবার দুঃখ প্রকাশ করতেই হবে যে, আমাদের সাহিত্যের ইতিহাসে বহু অভাজনের নাম আছে। এমন কি যাঁদের কোনো কৃতিত্বের দাবি নেই, এবং স্বভাবতই বিস্মৃত, তাঁরা শুধু প্রাচীন বলেই কবর থেকে তাঁদের নাম টেনে বার করে সাহিত্যের ইতিহাসে বসিয়ে দেওয়া হয়েছে, কিন্তু বনবিহারীর মতো এমন প্রচণ্ড শক্তিশালী সাহিত্য স্রষ্টা এবং ব্যঙ্গ সাহিত্য স্রষ্টার নাম কোথাও নেই।

তবু আশা করতে বাধা নেই যে, কোনো এক দূর ভবিষ্যতে, আমাদের রাষ্ট্রনৈতিক বা সামাজিক বা সংস্কৃতির ইতিহাসের ক্ষেত্রে যে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি বাংলা দেশে পঞ্চাশ বছরের ঊর্ধ্বকাল হল দেখা দিয়েছে, সেই একই দৃষ্টিভঙ্গি আমাদের সাহিত্য ক্ষেত্রেও একদিন পরিব্যাপ্ত হবে, এবং সেদিন নিশ্চয় বনবিহারী—সাহিত্যের সব্যসাচী, সব্যগামী, চিত্রশিল্পী, ব্যঙ্গ-বজ্রপাণি, বনবিহারী মুখোপাধ্যায় অবহেলিত থাকবেন না।

বিশ্বসাহিত্যের আদিপর্ব

ডঃ নরেন ভট্টাচার্য

॥ ২ ॥

প্রাচীন গ্রীক সাহিত্য ঃ অ্যাটিক যুগ

পারসিক যুদ্ধের পর থেকেই গ্রীক জাতির মধ্যে নবজীবনের জোয়ার আসে। এই জোয়ারের তরঙ্গ সাহিত্যকেও রীতিমত আঘাত করেছিল। এথেন্সে পেরিক্লেসের যুগে চিন্তার ক্ষেত্রে যেন স্বর্ণযুগ এসেছিল। পেরিক্লেসের এথেন্সে সাহিত্যের সব ক'টি ধারার মধ্যে সবচেয়ে বেশি বিকাশলাভ ঘটেছিল নাটকের। নাট্যসাহিত্যের বিয়োগান্ত ধারাটি পরিপূর্ণতা লাভ করেছিল এসকাইলাস, সফোক্লেস ও ইউরিপেডিসের হাতে; পক্ষান্তরে মিলনাত্মক ধারাটির প্রতিনিধি ছিলেন ক্রাটিনাস, ইউপোলিস এবং অ্যারিস্টোফানেস।

এসকাইলাস

এসকাইলাস ছিলেন ইউফোরিয়নের পুত্র, এথেন্সের নিকট এলিউসিসে তাঁর জন্ম ৫২৫ খৃস্টপূর্বাব্দে। প্রথম যৌবনে তিনি ম্যারাথন, সালামিস ও প্লেটিয়ার যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলেন। ২৫ বৎসর বয়সে তিনি বিয়োগান্ত নাট্যকাররূপে আবির্ভূত হন যদিও ৪৮৮ খৃস্টপূর্বাব্দের পূর্ব পর্যন্ত তিনি স্বীকৃতিলাভ করতে পারেন নি। ৪৭৬ খৃস্টপূর্বাব্দে তিনি সিসিলিতে রাজা হিয়ারোর সভাসদ হিসাবে ছিলেন, তারপর তিনি এথেন্সে ফিরে আসেন এবং তাঁর বয়ঃকনিষ্ঠ সমকালীন সফোক্লেসের প্রথম নাটকের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় তিনি পরাজিত হন। পরে অবশ্য তিনি নিজেকে প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হয়েছিলেন। ৪৫৯ খৃস্টপূর্বাব্দে রাজনৈতিক কারণে তিনি এথেন্স পরিত্যাগ করে সিসিলিতে ফিরে যান এবং সেখানে গেলা নামক স্থানে আকস্মিক দুর্ঘটনায় তাঁর মৃত্যু হয়।

এসকাইলাসের নাটকের সংখ্যা ৯০টি। তার মধ্যে ৮২টির নামটুকু শুধুমাত্র বজায় আছে। তবে তার সাতটি নাটক মোটামুটি অক্ষত অবস্থায় পাওয়া গেছে। (১) **দি সাপ্‌প্লায়াণ্টস**—এই নাটকটি এসকাইলাসের প্রথম জীবনের রচনা, প্লট ও প্রকাশভঙ্গীতে কাঁচা হাতের প্রভাব সুস্পষ্ট। বিষয়বস্তু হচ্ছে আর্গোসে ডানায়ুস এবং তাঁর কন্যাদের সম্বর্ধনা। ডানায়ুস ছিলেন মিশরের রাজা। তাঁর ভাই ইজিপ্টাস তাঁকে মিশর থেকে তাড়িয়ে দেয়। পঞ্চাশটি কন্যা নিয়ে ডানায়ুস তাঁর বংশের আদি প্রতিষ্ঠাত্রী আই-ওর দেশ আর্গোসে উপস্থিত হন এবং সেখানকার লোকেরা তাঁকে নিজেদের সম্রাট হিসাবে বরণ করে নেয়। জলহীন এই দেশে ডানায়ুস কূপ খনন শিক্ষা দেন এবং তাঁর মেয়েরা অনেকগুলি ঝর্ণা আবিষ্কার করে। তাঁর এক মেয়ে এনিমোনের সঙ্গে দেবতা পসেইডনের প্রেম হয়েছিল। ডানায়ুসের যে ভাই তাঁকে মিশর থেকে তাড়িয়ে দিয়েছিল তার পঞ্চাশটি পুত্র ছিল। তারা তাদের পিতার আদেশে আর্গোসে উপস্থিত হয়ে জোর করে ডানায়ুসের পঞ্চাশটি কন্যাকে বিবাহ করেছিল। ক্রুদ্ধ ডানায়ুস তখন কন্যাদের আদেশ দেন যে তারা যেন রাত্রে বিছানায় ছুরিকাঘাতে তাদের স্বামীদের হত্যা করে। পঞ্চাশজনের মধ্যে ঊনপঞ্চাশজন এই আদেশ পালন করে, শুধু একজন হাইপারমেনস্ট্রা পিতার আদেশ অমান্য করে স্বামী লাইনসেয়াসকে নিয়ে পলায়ন করে। **সাপ্‌প্লায়াণ্টস** নাটকের এই হচ্ছে বিষয়বস্তু, গ্রীক নাম **সাপ্‌প্লিকেস**। (২) **দি পারসিয়ান্‌স সাপ্‌প্লিকেস**।

(২) **দি পারসিয়ান্‌স**—এই নাটকটি প্রথম অভিনীত হয়েছিল ৪৭৩ খৃস্টপূর্বাব্দে। নাটকের কাহিনী ফ্রাইনিকাসের **ফিনিশে**-র অনুরূপ, সালামিসের যুদ্ধে জারাক্সেসের পরাজয়।

(৩) **দি সেভেন এগেনস্ট থিবস**—এই নাটকটি এসকাইলাসকে যশের উচ্চতম শিখরে আরোহণ করিয়েছিল। এতে আছে একটি থিবীয় উপকথার চক্র। মূল রচনাটি তিনভাগে বিভক্ত, প্রথম দুটি ভাগ হচ্ছে লেইয়াস ও ইডিপাসের কাহিনী এবং তৃতীয় ভাগে আছে স্ফিংক্‌সের কাহিনী, তৃতীয় অংশটি স্যাটায়ারধর্মী।

লেইয়াস ছিলেন ল্যাবডাকাসের পুত্র, থিবসের সম্রাট। তাঁর স্ত্রী ছিলেন মেনিসিউসের কন্যা আইওকাস্টি। অ্যাপোলোদেবের মন্দিরে দৈববাণী হয়েছিল যে লেইয়াস তাঁর পুত্র কর্তৃক নিহত হবেন। অতঃপর লেইয়াসের পুত্র ইডিপাস জন্মগ্রহণ করলে তাকে বিনষ্ট করার জন্য লেইয়াস আদেশ দেন। যে ক্রীতদাসের ওপর এই আদেশ হয়েছিল সে শিশুটিকে হত্যা না করে করিন্থের রাজা পলিবাসের হাতে তাকে তুলে দেয়, এবং অপুত্রক পলিবাস এবং তাঁর পত্নী পেরিবিয়া ইডিপাসকে পুত্রাধিক স্নেহে মানুষ করেন। ইডিপাস জানত যে সে পলিবাসেরই পুত্র। সফোক্লেসের **ইডিপাস টাইরানাস** নাটকেও হুবহু এই কাহিনী আছে।

অতঃপর ইডিপাস যৌবনে উপনীত হলে ঘটনাচক্রে সে একদিন ডেলফিতে গেল। সেখানে অ্যাপোলোদেবের মন্দিরে নিজের ভাগ্য সম্বন্ধে জানতে গিয়ে সে এক নিদারুণ বার্তা শ্রবণ করল যে সে তার পিতাকে নিহত করে নিজের মা'কে বিবাহ করবে। এই ভয়ানক ভবিষ্যদ্বাণী শ্রবণ করে সে আর করিন্থে ফিরে গেল না, কেন না সে জানত যে পলিবাস তার বাবা এবং পেরিবিয়া তার মা। সে হাঁটতে আরম্ভ করল থিবসের অভিমুখে। ফোকিস নামক স্থানে একটি সরু রাস্তার ওপর তার সঙ্গে দেখা হল, রাজা লেইয়াসের সঙ্গে যিনি তার আসল জনক। তিনি আসছিলেন ডেলফিতে, কেন না থিবস

রাজ্যে স্ফিংকস নামক একটি জীব তখন রীতিমত অত্যাচার করছিল। তার অত্যাচার থেকে কি করে উদ্ধার পাওয়া যায় সেটাই জানতে চাওয়া লেইয়াসের উদ্দেশ্য, এবং সেই উদ্দেশ্যেই তিনি দৈববাণীর জন্য দ্রুত যাচ্ছিলেন—ডেলফিতে। পিতা-পুত্রে পথে সাক্ষাৎ হল কিন্তু উভয়েই উভয়ের অপরিচিত। ইডিপাসেরও দ্রুত পলায়নের প্রয়োজন ছিল কেন না তার সম্বন্ধে যে নিদারুণ ভবিষ্যদ্বাণী হয়েছে তারপর একমুহূর্ত তার আর করিন্থে থাকা চলে না। কে কাকে আগে পথ ছেড়ে দেবে এই নিয়ে উভয়ের ঝগড়া হল, এবং শেষ পর্যন্ত রাগের মাথায় ইডিপাস নিজের অজ্ঞাতে নিজের পিতাকে হত্যা করল।

তারপর ইডিপাস থিবসে গিয়ে হাজির হল। এখানে স্ফিংকস নামক একটি অদ্ভুত জীব বছরের পর বছর অত্যাচার চালাচ্ছিল। কথিত আছে দেবী হেরা রাজা লেইয়াসের কোন অপরাধের জন্য এই জীবটিকে থিবসে পাঠিয়েছিল। সে পথচারীদের একটি ধাঁধা জিজ্ঞাসা করত, এবং তার উত্তর দিতে না পারলে তাদের প্রাণহানি ঘটাত। ধাঁধাটি ছিল ঃ কে সকালে চারপায়ে হাঁটে, দুপুরে দু'পায়ে হাঁটে এবং সন্ধ্যায় তিন পায়ে হাঁটে? ইডিপাস এই ধাঁধাটির উত্তর দিতেই স্ফিংকস থিবস ছেড়ে চলে যায়। নগরবাসীরা এই বিপদের হাত থেকে মুক্তি পাওয়ায় পরম আনন্দে তারা তাদের মৃত রাজা লেইয়াসের জায়গায় ইডিপাসকে রাজা করল। তারপর বিধবা রাণী আইওকাস্টির সঙ্গে ইডিপাসের বিবাহ হল। নিজের অজ্ঞাতে এইভাবে ইডিপাস তার নিজের মাকেই বিবাহ করল এবং এই বিবাহের ফলে তাদের চারটি সন্তান জন্মাল।

কয়েক বছর কেটে যাবার পর থিবসে দারুণ অনাবৃষ্টি ও শস্যহানি দেখা গেল। এর প্রতিকার কিভাবে করা সম্ভব তা জানবার জন্য আবার ডেলফির মন্দিরে যাওয়া হল। সেখানে দৈববাণী হল যে, মৃত লেইয়াসের হত্যাকারীকে দেশ থেকে নির্বাসিত না করা পর্যন্ত দুর্ভিক্ষ বন্ধ হবে না। তখন ইডিপাস লেইয়াসের হত্যাকারীকে খুঁজে বার করবার জন্য আদেশ দিল। শেষ পর্যন্ত অনুসন্ধানে জানা গেল যে ইডিপাসই তার পিতা লেইয়াসের হত্যাকারী, এবং লেইয়াসের বিধবা পত্নীকে সেই বিবাহ করেছে। হতভাগ্য ইডিপাসের নির্ধারিত অদৃষ্ট এইভাবে কাজ করল। এই কাহিনী জানা যাবার পরই লজ্জায় এবং দুঃখে তার গর্ভধারিণী ও স্ত্রী আইওকাস্টি আত্মহত্যা করল, এবং ইডিপাস নিজের চক্ষু দুটি নিজেই উৎপাটন করল এমন একটি অপরাধের প্রায়শ্চিত্ত করতে যে অপরাধের জন্য তার বিন্দুমাত্র দায়িত্ব নেই। তার পুত্ররা তাকে থিবস থেকে তাড়িয়ে দিল।

ইডিপাসের বিড়ম্বিত শেষ জীবন সম্বন্ধে বিভিন্ন কাহিনী প্রচলিত আছে। নাট্যকার সফোক্লেস—তাঁর **ইডিপাস এট কলোনাস** নাটকে দেখিয়েছেন যে তার উপর আরোপিত পাপের প্রায়শ্চিত্ত করতে করতে শেষ পর্যন্ত অ্যাপোলো দেবের নির্দেশে ইডিপ্যাস কলোন্নাসে এসে হাজির হয় যেখানকার শীতল ভূমির নিচে তার অভিশপ্ত জীবন মৃত্যুর মধ্য দিয়েই শান্তির স্পর্শ লাভ করে।

এসকাইলাসের অপরাপর নাটক

(৪) এসকাইলাসের **প্রমিথিউস বাউন্ড** তিন অংশে বিভক্ত। প্রথম দুটি অংশের একত্র নাম **প্রমিথিয়া** এবং তৃতীয় অংশটির নাম **ওরেস্টিয়া।** **প্রমিথিয়া** আবার তিনটি অন্তর্বিভাগে বিভক্ত—**প্রেমিথিউস দি ফায়ার বিয়ারার, প্রমিথিউস বাউন্ড** এবং **প্রমিথিউস রিলিজড।** এসকাইলাস তাঁর নাটকে প্রমিথিউসের মূল পৌরাণিক কাহিনীর অনেক পরিবর্তন ঘটিয়েছেন।

প্রমিথিউস ছিলেন একজন টাইটান, অর্থাৎ তিনি গ্রীক দেবগোষ্ঠীর একটি ভিন্নতর শাখায় অবস্থান করতেন। দেবতাদের সঙ্গে টাইটানদের সদ্ভাব ছিল না। কিন্তু তা সত্ত্বেও প্রমিথিউস শ্রদ্ধার পাত্র ছিলেন এবং দেবতারাও অনেক সময় তাঁর উপদেশ মেনে চলতেন, কিন্তু দেবরাজ জিউস তাঁকে ঈর্ষা করতেন। প্রমিথিউসের আর একটি মহত্ত্ব ছিল এই যে তিনি ছিলেন অসাধারণ মানবপ্রেমিক। এসকাইলাসের কাহিনী অনুযায়ী প্রমিথিউসের পরামর্শেই দেবরাজ জিউস একটি যুদ্ধে জয়ী হন। কিন্তু পরে প্রমিথিউস জানতে পারেন যে, দেবরাজ মানবজাতিকে নির্মূল করে তার জায়গায় অন্য ধরণের জীব সৃষ্টির চেষ্টা করছেন। মানবদরদী প্রমিথিউস এতে ভীষণ দুঃখ পান এবং মানবজাতিকে বাঁচানোর জন্য তিনি তাদের আগুনের ব্যবহার শিখিয়ে দেন, এবং এই আগুনের ব্যবহার শিখে মানুষ উন্নততর জীবনযাত্রায় পদক্ষেপ করায় দেবরাজের চেষ্টা ব্যর্থ হয়ে যায়। এই অপরাধে প্রমিথিউসের প্রতি কঠোর শাস্তির বিধান হয়। তাঁকে সমুদ্রের ধারে একটি পাহাড়ের উপর শিকল দিয়ে বেঁধে রাখা হয়। যেহেতু প্রমিথিউস অমর সেই হেতু তাঁর জন্য এক নির্মম যন্ত্রণাদায়ক শাস্তির ব্যবস্থা করা হয়। একটি ঈগলকে তাঁর কাছে পাঠিয়ে দেওয়া হয় যার কাজ ছিল প্রত্যহ প্রমিথিউসের দেহকে ছিন্নবিচ্ছিন্ন করা। বছরের পর বছর বন্দী প্রমিথিউস এই যন্ত্রণা ভোগ করেন। শেষ পর্যন্ত মহাবীর হেরাক্লেস সেই ঈগলটিকে বধ করেন ও প্রমিথিউসকে উদ্ধার করেন।

এসকাইলাসের পরের তিনটি নাটক হচ্ছে (৫) অ্যাগামেমনন, (৬) **দি সোয়েফার** এবং (৭) **ইউমেনিডেস**, এবং এ ছাড়া পূর্বোল্লিখিত নাটকের তৃতীয় অংশ **ওরেস্টিয়া।** একটি ঘটনা পরম্পরাকে অনুসরণ করেই সব কটি নাটকের কাহিনী গড়ে উঠেছে। অ্যাগামেমনন ছিলেন ট্রয় যুদ্ধে গ্রীক বাহিনীর সর্বাধিনায়ক। এই যোদ্ধা যখন ট্রয় যুদ্ধে ব্যস্ত ছিলেন, সেই সময় তাঁর স্ত্রী ক্লাইটিমেনস্ট্রা এগিস্থাস নামক এক ব্যক্তির সঙ্গে ব্যাভিচারে লিপ্ত হয়। অ্যাগামেমনন ফিরে এলে এরা দুজনে চক্রান্ত করে তাঁকে হত্যা করে। অ্যাগামেমনন নাটকের এই হচ্ছে বিষয়বস্তু। **দি সোয়েফার** নাটকে অ্যাগামেমননের মৃত্যুর পরবর্তী ঘটনা বর্ণিত হয়েছে। পিতৃহত্যার প্রতিশোধ নেবার জন্য অ্যাগামেমননের পুত্র ওরেস্টেস তাঁর মা ও মায়ের প্রেমিক উভয়কেই হত্যা করেন। ওরেস্টেসের কাহিনীর শেষ অংশ **ইউমেনিডেস** নাটকে বর্ণিত হয়েছে। মাতৃহত্যার অপরাধে ওরেস্টেসের বিচার হয়েছিল। অ্যাপোলো দেবের উপদেশে ওরেস্টেস এথেন্সের গণ আদালত বা এরিওপেগাসে আত্মসমর্পণ করেন। এই বিচারে দেবী আথেনী ছিলেন বিচারক এবং প্রধান সাক্ষী ছিলেন দেবতা অ্যাপোলো। বিচারে ওরেস্টেসের পক্ষে এবং বিপক্ষে ভোট সংখ্যা সমান হয়। তখন দেবী আথেনী তাঁর কাস্টিং ভোটটি ওরেস্টেসের পক্ষে দেন। ফলে ওরেস্টেস নির্দোষ প্রতিপন্ন হন।

এসকাইলাস ছিলেন মানবপ্রেমিক, পিথাগোরিয় দার্শনিক মতে বিশ্বাসী, মানবচরিত্রের বিভিন্ন দিকগুলিই তাঁর নাটকগুলিতে ফুটে উঠেছে, দেবতাদের চরিত্রকেও তিনি মানুষের মত করেই গড়েছেন। পৌরাণিক কাহিনীর বিশুদ্ধি বজায় রাখার জন্য তিনি ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র অংশগুলিকেও বাদ দেন নি, ফলে তাঁর নাটকের গতি অবশ্য

মাঝে মাঝে শ্লথ হয়ে গেছে। নাটকীয় সংলাপ ও মঞ্চের অঙ্গসজ্জার দিকেও তিনি প্রখর দৃষ্টি রেখেছিলেন, এবং তৎকালীন রীতি অনুযায়ী তিনি নিজের নাটকে নিজেও অভিনয় করেছেন। সব মিলিয়ে আদি বিয়োগান্ত নাট্যকার হিসাবে এসকাইলাসের খ্যাতি কালের নির্মম আবর্তে আজও অপরিম্লান।

সফোক্লেস

এসকাইলাসের বয়ঃকনিষ্ঠ নাট্যকার সফোক্লেস জন্মগ্রহণ করেছিলেন ৪৯৫ খৃস্ট-পূর্বাব্দে, এথেন্সের নিকট কলোনাস নামক স্থানে, পিতার নাম সোফিলাস। অল্পবয়সেই সফোক্লেস ক্রীড়া, সংগীত এবং অভিনয়ে নাম করেছিলেন এবং মাত্র সাতাশ বছর বয়সে একটি নাট্য প্রতিযোগিতায় এসকাইলাসকে পরাজিত করেন। তাঁর বন্ধু চিওসের আইওনের অনুরোধে তিনি রাজনীতিতে অংশগ্রহণও করেছিলেন, ৪৪০ খৃস্ট-পূর্বাব্দে এথেন্সের স্যামোস অভিযানের দশজন সেনাপতির মধ্যে তিনি একজন ছিলেন, ৪৩৫ খৃস্ট-পূর্বাব্দে তিনি রাষ্ট্রীয় কোষাধ্যক্ষের পদে নিযুক্ত হয়েছিলেন, এ ছাড়া তিনি পুরোহিতের কাজও করেছেন। ঐতিহাসিক হেরোডটাস তাঁর বন্ধু ছিলেন।

যদি এসকাইলাসকে গ্রীক ট্রাজেডির স্রষ্টা বলা হয়, সফোক্লেসের হাতে তা পূর্ণতা লাভ করেছিল একথা নিঃসন্দেহে বলা যায়। এসকাইলাস একটি কাহিনীকে তিনটি নাটকে ব্যক্ত করতেন যেখানে সফোক্লেস এই রীতির পরিবর্তন করেছিলেন। মঞ্চরীতির দিক থেকেও তিনি এসকাইলাসের উপর আরও সংযোজন করেছিলেন। কোন কোন পণ্ডিতের মতে রসসৃষ্টিতে সফোক্লেস আরও বেশি সার্থক।

সফোক্লেসের নাটকসমূহ

সফোক্লেসের নাটকের সংখ্যা ১৩০টি, কিন্তু এতগুলি নাটকের মধ্যে মাত্র ১০০টির নাম আমাদের জানা আছে, যদিও এ পর্যন্ত তাঁর সাতটির বেশি রচনা পাওয়া যায় নি। তাঁর অনেক নাটকের সঙ্গে এসকাইলাস ও ইউরিপেডিসের নাটকের বিষয়বস্তু অভিন্ন। তাঁর সাতটি নাটক হচ্ছেঃ (১) **ইডিপাস টাইরান্নাস**, (২) **ইডিপাস এট কলোনাস**—এই দুটি নাটকের কাহিনী এসকাইলাসের প্রসঙ্গে পূর্বেই উল্লিখিত হয়েছে। (৩) **ট্রাচিনিয়ে**—বিখ্যাত বীর হেরাক্লেসের মৃত্যুর কাহিনী অবলম্বনে এই নাটকটি রচিত হয়েছে। (৪) **অ্যাজাক্স** নাটকে তিনি ট্রয়যুদ্ধের অন্যতম প্রধান সেনাপতি বড় অ্যাজাক্সের (অ্যাজাক্স দুজন ছিলেন) জীবনের বিষাদময় পরিণতির কাহিনী বর্ণনা করেছেন। এই বীর যোদ্ধার প্রকৃত সম্মান দেওয়া হয় নি। দেবী থেটিস ট্রয় যুদ্ধে গ্রীক বাহিনীর শ্রেষ্ঠ যোদ্ধাকে অ্যাকিলিসের বর্ম ও অস্ত্রশস্ত্র পুরস্কার দেবেন ঘোষণা করেছিলেন এবং ন্যায়ত তা অ্যাজাক্সেরই প্রাপ্য ছিল, কিন্তু তাঁকে না দিয়ে অডিসিউসকে তা দেওয়া হয়। সেই ক্ষোভে শেষ পর্যন্ত অ্যাজাক্স আত্মহত্যা করেছিলেন।

(৫) **অ্যান্টিগোন**—এই নাটকে সফোক্লেস ইডিপাসের কন্যার কাহিনী বলেছেন। নিজের অজ্ঞাতে ইডিপাস তাঁর পিতাকে হত্যা করেছিলেন এবং মাতা আইওকাস্টিকে বিবাহ করেছিলেন। ইডিপাসের পুত্রগণ তাদের অন্ধ পিতাকে থিবস থেকে তাড়িয়ে দেয়। এই ইডিপাসের কন্যা ছিল অ্যান্টিগোন। ইডিপাসের মৃত্যুর পর অ্যান্টিগোন থিবসে ফিরে যায়। এদিকে ইডিপাসের দুই পুত্রের মধ্যে সিংহাসন নিয়ে বিরোধ বাধে এবং শেষ পর্যন্ত এক পুত্র এটিওক্লেসের হাতে অপর পুত্র পলিনেইসেসের মৃত্যু হয়। অ্যান্টিগোন তখন মৃত ভ্রাতার শেষকৃত্য সম্পন্ন করে। এই অপরাধে অ্যান্টিগোনকে একটি ঘরে জীবন্ত সমাধি দেওয়া হয়। তার বাক্‌দত্ত হেমোন তার মৃতদেহের পাশে নিজেও আত্মহত্যা করে।

(৬) **ফিলোকটেটিস**—এই আখ্যানটির নাট্যরূপ দান এসকাইলাস, সফোক্লেস ও ইউরিপেডিস তিনজনেই করেছিলেন। ফিলোকটেটিস ছিলেন এট্যার অন্তর্গত মালিয়দের রাজা পিয়াসের পুত্র। উত্তরাধিকারসূত্রে তিনি হেরাক্লেসের ধনুঃশর পেয়েছিলেন। ট্রয়ের বিরুদ্ধে যুদ্ধের সাতটি জাহাজের তিনি ছিলেন অধিনায়ক। কিন্তু যাত্রাপথে লেমনসে তিনি সর্পদষ্ট হন এবং সেই ক্ষতের জন্য অডিসিউসের নির্দেশে তাঁকে রেইসি দ্বীপে ফেলে রেখে যাওয়া হয়। সেই দ্বীপে দীর্ঘ দশ বছর তিনি অসহনীয় যন্ত্রণা ভোগ করেন। হেলেনাসের ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী হেরাক্লেসের তীর ব্যতিরেকে ট্রয় বিজয় অসম্ভব ছিল, এই কারণে ডাইওমেডেস এবং অডিসিউস ফিলোকটেটিসকে ফিরিয়ে আনেন এবং মাচাওন তাঁকে নিরাময় করেন। তাঁর তীরেই শেষ পর্যন্ত প্যারিসের মৃত্যু হয়, যার ফলে ট্রয়বিজয় সম্পূর্ণ হয়। (৭) **ইলেক্ট্রা** নাটকে সফোক্লেস অ্যাগামেমনের কন্যার কাহিনী বলেছেন (পূর্বে উল্লিখিত অ্যাগামেমনন ও তৎপুত্র ওরেস্টেসের কাহিনী স্মর্তব্য)। ইলেক্ট্রা ছিলেন ওরেস্টেস ও ইফিজেনিয়ার ভগিনী। তিনিই ওরেস্টেসকে পিতৃহন্তার হাত থেকে উদ্ধার করেছিলেন এবং পরে ওরেস্টেসকে পিতৃহত্যার প্রতিশোধ নিতে সাহায্য করেছিলেন।

নাটক ছাড়াও সফোক্লেস অনেক কবিতা, সংগীত ও গদ্যের রচয়িতা ছিলেন। তিনি ২০ বারেরও অধিক নাটকে প্রথম পুরস্কার পেয়েছিলেন।

ইউরিপেডিস

ইউরিপেডিস ছিলেন প্রাচীন গ্রীসের ত্রয়ী ট্রাজেডি লেখকের তৃতীয় জন, সফোক্লেসের বয়ঃকনিষ্ঠ সমকালীন, জন্ম ৪৮০ খৃস্ট-পূর্বাব্দে, সালামিস দ্বীপে। যৌবনে তিনি দার্শনিক অ্যানাক্সাগোরাস ও সক্রেটিসের সাহচর্য লাভ করেছিলেন, শিক্ষালাভ করেছিলেন তখনকার দিনের বিখ্যাত সফিস্ট প্রোটাগোরাস এবং প্রোডিকাসের কাছে। রাজনীতিতে আগ্রহ থাকলেও তিনি নিজেকে লিপ্ত করেন নি, তাঁর সময়ের অধিকাংশই কাটত গ্রন্থাগারে। তিনি দুবার বিবাহ করেছিলেন, কিন্তু দাম্পত্যজীবনে সুখী ছিলেন না। ৪০৯ খৃস্ট-পূর্বাব্দে তিনি এথেন্স পরিত্যাগ করে থেসালিতে গিয়ে বসবাস করেন এবং সেখানেই ৪০৫ খৃস্ট-পূর্বাব্দে তাঁর মৃত্যু হয়।

তাঁর রচনার সংখ্যা নিয়ে পণ্ডিতদের মধ্যে মতভেদ আছে। কেউ বলেন ৭৫, কেউ বলেন ৭৮, কেউ বলেন ৯২। এ পর্যন্ত তাঁর আঠারটি নাটক পাওয়া গেছে। (১) **আলসেস্টিস**—এই নাটকে ইউরিপেডিস পেলিয়াসের কন্যা আলসেস্টিসের প্রেম ও আত্মত্যাগের কাহিনী বর্ণনা করেছেন। তাঁর বিবাহ হয়েছিল ফেরেসের পুত্র অ্যাডমেটাসের সঙ্গে। আকস্মিক দুর্ঘটনায় অ্যাডমেটাসের মৃত্যু হলে আলসেস্টিস তাঁর নিজের আয়ু দান করে তাঁর স্বামীকে বাঁচিয়েছিলেন। (২) **অ্যান্ড্রোম্যাকি** নাটকে ট্রয়ভরসা হেক্টরের পত্নী অ্যান্ড্রোম্যাকির ভাগ্যবিড়ম্বিত জীবনের কথা বলা হয়েছে। (৩) **বাকিক** নাটকের বিষয়বস্তু হচ্ছে থিবসে ডাওনিসাসের আগমন এবং পেনথিউসের হত্যা। পেনথিউস ছিলেন থিবসের রাজা, ইডিপাসের মা এবং স্ত্রী আইওকাস্টির প্রপ্রপিতামহ। দেবতা ডাওনিসাস থিবসে এলে সেখানকার নারীরা চিথেরন পাহাড়ে যে মদ্যপানের উৎসব শুরু করেছিল, তাতে বাধা দেবার জন্য তিনি ছুটে গেছলেন। কিন্ত তাঁকে ভুল করে

কোন বন্য পশু মনে করে তাঁর মা ও অপরাপর মেয়েরা হত্যা করে। (৪) **ফিনিসে**—ইডিপাসের দুই পুত্র এটিওক্লেস ও পলিনেইসেসের রাজ্য নিয়ে বিরোধের মর্মান্তিক পরিণতির কথা এই নাটকে ইউরিপেডিস বর্ণনা করেছেন।

এর পর আসে তাঁর (৫) **হেকুবা**, (৬) **হেলেনা**, (৭) **ইলেক্ট্রা** ও (৮) **হেরাক্লিডির** কথা। ট্রয়ের রাজা প্রায়ামের ক্ষেত্রজা কন্যার জীবনকাহিনী **হেকুবা** নাটকে আলোচিত হয়েছে। ট্রয়ের পতনের পর হেকুবা বন্দিনী হন এবং লুঠের মাল হিসাবে অডিসিউসের ভাগ্যে পড়েন। হেকুবার পুত্র পলিডোরাস থ্রেসের রাজা পলিমেস্টরের হাতে নিহত হয়েছিল। তার প্রতিশোধ নিয়েছিলেন হেকুবা স্বহস্তে পলিমেস্টরের চক্ষুদুটি উৎপাটন করে। অবশ্য শেষ পর্যন্ত তাঁকে নির্মমভাবে শাস্তি দেওয়া হয়েছিল। ইলিয়াডের নায়িকা হেলেনের জীবনের একটি অধ্যায় নিয়ে ইউরিপেডিস তাঁর হেলেনা নাটক লিখেছিলেন। **ইলেক্ট্রার** কাহিনী সফোক্লেস প্রসঙ্গে পূর্বেই বলা হয়েছে। এথেন্সের ডেমোফুন কিভাবে ইউরিস্থেয়াসের কোপ থেকে হেরাক্লেসের বংশধরদের রক্ষা করেন সেই কাহিনী অবলম্বনে ইউরিপেডিস' হেরাক্লিডি নাটক গড়ে উঠেছে। দেবরাজ জিউস ঘোষণা করেছিলেন যে, পার্সিয়ুসের জনৈক বংশধর পৃথিবীর অধিপতি হবে। সেই বংশধর ছিলেন হেরাক্লেস। কিন্তু জিউসপত্নী হেরা ঈর্ষান্বিত হয়ে পার্সিয়ুস-বংশীয় অপর একজনের জন্ম তাড়াতাড়ি ঘটিয়ে দেন, সে হচ্ছে ইউরিস্থেয়াস। জিউস-কথিত সৌভাগ্য অতঃপর তারই উপর বর্ষিত হল, আর তার চেয়ে শতগুণে শ্রেষ্ঠ হওয়া সত্ত্বেও মহাবীর হেরাক্লেস ভাগ্যের দোষে তারই দাস হয়ে রইলেন। এই ইউরিস্থেয়াস হেরাক্লেসকে অত্যন্ত ঈর্ষা করত, কিন্তু যতদিন হেরাক্লেস বেঁচে ছিলেন ততদিন তাঁর কোন ক্ষতি করতে পারে নি। হেরাক্লেসের মৃত্যুর পর তাঁর পুত্রদের উপর ইউরিস্থেয়াসের কোপ পড়ে, কিন্তু থিসিউসের পুত্র ডেমোফুন ইউরিস্থেয়াসকে নিহত করে হেরাক্লেসের পুত্রদের রক্ষা করেন।

ইউরিপেডিসের অপরাপর নাটকের মধ্যে এর পর উল্লেখযোগ্য হচ্ছে (৯) **হিপ্পোলাইটস**, (১০) **আইওন**, (১১) **মিডিয়া**, (১২) **ওরেস্টেস**, (১৩) **রেহিসাস**, (১৪) **ট্রোয়াডেস** এবং (১৫) **সাপ্লিয়ান্টস**। হিপ্পোলাইটাস ছিল রাজা থিসিউসের পুত্র। তার সৎমা ফেড্রা তাকে প্রেম নিবেদন করেছিল, কিন্তু হিপ্পোলাইটাস কর্তৃক তা প্রত্যাখ্যাত হয়। তখন ফেড্রা থিসিউসের নিকট এই মর্মে অভিযোগ করে যে, হিপ্পোলাইটাস তাকে ধর্ষণ করার চেষ্টা করেছে। এতে থিসিউস কুপিত হয়ে হিপ্পোলাইটাসকে খতম করবার জন্য তাঁর পিতা দেবতা পসেইডনের সাহায্য চান। একদিন যখন হিপ্পোলাইটাস ঘোড়ায় চড়ে সমুদ্রের তীর দিয়ে যাচ্ছিল সেই সময় দেবতা পসেইডন একটি উন্মত্ত বৃষকে পাঠিয়ে দেন, যে শৃঙ্গাঘাতে হিপ্পোলাইটাসকে নিহত করে। এই ঘটনার পর ফেড্রার মনে অনুতাপ আসে এবং সেও আত্মহত্যা করে। **হিপ্পোলাইটাস** নাটকের এই হচ্ছে বিষয়বস্তু। **আইওন** নাটকে একটি মাতৃপরিত্যক্ত শিশুর দুঃখময় জীবন এবং পরিশেষে মাতার সঙ্গে তার মিলনের কাহিনী বর্ণিত হয়েছে; **মিডিয়া** নাটকে বর্ণিত হয়েছে এক প্রতিশোধের কাহিনী। ঈশনের পুত্র যেসন ইয়া দ্বীপ থেকে সেখানকার রাজকন্যা মিডিয়াকে বিবাহ করে নিয়ে এসেছিল। দশ বছর সুখী দাম্পত্যজীবন যাপন করার পর যেসন ক্রেয়নের কন্যা কেরুসাকে বিবাহ করতে ইচ্ছুক হয়। তখন মিডিয়া যেসনের নববিবাহিতা বধূকে একটি বিষাক্ত পরিচ্ছদ পাঠিয়ে দেয়, যা পরিধান করে তৎক্ষণাৎ তার মৃত্যু হয়। এরপর মিডিয়া বিশ্বাসহন্তা স্বামীর ঔরসজাত নিজের দুই পুত্রকে হত্যা করে দেশান্তরে চলে যায়। **ওরেস্টেসের** কাহিনী এসকাইলাস প্রসঙ্গে পূর্বেই বলা হয়েছে। **রেহিসাস** নাটকে ইউরিপেডিস এক ভাগ্যহীন থ্রেসীয় যোদ্ধার কাহিনী বলেছেন যে ট্রোজান পক্ষে যুদ্ধ করতে এসে আকস্মিকভাবে ডাওমিডেস ও অডিসিউসের হাতে প্রাণ হারিয়েছিল। **ট্রোয়াডেস** নাটকটি ট্রয়নগর ধ্বংসের পরবর্তী কাহিনী অবলম্বনে রচিত। **সাপ্লিয়ান্টস** নাটকটির বিষয়বস্তু হচ্ছে রাজা থিসিউসের নিকট সাতজন নিহত বীরের মাতাদের আকুল আবেদন, যাতে তাদের যথাযোগ্য অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সম্পন্ন করা হয়।

ইউরিপেডিসের অবশিষ্ট তিনটি নাটক হচ্ছে (১৬) **হেরাক্লেস ইন ম্যাডনেস**, (১৭) **ইফিজেনিয়া এট অউলিস** এবং (১৮) **ইফিজেনিয়া এমং দি টৌরি**। মহাবীর হেরাক্লেসের জীবননাট্যের এক করুণ অধ্যায়কে ভিত্তি করে প্রথমোক্ত নাটকটি রচিত হয়েছে। ইফিজেনিয়ার কাহিনী পূর্বে উল্লিখিত অ্যাগামেমনন ও ওরেস্টেসের কাহিনীর সঙ্গে সম্পর্কিত। ইফিজেনিয়া ছিল অ্যাগামেমননের কন্যা এবং ওরেস্টেসের ভগিনী। গ্রীক নৌবাহিনী যখন ট্রয়ের অভিমুখে যাত্রা করেছিল তখন দেবী আর্টেমিস হাওয়া বন্ধ করে সব জাহাজের গতি রুদ্ধ করে দেন। তখন পুরোহিতের নির্দেশে ইফিজেনিয়াকে বলি দেবার জন্য নিয়ে যাওয়া হয়, কিন্তু দেবী আর্টেমিস বলিদানের স্থানে একটি হরিণ রেখে ইফিজেনিয়াকে নিয়ে শূন্যপথে টৌরি নামক স্থানে চলে যান, এবং সেখানে ইফিজেনিয়া দেবীর পুরোহিতানী হয়ে থাকে। দীর্ঘকাল পর ইফিজেনিয়ার ভাই ওরেস্টেস দৈবাদেশ প্রাপ্ত হয়ে আর্টেমিসের মূর্তি আনার জন্য টৌরিতে যায়। নিয়ম ছিল যে, কোন বহিরাগত টৌরিতে গেলে তাকে সেখানে দেবীর সামনে বলি দেওয়া হবে। ওরেস্টেসকেও বলি দেবার জন্য নিয়ে আসা হয়। সেই সময় ভ্রাতা-ভগিনীর নাটকীয় সাক্ষাৎকার ঘটে এবং শেষ পর্যন্ত দেবীর কাঠের মূর্তি নিয়ে দুজনেই গ্রীসে চলে আসে। ইফিজেনিয়ার এই কাহিনী অবলম্বনেই ইউরিপেডিস উল্লিখিত দুটি নাটক রচনা করেছেন।

এই আঠারখানি নাটক ছাড়াও ইউরিপেডিস **সাইক্লোপস** নামে একটি ব্যঙ্গাত্মক নাটক রচনা করেছিলেন।

ইউরিপেডিসের নাটকের একটি বৈশিষ্ট্য হচ্ছে যে, তাঁর প্রতিটি নাটকেরই সুর বিভিন্ন, গুণগত দিক থেকেও তাই। করুণ দৃশ্যের সৃষ্টিতে ইউরিপেডিসের হাত ছিল অতুলনীয়। ধর্মীয় আদর্শের দিক থেকে এসকাইলাস ও সফোক্লেসের থেকে তাঁর মনোভাব ছিল পৃথক। তাঁর চোখে দেবতারা মোটেই উচ্চ পর্যায়ের জীব নয়, বরং নৈতিক শক্তিতে তারা মানুষের নীচে। মেয়েদের প্রতিও তাঁর দৃষ্টিভঙ্গী উদার ছিল না, বরং তাঁকে নারীবিদ্বেষী বলা যায়। পুরাণ থেকে তিনি সেই সব কাহিনীই তাঁর নাটকের জন্য বেছে নিয়েছিলেন, যে সব কাহিনীতে মেয়েদের চরিত্রের খারাপ দিকটাই বেশি প্রকট। ইউরিপেডিস মঞ্চসজ্জার বাহুল্য পছন্দ করতেন না এবং মঞ্চকে বর্ণাঢ্য করে তোলাও ছিল তাঁর আদর্শবিরুদ্ধ। তাঁর চরিত্রগুলি কেউই সাধারণতার উপরে উঠতে পারে নি, মহৎ ভাবের চেয়ে জাগতিক জ্ঞানই তাঁর নাটকে প্রাধান্য পেয়েছে বেশি। এই সব মিলিয়ে এসকাইলাস ও সফোক্লেসের সঙ্গে ইউরিপেডিসের পার্থক্য অনেকখানি।

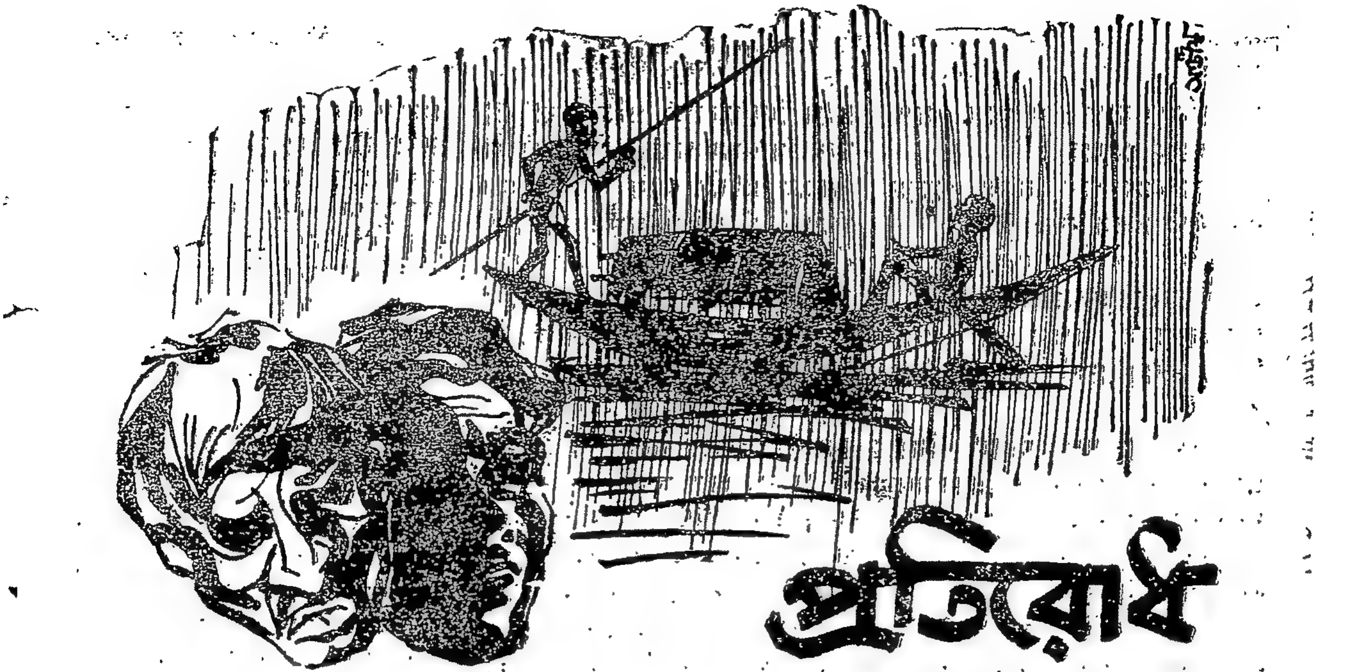

প্রতিরোধ

রাম রায়

লক্ষ্মণকে উদ্দেশ্য করে নন্দ বলল, দেখিস, একটু সাবধানে নামাবি। জোয়ার আসার অপেক্ষায় ছিল ওরা। লক্ষ্মণ আর কেষ্ট। নদীর ঘাটে উবু হয়ে বসে বিড়ি ফুঁকছিল দুজন।

প্রায় হাত পঞ্চাশ উঁচুতে, আড়তখানার চালা থেকে মনে হচ্ছিল, পাশাপাশি দুটো অশরীরী ছায়া। যেন কি গভীর শলা-পরামর্শে ব্যস্ত।

সেই সন্ধ্যে থেকে বসে আছে নন্দ। জোয়ার আসতে এখনো ঘণ্টাখানেক বাকী। ততক্ষণ তীর্থের কাকের মত হা-পিত্যেশ করে বসে থাকে—কখন জোয়ার আসবে।

অবশ্য একদিক থেকে নন্দ নিশ্চিন্ত হয়েছে। একটু রাত, গা ঢাকা অন্ধকার চেয়েছিল। রাতের অন্ধকারে নিঃশব্দে নৌকা চলবে।

কিন্তু এখন, ঘাটে এই অন্ধকারটা কেমন বিচ্ছিরি লাগছে নন্দর। মনটা কু গাইছে। ভেতরটা থেকে থেকে চম্‌কে উঠছে।

টিম্‌টিমে একটা হেরিকেন জ্বালিয়ে দিয়েছে গোকুল, ভুসো উঠে চিম্‌নির কাচ কালো হয়ে গেছে। দূর থেকে প্রেতচক্ষু মনে হয়।

গোকুলের সঙ্গে নন্দর আলাপ আজকের নয়' বহুদিনের আলাপ। অনেক বছরের কারবার তার সঙ্গে। আগে এই আড়ত ধান, চাল, পাট, ...তের শস্যে বোঝাই হয়ে থাকতো। ...রীদের নৌকা ভিড়তো। শস্যে ... নৌকা গঞ্জে চলে যেত। ...সব অনেক বছর আগের কথা।

বাংলাদেশে তখন লেভি ছিল না। জায়গায় জায়গায় চেক্‌পোস্ট বসতো না। বাজার গঞ্জে ঢালাও ধান চাল বিক্রি হোত। দূরান্তের ব্যবসায়ীরা আসতো, পালে বাতাস লাগিয়ে মহাজনী নৌকাগুলি তর্‌ তর্‌ করে এগুতো।

এখন বাংলাদেশের মজ্জা গেছে শুকিয়ে, তাই আড়তগুলো শূন্য, বিলুপ্তপ্রায়। বর্ষার পর আসন্ন শীতে সোনালী ফসল মাঠে দেখা যায়, কিন্তু তারপর যে কোথায় যায়, কেউ জানে না। সারা বছর চাষীর ভিটেতে শেয়াল কাঁদে। অনাহারে মানুষ মরে। দুর্ভিক্ষ লাগে।

ভাঙা ঘাটের দিকে তাকাল নন্দ। গড়ানে জমিটা দিয়ে হুমড়ি খেয়ে সব অন্ধকার যেন ওখানে গিয়ে পড়েছে। নিচে ভাঙা সিঁড়ির স্তূপাকার ইট। আরো নিচে ঘন ঝোপ-জঙ্গল। তারপর নদী।

নন্দ চম্‌কে উঠলো। ওখানে কি করছে দুটোতে? থেকে থেকে আগুনের দুটো লাল ফুট্‌কি জ্বলে উঠছে অন্ধকারে। যেন ধূর্ত, অতি সজাগ কোন নিশাচর জীব মাটি শুঁকে শুঁকে কি অন্বেষণ করছে। তারই দুটো চোখ দপ্‌ দপ্‌ করে জ্বলছে।

নৌকা বাঁধা আছে আরো এদিকে। মাল নামবে আড়তের পেছন দিয়ে। শালারা কি বসে বিড়ি টানার আর জায়গা পেল না।

ওহে গোকুল, তোমার বিশ্বাসী লোক তো?

আজ্ঞে, কাদের কথা বলছেন?

নন্দ কিছু না বলে সামনের দিকে তাকালো। নন্দর দৃষ্টি অনুসরণ করে ভাঙা ঘাটে অস্পষ্ট দুটো ছায়ামূর্তিকে দেখে একগাল হেসে ফেলল গোকুল।

লক্ষ্মণ আর কেষ্টর কথা বলছেন? নন্দ নিঃশব্দে ঘাড় দোলালো।

ওরা তো এই করে এখন খাচ্ছে।

হাঙ্গামা কিছু করবে না তো? যা দিনকাল পড়েছে—

সংশয়ের চোখে নন্দ আবার ওদের দিকে তাকালো।

আবার একগাল হাসল গোকুল।

বিশ্বাসী লোক না হলে কি আর বাবুর সাথে দিই। আপনি নিশ্চিন্ত থাকতে পারেন।

গোকুল উঠে দাঁড়াল। ক্যাচ্‌ ক্যাচ্‌ করে দুবার নাক ঝাড়ল। চিট্‌ কাপড়ে মুছলো।

আ রে এই, জোয়ার এলো রে? গোকুল এখান থেকে হাঁকলো। নিচে থেকে অম্‌নি জবাব এলো, আসবার সময় হলেই আসবে।

গোকুল খানিকক্ষণ চুপ্‌ করে সামনে তাকিয়ে রইলো। তারপর আবার হাঁকলো, ওখানে কি করছিস দুটোতে—এ্যাঁ?

নদীর শোভা দেখছি গো, বাবু। এবার অন্য গলার জবাব।

রসিকতায় হেসে কুটোকুটি হোল।

নন্দ বলল, সাপ-খোপেরও ভয় নেই ব্যাটাদের।

গোকুলের মুখ হেসেই ছিল। বলল, আজ্ঞে বাবু, চোলাই নিয়ে

বসেছে বোধ হয়। ওর গন্ধে সাপ ধারে-কাছেও ঘেঁষবে না।

যেন নাকে গন্ধ আসছে, পুচুক করে থুতু ফেলল নন্দ।

জোয়ার এলো। অন্ধকারে নিচে ছলাক্ ছলাক জলের শব্দ উঠলো। আড়তের চালে বাতাস এসে ধাক্কা দিল। লক্ষ্মণ কেষ্ট ওপরে উঠে এলো।

এতক্ষণ ভেতরে অধৈর্য নিয়ে চুপ্ করে বসে থাকার পর এখন নন্দ দারুণ ব্যস্ত, সরব হয়ে উঠলো।

বস্তাগুলো নাবা। দেখিস, একটু সাবধানে নাবাস।

চালার পেছনে ধাপ্ কাটা সিঁড়ি নদীর কোল্ অব্দি নেমে গেছে। এখানেই লক্ষ্মণের নৌকা বাঁধা আছে। পনের মণ ধান যাবে নৌকাতে।

হেরিকেন নিয়ে গোকুল চালার বাইরে এলো। লক্ষ্মণ আর কেষ্টর মাথায় বস্তাগুলো নিচে নামতে লাগলো।

এখন নন্দ নিশ্চিন্ত। লক্ষ্মণ কেষ্ট বস্তাগুলো উঠিয়ে নৌকা ছেড়ে দিল। জোয়ারের টানে, বাতাসের ধাক্কায় নৌকা তর্ তর্ করে এগুতে লাগলো।

বড় খুশি নন্দর মনটা। বস্তাগুলোয় হাত ছোঁয়ায় সে। এই ধান দেড়া দামে বিক্রি করতে পারবে শহরে রাইস মিলগুলোতে। প্রতি বছরই এই সময় সে গ্রামে আসে ধান কিনতে। কোমরে গেঁজেয় থাকে কাঁচা টাকা। মুখে মিষ্টি হাসি। আর সংগে থাকে ঝানু ধূর্ত ঐ গোকুল। সেই বেছে বেছে চাষীবাড়ি তাকে নিয়ে যায়। দর-দস্তুর তার সংগেই চলে। অভাবে পড়া চাষী বীজধান পর্যন্ত বিক্রি করে। খুশ মনে ধানে বস্তা বোঝাই করে নন্দ শহরের দিকে ফেরে।

আরো, আরো তাকে ধান যোগাড় করতে হবে। শহরে গুদামে এনে ভরতে হবে। মাঘ-ফাল্গুন যাবে, তারপর আসবে চৈত্র-বৈশাখের তীব্র খরা। ধানের দর তখন আগুন। গ্রামে গ্রামে তখন দুর্ভিক্ষের করাল ছায়া স্পর্শ করবে। শহরে রাইস মিলগুলির অচল অবস্থা।

খুক্ খুক্ করে নিজের মনে হাসল নন্দ।

দাঁতে দাঁত চিপে লগির খোঁচা মারলো কেষ্ট। রুগ্ন পাঁজরগুলো ফুলিয়ে চাপা ক্রোধে হিস্ হিস্ করলো। চোলাই গিলেছে কিনা কে জানে, দুজনেরই চোখ ক্ষ্যাপা শেয়ালের মত লাল দেখাচ্ছিল। ভুষো পড়া হেরিকেনের আলোতে সেই চোখের ভাষা পড়া যাচ্ছিল না। ওদের হাব-ভাব কেমন রহস্যজনক ঠেকছিল।

প্রায় পাড় ঘেঁষে চলেছে নৌকা, হাত দশেক দূরেই বোধহয় ডাঙা। নদীর নিচে থেকে উঁচু পাড় পর্যন্ত আলকাতরার মত ঘন অন্ধকারে লেপা। ঝোপ্‌ঝাড়ে ভরা জন বসতিহীন জায়গা। ধোঁয়ার মত অস্পষ্ট নদী-বক্ষে দৃষ্টিগোচর হয় না।

নন্দর বুকের রক্তে কি রকম হিম শিহরণ লাগলো।

ঘণ্টা চারেকের মধ্যে পেঁৗছে দিতে পারবি তো?

নন্দ জিজ্ঞেস করলো।

মাল আপনার ঠিক জায়গায় পেঁৗছে দেব, বাবু।

দাঁতে বিড়ি চেপে দাঁড় টানছিল লক্ষ্মণ, উত্তরটা তাই কেমন চাপা, আক্রোশভরা শোনাল।

বুকের ভেতর ছলাক্ করে উঠলো নন্দর। পাড়ের দিকে ঘেঁষছিল নৌকা, লগির ঠেলায় নৌকার মুখ ফিরিয়ে দিল লক্ষ্মণ।

নন্দ ভাবলো। না, কাজটা ভালো হয় নি। রাতটা অপেক্ষা করে সকালে নিজের লোক, নৌকা নিয়ে এলে ভাবনা থাকত না। সে রকম ব্যবস্থাই ছিল।

নদীর ভাঙা ঘাটে বসেছিল কেষ্ট। কাজ ছিল না। তাই সকাল থেকেই উপোসী পেটে নদীর ধারে এসে বসেছিল। এক সময় সে উঠে গোকুলের সামনে গিয়ে দাঁড়িয়ে ছিল। করুণ মুখ করে বলেছিল, বাবু, কাজ দিন।

কাজকম্ম কি আছে। দেখছিস না, বসে ধুঁধুল চুষচি।

ফের ঐ ভাঙা ঘাটে গিয়ে বসতে যাচ্ছিল কেষ্ট, পেছন থেকে গোকুল ডেকেছিল, আরে এই ব্যাটা, শোন।

কেষ্ট ফিরে দাঁড়িয়েছিল

এক মিনিট ভেবে গোকুল বলেছিল, তোর নাও আছে না?

কেষ্ট মাথা নেড়েছিল।

তোকে নৌকো নিয়ে ঘুরতে দেখেছি।

আজ্ঞে ওটা লক্ষ্মণের নৌকো।

ও।

চোখে জিজ্ঞাসা নিয়ে কেষ্ট দাঁড়িয়েছিল।

হাত নেড়ে গোকুল বলেছিল, তবে ভাগ।

লক্ষ্মণকে বললে নৌকো দেবে। ওর কাজ নেই।

গোকুল চোখ তুলে তাকিয়েছিল।

এগুলো পেঁৗছে দিয়ে আসতে পারবি? বাবু খুশি করবে।

মিট্‌মিটে চোখে বস্তাগুলোর দিকে তাকিয়েছিল কেষ্ট। তারপর

শ্রীরামচরিত-মানস

ভক্তকবি তুলসীদাস

অধ্যাপক শিবপ্রসাদ গংগোপাধ্যায় কর্তৃক বংগানুবাদ

শ্রীরামচন্দ্রের বন্দনা-গানে ভারতবর্ষের বহু গুণী ও জ্ঞানীজন লেখনী ধারণ করিয়া আত্মোৎসর্গ করিয়াছেন। সেই সকল অমর লেখনীর প্রতিভা-নির্ঝরে ভারতবর্ষের মহাকাব্য পৃথিবীর সাহিত্যে স্বীয় বৈশিষ্ট্যে সমুজ্জ্বল। ভক্তকবি গোস্বামী তুলসীদাস তন্মধ্যে অন্যতম—যিনি সহজ সরল ভাষায় পতিতপাবন সীতা-রামের চরিত্র বর্ণনা করিয়াছেন সুমধুর সংগীতের মাধ্যমে। তুলসীদাসের জীবনসর্বস্ব মহামানব শ্রীরামচন্দ্রের সেই বন্দনা-গানের সুললিত বাংলা অনুবাদ এই প্রথম—বসুমতী সাহিত্য মন্দিরের অপূর্ব কীর্তির নূতন এক পরিচয় এই শ্রীরামচরিত-মানস। বহু রঙীন চিত্রে সুশোভিত।

মূল্য—১ম খণ্ড দুই টাকা, ২য় খণ্ড দুই টাকা।

বসুমতী প্রাইভেট লিমিটেডঃ ১৬৬, বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী স্ট্রীট, কলি-১২

কিছু বলে নি। মাথা নেড়ে সম্মতি জানিয়ে চলে গিয়েছিল। ফিরেছিল ঘণ্টা দুই বাদে—সঙ্গে লক্ষ্মণ।

তখন থেকেই মন খুঁতখুঁত করেছিল নন্দর। কাজটা ভালো হল না। ওদের কথাবার্তা, হাবভাব ভালো ঠেকে না। গোকুল বলেছে বটে, তার বিশ্বাসী লোক। এ কাজ তারা অনেকবার করেছে। বিশ্বাসভঙ্গের মত কাজ তারা কোনদিন করে নি। হাতে দু' দশ টাকা দিলেই তারা যথাস্থানে মাল পৌঁছে দিয়ে আসে।

নৌকার গলুইয়ে বসে নিঃশব্দে নদীর মাঝে চেয়ে আছে কেষ্ট। ক্যাঁচ্ ক্যাঁচ্, ছলাৎ ছলাৎ। নিঃশব্দে দাঁড় টানছে লক্ষ্মণ।

খক্ খক্ করে কাশলো নন্দ। ভেতরে চেপে বসা উদ্বেগ তাড়াতে চাইল।

তোমরা তা' হলে এই কাজ কর?

হ' বাবু, আমি নৌকো টানি।

বেশ কিছুক্ষণ পরে উত্তর এলো। উত্তর দিল লক্ষ্মণ।

উত্তর একটা পেয়ে আরো সহজ হয়ে নন্দ কেষ্টকে শুধোল, তুমিও নৌকো চালাও নাকি?

না।

জমিজমা আছে?

বেচে দিয়েছি।

ঘর-সংসার?

ভাসিয়ে দিয়েছি।

ছোঁড়া রসিকতা করছে নাকি! ঘাটে বসে রসের গান গাইছিল। হাসছিল ঐ লক্ষ্মণের কোমর জড়িয়ে ধরে। 'হাতে কাঁচা টাকা এলেই ব্যাটাদের স্ফূর্তি!' বলেছিল গোকুল।

সেই কেষ্ট নৌকায় ওঠামাত্র গম্ভীর হয়ে গিয়েছিল। দূরের পানে কি যেন ঠাওর করে।

নন্দ চুপ্ করে গেছে। নদীর বুকে গাঢ় অন্ধকার এখন ফিকে হয়ে গেছে। 'চাঁদ উঠলো।' নিজের মনেই বলল নন্দ। নৌকা গন্তব্যের দিকে অনেকটা এগিয়ে গেছে আর কিছু দূর এগুলে অমরপুর। অমরপুর পেরিয়ে এলে আর ভাবনা নেই। সেখানে নন্দর লোকজন আছে।

নন্দ তাই এখন অনেকটা নিরুদ্বেগ। না, সে মতলব ওদের নেই। থাকলে বাঁওড়ে ঘন অন্ধকারে ঘন জঙ্গলভরা অমন জায়গার সুযোগ ছাড়তো না। তবু বলা যায় না। কে জানে, কি আছে ওদের মনের তলে তলে।

নৌকা ধীরগামী। স্রোত এখানে অবরুদ্ধ। নদীর এদিক প্রায় মজে এসেছে। অনেকখানি চড়া জুড়ে শ্মশান। হাড়-গোড়, আধ-পোড়া শব ছড়িয়ে থাকে। গৃধিনী আর শেয়ালের রাজত্ব। দিনের বেলাতেও দেখা যায় মড়া শেয়াল-শকুনে টানাটানি করছে।

লগি তুলে নৌকা ঠেলতে লাগলো কেষ্ট। হে-ই, হ্যাট্।

পাড়ের দিকে লগি উঁচিয়ে ধরলো কেষ্ট।

পাড়ের দিকে অস্পষ্ট সঞ্চরণশীল ক'টা ছায়া। ছায়াগুলি চতুষ্পদ জানোয়ারের। চাঁদের ঘষা আলোতে বোঝা যায়, কি একটা বস্তু নিয়ে টানাটানি চলেছে। মানুষের সাড়া পেয়ে খানিকক্ষণ পরম বিস্ময়ে তারা এদিকে তাকিয়ে থাকে।

মড়াগুলোকে পোড়ায় না, চড়ায় ফেলে যায়।

হায়! গোটা নদীর চড়া শ্মশান হয়ে গেল গো!

তবু শেষ হয় না।

বড় অন্ধকার গো!

আবার হিম শিহরণ জাগল নন্দর বুকে। ধক্ করে উঠলো বুক। চাঁদের অস্পষ্ট আলোতে নদীর চড়ায় শ্মশান স্পষ্ট হয়ে উঠলো। চতুর্দিকে ছড়ানো হাড়-গোড়, করোটি, শিয়াল-শকুনে খাব্‌লানো মৃতদেহ।

নৌকার ওপর সটান হয়ে দাঁড়িয়েছিল কেষ্ট। পরনে জীর্ণ ট্যানা, শীর্ণকায় কেষ্ট।

রামপদর ঘরে ধান ছিল না, চাল ছিল না। জোয়ান মদ্দ, পেটে বড় ক্ষুধা—

গলা শুকিয়ে আসে নন্দর।—হেই, এ কি কথা!

সেই জোয়ান মদ্দ পড়ে গেল, পেটে যে দানা ছিল না এক মাস। শুকনো গলায় ঢোক্ গেলার চেষ্টা করলো নন্দ।

হেই, এ কি কথা!

রামপদ মরে গেল!

নন্দ উঠে দাঁড়াল। অতিকায় স্থূল দেহপিণ্ডটা তার আকুঞ্চিত হোল।

চোখের সামনে নদীর চড়ায় সে অগণিত ছায়া দেখল। নরকঙ্কালের স্তূপ কি উঠে দাঁড়িয়ে তার দিকে আঙুল দেখায়! হেই বাপ!

দাঁতে দাঁত চিপে চোয়াল পাথরের মত শক্ত করলো কেষ্ট।

এই দ্যাখ রামপদ, কত ধান শহরে যায়! আর তুই জোয়ান মদ্দ না খেয়ে মরে গেলি! তোদের চোখের সামনে দিয়ে ধান পাচার হয় শহরের গুদামে, আর তোরা জোয়ান মদ্দ—নদীর পলিমাটির নিচে সজোরে হাতের লগি পুঁতে দিল কেষ্ট। নদীর চড়ায় কারা যেন অপেক্ষারত। এবার তারা ছুটে আসে।

এই খবরদার! এ আমার কেনা ধান! নন্দ কঁকিয়ে উঠলো।

দেব না, এ ধান মোরা শহরে যেতে দেব না।

নদীর চড়ায় অস্পষ্ট আলোতে ওরা চিৎকার করে উঠলো।

দেশ সেবায় নিয়োজিত,

এ্যালবার্ট ডেভিড লিমিটেড

কলিকাতা—৫০

নীতি ও বিজ্ঞানানুযায়ী ঔষধ প্রস্তুতকরণের অগ্রণী

—ব্রাঞ্চ সমূহ—

বোম্বে - মাদ্রাজ - দিল্লী - নাগপুর

বেজওয়াডা - শ্রীনগর - গৌহাটী

বিপ্লবী যুগের একটি বিস্মৃত অধ্যায়

—সত্যেন্দ্র নাথ গঙ্গোপাধ্যায়

এস আই মধুসূদন ভট্টাচার্যের হত্যা

"বিজলি তার বীণার তারে
আঘাত করে বারে বারে,
বুকের মাঝে বজ্র বাজে
কী মহাতানে।"*

(*১৮ই জ্যৈষ্ঠ ১৩১৭ সালে রচিত ৭০ নং কবিতা—গীতাঞ্জলি)।

১৬ই জানুয়ারী, ১৯১৬ সালের কথা—। কলকাতার রাজপথে আরমার্ড কার তখনও পাহারা রত। সংবাদে প্রকাশ—"Yet another political outrage was committed in Calcutta on Sunday morning at 9-30 a.m. on S. I. Madhu Sudan Bhattacharjee of the Calcutta C.I.D. When he was proceeding south to north along College Street towards College Square..in front of the house No. 52-1-1, College Street, near Protap Chatterjee's Lane, a Shot hit him ... This was committed by two youngmen."—"কলকাতা গোয়েন্দা বিভাগের এস আই মধুসূদন ভট্টাচার্যের ওপর কলকাতায় আবার এক আক্রমণ হয়ে গেছে রবিবার সকালে ৯-৩০ মিনিটের সময়। তিনি যখন কলেজ স্ট্রীট ধরে কলেজ স্কোয়ারের দিকে যাচ্ছিলেন... কলেজ স্ট্রীটে অবস্থিত ৫২।১।১ নং বাড়ির সামনে, প্রতাপ চ্যাটার্জী লেনের কাছে তিনি গুলীবিদ্ধ হন...এইভাবে ফুটপাতের ওপর পড়ে গেলে তাঁর ওপর আরো দুটি গুলীর আঘাত লাগে... এই কাজ অনুষ্ঠিত হয়েছে দু'জন যুবকের দ্বারা।"* (* এ বি পত্রিকা, সোমবার—১৭।১।১৯১৬)। এই ঘটনার তাৎপর্য ভাল করে বুঝতে হলে তখনকার পারিপার্শ্বিক এবং বিপ্লবীদের অবস্থা ও মনোভাব একটু জানা দরকার। আলোচনা প্রসঙ্গে একজন প্রখ্যাত বিপ্লবী একদিন বলেছিলেন—'এই জাতীয় শত্রু হত্যার প্রচেষ্টাকে এখনও সন্ত্রাসবাদ আখ্যা দিলে খুব ভুল করা হবে। টেররিস্ট, অ্যানার্কিস্ট ইত্যাদি শব্দগুলি ব্যবহার করেছিল বৃটিশ সরকার তখনকার সর্বত্যাগী, নির্মল আদর্শবাদী প্রকৃত বিপ্লবীদের নামে কাদা ছিটাবার জন্যে। দুঃখ হয়, আজও দেশের বহু লোক সেই শব্দগুলি ভুলতে পারেন নি।' আসল কথা, দেশের লোককে বা যে কোন মানুষকে কেবলমাত্র পুলিশের কর্মচারী ইত্যাদি হলেই বিপ্লবীরা তাঁদের শত্রু মনে করেন নি। অর্থাৎ তাঁদের জীবননাশ করে সন্ত্রাস সৃষ্টির কথা চিন্তা করতেন না। তবে বিপ্লবের পথে প্রকৃত বাধাকে অথবা বিশ্বাসঘাতককে না সরালে যেখানে তাঁদের কাজ চালানো অসম্ভব হোত, কিংবা যাঁরা স্বাধীনতা অর্জনের পথে সত্যিই অন্তরায় হয়ে উঠতেন—সেখানে প্রয়োজনীয় পথ অবলম্বন করা ছাড়া আর গত্যন্তর থাকত না।

উপরোক্ত "two youngmen"—দের পরিচয় সম্বন্ধে জানতে চাওয়ায় বিপ্লবী ডাঃ যাদুগোপাল মুখোপাধ্যায় তাঁর ৪।৬।১৯৬৪ তারিখের চিঠিতে লিখেছিলেন—"১৯১৬ সালে মেডিকেল কলেজের প্রায় সামনে মধুসূদন ভট্টাচার্যকে গুলী করেন "বিধু" নামে একজন। তাঁর উপাধি ভুলে গেছি। সুরেন্দ্রমোহন ঘোষ, এম-পি অর্থাৎ মধুবাবুর কাছে সংবাদ নেবেন।" পরবর্তী পত্রে ৩০।৭।১৯৬৪ তারিখে লিখেছিলেন—"১৯১৬ সালে মধুসূদন ভট্টাচার্যকে যিনি বা যাঁরা গুলী করেন তাঁদের ভিতর মন্মথ বিশ্বাস ওরফে বিধু ছিল না। ছদ্মনামধারী যে বিধুর কথা সতীশ চক্রবর্তী বলেন, তিনি অন্য লোক।" অতঃপর শ্রদ্ধেয় শ্রীসুরেন্দ্রমোহন ঘোষ তাঁর ১০।৮।৬৬ তারিখের চিঠিতে লেখেন—"আপনি যাহা জানিতে চাহিয়াছেন, তাহা জানান আমার পক্ষে সম্ভব নয়।...একজনের নাম বিধু ঠিক কিন্তু জামালপুরের বিধু সেন নয়।" সর্বশেষ ডাঃ যাদুগোপালের স্মৃতিতে "ময়মনসিং গ্রুপে" উল্লিখিত শ্রদ্ধেয় শ্রীসতীশ ঠাকুর (পৃঃ—৬৬৬) ওরফে সতীশ চক্রবর্তীর সৌজন্যে বিপ্লবী বীর শ্রীসুধীন্দ্রনাথ বসু (রায়) জানিয়েছেন—"বন্ধুবর বিধু রায় ওরফে উপেন রায় তখন রিপন কলেজের (বর্তমান সুরেন্দ্র কলেজ) তৃতীয় বার্ষিক শ্রেণীর ছাত্র। সে থাকত হ্যারিসন রোডের এক মেসে। আমি থাকতাম নিকটস্থ মিরজাপুর স্ট্রীটের ওপর একটি ঘরে। সেই ঘরে আমার একটি ঘি মাখনের দোকান ছিল। আমি তখন আত্মগোপন অবস্থায়। আমার সঙ্গে আর একটি আত্মগোপনকারী থাকতেন—মেদিনীপুরের মোহিনী সামন্ত। মধুসূদনবাবু তাঁর বৃত্তিজীবনে উন্নতিকল্পে স্বার্থ নিবন্ধন বিধুর মেসে গিয়ে আমাদের খবরের জন্যে তাকে ব্যতিব্যস্ত করতে আরম্ভ করেন। তা ছাড়া নরেন ঘোষ চৌধুরী একদিন কাঠগড়ায় দাঁড়িয়ে বলে ওঠেন—"সর্দি হয়েছে, মধু চাই।" এই ইঙ্গিতেই স্বনামধন্য শ্রীদেবেন চৌধুরীর দ্বারায় নির্দেশ হয়, মধুবাবুকে সরাতে না পারলে দলের সমূহ ক্ষতি হওয়ার সম্ভাবনা। তখনই বিপ্লবীবীর সুধীন্দ্র ও উপেন্দ্র তথা বিধু তৈরি হয়ে নেন মধুবাবুর খোঁজে বার হবার জন্যে। তখনও তাঁদের মনে সেই একই গানের লহরী—

"গরজী গরজী শঙ্খ তোমার
বাজিয়া বাজিয়া উঠুক এবার,
গর্ব টুটিয়া নিদ্রা ছুটিয়া
জাগুক তীব্র চেতনা।"*

(* ২৬ জৈষ্ঠ, ১৩১৭ সালে রচিত ৫৭ নম্বর কবিতা, গীতাঞ্জলি)

সেই সময় বিপ্লবীদের কাছে বুলেট ছিল, পিস্তল ছিল, কিন্তু বুলেট আটকাবার বেল্ট ছিল না। সেই কারণে তাঁরা নিজ হাতে তৈরি করে নেন মোটা ২/৩ ইঞ্চি ক্যাম্বিসের ফিতার সাহায্যে নিজেদের ব্যবহারের উপযোগী প্রয়োজনীয় কৃশ বেল্ট। সুধীন্দ্রনাথ সেদিন সেইরূপ একটি বেল্টে ৫০টি বুলেটের পাঁচটি তবক ক্লিপের সাহায্যে আটকে কাঁধে ঝুলান, আর হাতে নেন একটি লোডেড মশার পিস্তল। অপরজন তথা উপেন্দ্রনাথ ওরফে বিধু সঙ্গে নেন ৪৫০-বোরের একটি লোডেড রিভলভার। তারপরে ১৯১৬ সালের ১৬ই জানুয়ারী সকালে, নিজেদের গায়ে একটি করে চাদর জড়িয়ে দুই বন্ধুতে বেরিয়ে পড়েন মধুসূদন ভট্টাচার্যের খোঁজে, হ্যারিসন রোডের রাস্তা ধরে। কারণ তাঁদের জানা ছিল, এস আই মধুসূদনবাবু ঐ সময় হ্যারিসন রোডেই বেশি চলাফেরা করতেন, নিজের কাজে, বিপ্লবীদের গতিবিধি অনুসরণ করতে। এইভাবে দুই বন্ধুতে চলতে চলতে হ্যারিসন রোড ও কলেজ স্ট্রীটের সংযোগে এসে হাজির হন। এই স্থানে মিরজাফর লেনের কোনে (বর্তমান 'কলেজ রো') 'কমলা স্টোর্স' নামে

একটি স্টেশনারি দোকান ছিল। পূর্বোক্ত বিপ্লবী বন্ধুদের মধ্যে 'বিধুবাবুই প্রথম দেখেন তাঁদের লক্ষ্য, সেই বহু কলঙ্কিত এস আইটিকে কমলা স্টোর্সে দাঁড়িয়ে থাকতে। এই সূত্রে জানা দরকার যে, সংবাদে প্রকাশিত 'টু ইয়ংমেনদের' সঙ্গে আরও একটি বিপ্লবী সাইকেল যোগে দূর থেকে সমস্ত ক্রিয়াকলাপই অনুসরণ করছিলেন — শ্রীদেবেন চৌধুরী। অতঃপর সুধীন্দ্রনাথের ইঙ্গিতে বিধুবাবুই এগিয়ে গিয়ে এস আই মধুসূদনের সঙ্গে আলাপ জমিয়ে কলেজ স্ট্রীটের পূর্ব দিকের ফুটপাথ ধরে চলতে থাকেন দক্ষিণ দিকে। গোয়েন্দা মধুসূদন তিলার্ধও বুঝতে পারেন নি, এবার তিনি কত বড় বিপ্লবী গোয়েন্দার ফাঁদে পড়েছেন। এইভাবে মধুসূদনবাবু সেদিন একটি ১৮।১৯ বছরের কলেজের ছাত্রের কবলে পড়ে, এক উজ্জ্বল আকাশকুসুমের ভাবনায় বিভোর হয়ে যখন বর্তমান হরলালকার দোকানের কাছাকাছি এসে হাজির হন, ঠিক সেই সময় সুযোগ বুঝে উক্ত রাস্তার পশ্চিম ফুটপাথ থেকে সুধীন্দ্রনাথের পিস্তল গর্জে ওঠে মধুসূদনের ওপর। অব্যর্থ লক্ষ্য। এক গুলীতেই স্বার্থান্বেষী গোয়েন্দাবাবুর দেহ রাস্তায় লুটিয়ে পড়ে। অবশ্য কাজে স্থিরনিশ্চয় হওয়ার জন্যে সুধীন্দ্রনাথ তার ওপর আর একটি গুলী নিক্ষেপ করে, প্রতাপ চ্যাটার্জী স্ট্রীটে ঢুকে পড়েন। তখন ঐ অঞ্চলে খোলার বসতিই বেশি ছিল, আর ঐ রাস্তাটি থেকে বাহিরে যাওয়ার দ্বিতীয় পথ ছিল না। কাজেই সুধীন্দ্রনাথ তখন একটি পাঁচিল টপকে, অপর দিকে অবস্থিত খোলার বসতির ভিতর দিয়ে, আরপুলি লেন ইত্যাদি অতিক্রম করে বহুবাজার স্ট্রীটে (বর্তমান বিপিন গাঙ্গুলী স্ট্রীটে) এসে হাজির হন। এই বহুবাজার স্ট্রীটে তখন বঙ্গবাসী কলেজের একটি হোস্টেল ছিল, আর সেখানে থাকতেন সুধীন্দ্রনাথের এক ভাগিনেয়, নাম সুকুমার বসু দলীয় লোক। এই সুকুমার বসুর কাছে সুধীন্দ্রনাথ তাঁর চাদর ও অস্ত্রগুলি রেখে আবার ফিরে যান ঘটনাস্থলে, তখনকার পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ করার জন্যে। গিয়ে দেখেন সেই সময় মিস্টার লোম্যানের উপস্থিতিতে মধুসূদনবাবুর দেহ তখন মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে সরান হচ্ছিল। লোম্যান সেই সময় একটি প্যান্ট ও গেঞ্জি পরিহিত অবস্থায়, বুকে ঝুলছিল বুলেট আঁটা চামড়ার ক্রশবেল্ট, আর হাতে ছিল একটি রিভলভার। এই সকল খবর সংগ্রহ করে বিপ্লবী সুধীন্দ্রনাথ, পূর্বে-ব্যবস্থা মত এবারে চলে যান মিরজাপুর স্কোয়ারের (বর্তমান শ্রদ্ধানন্দ পার্ক) একটি পূর্ব নির্দিষ্ট স্থানে। সেখানে তখন অপেক্ষারত ছিলেন শ্রদ্ধেয় শ্রীদেবেন চৌধুরী। খবর শুনে সুধীন্দ্রনাথের ওপর তৎক্ষণাৎ নির্দেশ হয়, লোম্যানকেও সরিয়ে দেওয়ার জন্যে। কিন্তু কাছে তাঁর অস্ত্র না থাকায়, সেই কাজ তখন সম্ভব হয় নি, যা পরবর্তী কালে সম্পূর্ণ হয়েছিল ঢাকার হেমবাবুর গ্রুপের (শ্রদ্ধেয় শ্রীহেমচন্দ্র ঘোষ) বিনয় বসুর দ্বারায়। অন্যত্র এই আলোচনা করা হয়েছে।

অপরদিকে শ্রদ্ধেয় শ্রীবিধু রায় ওরফে শ্রীউপেন রায় প্রত্যক্ষভাবে এই কাজ না করলেও পুলিশ তাঁকে গ্রেপ্তার করে তাঁর ওপরে যথেষ্ট নির্যাতন চালিয়েছিল, একটা স্বীকারোক্তি আদায়ের জন্যে। কিন্তু সকল নির্যাতনই হার মেনেছিল বিপ্লবের আদর্শে তেজোদ্দীপ্ত ঐ বিধুর কাছে। শেষে পুলিশ তাঁকে ছেড়ে দিতে বাধ্য হলেও, তখনকার প্রচলিত সহজ অস্ত্র ডি আই অ্যাক্টের সাহায্যে তাঁর ওপরে হুকুম জারি হয় দীর্ঘ নির্বাসনের। সংবাদে প্রকাশ — "Upendra Krishna.. arrested on suspicion in connection with the murder of S. I. Madhu Sudan Bhattacharjee of the Special Branch, C.I.D... was produced before Mr. Loman, D. C. . was discharged. Immediately after this a copy of internment order was made

পৃথিবী দেখছে আজ

মুকুলরঞ্জন সাহারায়

অবশেষে ঘুম ভাঙে সেই ডাকে। ডাকছে ভিয়েতনাম;
বেদনার ক্লান্ত সুরে আমাকে করেছে অধিকার;
সহজে কি দিতে পারি?
এখন এ দেহ হতে কিছু রক্ত তেষ্টা মেটাবার।

ওখানে সমুদ্র-পারে হিংস্র চোখ হয়েছে উতলা;
বন্দুকের শব্দ কাঁপে। মাঠভরা পাখির নিনাদ।
রক্তমাখা ফসলের বুকে চলে শুধু বিশৃংখলা।
পৃথিবী দেখছে আজ নির্লজ্জ মনের রক্তস্বাদ।

আমার মতোই লক্ষ্যে তোমরা জাগাও চতুর্দিক।
লাল রক্তে পথ এঁকে সারারাত বাঁধো শক্ত ফাঁদ।
যা, অগ্নিযুগের গড়া—এ যুগেও তেমনি আছে ঠিক।

পৃথিবী দেখছে আজ নির্লজ্জ মনের রক্তস্বাদ......

---

over to Upendra under section 2 of the Defence of India Act. ...It is said Upendra is a student of the 4th year class."* (* এ বি পত্রিকা—৪।২।১৯১৬)। অর্থাৎ যৌবনের অভিযানে, দুষ্টকে দমন করার প্রচেষ্টায় সহায়তা করতে গিয়ে উপেন রায় ওরফে বিধু রায় উক্ত ঘটনার প্রায় এক মাস পরে সন্দেহে গ্রেপ্তার হন, আর পুলিশের ডেপুটি কমিশনার লোম্যান সাহেব তাঁকে নিয়ে বন্ধ দরজায় বিচারের এক প্রহসন করে, প্রমাণ অভাবে ছেড়ে দিতে বাধ্য হন। কিন্তু তখনকার প্রচলিত ডি আই অ্যাক্টের বলে, তাঁকে দীর্ঘ নির্বাসনে পাঠিয়ে দেবার ব্যবস্থা হয়। অপরদিকে আত্মগোপনকারী সুধীন্দ্রনাথ আরো কিছুদিন কাটাতে থাকেন আত্মগোপন অবস্থায়তেই, বিপ্লবের কাজে ইন্ধন যুগিয়ে। তারপর ১৯১৬ সালের শেষের দিকে মালুটি নামক গ্রামে অবস্থিত নিজের পৈত্রিক বাড়ি থেকে তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয় সন্দেহের অভিযোগে।

চার্জ—(১) মধুসূদন ভট্টাচার্যের হত্যা;

(২) কর্পোরেশন স্ট্রীটের মোটর ডাকাতি;

(৩) হাতীবাগানের মোটর ডাকাতি; ইত্যাদি।

এই সকল খবরের আভাস পাওয়া যায় নিকসন সাহেবের কনফিডানশিয়াল রিপোর্টের টেবল 'আই' থেকে। সুধীন্দ্রনাথ বলেন—গ্রেপ্তারের পরে তাঁর আন্দাজ হয়েছিল কুমিল্লার জিতেন সেনের মারফত এই সকল কথা হয়তো প্রকাশ পেয়ে থাকবে। কোন কোন মানুষের মনের এই অতর্কিত দিকটাকে একেবারে উপেক্ষা করা যায় না। যাই হোক, গ্রেপ্তারের পরে সুধীন্দ্রনাথ তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগগুলি স্বভাবতই দৃঢ়তার সঙ্গে অস্বীকার করেন। শেষে তাঁরই ভাষায়—

"টেগার্ট সাহেব বলে—'Are you a sportsman?'

উঃ—'Of course, I am so.'

টেঃ—'Let-me-play with you football—তার পরে পিঞ্জরাবদ্ধ সিংহ শিশুর ওপরে সুরু হয় অমানুষিক পাশবিক অত্যাচার, যার ফলে কিছুক্ষণের মধ্যেই তিনি জ্ঞান হারান। শেষে সংজ্ঞা ফিরে এলে দেখেন বীরপুঙ্গের টেগার্ট সাহেব আর সেখানে নেই; বদলে মাথার কাছে দাঁড়িয়ে আছেন একজন বাঙালী অফিসার, আর একটি ফ্যান ঘুরছে পুরো দমে।* শেষে তাঁকে নিয়ে যাওয়া হয় জেলখানার অন্তরালে। কিন্তু তখনকার ডি আই অ্যাক্টের আওতায় এক মাসের বেশি রাখা যেতো না। তাই তাঁর ওপরেও শেষে নির্বাসনের হুকুম হয়।...এইভাবে নানা স্থানে ঘুরিয়ে ১৯১৯ সালে তিনি মুক্তি পান।

* এ হচ্ছে ১৯১৬ সালের ঘটনা। ডি আই অ্যাক্টের বলে তখনকার পুলিশের উলঙ্গ তান্ডব। আরো ১৫।১৬ বছর পরের ঘটনা—"প্রেসিডেন্সি জেল হইতে দেউলী যাত্রার ৩।৪ দিন আগে '—ই জুন, ১৯৩২, রাত্রি দ্বিপ্রহরে দেউলী জেলে রাজবন্দী মৃণালকান্তি রায়চৌধুরী আত্মহত্যা করিয়াছেন।'...মৃণালকান্তির মৃত্যু—এ' কিসের সঙ্কেত?...মৃণালকান্তি কেন আত্মহত্যা করিলেন...আমাদের জন্য শুধু একটি প্রশ্নই...'সত্যই কি মৃণালকান্তি আত্মহত্যা করিয়াছেন?'...হারাণ (সাধারণ কয়েদি) আসিয়াছিল কিছুদিন পরে। এ প্রশ্নের উত্তর সে কেবল জানিত। সে বলিত 'না বাবু এ হতেই পারে না। বাবুরা কি কখন আত্মহত্যা করে?...আমি নিশ্চয় জানি এ ওদেরই কাজ!*" (* 'জেল ও জেলখানা' শ্রীনিকুঞ্জ সেন—পৃঃ ২৫—২৯)।

এই সকল চিরোন্মত্ত যৌবনের জলতরঙ্গ আজও জীবিত—কিন্তু অজ্ঞাত। তাঁদের উদ্দেশ্যে আজ তাই বলতে হয়—

"আজিকে তোমার অলিখিত নাম
আমরা বেড়াই খুঁজি—
আগামী প্রাতের শুকতারা সম
নেপথ্যে আছে বুঝি।"*

(* রবীন্দ্রনাথের—নবজাতক—পৃঃ ১০)।

অতঃপর দেশের স্বাধীনতা লাভের পরে আরো প্রায় আঠারো বছর অতীত হয়েছে। সংবাদে প্রকাশ—মার্চ মাসের ১৯৬৬ সালে বেলেঘাটার থানায় একটি ১৮ বছরের যুবক "২১শে মার্চ গ্রেপ্তার" হয়ে "বৃহস্পতিবার (২৪শে মার্চ)...গলায় দড়ি দিয়া আত্মহত্যা করিয়াছে...।"* (* দৈনিক বসুমতী—২৭।৩।৬৬—সম্পাদকীয়)।

রঙ্গমঞ্চ ওদেশে এবং এদেশে

শিলালিপি

১৩৩৫ সালের অগ্রহায়ণ মাসে নাট্যমন্দিরে শিশিরকুমার যোগেশ চৌধুরীর দিগ্বিজয়ী নাটক মঞ্চস্থ করেন। প্রথম রাতের ভূমিকালিপি ছিল এইরকমঃ

নাদির শা—শিশিরকুমার
সালেবেগ—বিশ্বনাথ
আলি আকবর—যোগেশ চৌধুরী
আমেদ খাঁ—জীবন গাঙ্গুলী
রহমৎ খাঁ—রবি রায়
রেজাকুলি—শৈলেন চৌধুরী
আসফ জা—রামময় চক্রবর্তী
সাদৎ আলি—শীতল পাল
মির্জা মেহেদী—অমলেন্দু লাহিড়ী
নেককদম—নৃপেশ রায়
সিতারা—কৃষ্ণভামিনী
সিরাজীবেগম—চারুশীলা

শেষ দানিক শিশিরকুমার প্রায়ই বলতেন দিগ্বিজয়ী হল মহম্মদ শাহের রাজত্বের সময় নিয়ে লেখা। তেমনি তখৎ-এ-তাউস জাহান্দর সাহের রাজত্বকালের বিষয় নিয়ে রচনা, মাঝখানে থাকে ফারুকসিয়ার অর্থাৎ জাহান্দরকে যে মেরেছিল এবং তারপর হল আমেদ আবদাল—এদের দুজনকে নিয়ে দুটো নাটক লিখতে পারলেই একটা চমৎকার সিরিজ হতে পারে।

দিগ্বিজয়ীর ভারতনারী চরিত্রটি একটা নাট্যকে—তার আগে অবধি নাটকটি এপিসডিক — ভারতনারীকে এনে একটা সিম্বলিক টাচ দেবার চেষ্টা করা হয়েছে—প্রথমে এ চরিত্রে অভিনয় করেছিল কৃষ্ণভামিনী, পরে কঙ্কা —বলেছিলেন শিশিরকুমার। নাট্যাচার্যের মতে দিগ্বিজয়ী হল শক্তিমত্তার মিথ্যাময়ী পরিণামের ছবি—শক্তিমত্তার ফল কখনই ভাল হয় না। শিশিরকুমারের কাছে শুনেছি যে, দিগ্বিজয়ী প্রথম লেখা হয় ১৯২১-এ —তিনি তখন ম্যাডান কোম্পানীতে চাকরি নিয়েছেন। নাটক পড়ে ওদের পছন্দ হয় নি। সালেবেগ একটি ঐতিহাসিক চরিত্র—লোকটি ছিল আদর্শবাদী. আলি আকবর হচ্ছে পারস্য-সম্রাট তামাসের ভাগনে। তামাসকেই বন্দী করে নাদির সম্রাট হয় —তামাসের যে মেয়েকে নাদির বিয়ে করে, আলি হল তারই কাজিন। রহমৎ হল অহিংসবাদী—প্রিস্টাইন পিওরিটীর মূর্ত প্রতীক।

সালেবেগ কর্তৃক নাদির হত্যা, ব্রুটাসের সিজার হত্যার মতই ট্র্যাজিক এবং রসঘন। ১৯২৮ সালের ২১শে ডিসেম্বর দিগ্বিজয়ী সম্বন্ধে সমালোচনা প্রসঙ্গে নাচঘরে লিখেছিলঃ

"দিগ্বিজয়ীর ভূমিকায় শিশিরকুমারের অভিনয়! কি করে তার পরচয় দেব, অবর্ণনীয়কে কি ভাষায় বর্ণনা করা যায়? তাজমহলের উপযোগী বর্ণনা আজও পাঠ করি নি —তাজমহলের স্রষ্টাও ভাষায় তাকে ফোটাতে পারতেন বলে বিশ্বাস করি না। দিগ্বিজয়ীর অভিনয়ও ঐ তাজমহলের মত। তা বর্ণনা করবার সাধ্য আমাদের নেই বরং শিশিরকুমার নিজেও তা কথায় প্রকাশ করতে পারবেন না।

"অনেকে আমাদের জিজ্ঞাসা করেছেন, নাদির সাহের ভূমিকায় শিশিরকুমারের অভিনয় কি আলমগীরের মতই ভাল হয়েছে? এ-সব জিজ্ঞাসার উত্তর নেই। কারণ যে শিল্পীর এক সৃষ্টি আর এক সৃষ্টিকে স্মরণ করিয়ে দেয়, তাঁর শ্রেষ্ঠতা সম্বন্ধে সন্দেহ প্রকাশ করবার অবকাশ আছে যথেষ্ট। আসল কলাবিদের প্রত্যেক সৃষ্টিই হয় আপনাতে আপনি সম্পূর্ণ, তারা পরস্পরের সঙ্গে তুলনারহিত এবং নূতনত্বের বিস্ময়ে অপূর্ব।

"কী সূক্ষ্ম এই নাদির সাহের অভিনয়। অসংখ্য স্থলেই শিশিরকুমার তাঁর মুহূর্তস্থায়ী অঙ্গভঙ্গী বা কণ্ঠের সামান্য অর্ধস্ফুট ধ্বনির ভিতরে এমন বৃহৎ ভাব বা অর্থকে প্রকাশ করতে চেয়েছেন, বাংলা দেশের আর কোন অভিনেতাকে তেমন চেষ্টা করতে দেখি নি। এবং তেমন চেষ্টা করবার মত মস্তিষ্ক তাঁদের আছে কি না, সেও একটা ভাববার কথা।

....

"শিশিরকুমারের মত ভাবব্যঞ্জক কণ্ঠস্বর যে এখন আর কোন বাঙালী

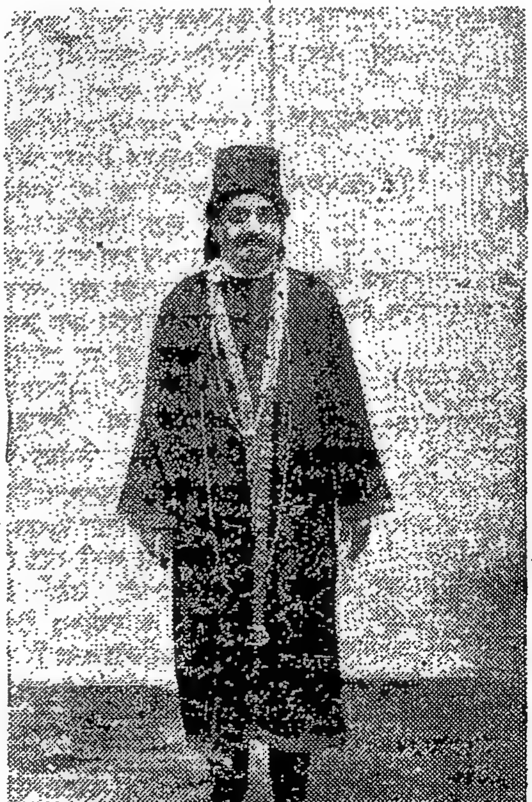

দিগ্বিজয়ী নাটকে আলি আকবরের ভূমিকায় শ্রীযোগেশচন্দ্র চৌধুরী

অভিনেতার নেই, এতদিনে তা নিশ্চিত-রূপে প্রমাণিত হয়ে গেছে। সুতরাং তা নিয়ে আর বিশেষ আলোচনা অনাবশ্যক। কিন্তু তবু এটা উল্লেখ না করে পারছি না যে, নাদির ভূমিকায় তাঁর এই বহু প্রশংসিত কণ্ঠস্বরের লীলা হয়ে উঠেছে অধিকতর অভাবনীয় ও বিচিত্রগতিমধুর। সে যেন এক ধ্বনি-তরবারি — নিপুণ ওস্তাদের শাসনে লীলায়িত হচ্ছে অকল্পিত কৌশলে। বিদ্যুতের মত! ও কণ্ঠ রহস্যের ভাণ্ডার, ওর ভিতরে কী না সঞ্চিত আছে—বজ্রের নির্ঘোষ, বসন্ত বায়ুর উচ্ছ্বাস, তপ্ত মরুর আর্তনাদ, কুঞ্জকাননের অস্ফুট মর্মর গীতি।

"কে নাদির, কে শিশিরকুমার জানি না। ভূমিকার ভিতরে অভিনেতা ডুবে গেছেন, না অভিনেতার ভিতরে ভূমিকা লুপ্ত হয়ে গেছে? নাদির সাহের ভূমিকায় আমরা নটের অভিনয় দেখি নি, শতাব্দীর অন্ধকার ঠেলে ঐতিহাসিক নাদির সাহ চোখের উপরে জ্যান্ত হয়ে জেগে উঠেছে—তার রক্তের স্রোত, মাংসের তপ্ততা, হৃৎপিণ্ডের নৃত্য আমরা নিজেদের জাগ্রৎ অনুভূতির ভিতর লাভ করেছি।"

দিগ্বিজয়ী করবার জন্য স্টেজের খুব বেশি ডেপথের দরকার—বিশেষত প্রথম দৃশ্যটির জন্য। নাট্যমন্দিরের যুগে কর্নওয়ালিশ মঞ্চে এ নাটকটি অভিনীত হয়েছিল। স্টেজের ষাট ফুট ডেপথ ছাড়াও, তার পেছনে বিশ ফুট একটা ঘর, চার পাল্লা দরজা খুলে কানাত লাগিয়ে তাঁবুর দরজা করে তার পেছনের বারো ফুট প্যাসেজ মায় গাছপালা শুদ্ধ দেখিয়ে দেওয়া হয়েছিল। মোট ডেপথ প্রায় একশ ফুটের মত হয়েছিল।

আমি অবশ্য নব নাট্যমন্দিরের যুগে দুবার স্টারে দিগ্বিজয়ীর অভিনয় দেখেছিলুম। শিশিরকুমারের অভিনয়ে নাদির চরিত্রের এই কথাটাই সব থেকে স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল—একজন যদি ক্ষমতা পায় তো তার মনে একটা মত্ততা আসে—তা সে যে অবস্থা থেকেই আসুক না কেন এবং শেষ পর্যন্ত তার ফল ভাল হয় না মোটেই। শিশিরকুমার বলতেন দিগ্বিজয়ী মোটামুটি ইতিহাসসম্মত। কিন্তু সাদাৎ আলি খাঁ আর চিন কিলিচ খাঁ এক সঙ্গে লড়েন নি। সাদাৎ আলি প্রথম দুদিন যুদ্ধে ঠেকা দিয়ে রাখার পর তৃতীয় দিন সকালে বন্দী হয়ে গেলেন আর সঙ্গে সঙ্গেই তাঁর সৈন্যদের হার হোল। এ নাটকের উপাদান নেওয়া হয়েছে আর্ভিন এবং বিশেষত মর্টিমার ডুরাণ্ডের বইয়ের থেকে।

মঞ্চে বিশ্বনাথ ভাদুড়ী যে সব চরিত্রে অভিনয়ের পিক্-এ উঠেছেন সালেবেগ তার অন্যতম। নাদির হত্যার দৃশ্যে তাঁর অভিনয় যে স্তরে উঠতো তাকে সামলিয়ে উঠে অভিনয় করা এক শিশিরকুমারের পক্ষেই সম্ভব ছিল। আলি আকবর রূপে দুই রাত্রে আমি দুই বিখ্যাত অভিনেতাকে মঞ্চাবতরণ করতে দেখেছি—প্রথমে মনোরঞ্জন বাবুকে এবং পরে রবি রায়কে। দুজনের অভিনয়ই ভাল হয়েছিল, তবে তুলনায় রবি রায়কে শ্রেষ্ঠ বলতে আমি বাধ্য। অথচ নাট্যমন্দিরের যুগে রবি রায় নাকি রহমৎ খাঁর ভূমিকা একেবারে জ্বালিয়ে দিয়ে গিয়েছিলেন। আমি রহমতের ভূমিকায় দেখেছিলাম নতুন শিক্ষার্থী অমল বন্দ্যোপাধ্যায়কে মোটামুটি ভালই করেছিলেন। জীবন গাঙ্গুলির আমেদ আবদালি আমার ভাল লাগে নি—অভিনয়ে ডেপথের অভাব ছিল। শৈলেন চৌধুরীর রেজাকুলি খুব প্রাণবন্ত হয়েছিল। কঙ্কাবতীর সিতারা এবং প্রভার সিরাজী প্রত্যেক দর্শকের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল।

ভারতনারী রূপে কঙ্কাবতীর অভিনয় হয়েছিল অনবদ্য—তবে চরিত্রটি এত মেলোড্রামাটিক এবং অস্বাভাবিক যে এ চরিত্রকে ঠিক মন থেকে গ্রহণ করা যায় না।

তবে একটা কথা এই প্রসঙ্গে বলি—দিগ্বিজয়ীতে ব্লাড এন্ড থাণ্ডার যথেষ্ট আছে বটে এবং খুব সহজেই দর্শকদের মাতিয়ে দিতে পারে। কিন্তু পরবর্তী যুগে অর্থাৎ শ্রীরঙ্গমে মঞ্চস্থ তখৎ-এ-তাউস নাটকটি আমার দিগ্বিজয়ীর থেকে নাটক হিসাবে অনেক ভাল লেগেছিল। যোগেশ চৌধুরী মশায়ের বেশ কয়েকটি নাটক প্রচুর মঞ্চ সাফল্য পেয়েছে একথা অনস্বীকার্য, তবে তাঁর লেখায় artistic polish-এ অত্যন্ত অভাব।

দিগ্বিজয়ী দেখে আমার বারবার মনে হয়েছিল আমেদ আবদালের ভূমিকায় ভূমেন রায়কে নির্বাচিত করলেই এ রোলটি সব দিক দিয়ে উঠে যেত। ভূমেন রায়ের মত অভিনেতা সে যুগেও দুর্লভ ছিল—আর এ যুগে তো ওই ধরণের শক্তিশালী অভিনেতা দেখাই যায় না। রাধিকাবাবুর পর ভূমেন রায়ের মত সাহেবের ভূমিকায় অভিনয় করবার মত কেউ ছিলেন না।

সাজাহানে তাঁর যশোবন্তের অভিনয়ও হত অনবদ্য—কোর্টসিনে আওরঙ্গজেব রূপে দুর্গাদাস, নির্মলেন্দু লাহিড়ীর মত প্রথম শ্রেণীর অভিনেতাকেও ভূমেন রায়ের যশোবন্তের কাছে নতি স্বীকার করতে দেখেছি। একমাত্র আওরঙ্গজেবের ভূমিকায় শিশিরকুমারকেই দেখেছি ভূমেন রায়ের যশোবন্তকে যথাস্থানে দাবিয়ে রাখতে। জোর করে নয়—যথাযোগ্যভাবে।

আমাদের জাতীয় জীবনে পরাধীনতা সত্ত্বেও গিরিশ যুগে এবং

সেক্সপীয়রের নাটক সাগরবৎ, কালিদাসের নাটক নন্দনকাননতুল্য।
—বঙ্কিমচন্দ্র

অল্পাংশের সংক্ষিপ্ত অনুবাদ নহে। মহাকবির নাট্য-মাধুর্যের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া অনুবাদ।

সেক্সপীয়র গ্রন্থাবলী

(প্রথম ভাগ)

—এই ভাগে আছে—

১। ম্যাকবেথ—অনুবাদক মণীন্দ্রনাথ ঘোষ।
২। মনের মতন (As You Like It)—অনুবাদক সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়।
৩। আন্টনী ক্লিওপেট্রা—অনুবাদক দেবেন্দ্রনাথ বসু।
৪। রোমিও জুলিয়েট—অনুবাদক হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।
৫। ভেরোনার ভদ্রযুগল—অনুবাদক সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়।
৬। জুলিয়াস সীজার—অনুবাদক জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর।

একত্রে মূল্য সাড়ে তিন টাকা

(দ্বিতীয় ভাগ)

—এই ভাগে আছে—

১। ওথেলো—অনুবাদক দেবেন্দ্রনাথ বসু। (নটকবিচূড়ামণি গিরিশ-চন্দ্র ঘোষ সংশোধিত)
২। মার্চেণ্ট অব্ ভেনিস—অনুবাদক সৌরীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়।
৩। মেজার ফর মেজার—অনুবাদক ঐ
৪। সিম্বেলিন— অনুবাদক ঐ
৫। কিং লিয়র—অনুবাদক যতীন্দ্রমোহন ঘোষ।
৬। টুয়েলফথ নাইট—অনুবাদক পশুপতি ভট্টাচার্য।

একত্রে মূল্য সাড়ে তিন টাকা

বসুমতী প্রাইভেট লিমিটেড
১৬৬, বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী ষ্ট্রীট, কলি-১২

পাঠক মন

আমি একজন অসমীয়া। স্বাধীনতা সংখ্যা 'সাপ্তাহিক বসুমতী' পাঠ করিয়া এই চিঠিখানা লিখিলাম—কিছু মনে করিবেন না। বলাই বাহুল্য, আপনার দ্বারা সম্পাদিত পত্রিকার মান যথেষ্ট উন্নীত বলিয়া দাবি করিতে পারেন। আপনার সম্পাদকীয় ভাষণে (প্রবন্ধে) রহিয়াছে মানবজীবনের নানা অভাব-অভিযোগ, দাবির স্বতঃস্ফূর্ত প্রকাশ এবং সেখানে অত্যুক্তিকর কোন কথা নেই জোরগলায় বলিতে পারি এবং ধন্যবাদ সেজন্য। বড়ই বিচিত্র, আমাদের হাতে, স্বাধীন ভারতে পত্র-পত্রিকার স্থান, স্বাধীন ভারতের সাহিত্য, একালের গল্প, রহিমুদ্দিনের "ফাগুন ফোটে ঝড়ে, দুর্গাপুরে", 'আই, সি, এস-এর রূপান্তর' প্রভৃতির লেখকগণকে অন্তরের ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছি। কুকুরের মাংস আজ মানুষের খাদ্য হল—এটাই আমাদের জীবনের বিরাট ধিক্কার তথা ট্র্যাজেডি! আজ সোনার আসামের বুকে চাল নেই—সেটা অসমীয়া কবিদের কণ্ঠে দীপ্ত হয়ে উচ্চারিত হয় না কেন ভাবলে অবাক হতে হয়। তবে কি তাঁরা তাঁদের কাব্যে মানুষের যন্ত্রণা ফুটিয়ে তোলার পক্ষপাতি নন?

এম কোবাদ আলী
সেন্ট্রাল এভিনিউ
গৌহাটি-১১

'সাপ্তাহিক বসুমতীর "স্বাধীনতা সংখ্যা" পড়ে বিশেষ আনন্দ পেলুম, সর্বাঙ্গসুন্দর এ সংখ্যাটির জন্যে আপনাকে অশেষ ধন্যবাদ।

স্বাধীনতা-উত্তর যুগে প্রত্যেক চিন্তাশীল নাগরিকের মনে যে প্রশ্ন নিয়তই জাগছে, তা হ'লঃ আমরা কী পেয়েছি ও কী পাই নি? বিগত আঠারো বৎসরের প্রচেষ্টায় আমাদের স্বপ্নের ভারত গড়ে তোলার কাজ কতটা ত্বরান্বিত হয়েছে, তা খুঁটিয়ে বিচার করা একান্ত প্রয়োজন।

—আলোচ্য সংখ্যাটি বাংলাদেশের সুখ্যাত চিন্তাবিদদের মননশীল আলোচনায় সমৃদ্ধ হয়েছে বলেই সে বিচারে বিদগ্ধ পাঠকসমাজকে উদ্বুদ্ধ করবে আশা করি। কেন না, বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ—রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক প্রভৃতি—থেকে অবলোকন করার সুযোগ পেয়ে অষ্টাদশী ভারতের সর্বাঙ্গীণ রূপটি কী, পাঠকসাধারণ তা ধারণা করতে পারবেন; আর একমাত্র তখনই তাঁদের সব হিসাব-নিকাশ তাৎপর্যময় হবে।

চন্দনকুমার ভট্টাচার্য
মঙ্গলদৈ (আসাম)

শিশির যুগে ছিল প্রাণবন্ত বলিষ্ঠতা, নির্ভীকতা এবং অন্যায়ের বিরুদ্ধে বুক ফুলিয়ে দাঁড়াবার মত সাহসিকতা। সেই কারণেই ঐ দুই যুগে জাতীয় জীবনের দর্পণরূপে বাংলার রঙ্গমঞ্চ বাঙালীর পরিচ্ছন্ন বলিষ্ঠ এবং নির্ভীক প্রতিচ্ছবি তুলে ধরতো বাঙালী দর্শকদের সামনে এবং তাদের মনে জাগিয়ে তুলতো কর্মপ্রেরণা এবং সত্যের পথে এগিয়ে চলবার অভীপ্সা।

আর আজ? জাতি ধুঁকে মরে অনশনে, সদা হয় নারীর লাঞ্ছনা। রক্ষক যখন ভক্ষক হয়ে দাঁড়িয়েছে, তখন রঙ্গমঞ্চের থেকে কিই বা আমরা আশা করতে পারি? জাতীয় জীবনের ফ্রাসট্রেটেড এবং বিকৃত চেহারার বীভৎস রূপায়ণই দেখা যায় বেশির ভাগ ক্ষেত্রে আজকের বাংলার নানা রঙ্গমঞ্চে। তবে কি এ অবস্থার কোন পরিবর্তন সম্ভব নয়? নিশ্চয়ই সম্ভব। এই সময়টাই হচ্ছে নানা ধরণের সমস্যার অবতারণা করে সেই সব সমস্যার সমাধান দিয়ে সমস্যামূলক নাট্যরচনার প্রকৃষ্ট সময়। অবশ্য একথাও সত্যি যে সমস্যামূলক নাটকের সবচেয়ে বড় দুর্বলতা এই যে সময়ের সঙ্গে সঙ্গে এসব নাটক ডেটেড হয়ে পড়ে—তবে এ ধরণের নাটকের ভেতর সাহিত্যিক মূল্য থাকলে সে নাটকের আবেদন চিরন্তনতার স্তরে গিয়ে পৌঁছয়—যেমন ইবসেনের এবং বার্নার্ড শ'র রচিত নাটকগুলো।

কিন্তু আজকের বাংলায় সমস্যামূলক নাটক লেখবার মত নাট্যকার কোথায়? অথচ—বাঙালীর জীবনের সর্বদিকেই তো আজ সমস্যা। এই সব সমস্যাকে ভালভাবে বুঝতে হলে যে রাজনীতিক, অর্থনীতিক, সমাজতন্ত্রবাদ ইত্যাদি বিষয়ক প্রকৃষ্ট জ্ঞান থাকা দরকার তেমন নাট্যকার তো এখন পর্যন্ত চোখে পড়ল না।

তবে কি আজকের দিনে বাংলার রঙ্গজগতে সত্যিকার ভাল নাট্যকার এবং ভাল নাটকের সাক্ষাৎ মিলবে না? নিশ্চয় মিলবে—সমাজের যে কোন ক্ষেত্রেই একটা গোল্ডেন এইজের পর আসে একটা ডার্ক এইজ। আমাদের রঙ্গজগতে শিশির যুগটা ছিলো গোল্ডেন এইজ—সুতরাং এই সময়টার পরে চলেছে বাংলা থিয়েটারের ডার্ক এইজ।

আবার আসবে বাংলা রঙ্গমঞ্চের নবজাগরণের দিন—তখন দেখা দেবেন আগামী দিনের বলিষ্ঠ নট এবং নাট্যকারের দল। যাঁরা নব নব রচনায় আবার বাংলার রঙ্গমঞ্চকে তুলে ধরবেন সেই উচ্চস্তরে। যে স্তরে বাংলার থিয়েটারকে উঠিয়ে এনেছিলেন গিরিশচন্দ্র, অর্ধেন্দুশেখর, অমৃতলাল এবং পরবর্তীকালে নাট্যমন্দির এবং আর্ট থিয়েটার সম্প্রদায়।

রূপজগৎ

রেডিও এবং রেকর্ডে নজরুল সঙ্গীত

রেডিওয় এবং গ্রামোফোন রেকর্ডে আবার নজরুল সংগীত শোনা যাচ্ছে। আজকাল রেডিওয় প্রতিদিনই নজরুল সংগীতের প্রোগ্রাম থাকছে। কিছুকাল উপেক্ষার পর নজরুল সংগীতের প্রতি এই সমাদর দেখে সংগীতানুরাগী মাত্রই খুশি হয়েছেন, এবং রেডিও কর্তৃপক্ষকে ধন্যবাদ জানাচ্ছেন। নজরুল সংগীতের অনুষ্ঠানসূচীতে পুরাতনের সংগে নতুন শিল্পীরাও সুযোগ পাচ্ছেন। পুরাতন ও নতুনের এই সমন্বয়ে নজরুল সংগীত পুনর্বার বিকশিত হয়ে উঠবে আশা করা যায়। বাংলা দেশে যে কয়টি বিশিষ্ট সংগীতধারা বাঙালীর মনেপ্রাণে মিশে রয়েছে তার মধ্যে নজরুল সংগীত অন্যতম। একদা নজরুল সংগীত বাঙালীর জীবনে এক বিদ্যুৎ চমক সৃষ্টি করেছিল। এই গানের কথা ও সুরের সাথে বাঙালী পরিচিত ছিল না। শিথিলগতি জীবনে এই কথা ও সুর এক জংগী উম্মাদনা আনে, পরাধীনতার শৃংখল মোচনের আহ্বানে এই গান বাঙালী তরুণদের মাতিয়ে তোলে। জাতির মুক্তি সংগ্রামের 'অভিজান সংগীত'-এর মর্যাদা লাভ করে। এই রুদ্ররসের গানে নজরুল সংগীত যেমন জাতির ঘুম ভাঙিয়েছে, তেমন ঝড়ের পরে উদার বর্ষণের অবিরাম ধারার মত প্রেম সংগীতের ধারায় তরুণমনকে রামধনুর রঙে রাঙিয়েছে; নতুন জীবনের স্বপ্ন জাগিয়েছে। ভক্তির গানে হৃদয়মন উজাড় করে দিয়েছে। দেশ-বিদেশের সুরের সংগে ভারতের লোকসংগীত ও রাগ-সংগীতের সমন্বয়ে নজরুল সংগীত বাংলার এক বিশিষ্ট সংগীতধারারূপে রবীন্দ্র সংগীতের পাশে স্থান লাভ করেছে। কাজী নজরুল ইসলাম প্রায় চার হাজার সংগীত রচনা করে সুর দিয়েছিলেন, কিন্তু বর্তমানে শিল্পীদের মুখে যে গানগুলি শোনা যায় তার সংখ্যা ত্রিশটির বেশি নয়। একই গান বিভিন্ন শিল্পীর মুখে শোনা যায়। নজরুল সংগীতের শিক্ষাদানে আজো যাঁরা নিষ্ঠার সংগে ব্রতী—তাঁরা মাত্র দুজন, শ্রীকমল দাশগুপ্ত ও শ্রীসিদ্ধেশ্বর মুখোপাধ্যায়। আর কাজী নজরুল ইসলামের কাছে সুর শিখেছেন এমন শিল্পী যাঁরা আজো নজরুল সংগীত গেয়ে থাকেন তাঁরাও সংখ্যায় কয়েকজন মাত্র। অথচ নজরুল সংগীতের সূচনা ও বিকাশের কাল খুব বেশিদিনের নয়। যে কারণেই হোক রেডিও কর্তৃপক্ষ বর্তমানে নজরুল সংগীত অনুষ্ঠানের যে উদ্যোগ গ্রহণ করেছেন তা খুবই সময়োপযোগী।

গ্রামোফোন কোম্পানী অসংখ্য নজরুল সংগীত রেকর্ড করেছিলেন। সেসব গানের অধিকাংশ রেকর্ড এখন পাওয়া যায় না। সেসব রেকর্ড লুপ্ত হওয়ার সংগে সংগে নজরুলের গান ও সুরের সংগে কয়েকজন বিশিষ্ট শিল্পীর কণ্ঠ শোনবার সৌভাগ্য থেকেও বর্তমানের শ্রোতারা বঞ্চিত হয়েছেন। আংগুরবালা, ইন্দুবালার মত অসাধারণ ক্ষমতাশালী শিল্পীর কণ্ঠে গীত অনেক গানের রেকর্ড আর রি-প্রিন্ট করা হয় নি। এ বিষয়ে দেশে সংগীত-রসিকদের মধ্যে কিছু বিক্ষোভ রয়েছে। গত কয়েক বছর যাবৎ নজরুল জন্মজয়ন্তী কমিটি (বর্তমানে নজরুল একাডেমি) এ বিষয়ে দৃষ্টি আকর্ষণ করছে। গ্রামোফোন কোম্পানী দীর্ঘদিন পরে নজরুল সংগীতের কয়েকটি লং প্লেয়িং রেকর্ড বার করেছেন আধুনিক শিল্পীদের গানের। সম্প্রতি গ্রামোফোন কোম্পানী নজরুল ইসলামের 'বিদ্রোহী' কবিতার আবৃত্তি এবং দু-টি নজরুল সংগীতের রেকর্ড বার করেছেন। আবৃত্তি করেছেন কবিপুত্র কাজী সব্যসাচী এবং গান গেয়েছেন বোম্বাইয়ের বিখ্যাত তালাত মাহমুদ। এই প্রচেষ্টা অভিনন্দনীয়। কিন্তু তালাত মাহমুদের কণ্ঠে গীত 'নিশি ভোর হল জাগিয়া' গানটি নজরুলের বিখ্যাত গান হওয়া সত্ত্বেও প্রকাশ যে, রেকর্ডে সুরকার হিসাবে নাম ছাপা হয়েছে শ্রীকমল দাশগুপ্তের। অথচ বহু পূর্বে প্রকাশিত স্বরলিপি পুস্তকে এই গানটির সুরকার হিসাবে নজরুল ইসলামের নাম রয়েছে। এরূপ ভুলের জন্য শ্রীকমল দাশগুপ্ত নিজেও নাকি বিব্রত বোধ করছেন বলে জানা গেল। গ্রামোফোন কোম্পানী না কি এই ভুলের কথা মৌখিক স্বীকার করেছেন, তবে এখনো প্রয়োজনীয় সংশোধন করেন নি। এই ভুলের কারণ সম্পর্কে বিভাগীয় তদন্ত করার সংগে গ্রামোফোন কোম্পানীর অবিলম্বে রেকর্ডে ভুল সংশোধনের ব্যবস্থা করা উচিত।

—সুজন

'কামরূপ কামাক্ষ্যা' ছবিতে রত্না ঘোষাল

চিত্র আলোচনা

সম্রাটা

(জি, সি, ফিল্মস)

কুমার বিজয় সিংহের হত্যার রহস্যকে ঘিরে 'সম্রাটা' হিন্দী ছবির কাহিনী গড়ে উঠেছে। জমিদারপুত্র দেশে আসার পথে খবরের কাগজে দেখল পিতার মৃত্যু খবর। বাড়িতে এসে জানল জমিদারের সেক্রেটারী আত্মগোপন করেছে। প্রথমে মা'র ব্যবহারে তার সন্দেহ সৃষ্টি হল। তারপর একে একে বহুজনের প্রতি সন্দেহ জাগবার পর একক চেষ্টায় সে হত্যার রহস্য উদ্ঘাটন করল। শেষ পর্যন্ত জানা গেল, দুই যমজ ভগিনীর ঈর্ষা এই হত্যার মূলে রয়েছে। পরিচালক প্রথম থেকে এক রহস্যময়তা এবং প্রশ্ন সৃষ্টি করে ধীরে ধীরে কাহিনীকে পরিণতির দিকে নিয়েছেন। এই কাহিনীতে কয়েকটি হিন্দী ছবির এবং বাংলা 'গুলমোহর' ছবির প্রচ্ছন্ন ছায়া রয়েছে। পরিচালক নতুন, নিজস্ব কল্পনাশক্তি অপেক্ষা ছবিতে পূর্ববর্তী ছবির ছায়া পড়া অস্বাভাবিক নয়। গানগুলি সুগীত। তবে এক্ষেত্রেও বহু পূর্বের 'মহল' অথবা 'বিশ সাল আগে'র ধরণ ব্যবহৃত হয়েছে রহস্যময়তা জাগাবার জন্য।

ছবিতে জমিদার ও জমিদারপুত্রের দ্বৈত ভূমিকায় অভিনয় করেছেন অনিল চ্যাটার্জী। বোম্বাইয়ের প্রতিষ্ঠিত নায়কদের তুলনায় অনিল চ্যাটার্জীর অভিনয় দুর্বল নয়। তিনি সাফল্যের সাথে চরিত্র রূপায়িত করেছেন। নায়িকার ভূমিকায় তনুজাকেও দর্শকদের ভাল লাগবে। অন্যান্য চরিত্রে অভিনয় করেছেন বীণা, ডেভিড, রাজ মেহ্‌রা, পূর্ণিমা, অসিত সেন, প্রতিমা দেবী, জানকী দাস প্রমুখ। সংগীত পরিচালনা করেছেন হেমন্ত মুখোপাধ্যায়। ছবিটির পরিচালনা ও চিত্রনাট্যের দায়িত্ব পালন করেছেন মহিন্দর সুবেরওয়াল। কাহিনীর বিন্যাসে যৌক্তিকতা ও সংগতির প্রশ্ন না তুললেই ছবিটি দেখতে হবে। সে প্রশ্ন তুললে উপভোগ করা চলবে না।

নাটকের কথা

শের আফগান

নান্দীকার সম্প্রদায় পশ্চিমবঙ্গের নাট্যজগতে প্রতিষ্ঠালাভ করেছেন। তাঁদের প্রত্যেকটি নাটক দর্শকদের দ্বারা সমাদৃত হয়েছে। ইতালীয় প্রকৃতিবাদী নাট্যকার পিরাণদেলোর 'ছয়টি চরিত্রের সন্ধানে' অভিনয় করে যদিও তাঁরা সর্বাধিক দর্শকের কাছে পরিচিত হয়েছেন, কিন্তু নাটকরসিকদের কাছে সর্বাধিক সাফল্যের স্বীকৃতি লাভ করেছে—'মঞ্জরী, আমের মঞ্জরী'। এই নাটক বিখ্যাত নাট্যকার চেকভের নাটকের ভাবানুবাদ। নান্দীকার সম্প্রদায়ের কৃতিত্ব বিদেশী নাটকের অভিনয়ে। এবার তাঁরা যে নাটক অভিনয় করছেন—সেটিও লুইজি পিরাণদেলোর নাটক, 'এনরিকো কোয়ার্টো'। হেনরি দি ফোর্থ-এর পিরাণদেলোর দৃষ্টি ও চিন্তার বিশ্লেষণ। অনুবাদক জ্যোতির্ময় রায়চৌধুরী এই নাটকের নাম দিয়েছেন 'শের আফগান'। এই নাটককে পিরাণদেলোর নাটকের অনুবাদ না বলে ভাবানুবাদ বলাই উচিত। কারণ, চরিত্র হতে পটভূমি পর্যন্ত সব কিছুই এখানে এদেশীয় ছাঁদে ফেলা হয়েছে—কেবলমাত্র ভাব বা মূল বক্তব্য বজায় রেখে। এরূপ ভাবানুবাদের ভালমন্দ দু-দিক আছে। একদিকে বিদেশী চরিত্রগুলি দেশীয় নামে ও পোশাকে দর্শকদের মনের কাছাকাছি আসতে পারে সত্যি, কিন্তু মূল নাটকের সাথে দর্শকদের পরিচয়ে কিছুটা বাধা সৃষ্টি হয় বলে আমাদের ধারণা। এরূপ ক্ষেত্রে মূল নাট্যকার আড়ালে চলে যান, ভাবানুবাদক প্রধান হয়ে ওঠেন।

ভাবানুবাদের ফলে নাটকের পটভূমি হয়েছে বর্ধমান। মূল চরিত্র শের আফগান, যাকে নিহত করে মেহেরুন্নেসাকে সেলিম হরণ করেছিল এবং যে পরবর্তী কালে দিল্লীর সম্রাজ্ঞী নুরজাহান নামে ইতিহাসে পরিচিত হয়েছিল।

নাটকে স্মৃতি এবং বাস্তব দুয়ের সমন্বয়ের মধ্য দিয়ে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে এক বক্তব্য। জ্ঞাতে বা অজ্ঞাতে প্রতিদিনের জীবনে সকলেই অভিনেতা। প্রত্যেকের আসল চেহারাকে আড়াল করে জনসমক্ষে উপস্থিত হয়। অতীতের যে ঘটনা ইতিহাসের পাতায় রয়েছে, সে ঘটনা ঘটছে প্রতিদিনের সমাজজীবনে বহুরকমে। নাটকের যে প্রধান চরিত্র সে বহুদিন থেকে পাগল বলে স্থিরীকৃত। ছাত্রকালে একদা শের আফগানের ভূমিকায় নাটক অভিনয় করতে গিয়ে সে আহত হয়েছিল। তারপর থেকে ওর ধারণা হয়েছে সেই শের আফগান। এই ধারণার সমর্থনে তাকে শান্ত করার জন্য সেভাবে পারিষদবর্গকে সাজিয়ে, অতীত ইতিহাসের নকল পরিবেশ রচনা করে তাকে রাখতে হয়েছে। এক মনোবিজ্ঞানী এসেছে তার চিকিৎসার জন্য। সঙ্গে এসেছে তারই (শের আফগানের) সহপাঠী অধ্যাপক মুখোপাধ্যায় এবং শ্রীমতী মুখোপাধ্যায় এবং তাঁদের কন্যা টুটু। এঁদের আলোচনায় বোঝা গেল সহপাঠিনী শ্রীমতী মুখোপাধ্যায় বর্তমানে বিবাহিতা হলেও আজও তার মনে পুরানো দিনের স্মৃতি প্রধান হয়ে আছে ; এবং হতভাগ্য নায়কের প্রতি তাঁর আকর্ষণ শেষ হয়ে যায় নি। একদা শ্রীমুখোপাধ্যায় এবং নায়কের মাঝখানে ছিলেন তিনি। এঁরা চারজনেই চারটি ভূমিকা গ্রহণ করে শের আফগানের কাছে এলেন—তার মানসিক অবস্থা বোঝবার জন্য। এই সাক্ষাৎকারের প্রতিক্রিয়ায় নাটকের চরম নাটকীয় পরিস্থিতি সৃষ্টি হয় এবং মূল বক্তব্য প্রকাশিত হয়। যেমন চমকের মধ্য দিয়ে নাটকের শুরু, তেমনই নাটকের শেষ। শেষ মুহূর্তকে আরও চমকপ্রদ বলা সংগত। ঘটনাগুলি এভাবে ঘটতে থাকে যে, শুরু থেকে দর্শকমনে পরিণতি জানার জন্য উৎকণ্ঠা জেগে থাকে। সরস সংলাপগুণে প্রতিটি মুহূর্ত দর্শকরা উপভোগ করেন।

অভিনয়ে শের আফগানের চরিত্রে অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায় বিস্ময়কর ক্ষমতার পরিচয় দিয়েছেন। ঐতিহাসিক চরিত্রের অভিব্যক্তির সঙ্গে একালের চেতনায় এক দার্শনিক বক্তব্যকে প্রকাশ করতে তিনি

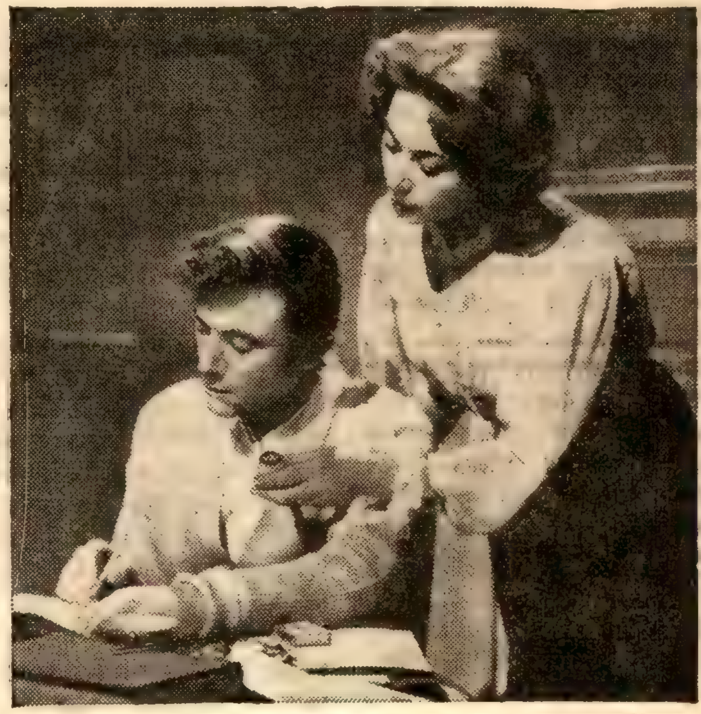

মেট্রোর সমারসেট মমের 'অব হিউম্যান বণ্ডেজ' ছবির একটি দৃশ্যে লরেন্স হার্বে ও সিওভ্যান ম্যাকেনা

মুক্তিপ্রাপ্ত 'অশ্রু দিয়ে লেখা' ছবির একটি দৃশ্যে অনিল চ্যাটার্জি ও জ্যোৎস্না বিশ্বাস

যে রূপদক্ষতা দেখিয়েছেন তাতে তাঁর অসাধারণ অভিনয়শক্তিতে দর্শকরা মুগ্ধ হয়েছেন। এই অভিনয়ে স্পষ্ট বোঝা গেছে যে, অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায় যেমন আধুনিক চরিত্রে, তেমন ঐতিহাসিক চরিত্র অভিনয়ে একজন দক্ষ অভিনেতা। শ্রীমুখোপাধ্যায় ও শ্রীমতী মুখোপাধ্যায়ের চরিত্রে যথাক্রমে রুদ্রপ্রসাদ সেনগুপ্ত ও দীপালি চক্রবর্তী এবং দাদার বন্ধুরূপে পশুপতি বসু, টুটুর চরিত্রে শেলী পাল প্রশংসনীয় অভিনয় করেছেন। অন্যান্য চরিত্রে অভিনয় করেছেন পবিত্র সরকার (ডাক্তার), অসিত বন্দ্যোপাধ্যায়, রাধারমণ তফাদার, রবীন চক্রবর্তী, অমলেন্দু চক্রবর্তী, বরুণ সেন, সুধীর দত্ত, পল্লব মুখোপাধ্যায়, রবীন্দ্রনাথ চক্রবর্তী এবং দীপক নন্দী। নাটকের মঞ্চ ও রূপসজ্জার গুণে যথার্থ পরিবেশ রচিত হয়েছে। নাটকটির পরিচালনা-কৃতিত্ব অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায়ের। এই নাটকটি সম্প্রতি নান্দীকার সম্প্রদায় নিউ এম্পায়ার মঞ্চে অভিনয় করলেন।

আবর্তন

সন্ধ্যানীড় একটি সুখ্যাত অপেশাদার নাট্যসংস্থা। রবীন্দ্র-নাটক ও দ্বিজেন্দ্রলালের নাটক এবং কয়েকটি বিদেশী নাটকের অভিনয় করে এই সংস্থা নাটক-রসিকদের কাছে পরিচিত। অনুবাদ নাটক অভিনয়ে এই সংস্থা বিশেষ এক রীতি অনুসরণ করেন। মূল নাটকের অঙ্গহানি করে, অথবা ভাবানুবাদ করে এঁরা মূল নাট্যকার এবং নাটকের বিশেষ পরিবেশ দুর্বল করার বিরোধী। এঁদের অভিনীত ইবসেন, চেখভ, প্রিস্টলী, স্যামুয়েল ব্যাকেট্ট এবং সেন্ট জন আর্ভিং-এর নাটক এ কারণে দর্শকদের কাছে অবিকৃতভাবে উপস্থিত হয়েছে। এদেশীয় দর্শকরা বিদেশী নাট্যকারের চিন্তা ও ধ্যান এবং সমাজকে বোঝবার সুযোগ পেয়েছে।

এই সংস্থা গত ২৭শে আগস্ট বিশ্বরূপা মঞ্চে অভিনয় করেছেন 'আবর্তন' নাটক। নাটকটি জে, বি, প্রিস্টলীর 'আই হ্যাভ বিন হিয়ার বিফোর'-এর অশোক সেন-কৃত অনুবাদ। মূল নাটককে যথার্থভাবে রেখে অনুবাদক এ ক্ষেত্রে চরিত্রের ও স্থানের নাম পরিবর্তন করেন। এঁদের পূর্ববর্তী নাটকে এই পরিবর্তন করা হত না।

তিন অঙ্কের এই নাটকে বলা হয়েছে প্রতিদিন আমাদের জীবনে যা ঘটছে তা অতীতেরই পুনরাবৃত্তি। যা আমরা মৌলিক বা অভিনব বলে দাবি করছি—পেছনের দিকে তাকালে দেখা যাবে—একই ঘটনা ঘটে গেছে কালে কালে, তার রঙে বা কার্যক্রমে যা একটু পরিবর্তন। স্বতঃস্ফূরিত এই ধারাপথে যারা হস্তক্ষেপ করতে পারে তারাই পৌরুষের দাবি করতে পারে। ঘটনায় গা ভাসিয়ে না দিয়ে অথবা প্রকৃতির দুর্বলতায় বশ্যতা স্বীকার না করে হস্তক্ষেপ করা পুরুষকারের লক্ষণ।

দূরবর্তী অঞ্চলের এক হোটেলের পটভূমিতে আবর্তনের কাহিনী গড়ে উঠেছে। এখানে এসেছেন অধ্যাপক নীরদ মুখার্জী, যিনি এই হোটেলে কি ঘটবে তা পূর্বাহ্নেই অনুমান করতে পারছেন, তাঁর বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণশক্তিতে। এখানে আছেন। রবীন্দ্র গুপ্ত নামে আর এক অধ্যাপক, পরে এসে উপস্থিত হলেন শিল্পপতি মল্লিক ও তাঁর স্ত্রী, দাম্পত্যজীবনে যাঁরা অসুখী, কিন্তু অভিজাত ও সুখের জীবনে অভ্যস্ত। জীবনের এই অসুখী দিক মল্লিককে করে তুলেছে পলায়নী মনোভাবসম্পন্ন। সারাদিন তিনি কাজে ডুবে থেকে নিজের অতৃপ্তিকে ঢাকতে চান। স্ত্রী অতসী এখানে এসে ক্ষণিকের সান্নিধ্যে রবীন্দ্র গুপ্তের সাথে নতুন করে ঘর করার সঙ্কল্পে পালিয়ে যাবার সঙ্কল্প করল। মল্লিক, রবীন্দ্র অথবা অতসী এঁরা কেউ বাস্তবের মুখোমুখি দাঁড়াতে পারছেন না, পলায়নী মনোবৃত্তির শিকার হয়েছেন। শেষ পর্যন্ত অধ্যাপক মুখার্জীর হস্ত-

ক্ষেপে এ'রা পলায়নী মনোবৃত্তি থেকে ফিরে এলেন বাস্তবে। পলায়নী বৃত্তি থেকে বাস্তবের মুখোমুখি দাঁড়াতে পারাটাই মানুষের কাজ, এখানেই যাবতীয় ঘটনায় ইতিহাসের ভূমিকা। এভাবেই ইতিহাস রচিত হচ্ছে প্রতিদিন, প্রতিটি মানুষের জীবনকে নিয়ে।

অভিনয়ে মল্লিক ও অতসীর ভূমিকায় অশোক সেন এবং বিনতা রায় অনবদ্য অভিনয় করেছেন। বিশেষ করে অশোক সেনের ভাবাবেগপূর্ণ ইংরেজী আবৃত্তি চমৎকার। এ দুজন দক্ষ অভিনেতার সঙ্গে নীরদ মুখার্জীর চরিত্রে সুখময় সেন প্রশংসনীয়। অন্যান্য চরিত্রে অভিনয় করেছেন দিলীপ দে, অশ্রুমুকুল সেন, অরুণ চ্যাটার্জী, পরিমল রায় এবং ফকির। নাটকটি সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করেছেন অশোক সেন ও বিনতা রায়।

ভারতীয় নৃত্যকলা মন্দিরের বার্ষিক উৎসব

গত ২৫শে আগস্ট সন্ধ্যায় মহাজাতি সদনে ভারতীয় নৃত্যকলা মন্দিরের ১৯তম বার্ষিক উৎসব উদ্‌যাপিত হয়েছে। নৃত্যবিদ্ নীরেন্দ্রনাথ সেনগুপ্তের পরিচালনায় শিক্ষাকেন্দ্রের ছাত্রীদের দ্বারা উচ্চাঙ্গ নৃত্য, গ্রাম্য-নৃত্য ও 'শ্যামা' নৃত্যনাট্য দর্শকবৃন্দের অকুণ্ঠ প্রশংসা অর্জন করে। নৃত্যে সহকারীরূপে ছিলেন অনুপশঙ্কর ও শ্রীমতী স্বপ্না সেনগুপ্তা।

আলো বাগচী, শুক্লা সেনগুপ্তা, পাপড়ি বোস, কৃষ্ণা রায়, মহুয়া ভৌমিক, শুভ্রা গাঙ্গুলী, শেলী দাস, সঙ্ঘমিত্রা রায়চৌধুরী, কৃষ্ণা নন্দী, মানসী ঘোষ, সুচরিতা ঘোষ, রুণু সেন, ইন্দ্রাণী দাশগুপ্তা, স্বপ্না দে, কৃষ্ণা ঘোষ, মায়া ভট্টাচার্য, তন্দ্রা রায় ও অনুপশঙ্কর প্রভৃতি নৃত্যে অংশ গ্রহণ করেন। কণ্ঠসঙ্গীতে ও যন্ত্রসঙ্গীতে অংশ গ্রহণ করেন যথাক্রমে বিপুল ঘোষ, কৃষ্ণা ঘোষ, স্বপ্না সেনগুপ্তা, কৃষ্ণা সেনগুপ্তা, কমলা নন্দী, গীতা মালিক, বিন্দু চৌধুরী, লীনা মজুমদার, বিপ্লব বক্সী, শিখা বক্সী, অরবিন্দ মিত্র, সুনীল গাঙ্গুলী, বিষ্ণু মিত্র, নেপাল ঘোষ, ফেলু চন্দ প্রভৃতি। অনুষ্ঠান উদ্বোধন করেন শ্রীদক্ষিণারঞ্জন বসু, সভাপতির আসন অলঙ্কৃত করেন ডাঃ প্রতাপচন্দ্র চন্দ্র। অনুষ্ঠানে বাৎসরিক পুরস্কার বিতরণ করা হয়। অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন সংস্থার সম্পাদক শ্রীঅসিত চক্রবর্তী।

হিন্দী ছবি 'কুমারী'-তে নৃত্যশিল্পী হেলেন

সংবাদ বন্যা

চলচ্চিত্রম-এর বিশেষ পত্রিকা

চলচ্চিত্রম-নামক এক সংস্থার মাসিক বুলেটিনের বিশেষ সংখ্যা 'Xth Muse' প্রকাশিত হয়েছে। এই সংখ্যা একান্তভাবে সত্যজিৎ রায়ের 'নায়ক' ছবির আলোচনায় নিবন্ধ। নায়ক সম্পর্কে শ্রী পি, লাল এবং মৃণাল সেনের সুচিন্তিত লেখা রয়েছে। এই সংখ্যার বিশেষ আকর্ষণ সত্যজিৎ রায়, উত্তমকুমার, দুলাল দত্ত, সুব্রত মিত্র, বংশীচন্দ্র গুপ্ত, আর, ডি, বনশাল এবং রণজিৎ সেনের সঙ্গে সাক্ষাৎকার। এই সাক্ষাৎকারে নায়ক সম্পর্কে বহু জ্ঞাতব্য বিষয় জানা যায়, বিশেষ করে সত্যজিৎ রায়, উত্তমকুমার ও দুলাল দত্তের সঙ্গে সাক্ষাৎকার কৌতূহলী পাঠকদের অনেক প্রশ্নের জবাব দিয়েছে। এই ইংরেজী পত্রিকাটির অঙ্গসৌষ্ঠব এবং ছাপা চমৎকার। সকলে আগ্রহের সাথে পত্রিকাটি হাতে তুলতে চাইবে। এই পত্রিকা সম্পাদনা করেছেন শ্রীসিদ্ধার্থ মুখার্জী।

সিনেমা সমালোচনা

'সিনেমা সমালোচনা' নামে একটি চলচ্চিত্র সম্পর্কিত নতুন পত্রিকা প্রকাশিত হয়েছে ৪।এ রাণী শঙ্করী লেন, কলিকাতা-২৬)। পত্রিকাটির সম্পাদক শ্রীবিজয় বসু। পত্রিকাটির প্রথম সংখ্যা দেখে মনে হয় মামুলী চলচ্চিত্র পত্রিকা-গোষ্ঠিভুক্ত হয়ে থাকা 'সিনেমা সমালোচক'-এর উদ্দেশ্য নয়। সম্পাদনায় সুস্থদৃষ্টি ও সুরুচির পরিচয় রয়েছে। প্রথম সংখ্যা থেকে শ্রীধীরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের (ডি, জি) স্মৃতিকথা আকর্ষণীয়, এ ছাড়া সত্যজিৎ রায় থেকে ঋত্বিক ঘটকের লেখা রয়েছে। তবে লেখাগুলি পুরানো। সুস্থ লেখাগুলির মধ্যে একমাত্র বিদেশী

সিনেমার গানের অনুবাদ অসংগতিপূর্ণ। চলচ্চিত্রের সমালোচনাগুলি আরো নির্ভীক এবং বিশ্লেষণমূলক হওয়া উচিত। প্রথম সংখ্যা দেখে মনে হয় পত্রিকাটি সুরুচি-সম্পন্ন পাঠকদের কাছে সমাদর লাভ করবে।

একক দশক শতক

গত ২৩শে আগস্ট স্টার রঙ্গমঞ্চে সেন্ট্রালজড ক্যাশ রিক্রিয়েশন ক্লাবের সভ্যবৃন্দ বিমল মিত্রের "একক দশক শতক" নাটকটি মঞ্চস্থ করেন—এ'দের নাট্য প্রযোজনা বৈশিষ্ট্যের দাবি রাখে সম্মিলিত সুন্দর অভিনয়ের দ্বারা। শোভেন মজুমদার এ নাটকের নির্দেশনায় ছিলেন। অভিনয়ে প্রথমেই নাম করতে হয় শিবদাস বন্দ্যোপাধ্যায় এবং খগেন সাহার যথাক্রমে কেদারনাথ রায় এবং নিরঞ্জনের চরিত্রে, অপরাপর কয়েটি গুরুত্বপূর্ণ চরিত্রে মণিজয়, চিত্ত মিত্র, সত্যজিৎ নিয়োগী, দ্বীপেন দত্ত, মুরারি সরকার, সুকুমার কর, প্রদ্যোৎ চট্টোপাধ্যায় এবং পরেশ দাসগুপ্ত, গুরুপদ ও মাড়োয়ারীর চরিত্র দুটি সুন্দরভাবে রূপদান করেন যথাক্রমে মানস বন্দ্যোপাধ্যায় (অতিথি) এবং ভবতোষ বন্দ্যোপাধ্যায়। স্ত্রী-চরিত্রে অভিনয় করেছেন সবিতা মজুমদার, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়, সুমিত্রা নাগ ও কল্যাণী পাল। কবিতা রায় ও ইরা মিত্রের অভিনয় ত্রুটিপূর্ণ। আবহ সঙ্গীতের কাজও ত্রুটিপূর্ণ।

স্বরাজ—স্বাধীনতার দীপ্তিবিষাণ—বাংলা জাতীয়-জীবন সংগঠনে নিবেদিত প্রাণ
স্বদেশ-প্রেমিক মনীষী—
যোগেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণের

যোগেন্দ্র গ্রন্থাবলী

প্রথম ভাগে :—ম্যাটসিনী, গ্যারিবল্ডী, বীরাঙ্গনা অ্যানিটা।

যে মহাপুরুষদ্বয়ের জ্বলন্ত উদ্দীপনা, প্রাণপণ প্রয়াস—আত্মসুখ, ঐশ্বর্য-বিলাস উপেক্ষা-ত্যাগে সমুজ্জ্বল আদর্শের প্রভাবে পদদলিত—নিদ্রিত ইটালী রণোন্মাদনায় অধীর হইয়া স্বাধীনতা-সংগ্রামে বিজয়ী হইয়াছিল—সেই স্বাধীনতার সূর্য—রাজনীতিক চিরজাগ্রত দেবতা—ম্যাটসিনী ও গ্যারিবল্ডীর জাতীয় জীবনের সংঘর্ষ—রাজনৈতিক তরঙ্গ-ভঙ্গময় তেজোদ্দীপ্ত মহাজীবনী এই মহাগ্রন্থত্রয় মাত্র ১, টাকায়।

দ্বিতীয় ভাগে :—কীর্তিমন্দির, হৃদয়োচ্ছ্বাস, বীরপূজা, প্রাতঃস্মরণীয় চরিতমালা, চিন্তাতরঙ্গিণী, জন ষ্টুয়ার্ট মিল। শক্তিমন্ত্রসমাহিত গ্রন্থরাজি ১, টাকা।

বসুমতী প্রাইভেট লিমিটেড
১৬৬, বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী স্ট্রীট,
কলিকাতা—১২

ভারতীয় নৃত্যকলা মন্দিরের পাঞ্জাবী লোকনৃত্যের একটি দৃশ্য

দি চিলড্রেন্স নভেল থিয়েটার

চিলড্রেন্স নভেল থিয়েটারের (সি, এন, টি) নূতন নাটিকা 'লাল নেকড়ে'র জন্য কলিকাতা ও কলিকাতার বাহিরে অভিনয় করিতে ইচ্ছুক শিশু শিল্পী নেওয়া হইবে। অভিভাবকদের সম্পাদকের সঙ্গে শিল্পীসহ সাক্ষাৎ করিতে বলা হইতেছে। ৬ কংগ্রেস একজিবিসন রোড, কলিকাতা-১৭ (পার্ক সার্কাস ট্রাম ডিপোর নিকট)

সুনন্দা বন্দ্যোপাধ্যায়ের জীবনাবসান

বাংলার সুপরিচিতা অভিনেত্রী শ্রীমতী সুনন্দা বন্দ্যোপাধ্যায়ের গত ২৮শে আগস্ট লণ্ডনের এডিনবরা হাসপাতালে জীবনাবসান হয়েছে। তিনি কিছুকাল যাবৎ অসুস্থ ছিলেন, এক জটিল অস্ত্রোপচারের জন্য তাঁকে লণ্ডনে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। ২৬শে আগস্ট তাঁর অস্ত্রোপচার হয়। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৪৫ বছর। মৃত্যুকালে তিনি চিত্র প্রযোজক স্বামী শ্রীসুধীর বন্দ্যোপাধ্যায় এবং এক ছেলে ও এক মেয়ে রেখে গেছেন।

শ্রীমতী বন্দ্যোপাধ্যায় প্রথম চলচ্চিত্রে অভিনয় করেন 'নিদ্রিত ভগবান' ছবিতে। তখন তাঁর বয়স মাত্র সাত বছর। তারপরে ১৯৪২ সাল হতে তিনি নিয়মিত অভিনয় করতে থাকেন। হিন্দী ও বাংলা 'কাশীনাথ', 'দম্পতি', 'দুই পুরুষ,' 'দত্তা,' 'নার্স সিসি,' 'পণ্ডিতমশাই,' 'বিরাজবৌ,' 'সমাপিকা,' 'অঞ্জনগড়,' 'পল্লীসমাজ,' বাংলা ও হিন্দী 'শুভদা,' 'উল্কা,' 'মায়ামৃগ' প্রভৃতি ছবিতে তিনি অভিনয় করে খ্যাতি-লাভ করেন। তাঁর প্রযোজিত ছবির মধ্যে 'দৃষ্টিদান,' 'সিংহদ্বার,' 'শুভদা,' 'পল্লীসমাজ,' 'পথের শেষে,' 'উল্কা' প্রভৃতি রয়েছে। তাঁর শেষ প্রযোজিত ছবি 'এণ্টনী ফিরিঙ্গী'। ছবিটির নির্মাণ প্রস্তুতি শুরু হতেই তিনি অসুস্থ হয়ে পড়েন।

শ্রীমতী বন্দ্যোপাধ্যায় কিছুকাল অভিনেত্রী সঙ্ঘের সভানেত্রী ছিলেন। তিনি কংগ্রেসের সাংস্কৃতিক বিভাগের সাথে যুক্ত ছিলেন। সমাজকর্মী হিসাবেও তাঁর পরিচিতি ছিল। গত সাম্প্রদায়িক হাঙ্গামার পরে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের মধ্যে রিলিফের কাজে তিনি সহযোগিতা করেছিলেন। শিশু চলচ্চিত্র সমিতি, মহিলা শিল্পী সমাজ ইত্যাদি প্রতিষ্ঠানের সাথে তিনি সম্পর্কিত ছিলেন। তাঁর মৃত্যুতে পশ্চিমবঙ্গ শিল্পী সমাজ একজন শিল্পী ও সমাজকর্মীকে হারাল।

তাঁর মৃত্যুতে গত ২রা সেপ্টেম্বর অভিনেত্রী সঙ্ঘের এক সভায় মিলিত হয়ে শোক প্রকাশ করেন।

সি এ বি'র কেরামতি

ক্রিকেট এ্যাসোসিয়েশন অফ বেঙ্গলের বিরুদ্ধে অভিযোগ আজকের নয়। এ'দের নানাবিধ কার্যকলাপে বাংলার ক্রিকেট-রসিকরা বিরক্ত এবং অসন্তুষ্ট। দিনের পর দিন ক্রিকেট এ্যাসোসিয়েশন অফ বেঙ্গল তাঁদের ব্যাংক ব্যালান্স বাড়িয়েই চলেছেন, কিন্তু বাংলার ক্রিকেটের উন্নতির জন্য চেষ্টা বা ক্রীড়ামোদীদের সুখ-সুবিধার দিকে দৃষ্টিদানের ক্ষেত্রে তাঁদের প্রচেষ্টা শূন্যে বললেই চলে। আমাদের প্রশ্ন যে সি এ বি একবার নিজরাই চিন্তা করে দেখুন যে তাঁদের ভাল কাজ কতটুকু আছে পুঁজিতে।

কয়েকদিন পূর্বে সি এ বি'র অর্থ অপব্যয়ের যে একটি সংবাদ পাওয়া গিয়েছে সে সম্বন্ধে সি এ বি কর্তৃপক্ষর কি বক্তব্য। বছরখানেক পূর্বে খুব ঘটা করে সি এ বি কর্তৃপক্ষ প্রচার করেছিলেন যে, তাঁদের সম্মুখে বিরাট পরিকল্পনা। কলকাতায় ইডেন উদ্যানে ইনডোর স্টেডিয়াম তৈরি করা হবে, এবং তার প্ল্যান নাকি তৈরিও হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু সেই নক্সাবন্দী প্ল্যান কার্যে পরিণত হবার কোন লক্ষণই তো দেখতে পাওয়া যাচ্ছে না।

আমাদের বাংলা থেকে, সর্বভারতীয় ক্রিকেটে তরুণ খেলোয়াড়েরা কিভাবে আত্মপ্রকাশ করার সুযোগ পাবে? কারণ অনুশীলনের সুযোগ নেই ঠিকমত। আমাদের বাংলা দেশে ক্রিকেট খেলার আয়ুষ্কাল মাত্র তিন মাস। আর সর্বভারতীয় ক্রিকেটের প্রতিনিধিত্বমূলক খেলায় সুযোগ পেতে হলে যে সময় ট্রায়ালে যেতে হবে, তখন আমাদের বাংলায় ফুটবলের শেষ রেশ আছে, ক্রিকেট বেশ দূরে। ফলে একেবারে অপ্রস্তুত অবস্থায় বাংলার ছেলেদের কোন ভাল ফলাফল প্রদর্শন করা সম্ভব হয় না। ক্রিকেট এ্যাসোসিয়েশনের কর্তাব্যক্তিরা যদি সত্যই বাংলার ক্রিকেটের উন্নতির জন্য ভাল কিছু করতে চান তবে তাঁদের ইনডোর স্টেডিয়ামের ব্যবস্থা প্রথমেই করতে হবে।

আর একটি কথা এই প্রসংগে আবার উল্লেখ না করে পারছি না; তরুণ ক্রিকেটারদের অন্য রাজ্য সফরের কথা বোধহয় একেবারে ভুলেই গিয়েছেন সি এ বি'র কর্তাব্যক্তিরা। অবশ্য ভুলে যাওয়াই স্বাভাবিক কারণ সামনেই আসছে ওয়েস্ট ইন্ডিজ ক্রিকেট দল।

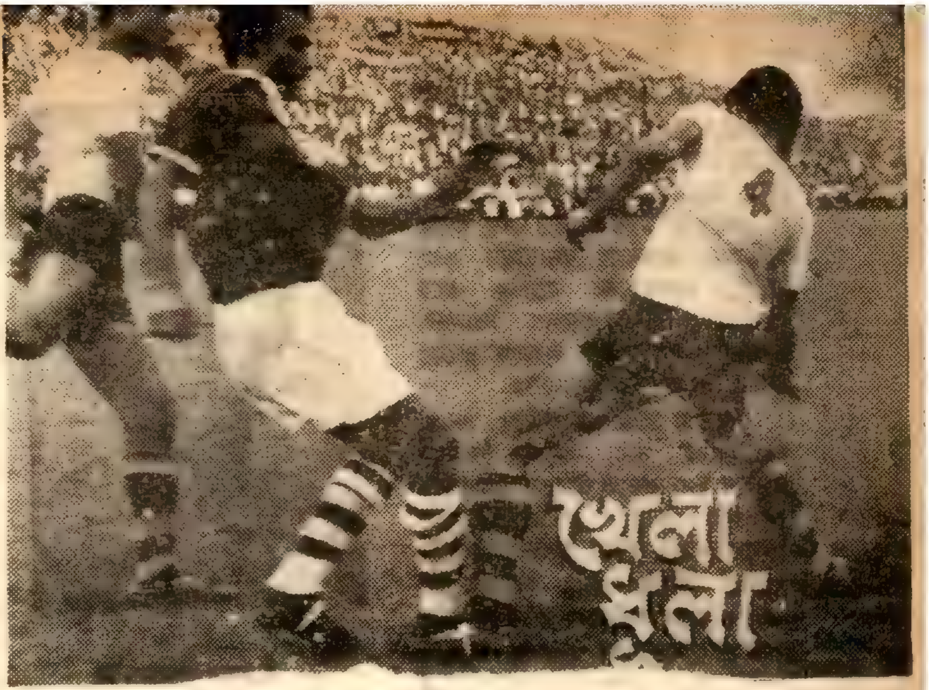

হায়দ্রাবাদ এবং এরিয়ান্স ক্লাবের শীল্ড খেলার দৃশ্য

ইন্দার সিং

শ্রীঅমিতাভ

এই তো একটা সুবর্ণ সুযোগ সি এ বি'র, এরই জন্য তো আমাদের ক্রিকেট-পরিচালকদের তীর্থের কাকের মত প্রতীক্ষা। এখন ক্রীড়ামোদীরা বেশ বুঝেছেন যে কোন বছর টেস্টের পাট না থাকলে একেবারে ফাঁকা গেলে আসর জমাবার জন্য সি এ বি'র কর্তাব্যক্তিরা অনেক ফাঁকা বুলি ছাড়েন আগামী পরিকল্পনা সম্বন্ধে এবং তা' কার্যে পরিণত হতে আর দেখা যায় না।

জনসাধারণের অর্থ নিয়ে ছিনিমিনি খেলার অধিকার সি এ বি'কে কে দিয়েছে। একবার চিন্তা করে দেখুন কুড়ি টাকার সিজন টিকিটে অথবা স্টেডিয়ামে দৈনিক টিকিটে যাঁরা খেলা দেখেন তাঁদের কি অবস্থায় খেলা দেখতে হয় এবং তাদের টাকায় সি এ বি তহবিল ভরাচ্ছেন কিন্তু অপব্যয়ের সীমা ছাড়িয়ে যাচ্ছে।

কলকাতায় কিছুদিন পূর্বে শেষ হল ভারতীয় ক্রিকেট কণ্ট্রোল বোর্ডের ওয়ার্কিং কমিটির সভা। এই সভা অনুষ্ঠিত হয় গ্রেট ইস্টার্ন হোটেলের শীততাপ নিয়ন্ত্রিত কক্ষে। আমাদের প্রশ্ন যে সাংবাদিকদের এই সভায় প্রবেশের অধিকার দেওয়া হয় নি কেন এবং শুধু তাই নয় সভাকক্ষের বাইরেও সাংবাদিকদের অপেক্ষা করাটাও অনেকে পছন্দ করেন নি। কোন গলদ না থাকলে এত রেখে-ঢেকে কাজ কখনও হয় না। এই সভায় এক রাজসিক ভোজের আয়োজন করা হয় এবং পরদিন ছিল আম্পায়ার সেমিনারে এক নৈশভোজ। সব মিলিয়ে সি এ বি উদারহস্তে জনসাধারণের অর্থ অপচয় করে চলেছেন।

জৌলুসহীন শীল্ডের আসর

সত্যি বলতে কি শীল্ডের খেলা দেখে মন ভরছে না, এত নেমে গেছে আমাদের ফুটবলের মান তা' আর কি বলব। আর একটা কথা হল যে আমাদের ফুটবলের মানের কোন স্থিরতা নেই। শীল্ডের আসরে এবার হায়দ্রাবাদ ফুটবল দলকে দেখে মনে হচ্ছে যে অতীতের সেই দুর্ধর্ষ হায়দ্রাবাদ দলের এরা ছায়া মাত্র। অবশ্য এই বছর হাবিব, নঈম এবং আফজলের মত তিনজন দলের নির্ভরযোগ্য খেলোয়াড়কে হারিয়ে তারা অনেকাংশে

দুর্বল হয়ে পড়েছে। আর যে ক'টি বাইরের দল শীল্ডে অংশগ্রহণ করেছে তাদের মধ্যে এমন কোন দল নেই যাদের খেলা উল্লেখযোগ্য বলে মনে হয়েছে।

এবার শীল্ডের আসরে দেখা যাচ্ছে হ্যাট্রিকের একেবারে ছড়াছড়ি। এর মধ্যেই অনেকগুলি হ্যাট্রিক হয়ে গিয়েছে। বি এন রেলের প্রিয়লাল মজুমদার এবং জলন্ধর লীডার্স ক্লাবের ইন্দার সিং হ্যাট্রিক করেছেন।

দ্বিতীয় রাউণ্ডের খেলার ফলাফল দিয়েই সুরু করছি। আসাম পুলিশ ২-০ গোলে উড়িষ্যা একাদশকে পরাজিত করে তৃতীয় রাউণ্ডে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবে ইস্টার্ন রেলের সঙ্গে। উড়িষ্যা দলের পুরোভাগের এল সি বোস দর্শকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। মধ্যপ্রদেশ দ্বিতীয় রাউণ্ডে ৯-০ গোলে পরাজিত করে বিহার রেজিমেণ্টাল পুলিশকে। কিন্তু আশ্চর্যের কথা যে একটিও হ্যাট্রিক হয় নি এই খেলায়। তৃতীয় রাউণ্ডে মধ্যপ্রদেশ দল ২-১ গোলে পাঞ্জাব পুলিশকে পরাজিত করে কোয়ার্টার ফাইন্যালে উন্নীত হয়। রাজস্থান ক্লাব দ্বিতীয় রাউণ্ডে পরাজিত করে গোয়ার কর্পস অফ সিগন্যালসকে এবং পরবর্তী খেলায় রাজস্থান খেলছে ইস্টবেঙ্গলের সঙ্গে।

জলন্ধরের লীডার্স ক্লাব হুগলী

সুকুমার সমাজপতি

জেলা দলের সঙ্গে প্রথম দিন খেলা ১-১ গোলে অমীমাংসিতভাবে শেষ করার পর দ্বিতীয় দিন ৪-১ গোলে জয়ী হয়। লীডার্স ক্লাবের ইন্দার সিং হ্যাট্রিক সহ একাই দেন চারটি গোল। ব্যাঙ্গালোরের এ এস সি ৫-১ গোলে পরাজিত করে এলাহাবাদ ইয়ং স্টারকে। তৃতীয় রাউণ্ডে এ এস সি মোহনবাগানের সম্মুখীন হচ্ছে।

বালী প্রতিভা ক্লাব দিল্লী একাদশকে অনায়াসে ৪-০ গোলে পরাজিত করে। বালী দল আরও বেশি গোলের ব্যবধানে জয়ী হতে পারত: বালী দল তৃতীয় রাউণ্ডে মিলিত হবে বি এন রেলের সঙ্গে। বি এন রেলদল দ্বিতীয় রাউণ্ডে পরাজিত করে বছরের দ্বিতীয় ডিভিসন চ্যাম্পিয়ান পোর্ট কমিশনার্স দলকে ৪-১ গোলে। প্রিয়লাল মজুমদার হ্যাট্রিক লাভের কৃতিত্ব অর্জন করেন। অন্য একটি দ্বিতীয় রাউণ্ডের খেলায় প্রথম দিন খেলা গোলশূন্যভাবে শেষ করে দ্বিতীয় দিন ভারতীয় নেভী ৩-০ গোলে পরাজিত করে স্থানীয় স্পোর্টিং ইউনিয়ন ক্লাবকে।

এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য খেলা ছিল এরিয়ান্স এবং হায়দ্রাবাদ দলের তৃতীয় রাউণ্ডের খেলাটি। এই খেলায় প্রচুর দর্শক সমাগম হয় হায়দ্রাবাদ দলের খেলা দেখার জন্য। কিন্তু হায়দ্রাবাদ দলের খেলা দেখা গেল জৌলুসহারা। যদিও হায়দ্রাবাদ ১-০ গোলে জয়ী হয়েছে, খেলার ধারা অনুযায়ী এরিয়ান্সের জয়ী হওয়া উচিত ছিল। কয়েকটি গোলের সুবর্ণ সুযোগ এরিয়ান্স ক্লাব নষ্ট করেছে।

লস এঞ্জেলসে আন্তর্জাতিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় ৪×১০০ মিটার রিলের দৌড়ে বিশ্ব রেকর্ড সৃষ্টিকারী আমেরিকার রিলে দল।

মুর্শিদাবাদ সুইমিং এ্যাসোসিয়েশন পরিচালিত বাহাত্তর কিলোমিটার এবং উনিশ কিলোমিটার সন্তরণ প্রতিযোগিতার পূর্বে ডাক্তারী পরীক্ষা হচ্ছে।

সমাচার দর্পণ

মার্দেকা ফুটবল প্রতিযোগিতায় তৃতীয় স্থানাধিকারী ভারতীয় ফুটবল দল সিঙ্গাপুরে অনুষ্ঠিত একটি প্রদর্শনী খেলায় সিঙ্গাপুরের রাজ্য একাদশের নিকট ১-০ গোলে পরাজিত হয়েছে। সবচেয়ে আশ্চর্যের কথা যে ভারত সারাক্ষণ খেলার ওপর প্রভাব বিস্তার করেও পরাজিত হয়। এখানে উল্লেখযোগ্য যে এই একই ফলাফলে কুয়ালালামপুরে ভারত এবার আশ্চর্যভাবে সিঙ্গাপুরের কাছে পরাজিত হবার ফলে মার্দেকা প্রতিযোগিতায় বিজয়ী হবার গৌরব থেকে বঞ্চিত হয়।

* * *

মুর্শিদাবাদ সুইমিং এ্যাসোসিয়েশনের পরিচালনায় গঙ্গাবক্ষে বাহাত্তর কিলোমিটার সন্তরণ প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হল। এবারের প্রতিযোগিতায় প্রথম স্থান অধিকার করেন কলকাতার বৈদ্যনাথ নাথ। গত দু বছরের বিজয়ী দেবী দত্তকে তিনি পরাজিত করেন। দেবী দত্ত এবার দ্বিতীয় স্থান দখল করেন। এই দীর্ঘ সন্তরণের সঙ্গে উনিশ মাইলের এক সন্তরণ প্রতিযোগিতাও অনুষ্ঠিত হয় এবং প্রথম স্থান দখল করেন ইস্টার্ন রেলের কে কে মণ্ডল। গত দু বছরের বিজয়ী এন এন ভৌমিক এবার পরাজিত হন।

* * *

মার্দেকা ফুটবল প্রতিযোগিতায় এবার বিজয়ীর গৌরব অর্জন করল দক্ষিণ ভিয়েতনাম। কুয়ালালামপুরে অনুষ্ঠিত ফাইন্যাল খেলায় দক্ষিণ ভিয়েতনাম ১-০ গোলে পরাজিত করে বার্মাকে। বিজয়সূচক গোলটি করার কৃতিত্ব অর্জন করেন নেউইন ভন চিউ। তবে ভিয়েতনামের জয়ের পেছনে তাদের নবাগত জার্মান কোচ ওয়েগ্যাঙের বিরাট অবদান আছে। মাত্র তিন মাস পূর্বে দক্ষিণ ভিয়েতনামের এক ভাঙা দলকে নিয়ে তিনি অক্লান্ত পরিশ্রম করে এই পর্যায়ে এনেছেন। ফাইন্যাল খেলাটি তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতার মধ্যে অনুষ্ঠিত হয় এবং প্রায় পঁয়ত্রিশ হাজার দর্শক খেলাটি উপভোগ করেন।

তৃতীয় স্থান নির্ণয়ের খেলায় ভারত পরাজিত করে দক্ষিণ কোরিয়াকে ১-০ গোলে। ভারতের পক্ষে বিজয়সূচক গোলটি করে পরিমল দে।

* * *

কলকাতার ভেটারেন্স ক্লাব এ বছর ইস্টবেঙ্গল ক্লাবের খেলোয়াড় সৈয়দ নঈমুদ্দিনকে বছরের শ্রেষ্ঠ ফুটবল খেলোয়াড় হিসাবে নির্বাচিত করেছেন। স্কুলের ফুটবল খেলোয়াড়দের মধ্য থেকে শ্রেষ্ঠ ফুটবল খেলোয়াড়ও ভেটারেন্স ক্লাব নির্বাচিত করবেন, জেলা স্কুল ফুটবলের খেলার পর।

নঈম

প্রদীপ ব্যানার্জী

পেশাদারত্ব ও অপেশাদারত্বের প্রশ্ন

ভারতীয় ফুটবল জগতে পেশাদারত্ব এবং অপেশাদারত্ব নিয়ে বিতর্কের ঝড় ওঠার দিন হয়েছে। কিন্তু এখন আমাদের দেশে পেশাদার ফুটবলের প্রবর্তন করার সময় হয়েছে কি? অবশ্য বর্তমানে আমাদের দেশে বিশেষত কলকাতা ময়দানে যে প্রথা চালু আছে তাকে বিশুদ্ধ অপেশাদার ফুটবল বললে বোধহয় একটা হাস্যকর ব্যাপার হবে। কারণ যে প্রথা বর্তমানে চালু আছে তা আমাদের ফুটবলকে এক নোংরা পরিবেশের মধ্যে টেনে নিয়ে যাচ্ছে একথাও অস্বীকার করা যায় না। আমাদের দেশে পেশাদার ফুটবল প্রথা প্রবর্তনের যে রব তোলা হয়েছে তাতে মুখ্য এবং সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণ করেছেন রাজস্থান ক্লাবের শ্রী বি পি হিম্মৎসিংকা মহাশয়।

গত বছর শ্রীহিম্মৎসিংকার তৎপরতার আঘাতে প্রায় কক্ষচ্যুত হয়েছিলেন আমাদের ভারতীয় ফুটবল জগতের কয়েকজন উজ্জ্বল তারকা। এই ক'জন ফুটবল তারকা কোন এক দৈনিক সংবাদপত্রে খেলার বিবরণ লিখেছিলেন নিজেদের নামে এবং এ'দের মধ্যে একজন ফুটবল তারকা আবার সিনেমা তারকা হিসাবে অবতীর্ণ হয়েছিলেন ছবির পর্দায়। শ্রীহিম্মৎসিংকার টানা-হেঁচড়ার ফলে সযত্নে রক্ষিত অপেশাদারত্বের নামাবলীটি প্রায় খসে পড়েছিল বলে। শ্রীহিম্মৎসিংকা এখানে ফুটবলের ভাগ্যবিধাতাদের কাছে এ বিষয়ে প্রতিবাদ জানিয়ে লিখলেন যে, উক্ত খেলোয়াড় কয়েকজনকে পেশাদার বলে ঘোষণা করা হোক। কিন্তু আমাদের দেশের ফুটবলের ভাগ্যবিধাতাদের এত সময় কোথায় যে এ সব বিষয়ে চিন্তা করার, তাই হিম্মৎসিংকার প্রতিবাদে বিন্দুমাত্র কর্ণপাত করলেন না এ'রা।

কিন্তু হিম্মৎসিংকাজী অত সহজে ছাড়বার পাত্র নন। তিনি এখানে ব্যর্থ হয়ে বিস্তারিত বিবরণ সহ এক চিঠি লিখলেন আন্তর্জাতিক ক্রীড়া সংস্থার সভাপতি আভেরী ব্রাণ্ডেজকে। ব্রাণ্ডেজ সাহেব উত্তরে লিখলেন যে চিঠির বক্তব্য এবং বিবরণ অনুযায়ী উক্ত ফুটবল খেলোয়াড়রা অপেশাদারত্বর যোগ্যতা হারিয়েছেন। বিষয়টি এতদূর গড়াবার পর আমাদের ফুটবলের কর্তাব্যক্তিদের টনক নড়ল। তাঁরা চিন্তা করে দেখলেন যে বিষয়টি এখানেই ধামা চাপা দেবার প্রয়োজন, এবং সর্বভারতীয় ফুটবল সংস্থা হিম্মৎসিংকার বক্তব্য বিবেচনা করার প্রয়োজন অনুভব করলেন।

যথারীতি তাঁদের সভায় বিষয়টি আলোচনার জন্য উপস্থাপিত করা হল এবং কর্তাব্যক্তিরা আলোচনার পর বললেন যে, উক্ত খেলোয়াড়রা দৈনিক সংবাদপত্রে লিখেছেন তাঁদের নাম দিয়ে,

চুনী গোস্বামী

আর একজন সিনেমা করেছেন বটে কিন্তু তাঁরা এখনও নির্ভেজাল বিশুদ্ধ অপেশাদার খেলোয়াড়, কোন দোষেই তাঁরা দোষী নন। এই সব খেলোয়াড়েরা অবশেষে লাভ করলেন নির্মল চরিত্রের সার্টিফিকেট।

এবার শ্রীহিম্মৎসিংকা আমাদের দেশে পেশাদার ফুটবল প্রথা প্রবর্তনের জন্য ভীষণ ব্যস্ত হয়ে পড়েছেন। বোধহয় তিনি আমাদের কলকাতা ময়দানে পেশাদার প্রথা চালু করে এক বিপ্লব সৃষ্টির চিন্তায় মশগুল। অবশ্য একথা স্বীকার করতে হবে যে, শ্রীহিম্মৎসিংকার বক্তব্য খুব দুর্বল নয়। এবার তিনি কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী চাগলার কাছে ফুটবলে পেশাদার প্রথা চালু করার জন্য আবেদন জানিয়েছেন। শ্রীচাগলা বিষয়টি বিবেচনা করার জন্য প্রেরণ করেছেন অল ইণ্ডিয়া কাউন্সিল অব স্পোর্টসের কাছে।

শ্রীহিম্মৎসিংকার বক্তব্য হল যে, এখন অপেশাদার প্রথায় লাভবান হন কয়েকজন ফুটবল পরিচালকেরা, কারণ তাঁরা দু-চারবার বিদেশ ভ্রমণ করে আসার সুযোগ পান। তাঁর মতে বিশেষত কলকাতায় ফুটবল হল একটা লাভজনক ব্যবসা। বর্তমানে আমাদের দেশের ফুটবলের ধারা নৈতিক চরিত্রের অবনতি ঘটাচ্ছে। এ কথা সকলেই জানেন যে, তলায় তলায় অর্থের বিনিময়ে অনেকেই খেলেন যদিও অপেশাদার প্রথার বিধি বহির্ভূত কাজ এটা। ফলে খেলোয়াড়েরাও মনে মনে কিছুটা দ্বিধাগ্রস্ত থাকেন এবং ক্লাব কর্তৃপক্ষও অনেক ক্ষেত্রে অবৈধ সুযোগ গ্রহণ করেন। আর পয়েন্ট ছাড়ার কথাও ভুলে গেলে চলবে না, কারণ ফুটবল লীগের জঘন্যতম কার্য হল এই পয়েন্ট ম্যানেজ। আমাদের ফুটবল খেলোয়াড়দের অর্থের প্রয়োজন, ফলে তাঁদের টাকার বিনিময়ে অল্পেই করায়ত্ত করতে সক্ষম হন জুয়াড়ীরা।

শ্রীহিম্মৎসিংকা আরও বলেছেন যে অন্য দেশে পেশাদার ফুটবলের চলন থাকার ফলে ফুটবল খেলোয়াড়েরা বৈধ উপায়ে ফুটবল থেকে উপার্জন করতে পারেন এবং পেশাদারত্বের ফলে খেলোয়াড়দের উৎসাহ বাড়ে এবং ফুটবলের মানের উন্নতি নিশ্চিত। এই বিষয়ে আগামী অল ইণ্ডিয়া স্পোর্টস কাউন্সিলের ত্রিবেন্দ্রামের সভায় আলোচনা হবে।

এটা অবশ্য ঠিক যে পেশাদার এবং অপেশাদার ফুটবলের চিন্তা আমাদের আজ না করলেও অদূর-ভবিষ্যতে করতেই হবে। কারণ পেশাদার ফুটবল প্রথার প্রবর্তন না করলে আমাদের পক্ষে ফুটবলে উন্নত অন্য দেশগুলি থেকে অনেক পশ্চাতেই থাকতে হবে। আর একটা বড় কথা হল যে এ্যামেচার এবং প্রফেসনালের মাঝামাঝি স্থানে ত্রিশঙ্কুর মত সেমি-এ্যামেচার হয়ে আর কতদিন অবস্থান করবে।

—সমীর দত্ত

সম্পাদিকা—জয়ন্তী সেন

বসুমতী (প্রাঃ) লিঃ-এর পক্ষে ১৬৬, বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী স্ট্রীটস্থ কলিকাতা-১২
বসুমতী প্রেস হইতে শ্রীসুকুমার গুহমজুমদার কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

সাপ্তাহিক বসুমতী

রাজ্য সরকারী কর্মচারীদের দাবির সমর্থনে
শ্রমিক-কর্মচারী-শিক্ষকদের
যুক্ত মিছিল

৭১ বর্ষ : ১৫শ সংখ্যা, বৃহস্পতিবার, ২৯শে ভাদ্র, ১৩৭৩ বঙ্গাব্দ ★ 15th Sept., 1966 * Vol. 71, No.

সূচীপত্র

বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা
সম্পাদকীয়		৮৯৯
আজকের মানুষ		৯০০
ভারতদর্শন		৯০১
আন্তর্জাতিক		৯০৪
অস্ট্রেলিয়া থেকে লিখছি	— সুরেশচন্দ্র সাহা	৯০৮
জন্মদিনে (কবিতা)	— নচিকেতা ভরদ্বাজ	৯১১
ব্যবহার (কবিতা)	— রবীন্দ্র গুহ	৯১১
বেদব্যাসের-এর রস-রচনা : অমৃতসমান		৯১২
সুবর্ণলতা (ধারাবাহিক উপন্যাস)	— আশাপূর্ণা দেবী	৯১৪
গ্রামবাংলার কথা	— পারুল ভট্টাচার্য	৯১৮
রঙ্গদর্শন		৯২৫

ডক্টর পঞ্চানন ঘোষাল এম, এস, সি প্রণীত

আমার দেখা মেয়েরা

(রহস্য রোমাঞ্চের স্বর্ণখনি)

'রক্তনদীর ধারা', 'অপরাধ বিজ্ঞান' ও 'বিখ্যাত বিচার কাহিনী' নামক সুপ্রসিদ্ধ গ্রন্থগুলির লেখকের সত্যঘটনামূলক বিভিন্ন ও বিচিত্র নারী-চরিত্রের রহস্য উদ্ঘাটন ও যথাযথ রূপদান। মেয়েদের মন আর মতি স্বয়ং দেবা ন জানন্তি। অভিজ্ঞ ও দক্ষ লেখকের রচনার বৈশিষ্ট্যে বাংলা দেশের নারী-সমাজের এক অজানা অংশ সাধারণের চোখে সুস্পষ্ট প্রতিভাত হয়েছে। পড়তে পড়তে বই শেষ না করে ওঠা যায় না। বইয়ের আদ্যোপান্ত রুদ্ধশ্বাস উদ্বেগ ও অনিশ্চয়তা।

উপন্যাসের চেয়েও সুখপাঠ্য।

মূল্য চার টাকা

মাইকেল মধুসূদন দত্তের

মাইকেল গ্রন্থাবলী

প্রথম ভাগ :—মেঘনাদবধ কাব্য, বীরাঙ্গনা কাব্য, পদ্মাবতী নাটক, বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রোঁ, একেই কি বলে সভ্যতা? —তিন টাকা।

দ্বিতীয় ভাগ :—কৃষ্ণকুমারী নাটক, শর্মিষ্ঠা নাটক, তিলোত্তমা-সম্ভব কাব্য, ব্রজাঙ্গনা কাব্য, চতুর্দশপদী কবিতাবলী, বিবিধ কাব্য, মায়া কানন, হেক্টর বধ। —দুই টাকা।

উপন্যাস-সাম্রাজ্যের রত্নমুকুট,—সেই সর্বজনপ্রমোদন—অমর-কীর্তি ঔপন্যাসিক—লব্ধপ্রতিষ্ঠ নাট্যকার—শক্তিমান রস-শিল্পী 'ভারতী' সম্পাদক শ্রীযুক্ত সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়ের—

সৌরীন্দ্র গ্রন্থাবলী

৫ম ভাগে :—বাদলা, মমতা, নির্ঝর, অতঃপর, পরদেশী সুরা, যবনিকার অন্তরালে, লেখার গলদ, পারিবারিক উপন্যাস, প্রগতি, অনাগত যুগ, আদর্শ এডিটোরিয়াল, আদর্শ সমালোচনা, সম্পাদকের দপ্তর, সংবাদপত্রের দৌলতে, [illegible] কাশ্মীর, এক যাত্রায়, ফুলকাটা, দুঃখীরাম, পান-সুপারি।

মাত্র ১৷৷০ টাকায়।

ডঃ মতিলাল দাশ প্রণীত

মতিলাল গ্রন্থাবলী

মূল্য—দুই টাকা

—ইহাতে আছে—

১। চলার পথে (উপন্যাস)
২। মনীষা (উপন্যাস)
৩। বিদ্যুৎশিখা (১১ খানি গল্প সমষ্টি)
৪। দীপশিখা (কবিতা সংকলন)
৫। চার্বাক (নাটক)

বসুমতী প্রাইভেট লিমিটেডঃ ১৬৬, বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী স্ট্রীট, কলি-১২

সূচীপত্র

বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা
ইতিহাসের উপাদান	— ভূপেন্দ্রকুমার দত্ত	৯২৯
বিশ্বসাহিত্যের আদিপর্ব	— ডঃ নরেন ভট্টাচার্য	৯৩৩
প্রতিবিম্বকে সাক্ষী রেখে (গল্প)	— রবীন রায়চৌধুরী	৯৩৬
সি, ভি, রমন ও মহাকাশ (প্রবন্ধ)	— আশিসকুমার সিংহ	৯৪০
বৃষ্টির দিনে (কবিতা)	— শান্তিপ্রিয় চট্টোপাধ্যায়	৯৪২
প্রার্থনা (কবিতা)	— গৌরাঙ্গ ভৌমিক	৯৪২
অশ্বযুগের একটি অধ্যায়	— অনন্ত সিংহ	৯৪৩
রূপমঞ্চ—ওদেশে এবং এদেশে	— শিলাদিত্য	৯৪৮
রূপায়জগৎ		৯৫২
খেলাধুলো	— শ্রীঅমিতাভ	৯৫৭

কলিকাতার ভূতপূর্ব মেয়র—প্রসিদ্ধ আইনবিদ

শ্রীসনৎকুমার রায়চৌধুরী প্রণীত

হিন্দুধর্ম্ম পরিচয়

দ্বিতীয় সংস্করণ—মূল্য দেড় টাকা

বাংলার বিদ্যালয়গুলিতে হিন্দু সংস্কৃতি প্রতিষ্ঠা যেদিন লুপ্ত হইল, সেইদিন হইতে হিন্দুর ব্যক্তিগত, পারিবারিক ও সামাজিক জীবনের ভিত্তি নষ্ট হইয়া গেল। তাহারই সুযোগ লইয়া আমাদের গৃহসমাজ ধ্বংস করিয়াছে যুনানী সভ্যতা। বাংলার অন্যতম শ্রেষ্ঠ হিন্দু নায়ক বাংলার বালগোপালদের কচি করকমলে যে পবিত্র নৈবেদ্য তুলিয়া ধরিয়াছেন, তাহাতে জাতি কৃতার্থ হইয়াছে।

প্রতি বিদ্যালয়ে এই গ্রন্থ অবশ্যপাঠ্য হওয়া উচিত।

কয়েকটি বিশিষ্ট অভিমত—

বিহারের প্রাক্তন প্রদেশপাল শ্রীমাধব শ্রীহরি অনে লিখিয়াছেন—

"...চমৎকার বই। ঋষিদের প্রচারিত হিন্দুধর্ম সম্বন্ধে স্পষ্ট ধারণা হবে বইখানি পড়লে। প্রত্যেক কিশোর ও কিশোরীদের হাতে এই রকমের একখানি করে বই শোভা পাক, এ আমার বড় ইচ্ছে।"

সুবিখ্যাত মাসিক পত্রিকা 'প্রবাসী'র অভিমত—

"স্বধর্মের মূল ও সার কথার সঙ্গে পরিচিত না হওয়ায় সন্তান-সন্ততিগণ ক্রমে বিভ্রান্ত ও আদর্শভ্রষ্ট হইয়া উঠে। ইহার ফল ইদানীং আমরা বিশেষভাবে প্রত্যক্ষ করিতেছি। এ সময় এইরূপ একখানি পুস্তকের প্রয়োজনীয়তা আছে।"

কিশোর-সাহিত্যের অভিনব আকর্ষণ

হেমেন্দ্র রায়ের গ্রন্থাবলী

শ্রীহেমেন্দ্রকুমার রায় প্রণীত

যাঁহার চাঞ্চল্যকর কাহিনীগুলি পাঠ করিয়া বাংলার কিশোর-কিশোরীরা আতঙ্কে, বিস্ময়ে ও কৌতূহলে হতবাক হয়, আমরা বাংলার সেই প্রখ্যাত প্রবীণ কথাশিল্পী শ্রীহেমেন্দ্রকুমার রায়ের শ্রেষ্ঠ রচনাগুলি চয়ন করিয়া এই গ্রন্থাবলী প্রকাশ করিলাম।

—গ্রন্থাবলীতে আছে—

১। যকের ধন, ২। প্রদীপ ও অন্ধকার, ৩। রহস্যের আলোছায়া, ৪। ক্ষুদিরামের কীর্তি, ৫। যেসা দেওগে তেসা পাওগে, ৬। বুড়োর খামখেয়ালী, ৭। গোয়েন্দা কাহিনীর সঞ্চয়ন—চাবি ও খিল, একরত্তি মাটি, চোরাই বাড়ি, ছেলেবেলার একদিন ও বন-বাদাড়ে। ৮। ভৌতিক কাহিনী সঞ্চয়ন—এক রাতের ইতিহাস, কঙ্কাল সারথি, বিজয়ার প্রণাম, কাণকাটা হাঁচি, শয়তান, ভেলকির হুমকী, ভূতের রাজা, শয়তানী জায়া। ৯। নতুন বাংলার প্রথম কবি, ১০। জগন্নাথদেবের গুপ্তকথা, ১১। হলিউডের টাকার পাহাড়।

মূল্য তিন টাকা।

বসুমতী প্রাইভেট লিমিটেডঃ ১৬৬, বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী স্ট্রীট, কলি-১২

CALCUTTA UNIVERSITY CENTRAL LIBRARY

৭১ বর্ষ ঃ ১৫শ সংখ্যা—মূল্য ২৫ পয়সা
বৃহস্পতিবার, ২৯শে ভাদ্র, ১৩৭৩ বঙ্গাব্দ

বাংলা ভাষায় দ্বিতীয় সর্বাধিক প্রচারিত
সাপ্তাহিক পত্রিকা

Price : 25 Paise
Thursday, 15th Sept., 1966

আন্দোলন ও সরকারী নীতি

কলকাতার বুকে এ যাবৎ যে সব মিছিল ও সমাবেশ বিরাটাকারে দেখা গেছে, গত ৯ই সেপ্টেম্বরের মিছিল ও সমাবেশ পূর্ববর্তী রেকর্ড ম্লান করে দিয়েছে। অনেকেই বিগত জুলাই মাসের সমাবেশের বিরাটত্ব দেখে বিস্মিত হয়েছিলেন, কিন্তু সেদিনের সমাবেশের যেন কোনো তুলনাই হয় না। এই সমাবেশ রাজনৈতিক ছিল না, এই যুক্ত সমাবেশে যোগদান করেছিলেন শ্রমিক-কর্মচারী ও শিক্ষক। মোট আশিটি সংগঠনের পক্ষ থেকে আহূত এই সমাবেশ ছিল নাকি অভূতপূর্ব।

কিন্তু কেন এই মিছিল সহ সমাবেশ, কী জন্য এই আন্দোলন? কেনই বা আজ কেন্দ্রীয় তথা রাজ্য সরকারের কর্মচারী এবং শিক্ষকগণ সংগ্রামের পথে নামলেন?

এই প্রশ্নের উত্তর অত্যন্ত সহজ ও সরল। কোনো রাজনৈতিক সুবিধা আদায় করা এই সংগ্রামের উদ্দেশ্য হওয়া সম্ভব নয়। এই সংগ্রাম তাঁরাই করছেন—যাঁরা সরকার পরিচালনার কাজে অপরিহার্য। এই সংগ্রামে সেই শিক্ষকরা নেমে এসেছেন যাঁরা জাতির মেরুদন্ড শক্ত রাখার কাজে নিযুক্ত থেকেও নিজেরাই ক্ষুধিত ও আর্ত। এ'দের এই আর্ত অবস্থার সুযোগ নিয়ে এ'দের সম্বন্ধে চটকদারী কথা বলেও—এ'দের আর সামলে রাখা যায় না। স্বভাবতই ন্যায্য দাবিতে মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকরা সক্রিয় আন্দোলনে নামতে বাধ্য হয়েছেন। সেই কারণে দশই সেপ্টেম্বর থেকে এই রাজ্যের বিদ্যালয়গুলিতে পঠন-পাঠন বন্ধ।

রাজ্য সরকারের কর্মচারীদের গণছুটির প্রতিক্রিয়াও তো তুচ্ছ নয়। অথচ রাজ্য সরকার যদি এদের দাবি মেটাতে না পারেন, তাহলে এদের আন্দোলন কোন পথ ধরবে তা অনুমান করা কঠিন নয়।

আগামী ২২শে ও ২৩শে সেপ্টেম্বরেরই বা আর কতো বিলম্ব। এই দুই দিবস 'বাংলা বন্ধ'-এর ডাক দিয়েছেন বিভিন্ন রাজনৈতিক দল। এ'দের বিভিন্ন দাবির মধ্যে মূল দাবি হচ্ছে—খাদ্য। সাধারণ মানুষ আজ খাদ্যের অভাব আর মূল্যবৃদ্ধির সমস্যায় একেবারে নাজেহাল। আমাদের সরকার এই দুই ব্যাপারে কতোটা সার্থক, তা আর বলার দরকার হয় না। একথা আজ কে অস্বীকার করবে যে, মূল্যবৃদ্ধির জন্যে কার্যত যারা দায়ী তাদের শায়েস্তা করার মতো শক্তি সরকারের নেই, অথবা সে সব ক্ষেত্রে সরকার নীরব। কিন্তু অসামর্থ্য বা নীরবতা রাষ্ট্র পরিচালনার ক্ষেত্রে শুভ ফলদায়ক নয়। কারণ এই দুই ব্যাপার সরকারকে এমন অবস্থায় আনতে পারে—যা আমাদের কল্পনাতীত। আর এই অবস্থার সূত্র তো হয়ে গেছে। তাই কোনো হুমকিতে আজ বাগ মানানো যায় না শান্ত প্রকৃতির কর্মচারী ও নিরীহ শিক্ষকদের। এ'দের ছাড়া সরকারেরও গত্যন্তর নেই। সুতরাং সরকার কি করবেন? মূল্যবৃদ্ধি রোধে সরকার আজ ব্যর্থ, ন্যায্য আন্দোলনকে চিরদিন দমিয়ে রাখাও সম্ভব নয়। এই অবস্থায় শাসনযন্ত্রের কি পরিণতি হতে পারে—তা আমাদের সরকার স্থিরমস্তিষ্কে চিন্তা করবেন বলে আমরা মনে করি।

সরকারের সবদিকেই যখন এই অবস্থা তখন লরী ও টেম্পোর চাকা বন্ধের ঘটনাটি রীতিমতো চাঞ্চল্যকর। লরী ও টেম্পোর চাকা বন্ধের দরুন রাজ্যে পরিবহন ব্যবস্থায় যে সংকটের সৃষ্টি হয়েছিল—তা কোনো কারণেই তুচ্ছ নয়। আমরা আশা করেছিলাম, এই বন্ধের ব্যাপারে সরকার কিছুটা শক্ত হবেন। কিন্তু কী জানি কেন সরকার এই ব্যাপারে অনমনীয় হওয়ার পরিবর্তে যে দুর্বলতা দেখিয়েছেন তদ্দ্বারা এদের আন্দোলনকে ন্যায্য বলেই স্বীকার করে নিয়েছেন। রাষ্ট্র পরিচালনার ক্ষেত্রে সরকারের যে মনোভাব ধীরে ধীরে আমাদের কাছে স্পষ্ট হয়ে উঠছে তা হচ্ছে এই যে, বিত্তবানদের ভাগ্যই এখন সুপ্রসন্ন। সেই কারণে বর্তমান শাসনব্যবস্থায় দ্রব্যমূল্য হ্রাস করার জন্যে সরকারকে কড়া নীতি গ্রহণ করার কথা বলা আজ অরণ্য রোদন মাত্র।

কিন্তু একথাও ঠিক আমরা অরণ্যে বাস করছি না। সরকার তাঁর দুর্বল নীতির ফলে নিজের বিপদ নিজেই আজ টেনে আনছেন। চোখ রাঙানিতে রাজ্য চালানো যায় না; যাঁদের জন্যে সরকার আজ ক্ষমতার আসনে অধিষ্ঠিত তাঁদের দুঃখ দুর্দশা মোচনের জন্য সরকার প্রকৃতপক্ষে কিই বা করছেন। বর্তমানে সারা পশ্চিমবঙ্গে যে আন্দোলন সুরু হয়েছে এবং ভবিষ্যতে যে সংগ্রাম সুরু হবে—তার অবসান একমাত্র সরকারই করতে পারেন—যদি সত্যিকারের সমাধানের জন্য সরকারের সদিচ্ছা থাকে। এই সদিচ্ছার অভাবে এই রাজ্য কিভাবে তোলপাড় খেতে পারে—বিগত দিনের আন্দোলনের কথা ভেবে তা আমরা কিছুটা অনুমান করে নিতে পারি। বলা বাহুল্য, প্রায় পাঁচ হাজার পুলিশ পশ্চিমবঙ্গ সরকার অন্যান্য রাজ্য থেকে আমদানী করেছেন। কিন্তু ৮০টি সংগঠন যেখানে আন্দোলনের পথে পা বাড়ায় সেখানে শুধু ঠেঙিয়ে তাঁদের শায়েস্তা করা কি সম্ভব?

সম্পাদকীয়

আজকের মানুষ

একদিন বিদেশী শাসককে উৎখাত করার জন্যে পরিকল্পনা রচনা করতেন, তরুণ দেশভক্তদের প্রাণে বৈপ্লবিক চিন্তাধারার আগুন জ্বালাতেন, অমসৃণ মুক্তির পথ প্রদর্শন করতেন। পথ দেখিয়ে নিয়ে চলেছেন আজ সমগ্র জাতিকে, গোটা দেশকে। কে তিনি, কী উনি? উনি হলেন আদম মালিক, ইন্দোনেশিয়ার পররাষ্ট্রমন্ত্রী। দুনিয়ার সংবাদ সংগ্রহ করতেন, সংবাদ লিখতেন, সাংবাদিক ছিলেন মালিক; আজ সারা দুনিয়া ব্যস্ত হয়ে পড়েছে তাঁর সংবাদ সংগ্রহ করার জন্যে, গোটা বিশ্ব আজ তাঁরই সংবাদ লিখছে।

বরাবরই চিন্তাশীল ব্যক্তি মালিক, চিন্তাধারা তাঁর গতানুগতিকতার দোষে দুর্বল নয়, স্বকীয়তা, মৌলিকত্ব রয়েছে তাঁর ভাবানুধ্যানে। সেই নতুনের রসেরই সঞ্জীবন দেখা যাচ্ছে আজ ইন্দোনেশিয়ার পররাষ্ট্রনীতিতে, তার বৈদেশিক সম্পর্কে। গত অক্টোবরের ব্যর্থ অভ্যুত্থান পর্যন্ত যে পথ ধরে ইন্দোনেশিয়ার বৈদেশিক নীতি পরিচালিত হয়েছে এবং আজ যা অনুসৃত হচ্ছে এখানে—এ-দুটোর মধ্যে গুণগত এবং চরিত্রগত পার্থক্য রয়েছে। আজ ইন্দোনেশিয়ার পররাষ্ট্রনীতির পালে যে নতুন হাওয়া লেগেছে, তা তার আভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রেও অনুকূল পরিবেশের সৃষ্টি করেছে, তার জন্যে আদম মালিক অনেকখানি কৃতিত্ব দাবি করতে পারেন।

অর্থাৎ পররাষ্ট্রমন্ত্রীর গদিতে ডঃ সুবান্দ্রিয়োর মত বিশ্বস্ত লোককে পেয়ে প্রেসিডেন্ট সুকর্নের পক্ষে 'মালয়েশিয়া ধ্বংস করো' শ্লোগান তোলা খুবই সহজ হয়েছিল। ওই ধ্বংস-যজ্ঞের কর্মসূচী নিয়েই ইন্দোনেশিয়ার অর্থনীতিতে সংকট ডেকে এনেছেন ডঃ সুকর্ন। প্রাক-ব্যর্থ অভ্যুত্থান সরকার ছিল অতি-মাত্রায় চীন-অনুরাগী, ফলে চীনকে খুশি করার জন্যে সে দেশের ভালো-মন্দও বিচার করতো না সব সময়। রাষ্ট্রসংঘের সদস্যপদ ত্যাগ করলো সে, ভারতের সঙ্গে সম্পর্কেরও অবনতি ঘটলো।

পূর্বতন সরকারের হঠকারিতাকে বরবাদ করে সুস্থ বাস্তব পররাষ্ট্রনীতি গ্রহণ করলেন আদম মালিক, মালয়েশিয়ার সঙ্গে বিরোধ মেটানোর প্রথম পদক্ষেপ হিসেবে স্বাক্ষর করলেন ব্যাংকক চুক্তি। রাষ্ট্রসংঘের সদস্যপদ ফিরে পাবার জন্য আবেদন করার কথাও চিন্তা করছেন মালিক।

ভারতের সঙ্গে ইন্দোনেশিয়ার সম্পর্ক খুবই প্রাচীন, এবং সে-সম্পর্ক মৈত্রীর সখ্যতার। বাণিজ্যিক যোগাযোগ থেকে সাংস্কৃতিক ভাব-বিনিময়—দুটি দেশের মধ্যে এই ছিল বন্ধুত্বের স্বর্ণসূত্র; সে-বন্ধন আরো নিবিড়, আরো অচ্ছেদ্য হয়েছিল ১৯৫৫ সালে যখন শ্রীনেহরুর উদ্যোগে বান্দুং সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় ইন্দোনেশিয়ার মাটিতে। সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে, উপনিবেশবাদের বিরুদ্ধে দু' দেশ পরস্পরের আরো কাছাকাছি এসেছিল পঞ্চশীলকে পাথেয় করে।

কিন্তু চীনা ড্রাগনের তপ্ত নিশ্বাস পড়েছিল ইন্দোনেশিয়ার ওপর, সে-বিষাক্ত নিশ্বাস দুই বন্ধু রাষ্ট্রের মধ্যখানে রচনা করেছিল দুর্ভেদ্য প্রাচীর। ডঃ সুকর্নের ইন্দোনেশিয়া, ডঃ সুবান্দ্রিয়োর ইন্দোনেশিয়া কার্যত চীনের হাতের পুতুলে পরিণত হলো—ভারত-বিরোধিতা শুরু করলো সে চীনেরই কণ্ঠে সুর মিলিয়ে। প্রায় চার বছর ধরে দুই রাষ্ট্র দেওয়ালের দু-পাশে রইলো। কিন্তু দুঃস্বপ্নেরই মতো সে অমানিশার অবসান ঘটেছে, বিরোধিতার গ্লানি মুছে বন্ধুত্বের হাত বাড়িয়ে দিতে এসেছেন মালিক নয়াদিল্লীতে।

মালিক যে ছোটবেলা থেকেই দেখে আসছেন, রাজ্য ভাঙা-গড়া, উত্থান-পতন-অভ্যুদয়। জাতিতে-জাতিতে, দেশে-দেশে বন্ধুত্বের মূল্য কতখানি সে কি তিনি জানেন না, মাত্র ১৭ বছর বয়স থেকে এই দেখে-শিখে এবং শিখিয়ে আসছেন। পূর্ব সুমাত্রায় ১৯১৭ সালে মালিকের জন্ম। তরুণ বয়স থেকেই জাতীয়তাবাদের প্রতি তিনি আকৃষ্ট, কিন্তু গোড়াতে তাঁর ভূমিকা ছিল বুদ্ধিজীবীর। সাংবাদিক হিসেবে তাঁর বুদ্ধিদীপ্ত রচনা অজস্র স্বাধীনতাকামী তরুণের প্রাণে প্রেরণা জুগিয়েছে। মাত্র কুড়ি বছর বয়সে ইন্দোনেশিয়ায় সংবাদ সরবরাহ প্রতিষ্ঠান আন্তারার প্রতিষ্ঠা করেন তিনি। ওলন্দাজদের বিরুদ্ধে এর পরে প্রত্যক্ষ সংগ্রামে নামেন তিনি যতদিন না স্বাধীনতা পেলো।

মালিকের পাণ্ডিত্য এবং তাঁর কূটনৈতিক বুদ্ধি তাঁকে মস্কোর রাষ্ট্রদূতের পদ পেতে সহায়তা করেছিল। এর পরে ১৯৬৩ সালে তিনি ডঃ সুকর্নের ক্যাবিনেটে স্থান লাভ করেন। আদম মালিক কমিউনিস্ট নন, তিনি ছিলেন জাতীয়তাবাদী, ওলন্দাজদের বিরুদ্ধে এবং অধিকার প্রতিষ্ঠাকারী জাপানের বিরুদ্ধে তাঁর সংগ্রাম মুরবা পার্টির নেতা হিসেবে। ডঃ মালিক একজন সোশ্যালিস্ট, প্রতিক্রিয়াশীলতার বিরুদ্ধে তিনি, তাই বলে অতি-বিপ্লবীও তিনি নন। তাঁর নেতৃত্বে ইন্দোনেশিয়া আবার বিশ্বসভায় তার হৃতগৌরব ফিরে পেতে চলেছে।

আদম মা

রাষ্ট্রপতি সকাশে আদম মালিক

বর্ষাকালীন অধিবেশন

সেপ্টেম্বরের পয়লা সপ্তাহে শেষ হল সংসদের বর্ষাকালীন অধিবেশনের প্রলয়ঙ্করী বর্ষণ। মনে পড়ছে, বর্ষাকালীন অধিবেশনে সংসদ-ভবনের দ্বারোদ্ঘাটনের সময় আমরা যে ঝোড়ো হাওয়ার সঙ্কেত পেয়েছিলাম এবং আমাদের আশঙ্কামিশ্রিত মন্তব্য প্রিয় পাঠকবর্গকে উপহার দিয়েছিলাম তা নিতান্ত ভীতি মাত্র ছিল না। এবারের অধিবেশন সংসদীয় ইতিহাসে এক অভূতপূর্ব চাঞ্চল্যময় অধ্যায়ের সৃষ্টি করে গেছে। তাই অধিবেশন সমাপ্তিতে ক্ষান্ত-বর্ষণের একটা ক্লান্ত তৃপ্তি যেন অনুভব করা যাচ্ছে। জানি না, এই বর্ষণক্লান্তি পুঞ্জ পুঞ্জ শুভ্র মেঘে ভারতের ভাগ্যাকাশে শারদীয় ঔজ্জ্বল্য আনয়ন করবে কি না। সে আশা না রাখাই ভাল। কেন না, সংসদের ঝড় এখন বাইরে বইছে, বইবেও, অন্তত তার নমুনা সমগ্র ভারতবর্ষব্যাপী নিত্যদিন প্রত্যক্ষ করা যাচ্ছে।

সংসদ-ভবনেই আমাদের সাধের গণতন্ত্রের একটা চেহারা আমরা লক্ষ্য করে থাকি। বাইরে তার চেহারাটা খুব প্রীতিপ্রদ নয়। তার ওপর গণতন্ত্র-খর্বকারী যে সমস্ত আইনকানুন চালু আছে ও হচ্ছে, তাতে ও-পাট তো লোপাট হতে চলল। এ সমস্ত নিয়েই সংসদীয় অধিবেশন বারম্বার উদ্বেল হয়ে উঠেছিল। আর সেই বন্যার আবেগ রোধ করতেই অধ্যক্ষ মহোদয়কে মার্শাল ডেকে সদস্যগণকে সাসপেন্ড করে, বহিস্কৃত করে ও তিরস্কৃত করে সংসদের উষ্ণ আবহাওয়াকে আয়ত্তে রাখতে হয়েছে।

মধু লিমায়ে

এবারের অধিবেশনে বিরোধী সদস্যগণ একত্র আক্রমণের অদ্ভুত নজির সৃষ্টি করেছেন এবং ক্ষমতাসীন দলকে আঘাতে আঘাতে কোণঠাসা করে একেবারে ম্লান করে দিয়েছেন। এবারের অধিবেশনে ইন্দিরা-মন্ত্রিসভার বিরুদ্ধে আনীত হয়েছে প্রথম অনাস্থা প্রস্তাব। এবারের অধিবেশনেই দ্রব্যমূল্য হ্রাসের জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নটিকে নাড়াচাড়া করতে হয়েছে। মুহুর্মুহু সংসদকক্ষ ত্যাগের ঘটনা প্রায় জল-ভাত হয়ে উঠেছিল। রোজদিন রাশিকৃত গুরুতর অভিযোগের ফাইলের ফিতে এবারেই টেনে খোলা হয়েছে।

কেন্দ্রীয় মন্ত্রিগণের বিরুদ্ধে মারাত্মক সব অভিযোগ উত্থাপন করে লোহিয়া-শিষ্য শ্রীমধু লিমায়ে হিরো হয়েছেন। অন্যান্য বিরোধী নেতাদের চোখা চোখা বাক্যবাণে বিব্রতবোধ করেছেন সরকার পক্ষ। এবারের অধিবেশনে ক্ষমতাসীন দলের সদস্যগণই যেভাবে সরকারী নীতির (বিশেষত মুদ্রামূল্য হ্রাস ও দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি সম্পর্কিত) কঠোর সমালোচনা করেছেন, ইতিপূর্বে তা আমরা শুনি নি। কৃষ্ণমেননকে মনে রাখার মতো সওয়াল করে আজ তাঁর নির্বাচনী এলাকা থেকে কংগ্রেসী প্রার্থী হিসেবে বহিস্কৃত হতে হচ্ছে। এবারের অধিবেশনে তিনজন

কেন্দ্রীয় মন্ত্রীর (মেহতা-চোধুরী-সুব্রহ্মণিয়ম) পদত্যাগ বারম্বার দাবি করা হয়েছে। মন্ত্রিবর্গের বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগ ভাসা-ভাসা উত্তেজক কথামাত্র না হয়ে কঠিন আক্রমণের পথ ধরেছে, যার জবাব দিতে বেশ বেগ পেতে হয়েছে অভিযুক্ত মন্ত্রিবর্গকে। অনেকের পদত্যাগের গুজবও শোনা গেছেঃ শচীনবাবুর, সুব্রহ্মণিয়মের, পাতিল সাহেবের। অবশ্য শেষ পর্যন্ত সকলেই স্ব স্ব টিকেট রক্ষা করেছেন। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী সংসদ সদস্যদের স্বাধিকার হরণের অভিযোগকে বিশ্বাসযোগ্যভাবে খণ্ডন করতে পারেন নি। প্রধানমন্ত্রী যত শুনেছেন তত বলেন নি। মোটের ওপর ক্ষমতাসীন ক্যাম্প বেশ ম্লান ও বিব্রতবোধ করেছেন এবার।

সংসদ-ভবনের সামনে লক্ষ মানুষের সমাবেশ ও সরকারের পদত্যাগ দাবি আর একটি উল্লেখ্য ঘটনা যা নতুন অধ্যায়ের সংযোজন করেছে।

সবে মিলে এবারকার অধিবেশন সংসদের ঘরে-বাইরে ঝড়ের যে আবহ রচনা করেছিল তা আগামীকালেও স্মরণযোগ্য।

শ্রীভূপেশ গুপ্তের মতো প্রশান্ত এবং মাননীয় সদস্যকে যেদিন রাজ্যসভা ত্যাগ করে বাইরে এসে দাঁড়াতে হয়েছে সেদিন বেশ বোঝা যাচ্ছে যে, শৃঙ্খলাভঙ্গের জন্য একতরফা দায়িত্ব চাপানোর আর যৌক্তিকতা বর্তমান নেই। দেশের আকাশে-বাতাসে শৃঙ্খলাভঙ্গের ও অরাজকতার যে তাণ্ডব চলেছে, সংসদে তারই প্রতিচ্ছবি আমরা দেখতে পেয়েছি। এ অভিজ্ঞতার সঙ্গে আমাদের দুঃখ পরিতাপ আশঙ্কা ও ভীতি একাকার হয়ে রইল।

জানি না, এর পর কী!

ভারত-ইন্দোনেশীয় মৈত্রী

মাঝপথে ডঃ সোয়েকার্নো যে ফারাক সৃষ্টি করেছিলেন, ইন্দোনেশিয়ার সঙ্গে ভারতের বন্ধুত্বপূর্ণ মনোভাবের আবহমান ইতিহাসে সেটাকে নিতান্তই সাময়িক উত্তেজনাপূর্ণ টুকরো ঘটনা হিসেবে সরিয়ে রেখে উভয় দেশ আজ আবার কাছাকাছি এগিয়ে আসার সুযোগ পেল। ভারত-ইন্দোনেশীয় মৈত্রী জিন্দাবাদ!

পুরনো মধুর সম্পর্ককে পুনশ্চ সংগঠিত করবার শুভ ইচ্ছা নিয়ে ভারত সফরে এসেছিলেন ইন্দোনেশিয়ার পররাষ্ট্রমন্ত্রী ডঃ আদম মালিক। সফরান্তে উভয় দেশের পক্ষে একটি যুক্ত বিবৃতি প্রচার করে উভয় রাষ্ট্রের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক মৈত্রীকে সম্প্রসারিত করার ওপর গভীর আস্থা প্রকাশ করা হয়েছে। আশা করা যায়, এই আস্থা একটি সৌজন্যমূলক ইস্তাহারেই পর্যবসিত হবে না, কারণ ইন্দোনেশিয়ার সঙ্গে ভারতের সম্পর্ক অর্বাচীন নয়। উভয় দেশ যখন বিদেশী শোষণের দ্বারা নির্জিত, ঐক্যসূত্র তখন থেকেই তাদের বেঁধেছে। নেহরুজী এক সময় দেশের সমস্যার সঙ্গে ইন্দোনেশিয়ার সমস্যাকে তুল্যমূল্য গুরুত্ব দান করেছিলেন, যা অতি-নিকট স্মরণকালের ঘটনা।

ভারতে বৃটিশ, ইন্দোনেশিয়ায় ডাচ। উভয় দেশই ছিল সাম্রাজ্যবাদের শিকারক্ষেত্র। নেহরুজী তাই দুই দেশের জনগণকে সমান সহানুভূতির সঙ্গে দেখেছেন, ভাই-ভাই ভাবনায় উভয়ের কথা একই সঙ্গে বলেছেন। সেসব ইতিহাস ইন্দোনেশীয় ভাই-বোনদেরও স্মরণ থাকারই কথা।

দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়াকে তার আর্থিক ও বৈষয়িক উন্নতির জন্য সম্ভবদ্ধ হতে হবে আপনাপন স্বার্থেই। এ সত্য স্বয়ং ডঃ মালিক স্বীকার করে গেছেন এবং এ সত্য কারও স্বীকৃতির অপেক্ষাও রাখে না, এ হল প্রয়োজনের সত্য। এই প্রয়োজনকে স্বীকার করেই ভারত নিজে অপর দেশের আর্থিক সাহায্যের মুখাপেক্ষী হওয়া সত্ত্বেও ইন্দোনেশিয়ার উন্নতিকল্পে তার দিকে সাহায্যের বাহু এগিয়ে ধরেছে। দশ কোটি টাকা ঋণ দানে স্বীকৃত হয়েছে।

তাসখন্দ ঘোষণার মাধ্যমে ভারত তার শান্তি ও সহাবস্থানের নীতিকেই স্বীকৃতি জানিয়েছিল। আলোচ্য যুক্ত ইস্তাহারেও তাসখন্দ ঘোষণার ভিত্তিতেই প্রতিবেশী ঝগড়াট মিটিয়ে ফেলার কথা ঘোষিত হয়েছে। ইন্দোনেশিয়া আজ সেই শান্তির পথে সাগ্রহে সাড়া দিয়েছে। সমর্থন করেছেন আপোষ-মীমাংসার এই প্রচেষ্টাকে, যা আশা করা যায়, পাক নেতাদের মনোভাবের ওপর কিঞ্চিৎ প্রভাব বিস্তার করবে।

ভারত-ইন্দোনেশিয়ার যুক্ত ইস্তাহারে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় শান্তি স্থাপনার আগ্রহই বিশেষভাবে লক্ষণীয় হয়ে উঠেছে। এশিয়াবাসীকে এইভাবেই বহির্দেশীয় হস্তক্ষেপের বিরুদ্ধে সঙ্ঘবদ্ধ হতে হবে। সেদিক থেকে এই যুক্ত ইস্তাহার এশীয় রাজনীতির প্রেক্ষাপটেও তাৎপর্যপূর্ণ।

একটি সাংঘাতিক প্রশ্ন

কথায় বলে বজ্র আঁটুনি ফস্কা গেরো। আমাদের ভারতবর্ষেও হয়েছে তাই। প্রতিদিনের সংবাদপত্রের পৃষ্ঠা ওল্টালেই দেখা যাচ্ছে যেখানে কেঁচো খোঁড়ার জন্য সবে মাত্র একটি ঘা পড়েছে, সেখানে গোখরো কেউটে ফোঁস করে উঠছে। কখনো শুনছি বাঘের ঘরে ঘোঘের বাসা। ক্ষমতাসীন দলের দায়িত্বশীল নেতার বিরুদ্ধে শত্রুচরের পক্ষাবলম্বনের অভিযোগ। আবার কোথাও বিপক্ষ দলের ঘরের চৌকাঠে ওয়াচারের শিকার সন্ধানী দৃষ্টির অভিযোগ। শুনেছি, সাধারণের অসন্তোষ ঘুচোতে যত বেশি ব্যর্থতা প্রমাণিত হচ্ছে, সাধারণের স্বাধিকার হরণের জন্য ততই আইনী বজ্র আঁটুনির প্রয়োজন দেখা দিচ্ছে।

সম্প্রতি লোকসভায় অনেক ইন্টারেস্টিং অভিযোগের মধ্যে একটি সাংঘাতিক প্রশ্ন উত্থাপিত হলে দেশবাসী 'থ' বনে গেছেন। অভিযোগ উঠেছে এই মর্মে যে এম পি-দের ঘরের দোরের অপর পারে গোয়েন্দা চোখ চকচক করছে। এম পি-দের চিঠিপত্র খুলে তা সেন্সর করা হচ্ছে এবং তাঁদের টেলিফোন লাইন ট্যাপ করা হচ্ছে। কম্যুনিস্ট শ্রীনেপাজন, স্বতন্ত্র শ্রী এন জি রঙ্গা এবং পি এস পি শ্রীহেম বড়ুয়া একযোগে এই অভিযোগ করেছেন যে এ ব্যাপারে তাঁরা ভুক্তভোগী। এম পি-দের অভিযোগ অস্বীকার করে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অনেক কথাই বলবার চেষ্টা করেছেন, কিন্তু বলতে পারেন নি যে, চীনা আক্রমণের সময় কম্যুনিস্টদের ওপর নজর রাখার জন্য যে ওয়াচার বাহিনী ছাড়া হয়েছিল তা প্রত্যাহার করে নেওয়া হয়েছে কি না। এ প্রশ্ন কংগ্রেস সদস্য শ্রীমহাবীর ত্যাগী উত্থাপন করেন। উত্তর মেলে নি।

উত্তর মেলে নি চিঠি সেন্সরিং-এর অভিযোগের সুতরাং ব্যাপারটা যে গোলমেলে এ ধারণা সাধারণের মনে শিকড় গাড়তে অবশ্যই পারে।

কিন্তু ভারতীয় গণতন্ত্রের বড়াই করে আমরা যখন গায়ের পালক ফোলাই তখন এমনতর স্বাধিকার হননের চিত্র গণতন্ত্রের মুখে চুণকালি লেপন করছে, যার সুস্পষ্ট জবাব এখনো অপ্রাপ্ত।

একমাত্র শাসনতান্ত্রিক বেসামাল অবস্থাতেই সরকারকে এজাতীয় বজ্র আঁটুনির প্রয়োগ করতে হয়। ভারতের সর্বত্রও যে খুব একটা সামাল শান্ত আবহাওয়ায় বিরাজিত এমন নয়। কিন্তু তারই জন্য গণতান্ত্রিক স্বাধিকার হননের এতাদৃশ নজির গণতন্ত্রে বিসদৃশ। জনবিক্ষোভকে দমন করতে সরকার অনেক কড়া ব্যবস্থা গ্রহণ করছেন শুধু জনবিক্ষোভকে প্রশান্ত করার জন্য করণীয় কাজে ব্যর্থতা প্রমাণ হয়ে পড়ছে বলে। রাজনৈতিক দল নেতাদের জেলে পুরেছেন যখন তার শাসনতান্ত্রিক প্রয়োজন দেখা দিচ্ছে। প্রথমত একরকম বোঝা যায়। কিন্তু দেশব্যাপী নাগরিকবৃন্দের দৈনন্দিন

জীবনকে ওয়াচার মারফৎ সন্ত্রস্ত করে তোলার অর্থ খুঁজে বার করা দুরূহ—যতক্ষণ আমরা একটি গণতান্ত্রিক দেশে বসবাস করছি বলে বিশ্বাস রাখি। গণতন্ত্রে যেনতেন প্রকারেণ গদি আঁকড়ে থাকার কুমৎলব নেই। জনগণের আস্থার ওপরেই সরকারের স্থায়িত্ব নির্ভরশীল। ওই আদর্শে বিশ্বাস অটুট থাকলে অকারণ বজ্র আঁটুনির সত্যিই কোন প্রয়োজন থাকতে পারে না গণতন্ত্রে। কিন্তু এই সব সহজ প্রশ্ন আজ তালগোল পাকিয়ে নিরুত্তর হয়ে যাচ্ছে দিন দিন। সুতরাং আজ একটি সাংঘাতিক প্রশ্ন উঁকি দিচ্ছে, তবে কি এদেশে ক্রমশ গণতন্ত্রের শরীরে অসুস্থতা প্রবেশ করতে শুরু করেছে। যদি তাই হয় তবে বর্তমান ক্ষমতাসীন দলেরও সতর্ক হওয়া প্রয়োজন। কেন না একমাত্র গণতন্ত্রেই রাজনৈতিক দলের ভাগ্যে মেঘ-রৌদ্রের খেলা সম্ভব। পূর্বে হতাশার কারণ নেই। গণতান্ত্রিক অধিকার হননের দ্বারা যে সম্ভাবনার মূলোৎপাটন সুতরাং বিধেয় নয়।

ডঃ রাধাকৃষ্ণণ

আমাদের সর্বজন শ্রদ্ধেয় প্রিয় রাষ্ট্রপতি ডঃ সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণণ আটাত্তর বৎসর বয়সে পদার্পণ করলেন।

রাষ্ট্রপতির নিরপেক্ষ সত্যনিষ্ঠ দৃষ্টিভঙ্গীর পরিচয় জনগণ বারাম্বয়ে পেয়েছেন এবং তাঁর বিপুল কর্মময় জীবনে তাঁর অসংখ্য অবদানস্বরূপ করে তাঁর প্রতি সকৃতজ্ঞ শ্রদ্ধা নিবেদন করেছেন। দেশবাসীর শ্রদ্ধার আসনে এমন অটুট ও অবিচলিতভাবে অধিষ্ঠিত থাকার দুর্লভ সৌভাগ্য যিনি লাভ করেছেন, দেশবাসী তাঁর সুদীর্ঘ সাফল্যপূর্ণ কর্মময় জীবনের আরও ব্যাপ্তি সর্বদাই কামনা করে।

রাষ্ট্রপতির জন্মদিবসটিকে আমরা শিক্ষক দিবসরূপে পালন করে আসছি। প্রায় দুইশত শিক্ষক রাষ্ট্রপতির সঙ্গে সাক্ষাৎ করে তাঁর জন্মদিনে তাঁকে শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করে এসেছেন। কৃতী শিক্ষকবৃন্দকে জাতীয় পুরস্কারে ভূষিত করা হয়েছে।

কিন্তু তবুও একটি চিন্তা এই উপলক্ষে মনকে বিষাদাচ্ছন্ন করে, তা হল, গণতান্ত্রিক ভারত এমন পণ্ডিতশ্রেষ্ঠকে রাষ্ট্রীয় কর্ণধাররূপেই পেয়েছে; অথচ ভারতের আকাশ আজ যে দ্বন্দ্ব-দ্বেষ ও অজ্ঞান স্বার্থপরতার তমসাবৃত সে কলঙ্ক দূরীভূত হয় নি। এজন্য স্বয়ং রাষ্ট্রপতিও বিচলিত এবং বেদনাহত। তাঁর জন্মদিনে শুভবুদ্ধির আবাহন করে আমরা তাঁর প্রতি আমাদের শ্রদ্ধা নিবেদন করি।

এ কি রে দুর্দৈব!

উড়িষ্যায়ঃ

দেশ যে অরাজকতার পথে দ্রুত অগ্রসর হয়ে চলেছে মহারাষ্ট্রের পর উড়িষ্যায় রাজনৈতিক সংকট তারই অন্যতম প্রমাণ, অপরাপর দৃষ্টান্ত বাহুল্যমাত্র।

উড়িষ্যায় আরও বিচিত্র ব্যাপার। মুখ্যমন্ত্রী শ্রীসদাশিব ত্রিপাঠীর প্রতি তাঁর মন্ত্রিসভার তেরজনের মধ্যে বারজন মন্ত্রী-উপমন্ত্রীই অসদয় হয়ে উঠলেন সদাশিবের 'ইচ্ছামত' দপ্তর পুনর্বণ্টনের আঘাতে। দপ্তর পুনর্বণ্টনে অসন্তুষ্ট মন্ত্রিসভা এক সপ্তাহ কালের মধ্যেই অকস্মাৎ একযোগে পদত্যাগপত্র পেশ করলেন। তেরজনের একজন সৌভাগ্যত উড়িষ্যার বাইরে: উড়িষ্যার প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী শ্রীবিজু পট্টনায়কের সঙ্গে বৈঠকে মিলিত হওয়ার সুযোগ তাঁর ঘটে ওঠে নি। তাঁর মনোগত ইচ্ছাও এ পর্যন্ত

শ্রীসদাশিব ত্রিপাঠী

অপ্রকাশিত আছে। শ্রীত্রিপাঠী এই বিপর্যয় সম্পর্কে কোন মন্তব্য করেন নি। শ্রীপট্টনায়ক স্বীকার করেছেন, বিক্ষুব্ধ মন্ত্রিসভা তাঁদের অসন্তোষ তাঁর কাছে উপস্থাপিত করেন। শ্রীত্রিপাঠী তাঁর সহকর্মিবৃন্দের সঙ্গে একত্রে কাজ করায় যেহেতু কতকগুলি বাস্তব অসুবিধা ভোগ করছিলেন, সেজন্য তিনি নিজেই মন্ত্রিসভা থেকে সরে দাঁড়াতে চেয়েছেন। এ সম্পর্কে দিল্লীতে তাঁর পত্রও পৌঁছে গেছে, উত্তর আসে নি। তবে যতদূর জানা গেছে, কংগ্রেস হাইকমান্ড বর্তমান নেতৃত্বের রদবদলে অনিচ্ছুক। অথচ পদত্যাগী মন্ত্রিগণ পদত্যাগ পত্র প্রত্যাহারে অদ্যাবধি গররাজি। এমতাবস্থায় উড়িষ্যার সংকট মহারাষ্ট্রের মত ক্ষণিক হারজিতের খেলায় পর্যবসিত হবে বলে মনে হয় না।

মন্ত্রিগঠনের এতাদৃশ শৃঙ্খলাভঙ্গের নজির যদিচ নিতান্ত হালের ঘটনা, রেখাগ্রেখির ঘটনাস্রোত, কিন্তু আকস্মিক নয়। অন্যান্য অনেক রাজ্যের মতই এখানেও মুখ্যমন্ত্রিত্বের আসনটি কোন অবিসংবাদী নেতৃত্বের দখলে নেই। অন্তর্দাহ তাই ধিকি ধিকি জ্বলছিলই। এখন অগ্ন্যুৎপাত সুস্পষ্ট দেখা দিয়েছে।

এককালে জনসেবাই যে দেশে রাজনীতির মূল লক্ষ্য ছিল, আজ রাজনীতি সেক্ষেত্রে 'কেরিয়ার' রচনাকারীদের চক্রান্তবিশেষে পরিণত লাভ করেছে। জনগণের প্রতি মমত্ববোধে নয়, গোষ্ঠী ও ব্যক্তিস্বার্থে রাজনীতির প্রাঙ্গণ গমগম করছে।

মহারাষ্ট্রেঃ

মহারাষ্ট্রেও শৃঙ্খলাভঙ্গের এক বিচিত্র ঘটনা প্রত্যক্ষ করতে হয়েছে সম্প্রতি। 'বন্বে বন্ধ' ও 'ঘেরা ডালো' উপলক্ষে কেন বর্তমান সরকার পিটিয়ে ঠাণ্ডা করার নীতি গ্রহণ করেন নি, এজন্য বৃহত্তর বোম্বাই থেকে নির্বাচিত সতেরজন আইনসভা সদস্য সহ দুজন মন্ত্রী পদত্যাগ করেছিলেন। অর্থাৎ ক্ষমতা মদমত্ততায় ক্ষমতাসীন দলই ভেতরে ভেতরে চিড় ফাঁক হয়ে আসছে। অরাজকতার মূল শেকড় গেড়েছে সেখানেই, অন্যে পরে আর কথা কি।

মহারাষ্ট্রের শাসনতান্ত্রিক কাঠামোটাই ক্ষমতার টাগ অব ওয়ারে নড়বড়ে হয়ে আছে। এ সমস্যা উত্তর প্রদেশ সহ অন্যান্য দু-একটি রাজ্যেও অরাজক অবস্থারই মুখোস ঢাকা অবয়ব সৃষ্টি করে রেখেছে। কিন্তু সে প্রসঙ্গে বিস্তারিত আলোচনা করার স্থান এটা নয়। প্রসঙ্গত শুধু ভূতপূর্ব কেন্দ্রীয় মন্ত্রী শ্রীহুমায়ুন কবীরের পদত্যাগপত্রের একটি বিশেষ অংশ এখানে তুলে ধরে কংগ্রেসী সাজানো বাগান শুকিয়ে যাওয়ার অন্তর্নিহিত রহস্যের কিছু নমুনা উদ্ধার করা যেতে পারে।

শ্রীকবীর কংগ্রেস থেকে পদত্যাগ করার কারণস্বরূপ যে যে বিষয় উল্লেখ করেছেন তারই অন্যতম হলঃ কংগ্রেস আজ ক্ষমতাসীন একটি শক্তিশালী গোষ্ঠীর স্বার্থে গণতন্ত্রকে জলাঞ্জলি দিতে চলেছে। ফলত শাসনতান্ত্রিক অগ্রগতি ব্যাহত হচ্ছে।

বস্তুত মহারাষ্ট্রে এই ক্ষমতাদ্বন্দ্ব তীব্রতর আকার ধারণ করে সরাসরি শক্তি পরীক্ষায় অবতীর্ণ হয়েছিল। সৌভাগ্যত অপেক্ষাকৃত গণতান্ত্রিক মনোভাবাপন্ন নায়েক নেতৃত্বই অবশেষে জয়ী হয়েছে। বি পি সি সির বিভেদ সৃষ্টিকারী দল শেষ পর্যন্ত প্রমাদ গণনা করে রণে ভঙ্গ দিতে বাধ্য হয়েছেন। পদত্যাগপত্রগুলি প্রত্যাহৃত হয়েছে এবং সভাপতি স্বয়ং শ্রী খের খেদ প্রকাশ করে শ্রীনায়েকের শক্তিকে আরও সুদৃঢ় ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠা দিতে বাধ্য হয়েছেন।

কিন্তু এই হারাজিতের খেলায় বি পি সি সি-কে নামতে হয়েছিল কেন? ইতিহাসের অমোঘ নিয়মেই এটা অনিবার্য ছিল। নির্বাচনের আগে একটা শক্তি-পরীক্ষার প্রয়োজন ছিল।

মহারাষ্ট্রে বোম্বে একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে আছে, যেন রাজ্যের ভেতর বোম্বে অঘোষিতভাবে একটি স্বতন্ত্র রাজ্যের মর্যাদা ভোগ করছে। কারণ, কেন না, বোম্বে মানেই কুবেরের আড্ডা। সুতরাং কুবেরী আখড়া মহারাষ্ট্র কংগ্রেস মায় সরকারকে পর্যন্ত ফুঁকে দেওয়ার একটা চেষ্টা করেছিল, কিন্তু কেন্দ্রীয় মন্ত্রী জনপ্রিয় মহারাষ্ট্রীয় নেতা চ্যবনের দলের হাতে প্রচণ্ড প্রত্যুত্তর পেয়েছে।

বোম্বের ধনিক গোষ্ঠী বি পি সি সি অধিকার করে জনসাধারণের স্বাভাবিক দাবি-দাওয়াকে জাহান্নমে পাঠাইতে মনস্থ ছিলেন। কার্যত সসম্মানে তাঁদের হার স্বীকার করতে হয়েছে। শুধু পদত্যাগ প্রত্যাহারই নয়, নাটের গুরু মন্ত্রিবর শ্রীশান্তিলাল সাহাকে স্বীয় অভিমান নিয়ে মানে মানে মন্ত্রিসভা থেকে সরে যেতে বাধ্য হতে হয়েছে। নায়েক মন্ত্রিসভা তাঁর পদত্যাগ গ্রহণ করে কুবের সম্প্রদায়ের ভোঁতা মুখ ভোঁতা করে দিয়েছেন। শ্রীশান্তিলাল সাহের কুবেরতোষণী কার্যকলাপের জন্য ইতিপূর্বে তাঁর হাত থেকে শ্রমদপ্তর কেড়ে নিতে হয়েছিল। অবশেষে তাঁকে মন্ত্রিত্বের আশাই ত্যাগ করতে হ'ল। কুবেরগোষ্ঠী তাঁকে রক্ষা করতে পারে নি, তিনিও কুবের স্বার্থ-রক্ষায় অক্ষম হলেন। ফলত মহারাষ্ট্রে বোম্বে প্রদেশ কংগ্রেসের কুবেরী ক্ষমতাও হ্রাস পেল এবং চ্যবন-পথ অনুসরণ করে শ্রীনায়েকের জয় প্রকারান্তরে গণতান্ত্রিক পদ্ধতির জয় বলে ঘোষিত হ'ল।

কংগ্রেসী ঘরে মুষ্টিমেয়ের স্বার্থে যে ক্ষমতা কাড়াকাড়ির দ্বন্দ্ব চলেছে সেখানেও শেষ পর্যন্ত গণস্বার্থবাদীরাই টিকে যাবেন, জনগণকে পিটিয়ে জনগণ-অর্জিত স্বাধীনতার 'মোয়া' ভোগ করব ভেবে আজও যাঁরা বিভিন্ন রাজ্যে একচক্ষু কুবুদ্ধির সাধনা করছেন, শ্রীশান্তিলাল সাহের দৃষ্টান্তে তাঁরা এবার হয়ত সচেতন হবেন এবং কংগ্রেসী ঘরে দুর্দৈব ঠেকাতে গণশক্তির চেহারাটা যথার্থ উপলব্ধি করবেন। করেন ভাল, না করেন শ্রীশান্তিলাল সাহের দৃষ্টান্ত তো রয়েছেই।

উত্তরপ্রদেশ:

নির্বাচনী প্রস্তুতি

যেমন স্বাভাবিক, উত্তরপ্রদেশ প্রজা সোস্যালিস্ট পার্টি নিজেকে 'এক ঘরে' করেই রেখেছে, কিন্তু অন্যান্য দলের মধ্যে জোট বাঁধার ও আগামী নির্বাচনে দলবদ্ধভাবে আক্রমণ রচনার তোড়জোড় সমানে চলছে। অবশ্য স্বতন্ত্র ও জনসঙ্ঘ সংযুক্ত বাম ফ্রন্ট থেকে সরে দাঁড়িয়ে জনতার মধ্যে আপন স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখার গুরুদায়িত্বে অটুট আছেই। তবে এ'রা উভয়ে একটি যুক্ত ফ্রন্ট গঠনে বদ্ধপরিকর। অন্য দিকে সংযুক্ত বাম জোট গঠন করেছেন সংযুক্ত সোস্যালিস্ট, উভয় পক্ষ কমিউনিস্টগণ, রেপাবলিকান্স ও রেভলিউশনারী সোস্যালিস্ট পার্টি, সুতরাং উত্তরপ্রদেশ কংগ্রেসকে প্রধানত বাম ফ্রন্ট ও স্বতন্ত্র জনসঙ্ঘের সঙ্গে লড়তে হবে। পি এস পি বিধানসভায় শ' খানেক ও সংসদে সতেরটি ভোটপ্রার্থী খাড়া করলেও নির্বাচনী যুদ্ধে দল হিসেবে খুব একটা পাত্তা পাবে বলে কেউ বিচলিত বোধ করছেন না।

বাম ফ্রন্ট আগামী নির্বাচন সম্পর্কে বেশ আশান্বিত। কেন না বিগত তিনটি নির্বাচনে কংগ্রেসের শক্তি ধারাবাহিক ক্ষয় হয়ে এসেছে। এবারে বাম ফ্রন্ট অন্তত চল্লিশ শতাংশ আসন সংগ্রহের আশা রাখেন। গত নির্বাচনে এস এস পি, কমিউনিস্ট ও রেপাবলিকান একত্রে শতকরা আঠাশ দশমিক তিনটি আসন সংগ্রহ করে। এবার জনসঙ্ঘকেও এস এস পি নির্বাচনী আঁতাতে আহ্বান জানিয়েছিল; কিন্তু বৃথা। জনসঙ্ঘ স্বতন্ত্র আদর্শগতভাবে প্রতিক্রিয়াবাদে একে অপরের দোসর। তথাচ অনেকেই এখনও হাল ছাড়েন নি।

কংগ্রেস পক্ষে তো ভাঙা হাট। সি এম (মুখ্যমন্ত্রী) সি সি (কংগ্রেস চীফ) এবং সি বি (চন্দ্রভানু গুপ্ত)-র সি কিউবে এখনও পোড় খাচ্ছে। সুতরাং কংগ্রেস পক্ষে হতাশা বেশ ঘনীভূত।

'৫২ সালের নির্বাচনে কংগ্রেসপক্ষে ভোট পড়েছিল শতকরা সাতচল্লিশ দশমিক প'চানব্বই। '৫৭ সালে কংগ্রেস পেয়েছে বিয়াল্লিশ দশমিক বিয়াল্লিশ শতাংশ এবং বিগত বাষট্টির নির্বাচনে এই পক্ষের অবস্থা ছিল মাত্র ছত্রিশ-দশমিক তিনটি ভোট। চারশত প'চিশ আসন সংশ্লিষ্ট সভায় কংগ্রেসের শক্তি ছিল দুইশত ঊনপঞ্চাশ।

এবার এস এস পি প্রার্থী খাড়া করছে বিধানসভায় দু'শ দশ, সংসদে চল্লিশ। দক্ষিণ সি পি আই যথাক্রমে দেড়শ ও প'চিশ। বাম কমিউনিস্ট ষাট ও পাঁচ।

উত্তরপ্রদেশের আগামী নির্বাচনী প্রস্তুতি বর্তমানে উত্তেজিত আবহাওয়ায় গম গম করছে। মুখ্যমন্ত্রী শ্রীমতী কৃপালনী দিল্লীতে কংগ্রেস প্রেসিডেন্ট এবং প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে দরবার করতে ছুটেছেন। তাঁর তরফে এবং অন্যান্যের চেষ্টায় ইউ পি সি সি-র বিরুদ্ধবাদী দলের সঙ্গে একটি প্রাক নির্বাচনী বোঝাপড়ায় উপনীত হওয়ার প্রচেষ্টা চালানো হচ্ছে। উত্তরপ্রদেশ বর্তমানে সি কিউবের তিনমুখো নেতৃত্বলোভী চাপে বেকায়দা। মন্ত্রিসভা বিরোধীরা চাইছেন কংগ্রেস সভাপতি (যাঁকে আমরা সি সি বা কংগ্রেস চীফ বলেছি) শ্রীকমলাপতি ত্রিপাঠীর জন্য মুখ্যমন্ত্রীর আসনটি বায়না করে রাখতে। বর্তমান মুখ্যমন্ত্রী শ্রীমতী কৃপালনী গদী ছাড়তে স্বভাবতই গররাজি, ওদিকে চন্দ্রভানু গুপ্তের দল মুখ্যমন্ত্রীর চেয়ারটি শ্রীগুপ্তের দখলেই আনতে সচেষ্ট।

এখন গদী অধিকারী উত্তরপ্রদেশ কংগ্রেস যাতে না নির্বাচনী ভরাডুবি করে বসে হাইকমান্ড সেদিকে দৃষ্টি রেখে একটা মীমাংসার চেষ্টা অবশ্যই করবেন। হায়, গদীর টানে এখন প্রায় পার্টি ভেঙে যায় যায় অবস্থা।

পুলিশরাজ

এলাহাবাদ হাইকোর্টের প্রাক্তন বিচারপতি শ্রীআনন্দ নারায়ণ মুল্লা উত্তরপ্রদেশ সরকারের সাম্প্রতিক বন্ধ নিবারণী ব্যবস্থাকে অর্থাৎ অত্যাবশ্যক কার্য সৃষ্টির প্রতি একটি পদক্ষেপ বলে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, জনসাধারণকে এই অর্ডিন্যান্স বিচারালয়ে বিচারপ্রার্থী হওয়ার সুযোগ দান করে নি, পুলিশের হাতে বরং তুলে দিয়েছে অসীম ক্ষমতা। একটি সাধারণ কনস্টেবল, ধর্মঘটী কর্মচারী বা শিক্ষককে গ্রেপ্তার করার মালিক। সরকার বিক্ষোভ নিবারণের আর কোন পথ খুঁজে পেলেন না, আবিষ্কার করলেন দমনমূলক পুলিশীতন্ত্র।

এলাহাবাদে অনুষ্ঠিত একটি সেমিনারে উক্ত অর্ডিন্যান্সের প্রতি একবাক্যে ধিক্কার জানানো হয়েছে।

গত সরকারী কর্মচারীদের ধর্মঘটের ফলে সরকারকে ঘাড় নোয়াতে হওয়ায় উত্তর প্রদেশ সরকার এবার যে অর্ডিন্যান্সের আশ্রয় গ্রহণ করতে চলেছেন, বাস্তবিক তা সর্বতোভাবে জনগণের গণতান্ত্রিক অধিকারকে নির্মমভাবে পর্যুদস্ত করতেই বদ্ধ পরিকর। সরকার বিক্ষোভের মোকাবিলায় হেরে গিয়ে বিক্ষোভকারীর গলা টিপে ধরতে উদ্যত হয়েছেন। এই অসুস্থ মনোভাবের প্রতি চতুর্দিকে আপত্তি উঠেছে প্রচণ্ডভাবে। সরকার এর ফলাফল সম্পর্কে অবহিত হ'ন, গণতন্ত্রের মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী সকলেই সেই কামনাই করেন।

বৃটেনঃ

তীব্র উত্তেজনার মধ্যে ৬ই সেপ্টেম্বর মার্লবরো হাউসে কমনওয়েলথ প্রধানমন্ত্রী সম্মেলন শুরু হয়েছে। দক্ষিণ রোডেশিয়ায় আইয়ান স্মিথের সংখ্যালঘু শ্বেতাঙ্গ শাসনের বিরুদ্ধে বৃটেন উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারে নি। এতে আফ্রিকীয় রাষ্ট্রগুলি অত্যন্ত ক্ষুব্ধ। এ ব্যাপারে কোন সুমীমাংসা না হলে জাম্বিয়া কমনওয়েলথ ত্যাগ করবে বলে হুমকী দিয়েছে। আরও দুই-একটি রাষ্ট্রও হয়তো সেক্ষেত্রে জাম্বিয়ার পথ অনুসরণ করবে।

কমনওয়েলথের মোট ২৩টি সদস্য-রাষ্ট্রের মধ্যে ২২টি রাষ্ট্রের প্রধানমন্ত্রী, রাষ্ট্রপতি বা অন্য কোন বিশিষ্ট মন্ত্রী সম্মেলনে যোগ দিয়েছেন। কেবলমাত্র তানজানিয়া এবারের সম্মেলনে যোগ দেয় নি। জাম্বিয়ার রাষ্ট্রপতি কেনেথ কাউন্ডা বৃটেনের রোডেশিয়া নীতির প্রতিবাদেই সম্মেলনে আসেন নি—তবে তিনি তাঁর পররাষ্ট্রমন্ত্রী সাইমন কাপুইপিকে সম্মেলনে পাঠিয়েছেন। কেনিয়ার রাষ্ট্রপতি জোমো কেনিয়াট্টার অনুপস্থিতিও উল্লেখযোগ্য। ভারতের প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী, পাকিস্তানের রাষ্ট্রপতি আয়ুব খাঁ, সিংহলের প্রধানমন্ত্রী ডাডলি সেনানায়ক, এ'রাও আসেন নি। বৃটেনের প্রধানমন্ত্রী হ্যারল্ড উইলসন সম্মেলনে সভাপতিত্ব করছেন। আর যাঁরা সম্মেলনে যোগ দিয়েছেন, তাঁরা হলেনঃ ডোনাল্ড স্যাংস্টার (জ্যামাইকা), আলবার্ট মারগাই (সিয়েরা লিয়ন), সাইমন কাপুইপি (জাম্বিয়া), ব্রিগেডিয়ার ওগানডিপে (নাইজেরিয়া), জোশেফ মুরুম্বি (কেনিয়া), আর্চবিশপ ম্যাকারিয়স (সাইপ্রাস), ফরবেস বার্নহাম (গায়না), স্বরণ সিং (ভারত), দাওদা জওয়ারা (গাম্বিয়া), পি সোলোমন (ত্রিনিদাদ টোবাগো), লি কুয়ান ইউ (সিঙ্গাপুর), জে ডাবলিউ কে হার্টলি (ঘানা), সরিফুদ্দিন পিরজাদা (পাকিস্তান), এ এফ বিজেমান্নে (সিংহল), হ্যারল্ড হল্ট (অস্ট্রেলিয়া), হেস্টিংস বান্দা (মালাউই), বোর্গ ওলিভিয়ের (মাল্টা), মিলটন ওবোটে (উগান্ডা), কিথ হোলিয়াক (নিউজিল্যান্ড), টুঙ্কু আবদুল রহমান (মালয়েশিয়া) ও লেস্টার পিয়ারসন (ক্যানাডা)।

সম্মেলন শুরুর দিন মার্লবরো হাউসের সম্মুখে কয়েকটি বিক্ষোভ প্রদর্শন করা হয়। আফ্রিকার ছাত্ররা রোডেশিয়ায় স্মিথ শাসনের অবসান দাবি করে বিক্ষোভ প্রদর্শন করে। কিছু শ্বেতাঙ্গ আবার স্মিথের পক্ষেও

কমনওয়েলথ প্রধানমন্ত্রী সম্মেলনে জোসেফ মুরুম্বীর (কেনিয়া) সঙ্গে স্বরণ সিং

বক্তব্য রাখার চেষ্টা করে। ঘানায় বর্তমান সামরিক শাসনের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ প্রদর্শিত হয়। পূর্ব-পাকিস্তানে আয়ুবী নীতির বিরুদ্ধেও লন্ডন প্রবাসী পূর্ব-পাকিস্তানের ছাত্র ও শ্রমিকরা বিক্ষোভ জানায়।

সম্মেলনের প্রথমেই দক্ষিণ রোডেশিয়ার বিষয় নিয়ে আলোচনা শুরু হয়। কমনওয়েলথ রাষ্ট্রগুলির প্রবীণ সচিবদের মধ্যে প্রারম্ভিক আলোচনার দ্বারা এই সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। এ ব্যাপারে ভারতের পররাষ্ট্রমন্ত্রী সর্দার স্বরণ সিং বিশেষ উদ্যোগ গ্রহণ করেন।

রোডেশিয়া প্রশ্ন আলোচনার সময় হ্যারল্ড উইলসন সভাপতির আসন ত্যাগ করে প্রবীণতম প্রধানমন্ত্রী লিস্টার পিয়ারসনকে সভাপতিত্ব করার জন্য অনুরোধ করেছিলেন। কারণ, রোডেশিয়ার ব্যাপারে বৃটেনের বিরুদ্ধেই প্রধান অভিযোগ, এবং উইলসন তাঁর চাতুরীর দ্বারা মূল বিষয়টি এড়িয়ে যাচ্ছেন—আইয়ান স্মিথকে রক্ষা করছেন, কেনেথ কাউন্ডা প্রভৃতি এই সমালোচনা করেছেন। তাই উইলসন চেয়েছিলেন, আলোচনা যাতে ঠিকভাবে হতে পারে, তার জন্য আলোচনার সময় তাঁর সভাপতির আসনে না থাকাই বাঞ্ছনীয়। কিন্তু উগান্ডার রাষ্ট্রপতি মিলটন ওবোটে, গায়নার প্রধানমন্ত্রী ফরবেস বার্নহাম, এমন কি জাম্বিয়ার পররাষ্ট্রমন্ত্রী সাইমন কাপুইপিও এতে আপত্তি করেন এবং সবাই বলেন, উইলসনের সভাপতির আসন ত্যাগ করার কোন প্রয়োজন নেই। এতে আলোচনার কোন অসুবিধা হবে না।

আফ্রিকার বিভিন্ন সদস্য বৃটেনের রোডেশিয়া নীতির তীব্র সমালোচনা করে বক্তৃতা করেন। এ'দের মধ্যে জাম্বিয়ার সাইমন কাপুইপি, সিয়েরা লিয়নের আলবার্ট মারগাই, উগান্ডার মিলটন ওবোটে ও কেনিয়ার জোশেফ মুরুম্বির নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। গায়নার ফরবেস বার্নহাম, ভারতের স্বরণ সিং, ক্যানাডার লিস্টার পিয়ারসন ও সাইপ্রাসের ম্যাকারিয়স মোটামুটি আফ্রিকার বক্তব্যকে সমর্থন করেন। এ'দের বক্তব্য হলঃ বৃটেন দক্ষিণ রোডেশিয়ায় আইয়ান স্মিথের অবৈধ ও সংখ্যালঘু শ্বেতাঙ্গ শাসনের বিরুদ্ধে ব্যর্থ হয়েছে। বৃটেন কর্তৃক অবলম্বিত অর্থনৈতিক অবরোধ সফল হয় নি। সুতরাং তাঁদের দাবিঃ (১) স্মিথ শাসনের অবসানের জন্য কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে; (২) রাষ্ট্রসঙ্ঘ সনদের সপ্তম ধারা অনুযায়ী নিরাপত্তা পরিষদের কাছে দক্ষিণ রোডেশিয়ার বিরুদ্ধে অবরোধ গ্রহণের জন্য আবেদন জানাতে হবে; এবং (৩) 'এক মানুষ, এক ভোট' নীতির ভিত্তিতে সংখ্যাগুরু আফ্রিকীয়দের শাসন প্রতিষ্ঠা না করা পর্যন্ত বৃটেন দক্ষিণ রোডেশিয়ার স্বাধীনতা স্বীকার করতে পারবে না।

বক্তৃতা প্রসঙ্গে অনেক রাষ্ট্রনেতাই বৃটেনের সরকার বিশেষ করে প্রধানমন্ত্রী উইলসনকে তীব্রভাবে আক্রমণ করেন। তাঁদের অভিযোগ, বৃটিশ সরকার আন্তরিকতার সঙ্গে স্মিথ সরকারের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করছেন না, স্বজাতি শ্বেতাঙ্গদের বিরুদ্ধে তাঁরা কঠোর হতে পারছেন না। শেষ পর্যন্ত স্মিথ শাসনকে স্বীকার করে

নেবার মতলব আছে বৃটেনের। এঁদের অনেকেই অবিলম্বে বলপ্রয়োগের দাবি করেছেন। ঘায়নার বার্নহাম আবেগের সংগে উইলসনকে প্রশ্ন করেনঃ ভারত, কেনিয়া বা ঘানায় স্বাধীনতা আন্দোলন দমনের সময় বলপ্রয়োগ করতে তো আপনাদের বাধে নি। এই সেদিনও আপনারা আমার দেশ ঘায়নায় বলপ্রয়োগ করেছেন। আজ তবে স্মিথের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করতে আপনাদের হাত উঠছে না কেন?

রোডেশিয়ার ব্যাপারে আফ্রিকার রাষ্ট্রগুলির মধ্যে তীব্র ক্ষোভ, এমন কি কমনওয়েলথ ত্যাগের হুমকী থাকলেও এ প্রশ্নে এই সংস্থা যাতে ভেঙে না যায়, অথবা সম্মেলনে যাতে অচল অবস্থার সৃষ্টি না হয় তার জন্য কয়েকজন বিশেষভাবে চেষ্টা করেন। আপোষ-মীমাংসার জন্য যে তিনজন প্রধান উদ্যোগীর ভূমিকা গ্রহণ করেছেন, তাঁরা হলেনঃ স্বরণ সিং, মিলটন ওবোটে ও জোশেফ মুরুম্বি।

একদিকে রোডেশিয়ার প্রশ্নে সদস্যদের মধ্যে তীব্র ক্ষোভ, এবং অপরদিকে সকলের পক্ষে গ্রহণযোগ্য মীমাংসার জন্য আন্তরিক প্রয়াস, এর ভেতর দিয়ে একটা সিদ্ধান্ত গ্রহণ সম্ভব হবে বলেই মনে হয়। এই প্রবন্ধ লেখার সময় (১১ই সেপ্টেম্বর) পর্যন্ত অবশ্য কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয় নি। সম্মেলনের অধিবেশন তখনও চলছে।

উইলসন ও তাঁর সরকারের ওপর এবার প্রচণ্ড চাপ পড়েছে। উইলসন তাঁর বক্তৃতায় স্বীকার করেছেন, অর্থনৈতিক অবরোধ ব্যবস্থায় যতটা সাফল্যলাভ হবে বলে তিনি আশা করেছিলেন, তা হয় নি। তবে স্মিথ সরকার খুবই অসুবিধার মধ্যে পড়েছে, এ কথা তিনি বোঝাবার চেষ্টা করেছেন।

উইলসন তাঁর মন্ত্রিসভার এক জরুরী বৈঠকের অনুষ্ঠান করেছেন শনিবার ১০ই সেপ্টেম্বর। তথ্যাভিজ্ঞ মহলের ধারণা, বৃটিশ সরকার শেষ পর্যন্ত দক্ষিণ রোডেশিয়ার বিরুদ্ধে বিধিবদ্ধ অবরোধ ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য নিরাপত্তা পরিষদে আবেদন করতে সম্মত হবেন। বৃটিশ অবরোধ ব্যবস্থাও কঠোর করা হবে।

দক্ষিণ আফ্রিকাঃ

দক্ষিণ আফ্রিকার বর্ণবৈষম্য নীতির প্রবলতম সমর্থক প্রধানমন্ত্রী হেনড্রিক ভেরউর্ড আততায়ীর গুলীতে নিহত হয়েছেন।

৬ই সেপ্টেম্বর কেপটাউনে পার্লামেন্টের নিম্ন কক্ষে অধিবেশন শুরু হবার মুখে একজন শ্বেতাঙ্গ ভেরউর্ডকে ছুরিকাঘাত করে, এবং এই আঘাতে তাঁর মৃত্যু হয়। গত মার্চ মাসে সাধারণ নির্বাচনের পর পার্লামেন্টে এইদিনই ভেরউর্ডের প্রথম বক্তৃতা করার কথা ছিল। এবারের নির্বাচনে তাঁর দল ন্যাশনাল পার্টি আরও বেশি সংখ্যাগরিষ্ঠতা নিয়ে জয়লাভ করেছে।

ভেরউর্ডের আততায়ীর নাম ডিমিট্রিও জাফেন্ডাস। জাফেন্ডাস গ্রীক বংশোদ্ভূত, এবং পার্লামেন্টের বার্তাবহের চাকরীতে নিযুক্ত ছিল।

এই হত্যাকাণ্ডের সংগে রাজনীতির কোন সংস্রব আছে বলে মনে হয় না। পার্লামেন্টের বার্তাবহরূপে সামান্য মজুরীপ্রাপ্তি ও অন্যান্য কারণে হতাশা থেকে জাফেন্ডাস ভেরউর্ডকে হত্যা করেছে, সংবাদপত্রে এইরূপ সংবাদই প্রকাশিত হয়েছে। তবে এখনও পুলিশের জিজ্ঞাসাবাদ চলছে।

আততায়ীর হাতে রাষ্ট্রনায়কের নিহত হবার ঘটনা নতুন নয়। তবে প্রশ্ন হলঃ ভেরউর্ডের মৃত্যুর ফলে দক্ষিণ আফ্রিকার রাজনীতিতে, বিশেষ করে বর্ণবৈষম্য নীতির ক্ষেত্রে কি কোন

ভেরউড

পরিবর্তন দেখা দেবে? এই প্রশ্নের উত্তর এখনই দেয়া শক্ত। তবে ভেরউর্ডের মৃত্যুর পর ন্যাশনাল পার্টির সংসদ সদস্যদের যে বৈঠক হয়, তাতে সর্বসম্মতিক্রমে ঘোষণা করা হয়েছে, ভেরউর্ডের নীতি ষোল আনা অনুসরণ করা হবে। ভেরউর্ডের সহকর্মীরা সবাই বর্ণবৈষম্যের উগ্র সমর্থক। তবু শাসনের দায়িত্ব যাঁর ওপর পড়বে, তিনি কিভাবে এই নীতি পরিচালনা করেন তা নিশ্চয়ই লক্ষ্য করতে হবে।

ভেরউর্ডের উত্তরাধিকারী। কে হবেন, তা এখনও ঠিক হয় নি। আপাততত অর্থমন্ত্রী ইবেন ডঙ্গেস অস্থায়ী প্রধানমন্ত্রী রূপে কাজ চালাচ্ছেন। আগামী সপ্তাহে ন্যাশনালিস্ট পার্টির ১৬৫ জন সংসদ-সদস্যের সভায় চূড়ান্ত ভাবে প্রধানমন্ত্রী নির্বাচন করা হবে। ইবেন ডঙ্গেস ছাড়াও বিচারমন্ত্রী বালথাজার জোহানেস ভর্স্টার, পরিবহন মন্ত্রী বেন স্যুমান, অর্থনৈতিক উন্নয়ন দপ্তরের মন্ত্রী হাক, এবং ন্যাশনালিস্ট পার্টির বিশিষ্ট নেতা পিটার বোথা ও জান দ্য ক্লার্কের নাম প্রধানমন্ত্রীপদের সম্ভাব্য প্রার্থীরূপে শোনা যাচ্ছে।

ভিয়েতনামঃ

১১ই সেপ্টেম্বর দক্ষিণ ভিয়েতনামে সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়ে গেল। প্রধানমন্ত্রী জেনারেল কাও কাই ও তাঁর সামরিক পরিষদের সিদ্ধান্ত মত এই নির্বাচন হয়েছে। এই নির্বাচনের দ্বারা ১১৭টি আসনবিশিষ্ট একটি গণপরিষদ গঠিত হবে। এই গণপরিষদ দক্ষিণ ভিয়েতনামের জন্য একটি সংবিধান রচনা করবে, এবং এই সংবিধান অনুসারে আইনসভা ও অসামরিক শাসনের প্রতিষ্ঠা করা হবে।

বৌদ্ধ নেতারা এই নির্বাচন বয়কট করেছেন। তাঁরা নির্বাচনের পূর্বে কাও কাই সরকারের পদত্যাগ দাবি করেছিলেন। কাও কাই-এর নিয়ন্ত্রণাধীন নির্বাচন স্বাধীন ও সুষ্ঠু হতে পারে না। 'জাতীয় মুক্তি ফ্রন্ট' বা ভিয়েত কং গেরিলারা এই নির্বাচনকে একটা মস্ত প্রহসন বলে অভিহিত করেছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও তাদের তাঁবেদার চক্রের সুবিধামত কিছু লোকের এই নির্বাচনকে কখনও জনসাধারণের অভিমত বলে গ্রহণ করা চলবে না।

প্রভাবশালী বৌদ্ধ নেতা ও ভিয়েত কং-দের বিরোধিতা সত্ত্বেও কাও কাই সরকার নির্বাচনের ব্যবস্থা করেছেন। ভোটদাতাদের ওপর যাতে কোনরূপ হামলা না হয় তার জন্য প্রচুর পুলিশ, সরকারী কর্মচারী এবং মার্কিন ও ভিয়েতনামী সৈন্য নিয়োগ করা হয়েছে। সারা দেশে নির্বাচনী আবহাওয়া সৃষ্টি করার জন্য লক্ষ লক্ষ টাকা খরচ করে সরকারের পক্ষ থেকে প্রচার চালানো

উত্তর ভিয়েতনামের যুবকেরা সোভিয়েট রাশিয়ায় সামরিক শিক্ষা গ্রহণ করছে।

হয়েছে। নির্বাচনের পর সরকারের পক্ষ থেকে দাবি করা হয়েছে, ভোটদাতাদের মধ্যে তিন-চতুর্থাংশ ভোটে অংশ-গ্রহণ করেছে। ৫২ লক্ষ ভোটদাতার মধ্যে প্রায় ৪০ লক্ষ লোক ভোট দিয়েছে। কোন কোন স্থানে সংঘর্ষে কিছু লোক নিহত হলেও নির্বাচন মোটামুটি শান্তিপূর্ণভাবেই হয়েছে। সরকারের পক্ষ থেকেই এই কথা বোঝা-বার চেষ্টা হচ্ছে, দেশের অধিকাংশ লোক কমিউনিস্ট বা বৌদ্ধ নেতাদের সমর্থন করে না—তারা গণতন্ত্রের প্রতি আস্থাশীল, এই নির্বাচনে সে কথাই প্রমাণ হয়েছে।

দক্ষিণ ভিয়েতনামের নির্বাচনের চূড়ান্ত ফলাফল এখন পর্যন্ত জানা না গেলেও, কাও কাই সরকারের নির্বাচনের কৃতিত্বের দাবি মেনে নেয়া যায় না। কোন বিচারেই একে স্বাধীন নির্বাচন বলা চলে না। প্রথমত, বেছে বেছে ভোটার করা হয়েছে। আইন অনু-সারে কমিউনিস্ট ও নিরপেক্ষবাদীরা ভোটার হতে কিংবা নির্বাচনে দাঁড়াতে পারে না। দেশের অধিকাংশ লোকই এই বিচারে ভোটার তালিকা থেকে বাদ যাবে। তাছাড়া সরকার যাকে খুশি 'কমিউনিস্ট' বা 'নিরপেক্ষবাদী' এই অভিযোগে বাদ দিতে পারে। এভাবে অনেককে বাদ দেয়াও হয়েছে। নির্বাচন-প্রার্থী এরূপ অন্তত ৬০ জনের মনোনয়নপত্র এই কারণ দেখিয়ে বাতিল করা হয়েছে। ভিয়েত কং-রা তো বটেই, দেশের রাজনীতিতে যাঁদের প্রভাব অত্যন্ত বেশি সেই বৌদ্ধ নেতারাও নির্বাচন বর্জন করার ফলে নির্বাচনের আর কোনরূপ গণভিত্তি নেই।

প্রস্তাবিত গণপরিষদের ১১৭টি আসনের জন্য ৫২টি নির্বাচন কেন্দ্রে মোট ৫৬৮ জন প্রার্থী প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছেন। প্রত্যক্ষভাবে এঁরা কেউই কোন রাজনৈতিক দলের প্রার্থী না হলেও, এঁদের অধিকাংশই উগ্র দক্ষিণপন্থী বৌদ্ধ-বিরোধী ন্যাশনালিস্ট পার্টি ও উগ্র কমিউনিস্ট বিরোধী দিয়া ভিয়েত-এর সদস্য। প্রার্থীদের মধ্যে ৫০ জন সামরিক অফিসারও আছেন।

ওয়াশিংটনের কর্তারা এই নির্বা-চনের ব্যাপারে বিশেষ উৎসাহ প্রদর্শন করেন ও দক্ষিণ ভিয়েতনামের মার্কিন রাষ্ট্রদূত হেনরী ক্যাবট লজ নাকি এই সময় এইভাবে নির্বাচন না করার জন্য পরামর্শ দিয়েছিলেন। তাঁর অভিমত, এই নির্বাচনের ফলে হিংসাত্মক কার্য-কলাপ বেড়ে যাবে এবং তাতে আরও বেশি সংকটের সৃষ্টি হবে।

* * *

গত সপ্তাহে কম্বোডিয়ার রাজ-ধানী নমপেনে বক্তৃতা প্রসঙ্গে ফ্রান্সের রাষ্ট্রপতি চার্লস দ্য গল ভিয়েতনাম থেকে সকল মার্কিন সৈন্য অপসারণের জন্য দাবি জানিয়েছিলেন। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সরাসরি এই প্রস্তাব অগ্রাহ্য করেছে।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের দূরপ্রাচ্য বিষয়ক সহকারী পররাষ্ট্রসচিব উই-লিয়াম বান্ডি ৪ঠা সেপ্টেম্বর এক টেলিভিশন সাক্ষাৎকারে বলেছেন, মার্কিন সরকারের কাছে দ্য গলের এই প্রস্তাব একেবারেই গ্রহণযোগ্য নয়। তাঁরা সৈন্য অপসারণ করবেন কেন? উত্তর ভিয়েতনামই আসলে জেনেভা চুক্তি ও রাষ্ট্রসংঘ সনদ লঙ্ঘন করেছে। সুতরাং উত্তর ভিয়েতনামকেই প্রথম সৈন্য অপসারণের জন্য উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে—এই হল বান্ডির বক্তব্য। ভিয়েতনামে ভিয়েতনামীরা থাকতে পারবে না, কিন্তু মার্কিন সৈন্য থাকতে পারবে—অপূর্ব যুক্তি!

বান্ডি আরও বলেছেন, দ্য গলের কথার কোন দাম দেবার প্রয়োজন নেই। কারণ, তিনি এখন মার্কিন নীতির বিরোধী।

* * *

ভিয়েতনামে মার্কিন সামরিক প্রচেষ্টা বৃদ্ধির ফলে সোভিয়েট ইউ-নিয়নের পক্ষে আর চুপ করে বসে থাকা সম্ভব হচ্ছে না। প্রত্যক্ষভাবে উত্তর ভিয়েতনামে সোভিয়েট সৈন্য প্রেরণ না করলেও উত্তর ভিয়েতনামকে সোভি-য়েট ইউনিয়ন সর্বতোভাবে সাহায্য করছে। উত্তর ভিয়েতনামের বহু যুবক বর্তমানে সোভিয়েট ইউনিয়নে সামরিক শিক্ষা গ্রহণ করছে। উন্নত ধরণের বিমান আক্রমণের শিক্ষায় শিক্ষিত এই যুবকরা উত্তর ভিয়েতনাম সৈন্য বাহি-নীর কাজে বিশেষভাবে সাহায্য করতে পারবে।

সিরিয়া :

সিরিয়া সরকারের বিরুদ্ধে আর একটি অভ্যুত্থানের চক্রান্ত ব্যর্থ হবার সংবাদ প্রচারিত হয়েছে। গত আগস্ট মাসেও অনুরূপ একটি চক্রান্ত ব্যর্থ করা হয়েছিল।

৬ই সেপ্টেম্বর দামাস্কাস বেতার থেকে ঘোষণা করা হয়, বাথ সোস্যা-লিস্ট পার্টির পরিচালনাধীন সিরীয় সরকারের অবসানের জন্য একটি চক্রান্তকে ব্যর্থ করা হয়েছে। দলের তিনজন প্রাক্তন নেতা এই চক্রান্তের সঙ্গে যুক্ত বলে অভিযোগ করা হয়েছে। সিরিয়ার প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী সালা বিতারও নাকি এই ব্যাপারের সঙ্গে যুক্ত। জোর গুজব, সালা বিতার এই চক্রান্ত ব্যর্থ হবার পর গোপনে দেশ ত্যাগ করেছেন। সম্ভবত তিনি লেবাননে আছেন।

অভিযোগ করা হয়েছে, এই চক্রান্তের পেছনে দেশের কিছু ব্যক্তির সঙ্গে বিদেশীরাও আছে। বাথ পার্টির ঘোষণায় এই ব্যাপারে প্রকাশ্যে সৌদি আরবের রাজা ফয়জাল ও জর্ডানের রাজা হুসেনের নাম করা হয়েছে। বর্তমান সিরীয় সরকারের উচ্ছেদের জন্য এঁরা চেষ্টা করছেন, এবং সর্বতোভাবে বিরোধীদের সাহায্য করছেন। অভিযোগে বলা হয়েছে, সিরিয়ার বার্ষিক বাজেটের মোট টাকার সাতগুণ বেশি টাকা রাজা ফয়জাল সিরিয়ায় বর্তমান সরকারের উচ্ছেদের জন্য খরচ করেছেন।

অস্ট্রেলিয়া থেকে লিখছি

সুরেশচন্দ্র সাহা

অস্ট্রেলিয়ার এডিলেড শহরে

এডিলেডে একজন অদ্ভুত মানুষের সংগে আলাপ হল; ঠাকুর্দা তার জাত-তুর্কী, মা জার্মান—নিজে অস্ট্রেলিয়ান। জিজ্ঞেস করেছিলাম—তোমার পূর্বপুরুষ কোন্ দেশ থেকে এসেছিল? ব্যস, এত অল্পেই ক্ষেপে গিয়েছিল, মুখিয়ে উঠে বলেছিল—তুমি বুঝি মনে করেছ আমার পূর্বপুরুষ ছিল কনভিক্ট? তা নয় হে বাপু! আর আমার কেন, এই সুন্দর এডিলেড শহরে একটি লোকও পাবে না যার পূর্বপুরুষ লোহার গোলা আর শেকল-বাঁধা হয়ে এখানে এসেছিল। এখানে সব স্বাধীন মানুষের কারবার, বুঝলে মেট? আমি বিলক্ষণ বোঝার ভান করলাম।

কবে কোথায় এবং কেন কার পূর্ব-পুরুষ অস্ট্রেলিয়ায় এসেছিল সে কথা জানার কৌতূহল ছিল আমার দুর্নিবার। অল্প লোকেই কিন্তু সে কথা জানে, অনেকে কনভিক্ট রক্তের উত্তরাধিকার অস্বীকার করে—যদিও কিছু লোক পূর্ব-পুরুষের ইতিহাস জানার জন্য এখন আগ্রহশীল। তাদের সাহায্য করতেই সিডনিতে এক সমিতি স্থাপিত হয়েছে; শখানেক টাকা চাঁদা দিলে সমিতির আপিসে বসে নথীপত্র ঘেঁটে সে ইতি-হাস কিছু সংগ্রহ করাও যায়। বংশের আদি পুরুষটি গরু চুরি, রুমাল চুরি বা সামান্য পয়সা চুরির অপরাধে সুদূর ইংলণ্ড থেকে অস্ট্রেলিয়ায় নির্বাসিত হয়েছিল, এমন খবর পেলে নবীনদের কেউ কেউ রোমাঞ্চিত হয়; গর্বের সঙ্গে বলে—বেশ ত' মজার ব্যাপার। আমার অতিবৃদ্ধ প্রপিতামহ কনভিক্ট ছিল—সে বেচারা সিডনির সড়কে বসে পাথর ভাঙত; আর সেই সড়কে আমরা এখন মোটর হাঁকাই।

আমার তুর্কো-জার্মান বন্ধুর কাছে লজ্জিত হয়ে মাফি মাগলাম। সে কিন্তু এসব কথা আর ততো খেয়াল না করে আলাপের মাঝে ছেদ টেনে বলল—একটু দাঁড়াও ত', এখনই আসছি। আশ্চর্যের কথা, অল্পক্ষণের মধ্যেই সে ফিরে এলো এককাঁড়ি আঙুর আর কমলালেবু নিয়ে। হেসে হাতে তুলে দিয়ে বলল—এই দিয়ে তোমাকে স্বাগত জানাচ্ছি। বিচিত্র মানুষ।

এডিলেড সুন্দর শহর। সুন্দর বলতে যেমনটি শোনায় তার চেয়েও বেশি সুন্দর। সামনে সাগর। পেছনে পাহাড়। মধ্যখণ্ডে মূল শহর। চারদিকে সমান দূরত্বে তার সম্প্রসারণ। ওপাশে ভাঁজের পর ভাঁজে উপত্যকাভূমিতে সবুজ ঘাসের গালিচা পাতা। অদূরে ছোট নদী, মটর ক্ষেত, আপেল বন আর আঙুর চাষ। এডিলেডের প্রান্তসীমা দিয়ে ওয়ালাগা যেতে যেতে এইসব দেখছিলাম। আর দেখছিলাম চাষ না-করা সর্ষে গাছ; রাস্তার দুপাশে এলোমেলোভাবে ভুঁই ফুঁড়ে উঠে মাঠকে মাঠ হলুদ ফুলে রাঙিয়ে রেখেছে। এই স্বয়ম্ভু সর্ষে ক্ষেতের বাহার এদেশে অনেক দেখা যায়। সর্ষেকে এরা বলে 'রাই'। অস্ট্রেলিয়ানরা কিন্তু কপির ফুল খায় না, মটরশুঁটির কদুর করে না, সর্ষে মটরের শাক কাকে বলে তাও জানে না। সঙ্গী মিঃ ম্যাক-কিনলে মটর শাকের গল্প শুনে আমে-রিকান খাদ্যের মুণ্ডপাত করে বললেন—ইয়াঙ্ক লোকগুলোর কিন্তু ফল-সব্জী টাটকা অবস্থায় খাওয়া ঘটে না; সব কিছু ওদের পেটে যায় ঠাণ্ডা ঘর ঘুরে। এডি-লেডের মানুষের দিকে তাকিয়ে দেখেছ? টাটকা ফল-সব্জী আর সবুজ ঘাস-খাওয়া ভেড়ার টাটকা মাংস খেয়েই এডিলেডবাসীরা এমন তাগড়া।—এই মাঠে মাঠে সেই তাজা রসের যোগান আছে। আমি বললাম—আমাদের মাঠে কিন্তু আর একটি বাড়তি আকর্ষণ আছে; রাখালী গান। চলার পথে গান গাওয়া রাখালের পা জড়িয়ে ধরে মটরশুঁটি একটুখানি খেলা করার অনুরোধ করে। এমন কল্পনা তোমরা করতে পার কি? এ হচ্ছে মটরের ঐশ্বর্য। জসিমউদ্দিনের মত কবিরা সে ঐশ্বর্য আবিষ্কার করেছেন।

সিডনির উপনিবেশ থেকে ছড়িয়ে পড়বার প্রয়োজন দেখা দিলে দলে দলে অভিযাত্রীরা বেরিয়ে পড়েছিল জমি আর জলের সন্ধানে। ক্যাপ্টেন চার্লস্ স্টার্ট মারে নদী বেয়ে মোহনার কাছাকাছি এসে অতি উৎকৃষ্ট জমি দেখে ভারি খুশি হলেন; ইংলণ্ডের কর্তাদের কাছে চিঠি লিখলেন এই দিকটাতে জনবসতি গড়ে তোলার যুক্তি দেখিয়ে। তখন ইংলণ্ডে গঠিত হল সাউথ অস্ট্রেলিয়ান কোম্পানী। কোম্পানীর লোকেরা এখানে এসে পতিত জমির উন্নতি করে বিক্রি শুরু করলেন। এংগাস নামে এক ভদ্রলোক ত' তিন লক্ষ টাকায় ২৮ হাজার একর জমি কিনে ফেললেন।

তখন জার্মানীতে ধর্মের নামে স্বৈরা-চার চলছে। প্রাশিয়ার রাজা লুথার-পন্থীদের ওপর জুলুম করছেন। ঠিক তখনই ইংলণ্ড থেকে কয়েকজন মিশনারী জার্মানীতে গিয়ে নির্যাতিতদের কাছে প্রস্তাব করলেন জার্মানী ত্যাগ করে নিরাপদ কোন স্থানে গিয়ে আশ্রয় নিতে। ঠিক এর পরই ১৬৫ ঘর লোক দেশ ছেড়ে চলে এলো অস্ট্রেলিয়াতে। অনেক ইংরেজও এলো। এমনি করে স্বাধীন মানুষ নিয়ে দক্ষিণ অস্ট্রেলিয়া রাজ্যের পত্তন হল। রাজধানী স্থাপিত হল এডিলেডে। এডিলেডের পঞ্চাশ মাইল উত্তরে বারোসা উপত্যকাটি জার্মানীর সেই প্রাশিয়া সাইলেসিয়া প্রদেশের অধিবাসী-দের নিয়ে ছোটখাটো একটি জার্মানী হয়ে দাঁড়ালো।

এডিলেডে আলাপ হল গ্রীক লোক বুইগিরিসের সঙ্গে। অস্ট্রেলিয়া এমন একটি দেশ যেখানে গ্রীক, ইটালীয়, ইংরেজ সকলের চেনা যায় এক বিশেষ দৃষ্টিকোণ থেকে—বাঙালীকে যেমন চেনা যায় বাংলার বাইরে।

গ্রেগরিয়াস বুইগিরিস যুবা পুরুষ; দেখতে গ্রেমিকের মত—টিকোলো নাক, চওড়া ভুরুর নিচে ভাবালু চোখ, সমস্ত মুখমণ্ডলে গ্রীক ভাস্কর্যের ঐশ্বর্য। ওর জন্মভূমি ম্যাসেডোনিয়া ছিল তুরস্কের অন্তর্গত। ১৯২১ সালে গ্রীক-তুরস্কে লোক পালটি হয়। সেই লোক বিনিময়ের সঙ্গে সঙ্গে ঘটে যুগবদল। গ্রীকরা চলে আসে গ্রীসে, তুর্কীদের যেতে হয় তুরস্কের স্যামসুণ্ডায়। ফেলে-আসা স্যামসুণ্ডার কথা গ্রেগরিয়াসরা আজও ভোলে নি।

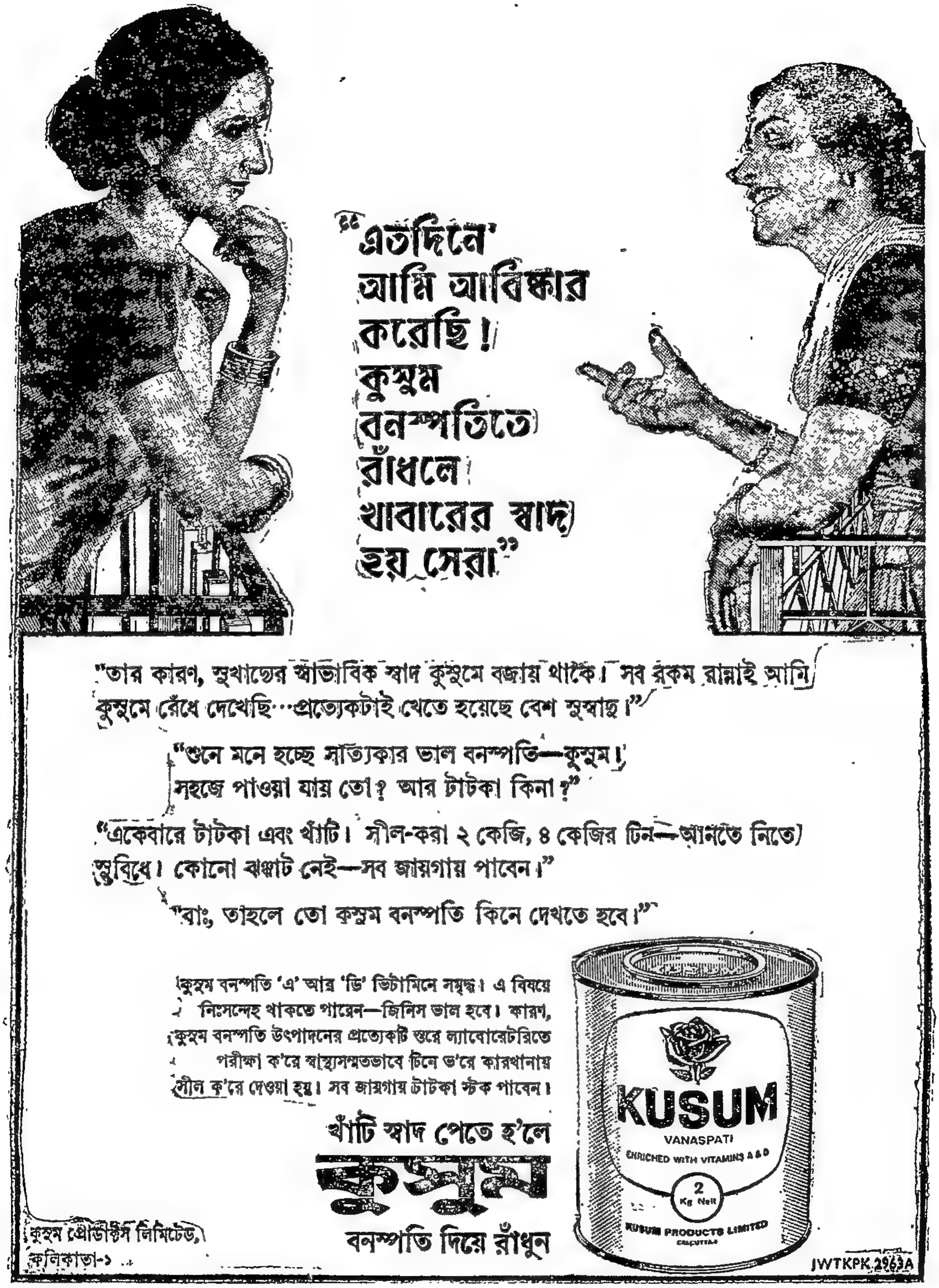
"এতদিনে আমি আবিষ্কার করেছি! কুসুম বনস্পতিতে রাঁধলে খাবারের স্বাদ হয় সেরা"
"তার কারণ, সুখাদ্যের স্বাভাবিক স্বাদ কুসুমে বজায় থাকে। সব রকম রান্নাই আমি কুসুমে রেঁধে দেখেছি···প্রত্যেকটাই খেতে হয়েছে বেশ সুস্বাদু।"
"শুনে মনে হচ্ছে সত্যিকার ভাল বনস্পতি—কুসুম। সহজে পাওয়া যায় তো? আর টাটকা কিনা?"
"একেবারে টাটকা এবং খাঁটি। সীল-করা ২ কেজি, ৪ কেজির টিন—আনতে নিতে সুবিধে। কোনো ঝঞ্ঝাট নেই—সব জায়গায় পাবেন।"
"বাঃ, তাহলে তো কুসুম বনস্পতি কিনে দেখতে হবে।"
কুসুম বনস্পতি 'এ' আর 'ডি' ভিটামিনে সমৃদ্ধ। এ বিষয়ে নিঃসন্দেহ থাকতে পারেন—জিনিস ভাল হবে। কারণ, কুসুম বনস্পতি উৎপাদনের প্রত্যেকটি স্তরে ল্যাবোরেটরিতে পরীক্ষা ক'রে স্বাস্থ্যসম্মতভাবে টিনে ভ'রে কারখানায় সীল ক'রে দেওয়া হয়। সব জায়গায় টাটকা স্টক পাবেন।
খাঁটি স্বাদ পেতে হ'লে
কুসুম
বনস্পতি দিয়ে রাঁধুন
KUSUM
VANASPATI
ENRICHED WITH VITAMINS A & D
2 Kg Nett
KUSUM PRODUCTS LIMITED
CALCUTTA
কুসুম প্রোডাক্টস লিমিটেড, কলিকাতা-১
JWTKPK 2963A

পদ্মার ওপারের মানুষদের সঙ্গে এদের মিল আছে। স্যামসুন্ডার কাস্টোরিয়া গ্রামে গ্রেগরিয়াসের জন্ম হয়েছিল। সেখান থেকে স্যালোনিকা মাত্র ২৫০ মাইল। স্যালোনিকা গ্রীক বীর আলেকজান্ডারের জন্মস্থান।

সারা অস্ট্রেলিয়াতে দুই লক্ষের মত গ্রীক আছে। সব চাইতে বেশিসংখ্যক গ্রীক বাস করে মেলবোর্নে। সিডনিতে প্রায় পঞ্চাশ হাজার, এডিলেডে ত্রিশ হাজার বাদবাকী চারদিকে ছড়িয়ে আছে। গ্রীকরা বেশির ভাগ ফলের দোকান করে, রেস্টুরেন্ট চালায়, নয়ত ফিশ এন্ড চিপসের দোকান। গ্রেগরিয়াস বুইগিরিস তার পেশীবহুল হাত নেড়ে মুখে তৃপ্তির রেখা ফুটিয়ে বলল—গ্রীকরা খেতে জানে। তাই ত' এত খাবারের দোকান খুলে বসে আছে। বৃটিশদের খাবার? আ রে দুত্তোর, ওরা আবার খেতে জানে? ওদের রান্নার পদ্ধতি ত' সেই এক আর অদ্বিতীয়; শুধু সেদ্ধ, সেদ্ধ খাবার। অমন খাবার তৈরি করতে না লাগে বুদ্ধি, না কৌশল। তাই ত এত খাবারের দোকান খুলে বসে ঢুকতে হয় মশলাপাচ্য খাবার চাখতে। বুইগিরিস থামল। ওরা সত্যি সত্যি খেতে জানে। গ্রীকরা বাড়িতে হামেশা খায় পোলাউ। মুর্গীসহযোগে রান্না করা। জলপাইয়ের তেলে পক্ক। ওরা বলে পিলাফি।

বুইগিরিসের অস্ট্রেলিয়াবাস আজ দশ বছরের। এডিলেডে মজুরের কাজ করে। দেশে পিতার অল্প জমি আর অনেক শরিক ছিল। চিলতে চিলতে ভাগ হওয়ার পর সে জমিতে নির্ভর করার মত উপায় গ্রেগরিয়াসের ছিল না। তখনই ভাগ্যান্বেষণে পাড়ি জমাতে হয়েছিল অস্ট্রেলিয়াতে। ইউরোপের শাদা চামড়ার মানুষ; এদের জন্য অস্ট্রেলিয়ার দ্বার চিরতরে খোলা। বুইগিরিস এডিলেডে এখন বেশ আছে। বাড়ি করেছে। গাড়ি করেছে। তারপর গ্রীসে গিয়ে ক্লিয়োপেট্রার মত সুন্দরী একটি মেয়েকে বিয়ে করে এনেছে। অস্ট্রেলিয়ার খাবার, অস্ট্রেলিয়ার শহর, অস্ট্রেলিয়ার মেয়েমানুষ ওর পছন্দ নয়। অস্ট্রেলিয়া? এখানে কি আছে? শনি-রবিবারের শহরগুলি দেখেছ? মৃতের শহর। ভাল বার নেই, নাইট ক্লাব নেই, আমোদ-আহ্লাদ নেই। পিলাফিড নেই। আছে শুধু কাঁড়ি কাঁড়ি টাকা। বুইগিরিসের মত সব বিদেশীর মোটামুটি এই মত। অবশ্য ছুটির দিনে অস্ট্রেলিয়া সত্যই বড় নিঃসঙ্গ নির্জন। নাইট লাইফ বলতে বিশেষ কিছুই নেই। সন্ধ্যারাতের অস্ট্রেলিয়ায় কেমন যেন একটা শূন্যতা খাঁ খাঁ করে। ছোট শহরের রাস্তাঘাটে ত' লোকজন চোখেই পড়ে না—দেখলে মনে হয় এক ঐশ্বর্যময় জনপদ এইমাত্র পরিত্যাগ করে সবাই যেন কি দুর্জ্ঞেয় কারণে সরে পড়েছে।

কিন্তু এসব সত্ত্বেও স্মরণ করিয়ে দিতে সাধ হল, ভূমিহীন, গৃহহীন, অর্থহীন বুইগিরিসের খাস মুলুকে বার নাইট ক্লাবে যাওয়ার মত অবস্থা ত' আর তার ছিল না। বুইগিরিসের দমে যাওয়া মুখটি কল্পনা করে বাক সংযম করতে হল। হাওড়া স্টেশনে নেমে ব্রীজ পার হয়ে কলকাতায় এসে অনেক অবাঙালী রুটি ছেড়ে ভাত ধরে, মাছ খায়, রোজগারের পয়সা পাঠায় দেশে। আর ঘরে ফিরে গিয়েই ভেতো বাঙালীর মুন্ডপাত করে। অবস্থাটা প্রায় একই।

তুর্কী ভাষায় বুইগিরি শব্দের অর্থ হচ্ছে গোঁফ। গ্রেগরিয়াসের বাবার ইয়া বড় গোঁফ ছিল। সেই সূত্রে তুর্কীরা তাকে বলত বুইগিরিস। শেষ পর্যন্ত তাই হল পদবী। গ্রেগরিয়াসের গোঁফ নেই। গোঁফওয়ালা দরিদ্র পিতার পুত্র—এই তার পিতৃপরিচয়ের সামান্য গৌরব। গ্রেগরিয়াস স্বনামে পুরুষ-ধন্য।

অস্ট্রেলিয়াবাসী গ্রীকরা আজও ম্যারাথনের গৌরবে শিহরিত হয়, থারমোপাইলীর কাহিনীতে রোমাঞ্চিত হয়; স্যালামিসের নৌযুদ্ধ তাদের উজ্জীবিত করে। পারস্য থেকে পাঞ্জাব পর্যন্ত আলেকজান্ডারের রণযাত্রার পূর্ণ বিবরণ এদের অস্ট্রেলিয়া-জাত সন্তানরা ইস্কুলে কণ্ঠস্থ করে না। গ্রীক বীরদের মোকাবেলা করার প্রতীক্ষায় পাটালীপুত্রে দিনগোণা হিন্দুস্থান সৈন্যের ভয়ে আলেকজান্ডারের পেছু হটার কাহিনী তারা হয়ত কোনদিনই শোনে না।

গ্রেগরিয়াস বুইগিরিসের সঙ্গে কত আলাপ হল; সুদূর রোম গ্রীস থেকে অস্ট্রেলিয়া পর্যন্ত কত আলোচনা হল। অথচ বুইগিরিস ভারতবর্ষ সম্বন্ধে একটি কথাও জিজ্ঞেস করল না। ইটালীয় গ্রীক জার্মান ইংরেজদের শুধু ভারতবর্ষ কেন, অন্য কোন দেশ সম্বন্ধেই যেন কিছুমাত্র কৌতূহল নেই—অস্ট্রেলিয়ার সুখ ও স্বাচ্ছন্দ্যের মধ্যে যে যার মত ব্যস্ত। ভারতবর্ষ সম্বন্ধে কারও বা সামান্য একটু কৌতূহল আছে; তবে প্রশ্নগুলি সেই মামুলি ধরণের—তোমাদের দেশে কি এখনও দুর্ভিক্ষ চলছে। ভারতে বড্ড বেশি লোকবৃদ্ধি হয়, তাই না?

এডিলেডের এডিথ রীডের নাম এত শুনেছিলাম যে তাঁর সঙ্গে দেখা করা অবশ্য কর্তব্য মনে হল। আশ্চর্যের ব্যাপার তাঁর সঙ্গে আলোচনা হল শুধু ধর্মকথা। বাহাই ধর্মের আলোচনা। প্রথমেই এডিথ রীড শুধালেন—তোমার ধর্ম কি? হোঁচট খেয়ে ভাবতে লাগলাম—তাই ত', আমার আবার ধর্ম কি? না কি এডিথ রীড জানতে চান আমার ধর্মমত কি বা জাত কি? হাজার হোক, মেয়ের বিয়ের সম্বন্ধ ত আর তিনি করছেন না। ভেবে দেখলাম, ধর্মাচরণের কোন নির্দেশ কেউ কোনদিন আমাদের দেয় নি—কেউ মন্দিরে গিয়ে উপাসনা করতেও শেখায় নি। হিন্দুধর্মসম্মত সর্বজনগ্রাহ্য ধর্মাচারটা কি তার কোন স্পষ্ট ধারণা কি অনেকেরই আছে? বাইবেল-কোরানের মত হিন্দুধর্মের সারকথা পুস্তকাকারে হিন্দু মন্দিরে রাখা হয় না, কাউকে শিক্ষাও দেওয়া হয় না। গীতার মাহাত্ম্য লেখা আছে পুঁথির পাতায়; বহু জ্ঞানের ব্যূহ ভেদ করে তার অর্থ সর্বসাধারণের পক্ষে উৎকলন করা সম্ভব নয়। বাড়িতে পুরুত এসে মাটির মূর্তিতে ফুল ছিটিয়ে যায়, আর সবাই ভাবি, আমরা ভারি হিন্দু।

আমার জবাব দিতে দেরি দেখে ধর্মপ্রাণা মহিলাটি বললেন—ব্যাপারখানা কি বল ত'? তোমার ধর্ম কি আধুনিক জাপানীদের মত এখনও ঠিক হয় নি? অবশ্য এমন সোজা প্রশ্নের জবাব দিতে দেরি হওয়া কাজের কথা নয়। ইউরোপীয়দের অভিযোগ বয়সের প্রশ্ন করলেও ভারতীয়রা অনেকে সঠিক জবাব দিতে না পেরে হাঁ করে থাকে, অনেক সময় অনুমানে বলে—কুড়ি-পঁচিশ হবে আর কি! অজস্র ছেলেমেয়ের সংসারে জন্মতারিখটি পর্যন্ত বাবা মায়ের টুকে রাখার অবকাশ নেই—তার কোন হিসেবও নেই, গুরুত্বও নেই; যেমন তাদের বিয়েবার্ষিকীর উৎসব নেই।

পাশ্চাত্য পণ্ডিতেরা বলেন, ভারতবর্ষ নামক দেশে হিন্দু নামে একটি ধর্ম ছিল; হাজার বছর আগে তা বাসি-মড়া হয়ে পড়ে আছে—উপযুক্ত সৎকারের অভাবে তার প্রেতাত্মা এখনও সবার ভয়ের বস্তু। এই মতের প্রতিধ্বনি অস্ট্রেলিয়াতেও এসেছে। নবাগত ভারতীয় পেলে অস্ট্রেলিয়ানরা অনেকে জানতে চায় হিন্দু কি না; হিন্দু হলে আবার প্রশ্ন ব্রাহ্মণ কি না। এসব হচ্ছে আসলে ইয়াঙ্কি ঢং। আজ আমেরিকার পত্র-পত্রিকায় ভারতবর্ষ সম্বন্ধে যত প্রবন্ধ প্রকাশিত হয় তার মধ্যে হিন্দু ও ব্রাহ্মণ—এই দুটি শব্দের প্রয়োগ প্রায়শই থাকে। এই নিয়ে ভারতকে একটু চিমটি কাটা আর কি! মিসেস এডিথ রীডের জবাবে শেষ পর্যন্ত বলেছিলাম—আমি খৃস্টকে ভক্তি করি, মহম্মদকে শ্রদ্ধা করি, বুদ্ধকে পূজা করি। এডিথ রীড চোখ তুলে এমন করে চাইলেন যার অর্থ—ঢাকতে পার, লুকোতে পার না!

বাহাই ধর্মগুরুর নাম বাহাউল্লা। পারস্যের লোক। ১৮৬৩ সালে তিনি

জন্মদিনে

নচিকেতা ভরদ্বাজ

জন্মদিন, মৃত্যুদিন—দুই প্রান্তে স্থিত দুই দেশ।
তবু এই অস্পষ্ট অমিল
আনন্দে গৈরিকে লগ্ন জীবনের সহজ সংলাপে;
জীবন তো তারই নাম। এবং তারই অর্থ
খুঁজে খুঁজে এখনো অশেষ,
আকাঙ্ক্ষায় আন্দোলিত হয়ে এই সমুদ্র-সমিল
নিহিত নদীর দেশে ফিরে আসে—আলো হাওয়া কাঁপে;
এ প্রাণের প্রাণের ভাষ্যে অতীন্দ্রিয় হয়ে যেতে পারে।
এক একটি বলয় থেকে আর এক বলয়ের পিছু
এ পৃথিবী বহমান, স্নেহ সেই শক্তির ডায়নামো।
আজন্ম লাভ করি বার বার স্নেহের প্রসারে।
এবং সে স্নেহ মানে বাসনার অন্ধকার ছাড়া আরো কিছু
আরো এক প্রত্যয়ের আলো। এই সমুদ্র-গাঢ়তায় নামো
তুমি মুক্তা পাবেই, পাবেই।

এক একটি নবজন্ম এক একটি আলোর আকাশ
স্পর্শ করে যাওয়া, আর এক একটি শুদ্ধির ঠিকানা।
এ হয়ে ওঠার এই বিশ্বাস রয়েছে বলেই
আমরা আজ এত কাছাকাছি, এই আশ্চর্য বাতাস
স্পর্শ করে গেল এসে, সূর্যের সাহানা
আজ এত ভালো লাগে। জন্মের তারিখ জানি,
তার চেয়ে জানি আরো বেশি
আমার স্নেহের ঘরে নবজন্ম তোমার এখন।
জন্মদিন দিয়ে গাঁথা এই মালা দিয়ে যেন মৃত্যুদিনে উপেক্ষা করার
স্পর্ধা থাকে,—এই ছদ্মবেশী
ধূসরের অন্তরালে—ফল্গুকে বরণ
করার ঔদার্য থাকেঃ তোমার জন্মদিনে
এই থাক শুভেচ্ছা আমার.

ব্যবহার

রবীন্দ্র গুহ

বড় বেশি দৃঢ়তার ছাপ শরীরে তোমার
এতো আলোর সম্ভার
সইতে পারি না
তাই জাগে হৃদয়ে যন্ত্রণা!

এতো কোলাহল চতুর্দিকে
তথাপি অন্ধকারে কেউ কেউ নির্জনতা হাঁকে
কদাপি পারি না যেতে দৃশ্যহীন ফুলের ভিতরে
নিরাপদে। প্রত্যুষে কুয়াশার জলস্তম্ভ ছুঁয়ে
অলৌকিক দীপ্ত ব্যবহারে
তুমি নিয়মিত হাসো।

এতো দুঃখ চতুর্দিকে, কেন যে তথাপি তুমি
স্বপ্ন ভালোবাসো।
এই হাসি, ভালোবাসা
শব্দে শব্দভরা আমাদের আশা
ঐক্যতার অপূর্ব ঈশ্বরে
ধরো যদি কোনোদিন ভুল করে চলে যায় বুকের ভিতরে?

নিজেকে ঈশ্বর প্রেরিত পুরুষ বলে ঘোষণা করেন।

সারা পৃথিবীতে আজ বাহাই ধর্মীদের সংখ্যা চল্লিশ লক্ষের মত। বাহাইরা সব ধর্মই স্বীকার করে, খৃস্ট, বুদ্ধ, আল্লাকে মানে। এদের ধর্মের কোন আচার উপাচার ভড়ং নেই, মোল্লা নেই পুরুত নেই। যে-কোন পোশাকে যে-কেউ প্রার্থনা পরিচালনা করতে পারে। সমস্ত পৃথিবীর জন্য একটিমাত্র ধর্ম, সত্য সন্ধানে স্বাধীনতা, বিজ্ঞান ও ধর্মের সমন্বয়, নারী-পুরুষের সমান অধিকার, কুসংস্কার বর্জন, বিশ্বব্যাপী বাধ্যতামূলক শিক্ষা, সারা বিশ্বের জন্য একটি কেন্দ্রীয় সরকার, একটি সহকারী সাধারণ ভাষা—এই হল বাহাই ধর্মীদের লক্ষ্য। বাহাই ধর্ম ও সভ্যতাপুষ্ট রাজ্যের রাজধানী স্থাপিত হবে কোন একটি বিশ্ব শহরে—সেইখান থেকে শুরু হবে নবীন সভ্যতার জয়যাত্রা। জাতিভেদ, বর্ণবিদ্বেষ, দারিদ্র্য এবং আয়ের অসাম্য থাকবে না বিশ্ব বাহাই রাজ্যে।

বাহাইদের উপাসনালয় নয়টি কোণবিশিষ্ট—বাহাই মতে নয় অঙ্কটি সমস্ত ঐক্যের প্রতীক। নয় পর্যন্ত এসেই ত' সংখ্যার পরিসমাপ্তি। প্রত্যেক বাহাইকে রোজ প্রার্থনা করতে হবে, নিজের নিভৃত স্থানে হাঁটু গেড়ে বসে—হাইফার দিকে মুখ ফিরিয়ে। হাইফাতে বাহাউল্লার সমাধি।

বাহাই ক্যালেন্ডার অনুসারে ১৯ মাসে বছর। প্রতিটি মাস উনিশ দিনের। বাকী চারটি দিন এক এক করে অন্য মাসে যোগ করে ৩৬৫ দিন পূর্ণ করা হয়। ২১শে মার্চ বাহাই নববর্ষ। বর্ষারম্ভের আগে সূর্যোদয় থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত প্রত্যেক বাহাইয়ের ১৯ দিন উপবাস করবার নিয়ম।

বাহাউল্লার পূর্ব নাম ছিল মীর্জা হোসেন আলী। ১৮১৭ সালে জন্ম। পিতা ছিলেন পারস্য সরকারের মন্ত্রী। ১৮৬৩ সালে মীর্জা যখন নিজেকে ঈশ্বর প্রেরিত পুরুষ বলে ঘোষণা করেন, তার ঠিক ১৩ বছর আগে রাজদ্রোহের অপরাধে তাব্রিজে মীর্জা আলী মহম্মদ নামে আর একজন লোককে গুলী করে মারা হয়। তিনিও ১৮৪৪ সালে নিজেকে ভগবানের দূত বলে ঘোষণা করে বলেছিলেন, তাঁর চেয়েও যে শক্তিমান দূতের আবির্ভাব আসন্ন তাঁর নাম বাহাউল্লা। বাহাউল্লা বললেন, ১৮৪৪ সালের এক হাজার বছর পর অর্থাৎ ২৮৪৪ খৃস্টাব্দে পরবর্তী দূতের আবির্ভাব ঘটবে। বাহাউল্লার আধ্যাত্মিক নবযুগ প্রবর্তনের দাবি পারস্যের মুসলমান শাসকদের ভাল লাগে নি। ফলে বাহাউল্লাকে নির্বাসন-উপনিবেশে প্রাণ হারাতে হয়েছিল।

এডিলেডে এডিথ রীডের কাছে বাহাই ছাড়া কথা নেই। মাত্র পাঁচশত বাহাই লোকের দেশে বাস করে তিনি স্বপ্ন দেখেন, বাহাই ধর্মই হবে সারা পৃথিবীর একমাত্র ধর্ম এবং সেদিন আগত ঐ। অস্ট্রেলিয়া থেকে বেবাক ধর্ম লোপ পেয়ে বাহাই প্রবর্তন না হলেও এডিথ রীডদের কখনই ধর্মীয় নির্যাতনের কবলে পড়তে হবে না। কারণ অস্ট্রেলিয়ার রাজনীতির ভিত্তি ধর্মের ওপর নয়—অস্ট্রেলিয়ানরা অধার্মিকও নয়। মিসেস রীড ধর্মপ্রচারে নিজে উৎসাহী হলেও পুত্র-কন্যার দল শুধু জন্মসূত্রেই বাহাই। তারা আসলে গড়পড়তা হিন্দুদের মত—শুধু চাকুরির দরখাস্তে 'ধর্ম কি' এই প্রশ্নের জবাব দেওয়া ছাড়া আর কিছুতেই তাদের ধর্মের ধার ধারতে হয় না।

অমৃতসমান · বেদব্যাস

পুলিশ পোষার সপক্ষে

ছেলেবেলায় চোর-পুলিশ খেলেছেন কখনো?

গরমের ছুটিতে যখন মামার বাড়িতে যেতাম তখন খুব চোর-পুলিশ খেলতাম, মনে আছে। ছোটমামির লাল ডুরে শাড়িটা দলা পাকিয়ে মাথায় পাগড়ি বাঁধতাম—দাদুর সিঙ্গাপুরী বেতের ছড়িটাকে করতাম ব্যাটন। মামাতো ভাই-বোনেরা হতো চোর, আর পুলিশের ভূমিকাটি তো ছিল আমার বাঁধা। শহর থেকে তো আর চোর সাজার জন্যে গ্রামে যাই নি। উঃ কী ঠ্যাঙানিই না দিতাম অপরাধীদের! বাগ মানানো যেতো না মেজমামার মেয়ে রিনিটাকে। বলাই বাহুল্য, চুরি, অপরাধ বা পুলিশ সবই কাল্পনিক, কিন্তু শাস্তিটা ছিল কঠোর বাস্তব। তা রিনির ওপর ছড়ি তুললেই ও ঠোঁট উল্টে বলতো ঃ হুঁ, পুলিশ না আরো কিছু! সব ঘুষ নেবার জন্যেই লাঠি ঘোরানো হচ্ছে। বলেই কোঁচড় থেকে একটা সিঁদুরে-আম ছুঁড়ে দিলে ওকে বেকসুর খালাস দিয়ে দিতাম।

আত্মকথা থাক। শহরের সর্বশেষ খবর শুনেছেন? কর্পোরেশন নাকি চোর-পুলিশ খেলবে। মেয়রসাহেব গভর্নমেণ্টের কাছে দাবি জানিয়েছেন ওঁদের নিজস্ব পুলিশফৌজ চাই, কারণ সময়ে সরকারী পুলিশ মেলে না।

বিষয়টি গুরুগম্ভীর সন্দেহ নেই, তাই ও নিয়ে কিঞ্চিৎ মগজ পীড়ন করতেই হচ্ছিল। কিন্তু পাঁচকড়িবাবু এক কথাতেই আমার ভাবনা-চিন্তার প্রায় অবসান ঘটিয়ে দিচ্ছিলেন ঃ কেন রাখবে না মশাই? মাগা-দুধ দিয়ে ছেলে বাঁচানো যায় কি?

অবশ্যই যায় না। পাঁচ বাড়ি থেকে দুধ চেয়ে নিয়ে মাতৃহীন শিশুকে বাঁচানো যায় না, তার জন্যে স্থায়ী কিছু ব্যবস্থা করতে হয়। সবই মানলাম, কিন্তু অবস্থাটা কী দাঁড়াবে, পাঁচকড়িবাবুরা ভেবে দেখেছেন কি? অর্থাৎ এর প্রতিক্রিয়াটা?

পাঁচকড়িবাবুর কিছু দায় ঠেকে নি ব্যারোমিটার নিয়ে সমাজের প্রতিক্রিয়ার রীডিং নেবার। আন্তর্জাতিক রাজনীতির ছাত্র দেবপ্রসাদ বলেছিল ভালো ঃ ভরসা করা যায় নাই তো। আমেরিকার সঙ্গে তো ফ্রান্সের এত দহরম-মহরম, কত অ্যালায়েন্স, কত সখ্যতা, কিন্তু কৈ পারলো ফ্রান্স ন্যাটোর ওপর ভরসা করতে? ওখানে আমেরিকার প্রাধান্য রয়েছে বলেই না ফ্রান্স আজ নিজেকে বা ইয়োরোপকে ন্যাটোর হাতে সঁপে দিয়ে নিরাপদ মনে করতে পারছে না। কর্পোরেশনই বা পরের দয়ায় থাকতে যাবে কেন?

তুলনাটা আমার ভালো লাগে নি, কিন্তু ওর ফার্স্ট ক্লাশের স্বপ্ন পাছে ভেঙে যায় সে জন্যে চেপে যেতে হলো আমাকে। তবে বিজন সরখেলের স্পষ্ট-ভাষণে বিষয়টি আর একটু খোলসা হলো। পুলিশের রোল্‌টা কি মশাই? বিজন প্রশ্ন ছুঁড়েছিল আমাদের তাগ্ করে। তারপর জবাবের প্রত্যাশা না করে নিজেই বলে চললো ঃ ঠ্যাঙানো, স্রেফ লাঠি-পেটা করে ঠান্ডা করে দেওয়া নয় কি? তা পুলিশ ফোর্স যার নেই তার টিঁকে থাকারও কোন রাইট্ নেই। দেখলেন না, নিজস্ব পুলিশ ফোর্স না থাকার জন্যে রাষ্ট্র সঙ্ঘ কঙ্গোয় কোরিয়ায় কেমন মারটি খেল!

অতএব শ্লোগান তুলুন ঃ আমাদের দাবি মানতে হবে, পুলিশফৌজ দিতে হবে। এবং সেই দাবিদারদের মধ্যে প্রথমেই দেখবেন স্কুল-কলেজের হেডমাস্টার প্রিন্সিপ্যালরা ঝাণ্ডা হাতে শোভাযাত্রা পরিচালনা করে নিয়ে যাচ্ছেন। কারণ জমানা বদল গিয়া,......অধ্যাপক মাস্টার-দেরই আজ ছাত্রদের সমীহ করে চলতে হচ্ছে, পুলিশফৌজ ছাড়া তাঁদের স্কুল-কলেজ চালানো, ছেলেদের পড়া আদায় করা অসম্ভব হয়ে পড়েছে, পরীক্ষা ভণ্ডুল হয়ে যাচ্ছে একের পর এক।

—কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় আইনের অমুক ধারার তমুক উপ-ধারার বলে তোমাকে টুকলিফাইং-এর দায়ে গ্রেপ্তার করা হলো—বলে হয়তো পরীক্ষার হল থেকে কোন ছাত্রকে বিশ্ববিদ্যালয় পুলিশ-বাহিনী হাতকড়ি লাগিয়ে নিয়ে গেলো। —কী, কোশ্চেন শক্ত হয়েছে...ইয়ার্কি পেয়েছো? পেপারসেটারকে সিলেবাস দেখাতে এসেছো ফচ্‌কে উল্লুকের দল? বলেই ঘাড় ধরে পরীক্ষার্থীকে চালান করে দেবে থানায়......

বেত্রাঘাত এমন কি নীল ডাউন বা স্ট্যাণ্ড আপ অন দা বেঞ্চ—এসব শাস্তি এখন সেকেলে হয়ে গিয়েছে। এখন সে জায়গায় হয়তো হেঁড়ে গলা শুনতে পারেন ঃ হোম টাসক আনিস নি কেন রে বিশে—বলেই পুলিশ ঝাঁপিয়ে পড়বে ফাঁকিবাজ ছাত্রের ওপর। শাস্তি দেবার ভার মাস্টারদের ওপর থাকবে না, তাঁরা লেকচার দিয়েই খালাস, পড়া আদায় করার দায়িত্ব স্কুলের পুলিশবাহিনীর। মাস্টারমশাইকে চশমাজোড়া নাকের ডগায় নামিয়ে মিটমিট করে চাইলে আর মুচকী হাসলেই চলবে।

কারখানার চারশো—সাড়ে আটশো গ্রেডের সিকিউরিটি অফিসারের পোস্টটির জন্যে যে প্রাক্তন সামরিক পুরুষটি ইণ্টারভিউ দিতে এলেন, তাঁকেই দেখা যাবে ইণ্টারভিউ নিতে ঃ

—দুটো রিভলবার কী দেখাচ্ছেন মশাই, আগে বলুন, আমার আণ্ডারে আর্মড পুলিশ থাকছে ক'শো?...আপনা-দের ১০ হাজার মজুরের মহড়া কি আর দুটো রিভলবারে নেওয়া যায়?...লেবর অফিসার তো টাকা খেয়ে আগেই হাওয়া হয়ে যাবে—

স্টেডিয়াম সমস্যারও সুসমাধান হয়ে যাবে, প্রত্যেক ক্লাবকে দুশো করে আর্মড পুলিশ আগে পুষতে দিন! পুলিশদের দুটো কাজ থাকবে ঃ খেলার আগে কয়েক রাউণ্ড ফাঁকা আওয়াজ করে (প্রয়োজন বোধে ফাঁকি না দিয়েও) দর্শকদের মাঠে ঢোকাবেন; খেলার শেষে দশ রাউণ্ড গুলী চালাবেন হেরো দলের সমর্থকদের উদ্দেশ্যে—চুকে যাবে ল্যাঠা। দেখবেন কোন মিঞাই আর বাপের জন্মে স্টেডিয়ামের নামটি নেবে না, দিব্যি গাছের আগা র‍্যামপার্টের গোড়া থেকে খেলা দেখে তুরীয় আনন্দলাভ করছে দর্শকসাধারণ। স্টেডিয়াম-পাগলদের কাছে টিকিট বেচার আগে পুলিশ সাহেবরা ওদের কানে ধরে ওঠ-বস করিয়ে এই মর্মে কবুলও করিয়ে নিতে পারেন যে, স্টেডিয়াম তাদের কাছে হারাম।

হাসপাতালগুলো এখনো কেন যে আউটডোরে পুলিশ পোস্টিং করছে না তা ওপরের ওই সবজান্তা ভদ্রলোকই বলতে পারেন। রথীন কাঞ্জিলাল এ-প্রস্তাব একাধিকবার রেখেওছে, কিন্তু ফল হয় নি কোন। পরে অথরিটিকে পস্তাতে হবে আর কি।

—এই হেভি রাশ, এ কি ঠ্যাকানো সম্ভব মশাই? নতুন বৌটা বিধবাই হলো দেখছি। রথীন বিয়ে করেছিল সম্প্রতি, পাশ করে শ্বশুরের পয়সায় বিলেত যাবার বাসনা রয়েছে, কিন্তু তা আর হতে দেবে না কর্তৃপক্ষ। রোগীদের সঙ্গে মিষ্টি ব্যবহার সে করবে কোত্থেকে, গভর্নমেণ্ট কি তার মুখে মধু জমতে দিচ্ছেন? থাকতো যদি রাইফেল

পুলিশফৌজ. দেখতেন আউটডোর ফাঁকা, রোগীর নাড়ী টিপে সুখ তখন, বাঁ চোখের অপারেশন করতে গিয়ে ডান চোখ উপ্‌ড়ে ফেলছে না। রাইফেল উঁচিয়ে ছুটে আসতো তখন পুলিশ-সাহেবটি ঃ ক্যা, পেট্‌মে দরদ, দিল্লাগী কর্‌তা ডাগ্‌ডরকী সাথ...ভুখ লাগা তেরা, যা ঘর যাকে রোটিগোস্ত খা, ফলে ডাক্তারের কাজ হাল্কা করে দিতো শহরের স্বাস্থ্যের প্রভূত উন্নতি ঘটতো...

মোরারজীভাই যদি পুলিশের হাতে ব্যাপারটি ছেড়ে দিতেন তবে স্বর্ণ-নিয়ন্ত্রণ আদেশ জারী করে তাঁকে খামোকা বদনাম কিনতে হতো না।

—খুল্‌ছি খুল্‌ছি, মুখপোড়ারা, এই নিয়ে যা, তোদের মন্ত্রীদের বৌয়ের গলায় পরিয়ে দিগে যা—বলে গিন্নিরা হয়তো পুলিশকে মুখনাড়া শোনাতেন, কিন্তু তাবৎ সোনাদানা সবই সরকারের জমা পড়তো।

হ্যাঁ, মশাই, কর্পোরেশন চোর-পুলিশ খেলবে কার সঙ্গে? সিনেমার লাইনে জনৈক দার্শনিকমন্যের প্রশ্ন।

—কার সঙ্গে আবার, নিজেরই সঙ্গে! বাদাম চিবোতে চিবোতে অপর চিত্র-রসিকের জবাব পাওয়া গিয়েছিল। কর্পোরেশন নিজেই চোর আবার নিজেই পুলিশ। কর্সিকান ব্রাদার্সে ডগলাস ফেয়ারব্যাঙ্কাসের ডাবল রোল মনে আছে......?

আমার মনে সন্দেহের ছিটে-ফোঁটাটিও নেই যে, কর্পোরেশনের পুলিশ রাখার দাবিটি খুবই ন্যায্য দাবি। কী বলেন মশাই, ২৯ হাজার শ্রমিক-কর্মচারী, চাট্টিখানি কথা নাকি......কথায় কথায় ওরা যদি ধর্মঘটের হুমকী দিতে পারে, আমরা কেন বিকল্প ব্যবস্থা দেখবো না—বলতে পারেন?...এ-গরমেন্টকে বিশ্বাস আছে?...

না, না, লোক ঠ্যাঙানোর কথা নয় বাদই দিলাম, বৃন্দাবনবাবুও সমর্থন জানিয়ে এগিয়ে এলেন, কর্পোরেশন তার রুটিন ওয়ার্কগুলো করতে গেলেও পুলিশের দরকার। এই জল দাও রে, ঐ ময়লা সাফাই করো রে, এই রাস্তার জমে-যাওয়া জল নিকাশী করো রে, ঐ আবার আলো জ্বালো রে......কাজ কি মশাই একটা?

তবে মশাই বাঙালী পুলিশের কম্ম নয় কর্পোরেশন চালানো, সুষেণ বাড়ি-ওয়ালা বলছিল, ওনারা শুধু পঁক পঁক করে সিগ্রেট ফুঁকতে আর ফ্যাক ফ্যাক্ করে পানের পীচ ফেলতেই জানেন...... বেশ তাগড়াই পাঠান পুলিশ চাই, যেমন কাজটি হবে, দেখেও আমাদের চোখ জুড়োবে......হ্যাঁ দেবো, বাড়তি ট্যাক্স লাগে তাও দিতে রাজী..., জানবো টাকা আমার জলে যাচ্ছে না...তারপর ময়দানী ঢঙে বললেনঃ কমরেড স্লোগান তুলুন—

'নিজের হাতে পুলিশ চাই,
গবরমেন্টের ভরসা নাই!'

না, মা এ আর সহ্য হয় না। বাবাকে এবার পুলিশের কাছে হ্যান্ড-ওভার করতে হয়...গভর্নমেণ্ট বলছে অঢেল মাছ পাওয়া যাচ্ছে গভর্নমেণ্ট স্টলে, আর উনি এক হপ্তার মধ্যে এক-দিনও মাছ কিনতে পেলেন না...চালাকী পেয়েছো......

দি শ্যাডো অব দি ম্যান—

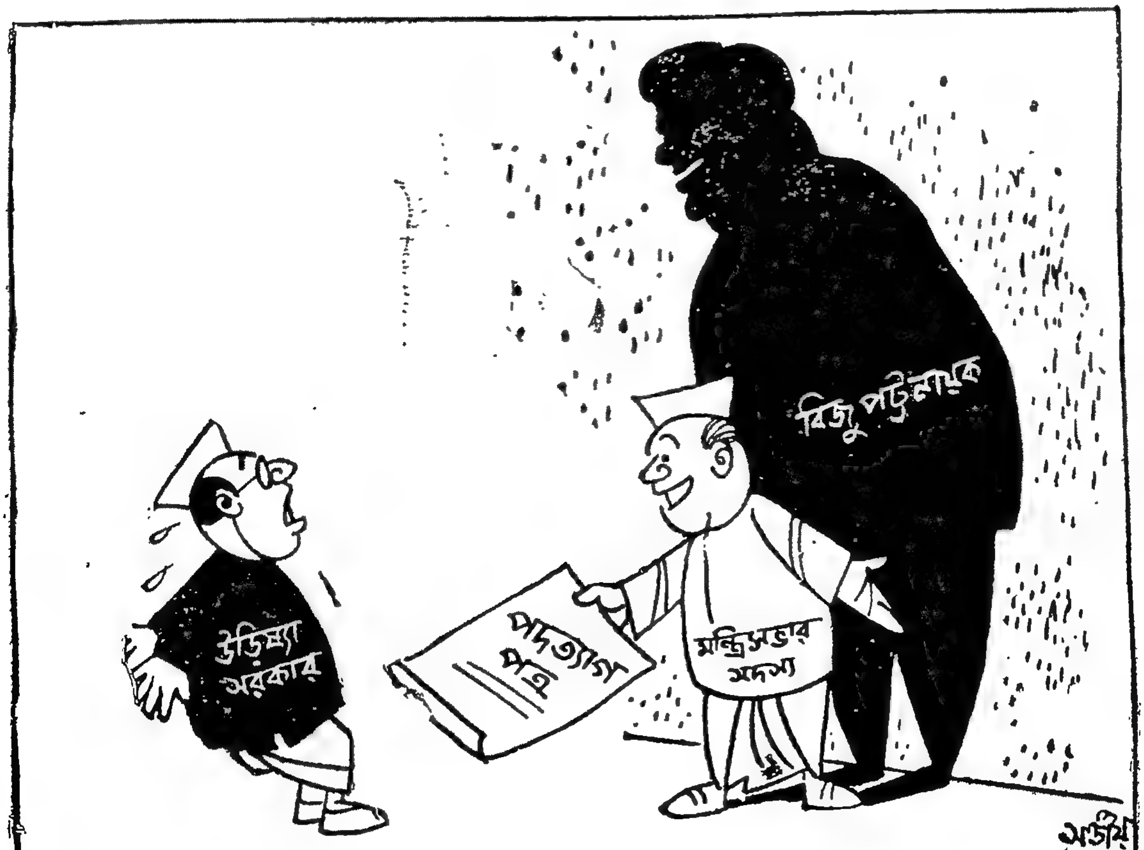

আশাপূর্ণা দেবী

ধারাবাহিক উপন্যাস

(পূর্ব-প্রকাশিতের পর)

ওই শোনো শোনো সাড়া জাগিয়াছে
কালের ঘূর্ণিপথে—
ভাঙনের গান গেয়ে ছুটে আয়
মরণের জয়রথে।
ওই দেখ, কারা আসে দলে দলে,
দেশজননীর পূজা বেদীতলে,
অক্লেশে প্রাণ করে বলিদান
হোমের আহুতি হতে।
তাই দ্বারে দ্বারে ডাক দিয়ে যাই
'চল চল ছুটে চল—
কে ওরা ভাঙিছে বন্দিনী মা'র
চরণের শৃঙ্খল।
ওদের সঙ্গে দে মিলায়ে হাত,
বৃথা পশ্চাতে কর আঁখিপাত,
বাঁধিবে কি তোরে শিশুর হাসা,
প্রিয়ার অশ্রুজল?
এখনো না যদি ভাঙিতে পারিস—'

পড়তে পড়তে থেমে যায় অম্বিকা। কুণ্ঠা কুণ্ঠা হাসি হেসে বলে, 'দূর, এ নিশ্চয় আপনার ভাল লাগছে না—'

ভাল লাগছে না!

সুবর্ণ উত্তেজিত গলায় বলে, 'ভাল লাগছে না মানে? কে বলেছে ভাল লাগছে না? পড়ো, পড়ে যাও। যে লাইনটা পড়লে আবার ওইটা থেকে পড়ে যাও।'

অম্বিকার অস্বস্তি হচ্ছিল।

অম্বিকার নিজের মন যতই উদার আর নির্মল হোক, পাড়াগাঁয়ের ছেলে সে। অনাত্মীয় তো দূরের কথা, নিকট আত্মীয় পুরুষের ঘরেও এমন একা বসে গল্প করলে সে মেয়ের ভাগ্যে ভর্ৎসনা জোটে, তার নামে নিন্দে রটে।

তার ওপর আবার কবিতা শোনা।

তবু সুবর্ণর ঐ আবেগ-আবিষ্ট ভাললাগার মুখটা বেশ একটা নতুন আনন্দের স্বাদ এনে দিচ্ছে। সত্যি, এমন করে এমন একটা আগ্রহ-উৎসুক মনের সামনে কবে অম্বিকা নিজের লেখা কবিতা আবৃত্তি করতে পেয়েছে?

তাছাড়া, অস্বস্তি যেমন ওদিকে, তেমনি এদিকেও। অম্বিকার অস্বস্তি ভাবটা যদি মেজবৌদির চোখে ধরা পড়ে যায়! তাতেও লজ্জার সীমা নেই। উনি স্ত্রীলোক হয়ে সাহস করে বসে রইলেন!

দূর, উনি কত বড়, গুরুজন, ওঁর কাছে আবার—

অতএব আবার গলা ঝেড়ে পড়া শুরু করে দেয় অম্বিকা,

'এখনো না যদি ভাঙিতে পারিস,
কখনো কি হবে আর?
লৌহনিগড় গড়িবে আবার
প্রবলের অনাচার।
মরণকুণ্ডে ঝাঁপ দিতে এসে,
নতশিরে কি রে ফিরে যাবি শেষে?
মস্তকে বহি কাঁটার মুকুট
ললাটে অন্ধকার।
বিশ্বজগৎ টিটকারি দেবে
ধিক্কৃত উপহাসে,
যষ্টি-আহত পশুর সমান
কাপুরুষ ক্রীতদাসে।
ভাবী তনয়ের ললাটে কি ফের—
এই সেরেছে!'

অম্বিকা হাতের কাগজগুলো উল্টে-পাল্টে দেখতে থাকে। বিপন্নমুখে বলে, 'এর পরের পৃষ্ঠাটা আবার কোথায় গেল।'

'নেই?'

সুবর্ণ চমকে ওঠে।

আশাভঙ্গের উত্তেজনায় বলে, 'কি করে রাখো কাগজপত্র? কী করলে ছাই! রয়েছে তো কাগজ তোমার হাতে—'

অম্বিকা অপ্রতিভমুখে বলে, 'এটা শেষ পৃষ্ঠা। মাঝখানটা একটা টুকরো কাগজে ছিল—'

'আশ্চর্য!' সুবর্ণর মনে আসে না সুবর্ণ অম্বিকার অভিভাবক নয়। মনে আসে না, ওকে তিরস্কার করবার তার অধিকার আছে কি না? প্রায় অভিভাবকের ভঙ্গীতেই ক্রুদ্ধ তিরস্কার করে ওঠে, 'ধন্যি ছেলে! অমন ভাল জিনিসটা হারিয়ে ফেললে?'

অম্বিকা অপরাধী অপরাধীভাবে বালিশের তলায় হাত বুলোয়, তোষক উল্টে দেখে। সুবর্ণও চৌকির তলায় উঁকি মারে হেঁট হয়ে, তারপর বিফল মনোরথ হয়ে বলে, 'নাঃ! সে নির্ঘাৎ হাওয়ায় উড়ে বনেজঙ্গলে চলে গেছে। মুখস্থ নেই?'

অম্বিকা কুণ্ঠিত হাসি হাসে, 'নাঃ। এই তো মাত্র কাল রাত্রে লিখেছি—'

'যাক গে শেষটাই পড়। এত ভাল লাগছিল।'

অম্বিকা আবার পরের পাতাটায় চোখ ফেলে। বোধ করি নিজের ওই মুখস্থ না থাকার জন্যে মরমে মরে। সেই কুণ্ঠিত গলাতেই পড়ে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েই!

'কালিমাখা মুখে পৃথিবীর বুকে
টিকে থেকে কিবা ফল?
অকারণ শুধু ধ্বংস করিতে
ধরার অন্নজল।
ক্ষুদ্র ক্ষতির হিসাব কষিয়া,
যে মাটি আগুলি রহিবি বসিয়া—
দাবিদাওয়াহীন সে মাটির ঋণ
শোধ দিবি কিসে বল?
নাড়া দিয়ে ভাঙ পুরনো দেওয়াল,
কতকাল রবে খাড়া?
শাসন রক্ত ভ্রূকুটির তলে
মাথা তুলে আজ দাঁড়া!
বীরদাপে যারা করে অন্যায়,
তারা যেন আজ ভাল জেনে যায়,
বিষবৃক্ষের উচ্ছেদ লাগি,
মাটিতেও জাগে সাড়া!'

'অম্বিকা ঠাকুরপো!'

সহসা যেন একটা আর্তধ্বনি করে ওঠে সুবর্ণলতা। কী ভাগ্যি অম্বিকার হাতটাই চেপে ধরে নি।

'অম্বিকা ঠাকুরপো, ওইখানটা আর একবার পড়ো তো—'

অম্বিকা বিস্মিত হয়।

অম্বিকা বিচলিত হয়।

তাকিয়ে দেখে সুবর্ণর মুখে আগুনের আভা, সুবর্ণর চোখে জল!

আশ্চর্য তো!

মানুষটা এত আবেগপ্রবণ?

একটু যেন ভয় ভয় করছে।

'কই পড়ো?'

সুবর্ণর কণ্ঠে অসহিষ্ণুতা, 'এ তো শুধু এই পরাধীন দেশের কথাই নয়। এ যে আমাদের মতন চিরপরাধীন মেয়েদের কথাও। কী করে লিখলে তুমি! পড়ো, পড়ো আর একবার—'

অম্বিকা যেন বিপন্নগলায় আর একবার পড়ে—

'নাড়া দিয়ে ভাঙ্ পুরনো দেওয়াল
কতকাল রবে খাড়া?
শাসন রক্ত ভ্রূকুটির তলে
মাথা তুলে আজ দাঁড়া!
বীরদাপে যারা করে অন্যায়,
তারা যেন আজ—।

নাঃ, সুবর্ণলতার আজকের দিনটা বুঝি একটা অদ্ভুত উল্টোপাল্টা দিয়ে গড়া।

ভালো আর মন্দ!

আলো আর ছায়া।

পদ্ম আর পঙ্ক।

তা নইলে এমন অদ্ভুত ঘটনা ঘটে? যখন সুবর্ণলতা মুগ্ধ বিহ্বল দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে একটা পরপুরুষের মুখের দিকে, যখন সুবর্ণর মুখে আলোর আভাস, আর চোখে জল এবং যখন এই অনাসৃষ্টি দৃশ্যের ধারে-কাছে কেউ নেই, তখন কিনা সে দৃশ্যের দর্শক হবার জন্যে এসে দরজায় দাঁড়ায় সুবর্ণলতার চিরবাতিকগ্রস্ত স্বামী। যে নাকি এ যাবৎকাল আপন চিত্তের আগুনেই জ্বলে-পুড়ে খাক্ হলো।

সেই জ্বলে-পুড়ে-মরা মানুষের সামনে এই জ্বলন্ত দৃশ্য!

দরজায় এসে দাঁড়িয়েছে।

থিয়েটারি ঢঙে বলে উঠেছে, 'বাঃ বাঃ —কেয়াবাৎ! এই তো চাই!'

'পুরনো দেওয়াল' অটুট রইল, 'বিষবৃক্ষে'র পাতাটি মাত্র খসলো না, 'মাটির সাড়া' মাটির মধ্যেই স্থির হয়ে রইল, সুবর্ণ তাড়াতাড়ি মাথার কাপড়টা একটু টেনে দিয়ে বলে উঠলো, 'তুমি যে হঠাৎ? চাঁপা ভালো আছে তো?'

হ্যাঁ, যে মুহূর্তে আচমকা দরজায় প্রবোধের মূর্তিটা ফুটে উঠেছিল, সেই চকিত মুহূর্তটুকুতে চাঁপার কথাটাই মনে এসেছিল সুবর্ণলতার?

হঠাৎ ও কেন এমন বিনা খবরে?

চাঁপার কোনো রোগবালাই হয় নি তো?

কিন্তু সেই চকিতচিন্তার পরমুহূর্তেই দূর হয়ে গেল সে আশঙ্কা! তেমন হলে ঐ থিয়েটারি ঢঙে 'কেয়াবাৎ'টা হতো না নিশ্চয়ই। এ আর কিছু নয়, গোয়েন্দাগিরি!

ঝাঁ ঝাঁ করে উঠলো মাথা, সারা শরীরের মধ্যে বয়ে গেল বিদ্যুৎপ্রবাহ, তবু ফেটে পড়তে পারা গেল না। সামলে নিতে হলো নিজেকে। মাথায় কাপড় টেনে উদ্বিগ্নগলায় বলতে হলো, 'তুমি যে হঠাৎ? চাঁপা ভালো আছে তো?'

বিদ্যুৎপ্রবাহকে সংহত করতে শক্তিক্ষয় হচ্ছে বৈকি, তবু উপায় কি? ঐ সভ্য ভদ্র উদার ছেলেটার সামনে তো আর সুবর্ণ তার স্বামীর স্বরূপটা উদ্ঘাটিত করতে পারে না,, তাদের ভিতরের দাম্পত্য সম্পর্কের স্বরূপ!

কিন্তু সুবর্ণর শক্তিক্ষয়ে কি রক্ষা হলো কিছু?

সুবর্ণর স্বামী কি মহোল্লাসে নিজের গায়ে কাদা মাখল না? নিজের মুখে চুন-কালি?

মাটিতে মিশিয়ে দিল না সুবর্ণর সমস্ত সম্ভ্রম। দিল। সুবর্ণর জীবনের সমস্ত দৈন্য উদ্ঘাটিত করে দিল সুবর্ণর স্বামী। বলে উঠলো, 'চাঁপা? ওসব নাম মনে আছে তোমার এখনো? আশ্চয্যি তো!' চাঁপার খবর জানি না, তবে চাঁপার মা যে খুব ভালো আছে, তা প্রত্যক্ষ করছি! বাঃ! চমৎকার! সাধে কি আর শাস্ত্রে বলেছে সাপ আর স্ত্রীলোক এই দুইকে কখনো বিশ্বাস করতে নেই!'

সুবর্ণ হঠাৎ অদ্ভুতরকমের শান্ত হয়ে যায়।

শান্ত শান্তভাবেই হেসে ওঠে। হেসে উঠে বলে, 'শাস্ত্রে বলে? দেখেছো অম্বিকা ঠাকুরপো, আমার স্বামীর কী শাস্ত্রজ্ঞান! তা' বলেছ ঠিকই, ভালই আছি। খুব ভাল আছি। তোমার এই বোনের দেশ থেকে যেতেই ইচ্ছে হচ্ছে না—'

'যেতেই ইচ্ছে হচ্ছে না!' প্রবোধ নিমপাতাগোলা গলায় বলে, 'তা' অনিচ্ছে তো হবেই, এখানে যখন এত মধু!...... কী মশাই, আপনিই না আমার বোনাইয়ের সেই 'দেশোদ্ধারী' ভাই? তা' দেশোদ্ধারের পথটা দেখছি ভালই বেছে নিয়েছেন। নির্জনে পরস্ত্রীর সঙ্গে রসালাপ—'

'আঃ মেজদা, কী বলছেন যা তা—' অম্বিকা যেন ধমকই দিয়ে ওঠে, 'ছোট কথা বলবেন না। ছোট কথা আর কারো ক্ষতি করে না, নিজেকেই ছোট করে!'

'মেজদা!' ধমক।

প্রবোধ একটু থতমত খায়, কারণ প্রবোধ এই উল্টো ধমকের জন্যে প্রস্তুত ছিল না। তবে থতমত খাওয়াটা তো প্রকাশ করা চলে না, তাই সামলে নেয়। তবে গলায় আগের জোর ফোটে না।

ফিকে ফিকে গলায় বলে, 'ছোট!

গৌর মোহন দাস এণ্ড কোং
২৩৩, ওল্ড চীনা বাজার স্ট্রীট,
কলিকাতা-১
ফোন: ২২-৬৩৮০

হুঃ, আমরা ক্ষুদ্র মনিষ্যি, আমাদের আবার ছোট হওয়া!'

'ক্ষুদ্রই ভাববেন কেন নিজেকে?' অম্বিকা ধীর গলায় বলে, 'নিজেকে ক্ষুদ্রও ভাবতে নেই, অধমও ভাবতে নেই; মানুষের মধ্যেই ঈশ্বরের বিকাশ!'

ওঃ, লম্বাচওড়া কথা! উপদেশ! গুরু এসেছেন! প্রবোধ এবার নিজ-মূর্তিতে ফেরে! বলে, 'ওঃ, নিরালায় বসে ঈশ্বরসাধনাই হচ্ছিল তা হলে? আমি এসে ব্যাঘাত ঘটালাম? কী আর বলবো, আপনি কুটুমের ছেলে, বোনাইয়ের ভাই, আপনার অপমান, তার অপমান। তাই পার পেয়ে গেলেন! এ অন্য কেউ হলে তাকে জুতিয়ে পিঠের ছাল তুলতাম! আর এই যে বড় সাধের মেজবৌদি! চল তুমি, তোমাকে আমি দেখে নিচ্ছি গিয়ে। অবাক কান্ড! একঘর ছেলে-পেলে, বয়সের গাছপাথর নেই, তবু কুবাসনা ঘোচে না? তবু ইচ্ছে করে পরপুরুষের দিকে তাকাই! যাক্, তার জন্যে ভাবি না! মেয়েমানুষকে কি করে শায়েস্তা করতে হয় তা' আমার জানা আছে।'

অবাক কথা বৈ কি, তবু সুবর্ণ ফেটে পড়ে না। বরং প্রায় হেসেই বলে, 'জানো না কি! তা' তবু তো শায়েস্তা করে উঠতে পারলে না আজ অবধি!... নাও চলো এখন শায়েস্তা করতে শূলে দেবে কি ফাঁসি দেবে। এই ভালমানুষ ছেলেটাকে আর ভয় পাইয়ে দেব না বাপু, পালাই।...অম্বিকা ঠাকুরপো, ওই পদ্যটা কিন্তু আমার চাই ভাই। একটু কষ্ট করে ওর একটা নকল করে দিও আমায়।'

তা' প্রবোধ দেবতা নয়।

রক্তমাংসের মানুষ সে।

অতএব গোড়ার জিনিস ঐ রক্তটাই তার টগবগিয়ে ফুটে ওঠে স্ত্রীর ঐ প্রচ্ছন্ন ব্যঙ্গের দাহে।

সুবর্ণ যদি ভয় পেত, যদি গুটিয়ে সুটিয়ে তাড়াতাড়ি ঘর থেকে বেরিয়ে আসতো, আর ঐ পাজী লক্কা ছেলেটা যদি প্রবোধকে দেখে বেত-খাওয়া কুকুরের মত ঘাড় নিচু করে পালিয়ে প্রাণ বাঁচাতো, তা' হলে হয়তো প্রবোধ এত ফেটে পড়তো না।

কিন্তু সেই স্বাভাবিকটা হল না।

হলো একটা অভাবিত বিপরীত।

ছোঁড়াটা এলো বড় বড় কথা কয়ে উপদেশ দিতে, আর সুবর্ণ কিনা স্বামীকেই ব্যঙ্গ করলো।

অতএব প্রবোধও ফেটে পড়লো।

উগ্রমূর্তিতে বলে উঠলো, 'শূল কেন, ফাঁসি কেন! পায়ে জুতো নেই আমার? জুতিয়ে মুখ ছিঁড়ে না দেওয়া পর্যন্ত তো তোমার মতন বেহায়া মেয়েমানুষের মুখ বন্ধ করা যাবে না। বেরিয়ে এসো! বেরিয়ে এসো বলছি! এতদিন পরে স্বামী এলো, ধড়ফড়িয়ে উঠে আসবে, তা' না, পরপুরুষের বিছানায় বসে বসে স্বামীকে মস্করা! আর তুমি শালা—'

তা' অনেক সামলেছে নিজেকে প্রবোধ। স্ত্রীর চুলের মুঠি ধরে নি, এবং শালা শব্দটা উচ্চারণ করেই থেমে গেছে।

সুবর্ণ এবার উঠে আসে।

কেমন একটা অবিচলিতভাবেই আসে।

আর সবচেয়ে আশ্চর্য, এর পরও সেই পরপুরুষটার সঙ্গে কথা কয়। বলে, 'মিথ্যে তোমরা দেশ উদ্ধারের স্বপ্ন দেখছো অম্বিকা ঠাকুরপো! দেশকে আগে পাপমুক্ত করবার চেষ্টা করো।...এই মেয়ে-মানুষ জাতটাকে যতদিন না এই অপমানের কুন্ডু থেকে উদ্ধার করতে পারবে, তত-দিন সব চেষ্টাই ভস্মে ঘি ঢালা হবে।'

প্রবোধের সঙ্গে এসেছিল সুবালার ছোট ছেলেটা! তাকেই বলেছিল সুবালা। 'এই যা যা ছুটে যা' তোর মেজমামীকে ডেকে নিয়ে আয়, অম্বিকা কাকার বাড়িতে আছে বোধ হয়।

প্রবোধ সেই মাত্র খুলে রাখা জুতোটা আবার পায়ে গলিয়ে বলেছিল, 'চল আমিও যাচ্ছি।'

সুবালা প্রমাদ গণেছিল।

সুবালা তার মেজদাকে অনেক দিন না দেখলেও একেবারে চেনে না তা তো নয়? তাই বলে উঠেছিল, 'তুমি আবার কি করতে যাবে গো? এই তেতেপুড়ে এলে, তুমি বোসো হাত মুখ ধোও, ও যাবে আর আসবে। তুমি ততক্ষণ একটু মিছরির পানা খাও—'

প্রবোধ বোনের এই সহৃদয় আতিথ্যের আহ্বানে কর্ণপাত করে নি। গট গট করে এগিয়ে গিয়েছিল ছেলেটাকে 'চল' বলে একটা হুমকি দিয়ে।

সুবালা কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে দাঁড়িয়ে ছিল, মেজদার পিছু পিছু গেলে যে ভাল হতো, সেটা তখন মনে পড়ে নি তার।

মনে পড়িয়ে দিলেন ফুলেশ্বরী। বললেন, 'তুমিও গেলে পারতে বৌমা, মনে হচ্ছে মেজ ছেলে একটু রাগী মানুষ—'

'একটু রাগী!' সুবালাও রেগে ওঠে, বলে, 'আজন্মের গোঁয়ার। বৌটাকে কি তিলার্ধ স্বস্তি দেয়? রাতদিন সন্দেহ ওই বুঝি বৌ মন্দ হলো! তার ওপর আবার—মেজবৌই বা মরতে একা মেয়ে-মানুষ পদ্য শুনতে ওর ঘরে গেল কেন ছাই, তাও জানি না!'

'পদ্য শুনতে!'

"হ্যাঁ গো বললো তো তাই কানু। মা অম্বিকা কাকার বাড় আছে পিসি, পদ্য শুনবে। পদ্যটদ্য লেখে তো ঠাকুরপো, আর মেজবৌও তেমনি পাগল, জানিস যখন বর ওইরকম—'

ফুলেশ্বরী আস্তে বলেন, 'সংসারে এই পাগলদেরই সবচেয়ে বিপদ বৌমা! সুবর্নর মতন মেয়ে সংসারে দুর্লভ! কিন্তু সবাই তো ওকে বুঝবে না? একা বেটাছেলের বাড়িতে যেতে নিন্দে, এ বোধই নেই ওর, গঙ্গাজলে ধোওয়া মন ওর।'

'তা তো ধোওয়া! এখন জানি না কি খোয়ার হয়। যা আগুন হয়ে গেল মেজদা!'

'তাতেই বলছিলাম, তুমি সঙ্গে গেলে পারতে!'

'তাই দেখছি। কিন্তু এখন আবার গেলে—'

'তা হোক বৌমা তুমি যাও। রাগের মাথায় যদি ছেলে সুবর্নকে একটা চড়া কথা বলে বসেন, সেটা ভারী লজ্জার কথা হবে। অম্বু আমাদের আপন, ওদের তো কুটুম!'

'তবে যাই। উনুনে যে আবার দুধ বসানো।'

'দুধ আমি দেখছি। তুমি যাও। আমার মন নিচ্ছে দাদা তোমার বকাবকি করবে।'

সুবালা অতএব দাওয়া থেকে নামে।

আর মনে মনে ভাবে, মেজদার এই দুম্ করে আসাটাই ফন্দীর। জানি তো সন্দেহবাতিকে মানুষ। আর মজা দেখ কোনোদিন মেজবৌয়ের এ খেয়াল হয় না, মরতে ছাই আজই! মেজদাকে বলিহারী! অমন পরিবার, মর্ম বুঝল না। বুঝবে কি 'মর্ম' বস্তু নিজের ভেতর থাকলে তো!

দ্রুত এগোতে থাকে সুবালা!

হয়তো সুবালা ঠিক সময় পোঁছতে পারলে ব্যাপার 'সমে' আসতো। হয়তো সুবালাই গিয়ে বলে উঠতো—'কী জ্বালা! মেজবৌ তুই এখেনে বসে বসে পদ্য শুনছিস? আর মেজদা যে ইদিকে মন কেমনের জ্বালায় ছুটেপুটে চলে এসে, তোকে না দেখে বিশ্বভুবন অন্ধ-কার দেখছে।'

হয়তো 'যাহোক' করে কেটে যেত ফাঁড়া।

কিন্তু কাটবার নয়, তাই কাটল না।

সুবালা বেরিয়ে দু'পা যেতেই গরুর রাখালটা কাঁদো কাঁদো হয়ে ধরলো, 'অ মা মুংলির বাছুরটা পেলে গেছে—'

'পালিয়ে গেছে!'

'হি' গো মা! ক্যাতো খুঁজনু—' বলে বিবরণ দিতে বসে তার খোঁজা পর্বের

'আচ্ছা তুই দাঁড়া, আমি আসছি—' বলে সুবালা এগিয়ে যায়, কিন্তু যখন পৌঁছয়, তখন তার মেজদা শেষ বাণী উচ্চারণ করছে।

জুতিয়ে মুখ ছিঁড়ে না দিলে যে মেয়েমানুষ শায়েস্তা হয় না, সেই অভি-মত ব্যক্ত করছে!

সুবালার সর্বাঙ্গ দিয়ে ঘাম ঝরে যায়।

সুবালা মরমে মরে যায়।

অম্বিকা ঠাকুরপোর সামনে এইসব কথা! তা-ও সুবালারই দাদার মুখ থেকে! নিরুপায়ে একটা অক্ষেপে হঠাৎ চোখে জল আসে তার। যেমন এসেছিল তেমনি দ্রুত পায়ে ফিরে যায়।

সুবর্ণলতা টের পায় না, তার এই অপমানের আরো একজন সাক্ষী রয়ে গেল!

কিন্তু অত অপমানের পরও আবার সুবর্ণ সেই স্বামীর পিছু পিছু সেই স্বামীর ঘরেই ফিরে গেল?

সুবর্ণলতা না সত্যবতীর মেয়ে?

(ক্রমশঃ)

পরিবার পরিকল্পনার অর্থ কি?

এটা হ'ল এমন একটা ব্যবস্থা যাতে

- কত বছরের ব্যবধানে আপনার ক'টি ছেলে মেয়ে হ'লে ভালো হয় তা আপনি নিজেই স্থির করতে পারেন।
- আপনার স্ত্রীর স্বাস্থ্য ভালো রাখতে পারেন।
- আপনার ছেলেমেয়েদের শিক্ষা, তাদের স্বাস্থ্য রক্ষা এবং ওদের ভালোভাবে মানুষ করার দিকে বেশী নজর দিতে পারেন।
- কোন রকম দুশ্চিন্তা বা ভয় না ক'রে আপনি বিবাহিত জীবন উপভোগ করতে পারেন।

কয়েক রকম পদ্ধতিতে পরিবার পরিকল্পনা করা যায় এবং আপনি সেগুলির মধ্যে যে কোন একটা বেছে নিতে পারেন।

বিনামূল্যে পরামর্শ ও সেবার জন্য যে কোন পরিবার পরিকল্পনা কেন্দ্রে যান।

DA 66/307 BENGALI

প্রসঙ্গ বাংলার কথা

॥ নটীর হাট?—নৈ হট্ট ॥

লোকে বলে নটীর হাট থেকেই নাকি হয়েছে নৈহাটী। শুনতে ভাল, উচ্চারণে মধুর, একটি রোমান্সের আবেশ, দূরাগত একটি কৌতূহলের অস্ফুট আভাসে ভরা। কিন্তু—

প্রমাণ কিছু নেই। সংস্কৃত নর্তকী শব্দ থেকেই বাংলা অপভ্রংশ হয়েছে নটী। (অবশ্যই বারবিলাসিনী অর্থেও কখনও কখনও ব্যবহার হয়ে থাকে এই শব্দটি)। কিন্তু কে নটী, কোন্ নটী, কবে কোথায় কেমন করে সমাবেশ ঘটলো এতগুলি নটীর, যাতে করে সমগ্র এলাকাটির নামকরণই হয়ে গেল নটীর হাট। এসব খুচরো, কিন্তু অতি প্রয়োজনীয় প্রশ্নগুলির জবাব কিছুতেই খুঁজে পাবেন না উৎসুক অনুসন্ধিৎসু।

কোন এক নটীর বসানো হাট। বহু নর্তকী কিংবা দেহজীবিনীর সমাবেশে সৃষ্ট হাট-তুল্য এক উপনিবেশ, অথবা বন্দর সপ্তগ্রামের আদিযুগে দাস ব্যবসা যখন চলিত ছিল এদেশে, তখনই নর্তকী কেনা-বেচার প্রয়োজনে কোন হাট বসানো হয়েছিল এখানে, এমন কথা মনে করবার মতো তথ্য-প্রমাণও খুঁজে পাওয়া যায় না যথাযথ। আর তখনই সঙ্গীত, মৃদঙ্গ, মন্দিরা, ঝঙ্কারময়, রহস্য, রোমাঞ্চ আর কৌতূহলের মধুর মদির আবেশে আভাসে ভরা নামখানির রোমান্সের রসে ডুবু ডুবু হয়েও মন ছুটতে চাইবে অন্যদিকে, আর তখনই পাওয়া যাবে সত্যের সন্ধান, প্রকৃত তথ্যের আবরণে মোড়া।

হালিশহর সংলগ্ন কুমারহট্ট সম্বন্ধে 'কুমার পালের শ্রমিকহট্ট' কিংবদন্তী যদি সত্য হয়, তবে মেনে নিতে হবে পাল রাজত্বের শেষের দিকে নৈহাটীর পরিচয় ধূসর হলেও একেবারে অনুল্লেখযোগ্য ছিল না। কিন্তু সম্ভবত এইসব এলাকাকে সম্পূর্ণ অরণ্যমুক্ত এবং উন্নত জনপদযোগ্য করে তোলেন সেন রাজবংশের প্রথম নরপতি বিজয় সেন। লক্ষ্মণ সেনের সভাকবি ধোয়ীর পবনদূতম কাব্যের বর্ণনা এবং নির্দেশ মতো অনুমান করে নেওয়া যেতে পারে হালিশহর প্রান্তবর্তী বর্তমান বীজপুরই ছিল বিজয় সেনের রাজধানী বিজপুর। আর তাই রাজধানীর এত নিকটবর্তী স্থানগুলিও নিশ্চয়ই একেবারেই পরিত্যক্ত অরণ্যময় ভূখন্ড ছিল না বলেই ধরে নিতে হবে।

সুস্পষ্ট উল্লেখ পাওয়া যাচ্ছে আবুল ফজল লিখিত আইন-ই-আকবরীতে। বর্ধমানভুক্তির অন্তর্গত, সরকার সাতগাঁও-এর সীমানাভুক্ত কুমারহট্ট সংলগ্ন এই অঞ্চলগুলির শাহী শাসনকর্তা ছিলেন মুনিয়ান খাঁ। রাজা টোডরমলের আদেশে এই সমগ্র এলাকা তিনি জরীপ করিয়েছিলেন এবং কুমারহট্টের দক্ষিণ প্রান্তবর্তী এই এলাকাটির নাম ছিল তখন নই-হট্ট। নৈ মৈথিলী শব্দ; অর্থ—'নদী'। হট্ট খাঁটি সংস্কৃত অর্থ—'জনপদ'। নৈ-হট্ট অর্থাৎ কিনা নদীতীরবর্তী জনপদ। এক কথায় নদী-তীর-নগরী। ভাষা বিবর্তনের এমন অনেক

পারুল ভট্টাচার্য

নজির বাংলাতেও পাওয়া যাবে। দৈ অর্থে যদি দধি হয়, সৈ অর্থে যদি সখি হয়, নৈ অর্থে নদী হতে বাধা নেই। প্রসঙ্গত বৌ অর্থে বধূ হওয়ার কথাও স্মরণ করতে বলি পাঠককে।

নামেই নদী-তীর-নগর। আসলে কিন্তু নির্জন নিবাস তখনও। বাসিন্দা বলতে কিছু জেলে, জোলা, বাউরী আর বাইতি। হালিশহরেরই জম-জমা তখন। নৈহাটী তখনও আপন অস্তিত্বের অন্ধকারে ভ্রূণাক্ষরে মাত্র স্বাক্ষরিত। ওপারে বন্দর সপ্তগ্রামের বেচা-কেনার ঢেউ একটু-আধটু এসে পৌঁছয়—কিছু মাছ ব্যবসায়ী, আর কাঠ ব্যবসায়ীদের আনাগোনায়। দু-চার জন নৌজীবী কিংবা বারুজীবীদের আবাসও যে খুঁজলে পাওয়া যায় না এমন নয়। কুমার পালের নৌ বিতান প্রসিদ্ধ। ছড়িয়ে-ছিটিয়ে বসত করে অভিজ্ঞ চালক কিংবা শিল্পীদল। কুমারহট্ট হালিশহরের সম্পদ-সৌভাগ্যের ছিটে-ফোঁটাই এসে পৌঁছায় এতদূরে। নৈ-হট্টের সাধারণ মানুষ তাদের গ্রামজীবনের অতি সাধারণ সাধ-সাধ্য, সুখ-দুঃখ, হাসি-আনন্দ নিয়েই সন্তুষ্ট তখনও।

একটা আলোড়নের আভাষ পাওয়া যায় বাংলা দ্বাদশ শতকের প্রথম দশকে। বৈষ্ণব-সহজিয়া তথা মুসলমান সুফী-ভাবের সমন্বয়ে সৃষ্ট আউলিয়া-পন্থার আদি আবিষ্কর্তা ফকির আউলচাঁদের আবির্ভাবের পর। এ সম্বন্ধে আউলিয়ারা একটি গভীর বিশ্বাস পোষণ করেন মনে মনে।

বঙ্গাব্দ দশম শতাব্দীর প্রথমার্ধ ভাগ। মাধো সম্প্রদায়ের আদিগুরু মাধবেন্দ্র পুরী হতেই বৈষ্ণবধর্মের প্রথম সূত্রপাত। পরবর্তীকালে মহাপ্রভুর হাতে যার সমূল সংস্কার এবং প্রবল প্রচার, নিত্যানন্দের চেষ্টায় পূর্ণ প্রতিষ্ঠা। চৈতন্য কালবর্তী প্রচারের সেই দেশজোড়া ধারাটি তখন প্রবল বেগে বয়ে গেছে বার বার। স্তিমিত হয়ে এসেছে নূতনত্বের উত্তেজনা। দুকূল ছাপানো জোয়ারের কূলে কূলে জমছে অবসাদের পলি। নামে রুচি এবং জীবে দয়ার অতি সরল নির্দেশিত বৈষ্ণবধর্মেও ধীরে ধীরে দেখা দিচ্ছে নানা যোগাযোগ, করণ-কারণ, কষ্টসাধ্য সব সাধন পদ্ধতি। তত্ত্ব আর তথ্যে রহস্য-ভারাতুর হয়ে উঠেছে বৈষ্ণবীয় সাধনা। বিশেষত অবতারবাদ। নররূপী নিমাই পরিণত হচ্ছেন নারায়ণে। ত্যাগ-তিতিক্ষা আর তপস্যার জীবন্ত বিগ্রহ উন্নীত হচ্ছে অসাড় অমরত্বে।

অদ্বৈত প্রেরিত এক প্রহেলিকা পাঠ করে চিন্তিত হলেন মহাপ্রভু। কঠোর কিংবা কষ্টসাপেক্ষ সাধনায় অক্ষম, স্বল্পায়ু ক্ষীণচিত্ত কলির মানুষের জন্য আরও সহজ, আরও সরল কোন এক সাধনপদ্ধতির প্রয়োজন অনুভব করলেন তিনি। আউলিয়ারা বলেন, এই প্রয়োজনেরই তাগিদে চৈতন্যলীলা অবসানের প্রায় ১৬১ বছর পরে রাঢ় বঙ্গে গঙ্গার পূর্বকূলে ঘোষপাড়ায় রামশরণ পালের গৃহে এক মুসলমান ফকিরের বেশে তাঁর নব আবির্ভাব। এই ফকিরই আউলিয়া ধর্মের আদি প্রবর্তক। আউলচাঁদ নামে প্রসিদ্ধ। লীলান্তে রামশরণ পালের সাধ্বী পত্নী সতী-মায়ের গর্ভে পুত্র দুলালচাঁদরূপে তাঁর পুনরায় জন্মগ্রহণ। দুলালচাঁদ সহজিয়া কর্তাভজা সম্প্রদায়ের প্রথম প্রচারক। রামশরণ কর্তাবাবা। আর বিখ্যাত সতীমাতলার দোলাই কর্তাভজা বা ন্যাড়া-নেড়ী সম্প্রদায়ের দোল নামে প্রসিদ্ধ। কিন্তু সে কথা বারান্তরে বিশদভাবে বিবৃত হবে।

আউল-দুলাল-রামশরণ আবির্ভাবের পর নৈ-হট্ট এলাকায় যে আলোড়ন তা ধর্মীয় আলোড়ন। আউল অর্থে আকুল। অর্থাৎ আকুল হওয়ার ধর্ম। আকুল হয়ে ভালবাসার ধর্ম। ঈশ্বর অসীম অনন্ত

অজ্ঞাত অচিন্ত্য সত্তা। ঈশ্বরকে ধারণা না করলেও ভাল না বাসলেও চলবে। মানুষকে ভালবাসার, ভালবেসে আকুল হবার। আর সেই আকুলতার মধ্য দিয়েই ঈশ্বরকে প্রত্যক্ষ করার ধর্ম।

আউলিয়াদের বিশ্বাসে সন্দেহ প্রকাশের অবকাশ কম। এমন দুঃসাহসিক ধর্মের প্রচার শ্রীচৈতন্যের পক্ষেই সম্ভব।

সাধারণত মুসলমান সহজিয়ারাই আউল নামে এবং হিন্দু সহজিয়ারা বাউল নামে পরিচিত। আউল অর্থে যদি আকুল হয়, বাউল তবে ব্যাকুল নিঃসন্দেহে। স্বয়ং চৈতন্যদেব তাঁর জীবদ্দশায় সহজিয়া পথের উল্লেখ করেছেন কয়েকবার। বরং এক কথায় সহজ ধর্মকে বৈষ্ণবধর্মেরই একটি পরিবর্তিত এবং সরলায়িত রূপেই বলা যেতে পারে। আর এই কুমারহট্ট হালিশহর যেখানে চৈতন্য-গুরু ঈশ্বরপুরী বাস করেছেন। নিত্যানন্দ সহ মহাপ্রভুও প্রদক্ষিণ করেছেন এই স্থান। সেখানে বৈষ্ণবধর্মের একটা প্রবল প্রভাব ছিলই। এখন এই নূতন ধর্মের অভ্যুত্থান মাত্রেই সাদরে গৃহীত হলো তা। বিশেষত নৈ-হট্ট এলাকায় উচ্চবর্ণের অনাদৃত যেসব নিম্নবর্গীয় মানুষেরা বাস করতো তাদের মধ্যে বিপুল সম্বর্ধনা পেল বললেও চলে। ছড়িয়ে পড়লো অতি দ্রুত, প্রায় বিদ্যুদ্‌বেগে।

গৌড়েশ্বর হুসেন শাহের আকর মালিক—অর্থাৎ রাজস্বসচিব এবং দবীরখান অর্থাৎ নিজস্ব সহকারী, পরবর্তীকালে মহাপ্রভুর শ্রেষ্ঠ শিষ্য এবং প্রিয় পার্ষদ রূপ-সনাতনের বাস ছিল এই নৈহাটীতেই। অনুমান খৃস্টীয় পঞ্চদশ শতকের প্রথম দিকে রাজা দনুজমর্দনদেবের পুত্র কুমার পদ্মনাভ। কোন এক অজ্ঞাত কারণে রাজ্য এবং রাজধানী ত্যাগ করে এসে তিনি নৈহাটীতে বসবাস করেন। কিছুকাল পরে ম্লেচ্ছভয়ে নৈহাটী ত্যাগ করে আবার চলে যান চন্দ্রদ্বীপে। এ সম্বন্ধে বৈষ্ণবগ্রন্থ প্রেমবিলাসের ২৩ সর্গে পাওয়া যাচ্ছে—

> যবনের ভয়ে কুমার নৈহাটী ছাড়িলা
> কিছুদিন বঙ্গে চন্দ্রদ্বীপে বাস কৈলা।

এই কুমার পদ্মনাভই রূপ-সনাতনের পিতা। রূপ এবং সনাতন ছাড়াও তাঁর আরও এক পুত্র ছিলেন অনুপম।

রূপ-সনাতন এবং পদ্মনাভের বাসস্থান নৈহাটী নিয়ে বিতর্ক আছে। কেউ কেউ মনে করেন বর্ধমান জেলার ওগগা তীরে আর এক নৈহাটী বর্তমান, সেইখানেই বাস করতেন পদ্মনাভ। কিন্তু সম্বন্ধ নির্ণয় গ্রন্থে এ সম্বন্ধে একেবারে সুস্পষ্ট উল্লেখ পাওয়া যাচ্ছে—

নৈহাটীর পৌরসভাভবন

> চক্রদ্বীপ দক্ষিণে কুমার হট্টগ্রাম
> তাহার দক্ষিণে ছিল কুমারের ধাম।
> (সম্বন্ধ নির্ণয়—৭২০ পৃষ্ঠা)

চক্রদ্বীপ বর্তমানে চাকদহ। আর কুমারহট্ট দক্ষিণ যে নৈহাটী, এতো সন্দেহের অতীত।

নদী-তীর-নগরীর নগরীত্ব সার্থক করে নূতন নূতন আগন্তুকের আবির্ভাব ঘটতে লাগলো এরও অনেক পরে, সপ্তদশ শতাব্দীর শেষভাগে। নবাব শায়েস্তা খাঁর আমল থেকে। দেশ জুড়ে তখন প্রবল বিশৃঙ্খলা। বিশেষত হুগলী নদীর এপার-ওপার—ওপারে হুগলী এবং এপারে হাবেলী শহর সংলগ্ন এলাকাগুলিতে তো অশান্তির আর শেষ নেই। ক্যাপ্টেন নিকলসনের নেতৃত্বে হুগলীতে নবাবী শাসনের ঘটেছে অবসান। অনেক রক্তস্রোত আর বহ্নিবন্যা বইয়ে স্থাপিত হয়েছে ইংরাজ অধিকার। পর্তুগীজ বণিকগোষ্ঠীর পতন হয়েছে বটে, কিন্তু হুগলী নদীতে হার্মাদদের অত্যাচারে নবরূপে তাঁদের আত্মপ্রকাশ। মানুষ ত্রস্ত, জনপদ থর থর। আরাকানী মগ দস্যুদলও ধীরে ধীরে করছে আত্মপ্রকাশ। বাংলা-ভাষায় মগের মুলুক কথাটির ব্যবহার এবং অর্থবোধ শুরু হয়ে গেছে ভালভাবেই। এই সব কিছু মিলিয়ে এবং তারও উপরে মেদিনীপুরের এক জমিদার শোভা সিং-এর বিদ্রোহ আক্রমণ ও অত্যাচারে এক ব্যাপক বিভীষিকার বিস্তার ঘটেছে দেশে। সাধারণ মানুষের ধনপ্রাণ রক্ষা করা, তাদের শান্তি এবং নিরাপত্তার সুব্যবস্থা করা কঠিন থেকে কঠিনতরই হয়ে উঠছিল দিন দিন।

এই সময়ই ভাগীরথীর পূর্বতীরে হাবেলী শহর সংলগ্ন এলাকাগুলির শান্তি ও সুরক্ষা বিধানে সামন্ত ভীমসেনকে শাসক নিযুক্ত করেছিলেন নবাব। ভীম শুধু সাহসী ও শক্তিমানই ছিলেন না, অত্যন্ত কৌশলী ও তীক্ষ্ণধী ছিলেন। শাসনভার হাতে পেয়েই প্রথমে তিনি দস্যুদমন করলেন। ঠেকালেন শোভা সিং-এর আক্রমণ। অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে সমস্ত এলাকাটি জুড়ে প্রতিষ্ঠা একটি করলেন সুরক্ষিত নিরাপত্তা।

এই নিরাপত্তার আকর্ষণেই এসেছিল মানুষ। হত্যা, রক্ত, মৃত্যু এবং লুণ্ঠন বিভীষিকাময় দিগ্‌বিদিক ছেড়ে দলে দলে পালিয়ে এসে আশ্রয় নিয়েছিল নৈহাটীতে। এসেছিল বর্ধমান থেকে, বীরভূম থেকে, হুগলী থেকে। সুদূর পূর্ব বা উত্তরবঙ্গ থেকেও এসেছিলেন কেউ কেউ। ব্রাহ্মণ, কায়স্থ, বৈদ্য এবং বৈশ্য সমাজ; অসিজীবী, মসীজীবী, বুদ্ধি আর বাণিজ্যজীবীর দল। নৈহাটীর জমজমাটি এইকালেই। আর বেশির ভাগ বনেদী পরিবারগুলিরই আগমন কতক এই সময়, কতক আরও কিছুকাল পরে নবাব আলিবর্দীর আমলে, বাংলায় বর্গী আগমনের ধাক্কায়।

প্রথম এসেছিলেন ঘোষ-মজুমদাররা। এঁদের আদিবাস ছিল হুগলী জেলার পাণ্ডুয়া থানার আকনা গ্রামে। কুলীন কায়স্থ, পদবী ঘোষ। নবাব সরকার থেকে উপাধি পেয়েছিলেন 'মজুমদার'। পালিয়ে এসে বসবাস করেন এবং করেও যাচ্ছেন বংশানুক্রমিকভাবে।

তারপর আসেন মিত্র বংশ। এঁরা

ঘোষ-মজুমদারদেরই দৌহিত্র বংশ। আগমনকালও প্রায় সমসাময়িক। বহু খ্যাত-বিখ্যাত পুরুষ জন্মেছেন এঁদের বংশে। শ্রীবরদাকান্ত মিত্রের নাম উল্লেখ করা যেতে পারে। দানবীর এবং দয়াশীল ব্যক্তি বলে তাঁর খ্যাতি ছিল সেকালে।

দত্তগোষ্ঠীও আগন্তুক। এঁদের আদিবাস ছিল বর্ধমানে। শোভা সিংহের অত্যাচার এড়াতে এসে বসতি নিয়েছিলেন নৈহাটীতে। সরকাররা কিছু পরের মানুষ। হুগলীতে ইংরাজ অধিকার সুপ্রতিষ্ঠিত হবার পর তাঁদের আগমন। ব্যবসা-বাণিজ্যের সুযোগ-সুবিধা লাভ করবার উদ্দেশ্যেই এসেছিলেন তাঁরা। এঁদের বংশে শ্রীতারক সরকার বিখ্যাত ব্যবসায়ীরূপে প্রতিষ্ঠালাভ করেছিলেন সেকালে। কার সাহেব নামে এক ইংরাজের সংগে যৌথভাবে মুর্শিদাবাদের সিল্ক, ঢাকার মসলিন, সপ্তগ্রামের সুতী কাপড়, সোরা, লাক্ষা প্রভৃতি সাগরপারে চালানের ব্যবসা ছিল এঁদের। কার-তারক এন্ড কোম্পানী নামে পরিচিত ছিল তাঁদের প্রতিষ্ঠান।

ভট্টাচার্যরা এসেছিলেন ১৭৫৭ সনে। পলাশীর মাঠে তখন ঘন হয়ে নামছে যুগান্তরের অন্ধকার। বাংলা তথা ভারতের ইতিহাসের পাতায় পাতায় ঘনিয়ে আসছে এক মহা অশুভ সন্ধিক্ষণের সঙ্কট মুহূর্ত।

নৈহাটীর ভট্টাচার্য বংশ প্রাচীন এবং পরিচিত। মহা মহা পন্ডিতদের বংশ। যজন, যাজন, অধ্যয়ন এবং অধ্যাপনায় প্রভূত খ্যাতিশীল এবং ইদানীংকালে মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর আবির্ভাব-ধন্য বংশ।

নৈহাটীতে এঁদের আদিপুরুষ পন্ডিত মাণিক্য তর্কভূষণ। খুলনা জেলার কুমিরা গ্রাম ত্যাগ করে এখানে চলে এসেছিলেন তিনি। শান্ডিল্য গোত্র, পদবী বন্দ্যোপাধ্যায়, পেশা যজন, যাজন, অধ্যাপনা। উপদ্রুত বরেন্দ্রভূমি ত্যাগ করে রাঢ় বঙ্গে গঙ্গাতীরে এসে আশ্রয় নেন—শান্তিতে জীবনযাপনের আশায়।

মহারাজ আদিশূরের আমন্ত্রণে কনৌজ থেকে যে পাঁচজন আদি ব্রাহ্মণ এসেছিলেন বাংলায়, শান্ডিল্য গোত্রীয় ক্ষিতীশ তাঁদের অন্যতম। বাংলাদেশে বন্দ্যোপাধ্যায় কুলীনকুলের তিনিই আদিপুরুষ। কনৌজ থেকে আসার পর প্রথম কিছুকাল বীরভূমের বন্দ্যোঘটী (বর্তমানে বন্দীঘাট) গ্রামে বাস করেন তিনি। এই বন্দ্যোঘটী গ্রামানুসারেই বন্দ্যোপাধ্যায় পদবীর উদ্ভব বলে মনে করেন অনেকে। নৈহাটীর ভট্টাচার্য বংশের প্রথম পুরুষ মাণিক্য তর্কভূষণ আদিপুরুষ ক্ষিতীশের পরে ২৬তম সন্তান। মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর দূরত্ব আরও কয়েক পুরুষ। ক্ষিতীশ থেকে হরপ্রসাদ শাস্ত্রী পর্যন্ত এঁদের যে কুলপঞ্জী পাওয়া যায়, তা উদ্ধৃত করে দেওয়া গেল।

কলিব্যাস
|
বামদেব —কনৌজীয়া (কলিব্যাস, বামদেব, রামদেব)
|
রামদেব
|
ক্ষিতীশ —কনৌজীয়া (আদিশূরের আমন্ত্রণে বাংলায় আসেন)।
|
ভট্টনারায়ণ
|
বরাহ
|
সুবুদ্ধি
|
বৈনতেয়
|
বিধুঠেশ
|
গাউ
|
গঙ্গাধর
|
পশে
|
শকুরি
|
মহেশ্বর
|
মহাদেব — (মহেশ্বর, মহাদেব) খৃস্টীয় দশম শতাব্দীর শেষার্ধ বাংলায় লক্ষ্মণ সেনের রাজত্ব।
|
দুর্বলী
|
নারায়ণ
|
পীতাম্বর
|
শ্রীরঙ্গ
|
নিত্যানন্দ
|
প্রজাপতি
|
বেদাঙ্গদ
|
পুন্ডরীকাক্ষ
|
জীবনাথ
|
কৃষ্ণদাস
|
রাজেন্দ্র
|
রঘুনাথ
|
রামবল্লভ
|
মাণিক্য তর্কভূষণ —১৭৫৭ সনে নৈহাটী এলেন।
|
শ্রীনাথ

শ্রীনাথের পর রামকমল। আর তারও পরে শরৎনাথ বা হরপ্রসাদ শাস্ত্রী। এঁরা সাত ভাই ও এক বোন ছিলেন—নন্দকুমার, রঘুনাথ, যদুনাথ, হেমনাথ, শরৎনাথ, হরপ্রসাদ ও মেঘনাদ। এক ভগ্নী দীনতারিণী।

বিশেষ বিশেষ এই পরিবারগুলি ছাড়াও খ্যাত-অখ্যাত আরও অনেক মানুষই এসে আশ্রয় নিয়েছিলেন এখানে। তাঁদের অনেকের উত্তরপুরুষেরা আজও আছেন নৈহাটীতে। অনেকেরই আবার অস্তিত্বের চিহ্নটুকুও বিলুপ্ত হয়ে গেছে। অনেক সুখ-দুঃখ, আশা-আনন্দের সমাধি সূচিত হয়ে গেছে তাঁদের সঙ্গে সঙ্গেই। যাঁরা আছেন তাঁরাও হয়ত ক্লান্ত, কর্মভারাতুর। নিত্যকৃত্য দৈনন্দিনের বোঝায় বিবশ। পুরানো কাহিনী, প্রাচীন ইতিহাস বিস্মৃতিতেই বিগত। স্মৃতির বাসায় তাকে সযত্নে সঞ্চিত করে রাখবার সময় কই? সাধ্যই বা কোথায়?

* * * *

ভীম সামন্তের একমাত্র পুত্র ব্রহ্মানন্দ দে সরকার। জনসাধারণে ব্রহ্ম সামন্ত নামেই তিনি খ্যাত ছিলেন সাধারণত। পিতার উপযুক্ত পুত্র। বলিষ্ঠ, সাহসী, সুযোগ্য এবং সংসারকুশলী। যুদ্ধ এবং রণনীতিতেও অভিজ্ঞতা ছিল ব্রহ্মানন্দের। উত্তীর্ণ কৈশোরেই পিতার বাগ্দী সৈন্যদলের অধিনায়ক হয়েছিলেন তিনি। এবং স্বয়ং তাঁর ও তাঁর এই বাহিনীর উপরে যথেষ্ট আস্থা রাখতেন হুগলীর তৎকালীন ফৌজদার মহারাজ নন্দকুমার ও নবাব সিরাজদ্দৌল্লা স্বয়ং। ব্রহ্মানন্দের শক্তি, সাহস এবং যোগ্যতার উপরে ভরসা ছিল তাঁদের।

কিন্তু প্রকৃত সঙ্কটকালে নবাব কিংবা নন্দকুমার কাউকেই খুব বড় রকমের কিছু একটা সাহায্য করে উঠতে পারেন নি ব্রহ্মানন্দ। অধিকৃত কলকাতা মাণিকচাঁদের হাতে ছেড়ে দিয়ে নবাব যখন ফিরে গেলেন মুর্শিদাবাদে এবং বিশ্বাসঘাতক মাণিকচাঁদের কারসাজিতে বিজিত নগরী পুনরায় হাতছাড়া হবার উপক্রম হল, তখন নাকি আপন সৈন্যদল নিয়ে কলকাতা

রক্ষার চেষ্টায় ইংরাজকে আক্রমণ করতে ব্রহ্মানন্দকে অনুরোধ জানিয়েছিলেন নন্দকুমার। ব্রহ্মানন্দ প্রস্তুত হচ্ছিলেন সৈন্যদল নিয়ে। এমন সময় হঠাৎ রাজধানী থেকে মীরজাফরের এক জরুরী আবাহন পেয়ে অতি ত্বরিতে মুর্শিদাবাদে চলে যেতে হয় তাঁকে। ফিরে যখন এলেন কলকাতা বিজয় তো সম্পূর্ণই বটে, হুগলীর উপরেও হামলা চলেছে ইংরাজের। ১৭৫৭ খৃস্টাব্দের ১০ই জানুয়ারী মেজর কিল প্যাট্রিক হুগলী আক্রমণ করেছেন। নিহাটীতে ব্রহ্মানন্দের প্রত্যাবর্তনের সংবাদ পেয়ে সাহায্যের জন্য পুনঃ আবেদন জানালেন নন্দকুমার। অস্ত্রশস্ত্র সৈন্যদল নিয়ে পুনঃ প্রস্তুত হলেন ব্রহ্মানন্দ। কিন্তু এবারেও দুর্ভাগ্য। গঙ্গা পার হবার আগেই মক্তবপুরের খালের (বর্তমানে মুক্তাপুর)। ঠিক মুখে পিছন দিক থেকে আকস্মিকভাবে আক্রান্ত ও বন্দী হলেন ব্রহ্মানন্দ। শোনা যায়, তাঁর এই সহসা বিপদ এবং বন্দিত্বের পিছনে নদীয়াধীপ মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের পরোক্ষ হস্তক্ষেপ ছিল।

ব্রহ্মানন্দের বন্দিত্ব নৈ-হট্টের একটি গৌরবোজ্জ্বল সম্ভাব্য ইতিহাসের উপরেই টেনে দিল কৃষ্ণ যবনিকা। যুদ্ধে অংশ নিতে পারলেন না ব্রহ্মানন্দ। অন্য ইতিহাসের বুকে এঁকে যেতে পারলেন না সবল এবং স্বাধীনতাকামী একটি তরুণ প্রাণের স্বপ্ন স্বাক্ষর কালস্রোত হয়তো রুখতো না। মহাকালের রথচক্রধ্বনিতে বাজছিল যে পরিবর্তনের আওয়াজ, আভাসিত হচ্ছিল নবযুগের নূতন সূত্রপাত, তাকেও স্তব্ধ করা যেতো না, তথাপি বাংলা তথা ভারতের জাতীয়তার ইতিহাসে মীরমদন আর মোহনলালের পাশে অগ্নির অক্ষরে হয়তো বা উজ্জ্বল হয়ে ফুটে উঠতে পারতো আরও একটি নাম—তাও হলো না। বন্দী হলেন, ইংরাজ-অধিকৃত কলকাতায় দুর্গ উইলিয়মের এক অন্ধকার বন্ধ কুঠরীতে দিনে দিনে, মাসে-বৎসরে হত আনন্দ, অপচয়িত হল আশা। তরুণ ব্রহ্মানন্দ এগিয়ে চললেন এক অদৃশ্য অনভিপ্রেত অকালবয়স্কতার পানে।

মুক্তি পেলেন একেবারে দীর্ঘ চার বৎসর পর ১৭৬১ খৃস্টাব্দের প্রথমে। বৃদ্ধ, অশক্ত, রুগ্ন একমাত্র পুত্রের বিচ্ছেদে শোকাতুর পিতা ভীম সামন্তের মৃত্যুর পর। ইতিমধ্যে অনেক পরিবর্তনের ঢেউ বয়ে গেছে দেশে। স্বর্ণপ্রসূ ভারতের সমৃদ্ধি তথা সম্পদের লোভে আকৃষ্ট বাণিজ্যলিপ্সু বিদেশী শক্তির ব্যবসায়িক অধিকার মাত্র প্রাপ্তিতে হয়েছিল যার সূত্রপাত, অনেক রক্ত কলুষিত ষড়যন্ত্রসঙ্কুল অধ্যায়ের পর পলাশীর মাঠে এক অশুভ সূর্যাস্তের সন্ধ্যায় ঘটেছে তার অবসান। ভারতের ভাগ্যলক্ষ্মী কুণ্ঠিত প্রহর গুণছেন এক অবশ্যম্ভাবী পরিণামের। বণিকলক্ষ্মীর পাদপীঠে দেখা দিয়েছে আগামী দিনের সোনালীদ্যুতির ইশারা। তথাপি মীরজাফরী শাসনের অন্ধকার কাটিয়ে শেষবারের মত দেখা দিয়েছে আশা-চিকচিক একটু আলোর আভাষ। মুর্শিদাবাদের মসনদে মীরকাশিম।

কাটোয়া, গিরিয়া, উধুয়ানালা। নিভে গেল আলো। অস্তমিত হল স্বাধীনতার শেষ রশ্মিচ্ছটাটুকু। বাংলা-বিহার-উড়িষ্যার নবাবীশক্তির পতনের সঙ্গে সঙ্গে ঘনিয়ে এল ভারতে ইংরাজ অধিকারের শুরুর কাল।

ব্রহ্মানন্দ দেখলেন। এই চারটি বছর তাঁর একেবারে বৃথা যায় নি। প্রথম যৌবনের স্বপ্নে উজ্জ্বল, মহিমায় মহৎ, চার-চারটি বছর কাটিয়ে এসেছেন তিনি কারাগারে। সেই কারাগার তাঁর অনেক নিয়েছে, তরুণ শরীরের দৃঢ়তা করেছে হরণ, গর্বিত মেরুদণ্ডের ঔদ্ধত্য নত হয়েছে ন্যুব্জতায়। কৃষ্ণ কেশপুঞ্জে ইতস্তত শুভ্রতার অকালস্বাক্ষর। তথাপি—

ব্রহ্মানন্দ জেনেছেনও অনেক। এই দীর্ঘ চার বৎসর কারাগারে বসে তিনি আলস্যে কাটান নি। পড়াশুনা করেছেন প্রচুর। আরবী, ফারসী, সংস্কৃত, ইংরাজী, দর্শন আর ইতিহাস। সঙ্কীর্ণ প্রাচীরের আড়ালে আটক দুই চোখের বন্ধ-দৃষ্টি ছড়িয়ে দিয়েছেন জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিস্তৃত সীমানায়। আর সেই পরিণত জ্ঞানচ্ছায়ায় বসে বুঝতেও শিখেছেন অনেক। পেয়েছেন সেই অনুভূতি, যা বর্তমানকে অতিক্রম করে ভবিষ্যৎকে ভাবতে শেখায়।

ব্রহ্মানন্দ অনুভব করলেন দেশে শুধু শাসক বদল হয় নি, সংস্কৃতিরও ঘটছে রূপান্তর। অসিজীবী সামন্ততন্ত্র বিদায় নিচ্ছে, এগিয়ে আসছে মসিনির্ভর বৈশ্যসভ্যতা।

এদিকে স্বামী-পুত্র শোকজর্জর বৃদ্ধা বিধবা মাতা তখনও জীবিতা। সামন্ত-বংশের অবসান আশঙ্কায় শঙ্কিত। বিবাহ করে সর্বপ্রথম তাঁকে চিন্তামুক্ত করলেন ব্রহ্মানন্দ। ১৭৬৪ খৃস্টাব্দে জন্ম হল কমললোচনের। ব্রহ্মানন্দের একমাত্র পুত্র, সামন্তবংশের অদ্বিতীয় উত্তরসূরী।

আর এখন, এই এতদিন পরে এই প্রথম জীবনরক্ষার প্রয়োজনে কোন জীবিকার তাগিদ অনুভব করলেন ব্রহ্মানন্দ। দেখলেন সামন্ত ভীমসেনের কালে অর্জিত বৈভবরাশি অন্তর্হিতপ্রায়। কষ্টে টিকিয়ে রাখা ঠাটে-বাটে সাজানো সংসারের তলায় তলায় শাসাচ্ছে যে দারিদ্র্য, তার চেহারাটি বড়ই ক্রূর। নবাগত বংশধরের নিরাপদ ভবিষ্যতের বনিয়াদ গড়ে দেবার একটা তাগিদও ছিল মনে মনে।

১৭৭৩ খৃস্টাব্দে ওয়ারেন হেস্টিংসের প্রত্যক্ষ করক্ষেপে সুপ্রীম কোর্টের মুন্সী নিযুক্ত হলেন ব্রহ্মানন্দ। কুখ্যাত স্যার ইলায়েজা ইম্পে তখন সুপ্রীম কোর্টের জজ। ব্রহ্মানন্দ মুন্সী নিযুক্ত হওয়ার কিছুকাল পরেই শুরু হয় বিখ্যাত মহারাজ নন্দকুমার সম্বন্ধীয় জালিয়াতির জাল মামলা। এককালের প্রিয় সুহৃদ এবং শ্রদ্ধেয় সহকারীকে এক অতি হীন ষড়যন্ত্রের শিকার হয়ে দিনের পর দিন কাঠগড়ায় দাঁড়াতে দেখে কি জাতীয় মনোভাব হয়েছিল ব্রহ্মানন্দের, তা আজ আর জানা যাবে না। আর বিচারের নামে সেই সুদীর্ঘ প্রহসনের অবসানের পর ফাঁসির মঞ্চে এক অ-কৃত অপরাধের গুরু প্রায়শ্চিত্ত অনুষ্ঠিত হতে দেখেই বা নব-প্রতিষ্ঠিত শাসনব্যবস্থার প্রতি ঠিক কতখানি শ্রদ্ধাশীল হয়েছিলেন তিনি সে কথাও চিরকাল অজ্ঞাতই রয়ে যাবে দেশবাসীর কাছে।

নন্দকুমারের মামলা শেষ হবার পর ইম্পে বদলী হয়ে যান, সুপ্রীম কোর্টের জজ হয়ে আসেন স্যার রবার্ট চেম্বারস এবং স্যার জন এস্ট্রেদার। যথাযথ দক্ষতার সঙ্গেই তাঁদের কাছেও দীর্ঘদিন কাজ করেছিলেন ব্রহ্মানন্দ।

১৭৭৩ খৃস্টাব্দেরই প্রথম দিকে ন্যাথানিয়েল ব্যাসী হ্যালহেড-এর চালনায় ১১ জন হিন্দু পণ্ডিত এবং কয়েকজন মৌলভীর মুখপাত্র হয়ে এক দেওয়ানী গ্রন্থ রচনায় হাত দিয়েছিলেন ব্রহ্মানন্দ। ১৭৭৫ খৃস্টাব্দে শেষ হয় গ্রন্থখানি। হ্যালহেডস জেন্টু-ল (এ কোড অফ জেন্টু অন অর্ডিনেশন অফ্ দি পান্ডিটস্ ইন ১৭৭৫) নামে ছেপে প্রকাশিত হয়।

১৭৭৮ খৃস্টাব্দে স্যার উইলকিন্স আসেন ভারতে। সন্ধানী এবং জ্ঞানানুরাগী এই বিদেশীর সঙ্গে একটি প্রগাঢ় বন্ধুত্বের সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল ব্রহ্মানন্দের। গীতা এবং মনুসংহিতার ইংরাজী অনুবাদে স্যার উইলকিন্সকে যথেষ্ট সাহায্যও করেছিলেন তিনি। গীতার অনুবাদ শেষ হয়েছিল। কিন্তু অত্যন্ত দুঃখের কথা এই যে, মনুসংহিতার কাজ শেষ হবার আগেই ১৭৮৩ খৃস্টাব্দে বিধবা পত্নী এবং একমাত্র তরুণ পুত্র কমললোচনকে রেখে মাত্র ৪৮ বছর বয়সে মৃত্যু ঘটে তাঁর। প্রকাণ্ড প্রাসাদ (মুন্সীবাটী) প্রভূত বিত্ত এবং প্রচুর প্রতিষ্ঠা ছাড়াও যা রেখে গেলেন

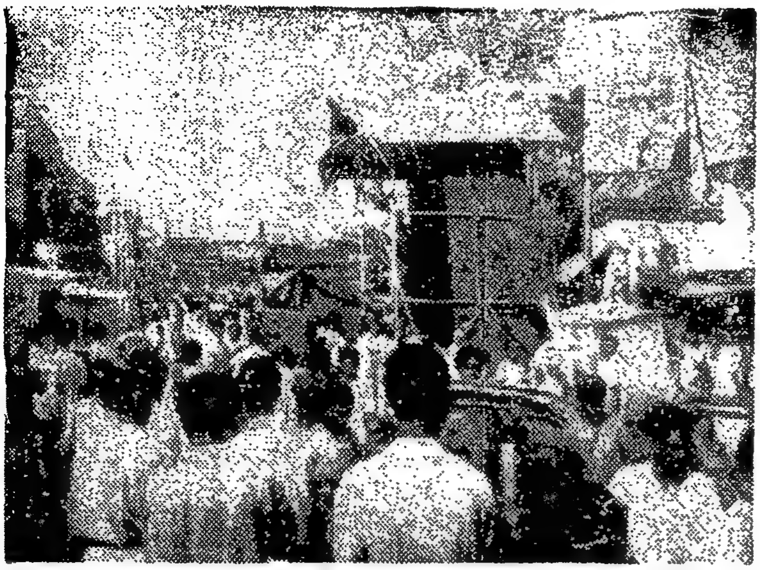

নৈহাটীর ব্যস্ততম অরবিন্দ রোড—রোডের কোন চিহ্ন নেই—কেবল ভিড় আর ভিড়

তিনি তা হল একটি স্মরণীয় স্মৃতি। তার কতক দুঃখে দুর্ভাগ্যে কণ্টকিত, কতক বা সুখ শিহরণে মধুর। বাংলা তথা ভারতের ইতিহাসে এক অতি অশুভ সন্ধিক্ষণের মানুষ তিনি। অনেক ঘটনা-দুর্ঘটনাময়, অনেক পতন-অভ্যুদয়ের বিচিত্র আবর্তসঙ্কুল যুগান্ত বিরতির তিনি দ্রষ্টা। স্বয়ং একটি ইতিহাসের স্রষ্টাও বটে। ব্রহ্ম সামন্তের মৃত্যু তাই নৈহাটী তথা সামন্ত বংশের একটি অধ্যায়েরও বিরতি সূচিত করে। সামন্তরা এখন থেকে শুধুই মুন্সী। তাঁদের সামন্ততান্ত্রিক ঐতিহ্যের মৃত্যু ঘটলো ব্রহ্মানন্দের সঙ্গে সঙ্গেই।

ব্রহ্মানন্দের পর কমললোচন, সামন্ত কমললোচন নন্, মুন্সী কমললোচন। হেস্টিংসের হস্তক্ষেপে, এবং স্যার উইলকিন্সের সুপারিশে সদর দেওয়ানী কোর্টের মুন্সী নিযুক্ত হন তিনি। পিতার অর্জিত যশসম্পদ তাঁর কালে বৃদ্ধি পেয়েছিল নিঃসন্দেহে।

পুত্র সন্তান ছিল না কমললোচনের। তিন কন্যা, প্রথমা আনন্দময়ী, জন্ম ১৭৯৬ খৃস্টাব্দ, বিবাহ হয়েছিল বাগবাজারের বিখ্যাত বসু পরিবারে, আন্দাজ ১৮০৭ খৃস্টাব্দে। দ্বিতীয়া মঙ্গলময়ী জন্ম ১৮০১, বিবাহ ১৮১১য় নৈহাটীরই মিত্র বংশে রামসুন্দর মিত্রের তৃতীয় পুত্র শ্রীমথুরামোহনের সঙ্গে। কনিষ্ঠা করুণাময়ী, জন্ম ১৮০৬, বিবাহ নৈহাটীতেই কুলীন কায়স্থ শ্রীভৈরবচন্দ্র মিত্রের চতুর্থ পুত্র শ্রীরামনারায়ণ মিত্রের সঙ্গে।

ব্রহ্মানন্দের মতো অতি অল্পায়ু না হলেও কমললোচনও খুব দীর্ঘায়ু ছিলেন না। ১৮২৪ খৃস্টাব্দে মাত্র ৫৩ বৎসর বয়সে তিন কন্যা, বিধবা স্ত্রী এবং করুণাময়ী গর্ভজাত একমাত্র দৌহিত্র মধুসূদনকে রেখে মৃত্যু হয় তাঁর।

মঙ্গলময়ী এবং আনন্দময়ী নিঃসন্তান ছিলেন। অতএব করুণাময়ীর একমাত্র পুত্র মধুসূদনই উত্তরাধিকারসূত্রে মাতামহের সমস্ত বিষয় সম্পত্তি লাভ করলেন। তখন থেকে মুন্সী বংশ প্রবাহিত হলো একটি মাত্র দৌহিত্র-ধারায়। ভীম সামন্ত থেকে ছকবন্ধ করলে এঁদের বংশপঞ্জী এইরূপ—

সামন্ত ভীম দে সরকার (জন্ম ১৭১২ বিবাহ ১৭৩৪, মৃত্যু ১৭৬১)

।

ব্রহ্মানন্দ দে সরকার (জন্ম ১৭৩৮, বিবাহ ১৭৬২ মৃত্যু ১৭৮৩)
(ব্রহ্ম সামন্ত)

।

মুন্সী কমললোচন (জন্ম ১৭৬৪, বিবাহ ১৭৮৫, মৃত্যু ১৮২৪)

।

আনন্দময়ী — মঙ্গলময়ী — করুণাময়ী

।

মধুসূদন (একমাত্র পুত্র, জন্ম ১৮২৩, মুন্সী বংশের উত্তরাধিকারী)

নৈহাটী তথা সংলগ্ন অঞ্চলগুলি বৃটিশ শাসিত গ্রামীণ জমিদারী এলাকারূপেই ছিল এতদিন। যার বেশির ভাগ অংশের মালিক ছিলেন মুন্সী বংশের উত্তরাধিকারীরা কিছুটা ছিল মহারাজ নন্দকুমারের দৌহিত্র বংশের হাতে। কিন্তু ইতিমধ্যে অনেক পরিবর্তন হয়েছে নৈহাটীতে। জনসংখ্যা বেড়েছে, ব্যবসা বাণিজ্য বৃদ্ধি পেয়েছে। সীমানা প্রসারিত, পথ-ঘাট, টোল, মক্তব, পাঠশালা প্রভৃতিরও বৃদ্ধি ঘটেছে বহুগুণে। এককথায় দেশী বিদেশী স্থায়ী অস্থায়ী নানা মানুষের ভিড়ে গ্রামীণ জনপদ উত্তীর্ণ হতে চাইছে নগরীত্বে। বিশেষত নূতন শাসন ব্যবস্থায় পাশ্চাত্য সভ্যতার আলোকে উদ্‌গ্রীব মানুষ পশ্চিমী সুযোগ সুবিধার আস্বাদনও পেতে চাইছে। জনসাধারণের প্রয়োজন এবং চাহিদা বুঝে গ্রাম নৈহাটীতে মিউনিসিপ্যালিটি পত্তনে মনোযোগী হলেন কর্তৃপক্ষ। এবং হালিশহর থেকে ভাটপাড়া পর্যন্ত, এদিকে বারাকপুরের প্রায় কোল ঘেঁসে এক বিস্তীর্ণ এলাকা জুড়ে প্রতিষ্ঠা হলো নৈহাটী মিউনিসিপ্যালটি। প্রাচীন নৈ-হট্ট এখানেই শেষ, এগিয়ে এলো নব যুগের নৈহাটী। কিন্তু সে প্রসঙ্গ বারান্তরে।

আদি থেকে, আধুনিকে উত্তরণের এই হল নৈহাটীর মোটামুটি ইতিহাস। কিন্তু আদিরও আদ্য থাকে। শুরুরও থাকে সূত্রপাত। সন্ধানী মত তাই প্রশ্ন করে তার আগে? তারও আগে?

নির্জন নদীতীর যেদিন নদী-তীর-নগরী ছিল না, শামুক, ঝিনুক, গুগলী আর জলজ উদ্ভিদের দল সমাচ্ছন্ন ভাগীরথীর বালুকাবেলায় পদপাত ঘটে নি মানুষের, মুঘল, পাঠান কিংবা হিন্দু রাজত্বেরও সূত্রপাতের আগে কি ছিল এখানে। কিংবা আরও আগে মন পিছিয়ে যায় আরও অতীতে। হিমাদ্রি যেদিন নীলাদ্রির বুক চিরে আকাশে তোলে নি মাথা, ভারতের বনে বনে অরণ্যের আড়ালে আড়ালে ধ্বনিত হয় নি বেদ গান, সিন্ধু অববাহিকায় আর্য পদধ্বনি তখনও বহু দূরে। শুধু এখানে ওখানে

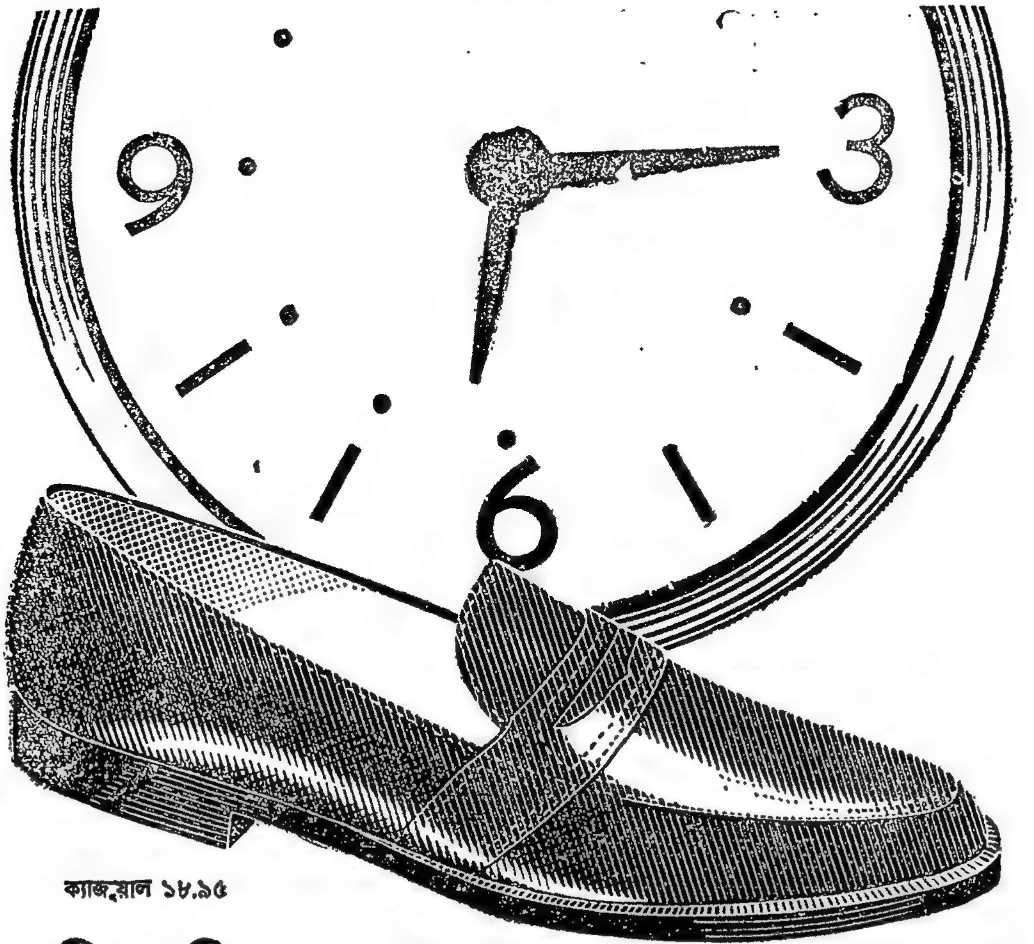

ঘড়ি-ঘড়ি আরাম

শুধু আরামই নয়, তার সঙ্গে রুচিসম্মত নকশা যে কেতাদুরস্ত পুরুষের কাম্য, তাঁর কাছে বাটার এই জুতো এক অভিনব আবিষ্কার। কারণ, দুটি বৈশিষ্ট্য যুক্ত হয়েছে এই জুতোয় : নির্মাণের নতুন-তম পদ্ধতি, আর তার সঙ্গে আধুনিক-নিয়মনিষ্ঠ নকশা। তার উপর এমন সুঠাম চামড়ায় এর গঠন যে পুরুষের পায়ে টিকে থাকবার ক্ষমতা এর অসীম, অথচ এমনই নমনীয় যে চলতেফিরতে পরম আরাম অনেক ঘড়ি পেরিয়ে। আজই কিনে দেখুন একজোড়া।

Bata

সসংকোচে দেখা দিচ্ছে কৃষ্ণকান্তি, হ্রস্বকায় বলিষ্ঠ দর্শন একদল মানুষ। উন্মেষ হচ্ছে আগামী যুগের অনাগত এক সভ্যতার। তখন সেই প্রাক আর্য, প্রাক দ্রাবিড়ীয় প্রাগৈতিহাসিক যুগে কি ছিল, কেমন ছিল, আজকের এই খণ্ডিত সমস্যাবিদ্ধ যন্ত্রণাজর্জর বঙ্গভূমির রূপ?

এখানে ইতিহাস নীরব। এখানে তার পা চলে না, চোখ অন্ধ, স্তম্ভিত চিন্তা, এখানে তার মুখর মুখে ভাষা নেই, তাই সে মূক। এখানে এগিয়ে আসে বিজ্ঞান, এগিয়ে আসেন নৃতত্ত্ব, ভূতত্ত্ব আর পুরাতত্ত্ব আর প্রত্নতাত্ত্বিকের দল, আসেন তাঁদের আধুনিক অস্ত্র-শস্ত্রে সজ্জিত হয়ে, জ্ঞান-বিজ্ঞানের নব-নব হাতিয়ার হাতে ধরে। হাজার হাজার বছরের জটা-জটিল অন্ধকারের গহন অরণ্যের জট ছাড়িয়ে আহরণ করেন আলো। উদ্ধার করে দেন ইতিবৃত্ত। অন্ধকার কাটে। মানুষের জানার খাতায় জমা হয় আর একটি পাতা।

* * * *

ভাগীরথী অববাহিকার ভূখণ্ডগুলি সম্বন্ধে একটি প্রাচীন ধারণা প্রচলিত আছে। ভাগীরথীর বয়ে আনা পলির প্রলেপে আর কিছুটা পিছিয়ে যাওয়া সমুদ্রের উদ্গীরিত বালুকাস্তরেই এগুলির উন্মেষ এবং গঠন বলেই মনে করেন অনেকে। কিন্তু স্মরণাতীত কাল থেকে পোষণ করে আসা এই ধারণাগুলি সম্বন্ধে চিন্তা এবং সন্দেহের অবকাশ উপস্থিত হয়েছে।

গঙ্গোত্রী থেকে বঙ্গোপসাগর পর্যন্ত মূল গঙ্গানদীর দুই তীরে যে ধরণের পলি এবং বালুকাস্তরের সাক্ষাৎ মেলে, মুর্শিদাবাদ থেকে বঙ্গোপসাগর পর্যন্ত ভাগীরথী অববাহিকায় তার একান্তই অভাব। সামান্য খোঁড়া-খুঁড়ি করলেই প্রচুর লৌহ মিশ্রিত যে লাল বালুকাস্তরের সাক্ষাৎ এখানে পাওয়া যায়, গঙ্গাতীরবর্তী ভূখণ্ডে তার উপস্থিতি নেই। কাজেই গঙ্গা থেকে শাখানদী ভাগীরথী কর্তৃক বয়ে আনা পলি এবং বালুকাস্তরে গড়ে উঠেছে এই দেশ, এমন ধারণা পরিত্যাগ করা যেতে পারে অনায়াসেই।

বর্তমান বিহারের অন্তর্গত ছোটনাগপুরের পার্বত্য মালভূমিতে যে প্রস্তর শ্রেণীর সন্ধান পাওয়া যায়, ভূতাত্ত্বিকের মতে সেগুলি পৃথিবীর প্রাচীনতম আগ্নেয় শিলাগোষ্ঠীর অন্যতম। হিমালয় পর্বতের পাথরকেও যার তুলনায় নিতান্তই নাবালক বলে মনে করা যেতে পারে।

ভাগীরথী তীরবর্তী ভূখণ্ড কয়েক শত ফুট খোঁড়া-খুঁড়ি করলেও ঠিক ঐ ধরণের আগ্নেয়শিলার সন্ধান পাওয়া যাচ্ছে। তথ্যটি কিঞ্চিৎ ঘোরালো। অর্থাৎ কিনা হিমালয় পর্বতের জন্মেরও আগে গঙ্গোত্রী গোমুখ সহ সমগ্র নগাধিরাজই যখন সমুদ্রগর্ভে নিমজ্জিত, তখন থেকেই এই বৃহৎ বঙ্গ ভূখণ্ডের অস্তিত্ব প্রমাণিত হয়।

আদি প্রস্তর যুগের মানুষের আগমন অবস্থিতি ও সভ্যতার নিদর্শন বাংলাদেশের এখানে-ওখানে আবিষ্কৃত হয়েছে। অপেক্ষাকৃত উচ্চ এই রাঢ় বঙ্গে তাদের আগমন না ঘটবার কোন কারণ নেই। অনুমান করা যেতে পারে—হয়তো এইসব অঞ্চলেও প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল তাদের জনপদ এবং সভ্যতা। হয়তো হিমালয় তখনও সমুদ্রগর্ভে। কিম্বা গঙ্গোত্রী গোমুখ পথে সবে মাত্র নেমে আসছেন মহাদেবের জটান্তরালবর্তিনী গৃহাখিতা জাহ্নবী।

ভাগীরথী প্রাকৃতিক নদী নয়। মূল নদী গঙ্গা থেকে কেটে নিয়ে আসা হয়েছিল তাকে। দুই তীরের মাটিতে গঙ্গা-সম পলিস্তরের অগভীরতাই তার প্রমাণ। লক্ষণীয় গঙ্গোত্রী থেকে বঙ্গোপসাগর পর্যন্ত মূল ধারাটি কোথাও ভাগীরথী নামে পরিচিত নয়। ভাগীরথী নামে পরিচিত কেবলমাত্র শাখানদীটি। ভগীরথের গঙ্গা আনার গল্প কল্পকথা নয়। জোয়ারের জলস্ফীতিতে যখন-তখন উপছে-ওঠা জনপদ ভাসানো লোনা সমুদ্র জলের দৌরাত্ম্য থেকে হাজার হাজার প্রজার শস্যসম্পদ এবং জীবনরক্ষার প্রয়োজনে (সগর রাজার ষাট হাজার সন্তানের জীবন ফেরানো যার রূপক) সেচ তথা পরিবহন ব্যবস্থার সুবিধাকল্পে মূল গঙ্গা থেকে মিঠাজলের একটি ধারা কেটে নিয়ে এসেছিলেন অযোধ্যাধিপ ভগীরথ। অত্যন্ত কৌশলে উচ্চ এলাকার ছোট-বড় সবগুলি নদীকে মিলিয়ে দেওয়া হয়েছিল এই ধারাটির সঙ্গে এবং অবশেষে সমুদ্রের সাথে সংযুক্ত করা হয়েছিল তাকে। মানুষের হস্তক্ষেপ ছাড়া নিছক প্রাকৃতিকভাবে এতগুলি নদীর সঙ্গে এই ধারাটির এমন কৌশলী মিলন সম্ভবপর হতে পারে না। বিশেষত নদীর স্রোত নিম্নমুখীই হয়। কিন্তু মুর্শিদাবাদ প্রান্তবর্তী সালারের কাছে ভূমি পূর্বমুখে ঢালু, গঙ্গা পশ্চিমবাহিনী। এ অসম্ভব শুধু মানুষের হাতেই সম্ভব হতে পারে। প্রাকৃতিক পরিণতিতে নয়।

কিন্তু সে সব কথা থাক। আমি নৃতাত্ত্বিক নই, ভূতাত্ত্বিক নই, পুরাতাত্ত্বিক বা প্রত্নতাত্ত্বিকও নই। ইতিহাসের গহনে যে সব গভীর তত্ত্ব আছে, গুরুতর সত্যের মোড়কে মোড়া তথ্য আছে, সেখানে আমার প্রবেশ নিষেধ। আমার আনাগোনা বার দরজায়। একটু উঁকি মারতেই যার সাধের সীমানা সাধ্যের পরিসমাপ্তি।

আর তাই সেই কিছু না দেখা, আর কিছু না জানা কিছু বোঝা আর বেশির ভাগ না বোঝার জটিল রহস্যের অরণ্যে হারিয়ে গিয়ে কল্পনার অগাধ স্রোতে অবাধে গা ঢেলে দেওয়া তাই আমাকেই সাজে। গৌড়জনও ক্ষমা করে নির্দ্বিধায়।

* * * *

পশ্চিম দিগন্তে সূর্যাস্তের শেষ রশ্মি নিঃশেষে মিলিয়ে গেছে তখন। সঘন অরণ্যের নিবিড় পত্রান্তরালে নিবিড়তর হয়ে নামছে রাত্রি। সেই নিকষ কঠিন অন্ধকারে নিঃশব্দে অংগচ্ছায়া মিলিয়ে দলে দলে নেমে এল প্রাগৈতিহাসিক কালের জানোয়ারের দল। বিশাল সরীসৃপ প্রকাণ্ড পক্ষী আর রাক্ষস চতুষ্পদের গর্জনে কোলাহলে আক্রমণে আর আর্তনাদে প্রতিধ্বনিত হয়ে উঠলো বনভূমি। আর সেই অরণ্যে, সেই অন্ধকারে, সেই শ্বাপদ আর সরীসৃপ অধ্যুষিত প্রাগৈতিহাসিক পটভূমিকায় আগুন যারা জ্বালাতে জানতো না, আগুন যারা জ্বালাতে শিখেছিল, আগুন জ্বালিয়ে ঘন হয়ে ঘিরে বসলো তেমনই একদল মানুষ। পাথরে শাণ-দেওয়া প্রকাণ্ড বর্শায় গেঁথে মেরে আনা মস্ত জানোয়ারের মাংস তাদের নৈশ আহার। আগুন আর আলো, উত্তাপ আর আশ্রয়, খাদ্য আর নিরাপত্তা সব মিলিয়ে বেঁচে থাকবার একটি অখণ্ড আশা। জীবন্ত, জীবন চেষ্টায় ভরপুর আশায়, আলোয়, উত্তাপে অধীর, কথায় ধ্বনিতে কল কল। আর সেই সবকিছুকে ছাপিয়ে, সবকিছুর উপর দিয়ে ধীরে ধীরে ধীরে নামতে লাগলো কাল। অবলুপ্তি যার আর এক নাম।*

[* আলোকচিত্র লেখিকা কর্তৃক গৃহীত। আসছে বারে নূতন নৈহাটী]

শেফালী দেবীর
'ভোরের শিউলী'
উৎপল মান্না কর্তৃক ১৩৮বি, কালীঘাট রোড, কলিকাতা-২৬ হইতে প্রকাশিত হইয়াছে।

শিক্ষকদের দাবি দিবস পালন

বিক্ষুব্ধ মাধ্যমিক শিক্ষক

পশ্চিমবঙ্গে সত্যই আগুন জ্বলেছে। একের পর এক ঘটনা এমন অনিবার্যভাবে ঘটে যাচ্ছে যে, স্থির মনে বিষয়গুলির মূল্যায়ন করাও অসম্ভব হয়ে উঠেছে। ঘটনাগুলির দ্রুততার সঙ্গে তাল রেখে চলাই কষ্টকর হয়ে উঠেছে।

যেদিন 'সাপ্তাহিক বসুমতী' আপনাদের হাতে পৌঁছাবে সেদিন শিক্ষক ধর্মঘটের ৬ষ্ঠ দিন চলবে যদি ইতিমধ্যে কোন অঘটন বা মিটমাট না হয়ে যায়।

মাধ্যমিক শিক্ষকদের ধর্মঘটে নামার কারণ কি? নিখিল বঙ্গ শিক্ষক সমিতির মতে যদিও কোঠারী কমিশনের রিপোর্ট এবং কিছুকাল আগে সরকার ঘোষিত নতুন বেতনহারের কথা সংবাদ-পত্রে দেখে জনসাধারণ ধারণা করে নিয়েছেন যে শিক্ষকদের মরচে-পড়া বরাত বোধ হয় খুলে গেল, আসল ব্যাপারটা ঠিক তার উল্টো। সমিতির মতে সরকার তুলনামূলক চিত্র অঙ্কিত করার জন্য দশ বছর আগেকার স্কেল এবং নবঘোষিত স্কেল পাশাপাশি প্রকাশিত করে এটা বোঝাবার চেষ্টা করেছেন যে বুঝি শিক্ষকদের বেতন অনেক বাড়ানো হয়েছে। কিন্তু ইতিমধ্যে আরও একটি বেতনহার চালু করা হয়েছিল যা অনুসরণ করে বর্তমানে শিক্ষকদের বেতন দেওয়া হয়। সরকার সেটা বিলকুল চেপে গেছেন।

আসল ব্যাপারটা হচ্ছে সরকার ঘোষিত নতুন স্কেলে কারো বেতন বৃদ্ধি হবে না, বরং অনেকের বেতন কমবে। শুধুমাত্র শিক্ষণশিক্ষাবিহীন অনার্স ও এম-এ, এম-এস-সি'রা দশ টাকা প্রারম্ভিক বেতন বেশি পাবেন। বাকি সকলের ক্ষেত্রে পূর্বেকারই ঘাসজল বজায় থাকবে, কোন কোন ক্ষেত্রে তারও বরাদ্দ কমে যাবে। নিখিল বঙ্গ শিক্ষক সমিতির মতে সরকার শিক্ষকদের একটি বিরাট ধাপ্পা দিয়েছেন। এমতাবস্থায় ধর্মঘট ছাড়া দাবি আদায়ের আর কি-উপায় আছে? সরকার লড়াই-এর ভাষাই বোঝেন, যুক্তির ভাষায় কান দেন না।

শক্তের ভক্ত নরমের যম

পশ্চিমবঙ্গ সরকার শক্তের ভক্ত নরমের যম। লরী ও টেম্পো মালিকদের স্ট্রাইকের বেলায় পশ্চিমবঙ্গ সরকারের যে দৃষ্টিভঙ্গীর পরিচয় পাওয়া গেছে তাতে এই ধারণাই স্পষ্ট হয়ে উঠেছে।

আধপেটা খাওয়া সরকারী কর্মচারী-দের, শিক্ষকদের বাঁচবার আন্দোলনকে বানচাল করার জন্য সরকারের যেখানে চেষ্টার অন্ত নেই, সেখানে অর্থবান ও প্রতিপত্তিশালী লরীর মালিকদের বেলায় সরকার যেভাবে আত্মসমর্পণ করেছেন সম-সাময়িক ইতিহাসে এই ন্যক্কারজনক নজীর বহুদিন থেকে যাবে।

সরকার লরীওয়ালাদের প্রায় সমস্ত দাবিই মেনে নিয়েছেন, এমন কি কোন লরী তার বহনমাত্রার অধিক মাল বহন করলেও পুলিশ তার বিরুদ্ধে কোনরকম ব্যবস্থা অবলম্বন করতে পারবেন না—প্রকারান্তরে লরীওয়ালারা সরকারকে দিয়ে এই ঘোষণা করিয়ে নিয়েছে। তাদের এক ধমকে পশ্চিমবঙ্গের মহামান্য সরকার বাহাদুর কাপড়ে-চোপড়ে হয়ে গিয়ে রাজ্যের ট্যাক্স মকুব করে দিলেন। যারা এ ক'দিন রাস্তায় লরী বার না করে জন-জীবনকে দুর্দশার শোচনীয় স্তরে নামিয়ে আনলো, তাদের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা তো দূরের কথা, তাদের আদর করে ডেকে এনে মুখে রাজভোগ তুলে দেওয়া হল।

কেন না লরীওয়ালারা শক্তিমান প্রতিপক্ষ, ফলে সরকারকেই বাধ্য হয়ে লেজ গোটাতে হল। পশ্চিমবঙ্গে পরিবহনের ওপর ট্যাক্স সবচেয়ে কম। আর একালে একটি লরী মানে একটি জমিদারী। সরকারী কর-নীতিতে তাদের লাভের ভাগ একটু কম হবে, শুধু এইটুকুর জন্য তারা এই ক'দিনে জনসাধারণের যে ক্ষতি করল তার পূরণ কি করে হবে।

যেখানে সরকারের কর্তব্য ছিল ধর্মঘটের জন্য প্রত্যেকটি লরীর লাইসেন্স বাতিল করে লরীগুলিকে কেড়ে নেওয়া, এবং জনজীবনে বিশৃংখলা আনার জন্য লরী-মালিকদের ফৌজদারী মামলায় সোপর্দ করা, সেখানে সরকার যে ক্লীবতা

দেখালেন তার তুলনা মেলা ভার। সরকার কেরানি-শিক্ষক-শ্রমিক ঠ্যাঙাতে ওস্তাদ, কিন্তু এই সব জগাই-মাধাইদের ক্ষেত্রে 'মারিলি কলসীর কানা তা'বলে কি প্রেম দিব না।'

সরকার আদৌ আছে কি?

যখন দেশের সাধারণ মানুষ আর কোন উপায় না পেয়ে 'শুধু দিনযাপনের, শুধু প্রাণধারণের' দাবিতে আন্দোলনে নামতে বাধ্য হয় তখনই নাকি দেশে আইন ও শৃঙ্খলা ভেঙে পড়ার সম্ভাবনা দেখা যায়, তখনই পুলিশের লাঠি, গুলী আর কাঁদুনে গ্যাসের চোটে মনে হয়—সরকার নামক একটা পদার্থ দেশে আছে। কিন্তু যখন একদল দুর্বৃত্ত সুপরিকল্পিত উপায়ে আইন ও শৃঙ্খলাকে জোড়া কাঁচকলা দেখিয়ে জনজীনের স্বাভাবিক গতিতে বিপর্যয় ডেকে আনে এবং তারপর তারা বহাল তবিয়তে টিকে থাকে তখনই সন্দেহ হয় সরকার আদৌ আছে কি না।

বসিরহাটের নিকটবর্তী বিবিপুর নামক স্থানে কয়েকদিন আগে কয়েকটি ছাত্রের সঙ্গে ভাড়া নিয়ে বাসের কন্ডাক্টরদের গণ্ডগোল হয়েছিল। ফলে দশ-দশটা রুটের সার্ভিস রাতারাতি বন্ধ হয়ে গেল, জনসাধারণের ভোগান্তির আর শেষ রইল না। দেশটা কি মগের মুল্লুক হয়ে গেছে? আইন নেই, শাসন নেই, শৃঙ্খলা নেই। কারো গায়ে একটু যেন আঁচড় লাগলেই সর্বনাশ। এই যে লক্ষ লক্ষ যাত্রীর অবথা ভোগান্তি হল এর কৈফিয়ৎ কেন সরকার বাসওয়ালাদের কাছে চাইছেন না?

যার যা ইচ্ছে হবে সে তাই করবে, বাসওয়ালা, লরীওয়ালা, দোকানদার প্রভৃতির ক্ষেত্রে যদি এই নীতির স্বীকৃতি সরকারী তরফ থেকে দেওয়া হয়ে থাকে, তাহলে জনসাধারণের ক্ষেত্রেও এই নীতির স্বীকৃতি প্রয়োজন। নৈরাজ্যবাদই যদি একমাত্র কাম্য বস্তু হয়, তাহলে তা সর্বস্তরে পরিব্যাপ্ত হোক। যেভাবে জনসাধারণের মানসিকতার ওপর নিপীড়ন চালিয়ে যেতে বিভিন্ন মহলকে সুযোগ দেওয়া হচ্ছে, তাতে যে প্রতিক্রিয়া কি ভয়ানক হতে পারে তার কি পরিমাপ করা হয়েছে? সাধারণ নিরীহ মানুষ যারা কাজকর্মের পর বাড়ি ফিরতে চায়, তারা যদি দিনের পর দিন দেখে যে বাসওয়ালারা খেয়াল-খুশিমত সার্ভিস বন্ধ করে দিচ্ছে, দু-একদিন তারা মুখ বুজে তা সহ্য করতে পারে বটে, কিন্তু যেদিন তাদের ধৈর্যের বাঁধ ভাঙবে, সেদিন কি অগ্নিসংযোগ বন্ধ করা সম্ভব হবে?

আসলে সমাজের যে অংশটি প্রকৃতিগতভাবেই শান্তিকামী ও আইন-শৃঙ্খলা মেনে চলার পক্ষপাতী তাদের ওপরেই শাসনের স্টীমরোলার চলছে। ভুখা মিছিলের ওপর গুলী চালাতে সরকারের হাত কাঁপে না। কিন্তু যারা আজ কাঁচা পয়সার দৌলতে মানুষকে মানুষ বলে গ্রাহ্য করছে না, নিজেদের কার্যকলাপ দ্বারা স্বাভাবিক জীবনযাত্রা বিপর্যস্ত করে দিচ্ছে, তাদের প্রতি সরকারী দরদের যেন অন্ত নেই। সরকারী কর্মচারীরা গণছুটি নিয়ে সরকারকে পথে বসাচ্ছেন না, যারা পথে বসাচ্ছে তাদের প্রতি সরকারী কর্তাদের একচক্ষু হরিণের দৃষ্টিশক্তিহীন চোখটাই নিবদ্ধ আছে। এটা ভাগ্যেরই পরিহাস।

সরকারী কর্মচারীদের সংগ্রাম

১৩ই সেপ্টেম্বর তারিখে, সরকারী কর্মচারীদের গণছুটি নেবার ঘোষিত দিনটির আগেই এবারের বঙ্গদর্শন লেখা শুরু করতে হয়েছে। জানি না এই কয়দিনে অবস্থার কোন পরিবর্তন হবে কি না।

কিছুকাল আগে সরকারী কর্মচারীরা ২৪ ঘণ্টা যাবৎ অবস্থান ধর্মঘট করেছিলেন। বলা বাহুল্য, তার উদ্দেশ্য ছিল একটিই। বাঁচার দাবি। নিত্য-ব্যবহার্য দ্রব্যমূল্যের অস্বাভাবিক বৃদ্ধি বাঁধা মাইনের সরকারী কর্মচারীদের সংসারযাত্রা নির্বাহ করা অসম্ভব করে তুলেছে। গত কয়েক বছরে যে হারে মূল্যবৃদ্ধি ঘটেছে, তার তুলনায় বেতনবৃদ্ধি কিছুই ঘটে নি।

সরকার ইতিমধ্যে অবশ্য নতুন করে একটা বেতনের হার বেঁধেছেন। আমরা সে সম্বন্ধে মন্তব্য করতে গিয়ে লিখেছিলাম যে, তাতে ফাঁক ও ফাঁকির পরিমাণ এতই বেশি যে, কর্মচারীরা তাতে মোটেই খুশি হন নি। আমরা সেবারে মন্তব্য করেছিলাম যে, বকশিস দেবার মত দু-চারটে টাকা কর্মচারীদের দিকে ছুঁড়ে দিয়ে সরকার তাঁদের জীবনধারণের মৌল সমস্যাটিকে এড়িয়ে যাবার চেষ্টা করেছেন মাত্র।

সরকারী কর্মচারীরা কোন বে-আইনী পথে যাচ্ছেন না। সেদিনের অবস্থান ধর্মঘট তাঁরা করেছিলেন সম্পূর্ণ আইনসঙ্গত পথে, সরকারের কাজে কোন অসুবিধা সৃষ্টি না করে। শনিবার বিকাল ৫টা থেকে আরম্ভ করে পরদিন রবিবার বিকাল ৫টা পর্যন্ত মোট ২৪ ঘণ্টা তাঁরা অবস্থান ধর্মঘট করেছিলেন।

তের তারিখের গণছুটির মধ্যে অবশ্য কোন বে-আইনী ব্যাপার নেই। প্রথমত ধর্মঘট বলতে যা বোঝায়, এই গণছুটির মধ্য দিয়ে তা প্রকাশিত নয়। দ্বিতীয়ত, গণছুটি গ্রহণ সরকারী আচরণবিধির বিরোধী নয়। তৃতীয়ত, যেটা সবচেয়ে বড় কথা, সরকারী কর্মচারীদের দাবি আদায়ের সংগ্রামের পিছনে কোন রাজনৈতিক তাৎপর্য নেই। সরকারী কর্মচারীদের সংস্থার মধ্যে কোন রাজনৈতিক দলের অনুপ্রবেশ হয় নি, এবং সরকারকে অপদস্থ করার মতলবও এখানে ঠাঁই পায় নি।

বরং একথা বলা যেতে পারে, সরকারী কর্মচারীদের আনুগত্য দ্বিধাহীন। এঁরা চিরকালই সরকারের পিছনে আছেন। এই একটি শ্রেণীই দ্বিধাহীনভাবে সরকারের তাবৎ নির্দেশ মেনে চলেন, সরকারী হুকুম পালন করতে গিয়ে এঁরা নিজেরাও সময় সময় অপ্রিয় হন। কাজেই সরকারের কর্তব্য, এঁদের দাবি-দাওয়াসমূহ সহানুভূতির সঙ্গে বিচার করা এবং কার্যকরী কিছু ব্যবস্থা অবলম্বন করা, যাতে এঁদের প্রাণধারণের প্রয়োজনটুকু মেটে!

এঁরা যে কত অল্পে সন্তুষ্ট হতে পারেন তার প্রমাণ পাওয়া গেছে উত্তরপ্রদেশে। সেখানকার সরকারী কর্মচারীদের দাবির যৌক্তিকতা শেষ পর্যন্ত সরকার স্বীকার করেছিলেন এবং তা মেনেও নিয়েছিলেন। শেষ পর্যন্ত যা মেনে নিতে অসুবিধা হয় নি, তা গোড়াতেই মেনে নিলে ভাল হত। তা হলে সেখানে এত ব্যাপক হাঙ্গামা, সরকারী সম্পত্তির ক্ষতি ইত্যাদি হত না।

ভরসার কথা এই যে, ১০ই সেপ্টেম্বর তারিখে মুখ্যমন্ত্রী সরকারী কর্মচারীদের প্রতিনিধিদের সঙ্গে এই সমস্যা সমাধানের জন্য একটি বৈঠকে বসেছিলেন। প্রথমদিনে সমস্ত আলোচনা হয়ে ওঠে নি, ফলে ১১ই তারিখেও উভয় পক্ষের মধ্যে আরও একটি বৈঠক বসে। মুখ্যমন্ত্রী কর্মচারীদের কিছু কিছু দাবি মেনে নিয়েছেন, যথা ১৯৬২ সালের পর থেকে ছাঁটাই কর্মচারীদের বিষয়গুলি পুনর্বিবেচনা, বাড়িভাড়া ও চিকিৎসা-সংক্রান্ত সুযোগ-সুবিধার সম্প্রসারণ ইত্যাদি। অবশ্য অন্তর্বর্তীকালীন ২০ টাকা হিসাবে মাগ্‌গী ভাতা বৃদ্ধির দাবি অর্থাভাবের জন্য মুখ্যমন্ত্রী বিবেচনা করতে রাজী হন নি।

সর্বশেষ সংবাদে জানা গেছে যে, অর্থনৈতিক এবং চাকরী ও অধিকারগত দাবি-দাওয়া, এমন কি ন্যূনতম দাবিগুলির কোন সুমীমাংসা না হওয়ায় রাজ্য সরকারী কর্মচারীরা গণছুটির সিদ্ধান্তে অটল আছেন।

দমকল কর্মীদের বিক্ষোভ

আন্দোলনের পথে দমকল কর্মিগণ

দমকল কর্মীদেরও শেষ পর্যন্ত আন্দোলনে নামতে হল। তাঁদের অভিযোগ অনেক, এবং সেগুলির প্রতি সরকার নির্মমভাবে উদাসীন। তাঁদের প্রথম অভিযোগ হচ্ছে পৃথিবীর সকল সভ্য-রাষ্ট্রেই যেখানে কোন ব্যক্তির কর্মকাল দিনে আট ঘণ্টার বেশি নয়, এবং আমাদের দেশেও যখন এই অধিকার সরকারের শ্রম আইন দ্বারা প্রতিষ্ঠিত, তখন দমকল কর্মীদের ক্ষেত্রে কিন্তু সেই সাবেক আমলের দৈনিক বারো ঘণ্টার কার্যকাল শুধু বিসদৃশই নয়, তা কর্মীদের মানসিক স্বাস্থ্যের পক্ষে হানিকরও বটে। দ্বিতীয়ত স্বাভাবিক ছুটির সুযোগ থেকেও তাঁরা বঞ্চিত। সপ্তাহে একদিন ছুটি আজ যে-কোন কাজের ক্ষেত্রেই স্বীকৃত, কিন্তু দমকলকর্মীরা এই সাধারণ ব্যাপারটুকু থেকেও বঞ্চিত। তাঁরা কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারের সমস্ত গেজেটেড ছুটি থেকেও বঞ্চিত।

এ তো গেল তাঁদের মানসিক অসুবিধার দিক। তাঁদের বাস্তব অসুবিধাও বড় কম নয়। জীবনধারণের মৌলিক অধিকার থেকেও তাঁরা বঞ্চিত, বিশেষ করে অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে। বিচিত্র কথা এই যে এখানে সকল কর্মীর পদোন্নতির কোন সুযোগ নেই। প্রমোশন দেওয়া হয় কর্তৃপক্ষের খেয়ালখুশি ও ইচ্ছানুসারে। ফলে বিভাগীয় কর্মক্ষমতা যে শিথিল হবে এতে কোন সন্দেহই নেই। দমকলকর্মীরা যে জীবনের ঝুঁকি নিয়ে জীবন ও সম্পত্তি রক্ষা করেন, যদি তাঁদের সেই কাজ করতে গিয়ে নিজের জীবন নষ্ট হয়, তার ক্ষতিপূরণ মাত্র পাঁচশ' টাকা। তাঁদের বেতনও প্রয়োজনের তুলনায় পর্যাপ্ত নয়।

এই সব কারণেই তাঁরা ন্যায়সঙ্গতভাবে দাবি করছেন যে, তাঁদের বেতন হার সংশোধন করা হোক ও ঝুঁকি ভাতা দেওয়া হোক। তা ছাড়া তাঁদের বিভাগের অপরাপর সংস্কারেরও দাবি তাঁরা তুলেছেন। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে তাঁদের ছুটিসংক্রান্ত অভিযোগগুলির যৌক্তিকতা পরলোকগত মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ রায় উপলব্ধি করেছিলেন এবং সেই মর্মে ব্যবস্থা অবলম্বনের জন্য তিনি নির্দেশও দিয়েছিলেন। কিন্তু যে-কোন কারণেই হোক সেই নির্দেশ প্রতিপালিত হয় নি। গত বছর ফেব্রুয়ারী মাসের গোড়ার দিকে মুখ্যমন্ত্রী শ্রীসেন দমকল কর্মচারীদের যুক্তিসঙ্গত দাবি-দাওয়া পূরণের যে আশ্বাস দিয়েছিলেন, দুঃখের সঙ্গে বলতে হচ্ছে, তা আজও পালিত হয় নি।

সরকারের নিজের ঘরেই লেগেছে আগুন, আশা করি তা নেভাবার কাজে দমকলবাহিনীকে যুক্তিসঙ্গত পথেই নির্দেশ দেবেন।

বিধান পরিষদে অনাস্থা প্রস্তাব

গত সপ্তাহে বিধানসভার বিশৃঙ্খলায় যে অভূতপূর্ব দৃষ্টান্ত শাসকদল স্থাপন করেছিলেন তারই ফলশ্রুতি হিসাবে বিধানসভার অধিবেশন মুলতুবী রয়েছে, কবে আবার নতুন করে তা চালু হবে তা বলা শক্ত।

বি, সি, মাইতি এণ্ড কোং

—ইলেকট্রো প্লেটিং সামগ্রী—

নিকেল ভ্যাট ও ব্যারেল * ডাইনামো * পলিশিং মেসিন এবং পলিশিং করিবার জন্য যাবতীয় সামগ্রীর আদি সরবরাহক।

শো রুমঃ—১৪, প্রেমচাঁদ বড়াল স্ট্রীট, কলি-১২। ফোন ঃ ৩৪-৩১৭৩

৩, রামমোহন দাস লেন, কলি-১২ ঃ অফিস-ফোন—৩৪-৪৮৪৫

কিন্তু বিধানসভা কার্যত বাতিল হয়ে গেলেও বিধান পরিষদের কাজ যথারীতি চলছে। এবারকার বিধান পরিষদের অধিবেশনে একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা হচ্ছে মন্ত্রিসভার বিরুদ্ধে অনাস্থা প্রস্তাব যা আনা হয়েছিল বৃহস্পতিবার ৮ই সেপ্টেম্বর তারিখে। যদিও এই অনাস্থা প্রস্তাব সংখ্যাগরিষ্ঠতার ভোটে বাতিল হয়েছে তা সত্ত্বেও এই প্রস্তাবের গুরুত্ব অস্বীকার করার উপায় নেই।

বিরোধী পক্ষের সদস্যরা অনাস্থা প্রস্তাবের উত্থাপনে ও সমর্থনে মন্ত্রিমণ্ডলীর বিরুদ্ধে অপদার্থতা, প্রশাসনিক দুর্নীতি, সংবিধান ও গণতন্ত্রবিরোধী কার্যকলাপের বিবিধ অভিযোগ তুলে বলেন যে, সারা দেশের মধ্যে কুশাসনের ফলে জনগণের মধ্যে যে তীব্র বিক্ষোভ ও যন্ত্রণার সৃষ্টি হয়েছে, এই অনাস্থা প্রস্তাব তারই প্রতিধ্বনি। জনসাধারণ এই অপশাসন বরদাস্ত করতে আর প্রস্তুত নন। বিভিন্ন সদস্য তীব্র ভাষায় সরকারী অযোগ্যতা ও অপদার্থতার অজস্র চিত্র তুলে ধরে দাবি করেন যে, জনসাধারণের প্রতিনিধিত্ব করার নৈতিক অধিকার শাসক দল হারিয়েছেন। প্রত্যুত্তরে শাসকদল অবশ্য একটি কথাই ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে জানান যে, সংখ্যাগরিষ্ঠতা যেহেতু তাঁদের পক্ষে নিরঙ্কুশ সেইহেতু বিরোধীপক্ষের সমালোচনায় কর্ণপাত করতে তাঁরা প্রস্তুত নন।

প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে এবারে অনাস্থা প্রস্তাব উত্থাপনের সময় মুখ্যমন্ত্রী অনুপস্থিত ছিলেন, বিরোধীপক্ষের মতে তাঁর এই অনুপস্থিতি সংসদীয় রীতির বিরোধী। এ প্রসঙ্গে আরও উল্লেখযোগ্য যে বিধান পরিষদে বিরোধীরা যে সব অভিযোগ করেছেন সেগুলির সত্যতা অধিবেশন চলাকালীনই প্রমাণিত হয়েছে, অবশ্য পরিষদের ভেতরে নয় বাইরে, এমন কি কলকাতাতেও নয়, সুদূর উত্তরবঙ্গে বালুরঘাটে। সেখানে জনসাধারণের কাছে মুখ্যমন্ত্রীর বিরূপ অভ্যর্থনা এ-কথাই সূচনা করে যে, শাসকদল সত্যই জনসাধারণের আস্থা হারিয়েছেন। তথাপি যতদিন পর্যন্ত আইনসভায় শাসকদলের সংখ্যাগরিষ্ঠতা থাকবে ততদিন পর্যন্ত এই সমস্ত অনাস্থাপ্রস্তাব থেকে তাঁরা কিছুই শিখতে রাজী হবেন না।

ইডেন হিন্দু হোস্টেল

ইডেন হিন্দু হোস্টেলের ছাত্ররা নয় দফা দাবি আদায়ের জন্য অনশন ধর্মঘট সুরু করেছিলেন, শেষ পর্যন্ত হোস্টেলের সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট পদত্যাগ করে চলে যাবার পর তাঁরা অনশন ভঙ্গ করেন।

ইডেন হিন্দু হোস্টেল পরিচালনার ক্ষেত্রে যে ত্রুটিগুলি বর্তমান তার দায়িত্ব শিক্ষাবিভাগের, সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের নয়। অথচ তাঁকেই সমস্ত কিছুর জন্য দায়ী করা হয়েছে। সরকারের প্রত্যক্ষ পরিচালনাধীন এই হোস্টেলের সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট সরকারী নির্দেশ মেনে চলতে বাধ্য, সংস্কারের সাধ থাকলেও সাধ্য তাঁর থাকতে পারে না, এই সরল সত্যটি জেনেও, তাঁর মত ছাত্রদরদী জনপ্রিয় অধ্যাপকের বিরুদ্ধে আন্দোলন পরিচালনার পেছনে কোন অদৃশ্য অঙ্গুলিসঙ্কেত নিশ্চয়ই আছে।

অঙ্গুলিসঙ্কেত আছে, তার প্রমাণ—প্রেসিডেন্সি কলেজে টিচার্স কাউন্সিল কর্তৃক এক বৈঠকে হিন্দু হোস্টেলের এক শ্রেণীর ছাত্র ও দুইজন অধ্যাপকের আচরণে তীব্র নিন্দা ও ধিক্কার জানানো হয়েছে। সেই বৈঠকে গৃহীত একটি প্রস্তাবে বলা হয়েছে যে, সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট ডঃ মিত্রের প্রতি ছাত্ররা যে ব্যবহার করেছে তার জন্য ছাত্ররা ক্ষমা প্রার্থনা না করলে প্রেসিডেন্সি কলেজের কোনো শিক্ষক ইডেন হিন্দু হোস্টেলের সুপারিন্টেন্ডেন্টের দায়িত্ব নেবেন না। প্রস্তাবের আর একটি বিষয় কম চাঞ্চল্যকর নয়। দুইজন অধ্যাপক ডঃ মিত্রকে অ-পদস্থ করার জন্যে ছাত্রদের সঙ্গে যোগসাজসে যে তৎপরতা দেখিয়েছেন তার জন্য প্রস্তাবে খোলাখুলিভাবে নিন্দা জানানো হয়েছে।

টিচার্স কাউন্সিলের এই সৎসাহসের প্রশংসা জানাবার মতো ভাষা আমাদের নেই। কিন্তু সত্যাগ্রহী হওয়ার পরিবর্তে ছাত্রদের হত্যাগ্রহী মনোভাবে যে ব্যাপার ঘটতে পারতো তার জন্যে সরকারই বা কি করছেন? যতদূর জানা গেছে ডঃ মিত্রের বিপন্ন অবস্থা যখন মুখ্যমন্ত্রীর গোচরীভূত হয়, তখন তিনি ব্যাপারটিকে গ্রহণ করে যে নির্দেশ দান করেছিলেন, তাঁর সেই নির্দেশ যথাস্থানে ঠিকভাবে পালিত হয় নি। তা যদি হোত তাহলে ছাত্রদের সেই ভয়ঙ্কর যুদ্ধক্ষেত্রের মাঝখানে নিরস্ত্র অবস্থায় ডঃ মিত্রকে সপরিবারে মুমূর্ষু অবস্থায় দিন কাটাতে হোত না। বৈদ্যুতিক আলোর লাইন ছাত্ররা কেটে ফেলেছে, পৃথিবীর সঙ্গে সম্পূর্ণ যোগাযোগহীন অসহায় অবস্থায় তাঁদের প্রাণ রক্ষা পেয়েছে একমাত্র মনের জোরেই। যাকে আমরা ইংরেজিতে মর‍্যালিটি বলি। ডঃ মিত্রের এই মর‍্যালিটি বোধ, সততা, পক্ষপাতহীনতার জন্যেই তিনি আজ এক শ্রেণীর ছাত্রের চক্ষুশূল। ডঃ মিত্রের বিরুদ্ধে যে আন্দোলন, তা রাজনৈতিক আন্দোলন নয়। কারণ যারা এই আন্দোলন করেছে, তাদের কাছে ব্যক্তিস্বার্থই বড় কথা, দেশের কল্যাণের কাজে এদের পাত্তা পাওয়া যায় না। আবার বড় কলেজ থেকে পাশ করে এরাই যখন বড় বড় চাকরিতে ঢুকবে তখন দেশের যে হাল হবে, তা ভেবে ভীত হতে হয়। সেই কারণে দুষ্ট গোরুর চেয়েও যেমন শূন্য গোয়াল ভালো তেমনি শিক্ষাক্ষেত্র থেকে এই দুষ্ট গ্রহের বিদায় দিয়ে এদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা করা দরকার।

এই শ্রেণীর ছেলেরা শ্রদ্ধা কি ভাবে দিতে হয় তা জানে না, মাদক দ্রব্যে এদের অরুচি নেই; এমন কি তার বিরুদ্ধে যথোচিত শাস্তির ব্যবস্থা হলেই এরা মারমূর্তি ধারণ করে। ফলে শিক্ষাক্ষেত্রে যেমন বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি হয়, তেমনি সৎ ও আদর্শবান ছাত্রদের মনে যে কী নিদারুণ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করে তা বলাই বাহুল্য।

ইডেন হিন্দু হোস্টেলে ঘরে ঘরে পাখা চলুক—তা কেই বা না চাইবে। কিন্তু পশ্চিমবঙ্গের সাধারণ ছাত্রসমাজ ক'জন পাখার তলে আরামে বসে পড়ার সুযোগ পায়? আমরা জানি সারা ভারতে এক একটি ছাত্রের জন্য যখন খরচ পড়ে বছরে উনিশ টাকা তখন প্রেসিডেন্সি কলেজের প্রতিটি ছাত্রের জন্য ব্যয় হয় বছরে তিন হাজার টাকা। এই টাকার যদি যথাযোগ্য মর্যাদা রক্ষিত হয় তাহলে বলার কিছু থাকে না। কিন্তু এক শ্রেণীর ছাত্রের কাণ্ডকারখানা দেখে মনে হচ্ছে তারা জনসাধারণের অর্থ অনর্থ সৃষ্টিতেই অপব্যয় করতে ইচ্ছুক। সেই কারণে আমরা চাই এর প্রতিবিধান হোক।

ডক্টর মিত্রের বিরুদ্ধে যেসব অভিযোগ আনা হয়েছে, তার একটাও ধোপে টেঁকে না। হোস্টেলে ছাত্রদের খাওয়া-দাওয়া, বাজার করা প্রভৃতি ব্যাপারে ডক্টর মিত্র কোনোমতেই দায়ী ন'ন। কারণ ছাত্রদের দ্বারা গঠিত মেস কমিটিই ব্যয় সংক্রান্ত ব্যাপারে সে সব বন্দোবস্ত করেন। আর এই মেস কমিটির চেয়ারম্যান হচ্ছেন সহকারী সুপারিনটেণ্ডেণ্ট। তিনিও কমিটির হিসেব অনুযায়ী ছাত্রদের খরচ-খরচা নির্ধারণ করেন।

সুতরাং এসব ঘটনা থেকে বোঝা যায় হিন্দু হোস্টেলের ছাত্রদের দাবীগুলি উপলক্ষ, তাদের লক্ষ্য হচ্ছে ডঃ মিত্রকে যেন-তেন প্রকারেণ বিদায় করা। কিন্তু কেন? যদিও ডঃ মিত্র বিদ্যা ও বিনয়ের গুণে করযোড়ে হোস্টেল থেকে বিদায় গ্রহণ করে আদর্শ স্থাপন করেছেন—তবু তাঁকে অন্যায়ভাবে বিদায় করার পেছনে যাদের হস্ত ক্রিয়া করেছে তাদের বিরুদ্ধে কি ব্যবস্থা গ্রহণ করা হোল—তা জানার জন্যে আমরা উদ্‌গ্রীব।

ইতিহাসের উপাদান

ভূপেন্দ্র কুমার দত্ত

(পূর্ব-প্রকাশিতের পর)

পশ্চিম পাঞ্জাবের মিয়ানওয়ালি জেলের একটা সেলে নিয়ে রাখল আমাদের চারজনকে। সেখানে প্রথম একমাস ও তিন-চার বছর পরে বোম্বাইয়ের আর্থার রোড জেলে পাঁচ মাস কর্তৃপক্ষের সঙ্গে আমাদের অনেক দ্বন্দ্ব, অনেক ধস্তাধস্তি চলে—যার ভেতর শেষ পর্যন্ত ভারত গভর্নমেন্টের তদানীন্তন ল মেম্বার স্যার নৃপেন সরকারের উপদেশে বিভিন্ন রকমের এমন শাস্তি আমরা ভোগ করি যা ১৮১৮ সালের তিন নম্বর রেগুলেশন বন্দীর জীবনে আর কারও ভাগ্যে জোটে নি। সত্যবাবুর (মেজর সত্য গুপ্ত) স্টেট-প্রিজনারের জীবন এই প্রথম। তিনি এসবের ভেতরই ছিলেন এবং বেশ আনন্দের সঙ্গেই ছিলেন। সত্যবাবুর সঙ্গে ব্যক্তিগতভাবে আমার বাইরের জীবনেই বেশ ভাব ছিল, এখন মনোরঞ্জনদার সঙ্গে মিয়ানওয়ালিতে তিন বছর পরে পুনার এরোডা (যারবেদা) জেলে আর তিন বছর থাকা কালে অরুণদার সাথে বেশ হৃদ্যতা হয়। জেলে অনেক কথাই তাঁর সঙ্গে হয়েছে বিশেষত আমাদের সব দলের পারস্পরিক সম্পর্ক নিয়ে। আমাদের কথা বলেছেন, "কি stuff আপনাদের! একটা বাড়ি থেকেই চারজন স্টেট-প্রিজনার!" এর অর্থ, আমরা মিয়ানওয়ালিতে আর যে তিনজন ছিলাম, আর রসিক [দাস]। বাইরে আমাদের আস্তানা ছিল ৭১ মির্জাপুর স্ট্রীটের বাড়িতে। "স্বাধীনতার" লেখা ও নীতিই যে ও-যুগের যুবকদের ভেতর উন্মাদনা সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ উৎস ছিল, একথাও কতদিন কতভাবে বলেছেন। উৎসাহী লোক। এক-একটি ঘটনা ঘটতো, আর কয়দিন ধরে সত্যবাবুর দিনেরাতে উচ্ছ্বাস থামতো না। বিশেষত কুমিল্লায় যখন জেলা ম্যাজিস্ট্রেটকে বাঙালী মেয়ে শান্তি ও সুনীতি গুলী করে মারলো, বীণা [দাস] জ্যাকসনকে (বাংলার গভর্নর) গুলী করলো কনভোকেশনের ভেতর, আর মেদিনীপুর জেল থেকে পালালো দীনেশ মজুমদার, শচীন কর আর সুশীল দাসগুপ্ত। সত্যবাবু বলতেন, কি সময়েই আপনারা আমরা একত্র হয়েছিলাম। না হ'লে, আমরা কি করতাম, কে জানে? আমরা কাজ যাই করে থাকি বা করি, political leadটা সারা দেশেরই এসেছে আপনাদের কাছ থেকে, "স্বাধীনতার" লেখা থেকে। আর এই সব কথারই শেষ দিকে প্রায় দিনই বলতেন, কিন্তু শেষ পর্যন্ত "..........." কি আপনাদের সঙ্গে আমাদের থাকতে দেবে? ও'দের দলের নেতৃস্থানীয় একজনের নাম এই প্রসঙ্গে করতেন। তিনি হেমদার আত্মীয়। এ'দের গ্রুপ থেকে একজনকে গুরুতর অপরাধে বের করে দেবার পর ইনি যোগ দেন তার সঙ্গে। এখন আবার এ'দের সঙ্গে এসে মিলেছেন। সত্যবাবু এ'র সম্পর্কে অনেক কথা বলেছেন, অনেক অসহিষ্ণু মতও প্রকাশ করতেন।

এখানে একটু অন্য কথা আনি। এ সম্পর্কে বিস্তারিত পরে দু-একখানা চিঠিতে বলব। এ অ্যান্ডার্সন আমলের অ্যান্টি টেররিস্ট ক্যাম্পেনের কথা। সাধারণত রাজনৈতিক দৃষ্টিতে দেখে অনেক জিনিসই বুঝতে আমরা অভ্যস্ত নই। এই অ্যান্টি টেররিস্ট ক্যাম্পেনকে আমরা শুধু একটা অত্যাচার জুলুমের ব্যাপার বলেই মনে করি। এতে যে একটা গোটা জাতের নতুন-করে-গড়ে-ওঠা চরিত্রের মূলে আঘাত হানার চেষ্টা হয়েছে সেদিকে আমাদের দৃষ্টি যায় নি। রুশ দেশের ১৯০৫ সালের বিপ্লবের একটা কাহিনী দিয়েছেন গর্কি তাঁর "By stander," "Magnet" ও "Other Fires" বলে এক trilogyতে। তার শেষ খণ্ডে তিনি বর্ণনা দিয়েছেন জার সরকার ঐ বিপ্লবের শেষ দিকে বিপ্লবী শক্তিকে কি করে বিক্ষিপ্ত, বিমুখী করতে চেষ্টা করেছিল। ঐ কাজই আরও নিপুণ হাতে ব্যাপকভাবে এদেশে করে এই অ্যান্টি টেররিস্ট ক্যাম্পেন। এদেশের বিপ্লবী আন্দোলন শুধু ইংরেজ রাজত্বকেই সরাতে চায় নি, জাতের মানুষের আত্মকেন্দ্রিক জীবনেরই অবসান চেয়েছে। এই যে জাতের যুবশক্তির বৃহত্তর আদর্শপ্রীতি তাই ভুলাবার জন্যে শিক্ষা, সাহিত্য, সংবাদপত্র, সিনেমা, ব্রতচারী নৃত্য, খেলাধুলো, আমোদ-প্রমোদ, কোনো কিছুরই সাহায্য নিতে কসুর করে নি। জেলে, ক্যাম্পে, পুলিশের মুখে, পুলিশের এজেন্টের মারফৎ, অ্যাপ্রুভারের সাহায্যে নানা ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের পুষ্পিত বচনে একত্বের জায়গায় বিচ্ছিন্নতা সৃষ্টির চেষ্টা করেছে। বিপ্লবীরা দেখেছে, দেশের লোকেও দেখেছে, ১৯৩০ থেকে ১৯৩৪ সাল পর্যন্ত সূর্য সেনের, দীনেশ মজুমদারের, হরিদাস দত্তের এবং আরও অনেকের প্রাণ-তুচ্ছ-করা চেষ্টায় একটাই আন্দোলন চলেছে দেশে। কিন্তু ক্যাম্প থেকে, জেল থেকে আবার দলস্বাতন্ত্র্যের নানা বিশ্লেষণও আমাদের অনেককে পেয়ে বসেছে। যে-প্রভাব যে-প্রবণতা আমাদের জাতের আগেও ছিল, পরেও আবার ফিরে এসেছে এবং আজকের অর্থনৈতিক ভাঙনের সাথে মিলেমিশে যা জাতের অস্তিত্বই বিলুপ্ত করতে বসেছে, তাতেই উস্কানি এসেছে প্রত্যক্ষ-পরোক্ষ নানা উৎস থেকে। এর পেছনে যে বেশ এক নিপুণ আয়োজন ছিল তা আমরা সবসময় দেখি নি। এর ইতিহাস বিচিত্র। পরে বলব।

ফিরে আসি সত্যবাবুর কথায়। পাঞ্জাব জেলে রাজনৈতিক বন্দীদের যে-সব সংবাদপত্র সে-যুগে দেওয়া হ'ত, কি করে জানি নে, তার তালিকার ভিতর Hindusthan Times কাগজখানাও

ছিল। আর, এই কাগজে বাংলার বিপ্লবাত্মক সমস্ত ঘটনার ও মামলার সাক্ষীসবুদসহ খবর বের হত। মেদিনীপুরে বার্জ হত্যা সম্পর্কিত ষড়যন্ত্র মামলার সাক্ষীসাবুদ অনেকদিন পাতা জুড়ে কাগজখানায় বের হত। এটা আমরা সবাই জানতাম, ভূপেনবাবু, সত্যবাবুদের গ্রুপের হাতেই পেডি, ডগলাস ও বার্জ মেদিনীপুরের এই তিনটি ম্যাজিস্ট্রেটের হত্যা হয়। এই মামলার একজন অ্যাপ্রুভার, যতদূর মনে পড়ে, শৈলেন ঘোষ তার নাম—সে তার সাক্ষীতে দুদিন বলে যায়ঃ দীনেশ গুপ্ত ঢাকা থেকে ওখানে যান যুগান্তর দলের শাখা গড়তে এবং ওরা ওখানে যুগান্তরের হয়েই কাজ করতো। এর পর হঠাৎ একদিন ও বলে, ওরা ওখানে কাজ করতো "বি ভি" গ্রুপের হয়ে। নামটা পড়ে অবাক হয়ে যাই। এ গ্রুপ কবে কোথা থেকে হ'ল? "বি. ভি." মানে মনে পড়লো, কলকাতা কংগ্রেসের সময় আমিই তৈরি করেছিলাম "Bengal Volunteers" সংক্ষিপ্ত নামের পিতলের ব্যাজ ভলান্টিয়ারদের পোশাকে লাগাবার জন্য। কিন্তু সে নামে বিপ্লবী দল কবে হ'ল?

সারা দুপুরবেলা ধরে সত্যবাবু নিজের খাটে শুয়ে কাগজখানা অনেকবার করে পড়লেন। আমাদের ঘরের সামনে একটা তাঁবু খাটানো ছিল, রাত্রে আমাদের কয়েদি পাচক, ভৃত্যরা সেখানে শুতো। দিনের বেলা আমরা অনেক সময় সেখানে টেবিল চেয়ার নিয়ে বসে পড়াশুনা করতাম। অরুণদা আর আমি সেদিন বিকেলে ওখানে বসে পড়ছি। সত্যবাবু আলুথালুভাবে বেরিয়ে এসে তাঁবুর সামনে দিয়ে ঘুরতে লাগলেন। বেশ খানিক সময় ঘুরে থেমে বিষণ্ণ অথচ উত্তেজিত সুরে বলতে লাগলেন, "এই ফরমুলা বেরিয়ে গেল। এখন থেকে যুগান্তর বলে আর আমাদের পরিচয় থাকবে না। এই বি. ভি. নামের সূত্রে '..........' (সেই নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি) আমাদের পরিচিত করবে সুভাষ বোসের দল হিসাবে। ও সব পারে। এর পর সুভাষ বোসও আর আপনাদের সঙ্গে থাকবে না, আমরাও না। থাকতে দেবে না। সুভাষ বোসের দল বলে পরিচিত হবার লোভে, King's own Regiment বলে পরিচিত হবার লোভে আমাদের কর্তারাও এখন নিজেদের বি. ভি. বলে পরিচয় দেবেন। আর আপনাদের সঙ্গে সম্পর্কও ভেঙে দেবেন।" এই ধরণের কথা সেদিন সমস্তক্ষণ ধরে কতবার যে বললেন। পরেও কয়দিন ধরে। যতদিন একত্র ছিলাম অনেকবার অনেকভাবে এইসব কথা ক্রমাগত বলেছেন, এই খেদ করেছেন।

এখানে একটা পুরোনো ঘটনার উল্লেখ করি। এতে কতকগুলো সম্পর্কের কথাও যেমন স্পষ্ট হবে সঙ্গে সঙ্গে আভাস পাবে ১৯২৩-২৪ সাল থেকে কি ধরণের সব প্রচারণা চলেছে বিপ্লবীদলগুলোর ভেতর ভাঙন ধরাবার জন্যে। তোমার বাবার মুখে গল্পচ্ছলে কখনও শুনে থাকতে পার ১৯২৮ সালে কলকাতা কংগ্রেসের সময় কংগ্রেসের মেডিকাল ভলান্টিয়ার্সদের অফিসটি বি কোরের ভলান্টিয়াররা আক্রমণ করে এবং অনেক ভাঙাচোরা করে। এই বি, কোরের অধিনায়ক ছিলেন সত্যবাবু। এই ঘটনার উপস্থিত কারণ আমি তখনই মোটামুটি জানতে পাই। কিন্তু ভেতরের খবর পরে শুনি আগে যে ক্ষেত্র পালের কথা বলেছি তার মুখে। সে সবের কোনো রাজনৈতিক ভিত্তি নেই। সুতরাং সে-সবের উল্লেখ নিষ্প্রয়োজন।

কিন্তু উপস্থিত কংগ্রেস ভলান্টিয়ার দলেরই একটি শাখার ওপর আর একটি শাখার এভাবে আক্রমণ—একটা গুরুতর ঘটনা। এখানে আর একটি ব্যাপার উল্লেখ করতে হবে। ১৯২৭-২৮ সালে কয়েকটি মহল থেকে একটি প্রচার চলতে থাকেঃ সুভাষ আমাদের exploit করছে। সুভাষের সঙ্গে আমার পরিচয় ১৯১৪-১৫ সাল থেকে, আর আমাদের দলের সঙ্গে সম্পর্ক হতে না হতেই ওটেন প্রহারের ঘটনায় ওকে কটক চলে যেতে হয়। পরে সে সম্পর্ক হয় ১৯২২ সালে। তারপর ম্যান্ডালে জেলে হরিদা, মধুদা, সতীশদা, পূর্ণদা, অমর, জীবন আর ইনসিন জেলে অরুণদা তার সঙ্গে একত্র কাটিয়েছে। এতে একটা ব্যক্তিগত সম্পর্কও গড়ে উঠেছে। আমাদের কেউ কখনও অনুভব করে নি, সুভাষ আমাদের মাথায় কাঁঠাল ভেঙে খাচ্ছে। ছোটবড় কোনো কোনো ব্যাপারে আমাদের মতানৈক্য হয়েছে—যেমন সহকর্মী, বন্ধুবান্ধবে অনেক সময়েই হয়। ওর কোনো কোনো ভুল মেনেও নিতে হয়েছে। আবার কোনো কোনো ভুলের জন্যে আমাদের তিরস্কার ও ধমকও ওকে সইতে হয়েছে। আমরা সুভাষকে কখনও আমাদের বিপ্লবী দলের নেতা বলে মনে করিনি, এমন কি PRIMUS INTER PAPERS হিসাবেও দেখি নি। বিপ্লবীদের প্রাধান্য যে-কংগ্রেস দলে, সেই কংগ্রেস দলের নেতা আর বিপ্লবীদলের নেতা এক নয়। তবু কোনো কোনো বিপ্লবীমহলে যেখানে সুভাষকে আমাদের দলের নেতা মনে করতো, সেখানে বিপ্লবী হিসাবে যথেষ্ট inferiority-র ভাবের প্রাধান্য ছিল। কিন্তু যে revolt group-এর কথা আগে বলেছি তার প্রেরণার উৎস যেখানে যেখানে, সেখান থেকে এই প্রচারটি ছিল বিশেষ উত্তেজনামূলক। ভলান্টিয়ার কোরের ভেতর এই যে সংঘর্ষ তার মূলেও এই উত্তেজনা অনেকখানি কাজ করে।

গণ্ডগোলের কারণ কয়েকজন মেডিক্যাল ভলান্টিয়ার আমাদের নেতৃস্থানীয় এক ব্যক্তির প্রতি অসৌজন্যমূলক ব্যবহার করে। মেডিক্যাল ভলান্টিয়ারদের অধিনায়ক ছিলেন ডাঃ কুমুদশঙ্কর রায়। তাঁর সঙ্গে সুভাষের সম্পর্ক খানিকটা ঘনিষ্ঠ। কিন্তু ঐ ভলান্টিয়ারদের আচরণের জন্য কুমুদবাবুকে বা সুভাষকে দায়ী করা চলে না। তবু বি. কোরের ভলান্টিয়াররা মার্চ করে এসে মেডিক্যাল ভলান্টিয়ারদের অফিস তছনছ করে দিয়ে প্রায় একটি বিদ্রোহী ক্যাম্পের সৈন্যদের মতো মার্চ করে তাদের ক্যাম্পের বাড়িতে গিয়ে ঘাঁটি করে বসলো। বাড়ির দরজায় লাঠি হাতে মস্ত একদল ভলান্টিয়ার পাহারায় রইলো। সুভাষ তার জি. ও, সি'র অফিসে বসে সব রিপোর্ট নিল। প্রথম রিপোর্টে সাব্যস্ত হয় সত্যবাবু এবং যতীন দাস (পর বৎসর ইতিহাস বিখ্যাত শহীদ) গোলমালের নেতা। তাঁদের কোর্ট মার্শাল হবে। কিন্তু সমস্যা—কি করে এঁদের কোর্ট বা জি. ও. সি'র সামনে হাজির করা যায়। লাঠি নিয়ে বৃহত্তর দল ওঁদের ধরে আনতে যেতে পারে। কিন্তু কংগ্রেসের সময়। এ করতে গেলে সারা ভারতবর্ষের সামনে কেলেংকারির চূড়ান্ত হয়ে যায়। আমি সুভাষকে বলি, পদাতিক বাহিনীর ও, সি. পূর্ণদা বা দলের নেতা মধুদাকে পাঠাও। পর পর দুজনেই ফিরে এলেন। সত্যবাবু বলে দিয়েছেন, "যান, সুভাষ বোসের খোসামোদ করুন গিয়ে।" সত্যবাবু যে ভাষায় এঁদের প্রত্যাখ্যান করেছেন, এ ভাষা তার অনেক সৌজন্যপূর্ণ সংস্করণ। পরে কাউকে কিছু না বলে আমি যাই। আমি staff কর্নেল। কিন্তু পায়ে একটা ফোড়ার জন্য তখনও সামরিক পোশাক পরি নি। আমি যেতেই সত্যবাবু বললেন, "আপনি এসেছেন, যাব, কিন্তু

ওকে (সুভাষকে—সত্যবাবুর ভাষা এতটা মোলায়েম ছিল না) আপনারা ছাড়ুন। ও যে আপনাদের সঙ্গে 'তুমি' বলে কথা বলে, তাও আমার ভাল লাগে না।" আমি বলি, "আপনি বলছেন কি সত্যবাবু? সুভাষ আমার সহপাঠী। সহপাঠী হবার আগেও রাজনীতির ক্ষেত্রে তার সঙ্গে আমার পরিচয়। সে 'তুমি' বলবে না, কি বলবে? আমিও তো তাকে 'তুমি' বলি। তাছাড়া, এ আপনার কি ভাব বলুন তো? আপনি জানেন, আমাদের বিপ্লবী দলের স্বার্থে এই ভলান্টিয়ার অর্গানিজেশন করা হয়েছে। আমরাই এর দায়িত্ব নিয়েছি। আমরাই সুভাষকে জি, ও, সি, করেছি। এখন মিলিটারি ডিসিপ্লিনের কথা আমি আপনাকে বলব, না, আপনি সবাইকে শেখাবেন? আপনার সঙ্গে অন্যভাবে সুভাষের মতের বা মনের বিরোধ যাই থাক, ভলান্টিয়ার বাহিনীর ভেতরে বসে এই ব্যবহার আপনি করতে পারেন?"

মাথা নিচু করে দুজন কথাগুলো শুনলেন। দুজনকে দুহাত ধরে জি, ও, সির সামনে নিয়ে এলাম। বিচার হল। ওঁদের উপস্থিত গার্ডরুমে বন্ধ থাকতে হবে এবং ডাঃ কুমুদশঙ্কর রায়ের কাছে দুঃখ প্রকাশ করতে হবে। করলেন। গার্ডরুমে মানে হরিদা, অরুণদা প্রভৃতি আমরা কয়জন যে ঘরে থাকি সেই ঘর। সেখানে দুজন ভলান্টিয়ার সে-রাতের মত পাহারায় রইল।

মিয়ানওয়ালি জেলের শেষ দিনের কথায় ফিরে যাওয়া যাক। সত্যবাবুর সে সময়ের মানসিক অবস্থা দেখে দুঃখ হত। বার্জ হত্যা ষড়যন্ত্র মামলার রিপোর্টে ঐ যুগান্তর, বি, ভি-র অসঙ্গতিপূর্ণ কাহিনী পড়ার পর থেকে বেশ কিছুদিন পর্যন্ত ক্রমেই যেন সত্যবাবু গম্ভীর হয়ে যেতে লাগলেন। এই সম্পর্কে নেতৃস্থানীয়দের সম্বন্ধে অনেক কথা অনেক সময় বলেছেন। কিন্তু সেসব একান্ত ব্যক্তিগত। বন্ধুদের কয়েকজনের কথা বলতেন। বিশেষত ভূপেনবাবুর (রক্ষিতরায়ের) কথা। এঁরা সময় মতো দায়িত্ব নিয়ে সাহস করে একটা ভাঙাচোরা করে ফেলেছিলেন আর ... একত্র হয়েছিলেন, তাই ... । তা নইলে, ...

বারবার এক-একটা বিপ্লবাত্মক প্রোগ্রামের ভিত্তিতে দাঁড়িয়ে বৃহৎ থেকে বৃহত্তর রূপ পেয়েছে। এবারই তার বিস্তৃতি সব চেয়ে বেশি হয়ে পড়েছে। আন্দোলনের পর এ বিস্তৃতি তার থাকবে না, আবার অনতত অনেক-দিনের মতো টুকরো টুকরো হয়ে যাবে। এ নিয়ে দুঃখ করে লাভ নেই। কিন্তু সত্যবাবুর দুঃখও আমরা বুঝি। তার প্রধান হেতু—এতদিন একটা গ্রুপের ভেতর তাঁর রাজনৈতিক জীবন গড়ে উঠেছে। সেখানে তো পরস্পরের ভেতর একটা পরিবারের ভেতর যেমন, তার চেয়েও বেশি আপনা আপনি ভাব।

সাধনা দশন নিয়মিত ব্যবহার করিলে কোন দন্তরোগের ভয় থাকে না। দন্তরাজী সুস্থ, সবল ও সুন্দর হয়।

দেশীয় গাছগাছড়া হইতে ইহা প্রস্তুত হয়।

সাধনা ঔষধালয়, ঢাকা

৩৬, সাধনা ঔষধালয় রোড, সাধনা নগর, কলিকাতা-৪৮

অধ্যক্ষ যোগেশচন্দ্র ঘোষ, এম, এ, আয়ুর্বেদশাস্ত্রী, এফ, সি, এস (লণ্ডন), এম, সি, এস (আমেরিকা) ভাগলপুর কলেজের রসায়নশাস্ত্রের ভূতপূর্ব অধ্যাপক।

কলিকাতাকেন্দ্র-ডাঃ নরেশচন্দ্র ঘোষ, এম, বি, বি, এস (কলিঃ) আয়ুর্বেদাচার্য্য

সেখানে বিচ্ছেদের আশঙ্কা কতখানি বেদনাদায়ক! এই সবে অন্য গ্রুপগুলির সঙ্গে অন্তরঙ্গ সম্পর্কে এসেছেন। তার ওপর অতিশয় ভাবপ্রবণ লোক। ওঁর কতটা লাগছে, তা বুঝি। মনোরঞ্জনদা গম্ভীর প্রকৃতির। আমাদের তিনজনের হাল্কা গম্ভীর সব রকম কথাই হয়। সত্যবাবু তাঁর সঙ্গে বেশি সময় কাটান এবং পড়াশুনা করেন। তাঁর কাছেও গভীর সহানুভূতি পান। কিন্তু এদিকে বিশেষ দায়িত্ব পড়ে অরুণদার ওপর যখন বেশে জেলে কর্তৃপক্ষের সঙ্গে এক তুলকালাম ঝগড়াঝাঁটির পর আমাদের চারজনকে দুই ভাগ করে তিন বছরের মত।

এখন এই বি, ভি, এবং যুগান্তর সম্পর্কে আর সামান্য কিছু কথা বলে এ সম্পর্কে প্রসঙ্গ শেষ করি। একটু পুরোনো দিন থেকে কথাটা তুলি। আগে তোমায় বলেছি, অসহযোগ আন্দোলন শেষ হবার পর ১৯২২ সালে আমি আমাদের যুগান্তরের তদানীন্তন বিভিন্ন গ্রুপের নেতৃস্থানীয়দের এক সভা ডাকি চট্টগ্রামে। তখন ওখানে শ্রীযুক্তা বাসন্তীদেবীর সভানেত্রীত্বে বঙ্গীয় প্রাদেশিক রাজনৈতিক কনফারেন্স চলছিল, তারই সুযোগে। আমাদের সভায় কে কে ছিলেন, তোমার মনে আছে? না থাকতে পারে, তাই লিখছি। এঁদের কারও কারও সম্বন্ধে তোমার হয়তো কমই জানা আছে। তাই পুরো নামই লিখছি—অমরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়; বগুড়ার যতীন্দ্রমোহন রায়; বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী; হুগলীর ডাঃ আশুতোষ দাস; পূর্ণচন্দ্র দাস; সূর্য সেন; জ্যোতিষচন্দ্র ঘোষ; সুরেন্দ্রমোহন ঘোষ; মনোরঞ্জন গুপ্ত; ভূপতি মজুমদার; জীবনলাল চাটার্জি; এবং আমি। এখানে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়, আবার আমরা সশস্ত্র বিপ্লবের লক্ষ্যে দল গড়ব এবং সুযোগসুবিধা মতো অস্ত্র সংগ্রহ করব, কিন্তু অস্ত্রের ব্যবহার এখনও করা হবে না।

কিছুকাল বাদে এই নতুন প্রোগ্রামের কথা সর্বত্র জানাবার উদ্দেশ্যে মনোরঞ্জনদা আর নরেশদা (ময়মনসিংয়ের নরেশচন্দ্র দত্তচৌধুরী) যান উত্তর বাংলায়। আর, আমি প্রথমে পূর্ব বাংলায়, পরে যুক্তপ্রদেশে ও পাঞ্জাবে। পূর্ব বাংলায় ফরিদপুরে আর মুন্সিগঞ্জে আমার সঙ্গে ছিল সুবোধ দাস—এ পরে হয় মাইনিং ইঞ্জিনিয়ার, সম্প্রতি অবসর নিয়েছে, কখনও ধরা পড়ে নি। মুন্সিগঞ্জ থেকে পূর্ব বঙ্গের বাকী জেলাগুলো ঘুরবার বেলায় আমার সঙ্গে ছিল উত্তরপাড়ার কালু (বরেন চাটার্জি)—অমরদার ভাই। সব জায়গার সব কথা বলার এখানে প্রয়োজন নেই। শুধু একটি জায়গার কথাই বলছি। সে ব্রাহ্মণবেড়িয়া। ময়মনসিং থেকে ব্রাহ্মণবেড়িয়া গিয়ে সেখানকার আমাদের ১৯১৫-১৬ সালের পুরোনো নেতৃস্থানীয় কর্মী ললিতমোহন বর্মণের সঙ্গে দেখা করি। এর আগে আমাদের দুজনের পরিচয় শুধু নামেই। কখনও দেখা হয় নি। তবে পরস্পরের আস্থাভাজন কর্মী আমাদের দুজনের যোগাযোগ রেখেছিল। ললিতবাবুর পরিচিত দুতিনজন কর্মী ১৯১৬-১৭ সালে আমার সঙ্গে ধরা পড়ে। এই সময় ওখানে গিয়ে দেখি, তাঁত চরকা সমন্বিত এক জাতীয় বিদ্যালয়ে বেশ একটি আশ্রমের মতো আস্তানায় থেকে উনি ওখানে কংগ্রেসের কাজ করছেন। আমাদের সেখানে ওঁর সঙ্গেই রাখেন। এই পরিবেশে প্রথমটা আমার মনে একটু ইতস্তত ভাব ছিল—কি জানি, যদি বিক্রমপুরের আমাদের বন্ধু জিতেন কুশারির মতো একনিষ্ঠ অহিংস গান্ধীবাদীই হয়ে গিয়ে থাকেন। এর ভেতর অস্বাভাবিক কিছু নেই। কিন্তু ললিতবাবুর সম্বন্ধে যা শুনেছিলাম বিশেষত সম্প্রতি ময়মনসিংয়ে মধুদার মুখে তার ওপর ভরসা রেখেই পরিবর্তিত অবস্থায় আমাদের পরিবর্তিত নীতির সব কথাই জানালাম। ললিতবাবু বিনা দ্বিধায় বললেন, ওখানে অতদিন কাজের পক্ষে যে-পন্থা নিয়ে আছেন, তাই সমীচীন ছিল। এখন তিনি নিজে থেকেই নীতির পরিবর্তনের কথা চিন্তা করছিলেন। এর পর ললিতবাবুর সঙ্গে আর আমার বহু বৎসর নেই। আমরা ১৯২৩ সালে জেলে চলে যাবার পর, কি ক জানতে চেষ্টা করি নি, ল সঙ্গে যোগাযোগ হয় হরিদ দার সঙ্গে। এটা খুব সম্ভব তারকেশ্বর সত্যাগ্রহের দিনে শুরু হয়। যোগাযোগসূত্র মধুদা। ১৯১৫-১৬ সালের পর ওখানেই তো যুগান্তরের পুনর্গঠন—মধুদা, হরিদা আর সুরেশ দাসের চেষ্টায়। পরে এই যোগাযোগ ঘনিষ্ঠ হয় ১৯৩০ সালে গান্ধী-আরউইন চুক্তির বিরুদ্ধে প্রচারের জন্য হরিদা যখন শরৎবাবুকে নিয়ে কুমিল্লা যান।

পরে ললিতবাবু পুরোপুরিভাবে বিপ্লবী আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়েন। ভূপেনবাবু—সত্যবাবুদের বয়ঃকনিষ্ঠ সহকর্মী নিকুঞ্জ সেন এবং পরে সুপতি রায় কুমিল্লায় দায়িত্ব নিয়ে ঐ প্রোগ্রামে তখন কাজ করছিলেন। এবং প্রোগ্রামের ভিত্তিতে কাজে নেমে ললিতবাবুর এবং এঁদের বেশ সহযোগিতা এবং অন্তরঙ্গতা হয়। তখনও কিন্তু ললিতবাবুরা কলকাতায় সাতুদার সঙ্গে যোগাযোগ রাখছিলেন এবং যে রিভলভার দিয়ে শান্তি ও সুনীতি কুমিল্লার জেলা ম্যাজিস্ট্রেট স্টীভেন্‌সকে হত্যা করে তা' সুধীর এখানে যোগাড় করে ললিতবাবুর কর্মী বীরেন ভট্টাচার্যকে দেয়। সুধীর ঘোষকে তুমি বেশ চেন। সে সাতুদারও একান্ত স্নেহভাজন ছিল। তার এবং বীরেন ভট্টাচার্যের ভেতর সম্পর্কও খুব ঘনিষ্ঠ হয়ে ওঠে। শান্তি সুনীতি ললিতবাবুর দলের কর্মী প্রফুল্লনলিনী ব্রহ্মের সাহচর্যে বিপ্লবের মন্ত্রে দীক্ষিত হয়। তিনি কমলাকে জেলে বলেছেন, "আমরা তো যুগান্তরের লোক বলেই নিজেদের চিরকাল জানি। শান্তিও তাই বলে। পরবর্তী যুগে করাচি যাওয়া-আসার পথে কলকাতায় যখন থেকেছি, তখন ললিতবাবুর সঙ্গে আমাদের বাসায় ও নবযুগ অফিসে কয়েকবার দেখা হয়েছে। তিনি বলেছেন, আমরাও যেমন জানতাম, সুপতিরাও তেমনি জানতো, আমরা সবাই যুগান্তরেই কাজ করেছি। জেলেই প্রথম শুনলাম, আমরা পর্যন্তও নাকি বি, ভি-র লোক।"

আগাগোড়া সমস্তটা থেকে যুগান্তরের চরিত্রও যেমন বুঝবে, এর সঙ্গে অন্য গ্রুপের সম্পর্কেরও মোটামুটি একটা আভাস পাবে। এর পর আরও কয়েকটা চিঠিতে ঐ শেষ যুগে দু-চারটে ঘটনা সম্প ইতিহ

চিত্রাঙ্কন শিখিবার বই
কে আর্টস
ড্রইং বুক
বিভিন্ন খণ্ডে প্রকাশিত
অ্যাঞ্জেলো পাবলিশার্স
১৪ নং রঘুনাথ মজুমদার স্ট্রীট

বিশ্বসাহিত্যের আদিপর্ব

ডঃ নরেন ভট্টাচার্য

তিন

প্রাচীন গ্রীক সাহিত্য ঃ অ্যাটিক যুগ

কমেডি ও প্রহসন

প্রাচীন গ্রীসের ত্রয়ী ট্রাজেডিকার ছিলেন এসকাইলাস, সফোক্লেস এবং ইউরিপিডেস। এ'দের কথা পূর্বে বলা হয়েছে। এই তিনজনকারই প্রতিভা দেশ ও কালের সীমা অতিক্রম করেছে। কিন্তু সেই তুলনায় সেযুগের কমেডিকারগণ, এক অ্যারিস্টোফানেস ছাড়া, তেমন কোন উল্লেখযোগ্য কৃতিত্বের স্বাক্ষর রেখে যান নি।

ক্রাটিনাস

ত্রয়ী গ্রীক কমেডি লেখকদের মধ্যে ক্রাটিনাসের নাম প্রথমেই করতে হয়। আর দুজন ছিলেন ইউপোলিস এবং অ্যারিস্টোফানেস। ক্রাটিনাসের জন্ম ৫২০ খৃস্টপূর্বাব্দে, মৃত্যু ৪২৩ খৃস্টপূর্বাব্দে। তিনি পেরিক্লেসের যুগেরই মানুষ, এবং পেরিক্লেসই ছিলেন তাঁর আক্রমণের বিশেষ লক্ষ্য। তিনি একুশটি নাটক রচনা করেছিলেন এবং পুরস্কার পেয়েছিলেন নয়বার। তিনি শেষ পুরস্কার লাভ করেন অ্যারিস্টোফানেসের লেখা **দি ক্লাউডস** নাটককে পরাজিত করে। তাঁর শ্রেষ্ঠ রচনা হচ্ছে **পাইটিন** যার বাংলা তর্জমা করলে দাঁড়ায় 'মদ্যভান্ড'। এই নাটকে তিনি নিজেকে একটি পাঁড় মাতালরূপে চিত্রিত করেছেন। তাঁর হাস্যরসের মধ্যে ছিল বুদ্ধির দীপ্তি, যদিও তার মধ্যে প্রচ্ছন্ন থাকত তীব্র শ্লেষ। রাজনীতির উপর লেখা প্রহসনের তিনিই ছিলেন জনক। তাঁর নাটকগুলির শুধু নামটুকুই পাওয়া যায়, আর কিছু নয়।

ইউপোলিস

ইউপোলিসের জন্ম ৪৪৬ খৃস্টপূর্বাব্দে, মৃত্যু পেলোপোনেশীয় যুদ্ধকালে। মাত্র সতের বছর বয়সেই তিনি নাট্যকার হিসাবে আবির্ভূত হন এবং সাতবার পুরস্কার লাভ করেন। কথিত আছে, স্বৈরাচারী শাসক অলকিবিয়াডেস তাঁকে হত্যা করান, কেন না ইউপোলিস এক নাটকে তাঁকে ব্যঙ্গ করেছিলেন। তাঁর পনেরটি নাটকের নাম ও কিছু কিছু অংশ পাওয়া গেছে। প্রাচীন লেখকেরা তাঁদের রচনায় ইউপোলিসের কল্পনার ঐশ্বর্য, মাত্রাজ্ঞান ও দেশপ্রেমের প্রশংসা করেছেন। অ্যারিস্টোফানেসের মত তিনিও তৎকালীন সমাজের দুর্নীতি ও অধঃপতনের বিরুদ্ধে লেখনী ধারণ করেছিলেন।

অ্যারিস্টোফানেস

অ্যারিস্টোফানেস ছিলেন গ্রীক কমেডির সম্রাট। জন্ম ৪৪৪ খৃস্টপূর্বাব্দ, মৃত্যু ৩৮৮। কথিত আছে তিনি মোট ৪৪খানি নাটক রচনা করেছিলেন, কিন্তু এ পর্যন্ত তাঁর মাত্র ১১খানি নাটক পাওয়া গেছে। এই ১১খানি নাটকের মধ্যে প্রথমটি হল **আকারনিয়ানস**। এই নাটকটি পেলোপোনেশীয় যুদ্ধের সময় লিখিত এবং এই নাটকে এথেনীয়দের যুদ্ধে সন্ধি করার জন্য আবেদন করা হয়েছে। তাঁর দ্বিতীয় নাটক **দি নাইটস** ক্লিয়নকে প্রত্যক্ষভাবে আক্রমণ করে লেখা। তৃতীয় নাটক **ক্লাউডস** তাঁর নিজের বিবেচনায় ছিল সর্বশ্রেষ্ঠ নাটক, যদিও প্রতিযোগিতায় এই নাটকটি বিশেষ সুবিধা করতে পারে নি। এই নাটকে তৎকালীন সফিস্টদের প্রতি বিরূপ মনোভাব দেখানো হয়েছে, এমন কি সক্রেটিসকে পর্যন্ত আক্রমণ করা হয়েছে। ৪২৩ খৃস্টপূর্বাব্দে এই নাটকটি প্রথম অভিনীত হয়েছিল। পরবর্তী নাটক **দি ওয়াস্পস** ৪২২ খৃস্টপূর্বাব্দে রচিত। এই নাটকে এথেনীয়দের মামলা-মোকর্দমা-প্রিয়তার প্রতি বিদ্রূপ করা হয়েছে। পঞ্চম নাটক **দি পীস** ৪২১ খৃস্টপূর্বাব্দে রচিত, এতে শান্তির স্বপক্ষে যুক্তি দেখানো হয়েছে। পরবর্তী নাটক **দি বার্ডস** মঞ্চস্থ হয়েছিল ৪১৪ খৃস্টপূর্বাব্দে। এই নাটকটিকে অ্যারিস্টোফানেসের সর্বশ্রেষ্ঠ নাটক বলে অনেকে মনে করেন। এথেন্সের সিসিলি অভিযানের পিছনকার প্রচ্ছদপট এই নাটকে আঁকা হয়েছে। তাঁর সপ্তম নাটক **লিসিস্ট্রাটে**। এই নাটকে শান্তির জন্য নারীদের একটি চক্রান্তের কথা বলা হয়েছে। এটিকে পুরোপুরি রাজনৈতিক নাটক বলা যেতে পারে। অষ্টম নাটক **থেমিস্ফোরিয়াজুসিতে** অ্যারিস্টোফানেস নাট্যকার ইউরিপিডেসের নারী-বিদ্বেষের উপর সুতীব্র কশাঘাত করেছেন। পরবর্তী নাটক **ফ্রগসে** ট্রাজিক নাটকের অবক্ষয়ের উপর আলোকপাত করা হয়েছে এবং এর জন্য ইউরিপিডেসকে দায়ী করা হয়েছে। দশম নাটকটির নাম হচ্ছে **ইক্লিজিয়াজুসি** বা মেয়েদের জাতীয় পরিষদ। এটিও একটি রাজনৈতিক স্যাটায়ার। একাদশ নাটকটির নাম **প্লুটাস**। ধনের দেবতা প্লুটাস দৃষ্টিহীন অবস্থা থেকে কিভাবে দৃষ্টিশক্তি ফিরে পেলেন তারই কাহিনী হচ্ছে এই নাটকের বিষয়বস্তু।

সমসাময়িকতাকে লেখার উপজীব্য করেছিলেন বলেই অ্যারিস্টোফানেসের সৃষ্টি কালোত্তীর্ণ হয় নি। তবুও মহাজ্ঞানী প্লেটো তাঁর সিম্পোজিয়াম গ্রন্থে অ্যারিস্টোফানেস সম্বন্ধে যা লিখে গেছেন তা অবশ্যই স্মরণীয়ঃ "বিদ্যাদেবী তাঁর এক চিরস্থায়ী মন্দিরের জন্য অ্যারিস্টোফানেসের আত্মাকেই বেছে নিয়েছিলেন। তাঁর মধ্যে সমন্বিত হয়েছিল ভাব এবং কল্পনা, যা খুবই অল্প প্রাচীন কবিদের মধ্যে ছিল। তাঁর সুতীব্র দৃষ্টি তৎকালীন সমাজের মর্মমূলে পৌঁছেছিল যা উদ্ঘাটিত করেছিল অজস্র দুর্নীতি এবং সেইগুলির আকর। ঘৃণ্যের প্রতি ঘৃণা, এবং দেশপ্রেম তাঁর মধ্যে জ্বলন্ত আগ্রহ সৃষ্টি করেছিল প্রাক্-ম্যারাথন দিনগুলি ফিরিয়ে আনতে, এবং এইজন্যই কোন কিছুর পরোয়া না করেই যা কিছু মানবতার বিরোধী সমস্তগুলিকেই অন্ধকার থেকে আলোকে নিয়ে এসেছেন।" এর চেয়ে বড় প্রশংসা আর কি হতে পারে!

অপরাপর নাট্যকারগণ

অ্যারিস্টোফানেসের পরে রচিত

কমেডিগুলিকে 'মিডল কমেডি' বলা হয়, এবং এই যুগের কমেডিকারদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য অ্যান্টিফানেস এবং আলেকসিস। খৃস্টপূর্ব ৩৩০ অব্দের পরবর্তী কমেডিকারদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিলেন ডিফিলাস, ফিলেমন এবং মিনাণ্ডার।

অ্যান্টিফানেসের জন্ম ৪০৮ খৃস্টপূর্বাব্দে, তিনি থেসালি থেকে এথেন্সে এসে বসবাস করেছিলন এবং ৭৪ বছর বয়সে মারা গিয়েছিলেন। কথিত আছে তিনি ২৬০টি নাটক লিখেছিলেন, এবং তাঁর রচিত ২০০ নাটকের নামটুকুই মাত্র পাওয়া গেছে। এই কারণেই তাঁর প্রতিভা সম্বন্ধে কিছু বলা আমাদের পক্ষে সম্ভব নয়, তবে তাঁর পরবর্তী যুগের লেখকরা তাঁদের রচনায় অ্যান্টিফানেসের নাটকের প্রশংসা করেছেন। আলেকসিস ৩৯২ খৃস্টপূর্বাব্দে থুরিতে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ১০৬ বৎসর পর্যন্ত বেঁচেছিলেন এবং কথিত আছে যে তিনি ২৪৫টি নাটক রচনা করেছিলেন। বর্তমানে তাঁর রচনার চিহ্নমাত্র নেই।

নাট্যকার ডিফিলাস ছিলেন সিনোপের অধিবাসী, কথিত আছে তিনি শতাধিক নাটক লিখেছিলেন; এ পর্যন্ত মাত্র তাঁর ৫০টি নাটকের নামটুকু পাওয়া গেছে। পণ্ডিতগণ বলেন যে প্লটাসের কাসিনা এবং রুডেনস নাটকদ্বয় ডিফিলাসের দুটি নাটককে মডেল করে গড়ে উঠেছে। নাট্যকার ফিলেমন ৩৬২ খৃস্টপূর্বাব্দে সাইরাকিউজে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। তিনি ছিলেন একজন জনপ্রিয় নাট্যকার, তাঁর ৯৭টি নাটকের মধ্যে ৫৭টির নাম এ-পর্যন্ত পাওয়া গেছে এবং তাঁর রচনার কিয়দংশের ল্যাটিন অনুবাদ প্লটাসের মারকেটর এবং ট্রিনুম্মাস গ্রন্থদ্বয়ে রক্ষিত আছে। নাট্যকার মিনান্ডার এথেন্সে ৩৪২ খৃস্টপূর্বাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। শতাধিক নাটক রচনার কৃতিত্ব তাঁরও উপর আরোপ করা হয়েছে কিন্তু তাঁর একটি নাটকও পাওয়া যায় নি। শুধু পাওয়া গেছে ৭৩টি নাটকের নাম এবং রচনার কিছু কিছু অংশ। সেই অংশগুলি প্লটাসের বাক্কিডেস, স্টিচাস ও ফিনুলাস এবং টেরেন্সের অ্যানড্রিয়া, ইউনুকাস, হুটনটিমরুমেনস এবং অ্যাডেলফি নামক গ্রন্থগুলিতে অনুদিত অবস্থায় রক্ষিত হয়েছে। তা ছাড়া লুসিয়ান তাঁর কনভারসেসনস অফ হেটিরি এবং আলকিফ্রন তাঁর লেটারস-এ মিনান্ডারের রচনার উল্লেখ করেছেন।

কবিতা

নীতিমূলক কবিতা তিনজন এলিয়াটিক দার্শনিক জেনোফানেস, পারমেনিদেস এবং এম্পেডোক্লেসের হাতে যথেষ্ট বিকাশলাভ করেছিল। জেনোফানেস কলোফোনে জন্মগ্রহণ করেছিলেন ৫৭০ খৃস্টপূর্বাব্দে। তিনি ছিলেন এলিয়াটিক দর্শনের পথিকৃৎ। সেই সঙ্গে তিনি কবিও ছিলেন। তাঁর প্রকৃতি নামক একটি কবিতার অংশ সিলোই নামক কবিতায় লেখা একটি স্যাটায়ারের অংশ এ পর্যন্ত পাওয়া গেছে। এলিয়ার পারমেনিদেস (জন্ম ৫১১ খৃঃ পূঃ) এবং আগ্রিজেন্টাসের এম্পেডোক্লেস। (জন্ম ৪৯২ খৃঃ পূঃ) উভয়েই ছিলেন দার্শনিক ও কবি। প্রথমোক্তজন বিশ্বাস করতেন বিশ্বচরাচর বলতে কেবল একটিমাত্র অপরিবর্তনীয় সত্তাকেই বোঝায়, এবং পরিবর্তন বলতে আমরা যা বুঝি তা আসলে বাস্তবতাহীন প্রতিভাস মাত্র। পক্ষান্তরে দ্বিতীয়জন সত্তার অপরিবর্তনশীলতায় বিশ্বাসী হওয়া সত্ত্বেও জৈনদের মত সত্তার বহুত্বেও আস্থাশীল ছিলেন। এঁদের নীতিমূলক কবিতার কিছু কিছু অংশমাত্র পাওয়া গেছে।

এযুগে মহাকাব্য লেখার চেষ্টাও যে হয় নি তা নয়। প্যানিয়াসিস নামক একজন কবি, যাঁর নিবাস ছিল হালিকারনাসাসে, হেরাক্লিয়া নামে চতুর্দশ সর্গে একটি মহাকাব্য লিখেছিলেন। প্যানিয়াসিসের জন্মকাল জানা যায় না, তবে তিনি ৪৫৪ খৃস্টপূর্বাব্দে লিগডামিস নামক একজন স্বৈরাচারীর হাতে নিহত হয়েছিলেন। তাঁর রচিত মহাকাব্যের কোন চিহ্নই বর্তমানে খুঁজে পাওয়া যায় না। প্রাচীন লেখকদের লেখায় এই মহাকাব্যের উল্লেখ আছে। আর একজন মহাকাব্য লেখকের নামও এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। তিনি হচ্ছেন অ্যান্টিম্যাকাস যিনি ছিলেন প্লেটোর সমকালীন এবং যিনি থিবাইস নামক একটি মহাকাব্য রচনা করেছিলেন। এ ছাড়াও তিনি তাঁর মৃত প্রিয়া লাইডির উদ্দেশ্যে কতকগুলি সুন্দর গীতিকাব্য রচনা করেছিলেন। তাঁর রচনাসমূহের কিছু কিছু অংশ পাওয়া গেছে মাত্র। তৃতীয় আর একজন মহাকাব্যকারের নামও আমরা পাই যিনি হচ্ছেন কিরিলাস। ইনি আনুমানিক ৪৭০ খৃস্টপূর্বাব্দে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। কিরিলাসের অভিনবত্ব হচ্ছে যে তিনি উপলব্ধি করেছিলেন যে পৌরাণিক কাহিনীর দিন শেষ হয়ে গেছে এবং মহাকাব্য রচনা করার জন্য পুরাণের চেয়ে ইতিহাস বেশি নির্ভরযোগ্য। তাঁর রচিত মহাকাব্যের নাম পের্সিইস, পারসিক যুদ্ধ অবলম্বনে যা রচিত।

এর পরে আসে গীতিকবিতার কথা। গ্রীক গীতিকবিদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ ছিলেন পিন্ডার, যিনি জন্মগ্রহণ করেছিলেন ৫২২ খৃস্টপূর্বাব্দে। কবি হিসাবে তিনি লিখেছেন প্রচুর, যদিও তাঁর রচনার অতি অল্প অংশই পাওয়া গেছে। পরবর্তী লেখকদের রচনায় পিন্ডারের কবিতার প্রশস্তি বর্ণিত হয়েছে। আলেকজান্ডার যখন থিবস ধ্বংস করেন, তখন তিনি শ্রদ্ধাবশত পিন্ডারের বাড়ির কোন ক্ষতি করেন নি, তাঁর বংশধরদেরও তিনি রেহাই দিয়েছিলেন। এ থেকেই বোঝা যায় সমগ্র গ্রীসে পিন্ডারের কিরকম খ্যাতি ছিল। কবি ব্যাক্কাইলিডেসও অ্যাটিক যুগের একজন প্রথিতযশা কবি ছিলেন, কিন্তু তাঁরও কবিতার অতি সামান্য অংশই অবশিষ্ট আছে। এঁদের পরে যে দুজন কবি প্রতিষ্ঠালাভ করতে সমর্থ হয়েছিলেন তাঁরা ছিলেন ফিলোকসেনাস (মৃত্যু ৩৮০ খৃঃ পূঃ) এবং টিমোথিয়াস (মৃত্যু ৩৫৭ খৃঃ পূঃ)। ফিলোকসেনাসের দুটি কাব্য এ পর্যন্ত পাওয়া গেছে, একটি হচ্ছে সাইক্লোপস অপরটি হচ্ছে দি ব্যাঙ্কোয়েট। প্রথমোক্ত কাব্যে তিনি একচক্ষু পলিফেমাসের সঙ্গে গালাটিয়া নামক একটি পরীর প্রেমের কাহিনী বর্ণনা করেছেন। এই কাব্যটি সাইরাকিউজের স্বৈরাচারী শাসক একচক্ষু ডাওনিসাসকে ব্যঙ্গ করে লেখা। ব্যাঙ্কোয়েট কাব্যটি গেরিয় ধাঁচে লেখা লঘুরসের কাব্য। টিমোথিয়াস ডিথাইরাম্বোস লিখে বিখ্যাত হয়েছিলেন। ডিথাইরাম্বোস এক জাতীয় সঙ্গীত যা দেবতা ডাওনিসাসের উৎসবে বছরে দুবার করে গাওয়া হত। আরও দুজন কবির নামও এক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য। তাঁরা হচ্ছেন পলেইডাস এবং টেলেস্টেস, দুঃখের বিষয়, এঁদের রচিত কোন কাব্য এ পর্যন্ত পাওয়া যায় নি, সামান্য দু-একটি কবিতার টুকরো ছাড়া। ৫০০ থেকে ৩০০ খৃস্টপূর্বাব্দের মধ্যে গ্রীক কাব্যসাহিত্যের বিকাশের এইটুকু তথ্যই পাওয়া গেছে।

গদ্যসাহিত্য

অ্যাটিক যুগের গদ্যসাহিত্য প্রধানত দার্শনিক অ্যানাক্সাগোরাস, ডেমোক্রিটাস, প্রোটাগোরাস ও গোরগিয়াস, ইতিহাসের জনক হেরোডোটাস এবং চিকিৎসাশাস্ত্রের জনক হিপোক্রাটেসের হাতেই বিশিষ্টতা লাভ করেছিল।

অ্যানাক্সাগোরাসের জন্ম ক্ল্যাজোমানিতে, আনুমানিক ৫০০ খৃস্টপূর্বাব্দে। তাঁর দর্শনের মূল কথা হচ্ছে যে এই বিশ্বচরাচর গঠিত হয়েছে অগণ্য ধ্বংসহীন মৌলিক উপাদান দিয়ে যেগুলিকে গুণগতভাবে পৃথক করা যায় এবং যেগুলির একের সঙ্গে অন্যের সমন্বয় হয়েছে এক পরম শক্তির অব্যক্ত ক্রিয়ায় যে শক্তিটি বস্তু নিরপেক্ষ হয়েও বর্তমান। ডেমোক্রিটাসের জন্ম অ্যাবডেরায়, আনুমানিক ৪৬০ খৃস্টপূর্বাব্দে, যাঁকে বস্তুতান্ত্রিক দর্শনের জনক বলা যায়। তিনিই প্রথম পারমানবিক ধারণার উদ্গাতা। প্রোটাগোরাসও

অ্যাবডেরায় জন্মগ্রহণ করেছিলেন ৪৮০ খৃস্টপূর্বাব্দে। নাস্তিক্যের জন্য তিনি এথেন্স থেকে বিতাড়িত হয়েছিলেন। তাঁর বিখ্যাত উক্তি 'মানুষই সর্বকিছুর মাপকাঠি' আজ প্রবচনে পরিণত হয়েছে। তাঁর একটি গ্রন্থই পাওয়া গেছেঃ **অন দি গডস**। গোরগিয়াসের জন্মস্থান সিসিলি। তিনি ছিলেন পূর্বোল্লিখিত দার্শনিকদের বয়ঃকনিষ্ঠ সমকালীন। দার্শনিক হিসাবে তাঁর দৃষ্টিভঙ্গী ছিল নেতিবাদী। তাঁর বক্তব্যঃ কোন কিছু নেই, যদি কিছু থেকে থাকে তো তা জানা যাবে না, যদি কিছু জানা থাকে তো তা বলা যাবে না। খৃস্ট-পূর্ব ষষ্ঠ শতকের ভারতীয় দার্শনিক সঞ্জয় বেলট্‌ঠিবিপুত্তের মতবাদও, হুবহু এই। তাঁর দুটি রচনা এ পর্যন্ত পাওয়া গেছেঃ **এনকোমিয়াম অফ হেলেন** এবং **ডিফেন্স অফ পালামেডেস**।

হিপ্পোক্রাটেস

হিপ্পোক্রাটেস ছিলেন গ্রীক চিকিৎসা-শাস্ত্রের জনক, জন্ম ৪৬০ খৃস্টপূর্বাব্দে কস দ্বীপে। পেলোপোনেশীয় যুদ্ধের সময় তিনি এথেন্সে ছিলেন, শেষ জীবনে বাস করেছেন থেসালিতে। বিজ্ঞানসম্মত চিকিৎসার তিনিই ছিলেন প্রবর্তক এবং কথিত আছে চিকিৎসাশাস্ত্র বিষয়ক ৭২টি গ্রন্থ তিনি রচনা করেছিলেন। তাঁর বিখ্যাত রচনা অ্যাফোরিজমস্ মধ্যযুগ পর্যন্ত বিভিন্ন পণ্ডিতদের দ্বারা সম্মানিত হয়েছে। পরবর্তীকালের রোমক ও আরও অনেক পরে আরব পণ্ডিতদের রচনায় এই গ্রন্থটির যথেষ্ট প্রভাব আছে। হিপ্পোক্রাটেস শুধু চিকিৎসাবিদ্যা নিয়েই লেখেন নি, আবহতত্ত্ব, সাহিত্যতত্ত্ব এবং নৃতত্ত্বের উপরও তাঁর মৌলিক চিন্তাধারার কথা প্রাচীনকালের পণ্ডিতেরা উল্লেখ করেছেন।

হেরোডোটাস

লোগোগ্রাফারগন ইতিহাসধর্মী রচনার সূত্রপাত করলেও, ইতিহাসের প্রকৃত জনক হেরোডোটাসকেই বলা হয়। ৪৯০ খৃস্ট-পূর্বাব্দে এশিয়া মাইনরের হালিকারনাসাসে হেরোডোটাস জন্মগ্রহণ করেন। রাজনৈতিক কারণে ৪৬০ খৃস্টপূর্বাব্দে তিনি সামোস দ্বীপে পালিয়ে যান। তারপর শুরু হয় তাঁর বিখ্যাত দেশভ্রমণ। পূর্ব-দিকে পারস্য পর্যন্ত এবং দক্ষিণে মিশর পর্যন্ত তাঁর ভ্রমণসূচীর অন্তর্গত ছিল। এই সকল দেশের অবস্থা তিনি চাক্ষুস পরিদর্শন করে, এই সকল স্থানের লোক-বৃত্তিসমূহ, নৃতত্ত্ব, পৌরাণিক কাহিনী, রাজবৃত্ত, লেখমালা ও সাহিত্য প্রভৃতি সম্বন্ধে প্রভূত তথ্য সংগ্রহ করে তিনি ইতিহাস রচনায় প্রবৃত্ত হন। ইতিহাসের আদর্শ সম্বন্ধে তাঁর নিজের একটি মতবাদ ছিল যা পুষ্ট হয়েছিল তাঁর ভূয়োদর্শনের দ্বারা। তিনি তাঁর ইতিহাস অবশ্য সম্পূর্ণ করতে পারেন নি। তবে তিনি যা লিখেছিলেন তার কিছুটা অংশ এখনো পাওয়া যায়, যা পরবর্তীকালে ল্যাটিন ভাষায় এবং এ যুগে বহু ভাষায় অনূদিত হয়েছে। তাঁর গ্রন্থটিকে বিভিন্ন দেশে, বিভিন্ন যুগে, বিভিন্ন নামে আখ্যাত করা হয়েছে। চলতি নাম **দি হিস্ট্রীজ**।

থুকিডিডেস

সমসাময়িক ঘটনার নিখুঁত ইতিবৃত্ত রচনা করে থুকিডিডেস অমর হয়েছেন। তাঁর জন্ম এথেন্সে ৪৭১ খৃস্টপূর্বাব্দে। তিনি ছিলেন দার্শনিক অ্যানাক্সাগোরাস ও গোরগিয়াসের ছাত্র। রাজনৈতিক কারণে তিনিও এথেন্স থেকে বহিষ্কৃত হয়েছিলেন, এবং কুড়ি বছর নির্বাসনে থাকেন। যখন বিখ্যাত পেলোপোনেশীয় যুদ্ধ শুরু হয়, তিনি উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন যে এই যুদ্ধ পরিধি এবং ঘটনার দিক থেকে পূর্ববর্তী সকল যুদ্ধকে ছাপিয়ে যাবে। এথেন্সের বাইরে থাকার জন্য তিনি নিরপেক্ষ দৃষ্টিতে ঘটনাসমূহ অনুধাবন করার সুযোগ পেয়েছিলেন। এই কারণেই তাঁর ইতিহাস প্রকৃতই তথ্যমূলক ও নিরপেক্ষ হতে পেরেছিল।

থুকিডিডেসের পেলোপোনেশীয় যুদ্ধের ইতিহাস তিনভাগে বিভক্ত। প্রথম ভাগে আছে আর্কিডামিয় যুদ্ধ থেকে নিকিয়াসের সন্ধি পর্যন্ত (১—৫।২৪)। দ্বিতীয় ভাগে আছে সিসিলি অভিযান ও তার পরবর্তী ঘটনা (৫—২৫।৭)। তৃতীয় ভাগে আছে ডেকেলিয় যুদ্ধ। প্রথম চারটি অধ্যায় এবং সিসিলি অভিযানের অধ্যায় দুটি (ষষ্ঠ এবং সপ্তম) এক কথায় অনবদ্য। পঞ্চম এবং অষ্টম অধ্যায় অপেক্ষাকৃত দুর্বল। তাঁর রচনার বৈশিষ্ট্য হচ্ছে ঘটনার মূল অন্বেষণ, সত্যানুসন্ধিৎসা এবং নিরপেক্ষতা। ইতিহাস যে কতদূর কাব্যময় হয়ে উঠতে পারে তার প্রমাণ পাওয়া যাবে পেরিক্লেসের সমাধি ভাষণে।

জেনোফোন

জেনোফোনও ছিলেন বিখ্যাত ঐতিহাসিক, জন্ম ৪৩১ খৃস্টপূর্বাব্দে। পেশায় তিনি ছিলেন একজন সেনানী। যখন কাইরাস ব্যাবিলনে কুনাক্সার যুদ্ধে পরাজিত হলেন, এবং গ্রীক সেনাপতিরা পারসিকদের দ্বারা বিশ্বাসঘাতকতায় নিহত হলেন, তখন জেনোফোন স্পার্টার সেনাপতি ক্লিসোফাসের সঙ্গে হতাশ দশ সহস্র গ্রীক সৈন্য নিয়ে মেসোপটেমিয়ার মধ্য দিয়ে, আর্মেনিয়ার মালভূমির উপর দিয়ে এবং আরও বহু স্থান ঘুরে, নানারকম বিপদসঙ্কুল অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে শেষ পর্যন্ত স্বদেশে ফিরে আসেন। দশ সহস্রের এই ঐতিহাসিক প্রত্যাবর্তনের কাহিনী জেনোফোন লিখেছিলেন সাতটি খণ্ডে বিভক্ত **অ্যানাবাসিস** গ্রন্থে। থুকিডিসের পেলোপোনেশীয় যুদ্ধের অসমাপ্ত ইতিহাস তিনিই সম্পূর্ণ করেছিলেন তাঁর **হেলেনিকা** গ্রন্থে। জেনোফোন আরও অনেক গ্রন্থ রচনা করেছিলেন। একটি হচ্ছে কাইরাসের জীবনী **কাইরোপেডিয়া**; তাঁর স্মৃতিকথা **অ্যাপোমনেমোনেউমাটা** এবং **সিম্পোজিয়াম** এই দুই গ্রন্থে তিনি তাঁর গুরু দার্শনিক সক্রেটিসের জীবনের খণ্ড খণ্ড দিকগুলি আলোচনা করেছেন। তাঁর অপরাপর গ্রন্থের মধ্যে উল্লেখযোগ্য অ্যাগেসিলাউস (জনৈক স্পার্টার রাজার জীবনী), **ইকনমিকাস** (গার্হস্থ্য অর্থ-নীতি), **হেয়িরোন** (দুজন স্বৈরাচারী নায়কের সংলাপ), **হিপ্পারচিয়াস** (যুদ্ধ-বিদ্যার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট) এবং **সাইনে-গেটিকাস**। তাঁর রচিত নিম্নোক্ত গ্রন্থাবলীর ল্যাটিন অনুবাদ পাওয়া গেছেঃ **ডে রিপাবলিকা ল্যাকেডিমোনিওরাম** (স্পার্টার সংবিধান), **ডে রিপাবলিকা এথেনিয়েনসিয়াম** (এথেনীয় সংবিধান), **ডে রে একুয়েস্ট্রি** (অশ্ব পালন ও পরিচালনা) এবং **ডে ভেকটিগালিবাস** (রাজস্ব-নীতি)। এই বইগুলি থেকেই জেনোফোনের প্রতিভার একটা সার্বিক পরিচয় পাওয়া যাবে।

বহু অভিজ্ঞ বিশেষজ্ঞের সাহায্যে সরকারী, বে-সরকারী ও বহু মার্চেন্ট অফিসের কার্য-পদ্ধতি অবলম্বনে লিখিত

MAN OF BUSINESS

কাজের লোক বা কেরাণী শিক্ষাদর্শ পাঠ করিলে আর চাকরীর জন্য উমেদারী করিয়া অফিসের দ্বারে দ্বারে ঘুরিতে হইবে না। যাঁহারা অভিজ্ঞ কেরাণী বলিয়া বেতন বৃদ্ধি করিতে চাহেন, তাঁহারা মনোযোগ দিয়া পাঠ করুন, অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করিবেন, কাজের লোক হইবেন।

মূল্য ১।৵ টাকা

বসুমতী প্রাইভেট লিমিটেড
১৬৬, বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী স্ট্রীট, কলিকাতা—১২

প্রতিবিম্বকে সাক্ষী রেখে

রবীন রায়চৌধুরী

খবরের কাগজটা খুলেই লক্ষ্য পড়েছিল ছবিটা। ধোঁয়া ধোঁয়া, আবছা আবছা। অস্পষ্ট সেই পরিচিত গম্বুজ। আকাশ নেই তবু মিনার চারটে স্পষ্ট। এক নজরেই চেনা যায়। ট্রামে, বাসে, হাঁটতে-হাঁটতে কিম্বা হঠাৎ কোন ছুটি কাটাতে ঐ চিত্রটিই একান্ত পরিচিত বন্ধুর মতো চিন্তার পাশে হাজির হয়। কতবার ওর সড়ক ধরে হেঁটেছি, ওর চারপাশ দেখতে দেখতে অল্প বয়সের ভাবপ্রবণতায় ভুগেছি। কখনও কখনও জোড়া জোড়া নারী-পুরুষ, তরল নিটোল যৌবন, ভাল-লাগা ভাল-লাগা অচেনা মুখ, সুখী সুখী চোখ দেখতে গেছি, পাথরের নুড়ি মাড়াতে মাড়াতে তৃপ্তির শব্দ শুনেছি। আমার বুকের অন্তরালে সে শব্দ নানান ঢঙে বাজে, তৃপ্তিগুলো জীবন্ত হয়ে ছটফট করতে থাকে। আমি নিস্পৃহভাবে স্কেচ বইয়ে পেন্সিলের আঁচড় টানি, অলক্ষ্যে নিজের লুকানো পর্দায় নানান রঙের প্যাস্টেলের দাগ পড়ে যায়। ভাবতে বসলেই সেগুলো নড়ে-চড়ে ওঠে। অজান্তেই নিজের কাছে নিজের জগৎটা ভয়ঙ্কর সংকীর্ণ হয়ে ওঠে।

আজকের ছবিটা দেখতে দেখতে হাজার হাজার বক্তব্য ভিড় করে আসছিল পড়া-বইয়ের পাতায় আমিও পুরানো দৃশ্যগুলো খুঁজছিলাম। কাগজের ছবিটার মতোই সেগুলো অস্পষ্ট তবু যেন পরিচিত। অথচ যে অত্যন্ত স্পষ্ট, যাকে অনায়াসেই বলা যায় একান্ত পরিচিত—আজ এ মুহূর্তে তাকে ভীষণ অপরিচিত, অনাহূত বলে মনে হচ্ছে। সেখানে অস্পষ্টতার কোন পর্দা নেই তাই তাকে নিয়ে ভাবনাও ফুরিয়ে গেছে, তাই তার সান্নিধ্য অসহ্য ভারপ্রদ।

দূরে কলিঙ্গ ভবনটার শীর্ষে রোদ পড়েছে। মাঠের মানুষগুলো নিজেদের ছায়া লক্ষ্য করে উচ্ছল হচ্ছে, ছায়া দ'লে রোদে পা ফেলছে। বাবলা বনটার মাথায় হলদে ফুল। হলদে ম্যাগনোলিয়ার বাক্স, হলদে ভিক্টোরিয়ার জল। সব কিছুর মধ্যে আমি একটা কোন সাযুজ্য খুঁজে ফিরছিলাম। হলদের সান্নিধ্যে কোন নিবিড় আসঙ্গ।

কারণ এখানে আসব এমন কোন স্থিরতাই ছিল না। বরং ভেবেছিলাম, বছরের একটা দিন অন্তত নিকটদূরত্ব থেকে আমার চৌহদ্দিকে উপভোগ করব। সেই আলোকিত দেহ, সাবলীল মুখ, মসৃণ সাহচর্য,—অর্থাৎ এক কথায় অনুভূতির সঙ্গতি খুইয়ে আমি সময়কে সম্ভোগ করতে চেয়েছিলাম তাই অস্পষ্ট চিত্রটা হাতড়ে হাতড়ে অনির্দিষ্ট বৃত্তকেন্দ্র খুঁজছিলাম। আর এমনই পরিক্রমায় কয়েকটি নির্দিষ্ট অক্ষর আমার পরিতৃপ্তিকে একটা সুস্পষ্ট বক্তব্যে লক্ষ্যগামী করল। আমি গতির নিশ্চিত নিয়মে এমন এক ক্ষেত্রে উপস্থিত হলাম যেখান থেকে অস্পষ্ট চিত্রটিকে ভীষণ স্পষ্ট বলে মনে হল, পরিচিতকে নিদারুণ অচেনা। দশ-জোড়া চোখের ভ্রূভঙ্গী এড়িয়ে নির্দিষ্ট মোড়ে বাস থেকে নামতে হয়েছিল।

সে হাসছিল বোধহয়। জানত আমি নামবই। অথচ আমার ইচ্ছের ইন্ডেক্স শূন্য কোঠায়। স্বস্তি কথাটা ঐতিহ্য হারিয়েছে। এমন কি ওকে পাশে নিয়ে হাঁটতেই অস্বস্তি। বুকের নিটোল ভাঁজটায় স্পষ্ট তিলটাও যেন মনটাকে নাড়া দিতে প্যারছে না। ঠোঁট দুটো মৃত শালিকের চিত্রটা মনে পড়িয়ে দেয়। তবু কি চেষ্টা। একটা সরীসৃপের মতো ওর জিহ্বার আনাগোনা চলছিল। তাই মুখের দিকে তাকালেই ঠোঁটে লালার অস্তিত্ব নজরে পড়ে। তাতে তাকে আরো কুশ্রী, বিরক্তিকর মনে হয়। অসহ্য সেই সান্নিধ্যে ইচ্ছে করে চিৎকার ক'রে বলি, আমি অসহ্য, তুমি বিকৃতির শিকার হয়েছ, তুমি বড্ড বুড়িয়ে গেছ।

কিছুই বলতে পারি নি। নির্বাক মুহূর্তে আর এক পরিচিত দৃশ্যে ভেসে উঠেছিল। হলদের সাযুজ্য খুঁজতে গিয়ে দেখলাম সেখানে অবক্ষয়, সূর্য উত্তরায়নের পথে আরো পশ্চিমে। এর প্রচ্ছায় তার আদলে। শচীন চাকীর আয়নায় যেন তাকে পরিচিত ভঙ্গীতে দেখলাম।

দশটা খাঁচায় দশটা আয়না। শালিক,

টিয়া, হট্টিটি, দোয়েল, ফিঙে সব এক একটা খাঁচার অধিবাসী আর আসবাব বলতে এক একটা আয়না। ওরা চিৎকার করত, লাফাত, আয়নায় মাথা কুটতো। আর শচীনদা গাল ফুলিয়ে হাসত—মর, ব্যাটারা মর। নিজেকেই যখন চিনলি না তখন মাথা কুটেই মর। আর টেবিলের দিকে তাকিয়ে চুক চুক করে সহানুভূতি জানাত। টেবিল ছেড়ে উঠতে গেলেই আয়নায় প্রতিবিম্ব পড়ে আর অনিবার্যভাবে চোখ-মুখ-নাক কুঁকড়ে ওঠে। সমস্ত মুখটার এতটুকু মিল পাওয়া যেত না। নিজের কাছেই নিজের ভীষণ অপরিচিত মনে হোত। নিজের আদলকে কেউ যেন নানান রেখা টেনে বিমূর্ত চিত্র এঁকেছে। যাকে সহ্য হয় না, সহ্য করা যায় না। অজান্তেই মুখের শিরাগুলো টান টান হোত আর শচীনদা চোখ মটকে হাসত—দেখে নে, দেখে নে। এটা তোর দ্বিতীয় অধ্যায়। ঐ যে তোদের 'to be or not to be'-র দুই পোল। তেমন লাগসই ম্যাগনেট পেলে দুই পোলই চেনা-জানা হয়ে যাবে।

শচীনদার হাসির জোয়ারে বিকৃত আয়নাটার কথা কেউই তুলতে পারতাম না। মন খারাপ করে ফিরে আসতাম আর অন্য কোন আয়নায় নিজেকে মিলিয়ে নিতাম।

ওর প্রতিবিম্ব প্রত্যক্ষ করতে করতে চিন্তায় ঐ সব দুশ্চিন্তাগুলো জড়ো হচ্ছিল। প্রতিবিম্বের এগুলিই প্রতিক্রিয়া। অথচ এককালে ওকেই দু'চোখ মেলে দেখেছি কখনও প্রতিবিম্বের কথা মনে হয় নি। নির্দ্বিধায় সেদিন বলতে পারতাম—তোমার জীবন সম্বলিত করতে আমার এতটুকু শঙ্কা নেই। এজন্য সব আশ্রয় আমি হারাতে রাজী আমি প্রতীক চাই না, প্রতিকৃতি নয়, আমি প্রত্যয় নিয়ে বাঁচতে চাই।

বিবাহের প্রতিশ্রুতি পত্রে স্বাক্ষর করার বিশ ঘণ্টা পূর্ব পর্যন্ত সে ছিল নিরুদ্বিগ্ন, নিশ্চিন্ত কিন্তু তার পরেই হঠাৎ সে বিচক্ষণ হয়ে উঠল। কতকগুলি সতর্ক শঙ্কা তার দৃষ্টিতে স্পষ্ট হল। ও অভিজ্ঞ জীবের মতো হাসল। দূরের সাংসারিক, প্রবীণ মানুষের ভিড়ে নিজের বক্তব্য আড়াল করে নানান আশঙ্কার কথা শোনাল, ওর প্রতিবিম্বটা একটু করে স্পষ্ট হতে সুরু করল।

আর আমি অজানিতভাবেই তার দ্বিধার দ্বিতীয় অধ্যায়টা দেখতে পেলাম। আমার আর্থিক অক্ষমতা হৃদয়বৃত্তি নিয়ে বাঁচতে দিল না। ওর কাছেই প্রথম শুনলাম, বাস্তব বলে একটা নিরেট পদার্থ আছে। বাঁচতে হলে সেখানকার যোগ্যতার অভিজ্ঞান দরকার যা আমার নেই।

এখানে বসবে?

ও যেন পাতাল থেকে উঠে এল। ওর দু'চোখে ব্যাকুলতা। সব কিছুর ছায়া আছে। বিশেষ পরিপ্রেক্ষিতে তা প্রত্যক্ষ হয়। এ মুহূর্তে আমি সেই ছায়া দেখতে পেলাম। ছায়া তার চোখে, মুখে, দেহে সর্বত্র। এক কথায় তার অস্তিত্বটাই একটা ছায়া। সেখানে হৃৎপিন্ডের তাল গোণা যায় না, কিন্তু নিশ্বাস দীর্ঘশ্বাসের বক্তব্য পড়া যায়। তাই তার শব্দকে একটা অসম্পূর্ণ বক্তব্য বলে মনে হল।

এই এখানেই বসা যাক।

তার ছায়া স্পর্শ হতে চাইল। ওর ঘনিষ্ঠ স্বরটা পুরানো ঘণ্টার মতো মিষ্টি শব্দ তুললো। মিষ্টি আওয়াজ থেকেই জলাশয়ের গভীরতা মাপা যায়।

দূর, জায়গাটা বড় নির্জন।

আমি গভীরতায় প্রবেশ করতে চাইলাম, যদিও আশঙ্কা পদে পদে।

কেন, নির্জনতা তোমার ভাল লাগে না?

ও মৃতের মতো ঘোলাটে দৃষ্টি নিয়ে তাকালো। এক মুহূর্তে চোখ দুটো অসহায় হয়ে উঠেছে। বলতে ইচ্ছে করল, না, না ভাল লাগে, দারুণ ভাল লাগে। কিন্তু এই মুহূর্তে ভীষণ আশঙ্কা জাগছে। তোমাকে নিয়ে নির্জন হওয়া! তোমার কোথাও তো স্বাভাবিক স্ফূর্তি নেই, সর্বত্র একটা ম্লান আকৃতির আনাগোনা। তুমি যেন হারিয়ে যাচ্ছ, শেষ হয়ে যাচ্ছ। তাই অবলম্বন হাতড়ে ফিরছ। তোমার দু'চোখে তাই অন্ধকারের ছায়া। অথচ আমি সাতাশের মণিকোঠায়। আমি সমৃদ্ধির অতলে নির্জন হতে চাই। সে ঐশ্বর্য তো তোমার উত্তর-পঁচিশের আশঙ্কিত শরীরে নেই। তোমাকে নিয়ে নির্জন হ'তে ভয় পাই। নিজেকে হারিয়ে ফেলার ভয়। এ নির্জনতা আমার অনুভূতিগুলিকে শিথিল করে দেবে। আমি জীবনকে নিয়ে সন্ত্রস্ত বয়ে পড়ব। আমি এত সত্বর মৃত্যুর সান্নিধ্যে পৌঁছতে চাই না। অথচ ও সে কথা বুঝতে চাইছে না।

আচ্ছা বস কিংবা ঐ ফাঁক জায়গায় গেলে হয় না।

এখান থেকে বাবলা গাছের হলদে ফুল, মনুমেন্টের চূড়া দেখা যায় না। ব্ল্যাক হোল ট্র্যাজেডী কতদূরে ঘটেছিল? যদি পুনরাবৃত্তি ঘটে সেটা উনিশশো পঁয়ষট্টির কত তারিখ?

তুমি কিন্তু বদ্‌লে যাচ্ছ।

হ্যাঁ, বদলাচ্ছি। তুমি বয়সের তারিখ পাল্টাচ্ছো আর আমি বয়সের ঋতু পাল্টাচ্ছি। আজকের ছবিটাতেও শীত ঋতুর খবর ছিল। শীতের পরের ঋতুটা কি?

আশ্চর্য! আর তুমি?

আমি?

দু'চোখে তার পরিচিত আলোটা ফুটে উঠেই মিলিয়ে গেল। অন্ধকারটা গাঢ় হ'ল। পাড়ের ছায়াগুলো সন্ধ্যার জলাশয়কে আরো মলিন করে তুললো। জলের গভীরে কি তারল্য কিছু আছে? বেদনার অপর নাম কি অন্ধকার? বেদনা কিংবা অন্ধকার তরল হ'ল।

আমি! আমি অবলুপ্ত হচ্ছি। শেষ পর্যন্ত একদিন আর ছায়া খুঁজে পাব না। দেখ, সবকিছুর হারিয়ে যাওয়ার মধ্যে আবির্ভাবের একটা সর্ত থাকে কিন্তু আমার? ঐ যে স্ট্রীটলাইটগুলো মৃত্যুর মতো ঠায় দাঁড়িয়ে আছে, বি-ও-এ-সি, বুকবন্ড, বোরোলিন সব নতুনভাবে জ্বলে উঠবে। আমার চতুর্দিকে হাজার বাতির রোশনাই কিন্তু তা থেকে নিজেকে জ্বালাবার মতো সঙ্গতি আমার নেই। আমি শেষ হ'য়ে যাবার দলে। বিশ-পঁচিশের গন্ডিটা আশ্চর্যরকমভাবে পেরিয়ে এলাম। কত সংক্ষিপ্ত সে পর্ব, আর একটু যদি দীর্ঘ হ'ত!

ওর নিশ্বাস আমাকে ঘিরে একটা শীতল পরিমন্ডল সৃষ্টি করল। অনুভব করতে গিয়ে দেখলাম, ওর আমার মধ্যে মস্ত দূরত্ব যেন কয়েকশো থট মাইল। কয়েক শত আলোকবর্ষ দূর থেকে ওর কথাগুলো ভেসে আসছে। উপলব্ধিতে তাই এতটুকু উত্তাপ ছড়িয়ে পড়ে না। আমার হৃৎপিন্ডেও নিরুত্তাপ স্পন্ট হতে সুরু করেছে। এই শীতল বলয়ে একটা শৈত্য স্রোত সচল হয়ে উঠেছে।

তোমার শীত করছে না?

ওর ভেঙে-পড়া আদলে স্বল্প পরিধানে ওকে অসহায় মনে হচ্ছিল। ও অলসভাবে নিজেকে আরো অসহায় করে তুলেছিল। ও দু'চোখ মেলে গঙ্গা থেকে উঠে-আসা কুয়াশা দেখছিল। কথা বলার ফাঁকে ফাঁকে ওর কণ্ঠনালীটা ওঠানামা করছিল। বুকের অনেকটাই অন্তর্হিত। হাত দুটো টান হ'য়ে শরীরকে জীবন্ত রেখেছে। শাড়ির খোলে পা দুটো গুটিয়ে ও যেন একটা বিশেষ মডেল হয়ে উঠেছে।

আমার কথা শুনে ও ব্যস্ত হ'ল না। আঁচলটা ঘুরিয়ে শরীরকে ঢাকল না। আমার কথা তাকে এতটুকু চঞ্চল করল না। বিষণ্ণতায় ও কেমন যেন নির্জীব, অচেতন। চতুর্দিকে ওর হিমপ্রবাহের নিস্তব্ধতা। ওকে সে মুহূর্তে আর জীবন্ত মনে হচ্ছিল না।

রাস্তায় আলো জ্বেলে গাড়িগুলো ছুটছিল। অন্ধকারে আলোর তীরটা জ্বলছে, নিভছে, ছুটছে। স্ট্রীটলাইটগুলো আলো দেখাচ্ছে। অথচ ওর

দৃষ্টিতে মুহূর্তের জন্যও আলো জ্বলছে না।

কলকাতায় শীত নেমেছে, তাই না?

ওরা কিন্তু শীতের মধ্যেই হেঁটে চলেছে। কি অদ্ভুত দেখ, ওরা এক নতুন ভবিষ্যতের স্বপ্ন এঁকে চলেছে, শৈত্যের মধ্যেই ওরা উত্তাপ সংগ্রহ করছে আর আমরা শৈত্যের শিকার হতে চলেছি, পরস্পরের কাছ থেকে দূরে সরে যাবার অজুহাত খুঁজছি।

কলকাতায় শীত নেমেছে। গরম পোষাকে অস্পষ্ট আলোয় জোড়া জোড়া পুরুষ নারী গা মিলিয়ে পা ফেলছে। আমার এই মুহূর্তে ওদের মতো শীতকে উপেক্ষা করতে ইচ্ছে করছিল। একটা নিঃশংক সান্নিধ্যে আতপ্ত হয়ে ওঠা সহজ শীতেই সে সান্নিধ্য উপভোগ্য হয়ে ওঠে। অথচ ওর আসঙ্গে আমার কল্পনাগুলো একটুও প্রতিধ্বনি তুললো না বরং প্রতিনিয়ত মনে হচ্ছে, আমি যেন ক্রমেই মেরুমণ্ডলের কেন্দ্রভূমির দিকে এগিয়ে চলেছি। একটা নির্জীব সাহচর্যে আমি নিষ্প্রাণ হয়ে পড়ছি।

আচ্ছা, আমার চিঠি পেয়েছিলে তো? কি স্থির করলে?

ও এবার সবকটি ইন্দ্রিয়কে সজাগ করে তুললো। আরো ঘনিষ্ঠ হতে চাইল।

তুমি তো জানো। আমার সমস্যা—অবিবাহিতা কয়েকটি বোন, অপরিণত কয়েকটি ভাই, বৃদ্ধ বাবা, অসুস্থ মা। সাংসারিক অনটন, পারিবারিক অস্বাচ্ছন্দ্য, এর ওপর আমার উচ্চাকাঙ্ক্ষা। এর মধ্যে তোমায় কোথায় এনে রাখব? সবকিছুর বদলে আমাকে ভাই-বোন-মা-বাবা সকলের প্রতি কর্তব্য করতেই হবে। এই কর্তব্য কর্মে আমার স্ব-প্রয়োজনটা নিতান্ত নগণ্য। তাই নিজের কথাটা ভুলতে হচ্ছে।

এটা, তোমার অজুহাত, পরোক্ষভাবে তুমি নিজের স্বার্থটাই দেখছ।

তুমি ঠিকই বললে—বাবা, মা, ভাই, বোন একান্ত আমার। তাই তাদের বাঁচিয়ে রাখা আমার স্বার্থ।

একদিন কিন্তু এ সব কিছু চিন্তা কর নি।

এ জন্য তোমার কাছে কৃতজ্ঞ। তুমিই এ চিন্তা করতে শিখিয়েছ।

কিন্তু আমি কি তোমার চিন্তা নই?

নিশ্চয়ই। সেটা সম্পূর্ণ ব্যক্তিগত. তাই ও ব্যাপারে স্বার্থপর হ'তে পারছি না। তুমি তো লিখেইছো—তোমার বাবা-মা'র ব্যবস্থা মেনে নেওয়াই উচিত। আমি এ ব্যাপারে এতটুকু দোষারোপ করব না। বরং নিঃস্বার্থভাবে তোমার শান্তি কামনা করব।

আচ্ছা. আমিও তো তোমার দায়িত্বের কিছুটা অংশ নিতে পারি। তোমার বোনের বিয়েতে আমার মাস্টারীর টাকা হয়ত কিছুটা কাজে আসবে।

কিন্তু ওকে কি করে বোঝাব—তোমার অভিজ্ঞ উত্তর-পঁচিশের সংগতি আমার জীবনে কোন কাজেই আসবে না। তোমার টাকা নিয়ে বোনের বিয়ে, ভাইদের শিক্ষা, বাবা মা'র তীর্থভ্রমণ সম্ভব কিন্তু আমার সাতাশের মানসিকতায় তার প্রয়োজন কতটুকু। তোমার ক্লান্তি, তোমার দীনতা, তোমার শৈত্য দিয়ে আমার প্রত্যাশা কতটুকু পূর্ণ করতে পারবে!

তুমি ভুল বুঝো না। আমার জীবনের অনিশ্চিত জটিলতার মধ্যে তোমায় টেনে আনতে চাই না। যেখানে নিজের ওপর ভরসা নেই সেখানে ভবিষ্যতে তোমাকে কোথায় থেকে বিশ্বাস যোগাব। আজ আমিই বলতে পারছি, বাস্তব একটি ব্যতিক্রম। সেখানে সব পরিকল্পনাই অচল। তাই বাড়ির ব্যবস্থা মানাই তোমার উচিত।

কি আশ্চর্য দেখ, এসব জানার পরও আমি তোমার কাছে ছুটে এসেছি। চল, সত্যি শীত করছে।

পাশাপাশি হাঁটছিলাম। আমার হাতটা ওর হাতের মধ্যে। ও হাতের ওপর ভর দিয়ে হাঁটছিল। আলোর দিকে হাঁটতে হাঁটতে মাঠের অন্ধকারকে বেশ গাঢ় হল মনে হচ্ছিল।

অন্ধকারটা লক্ষ্য করে ও বললো—চল, ঐদিকের পথ ধরে হাঁটি।

অজানতেই বোধহয় আমার আঙুলগুলো শক্ত হয়েছিল। আবার নানান আশঙ্কা উঁকি দিতে সুরু করল। ইচ্ছে হল, ওর সান্নিধ্য থেকে ছিটকে অনেক দূরে সরে যাই। ও ততক্ষণে অনেক কাছে সরে এসেছে। আর দূরের আলোর আঁচ আমাকে বিপন্ন করে তুললো।

অন্ধকারে আমাদের না যাওয়াই ভাল। এখানে অনেক রকম ঘটনাই তো ঘটে। তাছাড়া অন্ধকার বড় বেশি বিশ্বাসঘাতক।

ও আমার হাতটা ছেড়ে কাঁধের ওপর দিয়ে ঘুরিয়ে নিল। ওর আলিঙ্গনে আশঙ্কিত হয়ে উঠেছি।

আচ্ছা, এ মুহূর্তে যদি আর একটা কাণ্ড হয়। ধর, আমি চিৎকার করে উঠলাম। তুমি নিশ্চয় অন্ধকারে মাউন্ট পুলিশটাকে লক্ষ্য করেছ। আমি যদি ওদের ভিন্ন একটা বুঝিয়ে দিই।

আমার রক্তের ঢেউ এক মুহূর্তে হাজার গুণ বড় হ'ল, এঁকিয়ে বেঁকিয়ে যন্ত্রণাগুলো স্পষ্ট হতে চাইল। আমার দু'চোখে মৃতের ফ্যাকাসে মুখ ভাসতে লাগল। আমি মৃত্যুকে প্রত্যক্ষ করতে করতে জীবনের মুখোমুখি হলাম। সবটুকু সাহস নিয়ে হাসতে চাইলাম।

এতটা মূর্খামি তুমি করতে পারবে না। তাতে তোমার নামে কলঙ্ক রটবে। বাবা মা'র ব্যবস্থাও ব্যর্থ হয়ে যাবে। এতটা ক্ষতি তুমি সহ্য করতে পারবে?

ও ঠোঁট দুটো স্পষ্ট করে হাসল। আলিঙ্গনটা এক ফাঁকে শিথিল হ'য়ে এল। সত্যি, ও হিসেবটা ঠিক খেয়াল ছিল না। আর এতবড় ক্ষতিটা এ বয়সে সহ্য হবে না। যাক গে, চল ফেরা যাক।

তিন নম্বর বাসস্ট্যান্ডে এখন বেশ ভিড়। ওরই আড়ালে ও কয়েকটা খবর শোনাল—মল্লি'র স্বামী বয়সে পাঁচ বছরের ছোট, সুনীত প্রীতিকে ডাইভোর্স করে বিজয়া শাস্ত্রীকে বিয়ে করেছে। আমিনা ধর্ম পাল্টে প্রিতম কাউর হয়েছে—এই রকম আরো কত।

এই চল না, আজ আমার কোয়ার্টারে থাকবে। তাছাড়া আমাদের বিচ্ছেদটা রোমান্টিক হওয়াই ভাল। ব্রততীও আজ বাড়ি চলে গেছে। ঘর দুটো একেবারেই ফাঁকা। চল না, যাবে?

ওর দু'চোখে, জোড়া ঠোঁটে, দেহের আদলে জ্বলন্ত কৌতুক দেখলাম। নিজের সম্ভাব্য তাগিদগুলো চঞ্চল হয়ে উঠল। প্রবৃত্তি কখনও কখনও প্রবল হ'য়ে ওঠে। তাকে বশে আনার নামই কি মনুষ্যত্ব? মনুষ্যত্বের অপর একটা সংজ্ঞাও তো আছে।

বাবার এ্যাজমার ওষুধ কেনা, মা'র নিয়মিত পুরী দর্শনের তাগিদ মেটানো, তিতিরের বেহিসেবী কসমেটিক যোগানো, জোতু'র ফি বছর বি, এ পরীক্ষার ফীজ দেওয়া, অফিস কামাই করে লাইন দিয়ে ছোলা কেনা—এ সবের নামও তো মনুষ্যত্ব! অন্যথায় আমি অমানুষ। আমার দ্বি-মনুষ্যত্ব আমাকে মানুষ হ'তে হবে। সেখানে প্রবৃত্তির সংগে কোন বচসা নেই।

আচ্ছা, তোমার ট্রেন কটায়?

সাতটা বাইশ।

তাহলে তোমার এই বাসটায় চলে যাওয়াই উচিত।

কেন, ট্যাক্সীতেই চল না?

ওর প্রতিবিম্বকে আর বিশ্বাস করতে পারছিলাম না। নিজেকে অসহায় অনুভব করার আগে আমি বাঁচতে চাইলাম।

না, না তুমি বাসেই যাও। আমার একটু সাউথে যেতে হবে।

ততক্ষণে বাসটা ছেড়ে চলে গেছে। কলকাতা একটা নতুন রহস্য নিয়ে ঝলমল করছে। রেসকোর্সের ধার ঘেঁষে গাড়িগুলো হু হু করে ছুটছে।

একটি নারী একটি পুরুষের সান্নিধ্যে গতি যেন উদ্দাম হয়ে উঠেছে। আমিও ভাবতাম, সঙ্গিনী থাকলেই বুঝি উদ্দাম হওয়া যায়। কিন্তু আজকের এই মুহূর্তে মনে হল, কথাটা কত মিথ্যে তা না হলে

ওকে এত অসহ্য মনে হবে কেন? ঐ পাশের পাঞ্জাবীর নারীটির পাশে ওকে কত নগণ্য মনে হচ্ছে। ওকে সহ্য করতে না পারলেও ওর অসহায় বিষণ্নতা আমাকে বিমনা করে তুলছিল। ও হয়ত স্কুল থেকে সোজাই চলে এসেছে। আবার কাল প্রত্যুষে একজন সাধারণ শিক্ষিকা হয়ে যাবে। হাজার শিক্ষিকার মাঝে ওকে আর সঙ্গিনী বলে চেনা যাবে না। আজকের অবকাশে ও অনিবার্যভাবে নারী হয়ে উঠতে চেয়েছিল কিন্তু আমিই ওকে নির্মমভাবে বুঝিয়ে দিয়েছি—তুমি নারীত্বের গন্ডি ছাড়িয়ে অনেক দূর এগিয়ে গেছ তাই তোমার মধ্যে রমণীত্ব খুঁজে পাওয়া যায় না। তোমার আসঙ্গে তাই কোন পুরুষ উদ্ভ্রান্ত হয় না।

ওর চিঠি পড়ে অনুকম্পাই জেগেছিল। বাবা-মা ওর বিয়ের ব্যবস্থা করেছেন—অক্ষর কটি পড়ে মনে মনে হেসেছিলাম। তৈরি অক্ষরে ও আমার দারিদ্র্য দেখতে চেয়েছিল। আমি হয়ত ভীষণভাবে অসহায় হয়ে পড়ব। কিন্তু উল্টোটাই ঘটল—ওর দীনতাই স্পষ্ট হল। ও নিজের প্রতিবিম্বের কাছে নিজেই ধরা দিল।

কিন্তু আমি কি করব? মনুষ্যত্ব বিসর্জন না দিয়েও ভেবেছি, ও আমার জৈবিক কিংবা মানসিক কোন ক্ষুধাই জাগাতে পারে না। তাহলে ওকে নিয়ে কি করব? আমার প্রাত্যাহিক জীবনে ও একটা অস্বস্তির প্রতিকৃতি হয়ে টিকে থাকবে। তাতে লাভ?

এই, আমার বাস চলে এল।

ওর শরীরটা এক মুহূর্তে আমার সান্নিধ্যে এল। দুচোখে প্রত্যাশিত আলো ফুটলো। তারপর হাল্কা পায়ে ফুটবোর্ডের দিকে পা বাড়াল।

পর মুহূর্তেই সেই চিৎকার। ফুটবোর্ডের তলাটা রাস্তার ওপর একটা কর্কশ আওয়াজ তুলে কাত হওয়ার সংগে সংগে সেই চিৎকার। ছেলেটি বলিষ্ঠ হাতেই ওকে চাকার আকর্ষণ থেকে বাঁচিয়ে দিয়েছে। দুটো পুরুষের আড়ালে ওর ছোট্ট শরীরটা তলিয়ে গেছে। বাসটা আবার তীব্রভাবে ছুটে চলেছে।

আর আমি একটা সাংঘাতিক ঘটনা থেকে মুক্তি পেয়ে লম্বা লম্বা পা ফেলে এগিয়ে চলেছি। দুর্ঘটনার সম্ভাবনা আমাকে সব দুশ্চিন্তা থেকে মুক্তি দিয়ে গেল। এ মুহূর্তে আমার আর কোন দুশ্চিন্তা নেই। ওর মৃতদেহটা সনাক্ত করার হাত থেকে আমি রেহাই পেয়েছি। ও দুর্ঘটনাকে সংগে করে আমাকে নিশ্চিত দুর্ঘটনার কবল থেকে বাঁচিয়ে দিয়ে গেল।

দ্রুত নিরাপদ স্থানে সরে এসেছি। ও চলে যাওয়ার সংগে সংগে সমস্যাগুলো অনেক সহজ বলে মনে হল। মনে হল নিজেকে ভীষণ নিঃস্ব।

আমার দ্বিতীয় অধ্যায় সুরু হয়েছে। আমি একটি অভিজ্ঞ, ভীত, সাংসারিক জীব হয়ে উঠেছি। আমার মানসিক প্রগতি পঙ্গু হয়ে পড়েছে। আমার ইচ্ছা-আকাঙ্ক্ষার অগ্রপশ্চাতে সমস্যাগুলো ছুটছে। আমার পরিচিত জগতে আমার অস্তিত্ব মিথ্যা হয়ে গেছে। তাই আমি ভুলতে চাইলাম যে আমি দশটা-পাঁচটার অনুগত শিকার। আমি একদিন কল্পনা করতে ভালবাসতাম। স্বপ্নিল নেশায় কখনও কখনও মাতাল হয়েছিলাম।

ভবিষ্যতের বিশাল মণিকাঞ্চনের প্রতি আমার আর লোভ নেই। আমি অতীতকে মূলধন করতে পারি নি তাই বর্তমান হারাতে প্রস্তুত নই। তার অবর্তমানে এ সত্যই স্পষ্ট হল তাই নির্দ্বিধায় নির্দিষ্ট গলির দিকে পা বাড়ালাম।

এখানকার উত্তপ্ত আবর্তে, মুহূর্তের মাদকতায় স্বল্পপরিসরে আমি আত্মিক সান্নিধ্য সম্ভোগ করব। প্রবৃত্তির পরিচর্যায় আসক্তির বর্ণে আমি অনুভব করব বিস্মৃতির কল্পসুখ। সে মুহূর্তে আমার কোন কামনা নেই, বাসনা নেই, আকাঙ্ক্ষা নেই। আমি সেখানে সবকিছুর নেপথ্য মানুষ। অতীত-ভবিষ্যৎহীন বর্তমান মানুষ। যার অস্তিত্ব শাশ্বত, যার অন্তরালে কোন পরিতাপ নেই। আর এটাই একমাত্র আশ্রয়।

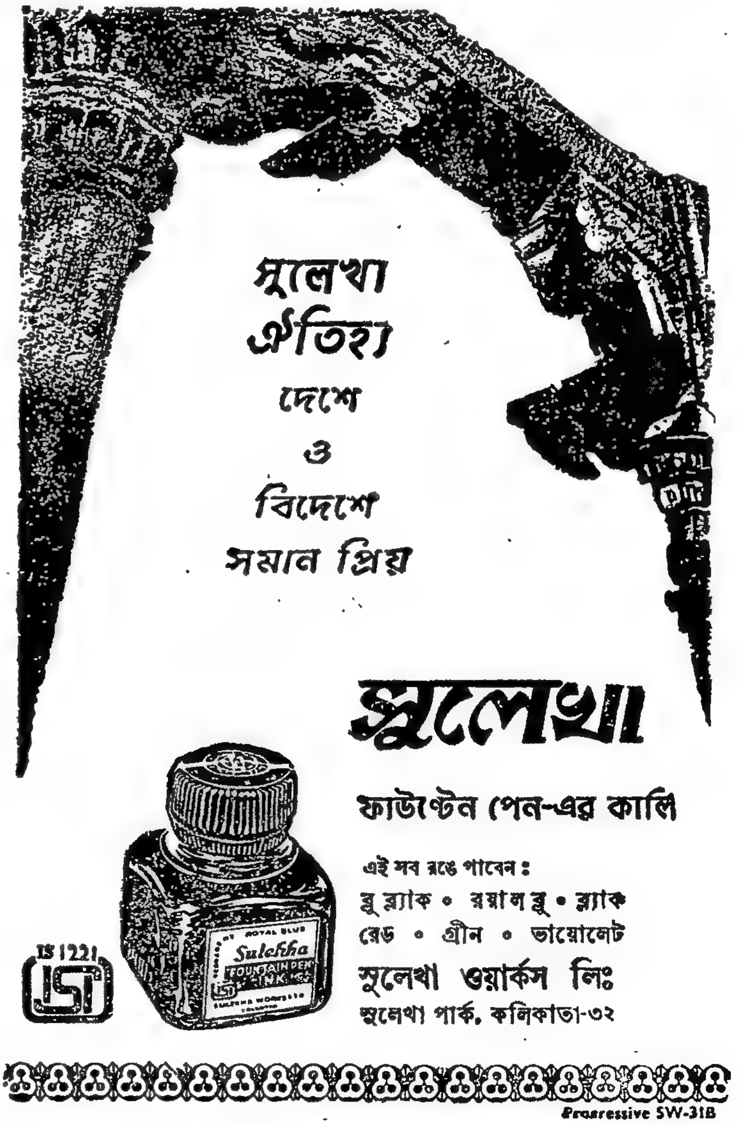

সি. ভি. রমন ও মহাকাশ

আশিসকুমার সিংহ

সম্প্রতি আচার্য রমন মাদ্রাজের ইন্সটিটিউট অব টেকনোলজিতে বক্তৃতা-প্রসঙ্গে মহাকাশবিজয়ের প্রয়াসকে "মানব মনীষার ব্যভিচার" বলে "অভিশাপ" দিয়েছেন। উক্তিটি প্রণিধানযোগ্য। সামান্য বাদ-প্রতিবাদ-ও পত্র-পত্রিকায় হয়েছে। সুস্থ দৃষ্টিসম্পন্ন (আমার মতে) অন্তত দু'টি চিঠি আমি দেখেছি। সংযত জীবনী আলোচনার মাধ্যমে শ্রদ্ধাও প্রকাশ করেছেন কেউ। দু'-একজন 'ভক্ত' রমনকে বিজ্ঞান শেখানর ধৃষ্টতা দেখাতে বিরোধীপক্ষকে মান্য করে দিয়েছেন। আবার, রমন যা বলেছেন তাও ভালো, মহাকাশ যাত্রাও ভালো, দুটোই চলুক—এ-ধরণের মতামতও চোখে পড়েছে। তার মানে, সমাজ ও বিজ্ঞান নিয়ে যাঁরা ভাবেন তাঁদের মধ্যে একাধিক মেজাজের লোক এই উক্তিতে সাড়া দিয়েছেন। আমরাও ব্যাপারটা নিয়ে আলোচনা করতে পারি।

কিন্তু প্রথমে বোধহয় রমনের একটি পরিচয় দেওয়া প্রয়োজন। কেন না, মহাকাশবিজয় এবং রমন—উভয়েই আমাদের অনেকের কাছে দুটি নাম বৈ কিছু নয়। প্রথমটি একটি ঘটনার নাম, দ্বিতীয়টি নোবেল পুরস্কার প্রাপ্ত জনৈক ভারতীয় বিজ্ঞানীর। "সাপ্তাহিক বসুমতী"-তে ব্যক্তি রমনের পরিচয় আগেই প্রকাশিত হয়েছে। ("আজকের মানুষ" ১১ই আগস্ট,, ১৯৬৬ দ্রষ্টব্য)। আমি এখানে বিজ্ঞানী রমনের একটি সংক্ষিপ্ত ছবি আঁকার চেষ্টা করব।

একটু গোড়া থেকেই সুরু করা যাক। রমনের বাবা ছিলেন পদার্থবিদ্যা ও গণিতের অধ্যাপক। বরাবরই পদার্থবিদ্যার দিকে রমনের একটা বিশেষ আকর্ষণ ছিল। বয়ঃসন্ধিতে এ্যানি বেসান্ত-এর রচনার প্রভাবে কিছুদিন ধর্মগ্রন্থের দিকে ঝুঁকলেও সে-প্রভাব কেটে যেতে দেরি হয় নি। পদার্থবিদ্যার মধ্যে আবার আলোক বিজ্ঞান তাঁর কাছে একটা বড় আকর্ষণের ব্যাপার ছিল। এম-এ পাঠকালীন এ-বিষয়ে তাঁর মৌলিক গবেষণা লন্ডনের বিজ্ঞানপত্রে প্রকাশিত হয়েছে। কলকাতায় সরকারী চাকরির সময় ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন ফর কাল্টিভেশন অব সায়েন্স-এর গবেষণাগারেও এই নিয়ে গবেষণা করেছেন তিনি। তারপরে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে পদার্থবিদ্যার পালিত অধ্যাপক হিসেবেও ১৯১৭-এর পর থেকে আলোক বিচ্ছুরণের উপরে মূল্যবান গবেষণা তাঁর নামকে ছড়িয়ে দিয়েছে দেশে বিদেশে। এরই স্বীকৃতিস্বরূপ ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের বিশ্ববিদ্যালয়গুলির কংগ্রেসে ভারতের প্রতিনিধিরূপে তিনি ইউরোপ গেলেন ১৯২১ সালে।

নোবেল পুরস্কার প্রদান উৎসবের ভাষণে রমন নিজেই বলেছেন এই যাত্রার পথে ভূমধ্যসাগরের নীল জলরাশি তাঁকে অত্যন্ত মুগ্ধ এবং আকৃষ্ট করে। তাঁর মনে হয় সূর্যালোকের বিচ্ছুরণেই সাগরের এই বর্ণগরিমা। কলকাতায় ফিরে এ-নিয়ে কাজ করার কথা ভাবেন তিনি। ঐ বছর সেপ্টেম্বরে কলকাতায় ফিরেই কাজ সুরু করেন এবং কিছুদিনের মধ্যেই বুঝতে পারেন কাজের গতি যে-দিকে এগুচ্ছে তাতে সুরুতে যা ভেবেছিলেন তার চেয়ে গভীরতর কোন লক্ষ্যেই হয়ত পৌঁছানো যাবে। এই কাজের ফলেই ১৯২৮-এ আবিষ্কৃত হল রমন-এফেক্ট, যা সহজ কথায় এই রকম ঃ

কোন একরঙা আলোর গতিপথে বহু পরমাণুবিশিষ্ট কোন অণু থাকলে ঐসব পরমাণুর সঙ্গে অল্প কিছু আলোক-রশ্মির বাস্তব সংঘাত ঘটে এবং ফলে, রমন দেখলেন, আহত রশ্মিগুলির রঙটা পালটে যায় সামান্য। (অধিকাংশ রশ্মি অবশ্য সংঘাত এড়িয়ে যায় এবং অবিকৃত থাকে)। কিম্বা, আলোর রঙ তার তরঙ্গদৈর্ঘ্যের ওপর নির্ভর করে বলে, বলা যায়, আহত আলোর তরঙ্গদৈর্ঘ্য পরিবর্তিত হয় এই সংঘাতে। আসলে বেড়ে যায়। কিন্তু তরঙ্গদৈর্ঘ্য বেড়ে যাওয়ার মানে প্রতি সেকেন্ডে আলোর কম্পনসংখ্যা কমে যাওয়া। আবার কম্পন আলোর শক্তির সম্বলের ওপর নির্ভরশীল বলে কম্পন-সংখ্যা কমে যাওয়ার অর্থ শক্তিও কমে যাওয়া। তার মানে, কোন পদার্থের বহু পরমাণুবিশিষ্ট অণুর সঙ্গে ধাক্কা খেয়ে আলো তার শক্তি খানিকটা হারিয়ে ফেলে। কোথায় যায় এই শক্তি? পদার্থ-বিদ্যায় সুগভীর অন্তর্দৃষ্টির সঙ্গে রমন বিচার করলেন যে সংঘাতের সময় পরমাণুগুলিই এই শক্তি শোষণ করে এবং এই শোষণের পরিমাণ ও প্রকৃতি অণুটির পরমাণু সংস্থানের ওপর নির্ভরশীল। অর্থাৎ অণুটির মধ্যে পরমাণুগুলি যেভাবে সাজানো আছে তার সঙ্গে এই শোষণ সম্বন্ধযুক্ত। অতএব শক্তিক্ষয়ের পরিমাণ ও প্রকৃতি জানা গেলে, রমনের পদ্ধতিতে যা জানা খুবই সহজ, অণুর পরমাণু-সংস্থান বার করা যাবে। অণুর সঙ্গে ধাক্কা খেয়ে আলোর এই রঙ পালটানো তথা তরঙ্গদৈর্ঘ্যের বৃদ্ধিই 'রমন-এফেক্ট' নামে পরিচিত; আর, আহত ভিন্নরঙা রশ্মির নাম 'রমণ-রশ্মি'। মনে রাখা দরকার যে, অনেক বৃহৎ পদার্থপিন্ডের গঠনপ্রকৃতি জানার কাজেও 'রমন এফেক্টে'র ব্যবহার হতে পারে।

বলা বাহুল্য, কাজটা খুবই ছোট্ট। কিন্তু অণুর আভ্যন্তরীণ গঠন নির্ণয়ে এর প্রয়োগের সম্ভাবনা অপরিসীম। যেমন ধরুন, অনেক আগে থেকেই জানা ছিল নাইট্রাস অক্সাইড গ্যাসের অণুর মধ্যে দুটো নাইট্রোজেন আর একটা অক্সিজেনের পরমাণু আছে। এটা তাহলে একটা বহু পরমাণুবিশিষ্ট অণু। এর মধ্য দিয়ে এক্স্-রে পাঠিয়ে খোঁজ পাওয়া গেল পরমাণুগুলো পরস্পরের সঙ্গে এক সরলরেখায় যুক্ত। অর্থাৎ হয় N-O-N (N বলতে নাইট্রোজেন এবং O বলতে অক্সিজেন বুঝবেন) না হলে N-N-O—এইভাবে পরমাণুগুলো সজ্জিত। কিন্তু সঠিক সংস্থানটি নির্ণয় করা গেল একমাত্র রমন এফেক্টের প্রয়োগে আলো পাঠিয়ে। জানা গেল N-O-N নয়, নাইট্রাস অক্সাইডের পরমাণু সংস্থান হল N-N-O। এমনিতর আরো বহু উদাহরণ আছে শুধু অণুর ক্ষেত্রেই নয়, বৃহৎ পদার্থপিন্ডের ক্ষেত্রেও।

পদার্থের গঠন নির্ণয়ের এমন সহজ পন্থা আবিষ্কৃত হওয়ায় বিজ্ঞানের অনেক মাঝপথে-থেমে-থাকা কাজ শেষ হল এবার। বিশেষভাবে উপকৃত হল রসায়ন; আর পদার্থবিদ্যার সামনেও একটা বন্ধ দরজা যেন খুলে গেল সহসা। এই প্রয়োগ-সাফল্য ও রমনের অন্তর্দৃষ্টির স্বীকৃতিরূপে ১৯৩০-এর পদার্থবিদ্যার নোবেল পুরস্কারটা এল ভারতবর্ষে।

আবিষ্কারের সঙ্গে সঙ্গেই রমন নিজেও এই প্রয়োগসম্ভাবনার কথা বুঝেছিলেন এবং স্বাভাবিকভাবেই উৎফুল্ল হয়েছিলেন সে-কথা ভেবে—নোবেল পুরস্কার প্রদান উৎসবের ভাষণে সে

সঙ্কেত আছে। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয়, এর আগে বা পরে বিভিন্ন সময়ে তিনি 'বিজ্ঞানচর্চা শুধু বিজ্ঞানচর্চার জন্যই'—এই মতবাদ প্রচার করেছেন। যেমন ১৯৪৮-এ আকাশবাণী থেকে প্রচারিত তাঁর বক্তৃতামালার প্রথমটির শেষে তিনি বলেছেন ঃ

"কিন্তু আমি আপনাদের ভুলতে দেব না যে, আমাদের বিজ্ঞানের শ্রেষ্ঠ নায়ক হয়েছেন সর্বদা তাঁরাই যাঁদের লক্ষ্য ছিল জ্ঞানের জন্যই জ্ঞানের চর্চা।"

এই একই কথা বক্তৃতাগুলির আর-ও দু'এক জায়গায় ছড়িয়ে আছে। বারাণসী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তন উৎসবের ভাষণেও এই ধরণের মতামত প্রচার করেছেন তিনি। আবার দেখুন, ১৯৪৮-এর ঐ বক্তৃতাগুলি দেওয়ার অব্যবহিত পূর্বেই তিনি ফ্রান্সের বর্দো শহর থেকে ঘুরে এসেছেন; সেখানে "রমন এফেক্ট"র বিশ বছর পূর্তি উপলক্ষে একটি আন্তর্জাতিক বিজ্ঞানীসভার আয়োজন হয়েছিল। মহাযুদ্ধের রক্তের দাগ ইউরোপের মাটিতে তখনও বোধ হয় শুকোয় নি ভাল করে। অথচ, এই খ্যাতিমান বিজ্ঞানীর মুখ থেকে মহাযুদ্ধ ও তার পশ্চাতে বিজ্ঞানের ভূমিকা নিয়ে একটি কথাও শোনা যায় নি সেদিন, যদিও ঐসব বক্তৃতার আলোচ্য বিষয়ে এ-প্রসঙ্গ এসে যাওয়া অস্বাভাবিক ছিল না। কেন না, ঐ বক্তৃতায় পদার্থবিদ্যার নবযুগ নিয়ে আলোচনা ছিল, বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গী এমন কি বিজ্ঞানের ভবিষ্যৎ নিয়েও তাঁর মতামত তিনি ব্যক্ত করেছেন ওখানে। সম্ভবত "জ্ঞানের জন্যই জ্ঞানচর্চা বলে" সমাজের কথা ভাবেন নি তখন। আর ১৯৬৬-তে হঠাৎ এমন একটি বিজ্ঞান প্রয়াসকে মানবসমাজের দোহাই দিয়ে তিনি "অভিশাপ" দিলেন যা প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ কোন দিক দিয়েই মানবজীবনকে আঘাত করে নি এখনও।

এই সব তথ্যের থেকে মনে হয় সমাজসচেতন বলতে ঠিক যা বোঝায় এই খ্যাতিমান বিজ্ঞানী তা নন। তাঁর সাম্প্রতিক "অভিশাপ"টি আকস্মিক। কেন না, তাঁর সমাজ চেতনার কোন ধারাবাহিক সুসংবদ্ধ পরিণতির সন্ধান পাওয়া যায় না। তিনি তাঁর ল্যাবরেটরীতেই একলা রইলেন আজীবন; কে জানে, হয়ত' নিশ্ছিদ্র অন্ধকারেই আলোর গবেষণা ভালো চলে, তাই।

এ-কথার সত্যতা শুধু রমনের ক্ষেত্রেই সীমাবদ্ধ নয়। "জ্ঞানের জন্যে জ্ঞানে"র কথা যাঁরা বলেন মূলত এই একাকিত্বের উপরে তাঁদের সকলেরই ভরসা। এ-কথার মধ্যে জীবনবিমুখ বিজ্ঞানের প্রতি একটা সমর্থন আছে, আছে নিজেকে "বিশুদ্ধ জ্ঞানী" হিসেবে দেখার একটি প্রচ্ছন্ন গর্ববোধ। এই গর্ব তাঁদের সাধারণের থেকে একা করে রাখেই। রমনের ক্ষেত্রে এই গর্বের একটা স্পষ্ট কারণ-ও ছিল। উঁচু মাইনের চাকরি ছেড়ে বিজ্ঞান কলেজের অধ্যাপনা গ্রহণ করেছিলেন তিনি, তারপরে নিরবচ্ছিন্ন গবেষণায় জগতের শ্রেষ্ঠ পুরস্কার জয় করে এনেছিলেন—"জ্ঞানের জন্য জ্ঞান" বলার গর্বটা তাঁর ক্ষেত্রে তাই খুবই স্বাভাবিক, সঙ্গতও, কিন্তু বিচারকালে নিরপেক্ষ নয় এ-কথা না মেনে উপায় কি?

রমনের ভাষণটি নিয়ে যে-সব আলোচনা চোখে পড়েছে তাদের সবকটিই এই বিষয়ে একমত যে, বিজ্ঞানীর সমাজ সচেতনতা খুবই কাম্য গুণ। এই চেতনার স্বরূপ কি? সমাজ যেহেতু কালে কালে একটি ধারাবাহিক ঐতিহাসিক পদ্ধতিতে নির্মিত প্রতিষ্ঠান, সমাজসচেতন হতে হলে ইতিহাস চেতনা তাই অপরিহার্য। ইতিহাস কিন্তু জীবন-বিচ্যুত "বিশুদ্ধ জ্ঞানে"র ধারণাটিকে অতীতের কিছু পরশ্রমজীবী পণ্ডিতের কল্পনা থেকে উদ্ভূত বলে প্রমাণ করে দিয়েছে। তাই সমাজসচেতন ব্যক্তির পক্ষে "বিশুদ্ধ জ্ঞানী" হওয়া সম্ভব নয়।

রমন তাই তাঁর আলোচ্য ভাষণে প্রধানত দুটি ভুল কথা বলেছেন। প্রথম, বিজ্ঞানীরা রাষ্ট্রযন্ত্রের হাতে পুতুল হয়ে পড়েছেন, তাই মহাকাশ বিজয়ের জন্যে কাজ করছেন অনিচ্ছাসত্ত্বেও। আজকের কোন সমাজসচেতন বিজ্ঞানী কখনও এমন কথা বলবেন না। কথাটির থেকে মনে হয় যেন বিজ্ঞানী মানেই এমন এক ব্যক্তি যার সব সিদ্ধান্ত নির্ভুল, যে সবকিছু নির্ভুল বুঝতে পারে, তার পরে ক্রোধ-লোভ পরিহার ক'রে উচিত কাজটা ঠিক ঠিক ক'রে যায়; আর যত দোষ বেচারি রাষ্ট্রযন্ত্রের। এটা ভীষণ ভুল কথা, বলা যায়, মিথ্যাও। কথাটা প্রথম তীব্রভাবে অনুভূত হয়েছিল গত বিশ্বযুদ্ধের সময় যখন সম্মিলিত বিজ্ঞানীদের আবেদন উপেক্ষা ক'রে আমেরিকার রাষ্ট্রশক্তি পরমাণু বোমা নির্মাণ অব্যাহত রেখেছিল। কিন্তু এর সঙ্গে এ-কথাও মনে রাখা দরকার যে, এই আবেদনের কিছুকাল আগে আমেরিকার বিজ্ঞানীরাই রাষ্ট্রকে বারবার অনুরোধ করেছিলেন পরমাণু বোমা তৈরির জন্যে। প্রেসিডেণ্ট প্রথমে এতে কান দেন নি। পরে বিজ্ঞানীরা আইনস্টাইনকে ধরেন এবং আইনস্টাইনও চিঠি লেখেন। সেই চিঠি পেয়েই আমেরিকার রাষ্ট্র পরমাণু বোমা নির্মাণের কথা নতুনভাবে বিবেচনা করে ও নির্মাণের পক্ষেই সিদ্ধান্ত নেয়। বলা বাহুল্য যে, প্রথমে বিজ্ঞানীরাও তাঁদের সঙ্কীর্ণ জাতীয়তাবাদ ও জার্মানীর ভয়ের দ্বারা চালিত হয়েছিলেন। তার মানে, তখন রাষ্ট্রশক্তি ও বিজ্ঞানী উভয়েই ছিলেন এই সঙ্কীর্ণতার হাতের পুতুল।

সমরায়োজন সম্বন্ধেও একই কথা। শুধু নিজেদের খেয়াল মেটানর জন্যে রাষ্ট্রনায়কেরা যুদ্ধ বাধায় এ-কথা এখন আর খাটে না। সে ছিল অনেক পুরোনো দিনের রাজরাজড়াদের আমলে, এবং সে-আমলেই সেটা শেষ হয়ে গেছে। আজকের দিনে যুদ্ধের পেছনে বিজ্ঞানের-ও হাত থাকে। অর্থনীতি-বিজ্ঞানের ও অন্যান্য সমাজ-বিজ্ঞানের কথা না হয় ছেড়েই দিলাম। কিন্তু নতুন বিজ্ঞান তথ্যের অভিঘাতে পুরোনো মূল্যবোধ ভেঙে যাওয়ার ফলেই পৃথিবী জুড়ে বিশৃঙ্খলার সূত্রপাত হয়েছে শতাব্দীর গোড়া থেকে—এই মতটা বর্তমানে বহুজনগৃহীত। যেমন ধরুন, ডারউইনবাদের "যোগ্যতমের বেঁচে থাকা"র যে কথা জীবজগতে প্রযোজ্য নাৎসী বাহিনী পররাষ্ট্র আক্রমণে তারই অজুহাতকে কাজে লাগিয়েছিল। কাজটাকে ছি ছি করা গেছে, কিন্তু কোন বিজ্ঞানীই বিজ্ঞানের পথে এ-কাজের যুক্তি গ্রাহ্য প্রতিবাদ তখন করতে পারেন নি।

ছোটদের পূজা বার্ষিকী

আনন্দ ১৩৭৩

= ৫০০ পৃষ্ঠার বিরাট বই =

* পাঁচটি উপন্যাস * ছয়টি নাটিকা *

* চল্লিশটি গল্প * বহু কবিতা *

নামকরা লেখক-লেখিকার শ্রেষ্ঠ লেখার সংকলন

১লা আশ্বিন বেরুচ্ছে

দাম ঃ পাঁচ টাকা

ক্যালকাটা পাবলিশার্স ঃ ১৪, রমানাথ মজুমদার স্ট্রীট, কলিঃ-৯।

বৃষ্টির দিনে

শান্তিপ্রিয় চট্টোপাধ্যায়

প্রকৃতিকে দেখে ভালবাসতে ইচ্ছে হয় ক'জনের?
সবাই সুবিধা মতো হাঁটবো, উঠবো, বসবো।
কাজের পায়ে পড়বে না বাধা, অথচ বৃষ্টি জমবে।

পরিমল বৃষ্টি চেয়েছিলো, প্রচন্ড গরমে
উত্যক্ত হ'য়ে বৃষ্টি চেয়েছিলো, আষাঢ়ের
আগেই বৃষ্টি নামলো; ক্ষণে ক্ষণে পরিমলের
সঙ্গে দেখা, রাস্তার বাঁকে বাঁকে, সকাল
ন'টা, দিন বারোটায়, হয়তো বা
আবার বিকাল চারটায়; পরিমল শেষ
পর্যন্ত বৃষ্টিকে চাইলো না; আজ বৃষ্টি
নেই, হয়তো বা দক্ষিণ সমুদ্রের কোনো
মেঘকন্যার কালো কেশে মুখ লুকিয়ে
সে আকুল হ'য়ে কাঁদছে, তার কান্না
ঝড়ের কণ্ঠে পরিমল কি শুনতে পাচ্ছে?

প্রার্থনা

গৌরাঙ্গ ভৌমিক

পৌরুষের অভিনয়ে বহুদিন বাজী মাৎ করেছি আসর
লক্ষ কোটি ব্যর্থতার সুগোপন উন্মাদনা বুকে বয়ে যায়।
কতোদিন সাজায়েছি অনির্দিষ্ট দিকভ্রান্ত আমার বাসর
অদৃশ্য উল্লাসময় কীটের দংশনে আর তীব্র যন্ত্রণায়।

ভরাডুবি হতে হতে কতবার বেঁচে গেছে আমার তরণী
কীটের উল্লাসে ভরে আর্তনাদে ছলনায় সবুজ প্রান্তর।
গ্লানিময় প্রতি অঙ্গ, মনে হয়, শরবিদ্ধ আমার ধরণী
বিস্মিত গোলাপ হোক, যন্ত্রণার অবসানে আমার এ ঘর।

এ প্রার্থনা জীবনের, যৌবনের, অনির্দিষ্ট চঞ্চল যাত্রার
এ প্রার্থনা নামহীন দেবতার অন্তর্ভেদী চৈতন্যের দ্বারে।
সে গুহা-শায়িত থাক, অন্ধকার পর্বতের সুকঠিন দ্বার
চিরতরে রুদ্ধ হোক।

আমি চাই যৌবনের পৌরুষের ভারে
সুদীপ্ত এ জীবনের ক্ষতহীন সুবিপুল পথ পরিক্রমা।
অজস্র শস্যের গন্ধে ডুবে যাক আকাশের কর্কশ নীলিমা।

জে বি এস হলডেন তাঁর "ডারউইনবাদ ও তার বিকৃতি প্রবন্ধে বিজ্ঞানসম্মত পথে এর প্রতিবাদ করেছেন; কিন্তু সে অনেক পরে। অর্থাৎ বিজ্ঞানীও তখন পরিবেশের হাতে পুতুল ছিলেন। আর বিজ্ঞানীরা স্ব স্ব রাষ্ট্রশক্তিকে যুদ্ধে কিভাবে সাহায্য করেছিলেন তা নিশ্চয়ই এই অল্প দিনে আমরা ভুলি নি।

বিজ্ঞানী যখন ইতিহাস ও সমাজ সম্বন্ধে সচেতন হবেন একমাত্র তখনই এই পুতুলনাচের অবসান হতে পারে। কিন্তু তার জন্যে সর্বপ্রথম "জ্ঞানের জন্য জ্ঞানচর্চা" এই মতটিকে বা এক কথায় বিজ্ঞান কৈবল্যবাদকে বাতিল করতে হবে। বিজ্ঞানচর্চাকে আন্তরিকভাবে মেনে নিতে হবে জীবনকেন্দ্রিক বলে। এর অর্থ এই নয় যে, বিজ্ঞান শুধুই "প্রয়োজন মেটানোর ঠিকাদার।" এ-কথাটা তার আছেই, থাকবেও, কিন্তু এখানেই তার সীমা নয়। জীবনকেন্দ্রিকতার গূঢ় অর্থ এই যে বিজ্ঞান এমন কিছু বলবে না বা করবে না যা সুস্থ স্বাভাবিক মানববুদ্ধির অসম্মান করে আত্মসমর্পণ করে অবাস্তবের পায়ে। (এখানে বুদ্ধি বলতে আমি মনন ও হৃদয়—উভয়কেই বোঝাতে চাইছি)। আজীবন বিজ্ঞান কৈবল্যবাদের পূজারী মহাকাশবিজয়কে "অভিশাপ" দিয়ে এই সুস্থ স্বাভাবিক মানববুদ্ধিকেই অভিশাপ দিয়েছেন।

এবং এইজন্যই হঠাৎ সমাজসচেতন হতে গিয়ে তিনি মহাকাশবিজয়ের মানব কল্যাণের দিকটিকে উপেক্ষা করেছেন। তাঁর দ্বিতীয় ভুল এখানে। আধুনিক শরীরবিজ্ঞান-গবেষণার একটি প্রধান পদ্ধতিই হল বিভিন্ন পরিবেশে শরীরের কাজকর্ম কিভাবে চলে সেটা দেখা। এই উদ্দেশ্যে অনেক উঁচুতে কম বায়ুচাপে যারা পুরুষানুক্রমে বাস করে এমন মানবগোষ্ঠীর ওপরে গবেষণা চলছে অথবা এস্কিমো বা আফ্রিকার বিচ্ছিন্ন ট্রাইবদের ওপরে কাজ করার বিশ্বব্যাপী পরিকল্পনা নিচ্ছেন রাষ্ট্রসংঘ। আমাদের দেশে শেরপাদের ওপরে কাজ করেছেন প্রেসিডেন্সী কলেজের ডঃ সুখময় লাহিড়ী হিমালয়ের ওপরে শেরপাদের দেশে গিয়ে। ঐ ল্যাবরেটরীতে ডঃ হরিপদ চট্টোপাধ্যায়ের সঙ্গে আমরা একই কাজ করছি বর্তমানে। সারা পৃথিবী জোড়া এ-ধরণের কাজের ফলে সাধারণ পরিবেশে দেহযন্ত্র কিভাবে কাজ করে জানতে সুবিধা হবে। মহাকাশ যাত্রার অর্থই হল মানুষের আরেক নতুন পরিবেশে যাওয়া। সেখানে শরীর ভারহীনতা ও অন্যান্য মহাজাগতিক রশ্মির সম্মুখীন হবে। তাই শরীরবিজ্ঞানের দিক দিয়ে মহাকাশযাত্রার অনেক গুরুত্ব। আর শরীরবিজ্ঞানকে বাদ দিয়ে মানুষের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের কথা চিন্তা করা যায় না। এ-ছাড়া আছে বাইরে থেকে পৃথিবীর বায়ুমণ্ডল বা আবহাওয়া পর্যবেক্ষণ। মাত্র কয়েকটির উল্লেখ করলাম। মানুষের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের কথা বলেছেন রমন। এই-ই ত' তার একটা পথ।

অন্য এক প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ একবার মাতলামীর জন্যে তালগাছকে দোষ দিতে নিষেধ করেছিলেন। রমন কিন্তু তালগাছকেই "অভিশাপ" দিয়েছেন। মহাকাশযাত্রা বন্ধ ক'রে দিলেই পৃথিবীর সমরায়োজন বা ধনবৈষম্য ঘুচবে কি? নিশ্চয়ই না। তার বিজ্ঞানসম্মত অন্য পথ আছে; এবং সে-পথেই সমাধান হবে একদিন। আর, সমাজবিজ্ঞানের সঙ্গে অন্যান্য বিজ্ঞানের সম্বন্ধ অবিচ্ছেদ্য বলে আজ যদি এ-যুগের বিজ্ঞানের অন্যতম শ্রেষ্ঠ প্রয়াসকে, সত্য প্রতিনিধিকে, রমনের কথামত বন্ধ ক'রে দেওয়া হয় তবে সে-সমাধান বিলম্বিত হবে মাত্র।

আমাদের দেশে ভক্তি অনেকটা আফিং-এর মত ক্রিয়াশীল! তাতে যুক্তির প্রকাশ দেখলে ভক্তরা বিচলিত হন। কিন্তু যুক্তিহীন ভক্তিতে ভক্তির পাত্রকে ছোটই করা হয়। তাই দ্বিধাহীনভাবে বলা উচিত যে, আচার্য রমনের সাম্প্রতিক ভাষণকে সমাজ-সচেতন বিজ্ঞানীর উক্তি বললে ভুল করা হবে। সে-মানসিক গঠন তাঁর নেই। সুখের বিষয় যে, তাঁর কথা মহাকাশযাত্রার প্রয়াসকে কোন দিক দিয়েই প্রভাবিত করবে না। সে-প্রয়াস চলবে; কাজের মধ্যে তাঁর আবিষ্কৃত "রমন এফেক্টে"রই সাহায্য হয়তো নেওয়া হবে নতুন নতুন পদার্থের গঠনপ্রকৃতি জানবার জন্যে। এটা স্বাভাবিক; কেন না, একদিন তিনি সত্যই বিজ্ঞানের একটা বড় বাধাকে অপসৃত করেছিলেন, এবং তার ফল আজ সমস্ত মানুষের সাধারণ সম্পদ হয়ে গেছে। তাঁর সাম্প্রতিক "অভিশাপ"টিকে দূরে রেখে আমরা বরং এই ভারতীয় বিজ্ঞানীর কাজের প্রতিই আমাদের শ্রদ্ধার্ঘ্য নিবেদন করব।

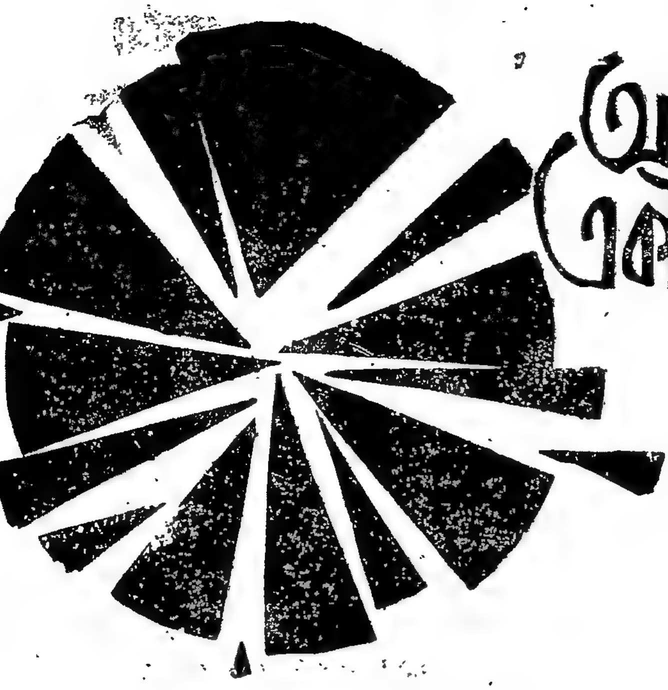

অগ্নিযুগের একটি অধ্যায়

অনন্ত সিংহ

সামগ্রিক আক্রমণের স্ট্র্যাটেজী

Controversial বা আলোচনা-সাপেক্ষ বিষয় নিয়ে আমাদের সম্পূর্ণ মতৈক্য হওয়ার পর কোন্ কোন্ শত্রুঘাঁটি আমরা আক্রমণ করবো, আর কোন্ কোন্ ঘাঁটি আক্রমণের দ্বিতীয় পর্যায়ের জন্য স্থগিত রাখতে হবে তাই স্থির করা হ'ল। সংক্ষেপে চূড়ান্তভাবে আক্রমণের স্ট্র্যাটেজী নিম্নলিখিতভাবে স্থির করা হ'ল—

(১) যুগপৎ আক্রমণের সর্বপ্রথম কাজ হবে টেলিফোন ও টেলিগ্রাফ অফিস ধ্বংস করা। তাই ব্যাপক আক্রমণের ঠিক পাঁচ মিনিট আগে এখানে আঘাত হানতে হবে। আমাদের জনবল ও অস্ত্রবলের স্বল্পতার জন্য ও অত সংক্ষিপ্ত সময়ের মধ্যে যদি টেলিগ্রাফ অফিস ধ্বংস করা নাও যায় তবু যাদের সেখানে পাঠানো হবে তাদের ওপর অলঙ্ঘনীয় নির্দেশ থাকবে যে টেলিগ্রাফ ও টেলিফোন অফিস ধ্বংস না করে তারা যেন না ফেরে। এই কাজ সম্পন্ন করবার পর তারা নির্ধারিত পথ ধরে পুলিশ-লাইনে এসে আমাদের সঙ্গে যোগ দেবে। ইতিমধ্যে আমরা পুলিশ-লাইন অধিকার করতে পারলাম কিনা তা' তারা আমাদের পরস্পরের মধ্যে সংকেত বিনিময়ের মাধ্যমে জেনে নেবে। সেইজন্য বিশেষ ধরণের বিশেষ বিশেষ স্লোগান, মোটরের হর্ন ও লাইটের সংকেত প্রভৃতি আগে থেকেই স্থির করে রাখা হয়েছিল।

(২) টেলিগ্রাফ ও টেলিফোন অফিস ধ্বংসের ঠিক পাঁচ মিনিট পরে পুলিশ-লাইন আক্রমণ ও দখল করার সামরিক নিয়মে আদেশ দেওয়া হয়েছিল। পুলিশ-লাইন দখল করে সেখানেই অস্থায়ী বিপ্লবী সরকারের হেডকোয়ার্টার স্থাপন করবার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল। পাহাড়ে ঘেরা পুলিশ-লাইনের স্বাভাবিক অবস্থান সামরিক অভিজ্ঞান মতে আত্মরক্ষার ব্যূহ হিসেবে খুব উপযোগী ছিল। তাই আমাদের হেডকোয়ার্টার স্থাপনের জন্য পুলিশ-লাইনই সর্বাপেক্ষা উপযুক্ত স্থান বলে নির্বাচিত হয়েছিল।

আমাদের বিবেচনায় পুলিশ-লাইনটি দখল করা সবচাইতে কঠিন কাজ বলে মনে হওয়ার প্রধান কারণ ব্যারাকে প্রায় সব সময়েই কম পক্ষে দু'শ' সশস্ত্র পুলিশ উপস্থিত থাকে। পুলিশ-লাইনে কেবল আর্মারি ও ম্যাগাজিন্ কক্ষ দুটি দখল করে নেওয়া খুব একটা সমস্যার বিষয় ছিল না। এই দুইটির সংলগ্ন একটি guard room (রক্ষীদের গৃহ) আছে। এখানে জন বারো সশস্ত্র সেপাই পাহারায় থাকবার ব্যবস্থা আছে। আকস্মিক আক্রমণের মুখে বারোজন রক্ষীকে পরাস্ত করে গার্ড রুম, আর্মারি ও ম্যাগাজিন অতি সহজে দখল করা গেলেও ব্যারাকে উপস্থিত দু'শ' সেপাই তখন কি করবে? নিশ্চিন্তে বসে থাকবে না কি প্রতি-আক্রমণ চালাবে তার স্থিরতা কি? তাই যে শত্রুঘাঁটিতে শত্রুর লোকবল অপেক্ষাকৃত অধিক থাকে এবং যেখানে আক্রমণ-কারীর লোকসংখ্যা ও অস্ত্রবল অনেক কম—সেখানে অনেক প্রয়োজনীয় বিষয় ভেবে সঠিক পন্থা নির্ধারণ করা অতি আবশ্যক।

পুলিশ-লাইন আক্রমণ ও দখল করার প্ল্যানটিকে চূড়ান্ত রূপ দেওয়ার সময় এই সব সমস্যার দিকে আমাদের বিশেষ দৃষ্টি রাখার একান্ত প্রয়োজন ছিল।

পুলিশ-লাইনে অসমান লড়াইয়ের জন্য সঠিক রণ-কৌশল প্রয়োগ না করলে পরাজয়ের সম্ভাবনা থাকে অনেক বেশি। এই ক্ষেত্রে রণ-কৌশল নির্ভর করে কতখানি ELEMENT OF SURPRISE (অতর্কিত আক্রমণের সুযোগ-সুবিধা) আমরা শত্রুর বিরুদ্ধে নিতে পারি। যদি আক্রমণ ও সশস্ত্র রক্ষীদের মুহূর্তে পরাস্ত করা সম্ভব হয় তবে প্রথম চোটেই দশ ভাগের নয় ভাগ জিত হবে আমাদের। এই আকস্মিক আক্রমণ ও জয় ব্যারাকের সেপাইদের ভীত-ত্রস্ত করবে—তাদের সামরিক বল নৈতিক বল বিনষ্ট করবে তাতে আমাদের সন্দেহ ছিল না। তাই এই সামরিক দৃষ্টিভঙ্গীর ওপর নির্ভর করে' আমরা পুলিশ-লাইন আক্রমণের প্ল্যান করি।

এইরূপ রণ-কৌশলের দিকে লক্ষ্য রেখে পুলিশ-লাইন দখল করার জন্য ঝটিকাবেগে অতর্কিত আক্রমণের যতদূর সম্ভব ব্যবস্থা করেছিলাম। রাতের অন্ধকারে পরোইকোরা ডাকাতির সময় ভীত-ত্রস্ত গ্রামবাসী মনে করেছিল মহাজনের বাড়ি আক্রমণ করেছে প্রায় চল্লিশজন সশস্ত্র ডাকাত যদিও আমাদের দলে লোক ছিল মাত্র সাতজন। কেবল অতর্কিত আক্রমণ করাটাই সব নয় সঙ্গে সঙ্গে অল্পসংখ্যক লোকের অবস্থান ব্যারাকের পুলিশ বাহিনীর দৃষ্টির অগোচরে রেখে যদি চারিদিক থেকে তাদের হাজার লোক আক্রমণ করেছে—এইরূপ বিভ্রান্তি সৃষ্টি করা যায়, তবেই এই ধরণের রণ-কৌশল সফল হতে পারে। সেই হেতু আমরা

ঠিক করেছিলাম আমাদের তৃতীয় সারির রিজার্ভ বিপ্লবী সৈনিক ছোট ছোট দলে বিভক্ত হয়ে পুলিশ-লাইনের বিভিন্ন দিক পূর্বাহ্ণে কৌশলের সংগে ঘিরে ফেলে সংকেতের জন্য গোপনে অপেক্ষা করবে।

প্রথম আক্রমণ সফল হওয়ার পর সংকেতধ্বনি ও বড় বড় টর্চের সাংকেতিক আলোর প্রদর্শনী অনুসারে আমাদের রিজার্ভ বাহিনী তাদের অর্ধ-চক্রাকার ব্যূহের বিভিন্ন স্থান থেকে একসংগে, রাতের অন্ধকার ও নিস্তব্ধতা বিদীর্ণ করে, জয়ধ্বনি তুলবে—এইরূপ নির্দেশ ছিল।

প্রথম আক্রমণকারী পাঁচজনের কাছে মাত্র পাঁচটি রিভলভার ছিল, বাকী দ্বিতীয় ও তৃতীয় সারির সৈনিকেরা সকলেই ছিল নিরস্ত্র। সেইজন্য আপেক্ষিকতায় বহুলাংশে স্বল্প সামরিক শক্তি নিয়ে পুলিশ-লাইন দখলের সমস্যা আমাদের এইভাবে সমাধান করতে হয়। এই দুরূহ সমস্যা সমাধানের মূলে ছিল অপরিসীম সাহস ও দুঃসাহসিক পরিকল্পনা। রণ-কৌশল সম্বন্ধে গভীর জ্ঞান ও বাস্তব ধারণা না থাকলে সামান্য কটি রিভলভার এবং চল্লিশ জনেরও কম নিরস্ত্র বিপ্লবী সৈনিকের গোপন সমাবেশের ওপর নির্ভর করে পুলিশ-লাইন দখল করার কার্যকরী প্ল্যান সম্ভব হোত না।

(৩) টেলিফোন ভবন- আক্রমণ করার ঠিক পাঁচ মিনিট পর পুলিশ-লাইন যে সময়টিতে আক্রমণ করার কথা, আমাদের সামরিক পরিষদের নির্দেশ ছিল যে A.F.I. Armoury (ভারতের অক্‌জিলারী ফোর্স আর্মারি)-ও ঠিক সেই সময় দখল করতে হবে।

এই আর্মারি পাহারা দেওয়ার জন্য আটজন দীর্ঘকায় বলিষ্ঠ পাঠান মিলিটারী সেপাই ম্যাগাজিন রাইফেল নিয়ে রক্ষীগৃহে মোতায়েন থাকার ব্যবস্থা ছিল। তারা সন্ধ্যে থেকে পালা করে সংগীন-আঁটা রাইফেল নিয়ে পাহারা দিত। এই আর্মারির ভার ন্যস্ত ছিল একজন সার্জেন্ট মেজরের ওপর। তাঁর কোয়ার্টারটি এই আর্মারির গা-ঘেঁষা একটি প্রাইভেট রাস্তার ঠিক উল্টো দিকে অবস্থিত।

যত বড় দেখতে ও বলিষ্ঠ পাঠান সৈন্য পাহারায় নিযুক্ত থাকুক না কেন বা তাদের আটজনের হাতে ম্যাগাজিন রাইফেল শোভাবর্ধন করুক না কেন, অতর্কিত আক্রমণের রণ-কৌশল ঠিক ঠিক প্রয়োগ করা গেলে এক নিমেষেই যে তাদের পরাস্ত করা সম্ভব সে সম্বন্ধে আমরা একেবারে নিঃসন্দেহ ছিলাম। A.F.I. আর্মারি আক্রমণ ও দখল করাটা আমরা পুলিশ-লাইন অধিকার করার চাইতে অপেক্ষাকৃত সহজসাধ্য মনে করেছিলাম। এর বিশেষ কারণ আগেই উল্লেখ করেছি যে পুলিশ-লাইনে প্রায় সময়েই দু'শ' সশস্ত্র পুলিশ ব্যারাকে হাজির থাকে। A.F.I. আর্মারি আক্রমণ ও অধিকারের ব্যাপারে এই বিশেষ সমস্যার সম্মুখীন হওয়ার কোন কারণ বা আশঙ্কা ছিল না।

তবে A.F.I. আর্মারিটিকে সম্পূর্ণ করায়ত্ত করার ব্যাপারে একটি অতি জটিল ও মারাত্মক সমস্যা ছিল। এই সমস্যার যথার্থ সমাধানের ওপর নির্ভর করছিল সান্ত্রীদের পরাস্ত করার পরও আমাদের এই স্থানের জয় সুনিশ্চিত হবে কি না?

এই আর্মারিতে দুটো খুব শক্তিশালী ভিন্ন-ধরণের লোহার দরজা ছিল। মোকদ্দমার ছাপানো জাজমেন্ট কপি থেকে এই আর্মারির দরজার বিবরণ দিচ্ছি—

"The only entrance to the armoury was in the western wall of the building, facing the western verandha and was protected by double doors, an outer door of solid iron, the two halves of which opened outwards, and inner grille, the two halves of which opened inwards into the room (Vide plans Exs. 18 and 19 and photographs. Exs. XXIII and XXIV). (পশ্চিম বারান্দার দিকে মুখ করে পাকা কোঠাটির পশ্চিম দেওয়াল দিয়ে আর্মারিতে একটিমাত্র প্রবেশ পথ ডবল দরজায় সুরক্ষিত ছিল—দুটি দরজার একটি নিরেট লোহায় গড়া যার উভয় কপাট বহির্মুখে, আর লোহার গ্রীলে তৈরি, অপরটির দুটি পাল্লাই ভেতর দিকে খোলার ব্যবস্থা ছিল)।

A.F.I. আর্মারিটি অধিকার করার পরে যদি এইরূপ দুটি মজবুত লোহার দরজা খুলতে বা ভাঙতে না পারি তবে প্রায় শ' পাঁচেক দশ শট্‌ওয়ালা ম্যাগাজিন রাইফেল, লুইস মেসিনগান ও তাদের উপযোগী কার্তুজ আমরা নিতে পারব না। আর্মারির চাবি কোথায় বা কার কাছে থাকে তা' সঠিক জানা যায় নি। তবে সহজেই অনুমান করা যাচ্ছিল যে চাবি নিশ্চয়ই সার্জেন্ট মেজরের জিম্মায় থাকবে। এই A.F.I. আর্মারির ইন্‌-চার্জ (জিম্মাদার), সার্জেন্ট মেজরের কোয়ার্টারটি অস্ত্রাগার গৃহের সংলগ্ন ছিল। তবু জিম্মাদারের কাছ থেকে চাবিটা আমরা যে সংগ্রহ করতে পারবই তার নিশ্চয়তা কি? তাই দুটো লৌহ-কপাট ভাঙবার জন্য বিভিন্ন বিকল্প ব্যবস্থার আয়োজন আমাদের রাখতে হয়েছিল। যদি প্রথম উপায়ে সফল না হই তবে পর পর নানাভাবে চেষ্টা করেও যাতে দরজা দুটি সুনিশ্চিতভাবে ভাঙতে পারি তার জন্য আমাদের রীতিমত গবেষণা করতে হয়েছে।

বাইরের দিকে যে নিরেট লোহার দরজাটা খোলা হোত সেই দরজার কপাটের ডালার ওপর ধরে খোলবার জন্য একটি মজবুত হাতল ছিল। মোটরগাড়ি ও দরজার এই হাতলের সংগে একটি দড়ির দুটি মাথা বাঁধা হবে এবং মোটরগাড়ি সম্মুখ দিকে চালিয়ে দড়িটি টান মারলেই আর্মারির দরজা ভাঙবে ও দুটি লৌহকপাটই সামনের দিকে উন্মুক্ত হতে বাধ্য। এই অভিনব পন্থার চিন্তা কার মাথা-প্রসূত তা' জানবার কৌতূহল প্রকাশ করেছেন আমাদের বন্ধুবান্ধব ও বিশেষ করে আমাদের বিচারের সময় উকিল-ব্যারিস্টাররা সবার আগে। বন্ধুবর গণেশ A.F.I. আর্মারির দরজা ভাঙার এইরূপ কৌশলের প্রয়োগ সম্বন্ধে চিন্তা করে। সকলেরই মনে হবে বাঃ কি চমৎকার! কি সহজ! কত সহজেই না দুর্ভেদ্য দরজাটি খোলা যাবে! কিন্তু যাঁদের ওপর সেইদিনের জয় সুনিশ্চিত করবার দায়িত্ব ছিল তারা এত সামান্যতে সন্তুষ্ট হন নি। মোটরের টানে দড়িটি যদি ছিঁড়ে যায় বা হাতলটি টানের চোটে উপড়ে আসে তবে যে আমরা আরও সমস্যায় পড়ব! তাই জাহাজ বাঁধবার শক্ত মজবুত দড়ি সদর-ঘাট জেটীর সন্নিকটে অবস্থিত ছোট্ট একটি ভাসা ফ্ল্যাটের ওপর থেকে আমাদের চুরি করতে হয়েছিল ঘটনার প্রায় দিন সাত পূর্বেই। কেবল তাই নয়, এই মস্ত বড় 'ম্যানিলা রোপটি'কে আমাদের সযত্নে লুকিয়ে আনা-নেওয়া ও রাখার ব্যবস্থা করতে হয়েছিল। দ্বিতীয় প্রশ্নের সমাধান, অর্থাৎ যদি মোটরের টানে দরজা বন্ধ অবস্থায় হাতলটি কেবল উপড়ে আসে তবে আর কি করা যায় তার জন্যেও গবেষণার প্রয়োজন ছিল। সে বিষয়েও গণেশ চিন্তা করে বলেছিল যে মস্ত বড় চাবি ব্যবহার করার জন্য আর্মারির নিরেট লোহার দরজায় যে ছিদ্র আছে সেই ছিদ্র দিয়ে পিক্‌রিক্‌ পাউডার (বিস্ফোরক দ্রব্য) একটু একটু করে ভরে দেব এবং টাইম ফিউজ (ধীরে ধীরে জ্বলবার জন্য বারুদের পলতে) সংযুক্ত করে বিস্ফোরণের ব্যবস্থা করা হবে। আমাদের এইরূপ বিস্ফোরণের প্রতিক্রিয়া যে কি ও কতখানি হবে তার সঠিক ধারণা থাকা সম্ভব ছিল না, কারণ এই বাস্তব অভিজ্ঞতার সুযোগ আমাদের আগে কখনও ঘটে নি। সেইজন্য আমাদের

ভাবনারও অন্ত ছিল না—যদি এই বিস্ফোরণের কৌশলও ব্যর্থ হয়! Necessity is the mother of invention! প্রয়োজনের তাগিদই নতুন আবিষ্কারের জননী! তাই শেষ পর্যন্ত ভাবা হয়েছিল এবং ভেবে ব্যবস্থা করা হয় যে, আর্মারির ছাদ ভেঙে ঘরে ঢুকবো। সেইজন্য রাস্তা খোঁড়ার গাঁইতি ও মই প্রভৃতির ব্যবস্থা রেখেছিলাম। ছাদ ভেঙে আর্মারি ঘরে ঢুকলে আমরা ভেতরের দিকের মোটা লোহার শিক্ দিয়ে তৈরি দরজাটা হাতের কাছে পাব। আমাদের পূর্ব অভিজ্ঞতা ছিল বলে ভেতরকার দরজার তালা খোলা বা ভাঙা, একটা কোন সমস্যা বলেই মনে হয় নি। ভেতরের দরজাটি খোলার পর রেল-লাইনের তলায় পাতা কাঠের 'স্লিপার' একটিকে তিনটি দড়িতে ঝুলিয়ে নিয়ে ছয়জন লোক সেটিকে দোল দিয়ে আঘাত করবে নিরেট লোহার দরজার কপাটের ওপর। ভারী স্লিপারের প্রচণ্ড আঘাতে নিরেট লোহ-কপাট দুটিকে শেষ পর্যন্ত আমাদের কাছে আত্মসমর্পণ করতেই হবে—এতে আমাদের কোন সন্দেহ ছিল না।

বিভিন্ন সমস্যা ও সে-সবের সমাধান-কল্পে যা' আমাদের করতে হয়েছিল তার খুব সামান্য নমুনাই এখানে দিলাম। সামগ্রিক আক্রমণের চূড়ান্ত স্ট্র্যাটেজী বাস্তবে যখন প্রয়োগ করতে গেছি তখন সমস্যার পর সমস্যা দেখা দিয়েছে। সমস্যার সমাধানের পথ আমাদের খুঁজতে হয়েছে—কার্যকরী উপায় বা পন্থা আমাদের নির্ধারণ করতে হয়েছে। এটাও মনে রাখা প্রয়োজন যে, কোন সমাধানই বাস্তব সীমিত ক্ষমতার বাইরে ভাবা ও করা সম্ভব হয় নি। তাই সমস্যার সমাধানে ত্রুটি থাকলেও বিশ্লেষণ করে বুঝতে হবে যে আমাদের সীমাবদ্ধ ক্ষমতার মধ্যে তারচেয়ে বেশি আরও কিছু সম্ভব ছিল কি না!

(৪) টেলিগ্রাফ ও টেলিফোন অফিস একই গৃহের দুই বিভিন্ন পার্শ্বে অবস্থিত ছিল। আমাদের প্রধান লক্ষ্য ছিল টেলিফোন এক্সচেঞ্জটি সম্পূর্ণ ধ্বংস করা। তার বিশদ, বিস্তারিত ও নিখুঁত ব্যবস্থা আমরা করি। লোকবল ও অস্ত্রবলের অভাবে একই সঙ্গে টেলিগ্রাফ অফিসটিও ধ্বংস করতে আর একটি সজ্জিত দল আমরা নিযুক্ত করতে পারি নি। সেইজন্য আমাদের নির্দেশ ছিল যে, টেলিফোন এক্সচেঞ্জটি ধ্বংস করার পর যদি সময় ও সুযোগ থাকে, তবে তারাই আবার আক্রমণ করবে টেলিগ্রাফ অফিসটি। টেলিফোন অফিস আক্রমণের জন্য আমরা পাঠাতে পারি মাত্র ছয়জনকে। সকলকে অস্ত্র দিতে পারি নি, কেবলমাত্র তিনটি রিভলভার দিতে পেরেছিলাম। এই অবস্থায় আমরা ধরে নিয়েছিলাম যে, টেলিগ্রাফ অফিস ধ্বংস না করার সম্ভাবনাই বেশি। আমাদের নির্দেশও ছিল যে টেলিগ্রাফ অফিস ধ্বংস করা বা না করা তাদের option (স্বেচ্ছাধীন); সুযোগ ও সুবিধে বুঝে তারা তা' করবে।

অবস্থা ও ক্ষমতানুযায়ী টেলিগ্রাফ্ অফিস আক্রমণের জন্য এইরূপ optional ব্যবস্থা করতে বাধ্য হই। কিন্তু টেলিফোন অফিস ধ্বংস করে শহরের আভ্যন্তরীণ সংবাদ ব্যবস্থা ছিন্ন করা যেমন একান্ত প্রয়োজনীয় ছিল, তেমনি আবার চট্টগ্রাম শহরকে তারবার্তা বিনিময়ের সুযোগ থেকে বঞ্চিত করে বহির্জগৎ থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন করাও অপরিহার্য বলে মনে করি। তাই টেলিগ্রাফ অফিস যদি ধ্বংস নাও করি তবু আমরা অন্তত চারটি স্থানে টেলিগ্রাফের তার ছিন্ন করবার ব্যবস্থা করবো। সেইজন্য শহরের দুটি নির্জন স্থানে আমরা দু'জন করে দুটি ছোট্ট দল মজুত করি টেলিগ্রাফের তার কেটে দেবার জন্য। তাদের সঙ্গে টেলিগ্রাফের তার কাটবার উপযুক্ত যন্ত্রপাতি দেওয়া হয়; কিন্তু তাদের আত্মরক্ষার জন্য কোন পিস্তল বা বন্দুক দেওয়া সম্ভব হয় নি। তাদের আত্মরক্ষার অস্ত্রের অভাব পূরণ করা হ'ল নির্জন স্থান দুটি বেছে নিয়ে। তাদের ওপর নির্দেশ ছিল যে, শহরের মধ্যে প্রধান প্রধান শত্রু ঘাঁটিগুলি আমাদের দখলে আসবার পনের মিনিট পরে তারা টেলিগ্রাফ তার কেটে দেবে।

শহরের বাইরে যে দুটি স্থানে রেল লাইন ওপড়ে ফেলে ট্রেন লাইনচ্যুত করে সৈন্যবাহী ট্রেনের গতিরোধ করবার ব্যবস্থা হয়েছিল সেই দুটি স্থানে টেলিগ্রাফ তার কেটে দেওয়ারও নির্দেশ ছিল। রেল লাইনচ্যুত করা ও টেলিগ্রাফ তার কাটার জন্য উপযোগী যন্ত্রপাতি তাদের সঙ্গে দেওয়া হয়েছিল। যদিও রেল লাইন ও টেলিগ্রাফ তার বিনষ্ট করবার জন্য আমরা তাদের বিভিন্ন ধরণের যন্ত্রপাতি সরবরাহ করি তবু তাদের আত্মরক্ষার জন্য আমরা যে পিস্তল বা বন্দুক বরাদ্দ করতে পারি নি তার একমাত্র কারণ হচ্ছে, আমাদের মূল অস্ত্রভাণ্ডারে অস্ত্রের স্বল্পতা। মুখ্য ঘাঁটিগুলি আক্রমণের জন্য অস্ত্র বরাদ্দ করবার পর এই গ্রুপ দুটির সঙ্গে অতিরিক্ত অস্ত্র দেওয়ার মত আমাদের সংগতি ছিল না।

আবার সেই একই কথা—যখন আত্মরক্ষার ব্যবস্থার অভাব ছিল তখন ধ্বংস কার্যের জন্য আমাদের এমন স্থান বেছে নিতে হ'ল যেন শত্রুপক্ষীয় কোন আক্রমণের সম্ভাবনা না থাকে। দেশ জুড়ে টেলিগ্রাফ তার ও রেল লাইন বিস্তৃত রয়েছে। সেই ক্ষেত্রে বিপ্লবী সৈনিকদের সবাইকে অস্ত্রে সজ্জিত করে আত্মরক্ষার সুব্যবস্থা করতে পারছি না বলে টেলিগ্রাফ ও রেল লাইন ধ্বংস করা হবে না বা করা যাবে না—এইরূপ পরাজিত মনোভাব থেকে আমরা মুক্ত ছিলাম। সীমিত শক্তি নিয়ে চট্টগ্রাম শহর দখল করে সাময়িক বিপ্লবী সরকার প্রতিষ্ঠা করবার সামগ্রিক প্ল্যান রূপায়িত করবার জন্য আমরা বদ্ধপরিকর ছিলাম। তাই অপর্যাপ্ত অস্ত্র সংগ্রহ না হওয়া পর্যন্ত সামগ্রিক প্ল্যানটিকে কার্যকরী করবার ব্যাপারে নিষ্ক্রিয় থাকব না কি প্রধান প্রধান সব ঘাঁটি আক্রমণের জন্য মাত্র "পর্যাপ্ত অস্ত্র" সংগ্রহ করা হলেই বিলম্ব না করে আমরা সাহসিকতার সঙ্গে আক্রমণের নির্দেশ দেব—এই প্রশ্ন নিয়ে আমাদের হেড কোয়ার্টারে আলোচনা হয় এবং তাতে আমরা বিবেচনা ও বিশ্লেষণ করে দেখেছি যে, নিষ্ক্রিয়তা বা বিলম্ব করা, কোনটাই আমাদের পক্ষে সম্ভব ছিল

সুশীতল আরামদায়ক হাওয়া পরিবেশনে সুপার ডিলাক্স
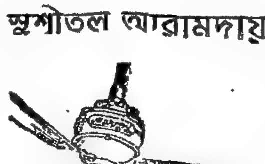
মার্কনী ফ্যান
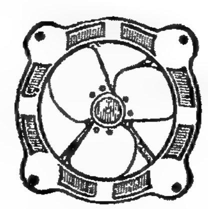
মার্কনী ইলেকট্রিক করপো
(প্রাঃ) লিঃ
১১৭, কেশব সেন ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৯
ফোন : ৩৫-৩০৪৮
শনিবার অর্দ্ধ দিবস ও
রবিবার ব্যতীত প্রত্যহ সকাল ১০টা
হইতে রাত্রি ৭টা পর্যন্ত খোলা থাকে
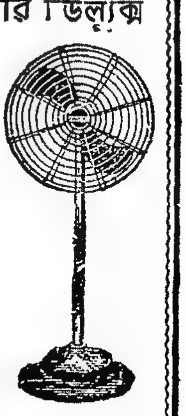

ন্য। তাই সামগ্রিকভাবে শহর দখল করবার মূল রণ-নীতির প্রয়োজনে ছোট ছোট স্থানে আক্রমণ চালানোর জন্য বিপ্লবী সৈন্যদের যদি অস্ত্র দিয়ে সজ্জিত নাও করে থাকি তবু আমরা সেই সব ছোট ছোট কেন্দ্রে সফল হওয়ার জন্য বাস্তবতার ভিত্তিতে যা' করা প্রয়োজন তা' করেছিলাম। বিকল্প ব্যবস্থানুযায়ী চারটি বিভিন্ন স্থানে টেলিগ্রাফ লাইন ছিন্ন করার জন্য আমরা দুটি ছোট ছোট দল গঠন করি। প্রত্যেকটিতে দু'জন করে নিয়োজিত করি এবং এই দু'টি দল শহরের দু'টি স্থানে টেলিগ্রাফ তার কাটবে—এইরূপ নির্দেশ দিই। আর রেল লাইনের ধারে দুটি স্থান বেছে নিই যেখানে চারজন করে দু'টি বড় দল লাইন ধ্বংস করতে পাঠিয়েছিলাম।

(৫) আমাদের সংগৃহীত তথ্যের ওপর ভিত্তি করে দু'টি স্থানে রেল লাইন উপড়ে ফেলবার ব্যবস্থা করা হয়। এই কাজের জন্য ধুম ও লাঙলকোট স্টেশনের সন্নিকটস্থ স্থান দু'টি খুব উপযোগী বলে মনে হয়েছিল। চারজন করে দু'টি দলে আটজনকে এই কাজে নিযুক্ত করা হয়। তাদের সঙ্গে রেল লাইন উপড়াবার জন্য মস্ত বড় ও ভারী ভারী লোহার যন্ত্রপাতি ছিল। সেগুলিকে গোপনে যোগাড় করতে হয়েছিল। Shalimar (শালিমার) কোম্পানীর লোহার কারখানা থেকে গোপনে তৈরি করিয়ে আনতে হয় রেল-লাইনের সঙ্গে আঁটা বড় পেরেক তোলবার জন্য 'ক্রোবার' (Crowbar)। এইসব যন্ত্রপাতি নিরাপদ স্থানে রাখা, এবং সাধারণের দৃষ্টির অগোচরে ধুম ও লাঙলকোট স্টেশনের কাছে গোপন আস্তানায় নিয়ে যাওয়া খুব সহজ ছিল না। পুলিশের কথা ছেড়েই দিলাম—যদি সাধারণ লোকের চোখেও Crowbar-টি পড়ে তবে তারা সেই নিয়ে যে বিভ্রাট ঘটাবে না তার কোন স্থিরতা ছিল না। সেইজন্য আমরা সব সময়ে সজাগ ও সাবধান ছিলাম। তবু আমাদের চিন্তার অবধি ছিল না—যদি কোন কারণে আমাদের কোন একটি দলও আগে ধরা পড়ে যায়! তাদের পাঠাতে হয়েছিল একদিন আগে—অর্থাৎ ১৭ই তারিখে। আমাদের আক্রমণের দিন এবং সময় স্থির হয়েছিল ১৮ই এপ্রিল সন্ধ্যা আটটার সময়। একদিন আগে যদি তারা কেউ ধরা পড়ত তাহলে তাদের মধ্যে কোন বিশ্বাসঘাতক না থাকলেও রেল ও টেলিগ্রাফ লাইন ধ্বংস করার মারাত্মক যন্ত্রপাতিই যথেষ্ট পরিমাণে সাক্ষ্য দিত আমাদের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে। অবশ্য আমরা সবরকম সাবধানতাই অবলম্বন করেছিলাম; যেন তারা কোনরকমে ধরা না পড়ে। আর যদি ধরা পড়ে তবে তাদের মধ্যে কেউ স্বীকারোক্তি করলেও যেন আমাদের আসল উদ্দেশ্য বা সামগ্রিক প্ল্যানের বিন্দুবিসর্গও না বলতে পারে, তার জন্য সব রকমে তাদের কাছে গোপনীয়তা রক্ষা করেছি; খুব চালাকি করে আমাদের প্ল্যান সম্বন্ধে তাদের মনে নানারকম ভুল ধারণার সৃষ্টি করেছি।

(৬) গ্রামে ও শহরের বিভিন্ন স্থানে আমাদের তিনরকম প্রচারপত্র ('উদ্দেশ্য ঘোষণা': 'যুবকদের প্রতি আহ্বান'; 'জয়ের পরে শহরবাসীর প্রতি নির্দেশ') বিলি করবার দায়িত্ব অর্ধেন্দু দস্তিদার, শৈলেশ্বর চক্রবর্তী, দীনেশ চক্রবর্তী ও সুখেন্দু দস্তিদারের ওপর দেওয়া হয়েছিল। তাদের ওপর আরও নির্দেশ ছিল যে তারা যেন বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে ও প্রতিভাসম্পন্ন ব্যক্তিদের কাছে ঘোষণাপত্র ডাকে পাঠায়। যদিও এই কাজ অপেক্ষাকৃত সহজ, তবু যাদের ওপর দায়িত্ব অর্পণ করা হয়েছিল তাদের সচেতন করে দিই যেন এই সহজ কাজের গুরুত্ব সম্বন্ধে তারা উদাসীন না থাকে। এই প্রচারপত্রের কোন একটিও যদি সামগ্রিক আক্রমণের পূর্বাহ্নে ধরা পড়ত তবে যে আমাদের সমস্ত আয়োজন ব্যর্থতায় পর্যবসিত হোত তা'তে কোন সন্দেহ ছিল না। তাই কাজটি সহজ হলেও তার গুরুত্ব বা প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে সঠিক ধারণা আমাদের ছিল এবং সেইরূপ গুরুত্ব অনুযায়ী বিপ্লবী সৈনিকদের মানসিক প্রস্তুতির বিষয়ে যথেষ্ট নজর দিই। বে-আইনী প্রচারপত্র বিলি করার ব্যাপারে কেবল মানসিক প্রস্তুতি থাকলেই যথেষ্ট হয় বলে আমরা মনে করি নি। ধরা না পড়ে পুলিশ ও শত্রুপক্ষীয় লোকেদের বোকা বানিয়ে বে-আইনী প্রচারপত্র বিলি করার পদ্ধতি ও উপায় সম্বন্ধে বিপ্লবী সৈনিকদের শিক্ষা দেওয়া হয়েছিল। আমাদের সামগ্রিক প্ল্যানের মধ্যে ঘোষণাপত্র প্রভৃতি বিলি করার পরিকল্পনা অপরিহার্যভাবে অঙ্গীভূত ছিল।

(৭) প্রধান প্রধান শত্রুঘাঁটির ওপর আক্রমণ চালাবার পূর্ব মুহূর্তে আমাদের গণতন্ত্র-বাহিনীর দ্রুত সমাবেশের প্রয়োজন ছিল। সেইরূপ দ্রুত সমাবেশ ও তাদের বিভিন্ন ঘাঁটির দিকে দ্রুত পরিচালিত করার জন্য মোটর গাড়ির ব্যবস্থা রাখা একান্ত আবশ্যক। আমাদের বিশেষ লক্ষ্য ছিল যত কম জোর-জবরদস্তি করে এবং যত কম সংখ্যক মোটর গাড়ি আমাদের কর্তৃত্বাধীনে আনতে হয় ততই ভাল। মোটর ড্রাইভারদের পরাভূত করে, তাদের হাত-পা বেঁধে অথবা অজ্ঞান করে রেখে গাড়ি নিয়ে উধাও হবার মধ্যে অনেক কিছু ঘটে যেতে পারে। ড্রাইভার প্রতি-আক্রমণ করতে পারে, চীৎকার করতে পারে, কেউ হয়ত চেঁচিয়ে প্রতিবেশীর দৃষ্টি আকর্ষণ করবে, কোন ড্রাইভারকে যেখানে বেঁধে রেখে আসা হবে সেখানে হঠাৎ কেউ গিয়ে উপস্থিত হতে পারে, কোন ড্রাইভার হয়ত জ্ঞান ফিরে পেয়ে অনর্থ ঘটাবে অথবা আমাদের অনভিজ্ঞতার জন্য ক্লোরফরম করার সময় ড্রাইভারের প্রাণ নাশের আশঙ্কা থাকতে পারে, ইত্যাদি, ইত্যাদি, বহু সমস্যা রয়েছে: এর কোনটিকেই উপেক্ষা করা যায় না। আক্রমণ আরম্ভ করার অন্তত তিন ঘণ্টা আগে ড্রাইভারদের বলপূর্বক বেঁধে রেখে মোটর গাড়ি যোগাড় করার কথা কারণ আমাদের 'সাধারণভাবে পরীক্ষা' (general check up) করে দেখার প্রয়োজন ছিল যে সব ক'টি মোটর গাড়ি আমাদের কর্তৃত্বাধীনে এসে গেছে এবং সেগুলি সাজসরঞ্জাম, অস্ত্রশস্ত্র ও বিপ্লবী গণতন্ত্র-বাহিনীর সৈনিকদের যথা সময়ে যথা স্থানে পৌঁছে দেবার কাজে লেগে গেছে। এই কারণে আক্রমণের তিন ঘণ্টা পূর্বে ড্রাইভারদের কাবু করে মোটর গাড়িগুলি বে-আইনীভাবে আমাদের দখলে রাখার সময় যদি পুলিশ সন্ধান পেয়ে যায় তবে সমস্ত প্ল্যানটির অপঘাত-মৃত্যু হবে! সেইজন্য যদিও কোন একজন ড্রাইভারকে কাবু করে তার মোটর গাড়ি নিয়ে আসা খুব একটা কঠিন কাজ নয়, তবু যেখানে অনিশ্চয়তা ও আশঙ্কার অনেক কারণ বর্তমান সেখানে এইরূপ সামান্য কাজকেও অবহেলা করা যায় না। তাই বলপূর্বক ড্রাইভারকে বন্দী করে মোটর গাড়ি নিজের আয়ত্তে আনবার জন্য আমরা ভার দিয়েছিলাম মাত্র দু'টি দলকে। নির্মলদা ও লোকনাথের দল একটি মোটর গাড়ি দখল করবে ও অপরটি অধিকার করার ভার আমার ও গণেশের ওপর ন্যস্ত হয়েছিল। ইউরোপীয়ান-ক্লাব গৃহ আক্রমণ করার জন্য যে ছয়জন সশস্ত্র বিপ্লবী যুবককে নিযুক্ত করা হয়েছিল তাদের ওপর মোটর গাড়ি দখল করার ভার দেওয়া গেলে, তা'রা যে অতি সহজে তা' করতে সমর্থ হোত তা'তে আমাদের কোন সন্দেহ ছিল না। তবু নীতিগত কারণে আমরা মনে করেছিলাম যে ঝুঁকি যত কম নেওয়া যায় ততই ভাল। তাই ইউরোপীয়ান-ক্লাব আক্রমণের জন্য যে ছয়জনকে নিযুক্ত করেছিলাম তা'দের অস্ত্র-শস্ত্র (বন্দুক, খড়্গ, কুড়ুল, হাত-বোমা, প্রভৃতি) সবই আমাদের বাড়ির মোটর গাড়ি—বেবি-অস্টিনে করে নিয়ে যাওয়ার ব্যবস্থা হয়েছিল। তারপর টেলিগ্রাফ ও টেলিফোন অফিস

আক্রমণ করবার দলটির জন্য আরও একটি মোটর গাড়ি অতি আবশ্যক ছিল। এই গাড়িটি জোর-জবরদস্তি করে দখল করতে আমরা কোনমতেই চাই নি। তাই কিস্তি করে (Higher Purchase) একটি নতুন 'সেভ্রোলে টুরার' গাড়ি কিনি। অম্বিকাদার নামে গাড়িটি কেনা হয়। আজকের ছেলে-মেয়েদের মনে হবে Higher Purchaseএ সেভ্রোলে গাড়ি কিনলেও আমাদের বিশ-পঁচিশ হাজার টাকা লেগেছিল। কিন্তু সেই সময় মোটর গাড়ি খুব সস্তা দামে বিক্রি হোত। সেভ্রোলে টুরারের দামও তখন তিন হাজারের কম ছিল। বারো শ' তেরো শ' টাকা প্রথম এককালীন দিয়ে কিস্তিতে গাড়িটি কেনা হল। ১৮ই এপ্রিল সকাল-বেলা গাড়িটি কিনেছি আর রাত্রে সেইটি আমরা ব্যবহার করি টেলিগ্রাফ অফিস আক্রমণ করবার সময়। এ ছাড়া আমরা দু'টি গাড়ি Reserve এ রেখেছিলাম। একটি ছিল মাখনদের বাড়ির গাড়ি—এসেক্স (Essex), আর একটি ডজ্ গাড়ি—যেটি হেরম্ব বল ট্যাক্সি খাটাত। যদি কোন কারণে এই দু'টি গাড়ির একটিও অচল অবস্থায় থাকে তবে অন্তত অপরটি আমরা সব সময় পাওয়ার আশা করেছি। এইভাবে মোটর গাড়ির সামগ্রিক ব্যবস্থা আমরা করি। তবু শেষ মুহূর্তে মোটর গাড়ির বিভ্রাটের জন্য আমাদের আক্রমণের সময় দু' ঘণ্টা পিছিয়ে দিতে হয়েছিল। যথাস্থানে এই গুরুতর পরিস্থিতি সম্বন্ধে বলবো।

(৮) আর একটি অত্যন্ত জরুরী ব্যবস্থা আমাদের করতে হয়েছিল। গণেশ ঘোষ আমাদের হেড কোয়ার্টারে সিগ্ন্যাল ব্যবস্থা করার জন্য এক প্রস্তাব উত্থাপন করল। পরস্পরের সঙ্গে যোগাযোগ রাখবার জন্য এবং রাত্রিবেলা অন্ধকারে আমরা পরস্পরকে চিনতে ভুল করে গুলী বিনিময় না করি—সেই জন্যে গণেশ বল্‌ল যে আমাদের সবার মিলিটারী পোষাকের বুকে পিঠে, দূর থেকে চোখে পড়ার মত, দু'টো ব্যাজ (Badge) লাগাতে হবে। ভেল্‌-ভেটের ওপর জরী দিয়ে এই ব্যাজের ডিজাইন তৈরি করা হল। তা'তে দু'টো জাতীয়-পতাকাও বসান হয়। আমার মাকে গিয়ে বললাম—"আমরা ভলান্টিয়ার-দের নিয়ে সীতাকুণ্ডের মেলায় যাত্রীদের সাহায্যে যাব। মা, তুমি খুব তাড়াতাড়ি এই ব্যাজগুলি সেলাইয়ের কলে তৈরি করে দাও।" গণেশ আমার সঙ্গে ছিল, সেও বল্‌ল—"মাসিমা, আপনার কষ্ট হবে—তবু এগুলি তৈরি করে না দিলেই নয়।...........।" বেচারী মা! বুঝতেই পারলেন না আমাদের মূল উদ্দেশ্যটি কি? মা. সময়ের আগেই, তাড়াতাড়ি সব তৈরি করে দিলেন। যতদূর মনে পড়ে ১৬০টি ব্যাজ তৈরি করার জন্য মা'র কাজে ভেল্‌ভেট, জরি প্রভৃতি দিয়ে-ছিলাম। যখন ব্যাজগুলি তৈরি হল তখন দেখতে কী অপূর্ব লাগছিল! আমাদের মামলার ছাপানো জাজ্‌মেন্ট কপির ৪৮ পৃষ্ঠায় লেখা আছে—

"(8) Badges and parts of Uniform—(a) A black velvet badge with silver embroidery and two small Swaraj flags (Ex, DCXLVIII)." এখানে বলা হয়েছে—রুপোলি জরিতে কাজ করা এবং দু'টো স্বরাজ পতাকা যুক্ত ভেল্‌ভেট ব্যাজ পোষাকের অঙ্গীভূত ছিল।

সেই একই জাজ্‌মেন্টের ৫৯ পৃষ্ঠায় পাওয়া যাবে—

"(I) Uniform—

(a) A khaki military tunic with brass buttons, blue and silver tabs on the collar and *black velvet badges*. with *silver embroidery* and *small Swaraj tri-colour ribbons on them, on the chest and back.* ...."

মামলার রায়ে দ্বিতীয়বারে উল্লেখ আছে যে ঐরূপ পূর্ববর্ণিত ভেল্‌ভেট ব্যাজ খাকি পোষাকের বুকে ও পিঠে আঁটা ছিল। আমরা পরীক্ষা করে দেখে-ছিলাম যে দূর থেকে এই ব্যাজগুলো জ্বল্‌জ্বল্ করে দৃষ্টি আকর্ষণ করত।

(৯) আমরা শত্রুপক্ষের খাকি পোষাকের অনুকরণে uniform ব্যবহার করা সাব্যস্ত করেছিলাম। সেইজন্য প্রথম থেকেই আমরা বৃটিশ সৈন্যের অনুকরণে স্বেচ্ছাসেবক-বাহিনী গঠন করি। আমা-দের গণতন্ত্র-বাহিনীর জন্য খাকি পোষাক তৈরি করা হয় এবং রণ-কৌশলের জন্য সেইরূপ সামরিক পোষাকে আক্রমণ চালাব বলে স্থির করি।

খাকি পোষাক পরে আমরা শহরে ঘোরাফেরা করতাম এবং কুচকাওয়াজের সময় তা' ব্যবহার করতাম। এই কারণে, আক্রমণের আগে আমাদের সেইরূপ পোষাকে যাতায়াত করতে দেখলে কেউ সন্দেহ করবে না। দ্বিতীয়ত কৌশলের দিক থেকে ভেবেছিলাম যে খাকি পোষাকে আর্মারি আক্রমণ করতে গেলে সান্ত্রীরা প্রথমে আমাদের সন্দেহ করতে পারবে না—তা'দের ওপরওয়ালা তদারক করতে গেছে বলে ভাবাটা স্বাভাবিক। প্রত্যেকের পদ (Rank) অনুযায়ী খাকি সামরিক পোষাক তৈরি হল। এই ব্যাপারে আমা-দের গোপনীয়তা অবলম্বনের প্রয়োজন ছিল না কারণ আমরা মিলিটারী পোষাক ব্যবহারে অভ্যস্ত ছিলাম এবং প্রায় দু' বছর আমরা স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী পরি-চালনা করেছি সকলের চোখের সামনে—পুলিশের নাকের ডগায়। এই সুযোগ আমরা ১৯৩০ সালে, ১৮ই এপ্রিল, পূর্ণমাত্রায় গ্রহণ করি।

(১০) অন্যান্য আরো বহু ব্যবস্থার মধ্যে দু'টি জরুরী অবস্থার জন্য আমরা প্রত্যেকের জন্য water-bottle (সঙ্গে নিয়ে চলার জন্য জল-পাত্র) এবং প্রত্যেকের আগ্নেয়াস্ত্র চালু রাখার জন্য Lubricating oil-can (তৈল-পাত্র)-এর ব্যবস্থা করি। শেষপর্যন্ত আমরা সবাইকে water-bottle দিতে পারি নি; কারণ পুলিশ আমাদের টিনের তৈরি জল-পাত্রগুলি একটি খালি বাড়ি থেকে নিয়ে যায়। পুলিশ বলেছিল—'water-bottle-গুলি আমাদের জিনিস'—এইরূপ একটি লিখিত রসিদ দিয়ে নিয়ে আসতে। আমরা তাদের সুপরামর্শকে খুব ভাল-ভাবে নিতে পারি নি। সেই জন্য জল-পাত্রগুলি আর আনা হল না। একেবারে শেষ সময় বলে তৈরি করবার সুযোগও ছিল না।

Lubricating oil-can, প্রত্যেকের সঙ্গে দেওয়ার জন্য; যোগাড় করা হল। নাগরখানা পাহাড়ে যুদ্ধের সময় নিদারুণ অভিজ্ঞতা লাভ করেছিলাম। দশ-বারোবার গুলী ছোঁড়ার পর রিলভারের চেম্বার একেবারে আঠা আঠা হয়ে যায় এবং চেম্বারে কার্তুজ ঢোকান অসম্ভব হয়ে ওঠে। এই তৈল-পাত্র জালালাবাদ পাহাড়ের যুদ্ধে অপরিহার্য বলে সবার মনে হয়ে-ছিল। পুলিশ মাস্কেট (একরকম সাধারণ বন্দুক) থেকে বার পাঁচ-ছয় গুলী ছুঁড়লেই—ব্যাস্, আর তা'তে টোটা ঢোকান যাবে না। এইরূপ অবস্থার সম্মুখীন হতে পারি মনে করে আগে থেকেই প্রত্যেকের জন্য oil-can সর-বরাহ করা হল। এই সামান্য তুচ্ছ জিনিসও যুদ্ধ-ক্ষেত্রে অতি প্রয়োজনীয় সামগ্রী। আজ মনে হচ্ছে যদি জালালা-বাদে oil-can না থাকত তবে কয়েক রাউন্ড গুলী ছোঁড়ার পর বিপ্লবীদের বন্দুক সম্পূর্ণ অকেজো হয়ে পড়ত! নাগরখানা লড়াই-এর অভিজ্ঞতার পর এই অত্যাবশ্যক oil-can-এর প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে আমাদের কখনও গাফিলতি হয় নি'।

[ক্রমশঃ]

মঞ্চ ওদেশে এবং এদেশে

দিলালি

পূর্বের একটি সংখ্যায় শ্রীমধু বোসের সি. এ. পি. সম্প্রদায়ের নাটকগুলির মঞ্চাভিনয়ের তারিখগুলোতে কিছুটা ভুল-ত্রুটি ছিল। তাই নিচে একটা শুদ্ধিপত্র দিয়ে দিচ্ছিঃ

আলিবাবা—সাধনা বসু মর্জিনার ভূমিকায় মঞ্চাভিনয় করেন ১৯৩৪ সালে। ১৯৩৮-এ নয়। রবীন্দ্রনাথ দালিয়ার অভিনয়ে উপস্থিত ছিলেন ১৯৩৩ সালে। ১৯৩৫-এ নয়।

সি. এ. পি-র নানা নাটকের মঞ্চাভিনয়ের তালিকাঃ

১৯৩৩ সালে ফেব্রুয়ারীতে—দালিয়া।

১৯৩৩ সালে ডিসেম্বর মাসে—জোরিনা (নিরঞ্জন পাল)।

১৯৩৪ সালে ফেব্রুয়ারী মাসে—আলিবাবা।

১৯৩৬ সালে এপ্রিল মাসে সৌরীন্দ্রমোহনের 'মন্দির'।

১৯৩৭ সালে ১লা মে—ওমরের স্বপ্নকথা ও সাবিত্রী।

১৯৩৭ সালের অক্টোবরে—ওমরের স্বপ্নকথা ও বিদ্যুৎপর্ণা।

১৯৩৮ সালে জানুয়ারীতে—রাজনটী।

১৯৩৮ ডিসেম্বর—রূপকথা।

এ ছাড়া সি. এ. পি. সম্প্রদায় দু'বার ভারত সফর করেছিলেন—ওমর খৈয়াম এবং সাধনা বসুর নৃত্য সম্প্রদায় নিয়েঃ ১৯৩৮ সালের সেপ্টেম্বরে—পাটনা, এলাহাবাদ, বেনারস এবং বোম্বাই গিয়েছিলেন। ১৯৩৯ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে লাহোর ও দিল্লী পরিভ্রমণ করেন।

আর একটি কথা বলেই শিশিরকুমারের বিষয় আলোচনা শুরু করবো। গত ৩রা সেপ্টেম্বর রবীন্দ্রসদন (ক্যাথিড্রেল রোডে) হলে শান্তিনিকেতন আশ্রমিক সংঘের দ্বারা মঞ্চস্থ রবীন্দ্রনাথের 'মায়ার খেলা' দেখলাম। ওপেরা স্টাইলে এটি প্রডিয়ুস করা হয়েছিল। হয়তো কিছু কিছু দোষত্রুটি এই প্রোডাক্সনে ছিল—কিন্তু একটা কথা ভেবে দেখা দরকার। কিভাবে ওপেরা প্রডিয়ুস করা উচিত সে বিষয়ে এখনও আমাদের অনেক পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করতে হবে—এ স্টাইলের প্রোডাক্সনে এখনও আমরা ঠিক অভ্যস্ত নই। সুতরাং এই নতুন প্রচেষ্টার জন্য আশ্রমিক সংঘকে আমাদের ধন্যবাদ দেওয়া উচিত। তাছাড়া হলের মাইকগুলো মোটেই ভালভাবে কাজ করছিল না। সে জন্যও গান ঠিকমত শোনা যায় নি সব সময়ে। গত ৪ঠা সেপ্টেম্বরের একটি ইংরাজী দৈনিকের মিউজিক ক্রিটিক 'মায়ার খেলার' সমালোচনা প্রসঙ্গে শুধু অভিনয়কেই যথেচ্ছভাবে নিন্দা করে ক্ষান্ত হন নি, রবীন্দ্রনাথের মিউজিক্যাল প্লেগুলো সম্বন্ধেও অনেক আজেবাজে কথা বলেছেন। ইনি কবির সম্বন্ধে মন্তব্য করেছেনঃ

'Like most of his musical plays, its structures, characterisation and even the words of the songs are weak.'

আমার কথা হল, প্লে কিভাবে করা হয়েছে তা নিয়ে ঐ ক্রিটিক মশায় নিজস্ব মতামত দিন তাতে কারোর কোন আপত্তি নেই—কেউ কেউ তাঁর সঙ্গে একমত হবেন। আবার কেউ কেউ হবেন না। কিন্তু কবিগুরু সম্বন্ধে এ ধরণের মন্তব্য করার সাহস হয় কি করে? আমাদের এই দেশে বোধহয় সবই সম্ভব! এই পত্রিকাটিতেই যখন নিউ শেক্সপীয়ার কম্পানী কলকাতায় অভিনয় করতে এসেছিলেন, শেক্সপীয়ারের নাটক সম্বন্ধেও অদ্ভুত অদ্ভুত কয়েকটি মন্তব্য প্রকাশ করা হয়েছিল এবং ফলে কয়েকজন পাঠকদের তরফ থেকে অত্যন্ত যুক্তিপূর্ণ এবং কঠোর ভাষায় প্রতিবাদপত্র এসেছিল। এ জাতীয় সমালোচকেরা নিজেদের লেখায় শুধু যে বিরাট অজ্ঞতারই পরিচয় দেন তাই নয়, দেশের নাট্যোন্নয়নের প্রভূত ক্ষতিসাধন করেন। সম্প্রতি এ ভদ্রলোক উঠে পড়ে লেগেছেন কলকাতার নিকৃষ্টতম নাট্য পরিচালক ভদ্রলোকটিকে বুস্ট আপ করতে। কিন্তু ব্যাপারটা এত সহজ নয়—মেকী জিনিসের ফাঁকি ধরে ফেলতে দর্শকদের বেশিদিন দেরি হয় না।

নাট্যমন্দিরে শরৎচন্দ্রের 'রমা' মঞ্চস্থ হয় ১৯২৯ সালের জুন মাসে। পল্লীসমাজ উপন্যাসকে শরৎচন্দ্রই নাট্যরূপ দিয়ে 'রমা' রচনা করেন। এর আগে কিন্তু স্টারে আর্ট থিয়েটার প্রথম এ নাটকটি মঞ্চস্থ করেন—কিন্তু সেখানে নাটক জমে নি। রমা নাট্যমন্দিরে খুব মঞ্চসাফল্য পেয়েছিল। ভূমিকালিপি ছিল এইরকম ঃ

রমেশ—শিশিরকুমার
বেণী—কুমার কনকনারায়ণ
গোবিন্দ গাঙ্গুলী—যোগেশ চৌধুরী
ধর্মদাস—অমলেন্দু লাহিড়ী
আকবর সর্দার—জীবন গাঙ্গুলী
রমা—শ্রীমতী প্রভা
বিশ্বেশ্বরী—শ্রীমতী কঙ্কা

ইমোশ্যনাল এ্যাকটিংকে কি গভীর এবং রসঘন করে তোলা যায় তা দেখিয়ে দিয়েছিলেন শিশিরকুমার রমেশের চরিত্র রূপায়ণে। কঙ্কাবতী বিশ্বেশ্বরীকে অদ্ভুত ডিগনিফায়েড এবং স্নেহশীল চরিত্র হিসাবে প্রতিষ্ঠা করতে পেরেছিলেন অনবদ্য অভিনয়-কৌশলে। প্রভার রমাও হয়েছিল চমৎকার। যোগেশবাবুর অন্যতম শ্রেষ্ঠ রোল হিসাবে প্রতিপন্ন হয়েছিল গোবিন্দ গাঙ্গুলী চরিত্রটি।

'শঙ্খধ্বনি' নাটকটি মঞ্চস্থ হয় ১৯২৯ সালের ২রা নভেম্বর। এ নাটকটি ইংরাজী 'দি বেলস' নাটকের ছায়া অবলম্বনে শ্রীযুক্ত ভূপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় কর্তৃক রচিত। 'দি বেল্‌স' নাটকটিতে অভিনয় করেই স্যার হেনরী আরভিং প্রথম গ্রেট এ্যাক্টরের খ্যাতি অর্জন করেন। শঙ্খধ্বনির প্রধান চরিত্র কেতনলালের ভূমিকায় শিশিরকুমারেরও অভিনয় হয়েছিল অনবদ্য। নাট্যকার ভূপেনবাবু যখন এ নাটকটি প্রকাশ করেন তখন উৎসর্গপত্রে লেখেন ঃ

"যাঁহার অক্লান্ত পরিশ্রমে—চেষ্টায় —যত্নে ও প্রযোজনায় এবং অনন্যসাধ্য—অভূতপূর্ব কৃতিত্বে
'শঙ্খধ্বনি'
নাট্যজগতে সকলকে মাতাইয়া তুলিয়াছে, যিনি ভিন্ন নাট্যজগৎকে অন্য কোন শক্তিমান যথোচিৎভাবে এই
'শঙ্খধ্বনি'
শুনাইতে সক্ষম হইতেন না বলিয়া জনসাধারণের বিশ্বাস, সেই বর্তমান নাট্য-যুগ-প্রবর্তক
আদর্শ অভিনেতা
শ্রীযুক্ত শিশিরকুমার ভাদুড়ীর
করে
আমার এই নাটক
'শঙ্খধ্বনি'
প্রীতি-উপহার
দিলাম।
শ্রীভূপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।

লাইসিয়ামে The Bells নাটকের প্রথম রাত্রির অভিনয়ে প্রোগ্রাম এইভাবে ছাপা হয়েছিল ঃ

Royal
Lyceum Theatre
Licensed By The Lord Chamberlain to
Mr. H. L. Bateman
Sole Lessee and Manager.
This Evening, Saturday, November 25
Will be produced
A New Drama
In Three Acts
By
Leopold Lewis
Entitled
The Bells,
Adapted from "The Polish Jew",
A Dramatic Study By
MM. Erckmann Chatrion

Mathias	Mr. Henry Irving
Walter	Mr. Frank Hall
Hans	Mr. F. W. Irish
Chrisaian	Mr. Herbert Crellin
Doctor Zimmer	Mr. A. Tapping
Notary	Mr. Collett
Tony	Mr. Fredericks
Fitz	Mr. Fothering-ham
Karl	Mr. Everard
Catherine	Miss. G. Paunce-fort
Annetto	Miss. Fanny Hey wood
Sozel	Miss. Ellen Mayne

With new and appropriate Scenery by Hawes Craven, H. Cuthbert and Assistants.

The Music composed and arranged by M. E. Singla.

Chef D' Orchestro of the Theatre Cluny, Paris, who is (by the kind permission of M. Larochelle) specially engaged for this piece, and will conduct the Orchestra.

The Mechanical Effects by Mr. H. Jones.

The Properties by A. Arnott and Assistants.

Costumes by Sam, May and Mrs. Ridler.

The whole produced under the immediate direction of Mr. H. L. Bateman.

স্যার হেনরী আরভিং—জন হেনরী ব্রড্‌রিব (১৯৩৮—১৯০৫) ইংরাজ অভিনেতা-ম্যানেজার, রাণী ভিক্টোরিয়ার রাজত্বকালের শেষ তিরিশ বছর বৃটিশ স্টেজে একাধিপত্য করেছিলেন—তাঁকে বলা হয় সর্বকালের এবং সর্বদেশের শ্রেষ্ঠ অভিনেতাদের অন্যতম। ১৮৭১ সালে ইনি বেইটম্যানের ম্যানেজমেণ্টে লাইসিয়াম থিয়েটারে যোগদান

Full Food with a flair . . .

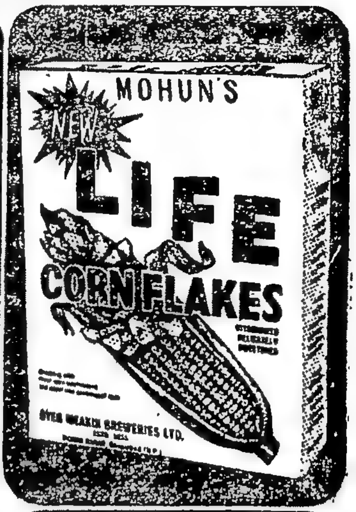

মোহনের
নিউ লাইফ
কর্ণ ফ্লেক্স

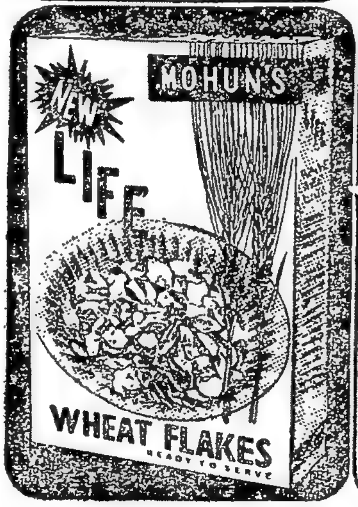

মোহনের
নিউ লাইফ
হুইট ফ্লেক্স

মোহনের "নিউ লাইফ" প্রাতঃকালীন খাদ্য সারা পরিবারের পক্ষে পূর্ণ পুষ্টিকর। এইগুলি প্রাত্যহিক অত্যাবশ্যকীয় ও অপরিহার্য প্রোটিন, কার্বোহাইড্রেট, মিনারল সল্ট এবং ভিটামিনের সারবান উৎস। এইগুলি খাইতে ভাল।

আমাদের জিনিষগুলি ১১০ বৎসরেরও বেশী কালের অভিজ্ঞতাপুষ্ট

ডায়র মীকিন ব্রুয়ারীজ লিঃ, স্থাপিত—১৮৫৫

মোহন নগর (গাজিয়াবাদ) ইউ, পি,

সোলান ব্রুয়ারী - লক্ষ্ণৌ ডিস্টিলারী - কশৌলী ডিস্টিলারী

BMB-NP-818

করেন। এ থিয়েটারের অবস্থা কিন্তু দিনকে দিন খারাপের দিকে যাচ্ছিল। শেষে ম্যানেজমেণ্ট আর কোন উপায় না দেখে আর্ভিংকে 'দি বেল্‌স' নাটক মঞ্চস্থ করতে দিলেন (an adaptation by Leopold Lewis of Erckmann—Chatrian's Le Juif polonais)—প্রথম রাত্রে দর্শক সংখ্যা খুব বেশি ছিল না—কিন্তু দেখা গেল পরদিন সকালে হেনরী আর্ভিং যশের উচ্চশীর্ষে উঠে গেছেন।

'শঙ্খধ্বনি' নাটকটি আজকাল দুষ্প্রাপ্য—তাই এর কাহিনীর সারাংশ এখানে তুলে দিচ্ছিঃ

প্রথম অঙ্কে দেখতে পাই—মিবারের শিয়ারগ্রাম প্রান্তস্থিত নাথজীর মন্দিরের নাটমন্দির—দূরে শৈলশ্রেণী, রাজপুত-কুমারগণ ও রাজপুত-কুমারীরা আবীর, কুঙ্কুম, পিচকারী প্রভৃতি নিয়ে ফাগোৎসবে মত্ত। মধুভট্ট (নাথজী বিগ্রহদেবের পুরোহিত) ও দিনকর (ঐ মন্দিরের সেবায়েত) এইসব কুমার, কুমারীদের সঙ্গে তরল রসালাপে প্রবৃত্ত। এরপর দেখা দেন অজিত সিংহ—ইনি সম্ভ্রান্ত-বংশীয় রাজপুত যুবক, নগরকোটাল এবং বিখ্যাত ধনী সামন্ত কেতনলালের মেয়ে পূর্ণার প্রেমিক। তারপর আসেন পূর্ণা—তিনি মায়ের সঙ্গে মন্দিরে এসেছেন বাবার খোঁজে। পূর্ণা এবং অজিতের মান-অভিমানের কথা-বার্তা এবং দিনকরের তাতে যোগদানে দৃশ্যটি বেশ মধুর হয়ে ওঠে। এবার পূর্ণার মা গৌরী এসে প্রবেশ করেন। বাইরে মুষলধারে বৃষ্টিপাত এবং মেঘগর্জন শুরু হয়। মা, মেয়ে মন্দিরে আরতি দেখতে চলে যান।

এরপর দিনকর এবং অজিতের নিম্নোক্তরূপে কথাবার্তা শুরু হয়ঃ

অজিত—ঠাকুর্দা! এই দোলপূর্ণিমার দিনে এরূপ ভীষণ ঝড়বৃষ্টি তো দেখা যায় না! দেখ—দেখ—প্রান্তরপথের কি ভয়ঙ্কর অবস্থা! একে তো ফাগোৎসবে চাদ্দিকে আবীরের ছড়াছড়ি—পিচকারীর অবিরাম উচ্ছ্বাসে পথঘাট যেন শোণিত-সিক্ত বলে মনে হচ্ছে। তার ওপর বৃষ্টির জলস্রোত প্রান্তর বয়ে চলেছে,—যেন মশানে এক সঙ্গে লক্ষ লক্ষ নরবলির রক্তস্রোত প্রবাহিত বলে মনে হচ্ছে! আজকের দুর্যোগ যথার্থই ভীষণ মূর্তি ধারণ করেছে!

দিনকর—ভায়া! আজকের এই বর্ষাকে আমরা কি বলি জান? এর নাম হচ্ছে 'জহুরী বর্ষা!' পাঁচ বৎসর পূর্বে—ঠিক ঐ প্রান্তরে—এই দুর্যোগে—এই দোলপূর্ণিমার দিনে মাড়োয়ারের সেই ধনকুবের ফুলচাঁদ জহুরীকে কে হত্যা করেছিল!

অজিত—ফুলচাঁদ জহুরীর হত্যার কথা জানি বটে! কিন্তু সে কি এই দোলপূর্ণিমার দিনে?

দিনকর—ঠিক এই দোলপূর্ণিমায়! এই রকম ভীষণ ঝড়বৃষ্টি, এই ভর-সন্ধ্যায়—নাথজীর মন্দিরে আরতি হচ্ছে—চারদিকে শাঁক ঘণ্টা বাজছে,—ঠিক এই সময়—মাড়োয়ারনিবাসী হতভাগ্য ফুলচাঁদ, আজমীরের প্রসিদ্ধ জহুরী ফুলচাঁদ—প্রায় কোটি টাকার হীরে জহরৎ—আর লক্ষ টাকার মোহরপূর্ণ থলে সঙ্গে নিয়ে—ঘোড়া চড়ে, কি জানি কোথায় যাচ্ছিল। যাবার পথে একবার বোধহয় নাথজী দর্শন করে যাবার বাসনা হয়েছিল,—তাই কুক্ষণে এই নাট-মন্দিরে এসে উপস্থিত হল! এখানে তখন আমি এই থামের পাশে মালা জপ কচ্ছিলেম,—আর ঐ পাশে একটা চেটাই পেতে কেতনলাল তার পান ও সরবৎ বিক্রির হিসেব নিকেশ কচ্ছিল।

* * *

কি বলব ভায়া—সে দিনও ঠিক এই রকম দুর্যোগ! সমস্ত রাত্রি আর দুর্যোগ থামল না।

অজিত—এই অবস্থায় ফুলচাঁদ জহুরী এসে আপনাদের অতিথি হ'লেন! তারপর!

দিন—আমি আর কেতনলাল দুজনে শশব্যস্তে তাঁকে অভ্যর্থনা কল্লেম। এই মন্দিরে এক নির্জন কক্ষে তাঁকে স্থান দিলেম। আরতি শেষে তাঁকে নাথজীর প্রসাদ খেতে দিলেম। তিনি আহারাদি করে কক্ষের দ্বার বন্ধ করে দিয়ে বিশ্রাম করতে লাগলেন। আমি আর কেতনলাল মন্দিরে যে যার নির্দিষ্ট ঘরে গিয়ে শয়নে পদ্মনাভ স্মরণ করে ঝড়বৃষ্টি বজ্রাঘাতের প্রকোপ শুনতে শুনতে নিদ্রামগ্ন।

অজিত—ফুলচাঁদের হত্যার কথা আপনারা শুনলেন কখন?

দিন—পরদিন প্রাতঃকালে। তোমার কোতোয়ালীর চেলা-চামুণ্ডারা মন্দিরে এসে খুব হৈচৈ লাগিয়েছে দেখলুম। জহুরীর হীরে, জহরৎ, মোহর ইত্যাদি নশ্বর জিনিসের এবং তার নশ্বর রক্ত-মাংসের চিহ্নমাত্র কেউ কোথাও খুঁজে পেলে না! প্রহরী মহাপ্রভুরা ঐ প্রান্তর থেকে টেনে নিয়ে এলেন ফুল-চাঁদের মরা ঘোড়াটা—তার রক্তমাখা সাদা চাপকান আর সবুজ রং-এর পাগড়ীটা। ব্যস—এই পর্যন্ত হয়েই সব খতম্‌! আজও পর্যন্ত জহুরীর লাসেরও কোন সন্ধান পাওয়া গেল না.—হত্যাকারীর বা হত্যাকারীদের অথবা তার ধন-সম্পত্তিরও কোন তল্লাস কেউ কর্তে পাল্লে না। এ সমস্ত ভগবান নাথজীর লীলাখেলা!

* * *

শুনলেম নাকি ভায়া—তুমি রাণার কাছ থেকে এই খুনের তদন্ত কর্বার ভার পেয়েছ? এটা সত্যি না গুজব কথা?

অজিত—হ্যাঁ, ঠাকুর্দা, সত্য কথা,—গুজব নয়।

দিন—আমিও প্রাণ খুলে আশীর্বাদ করি,—তুমি নাথজীর কৃপালাভ কর! আমি মুক্ত কণ্ঠে স্বীকার কচ্ছি—ফুলচাঁদের হত্যাকারীর সন্ধান যদি কেউ কর্তে পারে—সে তুমি!

এর পর প্রবেশ করেন কেতনলাল (ম্যাথিয়াস)—দোলপূর্ণিমার দিনে ঝড়-বৃষ্টি, মেঘগর্জন এবং দেবালয়ের আরতি-কালীন শঙ্খধ্বনি শুনে কেতন-লাল যেন কিছুতেই স্বাভাবিক হতে পারছেন না—বারবার পাঁচ বছর আগে-কার দোলপূর্ণিমার রাত্রে ফুলচাঁদ জহুরীর হত্যাকাণ্ডের স্মৃতি তাঁকে উতলা, অস্থির এবং চঞ্চল করে তুলেছে। কথায় কথায় কেতনলালের মেয়ে পূর্ণার সঙ্গে অজিত সিংহের বিয়ের কথা তুললেন দিনকর—কেতন-লাল রুক্ষকণ্ঠে জবাব দিলেন যে কেতনলাল সামন্তের মেয়ের সঙ্গে বিয়ে হবে রাণাপুত্র বা রাণার ভাইপোর সঙ্গে—বেতনভোগী দরিদ্র কোটাল অজিতের সঙ্গে তাঁর মেয়ের বিয়ের কথা তোলার মানে তাঁকে অপমান করা। এর উত্তরে অজিত সিংহও কেতনলালকে জানিয়ে দিলেন যে তাঁরও বংশমর্যাদা জ্ঞান আছে এবং যেদিন কেতনলাল উপযাজক হয়ে তাঁকে কন্যাদান করবেন সেইদিনই তিনি পূর্ণার পাণিগ্রহণ করতে সম্মত হবেন।

অজিত যখন স্থান পরিত্যাগ করতে উদ্যত সে সময় দিনকর অনুরোধ করলেন এই ভীষণ দুর্যোগের রাত্রে পথে না বের হতে।

অজিত উত্তর দিলেন—আজ থেকে—এই দোলপূর্ণিমার রাত্রে—এই "জহুরী বর্ষায়" ফুলচাঁদ জহুরীর হত্যার রাত্রি হতেই আমি তার হত্যা-কারীর সন্ধানে আত্মনিয়োগ কল্লেম!—এরপর অজিত সেখান থেকে চলে গেলেন।

অজিতের শেষ কথাগুলো শুনে ভীষণ ভয় পেয়ে গেলেন কেতনলাল। তখুনি তাকে ধরবার জন্য তার পেছনে ছুটলেন।

এবার কেতনলাল এসেছেন শুনে

তাঁর খোঁজে মন্দির থেকে চলে এলেন পূর্ণা ও তার মা গৌরী। তাঁরা দিনকরের সঙ্গে কথাবার্তা বলছেন এমন সময় মন্দিরে আরতি শুরু হল—আরতির বাদ্য এবং শঙ্খধ্বনির শব্দ শোনা যেতে লাগল। কেতনলাল ফিরে এলেন এবং এইসব বাদ্যধ্বনি এবং শঙ্খনাদ শুনে উন্মাদের মত চীৎকার করে উঠলেনঃ

কেতনঃ ওঃ—ওঃ কি ভীষণ—কি ভীষণ! বন্ধ কর—বন্ধ কর! খুড়োঠাকুর! দিনকর! থামাও—থামাও—এখ্খুনি বন্ধ কর!

* * *

সেই—সেই শঙ্খধ্বনি! সেই বজ্রনির্ঘোষের মত শঙ্খধ্বনি! এই রাত্রে,—এই মুহূর্তে,—এই দুর্যোগে—এই সেই শঙ্খধ্বনি। পূর্ণা জিজ্ঞেস করলেন কেতনলাল এমন করছেন কেন? কোন কারণ না দেখিয়ে কেতনলাল যেন সম্মোহিতের মত বলে চললেন—কোন কথা নয়—বন্ধ কর—বন্ধ কর! ঐ সেই শঙ্খধ্বনি—সেই শঙ্খধ্বনি! আমার কর্ণ বধির হয়ে গেল—আমি সহ্য করতে পার্‌বনা—সহ্য করতে পার্‌বনা,—অন্ততঃ আজকের রাত্রে কিছুতেই সহ্য করতে পার্‌না।

আরতি বন্ধ হবার সঙ্গে সঙ্গে শঙ্খধ্বনিও থেমে গেল—কেতনলাল এবার কিছুটা সুস্থির হলেন। তবু মাঝে মাঝে কথায় কথায় তাঁর মনের অস্থিরতা এবং অবচেতন মনের পাপস্মৃতির কথা প্রকাশ হয়ে পড়ছিল।

তাঁর মেয়ে যখন তাঁকে সিক্তবসন-ভূষণ বদলাতে বললেন কেতনলাল জবাব দিলেন—আমার জন্য ভাবনা নাই। কিন্তু তোমরা ঘরে ফিরবে কেমন করে? উঃ—কি ভীষণ—কি ভীষণ রক্তস্রোত! মানুষের দেহে কি এত রক্ত?

গৌরী—ছি—ছি—ও কথা বলতে নেই! হোরির দিনে মেবারের পথ ঘাট—এই রকম আবীরের রং-এ লাল-বর্ণ হয়ে থাকে। তার ওপর বৃষ্টি পড়ছে,—পথে জলের স্রোত বয়ে যাচ্ছে—তাই রক্তস্রোতের মতন দেখাচ্ছে!

কেতন—তা বটে—তা বটে! রক্তস্রোতের মতন দেখাচ্ছে বটে! ঐ আবীরের রক্তস্রোতে যদি মানুষের রক্ত মিশে যায়,—ধরবার উপায় নেই—কি বল? ধরবার উপায় নেই! পূর্ণা জিজ্ঞেস করবে এই দুর্যোগে কেতনলাল এলেন কি করে?

কেতন—পালিয়ে এলুম মা,—দুর্যোগ দেখে! চারদিকে আবীরের দরুণ রক্তবর্ণ বৃষ্টির জল—জলস্রোতের মত বয়ে যাচ্ছে দেখে—আর তার ওপর—রাজপ্রাসাদে চারদিকে শঙ্খধ্বনি——উঃ—সে কি ভীষণ—কি ভীষণ—! ছুটে পালিয়ে এলুম! কিন্তু—নিস্তার নেই,—কোথাও নিস্তার নেই!

গৌরী—এতদূর হেঁটে এলে?

কেতন—নাঃ—বরাবর ঘোড়ায় এসেছি! আসতে—আসতে ঠিক ঐ জায়গায়—ঐ সাঁকোর নীচে—ঐ প্রান্তরের ওপর—ঠিক সেই স্থানে, যেখানে—যেখানে—নাঃ—থাক্! ঘোড়া আর এগোতে চাইলে না—ঘোড়াটা বিষম ভয় পেলে! বিকট অন্ধকারে যেমন একটা বিদ্যুতের আলো জ্বলে উঠলো—দেখলুম—সেই—সেই জায়গায় রক্তের স্রোত চলেছে! ঘোড়া থেকে লাফিয়ে পড়লুম! ঘোড়াটাও তাই দেখে ভয়ে ঊর্ধ্বশ্বাসে কোন্ দিকে চলে গেল। আমিও ছুটতে ছুটতে নাটমন্দিরে এসে উপস্থিত হলুম!

একবার ভিজতে ভিজতে এসে আবার বাইরে জলে ভিজতে গিয়েছিলেন কেন। পূর্ণার এই প্রশ্নের উত্তরে কেতনলাল সম্মোহিতের মত জবাব দিলেনঃ অজিতকে ডাকতে! সে ফুলচাঁদ জহুরীর হত্যার তদন্ত করবার ভার পেয়েছে! তাকে সে কাজ করতে দেওয়া হবে না—হবে না—কিছুতেই নয়! কিছুতেই নয়!

এরপর কেতনলাল স্থির করে ফেললেন পরদিন প্রভাতেই পূর্ণার সঙ্গে অজিতের বিবাহ সম্পন্ন করা হবে। কারণ তারপর অজিতকে তিনি ফুলচাঁদ জহুরীর হত্যার তদন্ত থেকে নিবৃত্ত করতে পারবেন। সে রাত্রে মন্দিরের একটি কক্ষে কেতনলালের থাকবার ব্যবস্থা করা হোল।

নাটমন্দিরের দক্ষিণ দিকের বেদীর ওপর বিছানা পেতে কেতনলালের শয্যা-ব্যবস্থা করা হোল। প্রচুর সুরাপান করে কেতন শয্যায় শয়ন করলেন এবং অল্প পরেই ঘুমিয়ে পড়লেন। অকস্মাৎ ঘুমের ঘোরে কেতনলাল শয্যা ত্যাগ করে উঠলেন। স্থির দৃষ্টিতে প্রান্তরের দিকে কাকে যেন লক্ষ্য করতে লাগলেন। তারপর মাটি থেকে কল্পনায় যেন একটা বর্শা কুড়িয়ে নিয়ে কাকে সেই বর্শার দ্বারা হত্যা করবার জন্য অতি সন্তর্পণে সামনের দিকে এগিয়ে আসতে লাগলেন। এর পরেই কেতনলাল ভয়ানক ভয় পেয়ে গিয়ে বিকট চীৎকার করে উঠবেন।

চীৎকার শুনে গৌরী, পূর্ণা, দিনকর, মধুভট্ট প্রভৃতি সবাই ছুটে আসবে।

এইখানেই প্রথম অঙ্কের যবনিকা।

[ক্রমশঃ]

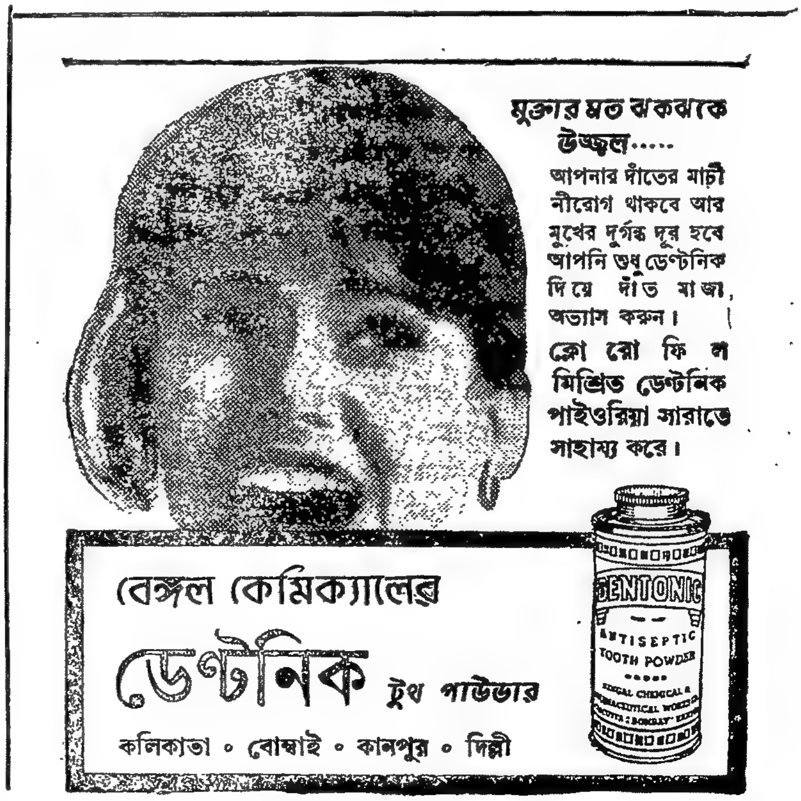

রঙ্গজগৎ

রবীন্দ্রসদন নিয়ে আদর্শগত দ্বন্দ্ব

রবীন্দ্রসদনের কার্যপরিচালক কমিটি সম্পর্কে সুজনের মন্তব্যের (পর্বতের মূষিক প্রসব) সমর্থনে বহু চিঠি এসেছে। বিভিন্ন সংস্কৃতি সংস্থা এবং সংস্কৃতি কর্মীরা সুজনের মন্তব্য সমর্থন করে নির্বাচনের ভিত্তিতে পরিচালকমণ্ডলী গঠনের দাবি জানিয়েছেন। কেবল যোধপুর পার্ক থেকে দুই মহিলা স্বাক্ষরিত একটি চিঠি এবং নৈহাটির জনৈক পত্রলেখক এই মন্তব্যের বিরোধিতা করেছেন। মহিলা দু-জন এত ক্ষুব্ধ হয়েছেন যে, তাঁরা ভাষার সংযম হারিয়ে ফেলেছেন। রবীন্দ্রসদনের কমিটি সম্পর্কে সুজন যে মন্তব্য করেছেন তা যে অপ্রাসঙ্গিক হয় নি তার প্রমাণ পাওয়া গেছে অসংখ্য পাঠকের সমর্থনসূচক চিঠিতে। বহু চিঠির মধ্যে মাত্র এই দুটি চিঠি ব্যতিক্রম।

সরকার মনোনীত কমিটির সদস্যদের মধ্যে কয়েকজনের প্রতিক্রিয়া জানতে পেরেছি তাও নীতিগত দিক থেকে আমার মন্তব্যের বিরোধী নয়। যদিও সকল সদস্যের কাছে এখনো সরকারী চিঠি পৌঁছয় নি, কিন্তু খবরের কাগজে প্রকাশিত সংবাদে নিজের নাম দেখে সদস্যদের কেউ কেউ বিস্মিত হয়েছেন; কিছুটা বিব্রতবোধ করছেন। কারণ এই তালিকায় এমন নাম রয়েছে যিনি বা যাঁরা নীতিগত দিক থেকে সরকারী মনোনয়নের পরিবর্তে গণতান্ত্রিক আদর্শে নির্বাচিত কমিটি এবং স্বায়ত্তশাসিত ব্যবস্থার দাবি সমর্থন করেছিলেন। গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে পরিচালকমণ্ডলীর সদস্য নির্বাচন এবং স্বায়ত্তশাসিত ব্যবস্থার দাবিতে স্মারকপত্র সরকারের নিকট কয়েকবার দেওয়া হয়েছে। এই স্মারকপত্রে কলকাতার বিশিষ্ট শিল্পী, সাহিত্যিক, সাংবাদিক এবং জ্ঞানী ব্যক্তিরা স্বাক্ষর করেছেন। আমার মত অনেকে মনে করেছিলেন সরকার এই স্মারকপত্রের প্রতি মর্যাদা দেবেন। আমলাতান্ত্রিক পদ্ধতির পরিবর্তে একমাত্র গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে জাতীয় নাট্যশালার কাজ সুষ্ঠুভাবে পরিচালিত হতে পারে। অমলাতান্ত্রিক রীতিতে মনোনীত কমিটির কথা এলে যোগ্য-অযোগ্যের প্রশ্ন এসে যায়। আমলাতান্ত্রিক পদ্ধতির সঙ্গে দুর্নীতি ও অযোগ্যতার সম্পর্ক বড় বেশি।

রবীন্দ্রসদন যদি জাতীয় নাট্যশালা হয় তবে তার জন্য স্বতন্ত্র গঠনতন্ত্র, পরিচালকমণ্ডলী গঠননীতি ইত্যাদি রচিত হওয়া দরকার। নীতির মূল কথা হবে গণতন্ত্র। পশ্চিমবঙ্গের প্রত্যেকটি রেজিস্টার্ড নাট্য বা সাংস্কৃতিক সংস্থা হবে নির্বাচকমণ্ডলীর প্রাইমারী ইউনিট। এই ইউনিট থেকে ভোটাধিক্যে নির্বাচিত হবেন রবীন্দ্রসদনের সদস্যবৃন্দ। সদস্যমণ্ডলী এমনভাবে গঠিত হবে যাতে থাকবেন প্রযোজক, পরিচালক, সঙ্গীত পরিচালক, রূপশিল্পী, নৃত্য পরিচালক, মঞ্চ বিশেষজ্ঞ, অভিনেতা, অভিনেত্রী, নাট্যকার এবং নাট্যশাস্ত্র বিশেষজ্ঞ ও সমালোচক ইত্যাদি। এই নির্বাচনে পেশাদার মঞ্চের অংশগ্রহণের সুযোগ থাকা প্রয়োজন। পেশাদার মঞ্চগুলি জাতির নাট্যশালাকে বাঁচিয়ে রেখেছে। পরিচালকমণ্ডলীর সদস্যরা নিজ নিজ ক্ষেত্রে অভিজ্ঞতাসম্পন্ন হবেন। যেমন প্রযোজনার জন্য যাঁরা নির্বাচিত হবেন তাঁরা ক্ল্যাসিক্যাল থেকে আধুনিক, দেশী-বিদেশী এবং রবীন্দ্র-নাটক প্রযোজনায় অভিজ্ঞ হওয়া উচিত। এভাবে পরিচালনা, অভিনয় ইত্যাদির ক্ষেত্রে বিবেচনা করতে হবে। তবেই কমিটি হবে সকলের আস্থাভাজন এবং সকলের সহযোগিতায় সক্রিয়। সর্বোপরি এই পরিচালন ব্যবস্থাকে হতে হবে স্বায়ত্তশাসিত। স্বায়ত্তশাসিত ব্যবস্থা না হলে আমলাতন্ত্রের চোরাগলিতে কমিটির কাজ অচল হয়ে পড়বে। নতুন কল্পনা, নতুন সৃজনীশক্তি এবং নতুন নতুন নাটক ও প্রয়োগ-কৌশলে নাট্যশালা বলিষ্ঠতর হয়ে ওঠার জন্য চাই অবাধ স্বাধীনতা। এই স্বাধীনতা না থাকলে জাতির নাট্যশালা বিকশিত হয়ে উঠতে পারে না। —সুজন।

সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায়

চিত্র আলোচনা

অশ্রু দিয়ে লেখা

ফাল্গুনী চিত্রম

পরিচালক—অমল দত্ত

'অশ্রু দিয়ে লেখা' ছবিটি প্রাপ্তবয়স্কের জন্য নির্দিষ্ট হয়েছে। ছবিতে চক্রান্ত, মারামারি, প্রণয় এবং নিষ্ঠুরতার কথা রয়েছে। এই কাহিনী গড়ে উঠেছে এক কয়লাখনিকে কেন্দ্র করে। পরিচালক অমল দত্তের এটি প্রথম ছবি। চিত্রনাট্য ও সংলাপ রচনার কাজও তিনি করেছেন। এই চিত্রনাট্যের অবলম্বন মেঘনাথ ছদ্ম নামে রচিত কাহিনী।

প্রতাপ চৌধুরী নিজের কয়লাখনি পরিদর্শনে যাবার পথে এক ভয়ানক মারামারির দৃশ্য দেখে স্তম্ভিত হয়ে যায়, এক মেয়েকে হরণ করার ঘটনায়। এই সঙ্গে জন বিশ্বাস নামক সমাজসেবকের এই দাঙ্গাকারীদের ওপর প্রভাব দেখে স্তম্ভিত হয়ে যায়। জানতে পারে জন বিশ্বাস তারই কয়লাখনির কর্মচারী। জনকে সে খনি-শ্রমিকদের ছেলেমেয়েদের লেখাপড়ার জন্য স্কুল গড়তে সাহায্য করে। মালিকের সাথে জনের এত মেলামেশায় ম্যানেজার ও সহকারী ম্যানেজার ভীত হয়। কারণ ওরা খনিটিকে দুর্নীতির

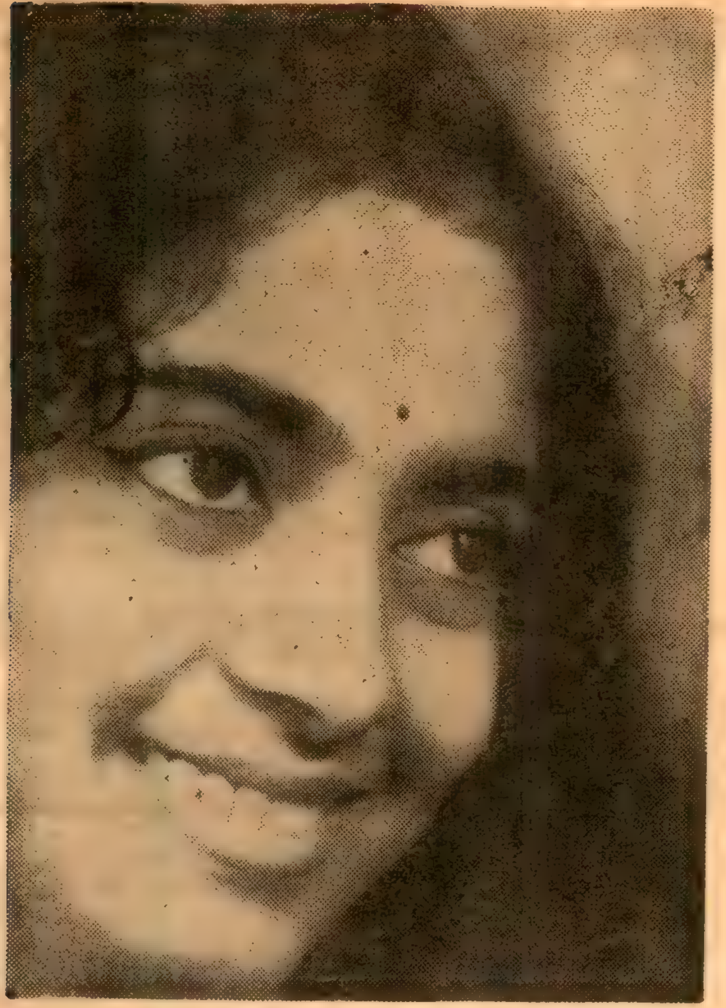

অনুন্ধতী মুখাজী পরিচালিত নির্মীয়মাণ 'ছুটি'র নায়িকা নন্দিনী মালিয়া

ও তাদের ব্যক্তিগত স্বার্থ উদ্ধারের প্রধান কেন্দ্রে পরিণত করেছে। ওরা গুন্ডা পোষে, সহ-শ্রমিকদের তাড়িয়ে দেয়, গোপনে খনির কয়লা বেচে দিয়ে অর্থ আত্মসাৎ করে। সেই অর্থ মদ ও মেয়েলোকে ওড়ায়। গুন্ডা কুন্দন তাদের এই কাজের সহায়। প্রতাপ চৌধুরী কয়েকদিনের জন্য এসে বেশিদিন থেক গেল জনের কন্যা সীমার ভালবাসা পেয়ে। এতে দুর্নীতিচক্রের অসুবিধা হয়। তারা চক্রান্ত করে প্রতাপকে খনি থেকে সরিয়ে দেয়। প্রতাপ যাবার মুহূর্তে সীমাকে কয়েকদিনের মধ্যে ফিরে আসার কথা দিয়ে গিয়েছিল, কিন্তু মা'র বিরোধিতার জন্য আসতে পারে নি। চক্রান্তের জন্য দু-জনের চিঠিপত্রও কারো কাছে পৌঁছয় নি। অথচ সীমা তখন অন্তঃসত্ত্বা। চক্রান্তকারীদের কোপে পড়ে জন গুরুতর আহত হয়, খনি থেকে চলে আসতে বাধ্য হয়। চক্রান্তকারীরা এবার তার নবজাত সন্তান সহ তাকে খুন করার চেষ্টা করে, কিন্তু ব্যর্থ হয়। অমানুষ কুন্দনই শিশুটিকে বাঁচিয়ে অনাথ আশ্রমে রেখে আসে নিজেকে পিতা পরিচয় দিয়ে। এদিকে সন্তান হারিয়ে সীমা তখন উন্মাদ। আর একদিকে মায়ের চাপে পড়ে প্রতাপ এক অভিজাত কন্যাকে বিয়ে করে অভিশপ্ত দিন কাটাচ্ছে।

ধর্মের কল বাতাসে নড়ে। সুতরাং চক্রান্তকারীদের মধ্যে পরস্পরের দ্বন্দ্বে কুন্দনের সুবুদ্ধি ফিরে আসে। তার হাতে ম্যানেজার খুন হয়। সহকারী ম্যানেজার প্রতাপের মা'র কাছে সব কথা বলে নিজেকে নির্দোষ প্রমাণ করার চেষ্টা করে। কুন্দনের সহযোগিতায় প্রতাপ সীমাকে ফিরে পায়। তার স্ত্রী তাকে পরিত্যাগ করে চলে যাওয়ায় সীমাকে বাড়িতে গ্রহণ করতে আর অসুবিধা থাকে না, সীমার সন্তান জলে ডুবে মরে যাওয়ায় প্রতাপের বিবাহিত স্ত্রীর সন্তানকেই সীমা নিজের সন্তানরূপে গ্রহণ করে। এভাবেই অনেক দুঃখের পরে কাহিনী শেষ হয়েছে।

ছবির শুরুতে কয়লাখনির দৃশ্য ও দুর্নীতির চক্রান্ত যথেষ্ট কৌতূহল সৃষ্টি করেছিল। কিন্তু পরেরদিকে খনি-জীবনকে পরিত্যাগ করে কেবলমাত্র প্রতাপ-সীমার দুঃখের কাহিনী প্রকাশ করেছে। খনি শ্রমিকদের জীবন পরিবেশের মধ্যে এই দুঃখ কাহিনী আরো সংক্ষিপ্ত হলে ছবিটি বিষাদভার থেকে কিছুটা মুক্ত হতে পারত এবং বিশ্বাস্য পরিবেশের দরুণ নতুনত্ব উপভোগ করা যেত। নতুন পরিচালক সর্বক্ষেত্রে পরিমিত রসজ্ঞানের পরিচয় দিতে না পারলেও পণ্যচিত্রের বিচারে হয়ত তিনি সার্থক হবেন।

অভিনয়ে সার্থকতার দাবি করতে পারেন জ্ঞানেশ মুখার্জি, জ্যোৎস্না বিশ্বাস, অনিল চ্যাটার্জী, অসিতবরণ, মন্মথ মুখার্জি, জহর রায়, নিরঞ্জন রায়, নৃপতি চ্যাটার্জী, সুনন্দা দেবী, নীলিমা দাস, গীতালি রায়, গীতা দে, সুমিতা সান্যাল, চিত্রা মণ্ডল, সুখেন দাস, মণি শ্রীমাণী, প্রবীরকুমার প্রমুখ।

ছবিটির সঙ্গীত পরিচালনায় অভিজিৎ ব্যানার্জী আবহসঙ্গীতে যথাযথ, কিন্তু কণ্ঠসঙ্গীতে বিশেষ প্রশংসা দাবি করতে পারেন না। সম্পাদনা করেছেন রমেশ যোশী।

পূর্ব জার্মানীতে প্রমোদ কর খরচ হয় কিভাবে

আমাদের দেশের মত জার্মান গণতান্ত্রিক সাধারণতন্ত্রে আমোদ-প্রমোদের অনুষ্ঠানে যোগ দিতে টিকেট পিছু কিছু বাড়তি কর দিতে হয়। করের পরিমাণ পাঁচ থেকে দশ ফেনিঙ্ক (এক ফেনিঙ্কের দাম ভারতের দুই পয়সার সমান)। টিকেট পিছু আমাদের দেশে প্রমোদকরের হার অবশ্য অনেক বেশি।

জার্মান গণতান্ত্রিক সাধারণতন্ত্রের প্রতিষ্ঠার আগে থেকেই একটি সাংস্কৃতিক তহবিল গড়ে তোলার উদ্যোগ-আয়োজন ছিল। তখন উদ্দেশ্য ছিল সাংস্কৃতিক কর্মীদের সর্বপ্রকারে সাহায্য করা যাতে মানবতাবাদী জার্মান সংস্কৃতি নতুন করে গড়ে উঠতে পারে। মাথাপিছু করের পরিমাণ যদিও খুবই সামান্য কিন্তু সব মিলিয়ে জনসাধারণ একে মোটেই সামান্য মনে করে না। সে সময়ে এই তহবিলের উদ্যোক্তা ছিল মুক্ত জার্মান ট্রেড ইউনিয়ন সমূহের কনফেডারেশন ও জার্মানীর গণ-

তান্ত্রিক পুনরুজ্জীবনের সাংস্কৃতিক লীগ। যুদ্ধবিধ্বস্ত দেশে সাংস্কৃতিক জীবনকে নতুন করে গড়ে তোলাটা বড় সহজ কাজ ছিল না। এজন্য, অর্থ সংস্থানের উদ্দেশ্যে, সংস্কৃতি যাঁরা ভালবাসেন তাঁদের সকলের কাছ থেকেই কর আদায়ের ব্যবস্থা করতে হয়েছিল। এখন অবশ্য অবস্থা অন্য রকম।

১৯৫১ সাল থেকে আজ পর্যন্ত সাংস্কৃতিক তহবিলে জমা পড়েছে ২০ কোটি মার্কের বেশি। এর মধ্যে ১৩·৫ কোটি মার্ক এসেছে থিয়েটার, সিনেমা, কনসার্ট, নৃত্যানুষ্ঠান থেকে; প্রায় ০·১ কোটি মার্ক এসেছে রেডিও টেলিভিসন ব্যবহারকারীদের কাছ থেকে, ৬০ লক্ষ মার্ক এসেছে গ্রামোফোন রেকর্ডের বিক্রি থেকে'

কিভাবে খরচ হয়

গোড়ার দিকে কয়েক বছর এই তহবিলের অর্থ সম্পূর্ণ ব্যয় হয়েছিল সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রের কতকগুলি জরুরী পুনর্নির্মাণমূলক কাজে। ১৯৬০ সাল থেকে সংস্কৃতিমন্ত্রকের নির্দেশ অনুসারে এই তহবিলের অর্থ ব্যয় করা হচ্ছে ব্যাপক সাংস্কৃতিক আন্দোলন গড়ে তোলার উদ্দেশ্যে। তারপর থেকে ৮·৮ কোটি মার্ক খরচ করা হয়েছে জনসাধারণের জন্য সাংস্কৃতিক কাজকর্মে। এই অর্থের অর্ধেকের বেশি পরিমাণ খরচ করা হয়েছে গ্রামাঞ্চলে ও কারখানায় সাংস্কৃতিক ভবন গড়ে তোলা, অপেশাদার চক্র ও লোকশিল্পের গোষ্ঠীগুলিকে সাহায্য করা ও লাইব্রেরী গড়ে তোলার কাজে।

একটি দৃষ্টান্ত

এরফুর্ট অঞ্চলের একটি ছোট জায়গার নাম স্লোটাইম। হাজার পাঁচেক লোকের বাস। এই ছোট্ট শহরে আছে একটি রাজপ্রাসাদের ধ্বংসস্তূপের মধ্যে ১৭৭৩ সালে নির্মিত একটি দুর্গ। দুর্গটি ছিল ভগ্নপ্রায়। ১৯৪৫ সালের পরে স্থানীয় অধিবাসীরা দাবি তুললেন যে দুর্গটি ভেঙে ফেলা হোক। কেন না দৃশ্য হিসাবে সেটি খুব নয়নাভিরাম ছিল না। কিন্তু দুর্গটি ভেঙে ফেলার বিরুদ্ধে ঘোরতর আপত্তি জানালেন ভারপ্রাপ্ত ইঞ্জিনীয়ার। তিনি বললেন দুর্গটি ভেঙে ফেলতে প্রচুর খরচ পড়বে, তার চেয়ে দুর্গটি মেরামত করে গড়ে তুললে শহরের একটি সাংস্কৃতিক কেন্দ্র হবে। কিছু বিরোধিতা সত্ত্বেও এই প্রস্তাব কার্যকরী করা হল। যেখানে ছিল ভাঙা দুর্গ, সেখানে গড়ে উঠল ক্লাবঘর, প্রেক্ষাগৃহ, মঞ্চ ইত্যাদি সমেত বিরাট সংস্কৃতি ভবন। এই নির্মাণকার্যে ১৫ হাজার মার্ক ব্যয় করা হয়েছিল সাংস্কৃতিক তহবিল থেকে।

তপন সিংহ পরিচালিত 'গল্প হলেও সত্যি' ছবির একটি দৃশ্যে রবি ঘোষ, ছায়া দেবী ও ভারতী দেবী।

স্টুডিও খবর

অনামিকা

হেমেন গুপ্তের পরিচালনায় বোম্বাইতে একটি বাংলা ছবি নির্মিত হচ্ছে। এই ছবির নাম রাখা হয়েছে 'অনামিকা'। ছবির প্রধান ভূমিকায় রয়েছেন মাধবী মুখার্জী, অনিল চ্যাটার্জী। সহশিল্পীদের মধ্যে আছেন ধর্মেন্দ্র, শশীকলা, পৃথিবরাজ কাপুর, তরুণকুমার, অজিত চট্টোপাধ্যায়, রমা গুপ্তা এবং আরো বহু শিল্পী। সঙ্গীত পরিচালনা করছেন হেমন্তকুমার, সম্পাদনা করছেন হৃষীকেশ মুখোপাধ্যায়।

অসমাপ্ত ছবি 'গৌরী'

পরলোকগত প্রযোজক পরিচালক ও অভিনেতা গুরু দত্তের 'গৌরী' ছবির কাজ অসমাপ্ত ছিল। সম্প্রতি তাঁর স্ত্রী গায়িকা গীতা দত্ত সেই অসমাপ্ত ছবির কাজ আবার শুরু করবেন। ছবিতে নায়িকার ভূমিকায় রূপ দেবেন গীতা দত্ত, নায়ক হবেন প্রদীপকুমার। পূর্বে এই চরিত্রে গুরু দত্ত অভিনয় করছিলেন।

সংবাদ বর্ণনা

মস্কোতে ভিয়েতনামী চলচ্চিত্র সপ্তাহ

২রা সেপ্টেম্বর ভিয়েতনাম গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্রের ২১তম বার্ষিকী উদ্‌যাপনের প্রস্তুতি চলছে। এখানে সাতদিন ধরে ভিয়েতনামী চলচ্চিত্র দেখানো হবে।

পাঁচটি বড় বড় চিত্রগৃহে প্রদর্শিত হবে নতুন পূর্ণদৈর্ঘ্য কাহিনীচিত্র "ঝড় উঠছে", "অগ্নিশিখার সমুদ্র", "তরুণ যোদ্ধা", "দক্ষিণ উপকূলের নারী" ও "দয়ালু স্ত্রাগন"। ভিয়েতনামী জনগণের জীবন ও বিদেশী হানাদারদের বিরুদ্ধে তাঁদের বীরত্বপূর্ণ সংগ্রাম সম্পর্কে সংবাদচিত্র প্রদর্শিত হবে অন্য পাঁচটি চিত্রগৃহে।

দি আগলি ডাকলিং

রাশিয়ার পপুলার সায়েন্স ফিল্ম স্টুডিও বোরিস ডোলিনের পরিচালনায় হান্স এণ্ডারসনের শিশুপাঠ্য গল্প 'দি আগলি ডাকলিং' বা কুৎসিত হাঁসের ছানাকে চিত্রে রূপায়িত করছে। এই ছবির প্রধান ভূমিকায় রয়েছে একটি হাঁস। আর্জান নামে যে স্টুডিও মহলে সকলের পরিচিত এবং আদরের। বহু ছবিতে আর্জান অভিনয় করেছে এবং তার জনপ্রিয়তা রয়েছে। এদিক থেকে আর্জানকে চিত্রতারকারূপে স্বীকার না করে উপায় নেই।

দক্ষিণ ভারত সফরে যাত্রীদের এ্যাকাডেমী হলে কলকাতার শিল্পীদের সম্বর্ধনা অনুষ্ঠানের দৃশ্য। ছবিতে ভি বালসারা, অরুণাভ মজুমদার, মণিমালা, শ্রীমতী গণেশন প্রমুখ।

সংগীতশিল্পী-মূকাভিনেতা

দক্ষিণ ভারতে সম্বর্ধিত

দক্ষিণ ভারতে একমাস ব্যাপী সাফল্যজনক অনুষ্ঠান করে ফিরলেন এক সাংস্কৃতিক প্রতিনিধিদল। ভি, বালসারার নেতৃত্বে এই দলের অন্যতম শিল্পী ছিলেন মূকাভিনেতা অরুণাভ মজুমদার। অরুণাভ'র অনুষ্ঠানে ছিল নতুনত্ব। উপস্থিত সকল অনুষ্ঠানের দর্শক বিশেষ-ভাবে প্রশংসা করেছেন। এমন অনুষ্ঠান ও'দের কাছে ছিল প্রথম। শিল্পী দক্ষতার সংগে অভিনয়কলা পরিবেশন করে বাংলার সুনাম রেখে এসেছেন। একটি সাংবাদিক সম্মেলন সহ অনেকগুলি অনুষ্ঠান করতে হয়েছিল শিল্পীদলকে দর্শকদের চাহিদার জন্য। এ্যাকাডেমি হলেই চারটি অনুষ্ঠান করতে হয়। তাছাড়া আন্নামালাই ডনবস্ক প্রভৃতি হলে অনুষ্ঠান হয়। মাদ্রাজে এ'রা বিপুলভাবে সম্বর্ধিত হন। এইচ, এম, ভি, এ, ভি, এম স্টুডিও প্রভৃতি প্রতিষ্ঠান স্বাগত জানান। বালসারা তাঁর শিল্পী-দের দ্বারা বাংলা এবং ভারত বিদেশের বিভিন্ন স্থানের সংগীত পরিবেশন করেন। রবীন্দ্রসংগীতের অনুবাদ অনুষ্ঠানের বিশেষ সম্পদ ছিল। দক্ষিণ ভারতে শিল্পীদের সাফল্যজনক সফর আনন্দের সংবাদ। আরও সাফল্যলাভ করুন এই কাম্য।

সংগীত পরিবেশনে দক্ষতা

সাজ-আওয়াজের পরিবেশিত অনু-ষ্ঠানে চিত্তপ্রিয় মুখোপাধ্যায়, ধান-আওয়াজ, মঞ্জু ঘোষ, সুষমা সিংহ ও সৌরেন পাল অপূর্ব দক্ষতার সংগে সংগীত পরিবেশন করে যথেষ্ট প্রশংসা পান। রবীন্দ্রসংগীত, লোক-গীতি, আধুনিক, রাগপ্রধান তাছাড়া ভিন্ন দেশের গান পরিবেশন করেন। রবীন সরকার যন্ত্রসংগীত ছাড়া ব্যবস্থাপকের দায়িত্ব পালন করেন

সঙ্গীত কথা

হারামণির সন্ধানে

মধ্যপ্রদেশের জব্বলপুর অঞ্চলের লোক-সংগীত সম্বন্ধে বলছি। জব্বলপুর পার্বত্য অঞ্চল। মনোরম স্থান। শুনতে পাওয়া যায়, জবলা ঋষির আশ্রম ছিল এখানে। কেউ বা বলেন, জবল নামক রাক্ষস বাস করত এখানে। তাই নাকি এস্থানের নাম হয়েছে জব্বলপুর। জব্বল-পুর হলো পাহাড়ের দেশ, অরণ্যের দেশ।

বাংলার মতই উৎসবময় এ দেশ। প্রতিটি উৎসবে মেলা বসে। মেলায় কত সুন্দর লোক-শিল্পের আমদানী হয়। মেলায় নাগরদোলায় পুরুষ-রমণী দলে দলে দুলতে থাকে। সাধুসন্তরা তাম্বুরা ও রামতারীর সাথে ধর্মগীতি গাইতে থাকে। রসপিপাসু যাঁরা, তাঁদের নিকট এসব চমৎকার লাগে।

শ্রাবণ মাস। এখানে অতিরিক্ত বর্ষা। তবু গাছে গাছে 'ঝুলা' টাঙান হয়। রমণী ও পুরুষরা এইসব ঝুলায় ঝুলে আর ছড়া গান গায়। তারা মেতে ওঠে আনন্দে। পূর্ব জব্বলপুরের লালমাটি গ্রামে একটি ঝুলায় দুটি কিশোর-কিশোরী, পার্বতীয়া আর শ্যামনন্দন ঝুলছে আর যৌথভাবে গাইছে—

কৃষ্ণ শ্যামরী সাথ রাধিকা
ঝুলন করত বিহার বহিয়া।
রেশম তরকসী ঝুলা
কদম কী ছহিয়া
ঝুলত মোহন রসিয়া।

ওদিকে অপর একটি ঝুলায় অন্য দুটি কিশোর-কিশোরী, নর্মদাবাঈ ও অযোধ্যাপ্রসাদ, গাইছে—

উমা পার্বতী সাথ জটো মে
গঙ্গা রমতী।
ধন্য ধন্য ভোলানাথ
সদা শিব স্বামী ভজতী।

এরা ঝুলায় ঝুলে আর দোলে এ ভারি সুন্দর দোলন খেলা।

পার্বতীয়া, নর্মদাবাঈ এরা শ্রমিক-দের কন্যা। এদেশের গাঁয়ের মেয়ে। পার্বতীয়া দেখবার মত মেয়ে। তার চেহারা তাজা—শক্ত, সমর্থ। চেহারা গ্রাম্য ছাঁদের, শ্যামল বর্ণের। মাথায় কালো কেশ। তার সুঠাম স্বাস্থ্যখানি প্রাচুর্যে ভরা। চলন-ভঙ্গী কতকটা শিথিল। সব থেকে ভাল লাগে তার ডাগর-ডোগর চোখ দুটি। গলার স্বরটি ভারি মিষ্টি। গ্রামের সব্জী যেমন তাজা, ঠিক তেমনি পার্বতীয়া তাজা।

মহালয়ার দিন। গোয়াড়ী ঘাটে নর্মদা তীরে পিতৃমোক্ষ স্নান উপলক্ষে বিরাট মেলা বসে। চোখা সাধু তাম্বুরা ও রামতারীর সাথে গাইছে—

কভি সুমরণে রাম
মন মে কাশী
মন মে গঙ্গা মন মে
কর লিয়া স্নান।

কার্তিকী পূর্ণিমা। ভেড়া ঘাটে নর্মদা তীরে মেলা বসে। ৩০-৪০ মাইল দূর হ'তে দারুণ শীতের মধ্যেও হাজার হাজার নরনারী নর্মদায় স্নান করতে আসে। মেলায় এত ভিড় হয়, যাতে পা ফেলবার জায়গা থাকে না। পথের দু-ধারে হাজার হাজার গরুরগাড়িও জমা-য়েত হয়—এইসব গাড়িতেই যাত্রীরা আসে। মেলায় ঘুরে ঘুরে রামদাস সাধু গাইছে "গুরু মহিমা" সংগীত—

পহিলা নাম গুরু কী গা লৈবী
ফির করিয়ে দুজো কাম।
গুরু মুক্তি কা দাতা।

সোভিয়েট মধ্য এশিয়ার চলচ্চিত্র 'প্রথম শিক্ষক'-এর নায়িকা নাটালিয়া আরিনবাসরোভা। খিরগিজ লেখক চেংগিস আইৎমাটোভ লিখিত কাহিনীর চিত্ররূপ।

বাংলার বাউলের গানের মত এদেশের সংগীত হচ্ছে গুরু মহিমা সংগীত। এগুলি মূলত ভক্তি-সংগীত।

সেদিন ছিল ফাল্গুন মাসের শেষা-শেষি। শীত প্রায় শেষ হয়েছে। সন্ধ্যার পরে সিদ্ধিনাথ পাহাড় থেকে নেমে আসছি। লালমাটির কাছাকাছি কানে এল ঢোলকের বাজনা। এক পা, দু' পা ক'রে নিকটে আসি। জানাশোনা এক শ্রমিকের বাড়িতে বিয়ের উৎসব। গৃহকর্তা একখানা টুল দিলেন বসতে। উন্মুক্ত প্রাঙ্গণে ঢোলকের বাদ্যের সাথে সাথে যৌথ নৃত্য ও সংগীত চলছে। নর্তক-নর্তকীদের মধ্যে পার্বতীয়া ও শ্যামনন্দন নাচে। পার্বতীয়া সেজেছে রাধা, শ্যামনন্দন সেজেছে কৃষ্ণ। পার্বতীয়া আর শ্যাম-নন্দনের রাধাকৃষ্ণ নৃত্য সজীব নৃত্য। সুন্দর উদ্দীপনায় ভরপুর। নয়ন সার্থক হয়ে গেল—রাধাকৃষ্ণের যুগলরূপ প্রত্যক্ষ করলাম। সেদিন ছিল পার্বতীয়া আর শ্যামনন্দনের বিয়ের উৎসব।

আমাদের সহকর্মী শংকরলাল বলে—"চল না আমাদের গাঁয়ে। দেখে আসবে সেখানকার ধরিত্রীর রূপ।"

উভয়ে রওনা হ'লাম। খামারিয়ার ওপারে পিপারিয়া অঞ্চলের পল্লীগ্রাম। চারদিকে পাহাড়। মাঝখানে সমতলভূমি। সেখানকার ধরিত্রীর বুক মধুভরা। সেখানে চাষ করলে সোনা ফলে।

তখন ছিল পৌষ মাস। ধান কাটা শেষ হয়েছে। কৃষকের আঙিনায় খড়ের পালা।

গাঁয়ের প্রবীণ কৃষক বাবুলালের সাথে আলাপ হয়। বাবুলাল পাকা ধানের গান শোনায়—

ধান আমাদের সোনার ফসল। ধরিত্রী আমাদের জননী। তার বুকে অজস্র স্নেহ-সুধা। এই ধরিত্রীর বুকে চাষ ক'রে ফলাই ফসল। ধান পাকে। ধানের গাছে সোনার রঙ্, ধানেও সোনার রঙ্। সেই সোনার রঙে চাষীর নয়নেও রঙ্ ধরায়। কাস্তে দিয়ে ধানের শীষ কেটে ধান বাড়িতে আনা হয়।

তখন আমাদের ঘরে ঘরে নবান্নের ডাক আসে। ধানের ফসলে গোলা ভর্তি। কৃষকের বুকে, কৃষকপত্নীর বুকে, কৃষক-কন্যার বুকে আনন্দের দোলা লাগে। তখন কত ঘরে বিয়ের উৎসব লেগে যায়।

আজকাল আর লোকে ধরিত্রীর সেবা করতে চায় না। কৃষির চেয়ে শিল্পের সেবায় তারা আকৃষ্ট হচ্ছে। এখানকার অধিকাংশ লোকই জব্বলপুরের কারখানা-গুলিতে মজদুরের কাজ নিয়েছে। তারা ভোর পাঁচটায় যায়, রাত্রি নটায় ঘরে ফেরে। মানুষ আজ যন্ত্রের মত হয়ে যাচ্ছে। ধরিত্রী কেঁদে মরে। তার বুকে আগাছা জন্মাচ্ছে।

এই সব কথা বলতে বলতে বাবু-লালের গলা ভারী হয়ে যায়। বাবুলাল নিমন্ত্রণ করে—"বাবুজী, আজ রাত্রে আমার কন্যার বিয়ে। শংকরলালের সঙ্গে। তুমি বিয়েতে এস।"

রাত্রে শঙ্করলালের সাথে বিয়ে বাড়িতে গেলাম। তখন দেখি বাবুলালের বাড়ির অঙ্গনে মেয়েদের করমানৃত্য সুরু হয়ে গেছে।

মাদল বাজে। ঢোলক বাজে। বাজনার তালে তালে যুবতী মেয়েরা নেচে চলেছে। সুঠাম শক্ত তাদের দেহ। স্বাস্থ্যবতী যুবতীদের নৃত্যচ্ছন্দ। ভারী চমৎকার জীবন্ত যৌবনের নৃত্য—মনোরম, নয়নাভিরাম।

নর্তকীরা পুরুষের মত কাছা দিয়ে শাড়ি পরেছে। শাড়ির আঁচলখানি যুবতীদের বুকের মাঝখান দিয়ে কোমরের সঙ্গে জড়িয়ে জড়িয়ে শক্ত ক'রে বাঁধা। মাদলের তালে তালে, ঢোলকের তালে তালে যুবতীরা দুলতে থাকে। যুবতীদের বুকের ওপর দিয়ে তরঙ্গ খেলে যায়, ঠিক যেমন ভরা বর্ষার দিনে পদ্মানদীর বুকে উঁচু উঁচু তরঙ্গ ওঠে। সারারাত্রি ধ'রে এই নৃত্য চলে। এই নৃত্য আদিম পরিবেশে অকৃত্রিম, আসল হ'য়ে ফুটে ওঠে—এতে আছে পল্লী-প্রাণতার খাঁটি ছোঁয়াচ।

জব্বলপুর অঞ্চলে মেয়েদের মধ্যে স্বাধীন ভাবের পরিস্ফুরণ দেখা যায়। মেয়েরা হাট করে, বাজার করে। মেয়েরা হাটে-বাজারে তরি-তরকারী সব জিনিস বিক্রয় করে। মেয়েরা পুরুষের সঙ্গে কথাবার্তা বলে অবাধে, অসঙ্কোচে। এদেশের মেয়েদের মধ্যে এই ট্রাডিশন এল কোথা থেকে?

তখন মনে পড়ে এদেশের বীর রমণী রাণী দুর্গাবতীর কথা। সাড়ে তিন শত বৎসর আগে মোগলদের সঙ্গে তিনি সংগ্রাম করেন। এখানকার মদনমহল পাহাড়ে রাণী দুর্গাবতীর দুর্গ আজও গরীয়সীর বীর্যবত্তার স্মৃতি বহন করছে। আরও মনে পড়ে, কয়েক হাজার বছর আগে এস্থানের অদূরে বিদর্ভ রাজার কন্যা লোপামুদ্রার কথা। রূপসুখিনী রূপোত্তমা লোপামুদ্রা নিঃস্ব ঋষি অগস্ত্যকে ভালবেসে স্বেচ্ছায় বিবাহ করেছিলেন।

—সুরেন্দ্রনাথ দাশ

খেলাধূলা

ফুটবলে পেশাদারত্ব

ফুটবলে পেশাদারত্ব এবং অপেশাদারত্বের প্রশ্নটি বিশেষ গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচনা করে দেখছেন অল ইণ্ডিয়া কাউন্সিল অফ স্পোর্টস। এ আই সি এস-এর সভাপতি জেনারেল কারিয়াপ্পা একজন কমিটি সদস্যের ওপর বিষয়টি বিশ্লেষণ করে দেখার ভার অর্পণ করেছেন। কলকাতা ময়দানে রাজস্থান ক্লাবের শ্রীহিম্মৎসিংকার প্রচেষ্টাতেই ফুটবলে পেশাদারত্ব এবং অপেশাদারত্বের প্রশ্নটি উচ্চমহলে পৌঁচেছে। শ্রীহিম্মৎসিংকা এই বিষয়ে কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী শ্রীচাগলাকে একটি পত্র দেন এবং দিল্লীতে ব্যক্তিগতভাবে তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করে এ বিষয়ে আলোচনা করেন এবং তিনি জেনারেল কারিয়াপ্পাকেও একটি পত্র প্রেরণ করেন। যাই হোক শ্রীচাগলা মৌখিকভাবে এবং চিঠিতে আশ্বাস দেন যে ফুটবলে পেশাদার প্রথার প্রচলন করার প্রস্তাবটি গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচনা করা হচ্ছে। এখন দেখা যাক শিক্ষা মন্ত্রণালয় এবং অল ইণ্ডিয়া কাউন্সিল অফ স্পোর্টসের রায় কি হয়!

ক্লের আগামী লড়াই

ক্যাসিয়াস ক্লের এবার লক্ষ্য হল পশ্চিম জার্মানীর পয়লা নম্বর মুষ্টিযোদ্ধা মিল্ডেনবার্জার। বর্তমানে ক্লে যেভাবে তাঁর বিজয় অভিযান অব্যাহত রেখেছেন তাতে মনে হয় মিল্ডেনবার্জারকেও পরাস্ত করতে তাঁকে বেশি বেগ পেতে হবে না। কয়েকদিন পূর্বে লণ্ডনে ইংলণ্ডের খ্যাতনামা মুষ্টিযোদ্ধা ব্রায়ান লণ্ডনকে ক্লে একেবারে নস্যাৎ করেছেন.

ক্যাসিয়াস ক্লে

মোহনবাগান এবং ইণ্ডিয়ান নেভী দলের শীল্ড খেলায় একটি গোলের প্রচেষ্টা ব্যর্থ করছেন নেভীর গোলরক্ষক বসু।

ক্লে-মিল্ডেনবার্জারের মুষ্টিযুদ্ধের পূর্বাভাসে প্রাক্তন বিশ্ব হেভী ওয়েট চ্যাম্পিয়ান জো লুই বলেছেন যে, ক্লের জয় নিশ্চিত, কারণ গতিতে মিল্ডেনবার্জারের পক্ষে তিনি অনেক দ্রুত।

জো লুই আরও বলেছেন যে. ক্লের এক সম্পূর্ণ নিজস্ব ভঙ্গী আছে। ক্লের আক্রমণধারা একেবারে ত্রুটিহীন নয়, লড়াইয়ের মাঝে ভুলচুক তাঁর বিপক্ষের সুবিধা করে দেয় বটে, কিন্তু ক্লে সব কিছু দোষত্রুটি সামলে নিতে পারেন তাঁর মার্জারের মত ক্ষিপ্রতা এবং দ্রুতগতির

শ্রীঅমিতাভ

জন্য। এবং একথাও ঠিক যে ক্লের লড়াইয়ে লড়াই কখন শেষ হবে তা পূর্বে বলা খুবই শক্ত।

কেক্লমিল্ডেনবার্জারের লড়াই উপলক্ষে ফ্রাঙ্কফুর্টে বিগত দিনের অনেক খ্যাতনামা মুষ্টিযোদ্ধাই আসবেন। জো লুই মিলিত হবেন তাঁর পুরাতন প্রতিদ্বন্দ্বী জার্মানীর ম্যাক্স কিমলিংয়ের সঙ্গে। ১৯৩৮ সালে রিংয়ে তাঁদের শেষ সাক্ষাৎ হয়। লুইকে ম্যাক্স প্রথম লড়াইয়ে পরাস্ত করেন কিন্তু ফিরতি লড়াইয়ে জো লুই জয়ী হন।

ডেভিস কাপ

রমানাথন কৃষ্ণাণ ডেভিস কাপের খেলায় অংশ গ্রহণের ইচ্ছা প্রকাশ করেছেন। অল্প কয়েকদিন হল রমানাথন কৃষ্ণাণ অবশ্য তেহরানে তেমন সুবিধে করে উঠতে পারেন নি। অবশ্য কৃষ্ণাণ বলেছেন যে, নিজের খেলায় তিনি সন্তুষ্ট। তেহরানের প্রতিযোগিতায় তৃতীয় রাউণ্ডের খেলায় কৃষ্ণাণ অবসর গ্রহণে বাধ্য হন। কৃষ্ণাণ ভারতে প্রত্যাবর্তনের পর বলেছেন যে, খেলার মধ্যে তিনি হঠাৎ কোর্টে পড়ে যান এবং হাঁটুতে চোট পান। এই আঘাতের জন্যই তাঁকে তৃতীয় রাউণ্ডে অবসর গ্রহণ করতে হয়। বর্তমানে নাকি তিনি সম্পূর্ণ সুস্থ আছেন।

আশা করা যাচ্ছে জাপানের বিপক্ষে ডেভিস কাপের খেলায় ভারতের পক্ষে রমানাথন কৃষ্ণাণ, জয়দীপ মুখার্জী এবং প্রেমজিৎ লাল অংশগ্রহণ করতে পারবেন। ডেভিস কাপের এই কোয়ার্টার ফাইন্যাল খেলা আগামী ৩০শে সেপ্টেম্বর, ১লা অক্টোবর এবং ২রা অক্টোবর টোকিওতে অনুষ্ঠিত হবে।

শীল্ডে মোহনবাগানের পরাজয়

প্রথম সেমিফাইনালের খেলায় ভারতীয় নেভী দল হেরে গেল। স্থানীয় বি এন আর দল ৯ই সেপ্টেম্বর নেভী দলকে ২—১ গোলে পরাজিত করে আই এফ এ শীল্ডের ফাইনালে ওঠবার গৌরব অর্জন করল। এর আগে ১৯৬৩ সালে রেল দল আর একবার ফাইনালে উঠেছিল—এবং শেষ পর্যন্ত ফাইনালে মহমেডান দলকে পরাজিত করে প্রথম শীল্ড বিজয়ের সম্মান লাভ করে। এবার তাদের দ্বিতীয় সুযোগ—এবং ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি হলে আশ্চর্য হবার কিছুই নেই।

খেলার কথা ধরলে বি এন আর দলই যোগ্য বিজয়ী। মোহনবাগানের বিরুদ্ধে নেভী দল যে ক্রীড়ানৈপুণ্য দেখিয়েছিল

তার একান্ত অভাব ছিল রেল দলের বিরুদ্ধে খেলায়। খেলা ১০ মিনিট চলবার পর রেল দল তীব্র আক্রমণধারা রচনা করে এবং নেভী দলের গোলে বারে বারে হানা দেয়। ১৭ মিনিটের সময় রাইট-উইং মিত্র একটি সুন্দর পাশ দেন গোলের মুখে এবং পি সুর এই সুযোগের সুন্দর সদ্ব্যবহার করেন। বিপুল হর্ষ-ধ্বনির মধ্যে বি এন আর প্রথম গোল করে। তিন মিনিটের মধ্যেই নেভী দল গোলটি পরিশোধ করে। খেলার মধ্যে যে আকর্ষণ ও উত্তেজনার সৃষ্টি হয় তা কিন্তু অতি সহজেই ঝিমিয়ে পড়ল। এর কারণ হয়ত দু-দলেই খেলোয়াড় কিছু জখম হয়ে পড়েছিল—নেভী দলের গোলকীপার বোস ব্যাক উচিল এবং রেল দলের রাজেন্দ্রমোহন। শেষের দিকে রেল দল জোর দিয়ে আক্রমণধারা রচনা করে আর একটি গোল করতে সমর্থ হয়। নেভী দলের গোল পরিশোধের শেষ চেষ্টা—পরিহারের তীব্র শট—অল্পের জন্যে গোলের বাইরে দিয়ে চলে যায়।

নেভী দলের বিদায়ে বহিরাগত দলের শেষ আশা নিভে গেল। নেভী দল মোহনবাগানকে পরাজিত করে কিছুটা বিস্ময়ের সৃষ্টি করেছিল। শীল্ডের আসরে প্রথম খেলায় ইন্ডিয়ান নেভীর যে নিষ্প্রভ রূপ ছিল—মোহনবাগানের বিপক্ষে সে খেলার রূপ ছিল সম্পূর্ণ ভিন্ন। মোহনবাগানের পরাজয় কিছুটা অপ্রত্যাশিত বটে—তবে খুবই আকস্মিক বললে নেভী দলের জয়ের কৃতিত্বকে উপযুক্ত মর্যাদা দেওয়া হয় না। কর্দমাক্ত পিচ্ছিল মাঠ মোহনবাগান দলের পক্ষে বিশেষ সুবিধাজনক ছিল এবং প্রথম গোল দিয়ে এগিয়ে যাবার সুযোগ মোহনবাগানই পেয়েছিল। অনেকে ভেবে-ছিল নেভীর জাহাজ পাঁকে আটকে যাবে বিশেষ এগুতে পারবে না। কিন্তু তাদের তরণী অতি সহজেই সাফল্যের তীরে ভিড়ল। ২—১ গোলের ব্যবধানে মোহন-বাগান পরাজিত হ'ল। এই পরাজয়ের পিছনে মোহনবাগানের রক্ষণভাগের ব্যর্থতা সবচেয়ে বেশি চোখে পড়ে। জার্নালের এই খেলায় অংশগ্রহণ করা ঠিক হয়েছে কি না হয়েছে তা নিয়ে মাঠে জোর বাদানুবাদ চলে কারণ ১ম গোলটি তার ভুলের জন্যেই হয়েছে সে বিষয়ে দ্বিমত নেই। মোহনবাগানের বিদায় আই এফ এ শীল্ডের আর্থিক দিকে মস্ত বড় আঘাত।

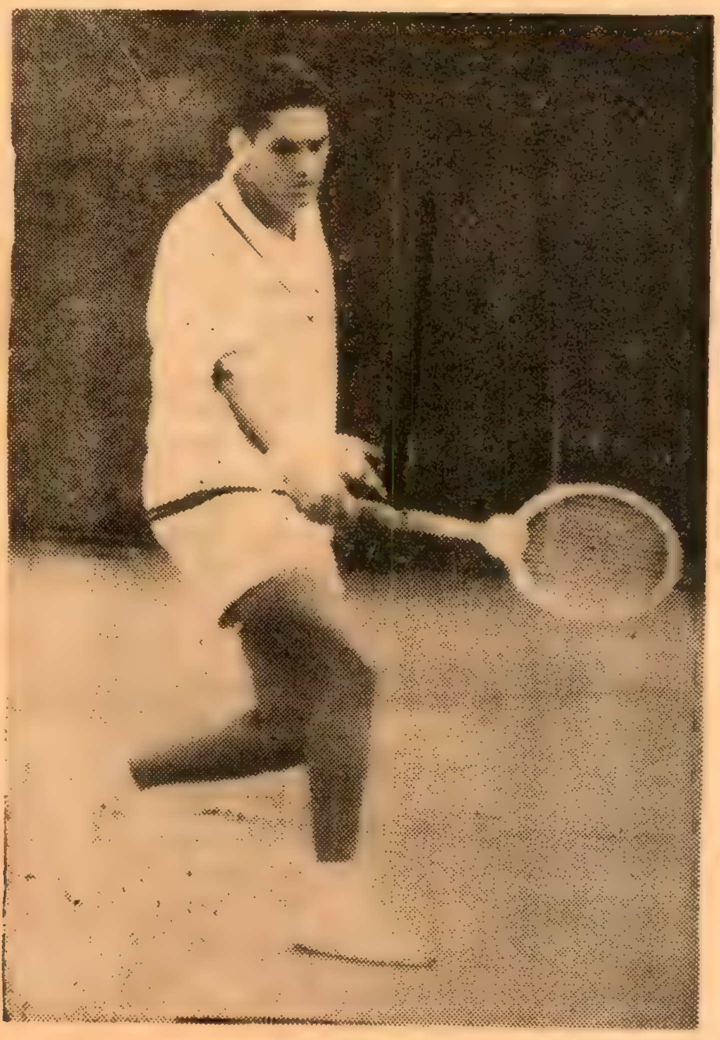

রামানাথন কৃষ্ণাণ

লীগবিজয়ী ইস্টবেঙ্গল কোয়ার্টার ফাইনালে মহমেডান দলের সঙ্গে একদফা ড্র করেছে। ১০ই সেপ্টেম্বরের খেলাটি আবার ড্র হওয়ায় ফাইনাল খেলাটি বেশ পিছিয়ে গেল। প্রথম খেলাটি চ্যারিটি ম্যাচ হয়। খেলাটি খুব উচ্চাঙ্গের হয় নি। ইস্টবেঙ্গল দল বেশি সুযোগ পেয়েছিল—বিশেষ করে সীতেশ দাস ও গুরুকৃপাল সিং অতি সহজ সুযোগ নষ্ট করেছেন। মহমেডান দলের পক্ষে সালাউদ্দিনের একটি তীব্র শট দেবনাথ গোল লাইন থেকে প্রতিহত করেন। শেষ মুহূর্তে সালাউদ্দিন ও নঈমের প্রচেষ্টা থঙ্গরাজ ব্যর্থ করে ইস্টবেঙ্গলের পতন রক্ষা করেন। নির্ধারিত সময়ের পরও অতিরিক্ত সময় খেলান হয় কিন্তু কোন পক্ষই গোল করতে পারে নি। ইস্টবেঙ্গল ও মহমেডান দলের বিজেতার সঙ্গে খেলার জন্যে ইস্টার্ন রেল দল সেমি-ফাইনালে উঠে অপেক্ষা করছে।

বহিরাগত টিমগুলি সম্বন্ধে এই কথা বলা যায় যে তাদের খেলার পদ্ধতি কলকাতায় ভিজে মাঠের সঙ্গে খাপ খাওয়াতে পারে নি। প্রতিদিনই প্রচুর বৃষ্টি হয়েছে ও মাঠ পিচ্ছিল ও কর্দমাক্ত থাকায় তারা স্বাভাবিক খেলা ফুটিয়ে তুলতে পারে নি। বিশেষ করে মধ্য-প্রদেশ, জলন্ধরদল, পাঞ্জাব পুলিশ, হায়দারাবাদ দল—শক্তির দিক দিয়ে খুব দুর্বল নয়। তাদের বহু খেলোয়াড়ের ক্রীড়াচাতুর্য উচ্চাঙ্গের কিন্তু কলকাতার মাঠে তারা তাদের পরিপূর্ণ স্বাক্ষর রেখে যেতে পারল না। এবার শীল্ডের খেলার পরিচালনা মোটামুটি ভালই এবং বহিরাগত দলগুলির এদিক দিয়ে কোন অভিযোগের সুযোগ ঘটে নি।

সমাচার দর্পণ

পশ্চিম জার্মানীতে রে-লিস্টনের লড়াইয়ের পূর্বে প্রতিযোগীরা কোন উত্তেজক পদার্থ গ্রহণ করেছে কি না তা পরীক্ষার জন্য ডাক্তারের সাহায্য গ্রহণের কথা বলেছেন ক্যাসিয়াস ক্লের ম্যানেজার। তিনি বলেছেন যে যদিও অবশ্য এই

ফুটবল পুলের মাহাত্ম্যে

১৯৬৬ সালের ফুটবলের মরশুমটা ইংলণ্ডের পক্ষে বিশেষ স্মরণীয়। বিশ্ব-কাপ প্রতিযোগিতায় ইংলণ্ডের সাফল্যে ইংরাজরা আনন্দে আত্মহারা। বিশ্বকাপ প্রতিযোগিতার অনুষ্ঠান এক বিপুল ব্যাপার। সাফল্যের সঙ্গেই শুধু এই রাজসূয় যজ্ঞ সমাধা হয় নি—যজ্ঞের পুরুস্কার জুলে রিমে কাপ ইংলণ্ডের ভাগ্যেই জুটেছে। কাগজে কাগজে এই নিয়ে বহু অনুকূল ও প্রতিকূল সমালোচনা হয়েছে। কিন্তু তা সত্ত্বেও ইংলণ্ডের ফুটবল প্রতিভার খ্যাতি নিঃসন্দেহে স্বীকৃতি লাভ করেছে। বিশেষ করে ওয়েস্ট ইণ্ডিজের কাছে ক্রিকেটে লাঞ্ছিত হওয়ার পর এই সাফল্য ইংলণ্ডবাসীর বিক্ষুব্ধ হৃদয়ের তৃপ্তিদায়ক সান্ত্বনা।

লণ্ডন থেকে ১১০ মাইল দূরে লিভারপুল শহরে ফুটবলের একটা বড় ঘাঁটি। ফুটবল লীগকে কেন্দ্র করে সেখানে গড়ে উঠেছে বহু ফুটবল-পুলের অফিস। খেলার ফলাফলের ওপর ঠিক-মত বাজি ধরতে পারলে মোটা টাকা পুরুস্কার পাওয়া যায়। এইসব ফুটবল-পুলের প্রতিষ্ঠানগুলির ব্যবসা খুব ফলাও হয়েছে। ইংলণ্ডের সাধারণ লোক খুব বেশি ফুটবল অনুরাগী হয়ে উঠেছে। আগে যারা শেয়ার বাজারে টাকা লগ্নী করত চট করে দু-পয়সা কামাবার জন্যে—তারা ফুটবল-পুলের ভক্ত হয়ে উঠেছে। এই সব ফুটবল-পুলের প্রতিষ্ঠানগুলির হিসাব থেকে জানা যায় ১৯৬৪ সালের জুলাই মাস থেকে ১৯৬৫ সালের জুলাই মাসের মধ্যে ১১ মিলিয়ন পাউণ্ড (১ মিলিয়ান=১০ লক্ষ) বেশি বাজি ধরা হয়েছে আগের বছরের তুলনায়। এই সব ফুটবল-পুলের কুপন-গুলি ধনী-দরিদ্র, শিক্ষিত-অশিক্ষিত সকল শ্রেণীর লোকই নিজের বুদ্ধিমত খেলার ফলাফল লিখে পাঠিয়ে দেয়। সপ্তাহে সপ্তাহে পুরুস্কার ঘোষণা করা হয়। সেপ্টেম্বরের প্রথম সপ্তাহের ঘোষণায় এক দরিদ্র কৃষি-মজুরের রাতারাতি ভাগ্য ফিরে গিয়েছে। পুরুস্কারের পরিমাণ ৩৩৮,৫৬৬ পাউণ্ড। ফুটবলের দৌলতে কালকের ভিখারী আজকের রাজা।

ফুটবল না খেলেও দরিদ্র কৃষক আজ সারা ইংলণ্ডের আলোচনার বস্তু। বাহান্ন বছরের প্রৌঢ় এই কৃষক এই প্রথম ফুটবল-পুলের কুপন ভর্তি করেন। প্রথম

জয়দীপ মুখার্জী

ব্যাপারে ডাক্তারী পরীক্ষা গ্রহণ সম্বন্ধে কোন বাঁধাধরা নিয়ম নেই তবুও বিশ্ব হেভী ওয়েট লড়াই বলে ডাক্তারী পরীক্ষা করলে ভাল হয়। ক্লের ম্যানেজার ডাণ্ডী বলেছেন যে এবার ইংলণ্ডে বিশ্ব কাপের খেলায় এই ধরণের ডাক্তারী পরীক্ষা হয়েছে বলে তিনি মনে করেন যে কোন বিশ্ব প্রতিযোগিতায় এই ধরণের ব্যবস্থা গ্রহণ করা উচিত।

* * *

বৃটেনের এক ষোল বছরের স্কুলের মেয়ে ইংলিশ চ্যানেল অতিক্রম করেছেন। ইতিপূর্বে এত অল্পবয়সী বৃটেনের কেউই ইংলিশ চ্যানেল অতিক্রম করতে সক্ষম হয় নি। মেয়েটি ইংলিশ চ্যানেল অতিক্রম করতে সময় নেয় ২০ ঘণ্টা ৫০ মিনিট।

• • •

এবারের পূর্বাঞ্চলের আন্তঃ বিশ্ব-বিদ্যালয় ফুটবল প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হবে মধ্যপ্রদেশের সগরে। প্রতিযোগিতা সুরু হবে আগামী ৪ঠা অক্টোবর। পূর্বাঞ্চলের মোট তেরোটি বিশ্ববিদ্যালয় এবারের প্রতিযোগিতায় যোগদান করেছেন।

দেশ সেবায় নিয়োজিত,
এ্যালবার্ট ডেভিড লিমিটেড
কলিকাতা—৫০
নীতি ও বিজ্ঞানানুযায়ী ঔষধ
প্রস্তুতকরণের অগ্রণী
—ব্রাঞ্চ সমূহ—
বোম্বে - মাদ্রাজ - দিল্লী - নাগপুর
বেজওয়াডা - শ্রীনগর - গৌহাটী

আই এফ এ শীল্ডে ইণ্ডিয়ান নেভী দল

সপ্তাহে তিনি জেতেন ১০ শিলিং। এতে মনে মনে খুব উৎসাহ পেলেন। আবার একটা ৩ শিলিং ৯ পেন্স দিয়ে কুপন কিনে ভাগ্য পরীক্ষা করলেন। দ্বিতীয় প্রচেষ্টায় তিনি যে পুরস্কার পেলেন তা ফুটবল-পুলের ইতিহাসে রেকর্ড।

টেলিভিশনের সামনে যখন তাঁকে দাঁড় করান হ'ল পুরস্কার লাভের খবর দিয়ে—তখনও তিনি সমস্ত জিনিসটা বিশ্বাস করতে পারছেন না। যেন স্বপ্ন দেখছেন। চিমটি কেটে দেখলেন সত্যই জেগে আছেন না ঘুমুচ্ছেন। প্রশ্নের উত্তরে বললেন—দারিদ্র্যের সঙ্গে লড়াই করে বেঁচে থাকা ছাড়া অতীত জীবনের আর কিছুই মনে পড়ছে না। গ্রাম ছেড়ে কোন দিনই কোথাও বেড়াতে যাই নি—মাত্র ২০০ মাইল দূরে লণ্ডনে আসবার সৌভাগ্য হয় নি—রাণীকে দেখবার বড় ইচ্ছা ছিল কিন্তু তাও সফল হয় নি। ৫২ বছরের জীবনে মনে পড়ে না ১টা দিনের জন্য ছুটি উপভোগ করেছি। চাকরি হারাবার ভয়ে রোগ-বালাইকে কাছে ঘেঁসতে দিই নি কোন দিন। পাঁচটি সন্তানকে মানুষ করতে হয়েছে—স্ত্রীকেও আলুর খেতে দিনমজুরী করতে হয়েছে আয় বাড়ানর জন্যে। একটার বেশি ভাল জামা-কাপড় নেই।

ফুটবলের কৃপায় আজ তিনি বিপুল সম্পদের মালিক। যে সব খেলার ফলাফল তিনি নির্ভুলভাবে গণনা করেছেন—তার কিছুই তিনি দেখেন নি। যে সব খেলোয়াড়ের প্রাণপাত পরিশ্রমে খেলার ফলাফল তাঁর গণনার সঙ্গে মিলেছে—তাঁর পুরস্কারলাভের পথ প্রশস্ত করে দিয়েছে—তাদের তিনি কোনদিন দেখবার সুযোগ পান নি—তবু তাদের প্রতি কৃতজ্ঞতায় অন্তর তাঁর পূর্ণ।

কৃষকদম্পতির শেষ কথাগুলি বড় করুণ—"ঈশ্বরের অপার করুণায়—আর আমাদের শীতের ভোর রাত্রে বিছানা থেকে উঠে কাজে বেরুতে হবে না।" ফুটবল আজ তাদের দারিদ্র্য থেকে মুক্তি দিয়েছে।

—সুদর্শন

শ্রীযামিনীমোহন কর প্রণীত

কলা দেখিয়ে

মূল্য : এক টাকা

ছেলেদের জন্য আর একখানি রহস্যোপন্যাস। পাঠ আরম্ভ করিলে শেষ না করিয়া ছাড়া যায় না।

উপহার দিবার যোগ্য বই

প্রসিদ্ধ চিত্রশিল্পী শ্রীশৈল চক্রবর্তী দ্বারা সুচিত্রিত।

ছাপা ও বাঁধাই মনোহর।

বসুমতী প্রাইভেট লিমিটেড

১৬৬, বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী ষ্ট্রীট, কলি-১২

সম্পাদিকা—জয়ন্তী সেন

বসুমতী (প্রাঃ) লিঃ-এর পক্ষে ১৬৬, বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী ষ্ট্রীটস্থ কলিকাতা-১২ বসুমতী প্রেস হইতে শ্রীসুকুমার গুহমজুমদার কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

সাপ্তাহিক বসুমতী

কলকাতার রাজপথে মাধ্যমিক শিক্ষক-শিক্ষিকাদের অবস্থান ধর্মঘট

সংখ্যা, বৃহস্পতিবার, ৫ই আশ্বিন, ১৩৭৩ বঙ্গাব্দ ★ 22nd Sept., 1966 * Vol. 71, N

ফেমিলা স্নো
একালের রূপ-কথায় শেষ কথা
বোরোলীন হাউস, কলিকাতা-৩

সূচী

বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা
সম্পাদকীয়		৯৬৩
আজকের মানুষ		৯৬৪
ভারতদর্শন		৯৬৫
আন্তর্জাতিক		৯৭০
বেদব্যাস-এর রস-রচনা : অমৃতসন্ধান		৯৭৩
এইচ, জি ওয়েলস্-এর গল্প	— বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য	৯৭৫
শ্রীনলিনীকান্ত সরকার—সংযোজন	— পরিমল গোস্বামী	৯৮০
সুবর্ণলতা (ধারাবাহিক উপন্যাস)	— আশাপূর্ণা দেবী	৯৮২
বিপ্লব প্রচেষ্টার একটি বিস্মৃত অধ্যায়	— সত্যেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়	৯৮৫
বঙ্গদর্শন		৯৮৯
ব্যবধান (গল্প)	— অতুলরঞ্জন দেব	৯৯৩
অবসর আকাঙ্ক্ষায় (কবিতা)	— মনোরমা সিংহরায়	৯৯৬
পুরুষ ও প্রকৃতি (অনুবাদ-গল্প)	— আর্যভট্ট	৯৯৭
অস্ট্রেলিয়া থেকে লিখছি	— সুরেশচন্দ্র সাহা	১০০০
বিশ্বসাহিত্যের আদিপর্ব	— ডঃ নরেন ভট্টাচার্য	১০০৪
অগ্নিযুগের একটি অধ্যায়	— অনন্ত সিংহ	১০০৭
একজন শিক্ষিকার কাহিনী (কবিতা)	— সুনীলকুমার চট্টোপাধ্যায়	১০১১
রঙ্গমঞ্চ—ওদেশে এবং এদেশে	— শিলালি	১০১২
পাঠকমন		১০১৫
রঙ্গজগৎ		১০১৬
খেলাধুলা	— শ্রীঅমিতাভ	১০২১

শারদীয়

সাপ্তাহিক বসুমতী

সম্পাদিকা : জয়ন্তী সেন

প্রিয় লেখকের জনপ্রিয় রচনায় স্ব-তন্ত্র নয়, থাকবে স্বাতন্ত্র্য; বিচ্যুতি নয়, থাকবে বিদ্রোহ। যুগ-সমাজের পূর্ণাঙ্গ পরিচয় নিয়ে এক একটি রচনায় মূর্ত হবে একালের অসংখ্য চরিত্র—তাদের জটিল জীবন যন্ত্রণার সঙ্গে সুগভীর জিজ্ঞাসা। তারি পাশাপাশি থাকবে বিজ্ঞানাচার্য সত্যেন বোস প্রমুখ খ্যাতিসম্পন্ন গুণীদের অশ্রুতপূর্ব স্মৃতিকথায় ব্যক্তিকথা থেকে একালের আদিকথা।

তিনটি উপন্যাস

লিখছেন নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, পরিমল গোস্বামী, সুশীল রায়

আশাপূর্ণা দেবীর বড় গল্প

গল্প লিখছেন

অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত, আশা দেবী, নরেন্দ্রনাথ মিত্র, লীলা মজুমদার, স্বরাজ বন্দ্যোপাধ্যায় ও আরো অনেকে

রিপোর্টাজ

সুভাষ মুখোপাধ্যায়

প্রতিনিধিত্বমূলক বিদেশী গল্পের অনুবাদ

ভবানী মুখোপাধ্যায় এবং আরো কয়জন

এইচ. জি. ওয়েলস-এর জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষে ওয়েলস-এর রচনার বিস্ময়কর আলেখ্য রচনা করেছেন

ডঃ বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য

এছাড়া লিখছেন

অনন্ত সিংহ, অরুণ মিত্র, অশোক সেন, কল্পতরু সেনগুপ্ত, জ্ঞানপ্রকাশ ঘোষ, দেবীপ্রসাদ রায়চৌধুরী, ধীরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় (ডি, জি) নলিনীকান্ত সরকার, প্রেমেন্দ্র মিত্র, বিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায়, বিষ্ণু দে, মন্মথ রায় এবং আরো অনেকে।

॥ খ্যাতিমান কবিদের স্বনির্বাচিত একগুচ্ছ কবিতা এবারের বিশেষ আকর্ষণ ॥

মূল্য : আড়াই টাকা

এজেন্ট, গ্রাহক ও বিজ্ঞাপনদাতাগণ অবিলম্বে যোগাযোগ করুন

দি বসুমতী প্রাইভেট লিমিটেড
১৬৬ বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী স্ট্রীট
কলিকাতা-১২

৭১ বর্ষ ঃ ১৬শ সংখ্যা—মূল্য ২৫ পয়সা
বৃহস্পতিবার, ৫ই আশ্বিন, ১৩৭৩ বঙ্গাব্দ

বাংলা ভাষায় দ্বিতীয় সর্বাধিক প্রচারিত
সাপ্তাহিক পত্রিকা

Price : 25 Paise
Thursday, 22nd Sept., 1966

শিক্ষকদের দাবি স্বীকৃত হোক

মাধ্যমিক শিক্ষক-শিক্ষিকাগণ রাজপথে অবস্থান করছেন। মাধ্যমিক বিদ্যালয়-গুলিও শিক্ষকদের ধর্মঘটের জন্য বন্ধ। এমন সময় আমরা তবে কি কিছু কিছু শ্রুতিসুখকর সংবাদ শুনছি এবং দৈনিক সংবাদপত্রে সেই রকম বিবৃতি পাঠ করছি? কিন্তু নীট কি লাভ হচ্ছে? কোথায় কোন্ বিদ্যালয়ে ছাত্ররা নিজেরাই শিক্ষকের আসনে বসে পড়াশুনা চালিয়েছে এ ধরণের সংবাদে যথেষ্ট চমক থাকতে পারে, কিন্তু যে সমস্যার আশু সমাধান প্রয়োজন তার কি কিছু ফয়সালা হবে?—এ সংবাদ যাঁরা পরিবেশন করেন তাঁরাও ভালো ভাবে জানেন যে, যেখানে হাজার হাজার বিদ্যালয় বন্ধ সেখানে কোনো একটি বিশেষ বিদ্যালয়ের ছাত্ররা ক্লাস নিলেও ফয়সালা কিছু হবে না। ফলাও করে এ সংবাদ প্রকাশ করা হলে আশার আলো দেখা যায় না, বরং এটাই সত্যি যে, প্রকৃত ঘটনা যে পথে চলার সে পথেই চলে এবং সাময়িকভাবে যদিও প্রকৃত ঘটনাকে বিপথে চালিত করা সম্ভব হয়, অবস্থার কোনো পরিবর্তন হয় না। একটি বিবৃতি বেশ মুখরোচক কারণ সেই বিবৃতিতে বলা হয়েছে বর্তমানে বিদ্যালয় বন্ধ থাকার দরুণ ছাত্ররা যেন মাইনে না দেয়।

মাইনে না দেওয়ার দাবিতে যথোচিত সাড়া জুটলে নিশ্চয়ই অভিভাবকরাও এগিয়ে আসবেন। এর কারণ মধ্যবিত্ত জীবনে যে আর্থিক সঙ্কট দেখা গেছে, তাতে এক টাকাও যদি রেহাই হয়—সেটাও মন্দ নয়।

আমরা প্রসঙ্গত, এখানে স্মরণ করিয়ে দিই—বিবৃতি যাঁরা দেন তাঁরা কি একেবারেই অন্ধ। বেসরকারী কলেজে অ-শিক্ষক কর্মচারীদের ধর্মঘটের ফলে কলেজ কর্তৃপক্ষ যখন কলেজগুলি বন্ধ করে দেন, আমরা তখন সম্পাদকীয় মারফৎ আবেদন করেছিলাম—যাতে ক্ষতিগ্রস্ত কলেজের ছাত্রছাত্রীদের কাছ থেকে ধর্মঘট চলা কালীন কয়েক সপ্তাহের মাইনে গ্রহণ করা না হয়; দুঃখের বিষয় এখন যাঁরা বিবৃতি দিচ্ছেন তখন তাঁরা হয় অন্ধ ছিলেন কিংবা আসল ঘটনা জেনে শুনেও নীরব দর্শকের ভূমিকা পালন করেছিলেন। সবচেয়ে দুঃখের ব্যাপার এঁরা বিবৃতি দিতে হঠাৎ গজিয়ে ওঠেন। তা নইলে এখন যাঁরা ছাত্রদের দুঃখে অশ্রুপাত করছেন—তাঁরা ছাত্রদের মাইনে বৃদ্ধির সময় চুপচাপ থাকেন কেন? অথবা আজ যে প্রায় সব বিদ্যালয়েই ডেভেলপমেন্ট ফি আদায় করা হচ্ছে তার বিরুদ্ধে তাঁরা একটি কথাও কোনোদিন বলেন নি কেন?

আমরা মনে করি, মাধ্যমিক শিক্ষকগণ যে দাবি নিয়ে পথে নেমেছেন, তা অন্যায় দাবি নয়, এই দাবির ব্যাপারে সরকারের সঙ্গে শিক্ষক প্রতিনিধির পারস্পরিক আলোচনা হওয়া দরকার। কিন্তু সে আলোচনার পথে প্রধান বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে নাকি সরকার পক্ষের বিভ্রান্তি-কর বিবৃতি।

শিক্ষামন্ত্রী শ্রীরবীন্দ্রলাল সিংহ শিক্ষকদের ধর্মঘট সম্বন্ধীয় যে বিবৃতি দিয়েছেন তার প্রতিবাদ করে নিখিল বঙ্গ শিক্ষক সমিতির সম্পাদিকা বলেছেন যে, শিক্ষামন্ত্রীর বিবৃতি অর্ধসত্য ও অসত্য কথায় পরিপূর্ণ এবং জনসাধারণকে ভ্রান্ত পথে পরিচালনা করাই উহার উদ্দেশ্য।

বস্তুত, আমরাও হিসেব করে দেখেছি যে, সরকার যে পরিমাণ বেতনবৃদ্ধির হিসেব দিয়ে পূর্বে তালিকা পেশ করেছেন তাতে সত্যিকারের বেতনবৃদ্ধি ঘটে নি। একমাত্র বলা যেতে পারে মাসিক দশ টাকা বেড়েছে সেই সব স্নাতক ও স্নাতকোত্তর শিক্ষকদের যাঁরা বি টি নন। এখানেও প্রশ্ন ওঠে যে, এই বি টি না হওয়ার জন্যে নিশ্চয়ই শিক্ষকরা দায়ী নন। সেই কারণে যাঁদের তিন বছরের শিক্ষকতার অভিজ্ঞতা আছে। তাঁদের বি টি-র সমতুল্য বলে গণ্য করা অবশ্য কর্তব্য এবং সেইভাবে বার্ষিক মাইনে বৃদ্ধি করার জন্যে সরকার কর্তৃক নির্দেশ দান করা উচিত।

শিক্ষামন্ত্রীর বিবৃতিতে আর একটি প্রধান বিষয় উল্লিখিত হয়েছে। বিষয়টি হচ্ছে এই যে ১৯৬৬ সালের আগস্টে সংশোধিত বেতনক্রমটি সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সংগে পরামর্শক্রমে ঘোষণা করা হয়েছে। অথচ নিখিল বঙ্গ শিক্ষক সমিতির সমিতির সম্পাদিকা প্রতিবাদ জানিয়ে বলেছেন যে, শিক্ষামন্ত্রী শিক্ষক সমিতির প্রতিনিধিদের সঙ্গে শেষ সাক্ষাৎ-কারের সময় এই বেতনক্রম সম্বন্ধে কোনো আলোচনা করতে অস্বীকার করেন।

জানি না, বিবৃতির মাধ্যমে এ ধরণের লুকোচুরি খেলার কারণ কি? শিক্ষামন্ত্রী নিশ্চয়ই অন্য কোনো শিক্ষা-সমিতির সঙ্গে পরামর্শ করেন নি। কারণ প্রধান শিক্ষক সমিতিও সর্বস্তরের মাধ্যমিক শিক্ষকদের মাইনে বৃদ্ধির সূচী দেখে তুষ্ট ন'ন। এ ছাড়া পেনসেনের নামেও রয়েছে দারুণ ধাপ্পা। মাগ্গীভাতার ব্যাপারেও শিক্ষক ও অশিক্ষক কর্মচারীরা রীতিমতো বঞ্চিত!

বর্তমান অবস্থায় বিদ্যালয়গুলি খোলার জন্যে এখন বিবৃতির পরিবর্তে সামনাসামনি আলোচনা কে না কামনা করেন? আর সেই আলোচনার সফল সমাধানের জন্য অর্থও দরকার। পশ্চিমবঙ্গ সরকার অন্তত সেই পরিমাণ অর্থ শুধু শিক্ষার খাতেই কি ব্যয় করতে অসমর্থ?

সম্পাদকীয়

আজকের মানুষ

ওলট-পালট রাজনীতির একটা নিয়ম-ধর্ম, স্থিরতা-স্বাভাবিকতাই হলো এর ব্যতিক্রম। এবং এ ওলট-পালট কেবল রাষ্ট্রযন্ত্রের পক্ষেই নয়, ব্যক্তিজীবনের বেলায়ও সমান সত্যি। রাজনীতির এ-চিত্রচরিত্র সর্বশেষ উপহার দিলো সংযুক্ত আরব প্রজাতন্ত্র ঃ প্রধানমন্ত্রীর আসন থেকে অপসারিত হয়েছেন জ্যাকেরিয়া মহিউদ্দিন, স্থলাভিষিক্ত হয়েছেন সিদকী সোলিমান।

রাজনীতি আবার নিয়ম-কানুনের বিশেষ ধার ধারে না, কিম্বা আকস্মিকতাও নেহাৎ এ রাজ্যে অচল তাই, নইলে বলা যেত সোলিমান একজন চাঁদ-কপালে পুরুষ। কারণ প্রধানমন্ত্রীর গদী যাঁরা আশা করতে পারেন তাঁদের প্রোবাবল্ বা সম্ভাবনাপূর্ণ দলেও তাঁর স্থান ছিল না। সোলিমান রাজনীতি করেন নি কোনো কালে, মূলত তিনি এঞ্জিনীয়ার, টেকনোক্র্যাট বললেই তাঁর সঠিক পরিচয় দেওয়া হয়। অর্থাৎ তাঁর পূর্ববর্তী দুই প্রধানমন্ত্রী আলি সাব্রী বা জ্যাকেরিয়া মহিউদ্দিন যেমন সংযুক্ত আরবের রাজনীতির সঙ্গে, তার গণজীবনের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত ছিলেন, সোলিমান সেই উত্তপ্ত আবহাওয়া থেকে দূরে ছিলেন। এমন কি সামরিক পুরুষ হওয়া সত্ত্বেও যে-ফ্রি অফিসার গ্রুপ ১৯৫২ সালের বিপ্লবে নেতৃত্ব দিয়েছিল, সেই দলেও তাঁর স্থান ছিল অনেক নিচে। সেদিক থেকে বিচার করতে গেলে প্রধানমন্ত্রীর পদে সোলিমানের চান্স কোথায়?

সিদকী সোলিমান এঞ্জিনীয়ার এবং একজন পাকা, সুদক্ষ এঞ্জিনীয়ার। যে-আসোয়ান বাঁধ নিয়ে একদিন বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ড তোলপাড় হয়ে গিয়েছিল, সে-বাঁধের পরিকল্পনা সোলিমানেরই মাথা থেকে আসে। তাঁরই সুযোগ্য কর্মপরিচালনায় এই ঐতিহাসিক বাঁধের কাজ সম্পন্ন হয়েছে। আজ আসোয়ান ও সোলিমানের নাম তাই একাকার হয়ে গিয়েছে।

সোলিমানের খ্যাতি প্রধানত বিশেষজ্ঞ হিসেবেই, যে-দায়িত্ব তাঁকে দেওয়া হয়েছিল তার প্রতিটিতেই অপূর্ব সাফল্যের অভ্রান্ত স্বাক্ষর রেখে তিনি অর্জন করেছেন সেরা প্রশাসকের দুর্লভ সম্মান। উৎপাদন পরিষদ সচিব, অর্থনৈতিক সংস্থার পরিচালক, বিল্ডিং মেটিরিয়াল এবং রিফ্র্যাক্টরির চেয়ারম্যান—প্রতিটি পদেই সোলিমান দেখিয়েছেন অসাধারণ যোগ্যতা ও কর্মকুশলতা। প্রেসিডেন্ট নাসের কি আজ নতুন কর্মভার দিয়ে সোলিমানের যোগ্যতা নতুনভাবে পরখ করতে চাইছেন?

১৯১৬ সনে তুক গ্রামের এক নিম্ন মধ্যবিত্ত পরিবারে সোলিমানের জন্ম। ছোটবেলা থেকেই সোলিমান অত্যন্ত মেধাবী ছিলেন, পরিবারের আশাভরসার স্থল ছিলেন সোলিমান। কায়রো বিশ্ববিদ্যালয়ে এঞ্জিনীয়ারিং পড়ার সুযোগ করে দেওয়া হয়েছিল তাই তাঁকে। এর পরে যোগদান করেন সামরিক বাহিনীতে। ১৯৫২ সালের বিপ্লবের পর যখন সোলিমানকে জাতীয় উৎপাদন পরিষদের সেক্রেটারী-জেনারেলের পদ দেওয়া হয় তখন তাঁর বয়স মাত্র ৩৬ বছর। এই পদে থেকেই তিনি আসোয়ান বাঁধ পরিকল্পনা হাজির করেন, তাঁর অনুন্নত দেশের দ্রুত শিল্প ও কৃষি উন্নয়নের জন্যে তিনি এ-বাঁধের অপরিহার্যতা ঘোষণা করলেন।

সিদকী সোলিমান

টেক্নিক্যাল বা কারিগরি কাজপাগল লোক যাঁরা—রাজনীতির প্রতি তাঁদের স্বাভাবিক আকর্ষণ বা মোহ কম থাকে; সোলিমানকেও তাই রাজনৈতিক মঞ্চে বিশেষ দেখা যায় নি, মতাদর্শ নিয়ে মাথা ঘামাবার অবকাশ মিলেছিল স্বল্প। আলী সাব্রী যদি রাজনৈতিক মতবাদের দিক থেকে বামপন্থায় বিশ্বাসী হন, বা জ্যাকেরিয়া মহিউদ্দিন হন জাতীয়তাবাদী মধ্যপন্থী বা কারো কারো মতে দক্ষিণপন্থী, তবে সিদকী সোলিমানকে বলতে হয় যে তিনি একান্তভাবেই স্বতন্ত্রপন্থী, তাঁর নিজস্ব কোন 'ইজ্‌ম' নেই, কাজের লোক তিনি, দেশের জন্যে, দশের জন্যেই নিবেদিত-প্রাণ তাঁর। সোভিয়েট রাশিয়ার সর্বশ্রেষ্ঠ সম্মান অর্ডার অফ লেনিন পুরস্কার তাঁর এ বাবদেই জুটেছিল।

নিরন্তর কর্মসমুদ্রে ডুবে থাকেন বলে সোলিমানের বিদেশ সফরের সুযোগ বিশেষ ঘটে নি—আজকের দিনে দেশের প্রধানমন্ত্রী হবার পক্ষে যেটা একটা অন্যতম যোগ্যতা হিসেবে বিবেচিত হয়ে থাকে। কিন্তু সেই কাজের খাতিরেই তাঁকে সোভিয়েট রাশিয়ায় যেতে হয়েছে কয়েকবার, তাঁর মানসপুত্র আসোয়ান বাঁধের সাফল্য ও সম্পূর্ণতার পেছনে তো সোভিয়েট সাহায্যেরই ইতিহাস। সোভিয়েটের সঙ্গে সোলিমানের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক লোকমনে এ-প্রতীতি জানাতে সহায়তা করেছে যে, তিনি বামপন্থার দিকে ঝুঁকবেন।

কিন্তু রাজনীতিতে কি সঠিকভাবে ভবিষ্যদ্বাণী করা চলে? বিশেষত রাজনীতি-নিস্পৃহ সোলিমান সম্পর্কে? দল-নেতা সাব্রীর সঙ্গে সরকার-নেতা মহিউদ্দিনের ক্ষমতা দ্বন্দ্বের ফল্গুধারা প্রবাহিত হচ্ছে, প্রেসিডেন্ট নাসের তাই নির্দলীয় এবং রাজনৈতিক কলহের ঊর্ধ্ববিহারী সোলিমানকে হয়তো প্রধানমন্ত্রীর পদ দিয়েছেন। পর্যবেক্ষকদের এ-সব অনুমানই হয়তো সত্যি, কিন্তু তার চেয়েও বড় সত্যি হলো, নীতিনির্ধারণের ব্যাপারে যে-পদের বিশেষ কোন ক্ষমতা নেই, সে-পদে তিনি একজন এ্যাসিড-পরিশুদ্ধ ব্যক্তিকেই চাইছিলেন। এবং ৫০ বছরের সিদকী সোলিমান যে সে বিচারে যোগ্যতম ব্যক্তি সে-বিষয়ে সন্দেহ আছে কি?

সীমান্তে শারদীয়া

পাক-ভারত সীমান্তের পুঞ্জীভূত মেঘ বুঝি এবার উজ্জ্বল সূর্যালোকের সংবাদে নীল দিগন্তকে পথ ছেড়ে দিয়ে সরে দাঁড়াবে। তাসখন্দের তরণী এবার কি সত্যই আসবে বৈরিতার বৈতরণী পার করতে। যদি সম্ভব হয়, ভারতের মতো সুখী আর কে হবে?

সৌভাগ্যত দীর্ঘকাল পর তারই এক-ছিটে ভরসা যেন দেখা যাচ্ছে মেঘাবৃত সীমান্তের দিকচক্রবালে। রামধনুর ঔজ্জ্বল্য পাক-ভারতের দুই সীমায় যেন দুই প্রান্ত প্রসারিত করতে সম্মত হয়েছে।

নেহরু-শাস্ত্রী-গান্ধী তিন আমলেই পাকিস্তানের সঙ্গে সীমান্ত সঙ্ঘর্ষের অবসান একান্তভাবে কামনা করে আসছে ভারতবর্ষ। শাস্ত্রী আমলে একটা মুখো-মুখী বোঝাপড়ার পর সোভিয়েটের আগ্রহে তাসখন্দ চুক্তিও সম্পাদিত হয়েছে; কিন্তু সুফল ফলতে বিলম্ব হয়েছে তারও পর।

সম্প্রতি (১৩।৯।৬৬) পাকিস্তানের ভাবী প্রধান সেনাপতি সি-এন-সি লেঃ জেনারেল ইয়াহিয়া খান ভারতে পদার্পণ করে ভারতের সেনাধ্যক্ষ জেনারেল পি পি কুমারমঙ্গলমের সঙ্গে বৈঠকে একটি কার্যকরী মতৈক্যে উপনীত হয়েছেন। সীমান্তের ঠান্ডা লড়াই বন্ধ করতে পাক লেঃ জেনারেলের ভারত সফর উল্লেখযোগ্য ভূমিকা গ্রহণ করবে বলে অতঃপর আশা করা যায়।

বৈঠকে স্থির হয়েছে : সীমান্তে সৈন্য চলাচলের প্রয়োজন দেখা দিলে পূর্বাহ্নে তা অপরপক্ষের গোচরে আনা হবে। এবং সীমান্তে অগ্রবর্তী ঘাঁটির দিকে সৈন্য চলাচল করবে না।

রাওয়ালপিণ্ডি যাত্রার প্রাক্কালে বিমান বন্দরে পাক সেনাধ্যক্ষ শ্রী খান বলেন, "জেনারেল কুমারমঙ্গলমের সঙ্গে আলোচনা প্রীতিপূর্ণ হয়েছে। পাক-ভারত উত্তেজনা প্রশমনে আমরা উভয়েই একমত।" একটি 'ফৌজী চুক্তি' সম্পাদন করে উভয় রাষ্ট্রের সেনাধ্যক্ষগণ এই মর্মে আশা প্রকাশ করেছেন যে, চুক্তির ফলে উত্তেজনা হ্রাস পাবে। অবশ্য চুক্তি বিশেষে আমাদের আস্থা ইদানীং খুবই কম। সিন্ধুজল চুক্তির মতো পাক-ভারতের বহুতর চুক্তিই কোন বাস্তব সুফল এ পর্যন্ত প্রসব করে নি, ফৌজী চুক্তি যে ফলবতী হবেই এমন নিশ্চিন্ত আশা বুকে ধরে রাখতে পারেন না সাধারণ মানুষ। কিন্তু উভয় রাষ্ট্রের সেনা-নায়কদ্বয় সীমান্তে উত্তেজনা হ্রাস সম্পর্কে বেশ নিশ্চিন্ত মতামতই প্রকাশ করেছেন। সেই হিসাবে আমরাও তাঁদের নিশ্চিন্তির অংশীদার।

দুই সেনানায়কের সাক্ষাৎকার

বস্তুতপক্ষে একটা সীমান্ত-বিরোধ টাঙিয়ে রেখে উভয়পক্ষই ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। সামরিক খাতে মোটা অঙ্ক নিয়োজিত রেখে দেশের অগ্রগতিকে বাধ্যতামূলকভাবে ব্যাহত করতে হচ্ছে। নিকটতম দুই প্রতিবেশী স্বভাবে পার্টিশন করে আজ দুনিয়ার কাছে কৃপাপ্রার্থী হয়েছে। বিবাদ মিটিয়ে ফেললে বৈদেশিক মাতব্বরীর শিকার হতে হয় না ভারত ও পাকি-স্তানকে। ঘরে বিবাদ ঢুকিয়ে দিয়ে পড়শীরা মজা দেখেন, তখন দলে টানার জন্য পড়শীদের হাত করতে উভয়পক্ষকে ঘর্মাক্ত হতে হয়। বিবাদ যদি মিটে যায় অন্তত অকারণ ঠান্ডা লড়াই যদি উভয় রাষ্ট্রের শক্তির এক বিপুলাংশ অপচয়িত করার সুযোগ না পায় তবে তার ফসল একই সঙ্গে ভারত ও পাকিস্তান আপনাপন গোলায় তুলতে পারে। হয়ত সেদিন সমাগত। সুতরাং স্বাগত জানাই চুক্তিকে, ধন্যবাদজ্ঞাপন করি উভয় রাষ্ট্রের সদিচ্ছাকে আর প্রার্থনা করি, জনস্বার্থে সর্বপ্রকার সীমান্ত বিরোধ মিটিয়ে নিয়ে আমরা যেন নেহরু-স্বপ্ন—শান্তি ও সহাবস্থান বজায় রেখে অগ্রগতির পথে নিত্যনব জয়যাত্রা শুরু করতে পারি।

শারদ প্রভাতের নাতি-প্রখর সূর্য-রোদ্দুর ভারতের সুবিস্তীর্ণ সীমান্ত অঞ্চলে মধুর ও প্রদীপ্ত-ভাস্বর হয়ে উঠুক!

আর এক নাম :

মিহির সেন

তেরই সেপ্টেম্বরের আর একটি সাফল্য ভারতের পক্ষে আকর্ষণ করে এনেছেন বিশ্ববিশ্রুত সাঁতারু শ্রীমিহির সেন।

তেরই সেপ্টেম্বর শ্রীসেন বরফ শীতল বাত্যাক্ষুব্ধ ভয়ঙ্করী দারদানেলেস প্রণালী সাঁতার দিয়ে বিশ্বের প্রথম সাঁতারুরূপে য়ুরোপ-এশিয়ার ঝটিকাবিক্ষুব্ধ জল-হাইফেন জয় করেছেন।

শুধু দারদানেলেস নয়, পক প্রণালী ও জিব্রালটার প্রণালী অতিক্রমণেও তিনিই প্রথম বিশ্ব রেকর্ড সৃষ্টি করেছেন। ভারতীয়দের মধ্যে ইংলিশ চ্যানেল জয় করার সৌভাগ্য তিনিই সর্বাগ্রে লাভ করেন। তাঁর আকাঙ্ক্ষিত প্রতিজ্ঞারূঢ় প্রত্যয়স্থির যৌবন ভারতের গৌরবকে বিশ্বের দরবারে সুপ্রতিষ্ঠিত করেছে। বাংলার দুরন্ত যৌবনের আজ তিনি সার্থক উত্তরাধিকারী।

ঘোঁট কিম্বা চোট অথবা নির্বাচনীজোট

ভারতের যে কোন রাজ্যেই হোক, ক্ষমতাসীন দলের বিরুদ্ধে একটি শক্তি-শালী রাজনৈতিক দলীয় জোট সৃষ্টি করতে হলে বর্তমানে যে অদ্বিতীয় দলের মুখাপেক্ষী হতে হয়, তাহল কম্যুনিস্ট পার্টি। সোবিয়েত ও চীনের বিরোধ এই দলের শক্তি আজ দ্বিধা-বিভক্ত করে দল-টিকে দ্বিখণ্ডিত করে দিয়েছে। আজকের নির্বাচনী জোট সে কারণেই বাম-দক্ষিণ উভয় কমরেডকুলের দিকেই সাগ্রহে তাকিয়ে আছে। অর্থাৎ কংগ্রেস বিরোধী নির্বাচনী জোটকে সফল করে তুলতে হলে দুইপক্ষ কম্যুনিস্ট দলের মধ্যে মতৈক্য প্রতিষ্ঠার একান্ত প্রয়োজন। শুধুমাত্র রাজনৈতিক

দলগুলিই নয়, এজন্য এক বিপুল সংখ্যক নাগরিকও সাগ্রহে দুই কম্যুনিস্ট পক্ষে একটা নির্বাচনী সমঝোতার প্রতীক্ষা করছেন। তাঁরাও পরস্পরের দিকে এগিয়ে আসছেন সত্য, কিন্তু উভয়ের মধ্যে বিদ্বেষ ও রেষারেষির ভাব পরস্পরকে জব্দ করার একটা প্রতিজ্ঞা মনের মধ্যে পুষে রেখেছে।

বাম কম্যুনিস্টদের মধ্যে উগ্রপন্থী বলে কথিত একটি গোষ্ঠী বর্তমান। এ'দের দক্ষিণপন্থায় বিদ্বেষ প্রায় মারমুখী। এ'রা চান দক্ষিণপন্থী কম্যুনিস্টদের সর্বাগ্রে ঘায়েল করতে। রাজনীতির শরিকানায় তাঁদের কাছে পহেলা শত্রু হলেন, দক্ষিণী কমরেডবৃন্দ। উগ্রপন্থীরা গলা ছেড়ে একথা প্রচার করেন। আর এই মনোভাব স্বাভাবিক। ভারতের মাটিতে কম্যুনিস্ট পার্টি বলতে টিকবে কে, এই প্রশ্নে বস্তুত-পক্ষে উভয়পক্ষ কম্যুনিস্টগণের পহেলা শত্রু, অন্যপক্ষ কম্যুনিস্ট হওয়াই স্বাভাবিক। শরিকানা মামলায় নিকটতম দাবিদারই শক্তিশালী। লড়তে হলে তারই ক্ষমতা সর্বাগ্রে খর্ব করার প্রয়োজন। উগ্রপন্থীরা এই প্রয়োজনকে রেখে-ঢেকে ঢোক গিলে প্রকাশ করতে নারাজ। প্রতিদিবসিক বিসম্বাদকে টাঙিয়ে রেখে অপর পক্ষ কম্যুনিস্টদের শক্তিসঞ্চয়ের সুযোগ দিতে গররাজি। বরং, তাঁদের বক্তব্য, আরও পাঁচ বছরের জন্য যদি কংগ্রেসী রাজত্ব অনায়াসে কায়েম হয় তো হোক। পহেলা শত্রু, অর্থাৎ নিকটতম রাজনৈতিক সংগঠনকে, সর্বাগ্রে নিশ্চিহ্ন করা পার্টির স্বার্থে অধিকতর প্রয়োজন। এদিক থেকে বিবেচনা করলে উগ্রপন্থীরা নিষ্ঠাবান সন্দেহ নেই। তাঁদের বিশ্বাস-মতে কম্যুনিজমের ভবিষ্যৎ স্বার্থে নরম অথবা গরম পন্থার কজ্জির লড়াইটাই একমাত্র লক্ষ্য। রাজত্বটা কার হাতে সেটা দ্বিতীয় চিন্তা।

কিন্তু রাজনীতিক্ষেত্রে কট্টর সতীত্ব-পনা, বিশেষত একটি জাতীয় নির্বাচনের মুহূর্তে কম্যুনিজমের কট্টর পন্থাকে 'ধর ধর শ্যাম' করে রক্ষা করার ব্যাপারে সর্বাগ্রাধিকার দান করা কতটা যুক্তিযুক্ত, এ নিয়েও নির্বাচকমণ্ডলীর মধ্যেও আজ তীব্র মতদ্বৈধ দেখা দিচ্ছে। অনেকে মনে করেন, জাতির জীবনে সাধারণ নির্বাচনের প্রশ্নটির গুরুত্বই এই মুহূর্তে অধিকতর। কেন না দেশব্যাপী আজ যে গণ-জাগরণ পরিলক্ষিত হচ্ছে, তা বিশেষ কোন রাজ-নৈতিক লক্ষ্যে স্থির নয়। কিন্তু এই সর্বাত্মক গণচাঞ্চল্য যে কারণে অস্থির, বর্তমান পরিপ্রেক্ষিতে তা উপলব্ধি করা দরকার। তার পূর্ণ মর্যাদা দান করে গণস্বৈর্য পুনঃপ্রতিষ্ঠার একটা সর্ব-ভারতীয় দায়িত্ব গ্রহণে যদি আজ ভারতের দ্বিতীয় শক্তিশালী রাজনৈতিক দল (কম্যুনিস্ট দল) ব্যর্থ হন, তবে কোনো সাধের কট্টরবাদই যে টেকসই হবে না, বরং অনির্দিষ্টকালের জন্য গণরোষে তাঁরা নিজেরাই নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবেন এমন আশঙ্কা অনায়াসেই করা যেতে পারে। কট্টরপন্থীদের সে সম্ভাবনার কথা স্মরণে রাখা উচিত। ভারতের দ্বিতীয় বৃহত্তর দল হিসেবেও কম্যুনিস্ট পার্টি জন-সাধারণের মনে কোনদিন একটি পরিপূর্ণ আস্থা স্থাপন করতে পারে নি। গণ-তান্ত্রিক নির্বাচনের পথ গ্রহণ করেও সে আস্থা অর্জন করা সম্ভব হয় নি। এজন্য সাধারণের কম্যুনিজম ভীতির চাইতে কম্যুনিস্ট পার্টির গণস্বার্থ অপেক্ষা পার্টি স্বার্থকে বড় করে আঁকড়ে থাকার দুর্বলতা বহুল পরিমাণে দায়ী। "ইজম" বস্তুটা যেখানে এমনই পলকা ও স্পর্শ-কাতর, সেখানে 'ইজমে'র ব্যানার বহন করাও এক মহা দায়। কট্টরপন্থীরা এই দায়িত্ব বহনে সবিশেষ আগ্রহী। কিন্তু সংখ্যাগুরু কম্যুনিস্ট কর্মীরা এই চিরন্তন ভ্রান্তি থেকে অনেক পরিমাণে মুক্ত হয়ে 'কম্যুনিজম' নামক ভাবনাটিকে আজ আর একটি ওয়াটার টাইট কম্পার্টমেন্টে সযত্নে রক্ষিত হৃৎপিণ্ডের ধুকপুকি বলে মনে করবেন না। অগ্রসরমাণ যুগে একটি 'ইজম' তার সাবেকী অবগুণ্ঠন একইভাবে প্রলম্বিত করে রাখতে পারে না। এসব চিন্তাই কট্টর উগ্রপন্থায় ক্রমশ অনাস্থা উপস্থিত করছে।

আগামী সাধারণ নির্বাচন ও নির্বাচনী জোট উপলক্ষে কম্যুনিস্ট কক্ষের চিন্তার দ্বন্দ্ব বেশ আসর জমিয়ে তুলেছে। দুইপক্ষে ঘোঁট ও পরস্পরের প্রতি চোটপাট তীব্র আকার ধারণ করছে। সৌভাগ্যত বামপন্থী কম্যুনিস্টপক্ষেও কট্টরপন্থীর সংখ্যা খুব বেশি নয়। দক্ষিণপন্থী কম্যুনিস্ট নেতা শ্রীরাজেশ্বর রাও সম্প্রতি রাজধানী দিল্লীতে এক সাংবাদিক সম্মেলনে বলেছেন, বাম-পন্থী কম্যুনিস্টগণের একটি বৃহদংশই, তথা মধ্যপন্থিগণ কংগ্রেসের বিপক্ষে সি পি আই-র সঙ্গে হাত মেলাতে প্রস্তুত আছেন বলে শ্রীরাও-এর বিশ্বাস।

এতৎ সত্ত্বেও দক্ষিণ-পন্থী অভিযোগ হল, বামপন্থীরা নির্বাচনী সমঝোতার ক্ষেত্রে অন্যান্য বিরোধী দলের প্রতি যত-খানি যৌক্তিকতা মেনে চলেন দক্ষিণীদের প্রতি ঠিক ততখানিই খড়্গহস্ত। তাছাড়া বামপন্থীরা নাকি এমন অনেক আসন দাবি করছেন যেখানে দক্ষিণীদের প্রভাব-প্রতিপত্তিই সমধিক।

বাম-দক্ষিণ আদর্শ বিরোধের ক্ষেত্রেও ঘরোয়া কোন্দলকে বামপক্ষ যেভাবে প্রকাশ্য সমালোচনার বিষয় করে তুলেছেন, দক্ষিণগণ তা করেন নি। উপরন্তু তাঁরা অন্যান্য বিরোধী দলের তুলনায় বামপন্থী-দের প্রতি সমধিক সম্মানই প্রদর্শন করে আসছেন।

শ্রীরাও বলেছেন, দক্ষিণগণ নির্বাচনী সমঝোতাকে আঘাত করতে পারে এমনতর প্রকাশ্য আদর্শগত বিরোধের বিস্ফোরণ যথাসম্ভব এড়িয়ে চলার চেষ্টা করছেন, তবে বামপক্ষ থেকে যে কোন মিথ্যা প্রচার শুরু হলে তার প্রতিবাদ করে নিজের ঘর রক্ষা করার দায়িত্ব সি পি আই'কে পালন করতেই হবে।

শ্রীরাও সাংবাদিক সম্মেলনে জানিয়ে-ছেন, বাম কম্যুনিস্টগণ কয়েকটি রাজ্যে কতকগুলি অবাস্তব দাবি উত্থাপন করছেন, যেমন পশ্চিমবঙ্গ, উত্তরপ্রদেশ, বিহার, মহারাষ্ট্র অন্ধ্র প্রভৃতি।

তামিলনাদ সি পি আই কার্যনির্বাহক সদস্য শ্রী এন কে কৃষ্ণন আপন রাজ্যের অবস্থা বর্ণনা করে জানান, ডি এম কে'র সঙ্গে নির্বাচনী আঁতাতের সিদ্ধান্ত করে সর্বভারতীয় নির্বাচনী মোর্চা গঠনের পন্থাই অনুসরণ করছেন সি পি আই। বামপন্থীরা এ বিষয়ে অনাগ্রহী। অথচ মাদ্রাজে অ-কংগ্রেসীয় মন্ত্রিসভা গঠনের পক্ষে তাঁরা বারম্বার অভিমত প্রকাশ করে আসছেন।

প্রকৃতপক্ষে আসন বণ্টনের প্রশ্নে কিন্তু খুব বড় রকমের একটা বিবাদ উপস্থিত থাকার কারণ নেই যদি এ পর্যন্ত গৃহীত ফরমুলা অনুসারে নির্বাচনী মোর্চা পারস্পরিকভাবে কাজ করতে রাজী থাকেন।

যে এলাকায় যে রাজনৈতিক দল (বাম-জোটের অন্তর্ভুক্ত) সর্বাপেক্ষা ক্ষমতাশালী, ফরমুলা অনুসারে, সেই দলকে সেই নির্বাচনী এলাকা ছেড়ে দেওয়া হবে। এক্ষেত্রে অন্যান্য দল কোন দাবি রাখতে পারবেন না। আর যেক্ষেত্রে কোন একটি বিশেষ দলের প্রভাব চূড়ান্তভাবে স্থিরীকৃত নয়, সেখানে আলোচনার ভিত্তিতে, অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র দল ও প্রগতি-শীল ব্যক্তির প্রশ্ন মনে রেখে—এলাকা বণ্টনের সমঝোতা গড়ে তোলা হবে।

এ প্রসঙ্গে একটি বাস্তব অসুবিধার কথাও শ্রীরাজেশ্বর রাও উত্থাপন করেন। তিনি বলেন, কেরালায় সাড়ে পাঁচ লাখ ভোট সংগ্রহ করে গতবার দক্ষিণপন্থীরা তিনটি আসন অধিকার করেন, আর মাত্র সাড়ে বার লক্ষ ভোটারের সমর্থনে বামপন্থীদের ভাগ্যে জুটে যায় এক-চল্লিশটি আসন। এই পরিপ্রেক্ষিতে যেহেতু বামপক্ষ কেরালায় অধিকতর ক্ষমতাশালী, শ্রীরাও বলেন, তার মানে এই নয় যে কেরালার সর্বত্রই বামমার্গের প্রভাব প্রতিষ্ঠিত। কিন্তু বামপক্ষের উত্তেজিত

শরীর যদি ভাল থাকে তাহলে ভ্রমণের জন্য মানুষ আনন্দে মেতে ওঠে প্রকৃতির সৌন্দর্য উপভোগ করবার জন্য।

আপনিও স্বাস্থ্য ভাল রাখার জন্য সাধনার অব্যর্থ মহৌষধ প্রতিদিন আহারের পর দুইবার করে দু'চামচ মৃতসঞ্জীবনীর সঙ্গে চার চামচ মহাদ্রাক্ষারিষ্ট (৬ বৎসরের পুরাতন) খাবেন। এতে ক্লান্তি দূর করে, খিদে ও হজমশক্তি বাড়ে, সর্দি কাশি থেকে রেহাই পাবেন।

সাধনা ঔষধালয় ঢাকা

অধ্যক্ষ ডাঃ যোগেশ চন্দ্র ঘোষ, এম-এ, আয়ুর্বেদশাস্ত্রী, এফ,সি,এস, (লণ্ডন), এম,সি,এস, (আমেরিকা), ভাগলপুর কলেজের রসায়ন শাস্ত্রের ভূতপূর্ব অধ্যাপক।

কলিকাতা কেন্দ্র ডাঃ নরেশ চন্দ্র ঘোষ, এম-বি, বি-এস, আয়ুর্বেদাচার্য্য।

৩৬, সাধনা ঔষধালয় রোড
সাধনা নগর, কলিকাতা ৪৮

বক্তব্যে মনে হয়, দক্ষিণপন্থীদের যেন কোন অস্তিত্বই নেই।

এই ঘরোয়া ঘোঁটে নির্বাচনী জোট কতদূর সফল হবে এ বিষয়ে স্বভাবতই প্রশ্ন জাগতে পারে। দেশের গরম আবহাওয়া লক্ষ্য করলে দেখা যায়, জনসাধারণ একটি নির্বাচনী জোটের শক্তিপরীক্ষা এবার অভূতপূর্বভাবে কামনা করছেন। সাধারণের এই মনোভাব আহত হলে জোট ভাঙানী রাজনৈতিক সুবিধাবাদ এর পর সাধারণের মধ্যে কত দূর পাত্তা পাবেন তাতেও যথেষ্ট সন্দেহের কারণ আছে। বাম বা দক্ষিণ কাউকেই যে তাঁরা ক্ষমা করবেন না, সম্ভবত স্বদলীয় ঘোঁটে সে কথাও নেতারা বিবেচনা করছেন।

দক্ষিণীদের প্রতি ভীষণভাবে বিদ্বেষ-পরায়ণ কোণারপন্থীরা কেরালার রিভিশনিস্ট উৎখাত করাই প্রথম বিবেচ্য বলে আওয়াজ তুলেছিলেন। এঁরা অবশ্য মুষ্টিমেয়। শ্রী এ কে গোপালন এবং শ্রী ই এম এস নাম্বুদ্রিপাদ অধিকাংশ বামপন্থীদের নেতা হিসাবে কট্টরপন্থাকে কোণঠাসা করেছেন। তাঁরা সমঝোতায় আসতে অনিচ্ছুক নন। বরং মনে করেন, বাম-দক্ষিণ আঁতাতে সংযুক্ত নির্বাচনী ফ্রন্ট গত নির্বাচনেই অন্ততপক্ষে সতেরটি বেশি আসন অধিকার করতে পারতেন। এই দুই নেতা আরও মনে করেন যে, ১৯৬৫ সালের অন্তর্বর্তীকালীন নির্বাচনে স্পষ্টতই দেখা গেছে যে অন্ততপক্ষে শতকরা পনেরটি ভোট হারাতে হয়েছিল। যদি এবারেও বাম-দক্ষিণ জোট সম্ভব না হয়, তবে অবস্থা অপেক্ষাকৃত খারাপ হবে। বামপক্ষ আগের তুলনায় কম ভোট সংগ্রহ করলে দলের সম্মানও নষ্ট হবে। এ কারণেই বামপন্থী নেতাদ্বয় দক্ষিণপন্থীদের সঙ্গে একটা নির্বাচনী বোঝাপড়া অনিবার্য বলে মনে করেন।

কেরালার ক্ষেত্রে মুস্কিল হয়েছে মুশ্লিম লীগকে নিয়ে। লীগ অনেকগুলি প্রগতিশীল পন্থার বিরোধী, যেমন, স্টেট ট্রেডিং, ভূমি সংস্কার প্রভৃতির প্রশ্নে। এ সমস্ত প্রশ্নও বিবেচনা করতে হচ্ছে কেরালা নির্বাচনী জোটকে।

ওদিকে দক্ষিণপন্থীদের সঙ্গে আসন বা নির্বাচনী এলাকা বণ্টনেও একটা অসুবিধা দেখা দিচ্ছে ঃ গত নির্বাচনে মালাবার অঞ্চলে দক্ষিণ সি পি আই একটি আসনও লাভ করতে পারেন নি। সুতরাং জোট-ফরমুলা অনুসারে এই অঞ্চলে তাঁদের দাবিও নস্যাৎ হয়ে যায়। কিন্তু প্রেস্টিজের প্রশ্নে এখানে দুই বা তিনটি আসনে দক্ষিণীদের প্রার্থী না দাঁড় করালেই নয়।

দ্বিতীয়ত কালিকটে কংগ্রেস একটি আসনও পান নি। বাম কমুনিস্ট, এস এস পি কিম্বা মুশ্লিম লীগ এসব এলাকা দখল করেছেন। সুতরাং এসব এলাকায় জোটের খাতিরে কেউ তাঁর অধিকৃত এলাকা অপরের হাতে তুলে দেবেন না।

অন্যান্য রাজ্যেও একই সমস্যা দানা বাঁধছে। এ সমস্তই ধীরভাবে গ্রহণ করে জোটভুক্ত দলগুলি যদি গ্রহণ-বর্জনের মাধ্যমে জোট রক্ষায় এগিয়ে না আসেন, বিশেষত উভয় পক্ষ কম্যুনিস্টগণ যদি পরস্পরের প্রতি বেঁকে বসে থাকেন তবে ঘোঁটেই জোট ভেঙে ভবিষ্যতে জন আস্থা হারিয়ে বিরোধী রাজনীতির ওপর প্রচন্ড চোট সৃষ্টি করবে এমন আশঙ্কা অমূলক নয়।

শ্রীমতী গান্ধীর প্রতি হুমকী

শ্রীমতী গান্ধী আকালী দলের চাপে যদি পাঞ্জাবী সুবা গঠন করেন তবে গুলী করে তাঁর প্রাণনাশ করা হবে—এই মর্মে 'অশোক' নামধারী দুটি অপ্রাপ্ত বয়স্ক বালক পত্র মারফৎ প্রধানমন্ত্রীর কাছে হুমকী পাঠিয়েছিল। বালক দুটিকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে।

আশ্চর্য কথা! বালকদুটির মধ্যে এই অদ্ভুত চেতনার সঞ্চার হয় কি করে সেটাও কম আশ্চর্যের কথা নয়। তদুপরি আশ্চর্য বিষয় এই যে অশোক-চক্র-ধৃত অহিংস ভারতে 'অশোক' নামী বালকদ্বয়ের মনেই এই বালসুলভ চাপল্যের উদ্রেক হয়েছে। পাঞ্জাবী সুবার প্রশ্ন আজ উপসংহারে পৌঁছেছে। এমন সময় এই হুমকী ক্রোধের শেষ পরিচায়ক। বালকদুটি কোন সূত্র থেকে এমন মারাত্মক প্ররোচনা লাভ করে, আশঙ্কার বিষয় সেটাই। ভারতবর্ষের মাটিতেই গান্ধী হত্যার মতো একটি দুঃখজনক অপ্রত্যাশিত ঘটনা ঘটেছিল। পাঞ্জাবের ইতিহাসে মুখ্যমন্ত্রী হত্যার অধ্যায়ও সংযোজিত হয়েছে। আজ নতুন এক বর্বর হুমকী আমাদের বিচলিত করছে।

বালকের দায়িত্বহীন ক্রোধের ফলশ্রুতি বলে এ ঘটনাকে গ্রহণ করা যায় না। এর পেছনে যে গভীরতর চক্রান্ত ক্রিয়াশীল তারই সম্যক অনুসন্ধান ও সতর্কতার প্রয়োজন আছে।

রাজনৈতিক সিদ্ধান্তের জন্য প্রধানমন্ত্রীর প্রাণনাশের পরিকল্পনা যেমনি অজ্ঞান মূর্খতার পরিচায়ক, কোনরূপ প্রাণনাশের প্রচেষ্টাও তেমনি কদর্য।

এ বিষয়ে গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করে আমরা প্রধানমন্ত্রীর নিরাপত্তার ব্যাপারে সর্বপ্রকার সতর্কতা অবলম্বন করা হবে বলে আশা করি।

মধ্যপ্রদেশঃ

অসন্তোষের দাবানল

গোয়ালিয়রে পুলিশের গুলী চালনার প্রতিবাদে মধ্যপ্রদেশে ছাত্র আন্দোলন বিভিন্ন শহরে ও এলাকায় দাবানলের মত ছড়িয়ে পড়ছে।

সতেরই সেপ্টেম্বর পর্যন্ত প্রাপ্ত সংবাদে জানা যায়, এখন পুলিশ-ছাত্র সঙ্ঘর্ষ উজ্জয়িনী ও ভিন্দ শহরকে গ্রাস করেছে। সেখানে অবস্থা এতদূর সঙ্গীন যে আটচল্লিশ ঘণ্টা কারফিউ জারি করতে হয়েছে। উজ্জয়িনী মাধব কলেজের ফটক বন্ধ করতে হয়েছে, কারণ জেলা ম্যাজিস্ট্রেট, পুলিশ সুপার এস ডি এম সহ পঁচানব্বইজন পুলিশ ও কয়েকজন শিক্ষকসহ পঞ্চাশজন ছাত্র তথাকার সঙ্ঘর্ষে আহত হয়েছেন।

প্রকাশ, বাইরের ছাত্র আন্দোলন, গ্রেপ্তার প্রভৃতি কলেজের প্রাঙ্গণ অতিক্রম করে অধ্যক্ষের কক্ষেও প্রবেশ করে। কক্ষের জানলার সার্সি চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়। ওদিকে কলেজমহলের বক্তব্য, পুলিশ অধ্যক্ষের ঘরে ঢুকে কয়েকজন শিক্ষককে প্রহার করে।

ভিন্দে মিউনিসিপ্যাল অফিস আক্রান্ত হয় এবং জেনারেল পোস্ট অফিসের রেকর্ড পত্রে অগ্নি সংযোগের চেষ্টা করা হয়।

ভূপালে ছাত্র ধর্মঘট সমানে চলছে; বিদিশায় উত্তেজনা বৃদ্ধির দিকে; ইন্দোরে ১৪৪ ধারা বলবৎ করা হয়েছে।

ছাত্র অসন্তোষ আজ শুধুমাত্র পথ জোড়া শোভাযাত্রা এবং গ্রেপ্তার বরণের মধ্যে সীমাবদ্ধ নেই। এমন কি কোন বিশেষ রাজ্যেও তার একাধিপত্য নেই। আইন ছাত্রদের অসন্তোষ রাজধানী থেকে রাজ্যে ছড়িয়ে পড়েছে। আর সমগ্র অসন্তোষের সঙ্গেই হিংসাত্মক কার্যকলাপ মারমুখী হয়ে উঠছে। আইনছাত্রদের ব্যাপারে আইন শিক্ষার ক্ষেত্রে আইনগত নির্দেশে যে বিভ্রান্তিকর অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে তাতে আইনছাত্রদের পক্ষে উত্তেজিত হয়ে ওঠা বিচিত্র নয়। কিন্তু ছাত্র অসন্তোষ যদি অগ্নিসংযোগ ও বিশৃঙ্খলার পথে আত্মপ্রকাশ করে তবে তা সামগ্রিকভাবে সামাজিক অকল্যাণ সাধন করবে, যে ক্ষতি ছাত্রসমাজ দেশের ওপর নিশ্চয় চাপিয়ে দেবেন না। অন্যপক্ষে ছাত্র অসন্তোষকে পুঞ্জীভূত করার দায়িত্ব এড়িয়ে গিয়ে সরকার যদি লাঠি গুলীর আশ্রয় নেন তবে সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে ছাত্র সম্প্রদায়কে ঠান্ডা করা কতদূর সম্ভব হবে তা সরকার পক্ষের বিবেচনা করে দেখা উচিত।

ছাত্র অসন্তোষ সৃষ্টির কারণগুলি অনুসন্ধানের জন্য সি বি আই পর্যায়ে একটি কমিটি গঠিত হয়েছে। আশা রাখব, কমিটি ছাত্র অসন্তোষের ক্ষেত্রে ছাত্রদের উচ্ছৃঙ্খলতার কারণ অনুসন্ধানের সময় একথাও বিচার করবেন, পারস্পরিক সহৃদয় বোঝাপড়ার দ্বারা কেমন করে এই অসন্তোষকে নিবারিত করা যায়।

বিহার ঃ

অঙ্গারে আগুন

পাতালপুরীর মানুষদের মধ্যেও মাটির ওপরতলার ঢেউ গিয়ে পড়েছে। প্রকাশ, ধানবাদের কেন্দুয়াদী কয়লা খনির গর্ভদেশে দেড় শতাধিক শ্রমিক তাঁদের প্রাপ্য বকেয়া লক্ষাধিক টাকা না পাওয়ার প্রতিবাদে অনশন ধর্মঘট করছেন। চুয়াত্তরের 'ফ' পঁচাত্তরের 'দ' ধর্মঘটী শ্রমিকমণ্ডলীর মধ্যে সতেরই সেপ্টেম্বর পর্যন্ত যে ক'জন খনিগর্ভের গ্যাসে সংজ্ঞা হারান, তাঁদের অনেককেই হাসপাতালে স্থানান্তরিত করতে হয়েছে। খনিগর্ভের অবস্থা খুবই আশঙ্কাজনক বলে ধানবাদ আঞ্চলিক লেবার কমিশনার তথ্য জ্ঞাপন করেছেন। খনিগর্ভের গ্যাসে যে-কারও জীবনান্ত হওয়া বিচিত্র নয়, যদি না পাতালপুরী থেকে তাঁদের উপরে তুলে আনা যায়। তাছাড়া এ খনির দুর্নামও আছে মানুষ মারার ব্যাপারে। বছরখানেক আগেই এই খনিতেই জলপ্রবেশের ফলে প্রাণান্ত ঘটে ছয়জন শ্রমিকের। এখানে কর্মরত শ্রমিকের সংখ্যা পাঁচ শত।

দুর্জয় সাহস ধর্মঘটী শ্রমিকগণের। অঙ্গারের প্রাচীরে বেষ্টিত, মুক্ত বায়ু থেকে বঞ্চিত এই শ্রমিকগণ স্বেচ্ছায় আহার ও মুক্ত বায়ু স্পর্শ ত্যাগ করেছেন মৃত্যুকে কোলের কাছে বসিয়ে। দাবি, মাস মাহিনার শ্রমিকদের পাওনাগণ্ডা মিটিয়ে দিতে হবে। অঙ্গারে আগুন লেগেছে, চুয়াত্তরের 'ফ'-এরা তাদের প্রাপ্য চেয়েছে। অবিলম্বে ব্যবস্থা প্রয়োজন। কমিশনার সাহেবের উদ্বেগও যথার্থ। অনশন ধর্মঘট এক কথা আর খনি গর্ভে না খেয়ে গ্যাস সেবন আর এক কথা। আশা করা যায়, এ সম্পর্কে অবিলম্বে ব্যবস্থা গ্রহণ করতে সরকার গড়িমসি করবেন না।

মহারাষ্ট্র ঃ

নায়েকের নতুন বোঝা

মহারাষ্ট্রের মুখ্যমন্ত্রী শ্রীনায়েকের ভাগ্যরবি এখন মধ্যগগনে। শ্রীনায়েক বৃহত্তর বোম্বাই-এর ক্ষুব্ধ প্রতিনিধিদের পদত্যাগের বোঝা "ভুল বোঝাবুঝি"র ফল বলে স্বীকার করে গিয়ে নির্বিবাদে বহন করে নিয়েছেন। আপোষে মিটে গেছে ব্যাপারটা, অন্তত বাহ্যত তাই বোধ হচ্ছে বা সে বোধ সৃষ্টি করা হয়েছে।

সম্প্রতি মহারাষ্ট্র ক্যাবিনেট শ্রীনায়েকের ওপর একটি নতুন বোঝা চাপিয়ে দিলেন। রাজ্য সরকারী কর্মচারীদের মাগ্গী ভাতার প্রশ্নটি বিবেচনা করার জন্য শ্রীনায়েককে একক ক্ষমতা দান করেছেন ক্যাবিনেট। এ সম্পর্কেও শ্রীনায়েক হৃষ্ট চিত্তে জানিয়েছেন, the cabinet look a "satisfactory decision informally."

শ্রীনায়েক মাগ্গী ভাতার প্রশ্ন কেমন করে সমাধান করবেন তা অবশ্য তাঁর বিচক্ষণতার ওপরই নির্ভর করে, কিন্তু এই ব্যাপারটি যে তাঁকে সহসা অধিকতর জনপ্রিয় করবে না তাও আশঙ্কা করা যেতে পারে। আগামী নির্বাচনের ঠিক আগ মুহূর্তে শ্রীনায়েকের ওপর এই গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নের সমাধান খোঁজার একক দায়িত্ব চাপিয়ে দিয়ে মুখ্যমন্ত্রীর প্রতি ক্যাবিনেট যথেষ্ট সম্মান প্রদর্শন করছেন সন্দেহ নেই, তবে অপ্রিয় কাজের দায়িত্ব বহন করে শ্রীনায়েক যে বেকায়দায় পড়বেন না এমন কথাও হলপ করে বলা যায় না। শ্রীনায়েক প্রশ্নটির গুরুত্ব নিশ্চয় সম্যক্‌ভাবে চিন্তা করেছেন। এই অপ্রিয় দায়িত্ব সঠিকভাবে পালন করে তিনি সফল হন, অতঃপর এই কামনাই করব আমরা।

টোপ—

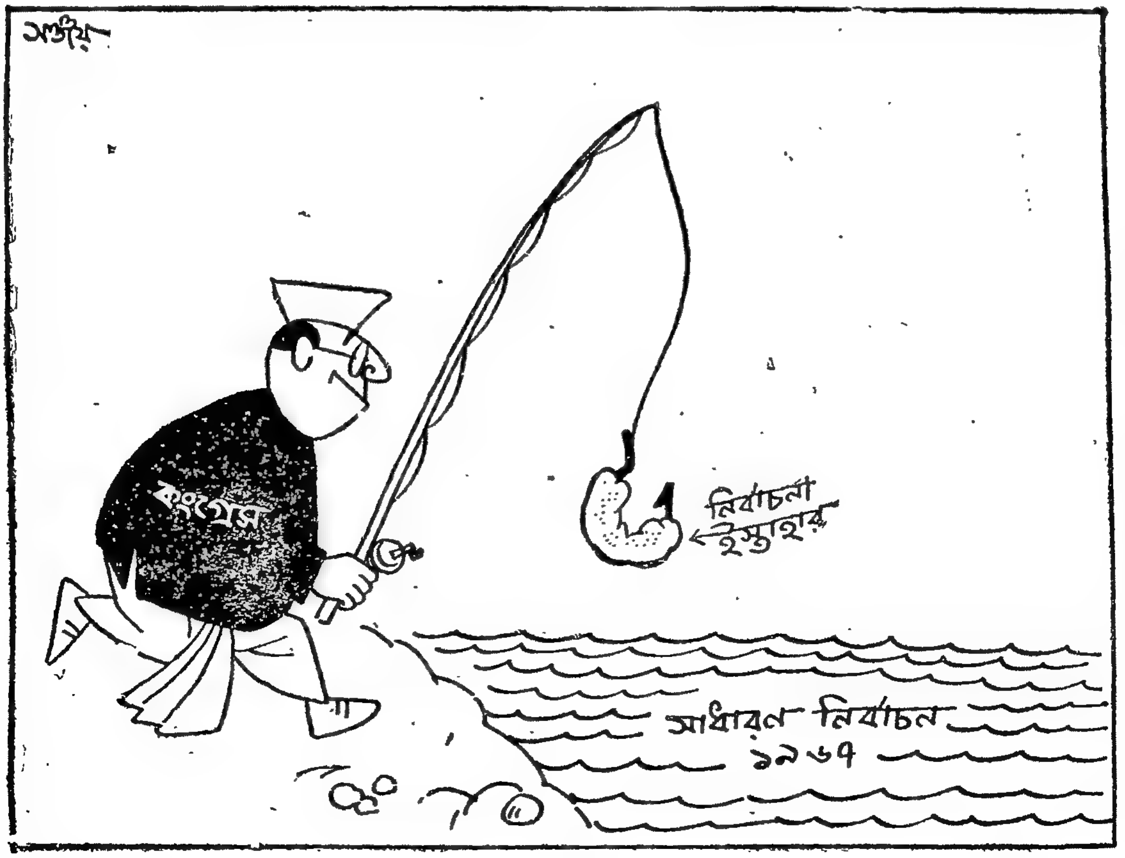

আন্তর্জাতিক

ব্ল্যাকবোর্ডে নির্বাচনের ফলাফল দেখছে দক্ষিণ ভিয়েতনামী

বৃটেন ঃ

দশদিনব্যাপী কমনওয়েলথ প্রধানমন্ত্রী সম্মেলন শেষ হয়েছে। দক্ষিণ রোডেশিয়ার ব্যাপারে শেষ পর্যন্ত সকলের পক্ষে গ্রহণ-যোগ্য একটা মীমাংসায় উপনীত হওয়া সম্ভব হয়েছে। ১৪ই সেপ্টেম্বর সম্মেলনের পক্ষ থেকে প্রচারিত ইস্তাহারে এই মীমাংসা-সূত্র প্রকাশ করা হয়েছে।

ইস্তাহারে দক্ষিণ রোডেশিয়ার প্রশ্নে বৃটেন এবং আফ্রো-এশীয়-কারিবীয় সদস্যদের দৃষ্টিভঙ্গীর পার্থক্যকে স্বীকার করা হয়েছে। তবু সকলে মিলে কতক-গুলি ব্যাপারে একমত হতে পেরেছেন।

সম্মেলনে স্থির হয়েছে, অবিলম্বে দক্ষিণ রোডেশিয়ার বেআইনী আইয়ান স্মিথ শাসনের অবসান ঘটিয়ে বৃটিশ সরকার কর্তৃক স্বীকৃত গভর্ণর স্যার হামফ্রে গিবসের হাতে সকল শাসনভার অর্পণের জন্য বৃটিশ সরকার চেষ্টা করবে। গভর্ণরের মারফৎ এই অভিমত স্মিথ সরকার ও অন্যান্য সকলকে জানিয়ে দেয়া হবে। যদি স্মিথ সরকার এই নির্দেশ না মানে, তবে বৃটিশ সরকার স্মিথদের সঙ্গে সকল প্রকার আলোচনা বন্ধ করে দেবে, এবং শাসনতান্ত্রিক সুবিচার প্রতিশ্রুতি প্রত্যাহার করবে। তা ছাড়া কমনওয়েলথের সকল সদস্য-রাষ্ট্রের সমর্থনে বৃটেন দক্ষিণ রোডেশিয়ার বিরুদ্ধে কার্যকরী অর্থনৈতিক অবরোধ গ্রহণের জন্য রাষ্ট্রসঙ্ঘ নিরাপত্তা পরিষদের কাছে আবেদন করবে।

আফ্রিকা, এশিয়া ও ক্যারিবিয়ান অঞ্চলের রাষ্ট্রগুলির বক্তব্য ছিল, বলপ্রয়োগ ছাড়া স্মিথ শাসনের অবসান সম্ভব নয়। যতক্ষণ দক্ষিণ আফ্রিকা এবং পর্তুগীজ অধিকৃত মোজাম্বিক ও অ্যাঙ্গোলা আছে, ততক্ষণ দক্ষিণ রোডেশিয়ার বিরুদ্ধে অবরোধ ব্যবস্থা সফল হতে পারে না। কিন্তু বৃটেন বলপ্রয়োগের তীব্র বিরোধী। ইস্তাহারেও সে-কথা বলা হয়েছে। তবে আফ্রো-এশীয়-কারিবীয় গোষ্ঠীর দ্বিতীয় দাবি বৃটেন কিছুটা মেনে নিয়েছে। তাদের দাবি ছিল ঃ 'এক' মানুষ, এক ভোট' নীতির ভিত্তিতে সংখ্যাগরিষ্ঠের শাসন প্রতিষ্ঠা না হওয়া পর্যন্ত দক্ষিণ রোডেশিয়ার স্বাধীনতা ঘোষণা করা চলবে না। হ্যারল্ড উইলসন স্বীকার করেছেন, সংখ্যাগরিষ্ঠের শাসন, অথবা দক্ষিণ রোডেশিয়ার জনসাধারণের সকল পক্ষের কাছে গ্রহণযোগ্য কোন ব্যবস্থা না হওয়া পর্যন্ত স্বাধীনতা দেয়া হবে না।

দক্ষিণ রোডেশিয়া সম্পর্কে হ্যারল্ড উইলসন যে পরিকল্পনা গ্রহণ করেছেন, তা হল ঃ আলোচনার দ্বারা স্মিথ শাসনের অবসান ঘটিয়ে গভর্ণর স্যার হামফ্রে গিবসের হাতে শাসনের সকল দায়িত্ব অর্পণ। এর পর গিবস মোটামুটি প্রতিনিধি স্থানীয় একটি সরকার গঠন করবেন। এই অন্তর্বর্তী সরকার এবং বিভিন্ন শ্রেণীর অধিবাসীদের সঙ্গে আলোচনা করে বৃটিশ সরকার শাসন-তান্ত্রিক সংস্কার ও রাজনৈতিক সমস্যা সমাধানের জন্য চেষ্টা করবে। সকলের পক্ষে গ্রহণযোগ্য একটা মীমাংসায় পৌছ-বার জন্য বৃটিশ সরকার চেষ্টা করবে। অন্তর্বর্তীকালে পুলিশ ও সৈন্যবাহিনী প্রত্যক্ষভাবে গভর্ণরের নির্দেশ অনুসারে চলবে। যে সব রাজনৈতিক নেতাদের আটক রাখা হয়েছে, তাঁদের মুক্তি দেয়া হবে, এবং সকল প্রকার রাজনৈতিক কার্য-কলাপের অনুমতি দেয়া হবে। তবে কোনরূপ ধ্বংসাত্মক কাজ করতে দেয়া হবে না।

এই পরিকল্পনাকে কার্যকরী করার জন্য উইলসন মন্ত্রিসভার নতুন কমন-ওয়েলথ সচিব হারবার্ট বাউডেন ইতিমধ্যেই সলিসবেরী রওনা হয়ে গেছেন। সেখানে তিনি গভর্ণর স্যার হামফ্রে গিবসের সঙ্গে আলোচনা করবেন। প্রয়োজন হলে তিনি আইয়ান স্মিথের সঙ্গেও সাক্ষাৎ করবেন।

কমনওয়েলথ সম্মেলনে বৃটিশ সরকার কর্তৃক দক্ষিণ রোডেশিয়া সম্পর্কে এই নীতি ঘোষণা নিশ্চয়ই পুরোনো বৃটিশ নীতি থেকে পৃথক, এবং কিছুটা প্রগতি-শীল। খুব সহজে বৃটিশ সরকার এই নীতি গ্রহণ করে নি। কমনওয়েলথ সম্মেলন শুরু হবার আগে থেকেই বিভিন্ন রাষ্ট্রনেতা যেভাবে বৃটিশ নীতির সমালোচনা করেছেন, এবং মার্লবরো হাউসে সম্মেলনের প্রথম দিন থেকেই বিভিন্ন বক্তা যেরূপ তীব্র আক্রমণ করেছেন, তাতে বৃটেনের পক্ষে পিছু হটা ছাড়া উপায় ছিল না। মাঝে অবস্থা এমন হয়ে দাঁড়িয়েছিল যে, রোডেশিয়ার প্রশ্নে কমন-ওয়েলথ ভেঙে যাবে, এমন আশঙ্কা দেখা দিয়েছিল। তানজানিয়া সম্মেলনে আসেই নি, আর জাম্বিয়া, সিয়েরা লিয়ন ও গায়না কমনওয়েলথ ত্যাগের হুমকী প্রদর্শন করেছে। তবু শেষ পর্যন্ত অনেক চেষ্টার পর সর্বসম্মত একটি মীমাংসায় উপনীত হওয়া সম্ভব হয়েছে। আফ্রিকা, এশিয়া ও ক্যারিবিয়ানের সদস্য-রাষ্ট্রগুলির চাপে উইলসন তাঁর পুরোনো নীতির কিছুটা পরিবর্তন করেছেন। এই পরিবর্তিত নীতি বিক্ষুব্ধ সদস্যদের সম্পূর্ণ খুশি করতে না পারলেও, তারা আপাতত এই অবস্থা মেনে অপেক্ষা করতে রাজী হয়েছেন।

উইলসনের আশা আছে, এই বৎসর শেষ হবার পূর্বেই স্মিথ সরকারের অবসান ঘটবে। আর যদি আইয়ান স্মিথরা কিছুতেই আপোষের পথে না আসেন, তবে কমনওয়েলথ সদস্য-রাষ্ট্রগুলির সমর্থনে বৃটেন নিরাপত্তা পরিষদের সাহায্য গ্রহণ করবে।

কমনওয়েলথের প্রায় সকলের চাপে হ্যারল্ড উইলসন তাঁর নীতির যতটুকু পরিবর্তন করেছেন, তা আপাতত কমন-ওয়েলথের ভাঙন রোধ করতে সক্ষম হলেও, দক্ষিণ রোডেশিয়ার ক্ষেত্রে তা কতখানি কার্যকরী হবে, সে বিষয়ে কিন্তু অনেকের মনেই সন্দেহ আছে। দশ মাস হল আইয়ান স্মিথরা স্বাধীনতা ঘোষণা করেছেন। কিন্তু বৃটিশ সরকার এখন পর্যন্ত বলতে গেলে কিছুই করতে পারে নি। অর্থনৈতিক অবরোধ ব্যবস্থা কার্যত ব্যর্থ হয়েছে। দক্ষিণ রোডেশিয়ার শ্বেতাঙ্গ-দের জীবনযাত্রা স্বাভাবিকভাবেই চলছে। সুতরাং, আজ উইলসন বলা মাত্রই আইয়ান

স্মিথ ভাল ছেলের মত তাঁর শাসন কর্তৃত্ব ছেড়ে দেবেন, এবং উইলসনের প্রতিনিধি গিবসের হাতে সব ক্ষমতা তুলে দেবেন, এ নেহাৎই কষ্ট-কল্পনা। অবশ্য যদি উইলসন সরকারের সঙ্গে স্মিথদের কোন গোপন চুক্তি হয়, এবং স্থির হয় যে, বিদ্রোহের অবসান ঘোষণা করে বৃটেনের কর্তৃত্ব স্বীকার করে নেবার পর বৃটিশ সরকার স্মিথদের কথা মত কাজ করবে, সে আলাদা কথা। কিন্তু উইলসন ও তাঁর সরকার যদি এই পথে যাবার চেষ্টা করেন, তবে আফ্রিকা ও কমনওয়েলথ তাঁর এই বিশ্বাসঘাতকতা কিছুতেই ক্ষমা করবে না।

স্মিথ সরকারের পতন না ঘটলে রাষ্ট্র-সঙ্ঘ কর্তৃক অর্থনৈতিক অবরোধ প্রয়োগ করা হবে। কিন্তু তার দ্বারাও কি স্মিথদের জব্দ করা যাবে? দক্ষিণ আফ্রিকার ক্ষেত্রে রাষ্ট্রসঙ্ঘের অবরোধ সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়েছে।

সুতরাং, শেষ পর্যন্ত বলপ্রয়োগ ছাড়া

"মাথাধরায় সব ট্যাবলেটই একরকমের ফল দেয়"
যদি আপনি তাই মনে করেন

তাহলে পরীক্ষা ক'রে দেখুন

স্কুইব-এর
অবেদন®
আশ্চর্য্যজনক 'অ্যাপেপ'যুক্ত ট্যাবলেট
আপনাকে দ্রুত, নিরাপদ, নিশ্চিত আরাম এনে দেবে!

'অ্যাপেপ'যুক্ত অবেদন কয়েক মিনিটের মধ্যেই কাজ করে—বহুক্ষণের জন্যে আরাম দেয়!

মাথাধরায়, দাঁতব্যথায়, পিঠের ব্যথায়, পেশীর বেদনায়, সর্দিতে, ফ্লুতে, বিশেষ যন্ত্রণাদায়ক দিনগুলিতে ও অন্যান্য সাধারণ পীড়ায় অবেদন ব্যবহার করুন।

SQUIBB® সারাভাই কেমিক্যালস্

® হচ্ছে ই. আর. স্কুইব এণ্ড সন্স, ইনকর্পোরেটেড-এর রেজিষ্টার্ড ট্রেডমার্ক। করমচাঁদ প্রেমচাঁদ প্রাইভেট লিমিটেড উহার লাইসেন্সপ্রাপ্ত ব্যবহারকারী।

Shilpi SC 31A-Beng

পথ [illegible] কিছুতেই সে পথ গ্রহণ করবে না। তাই আজ আফ্রিকীয়দের মধ্যে তীব্র হতাশার সৃষ্টি হয়েছে। জাম্বিয়ার পররাষ্ট্রমন্ত্রী সাইমন কাপুইপি সম্মেলন শেষ হবার আগেই স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করেন। ফেরার পথে তিনি নাইরোবিতে ও পরে লুসাকায় বৃটেন ও তার প্রধানমন্ত্রী হ্যারল্ড উইলসনের তীব্র সমালোচনা করেন। উইলসনকে তিনি 'বর্ণবিদ্বেষী' আখ্যা দেন। এতে অবশ্য উইলসন খুবই ক্ষুব্ধ হয়েছেন। তিনি জবাব দিয়েছেন, কোন বিশেষ একটি বর্ণ নয়, সমগ্র মানবগোষ্ঠীই তাঁর বর্ণ, তাঁর জাতি। কাপুইপি বলেছেন বলপ্রয়োগ ছাড়া রোডেশিয়া সমস্যার সমাধান অসম্ভব। কমনওয়েলথ বা বৃটেন যদি সে পথে অগ্রসর না হয়, তবে জাম্বিয়া তাদের সঙ্গে সম্পর্ক রাখবে কেন?

দক্ষিণ রোডেশিয়ার আফ্রিকীয়দের সংগঠন স্মিথ কর্তৃক নিষিদ্ধ 'জাপু' বা 'জিম্বাবোয়ে আফ্রিকান পিপলস ইউনিয়ন' কমনওয়েলথ সম্মেলনের সিদ্ধান্তে ক্ষোভ প্রকাশ করেছে। তাদের মতে, সম্মেলনের দ্বারা কার্যত স্মিথ সরকারকেই স্বীকার করে নেয়া হল। চল্লিশ লক্ষ আফ্রিকীয় অধিবাসীর মুক্তির কোন সন্ধান সম্মেলন দিতে পারে নি। তাদেরও অভিমত, বলপ্রয়োগ ছাড়া দক্ষিণ রোডেশিয়ার সংখ্যালঘু শ্বেতাঙ্গ শাসনের অবসান ও গণতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা অসম্ভব।

ভিয়েতনামঃ

ভিয়েতনাম সমস্যা সমাধানের জন্য নতুন করে মার্কিন-সোভিয়েট আলোচনা শুরুর কোন সম্ভাবনা কি দেখা যাচ্ছে? ওয়াশিংটন ও মস্কোর কূটনৈতিক মহলের সঙ্গে সংশিল্ষ্ট কিছু পর্যবেক্ষকের এইরূপ ধারণা হয়েছে।

রাষ্ট্রসংঘের সেক্রেটারী-জেনারেল ইউ থান্ট ৩রা নভেম্বরের পর আর একটিবারের মত সেক্রেটারী-জেনারেলের পদে থাকতে অস্বীকৃত হবার ফলেই নাকি এই কূটনৈতিক প্রচেষ্টা শুরু হয়েছে। ইউ থান্ট অত্যন্ত স্পষ্ট ভাষায় ঘোষণা করেছেন, রাষ্ট্রসংঘের মুখ্য কর্মসচিবের পদে তাঁর না থাকার প্রধান কারণ, ভিয়েতনাম সমস্যা সমাধানের জন্য কোন কিছু করা যাচ্ছে না। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও সোভিয়েট ইউনিয়ন, উভয়েই চায়, ইউ থান্ট সেক্রেটারী-জেনারেল পদে থাকুন। কিন্তু এ সম্পর্কে সকল অনুরোধ-উপরোধ ব্যর্থ হয়েছে। সকলেরই ধারণা হয়েছে, ভিয়েতনামের ব্যাপারে কোন কিছু না করতে পারলে ইউ থান্টকে রাজী করানো যাবে না। এই কারণেই উভয়পক্ষ তৎপর হয়েছে। অন্তত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র কিছুটা আগ্রহ প্রকাশ করেছে। তবে ভিয়েতনাম থেকে মার্কিন সৈন্যের অপসারণ, অন্তত উত্তর ভিয়েতনামে মার্কিন বোমাবর্ষণ বন্ধ না করা পর্যন্ত কোনরূপ আলাপ-আলোচনা সম্ভব বলে মনে হয় না। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র কি তাতে রাজী হবে? একদিকে আলোচনার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করছে, আর অপর দিকে বোমাবর্ষণ বৃদ্ধি পাচ্ছে। ১২ই সেপ্টেম্বর উত্তর ভিয়েতনামের ওপর মার্কিন বোমারু বিমান ১৭১ বার বোমাবর্ষণ করে। ১৯৬৫ সালের ৭ই ফেব্রুয়ারী উত্তর ভিয়েতনামে বোমাবর্ষণ শুরু হবার পর একদিনে এত বোমাবর্ষণ এর আগে কখনও হয় নি। কেবল তাই নয়, উত্তর ও দক্ষিণ ভিয়েতনামের মধ্যবর্তী আন্তর্জাতিক সৈন্যমুক্ত এলাকায়ও মার্কিন বোমাবর্ষণ হয়েছে।

তবে ভিয়েতনামের ব্যাপারে সোভিয়েট প্রভাব ক্রমেই বৃদ্ধি পাচ্ছে। উত্তর ভিয়েতনামের ওপর চীনের চেয়ে সোভিয়েট ইউনিয়নের প্রভাব বর্তমানে বেশি বলে মনে হয়। এ অবস্থায় সোভিয়েট ইউনিয়নের সঙ্গে যদি সত্যি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র আলোচনা শুরু করতে পারে, তাহলে মীমাংসার পথ খুঁজে বের করা অসম্ভব হবে না।

গত মাসে উত্তর ভিয়েতনামের প্রধানমন্ত্রী ফাম ভান ডং এবং প্রতিরক্ষা-মন্ত্রী ও কমিউনিস্ট দলের প্রকৃত নেতা ভো নেগুইন গিয়াপ মস্কো গিয়েছিলেন সোভিয়েট নেতাদের সঙ্গে বিস্তৃত আলোচনার জন্য। গত সপ্তাহে উত্তর ভিয়েতনাম কমিউনিস্ট পার্টির পলিট-ব্যুরোর বিশিষ্ট সদস্য লে থান নুঘি মস্কোয় সোভিয়েট ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টির সাধারণ সম্পাদক লিওনিদ ব্রেজনেভের সঙ্গে দীর্ঘ আলোচনা করেছেন। এই সব আলোচনা নিছক সৌজন্য-মূলক কিংবা অধিকতর সোভিয়েট সাহায্যের জন্য বলে মনে হয় না, এই আলোচনার ওপর পর্যবেক্ষকরা রাজনৈতিক গুরুত্ব আরোপ করছেন।

* * *

১১ই সেপ্টেম্বর দক্ষিণ ভিয়েতনামে যে নির্বাচনের প্রহসন হয়ে গেল, জেনারেল নেগুইন কাও কাই ও তাঁর সহকর্মীরা তাকে গণতন্ত্রের মস্ত জয় বলে মনে করছেন।

১২ই সেপ্টেম্বর সায়গন বেতার থেকে জাতির উদ্দেশে প্রদত্ত ভাষণে কাও কাই বলেছেন, এই নির্বাচন 'ভিয়েত কং-দের বিরুদ্ধে এক বিরাট জয়।' তাঁর মতে, ইতিপূর্বে ভিয়েত কং-দের এত বড় পরাজয় আর হয় নি। তিনি এ কথাও বলেছেন, 'ভিয়েত কং-দের বিরুদ্ধে তাঁদের সংগ্রামের এই হল জয়ের শুরু।'

দেশের অধিকাংশ লোক যে নির্বাচনে ভোটাধিকার পায় নি, দেশের তিন-চতুর্থাংশ যে ভিয়েত কং মুক্তিযোদ্ধাদের দখলে তারা যে নির্বাচন বয়কট করেছে, প্রভাবশালী বৌদ্ধ নেতারা যে নির্বাচনের সঙ্গে কোন সম্পর্ক রাখেন নি, সে নির্বাচনকে 'গণতন্ত্রের বিরাট জয়' বলা নিতান্তই হাস্যকর।

দক্ষিণ আফ্রিকাঃ

ভেরউর্ডের উত্তরাধিকারী নির্বাচন সম্পন্ন হয়েছে। ১৩ই সেপ্টেম্বর কেপ-টাউনে ক্ষমতাসীন ন্যাশনাল পার্টির সংসদ-সদস্যদের সভায় সর্বসম্মতিক্রমে ভেরউর্ড মন্ত্রিসভার বিচারমন্ত্রী ৫২ বৎসর বয়স্ক বেলথাজার জোহানেস ভোর্স্টার দক্ষিণ আফ্রিকার নতুন প্রধানমন্ত্রী পদের জন্য নির্বাচিত হয়েছেন। শেষ পর্যন্ত অন্যান্য প্রতিদ্বন্দ্বীরা প্রতিদ্বন্দ্বিতা থেকে সরে দাঁড়ান।

নির্বাচিত হবার পরই ভোর্স্টার ঘোষণা করেন, তিনি ভেরউর্ডের নীতি পুরোপুরি অনুসরণ করবেন এবং বর্ণ-বৈষম্য নীতিকে আরও দৃঢ়তার সঙ্গে কার্যকরী করার জন্য চেষ্টা করবেন।

ভোর্স্টার বর্ণবৈষম্য নীতি যে আরও কঠোরভাবে অনুসরণ করবেন, তাতে কোন সন্দেহ নেই। ভেরউর্ডের মন্ত্রীদের মধ্যে তিনি ছিলেন সবচেয়ে গোঁড়া ও রক্ষণশীল। বিচারমন্ত্রী রূপে তিনি কেবল বর্ণবৈষম্যের আইনই রচনা করেন নি, দক্ষিণ আফ্রিকায় সকল প্রকার গণতন্ত্র হরণ, কমিউনিস্ট অভিযোগে সরকারের সকল সমালোচনার কণ্ঠরোধের নায়কও তিনি। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় ভোর্স্টার দক্ষিণ আফ্রিকায় নিষিদ্ধ নাৎসী দলের কর্মীরূপে কাজ করেছেন, এবং এর জন্য স্মাটস শাসনে তাঁকে বন্দীও থাকতে হয়েছে। অনেকের মত তাঁরও বিশ্বাস ছিল, দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে জার্মানীর জয় হলে দক্ষিণ আফ্রিকার উপকার হবে।

ভোর্স্টার তাঁর ঘনিষ্ঠ সহকর্মী পেলসারকে নতুন বিচারমন্ত্রীর পদে নিয়োগ করেছেন। তিনি নিজে পুলিশ দপ্তরের দায়িত্ব নিয়েছেন।

ভোর্স্টারের নির্বাচনে বহির্বিশ্বে ইতিমধ্যেই দুশ্চিন্তা দেখা দিয়েছে। রাষ্ট্রসঙ্ঘের বর্ণবৈষম্য সংক্রান্ত কমিটির চেয়ারম্যান বলেছেন, ভোর্স্টার প্রধানমন্ত্রী হবার ফলে দক্ষিণ আফ্রিকায় বর্ণ-সংঘর্ষ আরও বৃদ্ধি পাবে। ভেরউর্ড হত্যাকে উপলক্ষ করে আফ্রিকীদের ওপর নির্যাতন বৃদ্ধি পাবে বলে অনেকের আশঙ্কা, যদিও হত্যাকারী জাফেন্ডাস একজন শ্বেতাঙ্গ এবং এই হত্যার সঙ্গে আফ্রিকীয়দের কোন সম্পর্ক নেই।

অমৃতসমান

• বেদব্যাস

গণছুটি প্রসঙ্গে

সন্দেহ তো বিপিন বোসের মনে ছিলই, সরকারকেও উনি বিশ্বাস করেন না, সরকারী কর্মচারীদেরও না। তার ওপর আবার দিন ঠিক করা হয়েছে ১৩ই তারিখ। কথায় বলে, আনলাকি থার্টিন, ওই তারিখে কোন শুভ কাজ হয় কখনো? ক্যালেন্ডার মিলিয়ে মঙ্গলবার দেখেও ওঁর মনটা খুঁৎখুঁত করছিল—হাতের পাঁজী মঙ্গলবার বলে না লোকে? ওঁর আরো খারাপ লাগছিল বাংলার ছেলেরা সেই মহারাষ্ট্র-নেতার ঐতিহাসিক উক্তিকে একেবারে উল্টে দিয়েছে বলে ঃ What Bengal thinks to-day, India thinks to-morrow আজ বিদ্রূপের মত শোনায়, বাংলাদেশ আজ মহারাষ্ট্রকে কপি করতে চলেছে দেখে বিপিনবাবুর ক্ষোভের সীমা ছিল না।

সই তো দিলাম—ছুটির দরখাস্তে, ভাবছি, দেওয়াটা ঠিক হল কি না...৫৬ বছরের প্রৌঢ় এল-ডি ক্লার্ক মুরারিবাবু বলছিলেন, সি-এল তো গত বত্রিশ বছরে নেহাৎ কম নিই নি রে বাপু, তাই বলে দরখাস্তর ছাপা ফর্মে তো বাপের জন্মেও সই করি নি—

—এ-রকম গণছুটি আর নিয়েছেন চক্কোত্তিমশাই? লাখ লাখ লোক যেখানে ক্যাজুয়াল নিচ্ছে সেখানে ফর্ম ছাপাবে না তো কী করবে—চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারী বিনোদ যেন মুরারিবাবুকে সান্ত্বনা যোগায়।

এটা আবার কী! এ্যাসিস্ট্যান্ট সেক্রেটারী মিঃ বেরা পুলক সেনের হাতের প্যাকেটটা দেখে প্রশ্ন করেন। ক্রিসমাস কেক নিশ্চয়ই নয়, পুজোর গিফ্ট দেবার বান্দাও ওই ছোঁড়ারা নয়। পুলক-বিজয় ইউনিয়নের দুই পান্ডা। সত্যি কথা বলতে কী, মিঃ বেরাকে ওদের একটু সমীহ করেই চলতে হয়। কিন্তু ওদের হাতের প্যাকেট ওঁকে ভাবিত করে তোলে, ভেবেই পান না উনি কী জেশ্চার দিতে চায় ওরা ওই সুদৃশ্য প্যাকেটটা দিয়ে। ও হরি, মনে পড়েছে এ তো খুশির দান নয়...রাগে ফেটে পড়ছিলেন মিঃ বেরা, কিন্তু মুখে হাসি টেনে বলতেই হয়...ও, আপনাদের সেই যে কী বলে...ইয়ে না...হেঁ হেঁ...

—হ্যাঁ হ্যাঁ স্যার, প্রবলভাবে মাথা ঝাঁকিয়ে বিজয় বলেছিল—ওই ইয়ে স্যার, দুশো চুয়াল্লিশখানা আছে......গুণে নেবেন স্যার...হেঁ হেঁ

নিউ সেক্রেটারিয়েটের ভুজঙ্গ ভটচাযই কি কম বিব্রত বোধ করেছিলেন দরখাস্তের তাড়া দেখে? প্রায় কাঁদো কাঁদো হয়ে নাকি বলেছিলেন ঃ ও আমাকে দিচ্ছেন কেন, আমি ও দিস্তে দিস্তে লীভ এ্যাপ্লিকেশন নিয়ে করবোটা কি?

—জানি না কী করবেন, আপনি আমাদের অফিসার, তাই আপনার হাতে দেওয়া। এখন তা ফাইল করবেন, কি পাশের গঙ্গায় বিসর্জন দেবেন, তা আপনিই—

চোখ কপালে তুলেছিলেন মিঃ মজুমদারও। আয়্যেম সরি, জেন্টলমেন, আমি আপনাদের লীভ এ্যাপ্লিকেশন এ্যাকসেপ্ট করতে পারছি না, অর্ডার পাই নি...

—রিজেক্ট করার অর্ডার আছে কি? তাও নেই নিশ্চয়ই...ওঁরই হেড এ্যাসিস্ট্যান্ট সওয়াল করছিলেন, সঙ্গে এক দঙ্গল কর্মচারী। তা যদি নেই তবে নেবেন না কেন দরখাস্তগুলো—অনেক পয়সা খরচা করে দরখাস্তগুলো ছেপেছি স্যার, নিয়ে নিন স্যার...অল্পবয়স্ক কর্মচারীর আবেদন ছিল...

শুনে মিঃ মজুমদার যেন আরো জ্বলে উঠেছিলেন।

মিঃ সেনগুপ্তও পাইপটা মুখ থেকে নামিয়ে বলেছিলেন ঃ আই রেফিউজ টু অ্যাকসেপ্ট...আমি রিজেক্ট লেটার লিখে দিচ্ছি...ছুটি মঞ্জুর করা যাবে না...বলে খচ্ খচ্ করে কি যেন লিখে কর্মচারী প্রতিনিধি অবনী ঘোষালকে দিতে যাচ্ছিলেন। ঘোষালও যেন সমান গাম্ভীর্য নিয়ে বললে ঃ উই রেফিউজ টু অ্যাকসেপ্ট ইয়োর রিজেক্ট লেটার...বলে দরখাস্তের বান্ডিলটা মিঃ সেনগুপ্তের টেবিলে পেপারওয়েট চাপা দিয়ে রেখে এসেছিল।

সাহেবের পি এ সুবল বাঁড়ুজ্যে বলেছিলেন ভালো। চারদিকটা একবার দেখে নিয়ে নিচু গলায় কর্মচারী-প্রতিনিধিদের তিনি বলেছিলেন ঃ মশাই পারবেন তো? দেখবেন আবার দু'জন এসে দশজন না এসে লোক হাসাবেন না যেন? বলে দরখাস্তের তাড়াটা পরম সযত্নে স্টীলের আলমারীতে রেখে দিয়েছিলেন।

—সরকারী চাকুরে তো নয়, সরকারের জামাই সব। অফিস-ফেরৎ ট্রামে কথা হচ্ছিল। কী কাজটা করেন ওনারা? এগারোটায় অফিস যান, জল-টল খেয়ে বারোটার আগে কাজে হাত দেন না... তারপর সারা দিনে তিনটে-কি-চারটে ফাইল দেখেই হাঁফিয়ে ওঠেন বাবুরা...

—আর আমাদের হাড় কালি হলো ৯টা ৬টা খেটে খেটে। মার্চেন্ট অফিসের কর্মচারীই হবে বোঝা গেল।

—তাও কি রকম ফাইল জানেন তো ঘোষদা? প্লীজ সী পি-ইউ-ডি। ব্যস্ হয়ে গেল ফাইল ডি করা।

—পি-ইউ-ডি'টা কি দাদা?

—পেপার আন্ডার ডিসকাসন-এর সংক্ষিপ্ত রূপ। ওই ছোকরাই আবার বলে চলে...সংক্ষেপ করতে আমেরিকানদেরও হার মানায় আমাদের গভমেন্ট এমপ্লয়িরা।

যা বলেছিস। ওরই এক বন্ধু সায় দিয়ে বলে ওঠে...আমার ছোট বোন আছে ফিনান্সে...ওর কাছেও শুনেছি ওদের অফিসার নাকি দীর্ঘ নোট দেখলেই ছুঁড়ে ফেলে দেন, তাই ওরা লেখে ডি-এফ-এ মানে ড্র্যাফট ফর এ্যাপ্রুভাল। কিম্বা হয়তো এফ-আই এ্যান্ড এন-এ অর্থাৎ ফর ইনফরমেশন এ্যান্ড নেসেসারী এ্যাকশন।

—এম-বি-এফ মানে কি বলতো? জানিস না তো...শিখে রাখ্ তবে, মে বি ফাইল্ড...রাইটার্সের এই হল চল্তি ভাষা...

—মশাই, দুশো টাকায় তিনটে ফাইলের বেশি ডিল করা সম্ভব নয়...নির্ঘাৎ সরকারী কর্মচারীর জবানী। শুনে ট্রামশুদ্ধ লোক হাসবে না করুণা করবে ভেবে পায় না যেন।

ছুটির দরখাস্তে সই করতে উৎসাহের অভাব দেখা যায় নি, যেন লটারীর টিকিট কিনছে। কিন্তু কেউ কেউ বলতেও ছাড়ে নি যে ঃ সই দিতে আমার কী আছে, কিন্তু আসলে সবাই আসবে।

কিন্তু আসে নি। উৎসবে মেতেছে যেন ওরা, ব্যস্ত অন্যত্র।

না আসুক, বাছাধনরা মজা টের পাবে, মাইনে যখন কাটা যাবে, ব্রেক অফ সার্ভিস হবে—অফিসার কুঁজো থেকে জল গড়াতে গিয়ে শূন্য কুঁজো দেখে গজ্‌গজ্ করেন।

অসুবিধে হচ্ছিল নিয়োগী সাহেবেরও। টেলিফোন অপারেটরটার সঙ্গে ওঁর সবে একটু জমে উঠেছিল, সি ইজ্ এ ফুল......আজ এলে বেশ ওপরে তুলে আনতে পারতেন ......ফাঁকা ঘর রয়েছে......

এ কি যোগেশবাবু আপনি! অফিসার বিস্মিতই হয়েছিলেন যোগেশবাবুকে দেখে।

—আমি একা নই স্যার, এগারোজন এসেছি আমরা......আমাদের কি না এলে চলে স্যার। বিশ-পঁচিশটা টাকা পকেটে আসে রোজ...সবই তো জানেন স্যার...

হরিধনবাবুও লম্বা সেলাম ঠুকে সাহেবকে জিজ্ঞাসা করে বসলো...আপনার সিগ্রেট-টিগ্রেট আছে তো স্যার? না থাকে বলবেন...বলাই এনে দেবে'খন...

—বলাই...সে তো সাসপেন্ড হয়েছিল না?

—তা তো হয়েছিল, সেই জন্যেই তো ঝুঁকি নিয়ে আজ এয়েছে...একটু দয়া করুন...সান্যাল সাহেব তো ওকে খাতা সই করতে দিয়েছেন...

পাঁচু সাধুখাঁ যেন নিজের মনকেই প্রবোধ দিচ্ছিল। একদিন কামাই করলে যদি মাইনে বাড়ে মন্দ কী তাতে। কাটা ফল বিক্রি করে পাঁচু। টিফিনের সময় দিয়ে কুলিয়ে উঠতে পারে না। বারোটা থেকে সাড়ে তিনটা পর্যন্ত সে একটা বিড়ি টানার অবসরটুকু পায় না। কুড়ি ডজন কলা চার ডজন আনারস তার দেখতে-না-দেখতে বিক্রি হয়ে যায়। বাবু-দের ওপর হয়তো বিশ্বাস ছিল, কিন্তু তার চেয়ে বেশি ছিল সরকারকে ভয়। সেজন্যেই সে গোটা চারেক আনারস আর ডজন দুয়েক কলা নিয়ে বসেছিল সেদিনও। তা ছাড়া বারীনবাবুর বাকী টাকাটা দেবার কথা ছিল আজ। যাক্ গে... মাইনে বাড়লে পাঁচুর লাভ কম নয়... বাকী টাকাগুলো পেয়ে যাবে...বাবুরা বেশি-বেশি খাবেন—নগদ পয়সা দিয়ে খেতে গায়ে লাগবে না তখন—ঠাকুর ওঁদের মাইনে বাড়াও, ঠাকুর......

মাথায় হাত দিয়েছিল গিরিন দে। বদমাইস ভাড়াটের বিরুদ্ধে আজকেই হাকিমের রায় দেবার কথা ছিল। সেবারে উকিলবাবু বলেছিলেন ওঁর জয়লাভ অনিবার্য। পেশকারের পকেটেও এতাবৎ কাল দুটো করে টাকা গুঁজে আসছিলেন ভদ্রলোক। কিন্তু তা সত্ত্বেও সব ব্যাটারাই আজ ভোঁ-ভা! শালাদের টাকার মায়াও নেই নাকি? কি আর করবে, উকিলবাবু নাছোড়বান্দা, ওঁকে ষোলটি টাকা গুণে দিতেই হল...ডেট পড়লো আবার...মানে এক মাসের ধাক্কা আবার...গণছুটি নিয়ে কটা হাত-পা তোদের গজায় দেখি...

—আমার হয়েছে জ্বালা দিদি...কল-তলায় দীপুর মা বোঝাচ্ছিলেন পাশের বাড়ির গিন্নীকে। বাপ তিন দিন ধরে রাস্তায় শয্যা পেতেছেন, সেই ছোটলাটের বাড়ির সামনে, আর মেয়েও তো আজ সকাল থেকে কেবল গানই গাইছে...গণ-ছুটি না কী নিয়েছে নাকি ...জ্বর না জারী না, ছুটির তোর কী দরকারটা ছিল বাপু...

দীপক, বিমল, সুখেন্দু, দুর্গাদাস, বোসদা—সকলেই চায়ের দোকান থেকে হাসতে হাসতে বেরিয়ে আসে। সহজ, নির্লিপ্ততার ছাপ সবার মুখে-চোখে। এক দিনের মাইনে কাটে কাটবে—আমরা কি তা না জেনেই কাজে নেমেছি? রাইটার্স ফাঁকা, হাজার-হাজার ভিজিটরের ঠেলায় গম্ গম্ করতো লাল বাড়িটা, খাঁ খাঁ করছে আজ।

—আরে ওই যে লোক ঢুকছে, বললাম আমি পিকেটিং করতে...সুবিমল যেন আর্তনাদ করে ওঠে। কিন্তু বোসদা বাধা দিয়ে বলেন ঃ রাখ দিকিনি, নো পিকেটিং...১৫ দিন ধরে যাদের বোঝাতে পার নি আজ দুমিনিটে তাদের কনভিন্স করতে পারবে না—ছেড়ে দে...কোথায় লোক, দুর্ দুর্, লোক চিনলি না এখনো...ও তো সাদা পোশাকে পুলিশের লোক রে...

—আরে, দত্তবাবু যে, কী করে এলেন ওই হিউমান ওয়াল ঠেলে?

—না স্যার, বাধা দেয় নি তো কেউ! এলুম কি আর সাধে স্যার। শুকদেব মুখুজ্যেকে এবার আমি বধ করেছি, খুব ট্যান্ডাই-ম্যান্ডাই করছিল ক'দিন...বয়স আমার ছেচল্লিশ হলো, এখনো আমার ওপরে প্রায় ১৯ জন...সুপারসিড করতে দেবেন তো স্যার...

—দেখা যাক। আচ্ছা শুনুন তো, তাড়াহুড়োর মধ্যে জুতোটা পালিশ করানো হয় নি, একটু বাইরে থেকে... আছে সু-শাইন...ইফ ইউ ডোণ্ট মাইন্ড...

—না না মনে করার কি আছে... আপনি তো আমার...মানে পিতৃতুল্য না হলেও...ইয়ে আমার ছোট কাকা আপনারই বয়েসী হবেন...দিন, জুতোটা খুলে দিন...কিন্তু স্যার হেড এ্যাসিস্টাণ্টের পোস্টটা আপনি একটু রেকমেন্ড করে না দিলে...

মাথায় দু-ঘটি জল ঢেলেছেন কি ঢালেন নি, লক্ষ্মীকান্তবাবু চিঁ চিঁ করতে সুরু করে দিয়েছেন। একবার ছেলেকে একবার মেয়েকে ধমকাচ্ছেন, কি না এখনো ভাত বাড়া হয় নি। তারপর কাউকে থামাতে না পেরে রান্নাঘরের দোর-গোড়ায় গিয়ে দুহাত দিয়ে বিচিত্র মুদ্রা রচনা করে বলে উঠলেন ঃ আর পিণ্ডি খেতে হবে না...চাকরী আমার নট্ হয়ে গিয়েছে, দেখ্‌গে যাও...

—যায় যাবে, তোমার একলার তো যাবে না, দু'লাখ আটত্রিশ হাজারের যাবে...

অফিসে সেদিন কী ভিড় কী ভিড়! সকলেই পরস্পর হ্যান্ডশেক করছে, কোলাকুলি করছে—বিজয়ার কোলাকুলি না হলেও বিজয়ের অভিনন্দন তো বটেই।

কিন্তু হুড়মুড় করে লোক সব তিনতলা থেকে নেমে আসছে কেন? সব করিডরে ছোটাছুটি করছে...কী যেন বলাবলি করছে...এক-একটা কথা ভেসে আসছে... দেখেন নি? চলুন দেখে আসি...কী দেখে আসবে? এ কি কুমোরটুলির ঠাকুর দেখতে চলল নাকি? জনস্রোতে পড়ে কেদার মুখুজ্যেও চললেন। ওরে বাবা এ যে লোকে লোকারণ্য ব্যাপার, ঠেলা-ঠেলি-হুড়োহুড়ি, এগোনো যাচ্ছে না এক ইঞ্চিও।

এই যে কেদারদা, উনি এখানে। কে যেন চেঁচিয়ে বললো।

উনিটা কে কেদারবাবুর তখনো তা আন্দাজের বাইরে! চীফ মিনিস্টার না ইউনিয়ন লীডার—কোন্ ব্যক্তি এত ভিড় টানছে...ঠেলে-ঠুলে কোন রকমে সেঁধিয়ে পড়লেন কেদারবাবু একটা হল ঘরে...এক যুবকের হাঁক শোনা গেল...আপনারা বিশৃঙ্খলা করবেন না...এক এক করে আসুন...লাইন দিন...কিউ...ডান দোর দিয়ে ঢুকে বাঁ দোর দিয়ে বেরিয়ে যান...

দেখা গেল একটা মেয়ে মাথা নিচু করে বসে আছে। দেখতে আহা-মরি কিছু না। কিন্তু ওকে দেখার জন্যে লোক সব পাগল হলো কেন? ও কি য়ুনি-ভার্সিটিতে ফার্স্ট হয়েছে, না খালি-হাতে বাঘ মেরেছে...কেদারবাবু বুঝে উঠতে পারেন না।

—কৈ, দাদা, আপনি দর্শনী না দিয়ে পালাচ্ছেন কোথায়?

ও হরি, টেবিলের ওপর আবার বিস্তর পয়সাও জমা পড়েছে দেখা গেল। দর্শনী...কিসের দর্শনী...সাক্ষাৎ কোন দেবী নেমে এলেন তাহলে...পেন্নাম হই মা, এই নাও দশ নয়া...বিকেলে রিণ্টুর মাকে নিয়ে আসবো'খন...

এমন সময় হেঁড়ে গলা শোনা গেল ঃ বন্ধুগণ, এটা বাড়াবাড়ি হচ্ছে। দোষ আমাদেরই, ভদ্রমহিলার নয়। আমরা ওঁকে ঠিকভাবে বোঝাতে পারি নি বলেই উনি কাল গণছুটির দিন অফিসে এসেছিলেন... ওঁকে এভাবে হ্যারাস করা ঠিক না... আপনারা যাঁর যাঁর কাজে চলে যান কাইন্ডলি...ওঁকে কাজ করতে দিন...

এতক্ষণে মেয়েটি চোখ তুলে চাইলো ...য়ুনিয়নের নেতার দিকে...চোখে তার জল টলটল করছে......

উঃ কী ঝামেলা বলো তো!...কাল একটা দিন তোমায় দেখি নি, মনে হচ্ছে যেন কত যুগ দেখতে পাই নি.. টিফিনের সময় লালদীঘির গুমটিতে অপেক্ষমাণা মেয়েটি বলছিল ঃ রক্ষে করো বাবা, দরকার নেই আর গণছুটির......

এইচ. জি. ওয়েলস-এর গল্প

বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য

[বিশ্বসাহিত্যের এক স্মরণীয় লেখক এইচ জি ওয়েল্‌স। আজ থেকে এক শত বছর আগেকার কথা। ১৮৬৬ খৃস্টাব্দের ২১শে সেপ্টেম্বর ইংল্যান্ডের কেন্ট অঞ্চলে জন্মগ্রহণ করেন তিনি. এ বছর তাঁর জন্মশতবার্ষিকী। এই উপলক্ষে আমরা তাঁকে নতুন করে স্মরণ করছি। আমাদের মনে পড়ছে, বহু-বিচিত্র গল্প, বিজ্ঞানাশ্রিত অনেক রহস্য-কাহিনী ও সামাজিক উপন্যাস লিখে সাহিত্যকে তিনি সমৃদ্ধ করে গেছেন। এ ছাড়া বিজ্ঞান, সমাজ-দর্শন ও ইতিহাস নিয়েও তাঁর বহু সুচিন্তিত আলোচনা সুধীজনের মনোরঞ্জন করেছে। আমরা এখানে এই মহৎ শিল্পীর গল্প ও বিজ্ঞানাশ্রিত রহস্যকাহিনীর কথা বলবো। কারণ, এই শ্রেণীর রচনাতেই ওয়েলস-এর বিশ্বজোড়া খ্যাতি। গল্পগুলো বলার সময় মূল রচনার স্বাদ যাতে অক্ষুণ্ণ থাকে, সেদিকে লক্ষ্য রাখা হবে। ঠিক সমালোচনা এ নয়। এ হল একজন প্রিয় লেখকের কিছু শ্রেষ্ঠ রচনাকে সহজ ও সরল করে পাবার প্রয়াস। ওয়েল্‌স-এর অন্যতম শ্রেষ্ঠ রচনা 'দি কাণ্ট্রি অব দি ব্লাইন্ড' বা 'অন্ধের দেশ'। সে কারণেই প্রথমে এ গল্পটির কথা বলা হল। তারপর একে একে অন্যান্য গল্পের প্রসঙ্গ আসবে। গল্পগুলোর অধিকাংশই বাংলার সাহিত্য-পাঠকদের কাছে নতুন ও অভিনব। অজানার সিংহদ্বার উন্মুক্ত করে অনাস্বাদিতপূর্ব রসের সন্ধান দেবে এরা।]

প্রথম অধ্যায় : অন্ধের দেশ

আঁধার থেকে আলোর পথে চলেছে নানেজ। অন্ধের দেশের দুর্ভেদ্য পর্বত-প্রাকার পেরিয়ে সে চলেছে বিরাট পৃথিবীর উদ্দেশে। জামা-কাপড় ছিঁড়ে গেছে তার। দেহের নানা জায়গা থেকে রক্ত বেরিয়ে আসছে। কিন্তু তবু এগিয়ে চলেছে সে। সকল বিঘ্নকে উপেক্ষা করে সে মুক্তির পথ খুঁজছে। অন্ধের দেশ তাকে বন্দী করতে পারল না। গ্যারাণ্টি-দেওয়া স্বর্গসুখ তাকে ধরে রাখতে পারল না। সব ছেড়ে সে এগিয়ে চলল বৃহত্তর সত্যের সন্ধানে।

নানেজের পথ-চলা আজও শেষ হয় নি। আজও মুক্তিকে খুঁজে পায় নি মানুষ। তাই ওর ওই চলার মধ্যে সকল যুগের সকল মুক্তিকামীরা যেন স্তব্ধ হয়ে আছেন। যেন চলেছেন সবাই। যুগ যুগ ধরে দুঃখের অনলে জ্বলে-পুড়ে সত্য-দ্রষ্টারা চলেছেন।

বিরাট এক অন্ধের দেশ এই পৃথিবী। এখানে সত্যদৃষ্টির অধিকারীরা প্রায়ই উন্মাদ বলে অভিহিত হন। পৃথিবীর মানুষ ওঁদের কথা শুনতে চায় না; ওঁদের বিশ্বাস করে না। নানেজের মতোই ওঁরা হন উপহাসের পাত্র। কিন্তু তবু হার মানেন না সত্যিকারের খাঁটি মানুষ; আঁধারের মধ্যে দাঁড়িয়েও আলোর স্বপ্ন দেখেন। ওঁরা সবাই নানেজ, আমরা সবাই অন্ধ, আর 'অন্ধের দেশ' হল আমাদের এই পৃথিবী। বড়কে ছোট করে দেখালে দেখাবার সুবিধে হয়, তাই এ দেশের পরিকল্পনা। তাই 'কাণ্ট্রি অব দি ব্লাইন্ড' আসলে একটি প্রতীকধর্মী গল্প।

কিন্তু গল্পটি পড়বার সময় প্রতীকের কথা ভুলে যাই আমরা। আমাদের মনে হয়, অন্ধের দেশটি সত্যি আছে। সভ্য-জগৎ থেকে অনেক দূরে আছে। তাই আমাদের চেনা-জানা জগতের সঙ্গে এর কোনো যোগ নেই।

আন্দিজ পর্বতমালার নাম শুনেছি আমরা। ভূগোল থেকে জেনেছি, এই অতিকায় পর্বত কেমন একটা বিরাট সরীসৃপের মতো দক্ষিণ আমেরিকার পশ্চিম উপকূল জুড়ে আছে। ইকোয়েডর দেশের নামও আমাদের কাছে অজানা নয়। দক্ষিণ আমেরিকার আন্দিজ পর্বতমালার গা ঘেঁষে দেশটি গড়ে উঠেছে। এখানেই আছে চিরতুষারে আচ্ছন্ন আন্দিজের দুই আকাশস্পর্শী পর্বতশৃঙ্গ—চিম্বোরাজো ও কোটোপাক্সি। এই কোটোপাক্সি থেকে এক শো মাইল এবং চিম্বোরাজো থেকে তিন শো মাইলেরও বেশি দূরে দাঁড়িয়ে আছে পাহাড়ে ঘেরা সেই রহস্যময় মালভূমি, অন্ধরা থাকে সেখানে, সেখানকার খবর সভ্যজগতের কেউ রাখে না এবং সে দেশ দুর্গম পর্বত-প্রাচীরের আড়ালে চিরকালের মতো পৃথিবী থেকে বিচ্ছিন্ন।

গল্পটির প্রারম্ভেই অন্ধের দেশের এই অপরূপ বর্ণনা আমাদের অন্তরকে স্পর্শ করে। দুরবগাহ আন্দিজ পর্বত-মালা তার সমস্ত রহস্য নিয়ে ভেসে ওঠে আমাদের সামনে। আমরা যেন সেই মহিমময় পার্বত্য ভূভাগকে প্রত্যক্ষ করি। কল্পনায় তার উপর দিয়ে অভিযানে বেরিয়ে অন্ধের দেশে এসে থামি। 'দি কাণ্ট্রি অব দি ব্লাইন্ড'-এর অস্তিত্ব কল্পনা করে নিতে এতটুকু কষ্ট হয় না আমাদের। কষ্ট হয় না সে দেশের ইতিহাসকে বুঝতেও। সেই কোন্ সুদূর অতীতে মর্মান্তিক এক প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের ফলে দেশটি পৃথিবী থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়, এ কথা মনে-প্রাণে বিশ্বাস করি আমরা এবং যে কারণে এ কথা বিশ্বাস করি ঠিক সেই কারণেই অন্ধের দেশের ইতিকথার অন্য অংশগুলোও অবিশ্বাস করতে পারি না। যখন জানতে পারি, ওই ভয়াবহ বিপর্যয়ের পর কেমন করে সে দেশ থেকে একজন মাত্র মানুষ ছিটকে এসে পড়ল আমাদের পরিচিত এই পৃথিবীতে, আর সে মানুষটির কাছ থেকেই পৃথিবীর সবাই অন্ধের দেশের কথা প্রথম শুনল, তখন আর এতটুকু সন্দেহ থাকে না আমাদের মনে হয়, এমন ঘটনা ঘটলেও ঘটতে পারে। আর মনে হয়, আমরা যেন সেই অন্ধের দেশে দাঁড়িয়ে। দেশটিকে চোখের সামনে স্পষ্ট দেখছি যেন। যেন সেই রহস্যময় উপত্যকা আমাদের সামনে নতুন এক জগৎকে মেলে ধরছে। নতুন জগৎ, কিন্তু পরিচিত জগতের সঙ্গে মিল তার প্রচুর। জলবায়ুর মিল। মিল ভূপ্রকৃতির। আর এই মিলটুকু আছে বলেই অন্ধের দেশের বর্ণনা আমাদের অবিশ্বাস উদ্রিক্ত করে না; বরং দেশটির অস্তিত্বকে পরম বিশ্বাসযোগ্য করে তোলে। মনে হয়, ওয়েল্‌স-এর বর্ণনা সার্থক। 'দি কাণ্ট্রি অব দি ব্লাইন্ড' যথার্থই রঙে-রসে ভরোভরো। মানুষের মন যা' কিছু চায়, তার সবই বুঝি মিলবে ওখানে। প্রকৃতি সত্যই ওখানে রূপে-রসে অনন্যা। তার দাক্ষিণ্য উপচে পড়ছে

ওখানকার আকাশে-বাতাসে। গল্প পড়তে বসে মনে হয়, যেন সেই অপরূপা দাক্ষিণ্য-ময়ীর অন্দরমহলে দাঁড়িয়ে আছি। ফুল-ফল, নদী-নালা ও অরণ্য-প্রকৃতিকে নিয়ে আশ্চর্য এক বিচিত্রতা চোখে পড়ছে। মিঠে জল এদেশের আনাচে-কানাচে। এখানকার সবুজ পশুচারণভূমির দিকে তাকালে চোখ জুড়িয়ে যায়। আর কী স্নিগ্ধ আবহাওয়া এখানে! বৃষ্টি নেই, তুষার নেই; অথচ কী মনোরম এখানকার জলবাতাস! জমির বাদামী রঙের ঢাল-গুলোও কেমন সুন্দর! সোনা ফলে এখানে। রাশি রাশি আপেল আর রকমারী ফসলের মহোৎসব লাগে। অরণ্যও যোগ দেয় এ উৎসবে। এখানকার পাইন বনে জাগে সবুজের সমারোহ। একদিকে খানিকটা দূরেই চোখে পড়ে আকাশছোঁয়া গিরিশৃঙ্গগুলি। সেখানে আছে সব হিমবাহ। এ দেশের অপর তিনটি দিক ধূসর আর সবুজ রঙের শিলাময় পাহাড়ে ঘেরা। প্রতিটি পাহাড়ের চূড়ায় মুকুটের মতো শোভা পায় ধবধবে সাদা বরফ।

গল্পটির সুরুতেই অন্ধের দেশের এই অপরূপ বর্ণনা আমাদের মুগ্ধ করে। লেখকের অসাধারণ কল্পনাশক্তির পরিচয় পেয়ে বিস্মিত হই আমরা। ভাবি, কোনো অসম্ভব কাহিনীকে সম্ভব করে তুলতে গেলে সর্বাগ্রে যে তার ভিত্তিটি বিশ্বাসের ইট-পাথর দিয়ে তিলে তিলে গড়ে তুলতে হয়, ওয়েল্‌স তা' জানতেন। সে কারণেই মূল গল্পটি সুরু হয় যখন তখন আর অবিশ্বাসের হাসি হাসি না আমরা। রূপকথার অবাস্তব জগতে প্রবেশ করেছি ভেবে ব্যাকুল হই না। বরং মনে করি, যে জগতে এলাম তা' এতকাল আমাদেরই মধ্যে ছিল; আমরা তার পরিচয়টুকু শুধু জানতাম না। ওয়েল্‌স আমাদের তা' জানিয়ে দিলেন। প্রকৃতির এক অজ্ঞাত রহস্যপুরীর যবনিকা তুলে ধরে বুঝিয়ে দিলেন, রূপকথা নয়, কিংবদন্তী নয়, যে দেশের কথা বলতে চলেছি, তা' এই পৃথিবীরই ধূলি-ধূসরিত।

তারপর গল্প যেমন এগোয়, সে দেশের ধূলি আমাদেরও গায়ে এসে লাগে। সেই যে অভিযাত্রীটি, নাম যার নানেজ, আন্দিজ পর্বতে অভিযানে এসে সে দুর্ঘটনায় পড়ল এবং পথ হারিয়ে শেষটায় গিয়ে আশ্রয় নিল অন্ধের দেশে, আমরা তার সঙ্গ অনুভব করি যেন। মনে হয়, আমরা তার সঙ্গে সঙ্গে সেই রহস্যময় দেশটির দিকে চলেছি যেখানকার সকলেই পুরুষানুক্রমে অন্ধ; যেখানে বিচিত্র এক রোগ দেখা দিয়েছিল একবার এবং তারই প্রভাবে কয়েক পুরুষের মধ্যে একে একে যেখানকার সকলেই দৃষ্টিশক্তি হারিয়ে ফেলেছিল।

অন্ধত্বের এই ইতিকথা এবং তারপর দুর্গম পার্বত্য অঞ্চলের উপর দিয়ে শ্রান্ত ও অবসন্ন নানেজের পথ-চলার কাহিনী আশ্চর্য সূক্ষ্মদর্শিতার সঙ্গে বর্ণিত। অন্ধের দেশ প্রথম দর্শন করে নানেজের বিস্ময় ও উৎকণ্ঠার মধ্যেও যেন আমরা কোনো অস্বাভাবিকতা খুঁজে পাই নে। বরং আমাদের মনে হয়, অন্ধদের উপত্যকা, পথঘাট ও ঘরবাড়ির যে বিশিষ্টতা লেখক ফুটিয়ে তুলেছেন, তা' যেন সম্পূর্ণ স্বাভাবিক। সত্যি থাকতে পারে এমন কোনো দেশ যার বেশির ভাগ জায়গা জুড়েই সবুজ প্রান্তর। সে প্রান্তর সুন্দর সব ফুলে আকীর্ণ। চাষবাস চলে ওখানে। শস্যক্ষেত্রগুলোকে দেখলে মনে হয়, অত্যন্ত যত্নসহকারে ওখানে জল-সেচনের ব্যবস্থা হয়েছে। বেশ খানিকটা উঁচুতে উপত্যকাকে ঘিরে আছে একটি দেওয়াল। দেওয়ালের বাইরে লাম্যাদের বিচরণভূমি। পাহাড় সেখানে আরও অনেক উঁচু।

বিচিত্র এক পশু ওই লাম্যারা। দেখতে অনেকটা উটের মতো। দক্ষিণ আমেরিকায় থাকে ওরা।

অন্ধের দেশের আকাশ-উঁচু পাহাড়ের গায়ে গায়েও ওদের দেখা যায়। সেখানে ওরা দল বেঁধে ঘুরে বেড়ায়। প্রয়োজন হলে অন্ধের দেশের সীমানা-নির্দেশক দেওয়াল বরাবর নেমে আসে। দেওয়ালের গায়ে আছে অনেক আশ্রয়ক্ষেত্র। সেখানে ওরা জড়ো হয়। আশ্রয়ক্ষেত্রগুলো অন্ধরা গড়েছে। লাম্যাদের সাহায্যার্থেই গড়েছে।

দেওয়াল ভেদ করে উপত্যকা বরাবর জলধারা এগিয়ে গেছে অনেকগুলো। এদের সাহায্যে কৃত্রিম উপায়ে জল-সেচন করা হয়। ধারাগুলোর সব ক'টিই গিয়ে মিলেছে মূল প্রবাহের সঙ্গে, উপত্যকার ঠিক মাঝ-বরাবর।

এ ছাড়া পথঘাটও আছে অন্ধের দেশে। পথগুলো সাদা ও কালো পাথর দিয়ে গড়া। প্রতিটি পথেরই দু'পাশে সীমানা-নির্দেশক ছোট ছোট শিলাখণ্ড আছে। দেখলে মনে হয়, সুপরিকল্পনার ছাপ ওদের সর্বত্র।

সে দেশের কেন্দ্রীয় গ্রামটির ঘর-বাড়িগুলো অন্য সব পাহাড়ী গ্রামের মতো ছড়ান নয়। অসমতলেও দাঁড়িয়ে নেই ওরা। বাড়িগুলোর সব ক'টিই সারিবদ্ধ-ভাবে গড়ে উঠেছে। অদ্ভুত পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন একটি রাস্তা চলে গেছে ওদের ঠিক মাঝখান দিয়ে।

ঘরগুলো বহুবর্ণবিশিষ্ট। একটি করে দরজা আছে প্রতি ঘরে। কিন্তু রঙের ব্যাপারে কোনো শৃঙ্খলা নেই। ঘরগুলোর যেখানে-সেখানে যেমন খুশি রঙ বুলিয়ে দেওয়া হয়েছে। ছাই-রঙ কোথাও, কোথাও মেটে-রঙ, বাদামী-রঙ কোথাও, কোথাও আবার স্লেট-পথরের মতো কালো রঙ।

বহুবর্ণে রঞ্জিত এই ঘরবাড়িগুলোকে দেখেই নানেজের প্রথমে মনে হল, এদের যারা গড়েছে তারা নিশ্চয় অন্ধ।

ঠিক এই একই কথা মনে হয় আমাদেরও। মনে হয়, এবার অন্ধের দেশের মুখোমুখি হলাম আমরা। কিন্তু তবু বলবো, আসল গল্প এখানে নয়। অন্ধের দেশে দৃষ্টিশক্তিসম্পন্ন একজন লোক যাবার পর যে বিপর্যয়ের সৃষ্টি হয়, গল্পটি হল তা' নিয়ে। যারা চোখে দেখে নি কোনোদিন, তাদের কাছে চক্ষুষ্মান মানুষ যে উন্মাদ ছাড়া কিছু নয়, এ সত্যটিকেই লেখক এখানে মর্ম-স্পর্শী করে তুলে ধরেছেন।

নানেজ অন্ধদের দেশে পৌঁছুবার পর দেখা গেল, তার কথা কেউ গ্রহণ করছে না। সবাই তাকে অবিশ্বাস আর সন্দেহের চোখে দেখছে; দৃষ্টিশক্তি কি জিনিস তা' কেউ বুঝতে পারছে না এবং সে কারণেই তার কথার অধিকাংশই তাদের কাছে প্রলাপোক্তি বলে মনে হচ্ছে। চোখে দেখা জগৎ সম্বন্ধে অন্ধদের এই অবি-শ্বাসের কথা বলতে গিয়ে ওয়েল্‌স অসা-ধারণ কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন। গল্পটি পড়তে বসে মনে হয়, লেখক অন্ধদের সুখ-দুঃখ ও বিশ্বাস-অবিশ্বাসের শরিক হয়েছেন যেন, যেন অন্তর দিয়ে তাদের প্রাণের কথা উপলব্ধি করবার চেষ্টা করছেন।

অপর দিকে নানেজের চরিত্রটিও জীবন্ত। অন্ধদের কাছে চোখে-দেখা জগতের স্বরূপ বোঝাবার জন্যে তার আপ্রাণ চেষ্টা যে কোনো পাঠকের সহানু-ভূতি উদ্রেক করবে। অন্ধের দেশের নাগরিক পেড্রো, কররিয়া, ইয়াকভ—সকলকেই বোঝাতে চাইছে নানেজ যে জগৎটা ওদের দেশের প্রাচীরের গায়েই শেষ হয়ে যায় নি। তারও বাইরে আছে বিরাট পৃথিবী; আছে বিশ্বজগৎ। চোখ থাকলেই সে জগৎকে দেখা যায়। কিন্তু কেউ বিশ্বাস করছে না নানেজের কথা। দৃষ্টিশক্তি বলে কোনো কিছু যে আদৌ আছে, তা' কেউ মেনে নিচ্ছে না। সবাই উপহাস করছে নানেজকে। বলছে, নিশ্চয় সে বিকৃতমস্তিষ্ক। তা' না হলে দৃষ্টি-শক্তি নামক একটা উদ্ভট বস্তুকে নিয়ে সে এত মাথা ঘামাত না।

অন্ধদের সঙ্গে নানেজের এই বিরোধ-চিত্রটি বড় সুন্দর ও অভিনব। লেখক বহু-বিচিত্র নাটকীয় ঘটনার মধ্য দিয়ে চিত্রটিকে জীবন্ত করে তুলেছেন। নানেজ ও অন্ধদের প্রথম সাক্ষাতের দৃশ্য থেকেই বিরোধের সূচনা। অন্ধের দেশের

নাগরিকরা গোড়াতেই সন্দেহ করল নানেজকে। ভাবল, সে কোনো দুষ্ট আত্মা; পাহাড় থেকে নেমে এসেছে। মূল ঘটনাটি আসলে এইরকম;—তিনজন অন্ধ পথ চলছিল। নানেজ গিয়ে দাঁড়াল ওদের সামনে। কথা বলল। কিন্তু অপরিচিতের কণ্ঠস্বরে অন্ধরা আঁৎকে উঠল ভীষণভাবে।

"ওদের একজন বলল,—'ভাই পেড্রো, লোকটা কোত্থেকে আসছে?'

—'পাহাড়ের ভিতর থেকে', অপর একজন বুঝিয়ে দিল।

নানেজ বলল, 'পাহাড় পেরিয়ে এসেছি আমি। অনেক দূরের এক দেশ থেকে এসেছি, যে দেশের মানুষরা দেখতে পায়। আমি এসেছি বগোটার কাছ থেকে। সেখানে থাকে এক শত সহস্র মানুষ। সবাই দেখতে পায় সে শহরে।'

—'দেখতে পায়?' বিড় বিড় করে উঠলো। পেড্রো, 'দেখতে পায়?'

দ্বিতীয় অন্ধটি বলে উঠল, 'লোকটা এসেছে পাহাড়ের ভিতর থেকে।'

নানেজ লক্ষ্য করল, অন্ধদের কোটের কাপড়গুলো দেখতে অদ্ভুত রকম। একটির সেলাই অপরটি থেকে সম্পূর্ণ আলাদা।

এদিকে অন্ধরা এক সঙ্গে তার দিকে এগোচ্ছে দেখে নানেজ বিস্মিত হল। ওদের প্রত্যেকেরই একটি করে হাত সামনের দিকে প্রসারিত ছিল।

কয়েক পা পিছিয়ে গেল নানেজ। ওই এগিয়ে আসা প্রসারিত হাতগুলো থেকে একটু দূরে সরল।

তৃতীয় অন্ধটি অনুসরণ করল তার গতিপথকে এবং তাকে বেশ দৃঢ়ভাবে ধরে নিয়ে বলল, 'এদিকে এসো।'

ওরা সবাই মিলে ধরল নানেজকে। তাকে নিয়ে পড়ল এবং যতক্ষণ অবধি না ভালভাবে ধরতে পেরেছে, ততক্ষণ অবধি আর কোনো কথা বলল না।

'সাবধানে ধরো', চোখে একটা আঙুল দিয়ে চীৎকার করে উঠল নানেজ। স্পষ্টই সে বুঝল, যে ওরা তার অস্থির দু'টি চোখের পাতাকে অদ্ভুত কোনো পদার্থ বলে ভাবছে। আবার ওরা ওই ইন্দ্রিয়ের উপর হুমড়ি খেয়ে পড়ল।

'এ কোনো বিচিত্র জীব, কররিয়া', বললো পেড্রো, 'আমি ওর রুক্ষ চুলগুলোকে স্পষ্ট অনুভব করছি। মনে হচ্ছে, কোনো লাম্যার চুল যেন।'

নানেজের গোঁফদাড়িযুক্ত গাল নরম ও ঈষৎ আর্দ্র হাত দিয়ে পরীক্ষা করতে করতে কররিয়া বলল, 'যেখান থেকে ও এসেছে, সেখানকার মতোই ও রুক্ষ। তবে ভবিষ্যতে আরও সুন্দর হবে হয়তো।'

'ওদের পরীক্ষার কবল থেকে মুক্তির জন্যে নানেজ একটু-আধটু চেষ্টা করছিল। কিন্তু ওরা তাকে বজ্রমুষ্টিতে ধরে রাখল।

'সাবধানে ধরো', আবার বলল নানেজ। তৃতীয় অন্ধটি বলল, 'ও কথা বলে দেখছি। তবে নিশ্চয় ও মানুষ।'

নানেজের কোটটা অমসৃণ মনে হতেই পোড্রো বলল, 'ধ্যেৎ!'

'তুমি বুঝি পৃথিবীতে নেমে এলে?' পেড্রো শুধাল।

'পৃথিবীতে নয়, পৃথিবীর বাইরে নেমে এসেছি', বলল নানেজ, 'ওই যে পথ যা' চলে গেছে পর্বত আর হিমবাহের উপর দিয়ে সূর্যের মাঝরাস্তা অবধি, সে পথ ধরে নেমে এসেছি। বিরাট ও মহৎ পৃথিবী থেকে এসেছি, এখান থেকে যার সমুদ্রে পৌঁছুতে বারো দিন সময় লাগে।'

কিন্তু অন্ধদের কেউ তার কথায় আদৌ কান দিচ্ছে বলে মনে হল না।

কেন না অদ্ভুত এক জগতের মানুষ ওরা। সে জগতের বাইরে অন্য কিছুর অস্তিত্ব ওদের কাছে অকল্পনীয়। তাই ওরা সলা-পরামর্শ করে ঠিক করল, আগন্তুক জীবটিকে প্রবীণদের কাছে নিয়ে যাবে। কিন্তু অন্ধের দেশের প্রবীণরা যে অজ্ঞতায়

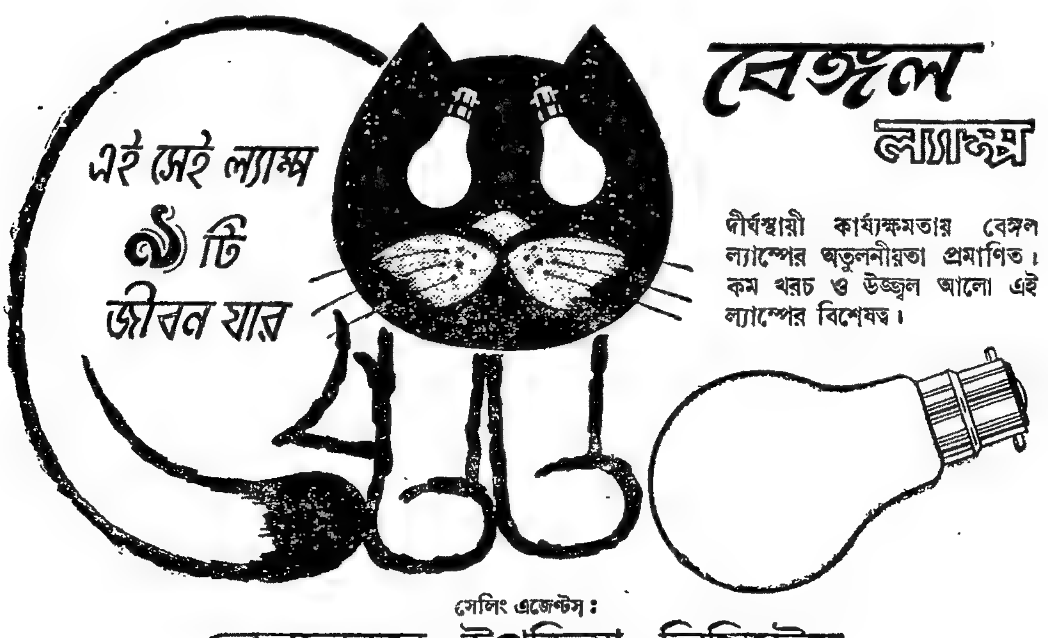

সেলিং এজেন্টস্ঃ
বেলরেক্স্ ইণ্ডিয়া লিমিটেড
কলিকাতা • দিল্লী • আমেদাবাদ
হেড অফিস : ১০, প্রিন্সেপ ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১৩

নবীনদের হার মানিয়েছে, গল্পটির পরবর্তী পর্বে তা' দেখি আমরা। আর এই পর্বে দেখি, নবীনদের দৃষ্টি অন্ধকূপের মধ্যে আবদ্ধ। নতুনকে বরণ করার মতো বুদ্ধি ও সহৃদয়তা নেই ওদের। নানেজকে কিছুতেই ওরা বিশ্বাস করতে পারছে না। পদে পদে সন্দেহ ও শঙ্কা ওদের ঘিরে ধরেছে।

তাই নানেজকে নিয়ে গ্রামের পথ ধরে যাবার আগেই চিৎকার করে সকলকে সাবধান করে দিল পেড্রো, কর্রিয়া ও তৃতীয় অন্ধটি। আগন্তুকের আবির্ভাবে ছোটরা ভয় পেতে পারে, এই ছিল ওদের ধারণা।

পেড্রো চলল সকলের আগে। হাত ধরে নিয়ে চলল নানেজকে। ঘৃণায় আর বিরক্তিতে নানেজ এদিকে অস্থির হয়ে উঠেছে। তাই এক-একবার হাত ছাড়িয়ে নিল সে। কিন্তু পথ-প্রদর্শকরা কিছুতেই তাকে রেহাই দিল না; আবার শক্ত করে ধরল। ঠাট্টায় আর বিদ্রূপে জর্জরিত করল তাকে। সে উন্মাদ আর অপরিণত, এই ভেবে অন্ধরা হেসে গড়িয়ে পড়ল।

সমস্ত গ্রাম ভিড় করল নানেজকে দেখবে বলে। ছেলে-বুড়ো, যুবক-যুবতী সবাই এসে জড়ো হল পথে। চিৎকার শোনা গেল ওদের। অনেকে আবার এগিয়ে এসে নানেজকে ধরল, স্পর্শ করল অনেকে; এবার অনেকে একটু দূরে দাঁড়িয়ে তার ঘ্রাণ নিল। কুমারী ও শিশুদের প্রায় সকলে দূরে দাঁড়িয়ে রইল। মনে হল, যেন ওরা খুব ভয় পেয়েছে।

দেখতে দেখতে নতুন নামকরণ হল নানেজের। সবাই ওকে বলল, 'বগোটা।' নানেজের অপরাধ, বগোটা নামক এক শহর থেকে সে এসেছে; এবং অন্ধদের সঙ্গে প্রথম পরিচয়ের সময় এই সত্যি কথাটি সে প্রকাশ করেছিল।

এদিকে অন্ধরা হঠাৎ তাকে এক প্রচণ্ড ধাক্কা দিল। সে গিয়ে হুমড়ি খেয়ে পড়ল এক ঘরে। সে ঘর পীচের মতো জমাট পুরু আঁধারে আচ্ছন্ন। সেখানে ছিলেন অন্ধসমাজের কয়েকজন প্রবীণ। নানেজকে অনেক প্রশ্ন করলেন ওরা। নানেজ ওদের বোঝাতে চাইল, পৃথিবী বিরাট ও মহিমময়। ওই পৃথিবী থেকেই সে এখানে ছিটকে পড়েছে। বোঝাতে চাইল, বিশ্বজগৎ বৈচিত্র্যে ভরা। পাহাড় আছে সেখানে, তারকাদীপ্ত আকাশ আছে, আছে সমুদ্র। কিন্তু প্রবীণরা ওকে বুঝল না। শুনল না ওর কথা। কেন না চোদ্দ পুরুষ ধরে ওরা অন্ধ; চোখে-দেখা জগৎ থেকে একেবারে বিচ্ছিন্ন। দৃষ্টিশক্তি কি জিনিস, তা' ওরা ভুলে গেছে। বাইরের জগতের কাহিনী ক্ষীণ থেকে ক্ষীণতর হতে হতে ওদের কাছে আজ ছেলেভুলোনো রূপকথায় পর্যবসিত।

নানেজ বুঝল, অদ্ভুত এক জগতে এসেছে সে। এখানকার অধিবাসীদের কাছে পৃথিবীর কথা বলা নিরর্থক। তার চেয়ে বরং এরা কি বলে, তা' শোনা যাক।

অনেক কথা বললেন প্রবীণদের একজন। অন্ধের দেশের বহু আজগুবি গল্প শোনালেন। নানেজ বুঝল, ওদের জগৎটা সামনের পাহাড়ের গায়েই শেষ হয়ে গেছে। পাখিদের ওরা দেবদূত ভাবে। আমাদের দিন ওদের কাছে রাত্রি। দিনকে উষ্ণ বলে ওরা; আর রাত্রিকে বলে শীত। ওরা ঘুমোয় আমাদের হিসেবে দিনের বেলায়। আর রাত্রিতে আমরা যখন ঘুমোই তখন ওরা কাজ করে।

শেষ অবধি ওই বিচিত্র জগতে নির্বাসিত হল নানেজ। নিরুপায় হয়ে অন্ধদের অনেক আইনকানুন মেনে নিল। লাম্যার দুধ খেল সে। দিনের বেলায় তার ঘুমুবার আয়োজন হল। কিন্তু সে ঘুমুতে পারল না কিছুতেই। সারাক্ষণ জেগে বসে রইল।

এদিকে সন্ধ্যে হয়ে এল যখন, সূর্য যখন অস্ত গেল তখন অনির্বচনীয় এক সৌন্দর্যে অন্ধের দেশের তুষার-প্রান্তর ও হিমবাহগুলো পরিপূর্ণ হয়ে উঠল। অস্তরবির আভা শস্যক্ষেত্রে ও গ্রামে ছড়িয়ে পড়ল। নানেজের মনে হল, এত সুন্দর দৃশ্য জীবনে সে আর কোনোদিন দেখে নি।

আর মনে হল, ভগবানের কাছে তার কৃতজ্ঞতার অবধি নেই; এই অনুপম দৃশ্য দেখবার জন্যে তিনি তাকে দৃষ্টিশক্তি দিয়েছেন।

কিন্তু দৃষ্টিহীনরা কেউ তাকে বুঝল না। চলনে-বলনে প্রতি মুহূর্তে তাকে বাধা দিল; উপহাস করল। নানেজের আশা ছিল, দৃষ্টিশক্তিকে মূলধন করে অন্ধদের উপর প্রভুত্ব বিস্তার করবে সে। অন্ধের দেশের একচ্ছত্র অধিপতি হবে। কিন্তু কার্যত দেখা গেল, অন্ধরাই তার উপর প্রভুত্ব করছে; এবং সে ধীরে ধীরে অন্ধের দেশের আচার-আচরণে অভ্যস্ত হয়ে পড়ছে।

গল্পটির পরবর্তী অংশে অন্ধদের জীবনযাত্রা ও স্বভাব-ধর্মের একটি নিখুঁত পরিচয় তুলে ধরেছেন ওয়েল্স। বলেছেন, দৃষ্টিশক্তি নেই বলেই ওদের ঘ্রাণ ও শ্রবণশক্তি অসাধারণ তীব্র। প্রধানত বিভিন্ন ঘটনার মধ্য দিয়ে অন্ধদের স্বভাব-ধর্মের এই বিশিষ্টতা বর্ণিত। সে কারণেই সমস্ত বর্ণনাটিকে বাস্তবধর্মী বলে মনে হয়। সেখানে বিচিত্র এক জীবনের সান্নিধ্যলাভ করি আমরা। কিন্তু ঠিক তার পরেই নানেজের সঙ্গে অন্ধদের সংঘাতের কাহিনী যখন পাঠ করি, তখন অদ্ভুত এক বেদনা ঘিরে ধরে আমাদের। মনে হয়, চক্ষুষ্মানদের সঙ্গে দৃষ্টিহীনদের এমন আরও কত সংঘাত যুগ যুগ ধরে হয়েছে, কে জানে!

চক্ষুষ্মান নানেজ অনন্যোপায় হয়ে বিরোধ ও বিদ্রোহের পথ বেছে নিয়েছিল। যখন দেখল সে, অন্ধরা কিছুতেই তাকে বুঝছে না, কিছুতেই মানছে না যে পৃথিবীটা ওদের দেশের পাহাড় বরাবর খানিকটা উঠেই শেষ হয়ে যায় নি, ছাদ নেই পৃথিবীর উপরে এবং কুয়াশা হিমানীসম্প্রপাত মাথার উপরকার ওই ছাদ থেকে নেমে আসে না, তখন বাধ্য হয়েই সে বিদ্রোহী হল।

দৃষ্টিশক্তি কি জিনিস, তা' প্রমাণ করবে বলে মরীয়া হয়ে উঠল নানেজ। এজন্য স্বেচ্ছায় সে দু'টি পরীক্ষাও দিল। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে তাদের একটিতেও অন্ধরা তাকে পাশ-মার্ক দিল না। অগত্যা হাতে একটি কোদাল তুলে নিল নানেজ। অন্ধদের আঘাত করবে বলে রুখে দাঁড়াল। অন্ধরা টের পেল সবই। তৎক্ষণাৎ তাকে সাবধানও করে দিল। কিন্তু নানেজ ক্ষিপ্ত হয়ে উঠেছে এবার। অন্ধদের বশে আনবে বলে মরণ-পণ করেছে। তাই শেষ অবধি সংঘাত অনিবার্য হয়ে উঠল। কোদাল হাতে নিয়ে অন্ধরা বেরিয়ে এল দলে দলে। আর প্রচণ্ড আক্রোশে নানেজ উন্মাদের মতো আচরণ করতে লাগল। কখনও গ্রামের পথ ধরে দ্রুত এগিয়ে গেল সে, কখনও মাঠের উপর দিয়ে বিদ্যুৎবেগে ছুটল; আবার কখনও দেখল, অন্ধরা চারিদিক থেকে তাকে ঘিরে ধরেছে। এক একবার অন্ধদের হত্যা করবার কথা মনে এল নানেজের। কিন্তু হত্যা করতে কিছুতেই সে পারল না। অসমতলে দাঁড়ান দৃষ্টিহীনদের আঘাত করতে গিয়ে বিবেকে বাধল তার। তাই শেষ অবধি অন্ধের দেশের দেওয়ালের বাইরে গিয়ে কোনোক্রমে সে আত্মরক্ষা করল।

নানেজের সঙ্গে অন্ধদের এই সংগ্রামের চিত্রটি আঁকতে গিয়ে ওয়েল্স আশ্চর্য শিল্পনৈপুণ্যের পরিচয় দিয়েছেন। দেখিয়েছেন, মরণকে বাদ দিয়েও জীবনের বিভীষিকা কেমন মর্মান্তিক হয়ে ওঠে। জীবনের খাতিরেই জগৎকে কেমন নিজের মতো করে পেতে চাই আমরা।

এদিকে অন্ধপুরীর বাইরে দাঁড়িয়ে নানেজ কিন্তু জীবনের স্বাদ পায় নি। দু' দিন দু' রাত্রি আশ্রয়হীনভাবে কাটিয়েছে সে। খায় নি কোনো কিছু। ঘুমুতে পারে নি এক মুহূর্ত। তাই জীবনের তাগিদেই আবার তাকে অন্ধদের

স্বারম্থ হতে হয়েছে। অন্ধের দেশে আবার ফিরে এসেছে সে। স্বীকার করেছে, দৃষ্টি বলে কিছু নেই, অপরিণত ও বিকৃতমস্তিষ্ক বলেই সে এতদিন ধরে ভুল করছিল। মেনে নিয়েছে যে, দশ মানুষ সমান উঁচুতেই আছে পৃথিবী-জোড়া ছাদ। পাথর দিয়ে গড়া সে ছাদটি বড় মসৃণ।

এই চরম অসত্যকে সত্য বলে মেনে নিতে গিয়ে হাহাকার করে উঠেছে নানেজের অন্তরাত্মা। চোখের জলে বুক ভেসে গিয়েছে তার।

আমরা নানেজের এই কান্নার মধ্যে অনেককে খুঁজে পাই। আমাদের মনে হয়, যুগ-যুগান্ত কাল ধরে মিথ্যের সামনে দাঁড়ান সমস্ত সত্যদ্রষ্টাদের বুকফাটা বেদনা ওখানে পুঞ্জীভূত। কিন্তু তবু জীবনকে অস্বীকার করতে পারে না মানুষ। বার বার অগ্নিপরীক্ষা দিয়েও নতুন আশ্রয়কে সে আঁকড়ে ধরে। এখানে নানেজ ঠিক তাই করেছে। অন্ধদের সাহায্য প্রার্থনা করেছে সে। অসুস্থ হবার পর ওদের শুশ্রূষাতেই সেরে উঠেছে।

অন্ধরা ক্ষমা করেছিল নানেজকে। ইয়াকভ্ নামে এক সর্দারের তত্ত্বাবধানে ওর চিকিৎসার ব্যবস্থা করেছিল। বড় কঠিন সেই চিকিৎসা। নানেজকে সর্বক্ষণ অন্ধকারে শুয়ে থাকতে হত। এই দুঃখের দিনে একজনই মাত্র সংগী ছিল তার। সে হল ইয়াকভের ছোট মেয়ে মেডিনা-শারোতে। ক্রমেই সেরে উঠল নানেজ। কিন্তু মেডিনাকে কোনমতেই ভুলতে পারল না। তার মনে হল, অমন সুন্দর মেয়ে পৃথিবীতে আর কোথাও নেই। এর পর ধীরে ধীরে নানেজের সঙ্গে মেডিনার প্রণয় গড়ে উঠল কেমন করে, ওয়েল্স তার এক আকর্ষণীয় বর্ণনা দিয়েছেন। এই বর্ণনা আমাদের কাছে সম্পূর্ণ বিশ্বাসযোগ্য বলে মনে হয়।

কেন না নানেজ ও মেডিনার প্রেমের এক সুন্দর মনস্তাত্ত্বিক ভিত্তি এ গল্পে রয়েছে। নানেজ প্রথম দিনেই অন্ধের দেশের মেয়েদের রূপে মুগ্ধ হয়েছিল। এ ছাড়া মেডিনা তন্ময় হয়ে নানেজের কাছ থেকে পৃথিবীর গল্প শুনত; এবং এর চেয়েও বড় কথা, মেডিনা ও নানেজ—উভয়েই ছিল অন্ধের দেশে চরম অবজ্ঞার পাত্র। এদিকে যে সব কারণে অন্ধরা মেডিনাকে কুৎসিত ভাবত, ঠিক সেই সব কারণেই নানেজের তাকে সুন্দরী বলে মনে হল। তাই বিশ্রামের দিনে, অন্ধকারে আহারের সময় অথবা জ্যোৎস্না-স্নাত বসন্তের রাত্রে উভয়ের মধ্যে প্রেম ঘনীভূত হতে সময় লাগল না।

নানেজ বুঝেছিল, অন্ধের দেশ থেকে তার মুক্তির আর কোনো আশা নেই। অতএব প্রণয়-পাত্রী মেডিনাকেই বিয়ে করবে বলে সে মন-স্থির করল। কিন্তু এ ব্যাপারে বাধা হয়ে দাঁড়াল তার চোখ। সবাই বলল, দৃষ্টিশক্তি আছে এমন কোনো মানুষের সঙ্গে মেডিনার বিয়ে হতে পারে না। সবচেয়ে কঠিন রায় দিলেন চিকিৎসক। নানেজের চোখ দু'টি পরীক্ষা করে বললেন, ওই হল যত নষ্টের গোড়া। ওরই জন্যে নানেজের যত কিছু পাগলামী। ওই চোখই ওর মাথায় খারাপ সব ভাবনা যোগায়। অতএব চোখ দু'টিকে কেটে বাদ দিলে নানেজ অন্ধের দেশের আর দশজন লোকের মতোই স্বাভাবিক হতে পারবে। তখন মেডিনার সঙ্গেও তার বিয়ে আটকাবে না।

কথা শুনে আঁৎকে উঠল নানেজ। কিন্তু সবাই নাছোড়বন্দা। এমন কি শেষ অবধি মেডিনার কাছ থেকেও অনুরোধ এল। সে বলল, প্রিয়তম কি তার জন্যে সামান্য দু'টি চোখও ত্যাগ করতে পারবে না?

"নানেজ বোঝাতে চাইল, 'দৃষ্টিই হল আমার জগৎ।'

কথা শুনে মেডিনার মাথা আরও ঝুঁকে পড়ল।

নানেজ বলল, 'কত সুন্দর জিনিস আছে জগতে, কত সুন্দর ছোটখাট জিনিস,—ফুল, পাহাড়ের গায়ে শৈবাল, হাল্কা ও নরম ফারের টুকরো। আছে আকাশ আর তার চলমান মেঘপুঞ্জ। সূর্যোদয় আছে, আছে সূর্যাস্ত। আর আছ তুমি। শুধুমাত্র তোমার খাতিরেই দৃষ্টি চাই আমি। তোমার শান্ত ও সুন্দর মুখ দেখবো বলে, তোমার করুণাভরা ঠোঁট ও তোমার প্রিয় ও সুন্দর দু'টি হাত যুক্ত অবস্থায় দেখবো বলে দৃষ্টির প্রয়োজন আমার। তুমি আমার এই চোখ দু'টোকেই জয় করেছ। এই দু'টি চোখই তোমাকে আমার সঙ্গে বেঁধে রেখেছে। কিন্তু মূর্খরা তা' জানে না। চোখ গেলে তোমাকে স্পর্শ করব আমি, তোমার কথা শুনবো, কিন্তু তোমাকে আর কোনো দিন দেখতে পাবো না। আমাকে সেই শিলাময় ছাদের তলায় নেমে আসতে হবে, যেখানে শুধু অন্ধকার; যেখানে ভয়ঙ্কর ওই ছাদের নিচে তোমাদের সমস্ত কল্পনা রুদ্ধ হয়ে আছে...না না, তুমি আমাকে দিয়ে ওকাজ করাতে পারবে না।'

কিন্তু শেষ অবধি রাজী হতে হল নানেজকে। মেডিনার প্রেম ও অনুনয়েই শেষ অবধি সে সম্মত হল। স্থির হল, অন্ধের দেশের ওই সেরা চিকিৎসক বিশেষ একটা দিনে তার চোখ কেটে বাদ দেবেন।

কিন্তু চোখের মায়া ত্যাগ করতে পারল না নানেজ। যে বিরাট ও মুক্ত পৃথিবীর সঙ্গে তার বিচ্ছেদ ঘটেছে, তার চিন্তা তাকে পেয়ে বসল। নক্ষত্রখচিত আকাশ, তরঙ্গোদ্বেল সমুদ্র ও জনসমাকীর্ণ নগর তাকে হাতছানি দিয়ে ডাকল। তার বহুকালের চেনা পৃথিবীর রূপ-রস আবার নতুন করে উপভোগ করার জন্যে উতলা হয়ে উঠল সে।

তাই দেখি, চোখের মমতায় ও চেনা পৃথিবীর আকর্ষণে মেডিনার মায়াও শেষ অবধি ত্যাগ করেছে নানেজ। অচেনা-অজানা দুর্গম পাহাড়ী পথ ধরে সে যাত্রা করেছে আমাদের চেনা-জানা পৃথিবীর উদ্দেশে। অন্ধের দেশের দুর্গম পাহাড় ডিঙিয়ে সে হয়তো কোনোদিনই পৃথিবীতে এসে পৌঁছুতে পারবে না; কিন্তু অন্ধের দেশ থেকে তার এই মহা-প্রস্থানের মধ্য দিয়ে জীবনের যে মহৎ সত্যটি প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, তা' হল এই যে, দৃষ্টিকে অবরুদ্ধ করতে চায় না মানুষ। নিজের জগৎটি সংকুচিত হবে ভেবে স্বর্গসুখকেও অনেক সময় সে তুচ্ছ জ্ঞান করে; এবং তার এই আত্মোৎসর্গের মধ্য দিয়েও মানব-সভ্যতার বিজয় ঘোষিত হচ্ছে।

কিন্তু সভ্যতার অভিশাপ যে কুসংস্কারাচ্ছন্ন অন্ধ মানুষ, এ কথাও অস্বীকার করা যায় না। তাই দেখা যায়, প্রকৃত সত্যদৃষ্টির অধিকারী যাঁরা, সাধারণের কাছে প্রায়ই তাঁরা হন উপহাসের পাত্র। অন্ধের দেশের মানুষ ওঁদের বোঝে না। গ্রহণ করে না ওঁদের কথা। আর অন্ধের দেশ তো শুধুমাত্র একটি বিশেষ স্থানেই আবদ্ধ নেই। পৃথিবীর সর্বকালে সর্বদেশেই এর অস্তিত্ব খুঁজে পাওয়া যায়। আসলে এই পৃথিবীটাই এক বিরাট অন্ধের দেশ। নানেজরা যুগে যুগে আসে এখানে; মহত্তর সত্যকে প্রকাশ করে। কিন্তু প্রতিদানে পায় ঘৃণা ও বিদ্বেষ।

কিন্তু তবু এগিয়ে চলে ওরা; দুঃখ ও বেদনার কণ্টকাকীর্ণ পথ ধরে চলে। গভীর এই জীবনসত্যটিকে শিল্পসম্মত উপায়ে প্রকাশ করেছে বলেই অন্ধের দেশ বা 'দি কাণ্ট্রি অব দি ব্লাইণ্ড' পৃথিবীর একটি শ্রেষ্ঠ গল্প।

শ্রীনলিনীকান্ত সরকার — সংযোজন

১। নলিনীকান্ত সম্পর্কে যে রচনাটি আমি লিখেছিলাম, তাতে তাঁর হাতে কলমে কৌতুক সৃষ্টির কথা ছিল। একটি খুব উপভোগ্য ঘটনা বাদ পড়ে গেছে। ১৯৪০ সাল। যুদ্ধের সময় সেটি, ট্রাম-বাসে এখন যেমন ভিড় তখন যেন তার চেয়েও বেশি ছিল মনে হয়। এমনি অবস্থায় আমি ভিতরে দাঁড়িয়ে আবিষ্কার করি, নলিনীকান্ত সামনের দিকে দাঁড়িয়ে আছেন। আমরা দুজনেই দুজনকে দেখছি, কিন্তু নিরেট ভিড় ঠেলে এগিয়ে মেলবার উপায় নেই।

কন্‌ডাকটর কাছাকাছি ছিল। তাকে আমার মাসিক টিকিটখানা যখন দেখাচ্ছি, তখন নলিনীকান্ত চেঁচিয়ে আমাকে বলে উঠলেন, নগেনবাবু, আপনি কি এখনও পরিমলবাবুর মান্থলি টিকিট ব্যবহার করছেন?

কন্‌ডাকটর কিন্তু অদ্ভুত ভাল ব্যবহার করল। আমাকে চ্যালেঞ্জও করল না, আমার টিকিট কেড়েও নিল না। সম্ভবত রসিকতাটা বুঝতে পেরেছিল। নলিনীকান্ত অত্যন্ত বিপজ্জনক কথাটি বলেছিলেন।

২। রবীন্দ্রনাথের গান সম্বন্ধে শান্তি পারাবার—সম্পর্কে একটি প্যারাগ্রাফ ঐ রচনায় ছিল। নলিনীকান্ত একটি মিলের অসঙ্গতিতে সন্দেহ প্রকাশ করায় পরে তা বিশ্বভারতী কর্তৃক আবিষ্কৃত হয়। মূলে ঠিকই ছিল নকলকারীর ভুল। এবং পরে সংশোধিত হয়। ঘটনাটি আমার জানা ছিল। নলিনীকান্ত এই রচনার আগে অনুরুদ্ধ হয়ে পুনরায় ওটি আমাকে লিখে পাঠান। প্রথমে গাওয়া হয় "জ্যোতির ধ্রুব তারকা"। পরে সংশোধিত হয় "জ্যোতি ধ্রুব তারকার।" ঐ ভুল কথাগুলি জানা থাকা সত্ত্বেও নকল করতে আমারও অসাবধানতাবশত "জ্যোতির" স্থলে "জ্যোতি" হয়েছে। সেজন্য দুঃখিত।

৩। ক্রসওয়ার্ডের সমাধান ছক এবারে দেওয়া হল। এতে দু-একটির ব্যাখ্যা দরকার। (সমাধান যাঁরা পাঠিয়েছেন, তাঁদের মধ্যে যাঁর সবচেয়ে কম ভুল হয়েছে, সেই ভুলের সংখ্যা ছয়। অন্যান্যের অনেক বেশি ভুল হয়েছে।)

[এখানে প্রথমে মূল ক্রসওয়ার্ডটি (সন্ধানসূত্র বাদে) যেমন ছিল তা দেওয়া হচ্ছে, এবং তার পরেই সমাধানের ছক ও কিছু ব্যাখ্যা:]

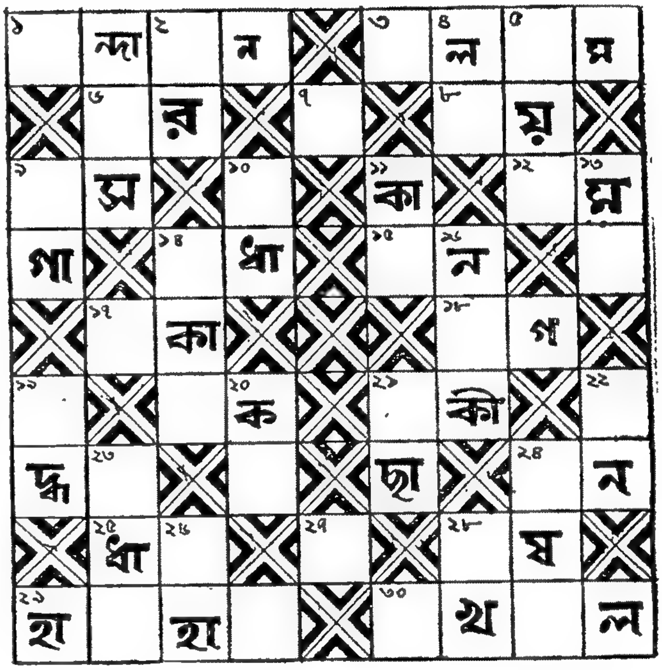

সমাধান

শব্দের অন্তর্নিহিত অর্থ—

পাশাপাশি

৯। একান্নবর্তী ৫১+বর্তী (তাস)

উপর থেকে নিচে

১১। সহজ=স+হজ

১৩। অস্থির=হাড়ের, সমাধান, মজ্জা। অস্থির মধ্যে মজ্জা থাকে।

২৫। ঊর্ধ্বগতি এর অন্তরায়=অন্ত-রায় মানে অন্তরাতে। সমাধান—গান। গানের অন্তরায় অপেক্ষাকৃত উচ্চসুর।

একঘরে

২৭। চা না থাকলে নাচা শব্দটির না অবশিষ্ট থাকে।

হেমেন্দ্রকুমার রায় সম্পর্কে চিঠি

গত ১৪ই জুলাই তারিখের সাপ্তাহিক বসুমতীতে প্রকাশিত 'আমি যাঁদের দেখেছি' পর্যায়ের হেমেন্দ্রকুমার রায় শীর্ষক লেখাটি পড়লাম। লেখকের অতি মূল্যবান দুই খণ্ড 'স্মৃতিচিত্রণে'র মত উক্ত পর্যায়ের লেখাগুলিও আমাকে সম-ভাবে আকৃষ্ট করেছে।

তবে হেমেন্দ্রকুমার-প্রসঙ্গে পরি-বেশিত একটি ত্রুটিযুক্ত তথ্য চোখে পড়ল। গোস্বামীমহাশয় এক জায়গায় লিখেছেন—'হেমেন্দ্রকুমারের পরিবারের এক ব্যক্তি রবীন্দ্র-বিরোধী বই লেখেন একখানা। বইয়ের নাম রবিয়ানা। লেখকের নাম অমরেন্দ্র রায়।'

এই তথ্য সঠিক নয়। অমরেন্দ্রনাথ রায় নামক ব্যক্তি হেমেন্দ্রকুমারের পরিবার-ভুক্ত কেউ নন। উভয়ের মধ্যে পারিবারিক আত্মীয়তার সূত্র থাকতে পারে।

হেমেন্দ্রকুমার তাঁর সাহিত্যজীবনের প্রথম পর্বে সাধনা সমিতি নামক এক সাহিত্য-গোষ্ঠীতে যোগদান করেন। ঐ গোষ্ঠীর মুখপত্র ছিল 'অর্চ্চনা'। ঐ সাহিত্যগোষ্ঠী এবং 'অর্চ্চনা'র অন্যতম প্রধান লেখক ছিলেন—অমরেন্দ্রনাথ রায় নামক ব্যক্তি। অর্চ্চনা লেখকগোষ্ঠীর রবীন্দ্র-বিরোধিতা সম্ভবত হেমেন্দ্রকুমারের প্রথমজীবনে কিছু প্রভাব বিস্তার করে থাকবে। পারিবারিক প্রভাব কতটা ছিল সন্দেহ।

প্রথমজীবনে হেমেন্দ্রকুমার এবং অমরেন্দ্রনাথ রায় নামক ব্যক্তি—এঁরা উভ-য়েই পরস্পর বন্ধুত্বসূত্রে আবদ্ধ ছিলেন। তদানীন্তন দৈনিক পত্রিকা 'নায়ক' এবং 'হিন্দুস্থানে' এঁরা উভয়েই একত্রে সাংবাদিকতা করেছেন।

পরবর্তীকালে সাহিত্যগত আদর্শ নিয়ে বিরোধ বাধে এবং উভয়েই পরস্পর বিচ্ছিন্ন হয়ে যান।

'অর্চ্চনা' পত্রিকায় দ্বিজেন্দ্রলালের 'দুর্গাদাস' নাটক এবং 'প্রবাহিনী' পত্রিকায় অবনীন্দ্রনাথের চিত্রকলা নিয়ে উভয়ের মসীযুদ্ধ এ-প্রসঙ্গে উল্লেখ্য। নমস্কারান্তে—ইতি।

শ্রীমতী চিত্রলেখা চৌধুরী

২৬৭, রবীন্দ্রসরণী,

ফ্ল্যাট—৭, কলি-৫

১৫-৭-৬৬

এই চিঠিতে যে সব তথ্য দেওয়া হয়েছে তা আমার জানা ছিল না। আমি, অমরেন্দ্রনাথ রায় যে হেমেন্দ্রকুমারের আত্মীয়, এটি শুনেছিলাম হেমেন্দ্রকুমারের তৎকালীন অন্তরঙ্গ বন্ধু শ্রীপ্রভাতচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়ের মুখে। তিনি যেটুকু বলেছিলেন, তাই লিখেছি। এটি অবিশ্বাস করবার আমার কোনো কারণ ছিল না, এবং লেখা ছাপা হবার পরেও তিনি পড়েছেন সেটি। হেমেন্দ্রকুমার রায়ের পুত্র প্রদ্যোৎকুমারও এ বিষয়ে কিন্তু কোনো আপত্তি জানান নি।

পরিমল গোস্বামী

১৩-৯-৬৬

মাঢ়ী সুস্থ ও সবল রাখতে
এবং মুখের গন্ধ দূর করতে
নিম অদ্বিতীয়
নিমের উপকারিতা হাজার হাজার বছরের পরীক্ষিত সত্য
যুগযুগান্ত ধরে' প্রতিষ্ঠিত এই মহোপকারী নিমের সক্রিয় উপাদানগুলিই নিম টুথ পেস্টের প্রধান উপকরণ। এর সঙ্গে বৈজ্ঞানিক উপায়ে মিশ্রিত রয়েছে ফ্লুরাইড ও আধুনিক দন্ত বিজ্ঞানসম্মত অন্যান্য উপকরণাদি।
● নিম টুথ পেস্টের প্রচুর বীজাণুনাশক ফেনা দাঁতের ফাঁকে ফাঁকে ঢুকে বীজাণু ধ্বংস করে।
● নিম টুথ পেস্ট মুখের দুর্গন্ধ দূর করে' শ্বাসপ্রশ্বাস সুরভিত করে।
● নিম টুথ পেস্ট পাইওরিয়া নিবারণে সাহায্য করে, মাঢ়ী সুদৃঢ় এবং দাঁতকে পরিষ্কার ঝকঝকে করে।

ক্যালকাটা কেমিক্যাল
কর্তৃক প্রস্তুত
CNP-1281-66

ধারাবাহিক উপন্যাস

আশাপূর্ণা দেবী

[পূর্ব-প্রকাশিতের পর]

তাই তো! সুবর্ণলতা না সত্যবতীর মেয়ে! যে সত্যবতী স্বামীর কাছ থেকে আঘাত পেয়ে এক কথায় স্বামী সংসার ত্যাগ করে চলে গিয়েছিল, আর ফেরে নি।

মায়ের সেই তেজের কণিকামাত্র পায় নি সুবর্ণলতা?

সত্যবতী যদি তার মেয়ের এই অধোগতি দেখে ধিক্কার দেবে না? বলবে না 'ছি ছি সুবর্ণ তুই এই!'

সে ধিক্কারের সামনে তো চুপ করে থাকতে হবে সুবর্ণকে মাথা হেঁট করে!

না কি করবে না মাথা হেঁট?

মুখ তুলেই তাকাবে মায়ের দিকে?

বলবে, 'মা তোমার অবস্থায় আর আমার অবস্থায়? সেখানে যে আকাশ-পাতাল তফাৎ!'

তা' বলতে যদি পারে সুবর্ণ, বলতে যদি পায়, মিথ্যা বলা হবে না। আকাশ-পাতালই। সুবর্ণর মা'র জীবনের পৃষ্ঠপটে ছিল এক অত্যুজ্জ্বল সূর্যজ্যোতি, সত্যবতীর বাবা সত্যবতীর জীবনের ধ্রুবতারা, সত্যবতীর জীবনের বনেদ, সত্যবতীর মেরুদণ্ডের শক্তি!

সুবর্ণর পৃষ্ঠপটে শুধু এক টুকরো বিবর্ণ ধূসরতা। সুবর্ণর কাছে বাবার স্মৃতি, বাবা প্রতারণা করে তার বিয়ে ঘটিয়ে জীবনটাকে ধ্বংস করে দিয়ে নির্লিপ্ত হয়ে বসে আছে!

সুবর্ণর বাবা সুবর্ণর ভাগ্যের শনি।

আর স্বামীভাগ্য?

সেও কি কম তফাৎ?

সত্যবতীর স্বামী অসার অপদার্থ, কিন্তু অসভ্য অশ্লীল নয়! সত্যবতীর অযোগ্য হতে পারে অত্যাচারী নয়! কিন্তু সুবর্ণলতার ভাগ্যে তো মাত্র ওই দ্বিতীয় নামগুলোই! আজীবন সুবর্ণকে একটা অসভ্য অশ্লীল, আর অত্যাচারীর ঘর করতে হচ্ছে!

ত্যাগ করে চলে যাবে কখন?

সোজা হয়ে দাঁড়াতে শিখবার আগেই তো ঘাড়ে-পিঠে পাহাড়ের বোঝা উঠেছে জমে! ওই বোঝার ভার নামিয়ে রেখে চলে যাবে সুবর্ণ তার সন্তানদের মধ্যে নিজের জীবনের প্রতিচ্ছবি দেখতে?

সুবর্ণ তাই তার মা'র সামনে মুখ তুলে বলতে পারবে, 'মা তোমার মেয়ে তোমার মত নিষ্ঠুর হতে পারে নি এই তার ত্রুটি! তোমার মত হাল্কা ছোট্ট সংসার পায় নি, এই তার দুর্ভাগ্য!'

তোমার মেয়ে মায়ে-তাড়ানো বাপে-খেদানো, তেজটা ফলাবে কোন পতাকাতলে দাঁড়িয়ে? ধিক্কার তুমি দিতে এসো না মা, শুধু এইটুকু ভেবো, সকলের জীবন সমান নয়, সবাইকে একই মাপকাঠিতে মেপে বিচার করা যায় না! যাকে বিচার করতে বসবে, আগে তার পরিবেশের দিকে তাকিও!

সুবর্ণর পরিবেশ সুবর্ণকে—অসম্মানের পাঁকেই পুঁতে রেখেছে, সুবর্ণ আবার এইটুকু অসম্মানে করবে কি?

আর সুবর্ণর দেহকোটরে এখনো না শত্রুর বাসা! তাকে বহন করে নিয়ে যাবে কোন মুক্তির মন্দিরপথে?

সুবর্ণকে অতএব সেই পথেই নেমে যেতে হবে, যে পথের শেষে কি আছে সুবর্ণ জানে না, পথটা অন্ধকারে ভরা এই জানে শুধু।

কিন্তু সুবর্ণ হয়তো একদিন তার সন্তানের মধ্যে সার্থক হবে! মাথা তুলে দাঁড়াবে পৃথিবীর সামনে। সেই স্বপ্নই দেখে সুবর্ণ! সেই ভবিষ্যতের ছবিতেই রং দেয়।...

এখন অতএব আর কিছু করার নেই সুবর্ণর তার স্বামীর পিছু পিছু চলে যাওয়া ছাড়া!

ফুলেশ্বরী ন্যাড়া মাথাটায় ঘোমটা টানেন।

ফুলেশ্বরী অবাক গলায় কুটুমের ছেলেকে সম্বোধন করে বলেন, 'সে কি বাবা? এই এসে এই চলে যাবে কি? বোনের বাড়ি এসেছ, একটা বেলাও তো থেকে যাবে?'

প্রবোধচন্দ্র গম্ভীর গলায় বলেন, 'থাকবার জো থাকলে থাকা যেত, সময়ের অভাব!'

'আহা আসছে কাল তো ছুটির বার—'

'অন্য কাজ আছে।'

নীরস গলায় বলে কথাটা প্রবোধ 'মাউইমা'র অনুরোধের সম্মান রাখবে এমন মনে হয় না।

কিন্তু ফুলেশ্বরী তবু অনুরোধ করেন।

কারণ ফুলেশ্বরীর বৌ তাঁর শরণ নিয়েছে। বলেছে, 'মা, যা মুখ করে বসে আছে মেজদা, দেখেই তো পেটের মধ্যে হাত-পা সেঁধিয়ে যাচ্ছে। আপনি একটু বলুন। আপনার কথা ঠেলতে পারবে না! আহা অকস্মাৎ এমন দুম করে নিয়ে যাবে, পোয়াতি বৌটাকে একটু মাছ-ভাত মুখে না-দিয়ে পাঠাবো কোন প্রাণে?'

ফুলেশ্বরী তাই আপ্রাণ করেন।

বলেন, 'বুঝলাম কাজ আছে। কিন্তু যো-সো করে সামলে নিয়ো বাবা! পুরুষ ছেলে, তোমাদের অসাধ্যি কি আছে? মেজ মেয়ে এই অবস্থায় যাত্রা করবে, একটু মাছ-ভাত মুখে না দিয়ে যেতে দিই কি করে? আমি তোমার হাতে ধরে অনুরোধ করছি বাবা—'

কিন্তু প্রবোধের কি এখন ওই সব তুচ্ছ ভাবপ্রবণতার মান রক্ষা করার মত মানসিক অবস্থা?

মাথার মধ্যে রক্ত তার টগবগ করে ফুটছে না? সেই উত্তাপকে প্রশমিত করে সে এই পাপ-পুরীতে রাত্রিবাস করবে? গুছিয়ে-গাছিয়ে বোনাইয়ের পুকুরের মাছের ঝোল খেয়ে তবে যাত্রা করবে? এই দণ্ডে সুবর্ণকে কোনো একটা নির্জন জায়গায় ঠেলে নিয়ে গিয়ে মেরে পাট করে দিতে ইচ্ছে করছে না?

বোন!

বোনের বাড়িতে বিশ্বাস করে পরিবার রেখে গিয়েছিলাম, বোন সে বিশ্বাসের মান রেখেছে যে? কেন, চোখে চোখে রাখতে পারে নি? শাসন করতে পারে নি? বলতে পারে নি 'বেচাল কোরো না মেজবৌ!'

তা নয়, সোহাগের দ্যাওরের সঙ্গে মাখামাখি করতে ছেড়ে দিয়েছেন!

সেই বোনের মান রাখতে যাব আমি!

অতএব প্রবোধকে বলতেই হয়, 'বৃথা উপরোধ করছেন, আজ না গেলেই নয়।'

এবার অমূল্য গলা বাড়ায়।

বলে, 'তা' কাজটা যখন এত জরুরি, সেরে নিয়ে দু'দিন বাদে এলে তো ভালো হতো মেজদা!'

মেজদা ভুরু কুঁচকে নেপথ্যবর্তিনীর উদ্দেশে একটি কড়া দৃষ্টি হেনে তেতো গলায় বলেন, 'হুঁ কারুর কারুর অন্তত ভালো হতো, তা'তে আর সন্দেহ কি!'

অমূল্য অত বোঝে না। বলে ফেলে, 'সত্যি, সেটাই ভালো ছিল মেজদা! হঠাৎ এঁদের যাবার তো কোনো কথা ছিল না—'

কথা ছিল না!

আইন দেখাতে এসেছে।

ফুটন্ত রক্ত উছলে ওঠে, 'বরাবর তোমার বাড়িতে থেকে যাবে, এমন কথাও ছিল না নিশ্চয়? আমার পরিবার, তার ওপর আমার জোর চলবে না?'

হঠাৎ নেপথ্যবর্তিনী বেরিয়ে আসে, বলে ওঠে, 'চলবে না কি বল? একশোবার চলবে! ইচ্ছে হলে কোমরে দড়ি বেঁধে কাঁটাবন দিয়ে হিঁচড়ে নিয়ে যাওয়াও চলবে! যাত্রার আয়োজন করে দিন আপনি ঠাকুরজামাই! গরুর গাড়িকে তো বলে পাঠাতে হবে! ঠাকুরঝি, তুমি মন খারাপ কোরো না! ভাজকে মাছ-ভাত খাইয়ে পাঠাবার বাসনা তো তোমার ভাইয়ের কল্যাণের জন্যে? আমার আর তাতে রুচি নেই ভাই! মুখ ফুটে বললামই সে কথা!'

সুবালা মনে মনে শিউরে উঠে বলে, 'দুর্গা দুর্গা।' অমূল্যও বোধকরি বিচলিত হয়, এবং অমূল্যর মেজ শালা হঠাৎ গগনবিদারী চীৎকারে বলে ওঠেন, 'শুনলে? শুনলে তো? নিজ কর্ণে শুনলে তো? এই মেয়েমানুষকেও সতী বলে বিশ্বাস করতে হবে? তোমরা কি বল? যে মেয়েমানুষ স্বামীর অকল্যাণ চায়, তার রীত-চরিত্তির ভাল, একথা বল তোমরা?'

কেউ আর কিছু বলে না।

গরুর গাড়ি আসে।

ছেলেমেয়েগুলো কাঁদতে কাঁদতে গিয়ে ওঠে সেই গাড়িতে! বড় আশা ছিল তাদের, আরো কিছুদিন থাকবে! কত সুন্দর করে আজই তারা ইট সাজিয়ে পাকা বাড়ি তৈরি করেছিল, সব গেল ঘুচে!

সুখ বস্তুটা তা হলে জলের আলপনা? অতি সুন্দর নক্সা নিয়ে ফুটে উঠেই মুহূর্তে মিলিয়ে যায়?

আনন্দ কি বস্তু, স্বাধীনতা কাকে বলে, ভারহীন মন কেমন জিনিস, এখানে আস্বাদ পেয়েছিল। কিন্তু ক'দিনই বা? 'শিকারী ঈগলপাখী'র গল্পের সেই ঈগল-টার মতই যেন বাবা ঠকাস করে এসে নামলো আর ছোঁ মেরে নিয়ে গেল!

কানু, ভানু আর চাঁপা ওরই মধ্যেই যতটা পারলো সংগ্রহ করে নিল। কষা পেয়ারা, কাঁচা কুল, টক বিলিতি আমড়া ইত্যাদি থেকে থোড়-করমচা, গাব-মাদার পর্যন্ত অনেক কিছুই জমে উঠলো তাদের সঞ্চয়ের ঘরে!

তা' জমে উঠতে উঠতেই তো জীবনের জমা-খরচ!

শুধুই কি জমে ওঠে ঘৃণা ধিক্কার অসন্তোষ? জমে ওঠে না ভালবাসার সঞ্চয়, কৃতজ্ঞতার সঞ্চয়, শ্রদ্ধার সঞ্চয়?

না জমলে, পৃথিবীর ভারসাম্য রক্ষা হচ্ছে কি করে? নিজের কেন্দ্রে পাক খেতে খেতে এই যে তার অনন্তকালের পথপরিক্রমা, এ তো কেবলমাত্র ভারসাম্যের উপর?

তাই সুবর্ণলতার শুকিয়ে ওঠা স্নায়ু-শিরার আবরণের মধ্যে কাঠ হয়ে থাকা আগুনের ডেলার মত চোখ দুটো দিয়েও জল ঝরে পড়ে।

বারে বারে পড়ে।

সুবালা যখন আলতা পরিয়ে দিতে দিতে অনবরত হাঁটুতে মুখ ঘসটে চোখ মোছে, তখন পড়ে, সুবালার ছেলেরা যখন সুবর্ণর ছেলেদের জন্যে এক চুপড়ি সেই ওদের মাটির ইঁট এনে রেখে যায় সুবর্ণর তোরঙ্গর কাছে, তখন পড়ে, আর উথলে উপচে শতধারে পড়ে, যখন ফুলেশ্বরী তাঁর সুদূর ভবিষ্যতের প্রপৌত্রের উদ্দেশে রচিত বহু পরিশ্রম-সঞ্জাত, আর বহু কারুকার্যখচিত কাঁথা-খানি ভাঁজ করে এনে বলেন, 'জিনিসের মতন জিনিস একটু হাতে করে দেবার ভাগ্যি তো করি নি মেজমেয়ে, একখান লালপেড়ে কোরা শাড়ি এনে দেবার সময়ও দিলেন না ছেলে। এইখানি রাখো, যে মনিষ্যিটুকু আমার সংসারে ক'দিন বাস করে গেল, অথচ কিছু দেখল না জানল না, তার জন্যে বুড়ি ঠাকুমার হাতের এই চিহ্নটুকু—'

তখন!

তখন চোখের জলে পৃথিবী ঝাপসা হয়ে গেল সুবর্ণর।

সুবর্ণর মুখ দিয়ে কথা বেরোল না, সুবর্ণ শুধু সেই অমূল্য উপহারখানি হাতে নিয়ে মাথায় ঠেকালো!...'

সুবর্ণর চোখে এত জল!

গৌর মোহন দাস এণ্ড কোং
২৩৩,ওল্ড চীনা বাজার স্ট্রীট
কলিকাতা-১
ফোন: ২২-৬৫৮০

সুবর্ণ আর পাঁচটা সাধারণ মেয়ের মত যাত্রাকালে কেঁদে ভাসাচ্ছে।

একটু যেন অপ্রতিভ হলো প্রবোধ, একটু যেন বিস্মিত! যাত্রাকালে তাই বেশি সোরগোল তুলল না, আর গরুর গাড়িতে ওঠার পর অমূল্য যখন বিরাট একটা বোঝা এনে চাপিয়ে দিল গাড়িতে, তখনও বিনা প্রতিবাদে নিল সেই ভার।

আরও একবার চোখের জল।

সুবর্ণ সেই বোঝাটার দিকে তাকালো! সুবর্ণ মুহূর্তখানেক স্তব্ধ হয়ে রইল। সুবর্ণর চোখ দিয়ে আস্তে আস্তে বড় বড় মুক্তোর মত কয়েকটি ফোঁটা গড়িয়ে পড়লো!

ধুলো মাখা মলাট ছেঁড়া দড়ি দিয়ে থাক করে করে বাঁধা এক বোঝা পুরনো মাসিকপত্র।

নিয়ে এল অমূল্য।

ব্যস্ত ভঙ্গীতে বললো, 'মেজদা যদি একটা উপকার কর! বইগুলো কলকাতায় একজনকে দেবার কথা, তো এই সুযোগে তোমার গলায় চাপাচ্ছি, যদি নিয়ে যাও—'

প্রবোধ আমার দ্বারা হবে না বলে চেঁচিয়ে উঠল না। নিমরাজির সুরে বললো, 'তা আমি কাকে দিতে যাবো—'

'আরে না না, তোমায় দিতে যেতে হবে না, সে যখন কলকাতায় যাওয়াটাওয়া হবে, দেখা যাবে! তুমি শুধু সঙ্গে করে নিয়ে গিয়ে তোমার ঘরে রেখে দিও।'

'এত জায়গা কোথায়? ঘর তো বোঝাই—'

এইটুকু বলে প্রবোধ!

অমূল্য আরো ব্যস্ততার ভাবে বলে, 'চৌকীর তলায়টলায় যে করে হোক! দেখতেই তো পাচ্ছ দামের জিনিস নয়, তবে জহুরীর কাছে জহরের আদর! জায়গা একটু দিও দাদা—'

চোখের জল পড়ে পড়ে এক সময় শুকিয়ে যায়, সুবর্ণ তবু নির্নিমেষে সেই 'জহর'গুলোর দিকে তাকিয়ে থাকে!

আর এক সময় খেয়াল হয় তার অম্বিকা নামের সেই উদোমাদা ছেলেটা সরল বটে, কিন্তু নির্বোধ নয়!

কিন্তু নির্মল ভালবাসার উপহার-গুলির পরিবর্তে একটু নির্মল প্রীতির কৃতজ্ঞ হাসি হাসবার অবকাশ পাবে না সুবর্ণ। হয়তো জীবনেও না!

আগে ইচ্ছে হয়েছিল, ওদের গ্রামের আওতা থেকে বেরিয়ে একবার রেল-গাড়িতে উঠতে পারলে হয়, সুবর্ণকে বুঝিয়ে ছাড়বে মেয়েমানুষের বাড় বাড়লে তার কি দশা হয়। কিন্তু করায়ত্ত করে ফেলার পর সেই দুরন্ত দুর্দমনীয় ইচ্ছেটা কেমন যেন মিইয়ে গেল। আর বোধ করি ওই মিইয়ে যাবার দরুণই হঠাৎ প্রবোধ-চন্দ্রের একটু বিচক্ষণতা এল।

ছেলেমেয়েরা বড় হয়েছে, ওদের সামনে ওদের মাকে বেশি লাঞ্ছনা না করাই ভালো!

তবে?

কাঁহাতক আর চুপ করে বসে থাকা যায় অপ্রতিভের চেহারা নিয়ে!

হয়তো প্রবোধের ওই উগ্র মেজাজের গভীরতম মূল শিকড়ের কারণটা এই! চুপ করে থাকলেই নিজেকে ওর কেমন অপ্রতিভ আর অবান্তর লাগে, তাই হয়তো সর্বদাই ওই হাঁকডাকের ঢাকঢোল!

যাতে নিজের কাছেও না নিজে খেলো হয়ে যায়। যাতে নিজের ওই অবান্তর মূর্তিটা আলোর চোখে ধরা না পড়ে।

অতএব চুপ করে বসে থাকা যায় না। ছেলেদের সঙ্গেই কথা পাড়ে প্রবোধ!

'গুচ্ছির 'আকোচ্ খাঁকোচ্' নিয়ে এলি যে? গিলবি ওইগুলো?'

চন্নন তাড়াতাড়ি কোঁচড়ের পেয়ারা-গুলো আঁচলে ঢেকে ফেলে বলে, 'সবগুলো খাবো না কি?'

'আহা তা না হোক, কিছুও যাবে তো পেটে! গেলে রক্ষে থাকবে? ফেলে দে, জানলা দিয়ে ফেলে দে—'

'বাঃ রে—'

চন্ননের স্বর আনুনাসিক হয়ে ওঠে, 'কত কষ্টে গাছ ঠেঙিয়ে নিয়ে এলাম—'

'আহা কী অমূল্য নিধি!' প্রবোধ আবার কৌতুকরসও পরিবেশন করে, 'অমূল্য পিসের দেশের অমূল্য বস্তু।'

তার পর ভানু কানুকেও কিছু উপদেশ দেয়, কিছু জেরা করে। এবং একটু পরেই গলাটা ঝেড়ে নেয়।

সুবর্ণলতা কি বোঝে না কিছু?

বোঝে না ছেলেদের সঙ্গে ওই বৃথা বাক্যব্যয়টা আসলে গৌরচন্দ্রিকা! এইবার আসল পালা ধরবে।

কম দিন তো দেখছে না লোকটাকে! তা' অনুমান মিথ্যা হয় না।

গৌরচন্দ্রিকা শেষ করে মূল পালায় আসে প্রবোধ!

হাসির মত সুরে বলে, 'বাবাঃ এমন কান্না জুড়লে তুমি, মনে হচ্ছিল যেন বাপের বাড়ির মেয়ে শ্বশুর বাড়িতে যাচ্ছে!'

বলা বাহুল্য উত্তর জুটল না।

শুধু নিরুত্তর কথাটা আর চেষ্টাকৃত হাসিটা যেন বাতাসে মাথা কুটলো।

একটু অপেক্ষা করে আবার বলে ওঠে, 'কি করবো, কাজ বলে কথা। মেয়ে-মানুষের বোঝবার ক্ষমতাই নেই। তবে এও বলি, বাড়াবাড়িটা কিছুই ভাল নয়। জামাই বেয়াই ননদাই এই সব হলো গিয়ে তোমার আসল কুটুম্বু! তাদের বাড়ি থেকে আসছো। যেন সমুদ্দুর বহাচ্ছো।'

তবুও নিরুত্তর থাকে সুবর্ণ।

জানলার ধারে বসেই থাকে আকাশের দিকে চেয়ে।

প্রবোধ আবার বলে, 'যাই বল আমি একেবারে তাজ্জব বনে গেছি! কখনো যার চক্ষে জল দেখি নি, সেই মেয়েমানুষ কি না কেঁদে ভাসালো।'

সুবর্ণ তেমনি নির্বিকার চিত্তে বসেই থাকে।

প্রবোধ এবার একটা নিশ্বাস ফেলে। আপন মনে বলে, 'উঃ খাটুনি যে কী জিনিস। তা' এই শালাই হাড়ে হাড়ে টের পাচ্ছে?'

তবু সুবর্ণ নীরব।

প্রবোধ এবার একটা নিশ্বাস ফেলে। ক্লিষ্টকান্তর ভূমিকা নেয়। বলে, 'কথায় বলে ব্যথার ব্যথী। তা' বিয়ে করা স্ত্রীই যার—ব্যথার ব্যথী নয় তার আবার কিসের ভরসা! এ কথা কারুর একবার মনে এল না যে, তাই তো লোকটা বিনা নোটিসে এমন হুট্ করে এল কেন! দোষটাই দেখে জগৎ, কারণটা দেখে না!'

তথাপি সুবর্ণর ঘাড় ফেরে না।

এইবার অতএব শেষ চাল চালে প্রবোধ!

'মাথাটা যা টিপটিপ করছে। হাড়ের জ্বর টেনে না বার করে!'

এইবার উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়। সুবর্ণ এই ডাহা মিথ্যেটা বরদাস্ত করতে পারে না। বলে ওঠে, 'শুধু জ্বর? জ্বর বিকার নয়?'

হয়তো প্রবোধের সন্ধির মনোভাব দেখে ঘেন্নাতেই বলে।

রাগ করবার কথা!

রাগ করে চেঁচিয়ে ওঠবার কথা।

কিন্তু আশ্চর্য, সে সব করে না প্রবোধ! বরং নিশ্চিন্ত গলায় বলে, তা সেটা হলেই বোধ হয় খুশি হও তুমি।'

সুবর্ণ আবার মুখটা ফিরিয়ে নিয়ে জানলার দিকে রাখে।

শুধু উদাস উদাস গলায় বলে, 'খুশি কি জানি! জিনিসটার আস্বাদ তো জানলাম না একাল অবধি!'

[ক্রমশঃ]

৫০০৲ টাকা উপার্জন করুন
১১০৲ টাকা মূল্যের ন্যাশনাল ট্রানজিস্টারের বিক্রয় বৃদ্ধির চেষ্টা করিয়া মাসিক উপরোক্ত টাকা রোজগার করুন। শর্তাদি এবং স্যাম্পেল ট্রানজিস্টারের জন্য পত্র লিখুন।
VERMA & CO. Agents)
Post Box 1222, Delhi-6.

বিপ্লবী প্রচেষ্টার একটি বিস্মৃত অধ্যায়

—সত্যেন্দ্র নাথ গঙ্গোপাধ্যায়

॥ রাওলাট অ্যাক্টের ইতিকথা ॥

বাংলায় তথা ভারতে বিপ্লব প্রচেষ্টার ইতিহাস আর তার লুপ্ত-পাতা উদ্ধারের চেষ্টার মাধ্যমে আজ অনেকটা স্পষ্ট হয়ে উঠেছে যে দেশের শৃঙ্খল-মোচনের জন্যে মোটামুটিভাবে ১৯০২ সাল থেকে সুরু করে ১৫ই আগস্ট ১৯৪৭ পর্যন্ত আপোষহীন সংগ্রামের যে দিক, তাতে বাঙালীর অবদান ছিল অবিস্মরণীয়। আর সেই কাজ প্রধানত সম্পাদিত হয়েছিল একাধিক সংবাদপত্র, প্রচারপত্র সঙ্ঘ সমিতি ইত্যাদির মাধ্যমে দেশে একটা সশস্ত্র অভ্যুত্থান আনার প্রচেষ্টায়। বাস্তব ভিত্তিতে এর সাংগঠনিক দিকটা, যে কারণেই হোক, কোন দিনই হয়তো পূর্ণতা পায় নি, বা পেতে পারে নি, আর সেই দিক থেকে ত্রুটি-বিচ্যুতিও হয়তো ছিল, কিন্তু এই শ্রেণীর কর্মীদের আন্তরিকতায় যে খাদ ছিল না, সেটা অবিসম্বাদী সত্য। তাই গান্ধীজীর ডাকে অহিংস আন্দোলনেও তাঁরা যখনই যোগ দিয়েছেন, তাতে ঐকান্তিক নিষ্ঠার সঙ্গে তাঁদের আত্মোৎসর্গ করতে দেখা গেছে সেই আন্দোলনের সাফল্যকল্পে। তবে আন্দোলনের অগ্রগতির সঙ্গে যখনই দেখা গেছে, রাজশক্তির দমন-নীতি তথা অত্যাচারের সীমা লঙ্ঘন করে মা-বোনকে পর্যন্ত অপমানিত ও লাঞ্ছিত করেছে, তখনই তাঁরা তাঁদের নীতিকে সময় উপযোগী পরিবর্তন করেছেন, সেই অন্যায়ের স্বাভাবিক প্রত্যুত্তর দেবার জন্যে। কেন না তাঁরা জানতেন যে —"লোকহত্যা করা অন্যায়...কিন্তু কোন স্ত্রীলোকের উপরে কেহ বল প্রকাশ করিতেছে, এমতাবস্থায় তাহাকে হত্যা করিলে অন্যায় হয় না, বরং সে ক্ষেত্রে না করাই অন্যায়।" ('সবলতা ও দুর্বলতা'—স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ, পৃঃ ৪৫)।

তাঁদের তাই গভীর বিশ্বাস ছিল হিন্দুর নীতি-শাস্ত প্রণেতা মনুর বচনে—

"ন ব্রহ্ম ক্ষত্রমৃধ্নোতি ন ক্ষত্রং ব্রহ্ম বর্ধতে।
ব্রহ্ম ক্ষত্রঞ্চ সংপৃক্তমিহচামুত্র বর্ধতে॥ ৯।১২১॥

বাস্তবিক ক্ষাত্রশক্তি ও ব্রাহ্মণশক্তি উভয়ে মিলেই নিয়মাদির শৃঙ্খলা রক্ষা করে, আর তারই দ্বারায় জগতের স্থিতি রক্ষা পায়। তাঁরা জানতেন ক্ষত্রিয়শূন্য দেশে ব্রাহ্মণ শক্তির অবস্থান অসম্ভব, বহিরাক্রমণের হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্যেও ক্ষাত্রশক্তির প্রয়োজন আছে।

যাই হোক এই বৈপ্লবিক শক্তিকেই দমন করার জন্যে সেদিনকার বিজাতীয় শাসকগোষ্ঠী চুপ করে বসে ছিলেন না। দেশে বৈপ্লবিক অভ্যুত্থানের সুরু থেকেই তাঁরা দিনের পর দিন, আর বছরের পর বছর, এক একটি বিশেষ ঘটনাকে উপলক্ষ্য করে রচনা করতেন একাধিক 'অ্যাক্ট' আর 'রুল'। তারই একটি সংক্ষিপ্তসার এখানে উদ্ধৃত করা গেল।—

(১) প্রিভেনসন্ অফ্ সিডিসাস্ মিটিং অ্যাক্ট—১৯০৭,
(২) এক্সপ্লোসিভ সাবসট্যান্স অ্যাক্ট—১৯০৮,
(৩) নিউজ পেপার (ইনসাইটমেন্ট অফ অফেন্স) অ্যাক্ট (৭)——১৯০৮,
(৪) ইন্ডিয়ান এমিগ্রেসন অ্যাক্ট——১৯০৮,
(৫) ইন্ডিয়ান প্রেস অ্যাক্ট—১৯১০,
(৬) প্রিভেনসন অফ সিডিসাস মিটিং অ্যাক্ট (১০)—১৯১১,
(৭) এমারজেন্সি পাওয়ার্র (কনটিনিউইং) ওর্ডন্যান্স (১)—১৯১৫,
(৮) ডিফেন্স অফ ইন্ডিয়া (ক্রিমিন্যাল ল অ্যামেন্ডমেন্ট) অ্যাক্ট (৪)—১৯১৫ ইত্যাদি।

এই সমস্ত আইন জারির সঙ্গে মোটামুটি সম্বন্ধ পাওয়া যায় (ক) বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন সম্পর্কীয় সভা ইত্যাদি, (খ) ১৯০৮ সালের বোমার মামলা, (গ) 'যুগান্তর', বন্দেমাতরম সন্ধ্যা প্রভৃতি পত্রিকা প্রকাশ, (ঘ) নরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য তথা এম এন রায় প্রমুখ বিপ্লবীদের অস্ত্র সংগ্রহ প্রভৃতির চেষ্টায় বিদেশে যাতায়াত (ঙ)বীরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়* প্রমুখ বিপ্লবীদের বিদেশে থেকে বিপ্লব চেষ্টার প্রকল্পে ভারতের সঙ্গে যোগসাজসের উদ্যোগ ইত্যাদি। কিন্তু এত আইন জারির পরেও যখন দেশে বিপ্লব প্রচেষ্টার অগ্রগতি, তখনকার রাজশক্তি, রোধ করতে অপারগ হন, তখনই তাঁদের আশ্রয় নিতে হয়েছিল ডিফেন্স অফ ইন্ডিয়া অ্যাক্টের, যার সাহায্যে বিনা বিচারে দলে দলে সন্দেহভাজন দেশপ্রেমিকদের সরকার গ্রেপ্তার করত, আর সবার অলক্ষ্যে একটা বিচার প্রহসনের ব্যবস্থা করে, তাঁদের অনির্দিষ্টকালের জন্যে আটকে রাখার সিদ্ধান্ত নেওয়ার প্রথা। মনে রাখতে হবে শেষোক্ত দমন নীতির ব্যবস্থা হয়েছিল প্রধানত প্রথম বিশ্ব যুদ্ধের সময় দেশের বিপ্লব প্রস্তুতিকে লক্ষ্য করে। অর্থাৎ ১৯১৪ সালে রাসবিহারীর অন্তর্ধান (সাপ্তাহিক বসুমতী ১২-৮-১৯৬৫ দ্রষ্টব্য), নরেন্দ্রনাথ তথা এম এন রায় প্রমুখ বিপ্লবীদের অস্ত্র সংগ্রহের জন্যে পুলিশের চোখে ধুলো দিয়ে একাধিক বার বিদেশে যাতায়াত (সাপ্তাহিক বসুমতী—২৮-৭-১৯৬৬), অপর দিকে ২৬শে আগস্ট, ১৯১৪ সালে মলঙ্গা পল্লীর দুরন্ত ছেলে শ্রীশচন্দ্র মিত্র ওরফে হাবুর দ্বারায়, মধ্য কলকাতার বুকের ওপর রডা কোম্পানীর ৫০টি মশার পিস্তল আর ৫০,০০০ বুলেট বেমালুম সরিয়ে দিয়ে অন্তর্ধান হয়ে যাওয়া (সাপ্তাহিক বসুমতী ২৬-৮-১৯৬৫ ও ৬-১-১৯৬৬)— আর সরকারপক্ষ থেকে সংশ্লিস্ট বিপ্লবীদের সকলকে ঠিক ঠিকভাবে মামলায় জড়িয়ে নিয়ে যথাযথ শাস্তি দিতে না পারা,* কারণ ঐ পিস্তলের সাহায্যেই তাঁরা সেদিন শত্রুর জীবনকে নিয়ে ছিনিমিনি খেলতে সুরু করেছিলেন। অপরদিকে সেপ্টেম্বর ১৯১৪ সালে বাংলার বজবজ নামক স্থানে

---

*স্বনামধন্যা সরোজিনী নাইডুর ভাই —"A Political suspect Bound Down—Rs. 20,000/- Security Ordered" (A. B. Patrika 1.5.1915)—.

* সাত মাসের ওপর মামলা চলার পরে—কালিদাস বসু, নরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও ভুজঙ্গ ধরের (সকলেই মধ্য কলকাতার অধিবাসী) কারাদন্ড হয়। গিরীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও অনুকূলচন্দ্র মুখোপাধ্যায় (মলঙ্গা লেনের অধিবাসী) মামলায় খালাস পেলেও বিনা বিচারে রেগুলেশন আইনে (১৮১৮) স্টেট প্রিজনার হন, বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী, শ্রীশ পাল, হরিদাস দত্ত, কালি দত্ত প্রভৃতি তখনকার মত আত্মগোপন করেই থেকে যান (পরে আরমস অ্যাক্টের আওতায় হরিদাস দত্তের ২ বছর সশ্রম কারাদন্ড হয় আর আগড়পাড়া ডাকাতির মামলায় কোনক্রমে জড়িয়ে দিয়ে বিপিনবিহারীরও ৫ বছর সশ্রম কারাদন্ড হয়েছিল। পরে আবার ডি আই অ্যাক্টে আটক বন্দী হন।

কোমাগাতামারু নামক জাহাজের সাহায্যে আমেরিকা থেকে প্রত্যাগত তথা বিতাড়িত কানাডার শিখদের সঙ্গে বৃটিশ সরকারের অধীনস্থ সৈন্যবাহিনীর লড়াই যার পরিণামে পাঞ্জাব পর্যন্ত সেই অগ্নিশিখার প্রসার হয়েছিল, ইত্যাদি ঘটনায় সেদিনকার শাসকদের শিরঃপীড়ার অন্ত ছিল না। তার ওপর দেখা যায় ঐ বিপ্লব প্রচেষ্টার কর্ণধারদের মধ্যে রাসবিহারী নাগালের বাইরে চলে গেলেন, যতীন্দ্রনাথ বালেশ্বরে সম্মুখ সমরে প্রাণ দিয়ে বাঙালী যে প্রথম শ্রেণীর যোদ্ধা তার প্রমাণ দিলেন, আবার তার ওপর তাঁরই অন্তরঙ্গদের মধ্যে বিপিন গাঙ্গুলী, অমর চট্টোপাধ্যায়, অতুল ঘোষ, নলিনী কর, ডাঃ যাদুগোপাল মুখোপাধ্যায় প্রমুখ বিপ্লবীরা মোটামুটি কর্তৃপক্ষের নাগালের বাইরেই রয়ে গেলেন। এইভাবে তখনকার রাজশক্তি হয়তো আরো ভেবেছিলেন যে, ১৯১৯ সালে প্রথম বিশ্ব-যুদ্ধ অবসানের সঙ্গে উক্ত বিপ্লবীরা অবাধে চলাফেরা করার সুযোগ পেলে আবার সেই বিপ্লবের আগুনই ধূমায়িত হতে পারে। উক্ত ঘটনাগুলিতে সমষ্টিগত-ভাবে চিন্তা করেই ভারত সরকারের কর্মসচিব মিস্টার এস এইচ হিগনেলের চিঠি—

"No. 2884, Dated, Delhi the 10.12.1917.

Resolution—By the Govt. of India, Home Dept.....

The Governor General in Council has with the approval of the Secretary of State in India, decided to appoint a Committee—

To investigate and report the nature and extent of the Criminal conspiracy committed with the revolutionary movement in India.

To examine & consider the difficulties that have arisen in dealing with such conspiracies....

The committee will assemble in calcutta in January 1918. It will sit in camera, but will be given full access to all documentary evidence in the possession of Government.."

অর্থাৎ ভারতবর্ষে বিপ্লবাত্মক আন্দোলনের মাধ্যমে ফৌজদারী ষড়যন্ত্রের প্রকৃতি ও তার বিস্তৃতি অনুসন্ধান করে তার বিবরণী শেষ করার জন্যে ভারতীয় রাজশক্তির তরফ থেকে একটি কমিটি নিয়োগ করা হয়েছে।

এই সকল ষড়যন্ত্রকারীদের বিষয় সমুচিত ব্যবস্থা করার ব্যাপারে অসুবিধার বিষয় পরীক্ষা ও বিবেচনা করতে হবে...

জানুয়ারী ১৯১৮—থেকে এই কমিটি কলকাতায় মিলিত হবে মাননীয় বিচার-পতির খাসকামরার মধ্যে, তবে সরকারী অধিকারে যে সমস্ত নথিপত্র আছে তাতে তাঁদের অবাধ প্রবেশাধিকার থাকবে...

উক্ত কমিটি গঠিত হয়েছিল নিম্নোক্ত ব্যক্তিবর্গকে নিয়ে।—

(১) মাননীয় মিস্টার জাসটিস রাওলাট—জজ কিংগ্রস বেঞ্চ (প্রেসিডেন্ট),

(২) মাননীয় স্যার বসিল স্কট, কে টি—প্রধান বিচারপতি বম্বে,

(৩) মাননীয় দেওয়ান বাহাদুর সি ভি কুমারস্বামী শাস্ত্রী,—জজ্, মাদ্রাজ হাইকোর্ট,

(৪) মাননীয় স্যার ভারনী লভেট, কে সি এস আই,—বোর্ড অফ রেভিনিউ-এর সভ্য, যুক্তপ্রদেশ,

(৫) মাননীয় মিস্টার পি সি মিত্র, অতিরিক্ত সভ্য, বেঙ্গল লেজিসলেটিভ কাউন্সিল, (মেম্বার্স)—

(৬) মিস্টার জে ডি ভি হজ্, আই সি এস, বেঙ্গল (সেক্রেটারী)—আর কমিটির নাম দেওয়া হয়েছিল 'সিডিসন কমিটি—১৯১৮', যদিও রাওলাট কমিটি নামেই এটি অধিক পরিচিত। এই কমিটির আয়োজনের প্রাক্‌কালে সরকারপক্ষ থেকে চীফ জাসটিস মিস্টার জেনকিনসের পরামর্শের জন্যেও আমন্ত্রণ হয়েছিল। কিন্তু তিনি এই বিষয়ে সহযোগিতা করতে অক্ষমতা প্রকাশ করে বলেছিলেন—"It would compromise the judicial office." অর্থাৎ সেটা হবে বিচার বিভাগের সঙ্গে একটা সন্ধির নামান্তর। এই আলোচনা অন্যত্র করা হয়েছে। (সাপ্তাহিক বসুমতী—৭-৭-১৯৬৬)।

আসলে এই কমিটির উদ্দেশ্য যে কত গভীরে ছিল তার আন্দাজ পাওয়া যায়, কমিটির রিপোর্টের প্যারা ৬৭ ও প্যারা ৬৯ থেকে যেখানে কতকগুলি বৈপ্লবিক সংঘটনের ফিরিস্তি দিয়ে লেখা হয়েছে—

"Among the outrages were four dacoities committed with the help of automobile taxi-cabs, a new feature in revolutionary crimes..committed.. under the direction of the notable leaders, Jotin Mukherjee and Bipin Ganguli...."

অর্থাৎ "সংঘটনগুলির মধ্যে চারটি ডাকাতি হয়েছিল মোটর গাড়ির সাহায্যে, বৈপ্লবিক অপরাধের নূতন অভিব্যক্তি...যা ঘটেছিল দুটি নামজাদা বিপ্লবী নেতার ইঙ্গিতে, যতীন মুখার্জী আর বিপিন গাঙ্গুলী।" তা' ছাড়া কমিটির সদস্যদেরই উক্তি—

Net Result of our Proposal

"The short result of the whole is that we suggest a scheme under which past and (say) war-time matters are immediately. Provided for, subject to which all special power became dorment till there is a notification"—

আমাদের প্রস্তাবের সার সিদ্ধান্ত

"সমগ্র ব্যাপারটির সংক্ষিপ্তসার হিসেবে আমরা একটি পরিকল্পনার প্রস্তাব করছি, যার দ্বারায় অতীত এবং (ধরে নেওয়া যাক) যুদ্ধকালীন ব্যাপারগুলির অবিলম্বে একটা ব্যবস্থা করা সম্ভব হবে এবং যার ভেতরে পূর্বে বলবৎ বিশেষ ক্ষমতাগুলিরও স্থান করে দেওয়া হয়েছে, যেগুলি বর্তমানে নূতন বিজ্ঞপ্তি ছাড়া বিলুপ্ত হবে।"

(স্টেটসম্যান—২০-৭-১৯১৮)

জানুয়ারী ১৯১৮ সালের সুরু থেকে দীর্ঘ ৪৬ দিনের একতরফা সাক্ষ্য গ্রহণ আর সেই বিষয়ে আলোচনার এই হয়েছিল ফলাফল। একটা দাম্ভিক, ভীত ও সন্ত্রাসিত শক্তির কাছে এ' ছাড়া আর গত্যন্তর কোথায়?

এই সকল কারণেই 'সিডিসন কমিটির' আয়োজনের সঙ্গে সঙ্গে সারা ভারতে সুরু হয়েছিল এক উত্তাল আলোড়ন, যার গতিবেগ সেদিন গান্ধীজীর অন্তরকেও নাড়া দিয়েছিল। উক্ত কমিটির রিপোর্ট প্রকাশ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে স্বনামধন্য মতিলাল ঘোষের সম্পাদনায় সেদিনকার অমৃতবাজার পত্রিকায় যা' লেখা হয়েছিল তার সারমর্ম হচ্ছে—"সিডিসন কমিটির তথা রাওলাট কমিটির রিপোর্টের একটি কপি এইমাত্র আমাদের হস্তগত হয়েছে ...এটি পড়ে এই কথা মনে না করে উপায় নেই যে, আমরা বিগত বহু বছর ধরে এমন একটি দেশে বাস করছিলাম যা' নাকি রাজদ্রোহী, ষড়যন্ত্রকারী, বিপ্লবী প্রভৃতির মধুচক্রেই কেবল পরিপূর্ণ।" (এ বি পত্রিকা—২০-৭-১৯১৮)। আবার তার পাশেই গান্ধীজী এবং সি এফ অ্যান্ড্রুজের উক্তি—

"A subtle and very deep evil lies beneath the surface of Indian life, especially the student world. Spying is already a terror and a dread.

But it will become armed with fresh powers of evil if these Bills (Rowlatt Bills) are carried into law.."

—"একটি চতুর ও সুদূরপ্রসারী অনিষ্টকর বস্তু এখন ভারতবাসীর জীবনের বহির্ভাগের ঠিক নিচে, বিশেষ করে ছাত্র জগতে, অবস্থান করছে। গুপ্তচরবৃত্তি এখনই একটি আতঙ্ক ও ভয়ের বস্তু। কিন্তু সেটি অন্যায়ের নূতন শক্তিতে সজ্জিত হবে যদি এই বিলগুলি (রাওলাট বিল) আইনে পরিণত হয়।" (এ বি পত্রিকা—৫-৪-১৯১৯)।

প্রসঙ্গত এই সমস্ত বাদ-প্রতিবাদের সেদিন কোন স্থান ছিল না, কেন না ক্ষমতা মদমত্ত যে কোন শক্তির এইটেই হচ্ছে প্রকৃত স্বভাব। ঐ রিপোর্টের ওপর ভিত্তি গেড়েই রাওলাট বিল সেদিন আইন সভায় উপস্থাপিত করা হয়েছিল। কাউন-সিলের সভায় সভাপতিত্ব করেছিলেন ভাইসরয় স্বয়ং, আর বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের যাঁরা সেদিন উপস্থিত ছিলেন, ভি জে প্যাটেল, পণ্ডিত মদনমোহন মালব্য, সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ ব্যক্তি তাঁদের মধ্যে অন্যতম। এই বিলটি আইনে বিধিবদ্ধ হওয়ার কথা সভায় ঘোষিত হলে, বিপক্ষে যাঁরা মত প্রকাশ করেছিলেন জনকে মত প্রকাশ করতে শোনা যায়। বিপক্ষে যাঁরা মত প্রকাশ করেছিলেন তাঁদের মধ্যে সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, ডাঃ তেজবাহাদুর সাপ্রু, পণ্ডিত মদন-মোহন মালব্য, ভি জে প্যাটেল, কাশিম-বাজারের মহারাজা প্রমুখ ব্যক্তির নাম পাওয়া যায়। (স্টেটস্‌ম্যান—১৯-৩-১৯ ও ২০-৩-১৯)। উক্ত কমিটি গঠনের প্রস্তাবের সময় থেকে (১৯১৭) শেষ পর্যন্ত (১৯১৯-২০) দেশের দিগ্‌বিদিকে একটা প্রবল বিক্ষোভের সূচনা হয়েছিল। কিন্তু তারই মধ্যে ১৯১৮ সালে ২৯শে নভেম্বরের স্টেটস্‌ম্যান পত্রিকায় সংবাদে প্রকাশ—

Indian National Congress
Loyalty Resolution....

Delhi, December '28

"The Special Congress resumed its sitting at 11.30 a.m. today, the attendance being larger than on the opening day..the following resolutions were put from the chair and carried:

"That this Congress most respectfully leags to convey to His Majesty the king Emperor its deep loyalty and profound devotion to the throne and its congratulations on the successful termination of the world war.

"That this Congress desires to place on records its profound appreciation of the brilliant gallantry of the Allved forces..in the cause of freedom, justice & self-determination.." (Statesman —29.12.1918).

ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস
রাজভক্তির সংকল্প

দিল্লী, ডিসেম্বর '২৮

"প্রথমদিন অপেক্ষা আরো অধিক লোক সমাবেশের মধ্যে আজ বেলা ১১-৩০ মিনিটের সময় কংগ্রেসের বিশেষ অধিবেশন সুরু হয়। নিম্নোক্ত প্রস্তাব সভাপতির দ্বারায় উপস্থাপিত করা হয় এবং গ্রহণ করা হয়েছিল।

"এই কংগ্রেস বিশেষ বিশেষ সম্মানের সঙ্গে মহারাজ সম্রাট বাহাদুরের উদ্দেশ্যে তাদের গভীর আনুগত্য ও প্রগাঢ় অনুরাগ নিবেদন করছে, আর সাফল্যের সঙ্গে বিশ্বযুদ্ধের পরিসমাপ্তি হওয়ায় তারা সিংহাসনের প্রতি অভিনন্দন জানাচ্ছে।

"স্বাধীনতা, ন্যায়বিচার ও আত্ম-সংকল্পের জন্যে মিত্রশক্তির গৌরবান্বিত সাহসিকতার কাহিনী এই কংগ্রেস তাদের খাতায় লিপিবদ্ধ করার অভিলাষ প্রকাশ করছে...।"

প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে যুদ্ধাবসান উপলক্ষে নিখিল ভারত কংগ্রেসের এই জাতীয় স্তুতিবাদের ঘোষণা সত্ত্বেও দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের দ্বারায় পরিচালিত সেদিনকার বাংলার কংগ্রেস ঐ জাতীয় অনুনয়-বিনয়ের মধ্যে তাঁদের কার্যক্রম নিবদ্ধ রাখতে পারেন নি। সেই কারণেই লক্ষ্য হয়—

"A conference convened by the Bengal Provincial Congress Committee and held on Sunday passed a resolution adopting the principle of passive resistance with a view of carrying a steady and persistant protest against the Rowlatt Bill" (ক)..Statesman 18.3.1919).

অর্থাৎ রবিবারের বাংলা প্রাভিন্স্যাল কংগ্রেস কমিটির এক অধিবেশনে নির্ধারিত হয়েছিল রাওলাট বিলের বিরুদ্ধে দৃঢ়-ভাবে উপর্যুপরি নিষ্ক্রিয় প্রতিবাদ চালাবার পরিকল্পনা। তা' ছাড়া একথাও ঠিক যে, সেদিন ভারতীয় জনসাধারণের কেউই ঐ বিলকে গ্রহণ করতে রাজী হন নি। তাঁরা এই বিলের নামকরণ করে-ছিলেন 'ব্ল্যাক বিল' বলে। সংবাদে প্রকাশ মাদ্রাজের রাজকীয় মন্ত্রণা-সভার বেসরকারী সভ্যরা উক্ত বিল প্রচলনের বিরুদ্ধে অসহযোগ করার অনুরোধ জানিয়েছিলেন। তাঁদের দলের নাম হয়েছিল 'মাদ্রাজ রাওলাট বিল একজিকিউটিভ কমিটি।' (স্টেটস্‌ম্যান—১৬-২-১৯)। বম্বে প্রদেশে উচ্চস্তরের ও পরিণত রাজনীতিকদের এক প্রতিনিধিবর্গ এই সম্পর্কে গান্ধীজীর সঙ্গে দেখা করেন এবং সরকারী জুলুমের বিরুদ্ধে সংবাদপত্রে প্রকাশের জন্য এক পত্র পাঠান। তা' ছাড়া দেশের সাধারণ মানুষের ধৈর্যের সীমাও যে সেদিন সকল দিক থেকেই অতিক্রান্ত হয়েছিল। এই বিলকে কার্যকরী করার চেষ্টার সঙ্গে, তার প্রমাণ আজও বহন করে আছে সাময়িক দৈনিক সংবাদপত্রগুলি। এমনি অবস্থায় গান্ধীজী নাকি শেষে বলে-ছিলেন—

"...the Rowlatt Bills show a deep-seated disease in the governing body & therefore need be drastically treated." (Statesman—4.3.1919).

অর্থাৎ রাওলাট বিলগুলি শাসক সম্প্রদায়ের মধ্যে একটা দৃঢ়মূল ব্যাধির পরিচায়ক হয়েছে, কাজেই তার প্রতি তীব্র আচরণের প্রয়োজন আছে। কিন্তু সাধারণ মানুষের উত্যক্ত ও তিক্ত মন মরিয়া হয়ে উঠলে, সে যে কখনই অনির্দিষ্টকাল আটকে রেখে তাঁদের আপোষহীন স্বাধীনতা সংগ্রামের প্রচেষ্টায় বাধার সৃষ্টি করার জন্যে। প্রথম বিশ্ব-যুদ্ধের অবসানের ইঙ্গিত পেয়ে রাজশক্তি যখন বুঝলেন যে, যুদ্ধের পরিসমাপ্তি জনিত শান্তি ঘোষণার সঙ্গে ঐ সকল দমন নীতির দরজাও বন্ধ হয়ে যাবে আপন ইঙ্গিতেই, আর আটক বন্দী এবং দণ্ডপ্রাপ্ত কয়েদি বিপিন গাঙ্গুলী প্রমুখ বিপ্লবীরাও যথাসময়ে মুক্তি পেয়ে আবার স্বাধীনভাবে চলাফেরা করার সুযোগ পাবেন, তখনই তাঁদের প্রয়োজন বোধ হয়েছিল সিডিসন কমিটির নিয়োগ করে নিজেদের উদ্দেশ্য অনুযায়ী নির্দেশের দ্বারায় রাওলাট বিলের মধ্য দিয়ে আবার কতকগুলি জবরদস্ত নীতির প্রচলন করা।

(ক) আলোচনা প্রসঙ্গে জানা দরকার —১৯১৫ সালে জারি হয়েছিল ডিফেন্স অফ ইন্ডিয়া অ্যাক্ট, বাংলা তথা ভারতের সন্দেহভাজন বিপ্লবীদের বিনা বিচারে

হিংসা-অহিংসার বাছ-বিচার করে না,—শেষে অহিংসার গণ্ডিতে নিজেদের বৈপ্লবিক গতিবিধি সীমাবদ্ধ রাখতে পারে না, তার পরিচয়, অধিক আগে না গেলেও ১৯১৯ থেকে ১৯৪২ সালের ভারতের ইতিহাস। যাই হোক, গান্ধীজী সেদিন এই বিষয়ে নতুন আন্দোলন সুরু করে দেন। আর তাঁর প্রতিজ্ঞাপত্রে লেখা হয়েছিল—

"Being conscientiously of the opinion that the Bills known as the Indian Criminal Law (Amendment) Bill No. 1 of 1919 and the Criminal Law (Emergency Power) Bill No. 2 of 1919 are unjust, subversive to the principle of liberty and justice and destructive to the elementary rights of the individual..we solemnly affirm that..we shall refuse civily to obey these laws.." (Statesman—4.3.19).

অর্থাৎ "ন্যায়দৃষ্টিতে ইণ্ডিয়ান ক্রিমিন্যাল ল (অ্যামেন্ডমেন্ট) বিল নং ১, ১৯১৯ এবং ক্রিমিন্যাল ল (এমারজেন্সি পাওয়ার) বিল নং ২, ১৯১৯-কে স্বাধীনতা ও ন্যায় বিচারের অযোগ্য ও ধ্বংসকারী এবং ব্যক্তি-স্বাধীনতার—বিনাশ কারক বলে মনে হওয়ায় আমরা যথার্থবিধি প্রতিজ্ঞা করছি যে এই আইনকে আমরা শিষ্টভাবে অবজ্ঞা করব।"

এরই পরে সুরু হয় যূপকাষ্ঠে অগ্নি নিক্ষেপের পালা। সোমবার, ৭ই এপ্রিল, ১৯১৯ তারিখের অমৃতবাজার পত্রিকায় বড় অক্ষরে ছাপা—

"Black Sunday"
"Calcutta in Mourning
Business at stand still
Trumph of soul Force
Monster Meeting at Maidan.
Several Overflow Meetings
2 Lacs of People Assembled
Unprecedented
Demonstration."
—ইত্যাদি

আর সম্পাদকীয় স্তম্ভে যা লেখা হয়েছিল তার সারমর্ম হচ্ছে এইরূপ—

"ময়দানের এই সুবিশাল সভা দেখে কর্তৃপক্ষের চোখ খোলা উচিত...রাজা, মহারাজা, নাইট প্রমুখ ব্যক্তিরা যাঁরা সাধারণ মানুষের নেতৃস্থানীয় বলে নিজেদের মনে করেন, তাঁরা এই সভায় উপস্থিত ছিলেন না সত্য, কিন্তু আমলাতন্ত্রের মূক শরণার্থীরা দলে দলে উক্ত সভায় হাজির হয়ে নিজেরাই নিজেদের নেতা নির্বাচন করে নিয়েছিলেন...অত্যাচার আর অত্যাচারের ভীতি প্রদর্শন উভয়ে মিলে সেদিন হিন্দু-মুসলমানের একতার বন্ধনকে সুদৃঢ় করে তুলেছিল—যে কাজে কংগ্রেস আর কনফারেন্স আগাগোড়াই ব্যর্থ হয়েছে।" সভা শেষে এক বিরাট শোভাযাত্রা গান গেয়ে রাজপথ ধরে অগ্রসর হতে থাকে। কলকাতার তখনকার বিখ্যাত 'ব্রিস্টল হোটেলের' সাহেবরা কিন্তু এই গণচেতনাকে প্রথমে উপেক্ষার চোখেই গ্রহণ করেছিলেন আর ওপরের বুলান বারান্দা থেকে শোভাযাত্রীদের গায়ে জল ছিটিয়ে দিয়েছিলেন উপেক্ষার ভঙ্গীতে। প্রত্যুত্তরে উত্তেজিত জনতা আর অহিংসার গণ্ডীতে নিজেদের সীমাবদ্ধ রাখতে পারেন নি। তাঁরা হোটেলটিকে আক্রমণ করেন এবং এইরূপ অবস্থায় স্বাভাবিক ফল যা ফলে তাই ঘটেছিল। তারপরে অনতিবিলম্বে কলকাতার দিগ্বিদিকে সেই আগুন ছড়িয়ে পড়ে। তাই ১৩ই এপ্রিলের স্টেটসম্যান পত্রিকায় আতঙ্কের অভিব্যক্তি দেখা যায়—"ক্যালকাটা মব্ গেট আউট অফ হ্যান্ড—ভায়লেন্ট অ্যাটাক অন পুলিশ, মিলিটারী কমপেল্ড টু ফায়ার..." ইত্যাদি। বিপ্লবের সক্রিয় সূচনার বোধ হয় এইভাবেই হয় প্রথম ইঙ্গিত। ইতিহাসের পাতা উল্টে বেশি দূরে না গেলেও, অল্পাবিস্তর শতাধিক বছর ধরে ঐ দৃষ্টান্তই চোখে পড়ে। ১৮৩০—৩২ সালের কথা। যোগেন্দ্র বিদ্যাভূষণ লিখিত 'গ্যারিবল্ডির জীবনবৃত্ত' থেকে একটি অংশ তুলে ধরি—"এই সময় একদিন বেলজিয়মের রাজধানী ব্রসেলস্ নগরের রঙ্গালয়ে অনেকে নীল-দর্পণের সমশ্রেণীক 'ম্যাসালীপো' নামক একখানি নাটকের অভিনয় শুনিয়া এতদূর উন্মত্ত হইয়াছিলেন যে, রঙ্গালয় হইতে বাহির হইয়া হলণ্ডের আধিপত্যের বিরুদ্ধে অভ্যুত্থিত হইলেন। সমস্ত বেলজিয়াম তাঁহাদিগের সহিত যোগ দিয়া......("পৃঃ ১০)—! আর ভারতের ১৯৪২-এর অভ্যুত্থান, সেখানেও তো এই প্রক্রিয়ার ব্যতিক্রম হয় নি। গান্ধীজীর পূর্বোক্ত ঘোষণার পরে ঐরূপ গণ-অভ্যুত্থান সেদিন ভারতের অন্যত্রও দেখা দিতে থাকে। কিন্তু ২২ এপ্রিল ১৯১৯ সালের সংবাদে প্রকাশ—*"Mr. Gandhi's Advice—The Suspension of civil Disobedience (Statesman)*— অর্থাৎ 'গান্ধীজীর পরামর্শ—সিভিল ডিস্ওবিডেন্স্ সাময়িকভাবে বিরত হোল'। এই বিষয় অন্যত্র আরো আলোচনা করা হয়েছে। এখানে গান্ধীজীর উদ্দেশ্যে লেখা রবীন্দ্রনাথের একটি চিঠির উল্লেখ করি।

Santiniketan
12. 4. 1919

"Dear Mahatmaji,

....Passive resistance is a force which is not necessarily moral in itself....I knew your teaching is to fight against evil by the help of the good. But such a fight is for heroes and not for men led by the impulses of the moment." Evil on one side naturally begets evil on the other, injustice leading to violence and insult to vengefullness. Unfortunately such a force has already started and either through panic or through wrath, our authorities have shown us their clans whose sure effect is to drive some of us into secret path of resentment and others into utter demoralisation..the great gift of freedom can never come to a people through charity... ('Truth called them Differently'—compiled by R. K. Prabhu & R. Kelekar, pp. 14-18).

"প্রিয় মহাত্মাজী,

শান্তিনিকেতন,
১২-৪-১৯১৯

...প্যাসিভ রেজিসট্যান্স হচ্ছে এমন একটি শক্তি, যার সঙ্গে আসলে ধর্মের কোন সম্পর্ক নেই...আমি জানি অন্যায়ের বিরুদ্ধে ন্যায়ের সাহায্যে যুদ্ধ করাই আপনার শিক্ষা। কিন্তু এই যুদ্ধ পদ্ধতি হচ্ছে বীরের উপযোগী, সাময়িক উত্তেজনায় পরিচালিত মানুষের জন্যে নয়। অসৎ একদিকে থাকলে মন্দের আবির্ভাব অপরদিকে হওয়াও স্বাভাবিক। অবিচার বলা প্রয়োগের প্রয়োজনীয়তা বোধকে আকর্ষণ করে, আর প্রতিহিংসা পরায়ণতার উৎপত্তি হয় অবমাননার ভেতর দিয়ে। দুর্ভাগ্যক্রমে এই জাতীয় শক্তির কাজ সুরু হয়ে গেছে, আর হয় আতঙ্ক কিংবা ক্রোধের মাধ্যমে, কর্তৃপক্ষ তাদের নখের সাহায্যে আমাদের আঁচড়াতে সুরু করেছে, যার প্রত্যক্ষ ফলস্বরূপ আমাদের একাংশ গুপ্ত পথে পরিচালিত হবে, আর অপর অংশের মানসিক শক্তি ভেঙে পড়বে...স্বাধীনতার সর্বোচ্চ দান গণ-সমষ্টির হাতে কখনই বদান্যতা বা দয়ার মাধ্যমে আসতে পারে না।"

বঙ্গদর্শন

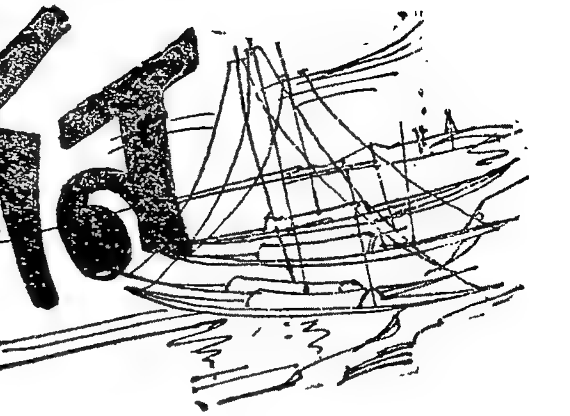

সরকারী কর্মচারীদের গণছুটি

রাজ্য সরকারী কর্মচারীদের গণছুটি পুরোপুরি সাফল্য অর্জন করেছে। সারা পশ্চিমবঙ্গে দু' লক্ষাধিক কর্মচারী এই গণছুটি পালন করেছেন। ব্যাপারটা ঘটেছে সম্পূর্ণ শান্তিপূর্ণভাবে, কোথাও কোন গণ্ডগোল হয় নি। শতকরা নিরানব্বই ভাগের অনুপস্থিতি একথা প্রমাণ করে দিয়েছে যে, সরকারী কর্মচারীদের মনোবল কত দৃঢ়। পারস্পরিক ঐক্যেরও তাঁরা অভূতপূর্ব নজীর দেখিয়েছেন। কেন না সরকারী তরফ প্রথম থেকেই যে আন্দাজ শাসানি শুরু করেছিলেন এবং যে রকম ভয়াবহ ফলাফলের ইঙ্গিত দিচ্ছিলেন, সেই অবস্থায় কর্মচারীরা তুলনাহীন দৃঢ়তা দেখিয়েছেন।

এই গণছুটি সম্বন্ধে সরকার গোড়া থেকেই প্রতিহিংসামূলক মনোভাবের দ্বারা চালিত হয়েছিলেন এবং সে মনোভাবের পরিবর্তন এখনো হয় নি। সম্ভাব্য সকল উপায়ে সরকারী কর্মচারীদের মনোবল ভেঙে দেবার চেষ্টা করতে তাঁরা কসুর করেন নি। সরকার এমন কথাও বলেছেন যে, সমগ্র ব্যাপারটিকে তাঁরা রাজনৈতিক উদ্দেশ্য প্রণোদিত বলে মনে করছেন এবং তার জন্য কঠোরতর দণ্ডদানেও সরকার পরাঙ্মুখ হবেন না। সরকারী বিজ্ঞপ্তি থেকে যা বোঝা যায়, সরকার ইতিমধ্যেই অনুপস্থিত কর্মচারীদের নামের তালিকা সংগ্রহ করেছেন এবং গণছুটিতে যাঁরা অংশ গ্রহণ করেছিলেন তাঁদের সার্ভিস ব্রেক হয়ে গেছে এরকম কথা সরকার ঘোষণা করেছেন। এর প্রতিক্রিয়া অবসরকালীন পেন্সন ইত্যাদির উপরেও বর্তাবে বলে সরকার জানিয়েছেন, তা ছাড়া অনুপস্থিত দিনটির বেতনও কাটা যাবে।

অর্থাৎ সরকারের হাতে যেসব অস্ত্র আছে, সবকটিই নির্দ্বিধায় প্রয়োগ করা হয়েছে। কিন্তু এত করেও সরকার তাঁর কর্মচারীদের মনোবল ভাঙতে পারেন নি। এ থেকে একথাই প্রমাণিত হচ্ছে যে, যে কারণে সরকারী কর্মচারীরা গণছুটি নিয়েছেন, তার মূলে সত্যই কোন ন্যায়সঙ্গত ভিত্তি আছে, নতুবা ভীতির মুখে তাঁরা সহজেই আত্মসমর্পণ করতেন।

আমরা একথা আগে বহুবার বলেছি, এখন আবার বলছি যে, অসন্তুষ্ট কর্মচারী নিয়ে কাজ করা চলে না। দেশের সামগ্রিক অর্থনীতি আজ যে পর্যায়ে এসে দাঁড়িয়েছে, তাতে ক্রমাগত মূল্যবৃদ্ধির প্রবণতাকে দমন করা যাবে না, একথা সরকারই বলছেন। নিত্যব্যবহার্য প্রতিটি পণ্যের দাম রাতারাতি বেড়ে দ্বিগুণ হবে এবং সরকার সেখানে সাংখ্য দর্শনের পুরুষের মতই নিষ্ক্রিয় দর্শক ও সক্রিয় সাক্ষী থাকবেন, অথচ অধীনস্থ কর্মচারীদের বেতন বাড়াবেন না, এ যুক্তির সমর্থন নিশ্চয়ই কোন সুস্থ লোক করতে পারে না।

সরকারী কর্মচারীরা সরকারের খাস তালুকের প্রজা হতে পারেন, কিন্তু তাঁদেরও পেট বলে একটা বস্তু আছে। ভাববাদী দার্শনিকদের মত যদি সরকারও বলতে আরম্ভ করেন যে, পেট বলে কিছু নেই, যা আছে তা পেটের ধারণামাত্র, এর থেকে দুর্ভাগ্যের কথা আর কি হতে পারে? কিন্তু সরকারের মনোভাব সেইরকমই। এই মনোভাবের অবসান হওয়ার প্রয়োজন। সরকারী কর্মচারীরা এয়ারকন্ডিশনড ঘর, মোটরগাড়ি, রেফ্রিজারেটার বা টেলিভিশন দাবি করেন নি, চেয়েছেন শুধু পোড়া পেটের দু' মুঠো অন্ন সংগ্রহের জন্য কিছুটা ক্রয়ক্ষমতা। নিজের কর্মচারীদের জন্য সেটুকুর ব্যবস্থাও সরকার করতে নারাজ।

সবকিছু দেখেশুনে তাই মনে হয় যে, সরকারী কর্মচারীদের যদি সরকারের কাছ থেকে দাবিদাওয়া আদায় করতে হয়, তা হলে তাঁদের আরও বৃহত্তর আন্দোলনে নামতে হবে। কিন্তু এ অবস্থাটা আদৌ কাম্য নয়। সমাজের সর্বস্তরের লোককেই যদি সরকারকে নিজেদের অবস্থার কথা জানাবার জন্য আন্দোলনের পথেই নামতে হয়, তাহলে সে সরকার জনসাধারণের প্রতিনিধিত্বের দাবি কিভাবে করতে পারেন সেটাই জিজ্ঞাস্য।

মাধ্যমিক শিক্ষকদের অবস্থান ধর্মঘট

গত ১০ই সেপ্টেম্বর থেকে মাধ্যমিক শিক্ষকদের নিরবচ্ছিন্ন কর্মবিরতি ও ১৩ই সেপ্টেম্বর থেকে এসপ্ল্যানেড ইস্টে অবস্থান ধর্মঘট শুরু হয়েছে। শিক্ষকমশাইরাও বাঁচার দাবিতে পথে নেমেছেন। গত ১০ই সেপ্টেম্বর থেকেই পশ্চিমবঙ্গের প্রায় ৬৫ হাজার শিক্ষক-শিক্ষিকা অনির্দিষ্টকালের জন্য ধর্মঘট করেছেন। ফলে শিক্ষাব্যবস্থায় এক অচল অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে।

সরকারী কর্মচারীদের মত শিক্ষকমশাইরাও বাঁচার দাবিতে আন্দোলনের পথই বেছে নিলেন। না নিয়ে কোন উপায় ছিল না। আমাদের সরকার শক্তের ভক্ত, নরমের যম। লরীওয়ালাদের অন্যায় দাবি নাকে খত দিয়ে মেনে নিতে সরকারের বাধে না, লরীওয়ালাদের আবদার মেটাতে গিয়ে সরকার হাসিমুখে নিজের আর্থিক লোকসান স্বীকার করতেও প্রস্তুত, এমন কি বে-আইনী মাল বহন করার জন্য লরীকে চেক করার যে অধিকার সকল সরকারের আছে, পশ্চিমবঙ্গ সরকার গুঁতোয় পড়ে সে অধিকারও ত্যাগ করেছেন, কিন্তু তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণীর সরকারী কর্মচারীদের অথবা শিক্ষকদের বেলায় সরকার বিন্দুমাত্র উপুড়হস্ত করতে নারাজ।

এই আন্দোলনের জন্য সমগ্র অবস্থাটা না বুঝে অনেকে মাস্টারমশাইদের সম্বন্ধে প্রতিকূল মন্তব্য করছেন। কয়েকটা বিভ্রান্তিকর সংবাদই এই অনর্থ ঘটিয়েছে। পাঠকদের স্মরণ থাকতে পারে যে

কোঠারি কমিশনের রিপোর্টে শিক্ষকদের বেতন-সংক্রান্ত সুপারিশগুলি সংবাদপত্রে বেশ ফলাও করে প্রকাশিত হয়েছিল, যা দেখে অনেকেই ধারণা করে নিয়েছেন যে, শিক্ষকদের বেতন বৃদ্ধি দারুণ বেড়ে গেছে। কিন্তু আসলে সেগুলি সুপারিশ মাত্র, যেগুলির বাস্তব প্রয়োগ মোটেই হয় নি।

আরও একটি বিভ্রান্তির সৃষ্টি হয়েছে সেদিন থেকে যেদিন সরকারী কর্মচারী ও শিক্ষকদের নতুন স্কেল সংবাদপত্রে প্রকাশিত হল। এর মধ্যে একটু সরকারী কারচুপি আছে। সরকার যে নতুন স্কেল ঘোষণা করলেন, সে স্কেল সকলেই এতকাল পেয়ে আসছেন, কেন না কয়েক বছর আগে মাস্টারমশাইদের স্কেল নতুন করে করা হয়েছিল। কিন্তু সরকার সংবাদপত্রে প্রকাশের জন্য দুইটি স্কেলের তালিকা দিলেন, একটি সরকারের নতুন স্কেল, আর একটি দশ বছর পূর্বেকার স্কেল। সরলমতি পাঠক অত বুঝলেন না; বরং দু'টি স্কেলের তুলনামূলক বিচার করে দেখলেন যে, অনেকটাই বাড়ানো হয়েছে। কিন্তু কার্যত এক পয়সাও বাড়ানো হয় নি, বরং ক্ষেত্রবিশেষে কারো কারো বেতন কমে গেছে।

কয়েকজন "শিক্ষাদরদী" বিভিন্ন দৈনিক পত্রের চিঠিপত্রের স্তম্ভে ছাত্রদের পড়াশোনার ক্ষতি হচ্ছে, এই ধুয়া তুলে শিক্ষকমশাইদের ও তাঁদের আন্দোলনের বিরুদ্ধে বিষোদ্গার করে শিক্ষক আন্দোলনকে জনসাধারণের চক্ষে হেয় করার চেষ্টা করছেন, এবং কিছুটা সাফল্যলাভও করেছেন। এই ধরণের অপপ্রচারের কিছু প্রতিবাদ শিক্ষকদের তরফ থেকে অবশ্যই হওয়া উচিত ছিল। গত বছরে শিক্ষকদের আন্দোলনের জন্য ১৯ দিন স্কুল বন্ধ ছিল এবং সমস্ত স্কুলের শিক্ষকরাই গ্রীষ্মাবকাশ ও পূজাবকাশের দিনগুলি থেকে তার ক্ষতিপূরণ করেছিলেন। শিক্ষকমশাইরা ছাত্রদের কখনই ক্ষতি করতে চান না। এবারেও তাঁরা প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন যে, আন্দোলনের ফলে ছাত্রদের যে কয়েকদিনের ক্ষতি হবে তা তাঁরা পূরণ করে দেবেন।

১৯৬৫ সালের আন্দোলনে শিক্ষকদের বরাতে কিছুই জোটে নি, চতুর্থ পরিকল্পনায় তাঁদের জন্য কিছু করা হবে এই ফাঁকা আশ্বাসের উপর নির্ভর করেই তাঁরা সেবার ধর্মঘট প্রত্যাহার করেছিলেন। কিন্তু ১৯৬৫-র সঙ্গে ১৯৬৬-র তফাৎ অনেকখানি। ১৯৬৬-র গোড়া থেকেই দ্রব্যমূল্য যেভাবে বেড়ে চলেছে, তদুপরি ডিভ্যালুয়েশনের ফলে তাতে যেভাবে ঘৃতাহুতি দেওয়া হয়েছে, তার ফলে সমাজের অপরাপর স্তরের মানুষদের সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষকেরাও মাথায় হাত দিয়ে বসেছেন। আমাদের নেতারা যে কোন উপলক্ষেই ঘোষণা করেন যে, শিক্ষকদের বেতন না বাড়ালে শিক্ষাব্যবস্থার উন্নতি হবে না, কিন্তু কার্যত সামান্য কিছু বাড়াতে হলেই সরকার তখন ভুরু কোঁচকান।

নতুন স্কেল যেভাবে করা হয়েছে, তাতে প্রবঞ্চনার দিকটাই বেশি ফুটে ওঠে। স্কেলের শেষ পর্যায়টিতে আছে একটি আকর্ষণীয় অঙ্ক। কিন্তু সেখানে পৌঁছানো কি এক জীবনে সম্ভব? তাঁদের অবসরকালীন সুযোগ-সুবিধার কথাও কর্তাব্যক্তিদের মুখ থেকে প্রায়ই শোনা যায়, কিন্তু কার্যত এ পর্যন্ত কোন ব্যবস্থাই হয় নি। ভারতের অপরাপর কয়েকটি রাজ্যে শিক্ষকদের পেন্সন স্কীম চালু হয়েছে। কিন্তু পশ্চিমবঙ্গ সরকার এ বিষয়ে উদাসীন। নানান কারণে বাধ্য হয়েই শিক্ষকদের আজ পথে নামতে হয়েছে।

আমরা আশা করব যে শিক্ষাক্ষেত্রে অধিকতর বিপর্যয় ডেকে না এনে সরকার শিক্ষকদের সঙ্গে একটা সম্মানজনক সর্তে মীমাংসা করে নিন। সমাজের সর্বস্তরে যেভাবে বিক্ষোভ দানা বেঁধে উঠছে তার প্রতিকার একগুঁয়েমির দ্বারা সম্ভবপর নয়। সমস্ত ক্ষেত্রে সরকার যে মনোভাব দেখাচ্ছেন তাকে এক কথায় বলা যায় অ্যাডামেণ্ট। নিতান্ত বাঁচার তাগিদে শিক্ষকেরা আজ রাজপথে নেমেছেন, তাঁরা সরকারকে চ্যালেঞ্জ করছেন না। কেরলের মত ক্ষুদ্র রাজ্যে যেখানে মোট রাজস্বের শতকরা ৩৭ ভাগ অর্থ শিক্ষাখাতে ব্যয় করা হয়, পশ্চিমবঙ্গে তার পরিমাণ মাত্র শতকরা ১৯ ভাগ। কাজেই সরকার যদি মনে করেন যে, শিক্ষকদের জন্য তাঁরা কিছু করেছেন, সেটা ভুল হবে। শিক্ষকেরা বা সরকারী কর্মচারীরা কি লরীওয়ালা নয় বলেই তাঁদের প্রতি এই বিমাতৃসুলভ ব্যবহার?

ছাত্র উচ্ছৃংখলতার আর একটি দিক

প্রথমেই বলে রাখা ভাল বর্তমান আলোচনায় দেশের সমগ্র ছাত্রসমাজের প্রতি কোন দোষারোপ করা হচ্ছে না। কেন না একথা বিশ্বাস করার যথেষ্ট কারণ আছে যে, বর্তমান ছাত্রসমাজের অধিকাংশই সৎ, নিষ্ঠাবান ও সমাজ সচেতন।

আমরা একটি বিশেষ শ্রেণীর ছাত্রদের কথাই এখানে তুলছি যাদের সম্বন্ধে জনসাধারণকে ও বৃহত্তর ছাত্রসমাজকে কিছুটা কঠোর মনোভাব অবলম্বন করতে হবে বলেই মনে হয়।

গত ৯ই সেপ্টেম্বর শিবপুর বি, ই, কলেজের একদল ছাত্রের সঙ্গে স্থানীয় জনসাধারণের যে সংঘর্ষ হয়েছিল, অনুসন্ধানে তার যে কারণ জানা গেছে তা থেকে একশ্রেণীর ছাত্রের মতিগতির যে পরিচয় পাওয়া যায় তাতে শঙ্কিত না হয়ে পারা যায় না। এরাই যখন ইঞ্জিনীয়ারিং পাশ করে কর্মক্ষেত্রে আসবে তখন তাদের দ্বারা যে দেশের স্বার্থ কতদূর রক্ষিত হবে সেটাই ভাববার বিষয়।

জনসাধারণের অভিযোগ এই যে উক্ত কলেজের ছাত্ররা প্রায়ই দলবদ্ধভাবে পল্লীতে প্রবেশ করে পথে, বাড়ির ছাদে বা বারান্দায় কোন কিশোরী বা যুবতী মেয়েকে দেখতে পেলেই অশ্লীল অঙ্গভঙ্গী সহ কুৎসিত বাক্য ব্যবহার করে। এই বিষয়টাকে মোটেই অস্বীকার করা যায় না, এবং অবিশ্বাস করারও কোন কারণ নেই। স্থানীয় জনসাধারণ বহুবার এদের এই আচরণের প্রতিবাদ করেছেন, কিন্তু কোন সুফল হয় নি। ছাত্ররা এমন ভাব দেখিয়েছে যেন এই ধরণের কুকাজ করার অধিকার তাদের আছে, এবং তারা কোন কৈফিয়ৎ দিতে বাধ্য নয়। এদের এই জাতীয় মনোভাব গড়ে ওঠার পিছনে আছে এদের অর্থকৌলিন্য। আজকালকার দিনে বাপের টাকার জোর না থাকলে ইঞ্জিনীয়ারিং পড়া যায় না। ইডেন হোস্টেলের কাহিনীও এখানে স্মর্তব্য; সেখানেও একমাত্র ধনী সন্তানরাই ঘর আলো করে থাকতে পারে। এরা মনে করে এরাই সমাজের গ্যালাণ্ট বয়, দেশ এদেরই সেবার মুখ চেয়ে আছে, কাজেই বেলেল্লাপনার অধিকার এদের জন্মগত অধিকার।

পুলিশকে আমরা কথায় কথায় দোষ দি, কিন্তু এক্ষেত্রে পুলিশ সঠিকভাবেই কর্তব্য করেছিল। তার ধাক্কায় অনশন ধর্মঘট। তবু এই আদুরে নাড়ুগোপাল, সমাজের গ্যালাণ্ট বয়দের খুঁটির জোর প্রচুর। কাজেই মুখ্যমন্ত্রীকে স্বয়ং এদের দোরগোড়ায় আসতে হয়, পিঠে হাত বুলিয়ে বাবা বাছা করে অনশন ধর্মঘট ভাঙাতে হয়। এই সব আধুনিক ডন জুয়ানদের ধাক্কায় পুলিশকে চার্জসীট প্রত্যাহার করতে হয়, যাতে তাদের "সম্মানহানি" না হয় সেই জন্য। তারা যে আচরণ করেছে, তা যদি সাধারণ রকবাজ কোন ছোকরা করত তাহলে কি তার "সম্মান রক্ষার" জন্য কর্তাব্যক্তিরা এভাবে উঠে-পড়ে লাগতেন?

বর্তমান শিক্ষাসঙ্কোচন নীতির জন্য দরিদ্রের ছেলে-মেয়েদের উচ্চশিক্ষার পথ রুদ্ধ হয়ে গেছে। হায়ার সেকেণ্ডারী পরীক্ষায় ভাল রেজাল্ট করতে হলে ভাল স্কুল ও গৃহশিক্ষকের প্রয়োজন হয়, যা দরিদ্রের সামর্থ্যের মধ্যে সম্ভব নয়।

দুর্গারঞ্জন অবশ্য মেধার জোরে ভাল ফল করে, কিন্তু বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই ধনীর ছেলেরাই ভাল ফলাফলের সুযোগ পেয়ে থাকে। এরাই পরবর্তীকালে উচ্চশিক্ষার আসর জমিয়ে থাকে, এবং তা থেকে উদ্ভূত সুপিরিয়রিটি কমপ্লেক্স তাদের মধ্যে একটা বেপরোয়া ভাবের সৃষ্টি করে, যার প্রকাশ ঘটেছে ইডেন হোস্টেলে, শিবপুর বি, ই, কলেজে।

আসন্ন বাংলা বন্ধ

২২শে ও ২৩শে সেপ্টেম্বরের প্রস্তাবিত বাংলা বন্ধ কার্যকরী হবার দিন এসে পড়ল। এই বন্ধের ডাক দিয়েছেন বামপন্থী নেতারা। বর্তমান শাসনে জনসাধারণের জীবনে যে দুর্বিষহ অবস্থা নেমে এসেছে তার জন্য সরকারকে নৈতিক ধিক্কার জানানোই এই বন্ধের উদ্দেশ্য।

৪৮ ঘন্টার এই বন্ধ আমাদের দেশের ইতিহাসে অভূতপূর্ব। এই বন্ধকে কার্যকরী ও সার্থক করে তোলবার জন্য বামপন্থী দলগুলিও যেমন উঠে-পড়ে লেগেছেন, সরকারও তেমনি এই বন্ধকে বানচাল করার জন্য বদ্ধপরিকর।

এই প্রসঙ্গে আশা করি গত মার্চ মাসের বাংলা বন্ধের কথা অনেকেই স্মরণ করতে পারছেন, তার প্রতিক্রিয়া যে কি ভয়াবহ আকার ধারণ করেছিল তা এখনো অতীতের কাহিনী হয়ে যায় নি। সেদিনকার বন্ধের পরিসমাপ্তি ঘটেছিল অসংখ্য প্রাণের মূল্যে। সূর্যপ্রসাদ কমিশনের রিপোর্ট অনুযায়ী সর্বক্ষেত্রেই হাঙ্গামার প্ররোচনা সরকারী তরফ থেকেই এসেছিল। এই বিষয়টি আমরা সরকারকে আবার স্মরণ করিয়ে দিতে চাই। অনর্থক রক্তপাত ও প্রাণহানি কখনোই অভিপ্রেত নয়।

বিগত বোম্বাই বন্ধের সময় মহারাষ্ট্র সরকার যে দৃষ্টিভঙ্গি অবলম্বন করেছিলেন, মনে হয় সেইটেই সঠিক পথ। তাতে অনাবশ্যক প্রাণহানি এড়ানো গেছে, সরকারী সম্পত্তিরও কোন ক্ষতি হয় নি। কিন্তু শাসক দলের সবাই মহারাষ্ট্রের মুখ্যমন্ত্রীর দৃষ্টিভঙ্গি পছন্দ করেন নি। মহারাষ্ট্র সরকার কেন শক্ত হন নি, কেন গুলী চালান নি সে কৈফিয়ৎ তাঁরা দাবি করেছিলেন এবং সরকারী দৃষ্টিভঙ্গির প্রতিবাদে পদত্যাগ পর্যন্ত করেছিলেন।

এই রকম লোকের অভাব পশ্চিমবঙ্গেও নেই এবং পশ্চিমবঙ্গের শাসকদলের অনেকেই ব্রিংস্ক্রীগ বাহিনী গঠনের পক্ষপাতী। এই সব এলিমেন্টের চাপে সরকার যেন এমন কিছু না করে বসেন যাতে দেশে রক্ত বন্যার সৃষ্টি হয়। এ ছাড়া এমন কিছু আদুরে নাড়ুগোপাল আছেন যাঁদের তামাম মৌলিক অধিকার বোধ এই সব বন্ধের দিনগুলিতেই জেগে ওঠে। কিন্তু তা সরকারী চেষ্টায় রক্ষা করতে গেলেই বিপর্যয় বাধে।

জনসাধারণ সরকারী সম্পত্তিকে নিজের সম্পত্তি বলেই মনে করেন এবং ততক্ষণ তাঁরা কোন ক্ষতিই করেন না যতক্ষণ না পর্যন্ত তাঁরা ভয়াবহভাবে প্ররোচিত হন। বিগত ৬ই এপ্রিলের সাধারণ ধর্মঘট নিঃসন্দেহে এই কথা প্রমাণ করে দিয়েছে যে, শান্তি রক্ষার আগ্রহ জনসাধারণের বড় কম নয়। কাজেই প্ররোচনা যদি সরকারী তরফ থেকে না আসে তাহলে একথা নিঃসংশয়ে বলা যাবে যে, বাংলা বন্ধের ফলে কোন হাঙ্গামা হবে না।

* * *

আমার জনৈক বন্ধু প্রশ্ন করেছিলেন বাংলা বন্ধের পথই কি সঠিক পথ? এ প্রশ্ন অনেকেরই মনে জেগেছে তাই বঙ্গদর্শনের পাতায় তার কিছুটা উত্তর দেওয়া চলতে পারে।

যে সকল দেশে পার্লামেন্টীয় গণতন্ত্র দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত, যেমন ইংলণ্ডে, এ-রকম বন্ধ প্রায় অকল্পিত। কথায় কথায় গণ-আন্দোলনের নজীরও সেখানে খুবই কম। কাজেই বন্ধ এবং আন্দোলন সংক্রান্ত বিষয়টি বিচার করতে হবে গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে।

গণতন্ত্রের সঙ্গে একনায়কতন্ত্রের মূল প্রভেদ হচ্ছে যে একনায়কতন্ত্রে শাসক বা শাসকদলের বক্তব্যকেই একমাত্র সত্য বলে মনে করা হয়, এবং সেই বক্তব্যের বাইরে কোন সত্য আছে একথা একনায়কতন্ত্রী ব্যবস্থায় মানা হয় না, কিন্তু গণতন্ত্রের মূল কথাই হচ্ছে 'আমি যা বলছি বা যা করছি তা অভ্রান্ত' সত্য নয়, অপরে যা

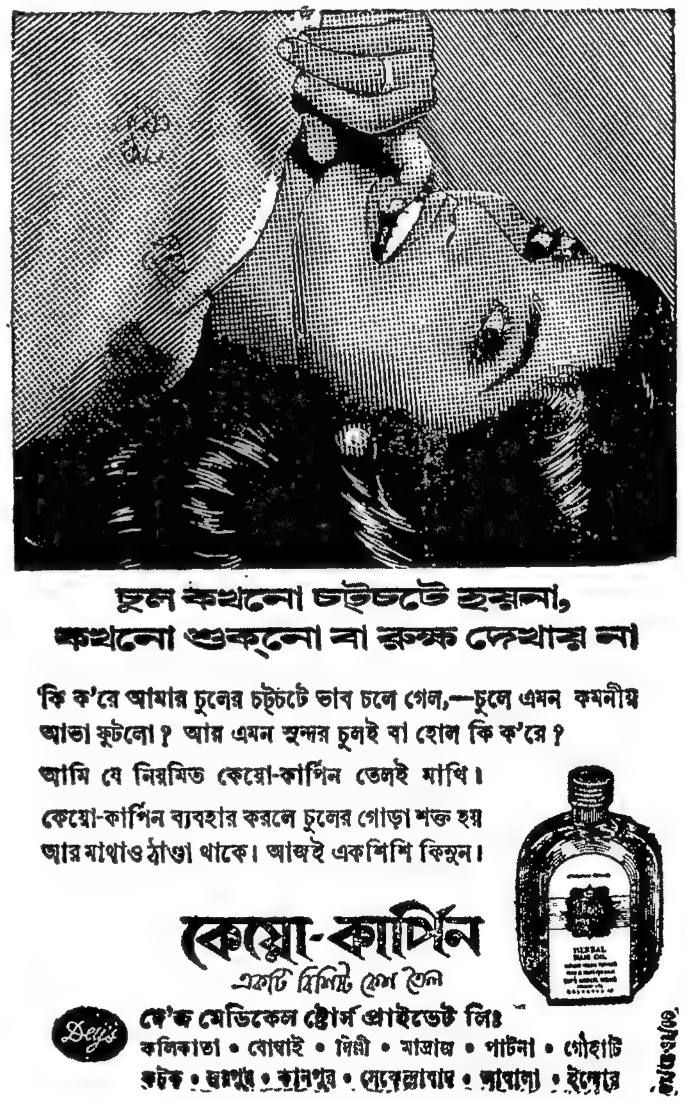

বলছে তার মধ্যে সত্য থাকতে পারে; বিরোধীপক্ষের যুক্তিগুলিও ফেলে দেবার নয়। প্রতিটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে বিরোধী দলের নেতার সঙ্গে পরামর্শ করা ইংলণ্ডের পার্লামেণ্টীয় গণতন্ত্রের একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য। পার্লামেণ্টীয় গণতন্ত্র অনেকটা পালাবিনীয় গণতন্ত্রের একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য। পার্লামেণ্ট্রীয় গণতন্ত্র অনেকটা ক্রিকেট খেলার মত। একদলের ব্যাটিং ওভার হয়ে গেলে, সেই দলকে এসে বোলিং করতে হবে এবং বিরোধী দলকে ব্যাটিং করার সুযোগ দিতে হবে।

অর্থাৎ গণতন্ত্র সার্থক করে তুলতে যার প্রয়োজন সর্বাধিক তা হচ্ছে গণতান্ত্রিক দৃষ্টিভঙ্গি, গণতান্ত্রিক জীবনাদর্শ। কেন না গণতন্ত্র বলতে শুধু একটা রাজনৈতিক প্যাটার্নই বোঝায় না। এর মৌল প্রত্যয় হচ্ছে সহনশীলতা, পরমসহিষ্ণুতা এবং পরমতের মধ্যেও যে কার্যকরী সত্য থাকতে পারে তা উপলব্ধি করার ও অকপটে স্বীকার করার মত মানসিকতা।

* * *

এখন দেখা যাক এ-রকম মানসিকতার কোন পরিচয় শাসকদল আগে দিয়েছেন কি না, আমাদের কানের কাছে প্রত্যহ তারস্বরে একটি ঘোষণাই করা হয় যে, এটা গণতান্ত্রিক দেশ। কিন্তু সরকারের যে আচরণ তার মধ্যে এই দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় কোথায়?

গত নির্বাচনের পূর্বের নির্বাচনে কেরলে কমিউনিস্ট সরকার প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। ইতিহাসে এটা ছিল অনন্যসাধারণ ঘটনা, কেন না ভোটের দ্বারা কমিউনিস্ট পার্টি ইতিপূর্বে কোথাও ক্ষমতায় আসে নি। কেরলে কমিউনিস্ট শাসন ভাল কি মন্দ হয়েছিল সে কথার আলোচনা এখানে নিরর্থক। তবে একথা ঐতিহাসিক সত্য যে সূতিকাগার থেকেই কেন্দ্রীয় সরকার কেরল সরকারকে খতম করার আপ্রাণ চেষ্টা করেছিলেন এবং শেষ পর্যন্ত সফলও হয়েছিলেন। এটা আর যাই হোক, গণতান্ত্রিক দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় নয়। বিগত খাদ্য আন্দোলনের সময় একটি ইংরাজী সাপ্তাহিক তথ্যাবলীর দ্বারা প্রমাণ করে দিয়েছিলেন যে, পশ্চিমবঙ্গের অবস্থা সেদিনের কেরলের চেয়েও অনেক বেশি রাষ্ট্রপতি-শাসনের অনুকূল ছিল, কিন্তু দলীয় কারণে এখানে তা হয় নি।

অনেকেই আশঙ্কা করছেন যে আগামী নির্বাচনে যদি পশ্চিমবঙ্গে বামপন্থী সরকার প্রতিষ্ঠিত হয় সে সরকারকে কাজ করতে দেওয়া হবে না। যে কোন একটা অছিলায় সেই সরকারকে উচ্ছেদ করে রাষ্ট্রপতির শাসন প্রবর্তিত হবে। এই জাতীয় নৈরাশ্যবাদী মনোভাব দেশের মধ্যে যে গড়ে উঠেছে তার কারণ শাসকদলের গণতান্ত্রিক মনোভাবের প্রতি সর্বস্তরেই একটা সন্দেহ উঁকি মারছে। গত কয়েক বছরের মধ্যে বিধানসভার অধিবেশনগুলিতে বিরোধী পক্ষের বক্তব্যসমূহকে যেভাবে নস্যাৎ করে দেওয়া হয়েছে, নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতার জোরে যেভাবে শাসকদলের অনুকূলে আইন পাশ করানো হয়েছে, বিরোধী সদস্যদের যেভাবে আইনসভা থেকে বিতাড়ন করা হয়েছে তার পিছনে কোন গণতান্ত্রিকতা নেই, আছে সংখ্যাগরিষ্ঠতার দম্ভ। বর্তমান শাসকদলের একনায়কতন্ত্রী প্রবণতাই বিরোধী দলগুলিকে পার্লামেণ্টীয় গণতন্ত্রের প্রতি বীতরাগ করে তুলেছে। যদি বিধানসভায় তাঁর বক্তব্যসমূহ যথোচিত মর্যাদা পেত তাহলে তাঁরা বিধানসভার মর্যাদাই বাড়াতেন। বিধানসভার বাইরে গণ-আন্দোলনের রাস্তা ধরতেন না। একথা আমরা বঙ্গদর্শনে বহুবার লিখেছি।

পার্লামেণ্টীয় গণতন্ত্রের প্রতি এই কারণে জনসাধারণেরও আস্থা নষ্ট হয়েছে। তাঁরা অনুভব করছেন যে তাঁদের অভাব-অভিযোগ বিধানসভায় ভাষা পাবে না, নিয়মতান্ত্রিক উপায়ে তাঁদের দাবি দাওয়াগুলি সরকারের কানে তোলার বা সরকারের কাছ থেকে প্রতিবিধান পাবার কোন আশা নেই। এই কারণেই তাঁরা রাজপথের আন্দোলনের প্রতি আকৃষ্ট হন। বিধানসভায় বিরোধী পক্ষরা যদি জনসাধারণের ন্যায্য অভাব-অভিযোগ দাবিদাওয়াগুলি তুলতে পারতেন, এবং যদি সরকারও গণতান্ত্রিক আদর্শের অনুগামী হয়ে সেগুলি সহানুভূতির সঙ্গে বিচার করতেন, অভিযোগগুলি বিরোধীদের কাছ থেকে এসেছে বলেই সেগুলি মূল্যহীন এমন ধারণার দ্বারা চালিত না হয়ে, তাহলে শিক্ষকদেরও অবস্থান ধর্মঘটে নামতে হত না, সরকারী কর্মচারীদেরও গণছুটি নিতে হত না, দমকল-কর্মীদেরও সংগ্রামের পথ অবলম্বন করতে হত না, দেশজোড়া ৪৮ ঘণ্টা হরতালেরও কোন প্রয়োজন হত না। আমাদের দেশে সেই গণতান্ত্রিক মনোভাব শাসকদের গড়ে ওঠে নি বলেই আন্দোলন রাজপথে নেমে এসেছে। বিরোধী সদস্যরা দেখছেন যে বিধানসভায় শুধুমাত্র সংখ্যালঘিষ্ঠ বলেই এঁরা অপাংক্তেয়, তাঁদের যুক্তিসমূহের প্রতি সরকারের কোন আকর্ষণই নেই। এই কারণেই তাঁদের অন্যপথ অবলম্বনের কথা চিন্তা করতে হয়। বাইরের আন্দোলনের চোটে মাঝে মাঝে তবু সরকারের কানে জল ঢোকে।

আইন পরীক্ষার পাঠক্রম তিন বছরের পরিবর্তে—দুই বছর, পার্টটাইম পাঠক্রমের সময় চার বছরের স্থলে তিন বছর এবং আইন পরীক্ষায় পাশ করে সরাসরি এডভোকেট হবার সুযোগের দাবিতে সারা ভারতের আইনের ছাত্রদের সঙ্গে পশ্চিমবঙ্গের আইনের ছাত্ররাও এগিয়ে এসেছেন। ১৯৬১ সালে যে এডভোকেট এ্যাক্ট সৃষ্টি হয়েছিল তা সম্পূর্ণ প্রতারণামূলক। সেই আইনের ফলে ছাত্রদের এডভোকেট হিসাবে তালিকাভুক্ত হবার জন্য চার বছর পড়তে হবে। প্রথম তিন বছর এল, এল, বি, পাশ করার জন্য, এর পরে আরও এক বছর ল কাউন্সিলের অধীনে আরও একটি পরীক্ষা দেবার জন্য।

বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ ছাত্রদের পুনরায় আর একটি বাইরের সংস্থা পরীক্ষা নেবে এটা কি রকম কথা? বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা যদি বাইরের কোন প্রতিষ্ঠানের স্বীকৃতিসাপেক্ষ হয়, তাহলে বিশ্ববিদ্যালয়ের মর্যাদাই বা কোথায় থাকে আর ডিগ্রীর মূল্যই বা কি থাকে? ল কাউন্সিল আইনজ্ঞদেরই প্রতিষ্ঠান। তাঁরা জেনে-শুনে এই রকম বেআইনী ব্যাপারে আছেন কেন? আর ১৯৬১ সালের আইনেই বা এই রকম বে-আইনী ব্যাপারের সুযোগ করে দেওয়া হল কেন?

এর উত্তরটা খুবই সহজ। আইনের রাজ্যে একটি কায়েমী স্বার্থ গড়ে উঠুক এটাই অনেকের মনোগত অভিপ্রায়। আইন ব্যবসার সঙ্গে সংশিলষ্ট ব্যক্তিদের নিজেদের পুত্রকন্যার জন্য পথ প্রশস্ত করা এবং অন্যান্যদের পথ সঙ্কুচিত করার জন্যই এই ব্যবস্থা। এই লাভজনক পেশার একটা গোষ্ঠীগত একচেটিয়াত্ব তাঁরা চান।

তাছাড়া ল কাউন্সিলের মেম্বাররা নিজেরাও সাধারণ ল গ্রাজুয়েট। তাঁদের কি অধিকার আছে অপর ল গ্রাজুয়েটদের পরীক্ষা নেবার? তাঁরা কি কেউ প্রমাণ করতে পারবেন যে, তাঁদের বিদ্যার বহরটা বেশি? কাগজে-কলমে তো সে কথা বলে না?

তদুপরি পাঠক্রমের সময় সম্বন্ধে ছাত্ররা যে দাবি তুলেছেন তা অতীব ন্যায়সঙ্গত। হায়ার সেকেন্ডারী পরীক্ষার পাঁচ বছর পরে যেখানে ইঞ্জিনীয়ার বা ডাক্তার হওয়া যায়, সেখানে আইন পাশ করতে সাত বছর সময় লাগবে কেন?

আশা করি আইনের ছাত্রদের এই ন্যায়সঙ্গত দাবিগুলি ভালভাবে মেনে নেওয়া হবে। কিন্তু যদি কর্তৃপক্ষ জল অধিকতর ঘোলা করতে চান তাহলে তার প্রতিক্রিয়া মোটেই ভাল হবে না, এ সাবধান বাণী উচ্চারণ করার সময় এসেছে।

১৭।৯।৬৬

ব্যবধান

অতুলরঞ্জন দেব

চিঠিখানা পড়ে টেবিলের ওপর রেখে দিলাম। সঙ্গে সঙ্গে মানসিক অবস্থাটা সম্পূর্ণ বদলে গেল। পিয়ন আসার আগে-পর্যন্তও ভাবতে পারি নি, এরকম একটা কঠিন পরীক্ষার সম্মুখীন হতে হবে আমাকে। কিংবা সুন্দর প্রস্তুতিটা শেষ পর্যন্ত বানচাল হওয়ার উপক্রম হবে। এ অবস্থায় কি করি, স্থির বুঝে উঠতে পারছি না। সিদ্ধান্তহীন একটা অস্বস্তি গলা পর্যন্ত বেয়ে উঠল। জটিলতার জালও বিস্তারিত হল। পায়চারি করতে লাগলাম। চিঠির সূত্র ধরে একসময় পাঁচ বছর আগের স্মৃতির সেই উৎসমুখে ফিরে গেলাম। স্মৃতি-সমুদ্রে নেয়ে যদি কিছুটা শান্তি পেতে পারি—

তখন শরৎকাল। সুরমা মেলে রওনা হয়ে কুলাউড়া পেঁছে যখন নির্দিষ্ট ট্রেনখানি ধরলাম, তখন বেশ ফর্সা হয়ে গেছে। ভোরের সতেজ আমেজে এবার চতুর্দিকে দৃষ্টি ফেরালাম। লাইনের দু-ধারে যতোদূর চোখ যায়, ক্ষেত-খামার, গ্রাম-মাঠের বিচ্ছিন্ন ছড়াছড়ি। ধানের শীষে শিশিরের সোহাগ। মাঠময় বাতাসের লুটোপুটি। সূর্যের কাঁচা আলোকে ভারি সজীব ও সুন্দর দেখাল দৃশ্যটা। এসব পেছনে ফেলে যেতে যেতে একসময় লাতু স্টেশনে এসে পেঁছিলাম। এটা পাকিস্তানের সর্বশেষ স্টেশন। ভিসা-পাসপোর্ট ও মালপত্র চেকিং-এর পর আমরা সীমান্ত পাড়ির অনুমতি পেলাম। তারপর ঘণ্টাখানেক চলার পর গাড়িখানা আবার এসে থামল। সাইনবোর্ডের দিকে তাকালাম—ভারতের সর্বশেষ স্টেশন মহীষাশন। এখানেও যথারীতি চেকিং-এর কাজ শেষ হল। পরের স্টেশন করিমগঞ্জে এসে যখন পেঁছিলাম, তখন বেলা প্রায় একটার কাছাকাছি।

আসাম সীমান্তে এই একখানা পাকিস্তানী গাড়িই যাত্রী নিয়ে ভারতের করিমগঞ্জ পর্যন্ত যাতায়াত করে। তা-ও দিনে মাত্র একবার। শুনলাম—গাড়িখানা নাকি আজ লেট করে এসেছে। মিনিট পনেরো বাদেই আবার ছেড়ে দেবে।

যাত্রীরা তাড়াহুড়া করে নামতে লাগল। আমি কিন্তু ধীরে-সুস্থেই প্ল্যাটফর্মে নামলাম। এটাই আমার শেষ স্টেশন। ভারতের ইটরঙের গাড়িগুলির মাঝখানে সবুজ রঙের পাকিস্তানী গাড়িখানাকে ভারি সুন্দর দেখাল। ভিড়ের ভেতর উদ্‌গ্রীব হয়ে এদিক-ওদিক তাকালাম। কিন্তু সৌমেনকে কোথাও দেখতে পেলাম না। তাহলে কি সে আমার টেলিগ্রাম পায় নি? কিন্তু চিঠি? চিঠিতেও তো তারিখটা আগেভাগে জানিয়েছিলাম। তবে কি সে আমাকে চিনতে পারে নি? এবং আমিও তাকে?

সৌমেন আমার পেন-ফ্রেন্ড। চাক্ষুষ পরিচয়ের সুযোগ এদ্দিন ঘটে নি। এই প্রথম। ফটো মারফৎ একে অন্যকে দেখেছি। চিঠি মারফৎ ঘনিষ্ঠভাবে জেনেছি। বন্ধুত্বের বাঁধনে জড়িয়ে গেছি। কোন একটা ছুটি-ছাটাতে একবার বেড়িয়ে যাওয়ার জন্যে অনেকবার সে আমাকে অনুরোধ জানিয়েছে। এবারের পুজোর ছুটিতে তার নিমন্ত্রণটা কোনক্রমেই উপেক্ষা করা গেল না।

আমি এলে নাকি সে পরেরবার আমাদের ওখানে যাবে। এই অঞ্চলে এই প্রথম আসছি। তাই সৌমেন স্টেশনে উপস্থিত থাকবে লিখেছিল।

শেষবারের মত চতুর্দিক ভালো করে আবার দেখে নিয়ে স্যুটকেস হাতে গেট পার হলাম। একখানা রিক্সা ডাকলাম—আজাদ সাগর রোডে যাব। সেখানে গিয়ে আশেপাশে জিজ্ঞাসাবাদ করে সৌমেনের

বাসার হদিস পেলাম। কড়া নাড়লাম। দরজা খুলে যেতেই একজন তরুণীর মুখোমুখি হলাম। চোখাচোখি হতেই চোখ নামিয়ে সন্দেহ দূর করার উদ্দেশ্যে বললাম—'এটা সৌমেনের বাসা, না?'

—'হ্যাঁ। আপনি ঢাকা থেকে এসেছেন বুঝি?'

—'হ্যাঁ।'

—'আসুন। বসুন। তা—দাদার সঙ্গে দেখা হয় নি বুঝি?'

—'ও স্টেশনে গিয়েছিল নাকি?'

—'হ্যাঁ। আপনাকে তাহলে চিনতে পারে নি। আমাদের যে ফটো আপনি দিয়েছেন, নিশ্চয়ই তা বেশ আগের তোলা। সেই ফটো দেখে আপনাকে ঝট করে চেনাও মুস্কিল। দাদাও তার দেওয়া ফটোর চাইতে খানিকটা মুটিয়ে গেছে।'

—'গোলমালটা কোথায় হয়েছে বুঝতে পেরেছি। তাছাড়া স্টেশনে অত্যধিক ভিড়ও ছিল। এতোক্ষণে হয়তো ফাঁকা হয়ে গেছে। সে-ও ফিরে আসছে।'

—'তাহলে দাদা এখন আসবে না। বাসায় বলে গেছে—আপনি না এলে পাকিস্তানী গাড়িতে বাড়ি যাবে। মহীশাশন স্টেশনের কাছেই আমাদের বাড়ি।'

এ খবরে আমি মনে মনে খানিকটা অসন্তুষ্ট হলাম—এ আবার কেমনতরো ভদ্রতা হল! মুখে জিজ্ঞেস করলাম, 'কবে আসবে?'

—'সন্ধ্যের গাড়িতেই আবার ফিরে আসবে। একটা বিশেষ প্রয়োজনে বাড়িতে গেছে।'

—'অ।'

—'বন্ধুকে না পেয়ে মনটা আপনার খারাপ হয়ে গেছে দেখছি। মাত্র কয়েক-ঘণ্টার ব্যাপার। আমাদের সঙ্গে না হয় গল্প-স্বল্প করে কাটিয়ে দেবেন।'

—'আমার জন্যে মিছিমিছি ব্যস্ত হবেন না। শিলচর রোডে আমার এক আত্মীয়ের বাসা আছে। আমি এখন সেখানেই যাই। পরে বরং আপনাদের এখানে আসব।'

প্রত্যুত্তরটা বড় আন্তরিকতাময়।

—'আপনি আমার দাদার বন্ধু। আমাকে "আপনি" বলছেন কেন? "তুমি" বলবেন। মানসী বলে ডাকবেন।'

স্ট্রেট ফরোয়ার্ড মেয়ে! আমি স্বভাবত অপ্রস্তুত হলাম। বললাম, 'প্রথম আলাপ কিনা, তাই—'

—'এটা কোন সমস্যাই নয়।'

—'আচ্ছা, "তুমি"-ই বলব। সৌমেন এলে বলবে, আমি সাতের-পাঁচ শিলচর রোডে গিয়েছি।'

—'তা হয় না, শেখরদা। এ অবস্থায় আপনি গেলে গোটা দোষটা আমার ঘাড়ে এসে পড়বে। কেন না, আমার সঙ্গেই আপনার প্রথম দেখা হয়েছে।'

বুদ্ধিমতী মেয়ে মানসী। মিশুকও বটে। জব্দ করার কলা-কৌশলও জানে। সহজেই সহজ হয়ে গেল। আমি তবু ইতস্তত করতে লাগলাম। ও আমাকে আর কথা বলার সুযোগ দিল না। বলল, 'জামা-কাপড় পালটে নিন। আমি এক্ষুণি চা নিয়ে আসছি।'

কিছুক্ষণ বাদে চা নিয়ে এল। আপত্তি থাকা সত্ত্বেও চান-টান করে শেষ-পর্যন্ত ভাত খেতে বসতে হল। আয়োজনের বহর দেখে বুঝে নিলাম প্রস্তুতিটা আগেরই।

আহারের পর্ব শেষ করে আমি আমার জন্যে নির্দিষ্ট-করা ঘরটায় এলাম। বেশ রুচিসম্মত ঘরের চেহারা। পরিপাটি বিছানা। বিছানার কাছেই একখানা মাঝারি গোছের টেবিল। টেবিলের একপাশে প্লেটে-ঢাকা এক গ্লাস পানীয় জল। তার কাছে একটি রেকাবিতে কয়েকটা পানের খিলি, মৌরি-মসলা-চূর্ণ ইত্যাদি সুন্দরভাবে সাজানো। অন্য পাশে কয়েকখানা দেশী-বিদেশী সাহিত্য-পত্রিকা। একখানা পত্রিকা তুলে নিয়ে বিছানায় শুয়ে উলটে-পালটে দেখতে লাগলাম। হঠাৎ পর্দার ফাঁকে একখানা কচি মুখের সাক্ষাৎ পেলাম। কাছে ডাকতেই মুচকি হেসে দূরে সরে গেল। সঙ্গে সঙ্গে অন্য ঘর থেকে মানসীর গলা শুনতে পেলাম, 'যা' না! এমন করছিস কেন?'

ও তবুও এল না। আমার সঙ্গে যেন লুকোচুরি খেলা সুরু করল—আস্তে আস্তে পর্দাটা ফাঁক করে চোখাচোখি হতেই আবার টেনে দেয়। এভাবে পর্যায়-ক্রমে কয়েকবার চলতে থাকলে হাতের ইশারায় আবার ওকে ডাকলাম। এইবার আস্তে আস্তে কাছে এল। জিজ্ঞেস করলাম, 'নাম কি?'

—'তপতী।'

—'ভারি সুন্দর নাম তো! কোন্ ক্লাসে পড়?'

—'ক্লাস থ্রি-তে।'

—'তাহলে তো তুমি একজন ভালো ছাত্রীও।'

এ কথায় তপতী ঈষৎ রাঙা হয়ে উঠল। তার লজ্জা কাটানোর জন্যে এলোপাতাড়ি কথাবার্তা আরম্ভ করলাম। জানলাম, তারা দুই ভাই, দুই বোন—সৌমেন, মানসী, সুমন ও তপতী। একসময়ে তপতী সহজ হয়ে উঠল। আমাকে প্রশ্ন করে করে কচিমনের কৌতূহল মেটাতে লাগল। আমিও ধৈর্য ধরে উত্তর দিতে লাগলাম। ওর বিচিত্র ধরণের বিচিত্র কৌতূহল। হঠাৎ জিজ্ঞেস করলে, 'ঢাকায় নাচ-গানের স্কুল আছে?'

—'এখানে আছে বুঝি?'

ও উল্লসিত হয়ে বললে, 'আছে। আমি ভর্তি হয়েছি।'

—'ক'টা?'

—'একটা। ছন্দভারতী।'

—'আমাদের ওখানে একটা নয়। অনেকগুলো আছে।'

খানিকটা অবিশ্বাসভরা দৃষ্টি মেলে ও আমার দিকে তাকাল। মনে মনে কি যেন চিন্তাও করল। বলল, 'তাহলে ঢাকা কি এই করিমগঞ্জের চেয়েও বড়?'

—'অ-নে-ক বড়। আরো বড় হও। তোমাকে নিয়ে যাব। সব দেখতে পাবে।'

—'ঠিক নেবেন?'

—'নিশ্চয়ই।'

—'ততোদিনে আমিও অনেক নাচ-গান শিখে ফেলব।'

—'তখন আরো বেশি মজা হবে—তাই না? এখন বরং একটা গান কর—শুনি।'

—'ও-মা! আমি কি আর তেমন শিখেছি।'

—'যা শিখেছ তা-তেই হবে।'

—'না। দিদিও আমার গান শুনে হাসে। আপনিও হাসবেন।'

—'মোটেই না। তুমি আরম্ভ কর।'

কিছুক্ষণ সাধাসাধি করে রাজী করালাম। বিকেলবেলাটা ভালোই কাটল।

সন্ধ্যের পর সৌমেন এল। আমার সেই আত্মীয়ের বাসায় আর গিয়ে থাকা হল না। যে ক'দিন ছিলাম, ওদের বাসায়ই কাটালাম। ওই ক'দিনেই ওদের পরিবারের সকলের সঙ্গে খাপ খেয়ে গিয়েছিলাম। সৌমেন কোন কাজে বাইরে গেলে মানসী এসে গল্প করছে। নির্জনতার বড় ফাঁকটাই তপতী ভরে ভরে রেখেছিল। একদিনের কথা বিশেষ করে মনে পড়ছে। সন্ধ্যের পর মানসী জ্যামিতির এগারো নম্বর উপপাদ্যটা মুখস্থ করছে। ওর মুখস্থের ধরনটা জ্যামিতি শেখার পক্ষে মোটেই অনুকূল ছিল না। তাই সহ্য করতে না পেরে কাছে ডাকলাম। বললাম, 'ওরকম করে জ্যামিতি তুমি কোনকালেই শিখতে পারবে না মানসী।'

এ ধরনের মন্তব্যে মানসী অপ্রস্তুত হল। লজ্জারাঙা হয়ে উঠল। কোন কথা বললে না। চোখ নামিয়ে দাঁড়িয়ে রইল।

মাসীমা এগিয়ে এলেন। বললেন, 'লজ্জার কি আছে, মানসী? শেখর যে ক'দিন আছে, ওর কাছ থেকে সব বুঝে-সুজে নে।'

এরকম একটা অনুমতি পাওয়ার বাসনা ক'দিন ধরেই আমার মনে উঁকি মারছিল। সময় কাটানোর স্বাদটাও বদলাল। তারপর যে ক'দিন ছিলাম, মানসীর

প্রয়োজনের দিনে সেরা বন্ধু

যে কোনো ব্যথা বা শারীরিক অস্বাচ্ছন্দ্য আমরা আমাদের সমস্যা বলে মনে করি... কি করে আমরা আপনার সাহায্য করতে পারি দেখুন!

রিসার্চঃ আমি 'অ্যাস্প্রো' রিসার্চ ইন্সটিটিউটের একজন। আমাদের কাজই হচ্ছে ব্যথা বা অস্বাচ্ছন্দ্য দূর করার নতুন নতুন পন্থা উদ্ভাবন করা। সারা পৃথিবীতে যে সব ইন্সটিটিউট এই রিসার্চে নিয়োজিত আছে আমরা তাদের মধ্যে অগ্রগণ্য। আমরা স্থির জানি যে ব্যথা বা শারীরিক অস্বাচ্ছন্দ্য দূর করার সর্বাধুনিক উপায় 'অ্যাস্প্রো' ফর্মূলাতেই পাওয়া যায়। তাই পৃথিবীর সর্বত্র বিভিন্ন হাসপাতালেও ডাক্তাররা 'অ্যাস্প্রো' ব্যবহার করে থাকেন।

শারীরিক বেদনার কি কারণ? আমাদের দেহতন্তুতে মেটাবলিক বস্তু জমা হ'য়ে নানা জায়গায় ফুলে ওঠে। নার্ভের ওপর চাপ পড়লে আমরা ব্যথা বা শারীরিক অস্বাচ্ছন্দ্য বোধ করি।

'অ্যাস্প্রো' কিভাবে কাজ করেঃ 'অ্যাস্প্রো' মুহূর্তের মধ্যে দেহের রক্ত চলাচলের সংগে মিশে যায়—ফোলা কমিয়ে—নার্ভের ওপর চাপ দূর করতে সাহায্য করে—শরীরের অস্বাচ্ছন্দ্য দূর করে।

কখন 'অ্যাস্প্রো' গ্রহণ করবেনঃ ব্যথা-বেদনা • মাথাধরা • গা-ব্যথা • দাঁত ব্যথা • গাঁটে ব্যথা • গা-জর জর • ফ্লু • ডেঙ্গু জরে 'অ্যাস্প্রো' গ্রহণ করতে পারেন।

মাত্রাঃ বয়স্কঃ দুইটি বড়ি। আবশ্যক হলে আবার গ্রহণ করা উচিত।

শিশুঃ একটি বড়ি অথবা ডাক্তার অনুমোদিত মাত্রা।

'অ্যাস্প্রো'

ব্যথা-বেদনা দূর করে নেয়

A.G.32.66. BEN

অবসর আকাঙ্ক্ষায়

মনোরমা সিংহরায়

ছোট গৃহ ছোট সুখ তার বেশি কিছু কোনোদিন
চাই নি কখনো। সাজানো উজ্জ্বল ফ্ল্যাটে কেরিয়ার
দাস-দাসী মালী ঘেরা আরামের ধনীর জীবন
কোনোদিন কামনা ছিলো না। শুধু নিভৃত সংলাপ
ধূমায়িত চায়ের পেয়ালা আর হাসি অকারণ
চিরকাল কল্পনা করেছি। তবু হৃদয় তোমার
অবুঝ থেকেছে আর ধীরে ধীরে জীবনের তাপ
নিভেছে কখন। আশাহত মন বাসনার পার
চলে গেছে। হেমন্তের শেষ দিন কী উদাস গান
গেয়ে যায়। একটি একটি করে পাতা ঝরে যায়
আসে কিছু শীতের আভাস। সন্ধ্যা হলো, আলো জ্বেলে
সব কাজ শেষে বসে আছি আজ শুধু প্রতীক্ষায়
কাছে এসে ডাকবে কখন! কর্মব্যস্ত তুমি
এখনো কি হয় নি সময়? মনে হয় ভুলে গেলে?

পড়া দেখিয়ে দিয়েছি। ফলে মন দেয়া-নেয়ার অবাধ সুযোগও হাতে এসেছিল। সিনেমায় গিয়েছি। রাস্তায় ঘুরেছি। মুখোমুখি মাঠে বসে গল্পের পর গল্প করেছি। বাদাম চিবিয়েছি। দিনের আলো যখন মুছে গেছে, পাখিরা যখন নীড়ে ফিরেছে, তখনো আমরা নক্ষত্রখচিত আকাশের নীচে বসে থেকেছি। ভেবেছি, এভাবে যদি অনন্তকাল বসে থাকতে পারতাম! দু'টি বিপরীতধর্মী চুম্বক-শলাকা যেমন পাশাপাশি থাকলে পরস্পর আকর্ষণ না করে থাকতে পারে না, তেম্নি হয়েছিল আমার ও মানসীর অবস্থাটা। যৌবনের ধর্মানুযায়ী চোখেও রঙিন স্বপ্ন নামতে বিলম্ব হয় নি। প্রথম জোয়ার। ভালোবাসার জোয়ার। বড় মারাত্মক! হাতে হাত রেখে পরস্পরের প্রতিশ্রুতি। নীড় গড়ার প্রতিশ্রুতি। তবুও মানসী যেন সম্পূর্ণ নিশ্চিন্ত হতে পারে নি। বলেছিল, 'দু'জন দু'রাষ্ট্রে আছি। শুধু চিঠিপত্রেই বাঁচতে পারব না, শেখরদা। তোমাকে অন্তত বছরে একবার আসতে হবে।'

—'নিশ্চয়ই আসব। দীর্ঘ প্রতীক্ষার পর যে মিলন, সে-ই তো বেশি গভীর হবে মানসী।'

—'বুঝলাম। কিন্তু যেটা আমার কাছে দীর্ঘ, তোমার কাছে তা দীর্ঘ না-ও তো হতে পারে, শেখরদা।'

—'কী যে বলো মানসী! আমিও তো মানুষ! তোমাকে বেশিদিন না দেখে আমিও কি থাকতে পারব?'

শেষের এই দিনগুলি যেন একটু তাড়াতাড়ি কেটে গিয়েছিল। যেদিন ফিরব ঠিক করেছি, তার আগের দিন থেকেই তপতী আমার পিছু লেগে রইল। ওর একই কথা—'তুমি আরো কিছুদিন থেকে যাও, শেখরদা।'

যতো বোঝাতে চাই, চোখ দু'টি ওর ছলছল করে ওঠে। কণ্ঠরোধ হয়ে পড়ে। কাছে টেনে আদর করতেই চাপা-দেওয়া কান্নাটা ওর উথলে উঠল। আমার কোলে মুখ লুকাল। আমি মাথায় হাত বুলোতে বুলোতে প্রবোধ দিতে লাগলাম, 'কাঁদিস নে তপু। আমি আবার আসব। তোদের কথা কক্ষণো ভুলতে পারব না।'

প্রত্যুত্তরের পরিবর্তে তপতীর ফুঁপানোর মাত্রাটা আরো বেড়ে গেল। শেষ-পর্যন্ত মাসীমা মধ্যস্থতা করলেন, 'আরো একটা দিন থেকে যাও, বাবা। নাহলে তো তপুর কাণ্ডটা দেখতেই পাচ্ছ।'

অগত্যা থাকতে হল।

রওনা হওয়ার দিন সকাল থেকেই লক্ষ্য করলাম, মানসী তেমন কথাবার্তা বলতে পারছে না। চোখ দু'টি কেবল ছল-ছল করছে। একসময় কাছে এল। বলল, 'সব কথা যেন মনে থাকে, শেখরদা।'

—'তা আর বলতে মানসী!'

মানসী সুন্দর করে বাঁধা কাগজের একটা ছোট প্যাকেট আমার হাতে তুলে দিয়ে বললে, 'তুমি পান ভালোবাস। এতে কয়েকটা খিলি তৈরি করে দিয়েছি। যতোক্ষণ শেষ না হবে ততোক্ষণ অন্তত, ধরে নিতে পারি, আমার হাতের স্পর্শটা তুমি অনুভব করবে।'

—স্পর্শটা হৃদয়েই স্থায়ী হয়ে গেছে মানসী।'

মানসীর ঠোঁটে খানিকটা হাসির ঝিলিক দেখতে পেলাম।

যথাসময়ে বিদায় নিয়ে সৌমেনের সঙ্গে এসে রিক্সায় চাপলাম। এই প্রথম অনুভব করলাম, আমারও যেন কণ্ঠরোধ হয়ে আসছে। পেছন ফিরে একটিবার তাকালাম। দরজায় দাঁড়ানো সকলের মাঝে মানসীকেই বড় অশান্ত দেখাল। স্টেশনে পোঁছলাম। আবার সেই পাকিস্তানী গাড়িতে চড়লাম।

সৌমেনের কাছ থেকে বিদায় নিলাম।

তারপর দীর্ঘ পাঁচ বছর কেটে গেছে। কারো সঙ্গে আর কারো দেখা হয় নি। কেবল নিয়মিত পত্রালাপে পরস্পরের ভালোবাসাটা বাঁচিয়ে রাখছি। সেই মানসীর-ই এই চিঠি। চিঠিখানা টেবিলের ওপর থেকে আবার তুলে নিলাম। পড়লাম—

'শেখরদা,

আসবে-আসবে করে পাঁচ বছর কেটে গেল। এলে না! এবার কিন্তু আমি তোমার কোন অসুবিধার কথাই শুনব না। চিঠিখানা পেয়ে যেভাবেই হোক্ ক'দিনের জন্যে অন্তত এসো। না এলে বুঝব, তুমি আমাকে মিছিমিছি প্রতীক্ষায় বসিয়ে রেখেছ। এই আমার শেষ অনুরোধ।......

আমরা আগামী মাসে করিমগঞ্জ থেকে চলে যাচ্ছি। বাবা নেফাতে বদলি হয়েছেন। তখন কি আর দুরূহ জার্নি করে আমাদের দেখতে আসবে? সান্ত্বনা দিতে পার। কিন্তু 'এবার না এলে কিছুতেই কিছু বিশ্বাস করব না।'..............

উত্তরটা এখনই মানসীকে লিখতে হবে। প্যাড টেনে নিলাম। লিখলাম—

'মানসী,

তোমার চিঠির মর্যাদা রক্ষা করতে পারলে বড় রকমের একটা কাজ হত ঠিকই। কিন্তু আমার দুর্ভাগ্য, আমি নিরুপায়! আগামীকাল ভোরের প্লেনে আমি করাচি ফ্লাই করছি। সেখানে একটা ফরেন ফার্মে কেমিস্টের চাকরি পেয়েছি। এ ধরনের চাকরি সচরাচর ভাগ্যে জোটে না।

তুমি আমাকে ভুল বুঝ না, লক্ষ্মীটি! আমাদের দেখা একদিন না হয়েই পারে না এবং হবেও ঠিকই। পাক-ভারত উপমহাদেশের দুই প্রান্তে দু'জন ছিটকে পড়ছি বটে, তবে দূরত্বের এই ব্যবধান আমাদের মিলনের পবিত্র আকাঙ্ক্ষাকে কখনো ঠেকিয়ে রাখতে পারবে না।'......

চিঠিখানা খামে এঁটে মাধুকে ডাকলাম—'নে। এখানা এক্ষুণি জি, পি, ও-তে ফেলে দিয়ে আয়।' মাধু চলে গেলে ইজি-চেয়ারখানা বারান্দায় টেনে নিলাম। বসলাম। নিজেকে অনেকটা হাল্কা বোধ করব ভেবে আকাশের দিকে তাকালাম। সেখানেও আজ নীলের তেমন ঔজ্জ্বল্য নেই। বায়ুতাড়িত একখণ্ড মেঘের বিচিত্র লীলাখেলা চলছে। দৃশ্যটা দেখতে দেখতে হঠাৎ অনুভব করলাম, প্রাণটা যেন আবার কেঁদে উঠছে। একটা নতুন অস্বস্তিও রক্তের মধ্যে দানা বাঁধছে। আচমকা চেয়ার ছেড়ে উঠে পড়লাম। রাস্তায় দৃষ্টি যেতেই দেখতে পেলাম, মাধু তখন জি, পি, ও. থেকে ফিরে আসছে।

পুরুষ ও প্রকৃতি

আর্যভট্ট

দু'জনার নামের মধ্যে এক অপূর্ব মিল। একজনার নাম রীং আর অপরজনার নাম রুথ্। রীং হোলো পুরুষ আর রুথ হোলো প্রকৃতির প্রাণরূপা নারী।

একটা পাহাড়ীয়া পথ ধ'রে হেঁটে চলেছে ওরা। হাঁটছে অনেকক্ষণ ধ'রে। ভোর না হ'তেই বেরিয়ে পড়েছে বাড়ি থেকে। যেতে হবে অনেক অনেক দূর। হাঁটতে হবে অনেক অনেক পথ।

ওরা হাঁটছে আর মাঝে মাঝে চোখ তুলে তাকাচ্ছে চক্রবালের দিকে। প্রথম প্রভাতের তরুণ দিবাকর তখন তার আবিররাঙা রাগ ছড়িয়ে দিয়েছে পূর্বাচলে। একটি চমৎকার ভোর; একটি আনন্দের সকাল। এ লগ্নে এমন সময়ে প্রকৃতির কোলে নিজেকে তুলে ধরলে প্রাণে অফুরন্ত আনন্দের জোয়ার বয়ে যায়।

লম্বা লম্বা পা ফেলে পথ হেঁটে চলেছে রীং আর রুথ্ তাকে অনুসরণ করছে অতি কষ্টে নিচের ঠোঁটটা দাঁত দিয়ে কামড়ে ধ'রে।

কয়েক ক্রোশ পথ হাঁটা হয়ে গেছে এর মধ্যে। রুথের শরীরে এবার এসেছে অবসাদ, এসেছে ক্লান্তি। থেকে থেকে নাকি সুরে প্যান প্যান ক'রে অস্ফুট স্বরে কি উচ্চারণ করছে রুথ, কিন্তু চিৎকার করছে না। তবে এটুকু বোঝা যায় যে ও আর পথ চলতে পারছে না। তবু একটা অনমনীয় মন নিয়ে অক্লান্ত চিত্তে রীং-কে অনুসরণ ক'রে চলেছে।

হয়ত এতটা ক্লান্ত বোধ করত না রুথ্ এই পথ চলায়, যদি ওদের সঙ্গে কিছু পাথেয় থাকত। কিন্তু দুঃখের ব্যাপার যে ওদের দু'জনার অস্তিত্ব ছাড়া আর কোন সম্বল, কোন আহার্য বা পানীয় ছিল না ওদের সঙ্গে।

"এবার একটু বিশ্রাম করা দরকার... আর পারা যাচ্ছে না।" অকস্মাৎ বলে উঠল রীং রুথের দিকে পিছন না ফিরেই।

রুথ্ কোন উত্তর দিল না।

রীং-ও ব'সে পড়ল না। পথ চলতেই লাগলো। রুথ্-ও নিঃশব্দে অনুসরণ ক'রে চলল রীং-কে।

এবার ওরা পাহাড়ের অনেকখানি ওপরে উঠে এসেছে। সূর্যও তখন চক্রবাল থেকে আকাশের গা বেয়ে অনেক ঊর্ধ্বে এসে আসন গেড়েছে।

রীং আর রুথ্ পাশাপাশি দাঁড়িয়ে একবার তাকালো সূর্যের দিকে। মনে হোলো ওরা যেন সূর্যের ঠিক মুখোমুখি এসে দাঁড়িয়েছে।

একটু দূরেই একটা সমতলভূমি; প্রায় উপত্যকারই মত।

বেশ কিছু চাষের জমি দেখতে পেলো ওরা সেখানে, আর কয়েকখানা বাড়ি। ঠিক বাড়ি নয়, গৃহই বলা চলে।

সব থেকে কাছের বাড়িটার চিমনী থেকে ধোঁয়া উঠছে দেখলো ওরা।

রুথ্ একবার তাকালো রীং-এর দিকে।

সূর্য তখন আগের চেয়ে অনেক প্রখর হয়ে উঠেছে। "প্রথম বাড়িটাতে গেলেই আমরা নিশ্চয়ই কিছু না কিছু খেতে পাব।" বলে উঠল রুথ্। বলেই রীং-এর মুখ থেকে কিছু শোনার প্রতীক্ষায় রইল।

কিন্তু রীং কোন উত্তরই দিল না।

রুথ্ আবার বলে উঠল, "প্রথম বাড়িটায় নিশ্চয়ই আমরা কিছু খেতে পাব... নিশ্চয়ই।"

রীং এবারও নিরুত্তর।

"যাই হোক, চেষ্টা করেই দেখা যাক কি হয়।" বলল রুথ্ অন্য দিকে তাকিয়ে।

এবার রীং তাকালো রুথের দিকে। দেখলো ওর মুখটা ফ্যাকাসে হয়ে গেছে। গাল দুটো যেন অনেকখানি ভেঙে পড়েছে।

কোন কথা বলল না রীং। ধীর পদক্ষেপে এগিয়ে চলতে আরম্ভ করল উপত্যকার দিকে সেই প্রথম বাড়িটার উদ্দেশে।

বাড়ির প্রায় সামনাসামনি এসে থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল রীং। চিমনী থেকে ধোঁয়া উঠে সেগুলো তখন আকাশখণ্ডে গা ভাসাবার জন্যে ক্রমশ ওপর দিকে ছুটে চলেছে।

পাশে এসে দাঁড়ালো রুথ্। বলল রীং-এর দিকে তাকিয়ে, "তুমি এখানে ব'সে একটু বিশ্রাম কর রীং, আমি বাড়ির ভেতর যাই, দেখি কি পাওয়া যায়।

রুথের কথার উত্তরে কিছু বলবার চেষ্টা করল রীং, কিন্তু পারল না। গলাটা শুকিয়ে গিয়ে যেন শ্বাসরোধ হ'য়ে আসবার উপক্রম হোলো।

বাড়িটার চিমনী থেকে অনর্গল ধোঁয়া উঠে চলেছে। প্রত্যেক জানালায় পরদা

টাঙানো, কিন্তু বাড়ির কোন কোন জায়গায় একটু জীর্ণতার ভাব দেখা দিয়েছে।

সম্পূর্ণ একজন ভিন্‌দেশী পান্থের মত বাড়িটার দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে থেকে ব'সে রইল রীং।

ফটক ঠেলে বাড়ির অঞ্চলের মধ্যে ঢুকেই ঠিক রান্নাঘরের সামনে দাঁড়িয়ে পড়ল রুথ্। তারপর পিছন দিকে তাকিয়ে দেখলো রীং ঠিক নিজের জায়গায় বসে বিশ্রাম করছে।

জানালার একটা পরদা তুলে তখন ওদের দু'জনকেই নজর করছে একজন বাড়ির ভেতর থেকে।

"কড়া নাড়ো না" সজোরে বলে উঠল রীং দূর থেকে।

রীং-এর কথামত রুথ্ কড়া ধরে নাড়লো। সঙ্গে সঙ্গে বাড়ির রান্নাঘরের দরজা খুলে উঁকি মেরে মুখ বাড়ালো একজন মধ্যবয়সী মহিলা।

"চলে যাও!" সঙ্গে সঙ্গে বলে উঠল সেই মহিলা রুথকে দেখার সঙ্গে সঙ্গে।

রুথ্ বলল, "দেখুন আপনাকে আমি বিশেষ বিরক্ত করতে আসি নি। একটু খাবার চাই। এর বেশি আর কিছুই নয়। আমরা দু'জনে আজ কিছুই খাই নি। খাবার জোটে নি। যদি কিছু খেতে দেন তবে প্রাণটা বাঁচে। দুটো আলু, দু'খানা পোড়া রুটি। এর বেশি আর কিছু চাই না। দেবেন?"

"আমি বুঝতে পারছি না, তোমরা এখানে কি করতে এসেছ! কি উদ্দেশ্য তোমাদের! আমি অবাক হচ্ছি! যাই হোক! আমি চাই না যে কোন অপরিচিত লোক আমার বাড়ির দরজায় আসুক। তুমি চলে যাও! আমায় বিরক্ত কোরো না।" বলল মহিলাটি। বলেই দরজা প্রায় বন্ধ করে দিল রুথের নাকের ওপর।

পরমুহূর্তেই কি চিন্তা করে আবার দরজা একটু ফাঁক ক'রে রুথের মুখের ওপর চোখ রেখে বলে উঠল, "আমি শুধু তোমাকে খেতে দিতে পারি। তোমাদের দু'জনার খাবারের মত জোগাড় আমার কাছে নেই। এবার রাজী থাক ত' এসো।"

রুথ্ ঘাড় ফিরিয়ে তাকালো রীং-এর দিকে। রীং তাড়াতাড়ি এগিয়ে এলো।

রুথ্ বলল, "চল অন্য কোথাও চেষ্টা করা যাক!"

"কেন এখানে হবে না?"

"হবে, কিন্তু তোমাকে খেতে দিতে পারবে না।"

"শুধু তোমাকে?"

"হ্যাঁ!"

"ঠিক আছে! তাই খেয়ে নাও। পরে যা হয় দেখা যাবে!"

"না, তা কি করে হয়?"

"হয়. আমি বলছি তুমি এ বাড়িতে খেয়ে নাও, পরের বাড়িটায় আমি চেষ্টা করব।"

রুথ্ তবু নড়বার চেষ্টা করল না। রীং-কে ছেড়ে একা ওবাড়িতে ঢুকে খাবার খেতে ওর মন একেবারেই সায় দিল না।

এদিকে মহিলাটি দরজা ফাঁক করে দাঁড়িয়ে রইল রুথের প্রতীক্ষায়।

রীং বলল, "যাও, রুথ্ তুমি কি বোকা! যাও! যা পাও খেয়ে এসো। আমার জন্যে ভেবো না। আমি আর একটা বাড়িতে ঠিক খেয়ে নেব। তুমি যা সুযোগ পেয়েছ ছেড়ো না! যাও। আমি তোমার জন্যে এখানে বসে রইলাম। যাও! শীগ্‌গির যাও।" বলেই রীং গাছের তলায় একটা বেঞ্চিতে ব'সে পড়ল।

রুথ্ রীং-এর কথায় আর কোন প্রতিবাদ না করে বাড়ির ভেতরে গিয়ে ঢুকলো।

মহিলাটি টেবিলের পাশে একটা চেয়ারে বসতে নির্দেশ করল।

রুথ্ মহিলার কথামত আসন গ্রহণ করল। সঙ্গে সঙ্গে এক ডিস আলু ভাজা, বেশ কয়েক পিস্ রুটি, আর কিছু বিস্কুট এসে হাজির হোলো রুথের সামনে। তারপর মহিলাটি নিজের হাতে এক কাপ গরম কফি এনে ধরল টেবিলের ওপর।

রুথ্ খেতে আরম্ভ করল। ওর খাওয়া দেখলে মনে হবে যেন অনেকদিন কিছু খায় নি। রুটি আর আলু চিবোতে আরম্ভ করল ঠিক একটা ক্ষুধার্ত ভিখারিণীর মত। মাঝে মাঝে কফির কাপে চুমুক দিচ্ছে, আর সঙ্কোচে তাকাচ্ছে মহিলার দিকে।

মহিলাটি তখন দরজার কাছে এমন একটা জায়গায় দাঁড়িয়ে আছে যেখান থেকে রুথ্ এবং রীং দু'জনকেই ঠিক নজরে রাখতে পারবে।

রুথ্ মহিলার নজরকে দু'-দুবার ফাঁকি দিয়ে ব্লাউজের ভেতর কয়েক পিস্ রুটি আর স্কার্ট-এর পকেটে কিছু আলুভাজা লুকিয়ে ফেলল।

মহিলার নজর ছিল তখন বাড়ির বাইরে রীং-এর দিকে। রীং-এর ওপর থেকে নজর ফিরিয়ে নিয়ে মহিলা রুথের দিকে একটু সন্দেহের চোখে তাকালো।

একটু পরেই বলল, "অনেক দূরে যাচ্ছ?"

"হ্যাঁ!" বলল রুথ্।

"আসছও বোধ হয় অনেক দূরে থেকে?"

"হ্যাঁ!"

"ঐ লোকটা তোমার সঙ্গে কে?"

"আমার স্বামী!"

রুথের কথা শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গে মহিলা বাড়ির বাইরে রীং-এর দিকে দৃষ্টিনিক্ষেপ ক'রে পরমুহূর্তেই আবার সেই দৃষ্টি ফিরিয়ে নিয়ে এলো রুথের ওপর। কিছুক্ষণ আর কোন কথা বলল না মহিলাটি।

ইত্যবসরে রুথ আর একবার কয়েক পিস আলু নিজের স্কার্টের পকেটে লুকোবার চেষ্টা করল কিন্তু পারল না। কেন না মহিলাটি তখন ওর ওপর একটা গভীর সন্দেহের দৃষ্টি নিয়ে তাকিয়ে আছে। "আমার মনে হয় না যে ঐ লোকটা তোমার স্বামী।" অকস্মাৎ বলে উঠল মহিলাটি রুথের দিকে তাকিয়ে থেকে।

রুথ বলল, "হ্যাঁ ও আমার স্বামী... আমার স্বামী।" আপনি ভুল বলছেন।

"তাই যদি হয় তবে তোমাকে দরজায় দরজায় পেটের জন্যে ভিক্ষে চেয়ে বেড়াতে হচ্ছে কেন? স্বামী হলে সে কি তার স্ত্রীকে দিয়ে এরকম ভিক্ষে মাগিয়ে বেড়ায়? এ আবার কি রকম স্বামী?" বলল মহিলাটি অত্যন্ত ঘৃণাপূর্ণ কণ্ঠে রুথের দিকে চেয়ে।

রুথ বলল, "আমার স্বামী অসুস্থ। প্রায় মাসখানেক বিছানায় শুয়েছিল। এই সবে পথ্যি করেছে। কাজ করত। এখন কাজ নেই।"

"বেশ ত' কাজ নেই যখন বাড়িতে থাকলেই ত' পারতে। বাড়ি থেকে বেরিয়ে এরকম ভবঘুরেমি করে দরজায় দরজায় ভিক্ষে মেগে কাজ কি? একটা কাজ না হয় গেছে, তাই বলে আর কি কোন কাজ নেই সংসারে। আমার মনে হয় ঐ লোকটা কোন কাজই করতে চায় না। তোমাকে দিয়ে ভিখ্ মাগিয়ে খেতে চায়।"

রুথের হাতে এক পিস্ রুটি ছিল। সেটা ও মুখে দিতে যাচ্ছিল। কিন্তু মহিলার কথায় সেটা ওর আর খাওয়া হোলো না। রুটিটা ডিসে ফেলে রেখে উঠে দাঁড়ালো রুথ। বল, "আপনি যে-আমাকে খেতে দিয়েছেন তার জন্যে অশেষ ধন্যবাদ আপনাকে। এবার আমি চললাম।"

"তুমি যদি আমার কথা শোন তবে ঐ লোকটাকে তোমার আজই ছেড়ে দেওয়া উচিত। কেন না ও কাজ করে খেতে চায় না। ওকে যদি না ছাড় তোমার দুঃখের অন্ত নেই।"

"আপনি বিশ্বাস করুন ওর কাজ ছিল। অসুখে পড়ে কাজটা গেছে।" বলল রুথ প্রায় কাঁদ কাঁদ হয়ে।

মহিলাটি বলল, "তোমার কথা আমি বিশ্বাস করি না। কোন সাহসে তুমি লোকটার হয়ে মিথ্যে কথা বলছ?"

কোন কথা না বলে দরজার কাছে এগিয়ে গেল রুথ। নিজের হাতেই

দরজা ঠেলে বারান্দায় বেরিয়ে এলো। তার পর একবার চোখ তুলে তাকালো অতিথিসেবিকার দিকে।

মহিলাটিও সঙ্গে সঙ্গে বেরিয়ে এলো বারান্দায়। শেষ বারের মত বলল রুথের চোখের ওপর চোখ রেখে, "আচ্ছা তোমার কথাই না হয় মেনে নিলাম! তুমি বলছ তোমার স্বামী অসুখে পড়েছিল, তাই ওর কাজ গেছে। বেশ ত' কাজ গেছে আবার কাজ জোটাবে। তা না জুটিয়ে, পেটের জোগাড় না করে দু'জনে মিলে জোড় বেঁধে ভবঘুরের মত দরজায় দরজায় ভিখ্ মেগে বেড়ানোর দরকার কি বলতে পার?"

রুথ দেখল রীং গাছতলায় বেঞ্চিতে চুপ করে বসে আছে। মহিলাটির এই রূঢ় কথার কোন জবাব দেবার ইচ্ছা হোলো না রুথের। কিন্তু শেষ পর্যন্ত কিছু না বলেও থাকতে পারল না।

বলল, "দেখুন, আপনি আমাদের ভুল বুঝবেন না। আমরা এরকমভাবে বেরিয়েছি কেন জানেন?"

"কেন বলত?" একটা কঠোর দৃষ্টি নিয়ে বলল মহিলাটি।

রুথ বলল, "আমার স্বামী যখন......"

"আহা স্বামী! আর স্বামী বলতে হবে না। কি আমার স্বামী রে! ঠিক আছে, কি বলবে তাড়াতাড়ি বলে ফেল।"

"বলছিলাম যে আমার স্বামী যখন......"

"আবার স্বামী স্বামী করছ? কোত্থেকে একটা মন্দাকে ধরে এনে এখানে স্বামী ফলানো হচ্ছে।"

"বিশ্বাস করুন ও আমার স্বামী।"

"স্বামী না ছাই! স্বামীই যদি হবে তবে তোমায় ভিখ্ মাগতে পাঠিয়েছে কেন এখানে? রোজগার করে খাওয়াতে পারে না। কোন স্বামী আবার নিজের বউকে দরজায় দরজায় পেটের জন্যে ভিখ্ মাগতে পাঠায়? আমাদেরও ত' স্বামী আছে। কই কোথাও যাচ্ছি না ভিক্ষে করতে?"

রুথের চোখ দুটো এবার ছল ছল হয়ে উঠল। বলল, "বিশ্বাস করুন ও আমার স্বামী।"

"ঠিক আছে স্বামীই ধরে নিলাম। এবার কি বলবার বল শিগ্গির, আমি দাঁড়াতে পারব না।"

রুথ বলল, "আমার স্বামী যখন প্রথম অসুখে পড়ে তখন আমার কোলের বাচ্ছা মেয়েটাকে আমার বোনের কাছে পাঠিয়ে দিই। কাল বোনের চিঠি পেলাম। চিঠিতে জানলাম আমার মেয়েটি মারা গেছে। এখন তার কবর দেখতে চলেছি, সেখানে কিছু ফুল দেব বলে।"

"ফুল? ফুল দেবে কোত্থেকে? পয়সা কোথায়?"

রুথ "পয়সা আছে?"

"ফুল আমার বোন কিনে দেবে।"

"কেন? বোন দেবে কেন? নিজেদের পয়সা জোটে না? মরণ আর কি? গলায় দড়ি জোটে না!"

রুথ আর কোন জবাব দিল না মহিলাটির এই কথায়। দৌড়ে চলে গেল রীং-এর কাছে।

রীং উঠে দাঁড়ালো। তার পর দু'জনাই পথ চলতে আরম্ভ করল ঠিক আগের মত।

কিছুদূর গিয়েই রুথ ফিরে তাকালো সেই বাড়িটার দিকে। কিন্তু সেই মহিলাটিকে দেখতে পেলো না।

ব্লাউজের ভেতর থেকে রুটি আর স্কার্টের পকেট থেকে আলু ভাজা বের করে রুথ তুলে ধরল রীং-এর সামনে।

রীং বলল, "এ কি?"

"তোমার জন্যে এনেছি!" বলল রুথ সজল করুণ দৃষ্টিতে রীং-এর দিকে চেয়ে।

রীং বলল, "আমার জন্যে?"

"হ্যাঁ তোমার জন্যে?"

"নিজে না খেয়ে?"

"আমি খেয়েছি। এগুলো তোমার জন্যে।"

"না খাও নি!"

"হ্যাঁ খেয়েছি রীং বিশ্বাস কর।"

"বিশ্বাস আমি করতে পারছি না রুথ। নিশ্চয়ই তুমি না খেয়ে আমার জন্যে নিয়ে এসেছ।"

"তাই যদি এনে থাকি তাতে কি হয়েছে?"

"কিছু হয় নি! তবে এটাও ত' ঠিক যে তুমি না খেয়ে থাকবে আর আমি খাব! এটাও ত' ঠিক নয়?"

"তা ঠিক নয় ঠিকই। তবে আমি চাই না যে তুমি না খেয়ে থাক।"

"আমিও চাই না যে তুমি না খেয়ে থাক।"

"তা হলে তুমি খেয়েছ?"

"হ্যাঁ খেয়েছি!"

"তোমার পেট ভরেছে?" জিজ্ঞাসা করল রুথ রীং-এর দিকে চেয়ে।

"রীং বলল, হ্যাঁ ভরেছে!"

কিছুক্ষণ দু'জনাই নির্বাক।

রীং প্রথমে বলে উঠল, "ছি রুথ এগুলো আমার জন্যে না এনে নিজেই ত' খেয়ে নিলে পারতে!"

রুথ বলল, "তাও কি হয়? তুমি না খেয়ে থাকবে আর আমি খাব? অসম্ভব রীং। তুমি আমার আত্মা, তুমি আমার প্রাণ। তুমি বেঁচে আছ তাই আমিও বেঁচে আছি। কাজেই তোমার জীবন রক্ষে না করে ত' আমি আমার নিজের জীবনের দিকে তাকাতে পারি না। এ আমার ধর্ম! তুমি পুরুষ, আর আমি নারী। যে ভাবেই হোক তোমাকে আমার বাঁচিয়ে রাখতেই হবে। এইটেই নারীর ধর্ম। আমি ত' কোন অন্যায় করি নি রীং।"

রীং নিরুত্তর।

আবার পথ চলতে আরম্ভ করল দু'জনে। সামনে রীং। আর পিছনে পুরুষের সহচরী পিরীতিপরায়ণা প্রাণাধিকা রাধিকা রুথ।

EARSCKINE CALDWELL-এর 'MAN AND WOMAN' গল্পের অনুবাদ)।

বিশ্ব-সাহিত্যে বসুমতীর অমর অবদান

শ্রীঅরবিন্দের

ANANDAMATH

ঋষি বঙ্কিমচন্দ্রের অমর আনন্দমঠের অমর ইংরাজী অনুবাদ

- আনন্দমঠে—স্বাধীনতার সক্রিয় সংগ্রামের পূর্ব্বাভাষ।
- আনন্দমঠে—'বন্দেমাতরম' মন্ত্রের পূত-প্রকাশ।
- আনন্দমঠে—ঋষি বঙ্কিম ও ঋষি অরবিন্দের আদর্শ সমন্বয়।

আনন্দমঠের এই মহামন্ত্রের অর্দ্ধশতাব্দীর সাধনে ভারতের স্বাধীনতা অর্জ্জিত

ভারতের প্রতি গৃহে এই পবিত্র গ্রন্থ শোভা পাউক

দাম—তিন টাকা

বসুমতী প্রাইভেট লিমিটেড

১৬৬, বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১২

অস্ট্রেলিয়া থেকে লিখছি

সুরেশ চন্দ্র সাহা

॥ বারোসার জার্মান কলোনী ॥

ওয়ালাংগায় বাদামের বনে ঘুরতে ঘুরতে পরলোকগত শাস্ত্রীজীর কথা বার বার মনে পড়ল, বিশেষ করে তাঁর প্রধানমন্ত্রী হওয়ার দিনের কথা। রোজকার মত সেদিনও তিনি দড়ির খাটিয়ায় শুয়েছিলেন, ভোর সকালে উঠে দিবসারম্ভের কর্মসূচীগুলি অভ্যাসমত পালন করেছিলেন। তারপর চারটি বাদামদানা আর এক গ্লাস কমলালেবুর রসের প্রাতর্ভোজন সেরে পঁয়তাল্লিশ কোটি ভারতবাসীর গুরুভার মাথায় তুলে নিতে রাষ্ট্রপতি ভবনে গিয়েছিলেন।

দক্ষিণ অস্ট্রেলিয়া রাজ্যটির অনেক বৈশিষ্ট্য আছে। অপেক্ষাকৃত দেরিতে ১৮৩৬ সালে এখানে উপনিবেশের শুরু। জার্মান লোক নিয়ে কলোনী শুরু হলেও ইংরেজ স্কচ আইরিশদের সংখ্যাই সেখানে বেশি। রাজ্য সরকার বৃটিশ প্রজাবৃদ্ধির জন্য জাহাজ ভাড়া বাবদ এক শ' টাকা বাদে বাকীটা যোগায়। এসেই নবাগতরা তৈরি বাড়ি পায়।

দক্ষিণ অস্ট্রেলিয়ার সম্পদ ও সম্বলের তুলনা নেই। দুধ গম পশম মাংসের কারবার বাদেও অর্থার্জনের আরও উৎস আছে। ওয়াইলার লোহার খনি অস্ট্রেলিয়ার ইস্পাত উৎপাদনের আশী ভাগ মিটিয়েও জাপানকে লোহা যোগায়। দক্ষিণ অস্ট্রেলিয়া রাজ্য পত্তনের সাত বছরের মধ্যে ওয়ালারু মুন্ডা কাপুন্দার তামার খনি দেশের অশেষ ধনবৃদ্ধি করেছিল। আজ পোর্ট পিরির অদূর অঞ্চলের সীসার খনি তেমনি ঐশ্বর্য বৃদ্ধি করছে; পৃথিবীর বৃহত্তম সীসার কারখানা স্থাপিত হয়েছে পোর্টপিরিতে।

অস্ট্রেলিয়ায় আগে শহর গড়ে বাড়িঘর খাড়া করে কারখানা তৈরি করে লোক খুঁজে বেড়াতে হয়। এডিলেডের ২৭ মাইল দূরে ১৯৫৫ সালে এলিজাবেথ শহরের পত্তন হয়েছিল। অধিবাসী বেশির ভাগ ইংরেজ। বর্তমান লোকসংখ্যা ৩৭ হাজার। বছরে এক হাজারটি বাড়ি সরকারী খরচে তৈরি হচ্ছে। ১৯৬৮ সালের মধ্যে লোকসংখ্যা পঞ্চাশ হাজারে পরিণত করতে হবে। তাই সবাইকে সেধে বেড়াতে হচ্ছে—এখানে এস, ঘর নাও।

মিঃ ম্যাককিনলের গাড়িতে রাজধানী এডিলেড থেকে রওনা হয়ে এলিজাবেথ শহর দেখে ফিরে এলাম ওয়ালাংগায়। এডিলেড শহরের এক নামকরা শিল্প কারখানায় উচ্চ কর্মচারী হয়েও ওয়ালাংগায় তিনি বাদাম চাষ করেন। সপ্তাহ শেষের দুই দিনের ছুটিতে সোজা চলে আসেন এইখানে; জমির যত্ন করা, আগাছা কাটা, সার দেওয়া, নতুন চারা লাগান, বেড়া দেওয়া, বাদাম তোলা, বিক্রি করা—সবই তাঁকে করতে হয় একা। শুধু জনকয়েক মজুর নিতে হয় ফসল তোলার মরশুমে। এ হচ্ছে তাঁর এক রকমের কর্মবিলাস, ছুটি কাটাবার কৃষাণী কৌশল। অথচ মাত্র চল্লিশ একর জমির সখের বাদাম চাষ থেকে যে টাকা পান তা নেহাৎ কম নয়—বছরে প্রায় তিরিশ হাজার টাকা। এই বাদামের চাষ দেখতে দেখতেই তাঁকে বলেছিলাম শাস্ত্রীজীর লঘুপথ্য অনাড়ম্বর প্রাতরাশের কথা। ম্যাককিনলে সাহেব বিস্ময় প্রকাশ করে বলেছিলেন—সে কি, শুধু চারটি মাত্র বাদাম আর কমলালেবুর রস? পরেজ, এগ এন্ড বেকন মাখন টোস্ট কিছুই নয়?

ওয়ালংগা নামটি আদিম অধিবাসীদের ব্যবহার করা। অস্ট্রেলিয়ায় প্রতি জন-

বাদাম বন

পদের কিন্তু ইংরেজী নাম নয়। আদিম অধিবাসীগন্ধী অনেক অনেক নাম আছে। ওয়াইলা, ওয়ালারু, ওয়ালাংগং, প্যারামাটা, বেনেলং কম বিখ্যাত নয়। অস্ট্রেলিয়ানরা শহর গ্রাম রাস্তা এবং নৌকো জাহাজাদির নাম আদিম অধিবাসীদের ভাষায় রাখাটা খুব পছন্দ করে। যে সব স্থানে আজ ব্রিসবেন সিডনি হোবার্ট মেলবোর্ন এডিলেড পার্থ শহর গড়ে উঠেছে এক-কালে তার সব ক'টি স্থানে ছিল আদিম অধিবাসীদের বাস। পূবে-পশ্চিমে তিন হাজার মাইল উত্তর-দক্ষিণে আড়াই হাজার মাইলের মধ্যে একমাত্র বসবাসের উপযুক্ত স্থানেই তারা ছড়িয়ে ছিল। সভ্য মানুষেরা এসে ঐ সব জায়গাতেই ঘর-বাড়ি তৈরি করেছে, চাষ-আবাদ করেছে, জ্ঞান-বিজ্ঞানের উন্নতি করেছে; আর আদিম অধিবাসীরা শতাব্দীর পর শতাব্দী যাযাবরের জীবন যাপন করেছে—সভ্যতা বিকাশের বিন্দুমাত্র চেষ্টা করে নি। আরও মজার কথা, দশ হাজার বছর ধরে তাদের সংখ্যা বৃদ্ধি ঘটেও সারা অস্ট্রেলিয়াকে ছেয়ে ফেলে নি। শ্বেতাঙ্গদের আগমনকালে ব্ল্যাকদের সংখ্যা ছিল দেড় লাখের মত। এখন কুইনস্ল্যান্ড নর্দান টেরিটরির সংরক্ষিত অঞ্চলে হাজার পঞ্চাশেক ব্ল্যাক আছে। আরও পঞ্চাশ হাজার আছে হাফ-কাস্ট, শ্বেতাঙ্গদের ভেজাল রক্তের বর্ণসংকর। তাদের বাস শহরে শহরে।

এই দারুণ এটম সভ্যতার যুগেও ব্ল্যাকদের প্রস্তরযুগে পড়ে থাকার কারণ কিছু অবশ্য আছে। উচ্চতর সভ্য মানুষ দ্বারা বিতাড়িত হয়ে এদের পূর্বপুরুষেরা অস্ট্রেলিয়ায় আগমনকালে সঙ্গে কিছুই আনতে পারে নি—এক কণা ধান গমের বীজও নয়, গরু-ভেড়া-কুকুর প্রভৃতি গৃহপালিত পশুও নয়। আর যে দেশে তারা এসে পৌঁছেছিল সে দেশও ছিল তেমনি বিচিত্র— ধান গমের দানাটি নেই, গরু-ভেড়ার টিকিটি নেই। চারদিকে শুধু মাটি পাহাড় আর গাম গাছ। সাপ ক্যাঙারু আর পাখী। সুতরাং বীজ না থাকলে চাষই বা কি করে চলে—চাল, গম, আপেল আঙুরই বা আসে কোত্থেকে? গরু না থাকলে দুধ মাখনই বা পাবে কোথায়? তাই অস্ট্রেলিয়ার মাটিতে পা দিতে না দিতেই তাদের জীবন-সংগ্রাম শুরু করতে হল, শামুক মাছ গুগলি খেতে হল, সাপ আর ক্যাঙারু খাওয়া অভ্যেস করতে হল। পাথর ঘষে তারা বর্শা বানাল, গাছের ছালে লজ্জা নিবারণের সামান্য চেষ্টা করল। এক অঞ্চলের সাপ ক্যাঙারু সাবাড় হতেই আর এক অঞ্চলে ধাওয়া করতে হল। জীবনযাত্রার এই অনিশ্চিত ক্লেশ-কর অবস্থার জন্য জন্মশাসন না করে তাদের উপায় ছিল না। বৃদ্ধার সঙ্গে যুবকের এবং যুবতীর সঙ্গে বিবাহ বয়সোত্তীর্ণ পুরুষের বিবাহ চল হয়ে দাঁড়াল। আর কিই বা করা যেত—লুপের আবিষ্কার ত' আর তখন হয় নি। এমনি করে এই হতভাগ্য মানবগোষ্ঠীর মধ্যে এই হয়ে দাঁড়াল জীবনযাত্রার ট্র্যাডিশন; আর তা ক্রমে এমনই গা-সহা হয়ে গেল যে তাদের মনে হতে লাগল—এই ত জীবন! এমনধারা জীবনের চাইতে উন্নত যে কিছু থাকতে পারে সে কথা চিন্তা করার সুযোগ আর তাদের রইল না। তাই শ্বেতাঙ্গরা যখন এলো, তাদের জীবন-যাত্রার প্রণালীকেও ব্ল্যাকরা উন্নত বলে ভাবতে পারল না, বরং মনে করল—এ কি সব উৎপাত। এরা কোত্থেকে উড়ে এসে জুড়ে বসেছে। বন-জঙ্গল সাফ করে সাপ ক্যাঙারু নাশ করে আমাদের খাদ্যসমস্যা বাড়িয়ে তুলছে। সুতরাং ব্ল্যাকরা বর্শা-হাতে নবাগতদের আক্রমণ করল। আর শ্বেতাঙ্গরা? বন্দুকের গুলীতে তাদের খতম করতে করতে প্রায় উজাড় করে ফেলল।

আঙ্কাপেরিঙ্গা ওয়ালাঙ্গার কয়েক মাইল দূরে একটি জায়গা। এর অর্থ হল স্ত্রীলোকের অবস্থানকেন্দ্র। এই থেকে অনুমান করা যায় জন্মনিয়ন্ত্রণের প্রয়োজনে ব্ল্যাকদের মধ্যে স্ত্রী-পুরুষের সম্পর্ক কত কঠোর শাসনে নিয়ন্ত্রিত ছিল। এ অঞ্চলে পুরুষের গমনাগমন ছিল সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। শুধু পুরুষের মিলনের স্থানের নাম ইয়াঙ্কাছিলা।

আঙ্কাপেরিঙ্গার উপত্যকা থেকে দেখলাম বিস্তৃত ঘাসের চাষ। এক সঙ্গে পঁচিশ-ত্রিশ বিঘা জমিতে ঘাস জন্মে আছে। কৃষক ট্রাক্টর চালিয়ে নিচ্ছে—সেই ট্রাকটারে ঘাস কাটা হচ্ছে আর কাটা

পোর্টপিরির কাছে একটি নবপ্রতিষ্ঠিত গ্রামের বাড়িঘর

ঘাস সঙ্গে সঙ্গে ট্রাক্টারের মধ্যে যন্ত্র-ব্যবস্থায় বেল তৈরি হয়ে অপর দিক দিয়ে বেরিয়ে যাচ্ছে। আট-দশ গজ পর পর এমনি এক-একটি বেল-করা ঘাসের আঁটি সারা মাঠময় ছড়িয়ে আছে। এইগুলি লরী ভরে তুলে নিয়ে গুদামজাত করে রাখা হয়। অনুমান করা কঠিন নয় একটি-মাত্র লোকের পক্ষে হাজার বিঘা জমির চাষ করা, ঘাস বোনা, চার-পাঁচ শ' গরু পালন করা, দুধ দোয়া কি করে সম্ভব হয়। একজন কৃষক, একটি কুকুর এবং ট্রাক্টার মোটরগাড়ি দুধ দোয়ার কল—কল চালাবার বিদ্যুৎ আর প্রয়োজনমত জল, ব্যস। এই হলেই হল।

এবার এগিয়ে চলেছিলাম বারোসার পথে। জার্মান কলোনী বারোসা। অস্ট্রেলিয়ার আর কোথাও একটিমাত্র স্থানে এত জার্মান লোক বাস করে না। মিঃ ম্যাক কিনলের ধমনীতেও কিছু জার্মান রক্ত আছে। ঠাকুমা ছিলেন তাঁর জার্মান। পিতৃগোষ্ঠী স্কচ। ১৮৩৮ সালে তাঁর পূর্বপুরুষ স্কটল্যান্ড থেকে এখানে এসেছিলেন ভাগ্যান্বেষণে। একুশ বছরের দরিদ্র যুবক। বিবাহিত। ভাগ্য ফিরবে সেই ভরসায় আঠারো বছরের যুবতী বৌকে নিয়ে পনের হাজার মাইল দূরে পাড়ি জমিয়েছিলেন। ম্যাক কিনলে সাহেব বললেন—সেদিন অজানার ঝুঁকি সেই ভাগ্যান্বেষী যুবক নিয়েছিলেন বলেই ত' তাঁর বংশের আমরা আজ কত সমৃদ্ধ, কত সুখী।

আঠারো মাইল দৈর্ঘ্য আর পাঁচ মাইল প্রস্থে বারোসার উপত্যকা। বিশ হাজার একর জমিতে তার আঙুর চাষ। বারোসার পীচ পেয়ার্স এপ্রিকটের বাগান এবং দূরে উপত্যকায় পশুচারণ ভূমিও দেখবার মত।

শ্রীউমাপদ মুখোপাধ্যায় সঙ্কলিত

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণায়ণ

মূল্য ঃ দুই টাকা

"অমূল্য গ্রন্থ হয়েছে।"

—স্বামী অপূর্বানন্দ।

"বইখানি নতুন ধরণেরই হয়েছে।"

—স্বামী সদাত্মানন্দ।

"বইখানি দেখিতে সুন্দর, বিষয়বস্তু অমল ও অতুলনীয়। একখানি গ্রন্থে এত মহামূল্য রত্নের সন্নিবেশ পূর্বে আর হয় নাই।"

—স্বামী শুদ্ধসত্ত্বানন্দজী।

বসুমতী প্রাইভেট লিমিটেড
১৬৬, বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী স্ট্রীট,
কলিকাতা—১২

এডিলেডের গাম গাছ। ১৮৩৬ সালে এইখানে গাম ট্রি সেট্লমেন্ট স্থাপিত হয়েছিল।

ফলে-ফুলে বনশোভায় সারাটি উপত্যকা রাঙা। সবার সেরা কিন্তু বারোসার মেয়ে। সবাই বলে বারোসার মেয়ের মত মেয়ে হয় না।

এখানকার বৈশিষ্ট্য লুথারিয়ান গীর্জাগুলি—আশপাশের সমস্ত সৌধাবলীর ওপর মাথা তুলে আকাশে উঠেছে। যে লুথারপন্থী মানুষদের আপন দেশে ঠাঁই হয় নি, এখানে তাদেরই গীর্জাগুলি যেন স্বৈরাচারী রাজাকে আজও উপহাস করছে। প্রাচীন জার্মানীর একটি সামাজিক বৈশিষ্ট্য এখনও বারোসার মানুষ জিইয়ে রেখেছে। বিয়ে করে বৌ নিয়ে বাড়ি ফেরার পথে পাড়ার ছোকরারা লাঠি দেখিয়ে গাড়ি থামিয়ে বরের কাছে মদের পয়সা আদায় করে, পূর্ববঙ্গের জামাইবাবুদের পাল্কী থামিয়ে মিষ্টির পয়সা আদায়ের মত।

মেলবোর্নের একটি অপরিসর ঘন-বসতির নাম ব্রান্স উইক। ইটালীয় কলোনী। সেখানেও সব ইটালীয় আচরণ চোখে পড়ে। মেলবোর্নবাসীরা ব্রান্স উইককে বলে—এ লিট্ল ইট্লী। ওখানকার ইটালীয়রা রোজগারের ধান্দায় ঘোরে, ইটালীয় উচ্চারণে ইংরেজী বলে, পাড়ার ইংরেজ স্কচদের একটু ঘৃণার চোখে দেখে। ব্রান্স উইকের ইটালীয়ানদের প্রাচীন রোম সভ্যতার জন্য গর্ববোধ নেই; বারোসার জার্মানদের মত তারা কোন আদর্শের জন্যও দেশত্যাগ করে নি—অস্ট্রেলিয়ায় এসেছিল পেটের দায়ে।

বারোসার তালুন্দাতে একটি ব্র্যান্ডি তৈরির কারখানা দেখলাম। মারে নদীর উপত্যকা থেকে শুরু করে বারোসার মাঠ পর্যন্ত বিস্তৃত অঞ্চল থেকে এন্তার আঙুর এসে জমেছে। বারোসায় বিঘা প্রতি আঙুর ফলন সাত মণ। এই কারখানায় দৈনিক চার হাজার মণ আঙুর পেশাই হচ্ছে। পেশাই কলের মুখে লরী থেকে আঙুর নিক্ষেপের সময় হাঁ করে চেয়ে রইলাম। আমাদের চোখে এ দৃশ্য যে কত দুর্লভ। মদ তৈরিতে যে সত্যি এত টাটকা আঙুর রসের দরকার হয় তা জানা ছিল না। আমাদের দেশেও খাদ্য আর মদ্য তৈরি হচ্ছে। অনুমান করি আমাদের চোলাইকারীদের মত আঙুরের সঙ্গে ডুমুর আর ডাবের রস মিশ্রণের ধান্দায় থাকে না—কারণ সেখানে দ্রাক্ষা-রসের মদ্যপায়ীরা গোবিন্দদাস শ্রেণীর জীবের চাইতে অনেক উঁচুতলার লোক। তবে খাদ্যের কথাটা আলাদা; তার সঙ্গে পাথরকুচির খাদ থাকতে দোষ নেই।

বারোসার থিয়োডোর গেকীর সাথে আলাপ হল। গেকীর পূর্বপুরুষ এসেছিল ব্যাভেরিয়া থেকে। গেকীর মত ব্যাভেরিয়া সাইলেসিয়া এবং প্রাশিয়ার লোকেরা কিন্তু সগর্বে বলে—আমরা অস্ট্রেলিয়ান। অবশ্য তারা জার্মান ধরণে বাড়ি তৈরি করে, জার্মান কৃষ্টি পোষণ করে। অবশ্য বিগত চার-পাঁচ পুরুষ অস্ট্রেলিয়াবাসের পরও কিন্তু ইংরেজীর উচ্চারণে জার্মান টানটি তারা ভোলে নি। প্রবাসী বাঙালী কি আর সহজে ভোলে মাছ-ভাত লক্ষ্মীব্রত, শারদীয়া পত্রিকা, সহজে কি রপ্ত করতে পারে অবাঙালী ধরণে 'ভ'-র উচ্চারণ?

রজার টুইসনার নামে ভদ্রলোক ১৯৪১ সালের একটি পত্রিকা বের করে দেখালেন; বিশ্বযুদ্ধের প্রথম দিকে এডিলেড থেকে প্রকাশিত। বারোসা ভ্যালীর জার্মান শাখার লোকদের প্রতি

অভিযোগ করে পত্রিকার নিজস্ব সংবাদদাতা লিখেছেন—এরা সব হিটলার পন্থী। সেদিন বারোসায় দারুণ প্রতিবাদের ঝড় উঠেছিল; সবাই কিন্তু প্রমাণ করে ছেড়েছিল যে, বারোসাবাসীদের অস্ট্রেলিয়া-প্রীতি কারও চাইতে কম নয়। তবে টুইসনারের একটি দুর্বলতা আছে। জার্মান নামের দুর্বলতা। তাঁর মতে প্রাচীন যুগের জার্মান নামগুলি ঝঙ্কারময় এবং কাব্যময়, ওজনও ভারী; অথচ ডাকতে কুলী লাগে না। টুইসনার নিজের মেয়ের নাম রেখেছেন উইলহেলমিনা। অর্থাৎ এরা আধুনিক বাংলা দেশের মীনা সেন নোড়া শীলের মত মোটেই নয়, যে আগের দিনের মীনাক্ষীরা সুযোগ পেলেই বলবে—যার শীল যার নোড়া, তারই ভাঙি দাঁতের গোড়া!

আধুনিক জার্মানীর কথা উঠল, এডুনোয়ার এরহার্ড প্রসঙ্গও বাদ গেল না। যে পশ্চিম জার্মানীকে বৃদ্ধ এডুনেয়ার হাতে তুলে নিয়েছিলেন সে হচ্ছে ধ্বংসস্তূপের জার্মানী, সাতচল্লিশের ভারতবর্ষের মত খণ্ডিত—খাদ্য বস্ত্র জ্বালানী বেকারী রেফুজী সমস্যাকীর্ণ জার্মান জাতির কঙ্কাল। বিদায়কালে এডুনেয়ার যে জার্মানীকে অর্থমন্ত্রী ডাঃ এরহার্ডের হাতে তুলে দিলেন সে হচ্ছে সুস্থ সুখী সুন্দর জার্মানী—যার আর্থিক কাঠামো গঠনে এরহার্ডের দান অসামান্য।

আজ পশ্চিম জার্মানীর কর্ণধার স্বয়ং এরহার্ড। ব্যাভেরিয়ার লোক। অর্থনীতিশাস্ত্রের ভূতপূর্ব অধ্যাপক। আমরা যে দৃষ্টিতে এরহার্ডকে দেখি তেমন দৃষ্টি বারোসার ব্যাভেরিয়ানদের নয়; তাঁকে নিয়ে যে বারোসাবাসীদের কিছুমাত্র গর্ব আছে তাও মনে হল না—বরং অস্ট্রেলিয়া-প্রধানমন্ত্রীর হোল্ট-গিন্নীর ভূতপূর্ব স্বামীর বিকিনীপরা পুত্রবধূদের সঙ্গে সমুদ্রসৈকতে মিঃ হোল্টের সাঁতার কাটার কথা আলোচনা করতে তারা বেশি পছন্দ করে।

মিঃ ম্যাককিনলে মাঝে মাঝে বারোসায় এসে খুবই খুশি হন—হয়ত বারোসার ইয়ালুম্বা মদ আর আঙুরবনের সমারোহের জন্য। এখানকার লোকেরা যে জার্মান সে কথা তাঁর কাছে তেমন কোন বিশেষ অর্থও বহন করে না। কিন্তু কন্যাটি তাঁর মনেপ্রাণে জার্মান; জার্মান ভাষা জার্মান আচার জার্মান কেতা তার নিখুঁতভাবে রপ্ত করা। সেও সুযোগমত বারোসার তাপুন্দা নুরিউপ্তা এঙ্গাস্টনের বদলে বনে ঘোরে, তাপুন্দার লোকসঙ্গীত শোনে—যার মধ্যে সাইলেসিয়ার সুরছন্দের ঢেউ আছে। ম্যাককিনলের মতে মেয়েটি তাঁর একটু কাঠখোট্টা ধরণের জার্মান—যুদ্ধের খবরে তার উৎসুক্য, যন্ত্রচর্চায় তার আনন্দ, হেগেল-দর্শন আলোচনায় তার আগ্রহ। আমি কিন্তু শুনে ভারি অবাক হলাম, যে প্রাক-বিবাহ জীবনে সে ছিল নার্স—যে কাজের সঙ্গে যুদ্ধ যন্ত্র বা দর্শন শাস্ত্রের কোন যোগই নেই। এমন কি সে-মেয়ে বিয়ে করেছে জার্মান নয়, ইংরেজ নয়, ডাক্তার এঞ্জিনীয়ার দর্শনের অধ্যাপকও নয়—একজন ইটালীয় ফার্মারকে। সিডনি শহরের তিন শ' মাইল দূরে ডেয়ারী ফার্মারের বৌ হয়ে দিব্যি ঘরসংসার করছে। উইমেন আর ফানি।

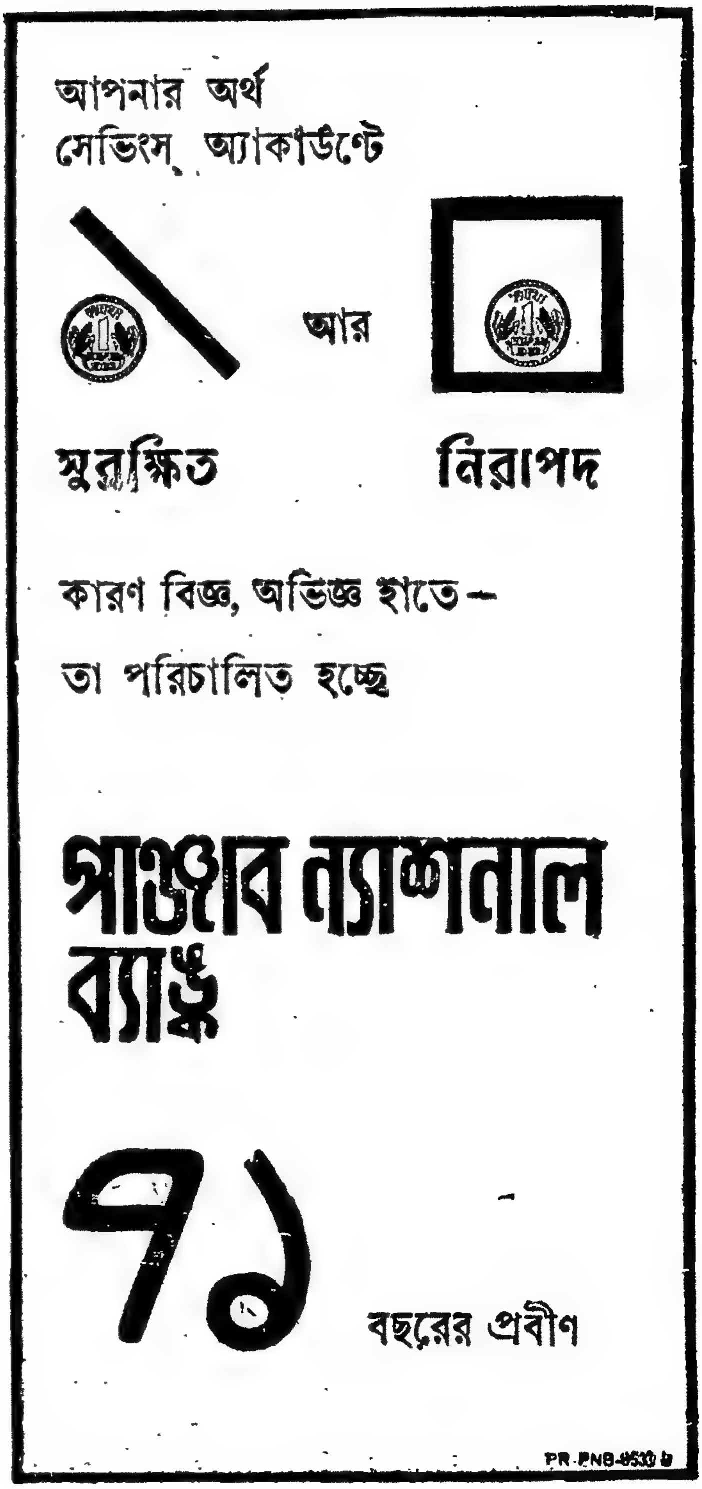

বিশ্বসাহিত্যের আদিপর্ব

ডঃ নরেন ভট্টাচার্য

॥ চার ॥

প্রাচীন গ্রীক সাহিত্য : প্লেটো ও অ্যারিস্টোটল

প্লেটো

মহাদার্শনিক প্লেটো ও তৎশিষ্য অ্যারিস্টোটলের বিশেষ উল্লেখ না করলে অ্যাটিক যুগের গ্রীক সাহিত্যের সবিশেষ পরিচয় দান অসম্পূর্ণ হবে।

প্লেটো এথেন্সে জন্মগ্রহণ করেছিলেন ৪২৮ খৃস্ট-পূর্বাব্দের ২১শে মে তারিখে, প্রাচীন গ্রীক বিশ্বাস অনুযায়ী ঐ দিনটি অ্যাপোলোদেবের জন্মদিন। প্লেটো ছিলেন কোড্রোরাস নামক জনৈক নৃপতির বংশজাত, পিতার নাম অ্যারিস্টন। তাঁর মা পেরিকটিওন ছিলেন বিখ্যাত এথেনীয় আইনপ্রণেতা সোলোনের পরিবারের মেয়ে। প্লেটোর আসল নাম অ্যারিস্টোক্লেস, প্লেটো নামটি তাঁর গুরু সক্রেটিসের দেওয়া।

প্লেটোর যৌবনকালটা ছিল পেলোপনেশীয় যুদ্ধের কাল। অবক্ষয়ের লক্ষণ তখন এথেন্সের সমাজদেহে ধীরে ধীরে প্রকাশিত হচ্ছে। তা প্লেটোর দৃষ্টি এড়ায় নি। এই কারণেই তিনি সমসাময়িক রাজনীতি থেকে নির্লিপ্ত ছিলেন, যদিও যে পারিবারিক ঐতিহ্যে তিনি গঠিত হয়েছিলেন তাতে রাজনীতি করার সুযোগ তাঁর প্রচুর ছিল। কিন্তু তিনি শুধুমাত্র বুদ্ধিবৃত্তির অনুশীলন করেই জীবন কাটিয়েছেন। প্রথম জীবনে তিনি কাব্যপাঠ ও কাব্য রচনায় নিজেকে নিয়োজিত করেছিলেন, তারপর তিনি ধীরে ধীরে দর্শনশাস্ত্রের অনুরাগী হয়ে ওঠেন। দার্শনিক হেরাক্লাইটাসের শিষ্য ক্রাটিলাস এ বিষয়ে তাঁর প্রথম গুরু। কুড়ি বছর বয়সে তিনি সক্রেটিসের শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন এবং অল্পকালের মধ্যেই তিনি সক্রেটিসের সর্বাপেক্ষা প্রিয় শিষ্য হয়ে ওঠেন।

৩৯৯ খৃস্ট-পূর্বাব্দে সক্রেটিসের মৃত্যুর পর প্লেটো মেগারায় গমন করেন এবং সেখান থেকে তাঁর সতীর্থ ইউক্লিডেসের সঙ্গে তিনি সাইরিন ও ইজিপ্টে পরিভ্রমণ করেন। তারপর তিনি সিসিলির স্বৈরাচারী শাসক ডাইওনিসাসের আমন্ত্রণে সিসিলিতে গমন করেন, কিন্তু সেখানে কোন কারণে ডাইওনিসাসের সঙ্গে তাঁর সদ্ভাব নষ্ট হয়ে যাওয়ায় তিনি এথেন্সে ফিরে আসেন।

৩৮৮ খৃস্ট-পূর্বাব্দে তিনি এথেন্সের একটি বাগানে তাঁর বিখ্যাত একাডেমির প্রতিষ্ঠা করেন এবং এখানে তিনি চল্লিশ বৎসর একনাগাড়ে শিক্ষাদানের কাজ চালিয়ে যান। তিনি অবিবাহিত ছিলেন, রাজনীতি নিয়ে মাথা ঘামান নি, বিশুদ্ধ জ্ঞানচর্চা ভিন্ন তাঁর জীবনের কোন উদ্দেশ্যই ছিল না। এখানে তিনি বহু শিষ্য পেয়েছিলেন যাঁদের মধ্যে বিখ্যাত ছিলেন অ্যারিস্টোটল, স্পেউসিপ্পাস এবং জেনোক্রাটেস। রাজনীতির বিষয়ে প্লেটোর উপদেশ শুধু এথেন্সেই নয়, গ্রীসের অপরাপর রাজ্যেও গ্রহণ করা হত। প্লেটো শিক্ষাদান করতেন সাধারণ কথোপকথনের মাধ্যমে, দার্শনিক বিষয়গুলি সম্বন্ধে অবশ্য তিনি বক্তৃতা দিতেন। বৃদ্ধবয়সে তাঁর কর্মশক্তির কোন ক্ষয় হয় নি। ৮১ বছর বয়সে যখন তিনি মারা যান, তখনও তিনি ছিলেন লিখনরত। তাঁর একাডেমির প্রাঙ্গণেই তাঁকে সমাধিস্থ করা হয়।

প্লেটো মোট ৩৬টি গ্রন্থ রচনা করেছিলেন, যেগুলি পরবর্তীকালে থ্রাসিলাস নামক নব্য পিথাগোরীয় গোষ্ঠীর এক দার্শনিক কর্তৃক নয়টি খণ্ডে পুনর্বিন্যস্ত করা হয়। (১) **ইউথাইফ্রো, অ্যাপোলজি অফ সক্রেটিস, ক্রিটো এন্ড ফিডো**; (২) **ক্রাটাইলাস, থিওটিটাস, সোফিস্টেস, পোলিটিকাস**; (৩) **পারমেনিদেস, ফিলেবাস, সিম্পোজিয়াম, ফিডরাস**; (৪) **অলকিবিয়াডেস, হিপ্পারকাস, অ্যান্টেরাস্টি**; (৫) **থিয়াজেস, চারমিডেস, লাচেস, লাইসিস**; (৬) **ইউথেডিমাস, প্রোটাগোরাস, গোর্জিয়াস, মেনো**; (৭) **হিপ্পিয়াস, আইওন, মেনেক্সেনাস**; (৮) **ক্লিটোফো, রিপাবলিক, টিমিয়াস, ক্রিটিয়াস**; এবং (৯) **মিনোস, লজ, এপিনোমিস, লেটারস**। এগুলি ছাড়া আরও আটটি রচনা প্লেটোর নামে প্রচলিত আছে, কিন্তু সেগুলি যে পরবর্তীকালে প্রক্ষিপ্ত তাতে কোন সন্দেহ নেই। প্লেটোর উপরি-উক্ত রচনাবলীর মধ্যে অধিকাংশেরই নামকরণ হচ্ছে তাঁর পূর্ববর্তী দার্শনিকদের নামে। পূর্বসূরীদের দার্শনিক মতবাদসমূহ ছাত্রদের বোঝানোর জন্যই তিনি এগুলি লিখেছিলেন। তাঁর রাষ্ট্রবিজ্ঞান সংক্রান্ত গ্রন্থটি, যার নাম **রিপাবলিক**, দশটি খণ্ডে বিভক্ত; এবং তাঁর আইন-সম্পর্কিত গ্রন্থ **লজ** বারোটি খণ্ডে বিভক্ত।

প্লেটোর রচনাসমূহ মোটামুটি অবিকৃতভাবেই বর্তমান আছে, তার কারণ সেগুলি তাঁর যুগ থেকে শুরু করে পরবর্তী যুগসমূহে নিরবচ্ছিন্নভাবে ছাত্রগণ কর্তৃক পঠিত হয়ে এসেছে। তবুও উপরি-উক্ত গ্রন্থগুলির মধ্যে সবই তাঁর লেখা কি না সে বিষয়ে সন্দেহ আছে। তাঁর **এপিনোমিস** নামক গ্রন্থটি তাঁর বিখ্যাত আইন সংক্রান্ত গ্রন্থের পরিশিষ্ট, যা সম্ভবত রচনা করেছিলেন তাঁর ছাত্র ওপাসের ফিলিপ্পাস। এ ছাড়া প্লেটোর থিয়াজেস, **মিনোস** এবং **ক্লিটোফো** সম্ভবত তাঁর নিজস্ব নয়, তাঁর নামে প্রচলিত। প্লেটোর রচনাবলীকে কালানুক্রমিক সাজানোর বহু চেষ্টা হয়েছে, কিন্তু সার্থকভাবে কোন কিছুই হয় নি। তবে এটুকু মনে করার যথেষ্ট কারণ আছে যে, ফিডরাস-ই তাঁর প্রথম গ্রন্থ, বিখ্যাত রিপাবলিক তাঁর জীবনের শেষের দিকে রচিত হয়েছিল।

প্লেটোর রচনাবলী শুধু গ্রীক সাহিত্যেরই নয়, সমগ্র বিশ্বসাহিত্যের অমূল্য সম্পদ। বিষয়বস্তু এবং আকার সেই সঙ্গে ভাবের গভীরতা এবং রচনাশৈলী সর্বদিক থেকেই তা অনবদ্য।

প্লেটো তাঁর বিষয়বস্তুকে কথোপকথনের ছলে ব্যক্ত করেছেন এবং তাঁর রচনায় কথোপকথনের নায়ক তিনি নন, তাঁর গুরু সক্রেটিস। ঘটনাবলীর নিখুঁত উপস্থাপন, চরিত্র-চিত্রণ, বক্তাদের ব্যক্তিত্ব এবং তদনুযায়ী পরিবেশ সৃষ্টিতে এবং সর্বোপরি তাঁর অনবদ্য ভাষায় মনে হয় যে, দার্শনিক প্লেটো, কবি প্লেটো ও শিল্পী প্লেটোর মধ্যে কোন্ প্লেটো বেশি প্রশংসা পাবার যোগ্য? শোনা যায় যে, প্লেটো তাঁর কল্পিত আদর্শ রাষ্ট্র থেকে কবিকুলকে নির্বাসিত করার পক্ষপাতী ছিলেন, কিন্তু তাঁর রচনার কাব্যময়তা যেন এই উক্তিটির জীবন্ত প্রতিবাদ।

অ্যারিস্টোটল

প্লেটোর পরেই যে গ্রীক দার্শনিক জগৎজোড়া খ্যাতি অর্জন করতে পেরেছিলেন তিনি হচ্ছেন অ্যারিস্টোটল। তিনি জন্মগ্রহণ করেছিলেন ৩৮৪ খৃস্টপূর্বাব্দে থ্রেসের অন্তর্গত স্টাজেইরা নামক স্থানে। তাঁর পিতা ছিলেন চিকিৎসক, নাম নিকোমাকাস। ১৭ বছর বয়সেই অ্যারিস্টোটল পিতৃমাতৃহীন হন, এবং জন্মভূমি ত্যাগ করে এথেন্সে চলে আসেন এবং প্লেটোর বিদ্যালয়ে ভর্তি হন। এখানে তিনি কুড়ি বছর ছিলেন, প্রথমে ছাত্র হিসাবে এবং পরে অলঙ্কারশাস্ত্রের অধ্যাপক হিসাবে।

প্লেটোর শিষ্য হলেও কিন্তু অ্যারিস্টোটল প্লেটোর মতবাদে অনুগামী ছিলেন না বরং নানা বিষয়ে গুরুর সঙ্গে তাঁর মতানৈক্যই ঘটত বেশি। তথাপি প্লেটো তাঁকে প্রচুর স্নেহ করতেন, তাঁকে তিনি চিহ্নিত করেছিলেন তাঁর একাডেমীর "মস্তিষ্ক" বলে, কেন না অ্যারিস্টোটলের মত পাঠপ্রবণতা খুব কম লোকেরই ছিল। তাঁর অপর এক কৃতী ছাত্র জেনোক্রাটেসের সঙ্গে অ্যারিস্টোটলের তুলনা করে প্লেটো বলেছিলেন একজনের দরকার লাগাম, আর একজনের চাবুক। পক্ষান্তরে অ্যারিস্টোটল ছিলেন সাক্ষাৎ গুরু-মারা চেলা। তিনি লিখেছিলেন, দার্শনিকদের পারস্পরিক বন্ধুত্ব যেন সত্যের অনুসন্ধানে ব্যাঘাত না ঘটায়। তবে তিনি তাঁর গুরু প্লেটোকে যথেষ্ট সম্মান করতেন। একটি কবিতায় তিনি লিখেছিলেন যে, প্লেটো ছিলেন প্রথম ব্যক্তি যিনি কথায় এবং কাজে দেখিয়ে দিয়েছেন কিভাবে মানুষকে সুখী এবং সুন্দর হতে হয়।

৩৪৭ খৃস্ট-পূর্বাব্দে যখন প্লেটো তাঁর ভাগ্নে স্পেউসিপ্পাসের হাতে নিজের বিদ্যালয়ের ভার তুলে দিলেন, তখন অ্যারিস্টোটল এথেন্স ত্যাগ করে মাইসিয়াতে চলে গেলেন এবং সেখানে দু'বছর কাটিয়ে তিনি লেসবসে চলে এলেন। সেখানে তিনি ম্যাসিডোনিয়ার রাজা ফিলিপের আমন্ত্রণ পেলেন, তাঁকে রাজা ফিলিপের ত্রয়োদশ বৎসর বয়স্ক পুত্র আলেকজান্ডারকে পড়াতে হবে। অ্যারিস্টোটল এই আমন্ত্রণ গ্রহণ করলেন এবং ম্যাসিডোনিয়ায় চলে গেলেন। ফিলিপ এবং আলেকজান্ডার উভয়েই তাঁকে খুব শ্রদ্ধা করতেন। দীর্ঘ আট বছর তিনি আলেকজান্ডারের শিক্ষক ছিলেন।

আলেকজান্ডারের এশিয়া অভিযানের সময় অ্যারিস্টোটল এথেন্সে ফিরে আসেন এবং সেখানে ১৩ বৎসর লিসিয়াম নামক একটি প্রতিষ্ঠানে শিক্ষাদান করেন। প্রত্যহ প্রভাতে তিনি তাঁর পরিণত ছাত্রদের সঙ্গে এথেন্সের ছায়াসুশীতল পথগুলি দিয়ে ভ্রমণ করতে করতে উচ্চতর দার্শনিক সমস্যাসমূহ আলোচনা করতেন। সন্ধ্যায় তিনি অপেক্ষাকৃত বৃহৎ জনসভায় দর্শন ও অলঙ্কারশাস্ত্রের উপর বক্তৃতা দিতেন। আলেকজান্ডারের মৃত্যুর পর এথেন্সে যখন ম্যাসিডোনীয় সাম্রাজ্যবাদের পক্ষাবলম্বীদের ব্যাপক পার্জিং শুরু হয় এবং ডেমোফিলাস নামক জনৈক ব্যক্তি অ্যারিস্টোটলের নামে অভিযোগ আনে। হয়ত সক্রেটিসের মত পরিণতি তাঁরও হত, কিন্তু তিনি ইউবিয়াতে পালিয়ে যান এবং সেখানে ৩২২ খৃস্ট-পূর্বাব্দে তাঁর মৃত্যু হয়।

অ্যারিস্টোটলের রচনা অজস্র যেগুলিকে দু'ভাগে ভাগ করা যায়, একটি গবেষণাধর্মী বিজ্ঞানসম্মত, পণ্ডিতদের জন্য, এবং অপরটি সাধারণ লোকের বোঝবার মত সরল ভঙ্গী। তবে তাঁর প্রাপ্ত রচনাবলীর মধ্যে প্রথমোক্ত শ্রেণীর রচনাই বেশি, দ্বিতীয় শ্রেণীর রচনা, যেগুলি কথোপকথনের ভঙ্গীতে লিখিত, সেগুলির মাত্র কিছু কিছু অংশ এ পর্যন্ত পাওয়া গেছে। বিজ্ঞানসম্মত লেখাগুলি বিষয়বস্তু অনুযায়ী চারটি ভাগে ভাগ করা যায়—ন্যায়শাস্ত্র, অধিবিদ্যা, প্রকৃতি-বিজ্ঞান এবং নীতিশাস্ত্র। তাঁর বিখ্যাত লজিক বা ন্যায়শাস্ত্র তাঁর পরবর্তীকালের ভক্তগণ কর্তৃক শ্রেণীবদ্ধ হয়েছে। সেগুলির সাধারণ নাম দেওয়া হয়েছে ওরগানন বা হাতিয়ার, কেন না তা গবেষণা বা অনুসন্ধানের পদ্ধতির উপর রচিত। এই রচনাগুলির মূল গ্রীক নামের চেয়ে পরবর্তী যুগের ল্যাটিন নামই অধিকতর প্রচলিত। এই পর্যায়ের রচনাগুলির মধ্যে আছে (১) ক্যাটেগোরিজ যার বিষয়বস্তু হচ্ছে বিভিন্ন ভাব বা আদর্শের আদি বা প্রাথমিক রূপ ও ধর্মের পরিচয়। (২) **ডে ইন্টারপ্রেটেশন**—এখানে আছে তর্কশাস্ত্রে যাকে বলা হয় জাজমেন্ট এবং প্রপোজিসন, অর্থাৎ ন্যায়শাস্ত্রীয় প্রতিপাদ্য বচন ও তার ধরণাগত পরিমণ্ডলের বিভিন্ন দিকগুলির উপর বিস্তৃত আলোচনা; দার্শনিক পরিভাষাসমূহের আদি গ্রন্থ হিসাবেও এই রচনাটির গুরুত্ব অসম্ভব। (৩) **অ্যানালিটিকা প্রায়োরিয়া** ও (৪) **অ্যানালিটিকা পোস্টেরিওরা**—প্রথমোক্ত রচনার বিষয়বস্তু হচ্ছে সিলো-

দেশ সেবায় নিয়োজিত,
এ্যালবার্ট ডেভিড লিমিটেড
কলিকাতা—৫০
নীতি ও বিজ্ঞানানুযায়ী ঔষধ প্রস্তুতকরণের অগ্রণী
—ব্রাঞ্চ সমূহ—
বোম্বে - মাদ্রাজ - দিল্লী - নাগপুর
বেজওয়াডা - শ্রীনগর - গৌহাটী

জিসম বা ন্যায় এবং শেষোক্ত রচনায় আছে তর্কশাস্ত্রীয় সংজ্ঞা, বিভজন এবং পদের ব্যাপ্যতা। (৫) তাঁর টোপিকা আট খণ্ডে লেখা, যার বিষয়বস্তু হচ্ছে ন্যায়শাস্ত্রীয় অনুমান, এবং (৬) এই পর্যায়ের শেষ রচনা সফিজম্-এ তিনি তাঁর পূর্ববর্তী সফিস্টদের চিন্তাধারা ও সিদ্ধান্তের হেত্বাভাস প্রমাণ করেছেন।

এরপরে আসে অ্যারিস্টোটলের বিখ্যাত মেটা ফিজিক্স বা অধিবিদ্যার কথা। নামটি অবশ্য পরবর্তীকালের লেখকদের দেওয়া। এই রচনাটি মোট চোদ্দটি খণ্ডে বিভক্ত। এই অসমাপ্ত গ্রন্থটিকে অ্যারিস্টোটল 'প্রথম দর্শন' বলে অভিহিত করেছেন। প্রকৃতি বিজ্ঞানের উপর বোধ হয় অ্যারিস্টোটলের রচনা সর্বাধিক। তাঁর বিখ্যাত ফিজিক্স বা পদার্থবিদ্যা আট খণ্ডে বিভক্ত। এ ছাড়া আছে চার খণ্ডে রচিত হেভেনস বা বিশ্ব-চরাচর এবং দুটি গ্রন্থ আছে, জন্মমৃত্যু সম্বন্ধে লেখা—বিগিনিং টু বি এবং পেরিশিং। বায়ুমণ্ডল নিয়ে তিনি চার-খণ্ডে রচনা করেছিলেন মেটিওরোলজিকা। এ ছাড়া অন দি কসমস নামক তাঁর নামে প্রচলিত একটি পুস্তিকাও আছে। আরও একটি গ্রন্থের কিয়দংশমাত্র পাওয়া গেছে, নাম ডিরেকসনস এন্ড নেমস অফ দি উইন্ডস। তাঁর বিভিন্ন মতের সংক্ষিপ্তসার হিসাবে তাঁর নামে প্রোবলেমস নামক একটি গ্রন্থ প্রচলিত আছে।

বস্তুত অ্যারিস্টোটলের জ্ঞান ছিল সর্বব্যাপী। প্রকৃতি বিজ্ঞানে তাঁর আরও অজস্র অবদান আছে। অঙ্কশাস্ত্রে লিভার এবং ব্যালান্সের উপর তাঁর রচিত মেক্যানিকাল প্রোবলেমস এবং ইনডিভিজিবল লাইনস বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তাঁর দশখণ্ডে রচিত অ্যানিমাল হিস্ট্রী, চার-খণ্ডে রচিত পার্টস, পাঁচ খণ্ডে রচিত জেনারেশন এবং এক খণ্ডে রচিত মোড অফ প্রোগ্রেশন অফ অ্যানিমালস জীব-বিজ্ঞানের প্রথম গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থাবলী। এ ছাড়া মোশান অফ অ্যানিমালস এবং প্ল্যান্টস নামক দুটি গ্রন্থও তাঁর নামে প্রচলিত।

মনোবিজ্ঞানের উপরেও অ্যারিস্টোটলের অবদান বড় কম নয়। এ বিষয়ে তাঁর তিনখণ্ডে রচিত অন দি সোল বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এ ছাড়া তিনি মনোবিজ্ঞানের উপর অজস্র ছোট ছোট পুস্তিকা রচনা করেছিলেন, যথা—অন দি সেন্সেস, অন দি অবজেক্টস অফ পারসেপশন, অন মেমরী এন্ড রিকালেকশন, অন স্লীপ এন্ড ওয়েকিং, অন ড্রীমস, অন ডিভিনেশন বাই স্লীপ, অন দি লেনথ এন্ড শর্টনেস অফ লাইফ, অন ইয়ুথ এন্ড এজ, অন লাইফ এন্ড ডেথ, অন ব্রীদিং, অন সাউন্ড এন্ড ভয়েস ইত্যাদি। এ ছাড়াও একটি বৃহৎ গ্রন্থ তাঁর নামে প্রচলিত আছে, অন ফিজিওনমি।

এরপর আসে নীতিশাস্ত্রের উপর তাঁর বিখ্যাত রচনাসমূহ—দশখণ্ডে রচিত নিকোম্যাকেন এথিক্স, সাতখণ্ডে রচিত ইউডেমিয়ান এথিক্স এবং দুই খণ্ডে রচিত ম্যাগনা মোরালিয়া। প্রথমটি তিনি তাঁর পুত্র নিকোমাকাসকে উদ্দেশ্য করে লিখেছিলেন, বিষয়বস্তু এবং লেখার ভঙ্গীতে গ্রন্থটি নিশ্চয়ই অ্যারিস্টোটলীয়। দ্বিতীয় গ্রন্থটি সম্ভবত তাঁর ছাত্র রোডসের ইউডেমাস রচনা করেছিলেন এবং তৃতীয়টি হচ্ছে প্রথম দুটি গ্রন্থের সার-সংকলন। এ ছাড়া ভারচুস এন্ড ভাইসেস নামক একটি গ্রন্থও তাঁর নামে চলে। তাঁর নীতিশাস্ত্রের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে সম্পর্কিত হচ্ছে পলিটিক্স, যা আট খণ্ডে রচিত একটি অনবদ্য গ্রন্থ, যদিও তা অসমাপ্ত। এই গ্রন্থে অ্যারিস্টোটল রাষ্ট্রের আদর্শ এবং উপাদান, বিভিন্ন ধরণের সরকার, রাষ্ট্রের কর্তব্য ও শিক্ষাব্যবস্থা সম্বন্ধে আলোচনা করেছেন। ১৫৮টি রাষ্ট্রের সংবিধানের উপর তিনি মূল্যবান গবেষণা করেছিলেন, কিন্তু এ পর্যায়ের একটিমাত্র বই এ পর্যন্ত উদ্ধার করা সম্ভব হয়েছে, কনস্টিটিউসন অফ এথেন্স। এ ছাড়া দুই খণ্ডে রচিত ইকনমিকস-এর নাম অবশ্যই উল্লেখযোগ্য, যদিও দুটির মধ্যে একটি নিঃসন্দেহে প্রক্ষিপ্ত বলে পণ্ডিতেরা মনে করেন।

অংশত তাঁর লজিক এবং অংশত তাঁর এথিক্স-এর সঙ্গে সম্পর্ক রেখে রচিত হয়েছিল তিন খণ্ডে রেটরিক এবং আরও একটি অমূল্য গ্রন্থ পোয়েটিকস, বর্তমানে যা আমাদের হাতে এসেছে খণ্ডীকৃত ও পরিবর্তিত অবস্থায়। শেষোক্ত রচনাটি অ্যারিস্টোটলের মনীষার অপূর্ব কীর্তি। এ ভিন্ন আরও কয়েকটি গদ্যরচনা অ্যারিস্টোটলের নামে চলে। এগুলি হচ্ছে কালার্স, মিরাবিলেস অসকালটাটিয়নেস, মেলিসাস, জেনো ও গর্জিয়াস। তা ছাড়া আছে তেত্রিটি কবিতার সংকলন, নাম পেপলোস। অবশ্য এগুলি অ্যারিস্টোটলের রচনা কিনা সে বিষয় যথেষ্ট সন্দেহ আছে।

অ্যারিস্টোটল তাঁর নিজস্ব রচনাবলী তাঁর প্রিয় ছাত্র থিওফ্রাসটাসের হাতে অর্পণ করে যান। শেষোক্তজন আবার তাঁর শিষ্য নেলেউসকে অ্যারিস্টোটলের রচনা-বলীর উত্তরাধিকারী করে যান। তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর আত্মীয়-স্বজনেরা অ্যারিস্টোটলের রচনাবলী কঠিন আবরণে ঢেকে তাঁর সমাধির নীচে রেখে দেন। আনুমানিক ১০০ খৃস্ট-পূর্বাব্দে টিওসের অ্যাপেলিকন নামক একজন ধনী গ্রন্থ-সংগ্রাহক অ্যারিস্টোটলের রচনাবলী উদ্ধার করেন। সেগুলির তখন শোচনীয় অবস্থা। পরে রোমকরা এথেন্স জয় করে নিলে অ্যারিস্টোটলের রচনাবলীর সুল্লার হাতে গিয়ে পড়ে, যেগুলিকে তিনি রোমে নিয়ে আসেন। রোমের বিখ্যাত ব্যাকরণবিদ টাইরান্নিয়ন ছিন্নবিচ্ছিন্ন জরাজীর্ণ পুঁথিগুলির অনুলিপি করে নেন, এবং সেই অনুলিপির ভিত্তিতে পরবর্তীকালে রোডসের অ্যান্ড্রোনিকাস অ্যারিস্টোটলের রচনাবলীর একটি সংস্করণ প্রস্তুত করেন।

জ্ঞান-বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে অ্যারিস্টোটল অনেক পথের সন্ধান দিয়েছেন, তর্কশাস্ত্র, ব্যাকরণ, অলংকারশাস্ত্র, সাহিত্য সমালোচনা, প্রকৃতিবিজ্ঞান, মনস্তত্ত্ব, শারীরতত্ত্ব এমন বিষয় নেই যার সূত্রপাত তিনি করে যান নি। তিনি ছিলেন অভিজ্ঞতা-বাদী লেখক, বাস্তব ঘটনা পুংখানুপুংখ-ভাবে পর্যবেক্ষণ করে যিনি সিদ্ধান্তে উপনীত হতেন। কোন কিছুই অকারণে ঘটে না, যা কার্যে ব্যক্ত তার মূলে কারণে নিহিত, বিজ্ঞানসম্মত দৃষ্টিভঙ্গীর যা মূল কথা, অ্যারিস্টোটলের প্রতি ছত্রে তা প্রকাশিত।

লেখক হিসাবে অ্যারিস্টোটলের ব্যক্তিত্ব সেই বিরল পর্যায়ে পড়ে যা কালের স্রোতে ধৌত হয়ে যায় না। প্লেটোর মতই তাঁর রচনাবলীর প্রভাব খৃস্টীয় শতাব্দীগুলিতে অনুভূত হয়েছিল যা ছিল বিজ্ঞানসম্মত চিন্তার প্রেরণাস্বরূপ। মধ্যযুগের ইউরোপে অ্যারিস্টোটল কিছুটা ম্লান হয়ে গেছলেন সন্দেহ নেই, কিন্তু সেদিককার ঘাটতি পূরণ করে দিয়েছিলেন আরবীয় পণ্ডিতেরা, যাঁরা অ্যারিস্টোটলের রচনাবলী নিজেদের ভাষায় অনুবাদ করেন। রেনেসাঁশের যুগে ইউরোপে আবার অ্যারিস্টোটল চর্চার পুনরারম্ভ হয় এবং তাঁকে নতুন করে ইউরোপে পরিচিত করার মূলে আরব পণ্ডিতদের অবদান অনেকখানি।

অগ্নিযুগের একটি অধ্যায়

অনন্ত সিংহ

সমস্যার পর সমস্যা

আমাদের প্রস্তুতি-পর্ব প্রায় শেষ করেছি। সামগ্রিক আক্রমণের স্ট্র্যাটেজী (রণনীতি) ও কৌশল আমাদের সামর্থ্য অনুযায়ী ঠিক করে ফেলা হয়েছে। এখন আক্রমণের দিন ধার্য করা ও প্রয়োজনীয় নির্দেশের অপেক্ষায় আছি। কিন্তু দিন স্থির করার পথে বাধার পর বাধা আসছে, সমস্যার পর সমস্যা দেখা দিচ্ছে, একটার পর একটা প্রতিকূল অবস্থার সৃষ্টি হচ্ছে। তবু ঘনিয়ে আসা সময় ও পরিবর্তিত বাস্তব অবস্থার সঙ্গে যে কোন উপায়ে সমন্বয় রেখে সামগ্রিক প্ল্যানটিকে কার্যে পরিণত করবার জন্য আমাদের প্রাণপাত চেষ্টা করতে হয়েছে।

আগে উল্লেখ করেছি যে, চট্টগ্রাম জেলা কংগ্রেসের রাজনৈতিক কন্‌ফারেন্সে গোলযোগ ও মারামারির ব্যাপারে নিম্ন আদালতে ১৯২৯ সালের ২৩শে অক্টোবর চার মাসের জন্য আমার সশ্রম কারাদণ্ড হয়। স্বভাবতই জেলা জজের আদালতে পুনর্বিচার প্রার্থনা করা হয়। জজ কোর্টে আপীলের সুযোগ পাওয়া গেল। আমি জামিনে মুক্ত অবস্থায় বাইরে আছি।

দ্রুতগতিতে প্রস্তুতিকার্য চলছে। এখন আমার জেলে যাওয়া কোনমতেই চলে না। মাস্টারদা, গণেশ, অম্বিকাদা, নির্মলদা সকলেই চিন্তিত হয়ে পড়লেন—যদি জজসাহেব দণ্ড বহাল রাখেন। অম্বিকাদা খুব জোর দিয়ে বললেন যে. তিনি সুভাষবাবু ও শরৎবাবুর সঙ্গে পরামর্শ করবেন এবং জজ কোর্টে পুনর্বিচারের জন্য আপীল করার ব্যবস্থা করবেন। শরৎবাবুর পরামর্শ অনুযায়ী ভালো ব্যারিস্টার নিযুক্ত করবেন। অম্বিকাদা কলকাতায় চলে গেলেন—শরৎবাবুর সঙ্গে পরামর্শ করে প্রসিদ্ধ ব্যারিস্টার মিঃ এন আর দাশগুপ্তকে (সাহিত্যিক নীরদরঞ্জন দাশগুপ্ত) আমার পক্ষে আপীলে সওয়াল করবার জন্য নিযুক্ত করলেন। মিঃ এন আর দাশগুপ্ত চট্টগ্রামে এলেন। জেলা ও সেসন জজ মিঃ লজ-এর কোর্টে আমার পক্ষ সমর্থন করে আপীলে সওয়াল করলেন। কিছুতেই কিছু হলো না। আমার দণ্ড বহাল রইলো। ১৯৩০ সালের ১৭ই ফেব্রুয়ারী সেসন জজ আমার বিরুদ্ধে রায় দিলেন। জজ কোর্টে দণ্ড বহাল রইল বলে নিয়ম অনুযায়ী আমাকে নির্ধারিত দিনে প্রথম বিচারপতির নিম্ন আদালতে যেখানে আমার প্রথম সাজা হয় সেখানে উপস্থিত হওয়া চাই। যতদূর মনে পড়ে, দিন তিন-চারের মধ্যে নিম্ন কোর্টে আমার উপস্থিত হওয়ার আদেশ ছিল।

আর মাত্র দু' মাস পরে ১৯৩০ সালের ১৮ই এপ্রিল চট্টগ্রামের যুব-অভ্যুত্থান হয়েছিল। কাজেই অনুমান করা সম্ভব আমাদের প্রস্তুতি কতখানি এগিয়ে গিয়েছিল। আমার দণ্ড বহাল হয়েছে। দিন তিনেক পরে জেলে যেতেই হবে। এই অবস্থায় কি করা যায়, তা স্থির করার জন্য হেড্ কোয়ার্টারে সভা বসল। দারুণ সমস্যা—যদি আমি এখন চার মাসের জন্য জেলে যাই, তবে আমাদের প্রস্তুতি সমাপ্ত হওয়া সত্ত্বেও কি—অনিশ্চয়তার মধ্যে—আমার মুক্তি পাওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে! চার মাস তো বটেই. তা ছাড়া আরও দু'-এক মাস—যদি মুক্তি পাওয়ার পর প্রস্তুতির জন্য আরও কিছু সময় নিই—বেশি দেরি হতে পারে। এইরূপ অনিশ্চয়তার মধ্যে সামগ্রিক আক্রমণের প্ল্যান কি স্থগিত রাখা যুক্তিসংগত হবে, না কি এখনই আমার আত্মগোপন করা উচিত?

সবার মনে হবে—এই প্রশ্ন আসবেই বা কেন? এটা তো স্বতঃসিদ্ধ যে, আমায় আত্মগোপন করতেই হবে। আপাত-দৃষ্টিতে আমার আত্মগোপনকে সমস্যার সহজ সমাধান বলে মনে হবে। আমরা কিন্তু অত সহজে এই সিদ্ধান্ত নিতে পারি নি। এই সময় যখন আমাদের উপর পুলিশের প্রখর দৃষ্টি নিবদ্ধ আছে এবং আমাদের সন্দেহজনক চলাফেরার প্রতি লক্ষ্য রেখে প্রতি মুহূর্তে তারা উদ্বেগের সঙ্গে দিন কাটাচ্ছে এইরূপ অবস্থায় সামান্য চারটি মাসের কারাদণ্ড ভোগ থেকে নিষ্কৃতি পাওয়ার জন্য যদি আত্মগোপন করি, তবে পুলিশের পক্ষে তাকে কোন এক আসন্ন ঝড়ের লক্ষণ বলে অনুমান করা কি অসম্ভব হবে?

এই কারণে আমার আত্মগোপন করা আমরা কেউ-ই সমীচীন মনে করি নি। অবশ্য দু'-তিন দিনের মধ্যে কোর্টে উপস্থিত হওয়ার পূর্বে সামগ্রিক আক্রমণ চালানো সম্ভবও ছিল না। এইরূপ পরিস্থিতিতে দু'টি পথ আমাদের কাছে খোলা ছিল। কলকাতা হাইকোর্টে পুনর্বিচারের আবেদন করা। সেই ক্ষেত্রে যদি একবার হাইকোর্ট আপীল মঞ্জুর করে তবে আমাকে আবার জামীনে মুক্ত করে আনা সম্ভব। তা হলে সমস্যার সমাধান খুব ভালোভাবেই হয়। আর যদি আপীল নামঞ্জুর হয় এবং অগত্যা আমাকে চার মাস কারাদণ্ড ভোগ করতেই

হয়, তবে সেই অবস্থায় বসে না থেকে, সামগ্রিক প্ল্যানটিকে একটু রদ-বদল করে নতুন অবস্থার সংগে খাপ খাইয়ে নিতে হবে—একটি ছোট দলকে অতর্কিতে জেলের উপর হামলা চালিয়ে আমাকে মুক্ত করে আনতে হবে, যাতে আমিও সামগ্রিক আক্রমণে অংশগ্রহণ করতে পারি। আমাদের সংগৃহীত সমস্ত অস্ত্রশস্ত্র এবং প্রথম শ্রেণীর সমস্ত কর্মীদেরই কাজ ভাগ করে দিয়ে বিভিন্ন দলে বিভক্ত করে দেওয়া হয়ে গেছে। এখন জেল ভাঙার জন্য আবার নতুন কর্মীদল কোথায় পাবো! কাজেই এদের মধ্য থেকে কোন একটি দলকে সরিয়ে এনে জেল ভাঙার কাজে নিযুক্ত করতে হবে। অনেক আলোচনার পর ঠিক হলো ইউরোপীয়ান ক্লাব হাউস আক্রমণ স্থগিত রেখে সেই ছয়জনের দলটি জেল ভাঙার দায়িত্ব নেবে এবং সেইভাবে তারা ইতিমধ্যে উপযুক্ত রণকৌশল গ্রহণ করার জন্য সর্বপ্রকার চেষ্টা করে প্রস্তুত থাকবে। টেলিফোম-ভবন, পুলিশ লাইন, এ এফ আই আর্মারী—এই তিনটি প্রধান শত্রুঘাঁটির উপর আক্রমণ করবার জন্য যাদের নিযুক্ত করা হয়েছিল তাদের কাকেও প্রত্যাহার করা সম্ভব ছিল না।

অম্বিকাদা খুব জোরের সংগে বললেন যে, আপীলের ব্যবস্থা তিনি করবেনই এবং আরও বেশি জোর দিয়ে বললেন যে, কলকাতা হাইকোর্টে পুনর্বিচারের আবেদন গ্রাহ্য হবেই। মাস্টারদা প্রশ্ন করলেন—"কি করে আপনি এত জোর দিয়ে বলছেন?" অম্বিকাদা বললেন—"কি করে বলছি তা তো জানি না, তবে মনে হচ্ছে আপীলের শুনানী গ্রাহ্য হবেই।"

আমি নির্ধারিত দিনে নিম্ন আদালতে উপস্থিত হলাম। আমাকে রীতি অনুযায়ী জেলে পাঠানো হল—এখন আমি জেলের কয়েদী। অম্বিকাদা কলকাতায় গেলেন। তিনি এত গর্ব করে বলে এসেছেন আপীল শুনানীর ব্যবস্থা তিনি যে-কোনভাবেই হোক করবেনই। তাঁর মুখে আমি পরে শুনেছিলাম যে, তিনি ক'টি রাত ঘুমতে পারেন নি, এই ভেবে, যদি কোন অনিশ্চয়তার জন্য শেষ পর্যন্ত আপীলের শুনানী হাইকোর্ট অগ্রাহ্য করে, আর আমাকে জামীনে মুক্ত করা সম্ভব না হয়! এদিকে আমি জেলে বসে বসে বাইরের অবস্থা ভাবছি—কোন কিছু স্থির করতে পারছি না। কেবল মনে হচ্ছিল—যদি আপীল নামঞ্জুর হয়, তবে যে আমাদের স্ট্রাটেজীর রদ-বদল হবে! সেটা কোনমতেই ভালো লাগছিল না।

জেল সুপারিনটেন্ডেন্ট শ্রীজ্ঞান চ্যাটার্জী (সরকারী হাসপাতালের ইনচার্জ, সিভিল সার্জন) আমাদের পারিবারেরও ডাক্তার। তিনি জেলে আমাকে কোন কাজ করতে দিলেন না। তখনও জেলে কয়েদীদের জন্য কোন শ্রেণীভাগ হয় নি। সবাই Division III, অর্থাৎ জাঙিয়া কুর্তা পরতে হবে, সাধারণ কয়েদীদের মত আহারের ব্যবস্থা, লাইনে দাঁড়ানো, 'লাইনে সেলাম' প্রভৃতি নিয়মকানুন মেনে চলার কাঠিন্যের মধ্যে থাকার নাম হল তৃতীয় শ্রেণীর দণ্ডিত আসামী। যা হোক, আমার আর এইসব করার প্রয়োজন হ'ল না। আমাকে সুপারিনটেন্ডেন্ট বললেন—"তোর কাজ হলো—নিজে রাঁধবি আর খাবি।" তিনি বয়সে আমাদের চেয়ে বড় আর পারিবারিক ডাক্তার হিসাবে তিনি আমাকে এইভাবেই সম্বোধন করতেন। জ্ঞানবাবু বিশ্বাস করতেন না যে, আমি রাধিকাবাবুকে লাঠি দিয়ে নিজে আঘাত করেছি। আমার সামনেই তাঁকে অনেকবার জেলারকে বলতে শুনেছি—"আমি বিশ্বাস করি না যে, অনন্ত নিজে কখনও রাধিকাবাবুকে লাঠি দিয়ে আঘাত করেছে।" আমাদের সম্বন্ধে জ্ঞানবাবুর সব সময়ে উচ্চ ধারণা ছিল।

একদিন, দু'দিন, তিনদিন হয়ে গেল কোন খবরই নেই। রোজই মনে করছি, আজই বোধ হয় কলকাতা হাইকোর্ট থেকে টেলিগ্রাম এল—আজই বোধ হয় জামীনে মুক্তি পাবো! এইভাবে আরও তিনদিন আশা-নিরাশা নিয়ে কাটল। সাতদিনের দিন দোলের ছুটি। সুপারিনটেন্ডেন্ট রোজকার মত আজ আর জেল পরিদর্শন করতে এলেন না—ছুটির দিন সাধারণত জেল পরিদর্শন করা হয় না। এই ছুটির দিনে যে আমাকে জামীনে নিশ্চয়ই মুক্তি দেওয়া হবে না বা কলকাতা হাইকোর্ট থেকেও যে কোন খবর আসার সম্ভাবনা নেই, তা স্থির বুঝেছিলাম। যদি কোন সুখবর আসে, তাও আগামীকালের পূর্বে কোনমতে জানার উপায় নাই। তাই দুপুরের খাওয়া-দাওয়া শেষ করে নিশ্চিন্তে ঘুমোচ্ছিলাম, আর প্রতিদিনের মত আগামীকালের অপেক্ষায় ছিলাম—যদি জেল কর্তৃপক্ষ আমাকে জামীনে মুক্তি দেওয়ার নির্দেশ পায়!

প্রায় একটার সময় হঠাৎ পাহারায় রত জেল ওয়ার্ডার খবর দিল যে, আমাকে জামীনে মুক্তি দেওয়ার আদেশনামা জেল অফিসে এসেছে এবং আমি যেন তার সংগে তখনই যাই—জেলার বসে আছেন।

জামীনে মুক্তি পাবো—আর কি তর সয়! মুহূর্তে তৈরি হয়ে জেল গেটে এলাম। দেখি লোকনাথ বল ও আমাদের দলের দশ-পনেরো জন কর্মী এসেছে আমাকে জামীনে মুক্ত করে নিয়ে যেতে। তাদের দেখে আমার আনন্দের সীমা নেই। মনে মনে অম্বিকাদার প্রতি শ্রদ্ধা জানালাম। তাঁর একান্ত চেষ্টায় এটা সম্ভব হয়েছে। পরে যখন অম্বিকাদার সংগে দেখা হল তখন তাঁর কাছে শুনেছি যে, হাইকোর্ট আমার আপীলের দরখাস্ত প্রথমে সরাসরি নামঞ্জুর করে। যখন আপীল নামঞ্জুর হল তখন অম্বিকাদা যেন একেবারে পাগলের মত হয়ে গিয়েছিলেন। কি যে হবে, কি যে করবেন তা যেন ভেবে পাচ্ছিলেন না। তারপর আরও অনেক চেষ্টার পর নাকি 'Motion accepted' হয়। এই Technical terms-এর অর্থ কি এবং Appeal ও Motion-এ পার্থক্য কি তা আমি আজও জানি না। অবশ্য এই বিষয়ে আমাদের জানার কোন প্রয়োজনই ছিল না—প্রয়োজন ছিল মাত্র একটি—আমি কোন-মতে আইন-আদালতের মারফৎ জেলের বাইরে আসতে পারছি কি না!

সেই ক'টি দিন আমাদের সকলের যে কি গভীর উৎকণ্ঠায় কেটেছে তা আমরা ছাড়া আর কেউ জানে না। জেল গেটে এসে লোকনাথ এবং অন্য বন্ধুদের দেখে আমার আনন্দের সীমা-পরিসীমা রইল না। লোকনাথের কাছে শুনলাম, যে, সে জ্ঞান চ্যাটার্জীর পাহাড়ের উপরকার বাংলোতে গিয়ে জামীনে মুক্তি দেওয়ার আদেশনামা তৈরি করিয়ে নিয়ে এসেছে। তারপর যা হয় আর কি! 'বাঁশের চেয়ে কঞ্চি দড়!' জেলারবাবু খেয়ে-দেয়ে ঘুমতে গেছেন। তাঁর ঘুমবার সময়—তিনি এখন উঠবেন কেন? চারটার সময় যখন জেল অফিসে আসবেন, তখন যা করার করবেন। তিনি লোকনাথদের সংগে দেখাও করলেন না। সেপাইকে দিয়ে তাদের খবর পাঠালেন, তারা যেন চারটার সময় আসে। জেলারবাবু তখনও এইরূপ উপেক্ষার গুরুত্ব উপলব্ধি করতে পারেন নি—তাদের ঐভাবে চারটার সময় ফিরে আসতে বললে তার কি প্রতিক্রিয়া হতে পারে তাও আন্দাজ করতে পারেন নি। যেমনটি জেল-সেপাই এসে বলল, জেলারবাবুর নিদ্রার ব্যাঘাত হবে—এখন তিনি কিছু করতে পারবেন না—যেন আবার চারটার সময় আসে, তখন লোকনাথ গর্জন করে উঠল এবং জেলারবাবুর বাড়ির বন্ধ দরজায় সজোরে করাঘাত করতে লাগল—সেপাই-এর কোন বাধাই মানল না। জেলারবাবু বিরক্ত হয়ে বাইরে এলেন—রাগ করে কিছু বলতে যাবেন—কিন্তু লোকনাথের সংগে অতজন বলিষ্ঠ যুবকদের দেখে নিজেকে সামলে নিলেন। লোকনাথ জেলারবাবুকে বলল যে, জামীনে মুক্তি দেওয়ার আদেশ এখুনি দিয়ে দিতে

হবে—তারা কেউ এখনও খায় নি—দেরি তাদের সহ্য হচ্ছে না। জেলারবাবু কোন-রূপ বাগ্‌বিতণ্ডা করতে ভরসা পেলেন না—কারণ সবারই তখন উগ্রমূর্তি।

আমি মুক্তি পেয়ে জেল গেটের বাইরে এলাম। সবাই উল্লাসের সঙ্গে আমাকে অভ্যর্থনা করল। আমিও তাদের অভ্যর্থনার উপযুক্ত জবাব দিলাম। তারা সবাই আবীর ও রং খেলছে—আজ যে দোলের দিন!—আমার দোল খেলা—রং দেওয়া, আবীর মাখা ইত্যাদি কোন-দিনই ভালো লাগত না। আমার বন্ধুরাও খুব একটা রং খেলতো না—অন্তত খুব খেলতো বলে শুনি নি। তবে সেই বিশেষ দিনটিতে হয়ত তারা কেউ আমাকে রং দিয়েছিল। আমি পাল্টা আবীর বা রং কাউকে তখন দিয়েছি কিনা মনে পড়ছে না—আমি তখন খবরের জন্য ব্যস্ত। মাস্টারদা, গণেশ ও অন্যান্যদের খবরাদি নিলাম। তারপর মোটরে সোজা আমার বাড়ি চলে এলাম। আমাদের বাড়ি বোধ হয় জেলখানা থেকে আধ মাইলের মধ্যে হবে।

মা, বাবা, দাদা, দিদি, বৌদির সঙ্গে দেখা হল। দোল-পূর্ণিমার শুভদিনে ছাড়া পেয়েছি বলে সংস্কারগ্রস্ত মনে বাবা, মা আশ্বস্ত হয়েছিলেন সত্যি—কিন্তু এই দোলপূর্ণিমার শুভদিনটি কি সবার জন্য সমান মঙ্গলজনক!

বাইরে বসার ঘরে আমাদের দলের প্রথম সারির চার-পাঁচ জন তরুণ বন্ধু উপস্থিত ছিল। তাদের বসিয়ে রেখে বাড়ির ভিতর এসেছিলাম। স্নান সেরে নিয়ে তৈরি হয়ে তাদের সঙ্গে বেরিয়ে যাব সেই ইচ্ছা ছিল। গণেশের বাড়ি গিয়ে সব খবর আগে নিতে হবে—কোথাও কোন অসুবিধা, বাধা-বিঘ্ন বা কাজে কোন অন্তরায়ের সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে কি না।

আমি তাড়াতাড়ি করে স্নানের ঘরে যাচ্ছি এমন সময় খুব ব্যস্ত হয়ে বসার ঘর থেকে একজন বন্ধু ডাকল—যেন দ্বিরুক্তি না করে আমি তক্ষুণি বাইরে চলে আসি—আমার জন্য একজন অপেক্ষা করছে। এভাবে ব্যস্ত-সমস্ত হয়ে আমাকে ডেকে পাঠানোতে আমি অত্যন্ত বিচলিত হলাম। স্নানের ঘরে আর যাওয়া হলো না। ছুটে বাইরে এলাম কি ব্যাপার জানতে।

দুর্ঘটনা

এক ঘণ্টাও হয় নি আমি জামীনে মুক্তি পেয়ে বাড়ি ফিরে এসেছি। প্রস্তুতি-পর্বের শেষ মুহূর্তে এত বড় সংকট কাটিয়ে উঠেছি—এরই মধ্যে আবার হ'ল কি? কেন একেবারে অধীর হয়ে আমাকে ডেকে পাঠাল?

বাইরে এসে দেখি একজন ভগ্নদূত দুঃসংবাদ নিয়ে এসেছে। প্রথম দৃষ্টিতেই মনে হয় সে খুব বিচলিত। সারা মুখে তার ভীতির চিহ্ন। ভালভাবে কথাও যেন বলতে পারছে না। কথা ভালোভাবে বলতে না পারার কারণ বোধ হয় আমিই। সেই আগন্তুক বন্ধুকে আমি ঠিক চিনি না। যারা আমার বাড়িতে উপস্থিত ছিল তারাও তাকে কেউ চেনে না। আমি ঠিক মনে করতে পারছিলাম না তাকে আগে কোথাও দেখেছি কিনা। আর দেখলেও বা—কোথায় ও কোন সময়ে দেখেছি তা মনে পড়ছিল না। তাই আমি ঘন ঘন তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে তার আপাদ-মস্তক নিরীক্ষণ করছিলাম। যত না বুঝতে চেষ্টা করছিলাম তার চেয়েও বেশি লক্ষ্য করতে চাইছিলাম আমার ঐরূপ উগ্র ও তীব্র দৃষ্টির সামনে তার কি রূপ প্রতিক্রিয়া হয়? বোধ হয় তাকে মাস্টারদার বাড়িতে, অর্থাৎ কংগ্রেস অফিসে কখনও দেখেছি। খুব আবছা আবছা মনে পড়ছে কিন্তু পুরোপুরি কিছু বুঝতে পারছিলাম না সে আমাদের দলের কোন স্তরের ছেলে। গ্রামের ছেলেরা, যাদের সঙ্গে তারকেশ্বর, রাম-কৃষ্ণদের বেশি যোগাযোগ ছিল তাদের সঙ্গে আমরা, অর্থাৎ আমি গণেশ লোক-নাথ প্রভৃতি খুব মিশতাম না—তার কারণ সংগঠনের সেই অংশকে আমরা পুলিশের চোখের অন্তরালে রাখতে চাইছিলাম। শহরের প্রায় সব ছেলেরা আমাদের সঙ্গে খোলাখুলি মিশত বলে তাদের সম্বন্ধে পুলিশ খবর রাখত। এই প্রকাশ্য অংশের সঙ্গে আমরা গ্রামের গোপন বিভাগের খোলাখুলি যোগাযোগ সব রকমে পরি-হার করে চলতাম। সেই জন্য এই বন্ধুকে ঠিক চিনে উঠতে পারছিলাম না।

আমি প্রশ্ন করলাম—তোমাকে আমি কোথায় দেখেছি? তুমি বাড়ি চিনলে কি করে? কে তোমাকে পাঠিয়েছে? তোমাকে এত বিচলিত মনে হচ্ছে কেন? ইত্যাদি ইত্যাদি—।

সে অবশ্য আমার সব প্রশ্নেরই উত্তর দিচ্ছিল। দেখতে পাচ্ছিলাম সে অস্থির হয়ে উঠেছে—আগে সংবাদটি দিতে। সেটি সে আমাকে গোপনে বলতে চাই-ছিল। আমি তাকে নিয়ে অন্য একটি ঘরে গেলাম খবরটি শোনবার জন্য। লেখাটি পড়তে হয়ত দেরি হবে কিন্তু তখন আমি শুধু শুধু সময় নষ্ট করি নি। যত তাড়াতাড়ি পারি আমার প্রশ্ন শেষ করেছি, তাকে বুঝে নিতে চেষ্টা করেছি এবং তৎক্ষণাৎ তাকে একান্তে ডেকে এনেছি। সে যা বলল তাতে আমি খুব শঙ্কিত, বিচলিত ও দুর্ভাবনায় পড়লাম।

সে বলল যে তার নাম শঙ্কর। খবরটা এই—রামকৃষ্ণ ও সে পাথরঘাটার

রামকৃষ্ণের ভগ্নীপতির বাড়িতে Percussion Cap (আঘাতে বিস্ফোরিত হবার মত ক্যাপ) তৈরি করার জন্য বিস্ফোরক দ্রব্য সংমিশ্রণ করছিল। তাদের অসাবধানতার জন্য দারুণ বিস্ফোরণ হয়েছে আর তাতে রামকৃষ্ণের বুক হাত-মুখ ভীষণভাবে পুড়ে গেছে। রামকৃষ্ণ খুব বিপন্ন—সেখানে সে একা আছে। বাড়ি থেকে এক্ষুণি রামকৃষ্ণকে স্থানান্তরিত করা প্রয়োজন। আর বেআইনী সব বিস্ফোরক দ্রব্য তৈরি করার যন্ত্রপাতিও কালবিলম্ব না করে সরিয়ে ফেলা অত্যাবশ্যক। রামকৃষ্ণ তাকে এই বলে আমার কাছে পাঠিয়েছে। আরও বলল যত শীঘ্র সম্ভব রামকৃষ্ণকে First aid দিতে হবে এবং ডাক্তার দেখাবার বন্দোবস্ত না করলেই নয়।

আমি নিশ্বাস বন্ধ করে সব শুনলাম। কি ভয়ানক কান্ড! কি সংকট-পূর্ণ মুহূর্ত! এইমাত্র জেল থেকে এলাম। এখনও শেষ প্রস্তুতির জন্য যা যা বাকি সে সব আমাদের দ্রুত সারতে হবে। এখন আবার এই এক নতুন বিপদ। মনে মনে বললাম—আসুক বিপদ, আমরা ভয় করবো না। বিপদ আছে আঘাত আছে—তাইত বক্ষে পরাণ নাচে! বিপদ আসুক, বাধা আসুক—আসুক শত বিঘ্ন; তারই মধ্যে পথ করে নিয়ে যেতে হবে। এইরূপ কঠিন পরীক্ষার মধ্যে আমাদের এগোতে হবে—তাই তো জানতাম এবং আমাদের সাথীদেরও এতদিন তাই শিখিয়েছি। যখন অপ্রত্যাশিত ঘটনা ঘটেছে তখন তার সম্মুখীন হতেই হবে—এ বিষয়ে কোন দ্বিধাই থাকতে পারে না।

তবে দ্বিধা এসেছিল—এবং ভাবছিলাম পুলিশের কোন ফাঁদ নয় তো? সে কি করে জানল যে আমি আজ এক্ষুণি ছাড়া পেয়ে এসেছি? কেন সে গণেশের বাড়ি গেল না? এই সব প্রশ্ন একটার পর একটা খুব দ্রুতভাবে মনকে আলোড়িত করছিল এবং সঙ্গে সঙ্গে শঙ্করকে আমি তন্ন তন্ন করে দেখতে চেষ্টা করছিলাম। খবর যে রকম সাংঘাতিক তাতে যেমন দ্বিরুক্তি বা বিলম্বের অবকাশ ছিল না, তেমনি আবার বোকার মত পুলিশের ফাঁদ বা খপ্পরে গিয়ে পড়ব তাও ভাবতে পারছিলাম না। তবু যত বিপদের সম্ভাবনা থাকুক না কেন রামকৃষ্ণের অবস্থাও ঐরূপ দুর্ঘটনা সম্বন্ধে জানার পর স্থির থাকা সম্ভব ছিল না। তাই মনে সন্দেহ থাকা সত্ত্বেও বিপদের সম্মুখীন হতেই হবে।

আমার সাতদিনের অনুপস্থিতিতে আমার পিস্তলটি দিদির হেফাজতে আমার বাক্সে রেখে গিয়েছিলাম। ছুটে বাড়ির ভিতর গেলাম—পিস্তলটি নিয়ে তক্ষুণি ফিরে এলাম। শঙ্করকে সঙ্গে নিয়ে মোটরে গণেশের বাড়ি গিয়ে পৌঁছলাম। গণেশকে সব জানালাম, নরেশ আর বিধুকে তাদের নিজ নিজ রিভলবার নিয়ে আমার সঙ্গে আসতে বললাম। গণেশকে সাবধানে থাকতে বলে ও এটা যদি পুলিশের কোন ফাঁদ হয় তবে ভবিষ্যৎ সামলাতে বলে আমরা চারজন—নরেশ, বিধু, শঙ্কর ও আমি পাথরঘাটার বাড়ির (দুর্ঘটনা যেখানে ঘটেছে) উদ্দেশ্যে রওনা হলাম। পথে তাদের সঙ্গে প্ল্যানটা করে ফেললাম—শঙ্কর প্রথমে দেখে আসবে এবং আমাদের নির্দেশ মত রামকৃষ্ণকে গাড়িতে তুলে দেবে। শঙ্কর গাড়ি থেকে নামলেই নরেশ, বিধু ও আমি আমাদের কৌশল অনুযায়ী position নিয়ে অপেক্ষা করব। যদি পুলিশের ফাঁদ হয় তবে যেন তাকে কৌশলে পরাভূত করে আমরা উধাও হতে পারি তার জন্য প্রস্তুত হয়ে থাকব। শঙ্কর চলে গেল। আমরা অপেক্ষা করছি। শঙ্কর খুব তাড়াতাড়ি ফিরে এসে সংকেত দিল। আমরা ইঙ্গিতে জানালাম রামকৃষ্ণকে নিয়ে আসতে।

অর্ধদগ্ধ অবস্থায় দিনের বেলায়—দুপুর তিনটে নাগাদ রামকৃষ্ণ আমার গাড়িতে এসে উঠল। আশে-পাশে সন্দেহজনক কিছু চোখে পড়ল না। আমি কেবল রামকৃষ্ণ ও নরেশকে সঙ্গে নিলাম। বিধুকে পাঠালাম গণেশের কাছে সব খবর জানাতে। রামকৃষ্ণকে গাড়িতে নিয়ে আমরা তক্ষুণি সে স্থান ত্যাগ করলাম। কিন্তু যাব কোথায়? আগে থেকে গোপন Shelter (আশ্রয় স্থান) ঠিক করে না রাখলে ঐ রকম অগ্নিদগ্ধ অবস্থায় আত্মগোপন করে থাকতে পারবে তেমন কোন নিরাপদ বাড়ি তক্ষুণি পাবো কোথায়? যেভাবে শরীরের উপরের অর্ধেক পুড়ে গেছে তা কাপড় দিয়ে ঢেকে রাখাও সম্ভব নয়। পোড়া স্থানের এক বীভৎস দৃশ্য। ক্ষতস্থান ঢাকা দেওয়া সম্ভব নয়—ব্যান্ডেজ করে রাখাও যায় না। ঐ অবস্থায় কার বাড়িতে আশ্রয়ের আশায় যাব? কোন ডাক্তারকে দিয়েই বা চিকিৎসা করাবো? সমস্যার আর অন্ত নেই! বর্তমানে রামকৃষ্ণের আশ্রয়স্থল হল আমার গাড়ি আর ডাক্তার হলো আমাদের দুইজন প্রথম শ্রেণীর সদস্য নরেশ আর বিধু। দুজনেই চট্টগ্রাম মেডিক্যাল স্কুল থেকে সবে মাত্র কৃতিত্বের সঙ্গে পাশ করেছে। বিধু স্বর্ণপদকও পুরস্কার পেয়েছিল। রামকৃষ্ণের প্রাথমিক চিকিৎসা নরেশ ও বিধুই করেছে। কিন্তু তারাও অবস্থার গুরুত্ব বুঝে কোন বড় ডাক্তার এনে চিকিৎসা করা যায় কিনা তার চেষ্টা করতে বলল আমাদের।

গাড়িতে নিয়ে আর কতক্ষণ ঘোরা যায়? কোন আশ্রয়ে গিয়ে তো উঠতেই হবে! দু-একটি জায়গায় খোঁজ করা হল কিন্তু তাদের অমত থাকাতে কোন সাহায্য পাওয়া গেল না। শেষ পর্যন্ত মাত্র দুদিনের জন্য একটা আশ্রয় পাওয়া গেল এক Sympathiser (সহানুভূতিশীল ব্যক্তি)-এর বাড়িতে। সেই বাড়িটি কার ছিল তা আজ আর মনে পড়ছে না। সেই বাড়িতে রামকৃষ্ণকে নামিয়ে দিয়ে সোজা গণেশের বাড়ি চলে গেলাম। গণেশ, মাস্টারদা ও আমি পরামর্শ করে ঠিক করলাম যে, আমাদের সংগঠনের প্রকাশ্য অংশের সভ্যদের উপর রামকৃষ্ণকে দেখা শোনার ভার না থাকাই উচিৎ। তাই সবরকম তত্ত্বাবধানের প্রত্যক্ষ ভার দেওয়া হল তারকেশ্বর দস্তিদারের উপর। তারক সংগঠনের গোপন অংশের সঙ্গে প্রত্যক্ষ যোগাযোগ রেখে চলত। তারকেশ্বর দস্তিদার তখন খুব সম্ভব B. sc. Final পরীক্ষা দিয়েছে। তার গতিবিধি খুব গোপন ছিল—অর্থাৎ শরীরচর্চার ক্লাবে বা স্বেচ্ছাসেবক বাহিনীর সংগঠনে যোগ দিত না। মাস্টারদার সাথে এক সঙ্গে তারকেশ্বর দস্তিদারের একই দিনে ফাঁসী হয়েছে। সে মর্মান্তিক ঘটনার বিবরণ এই কাহিনীর যথাস্থানে বিবৃত করবো।

তারকেশ্বর দস্তিদারের মত দায়িত্বশীল কর্মীর উপর এই গুরুভার ন্যস্ত হ'ল। অন্যান্য সর্বপ্রকার ব্যবস্থার সঙ্গে সঙ্গে তারককে বললাম—সে যেন একদিনের মধ্যেই একটি বাড়ি ভাড়া করে এবং কোন উপযুক্ত বিশ্বাসী সভ্যকে সেই বাড়িতে রামকৃষ্ণের তত্ত্বাবধানের জন্য নিযুক্ত করে। এদিকে চিকিৎসার জন্য বড় ডাক্তার দেখানো প্রয়োজন। কে ভার নেবে? গণেশ স্বয়ং ভার নিল—রামকৃষ্ণকে চিকিৎসা করবার জন্য কোন বড় ডাক্তারকে অনুরোধ করবে। স্বর্গীয় জগদানন্দ বিশ্বাস চট্টগ্রামে তখন নাম করা ডাক্তার। গণেশের সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠ পরিচয় ছিল। ডাক্তারবাবু আমাদের প্রতি খুবই অনুরক্ত ছিলেন—আমাদের শরীর গঠন, স্বেচ্ছাসেবক বাহিনীর নিয়মানুবর্তিতা প্রভৃতি দেখে তিনি খুব আনন্দ পেতেন—আমাদের উৎসাহ দিতেন। যতটুকু জানা ছিল তিনি আমাদের একজন সমর্থক ও আমাদের প্রতি সহানুভূতিশীল। আমাদের সঙ্গে তিনি কখনও বিশ্বাসঘাতকতা করবেন বলে মনে করি নি। যদি কোন কারণে আমাদের সঙ্গে তিনি একমত হতে নাও পারেন তবু বিরুদ্ধে যাবেন

একজন শিক্ষিকার কাহিনী

সুনীলকুমার চট্টোপাধ্যায়

কৃপণ আকাশ তাকে দেয়নিকো ছিটেফোঁটা আলো আর হাওয়া,
কালো দেহ আরো কালি করতে সূর্য ছোঁড়ে খর আগুনের তাপ;
যৌবন ছিল কি তার কোনোদিন? এখন সে যেন মজে-যাওয়া
শীর্ণ নদী। বসন্ত-মর্মর তার কাছে শুধু প্রমত্ত প্রলাপ।
কলকণ্ঠ কোকিলেরা বৃথাই পাঠায় তাকে গানের অঞ্জলি;
'অন্নচিন্তা চমৎকারা'—নিঃসঙ্গ আঁধারে তা-ই ভাবে সে কেবলি।

স্কুলের শিক্ষিকা হেনা। বহু কষ্টে খুঁজে-খুঁজে মনের মতন
রেবার দিয়েছে বিয়ে। পাত্র এক খাঁটি হীরে—মেড-ইন-জার্মানী।
রেখারও সুযোগ্য বর বিত্তবান সুশ্রী কৃতী—মেড-ইন-লন্ডন;
বুকের পাষাণভার নেমে গেছে, বোনেরা হয়েছে রাজরাণী।

ব্যাঙ্কের প্রচুর দেনা শুধতে হবে। অপোগণ্ড আরো গুটিকয়
ভাইবোনকে মানুষ করতেই হবে। তাই তিনটে টিউশানি করে।
বলদের জোয়ালের মতো কাঁধে চেপে আছে নির্দয় সময়;
অস্থিচর্মসার দেহে বাড়ি-বাড়ি ফেরে হেনা রোদ-বৃষ্টি-ঝড়ে।

একদিন সে তাড়াতাড়ি পথ পার হতে গিয়ে কলার খোসাতে
পা পিছলে যাচ্ছিল পড়ে, ছুটন্ত মোটর এসে ধাক্কা দিল তাকে;
সে-গাড়িই হাসপাতালে নিয়ে গেল। ডান হাতে মাথায়-পাঁজরাতে
চারদিকে ব্যান্ডেজ বাঁধা—জ্ঞান হয়ে দেখল হেনা, উদ্গত কান্নাকে
চেপে বলল ঃ বলুন ডাক্তারবাবু, বাড়ি ফিরতে কত দেরি আর?
চোখে ভাসছে মরা-বাপ-মায়ের—গচ্ছিত-রাখা বিচিত্র সংসার।

বলে কখনও ভাবি নি। গণেশের বিশ্বাস ছিল—জগদাবাবুর কাছে গিয়ে যদি এই বিপদে সাহায্য চাওয়া যায়, তবে তিনি কখনও বিমুখ করবেন না। গণেশ জগদাবাবুর কাছে সাহায্য চাইল। সব খুলেই তাঁকে বলা হ'ল—কারণ তিনি ডাক্তার এবং আমাদের দরদী বন্ধু। তিনি যদি মনে করেন যে, তাঁকে মিথ্যা বলছি এবং বিস্ফোরণে দগ্ধ হয়েছে সে কথা গোপন করছি তাহলে তার প্রতিক্রিয়া আমাদের অনুকূলে না গিয়ে বরং বিরুদ্ধে যাওয়ার সম্ভাবনা। তাই তাঁর কাছে গোপন না করাই বাঞ্ছনীয় বলে গণেশ মনে করেছিল। তাতে আমাদের পক্ষে ফল যে খুবই ভালো হয়েছিল সে কথা পরে বলছি।

জগদাবাবু গণেশের সঙ্গে এসে রামকৃষ্ণের চিকিৎসার ভার নিলেন। ডাক্তারবাবুকে আনার ও নেওয়ার ব্যবস্থা এমনভাবে করতে হ'ত যেন রামকৃষ্ণের অবস্থান সংবাদ গোপন থাকে। আমাদের খুব কঠোর নির্দেশ ছিল—রামকৃষ্ণকে যে বাড়িতে আমরা রেখেছি সেই বাড়িতে যেন ডাক্তারবাবুকে কখনও নেওয়া না হয়। তিনি অন্য কোন একটি বাড়িতে রামকৃষ্ণকে পরীক্ষা করবেন এবং অবস্থা অনুযায়ী ঔষধ পথ্য প্রভৃতির নির্দেশ দিয়ে চলে যাবেন। আর ডাক্তারবাবু চলে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আমাদের পূর্ব নির্ধারিত ব্যবস্থা অনুযায়ী রামকৃষ্ণকে তার স্থায়ী আশ্রয়ে স্থানান্তরিত করতে হবে। এই ভাবে খুব সন্তর্পণে এবং সব দিকে খুব নজর রেখে আমাদের চলতে হয়েছিল। কারণ রামকৃষ্ণের ভগ্নীপতি সরকারী চাকরী করতেন এবং তার ওপরও উন্নতির আশায় সব কিছু করতে পারেন বলে আমাদের ধারণা ছিল।......ধারণা আমাদের ভুল হয় নি—প্রথম সুযোগেই রামকৃষ্ণ বিশ্বাসের ভগ্নীপতি কালীপ্রসন্ন বাবু অফিস থেকে বাড়ি ফিরে সমস্ত ঘটনাটা তাঁর ছোট মেয়েটির কাছে শুনলেন। আর কাল বিলম্ব করা তাঁর পক্ষে সম্ভব হল না—পাছে তাঁর পদোন্নতিতে ব্যাঘাত আসে বা চাকরী যায়! তিনি সোজা গিয়ে পুলিশের কাছে ঘটনার আদ্যোপান্ত বিবরণ দিলেন। তারপর পরবর্তী অধ্যায়টি সুরু হল—পুলিশ ও আমাদের মধ্যে দারুণ প্রতিযোগিতা, কে কাকে পরাস্ত করতে পারে!

নিজ মুখে না বলে সরকারী পক্ষের ভাষা থেকেই আমি উদ্ধৃতি দিচ্ছি। আমাদের মামলার রায়ে লিপিবন্ধ আছে ঃ—

"The circumstances in which Ramkrishna's injuries were caused, his hasty removal from his brother-in-law's house and concealment in one house after another in different parts of the town, the arrangements made for his medical treatment and nursing by Ganesh Ghosh and associates, his subsequent complete disappearance, all indicate according to the prosecution that Ramkrishna had been injured while engaged in a criminal activity on behalf of the party, viz, the preparation of a bomb." (Judgement Copy Page 11, of Armoury Raid case No. 1 of 1930).

জজসাহেব সাক্ষ্য-প্রমাণ আলোচনার পর উপরের ক'টি লাইনে ব্যক্ত করলেন—রামকৃষ্ণকে যেভাবে আমরা নিমেষে সরিয়ে নিয়ে গেলাম, তার পর একটার পর একটা বাড়ি বদল করে ও সর্বশেষে তাকে সম্পূর্ণভাবে লুকিয়ে রাখতে সমর্থ হলাম, এবং লুকিয়ে রেখে ডাক্তার ও নার্সের ব্যবস্থা যেভাবে গণেশ ও আমরা সফলতার সঙ্গে করেছি তাতে সন্দেহের কোন অবকাশ থাকে না যে, রামকৃষ্ণ বিশ্বাস আমাদের দলের জন্য সেই বাড়িতে বিস্ফোরক দ্রব্য তৈরি করছিল।

জজসাহেবের আক্ষেপ করবার যথেষ্ট কারণ আছে। সেই আক্ষেপ তিনি পক্ষান্তরে করেছেনও। কিন্তু এইখানেই এই পর্ব শেষ হয় নি—আমাদের সমস্যা আরও বেড়ে যেতে লাগল এবং পুলিশের কর্মতৎপরতাকে বার বার পরাস্ত করে এগিয়ে যেতে লাগলাম।

[ক্রমশঃ]

রঙ্গমঞ্চ ওদেশে এবং এদেশে

দীপালি

শঙ্খধ্বনি ঃ দ্বিতীয় অঙ্কের দ্বিতীয় দৃশ্যে দেখি কেতনলাল নিজের বাড়িতে শয়নকক্ষে অসুস্থ অবস্থায় অর্ধশায়িত—সেখানে রয়েছেন বৈদ্যরাজ ও শ্রীগৌরী। কথোপকথনের ভেতর থেকেও স্পষ্ট বোঝা যায় যে, কেতনলালের অসুখের আসল কারণ হচ্ছে তার অবচেতন মনের, ফুলচাঁদ জহুরীকে হত্যা করার জন্য তীব্র অনুশোচনা।

যাই হোক কেতনলাল ব্যগ্র আগ্রহে অজিতের আগমনের প্রতীক্ষা করছে—সে এসে উপস্থিত হলেই তার সঙ্গে নিজের মেয়ের বিয়ের ব্যাপারটা সম্পন্ন করবে—তাকে প্রচুর যৌতুক দেবে—সুতরাং এই নিম্নস্তরের সদর কোটালের কাজ অজিতকে আর করতে হবে না। অজিতের মত কর্মদক্ষ লোক যদি ফুলচাঁদের হত্যার তদন্ত পরিত্যাগ করে, তাহলে আর কারোর সাধ্য নেই যে কেতনলালকে ফুলচাঁদ জহুরীর আসল হত্যাকারী বলে প্রতিপন্ন করবে।

এরপর অজিত আসে এবং জানায় যে, ফুলচাঁদের হত্যাকাণ্ডের ব্যাপারে যে সব কাজগপত্র কোতোয়ালিতে ছিল সে সব দেখতে শুনতেই তার এত সময় লেগেছে এবং এই জন্যই তার দেরি হয়ে গেছে। অজিত কথায় কথায় বলে যে, তার ধারণা যে পাহাড়ের গায়ে যে সব চূণের ভাঁটি আছে, যাতে পাথর পুড়িয়ে চূণ করা হয়, হত্যাকারী নিশ্চয়ই ওরই একটার মধ্যে ফুলচাঁদের দেহটা ফেলে পুড়িয়ে ছাই করে ফেলেছে—তাই তার দেহটা পর্যন্ত সে সময় লুপ্ত হয়ে গিয়েছিল। শুনে ভয়ে শিউড়ে ওঠে কেতনলাল—কারণ সত্যি সত্যিই ব্যাপারটা এইভাবেই ঘটেছিল।

এরপর কেতনলাল অজিতকে বলে যে, পূর্ণার সঙ্গে বিয়ের পর সে রাজার ঐশ্বর্য লাভ করবে এবং রাণাকে বলে তাকে সর্দারের পদমর্যাদা দেবার ব্যবস্থা করবে কেতনলাল। সুতরাং আর তার এ-হীন কোটালের কাজ করবার দরকার নেই। অজিতও এ প্রস্তাবে সম্মতি জানায়। বিয়ের ব্যাপার চুকে যায়। উৎসবান্তে যে যার ঘরে চলে যাবার পর কেতনলাল দ্বার অর্গলবন্ধ করে শয্যা গ্রহণ করে। আজ সে পরম নিশ্চিন্ত—অজিতকে আত্মীয়তার বন্ধনে বেঁধে ফেলেছে। আর তার ভয় কিসের। তারপর দেখি নিদ্রিত অবস্থায় কেতনলাল উঠে দাঁড়িয়েছে—এরপর সুরু হয় কেতনলালের একক স্বপ্ন দর্শনের অভিনয়—তাকে যেন বিচারালয়ে আনা হয়েছে—ফুলচাঁদ জহুরীকে হত্যার অভিযোগে সে অভিযুক্ত।

স্বপ্নের প্রভাবে কেতনলাল মনে করে তাকে ফাঁসীর দড়িতে ঝুলিয়ে দেওয়া হচ্ছে—গলায় হাত দিয়ে সে চিৎকার করে ওঠে—উঃ দম বন্ধ হয়ে গেল—দড়িটা কেটে দাও—ফাঁসীর দড়িটা এখুনি কেটে দাও! এই যে,—এই যে অজিত! অজিত! তুমি এসেছ? আমাকে ফাঁসী দেবার জন্য নিয়ে যেতে এসেছ? বিশ্বাসঘাতক — বিশ্বাসঘাতক! তুই আমাকে ধরিয়ে দিয়েছিস। তুই আমাকে ধরিয়ে দিয়েছিস! ফুলচাঁদকে হত্যা করে—আমি তার দেহ চূণের ভাঁটির মধ্যে ফেলে দিয়েছিলেম,—সে তুই ছাড়া কে জানতো? তুই বরাবর জানতিস। আমি ফুলচাঁদের হত্যাকারী,—এখন নিজের কার্য সিদ্ধ করে, আমার কন্যার পাণিগ্রহণ করে এখুনি আমাকে ধরিয়ে দিয়ে নিষ্কণ্টক হতে চাস? আমার অতুল সম্পত্তি নিরাপদে ভোগ করতে চাস্? বিশ্বাসঘাতক—না—না—না — না—এ কি—একি—এ সব কি স্বপ্ন? স্বপ্ন? হ্যাঁ—তাই তো—তাই তো—এই তো আমার নিজের কক্ষ!

*   *   *

ঐ ঐ—আবার—আবার শাঁক বাজাচ্ছে। ঐ যে—ঐ যে ফুলচাঁদ—তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে তাকিয়ে রয়েছে আমার দিকে! চোখ ফেরাও চোখ ফেরাও! ওঃ—ওঃ—আর না—আর না—থামাও শঙ্খধ্বনি—বন্ধ কর শঙ্খধ্বনি—আমি শুনতে চাই না শঙ্খধ্বনি! আবার—আবার শঙ্খধ্বনি? তবে হোক—হোক্ শঙ্খধ্বনি। অনন্ত—অনন্তকাল ধরে চলুক "শঙ্খধ্বনি"!!!

(বিকট চিৎকার ও মৃত্যু)

এবার The Bells নাটকের তৃতীয় অঙ্কের শেষাংশ থেকে কিছুটা তুলে দিচ্ছি ঃ

Mathias: Yes, yes, I have crossed the fields! (Pointing) Here is the old bridge, and there below the frozen rivulet! How the dogs howl! as Daniel's farm—how they howl! And old finck's forge, how heightly it glows upon the hillock. (Low, as if speaking to himself). Kill a man!—kill a man! You will not do that, Mathias—you will not do that! Heaven forbids it (Proceeding to walk with measured steps and bent body.) You are a fool! Listen, you will be rich, your wife and child will no longer want anything! [The jew came; so much the worse—so much the worse. He ought not to have came!] You will pay all you owe; You will no more be in debt (Loud, in a broken tone.) It must be, (Mathias,) that you kill him! (He listens) No one on the road—no one! (With an expression of terror) What dreadful silence! (He wipes his forehead with his hand.) One o'clock strikes, and the moon shines.

[Ah!] One! One!! The Jew has [already] passed. Thank God! Thank God! (He kneels, a pause; he listens; the Bells heard without as before.) No. The Bells! The Bells! He comes! (He bends down in a watching attitude, and remains still. A pause. In a low voice.) You will be rich—you will be rich—(you will be) rich! rich! (The noise of the Bells increases. The crowd express alarm simultaneously. All at once Mathias springs forward, and with a species of savage roar, strikes a terrible blow with his right hand.) Ah! ah! [I have you now] Jew! (He strikes again. The crowd simultaneously express horror. Mathias leans forward and gazes anxiously on the ground. He extends his hand as if to touch something, but draws it back in horror.) He does not move! (He raises himself, utters a deep sigh of relief, and looks round.) The horse has fled with the sledge!

(The Bells cease. Kneeling

down). Quick, quick! The girdle! I have it. Ha! (He performs the action in saying this of taking it from the Jew's body and buckling round his own.)

[It is full of gold, quite full.] It is full of gold, gold, full of gold, quite full. Be quick, Mathias, be quick! Carry him away.

Mesmerist: Where are you going?

Mathias: (stopping.) To the lime kiln. I am there (He appears to throw the body upon the kiln.) How heavy he was! (He breathes with force, then he again bends down to take up a pole. In a hoarse voice.) Go into the fire,

প্রত্যেকের জন্য সঞ্চয় পরিকল্পনা

এঁদের কথাই ধরুন-না।

শ্রীরিয়াজ আহমেদ

ইনি বাস্তববাদী। সঞ্চয়ের উপযোগীতার কথা ইনি ভালোই জানেন। প্রতি মাসে ইনি ১০০৲ সেভিংস সার্টিফিকেট কেনেন। এ থেকে ১০ বছর পরে এঁর প্রতি মাসে ১৮০৲ ক'রে নিয়মিত আয় হবে।

শ্রীমতী টি, এস, সুন্দরম্

ভারী গোছানো গৃহকর্ত্রী। ইনি আয় বুঝে ব্যয় করেন। প্রতি মাসে ইনি কিউমিউলেটিভ টাইম ডিপজিট অ্যাকাউন্টে ১০৲ ক'রে জমা দেন। ১৫ বছর পরে এ থেকে উনি ২,৬০০৲ পাবেন। ওঁর মেয়ের বিয়ের সময়ই টাকাটা হাতে আসবে।

ছোট্ট তপন ঘোষ

নিজের পোস্ট অফিস সেভিংস ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট নিয়ে ভারী খুশি। হাত-খরচের টাকার কিছুটা সে এতে নিয়মিত জমা দেয়। অল্প বয়স থেকেই ওর সঞ্চয়ের সুঅভ্যাস গ'ড়ে উঠছে।

তিনজন বিভিন্ন ব্যক্তির বিভিন্ন প্রয়োজন জাতীয় সঞ্চয় পরিকল্পনা এর সবগুলিই মেটায়

এগুলি এবং অন্যান্য জাতীয় সঞ্চয় পরিকল্পনা সম্পর্কে আপনার পোস্ট অফিসে খোঁজ নিন

জাতীয় সঞ্চয় সংস্থা

DA 6E/339 BENGALI

jew, go into the fire! (He appears to push the body with the pole, using his whole force, suddenly he utters a cry of horror and staggers away, his face covered with his hands. [Those eyes, oh, those eyes! How he glares at me). Look, look, look, look—those eyes, oh, those eyes! How he glares at me.

* * * *

Mathias: (In a voice of strangulation) The rope! the rope! Cut the rope!] (He falls suddenly, and is caught in the arms of Hans and Walter, who carry him to the chair in centre of stage. The Bells heard off—music, the melody played in the second Act when promise given, his hands clutch at his throat as if to remove something that strangles him.)

Mathias: [In a voice of strangulation) Take the rope from my neck—take the rope from my neck! (He looks pitifully round, as if trying to recognize those about him, and then his head falls on his breast—Catherine, kneeling, places her hand on Mathias's heart.

Catherine: Dead. (The Bells cease).

(Annette bursts into tears—the women in the crowd kneel; the men remove their hats and bend their heads upon their breasts—tableau.)

Curtain

এড্ওয়ার্ড গর্ডন ক্রেগ তাঁর হেনরী আরভিং-এর জীবনীতে 'দি বেল্স নাটকে' আরভিং-এর অভিনয় সম্বন্ধে যে সব কথা লিখেছেন তার কিছু কিছু অনুবাদ করে তুলে দিচ্ছি ঃ

ব্রডরিব (আরভিং-এর আসল নাম) যেদিন আরভিং হবার জন্য প্রস্তুত হচ্ছিলেন সে দিনটা হচ্ছে যেদিন তিনি ১৮৫৬ সালে সান্ডারল্যান্ডে অভিনয়ে যোগ দেন। কিন্তু যেদিন তিনি আরভিং হলেন সেদিনটা হচ্ছে ১৫ বছর বাদে, ১৮৭১ সালের ২৫শে নভেম্বর অর্থাৎ যেদিন তিনি 'দি বেলস' প্রডিয়ুস করলেন এবং তাতে অভিনয় করলেন।

শিল্পী তাঁর কেরিয়ার শুরু করেন সেদিন যেদিন তিনি তাঁর মাস্টারপিস সম্পূর্ণ করেন। মাস্টারপিস আসলে একটিই হয়। যদিও অনেক সময় বহুবচনে এই শব্দটির ব্যবহার করা হয়ে থাকে। 'দি বেল্স' হচ্ছে আরভিং-এর মাস্টারপিস—এ নাটকটিই তাঁকে মাস্টার হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করেছিল।

* * *

আমার বয়স যখন ২৫ তখন লাইসিয়াম থিয়েটারে 'দি বেলস' নাটকটি দেখে আমি উত্তেজিত হয়ে উঠেছিলাম—আমি জানি আমার দ্বিগুণ বয়সের বহু লোকও সেদিন আমারই মতন উত্তেজনা অনুভব করেছিলেন।

[এখানে ক্রেগ খুব একটি বড় কথা বলেছেন। গ্রেট এ্যাকটিং দেখবার সময় প্রত্যেক দর্শকেরই এই উত্তেজনার অনুভূতি হয়—উদাহরণস্বরূপ শিশিরকুমারের চাণক্য, আলমগীর, রঘুবীর, নাদির শা, মাইকেল প্রভৃতি ভূমিকায় অভিনয়ের কথা স্মরণ করুন। বারবার দেখা সত্ত্বেও, আবার দেখতে গিয়ে ঐসব রোলে শিশিরকুমারের অভিনয় হত সত্যি-সত্যিই exciting. এইভাবে দর্শককে উত্তেজিত করে তোলবার ক্ষমতা বর্তমানের কোন অভিনেতার ভেতর দেখা যায় না।]

* * *

১৮৭১ সালের নভেম্বর মাসে লাইসিয়াম থিয়েটারের কতৃত্বভার আসে আমেরিকান ম্যানেজার কর্নেল বেইটম্যানের হাতে। যুবক ব্রডরিব এখানে এসে কাজ নিলেন—তখনও তিনি হেনরী আরভিং হিসাবে আত্মপ্রকাশ করবার অবকাশ পান নি। এরপর এখানে খুবই ইণ্টারেস্টিং অবস্থার উদ্ভব হল। দেখা গেল একজন আমেরিকান লন্ডনে একটি বড় থিয়েটার পরিচালনার চেষ্টা করছেন। বেইটম্যান নিজের বিচারবুদ্ধি এবং ইন্সটিংকটের অনুপ্রেরণায় একজন অভিনেতাকে কাজে নিয়েছেন যিনি মাস দুয়ের ভেতর তাঁর সময়কার শ্রেষ্ঠ অভিনেতা হিসাবে পরিণত হবেন। তবুও এই সুদক্ষ এবং কৌশলী পরিচালকটি দ্বিধা করছিলেন তাঁর হাতের ট্রাম্প কার্ডটিকে ঠিকভাবে কাজে লাগাতে।

এই দ্বিধার প্রথম কারণটি খুবই স্বাভাবিক। তিনি এ সময় ব্রডরিব সম্বন্ধে বিশেষ চিন্তা করছিলেন না। আসল চিন্তা কেন্দ্রীভূত হয়েছিল নিজের সতের বছরের মেয়ে ইজাবেল বেইটম্যানের উপর—বেইটম্যানের আন্তরিক বাসনা ছিল ইজাবেলকে বিশেষভাবে যশস্বী করে তুলবেন। ধীরে সুস্থে চিন্তা করে বৃদ্ধ বেইটম্যান একটি নাটক বেছে ঠিক করলেন—তাঁর ধারণা হল এটি স্টেজ করিয়ে তিনি যশ, অর্থ এবং খ্যাতি অর্জন করতে পারবেন। ম্যাডাম জর্জ স্যান্ডের একটি গল্পের—La petite fadelte—উপর ভিত্তি করে নাটকটি লেখা। এটি মঞ্চস্থ করলে বিরাট সাফল্য হবেই—ভেবেছিলেন বেইটম্যান।

নাটকটি কিন্তু সফল হল না।

এরপর বেইটম্যান ওই নাটকটি তুলে নিয়ে দি পিক্উইক পেপারসের একটি এডাপ্টেশন মঞ্চস্থ করলেন—এটিও জনপ্রিয় হল না। এসব সত্ত্বেও বেইটম্যানের মত দূরদর্শী প্রডিউসারও নিজের কর্তব্য ঠিক করতে পারছিলেন না—তাঁর দলভুক্ত বিরাট প্রতিভাসম্পন্ন অভিনেতাটিকে যে ঠিক রোল দিয়ে কাজে লাগানো দরকার, একথা তাঁর মনে আসে নি। তিনি মনে মনে স্থির করলেন ইংলন্ড ছেড়ে আমেরিকায় ফিরে যাবেন।

এই সময়ই আরভিং Le Juif Polonais-এর লিওপোল্ড লিউইস-কৃত অনুবাদ 'দি বেল্সের' একটি কপি যোগাড় করলেন। নাটকটি রিহার্সালে ফেলা হোল। আরভিং বলেছেন বেইটম্যানের ইচ্ছার বিরুদ্ধেই এটি মঞ্চস্থ করবার আয়োজন করা হয় আর দলের অন্যান্য অভিনেতারা মনে করছিলেন ব্রডরিব উন্মাদ হয়ে গেছেন।

ছাব্বিশ দিন ধরে রিহার্সাল করা হোল—সবাই বিমর্ষ। মিসেস এবং মিস্ বেইটম্যান থেকে শুরু করে মিস্—পেণ্টার হাওয়েস ক্রেভেন পর্যন্ত। কিন্তু মঞ্চস্থ হবা মাত্রই 'দি বেলস' ইংলিশ স্টেজে নবযুগের প্রবর্তন করল।

অবশ্য বেইটম্যান অসহযোগিতা করেন নি আরভিং-এর সঙ্গে। বরং তিনি প্যারিসে গিয়ে এই নাটকের ফরাসী ভার্সন দেখে এলেন—এই কারণে, যদি ফরাসী নাটকটি থেকে এমন কিছু পান যা ইংলিশ প্রডাকসনের সাফল্যলাভে সাহায্য করতে পারে সেকথা আরভিংকে জানাবেন।

যখন ব্রডরিব 'দি বেলসের' রিহার্সাল চালাচ্ছিলেন, সে সময় মিঃ এফ্ বারনান্ড ঐ একই গল্পের উপর ভিত্তি করে 'ড্রিম অভ্ রিট্রিবিউশন' বলে যে নাটকটি রচনা করেছিলেন সেটি রয়েল এ্যালফ্রেড থিয়েটারে মঞ্চস্থ হয়—১৩ই নভেম্বর এটি মঞ্চস্থ হয় এবং ফ্লপ করে। এর বার রাত্রি বাদে যুবক ব্রডরিব 'দি বেলস' নাটকে ম্যাথিয়াসের ভূমিকায় দর্শকদের অভিবাদন করেন—and on that night of November 25th, and not before, the greatest actor of the century sprang into existence—Brodriff became Henry Irving.

পাঠক মন

গত ৮ই সেপ্টেম্বর তারিখের বঙ্গদর্শন ৮৬৩ পৃষ্ঠায় "একটি সামাজিক অন্যায়" শীর্ষক আলোচনায় আপনারা সত্যই গ্রামাঞ্চলের একটি জটিল সমস্যা সম্পর্কে আলোচনা করিয়াছেন। আজ শুধু ২।১টি গ্রামেই নহে পশ্চিমবঙ্গের প্রায় সমস্ত গ্রামেরই ওই দুরবস্থা। গ্রাম পঞ্চায়েতের রাস্তার কিয়দংশ সত্যই আজ প্রভাবশালী ব্যক্তিদের কবলগ্রস্ত। এ সমস্যার প্রতি একমাত্র আপনার এই পত্রিকা ছাড়া আর কোনো পত্রিকায় কোন-রূপ আলোচনা আমাদের নজরে পড়ে নাই। তাহার কারণ পঞ্চায়েতের যাঁহারা কর্তা তাঁহাদের মধ্যে অধিকাংশই আজ ওই বেদখলকারীদেরই অন্তর্ভুক্ত। কাজেই অবস্থা দাঁড়িয়েছে ঃ

"শিরে হৈল সর্পাঘাত
তাগা বাঁধব কোথা?"

আপনি যে সমস্যার আলোচনার সূত্রপাত করিয়াছেন তাহা যেন আপনার সবল লেখনী মাধ্যমে সর্বত্র ছড়াইয়া পড়ে এই কামনা আমরা করি।

শ্রীদেউলেশ্বর রায়
গ্রাম—খ্যারিয়াপুর
পোঃ—গোমা খ্যারিয়াপুর
ভায়া—গুসকরা
জেলা—বর্ধমান

* * *

১৪শ সংখ্যা ২২শে ভাদ্র ১৩৭৩ বঙ্গাব্দে—আপনাদের বঙ্গদর্শনে "একটি সামাজিক অন্যায়" শীর্ষক অধ্যায়ে যে প্রসঙ্গ আলোচিত হইয়াছে—তাহা শুধু একটি গ্রামের নহে, পল্লী বাংলার অধিকাংশ স্থানেরই সমস্যা, আপনাদের পত্রিকা মাধ্যমে যদি এ বিষয়ে একটি জনমত গড়িয়া উঠে তবেই আপনাদের পরিকল্পীত আইন প্রণয়নের রাস্তা সহজ-সাধ্য হইবে।

শিশিরকুমার গোস্বামী
১০/এ, হরকুমার ঠাকুর স্কোয়ার
কলিকাতা-১৪

* * *

গত ৮ই সেপ্টেম্বর ১৯৬৬ সালের 'সাপ্তাহিক বসুমতী'তে প্রকাশিত 'পেশাদারত্ব ও অপেশাদারত্বের প্রশ্ন'—শীর্ষক প্রবন্ধটি পাঠ ক'রে বিস্মিত হলাম।

এই প্রবন্ধের লেখক শ্রীসমীর দত্তের সংগে আমরা একমত হ'তে পারলাম না। কয়েকজন বিশিষ্ট ফুটবল তারকার নামে যে অহেতুক কলঙ্ক রটনার চেষ্টা এতে করা হয়েছে তা' অসঙ্গত বলেই মনে হ'ল।

"পেশাদারত্ব ও অপেশাদারত্বের প্রশ্নে"র উত্তর অভিযুক্ত খেলোয়াড়েরা অনেকদিন আগেই দিয়েছিলেন। মনে হয়, সেই প্রতিবাদের প্রতি লেখকের দৃষ্টি আকর্ষিত হয় নি। তাঁদের প্রতিবাদের মধ্যেই 'পেশাদারত্ব' ও 'অপেশাদারত্বের' সংজ্ঞা নির্দেশ করে দেওয়া হ'য়েছিল। সেই সংজ্ঞা বিচার করে মনে হয় পেশাদারের পর্যায়ে তাঁদের ফেলা চলে না। আর তাঁদের এই যুক্তিসংগত প্রতিবাদকে ভিত্তি করেই "আমাদের ফুটবলের কর্তাব্যক্তিরা" বিচার করেছেন। এবং তাঁদের 'অপেশাদারত্বের যোগ্যতা' প্রমাণিত করেছেন। তার মধ্যে "ধামাচাপা" দেবার কোন প্রচেষ্টাই ছিল না। তাছাড়া, তাঁদের এই বিচার যদি যুক্তিসংগত ও আইনসিদ্ধ না হ'ত তবে আন্তর্জাতিক ক্রীড়া সংস্থার সভাপতি এ বিষয়ে অবহিত হয়েও অবশ্যই চুপ করে থাকতেন না।

জ্যোৎস্না ভট্টাচার্য, মায়া ভট্টাচার্য ও
লিলি ভট্টাচার্য
৩, রায়পাড়া বাইলেন,
কলিকাতা-৫০

* * *

আপনার বহুল প্রচারিত 'সাপ্তাহিক বসুমতী'তে আমার এই পত্রখানি প্রকাশ করিয়া বাধিত করিবেন। হিন্দী সাম্রাজ্যবাদীদের দাপটে আমরা (বিহারের বাংলাভাষী জনসাধারণ) আজ দারুণ সংকটাপন্ন অবস্থার মধ্যে পতিত হইয়াছি। বিহারের বাংলাভাষী অঞ্চলসমূহের গ্রামাঞ্চলে অবস্থিত সমস্ত প্রাথমিক বাংলা বিদ্যালয়গুলিকে বর্তমানে নানা অজুহাতে একের পর এক হিন্দী বিদ্যালয়ে রূপান্তরিত করা হইতেছে। এই ব্যাপারে সরল গ্রামবাসীদের কোন যুক্তিকেই গ্রাহ্য করা হইতেছে না। নতুন যে সব প্রাথমিক বিদ্যালয় আজকাল গ্রামাঞ্চলে স্থাপিত হইতেছে সেগুলিতে হিন্দী ভাষার মাধ্যমেই শিক্ষাদানের ব্যবস্থা হইতেছে। অল্পবয়স্ক বালক-বালিকাদের নিজেদের মাতৃভাষা বাংলার মাধ্যমে শিক্ষাদানের জন্য গ্রামবাসীদের শত অনুরোধ-উপরোধেও কিছু ফল হইতেছে না। উপরন্তু এইসব প্রাথমিক বিদ্যালয়ের জন্য শিক্ষক প্রায়ই বিহারের মধ্যাঞ্চল বা পশ্চিমাঞ্চল হইতে আমদানি করা হয়। তাহারা সকলেই হিন্দীভাষী। তাহারা বাংলাভাষী ছাত্র-ছাত্রীদিগের বক্তব্য বুঝিতে সক্ষম হন না এবং ছাত্র-ছাত্রীগণও তাঁহাদের বক্তব্য বুঝিতে সক্ষম হয় না। ফলত সুকুমারমতি বালক-বালিকাদিগকে শিক্ষাদানের নামে প্রহসনের সৃষ্টি করা হয় এবং তাহাদিগকে প্রাথমিক শিক্ষাগ্রহণের সুযোগ হইতে বঞ্চিত করা হয়। ইহারাই হইবে আমাদের স্বাধীন দেশের নাগরিক। হায় রে! আমাদের স্বাধীন দেশ। আমরা এরূপ এক স্বাধীন দেশেই বাস করি,—যেখানে জনগণের মৌলিক অধিকারকে গণতান্ত্রিক সরকার নিয়ত পদদলিত করিয়া চলিতেছে।

হিন্দীকে যদি রাষ্ট্রভাষা হিসাবে মানিয়া লওয়াও হয় তবু নিজ মাতৃভাষার মাধ্যমেই সর্বস্তরে শিক্ষালাভের সুযোগ থাকা উচিত। অবশ্য রাষ্ট্রভাষা হিসাবে হিন্দী শিখিতে আমাদের কোন আপত্তি নাই। তবে কেন এরূপ অন্যায় জবরদস্তি? আমাদের স্বাধীন দেশের গণতান্ত্রিক সরকার কি ইহার জবাব দিবেন?

শ্রীদেবোত্তম দত্ত
পোঃ জামতাড়া
জেলা—দুমকা (বিহার)

* * *

আপনার পত্রিকা মারফৎ যে সকল জাতীয় আন্দোলনের ইতিহাস প্রকাশিত হচ্ছে তা প্রত্যেক পাঠকের কাছেই মূল্যবান। "বিপ্লবী নিবেদিতা" আলোচনা প্রাথমিক আলোচনা হিসাবে মূল্যবান। এ বিষয়ে আরো ব্যাপক ও গভীরতর আলোচনা আশা করি আমরা পাবো। "অরবিন্দ ও নিবেদিতা" এই শিরোনামারও সম্বন্ধযুক্ত কোন আলোচনা যদি করা হয় তবে বিপ্লবী যুগের একটা অস্পষ্ট দিক স্পষ্টরূপে প্রকাশিত হবে।

আজও অধিকাংশ ব্যক্তি নিবেদিতাকে কেবল মাত্র ধর্মের আলোতে স্মরণ করেন।

আগামী শতবার্ষিকীতে নিশ্চয়ই আমরা আমাদের এই পত্রিকার মাধ্যমে আরো ঘনিষ্ঠভাবে "নিবেদিতা"কে জানবার ও বুঝবার সুযোগ পাবো।

শ্রীসুবোধ সেন
৯নং উমেশ মিত্র রোড
বজবজ

রঙ্গজগৎ

সিনেমার সংকট

সারা পশ্চিমবঙ্গব্যাপী চলচ্চিত্র-শিল্পে এক সংকট দেখা দিয়েছে। আগামী শুক্রবার নতুন কোন ছবি যে মুক্তিলাভ করবে এমন নিশ্চয়তা নেই। পুরাতন ছবি যা চলছে তা প্রদর্শন বন্ধ হয়ে যেতে পারে। দর্শকরা চিত্তবিনোদনের সামান্য যেটুকু সুযোগ পান সেই সুযোগ থেকে বঞ্চিত হবেন। সমস্ত সিনেমা অনির্দিষ্ট কালের জন্য বন্ধ হয়ে যেতে পারে।

সিনেমাগুলির কর্মীদের বুকে দাবিব্যাজ দেখা যাচ্ছে। তাঁরা দাবি করছেন—(১) শ্রমিক-মালিক বিরোধ ১৪ই সেপ্টেম্বরের মধ্যে নিষ্পত্তি করুন, (২) মেট্রো সিনেমার হারে সকল সিনেমায় দুর্মূল্যভাতা দেওয়া হোক, (৩) পুরাতন দুর্মূল্যভাতা মূল বেতনের সঙ্গে যুক্ত করা হোক, (৪) তিন মাসের বেতন বোনাস হিসাবে দেওয়া হোক। এই দাবিব্যাজ বুকে এঁটে সিনেমাকর্মীরা বিভিন্ন সিনেমার সামনে বিক্ষোভ প্রদর্শন করছেন। গত কয়েকদিনে কলকাতার বড় বড় সিনেমাগুলির সামনে বিক্ষোভ প্রদর্শন হয়েছে। সিনেমাকর্মীরা বলছেন এই দাবি মেনে না নিলে তাঁরা ১৮ই সেপ্টেম্বর থেকে ধর্মঘট করবেন।

মালিক পক্ষ বলছেন কর্মীরা যদি ১৮ই ধর্মঘট করে তাহলে তাঁরা অনির্দিষ্ট কালের জন্য লক-আউট করে দেবেন। ইতিপূর্বে তাঁরা আরো কড়া সুরে বলেছিলেন একদিনের প্রতীক ধর্মঘট করলেও লক-আউট করা হবে।

দর্শকরা উদ্বিগ্ন হয়ে দেখছে ধর্মঘট ও পাল্টা হুমকীর কি পরিণতি ঘটে। দর্শকদের সাধারণ সমর্থন কর্মীদের প্রতি হওয়াই স্বাভাবিক, কারণ দর্শকরা খেটে খাওয়া মানুষ।

যাঁরা ভিতরের খবর রাখেন তাঁরা জানেন যে প্রথমশ্রেণীর সিনেমাগুলির এখন আর্থিক অবস্থা খুবই ভাল। যেসকল সিনেমায় প্রথম ছবি মুক্তিলাভ করে সেখানে অস্বাভাবিক-ভাবে ভাড়া বৃদ্ধি করা হয়েছে। আগে মালিকরা যেখানে আধাআধি হারে ছবি দেখাত, এখন সেখানে শতকরা ৬০ ভাগ অথবা সাপ্তাহিক নির্দিষ্ট মোটা টাকা ভাড়া আদায় করে থাকে। এই ব্যবস্থার ফলে বাংলা ছবি দারুণভাবে পিছু হটে যাচ্ছে। বাস্তবিকপক্ষে সিনেমার মালিকের কাছে ছবি বন্ধক না রেখে অনেক বাঙালী প্রযোজক-পরিবেশকের পক্ষে ছবির মুক্তি ঘটানো সম্ভব হয় না। এই অবস্থার চাপে যেসকল সিনেমায় আগে বাংলা ছবি মুক্তিলাভ করত এখন সেখানে হিন্দী ছবি মুক্তিলাভ করে। বাংলা ছবি মুক্তি-লাভের জন্য মাসের পর মাস প্রতীক্ষায় থাকে। এক বছর সময়ের মধ্যে মালিকরা ছবি-প্রতি যেভাবে ভাড়া বৃদ্ধি করেছে কোনকালে তার তুলনা মেলে না। তার ওপরে একটা কালোবাজারের চক্র আছে। যাতে খাতায় না লিখে প্রযোজক-পরিশেকদের গোপনে অর্থ দিতে হয়। এসব অন্যায় ও অনাচারের দরুণ বাংলা ছবির প্রদর্শনক্ষেত্র একেবারে সংকুচিত হয়ে পড়েছে। নতুবা পশ্চিমবঙ্গে বড়-ছোট প্রায় আড়াইশ’র মত সিনেমা আছে। এই সিনেমাগুলিতে বছরে তিনমাস করে বাংলা ছবি দেখালেও অন্তত পঞ্চাশটি বাংলা নতুন ছবি দরকার হবে। কিন্তু একশ্রেণীর অতিমুনাফাবাজের জন্য বাংলা ছবির এই সংকট।

বর্তমানে এই সংকটে সিনেমার কর্মীরা যেমন অসুবিধার সম্মুখীন হবে, তেমন স্টুডিও থেকে পরিবেশনার ক্ষেত্রে প্রতিক্রিয়া ঘটবে। দর্শকরা অবসর যাপনের সুযোগ থেকে বঞ্চিত হবেন। এই অবস্থায় সরকারের উচিত মধ্যস্থতার দ্বারা মীমাংসা করে দেওয়া। এই দুর্মূল্যের দিনে সিনেমাকর্মীরা যাতে মানুষের মত সংসার বাঁচাতে পারে সেভাবেই মীমাংসা করতে হবে। এই সিনেমা সংকটে দর্শকদেরও ভূমিকা আছে। বাংলা চলচ্চিত্রের স্বার্থে সেই ভূমিকাকে কাজে লাগাতে হবে।

—সুজন।

গীতা দে

আজকের ভারতের চলচ্চিত্র-শিল্প

পুনার ফিল্ম ইনস্টিটিউট ভারতের মধ্যে সর্বপ্রথম এমন একটি ইনস্টিটিউট যা চলচ্চিত্র-পরিচালক, স্ক্রিপ্ট-লেখক, অভিনেতা ও আলোকচিত্রশিল্পী প্রমুখকে শিক্ষিত করে তোলার জন্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এই ইনস্টিটিউট থেকে শিক্ষাপ্রাপ্ত শিল্পী ও কলাকুশলীরা তাঁদের নিজ নিজ ভাষায় যেমন, হিন্দী, বাংলা, উর্দু, মারাঠি, তামিল প্রভৃতি ভাষায় চলচ্চিত্র সৃষ্টিকর্মে আত্মনিয়োগ করবেন। (ভারতে এখন ১২টি ভাষায় চলচ্চিত্র তোলা হয়)।

এই ইনস্টিটিউটে চলচ্চিত্র-শিল্প সম্পর্কে অনেক বিদেশী বিশেষজ্ঞরা বক্তৃতাদান করেছেন। এঁদের মধ্যে আছেন পোল্যান্ডের অধ্যাপক তেপলিৎজ, বৃটেনের রজের মানভেল (চলচ্চিত্র ও তার দর্শক সম্পর্কে লিখিত এঁর বইটি রুশ ভাষাতেও অনুদিত হয়েছে), সোভিয়েত স্ক্রিপ্ট-রচয়িতা এম. পাপাভা প্রমুখ। এঁদের সংগে একই সময়ে আমিও পুনা ইনস্টিটিউটে চলচ্চিত্র সম্পর্কে বক্তৃতা দিই।

মাদ্রাজে রয়েছে টেকনোলজিক্যাল ফিল্ম ইনস্টিটিউট। এখানে চলচ্চিত্র স্টুডিও ও ল্যাবরেটরির কর্মীদের শিক্ষা দেওয়া হয়। এই ইনস্টিটিউট-ভবনের অপর প্রান্তে চোখে পড়ে পাতায় ছাওয়া কুটির। ভারতে হাজার বছর ধরে এরকম কুটির নির্মিত হয়ে আসছে। বর্তমান ও

ইভান দি টেরিবল'-এ আইভানের ভূমিকায় চেরকাশোফ

অতীত যেন এভাবে একসংগে সহাবস্থান করছে।

বিশ্বের সর্বাধিক সংখ্যক পূর্ণদৈর্ঘ্য চলচ্চিত্র (ফিচার) নির্মাতাদের মধ্যে ভারতের স্থান দ্বিতীয় (প্রথম স্থানাধিকারী হচ্ছে জাপান)। এইসব চলচ্চিত্র প্রধানত নিছক ব্যবসায়িক প্রকৃতির। ভারতের প্রগতিশীল চলচ্চিত্র-পরিচালকরা এর বিরুদ্ধে প্রতিবাদী এবং নিজেরা বাস্তবধর্মী চলচ্চিত্র তোলায় আত্মনিয়োগ করেছেন। সোভিয়েত দর্শকরা পরলোকগত বিমল রায় পরিচালিত "দো বিঘা জমিন" ছবিটি দেখে তৃপ্তি লাভ করেন।

এ ছাড়া, সোভিয়েত দর্শকরা মনে রাখেন শ্রীনিমাই ঘোষ পরিচালিত "ছিন্নমূল" ছবিটিকে। বিখ্যাত সোভিয়েত চলচ্চিত্র-পরিচালক ভি. পুদোভকিন ও অভিনেতা এন. চেরকাশোফ ভারত ভ্রমণকালে এই ছবিটি দেখেন ও তাঁদের সুপারিশে ১৯৫১ সালে এই ছবি সোভিয়েতে আনা হয়। পরিচালক খাজা আহম্মদ আব্বাসের "শেহর আউর স্বপ্না" ছবিটিও সোভিয়েত দর্শকদের মধ্যে জনপ্রিয়তা লাভ করে।

বর্তমান ভারতের আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন চলচ্চিত্র-পরিচালক শ্রীসত্যজিৎ রায়ের অনুপম সৃষ্টি-ত্রয়ী "পথের পাঁচালী", "অপুর সংসার" ও "অপরাজিত" অতি মৌলিক শিল্পসৃষ্টি। প্রখ্যাত বাঙালী কথাশিল্পী পরলোকগত বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাহিনী অবলম্বনে শ্রীরায় এই "ট্রিলজি" সৃষ্টি করেছেন। শ্রীসত্যজিৎ রায়ের ছবি দেখলে উপলব্ধি হয় সাধারণ মানুষের প্রতি কতখানি দরদ। তাদের বিষণ্ণ-মধুর জীবনযাত্রা এইসব ছবির মধ্য দিয়ে প্রকাশিত ও

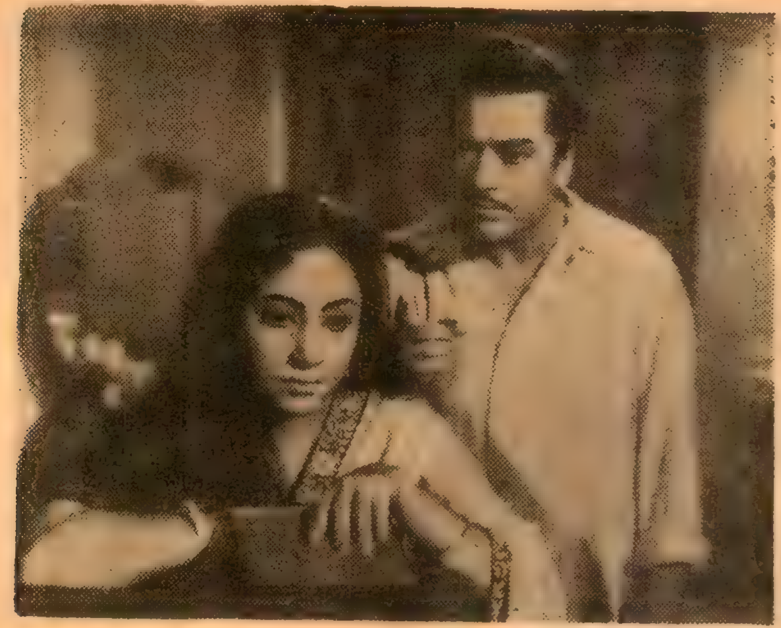

নির্মীয়মাণ 'বধূবরণ' ছবিতে বোম্বাইয়ের নেপথ্য-গায়িকা গীতা ও প্রদীপকুমার।

নাটকের কথা

ইউরেকা'র অনুষ্ঠান

গত ২৮শে আগস্ট রবিবার বরানগরের সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান 'ইউরেকা' পরিচালিত আবৃত্তি ও রবীন্দ্রসঙ্গীত প্রতিযোগিতার পুরস্কার বিতরণ উৎসব আলমবাজার নারায়ণী প্রেক্ষাগৃহে অনুষ্ঠিত হয়ে গেল। পুরস্কার বিজেতাদের পুরস্কার বিতরণ করেন মঞ্চ ও চিত্রাভিনেতা শ্রীসবিতাব্রত দত্ত।

পুরস্কার বিতরণের পর বেতারশিল্পী শ্রীভূপেন মুখোপাধ্যায় সঙ্গীত পরিবেশন করেন। ভরতনাট্যম নৃত্যে পারদর্শিতা দেখান মিনতি ঘোষ।

অনুষ্ঠানে 'ইউরেকা' শিল্পীগোষ্ঠী অভিনীত বিমল রায়ের 'অভিনয়'-তে প্রকাশ ও বিকাশের ভূমিকায় করুণ ঘোষ ও সুখেন্দু সরকার সু-অভিনয় করেন। অন্যান্য ভূমিকায় অভিনয় করেন দেবু

মর্মস্পর্শী। শ্রীরায় নিজে বলেছেন: "আমি ছবি করি, কেন না তা আমাকে আমাদের স্বদেশ ও দেশবাসীর অতি নিকটে এনে দেয়। 'পথের পাঁচালী' তোলার আগে আমি গ্রামজীবন সম্পর্কে খুব কমই জানতাম। আমি এখন তার থেকে অনেক বেশি জানতে পেরেছি। আমি তার সত্তাকে জেনেছি, তার গাছগুলিকে, ফুলগুলিকে।" এই বিখ্যাত চলচ্চিত্র-পরিচালকের প্রতি ছবিতেই দেখা যাবে যে তিনি তাঁর দেশের জীবনের মুখ্য সামাজিক ও নৈতিক সমস্যাগুলি নিয়ে ভাবিত। একজন সত্তাবান, নীতিবান ও জিজ্ঞাসু শিল্পীর অন্বেষা এইসব ছবিতে ফুটে ওঠে।

আধুনিক ভারতীয় প্রগতিশীল চলচ্চিত্র-পরিচালকরা সোভিয়েত চলচ্চিত্র-শিল্প সম্পর্কে যথেষ্ট শ্রদ্ধাবান। আইজেনস্টাইনের নাম ভারতে অত্যন্ত শ্রদ্ধার সংগে উচ্চারিত হয়। ভারতের চলচ্চিত্র-দর্শকরা পুদোভকিন, কালাতোজোফ ও চুকরাই-এর ছবির সংগে পরিচিত। ভারতে সম্প্রতি যে সোভিয়েত চলচ্চিত্র-উৎসবগুলি হয়েছে তার সাফল্য সংবাদ-পত্রজগতে যথেষ্ট প্রতিফলিত হয়েছে।

বিশ্বের প্রগতিশীল চলচ্চিত্রকারদের মধ্যে ঘনিষ্ঠ যোগসূত্র, চলচ্চিত্রে সামাজিক বাস্তবতাকে প্রতিফলিত করার জন্য ভারতের প্রগতিশীল চলচ্চিত্র-পরিচালকদের সংগ্রামকে আরও এগিয়ে নিয়ে যায়।

—আই. ভাইসফেল্ড।

মুক্তি-প্রতীক্ষিত 'জোড়াদীঘির চৌধুরী পরিবার'-এ সৌমিত্র চ্যাটার্জী

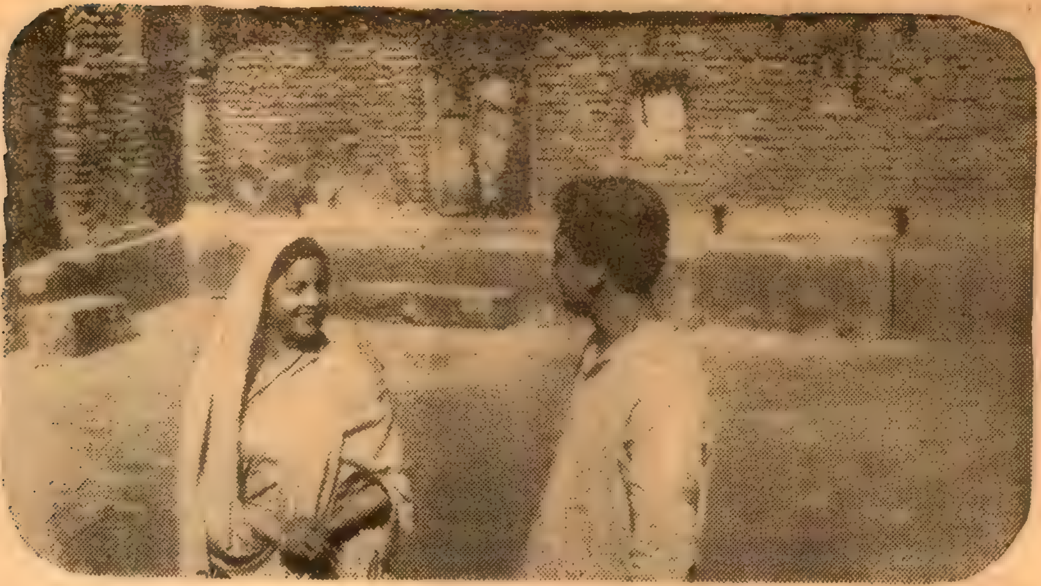

নির্মীয়মাণ 'কেদার রাজা' ছবিতে লিলি চক্রবর্তী ও দিলীপ রায়

মুখার্জী, অজয় কোলে ও পূর্ণেন্দু সরকার।

দ্বিতীয় নাটক রবিদাস সাহা রায় রচিত 'শিল্পী চাই'-তে অভিনয় করেন অরুণ ঘোষ, কমল গাঙ্গুলী, গৌরী মুখার্জী ও প্রবীর মুখার্জী। দু'টি গুণ্ডার ভূমিকায় সু-অভিনয় করেন রবীন হুতাইত ও অজয় কোলে।

প্রবীর সেনের সঙ্গীত পরিচালনায় ও রত্না ভট্টাচার্যের নৃত্য নির্দেশনায় 'বর্ষা-মঙ্গল' নৃত্যনাট্য উপভোগ্য হয়েছিল। সঙ্গীতে ও নৃত্যে অংশগ্রহণ করেন যথাক্রমে প্রবীর সেন, দেবাশিস সান্যাল, রত্না সরকার প্রভৃতি ও মন্দিরা বসু, অর্চনা সরকার প্রভৃতি। আবহসঙ্গীতে ছিলেন বীরবল বাহাদুর, তমাল ব্যানার্জী, ইন্দিরা বসু, অনুরূপা হুতাইত প্রভৃতি।

জীবনযৌবন

গত ৬ই সেপ্টেম্বর প্রতাপ মেমোরিয়াল হলে রবিরূপের শিল্পীরা 'জীবনযৌবন' ও 'বেকার বিদ্যালঙ্কার' নাটক দুটি অভিনয় করেন। পরিচালক তমাল লাহিড়ীর পরিচালনায় নাটক দুটি সুন্দরভাবে অভিনয় হয়। অভিনয়ে প্রথমেই নাম করতে হয় অচিন্ত্য দত্ত ও স্বপন দাসের। অন্যান্য ভূমিকায় সুন্দর অভিনয় করেন প্রদীপ মিত্র, সুভাষ চ্যাটার্জী, মিলন বোস, দিলীপ চৌধুরী, সমীরণ দত্ত, সন্তোষ দাস, গুরুপ্রসাদ ভড়, বিশ্বদেব দত্ত ও সন্দীপ গোস্বামী। সংগীত পরিচালক মুরারি ভড় নিজের সুনাম অক্ষুণ্ণ রেখেছেন।

যাদবপুর কলোনী মণিমেলায় শিশু সাহিত্য প্রতিযোগিতা

যাদবপুর কলোনী মণিমেলায় রজত জয়ন্তী উৎসব উপলক্ষে গত ১০ই ও ১১ই সেপ্টেম্বর, ১৯৬৬, এক শিশু সাহিত্য প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়েছিল।

বয়স অনুসারে তিনটি দলে বিভক্ত হয়ে মণিভাইবোনেরা বিতর্ক, কবিতা রচনা, গল্পবলা ও আবৃত্তি প্রতিযোগিতায় অংশ গ্রহণ করে। আবৃত্তি ছাড়া অন্যান্য প্রতিযোগিতার বিষয়গুলি প্রতিযোগীদের প্রতিযোগিতায় শুরু হবার সময়ে জানান হয়, প্রতিযোগিতার প্রতিটি বিষয়ে শিশু ও কিশোর প্রতিযোগীদের মধ্যে বিশেষ উৎসাহ ও উদ্দীপনা লক্ষ্য করা যায় এবং প্রতিটি বিষয়েই বেশ উচ্চমান এই প্রতিযোগিতার বৈশিষ্ট্য ছিল।

স্থানীয় বিদ্যালয়, মহাবিদ্যালয় ও বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক-শিক্ষিকাবৃন্দ বিচারক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন।

নতুন অভিনেত্রী

মার্গারিটা তেরেখোভা সোভিয়েত চলচ্চিত্রে একটি নতুন নাম। দীর্ঘকায়া, সুন্দর চুলের গোছা, উজ্জ্বল চোখ তরুণী মার্গারিটার পরিবারের সকলে শিল্পী। তাসখন্দে লেখাপড়া শিখেছে; তারপরে মস্কোভিয়েৎ থিয়েটারে অভিনয় বিদ্যা আয়ত্ত করেছে। পোষাকে, ব্যবহারে, কালের চেতনায় মার্গারিটা একেবারে আধুনিকা।

বিনামূল্যে মহিলাদের পার্স

প্রত্যেক গৃহের জন্য একটি উপহার। প্রমাণ সাইজের বিখ্যাত কাশ্মীর শাল। মনোমুগ্ধকর ডিজাইন এবং রং, ক্লিয়ারেন্স সেল। মূল্য একটির জন্য ৮৲ টাকা, ২টির জন্য ১৫৲ টাকা, ৩টির জন্য ২১৲ টাকা। স্পেশাল ডি-লুক্স কোয়ালিটি ১২৲ টাকা, ২টির জন্য ২২৲ টাকা, ৩টির জন্য ৩১৲ টাকা, ৪টির জন্য ৪০৲ টাকা। ২টি অথবা তদধিক ডি-লুক্স শালের অর্ডার দিলে বিনামূল্যে মহিলাদিগকে পার্স। ভি, পি, পি-যোগে অর্ডার সরবরাহ করা হয়।

KASHMIR FABRICS (Dbm-16)
BEAT No. 13, ALIGARH.

'হ্যালো ইট ইজ মী'র নায়িকা মার্গারিটা তেরেখোভা

মার্গারিটা তেরেখোভার প্রথম ছবি 'হ্যালো, ইট ইজ মী'। আর্মানিয়ান পরিচালক ফ্রুঙ্ক ডভলাতয়ান এই ছবি পরিচালনা করেছেন।

ছবির নায়ক আর্তিয়ম এক যুবক বৈজ্ঞানিক। স্ত্রীর মৃত্যুতে সে এত বিমর্ষ হয়ে পড়ে যে জীবন তার কাছে অর্থহীন হয়ে পড়ে। এমন সময় তার সাথে তানিয়ার সাক্ষাৎ হয়। তানিয়া তাকে বিষাদ থেকে উদ্ধার করে। সে আবার নতুন করে জগৎকে দেখে, সে বুঝতে পারে অতীতকে নিয়ে পড়ে থাকার অর্থ নেই। সেই অতীত যতই সুন্দর হোক না কেন। কেবল অতীতকে নিয়ে মানুষ বেঁচে থাকতে পারে না।

ছবিতে তানিয়ার ভূমিকা যদিও ছোট কিন্তু ছবির মূল বক্তব্য প্রকাশের সহায়ক। তাবিয়া। আনুগত্য, একাগ্রতা, এবং ব্যক্তিত্বে পূর্ণ। এই তানিয়ার চরিত্রে অভিনয় করেছে মার্গারিটা তেরেখোভা। ছবির নাম 'হ্যালো, ইট ইজ মী'।

মার্গারিটা বার্নার্ড শর নাটকে ক্লিয়োপেট্রার ভূমিকায় অভিনয় করছে। এই চরিত্র তার খুব পছন্দ। বর্তমানে সে 'চন্দ্রগ্রহণের রাতে' নামক তাসখন্দের করিম লিখিত নাটকে নায়িকার চরিত্রে রিহার্সাল দিচ্ছে। এই নাটকের কাহিনী অনেকটা 'রোমিও জুলিয়েট'-এর মত। মার্গারিটা চায় ফিল্মে ও নাটকে একসঙ্গে অভিনয় করতে। তার একটি বড় ইচ্ছা হল ডস্টয়েভস্কির নাটকে নায়িকার ভূমিকায় অভিনয় করা।

ভেনিস চলচ্চিত্র উৎসব

এবারের ভেনিস চলচ্চিত্র উৎসবে শ্রেষ্ঠ পুরস্কার বা গ্রান্ডপ্রিক্স পেয়েছে ইতালীয়-আলজেরিয় যুক্ত ছবি 'ব্যাটল ইন আলজেরিয়া'।

শ্রেষ্ঠ অভিনেতার পুরস্কার পেয়েছে ফরাসী অভিনেতা জ্যাক পেরী। ইনি ইতালীয় ছবি 'হ্যাফ এ ম্যান' এবং স্প্যানীস ছবি 'লা কেঁতো'-তে অভিনয় করেছেন। শ্রেষ্ঠা অভিনেত্রীর পুরস্কার পেয়েছেন সোভিয়েত খিরগিজিয়ার অভিনেত্রী নাতালিয়া আরিনবাসরোভা, 'দি ফার্স্ট টিচার' ছবিতে অভিনয় করার দরুণ।

জার্মানীর 'এ্যান আননোন গার্ল' ছবিটি জুরীদের বিশেষ পুরস্কার পেয়েছে। জুরীদের বিশেষ পুরস্কার 'শাম্পাকুয়া' ছবিটিও পেয়েছে।

ভেনিস উৎসবে সুইডিস ছবি 'নাইট গেম' ও আমেরিকান 'শাম্পাকুয়া' ছবির বিরুদ্ধে অশ্লীলতার অভিযোগে খুব হৈচৈ হয়েছে। 'ব্যাটল ইন আলজেরিয়া' ছবির বিরুদ্ধে রাজনৈতিক কারণে ফরাসীরা বিক্ষোভ করেছে।

নিকোলাই চেরকাশোফের জীবনাবসান

বিশ্ববিখ্যাত সোভিয়েত অভিনেতা নিকোলাই চেরকাশোফ গত ১৪ই সেপ্টেম্বর লেনিনগ্রাদে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছেন। সোভিয়েত রঙ্গমঞ্চ ও চলচ্চিত্রের অন্যতম শ্রেষ্ঠ অভিনেতা চেরকাশোফ ছিলেন সোভিয়েত ইউনিয়নের সম্মানিত জনগণের শিল্পী। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৬৩ বছর।

চেরকাশোফের চিরস্মরণীয় অভিনয় হ'ল জগদ্বিখ্যাত চিত্র-পরিচালক সের্গেই আইজেনস্টাইনের "ইভান দি টেরিবল" চলচ্চিত্রে জার ইভানের চরিত্রে। ১৯৪৬ সালে আইজেনস্টাইন এ ছবি তোলেন। ক্ষমতাপ্রিয় জার ইভানের চরিত্রের জটিলতা চেরকাশোফ অনন্যসাধারণ অভিনয়গুণে মূর্ত করে তোলেন।

চেরকাশোফ ছিলেন প্রধানত অসাধারণ চরিত্রাভিনেতা। বিখ্যাত চারজন সোভিয়েত বিজ্ঞানসাধকদের চরিত্রেও তিনি অভিনয় করেছেন। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হ'ল "এভরিথিং রিমেন্স ফর দি পিপ্‌ল" ছবিতে অ্যাকাডেমিসিয়ান দ্রোনোফের চরিত্রে তাঁর অভিনয়। চেরকাশোফ তাঁর অভিনয় প্রতিভার জন্য পাঁচবার সোভিয়েত রাষ্ট্রীয় পুরস্কারে ভূষিত হন।

বিখ্যাত সোভিয়েত চলচ্চিত্র-পরিচালক ভি, পুদোভকিনের সংগে নিকোলাই চেরকাশোফ ১৯৫১ সালে ভারত ভ্রমণে আসেন। ভারতের অন্যান্য স্থানের মধ্যে তাঁরা কলকাতা মহানগরীতেও এসেছিলেন এবং শিল্পসংস্কৃতি জগতের সংগে অন্তরঙ্গ সম্পর্ক গড়ে তুলেছিলেন। তিনি তৎকালীন শ্রীরঙ্গম মঞ্চে নাট্যাচার্য শিশির ভাদুড়ী অভিনীত 'ষোড়শী' নাটকটি দেখে মুগ্ধ হয়েছিলেন।

তাঁরই উদ্যোগে সোভিয়েত-ভারত সাংস্কৃতিক যোগসূত্র প্রতিষ্ঠা হয়।

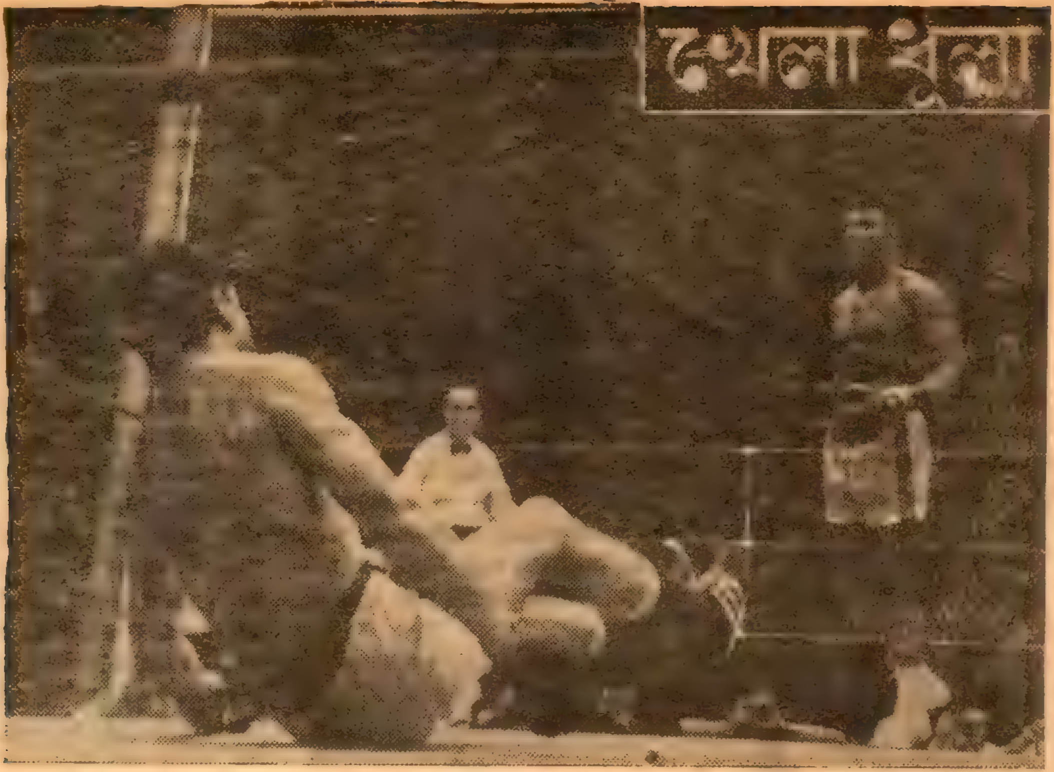

ফ্রাঙ্কফুর্টে অনুষ্ঠিত বিশ্ব হেভী ওয়েট মুষ্টিযুদ্ধে ক্যাসিয়াস ক্লে এবং কার্ল মিল্ডেনবার্জারের লড়াইয়ের একটি দৃশ্য

ক্রিকেটের বিশ্ব প্রতিযোগিতা

ইংলন্ডের একজন বিখ্যাত ক্রিকেট সমালোচক বলেছিলেন যে তিনি বিশ্বের বিভিন্ন দেশের সেরা খেলোয়াড়দের নিয়ে এক বিশ্ব একাদশ তৈরি করেছেন; আরও বলেছিলেন যে, স্বপ্নে গড়া তাঁর এই দলটি খেলবে কার সঙ্গে এই নিয়েই তিনি বিরাট চিন্তায় পড়েছেন। কিন্তু আজ সত্যই বিশ্বক্রিকেট একাদশ গঠিত হয়েছে এবং সেরা সেরা দেশ-বিদেশের খেলোয়াড়রা স্থান পেয়েছেন। গত বছর এই বিশ্ব একাদশ ইংলন্ডে প্রদর্শনী খেলায় অংশ গ্রহণ করেছিল ওখানকার এক ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানের সৌজন্যে। আর দল নির্বাচন হয়েছিল বিচিত্র উপায়ে। বিভিন্ন দেশের বাছাই করা খেলোয়াড়দের নাম দেওয়া হয়েছিল এবং এদের মধ্য থেকে চূড়ান্ত দল গঠন করে টেলিভিশনের শ্রোতারা ভোট দিয়ে।

এবার লর্ডসে অনুষ্ঠিত বিশ্ব একাদশ এবং ইংলন্ড একাদশের প্রদর্শনী খেলায় ইংলন্ড ৮৩ রানে জয়ী হল। ভারতের দুজন খেলোয়াড় বিশ্ব একাদশ দলে স্থান পান, এ'রা হলেন অধিনায়ক পতৌদির নবাব এবং বাপু নাদকার্নী। এই দলে ছিলেন ভারত, অস্ট্রেলিয়া, নিউজিল্যান্ড, পাকিস্তান এবং দক্ষিণ আফ্রিকার খেলোয়াড়রা, শুধু ছিলেন না ওয়েস্ট ইন্ডিজের খেলোয়াড়েরা। ওয়েস্ট ইন্ডিজও এই বিশ্ব একাদশের সঙ্গে একটি খেলায় অংশ গ্রহণ করেছে।

এই খেলা হবে শুধু একদিনের এবং প্রত্যেক দল পঞ্চাশ ওভার খেলার সুযোগ পাবে এবং একটি বোলার এগারো ওভারের অধিক বল করতে পারবে না। ইংলন্ড প্রথমে ব্যাট করার সুযোগ লাভ করে এবং পঞ্চাশ ওভারে ৭ উইকেটে ২০১ রান সংগ্রহ করে। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য ব্যক্তিগত সংগ্রহ ছিল বেসিল অলিভিয়েরার

শ্রীঅমিতাভ

৪৯ রান, জিম পার্কসের ৪২ রান এবং টেড ডেক্সটারের ৩২ রান। বাপু নাদকার্নী এগারো ওভারে মাত্র ৩১ রান দিয়ে দখল করেন ৩টি উইকেট এবং পিটার পোলক ২টি। কিন্তু বাছাই করা খেলোয়াড়ে গড়া বিশ্ব একাদশ সুরু করে ভাল কিন্তু শেষ রক্ষা করতে পারে না। মাত্র ৩৬·৩ ওভারে সকলেই আউট হয়ে যায় মাত্র ১১৯ রানের মধ্যে।

এরপর আরও দুটি খেলা অনুষ্ঠিত হয়—একটিতে ওয়েস্ট ইন্ডিজ পরাজিত করে বিশ্ব একাদশকে এবং অপর খেলায় ইংলন্ড একাদশ ৬৩ রানে ওয়েস্ট ইন্ডিজ একাদশকে পরাজিত করে স্বর্ণপদক লাভ করে।

ম্যারাথন কোয়ার্টার ফাইন্যাল

শীল্ডের সেমিফাইন্যালে অবশেষে ইস্টবেঙ্গল উন্নীত হয়েছে, কোয়ার্টার ফাইন্যালের চতুর্থ দিনের খেলায় ১—০ গোলে মহামেডান স্পোর্টিং দলকে পরাজিত করে। বলতে গেলে কোয়ার্টার ফাইন্যালে এবারের লীগ বিজয়ী এবং গত বছরের শীল্ড জয়ী ইস্টবেঙ্গলের সঙ্গে মহামেডানের ম্যারাথন খেলা এ বছরের শীল্ডের অন্যতম আকর্ষণ।

প্রথম ফিরতি খেলাটি ১—১ গোলে অমীমাংসিতভাবে শেষ হয়। এই দিন প্রথম গোল দেবার কৃতিত্ব অর্জন করে মহামেডান ক্লাব। কিন্তু তাদের এই অগ্রগতি বেশিক্ষণ স্থায়ী হয় না, ইস্টবেঙ্গলের সীতেশ দাস গোলটি পরিশোধ করে দলকে রক্ষা করেন। মহামেডানের পক্ষে প্রথম গোল করেছিলেন বসির। খেলার প্রথমার্ধের ন' মিনিটের সময় নঈমের দুটিতে বল বসিরের কাছে যায় এবং আস্তে কোণাকুণি সটে তিনি থঙ্গরাজকে পরাজিত করেন। প্রথমার্ধের পনেরো মিনিটের সময় নঈমের মারফৎ বল পেয়ে পরিমল দে সীতেশ দাসকে এক গোলের সুযোগ সৃষ্টি করে দেন এবং দর্শনীয়

উঁচু সটে সীতেশ মুস্তাফাকে পরাজিত করে গোল পরিশোধ করেন। এদিন উভয় দলই কয়েকটি সহজ গোলের সুযোগ পায় কিন্তু এর মধ্যে মহামেডান দু'টি পেয়েছিল নিশ্চিত গোলের সুযোগ। দ্বিতীয়ার্ধে ৬ মিনিটের সময় সালাউদ্দীনের লম্বা পাশ থেকে আসাদুল্লা গোল করার উপক্রম করলে বি দেবনাথ কোনক্রমে তা' প্রতিহত করেন। দিনের সবচেয়ে নিশ্চিত গোলের সুযোগ পেয়েছিল মহামেডান দল দ্বিতীয়ার্ধের আঠারো মিনিটের সময়। একটি কর্নার কিক থেকে বল পেয়ে লাওনেল জোরালো সট করেন, গোলরক্ষক থঙ্গরাজকে পরাস্ত করে বল গোলে প্রবেশ করছে, ঠিক গোল লাইন থেকে অব্যর্থ গোলটি রক্ষা করেন রামবাহাদুর।

দ্বিতীয় ফিরতি খেলা, মানে তৃতীয় দিনের খেলা তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতার মধ্যে অমীমাংসিতভাবে শেষ হয় গোলশূন্য ফলাফলে। দু-দলই প্রাণপণে লড়েছেন জয়লক্ষ্মীর অনুগ্রহ লাভের জন্য। মহামেডানের রক্ষণভাগে স্টপার জন এবং আলতাফ সুন্দর ক্রীড়াধারার পরিচয় দেন। মহামেডানের আক্রমণভাগে প্রধান ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন লাওনেল, লতিফ এবং বসির, তাঁরা ইস্টবেঙ্গলের রক্ষণভাগকে বিব্রত করেছেন। অন্যদিকে ইস্টবেঙ্গলের রক্ষণভাগে রামবাহাদুর এবং দেবনাথ দৃঢ়তার সঙ্গে খেলেছেন। উভয় দলের গোলরক্ষক থঙ্গরাজ এবং মুস্তাফা অনেকগুলি অবধারিত গোলের সুযোগ প্রতিহত করেছেন। দুজনেই দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হয়ে খেলছিলেন অতন্দ্র প্রহরীর ন্যায়। এই দিন মাঠে সারমাদ খাঁ সমাজপতিকে মারাত্মকভাবে ফাউল করলে মাঠের আবহাওয়া উত্তপ্ত হয়ে ওঠে। সবুজ গ্যালারীর অবুঝ দর্শকরা মাঠের মধ্যে ইট এবং বোতল ইত্যাদি বস্তু অকৃপণভাবে বর্ষণ করতে লাগলেন। কিন্তু ক্লাবের কর্মকর্তাদের শান্ত হওয়ার আবেদন দর্শকরা মঞ্জুর করলে খেলা সুরু হয় পুনরায়।

চতুর্থ দিনে বর্ষণসিক্ত এবং কর্দমাক্ত মোহনবাগান সি এফ সি মাঠে ইস্টবেঙ্গল-মহামেডান স্পোর্টিং মিলিত হয়। ইস্টবেঙ্গল ক্লাব এইদিন তাদের দু'জন নির্ভরযোগ্য খেলোয়াড়ের সাহায্য লাভে বঞ্চিত হয়; অসুস্থতার জন্য স্টপার নঈম এবং আঘাতের জন্য সেণ্টার ফরোয়ার্ড গুরুকৃপাল সিং মাঠে অবতীর্ণ হতে পারেন নি। প্রথম থেকেই ইস্টবেঙ্গল উন্নত ক্রীড়ানৈপুণ্য প্রদর্শন করতে থাকে এবং তাঁদের ক্রীড়াধারা দেখে মনে হচ্ছিল তাঁরা জয়ের জন্য দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হয়ে এদিন মাঠে নেমেছেন। অন্যদিকে মহামেডান দল কিন্তু এইদিন কিছুটা নিষ্প্রভ বলে মনে হচ্ছিল। এখানে উল্লেখ করা চলে সীতেশ দাসের কথা, কারণ প্রথম দিনে সীতেশ দাসের শোচনীয় ব্যর্থতার জন্য ইস্টবেঙ্গল জয়ী হতে পারে নি, দ্বিতীয় দিন সীতেশ দাস পরিশোধমূলক গোল দিয়ে দলকে রক্ষা করেছিলেন পরাজয়ের হাত থেকে এবং চতুর্থ দিন দর্শনীয় সটে বিজয়সূচক গোল দিয়ে দলকে সেমি-ফাইন্যালে উন্নীত করতে সাহায্য করেছেন। মহামেডানের স্টপার জন ভাল খেলেছেন বটে কিন্তু তাঁর একটি ত্রুটির সুযোগে খেলা শেষ হবার মাত্র চার মিনিট পূর্বে সীতেশ দাস গোল করে দেন।

ইস্টবেঙ্গল এবং মহামেডান দলের খেলার নিষ্পত্তি হতে এত সময় নেবার জন্য ফাইন্যাল খেলাও নির্ধারিত দিনের পরে অনুষ্ঠিত হবে। আপাত ফাইন্যাল খেলার দিন ২৬শে সেপ্টেম্বর বলে স্থির হয়েছে।

ইস্টবেঙ্গল এবং মহামেডানের শীল্ডের খেলায় পরিমল দের একটি সট প্রতিহত করছেন গোলরক্ষক মুস্তাফা।

দার্দানেলেস বিজয়

আর একটিকে জয় করলেন দুরেপাল্লার সন্তরণবীর মিহির সেন। এবার মিহির সেনের লক্ষ্য ছিল দার্দানেলেস প্রণালী। মিহির সেন অবতরণ করেছিলেন মারমারা সাগরে, একনাগাড়ে ১৩ ঘণ্টা ৫৫ মিনিট সাঁতার কেটে প্রণালী অতিক্রম করলেন এজিয়ান সাগরে। এই সময়ের মধ্যে তাঁকে প্রণালী অতিক্রম করার জন্য পাড়ি দিতে হয়েছে প্রায় চল্লিশ মাইল।

মিহির সেন গ্যালীপোলী থেকে যখন সাঁতার সুরু করেন তখন স্রোত ছিল তাঁর অনুকূলে। সাগরের শীতল জলে একটানা সাঁতার কেটে চলা সত্যই দুঃসাধ্য, এছাড়া আছে প্রণালীর বিক্ষুব্ধ সাগরের উত্তাল ঢেউ। কিন্তু বাংলার ছেলে তেত্রিশ

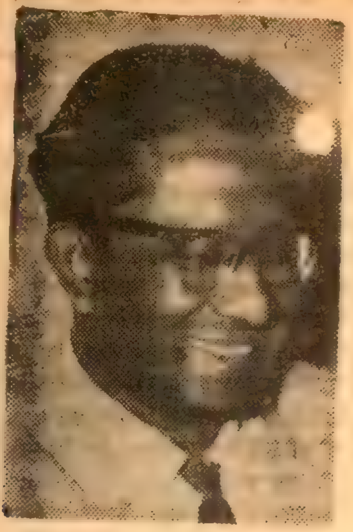

মিহির সেন

বৎসর বয়স্ক ব্যারিস্টার মিহির সেন সেই দুর্গমকে জয় করলেন।

তেরো ঘণ্টা পঞ্চান্ন মিনিট সন্তরণের মধ্যে মিহির সেন আপেল, মধু এবং ডিম খাদ্য হিসাবে গ্রহণ করেন। সাঁতারের সুরু থেকে শেষ পর্যন্ত তাঁর সংগে ছিল দুটি নৌকা। এতে ছিলেন একদল সাংবাদিক, তুরস্কের ক্রীড়া সংস্থার প্রতিনিধিরা এবং চিকিৎসক।

ভারতের রাষ্ট্রপতি সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণান মিহির সেনের কৃতিত্বের জন্য এক তারবার্তায় অভিনন্দন জানিয়েছেন তাঁকে। দার্দানেলেস প্রণালী প্রথম সাঁতার দিয়ে অতিক্রম করার কৃতিত্বের জন্য তুরস্কের প্রধানমন্ত্রীর পক্ষে এক মানপত্র মিহির সেনকে অর্পণ করা হয়।

মিহির সেন এরপর এক সপ্তাহ বিশ্রাম গ্রহণ করবেন। বিশ্রাম গ্রহণের পর মিহির সেন বস্ফোরাস প্রণালী অতিক্রমের চেষ্টা করবেন এই মাসেরই ২২ তারিখের মধ্যে। এত অল্প সময়ের মধ্যে এইরূপ তিনটি দুরপাল্লার সাগর সন্তরণের চেষ্টা (এর মধ্যে দুটিতেই সাফল্য) সত্যই দুঃসাহসিক।

সমাচার দর্পণ

আগামী ভারত সফরের জন্য ওয়েস্ট ইণ্ডিজ দলের দশজন খেলোয়াড়ের নাম জর্জ টাউন থেকে ঘোষণা করেছেন ওয়েস্ট ইণ্ডিজ ক্রিকেট কণ্ট্রোল বোর্ড। অধিনায়কের পদে আছেন গ্যারফিল্ড সোবার্স এবং অন্যান্য খেলোয়াড়রা হলেন কনরাড হাণ্ট, ওয়েসলী হল, ল্যান্স গীবস, রোহান কানহাই, বেসিল বুচার, সেমুর নার্স, চার্লস গ্রীফিথ, ডেভিড হলফোর্ড এবং জ্যাকি হেনড্রেক্স। বাকি কয়েকজনের নাম কয়েক দিনের মধ্যেই জানা যাবে। ওয়েস্ট ইণ্ডিজ ক্রিকেট দল বোম্বাইয়ে ১লা ডিসেম্বর এসে পৌঁছাবে।

* * * *

ফরেস্ট হিল টেনিস প্রতিযোগিতার ইতিহাসে সর্বপ্রথম দুজন তালিকা বহির্ভূত খেলোয়াড় ফাইন্যালে খেললেন। এই দুজন হলেন অস্ট্রেলিয়ার ফ্রেড স্টোলে এবং জন নিউকোম্ব। সেমিফাইন্যালে নিউকোম্ব পরাজিত করেন ১৯৬৬ সালের উইম্বলডেন বিজয়ী স্পেনের ম্যানুয়েল সান্তানাকে এবং ফ্রেড স্টোলে প্রাক্তন উইম্বলডেন জয়ী স্বদেশের খেলোয়াড় রয় এমার্সনকে। ফাইন্যালে স্টোলে ৪—৬, ১২—১০, ৬—৩, ৬—৪ সেটে নিউকোম্বকে পরাজিত করেন প্রায় দুঘণ্টা কুড়ি মিনিট তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতার পর।

সীতেশ দাস

মহিলাদের সিংগলস খেলার ফাইন্যালে ব্রেজিলের প্রাক্তন উইম্বলডেন চ্যাম্পিয়ান মারিয়া বুনো আমেরিকার অ্যান রিচিকে পরাজিত করেন।

ফ্রেড স্টোলে

ফ্রাঙ্কফুর্টের রিংয়ে

বারো রাউন্ড লড়াই সমানে সমানে প্রায় চালিয়ে যাবেন মিল্ডেনবার্জার, একথা অনেকেই চিন্তা করতে পারেন নি। ক্যাসিয়াস ক্লে'র সংগে ব্রায়ান লন্ডনের লড়াইয়ের ফলাফল দেখে অনেক বিশেষজ্ঞই ভেবেছিলেন যে ক্লে ফ্রাঙ্কফুর্টের রিংয়ে অনায়াসেই কাবু করবেন মিল্ডেনবার্জারকে। কিন্তু আটাশ বছরের জার্মান মুষ্টিযোদ্ধা মিল্ডেনবার্জার অনেক বিশেষজ্ঞের ভবিষ্যদ্বাণী, অনেক আলোচনার আসরের নির্ধারিত ফল আর সোজা পথে কষা অঙ্ককে ভীষণভাবে ওলটপালট করে দিলেন।

ক্লে জিতেছেন এবং জিতবেন একথা সকলেই জানতেন—বোধ হয় স্বয়ং মিল্ডেনবার্জারও! কিন্তু ফ্রাঙ্কফুর্টের রিংয়ে ক্লে'কে এক এক করে তাঁর সঞ্চয়ের তূণ থেকে বার করে প্রয়োগ করতে হয়েছে বাছা বাছা কায়দা। শেষ পর্যন্ত বারো রাউন্ডের পর মিল্ডেনবার্জার নতি স্বীকার করেছেন।

লড়াইয়ের শেষে অতীতের হেভী ওয়েট মুষ্টিযুদ্ধ চ্যাম্পিয়ান জো লুই বলেছেন যে লড়াই বেশ ভাল হয়েছে। যদিও অনেকে মনে করেছিলেন দু-তিন রাউন্ডেই সব খতম হয়ে যাবে, মিল্ডেনবার্জার দারুণভাবে লড়াই করে ক্লে'কে বারো রাউন্ড পর্যন্ত টেনেছেন। আর জো লুইয়ের সমসাময়িক জার্মানীর হেভী ওয়েট মুষ্টিযোদ্ধা ম্যাক্স স্কিমলিং বলেছেন যে, 'ক্লে অনেক ভারী মিল্ডেনবার্জারের চেয়ে তাই মিল্ডেনবার্জার সুবিধা করে উঠতে পারে নি। জো লুইয়ের যুগে হলে ক্লে'কে জো লুই নক আউট করে দিতে পারতেন।' লড়াইয়ে উপস্থিত জার্মান চিকিৎসক বলেছেন যে রেফারী যখন লড়াই বন্ধ করে দেন তখন মিল্ডেনবার্জার চোখে কোন কিছুই দেখতে পাচ্ছিলেন না।

ক্যাসিয়াস ক্লে'র মা মিসেস ওডেসা ক্লে আমেরিকা থেকে পশ্চিম জার্মানী এসেছিলেন পুত্রের লড়াই দেখবার জন্য। লড়াই দেখে তিনি বলেন, "ক্যাসিয়াস জীবনের একটা কঠিনতম লড়াই লড়ল। মাঝে মাঝে লড়াই দেখে মনে হচ্ছিল ক্লে কিছুটা বিপদগ্রস্ত।"

তবে একথা ঠিক, ফ্রাঙ্কফুর্টের ওয়াল্ড স্টেডিয়ামের প্রায় ত্রিশ হাজার দর্শক যে মুষ্টিযুদ্ধ প্রত্যক্ষ করেছেন তা সহজে দেখা যায় না, আর একজনের জীবনে খুব কমই সৌভাগ্য হয় এরূপ। প্রথম রাউন্ডের প্রথম ঘুঁষি চালান মিল্ডেনবার্জার ক্লে'র ওপর। কিন্তু ক্লে চাতুর্যের সংগে পিছু হটে লড়তে লাগলেন এবং পর পর দুটি ঘুঁষি চালালেন কার্ল মিল্ডেনবার্জারকে লক্ষ্য করে। লড়াইয়ের সুরুতে মিল্ডেনবার্জারের উৎসাহ ভরে লড়ার ধরণ দেখে মনে হচ্ছিল যে, ক্লে'র প্রায় সমানই দ্রুত বুঝি তিনি! চতুর্থ রাউন্ডে অবশ্য মিল্ডেনবার্জার ক্লে'কে কয়েকবার বেকায়দায় ফেলেন।

পঞ্চম রাউন্ডে মিল্ডেনবার্জার ক্লে'র কাছ থেকে এমন আঘাত পেলেন যে তাঁর নাক থেকে রক্ত পড়তে লাগল আর বাঁ চোখের নিচে এক গভীর ক্ষতের সৃষ্টি হল। আঘাত পেয়েও কিন্তু তিনি ক্লে'কে আক্রমণের প্রচেষ্টার ত্রুটি রাখলেন না। এই সময় ক্লে'র একটি ডান হাতের আড়াআড়ি আঘাত কার্লকে রিংয়ে ফেলে দিল। ষষ্ঠ রাউন্ডে মনে হল কার্লের বুঝি সময় হয়ে এসেছে, কারণ তখন তাঁর আঘাতগুলি ছিল দুর্বল। পরবর্তী রাউন্ডে কিন্তু দেখা গেল কার্ল মিল্ডেনবার্জারের এক অন্য রূপ। ভীষণভাবে তিনি ক্লে'র ওপর আক্রমণ চালাবার চেষ্টা করতে লাগলেন এবং কতকাংশে সফলও হলেন। এই রাউন্ডে ক্লে'কে একটু বিভ্রান্ত মনে হচ্ছিল। কার্লের একটি ঘুঁষি আচমকা ক্লে'র মুখে লেগে তাঁকে কিছুটা বেকায়দায় ফেলেছিল।

অষ্টম রাউন্ডের সুরুতে একটু কোণঠাসা হয়ে পড়েছিলেন বটে মিল্ডেনবার্জার, কিন্তু ডান হাতের এক প্রচন্ড আঘাত ক্লে'র শরীরে দিয়ে কার্ল তাকে কিছুটা আহত করেছিলেন। এই ফাঁকে ক্লে-কে রিংয়ের দড়ির ওপর বাগেও পেয়েছিলেন মিল্ডেনবার্জার, কিন্তু পাল্টা আক্রমণে ক্লে মিল্ডেনবার্জারকে কোণঠাসা করে দিলেন।

দশম রাউন্ডে জার্মান চ্যাম্পিয়ান মিল্ডেনবার্জার যে সুযোগ পেয়েছিলেন তা ঠিকভাবে কাজে লাগাতে পারলে ফলাফল হয়ত উল্টে যেত। মিল্ডেনবার্জার ক্লে'র ওপর প্রায় ঝাঁপিয়ে পড়ে যেভাবে তাঁকে আঘাত করেন তাতে ক্লে স্থানচ্যুত হয়ে রিংয়ে পড়ে যাচ্ছিলেন কিন্তু কোনক্রমে তিনি নিজেকে সামলে নেন। এরপর ক্লে'র পালা; ক্লে কোণঠাসা করে দিলেন মিল্ডেনবার্জারকে। অবশেষে মিল্ডেনবার্জার এক শেষ চেষ্টা করলেন; কয়েকটি জোরালো আঘাত বর্ষণ করার চেষ্টা করলেন ক্লে'র ওপর, কিন্তু ক্ষিপ্র এবং চতুর ক্লে অদ্ভুত তৎপরতার সংগে মাথা নিচু করে সব আঘাত এড়িয়ে গেলেন।

এরপর দ্বাদশ রাউন্ডে ক্লে'র শরাভেদ্য থেকে এক প্রচন্ড আঘাত আকস্মিকভাবে মিল্ডেনবার্জারকে পরাজয়ের মুখে ঠেলে দিল। ওই প্রচন্ড আঘাতে মিল্ডেনবার্জার মাতালের মত টলতে টলতে সারা রিংয়ে ঘুরপাক খেতে লাগলেন; দু চোখের ক্ষত থেকে রক্ত পড়ছে—সামনে তখন আর তিনি কোন কিছুই দেখতে পাচ্ছেন না। কার্ল মিল্ডেনবার্জারের এই অবস্থা দেখে ব্রিটিশ রেফারী টেডি ওয়াল্টহ্যাম লড়াই বন্ধ করে দ্বাদশ রাউন্ডে ক্যাসিয়াস ক্লে'কে বিজয়ী বলে ঘোষণা করলেন।

রিং থেকে ফিরে মিল্ডেনবার্জার বলেছেন—"আমি যা দেখাতে পেরেছি, তাতেই আমি খুশি, আমি জয়ী হব আশা করেছিলাম, কিন্তু যতটুকু করেছি এর বেশি করার ক্ষমতা আমার ছিল না।"

ক্যাসিয়াস ক্লে'র মতে মিল্ডেনবার্জারের সংগে তাঁর লড়াই তাঁর জীবনের সবচেয়ে শক্ত লড়াই। অবশ্য তাঁর মতে কানাডার জর্জ চুভালোর ঘুঁষির জোর অনেক বেশি। ক্লে-মিল্ডেনবার্জারের লড়াইয়ের অন্যতম উদ্যোক্তা এবং লন্ডনের "ভিউ স্পোর্টস"-এর ম্যানেজিং ডিরেক্টর বলেছেন যে ক্রীড়ানুরাগীদের আগ্রহে ক্লে-মিল্ডেনবার্জারের আবার একটি সাক্ষাৎকারের ব্যবস্থা করা হচ্ছে। ১৯৬৭ সালের মার্চ মাসে বার্লিনে আশা করা যাচ্ছে এই ফিরতি মুষ্টিযুদ্ধ অনুষ্ঠিত হবে।

ফ্রাঙ্কফুর্টে উপনীত হবার পূর্বে মহম্মদ আলি ক্লে স্থির করেছিলেন যে, ১৯৬৬ সালে আরও দুটি লড়াইয়ে তিনি অবতীর্ণ হবেন। কিন্তু মিল্ডেনবার্জারের সংগে লড়াইয়ের পর সেই সিদ্ধান্তের পরিবর্তন করেছেন ক্লে। এবছর তিনি মাত্র আর একটি লড়াইয়ে অবতীর্ণ হবেন। ক্লে'র আগামী প্রতিদ্বন্দ্বী হলেন টেক্সাসের ক্লিভল্যান্ড উইলিয়ামস। এই লড়াইয়ের তারিখ এখনও ঠিক হয় নি বটে কিন্তু নভেম্বর মাসেই লড়াইটি অনুষ্ঠিত হবার কথা। ক্লে'র এখন ইচ্ছা টেক্সাসের হাউস্টনে "বিগ ক্যাট" নামে খ্যাত ক্লিভল্যান্ড উইলিয়ামসকে পরাজিত করে মাস তিনেক বিশ্রাম নেবেন। অবশ্য এখন খেতাব আরও কিছুদিন অক্ষুন্ন রাখতে হলে তাঁর কিছুদিন বিশ্রাম খুবই প্রয়োজন।

—দিলীপ চৌধুরী

সম্পাদিকা—জয়ন্তী সেন
বসুমতী (প্রাঃ) লিঃ-এর পক্ষে ১৬৬, বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী স্ট্রীটস্থ কলিকাতা-১২
বসুমতী প্রেস হইতে শ্রীসুকুমার গুহমজুমদার কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

সাপ্তাহিক বসুমতী

আটচল্লিশ ঘণ্টার ঐতিহাসিক 'বাংলা বন্ধ'-এ কলকাতার রাজপথের কয়েকটি চিত্র

বর্ষ : ১৭শ সংখ্যা, বৃহস্পতিবার, ১২ই আশ্বিন, ১৩৭৩ বঙ্গাব্দ 29th Sept., 1966 * Vol. 71, No.

সূচীপত্র

বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা
সম্পাদকীয়		১০২৭
আজকের মানুষ		১০২৮
ভারতদর্শন		১০২৯
আন্তর্জাতিক		১০৩৩
গ্রন্থমেলা	— জয়ন্তী সেন	১০৩৫
বিপ্লব প্রচেষ্টার একটি বিস্মৃত অধ্যায়	— সত্যেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়	১০৩৬
ফুটপাতের সংসারে : স্বপ্ন (কবিতা)	— শম্ভুনাথ চট্টোপাধ্যায়	১০৩৭
অগ্নিযুগের একটি অধ্যায়	— অনন্ত সিংহ	১০৩৮
তাঁর স্ত্রী (অনুবাদ-গল্প)	— কল্পতরু সেনগুপ্ত	১০৪৪
রংগদর্শন		১০৪৭
জীবদেহ কি যন্ত্র? (প্রবন্ধ)	— আশিসকুমার সিংহ	১০৫০

সর্বপুরাণ, সর্বতন্ত্র, সর্ব উপনিষদ, সমস্ত ভক্তিগ্রন্থ হইতে সংকলিত

স্তবকবচমালা

(পঞ্চম সংস্করণ)

যে ঋষির যে স্তবে যে দেবতা আকৃষ্ট হইয়া বর প্রদান করিয়াছিলেন—পুরাণ, উপনিষদ, তন্ত্র, ভক্তিগ্রন্থরাশি মথিত করিয়া সেই সকল শ্রেষ্ঠ ভক্তিনিবেদন অতি যত্নে সুনির্বাচন—সংকলন করিয়া স্তবকবচমালারূপে গ্রথিত। স্তব—ভক্তির উচ্ছ্বাস—দেবতার বন্দনাগীতঃ আত্মনিবেদিত প্রাণে তন্ময় হইয়া স্তব পাঠে যে লাভ হয়—জাগতিক শক্তি তাহার নিকট অতি তুচ্ছ। স্তবকবচমালায় প্রায় ৫০০ দেব-দেবীর স্তব-সন্নিবেশিত।

মূল্য পাঁচ টাকা।

পৃথিবীর তরুণ-সমাজের হৃদয়জয়ী

সার ওয়াল্টার স্কটের গ্রন্থাবলী

দ্বিতীয় ভাগ

শরৎচন্দ্র মিত্র অনূদিত

আইভ্যানহো, হাইল্যান্ড উইডো, ফেয়ার মেড অফ পার্থ, সার্জনস্ ডটার

মূল্য—২·০০

তৃতীয় ভাগ

সরোজনাথ ঘোষ অনূদিত

দি ব্রাইড অব ল্যামারমুর, লিজেন্ডস অব মনট্রোজ, দি এ্যান্টিকোয়ারি

মূল্য ১৷৷০ টাকা।

সাহিত্য-জগতের গৌরবপ্রভা—হাস্যরসাবতার—নাট্যসাহিত্যের প্রবর্তক—রস-সাহিত্যের স্রষ্টা—রায় দীনবন্ধু মিত্র বাহাদুরের

দীনবন্ধু মিত্রের গ্রন্থাবলী

১ম ভাগে—জীবনী ও কবির সমালোচনা, নীলদর্পণ, জামাই বারিক, বিয়ে পাগলা বুড়ো, নবীন তপস্বিনী, কমলে কামিনী।

২য় ভাগে—সধবার একাদশী, যমালয়ে জীবন্ত মানুষ, পোড়ামহেশ্বর, কুড়ে গরুর ভিন্ন গোঠ, লীলাবতী, সুরধুনী কাব্য, দ্বাদশ কবিতা, পদ্য সংগ্রহ।

প্রতি ভাগ দুই টাকা

কবি বিহারীলাল চক্রবর্তীর

গ্রন্থাবলী

রবীন্দ্রনাথ বলেন—"আধুনিক বঙ্গসাহিত্যে প্রেমের সঙ্গীত এরূপ সহস্রধারে উৎসর মত কোথাও প্রোৎসারিত হয় নাই। এমন সুন্দর ভাবের আবেগ, কথার সহিত এমন সুরের মিশ্রণ আর কোথাও পাওয়া যায় না।"

বাঙ্গালার নব গীতিকবিতার এই প্রবর্তক, রবীন্দ্রনাথ, অক্ষয় বড়াল, রাজকৃষ্ণ রায় প্রভৃতির এই কাব্যগুরু ঋষি কবি বিহারীলাল চক্রবর্তীর রচনার সমাবেশ।

কবির জীবনী, সুবিস্তৃত সমালোচনা সহ সুবৃহৎ গ্রন্থ

মূল্য তিন টাকা

বসুমতী প্রাইভেট লিমিটেড, ১৬৬ বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী স্ট্রীট, কলিকাতা—১২

সূচীপত্র

বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা
সুবর্ণলতা (ধারাবাহিক উপন্যাস)	আশাপূর্ণা দেবী	১০৫২
১৯৬৬ (কবিতা)	সুদীপ্ত ভাদুড়ী	১০৫৬
দুঃখ—প্রেম মায়া ভালবাসা (কবিতা)	মনোরঞ্জন চট্টোপাধ্যায়	১০৫৬
অস্ট্রেলিয়া থেকে লিখছি	সুরেশচন্দ্র সাহা	১০৫৭
[illegible]সাহিত্যের আদিপর্ব	ডঃ নরেন ভট্টাচার্য	১০৬০
[illegible] কথা	[illegible] ভট্টাচার্য	১০৬৩
এক আর একে দুই নয় (গল্প)	সুপ্রীতিকুমার দাস	১০৬৮
এইচ. জি ওয়েলস্-এর [illegible]	সুখদেব ভট্টাচার্য	১০৭১
[illegible]—ওদেশে এবং এদেশে	[illegible]	১০৭৫
[illegible]		১০৭৮
[illegible]		১০৮৩
[illegible]	শ্রীঅমিতাভ	১০৮৫

শ্রীমদ্ভাগবত

প্রাচীন ভক্তদের রচিত সুললিত বাংলা পয়ারে

মূল্য [illegible] টাকা মাত্র

এই সুবৃহৎ গ্রন্থে আছে—শ্রীল সনাতন গোস্বামীর 'ভাগবতামৃত' গ্রন্থের কবিচন্দ্রের বঙ্গানুবাদ এবং শ্রীগৌরাঙ্গের প্রিয়তম ভাগবতাচার্য্য রঘুনাথ পণ্ডিতের প্রেমতরঙ্গিনী।

ইহাতে আছে দুইখানি অমূল্য গ্রন্থ

শ্রীল সনাতন গোস্বামীর ভাগবতামৃতের অনুবাদ

কবিচন্দ্রের

শ্রীবৃহদ্ভাগবতামৃত

এবং

ভাগবতাচার্যের বিশ্বপ্রসিদ্ধ

শ্রীকৃষ্ণ প্রেমতরঙ্গিনী

সমগ্র ভারতে প্রথম বঙ্গানুবাদ

"...শুনিয়া তাহার ভক্তিযোগের পঠন।
আবিষ্ট হইল গৌরচন্দ্র নারায়ণ॥"

ইহা কৃত্তিবাসী রামায়ণ এবং কাশীরাম দাসের মহাভারতের ন্যায় বাংলার প্রতি গৃহস্থের অবশ্যপাঠ্য হউক, এই নিবেদন। এই মূল্যবান গ্রন্থ বাংলার প্রতি ঘরে প্রতিষ্ঠিত করুক।

সাহিত্য-সম্রাট—বন্দেমাতরম্ মন্ত্রের ঋষি

বঙ্কিমচন্দ্রের গ্রন্থাবলী

—উপন্যাস—

প্রথম খণ্ড :—রাজসিংহ, বিষবৃক্ষ, দুর্গেশনন্দিনী, মৃণালিনী, রজনী। [সচিত্র] মূল্য—৩, টাকা।

দ্বিতীয় খণ্ড :—দুর্গেশনন্দিনী, কৃষ্ণকান্তের উইল, ইন্দিরা, রাধারাণী, সীতারাম। মূল্য—২, টাকা।

তৃতীয় খণ্ড:—আনন্দমঠ, চন্দ্রশেখর, কপালকুণ্ডলা, দেবী চৌধুরাণী। [সচিত্র] মূল্য—৩, টাকা।

—সাহিত্য—

প্রথম খণ্ড :—কৃষ্ণচরিত্র, লোকরহস্য, বিবিধ প্রবন্ধ (১ম)। মূল্য—২, টাকা।

দ্বিতীয় খণ্ড :—(১ম ভাগ অনুশীলন), মুচিরাম গুড়, বিবিধ প্রবন্ধ (২য়), বিজ্ঞান রহস্য। মূল্য—২, টাকা।

তৃতীয় খণ্ড :—শ্রীমদ্ভগবদগীতা, কমলাকান্ত, সাম্য, সাহিত্য-প্রসঙ্গ, মানস, ললিতা। মূল্য—২, টাকা।

বসুমতী প্রাইভেট লিমিটেড: ১৬৬, বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী স্ট্রীট, কলি-১২

৭১ বর্ষ : ১৭শ সংখ্যা—মূল্য ২৫ পয়সা
বৃহস্পতিবার, ১২ই আশ্বিন, ১৩৭৩ বঙ্গাব্দ

বাংলা ভাষায় দ্বিতীয় সর্বাধিক প্রচারিত
সাপ্তাহিক পত্রিকা

Price : 25 Paise
Thursday, 29th Sept., 1966

ঐতিহাসিক ৪৮ ঘণ্টা

সারা পশ্চিমবঙ্গে ২২শে ও ২৩শে সেপ্টেম্বর ৪৮ ঘণ্টাব্যাপী হরতাল পালিত হয়েছে। এই হরতাল একদিকে অভূতপূর্ব, কারণ ৪৮ ঘণ্টাব্যাপী হরতালের কোনো পূর্ব নজির নেই।

সংযুক্ত বামপন্থী ফ্রণ্ট ও রাষ্ট্রীয় সংগ্রাম সমিতি এই হরতালের আহ্বান জানিয়েছিলেন। হরতাল আহ্বানের কারণস্বরূপ বলা হয়েছে যে, বামপন্থী ফ্রণ্ট মুখ্যমন্ত্রীর সামনে মূল সতের দফা দাবি স্বীকৃতির জন্যে অনুরোধ জানিয়েছিলেন, তা মুখ্যমন্ত্রী কর্তৃক প্রত্যাখ্যাত হয়েছে। হরতাল পালিত হবার আগেই মুখ্যমন্ত্রী বলেছেন যে, হরতাল অনুষ্ঠিত হলেও বরাদ্দ রেশন বৃদ্ধি করা সম্ভব হবে না।

৪৮ ঘণ্টাব্যাপী হরতালের আহ্বান সাফল্যমণ্ডিত হবে কি না সে বিষয়েও কেউ কেউ সংশয় প্রকাশ করেছিলেন। কারো অভিমত এই ছিল যে, ৪৮ ঘণ্টাকে ৮ ঘণ্টায় নামিয়ে আনলেই বা ক্ষতি কি? এক-একটি সংস্থা যাদের নাম কোনোদিনই শোনা যায় না হরতালের বিরুদ্ধে দৈনিক সংবাদপত্রে তাদের বিবৃতি নিয়মিত প্রকাশিত হয়েছে। একদল বুদ্ধিজীবী, যাঁরা সংখ্যায় প্রায় দু'শজন ছিলেন বলে দাবি করেন, তাঁরাও সংবাদপত্রে বিবৃতি দিয়ে হরতালের বিরুদ্ধাচরণ করেছিলেন। এই সব বিবৃতিদানকারীদের পক্ষে প্রধান যুক্তি এই ছিল যে, যারা দিন-মজুরী করে তারাই হরতালের দ্বারা সর্বাপেক্ষা ক্ষতিগ্রস্ত হবে। অবশ্য এঁদের এই যুক্তির বিরুদ্ধে যে যুক্তি উপস্থাপিত করা হয়েছিল, তা হচ্ছে এই যে—দিন-মজুরদের রুজি রোজগার বন্ধ করার ব্যবস্থা হয়েছিল সরকারী বিধানেই। একমাত্র বামপন্থী নেতাদের প্রচেষ্টায় তা রোধ করা সম্ভব হয়েছে। সুতরাং যাঁরা অকস্মাৎ দিন-মজুরদের দুঃখে অ— করেন—তাঁরা কোনো ঘটনা বা খবরাখবর না রেখেই প্রভুর মন যোগাতে সত্যের মূলে কুঠারাঘাত করেন।

তবু ৪৮ ঘণ্টার হরতাল সাফল্যমণ্ডিত হয়েছে। অন্তত যাদের চোখ আছে, জনাকীর্ণ ট্রাম-বাস মুখর কলকাতাকে যাঁরা প্রত্যহ প্রত্যক্ষ করেন, তাঁদের কাছে ২২শে ও ২৩শের নিস্তব্ধ পথে, ফুটপাথে হরতালের নৈঃশব্দ ছাড়া আর কি ছিল? দৈনিক পত্রিকাগুলিতে প্রকাশিত হরতালের নীরবতায় গৃহীত ফটোগুলিও নিশ্চয় মিথ্যা নয়। কলকাতার সংবাদসহ বিভিন্ন জেলার সংবাদও হরতালের পক্ষেই সাক্ষ্য দেয়। তবু মুখ্যমন্ত্রী ক'খানা স্টেট বাস চালিয়ে দুই দিনের মোট তিনটি বেতার ভাষণে প্রমাণ করতে চেয়েছেন যে, হরতাল সাফল্যমণ্ডিত হয় নি। কিন্তু মুখ্যমন্ত্রীর কথায় যাঁরা আস্থা স্থাপন করেন, তাঁরা স্বচক্ষে ২২শে ও ২৩শে সেপ্টেম্বরের কলকাতার বা মফঃস্বলের আপন অঞ্চলটুকু পরিদর্শন করে কি অভিজ্ঞতা অর্জন করেছেন? একটা রাজত্ব চালাতে গেলে নিশ্চয়ই বিরোধীদের কৃতিত্বকে বৃহৎ আকারে দেখা সম্ভব নয়, কিন্তু নিজেদের অক্ষমতা, ব্যর্থতাকে একেবারেই অস্বীকার করার অর্থ ইতিহাসের শিক্ষাকে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ প্রদর্শন করা।

অবশ্য সবচেয়ে উপরে গেছেন অল ইণ্ডিয়া রেডিও। এঁরা দিনকে রাত আর রাতকে দিন করতে ওস্তাদ। এঁদের সংবাদের উপর নির্ভর করে যাঁরা হরতালকে থুড়ি মেরে ট্রাম, বাস ও ট্রেন ধরতে বাড়ির বাইরে বের হন, তাঁরাই দেন চরম আক্কেল সেলামী। তখন রেডিও নামক যন্ত্রটিকে আছড়ে ফেলার ইচ্ছাই বলবৎ হয়।

এবারকার হরতাল রক্তাক্ত হবার আশঙ্কাই ছিল সব চেয়ে বেশি। কারণ একদিকে সংযুক্ত বামপন্থী ফ্রণ্ট ও রাষ্ট্রীয় সংগ্রাম সমিতি আর একদিকে সরকার ও সরকারী দল যারা হরতালের ঘোরতর বিপক্ষে। এই কারণে কংগ্রেস প্রতিরোধ বাহিনীও কম কর্মব্যস্ত ছিল না। দোকান-পাট খুলে রাখার জন্যে কোনো কোনো অঞ্চলে বলপ্রয়োগ পর্যন্ত করা হয়েছিল। এমনি দু-একটি দোকান খোলাও রাখা হয়েছিল যেখান থেকে মুখ্যমন্ত্রী মাছ থেকে মিষ্টি পর্যন্ত ক্রয় করেছিলেন। এই কথা বলা হয় যে, রাজ্যপাল দলীয় রাজনীতির ঊর্ধ্বে। কিন্তু অত্যন্ত শোচনীয় ব্যাপার, সেই রাজ্যপালও হরতাল মিথ্যা প্রমাণ করতে রাজনীতির আসরে নেমে মন্ত্রীদের সঙ্গে নিউমার্কেটে শাড়ি কিনতে গিয়েছিলেন।

এখন আমরা বলতে চাই, হরতাল সম্বন্ধে সরকার যাই প্রচার করুন না কেন, তাঁরা যদি বাস্তববুদ্ধি বিবর্জিত হন তাহলে নিজেদের তৈরি খালে নিজেরাই পা দেবেন। এই হরতালের সময় বামপন্থীদল যে ধৈর্য ও শৃঙ্খলার পরিচয় দিয়েছেন, তা তাঁদের আন্দোলনের পথে আর এক ধাপ এগিয়ে দিয়েছে। তাঁদের সামনে প্ররোচনা ও গুণ্ডামির অন্ত ছিল না তবু তাঁরা শান্তিরক্ষা করতে সমর্থ হয়েছেন। জনসাধারণের স্বতঃস্ফূর্ত সমর্থন লাভ করেছেন। বর্তমান হরতালে গণতন্ত্রের প্রতি তাঁরা যে মর্যাদা দেখিয়েছেন—সেই গণতন্ত্রকে উৎখাত করতে চেয়েছিল তারাই যারা মুখে গণতন্ত্রের বুলি নিয়ে লাঠি উঁচিয়ে অনিচ্ছুক নাগরিকদের উপর মারমুখী হয়ে হরতালকে বানচাল করতে চেয়েছিল। তবু সহস্র সহস্র মানুষের দৃঢ় প্রতিজ্ঞা থেকে তাদের বিচ্যুত করতে পারে নি। ৪৮ ঘণ্টার সফল হরতাল, তাই, ইতিহাসে স্মরণীয় হয়ে থাকবে।

সম্পাদকীয়

আজকের মানুষ

ধীর অথচ দৃঢ় পদক্ষেপে ইন্দোনেশিয়া তার বিপর্যয়-বন্ধন থেকে বেরিয়ে আসছে, তার ভাঙা ও এলোমেলো ঘর গুছিয়ে নিতে প্রয়াসী হয়েছে। ভারতের পক্ষে তারও চেয়ে বড় কথা, ইন্দোনেশিয়া ভারতের সঙ্গে তার পুরোনো বন্ধুত্ব ও সংস্কৃতির মৈত্রীবন্ধনটি ঝালিয়ে নিতে আগ্রহী হয়েছে। পররাষ্ট্রমন্ত্রী ডঃ আদম মালিকের পর জোগজাকার্তার সুলতানের ভারত আগমন তো তারই নির্ভুল নজীর।

জন্মসূত্রে হেমেংকু বুয়েনো ইন্দোনেশিয়ার একটা প্রদেশের সুলতান বটে, কিন্তু সুলতান অর্থে আমরা যা বুঝি, সিরি বুয়েনো তার চেয়েও কিছু বেশি। কারণ সুলতানী গদী, অগুন্তি দাসদাসী, বেগম হারেম নিয়ে বুয়েনোর সুলতানী নয়, দেশসেবক হিসেবেই তাঁর পরিচয়।

এ-পরিচয়, এ-মর্যাদা তিনি আজ দেশের অর্থনৈতিক বিষয়ের মন্ত্রী হয়ে লাভ করছেন না, এ পরিচয় তাঁর ছাত্রাবস্থা থেকেই। বিদেশী শাসনের বিরুদ্ধে যখন ইন্দোনেশিয়ার জনসাধারণ মরণপণ সংগ্রামে লিপ্ত, তখন থেকেই বুয়েনো তার সঙ্গে আত্মিক যোগাযোগ স্থাপন করেছেন—বুয়েনো তখন লিডেনে (হল্যান্ড) ছাত্র মাত্র। পরে ১৯৪০ সালে উত্তরাধিকার-সূত্রে সুলতানী লাভ করেও তিনি দেশ বা দেশবাসীকে ভুলতে পারেন নি, শত্রুকে চিনে নিতেও তাঁর ভুল হয় নি। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সূচনা কাল তখন। জাপান বিদ্যুৎ-গতিতে এগিয়ে আসছে, একটার পর একটা দেশ করতলগত করতে করতে। একে ওলন্দাজদের অত্যাচার তার ওপর আবার নতুন উৎপাত, বুয়েনো বুঝলেন, যে কোন মূল্যে জাপানী আক্রমণ রুখতে হবে। জোগজাকার্তার সুলতান গড়ে তুললেন অপ্রতিরোধ্য প্রতিরোধ বাহিনী।

জাপানী সামরিকবাদ পিছু হটলো তো বৃটিশ উপনিবেশবাদ এগিয়ে এলো উদ্যত হয়ে। তার লুব্ধ দৃষ্টি পড়েছিল খনিজ সম্পদে সমৃদ্ধশালী ইন্দোনেশিয়ার ওপর। ওলন্দাজ শাসকরা তো রয়েছেই। ওলন্দাজরা একবার টোপ ফেলেছিল ভাল। সুলতানের কাছে ওরা এ প্রস্তাব রেখেছিল যে, যদি তিনি ওদের সমর্থন করেন তবে তাঁর পদমর্যাদা ওরা বাড়িয়ে দেবে। কিন্তু সুলতান বুয়েনো ঘৃণার সঙ্গে সে প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেন, বিদেশী শাসকের হয়ে তিনি দেশবাসীর বিরুদ্ধে বন্দুক ধরতে রাজী হন নি। সেই থেকে ওলন্দাজদের শত্রু তালিকায় সুলতান বুয়েনোর নাম শীর্ষস্থানে।

সুলতান বুয়েনো

এ-দেশপ্রীতির পুরস্কার তিনি সঙ্গে সঙ্গেই পেয়েছিলেন, দেশবাসী তাঁকে বীরোচিত সম্মান দিতে দেরি করে নি। এবং সে সম্মানপ্রাপ্তির সূত্র আজো অব্যাহত রয়েছে। দেশ যখন বিদেশী-শাসনমুক্ত হল তখন তাঁকে মিনিস্টার অফ স্টেট পদ দেওয়া হয়েছিল শাহ্‌রিয়র মন্ত্রিসভায়। এর পরে বুয়েনো বিভিন্ন মন্ত্রিসভায় দায়িত্ব নিয়ে কাজ করে আসছেন।

ডঃ হাত্তা যখন মন্ত্রিসভা গঠন করেন তখন বুয়েনোর ডাক পড়েছিল আরো গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালনে : এক সঙ্গে প্রতিরক্ষা এবং আভ্যন্তরীণ নিরাপত্তার সমন্বয় সাধনের দপ্তর তাঁকে নিতে হয়। তারপর ১৯৫১ সালের নতশিয়র ক্যাবিনেটে তিনি উপ-প্রধানমন্ত্রীর আসন অলংকৃত করেন। দু' বছর পরে উইলোপোর নেতৃত্বে মন্ত্রিসভা গঠিত হলে বুয়েনোকে আবার প্রতিরক্ষামন্ত্রী করা হয়েছিল।

কিন্তু মিঃ বুয়েনোর লাইন অর্থনীতি, দেশের প্রয়োজনও অর্থনৈতিক বিষয়ে দক্ষ লোকের। ১৯৬৪ সালে তাই তাঁকে দেখা গেল রাষ্ট্রীয় অর্থনৈতিক নিয়ন্ত্রণ সংস্থার প্রধানের মন্ত্রিপদে। চলতি বছরের গোড়ার দিকে দেশের অর্থনৈতিক ও উন্নয়নবিষয়ক দপ্তরের উপ-প্রধানমন্ত্রীর পদ পেলেন সুলতান বুয়েনো; তারই কয়েক মাসের মধ্যে জেনারেল সুহার্তো যখন দেশের শাসনভার নিলেন তখন আরো দায়িত্ব চাপালেন এই যোগ্য ব্যক্তিটির ওপর—ফিনান্সিয়াল অ্যান্ড ইকনমিক অ্যাফেয়ার্স দপ্তর নিয়ে তিনি প্রেসিডিয়াম মিনিস্টার হলেন।

কিন্তু তাই বলে নীরস অর্থনীতির মতো বুয়েনো রসবোধহীন নন, নৃত্য-গীত-সংস্কৃতির প্রতি তাঁর অনুরাগ গভীর। জোগজাকার্তার রামায়ণ ব্যালে গ্রুপের খ্যাতি বিশ্বজোড়া। এ ব্যালে গ্রুপ প্রতিষ্ঠার পূর্ণ গৌরব সুলতান বুয়েনোরই প্রাপ্য। দলটির ভারত সফরের কথা আছে অদূর ভবিষ্যতে।

ইন্দোনেশিয়ার বিপর্যস্ত অর্থনীতিকে নতুন করে গড়ে তোলার কঠিন দায়িত্ব বর্তেছে বুয়েনোর ওপর, কিন্তু একা ইন্দোনেশিয়ার পক্ষে সংকট উত্তীর্ণ হওয়া সম্ভব নয়। তাই ইন্দোনেশিয়া তার পুরোনো বন্ধু ভারতের সহায়তা চেয়েছে। আফ্রো-এশীয় ব্লকের অন্যতম শরিক ইন্দোনেশিয়ার প্রতি ভারত উদাসীন মনোভাব পোষণ করতে পারে না, ইন্দোনেশিয়ার সমৃদ্ধি, তার উন্নতি তো এশিয়ারই উন্নতি। তাই ভারত ১০ কোটি টাকা ঋণ দেবার আশ্বাস দিয়েছে ইন্দোনেশিয়াকে। বিশেষত তার আভ্যন্তরীণ হাওয়ায় যখন গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন সাধিত হয়েছে তখন তার দুর্দিনে পাশে গিয়ে দাঁড়ানো তো ভারতের পবিত্র কর্তব্য। জোগজাকার্তার সুলতানের দিল্লী আগমন প্রধানত সেই ঋণের সূত্র ধরেই।

প্রাক নির্বাচনী ভারতদর্শন

কংগ্রেস সভাপতি তাঁর বক্তৃতা সফরকালে বলেছেনঃ গত কয়েকটি পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় ধনীরা অধিকতর ধন সঞ্চয় করেছে, তাই বলেই গরীবে আরও গরীব বনেছে একথা বলা ঠিক নয়।

আর দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি?

কংগ্রেস সভাপতি বলেন, এজন্য শঙ্কিত হবার কারণ নেই, কেন না "জনগণের জীবনযাত্রার মানও একই সঙ্গে উন্নীত হয়েছে।"

(মাদুরাই, ১৮।৯।৬৬)

* * *

"দেশ থেকে দারিদ্র্য দূর করা না গেলে বিপ্লব অনিবার্য।" (কলকাতায় শ্রমমন্ত্রী শ্রীজগজীবন রামের ভাষণাংশ) অর্থাৎ জীবনযাত্রার মানোন্নয়নের প্রত্যয় তাঁর নেই।

* * *

কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনামন্ত্রী সম্প্রতি কলকাতায় ঔষধের মূল্য সাধারণের ক্রয়ক্ষমতার মধ্যে আনার আহ্বান জানানোর কালে যে যুক্তি দেখান, তাতে ভারতবাসীর দারিদ্র্যের চূড়ান্ত লক্ষণ পরিস্ফুট হয়ে ওঠে। তিনি বলেন, ভারতে জনপ্রতি ঔষধ ব্যবহারের পরিমাণ মাত্র তিন টাকা। চিকিৎসকের পরামর্শ অনুসারে ঔষধ ব্যবহারের পরিমাণ বাৎসরিক হারে জনপ্রতি দু' টাকা। এটা পৃথিবীর মধ্যে চিকিৎসাখাতে সর্বনিম্ন হার। জনগণের দারিদ্র্যই এর কারণ।

* * *

উত্তরপ্রদেশ তেহরি জেলার কংগ্রেস-সেবিকা শ্রীমতী বিনয়লক্ষ্মী সুমন মুখ্যমন্ত্রী শ্রীমতী কৃপালনীকে জানিয়েছেন, ভাদুরাপত্তি নামক স্থানে জনৈক ব্যক্তি অনাহারে মারা গেছে।

শ্রীমতী বিজয়লক্ষ্মী পণ্ডিত

শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী সকাশে [illegible]

রাজস্থান বিধানসভায় এক প্রশ্নোত্তরে জানানো হয়; ১৯৬২ সাল থেকে ১৯৬৩ সালে মোট বারশত দুইজন (১২০২) ব্যক্তি আত্মহত্যা করেন। কারণ স্বরূপ জানানো হয়েছে, চরম আর্থিক দুরবস্থা, স্থায়ী ব্যাধির প্রকোপ এবং অন্যান্য পারিবারিক হতাশাই গড়ে দৈনিক একজনের আত্মহত্যার কারণ।

* * *

শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী মুজফফরপুর (বিহারে) তাঁর নির্বাচনী বক্তৃতা সফরে বলেছেনঃ ধনী দরিদ্রের পার্থক্য দূর করে জনগণের সামাজিক ও আর্থিক অবস্থা উন্নত করার জন্য কংগ্রেসীদের সর্বশক্তি নিয়োগ করা উচিত। তিনি সমাজতান্ত্রিক ধাঁচের সমাজ গঠন করতেও কংগ্রেসসেবীদের অনুরোধ জানান।

কংগ্রেসের খসড়া নির্বাচনী ইস্তাহারের কঠোর সমালোচনাকালে নেহরু-ভগ্নী শ্রীমতী বিজয়লক্ষ্মী পণ্ডিত অভিযোগ করেনঃ কংগ্রেস তার অতীতে প্রদত্ত প্রতিশ্রুতির মর্যাদা রক্ষা করে নি, বর্তমান ইস্তাহারে সেইসব প্রতিশ্রুতিরই পুনরাবৃত্তি করা হয়েছে। কিন্তু জনগণের বর্তমান সমস্যাগুলির বিষয় কিছুই উল্লেখ করা হয় নি।

* * *

প্রবীণ কংগ্রেসী শ্রীঅমরনাথ বিদ্যালঙ্কার একই কথা বলে জানানঃ দেশের মানুষ আজ সচেতন। ভোট দেবার আগে তারা কাজ দিয়ে কংগ্রেসকে বিচার করতে ভুলবে না।

মহাবীর ত্যাগী নির্বাচনী ইস্তাহার সম্পর্কে বলেনঃ আমার আশঙ্কা হচ্ছে, এই ইস্তাহার হয়ত শেষ পর্যন্ত কংগ্রেস দলের একটি শোক-সংবাদে পরিণত হবে।

* * *

হায়দ্রাবাদে নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির অধিবেশনে যোগদানের জন্য উপনীত হয়ে প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী গান্ধী বেগমপেট বিমান বন্দরে সাংবাদিকদের বলেছেনঃ দরিদ্ররা আরও দরিদ্র হচ্ছে একথা বলাটা আজ একটা ফ্যাশনে দাঁড়িয়েছে।

* *

কেন্দ্রীয় স্ট্যাটিস্টিক্যাল অরগানাইজেশন কর্তৃক প্রস্তুত জাতীয় আয়ের একটি হিসাবে দেখা যাচ্ছেঃ ১৯৬৫-৬৬ সালে জাতীয় আয় তিন দশমিক সাত হারে হ্রাস পেয়েছে। তৃতীয় যোজনাকালের প্রথম চার বছরে মাথাপিছু আয় হ্রাসের পরিমাণ প্রায় ছয় শতাংশ।

সাধারণ সমালোচকরা এই সঙ্গে বলবেনঃ মাথাপিছু আয়ের হিসাবটাও গোলমেলে। ঐ হিসাবের দ্বারাও দারিদ্র্যের সঠিক পরিচয় ধরা পড়ে না। এই হিসাবের বাইরে আছে কালো টাকা এবং উচ্চ আয় নিম্ন আয় একত্রে যোগ করে জনসংখ্যার দ্বারা ভাগ করেই এই অঙ্ক বার করা হয়। তাতে হত দরিদ্রকেও কুবেরের সঙ্গেই এক পঙ্‌ক্তিতে গণনা করা হয়ে থাকে। সুতরাং প্রধানমন্ত্রীর উজ্জ্বল চিত্র ধোপে টেকে না।

মুদ্রামূল্য হ্রাসের ঘটনাই ভারতের "অর্থনৈতিক স্বাস্থ্যহানি প্রমাণ করে"—লিখেছেন শ্রীমোরারজী দেশাই এ-আই-সি-সি স্মারকগ্রন্থে তাঁর নিজস্ব প্রবন্ধে।

* * *

স্মারকগ্রন্থে শ্রী টি ম্যানিয়েন, যিনি কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক, লিখছেনঃ "আমাদের নিরস্ত্র দেশবাসীর ওপর পুলিশের গুলীবর্ষণ কবে সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ হবে, আমি কেবল সেই দিনটির পথ চেয়ে আছি এবং তার জন্য প্রার্থনা করছি।"

* * *

এমনকি রেলমন্ত্রী শ্রী এস কে পাতিলও লিখছেন ঃ "কংগ্রেস সংগঠনে সকলেই অনুভব করছেন সংগঠনের অন্তর্নিহিত দুর্বলতার কথা, এবং তাঁরা উপলব্ধি করছেন যে যতদিন না এই দুর্বলতা অপসারিত হচ্ছে এবং শাসনযন্ত্রেও সমানভাবে সমন্বয় সাধন করা হচ্ছে, ততদিন দেশের ভবিষ্যৎ অন্ধকার।"

* * *

হায়! কংগ্রেসের মধ্যেই আজ কী নিদারুণ হতাশা! শ্রীম্যানিয়েনের মতো কতজনেই আজ প্রার্থনার জন্য নাটমন্দিরে ধ্যানস্থ। মা কি হইয়াছেন!

কিন্তু অসহায় শুভকামীরা কোথায় প্রার্থনার আয়োজন করেছেন, সম্মুখে কার মূর্তি? দেখা যাচ্ছে তো, সমাবেশ এর্ণাকুলামে। সভা প্রার্থনামঞ্চ নয়, ম্যানিফেস্টো বা নির্বাচনী ইস্তাহার নিয়ে আলোচনা মঞ্চ। পাঁচ বছরে একবার কী আশ্চর্য চেতনার সঞ্চার! ভারতের এমন চিন্ময়ীমূর্তি ভারত ভাগ্যবিধাতাদের সামনে ইতিপূর্বে কি কখনো উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে নি?

এ কী অপরূপ ভারতদর্শন আজ আমাদের পক্ষে সম্ভব হ'ল!

হে নির্বাচন, তোমাকে ধন্যবাদ! তুমি মূককে বাচাল এবং পঙ্গুকে গিরিলঙ্ঘনে সাহায্য কর! হে নির্বাচন, তুমিই সত্যকে ধোঁকার দ্বারা আবৃত করতে পার এবং তুমিই পার ধোঁকাকে ক্ষণিকের জন্য অপসারিত করতে।

কংগ্রেসী ইস্তাহার

খুব সহজে এবার কংগ্রেসের পক্ষে তার নির্বাচনী ইস্তাহার গুছিয়ে তোলা সম্ভব হয় নি। কংগ্রেসের প্রবীণ সদস্যবর্গই খসড়া ইস্তাহারের নির্ভীক সমালোচনা করে এই কথাটা সুস্পষ্টভাবেই বুঝিয়ে দিতে চেয়েছেন যে, চমকপ্রদ কথার ও প্রতিশ্রুতির মধ্য দিয়ে নির্বাচনে বাজিমাৎ করার সুবর্ণ সময় আর নেই, জনগণ এখন অনেক বেশি সচেতন হয়েছেন, তাঁরা কাজে ও কথায় কংগ্রেসকে বাজিয়ে দেখবেন অতঃপর। সুতরাং ময়ও না ঢেলে কেমন করে দেশটাকে ঢেলে সাজানো যায় বা তার একটা চেষ্টা শুরু করা যায় সেদিকে কড়া লক্ষ্য রেখেই এবারের নির্বাচনী ইস্তাহার প্রণয়ন করা উচিত। বলা বাহুল্য এই ঔচিত্যবোধ যে কুম্ভকর্ণের নিদ্রাভঙ্গ এমন কথা অবশ্য কেউ বলবেন না। এই ঔচিত্যবোধ আপনি গজিয়ে ওঠে নি, ভারতব্যাপী বেসামাল এবং ক্রমাগত গণ-আন্দোলন নেতাদের মাথায় উচিত কর্তব্যের চিন্তা অনুপ্রবিষ্ট করিয়ে ছেড়েছে।

এ আই সি সির অধিবেশনে ঝড় বয়ে গেছে তাই। গণবিক্ষোভ দেখে যাঁরা সচেতন হয়েছেন, তাঁরা পার্টির আগাপান্তালা সমালোচনা করে আত্মতৃপ্তির ভূত জাগিয়ে দিতে চেয়েছেন এবং বস্তুতপক্ষে আ-স্বাধীনতাকালের আত্মতুষ্ট ভূত পার্টির ঘাড়ে যে কিঞ্চিৎ নড়ে বসার চেষ্টা করেছে তাও লক্ষণীয়।

বর্তমান ইস্তাহারে যে কয়টি সংশোধনী প্রস্তাব রাখা হয়েছে তার মূল লক্ষ্যই হল ক্ষুব্ধ জনগণকে শান্ত করার জন্য কিছু প্রলেপের ব্যবস্থা করা।

খসড়া ইস্তাহারে 'জাতীয় সর্বনিম্ন' বলে যে অংশটি সংযোজিত করা হয়েছে তাতে বলা হয়েছে, পঞ্চম যোজনার শেষাশেষি সার্বিকভাবে জাতির অন্ন বস্ত্র বাসস্থান এবং শিক্ষা স্বাস্থ্য প্রভৃতির সর্বনিম্ন একটি ব্যবস্থা করার জন্য জাতির সম্মুখে একটি লক্ষ্য স্থাপন করতে হবে। অর্থাৎ স্বাধীনতার বিশ বছরের পরেও আরও দশ বছর লাগবে 'মিনিমামে' পোঁছাতে। অবশ্য যদি কথায় ও কাজে সমতা রক্ষা করা হয় এবং কংগ্রেসই ক্ষমতায় আসীন থাকেন।

যতই দিন যাচ্ছে দুনিয়ার শ্রমিক সম্প্রদায়কে ততই ক্ষমতাবানরা সমীহ করতে শিখছেন। আশ্বস্ত হওয়া গেল এই দেখে যে, কংগ্রেসও এ শিক্ষা গ্রহণ করেছেন এবং শ্রীসঞ্জীবায়ার সংশোধনী প্রস্তাবে শ্রমিকদের জন্য উন্নত ব্যবস্থা এবং শ্রমশিল্পে শ্রমিকদের অংশীদারিত্ব স্থাপন করার জন্য কিছু চিন্তাও করা হয়েছে।

এসব বিষয় আজ উত্থাপিত হচ্ছে এবং তাও সংশোধনীর মারফৎ, এটাই বড় বিচিত্র ব্যাপার। যে কংগ্রেস দেশে সমাজতান্ত্রিক ধাঁচের সমাজ প্রতিষ্ঠার বিশ্বাসী বলে ফলাও বক্তৃতা করেন সেই সংগঠনের ইস্তাহার এতকাল পর সংশোধনীর মাধ্যমে সর্বনিম্ন ব্যবস্থার কথা চিন্তা করছে। কিন্তু ব্যাপারটা যতই গোলমেলে ঠেকুক কংগ্রেস যে ঠেকে শিখছেন, এটাই তার অন্যতম পরিচায়ক বলে মনে করা যেতে পারে। আর এসব কারণেই তো উন্নতিশীল দেশে দুটি সমান ক্ষমতাশালী রাজনৈতিক দলের প্রয়োজন দেখা দেয়। একে নিদ্রার আয়োজন করলেই, অপরে তৎক্ষণাৎ সে তন্দ্রা ভেঙে দেন। আজ সমগ্র ভারতব্যাপী বাম ঐক্যের চেষ্টায় সে জাতীয় ফলই যে অঙ্কুরিত হতে শুরু করছে একথা বললে অত্যুক্তি হবে না।

শাস্ত্রীনগরে এ আই সি সি অধিবেশনে ২৪শে তারিখ সকল বক্তাই সমস্বরে ব্যাঙ্ক রাষ্ট্রীয়করণের দাবি সমর্থন করেন। এই সঙ্গে অনেকে আঞ্চলিক আর্থিক অসাম্যের অবসানও দাবি করেন। (চূড়ান্ত সিদ্ধান্তের সংবাদ এ পর্যন্ত আমরা পাই নি)।

অধিবেশনে একটা মোদ্দা কথা বলেছেন শ্রীবাবুভাই চিনাই। তিনি বলেনঃ কংগ্রেস হাইকমান্ড বলতে সেদিন বোঝাত গান্ধীজী এবং তারপর নেহরুজীকে; আজ প্রত্যেকেই হাইকমান্ড।

প্রশ্নটি গুরুত্বপূর্ণ। সেদিনের মতো অবিসংবাদী নেতা না থাকায় আজ কংগ্রেসের অবস্থাও বেশ 'টাইট' হয়ে পড়েছে। এখন খুশিমত কথায় কাজে ফারাক সৃষ্টি করেও ক্ষেপে ক্ষেপে নির্বাচনী তরণীকে অনায়াসে কূলে ভেড়ানো সম্ভব নয়। এখন বেশ বুঝে সমঝে চলতে হবে কংগ্রেসী নেতাদের সমালোচনা সে সত্যই জানান দিচ্ছে।

এই প্রসঙ্গে কংগ্রেস সমাজতন্ত্রী ফোরামের প্রকাশিত পুস্তিকায়ও সতর্কবাণী উচ্চারিত হয়েছে। পুস্তিকায় বলা হয়েছেঃ কংগ্রেসের নির্বাচনী ইস্তাহারে ...অনেক প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়ে থাকে। কিন্তু সরকার যথারীতি সেগুলি ধামাচাপা দেন। এই ব্যবস্থার অবসান না ঘটালে মারাত্মক বিপর্যয় দেখা দেবে।

ব্যাঙ্ক জাতীয়করণের ফলে মুষ্টিমেয়ের দ্বারা সম্পদ স্তূপীকৃত হওয়ার সম্ভাবনা লুপ্ত হবে বলে ফোরাম আশা প্রকাশ করে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার ও প্রকৃত বাস্তব ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য কংগ্রেসের প্রতি আবেদনও জানিয়েছেন।

এ সমস্ত সতর্কীকরণই কংগ্রেসের মঙ্গলার্থে। এখন কর্তাদের মধ্যে চেতনা সঞ্চার হলেই সর্বৈব মঙ্গল।

ভারত-ইন্দোনেশিয়া চুক্তি

দিল্লীতে ভারত-ইন্দোনেশিয়া বৈষয়িক চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে। চুক্তি অনুযায়ী স্থির হয়েছে, ইন্দোনেশিয়াকে ভারত দশ কোটি টাকা ঋণ দেবে, সেই টাকায় ইন্দোনেশিয়া ভারতের কাছ থেকে কয়েক ধরণের পণ্য কিনবে। এই চুক্তি স্বাক্ষরকালে ইন্দোনেশিয়ার বৈষয়িক বিভাগের

মন্ত্রী যোগজাকার্তায় সুলতান হেমেঙ্কু বুয়োনো বলেন, ভারত ও ইন্দোনেশিয়ার মধ্যে যে সম্পর্ক গড়ে উঠতে চলেছে তাতে ইতিপূর্বের সমস্ত অপ্রীতিকর ঘটনাবলী অতীতের গর্ভে নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে।

মহারাষ্ট্র:

সরকারী কর্মচারীর বেতনহার

আমরা আশা করেছিলাম গণতান্ত্রিক মনোভাবে বিশ্বাসী মুখ্যমন্ত্রী শ্রী ভি পি নায়েক রাজ্য সরকারী কর্মিগণের মাগ্গী-ভাতার দাবি সহানুভূতি ও সুবিবেচনার সংগে বিচার করবেন। আমাদের আশা নিষ্ফল হয় নি। শ্রীনায়েকের ওপর ক্যাবিনেট যে গুরুদায়িত্ব চাপিয়ে দিয়েছিলেন, শ্রীনায়েক মোটামুটিভাবে তার এ সর্ব-গ্রাহ্য সমাধানে উপনীত হতে সমর্থ হয়েছেন।

কর্মচারী অসন্তোষের এমনভাবে মোকাবিলায় অন্যান্য রাজ্য সফল হয় নি। এর অন্যতম কারণ হয়ত এই যে, মহারাষ্ট্রে অধিক সন্ন্যাসীতে গাজন নষ্ট করেন নি। সমগ্র প্রশ্নটি মীমাংসার গুরুদায়িত্ব ছেড়ে দেওয়া হয়েছিল শ্রীনায়েকের নায়কোচিত দক্ষতার ওপর। ক্যাবিনেটের কোন মাথাগরম মন্ত্রিগ্রুপ পথের বাধা না-হওয়ায় ঠাণ্ডা মাথায় শ্রীনায়েক প্রশ্নটির সন্তোষজনক মীমাংসায় উত্তীর্ণ হওয়ার সুযোগ পেয়েছেন তাই।

মহারাষ্ট্র রাজ্য সরকারী কর্মচারী ফেডারেশন, মহারাষ্ট্র রাজ্য জেলা পরিষদ য়ুনিয়ন, মারথওয়াড়া প্রভৃতি দল উপদল ও সমিতিগুলি শ্রীনায়েকের সহানুভূতি-পূর্ণ বিবেচনায় খুশি। কর্মচারিগণ বিগত এগারই আগস্ট তাঁদের কর্মবিরতিজনিত যে ক্ষতি হয়েছে তা পূরণ করার জন্য দুটি শনিবার পূর্ণদিবস কাজ করতেও রাজী হয়েছেন। অপর পক্ষে শ্রীনায়েক রাজী হয়েছেন এগার তারিখ সর্বাধিক ক্যাজুয়াল ছুটি গ্রহণের দিনটিতেও কর্মীদের পুরো বেতন মঞ্জুর করতে।

আপাতত রাজ্য ও কেন্দ্রীয় মাগ্গী-ভাতার হারের তারতম্য সম্পূর্ণভাবে রদ করা হবে একশত দশ টাকা পর্যন্ত বেতন-ভোগী কর্মীদের ক্ষেত্রে। তাঁরা কেন্দ্রীয় হারেই পাবেন তাঁদের মাগ্গীভাতা। এই বেতনক্রমের ঊর্ধ্বে যাঁরা মাইনে পান তাঁদের ক্ষেত্রে ঐ তারতম্যে আশি শতাংশ সমতা সৃষ্টি করা হবে। বাকি কুড়ি শতাংশের বিষয়টিও বিবেচনাধীন রাখা হয়েছে।

মহারাষ্ট্র রাজ্যস্তরে সরকারী কর্ম-চারীদের অসন্তোষের ক্ষেত্রে একটি সন্তোষজনক সমাধানের পথে অনেকটা অগ্রসর হয়ে একটি নতুন নজির স্থাপন করল, যার প্রায় পুরোপুরি প্রশংসা শ্রীনায়েকের সহানুভূতিপূর্ণ বিবেচনাই দাবি করে। অবশ্য কর্মচারীদের সংগ্রাম-শীল মনোভাব ও জনমতের সমর্থন তো সর্বাগ্রেই প্রশংসনীয়।

বস্তুত একই দেশে একই অর্থনৈতিক অবস্থায় বসবাসকারী একই সরকারের অধীন কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারী কর্মীদের মাহিনার মধ্যে কেন তারতম্য থাকবে তা কোনরকম বিবেচনায়ই বোধগম্য হয় না। শুধু মাগ্গীভাতা নয়, সমগ্র বেতনহারই কেন্দ্রীয় ও রাজ্যস্তরে বিভিন্ন কর্মস্তর পর্যায়ে সমান হওয়া উচিত। সরকারী বিবেচনায় যদি অসমতা রক্ষা করে চলতে হয় তবে তা সমাজতান্ত্রিক সমাজের গাল-ভরা কথাটি মূলেই গলদপূর্ণ হয়ে থাকে। ভারতের সর্বত্র সরকারী কর্মিগণের বেতন-হার বাজারমূল্যের গতি-প্রকৃতি অনুসারে

শ্রী ভি পি নায়েক

সমহারে নির্ধারিত হওয়া উচিত। আমা-দের বর্তমান সরকারের মুখে সমাজবাদ প্রতিষ্ঠার কথা খুবই হাঁকডাক সহকারে উচ্চারিত হয় শুনতে পাই। কিন্তু দেশের কর্মিসম্প্রদায়ের মধ্যে বেতনক্রমে আকাশ-পাতাল তফাৎ সরকারী বিবেচনায়ই বহাল আছে। সরকারী ও বেসরকারী সংস্থার কর্মীদের মধ্যে তো প্রায় 'হ্যাভস' এবং 'হ্যাভ নটস' তারতম্য। সরকারী পর্যায়েও সরকার অনুরূপ ব্যবস্থা বজায় রাখারই পক্ষপাতী। তাঁর সেক্রেটারিয়েটে এক বেতনক্রম, হাইকোর্টে আর এক, অন্যত্র আর এক। কিন্তু এই অসমতা জিইয়ে রাখার পক্ষে সরকার কেন এমনভাবে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ, তা ক্ষমতাসীন দলের মুখে যখন সমাজতান্ত্রিক সমাজগঠনের লম্বা-চওড়া বুলি শুনতে পাই তখন প্রকৃতপক্ষে সমগ্র হেঁয়ালিটি হৃদয়ঙ্গম করে ওঠা (একটা দুর্বল ধাঁধার মতো সমাধানহীন) দুরূহ প্রশ্ন বলেই বোধ হয়।

প্রসঙ্গত উল্লেখ করব, 'সাপ্তাহিক বসুমতী' 'বঙ্গদর্শন' পর্যায়ে লিখিত প্রবন্ধে এই বিষয়টির ওপর আমরা বারম্বার আলোকপাত করেছিলাম। প্রশ্নটি আজ সাধারণভাবে ভারতের সর্বরাজ্যে একটি জ্বলন্ত প্রশ্নের রূপ গ্রহণ করেছে। আশা করি, কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারের মধ্যে যুক্ত আলোচনায় অচিরকালমধ্যে রাজ্য ও কেন্দ্রীয় কর্মচারীদের বেতন ও অন্যান্য সর্বপ্রকার সুযোগ-সুবিধার মধ্যে দ্রুত সমতা সাধনের চেষ্টা করে সমাজবাদ প্রতিষ্ঠার কল্পনাকে এই স্তরে কিছু বাস্তব রূপদানের চেষ্টা করা হবে।

কথায় বলে, আপনি আচরি ধর্ম পরেরে শিখাও। সরকার তাঁর কর্মচারী-দের ক্ষেত্রে এই ঋষিবাক্যকে মর্যাদা দান করতে পারেন। এবং দ্বিতীয় পর্যায়ে সরকারী ও বেসরকারী ক্ষেত্রে কর্মিগণের প্রকৃত আয়ের মধ্যেও সমতা বিধানের চেষ্টা শুরু করতে পারেন।

কেরালা:

আবো জোকের বিক্ষোভ

কেরালায় সাতটি বামপন্থী দলের মধ্যে সম্প্রতি একটি সাধারণ কর্মসূচীর মাধ্যমে নির্বাচনী জোট গঠন সম্ভব হয়েছে। বর্তমানে দ্বিতীয় এবং চূড়ান্ত সমস্যা বাম ঐক্যের সামনে এসে যা দাঁড়াবে তা হ'ল পরস্পরের মধ্যে মতৈক্যের ভিত্তিতে আসন বণ্টন।

কিন্তু সে প্রসংগে আসবার আগে কেরালার শাস্ত্রীনগরে সম্প্রতি যে সপ্তবাম পরিচালিত ঐতিহাসিক বিক্ষোভ মিছিল কেরালার জনবিক্ষোভের ইতিহাসে নতুন অধ্যায় সংযোজিত করল সংবাদ গ্রন্থনায় সে সংবাদের দাবিকে পুরোভাগে জায়গা ছেড়ে দিতে হচ্ছে।

কেরালার নাম্বুদ্রিপাদ মন্ত্রিসভার স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী শ্রী ভি আর কৃষ্ণ আয়ারের নেতৃত্বে সপ্তবাম দলের মিলিত উদ্যোগে 'কোচিন জাহাজ নির্মাণ কারখানা সংগ্রাম কমিটি' কেরালার ইতিহাসে এ পর্যন্ত সর্ববৃহৎ রাজনৈতিক বিক্ষোভ সমাবেশের আয়োজন করেন ২৩শে সেপ্টেম্বর। স্থান শাস্ত্রীনগর।

লক্ষাধিক মানুষের বিক্ষোভ মিছিল কেরালায় অবিলম্বে দ্বিতীয় জাহাজ নির্মাণ কারখানা স্থাপনার দাবিতে এ-আই-সি-সি'র অভ্যর্থনা সমিতির কার্যালয়ের সামনে শান্তিপূর্ণ বিক্ষোভ প্রদর্শন করে। বিক্ষোভ মিছিলে অংশ

গ্রহণের জন্য রাজ্যের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে কাতারে-কাতারে বিক্ষোভকারী এসে উপস্থিত হ'ন। বিভিন্ন দল শহর পরিক্রমা শুরু করেন ভোর সকাল থেকেই এবং এর্নাকুলামের কাসুর অঞ্চলে কংগ্রেসের নব-নির্মিত অভ্যর্থনা সমিতির প্রাসাদটির পুরোভাগে জনসমুদ্রে প্লাবন ডেকে আনে। এর্নাকুলামের প্রধান রাস্তাগুলি যান-বাহন বর্জিত অবস্থায় জনসমুদ্রে 'জনমগ্ন হ'য়ে যায়।

মিছিলকারীদের মুখে জাহাজ নির্মাণ কারখানার দাবি ছাড়াও অন্যান্য পপুলার শ্লোগান সমানে শোনা যায়।

মিছিলে সমাবিষ্ট জনতা এক ডাকে কেন এমনভাবে কংগ্রেসী অভ্যর্থনা সমিতির কার্যালয় ঘেরাও করলেন আশা করি সে কথা চিন্তা করলে একটিমাত্র উত্তরই মিলবে। তা হ'ল উপলক্ষ যাই হোক লক্ষ্য কংগ্রেসী শাসনের ওপর হাড়ে চটা জনতার অসন্তোষ প্রকাশ। আজ ভারতব্যাপী বন্ধ আন্দোলন তারই প্রকাশ। লক্ষ মানুষ যেন শুধু এক একটি ডাকের অপেক্ষায় আছেন। শুধু জাহাজী কারখানাই নয়, ঐ প্রশ্নটি যথেষ্ট মূল্যবান হলেও লক্ষ্য বোধহয় দেশের মধ্যে একটি প্রকৃত 'সুশাসন কারখানা' স্থাপনার দাবি এই হিসেবে তুলে ধরা। আর সেজন্যই বিক্ষোভকারীদের কণ্ঠে উচ্চারিত হয়েছে সাধারণ শ্লোগান। সমগ্র ভারতব্যাপী গণ-অসন্তোষের এ হ'ল আর এক রূপ।

কোচিন তৈল শোধনাগার

কেরালায় ২৫ লক্ষ টনের কোচিন তৈল শোধনাগারের উদ্বোধন করেছেন শ্রীমতী গান্ধী ঐ একই দিনে। এই শোধনাগারের নির্মাণব্যয় ত্রিশ কোটি টাকা। সরকারী শিল্পক্ষেত্রে এটিই হবে চতুর্থ তৈল শোধনাগার। কেরালায় বিদ্যুৎ সরবরাহের ক্ষেত্রেও এই শোধনাগার উল্লেখ্য সাহায্য দান করবে এবং বিরাট একটি সার কারখানার কাঁচা মাল যোগানে সমর্থ হবে।

শ্রীমতী গান্ধী তাঁর উদ্বোধনী ভাষণে পরিতৃপ্ত কণ্ঠে সগর্বে বলেছেন, এবার পরিকল্পনার সমালোচকরা এসে দেখে যান, কোচিনে কী করা হ'ল।

অনেক কিছুর সঙ্গে তৈল শোধনাগার আর যা করবে, তা হল ঃ বাৎসরিক তের থেকে পনের কোটি টাকার বৈদেশিক মুদ্রা বাঁচাতে সহায়তা করবে এই শোধনাগারটি।

অতি উত্তম সৃষ্টি এবং প্রধানমন্ত্রী এসব ব্যাপারে বস্তুতই গর্ব প্রকাশ করলে জনগণও সে গর্বের অংশীদারিত্ব অস্বীকার করবে না।

সপ্তবাম জোট

কেরালার সপ্তবাম জোটের প্রশ্নে এইবার আসা যাক।

এর্নাকুলামেই এই সাতটি বামপন্থী দল সর্বনিম্ন কর্মসূচীর ভিত্তিতে একটি যুক্ত ফ্রন্ট গঠনে অবশেষে সফল হলেন গত সতেরই সেপ্টেম্বরের বৈঠকে। যে বিরল মতৈক্যে এই সাতটি দল উপনীত হলেন, বাম ঐক্যের ক্ষেত্রে তা সত্যিই অভূতপূর্ব। প্রায় বেশির ভাগ এবং প্রধান প্রধান প্রশ্নেই অবিসংবাদী মতৈক্য তাঁরা স্থাপন করতে পেরেছেন। বৈঠকে প্রায় বিশজন বিভিন্ন দলীয় নেতা উপস্থিত ছিলেন। দল সপ্তকের মধ্যে আছেন, সি-পি-আই ও বাম কম্যুনিস্ট পার্টি, এস-এস-পি ও আর-এস-পি, কে-এস-পি, কে-টি-পি ও মুসলিম লীগ।

সপ্তবাম ম্যানিফেস্টোয় স্থায়ী জনপ্রিয় সরকার গঠনের আশা প্রকাশ করা হয়েছে। রাজ্যের আর্থিক সমস্যা সমাধানের জন্য বাম ফ্রন্ট কেন্দ্রের উপর চাপ সৃষ্টি করবেন বলেও উল্লেখ রেখেছেন তাঁদের কার্যসূচীতে।

অন্যান্য কর্মসূচীর মধ্যে উল্লেখযোগ্য ঃ ১৯৬৪ সালের কৃষিভূমি সংক্রান্ত আইনের সংশোধন; খাজনা হ্রাস ও বকেয়া খাজনা মকুব; শিল্প সংস্থা গঠন ও শ্রমিক শ্রেণীর উন্নতি; ব্যক্তিগত মূলধন নিয়োগ প্রকল্পকে উৎসাহ দান করে রাজ্যে শিল্প প্রসার সাধন এবং নতুন আইন প্রণয়নের দ্বারা সরকারী চাকুরে সহ শ্রমজীবী শ্রেণীর দাবি-দাওয়া মেটানো প্রভৃতি। খাদ্যসামগ্রীর ক্ষেত্রে স্টেট ট্রেডিং প্রথা চালু করার ইচ্ছাও উল্লিখিত হয়েছে।

এর্নাকুলামে এক সাংবাদিক সম্মেলনে এস-এস-পি নেতা শ্রীমধু লিমায়ে বাম জোটে সন্তোষ প্রকাশ করে জানিয়েছেন যে, জোটের সামনে নির্বাচনী আসন সংস্থানের গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নে বাম জোট একটি সমঝোতায় উপনীত হলে রাজ্যের শাসনক্ষমতা অধিকারে জোটকে খুব বেগ পেতে হবে না। এ বিষয়ে তিনি বিগত ১৯৬৫ সালের নির্বাচনী ফলাফলেরও উল্লেখ করে তাঁর দৃঢ় অভিমত ব্যক্ত করেন।

প্রকাশ, সংযুক্ত বাম জোট রাজ্য বিধানমণ্ডলীতে একশত তেত্রিশটি আসনেই প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবেন। লোকসভায়ও অনুরূপভাবে প্রার্থী দাঁড় করানো হবে সর্বমোট উনিশটি আসনের জন্য।

একাকী বিজনে

পি-এস-পি'র চেয়ারম্যান শ্রী এন জি গোরে কিন্তু বড্ড গোঁসা করেছেন বাম জোটের ওপর। কেরালা রাজ্য পি-এস-পি সম্মেলনে বক্তৃতা প্রসঙ্গে বলেছেন, বামেরা সম্মিলিতভাবে রাজনৈতিক দলের চরিত্র হনন করেছেন এর্নাকুলামে ২৩শে সেপ্টেম্বর লাখো লোকের বিক্ষোভ মিছিল আহ্বান করে। এই ব্যাপারটি মিঃ গোরের কাছে খুব বেদনাদায়ক বোধ হয়েছে। মিঃ গোরের মতে এহেন বিক্ষোভ প্রদর্শনের দ্বারা রাজনৈতিক দলের গোষ্ঠী স্বাধীনতাকে গোরে (কবরে) পাঠানো হয়েছে। শ্রীমতী গান্ধী তো প্রধানমন্ত্রিরূপে নয়, কংগ্রেস নেত্রীরূপে এর্নাকুলামে গেছলেন। কংগ্রেসী সভায় এমন ব্যাঘাত সৃষ্টির দ্বারা পার্টির স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করা হয়েছে।

শ্রীগোরে সুবিবেচক সন্দেহ নেই। কিন্তু বিক্ষুব্ধ জনতাও বিবেচনাহীন একথা বলা চলে না। তাঁদের বিক্ষোভ শান্তিপূর্ণই ছিল এবং তাঁদের উদ্দিষ্ট ব্যক্তি প্রধানমন্ত্রীই ছিলেন। একাকী বিজনে অবস্থানকারী মানুষ স্বভাবতই সাত-পাঁচ ভেবে হতাশ হয়ে থাকেন, মিঃ গোরের অবস্থাও হয়ত তদ্রূপ, নচেৎ শ্রীমতী গান্ধী যেখানেই যান, প্রধানমন্ত্রিরূপেই তাঁর আগমন সে রাজ্যে অভ্যর্থিত হয়ে থাকে। মিঃ গোরে তো দেখলেনই, শ্রীমতী গান্ধী একই দিনে কোচিনে তৈল শোধনাগারের উদ্বোধন করে এলেন। নিশ্চয় কংগ্রেস নেত্রীর যোগ্যতায় এই অনুষ্ঠানে তাঁর উপস্থিতি ঘটে নি।

আর-এস-এস'র রূপান্তর

রাষ্ট্রীয় স্বয়ং সেবক সঙ্ঘ নেতৃত্ব বিবেচনা করে দেখেছেন যে, কেবলমাত্র সমাজ ও ধর্মীয় ব্যাপার নয়, সমস্ত রকম জনপ্রিয় ও গণ-প্রয়োজনীয় কাজেই সঙ্ঘের পক্ষে এগিয়ে আসা দরকার। এজন্যই সঙ্ঘ অতঃপর এস-এস-পি ও জনসঙ্ঘের মাধ্যমে গণ-আন্দোলনে (সামাজিক অর্থ-নৈতিক) যোগদান করবেন।

অভিজ্ঞ মহলের ধারণা, একাজ আর-এস-এস ইতিপূর্বেই শুরু করে দিয়েছেন। উত্তরপ্রদেশে প্রধানমন্ত্রীর আগমনে এস-এস-পি যে বিক্ষোভ প্রদর্শনের আয়োজন করেন, আর-এস-এস'এর সমর্থন ছিল নাকি তাতে; এস-এস-পি নেতৃত্বে পরিচালিত মধ্যপ্রদেশ ছাত্র আন্দোলনেও সমর্থন দান করেছেন নাকি স্থানীয় আর-এস-এস সদস্যগণ।

আর-এস-এস'এর রাজনীতি সচেতন প্রতিষ্ঠানে রূপান্তর অভিনন্দনযোগ্য। কেবল একটিমাত্র প্রশ্ন আমাদের কাছে ধোঁয়াটে ঠেকল, আর-এস-এক কি এ বিষয়ে বিশেষ কোন নীতিতে স্থিরসংকল্প হতে পেরেছেন! বোধ হয়, তা' সম্ভব হয় নি। হলে একই সঙ্গে আর-এস-এস'এর পক্ষে প্রগতিশীল এস-এস-পি এবং অন্যপক্ষে জনসঙ্ঘের সঙ্গে গাঁটছড়া বাঁধা কেমন করে সম্ভব।

প্রেসিডেন্ট সোয়েকার্ণোর দেশত্যাগের দাবিতে জাকার্তায় যুব-ছাত্র বিক্ষোভ

ইন্দোনেশিয়া :

বেচারা সোয়েকার্নো। এতকাল বহাল তবিয়তে নিশ্চিন্তে নিরুপদ্রবে রাজত্ব করে আজ কী কঠোর পরীক্ষার সম্মুখীন হলেন! যিনি নাকি দেশের আমরণ প্রেসিডেন্ট বলে বিশ্ব রেকর্ড স্থাপন করতে চেয়েছিলেন তাঁকেই আজ দেশ-ছাড়া করার জন্যে স্কুলের দুগ্ধপোষ্য ছাত্রেরা উঠে পড়ে লেগেছে!

ইন্দোনেশিয়ার ছাত্র সংগঠনের শক্তির পরিচয় আগেও যথেষ্ট পাওয়া গিয়েছে। বিশেষত গত অক্টোবরের ব্যর্থ অভ্যুত্থানের পর ছাত্রদের প্রভাব-প্রতিপত্তি যেন হাজারগুণে বেড়ে গিয়েছে, সরকারের নীতিনিয়ামক যেন তারাই। ওদেরই কথায় এখানকার কমিউনিস্ট পার্টি বে-আইনী ঘোষিত হয়েছে, পূর্বতন পররাষ্ট্রমন্ত্রী ডঃ সুবান্দ্রিয়োকে অপসারণ করে বিচারের সম্মুখীন করা হয়েছে। এদের সর্বশেষ দাবি হলো প্রেসিডেন্ট সোয়েকার্নোকে দেশত্যাগ করতে হবে। এদের আরেকটি দাবি ছিল সোয়েকার্নোর দ্বিতীয় বেগম মাদাম হার্টিনি সম্পর্কে। ছাত্রদের অভিযোগ হলো, ভদ্রমহিলা গোপনে কমিউনিস্ট পার্টিকে অর্থ সাহায্য দিয়ে কার্যত রাষ্ট্রদ্রোহিতা করেছেন। প্রেসিডেন্ট সোয়েকার্নোর বিরুদ্ধে ওদের অভিযোগ হলো প্রেসিডেন্ট সোয়েকার্নো কমিউনিস্ট পার্টিকে বে-আইনী ঘোষণা করে যে সরকারী আদেশ জারী করা হয়েছিলো তাতে স্বাক্ষরদানে অস্বীকৃত হয়েছিলেন। দ্বিতীয় অভিযোগ হলো, গত অভ্যুত্থানের সময় নাকি প্রেসিডেন্ট সোয়েকার্নো কমিউনিস্ট পার্টির সদর দপ্তরে ছিলেন।

এতকাল ছাত্ররা যে একটার পর একটা দাবি আদায়ে সফল হয়েছিল তার প্রধান কারণ ছিল সেনাবাহিনী ছিল তাদের পেছনে। কিন্তু তাদের সর্বশেষ দাবির প্রতি নাকি সেনাবাহিনী সায় দিতে পারে নি, "রাস্তার পার্লামেন্টের দাবি" মেনে নিতে তাদের আগ্রহ দেখা গেল না এবার।

ওদিকে আগামী ১লা অক্টোবর, ব্যর্থ অভ্যুত্থানের ঠিক এক বছর পরে ডঃ সুবান্দ্রিয়োর প্রকাশ্য বিচার আরম্ভ হচ্ছে। ইতিমধ্যে তিনি বলেছেন যে, গত অভ্যুত্থানের ব্যাপারে ডঃ সোয়েকার্নোর হাত ছিল এবং ইন্দোনেশিয়াকে চীনাপন্থী করার ব্যাপারেও প্রেসিডেন্ট সোয়েকার্নোই মূলত দায়ী ছিলেন। অবশ্য জানা গিয়েছে গত ১৬ই মার্চ থেকে অন্তরীণ থাকার ফলে ডঃ সুবান্দ্রিয়োর মস্তিষ্ক বিকৃতি দেখা দিয়েছে।

রাষ্ট্রসংঘ :

সাধারণ পরিষদের ২১তম অধিবেশন শুরু হলো। এ-অধিবেশনের সভাপতি নির্বাচিত হয়েছেন আফগানিস্তানের প্রতিনিধি আবদুল রহমান পাজোয়াক। সেক্রেটারী জেনারেল ইউ থান্ট তাঁর বার্ষিক বিবরণী দিতে গিয়ে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে উত্তেজনা প্রশমনে রাষ্ট্রসঙ্ঘের ব্যর্থতার যে-চিত্র তুলে ধরেছেন তাতে চিন্তাশীল ব্যক্তিমাত্রেরই দুশ্চিন্তা বাড়বে।

ভিয়েতনাম সম্পর্কে ইউ থান্ট বলেছেন যে, যে-তত্ত্বের ওপর ভর করে এখানে যুদ্ধ চালিয়ে যাওয়া হচ্ছে সেই মূল তত্ত্বটাই ভ্রান্ত। এখানে আদর্শ বা মতবাদ নিয়ে কোন সংঘর্ষ বাধে নি, কিম্বা কমিউনিজমের বিরুদ্ধে স্বাধীন গণ-তন্ত্রের লড়াইও এটা নয়, এটা হলো নিতান্তই একটা জাতির অস্তিত্ব ও তার পরিচয় বজায় রাখার সংগ্রাম। এ-যুদ্ধকে যদি আরো বাড়তে দেওয়া হয় তবে তা যে তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধ ডেকে আনবে সে-সম্বন্ধে সেক্রেটারী জেনারেল প্রায় নিঃসন্দেহ। এ-ব্যাপারে রাষ্ট্রসঙ্ঘের অক্ষমতা সম্পর্কেও তিনি অনবহিত নন, তবে সে-অক্ষমতার কারণ অনেকেরই জানা। ভিয়েতনাম সমস্যা সম্পর্কে দুশ্চিন্তা কারুরই কম নয়, সকলেই যদি আন্তরিকভাবে এ-সংকট উত্তরণে এগিয়ে আসে তবে তার কিনারা করতেও দেরি হয় না, কিন্তু ওই জানা-কারণেই সমাধানের দিকে এগুনো যাচ্ছে না বিশেষ। বলপ্রয়োগের

বারা যে ভিয়েতনাম সমস্যার সমাধান সম্ভব নয় এ সম্বন্ধে ইউ থাণ্ট স্থির নিশ্চয়, আলাপ-আলোচনার মাধ্যমেই বিরোধ-মীমাংসা করতে হবে। গত ২৫ বছর ধরে ভিয়েতনামের শান্তি বিঘ্নিত, এখানকার স্বাভাবিক জীবন আজ বিপর্যস্ত, কিন্তু তা সত্ত্বেও একটা দেশ, একটা জাতি যখন নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবার মুখে তখনো বৃহৎ রাষ্ট্রগুলির, যাদের ওপরই বিশ্ব-শান্তি কার্যত নির্ভরশীল তাঁরা দায়িত্ব ও আন্তরিকতা নিয়ে এগিয়ে আসছেন না।

দক্ষিণ আফ্রিকার বর্ণবিদ্বেষ নীতি সম্পর্কেও সেক্রেটারী জেনারেল উদ্বেগ প্রকাশ না করে পারেন নি। দক্ষিণ আফ্রিকার সঙ্গে যাদের বাণিজ্য সম্পর্ক রয়েছে তাদেরই প্রধান দায়িত্ব হলো এটা দেখা যে দক্ষিণ আফ্রিকাকে তার দুষ্ট নীতি পরিহার করানোর।

রাষ্ট্রসঙ্ঘের ব্যর্থতা ঢাকার কোন উপায়ই নেই আজ, সেক্রেটারী জেনারেল সে-চেষ্টা করেনও নি। তিনি সরল ও খোলাখুলিভাবেই বলেছেন যে, দোষ যন্ত্রের নয়, যন্ত্রকে যাঁরা চালাবেন তাঁদেরই; যন্ত্রীর নিষ্ঠা ও আন্তরিকতার অভাবের জন্যেই এই বিশ্ব সংস্থাটি আজ দুর্বল হয়ে পড়েছে। কি ভিয়েতনাম সমস্যা কি বর্ণবিদ্বেষের প্রশ্নটি—সমাধানের বাইরে কোন সমস্যাই নেই, এবং রাষ্ট্রসঙ্ঘের সনদে যে শর্তগুলি দেওয়া আছে তা মেনেই সকল বিরোধের শান্তিপূর্ণ সমস্যা সম্ভব। কিন্তু রাষ্ট্রসঙ্ঘের সেই স্বাভাবিক নিরপেক্ষ ভূমিকা তো আজ নেই, এই বিশ্ব সংগঠনটি আজ কুক্ষিগত হয়ে পড়েছে একটা সদস্য-গোষ্ঠীর। এই গোষ্ঠীর ইচ্ছের বিরুদ্ধে এখানে কোন বিষয় আলোচনা হতে পারে না, সিদ্ধান্ত নিতে গেলেও ওই গোষ্ঠীর মনোমত হওয়া চাই। কাজেই ভিয়েতনাম সমস্যাই বলুন আর প্যালেস্টাইন বিরোধই বলুন—সমাধান তার হবে কোত্থেকে? স্বার্থ যেখানে রয়েছে সেখানে সমাধান একতরফা হতে বাধ্য, আর একতরফা সমাধানই যদি করবে তবে তার জন্যে প্যাসোলিন পুড়িয়ে রাষ্ট্রসঙ্ঘে ছোটা কেন?

তাহলে সমাধান কোথায়? লীগ অফ নেশন্স যে-পথে গিয়েছে সেই অকাল-মৃত্যুর পথে রাষ্ট্রসঙ্ঘকেও ঠেলে দেওয়া? হাস্যকর, ছেলেমানুষি! প্রবেশপথ সঙ্কীর্ণ বলে মাথা কেটে ঘরে ঢোকার মত সে-সমাধান। সত্যিকারের সমাধান মিলবে ওই গোষ্ঠীর অর্গল ভঙ্গ করা, রাষ্ট্রসঙ্ঘ যে সত্যিকারের স্বাধীন ও সার্বভৌম রাষ্ট্রের মিলনভূমি এই থিয়োরীকে কাজে প্রমাণ করা। বস্তুত সাংগঠনিক দুর্বলতাই রাষ্ট্রসঙ্ঘের আসল রোগ। রাষ্ট্রসঙ্ঘের সদস্য সংখ্যা ১১৫ হতে পারে, কিন্তু তাই বলে তাকে সার্বজনীন বলা চলে না বৈজ্ঞানিক ও বাস্তবনিষ্ঠ সংজ্ঞার নিরিখে। ইউ থাণ্ট তাঁর রিপোর্টে এই সার্বজনীনতার ওপরই জোর দিয়েছেন। কমিউনিস্ট চীনকে রাষ্ট্রসঙ্ঘের বাইরে রাখা যেমন সত্যকে অস্বীকার করা তেমনি পূর্ব জার্মানী, উত্তর কোরিয়া, উত্তর ভিয়েতনাম প্রভৃতি স্বাধীন রাষ্ট্রকে সদস্যপদ দিতে অস্বীকার করাটাও বাস্তব থেকে চোখ ফিরিয়ে নেওয়া। সেক্রেটারী জেনারেল সেজন্যই এই রাষ্ট্রগুলিকে নিদেনপক্ষে পর্যবেক্ষক পাঠানোর অধিকার দেবার কথা বলেছেন।

ভিয়েতনাম :

ভিয়েতনাম সমস্যাটি যেমনকার তেমনি রয়ে গিয়েছে; উত্তর ভিয়েতনামে মার্কিনী বোমাবর্ষণ যেখানে অব্যাহত রয়েছে সেখানে সমাধানের নীল আলোটি জ্বলবে কী করে? অথচ সমস্যা-সমাধানের সূত্রেরও কিছু কম উদ্ভাবন হয় নি এ-পর্যন্ত, আলোচনাবৈঠকেরও প্রায় কামাই নেই বলতে গেলে।

রাষ্ট্রসঙ্ঘের সাধারণ অধিবেশনে মার্কিন প্রতিনিধি গোল্ডবার্গ ভিয়েতনাম সমস্যার সমাধানকল্পে একটি তিন দফা ফরমুলা দিয়েছেন। এতে বলা হয়েছে যে, ভিয়েতনামের যুদ্ধ শেষ করার জন্যে সমস্যাটি রাষ্ট্রসঙ্ঘের মাধ্যমেই মীমাংসিত হতে পারে। উত্তর ভিয়েতনামে মার্কিনী বোমাবর্ষণ তখনই বন্ধ করা হবে যদি উত্তর ভিয়েতনাম যুদ্ধে অংশ গ্রহণ না করে; আমেরিকা ও উত্তর ভিয়েতনাম পর্যায়ক্রমে দক্ষিণ ভিয়েতনাম থেকে নিজ নিজ সৈন্য অপসারণ করবে এবং তৃতীয়ত জাতীয় মুক্তি বাহিনীর (ভিয়েত কং) পক্ষে আলোচনা-বৈঠকে তাদের মতামত জানাবার পথে কোন বাধা থাকবে না।

এই সুরের মধ্যে খানিকটা নরম মেজাজ পরিলক্ষিত হলেও বাস্তবিকপক্ষে নতুন কথা এখানে কিছুই বলা হয় নি। অর্থাৎ এ ফরমুলার মধ্যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের উদারতার সন্ধান করা বৃথা, কারণ তার সুখ-সুবিধে সে এতটুকুও ত্যাগ করে নি। বরং সে আরেকবার জানিয়ে দিয়েছে যে তার শর্ত যদি অপরপক্ষ না মেনে নেয় তবে তার আর করার কিছুই নেই। রাষ্ট্রসঙ্ঘের মাধ্যমে ভিয়েতনাম সমস্যার সমাধানের মানেই হলো সমগ্র বিশ্বকে মার্কিনী শর্তবন্ধনে বেঁধে ফেলা। উত্তর ভিয়েতনামকে যুদ্ধ থেকে নিবৃত্ত করার অর্থ হলো দুর্বল ভিয়েত কংদের শক্তিশালী মার্কিন ও দক্ষিণ ভিয়েতনামী সেনাবাহিনীর মিলিত শক্তির সামনে বলির পাঁঠার মত নিক্ষেপ করা; পর্যায়ক্রমে সৈন্য অপসারণ করা হলে উত্তর ভিয়েতনাম যুদ্ধ থেকে সরে আসার পরেও যথেষ্ট মার্কিন সৈন্য ভিয়েত কংদের সমূলে বিনাশ করার মতো থেকেই যাবে। আর জাতীয় মুক্তি বাহিনীকে যে তাদের মতামত জানাবার অধিকার দেওয়ার কথা বলা হয়েছে সে তো ওই সংস্থাটির রাজনৈতিক অস্তিত্ব অস্বীকার করা, কারণ ওদের তো সরাসরিভাবে আলোচনায় অংশ গ্রহণের কথা এখনো বলা হয় নি।

স্বভাবতই আমেরিকান প্রস্তাব সংশ্লিষ্ট রাষ্ট্রগুলি কর্তৃক নিন্দিত-উপহাসিত হয়েছে। প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে উত্তর ভিয়েতনাম বলেছে যে, বিশ্বের জনমতকে বিভ্রান্ত করার আরেকটি চাল দিয়েছে আমেরিকা। প্রত্যাখ্যাত হয়েছে পিকিঙ-মস্কোতেও।

এমন নয় যে, ভিয়েতনাম সমস্যার সমাধান অসম্ভব বা সংশ্লিষ্ট রাষ্ট্রগুলি জানে না সমাধান তার কোন্ পথে। দক্ষিণ ভিয়েতনাম সরকারের কথা বাদ দেওয়াই ভালো, যতই নির্বাচন প্রহসন করুক, তার স্বাধীনতা বা স্ব-ইচ্ছে বলতে কিছুই নেই। কৃষ্ণনগরের মাটির পুতুলের মতো আমেরিকা তাকে যেমন খুশি ভাঙছে, আবার খুশিমতো গড়ছে। সরকারী সৈন্যেরা আজ দক্ষিণ ভিয়েতনামের স্বার্থ রক্ষায় লড়ছে না, লড়ছে আমেরিকার মুখ রাখার জন্যে, হাতে তার মার্কিন রাইফেল, মুখে মার্কিন চুইং গাম। সিকি শতাব্দী ধরে এখানে একটানা অশান্তি, শ্রান্ত ক্লান্ত দক্ষিণ ভিয়েতনামের সাধারণ মানুষ। কিন্তু যেহেতু স্বাধীন সত্তা বলতে এদের আজ আর কিছু অবশিষ্ট নেই, নিজের দেশের ওপর এদের কোন নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা নেই, সেহেতু এরা সম্পূর্ণভাবে নির্ভরশীল হয়ে উঠেছে তাদের ওপর যারা তাদের রুটি জোগাচ্ছে, রসদ দিচ্ছে। দক্ষিণ ভিয়েতনামের সরকারী সৈন্যরা আজ ভাড়াটে সেনাবাহিনীতে পরিণত হয়েছে, মার্কিনী কর্তার ইচ্ছের এদের কর্ম করে যেতে হচ্ছে।

শান্তি ফিরিয়ে আনার আন্তরিক আগ্রহ যদি আমেরিকার থাকতো তবে বোম্বেটে নীতি সে আগেই পরিহার করতো, উত্তর ভিয়েতনামে আগেই বোমাবর্ষণ বন্ধ করতো, তার জন্যে শর্ত আরোপ করতো না হাজারগণ্ডা। আন্তরিকতা যদি থাকতো তাহলে এ বছরের শেষে এখানে তার সৈন্য সংখ্যা চার লক্ষে নিয়ে যাওয়ার পরিকল্পনা ভাঁজতো না। তখন সে নিরেট সত্যকে মেনে নিয়ে সংশ্লিষ্ট ভিয়েত কংদের টেবিলে বসবার সুযোগ দিত, মুক্তি ফৌজের হক্-এক্তিয়ার মেনে নিতো।

গ্রন্থমেলা

বিজ্ঞানের সংকট—সত্যেন্দ্রনাথ বসু। লেখক সমবায় সমিতি, কলিকাতা-২৬। পরিবেশক ঃ বাক্-সাহিত্য, ৩৩ কলেজ রো, কলিকাতা-৯। মূল্য ঃ ৬·৭৫।

ভারতীয় মধ্যযুগে সাধনার ধারা—ক্ষিতিমোহন সেন। ঐ। মূল্য ঃ ৫·০০।

বিজ্ঞানাচার্য সত্যেন্দ্রনাথ বসু বিজ্ঞানের সাধনায় রত থেকে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যে যে পরমাশ্চর্য সিদ্ধিলাভ করেছেন, তার প্রমাণস্বরূপ "বিজ্ঞানের সংকট" গ্রন্থটি বাংলা সাহিত্যক্ষেত্রে চিরস্থায়ীরূপে বিরাজ করবে। আচার্য বসু দীর্ঘকাল ধরে বাংলাদেশের নানা পত্র-পত্রিকায় বহু প্রবন্ধ লিখেছেন—সেই সব প্রবন্ধ সংগ্রহ করে গ্রন্থাকারে প্রকাশ বহু পূর্বেই প্রয়োজন ছিল, যাহোক বিলম্বে হোলেও সেই মহৎ কাজ লেখক সমবায় সমিতি সম্পন্ন করেছেন। এবং আরো আনন্দদায়ক সংবাদ এই যে, এই গ্রন্থটির জন্যে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ বসুকে 'জগত্তারিণী' পুরস্কার প্রদান করে উত্তম কাজই করেছেন। তবু এখানে একটি কথা বলা প্রয়োজন বোধ করি, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কি এতোকাল আচার্য বসুর বাংলা ভাষায় লিখিত প্রবন্ধগুলি সম্বন্ধে জ্ঞাত ছিলেন না? যদি তাঁরা জ্ঞাত ছিলেন বলে মনে করেন—তাহলে তাঁদের কি উচিত ছিল না, এই সব প্রবন্ধগুলি সংগ্রহ করে প্রকাশের ব্যবস্থা করার? যাহোক, এই গ্রন্থটিতে মোট চৌদ্দটি প্রবন্ধ সংগৃহীত হোলেও অন্তত দুটি মূল ইংরেজি থেকে বাংলায় অনূদিত। আর 'প্রবোধচন্দ্র বাগচী' নিবন্ধটির অনুলেখক ডক্টর সুশীল রায়।

বৈজ্ঞানিকের প্রবন্ধ বলেই যে প্রতিটি প্রবন্ধই বিজ্ঞান বিষয়ে লিখিত—তা নয়, তবে 'মাতৃভাষা' প্রবন্ধে শিক্ষার বাহন সম্পর্কে সম্যক আলোচনা করতে যে উপায় তিনি নির্ধারণ করেছেন, তা অত্যন্ত যুক্তিযুক্ত এবং বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা সম্মত।

গ্রন্থটির বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ হচ্ছে "বিজ্ঞানের সংকট"। এই প্রবন্ধে বিজ্ঞানের ক্রমিক পরিণতি এবং সেই পটভূমিকায় বিংশ শতাব্দীতে পদার্থ বিজ্ঞানের যে নতুন যুগ আরম্ভ হয়েছে তার আলোচনা করেছেন আচার্য বসু। পদার্থ বিজ্ঞানের নতুন যুগ কেন? নিউটন-এর পর আইনস্টাইনের অবদান কি—এতৎ সম্পর্কিত আলোচনা বাংলা ভাষায় এমন প্রাঞ্জল ও সুন্দরভাবে পেতে পারি—এ যেন কল্পনাও করা যায় না। পরমাণুবাদ ও ইলেকট্রনবাদ সম্পর্কে বাংলা ভাষার সাধারণ পাঠক যদি কিছু জ্ঞাত হতে চান তাহলে এই প্রবন্ধটি তাঁদের কাছে অপরিমেয় মূল্যবান বলে মনে হবে। "শক্তির সন্ধানে মানুষ" প্রবন্ধে পরমাণু সংক্রান্ত গবেষণার আলোচনা আছে। ভারতে পরমাণু সংক্রান্ত গবেষণার জন্য ইউরেনিয়মের অভাব নেই। একথার পর আচার্য বসু আমাদের এই বলে সতর্ক করে দিয়েছেন যে, "যে-কোন জাতির পক্ষে আজ বিজ্ঞানকে তুচ্ছ করা কিংবা তার সম্ভাব্যতাকে অবহেলা করা একান্ত বিপজ্জনক। সাময়িক ইতিহাসের সংগে যাঁর পরিচয় আছে তিনিই একথা স্বীকার করবেন।"

আইনস্টাইন সম্পর্কিত পর পর দুটি প্রবন্ধে আইনস্টাইনের ব্যক্তিগত জীবন, তাঁর মনীষা, ও তাঁর জটিল তত্ত্ব রূপায়িত হয়ে উঠেছে। আইনস্টাইনের মানবতাবোধ, আন্তর্জাতিকতা, কবি প্রাণ—এই দিকগুলিও উজ্জ্বলরূপে বিকশিত।

মোট কথা ডাঃ মহেন্দ্রলাল সরকার, প্রবোধচন্দ্র বাগচী, গালিলিও প্রভৃতি আলোচনায় ব্যক্তিজীবনের পটভূমিকায় সমাজ, রাষ্ট্র ও তাদের সর্বজনহিতকর সাধনার কথাই অভিব্যক্ত হয়ে উঠেছে। তাই প্রসঙ্গক্রমে এসে পড়েছে, মহেন্দ্রলাল প্রতিষ্ঠিত "২১০, বৌবাজারের ল্যাবরেটরী থেকে আবিষ্কারের ফলে অধ্যাপক রমণ নোবেল পুরস্কার লাভ করেছেন।"

রবীন্দ্রনাথের শ্রেষ্ঠত্বও আচার্য বসু দেখিয়েছেন, বৈজ্ঞানিকের সাফাই প্রবন্ধে। এছাড়া দৃষ্টি আকর্ষণ করি—একালের শিক্ষাবিদদের—যাঁরা উচ্চশিক্ষা, কিংবা ভাষা নিয়ে আজো কোন সমস্যার সমাধান করতে পারেন নি। দয়া করে তাঁরা "শিক্ষা ও বিজ্ঞান", "আমাদের উচ্চশিক্ষা", "মাতৃভাষা," "নানা চিন্তা", "আশুতোষ ও বাঙলার শিক্ষা ব্যবস্থা" পাঠ করুন। প্রয়োজনবোধে, এগুলি কেন্দ্রীয় সরকার ও রাজ্য সরকারেরও গোচরীভূত থাকা দরকার।

আচার্য বসুর প্রবন্ধগুলি পড়ে আমরা গভীর তৃপ্তি বোধ করছি। প্রতিটি রচনায় মানুষের মূল্যবোধ স্বীকার করে নিতে তিনি বিজ্ঞানের জগতে আমাদের সচেতন করে দিয়েছেন। তাঁর আন্তর্জাতিকতাও আমাদের অনুপ্রাণিত করে। সেই সংগে তাঁর রচনায় কবির কল্পনা ও ভাবাবেগ থাকলেও তা বিজ্ঞানের সত্যকে একটুও ক্ষুণ্ণ করে নি। তবে সবচেয়ে আমরা বিস্মিত হয়েছি, আচার্য বসুর বাংলা ভাষায় অসাধারণ রচনা-কৌশল। এ ভাষা সহজ সুন্দর অথচ স্বভাব-অলংকারে দীপ্তিময়। রবীন্দ্রনাথের পর এইরকম ভাষা ক'জনই বা লিখতে পারেন? তাই মনে হয়, তিনিই যথার্থ বৈজ্ঞানিক, যিনি 'মাতৃভাষারূপে খনি পূর্ণ মণিজালে'র মধ্যে অবাধ প্রবেশের অধিকার পেয়েছেন।

আলোচ্য দ্বিতীয় গ্রন্থটি প্রকাশ করেও লেখক সমবায় সমিতি ধন্যবাদার্হ। কারণ, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক ১৯৩০ খৃস্টাব্দে প্রকাশের পর এটি বাজারে একেবারে দুর্লভ হলেও পুনঃপ্রকাশের সম্ভাবনা ছিল না।

এই গ্রন্থটির ভূমিকায় রবীন্দ্রনাথ বলেছেন—"এ কথা মানতে হবে যে রাষ্ট্রিক সাধনা ভারতের সাধনা নয়।...কিন্তু ভারতের একটি স্বকীয় সাধনা আছে; সেইটি তার অন্তরের জিনিস। সকল প্রকার রাষ্ট্রিক দশা-বিপর্যয়ের মধ্য দিয়ে তার ধারা প্রবাহিত হয়েছে। আশ্চর্যের বিষয় এই যে, এই ধারা শাস্ত্রীয় সম্মতির তটবন্ধনের দ্বারা সীমাবদ্ধ নয়, এর মধ্যে পাণ্ডিত্যের প্রভাব যদি থাকে তো সে অতি অল্প। বস্তুত এই সাধনা অনেকটা পরিমাণে অশাস্ত্রীয় এবং সমাজশাসনের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত নয়। এর উৎস জনসাধারণের অন্তরতম হৃদয়ের মধ্যে, তা সহজে উৎসারিত হয়েছে, বাধানিষেধের পাথরের বাধা ভেদ করে। যাঁদের চিত্তক্ষেত্রে এই প্রস্রবণের প্রকাশ, তাঁরা প্রায় সকলেই সামান্য শ্রেণীর লোক, তাঁরা যা পেয়েছেন ও প্রকাশ করেছেন তা 'ন মেধয়া ন বহুনা শ্রুতেন।"

আলোচ্য গ্রন্থটিতে মধ্যযুগের সাধকদিগের সাধনা ও বাণী প্রধানভাবে উপজীব্য। সেই সংগে সুফী মতবাদও সুস্পষ্টরূপে আলোচিত হয়েছে। এছাড়া বিভিন্ন মতবাদ, বিভিন্ন তত্ত্বের আলোচনা পড়ে মনে হয়, সত্য-সত্যই ভারতের স্বকীয় সাধনা তার অন্তরের জিনিস।

বর্তমান সময়ে যখন রাষ্ট্রীয় শক্তির গৌরব ও গর্ব চূড়ান্তরূপে প্রকটিত, তখন এই ধরণের গ্রন্থ পাঠ করা যে কোনো 'ভারতবাসী'র একান্ত কর্তব্য।

জয়ন্তী সেন

বিপ্লবী প্রচেষ্টার একটি বিস্মৃত অধ্যায়

—সত্যেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়

সালখিয়ার খণ্ডযুদ্ধ

"প্রকৃত যোদ্ধা যে, সে জয়-পরাজয়ের চিন্তা কখনও করে না। জয়-পরাজয় ঘটনা অনুসারে হয়। প্রকৃত যোদ্ধা মৃত্যুকে ভয় করে না। মানুষ তো সর্বদাই মৃত্যুমুখে পড়িয়া রহিয়াছে।"* (*ঝান্সির রাণী, চন্ডীচরণ সেন......পৃঃ ২৫)।

৭ই আগস্ট, ১৯১৬ সালের অমৃত-বাজার পত্রিকায় বড় অক্ষরে ছাপা হয়েছিল—"*Police Fired on at Howrah—Sequel to House Raid—Two Persons Arrested.*"

'হাওড়ায় পুলিশের ওপর গুলী চলেছিল—বাড়ি আক্রমণের ফল—দু'জনা গ্রেপ্তার।' তারপর উক্ত শিরোনামায় এক সুবিস্তৃত বিবৃতির মধ্যে লেখা ছিল—"This is the first occassion on which the police in conducting a raid in force have been fired upon." এই পুলিশ দল আক্রমণ চালাতে গিয়ে গুলী খেয়েছে এই প্রথম।' যতদূর জানা যায়, যতীন্দ্রনাথের আদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়ে, বালেশ্বরের যুদ্ধের অনুক্রমে, পুলিশ শক্তিকে বিপর্যস্ত করে সরে পড়তে সমর্থ হয়েছিলেন বিপ্লবীরা এই সর্বপ্রথমই বটে। ঘটনার স্থান, হাওড়ার সালখিয়া অঞ্চলে, ডোমপাড়া লেনের একটি বাড়ি।

কলকাতার আহিরীটোলা অঞ্চলে ১৯১০ সালের পর থেকে ক্রমে যে বিপ্লব সংস্থাটি গড়ে উঠেছিল তার মধ্যে নিম্নলিখিত নামগুলি অন্যতম :—

(১) শ্রীযুগল দত্ত—১৯নং নিমু-গোস্বামী লেন।

(২) শ্রীহরিশচন্দ্র দাশগুপ্ত—৭৩নং রাজা নবকৃষ্ণ স্ট্রীট।

(৩) শ্রীহেমন্তকুমার মিত্র—১২নং জগন্নাথ সুর লেন।

(৪) শ্রীঅমরনাথ রায়—৬।৫নং রামধন মিত্র লেন।

(৫) পরিচালক শ্রীসতীশ চক্রবর্তী—খুলনা (তখন তাঁর কোন নির্দিষ্ট ঠিকানা ছিল না) ইত্যাদি।

আহিরীটোলা অঞ্চলে ১৯০৫ সাল বরাবর সময় সরস্বতী ক্লাব নামে একটি সংগ প্রতিষ্ঠিত হয় এবং তারই মাধ্যমে তাঁদের হয়েছিল বৈপ্লবিক কাজের সূচনা। বিভিন্ন কাজকর্মের মধ্যে উক্ত গোষ্ঠীর একটি প্রধান কাজ ছিল বিপ্লবীদের আশ্রয় দেওয়া। শ্রীযুগল দত্ত, শ্রীহরিশচন্দ্র দাশগুপ্ত প্রমুখ যুবকেরা এই জাতীয় কাজে ছিলেন অগ্রণী। ডাঃ যাদুগোপাল মুখোপাধ্যায়ের কাছে জানা যায়, ১৯১৬ সালের মার্চ মাস আন্দাজ সময়ে তিনিও কিছুকাল ঐ যুগল দত্তের বাড়িতে আত্মগোপন করার সুযোগ নিয়েছিলেন।

এই বিপ্লব গোষ্ঠীর তত্ত্বাবধানে সালখিয়া অঞ্চলেও তখন একাধিক আশ্রয়-গৃহের ব্যবস্থা ছিল। তার মধ্যে পূর্বোক্ত হাওড়ার বাবুডাঙ্গা রোডের কাছে, ডোমপাড়া লেনের একটি দ্বিতল বাড়ি উল্লেখযোগ্য। এই বাড়ি সম্বন্ধে পরে স্টেটসম্যান পত্রিকায় লেখা হয়েছিল—"স্পষ্টই বোঝা যায়, বাড়িটি বেশ যত্ন সহকারেই নির্ধারিত হয়েছিল। সরু গলির পর সরু গলি, তারপর ততোধিক সরু গলি দিয়ে চলে তবেই ঐ বাড়ির প্রবেশ পথে পৌঁছান যায়।" (অমৃতবাজার পত্রিকা—৭।৮।১৯১৬-তে স্টেটসম্যান পত্রিকার প্রতিনিধির রিপোর্টের উদ্ধৃতি)। বাড়িটি ভাড়া করা হয়েছিল তখন সেন্ট জেভিয়ার কলেজের ৪র্থ বার্ষিক শ্রেণীর একটি ছাত্র রাজেন চৌধুরীর নামে (দলীয় লোক)। শোনা যায় শ্রদ্ধেয় শ্রীঅতুল ঘোষ প্রমুখ বিপ্লবীরাও এই বাড়িতে যাতায়াত করতেন।

১৯১৬ সালের মার্চ-এপ্রিল মাসের কোন সময় শ্রদ্ধেয় শ্রীযুগল দত্তের বাড়ি, ১৯নং নিমু গোস্বামী লেনে খানাতল্লাসী হয়। ফলে যুগলবাবুকেও উক্ত সালখিয়ার বাড়িতে আত্মগোপন করে আশ্রয় নিতে হয়েছিল। আলোচ্য সময়ে শ্রদ্ধেয় শ্রীসতীশ চক্রবর্তীও উক্ত নিমু গোস্বামী লেনের আশেপাশে আত্মগোপন করে থাকতেন। কারণ শোনা যায়, তাঁর নামে তখন একাধিক ওয়ারেন্ট জারি হয়েছিল, আর বেশ কিছু টাকার ঘোষণাও ছিল। যুগলবাবু গৃহত্যাগ করার পরে সতীশবাবুকেও স্বভাবতই ঐ অঞ্চল ছেড়ে যেতে হয়। এইভাবে একটি মশার পিস্তল সঙ্গে নিয়ে বিপ্লবী পরিব্রাজক সতীশচন্দ্র নানা স্থানে পায়ে হেঁটে ঘুরে, সেই সময় উক্ত গৃহে উপস্থিত হয়েছিলেন সন্ধ্যার অন্ধকারে ১৯১৬ সালের ৪ঠা আগস্ট শুক্রবারে। শ্রান্ত ক্লান্ত সতীশদা, তাঁর প্রিয় যুগল দত্ত ও সুধীর সোমকে সেই বাড়িতে পেয়ে, একটি স্বস্তির নিশ্বাস ফেলেন। তারপরে যুগল দত্ত আর সুধীর সোমকে পাহারায় রেখে নিজে দোতলার ঘরে প্রবেশ করেন একটু বিশ্রামের আশায়। অপরদিকে ক্লান্তির পরিক্রমায় ভোরের স্নিগ্ধ বাতাসের স্পর্শে উক্ত পাহারাদার দুটিও একটু তন্দ্রালু হয়ে পড়েন। এমন সময় সতীশচন্দ্র হঠাৎ ঘুম থেকে উঠে ঘরের বাইরে ছোট একটি ছাদে এসে দেখেন, সেই বাড়ি তখন পুলিশে ঘিরে ফেলেছে। পালাবার পথ নেই, অথচ এক মুহূর্তও সেখানে আর থাকা উচিত নয়। সতীশচন্দ্রের কাছে শোনা—অপর সকলকে তৎক্ষণাৎ গৃহত্যাগের আদেশ দিয়ে তিনি নিজে প্রিয় যুগলকে সঙ্গে নেন, আর অবিশ্রান্ত গুলীবর্ষণ করতে করতে দু'জনায় বেরিয়ে আসেন সেই বাড়ি থেকে। যুগলবাবু বলেন, তাঁর সতীশদার কাছে তখন ছিল একটি মশার পিস্তল (সেই ১৯১৪ সালের রডা কোম্পানী থেকে লুঠ করা মাল) আর তাঁর কাছে তথা যুগল দত্তের কাছে ছিল একটি ফোর ফর্টি রিভলভার। আর প্রতিপক্ষ? স্টেটস্‌ম্যানের ভাষায়—'দুটি মোটরে চড়ে আটজন সাহেব রাত দু'টা আন্দাজ সময়ে বাবুডাঙ্গা লেন থেকে কিছু তফাতে এসে হাজির হয়েই মোটর থেকে নেবে পড়েন। আর অল্প ক্ষণের মধ্যেই গোলাবাড়ি থানা থেকে বহু কন্‌স্টেবলও এসে উপস্থিত হয়ে, অতি সন্তর্পণে বাড়িটি ঘিরে ফেলার চেষ্টা করে।' (এ বি পত্রিকা ৭।৮।১৯১৬-তে স্টেটস্‌ম্যান থেকে উদ্ধৃতি)।

তা' হলে দেখা যাচ্ছে, এক দিকে অগণিত সশস্ত্র রাজশক্তি—আটজন বিশিষ্ট সাহেবের দ্বারায় পরিচালিত। যাঁদের মধ্যে ছিলেন টেগার্ট, ডেনহাম ইত্যাদি তখনকার প্রতিটি বিশিষ্ট পুলিশ অফিসার, আর অপরদিকে পরিশ্রান্ত, ক্ষুধাক্লিষ্ট, অনিদ্র দু'জন মাত্র বাংলার মরিয়া যুবক। এরা নাকি স্টেট্‌স্‌ম্যানের ভাষায় 'ডেস্পারেডো' তথা বেপরোয়া পলাতক, অতি দুরন্ত। সমকক্ষ প্রতিদ্বন্দ্বিতাই বটে। কিন্তু বিপ্লবীদের প্রাণে সেদিন প্রতিধ্বনিত হয়েছিল কবির গানের সুর—

"ভাঙিয়া পড়ুক ঝড় জাগুক তুফান,
নিঃশেষ হইয়া যাক নিখিলের যত
বজ্রবাণ।।"

আবার মনে পড়ে সেই বালেশ্বরের ছবি। কিন্তু এবার কালচক্রে ইতিহাসের

ফুটপাতের সংসারে ঃ স্বপ্ন

শম্ভুনাথ চট্টোপাধ্যায়

গ্রামে ছিলো কোঠাবাড়—সে কি কোনো জন্মের ওপারে
পুকুরে শালুক ফুল, শান্ত সিঁড়ি, ছবির মতন
উঠোনে ডালিম গাছ, সন্ধ্যা হলে স্বরশস্থ পাখি
শিস দিয়ে উড়ে যেতো পার হয়ে অন্ধকার বন,
রূপকথা শোনাতের রান্নাঘরে বসে ছোট-কাকী,
কী গভীর স্বরণীয় সুখ ছিলো জীবনে তখন,
স্বর্গের পরীরা এসে দেখা দিতো জানালার ধারে।

গোলা ঘরে ধান ছিলো, ক্ষেতে ছিলো অজস্র আনাজ।
সমস্ত হারিয়ে গিয়ে শুধু তীব্র ক্ষুধা আছে আজ।

সংসার এসেছে নেমে এখন শহরে, ফুটপাতে ঃ
ছেলেটা অবাধ্য বড়, আজও তাই মাংস খেতে চায়,
রেস্তোরাঁর পাশে গিয়ে ডাস্টবিনে তীর্যক্ তাকায়,
নিহত স্বপ্নের শব যেন ঝুঁকে স্পর্শ করে হাতে?
কিন্তু সে জানে না নিজ দেহখানি অস্থি-চর্ম-সার
কেন হলো, তার মাংস চুপিচুপি কে করে আহার-
কে তাকে বঞ্চিত করে স্বাধীন দেশের দুধ-ভাতে।

বড় শূন্য পড়ে থাকে ঘুমন্ত মায়ের দুটি হাত ঃ
মনে তবু ঝরে যায় স্বপ্নের বকুল সারারাত।

কাঁটার কিছুটা বিপরীত গতি হয়ে যায়। গুরুর মন্ত্রে উদ্বেলিত প্রাণ, ভীষণ প্রতিজ্ঞায় অনড়, অটল, সেই দুটি মাত্র বাঙালী যুবকের অবিশ্রান্ত গুলীবর্ষণে ঐ বিরাট পুলিশশক্তি, সাময়িকভাবে হলেও তখন ছুটে যেতে বাধ্য হয়েছিল। সুযোগ বুঝে সতীশচন্দ্র তাঁর হাতের মশার পিস্তলটি, প্রিয় ভাই যুগল দত্তের হাতে অর্পণ করে তাঁকে নির্দেশ দেন, অপর এক গৃহে অবস্থিত আরো কয়েকজন আত্মগোপন-কারীকে এই সংবাদ পোঁছে দিতে। আর নিজে ইত্যবসরে পটাসিয়াম সাইনায়েড্ মুখে পোরেন। উদ্দেশ্য বীর যতীন্দ্রনাথের মন্ত্র—জ্যান্ত ধরা দেব না। কিন্তু এখানেও ভাগ্যের বিপরীত লিপি। উক্ত পটা-সিয়ম্ সাইনায়েডের বিষক্রিয়ার শক্তি তখন নষ্ট হয়ে যাওয়ায় তাতেও তাঁর মৃত্যু হয় নি। শেষে তিনি কোনক্রমে উত্তরপাড়া কলেজের হোস্টেলে গিয়ে হরিশচন্দ্র দাশগুপ্তের আশ্রয়ে আবার আত্মগোপন করেন। সতীশচন্দ্র আজও জীবিত। আমরা তাঁর দীর্ঘায়ু কামনা করি।

অপর দিকে যুগল দত্ত তাঁর গন্তব্য পথে অগ্রসর হয়ে আবার সেই পুলিশ-বাহিনীর দ্বারায় আক্রান্ত হন। এবার দ্বন্দ্বের পরীক্ষা হয়েছিল ইংরাজীতে যাকে বলে '100 : 1' বা শতকের আনু-পাতিক এক, এই হিসেবে। কিন্তু বিপ্লবী বীর যুগল দত্তের ভ্রূক্ষেপ নেই। তাঁর প্রাণে তখন বুদ্ধদেবের মন্ত্রের একটি মাত্র অংশ স্পন্দিত হচ্ছিল—"ইহাসনে শুষ্যতু মে শরীরং" তথা নিজের আত্মিক শক্তির বলে নির্ভয়ে দৃঢ়প্রত্যয়। ডাইনে বাঁয়ে গুলী ছুড়তে ছুড়তে এগিয়ে চললেন যুগল দত্ত। শেষে গুলী ফুরিয়ে গেল। দু' হাতে দুটি আগ্নেয়াস্ত্র নিয়ে এবার গ্রেপ্তার হলেন তিনি। বিচার হলো তখনকার স্পেশ্যাল কোর্টে। অভিযোগ "Attempt to Murder," 'Arms Act" ইত্যাদি, ইত্যাদি। শাস্তি পাঁচ বছর সশ্রম কারাদণ্ড। পরাধীন জাতির স্বাধীনতা সৈনিকের সমুচিত শাস্তি।

কিন্তু আজ? এখনও এই বিপ্লবী বীরের কথা ভাবতে গেলে কেবলই মনে হয়—তুমি যে কতখানি দিয়েছিলে স্বাধীনতার বেদীমূলে, আজ যাঁরা সেই স্বাধীনতা ভোগ করছেন, তাঁরা কি সেই বিষয়ে কোন খবর রাখেন? না ইচ্ছা করেই তা' ভুলে যাওয়ার চেষ্টা চলছে।

এখন বর্তমান আলোচনায় দেখা যাচ্ছে বুড়ীবালামের তীরে বসে ৯ই সেপ্টেম্বর ১৯১৫ সালে, বীরশ্রেষ্ঠ যতীন্দ্রনাথ যে আদর্শ রেখে গিয়েছিলেন, তার পরবর্তী প্রথম পরিণতি হাওড়া জেলার সালখিয়া নামক স্থানে ৪।৫ই আগস্ট ১৯১৬ সালে। অনন্তর বিপ্লবী বাংলায় মারণ আঘাতের ঘটনাপঞ্জী চলতে থাকে সময়ের অপ্রতিহত তালে। এই-ভাবে যে সকল খণ্ডযুদ্ধের ধারাবাহিক খবর পাওয়া যায়, সেগুলি হচ্ছে—

(১) ১৯১৭ সালে পাবনা জেলার সিরাজগঞ্জ মহকুমার আটঘরিয়া থানার তেলিজানা গ্রামে পলাতক বিপ্লবীদের সঙ্গে খণ্ডযুদ্ধ।

(২) ৭ই জানুয়ারী ১৯১৮ সালে গৌহাটির আটগাঁও বাড়িতে পলাতক বিপ্লবীদের সঙ্গে খণ্ডযুদ্ধ।

(৩) ঢাকা কলতা বাজারের গলিতে পলাতক বিপ্লবীদের সঙ্গে খণ্ডযুদ্ধ ইত্যাদি। এইগুলি লিপিবদ্ধ হয়েছে শ্রীত্রৈলোক্যনাথ চক্রবর্তী লিখিত 'জেলে ত্রিশ বছর ও ভারতে বিপ্লব সংগ্রাম' নামক গ্রন্থে—(পৃঃ ২০০—২০২)—। কিন্তু এই সকল বিপ্লবীদের সকলেরই বোধহয় সমস্বরে গান ছিল—

"এই দেহটির ভেলা নিয়ে
দিয়েছি সাঁতার গো,
এই দু দিনের নদী হব পার গো,

* * *

তার পরে তার খবর কী যে ধরি সে
তার ধার গো,
তার পরে সে কেমন আলো, কেমন
অন্ধকার গো।
(বলাকা থেকে)

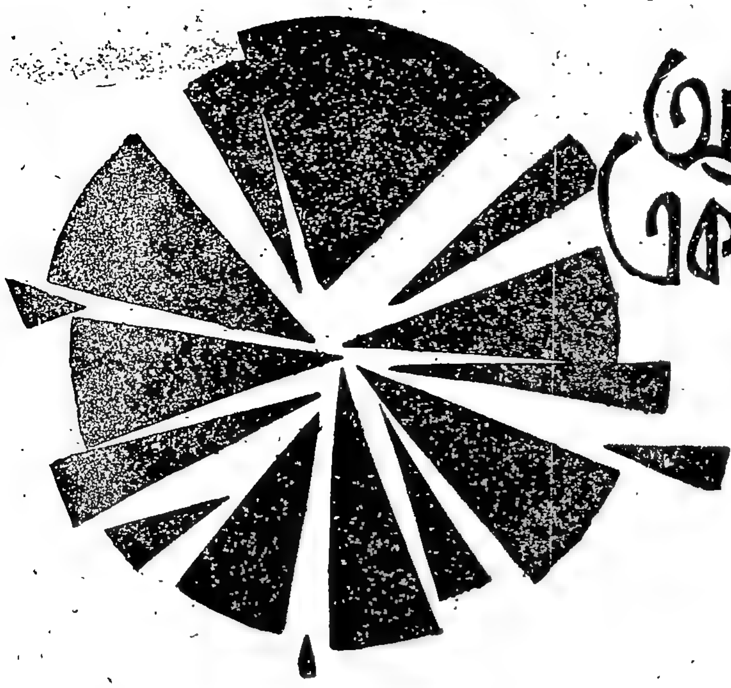

অগ্নিযুগের একটি অধ্যায়

অনন্ত সিংহ

হামলা ও মামলা রুজু

রামকৃষ্ণের ভগ্নীপতি কালীপ্রসন্নবাবু মন খুলে প্রাণের সাধে পুলিশের কাছে আমাদের বিরুদ্ধে সব বললেন। পুলিশ প্রাথমিক তথ্য পাওয়ার পর গোপনে রীতিমত অনুসন্ধান করতে লাগল। চট্টগ্রামের বিভিন্ন ডাক্তারখানায়ও ডাক্তারবাবুদের বার বার প্রশ্ন করে জানতে চাইছিল—১৪ই মার্চ দোলযাত্রার দিনে তাঁদের ডিসপেনসারীতে বা কারো বাড়িতে গিয়ে তাঁরা কেউ বিস্ফোরণে আহত কোন ব্যক্তিকে চিকিৎসা করেছেন কিনা। এইভাবে অনুসন্ধান করতে করতে প্রায় ১০।১২ দিন পরে একদিন সন্ধ্যাবেলা পুলিশ, ডাক্তার জগদা বিশ্বাসের বাড়ি গিয়ে উপস্থিত। জগদাবাবুকে জিজ্ঞাসাবাদ করে পুলিশ জানতে পারল যে তিনি দোলযাত্রার পরের দিন অগ্নিদগ্ধ এক ব্যক্তিকে চিকিৎসা করেছেন। তিনি সেই আহত ব্যক্তিটির কাছে জানতে পেরেছিলেন যে, লুচিভাজার সময় দুর্ঘটনায় সেই ব্যক্তিটি পুড়ে গেছেন। কোন্ বাড়িতে রামকৃষ্ণকে চিকিৎসা করেছেন জগদাবাবুকে তাও বলতে হল। অবশ্য তাঁর পক্ষে অস্বীকার করার কথা ওঠে না।

জগদাবাবুর সঙ্গে সন্ধ্যার সময় পুলিশের এই সব কথা হয়েছে। স্বাভাবিকভাবে ধরে নেওয়া যায় খবর পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে—না হয় কিছুক্ষণের মধ্যেই পুলিশ সেই নির্দিষ্ট বাড়িতে হানা দেবে—বা সেই রাত্রেই তারা নিশ্চয়ই রামকৃষ্ণকে গ্রেপ্তার করবে। আমরা কিন্তু তখনও জানি না যে অবস্থা এতদূর গড়িয়েছে। যাদের ওপর রামকৃষ্ণের চিকিৎসা ও শুশ্রূষার ভার ছিল তারা যে আমাদের সম্পূর্ণ অগোচরে—আমাদের নির্দেশের গুরুত্ব অবহেলা করে চিকিৎসা করাবার জন্য রামকৃষ্ণের স্থায়ী আশ্রয়স্থলে জগদাবাবুকে নিয়ে যাবে—এ আমরা ভাবতেই পারি নি! ক্ষতি যা হওয়ার তাতো হয়েইছে! তবু মন্দের ভালো—সন্ধ্যা গেল—রাত গেল—তারপর খুব ভোরে ভোরে জগদাবাবুর লোক গণেশের বাড়ি গিয়ে—পুলিশের সঙ্গে গত সন্ধ্যায় জগদাবাবুর যা যা কথাবার্তা হয়েছে—গণেশকে সব খবর জানাল। কি সর্বনাশ! এত সময় অতিবাহিত হয়েছে! এখন কি আর কিছু করবার আছে! হয়ত এতক্ষণে রামকৃষ্ণ ধরা পড়েছে—হয়ত পুলিশ বেরিয়ে পড়েছে আমাদের বন্দী করবার জন্য।

যা হোক—অবস্থার গুরুত্ব উপলব্ধি করে নিষ্ক্রিয় থাকা যায় না। গণেশ আমার কাছে তৎক্ষণাৎ খবর পাঠাল। আমি ছোট গাড়িটি নিয়ে তখনি তার কাছে হাজির হলাম। বিন্দুমাত্র সময় নষ্ট না করে গণেশ গাড়িতে উঠল এবং আমাকে দ্রুত জগদাবাবুর বাড়িতে যেতে বলল। পথে গাড়িতে গণেশ আমাকে সব কথা জানিয়ে গুরুতর পরিস্থিতির সম্ভাবনা সম্বন্ধে আলোচনা করল। জগদাবাবুর বাড়ি ছুটে চলেছি—তাঁর মুখে বিবরণের খুঁটিনাটি সব জেনে নেওয়ার জন্য। খুব ভোরেই জগদাবাবুকে ঘুম থেকে তুলে তাঁর কাছে শুনলাম যে পুলিশ রামকৃষ্ণের বর্তমান বাসার ঠিকানা জেনে নিয়েছে।

জগদাবাবুর কাছ থেকে বিদায় নিয়ে ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটলাম কংগ্রেস অফিসের দিকে—মাস্টারদার সঙ্গে পরামর্শ করতে। যাওয়ার সময় পথে মেডিকেল স্কুলের বোর্ডিং-এ নরেশ রায় ও বিধু ভট্টাচার্যকে জানালাম—তারা যেন এই মুহূর্তেই প্রস্তুত হয়ে আসে—আমাদের সঙ্গে যেতে হবে। তারা নিজ নিজ রিভলবার নিয়ে দ্রুত আমাদের গাড়িতে এসে উঠল। আমাদের চারজনের সঙ্গেই রিভলবার। শোঁ শোঁ করে গাড়ি ছুটেছে কংগ্রেস অফিসের দিকে—মাস্টারদার সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে হবে—এবং কালক্ষয় না করে মারাত্মক সিদ্ধান্ত গ্রহণ না করলেই নয়।

মাস্টারদাকে আমরা এই জটিল পরিস্থিতির আদ্যোপান্ত বিবরণ খুব সংক্ষেপে দিলাম এবং প্রস্তাব করলাম যে দেরি না করে রামকৃষ্ণ বিশ্বাসের বাসায় আমাদের যাওয়া চাই। তারপর যদি সম্ভব হয়, এবং যদি পুলিশ তখনও তাকে গ্রেপ্তার না করে থাকে, তবে সাদা বা খাকী পরিহিত পুলিশ বেষ্টনী উপেক্ষা করেও রামকৃষ্ণকে নিয়ে চলে আসা আমাদের উচিত। যদি পুলিশ তাকে দগ্ধ অবস্থায় বন্দী করতে পারে তবে সাক্ষীসাবুদ দিয়ে মামলা রুজু করা সম্ভব হবে। আর যাকে নিয়ে তাদের মামলা উপস্থিত করতে হবে সেই যদি পুলিশের আওতার বাইরে থাকতে পারে তবে কেবল শোনা কথার উপর নির্ভর করে কোন মামলা চলতে পারে না। মাস্টারদাও আমাদের প্রস্তাবে মত দিলেন—এবং আসন্ন বিপদের সম্মুখীন হওয়ার জন্য প্রস্তুত হলাম। কেউ বলতে পারে না রামকৃষ্ণকে কি অবস্থায় পাওয়া যাবে! এখন সকাল ছয়টা সাড়ে ছয়টা হবে। চারিদিকে দিনের আলো! গতকাল সন্ধ্যার সময় পুলিশ এই বাসস্থানের সন্ধান পেয়েছে!

কংগ্রেস অফিসটি ছিল আসকর খাঁ দীঘির পশ্চিম পাড়ে। আর রামকৃষ্ণের গোপন বাড়িটি কংগ্রেস অফিসের পাঁচশ গজের মধ্যে আসকর খাঁ দীঘির দক্ষিণ-পূর্ব কোণে পাহাড়ের ঢালু স্থানে অবস্থিত। আমরা যথাসম্ভব সতর্কতার সংগে সেই বাড়ির খুব কাছাকাছি গেলাম। দূর থেকে দেখে খুব ভালো বোঝা গেল না। বুঝতে পারলাম না পুলিশ ইতিমধ্যে রামকৃষ্ণকে গ্রেপ্তার করে নিয়ে যাওয়ার পর—দলের অন্য লোক-দের ধরবার জন্য বাসার ভিতর ঘাপটি মেরে বসে আছে কিনা! বাংলাদেশে এইরূপ শোচনীয় পরিণতির বহু নজীর আছে যে পুলিশ গোপনে সংবাদ পেয়ে বাড়ি খানাতল্লাসী করেছে এবং বিপ্লবী যুবকদের বন্দী করে নিয়ে যাওয়ার পরও গোপনে সেই স্থানে ওৎ পেতে বসে থেকেছে আর পর পর দলের অন্যান্য যুবকদের ওইখানে উপস্থিত হওয়ার সংগে সংগে গ্রেপ্তার করেছে।

১৯২৯ সালে—আমাদের সশস্ত্র যুব-অভ্যুত্থানের প্রায় বছরখানেক আগে—নিরঞ্জন সেনের নেতৃত্বে মেছুয়াবাজারের এক বাড়িতে বিপ্লবী যুবকেরা ভবিষ্যতের পরিকল্পনা নিয়ে ব্যস্ত। তাদের সংগে আমাদের যোগাযোগ ছিল—গণেশের মারফৎ। গণেশ তাদের কাছে গোপনে চট্টগ্রামে সুবোধ চৌধুরীর ঠিকানাটি দিয়েছিল সাংকেতিক চিঠি মারফৎ যোগাযোগ রাখার জন্য। সেই গোপন বাড়িতে পুলিশ নিরঞ্জন সেনকে বন্দী করে। গোপন সংবাদের ভিত্তিতে প্রথম একজন বা দুইজন যুবককে পুলিশ রিভলবার ও তাজা বোমা সহ গ্রেপ্তার করল। দলের একজন বিশ্বাসী যুবক বোমা ও পিস্তলটিকে সযত্নে তরিতরকারী ও মাছ ইত্যাদি দিয়ে ঢেকে নিয়ে এই মেছুয়াবাজারের বাড়িতে আসছিল এবং "ঘ্রাণ পেয়ে" পুলিশ তাকে বন্দী করে সেখান থেকে সরিয়ে নিল এবং বেশ প্রস্তুত হয়েই ঘরের ভিতর আত্মগোপন করে অপেক্ষা করতে লাগল। তারপর একের পর এক তাদের দলের অন্য যুবকেরা যেমনটি এসেছে তক্ষুণি ধরা পড়েছে। তারপর সেই গোপন ঠিকানা দেওয়ার সূত্র ধরে চট্টগ্রামে রেলওয়ে ক্লাস কোয়ার্টারে সুবোধ চৌধুরীর বাড়িও খানাতল্লাসী হল এবং তাকে পুলিশ জিজ্ঞাসাবাদ করে কিন্তু গ্রেপ্তার করে নি। পরে সুবোধ চৌধুরী চট্টগ্রাম যুব-অভ্যুত্থানে প্রথম সারিতে অংশ নিয়েছিল, জালালাবাদ যুদ্ধে গণতন্ত্র বাহিনীর অংশীদার হয়ে শত্রুকে পরাস্ত করার গৌরব অর্জন করেছে। কালারপোল যুদ্ধ প্রাঙ্গণে শত্রুপক্ষীয়দের নিহত করেছে ও নিজে বন্দী হয়েছে; তারপর আমাদের সংগে দ্বীপান্তরের সাজা নিয়ে গেল কালাপানি। সুবোধ চৌধুরী বর্তমানে বাম কম্যুনিস্ট পার্টির সদস্য ও একজন এম-এল-এ।

রামকৃষ্ণের গোপন আস্তানার কাছে পৌঁছে কিছুদিন আগেকার মেছুয়া-বাজারের বাড়ির নিদারুণ ও শোচনীয় পরিণতির কথা মনে পড়ল। আমাদের বন্ধু নিরঞ্জন সেন মেছুয়াবাজারের বাড়িতে পুলিশের ফাঁদে পড়ে গিয়ে যেভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন সেই শোচনীয় স্মৃতি আমাদের মন থেকে তখনও মুছে যায় নি—তাই চট করে রামকৃষ্ণের বাসার ভিতরে ঢুকে পড়া যুক্তিযুক্ত মনে করি নি। আমি গাড়ি নিয়ে রাস্তার উপর রইলাম। নরেশ একজন বন্ধুর সংগে সন্তর্পণে রামকৃষ্ণের বাসায় গেল তাকে ডেকে আনতে। দিনের আলোতে মুখ বুক হাতের দগ্ধ চিহ্ন থাকা সত্ত্বেও লোকের দৃষ্টি উপেক্ষা করে রামকৃষ্ণকে গাড়িতে চলে আসতে নির্দেশ দিলাম। রিভলবার হাতে গণেশ ও বিধু অতর্কিত পুলিশের আক্রমণ ব্যাহত করার জন্য সুবিধে-জনক স্থানে প্রস্তুত হয়ে রইল। সাদা পোষাকে দুই তিন জন লোককে দেখতে পেলাম। তাদের সবাই বা কেউ কেউ যে পুলিশের লোক তাতে কোন সন্দেহ ছিল না। অন্য কোথাও দৃষ্টির অগোচরে ঘাপটি মেরে পুলিশ অপেক্ষা করছিল কিনা তা ভাববার সময় ছিল না। পাছে সেইরূপ কোন আকস্মিক অবস্থার সম্মুখীন হতে হয় তার জন্য আমাদের আত্মরক্ষার পাল্টা ব্যবস্থা করে নিয়ে আমরা নরেশকে পাঠালাম রামকৃষ্ণকে নিয়ে আসতে।

Initiative কে আগে নেবে—আমরা না পুলিশ? অনেক বেশি ক্ষেত্রেই সার্থক ও সফল রণকৌশলের প্রয়োগ বিবেচিত হয় যদি শত্রুর প্রস্তুত হওয়ার আগেই initiative থাকে অন্য পক্ষের অধিকারে। জগদাবাবুর কাছে পুলিশ এই বাড়ির খোঁজ পেয়েছে প্রায় ১২ ঘণ্টা পূর্বে—আগের দিন সন্ধ্যাবেলা, আর আমরা খবরটি শুনেছি পরের দিন ভোরে! সময়ের যেখানে এতখানি ব্যবধান সেখানে বৃটিশ আমলের সুগঠিত পুলিশ বাহিনীর পক্ষে initiative নেওয়া যে আমাদের গোপন বিপ্লবী দলের সীমিত শক্তির চাইতে অনেক গুণ বেশি তা অতি সহজেই অনুমান করা যায়। তবু—তবু একেবারে শেষ সময়ের সংক্ষিপ্ত মুহূর্তের সুযোগ নেওয়ার জন্য ক্ষিপ্রতার সংগে আমাদেরই initiative নেওয়া উচিত মনে করে সাহসের সংগে সেইরূপ কৌশলই গ্রহণ করলাম।

আশ্চর্য! দিনের আলো, পুলিশের প্রহরা, লোকের দৃষ্টি সব উপেক্ষা করে নরেশ রামকৃষ্ণকে গাড়িতে তুলে দিল। সবাই অবাক হয়ে তাকিয়ে রইল—সকলেই নিষ্ক্রিয়—কেউই কোন বাধা দিল না। সংগে সংগে আমি একা রামকৃষ্ণকে নিয়ে উধাও হলাম। এইরূপ ব্যবস্থা করে-ছিলাম—কারণ যদি গাড়িতে ধরা পড়ি তবু যেন সংখ্যায় আমরা কম থাকি। যখন গাড়ি নিয়ে আমি দ্রুতবেগে বেরিয়ে গেলাম তখনও জানি না কোনো নির্দিষ্ট আশ্রয়ে রামকৃষ্ণকে নিয়ে তোলা যাবে কিনা! আমার উপর নির্দেশ ছিল—শহরের বাইরে পথে পথে রামকৃষ্ণকে গাড়িতে নিয়ে ঘুরে ঘুরে প্রায় তিন ঘণ্টা সময় কাটাব এবং ইতিমধ্যে গণেশ ও মাস্টারদা আলোচনা ও বিবেচনা করে ঠিক করবেন রামকৃষ্ণকে শহরের কোন বাসায়—নাকি নৌকা করে নদীপথে গ্রামের কোন নির্জন বাড়িতে পাঠাবেন? এইরূপ নতুন পরিস্থিতির জন্য মানসিক প্রস্তুতি থাকা এক কথা; আর গুপ্ত বিপ্লবী দলের সীমিত শক্তির মধ্যে নতুন নতুন আকস্মিক পরিস্থিতির জন্য বাস্তব সাংগঠনিক প্রস্তুতির ব্যবস্থা আগে থেকে করে রাখা সম্পূর্ণ ভিন্ন জিনিষ! এইরূপ অবস্থায় রামকৃষ্ণকে তৎক্ষণাৎ কোথাও নিয়ে যাওয়ার ব্যবস্থা আমাদের আগে থেকে ছিল না। তাই তেমন কোন ব্যবস্থা করার জন্য অন্তত কয়েক ঘণ্টার সময় চাই। মাস্টারদা ও গণেশ সব ঠিকঠাক করে তিন ঘণ্টা পরে একটি নির্দিষ্ট সময়ে (৯॥টা নাগাদ হবে) ডবল মুরিং-এর কাছাকাছি নদীর ধারে নির্দিষ্ট স্থানে কোন এক সদস্যকে পাঠাবেন বলে ঠিক করা হয়েছিল। সেই ব্যবস্থা অনুযায়ী আমি গাড়িতে তিন ঘণ্টা ধরে পথে পথে ঘুরে নির্দিষ্ট সময়ে—সেই নির্দিষ্ট স্থানে গেলাম। আমাদের একজন সাথী সেখানে উপস্থিত ছিল। সে গণেশ ও মাস্টারদার নির্দেশ মত ইতিমধ্যে একটি নৌকা ভাড়া করে নৌকার জিম্মা একজনকে দিয়ে এসেছে। নৌকার ঘাটটি খুব কাছেই। রামকৃষ্ণকে নিয়ে সে চলে গেল আর আমি গণেশের বাড়ির উদ্দেশ্যে চললাম।

পুলিশের দৃষ্টির অগোচরে রামকৃষ্ণকে নিয়ে এই আকস্মিক ঘটনার জন্য আমাদের যে কি কঠিন সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়েছিল তার সামান্য তথ্যই আমরা সরকারী দলিলে পাই। আমাদের মামলার মুদ্রিত জাজমেন্ট কপির ১০ ও ১১ পৃষ্ঠায় নিম্নলিখিতভাবে বিষয়টির উল্লেখ আছে ঃ

"The next evening about 6 P. M. Ganesh Ghosh arrived in a Baby Austin Car at the house of Dr. Jagada Biswas

(PN 170) and asked him to attend a case of burning injuries....Dr. Biswas found Ramkrishna suffering from burning injuries on his face, hands and chest....about 8 or 10 days later, a youth whom he did not know, came to P. W. 170's dispensary and took him in a Tikka gharry to a house on the left side of the lane which runs north from the main road at the bottom of the Collectors' hill. There he found the patient to be Ramkrishna....One or two other youths were present but he (P. W. 170) did not know any of them....On the 26th March Abdul Azim had drawn up a first information (Ex 268) and started a case against Ramkrishna under the explosive substance act. He searched for Ramkrishna at the house of his brother-in-law, at his home in Saroatali, at the house in the lane under Collectors' hill and else where but could not find him. Ramkrishna remained untraced until 1st December 1930, when he was arrested (sic) on the Chandpur-Laksam Road along with Kalipada Chakravarti (another absconding accused in the case) in possession of arms and ammunition in connection with the murder that morning at Chandpur of Inspector Tarini Mukherjee—for which he was subsequently convicted and hanged."

মামলার রায়ে জজসাহেব লিখছেন যে—পরের দিন সন্ধ্যাবেলা—অর্থাৎ ১৫ই মার্চ, গণেশ ঘোষ একটা বেবী অস্টিন গাড়ি করে ডাক্তার জগদাবাবুকে নিয়ে যায়। জগদাবাবু সেখানে গিয়ে রামকৃষ্ণকে দেখেন যে, তার বুক হাত মুখ আগুনে পুড়ে গেছে।......তারপর প্রায় ৮ বা ১০ দিন পরে একজন যুবক ডাক্তারবাবুকে তাঁর ডিসপেনসারী থেকে ঠিকা গাড়ি করে নিয়ে যায়। ডাক্তারবাবু সেই যুবককে চেনেন না বলে বলেছেন। (আমরা জানি তিনি তাকে চিনতেন)। যে বাড়িতে ডাক্তারকে নিয়ে গেল সেটি কালেক্টার সাহেবের পাহাড়ের উত্তর দিক সংলগ্ন গলির মধ্যে ছিল। (এই বাসাটি ভাড়া নিয়ে রামকৃষ্ণকে স্থায়িভাবে রাখার ব্যবস্থা করেছিলাম। প্রাথমিক নিয়ম অনুসারে এই বাসায় ডাক্তারবাবুকে না আনবার জন্য নির্দেশ দেওয়া ছিল। রামকৃষ্ণকে অন্য স্থানে নিয়ে গিয়ে ডাক্তারবাবুকে দেখিয়ে আবার এখানে ফিরিয়ে নিয়ে আসার কথা ছিল। কিন্তু এই নির্দেশ অবহেলিত হয়েছে বলে আমাদের এক অসম্ভব পরিস্থিতির সম্মুখীন হতে হল।) এই বাসায় ডাক্তারবাবু আরও দু'তিন জনকে দেখেছেন। তিনি তাদেরও চেনেন না বলেছেন। (কিন্তু তিনি তাদের প্রত্যেককেই চিনতেন)।......২৬শে মার্চ আবদুল আজীম Explosive Substance act (বিস্ফোরক দ্রব্য আইন) অনুযায়ী প্রাথমিক সংবাদের ভিত্তিতে মামলা আরম্ভ করল। জজসাহেব সাক্ষীদের বিভিন্ন উক্তি হতে বলছেন যে আজীম সাহেব (কোতোয়ালীর ইন্-চার্জ) রামকৃষ্ণের ভগ্নীপতির বাড়ি, সারওয়াতলীতে রামকৃষ্ণের নিজের বাড়ি, ও জেলা শাসকের পাহাড় সংলগ্ন গলির ভিতরকার বাড়িটি খানাতল্লাসী করে। কিন্তু রামকৃষ্ণকে কোথাও পাওয়া যায় নি। রামকৃষ্ণ ১৯৩০ সালের ১লা ডিসেম্বর পর্যন্ত পুলিশের চোখে ধুলো দিয়ে আত্মগোপন করেছিল। কিন্তু আগের দিন ভোর রাত্রে চাঁদপুরে ইন্সপেক্টার তারিণী মুখার্জীর হত্যাপরাধে—১লা ডিসেম্বর তারিখে চাঁদপুর-লাকসাম রাস্তায় অস্ত্রশস্ত্র সহ রামকৃষ্ণ ও কালীপদ চক্রবর্তীকে গ্রেপ্তার করা হয়। সেই মামলায় রামকৃষ্ণের মৃত্যু-দণ্ড হয়।

রামকৃষ্ণকে আমরা এইভাবে পুলিশ-বেষ্টিত বাড়ি থেকে উদ্ধার করে নিয়ে এলাম বটে, কিন্তু সমস্যার সমাধান তাতে কি হল? পুলিশ হয়ত আমাদের তখন বাধা দেওয়ার মত অবস্থায় ছিল না, আর তাই হয়ত আমরা প্রথম initiative নিয়েছিলাম বলে, তাদের নাকের ডগায় রামকৃষ্ণকে নিয়ে প্রস্থান করা সম্ভব হয়েছিল। আমরা দৃঢ়তা, সাহস ও ক্ষিপ্রতার সংগে কাজ করেছি বলে পুলিশ নিষ্ক্রিয় ও নির্বাক দর্শকের মত হতভম্ব হয়ে পড়ে। যা' হোক পরাজয়ের এই সাময়িক ধাক্কা সামলে নিয়ে পুলিশ যে হামলা চালাবে সে সম্বন্ধে আমরা সচেতন ছিলাম। নদীর ঘাটে রামকৃষ্ণকে বিদায় দিয়ে আমি প্রথমে গণেশের বাড়ি যাই, তারপর আমরা দু'জনে মাস্টারদার সংগে দেখা করি। আমাদের সংক্ষিপ্ত আলোচনার মাধ্যমে ঠিক হ'ল যে—যাদের উপর পুলিশের সন্দেহ আছে—সেই মুহূর্ত থেকে তারা কেউ বাড়িতে থাকবে না। আর যারা সন্দেহের বাইরে আছে তাদের মধ্য থেকে কয়েকজনকে বাছাই করে সংবাদ সংগ্রহের জন্য নিযুক্ত করা হোক। তারা পুলিশের কার্যকলাপের সংবাদ যথাসময়ে ও যথাস্থানে আমাদের পাঠিয়ে দেবে। আর আমরা—মাস্টারদা, নির্মলদা, গণেশ, অম্বিকাদা ও আমি—রাত দশটায় কোন এক নির্দিষ্ট স্থানে একত্র হয়ে তথ্যাদির ভিত্তিতে পরবর্তী প্রোগ্রাম নেব। এইটুকু প্রোগ্রাম ঠিক করে আমরা নিজ নিজ এলাকায় চলে গেলাম।

আজ যারা এই সব ঘটনা ও অবস্থার কথা পড়বেন তাঁদের কাছে এটা গল্পের মত মনে হবে। কিন্তু যাঁরা একটু চিন্তা করবেন তাঁরা বুঝবেন কি দুশ্চিন্তা, কি নিদারুণ ভয়াবহ অবস্থার মধ্যে আমাদের দিন ও সময় কাটাতে হয়েছে।

১৯৩০ সালের ২৬শে মার্চ আবদুল আজীম রামকৃষ্ণের বিরুদ্ধে মামলা আরম্ভ করতে চেষ্টা করল এবং সেই অনুযায়ী ব্যাপক অনুসন্ধান ও খানাতল্লাসী চালাতে লাগল।

মাত্র বাইশদিনব্যাপী—১৮ই এপ্রিল ১৯৩০ সালে আমাদের যুব-অভ্যুত্থান সংগঠিত হবে। এই সংক্ষিপ্ত সময়ের মধ্যে এইরূপ একটি ঘটনা সামাল দিয়ে চলা ও প্রতি মুহূর্তে পুলিশের প্রতি-আক্রমণের কোন না কোন ব্যবস্থাকে প্রতিহত করা যে কি দুরূহ ব্যাপার ছিল, তা, যাঁরা বৃটিশ সরকারের বিরুদ্ধে কিছু না কিছু বিপ্লবী ষড়যন্ত্রে লিপ্ত ছিলেন তাঁরা নিশ্চয়ই বুঝতে পারবেন। আমার তরুণ পাঠক-পাঠিকাদের উপলব্ধির জন্যে, এখানে সামান্য একটি ঘটনার উল্লেখ করছি। একদিন একটি বাড়িতে গোটা তিনেক automatic fire arms (স্বয়ংক্রিয় আগ্নেয়াস্ত্র) আনা হল আমার হাতে, নিচের দিকে মুখ করা অবস্থায়, আগ্নেয়াস্ত্রগুলির একটি থেকে একটা accidental fire হয়ে গেল। যখন ঐরূপ পরীক্ষা করছিলাম, তখন, আগ্নেয়াস্ত্রের সামনের দিকে কাউকে থাকতে দিই নি, তাই accidental fire হয়ে গেলেও, কেউ জখম হয় নি। সেই ঘরে আরও দুজন ভবিষ্যৎ বিপ্লবী নেতা ছিলেন। ঐ বাড়িতে প্রায়ই আমরা বন্দুক ছুঁড়তাম—কয়েকটি লাইসেন্স করা বন্দুক দিয়ে। তাই এই বিশেষ বাড়িতে একটি সাধারণ আগ্নেয়াস্ত্রের আওয়াজ যদি হয়েই থাকে তাতে কি আসে যায়! সেই ভদ্রলোকের স্ত্রীও সেইখানে উপস্থিত ছিলেন, —তিনি কিন্তু ঐরূপ একটি accidental fire-এর আওয়াজে কিছুমাত্র

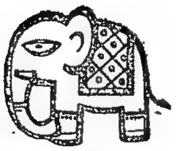

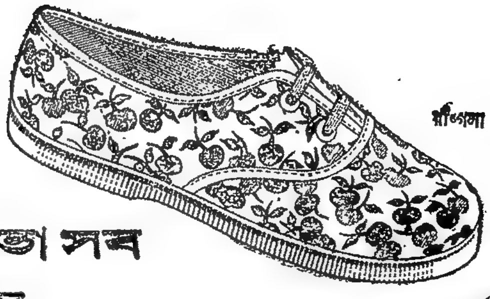

রঙিলা ২.৭৫

জীবনের মজো সব দরকারী কাজ

জীবনের বহু দরকারী কাজে জুতো না-হলে ছোটদের চলে না। এমন সব কাজ যথা : ইঁট-পাথরে লাথি মারা, গাছে চড়া, মারবেল সুট করা, স্কুলে যাওয়া, হকি খেলা, ট্রাইসাইকেল চড়া, কিম্বা যেখানে মজা সেখানে উর্ধশ্বাসে ছুটে যাওয়া। জুতো পায়ে না-থাকলে এসব কাজ কি জমবে! তাই জুতোর দরকার বড় বেশি। দেখতে ভালো, টিকবে ভালো, আরামে হাঁটতে ভালো—এমন জুতোই ছোটদের দরকার। আর এমন জুতোই তো বাটার জুতো, গত ৩৪ বছরের অভিজ্ঞতায় উৎকৃষ্ট।

মিণ্টু ৬.৯৫

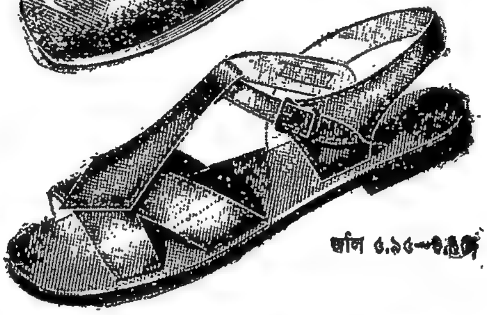

জলি ৫.৯৫—৭.৯৫

ট্রিকি ৬.৯৫

জুলিগুড ৮.৫০—৯.৫০

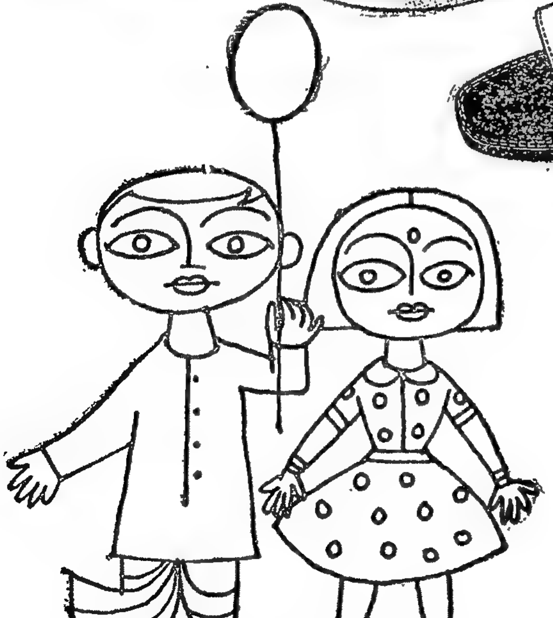

Bata

বিচলিত না হয়ে সম্পূর্ণ নির্বিকার ছিলেন। কিন্তু দেখেছি ভাবী বিপ্লবী নেতারা ঐ ঘটনায় যেন ভীতি-বিহ্বল হয়ে গেলেন; কি করবেন, কোথায় যাবেন, ঐ আগ্নেয়াস্ত্র তিনটিকে কি ভাবে, কোথায় সরিয়ে ফেলা হবে, এই চিন্তায় একেবারে বিচলিত হয়ে পড়লেন। কি আর করেন তখন, গৃহস্বামী নিজে, ভাবী বিপ্লবী নেতাদের তাঁর বাড়িতে শান্ত-ভাবে অপেক্ষা করতে বলে, অস্ত্রগুলি নিয়ে, নিজেই গাড়ি চালিয়ে অন্যত্র চলে গেলেন। আমি তাঁর সঙ্গে গাড়িতে ছিলাম।

এই সামান্য ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে যদি একবার তুলনা করে দেখা যায়, তাহ'লে আমাদের সেই সময়কার মানসিক অবস্থা কিছুটা বোঝা যায়। সশস্ত্র যুব-অভ্যুত্থানের তখন বাকী আছে মাত্র ২২ দিন। সেই সংক্ষিপ্ত সময়ের মধ্যে যখন পুলিশ আমাদের খবর পেয়েছে, ও রামকৃষ্ণের বিরুদ্ধে প্রাথমিক সংবাদের ভিত্তিতে, Explosive substance Act-এ মামলা রুজু করেছে তখন আমাদের ওপর রামকৃষ্ণের ঘটনার জন্যে কী ভয়ানক প্রতিক্রিয়া হয়েছিল তা সহজেই অনুমান করা যায়। স্নায়বিক দুর্বলতা নিয়ে ভীত ত্রস্ত হয়ে পড়লে মাত্র ২২ দিনের মধ্যে প্রস্তুতি শেষ করে চট্টগ্রাম সশস্ত্র যুব-অভ্যুত্থান চালানো সম্ভবপর হত না। বইয়ের পাতায় সশস্ত্র অভ্যুত্থানের চিন্তা নিবদ্ধ থাকা এক কথা, আর বাস্তবে সমস্ত বিপ্লবের প্রস্তুতি ও তা পরিচালনা করা সম্পূর্ণ আর এক কথা। সেই জন্যে চাই ধারাবাহিকভাবে ভিন্ন ধরণের মানসিক, শারীরিক, ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগতভাবে সাংগঠনিক প্রস্তুতি। সেরূপ সামগ্রিক প্রস্তুতি দু-একদিনের কাজ নয়। পূর্বের প্রায় আট বছরের বিভিন্ন অভিজ্ঞতা ও শিক্ষার ভিত্তিতে—চট্টগ্রাম যুব-অভ্যুত্থানের আগে পুরো দুটি বছর ধরে 'মৃত্যু প্রোগ্রাম' সম্মুখে রেখে, কঠোর মানসিক ও শারীরিক training-এর মধ্যে নিজেদের তৈরি করতে হয়েছিল বলেই, আমরা পুলিশের বিভিন্ন প্রচেষ্টাকে প্রতিহত করে সামনের দিকে এগিয়ে যেতে সক্ষম হয়েছিলাম।

আগের কথায় আসা যাক,—রামকৃষ্ণকে নদীপথে রওনা করে দিয়ে, মাস্টারদার সঙ্গে গণেশ ও আমি পরামর্শ করার পর আমরা যে যার গোপন জায়গায় গা ঢাকা দিয়ে আছি। প্রায় দুটোর সময় দুপুরে আমার কাছে খবর এলো, রামকৃষ্ণের সেই বাড়িতে পুলিশ হানা দিয়েছে। বাড়ি খালি ছিল,—দরজার তালা ভেঙে পুলিশ ঘর তল্লাসী করেছে। শহরের আরও দু-একটি বাড়িতেও ঐ সঙ্গে খানাতল্লাসী করেছে। আমি যেমন বার্তাবাহকের কাছে খবর পেয়েছিলাম, সেরূপ খবর অন্যরাও নিশ্চয়ই পেয়েছেন ততক্ষণে। যাই হোক, পূর্ব নির্ধারিত সময়ে ও স্থানে আমরা রাত দশটায় একত্রিত হলাম। সংক্ষিপ্ত আলোচনায় স্থির হল, আমাদের আরো কিছুদিন গা ঢাকা দিয়ে থেকে, পুলিশের কার্যপদ্ধতির প্রতি লক্ষ্য রাখতে হবে, আমরা আরও সিদ্ধান্ত নিলাম যে, আমাদের আসন্ন যুব-অভ্যুত্থানের জন্যে যত শীঘ্র সম্ভব চূড়ান্তভাবে প্রস্তুত হতে হবে।

আমরা, যাদের উপরে পুলিশের আক্রমণ আসা সম্ভব সবাই নিজের নিজের গোপন আস্তানায় চলে গেলাম। এবং সেইখান থেকেই সাংগঠনিক কাজ চালিয়ে যেতে লাগলাম। পুলিশের অনুসন্ধান পদ্ধতি ও তাদের আক্রমণের লক্ষ্যবস্তু কি, বা কোন দিকে, তারও সংবাদ সংগ্রহ করতে লাগলাম। কলকাতায় মেছুয়া-বাজারের বাড়িতে সকালে খানাতল্লাসী হয়। তারপর কলকাতার বুদ্ধিমান ও বিচক্ষণ পুলিশের "ইন্টেলিজেন্স বিভাগ" নতুন পদ্ধতিতে আকস্মিকভাবে ও অতর্কিতে সন্দেহজনক সব বাড়ি দিনের বেলাতেই যখন তখন খানাতল্লাসী করতে লাগল। কলকাতা পুলিশের পদাঙ্ক অনুসরণ করে চট্টগ্রাম পুলিশও প্রতি-দিনই একটি দুটি বাড়িতে দিনের বেলা, হঠাৎ গিয়ে খানাতল্লাসীর মহড়া অব্যাহত রাখলো, পুলিশ কিন্তু আমাদের বাড়ি, অর্থাৎ গণেশ, মাস্টারদা, নির্মলদা, নরেশ, বিধু ও আমার বাড়ির দিকে নজর দিল না। কারণ বুঝলাম, পুলিশ প্রথম প্রমাণ হিসেবে রামকৃষ্ণকে দগ্ধ অবস্থার চিহ্ন নিয়ে হাতে নাতে ধরতে চায়, এবং তার পর যাদের বিরুদ্ধে প্রাথমিক সংবাদ পেয়েছে তাদের গ্রেপ্তার করবে। রামকৃষ্ণকে যতক্ষণ দগ্ধ অবস্থায় ধরতে পারছে না ততক্ষণ আমাদের বিরুদ্ধে কোন প্রমাণ নেই।

বাংলার নতুন লাট—স্যার স্ট্যানলী জ্যাকসন দু'বছর আগে বিনা বিচারে আটক রাখার অর্ডিন্যান্স প্রত্যাহার করেছেন। কাজেই বিনা বিচারে—ও সঠিক সাক্ষ্য-প্রমাণ ছাড়া পুলিশ আমাদের বর্তমানে গ্রেপ্তার করা বা আমাদের বিরুদ্ধে কোন আক্রমণ চালানো যুক্তিযুক্ত বোধ করে নি।

অবস্থার এইরূপ গতি লক্ষ্য করে, আমরা সিদ্ধান্ত নিলাম যে, সবাই আবার নিজ নিজ বাড়িতে আগের মত সাবধান-তার সংগে থাকবো এবং শহরেও সাবধান-তার সংগে স্বাভাবিক গতিবিধি বজায় রাখবো। পরোইকোরা ডাকাতির পর যেমন আমরা নিজেদের নিরীহ প্রমাণ করার জন্যে প্রায় দেড় বছর একেবারে নিষ্ক্রিয়তা অব-লম্বন করেছিলাম সেইরূপ পরাজয়ের মনোভাব এই সময় ছিল না। আমরা স্বাভাবিক ঘোরাফেরার সুযোগ নিতে চাইলাম, —তার একমাত্র কারণ নিষ্ক্রিয়তা নয়—কারণ এই যে, যেন সক্রিয়ভাবে দ্রুত প্রস্তুতি কাজ আমরা সারতে পারি।

পুলিশ এতদিন ধরে ক্রমাগত প্রায় ২০।৩০টি বাড়ি খানাতল্লাসী করেছে, কিন্তু সম্পূর্ণ নিষ্ফল ও বিফল মনো-রথ হয়ে ফিরেছে। তার একমাত্র কারণ আমরা আমাদের সমস্ত শক্তি ও বুদ্ধি প্রয়োগ করে বিচক্ষণতার সংগে পুলিশ তৎপরতাকে ব্যাহত করে, রামকৃষ্ণকে সম্পূর্ণ নিরাপদ স্থানে রাখার ব্যবস্থা করতে সক্ষম হয়েছিলাম। শেষ পর্যন্ত পুলিশ হার মানলো। আর না পেরে আমাদের কোতোয়ালীতে ডেকে পাঠালো। আমাদের ট্রাইব্যুনালের ইংরেজ জজ, তাঁর মামলার রায়েতে লিখেছেন ঃ—"On 5th April, Azim called Ganesh Ghosh and Ananta and Bidhu Bhattacharjee to Kotowali P.S. and questioned them about Ramkrishna's whereabouts. They came accompanied by Naresh Roy and Lokenath Ball. Ganesh said he knew Ramkrishna, but did not know where he was, or whether he had been injured, while Ananta alleged that he did not know him at all. From Kotowali, Ganesh, Ananta, Lokenath and Naresh Roy went on to the D.I.B. Inspector and questioned him regarding the policy of the Government towards them (P.W.S. 70 and 314)."

জজসাহেব লিখছেন যে ৫ই এপ্রিল আজীম সাহেব গণেশ বিধু ও অনন্তকে সদর কোতোয়ালীতে ডেকে পাঠান। নরেশ ও লোকনাথ বলও তাদের সংগে গেল। আজীম সাহেব তাদের প্রশ্ন করে রামকৃষ্ণের দগ্ধ হওয়ার বিবরণ জানতে চাইলেন এবং সে কোথায় আছে জিজ্ঞাসা করলেন। গণেশ রামকৃষ্ণকে যে চেনে তা অস্বীকার করে নি—কিন্তু সে কোথায় থাকে বা কি হয়েছে কিছুই জানে না বলল। অনন্ত বলল রামকৃষ্ণকে সে মোটে চেনেই না। তারপর এই সব জিজ্ঞাসাবাদ হয়ে যাওয়ার পর তারা চারজন—গণেশ, লোকনাথ, নরেশ ও অনন্ত—ডি, আই, বি ইনেসপেক্টারের বাড়ি গিয়ে ইনেস-পেক্টারমহাশয়কে পাল্টা জিজ্ঞাসাবাদ করে এবং তাদের বিরুদ্ধে সরকারের কি

পরিকল্পনা বা নীতি অনুসরণ করার ইচ্ছা আছে তা জানতে চায়।

আমাদের যখন কোতোয়ালীতে ডেকে পাঠাল তখন আমরা চারজন স্থির উদ্দেশ্য নিয়েই গিয়েছিলাম। যাওয়ার আগে একটু আলোচনা করে বুঝতে চেষ্টা করলাম এই 'ডাকার' পেছনে পুলিশের কি অভিপ্রায় থাকতে পারে! তারা কি আমাদের সেখানে ডেকে নিয়ে গিয়ে বন্দী করবে না কি জিজ্ঞাসাবাদ করে ছেড়ে দেবে? সব দিক বিবেচনা করে মনে হচ্ছিল গ্রেফতার করবে না—যদি গ্রেফতার করবার ইচ্ছা থাকত তবে আমাদের অনেকের বাড়ি একসংগে খানাতল্লাসী করত ও বাড়ি থেকেই ধরে নিয়ে যেতো। পুলিশ যখন সেই পদ্ধতিতে চলে নি তখন ডেকে নিয়ে গিয়ে বন্দী করবে বলে মনে হলো না। তবু যদি বিশ্বাসঘাতকতা করে! সেইরূপ অবস্থার জন্য প্রস্তুত হয়ে আমরা চারজন সংগে রিভলবার নিয়েই কোতোয়ালীতে যাই। অগত্যা যদি আমাদের গ্রেফ্তার করার অভিসন্ধিই তাদের থাকে তবে কি আমরা বন্দিত্ব বরণ করব? মাত্র দু' সপ্তাহও বাকী নেই—১৮ই এপ্রিলের যুব-অভ্যুত্থান সংঘটিত হতে! যদি আমাদের জেল-হাজতে আটকে ফেলে তবে সমস্ত প্রস্তুতি থাকা সত্ত্বেও হয়ত অনিশ্চয়তার মধ্যে আসন্ন যুব-অভ্যুত্থানের অকাল মৃত্যু ঘটবে।

কোতোয়ালীতে ডাকার পর যদি আমরা তাদের অনুরোধ উপেক্ষা করতাম তা'হলে খুব সম্ভবত আমাদের বিরুদ্ধে গ্রেপ্তারী ওয়ারেন্ট বেরোত এবং আমাদের বন্দী করে জেল-হাজতে পাঠাত। অবস্থা আরও অধিক জটিল ও ঘোরালো হোক তা আমরা বাঞ্ছনীয় মনে করি নি। একটা chance নিতে চেয়েছিলাম—যদি সহজে পার পেয়ে যাই! আর যদি তেমন চূড়ান্ত ঝুঁকি নিতেও হয়—তা নেবার জন্যও প্রস্তুত ছিলাম। অর্থাৎ যদি আমাদের হঠাৎ বন্দী করার মতলব করে তবে সদর কোতোয়ালীকে চমকে দিয়ে আমাদের চারটি রিভলবার গর্জন করে উঠবে। আমাদের কাছ থেকে সেইরূপ অপ্রত্যাশিত ও আকস্মিক আক্রমণ কোতোয়ালীর কল্পনারও বাইরে—ভীত, বিহ্বল, বিমূঢ় সেপাইদের চমক ভাঙার আগেই আমরা সে স্থান পরিত্যাগ করতে পারব সে বিষয়ে নিশ্চিত ছিলাম। এখন প্রশ্ন হল—এইরূপ অবাঞ্ছিত ঘটনার একটুও আশঙ্কা যখন ছিল তখন এইরূপ adventure-এর ঝুঁকি নেওয়া কি আমাদের অনুচিত হয় নি? বেশি লাভের জন্য সামান্য ঝুঁকি নেওয়াটা শ্রেয় মনে করি। আর যদি কোন কারণে হিসাবে ভুল হয় এবং আজীম সাহেব আমাদের বন্দী করতে উদ্যত হন তবে সেই ক্ষেত্রে ঐরূপ চূড়ান্ত প্রতি-আক্রমণের পরিকল্পনা বাঞ্ছনীয় মনে করি—এই জন্য যে —আমরা বাইরে আত্মগোপন করে থেকেও—সামগ্রিক প্ল্যানের সামান্য রদ-বদল করে যুব-বিদ্রোহকে সফল করে তুলতে পারব।

তারপর যখন দেখি আমাদের হিসেব ঠিক হল—পুলিশ জিজ্ঞাসাবাদ করা ছাড়া আর কিছু করল না তখন মনে ভাবলাম পুলিশের বিরুদ্ধে আমাদের কূটনৈতিক counter offensive (প্রতি-আক্রমণ) নেওয়া প্রয়োজন। তাই আমরা আই, বি ইনস্‌পেক্টার সারদা ভট্টাচার্যের কাছে গিয়ে খুব হম্বি-তম্বি করে আসি—এবং নানাভাবে বিক্ষোভ প্রকাশ করি এবং তাঁকে ভালোভাবে বোঝাই যদি সরকার বা তাঁরা আমাদের এমনিভাবে harass (হয়রান) করেন বা আমাদের বিরুদ্ধে কোন চক্রান্ত করেন তবে আমরা তা সহ্য করব না—ইত্যাদি ইত্যাদি।

এইরূপ demonstration-এ, সাময়িক শক্তি বা অভিব্যক্তি প্রদর্শনে তখন আমাদের কি লাভ হয়েছিল তা বলা সম্ভব নয়। তবে হয়ত পুলিশ ও জেলা কর্তৃপক্ষ বুঝেছিল যে আমরা চুপ করে তাদের আক্রমণ সহ্য করব না। এইরূপ বোঝার পর কর্তৃপক্ষ হয়ত বিবেচনা করেছে—আমাদের উত্তেজিত করে তক্ষুণি তারা ব্যাপক সমস্যার সৃষ্টি করবে না, তখনও তাদের ধৈর্য ধরা উচিত? কর্তৃপক্ষ শেষ পর্যন্ত কি ভেবেছিল জানি না—তবে আমরা চেয়েছিলাম অন্তত ব্যক্তিগতভাবে পুলিশ অফিসারেরা অতীত বিপ্লবী কার্যকলাপের পরিপ্রেক্ষিতে যেন একটু মনে মনে ভাবেন যে, আমাদের বিরুদ্ধে যদি তাঁরা হয়রানি করার নীতি গ্রহণ করেন তবে তাঁদের পৈত্রিক প্রাণটি হারাবার যথেষ্ট কারণ ঘটবে। মৃত্যু ভয়—বড় ভয়! এইরূপ মৃত্যু বিভীষিকা থাকা সত্ত্বেও রায়বাহাদুর, খাঁ বাহাদুর খেতাব লাভের আশায় এবং পুরস্কার ও পদোন্নতির লোভে পুলিশ অফিসারদের 'আত্মত্যাগের' বহু নজীর আছে। তবু যদি বেঁচে থেকেই খেতাব চাকরির উন্নতি পুরস্কার প্রভৃতির অধিকারী হওয়া যায় তবে মন্দ কি! মৃত্যু বিভীষিকা খুব সাহসীকেও ভাবতে শেখায়! Prudence is better than Valour ! (বিজ্ঞতা বিক্রমের চাইতে শ্রেয়!) আমাদের উদ্দেশ্য ছিল ডি, আই, বি ইন্সপেক্টারের কাছে ক্ষুব্ধভাব প্রদর্শন করে জেলা কর্তৃপক্ষকে ভাবাতে চেষ্টা করব যে বর্তমানে তাদের বিচক্ষণতা বিক্রমের চাইতে অধিকতর বাঞ্ছনীয়!

আমাদের প্রস্তুতির একটি প্রধান কাজ তখনও বাকি। আমাদের কাছে বোমার সতেরোটি লোহার খালি খোল বহুকাল পূর্ব থেকে সযত্নে রাখা ছিল। ঐ ক'টি বোমাই আমাদের সম্বল হবে যদি পিক্‌রিক্ পাউডার দিয়ে ভর্তি করে নিতে পারি। তাই একদিকে রামকৃষ্ণ 'পারকাশান ক্যাপ' (ফেটে গিয়ে আগুন ধরাবার ক্যাপ) তৈরি করছিল আর অন্য দিকে তারকেশ্বর দস্তিদার পিক্‌রিক্ পাউডার বানাবার কাজে ব্যস্ত ছিল। রামকৃষ্ণ বিস্ফোরণে গুরুতরভাবে আহত হওয়ার পর তাকে পুলিশের চোখের অন্তরালে নিরাপদে রাখার জন্য যেভাবে আমরা ব্যস্ত হয়ে পড়লাম তাতে বুঝে ছিলাম যে, 'পারকাশান ক্যাপ' অল্প সময়ের মধ্যে আর তৈরি করা সম্ভব হবে না। 'পারকাশান ক্যাপ'-এর পরিবর্তে আমরা বিদেশে তৈরি ডিনামাইট ফাটাবার ফিউজ (বারুদের পলতে) ব্যবহার করব বলে ঠিক করলাম। এই সব বিদেশে তৈরি ফিউজ মাপমত ছোট ছোট করে কেটে 'টাইম ফিউজের' মত ব্যবহার করা যায়—অর্থাৎ যে ক' সেকেণ্ডের মধ্যে বোমা ফাটাতে চাই সেই মাপে কেটে নিলেই হয়। আমরা সতেরোটি 'টাইম বোমা' এইরূপ ফিউজ দিয়ে তৈরি করা সাব্যস্ত করলাম। কিন্তু আসল কাজই বাকি থাকবে যদি বোমার খোল পিক্‌রিক্ পাউডারে ভর্তি করা না হয়। সারা রাত জেগে তারকেশ্বর ও অর্ধেন্দু পিক্‌রিক্ অ্যাসিড তৈরি করতে লাগল। এখন আমার ঠিক মনে নেই—প্রায় দশ-বারো পাউণ্ড নাইট্রিক ও সালফিউরিক্ অ্যাসিড রাসায়নিক পদ্ধতিতে সংমিশ্রণের পর পিক্‌রিক্ অ্যাসিডের খুব মিহি পাউডার প্রস্তুত হয়। গোপন স্থানে খুব সংকীর্ণ অবস্থার মধ্যে সারা রাত চেষ্টা করেও এক আউন্সের বেশি পিক্‌রিক্ অ্যাসিড তৈরি করা সম্ভব হয় নি। তবু অক্লান্ত পরিশ্রম করে খুব ধীরে হলেও অপ্রতিহত গতিতে পিক্‌রিক্ অ্যাসিড তৈরির কাজ চলছিল।

যুব-বিদ্রোহের সময় আসন্ন। হাতে মাত্র দু' সপ্তাহ সময় বাকি। সেই আসন্ন ঝড়ের প্রাক্কালে আরও ভয়ঙ্কর বিপদ এসেছে—তবু লঙ্ঘিতে হয়েছে রাত্রি নিশীথে দুস্তর পারাবার। (ক্রমশঃ)

তাঁর স্ত্রী

ই. কার্পেন্তসেভা

আমার অফিসের দরজায় মৃদু করাঘাতের শব্দ পেয়ে বললাম ঃ ভিতরে আসুন।

দরজা খুলে একজন মহিলা এসে দাঁড়ালেন। চোখ দুটি ছাড়া তাঁর সর্বাঙ্গ পোষাকে ঢাকা। আস্তে আস্তে এগিয়ে এসে উনি মেঝের উপর একটা বড় ব্যাগ রাখলেন। তারপর হাত থেকে একটা দুধের পাত্র রাখলেন। এবার গা থেকে একটা শাল সরিয়ে নিলেন। তারপরে আর একটি ছোট শাল, কিন্তু নতুন। শাল দুটি সযত্নে ভাঁজ করে সামনের একটা আসনের উপর রেখে মহিলা আমার দিকে তাকালেন।

—কেমন আছেন? কত পরে আপনার সন্ধান পেয়েছি। আপনারই নাম তো...' বলেই মহিলা আমার নাম উচ্চারণ করলেন।

—হ্যাঁ, আমিই। আমি মনে মনে ভাবতে থাকি কে এই মহিলা, কী জন্যে এসেছেন একটি সংবাদপত্রের সম্পাদকীয় দপ্তরে।

মহিলার বয়স ঠাওর করা শক্ত। দেখতে তেমন ভাল নয়। মুখে তুষারের দাপটের ছাপ। (বাইরে তখন তাপাঙ্ক শূন্যের নিচে ৩০ ডিগ্রীর কাছাকাছি নেমে গিয়েছে।) তাঁর নীলাভ চোখের তারা দুটি তেমন উজ্জ্বল নয় বটে তবে আশ্চর্য রকমের শান্ত ও স্বচ্ছ।

—আপনি কী চান বলুন।

—বলছি, একটু অপেক্ষা করুন।

মহিলা ব্যাগটি খুলে তার মধ্য থেকে সযত্নে ভাঁজ করা পাণ্ডুলিপি বার করে বললেন ঃ এই লেখা এমনভাবে রেখে দিয়েছি যাতে ভাঁজ পড়ে নষ্ট না-হয়। আমি দূর থেকে আসছি। পঁয়ত্রিশ মাইল পথ। কখনো গাড়িতে, কখনো পায়ে হেঁটে পার হয়েছি। আমি রুমিয়ানত্‌সেফের কাছ থেকে আসছি। উনি থাকেন এনস্ক-এর কাছাকাছি। তাঁর কথা আপনার নিশ্চয় মনে আছে। তিনি বলে দিলেন এই লেখাগুলি আপনার হাতে বুঝিয়ে দিতে। তিনি আপনাকে ভাল করেই চেনেন।

বিরক্ত হলাম। ঐ নামের কাউকে আমি স্মরণ করতে পারছি না। জিজ্ঞাসা করলাম ঃ

—আপনি বুঝি তাঁরই গ্রাম থেকে আসছেন?

—হ্যাঁ, আমি তাঁরই স্ত্রী।

মহিলার কথা বলার মধ্যে এমন একটা মর্যাদা বোধের ছাপ রয়েছে যে, এই অপরিচিতার দিকে মনোযোগ না দিয়ে পারলাম না। শান্ত সংযত কণ্ঠে মহিলা বলে চললেন ঃ

—উনি অসুস্থ। তাই নিজে আসতে পারলেন না। এই পাণ্ডুলিপি তিনি পাঁচবার লিখেছেন। তাঁর আশা লেখাগুলি আপনি নিশ্চয় ছাপবেন।

এভাবে মহিলার সাথে আমার পরিচয় হল। যে লেখাগুলি তিনি নিয়ে এসেছিলেন তা সত্যি ভাল। আমাদের সংবাদপত্রে একটি লেখা বার হয়েছে। দিন কয়েক পরে রুমিয়ানতসেফ কে সে কথা আমি স্মরণে আনতে পারলাম।

পনের-ষোল বছর আগের কথা। আমি সবে সম্পাদকীয় দপ্তরের কাজে যোগ দিয়েছি। সাংবাদিকতার দায়িত্ব নিয়ে আমাকে যেতে হল ছোট্ট একটি জেলা শহরে। স্থানীয় সংবাদপত্রের অফিসে গিয়ে জিজ্ঞাসা করলাম আমার গন্তব্যস্থল যৌথ খামারে কোন পথে যেতে হবে।

—এই যুবকটি আপনাকে পথ দেখিয়ে নিয়ে যাবে। ঐ যৌথ খামারের ইয়ং কমিউনিস্ট লীগের সে সেক্রেটারি।

সম্পাদকের কথা শেষ হতে না হতে আমার দিকে এগিয়ে এলেন সেই যুবকটি। শক্ত গড়ন, উচ্চতা গড়পড়তা, কালো দুটি চোখ।

—আমার নাম আলিক্সি রুমিয়ানত্‌সেফ, বলেই তিনি আমার সঙ্গে করমর্দন করে এক সহজ কৌতূহল নিয়ে তাকিয়ে রইলেন।

সেদিনের আবহাওয়া ছিল চমৎকার। আমরা ঠিক করলাম পায়ে হেঁটেই যাব।

গ্রামের পথ। দুধারে বড় বড় সর্ষের ক্ষেত তখনো সবুজ। পাহাড়ের সারি চলে গেছে নদীর দিকে।

আমার সঙ্গী কথা বেশি বলেন নি। মাঝে মাঝে কি সব নোট লিখছিলেন। এক-একবার আমার দিকে চোখ বুলিয়ে নিচ্ছিলেন। হঠাৎ এক সময়ে তিনি কবিতা আবৃত্তি শুরু করে দিলেন। সন্দেহ হল তাঁর নিজেরই লেখা কবিতা। সেই কবিতায় পাওয়া যায় এক অকপট মনের কোমল স্পর্শ, অনুভূতির সুখময় উত্তাপ। এই কবিতার মধ্য দিয়ে আলেক্সি রুমিয়ানত্‌সেফকে যতটা চিনতে পারলাম তিনি ঘণ্টার পর ঘণ্টা কথা বলে গেলেও বোধ হয় তার ভগ্নাংশ পরিচয় পেতাম না।

বোঝা গেল যুবকটি প্রেমে পড়েছেন। তাঁর কবিতার মধ্যে সুন্দরী তরুণী ঘুরে ফিরে দেখা দিচ্ছেন। নদীর ধারে সেই মেয়েটির অপেক্ষায় তিনি বসে থাকেন। মাঝে মাঝে প্রণয়িনীর ঔদাসীন্যে প্রণয়ীর ভর্ৎসনার সুর। আজো মনে আছে সেই কবিতায় ছিল সুন্দর আবেগ, ছিল স্বতঃস্ফূর্ততা। সেই সঙ্গে কেমন এক বিষণ্ণতা।

সে সব কথা আমার মনে পড়ল। কিন্তু আমার সেই অতীত স্মৃতি রুমিয়ানত্‌সেফের এই মহিলাকে কিছুতেই মিলিয়ে নিতে পারছিলাম না। জানতে উৎসুক হই এঁদের দু-জনার কথা, রুমিয়ানত্‌সেফ এখন কি করছেন সে কথা।

তারপর বেশ কিছুকাল কেটে গেল। আর একবার এনস্ক-এ যাবার সুযোগ এল। সেখানে গিয়ে রুমিয়ানত্সেফ কোন্ গ্রামে থাকেন খোঁজ করলাম। শুধু খোঁজ করা নয়, তাঁর বাড়িতে গিয়ে উপস্থিত হলাম। তাঁর শয়নকক্ষে যেতেই তিনি শয্যা ছেড়ে উঠে আমাকে স্বাগত জানান। এ কী! এ তো আমার জানা সেই রুমিয়ানত্সেফ নন। কোথায় সেই কোঁকড়া চুল, সেই বলিষ্ঠ তরুণ। বিছানায় কাৎ হয়ে আছেন একটি রোগা লোক। মুখখানি নিস্প্রভ। চক্ষু কোটরগত। তিনি সাংঘাতিক অসুস্থ। মনটা বড় খারাপ হয়ে গেল। অতি কষ্টে মনের ভাব গোপন করে গেলাম।

সব কথা শুনলাম। দেশরক্ষার মহাযুদ্ধে রুমিয়ানত্সেফ গুরুতর আহত হয়ে এখন কর্মক্ষমতাহীন। বেশি হাঁটাচলা করতে পারেন না। বেশির ভাগ সময় বিছানায় শুয়ে থাকেন। মাঝে মাঝে অসহ্য ব্যথায় কষ্ট পান। যখন ভাল থাকেন, নানা রকমের বই পড়েন, হালে লেখায় হাত দিয়েছেন।

প্রথমে কবিতা লিখেছেন। এখন গল্প লিখতে শুরু করেছেন। একখানি ছোট উপন্যাস লেখার পরিকল্পনাও আছে। প্রথম লেখার সাফল্যে তিনি উৎসাহিত।

সেদিন সন্ধ্যা পর্যন্ত রুমিয়ানত্সেফের স্ত্রীর সংগে আমার দেখা হল না। দেখা না হলেও ঘরের সর্বত্র তাঁর উপস্থিতি অনুভব করছিলাম—চারদিকের পরিচ্ছন্নতায়, সুষ্ঠু গোছগাছের মধ্যে।

অবশেষে একসময় সাহস করে প্রশ্ন করলাম ঃ বাড়ির গৃহিণী কোথায়?

—ও একটা কনফারেন্সে গেছে। যেভাবে তিনি কথাটা বললেন তাতে বুঝতে পারলাম না। স্ত্রীর কনফারেন্সে যাবার জন্য স্বামী গর্বিত না অসন্তুষ্ট।

—আমার স্ত্রী পশুপালন খামারের একজন বিশেষজ্ঞ কর্মী। সারা জেলার সেরা কর্মীদের মধ্যে তারও নাম করা হয়। তার কর্মজীবনের অভিজ্ঞতার কথা জানবার জন্য এই কনফারেন্সে তাকে আমন্ত্রণ করা হয়েছে।

খুশি হয়ে ঘরের চারদিকে আবার তাকাই। জানালায় সাদা পরদা, সুন্দর পালিশ করা কাঠের মেঝের উপর রঙীন গালিচা, স্বামীর জন্য টেবিলের উপর একটা মগে জবাল দেওয়া দুধ। তাঁর শিয়রের কাছে যথাস্থানে ওষুধের শিশি। সুনিপুণ গৃহিণীপনায় মুগ্ধ না হয়ে পারলাম না।

সন্ধ্যার ঠিক পরেই শুরু হল প্রবল বর্ষণ। রুমিয়ানত্সেফ দুশ্চিন্তায় পড়লেন।

—ওকে বৃষ্টিতে ভিজে নাজেহাল হতে হবে। বলেই তিনি বাইরের দিকে কান পেতে থাকেন কড়ানাড়ার শব্দ শোনার আশায়।

স্ত্রী আনা বাড়ি ফিরে এলেন অনেক রাত করে। ক্লান্ত। ভিজে পোষাকে কাদার ছাপ।

আমাকে দেখেই আনন্দে ফেটে পড়ে বললেন ঃ কী ভাগ্যের কথা! আপনি এসেছেন? যাহোক, আলেক্সি এতক্ষণ তাহলে একা ছিল না।

ভিজে পোষাক ছেড়ে শুকনো পোষাক পরে খানিকবাদেই আনা ফিরে এলেন।

এই মহিলাই যখন আমাদের সম্পাদকীয় দপ্তরে গিয়েছিলেন তখন তাঁকে অদ্ভুত প্রকৃতির মনে হয়েছিল কেন? এখানে তাঁর নিজের ঘরে তাঁর চলায় বলায় কী সুন্দর স্বাচ্ছন্দ্য, তাঁর বৃষ্টিধোওয়া মুখখানিতে কী কমনীয়তা! এখানে তাঁর বয়স অনেক কম মনে হচ্ছে, মহিলা চটপট তাঁর স্বামীর বিছানা ঠিক করে দেন, টেবিলের উপরের জিনিসগুলি গুছিয়ে রাখেন। অথচ ব্যস্ততার ভাব কোথাও প্রকাশ পেল না। একটি পরিচ্ছন্ন ঘরে একটি ছোট্ট পালঙ্কে আমার শোবার ব্যবস্থা করা হল।

—আপনি একটু গড়িয়ে নিন। আমাকে একবার খামারে যেতে হবে, জরুরী কাজ আছে।

আনা চলে যাবার পর রুমিয়ানত্সেফকে বললাম ঃ আপনার স্ত্রীভাগ্য ভাল।

—আনা আমায় খুব ভালবাসে।

খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে কী যেন ভেবে নিলেন। তারপরে হঠাৎ অকপটে বললেন ঃ প্রথম দিকে ওকে কিন্তু আমি ভালবাসতাম না। একটা ঝোঁকের মাথায় ওকে বিয়ে করেছিলাম।

ঝোঁকের মাথায়? সে কী বলছেন!

—হ্যাঁ, তাই। ওর সংগে পরিচয় হওয়ার পরে দিন কয়েকের মধ্যে আমাদের বিয়ে হয়ে গেল। আপনার মনে আছে কি একটি মেয়েকে নিয়ে লেখা আমার কবিতা আপনাকে শুনিয়েছিলাম?

—হ্যাঁ, মনে আছে।

—তখন আমি একটি মেয়ের প্রেমে পড়েছিলাম। তাকে খুব ভালবাসতাম। দেখতে সে সুন্দরী ছিল। কিছুকাল বাদে হঠাৎ সে শহর ছেড়ে চলে গেল। তারপরে শোনা গেল সে বিয়ে করেছে। আমার তখনকার মনের অবস্থা বুঝতেই পারছেন। সেদিন সারা রাত ঘুমাতে পারলাম না। পরদিন ঠিক করলাম আমিও বিয়ে করে তাকে পাল্টা জবাব দেব। বোকার মত সিদ্ধান্ত, তাই না? যাক, সে সব কথা। এমনতর কত লোকের জীবনে ঘটে।

রবীন্দ্র ভারতী বিশ্ববিদ্যালয় প্রকাশনা

Studies in Artistic Creativity—ডঃ মানস রায়চৌধুরী	১৫·০০
A Critique of the theories of Viparyaya—ডঃ ননীলাল সেন	১৫·০০
Tagore on Literature and Aesthetics —ডঃ প্রবাসজীবন চৌধুরী	৮·৫০
Studies in Aesthetics—ডঃ প্রবাসজীবন চৌধুরী	১০·০০
The House of the Tagores—হিরণ্ময় বন্দ্যোপাধ্যায়	২·০০
রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টিতে মৃত্যু—ডঃ ধীরেন্দ্র দেবনাথ	৬·০০
রবীন্দ্র-সুভাষিত—শ্রীবিনয়েন্দ্রনারায়ণ সিংহ	১২·০০
চৈতন্যোদয়—হরিশচন্দ্র সান্যাল	২·৫০
জ্ঞানদর্পণ—হরিশচন্দ্র সান্যাল	৩·০০

রবীন্দ্র ভারতী বিশ্ববিদ্যালয়
ঠাকুর লেন, কলিকাতা-৭
পরিবেশক ঃ জিজ্ঞাসা, ৩৩, কলেজ রো, কলিকাতা-৯
১৩৩এ, রাসবিহারী অ্যাভিনিউ, কলিকাতা-২৯

সুখের বিষয় আমি পরে আপশোষ করি নি।

আনা কিন্তু সব সময় আমায় ভালবেসে এসেছে। আমি কিন্তু প্রথমে তাকে পছন্দ করি নি। তাকে দেখতে ভাল মনে হয় নি, তার উপরে লেখাপড়া বেশি নয়। ষষ্ঠ শ্রেণীতেই তার শিক্ষা খতম। তবু সে যে আমায় পছন্দ করে তাতে মনে মনে আমি খুশি না হয়ে পারতাম না। আমি লাইব্রেরীতে যাই বলে সেও লাইব্রেরীতে যেতে শুরু করল। যে সব বই আমি পড়তাম সেও লুকিয়ে লুকিয়ে সেগুলি পড়তে চেষ্টা করত। ধরা পড়লে লজ্জায় উঠে চলে যেত।

আমি বিয়ের প্রস্তাব করার সঙ্গে সঙ্গে সে রাজী হয়েছিল। মহাযুদ্ধের শুরুতে আমাদের বিয়ে হল। বেশিদিন এক সঙ্গে থাকার সৌভাগ্য হল না। নববিবাহিতা স্ত্রী ভাল কি মন্দ বুঝবার সময়টাও পেলাম না। যুদ্ধক্ষেত্রে যাবার দিন যারা বিদায় দিতে এসেছিল তাদের সবার চোখে জল, কিন্তু আনা পাথরের মূর্তির মত নিশ্চল, নির্বিকার। সে কাঁদল না, সর্বক্ষণ একদৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল আমার দিকে। শেষ মুহূর্তে বলল, আলেক্সি শরীরের দিকে সব সময় নজর রেখো। স্বাস্থ্যের কথা কখনো ভুলো না। আমি তোমার জন্য অপেক্ষা করে থাকবো। তুমি যেভাবেই ফের না কেন, তোমায় আগের মত সমান ভালবাসব।

খানিক নীরব থেকে আলেক্সি একটু বিষাদের হাসি হেসে বলে চললেন ঃ

আমি যুদ্ধের পরে ফিরে এলাম। হাতও খোয়াই নি, পাও খোয়াই নি। তার চেয়ে শোচনীয় অবস্থা। পঙ্গুর ভার কেউ নিতে চাইল না। আনা কিন্তু মনপ্রাণ দিয়ে আমার শুশ্রূষা করতে লাগল। তখন, কেবল তখনই অনুভব করতে পারলাম নারীর প্রেম কাকে বলে।

পরদিন আলেক্সি আবার বলতে শুরু করলেন তাঁর পরবর্তী জীবনকাহিনী। আনাও একপাশে চুপ করে বসে মন দিয়ে সব কথা শুনছেন। আমি কিন্তু খুব মন দিয়ে শুনছিলাম না। আমার অনেকখানি মনোযোগ কেড়ে নিয়েছিল আনার মুখখানি। কী তন্ময় হয়েই না তিনি স্বামীর প্রতিটি কথা শুনে যাচ্ছেন। তাঁর চোখ দুটি মাঝে মাঝে উজ্জ্বল হয়ে উঠছে। কখনো ঠোঁটের কোণে মৃদু মৃদু হাসি। মনে হল যেন এক তরুণীর মুখ। স্বামীর মুখের উপর নিবদ্ধ তাঁর দৃষ্টি। সেই দৃষ্টিতে প্রেম আর আনুগত্যের ছাপ সুস্পষ্ট। বিশ-বাইশ বছর আগের প্রেম এখনো অমলিন।

আমাদের কাগজে প্রকাশিত রুমিয়ানত্সেফের নতুন গল্পটি বেশ কবিত্বময়। সেই গল্পের নায়িকা এক তরুণী দলনেত্রী। দোহারা গড়ন, সুন্দর চোখ, সোনালী চুল।

গল্পটি প্রকাশিত হওয়ার দিন কয়েক পরে সুসজ্জিতা এক যুবতী আমাদের দপ্তরে এলেন। তাঁর যৌবনে ভাটার টান শুরু হয়েছে। তবু এখনো বেশ সুন্দরী। তাঁর আয়ত চোখের দৃষ্টিতে কেমন যেন ক্লান্ত বিষণ্ণ ভাব। এসেই কিছুটা উত্তেজিতকণ্ঠে প্রশ্ন করলেন ঃ 'দি টীম-লীডার' গল্পটির লেখক রুমিয়ানত্সেফ কে, তিনি কোথায় থাকেন?

তাঁর ঐ অসহিষ্ণু আগ্রহ দেখে বহুকাল আগে শোনা রুমিয়ানত্সেফের আবেগময় কবিতার কথা আমার মনে পড়ে গেল। মেয়েটির নাম যে জিনচ্কা তাও ভুলে যাই নি। এই মহিলার দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে থেকে তাকে রুমিয়ানাত্সেফ সম্পর্কে যা যা জানি সবই বললাম।

আমার সব কথা তিনি উৎকর্ণ হয়ে শুনলেন। রুমিয়ানত্সেফের ভয়ানক অসুস্থতার কথা শুনে তাঁর সুন্দর মুখখানিতে প্রথমে ফুটে উঠল দুঃখ ও বিমূঢ়তার ভাব, তারপরেই বুঝি একটা স্বস্তির ভাব।

আমি সোজা প্রশ্ন করে বসলাম ঃ তা হলে আপনিই সেই জিনা?

তিনি অবাক হয়ে আমার দিকে খানিক তাকিয়ে থেকে বললেন ঃ কী করে জানলেন? আমি বোকার মত হঠাৎ আর একজনকে বিয়ে করে বসলাম। তারপর আরো একবার বিয়ে করেছি। এখন আমি সুখী। আমার স্বামী আমায় শ্রদ্ধা করেন, সমীহ করেন।

হঠাৎ আপনাদের কাগজে আলেক্সির গল্পটা আমার নজরে পড়ল। পড়ে ফেললাম। বুকের মধ্যে কী একটা যেন জেগে রইল। ঠিক করলাম রুমিয়ানত্সেফের সঙ্গে একবার দেখা করব। কিন্তু তার আগে জেনে নিতে এসেছিলাম এই গল্পের লেখক সেই রুমিয়ানত্সেফ কি না।

এই সুবেশা মহিলা রুমিয়ানত্সেফের ঘরে ঢুকছেন সেই দৃশ্য কল্পনা করতে আমার অসহ্য লাগছিল।

মহিলা আবার বললেন ঃ কিন্তু আমি সিদ্ধান্ত পাল্টেছি। তাঁর সঙ্গে এখন দেখা করার কোন মানে হয় না। মনে হচ্ছে অদৃষ্ট আমাকে বাঁচিয়ে দিয়েছে। তাঁকে বিয়ে করলে আজ আমার কী দশা হত? আমি সেবা-শুশ্রূষা করতে জানি না, করতে চাইও না। কথায় বলে—যা কিছু হয় ভালর জন্য হয়।

আমি না বলে পারলাম না, আপনি তাঁকে আদৌ ভালবাসেন নি।

মহিলা তাঁর দস্তানা জোড়া হাতে তুলে নিয়ে বললেন ঃ জানেন, প্রেম বা ভালবাসা একটা আপেক্ষিক ধারণা। আমি দু'বার বিয়ে করেছি, তবু এখনো জানি না প্রেম কাকে বলে।

আমার চোখের সামনে ভেসে উঠল আর এক মহিলার মুখ, তাঁর স্বচ্ছ দৃষ্টি। তাঁর সেবা-নিপুণ হাত। যিনি সযত্নে ভাঁজ করা পাণ্ডুলিপি আমার হাতে বুঝিয়ে দিয়ে শান্ত, সংযত কণ্ঠে বলেছিলেন ঃ আমি তাঁর স্ত্রী।

এই নারীই জানেন প্রেম কী, ভালবাসা কাকে বলে।

অনুবাদ ঃ কল্পতরু সেনগুপ্ত

শারদীয়

সবিতা

[১৩৭৩]

সম্পাদিকা ঃ সাধনা সোম

সবিতা'র স্বাধীনতা সংখ্যা পড়ে যাঁরা খুশি হয়েছেন, তাঁরা শারদীয় সংখ্যাটি পাঠ করে আনন্দে উচ্ছ্বসিত হবেন। এ সংখ্যায় কয়েকটি নতুন বিষয় ও বিশেষ আকর্ষণ ছাড়াও থাকবে গল্প-কবিতা-প্রবন্ধ-জীবনী প্রভৃতি। লেখকদের মধ্যে আছেন—সর্বশ্রী ত্রিপুরাশংকর সেন, ডক্টর প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ, নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, নন্দগোপাল সেনগুপ্ত, চিত্তরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়, বিনয় ঘোষ, নলিনীকান্ত গুপ্ত, ডঃ সুবোধরঞ্জন রায়, ডঃ পঞ্চানন মণ্ডল, ডঃ চণ্ডিকাপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায় ও আরো অনেকে।

মূল্য ঃ প্রতি সংখ্যা এক টাকা

সত্বর যোগাযোগ করুন

৮৬-এ, আচার্য জগদীশ বসু রোড, কলিকাতা-১৪

সফল 'বাংলা বন্ধ'-এর দিনে চৌরঙ্গীর অবস্থা

বাংলা বন্ধ্

আটচল্লিশ ঘণ্টার বাংলা বন্ধ্ সফল হয়েছে এ কথা দ্বিধাহীনভাবেই বলা যায়। পশ্চিমবঙ্গের সর্বত্রই এমন কি দূরবর্তী গ্রামসমূহে পর্যন্ত পর পর দুদিন নিরবচ্ছিন্নভাবে হরতাল পালিত হয়েছে। কলকাতা মহানগরীর স্বাভাবিক জীবনযাত্রা এই দুদিন স্তব্ধ ছিল। অবশ্য দু-একটা দোকান-পত্র যে খোলা ছিল না, তা নয়। কিন্তু সামগ্রিক বিচারে তা নেহাৎই গৌণ ব্যাপার। সমুদ্রে শিশিরবিন্দুবৎ।

এবার বাংলা বন্ধের ব্যাপারে কয়েকটি বিশেষ জিনিস লক্ষ্য করা গেছে। প্রথমত বামপন্থী দলগুলি কারুর উপর হরতালের জন্য কোন জবরদস্তি করেন নি, পথে ঘাটে কোনো ব্যারিকেড ছিল না। জনসাধারণ সর্বত্রই হরতালের ক্ষেত্রে এগিয়ে এসেছিলেন। অশান্তিপূর্ণ ব্যাপার কোথাও বড় একটা ঘটে নি। এ থেকেই প্রমাণিত হল যে জনসাধারণকে আগে থেকে প্ররোচিত না করলে অশান্তি হবার কোন সম্ভাবনাই নেই। বিগত ৬ই এপ্রিলের হরতালের দ্বারা যা প্রমাণিত হয়েছিল, ২২শে ও ২৩শে তারিখের বাংলা বন্ধে তা আবার নতুন করে প্রমাণিত হল।

অবশ্য একটু-আধটু হাংগামা যে একেবারে হয় নি তা নয়। কিন্তু সেখানেও কোন তরফ থেকে প্ররোচনা এসেছিল সেটা আগে বিচার করতে হবে। আমার সুনিশ্চিত বিশ্বাস যে হাংগামার প্ররোচনা এসেছিল হয় পুলিশ না হয় শাসকদলের চেলাচামুণ্ডাদের কাছ থেকে। আমার এ সিদ্ধান্ত হয়ত অনেকেই একদেশদর্শী বলে মনে করতে পারেন। কিন্তু যদি প্রত্যক্ষ প্রমাণ হাতের কাছে থাকে তাহলে তার ভিত্তিতে সত্য কথা বলতে আপত্তি কোথায়?

এবারকার ধর্মঘটের একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য হল শাসকদলের তরফ থেকে গঠিত প্রতিরোধ বাহিনী যা আগাগোড়াই বন্ধ্‌কে বানচাল করার চেষ্টা করেছে। এদের হাতে অনেক বামপন্থী কর্মী ও হরতালকারী যে লাঞ্ছিত হয়েছেন তার কিছু প্রমাণ সংগ্রহ করতে পারা গেছে।

দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্য হল, এবারে যদিও নামকরা কোন বামপন্থী নেতাকে গ্রেপ্তার করা হয় নি, কিন্তু হাজার হাজার বামপন্থী কর্মীকে অসামাজিক ব্যক্তি বা গুণ্ডা আখ্যা দিয়ে গ্রেপ্তার করে রাখা হয়েছে। সরকার এটা বুঝতে পেরেছিলেন যে হরতালের সাফল্য ষোল আনা নির্ভর করে কর্মীদের উপরে। কাজেই নির্বিচারে যাকে সামনে পাওয়া যায় তাকেই গ্রেপ্তার কর। যে কোন একটা মিথ্যা অজুহাত হলেও চলবে। ফলে অনেক শিক্ষিত ভদ্র সন্তানকে, শুধুমাত্র সে কংগ্রেসী নয় বলেই, গুণ্ডা আখ্যা দিয়ে হরতালেব বহু পূর্ব থেকেই গ্রেপ্তার করা হয়েছে। স্থানীয় কংগ্রেস দলের সদস্যরাই এদের নামের তালিকা পুলিশের কাছে পাঠিয়ে দিয়েছিল। এবং কর্তাভজা পুলিশ তাদের কথাকেই শিরোধার্য করে এতগুলি মানুষের মৌলিক অধিকার হরণ করতে কুণ্ঠিত হয় নি।

নার্সজীবনের বিড়ম্বিত দিক

কয়েক সপ্তাহ পূর্বে বঙ্গদর্শনে অনুরাধা করানি নামক একজন শিক্ষার্থিনী নার্সের শোচনীয় মৃত্যুর কথা লিখতে গিয়ে বলেছিলাম যে চিকিৎসাবিভাগের সংগে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরা যদি অবহেলায় ও বিনা চিকিৎসায় মারা যায় তার চেয়ে দুঃখের বিষয় আর কিছু থাকতে পারে না। মেয়েটি চিকিৎসা চেয়েও পায় নি, চূড়ান্ত অবহেলা ও শোচনীয় দায়িত্বহীনতার ফলে একটি প্রাণকে অকালে ঝরিয়ে দেওয়া হল। আমরা স্বাস্থ্য-অধিকর্তাকে এ বিষয়ে তদন্ত করবার অনুরোধ জানিয়েছিলাম, কিন্তু তাতে কি ফল হয়েছে তা জানি না।

সেই সূত্রে আমাদের হাতে এমন কিছু সংবাদ এসেছে যাতে নার্সদের জীবনের একটি বিড়ম্বিত দিক বড় করুণভাবে উদ্ঘাটিত হয়েছে। বাইরে থেকে নার্সদের সম্বন্ধে অনেক মন্তব্য করা হয়, রোগীদের

প্রতি নার্সদের হৃদয়হীন আচরণের কথাও বেশ ফলাও করে সংবাদপত্রে প্রতিফলিত করা হয়, কিন্তু সেই সঙ্গে কর্তব্যরত নার্সদের কি পরিবেশে, কি প্রতিকূল অবস্থায় কিভাবে কাজ করতে হয় তার সঠিক চিত্র তুলে ধরার কোন চেষ্টা হয় না।

নার্সদের বিড়ম্বিত জীবননাট্যের প্রথম পরিচ্ছেদেই যা চোখে পড়ে সেটা তাদের দৈনিক কর্মকাল। ফ্যাক্টরী আইনে শ্রমিকদের সর্বোচ্চ কর্মকাল বেঁধে দেওয়া আছে নার্সদের দৈনিক কার্যকাল তার চেয়েও বেশি। কখনো কখনো তাদের কাজ করতে হয় দৈনিক বারো ঘণ্টা, চোদ্দ ঘণ্টা কখনো কখনো তারও বেশি। সবই নির্ভর করে সিস্টার বা মেট্রনদের মর্জির উপর। এমন কাহিনী আমাদের হাতে এসেছে যে, সকাল ছ'টা থেকে বেলা চারটে পর্যন্ত একটানা ডিউটি দেবার পরও সন্ধ্যা সাতটায় আবার তাকে ডিউটিতে পাঠানো হয়েছে। কাজের মানসপ্রস্তুতির কথা ছেড়ে দিলাম, প্রয়োজনীয় দৈহিক বিশ্রাম পর্যন্ত তাদের নিতে দেওয়া হয় না। এর বিরুদ্ধে কোন প্রতিবাদ চলে না। প্রতিবাদ করলে যে তার পরিণতি কি মারাত্মক হতে পারে তা নিম্নলিখিত কাহিনী থেকেই বুঝতে পারা যাবে।

স্বাধীনতা দিবসে নার্সদের ওই দিনটি উদ্‌যাপন করার জন্য কর্মকাল কিছুটা কমিয়ে দেওয়া হয়। মেডিক্যাল কলেজের ক্যাজুয়ালটি বিভাগের একটি নার্স, স্বাধীনতা দিবসে যার ডিউটি ছিল অপারেশন থিয়েটারে, সকাল সাড়ে সাতটা থেকে বেলা তিনটে পর্যন্ত একনাগাড়ে ডিউটি করেছে। অপারেশন থিয়েটারের ডিউটির গুরুত্ব সহজেই বুঝতে পারছেন। যতক্ষণ কাজ চলবে ততক্ষণ তাকে সেখানে একভাবে হাজির থাকতে হবে, কোন সর্তে একবার নিশ্বাস নেবার জন্যও বাইরে আসবারও হুকুম নেই। যাই হোক, আট ঘণ্টা একনাগাড়ে এইভাবে ডিউটি করবার পর সে বেলা তিনটেয় যখন ছাড়া পেল, তখন তাকে জানানো হল যে, সন্ধ্যা ছ'টা থেকে আবার তার ডিউটি আছে। সেই অবস্থায় তখন তার শারীরিক এবং মানসিক অবস্থাটা চিন্তা করে নিন। আরও বড় কথা সেই নির্দেশ দিচ্ছে তার উপরওয়ালা সিস্টার সম্পূর্ণ মৌখিকভাবে। কোন লিখিত নির্দেশও তাকে দেওয়া হয় নি। ফলে সে দ্বিতীয়বার ডিউটিতে যেতে অস্বীকার করল এই কারণে যে, প্রথমত আট ঘণ্টা ও. টি.তে ডিউটি করে আসার পর পুনরায় ডিউটি করতে যাওয়া তার পক্ষে শারীরিক কারণে অসম্ভব, দ্বিতীয়ত উপরি উক্ত মৌখিক নির্দেশ তাকে পূর্বঘোষিত স্বাধীনতা দিবসের রিসেস থেকে বঞ্চিত করছে এবং তৃতীয়ত যেহেতু নির্দেশটি লিখিত নয় মৌখিক সেইহেতু নির্দেশদাত্রী তাঁর উপরওয়ালার কাছ থেকে তাকে পুনরায় খাটানোর যে সত্যকার কোন নির্দেশ পেয়েছে তার প্রমাণাভাব।

কিন্তু এই অস্বীকৃতির ফল হল মারাত্মক পরিণামে তাকে কাঁচরাপাড়া টি. বি. হাসপাতালে বদলি করা হল। সিস্টারদের প্রতিনিয়ত তেল দিয়ে না চললেই সর্বনাশ, একবার তাদের বিরাগভাজন হলেই তৎক্ষণাৎ বদলি হতে হবে মালদহ, জলপাইগুড়ি, পুরুলিয়া। আর একজন নার্সের কথাও এ প্রসঙ্গে তোলা প্রয়োজন, সে ছিল ইডেন নার্সারীতে, সে বেচারীর অপরাধ হচ্ছে, সে একদিনের 'ক্যাজুয়েল লীভ' নিয়েছিল। তাকে বদলী করা হয়েছে ইনফেকসাস ডিজিস হাসপাতালে। বস্তুত কর্মরত নার্সদের প্রাত্যহিক বিড়ম্বিত জীবন তাদের সুষ্ঠুভাবে নিজেদের কাজ করতে দিচ্ছে না। কারখানার মজুরদেরও ততটা শ্রম করতে হয় না যতটা করতে হয় এই নার্সদের, বিনিময়ে তারা না পায় পর্যাপ্ত বেতন, না পায় প্রয়োজনীয় ছুটি, এমন কি তাদের নীরব কাজের স্বীকৃতিটুকু থেকেও তারা বঞ্চিত। তদুপরি উপরওয়ালা সিস্টার ও মেট্রনের হুলের জ্বালা তাদের প্রতিনিয়ত অস্থির করে রাখে, পান থেকে একটু চুন খসলেই সর্বনাশ। মেডিক্যাল কলেজে একই উপাধিধারী দুজন সিস্টার আছেন, বহুদিনের পুরোনো ঘুঘু, যাঁরা নার্সদের ভাগ্যবিধাত্রী, তাঁদের তোয়াজ করতে পারার উপরেই নার্সদের ভবিষ্যৎ নির্ভর করে। রাইটার্স বিল্ডিং-এ নার্সদের ভারপ্রাপ্ত যিনি বসে আছেন তাঁর কাছে কোন অভিযোগ জানাতে গেলে নাকি নার্সদের অশ্রাব্য, কুৎসিত ও ইঙ্গিতমূলক গালাগাল শুনতে হয়, এই রকম অভিযোগ বহু নার্সই আমাদের কাছে করে গেছেন।

নার্সদের খাওয়া-দাওয়ার দিকটাও এককথায় শোচনীয়। যাদের প্রতিনিয়ত নানান সংক্রামক রোগ নিয়ে ঘাঁটাঘাঁটি করতে হয় তাদের খাওয়া-দাওয়াটা ভালই হওয়া উচিত সাধারণ বুদ্ধি একথা বলে। সরকারী খাদ্যতালিকায় অবশ্য কোন কিছুরই অভাব নেই, মাছ, মাংস, ডিম, দুধের ব্যবস্থা আছে। কন্ট্রাক্টারদের সঙ্গে কর্তৃপক্ষের অলিখিত চুক্তি অনুযায়ী অর্ধেক মাছ যে পচা থাকে, অর্ধেক ডিম যে খারাপ থাকে. সেকথা বলাই বাহুল্য। তার মধ্যে যেগুলি ভাল সেগুলি সিস্টার বা তাদের পেয়ারের দু-চারজন নার্সের ভাগ্যেই জোটে। বেশিরভাগের বরাতেই জোটে পচা মাছ, আর খারাপ ডিমের ঝাল মশলা পেঁয়াজ মেশানো কড়া করে ভাজা মামলেট, যাতে সহজে বুঝতে না পারা যায় জিনিসটা কতটা খারাপ। মাখন এমন দেওয়া হয় যে তার গন্ধে বমি আসে। ফলে রাজ্যের অখাদ্য-কুখাদ্য খেয়ে এবং প্রয়োজনীয় পুষ্টিকর খাদ্য না পেয়ে শতকরা নব্বইজন নার্সই কোন না কোন ব্যাধিগ্রস্ত, যদি স্বাস্থ্য পরীক্ষা করা যায় তাহলে দেখা যাবে যে এদের প্রত্যেকেরই স্বাস্থ্যের উত্তরোত্তর অবনতি হচ্ছে, অনেকেই ক্ষয়রোগের শিকার হয়েছে। অনুরাধা মারা গেছে কর্মস্থলে তাই তার কথা আমরা জনতে পেরেছি, কিন্তু শত শত অনুরাধা যে দৃষ্টির অন্তরালে তিলে তিলে মৃত্যুর পথে এগিয়ে যাচ্ছে তার খোঁজ কে রাখে?

কিন্তু সবচেয়ে শোচনীয় অবস্থা হচ্ছে শিক্ষার্থী নার্সদের ক্ষেত্রে। তাদের উপর যে অমানুষিক পীড়ন চলে তার তুলনা কোথাও নেই। তবু কর্মরত নার্সদের প্রতি অবিচার ঘটলে প্রতিকারের একটা আইনসঙ্গত পন্থা আছে। কিন্তু এদের ক্ষেত্রে কোন রাস্তাই খোলা নেই। হাড়ভাঙা খাটুনি, তদুপরি উপরওয়ালী প্রত্যেকেরেই ফাইফরমাস খাটা, বলার কিছু নেই, তাহলে জীবন অতিষ্ঠ হয়ে উঠবে। বহু শিক্ষার্থী নার্সকে উৎপীড়নের ঠেলায় শিক্ষানবিশী পরিত্যাগ করে পালিয়ে প্রাণ বাঁচাতে হয়েছে। ঘটা করে ভদ্রপরিবারের মেয়েদের নার্সিং-এ যোগদান করতে আহ্বান করা হয়, কিন্তু তাদের যে পরিবেশে শিক্ষা দেওয়া হয়, খাওয়াদাওয়া থেকে আরম্ভ করে সমস্ত ব্যাপারে যেভাবে তাদের উপর অবিচার করা হয় তার তুলনা নেই। এমন কি অনেক ক্ষেত্রে তাদের হতে হয় মর্ষকামিতার শিকার। এদের জীবনের করুণ কাহিনী নিয়ে মহাভারত রচনা করা যায়। সভ্যদেশে, সেইসব মেয়েদের উপর, বিশেষ করে যারা সেবামূলক কাজে দীক্ষিত হয়েছে, তাদের উপর সর্বদিক থেকে নিপীড়ন একটা অকল্পনীয় ব্যাপার, অথচ এখানে তা দিনের পর দিন করে যাওয়া হচ্ছে।

নার্সজীবনের এই শোচনীয় দিকগুলির সঙ্গে স্বাস্থ্যমন্ত্রী যে পরিচিত নন তা নয়, কেন না এগুলি হঠাৎ আজই সৃষ্টি হয় নি, দীর্ঘকাল ধরেই এই অবস্থা চলে আসছে। চাকরীর দায়ে আবদ্ধ জীবনের প্রাথমিক সুখ-সুবিধা থেকে বঞ্চিত, মাত্রাতীত শ্রমের ভারে দৈহিক ও মানসিকভাবে রিক্ত, উপরওয়ালাদের নানান ধরণের উৎপীড়নের ভারে অবসন্ন ভাগ্যবিড়ম্বিত এই নার্সদের বর্তমান অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে তাদের কাছ থেকে ভাল কাজ কিভাবে জনসাধারণ, তথা সরকার আশা করতে পারেন?

বিভিন্ন কর্তৃপক্ষের কাছে আমরা এই

বলে আবেদন করছি যে, হাসপাতালগুলিতে সভ্য জগতের আলো-বাতাস ঢুকুক, শ্বাসরোধী আবহাওয়ার বাইরে মুক্তজীবনের সুযোগ নার্সরা লাভ করুক, শুধু দিনযাপনের শুধু প্রাণধারণের' গ্লানি থেকে বেরিয়ে এসে তারা সভ্যকার কাজে লাগুক, হাসপাতালগুলি থেকে কায়েমী স্বার্থের অবসান হোক, আর যারা নার্সদের নারীজীবনের অসহায়তার সুযোগ নিয়ে তাদের জীবনকে বিষময় করে তুলছে, তাদের বিচার হোক। আপাতত একটি তদন্ত কমিটি বসানো দরকার যেখানে নার্সরা নির্ভয়ে নিজেদের কথা বলার সুযোগ পায়।

পশ্চিমবঙ্গে সিনেমা কর্মচারীদের ধর্মঘট

আমাদের প্রাত্যহিক জীবনের অবসাদের হাত থেকে সস্তায় মুক্তি পাওয়ার একমাত্র উপায় যে সিনেমা, তার দ্বার আজ কয়েকদিন থেকেই রুদ্ধ হয়ে আছে। এর কারণ সিনেমা কর্মীদের ধর্মঘট। আর সকলের মত আজ সিনেমা কর্মচারীদেরও এগিয়ে আসতে হয়েছে ধর্মঘটেরই চিরাচরিত পথে, কেন না তাঁদের দাবি আদায়ের অন্যান্য সমস্ত পথ রুদ্ধ হয়ে গেছে। কিছুকাল পূর্বে তাঁরা একদিন প্রতীক ধর্মঘটের নোটিশ দিয়েও পরে তা প্রত্যাহার করে নিয়েছিলেন এই যুক্তিতে যে আলাপ-আলোচনার পথে হয়ত তাঁদের দাবিগুলি মিটতে পারে। তাঁদের সেই সহিষ্ণু দৃষ্টিভঙ্গীর কোন মর্যাদা দেওয়া সিনেমামালিকেরা প্রয়োজন মনে করে নি।

সিনেমা কর্মচারীদের দাবির বহর এমন কিছু বিরাট নয়। অতি সম্প্রতি ব্যাপকভাবে দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির হার যেমন আকাশছোঁয়া হয়ে উঠেছে তাতে সমাজের অপরাপর স্তরের মানুষদের মত সিনেমা কর্মচারীদের সাংসারিক জীবনযাত্রা নির্বাহ করা একেবারেই অসম্ভব হয়ে উঠেছে। কাজেই তাঁরা কিছুটা বর্ধিত বেতন ও মহার্ঘভাতা দাবি করছেন অত্যন্ত সংগতভাবেই। কিন্তু মালিকপক্ষের হৃদয় তাতে বিগলিত হবার নয়। তাদের মুনাফার পরিমাণ একচুল কমুক এ তারা চায় না।

অথচ সমগ্র ফিল্ম লাইনের মধ্যে সিনেমাহলওয়ালাদের অবস্থাই সবচেয়ে ভাল। প্রযোজক, পরিবেশক ও প্রদর্শকদের মধ্যে সিংহভাগটা শেষোক্তদের কোলেই পড়ে। অথচ আমাদের দেশের বহু সিনেমাহলেই কর্মচারীদের নির্দিষ্ট স্কেল পর্যন্ত নেই। যেহেতু একটি হলে কর্মচারীদের সংখ্যা খুব বেশি থাকে না সেই হেতু হল-মালিকদের পক্ষে তাঁদের দাবিদাওয়ায় কর্ণপাত না করতেই সুবিধা বেশি।

সিনেমা কর্মচারীদের ধর্মঘটের ব্যাপারকে কেন্দ্র করে সরকার মালিক ও শ্রমিকদের ত্রিপাক্ষিক বৈঠক ব্যর্থ হয়েছে। ইতিমধ্যেই মালিকরা হলগুলি লক আউট করে দেবার কথা ঘোষণা করেছে। এটা কর্মচারীদের প্রতি প্রত্যক্ষ চ্যালেঞ্জ। এই চ্যালেঞ্জের জবাব কর্মচারীরা কিভাবে দেন দেখা যাক।

সিনেমা কর্মচারীদের ধর্মঘটের বিষয়টি সাপ্তাহিক বসুমতীর সিনেমা বিভাগে অধিকতর তথ্যাদি সহকারে আলোচিত হয়েছে বলেই বঙ্গদর্শনে বিশেষ করে তা লেখা হল না।

বিশ্ববিদ্যালয় সমাচার

শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান হিসাবে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কৌলিন্য বহুকাল পূর্বেই অন্তর্হিত হয়েছে। এই প্রতিষ্ঠান শুধু বয়সের ভারেই অবনত নয়, মানস সম্পদের দিক থেকেও সম্পূর্ণ রিক্ত, এককালের জগদ্বিখ্যাত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান আজ দলাদলি, ঘরোয়া কোন্দল ও ব্যক্তিগত স্বার্থসিদ্ধির পীঠস্থান হয়ে দাঁড়িয়েছে, এই সব কাহিনী একত্র করলে মহাভারত প্রমাণ হয়। আপাতত আমরা দু' একটি প্রসঙ্গের উপরেই আমাদের দৃষ্টি নিবদ্ধ করব।

আমাদের দেশের পরম দুর্ভাগ্য এই যে এই দেশে কাজের লোকের কোন স্থান নেই। সর্বক্ষেত্রে তারাই আসর জাঁকিয়ে বসে আছে যারা দলাদলিতে ওস্তাদ, সোজা পথে যারা যেতে পারে না বলে খিড়কি পথেই যাদের আনাগোনা। এই শ্রেণীর জীবদের নিজেদের কোন কর্মশক্তি নেই বলেই, যারা কাজের মানুষ তাদের বিরুদ্ধে চক্রান্ত করে, তাদের নামে নিন্দা ছড়ায়, পদে পদে তাদের চরিত্র হননের চেষ্টা করে।

এই রকম একটি দৃষ্টান্ত সম্প্রতি আমাদের হাতে এসেছে। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাচীন ভারতীয় ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগের প্রধান অধ্যাপক এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের মঞ্জুরী কমিশন প্রদত্ত ওই বিভাগের উচ্চতর গবেষণাকেন্দ্রের যিনি অধ্যক্ষ তাঁর পাণ্ডিত্য ও কর্মশক্তির খ্যাতি প্রায় প্রবাদে পরিণত হয়েছে। ঐতিহাসিক হিসাবে তিনি আন্তর্জাতিক খ্যাতির অধিকারী, গবেষণামূলক গ্রন্থ ও প্রবন্ধ রচনায় তিনি সর্বকালের রেকর্ড স্থাপন করেছেন। তাঁর প্রচণ্ড কর্মক্ষমতার প্রভাব প্রাচীন ভারতীয় ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগের প্রতিটি স্তরে অনুভূত হচ্ছে। ওই বিভাগের উচ্চতর অনুশীলন কেন্দ্রের অধ্যক্ষ হিসাবেও তাঁর কর্মধারা মঞ্জুরী কমিশন গঠিত অন্যান্য যে কোন কেন্দ্রের কাজের চেয়ে অনেক বেশি। ওই কেন্দ্র আয়োজিত বক্তৃতামালা ও সেমিনার সমূহের ধারাবিবরণীগুলি আশ্চর্য দ্রুততা ও ত্রুটিহীনতার সঙ্গে প্রকাশিত হচ্ছে। এই কেন্দ্রের মাসিক সেমিনারগুলি যেরকম নিয়মিতভাবে পরিচালিত হয় তারও তুলনা নেই।

অথচ দুঃখের কথা, এই রকম অমিত কর্মশক্তিযুক্ত অতুলনীয় পণ্ডিতকে লোকচক্ষে হেয় করার একটা অশোভন প্রচেষ্টা কোন কোন মহল থেকে হচ্ছে। খুবই দুঃখের কথা, এই ধরণের চেষ্টা যাঁরা চালাচ্ছেন তাঁদের নেতা একজন বিশ্ববিদ্যালয়েরই অধ্যাপক। অক্ষমতা ও অকর্মণ্যতাজনিত হীনমন্যতা বোধ থেকেই এই জাতীয় অপচেষ্টার উদ্ভব!

তাঁকে লোকচক্ষে হেয় করার অপচেষ্টায় তাঁর ব্যক্তিগত কোন ক্ষতিই হবে না, কিন্তু সামগ্রিকভাবে প্রাচীন ভারতীয় ইতিহাস ও সংস্কৃতি চর্চার ক্ষেত্রে যে কর্মচাঞ্চল্য এসেছে তা' যদি স্তিমিত হয়ে পড়ে সেটা খুবই দুঃখের বিষয় হবে। আমরা এ বিষয়ে উপাচার্যের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।

এবার পূজায় ছোটদের সব-সেরা বার্ষিকী

আনন্দ ঃ ১৩৭৩

সম্পাদক ঃ শ্রীধীরেন্দ্রলাল ধর

এতে আছে ঃ ৫ খানি উপন্যাস

লিখেছেন ঃ যোগেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় * মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য * প্রভাতকিরণ বসু

* শিবরাম চক্রবর্তী * ধীরেন্দ্রলাল ধর

এতে আছে ঃ নামকরা লেখকদের ৪০টি গল্প

এতে আছে ঃ বহু কবিতা, ছড়া ও ধাঁধা।

আর আছে একালের বিশ্ববরেণ্য বাঙালীদের ছবি!

৫৩৫ পৃষ্ঠার বিরাট বই ঃ মূল্য পাঁচ টাকা।

ক্যালকাটা পাবলিশার্স, ১৪ রমানাথ মজুমদার স্ট্রীট, কলি-৯

জীবদেহ কি যন্ত্র?

আশিসকুমার সিংহ

আচার্য জগদীশচন্দ্র একবার একটি 'কৃত্রিম চক্ষু' নির্মাণ করেছিলেন; উদ্দেশ্য ছিলঃ দৃষ্টিতত্ত্বের পরীক্ষা করবেন। আলো ঐ 'চক্ষু'র পশ্চাদ্‌ভাগে একটি আলোকসচেতন ব্রোমিনলিপ্ত রোপ্য পাতের উপর পড়লে পাতটির মধ্যে রাসায়নিক পরিবর্তন ঘটত। এই পরিবর্তনের ফলে বিদ্যুৎপ্রবাহ উৎপন্ন হত এবং সেই প্রবাহকে বিদ্যুৎ-পরিবাহী তারের সাহায্যে বয়ে নেওয়া যেত কিছুদূর। তারপরে জগদীশচন্দ্র ঐ বিদ্যুৎ-প্রবাহের প্রকৃতি পরীক্ষা করে দৃষ্টি-রহস্যকে বুঝতে চেষ্টা করতেন। ঐ পাতটি চক্ষুর রেটিনার যান্ত্রিক বিকল্প।

ক্যামেরাকেও এক ধরণের 'কৃত্রিম চক্ষু' বলা যায়। চক্ষুর মত এতে আলো প্রবেশের ছিদ্রপথ আছে, এমন লেন্স্ আছে যাকে ইচ্ছামত অ্যাড্‌জাস্ট্ করা যায়। চক্ষুর রেটিনার সঙ্গে ক্যামেরার ফিল্ম তুলনীয়—উভয়ের উপরে আলো পড়লেই রাসায়নিক পরিবর্তন ঘটে। তফাৎ শুধু এই যে, রেটিনার রাসায়নিক পরিবর্তনে যেমন রেটিনার পশ্চাদ্বর্তী স্নায়ু-মণ্ডলীতে এক বিশেষ ধরণের সাড়া জাগে এবং সেই সাড়া স্নায়ুপথে মস্তিষ্কে বাহিত হয়ে দৃষ্টির চেতনা জাগায় ফিল্মের পরিবর্তনে তেমন কিছু হয় না। এদিক দিয়ে বরং জগদীশচন্দ্রের 'কৃত্রিম চক্ষু'র সঙ্গেই চক্ষুর সাদৃশ্য বেশি।

রেটিনার পশ্চাদ্‌ভাগে ঐ যে স্নায়ু-সূত্রগুলি বর্তমান ওদের মত অসংখ্য স্নায়ুসূত্র সমস্ত শরীরে জালের মত ছড়িয়ে আছে। তারা দেখতে যেন ঠিক টেলিগ্রাফের তার, কাজেও তাই। সংবাদ আদান-প্রদানই কাজ তাদের।

জড়যন্ত্রের সঙ্গে চক্ষু এবং স্নায়ুসূত্র ছাড়া আরও অনেক দেহযন্ত্রের সাদৃশ্য পাওয়া যায়। যেমন ধরুন, হৃৎপিণ্ড একটা পাম্পিং মেশিনের সঙ্গে তুলনীয়; ফুস-ফুস, কিড্‌নী প্রভৃতিরও জড় মডেল নির্মাণ করা গেছে। বস্তুত যন্ত্রের সঙ্গে সাদৃশ্য থাকাতেই এদের নাম হয়েছে দেহযন্ত্র। আর, কোন দেহযন্ত্রের জড় মডেল তৈরি করে তার কাজ পরীক্ষা দ্বারা মূল দেহযন্ত্রের কর্মপদ্ধতি বোঝার চেষ্টা বর্তমান শারীরবৃত্তের একটি স্বীকৃত পদ্ধতি।

আমরা যদি দেহযন্ত্রগুলিকে আরও বিশ্লেষণ ক'রে ভিতরে যাই তাহলে যে-দেহকোষ দিয়ে এইসব দেহযন্ত্র তথা সমস্ত শরীর নির্মিত যন্ত্রের সঙ্গে তাদেরও সাদৃশ্য খুঁজে পাব। দেহকোষের অন্তর্ভাগকে একটি বেশ নিপুণ এবং কর্মব্যস্ত ফ্যাক্টরীর সঙ্গে তুলনা করা চলে। এখানে ওখানে বিবিধ পদার্থ ছড়িয়ে থেকে যেন ঘড়ি ধরে তাদের নির্দিষ্ট কাজ ঠিকমত ক'রে যাচ্ছে; স্বাভাবিক অবস্থায় একচুল এদিক-ওদিক নেই। আর কোষের মধ্যে মাইটোকন্‌ড্রিয়া নামে যে ক্ষুদ্র লম্বাটে পদার্থগুলি বর্তমান তাদের ত' কারখানা ছাড়া কিছু বলাই চলে না! এই পদার্থের অন্তর্ভাগ অনেকগুলি খোপে বিভক্ত। এক-একটি খোপে এক-এক রকম কাজ হয়। এক কথায় খাবারের সূক্ষ্ম অংশকে আরও ভেঙে তার অন্তর্নিহিত শক্তিকে মুক্ত করার কাজ চলে এই সব খোপে।

দেহকোষ এবং বিচ্ছিন্ন দেহযন্ত্রের মতনই জীবের গোটা শরীরটাও অনেক দিক দিয়ে যন্ত্রের মত আচরণ করে। এর নড়াচড়ার কথাই ধরুন না। শরীরের এক স্থান থেকে অন্যস্থানে নড়াচড়ার মানে তার অস্থিময় কঙ্কালের নড়ে বেড়ানো। আর অস্থিগুলি পরস্পরের সঙ্গে এমন-ভাবে জোড়া আছে যেন শরীরটা একটা অস্থিনির্মিত যন্ত্র। এর ওপরে ঠিকমত ত্বক-সন্নিবেশ করতে পারলেই একটি যান্ত্রিক "জীব" তৈরি হয়ে যাবে। এ-রকম একটা হাতীর গল্প বলি।

গত বছর বা তার আগের বছর ইংলণ্ডের এক বরফ প্রদর্শনীতে দর্শকেরা একটি কৃত্রিম হাতীকে বরফের উপর দিয়ে হাঁটিতে দেখেছিলেন। এর চামড়া ছিল বিশেষ ধরণের পশম আর কাগজে তৈরি। ৫০ ভোল্টের একটা মোটর দিয়ে একে হাঁটানো হত ঘণ্টায় প্রায় ৬ মাইল বা তার কম বেগে। দৌড়লে বেগ হত ঘণ্টায় ২৩ মাইল। কন্ট্রোল করার যন্ত্রপাতি ছিল ঘাড়ে। এর পিঠের উপরে হাওদায় ৮ জন বয়স্ক ব্যক্তি বা ১৬ জন ছোট ছেলেমেয়ের বসার জায়গা হত। দর্শকদের এ এত জ্বালাতন করছিল যে তাঁরা এর ব্যবহার সম্বন্ধে অভিযোগ না করে পারেন নি।

এই যান্ত্রিক হাতীটির মোটর বা অন্য কোন "দেহযন্ত্র" অকেজো হয়ে গেলে সেটা যে পাল্‌টে দেওয়া হবে এ-কথা আমরা অনুমান করতে পারি। তেমনি জীবদেহের কোন দেহযন্ত্র বিকল হলে আজকাল সেটা পাল্‌টে দেওয়া অনেক ক্ষেত্রে সম্ভব হচ্ছে। শরীরেরও স্পেয়ার পার্টস্ পাওয়া যাচ্ছে যন্ত্রের মত। বছর কয়েক আগে এস্ এস কে এম্ হস্‌পিটালে একটি অল্পবয়সী মেয়ের হৃৎপিণ্ডে অস্ত্রোপচারের সময় তার ফুসফুস ও হৃৎপিণ্ডের কাজ একটি যন্ত্রের সাহায্যে সম্পন্ন করা হয়েছিল সে-কথা হয়ত আপনাদের মনে আছে। যন্ত্রটি ফুসফুস ও হৃৎপিণ্ডের যান্ত্রিক বিকল্প। এ-ছাড়া, 'কর্নিয়া-গ্রাফ্‌টিং'-এর বন্দোবস্ত আজকাল কলকাতাতেও হয়েছে। এই ক্ষেত্রে স্পেয়ার পার্টস্ সংগ্রহ করা হচ্ছে অন্য ব্যক্তির শরীর থেকে। আর, এ-ব্যাপারে পাশ্চাত্য জগতের ত' কথাই নেই। কিড্‌নী-গ্রাফটিং-এর মত গুরুতর কাজও সেখানে হয়েছে বলে সংবাদ বেরিয়েছে বিজ্ঞান-পত্রে।

গোটা শরীরের আরও গভীরে তাকালেও যান্ত্রিক চরিত্রের অনেক নিদর্শন আমরা দেখতে পাব। একটা যন্ত্রে যে-পরিমাণ শক্তির যোগান দেওয়া হয় সে তার সবটা কাজে লাগাতে পারে না। অনেকটাই শেষ পর্যন্ত তাপ হয়ে নষ্ট হয়ে যায়। কিন্তু কাজে ব্যয়িত শক্তি এবং তাপের যোগফল প্রদত্ত শক্তির সমান থাকে। শরীরের ক্ষেত্রেও তাই। খাদ্যের আকারে যে-শক্তি শরীর গ্রহণ করে তার

শ্রীউমাপদ মুখোপাধ্যায় সঙ্কলিত

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণায়ণ

মূল্য ঃ দুই টাকা

"অমূল্য গ্রন্থ হয়েছে।"

—স্বামী অপূর্বানন্দ।

"বইখানি নতুন ধরণেরই হয়েছে।"

—স্বামী সদাত্মানন্দ।

"বইখানি দেখিতে সুন্দর, বিষয়বস্তু অমল ও অতুলনীয়। একখানি গ্রন্থে এত মহামূল্য রত্নের সন্নিবেশ পূর্বে আর হয় নাই।"

—স্বামী শুদ্ধসত্ত্বানন্দজী।

বসুমতী প্রাইভেট লিমিটেড

১৬৬, বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী স্ট্রীট, কলিকাতা—১২

অনেকটাই তাপ হয়ে যায়। মাত্র শতকরা কুড়ি ভাগ কাজে লাগে। এখানেও শক্তির যোগান এবং ব্যয়ের মধ্যে একটা চমৎকার ব্যালান্স্ শীট্ তৈরি করা সম্ভব। শুধু তফাৎ এই যে, শরীরে উৎপন্ন তাপটা স্বাভাবিক অবস্থায় বাজে খরচের তালিকায় পড়ে না। এই তাপ দেহতাপের স্বাভাবিক মাত্রা বজায় রাখে। আর, শরীরের বিভিন্ন কাজের পেছনে বা দৈহিক তাপ, আলো, বিদ্যুৎ প্রভৃতি উৎপাদনের পেছনেও যে জড়জগৎসুলভ রাসায়নিক বিক্রিয়া বর্তমান, জৈব আলো ও বিদ্যুতের আলোচনা প্রসঙ্গে আমরা আগের দু'-একটি প্রবন্ধে তার উল্লেখ করেছি।

এইসব দেখাশোনার পরে প্রবন্ধের শিরোনামে উত্থাপিত প্রশ্নটি খুব তীব্র হয়ে ওঠে ঃ "জীবদেহ কি তাহলে সত্যিই যন্ত্র?" উপরের নিদর্শনগুলি একবাক্যে উত্তর দেবে ঃ "হ্যাঁ।" কিন্তু এ-সম্বন্ধে চরম সিদ্ধান্তে আসার আগে আসুন আমরা একটু ঘুরিয়ে আর একটি প্রশ্ন তুলে ব্যাপারটাকে যাচাই করে দেখি ঃ "যন্ত্র কি জীবিত?" সম্ভবত আমরা সকলে একসঙ্গেই "না না" করে উঠব।

এ-রকম "না না" করার পক্ষেও অনেক বিজ্ঞান-তথ্য সাক্ষ্য দেবে। যেমন ধরুন একটি বড় যন্ত্র নিজে ভেঙে গিয়ে বা আর একটি বড় যন্ত্রের সহযোগিতায় একটি অনুরূপ ছোট্ট যন্ত্রের জন্ম দিতে পারে না। কিংবা ধরুন জড়যন্ত্রের তাপমাত্রা পরিবেশের তাপমাত্রার সঙ্গেই ওঠানামা করে; উষ্ণ রক্তের জীবের দেহতাপের মত স্থির থাকে না। এ-সব তফাৎ উপেক্ষণীয় নয়।

তাহলে দেখা যাচ্ছে জীবদেহ একই সঙ্গে কিছুটা যান্ত্রিক, কিছুটা আবার অযান্ত্রিকও। এটা হয়তো একটা ধাঁধার মত মনে হবে অনেকের কাছে। এই ধাঁধার উত্তর দিয়েছিলেন গত শতাব্দীর শ্রেষ্ঠ শরীরবিজ্ঞানী ফরাসী দেশের ক্লড্ বার্নার্ড্। তাঁর ব্যাখ্যাটি এখানে স্মরণ করা যাক।

বার্নার্ড্ বলেছিলেন ঃ জীবদেহ জড়-পদার্থের দ্বারা নির্মিত। তাই সে জড়-যন্ত্রের নিয়মেই চলে। কিন্তু তাহলেও নিয়মগুলি জীবদেহে এমন বিশেষভাবে কাজ করে যাতে "জীবন" নামক একটি বিশেষ অবস্থার অভ্যুদয় ঘটে। জীবদেহ এক বিশেষ ধরণের যন্ত্র। কিন্তু তার যান্ত্রিকতার মানে এই নয় যে, সাধারণ জড়যন্ত্রে জীবদেহের সমস্ত বৈশিষ্ট্য দেখা যাবে। আবার জীবদেহের অযান্ত্রিকতার মানেও এই নয় যে জীবদেহে যন্ত্রের অতিরিক্ত কোন অলৌকিক শক্তির প্রকাশ দেখা যায়।

সপ্তদশ শতাব্দীর ফরাসী দার্শনিক ও গণিতবিদ রেনে দেকার্তের সময় থেকে বার্নার্ডের আগে পর্যন্ত প্রায় দু'শ বছর একদল বিজ্ঞানী জীবদেহকে সাধারণ জড়-যন্ত্রের অনুরূপ বলেই মত প্রকাশ করে-ছিলেন। বলা বাহুল্য, তাতে তাঁরা জীব-দেহের বৈশিষ্ট্যের কোন সংগত কারণ দেখাতে পারেন নি। তাঁদের এই দুর্বল-তার সুযোগ নিয়ে আর একদল বিজ্ঞানী জীবদেহে কোন অলৌকিক শক্তির প্রকাশ প্রমাণে সচেষ্ট ছিলেন। এই দুটি ভ্রান্ত ও চরম মতের কলহের অবসান ঘটালেন ক্লড্ বার্নার্ড্। তাঁর মতটি অদ্যাবধি শারীরবৃত্তে স্বীকৃত।

আধুনিক শারীরবৃত্তের পরিপ্রেক্ষিতে বার্নার্ডের মতটিকে আমরা কৃত্রিম জীবনের প্রসঙ্গেও প্রসারিত করতে পারি। অনেকে মনে করেন কৃত্রিম জীবন নির্মাণের চেষ্টা ক'রে জড়বিজ্ঞান জীবনের সব মাধুর্য এবং মহিমাকে ধ্বংস করতে চলেছে। তাই এ প্রসঙ্গে বিজ্ঞানকে সন্দেহের চোখে দেখেন তাঁরা। কিন্তু বার্নার্ডের অনুসরণে আমরা বলতে পারি যে কৃত্রিম জীবন কোনদিন জড়বিজ্ঞানের পথে নির্মিত হলেও সেটা জীবনই হবে। প্রচলিত অর্থে যাদের আমরা জড়যন্ত্র বলি তাদের জগতে সে-জীবনের কোন প্রতিরূপ খুঁজে পাওয়া যাবে না।

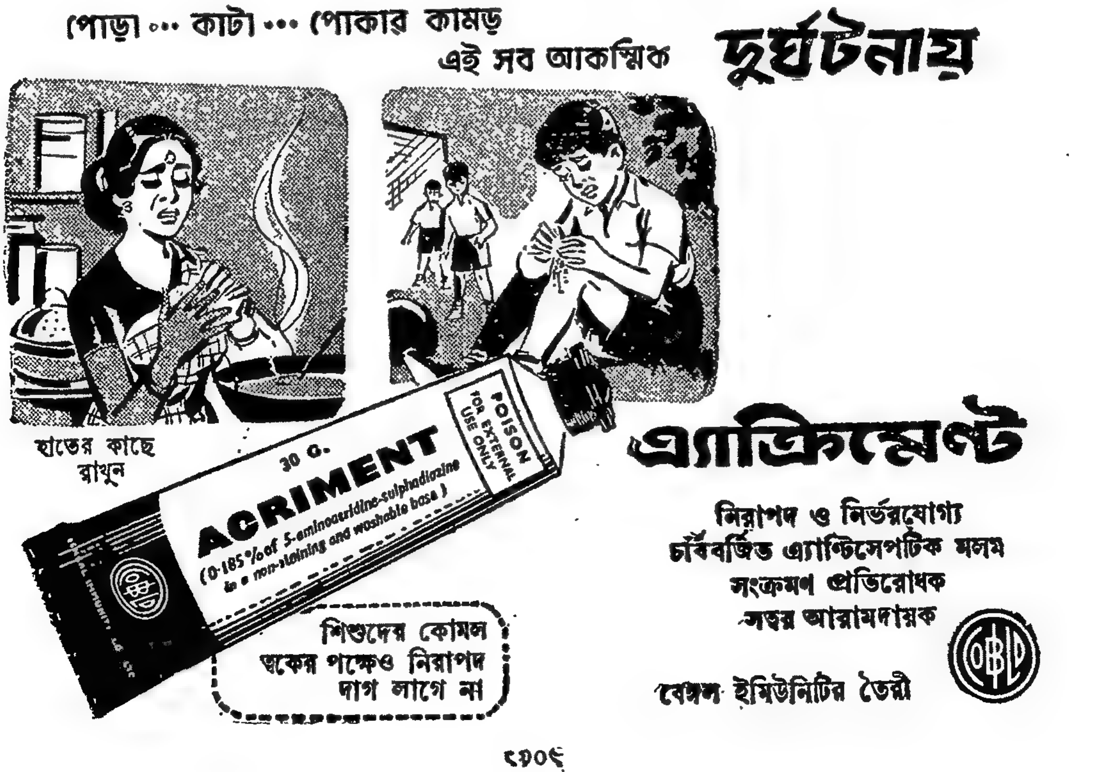

ধারাবাহিক উপন্যাস

আশাপূর্ণা দেবী

(পূর্ব-প্রকাশিতের পর)

মেয়ে গাড়িতে শুধু বৌকেই তুলে দেয় না প্রবোধ, সব ছেলে-মেয়ে কটাকেই তুলে দেয়। মালপত্র তো বটেই। নিজে হাত-পা ঝেড়ে পাশের কামরায় বসে মনে মনে চিন্তা করতে থাকে কি করে আবার অবস্থা আয়ত্তে আনা যাবে।

নিতান্তই যে হাত পুড়িয়ে রেঁধে খাওয়ার এবং তৎপরে মামীর বাড়ি গিয়ে গিয়ে খাওয়ার যন্ত্রণাতেই বৌকে আনতে গিয়েছিল সে, এবং গিয়ে মাত্র দেখতে না পেয়ে মেজাজ বিগড়ে গিয়েছিল সেটাই বোঝাতে হবে বিশদ ব্যাখ্যায়।

তা' ছাড়া শরীর খারাপের ভানও করতে হবে একটু, নচেৎ যে পাষাণ মেয়েমানুষ, মন গলবে না।

আশ্চর্য এই বৌ যতই বেচাল করুক, আর প্রবোধ তা'তে যতই ক্ষেপে যাক, শেষ পর্যন্ত নিজেকেই যেন 'ক্ষুদ্র' মনে হয়। সুবর্ণকে কিছুতেই সত্যি 'অসতী মেয়েমানুষ' ভাবা যায় না। ও যেন আপন মহিমায় মাথা খাড়া করে দাঁড়িয়ে থাকে। তখন নিজেকে সমর্থন করতে কৌশল করতে বসা ছাড়া আর কি করা যায়?

তা' এবার সুবিধে আছে।

বাড়িতে কেউ নেই।

অত বড় বাড়িটায় শুধু তো আরা চার ভাই। আর গিয়ে পড়বে শুধু প্রবোধেরই নিজ পরিবারটুকু। অতএব—

কিন্তু হায় প্রবোধের কপাল!

একবেলার জন্যে ঘুরে এসে দেখলো কি না পরিস্থিতি বিপরীত! বাড়ি লোকে লোকারণ্য।

গুরুবাড়ি থেকে মুক্তকেশী এসে গেছেন নাতনীকে নিয়ে, বোনের বাড়ি থেকে উমাশশী এসে গেছে দশ ছেলে-মেয়ে নিয়ে।

প্রভাসের বৌ এসে গেছে নিজস্ব বাহিনী নিয়ে।

তা' তার জন্যেই মুক্তকেশীর আসার সুবিধে। সে ছিল কাটোয়ায় পিসির বাড়ি। শাশুড়ী রয়েছেন নবদ্বীপে, এই সুবিধেয় পিসির সঙ্গে গিয়েছিল শ্রীপাট দেখতে। মুক্তকেশী এমন সুযোগ ছাড়লেন না, ওকে ধরে বসে বললেন, 'আর দীর্ঘকাল পরের বাড়ি বাসে কাজ নেই সেজবৌমা, চলো চলে যাই। রোগ-বালাই কিছু চিরকাল থাকছে না। আর সব কথার সার কথা রাখে কেষ্ট মারে কে?'

সেজবৌ সুবর্ণলতা নয়।

সেজবৌ শাশুড়ীর মুখের উপর বলে বসলো না, 'তা সেই সার কথাটাই তো জানাই ছিল মা আপনার, তবে এতবড় সংসারটাকে নিয়ে সাত ছরকোট করলেন কেন?'

বললো না। বলতে জানলেও বলতো না।

কারণ সেজবৌও বাঁচলো।

অধিক দিন যে পরের বাড়ি বাস সুবিধের নয়, সে কথাটা সেও বুঝে ফেলেছে।

অতএব সেই যাত্রাতেই কলকাতার ট্রেনে চেপে বসা! পুরুষ অভিভাবক হিসেবে পিসির ছেলে এল সঙ্গে! বছর ষোলর ছেলেটা, তা' হোক পুরুষ তো বটে!

পাকে-চক্রে, অথবা প্রবোধের গ্রহের ফেরে; ক্রুদ্ধ অভিমানাহত দিদির নির্দেশে উমাশশীও সেই দিনই চলে এসেছে দিদির বাড়ি থেকে। এরা সকালে, ও বিকেলে।

তার মানে বৌ নিয়ে নির্জন গৃহ-বাসের রোমাঞ্চময়—কল্পনাটা ভূমিসাৎ হয়ে গেল প্রবোধের। একা বাড়িতে গলা খুলে উপদেশ আদেশ দিয়ে দিয়ে বৌকে গড়ে পিঠে নতুনভাবে তৈরি করে নেবার স্বপ্ন গেল ভেঙে। অবস্থাটা পর্যবেক্ষণ করেই, মনে মনে সংসার-পরিজন সকলের সম্পর্কে একটা কটূক্তি করে বাড়ি থেকে বেরিয়ে গেল সে।

আর আজ সুবর্ণর মত তারও মনে হয়, বাড়িতে বড় বেশি লোক! এত লোকের চাপে সত্যিই নিজের আর কিছু খোলে না। অথচ সুবর্ণ যখন, দুমদাম করে বলে বসে, 'বাবাঃ, এ বাড়িতে মানুষ আর মানুষের বুদ্ধি খেলাবে কোথা থেকে, বৃথা গজালি করতে করতেই দিন রাত্তির কেটে যায়।' তখন প্রবোধ তাকে 'একালষেঁড়ে' 'আত্মসুখী' বলে গঞ্জনা দিয়েছে।

এখন মনে হচ্ছে বাস্তবিক এত লোকের চাপে নিজের মাহাত্ম্য ফোটানো যায় না কোথাও। মনে হচ্ছে—সেই রাত

দুপুরের আগে আর সুবর্ণর সঙ্গে মোকাবিলার উপায় নেই।

দূর, শালার সংসারের নিকুচি। বেশ আছে জগুদা! তারপরেই মনে হয় মামীর বাড়িতে খবর দেওয়া আবশ্যক।

সেই দিকেই পা চালায়।

সুবর্ণও প্রথমটা এসে হতচকিত হয়ে গিয়েছিল বৈকি। এসে যে বাড়ি এমন গুলজার দেখবে সে ধারণা ছিল না। তবে চাঁপাকে দেখে ভাল লাগল। আবার দেখে চোখে জল এল। কী হাল হয়েছে মেয়েটার। অথচ এরা! বড় জায়ের ছেলে মেয়েরা। পিসির ভাত খেয়ে, বলতে নেই দিব্যি হয়ে উঠেছে।

রোগা হয়ে যাওয়ার কথা তোলে না।

কে বলতে পারে সেই কথায় কত কথা হবে। তোলে রঙের কথা। বলে,'কী রং হয়েছে রে তোর চাঁপা? একেবারে যে কালি-ঝুল! গঙ্গার জলে নেয়ে নেয়ে চুলগুলোও তো গেছে।'

কথাটা মিথ্যা নয়।

মুক্তকেশী নিজেই পঞ্চাশবার এ আক্ষেপ করেছেন, কিন্তু এখন সহসা চাঁপার মায়ের মুখের আক্ষেপবাণীতে অপমান বোধ করেন। যেন এই রং আর চুলের খর্বতার সঙ্গে মুক্তকেশীর ত্রুটির কথা নিহিত আছে।

অথচ অস্বীকার করে উড়িয়ে দেওয়া যায় না, চুলের কথা বাদ দিলেও মেয়েটা শুধু কালো ঝুলই হয় নি রোগা দড়িও হয়ে গেছে। আর সেটা আরো বেশি চোখে পড়ছে উমাশশীর ছেলে-মেয়েগুলোর স্বাস্থ্যের লক্ষণীয় উন্নতির পাশে।

মাসীর বাড়ি থেকে এত গোলগাল হয়ে আসা কেন! এটা যেন মুক্তকেশীকেই অপমান করা!

অপমানের দাহে জ্বলতে জ্বলতে এক সময় শোধ নেন।

একটা নাতনীকে ডেকে বলে বসেন, বড়লোক মাসীর বাড়ি গিয়ে খুব আদেখলার মত খেয়েছিলি কেমন।'

নাতিকে বলবেন না, 'নজর' লাগবে। মেয়ে সন্তানে 'নজর' লাগে না।

মেয়েটা থতমত খেয়ে বলে, 'বাঃ আমরা বুঝি চেয়ে খেয়েছি?'

'চেয়ে খেয়েছিস কি মেগে খেয়েছিস তা' জানি নে তবে খেয়েছিস তা' মালুম হচ্ছে। তা' হঠাৎ চলে এলি যে? আরো থাকলেই পারতিস? ইস্কুল-মিস্কুল তো খোলে নি ভাইদের!'

'ভাইদেরই! কারণ ওদের ইস্কুলের বালাই নেই। মেয়েমানুষের পড়ার ওপর দস্তুরমত খাপ্পা মুক্তকেশী। মেয়েরা লেখাপড়া শিখলে বাচাল আর ম্লেচ্ছ ভাষা শিখলে বিধবা হয়, এটা যে অবধারিত, তা' তাঁর জানা আছে।

তবু চাঁপাকে সুবর্ণ জবরদস্তি করে পড়ায়, কিন্তু চাঁপা আর এ পর্যন্ত 'কথামালা' ছাড়িয়ে 'বোধোদয়ে উঠল না। বরং চন্ননটা দাদা-দিদির বই টেনে টেনে নিজেই দিব্যি পড়তে শিখে গেছে। সেজমেয়ে পারুলটাও দুলে দুলে পড়া মুখস্থর ভান করে। কাকারা ওদের ঘরের দৃশ্য দেখতে পেলে বলে, 'মেজগিন্নীর পাঠশালা!'

কিন্তু সে যাক, উমাশশীর মেয়ে মোটা হওয়ার অপরাধে ধিক্কার খেয়ে অপ্রতিভ গলায় বলে, 'নাই বা খুললো! কুটুমবাড়িতে কত দিন থাকা হবে?'

'থাকলেই বা! বড়মানুষ কুটুমবাড়ি! তোর মা তো বোনের সংসারের গপ্পো করতে করতে দিশেহারা হচ্ছে।'

হঠাৎ মেয়েটা অবিশ্বাস্য দুঃসাহসে বলে ওঠে, 'হবে না কেন? তোমার মতন তো ওখানে কেউ রাতদিন খিট্‌খিট্‌ করে না।'

মুক্তকেশী স্তম্ভিত হয়ে যান।

মুক্তকেশী যেন আপন ভবিষ্যতের অন্ধকার ছবি দেখতে পান। মানবে না, আর কেউ মানবে না, মনে হচ্ছে মান সম্মানের দিন শেষ হয়ে এল! একজন চোপা করলেই সবাই সাহস পাবে।

এইটি করলো মেজবৌমা!

দুঃসাহস ঢোকালো সবাইয়ের মধ্যে!

মেজবৌমাই দেখালো গুরুজনের মুখে মুখে কথা কয়েও পার পাওয়া যায়।

মুক্তকেশীর তবে গতি কি?

মাসতুতো বোন হেমের মতন 'পাশঠেলা' বুড়ি হয়ে পড়ে থাকবেন?

হেমের দুর্দশা তো নিজের চক্ষে দেখে আসছেন ওই একটা বৌ থেকেই তো শনি ঢুকলো!

কিন্তু মুক্তকেশী কি এখনি হার মানবেন?

মুক্তকেশী আর একবার শক্ত হাতে হাল ধরবার চেষ্টা করবেন না?

করেন।

অতএব সেই মেজবৌমাকেই নিয়ে পড়েন।

'বলি মেজবৌমা, পেবা নয় বেটাছেলে, এত কথা জানে না। তুমি কি বলে চলে এলে? তুমি জানো না 'আটে কাঠে' চড়তে নেই? এটা তোমার আট মাস পড়েছে না?'

সুবর্ণ এতক্ষণ বড় এবং সেজ জায়েদের সঙ্গে নিজ নিজ অভিজ্ঞতার গল্প করছিল, এবং বলতে কি মনটা একটু ভালই ছিল। চাঁপা 'নেটিপেটি' হয়ে গায়ের কাছে বসেছিল, আর ঠাকুমার গুরুবাড়ির সম্পর্কেও ভাল-মন্দ গল্প তুলে হাসছিল। মোট কথা একা বাড়িতে এসে পড়ার থেকে, এই জনারণ্য তার পক্ষে ভালই হয়েছিল।

কিন্তু শাশুড়ীর এই গায়ে পড়ে অপদস্থ করায় চাপা-পড়া-আগুন জ্বলে উঠল এবং কঠিন গলায় বলে উঠল, জানব না কেন মা? তবে সেই আদিখ্যেতা করতে গিয়ে কি কুটুমবাড়িতে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে জুতো খাব?'

'জুতো!'

মুক্তকেশী বলে ওঠেন, 'তুমি খাবে জুতো? গলবস্ত্র জোড়হস্ত সোয়ামীকেই তো ফি হাত জুতো মেরে তবে কথা কইছ মেজবৌমা? তাকে বলতে পারলে না এখন যাওয়া চলবে না? সুবালাও তো বুড়োমাগী, সে জানে না?'

সুবর্ণ তীব্রস্বরে বলে, 'সবাই সব জানে মা, শুধু আপনিই আপনার ছেলেকে জানেন না। তবে 'আটে কাঠে' চড়ে যদি কিছু বিপদ ঘটে তো বুঝবো সেটা আমার পুণ্যফল।'

'পুণ্যফল! বিপদ ঘটলে তোমার পুণ্যফল!' মুক্তকেশী যেন অসহ্য ক্রোধে এলিয়ে পড়েন; 'মেজবৌমা তুমি না মা?'

'মা বলেই তো বলছি মা' সুবর্ণ খুব শান্ত গলায় বলে, 'তবু তো পৃথিবীতে একটা হতভাগাও কমবে।'

'হতভাগা!' মুক্তকেশী এবার স্বক্ষেত্রে আসেন। বলেন, 'তা' বটে! তোমার মতন মায়ের গর্ভে যে জন্মাতে এসেছে, তাকে হতভাগাই বলতে হবে!'

'তা সেই কথাই তো আমিও বলছি

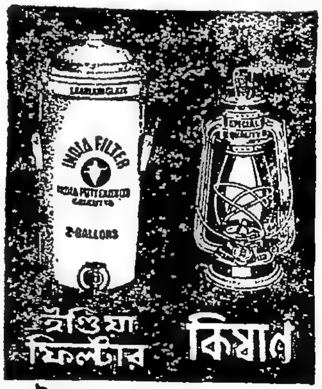

গৌর মোহন দাস এণ্ড কোং
২৩৩, ওল্ড চীনা বাজার স্ট্রীট
কলিকাতা-১
ফোন: ২২-৬৫৮০

মা! কেনা বাঁদীর পেটের সন্তান হতভাগ্য ছাড়া আর কি?'

চলে যায় সেখান থেকে।

আর গল্পের আসরে গিয়ে যোগ দেয় না, চলে যায় নিজের ঘরে। আর দড়ি বাঁধা বাঁধা সেই পুরনো পত্রিকাগুলো টেনে নিয়ে বাঁধন খোলে।

হঠাৎ চোখে পড়ে একটা পত্রিকার খাঁজে ভাঁজকরা রয়েছে সেই কবিতার পৃষ্ঠা দুটো! তার সঙ্গে আলাদা একটা টুকরো! যেটুকু হারিয়ে গিয়েছিল!

সুবর্ণর অজ্ঞাতসারে সুবর্ণর চোখ দিয়ে বড় বড় ফোঁটায় জল গড়িয়ে পড়ে।

সুবর্ণর জন্যেও পৃথিবীতে শ্রদ্ধা আছে, সম্মান আছে, প্রীতি আছে। নির্মল ভালবাসার স্পর্শ আছে। তবে পৃথিবীর উপর একেবারে বিশ্বাস হারাবে কেন সুবর্ণ? কেন একেবারে হতাশ হবে? সুবর্ণর গর্ভজাত সন্তানদের কি 'মানুষের' পরিচয় দিতে পারবে না সুবর্ণ? যে মানুষ পৃথিবীর উপর বিশ্বাস ফিরিয়ে আনতে পারে, আশা ফিরিয়ে আনতে পারে, তেমন মানুষ?

কিন্তু সে কি এই পরিবেশে সম্ভব?

জলের ফোঁটাগুলো গড়িয়ে পড়ে আবার শুকিয়ে যায়, বইগুলো ওল্টাতে থাকে সুবর্ণ।

টের পায়না তখন—ওর জায়েরা ভাঙা গল্প জোড়া দিয়ে আবার জমিয়ে বসে হেসে হেসে বলছে, 'ওর পেটের সন্তান হতভাগা? বাবা, ভাগ্যবন্ত তা' হলে কে? বলে ওঁর ছেলে-মেয়ের আদর দেখলে—'

যত্নকেই আদর বলে ওরা।

কান্না! কান্না!

কটু কুৎসিত কদর্য কান্না!

শুনলে করুণা আসে না, মায়া আসে না, আসে বিতৃষ্ণা।

গিরিবালা পোস্ত বাটতে বাটতে বলে, 'মেজদির এই শেষ নম্বরেরটি যা হয়েছে উঃ! গলা বটে একখানি! মানুষের ছা কাঁদছে কি জন্তুজানোয়ার চেঁচাচ্ছে—বোঝবার জো নেই।'

'জন্মাবধি রুগ্ন যে—' বলে উমাশশী।

'তুমি আর জগৎসুদ্ধ সবাইয়ের দোষ ঢেকে বেড়িও না দিদি,' গিরিবালা ঠেশ দিয়ে বলে, 'কে যে তোমায় কি দিয়ে রাজা করে দিচ্ছে, তুমিই জানো!'

'দোষ ঢাকা আবার কি!' উমা অপ্রতিভ হয়, 'রুগ্ন তাই বলছি।'

গিরিবালা কাজ সেরে শিল তুলে রাখতে রাখতে বলে, 'আমার এই হয়ে গেল বাবা, চললাম এবার। উনুন দুটো তো জ্বলে-পুড়ে খাক হয়ে গেল, যার পালা তার হুঁশ নেই!'

উমার ধারণা ছিল এবেলার পালাটা আজ ছোটবৌয়ের তাই বলে 'কোথায় ছোটবৌ'

'ছোটবৌ? কেন ছোটবৌ কি করবে? পালা তো মেজদির!'

'ও মা সে কি! আজ বুধবার না?'

'বুধবারই! কিন্তু গেল হপ্তায় ছোটবৌয়ের বাপেরবাড়ি যাবার গোলমালে পালা বদলে গেল না?'

উমাশশী বড়ো, উমাশশী নির্বোধ, উমাশশী গরীবের মেয়ে। আবার উমাশশী কিছুটা প্রশংসার কাঙালও। তাই উমাশশী একাই সংসারের অর্ধেক কাজ করে।

প্রতিদিন সকালে এই রাবণের গোষ্ঠীর রান্না সে একাই চালায়। আর তিনজনে পালা করে বিকেলে।

সুবর্ণ অনেকবার প্রস্তাব করেছে একটা রাঁধুনী রাখবার। মাইনে সে একলাই দেবে। একটা ভদ্র বামুনের ঘরের আধাবয়সী বিধবা খুঁজলে না মেলে তা' নয়। কিন্তু উমাশশী শাশুড়ীর 'সুয়ো' হতে সে প্রস্তাব নাকচ করেছে। বলেছে, 'ও মা আমরা হাত-পা নিয়ে বসে থাকবো, আর বামনীতে রাঁধবে? ছিঃ।'

সুবর্ণ বলেছে, 'তবে মরো রেঁধে রেঁধে! আমার দ্বারা তো একদিনও সকালে সম্ভব নয়। ওদের লেখাপড়া তা' হলে শিকেয় উঠবে।'

উমা বিগলিত স্নেহে বলেছে, 'ওমা আমি থাকতে সকালবেলা আবার তোরা কেন? সকালবেলা তো আমিই—'

'জানি, তুমিই চালাচ্ছো! হাড়-মাস পিষছো। কিন্তু সেটা বারোমাস দেখতেও ভাল লাগে না। তোমার মেজদ্যাওর তো করছে বেশি বেশি রোজগার, দেবে অখন মাইনেটা—'

উমাশশীই 'না না' করেছে।

অতএব সুবর্ণর আর বিবেকের দংশন নেই। কিন্তু কে বলবে কেন উমাশশীর এমন বোকামী! কেন সে অবিরত সংসারের সকলের মন রাখার চেষ্টা করে মরে? মন কি সত্যিই কারো রাখতে পেরেছে?

মন রেখে রেখে কি কখনো কারো 'মন রাখা' যায়?

যায় না।

শুধু সেই মনের দাবি আর প্রত্যাশা বাড়িয়ে দেওয়া হয় মাত্র। আর সেই ব্যর্থ চেষ্টা অবিরতই তাকে অবজ্ঞেয় করে তোলে।

উমাশশীও বৃথা চেষ্টার বোঝা চাপিয়ে চাপিয়ে জীবনটাকে শুধু ভারাক্রান্তই করে তুলেছে, মন কারো রাখতে পারে নি। মুক্তকেশী সর্বদাই তার উপর ব্যাজার! মুক্তকেশী তোয়াজ করেন উকিল ছেলের বৌকে!

কেন করেন সেটাই আশ্চর্য!

এও এক মনস্তত্ত্ব।

নচেৎ টাকার স্বচ্ছলতা যদি কেউ তাঁকে দেয়, সে তো মেজছেলে। তবু সেজবৌকে ভয় করেন, তোয়াজ করেন।

ছোঁয়াচ লাগার মত উমাশশীও করে। তাই ভয়ে ভয়ে বলে, মেজবৌয়ের মেয়ে আজ যা কান্ড করছে, ও আর পেরেছে!

'না পারেন; যে পারে করুক। আমি বাবা উনুনের ছায়াও মাড়াচ্ছি না। আমার পালার দিনে কি কেউ হাঁড়ি ধরতে আসবে?' বলে 'দুম দুম' করে চলে যায় গিরিবালা!

সুবর্ণ নামে না।

খবরটা দোতলায় ছড়িয়ে পড়ে, অসন্তোষ আর সমালোচনার কলগুঞ্জন প্রবল হয়ে ওঠে। এবং সব ছাপিয়ে প্রবলতর হয়ে ওঠে, কান্না!

কান্না কান্না, কুৎসিত কান্না—।

ওই আর্তনাদ যেন এই অন্ধকূপ থেকে আকাশে উঠতে চায়।

'বাড়িতে কি হচ্ছে কি?' তীব্র চীৎকার শোনা যায় প্রভাসচন্দ্রের। তাসের আড্ডা থেকে উঠে এসেছে লজ্জায় আর বিরক্তিতে। মেজাজ তাই সপ্তমে।

'বলি, কাঁদছে কোনটা? মেজবৌয়ের শেষ নম্বরেরটা না? মেজবৌ বাড়ি নেই না কি?'

বাড়ি!

থাকবেন না আবার কেন!

বাড়ি ছেড়ে আবার যাবেন কোথায়?

মেয়ে কোলে নিয়েই বসে আছেন।

'কোলে নিয়েই বসে আছেন ? প্রভাস বিরক্তির সব বিষটা উপুড় করে দিয়ে চলে যান, 'তবু গলা বন্ধ করতে পারছেন না? মেয়ের গলার এমন শাঁখের বাদ্যি? মুখে একমুঠো নুন দিতে বল, বন্ধ হয়ে যাবে!'

চলে যান।

ঈশ্বরের দয়া সুবর্ণলতার কানে পৌঁছয় না এই হিত পরামর্শটুকু! সুবর্ণলতার কানের পর্দা কান্নার শব্দে ফেটে যাচ্ছে তখন।

ওদিকে রান্নাঘরে ঝড় উঠেছে।

উমাশশীই হাঁড়ি চড়াবার ভার নিচ্ছিল, প্রবল প্রতিবাদ উঠেছে সেজবৌ আর ছোটবৌয়ের পক্ষ থেকে। সুবর্ণকেই বা এত আস্কারা দেবে কেন উমাশশী? যার পাঁচ-সাতটা ছেলে-মেয়ে, তার ঘরে তো নিত্যি রোগ লেগে থাকবেই, তাই বলে ওই ছুতোয় সে দিব্যি পার পেয়ে যাবে?

কই বলুক দিকি কেউ সেজবৌ

ছোটবৌ কোনোদিন 'পালা' ফাঁকি দিয়েছে! তার নিজের ঘর হেজে যাক মজে যাক, তবু সংসারের কাজ 'বাজিয়ে' দিয়ে চলে গেছে। মেজগিন্নীই বা কি এমন সাপের পাঁচ পা দেখেছে যে ইচ্ছেমত চলবে?

উমাশশী যদি এইভাবে এক চোখোমি করে, তারাও ছেলের সর্দিটি হলেই কাজে কামাই দেবে, এই হচ্ছে শেষ কথা!

উমা ভয়ে ভয়ে হাঁড়িখানাকে তাক থেকে নামিয়ে, চালের গামলা হাতে নিয়ে কিংকর্তব্যবিমূঢ় অবস্থায় দাঁড়িয়ে আছে। জোর করে কর্তব্য করবার সাহসও তার নেই!

একথা বলবার সাহস নেই, 'তোমাদের তো কর্তে হচ্ছে না বাপু তবে অত গাত্রের জ্বালা কেন?

কিন্তু কেন যে গায়ের জ্বালা সে-কথার উত্তর কি নিজেরাই জানে ওরা?

যেখানে 'ছোট কথা' ছাড়া আর কোনো কথার চাষ হয় না, সেখানে 'বড় কথা', 'মহৎ কথা' তারা পাবে কোথায়? ছোট কথাই জ্বালার জনক।

'মেয়ে নিয়ে ঘরে বসে সোহাগ হচ্ছে? তোমার না আজ রান্নার পালা?'

ঘরের মধ্যে যেন হাতুড়ির ঘায়ের মত একটা হুমকি এসে পড়ে!

নিরবচ্ছিন্ন ক্রন্দনে শক্ত হয়ে যাওয়া মেয়েটাকে চুপ করাবার বৃথা চেষ্টায় নিজেই কাঁদো কাঁদো হচ্ছিল সুবর্ণ, এ শব্দে চমকে পিছন ফিরে তাকায়। তার পরই অগ্রাহ্যভরে মুখটা ফিরিয়ে নিয়ে বলে, 'পালা বজায় রাখতে যাবার মত অবস্থা যে!'

এই মাত্র নীচে বহুবিধ বিরুদ্ধ সমালোচনা শুনে এসে প্রবোধচন্দ্রেরও মেজাজ খাপ্পা, তাই ক্রুদ্ধস্বরে বলে, 'তোমার অবস্থা অপরে শুনবে কেন শুনি? ফেলে রেখে দিয়ে চলে যাও। মেয়ে নিয়ে এত আদিখ্যেতা!'

সুবর্ণলতা তেমনি অগ্রাহ্যের গলায় বলে, 'কার কাছে ফেলে রেখে যাবো শুনি? তুমি সামলাবে?'

'আমি? আমি সামলাতে বসবো তোমার ওই গুণধরী মেয়েকে? আমায় তো ভূতে পায় নি।'

'আমার মেয়ে। একা আমার মেয়ে। সামলাতে ভূতে পায় তোমার? বলতে লজ্জা করল না?' উগ্রমূর্তি সুবর্ণলতা উঠে বসে, 'আর যদি এ ধরণের কথা বল, মান-মর্যাদা রাখবো না বলে দিচ্ছি!'

প্রবোধ এ মূর্তিকে ভয় পায়।

তত্রাচ ভয় পাওয়াটা প্রকাশ করে না। বলে, 'ওঃ মান-মর্যাদা রেখে তো উল্টে যাচ্ছ! এখন যাও নিজের মান বজায় রাখো তো, পালাটা সেরে দিয়ে এসো!'

'আমার মান এমন ঠুনকো নয় যে তাকে বজায় রাখতে পিশাচী হতে হবে!'

মেয়ে নিয়ে শুয়ে পড়ে সুবর্ণ!

ভঙ্গীতে অবহেলা অবজ্ঞা।

প্রবোধচন্দ্রের গায়ের রক্ত ফুটে ওঠে, তীব্রস্বরে বলে, 'শুলে যে? ইয়ার্কি পেয়েছ না কি? রোজ রোজ তোমার ভাগের কাজই বা অন্যে করে দেবে কেন শুনি? যাও উঠে যাও। একটু কাঁদলে মেয়ে মরে যাবে না।'

সুবর্ণলতা তথাপি ওঠে না।

শুয়ে শুয়েই বলে, 'একটা রাত না খেলেও কেউ মরে যাবে না।'

না খেয়ে!

এ কী সাংঘাতিক শব্দ!

তার মানে উঠবে না। শক্ত পাথর মেয়েমানুষ!

অতএব অন্য সুর ধরতে হয় প্রবোধকে। নরম সুর।

'পাঁচজনে পাঁচ কথা বলবে, গায়ে পেতে নেবেই বা কেন? এতে তোমার লজ্জা হয় না?

সুবর্ণ আবার উঠে বসে।

উঠে দৃঢ়কণ্ঠে বলে, 'না হয় না! আমার লজ্জা-সরমের জ্ঞানটা তোমাদের সঙ্গে মেলে না। আমার কাছে তার চাইতে অনেক বেশি লজ্জার, নিন্দুকের মুখের দুটো 'কথা' শোনার ভয়ে রুগ্ন সন্তানের দুর্দশা করা! যারা অমন করে, তারা মা নয় শয়তান, মা নয় পিশাচী!

'তারা শয়তান! তারা পিশাচী?'

'নিশ্চয়! শয়তান স্বার্থপর মহা পাতকী!'

'তোমার সবই সৃষ্টিছাড়া!'

'হ্যাঁ আমার সবই সৃষ্টিছাড়া! কী করবে? ফাঁসি দেবে?'

'আমি বলছি তুমি যাও, মেয়ে আমি দেখছি—'

'না!'

না, সুবর্ণ সেদিন রাঁধতে নামে নি।

উমাশশীই রেঁধেছিল শেষ পর্যন্ত।

আর আশ্চর্য, বাড়ি সুদ্ধ সবাইকে তাক লাগিয়ে দিয়ে নেমে এসে অম্লান বদনে সেই ভাত খেয়ে গিয়েছিল সুবর্ণ! ডাকতে পর্যন্ত হয় নি, হঠাৎ এক সময় রান্নাঘরে এসে জল-কাদার উপর মাটিতেই ধপাস করে বসে পড়ে বলেছে, 'এইবেলা আমায় চারটি দিয়ে দাও তো দিদি! অনেক কষ্টে ঘুম পাড়িয়েছি।'

এতবড় বেহায়া মেয়েমানুষ, তবু মুক্তকেশী আশা করছিলেন, 'আজ হয়তো সকালবেলার রান্নার ভারটা মেজ গিন্নী নেবে। কিন্তু সে আশা ফলবতী হল না।

সকালবেলায় দেখা গেল মেয়েটার গায়ে ঘাম বেরিয়েছে।

কান্নার হদিস পাওয়া গেল।

এবং রান্নার ভরসাও গেল।

একদিন আধদিন নয়? এখন অনেক দিন।......

দেশ সেবায় নিয়োজিত,

এ্যালবার্ট ডেভিড লিমিটেড

কলিকাতা—৫০

নীতি ও বিজ্ঞানানুযায়ী ঔষধ
প্রস্তুতকরণের অগ্রণী

—ব্রাঞ্চ সমূহ—

বোম্বে - মাদ্রাজ - দিল্লী - নাগপুর
বেজওয়াডা - শ্রীনগর - গৌহাটী

১৯৬৬

সন্দীপা ভাদুড়ী

উনিশ শ ছেষট্টি সাল মিথ্যা হবে নাকি ইতিহাসে?
চারিদিকে অকস্মাৎ মানুষের পুঞ্জীভূত ক্রোধ
যেন অগ্ন্যুদ্গার করে বাঁচার সংগ্রামে। প্রতিরোধ
কে করবে? তবু নীল সমুদ্রের ফেনার উচ্ছ্বাসে
নিভলে আগুন—তারা ফিরে যায় যদিও হতাশে,
জানে তারা নিতে হয় কিভাবে দ্বিগুণ প্রতিশোধ!
আবার হঠাৎ জাগে ঘুমন্ত আগ্নেয়গিরি। খোদ
ঈশ্বর তখন নিজে দিন গোণে একা রুদ্ধশ্বাসে।

তারপর অন্য দিন সুরু হয়। নতুন সকাল।
রাখাল বালক যায় পুনরায় গোচারণ মাঠে।
চিমনিতে ধোঁয়া ওঠে। মাঠে মাঠে ট্রাক্টরের কাল।
অঋণী চাকুরিজীবী হেঁটে যায় আনন্দিত হাটে।
আর যেন সেইদিন শোনা যায় ইতিহাস-পাঠে
উনিশ শ ছেষট্টি সাল প্রারম্ভিক প্রাগ্রসর কাল।

বৃক্ষ-প্রেম ছায়া ভালোবাসা

মনোরঞ্জন চট্টোপাধ্যায়

সমস্ত বিশ্বাস-প্রেম-শব্দ ভালোবাসাকে তুমি গুঁড়িয়ে দিচ্ছো
কঠিন দু'হাতে। জলের গভীরে কেন ছায়া নামে—
অস্পষ্ট ধূসর ছায়া—
হেঁটে যাচ্ছে নির্জনতা চিরে, হেঁটে যাচ্ছে সমস্ত প্রান্তর
নদ-নদী। চিহ্ন কোনো রাখবে না ছায়ারাও ছায়ার গভীরে;
অন্ধকারে মুখ ঘসে ঘসে ঈশ্বর দেয়ালে কাঁপছে,
শোকের মিছিল ধরে পথ হেঁটে যাওয়ার চেয়ে—
ঢের ভালো নদীর উৎসে কিংবা বৃক্ষমূলে যাওয়া।
দেখা যাবে কি আশ্চর্য নাভিশ্বাস উঠছে সেখানে।
সমস্ত বৃক্ষের সংসার জুড়ে শোকের উৎসব চলছে,
ক্রমশ শুকিয়ে যাচ্ছে মাটি। ওরা—ওরা কারা জড়ো হয়ে
ক্লান্ত দেহে কথা বলছে বৃক্ষের ছায়ায় এসে রাত্রির গভীরে।
নিশ্বাসে ক্রমশ আমরা ফেটে পড়ছি, ফেটে
পড়ছি শোকের উৎসবে
নিশ্বাসে ক্রমশ আমরা ফেটে পড়ছি, ফেটে পড়ছি
শোকের উৎসবে।
অন্ধকারে মুখ রেখে শোকের মিছিল ধরে আমরা কেউ পথ
হাঁটবো না।
বৃক্ষ-প্রেম-ছায়া ভালোবাসা আমরা কিন্তু কিছুই নেবো না।

বলবার কিছু নেই। এ রোগ কারো হাতধরা নয়।

কিছু নেই।

তবু বলাবলি হয়। সকলের মধ্যেই হয়।

কিন্তু সেই বলার মুখে এক প্রকাণ্ড পাথর পড়লো। বেলা বারোটা নাগাদ জগু এসে হাজির হলো, একটা আধা-বয়সী বিধবা বামনী সঙ্গে নিয়ে।

'কই গো পিসি, এই নাও, তোমার রাঁধুনী। কি করতে-টরতে হবে দেখিয়ে শুনিয়ে দাও! মা বলেছে কাজকর্ম ভাল হবে।'

মুক্তকেশী অবাক গলায় বলেন, 'রাঁধুনী আনতে হুকুম করলো কে তোকে?'

জগু মেয়েলী ভঙ্গীতে বলে ওঠে, 'শোন কথা! তোমার নিজের ব্যাটাই তো বলে এলো গো! মেজ পুত্তুর! বললো, মেজবোমার খুকীর হাম বেরিয়েছে, ওদিকে বড়বোমার খেটে খেটে জান নিকলোচ্ছে, সংসারের অচল অবস্থা, রান্নাবান্নার জন্যে একটি বামুনের মেয়ে চাই। তোমার দেখি সাত কাণ্ড রামায়ণ শুনে সীতা কার পিতা!'

মুক্তকেশী একবার জ্বলন্ত দৃষ্টিতে মেজবৌয়ের ঘরের দিকে দৃষ্টিপাত করে বলেন, 'বুঝেছি। কামরূপ কামিখ্যের ভেড়াটা ছাড়া এ কাজ আর কার হবে। তবে আমি এখনো মরি নি জগা, আমার জীবদ্দশায় রাঁধুনী ঢুকতে দেবু না বাড়িতে।'

জগা বীরদর্পে বলে, 'দেবে না? বললেই হল? তুমি ওদের আঁশ-হাঁড়ি নাড়বে?'

'আমি? আমার মরণ নেই?'

'তবে?'

'যারা করবার তারাই করবে! লোকের আমার দরকার নেই জগা! মিথ্যে বামুনের মেয়েকে আশা দিয়ে নিয়ে এসে নৈরাশ করা!'

জগু যে জগু, সেও এ পরিস্থিতিতে থতমত খায়।

অনুরোধ মাত্র লোক জুটিয়ে আনার মহিমায় উৎফুল্ল হচ্ছিল, কিন্তু এ কী?

বোকার মত বলে, 'তাহলে বলছো দরকার নেই?'

মুক্তকেশী সেই কথাই বলতে যাচ্ছিলেন, কিন্তু বলা হয় না। সহসা সেই ভর দুপুরে শুকনো আকাশ থেকে বজ্রপাত হয়।

সেই বজ্রে ধ্বংস হয়ে যায় সভ্যতা, ভব্যতা, সামাজিক নিয়ম নীতি।

আর ধ্বংস হয়ে যায় মুক্তকেশীর পদ-মর্যাদার মহিমা।

হঠাৎ দরজার ওদিক থেকে সুবর্ণর পরিষ্কার গলার দ্বিধাহীন ভাষা উচ্চারিত হয়, 'আছে দরকার! মা ভাসুরঠাকুরকে বলে দিন যেন রেখে যান ওঁকে।'

মুক্তকেশী স্তম্ভিত বিস্ময়ে বলেন, 'আছে দরকার! রেখে যাবে? আমি মানা করছি, তার ওপর তুমি এলে হুকুম চালাতে!'

'হুকুম চালাচালির কথা নয় মা।

অবুঝের মতন রাগ করলে তো চলবে না। দিদি একা আর কত দিক দেখবে। বামুনের মেয়ের কথা আমি বলে পাঠিয়েছি বামুনদি তুমি এসো তো এদিকে—'

'জীতা রহো!' চেঁচিয়ে ওঠে মুখ্যু জগু, 'এই তো চাই। আমার পিসিটির এই রকম শিক্ষারই দরকার ছিল!

মুক্তকেশীর সংসারে যুগ প্রলয় ঘটে।

মুক্তকেশীর কলমের উপর নতুন কলম চলে।...মুক্তকেশীর সংসারে মাইনেকরা রাঁধুনী ঢোকে!

এ যেন অনিবার্য অমোঘের একটা চিহ্ন!

তা বোধকরি এই প্রথম বিন্দু আর গিরিবালা সুবর্ণলতার তেজ আসপর্দার সমালোচনা না করে তার উপর প্রসন্ন হয়।

শুধু উমাশশীরই মনে হয় সে যেন সর্বহারা হয়ে গেছে!

রান্নাঘর থেকে চ্যুত হলে কিসের দামে বিকোবে উমাশশী? মূল্যহারা এই দিনগুলোকে নিয়ে করবে কি?

যখন তখন—চোখে জল আসে তার!

আর বামুনদির পায়ে পায়ে ঘোরে তার সাহায্যার্থে!

তবু তো বোঝা যাবে কিছুটা প্রয়োজন আছে উমাশশীর।

সুবর্ণলতার মত সে নিজের উপস্থিতির জোরেই নিজেকে মূল্যবান ভাবতে পারে না।

[ক্রমশঃ]

অস্ট্রেলিয়া থেকে লিখছি

সুরেশচন্দ্র সাহা

উলাউরার মেষচারণে

রবার্ট টাউন্‌স্‌ ছিল ইংলণ্ডের এক দরিদ্র বালকের নাম। মাত্র এগার বছর বয়সে জাহাজের নাবিক হয়ে রবার্ট দেশের বাইরে আসেন। ষোল বছর বয়সে ক্যাপটেনের পদে উন্নীত হন। ১৮১৪ সালে যখন তাঁর বয়স বিশ বছর, নিজে তখন তিনি একটি জাহাজের মালিক। ইংলণ্ড আর অস্ট্রেলিয়ার মধ্যে কনভিক্‌ট পারাপার ছিল তাঁর কাজ। টাউন্‌স্‌ নামের স্মৃতি জড়িয়ে আছে আজ টাউন্‌স্‌ভিল বন্দরে। টাউন্‌স্‌ভিল অস্ট্রেলিয়ার পশম মাংস রপ্তানীর অন্যতম বন্দর।

লণ্ডনে জাহাজ ভিড়িয়েই যুবক টাউন্‌স্‌ অস্ট্রেলিয়ার পশম মাংসের গল্প করতেন। সবাই তাঁর গল্প শুনত শুধু গল্পের মত; তার আর কোন গুরুত্ব আছে বলে মনে করত না। কিন্তু ১৮৩০ সালে এর ব্যতিক্রম ঘটল। ক্যাপটেন রবার্ট টাউন্‌স্‌ এক জাহাজ পশমের পণ্য নিয়ে এসে লণ্ডনে নোঙর করলেন। অস্ট্রেলিয়া যে শুধু অপরাধী উপনিবেশ সে ধারণা সেই দিন থেকে বদলে যেতে লাগল। যে দেশ এমন পশম উৎপন্ন করে সে ত হেলা-ঠেলার স্থান নয়। শিল্পপতিদের মধ্যে আলোড়ন শুরু হল। অনেকে অস্ট্রেলিয়ায় এসে মেষপালন আর পশমের কারবার করার সিদ্ধান্ত করলেন। অস্ট্রেলিয়াতে স্বাধীন মানুষ আগমনের সাড়া জাগল এবং পরে সোনার খনি আবিষ্কারে তা চরমে পৌঁছাল। কিন্তু অস্ট্রেলিয়ার মাটিতেই তখন পশমশিল্পে যুগান্তর আনবার চেষ্টা চলছিল। ক্যামডেনের ম্যাক আর্থার ছিলেন তার পুরোধা। আজ অস্ট্রেলিয়ার সমস্ত আয়ের এক তৃতীয়াংশ আসে পশমের কারবার থেকে। ম্যাক আর্থারের ঋণ পরিশোধের জন্য অস্ট্রেলিয়াবাসীদের অধুনাতম প্রচেষ্টা হল দুই ডলারের নোটে একটি ভেড়া আর ম্যাক আর্থারের প্রতিকৃতি মুদ্রণ।

টিমারু একটি মেষচারণ তালুকের নাম। মেলবোর্ন থেকে দেড় শ' মাইল পশ্চিমে উলাউরা অঞ্চলে তার অবস্থান। উলাউরার অদূরে ছোট শহর মেরুনা। অস্ট্রেলিয়ার বড় শহরগুলির অবস্থান সমুদ্র বা নদীর তীরে তীরে। সে নদীও আবার আসল নদী নয়—শুধুই লোনা জলের প্রবাহ; সমুদ্র সরু হতে হতে এই ক্ষীণপ্রবাহ নিয়ে অন্তর্দেশে ঢুকে পড়েছে। অস্ট্রেলিয়ার বৃহত্তম অন্তর্দেশীয় শহর ব্যালারাট। মেলবোর্নের ষাট মাইল উত্তর-পশ্চিমে ভিক্টোরিয়ার স্বর্ণখনি এইখানে প্রথম আবিষ্কৃত হয়েছিল। ব্যালারাট গোল্ড রাশের শহর। মেরুনার তেমন কোন জন্ম ইতিহাস নেই। দেখে কিন্তু মনে হল মেরুনা আর ব্যালারাটে অশেষ মিল আছে—যাকে বলা চলে অন্তর্দেশীয় মিতালী। সিডনি মেলবোর্নের আন্তর্জাতিক পরিবেশে এমনটি চোখে পড়ে না। অবশ্য ব্যালারাটের আরও একটি বৈশিষ্ট্য আছে; লাখো লাখো বেগনিয়া ফুল এবং একটি মিঠাজলের অন্তর্দেশীয় হ্রদ; সে হ্রদে আছে অজস্র কালো হাঁস। ব্ল্যাক সোয়ান্।

টিম জনস্টোন আর পত্নী রুথের যুগ্ম নামে টিমারু তালুক। চারদিকে দেখা যায় শুধু ঢেউ-খেলা তৃণভূমি। তিন মাইলের মধ্যে দ্বিতীয় একটি বাড়ি নেই। ভাবছিলাম এই বিস্তীর্ণ ফাঁকা মাঠের নির্জন প্রান্তরে একটি বাড়ির তিনটি মানুষ কেমন করে দিন কাটায়। এদের কিন্তু দিন কাটাবার তেমন কোন সমস্যা নেই। টিম সারাদিন মাঠে মাঠে ভেড়ার পাল নিয়ে কাজ করেন, ঘড়ি ধরে বাড়িতে এসে শহরের লোকের মত ব্রেকফাস্ট, লাঞ্চ, ডিনার খান; সন্ধ্যায় ঘরে বসে স্ত্রী-কন্যা নিয়ে টেলিভিশন দেখেন। ডেয়ারী ফার্মের জীবনযাত্রার সঙ্গে কোন পার্থক্যই নেই। ডেয়ারী ফার্মারের মত এঁরাও শাওয়ারে স্নান করেন, ফোনে কথা বলেন। এঁদেরও মাঠজোড়া বসতবাড়ির সামনে-পেছনে এপাশে-ওপাশে আপেল আঙুর কমলালেবুর বাগান। ফুলের বাগিচা। এ ত শুধু জীবনযাত্রা নয়, জীবনের শিল্প বিকাশ।

মেলবোর্ন থেকে উলাউরাতে আমরা গিয়েছিলাম পাঁচজন—আগ্রার যশোবন্ত চৌধুরী, রাকেশ গুপ্তসহ তিনজন ভারতীয়; বাকী দু'জন অস্ট্রেলিয়ান। মেলবোর্নের মিঃ অলসফের ব্যক্তিগত প্রতিনিধি। মিঃ অলসফের সৌজন্যেই উলাউরার শিপ-ফার্মিং দেখার সুযোগ হয়েছিল।

লাউঞ্জে বসিয়ে গৃহস্বামিনী জিজ্ঞেস করলেন কার কি পানীয় চাই। মিনিট দশেক পরে হরিণীর মত এক ত্রস্ত কিশোরী পাশের কক্ষ থেকে ছোট্ট ট্রলি ঠেলে পানীয়ের সরঞ্জাম নিয়ে লাউঞ্জে ঢুকল। পরনে কালো রঙের সরু পাতলুন। গায়ে তার সঙ্গে ম্যাচ করা জ্যাকেট। খালি পা। মিসেস জনস্টোন পরিচয় করিয়ে দিয়ে বললেন—ইটি আমার কন্যা ডোরিন। ডোরিন কপালের

মিসেস কুপারের বাড়িতে অতিথিদল

একটি ভেড়া থেকে কাটা পশম টেবিলে বিছিয়ে দেওয়া হয়েছে

ওপর লুটিয়ে পড়া একগুচ্ছ রেশমী চুল মাথার পেছনে হটিয়ে সহাস্যে বলল—হ্যালো! যে যার রুচি অনুযায়ী চা কফি বীয়ারের গ্লাসে চুমুক দিতে দিতে গল্প জুড়ে দিল। মিসেস জনস্টোন আমাকে বললেন—তোমার গ্লাসের রসটি কিন্তু শহরের বোতলে ছিপি-আঁটা কমলা-লেবুর আরক নয়; ফ্রেশ অরেঞ্জ জুস। দুই গজ দূরে জানালার পাশে গাছে গাছে ঝুলন্ত কমলালেবুর দিকে চেয়ে বললাম—তার প্রমাণ ত দূরে নয়।

টিম প্রাক্তন নাবিক। দ্বিতীয় বিশ্ব-যুদ্ধে সরকারের আহ্বানে নৌবাহিনীতে যোগ দিয়েছিলেন। যুদ্ধ শেষে কৃষি বিদ্যালয়ে ভর্তি হলেন। দুই বছর শিক্ষালাভের পর একটি মেষচারণ ফার্মে এক বছর হাতে-কলমে কাজ শিখে ওয়ার সার্ভিস ল্যান্ড সেটলমেণ্ট স্কীমে জমির জন্য দরখাস্ত করেন। তখন সরকার থেকে নয়শ' একর জমি, তিনশ' চোদ্দটি ভেড়া এবং নগদ কুড়ি হাজার টাকা মেলে। জমির দাম নির্ধারিত হয় এক লক্ষ টাকা; পঞ্চাশ বছরে সহজ কিস্তিতে পরি-শোধনীয়। এই জমি পেতে টিমকে আপিসে আপিসে ধর্না দিতে হয় নি। লাল ফিতাবন্ধন শিথিল করতে সাধ্যাতীত চেষ্টা করতে হয় নি, নগদ কুড়ি হাজার টাকা থেকে কিছুটা অংশ কেরানী অফিসার আমলাদের দিতে হয় নি। আরও মজার কথা, জমি মঞ্জুর হওয়ার আগে প্রতিবেশী ভদ্রসন্তানরা জমি আপিসে বেনামী চিঠি পাঠিয়ে প্রমাণ করতে চেষ্টা করে নি যে, টিম জনস্টোন সরকারী সাহায্য পাওয়ার অযোগ্য।

এই অঞ্চলে টিমের মত আরও মেষ-পালক কৃষক আছে। মেষচারণ ক্ষেত্র হিসেবে এক বিস্তীর্ণ অঞ্চলকে কতগুলি স্টেশনে ভাগ করা হয়েছে। টিমদের বারামপীপ স্টেশনে এগার ঘর কৃষকের বাস। সবাই প্রাক্তন সৈনিক বা নাবিক। সরকার থেকে টিমের মত সবারই পুনর্বা-সন মিলেছে।

টিমের মোট ভেড়ার সংখ্যা চার হাজার। ছ' মাস বয়স হলেই ভেড়ার পশম কাটা চলে। বছরে মাত্র একবার পশম কেটে ভেড়া পিছু আট থেকে ষোল পাউণ্ড পর্যন্ত পশম মেলে। মাত্র চার বছর পশম কাটার পর মাংসের দামে কশাইয়ের কাছে ভেড়াগুলি বিক্রি করা হয়। অস্ট্রেলিয়া থেকে দুনিয়াময় এমনি সব ভেড়ার মাংসই চালান হচ্ছে।

টিম মোটর নিয়ে মাঠময় ঘুরে তাঁর নয়শ' একর মেষচারণ ভূমি দেখালেন। সঙ্গে ছিল ভেড়া-তাড়ানো কুকুর ববি। ডেয়ারী ফার্মের মত শিপ-ডগেরও একই রকমের কাজ। পাঁচ-সাত-দশ একরের টুকরো টুকরো জমিতে ভেড়া চরছে। প্রভুর নির্দেশে ববি এক মাঠ থেকে আর এক মাঠে, অল্প ঘাসের জমি থেকে বেশি ঘাসের জমিতে ভেড়াগুলিকে তাড়া দিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। সে এক দেখবার মত দৃশ্য।

টিমের একজন সহকারী আছে। জন। ব্যাচিলার। পঞ্চাশ বছর বয়স। চেষ্টা করেও নাকি জন বৌ জোটাতে পারে নি। টিমের জমিতে নিজের এক ছোট্ট বাড়িতে সে বাস করে, রান্না করে খায় আর অল্প লাভের অংশীদার হিসেবে পশম কাটার কাজ করে। জন বৈদ্যুতিক কাঁচি চালিয়ে পশম কাটার কৌশল আমা-দের মহানন্দে দেখাল; বার বিশেক মুখস্থের মত বলল—অস্ট্রেলিয়াতে তোমা-দের স্বাগত জানাই, উলাউরাতে তোমাদের স্বাগত জানাই। টিমারু ভবনে তোমাদের স্বাগত জানাই। পেছন থেকে ওর মাথার দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করে টিম বললেন—একটু ছিট আছে।

উলাউরা অস্ট্রেলিয়ার অন্যান্য অন্তর্বর্তী অঞ্চলের মতই শুষ্ক। নদী নেই, অন্য কোন জলের উৎস নেই। বছরে বৃষ্টিপাতও পনের ইঞ্চির বেশি নয়। তাই শস্যাদির আবাদের পক্ষে তেমন সুবিধা-জনক নয়। সেজন্য এরা ঘাসের চাষ করে, মেষপালন করে; জমিতে সুপার ফসফেট সার দেয় আর প্রতি পাঁচ বছর পর পর ভাল ঘাসের বীজ ছড়ায়। এখন একর প্রতি চারটি করে ভেড়া চরে। পনের বছর আগে একটি করে চরত। তখন সার দেওয়া শুরু হয় নি।

লাঞ্চ খেতে এলাম দুপুর গড়িয়ে গেলে। বসতবাড়ির এক কোণে ওয়াটল ইউক্যালিপটাসের ছায়ায় প্লেট-হাতে দাঁড়ালাম। খানকত ইট গেঁথে উনোন তৈরি হয়েছিল। বিশেষ বিশেষ উপলক্ষে এইখানে বনভোজনের আয়োজন হয়। উনোনের ওপর একটি লোহার জাল রেখে কাঠের আগুনে ভেড়ার মাংস ঝলসানো হল। বার্বিকিউড ল্যাম্ব চপ। ইচ্ছামত সবাই প্লেটে প্লেটে মাংস পেঁয়াজকলি লেটুস টমেটো ডিম সেদ্ধ তুলে নিলাম। এক হাতে গ্লাস। শ্যাম্পেন ক্ল্যারেট এবং শেষ পর্যন্ত ব্রাণ্ডিতে পানীয়ের প্রয়োজন মিটল। এটি চার্চিলীয় প্রথা। শ্যাম্পেন আর ব্র্যাণ্ডি ছাড়া চার্চিলের লাঞ্চ হত না। অস্ট্রেলিয়ার দূর মাঠে চার্চিলীয় লাঞ্চ পদ্ধতি নিয়ে কেউ কোনদিন মাথা ঘামায় নি।

খাদ্য প্রস্তুতের প্রয়োজনে হিটার কুকার টোস্টার কত কিছুই ত আবিষ্কৃত হয়েছে। এখন আবার আমেরিকা থেকে রান্নার এক নতুন আইডিয়া অস্ট্রেলিয়াতে এসেছে। মোটর গাড়ির বনেটের নিচে ব্যবস্থামত ছোট চুল্লীতে রান্না চাপিয়ে ষাট মাইল বেগে গাড়ি চালিয়ে গন্তব্যে পেঁছে গরম গরম ল্যাম্ব চপ সহযোগে ডিনার খাওয়া যায়। রান্নায় এত সব যুগান্তরের মধ্যে বনভোজন ত নেহাৎ সময়ের অপচয়। তবু তা মেনে নিতে হয়। মোটর-চুল্লীর রান্নায় শুধু পেট ভরে। মচ্ছবের ফলার খেতে বনভোজন চাই।

আজ লোক বেড়েছে। যে কৃষকের আগে মাত্র দুইশ' ভেড়া ছিল তার থাকা-খাওয়ায় আজকের মত রাজসিকতা ছিল না। তার মোটর গাড়ি, টেলিভিশন, ধোলাইকল ছিল না, নিমেষে দশজন লোকের কমলালেবুর রস করার উপায় ছিল না; ফ্রেজার থেকে বরফশীতল বীয়ার বার করাও যেত না। আজ তাকে আয় বাড়াতে হয়েছে। তাই চার হাজার ভেড়া না হলে চলবে কেন? আজ একাই

সে চার হাজার ভেড়াপালনের কাজ করে। তাই কাজে স্পীড আনতে হয়েছে। এজন্য এসেছে কলের ব্যবহার, বিদ্যুতের ব্যবহার, নতুন নতুন চাষপ্রণালীর উদ্ভাবন। আর সেই একই কৃষক একা চার হাজার মেষ ব্যবসায়ের বর্ধিত আয় ভোগ করছে উন্নত জীবনযাত্রার মধ্য দিয়ে। আমাদের দরিদ্র কৃষকের বৌ হিটার-কুকারের কথা শোনে নি। আম, বাঁশ, গাবের পাতা কুড়িয়ে দিনান্তে সে যখন রান্নার আয়োজন করতে যায় তখনও হয়ত চালের যোগাড় হয় নি। দুনিয়ার আর সব মানুষের সঙ্গে না এগিয়ে আমরা যেন পিছিয়ে গেছি। তাই আমাদের খাবার চাল বাড়তি না হয়ে বাড়ন্ত হয়েছে। নানা দেশে লোকে এখন অল্প সময়ে রান্না খাওয়ার পাট চুকানোর ব্যবস্থা করছে, আর মাঝে মাঝে বন-ভোজন করে পুরানো দিনের স্বাদ গ্রহণ করছে। হয়ত এমন দিন আসছে যখন রান্নার পাট আর একেবারেই থাকবে না। তখন মানুষ কাজের গতিবেগ বাড়িয়ে বাড়িয়ে যে কি করবে বলা শক্ত। হয়ত তখন পত্রিকা খুললে হামেশা চোখে পড়বে—অমুক চন্দ্র অমুক তিন মাস মঙ্গল মুল্লুকে বাস করে আজ তাঁর পৃথিবীর বাড়িতে ফিরে এসেছেন। তবে প্রশ্ন হল, তখন সংবাদপত্র থাকবে কি না। হয়ত সংবাদ আদান-প্রদানেরও ভিন্ন ব্যবস্থা হবে।

টিমের বাড়িতে খেতে খেতে গল্প হচ্ছিল। সন্তানদের রূপ-গুণ নিয়ে মিসেস জনস্টোনের অশেষ গর্ব। তিন সন্তানের সবার ছোট ডোরিন। রূপ ত নয়, যেন আগুনের শিখা। বড় মেয়ে মেলবোর্নে নার্সিং শেখে, একমাত্র ছেলেও সেখানে বোর্ডিং ইস্কুলে পড়ে। মিসেস রুথ জনস্টোন বললেন—মেয়েটি যখন মেলবোর্নের রাস্তায় বের হয় তখন পাঁচ-জনে দাঁড়িয়ে দেখে। কলকাতার রাস্তায় রূপসীরা চললেও যে ট্রামবাস থেমে যায় মিসেস জনস্টোনকে সে কথা বললাম। তখন তিনি ডোরিনের দিকে তাকিয়ে তার রূপ-গুণ সম্বন্ধে আরও কিছু বলতে যাচ্ছিলেন। কিন্তু মুখ খোলার আগেই ডোরিন বলল—মা তোমার গ্লাসে আর একটু ব্র্যান্ডি ঢালব?

তখন হু হু করে বাতাস বইছিল। উত্তুরে হাওয়া। দাবানল ছড়ায়। গাম-গাছের অরণ্যে যখন আগুন লাগে, এই দারুণ হাওয়া তখন আগুনের শিখাকে তাড়িয়ে শত শত মাইল নিয়ে যায়। মাঠে মাঠে শস্য পোড়ে মানুষ গরু মরে ভেড়ার পালে আগুন ধরে। কয়েক বছর আগে উত্তুরে হাওয়া তাড়িত আগুনের হলকা টিমদের বাড়ির সীমানা পর্যন্ত এসেছিল। ভাগ্যিস আর এগোয় নি।

টিমের বাড়িতে কুকুর আছে, মুরগী আছে, ময়ূর আছে। কাকাতুয়া কোকো-বারো প্লাটিপাস আছে। বাড়ির বাইরে মাঠে মাঠে ভেড়া আছে। সে ভেড়ার পালের একটি প্রাণীও জীবন্ত অবস্থায় বাড়িতে ঢুকতে পারে না। লক্ষ্য করার বিষয়, এদের বাড়িতে গরু নেই। টিম বললেন—গোপালনের সময়টুকু মেষ-পালনের কাজে লাগানই ত বুদ্ধিমানের কাজ। তাছাড়া গরু রাখার যে অনেক সমস্যা। দুইবে কে? বিশেষ করে শনি আর রবিবার। আমরা ত তখন বাড়িতে থাকি না; ডোরিন আর ববিকে নিয়ে ওয়ারাম্বুলে যাই। শুধু দুধ দোহনের প্রয়োজনে সাপ্তাহিক ছুটির দিন দুটি ত আর মাটি করা যায় না। উলাউরা, বারিমপীপ, ওয়ারাম্বুল ইত্যাদি নাম শুনে টিমকে জিজ্ঞেস করলাম—এই সব অঞ্চলে এককালে বুঝি খুব আদিম অধিবাসীদের বাস ছিল? ঘাড় শ্রাগ করে নিরাসক্তভাবে টিম বললেন—হয়ত বা!

বিকেলের দিকে টিমারু থেকে রওনা হলাম তাতিয়ুনের দিকে, এক বিচিত্র ফার্ম দেখতে। একজন মহিলা ফার্মার তার মালিক। মিসেস কুপার। অস্ট্রেলিয়ার এক মহীয়সী মহিলা। স্বামীর মৃত্যুর পর একেবারে দেউলিয়া হয়ে পড়েন মিসেস কুপার। তারপর নিজের হাতে কাজ আরম্ভ করলেন ডেয়ারী ফার্মে, গমের চাষে। আজ তিনি সতের শ' একর জমির মালিক। চারদিকের জমির মাঝ-খানে একটি উচ্চ টিলায় তাঁর সুদৃশ্য বাংলো। মনে হল, এই দিগন্তজোড়া সবুজ ঘাসের মাঠের মধ্যে সমস্ত সম্পদের অধীশ্বরী হয়ে মিসেস কুপার শুধু বাস করছেন না—একেবারে সগৌরবে বিরাজ করছেন। আমাদের দেশ হলে হয়ত জন-মানবহীন প্রান্তরে এমনি ধনবতী একটি মহিলার ঘরে ডাকাত এসে কবে সব লোপাট করে দিত। অস্ট্রেলিয়ায় সে-ডাকাত নেই। ভুরভুরিয়ার চক, ভুষুণ্ডির মাঠের কল্পনাও সেখানে মনে আসে না।

মিসেস কুপারের কাজ কিন্তু শুধু তাতিয়ুনের মাঠে নয়, সমস্ত বহিঃ পৃথিবীর সঙ্গে তার যোগাযোগ। অস্ট্রে-লিয়ার একমাত্র মহিলা প্রতিনিধি হিসেবে তিনি ওয়াশিংটন মস্কো পিকিঙের কৃষি সম্মেলনে একাধিকবার যোগ দিয়েছেন। উজবেকিস্তান আর ইউক্রেনের গমের চাষ সম্বন্ধে অনেক কথা বললেন। ভারত-বর্ষেও তিনি বার তিনেক এসেছেন, নয়াদিল্লীর অশোকা হোটেলের প্রশংসা করে বললেন—সত্যি তোমাদের কারি-রাইসের মত খাবার হয় না।

মিসেস কুপার মহিলাসমাজের গর্ব। শনি রবিবারের বিকেলে দূর ও নিকটের কৃষাণবধূরা তাতিয়ুনে এসে মিলিত হন তাঁর মুখের দুটি কথা শুনবেন বলে। সেদিন একঘর লোক জমেছিল। বীয়ার ব্র্যান্ডি দুধ—অতিথিদের রুচি অনুযায়ী ইতিমধ্যে দেওয়া হয়ে গেছে। কারও সঙ্গে একটু আলাপ করছেন, কাউকে পরে আলাপের আশ্বাস দিচ্ছেন। এরই ফাঁকে আলমারী খুলে একটি সার্টিফিকেট এনে আমাকে দেখালেন—ঐ অঞ্চলের সেরা ফার্মার হিসেবে গভর্নমেণ্ট থেকে পাওয়া প্রশংসাপত্র। বিখ্যাত হলেও সাধারণ মানুষের মত প্রশংসা প্রশস্তির উপর দুর্বলতা কিন্তু মিসেস কুপারের একটু আছে। কিন্তু ট্রেতে সাজিয়ে যখন দুধ বীয়ার কাজু বাদাম নিয়ে এলেন তখন মনে হল, এ ত কলেজে-পড়া খামারের-কাজ-করা দুনিয়া-দেখা বিখ্যাত মহিলা নন—শুধুই মেয়েমানুষ।

মেলবোর্নে ফিরে এসে হাওড়ার প্রণব চৌধুরীর কাছে ফার্মে বনভোজনের গল্প করলাম। ঘাসের শোভা, ফুলের বাহার, মাংসল ভেড়া আর আঙুর আপেল কমলা-লেবুর কথা বললাম। মিসেস কুপারের ঐশ্বর্য আর আতিথেয়তার বর্ণনা দিলাম। চৌধুরীমশাই অল্প মনোযোগে সব কথা শুনে বললেন—আজ বাড়ি থেকে একটি চিঠি পেয়েছি। জোর খবর আছে মাইরী! আমি বললাম—বৌয়ের চিঠি বুঝি? ভদ্রলোক বললেন—হ্যাঁ। সেদিন বাড়িতে অতিথি এসেছিল, আর সেই উপলক্ষে অনেক চেষ্টা করে দুটি ইলিশ মাছও পাওয়া গিয়েছিল। মনে হল, মেলবোর্ন প্রবাসী প্রণব চৌধুরী বাড়ির চিঠি পড়ে খুবই প্রীত হয়েছেন। জানি না ইলিশ মাছই এর কারণ কি না।

অস্ট্রেলিয়ার মাছ মাংস দুধের প্রাচু-র্যের মধ্যে বাস করে হঠাৎ আমার খেয়াল হল—তাই ত, আমাদের দেশে আজ দুই দুইটি ইলিশ মাছ একই দিনে সংগ্রহ করা এক অসামান্য ব্যাপার, আট হাজার মাইল দূরে একটি দেওয়ার মত খবরই বটে।

বিশ্বসাহিত্যের আদিপর্ব

ডঃ নরেন ভট্টাচার্য

॥ ৫ ॥

প্রাচীন গ্রীক সাহিত্যঃ আলেকজেন্ড্রিয় যুগ

গ্রীকদের স্বাধীনতাসূর্য অস্ত যাবার পর এথেন্স শুধুমাত্র দার্শনিকদের শহর হয়েই ছিল, আর সমগ্র হেলেনীয় জগতের প্রকৃত সাহিত্যগত প্রাণকেন্দ্র হয়ে দাঁড়িয়েছিল আলেকজেণ্ড্রিয়া। এই নগরটির ক্রমিক অভ্যুদয়ের কারণ ছিল এই যে পূর্বে এখানে ছিল মিশরীয় টলেমিবংশীয় রাজাদের রাজধানী, এবং এই বংশের রাজারা বিজ্ঞানচর্চায়, বিশেষ করে গ্রন্থাগার ও যাদুঘর গঠনে উৎসাহ দিয়েছিলেন।

পূর্ববর্তী যুগের সাহিত্য ছিল স্বাধীন গ্রীক জাতির নিজস্ব, যার চরিত্র ছিল জাতীয়। কিন্তু স্বাধীনতা লুপ্ত হবার পর যখন সেই জাতিই আর রইল না, তখন সাহিত্য আর জাতীয় সাহিত্য থাকল না, তা হয়ে গেল পণ্ডিতদের নিছক পেশামাত্র এবং সেই কারণেই সাহিত্য ভরে উঠল কৃত্রিমতায়।

আমাদের বর্তমান আলোচ্য যুগের পরিধি হচ্ছে খৃস্টপূর্ব ৩০০ থেকে ৩০ অব্দ পর্যন্ত। এ যুগে গীতিকবিতার বিশেষ কোন চিহ্ন পাওয়া যায় না। তবে মহাকাব্য রচনার একটি প্রবণতা এ যুগে লক্ষ্য করা যায়। এ যুগের উল্লেখযোগ্য কবিদের মধ্যে প্রথম হচ্ছেন থিওক্রিটাস (৩২৫-২৬৭ খৃঃ পূঃ) তিনি গ্রামজীবন, বিশেষ করে পশুপালকদের জীবন নিয়ে তাঁর কবিতাসমূহে অপূর্ব চিত্র অঙ্কিত করেছেন। তাঁর কবিতাসমূহ ইডুল নামে খ্যাত, এবং এই নামটিই পরবর্তীকালে পশুপালননির্ভর গ্রামজীবন সম্পর্কীয় কবিতাকে বোঝাবার জন্য ব্যবহৃত হয়েছে।

আলেকজেণ্ড্রীয় ভাবধারার সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য প্রতিনিধি ছিলেন ক্যালিমাকাস। আনুমানিক ২৬০ খৃস্টপূর্বাব্দে তিনি টলেমি ফিলাডেলফস কর্তৃক আলেকজেণ্ড্রিয়ার গ্রন্থাগারের সর্বাধ্যক্ষ হন এবং প্রভূত পরিশ্রম করে তিনি সেই গ্রন্থাগারের একটি বর্ণনামূলক ক্যাটালগ ১২০ খণ্ডে রচনা করেন। এরই ভিত্তিতে প্রাচীন গ্রীক সাহিত্য আলোচনার সূত্রপাত হয়েছিল। তাঁর নিজস্ব রচনাবলীর মধ্যে আছে কিছু কবিতা যার মধ্যে বিখ্যাত হচ্ছে **কোমা বেরিনিসেস**। এ ছাড়া তিনি একটি জনপ্রিয় মহাকাব্যও রচনা করেছিলেন যা **হেকাটি** নামে খ্যাত। এই মহাকাব্যের অবশ্য খুবই সামান্য অংশ পাওয়া যায়। পরবর্তীকালে ওভিড ক্যালিমাকাসকে তাঁর রচনার আদর্শ হিসাবে গ্রহণ করেছিলেন।

ক্যালিমাকাসের শিষ্য রোডিয় অ্যাপোলোনিয়াস ২৬০ খৃস্টপূর্বাব্দে আলেকজেণ্ড্রিয়ায় জন্মগ্রহণ করেন। তিনি চার খণ্ডে একটি মহাকাব্য রচনা করেছিলেন যার নাম **আর্গোনটিকা**। ট্রোজান যুদ্ধের বহু পূর্বে ঈশনের পুত্র জেসন কৃষ্ণসাগরের পূর্বতীরে ইয়া নামক একটি দ্বীপে অভিযান করেছিলেন সেখানে লুক্কায়িত অলৌকিক ক্ষমতাসম্পন্ন একটি মেষের চামড়া হস্তগত করার জন্য। সেই অভিযানকে কেন্দ্র করেই এই মহাকাব্য হোমারের ভঙ্গীতে লেখা হয়েছে। পাণ্ডিত্যাভিমানী ক্যালিমাকাস ও তাঁর অনুচরেরা অ্যাপোলোনিয়াসের সরল ভঙ্গীর রচনারীতিতে খুশি হতে পারেন নি, ফলে ক্ষুণ্ণমনে অ্যাপোলোনিয়াস রোডসে চলে যান। সেখানকার জনসাধারণ তাঁর মহাকাব্য শ্রবণ করে এতই প্রীত হয় যে তারা তাঁকে সেখানকার নাগরিকত্ব দান করে। তদবধি তিনি অ্যাপোলোনিয়াস রোডস নামে পরিচিত হন।

কবি রিহানাস জন্মগ্রহণ করেছিলেন ক্রীটে, খৃস্টপূর্ব তৃতীয় শতকের শেষের দিকে। তিনি **মেসেনিয়াকা** নামক একটি মহাকাব্য রচনা করে বিখ্যাত হয়েছিলেন। ছয় খণ্ডে রচিত এই মহাকাব্যের বিষয়বস্তু হচ্ছে মেসেনীয় যুদ্ধ এবং তার কাল্পনিক নায়ক অ্যারিস্টোমেনেসের বীরত্ব। আরাটাস চিলিকায় জন্মগ্রহণ করেছিলেন এবং তিনি ক্যালিমাকাস ও থিয়োক্রিটাসের সমকালীন ছিলেন, তিনি ম্যাসিডোনীয় রাজা অ্যাণ্টিগোনাস গোনাটাসের চিকিৎসক ছিলেন। তাঁর একটি কাব্যগ্রন্থ এ পর্যন্ত পাওয়া গেছে যার নাম **ফেনোমেনা এণ্ড প্রোগনস্টিকা,** অর্থাৎ নভোমণ্ডলের দিকসমূহ এবং আবহাওয়া নিরূপণ। ব্যবহারিক গুরুত্ব থাকায় কাব্যটি আদৃত হয়েছিল এবং রোমকরা কাব্যটিকে অনুবাদও করেছিল। কবি নিসাণ্ডার ছিলেন এই যুগের শেষ পর্যায়ের কবি যিনি জন্মগ্রহণ করেছিলেন ১৫০ খৃস্টপূর্বাব্দে কলোফোনে। তাঁর কবিতার বিষয়বস্তু ছিল কৃষি, পশুপালন, ঔষধ, খাদ্যের গুণাগুণ ইত্যাদি। এ পর্যন্ত তাঁর দুটি বৃহৎ কবিতা পাওয়া গেছে। একটির নাম **থেরিয়াকা,** বিষয়বস্তু হচ্ছে বিভিন্ন পশুপক্ষী ও কীট-পতঙ্গের কামড় থেকে আত্মরক্ষার উপায় এবং তার চিকিৎসা, দ্বিতীয় কবিতাটি হচ্ছে **অ্যালেক্সিফার্মাকা** অর্থাৎ খাদ্যে এবং পানীয়ে বিষক্রিয়ার চিকিৎসা।

আলেকজেণ্ড্রীয় যুগে গদ্যসাহিত্য রচিত হয়েছিল প্রচুর। গদ্যসাহিত্যের বিষয়বস্তুর বৈশিষ্ট্য থাকলেও সাহিত্যগত ধর্মের দিক থেকে তার মূল্য যৎসামান্যই। এই যুগে ইতিহাস রচনার একটি বিশেষ প্রবণতা দেখা গিয়েছিল, এবং বেশির ভাগ ইতিহাস লেখকের বিষয়বস্তু ছিল আলেকজাণ্ডারের দিগ্বিজয়। এই ঐতিহাসিকদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিলেন ক্লিটারকাস (৩০০ খৃঃ পূঃ), টিমেউস (২৫৬ খৃঃ পূঃ) এবং পলিবিয়াস (খৃঃ পূঃ ১২২)। আলেকজাণ্ডারের অভিযানের ইতিহাস লিখেছিলেন ক্লিটারকাস বারো খণ্ডে। তাঁর তথ্যাবলী মারাত্মকভাবেই অবিশ্বাস্য, অলৌকিক ক্রিয়াকলাপের উপরেই তাঁর বেশি আস্থা। তবে তাঁর রচনায় ছিল বেগ এবং অলংকারের অপরূপ সমন্বয় যে কারণে তাঁর গ্রন্থাবলীর

জনপ্রিয়তা ছিল অসীম। টিমেউস লিখেছিলেন আদিকাল থেকে ২৬৪ খৃস্টপূর্বাব্দ পর্যন্ত সিসিলির ইতিহাস ৬৮ খণ্ডে। এ ছাড়া তিনি আরও একটি গ্রন্থ লিখেছিলেন **ক্যামপেন্স অফ ফিরাস**। পলিবাস ছিলেন রোম অধিকৃত গ্রীসের সবচেয়ে বড় ঐতিহাসিক প্রতিভা। তিনি ২২০ এবং ১৪৬ খৃস্টপূর্বাব্দের মধ্যে চল্লিশ খণ্ডে রচনা করেন **ইউনিভার্সাল হিস্ট্রী**। প্রথম দুই খণ্ডে তাঁর রচনার ভূমিকা হিসাবে তিনি ইটালী, আফ্রিকা ও গ্রীসের রাজনৈতিক ইতিহাসের প্রচ্ছদ, রোমের আদি ইতিহাস থেকে শুরু করে প্রথম পিউনিক যুদ্ধ পর্যন্ত ঘটনাবলীর পরিপ্রেক্ষিতে রোমের অভ্যুত্থানের বাস্তব চিত্র অঙ্কিত করেছেন। তৃতীয় থেকে বিংশতিতম খণ্ডে তিনি ২২০ খৃস্টপূর্বাব্দ থেকে ১৬৮ খৃস্টপূর্বাব্দ পর্যন্ত ঘটনাবলী লিপিবদ্ধ করেছেন, কিভাবে রোম সাম্রাজ্য হ্যানিবলীয়, ম্যাসিডোনীয়, সিরীয় এবং স্পেনীয় যুদ্ধসমূহের ভিতর দিয়ে উন্নতির চরম সীমার আরোহণ করতে চলেছিল' তার বিবরণ দিয়েছেন। একবিংশ থেকে চল্লিশতম খণ্ডে তিনি ১৬৮ থেকে ১৪৬ খৃস্টপূর্বাব্দ পর্যন্ত ঘটনাবলীর উল্লেখ করেছেন।

বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় এ-যুগে আরও যে কয়জনের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য তাঁদের মধ্যে প্রথম হচ্ছেন এরাটোস্থেনেস। ইনি ছিলেন ভূগোল-বিশারদ, ইতিহাসের কালপঞ্জিকার, জ্যোতিষ ও পুরাণেও তিনি ছিলেন দিকপাল। তাঁর রচিত গ্রন্থাবলীর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে **জিয়োগ্রাফিকা, ক্রোনোগ্রাফিকা, ক্যাটালোগোই, ক্যাটাস্টেরিসমোই**, এবং দুটি কাব্যগ্রন্থ **হার্মেস** এবং **এরিগোন**। এরাটোস্থেনেস মারা যান ১৯৫ খৃস্টপূর্বাব্দে। অ্যাপোলোগেরাস ছিলেন ঐতিহাসিক, ভূগোলবিদ এবং বৈয়াকরণ। তাঁর কাল ছিল ১৪০ খৃস্টপূর্বাব্দ। তাঁর তিনটি গ্রন্থের এ পর্যন্ত হদিস পাওয়া গেছে, **ক্রনিকা, বিবলিওথেকা** এবং **অন দি গডস**। সমালোচনা নামক সাহিত্যের যে বিভাগ, তার সূত্রপাত হয়েছিল জেনোডোটাস (২৭৫ খৃঃ পূঃ), বাইজানসিয়ামের অ্যারিস্টোফানেস (১৭৫ খৃঃ পূঃ), ক্রাটেস (১৭০ খৃঃ পূঃ) এবং অ্যারিস্টারকাসের (১৫০ খৃঃ পূঃ) হাতে। এঁদের জীবন সম্বন্ধে কিছু তথ্য পাওয়া যায় বটে, কিন্তু এঁদের রচনাবলীর তেমন কিছু উল্লেখযোগ্য নিদর্শন অবশিষ্ট নেই।

পরিশিষ্ট : রোমক যুগে গ্রীক সাহিত্য

যখন গ্রীক সাহিত্যের আলেকজেন্ড্রীয় যুগ চলছে তখন রোমক আধিপত্যের বাহুপাশ আস্তে আস্তে সমগ্র গ্রীকভূমিকে বেষ্টন করছিল। ৩০ খৃস্টপূর্বাব্দের মধ্যেই সমগ্র গ্রীকভূমি রোমক শক্তির কবলিত হয়, শুধু মূল গ্রীক ভূখণ্ডই নয়, এশিয়া এবং আফ্রিকাতে যে গ্রীক উপনিবেশ ছিল সেগুলিও রোমক অধিকারে চলে যায়। এতদিন জ্ঞান-বিজ্ঞান-সাহিত্যের পীঠস্থান ছিল এথেন্স, এবং পরবর্তীকালে আলেকজান্ড্রিয়া, এবারে এদের সঙ্গে যুক্ত হল রোম। কিন্তু রোম শুধুমাত্র একটি নগরই নয়, তদানীন্তন জগতের রাজধানী বললেও অত্যুক্তি হয় না। তাই সব জায়গা থেকেই গ্রীক পণ্ডিতেরা রোমে এসে জড়ো হয়েছিলেন।

কিন্তু রোমের জাতীয় সাহিত্য গড়ে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে স্বাভাবিক নিয়মেই গ্রীক সাহিত্যের গতি রুদ্ধ হয়ে গিয়েছিল। এখানে আমরা রোম সাম্রাজ্য ও রোমক সাহিত্য বলতে মূল রোমক সাম্রাজ্য ও পূর্ব রোমক সাম্রাজ্যকে এবং উভয় রোমের সাহিত্যকেই একসঙ্গে বুঝব। রোমের জাতীয় সাহিত্যের অবক্ষয়ের যুগে অর্থাৎ খৃস্টীয় দ্বিতীয় শতকে, রোমক সম্রাটেরা গ্রীক সাহিত্যের কিছুটা পৃষ্ঠপোষকতা করেছিলেন, যে কারণে গ্রীক সাহিত্যের মরাগাঙে আর একবার জোয়ার এসেছিল। তদুপরি খৃস্টধর্মের সঙ্গে প্রতিযোগিতার জন্য প্রাচীন গ্রীক আদর্শসমূহকে পুনরুজ্জীবিত করার প্রয়োজনীয়তা দেখা গিয়েছিল।

কিন্তু শেষ পর্যন্ত অবশ্য প্রতিযোগিতায় খৃস্টধর্মই জয়ী হয়েছিল। ফলে গ্রীকচর্চার ক্ষেত্র অত্যন্ত সীমাবদ্ধ হয়ে গিয়েছিল। ৪৭৬ খৃস্টাব্দে মূল রোমক সাম্রাজ্য বারবেরিয়ানদের পদানত হয়ে গেলেও, পূর্ব রোমক সাম্রাজ্য, যার রাজধানী ছিল কনস্টান্টিনোপল, আরও বহুকাল স্বাধীন ছিল। গ্রীকভাষী অঞ্চলসমূহ পূর্ব রোমক সাম্রাজ্যের অন্তর্গত থাকায় গ্রীকচর্চা মোটের উপর অব্যাহত ছিল। কিন্তু ৫২৯ খৃস্টাব্দে সম্রাট জাস্টিনিয়ন যখন পৌত্তলিক গ্রীক শিক্ষায়তনসমূহ জোর করে বন্ধ করে দিলেন, তখনই গ্রীক সাহিত্যের কার্যত মৃত্যু ঘটল।

খৃস্টীয় দ্বিতীয় শতকের গ্রীক কবিদের মধ্যে একজনেরই উল্লেখ পাওয়া যায় যিনি হচ্ছেন কবি ওপ্পিয়ান। তাঁর রচিত একটিমাত্র কাব্যগ্রন্থের পরিচয় পাওয়া গেছে, নাম **হ্যালিউটিকা**। ওই একই নামের আর একজন কবি, যাঁর জন্মভূমি সিরিয়া, দ্বিতীয় শতকের শেষের দিকে আবির্ভূত হয়েছিলেন যাঁর রচিত কাব্যের নাম **সাইনেজেটিকা**। তৃতীয় শতকে আমরা জনৈক ব্যাবরিয়াসের উল্লেখ পাচ্ছি যিনি ঈশপের গল্পগুলিকে ছন্দে রূপদান করেন। তাঁর দুটি গ্রন্থের পাণ্ডুলিপি যথাক্রমে ১৮৪৪ ও ১৮৫৭ খৃস্টাব্দে আবিষ্কৃত হয়েছে। কুইন্টাস স্মার্নাস ছিলেন স্মার্নার অধিবাসী। চতুর্থ শতকে তিনি হোমারের ইলিয়াডের পরিশিষ্ট হিসাবে চতুর্দশ খণ্ডে **পসথোমেরিকা** নামক একটি মহাকাব্য রচনা করেন, বিষয়বস্তু হচ্ছে হেক্টরের মৃত্যুর পর থেকে একীয়দের স্বদেশ প্রত্যাবর্তন পর্যন্ত ঘটনাবলী। খৃস্টীয় পঞ্চম শতকে ইজিপ্টের প্যানোপলিসে নোন্নাস নামক একজন গ্রীক কবি আবির্ভূত হয়েছিলেন। পৌত্তলিক ধর্মবিশ্বাসে উদ্দীপ্ত হয়ে তিনি ৪৮ খণ্ডে একটি বিশাল মহাকাব্য লেখেন, নাম **ডাওনিসিয়াকা**। দেবতা ডাওনিসাস সম্পর্কিত সমুদয় কাহিনী ও অনুষ্ঠান এই মহাকাব্যে বর্ণিত হয়েছে। পরবর্তীকালে তিনি খৃস্টধর্ম গ্রহণ করেন এবং গ্রীক হেক্সামিটারে (সপ্তমাত্রিক ছন্দ) তিনি সেণ্ট জন কথিক সুসমাচারের অনুবাদ করেন। মিশরে আরও একজন গ্রীক কবি ছিলেন যাঁর নাম ট্রাইফিডোরাস, যিনি সপ্তমাত্রিক ছন্দে ৬৯১টি শ্লোকে **ইলিয়াম-বিজয়** নামক কাব্য লিখেছিলেন। তাঁরই সমকালীন (খৃস্টীয় ষষ্ঠ শতক) ছিলেন কোল্লুথাস যিনি ৩৮৫টি শ্লোকে হেলেন-ধর্ষণ নামক একটি কাব্য লিখেছিলেন। এই শতকেই মিউসেয়াস হেরো এবং লিয়াণ্ডারের প্রেমকাহিনী নিয়ে একটি অপূর্ব কাব্য রচনা করেন। লিয়াণ্ডার ছিল হেলেস্পন্টের অ্যাবাইডোস নামক স্থানের একজন যুবক। তার প্রণয়িনী ছিল হেরো যে বাস করত লেসবসের একটি নির্জন টাওয়ারে। প্রতিরাত্রে লিয়াণ্ডার হেলেস্পন্ট থেকে সাঁতার কেটে লেসবসে হাজির হত, যে টাওয়ারে তার প্রণয়িনী বাস করত সেখানকার আলোকে নিশানা করে সে সমুদ্রে ঝাঁপ দিত। একদা ঝড়ের রাত্রে সেই আলো নিভে যায় এবং অন্ধকার সমুদ্রে নিশানা ঠিক করতে না পেরে হতভাগ্য লিয়াণ্ডার মারা যায়। পরদিন প্রভাতে ঠিক সেই টাওয়ারের তলায় তার মৃতদেহ পাওয়া যায়। এই দৃশ্য দেখে লিয়াণ্ডারের প্রণয়িনী হেরো টাওয়ার থেকে লাফিয়ে পড়ে আত্মহত্যা করে।

খৃস্টীয় প্রথম থেকে ষষ্ঠ শতকের মধ্যে গদ্যসাহিত্যও বিশেষ পুষ্টিলাভ করে। খৃস্টীয় প্রথম শতকের দুজন শ্রেষ্ঠ গদ্য-লেখক ছিলেন হালিকারনাসাসের ডাওগেরাস এবং ডায়োনিসাস। ডাওগেরাস ছিলেন ঐতিহাসিক, চল্লিশ খণ্ডে তিনি লিখেছিলেন **বিশ্বের ইতিহাস**, ডাওনিসাসও

ছিলেন ঐতিহাসিক, রোমের পুরা বৃত্তই ছিল তাঁর রচনার বিষয়বস্তু। এ ছাড়া গ্রীক গদ্যরচনার পদ্ধতির উপর এবং অলংকারশাস্ত্রের উপর তিনি দুটি গ্রন্থ রচনা করেছিলেন। দ্বিতীয় শতকের সর্বাধিক বিখ্যাত লেখক ছিলেন প্লুটার্ক। তিনি ছিলেন মূলত জীবনীসাহিত্য লেখক এবং তাঁর রচনার একটি বৈশিষ্ট্য খুবই চিত্তাকর্ষক। তিনি জোড়ায় জোড়ায় জীবনী লিখেছেন—একটি গ্রীক চরিত্র এবং তার অনুরূপ একটি রোমক চরিত্র। এই-রকম জীবনীগ্রন্থ মোট ছেচল্লিশটি পাওয়া গেছে। ঠিক ইতিহাস লেখা প্লুটার্কের উদ্দেশ্য ছিল না, তিনি ইতিহাস থেকে তাঁর পছন্দমত চরিত্রগুলি বেছে নিয়েছেন এবং সেগুলির রূপদান করেছেন। এই ৪৬টি জীবনীগ্রন্থ ছাড়া আরও ৮৩টি নানা ধরণের রচনা তাঁর আছে। তার মধ্যে কয়েক খণ্ডে রচিত **মোরালিয়া** বিশেষ উল্লেখের দাবি রাখে। তাঁর অপরাপর গ্রন্থ-সমূহের মধ্যে আছে একটি দর্শনের ইতি-হাস, পাঁচ খণ্ডে রচিত, যার রোমক নাম **ডে প্লাসিটিস ফিলোসোফোরাম**। বর্তমান লেখকের মতে প্লুটার্কের সবচেয়ে বড় কাজ হচ্ছে পুরাণ-আলোচনায় আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গীর প্রয়োগ। এই জাতীয় রচনা তাঁর তিনটি আছে : (১) **আইসিস এন্ড ওসিরিস** (২) **ওরাকুলস অফ দি পাই-থিয়ান প্রিস্টেস** এবং (৩) **ডিকে অফ দি ওরাকুলস**। কিন্তু রচনার সাহিত্যগুণ সবচেয়ে বেশি প্রকটিত হয়েছে তাঁর শেষ গ্রন্থ **কোয়েসটিওনেস কনভিভিয়ালেস** বা **কথোপকথন** নামক গ্রন্থে। যেখানে তৎ-কালীন যাবতীয় জ্ঞান-বিজ্ঞানের কথা, সরস কথোপকথনের মধ্য দিয়ে তিনি ফুটিয়ে তুলেছেন।

দ্বিতীয় শতকের আরও দুজন বিখ্যাত গদ্যলেখক ছিলেন। আপ্পিয়ান এবং আরিয়ান। আপ্পিয়ান ছিলেন ঐতি-হাসিক, রোমক সাম্রাজ্যের আদি যুগ থেকে ট্রাজানের যুগ পর্যন্ত ইতিহাস লিখে তিনি যশস্বী হয়েছেন। তাঁর ২৪টি গ্রন্থের মধ্যে এ পর্যন্ত মোট ১১টি পাওয়া গেছে যেগুলি হচ্ছে : **স্পেন** (ষষ্ঠ), **হ্যানি-বল** (সপ্তম), **কার্থেজ** (অষ্টম), **সিরিয়া** (একাদশ), **মিথ্রিডেটেস** (দ্বাদশ), **রোমক গৃহযুদ্ধ** (ত্রয়োদশ থেকে সপ্তদশ) এবং **ইলিরিয়া** (ত্রয়োবিংশ)। আরিয়ান ছিলেন একাধারে দার্শনিক ও ঐতিহাসিক। তিনি সম্রাট হাড্রিয়ান, এন্টোনিয়াস পায়াস ও মার্কাস অরেলিয়াসের রাজসভা অলংকৃত করেছিলেন। তাঁর দার্শনিক রচনাবলীর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে **ডিসকোর্সেস অফ এপিকটেটাস** এবং **এনকেইরিডিয়ন অফ এপিকটেটাস**। তাঁর ঐতিহাসিক রচনা-বলীর মধ্যে সবচেয়ে বিখ্যাত হচ্ছে **অ্যানাবাসিস অফ আলেকজান্ডার**। সাত খণ্ডে রচিত এই গ্রন্থটি আলেকজান্ডারের অভিযান সম্বন্ধে একমাত্র প্রামাণ্য রচনা। এ ছাড়া ভারতের উপরও তাঁর একটি বই আছে যার নাম **ইন্ডিকা**, আলেকজান্ডারের অন্যতম সেনাপতি নিয়ার্কাস প্রদত্ত রিপোর্টের উপর নির্ভর করে গ্রন্থটি লেখা হয়েছে। এ ছাড়া একটি সমুদ্র-যাত্রার বিবরণী হিসাবে তিনি লিখেছিলেন **পেরিপ্লাস পন্টি ইউক্সিনি** ও একটি শিকার-কাহিনী, নাম **সাইনেগেটিকাস**। তাঁর বহুমুখী প্রতিভার জন্য তাঁকে **ছোট জেনোফোন** বলে অভিহিত করা হত।

তৃতীয় শতকের উল্লেখযোগ্য ইতিহাস লেখক ছিলেন ডাওকাসিয়াস এবং হেরো-ডিয়ান ও চতুর্থ শতকের ছিলেন জোসিমাস। ডাওকাসিয়াস ৮০ খণ্ডে লিখেছিলেন রোমের ইতিহাস, ইনিয়াসের রোমে আগমন থেকে তাঁর নিজের যুগ অর্থাৎ ২২৯ খৃস্টাব্দ পর্যন্ত। হেরোডিয়ান অপেক্ষাকৃত অল্পপরিসরে লিখেছিলেন তাঁর যুগের রোমের ইতিহাস মার্কাস অরেলিয়াসের মৃত্যুর পর থেকে তৃতীয় গর্ডিয়ানাসের সিংহাসনে আরোহণ পর্যন্ত (১৮০—২৩৮ খৃস্টাব্দ)। খৃস্টীয় প্রথম ও দ্বিতীয় শতকের বিখ্যাত ভূগোলবিদ ছিলেন স্ট্রাবো এবং টলেমি। স্ট্রাবোর **জিওগ্রাফিকা** মোট সতের খণ্ডে আজও পাওয়া যায়। এই গ্রন্থের প্রথম দুটি খণ্ডে স্ট্রাবো তাঁর পূর্বতন ভূগোলকারদের সমালোচনা করেছেন, যদিও সর্বত্র তাঁর সমালোচনা যথার্থ হয় নি। দ্বিতীয় খণ্ডে আছে প্রাকৃতিক ভূগোলের গাণিতিক আলোচনা যা তাঁর গ্রন্থের সবচেয়ে দুর্বল অংশ। তৃতীয় খণ্ডে আছে স্পেনের ভূগোল, চতুর্থ খণ্ডে গল, বৃটেন, আয়র্ল্যান্ড এবং আল্‌পস, পঞ্চম ও ষষ্ঠে ইটালী, সপ্তমে ডানিয়ুব পর্যন্ত উত্তর-পূর্ব ইউরোপ, অষ্টম থেকে দশমে গ্রীস, একাদশ থেকে ষোড়শে এশিয়া ও সপ্তদশে আফ্রিকা। স্ট্রাবোর ভাষা ও বর্ণনাভঙ্গী খুবই চিত্তাকর্ষক। টলেমি ছিলেন, বিখ্যাত গণিতজ্ঞ, জ্যোতির্বিদ ও ভূগোল বিশারদ। তাঁর ভূগোল সম্পর্কিত বই হচ্ছে **জিওগ্রাফিকি হাইফেগেমিস**। আটখণ্ডে লেখা এই গ্রন্থের প্রথম খণ্ডে আছে গাণিতিক ভূগোল এবং অক্ষাংশ ও দ্রাঘিমাংশের হিসাব, দ্বিতীয় থেকে সপ্তম খণ্ডে আছে তাঁর রচিত বিশ্বের মানচিত্রের স্থান নাম ও পরিচয়, অষ্টম খণ্ডে আছে আবহাওয়ার কথা। তাঁর অপরাপর গ্রন্থ-সমূহের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে **আলমাগেস্ট** (জ্যোতির্বিদ্যা বিষয়ক), **হার-মোনিকস** (সংগীত বিষয়ক) এবং **ক্যানন অফ কিংস** (ইতিহাসের কালপঞ্জী বিষয়ক)। খৃস্টীয় দ্বিতীয় শতকের আর একজন বিখ্যাত পর্যটক ও ভূগোলকার ছিলেন পজেনিয়াস। তিনি নিজে সমগ্র গ্রীকভূমি পর্যটন করে তার বৃত্তান্ত লিখে-ছিলেন দশখণ্ডে, নাম **পেরিইজেসিস**। সমগ্র গ্রন্থটি অবিকৃত আছে এখনো পর্যন্ত, এবং গ্রীকবিদদের নিকট পজেনিয়াসের যথেষ্ট মূল্য আছে।

রোমক যুগের গ্রীক লেখকেরা জ্ঞান-বিজ্ঞানের অপরাপর শাখাতেও যথেষ্ট কৃতিত্ব দেখিয়েছিলেন। অঙ্কশাস্ত্রে যাঁদের উল্লেখযোগ্য অবদান ছিল তাঁরা হচ্ছেন থিওন, নিকোমাকাস, ডিওফ্যানটাস এবং পাপ্পাস, চিকিৎসাশাস্ত্রে ডাওস্কোরিডেস, সোরানাস এবং গ্যালেন, ভাষাতত্ত্ব, ব্যাকরণ এবং অলংকারশাস্ত্রে অ্যাপোলোনিয়াস ডাইসকোলাস ও তাঁর পুত্র হেরোডিয়ান, এথেনিয়াস, স্টোরেয়াস ও হারমোজেনেসের নাম উল্লেখযোগ্য। দর্শনশাস্ত্রে এ যুগে কোন নতুন চিন্তার উদয় হয় নি। ফিরো, জেনো, এপিকুরিয়াস প্রভৃতি পূর্ববর্তী যুগের দার্শনিকদের ভাবধারা এ যুগে ব্যাখ্যাত হয়েছে। এ যুগের দার্শনিকদের মধ্যে আরিয়ান, গ্যালেন, সেকসটাস এমপিরিকাস, সম্রাট মার্কাস অরেলিয়াস প্রভৃতি যাঁদের নাম করা হয় তাঁদের বরং দার্শনিক না বলে দর্শনের ইতিহাসকার বলা যেতে পারে। তবে তৃতীয় শতকের পরবর্তীকালে নব্য প্লেটোবাদ নামক একটি নতুন ধারার সূত্রপাত হয়। প্লোটিনাসের নেতৃত্বে এবং এই ধারাটির সম্যক বিকাশ হয় পরফিরিয়াস, আইয়ামব্লিকাস ও প্রোক্লাসের হাতে।

শ্রীউপেন্দ্রচন্দ্র মল্লিক প্রণীত

অ-আ-ক-খ

মূল্য : বার আনা

শিশু মনোবিজ্ঞানে নিপুণ লেখক এই গ্রন্থে শিশুদের বর্ণবোধ ও যুক্তাক্ষরসহ বানান শিক্ষা যেরূপ অতুলনীয় ছন্দের সাহায্যে করিয়াছেন, তাহাতে শিশুদের শিক্ষারম্ভ সহজ হইয়াছে। এ সম্বন্ধে বাজারে যতগুলি বই আছে তাহার মধ্যে শীর্ষস্থানীয় বলিয়া কলিকাতা কর্পোরেশনের শিক্ষাবিভাগ এই বইখানিকে প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলিতে পাঠ্য-পুস্থিরূপে নির্বাচিত করিয়াছেন।

চিত্রে চিত্রময়—রঙ্গীন আর্ট পেপারে বড় হরফে ছাপা।

বসুমতী প্রাইভেট লিমিটেড
১৬৬, বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী স্ট্রীট, কলিকাতা—১২

গ্রামবাংলার কথা

নূতন নৈহাটী

অক্ষরেখা ২২·৫১ উত্তরাংশ ও দ্রাঘিমাংশ ৮৮·২৫ পূর্বভাগ—পৃথিবীর প্রাচ্য ভূখন্ড, ১৮৬৯ খৃস্টাব্দের ১লা মে ৬ বি, সি ডিস্ট্রিক্ট টাউন এ্যাক্টের ২ ও ৫ ধারা অনুসারে দক্ষিণে শ্যামনগর থেকে উত্তরে কাঁচরাপাড়া পর্যন্ত প্রায় ১০ বর্গ-মাইল এলাকা জুড়ে প্রথম প্রতিষ্ঠিত হল নৈহাটী মিউনিসিপ্যালিটি। লোকসংখ্যা ছিল প্রায় ৪০ হাজারের কাছাকাছি। হিন্দু ২৪৮৯৬ জন এবং মুসলমান ৫৮০১। বাদ বাকী সব আগন্তুক।

১৮৬৯ খৃস্টাব্দের ২৬শে মে তারিখে প্রকাশিত বাংলা সরকারের তৎকালীন সেক্রেটারী এ, ইডেন স্বাক্ষরিত কলকাতা গেজেটের এক ইস্তাহারে দেখা যায় যে, এই আইন বলবৎ হয়েছিল আরও ২০ দিন পরে ২১শে মে তারিখ থেকে এবং এই নূতন আইনানুসারে মূলাজোড়, আঁটপুর, জগদ্দল, ভাটপাড়া, কাঁঠালপাড়া, নৈহাটী, গরিফা, কোণে এবং হালিসহর—এই ন'খানি সমৃদ্ধ গ্রামই সীমানাভুক্ত হয়েছিল মিউনিসিপ্যালিটির।

সমস্ত এলাকা ৫টি ওয়ার্ডে বিভক্ত ছিল। কমিশনার ছিলেন ১৫ জন। এবং প্রথম চেয়ারম্যান হয়েছিলেন বারাসতের এক ম্যাজিস্ট্রেট।

পদাধিকারবলে বারাসতের ম্যাজিস্ট্রেট-রাই মিউনিসিপ্যালিটির চেয়ারম্যান হতে পারতেন তখন। ১৮৭২-৭৩-এ আসেন মিঃ জর্জ পোর্টার। পোর্টার বদলী হয়ে যাবার পর ১৮৭৪-৭৫-এ চেয়ারম্যানরূপে নাম পাওয়া যায় সাহিত্যসম্রাট শ্রীবঙ্কিম-চন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এবং মিঃ সি, এ, উইল-কিন্স-এর। চেয়ারম্যান পদে আরও যত-গুলি স্মরণীয় নাম পাওয়া যাচ্ছে তাঁরা হলেন শ্রীসুরেন্দ্রনাথ পালচৌধুরী, শ্রীবিজয়মাধব মুখোপাধ্যায়, শ্রীকালীপ্রসন্ন সরকার, শ্রীব্রহ্মমোহন সেন, শ্রীকেদারনাথ দত্ত এবং কুমার গোপেন্দ্রকৃষ্ণ দেবরায়।

১৮৬৯ থেকে ১৮৭৫ সন পর্যন্ত বঙ্কিম-পিতা যাদবচন্দ্র ছিলেন এই মিউ-নিসিপ্যালিটির ভাইস-চেয়ারম্যান। তাই খুব বেশি দিনের জন্য না হলেও একই মিউনিসিপ্যালিটিতে পুত্র এবং পিতা চেয়ারম্যান এবং ভাইস-চেয়ারম্যানরূপে অধিষ্ঠিত ছিলেন কিছুকাল।

শ্যামনগর থেকে কাঁচরাপাড়া—এই বিরাট এলাকা একটিমাত্র মিউনিসিপ্যালি-টির অধীনে সুব্যবস্থিত করে রাখা সম্ভব হয়ে উঠছিল না কিছুতেই। তাই ১৮৯৯ খৃস্টাব্দের ১লা জুলাই নৈহাটী ভেঙে পুনরায় প্রতিষ্ঠিত হল ভাটপাড়া মিউ-নিসিপ্যালিটি। প্রতিষ্ঠাকালে যার জন-সংখ্যা ছিল হিন্দু ৫৬২৭৯, মুসলমান ২৭৬৪৫: কিছু অপরাপর ধর্মাবলম্বী এবং সব মিলিয়ে ৮৪৯৭৫ জন।

১৯০৩-এর ১লা অক্টোবর হল হালি-সহর। জনসংখ্যা ১৬৭৭০। যার মধ্যে হিন্দু ১২৪৭৮, মুসলমান ৪২১৪। এবং তারপরেও আবার ১৯১৭ খৃস্টাব্দের ১লা অক্টোবর হালিসহরকে ভেঙে দু'ভাগ করে প্রতিষ্ঠা হল কাঁচরাপাড়া মিউনিসিপ্যালি-টির। জনসংখ্যা ছিল ১৫০০৫। ১১৬৮৯ জন হিন্দু ও মুসলমান ২৬৪৬।

১৯১৭-১৮ খৃস্টাব্দে অর্থাৎ পুরনো মিউনিসিপ্যালিটি চার খন্ডে ভেঙে বিভক্ত হয়ে যাবার পর কেবলমাত্র নৈহাটীতেই পৌর-কর আদায় হয়েছিল ৩২২৩৩ টাকা। ব্যয় ছিল ৪৬৫৪৩ টাকা। ১৯০২-৩ থেকে ১৯১৭-১৮ সন পর্যন্ত আংশিক তথা পূর্ণ বিভক্ত নৈহাটীর আদায়ী করের একটা মোটামুটি হার হিসাব দেওয়া গেল।

১৯০২-৩	—	৮৪·৯
১৯১১-১২	—	৯৯·৬
১৯১৪-১৫	—	৯৮·৮
১৯১৫-১৬	—	৮১·৪
১৯১৬-১৭	—	১০৮·৬
১৯১৭-১৮	—	৯৩·৮

শতকরা ১০০ ভাগেরও অধিক ট্যাক্স আদায়ের নজীর রয়েছে এখানে। ইদানীং-কালে এ ঐতিহ্য ব্যাহত হয়েছে নিঃসন্দেহে। সেটা কতখানি আরোপিত করহারের বহনযোগ্য ক্ষমতার অভাবে, আর কতটাই বা সমস্যাজর্জর মানুষের কর ফাঁকি দেবার কায়দা-কানুনে রপ্ত হয়ে ওঠার ফলে তা জানেন কর্তৃপক্ষ।

* * *

গঙ্গার এপারে হুগলীর দিক থেকে সরাসরি নৈহাটী প্রবেশের রাস্তা আছে দুটি। একটি ব্যান্ডেল থেকে ট্রেনযোগে। অপরটি চুঁচুড়ার ফেরিঘাট থেকে লঞ্চ-যোগে গঙ্গা পার হয়ে।

দুর্ভাগ্যবশত দ্বিতীয় পথটিই আমি বেছে নিয়েছিলাম। দেখা গেল গঙ্গা পার হওয়া প্রায় অপার পারাবার পার হওয়ারই মত। এই ভরা বর্ষাকালেও ভাগীরথী কৃপণ। ভাটার জল নেমে গিয়ে অনেক দূর পর্যন্ত থক্ থক্ করছে বালি, কাদা আর জলে ভেজা নরম দলদলে পলি। ওপারের লঞ্চ এপারে এসে ভিড়তে পারে না সোজাসুজি। নোঙর ফেলে বসে আছে মাঝ বরাবর। তীর থেকে সেই তরণী-

পারুল ভট্টাচার্য

মুন্সিবাটী

কুমার মহেন্দ্র হাই স্কুলের পুরনো বাড়ি

সংযোগে প্রসারিত প্রথম অনেকগুলি নৌকায় নৌকায় বাঁধা এক নৌ-সেতু। তারপর পরণের কাপড়-চোপড় গুটিয়ে তুলে হাঁটুভর জল ভেঙে হেঁটে গিয়ে চড়তে হবে আর এক নৌকায়। এই নৌকা খেয়া নৌকা। মাঝি পার করে দাও, মাঝি পার করে দাও—ঊর্ধ্বশ্বাস হাঁকাহাঁকি একপ্রস্থ। নির্বিকার মাঝি শুনলো কি না শুনলো, ইচ্ছা হলে এলো তাড়াতাড়ি। নৌকা বোঝাই যাত্রিদল নিয়ে গিয়ে ভিড়িয়ে দিল লঞ্চের গায়ে। একবার, দুবার, তিনবার। যতক্ষণ না লঞ্চ ভর্তি হয় ততক্ষণ। পার হওয়ার প্রশ্ন তারপর। লঞ্চ চললে তবেই ওপারের আশা।

হ্যাঁ—লঞ্চ না চলার প্রশ্নও আছে। চুঁচুড়া-নৈহাটী ফেরি পারাপারের এই লঞ্চগুলি বয়সে প্রায় মান্ধাতা আমলের। ঝরঝরে, নড়বড়ে। ঝড়-তুফানে তো বটেই শুকো-রুখো পরিস্কার দিনেও নিরাপদ নয় ষোল আনা। কর্তৃপক্ষ তবু চালিয়ে যাচ্ছেন। চলে যাচ্ছে পুরুষ-মহিলা-শিশু-বৃদ্ধ নির্বিচারে প্রত্যহ শত শত যাত্রীর সওয়ার।

ফেরিঘাট থেকে স্টেশনের মুখ পর্যন্ত রাস্তাটি নৈহাটীর সবচেয়ে ব্যস্ততম, প্রশস্ততম, সজ্জিততম এবং বর্তমানে নোংরা ও ঘিঞ্জিতম, পথ চলার পক্ষে প্রায় অযোগ্যতম রাস্তা হয়ে উঠেছে বললেও চলে। দুপাশে বাঁধা দোকানের সারি বেপাত্তা। ফুটপাতের চিহ্নমাত্র নেই। কোথাও রাস্তারও কতকাংশ লুপ্ত হয়ে গেছে ঝাঁক বেঁধে এগিয়ে আসা দোকানের সারের তলায়। কাটা কাপড় থেকে তৈরি পোষাক, হাঁড়ি, হাতা-বালতি, বাসন থেকে, চামড়ার জুতো, বেতের সাজ, সস্তার রুকারী, বিয়ের টোপর, বরের চেলি, শাক-সব্জি, মাছ-মাংস, হোটেল-রেস্টুরেন্ট এমন কি ফুলের বাজার, ফলের বাজার পর্যন্ত। গায়ে গায়ে, গাদাগাদি, ঠাসাঠাসি হয়ে বাসা বেঁধেছে এখানে। এইটুকু—লম্বায় চওড়ায় মাত্র কয়েক শত গজের পরিধির মধ্যে। গাড়ি-ঘোড়া, লরি-মোটরের কথাই তো দূরে, একখানা সাইকেল ঢুকলে রীতিমত সমস্যা, রিক্সা চললো তো সর্বনাশ!

সবাসী-প্রবাসী-আগন্তুক এবং বসবাসী মিলিয়ে নৈহাটী নিঃসন্দেহে একটি জনবহুল ব্যস্ত এলাকা। বাঁধাধরা আরও একটি-দুটি বাজারের ব্যবস্থা সঙ্গত কারণেই এখানে অতি প্রয়োজন। আর বিপণির নামে ফুটপাতপ্রসারী এই উচ্ছৃঙ্খলতার অবসানও শহরবাসীর স্বার্থ তথা স্বাচ্ছন্দ্য রক্ষার জন্যই দরকার। ফুটপাত-বিপণির মালিক যাঁরা তাঁরা বেশির ভাগই পূর্ববঙ্গাগত উদ্বাস্তু। এই ছোট ছোট দোকানগুলি তাঁদের পেশা, জীবনধারণের জড় বললেও অত্যুক্তি হয় না। এঁদেরকে কুড়িয়ে-গুছিয়ে শহরের সুবিধেজনক কোনও একটি স্থানে হকার্স কর্নার জাতীয় কিছু একটা প্রতিষ্ঠা করা দরকার। পৌর কর্তৃপক্ষকে অবহিত হতে বলি।

নৈহাটী যাকে বলে ঠিক প্ল্যান্ড্ টাউন নয়। লোকসংখ্যা যেমন বেড়েছে, এলাকাও হয়েছে বর্ধিত। এই লোকসংখ্যাও যে ঠিক জন্ম-মৃত্যুর সূত্র ধরেই বেড়েছে এমন কথাও বলা যাবে না। কলকারখানা চারদিকে। ছোট-বড় ব্যবসা-বাণিজ্যেরও উত্থান-অগ্রগতি ঘটছে নিয়তই। অধিবাসী ছাড়া আগন্তুকের সংখ্যাও তাই নিতান্ত কম নয়। পুরানো দুটি জনগণনার সঙ্গে তুলনা করলে হিসেব স্পষ্ট হবে খানিকটা।

১৯০১ সনের জনগণনায় আংশিক বিভক্ত নৈহাটীতে লোকসংখ্যা ১৩২৩১ জন। ১৯১১-তে ১৮২১৮ জন। বিগত ৫৫ বছরে সম্পূর্ণ বিভক্ত নৈহাটীতে সেই সংখ্যা বাড়তে বাড়তে এসে পৌঁছেছে ৫৮৩১৬-য়। যার মধ্যে ভোটার আছেন ২৫ থেকে ৩০ হাজার।

এক দশমিক আটষট্টি বর্গমাইল এলাকা মিউনিসিপ্যালিটির। সমস্ত এলাকা ছ'টি ওয়ার্ডে বিভক্ত ছিল এতদিন। এইবার আগামী নির্বাচনে ভেঙেচুরে দাঁড়াবে উনিশে। কমিশনার হবেন উনিশজন। ১৯৬৪-৬৫-তে মোট আয় ছিল ৭,১৬,৭৫৮ টাকা। এ ছাড়াও প্রায় এক লক্ষ টাকার মত সরকারী সাহায্য পান এঁরা।

তিনটি ফ্রি প্রাইমারী স্কুল সম্পূর্ণ চালান মিউনিসিপ্যালিটি। দুটি বাংলা, একটি হিন্দী। তার মধ্যে একটি বালিকাদের জন্য। এ ছাড়াও এগারটি প্রাথমিক বিদ্যালয় ও ছ'টি গ্রন্থাগার নিয়মিত অর্থ সাহায্য পেয়ে থাকে এঁদের কাছ থেকে। ১৯৬৪-৬৫ সনে শিক্ষাখাতে মোট ব্যয় করেছেন মিউনিসিপ্যালিটি ৪৫,৫২৮ টাকা।

যদিও নল-নর্দমা, পরিস্কার-পরিচ্ছন্নতা এবং রাস্তাঘাট মেরামতী বাবদ ১৯৬৪-৬৫ সনে খরচ হয়েছে এঁদের যথাক্রমে ৫৬,৯০৮ টাকা, ২,১৪,৪৭০ টাকা এবং ৫০,৯৭৪ টাকা। তথাপি শহরের চেহারা খুব সুসংস্কৃত নয় মোটেই। রাস্তাঘাটের মধ্যে কাঁচা রাস্তার কথা বাদই দেওয়া গেল, পাকা রাস্তাগুলিও চমৎকার নয়। উঁচু-নিচু খানা-খন্দ তো আছেই, জায়গায় জায়গায় সংস্কারের অভাবে ছোট-বড় গর্তেরও অভাব নেই। বিশেষত জল-নিকাশী বন্দোবস্ত একেবারে অতি যাচ্ছে-তাই। দুপাশে একহাঁটু করে গভীর—দুর্গন্ধ, কালো কাঁচা নোংরা নর্দমা! পোকা আর মশার ছানায় কিলবিল! খাটা পাইখানা যত্রতত্র, মুখগুলি রাস্তার দিকে এবং বেশির ভাগই খোলা। দুর্গন্ধে পদচারীর পথচলা দায়। একটু বৃষ্টি হলেই হাঁটুভর জল জমে যায় রাস্তায়। নর্দমার নোংরা পাইখানার চোয়ানো জল, উপচে-পড়া ডাস্টবিনের ভেসে-আসা কথ্য-অকথ্য

নানা আবর্জনায় শহর এক বিভীষিকাময় রূপ ধারণ করে তখন। স্টেশন-ফেরিঘাট রাস্তার মোড়ে জমা জলে মরা বিড়াল আমি নিজে ভাসতে দেখে এসেছিলাম। এবং তার উপরে এই সবের একেবারে ধার ঘেঁসে রাস্তার কোলে কোলে খোলা খাবারের দোকান আর উড়ন্ত মাছির অবিরাম ভনভনানি! জনস্বাস্থ্য যে কোথায় যাচ্ছে তা খোদায় মালুম। যে কোন কারণেই হোক, রাজ্য সরকারের খুব নেক-নজর নেই এই শহরটির উপরে বলে মনে করেন কেউ কেউ। কমিউনিস্ট-বিজিত এলাকা বলেই কৃপার এই কৃপণতা এমন সন্দেহও আছে কারও কারও মনে। (লোক-সভায় শ্রীমতী রেণু চক্রবর্তী এবং বিধান সভায় ডাঃ গোপাল বসু (উভয়েই কমিউ-নিস্ট) বিজয়ী হয়েছেন এখান থেকে)।

নৈহাটী স্টেশনের সামনে দিয়ে বরাবর চলে গেছে বারাকপুর ট্রাঙ্ক রোড, কাঁচরাপাড়া ছাড়িয়ে কল্যাণীর পানে। লঞ্চঘাট থেকে বাজারের মাঝখান দিয়ে অরবিন্দ রোড এসে মিলেশে বারাকপুরে রাস্তায়। এ ছাড়া আছে রাধাবল্লভ রোড, সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায় রোড, নলিনী ভট্টাচার্য রোড, জনস্টন রোড, মিত্রপাড়া, বনকপুর এবং মুসলমানপাড়া রোড।

জল সরবরাহ ব্যবস্থা একান্তই অপ্রচুর ছিল এতদিন। অনেক আবেদন-নিবেদনের পর সম্প্রতি কর্ণপাত করেছেন সরকার। শোনা গেল নতুন দুটি গভীর নলকূপ বসানো হবে এখানে। আন্দাজ পাঁচ থেকে ছ' লাখ টাকার পরিকল্পনা। যার তিনভাগের দু-ভাগ দেবেন সরকার এবং একভাগ বহন করবেন মিউনি-সিপ্যালিটি।

গার্লস স্কুল আছে দুটি। নৈহাটী মিউনিসিপ্যাল গার্লস হাইয়ার সেকেন্ডারী।। আর একটি গরিফা হাই স্কুল। দু'টিতেই মেয়েদের জন্যে প্রাতঃ-কালীন ব্যবস্থা। দুপুরে ছেলেদের পড়ানো হয়।

নৈহাটী মহেন্দ্র হাইয়ার সেকেন্ডারী, নৈহাটী বয়েজ হাই স্কুল এবং গরিফা হাই স্কুল—এগুলি ছেলেদের জন্য এবং সবগুলিই হাইয়ার সেকেন্ডারী। এছাড়াও মিউনিসিপ্যালিটির বাইরে নৈহাটী থানার অন্তর্ভুক্ত আছে বিজয়নগর হাই স্কুল দশম শ্রেণী সম্বলিত। প্রফুল্ল সেন হাই স্কুল—দশম শ্রেণী সম্বলিত। এবং আদর্শ বিদ্যানিকেতন। বিজয়নগর এবং প্রফুল্ল সেন-এ রাত্রিকালীন পাঠ ব্যবস্থা আছে। এতগুলি বিদ্যালয়ের মধ্যে নৈহাটী মহেন্দ্র হাই স্কুলের একটি ঐতিহ্যময় প্রাচীনত্ব আছে। বিদ্যালয়টির প্রতিষ্ঠা-কাল ১৮৬৭। শিক্ষককুলের মধ্যে সগৌরবে স্মরণযোগ্য হয়ে আছে

মিত্রপাড়া রোডের একটি দৃশ্য

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের নাম। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর তখন ইনস্পেক্টর অফ স্কুল ছিলেন। বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার দিনে স্বয়ং ছাত্রদের পড়িয়ে পাঠদানের রীতি-পদ্ধতি বুঝিয়ে দিয়ে গিয়েছিলেন অপরাপর শিক্ষকমণ্ডলীকে।

শোনা যায় এই বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা পাঠদান উপলক্ষে নৈহাটীতে এসে কিঞ্চিৎ বিপাকেও পড়েছিলেন তিনি। নৈহাটীর কুলীন কায়স্থ পরিবার মিত্রদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সৌহার্দ্য ছিল তাঁর। মধ্যাহ্নের ভোজন এই বন্ধুগৃহেই সমাপন করে-ছিলেন তিনি। রাতের আহারের নিমন্ত্রণ ছিল ভট্টাচার্য বংশের শ্রীমেঘনাদ ভট্টা-চার্যের বাড়িতে। কিন্তু ভট্টাচার্যরা নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ। যজন-যাজন অধ্যাপনা পেশাধারী জাত-জ্ঞাত গোষ্ঠী বিচারে গুরুতর কঠোর। কায়স্থবাড়িতে বিদ্যা-সাগর মশায়ের আহার্য গ্রহণের সংবাদ কানে পেঁাচেছিল তাঁদের। এমন আচার-বিচারহীন—তা তিনি বিদ্যাসাগর হলেও তাঁকে গৃহে নিয়ে এসে একসঙ্গে বসে আহার করবার ইচ্ছা কিংবা সাহস ছিল না তাঁদের। রাত হল। আহারের আহ্বানের অপেক্ষায় বসে থেকে থেকে এক সময় ঘুমিয়ে পড়লেন বিদ্যাসাগর। আহ্বান আর এল না, আহারও হল না তাঁর। সে রাত্রি উপবাসেই কাটাতে হয়েছিল তাঁকে। ১৯২৩ সনের বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলনের স্মৃতিটিও যুগপৎ কৌতুক এবং ক্ষোভের খোরাক জুগিয়ে আসছে নৈহাটী-বাসীর মনে। দলাদলি আর আপোস-ঝগড়ার ফলে সম্মেলন দু'ভাগে ভাগ হয়ে যায়। এবং একদিন একই সময়ে কাঁঠালপাড়ায় বঙ্কিমচন্দ্রের বাড়িতে একটি, আর নৈহাটীতে রামায়ণের মাঠে আর একটি সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। কাঁঠালপাড়ার সম্মেলনের উদ্যোক্তা ছিলেন শ্রীরামসহায় বেদান্ত শাস্ত্রী এবং প্রধান অতিথি হয়ে এসেছিলেন নাটোরের মহা-রাজা জগদীন্দ্রনারায়ণ।

নৈহাটী সম্মেলনের উদ্যোক্তা শ্রীহর-প্রসাদ শাস্ত্রী এবং প্রধান অতিথি হয়ে এসেছিলেন শ্রীরবীন্দ্রনাথ স্বয়ং। শোনা যায় আপন ভাষণ দানকালে অত্যন্ত ক্ষুব্ধকণ্ঠে নাকি বলেছিলেন হরপ্রসাদ শাস্ত্রী—নটীর হাট তো? অধিবাসীদের চাল-চলনেও তাই নট-নটীসুলভ এমন নির্লজ্জতা।

এতগুলি লোকের বাসস্থান এতবড় একটা এলাকায় হাসপাতাল বলে কিছু নেই। মানুষের দায়ে-আদায়ে ভরসা গঙ্গার ওপারে হুগলীতে ইমামবাড়া হাসপাতাল। গুরুতর অসুস্থ রোগী নিয়ে যথা-সম্ভব তাড়াতাড়ি করলেও এক ঘণ্টার আগে পেঁাছনোই সম্ভব নয় যেখানে।

একটিমাত্র প্রসূতিসদন ও শিশু-কল্যাণ কেন্দ্র আছে এখানে। ললিত-মোহন মেটারনিটি এন্ড চাইল্ড ওয়েলফেয়ার সেন্টার। আট থেকে দশটি শয্যা। যদিও টাকা দিয়ে ভর্তি হতে হয়, তথাপি কোনও মহিলা চিকিৎসক নেই। মিউনিসিপ্যালিটির ডাক্তারবাবুই দেখা-শোনা করেন। বাদবাকী সময়ে দাই এবং মিডওয়াইফ ভরসা।

একটি হোমিওপ্যাথি ও একটি এ্যালোপ্যাথি ডিসপেনসারী আছে মিউনিসিপ্যালিটির নিজস্ব। কয়েকটি

কলকারখানা কর্তৃপক্ষ পরিচালিত ডিসপেনসারিও আছে এখানে। এবং যেহেতু স্থানীয় জনসাধারণই চিকিৎসা পেয়ে থাকে, সেইহেতু চিকিৎসাব্যবস্থার হিসাবে সেগুলির নাম উল্লেখ করলে অযৌক্তিক হবে না। গৌরীপুর জুট মিল ডিসপেনসারী, নদীয়া জুট ডিসপেনসারী, নৈহাটী রেলওয়ে ডিসপেনসারী, জনসন এন্ড নিকলসন কোম্পানীর পরিচালিত ডিসপেনসারী।

১৯৬৪-৬৫-তে চিকিৎসাখাতে ব্যয় করেছেন পৌরসভা ১৭,৩৯৪ টাকা। ১৯৬৩-৬৪-তে যার পরিমাণ ছিল ৩০,৫৪৮ টাকা।

ভারী শিল্প আছে এখানে অনেকগুলি। নৈহাটী হুকুমচাঁদ মিল, নদীয়া জুট মিল, গৌরীপুর জুট মিল, জনসন এন্ড নিকলসন রং-এর কারখানা ইত্যাদি। ইতস্তত গজিয়ে ওঠা এ সব কলকারখানাকে কেন্দ্র করেই গড়ে উঠেছে নৈহাটী শহর। লোকসংখ্যা বেড়েছে, সীমানা হয়েছে প্রসারিত। বেকারী গেছে কিছুটা, ক্রয়ক্ষমতা বেড়েছে মানুষের। পৌরসভার আয়ভাগের একটা বৃহৎ অংশও পুষ্ট হয়েছে এই কলকারখানা থেকেই।

অপরদিকে নোংরামি বেড়েছে, অসজ্জিত, অ-সংস্কৃত বস্তি এলাকার ঘটেছে প্রসার। গুন্ডামি, মাতলামি, হল্লাবাজী, প্রভৃতি অসামাজিক ক্রিয়াকলাপের ঘটেছে বৃদ্ধি। ভালয়-মন্দয় মিলিয়ে যন্ত্র-সভ্যতার এ এক বিচিত্র অবদান। একে এড়ানো যায় না। অস্বীকার করতে বাধে। অথচ সহ্য করতে গেলেও অন্তরাত্মা সঙ্কুচিত হয়ে উঠতে চায় বারবার।

গৌরীপুর জুট মিল অনেককালের। ১৭৫৭ খৃস্টাব্দে কলকাতা আক্রমণকালে এইখানে কাছেই রথডাঙার মাঠে ছাউনি ফেলে গঙ্গা পার হয়েছিলেন নবাব সিরাজদ্দৌলা। সেইসময় অপেক্ষারত সৈন্যদলকে রসদ যোগাবার প্রয়োজনে বসানো হয়েছিল একটি হাট। এই হাটটিই কালক্রমে গুড়ের হাটে পরিণত হয়। বর্ধমান, বীরভুম, নদীয়া, হুগলী প্রভৃতি এলাকা থেকে গুড় এসে পড়তো এখানে। আর সেই বিপুল পরিমাণ গুড়ের বেশির ভাগ অংশই চোলাই হয়ে তৈরি হতো সেকালের বিখ্যাত গৌড়ীয় বা গুড়ের মদ। এই মদ তৈরির প্রয়োজনেই একটি ডিস্টিলারীও স্থাপিত হয়েছিল এখানে। সেই ডিস্টিলারীটি পরে উঠে যায় এবং সেই সব বাড়ি-ঘর জমি-জমা কিনে নিয়েই প্রতিষ্ঠিত হয় গৌরীপুর জুট মিল।

কলোনী আছে এখানে মোট পাঁচটি। হরিনগর, অশোকনগর, রামনগর, এবং বিদ্যাসাগর কলোনী। অধিবাসীরা বেশির ভাগই উদ্বাস্তু। ছোট ব্যবসাদার, ফেরিওয়ালা, রিক্সাচালক, কলকারখানার শ্রমিক—উকিল, ডাক্তার, শিক্ষক কিংবা আরও অপেক্ষাকৃত উচ্চ বৃত্তিধারীও আছেন দু-চারজন। মোটকথা ছোট-বড় নানা পেশায় জীবনযাপনের যুদ্ধে যুক্ত সবাই। রাস্তাঘাট, বিদ্যালয়, বিদ্যুৎ সরবরাহ, জলকল কিংবা নল-নর্দমার বন্দোবস্ত আরও পাঁচটা কলোনীর মতই। যেটুকু না হলে মানুষের চলে না শুধু সেটুকুই আছে।

নৈহাটী রেল স্টেশন বাংলা তথা ভারতের প্রাচীনতম রেল স্টেশনগুলির অন্যতম। বর্তমানে শিয়ালদহ সেকশনের ব্যস্ততম এবং বিরাট জংশন স্টেশন। প্রকান্ড ইয়ার্ড, যতদূর দৃষ্টি যায় মাকড়সার জালের মত পাতা লাইনের সারি, সাইডিং-এর বিপুল চাপ স্টেশনটিকে কর্মব্যস্ত করে রেখেছে সদাই।

অনুসন্ধান ব্যবস্থা ভাল নয় স্টেশনটির। টিকিট কাউন্টারগুলির অবস্থান এমনই গোলমেলে যে নতুন যাত্রীর গুলিয়ে যাবার সম্ভাবনা খুব বেশি। ওয়েটিংরুম সদাই দখল হয়ে থাকে—অ-প্যাসেঞ্জার একদল কর্তৃক। প্ল্যাটফরমের পরিচ্ছন্নতা আরও একটু সতর্কতার সঙ্গে দেখাশোনা করার দরকার আছে।

ভাল ক্যান্টিন নজরে পড়লো না কোথাও। একটি চায়ের স্টল আছে। কিন্তু চা, স্ন্যাকসের নামে তাঁরা যে অখাদ্য এবং অপেয় পরিবেশন করে থাকেন মানুষের জিহ্বায় তা অত্যাচার বিশেষ। রাণাঘাট-শিয়ালদহ লাইনে চুরি, ছিনতাই প্রভৃতি লেগেই থাকে। নৈহাটীতেও দুর্বৃত্তদলের সংখ্যা নেহাৎ কম নয় বলে জানা গেল। রেল পুলিশের এ বিষয়ে অবহিতির প্রয়োজন আছে।

পুলিশী প্রসাশন শহরেও ভাল নয়। একে শিল্পপ্রধান এলাকা তার উপরে উদ্বাস্তু অধ্যুষিত। নানা সমস্যায় জর্জরিত মানুষের ফাটলধরা আর্থিক বুনিয়াদ আর এক সমস্যা। অসামাজিক কার্যকলাপ লেগেই আছে এখানে। কিন্তু পুলিশের দ্বারায় কোন প্রতিকার বা প্রতিরোধ হবে এমন ভরসা সাধারণ মানুষের নেই। বরং ঝামেলার উপরে ঝামেলা এড়াতে পুলিশ ডাকার পুরনো পদ্ধতিটাই তুলে দিতে চাচ্ছেন অনেকে। এক কথায় সমাজের ধন-প্রাণ এবং শান্তি ও শৃঙ্খলার সংরক্ষক আরক্ষা বিভাগের উপর একদা যে একটি নিশ্চিত বিশ্বাস পোষণ করতো মানুষ, ইদানীংকালে তার ঘাটতি ঘটেছে দেশে। শুধু নৈহাটীতে নয় প্রায় সর্বত্রই দেখেছি এই অশ্রদ্ধা এবং অবিশ্বাস। ফলাফল ভাল কি মন্দ তা ঈশ্বরই জানেন।

নৈহাটীর কালীপুজো বিখ্যাত। চন্দননগরের জগদ্ধাত্রী প্রতিমার মতো নৈহাটীর কালী প্রতিমাও উচ্চতা এবং গঠনসৌকর্যে অনবদ্য। কখনও কখনও ষাট ফুট উঁচু হয়েছে প্রতিমা বলে শোনা যায়। বাজী বাজনা এবং নৌকা-বাচেরও একটি প্রবল রেওয়াজ আছে এই উপলক্ষে।

মিত্রপাড়া রোডের একাংশ

ঠিক করে কি উপলক্ষ থেকে এই

বৃহৎ প্রতিমার প্রচলন হলো এখনো তা সঠিক করে বলা সম্ভব নয়। তবে ওপারে চুঁচুড়ার কার্তিক, চন্দননগরের জগদ্ধাত্রী এবং সাহাগঞ্জের গণেশপুজার প্রভাব থেকে এমন পদ্ধতি প্রচলন হয়ে থাকবে বলে অনুমান করা যায়।

* * *

খ্যাত-বিখ্যাত অনেক নামের তালিকাই হাতে ঠেকবে নৈহাটীর মাটি হাতড়ালে—বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, সুরেন্দ্রনাথ পালচৌধুরী, বাবু রামকমল সেন, চিকাগো ধর্মসম্মেলনে ব্রাহ্মধর্মের প্রতিনিধি ভাই প্রতাপচন্দ্র মজুমদার, ব্রহ্মমোহন সেন, কালীপ্রসন্ন সরকার, কেদারনাথ দত্ত প্রভৃতি। অনেক স্বনামখ্যাত পুরুষই কেউ জন্মসূত্রে কেউবা কর্মসূত্রে নৈহাটীর সঙ্গে জড়িত। সর্দার শঙ্কর ছিলেন মহারাজ প্রতাপাদিত্যের প্রধান সেনানী, নৈহাটীতে বাস ছিল তাঁর। মুঘল উচ্ছেদে আজন্ম নিয়োজিত করে রেখেছিলেন নিজেকে।

পণ্ডিত মাণিক্য তর্কভূষণ, মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর পূর্বপুরুষ ত্রিবেণীর জগন্নাথ তর্কপঞ্চানন, আর গুপ্তিপাড়ার বাণেশ্বর তর্কালঙ্কারের প্রতিযোগী মহাপণ্ডিত। ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র সেন ব্রাহ্মধর্মের প্রতিষ্ঠাতা। ইণ্ডিয়া মিরার-এর সম্পাদক রায় নরেন্দ্রনাথ সেনবাহাদুর।

আজকের নৈহাটীতে মানুষ তথা মনীষার সেই তীব্র প্রাণবেগ স্তিমিত হয়েছে নিঃসন্দেহে। যুগসৃষ্টিকারী যুগান্তপ্রসারী কর্মস্রোতে ধরেছে ভাটার টান। স্রষ্টাদলও অস্তমিতপ্রায়। বিষাদে, হতাশায়, আনন্দ আর আশাহীনতায় ক্লান্ত জর্জর জনপদের উপর থমকে নেমে আছে যে ছায়া—সে ছায়া শুধু দিন যাপনের, শুধু প্রাণ ধারণের গ্লানির। তথাপি কর্মস্রোত বয়, জীবনধারা প্রবাহিত হয় সবার অলক্ষ্যে, নীরবে নিভৃতে, সর্বত্র সঞ্চারী অবসাদ আর আবিলতার তলায় তলায়। কলোনীতে কারখানায় ছোট-ছোট পেশায়, আর বড় বড় দায়ে। হাতুড়ি যারা পিটছে, হাল যারা টানছে, প্রকাণ্ড ময়লা গাড়ির ঘড় ঘড় ঠেলায় কপাল জুড়ে যাদের ঘামের বিন্দু। শ্রমে শক্তিতে সাহসে এবং সংগ্রামে যাদের অবারিত আত্মপ্রকাশ। মহাকালের মূক মিছিলে ওরাই হয় মৌন শরিক। যুগ ওদের চেনে না, কিন্তু যুগ সৃষ্টি হয় ওদেরই হাতে। ইতিহাস ওদের ঠেলে সরিয়ে দেয় তার পথের দু'পাশে তথাপি ওরাই হয় কালে কালে ইতিহাসের নিয়ামক। হেরেও যারা হার মানে না, মার খেয়ে যাদের মৃত্যু নেই, অনেক বঞ্চনা আর বেদনার স্রোতে উজান বেয়ে জীবনের সত্যকে খুঁজে পাওয়ার সেই ওদের সার্থক সন্ধান। আজকের নৈহাটীও তাই অন্তহীন আগামীকালের অন্তরঙ্গ অংশীদার।

[আলোকচিত্র লেখিকা কর্তৃক গৃহীত।]

অযাচিত—

এক আর একে দুই নয়

সুপ্রীতিকুমার দাশ

সাধন মিত্তির চেয়ে আছে আকাশের দিকে। তারায়ভরা রাতের আকাশ। জ্বল্‌জ্বল্‌ করে জ্বলছে অগণিত তারকা। কোনটার উজ্জ্বল দীপ্তি বিচ্ছুরিত হয়ে অন্ধকার ভেদ করে ক্লান্ত ধরণীর বুকে আছড়ে পড়ছে। কোনটা আবার জ্যোতিহীন—মনে হয় এখনি বুঝি হারিয়ে যাবে অনন্ত নীলিমার বুকে।

সাধন মিত্তির অপলকনেত্রে চেয়ে আছে। মনে তার হাজারো প্রশ্ন। 'জীবন মৃত্যু পায়ের ভৃত্য' করে যারা অকালে ঝরে গেল সবুজ তাজা বৃন্ত হ'তে, এরা কি তাদেরই জ্যোতির্ময় রূপ। ত্যাগ ও তিতিক্ষা—রূপ আর কল্পনার আলোকবন্যায় অবগাহন করে কি ওরা অনন্ত নীলিমার বুকে ভেসে বেড়াচ্ছে আপন মহিমার দ্যুতি অঙ্গে ধারণ করে দিগ্‌ভ্রান্ত পথিকদের পথের সন্ধান দিতে? না, শুধু-ই ওরা নীহারিকা? ঐ রূপেই কি ওরা যুগ-যুগান্তর আপন দীপ্তিতে দীপান্বিতা? মহত্ত্বের আহ্বানে মরণ পারে যাত্রা করে যারা জাতিকে মহিমান্বিত করেছে, তাদের সঙ্গে কি ওদের কোন সম্পর্ক-ই নেই?

অনন্ত নীলিমার বুকে নিবিড় আঁধার ভেদ করে জ্বল্‌জ্বল্‌ করে জ্বলছে যেমন অসংখ্য তারকা, সাধন মিত্তিরের শোক-সন্তপ্ত বুকের মাঝে তেমনি হারিয়ে যাওয়া তার দুই পুত্রের হাজারো স্মৃতি জ্বল্‌জ্বল্‌ করছে।

নাঃ, আর ভাবতে পারে না সাধন মিত্তির। স্ত্রী সরমার মৃত্যুশয্যায় আশ্বাস দিয়েছিল—তার দুই ছেলেকে মানুষের মত মানুষ করে গড়ে তুলবে। আর মেয়ে? ম্লান হাসির ক্ষণিক রেখা বুঝি ঝিলিক দিয়ে উঠেছিল সরমার চোখের কোণে।

মৃদুকণ্ঠে বলেছিল—মেয়ে তোমার গলার হার। তোমারই মনোমত করে গড়ে তুলো। ওর জন্যে ভাবনা তো আমার নয়—তোমার। কিন্তু আমার ইচ্ছাকে পূর্ণ কোরো তোমার ভাবনায় মিশিয়ে দিয়ে, এই আমার শেষ অনুরোধ। তোমার ওপর সে বিশ্বাস আমার আছে। তবু সবার আগে আমার শেষ ইচ্ছা তোমায় শুনিয়ে নিশ্চিন্ত হলাম। বলতে বলতে সরমার চোখ দিয়ে সেদিন মায়ার-বাঁধন-ছেঁড়া বেদনার দুটি কণা অশ্রু হয়ে ঝরে পড়েছিল। বোধহয় সেই প্রথম আর সেই শেষ।

তারপর কেটে গেছে কয়েকটা বছর। দুই ছেলে তপন আর প্রদীপ। লোকে বলে—হ্যাঁ, ছেলে বটে সাধন মিত্তিরের। আজকালকার দিনে অমন ছেলে মেলা ভার। দুটি ছেলেই যেন দুটি হীরের টুকরো।

মাঝে মাঝে সাধন মিত্তির দেওয়ালে ঝোলানো স্ত্রীর অয়েল্‌পেণ্টিং-টার দিকে চেয়ে মনে মনে বলে—তুমি দেখে গেলে না সরমা, তোমার ইচ্ছাই পূর্ণ হতে চলে। ওপার হতে তুমি ওদের আশীর্বাদ কোরো।

তারিখটা আজও মনে আছে তার। বি এস সি পাশ করবার পর তপন যেদিন এসে বললে—বাবা, আপনার মত না নিয়েই একটা কাজ করে ফেলেছি।

হাসতে হাসতে সাধন মিত্তির বলে—তুমি যে অন্যায় কিছু করবে না, তোমার ওপর সে বিশ্বাস আমার আছে বাবা।

তপন পিতার পদধূলি নিয়ে দাঁড়াতেই পুত্রের মাথায় হাত রেখে বলে—আশীর্বাদ করি জয়ী হও।

তপন মাথা নিচু করে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকে, তারপর মৃদুকণ্ঠে বলে—আমি—আমি এয়ারফোর্সে যোগ দিয়েছি বাবা। সাধন মিত্তির হঠাৎ যেন একটা ধাক্কা খায়। ফ্যাল্ ফ্যাল্ করে পুত্রের মুখের দিকে চেয়ে থাকে। কিছুই যেন বুঝতে পারে না।

মৃদুকণ্ঠে তপন আবার বলে—স্বাধীন ভারতের সৈনিক হবার সংকল্প আমার বহুদিনের বাবা। তাই—

তুমি আমাকে আগে বল নি কেন? সাধন মিত্তিরের কণ্ঠস্বর যেন বহুদূর হতে ভেসে আসে।

তপন বলে—ভেবেছিলাম হয় তো আপনি আপত্তি করবেন। তাই—

ভুল তপন—ভুল। হঠাৎ যেন সাধন মিত্তির সম্বিৎ ফিরে পায়। তোমাদের কোন স্বাধীন ইচ্ছায় আমি হাত দিয়েছি? আর এ তো প্রত্যেক পিতা-মাতারই পরম গৌরব। ভবিষ্যতে যাই হোক না কেন তার জন্যে প্রস্তুত থাকাই তো মানুষের কাজ। তুমি নিশ্চিন্ত থাকো, তোমার এই মহৎ ইচ্ছায় আমার পূর্ণ সমর্থন রইলো। তোমাকে ঘিরে থাকুক আমাদের আশীর্বাদ।

সেই তপন বীরের মত চলে গেল—পাকিস্তানের সঙ্গে ভারতের মোকাবিলার সময়। বীর পুত্রের পিতা হওয়ার পরম গৌরব বুকে আঁকড়ে সাধন মিত্তির অশ্রুসজল নেত্রে স্ত্রীর ছবির দিকে চেয়ে বলেছিল সেদিন—সরমা, আমার ওপর বুঝি তোমার বিশ্বাস হল না? তাই বুঝি তাকে নিজের কাছে নিয়ে গেলে? তপন মাতৃভূমি রক্ষায় প্রাণ দিয়েছে। তার

নাম আজ দেশের লোকের মুখে মুখে। তার বীরত্ব কাহিনী দেশ-দেশান্তরে প্রচারিত হচ্ছে আজ। না-না—আমি শোক করছি না সরমা,—এ তো আমাদের পরম গৌরব। তুমি শুধু আজ আমায় বলো তোমার ইচ্ছা পূর্ণ হয়েছে কি না। বলতে বলতে কান্নায় ভেঙে পড়েছিল সেদিন সাধন মিত্তির।

তারপর কেটেছে আরও কয়েকটামাস। রাষ্ট্রসংঘের নির্দেশে অঘোষিত সেই যুদ্ধের অবসান ঘটেছে। স্বাধীন ভারতের বীর জোয়ানদের অসামান্য বীরত্ব কাহিনীতে দেশের আবাল-বৃদ্ধ-বনিতার হৃদয় ভরে উঠেছে। অসংখ্য নরনারীর সমবেদনা আর সহানুভূতিতে সাধন মিত্তিরের বুকের ক্ষতে প্রলেপ পড়েছে।

কিন্তু পশ্চিম বাংলায় আবার আগুন জ্বলে ওঠে। এ আগুন যুদ্ধের নয়—সাধারণ মানুষের পেটে ক্ষুধার আগুন। যুদ্ধ অবসানের পর দেশের সর্বত্র নানা সমস্যা দেখা দেয়। এই সুযোগে একদল মুনাফাশিকারী খাদ্য ও নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসের কৃত্রিম অভাব সৃষ্টি করে অবস্থাকে চরমে তোলে। দ্রব্যমূল্য সাধারণ লোকের নাগালের বাইরে যাওয়ার উপক্রম হয়। অসাধু-ব্যবসায়ীদের চক্রান্ত দেশের প্রশাসন ব্যবস্থায় চরম আঘাত হানে। অভাবগ্রস্ত জনতা উদ্বেল হয়ে ওঠে। সর্বত্র দাবি ওঠে "খাদ্য দাও—দাম কমাও"।

সামনে পরীক্ষা, গ্রামের ছাত্রেরা ন্যায্য মূল্যে পায় না একফোঁটা কেরোসিন। জনতার দাবিতে তারাও কণ্ঠ মেলায়। গ্রামে গ্রামে আগুন জ্বলে ওঠে। বারাসত বসিরহাট কৃষ্ণনগর মেদিনীপুর হুগলী প্রভৃতি স্থানের ছাত্রেরা মিছিল করে এগিয়ে চলে সরকারী আমলাদের দ্বারে দাবি জানাতে।

কিন্তু হায়! রাতের অন্ধকারে আর দিনের স্বচ্ছ আলোয় যারা লোভের ঠুলি চোখে পরে দেশের মানুষকে অভাবের অতলে তলিয়ে দিতে চায়, তাদের চক্রান্ত জয়ী হয়। স্বতঃস্ফূর্ত এই আন্দোলনকে দাবিয়ে রাখবার জন্য নিরস্ত্র ছাত্র শোভাযাত্রীর ওপর নির্বিচারে গুলী চলে। তরুণ তাজা রক্তে রাজপথ হয় পিচ্ছিল।

এমনি এক ছাত্র শোভাযাত্রার ওপর আকস্মিক গুলী চালনার ফলে প্রদীপের প্রাণহীন দেহ লুটিয়ে পড়ে পথের ধুলোয়। স্বাধীন ভারতের আরও একটি তরুণ তাজা প্রাণ একমুঠো অন্ন আর একফোঁটা কেরোসিনের জন্য অকালে ঝরে পড়ে পথের ধুলোয়। এই তো ক'দিন আগের ঘটনা।

প্রদীপের শেষ কাজ করে সাধন মিত্তির যখন বাড়ি ফিরলো, তখন সবেমাত্র সন্ধ্যা নেমেছে। ধরণীর বুকে তখনও অন্ধকারের গভীরতা আসে নি। সেদিনও ঠিক আজকের মতই আকাশে বসেছিল নক্ষত্রের মেলা। বন্ধুবান্ধব পাড়াপড়শীরা এসেছে সান্ত্বনা দিতে। এই তো ক'দিন আগের কথা।

হরেন বোসের কথাটা মনে পড়ছে আজ সাধন মিত্তিরের। সকলে ধীরে ধীরে চলে যাবার পর দীর্ঘশ্বাস ফেলে হরেন বোস বলেছিল সেদিন,—মিত্তির, তোমার সমব্যথী হয়ে এসেছি ভাই। এ শোকে তোমায় সান্ত্বনা দেবার ভাষা আমার জানা নেই। পুত্রগর্ব ছিল তোমার জীবনের শ্রেষ্ঠ সম্পদ। তপন আর প্রদীপ ছিল যেন দুটি রত্ন। ভাবলে অবাক হয়ে যাই মিত্তির—যার ছেলে সৈনিক বৃত্তি নিয়ে দেশের স্বাধীনতা রক্ষায় বীরের মত প্রাণ দিলে, তারই আর এক ছেলে ক্ষুধার্তের মুখে অন্ন দেবার দাবি নিয়ে দাঁড়িয়ে সেই সৈনিকের গুলী বুকে নিয়ে মৃত্যুকে বরণ করল—সে হ'ল দেশদ্রোহী। হায় রে অদৃষ্ট! তারপর বলেছিল—মিত্তির, এমন দেশে আমরা জন্মেছি যেখানে দেশ আর দেশবাসী এ দুটোকে স্বতন্ত্র করা হয়েছে। তাই মাঝে মাঝে প্রশ্ন করতে ইচ্ছে হয়—কাদের নিয়ে দেশ? কিন্তু এ প্রশ্নের তো জবাব পাওয়া যাবে না ভাই।

সরকারী সম্পত্তি যে জাতীয় সম্পত্তি এ কথা কেউই অস্বীকার করতে পারে না। সরকারী সম্পত্তির ক্ষতি যে জাতীয় ক্ষতি সে বোধ সকলেরই আছে। কিন্তু দেশের যুবশক্তি কি দেশের সম্পদ নয়? স্বাধীন দেশের জনগণ কি জাতীয় সরকারের শক্তির উৎস নয়? তা' যদি হয়, তবে তার অকারণ বিনাশ জাতীয় ক্ষতির সামিল হয় না কেন? হরেন বোস ধীরে ধীরে বলে চলে—

যে দেশে একজনকে হত্যা করলে হত্যাকারী আইনের চোখে দোষী সাব্যস্ত হয়। আর তার জন্য আছে চরম শাস্তির বিধান। কিন্তু যারা অধিক মুনাফার লোভে মানুষের মুখের গ্রাস কেড়ে নেয়, শিশুর খাদ্যে ভেজাল দিয়ে সমগ্র জাতিকে পঙ্গু করে দেয়। তাদের ন্যায় বিচারের কথা কখনও শুনেছো ভাই।

সেদিনের কথাগুলো সাধন মিত্তিরের একে একে মনে পড়ছে আজ। সকলে চলে যাবার পর হরেন বোস যে কথাগুলো ধীরে ধীরে বলেছিল।

—হ্যাঁ, মনে পড়ছে সাধন মিত্তিরের।

হরেন বোস বলেছিল—তোমার বড় ছেলে বীরের মৃত্যু বরণ করেছে। তার জন্যে তুমি শুধু নও—আমরা সকলেই গর্ব করি—

—কিন্তু প্রদীপ?

—মিত্তির, শুধু তোমার নয়—আমাদের সকলেরই মনে আফশোষ, অমন ছেলের কাছ হ'তে দেশ হয়তো অনেক কিছু পেতো। কিন্তু...কিন্তু পেলো না।

দীর্ঘশ্বাস ফেলে হরেন বোস বলেছিল—এ শুধু তোমার আফশোষ নয়, এ ক্ষতির ক্ষতে একদিন হয়তো সমস্ত জাতিকে ভুগতে হবে।

হ্যাঁ, সাধন মিত্তির এই ক'দিন অনেক ভেবেছে। কিন্তু হিসাব মেলে নি। যে দু'টি তরুণ তাজা প্রাণ অকালে ঝরে গেল, সরকারের দৃষ্টিতে তার একজন হ'ল দেশপ্রেমিক,—আর একজন দেশদ্রোহী!

কই, এক আর একে দুই তো হ'ল না! অথচ তারা দু'জনেই তো দেশ ও জাতির কল্যাণে আত্মোৎসর্গ করেছে!

—বাবা, অনেক রাত হয়েছে ঘরে চলো একমাত্র কন্যা সুনীতি পাশে এসে দাঁড়ায়।

সাধন মিত্তির আকাশের দিক হতে চোখ ফিরিয়ে বলে—বলতে পারিস মা, হিসেব আমার মিলছে না কেন?

কন্যা উদ্গত অশ্রু দমন করতে করতে শোকাতুর পিতার হাত ধরে শুধু বলে—ঘরে চলো বাবা। ঘটনার আকস্মিকতায় সেও যেন আজ মূক হয়ে গেছে।

সাধন মিত্তির কন্যার মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে দিতে উদ্ভ্রান্তের মত বলে—হ্যাঁ হ্যাঁ ঘরে যাবো বই কি মা। কিন্তু হিসেব আমার মিলছে না কেন বলতে পারিস?

—এক আর একে দুই হল না কেন?

David Hare

Peary Chand Mittra

মূল্যঃ এক টাকা মাত্র

প্যারীচাঁদ মিত্র ওরফে টেকচাঁদ ঠাকুরের ১৮৭৭ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত মূল্যবান ইংরাজী ভাষায় লিখিত গ্রন্থখানি বসুমতী সাহিত্য মন্দির জাতির পূর্ণাঙ্গ ইতিহাসের অন্যতম প্রামাণ্য বিবরণী হিসাবে পুনঃ প্রকাশ করিয়াছেন।

বসুমতী প্রাইভেট লিমিটেড

১৬৬, বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী স্ট্রীট, কলিকাতা—১২

এইচ. জি. ওয়েলস-এর স্বপ্ন

বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য

দ্বিতীয় অধ্যায় : স্বপ্নরাজ্য

ওয়েলস-এর স্বপ্ন-দেখা চোখ। তাই অন্ধের দেশকে খুঁজে পেয়েছিলেন তিনি। স্বপ্নজগৎ নিয়ে বিচিত্র সব গল্প লিখেছিলেন। অন্ধের দেশের মতো জীবনরস হয়তো সব গল্প থেকেই উচ্ছ্বসিত হয়ে ওঠে নি, কিন্তু বৈচিত্র্য যে প্রায় সর্বত্রই রঙ-রসের ইন্দ্রধনু ছড়িয়েছে, একথা বোধ করি অস্বীকার করা চলে না। অবিশ্বাস করা চলে না যে, ওয়েলস স্বপ্ন দেখেছেন, বাস্তবকে ভুলে থাকবেন বলে নয়, বাস্তবকেই নতুন করে পাবেন বলে। এছাড়া স্বপ্ন দেখার আরও অনেক সুবিধা আছে। কল্পনা সেখানে রাজপুত্রের পক্ষীরাজ ঘোড়ার মতো উদ্দাম বেগে ছুটতে পারে। সেখানে সম্ভব এসে অসম্ভবের উপর খবরদারি করে না; কৈফিয়ৎ তলব করে না যখন-তখন। তাই স্বপ্ন দেখছেন যাঁরা, অথবা যাঁরা স্বপ্নের কথা বলছেন, যুক্তিতর্ক ও তথ্য-প্রমাণকে তাঁরা উপেক্ষা করলেও করতে পারেন। কিন্তু ওয়েলস-এর স্বপ্নসম্ভব গল্পগুলোর বৈশিষ্ট্য এই যে, যুক্তি সেখানে উপেক্ষিত হয় নি। সেখানে স্বপ্নের মধ্য দিয়ে জীবনের মাধুর্যকেই নানারূপে খুঁজে পাই আমরা।

এই প্রসঙ্গে প্রথমেই উল্লেখযোগ্য 'দি ম্যান হু কুড ওয়্যার্ক মিরাক্‌লস' নামক গল্পটি। বাংলায় এর নাম দেওয়া যেতে পারে 'যে লোকটি অলৌকিক ঘটনা ঘটাত'। ওয়েলস-এর লেখা সবচেয়ে সুন্দর গল্পগুলোর মধ্যে এটি একটি। অলৌকিকের সঙ্গে লৌকিক, রহস্যের সঙ্গে জীবনরস এ গল্পে এমনভাবে মিশে আছে, অতি-প্রাকৃতের আবরণে এ গল্পের বক্তব্যটিকে এমন শিল্পসম্মত উপায়ে উপস্থাপিত করা হয়েছে যে আমরা এখানে গল্পকারের রুচি ও রসদৃষ্টির বিশিষ্টতায় অভিভূত হই। এখানে গল্প-বলার টেকনিক মুগ্ধ করে আমাদের। আমরা ভাবি, গল্পকার নিজেই বুঝি যাদু জানেন। অঘটন ঘটানোতে সিদ্ধহস্ত তিনি। তা না হলে এই যে বাস্তবের মধ্য থেকেই অবাস্তব ও অসম্ভবের দেশে তিনি আমাদের নিয়ে গেছেন, এ কথা গল্পটি শেষ হবার আগে অবধি আমরা তো কই একবারও জানতে পারি নি। আমরা মুহূর্তের জন্যেও বুঝতে পারি নি যে, অলৌকিক ঘটনাগুলো লৌকিক জীবনেরই মরীচিকা ছাড়া কিছু নয়।

মনে হয়, গল্প-বলার টেকনিকের জন্যই পারি নি। গল্পটির নাম দেখে প্রথমেই অতি-প্রাকৃতের কথা মনে পড়ে আমাদের। নিজেদের অজ্ঞাতসারেই আমরা সে মানুষটির জীবনচিত্র দেখব বলে প্রস্তুত হই, যে অলৌকিক ঘটনা ঘটাত। তারপর গল্পটি যখন এগোয়, যখন দেখি, লেখক ধীরে ধীরে ফদারিঙ্গের অলৌকিক শক্তির কথা প্রকাশ করছেন, যখন বলছেন যে এ কাহিনীর নায়ক ত্রিশ বছর বয়সেই প্রথম তার অলৌকিক শক্তির কথা জানতে পারল, তখন আর কোনো সন্দেহ থাকে না আমাদের। তখন মনে হয়, যথার্থই অপার্থিব শক্তির অধিকারী কোনো ব্যক্তির কথা পড়তে চলেছি বুঝি। এমন কি গল্পটি যে মদের দোকানে শুরু হয়েছে, এ কথাও মুহূর্তেই ভুলে যাই আমরা। মদের দোকান, মদ-পরিবেশিকা মিস মেব্রিজ এবং অলৌকিক শক্তির অস্তিত্ব নিয়ে ফদারিঙ্গের সঙ্গে তর্করত মিঃ কক্‌স ও মিঃ বিয়ামিস—এ সব কিছু ভুলে গিয়ে শুধুমাত্র একটি ঘটনার প্রতি দৃষ্টি আবদ্ধ হয় আমাদের। সে ঘটনাটি হল, ফদারিঙ্গের নির্দেশ অনুযায়ী একটি প্রদীপ উল্টে যাওয়া এবং উল্টো অবস্থাতেই জ্বলতে থাকা।

উপস্থিত সকলেই বিস্মিত হয়েছিল এই দৃশ্য দেখে। ফদারিঙ্গে নিজেও কম বিস্মিত হয় নি। কারণ অলৌকিক ঘটনায় সে কোনোদিনই বিশ্বাস করত না। এ নিয়ে বন্ধুদের সঙ্গে অনেক সময় তর্কও করেছে সে। কিন্তু এবার নিজের মধ্যেই অলৌকিক ক্ষমতা লক্ষ্য করে বিস্ময়-আনন্দে সে বিমূঢ় হল। সঙ্গীদের অবশ্য ধারণা, ইচ্ছাশক্তিকে সংহত করেই সে অসাধ্য-সাধন করেছে। কিন্তু মনে মনে স্পষ্টই বুঝল যে তার মধ্যে অত্যাশ্চর্য কোনো ক্ষমতা জন্ম নিয়েছে। দেখতে দেখতে মুখচোখ বিবর্ণ হয়ে গেল তার। কান লাল হয়ে উঠল। তাড়াতাড়ি বাড়ির পথ ধরল সে। পথে যেতে যেতে ভীত-চকিত দৃষ্টিতে রাস্তার আলোগুলোর দিকে তাকাল। ভাবল, সব আলোই উল্টে যায় নি তো? সব শেষে সে যখন বাড়ি পৌঁছুল তার বুকে তখন সন্দেহ-শঙ্কার ঝড় বইছে। ফদারিঙ্গের এই দ্বিধা ও সংশয় এবং তার ঘরে ফেরার ঘটনা এমন সুকৌশলে এত বাস্তবধর্মী করে চিত্রিত করেছেন লেখক যে অতি সতর্ক পাঠকও এখানে কোনো সন্দেহ পোষণ করবার অবকাশ পায় না। সবাই ভাবে, ফদারিঙ্গে সত্যি ঘরে ফিরেছে এবং গল্পটির পরবর্তী পর্বে যা কিছু অঘটন ঘটেছে তাদের সবই ওই মদের দোকানের বাইরে। কিন্তু আসলে তা' নয়। ফদারিঙ্গে আদৌ ঘরে ফেরে নি। মদের দোকানেও অলৌকিক কিছু ঘটে নি। অলৌকিক সব কিছুরই ঘটনাস্থল ফদারিঙ্গের মনোজগৎ। দোকানে বসেই কল্পনায় সে-জগতে অঘটনের অস্তিত্ব কল্পনা করেছে সে।

কিন্তু পাঠকরা গোড়াতে এ কথা বুঝতে পারে না। সে কারণেই এ গল্পের নায়ক ঘরে ফিরবার পর থেকে যে সব ঘটনা ঘটে, সেগুলো প্রতি মুহূর্তে তাদের চমকিত করে। ফদারিঙ্গের নির্দেশে যখন প্রদীপ খাড়া হয়ে ওঠে এবং শূন্যে ঝুলে থাকে, ইচ্ছে করা মাত্রই যখন দেশলাই হাতে পায় সে এবং বিনা চেষ্টাতেই সেটি জ্বালাতে পারে, যখন তার খুশিমাফিক গ্লাসের জলের রঙ আপনার থেকেই বার বার পরিবর্তিত হয়, টুথব্রাশ এসে হাজির হয়—বিছানায় যেতে, জামাকাপড় খুলতে বা ঘুমুতে ফদারিঙ্গেকে কোনো চেষ্টা করতে হয় না, অলৌকিক শক্তিবলে আপনার থেকেই সব হয়ে যায়, পাঠকরা তখন এ সব ঘটনা বিশ্বাস করুক আর নাই করুক, এ থেকে যে বিস্ময় ও রহস্যের স্বাদ লাভ করে, সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। অন্তত ফদারিঙ্গের কাছে যে ঘটনাগুলো সত্য, এ বিষয়ে কারও কোনো সংশয় থাকে না। কেন না সকলেই লক্ষ্য করে, পূর্ব-রাত্রির অভিজ্ঞতা যে অলীক স্বপ্ন নয়, রূঢ়

বাস্তব,—এ কথা প্রমাণ করবার জন্যে ফদারিঙ্গে নিজেই উদ্যোগী হয়েছে। দিনের আলোকে আরও কয়েকটি অলৌকিক ঘটনা সংঘটন করেছে সে। প্রাতরাশের সময় রহস্যজনকভাবে একটি ডিম আমদানী করেছে এবং ইচ্ছে করা মাত্রই হীরের বোতাম হাতে পেয়েছে। তারপর রাত্রির অন্ধকারে অলৌকিক শক্তি প্রদর্শনের নতুন পথ খুঁজেছে। বেড়াবার লাঠি চালনা করে শুকনো উদ্যানে ফুল ধরিয়েছে। এই লাঠি গিয়ে শেষ অবধি পুলিশ-প্রহরী উনন্‌চকে আঘাত করায় গল্পের মধ্যে কৌতুকরস বেশ জমে উঠেছে। তার সঙ্গে তর্ক-বিতর্কের সময় অসতর্ক ফদারিঙ্গে তার অলৌকিক শক্তির কথা হঠাৎ প্রকাশ করে ফেলেছে এবং এ কারণেই ওই পুলিশ-প্রহরীকে শেষ অবধি সুদূর সানফ্রানসিসকো পাঠিয়ে সে নিশ্চিন্ত হয়েছে।

গল্পটির পরবর্তী অংশে ফদারিঙ্গে আর একা নয়। মিঃ মেডিগ নামে তার নতুন এক সহকারী জুটেছে। তামাকের পাত্রকে প্রথমে ফুলদানীতে এবং পরে মাছের আধারে ও পায়রায় রূপান্তরিত করে এবং শেষে আবার তামাকের পাত্রটিকে হাজির করে ফদারিঙ্গে গোড়া থেকেই সহকারীর বিস্ময়মিশ্রিত শ্রদ্ধা আকর্ষণ করেছে। তারপর তারা দুই বন্ধুতে যুক্তি করে আরও অনেক অঘটন ঘটিয়েছে। অবশেষে গল্পটি ক্লাইম্যাক্সে পৌঁছেছে তখন মেগিডের পরামর্শে ফদারিঙ্গে যখন পৃথিবীর আবর্তনকে রুদ্ধ করে দিল। এর ফলে মহাপ্রলয় দেখা দিল কেমন করে এবং কেমন করে পৃথিবীর সমস্ত জীবজন্তু ধ্বংস হল, গল্পটির শেষদিকে তার বিস্ময়কর বর্ণনা আছে। কিন্তু এ বর্ণনা আমাদের মনকে ততটা স্পর্শ করে না, যতটা স্পর্শ করে আগের পৃথিবীকে ফিরে পাবার জন্যে ফদারিঙ্গের ব্যাকুলতা। ফদারিঙ্গে হাঁপিয়ে উঠল এবার। অলৌকিক শক্তিকে বিদায় দিয়ে সে আর দশজন সাধারণ মানুষের মতো সহজ ও সরল জীবনের জন্যে আকুল হয়ে উঠল। শেষ অবধি আগের জীবনকে আবার ফিরে পেল সে। কেমন করে পেল তা বলতে গিয়ে লেখক আশ্চর্য মুন্সীয়ানার পরিচয় দিয়েছেন। বলেছেন, দুটো প্রার্থনা ছিল ফদারিঙ্গের। এক—অলৌকিক শক্তিকে হারাতে চায় সে; দুই—আবার সেই পূর্বেকার মদের দোকানে ফিরে যেতে চায়।

প্রার্থনা পূর্ণ হল তার। চোখ মেলে দেখল, মদের দোকানেই সে রয়েছে। অর্থাৎ, গল্পটি যে জায়গা থেকে শুরু হয়েছিল, ঠিক সেখানেই এসে শেষ হল। মাঝখানে মদের নেশায় তন্দ্রাচ্ছন্ন অবস্থায় ফদারিঙ্গে অদ্ভুত একটা স্বপ্ন দেখে নিল শুধু। তবে এ স্বপ্নকে শুধুমাত্র একটা অলৌকিক ঘটনা বলবার পন্থা হিসেবে ধরে নিলে গল্পকারের উপর আমরা অবিচার করবো। এর একটা বৃহত্তর বক্তব্য আছে। বক্তব্যটি হল এই যে, অস্বাভাবিক বা অলৌকিক কিছু ক্ষমতা, তা যত বড়ই হোক না কেন, অনেক সময় বিপদ ডেকে আনে। অতি-প্রাকৃত বা অদ্ভুত কিছুর মধ্যে নয়, প্রাকৃত জীবনের সহজ সরল প্রবাহের মধ্যেই যথার্থ আনন্দের সন্ধান মেলে। গল্পটির শেষ দিকে ফদারিঙ্গের আকুল প্রার্থনার মধ্য দিয়ে জীবনের এই মহৎ সত্যটি নির্মমভাবে প্রকাশিত হয়েছে।

'থামো বলছি!' এগিয়ে আসা জলস্রোতকে লক্ষ্য করে চীৎকার করে উঠল ফদারিঙ্গে, 'আঃ ভালর জন্যে বলছি, থামো!'

বজ্র-বিদ্যুতের দিকে তাকিয়ে ফদারিঙ্গে বলল, 'মুহূর্তের জন্যে থামো শুধু। শুধুমাত্র একটি মুহূর্তের জন্যে স্তব্ধ হও, যাতে করে একটু ভেবে নিতে পারি।'

'...এখন কি করব আমি? হে ঈশ্বর! আমি কি করব?...'

ঘূর্ণিঝড়ের মধ্যে দাঁড়িয়ে ক্ষীণকণ্ঠে আর্তনাদ করে উঠল সে। জোরে খুব জোরে চীৎকার করে বৃথাই নিজের কণ্ঠস্বর শোনবার চেষ্টা করল।......

...বলল, 'অলৌকিক শক্তিকে হারাতে চাই আমি। আমার ইচ্ছাশক্তিও অন্য সকলের মতো হোক; এবং এই সব বিপজ্জনক অতি-প্রাকৃত ঘটনার অবসান হোক এবার। ওগুলোকে পছন্দ করি না আমি। ওদের না ঘটালেই বরং ভাল করতাম।...'

'অলৌকিক ঘটনা শুরু হবার ঠিক আগের অবস্থায় যেতে চাই আমি।...অতি-প্রাকৃত আর নয়। আগের অবস্থাটি ফিরে পেলেই আমি খুশি।'

'মিঃ স্কেলমারস্‌ডেল ইন্‌ ফেয়্যার্‌ই-ল্যান্ড' বা 'পরীর দেশে স্কেলমারস্‌ডেল' গল্পে ভিন্ন-রসের স্বাদ পাই আমরা। এ গল্প আমাদের রূপকথায় শোনা পরীর রাজ্যে নিয়ে যায়। শিশুর মতোই কৌতূহলী চোখ মেলে সে রাজ্যের আনন্দ ও মাধুর্যকে উপভোগ করি আমরা। রূপকথার সোনার কাঠি ছুঁইয়ে লেখক এখানে আমাদের অনির্বচনীয়ের মুখোমুখি দাঁড় করিয়ে দেন। তারপর রূপোর কাঠির স্পর্শে সম্বিৎ ফিরে পাই যখন, তখন দেখি, স্বপ্নসম্ভব জগৎকে বাস্তবের রূপ রস স্পর্শ দিয়েই খানিকক্ষণ ধরে উপভোগ করছিলাম। এটা সম্ভব হয়েছে লেখকের বর্ণনানৈপুণ্যের জন্য। গল্প বলতে বসেই পাঠকদের তিনি পরীর দেশে নিয়ে যেতে চান নি। চেনা থেকে অচেনার রহস্যময় পথ তিনি ধরেছেন ধীরে ধীরে, ধাপে ধাপে। এ গল্পের নায়ক স্কেলমারস্‌ডেল পরীর দেশে কিছুদিন ছিল, স্থানীয় লোকদের মুখে একথা ছড়িয়ে দিয়ে লেখক প্রথমেই কিংবদন্তীর প্রতি পাঠকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। গল্পটির অনেকটা দূর অবধি এই ভূমিকা চলে। তারপর যখন হঠাৎ একদিন ঘটনাচক্রে স্কেলমারস্‌ডেল তার পরীর দেশের অভিজ্ঞতার কথা এ গল্পের 'আমি'র কাছে বলতে উদ্যত হয়, তখন কিন্তু রূপকথা শুনবো বলে আমরা পাঠকরা প্রস্তুত হয়েই থাকি। আমাদের মনে হয়, এলডিংটন টিলায় চন্দ্রালোকিত যে মায়াময় পরিবেশে স্কেলমারস্‌ডেল ঘুমিয়ে পড়েছিল, রূপকথার দেশে অভিসারের পক্ষে সেটি একটি প্রশস্ত স্থানই বটে। তারপর সেই অপরূপা পরীটিকে দেখি আমরা। দেখি,—প্রেমে-প্রণয়ে, সোহাগে-চুম্বনে স্কেলমারস্‌ডেলকে সে অভিভূত করেছে। স্কেলমারস্‌ডেল প্রথমে সাড়া দেয় নি। পূর্ব-প্রণয়ী মিল্লীর কথা ভেবে নিজেকে আড়ালে রাখতে চেয়েছিল। যে বাগদত্তাকে সে পৃথিবীতে ফেলে এসেছে, তার স্মৃতি তাকে আচ্ছন্ন করেছিল প্রথমে। কিন্তু অবশেষে পরীরই জয় হল। স্কেলমারস্‌ডেল তাকে নিবিড়ভাবে ভালবাসল। এই ভালবাসা এতদূর গড়াল যে মাটির পৃথিবীতে ফিরে এসেও সে তার পরীর দেশের ওই প্রেয়সীকে ভুলতে পারল না। মাত্র একুশ দিনের স্মৃতি তার সমস্ত জীবনকে ওলটপালট করে দিল। মিল্লীকে ভুলে গেল সে। আবার পরীর দেশে যাবে বলে ব্যাকুল হয়ে উঠল। জ্যোৎস্না-প্লাবিত কত রাত্রি কাটিয়ে দিল এলডিংটন টিলায়। পরীর দেশে যাবার জন্যে কত সাধ্য-সাধনা করল। কিন্তু সে দেশে আর কোনোদিনই যেতে পারল না। পরীর দেশের সেই প্রেয়সী চিরকালের মতো তার ধরাছোঁয়ার বাইরে থেকে গেল। গল্পের এই অংশে স্কেলমারস্‌ডেল-এর ব্যাকুলতা খুব সুন্দর ফুটেছে। আমাদের মনে হয়েছে, এমন মানুষ পৃথিবীতে নিশ্চয়ই থাকতে পারে; ক্ষণকালের জন্যে মনের মানুষকে খুঁজে পায় এরা; ঈপ্সিত জগতের আস্বাদ পায়।

কিন্তু তার পরেই দূরে চলে যায় সব। আর ওই হতভাগ্যরা জীবনজোড়া দহনের বিনিময়ে ক্ষণকালের পাওয়ার মূল্য পরিশোধ করে। স্কেলমারস্‌ডেল সারা জীবন

ধরে খুঁজে বেড়িয়েছে স্বপ্নে-দেখা ওই পুরীকে। স্বীকার করেছে,

"হায়, আমি তাকে পেতে চেয়েছিলাম। হায় ঈশ্বর! কত করে পেতে চেয়েছিলাম তাকে। প্রায় প্রতি সন্ধ্যাতেই সেখানে যেতাম আমি। টিলার উপরে উঠে দাঁড়াতাম। এমন কি বৃষ্টি হলেও প্রায়ই দাঁড়াতাম।

"টিলার গা বেয়ে ঘুরে বেড়াতাম আমি। কতবার টিলাটিকে চক্কর দিতাম। কত ডাকতাম আমাকে পরীর দেশে যেতে দেবার জন্য। চীৎকার করতাম। কত সময় চোখ থেকে জল বেরিয়ে আসার উপক্রম করত। বিকৃতমস্তিষ্ক হয়ে পড়ছিলাম আমি। আমার অবস্থা শোচনীয় হয়ে উঠছিল।......

"প্রায়ই আমি ওখানে ঘুমিয়ে পড়বার চেষ্টা করেছি; এবং জানো তোমরা, ঘুমুতে আমি পারি নি। কখখনো পারি নি। আমার মনে হত, যদি ওখানে ঘুমুতে পারতাম, তবে হয়তো কিছু একটা ঘটতে পারত।......কিন্তু আমি ওখানে বসে থেকেছি, শুয়ে থেকেছি, তবু ঘুমুতে পারি নি"—

স্কেলমারসৃডেল-এর কাহিনী আমাদের পরীর দেশে নিয়ে যায়। কিন্তু 'আন্ডার দি নাইফ' নিয়ে যায় সেই দেশে যা ভূলোক এবং সৌরলোক থেকেও শত শত কোটি মাইল দূরে। যে দেশ সুদূরতম নীহারিকালোকের এক প্রান্তে। যেখানে দাঁড়িয়ে নক্ষত্রের জন্ম-মৃত্যু চোখে পড়ে।

'আন্ডার দি নাইফ' একটি সুন্দর ছোটগল্প। অস্ত্রোপচারের সময় মৃত্যুভয়ে ভীত একজন প্রায়-অচেতন মানুষের কল্পনার উপর ভিত্তি করে গল্পটি লেখা। সে মানুষটি প্রায়ই মৃত্যুর কথা ভাবত। মরণ সম্বন্ধে অদ্ভুত একটা কৌতূহল অনেক আগে থেকেই ঘিরে ধরেছিল তাকে। কারণে-অকারণে, অবসরে-অনবসরে এই ভাবনা তাকে আকুল করে তুলেছিল। তাই যখন সে অস্ত্রোপচার-গৃহে গেল, যখন ক্লোরোফরম দিয়ে তাকে অজ্ঞান করার আয়োজন হল, তখন সে ধরেই নিল, এইবার মৃত্যু হবে তার। তারপর যখন ক্লোরোফরম প্রয়োগ করা হয়েছে অস্ত্রোপচার চলেছে তখন প্রায়-অচেতন মুমূর্ষু ওই মানুষটি মৃত্যুর পরপারের জগৎকে কল্পনা করেছে। স্পষ্টই মনে হচ্ছে তার, মানবদেহধারী কোনো বিরাট কে যেন তাকে তার দেহ থেকে মুক্ত করে বলে উপরের দিকে টানছে। নিজের দেহের উপর প্রচণ্ড এক চাপ অনুভব করেছে সে। মনে হয়েছে, সেই চাপ ক্রমেই যেন বাড়ছে। তারপর চিকিৎসকরা, অস্ত্রোপচার-গৃহ এবং তার নিজের দেহটি ঘূর্ণিজলের মধ্যে অতি ক্ষুদ্র বুদ্বুদের মতো হারিয়ে গেছে। মুমূর্ষুর মনে হয়েছে, যেন সে বাতাসের মধ্যে নিরালম্ব অবস্থায় দাঁড়িয়ে। অনেক নিচে লন্ডন শহরকে দেখা যাচ্ছে। ক্রমেই দূরে সরে যাচ্ছে শহরটি। আর সে যেন প্রচণ্ড বেগে উর্ধ্বলোকের পথে ছুটছে। দেখতে দেখতে শহর লন্ডন তার দৃষ্টির বাইরে চলে গেল। ওখানকার ঘরবাড়ির ছাদ ও গীর্জার চূড়াগুলোকে আর চোখে পড়ল না।

আশ্চর্য এই বর্ণনা। এ যেন কোনো পরলোকযাত্রীর সত্যিকারের ভ্রমণবৃত্তান্ত। প্রথম পরিচ্ছেদ থেকেই বৃত্তান্তটি জমে ওঠে। তারপর যত এগোয় ওই যাত্রী, ভ্রমণকাহিনীও ততই রঙে-রসে, রহস্যে-রোমাঞ্চে নিবিড় হয়ে আসে। স্বর্গপুরীর রুদ্ধ-দুয়ার খুলে যায়। অদৃষ্টপূর্ব এক জগতের মুখোমুখি হই আমরা। দেখি, স্ফীতকায়া নদীকে সরু নীল সুতোর মতো মনে হচ্ছে। সারি-বাঁধা পাহাড়-পর্বত ধূসর ও অস্পষ্ট হয়ে উঠছে ক্রমেই। দেখতে দেখতে পৃথিবীর বিরাট একটা অঞ্চল নজরে পড়ছে। কিন্তু ঠিক চেনা যাচ্ছে না কিছুই। বন-পাহাড়, নদী-নালা, শহর-প্রান্তর সব একাকার হয়ে যাচ্ছে। ওদিকে আকাশ যা এতক্ষণ ছিল ঘন নীল, তা ক্রমেই ঘোর কালো হয়ে উঠছে। একটি দুটি করে নক্ষত্র চোখে পড়ছে সেখানে। নক্ষত্রের সংখ্যা বাড়ছে ক্রমেই। ক্রমেই সমস্ত আকাশ লক্ষ লক্ষ নক্ষত্রে ছেয়ে যাচ্ছে। সূর্যকে মনে হচ্ছে ধবধবে সাদা একটি চক্র বলে। সেখান থেকে শুভ্র আলো ঠিকরে বেরুচ্ছে। কিন্তু সে আলোর তেজ নেই মোটে। মহাশূন্যে বাতাস ও ধূলিকণা নেই বলে আলো সেখানে প্রভাবহীন। উত্তাপের প্রশ্নও সেখানে ওঠে না।

ওয়েল্‌স-এর এই বর্ণনায় বৈজ্ঞানিক দৃষ্টির পরিচয় সুস্পষ্ট। পৃথিবী থেকে হাজার মাইল দূরে সূর্য ও নক্ষত্রপুঞ্জকে ঠিক এইরকমই দেখাবে হয়তো। হয়তো ওখানে আলো ও উত্তাপের অনুভূতি ঠিক এইরকমই হবে। কিন্তু মনে যেন রাখি, এই বর্ণনা গল্পটির বহিরঙ্গ মাত্র। যেখানে এর অন্তরঙ্গ দিক, সেখানে পরলোকযাত্রীর মানসিক অবস্থার একটি বিশ্বাসযোগ্য চিত্র খুঁজে পাই আমরা। যাত্রীটিকে বলতে শুনি,

"আমি অনুভব করলাম এখন যে, আমার হাত পা কিছুই নেই। কোনো অঙ্গপ্রত্যঙ্গ নেই আমার। আমি বেদনা বা বিস্ময় কিছুই বোধ করছি নে। নিজের পরিবেশ সম্বন্ধে শুধু এইটুকু মনে হয়েছিল আমার (কেন না এর মধ্যে বায়ুমণ্ডলকে আমি অনেক দূরে ফেলে এসেছি) যে, এই শূন্যপুরীর প্রচণ্ড শীতলতাকে মানুষ কল্পনায়ও আনতে পারবে না; কিন্তু এজন্যে চিন্তিত হই নি আমি।......

আমি এক অচঞ্চল ও আত্মভোলার দৃষ্টিতে সব কিছুকে দেখলাম। মনে হল, যেন আমিই ভগবান। ওদিকে নীচের ওই পৃথিবী ক্রমেই দূরে সরে যাচ্ছে। প্রতি মুহূর্তে অসংখ্য মাইল পথ পেরিয়ে আসছি আমি। অনেক দূরে ধূসর পৃথিবীর গায়ে কালো একটা বিন্দু চোখে পড়ছে। ওই হল লন্ডন। ওখানে দুজন ডাক্তার আমার ফেলে-আসা দুর্বল দেহটাকে কাটা-চেরা করছে। আপ্রাণ চেষ্টা করছে সেটাকে বাঁচিয়ে তুলবার। সেই মুহূর্তে আমি এমন এক মুক্তির স্বাদ পেলাম, এমন প্রশান্তি অনুভব করলাম যার সঙ্গে তুলনা করতে পারি এমন কোনো আনন্দ পৃথিবীতে আছে বলে আমার জানা নেই।"

গল্পটির পরবর্তী অংশে কোটি কোটি মাইল দূরের পরলোকযাত্রীকে প্রত্যক্ষ করি আমরা। কিন্তু যাত্রীটি বড় অভিনব। সে নিজে চলছে না; থেমে দাঁড়িয়ে সমস্ত চলাকে প্রত্যক্ষ করছে। অবস্তু বলেই কোনো চলৎশক্তি নেই তার। কোনো কিছু তাকে আকর্ষণ করছে না। সে নিজে অচঞ্চল; কিন্তু চঞ্চল পৃথিবী ও সৌরজগৎ তার কাছ থেকে দূরে সরে যাচ্ছে। বিশ্বজগৎ তাকে ফেলে দূর-দূরান্তরে উধাও হচ্ছে।

গল্পটির শেষাংশে যাত্রীটিকে রহস্যময় ব্রহ্মাণ্ডের একেবারে মাঝখানে দেখি আমরা। দেখি, এত দূরে এসেছে সে, সেখান থেকে সূর্যকে মনে হচ্ছে অতি ক্ষুদ্র একটি নক্ষত্রের মতো। যেখানে ঘূর্ণ্যমান নীহারিকার দল আকাশ-জোড়া মায়াজাল বিস্তার করেছে। লক্ষ কোটি নক্ষত্র ঝলমল করছে সেখানে। যেখানে অগণিত গ্রহ সেই সব নক্ষত্রকে প্রদক্ষিণ করছে।

মুমূর্ষুর এই পরলোক-কল্পনাকে ফুটিয়ে তুলতে গিয়ে ওয়েল্‌স এখানে অসাধারণ শিল্পনৈপুণ্যের পরিচয় দিয়েছেন। মানুষের অবচেতন সত্তা এবং গ্রহলোক ও নক্ষত্রমণ্ডলের চিত্র উদ্ঘাটনে বিজ্ঞানবুদ্ধির পরিচয় তো এখানে আছেই, তা ছাড়া আছে দূরাভিসারী কল্পনাশক্তির পরিচয়। ওয়েল্‌স এখানে পাঠকদের যেন সেই রহস্যময় লোকের দিকে নিয়ে যান, সূর্য যেখানে সমুদ্রতীরে বালির মতোই অকিঞ্চিৎকর, যেখানে লক্ষ

লক্ষ কোটি কোটি নতুন সূর্যের অস্তিত্ব প্রতি মুহূর্তে ধরা পড়ে।

পাঠকদের চরাচরবিস্তারী নক্ষত্রলোকের এই অভিজ্ঞতাকে অবিশ্বাস করতে পারে না; কেন না, মুমূর্ষু যে ব্যক্তিটি এই কল্পনা করছে, অস্ত্রোপচারের অনেক আগে থেকেই মৃত্যু সম্বন্ধে আকাশ-পাতাল ভাবতে সে অভ্যস্ত। এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে ক্লোরোফরমের প্রভাব এবং অস্ত্রোপচারের বিভীষিকা। এই সব কিছু মিলে পরলোকের অসম্ভব-কল্পনার একটি মনস্তাত্ত্বিক ভিত্তি এখানে রচিত হয়েছে।

গল্পটির সবচেয়ে সুন্দর অংশ পরলোকের স্বপ্নজগৎ থেকে ভূলোকের সত্যজগতে উত্তরণ-অংশটি। নীহারিকাপুঞ্জের কোটি কোটি নক্ষত্র মহাকায় একটি হাতকে আশ্রয় করে আছে বলে মুমূর্ষুটি ভেবেছিল। এই হাতটি যে আসলে চিকিৎসকের, অমর্ত্যের কল্পনা ও মর্ত্যের অস্পষ্ট অভিজ্ঞতা মিশে যাবার ফলেই যে জ্ঞান ফিরে আসবার পূর্ব মুহূর্তে ঠিক এইরকম কল্পনা করেছিল ওই অসুস্থ ব্যক্তিটি, অতি সতর্ক পাঠকও তা প্রথমে বুঝে উঠতে পারে না।

এছাড়া ঘড়ির ডায়েল ও কাঁটা এবং বিছানার রডকে কেন্দ্র করেও লেখক অতি সুকৌশলে বাস্তব ও স্বপ্নজগতের মধ্যে সেতু রচনা করেছেন। ওই সেতুর উপর দাঁড়িয়ে বিশেষ এক মুহূর্তে দিশাহারা হই আমরা। ভেবে পাই না, কোনটা সত্যি,—এপারের এই ভূলোক, না ওপারের ওই নীহারিকালোক!

এই সত্যি-মিথ্যের দ্বন্দ্ব অন্য এক দৃষ্টিকোণ থেকে উপস্থাপিত 'এ ড্রিম অব আরম্যাগেডন' গল্পে। আরম্যাগেডন বলতে বুঝি সৎ ও অসতের সর্বশেষ রণক্ষেত্র। ওই রণক্ষেত্রেরই স্বপ্ন দেখেছিল ইংল্যান্ডের এক ব্যবহারজীবী। কেমন করে দেখেছিল এবং কী দেখেছিল, তা' নিয়েই এই গল্প। গল্পটির বিশেষত্ব হল, ভবিষ্যতে কী ঘটতে পারে তারই চিত্র আছে এখানে। এ ছাড়া এখানে স্বপ্নকেই যেন বাস্তব করে দেখান হয়েছে; আর বাস্তব জগৎ এ কাহিনীর নায়কের চোখে স্বপ্নসম্ভব ও অলীক বলে মনে হয়েছে। স্বপ্নে দেখা জগৎ নায়ককে নেশার মতো পেয়ে বসেছে যেন। যেন সে ওই জগতের বাইরে আর কিছু ভাবতেই পারছে না। বার বার স্বপ্ন দেখেছে সে। দেখেছে; কেপ্রি দ্বীপের অতি সুন্দর এক প্রাকৃতিক পরিবেশে সে তার রূপবতী প্রেয়সীকে নিয়ে প্রেমে প্রণয়ে আত্মহারা। প্রিয়তমাকে নিয়ে সুখের দিনগুলো বড় সুন্দর কাটছিল তার। এমন সময় হঠাৎ একদিন দেখা দিল মূর্তিমান অশান্তি। আকাশে-বাতাসে যুদ্ধের কোলাহল শোনা গেল। জানা গেল, রাজনীতির ক্ষেত্রে তার প্রতিদ্বন্দ্বী গ্রেসাম শক্তি-সঞ্চয় করেছে। যুদ্ধ করবে বলে ওই ক্ষমতালোভী স্বার্থ-পিশাচ উঠে পড়ে লেগেছে। এ গল্পের নায়ক কুপার, স্বপ্নে যার নাম হেডন প্রথমটায় সে সচকিত হল। কেন না রাজনীতির ক্ষেত্রে তার স্থান ছিল গ্রেসাম-এর উপরে। হিতৈষী জননায়ক বলে হেডনকে শ্রদ্ধা করত সবাই; সবাই ভালবাসত। হেডন-এর ডাক পড়ল শেষ অবধি। অনেকেই বলল, যুদ্ধকে ঠেকিয়ে রাখতে হলে, গ্রেসামকে রক্তক্ষয়ী সংগ্রাম থেকে প্রতিনিবৃত্ত করতে হলে হেডন-এর সহযোগিতা একান্ত প্রয়োজন। কিন্তু হেডন তার প্রিয়তমাকে ছেড়ে কোলাহল ও অশান্তির মধ্যে ঝাঁপিয়ে পড়তে কিছুতেই রাজী হল না। প্রিয়তমাও অনেক করে বোঝাল তাকে। বলল, বৃহত্তর কাজের ডাক এসেছে যখন, নিজের ক্ষুদ্র ভোগ-সুখের কথা তখন ভুলে যাওয়া উচিত। কিন্তু হেডন তার প্রিয়তমাকে ঘিরে গড়ে তোলা কেপ্রি দ্বীপের শান্ত ও সুন্দর জীবন থেকে কোনোমতেই বিদায় নিতে শান্তিকেই আঁকড়ে ধরল সে। প্রিয়তমার কাছ থেকে কোনোমতেই সে ছুটি নিতে পারল না। প্রেমই বড় হল তার কাছে। দেখতে দেখতে কেপ্রি দ্বীপেও ছড়িয়ে পড়ল। শান্তির আশায় হেডন তার প্রিয়তমাকে নিয়ে পালিয়ে গেল শেষ অবধি। নৌকোয় ভেসে গিয়ে নতুন এক জনপদে আশ্রয় নিল। কিন্তু শান্তি মিলল না সেখানেও। সেখানেও বিমান-আক্রমণ চলেছে। গুলীগোলার দাপটে আগুন জ্বলছে চারিদিকে। এমন সময় হঠাৎ এক গোলার আঘাতে হেডন-এর প্রিয়তমা প্রাণ হারাল। এক মন্দিরে আশ্রয় নিয়ে হেডন তার মৃতদেহটিকে রক্ষা করতে চেয়েছিল। কিন্তু শেষ অবধি তা'ও পারল না। রণোন্মত্ত ও হিংস্র এক সৈন্যের তরবারির আঘাতে সে নিজেও নিহত হল।

এই যে ভয়াবহ যুদ্ধের চিত্র এখানে আঁকা হয়েছে, এই হল অসৎ। আর এই যে শান্ত ও সুন্দর প্রেমের কাহিনী—এ হল সৎ। সৎ-এর সঙ্গে অসতের যুদ্ধ এখানে। সুন্দরের সঙ্গে অসুন্দরের যুদ্ধ। অসৎ যদি সৎকে এভাবে ধ্বংস করে, তবে সেই হবে পৃথিবীর সর্বশেষ যুদ্ধ। মনে হয়, হেডন-এর প্রেমোপাখ্যান ও গ্রেসাম-এর যুদ্ধলিপ্সার মধ্য দিয়ে লেখক এই কথাই বলতে চেয়েছেন। দেখাতে চেয়েছেন যে, শৌর্যের চেয়ে সুন্দর বড়, শক্তির চেয়ে প্রেমের স্থান অনেক উঁচুতে।

গল্প-বলার টেকনিকটিও চমৎকার। চলন্ত ট্রেন। একটির পর একটি স্টেশান পেরিয়ে যাচ্ছে। আর তারই মাঝে চলেছে স্বপ্নে-দেখা জগতের বর্ণনা। বর্ণনা করেছে, সেই ব্যবহারজীবী কুপার। তার হাব-ভাব চাল-চলন সব কিছুর মধ্যেই আমরা যেন এক অনন্য বিশিষ্টতা খুঁজে পাই। দশজনের মধ্যে থেকেও সে যে আলাদা, এ কথা প্রতি মুহূর্তেই উপলব্ধি করি আমরা। আর সে কারণেই মনে হয়, এ গল্পের আসল রস এর বক্তব্যের মধ্যে নেই; আছে এর রহস্য-ঘেরা স্বপ্নের মধ্যে। কুপার স্বীকার করেছে,

> "আমি স্বপ্নে দেখা ওই নারীকে ভালবেসেছিলাম। কিন্তু এখন সে এবং আমি দুজনেই মৃত।
>
> একটা স্বপ্ন শুধু! কিন্তু তা' কি করে হয়! একটা স্পন্দমান জীবন যখন তার প্রভাবে অপ্রশমিত দুঃখে ভরে গেল, যখন আমি যা' কিছুর জন্যে বেঁচে থেকেছি এবং যত্নপর হয়েছি তাদের সবই মূল্যহীন ও অসার হয়ে গেল, তখন কি করে বলি যে সেটা শুধুই স্বপ্ন।"

স্বপ্ন অক্টোপাশের মতো ঘিরে ধরেছে কুপারকে। কিন্তু তাই বলে জীবনের মহত্তর সত্যকে সে বিস্মৃত হয় নি। অবিচলিত আত্মবিশ্বাস নিয়েই সে প্রশ্ন তুলেছে,

> "কিন্তু কেন এমন হবে? যদি এই যুদ্ধ, হত্যা এবং আক্রমণই হয় জীবন, তবে কেন সুখ ও সৌন্দর্যের জন্যে আমাদের এই আকুলতা? যদি বিশ্রাম না থাকে, শান্তির অবকাশ না থাকে যদি, যদি শান্ত পরিবেশকে ঘিরে দেখা আমাদের সব স্বপ্নই ভুল হয়, যদি এরা বিপদ ডেকে আনে, তবে আর এমন সব স্বপ্ন দেখে লাভ কি?"

এইচ জি ওয়েলস-এর গল্প নিয়ে আলোচনা করলে দেখি, এইভাবে স্বপ্ন নিয়ে বিচিত্র সব রহস্যপুরী গড়ে তুলেছেন তিনি। এইভাবে রহস্যের পাদপীঠে দাঁড়িয়ে বিচিত্র সব জীবন-জিজ্ঞা[illegible] উপস্থাপিত করেছেন। তাই ম[illegible] ওয়েলস-এর স্বপ্নভিত্তিক গল্পে জ[illegible] বিকৃতি যতটা আছে, তার চেয়েও [illegible] বেশি আছে প্রকৃত জীবন।

রঙ্গমঞ্চ ওদেশে এবং এদেশে

শিলালি

এরপর গর্ডন ক্রেগ লন্ডনে 'দি বেলসের' (ক্রেগের মতে আরভিং-এর মাস্টারপিস) প্রথম রজনীর অভিনয়ের কথা আলোচনা করতে গিয়ে বলেছেন ঃ ১৮৭১ সালে এ নাটকের প্রথম রাত্রির অভিনয়ের সময় আমি উপস্থিত ছিলাম না—কারণ তখনও আমি জন্মাই নি। কিন্তু আমি আরভিংকে এ নাটকে তিরিশবারেরও বেশি অভিনয় করতে দেখেছি। ১৮৮৯ থেকে ১৯০০ সালের ভেতর—কিন্তু নিজে আমি এ নাটকে কখনও প্লে করি নি। আরভিং-এর ম্যানেজমেন্টে যে সব নাটকে আমি অভিনয়ে অংশ গ্রহণ করি নি, সেগুলোর রিহার্সালও দেখতে যাই নি। কারণ আমার মনে হোত ঐভাবে রিহার্সাল দেখতে যাওয়াটা একটা অনধিকার প্রবেশের মত —যে নাটকে আমি কাজ করছি না তার প্রস্তুতিপর্বে সেখানে উপস্থিত থাকাটা চুরি করে কোন কিছু দেখে নেওয়ার মত বলে আমি মনে করতাম। পরে আমি যখন আরভিং-এর দলে অখ্যাত অভিনেতা হিসাবে কাজ করছিলাম সে সময় 'দি বেলসে'র রিহার্সাল দেখবার আমার প্রচুর সুযোগ হয়েছে—কিন্তু তা সত্ত্বেও আমি রিহার্সাল দেখতে যাই নি।

আমার বহুকালের বন্ধু মার্টিন হার্ভে (ভবিষ্যতের বিখ্যাত ইংরাজ অভিনেতা স্যার মার্টিন হার্ভে)—যাঁকে বলা যেতে পারে আরভিং-এর হাতে তৈরি এ দলের সব চেয়ে সেরা এ্যাক্টর 'দি বেলসে'র প্রস্তুতি-পর্ব সম্বন্ধে ইচ্ছা করলে অতি সুন্দর একটি প্রবন্ধ লিখতে পারতেন—এবং আমি অন্তত সে প্রবন্ধ আনন্দের সঙ্গে পড়তাম। কারণ হার্ভে এ নাটকে বহুবার অভিনয় করেছেন—যদিও ১৮৭১-এর প্রথম প্রডাকসনে তিনি ছিলেন না—কারণ তখন তাঁর বয়স ছিল মাত্র চার বছর।

আজকের দিনেও (অর্থাৎ ১৯৩০ সালে যখন ক্রেগ এ বইটি লিখেছেন) অনেক অভিনেতা আছেন, যাঁদের এ যুগের দর্শকেরা বড় অভিনেতা আখ্যা দেন। আরভিং কিন্তু কোন দিক দিয়েই ঠিক এঁদের মত ছিলেন না। কিন্তু এখনকার একজন বড় সংগীতজ্ঞ আছেন যাঁকে আজকের দিনের যুবকেরা খুব শ্রদ্ধা করে থাকেন এবং ভাল অভিনেতাদের থেকেও উচ্চশ্রেণীর শিল্পী বলে মনে করেন—এর নাম হচ্ছে, সালিয়াপিন।

সালিয়াপিনকে দেখে আপনাদের কি মনে হয়েছে? কিভাবে তাঁকে আপনারা স্মরণ করেন? নিশ্চয় মনে হয়েছে "বেশ ভাল"। তাই নয় কি? ও'র সম্বন্ধে বলতে গিয়ে আপনারা নিশ্চয় একথা বলবেন না যে উনি "কৌতূহলোদ্দীপক" বা "সুদক্ষ" বা "বুদ্ধিসম্পন্ন" শিল্পী। তার থেকে অনেক বেশি বাড়িয়ে বলবেন—"উনি বিরাট", "উনি সম্মোহন করবার শক্তির অধিকারী"। আরভিং-এর শক্তি ছিল এর দ্বিগুণ।

He was twofold what Chaliapine is, because there was greater depth—even as Shakespeare is greater than Marlowe for all his mighty line, because of a deep and human beauty which he lets you see.

এরপর আরভিং সম্বন্ধে খানিকটা আবছা ধারণা করতে পারছেন কি?

১৮৭১ সালের ২৫শে নভেম্বর শনিবার সন্ধ্যা পৌনে আটটার সময় লাইসিয়াম মঞ্চের যবনিকা উত্তোলনের সঙ্গে সঙ্গে চোখের সামনে প্রতিভাত হল ভেতরকার দৃশ্য—ব্রাউনিশ টোনের...... এলসেসে একটি পারলার।

সময় সন্ধ্যা—বাইরে তুষারপাত হচ্ছে —বারগোমাস্টারের প্রতীক্ষায় সবাই অপেক্ষা করছেন—আরভিং যে কোন মুহূর্তে স্টেজে আবির্ভূত হবেন বলে দর্শকরা উদ্‌গ্রীব হয়ে উঠেছে। প্রথম পনের মিনিট, অর্থাৎ যতক্ষণ না আরভিং আসছেন, অন্যান্য অভিনেতারা বেশ দক্ষভাবেই সময়ের শূন্যতা পূর্ণ করে রেখেছেন।

এই প্রথম কয়েক মিনিট সব সময়েই আমাকে মুগ্ধ করে রাখতো। আমার মনে হয় আমাদের দলটা এই প্রথম পনের মিনিট অভিনয়-কলা প্রদর্শনের বিশেষ সুযোগ পেত—যদিও আগাগোড়া নাটকটিতে তারা খুব প্রশংসনীয়ভাবেই অভিনয় করতো—কিন্তু আরভিং-এর মঞ্চে আসবার আগের সময়টাই সর্বচেয়ে ভাল অভিনয় করতো।

আরভিং আসবার পর যে যার যথা-যোগ্য স্থানে নিজেদের খাপ খাইয়ে নিত। কারণ অন্যায়ভাবে নিজেকে প্রকট করে তোলবার প্রশ্নই তো কারো মনে উঠতো না। যৌথ অভিনয়ের চমৎকার পরি-পূর্ণতা দেখা যেত—কিন্তু শুধুমাত্র "আসেম্বলের" সৃষ্টি করবার জন্য যৌথ অভিনয়ের অবশ্যকতা—এতো একটা উদ্ভট কথা—

Ensemble was achieved, but there was something to achieve it for, something to which it could lend support; ensemble supporting itself, is it not rather a ridiculous spectacle?

[শ্রীল শ্রীযুক্ত হ য ব র ল মশায়কে বলি যে শিশিরকুমারের অভিনয় বিচার করবার আগে এই দৃষ্টিভংগীটা আয়ত্ত করা দরকার। শিশিরকুমারের দলে টিমওয়ার্ক ছিল না, এ ধরণের রিমার্ক করলে শুধু অজ্ঞতারই পরিচয় দেওয়া হয়। আজ-কালকার নাট্যাচার্য, নটসূর্য এবং নটজোনাকীর দল যে যৌথ অভিনয় নিয়ে হৈ হৈ করেন তা আসলে ঐ—ensemble supporting itself—ridiculous spectacle.]

ম্যাথিয়াসের ভূমিকায় কোন দ্বিতীয় অভিনেতার কথা ভাবতে গেলে একমাত্র ককেলীর নামই মনে আসে।

এ নাটকে আরভিং স্টেজে ঢোকবার সঙ্গে সঙ্গেই দর্শকদের ভেতর থেকে স্বতঃস্ফূর্তভাবে বিরাট করতালিধ্বনি শুরু হোত। ফলে মনে হোত এই আনন্দের অভিব্যক্তিটা যেন এ নাটকের একটা অংশ বিশেষ হয়ে দাঁড়িয়েছে।

১৯০৯ সাল থেকে মস্কো আর্ট থিয়েটারে করতালি দ্বারা অভিনন্দন ব্যাপারটা প্রায় বন্ধ করে দেওয়া হয়। স্টানিসলাভস্কি মনে করতেন হাততালি দেওয়া ব্যাপারটা হচ্ছে অত্যন্ত নিন্দনীয় এবং অশিল্পী-মনোভাবের পরিচায়ক—থিয়েট্রিক্যাল পারফরমেন্সে এর কোন আবশ্যকতাও নেই।

আমিও এ বিষয়ে একমত। খুবই ভাল নিয়ম—করতালি দেওয়া চলবে না। কিন্তু 'দি বেলসে' আরভিং-এর ব্যাপারটা একটা ব্যতিরেক।

In 'The Bells', the hurricane of applause at Irving's entrance was no interruption. It was no boisterous greeting by an excitable race, for a blustering actor—it was something which can only be described as part and parcel of the whole, as right as rain. It was a torrent while it lasted. Power responded to power. This applause was no false note, whereas silence would have been utterly false; for though Irving endured and did not accept the applause, he deliberately called it out of the spectators. It was necessary to them—not to him; it

was something they had to experience, or to be rid of, or rather released from, before they could exactly take in what he was going to give them.

এই ধরণের মঞ্চ প্রবেশের প্রস্তুতির জন্যই যেন 'বেলস' নাটকের প্রথম পনের মিনিটের অভিনয় দর্শকদের মনকে তৈরি করে রাখতো।

মঞ্চে অপেক্ষমাণ চরিত্রগুলির কথা-বার্তা থেকে বোঝা যেত তারা সাগ্রহে ম্যাথিয়াসের আসবার জন্য অপেক্ষা করছে —ম্যাথিয়াস এবং তার সম্পর্কিত ব্যাপার নিয়েই এই পনের মিনিট আলোচনা চলতো। বাইরে এ সময়টায় দারুণ ঝড় জল হতে থাকতো—ঝড়ের দাপটে পাশের ঘরের জানলাটা দমকা খুলে যেত—তার ধাক্কায় একটি ক্রকারী এবং কাচের গ্লাসপূর্ণ ট্রে ছিটকে এসে পড়তো—ঘরের ঘড়িটার দিকে নজর পড়লে বোঝা যেত রাত গভীর হয়েছে এবং প্রত্যাশিত ব্যক্তিটির (অর্থাৎ ম্যাথিয়াসের) অনেক আগেই চলে আসা উচিত ছিল। মন্থর গতিতে এবং মৃদু স্বরে কথাবার্তা চলতে থাকতো—এর উপরে থাকতো অদ্ভুত ধরণের দ্রুততালের মিউজিক। সব মিলিয়ে এ সময়টা অত্যন্ত ড্রামাটিক হয়ে উঠতো। সমস্ত পরি-বেশটাই সৃষ্টি করা হোত প্রত্যাশিত ব্যক্তিটির আবির্ভাবের জন্য। এরপর ঢুকতেন আরভিং। সবাই নজরে করে দেখতো তিনি কি করেন এবং যা করবেন কিভাবে তা করে চলবেন—তাঁর মুখ এবং সর্বদেহের দিকে দেখে দর্শক বুঝতে চেষ্টা করতো কিসের কিসের উদ্দেশ্যে তিনি কখন কি কি ইঙ্গিত করে বোঝাবার চেষ্টা করছেন।

আগেই বলা হয়েছে মঞ্চে আরভিং আসার সঙ্গে সঙ্গেই প্রেক্ষাগৃহে দর্শক-গণের করতালি বৃষ্টি শুরু হত। আরভিং হাত নামিয়ে নিতেন, মাথাটা নোয়াতেন, সর্বাঙ্গ রিল্যাক্স করে ফেলতেন, দর্শকদের করতালি তখনও চলতে থাকতো। দু'বার কি তিনবার পা'টা একটু (যত দূর মনে পড়ে ডান পা) এদিক থেকে ওদিকে টানতেন এবং এই অর্থহীন জেসচারের দ্বারা ওই করতালিধ্বনিকে সীমিত করবার জন্য ইঙ্গিত দিতেন। অন্য কোন রকমের মুভমেন্ট করতেন না আরভিং—কিন্তু ঐ সামান্য পা টানার থেকে একটা মৃদু স্পন্দন স্ফুরিত হত—তারপর করতালিধ্বনি ধীরে ধীরে থেমে আসতো—সঙ্গে সঙ্গে যেন গা ঝাড়া দিয়ে জেগে উঠতেন আরভিং—টুপি এবং চাবুকটা ডান এবং বাঁ দিকে ছুড়ে দিতেন—কোট ও মাফলার খুলে ফেলতেন এবং তাঁকে এ বিষয়ে সাহায্য করতে ছুটে আসতেন স্ত্রী ও মেয়ে।

এবার গর্ডন ক্রেগের লেখা 'দি বেলস' নাটকের সংক্ষিপ্তসার তুলে দিচ্ছিঃ

A man, not by habit or by instinct a murderer, murders a Polish Jew for his money. He needs money—his child is crying in its cradle for food, and by chance this Jew stops at his hut in a storm, and the man sees him undo a belt which, as it clanks on the table, emits the sound of untold riches. This tempts him, he resolves on the deed, and when the Jew, refreshed by his punch and comforted by the warmth, goes on his way through the snowstorm, the man, taking a short cut across the fields, arrives at a cross-road and, hacking him down with an axe, takes the belt full of gold, drags the body to a limekiln, burns it and, now become rich, relieves the want of his household, and there-after lives a blameless life—finally becoming Burgs master of his village.

But whereever he goes, whoever speaks, to him, what-ever he sees or hears, even as he stands speaking to some-one about ordinary things, there comes to his ears the far-off sound of the sledge-bells of the Polish Jew. Haunted by this, he lives his life in sorrow, which increases until one night, dreaming that he is in the dock and being convicted and sentenced to death, he wakes only to die, believing that he is being hanged.

আরভিং এ নাটকে দেখাতে চাইতেন যে, তীব্র অনুশোচনা এবং মনোবেদনা ম্যাথিয়াসকে ধীরে ধীরে এবং অতি নিষ্ঠুরভাবে চরম পরিণতির পথে টেনে নিয়ে গেল। লোকটি যেই হোক এবং তার অপরাধ যত গুরুতরই হোক না, তার গভীর অন্তর্দাহ এবং দুঃখানুভূতি দর্শকদের মর্মের মর্মস্থলে গিয়ে স্পর্শ করতো আরভিং-এর অভিনয় পটুতায়। দর্শকদের সেন্টিমেন্টে সুড়সুড়ি দিয়ে অভিনয় জমাবার চেষ্টা করতেন না আরভিং —সমস্ত ঘটনাটা স্পষ্টভাবে তুলে ধরতেন প্রদর্শনীর ভেতর দিয়ে—দেখিয়ে দিতেন একটি শক্ত ধাতের মানুষ, এক মুহূর্তের দুর্বলতায়, ভুল পথে গেল। দু' ঘণ্টা ধরে আরভিং এই অপরাধীর মনস্তত্ত্ব বিশ্লেষণ করে দেখাতেন স্টেজের উপর—does what he knows he is doing—acts deliberately—but (and here is Irving) acts automati-cally, as though impelled by an immense force, against which no resistance is possible.

আবার স্টেজে আরভিং-এর প্রথম আবির্ভাবের কথায় ফিরে আসি। দরজার কাছে দাঁড়িয়ে কোট খুলে তার গায়ে লেগে থাকা তুষারকণাগুলো ঝেড়ে সাফ করে নিতেন ম্যাথিয়াস, তারপর এসে বসতেন স্টেজের মাঝে রাখা একটি চেয়ারে (আরভিং সব সময়েই স্টেজের মাঝে থাকতেন—তাঁর কোন ইনফিরিওটি কমপ্লেক্স ছিল না), এবং সেখানে বুট খুলে ফেলে. সু পরে তাতে ফিতে লাগাতে থাকতেন।

আপনাদের হয়তো মনে হতে পারে বুট খুলে ফেলাটা একরকমভাবেই করা যেতে পারে—কিন্তু আরভিং যেভাবে এ কাজটা করতেন এ দৃশ্য না দেখলে কেউ তা আগে ভাবতেও পারতেন না, তাঁর পরেও কাউকে ওভাবে ওকাজ করতে দেখি নি।

প্রত্যেক ভঙ্গী, নড়াচড়া, কাঁধ, পা, মাথা, হাত প্রভৃতির ঝাঁকুনিতে মনে হোত যেন ম্যাথিয়াস প্রবলভাবে সম্মোহিত অবস্থায় রয়েছেন। কোন বিশেষ প্রতিভা সম্পন্ন লেখকের লেখার দ্বারা যেমন আমরা বিশেষভাবে আকর্ষিত হই, প্রত্যেকটি সিলেবল থেমে থেমে উপভোগ করে পড়ি। তেমনি সময় দিয়ে দিয়ে দর্শকেরা আরভিং-এর কাজের প্রতিটি ইঙ্গিতকে বিশ্লেষণ করে উপভোগ করতেন। ক্রাফটসম্যানসিপের পরিপূর্ণ রূপায়ণ দেখা যেত আরভিং-এর অভিনয়ে।

আরভিং যখন বুট খুলে ফেলে সু পরতে থাকতেন. টেবিলের পাশে যাঁরা বসে থাকতেন তাঁরা সে সময় কেউ কেউ ধূমপান করছেন, কয়েকজন আলস্য উপভোগ করছেন মদ্যপান করতে করতে —এরা টেনে টেনে এই কথাই বলছিলেন যে, ম্যাথিয়াস আসবার আগে তাঁরা আলোচনা করছিলেন যে, আজকের মত দুর্যোগের রাত্রি সেই পোলিশ জু'র ভয়াবহ উইন্টারের পর আর কখনও তাঁরা দেখেন নি।

এই সব কথা যখন আলোচিত হচ্ছিল আরভিং তখন ঝুঁকে পড়ে দ্বিতীয়

দুটিতে ফিতে লাগাচ্ছিলেন। আলোচনা কানে যেতে তাঁর আঙুলগুলো হঠাৎ কাজ বন্ধ করে থেমে পড়তো—হাত দুটিতে এরপর যেন কোন স্পন্দন থাকতো না, মনে হোত এরা যেন মৃতলোকের হাত, হাত দুটি আস্তে আস্তে পায়ের পাশ দিয়ে উঠে আসতে থাকে। সমস্ত কবন্ধটি যেন জমে গিয়েছিল, এবার সেটা ফুলে ফুলে উঠতে থাকে—তিনি চেয়ারের পেছনে দেহ আলগা দিয়ে বসে থাকেন।

এই অবস্থায় বসে থাকাকালে—অর্থাৎ শরীরের যখন কোন মুভমেন্ট নেই, দৃষ্টি সামনের দিকে প্রসারিত হয়ে এক জায়গায় যেন কেন্দ্রীভূত হয়ে রয়েছে—এইরকমভাবে ১০ থেকে ১২ সেকেন্ড আরভিং চুপচাপ বসে থাকতেন—আমাদের মনে হোত যেন অনন্তকাল তিনি এইভাবে বসে আছেন—তারপর বলতেন ঃ ওঃ, ওই ব্যাপারটা নিয়ে তোমরা আলোচনা করছিলে—তাই না? তাঁর শেষ কথাটা উচ্চারিত হবার সঙ্গে সঙ্গে দূরে ক্রমান্বয়ে স্লেজ-বেলের শব্দ হতে থাকতো।

আরভিং ঐখানেই বসে আমাদের দিকে চেয়ে আছেন, অন্যেরাও বসে রয়েছে. ধূমপান করছে, কি যেন চিন্তায় সবাই মগ্ন, কোন দিক থেকেই কোন নড়াচড়ার ব্যাপার নেই স্টেজের ওপর, খালি লোকেদের মুখের পাইপ থেকে ধোঁয়া বের হচ্ছে—আর ক্রমাগত বেজে চলেছে ওই স্লেজের ঘণ্টাধ্বনি।

Again I assure you, that time seemed out of joint, and moved as it moves to us who suffer, when we wish it would move on and it does not stir.

And the next step of his dance began. He moves his head slowly from us—the eyes still somehow with us—and moves it to the right—taking as long as a long journey to discover a truth takes. He looks to the faces on the right—nothing. Slowly the head revolves back again, down, and along the tunnels of thought and sorrow, and at the end the face and eyes are bent upon those to the left of him.... utter stillness—nothing there either—every one is concerned with his or her little doings—smoking or knitting or unravelling wool or scraping a plate slowly and silenty. A long pause, endless, breaking our hearts, comes down over everything, and on and on go these bells. Puzzled, motionless.... he glides up to a standing position; never has any one seen another rising figure which slid slowly up like that. With one arm slightly raised, with sensitive hand speaking of far-off apprehended sounds, he asks, in the voice of some woman who is frightened yet does not wish to frighten those with her: "Don't you..don't you hear the sound of sledge-bells on the road ?" "Sledge-bells ?" pipes his companion; "Sledge-bells ?" Says the wife—all of them seemingly too sleepy and comfortable to apprehend anything..see anything..or understand..and, as they grumble a negative, suddenly he staggers, and shivers from his toes to his neck; his jaws begin to chatter; the hair on his forehead, falling over a little, writhes as though it were a nest of little snakes. Every one is on his feet at once to help: Caught a chill".. let's get him to bed"..and one of the moments of the immense and touching dance closes—only one—and the next one begins, and the next after—figure after figure of exquisite pattern and purpose is unfolded in its wake.

I can write no more; you may perhaps have felt something. I don't know—but, if you did, I know it was—one-thousandth part of what we felt. As we watched this figure, we felt as silent and as still as when we hear of things too sad to realize; and when it was over and we might move, we knew that this was the finest point that the craft of acting could reach.

আর 'শঙ্খধ্বনিতে' কেতনলালের ভূমিকায় (Mathias) শিশিরকুমার কি রকম অভিনয় করেছিলেন? ২২শে কার্তিক, ১৩৩৬-এর নাচঘর থেকে তুলে দিচ্ছিঃ

"নাট্যমন্দিরে 'শঙ্খধ্বনি' শুনলুম না—দেখলুম। বিখ্যাত বিলাতী নাটক 'The Bells' অবলম্বনে শ্রীযুক্ত ভূপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় 'শঙ্খধ্বনি' রচনা করেছেন। গত-পূর্বযুগের সর্বশ্রেষ্ঠ ইংরাজ নট স্যার হেনরী আরভিং ঐ নাটকের প্রধান ভূমিকায় অভিনয়-কৌশল দেখিয়ে অমর হয়ে আছেন। জানি না আরভিং কেমন অভিনয় করতেন। কিন্তু 'শঙ্খধ্বনি'র কেতনলালের ভূমিকায় শিশিরকুমার অতুলনীয় প্রতিভার প্রমাণ দিয়েছেন। আরভিং তাঁর চেয়েও বেশি শক্তি দেখিয়েছিলেন শুনলে বিস্মিত হব। শিশিরকুমারের কেতনলাল এক বিরাট সৃষ্টি।"

(শ্রীযুক্ত অমল মিত্র মহাশয়ের সৌজন্যে নাচঘরের রিভিউটি পেয়েছি।)

[ক্রমশঃ]

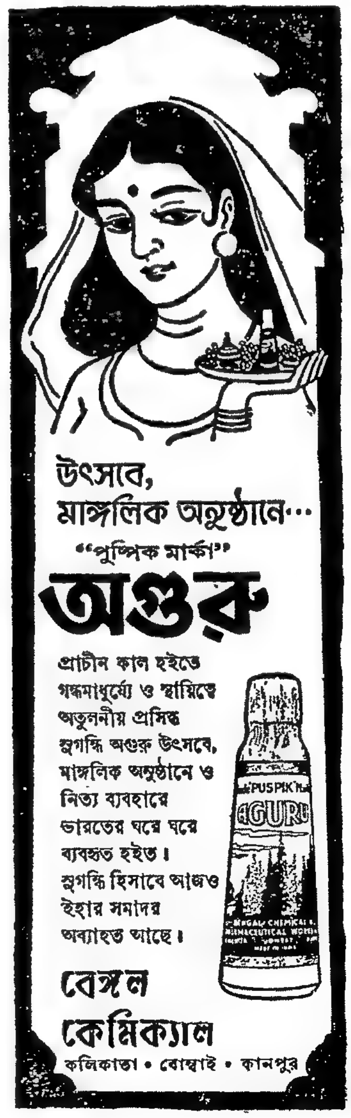

রঙ্গজগৎ

অশালীন প্রাচীর চিত্রের বিরুদ্ধে

চলচ্চিত্রে অশ্লীলতা সারা ভারতের আলোচনার বিষয় হয়ে উঠেছে। কেবলমাত্র প্রাচীর চিত্র নয়, ছবিতে যেভাবে যৌন বিষয়ক ঘটনা ও অঙ্গভঙ্গি সংযোজিত হচ্ছে তাতে ছবিগুলির শিল্পমান যে কত নিচে নেমে গেছে তা ভাববার বিষয়। গান্ধীবাদী নেতা কালেলকরের নেতৃত্বে চলচ্চিত্রে অশ্লীলতার বিরুদ্ধে এক আলোচনাসভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। দেশের বুদ্ধিজীবীমহল ক্রমেই এসব ছবির প্রতিক্রিয়া বিষয়ে আশঙ্কিত হয়ে উঠছেন, এবং বিরুদ্ধে মতামত ব্যক্ত করছেন। এই বিরুদ্ধতার জন্যই সম্ভবত রাজ্য সরকারের কিছুটা দৃষ্টি আকর্ষিত হয়েছে। সম্প্রতি রাজ্য সরকারের প্রচার দপ্তর থেকে ছবি সেন্সর করার এক তালিকা সংবাদপত্র অফিসে পাঠিয়েছেন (সাপ্তাহিক বসুমতীকে নয়)। এই তালিকায় যা থাকুক না কেন ছবি দেখে দর্শকেরা মনে করতে পারেন না যে বাস্তবিক হিন্দী ও ইংরেজী ছবির ব্যাপারে সেন্সর বোর্ডের কোন নীতি আছে।

প্রাচীর চিত্রের নষ্টামী এখনো বন্ধ হয় নি। এখনো পথে-ঘাটে যেসব প্রাচীর চিত্র দেখা যায় তার প্রতি কোন রুচিশীল পথচারী তাকাতে পারেন না। সরকারী প্রাচীর চিত্র সেন্সরকারী কর্মচারী যতই তাঁর কাজের ফিরিস্তি দেন না কেন প্রাচীর চিত্রগুলি তাঁর নিষ্ক্রিয়তা অথবা নীতিহীনতার পরিচয় দিচ্ছে।

কাকা কালেলকর যেভাবে উদ্যোগ নিয়ে অশ্লীল চিত্র ও প্রাচীর চিত্রের বিরুদ্ধে জনমত সংগঠনের উদ্যোগ গ্রহণ করেছেন পশ্চিমবঙ্গে এরূপ ব্যবস্থা গ্রহণ করার প্রয়োজন আছে। পশ্চিমবঙ্গের সর্বোদয় মতবাদের নেতারা নানা বিষয়ে মতামত ব্যক্ত করে থাকেন। সম্প্রতি এই সংস্থার নেতা শ্রীচারু ভাণ্ডারী হরতালের সময় শান্তিরক্ষার জন্য আবেদন করেছিলেন। কিন্তু অশ্লীল চলচ্চিত্র এবং প্রাচীর চিত্রের নষ্টামীর মত সমাজ কলুষকর বিষয়ে তাঁরা বিশেষ জোরের সাথে মতামত প্রকাশ করেন নি। গান্ধীবাদী কাকা কালেলকরের পথে তাঁরাও অগ্রসর হলে পশ্চিমবঙ্গে এই দৌরাত্ম্য অবিলম্বে বন্ধ হতে পারে। সুস্থবুদ্ধি মানুষমাত্রই অশালীন প্রাচীর চিত্রের বিরোধী। তার বিরুদ্ধে যাঁরা সক্রিয়ভাবে অগ্রসর হবেন জনসাধারণ তাঁদের সমর্থন করবেন। —সুজন

চিত্রতারকা মিচেলে মার্সিয়ের

নাটকের কথা

অজেয় ভিয়েৎনাম

মিনার্ভা থিয়েটারে লিটল থিয়েটার গ্রুপের প্রযোজনায় 'অজেয় ভিয়েৎনাম' নাটকটি এ পর্যন্ত তিন রজনী অভিনীত হয়েছে। জানা গেল নাটকটি আরো অভিনীত হবে। তিন রজনী অভিনয়ে এই নাটক দর্শকমহলে এমন কৌতূহল ও চাঞ্চল্য সৃষ্টি করেছে যে গত ১৯ তারিখের অভিনয়ে বহু দর্শক টিকেট না পেয়ে ফেরৎ এসেছেন। টিকেটের জন্য বুকিং কাউন্টারে যে ভিড় এবং উত্তেজনা দেখেছি এরূপ স্পষ্ট রাজনৈতিক বক্তব্যপূর্ণ কোন নাটকে তা আশা করা যায় না। এই নাটকটি দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে দু-কারণে। প্রথমত ভিয়েৎনামের জনগণের ওপর সভ্যতাগর্বী মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের পৈশাচিক কার্যকলাপ এখানে স্পষ্টভাবে দেখান হয়েছে এবং ভিয়েৎনামীদের প্রতিরোধ সংগ্রাম ও দৃঢ় মনোবলের এক চিত্র তুলে ধরা হয়েছে। মার্কিন সাম্রাজ্যবাদীদের মুখোস উদ্‌ঘাটনকারী এই কাহিনী—পশ্চিম বাংলার সাম্রাজ্যবাদবিরোধী জনমনে প্রবল আলোড়ন সৃষ্টি করছে। দ্বিতীয়ত নাটকের কলাকৌশল। প্রচলিত নাট্যরীতি অতিক্রম করে এখানে নাটকের সঙ্গে চলচ্চিত্র সংযোজিত হয়েছে। দৃশ্যসজ্জার বৈচিত্র্য এবং নৈপুণ্যগুণে যেমন বাস্তব পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছে, সেই সঙ্গে এক রীলের দলিলচিত্র নাটকের প্রামাণিক মূল্য বৃদ্ধি করেছে। এই চলচ্চিত্র সংযোজনায় নাটকের গতি বৃদ্ধি হয়েছে এবং দর্শক-মনে চমক সৃষ্টি করেছে।

নাটকের সঙ্গে চলচ্চিত্র সংযোজন বাংলার মঞ্চে এই প্রথম। স্বভাবত একদল নাটক বিশেষজ্ঞ এই রীতি সম্পর্কে প্রশ্ন তুলবেন। যেমন তুলেছিলেন 'অঙ্গার'-এ জলের ইলিউশন সৃষ্টি করা নিয়ে, 'কল্লোল'-এ জাহাজের প্রাধান্যে, 'সেতু' নাটকে রেলগাড়ির ইলিউশন এবং বর্তমানে 'রাধা' নাটকে ম্যাজিক ল্যান্টার্ন স্লাইড ব্যবহারে। প্রশ্ন তুললেও বিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগ অতিক্রমের পর নাট্যমঞ্চকে আঠারো শতকের রীতিতে আটকে রাখা যাবে না। মাত্র পঞ্চাশ বছরের মধ্যে চলচ্চিত্রকে যেখানে অবিরাম নতুন নতুন রীতির প্রবর্তন করতে হচ্ছে। টেলিভিশনের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় নতুন বৈচিত্র্যের সন্ধান করতে হচ্ছে সেই ক্ষেত্রে নাট্যমঞ্চ আঠারো শতকের রীতি আঁকড়ে ধরে কেবলমাত্র অভিনয়ের ওপর নির্ভর করে থাকবে তা চলতে পারে না। নাট্যমঞ্চের বিশেষ আকর্ষণ যদিও অভিনয়, দর্শকের সামনে দাঁড়িয়ে শিল্পীদের আর্ট সৃষ্টি; কিন্তু এই সঙ্গে দৃশ্যসজ্জা ও ইলিউশন সৃষ্টির সহায়তা নিতে হয়েছে। চলচ্চিত্রের ব্যাপকতার সঙ্গে সঙ্গে এই দিকটার দিকে নাট্যমঞ্চকে আরো বেশি ভাবতে হয়েছে। ক্রমে ক্রমে এমন অবস্থায় নাট্যমঞ্চ পৌঁছবে যখন কাহিনীর পূর্ণাঙ্গতাকে ফুটিয়ে তোলার জন্য, ঘটনাকে ব্যাপকতর করার জন্য শব্দ ও দৃশ্যের আরো উন্নতি বিধান করতে হবে। তখন কেবল অভিনয় ও দৃশ্যসজ্জায় চলবে না। প্রয়োজন মত বিভিন্ন ইলিউশন এবং চলচ্চিত্রের পর্যন্ত সহায়তা নিতে হবে। আগামী দিনের মানুষকে তৃপ্তিদান করতে হলে নাট্য-

তরুণ মজুমদার পরিচালিত 'বালিকা বধূ' ছবিতে মৌসুমী চট্টোপাধ্যায় ও রুই বন্দ্যোপাধ্যায়।

মঞ্চকে প্রচলিত রীতির গণ্ডি মেনে বসে থাকলে চলবে না। 'অজেয় ভিয়েৎনাম' নাটকে নতুন রীতির এক নিদর্শন পাওয়া গেল। 'নাটক বিশেষজ্ঞ'রা হয়ত এ নিয়ে প্রশ্ন তুলবেন, কিন্তু সাধারণ দর্শক-মনে ঘটনাকে স্পষ্ট করতে, স্পষ্টভাবে একটা বাণী পেঁছাতে সাহায্য করেছে কি না এবং উপভোগের সহায়ক হয়েছে কি না এটাই প্রশ্ন। এই নতুন নাট্যরীতির সাহসিক পদক্ষেপের জন্য আমি পরিচালক উৎপল দত্তকে অভিনন্দন জানাই।

অজেয় ভিয়েৎনাম নাটকে দেখান হয়েছে যে, মার্কিন সৈন্যাধ্যক্ষরা সেখানে আক্রমণ চালাচ্ছে। তারা সাধারণ মানুষ থেকে কী রকম অমানুষ হয়ে গেছে। তাদের আত্মবিশ্বাস যত দুর্বল হয়ে উঠছে ততই তারা পশু হয়ে উঠছে। নির্মম নিপীড়ন থেকে বলাৎকার পর্যন্ত তারা গণতন্ত্র রক্ষার নামে চালিয়ে যাচ্ছে। যার সঙ্গে হিটলারের কাজে কোন বৈষম্য খুঁজে বার করা যায় না। এই নির্মমতা, বিশেষ করে মঞ্চে বলাৎকারের মত (সাজেস্টিভ) ঘটনা দেখে দর্শকদের চোখ বন্ধ হয়ে আসে, ঘৃণায় গা শিউরে ওঠে। এই নির্মমতা অনেক দর্শক সহ্য করতে না পেরে প্রশ্ন করেন এত নিষ্ঠুরতা কেন? কিন্তু যা একটা জাতির ওপর চলছে এ যে তারই কয়েকটি নমুনা মাত্র। এ যে বাস্তব। এই নির্মম দৃশ্যের পরেই অবশ্য ভিয়েৎনামীদের সুচতুর দেশরক্ষার সংগ্রামের দৃশ্য দেখান হয়েছে। এবং শেষ দৃশ্যে দেখা গেল এত নিষ্ঠুরতার পরও ভিয়েৎনাম অজেয়, মার্কিন অত্যাচারীরা বন্দী হল এবং বিশ্বের জনগণের সামনে বিচারের জন্য তাদের আটক রাখা হল। নাটকে প্রতিরোধের প্রসঙ্গ আরো কিছুটা বৃদ্ধি করলে এবং নিষ্ঠুরতার দিকটায় গতি বৃদ্ধির জন্য কিছু প্রতীকের সাহায্য নিলে হয়ত দর্শক-মনের ওপর চাপ কিছুটা কমতে পারত। দর্শক-মনকে যেমন রিলিফ দেওয়া যেতো তেমন ভিয়েৎনামী জনশক্তিকে আরো বড় করা হত।

নাটকের অন্যতম বৈশিষ্ট্য ভিয়েৎকংদের জঙ্গী সঙ্গীত ও ভিয়েৎনামী জনগণের সঙ্গীতের টেপরেকর্ড ব্যবহার করে যথার্থ মেজাজ সৃষ্টি। এই গানগুলি দর্শক-মনের ওপর শ্রদ্ধাপূর্ণ বিশ্বাস সৃষ্টি করে।

যাঁরা অভিনয়ে অংশগ্রহণ করেছেন তাঁরা প্রত্যেকেই এখানে সার্থকভাবে চরিত্র ফুটিয়ে তুলেছেন। মার্কিন জেনারেলরূপে উৎপল দত্ত, গেরিলানেত্রীরূপে শোভা সেন, একজন অত্যাচারী মার্কিন সেনানায়করূপে সান্তনু ঘোষ এবং নার্শ, গেরিলানেতা ইত্যাদি চরিত্রে (নাম জানা নেই) প্রত্যেকেই প্রশংসনীয় অভিনয় করেছেন। ভিয়েৎনামের প্রতিরোধ সংগ্রামে বাঙালীদের শ্রদ্ধা ও সমর্থন জ্ঞাপনের একটি উল্লেখযোগ্য নিদর্শন এই নাটক 'অজেয় ভিয়েৎনাম'। এই নাটক মার্কিন সাম্রাজ্যবাদীদের পররাজ্যে হস্তক্ষেপের বিরুদ্ধে জনমত জাগ্রত করে তুলবে।

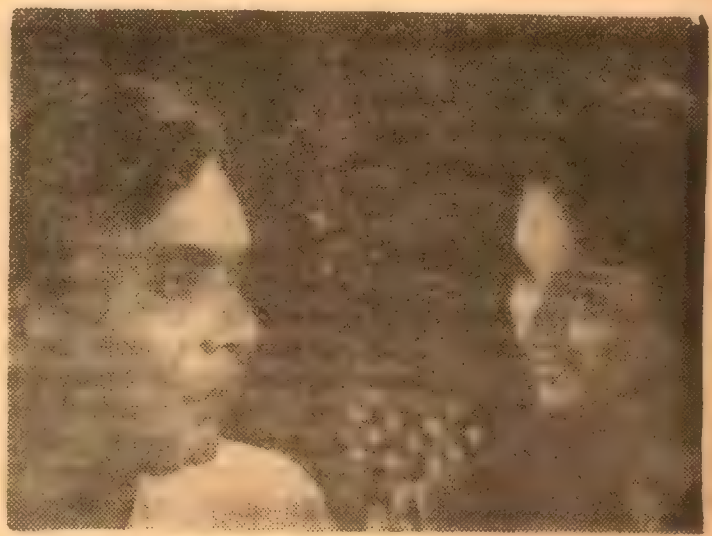

নির্মীয়মাণ 'প্রস্তর স্বাক্ষর' ছবিতে বিকাশ রায় ও সন্ধ্যা রায়

সংবাদবর্ণনা

সুরকার দেবেশ বাগচীর জীবনাবসান

সুরশিল্পী দেবেশচন্দ্র বাগচী গত ৪ঠা সেপ্টেম্বর পরলোক গমন করেছেন। তিনি গলায় ক্যান্সার রোগে আক্রান্ত হয়েছিলেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৪৯ বছর।

তাঁর পূর্ব নিবাস ছিল ফরিদপুর জেলার বালিয়াকান্দি গ্রামে। প্রখ্যাত সঙ্গীতজ্ঞ গিরিজাশঙ্করের কাছে তিনি সঙ্গীতশিক্ষা করেন। তিনি প্রথমে ঢাকা রেডিও ও পরে কলকাতা রেডিওতে সঙ্গীত পরিবেশন করেছেন। তাঁর সুর দেওয়া কয়েকটি গান বিশেষ জনপ্রিয় হয়েছিল। তার মধ্যে 'রজনী গো যেও না', 'আকাশে লক্ষ তারার দেওয়ালি', 'আমায় নিয়ে একি পুতুল খেলা', 'রুপালী চাঁদ যাদু জানে' ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য। কয়েকটি চলচ্চিত্রে তিনি সুর সংযোজন করেছিলেন। তার মধ্যে রয়েছে 'ভৈরব মন্ত্র', 'বাঘা যতীন' 'ক্ষুদিরাম', 'পাগল ঠাকুর', 'রাজমোহনের বৌ'। তিনি পত্নী, তিন ভাই, তিন বোন রেখে গেছেন।

সানফ্রান্সিসকো উৎসবে 'নায়ক'

সত্যজিৎ রায়ের 'নায়ক' সানফ্রান্সিসকো আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবে দেখান হবে। এই উৎসব শুরু হবে অক্টোবর মাসে।

জাপানে 'পথের পাঁচালী'

আগামী নভেম্বর মাসে জাপানের টোকিও এবং ওসাকায় সত্যজিৎ রায়ের 'পথের পাঁচালী'র প্রদর্শন শুরু হবে।

পূর্ব জার্মানীর পথে শোভা সেন

সুপরিচিতা মঞ্চ ও চলচ্চিত্রাভিনেত্রী শোভা সেন গত ২০শে সেপ্টেম্বর তাঁর কনিষ্ঠা কন্যা সহ জার্মান গণতান্ত্রিক ফেডারেশনের পথে রওনা হয়েছেন। তিনি প্রায় মাসাধিক কাল জার্মানীতে থাকবেন।

লিটল থিয়েটার গ্রুপের বিখ্যাত অভিনেতা সত্য বন্দ্যোপাধ্যায় একই সঙ্গে পূর্ব জার্মানীর পথে রওনা হয়েছেন। তিনি গণতান্ত্রিক জার্মানীর নাট্যমঞ্চ সম্পর্কে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করবেন।

কলাভারতী ও চিলড্রেন্স হ্যাপীহোম-এর বাৎসরিক পারিতোষিক বিতরণী নৃত্যানুষ্ঠানে নৃত্যরতা মঞ্জুলা ভট্টাচার্য।

স্টুডিও খবর

স্বর্ণশিখর প্রাঙ্গণে

পরিচালক পীযূষ বসুর পরবর্তী ছবি 'স্বর্ণশিখর প্রাঙ্গণে'। কালকূট রচিত এই কাহিনীর চিত্রনাট্য রচনা করেছেন পরিচালক স্বয়ং। সারদা চিত্রমন্দিরের প্রযোজনায় এই ছবির চিত্র গ্রহণ ও সম্পাদনা করবেন যথাক্রমে দিলীপরঞ্জন মুখোপাধ্যায় ও বৈদ্যনাথ চট্টোপাধ্যায়। সুর দেওয়ার দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন শৈলেন রায়। লতা মুঙ্গেশকর, আশা ভোঁশলে, মান্না দে, হেমন্ত মুখার্জী প্রমুখ গান গাইবেন। বোম্বাইতে ইতিমধ্যে কয়েকটি গান রেকর্ড করা হয়েছে। বিভিন্ন চরিত্রে রূপদান করবেন সুমিতা সান্যাল, গীতালি রায়, রবি ঘোষ, দিলীপ রায়, প্রসাদ মুখার্জী, বঙ্কিম ঘোষ, গীতা দে, সুনীলেশ ভট্টাচার্য, শীতল ব্যানার্জী এবং কাহিনীকার কালকূট।

বিসর্জন

কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের 'বিসর্জন'-এর নতুন করে চিত্ররূপ দিচ্ছেন পরিচালক বীরেশ্বর বসু মহালক্ষ্মী চিত্রমের প্রযোজনায়। ইন্দ্রপুরী স্টুডিওতে ছবিটির চিত্রগ্রহণ শুরু হয়েছে। অভিনয়ে আছেন কমল মিত্র (রঘুপতি), অভি ভট্টাচার্য (গোবিন্দ মাণিক্য), দীপ্তি রায় (গুণবতী), নমিতা বিশ্বাস (অপর্ণা), আনন্দ মুখোপাধ্যায় (জয়সিংহ), জহর রায়, ভানু বন্দ্যোপাধ্যায়, জহর গাঙ্গুলী প্রমুখ। সঙ্গীতের দায়িত্ব নিয়েছেন দ্বিজেন

চৌধুরী ও কালিপদ সেন। চিত্রগ্রহণ করছেন সুবোধ বন্দ্যোপাধ্যায়।

বগলার বঙ্গদর্শন

ঋত্বিক ঘটক পরিচালিত 'বগলার বঙ্গদর্শন' ছবির কাজ আবার শুরু হচ্ছে। এই ছবির চিত্রনাট্য শ্রীঘটক নিজেই রচনা করেছেন। বাংলাদেশের রাজনৈতিক ও সামাজিক জীবনের পরিপ্রেক্ষিতে চিত্রনাট্য রচিত হয়েছে। প্রধান নারী চরিত্রে অভিনয় করবেন বোম্বাইয়ের ইন্দ্রাণী মুখার্জী।

আর একটি ভোজপুরী ছবি

ক্যালকাটা মুভিটোন স্টুডিওতে 'ভর দে ফুলুয়াসে আচারায়া' নামক একটি ভোজপুরী ছবির মহরৎ অনুষ্ঠিত হয়েছে। ছবিটি পরিচালনা করছেন কাত্যায়ন। কাহিনী, সংলাপ ও গান রচনা করেছেন রামচন্দ্র আঁসু। সংগীত পরিচালনা করছেন রবীন্দ্র প্রশান্ত।

সিনেক্লাব অব ক্যালকাটা

গত ২০শে সেপ্টেম্বর সিনেক্লাব অব ক্যালকাটার সদস্যদের জন্য সরলা রায় মেমোরিয়াল কমিউনিটি হলে এক ফিল্ম-শো'র আয়োজন করা হয়েছিল। এই সন্ধ্যায় ছয়টি ডাচ স্বল্প দৈর্ঘ্যের ছবি দেখান হয়েছে। ছবিগুলি হলঃ রিদম অব রটারডম, বেলস্ অব হল্যান্ড, বিগ সিটি ব্রুজ, প্যান, ডাচ মাস্টারপীসেজ, গ্লাশ।

জার্মান টেলিভিশনে পিটার ফনৎজান

জার্মান টেলিভিশনে এক নবযুগের সঞ্চার করেছেন পিটার ফনৎজান। প্রামাণিক চিত্র বা ডকুমেন্টারী ফিল্মে তাঁকে একজন পথিকৃৎ বলা যায়। রেডিও ও টেলিভিশনে তাঁর ধারাবিবরণী দেবার ভঙ্গি আজ অনেকে অনুকরণ করছেন।

পিটার ফনৎজান সম্প্রতি হামবুর্গের উপকণ্ঠে "উইন্ডরোজ দ্যুম'-টাইম" নামে একটি স্টুডিও স্থাপন করেছেন। এখানে দেশ-বিদেশের বিভিন্ন ঘটনা সম্বন্ধে প্রামাণিক চিত্র নির্মাণ হয়। সম্প্রতি এখানে আডেনাউয়েরের স্মৃতিকথা ও জার্মানীর তরুণদের সম্বন্ধে দুটি প্রামাণিক চিত্র তোলা হচ্ছে। বিশ্বের বিভিন্ন রাজনৈতিক নেতাদের সঙ্গে ফনৎজানের সাক্ষাৎকার সম্বন্ধে প'য়তাল্লিশ মিনিটব্যাপী যে প্রামাণিক চিত্রটি তোলা হয়েছে সেটি সত্যিই চিত্রজগতের একটি সম্পদ।

ইতিহাস, দর্শন ও সাংবাদিকতায় সুপণ্ডিত পিটার ফনৎজানের সাফল্যময় কর্মজীবনের শুরু হয় দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের শেষে। তখন তিনি জার্মানীর একটি টেলিভিশন প্রতিষ্ঠানে ধারাবিবরণী দেবার কাজে নিযুক্ত ছিলেন। ঐ প্রতিষ্ঠানটি ১৯৫১ সালে তাকে আমেরিকায় পাঠায়। সেখানে যাবার অতি অল্পদিনের মধ্যেই তার "নয়া দুনিয়ার খবর" সূচীর মারফৎ জার্মানীর এক বিরাট শ্রোতৃমণ্ডলীর কাছে তিনি বিশেষ প্রিয় হয়ে ওঠেন।

শ্রীজয়দ্রথ পরিচালিত '৮০তে আসিও না' চিত্রে জহর রায়

ভূতাত্ত্বিক চলচ্চিত্র সংস্থা
সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্রের এক অভিনব চলচ্চিত্র প্রতিষ্ঠান

সোভিয়েত ভূতাত্ত্বিক চলচ্চিত্র সংস্থা, সম্ভবত, বিশ্বের মধ্যে এ ধরণের সর্বপ্রথম ও একমাত্র চলচ্চিত্র সংস্থা। লক্ষ লক্ষ দর্শক এই সংস্থার তোলা ছবিগুলি দেখে তাঁদের স্বদেশ ও অন্যান্য দেশের বিভিন্ন প্রাকৃতিক বৈচিত্র্য ও সৌন্দর্য উপভোগ করেন ও ভূপ্রকৃতিগত তথ্যাদি সম্পর্কে অবহিত হন। বিজ্ঞানমূলক চলচ্চিত্রের কেন্দ্রীয় ফিল্ম-স্টুডিও ভবনে উল্লিখিত সংস্থাটির দপ্তর, যার পুরো নাম হল "ইউনিয়ন অব জিওগ্রাফিক ফিল্মস, ইউ-এস-এস-আর"।

ভ্রমণ ও ভূতাত্ত্বিক অভিযানমূলক এইসব চলচ্চিত্র তোলা যথেষ্ট পরিশ্রম ও আয়াসসাধ্য। হয়তো ছবি তোলার জন্য ক্যামেরা-শিল্পীকে তাঁর ক্যামেরাটি নিয়ে দৃশ্যগ্রহণের জন্য এক দুর্গম পর্বতশিখরে উঠতে হ'ল, যেখানে অক্সিজেনের স্বল্পতার জন্য তাঁর নিজেরই নিশ্বাস নেওয়া দুরূহ হয়ে পড়েছে অথবা এক খরস্রোতা নদীর উৎস সন্ধানে তাঁকে ক্যামেরা পিঠে নিয়ে যাত্রা করতে হ'ল। আগ্নেয়গিরির

পশ্চিম জার্মানীর টেলিভিশন ভাষ্যকার পিটার ফনৎজান তাঁর সহকর্মীর সঙ্গে আলোচনা করছেন।

গহ্বরেও অনেক সময় এই চলচ্চিত্রকারদের নামতে হয়। ঘোড়া, মোটরগাড়ি, এরোপ্লেন,—যে কোনও যানবাহনেই যাওয়া যাক না কেন, এ ছবির ক্যামেরা-শিল্পীকে সবসময়েই সজাগ থাকতে হয়—কখন ঠিক ঠিক দৃশ্য গ্রহণের সময় ও স্থান বেছে নিতে হবে।

এই সংস্থার চলচ্চিত্র পরিচালক ও ক্যামেরা-শিল্পীরা সকলেই হলেন মস্কো সিনেমাটোগ্রাফি ইন্সটিটিউটের স্নাতক। এঁরা বয়সে তরুণ বলেই উৎসাহী, পরিশ্রমী ও নতুনকে জানার জন্য সবরকমভাবে প্রস্তুত ও আগ্রহী।

সোভিয়েত ভূতাত্ত্বিক মানচিত্রানুসারে এঁরা এঁদের চলচ্চিত্রাভিযানের পরিকল্পনা করেন। এই মানচিত্রের পথরেখা ঘিরে আছে, উত্তর মেরু, দক্ষিণ মেরু, ইস্টার দ্বীপপুঞ্জ ও নিউজিল্যান্ড, অস্ট্রেলিয়া, হিমালয় পর্বতমালা, আফ্রিকার মধ্যভাগ, য়ুরোপ, উত্তর ও দক্ষিণ আমেরিকা, জাপান, কিউবা ও পৃথিবীর নানান অঞ্চল।

সোভিয়েত দেশের ইউনিয়ন অব জিওলজিক্যাল ফিল্মস প্রতি বছর আটবার তাঁদের 'চলচ্চিত্রাভিযানের পত্রিকা' প্রকাশ করেন। প্রকাশ করেন না বলে 'পত্রিকা'টির চিত্রমুক্তি ঘটে বলাই সংগত। কেন না এটিও হল জনপ্রিয় তথ্যমূলক চলচ্চিত্র, দেখাতে সময় লাগে মাত্র ২০ মিনিট এবং প্রতি পাঁচ মিনিটে এক-একটি বিষয়ের সম্পর্কে দৃশ্যাদির অবতারণা থাকে। এ ছাড়া থাকে একটি 'চলচ্চিত্র সম্পাদকীয়', যাতে সোভিয়েত দেশের নয়া গঠনকার্য, বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার প্রভৃতি যেমন থাকে, তেমনি থাকে অন্যান্য দেশের বিজ্ঞান-প্রগতিরও খোঁজখবর।

এই 'চলচ্চিত্র পত্রিকা'টি যে সোভিয়েত দর্শকসাধারণের কাছ থেকে সথেষ্ট সমাদর পায়, তা কিয়েফে সম্প্রতি অনুষ্ঠিত সোভিয়েত চলচ্চিত্র উৎসবে তার দু-দু'বার পুরস্কারপ্রাপ্তি দ্বারাই প্রমাণিত হয়।

ব্রজেন্দ্রকিশোর স্মৃতি সংগীত সংসদ

আগামী ৫ই অক্টোবর রবীন্দ্র সরোবর স্টেডিয়াম হলে ব্রজেন্দ্রকিশোর সংগীত সংসদের বার্ষিক অধিবেশন অনুষ্ঠিত হবে। অনুষ্ঠানে জাতীয় অধ্যাপক ডঃ সত্যেন বোস সভাপতিত্ব করবেন। অনুষ্ঠান উদ্বোধন করবেন রাষ্ট্রমন্ত্রী শ্রী এস, এম, মিশ্র। সঙ্গীত অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করবেন—কণ্ঠসঙ্গীতে শ্রীচিন্ময় লাহিড়ী, শ্রীমতী অপর্ণা চক্রবর্তী; বেহালায় শ্রী ভি, জি, যোগ; স্বরোদে শ্রীবুদ্ধদেব দাশগুপ্ত; এবং সেতারে শ্রীইমরৎ খাঁ। তবলা সঙ্গতে শ্রীকেরামতউল্লা খাঁ, শ্রীশ্যামল বসু এবং শ্রীদিলীপ দাস।

কাব্যে ও চিত্রে বিচিত্র মিলন।

চিত্র শোভা এল্‌বাম

নয়ন-মনোমোহন সুশোভন সংস্করণ। কবিঃ—বিশ্বকবি কবীন্দ্র শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর; শিল্পীঃ—সর্বজনসুপ্রসিদ্ধ শ্রীযুক্ত ভবানীচরণ লাহা। এ সমন্বয়ের তুলনা সাহিত্যরাজ্যে কোথায়?

চিত্রে চিত্রে চিত্রময় সুশোভন এলবাম। বঙ্কিম-কটাক্ষের মাধুরীচ্ছটায় পুলকলীলা—আর ভাব-বিকাশের অমিয় মাধুরী। এ যেন মেঘে জ্যোৎস্নায়—হীরায় পান্নায়—কিশলয়ে পুষ্পে মধুর সম্মিলন।

সুদৃশ্য বাঁধাই—মূল্য ২॥০ টাকা।

বসুমতী প্রাইভেট লিমিটেড
১৬৬, বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী স্ট্রীট,
কলিকাতা—১২

পাঠক মন

গত ২৬শে জ্যৈষ্ঠ ১৩৭৩ 'সাপ্তাহিক বসুমতী' পত্রিকায় শ্রীপারুল ভট্টাচার্য চুঁচুড়া আদিপর্ব শীর্ষক একটি প্রবন্ধ লিখেছেন। প্রবন্ধটি উপাদেয় নিঃসন্দেহে বলা যায়। কিন্তু দুঃখের বিষয় উহার উপাদান সমস্তই শ্রীসুধীরকুমার মিত্র বিরচিত হুগলী জেলার ইতিহাস থেকে গ্রহণ করা হয়েছে এবং আশ্চর্য এই যে কোথাও তিনি ঘুণাক্ষরেও একথা স্বীকার করেন নি।

নিম্নে পাঠকগণের অবগতির জন্য দু-একটি উদাহরণ দিচ্ছি।

শ্রীসুধীরকুমার মিত্রের গ্রন্থে আছেঃ "চুঁচুড়ায় যে সমস্ত স্থান ওলন্দাজদিগের অধিকারভুক্ত ছিল তাহা হইতে তের হাজার একশত বাইশ টাকা (১৩১২২্) রাজস্ব আদায় হইত। বাস্তুভিটার উপর তাহারা বিঘা প্রতি সাড়ে বাইশ টাকা খাজনা আদায় করিত এবং চুঁচুড়ায় তৎকালে বাস্তুভিটার পরিমাণ ছয় শত আটান্ন বিঘা ছিল।"

এইটি শ্রীপারুল ভট্টাচার্য লিখেছেনঃ "চুঁচুড়া থেকে তের হাজার একশো বাইশ টাকা রাজকর আদায় হতো বছরে। প্রতি বিঘা বাস্তুভিটায় বার্ষিক খাজনা ধার্য করা ছিল সাড়ে বাইশ টাকা এবং মোট দুশো আটান্ন বিঘার মতো বাস্তুভিটা ছিল তখন চুঁচুড়ায়।"

তিনি এই কয় লাইন নকল করতে গিয়ে আবার একটি মারাত্মক ভুল করেছেন। বাস্তুভিটার সংখ্যা ছিল ৬৫৮ বিঘা, কিন্তু তিনি ভুলে লিখে ফেলেছেন ২৫৮ বিঘা।

সুধীরবাবুর গ্রন্থের (১ম সংস্করণ—৪৯৬-৫০০ পৃষ্ঠা) ১৭৯৫ থেকে ১৯০৪ খৃস্টাব্দ পর্যন্ত জেলা ম্যাজিস্ট্রেট-দের একটা তালিকা আছে। ২য় সংস্করণে উহা পরিত্যক্ত হয়। শ্রীমতী ভট্টাচার্য এ সম্বন্ধে লিখেছেনঃ "১৭৯৫ থেকে ১৯০৪ পর্যন্ত প্রায় ৬৬ জন ম্যাজিস্ট্রেটের নাম পাওয়া যায়।" অর্থাৎ এর পর আর নাম পাওয়া যায় না। হুগলী জেলার ইতিহাসে আর নাম দেওয়া হয় নি বলে তিনি আর নাম পেলেন না। কিন্তু 'কলিকাতা গেজেটে' অনুসন্ধান করলে যে সমস্ত নামই পাওয়া যায় এটা ঐতিহাসিকের জানা উচিত ছিল।

সুধীরবাবু "ধর্মপুস্তক" নামে একখানি গ্রন্থ আবিষ্কার করেন উহার বিবরণ হুগলী জেলার ইতিহাসে দেওয়া আছে। এ সম্বন্ধে ১লা আশ্বিন ১৩৫৬ সালের আনন্দবাজার পত্রিকায় ২৬ ফাল্গুন ১৩৬৭ সালের দৈনিক বসুমতীতে শ্রীশৌরীন্দ্রকুমার ঘোষের প্রবন্ধে এবং দীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্যের শ্রাবণ ১৩৫৯ সালের প্রবাসীতে প্রকাশিত প্রবন্ধে সুধীরবাবুকেই প্রথম গদ্য পুস্তকের আবিষ্কারক বলা হয়েছে। তিনি হুগলী জেলার ইতিহাস হতে সমস্ত তথ্য গ্রহণ করেছেন (বসুমতী পৃষ্ঠা ৫০) কিন্তু কোথাও আবিষ্কারকের নামটি প্রকাশ করেন নি। পাঠকগণ যদি হুগলী জেলার ইতিহাসের ৫৯৬ পৃষ্ঠা থেকে ৬২০ পর্যন্ত পাঠ করেন তা হলে দেখবেন যে কৌশলে কিভাবে পরের জিনিষ নিজের বলে চালান যায়।

এর আগে গ্রাম বাংলার কথায় তিনি যে সব প্রবন্ধ লিখেছেন, সমস্তই কিন্তু সুধীরবাবুর পূর্বোক্ত গ্রন্থ থেকে নেওয়া।

সুধীরবাবু দশ বৎসরের অক্লান্ত পরিশ্রমে যে সুবৃহৎ গ্রন্থ তিন খণ্ডে প্রণয়ন করেছেন এবং রাষ্ট্রীয় সহায়তায় আজ যা প্রকাশিত হয়েছে, তা থেকে উপাদান হরণ করে আধঘণ্টায় 'ঐতিহাসিক নিবন্ধ' রচনা করা হয়ত খুবই সহজ কিন্তু ঋণ স্বীকার না করার মতন অকৃতজ্ঞতা বোধহয় আর কিছুই নেই।

শ্রীরমা দেবী
৩৩সি, নেপাল ভট্টাচার্য ফার্স্ট লেন
কালীঘাট, কলিকাতা

লেখিকার উত্তর

গত ২৫শে জ্যৈষ্ঠ গ্রাম বাংলার কথা কলমে প্রকাশিত চুঁচুড়া আদিপর্ব শীর্ষক প্রবন্ধটির প্রতিবাদে লিখিত শ্রীরমা দেবীর তারিখবিহীন পত্র পেয়েছি। লেখিকাকে ধন্যবাদ তিনি কলমটি নিয়মিত পাঠ করেন এবং পরিশেষে সংশোধনকল্পে লেখনীও ধারণ করেছেন।

পত্রলেখিকার সবগুলি অভিযোগের সুর মূলত একই। গ্রাম বাংলার কথা—চুঁচুড়া আদিপর্ব প্রবন্ধের উপাদান প্রায় সবই শ্রীসুধীরকুমার মিত্রের হুগলী জেলার ইতিহাস থেকে হরণ করা হয়েছে এবং কোথাও সে কথা স্বীকার করা হয় নি। অভিযোগ গুরুতর এ সম্বন্ধে প্রবন্ধ-লেখিকারও বক্তব্য অবশ্যই পেশনীয়।

যতগুলি অভিযোগ পত্রলেখিকা করেছেন তার মধ্যে সবচেয়ে গুরুতর বোধ করি ধর্মপুস্তকের আবিষ্কার প্রসঙ্গে। তাঁর মতে হুগলী জেলার ইতিহাস লেখক সুধীরবাবু ধর্মপুস্তকের আবিষ্কর্তা এবং চুঁচুড়া আদিপর্বে সেকথা কোথাও স্বীকার করা হয় নি।

এ অভিযোগ ভিত্তিহীন। ধর্মপুস্তকের আবিষ্কারক সুধীরবাবু নন। ধর্মপুস্তক আবিষ্কার করেছিলেন শ্রীরামপুরবাসী শ্রদ্ধেয় ইতিহাস গবেষক শ্রীফণীন্দ্রনাথ চক্রবর্তী। এবং আমার প্রবন্ধে অতি পরিচ্ছন্ন ভাষায় সুস্পষ্টভাবে তাঁকেই এই গ্রন্থের উদ্ধারক এবং সংগ্রহ-কর্তা বলে উল্লেখ করা হয়েছে। 'উদ্ধার' শব্দটি ইচ্ছা করেই ব্যবহার করা হয়েছে। বাংলা ভাষা তথা বাংলার ইতিহাসের অমূল্য সম্পদ এই গ্রন্থখানি ঘটনাচক্রে নষ্টই হয়ে যেতে বসেছিল প্রায়। অনেক শ্রম সময় এবং অর্থব্যয়ের পর, প্রায় একটি দুরূহ অভিযান শেষে গ্রন্থখানিকে উদ্ধার করেছিলেন ফণিবাবু। কাজেই তাঁকে এই গ্রন্থের উদ্ধারকর্তা বলে অত্যুক্তি কিছু করা হয়েছে বলে আমি মনে করিনে।

ধর্মপুস্তকের আবিষ্কারক যে ফণিবাবু একথা সুধীরবাবুও স্বীকার করেছেন তাঁর হুগলী জেলার ইতিহাসের প্রথম খণ্ডে। (যদিও ঐ গ্রন্থেরই শোভন সংস্করণে অত্যন্ত কৌশলী বাক্যজাল বিস্তার করে তিনি এ সত্য অস্বীকার করবারও প্রয়াস পেয়েছেন) পত্রলেখিকার এ তথ্য অজানা নয়। কারণ 'হুগলী জেলার ইতিহাস' তাঁর উত্তমরূপেই পড়া আছে। তথাপি সব কিছু জেনে-শুনেও এমন মিথ্যা প্রসঙ্গের অবতারণা তিনি করেছেন কেন তা আমার বিবেচনা বুদ্ধির অগোচর।

লেখিকার অপর অভিযোগ ওলন্দাজ আমলে আদায়ী খাজনা এবং ভিটাবাড়ির পরিমাণ সম্বন্ধে। তাঁর বিশ্বাস এই উপাদানগুলিও সামগ্রিকভাবে অপহৃত হয়েছে হুগলী জেলার ইতিহাস থেকে। উদাহরণস্বরূপ তিনি কয়েকটি তথ্য অবিকল উদ্ধৃত করেছেন।

সুরুতেই লেখিকা কিঞ্চিৎ ভুল করেছেন তথ্য সংগ্রহের উৎস নির্ণয়ে। হুগলী, চুঁচুড়া, চন্দননগর প্রভৃতি স্থানগুলি খুব বেশিদিনের প্রাচীন নয়, এই

'বিশ্বের বিবিধ ধর্ম ও সন্তগণ' (হিন্দু-ব্রাহ্ম-শিখ-বৌদ্ধ-জৈন-পার্শী-ইহুদী-খৃষ্ট-ইসলাম-কনফুসি ধর্ম ও সন্তগণের বিবরণ, শেষে : সর্ব-ধর্ম-সমন্বয়। মূল্য : ২-৫০ পঃ। লেখক : তারক বন্দ্যোপাধ্যায়, এম-এস-সি; বি-এল, উত্তরপাড়া। প্রাপ্তিস্থান : চক্রবর্তী-চ্যাটার্জি এণ্ড কোং প্রাঃ লিঃ ও মহেশ লাইব্রেরী, কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা।

সমস্ত স্থানে বিদেশী শক্তিগুলির অধিকার এবং ঘাঁটি প্রতিষ্ঠার কাহিনীও কোনো প্রাগৈতিহাসিক কালের ইতিবৃত্ত নয় এবং এ সম্বন্ধীয় প্রামাণ্য পুস্তক গ্রন্থরাজিও দুর্লভ দুষ্প্রাপ্য বা অধুনা-লুপ্ত হয়ে যায় নি। সবই সযত্নে সংরক্ষিত আছে জাতীয় গ্রন্থাগারে। সকলের পক্ষেই যা আয়ত্তসাপেক্ষ।

হুগলী জেলার ইতিহাস লিখতে গিয়ে সুধীরবাবুকে যে সব গ্রন্থ তথ্য স্থান এবং প্রমাণপঞ্জীর উপর নির্ভর করতে হয়েছে উপাদান সংগ্রহে, গ্রাম বাংলা লেখার প্রয়োজনে বর্তমান লেখিকাকেও ঠিক সেই সব গ্রন্থ স্থান এবং প্রমাণপঞ্জীর উপর নির্ভর করতে হয়েছে অনেক স্থলেই। কাজেই কোথাও কোথাও তথ্যের অবিকলত্ব অসম্ভব নয়। নকলীকরণ এতে করে প্রমাণিত হয় না। তথ্য এবং উপাদান সংগ্রহের মূল গ্রন্থগুলি হাতে রয়েছে যখন, তখন হুগলী জেলার ইতিহাস থেকে নকল করবার ইচ্ছা বা প্রবৃত্তি কোনো অনুসন্ধিৎসুর হবে বলে মনে হয় না। চুচুড়া আদিপর্ব রচনায় যেসব গ্রন্থের সাহায্য নেওয়া হয়েছে তার মধ্যে প্রধান দুইখানির নাম এখানে উল্লেখ করে দেওয়া গেল—

১। ক্রফোর্ডস্ মেডিক্যাল গেজেটিয়ার
২। টয়েনবিস্ অ্যাকাউন্টস অফ দি ডিস্ট্রিক্ট হুগলী, এবং কিছু প্রাচীন পত্র-পত্রিকা।

পরিশেষে সবিনয়ে নিবেদন জেলা-ইতিহাস রচনায় উদ্যোগী হয়ে শ্রীসুধীরকুমার মিত্র হুগলীবাসীর ধন্যবাদভাজন হয়েছেন। ব্যক্তিগতভাবে আমি তাঁকে শ্রদ্ধাই করি। তথাপি তাঁর বিস্তারিত তথ্যরাজিকেই সর্বথা অভ্রান্ত বলে মেনে নেবার মতো মূঢ় বিশ্বাসপরায়ণতা আমার নেই। কারণ প্রথমত—ইতিহাস সদা উদ্ঘাটনশীল। আজ যা তথ্য নামে সত্যের মর্যাদা পায়, কাল নবতর আবিষ্কারে অসারবোধে পরিত্যক্ত হয় তা। তাই ঐতিহাসিক কোনো সময়েই নির্ভুল নন এবং সর্বদাই সন্দেহপরায়ণ। দ্বিতীয়ত—সুধীরবাবুর ইতিহাস যথেষ্ট নির্ভরযোগ্য নয়ও। বহু ভ্রান্ত এবং অনুপস্থিত তথ্য দোষে দুষ্ট, ভারাক্রান্ত প্রমাণস্বরূপ একটিমাত্র অতিক্ষুদ্র উদাহরণ উপস্থিত করেই প্রসঙ্গ শেষ করবো।

সুধীরবাবু তাঁর হুগলী জেলার ইতিহাস ও বঙ্গসমাজ নামক গ্রন্থে নিত্যানন্দপুর নামক একটি ক্ষুদ্র অনুচ্ছেদ লিখেছেন। এই প্রসঙ্গে নিত্যানন্দপুরের যুগ্ম শিবমন্দিরের নাম উল্লেখ করেছেন তিনি ঈশানেশ্বর ত্র্যম্বকেশ্বর। প্রকৃতপক্ষে মন্দির দুটি ঈশানেশ্বর অঘোরেশ্বরের। মন্দিরের গায়ে উৎকীর্ণ পোড়া মাটির শিল্পকলা সম্বন্ধে যে বর্ণনা তিনি দিয়েছেন সেগুলি আনন্দবাজার পত্রিকায় প্রকাশিত 'নিত্যানন্দপুরের স্থাপত্য কীর্তি' শীর্ষক প্রবন্ধের আক্ষরিক অনুলিপি বললেও চলে এবং আরও পরিতাপের বিষয় এই প্রসঙ্গে নিত্যানন্দপুরে একটি বয়নশিল্প শিক্ষাকেন্দ্রের তিনি উল্লেখ করেছেন সমাজসেবিকা পারুল ভট্টাচার্যের পরিচালনায় যেটি সঞ্চালিত হচ্ছে।

প্রসঙ্গত জানাই নিত্যানন্দপুরে কোনোদিন বয়নশিল্প শিক্ষাকেন্দ্র ছিল না এবং পারুল ভট্টাচার্যও কোনোদিন এই ধরণের কোনো প্রতিষ্ঠান পরিচালনা করবার সৌভাগ্য অর্জন করে উঠতে পারেন নি। এমন উদাহরণ আরও অনেক আছে। অপ্রাসঙ্গিক বোধে এবং পত্রাকার বৃদ্ধি ভয়ে উদ্ধৃত করা গেল না। কাজেই এমন খণ্ডিত এবং অসম্পূর্ণ ইতিহাসের উপর নির্ভর করে কোনো তথ্যমূলক প্রবন্ধ রচনায় হাত দেওয়া যে যেতে পারে না আশা করি পাঠককুল তা অনুধাবন করবেন।

পত্রলেখিকা হুগলী জেলার ইতিহাসের ৬২০ পৃষ্ঠা পর্যন্ত পাঠ করে দেখবার জন্য পাঠকগণকে অনুরোধ জানিয়েছেন, আমিও এই সম্বন্ধীয় বিচারের দায় পাঠকের আদালতে অর্পণ করেই নিশ্চিন্ত হলাম।

পারুল ভট্টাচার্য

• • •

১৪ শ সংখ্যা সাপ্তাহিক বসুমতীর 'বঙ্গদর্শনে' 'একটি সামাজিক অন্যায়' পড়লাম। 'গ্রামাঞ্চলের পঞ্চায়েৎ নিয়ন্ত্রিত রাস্তাঘাট, শ্মশান, ভাগাড় ইত্যাদি ক্রমে ক্রমে শক্তিশালী ব্যক্তিদের জবর দখল সম্পত্তিরূপে পরিণত' তো নিত্যনৈমিত্তিক ঘটনা। তার চেয়েও অতিবড় অন্যায় পঞ্চায়েতের কর্মকর্তাদের দ্বারা সাধিত হয়। 'শক্তি, অর্থ ও প্রতিপত্তির জোরে' স্বার্থান্বেষী ব্যক্তিরা পঞ্চায়েতের কর্মকর্তাদের উপর প্রভাব বিস্তার করে দরিদ্র, শান্তিপ্রিয় নিরীহ সাধারণ গ্রামবাসীর যথাসর্বস্ব গ্রাস করে। মহৎ প্রণোদিত হয়ে আমাদের পূর্বসূরীরা যে মহৎ উদ্দেশ্যে গ্রাম নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার কথা বলে গেছেন, তা এখন প্রহসন ছাড়া আর কিছু নয়। রোগগ্রস্ত বুর্জোয়া ভাবাপন্ন কতকগুলো লোকের হাতে আজ প্রায় প্রতিটি গ্রামের 'নিয়ন্ত্রণ' ভার ন্যস্ত। অতিবড় আড়ম্বরী, দাম্ভিক ও দায়িত্বজ্ঞানহীন স্বার্থপর লোক পঞ্চায়েতের মহৎ উদ্দেশ্যকে নিজেদের সুযোগ-সুবিধায় অস্ত্র হিসাবে ব্যবহার করে শান্তিপ্রিয় খেটে-খাওয়া কৃষকদের মুখের গ্রাস কেড়ে নিতে তৎপর—সুবিচার বা সাহায্য পাওয়া বাতুলতা মাত্র—ওরা শোষণ করতে ওস্তাদ। একশ্রেণীর কৃষককে নিম্নশ্রেণী বলে অতি ঘৃণা করে—সমাজে তারা উপেক্ষিত—পশুর মতো ওদের খাটতে হয়। তবু তারা দুবেলা পেটভরে খেতে পায় না। গ্রাম অধ্যক্ষের বাড়িতে যখন বস্তা বন্দী বে-আইনী চাল-চিনি-গম মজুত, ঠিক সেই সময়ে গ্রামের মধ্যে অনাহারে দরিদ্র কৃষক মৃত্যু বরণ করে। এতে তাঁদের লজ্জা বোধ তো হয়ই না,—মেহনতি গ্রামবাসীদের ঠকিয়ে যথাসর্বস্ব গ্রাস করে গর্ব বোধ করে, বিজয়োল্লাসে স্ফীত হয়। এরাই আবার গ্রামের মহান অধ্যক্ষ এবং সম্মানের পাত্র। সমীহ করে চলতে হয় সকলকে। এদের অকথ্য অত্যাচার, জুলুমবাজি পূর্বের দুর্দান্ত প্রতাপশালী জমিদারের কথাই মনে পড়িয়ে দেয়।

আজও গ্রাম বাংলার কৃষিজীবী মানুষ দারুণ দারিদ্র্যে জর্জরিত। নিরক্ষরতা আজও তাদের বুকে পাষাণের মতো চেপে বসে আছে। ভাদ্র-আশ্বিন মাসে তাদের আজও অনাহারে অর্ধাহারে কাটাতে হয়। গ্রাম পঞ্চায়েতের শরণাপন্ন হলেও কোন সুরাহা তাদের হয় না। ফেলে আসা দিনগুলির মতোই আজও তাদের সুদখোরদের কাছ হতে উচ্চহারে সুদে ঋণ গ্রহণ করতে হয়। তাদের দারিদ্র্য, নিরক্ষরতার সুযোগ নিয়ে শোষণকারী, দুর্দান্তপ্রতাপশালী, অন্তঃসারশূন্য, পরধন অপহরণকারী ব্যক্তিরাই আবার হয়ে বসে গ্রামপঞ্চায়েৎ মধ্যমণি। নিরুদ্বেগ শান্তিপূর্ণ জীবনযাপন করে দুবেলা দুটি খেয়েমেখে সকলের সঙ্গে ভ্রাতৃভাব বজায় রেখে বাঁচতে চায় সাধারণ গ্রামের কৃষিজীবী মানুষ। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় তাতেও বাদ সাধে সমাজবিরোধী স্বার্থপর পঞ্চায়েতের শীর্ষ স্থানাভিষিক্ত লোকগুলো। মিথ্যা মামলার দায়ে কৃষকের জমি, রাস্তাঘাট দখল করে তাদের বঞ্চিত করে—পথের ভিখারী করে। যদি কখনো কোন সহৃদয় ব্যক্তি তার বিরোধিতা করেন তবে তাঁকে চরম শিক্ষা পেতে হয় এই পঞ্চায়েতেরই কাছে। ফলে সদিচ্ছা থাকলেও কেউ এগোতে সাহস করে না।

তাই বলতে চাই, সরকার যে উদ্দেশ্যে গ্রাম পঞ্চায়েৎ প্রতিষ্ঠা করেছেন, তা এখন কতকগুলি স্বার্থান্বেষী লোকের হাতে পড়ে সরকারের প্রচেষ্টাকে ব্যর্থ করে দিচ্ছে।

রবি রায়
সম্পাদক 'পতাকা' প্রগতিশীল মাসিক সাহিত্য পত্রিকা
১২, কেনাল রোড, সালকিয়া, হাওড়া

খেলা ধুলো

জাপানের বিমান বন্দরে ভারতীয় হকি দল

ইস্টবেঙ্গল শীল্ড ফাইন্যালে

শ্রীঅমিতাভ

মরশুমের ডাবল লক্ষ্য করে দৃঢ় পদক্ষেপে অগ্রসর হচ্ছে গতবারের শীল্ড জয়ী ইস্টবেঙ্গল ক্লাব। এই মরশুম মনে হচ্ছে ইস্টবেঙ্গল ক্লাবের ভরা মরশুম বলেই সূচিত হবে, কারণ ইতিমধ্যেই লীগের সম্মান কৃতিত্বের সঙ্গে করায়ত্ত করেছে ইস্টবেঙ্গল ক্লাব এবং শীল্ড প্রায় নাগালের মধ্যে বলতে গেলে। ফাইন্যালে ইস্টবেঙ্গলের এবার প্রতিদ্বন্দ্বী বি এন রেলদল। ১৯৬৩ সালের শীল্ড বিজয়ী বি এন রেলদল এবার অবশ্য আপ্রাণ চেষ্টা করবে আর একবার আই এফ এ শীল্ড বিজয়ীর দুর্লভ সম্মান লাভের জন্য।

সেমিফাইন্যালের বাধা ইস্টবেঙ্গল ক্লাব কৃতিত্বের সঙ্গে অতিক্রম করে পৌঁছুল ফাইন্যালে। ইস্টার্ন রেলদল প্রথম গোল দিয়ে অগ্রগামী হলেও শেষ রক্ষা করতে পারে নি, জয়লক্ষ্মীর আশীষ লাভ করেছে ইস্টবেঙ্গল ক্লাবই। এক গোল পশ্চাতে থেকে শেষ পর্যন্ত ২-১ গোলের ফলাফলে জয়তিলক ললাটে নিয়ে তাঁবুতে ফেরা কম কৃতিত্বের পরিচয় নয়, বিশেষত শীল্ডের সেমিফাইন্যালের এই গুরুত্বপূর্ণ খেলায়। এখানে উল্লেখযোগ্য যে এই বছরই লীগে ইস্টবেঙ্গলের একবার মাত্র সাক্ষাৎ হয়েছে এবং এই খেলায় ১-০ গোলে ইস্টার্ন রেল জয়ী হয়ে ইস্টবেঙ্গলের লীগের অপরাজিত আখ্যা ক্ষুণ্ণ করেছে।

ইস্টবেঙ্গল এবং ইস্টার্ন রেলের সেমিফাইন্যালের আকর্ষণীয় খেলাটিতে বিশেষভাবে উল্লেখ করতে হবে দুটি খেলোয়াড়ের ভূমিকা। একজন হলেন ইস্টবেঙ্গলের পুরোভাগের প্রাণকেন্দ্র এবং আক্রমণধারার মূল উৎস পরিমল দে এবং অন্যজন হলেন ইস্টার্ন রেলদলের রক্ষণভাগের স্তম্ভস্বরূপ তরুণ স্টপার সঞ্জীব বসু। এই মরশুমে লীগ খেলার সুরুতে পরিমল দে যে সুন্দর ক্রীড়াধারার পরিচয় দিয়েছিলেন, মাঝে তা' কিছুটা নিষ্প্রভ হয়ে পড়েছিল। কিন্তু এই সেমিফাইন্যাল খেলায় পরিমল দে'র উচ্চাঙ্গের ক্রীড়া-নৈপুণ্য শুধু দলকেই জয়যুক্ত করে নি, তাকে ফিরিয়ে দিয়েছে তার ক্রীড়াধারার উজ্জ্বলতা এবং দর্শকদের মন দিয়েছে ভরিয়ে। পরিমল একাই দিয়েছেন ইস্টবেঙ্গলের পক্ষের দুটি গোল। পরিমল দে'র দেওয়া জয়সূচক দ্বিতীয় গোলটি বহুদিন দর্শকদের মানসপটে অক্ষয় হয়ে থাকবে। আশ্চর্যের কথা যে আমাদের ফুটবলের কর্তা ব্যক্তিরা কেন জানি না এই খেলোয়াড়টি সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ উদাসী। একেবারে উপায় না থাকলে পরিমলকে তারা স্বীকৃতি দিতে রাজী নন মনে হয়।

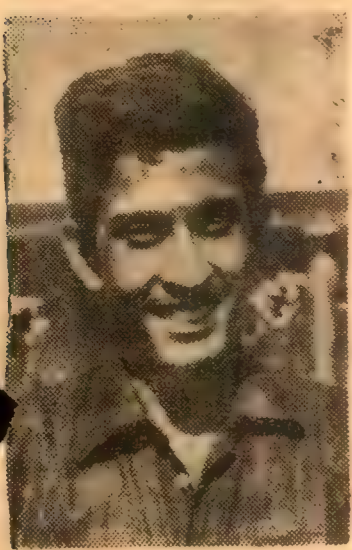

পরিমল দে

এরপর উল্লেখ করছি ইস্টার্ন রেলের তরুণ স্টপার সঞ্জীব বসুর কথা। এই মরশুমের সুরু থেকে সুন্দরভাবে এবং দৃঢ়তার সঙ্গে খেলে চলেছেন সঞ্জীব বসু। ইস্টবেঙ্গলের বিপক্ষে লীগে জয়ী হবার জন্য কৃতিত্বের অনেকটা প্রাপ্য সঞ্জীবের, কারণ সঞ্জীব সেদিন ইস্টবেঙ্গলের পুরোভাগের আক্রমণের ঢেউ প্রতিহত করেছিলেন সাফল্যের সঙ্গে। আর শীল্ডের সেমিফাইন্যালে ইস্টার্ন রেলের রক্ষণভাগে বলতে গেলে একা খেলেছেন সঞ্জীব বসু। প্রায় তিন-চারটি অবধারিত গোলের সুযোগ তিনি কৃতিত্বের সঙ্গে ব্যর্থ করেছেন।

সেমিফাইন্যালে ইস্টবেঙ্গল গুরুকৃপাল সিং এবং নঈমের সাহায্যলাভে বঞ্চিত হয়।

কিন্তু ইস্টবেঙ্গলের প্রতিটি খেলোয়াড় ভাল খেলেছেন এবং দলগত ক্রীড়াধারা উচ্চাঙ্গের হয়েছে বলে গুরুকৃপাল এবং মঈমের অভাব তেমন অনুভব করা যায় নি।

ইস্টার্ন রেল এইদিন আশানুরূপ খেলা দেখাতে পারে নি, তবে প্রথমার্ধে তাদের খেলার যেটুকু জৌলুস ছিল দ্বিতীয়ার্ধে তা অন্তর্হিত হয়। প্রথমার্ধের সতেরো মিনিটের সময় পি মজুমদারের বদলী খেলোয়াড় এন গাঙ্গুলী একটি গোলের সুযোগ লাভ করেন, কিন্তু তাঁর দুর্বল সট অনায়াসেই থঙ্গরাজ প্রতিহত করেন। ছাব্বিশ মিনিটের সময় সীতেশের সট অল্পের জন্য লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়। সাতাশ মিনিটের সময় অতর্কিতে ইস্টার্ন রেল একটি গোল করে বসে। পি কে ব্যানার্জীর কাছ থেকে একটি বল পেয়ে মীরকাশিম কোণাকুণি সটে থঙ্গরাজকে পরাজিত করেন। এই গোলের দু' মিনিট পরে রামবাহাদুর কর্নার সট থেকে একটি হেড করলে অব্যর্থ গোলের রক্ষা করেন সঞ্জীব বসু। তিরিশ মিনিটের সময় যে গোলের সুযোগ শর্মা নষ্ট করেছেন তা' যে কত সহজ সুযোগ সে কথা শর্মাই জানেন! রামবাহাদুরের পাসটিতে ঠিক-ভাবে পা লাগাতে পারলে শর্মাই পরি-শোধমূলক গোলটি দিতে পারতেন। এর পরই রামবাহাদুরের একটি সট সঞ্জীব বসুর গায়ে লেগে বিপথগামী হয়। প্রথমার্ধে ১-০ গোলে অগ্রগামী থাকে ইস্টার্ন রেল।

দ্বিতীয়ার্ধে সমাজপতির পরিবর্তে মাঠে নামেন এস ভট্টাচার্য এবং সেন্টার ফরোয়ার্ডের স্থানে তাঁকে খেলতে দেখা যায়। এই অনভ্যস্ত স্থানে কিন্তু ভট্টা-চার্য নিজেকে বেশ খাপ খাইয়ে নেন এবং তিনি কৃতিত্বের সঙ্গে ইস্টার্ন রেলের গোলে হানা দিতে থাকেন। বলতে গেলে দ্বিতীয়ার্ধের প্রথম কুড়ি মিনিট ইস্টবেঙ্গল একচ্ছত্র প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত করে পরাজয় থেকে জয়ের মুখ দেখেছেন। দ্বিতীয়ার্ধের তিন মিনিটের সময় শর্মার কর্নার কিক থেকে হেড দিয়ে পরিমল দে গোল পরিশোধ করেন। এরপর সতেরো মিনিটের সময় পরিমল দে ইস্টবেঙ্গলের পক্ষে যে জয়সূচক গোলটি করেন তা' সত্যই দর্শনীয়। ইস্টবেঙ্গল ক্লাব একটি ফ্রি কিক পায় এবং গোল থেকে প্রায় চল্লিশ গজ দূরে থেকে বলটি সট করেন পরিমল দে। অত দূরে থেকে বলটি রক্ষণভাগের খেলোয়াড়দের তৈরি বাধার ফাঁক দিয়ে কিভাবে জালের বুকে আশ্রয় পেল তা' বিরাট বিস্ময়ের। দর্শকরাও ক্ষণিকের তরে চমকে গিয়েছিলেন, কিন্তু তাঁদের বাঁধভাঙা উল্লাসে বোঝা গেল গোল হয়েছে এবং ইস্টবেঙ্গল এক গোলে অগ্র-গামী। শেষ পর্যন্ত ২-১ গোলেই ইস্টবেঙ্গল জয়ী হল। ইস্ট-বেঙ্গল-বি এন রেলের ফাইন্যাল খেলাটি ২৭শে সেপ্টেম্বর প্রদর্শনী খেলা হিসাবে অনুষ্ঠিত হচ্ছে আই এফ এ-র টুর্নামেন্ট কমিটির গৃহীত সিদ্ধান্ত অনুযায়ী।

ইস্টবেঙ্গলের চন্দন ব্যানার্জী রেলওয়ে দলের পুরোভাগের খেলোয়াড়ের 'হেড' প্রতিহত করছেন।

প্যাটার্সন-কুপার মুষ্টিযুদ্ধ

প্রাক্তন হেভী ওয়েট মুষ্টিযোদ্ধা এবং বিশ্ব খেতাবের অধিকারী ফ্লয়েড প্যাটার্সন তাঁর খেতাব হারিয়েছিলেন সোনী লিস্টনের কাছে পরাজিত হয়ে। এরপর প্যাটার্সন আর একবার তাঁর খেতাব পুনরুদ্ধারের সুযোগলাভ করে-ছিলেন বর্তমান বিশ্ব চ্যাম্পিয়ান ক্যাসিয়াস ক্লের সঙ্গে লড়াইয়ে অবতীর্ণ হয়ে। কিন্তু প্যাটার্সন ক্লের কাছে পরাজিত হন।

সম্প্রতি লণ্ডনে অনুষ্ঠিত এক মুষ্টিযুদ্ধে ফ্লয়েড প্যাটার্সন বৃটিশ হেভী ওয়েট চ্যাম্পিয়ান হেনরী কুপারকে চতুর্থ রাউণ্ডে নক আউটে পরাজিত করেছেন। মুষ্টিযুদ্ধ মাত্র ২ মিনিট ২০ সেকেণ্ডের মধ্যেই শেষ হয়ে যায়। তৃতীয় রাউণ্ডে প্যাটার্সনের তীব্র ঘুসির আঘাতে রিং-য়ে পড়ে যান কুপার দুবার, কিন্তু তিন গণনার মধ্যেই আবার লড়াই সুরু করেন।

চতুর্থ রাউণ্ডে প্যাটার্সনের বাঁ ও ডান হাতের উপর্যুপরি দুটি প্রচণ্ড ঘুসি এসে পড়ে কুপারের মাথায়। কুপার লুটিয়ে পড়েন রিং-য়ে, রেফারী গণনা করতে থাকেন; নয় গণনার সময় কুপার উঠতে চেষ্টা করেন কিন্তু প্যাটার্সনের আর একটি আঘাতের ফলে কুপার একেবারে ভূতলশায়ী হন। রেফারী নক আউটে প্যাটার্সনকে জয়ী ঘোষণা করেন।

ভারতীয় হকিদলের পরাজয়

গুরুবক্স সিংয়ের নেতৃত্বে একটি ভারতীয় হকিদল বর্তমানে জাপান সফরে ব্যস্ত। সফরের উদ্বোধনী খেলায় ভারতীয় একাদশ ২—০ গোলে হকাইডো একাদশকে পরাজিত করেন। গোল দুটি

সঞ্জীব বসু

ফ্লয়েড প্যাটার্সন

করেন হরিপাল এবং ইন্দার সিং। সফরের দ্বিতীয় খেলায় এবং প্রথম টেস্টে ভারত আশ্চর্যভাবে ৩—২ গোলে পরাজিত হয়। ২—১ গোলে ভারত অগ্রগামী থেকেও শেষ পর্যন্ত পরাজিত হয়। ভারতের পক্ষে প্রথম গোল করেন ইনামুর রহমান এবং ভারতের দ্বিতীয় গোলটি হয় ইনামুর ও হরিপালের প্রচেষ্টায়। সফরের তৃতীয় খেলায় ভারত অল কাণ্টো স্টুডেণ্ট একাদশকে কোনক্রমে ১—০ গোলে পরাজিত করেন। ভারতের পক্ষে জয়-সূচক গোলটি করেন ধরম সিং।

সমাচার দর্পণ

এবারের আন্তঃবিশ্ববিদ্যালয় সন্তরণ প্রতিযোগিতা কলকাতায় অনুষ্ঠিত হবে। এই প্রতিযোগিতা কলকাতায় অনুষ্ঠিত করার প্রস্তাবে আন্তঃবিশ্ববিদ্যালয় স্পোর্টস বোর্ড সম্মতি দিয়েছেন। আজাদ হিন্দ বাগে ছাত্র এবং ছাত্রীদের এই সন্তরণ প্রতিযোগিতা হবে অক্টোবর মাসের ২৬শে, ২৭শে ও ২৮শে তারিখে।

*   *   *

লণ্ডনে অনুষ্ঠিত লণ্ডন ইনডোর প্রফেসনাল টেনিস চ্যাম্পিয়নশীপের প্রতিযোগিতায় রড লেভার তাঁরই স্বদেশ-বাসী অস্ট্রেলিয়ার কেন রোজওয়ালকে পরাজিত করে বিজয়ীর গৌরব অর্জন করেছেন। এবার বিজয়ী হবার ফলে রোজওয়াল উপর্যুপরি তৃতীয়বার এই প্রতিযোগিতায় জয়ী হবার গৌরব অর্জন করলেন। এই প্রতিযোগিতায় জয়ী হবার ফলে লেভার এক হাজার পাউণ্ডের পুরস্কার লাভ করেছেন।

*   *   *

আন্তঃরাজ্য পূর্বাঞ্চল ব্যাডমিণ্টন প্রতিযোগিতা সুরু হচ্ছে এবার কটকে। প্রতিযোগী রাজ্যগুলি হ'ল উড়িষ্যা, পশ্চিমবঙ্গ, বিহার, আসাম এবং উত্তর প্রদেশ। বাংলা দলের অধিনায়কত্ব করবেন এবার হরিপদ গুহ। বাংলার পক্ষে বিভিন্ন বিভাগে প্রতিনিধিত্ব করবেন প্রেম পাইন, বৈদ্যনাথ দাস, সোন্ধী, লক্ষ্মী শীল, শৈবাল হালদার, কাজল সাহা, সুব্রত ব্যানার্জী, অমিতাভ ঘোষ, সুনন্দা দে, অনুরাধা সরকার এবং তুলসী ব্যানার্জী।

সাত-সমুদ্র বিজয়ী

অবশেষে সাত-সমুদ্র জয় করে দেশে ফিরছেন দূরপাল্লার সন্তরণবীর মিহির সেন। এই সফরের তাঁর তৃতীয় ও শেষ অভিযান ছিল বস্ফোরাস প্রণালীকে কেন্দ্র করে। বস্ফোরাস প্রণালীর ১৭ মাইল জলভাগ মিহির সেন অতিক্রম করলেন ঠিক চার ঘণ্টা সময়ের মধ্যে। তুরস্কের নৌ-সেনা বিভাগ এবং ইস্তাম্বুলের সুইমিং এ্যাসোসিয়েশন মিহির সেনের ভূয়সী প্রশংসা করেছেন, তাঁদের মতে সম্পূর্ণ এক প্রতিকূল আবহাওয়ায় ওই বিপদসংকুল সাগর পাড়ি দেওয়ার প্রচেষ্টাই অসীম সাহসের, আর মিহির সব বাধা ভেঙে জয়মাল্য গলায় পরেছেন।

ভারতীয় রাষ্ট্রদূত সাদাৎ আলি খান আংকারা থেকে ইস্তাম্বুলে উপনীত হন তাঁরই স্বদেশের ছেলের এই দুঃসাহসিক প্রচেষ্টা প্রত্যক্ষ করার জন্য। এ ছাড়া আরও উপস্থিত ছিলেন তুরস্কের এবং সুইডেনের কয়েকজন সন্তরণ বিশেষজ্ঞ। মিহির সেন কৃষ্ণ সাগরে অবতরণ করে যখন তাঁর সাঁতার সুরু করেন আবহাওয়ার অবস্থা বেশ খারাপই ছিল। উঁচু ঢেউ, প্রবল স্রোত এবং হিমশীতল জলে বলতে গেলে যুদ্ধ করেই একটু একটু করে অগ্রসর হতে হয়েছে মিহির সেনকে। কয়েকটি সন্তরণ সংস্থা এবং সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধিগণ সন্তরণের পর মিহির সেনকে অভিনন্দন জানান। ভারতের রাষ্ট্রপতি শ্রীরাধাকৃষ্ণণ মিহির সেনকে এক অভিনন্দনবাণী প্রেরণ করেন।

মর্মর সাগরে সন্তরণ শেষ করার পর মিহির সেন বলেন যে, ইতিহাসে তিনিই একমাত্র লোক যিনি সাতটি সমুদ্র জয় করার কৃতিত্ব অর্জন করলেন।- ৩৬ বৎসর বয়স্ক ব্যারিস্টার মিহির সেন আরও বলেন যে, এই তাঁর শেষ দূরপাল্লার সন্তরণ। তাঁর মতে তিনি জলে প্রায় ছ' হাজার মাইল সাঁতার দিয়েছেন আজ পর্যন্ত।

১৯৫৮ সালে মিহির সেন অতিক্রম করেছেন ইংলিশ প্রণালী। ১৯৬৬ সালের এপ্রিল মাসে বিপদসংকুল পক প্রণালী সাফল্যের সঙ্গে অতিক্রম করলেন তিনি। এর পর তিনি বেরিয়েছিলেন আরও তিনটি প্রণালী জয়ের প্রয়াসে। এবং প্রথম প্রচেষ্টাতেই তিনি তাঁর অভিযান সাফল্যমণ্ডিত করতে পেরেছেন। গত মাসে মিহির সেন স্পেন এবং মরক্কোর মধ্যে অবস্থিত জিব্রাল্টার প্রণালী অতিক্রম করে তাঁর যাত্রা সুরু করলেন। এর পরে ৩৭ মাইল দার্দানেলেস প্রণালী অতিক্রম করলেন তিনি।

লোকে বলে যে ছোটবেলাতেই আভাস পাওয়া যায় যে কোন্ ছেলে বড় হয়ে প্রসিদ্ধি অর্জন করবে। কিন্তু মিহির সেনের ক্ষেত্রে কথাটি ঠিক ফলে না। এতগুলি সাগর-জয়ী মিহির সেন কিন্তু ছোটবেলায় ভাল সাঁতারু হওয়া তো দূরের কথা, সাঁতারই জানতেন না। তবে একথা ঠিক যে ছোটবেলা থেকেই তিনি ছিলেন ডানপিটে; অজানাকে জানা, আর দুর্গমকে জয় করার দিকে ছিল তাঁর লক্ষ্য। ইংলণ্ডে ব্যারিস্টারী অধ্যয়নের সময় তাঁর ইচ্ছা হল ইংলিশ চ্যানেল জয় করব। সাঁতার নিয়ে তিনি উঠে পড়ে লাগলেন। ইংলিশ চ্যানেল অতিক্রম করার প্রচেষ্টায় পর পর পাঁচবার তিনি ব্যর্থ হলেন। এই ব্যর্থতাই তাঁকে এনে দিল দৃঢ়তা, অবশেষে ষষ্ঠবারের প্রচেষ্টায় প্রথম ভারতীয় হিসাবে মিহির সেন অতিক্রম করলেন ইংলিশ চ্যানেল।

বস্ফোরাস প্রণালী অতিক্রমের পূর্বে প্রস্তুত হচ্ছেন মিহির সেন

—সমর পালচৌধুরী

সম্পাদিকা—জয়ন্তী সেন
বসুমতী (প্রাঃ) লিঃ-এর পক্ষে ১৬৬, বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী স্ট্রীটস্থ কলিকাতা-১২
বসুমতী প্রেস হইতে শ্রীসুকুমার গুহমজুমদার কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

বসুমতী

গণ-ছুটির বেতন কাটার প্রতিবাদে রাজ্য সরকারী কর্মচারীদের বিক্ষোভ

বর্ষ ঃ ১৮শ সংখ্যা, বৃহস্পতিবার, ১৯শে আশ্বিন, ১৩৭৩ বঙ্গাব্দ * • * 6th Oct., 1966 * Vol.

সূচীপত্র

বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা
সম্পাদকীয় ...		১০৯১
আজকের মানুষ		১০৯২
বিহার ভূমিকম্প ঃ গান্ধী-রবীন্দ্রনাথ বিতর্ক (প্রবন্ধ)	— নেপাল মজুমদার	১০৯৩
প্রত্যক্ষ (কবিতা) ...	— গোবিন্দ চক্রবর্তী	১০৯৯

সিল্ক ও তাঁত বস্ত্র
ছিট কাপড়

শৈললাল মনিলাল
বহুবাজার
ফোন ৩৪-২১২৬
শ্যামবাজার
ট্রামডিপোর দক্ষিণে

বিছানা
শাল ও আলোয়ান

কলিকাতার ভূতপূর্ব মেয়র—প্রসিদ্ধ আইনবিদ
শ্রীসনৎকুমার রায়চৌধুরী প্রণীত

হিন্দুধর্ম্ম পরিচয়

দ্বিতীয় সংস্করণ—মূল্য দেড় টাকা

বাংলার বিদ্যালয়গুলিতে হিন্দু সংস্কৃতি প্রতিষ্ঠা যেদিন লুপ্ত হইল, সেইদিন হইতে হিন্দুর ব্যক্তিগত, পারিবারিক ও সামাজিক জীবনের ভিত্তি নষ্ট হইয়া গেল। তাহারই সুযোগ লইয়া আমাদের গৃহসমাজ ধ্বংস করিয়াছে য়ুনানী সভ্যতা। বাংলার অন্যতম শ্রেষ্ঠ হিন্দু নায়ক বাংলার বালগোপালদের কচি করকমলে যে পবিত্র নৈবেদ্য তুলিয়া ধরিয়াছেন, তাহাতে জাতি কৃতার্থ হইয়াছে।

প্রতি বিদ্যালয়ে এই গ্রন্থ অবশ্যপাঠ্য হওয়া উচিত।

কয়েকটি বিশিষ্ট অভিমত—

বিহারের প্রাক্তন প্রদেশপাল শ্রীমাধব শ্রীহরি ইনি লিখিয়াছেন—

"...চমৎকার বই। ঋষিদের প্রচারিত হিন্দুধর্ম সম্বন্ধে স্পষ্ট ধারণা হবে বইখানি পড়লে। প্রত্যেক কিশোর ও কিশোরীদের হাতে এই রকমের একখানি করে বই শোভা পাক, এ আমার বড় ইচ্ছে।"

সুবিখ্যাত মাসিক পত্রিকা 'প্রবাসী'র অভিমত—

"স্বধর্মের মূল ও সার কথার সঙ্গে পরিচিত না হওয়ায় সন্তান-সন্ততিগণ ক্রমে বিভ্রান্ত ও আদর্শভ্রষ্ট হইয়া উঠে। ইহার ফল ইদানীং আমরা বিশেষভাবে প্রত্যক্ষ করিতেছি। এ সময় এইরূপ একখানি পুস্তকের প্রয়োজনীয়তা আছে।"

কিশোর-সাহিত্যের অভিনব আকর্ষণ

হেমেন্দ্র রায়ের গ্রন্থাবলী

শ্রীহেমেন্দ্রকুমার রায় প্রণীত

যাঁহার চাঞ্চল্যকর কাহিনীগুলি পাঠ করিয়া বাংলার কিশোর-কিশোরীরা আতঙ্কে, বিস্ময়ে ও কৌতূহলে হতবাক হয়, আমরা বাংলার সেই প্রখ্যাত প্রবীণ কথাশিল্পী শ্রীহেমেন্দ্রকুমার রায়ের শ্রেষ্ঠ রচনাগুলি চয়ন করিয়া এই গ্রন্থাবলী প্রকাশ করিলাম।

—গ্রন্থাবলীতে আছে—

১। যকের ধন, ২। প্রদীপ ও অন্ধকার, ৩। রহস্যের আলোছায়া, ৪। ক্ষুদিরামের কীর্তি, ৫। যেসা দেওগে তেসা পাওগে, ৬। বুড়োর খামখেয়ালী, ৭। গোয়েন্দা কাহিনীর সঞ্চয়ন—চাবি ও খিল, একরাত্তি মাটি, চোরাই বাড়ি, ছেলেবেলার একদিন ও বন-বাদাড়ে। ৮। ভৌতিক কাহিনী সঞ্চয়ন—এব রাতের ইতিহাস, কঙ্কাল সারথি, বিজয়ার প্রণাম, কাণকাটা হচি, শয়তান, ভেলকির হুমকী, ভূতের রাজা, শয়তানী জায়া ৯। নতুন বাংলার প্রথম কবি, ১০। জগন্নাথদেবের গুপ্তকথা ১১। হলিউডের টাকার পাহাড়।

মূল্য তিন টাকা।

বসুমতী প্রাইভেট লিমিটেডঃ ১৬৬, বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী স্ট্রীট, কলি-১২

সূচীপত্র

বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা
ভারতদর্শন		১১০০
আন্তর্জাতিক		১১০৫
সুবর্ণলতা (ধারাবাহিক উপন্যাস)	— আশাপূর্ণা দেবী	১১০৮
অগ্নিযুগের একটি অধ্যায়	— অনন্ত সিংহ	১১১০
বঙ্গদর্শন		১১১৭
শিশুসাহিত্যের আদিপর্ব	— ডঃ নরেন ভট্টাচার্য	১১২১
নীগ্রোদের বাঘ (অনুবাদ-গল্প)	— হরিপ্রসন্ন চক্রবর্তী	১১২৪
এইচ, জি ওয়েলস্-এর গল্প	— বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য	১১২৭
বেদব্যাস-এর রস-রচনা ঃ অদ্ভুতসমান		১১৩৩
লিফট্ (গল্প)	— ত্রিশঙ্কু	১১৩৬
রঙ্গমঞ্চ—ওদেশে এবং এদেশে	— শিলাদিত্য	১১৩৯
গ্রন্থমেলা	— জয়ন্তী সেন	১১৪১
রঙ্গজগৎ		১১৪২
পাঠকমন		১১৪৭
খেলাধূলা	— শ্রীঅমিতাভ	১১৪৯

ডক্টর পঞ্চানন ঘোষাল এম, এস, সি প্রণীত

আমার দেখা মেয়েরা

(রহস্য রোমাঞ্চের স্বর্ণখনি)

'রক্তনদীর ধারা', 'অপরাধ বিজ্ঞান' ও 'বিখ্যাত বিচার কাহিনী' নামক সুপ্রসিদ্ধ গ্রন্থগুলির লেখকের সত্যঘটনামূলক বিভিন্ন ও বিচিত্র নারী-চরিত্রের রহস্য উদ্ঘাটন ও যথাযথ রূপদান। মেয়েদের মন আর মতি স্বয়ং দেবা ন জানন্তি। অভিজ্ঞ ও দক্ষ লেখকের রচনার বৈশিষ্ট্যে বাংলা দেশের নারী-সমাজের এক অজানা অংশ সাধারণের চোখে সুস্পষ্ট প্রতিভাত হয়েছে। পড়তে পড়তে বই শেষ না করে ওঠা যায় না। বইয়ের আদ্যোপান্ত রুদ্ধশ্বাস উদ্বেগ ও অনিশ্চয়তা। উপন্যাসের চেয়েও সুখপাঠ্য।

মূল্য চার টাকা

মাইকেল মধুসূদন দত্তের

মাইকেল গ্রন্থাবলী

প্রথম ভাগ ঃ—মেঘনাদবধ কাব্য, বীরাঙ্গনা কাব্য, পদ্মাবতী নাটক, বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রোঁ, একেই কি বলে সভ্যতা? —তিন টাকা।

দ্বিতীয় ভাগ ঃ—কৃষ্ণকুমারী নাটক, শর্মিষ্ঠা নাটক তিলোত্তমা-সম্ভব কাব্য, ব্রজাঙ্গনা কাব্য, চতুর্দশপদী কবিতাবলী, বিবিধ কাব্য, মায়া কানন, হেকটর বধ। —দুই টাকা।

উপন্যাস-সাম্রাজ্যের রত্নমুকুট,—সেই সর্বজনপ্রমোদন—অমর-কীর্তি ঔপন্যাসিক—লব্ধপ্রতিষ্ঠ নাট্যকার—শক্তিমান রস-শিল্পী 'ভারতী' সম্পাদক শ্রীযুক্ত সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়ের—

সৌরীন্দ্র গ্রন্থাবলী

৫ম ভাগে ঃ—বাদলা, মমতা, নির্ঝর, অতঃপর, পরদেশী সুরা, যবনিকার অন্তরালে, লেখার গলদ, পারিবারিক উপন্যাস, প্রগতি, অনাগত যুগ, আদর্শ এডিটোরিয়াল, আদর্শ সমালোচনা, সম্পাদকের দপ্তর, সংবাদপত্রের দৌলতে, মোটরে কাশ্মীর, এক যাত্রায়, কুলকাঁটা, দুঃখীরাম, পান-সুপারি। মাত্র ১৷৷৹ টাকায়।

ডঃ মতিলাল দাশ প্রণীত

মতিলাল গ্রন্থাবলী

মূল্য—দুই টাকা

-ইহাতে আছে-

১। চলার পথে (উপন্যাস)
২। মনীষা (উপন্যাস)
৩। বিদ্যুৎশিখা (১১ খানি গল্প সমষ্টি)
৪। দীপশিখা (কবিতা সঙ্কলন)
৫। চার্বাক (নাটক)

বসুমতী প্রাইভেট লিমিটেড: ১৬৬, বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী স্ট্রীট, কলি-১২

৭১ বর্ষ ঃ ১৮শ সংখ্যা—মূল্য ২৫ পয়সা
বৃহস্পতিবার, ১৯শে আশ্বিন, ১৩৭৩ বঙ্গাব্দ

বাংলা ভাষায় দ্বিতীয় সর্বাধিক প্রচারিত
সাপ্তাহিক পত্রিকা

Price : 25 Paise
Thursday, 6th Oct., 1966

শিক্ষা গেল! শিক্ষা গেল!!

তিন সপ্তাহের অধিক পশ্চিমবঙ্গের মাধ্যমিক বিদ্যালয়গুলির ৬৫ হাজার শিক্ষক-শিক্ষিকা ও অশিক্ষক কর্মচারী কর্মবিরতি পালন করছেন। তাঁদের দাবি-দাওয়া সম্বন্ধে ইতোপূর্বে আমরা আলোচনা করেছি। তাঁদের দাবির মধ্যে 'আকাশের চাঁদ' জাতীয় কিছুই নেই। তাঁরা চেয়েছেন যে, কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক প্রায় সাত লক্ষ টাকা ব্যয়ে যে শিক্ষা কমিশন বসানো হয়েছিল, সেই কমিশনের সুপারিশ কার্যকর করা হোক। সংবাদ-পত্রে যখন এই কমিশন কর্তৃক শিক্ষকদের বেতনের সম্ভাব্য হার প্রকাশিত হয়েছিল, তখন সাধারণের মধ্যে ধারণা হয়েছিল যে, সেই বেতন শিক্ষকরাই পাচ্ছেন। বস্তুত সেই বেতন কার্যকর করার প্রতিশ্রুতি সরকার দিলেও, রাজ্য সরকার কাজের কাজ কিছু করতে পারেন নি।

সরকারী সাহায্যপ্রাপ্ত বিদ্যালয়-গুলির আর্থিক অবস্থাও শোচনীয়। উক্ত বিদ্যালয়গুলিতে ছিটেফোঁটা সরকারী সাহায্যও নিয়মিতভাবে বা নির্দিষ্ট সময়ে পৌঁছায় না। স্বভাবতই শিক্ষকদের বেতন শতকরা প্রায় ৯০টি সরকারী সাহায্যপ্রাপ্ত বিদ্যালয়ে পাঁচ মাস বাকি থাকে। আবার পশ্চিমবঙ্গের মোট বিদ্যালয়ের শতকরা ৪০টি সাহায্যবিহীন বিদ্যালয়ের শিক্ষক-শিক্ষিকাদের অবস্থা আরো শোচনীয়। সেখানে নির্দিষ্টীকৃত বেতন কখনোই শিক্ষকদের হাতে পৌঁছায় না। অতি সামান্য যে বেতন তাঁরা সেখানে পান তা দ্বারা জাতিগঠন সম্ভব হয় না, যা হয় তা জাতিগঠনের প্রহসন।

এই আর্থিক দুরবস্থার মধ্যে শিক্ষকরা যখন দেখলেন, রাজ্য সরকার নীরব নির্বিকার, তখন তাঁরা বাধ্য হয়েই রাজপথে অবস্থান শুরু করলেন; এবং শিক্ষকরা এখন একমুঠো ক্ষুধার অন্নের জন্যে ২৬শে সেপ্টেম্বর থেকে প্রতিদিন কারাবরণ করছেন। সবচেয়ে দুর্ভাগ্যের ব্যাপার এই যে, সরকার এঁদের কারাগারের দ্বারে নিয়ে যেতে এতটুকু দ্বিধা প্রকাশ করলেন না, লজ্জিত হলেন না;—বিশেষত পারস্পরিক আলোচনার দ্বার যেখানে খোলাই ছিল। তাছাড়া নিখিল বঙ্গ শিক্ষক সমিতির সম্পাদিকা যখন বলে-ছিলেন যে, তথাকথিত বৃদ্ধিপ্রাপ্ত বেতন সম্পর্কে রাজ্য শিক্ষামন্ত্রী তাঁদের সঙ্গে আলোচনা করেছেন বলে জানালেও তা করা হয় নি, তখন সদিচ্ছা থাকলে পশ্চিম-বঙ্গ সরকার অবশ্যই এগিয়ে আসতে পারতেন। দুঃখের ব্যাপার, পশ্চিমবঙ্গ সরকার অবশ্যই তা তো করলেন না, উল্টো বরং তাঁরা বিবৃতিতে কিংবা মিটিংয়ে এমন কিছু কথা বললেন যা নিতান্ত উস্কানিমূলক।

কিন্তু আমাদের প্রশ্ন, বেতন বাড়ানো সম্ভব নয় কেন? শিক্ষক প্রতিনিধিরা যে কোঠারী কমিশন কার্যকর করার জন্যে আবেদন-নিবেদন করছেন—সে সম্বন্ধে আমাদের সরকার চুপই বা কেন? আর অত টাকা খরচ করে কোঠারী কমিশন যখন বসানো হল—তা কি শিক্ষাক্ষেত্রে প্রহসন সৃষ্টির জন্যে?

শিক্ষকদের বেতনবৃদ্ধি ছাড়া শিক্ষার অগ্রগতি সম্ভব নয় এবং প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষকদের বেতনের হার অত্যন্ত কম বলে পরিকল্পনা কমিশনের শিক্ষা প্যানেলের সর্বসম্মত অভিমত ২৮শে সেপ্টেম্বর প্রকাশিত হয়েছে। অতএব শিক্ষকদের দাবি যে অন্যায় নয়, উপর্যুক্ত অভিমতই তার প্রমাণ। অথচ পশ্চিমবঙ্গ সরকার শিক্ষার ক্ষেত্রটিকে নিষ্প্রয়োজনের তালিকায় সীমাবদ্ধ রেখে, শিক্ষার ক্ষেত্রে বরাদ্দ অর্থ নামমাত্র রেখে সেখানে গণ্ডগোল পাকাবার চেষ্টা করছেন।

রাজ্য সরকার বেতন বৃদ্ধি করতে অস্বীকৃত হয়ে এখন এমন এক পথে অভিভাবক ও ছাত্রদের প্ররোচিত করছেন, যা শিক্ষার ক্ষেত্রে অরাজকতার সৃষ্টি করবে। শিক্ষকদের কর্মবিরতির দরুণ ছাত্রদের ক্ষতি হচ্ছে না—একথা কেউ অস্বীকার করবে না। তবে ছাত্রদের জন্য এই দরদ এতদিন কোথায় ছিল? সরকার যখন সামান্য ছুতোয় বিদ্যালয় বন্ধ রাখেন তখনই বা তাহলে ছাত্ররা বেতন দেবে কেন? দ্বিতীয়ত, আজ যাঁরা "শিক্ষা গেল" বলে কুম্ভীরাশ্রু ফেলছেন—এত-দিন তাঁরা কোথায় ছিলেন? বছর বছর অনুত্তীর্ণ ছাত্রদের তালিকার উল্লেখ করে জাতীয় ক্ষতি সম্বন্ধে আমরা বার বার সরকার, অভিভাবক ও শিক্ষাবিদ্‌দের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছি ও সমস্যা সমাধানের জন্য আহ্বান জানিয়েছি। আশ্চর্যের ব্যাপার, তখন কারো কোনো সাড়া মেলে নি। আর এখন শিক্ষকদের ন্যায্য দাবিকে পদ-দলিত করার জন্য বিদ্যালয়ে অনুদান বন্ধ করে যেন ছাত্রদের ডাণ্ডা নিয়ে এগিয়ে আসার জন্য অলিখিত উস্কানি দিচ্ছেন! আর্থিক সঙ্কটাপন্ন ছাত্র ও অভিভাবকদের সেই পথে উস্কানি দিলেও তা কার্যকর হবে না বলেই মনে করি।

রাজ্য সরকার সত্যিকারের এখনো যদি কিছু করার মতো ইচ্ছা পোষণ করেন, তা হলে অনতিবিলম্বে শিক্ষকদের দাবি-গুলি মেনে নেওয়া উচিত। সে পথেই শিক্ষার ক্ষেত্রে যে সঙ্কট নেমে এসেছে, তা দূরীভূত হবে।

সম্পাদকীয়

আজকের মানুষ

আন্তরিকতা বা নিষ্ঠা সব সময়েই পুরস্কৃত হয় না, সাফল্য দিয়ে কি প্রতি কাজের বিচার করা চলে? কিন্তু তাই বলে মানুষ কাজের প্রতি, তার দায়িত্বের প্রতি সচেতন হবে না কেন, কেন কর্তব্যের প্রতি যত্নবান হবে না? ব্যর্থতা কখনই আন্তরিকতাকে ঢেকে রাখতে পারে না। অসাধ্য যে সাধন করে তাকে বাহবা দেওয়াই রীতি, কিন্তু অসাধ্য সাধনের ব্রত যে নিয়েছে, বিফল হলেও তার মূল্য কিছুই হ্রাস পায় না। বোডেন-মিশন হয়তো আকাঙ্ক্ষিত ফল লাভে ব্যর্থ হয়েছে, কিন্তু সে-ব্যর্থতার দায় বোডেনের ওপর চাপানো অবিচার।

রোডেশিয়ার ক্ষিপ্ত হস্তীকে বাগ মানানোর দায়িত্ব চাপানো হয়েছিল বোডেনের ওপর, সম্প্রতি যিনি বৃটেনের কমনওয়েলথ সেক্রেটারীর পদে উন্নীত হয়েছেন। কিন্তু শূন্য হাতেই তাঁকে ফিরতে হয়েছে, রোডেশিয়ার উদ্ধত প্রধানমন্ত্রী মিঃ আয়ান স্মিথ টোপ গিলতে রাজী হন নি। কিন্তু সে-টোপ কি বোডেনের ব্যক্তিগত কিছু, ছিপটাই যা ওঁর হাতে ছিল, টোপ গেঁথে দিয়েছিলেন প্রধানমন্ত্রী হ্যারল্ড উইলসন।

বরং মিঃ উইলসন স্বীকৃতি দিয়েছিলেন বোডেনের পূর্ব-খ্যাতিকে, বিরোধী পক্ষকে দিয়ে আত্মপক্ষের যুক্তি শানিয়ে নিতে; পোষ মানাতে মিঃ বোডেন যে সিদ্ধহস্ত। কম শ্রম-বিরোধের মীমাংসা হয়েছে তাঁর হাত দিয়ে? শ্রমিক আন্দোলন করে আসছেন বোডেন গত প্রায় চল্লিশ বছর ধরে, শ্রমিকদের নেতার আসনেই তাঁর অধিকার, কিন্তু তাই বলে যুক্তিকে উপেক্ষা করতে পারেন নি। তিনি কখনই নিছক শ্রমিকস্বার্থ রক্ষা করতে গিয়ে, জাতির স্বার্থকেই বড় করে দেখে এসেছেন বরাবরই।

উইলসন ক্যাবিনেটে একটি গুরুত্বপূর্ণ আসন লাভ করেছেন বোডেন, কিন্তু সে পদ তাঁর পড়ে-পাওয়া নয়, সম্পূর্ণত করে-পাওয়া। এর নেপথ্য-কাহিনী অবিরাম সংগ্রাম ও ধৈর্যের, এবং অবিচল নিষ্ঠা ও আত্মবিশ্বাসের। শ্রমিকদের মধ্যেই তাঁর রাজনীতির প্রথম পাঠ নেন, আজো তিনি নিজেকে শ্রমিকদেরই মুখপাত্র মনে করেন।

রক্ষণশীল সরকারের মালিক-তোষণ নীতির বিরুদ্ধে বোডেনকে লড়তে হয়েছে, নামতে হয়েছে শ্রমিক-সংগঠনের কাজে। তীক্ষ্ণ বুদ্ধি, ক্ষুরধার যুক্তি সর্বোপরি অমায়িক ব্যবহারই বোডেনের রাজনৈতিক জীবনের পুঁজি, বিরুদ্ধ মতাবলম্বীকেও স্বদলে টেনে আনতে তিনি ওস্তাদ। কিন্তু শক্তিশালী রক্ষণশীল সরকার ও দলের সঙ্গে যুঝতে হলে এক বোডেনে যে কাজ হবে না এটা শ্রমিক দল বুঝতে পেরেছিল, তাই তাঁকে দেওয়া হলো প্রচার-সংগঠকের কাজ, শত শত বোডেন তৈরির কঠোর দায়িত্ব। মহল্লায় মহল্লায়, কাউন্টিতে-কাউন্টিতে বোডেন প্রচার করে বেড়াতে লাগলেন: শ্রমিকদের ন্যায্য ও গণতান্ত্রিক অধিকার প্রতিষ্ঠা করতে হবে।

—ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনে যোগদান করে বোডেন শুধু শ্রমিকদের স্বার্থের কথাই বললেন না, তাদের দায়িত্বের কথাও স্মরণ করিয়ে দিলেন, জাতীয় উৎপাদন ব্যাহত করে শ্রমিকদের স্বার্থরক্ষা স্বার্থ-

বোডেন

পরতা—একথা বোঝাতে লাগলেন। বোডেনের প্রচারকৌশল, তাঁর বাচনভঙ্গী ও যুক্তিবহ থিয়োরী শীগ্গিরই তাঁকে এনে দিল লেকচারারের কাজ। বিভিন্ন শ্রমিক-কলেজে তিনি বক্তৃতা দিয়ে বেড়ালেন চার বছর ধরে, ১৯২৯ থেকে ১৯৩৩ সাল পর্যন্ত।

১৯৩৩ সনে তিনি নিজেকে খানিকটা গুটিয়ে আনলেন, ছড়ানো অস্তিত্বকে কেন্দ্রীভূত করলেন। লিচেস্টার পৌর-রাজনীতিতে ঝাঁপিয়ে পড়লেন তিনি, একাত্ম হয়ে গেলেন এখানকার গণজীবনের সঙ্গে। কিন্তু এক যুগ তো হলো, আর কতকাল ওই ক্ষুদ্র গণ্ডীর মধ্যে নিজেকে আবদ্ধ করে রাখা যায়, স্বল্পপরিসর লিচেস্টার তাঁর কর্মযজ্ঞের-ক্ষেত্র হতে পারে না, তার জন্যে চাই জাতীয় রাজনীতির রঙ্গমঞ্চ।

সে সুযোগ প্রথম এলো ১৯৪৫ সালেই, সেই যেবার সাধারণ নির্বাচনে শ্রমিক দলের জয়জয়কার হয়েছিল। পার্লামেন্টের সদস্য নির্বাচিত হলেন বোডেন, বয়স তখন তাঁর কত হবে? গোটা চল্লিশ, পশ্চিমী দেশে যাকে তরুণের দলে ফেলা হয়। কিন্তু কেবল হাততোলা সদস্যের ভূমিকা পালনের জন্যে বোডেনের কী দরকার, বোডেনই কি ওই ধাতুতে তৈরি? দু' বছরের মধ্যে তিনি শ্রমিক দলের অন্যতম পার্লামেন্টারী সেক্রেটারী হলেন। এ পদে থেকে তিনি শুধু অভিজ্ঞতাই সঞ্চয় করলেন না, প্রত্যেক এম পি-র সঙ্গে ব্যক্তিগতভাবে পরিচিত হবার ফলে প্রত্যেকের সুবিধে-অসুবিধের সঙ্গেও পরিচিত হলেন। এ প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতাই আর দু' বছরের মধ্যে ১৯৪৯ সালে তাঁকে এনে দিল একটি দায়িত্বপূর্ণ কাজ, সে কাজ পার্লামেন্টারী দলের সহকারী হুইপের।

কিন্তু বোডেনকে পুরোদস্তুর কুলীন হতে আরো এক বছর অপেক্ষা করতে হলো। ট্রেজারীর লর্ড কমিশনার এবং সরকার দলের হুইপ হয়েছিলেন তিনি ১৯৫০ সালে। পার্লামেন্টারী দলের শৃঙ্খলা ও নিয়মানুবর্তিতা রক্ষা করার যে দায়িত্ব তিনি সরকারী দলের হয়ে করেছিলেন, পরবর্তী নির্বাচনে পরাজিত হবার পর শ্রমিক দল যখন বিরোধী দলে পরিণত হলো, তখনো দলের সে দায়িত্ব তাঁর ওপর অর্পিত হয়েছিল, ডেপুটি চীফ হুইপের। এবং পরে চীফ হুইপের দায়িত্ব।

এ মূল্যবান অভিজ্ঞতা বোডেনের পরবর্তী জীবনেরও পাথেয় হয়েছিল। ব্রিটেনের রাজনৈতিক রঙ্গমঞ্চে আবার দৃশ্যান্তর ঘটলো, শ্রমিক দল সরকার গঠন করলো। মিঃ উইলসনের মন্ত্রিসভার তিনিই হলেন কমন্সের দলনেতা এবং পরে কাউন্সিলের লর্ড প্রেসিডেন্ট। কিন্তু মিঃ বোডেন তো 'শো বয়' নন যে তাঁকে কাচের আলমারীতে সাজিয়ে রাখা হবে, কাজের লোককে কাজ দিয়ে সম্মান করতে হয়। মিঃ উইলসন তাঁর ক্যাবিনেটে রদবদল করলেন, আর তাতে মিঃ ব্রাউনের সঙ্গে লাভবান হয়েছেন মিঃ বোডেনও, গুরুত্বপূর্ণ দপ্তর তিনি এবারই পেলেন: সেক্রেটারী অফ স্টেট ফর কমনওয়েলথ।

বোডেনের লোক-বোঝানোর ক্ষমতা ও কৌশলই মিঃ উইলসনকে অনুপ্রাণিত করেছে তাঁকে রোডেশিয়া পাঠাতে। মিঃ আয়ান স্মিথকে বোঝানোয় যদি তিনি ব্যর্থ হয়ে থাকেন, তো সে দায়িত্ব তাঁর একার নয়, রোডেশিয়া প্রসঙ্গে মিঃ উইলসনেরই ভ্রান্ত নীতির অপ্রতিরোধ্য পরিণাম এটা। এ-বাবদে অন্তত বোডেনের হতাশ হবার কিছু নেই, কারণ এ ফলশ্রুতির জন্যে সকলেই প্রস্তুত ছিলেন।

বিহার ভূমিকম্প: গান্ধী-রবীন্দ্রনাথ বিতর্ক

নেপাল মজুমদার

১৯৩৪ সালের ১৫ই জানুয়ারি অপরাহ্ণে উত্তর বিহার ও নেপালের সন্নিহিত এলাকায় এক প্রচণ্ড ও ভয়াবহ ভূমিকম্প হয়। স্মরণকালের মধ্যে দেশে এতবড় ভূমিকম্প আর হয় নি। কয়েক মিনিটের মধ্যেই হাজার হাজার ঘর-বাড়ি ধূলিসাৎ হয়ে মাটির নিচে চাপা পড়ল। মাটির তলদেশ থেকে গরম জল আর বালুকারাশি উৎক্ষিপ্ত হয়ে শস্যক্ষেত্র ঢেকে ফেলে। এর ফলে আনুমানিক প্রায় ১০ লক্ষ বিঘার মত শস্যপূর্ণ ক্ষেত বালি চাপা পড়ে। সরকারী হিসাব মতে এই ভূমিকম্পের ফলে প্রায় ৩০,০০০ বর্গমাইল এলাকা জুড়ে প্রায় দেড় কোটি মানুষ ক্ষতিগ্রস্ত হয়। আনুমানিক প্রায় ২০,০০০ মানুষ প্রাণ হারায় তাছাড়া ছাগল, ভেড়া ও গবাদি পশু কত যে নষ্ট হল, তার আর ইয়ত্তা নেই। ভূমিকম্পের পর সব চেয়ে মুস্কিল হল, খাদ্য, বস্ত্র এবং সেই সংগে পানীয় জল সমস্যা। কেন না, এর ফলে ৬৫,০০০-এর মত কূপ, ইঁদারা ও পুকুর নষ্ট হয়ে গিয়েছিল। অবশ্য এইসব ক্ষয়-ক্ষতির বিবরণ ঘটনার বেশ কয়েকদিন পরে আস্তে আস্তে প্রকাশিত হতে থাকে। আরও মারাত্মক বিষয় হল, দুর্গতদের ত্রাণকার্য ও উপযুক্ত সাহায্য প্রেরণের জন্য সরকার পক্ষ থেকে বিশেষ কোনো তৎপরতা দেখা গেল না। স্মরণ রাখা দরকার, আইন অমান্য আন্দোলন উপলক্ষে দেশের অধিকাংশ নেতা ও কর্মীরা তখন কারাগারে অথবা অন্তরীণাবদ্ধ।

ঘটনার তিন দিন পর যখন এই ভয়াবহ ধ্বংসলীলা ও ক্ষয়-ক্ষতির বিবরণ প্রকাশ হতে থাকে তখন গভর্নমেণ্ট রাজেন্দ্রপ্রসাদকে মুক্তি দিলেন (১৭ই জানুয়ারি)। মুক্তি পাওয়ার প্রায় সংগে সংগে তিনি দুর্গত এলাকায় উদ্ধার ও সেবাকার্যের জন্য ছুটলেন। এর দু'দিন পরে তিনি গান্ধীজীকে এক তারবার্তায় পরিস্থিতির শোচনীয়তা ও ভয়াবহতার কথা উল্লেখ করে অবিলম্বে দুর্গতদের সাহায্যের জন্য আবেদন জানালেন। তাছাড়া এক প্রেস-বিবৃতিতে দেশবাসীর উদ্দেশেও অনুরূপ মর্মে আবেদন জানালেন। জওহরলাল কিছুদিন পূর্বে ছাড়া পেয়েছিলেন, তিনিও সেবাকার্যের জন্য ছুটলেন সেখানে।

রবীন্দ্রনাথ তখন শান্তিনিকেতনে। এই সংবাদে তাঁর মানসিক প্রতিক্রিয়া কী হয়েছিল তা বলাই বাহুল্য। ২৩শে জানুয়ারি তিনি শান্তিনিকেতন থেকে এ্যাসোসিয়েটেড্ প্রেসের মাধ্যমে দুর্গতদের অবিলম্বে সাহায্য প্রেরণের জন্য দেশবাসীর উদ্দেশে আবেদন জানালেন। আবেদনটি ছিল এই ঃ

"I appeal to my countrymen and women in the name of humanity and all that is best in us to come forward and give all they can for the succour of the stricken people.

"The vast nature of the calamity has already evoked much sympathy abroad and I appeal to the humanitarians and numerous friends of India in other parts of the world to come to our rescue. For it is a calamity which transcends geographical limits and makes its appeal to the Universal man."

[*Liberty*.—24th January 1934.]

গান্ধীজী তখন 'হরিজন আন্দোলন'-এ দক্ষিণ ভারত পরিক্রমা করছিলেন। রাজেন্দ্রপ্রসাদের তার পেয়ে মর্মান্তিক দুঃখে তাঁর হৃদয় ভেঙে পড়বার উপক্রম হয়। ২৪শে জানুয়ারি তিনিও তিনেভেলি-তে এক জনসভায় বিহার দুর্গতদের অকাতরে সাহায্য করবার জন্য দেশবাসীর কাছে এক করুণ আবেদন জানালেন। কিন্তু এই ভূমিকম্পের কার্যকারণ সম্পর্কে তিনি এমন কিছু মন্তব্য করলেন যার ফলে দেশে খুবই 'হৈ-চৈ' ও তর্ক-বিতর্ক চলতে থাকে। তিনি বললেন, অস্পৃশ্যতা-অপরাধের ও পাপের জন্যই ঈশ্বরের এই রুদ্র রোষ আমাদের 'পরে নেমে এসেছে।

.."We who have faith in God must cherish the belief that behind even this indescribable calamity there is a divine purpose that works for the good of humanity. You may call me superstitious if you like. A man like me cannot but believe, that this earthquake is a divine chastisement sent by God for our sins. ....It is my unmistakable belief that not a blade of grass moves but by the divine will.

"For me there is a vital connection between the Bihar calamity and the untouchability campaign. The Bihar calamity is a sudden and accidental reminder of what we are and what God is; but untouchability is a calamity handed down to us from century to century. ....Let this Bihar calamity be a reminder to us that, whilst we have still a few more breaths left, we should purify ourselves of the taint of untouchability and approach our Maker with clean hearts."

[*Mahatma*.—Vol. III—pp. 217-48]

গান্ধীজীর এই বিবৃতি সংবাদপত্রে প্রকাশিত হলে চারদিকে একটা সমালোচনার গুঞ্জন উঠল। এই বিবৃতি পাঠ করে রবীন্দ্রনাথ স্তম্ভিত হয়ে গেলেন। এমন কথা গান্ধীজী যে বলতে পারেন প্রথমে তিনি তা বিশ্বাসই

করতে পারলেন না। তিনি ভেবে দেখলেন, এমন কথা বিনা প্রতিবাদে চলতে দিলে তার পরিণাম খুবই অশুভ হবে। তাই গান্ধীজীর এই বক্তব্যের যুক্তি খণ্ডন করে তিনি একটি বিবৃতি রচনা করলেন। কবি ইংরেজিতে তাঁর এই বিবৃতিতে যা লিখেছিলেন তার মর্মার্থ ছিল এইরূপ—

"যাঁরা অস্পৃশ্যতার সামাজিক সংস্কারে বিশ্বাস করেন গান্ধীজী তাঁদের বিরুদ্ধে এই বলে অভিযোগ করেছেন যে, এই পাপের জন্যই ঈশ্বরের রোষানল বিহারের কিয়দংশের উপর—স্পষ্টত তাঁর বিশেষ নির্বাচিত স্থান হিসেবে—পতিত হয়েছে। এই কথা পাঠ করে আমি অত্যন্ত বেদনাজনক বিস্ময় বোধ করছি। আরও এক দুর্ভাগ্যজনক ব্যাপার এই যে, বিশ্বঘটনা সম্পর্কে এই ধরণের অবৈজ্ঞানিক চিন্তা আমাদের দেশের এক বৃহৎ সংখ্যক মানুষ অনায়াসে মেনে নেয়।

"প্রাকৃত জড়ঘটনাসমূহের একটি বিশেষ সমবায়ই হ'ল প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের অনিবার্য ও একমাত্র কারণ। বিশ্ববিধানসমূহ অলঙ্ঘ্য; এই বিধানগুলির কাজে ঈশ্বর নিজেও কোনদিন হস্তক্ষেপ করেন না। যদি করতেন তবে তিনি নিজেই তাঁর নিজের সৃষ্টির সামগ্রিক সততা নষ্ট করে দিতেন। এই কথায় যদি আমরা বিশ্বাস করতাম তা'হলে বর্তমান যে-ঘটনাটি ভয়াবহরূপে ও ব্যাপকভাবে আমাদের মর্মে তীব্র আঘাত করেছে, এই জাতীয় ঘটনাস্থলে বিধাতার কার্যকলাপের সমর্থন করা আমাদের পক্ষে অসম্ভব হয়ে পড়ত।

"আমরা যদি আমাদের নৈতিক সত্যগুলিকে বাহ্যসৃষ্টির ঘটনাসমূহের সঙ্গে মিশিয়ে ফেলি তা' হলে আমাদিকে স্বীকার করতে হবে যে, নৈতিক দিক দিয়ে বিধাতা থেকে মানব-প্রকৃতি অনেক বড়; কারণ, দেখা যাবে সৎচরিত্রশিক্ষার প্রচারের জন্য তিনি এমন বিপর্যয় ঘটিয়ে বসেন যা সর্বনিকৃষ্ট চরিত্রের পরিচায়ক। আমরা মানুষের মধ্যে এমন কোনও সুসভ্য শাসকের কথা কল্পনা করতে পারি না যা আকস্মিক নরহত্যার একটা বহু বিচারহীন দৃষ্টান্ত স্থাপন করবেন; এ নরহত্যার মধ্যে শিশু আছে, অস্পৃশ্য সমাজের লোকেরাও আছে; আর এই হত্যা সাধন করা হবে সেই সব লোকেরই মনে দাগ কাটবার জন্যে যারা বেশ নিরাপদে দূরে বাস করছে—অথচ তারাই হ'ল তীব্র নিন্দা ও শাস্তির যোগ্য।........"

পরিশেষে কবি লিখলেন, "আমার দিক হতে এই বিশ্বাসেই নিজেদিকে আমরা সম্পূর্ণ নিরাপদ মনে করছি যে, আমাদের পাপ এবং ভুলভ্রান্তি যত বিপুলই হোক—তারা এত শক্তিশালী কখনই নয় যাতে করে সৃষ্টির কাঠামোটিকে নিচের দিকে টেনে নিয়ে একেবারে ধ্বংস করে দিতে পারে। এই সৃষ্টির কাঠামোর উপরে আমরা পাপী এবং পুণ্যাত্মা, গোঁড়া এবং প্রথাভঙ্গকারী দল—সকলেই নির্ভর করতে পারি। মহাত্মাজী তাঁর বিস্ময়কর প্রেরণা দ্বারা দেশবাসীর মনে যে ভয় ও ভীরুতা সঞ্চিত ছিল তা থেকে সকলকে মুক্তির জন্য উদ্বুদ্ধ করতে পেরেছেন; তার জন্য তাঁর কাছে আমরা যারা অশেষভাবে কৃতজ্ঞ বলে মনে করি তারাই আবার মনে অত্যন্ত বেদনাবোধ করি যখন দেখি যে, মহাত্মাজীর মুখ হতে এমন বাণী নিঃসৃত হচ্ছে যা সেই সব দেশবাসীর মনে অযুক্তির উপাদানসমূহকে বড় করে তুলতে পারে—এই অযুক্তিই সকল অন্ধশক্তির আকর—যা আমাদিকে জোর পূর্বক স্বাধীনতা ও আত্মসম্মানের পথ হতে দূরে সরিয়ে নিতে পারে।"

কিন্তু কবি এই বিবৃতি গান্ধীজীকে না-দেখিয়ে প্রেসে দিতে চাইলেন না। তাছাড়া সংবাদপত্রে গান্ধীজীর যে বিবৃতি প্রকাশিত হয়েছিল—তার কতখানি সত্য কতখানি বিকৃত তা নির্ধারণ করা তাঁর পক্ষে সম্ভব ছিল না। এই কারণেই প্রথমে তিনি তাঁর এই বিবৃতি গান্ধীজীকে পাঠিয়ে দিয়ে সেই সাথে একটি পত্রও দিলেন তাঁকে (২৮শে জানুয়ারী ১৯৩৪)। এই পত্রে সংবাদপত্রে গান্ধীজীর যে-বিবৃতি প্রকাশিত হয়েছিল তার অংশবিশেষ উদ্ধৃত করে দিয়ে তিনি লিখলেন ঃ

"Dear Mahatmaji — The Press reports that you in a recent speech referring to the recent earthpuake in Bihar spoke as follows, 'I want you, the superstitious enough* (sic) to believe with me that the earthquake is a divine chastisement for the great sin we have committed against those whom we describe as Harijans.' I find it difficult to believe it. But if this be your real view on the matter, I cannot think it should go unchallenged. Herewith you will find a rejoinder from me. If you are correctly reported in the Press, would you kindly send it to the press ? I have not sent it myself for publication, for I would be the last person to criticise you on unreal facts. I am looking forward to meeting you here."**

কবির বিবেকবুদ্ধি ও সৌজন্যবোধ কত প্রখর ছিল, এই ঘটনাটি থেকে তার কিছু পরিচয় মেলে। যাই-ই হোক, গান্ধীজীকে এই পত্র পাঠিয়ে দিয়ে কবি চুপ করে থাকতে পারলেন না। দুর্গতদের সাহায্য সংগ্রহের জন্য প্রেস-বিবৃতি ছাড়াও ব্যক্তিগতভাবে চেষ্টা করতে লাগলেন। ইতিমধ্যে ভূমিকম্পে নেপালের ক্ষয়-ক্ষতির বিবরণও সংবাদপত্রে প্রকাশিত হতে থাকে, পরদিন কবি নেপালের মহারাজকে সহানুভূতি জানিয়ে এই তারবার্তাটি পাঠালেন (২৯শে জানুয়ারি) ঃ

"I am staggered at the detailed news of the devastation of your land. Pray accept our sincerest sympathies in your terrible affliction."

এদিকে গান্ধীজী তখনও হরিজন আন্দোলনে দক্ষিণ ভারত পরিক্রমা করছিলেন। এই কারণেই রবীন্দ্রনাথের পত্রটি যথাসময়ে তাঁর হস্তগত হয় নি। ২রা ফেব্রুয়ারি কুন্নুর-এ তিনি কবির পত্রটি পান। ইতিমধ্যে বিহার ভূমিকম্প গান্ধীজীর ঐ-মন্তব্য সম্পর্কে দেশে নানা বিরূপ ও তীব্র সমালোচনা চলছিল। 'হরিজন' পত্রিকায় (২রা ফেব্রুয়ারি) গান্ধীজী আর একটি বিবৃতি দিয়ে তাঁর বক্তব্য বিষয় পরিষ্কার করবার চেষ্টা করলেন, "সমগ্র সভ্য জগৎ ও অসভ্য জগতের ন্যায় আমিও বিশ্বাস করি যে, বিহারের ভূমিকম্পের ন্যায় দুর্বিপাক মানুষের পাপের শাস্তিস্বরূপই ভগবান প্রেরণ করে থাকেন। আন্তরিকভাবে যখন মানুষ এই বিশ্বাস পোষণ করে, তখনই মানুষ ভগবানের নিকট প্রার্থনা করে, অনুশোচনা করে, এবং আত্মশুদ্ধি করে। আমি মনে করি,

* অস্পষ্ট বা দুর্বল লেখা।

** পত্রের অনুলিপি শান্তিনিকেতনে 'রবীন্দ্রসদন'-এ রক্ষিত আছে।

অস্পৃশ্যতা এরূপ গুরুতর পাপ যে, ভগবান তজ্জন্য শাস্তি দিতে পারেন। যাঁরা বলেন,—'চিরপ্রচলিত পাপের জন্য এতদিন পর শাস্তি কেন? দক্ষিণ ভারত দণ্ডিত না-হয়ে একমাত্র বিহার দণ্ডিত হ'ল কেন?—ভূমিকম্প ব্যতীত আর কোন শাস্তি ভগবান দিলেন না কেন?' —যাঁরা এই সব প্রশ্ন উত্থাপন করেন, আমি তাঁদের যুক্তির সারবত্তা স্বীকার করতে পারি না। আমার উত্তর এই যে, আমি সর্বজ্ঞ ভগবান নই। সুতরাং ভগবানের অভিপ্রায় উপলব্ধি করা আমার ক্ষমতাতীত। ভগবান অথবা নিসর্গের খামখেয়াল বশত এইসব দুর্ঘটনা ঘটে না। আকাশের গ্রহ-উপগ্রহগুলি যেরূপ কতকগুলি নির্দিষ্ট প্রাকৃতিক নিয়মের অধীনে ঘূর্ণায়মান, এইসব নৈসর্গিক দুর্ঘটনাও সেই রকম কতকগুলি প্রাকৃতিক নিয়মের অধীন। এইসব নিয়ম কি, তা আমি জানি না বলেই এটা সাব্যস্ত করি যে, এইগুলি 'দুর্ঘটনা' অথবা নিসর্গের ব্যতিক্রম। সুতরাং এ সম্পর্কে যিনিই যা বলুন না কেন সমস্তই অনুমান সাপেক্ষ। তবে, মানুষের জীবনে অনুমানেরও স্থান আছে; সুতরাং আমি যে অনুমান করি, অস্পৃশ্যতা-পাপের শাস্তিস্বরূপই ভূমিকম্প সংঘটিত হয়েছে, সেই অনুমানে বরং হৃদয় উন্নত হয়। এই অনুমান আমাকে বিনয় শিক্ষা দেয়, অস্পৃশ্যতা উচ্ছেদ প্রচেষ্টায় আমাকে সৃষ্টিকর্তার সান্নিধ্যে নিয়ে যায়। হতে পারে, আমার অনুমান ভিত্তিহীন, কিন্তু তা হলেও পূর্বোক্ত সুফললাভে কোনও বিঘ্ন হয় না। কারণ সন্দেহবাদী ও সমালোচকের নিকট যা অনুমান, আমার নিকট তা জ্বলন্ত বিশ্বাস এবং এই বিশ্বাস অনুসারেই আমি আমার ভবিষ্যৎ কার্যক্রম নির্ধারণ করি।"......

ঐ-দিনই তিনি রবীন্দ্রনাথকে তাঁর পত্রপ্রাপ্তির কথা স্বীকার করে এই সংখ্যা 'হরিজন'-এর একটি কপি পাঠিয়ে দিয়ে তার করলেন যে, এটি পাঠ করবার পর তিনি যদি প্রয়োজন বোধ করেন তবে তাঁর প্রতিবাদ-বিবৃতিটি প্রকাশ করতে পারেন। কিন্তু তার করেও তিনি নিশ্চিন্ত থাকতে পারলেন না। ডাক ছাড়বার শেষ মুহূর্তে তাঁর এই বিবৃতির একটি কপি সহ কবিকে পত্র লিখে পাঠালেন (২রা ফেব্রুয়ারি—১৯৩৪)। তাঁর বিরুদ্ধে তখন যে নিন্দা ও কুৎসার ঝড় বইছিল তার উল্লেখ করেও তিনি কবিকে লিখলেন যে, তাঁর প্রবন্ধটি পাঠ করবার

রবীন্দ্রনাথ ও গান্ধীজী

পর তিনি প্রয়োজন মনে করলে তাঁর বিবৃতিটি প্রকাশ করতে পারেন। গান্ধীজীর পত্রটি ছিল এই :

Dear Gurudev,

I received your letter only just now. There is a campaign of vilification of me going on. My remarks on the Bihar calamity were a good handle to beat me with. I have spoken about it, at many meetings. Enclosed is my considered opinion. I see from your statement that we have come upon perhaps a fundamental difference. But I cannot help myself. I do believe that super physical consequences flow from physical events. How they do, I do not know.

If after reading my article, you still see the necessity of publishing your statement it can be at once published either here or there just as you desire. I hope you are keeping well.

Yours sincerely
(Sd.) M. K. Gandhi*

সম্ভবত ৪ঠা ফেব্রুয়ারি নাগাদ কবি গান্ধীজীর প্রেরিত এই পত্র ও হরিজন পত্রিকাটি পান। এই পত্র পাওয়ার পর এবং হরিজন-এ গান্ধীজীর প্রবন্ধটি পাঠ করার পর গান্ধীজীর বক্তব্যটি তাঁর কাছে পরিষ্কার হয়ে ওঠে। এই অবস্থায় তিনি তাঁর প্রতিবাদ বিবৃতিটি প্রকাশ করাই যুক্তি-যুক্ত বোধ করে ইউনাইটেড প্রেসের

* এই পত্রের পুনশ্চে গান্ধীজী (স্বহস্তে) লিখেছিলেন :

"The last lines are disgracefully written but I was tired out and half asleep. Please forgive. If I am to catch the post to-day, I may not wait to make a fair copy." —পত্রটি 'রবীন্দ্র-সদন'-এ রক্ষিত আছে।

প্রতিনিধিকে তা দেন। পরদিন এটি দেশের প্রায় অধিকাংশ পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত হয় (৫-৬ ফেব্রুয়ারি)। কিন্তু গান্ধীজীর ঐ-পত্রে এমন একটি বেদনা-জনক উক্তি ছিল যা পাঠ করে কবি অত্যন্ত মর্মাহত ও বিচলিত হয়ে পড়েন। পূর্বেই বলেছি, বিহার ভূমিকম্প সম্পর্কে গান্ধীজীর মন্তব্যকে উপলক্ষ করে তখন গান্ধীজীর বিরুদ্ধে কুৎসা ও অপপ্রচার চলছিল। বিশেষ করে 'পুনা' চুক্তি'র ব্যাপারে গান্ধীজীর বিরুদ্ধে এক শ্রেণীর বাঙালী বুদ্ধিজীবীর মনে প্রচুর বিদ্বেষবাষ্প জমেছিল,—এই উপলক্ষে তার স্ফুরণ ঘটল। কবি স্পষ্টই বুঝলেন, তাঁর প্রতিবাদটি প্রকাশিত হলে গান্ধীজীর বিপক্ষ ও নিন্দুকের দল আরও উৎসাহিত হয়ে উঠবেন। এইসব বিবেচনা করে পরদিনই তিনি ইউনাইটেড প্রেসের মাধ্যমে এক বিবৃতিতে এই গান্ধী-বিরোধী কুৎসা প্রচার অবিলম্বে বন্ধ করবার আবেদন জানালেন। তাছাড়া এই কুৎসাকারীদের তিরস্কার করে তিনি জানিয়ে দিলেন যে, সুস্থ সমালোচনাকে তিনি সমর্থন করলেও সমালোচনার নামে কুৎসা প্রচারের হীনতাকে তিনি কখনও সহ্য করবেন না। ভারতের জাতীয় সাধনার ক্ষেত্রে গান্ধীজীর মহান অবদানকে সশ্রদ্ধ-চিত্তে স্বীকার করে নেবার আবেদন জানিয়ে তিনি দেশবাসীর উদ্দেশে তাঁর ঐ বিবৃতিতে বলেন (৬ই ফেব্রুয়ারী—১৯৩৪) ঃ

"মহাত্মা গান্ধীর বর্তমান কর্ম-প্রচেষ্টার বিরুদ্ধে আমার দেশবাসীর মধ্যে একদল লোকের বৈর-মনোভাব আমি কিছুকাল যাবৎ লক্ষ্য করিতেছি। খাঁটি সমালোচনা হইলে কাহারও তাহাতে আপত্তি থাকিতে পারে না। কিন্তু সমালোচনা ও কুৎসা রটনার মধ্যে একটা পার্থক্য সর্বদাই আছে। যিনি প্রকৃতই মহৎ, তাঁহার নিকট স্তুতি-বাদও যেমন অসার, কাণ্ডজ্ঞানহীন লোকের টিট্‌কারীও তেমনই এবং আমি জানি যে, মহাত্মাজীর মধ্যে সে মহত্ত্ব আছে। কিন্তু তথাপি, তাঁহার বিরুদ্ধে যে কুৎসা প্রচারের কার্য চলিতেছে, তাহার প্রতিবাদ যদি আমি না করি, তাহা হইলে আমার কর্তব্যে আমি পরাঙ্মুখ হইব। কারণ মহাত্মাজীই একমাত্র ব্যক্তি, যিনি জনসাধারণকে বহু শতাব্দীর দাসত্বসঞ্জাত নৈরাশ্য ও আত্মাবমাননার পঙ্ককুণ্ড হইতে উদ্ধার করিতে সর্বাপেক্ষা অধিক সহায়তা করিয়াছেন। তাঁহার আশা ও বিশ্বা-সের বাণী যেন একরাত্রের মধ্যেই জনসাধারণের সমগ্র মনোভাব পরি-বর্তিত করিয়া দিয়াছে। যাহারা শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরিয়া নিজেদের শিরে অসম্মানের বোঝা অসীম সহিষ্ণুতায় বহন করিয়া চলিয়াছিল এবং ভাবিয়াছিল যে, এ বোঝা চির-কালই বহিতে হইবে, তাহাদের হৃদয়ে তিনি সাহস ও আত্মসম্মান জাগ্রত করিয়াছেন। যিনি তাঁহার আশ্চর্য ক্ষমতায় এই অসম্ভবকে সম্ভব করিয়াছেন, তাঁহার প্রতি আমাদের শ্রদ্ধার অঞ্জলি অর্পণ না-করিয়া আমরা পারি না।

"সময় সময় মত-পার্থক্য ঘটে বলিয়াই যখন তাঁহার মত মানবসেবায় উৎসর্গীকৃত জীবনকে কুৎসালিপ্ত করা হয়, তখন মনে হয় যে, জনসাধারণের অকৃতজ্ঞতা নীচতার সীমায় উপনীত হইয়াছে। আমি অনেক সময় প্রকাশ্যে তাঁহার সহিত মত-পার্থক্য জ্ঞাপন করিয়াছি; এমন কি সম্প্রতি তিনি ভূমিকম্পের ধ্বংসলীলাকে অস্পৃশ্যতা-পাপের জন্য ঈশ্বরের ভর্ৎসনা বলিয়া যে বিশ্বাস ব্যক্ত করিয়াছেন, আমি তাহারও সমালোচনা করিয়াছি। কিন্তু তাঁহার ধর্মবিশ্বাসের আন্তরিকতা এবং দরিদ্র জনগণের প্রতি তাঁহার যে ঐকান্তিক প্রেম, তাহার প্রতি এতদূর শ্রদ্ধা আমার আছে যে, আমার মত হইতে পৃথক তাঁহার মতকে আমি শ্রদ্ধার সহিত দেখিয়া থাকি।

"আমি তাঁহাকে অন্তরের সহিত বাংলা দেশে অভ্যর্থনা করিতেছে এবং বাংলার জনসাধারণের নিকট আবেদন জানাইতেছি যে, মাতৃভূমির সেবায় মহাত্মার জীবনের যে মহার্ঘ্যতা, তাহা আমার সহিত তাঁহারাও উপলব্ধি করুন।"

—ইউ, পি,

[আনন্দবাজার পত্রিকা—৮ই ফেব্রু-য়ারি—১৯৩৪]

কবির এই বিবৃতি ও মূল প্রতি-বাদটি খুব অল্প সময়ের ব্যবধানে বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। এইসবই গান্ধীর নজরে আসে। বলা-বাহুল্য, কবির ঐ বৈজ্ঞানিক যুক্তিবাদী দৃষ্টিভঙ্গি তিনি গ্রহণ করতে পারেন নি;—তিনি তাঁর পূর্ব মত ও বিশ্বাসে অটল রইলেন। কয়েকদিন পর রবীন্দ্র-নাথের ঐ প্রতিবাদের জবাবে তিনি তাঁর বক্তব্য ব্যাখ্যা করে,—'Superstition Versus Faith'* এই শিরো-নামায় 'হরিজন'-এ একটি প্রবন্ধ লিখলেন। তার মর্মার্থ ছিল এই ঃ

"শান্তিনিকেতনের কবি শুধু শান্তিনিকেতন আশ্রমবাসীদেরই গুরু-দেব নন—আমারও গুরুদেব। যখন দক্ষিণ আফ্রিকায় স্বেচ্ছানির্বাসন হতে আমরা প্রত্যাবর্তন করি, তখন আমি ও আমার সহকর্মীরা এখানেই আশ্রয় পেয়েছিলাম। কিন্তু অতি অল্পকালের মধ্যেই গুরুদেব এবং আমি আমাদের মধ্যে কোন কোন বিষয়ে মতের বা দৃষ্টিভঙ্গির পার্থক্য আবিষ্কার করতে পেরেছি। নানা বিষয়ে আমাদের দৃষ্টি-ভঙ্গির পার্থক্যের দ্বারা আমাদের পরস্পরের প্রতি শ্রদ্ধাপ্রীতির কোনও পরিবর্তন ঘটে নি; বিহারের বিপৎ-পাতের সঙ্গে আমি অস্পৃশ্যতার যোগাযোগ স্থাপন করায় গুরুদেব সর্বশেষে যে-সব কথা বলেছেন তার দ্বারাও ঐ শ্রদ্ধাপ্রীতির কোনও লাঘব হবে না।

"আমি ভুল করেছি, এই যখন তাঁর বিশ্বাস তখন আলবাৎ তাঁর প্রতি-বাদ করবার সেই অধিকার আছে। আর তাঁর প্রতি আমার অগাধ শ্রদ্ধা আছে বলেই তাঁর কথা আমি অন্যান্য সমালোচক অপেক্ষা অধিক আগ্রহের সঙ্গে শুনে থাকি। এই বিবৃতিটি আমি তিনবার পাঠ করেছি, কিন্তু তা-সত্ত্বেও আমি ঐ-বিবৃতিতে যা বলেছি এখনও তারই সমর্থন করছি।

"তিন্নেভেলিতে বসে আমি প্রথমে যখন বিহারের বিপৎপাতকে অস্পৃশ্যতার সঙ্গে যুক্ত করেছিলাম তখন আমি যতদূর সম্ভব ভেবেচিন্তেই কথা বলেছিলাম আর সে-কথা আমার পরিপূর্ণ অন্তর হতেই উৎসারিত হয়েছিল। আমি যা বিশ্বাস করি তাই বলেছিলাম। আমি বহুদিন ধরেই এই কথা বিশ্বাস করে আসছি যে, প্রাকৃতিক ঘটনা প্রাকৃতিক এবং আধ্যাত্মিক এই উভয়বিধ ফলই উৎপাদন করে। আমি এর উল্টোটাকেও সমভাবেই সত্য বলে বিশ্বাস করি।

"আমার কাছে ভূমিকম্প ভগবানের কোনও খেয়ালমাত্র নয়, নিছক কতক-গুলি অন্ধ শক্তির মিলনেও তা সঙ্ঘটিত হয় না। আমরা ভগবানের সব বিধানের কথা জানি না, সেগুলির

*গান্ধীজীর এই প্রবন্ধটি 'হরিজন'-এ প্রকাশিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে কুম্বোকোনাম হইতে ১৫ই ফেব্রুয়ারি প্রেসে দেওয়া হয়। পরদিন ১৬ই ফেব্রুয়ারি *'Amrita Bazar Patrika'*, আনন্দবাজার পত্রিকা প্রভৃতি পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত।

কার্যাবাধর কথাও জানি না। সর্বাপেক্ষা সমুন্নত বৈজ্ঞানিক অথবা সর্বাপেক্ষা বড় অধ্যাত্মবাদীর জ্ঞানও একটি ধূলি-কণার মত। আমার কাছে আমার ভগবান শুধু আমার পিতার ন্যায় একজন ব্যক্তিত্বসম্পন্ন জীব নন, তিনি তার অপেক্ষাও অনন্তগুণে বেশি। আমার জীবনের ক্ষুদ্রতম খুঁটিনাটিতে তিনি আমাকে পরিচালিত এবং নিয়ন্ত্রিত করছেন। আমি আক্ষরিক-ভাবেই একথা বিশ্বাস করি যে, তাঁর ইচ্ছা ব্যতীত একটি পাতাও নড়ে না। তাঁর করুণাময়ী ইচ্ছার উপরেই আমার প্রত্যেকটি শ্বাস নির্ভর করছে।

"তিনি এবং তাঁর বিধান এক। বিধানই (Law) ঈশ্বর। তাঁর সম্পর্কে যেটাকে বিভূতি বলা হয় তা' বিভূতি (attribute) মাত্র নয়; তিনি নিজেই বিভূতি। তিনিই সত্য, প্রেম, বিধান—মানুষের বুদ্ধিচাতুর্য আরও যত লক্ষ লক্ষ জিনিসের নাম করতে পারে তিনি তার সবই। গুরুদেবের সঙ্গে আমিও 'বিশ্ববিধানের অমোঘতায় বিশ্বাস করি—যার ভেতরে ভগবান নিজেও হস্ত-ক্ষেপ করেন না'। এর কারণ ঈশ্বর নিজেই বিধান। কিন্তু এক্ষেত্রে আমার নিবেদন এই যে, আমরা বিধানকে বা বিধানসমূহকে পূর্ণভাবে জানি না, আমাদের কাছে যা একটা সর্বনাশ বলে মনে হয় তা এইরকম মনে হওয়ার কারণ এই যে, আমরা বিশ্ববিধান-সমূহকে যথোপযুক্তভাবে জানি না।

"অনাবৃষ্টি, বন্যা, ভূমিকম্প এবং অনুরূপ যা'কিছু দেখা দেয়—যদিও ঐগুলি প্রাকৃতিক বা বাস্তুগত কারণ-সম্ভূত বলে বোধ হয় কিন্তু আমার মনে হয় যে, ঐগুলি মানুষের নৈতিক আচরণের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত। সেই কারণেই আমি আমার প্রকৃতিগতভাবেই স্থির করে নিয়েছিলাম যে, অস্পৃশ্যতার পাপের জন্যই ভূমিকম্পটি সংঘটিত হয়েছে। অবশ্য সনাতনীদেরও এই কথা বলার যুক্তিসংগত অধিকার আছে যে, অস্পৃশ্যতার বিরুদ্ধে প্রচার করার দরুণ আমারই অপরাধে তা ঘটেছে। অনুশোচনা ও আত্মশুদ্ধির আহবানের মধ্যে আমার বিশ্বাস আছে।

"প্রাকৃতিক বিধানসমূহের কার্য-কলাপ সম্পর্কে আমার অতীব অজ্ঞতার কথা আমি স্বীকার করছি। কিন্তু তবুও আমি যেমন ঈশ্বরে বিশ্বাস না-করে পারব না—যদিও সন্দেহ-বাদীদের (sceptics) কাছে তাঁর অস্তিত্ব আমি প্রমাণ করতে পারব না, অনুরূপভাবে বিহারের ঘটনার সঙ্গে অস্পৃশ্যতাজনিত অপরাধের

ঐতিহাসিক 'ডাণ্ডি-অভিযানে' শ্রীমতী সরোজিনী নাইডুর সঙ্গে গান্ধীজী।

সম্পর্কটি কি তাও আমি প্রমাণ করতে পারব না—যদিও তা আমার সহজাত অনুভূতির দ্বারা অনুভব করতে পারি।...

"গুরুদেবের সঙ্গে আমি এ কথায় একমত নই যে, 'আমাদের পাপ এবং ভুলভ্রান্তি যত বিপুলই হোক—তারা কখনই এত শক্তিশালী নয় যাতে করে সৃষ্টির কাঠামোটিকে নীচে টেনে নামিয়ে একেবারে ধ্বংস করে দিতে পারে।' অপরপক্ষে আমার বিশ্বাস, অন্য কোনো প্রাকৃতিক ঘটনা অপেক্ষা আমাদের নিজেদের পাপসমূহ এই কাঠামোটিকে ধ্বংস করে দিতে অধিক শক্তিশালী। জড়বস্তু ও আত্মার মধ্যে একটা অচ্ছেদ্য বিবাহবন্ধন রয়েছে। আমরা এর উভয়ের ফলগুলি সম্পর্কে অজ্ঞ, কিন্তু তা সত্ত্বেও এই অজ্ঞতাই অনেককে বাহ্য বিপৎপাতকে নিজেদের নৈতিক উন্নয়নের কাজে লাগাতে সক্ষম করে তুলেছে।"...

এখানে গান্ধীজী ও রবীন্দ্রনাথের চিন্তা ও মানসপ্রকৃতির পার্থক্যটি লক্ষ্য করবার মত। মানুষের যুক্তি-বুদ্ধি ও আধুনিক বিজ্ঞানচেতনার সীমাবদ্ধতার অভিযোগে গান্ধীজী বস্তুত তাদের ক্ষমতা ও কার্যকারিতা সম্পর্কে তীব্র সন্দেহ ও সংশয় প্রকাশ করেছেন। গান্ধীজীর কাছে তাঁর ব্যক্তি-গত ধর্মবিশ্বাস—তাঁর সুগভীর ঈশ্বর-প্রেম বা ভগবৎবিশ্বাসই মূল কথা। এই ধরণের বিশ্বাসের ওপরে আর কথা নেই,—অন্তত যুক্তিতর্ক ও প্রশ্ন করে সেখানে খুব বেশি লাভ হয় না এবং সত্য-সত্যই গান্ধীজীর ক্ষেত্রে তা হয় নি। তিনি তাঁর অন্তর ও মনের চার-পাশে এই বিশ্বাসের এমনই একটা লোহপ্রাচীর সৃষ্টি করে নিয়েছিলেন যে, তার কাছে যত বড় বৈজ্ঞানিকই যত কঠিন যুক্তি দিয়ে আঘাত করুন না কেন, বয়লারের গায়ে কড়াইশুটি দ্বারা আঘাত করার মতই তা' ব্যর্থ ও নিষ্ফল হয়েছে। যাই-ই হোক, ভূমি-কম্পের প্রসঙ্গে গান্ধীজীর উক্তির

চূড়ান্ত অবৈজ্ঞানিকতা নিয়ে আজকের দিনে বিস্তারিত আলোচনা করার প্রয়োজনই হয় না।

পক্ষান্তরে রবীন্দ্রনাথ শেষ জীবনে ছিলেন যুক্তিবাদী এবং আধুনিক বিজ্ঞানের শক্তি ও সম্ভাবনার 'পরে তাঁর আস্থা ক্রমেই দৃঢ়তর হয়। তাই ভূমিকম্প প্রসঙ্গে কবির প্রধান বক্তব্যই ছিল এই যে, মানুষের পাপ-পুণ্য বা নৈতিক আচরণের প্রাকৃতিক ঘটনার ওপর কোন ক্রিয়া বা প্রভাব নেই; প্রকৃতি-জগৎ বা বস্তু-জগৎ তার আপন বিধান অনুসারেই চলেছে।

প্রশ্ন থেকে যায়, ভূমিকম্প প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ যে যুক্তিনিষ্ঠ ও বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গির পক্ষে এত কথা বললেন, ব্যক্তিগত জীবনে তিনিই কি একেবারে শেষ পর্যন্ত এই নীতিতে অবিচল, নিষ্ঠ থাকতে বা পুরোপুরি গ্রহণ করতে (totally and consistently) পেরেছিলেন? গান্ধীজীর মত ও দৃষ্টিভঙ্গীর প্রশ্নে তিনি যে অভিযোগ আনলেন, সেই অভিযোগ কি তাঁর সম্পর্কেও আসে না? অস্পৃশ্যতার পাপে ভগবানের রুদ্ররোষ ভূমিকম্প-রূপে গিয়ে পড়েছিল বিহারে,—এই কথা বলায় যে-অবৈজ্ঞানিকতার অভিযোগ আসে তাঁর 'গীতাঞ্জলি'র 'অপমানিত' এবং অন্যান্য বহু কবিতা, ভাষণ ও রচনার জন্যও সেই অভিযোগ আসতে পারে।

বিধাতার রুদ্ররোষে দুর্ভিক্ষের দ্বারে বসে
ভাগ করে খেতে হবে সকলের সাথে অন্ন
পান।
অপমানে হতে হবে তাহাদের সবার সমান॥"

—এখানেও তো কবি অস্পৃশ্যতা-জনিত পাপের শাস্তিস্বরূপ উচ্চবর্ণের হিন্দুদের বিধাতার রুদ্ররোষের ভীতি-প্রদর্শনের চেষ্টা করেছেন।

"ভূকম্পের পর ভূকম্পের সৃষ্টি করে যাবে সভ্যতাসৌধের এই সমূল উৎপাটন; মানুষকে প্রস্তুত থাকতে হবে আরো দুঃখভোগের জন্যে।"—এই বলে কঠোর ভর্ৎসনা করেছেন তিনি জালিয়ানওয়ালাবাগের হত্যাকারী ইউরোপের সাম্রাজ্যবাদী সভ্যতাকে।

'নৈবেদ্য', 'গীতাঞ্জলি', 'গীতিমাল্য', 'গীতালি'র কবির কথা স্মরণ রাখা দরকার। সেদিন মরমীয়া কবিদের মত তিনি শুধু ঈশ্বরের সঙ্গে প্রেমাভিসারেরই কল্পনা করে গান রচনা করেন নি। ঈশ্বর তাঁর কাছে শুধু দয়িত—প্রিয়তমই নন,—জগতের যত কিছু অন্যায় অবিচার ও উৎপীড়নের দ্রষ্টা এবং বিচারকও তিনি। তাই প্রবলের অন্যায় ও উৎপীড়ন যখনই যেখনে অসহ্যমাত্রায় পৌঁছেছে,—যখন তার প্রতিকারের কোনো রাস্তা তিনি দেখতে পান নি, তখন অশ্রুসিক্ত নয়নে আকাশের পানে মাথা তুলে তার প্রতিকার ও উপযুক্ত বিচার প্রার্থনা করেছেন তিনি। কখনও কখনও বা 'বিচারের ন্যায়দণ্ড' আপন হাতে তুলে নিয়ে অত্যাচারী ও উৎপীড়কদের বজ্রগর্জনে ভর্ৎসনা ও বিনিপাত করেছেন। কিন্তু এই পর্যন্ত অগ্রসর হয়েই তিনি থমকে দাঁড়িয়েছেন—তার অধিক তিনি অগ্রসর হতে পারেন নি।

অবশ্য শেষজীবনে কবি ক্রমশই বৈজ্ঞানিক যুক্তিবাদী ও প্রগতিশীল চিন্তাধারার দিকে ঝুঁকে পড়েছিলেন। কিন্তু মানুষের সৃষ্ট অন্যায় ও অত্যাচারী সমাজ কিংবা রাষ্ট্র-ব্যবস্থার মানুষই প্রতিকার ও সংশোধন করবে, —এই প্রত্যয় তাঁর থাকলেও বাস্তব কার্যক্ষেত্রে সেই অন্যায় ও শাসন-ব্যবস্থার প্রতিরোধ করবার জন্য সাধারণ মানুষকে তিনি বলিষ্ঠ সংগ্রামের আহ্বান জানাতে পারেন নি। জনসাধারণের সচেতন ভূমিকা ও সৃজনশীলতার প্রতি কবির গভীর আস্থা ছিল এ'কথাও সত্য;—এমন কি 'আসন্ন বিদ্রোহ' ও সমাজবিপ্লবেরও তিনি সতর্কবাণী করেছেন তবুও গান্ধীজীর মত কিংবা রোলাঁ-বারবুসের মত তিনি গণ-আন্দোলন ও গণ-সংগ্রামের বলিষ্ঠ আহ্বান জানাতে পারেন নি। এই কারণেই চরম বিপদের দিনে 'সর্বশক্তিমান ঈশ্বরের' কাছে কখনো কখনো তাঁকেও শরণাপন্ন হতে হয়েছে, অন্যায়-অবিচারের প্রতিকার প্রার্থনা করে। কিন্তু দুর্ভিক্ষ, ভূমিকম্প, অনুৎপাত প্রভৃতির দ্বারা ঈশ্বর মানুষকে তার 'পাপের' জন্য শাস্তি দিয়ে থাকেন—একথা তিনি আন্তরিকভাবে বিশ্বাস করতেন না, যদিও অত্যাচারী ও উৎপীড়কদের মনে ভীতি-উৎপাদনের জন্য কখনো কখনো তিনি ঐগুলিকে পরোক্ষে ঈশ্বরের শাস্তিবিধান বলতে চেয়েছেন। কিন্তু তবুও তাঁর ঈশ্বরনির্ভরতা এক-এক সময় অত্যন্ত বেদনাদায়ক নিষ্ফল ক্রন্দনের মত শুনিয়েছে, যাতে করে সত্যিসত্যি মানুষের যুক্তিবুদ্ধি আঘাত পায়।

আসলে কয়েকটি পরস্পরবিরোধী মানসিক প্রবণতার অন্তর্দ্বন্দ্ব চিরকাল তাঁর মধ্যে চলেছিল। একদিকে তাঁর যুক্তি ও বিজ্ঞান-নিষ্ঠা এবং বাস্তবতা-বোধ, অপরদিকে তাঁর অধ্যাত্মবাদ ও মরমীয়া লীলাবাদ;—একদিকে বিদ্রোহ ও সংগ্রাম-প্রবণতা অপরদিকে সংগ্রাম-বিমুখতা ও শান্ত রসনিমগ্নতা। গান্ধীজীর মধ্যেও দুটি স্বতন্ত্র ধরণের পরস্পর-বিরোধী সত্তার অন্তর্দ্বন্দ্ব ছিল। আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞান ও যুক্তিবুদ্ধির 'পরে তাঁর বড় একটা আস্থা ছিল না, সত্য কথা; তবে গান্ধীজীর ভগবৎ-প্রেম ও ঈশ্বর-নির্ভরতা প্রত্যক্ষ ও সক্রিয় সংগ্রামের অন্তরায় হয় নি। গান্ধীজী অসীম ভগবৎ-প্রেমিক আবার কর্মযোগীও বটেন; শুধু কর্মযোগী বললেও সম্পূর্ণ হয় না, অপরাজেয় সংগ্রামের যোদ্ধাও। কখন কি বিষয়ে সংগ্রাম অথবা সন্ধি করতে হবে, এ-ব্যাপারে তিনি তাঁর অন্তরের রহস্যময় পুরুষটির নির্দেশ মেনে চলতেন, সত্যি কথা; তবে তা সংগ্রামের চূড়ান্ত ও ব্যাপক স্বার্থের প্রতি লক্ষ্য রেখেই করতেন,—অধিকাংশই ক্ষেত্রে এইটিই দেখা গেছে। আর যেহেতু তিনি প্রায় সর্বদাই গণ-আন্দোলনের বা গণ-সংগ্রামের পরিপ্রেক্ষিতেই চিন্তা করতেন, সেই কারণে তিনি জনসাধারণের সহজ অনুভূতি-প্রবণতা ও তাদেরই মত খুব সহজ ও সরল ভাষায় কথা বলতেন।

কিন্তু বিহার ভূমিকম্পের ক্ষেত্রে দেশবাসীর অস্পৃশ্যতা কুসংস্কারকে আঘাত করবার উদ্দেশ্যেই যে শুধু গান্ধীজী ঐ-কথা বলেছিলেন তা নয়; —তিনি সত্যসত্যই বিশ্বাস করতেন যে, মানুষের পাপাচার ও নৈতিক আচরণই ঐ-ধরণের প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের সৃষ্টির কারণ।

কিন্তু রবীন্দ্রনাথ ভারতবর্ষের মুক্তিসাধনায় দেশবাসীর বিজ্ঞান-চেতনা ও চিত্তের সর্বপ্রকার মুক্তির স্বপ্ন দেখছিলেন। তাই এ-ক্ষেত্রে কবির আপত্তির প্রধান কারণ এই যে, আধুনিক যুগে এই ধরণের অবৈজ্ঞানিক ও কুসংস্কারপূর্ণ কথা যদি স্বয়ং গান্ধীজীর মুখ হতে নিঃসৃত হয়, তবে তার পরিণাম অত্যন্ত মারাত্মক হবে। কিন্তু শুধু রবীন্দ্রনাথই নন;—জওহরলাল প্রমুখ কংগ্রেসের নবীন ও প্রগতিশীল গোষ্ঠীও গান্ধীজীর ঐ-ধরণের উক্তির সুদূরপ্রসারী কুফলের কথা চিন্তা করে অত্যন্ত বিরত ও অস্বস্তি বোধ করছিলেন। এই প্রসঙ্গে স্বয়ং জওহরলাল লিখেছেনঃ

"পীড়িত অঞ্চলে ভ্রমণকালীন অথবা যাত্রার অব্যবহিত পূর্বে আমি সংবাদপত্রে গান্ধীজীর বিবৃতি পাঠ করিয়া মর্মাহত হইলাম; তিনি বলিয়াছেন অস্পৃশ্যতার পাপের

প্রত্যক্ষ

গোবিন্দ চক্রবর্তী

শূন্য দুপুরে
তখন শুধু চিল চেঁচাচ্ছিল, চাতক ছাতি ফাটাচ্ছিল।
পৃথিবী সর্বাঙ্গে আগুন—ধু-ধু পুড়ছিল।
হাওয়ায় 'লু' চলছিল, 'লু' চলছিল।

ভয়ানক ক্লান্ত তখন
চোখে হাত চেপে চুপচাপ শুয়ে ছিলাম।
স্নায়ুগুলি ঝিম-ঝিম, শিরাগুলি বিদীর্ণ হচ্ছিল।
ইলেকট্রিকের পুরোনো পাখাটা মুঠো মুঠো নরক ছড়াচ্ছিল।
আর আর্ত কাক ডাকছিল। ডাকছিল।

বড় বেশি শ্রান্তিতে
কোনো প্রিয় মুখ মনে আনতে চাইছিলাম।
কিন্তু না, মনে আসছিল না।
ভেঙে, ক্রমশ ভেঙে পড়ছিলাম।
যন্ত্রণায় টুকরো, টুকরো-টুকরো হচ্ছিলাম।
ছটফট করছিলাম, ছটফট করছিলাম।

বাইরে কাঁসার আকাশ, সেই আকাশকে—
সূর্য চাবুক কষাচ্ছিল, চাবুকে হাঁকাচ্ছিল।
পলাতক আসামীর মত কাকে যেন তন্ন-তন্ন করছিল।
হঠাৎ তীব্র এক তীর এসে বিঁধল দু'চোখে :
ফাঁক-হওয়া কবাটের সেই চোখ-ধাঁধানো ঝলকে
জানলাটা হঠাৎ গেল খুলে।
জানলা খুলে গেল, একেবারে খুলে গেল।

পিচ-গলা টগবগে গ্রাণ্ডট্রাংক রোডে—
ঠেসে মাল-বোঝাই এক রিক্সা-ওলা যাচ্ছিল,
দেখলাম—নুয়ে, নুয়ে, প্রায় শুয়ে পড়েই—
যেন টানতে পারছে না, আর পারছিল না।
এবং ঈশ্বরকেও সেই মুহূর্তেই আমি প্রত্যক্ষ করলাম,
প্রত্যক্ষ করলাম—চলেছেন নতমুখে,
সারা দুনিয়ার বোঝা ব'য়ে চলেছেন নতমুখে
বুঝি তিনিই চলেছেন নতমুখে, নতমুখে—নতমুখে।

শাস্তি এই ভূমিকম্প। এরূপ মন্তব্য শুনিলে বিহ্বল হইতে হয়, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাহার যে উত্তর দিলেন তাহা আমার মনঃপূত হইল এবং আমি আনন্দিত হইলাম। বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গির ইহাপেক্ষা অধিক বিরোধী কথা কল্পনা করাও কঠিন। জড় প্রকৃতির উপর ভৌতিক ঘটনাগুলি মনোরাজ্যে যে ভাবাবেগ উদ্বোধিত করে, তাহার সম্বন্ধে বিজ্ঞানও সম্ভবত বর্তমানে এতখানি যুক্তিহীন মতবাদ সমর্থন করিবে না। মানসিক আঘাতে কোন ব্যক্তির অজীর্ণ রোগ বা আরও কিছু কঠিন ব্যাধি হইতে পারে। কিন্তু মানুষের কোন আচার ব্যবহার বা ত্রুটির ফলে ভূপৃষ্ঠের স্তরগুলি সঞ্চালিত হয় এমন কথা শুনিলে বিমূঢ় হইতে হয়। পাপবোধ, ঐশ্বরিক ক্রোধ এবং সৌরজগতের ব্যাপারে মানুষের আপেক্ষিক সম্পর্ক প্রভৃতি আমাদিগকে কয়েক শতাব্দী পিছাইয়া লইয়া যায়; —যখন ইউরোপে ধর্মমতের বিরুদ্ধবাদীদের বিচার করিবার জন্য খৃস্টান যাজকদের বিচারালয়ের প্রাবল্য ছিল, যখন ধর্মবিরোধী বৈজ্ঞানিক কথা বলার দরুণ জিওরদানো ব্রুনোকে পোড়াইয়া মারা হইয়াছিল এবং আরও অনেককে 'ডাইনী' প্রভৃতি বলিয়া পোড়াইয়া মারা হইত।...

"এই ভূমিকম্প যদি আমাদের পাপের ঐশ্বরিক শাস্তি হয়, তাহা হইলে কি বিশেষ পাপের ফলে আমরা শাস্তি পাইলাম, কেমন করিয়া নির্ণয় করিব? হায়! আমাদের বহুতর প্রায়শ্চিত্ত বাকী রহিয়াছে? প্রত্যেক ব্যক্তিই তাহার পছন্দমত ভাবে ব্যাখ্যা করিতে পারে।...দক্ষিণ ভারতের লোকের অস্পৃশ্যতাবোধের শাস্তি আসিয়া পড়িল অল্পবিস্তর নির্দোষ বিহারের লোকের উপর, এ কথা বলা অপেক্ষা পূর্বের কথাগুলি লক্ষ্যের অধিকতর নিকটবর্তী। যে দেশে ছুঁৎমার্গের প্রাবল্য সর্বাধিক, সেখানে ভূমিকম্প হইল না কেন? অথবা ব্রিটিশ গভর্ণমেন্টও বলিতে পারেন, এই দৈবদুর্বিপাক, আইন অমান্য আন্দোলন করার জন্য ঐশ্বরিক শাস্তি।..."

[আত্ম-চরিত ॥ পৃঃ ৫২৩—২৪]

যাইই হোক, এই প্রসঙ্গে দেশে কিছুদিন তর্কবিতর্ক চললেও গান্ধী-রবীন্দ্রনাথের পারস্পরিক সম্প্রীতি ও শ্রদ্ধাভাব এতটুকু ক্ষুণ্ণ হয় নাই। কবি যে গান্ধীজীকে কতখানি শ্রদ্ধা করতেন তা এই প্রসঙ্গে তাঁর শেষ বিবৃতিটি (৬ই ফেব্রুয়ারি) থেকেই প্রমাণিত হয়। আরও একটি লক্ষণীয় বিষয় এই যে, অসহযোগ আন্দোলন ও চরকা-বিতর্ক কালে তিনি গান্ধীজীর মতাদর্শ খণ্ডন করতে গিয়ে যে তীব্র কঠোর ভাষা ও উপমা ব্যবহার করেছিলেন, আইন অমান্য আন্দোলনের পরবর্তীকালে গান্ধীজীর সমালোচনায় তার প্রায় কিছুই করেন নি। এক কথায়, আইন অমান্য আন্দোলনের সময় থেকে তিনি গান্ধীজীর প্রতি পূর্বাপেক্ষা অধিক শ্রদ্ধাশীল ও তাঁর অধিক নিকটবর্তী হয়েছিলেন,—যদিও কয়েকটি মৌলিক বিষয়ে তাঁদের চিন্তা ও দৃষ্টিভঙ্গির দুস্তর ব্যবধান ও পার্থক্য থেকেই গিয়েছিল।*

---

* বিশ্বভারতী কর্তৃপক্ষের অনুমতিক্রমে তথ্য ও চিঠিপত্রগুলি শান্তিনিকেতনে 'রবীন্দ্র সদন' থেকে সংগ্রহ করা হয়েছে। গান্ধীজীর চিঠিপত্রগুলি আমার রচনায় ব্যবহার করার জন্য 'নবজীবন ট্রাস্ট' অনুমতি দিয়েছেন। তাঁদের সকলেরই নিকট আমার কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি। লেখকের অচিরে প্রকাশিতব্য "ভারতে জাতীয়তা ও আন্তর্জাতিকতা এবং রবীন্দ্রনাথ" (তৃতীয় খণ্ড) গ্রন্থে এ সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য সম্বলিত আলোচনা করা হয়েছে। —লেখক।

সর্দার বল্লভভাই প্যাটেলের সঙ্গে আলোচনারত গান্ধীজী

নেহর্‌ পর্রস্কার

নেহর্‌ শান্তি পর্রস্কার। চোদ্দই নভেম্বরের মতই নেহর্‌ শান্তি পর্রস্কারও নেহর্‌ স্মৃতির সঙ্গে ওতোপ্রতোভাবে একাত্ম। শান্তির জন্যই তাঁর আগমন, শান্তির বাণী মুখে নিয়েই তাঁর লোকান্তর। শুধু নেহর্‌জী বললে সম্পূর্ণ বলা হল না, অশোক ভারত শান্তির উপাসক। বুদ্ধ, চৈতন্য এবং সমগ্র ভারতীয় সাধনার লক্ষ্যই হল জীবে প্রেম প্রতিষ্ঠা। গান্ধী-নেহর্‌ সেই ভারতীয় সাধনারই ফলশ্রুতি, গর্‌দেব রবীন্দ্রনাথের প্রেম-সাগরে এই দুই নেতাই অবগাহন করেছেন। নেহর্‌ শান্তি পর্রস্কার তাই সামগ্রিকভাবে ভারতীয় সাধনারই স্বর্‌পটিকে মহাবিশ্বে আর একভাবে উপস্থাপিত করার প্রয়াস। ১৯৬৫ সালের জন্য নেহর্‌ পর্রস্কার প্রদান করে রাষ্ট্রসংঘের সেক্রেটারী জেনেরাল ইউ থাণ্টের আন্তর্জাতিক বুঝাপড়ার ব্যাপারে বিশেষ অবদানকে সম্মান প্রদান করা হয়েছে।

নেহর্‌ পর্রস্কার যে বিশ্বশান্তি প্রতিষ্ঠায় বিশেষ অবদানের জনাই প্রদত্ত হবে এবং প্রথম পর্রস্কার সেই হিসেবেই প্রদত্ত হল এটাই স্বাভাবিক। 'নেহর্‌ পর্রস্কার' সেজন্য প্রকৃত অর্থে নেহর্‌ 'শান্তি' পর্রস্কার। ১৪ই নভেম্বর নেহর্‌জীর জন্মদিন উপলক্ষে এই পর্রস্কার এক বিশেষ অনুষ্ঠানে নয়াদিল্লীতে নিজে এসে গ্রহণ করার জন্য আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে ইউ থাণ্টকে।

ভারতীয় সংস্কৃতি সম্পর্কে পরিষদের উদ্যোগে এক লক্ষ মুদ্রার নেহর্‌ পর্রস্কার সৃষ্টি করেছেন ভারত সরকার। এই অর্থ বিদেশী মুদ্রায় পরিবর্তিত করা যাবে। স্বয়ং রাষ্ট্রপতি এই পর্রস্কার উপহার দেবেন বলে স্থির আছে।

দাগ হ্যামারশিল্ডের আকস্মিক মৃত্যু ঘটে অগ্নিগর্ভ কংগোয় ১৯৬১ সালে। ইউ থাণ্ট অতঃপর হ্যামারশিল্ডের শূন্য আসনে প্রতিষ্ঠিত হ'ন আর তারপর থেকেই তিনি আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে ইউ এন সেক্রেটারী জেনেরালের উপযুক্ত নিরপেক্ষ সমমনোভাবাপন্ন দৃষ্টি নিয়ে বিভিন্ন রাষ্ট্রের মধ্যে সমঝোতা সৃষ্টির জন্য এতোকাল একান্তভাবে তাঁর ক্ষমতা প্রয়োগের চেষ্টা চালিয়ে এসেছেন। কিন্তু বিচার করব বললেই বিচারক মানছে কে।

ইউ থাণ্ট

ইউ থাণ্ট বর্তমানে সেজন্যই তাঁর বর্তমান পদে থাকতে আর রাজী নন। ভিয়েতনামে শান্তি প্রচেষ্টার উদ্যোগ তিনি কার্যকর করতে পারেন নি শক্তিশালী রাষ্ট্রের একগ্রুঁয়েমীর জন্য। ভিয়েতনামে অমানবিক বর্বরতার বিরুদ্ধে শ্রীথাণ্ট প্রতিবাদ জানিয়েছেন। কিন্তু এই বর্বরতা বন্ধ করতে পারেন নি। কয়েকটি শক্তিশালী রাষ্ট্রের অঙ্গুলী হেলনে এই দায়িত্বপূর্ণ কাজ চালিয়ে যাওয়ার মতো বিড়ম্বনা আর কি থাকতে পারে। ইউ থাণ্টও তাই চান না শক্তি জোটের হাতের পুতুল হয়ে সাজানো সেক্রেটারী জেনেরালের গর্‌দায়িত্ব বহন করতে। সেক্রেটারী জেনেরালের এহেন সিদ্ধান্তই সমগ্র বিশ্বের সামনে তাঁকে অনন্য ব্যক্তিস্বর্‌পে খাড়া করেছে।

আগামী ১৪ই নভেম্বর ইউ থাণ্ট যদি নেহর্‌ পর্রস্কার গ্রহণ করতে ভারতে পদার্পণ করেন তবে ভারতবাসী এই দৃঢ়চেতা ব্যক্তিত্বের আতিথ্য গ্রহণে আপনাদের ধন্য মনে করবে। নেহর্‌জীর শান্তির স্বপ্নে আজও অবিচলিত ভারতবর্ষ থাণ্টকে নেহর্‌ জন্মদিবসে কাছে পেয়ে নেহর্‌ স্মৃতিবার্ষিকী পালনের কালে ভাববার অবসর পাবেন, হিংসায় উন্মত্ত পৃথিবীর বুকে হানাহানি আসবে যাবে, শান্তির স্বপ্ন তবুও থাকবে অক্ষয় হয়ে।

নেহর্‌ গোলটেবিল বৈঠক

নয়াদিল্লীতে আন্তর্জাতিক নেহর্‌ গোলটেবিল সম্মেলনে বহু গুণীজন বিশেষ বিতর্ক সভায় মিলিত হয়েছিলেন। গুণীজন সম্মেলনে অনেক গুরুগম্ভীর প্রশ্নেরও আলোচনা হয়েছে। ভারতের

মাটিতে এহেন বৈঠকও নেহরু ভারতের আন্তর্জাতিক সমঝোতার জন্য একান্ত আগ্রহই আর একভাবে প্রকাশ করে।

দোসরা অক্টোবর

দ্বিতীয়-বিহীন দোসরা অক্টোবর ভারতের ইতিহাসে শান্তির পূজারী ভারতের দুই জীবন্ত আলেখ্যের জন্মদিন, পুণ্য পবিত্র দিন।

এই একটি স্মরণীয় দিবসে জন্মগ্রহণ করেছিলেন শান্তিপথিক মহাত্মা গান্ধী এবং শান্তি প্রতিষ্ঠাকামী লালবাহাদুর শাস্ত্রী। একজন শান্তির বাণী জগতে প্রচার করেছেন, অন্যজন সেই আদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়ে আজীবন শুদ্ধাচারী জীবন-যাপন করে জাতিকে বলিষ্ঠ শান্তিমন্ত্রে দীক্ষা দিয়ে গেছেন। একজন শান্তির জন্য ত্যাগ এবং অহিংসাকে মন্ত্র করেছেন। শাস্ত্রীজী শান্তিরক্ষার জন্য শান্তিরক্ষকের শৌর্য প্রদর্শনের প্রয়োজনীয়তা বিশেষভাবে উপলব্ধি করেছেন।

একজন শান্তির জন্য অশান্তি সৃষ্টিকারীর অনেক বায়না সহ্য করেছেন; অন্যজন অন্যায়কারীকে প্রত্যুত্তর দানের দ্বারাই শান্তি লভ্য বলে বিশ্বাস করে গেছেন এবং তার আংশিক প্রতিষ্ঠাও দিয়ে গেছেন ভারতের ইতিহাসে। নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্য। আত্মার অভিপ্রেতকে প্রেয়কে লাভ করতে হলে তাকে শৌর্যবানও হতে হবে। অনাস্থা সৃষ্টির মূলেই যে মাৎসন্যায় তাকে জব্দ করা সম্ভব নয়।

একজন শান্তির মনোভাবকে ভারতের মর্মমূলে প্রবিষ্ট করিয়ে গেলেন (আধ্যাত্মিক জগৎ থেকে রাজনীতির নিষ্ঠুর প্রাঙ্গণে।) অন্যজন সেই বিশ্বাসকে কার্যে রূপায়িত করার পথপ্রদর্শন করে গেলেন তাসখন্দ চুক্তি সম্পাদন করে।

দোসরা অক্টোবর এই দুই মহাব্যক্তিদের শুভ আবির্ভাব দিবসে আমরা আমাদের কৃতজ্ঞতা ও প্রণাম তাঁদের পুণ্য স্মৃতির উদ্দেশ্যে অর্ঘ হিসেবে নিবেদন করি।

আসাম ঃ

দ্বন্দ্ব

সেপ্টেম্বর মাস চলে গেছে, আসাম মন্ত্রিসভায় কিন্তু শ্রীদেবকান্ত বড়ুয়া নিজেকে স্বস্থানেই ধরে রেখেছেন। অর্থাৎ সক্রিয় প্রচেষ্টার দ্বারাও মুখ্যমন্ত্রী শ্রীবিমলাপ্রসাদ চালিহা তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বী শিক্ষামন্ত্রী শ্রীবড়ুয়াকে ক্যাবিনেট থেকে অপসারিত করতে সক্ষম হলেন না। হাইকম্যান্ডও সাড়া দেন নি শ্রীচালিহার আবেদনে। অতএব আসাম ক্যাবিনেট দুই প্রধানের দ্বন্দ্বভূমি হয়েই রইল। এর্নাকুলামে নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির অধিবেশনে যোগদান না করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে অতঃপর তাঁর বিরাগকে ভালমত প্রকাশ করলেন শ্রীচালিহা। বস্তুত মুখ্যমন্ত্রী শ্রীচালিহার আবেদনে কংগ্রেস হাইকম্যান্ড যে রকম ডোন্ট-কেয়ার ভাব দেখিয়েছেন (প্রকাশ, শ্রীবড়ুয়াকে ক্যাবিনেটচ্যুত করার জন্য শ্রীচালিহা হাইকম্যান্ডে লিখিত পত্রে আবেদন করেছিলেন), তাতে মুখ্যমন্ত্রীর পক্ষেও কিছু একটা করা নিতান্ত প্রয়োজন ছিল। শ্রীবড়ুয়ার বিরুদ্ধে উষ্মা প্রকাশের অন্যতর পথও নেই। শ্রীবড়ুয়াও জানিয়ে দিয়েছেন যে, পদত্যাগ কর বললেই তাঁকে নড়ানো যাবে না, সরাতে হলে গোটা ক্যাবিনেটকেই পদত্যাগ করে নতুন ক্যাবিনেট গঠন করতে হবে শ্রীচালিহাকে। কিন্তু সে ব্যাপারে জল অনেক গভীর। তাই শ্রীচালিহাও অধিকদূর অগ্রসর হওয়া সমীচীন বোধ করেন নি। কংগ্রেস

লালবাহাদুর শাস্ত্রী

সভাপতির নিকট এজন্যই সাহায্য চেয়ে পত্র লিখেছিলেন নাকি তিনি।

অভিজ্ঞমহলের ধারণা, কিছুদিন আগে নতুন দিল্লীতে চালিহা-বড়ুয়া সমঝোতার একটা ব্যবস্থা করা হয়েছিল। ফল হয় নি। প্রকাশ, চালিহা নাকি বলেছেন, শিক্ষামন্ত্রী শ্রীবড়ুয়া কংগ্রেস সদস্যদের মুখ্যমন্ত্রীর বিরুদ্ধে উত্তেজিত করার চেষ্টা করেছেন। শ্রীবড়ুয়া অন্যদিকে মুখ্যমন্ত্রীর বিরুদ্ধবাদী সদস্যদের তালিকা প্রচার করেছেন মুখ্যমন্ত্রীর প্রতি বিরূপ মনোভাবকে সংগঠিত করার জন্য। নির্বাচনের প্রাক্কালে কোন রাজ্যেই হাইকম্যান্ড ক্ষমতা হস্তান্তরের পক্ষপাতী নন। এজন্য কংগ্রেস সভাপতি মুখ্যমন্ত্রীকে আশ্বস্ত করেছিলেন এই স্তোক দিয়ে যে, তাঁর বিদেশ সফর থেকে ফিরেই তিনি আসাম কংগ্রেসের ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করবেন।

আসাম ক্যাবিনেট বর্তমানে দ্বিধা-বিভক্ত। মুখ্যমন্ত্রী ও শ্রীবড়ুয়ার ঘর। এঁদের উভয়ের বর্তমানে মুখ দেখাদেখি পর্যন্ত নেই, বাক্যালাপ তো দূরের কথা। এ পর্যন্ত তবু এক রকম বোঝা যায়। কিন্তু অভিজ্ঞমহল আরও সাংঘাতিক অভিযোগ তুলে ধরেন আসাম মন্ত্রিসভার বিরুদ্ধে।

প্রকাশ, আসাম রাজ্যে গত অগাস্ট মাসে ক্ষমতাসীন দলে যে দলগত রেষারেষি দেখা গিয়েছিল তার মূলেও বেশ বড়রকম ক্রিয়া করেছে চালিহা-বড়ুয়া বিসম্বাদ।

শ্রীবড়ুয়াকে কায়দা করার জন্য চালিহা যে চাল চেলেছিলেন, তাতে অন্তত ধানকল মালিকগণ এবং ব্যবসায়ী সম্প্রদায়কে হাত করার রাজনীতিতে তাঁর কিছুটা সাফল্যলাভ হয়েছিল বলে অনেকের ধারণা।

শ্রীচালিহা রাতারাতি সংগ্রহ-নীতিতে রদবদল করে ব্যবসায়ী ও ধানকল মালিকদের ঢালাও লাইসেন্স দিয়ে সংগ্রহ কার্যের অনিয়ন্ত্রিত সুযোগ দান করলেন। অথচ কো-অপারেশনের পোর্টফোলিও ছিল শ্রীবড়ুয়ার দখলে। রাজ্য সরকারের তরফে সংগ্রহ কার্য চালাতেন আসাম রাজ্য কো-অপারেটিভ আপেক্স সোসাইটি। অবশ্য অভিযোগ শ্রীবড়ুয়ার বিরুদ্ধেও প্রায় সমান্তরালভাবেই বর্তমান। জানা যায়, শ্রীবড়ুয়া নাকি তাঁর পোর্টফোলিও নিজের ভোটার সংগ্রহের কাজে লাগাচ্ছিলেন। আপেক্স মার্কেটিং-এর একচেটিয়া অধিকার বলে বিভিন্ন জেলায় চালিহা-বিরোধী জোট গঠনের কাজে এই একচেটিয়া অধিকারকে কাজে লাগিয়েছেন। ওদিকে চালিহার প্রসাদ লাভ করে এক-একটি জোট সংগ্রহের ব্যাপারে বেশ কিছু সুবিধা সুযোগ লাভ করে আসছিলেন। কিন্তু এই ব্যবসায়ী সুযোগভোগীদের সাম্রাজ্য প্রথমাবধি অনায়াসলভ্য হয় নি। ছাত্র সম্প্রদায়ের অগাস্ট খাদ্য আন্দোলনকে গৌণভাবে নাকি উক্ত সুযোগভোগীদের বিরুদ্ধে ব্যবহার করা হয়েছিল। বিভিন্ন জায়গায় এদের ওপর ছাত্ররা চড়াও হয়েছিলেন বলেও কোন কোন মহলে অভিযোগ আছে। অন্তত এ সংবাদের সত্যতাকে উল্টোভাবে প্রমাণ করা যায়। প্রকাশ, ডিব্রুগড়ে সুযোগভোগীরা ছাত্র-শোভাযাত্রা আক্রমণ করেন। ডিব্রুগড়ে

লাঠি, সোডার বোতল এবং জোড়হাটে এ্যাসিড বাল্ব ছিল সুযোগভোগীদের হাতিয়ার।

অভিযোগে আরও প্রকাশ, নওগাঁ প্রভৃতি জায়গায় ছাত্ররা যখন সভা করছেন, পুলিশের উপস্থিতিতেই তখন সমাজ-বিরোধী সম্প্রদায়ের দ্বারা দোকান-বাজার লুঠ হচ্ছে। লুঠতরাজ যখন অবাধে অনুষ্ঠিত হল, আই. পি এ সংবাদ সংস্থা জানাচ্ছেন, তখনই পুলিশের টনক নড়ল এবং তাঁরা "কিছু সংখ্যক কমিউনিস্ট পাকড়াও করলেন, কিন্তু দোষীদের সসম্মানে ছেড়ে দেওয়া হল।"

মুখ্যমন্ত্রী চালিহাকে মাথায় হাত দিয়ে বসতে হল—"কি ফল লভিনু হায়" অবস্থা। মজুতদার শ্রেণী, যাদের জন্য মুখ্যমন্ত্রীর এতো প্যাঁচ, এতো জাল দৃষ্টি, ভাগ্যের ফেরে তাঁরাও সদলবলে বেঁকে বসলেন, অভিযোগ, মুখ্যমন্ত্রী সমাজ-বিরোধীদের ঠেঙিয়ে তাঁদের মজুত ও গুদাম বাঁচাতে পারেন নি। ওদিকে জনসাধারণ মুখ্যমন্ত্রীর মুখোস-খোলা মুখ দেখে চটে আগুন। অভিযোগ, মুখ্যমন্ত্রীই মজুতদার ও মুনাফা লুঠেলদের দিকে লম্বা সিঁড়ি এগিয়ে দিয়েছেন। লুটে-পুটে খাওয়ার নির্বিচার ব্যবস্থা তাই তাঁরা রানচাল করে দিতে মনে মনে প্রস্তুত হলেন। মুখ্যমন্ত্রীর ভোটার-জোট সংগঠনের স্বপ্ন ভরাডুবি হতে বসল।

রাজনীতির নোংরামি বড় সাংঘাতিক। রাষ্ট্রনীতি দেবতাকে তুষ্ট করতে হলে জ্যান্ত মানুষ বলি দিতে হয়। ইতিহাস এমন বলি অনেকবার দিয়েছে। প্রকাশ, আসামের নড়বড়ে রাজনীতির দেব-দেউলেও দু-পক্ষের যে যাগযজ্ঞ অনুষ্ঠিত হচ্ছিল, সেখানে রাষ্ট্রনীতির কুটিল শয়তান দেবতার পরিতৃপ্তির জন্য বলিদানপর্বও অনুষ্ঠিত হয় দশই আগস্ট পুলিশী গুলীচালনার দ্বারা। সাধারণ ঠেঙিয়ে হত্যা করে, জখম করে, চালিহা-বিরোধীরা নাকি চালিহা মন্ত্রিসভাকে জন-অপ্রিয় করতে চেয়েছিলেন—আই পি এ সংবাদ-দাতা কোন কোন মহলের এহেন অভিযোগকেও নথিবদ্ধ করেছেন।

উত্তর প্রদেশ।

ফ্যুয়েরারের ফ্যান

উত্তর প্রদেশের ফ্যুয়েরার শ্রী সি বি গুপ্ত বর্তমানে কেন্দ্রীয় অর্থ মন্ত্রণালয়ের ওপর অত্যন্ত খাপ্পা হয়ে উঠেছেন। লক্ষ্ণৌ-এ এক জনসভায় ফ্যুয়েরারের জন্মদিন উপলক্ষে তাঁর ফ্যানরা পঁয়তাল্লিশ লক্ষ টাকার একটি তোড়া প্রদান করেন। (ভারত দর্শন পাঠকবর্গের স্মরণ থাকতে পারে, এই 'গুপ্ত ফান্ড' নিয়ে অনেক গুপ্ত কীর্তিকলাপ অর্থাৎ রাজ্যে ক্ষমতা অধিকারের ব্যাপারে অনেক রকম গুপ্ত প্রচেষ্টার বহুতর সমালোচনা হয়ে গেছে। রাজ্য কংগ্রেসী নেতারাও এ নিয়ে হরদম হাইকম্যান্ডে দরবার করেছেন। শ্রীগুপ্ত কোন্ অধিকারে এতো কাঁচা টাকা পার্টির হাতে তুলে না দিয়ে নিজের হেপাজতে রেখে খুশিমত বিলি-বন্দোবস্ত করে স্বদলের জন্য অনুগৃহীত সমাজ সৃষ্টি করবেন, প্রশ্ন হয়েছিল তা নিয়েও। কিন্তু উত্তর প্রদেশ ফ্যুয়েরারের একগুঁয়েমী টলানো কারও সাধ্যে কুলায় নি।)

কেন্দ্রীয় অর্থ মন্ত্রণালয় অতঃপর একটা পরোক্ষ চাপের ব্যবস্থা করেছেন। সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে এই মর্মে যে, শ্রীগুপ্তের জন্মদিনে প্রাপ্ত টাকার ওপর যথাযথ আয়কর ধরা হবে। শুধু তাই নয়, শ্রীগুপ্তের 'ফ্যান'রা কোত্থেকে এই টাকা উপায় করলেন (অর্থাৎ ওগুলি কালোটাকা কি-না) তারও অনুসন্ধান চালানো হবে।

শ্রীগুপ্তের, সুতরাং চটে ওঠা স্বাভাবিক। তিনি বলছেন, টাকাটার ওপর আয়কর ধার্য করার কোনও যুক্তিসংগত কারণ নেই। কেন না, তাঁর ওপর আস্থাভাজন তাঁর সমর্থক সম্প্রদায় পঁয়তাল্লিশ লক্ষ টাকা তাঁকে খুশিমত বণ্টন করার অধিকার দিয়েছেন। তবে, সেটাই বড় কথা নয়। আসল কথা হল, ঐ টাকা তো আর শ্রীগুপ্তের সিন্দুকে উঠছে না। ঐ টাকা দিয়ে তিনি একাধিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে সাহায্য করবেন (অবশ্য নিজের ইচ্ছামত)।

ঐ 'ইচ্ছেমত' ব্যাপারটাতেই আপত্তি। শ্রীগুপ্তের ওপর এই হিটলারী ক্ষমতা যাঁরা অর্পণ করতে চান তাঁদের উদ্দেশ্যেও সে-কারণেই সন্দেহভাজন। আর হুট বলতেই পঁয়তাল্লিশ লাখ টাকা ঘড়া উপুড় করে কারা ঢেলে দিলেন তাও সরকারের পক্ষে অনুসন্ধান করে দেখা কর্তব্য বৈকি? বিশেষত দেশের আকাশে-বাতাসে, মাটিতে-ময়দানে যখন কালোটাকা ধুলোবালির মতই উড়ছে।

সুতরাং অর্থ মন্ত্রণালয়ের সিদ্ধান্তে ফ্যুয়েরার-প্রেমী সমাজ ছাড়া গোটা দেশ-টাই যে খুশি হবেন এতে আর সন্দেহ কি। শ্রীগুপ্ত, সুতরাং, বেকায়দায় পড়েছেন সন্দেহ নেই; কিন্তু গুপ্ত ফান্ড যে 'ফ্যান' সম্প্রদায় ভরিয়ে তুললেন, তাঁদের ফ্যাসাদই বোধহয় সবচেয়ে বেশি। কারণ, ওঁরা আবার এই কুবেরের সম্পত্তি কোথা থেকে অর্জন করলেন, অর্থ মন্ত্রণালয় তাও দেখবেন। কেঁচো খুঁড়তে সাপ না বেরলেই মঙ্গল।

মাদ্রাজ।

প্রার্থী নির্বাচনে কংগ্রেস

মাদ্রাজের প্রার্থী মনোনয়নের ক্ষেত্রে এখন প্রধান দুই ভূমিকায় কর্মব্যস্ত আছেন মুখ্যমন্ত্রী শ্রীভক্তবৎসলম এবং শ্রী টি, টি, কৃষ্ণমাচারী। কংগ্রেসী প্রার্থী মনোনয়নে আঞ্চলিক জনপ্রিয়তা খতিয়ে দেখার জন্য এই দুই প্রধান রাজ্যের বিভিন্ন অঞ্চল অকুস্থলে পরিদর্শন করেও এসেছেন। আগামী ১৫ই অক্টোবর পর্যন্ত প্রার্থীদের আবেদনপত্র গ্রহণ করবেন এবং নভেম্বরের শেষাশেষি মনোনীত প্রার্থী তালিকা সম্পূর্ণ হবে বলে আশা করা হচ্ছে। দুই প্রধানই আশায় আশ্বস্ত, কল্পনায় আকাশ-স্পর্শী। এঁদের ধারণা কংগ্রেস এবার মাদ্রাজে বর্তমানের মতই সংখ্যা-গরিষ্ঠতা লাভ করবে, চাই কি বেশি আসনও পেয়ে যেতে পারে।

যাঁরা ইতিমধ্যে এক-একজন ভি, আই পি হয়ে উঠেছেন, মনোনয়নের সময় তাঁদের সর্বাধিকার দেওয়ার কথা চিন্তা করা হচ্ছে। যেমন কোয়েম্বাটুরের পোলাচি থেকে পয়লা নম্বর প্রার্থী হিসেবে গণ্য হয়েছেন বহু-আলোচিত শ্রী সি সুব্রহ্মণিয়ম, কেন্দ্রীয় খাদ্যমন্ত্রী। বর্তমান যে সমস্ত সদস্যরা নির্বাচন-তরণী বেঁধে যেতে পারবেন বলে আশা আছে, তাঁদের এলাকায় দোসরা মনোনয়নের কোন সমস্যা সৃষ্টি করা হবে না। সে হিসেবে শ্রীমতী চন্দ্রশেখর, শ্রীআলেগেসান, শ্রী সি বি পট্টভিরমণ প্রথম পছন্দে উত্তীর্ণ। টি টি কে নিজে আবার লোকসভা আসনের জন্য নির্বাচনে নামবেন কিনা তা এ পর্যন্ত অস্থিরীকৃত। তবে তিনি যে ধনুক-ভাঙা পণ নিয়ে বসে নেই তা একরকম বলা যেতে পারে। টি টি কের সর্ত হল, কংগ্রেসের বহুল প্রচারিত সমাজতন্ত্রবাদকে প্রতিষ্ঠার সম্ভাবনা না থাকলে তিনি আর নির্বাচনে প্রার্থী হতে চান না। বস্তুত টি টি কে সরকারের অর্থনীতি চিন্তায় সম্পূর্ণ সায় দিতে অক্ষম হওয়াতেই মন্ত্রিত্ব ত্যাগ করতে বাধ্য হয়েছিলেন। সুতরাং টি টি কের অনিচ্ছায় একথা মনে হতেই পারে যে, কংগ্রেসের নেতৃস্থানীয়গণ এখনও কংগ্রেসী ম্যানিফেস্টোয় নিজেরাই আস্থাশীল নন। নচেৎ ম্যানিফেস্টো তো সমাজতন্ত্রবাদের চর্বিতচর্বণ এবারেও করেছে। তবু টি টি কে আশ্বস্ত নন কেন!

দক্ষিণ মাদ্রাজে টি টি কে-র মত জনপ্রিয় নেতাকে খাড়া করে ডি এম কে অধিকৃত আসনটি দখল করার যথেষ্ট সম্ভাবনা আছে। এই আসনে টি টি কে ক্রমান্বয়ে ১৯৫২ ও ১৯৫৭ সালে নির্বাচিত হন। বর্তমানে আসন অধিকারী

"ভারি খুশি
হলুম শুনে যে
কাল রাত্তিরে
খুব তৃপ্তি ক'রে
খেয়েছ—
সব কিছুই আমি
কুসুম বনস্পতিতে
রেঁধেছিলাম।"
"বলতে চাও লুচি, তরকারি···সব কিছুই ?"
"হ্যাঁ ভাই, এমন কি মিষ্টি খাবারগুলোও। দেখ্ মালা, রাঁধবার পক্ষে কুসুম সত্যিই খুব ভালো। যেমন টাটকা, তেমনি খাঁটি। ২-কেজি ৪-কেজির সীল-করা টিনে পাওয়া যায়। আনতে-নিতেও খুব সুবিধে।"
"শুনে আমার লোভ হচ্ছে। কুসুম কিনে দেখতে হবে তো !"
"দেখিস। তোর রান্নার স্বাদ দেখবি আগের চেয়ে আরও ভাল হয়ে গেছে।"
কুসুম বনস্পতি 'এ' আর 'ডি' ভিটামিনে সমৃদ্ধ। এর
উৎকর্ষ সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত থাকতে পারেন, কারণ কুসুম বনস্পতি
উৎপাদনের প্রত্যেকটি স্তরে ল্যাবোরেটারীতে পরীক্ষিত।
স্বাস্থ্যসম্মত রীতিতে টিনে ভ'রে কারখানায় সীল করা হয়।
সব জায়গায় টাটকা পাবেন।
খাঁটি স্বাদ পেতে হ'লে
কুসুম
বনস্পতি দিয়ে রাঁধুন
KUSUM
VANASPATI
ENRICHED WITH VITAMINS A & D
2
Kg Nett
KUSUM PRODUCTS LIMITED
কুসুম প্রোডাক্টস লিমিটেড,
কলিকাতা-১
KPK 2964A

ডি এম কে নেতা শ্রী কে মনোহরণ। টি টি কে রাজী না হলে কংগ্রেসের পক্ষে অপর জনপ্রিয় নেতা শ্রী ভি কে কৃষ্ণমেননকে উক্ত আসনে প্রতিদ্বন্দ্বী খাড়া করতে হবে। যেখানে কংগ্রেস ধরাশায়ী সেখানে তাকে খাড়া করে দাঁড় করিয়ে দিতে পারেন একমাত্র বামমার্গীয় কংগ্রেসী নেতারা। তাই কৃষ্ণমেননকে বম্বে প্রদেশ কংগ্রেস কমিটি জায়গা দেব না বলে বেঁকে বসলেও, বসে-যাওয়া কংগ্রেসকে একমাত্র তিনিই তুলে দাঁড় করাতে সক্ষম একথা মদগর্বী দুর্বল কংগ্রেসী নেতারাও বেশ ভাল করেই জানেন।

গুজরাট:

মাগ্গীভাতায় সমতা

গুজরাট বিধানসভায় এক অভিনব কাণ্ড ঘটে গেছে গত ২৮শে সেপ্টেম্বর। বিরোধী এবং কংগ্রেসী সদস্যগণ একযোগে রাজ্য সরকারকে রাজ্য সরকারী কর্মচারীদের মাগ্গীভাতার হার কেন্দ্রীয় সরকারী কর্মচারীদের সঙ্গে সমান হারে বেঁধে দেওয়ার জন্য দাবি করেছেন।

মাগ্গীভাতার প্রশ্নে রাজ্যে কেন্দ্রে কোন রকম অসাম্য রক্ষা করা অনুচিত বলে সমস্বরে সদস্যগণ বক্তৃতা করলে এতদিনে এক আশ্চর্য উপায়ে পাথর গলতে শুরু করেছে। মহারাষ্ট্রে এ পাথর বর্তমানে গলন্ত। গুজরাটও বলছে, মূল্যমানে যখন ফারাক নেই তখন সরকারী কর্মীদের ক্ষেত্রে মাগ্গীভাতায় তারতম্য কেন। বস্তুত সরকারী ক্ষেত্রে এই অসাম্য কংগ্রেসী ভারত সরকারের উচ্চাভিলাষী সমাজতান্ত্রিক সমাজ প্রতিষ্ঠার আলোকে একটা দন্তুর ব্যঙ্গের হাসি বলেই মনে হয়। যাঁরা করবেন সমাজবাদী সমাজ, তাঁদের নিজের কর্মচারীরাই অসম পে স্কেল আর মাগ্গীভাতার শিকার। এ ব্যবস্থায় যুক্তি তো নেই-ই বেযুক্তিই আসল যুক্তি। কিন্তু সে সম্পর্কে অধিক মন্তব্যে বর্তমানে বিরত থাকছি, কারণ কেন্দ্রে রাজ্যে সরকারী কর্মচারীদের প্রতি অসম দৃষ্টিপাত সম্পর্কে আমরা 'সাপ্তাহিক বসুমতী'র পৃষ্ঠায় বহুদিন যাবৎ আলোচনা চালিয়ে যাচ্ছি এবং মনে করি মহারাষ্ট্র গুজরাটের মতো অচিরকাল মধ্যেই অন্যান্য রাজ্যেও কেন্দ্র রাজ্য সরকারী কর্মচারীদের মাহিনা এবং মাগ্গীভাতার অসাম্য ও ফারাক ঘুচিয়ে দেওয়ার জন্য রাজ্য সরকারগুলি গভীরভাবে চিন্তা করবেন। অর্থনৈতিক দিক দিয়ে এ ফারাক রক্ষা করার কোন যুক্তি তো নেইই, কর্মচারীদের যোগ্যতার প্রশ্নেও কেন্দ্রে রাজ্যে সরকারী কর্মচারীদের শ্রমমূল্য নির্ণয়ের ক্ষেত্রেও অসাম্য রক্ষা করার পক্ষে কোন 'খোঁড়া যুক্তিই' টেকসই নয়। গুজরাট বিধান সভায় বিতর্ককালে গুজরাটের অর্থমন্ত্রী স্বীকার করেছেন, গুজরাট সরকারের রাজ্যে সরকারী কর্মচারীদের প্রতি যথেষ্ট সহানুভূতি বর্তমান কেন না তাঁরাও কেন্দ্রীয় কর্মচারীদের সমতুল যোগ্যতাসম্পন্ন পরিশ্রমী। সুতরাং এর পরেও কেন্দ্রে রাজ্যে রাজ্য সরকারগুলি পে-স্কেলে অসাম্য টাঙিয়ে রাখতে পারেন শুধু একটি মাত্র ধুয়ো তুলে। টাকা নেই।

সেই একচক্ষু যুক্তি। টাকা না থাকে তার সংস্থান করতে হবে। আর সেজন্য কেন্দ্রীয় সরকারকেও একটু মাথা ঘামাতে হবে বৈ কি। অসাম্য দূর করব বলে গাওনা গাওয়া হচ্ছে আজ এক যুগ। তবে সরকার তার নিজের কর্মচারীদের ক্ষেত্রেই এই অসাম্য আর কতকাল বহাল রাখবেন। সরকারের অসাম্য দূরীকরণের আওয়াজ যে 'সম্ভবামি যুগে যুগে' তাতে অবশ্য এ পর্যন্ত সন্দেহ প্রকাশের কোন কারণ ঘটে নি। কিন্তু বর্তমানে সমগ্র ভারতব্যাপী রাজ্য সরকারী কর্মীরা যেভাবে সমস্বরে নিজেদের দাবি দাওয়া ঐক্যবদ্ধভাবে উপস্থিত করতে আরম্ভ করেছেন, তাতে সরকারের পক্ষে আজ হোক কাল হোক, এ বিষয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতেই হবে। কয়েকটি রাজ্যে সরকার নমনীয় হতে শুরু করেছেন, অন্যান্য ক্ষেত্রেও চাপের প্রতি সম্মান প্রদর্শন না করে পথ থাকবে বলে ভরসা হয় না।

অন্ধ্র:

বামজোট: অনিশ্চিত ভবিষ্যৎ

বামজোট গঠনে বাম-দক্ষিণ কমিউনিস্টদের ঘরোয়া বিবাদ অন্ধ্রের নির্বাচনী ভবিষ্যৎকে অনিশ্চিত ও তিমিরাচ্ছন্ন করে রেখেছে। এই দুদলের দলাদলিরই অনুরূপ স্বপ্রকাশ হয়ে পড়েছিল দিল্লীতে দুই কমিউনিস্ট নেতা শ্রীসুন্দরায়া এবং শ্রীরাজেশ্বর রাও-এর চিন্তায়।

সেপ্টেম্বরের তৃতীয় সপ্তাহ পর্যন্ত বাম ও দক্ষিণীদের দু-দুবার রাজ্যওয়ারী বৈঠক বসেছে, ফল হয় নি কিছুই।

ট্রেড ইউনিয়ন ফ্রণ্টের বিপদটা বেশ ঘোরালো হয়ে উঠল, যখন দক্ষিণীরা জনৈক বাম ট্রেড ইউনিয়ন নেতাকে দক্ষিণীদের আক্রমণ করে প্রবন্ধ লেখার জন্য দোষারোপ করলেন। দক্ষিণীরা পরিবহন সংস্থার (ব্যক্তি মালিকানার) মালিকদের সঙ্গে একটা আপোষ-মীমাংসায় উপনীত হয়েছেন বলে বামপক্ষ তীব্র সমালোচনা করেছিলেন।

বামপক্ষ দক্ষিণীদের ওপর খড়্গহস্ত, কেন না, দক্ষিণীরা রাজ্য ট্রেড ইউনিয়নের সভাপতিকে "নারদ" (disrupter) বলে গালিগালাজ করেছেন।

ওদিকে পারস্পরিক দোষারোপ চললেও বিগত ১১ই ও ১৫ই তারিখে আবার এঁরা একই ছাদের তলায় মিলিত হয়ে রাজ্যব্যাপী বন্ধ আহ্বানের বিষয়টি নিয়ে আলোচনাও চালিয়ে গেছেন।

অবশ্য শুধু এই কারণেই বামজোট 'গেল গেল' চিন্তায় চুল পাকানোর যথেষ্ট কারণ নাও থাকতে পারে। দ্বিধা-বিচ্ছিন্ন কমিউনিস্টগণ এখন বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে তাঁদের দখলীস্বত্ব নিয়ে বিবাদ বাধা এবং নিজেদের আদর্শ-বিরোধ নিয়ে আপন ঘরে কাদা ছোড়াছুড়িটা কিছু অস্বাভাবিক নয়। সেটাকেই বামজোটের ভাঙনের পূর্বাভাষ বলে গণ্য করা অসমীচীন।

তথাচ, বাম-দক্ষিণ বিবাদ মাসপাঁচেক শিকেয় তুলে আপাতত তাঁরা শক্তিশালী বামজোট গঠনে এগিয়ে আসুন এটাই কংগ্রেস-বিরোধী বিক্ষুব্ধ নাগরিকদের একমাত্র কামনা। সে আশা পূরণে বাম-দক্ষিণ কমিউনিস্টরা ঠিক ততটা গুরুত্ব আরোপ করছেন না, যতটা হলে নির্বাচকগণ নিশ্চিন্ত হতে পারতেন।

অন্ধ্র বন্ধ

অন্ধ্রে অক্টোবর বন্ধের প্রস্তুতি পুরোদমেই চলছে। বিরোধী দলগুলি ছাড়াও মধ্যবিত্ত এবং মেহনতী সমাজের বিভিন্ন সংস্থা, ট্রেড ইউনিয়ন এবং কিষাণ সভাগুলিও সেপ্টেম্বর-ভোর বৈঠক করেছেন।

এর মধ্যে আবার অসাধু ব্যবসায়ীদের প্রতি পুলিশী এ্যাকসনের প্রতিবাদে হরতাল হয়ে গেছে বাজারে।

আই, এন, টি, ইউ, সি (কংগ্রেস পরিচালিত) পর্যন্ত সরকারের মজদুর-বিরোধী মনোভাবের প্রতিবাদ জানিয়েছেন। সমগ্র অন্ধ্র রাজ্য জুড়ে এমনিই বেসামাল অবস্থা।

খাদ্য সমস্যাও রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে খুব ঘোরালো আকার ধারণ করেছে। নালগোন্দা, ওয়ারাঙ্গাল, অনন্তপুর এবং চিত্তোর বর্তমানে বিশেষভাবে সমস্যা-পীড়িত। রাজ্যের কংগ্রেস প্রধান শ্রী পি, থিম্মা কিন্তু বড়ই পরিতৃপ্ত মানুষ। যখন মুখ্যমন্ত্রী স্বয়ং চিত্তোর জেলাকে খাদ্য-সমস্যা পীড়িত অঞ্চল বলে ঘোষণা করছেন, শ্রীথিম্মা তখন হেঁকে উঠেছেন, আদৌ তা নয় বলে। অন্যদিকে বাম কমিউনিস্ট নেতা শ্রী টি, নাগি রেড্ডি অনশন চালিয়ে গেছেন কয়েকটি অঞ্চলকে দুর্ভিক্ষ প্রপীড়িত অঞ্চল বলে ঘোষণা করার দাবিতে।

তাসখন্দে শ্রীমতী ললিতা শাস্ত্রী

ভিয়েতনাম১

ভিয়েতনামে শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পক্ষ থেকে আর্থার গোল্ডবার্গ রাষ্ট্রসংঘ সাধারণ পরিষদের অধিবেশনে যে প্রস্তাব উত্থাপন করেছিলেন, মার্কিন মহলে তা যুগান্তকারী আখ্যা দেয়া হলেও, উত্তর ভিয়েতনাম, সোভিয়েট ইউনিয়ন ও ভিয়েতনাম মুক্তি ফ্রন্ট এই প্রস্তাব বিবেচনার অযোগ্য বলে প্রত্যাখ্যান করেছে। এদের মতে নতুন মার্কিন প্রস্তাব চাতুরীপূর্ণ এবং ভিয়েতনামের যুদ্ধে রাষ্ট্রসংঘকে নামাবার অপচেষ্টা মাত্র।

এ ভাবে শান্তি-প্রস্তাব প্রত্যাখ্যাত হওয়ায় লিনডন জনসন, ডিন রাস্ক প্রভৃতি মার্কিন কর্তারা ক্ষুন্ন হয়েছেন। কিন্তু তাই বলে তাঁরা হাল ছাড়েন নি। দেশের ভেতরে ও বাইরে জনসনের ভিয়েতনাম নীতির সমালোচনা এত তীব্র হয়ে উঠেছে যে, জনসনের পক্ষে আজ শান্তির জন্য আগ্রহ প্রকাশ না করে উপায় নেই।

ভিয়েতনামের ব্যাপারে নতুন শান্তি প্রচেষ্টার কথা ঘোষণা করা হয়েছে। ওয়াশিংটন থেকে ২৭শে সেপ্টেম্বর জানানো হয়েছে, আগামী ১৮ই অক্টোবর ফিলিপাইনসের রাজধানী ম্যানিলায় সাতটি রাষ্ট্রের এক শীর্ষ সম্মেলনে ভিয়েতনাম সমস্যা নিয়ে আলোচনা করা হবে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, দক্ষিণ ভিয়েতনাম, দক্ষিণ কোরিয়া, অস্ট্রেলিয়া, নিউজিল্যান্ড, ফিলিপাইনস ও থাইল্যান্ডের সরকারের প্রধানেরা ম্যানিলা শীর্ষ সম্মেলনে ভিয়েতনাম যুদ্ধের বর্তমান পরিস্থিতি ও শান্তির সম্ভাবনা নিয়ে নিজেদের মধ্যে আলোচনা করবেন। হোয়াইট হাউস থেকে ঘোষণা করা হয়েছে, রাষ্ট্রপতি জনসন নিজে এই সম্মেলনে উপস্থিত থাকবেন। ওয়াশিংটন থেকে ম্যানিলায় ফিরে এসে ফিলিপাইনসের রাষ্ট্রপতি ফার্ডিনান্ড মার্কোস ঘোষণা করেছেন, দক্ষিণ কোরিয়ার রাষ্ট্রপতি চুং হি পার্ক,

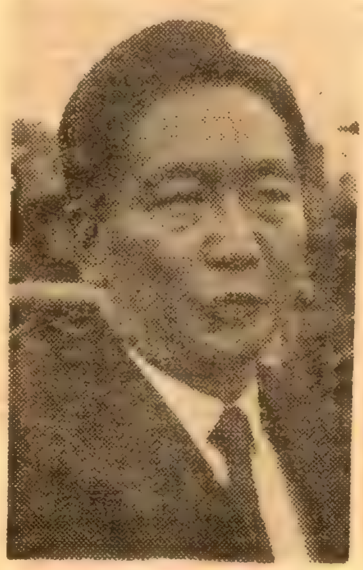

মার্কোস

থাইল্যান্ডের প্রধানমন্ত্রী থানম কিটিকাচরন ও মার্কোসের নামে সবাই-এর কাছে শীর্ষ সম্মেলনের আমন্ত্রণ পাঠানো হয়েছে। এই সম্মেলনে জাপানকে উপস্থিত করার জন্যও চেষ্টা করা হয়েছে। তবে টোকিও থেকে জাপানী পররাষ্ট্র দপ্তর জানিয়ে দিয়েছে, তাঁদের পক্ষে এই সম্মেলনে যোগ দেয়া সম্ভব হবে না। মার্কিন সেনেটে বক্তৃতা প্রসঙ্গে পররাষ্ট্র সম্পর্ক কমিটির চেয়ারম্যান ও জনসনের ভিয়েতনাম নীতির মুখ্য সমালোচক জে ডাবলিউ ফুলব্রাইট বলেছেন, ভিয়েতনামের সমস্যা সমাধানে এশীয় উদ্যোগ গ্রহণের চেষ্টা প্রশংসনীয়, এবং এই প্রসঙ্গে তিনি ম্যানিলা শীর্ষ সম্মেলনে জাপান ছাড়াও ভারত ও পাকিস্তানকে আমন্ত্রণ জানাবার জন্য প্রস্তাব করেছেন।

ম্যানিলা সম্মেলনের উদ্দেশ্য কি? যাদের ডাকা হয়েছে, তারা সবাই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সমর্থক—কেবল সমর্থক কেন এদের তাঁবেদারই বলা চলে, এবং এরা সবাই দক্ষিণ ভিয়েতনামকে যুদ্ধের জন্য সৈন্য, রসদ, ওষুধ প্রভৃতি দিয়ে সাহায্য করছে। সুতরাং, ভিয়েতনাম যুদ্ধের সঙ্গে যুক্ত মার্কিন পক্ষের রাষ্ট্রগুলির বৈঠক বসছে। কিভাবে ভিয়েতনাম যুদ্ধকে আরও জোরদার করা যায়, সে বিষয়ে সমাগত রাষ্ট্রনেতারা ম্যানিলা বৈঠকে আলোচনা করবেন, এ কথা ভাবাই স্বাভাবিক। তবু চারদিকের অবস্থা দেখে মনে হচ্ছে, যুদ্ধের আলোচনা হয়তো তাঁরা করবেন, কিন্তু তার পাশাপাশি

শান্তির সম্ভাব্য সূত্র সন্ধানের জন্যও তাঁরা চেষ্টা করবেন। ভিয়েতনাম যুদ্ধ অবসানের দাবিতে বিশ্বজনমতের চাপ এবার অত্যন্ত তীব্র। রাষ্ট্রসঙ্ঘের সেক্রেটারী-জেনারেল ইউ থাণ্ট কর্তৃক আর একটি বারের জন্য বিশ্ব সংস্থার মুখ্য কর্মসচিব পদ গ্রহণে অস্বীকৃতি, এবং এর জন্য প্রধানত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ভিয়েতনাম নীতি দায়ী এই মনোভাব প্রসার লাভ করায় জনসন সরকার খুবই বিব্রত বোধ করছেন। তাছাড়া আগামী নভেম্বর মাসে মার্কিন কংগ্রেসের কিছু নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে। তার আগে কোন একটা শান্তি-উদ্যোগ গ্রহণ করা জনসনের পক্ষে একান্ত আবশ্যক হয়ে পড়েছে। এই সব কারণে কোন কোন মহল আশান্বিত হয়ে উঠেছেন যে, ম্যানিলা বৈঠক থেকে হয়তো সত্যিই মীমাংসার উপযোগী একটা প্রস্তাব জন্ম নেবে।

তবে এ কথা ভুললে চলবে না যে, ম্যানিলা বৈঠকের নাম করে যে এশীয় উদ্যোগের কথা বলা হচ্ছে, তার কোন দাম নেই। যোগদানকারী সব রাষ্ট্রই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রভাবাধীন। সুতরাং, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র যে প্রস্তাব গ্রহণ করতে চাইবে, সম্মেলনে তাই গৃহীত হবে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র কি আলোচনার পূর্ব শর্তরূপে উত্তর ভিয়েতনামে বোমা বর্ষণ বন্ধ ও ভিয়েতনাম থেকে মার্কিন সৈন্য অপসারণে সম্মত হবে? একমাত্র এই পথেই মীমাংসা সম্ভব।

তানজানিয়া ঃ

সংযুক্ত আরব প্রজাতন্ত্রের রাষ্ট্রপতি আবদুল গামেল নাসের সরকারীভাবে তানজানিয়া সফরের উদ্দেশ্যে দার-এস-সালামে এসে পৌঁছলে তানজানিয়ার জনসাধারণ নাসেরকে বিপুলভাবে সম্বর্ধনা জানায়। তানজানিয়ার রাষ্ট্রপতি জোশেফ নিয়েরে বিমানবন্দরে নাসেরকে অভিনন্দন জানান।

তানজানিয়ার অন্যতম জাঞ্জিবার দীর্ঘকাল আরব প্রভুত্বে থাকায় তানজানিয়ার জনগণ আরবদের বিশেষ পছন্দ করে না। তা সত্ত্বেও নাসেরকে এভাবে অভিনন্দন জানাবার কারণ, নাসের আজ জাগ্রত আফ্রিকার প্রতিনিধি। কেবল তানজানিয়া নয়, বিষুবরেখার দক্ষিণে নাসেরের এই প্রথম সফর।

২৭শে সেপ্টেম্বর তানজানিয়া পার্লামেন্টে প্রদত্ত ভাষণে নাসের বলেন, বৃটেন, দক্ষিণ রোডেশিয়া ও পর্তুগাল—এই 'নয়া সাম্রাজ্যবাদী' দেশগুলি আজ আফ্রিকার স্বাধীন রাষ্ট্রগুলির বিরুদ্ধে এক চক্রান্তে লিপ্ত হয়েছে। বৃটেন বর্ণবৈষম্যকে প্রশ্রয় দিচ্ছে, দক্ষিণ আফ্রিকায় বর্ণবৈষম্য তীব্র আকার ধারণ করেছে, পর্তুগাল তার উপনিবেশে নতুন করে অত্যাচার সুরু করেছে। নাসের বৃটেনের রোডেশিয়া নীতির তীব্র সমালোচনা করেন।

আফ্রিকার স্বাধীনতার বিরুদ্ধে নয়া-সাম্রাজ্যবাদী চক্রান্তের কথা বলতে গিয়ে নাসের এদের প্রতি সতর্কবাণী উচ্চারণ করেন ঃ জাগ্রত আফ্রিকার কাছে এদের অবশ্যই পরাজয় স্বীকার করতে হবে। আফ্রিকার শক্তি আজ অনেক বেশি।

দক্ষিণ রোডেশিয়া ঃ

লণ্ডনে কমনওয়েলথ প্রধানমন্ত্রী সম্মেলন শেষ হতে না হতে বৃটেনে কমনওয়েলথ সচিব হার্বার্ট বাউডেন ও এটর্নী-জেনারেল এলউইন জোনস সলিসবেরী ছুটেছিলেন আইয়ান স্মিথের বিদ্রোহী শ্বেতাঙ্গ শাসনের সঙ্গে একটা আপোষ-মীমাংসার চেষ্টায়।

গত নভেম্বর মাসে বৃটেনের কর্তৃত্ব অগ্রাহ্য করে আইয়ান স্মিথ ও তাঁর দলবল একতরফাভাবে দক্ষিণ রোডেশিয়ার স্বাধীনতা ঘোষণার পর থেকে বৃটেনের প্রধান চেষ্টা হয়েছে, কিভাবে তাদের আবার বৃটিশ শাসনের কর্তৃত্বে ফিরিয়ে আনা যায়। বিদ্রোহের অবসান ঘটিয়ে 'সাংবিধানিক অবস্থা' ফিরিয়ে আনাই তাঁদের কাছে প্রধান কাজ। আফ্রিকা, কমনওয়েলথ ও বিশ্ব জনমতের চাপে কৃষ্ণকায় সংখ্যাগুরুর স্বার্থের কথাও হ্যারল্ড উইলসন ও তাঁর সরকারকে বলতে হচ্ছে।

কিন্তু বৃটেনকে বাধিত করার কোন সদিচ্ছা আইয়ান স্মিথের আছে বলে মনে হয় না। অন্তত বাউডেনের উক্তি থেকে সেই ধারণাই হয়।

সলিসবেরীতে বাউডেন ও জোনস আইয়ান স্মিথ সহ অনেকের সঙ্গেই সাক্ষাৎ করেছেন। বৃটেন কর্তৃক স্বীকৃত কিন্তু স্মিথ শাসন কর্তৃক অস্বীকৃত দক্ষিণ রোডেশিয়ার গভর্নর স্যার হামফ্রে গিবসের মাধ্যমে এই সব আলোচনা হয়েছে। কিন্তু আলোচনার ফলে মীমাংসার কোন পথ আবিষ্কৃত হয় নি। স্মিথরা তাঁদের বক্তব্যে অনড় আছেন। বৃটেনের কর্তৃত্বে তাঁরা ফিরে যাবেন না, সংখ্যাগুরু কৃষ্ণকায়দের অধিকার স্বীকার করবেন না।

সলিসবেরী থেকে লণ্ডন যাত্রার পূর্বে

নাসের ও নিয়েরে

শুরুতে বাউডেন বলেছেন, তিনি কোন আশার আলো দেখতে পাচ্ছেন না। যদিও আলোচনার ধারা এখনও উন্মুক্ত রাখা হয়েছে, তবু এভাবে বেশি দিন অপেক্ষা করা যাবে না। দু-এক মাসের মধ্যেই যা হোক একটা ব্যবস্থা করতে হবে।

বৃটেনের মনোভাব ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বাউডেন বলেছেন, দু'টি নীতির ভিত্তিতে বৃটেন দক্ষিণ রোডেশিয়ার সঙ্গে মীমাংসার চেষ্টা করছে। প্রথম, অবিলম্বে স্মিথ সরকারকে 'সাংবিধানিক অবস্থায়' অর্থাৎ বৃটেনের কর্তৃত্বে ফিরে আসতে হবে, এবং সকল জাতির পক্ষে গ্রহণযোগ্য একটি শাসনব্যবস্থা প্রবর্তন করতে হবে। দ্বিতীয়ত, ধীরে ধীরে সংখ্যাগুরুর শাসন প্রতিষ্ঠার জন্য চেষ্টা করতে হবে।

কিন্তু স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে, আইয়ান স্মিথ বাউডেনদের হাঁকিয়ে দিয়েছেন। দুই প্রস্তাবের কোনটিই তিনি গ্রহণ করেন নি। এর পর বৃটেন কি করবে? শোনা যাচ্ছে, দক্ষিণ রোডেশিয়ার বিরুদ্ধে অর্থনৈতিক ব্যবস্থার কড়াকড়ি বাড়ানো হবে। হয়তো রাষ্ট্রসঙ্ঘ নিরাপত্তা পরিষদের দ্বারস্থও হবে। কিন্তু এই নরম পন্থায় স্মিথদের শায়েস্তা করা যাবে না। শেষ পর্যন্ত বলপ্রয়োগের পথে যেতেই হবে। এই সোজা কথাটা বৃটেন ইচ্ছা করে বুঝছে না।

সোভিয়েট ইউনিয়ন ঃ

শ্রীমতী ললিতা শাস্ত্রী পুত্র-কন্যা সমভিব্যাহারে ২২শে সেপ্টেম্বর তাসখন্দ গিয়ে পৌঁছলে বিমানবন্দরে উজবেকিস্তানের রাষ্ট্রপতি, উজবেক প্রজাতন্ত্র ও সোভিয়েট ইউনিয়ন সরকারের বিশিষ্ট নেতৃবৃন্দ ও বহু সাধারণ মানুষ শ্রীমতী শাস্ত্রীকে সম্বর্ধনা জানান। বিমানবন্দরে এই সময় এক ভাবগম্ভীর ও করুণ পরিবেশের সৃষ্টি হয়।

গত জানুয়ারী মাসে এই তাসখন্দে ভারতের প্রধানমন্ত্রী লালবাহাদুর শাস্ত্রীর অকস্মাৎ মৃত্যুর পর থেকেই তাসখন্দবাসী অপেক্ষা করে আছে, কবে শাস্ত্রীজীর সহধর্মিণী এখানে আসবেন। উজবেক প্রজাতন্ত্র ও সোভিয়েট ইউনিয়ন সরকারের পক্ষ থেকে তাঁকে এখানে আসার জন্য আমন্ত্রণ জানানো হয়। স্বামীর স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদনের জন্য ও তাসখন্দবাসীর আগ্রহাতিশয্যে শ্রীমতী শাস্ত্রী শেষ পর্যন্ত এখানে আসেন।

যে ঘরে শাস্ত্রীজী শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন, সেখানে এসে শ্রীমতী শাস্ত্রী কান্নায় ভেঙে পড়েন। মৃত্যুর সময় ঘরটি যেমন ছিল, ঠিক তেমনি আছে। বিছানা, টেবিল, ধূপদানী—সবই ঠিক আছে। নেই কেবল সেই মানুষটি।

শ্রীমতী শাস্ত্রীর সফরে আর একবার প্রমাণিত হল, তাসখন্দ তথা সোভিয়েটের জনগণের অন্তরে লালবাহাদুর শাস্ত্রী ও ভারত আজ কতখানি মর্যাদার আসনে প্রতিষ্ঠিত।

দক্ষিণ কোরিয়া ঃ

বিভিন্ন দেশে আইনসভায় নানা সময় বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি হয়, ইদানীং ভারতে কেন্দ্রীয় ও রাজ্য আইনসভাগুলিতে গোলমাল চরমে উঠেছে। জাপান, ইতালী, ফ্রান্স, এমন কি বৃটেন-আমেরিকাতেও আইনসভার অভ্যন্তরে নানাভাবে গোলযোগের সৃষ্টি হয়। চিৎকার ঘুঁষি ছোঁড়া, জুতো, কালির দোয়াত ও বরফ ছোঁড়া থেকে সুরু করে কিল-চড়, এমন কি রিভলভারের গুলী পর্যন্ত চলেছে বিভিন্ন দেশের আইনসভায়। কিন্তু সমস্ত রেকর্ডকে ম্লান করে দিয়ে গত সপ্তাহে গোলমাল ও বাধাদানের নতুন রেকর্ড স্থাপন করেছে দক্ষিণ কোরিয়া পার্লামেণ্ট 'ন্যাশনাল অ্যাসেম্বলী'। একজন সদস্য সেখানে মন্ত্রীদের গায়ে মল নিক্ষেপ করেছেন।

এক লক্ষ বিশ হাজার ডলার মূল্যের 'স্যাকারিন' চালানের এক কেলেঙ্কারী নিয়ে আইনসভায় খুব উত্তপ্ত বিতর্ক চলছিল। সারের জন্য প্রয়োজনীয় করমুক্ত জিনিস বলে এই স্যাকারিনকে চালিয়ে দক্ষিণ কোরিয়ার বৃহত্তম ব্যবসা প্রতিষ্ঠান 'সামসুং' ও তার মালিক দেশের সর্বাপেক্ষা ধনী ব্যক্তি লি বিয়াং চুল সরকারকে বহু সহস্র ডলার কর ফাঁকি দিয়েছেন। বিরোধী দলের [illegible], এই কর ফাঁকির ব্যাপারে [illegible] চুং ইল কুয়ো ও তাঁর মন্ত্রিসভার অন্য সদস্যদের হাত আছে। এই ঘটনা নিয়ে দেশের মধ্যে সর্বত্র উত্তেজনার সৃষ্টি হয়েছে।

ঘটনার দিন আইনসভার বৈঠকে কিম ডু হান নামে ৪৮ বৎসর বয়স্ক 'কোরিয়ান ইণ্ডিপেণ্ডেন্স পার্টি'র এক সদস্য সভার বক্তৃতামঞ্চে বক্তৃতার জন্য যান। তাঁর হাতে কার্ডবোর্ডের একটি বাক্স ছিল। বিশ মিনিট ধরে বক্তৃতার পর তিনি অত্যন্ত ধীর-স্থিরভাবে বাক্সের দড়ি খুলে ভেতর থেকে পাঁচ গ্যালনের একটি টিন বের করেন। তখনও অন্য সদস্যরা কিছু বুঝতে পারেন নি। অকস্মাৎ কিম টিনের মুখ খুলে চিৎকার করে মন্ত্রীদের উদ্দেশ্য করে বলেন ঃ এই নিন স্যাকারিন! খেয়ে দেখুন! এই কথা বলে তিনি টিন থেকে মল ছিটিয়ে দেন প্রধানমন্ত্রী ও অন্যান্য মন্ত্রীদের গায়ে। সদস্যরা ঘটনার আকস্মিকতায় এতটা হতচকিত হয়ে যান যে কিছুক্ষণ তাঁরা স্তব্ধ হয়ে থাকেন। কিম ধীর পদক্ষেপে কক্ষ থেকে বেরিয়ে যাবার পর তাঁদের সম্বিৎ ফিরে আসে। সঙ্গে সঙ্গে অধিবেশন বন্ধ হয়ে যায়।

'ন্যাশনাল অ্যাসেম্বলীর' স্পীকার রি হিও সাং এই ঘটনাকে 'জাতীয় কলঙ্ক' আখ্যা দেন। প্রধানমন্ত্রী উত্তেজিতভাবে মন্ত্রিসভার বৈঠক আহ্বান করেন। এই ঘটনায় মন্ত্রীরা এতটা উত্তেজিত ও বিচলিত হয়ে পড়েন যে, তাঁরা সর্বসম্মতিক্রমে পদত্যাগের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। প্রধানমন্ত্রী চুং ইল কুয়ো সঙ্গে সঙ্গে রাষ্ট্রপতি চুং হি পার্কের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে তাঁর মন্ত্রিসভার পদত্যাগপত্র পেশ করেন।

রাষ্ট্রপতি অবশ্য মন্ত্রীদের পদত্যাগ গ্রহণ করেন নি। ইতিমধ্যে 'সামসুং'-এর মালিক লি বিয়ান চুং তাঁর সারের কারখানাটি সরকারের হাতে তুলে দেবার প্রস্তাব করেছেন। কিমও তাঁর আইনসভা সদস্যপদে ইস্তফা দিয়েছেন।

বি. সি. মাইতি এণ্ড কোং

—ইলেকট্রো প্লেটিং সামগ্রী—

নিকেল ভ্যাট ও ব্যারেল * ডাইনামো * পলিশিং মেসিন এবং প্লেটিং করিবার জন্য যাবতীয় সামগ্রীর আদি সরবরাহক।

শো রুম ঃ—৯৪, প্রেমচাঁদ বড়াল স্ট্রীট, কলি-১২। ফোন ঃ ৩৪-৩১৭৩

৩, রাধামোহন পাল লেন, কলি-১২ ঃ অফিস-ফোন—৩৪-৪৮৪৬

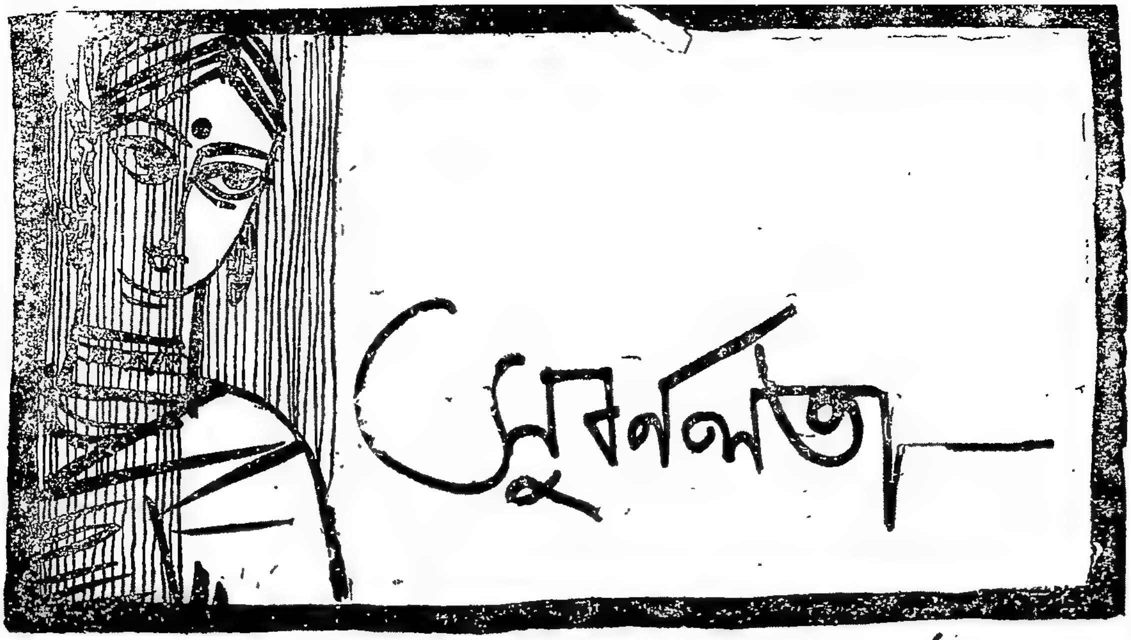

ধারাবাহিক উপন্যাস

আশাপূর্ণা দেবী

(পূর্ব-প্রকাশিতের পর)

কালো শুঁটকো পেটে পীলে ছেলেটার দিকে জ্বলন্ত দৃষ্টি হেনে শ্যামাসুন্দরী বলেন, 'ওকে বাড়িতে জায়গা দিতে হবে? কী করবো ওকে নিয়ে?'

জগু তার বাইরের 'বাবু সাজ' আধ-ময়লা ফতুয়াটা খুলে উঠোনের তারে ছড়িয়ে দিতে দিতে অগ্রাহ্যের গলায় বলে, 'করবে আবার কি, সময়ে দুটো ভাত-জল দেবে, খানিক পাঁচন সেদ্ধ করে দেবে, আর কি! মাথায় করে নাচতে বলি নি।'

শ্যামাসুন্দরী ক্রুদ্ধ গলায় বলেন, 'মাথায় করে নাচার আমার হাত-পা কি আছে? সময়ে দুটো ভাত-জল দেব, পীলে পেটের জন্যে পাঁচন সেদ্ধ করে দেব, কেন কি জন্যে?'

'কি জন্যে, সে কথা তো রাজকন্যেকে বলা হলো আগেই। মা নেই, দিদিমা পুষতো, সেটাও পটল তুলেছে, কে দুটো ভাত দেয় তার ঠিক নেই।'

'ওঃ আমাকেই তা'হলে ওর দিদিমা হতে হবে?' শ্যামাসুন্দরী মানবিকতার ধার ধারেন না, বলেন, 'তুই আর আমার সঙ্গে জ্ঞাতশত্তুরতা করিস না জগা, চিরটা কাল জ্বলে পুড়ে মলাম। জগতে অমন ঢের মাতৃহারা আছে সবাইকে দয়া করতে পারবি তুই?'

'সবাইকে পারবার বায়না নেবে জগা এমন মুখ্যু বামুন নয় মা', জগু দৃপ্তস্বরে বলে, 'একটার কথাই হচ্ছে।'

'না হবে না—' শ্যামাসুন্দরী আরো দৃপ্ত হন, 'বলে আমায় কে ভাত-জল করে তার ঠিক নেই, হিতৈষী ছেলে এলেন আমার ঘাড়ে একটা রুগী চাপাতে। রাগ বাড়াস নে জগা, যেখানকার নিধি, সেখানে রেখে আয়।'

জগা অবশ্য মায়ের এই শাসনবাক্যে বিন্দুমাত্র বিচলিত হয় না, বলে, 'রেখে আসবার জন্যে নিয়ে এলাম যে! এই ছোঁড়া, হাঁ করে দাঁড়িয়ে আছিস যে? নতুন দিদিমাকে পেন্নাম কর! দেখছিস—কেমন ভগবতীর মতন চেহারা! ...এই এই খবরদার পায়ে হাত নয় দূরে থেকে আলগোছে। তুই বেটা এমন কি পুণ্যি করেছিস যে, আমার মায়ের চরণস্পর্শ করবি! পেন্নাম করে বোস ওখানে! মা ছোঁড়াকে দুটো জলপানি দাও দিকি, খিদেয়-তেষ্টায় 'টা টা' করছে। দেখো আবার দুঃখীর ছেলে বলে—'খানিক আকোচ খাঁকোচ' ধরে দিও না! দেখছো তো পেটের অবস্থা? এক-আধটা রসগোল্লা-ফোল্লা আছে ঘরে?'

শ্যামাসুন্দরী ছেলেকে চেনেন, ওই পীলে-পেটাকে যে আর নড়ানো যাবে না, রসগোল্লা খাইয়ে রাজ সমাদরেই রাখতে হবে, তা তিনি নিশ্চিত অবলোকন করছেন। তবু সহজে হার স্বীকার না করে ক্রুদ্ধ গলায় বলেন, 'না থাকে আনতে কতক্ষণ! এখুনি তো ছুটতে পারো তুমি। কিন্তু বাড়িতে না হক একটা পুষ্যি বাড়াতে আমি পারব না জগা, বয়েস বাড়ছে বৈ কমছে না আমার! পারব না আর খাটতে—'

জগু এবার উদ্দীপ্ত হয়।

বলে, 'মা তুমি যে দেখছি তোমার ননদের ওপর এককাঠি সরেস হলে। মুখ ফুটে বলতে পারলে একথা? ওর জন্যে কালিয়া পোলাও রাঁধতে হবে, বলেছি একথা? দু'বেলা দু'মুঠো 'পোরের' ভাত আর কাঁচকলা সেদ্ধ, এই তো ব্যাপার। লোকে গরু পোষে, কুকুর বেড়াল পোষে, আর একটা মানুষের ছেলেকে 'দূর দূর' করছো? ছি ছি!'

'তা' সে তুই আমায় শতেক ছি দে'—শ্যামাসুন্দরী অনমনীয় গলায় বলেন, 'বুড়ো বয়সে একটা খোকা পুষে তার 'পোরে'র ভাত রাঁধতে বসতে পারব না, ব্যস। ভারী হিতৈষী ছেলে আমার। সেই যে বলে না—ভাল করতে পারি না মন্দ করতে পারি কি দিবি তাই বল, তোর হয়েছে তাই।' ...শ্যামাসুন্দরী সহজে এক সঙ্গে এত কথা বলেন না, কিন্তু আজ ছেলের গোঁয়াতুমি বায়নায় মেজাজ খাপ্পা হয়ে গেছে তাঁর। ...পাড়ার একটা ছুতোরের ছেলে, তার দিদিমা মরেছে কি ঠাকুমা মরেছে। তার ভাত রাঁধবার লোক নেই, এই যুক্তি দিয়ে কিনা একটা রুগীকে এনে মা'র গলায় গেঁথে দিতে চায়!

বামুনের ছেলে হলেও বা ভবিষ্যতের একটা আশা ছিল। দিনে অদিনে, কিছু না হোক জগাকেও এক ঘটি জল দিতে পারতো। কিন্তু এ কি!

ছুতোরের ছেলে।

একেবারে জল অচল!

তারপর শক্তপোক্ত নয় যে চাকরের কাজও করবে।

তবে?

শুধু শুধু কেন শ্যামাসুন্দরী এই নির্ঝঞ্ঝাট সংসারে অত বড় একটা ঝঞ্ঝাট ঢোকাবেন? একটা আট-দশ বছরের ছেলে, সে তো খোকার সামিল। বুড়ো বয়সে একটা খোকা পুষবেন শ্যামাসুন্দরী?

রেগে বলেন, 'গরু পুষে দুধ আসে, কুকুর পেড়ালেও উপকার আছে, এর থেকে কি উপকার পাওয়া যাবে?'

'উপকার!'

জগু হঠাৎ সত্যিকার রেগে ওঠে।

ফুলে দেড়া হয়ে উঠে বলে, 'উপকার পাবে কি না ভেবে তবে তুমি দয়া দেখাবে? থাক মা দরকার নেই, তোমার ওই ওজন-করা দয়ায় দরকার নেই। উঃ এমন-কথা শোনার আগে জগার মরণ হল না কেন! ঠিক আছে ভাত তোমায় রাঁধতে হবে না, জায়গাও দিতে হবে না। চল রে নিতাই— ভুল করে এনেছিলাম তোকে, বাড়িটা যে জগার বাপের নয়, সেটা খেয়াল ছিল না।'

ছেলেটার হাত ধরে টান দেয় জগু!

বলে, 'ভালো বাড়িতে এনেছিলাম তোকে, শিক্ষা পেলি ভালো। এরপর আর কখনো বামুন বাড়ির দরজায় এসে দাঁড়াস নি। হ্যাঁ বরং কসাইয়ের বাড়িতে আশ্রয় চাইবি, তবু বামুন বাড়ি নয়।... কী কথা কানে শুনলাম, ছি ছি! কি না ওকে যে আমি দয়া করবো, ও আমার কি উপকারে আসবে।'

[illegible] দরজার দিকে পা [illegible] গণেন। [illegible] ত্যি রেগেছে। [illegible] লে পাঁচদিন জলস্পর্শ [illegible] ছোঁড়াকে গলায় [illegible] তবে নরম হওয়া তো [illegible] ও জগুর মা। তাই তীব্র-[illegible] দেখ জগা রাগ বাড়িয়ে দেস [illegible] কিন এক পা দেখি কেমন যাস!'

'যাব না? তোমার কথায় না কি?' বলে হঠাৎ পাক খেয়ে ঘুরে দাঁড়ায় জগু, এবং উচ্চ উদাস স্বরে বলে, 'দেখ নিতাই দেখে নে এত বড় একটা বুড়ো মর্দর মান প্রতিষ্ঠাটা একবার দেখে নে। রাগ করে বেরিয়ে যাবার স্বাধীনতাটুকুও নেই। এই অসহায় অবলা জীবটাকে আবার একটা মনিষ্যি জ্ঞান করে তোর বাবা মুরুব্বি ধরেছে। হুঃ!'

দাওয়ায় এসে বসে পড়ে নিতাইকে কাছে নিয়ে। যেন সেও ওর মতই বাইরে থেকে প্রার্থী হয়ে এসেছে। নিতাই বিস্ময়াহত দৃষ্টি মেলে বসে থাকে।

শ্যামাসুন্দরী আর দ্বিরুক্তি না করে ঘর থেকে একখানা শালপাতায় করে পয়সায় দু গণ্ডা রসমুণ্ডির গোটা চারেক এনে ধরে দিয়ে, জোরালো গলায় বলেন, 'কলে মুখ দিয়ে জল খাওয়া চলবে, না গেলাসে করে দিতে হবে?'

সহসা জগু অন্যমূর্তি ধরে।

যেন সে মানুষই নয়।

চড়া গলায় বলে, 'গেলাসে করে জল দিতে হবে? কেন, আমার গুরুপুত্তুরের ঠাকুর্দা এসেছে? কলে মুখ দিয়ে জল ওর ঘাড় খাবে না? দেখ নিতাই, ওসব রাজ কায়দা যদি করতে আসিস, পোষাবে না! বৃদ্ধা ব্রাহ্মণ-কন্যা তোকে খাবার জল গড়িয়ে দেবে, আর তুই তাই খাবি? ছি ছি! হ্যাঁ একথা যদি বলিস, 'এই রসমুণ্ডি ক'টা আমার জঠরাগ্নির কাছে নস্যি হল গো দিদিমা, আর গোটা চার-পাঁচ দাও।' সে আলাদা কথা! খিদের কাছে চক্ষুলজ্জা নেই। তা' বলে কলে জল খাব না' এ বায়না করতে পারি না।'

শ্যামাসুন্দরী কড়া চোখে একবার ছেলের দিকে তাকিয়ে ঘর থেকে আবার একেবারে পুরো এক পয়সার রসমুণ্ডি এনে বসিয়ে দিয়ে বলেন, 'আর কিন্তু নেই জগা! কাল চার পয়সার এনেছিলি, তারই দরুণ গোটাকতক ছিল।'

জগু হৃষ্ট গলায় বলে, 'ব্যস ব্যস, ওতেই হবে। আর কত চাই? হ্যাঁ রে নিতাই শরীরে বল পাচ্ছিস? যে হাল হয়েছে, ওটাই প্রধান দরকার।...নিজে থেকে মনে করে করে দুধ চেয়ে নিয়ে খাবি, বুঝলি? এই যে ভগবতীকে দেখছিস, এনার কাজের সীমা সংখ্যা নেই। ইনি যে হুঁশ করে তোকে ডেকে ডেকে দুধ খাওয়াতে বসবেন তা মনে করিস নি।'

মার প্রতি এই কর্তব্যটি সেরে জগু হৃষ্টচিত্তে বসে পড়ে বলে, 'যাক বাবা, আমার একটা দায় ঘুচলো। মাতৃহীনকে মায়ের কোলে ফেলে দিলাম।'

শ্যামাসুন্দরী ছেলের দিক থেকে এদিকে চোখ ফেলে তীব্র স্বরে বলেন, 'এই ছেলেটা, "তোর নাম কি?"'

নিতাই এসেই যে পরিস্থিতির মুখে পড়েছিল, তাতে তার কথা কওয়ার সাহস ছিল না কিন্তু এখন চুপ করে থাকাও শক্ত। তাই সাবধানে নিজের নাম বলে।

নিতাই।

'ও কি নাম বলার ছিরি রে নিতাই', জগু সদুপদেশ দেয়, 'ভদ্রলোকের মত বলবি, শ্রীনিতাই দাস! নেহাৎ চাকর-বাকরের মত থাকলে তো চলবে না। ভদ্দর লোকের মতন থাকতে হবে।

শ্যামাসুন্দরী বোঝেন, এ হচ্ছে ঝিকে মেরে বৌকে শিক্ষা দেওয়া। পাছে তিনি ছেলেটাকে চাকরের পর্যায়ে ফেলেন তাই জগার এই শাসন বাণী। তা তিনিও সোজা মেয়ে নন, তাই কড়া গলায় বলেন, 'চাকরের মত হবে না। কি রাজার মত হবে? এই নিতাই, তোর বাপ কি করে রে?'

নিতাইয়ের আগেই জগু তাড়াতাড়ি বলে ওঠে, 'বাপ ব্যাটা তো ছুতোর! কাঠ ঘসে আর কি করে? যাক গে ও সব কথা মনে নিতে হবে না। তুই নিজে মানুষ হবি বুঝলি। ঘর সংসার দেখিয়ে দিই গে।'

এই সময় বহুকাল পরে মুক্তকেশীর আবির্ভাব ঘটে! এবং মুহূর্তেই ছেলেটার দিকে চোখ পড়ে তাঁর। সন্দেহের গলায় বলেন, 'এ ছোঁড়া কে? চাকর রাখলি বুঝি?'

জগু আভূমি সেলাম করে বলে, 'কী যে বল পিসি! জগা রাখবে চাকর! ভারী তালেবর তোমার ভাইপো! কেষ্টর জীব, কেষ্ট যখন যেখানে রাখেন থাকে।'

শ্যামাসুন্দরী বিদ্রূপের গলায় বলেন, 'তা বলে! অন্তত যে ক'দিন পোরের ভাত আর রসগোল্লা ভিন্ন সইবে না, সে ক'দিন এখানেই থাকবে।'

মুক্তকেশী খুঁটিয়ে জিগ্যেস করে ব্যাপারটা জেনে নেন। মুক্তকেশী গালে হাত দেন। তারপর বলেন, 'জাতটা কি?'

[ক্রমশঃ]

গৌর মোহন দাস এণ্ড কোং
২৩৩, ওল্ড চীনা বাজার স্ট্রীট,
কলিকাতা-১
ফোন: ২২-৬৫৮০

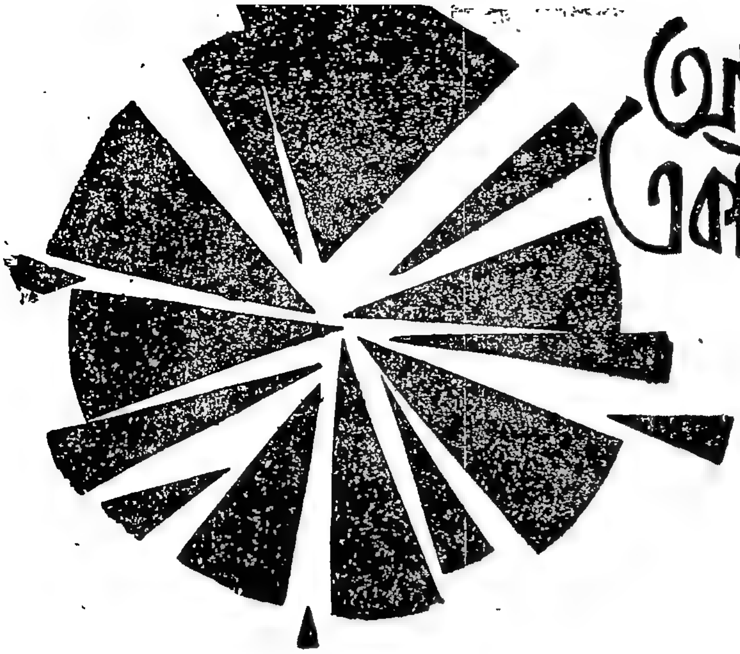

অগ্নিযুগের একটি অধ্যায়

অনন্ত সিংহ

চরম বিপদ—চরম পরীক্ষা

আমি সেইদিন দুপুরে নিজ বাড়িতে বিশ্রাম করছি। আর কেউ উপস্থিত ছিল কি না মনে নেই। প্রায় দুটো-তিনটের সময় আমাদের দলের একজন কর্মী সাইকেলে ছুটে এল। তাকে পাঠিয়েছেন মাস্টারদা। সে এসে হাঁপাতে হাঁপাতে বলল যে—কংগ্রেস অফিসে 'পিক্‌রিক পাউডার' প্রস্তুত করার সময় ভয়ঙ্কর এক বিস্ফোরণ হয়েছে। তারকেশ্বর (দস্তিদার) ও অর্ধেন্দু (দস্তিদার) দারুণভাবে আহত হয়েছে। তারকেশ্বরের হয়ত বাঁচবারই আশা নেই। মাস্টারদা আমাকে গণেশের সঙ্গে তক্ষুণি যেতে বলেছেন।

আমি ও গণেশ জানতাম যে আজ কংগ্রেস অফিসের একটি ঘরে 'পিকরিক্ পাউডার' তৈরির কাজ চলবে। 'পিক্‌রিক পাউডার' তৈরি করবার সময় যদি সেই পাউডারে আগুন না লাগে তবে ঘর্ষণে বা আঘাতে কোনরূপ বিস্ফোরণ হওয়ার সম্ভাবনা থাকে না। এটাই আমাদের বহুদিনের অভিজ্ঞতা। পিক্‌রিক অ্যাসিড (খুব মিহি গুড়ো) তৈরি হয় নাইট্রিক ও সালফিউরিক অ্যাসিডের সংমিশ্রণে। তারপর অ্যামনকার্ব-এর সঙ্গে বেশি পরিমাণ জলে মাপ মত পিক্‌রিক অ্যাসিডের crystal সিদ্ধ করতে হয়। তারপর এইভাবে ধোওয়ার পর তাকে 'অ্যামন-পিকরেট' বলা হয়। অ্যামন-পিক্‌রেটের সঙ্গে পটাস-ক্লোরার্স বিভিন্ন পরিমাণে মিশিয়ে ভিন্ন ভিন্ন শক্তিশালী 'পিক্‌রিক পাউডার' তৈরি হয়। আমরা পঞ্চাশ ভাগ অ্যামন-পিকরেট ও অর্ধভাগ পটাস-ক্লোরার্স মিশিয়ে পাউডার তৈরি করা ঠিক করেছিলাম। তারকেশ্বর ও অর্ধেন্দু সেইরূপ পাউডার তৈরি করবার কাজে নিযুক্ত ছিল। তারা অন্য কোন বিস্ফোরক দ্রব্য, যা ঘর্ষণে ফেটে পড়ে তা' যে তৈরি করছিল না, সেই সম্বন্ধে আমি একেবারে নিঃসন্দেহ ছিলাম। তা' ছাড়া আমাদের মধ্যে কারও ধূমপানের অভ্যেস ছিল না—তারা কেউ সিগারেট বা বিড়ি কখনই খেত না। তবে কি করে বিস্ফোরণে দুর্ঘটনা ঘটতে পারে! এ আমার কাছে একেবারে দুর্বোধ্য—সম্পূর্ণ অবিশ্বাস্য বলে মনে হল।

সংবাদটি শোনার পর আমি একেবারে যেন ক্ষেপে গেলাম। যে সংবাদ দিতে এসেছিল তার ওপর রাগের কোন কারণ ছিল না। কিন্তু কেন, কিসের জন্য, কিভাবে, বা কার গাফিলাতিতে ঐরূপ দুর্ঘটনা পিক্‌রিক পাউডার তৈরি করার সময় ঘটতে পারে? আগুন না লাগলে তো পিক্‌রিক পাউডার বিস্ফোরিত হতে পারে না! তাদের মধ্যে তো কেউ ধূমপান করে না! তবে কে সেখানে স্টোভ ধরাল বা কেন আগুন নিয়ে গেল? দারুণ বিরক্তির সঙ্গে প্রশ্ন করলাম,—

—"কিভাবে বিস্ফোরণ সম্ভব হল? কে দায়ী? কে আগুন নিয়ে গিয়েছিল? কে স্টোভ ধরিয়েছে?"

—"কেউ আগুন ধরায় নি। পটাস-ক্লোরার্সের সঙ্গে পিক্‌রিক অ্যাসিড মেশাবার সময় এই দুর্ঘটনা ঘটেছে।"

—"আমি বিশ্বাস করি না। খুব জোর সংঘর্ষণে বা হাতুড়ির আঘাতেও পিক্‌রিক পাউডার কখন বিস্ফোরিত হয় না। তা' হতে পারে না।"

—"কিসে কি হতে পারে তা আমার জানা নেই। তবে যা' ঘটেছে তা' আমি জানি। এই পাউডার 'মর্টার ও পেসেলে' (ডাক্তারদের ওষুধ তৈরি করবার পাথরের বাটি ও একটি ছোট মুষল) সংমিশ্রণ করা হচ্ছিল এবং মিশ্রণ ও ঘর্ষণের সময় হঠাৎ ভয়ঙ্কর বিস্ফোরণ হয়েছে। মর্টারটি ভেঙে টুকরো টুকরো হয়েছে আর পেসেলটি উড়ে গেছে। ফুট্যাদা (তারকেশ্বর) ও অর্ধেন্দু বিস্ফোরণের ঝাপটায় পাঁচ-ছয় হাত দূরে ছিটকে পড়েছে ও গুরুতরভাবে আহত হয়েছে।"

আমরা এইভাবে দুজনে কথা বল-ছিলাম ও সঙ্গে সঙ্গে ছেলেটিকে (নাম মনে নেই) নিয়ে বেবী-অ... গণেশের বাড়ির ... গণেশের সঙ্গে দেখা ... সেও বিশ্বাস করতে পারল... পাউডার তৈরি করার সময়... বিস্ফোরণ হতে পারে। বিন্দুমাত্র... না করে গণেশও আমাদের সঙ্গে রওনা হল। পথে আমরা মাখনকে (জীবন ঘোষালকে) খবর দিলাম সে যেন তাদের ছয় সিলেন্ডার যুক্ত বড় নতুন 'এসাক্স' মোটর গাড়িটি নিয়ে খুব শীঘ্র কংগ্রেস অফিসে চলে আসে।

কংগ্রেস অফিসে এসে দেখি যে মাস্টারদা ও দু-একজন প্রথম শ্রেণীর কর্মী সেখানে উপস্থিত। সংক্ষিপ্ত সংবাদ শুনে নিয়ে আমরা পাশের ঘরে গেলাম। কি ভীষণ দৃশ্য! তারক ও অর্ধেন্দুর বুক হাত মুখ কেবল যে পুড়ে গেছে তা' নয়—শরীরের খণ্ড খণ্ড মাংস উড়ে গিয়ে হাড় বেরিয়ে পড়েছে। অসহ্য মৃত্যুযন্ত্রণায় দুজনে ছটফট করছিল। অর্ধেন্দুর অবস্থা অপেক্ষাকৃত ভাল।

সে যন্ত্রণায় থাকতে না পেরে এক-একবার উঠে একটু পায়চারী করে আবার বসে পড়ছে। প্রাণভরে চেঁচাতে পারলে হয়ত শান্তি পেত, কিন্তু তার উপায় নেই। দুজনেই প্রাণপণে চেষ্টা করছিল অসহ্য যন্ত্রণায় গোঙানির শব্দও যেন ঘরের বাইরে না যায়। তারকের নড়বার শক্তি ছিল না। সমস্ত শরীর তার থরথর করে কাঁপছিল। তার গোঙানির শব্দও কেঁপে কেঁপে গলা দিয়ে বার হচ্ছিল। কেবল শুনতে পাচ্ছিলাম—উঃ—উঃ—, ইঃ ইঃ ইঃ—। মনে হচ্ছিল তারকেশ্বর বুঝি তক্ষুণি collapse করবে — চরম অবসাদে ভেঙে পড়বে—আর বাঁচবে না!

আমি ও গণেশ ঘরে ঢুকলাম। আমাদের ঠিক পেছনে মাস্টারদাও এলেন। সান্ত্বনা দেওয়ার জন্য কিছু বলেছিলাম কি না তা' এখন মনে নেই। আমার গলার শব্দ শুনতে পেয়ে তারক দুঃসহ যন্ত্রণায় অধীর কণ্ঠে বলল—"অনন্তদা, অনন্তদা আপনি আমাকে গুলী করুন! আপনি ছাড়া আর কেউ পারবে না! আমি সহ্য করতে পারছি না—আমাকে গুলী করুন!...।" এভাবে তারক কাতর মিনতি জানাতে লাগল। তারক ও অর্ধেন্দু দুজনেই জানে রামকৃষ্ণকে নিয়ে আমাদের কি ভীষণ অসুবিধা হচ্ছে। প্রতিদিনই রামকৃষ্ণকে ধরবার জন্য পুলিশ শহরে ও গ্রামে হানা দিচ্ছে। তাই বোধ হয় তারক আরও বেশি করে চাইছিল যে তাকে গুলী করে মেরে ফেলি—তাতে সে যন্ত্রণা থেকে মুক্তি পাবে আর সংগঠনও বাঁচবে।

আমরা সেই ঘরে এক মিনিটের বেশি ছিলাম না। ঐ সাংঘাতিক অবস্থা দাঁড়িয়ে দেখা কারো পক্ষে সম্ভব নয়, অবিলম্বে প্রতিকার করা দরকার। মাস্টারদা, গণেশ ও আমি দ্বিতীয় কামরায় এলাম। আমি বললাম—"দেরি না করে গুলী করে মেরে ফেলি!" কি নিদারুণ, কি নিষ্ঠুর—কি নিষ্করুণ মনোভাব! তবু আমি তাই ভেবেছিলাম—তাই বলেছিলাম। সেইদিন এইরূপ ভাবার পেছনে ঠিক কি ছিল তা' এতদিন পরে বলা সম্ভব নয়। হয়তো ভেবেছিলাম, বাঁচাব তো না-ই, তবে আর ওদের অনর্থক কষ্ট দিয়ে এবং সংগঠনের পক্ষে বিপদের ঝুঁকি নিয়ে দরকার কি?

তখন আমি খুব অবসাদগ্রস্ত হয়ে পড়েছি। বাধার পর বাধা আসছে৷ কোন্‌-দিক সামলাব? আমরা কি তাহলে সামগ্রিক আক্রমণের প্ল্যান কাজে পরিণত করবার আগেই ধরা পড়ব? আমাদের এত দিনের এত আয়োজন, এত চেষ্টা, এত পরিশ্রম—সবই কি তীরে পৌঁছবার আগেই বিনষ্ট হবে? এক রামকৃষ্ণকে নিয়েই এত বিপদ—তাকেই লুকিয়ে রাখার ভাল ব্যবস্থা নেই—তারপর তারক ও অর্ধেন্দুকে রাখবার নিরাপদ আশ্রয় কোথায় খুঁজে পাবো? তা'ছাড়া ডাক্তার ওষুধ ও চিকিৎসার ব্যবস্থা করা যে সময় ও সামগ্রিক শক্তির ওপর নির্ভর করে। আমাদের সময় কোথায়—দুটি সপ্তাহও সময় নেই। এইরকম সাতপাঁচ ভেবে, আমাদের এত বড়—এত পরিশ্রমের আয়োজন তারক ও অর্ধেন্দুর এই আকস্মিক দুর্ঘটনার জন্য ব্যর্থ হয়ে যাওয়ার চাইতে তাদের বাঁচাবার বিফল প্রচেষ্টায় সময় ও শক্তি ক্ষয় না করে যদি তাদের এখনই গুলী করে মেরে ফেলে গুম্ করে দেওয়া হয় তবে হয়ত আমরা বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদী সরকারকে চরম আঘাত হানতে পারব, এই মনে করেই বলেছিলাম—"দেরি না করে গুলী করে মেরে ফেলি!"

আমার মুখের কথা শেষ হওয়ার আগেই গণেশ বিরক্ত ও উত্তেজিত হয়ে বলল,—"কেন বাজে কথা বলছ? ঘাবড়াবার কি আছে? বিপদ এসেছে, বিপদকে রুখতে হবে।" সেই সময়—সেই সন্ধিক্ষণে এইরূপ দৃঢ়তার সঙ্গে নেতৃত্বের একান্ত প্রয়োজন ছিল। মনের অক্ষমতা, অন্তরে পরাজয়ের চিন্তা আমাকে ঐরূপ দৃঢ় বৈপ্লবিক সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়ার পথে বাধা দিয়েছে। সেই দিন থেকে আজ পর্যন্ত যখনই এই ঘটনাটি কোন উপলক্ষে আমার মনে হয়েছে তখনই আমি পীড়া অনুভব করেছি এই ভেবে—আমি কেন গণেশের মত একইভাবে একই সিদ্ধান্তে উপস্থিত হতে পারলাম না?

বিপদকে রুখতে হবে। যত বাধা আসুক না কেন, তবুও এগোতে হবে। আর দেরি নয়, যত শীঘ্র পারা যায় দু'জন বিস্ফোরণে আহত সাথীকে কংগ্রেস অফিস থেকে সরিয়ে নিরাপদ স্থানে নিয়ে যেতে হবে। রামকৃষ্ণকে তার ভগ্নীপতির বাড়ি থেকে বেবী-অস্টিনে করে নিয়ে এসেছিলাম। কিন্তু এখন দু'জনকে নিতে হবে। তা'ছাড়া তাদের বসে থাকার ক্ষমতাও ছিল না। এরা দুজন যেভাবে পুড়ে গেছে তাকে Second stage Burning (দ্বিতীয় স্তরের পোড়া) বলা হয়। তাদের শরীরের মাংস খণ্ড খণ্ড হয়ে উড়ে গিয়ে হাড় বেরিয়ে পড়েছিল। "প্রথম stage পোড়া" তাকে বলে যখন মাংসের ওপরে চামড়া পর্যন্ত পুড়ে যায়। রামকৃষ্ণের ক্ষত প্রথম stage-এর পোড়া। আর তৃতীয় stage-এর পোড়া হচ্ছে যখন septic হয়ে যায়। সবেমাত্র দুর্ঘটনা ঘটেছে—septic হওয়ার পর্যায়ে এখনও আসে নি। তবে ডাক্তারদের বিবেচনার বিষয়—যেন septic না হয় তার জন্য প্রতিষেধক ব্যবস্থা করা। আমরা নিজেরা ডাক্তার নই কাজেই septic নিবারণ করবার আগে safety ও Security-র (নিরাপত্তা ও নিশ্চয়তার) ব্যবস্থার জন্য ব্যস্ত হলাম। First Aid (প্রাথমিক চিকিৎসা) আমরা যা জানতাম সেটুকুর ত্রুটি অবশ্য করি নি। "Borafex" মলম ছোট ছোট টিউবে পাওয়া যায়। তা আমরা রামকৃষ্ণের চিকিৎসায় ব্যবহার করেছি। পোড়া স্থানের নিরাময়ের জন্য পিক্‌রিক্‌ লোশন ও Borafex ব্যবহার আমরা শিখেছিলাম। তা দিয়েই প্রাথমিক চিকিৎসা করা হল তারক ও অর্ধেন্দুর ক্ষতস্থানে।

ইতিমধ্যে মাখন ঘোষাল তাদের বাড়ির বড় নতুন Essax (এসাক্স্) টুরারটি নিয়ে এল। খুব সাবধানতার সঙ্গে ও অন্যান্যদের দৃষ্টির অগোচরে তারক ও অর্ধেন্দুকে গাড়িতে তোলা হ'ল। পেছনের বসবার গদির ওপর অর্ধেন্দুকে শুইয়ে দিলাম। তার ক্ষতস্থান অপেক্ষাকৃত কম, তাই গাড়ি চলার সময় লোকের চোখে পড়ার সম্ভাবনাও সেই অনুপাতে কম। তারক ছট্‌ফট্‌ করছিল ও তাকে পোড়া অবস্থায় 'বীভৎস' দেখাচ্ছিল। তার সেইরূপ অবস্থা সহজেই লোকের দৃষ্টি আকর্ষণ করবে এই আশঙ্কায় আমরা তাকে পেছনের সিটের নিচে, পা রাখবার জায়গায়, একটা তোষকের ওপর শুইয়ে দিলাম।

যখন আমরা তাদের সরাবার ব্যবস্থা করছিলাম তখন মাস্টারদা নানাভাবে সামাল দিচ্ছিলেন যেন আশেপাশের লোকেরা কিছু সন্দেহ করতে না পারে। ভয়ানক শব্দ করে বিস্ফোরণ হয়েছিল এবং বিস্ফোরণের পর ঘন ধোঁয়া অস্তিত্ব জানিয়ে দিচ্ছিল দুর্ঘটনার স্থানটি সম্বন্ধে। কংগ্রেস অফিসে আমাদের ছেলেরা ও সমর্থকরাই আসত বেশি। তাই বলে সাধারণ সভ্য ও সমর্থকদের কাছে গুপ্ত বিপ্লবী ষড়যন্ত্রের তথ্য উদ্ঘাটিত হতে দিতে পারি না। সেইজন্য বনবিহারী দত্ত দু-চারজনকে সঙ্গে নিয়ে কংগ্রেস অফিসের সংলগ্ন ছোট্ট মাঠে বসে গান ও বাঁশী বাজাবার এক 'আসর' বসাল। যারাই আসছে তাদেরই ডেকে নিয়ে সেখানে বসাচ্ছে। এই "গানের আসরে"র অন্তরালে আমরা যত তাড়াতাড়ি সম্ভব তারক ও অর্ধেন্দুকে গাড়িতে তুলে নিলাম। একা আমি গাড়িতে তাদের দু'জনকে নিয়ে বেরিয়ে গেলাম। রামকৃষ্ণের বেলায়ও এই এক নীতি অনুসরণ করি। একসঙ্গে যেন বেশি ধরা না পড়ি।

বেবী-অস্টিন নিয়ে গণেশ চলে গেল

ডাক্তারের ব্যবস্থা করতে। ঠিক হ'ল আজ তারক ও অর্ধেন্দুকে গাড়িতে নিয়ে ঘণ্টার পর ঘণ্টা ঘুরে বেড়াব যতক্ষণ পর্যন্ত তাদের নিরাপদে রাখার মত কোন বাড়ি ঠিক না হয়। এও ঠিক হ'ল যে বেবী-অস্টিনে করে আমার গাড়িতে টিনে ভর্তি পেট্রোল দিয়ে যাবে কারণ, আহত-দের সঙ্গে নিয়ে কোন পেট্রোল পাম্পে যাওয়া সম্ভব ছিল না। কংগ্রেস অফিস থেকে চলে আসবার সময় আমার সঙ্গে যোগাযোগ রাখার ব্যবস্থা কিরূপে হবে তাও ঠিক করা হয়েছিল।

প্রায় পাঁচটার সময় রেলের ক্লাস কোয়ার্টারের বড় রাস্তায় সুবোধ চৌধুরীর সঙ্গে আমার দেখা হয়। তাকে কাছে ডেকে সব ব্যাপারটা বললাম। সে তো তারক ও অর্ধেন্দুকে সেইরূপ গুরুতর আহত অবস্থায় দেখে খুব বিচলিত হয়ে উঠল। তখনও বেবী-অস্টিন ফিরে আসে নি। অথচ আমার গাড়িতে পেট্রোল নেওয়া একান্ত প্রয়োজন। তাই সুবোধ চৌধুরীকে একটি পেট্রোলের দোকানের সামনে নাবিয়ে একটু দূরে অপেক্ষা করতে লাগলাম। সুবোধ দু' গ্যালন পেট্রোল সিল করা টিনে নিয়ে এল। তা' ছাড়া সুবোধকে তার বাড়ি থেকে দু'টি বিছানার চাদর বা ধুতি নিয়ে আসতে বলি। সুবোধ তার ক্লাস কোয়ার্টারের বাসা থেকে ধুতি বা চাদর নিয়ে এল। টুরার গাড়ির দু'পাশের খোলা দিক কাপড় দিয়ে ঢেকে দিলাম—যেন পেছনে কোন পর্দানসীন মুসলমান মহিলা আছেন। আমি নিজে খুব সামান্যই বেশ পরিবর্তন করলাম। যারা চেনে না তারা যেন মনে করে যে আমি একজন মুসলমান ড্রাইভার; আর চেনা লোক দেখলে যেন সন্দেহ না করে যে আমি বেশ পরিবর্তন করেছি।

যে সব পথে ঘুরে বেড়াচ্ছিলাম সেই সব নির্জন রাস্তায় সাধারণত আশঙ্কার কারণ ছিল না বললেই হয়। অনেক ঘণ্টা অতিবাহিত হ'ল তবু খবর নেই। সন্ধ্যে প্রায় ছ'টা নাগাদ বেবী-অস্টিন করে গণেশ পেট্রোল দিয়ে গেছে। জানলাম তখনও বাড়ি ঠিক হয় নি—যেখানে তাদের নিয়ে যেতে পারি। রাত আটটার সময় আবার খবর দিল যে তখনও বাড়ি ঠিক হয় নি। চিন্তা-ভাবনা ও উৎকণ্ঠায় অস্থির হয়ে উঠছিলাম। তারপর রাত দশটার সময় গণেশ বেবী-অস্টিন করে এসে খবর দিল যে, বাড়ি সাময়িকভাবে ঠিক হয়েছে এবং ডাক্তারবাবুকেও আনবার ব্যবস্থা করেছে। আমি তাকে অনুসরণ করলাম।

প্রায় সাড়ে দশটার সময় লোকনাথের শহরের বাসা পাথরঘাটায় গেলাম। বাড়ির দরজা ঘেঁষে গাড়িটি দাঁড় করালাম। তারপর নানা সাবধানতা অবলম্বন করে তারক ও অর্ধেন্দুকে বাড়ির ভেতরে নিয়ে যাওয়া হ'ল। এইটুকু টানা-হেঁচড়া করবার সময় তারক একেবারে অবসন্ন হয়ে পড়ে—মনে হচ্ছিল যেন তক্ষুণি তার হৃদযন্ত্র চিরকালের মত স্তব্ধ হয়ে যাবে! গণেশ ঐদিকে ডাক্তার জগদাবাবুর বাড়ি যায় এবং তাঁকে সঙ্গে করে নিয়ে আসে। ডাক্তারবাবু ও গণেশ প্রায় আমাদের সঙ্গে সঙ্গে বাড়ির ভেতর এসে ঢুকল। তারকের ঐরূপ সঙ্গিন অবস্থা লক্ষ্য করে ডাক্তারবাবু বোধহয় কোরামিন দিয়েছিলেন। তারপর ইনজেকশন প্রভৃতি দিয়ে, আমাদের দুই ডাক্তারকর্মী—নরেশ রায় ও বিধু ভট্টাচার্যকে প্রেস্‌ক্রিপ্‌সন ও নির্দেশ দিয়ে গেলেন। লোকনাথের বাড়িতে এই প্রাথমিক চিকিৎসার পর তারক ও অর্ধেন্দুকে নিরাপদ স্থানে সরিয়ে নিয়ে যাওয়ার ব্যবস্থা করে দিয়ে আমি ও গণেশ ডাক্তারবাবুকে পৌঁছে দিতে গেলাম। ডাক্তারবাবুকে এর কিছুদিন আগে পুলিশ রামকৃষ্ণ সম্বন্ধে জিজ্ঞাসাবাদ করেছে। কোথায় রামকৃষ্ণকে চিকিৎসা করেছেন তাও তিনি পুলিশকে বলেছিলেন। কিন্তু কারও নাম বলেন নি। ডাক্তারবাবুর প্রতি আমাদের আস্থা ছিল। তিনিও আমাদের পুরোপুরি বিশ্বাস করতেন—তাঁর অগাধ বিশ্বাস ছিল যে, আমরা তাঁকে কোন বিপদে ফেলব না। ডাক্তারবাবু যখন আমাদের খুব একান্তে পেলেন তখন তিনি অত্যন্ত শুভানুধ্যায়ী অভিভাবকের মত আবেগভরে বললেন—"দেখ একটার পর একটা তোমাদের ওপর বিপদ আসছে। এ যেন কোন অমঙ্গল সূচনার ইঙ্গিত। তোমরা এই পথ ছেড়ে দাও। ভগবানের বোধহয় ইচ্ছে নয় যে, তোমরা আর এই বিপদসঙ্কুল পথে থাক।"

ডাক্তারবাবুর স্নেহপরবশ মনের অভিব্যক্তি পেলাম। তাঁর সদিচ্ছা ও আন্তরিকতার প্রতি শ্রদ্ধা জানালাম। তবু তাঁকে বিনীতভাবে জবাব দিলাম, "দেখুন ডাক্তারবাবু! বিপদকে ভয় করা আমাদের শোভা পায় না। আর ভগবানের কথা বলছেন? তিনি মাঝে মাঝে পরীক্ষা করে দেখেন বিপদে আমরা স্থির থাকতে পারি কি না? আমাদের চলার পথে দুর্বলতার সঙ্গে কোন আপোষ নেই! আশীর্বাদ করুন যেন আমরা আমাদের লক্ষ্যের প্রতি অচল-অটল ও দৃঢ়প্রতিজ্ঞ থাকতে পারি।"

ডাক্তারবাবুকে বাড়ি পৌঁছে তাঁর কাছ থেকে বিদায় নিয়ে আমরা চলে এলাম। এতদিন ধরে একটানা পুলিশের সঙ্গে আমাদের প্রতিযোগিতা চলেছিল রামকৃষ্ণকে তাদের হামলার বাইরে নিরাপদ স্থানে কি করে রাখা যায় তাই নিয়ে। বৃটিশের বিরাট শক্তির বিরুদ্ধে আমাদের কতখানিই বা সাংগঠনিক ক্ষমতা ছিল যে বহুদিন ধরে পুলিশের চাতুর্যকে পরাস্ত করা আমাদের পক্ষে সম্ভব? সংক্ষিপ্ত সময় ও নির্দিষ্ট সাংগঠনিক শক্তি নিয়ে যখন দলের অস্তিত্ব বজায় রাখা প্রায় অসম্ভব হয়ে উঠেছিল তখন এর ওপর এল আরও জটিল সমস্যা। পুলিশ প্রতিদিনই রামকৃষ্ণের খোঁজে বাড়ি বাড়ি তল্লাসী করছে। তারা তো জানে না যে আমাদের পক্ষে দু-একটি উপযুক্ত বাড়িও যোগাড় করা কত কঠিন ছিল! তার ওপরে এখন বিস্ফোরণে আহত আরও দু'জনকে নিরাপদ স্থানে—ক্রমাগত বাড়ি পরিবর্তন করে নতুন নতুন বাড়িতে রাখতে হবে। কাজেই অতগুলি বাড়ি যোগাড় ও ক্রমাগত বাড়ি বদলানোর মধ্যে ধরা পড়বার সম্ভাবনাও অনেক বেশি দেখা দিল। ইতিমধ্যে আমরা রামকৃষ্ণকে গ্রামে পাঠিয়ে অনেকটা নিশ্চিন্ত ছিলাম। পুলিশ শহরে যতই খানাতল্লাসী করুক না কেন আমাদের তাতে ভয় ছিল না—বরং আমরা খুব আনন্দ পেতাম মূর্খের দলকে শহরে মাথা খুঁড়ে মরতে দেখে। কিন্তু এখন আমাদের প্রতিকূল অবস্থার পরিবর্তন হয়েছে। পুলিশ রামকৃষ্ণকে না পেলেও তার পরিবর্তে আর দু'জনকে হয়ত দগ্ধ অবস্থায় পেয়ে যাবে! তারক এবং অর্ধেন্দুকেও যে আমরা প্রথম সুযোগেই গ্রামের কোন বাড়িতে নিরাপদে থাকার জন্য পাঠাবার ব্যবস্থা করব তাতে কোন সন্দেহ নেই। কিন্তু শহরে কিছুদিন চিকিৎসা করাবার পর তারা একটু সুস্থ হলে তবে তাদের গ্রামে কোন আশ্রয়ে পাঠানো সম্ভব। সেইজন্য আরও কিছুদিন তাদের শহরে রাখতে হয়েছিল।

কয়েকটি নিরাপদ বাড়ি যোগাড় করেই আমরা নিরাপত্তার ব্যাপারে ক্ষান্ত হই নি। খানাতল্লাসী করার পূর্বে পুলিশের বিশেষ ধরণের কর্মতৎপরতা লক্ষ্য করার জন্য আমরা বাছাই করা সভ্যদের নিযুক্ত করি। খুব সামান্যভাবে হলেও পুলিশের বিরুদ্ধে আমাদের পাল্টা-গোয়েন্দাগিরি (counter espionage) করবার ব্যবস্থা সব সময়েই রেখেছিলাম। কিন্তু এই বিশেষ অবস্থার জন্য—অর্থাৎ বিস্ফোরণে দগ্ধ ও আহত সাথীদের নিরাপত্তা বজায় রাখবার জন্য—একটি বিশেষ বিভাগ আমাদের সংগঠিত করতে হ'ল যেন খানাতল্লাসী করতে যাওয়ার পূর্বাহ্নে পুলিশের গতিবিধি সম্বন্ধে আমরা তড়িৎ খবর পেয়ে যাই। সেইজন্য কোতোয়ালী, পুলিশ বিট্, ডি-আই-বি ইন্‌স্পেক্টার ও সাব-ইন্‌স্পেক্টারদের বাড়ি

প্রভৃতি স্থানে নজর রাখার জন্য আমরা আমাদের কর্মীদের মোতায়েন করি। পুলিশের কিরূপ বিশেষ ধরণের আনা-গোনা ও তৎপরতা লক্ষ্য করলেই অনুমান করা যাবে যে খানাতল্লাসীর উদ্দেশ্যেই তাদের সেই কর্মচঞ্চলতা—এই সম্বন্ধে আমাদের কর্মীদের বাস্তব ধারণা জন্মাবার জন্য তাদের সঙ্গে বহু আলোচনা করেছি।

পুলিশের গতিবিধির সংবাদ পাওয়ার ব্যবস্থা খুব সফলতার সঙ্গে যদি চালাতে না পারতাম তবে নিঃসন্দেহে আজ বলা যায় যে চট্টগ্রাম যুব-বিদ্রোহের আগুন জ্বলে ওঠার আগেই তার মৃত্যু ঘটত—ভারতের বিপ্লবী ইতিহাসে একটি সমুজ্জ্বল পাতা হয়ত স্বর্ণাক্ষরে লেখা থাকত না। পুলিশের ওপর নজর রাখার পরিকল্পনার সঙ্গে আমাদের আরও তিনটি অত্যন্ত জরুরী ব্যবস্থার আয়োজন করতে হ'ল। পুলিশের সন্দেহজনক কর্মতৎপরতা লক্ষ্য করবার পর যদি তৎক্ষণাৎ আমরা হেড্ কোয়ার্টারে (H.Q.-তে)—কেন্দ্রীয় কার্যালয়ের খবর নাই পেলাম তবে তো সবই ব্যর্থ হ'ল! আর খবর পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই যদি পুলিশের গতির পূর্বে আমরা তীব্রতর গতিতে তারক বা অর্ধেন্দুকে অন্যত্র নিরাপদ স্থানে সরিয়ে ফেলতে না পারি তবে খবর পেয়েই বা লাভ কি? পুলিশের সমাবেশ (mobilisation) লক্ষ্য করবার পর তারা কোন্ পথে কোন্ গন্তব্য স্থানে যাওয়ার উপক্রম করছে তারও সন্ধান দিতে আমাদের যুবক কর্মীদের বলা হয়েছিল। পুলিশ mobilisation-এর খবর পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আমরা, যারা নিজেদের পুলিশী আক্রমণের লক্ষ্য (target) বলে মনে করতাম, তারা পরবর্তী সংবাদের জন্য নিরাপদ স্থানে গোপনে অপেক্ষা করতাম এবং পুলিশ কোন দিকে ও কোন পথে অগ্রসর হচ্ছে তা জেনে নিয়ে আমাদের কর্ম-কৌশল স্থির করতাম। যখন জানতে পেরেছি যে, যেখানে তারক বা অর্ধেন্দু আত্মগোপন করে আছে পুলিশের গন্তব্য পথ আমাদের সেই সব আশ্রয়স্থলের দিকে নয়—তখন অনর্থক আমরা কোন সক্রিয় ব্যবস্থা অবলম্বনের প্রয়োজন অনুভব করি নি। অতি ক্ষিপ্রতার সঙ্গে সংবাদ পৌঁছানোর জন্য আমরা কতকগুলি টেলিফোন ও সাইকেলের বন্দোবস্ত করে রেখেছিলাম। দ্বিতীয়ত, যদি পুলিশের সমাবেশ ও গতিপথের সংবাদ পাই তবে সঙ্গে সঙ্গে আমাদের যেন মোটরগাড়ি ব্যবহারের সুযোগ থাকে—এই অপরিহার্য ব্যবস্থা না হওয়া পর্যন্ত আমরা নিশ্চিন্ত হতে পারি নি। তৃতীয়ত, যদি সেইরূপ আকস্মিক পরিস্থিতিতে আহত সাথীদের স্থানান্তরিত করতেই হয় তবে অন্তত সাময়িক আশ্রয়স্থলের ব্যবস্থা রাখা চাই-ই। সেইরূপ সাময়িক ব্যবস্থা খুব সুবিধের না হলেও চলবে কারণ, যদি দেখি শেষ পর্যন্ত পুলিশ আমাদের গোপন বাড়ির সঠিক সংবাদ পায় নি তবে আবার সেই স্থানেই আহত বন্ধুদের ফিরিয়ে নিয়ে যাব। আমাদের এই ব্যাপক ব্যবস্থার কার্যকরী সুফল পাওয়া তখনই সম্ভব ছিল যদি পুলিশের ক্ষিপ্রতা ও গতিকে পরাস্ত করে আমরা অধিকতর তৎপরতা ও দ্রুতবেগে কাজ

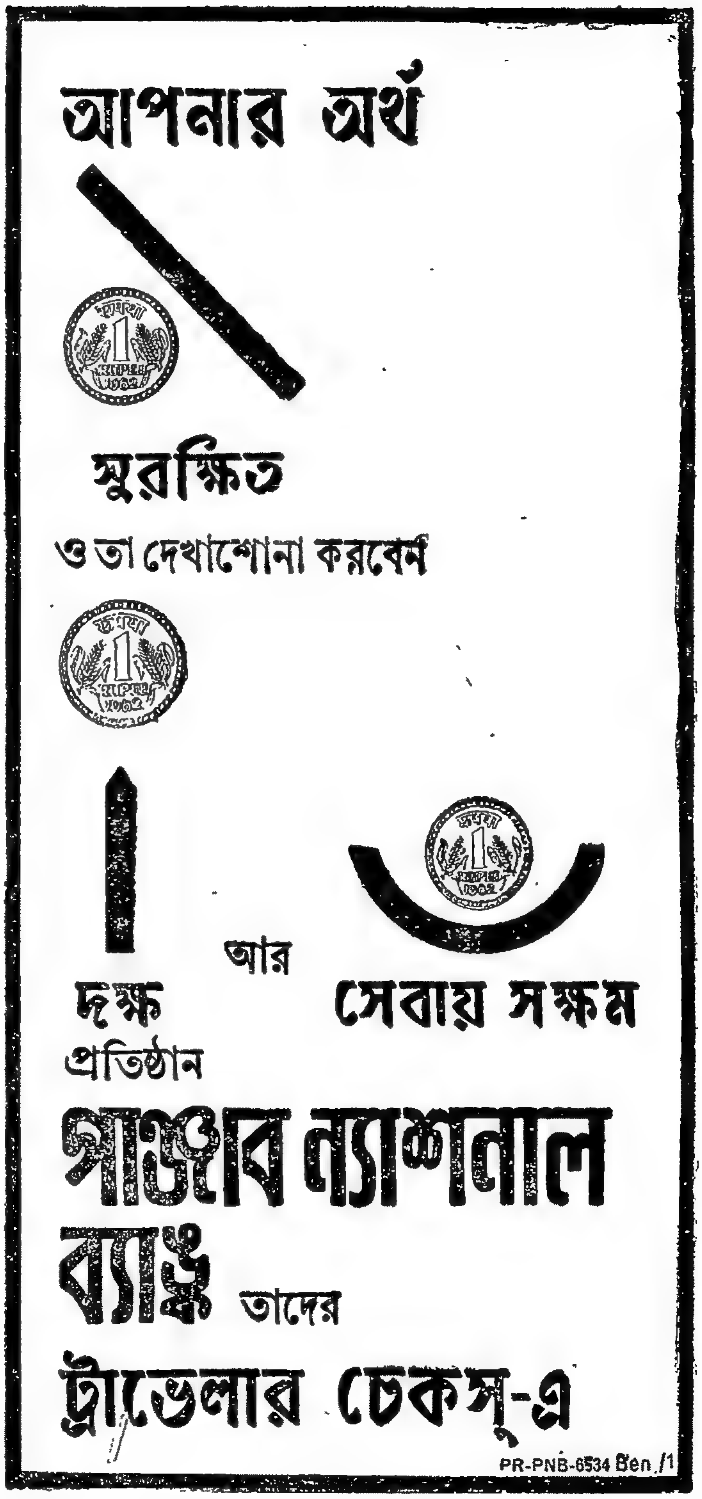

সম্পন্ন করতে পারতাম। যে সংগঠন বেশি গতিশীল হবে সেইটিই জয়ী হবে। তখনকার দিনে বৃটিশ পুলিশ-অর্গেনিজেশন বিপ্লবী সংগঠন সম্বন্ধে যেটুকু অভিজ্ঞতা অর্জন করেছিল সেই ভিত্তিতে তারা ভাবতেও পারে নি যে, তাদের জ্ঞান বুদ্ধির অগোচরে ও দৃষ্টির অন্তরালে আমরা তাদের বিরুদ্ধে পাল্টা-গোয়েন্দাগিরি করছি এবং টেলিফোন, সাইকেল ও মোটর সমাবেশ করে এমনভাবে সারাক্ষণ প্রস্তুত হয়ে আছি যে তাদের খানাতল্লাসীর অভিযানকে প্রতিহত করবই।

পুলিশ অবশ্য অনেক পরে বুঝেছিল যে আমরা তাদের ওপরে নজর রাখি। তবু তারা জানতে পারে নি যে কতখানি গুরুত্ব দিয়ে তাদের বিরুদ্ধে বিশেষ অবস্থায় সময় সময় আমরা কি কি বিশেষ ব্যবস্থা অবলম্বন করেছি। তাদের পক্ষে তা' জানা সম্ভব ছিল না। তবু তারা আমাদের তৎপরতা সম্বন্ধে কিছুটা যে আন্দাজ করেছিল তার নজীর পাই সরকারী তথ্য থেকে। ট্রাইব্যুনালের জজ্ সাহেব আমাদের মামলার রায়ে ৮ পৃষ্ঠায় উল্লেখ করেছেন—

"....It was noticed also that youths were deputed to watch the houses of the D. I. B. officers and note their movements—by way of counter-espionage."

জজ্ সাহেব বলছেন—এটা পরিলক্ষিত হয়েছিল যে পাল্টা-গোয়েন্দাগিরি করবার উদ্দেশ্যে ডি-আই-বি অফিসারদের বাড়ির ওপর নজর ও তাদের গতিবিধি সম্বন্ধে নোট রাখবার জন্য তরুণদের নিয়োগ করা হয়।

পাল্টা-গোয়েন্দাগিরি করে সংবাদ পাওয়ার পর আমরা যেভাবে তৎপরতার ব্যবস্থা করেছিলাম তার একটু আভাস পাওয়া যায় আমাদের মামলায় অভিযুক্ত কারও স্বীকারোক্তিতে—

"....Hari Gopal told me that, while preparing a bomb Ramkrishna met with an accident, and his face, etc., were burnt. A few days after, Hari Gopal told me that Ramkrishna had been removed from the town, where —I do not know. I knew him to belong with this secret revolutionary party and found him at Ganesh Ghosh's house on many days. After this accident, Hari Gopal, Amarendra, and myself were deputed as guards to watch the movements of the police. I kept watch at the basha of Sarada Babu of the C.I.D., Kotwali, Sadarghat and Baxi Hat beat, in order to ascertain whether they were going anywhere to make arrests or where they were going or what they are doing? Only one day we found that Hem Daroga, Siddik, Sachin Babu, and constables were passing through a lane in Jamalkhan. Except this we noticed no other movements of the police in this connection." (From the Printed Judgment in Armoury Raid Case No. I of 1930—page 85.).

উপরে উদ্ধৃত বিষয়ের সারমর্ম এইরূপ—হরিগোপাল তাকে বলেছিল যে রামকৃষ্ণ বোমা নির্মাণ করার সময় বিস্ফোরণে আহত হয়—তার মুখ প্রভৃতি পুড়ে গেছে। কিছুদিন পর হরিগোপাল তাকে পুনরায় বলেছিল যে রামকৃষ্ণকে শহর থেকে স্থানান্তরিত করা হয়েছে—কোথায়, তা' অবশ্য সে জানে না। সে রামকৃষ্ণকে গণেশ ঘোষের বাড়িতে দেখেছে এবং তাকে বিপ্লবী দলের একজন বলে জানত। এই দুর্ঘটনার পর হরিগোপাল, অমরেন্দ্র ও সে পুলিশের গতিবিধি লক্ষ্য করবার জন্য নিযুক্ত হয়েছিল। সি-আই-ডি সারদাবাবুর বাড়ি, কোতোয়ালী এবং সদরঘাট ও বক্সিহাট পুলিশ বিট্ দু'টির ওপর নজর রাখবার ভার তার ওপর পড়েছিল। পুলিশ দল গ্রেপ্তার করতে কোথাও যাচ্ছে কি না বা কোথায় যাচ্ছে ও কি করছে সেইরূপ তথ্যাদির সত্যতা যাচাই করার জন্য তার ওপর নির্দেশ ছিল। তারা মাত্র একদিন হেম দারোগা, সিদ্দিক, শচীনবাবু ও কনেস্টবলদের জামাল খাঁর একটি গলিতে ঢুকতে দেখে। এই সংক্রান্তে পুলিশের এই একটি গতিবিধির কথা ছাড়া তারা আর কিছু জানে না।

এই বিবরণ থেকে পুলিশের বিরুদ্ধে আমাদের কৌশল-প্রতিযোগিতার সামান্য আভাস মাত্র পাওয়া যায়। বিভিন্ন ছোট ছোট দল গঠন করে counter-espionage করার বিশেষ ব্যবস্থা করতে হয়েছে সেই বিশেষ পরিস্থিতির সম্মুখীন হওয়ার জন্য। এইরূপ সক্রিয় ব্যবস্থা ছিল বলেই আমরা ঠিক সময়মত খবর পেয়ে পাঁচ-ছয় বার ঘোর বিপদ থেকে নিষ্কৃতি পেয়েছি।

সেই দিন রাত্রের শো-তে আমরা প্রায় আট-দশজন সিনেমায় গেছি। একজন দু'জন করে আলাদাভাবে টিকিট করে ছড়িয়ে বসেছি। সিনেমার নামটি এখন ঠিক আমার মনে পড়ছে না। সেই সিনেমা হাউসের নাম বোধহয় "লোটাস্"। চট্টগ্রাম জেলা আদালতগৃহে যে পাহাড়ের ওপর অবস্থিত তারই পূর্ব দিকে পুরনো পোস্ট অফিসের দক্ষিণে এই সিনেমা হলটি ছিল। সেদিন কি ছবি দেখেছিলাম—বাংলা না ইংরেজী, তাও মনে নেই। তরুণ পাঠক-পাঠিকারা সেই যুগের চলচ্চিত্র সম্বন্ধে হয়ত খুব কমই জানেন। ১৯৩০ সালেও পুরাদস্তুর সবাক্ চলচ্চিত্র (Talkies) ভারতে আমদানী আরম্ভ হয় নি। কলকাতার কোন কোন হলে অর্ধ বা আংশিক সবাক্ চলচ্চিত্র দেখতে পাওয়া যেত। চট্টগ্রামে নির্বাক চলচ্চিত্রই তখন দেখেছি।

পর্দায় ছবি চলছে। দর্শকরা নিবিষ্ট মনে ছবি দেখছে। আমরাও হয়ত ছবিটি উপভোগ করছিলাম। এমন সময় প্রহরায় রত আমাদের এক যুবক কর্মী ছুটে এসেছে। সে আমাদের একজনকে সাঙ্কেতিকভাবে বিপদ সঙ্কেত দিল। সঙ্গে সঙ্গে সঙ্কেতটি প্রত্যেকের কাছে চুপি চুপি মৃদুস্বরে পৌঁছে গেল। ছবি চলার মাঝখানে নিঃশব্দে আমরা একের পর এক সিনেমা হল ছেড়ে বাইরে এলাম। একজন দু'জন করে আমরা যত শীঘ্র পারি গণেশের বাড়ি পৌঁছলাম। সেখানে মাঝে মাঝে পরীক্ষা-নিরীক্ষার জন্য গান-কটন্, পিক্রিক পাউডার প্রভৃতি আনা হোত। সেইদিন আবার তিন-চারটি তরবারি (sword) শাণ দিয়ে ধার করে আনা হয়েছিল। সেইগুলিও গণেশের বাড়িতে ছিল। খবর পেয়েছিলাম ডি-আই-বি সাব-ইনস্পেক্টর রোহিণী ভৌমিকের বাড়িতে রাত দশটা থেকে অস্বাভাবিক রকম পুলিশের আনাগোনা চলছে। তাদের গতিবিধির লক্ষণ খুব সন্দেহজনক মনে হওয়ায় আমাদের কাছে সেই সংবাদ পৌঁছায়। দ্রুত ও তড়িৎগতিতে নিরাপত্তার ব্যবস্থা না করলেই নয়। বলা বাহুল্য যে, এইরূপ পরিস্থিতির জন্য আমরা সদাসর্বদা প্রস্তুত হয়েই ছিলাম। কাজেই ঘড়ির কাঁটার সঙ্গে সঙ্গে চলার পদ্ধতিতে (clock-like-precession) আমাদের আসন্ন কাজ সমাপ্ত করি। গণেশের বাড়িতে যত সব বে-আইনী বৈপ্লবিক ষড়যন্ত্রমূলক জিনিসপত্র ছিল সব সরিয়ে ফেলা হ'ল। তারক ও অর্ধেন্দুর বাড়ির দিকে পুলিশ ফোর্সের মুখ্য গতি কি না তা' লক্ষ্য করছে তখনও অন্য একজন বা দু'জন যুবক বন্ধু। তাদের পরবর্তী

সংবাদের অপেক্ষায় আছি আমরা—গাড়ি তৈরি আছে। খবর পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে প্রয়োজন অনুযায়ী ব্যবস্থা অবলম্বনের জন্য তৈরি হয়ে রইলাম। কিছুক্ষণের মধ্যেই খবর পেলাম যে পুলিশ পার্টি যে রাস্তা ধরেছে তাতে মনে হয় অর্ধেন্দুর বাড়ির দিকেই যাচ্ছে। মুহূর্তে আমাদের গাড়ি ছুটল। পুলিশ সেই পাড়ায় পৌঁছবার আগেই আমরা উপস্থিত হলাম এবং পূর্ব ব্যবস্থা অনুযায়ী অর্ধেন্দু সঙ্কেত পেয়েই গাড়িতে এসে উঠল। সেই বাড়িতে আমাদের যে তরুণ বিপ্লবী বন্ধু ছিল, সেই অর্ধেন্দুর গতিবিধি নিয়ন্ত্রণ করেছে। আমরা সেই রাত্রে অর্ধেন্দুকে গাড়িতে নিয়ে প্রায় ঘণ্টা দুই ঘুরে বেড়াই। তারপর আবার খবর পেলাম পুলিশ অন্য একটি বাড়িতে হানা দিয়ে ফিরে এসেছে। তখন যথারীতি অর্ধেন্দুকে আবার সেই আশ্রয়স্থলে পৌঁছে দিয়ে ফিরে এলাম।

আর একদিনের ঘটনা। দুপুর বেলা প্রায় দুটো হবে। গণেশ আমাকে চন্দনপুরাতে হিমাংশুদের বাড়ি পৌঁছে দিয়ে বেবী-অস্টিনটি নিয়ে কোন কাজে গেল। প্রায় দু'-তিন ঘণ্টা পরে এসে আমাকে তুলে নেবে সেরকম কথা ছিল। গণেশ চলে যাওয়ার পর পনেরো মিনিটও হয় নি আবার অস্টিন গাড়ির হর্ন শুনতে পেলাম। এ কি এ যে বিপদ-সঙ্কেত! হর্নের শব্দের বিশেষত্ব লক্ষ্য করে নিশ্চিত হলাম যে বিপদ গুরুতর ও আসন্ন। মুহূর্তে লাফিয়ে গাড়িতে গিয়ে উঠলাম। বলাই বাহুল্য, আমাদের দু'জনের কাছেই গুলীভর্তি রিভলভার সব সময়েই থাকত। গণেশ ঊর্ধ্ব গাড়ি চালাতে চালাতে খবর বলল যে চরচাক্‌তাইয়ের দিকে পুলিশ ফোর্স যাচ্ছে। সেই এলাকায় আমরা তারককে একা একটা বাসায় থাকবার ব্যবস্থা করেছিলাম। সেই বিশেষ বাসাটির অস্তিত্ব এবং সেখানে যে তারক দগ্ধ অবস্থায় ডাক্তারের চিকিৎসায় আছে তা' আমরা মাত্র ক'জনে জানতাম। গণেশকে যে খবর দিয়েছে পুলিশের গতিপথ সম্বন্ধে, সেও জানত না এই বাড়ির অবস্থান। তাই ওর খবরের গুরুত্ব বুঝেছিল একমাত্র গণেশ।

আমরা দু'জনে চলন্ত গাড়ির মধ্যে আলোচনা করে বুঝেছিলাম যে সময় খুব সংক্ষেপ। পুলিশ হয়ত ইতিমধ্যে পৌঁছে গেছে নয়ত আমাদের পৌঁছবার আগেই সেখানে উপস্থিত হবে। বড় গাড়ির ব্যবস্থা করতে গেলে আরও সময় যাবে। এখন পুলিশের সঙ্গে দৌড় প্রতিযোগিতা। কে আগে লক্ষ্যস্থলে গিয়ে পৌঁছবে? তখন সমর-বিজ্ঞান সম্বন্ধে কিই বা জানতাম! নেপোলিয়নের War of Movement (গতিশীল যুদ্ধ প্রণালী) সম্বন্ধে কিছুই পড়ি নি। ছত্রপতি শিবাজীর ঝটিকাবেগে রণ-কৌশলের প্রয়োগ সম্বন্ধে কি বা জ্ঞান ছিল! সমর-বিজ্ঞান সম্বন্ধে তখন আমাদের অ-আ-ক-খ জ্ঞানও ছিল না। তবে 'ঝটিকাবেগে আক্রমণ চালাতে হবে', 'তড়িৎ গতিতে স্থান পরিবর্তন করতে হবে', 'আকস্মিক আক্রমণের সুযোগ নিতে হবে'—ইত্যাদি আমরা শ্লোগানের মত বুঝেছিলাম আর তা' বুদ্ধি ও সাহসের সঙ্গে প্রয়োগ করেছি।

হাতে সময় খুব কম—একেবারে নেই বললেই হয়। এখন চাই প্রবল বেগ (Dash), প্রচণ্ড শক্তি ও দুর্দান্ত সাহস! We must race for time! সময়ের প্রতিযোগিতায় আমাদের জেতা চাই-ই। যদি পুলিশের আগে গিয়ে পৌঁছতে পারি তবে হয়ত সংঘর্ষ এড়ানো যাবে—হয়ত নির্বিঘ্নে তারককে নিয়ে আসতে পারব। তাই আর বড় গাড়ি বা অন্য কোন প্রথম সারির সাথীদের সঙ্গে নেওয়ার চেষ্টা করি নি। পথ থেকে একজন সাথীকে তুলে নিলাম যে সেই বাড়িটি আমাদের মত আগে থেকেই চেনে। এই ব্যবস্থা পূর্ব থেকেই ছিল। তাই ছেলেটিকে সঙ্গে নিতে সময় নষ্ট হয় নি। আমরা অস্টিন গাড়িটি একেবারে পাথরঘাটা ইঁটখোলার মাঠের শেষ প্রান্তে নিয়ে গেলাম। সেই স্থান থেকে প্রায় পোয়া মাইল মাঠ, বিল, কাদা পেরিয়ে চরচাক্‌তাই যাওয়া যায়। এই পথে লোকজনের যাওয়া-আসার রীতি ব্যবস্থা নেই। আমরা এই অব্যবহৃত, অপ্রচলিত, সহজ ও পেছনের স্বল্প দূরত্বের রাস্তাটি ব্যবহার করাই অধিকতর যুক্তিযুক্ত বলে মনে করলাম।

গাড়িতে আমরা দুজন—গণেশ ও আমি, বসে রইলাম। আমাদের যুবক বন্ধুকে এই পেছনের পথে পাঠালাম, সে যেন তারককে সঙ্গে করে সেই রাস্তায় দ্রুত ফিরে আসে। তারকের পক্ষে এতদূর হেঁটে আসা খুবই কষ্টসাধ্য ছিল। তবু বিপ্লবীদের প্রয়োজনের খাতিরে সব কষ্ট সহ্য করতে হবে—সব ঝুঁকি নিতেই হবে। বর্তমানে তারকের হাঁটবার ক্ষমতা অবশ্য হয়েছিল। তবে এতদূরে হাঁটবার তার প্রয়োজন হয় নি। বাড়িতে নড়াচড়া করত, বাথ্‌রুম প্রভৃতিতে নিজে যেতে পারত। সেই ভরসায় তারককে এই পথে আনতে বললাম। স্বল্প সময়ের মধ্যে এই পথটির সুযোগ নিলে হয়ত শেষ পর্যন্ত আমরা জয়ী হতেও পারি—এই আশায় তখনকার মত এই tactical route নেওয়া ছাড়া গত্যন্তর ছিল না।

আমাদের যুবক বন্ধু অবস্থার গুরুত্ব উপলব্ধি করে প্রায় দৌড়ে তারককে আনতে গেল। প্রায় দশ-বারো মিনিটের মধ্যে দূর থেকে দেখতে পেলাম তারক ও সে মাঠের অপর প্রান্তে এসে পৌঁছেছে এবং বিল, কাদা অতিক্রম করে আমাদের দিকে অগ্রসর হচ্ছে। তাদের দেখতে পেয়ে তবু আশা হল—বোধহয় এ যাত্রাও রক্ষা

শ্রীহিরণ্ময় বন্দ্যোপাধ্যায়,
উপাচার্য, রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয় রচিত

ঠাকুরবাড়ীর কথা

ঠাকুরবাড়ী আমাদের জাতীয় ইতিহাসের ধারাকে দুইভাবে প্রভাবান্বিত করেছে। প্রথমত, পাশ্চাত্য সংস্কৃতির সহিত সংঘাত আমাদের জরাগ্রস্ত সংস্কৃতির মধ্যে যে আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল, তাকে জাতীয় স্বার্থের অনুকূলে প্রবাহিত করেছে। দ্বিতীয়ত তা এমন একটি পরিবেশ সৃষ্টি করেছিল, যা এই বাড়ীর সন্তান রবীন্দ্রনাথের অনন্য-সাধারণ প্রতিভার ঠিক পথে বিকাশের সহায়তা করেছিল। ভাল ফুল পেতে যেমন উপযুক্ত সেবা ও যত্ন প্রয়োজন তেমনি প্রতিভাবান মানুষের বিকাশের জন্যও অনুকূল পরিবেশের প্রয়োজন। রবীন্দ্রনাথের অগ্রজ ভ্রাতা, ভগিনী ও ভ্রাতৃজায়াগণ সেই পরিবেশটি রচনা করেছিলেন।

এই গ্রন্থের আলোচ্যসূচী ঃ পূর্বপুরুষ, দ্বারকানাথ, দেবেন্দ্রনাথ, মহর্ষির পরিবার, রবীন্দ্রনাথ, পরিবারের উত্তরপুরুষ, বাঙলার সমাজজীবনে ঠাকুরবাড়ীর ভূমিকা। রবীন্দ্রচর্চায় একটি অপরিহার্য বই। উৎকৃষ্ট প্রকাশন-সৌষ্ঠব। [১২·০০]

সা হি ত্য সং স দ

৩২এ আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড ঃঃ কলিকাতা-৯

পেলাম! তবু তখনও বিপদসীমারেখা (Danger Zone) উত্তীর্ণ হতে পারি নি। তাই আশার ক্ষণিক আলো দেখে আনন্দিত হয়েছি—উৎফুল্ল হই নি।

তারক ও আমাদের যুবক বন্ধুটি গাড়িতে এসে উঠল। তারক খুব হাঁপিয়ে পড়েছে। তবু মনের জোরের কমতি ছিল না। আমরা বড় রাস্তায় সুবিধেমত স্থানে যুবক বন্ধুটিকে নামিয়ে দিলাম। গাড়িতে তখন আমরা তিনজন—গণেশ, আমি ও তারক। তখনও পরিষ্কার দিনের আলো। বোধহয় চারটে বা সাড়ে চারটে হবে। উপায় নেই—তারকের দগ্ধস্থান কোন আবরণে ঢেকে রাখাও সম্ভব ছিল না। সেই অবস্থায় দিনেরবেলা বেবী-অস্টিন চেপে শহরের রাস্তা অতিক্রম করে চলেছি। পথে অনেকেরই দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়েছে তাতে সন্দেহ নেই। সেজন্য অবশ্য ভাববার কিছু ছিল না। কিন্তু যদি কোন পরিচিত পুলিশের নজরে পড়তাম তাহলে যে কি সর্বনাশ হোত, সেইটিই ছিল ভাবনার। যতদূর সম্ভব আমরা বড় রাস্তা বা ভিড়ের রাস্তা পরিহার করেই চলেছি।

আমরা তখন ঠিক করেছিলাম তারককে সাময়িকভাবে আনন্দ ও দেবুর বাড়িতে নিয়ে তুলবো। এই বাড়িটি গভর্নমেন্ট কলেজের অপর দিকে একটি ছোট টিলার ওপরে। আনন্দের পড়বার ঘরটি প্রধান দালান থেকে প্রায় পঁচিশ-তিরিশ ফুট দূরে বাড়ির লনের অন্য প্রান্তে। এই টিলার ওপর মোটর গাড়িটি যাওয়ার কোন পথ ছিল না। টিলার নিচে গাড়ি থেকে নেমে হেঁটে ওপরে উঠতে হোত। আমরা অবশ্য অস্টিন গাড়িটি মাঝে মাঝে তাদের বাড়ি ওঠার পথ ধরে প্রায় অর্ধেক ওপরে উঠিয়ে আনতাম। সেখানেই গাড়ি পার্ক করে রাখতে হোত—তার ওপরে আর যাওয়া যেত না।

গাড়ি নিচে রেখে তারককে ঐ অবস্থায় সবার দৃষ্টির মধ্যে হাঁটিয়ে নিয়ে যাওয়া কোনমতেই চলতে পারে না। তাই এক নতুন পথে আনন্দদের বাড়ির লনের ওপর গাড়ি নিয়ে যাব ঠিক করলাম। অপ্রচলিত রাস্তায়, অর্থাৎ, কোন রাস্তাই নেই তবু সেই পথে—এক পাদ্রী সাহেবের পাহাড়ের মাঝখান দিয়ে গাড়ি চালালাম। এক বৃদ্ধা মেমসাহেব খুব তেড়ে এলেন—চেঁচিয়ে কি কি যেন বলছিলেন। সেদিকে বিন্দুমাত্র কর্ণপাত না করে নিমেষে পাদ্রী সাহেবের পাহাড় অতিক্রম করে বেবী অস্টিনটি নিয়ে আনন্দদের বাড়ির উত্তর-পশ্চিম কোণ দিয়ে কম্পাউন্ডে প্রবেশ করলাম। গাড়িটি একেবারে তাদের পড়ার ঘরের সঙ্গে লাগিয়ে দাঁড় করালাম। তারক টুপ করে নেমে ঘরের মধ্যে চলে গেল। আনন্দের মা, দিদি, কেউই টের পেলেন না। তবে অপ্রত্যাশিতভাবে এই প্রথম তাদের টিলাটির ওপরে দালানের সামনে মোটর গাড়ি এসেছে দেখে অবাক হলেন ও খুশি হয়েছেন বলে মনে হল।

তারককে সেখানে আনার সঙ্গে সঙ্গে সব রাস্তার ওপরে আমাদের 'প্রহরী' মোতায়েন করলাম, যেন অনেক দূর থেকেও পুলিশ ফোর্সকে আসতে দেখলেই 'রিলে' করে টিলার ওপর সংবাদ দিতে পারে। এই টিলার পশ্চিমে লাগান ছোট-বড় পাহাড়ের সারি বহুদূর পর্যন্ত বিস্তৃত হয়ে আছে। তাই একটু আগে পুলিশের আগমনবার্তা পেলেই তারক অতি সহজে পাহাড়ের আড়ালে আত্মগোপন করতে পারবে। এই বাড়িটিকে এইভাবে নানান ষড়যন্ত্রমূলক কাজে ব্যবহার করেছি। যথাস্থানে সে-সব বিবরণ দেওয়া হবে।

তারক, অর্ধেন্দু বেঁচে আছে তখনও। আর তাদের যন্ত্রণার উপশম করবার জন্য এবং সর্বোপরি চট্টগ্রাম যুব-অভ্যুত্থানকে অপঘাত মৃত্যুর হাত থেকে বাঁচাবার উদ্দেশ্যে আমি তাদের মৃত্যুই শ্রেয় বলে মনে করেছিলাম—তাদের গুলী করে মারবার প্রস্তাব আমিই করি! তারক, অর্ধেন্দু বেঁচে আছে—এখন অনেক সুস্থ তারা। কিছুদিনের মধ্যে তারা সম্পূর্ণ সুস্থ হবে। কত বড় একটি অন্যায় করতে যাচ্ছিলাম! গণেশ যদি ঐরূপ দৃঢ়তার সঙ্গে বিপদকে উপেক্ষা করার সাহস না দিত, তবে হয়ত জীবনের সেই মহা ভুলের জন্য কোন প্রায়শ্চিত্তই আমার যথেষ্ট হত না। প্রতি মুহূর্তে আমি পীড়া অনুভব করেছি এই ভেবে, যারা সশরীরে বেঁচে আছে, সুস্থ হয়ে উঠছে,—তাদেরই মুমূর্ষু অবস্থায় চিরকালের জন্য স্তব্ধ করে দিতে চেয়েছিলাম। আর আনন্দ হয়েছে গণেশের কথা ভেবে, তারই জন্য আমি এতবড় একটা অন্যায়ের হাত থেকে বেঁচে গিয়েছি।

দু-তিন দিনের মধ্যে তারক ও অর্ধেন্দুকে আমরা গ্রামের আশ্রয়ে পাঠাবার ব্যবস্থা করলাম। রাত বারোটায় জোয়ার আসবে। সেই সময় নৌকা ছাড়বে। নৌকা ভাড়া করা হয়েছে। আব্দুর রহমানের খেয়াঘাটে নৌকা বাঁধা থাকবে। শঙ্কর আমাদের সঙ্গে সেই ঘাটের কাছে রাস্তায় দেখা করবে। আমরা মোটর গাড়ি করে রাত বারোটায় তার জিম্মায় দিয়ে আসব—এটাই ঠিক ছিল। সেই মত রাত বারোটার সময় আমরা ঘাটের রাস্তা পর্যন্ত গেলাম। গাড়ি থেকে নেমে কিছুটা হেঁটে তারপর ঘাটে যাওয়া যায়। গলির মত ছোট একটি রাস্তা। আলো ছিল না। ঘুটঘুটে অন্ধকার! শঙ্কর অপেক্ষা করছিল। আমাদের কাছে এসে সে কানের কাছে মুখ নিয়ে ফিস্ ফিস্ করে বলল—"দুই টেঁয়া দুই আনা!" (দুই টাকা দু' আনা)। এই কথা ক'টি সে দু' তিনবার সেইরূপ ফিস্ ফিস্ করে বলল। তার গলার স্বর, চাহনি, চলাফেরা—সবই যেন একটি ভীষণ ষড়যন্ত্রমূলক কাজ করছে বলে প্রমাণ দিচ্ছে। আমি বিরক্ত হয়ে খুব জোরে জোরে বললাম—"দুই টেঁয়া, দুই আনা", "দুই টেঁয়া দুই আনা!" তারপর সেইরূপ উচ্চস্বরে বললাম—তোমার এখানে ভয় কিসের? তোমার গলার স্বর, চলাফেরা এমন করছ যে সন্দেহ করার না থাকলেও লোকে সন্দেহ করবে।" যা হোক, তারককে নিয়ে সে চলে গেল। তার পরদিন মাস্টারদার কাছে 'দুই টেঁয়া, দুই আনার' গল্পটা বলে আমরা খুব হাসাহাসি করলাম। সেই থেকে কাউকে ঘাবড়াতে দেখলে আমরা বলতাম—"এই খেয়েছে! আবার দুই টেঁয়া দুই আনা!"

ষড়যন্ত্রমূলক কাজ সফলতার সঙ্গে করতে হলে কথাবার্তা, চলাফেরা খুব স্বাভাবিক হওয়া উচিত। তাই আমাদের শিক্ষা-পদ্ধতিতে এটার ওপর বিশেষ নজর রেখেছিলাম যেন কোন চক্রান্তমূলক কাজ করবার সময় কোন অস্বাভাবিক কিছু করে না বসি। চালচলনে, কথাবর্তায়, মুখের চেহারা বা চাহনির মধ্যে কোন প্রকার পার্থক্য যেন দেখা না যায়, তার জন্য চেষ্টা করে সহজ, সরল ও স্বভাবজাত ভাব বজায় রাখতে চেষ্টা করি। এই পরিপ্রেক্ষিতে "দুই টেঁয়া দুই আনা!"—অর্থাৎ নৌকা ভাড়া করা হয়েছে দু' টাকা দু' আনা দিয়ে, এই সহজ কথাটাও সহজভাবে বলতে না পারাটা একটা উদাহরণ হয়ে রইল আমাদের সংগঠনে এবং এই ধরণের কারও স্নায়বিক দৌর্বল্য প্রকাশ পেলে উদাহরণটি উল্লেখ করতাম—"দুই টেঁয়া দুই আনা!"

[ক্রমশঃ]

শ্রীযামিনীমোহন কর প্রণীত

কলা দেখিয়ে

মূল্য ঃ এক টাকা

ছেলেদের জন্য আর একখানি রহস্যোপন্যাস। পাঠ আরম্ভ করিলে শেষ না করিয়া ছাড়া যায় না।

উপহার দিবার যোগ্য বই

প্রসিদ্ধ চিত্রশিল্পী

শ্রীশৈল চক্রবর্তী দ্বারা সুচিত্রিত।

ছাপা ও বাঁধাই মুগ্ধকর।

বসুমতী প্রাইভেট লিমিটেড

১৬৬, বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী স্ট্রীট, কলি-১২

বঙ্গদর্শন

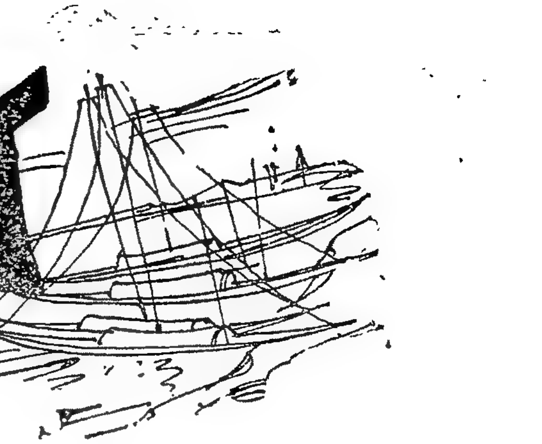

বিধানসভায় অনাস্থা প্রস্তাব

আমাদের দেশের 'গণতন্ত্র' বড়ই বিচিত্র। পশ্চিম থেকে আমরা যে গণতন্ত্রের পাঠ নিয়েছি, তার সংগে খাঁটি ভারতীয় ভেজাল মিশিয়ে আমরা এ হেন চীজ তৈরি করেছি যার তুলনা আর কোথাও নেই।

পশ্চিমী ধরণের গণতন্ত্র, যার দার্শনিক ভিত্তি হচ্ছে লিবারালিজম, ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের আদর্শে বিশ্বাসী এবং এই কারণেই বিরোধী দলসমূহ গণতন্ত্রের অপরিহার্য অংগ। আমাদের দেশ কাগজে-কলমে এই গণতন্ত্রের আদর্শই গ্রহণ করেছে, কিন্তু ভারতীয়ত্ব বজায় রাখার জন্যই বোধ হয় 'বিরোধীদের' একেবারে ছেঁটে বাদ দিয়েছে।

পার্লামেন্ট থেকে বিরোধীদলের সদস্যদের ঘাড় ধরে বার করে দিয়ে শাসকদল নিজেদের অনুকূলে আইন পাশ করছে এ দৃশ্য ইংলন্ডের পার্লামেন্টে অকল্পনীয় কিন্তু ভারতের প্রতিটি রাজ্যেই যেন এটাই রীতি। এ বিষয়ে পশ্চিমবঙ্গ সবাইকে টেক্কা দিয়েছে। গতবারের আইনসভার অধিবেশনে বিরোধীদের সমূলে বহিস্কৃত করে গণতন্ত্রের মহিমা কীর্তন করা হয়েছিল। এবারের অধিবেশনের প্রথম চোটে বেকায়দায় পড়ে শাসক দলের তরফ থেকে অনির্দিষ্টকালের জন্য অধিবেশন বাতিল করে দেওয়া হয়েছিল, আবার অবশ্য এখন তা খুলেছে কয়েকদিনের জন্য।

বিধানসভার অধিবেশন বাতিল থাকাকালীন সৌভাগ্যক্রমে বিধান পরিষদের অধিবেশন চলেছিল এবং সেই অধিবেশনে সরকারের বিরুদ্ধে অনাস্থা প্রস্তাব আনা হয়েছিল। অবশ্য নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতার জোরে সরকার পার পেয়েছিলেন। এবারে বিধানসভায় পুনরায় অনাস্থা প্রস্তাব আনা হয়েছিল এবং ঐ একই কারণে, অর্থাৎ নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতার জোরে এবারেও তাঁরা পার পেয়ে গেছেন।

বিরোধী দল নেতা জ্যোতি বসু অনাস্থা প্রস্তাবের তিনদিনব্যাপী বিতর্কের সূচনা করে বলেন যে, ৪৮ ঘণ্টাব্যাপী বন্ধের ঘটনা অবিস্মরণীয় ও ঐতিহাসিক। এইরকম গণজাগরণ আর ইতিপূর্বে দেখা যায় নি। সমগ্র পশ্চিমবঙ্গের সাধারণ মানুষ সরকারের সর্বপ্রকার বিরোধিতা, পুলিশী নির্যাতনের সমস্ত প্রস্তুতি ও হুমকি, কংগ্রেস বাহিনীর হামলা সব কিছু অগ্রাহ্য করে দুঃখ-কষ্ট সহ্য করার ঝুঁকি নিয়ে বন্ধকে সফল করায় এই মন্ত্রিসভার বিরুদ্ধে জনগণের সুস্পষ্ট অনাস্থা ঘোষিত হয়েছে। দুর্গাপুর, সোনারপুর, বেলঘরিয়া প্রভৃতি অঞ্চলে কংগ্রেসের ভাড়াটে লোকেরা অকথ্য জুলুম করেছে।

দক্ষিণপন্থী কমিউনিস্ট নেতা সোমনাথ লাহিড়ী বলেন যে, কংগ্রেসী গুণ্ডা, পুলিশ, মন্ত্রিসভার সকল সদস্য, তৈরি করে রাখা সৈন্যবাহিনী সব কিছু মিলিয়েও ধর্মঘট ব্যর্থ করা সম্ভব হয় নি। ট্রাম ও স্টেট বাস কর্মীদের হুমকি দেওয়া সত্ত্বেও সংগ্রামী শ্রমিকশক্তিকে বিপর্যস্ত করা সম্ভব হয় নি। ফরোয়ার্ড ব্লক নেতা ভক্তিভূষণ মণ্ডল বলেন যে, বিভিন্ন বামপন্থী দলের মধ্যে মতানৈক্য আছে বটে, কিন্তু অকংগ্রেসী জনপ্রিয় সরকার গঠনে সকল বিরোধী দলই একমত। কমল গুহ রাজ্যপাল সম্বন্ধে বিরূপ মন্তব্য করেন এবং মন্ত্রিসভার সদস্যদের প্রায় প্রত্যেকের বিরুদ্ধে অভিযোগ এনে বলেন যে, এই অনাস্থা প্রস্তাব কোন বামপন্থী দলের নয়, সারা পশ্চিমবঙ্গের জনগণের। পি-এস-পি নেতা শ্রীবলাইদাস মহাপাত্র বলেন যে, কংগ্রেসী সরকারের অত্যাচার লাঞ্ছনা ও অবমাননার হাত থেকে আজ লক্ষ লক্ষ মানুষ মুক্তি পেতে চায়। এস-এস-পি নেতা শ্রীশৈলেন অধিকারী বলেন যে, কংগ্রেস সরকার গত নির্বাচনের সময় যে-সব প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন তার একটাও পালিত হয় নি, যে সরকার দেশকে ধনীর স্বার্থে বিকিয়ে দিয়ে গণতন্ত্রকে হত্যা করে, চোরাকারবারীদের সহায়তা করে সেই সরকারের প্রতি দেশবাসীর আস্থা থাকতে পারে না। অন্যান্য সকল রাজনৈতিক দলের বক্তারা অনুরূপ কথা বলে অনাস্থা প্রস্তাব সমর্থন করেন।

অনাস্থাজ্ঞাপক প্রস্তাবটি সমর্থন করে বাংলা কংগ্রেস দলের নেতা শ্রীঅজয় মুখোপাধ্যায় বলেন যে, এই সরকারের কৃতিত্বে জাতীয় আয় কমছে, পাট ও ধানের বিঘাপ্রতি ফলন কমেছে, শিক্ষা ক্রমশ অবনতির দিকে যাচ্ছে, প্রতিটি ইউনিয়নে হাসপাতাল তৈরির প্রতিশ্রুতি পালিত হয় নি। জনসাধারণ খাদ্যের জন্য খাবি খাচ্ছে, টাকা নেই বলে সরকারী কর্মচারীদের ও শিক্ষকদের বেতন বৃদ্ধি করা হচ্ছে না, অথচ বাইরে থেকে পুলিশ আমদানী করতে টাকায় অকুলান হচ্ছে না। এই টাকাটা কি মন্ত্রীরা নিজেদের পকেট থেকে দিচ্ছেন, না কংগ্রেসের তহবিল থেকে দেওয়া হচ্ছে? সরকার ক্ষমতায় মদমত্ত হয়ে বাংলা বন্ধকে গুলীর মুখে উড়িয়ে দিতে চেয়েছিলেন। কিন্তু বন্ধের পর লজ্জা থাকলে তাঁদের পদত্যাগ করা উচিত ছিল। মন্ত্রিসভাকে আগামী সাধারণ নির্বাচনের কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে তিনি সতর্কবাণী উচ্চারণ করেন—সাবধান, দুঃশাসন সাবধান!

বিতর্কের শেষ দিনে বাংলা কংগ্রেস নেতা শ্রীশক্তি সরকারের তীব্রতম ভাষণে কয়েকজন মন্ত্রীর বিরুদ্ধে সুতীক্ষ্ণ অভিযোগকে কেন্দ্র করে সভাকক্ষে খণ্ডযুদ্ধের উপক্রম হয়। শ্রীসরকার অভিযোগ করেন যে, মুখ্যমন্ত্রীর অসংলগ্ন উক্তি তাঁর মস্তিষ্কের সুস্থতা সম্বন্ধে সন্দেহের সৃষ্টি করেছে এবং তাঁর মস্তিষ্ক পরীক্ষা করার জন্য বিশেষজ্ঞ কমিশন বসানো প্রয়োজন। পূর্তমন্ত্রীর বিরুদ্ধে রাইটার্স বিল্ডিংস-এর কক্ষকে বিলাসাগারে পরিণত করা, শিক্ষা-দপ্তরের রাষ্ট্রমন্ত্রীর বিরুদ্ধে বিদ্যালয় অনুমোদনের ব্যাপারে দুর্নীতি এবং পুলিশ বিভাগের রাষ্ট্রমন্ত্রীর বিরুদ্ধে দুর্নীতি ও মারাত্মক অপরাধে বিচারালয়ে অভিযুক্তদের পোষণ করার নির্দিষ্ট কয়েকটি গুরুতর অভিযোগও তিনি করেন। শ্রীসরকারের এই অভিযোগগুলির

দৃঢ়তায় সভায় যুগপৎ বিস্ময় ও চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয় এবং পুলিশ বিভাগের রাষ্ট্র-মন্ত্রী এতে এত উত্তেজিত হয়ে ওঠেন যে, তিনি সকল শালীনতা বিসর্জন দিয়ে বিধানসভায় এক লজ্জাজনক পরিস্থিতির সৃষ্টি করেন। পরে অবশ্য তাঁর এই কদাচরণের জন্য তিনি ক্ষমাপ্রার্থনা করতে বাধ্য হন। শ্রীকাশীকান্ত মৈত্রও সরকারের বিরুদ্ধে অনেকগুলি নির্দিষ্ট অভিযোগ আনেন।

সব মিলিয়ে তিনদিনব্যাপী অনাস্থা প্রস্তাবের উপর বিতর্ক ও আলোচনার পর প্রস্তাবটি ৮৪-১৪৬ ভোটে অগ্রাহ্য হয়। সেটা যে হবেই তা অবশ্য জানা ছিল, কারণ এখনও শাসকদল নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতার অধিকারী। তবে এই অনাস্থা প্রস্তাবকে উপলক্ষ করে বিরোধী দলগুলি সরকারকে একহাত দেখে নেবার চেষ্টায় ত্রুটি করেন নি। এবারের বিধানসভার বোধ হয় এই শেষ অধিবেশন।

শিক্ষক আন্দোলনের তৃতীয় পর্যায়

সরকার যতক্ষণ না পর্যন্ত শিক্ষকদের কোন সুস্পষ্ট, আন্তরিক ও কার্যকরী প্রতিশ্রুতি দিচ্ছেন ততদিন পর্যন্ত শিক্ষক আন্দোলনের বিরতি ঘটবে না। এবং সরকারকে যখন তা করতেই হবে তখন শুরুতেই তা করলে শিক্ষাব্যবস্থা এতখানি বিপর্যয়ের সম্মুখীন হত না। আজ ২৯শে সেপ্টেম্বর তারিখে এই বঙ্গদর্শন লেখবার সময় পর্যন্ত যে চিত্র দেখা যাচ্ছে তাতে সরকার পক্ষ এখনো উদাসীন এবং শিক্ষকেরা আরো বেশি দৃঢ়প্রতিজ্ঞ।

খুবই দুঃখের সঙ্গে লক্ষ্য করা যাচ্ছে শিক্ষকদের এই ন্যায়সঙ্গত সংগ্রামকে লোকচক্ষে হেয় করার জন্য এক শ্রেণীর লোক উঠেপড়ে লেগেছেন। আইনসভায় একজন মন্ত্রী শিক্ষকদের সম্বন্ধে রীতিমত অশ্রদ্ধাকর মন্তব্য করে বলেছেন যখন তাঁরা শ্রমিকের মত আন্দোলনে নেমেছেন তখন তাঁদের ক্ষেত্রেও 'নো ওয়ার্ক নো পে'-র নীতি অনুসৃত হওয়া উচিত। এই শ্রেণীর জীবেরা ভুলে গেছেন যে শিক্ষার দাবি জাতীয় দাবি, এবং কোন সভ্য দেশে যদি শিক্ষককে প্রাণধারণের তাগিদে রাজপথে নামতে হয় তাহলে সেটা সেই দেশের চালকদের পক্ষে গৌরবের বিষয় নয়। মুখ্যমন্ত্রীও শিক্ষকদের সম্বন্ধে রীতিমত অশ্রদ্ধাকর মন্তব্য করেছেন। তবে তাঁরা একটা বিষয়ে বড় ভুল করেছেন। এ দেশে দাবি আদায়ের অন্য কোন ভদ্র পন্থায় কান দেবার মত ভদ্রতাজ্ঞান যেহেতু সরকার শেখেন নি সেই হেতু সংগ্রাম ভিন্ন পথ কোথায়? কিভাবে সরকারকে লেজে-গোবরে করে দাবি আদায় করতে হয় তা লরীওয়ালারা দেখিয়ে দিয়েছে। তাদের টাকার জোর এবং সংগঠনের জোর ছিল তাই সরকার তাঁর সিংহগর্জন স্থগিত রেখে বিড়ালের মত মিউ-মিউ করতে করতে নাকে খত দিয়ে তাদের অন্যায় দাবি মেনে নিয়েছেন। শিক্ষকমশাইরা কি লরীওয়ালা নয় বলেই মন্ত্রীদের মুখ থেকে শিক্ষকদের সম্বন্ধে এই জাতীয় অশ্রদ্ধাকর উক্তিগুলি বেরিয়ে আসছে?

শিক্ষকদের লোকচক্ষে হেয় করার জন্য আরও একশ্রেণীর লোক উঠেপড়ে লেগেছে। যতদূর মনে হয় এরা স্বচ্ছল সমাজের অভিভাবক। এরা ইংরাজী দৈনিকগুলিতে চিঠির পর চিঠি লিখে এটাই প্রমাণ করতে চাইছে যে, ছেলেদের লেখাপড়ার ক্ষতি হচ্ছে। মাস্টারমশাইরা ধর্মঘট করে বড় অন্যায় কাজ করছেন। তাঁরা শুধু নিজেদেরই স্বার্থ দেখছেন। অভিভাবকদের সঙ্ঘবদ্ধ হতে হবে। সেপ্টেম্বর মাসের বেতন দেওয়া বন্ধ করতে হবে। কয়েকটি বড় বড় বাংলা কাগজেও এই একই সুর তোলা হচ্ছে। একটি বিখ্যাত দৈনিকে তো খোলাখুলি সম্পাদকীয়ই লিখে ফেলা হয়েছে যে, মাস্টারমশাইরা আন্দোলন করে বড় অন্যায় কাজ করছেন। গার্জেনদের এ বিষয়ে নিজে থেকে এগিয়ে এসে স্কুল চালানোর দায়িত্ব নিতে হবে, ইত্যাদি। তাছাড়া, মাস্টারমশাইরা ফাঁকিবাজ, তাঁরা টুইশানী করেন, ইত্যাদি গাদা গাদা অভিযোগ।

এই মিথ্যাচারের বিরুদ্ধে সুস্থ দায়িত্বশীল নাগরিকদের এগিয়ে আসতে হবে। এই সব অপপ্রচারের দ্বারা অভিভাবকদের বিভ্রান্ত হওয়া উচিত নয়, কেন না তাঁদের সর্বাধিক অংশ যেমন সরকারী কর্মচারী, শ্রমিক ইত্যাদি নিজেরাই প্রাণধারণের তাগিদে আজ আন্দোলনের পথ বেছে নিয়েছেন। কাজেই তাঁরা যে আন্দোলনরত শিক্ষকদের সঙ্গে সমধর্মিতা বোধ করবেন এটাই স্বাভাবিক। গতবারের বঙ্গদর্শনে লিখেছিলাম যে, শিক্ষকদের আন্দোলন ইত্যাদিতে ছাত্রদের যে দিনগুলি নষ্ট হয়েছে, মাস্টারমশাইরা গ্রীষ্মাবকাশ, পুজাবকাশ ও অন্যান্য ছুটি কমিয়ে তা পুরণ করে দিয়েছেন। গত বছরে উনিশ দিন মোট নষ্ট হয়েছিল এবং সব স্কুলেই এই দিনগুলি গ্রীষ্ম ও পুজাবকাশ থেকে পূরণ করে দেওয়া হয়েছে। কাজেই শিক্ষকমশাইরা ছাত্রদের দিক দেখছেন না, এই অভিযোগ শুধু অসত্যই নয়, দুরভিসন্ধিমূলক। এ বছরের গোড়ার দিকে খাদ্য আন্দোলনের সময় যে ক'দিন স্কুল বন্ধ ছিল, তা গরমের ছুটি থেকে বাদ গেছে, আশা করি অভিভাবকেরা এই কথা স্মরণে রেখেছেন। এ সত্ত্বেও যদি তাঁরা বলেন যে, মাস্টারমশাইরা ছাত্রদের ক্ষতি করছেন তাহলে তাঁদের সেয়ানা শয়তান ছাড়া অন্য কিছু আখ্যা দেওয়া যায় না। শিক্ষকমশাইরা প্রাইভেট টুইশানী করেন, এ অভিযোগ সম্পূর্ণ অপ্রাসঙ্গিক ও অবান্তর, কেন না প্রাইভেট টুইশানী কোন বে-আইনী ব্যাপার নয়। অবসর সময়ে উপার্জন বৃদ্ধির জন্য কোন কাজকর্ম করা নিশ্চয়ই সংবিধানবিরোধী নয়। যাঁরা অশিক্ষক তাঁরাও অনেকে প্রাইভেট টুইশানী করেন এবং জীবনধারণের তাগিদে মূল পেশা ছাড়াও অনেকে অন্য অনেক পেশায় লিপ্ত হন। এক্ষেত্রে একমাত্র শিক্ষকদের স্কেপগোট করার পিছনে যে মনোভাব কাজ করে, সেটা ইতর মনোভাব।

চলতে-ফিরতে যে কথাগুলি শুনতে শুনতে কান ঝালাপালা হয়ে যায়, তার মধ্যে আজকাল একটি কথা বড় বেশি শোনা যাচ্ছেঃ মাস্টাররা তো আজকাল অনেক মাইনে পাচ্ছে। কত মাইনে? এম, এ ও এম, এস, সি-র প্রারম্ভিক বেতন ২১০ টাকা। কিন্তু স্কুলে ক'জন এম, এ, এম, এস, সি, থাকেন? আর সকলে কত করে পান? এ ছাড়া এই বেতন সেইসব স্কুলেই দেওয়া হয় যেসব স্কুল সরকারী সাহায্যপ্রাপ্ত। ক'টা স্কুল সরকারী সাহায্য পায়? জুনিয়ার হাই স্কুলগুলির ঘাটতি ব্যয় মেটানোর দায়িত্ব তো সরকার গ্রহণ করেন নি। আমাদের দেশের দুর্ভাগ্য চামড়ার মুখ, কথা বলতে ট্যাক্স লাগে না। যার মুখে যা আসে, সে তাই বলে যায়। কাজেই আজ যাঁরা কোমর বেঁধে শিক্ষকদের বিরুদ্ধে অপপ্রচারে নেমেছেন, তাঁরা হয় জেনেশুনে সজ্ঞানে এইসব নির্জলা অসত্য প্রচার করছেন, না হয় অপপ্রচারে বিভ্রান্ত হয়ে তা করছেন।

মাধ্যমিক শিক্ষকেরা গত ১০ই সেপ্টেম্বর থেকে ধর্মঘট শুরু করেছিলেন, সরকার তা গ্রাহ্য করেন নি। দ্বিতীয় পর্যায়ে তাঁরা দিনের পর দিন অবস্থান ধর্মঘট করেছিলেন কোন ফল হয় নি, তৃতীয় পর্যায়ে তাঁরা প্রত্যক্ষ আইন অমান্য আন্দোলন শুরু করেছেন। এবার কি ফল হয় দেখা যাক। প্রাথমিক শিক্ষকেরাও মাধ্যমিক শিক্ষকদের সঙ্গে আন্দোলনে সামিল হয়েছেন। শিক্ষকেরা আজ সঙ্ঘবদ্ধ। তাঁদের আন্দোলনে একদিন না একদিন সরকারকে মাথা হেঁট করতেই হবে। আমরা সেদিনের আশায় রইলাম।

বন্ধের ফলশ্রুতি ঃ পুলিশী তাণ্ডব

২২ ও ২৩ তারিখের হরতালের সাফল্যের যে সব সংবাদ আসছে তা থেকে স্পষ্টই প্রতীয়মান হচ্ছে যে সারা বাংলার জনসাধারণ দু'দিনব্যাপী হরতালের দ্বারা বর্তমান ব্যবস্থার প্রতি অনাস্থাই প্রকাশ করেছেন।

যে কোনো ব্যথা বা শারীরিক অস্বাচ্ছন্দ্য আমরা আমাদের সমস্যা বলে মনে করি...কি করে আমরা আপনার সাহায্য করতে পারি দেখুন।

রিসার্চঃ আমি 'অ্যাস্‌প্রো' রিসার্চ ইনষ্টিটুয়েটের একজন। আমাদের কাজই হচ্ছে ব্যথা বা অস্বাচ্ছন্দ্য দূর করার নতুন নতুন পন্থা উদ্ভাবনা করা। সারা পৃথিবীতে যে সব ইন্সটিটিউট এই রিসার্চে নিয়োজিত আছে আমরা তাদের মধ্যে অগ্রগণ্য। আমরা স্থির জানি যে ব্যথা বা শারীরিক অস্বাচ্ছন্দ্য দূর করার সর্বাধুনিক উপায় 'অ্যাস্‌প্রো' ফর্মুলাতেই পাওয়া যায়।

সম্প্রতি ইউনাইটেড স্টেটস্ গভর্নমেণ্টের উদ্যোগে যেসব পরীক্ষানিরীক্ষা হয়েছে তাতে পরিষ্কার দেখা গেছে যে 'অ্যাস্‌প্রো'র সক্রিয় উপাদান গতি ও কার্যকারিতার বিচারে সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ ব্যথা-নিবারক। তাই পৃথিবীর সর্বত্র বিভিন্ন হাসপাতালে ও ডাক্তাররা 'অ্যাস্‌প্রো' ব্যবহার করে থাকেন।

শারীরিক বেদনার কি কারণ? আমাদের দেহতন্তুতে মেটাবলিক বস্তু জমা হ'য়ে নানা জায়গায় ফুলে ওঠে। নার্ভের ওপর চাপ পড়লে আমরা ব্যথা বা শারীরিক অস্বাচ্ছন্দ্য বোধ করি।

'অ্যাস্‌প্রো' কিভাবে কাজ করেঃ 'অ্যাস্‌প্রো' মুহূর্তের মধ্যে দেহের রক্ত চলাচলের সংগে মিশে যায়—ফোলা কমিয়ে—নার্ভের ওপর চাপ দূর করতে সাহায্য করে—শরীরের অস্বাচ্ছন্দ্য দূর করে।

কখন 'অ্যাস্‌প্রো' গ্রহণ করবেনঃ ব্যথা-বেদনা • মাথাধরা • গা ব্যথা • দাঁত ব্যথা গাঁটে ব্যথা • গা-জ্বর জ্বর • ফ্লু • ডেঙ্গু জ্বরে 'অ্যাস্‌প্রো' গ্রহণ করতে পারেন।

মাত্রাঃ
বয়স্কঃ দুইটি বড়ি।
আবশ্যক হলে আবার
গ্রহণ করা উচিত।
শিশুঃ একটি বড়ি অথবা
ডাক্তার অনুমোদিত মাত্রা।

A.G.3.66 B.

'অ্যাস্‌প্রো' ব্যথা-বেদনা বার করে নেয়!

এবারকার বাংলা বন্ধের একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য হচ্ছে পুলিশের টেকনিক পরিবর্তন। এবারে বন্ধের সময় গোলাগুলী চলে নি বটে, কিন্তু পুলিশ যে শাসক দলের স্বার্থে নিরামিষ নয় তার প্রমাণ পাওয়া যাচ্ছে হাড়ে হাড়ে বাংলা বন্ধের পর। প্রতিটি জেলায় অতঃপর পুলিশ ব্যাপক সন্ত্রাসের সৃষ্টি করছে। হরতালে অংশগ্রহণ করা বা হরতালে প্ররোচনা দেবার শাস্তি হিসাবে পুলিশ বামপন্থী কর্মী ও জনসাধারণের উপর ব্যাপক নির্যাতন চালাচ্ছে। এবং এখন এই কাজটা চালানো তাদের পক্ষে বেশ সুবিধাজনকই হয়েছে।

প্রথমে নদীয়া জেলা থেকেই আরম্ভ করা যাক। সেখানকার স্থানীয় থানাগুলির পুলিশ অফিসারেরা শাসকদলের স্বার্থে নির্দোষ নাগরিকদের উপর চড়াও হচ্ছে এবং কংগ্রেস বিরোধীদের গ্রেপ্তার অপমান এবং অযথা হয়রানি করছে। তারা বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলির কর্মীদের উৎখাত করবার জন্য উঠেপড়ে লেগেছে এবং সগর্বে ঘোষণা করছে যে এ অঞ্চলে বিরোধীদের নিশ্চিহ্ন করে ছাড়বে। নদীয়ার পুলিশ সরকারী কর্মচারী হওয়ার বদলে কংগ্রেসের ভৃত্য হয়েছে। এদের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে স্থানীয় গুণ্ডাবাহিনী। পি ডি অ্যাক্টের ঠেলায় নদীয়াবাসীরা চোখে অন্ধকার দেখছেন এবং অনেকে গ্রেপ্তার ও লাঞ্ছনা এড়াবার ভয়ে পালিয়ে পালিয়ে বেড়াচ্ছেন। পুলিশ বৃটিশ আমলের পদ্ধতি অনুযায়ী এখানে এক সন্ত্রাসের রাজত্ব সৃষ্টি করে দেখিয়ে দিতে চায় যে, হরতাল করার পরিণাম কি। এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে পুরোনো আক্রোশ, গত মার্চের সেই আন্দোলনের স্মৃতি। সেদিন যারা বিবরে প্রবেশ করেছিল, তারা আজ তার শোধ তুলছে গুণ্ডাবাহিনী ও পুলিশকে দিয়ে।

অনুরূপ পুলিশী সন্ত্রাস চলেছে কাঁথিতে। বাংলা বন্ধের ঘটনাকে উপলক্ষ করে এখানেও শুরু হয়েছে অত্যাচার ও ব্যাপক গ্রেপ্তার। ২৩শে সেপ্টেম্বর স্টেট ব্যাঙ্কের সামনে পুলিশ জনসাধারণের উপর নির্মমভাবে লাঠিচার্জ করেছিল। ফলে সাত সহস্রাধিক বিক্ষুব্ধ জনতা সংশ্লিষ্ট পুলিশ অফিসারের উপর চড়াও হয়েছিল। মহকুমা শাসক এবং এস, ডি, পি, ও উভয়েই পুলিশী অত্যাচারের জন্য জনসাধারণের নিকট ক্ষমা চেয়েছিলেন এবং প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন যে কাউকে গ্রেপ্তার করা হবে না। কিন্তু পুলিশী চরিত্রে প্রতিশ্রুতি রাখা অসম্ভব। ২৫শে সেপ্টেম্বর থেকেই স্থানীয় কংগ্রেসীদের প্ররোচনায় পুলিশ বদলা নিতে শুরু করে। প্রথমেই শুরু হয় ছাত্রাবাসগুলির উপর হামলা। কাঁথি শহরের প্রতিটি বাড়িতে পুলিশ প্রবেশ করে এক ব্যাপক সন্ত্রাসের রাজ্যের সৃষ্টি করেছে। মেয়েদের উপর অকথ্য অশ্লীল গালিগালাজ বর্ষণ থেকে শুরু করে তারা কিছুই বাদ দেয় নি। এ পর্যন্ত শতাধিক ব্যক্তিকে পুলিশ গ্রেপ্তার করেছে। কাঁথি বন্ধ করার শাস্তি।

হুগলী জেলার চুঁচুড়ার একজন পুলিশ অফিসার একটি সম্পূর্ণ অরাজনৈতিক ব্যাপার নিয়ে জনসাধারণের উপর এমন লাঠিবাজি করলেন যে কয়েকজন সাংঘাতিকভাবে জখম হলেন। চুঁচুড়া হাসপাতালে জনৈক কংগ্রেসী নেতা ১৮০০ পাউন্ড পচা রুটি দান করেছিলেন। চিকিৎসকগণ কর্তৃক ঘোষিত মনুষ্যখাদ্যের অনুপযোগী সেই রুটি যাতে অন্য কোথাও দান না করা হয় সেই জন্য কতিপয় নাগরিক রুটিগুলি নষ্ট করে দেবার ব্যবস্থা করছিলেন। উক্ত কংগ্রেসী নেতার নির্দেশে অতঃপর চুঁচুড়া পুলিশ বাঘের মত সেই দায়িত্বশীল মানুষগুলির উপর ঝাঁপিয়ে পড়েন এবং তাঁদের ব্যাপক লাঠির চোটে অনেকেই জখম হলেন। ফলে চুঁচুড়া শহরে ব্যাপক ক্ষোভের সঞ্চার হয়েছে এবং সংশ্লিষ্ট অফিসারের অপসারণের দাবিতে মিছিল ইত্যাদি নিয়মিত বেরুচ্ছে।

পুলিশ যে কতদূর মিথ্যাচারী হয়ে উঠেছে, এবং শুধুমাত্র পীড়ন করার প্রয়োজনে তারা যে কোন কিছুই গ্রাহ্য করে না, তার প্রমাণ পাওয়া যাবে গত ২৭শে সেপ্টেম্বরের দৈনিক বসুমতীতে প্রকাশিত একটি চিঠিতে। একজন বামপন্থী কর্মীকে জেলে পোরবার জন্য কি বিচিত্র মিথ্যা মামলার উপস্থাপনা কংগ্রেস এবং তার অনুগত পুলিশ যে করতে পারে তার প্রমাণ ওই চিঠি। পুলিশের অভিযোগ যে উক্ত বামপন্থী কর্মীটি গত ১০ই মার্চ জনৈক কংগ্রেস কর্মীকে মারধোর করেছিলেন। কিন্তু গত ৬ই মার্চ থেকে ২৩শে মার্চ পর্যন্ত উক্ত বামপন্থী কর্মীটি দমদম সেন্ট্রাল জেলে ডি, আই, আর-এর ৩০ ধারায় আটক ছিলেন। এই রকম মিথ্যাচার শাসকদলের স্বার্থে যে দেশের পুলিশ করতে পারে এবং গণতন্ত্রের নামে যে দেশে এইভাবে মানবিক অধিকারসমূহ পদদলিত হয় সে দেশের রাজনীতির গতি যে কোন দিকে তা সহজেই অনুমান করা যায়। উপরি উক্ত মিথ্যা মামলায়, যা স্বতঃই প্রমাণিত, পুলিশ তথা শাসকদলের বেপরোয়া আচরণেরই বাস্তব উদাহরণ।

সরকারী কর্মচারীদের বিক্ষোভ

আগেই বলেছি, এবারে দমননীতির টেকনিক পাল্টেছে। সরকার এখন সাত তাড়াতাড়ি কোন ব্যবস্থা অবলম্বন না করে ধীরে ধীরে ধাপে ধাপে প্রতিহিংসা চরিতার্থ করছেন।

তেরই সেপ্টেম্বর সরকারী কর্মচারীদের নৈমিত্তিক ছুটি গ্রহণের সাজা হিসাবে সরকার ঐ দিনের বেতন কাটার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন। বলা বাহুল্য, এই সিদ্ধান্ত সম্পূর্ণ প্রতিহিংসামূলক। এবং সরকারী এ সিদ্ধান্ত আইনসম্মত কিনা এ বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ আছে।

সরকার একথা বলতে পারেন যে, ক্যাজুয়াল লীভ একটা 'প্রিভিলেজ' সেটা কোন 'রাইট' নয়। কাজেই তা মঞ্জুর না করার অধিকার সরকারের অবশ্যই আছে। সেই হিসাবে যাঁরা কাজে যোগদান সেদিন করেন নি তাঁদের বেতন অবশ্য কেটে নেওয়া চলতে পারে।

ধরে নেওয়া গেল, এই সরকারী ভাষ্য সঠিক। কিন্তু এখানে একটা প্রশ্ন থেকে যায়। ক্যাজুয়াল লীভ মঞ্জুর না করার অধিকার সরকাবের অবশ্যই আছে। সরকারী ভাষ্য অনুযায়ী সকলের একসঙ্গে ক্যাজুয়াল লীভ নেওয়াটা যদি দুরভিসন্ধিমূলক হয়, সকলকে একসঙ্গে সেই ছুটি মঞ্জুর না করাটাও নিশ্চয়ই দুরভিসন্ধিমূলক। সরকার যদি কয়েকজনকেও ছুটি মঞ্জুর করতেন তা হলে আইনের ফাঁদে কর্মচারীদের ফেলা যেত। যদি অফিসারদের সরকার এই কথা বলতে শিখিয়ে দিতেন যে, "আপনারা সবাই ক্যাজুয়াল লীভের দরখাস্ত করেছেন, কিন্তু সকলকে তা মঞ্জুর করলে অফিস চলবে না, আমি এই এই ক'জনকে মঞ্জুর করলাম" তাহলে একটা লজিক্যাল কনসিস্টেন্সি থাকত। সেক্ষেত্রে আইনের আওতায় কর্মচারীদের ফেলা যেত। কিন্তু যেখানে সরকার নিজেই একটা পার্টি হয়ে গেছেন, যেখানে অভিসন্ধির দ্বারা চালিত হয়ে পাইকারীভাবে সবাইকেই ক্যাজুয়াল লীভ থেকে বঞ্চিত করেছেন, সেখানে সরকারও ঠিক আইন মেনে চলেন নি।

একদিনের বেতন কাটার সরকারী আদেশ প্রত্যাহারের দাবিতে সরকারী কর্মচারীরা বিক্ষুব্ধ হয়েছেন। গত ২৮শে সেপ্টেম্বর বুধবার রাজ্য সরকারের প্রায় পঞ্চাশ হাজার কর্মচারী, শোভাযাত্রা সহকারে বিধানসভার সম্মুখে উপস্থিত হয়ে বিক্ষোভ প্রদর্শন করেন। তাঁদের পাঁচজন প্রতিনিধি মুখ্যমন্ত্রীর নিকট একটি স্মারকলিপি পেশ করেন, যাতে বলা হয়েছে যে, সরকারকে কর্মচারীদের দাবি সম্পর্কে সচেতন করার জন্য রাজ্যব্যাপী গণছুটির কর্মসূচী পালন করা হয়েছে এবং শতকরা একশ জন কর্মচারী অভূতপূর্ব শৃঙ্খলার সঙ্গে এই কর্মসূচীতে অংশ গ্রহণ করেছেন। ৩১।৯।৬৬

বিশ্বসাহিত্যের আদিপর্ব

ডঃ নরেন ভট্টাচার্য

প্রাচীন মিশরীয় সাহিত্য

একদা বিশ্বাস করা হত যে সভ্যতার আদি উন্মেষ মিশর দেশেই হয়েছিল। বর্তমান যুগের ঐতিহাসিক ও সমাজ-বিজ্ঞানীরা অবশ্য সভ্যতার পুরাতন সংজ্ঞা বদলে দিয়েছেন। সেই হিসাবে মিশরকে বিশেষ কৌলিন্যের আসন না দেওয়া হলেও, ঐতিহাসিকেরা আজও এ কথা স্বীকার করেন যে, মিশরের অতীত ইতিহাসের প্রাচীনত্বকে অন্যান্য দেশের তুলনায় বেশি করে উপলব্ধি করার মত তথ্যাবলী আবিষ্কার করা সম্ভব হয়েছে। কবি হোমার তাঁর ইলিয়াড মহাকাব্যে মিশরের অন্তর্গত শতদ্বার বিশিষ্ট থীবস নগরীর প্রাচীনত্বের কথা উল্লেখ করেছেন। জেরেমিয়া এবং এজেকিয়েল মিশরের সমৃদ্ধি ও প্রাচীনত্বের কথা বলেছেন, বাইবেলের পুরাতন অংশের অর্ধেকই মিশরের কাহিনী। মোট তিরিশটি রাজবংশ প্রাচীন মিশরে রাজত্ব করেছে, প্রথম বংশের রাজত্বকাল খৃস্টের জন্মের তিন সহস্র বৎসর পূর্বেকার বলে অনুমিত হয়েছে, এবং শেষ রাজবংশের বিলুপ্তি ঘটে মহাবীর আলেকজান্ডারের আক্রমণে ৩৩২ খৃস্টপূর্বাব্দে। বর্তমানে আমরা উল্লিখিত যুগের মধ্যেই আমাদের আলোচনা সীমাবদ্ধ রাখব।

দুর্ভাগ্যক্রমে প্রাচীন মিশরীয় সাহিত্যের ইতিহাস রচনা করার সুযোগ খুবই সীমাবদ্ধ। প্রাচীন গ্রীসের ক্ষেত্রে যেমন আমরা অসংখ্য কবি, সাহিত্যিক ও নাট্যকারের পরিচয় পাই, মিশরের ক্ষেত্রে তেমন কোন সুযোগ নেই। তবে প্রাচীন মিশরীয় সাহিত্যের কিছু কিছু নিদর্শন যে একেবারে নেই তা নয়, প্যাপিরাসের পাতায় লেখা কিছু কিছু নিদর্শন অবশ্যই আছে, যদিও বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই কবি বা লেখকের নাম অনুপস্থিত। তবে একটি ক্ষেত্রে আমাদের সুবিধা আছে। বহু ক্ষেত্রে লেখকের নাম না থাকলেও রচনাটি অক্ষুন্ন আছে। ফলে গ্রীক সাহিত্যের ক্ষেত্রে যেখানে লেখক ও তাঁর রচনার নামটুকু উল্লেখ করে ছেড়ে দিতে হয়েছে, সেখানে আমরা সমগ্র রচনাটিই পাঠককে উপহার দিতে পারব।

মিশরীয় লোকগাথাঃ

পৃথিবীর অন্যান্য সকল দেশের সাহিত্যের মতই মিশরের সাহিত্যের আদিতম দিকটি হচ্ছে লোকসাহিত্য। এইগুলি চারণকবিরা দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে গেয়ে বেড়াতেন। আমাদের রামায়ণ মহাভারতও গোড়ার দিকে লোক-মুখে সর্বত্র গীত হত, গ্রন্থাকারে সেগুলির নবজন্ম হয়েছে অনেক পরে। গ্রীক সাহিত্য নিয়ে আলোচনা করতে গিয়ে আমি পূর্বেই লিখেছি যে হোমারের মহাকাব্যও রাপসোডিরা এখানে-ওখানে গেয়ে বেড়াতেন, যার ফলে হোমারের মূল রচনা অনেক পরিবর্তিত হয়ে গিয়েছিল।

আমি প্রথম যে মিশরীয় লোক-গাথাটির উল্লেখ করব সেটি সৃষ্টিতত্ত্বের উপর রচিত। কোন্ সুদূর অতীতে এই কাহিনী রচিত হয়েছিল তা কেউ বলতে পারে না, তবে মিশরে ঊনবিংশতি ও বিংশতিতম রাজবংশের রাজত্বকালে এই কাহিনী প্যাপিরাসের পাতায় লিপিবদ্ধ হয়েছিল। এবারে কাহিনীটি সংক্ষেপে বর্ণনা করা যাক।

আদিতে বিশ্বচরাচর ছিল অসীম জলরাশি যা থেকে জন্মগ্রহণ করেছিলেন দেবতা রা। তিনি সৃষ্টি করতে ইচ্ছা করলেন যার ফলে জন্মগ্রহণ করল বায়ু-দেবতা সু এবং তার প্রণয়িনী টেফনাট। আরও জন্মাল পৃথিবীরূপী দেবতা সেব এবং আকাশরূপিণী দেবী নাট। সেব ও নাটের ঔরসে জন্মাল অসিরিস ও তার প্রণয়িনী আইসিস, সেট এবং তার প্রণয়িনী নেপথাইস। দেবাদিদেব রা এর-পর ক্রমাগত সৃষ্টি করেই চললেন। তাঁর শক্তির উৎস ছিল একটি গোপন নাম। এই নামের অধিকারী যে হবে, দেবতা রা-এর শক্তি তার দেহে সঞ্চারিত হবে।

দেবীদের মধ্যে আইসিস ছিল অত্যন্ত কুটিল ও কুচক্রী। তদুপরি সে ছিল যাদুকরী। দেবগোষ্ঠীর মধ্যে রা-এর প্রতিপত্তি তার কাছে অসহ্য ছিল। সে চাইত রা-এর সকল শক্তি করায়ত্ত করতে। সে জানত যে রা-এর সকল শক্তির উৎস হচ্ছে একটি গোপন নাম যা রা ছাড়া আর কেউ জানে না। কিভাবে সে সেই গোপন নামটি জানবে?

অবশেষে আইসিস একটি চক্রান্ত করল। তার যাদুশক্তির দ্বারা সে তৈরি করল একটি বিষধর সর্প, এবং সেটি সে রা-এর গমনাগমনের পথে রেখে দিল।

একদিন প্রভাতে রা যখন অপরাপর দেবতাদের সঙ্গে পদচারণা করছিলেন, নিয়তিস্বরূপ সেই সর্প তাঁর পদমূলে দংশন করল। রা যন্ত্রণায় কেঁপে উঠলেন। তাঁর দাঁতে দাঁত লেগে গেল। বন্যার নীলনদের মতই তাঁর সর্বাঙ্গ বিস্ফারিত হল। তিনি চেঁচিয়ে বললেন, "হে আমার সন্তানগণ, আমার কাছে এস। আমি এক নিদারুণ যন্ত্রণায় অভিভূত হয়েছি। আমি জীবনে কাউকে কোন যন্ত্রণা দিই নি, অথচ কোন একটি কুৎসিত বস্তু আমায় দংশন করেছে; তা আগুন নয় অথচ তা আমার ত্বককে পুড়িয়ে দিচ্ছে; আমার হৃৎপিন্ড বরফের ন্যায় শীতল হয়ে যাচ্ছে; আমার অঙ্গপ্রত্যঙ্গসমূহ শিথিল হয়ে পড়ছে।"

সমবেত দেবতারা তারস্বরে বিলাপ করতে শুরু করল। শুধু দেবী আইসিস মনে মনে অত্যন্ত প্রফুল্ল। রা-কে উদ্দেশ্য করে সে বলল, "হে পরম পিতা, কিসে আপনাকে যন্ত্রণা দিচ্ছে তা আমি জানি। তা হচ্ছে আপনারই সৃষ্ট জগতের একটি বিষধর প্রাণী, যার নাম সর্প। আমি আমার যাদুশক্তির দ্বারা আপনার যন্ত্রণা দূর করতে পারি। কিন্তু আমার একটি সর্ত আছে যা আপনাকে পূরণ করতে হবে। আপনার শক্তির উৎস যে গোপন নামটি আপনি হৃদয়ের মধ্যে লুকিয়ে রেখেছেন, তা আমাকে জানাতে হবে।"

আইসিসের এই কথায় ক্রোধে রা-এর মুখমন্ডল শাদা হয়ে গেল সর্পদংশনের

নিদারুণ যন্ত্রণাকে ছাপিয়েও তাঁর সর্বাঙ্গ দিয়ে গ্লানি ও ক্রোধ উপছে পড়তে লাগল। তারস্বরে তিনি বলে উঠলেন, "আমি এই জগৎ ও আকাশ সৃষ্টি করেছি, আমি নিজ হাতে পর্বতসমূহ সৃষ্টি করেছি, সমুদ্রকে প্রবাহিত করেছি, আমিই মিশরের নীলনদের বন্যার স্রষ্টা। আমিই দেবগণকে গঠন করেছি। আমার গোপন নাম দেবগণ জানে না। আমি সকালে খেপরা, দুপুরে রা এবং সন্ধ্যায় তুম।"

তথাপি রা-এর যন্ত্রণা দূর হল না। কুটিল হাসি হেসে আইসিস বলল, "হে পরম পিতা, আপনি মিথ্যাচরণ করছেন, যন্ত্রণায় নীল হয়ে আপনাকে কুঁকড়ে মরতে হবে, যদি না এখনও আপনার গোপন নাম আপনি আমাকে দেন।"

দেবতা রা-এর মুখে তখন ফুটে উঠছে বিষন্ন বেদনা। গোপন নাম হস্তান্তরিত করার অর্থই হচ্ছে নিজের সব শক্তি হস্তান্তরিত করে দেওয়া। রা বহুক্ষণ চিন্তা করলেন। তার পর কোন-ক্রমে ধীরে ধীরে এই ক'টি কথা উচ্চারণ করলেন, "হে সমবেত দেবগণ, আজ থেকে আইসিস আমার গোপন নামের অধিকারী হবে।"

বলতে বলতে রা অদৃশ্য হয়ে গেলেন। তাঁর দেহ থেকে নির্গত একটি জ্যোতি ধীরে ধীরে আইসিসের দেহে প্রবেশ করল। কিছুক্ষণ পরে আইসিস বলে উঠল, "আমি সেই গোপন নামের অধিকারী হয়েছি। রা সুস্থ হয়ে উঠুন, তাঁর দেহ থেকে সমুদয় বিষ নির্গত হয়ে যাক, তাঁর যন্ত্রণার নির্বাপণ হোক।

ওসিরিসের ট্রাজেডি:

আক্ষরিক অর্থে ওসিরিসের ট্রাজেডি নামক কোন নাটকের অভিনয় কোনদিনই হয় নি, যদিও বহু যুগ প্রচলিত এই কাহিনীটি মিশরের শস্য উৎসবের দিন-গুলিতে বিভিন্ন প্রতীকের মাধ্যমে উপ-স্থাপিত করা হত।

ওসিরিসের ট্রাজেডিকে গ্রন্থাকারে রূপ দেন প্রাচীন রোমের বিখ্যাত ঐতি-হাসিক প্লুটার্ক। প্লুটার্ক-কথিত সে কাহিনী আমরা অন্যত্র উল্লেখ করব। এখানে আমরা মূল মিশরীয় কাহিনীটিই বলব যা সংগ্রহ করা হয়েছে প্যাপিরাসের পাতায় লেখা থেকে। এগুলি সংগ্রহ ও অনুবাদ করেছিলেন জে টি ডোনিস।

ওসিরিস ছিলেন পৃথিবীরূপী দেবতা সেব এবং আকাশরূপিণী দেবী নাটের পুত্র, পূর্বোল্লিখিত দেবী আইসিসের ভ্রাতা তথা স্বামী। দেবতা রা-এর মৃত্যুর পর ওসিরিসই হন মিশরের শাসক। রা-এর আমলে মিশরের লোকেরা ছিল শিকারজীবী। ওসিরিসের পত্নী আইসিস আবিষ্কার করল যব, আর ওসিরিস দেশ-বাসীকে শেখালেন কৃষিকাজ। তারপর তিনি উপলব্ধি করলেন যে এই বিদ্যা সারা জগতের কল্যাণেই লাগা উচিত। এই উদ্দেশ্য নিয়ে ওসিরিস জগৎ পরিভ্রমণে বার হলেন।

ওসিরিসের অবর্তমানে আইসিস হল মিশরের শাসক। ওসিরিসের জনপ্রিয়তায় একজন দেবতা ক্ষুব্ধ ছিল। সে হচ্ছে ওসিরিসের ভাই সেট। ওসিরিসের অবর্তমানে সে মিশরে বিদ্রোহ ঘটাবার চেষ্টা করল। কিন্তু ওসিরিস-পত্নী আইসিস সেটের তুলনায় শক্তিশালী ছিল, কাজেই সেটের প্রচেষ্টা ব্যর্থ হল।

তারপর ওসিরিস ফিরে এলেন। সারা দেশে আনন্দের সাড়া পড়ে গেল। একটি রাজকীয় ভোজসভা তাঁর সম্মানার্থে দেওয়া হল। সেই সভায় ওসিরিসের ভাই সেটও এল বন্ধুভাবে। তার সঙ্গে একটি সিন্দুক, যা ওসিরিসের দেহের মাপে তৈরি। সিন্দুকটি এত সুন্দর যে অনেকেই সেটা নেবার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করতে লগল। তাদের আগ্রহের উত্তরে সেট জানাল যে একমাত্র সেই লোককেই সে সিন্দুকটি উপহার দেবে যার দেহ সিন্দুকের মধ্যে নিখুঁতভাবে প্রবিষ্ট হবে।

কারো দেহ যখন সিন্দুকের মাপে হল না, তখন ওসিরিস এগিয়ে গেলেন। তাঁর দেহটি সিন্দুকের মধ্যে আশ্চর্যভাবে ফিট করল। কিন্তু ওসিরিস সিন্দুক থেকে উঠে পড়ার আগেই সেট ডালাটি বন্ধ করে পেরেক এ'টে দিল এবং তার অনুচরেরা ভোজসভায় রক্তারক্তি কাণ্ড শুরু করল। নিমেষের মধ্যে সমগ্র ব্যাপারটি ঘটে গেল, সেই সিন্দুকটিই হল ওসিরিসের কফিন, সেটিকে নিয়ে গিয়ে ফেলে দেওয়া হল নীলনদের গভীর জলে, আর তা ভাসতে ভাসতে চলে গেল মহা-সমুদ্রে।

ওসিরিস নিধনের এই বার্তায় তাঁর পত্নী দেবী আইসিস শোকে ভেঙে পড়ল। কিছুতেই তাকে সান্ত্বনা দেওয়া গেল না। অবশেষে সিদ্ধান্ত করল যে সে ওসিরিসের দেহ খুঁজে বার করবে।

দীর্ঘকাল আইসিস ওসিরিসের মৃত-দেহের সন্ধানে এখানে-ওখানে ঘুরে বেড়াল। অবশেষে কয়েকজন বালক একদিন তাকে বলল যে তারা একটি সিন্দুক সমুদ্রে ভেসে যেতে দেখেছে। এদিকে ওসিরিসের ভাই সেট সিংহাসনে বসেছে। তার অত্যাচারে প্রজারা বিক্ষুব্ধ। মিশরে বাস আইসিসের পক্ষেও নিরাপদ নয়।

সারাদিন আইসিস বনে-জঙ্গলে আত্মগোপন করত। রাত্রে সে ওসিরিসের দেহের সন্ধানে বার হত। অবশেষে সে একজন দরিদ্রা স্ত্রীলোকের গৃহে আশ্রয় পেল, এবং সেখানেই জন্মাল তার পুত্র হোরাস। কিন্তু কুচক্রী সেট আইসিসের গোপন বাসস্থানের সন্ধান পেয়ে গেল এবং মাতাপুত্র দুজনকেই সে বন্দী করল। কিন্তু কৌশলী আইসিস পুত্রকে নিয়েই বন্দীশালা থেকে পলায়ন করল এবং বুটো নামক এক রাজ্যে হাজির হল। সেখানকার নগররক্ষিণী দেবী উয়জিতের হাতে হোরাসকে সমর্পণ করে সে পুনরায় ওসিরিসের দেহের সন্ধানে যাত্রা করল।

এদিকে ওসিরিসের কফিনটি ভাসতে ভাসতে সিরিয়ার অন্তর্গত বিবলাস নামক স্থানে হাজির হল। সেখানকার রাজা সেই কফিনটিকে একটি স্তম্ভের নিচে সমাধিস্থ করলেন। ঘটনাচক্রে ঘুরতে ঘুরতে আইসিসও বিবলাসে এসে হাজির হল। সেও সেখানে রাজার গৃহে আশ্রয় পেল। রাণী তাকে নিজ শিশুপুত্রের রক্ষণা-বেক্ষণের ভার দিল। শত হলেও আইসিস একজন দেবী, এবং তার ইচ্ছা হল শিশুটিকে সে অমর করবে। সে স্তন্য-দানের পরিবর্তে শিশুটিকে নিজের আঙুল চুষতে দিত এবং প্রত্যহ রাত্রে তাকে জ্বলন্ত চুল্লীর উপর শায়িত করে তার মধ্যে দেবত্বের শক্তি সঞ্চার করত। ঘটনা-চক্রে একদিন শিশুটির আসল মা ব্যাপারটি দেখে ফেলে এবং তাড়াতাড়ি এসে শিশুটিকে আগুনের উপর থেকে সরিয়ে নেয়। ফলে শিশুটির কপালে দেবত্ব-প্রাপ্তি ঘটল না, এবং আইসিসের নিকট কৈফিয়ৎ তলব করা হল। তখন আইসিস নিজ পরিচয় ও উদ্দেশ্য বলার পর বিবলাসের রাজা স্তম্ভ ভেঙে ওসিরিসের শবদেহবাহী সিন্দুকটি আইসিসের হাতে প্রত্যর্পণ করলেন।

সেই সিন্দুক নিয়ে জাহাজে করে আইসিস বুটো শহরে নিজ পুত্র হোরাসের সঙ্গে সাক্ষাৎ করবার জন্য এল। কিন্তু তার এই বিজয় ছিল ক্ষণস্থায়ী। তাকে আবার দুর্ভাগ্যের মধ্যে পড়তে হল। ঘটনাচক্রে ওসিরিসের কুচক্রী ভ্রাতা সেট সেখানে শূকর শিকার করতে এসেছিল। সে হঠাৎ একটি ঝোপের আড়াল থেকে ওসিরিসের দেহ সহ সিন্দুকটি আবিষ্কার করে। তখন সে ওসিরিসের মৃতদেহ চোদ্দ ভাগে ভাগ করে এক-একটি টুকরো নীলনদের এক-একটি জায়গায় ফেলে দেয়।

সেটের এই অপকর্ম যখন আইসিস জানতে পারল তখন সে পুনরায় শোকে ও দুঃখে উন্মত্ত হয়ে উঠল। সে একটি প্যাপিরাসের নৌকায় করে ভাসমান দেহ-খণ্ডগুলি খুঁজতে বার হল। কুমীরেরা

আইসিসের অনুগত ছিল, তাই তারা ওসিরিসের দেহখণ্ডগুলি ভক্ষণ করে নি। আইসিস সেগুলিকে একে একে উদ্ধার করল এবং যেখানে যেখানে সেগুলি পাওয়া গেল সেখানে সেখানে একটি করে মন্দির নির্মিত হল।

অত্যাচারী শাসক হিসাবে সেট জনগণের কাছে অপ্রিয় হয়েছিল। ওসিরিসের ও আইসিসের পুত্র হোরাস সাবালক হয়ে সেটকে প্রকাশ্য যুদ্ধে হত্যা করে পিতৃহত্যার প্রতিশোধ নেয়, এবং মিশরের সম্রাট হয়। ওসিরিসের কাহিনীর এখানেই শেষ।

আদি মিশরীয় কবিতাঃ

আগেই বলেছি, পরিমাণে অল্প হলেও, মিশরীয় সাহিত্যের কিছু কিছু নিদর্শন পাঠকদের উপহার দেওয়া সম্ভব। প্যাপিরাসের পাতায় লেখা, অথবা সমাধিগাত্রে উৎকীর্ণ, কয়েকটি সম্পূর্ণ কবিতা পাওয়া গেছে, যেগুলি আজ থেকে প্রায় চার হাজার বছর আগে লেখা। বিবেকানন্দ বলেছিলেন, অনুবাদ মাত্রই কাশ্মীরী শালের উল্টো দিকের মত। তাতে নকসাটুকু ফুটে ওঠে, কিন্তু মূলের সৌন্দর্য তাতে থাকে না। তদুপরি আমি কবি নই, ঐতিহাসিক। ইতিহাসের লবণসমুদ্রে হাবুডুবু খাওয়াই আমার পেশা, কাব্যমন্দাকিনীতে অবগাহনের অধিকার বিধাতা আমায় দেন নি। তাই আমি শুধু আক্ষরিক অনুবাদ দিয়ে খালাস।

প্রেমের ফাঁদ

হাতে ফাঁদ নিয়ে আমি লুকিয়ে থাকি,
আমি অপেক্ষা করি। আমি কাঁপি না।
আরব থেকে আসে রঙীন পাখীর
ঝাঁক,
তাদের ডানায় জড়ানো আছে
আদিগন্ত সুরভির ছটা।
তারা আসে মিশরে, সুবাসের
আঠালো মিষ্টতা বহন করে।

যদি আমি তা হতাম! এ কথা মনে হয়
যখন আমি তাদের ফাঁদে ফেলি।
আমরা দুজনে হতে পারতাম।
মনে হয় আমি তা হতে পারতাম
যখন আমি তাদের ডাক শুনি
যদি আমি একা তোমার সঙ্গে
থাকতাম।
যদি তুমি আসতে, হে প্রিয়
যখন পাখীদের উপর ফাঁদ ফেলা হচ্ছে
আমি তোমাকে নিতাম, আমি তোমাকে
বেঁধে রাখতাম
প্রেমের ফাঁ/

২। ডুমুর গাছের গান

একটি ডুমুর গাছ গেয়েছিল
কোন এক সুন্দরীর কাছে—
সে স্বরে মাধুরী ছিল শিশিরের
ফোঁটার মতন।
"এখন হয়েছে লাল পদ্মরাগ এ ফল
আমার
আমার নিকুঞ্জ আজ অবারিত
প্রতীক্ষামুখর।

"প্যাপিরি সবুজ আজ এ দেহের
পাতা,
শাখাগুলি সদ্যস্নিগ্ধ যৌবনে হিরণ,
এ শীতল প্রচ্ছায়া তোমারই আবাস—
তোমার স্বপ্নের স্বপ্ন তোমার হৃদয়।

"একটি প্রেমের চিঠি লিখো তুমি প্রিয়,
তোমার যে জন আছে মনের মুকুরে;
বল তাকে, যেন আসে তোমার উদ্যানে
বসে যেন এ কুঞ্জের নিভৃত ছায়ায়।

"তোমার উল্লাসে আমি দিয়ে যাব ফল,
আমি নেব রুটি আর আসবের ভার,
ফুলের সুরভি আর সূর্যের কিরণ—
তোমাদের আকাঙ্ক্ষার দায়িত্ব আমার।

"আশ্চর্য নতুন হবে তুমি আর তোমার
প্রেমিক
কণ্ঠ তার মধুক্ষরা ভাষায় কোমল—
আমি রব নির্বিকার নিশ্চুপ নীরব
তোমাদের লীলারঙ্গে নির্বাক দর্শক।"

৩। প্রেমের মদ

ওগো, যখন আমার প্রে[illegible] আসে,
আমি যখন আমার ভালবাসার
আলোয় তাকে দেখি
আমার স্পন্দমান বুকে যখন তাকে
টেনে ধরি
আমার হাত দুটি দিয়ে যখন তাকে
বেঁধে ফেলি
আমার হৃদয় ভরে ওঠে স্বর্গীয়
আনন্দে
কেন না আমি তার, সে আমার।

ওগো, যখন তার কোমল আশ্লেষ
আমার প্রেমকে পূর্ণ করে তোলে,
আরবের সকল সুরভি
আমাকে মিষ্টতায় অভিষিক্ত করে।
এবং যখন তার ঠোঁট দুটি আমাতে
লীন হয়ে যায়
আমি মাতাল হই, যদিও মদের
দরকার পড়ে না।

৪। প্রেমের ভান

ক্লান্তি আর অবসাদজনিত মূর্ছায়
যখন আমি সারাদিন বিছানায় পড়ে
থাকব।
আমার বন্ধুরা আমার কাছে জড়ো
হবে
এবং তদের সঙ্গে সে-ও আসবে।
আমার উপর ঝুঁকে-পড়া ডাক্তারদের
সে লজ্জা দেবে,
কেন না আমার প্রেমিকা একমাত্র
সেই জানে
আমার রোগটা কোথায়।

দেশ সেবায় নিয়োজিত,
এ্যালবার্ট ডেভিড লিমিটেড
কলিকাতা—৫০
নীতি ও বিজ্ঞানানুযায়ী ঔষধ
প্রস্তুতকরণের অগ্রণী
—ব্রাঞ্চ সমূহ—
বোম্বে - মাদ্রাজ - দিল্লী - নাগপুর
বেজওয়াড়া - শ্রীনগর - গোহাটী

নীলামের বলি

হরিপ্রসন্ন চক্রবর্তী

দুই ভাই, বার্ড আর এ্যান্ডার্স। পরস্পরে খুব ভাব। এক ইস্কুলে দুজনে পড়ত, এক ঘরে দুজনে শুত, এক সংগে দুজনে যুদ্ধের খাতায় নাম লিখিয়েছিল আবার সসম্মানে দুইভাই একসংগে যুদ্ধ-ক্ষেত্র থেকে বাড়ি ফিরে এসেছিল। তাদের দেখে গ্রামের লোকেরা বলল: হ্যাঁ, দুটি ভাই বটে। দেখলে চোখ জুড়িয়ে যায়।

বাবা মারা গেলেন। কিন্তু সম্পত্তি ভাগ করা যায় কেমন করে? দুই ভাই অনেক চিন্তা করে ঠিক করল যে তারা নিজেরা সম্পত্তি ভাগ করবে না, তাতে হয়ত ঠিক সমান সমান ভাগ হবে না, ভাইয়ে ভাইয়ে ঝগড়া লেগে যেতে পারে। তার চেয়ে বরং সম্পত্তি নীলামে দেওয়া হোক, তাহলে ঠিক সমান ভাগ পাওয়া যাবে, কোন ভাইয়েরই তখন আর কিছু বলবার থাকবে না। হলও তাই। সম্পত্তি নীলাম হয়ে দুভাগ হয়ে গেল। দুজনেই সমান সমান টাকা পেল।

কিন্তু গোল বাধল বাবার সোনার হাত ঘড়িটিকে নিয়ে। ও-রকম ঘড়ি আশেপাশের কারুর ছিল না। এই ঘড়িটির উপর দুই ভাইয়েরই লোভ। বড় ভাই মনে করছিল ঘড়িটি তারই প্রাপ্য আর ছোট ভাই এ্যান্ডার্স আশা করছিল দাদা ঘড়িটি নিশ্চয় নেবে না, তাকেই দিয়ে দেবে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত ঘড়িটিকে নীলামে চড়ান হল। অমন অদ্ভুত এবং সুন্দর ঘড়ি কেনবার জন্য অনেক ধনী ব্যক্তি নীলাম ঘরে এসে জমায়েত হল। কিন্তু যখন তারা দেখল যে ঘড়িটিকে পাবার জন্য দুই ভাই-ই পরস্পরের প্রতিদ্বন্দ্বী হয়ে দাঁড়িয়েছে, তখন তারা দর হাঁকল না, সরে দাঁড়াল।

দুই ভাই, বার্ড আর এ্যান্ডার্স মুখো-মুখি দাঁড়িয়ে দর হাঁকতে লাগল। সে এক, অদ্ভুত দৃশ্য। কুড়ি ডলার—পঁচিশ ডলার—ত্রিশ ডলার। কোন ভাই-ই ঘড়িটি ছাড়তে রাজী নয়, ঘড়িটিকে পাবার জন্য যেন দুজনের রোখ চেপে গেছে। আবার দর উঠল। বার্ড চল্লিশ ডলার হেঁকে বসল। কিন্তু এ্যান্ডার্স ছাড়বার পাত্র নয়। ঘড়িটি তার চাই-ই, তাই সে পঞ্চাশ ডলার হেঁকে দিল। আশা করল তার দাদা আর কিছুতেই দর বাড়াবে না, ছেড়ে দেবে, ঘড়িটি তারই হবে।

এ্যান্ডার্সের কান্ড দেখে বার্ড হো হো করে হেসে উঠল। সকলে মনে করল বার্ড আর দর বাড়াবে না, ছোট ভাই এ্যান্ডার্সকেই ঘড়িটি দিয়ে দেবে, হয়ত টাকাও নেবে না? কিন্তু তা হল না।

হঠাৎ বার্ড চীৎকার করে উঠল, 'একশো ডলার। যদি ঘড়ি পাই, ভালই, নইলে ঘড়ির সংগে ভাইকেও নীলামে বলি দিয়ে গেলাম।' এই বলে বার্ড আর দাঁড়াল না, রাগত মুখে ঘর থেকে বেরিয়ে এসে ঘোড়ায় উঠতে যাবে এমন সময় একজন ছুটতে ছুটতে এসে বলল,

এইচ. জি. ওয়েলস-এর গল্প

বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য

তৃতীয় অধ্যায় : ভৌতিক জগৎ

জীবনরসিক ওয়েলস-এর গল্প পড়তে বসে প্রায় সর্বত্রই নতুনের সাক্ষাৎ পাই আমরা। কিন্তু অশরীরীর অস্তিত্ব অনুভব করি শুধুমাত্র তাঁর ভৌতিক গল্প-গুলোতে। সেখানে হয় আভাসে-ইঙ্গিতে পাই তাদের, আর না হয় স্পষ্টই তাদের প্রত্যক্ষ করি। কোথাও আবার দেখি, অশরীরীকে বা অলৌকিক ঘটনাকে প্রতীক হিসেবে নির্বাচন করা হয়েছে। এরা ভৌতিক বিভীষিকা যতটা সৃষ্টি করছে, জীবনের নির্মম সত্যকে প্রকাশ করছে তার চেয়েও অনেক বেশি পরিমাণে। সেখানে জীবনরসিক দরদী ওয়েলসকে খুঁজে পাই আমরা। সত্যিকারের এক সহৃদয় কথা-শিল্পীকে আবিষ্কার করি। মনেপ্রাণে বিশ্বাস করি যে, এ শিল্পীটি অলৌকিকের পিরামিড লৌকিক জীবনের গা ঘেঁষেই গড়ে তুলেছেন। এই শেষোক্ত শ্রেণীর গল্পের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ 'দি ডোর ইন দি [illegible] লায় এ গল্পটির নাম দেওয়া [illegible] গায়ে দরজা'।

[illegible] ন্দর কাহিনী [illegible] ছেন। বক্তব্যের [illegible] এ যেন মহাকাব্যের [illegible] গল্পটির প্রতীকের [illegible] করলে দেখি, জীবনের [illegible] এখানে উদ্ভাসিত। সে [illegible] এই যে, জীবন একটি দেওয়াল দিয়ে ঘেরা। প্রয়োজনের খাতিরে বিশেষ একটি গন্ডীর মধ্যে জীবনসংগ্রাম করতে আমরা অভ্যস্ত। সারা জীবন ধরে অসংখ্য কাজ আমাদের। এত কাজ যে ওই দেওয়ালটির গায়ে-লাগান দরজা দিয়ে বইরে গিয়ে জগৎ ও জীবনের বৃহত্তর সৌন্দর্যকে উপভোগ করার সময় আমরা পাই নে। অর্থাৎ কঠিন কর্তব্যসিদ্ধির জন্যে আমরা ব্যস্ত, আমরা খ্যাতি-প্রতি-পত্তি ও স্বার্থচিন্তার মোহে আচ্ছন্ন। নিয়মানুবর্তিতার কঠোর অনুশাসনে নিজেদের এত বেশি বদ্ধ করি আমরা যে তা' থেকে বেরিয়ে গিয়ে মুক্ত জীবনের সহজ-সুন্দর আনন্দকে উপভোগ করতে পারি নে। তবে একেবারেই যে কেউ কোনোদিন পারি নে, তা' নয়। কদাচিৎ কেউ কখনও ওই দরজার সন্ধান পেলেও পেতে পারি। কিন্তু সে পাওয়া চিরস্থায়ী কোনো সম্পদ নয়; ক্ষণস্থায়ী একটা অনুভূতি মাত্র। জীবনের কোনো বিশেষ মুহূর্তে ক্ষণকালের জন্যে সেই পথ ধরে বেরিয়ে গিয়ে আনন্দ ও মুক্তির আস্বাদ পেতে পারি আমরা। এই গল্পের নায়ক ওয়ালেস তা' পেয়েছে। সেই কবে কোন্ শৈশবে পেয়েছে। তারপর থেকে আরও কয়েকবার দেওয়ালের গায়ে ওই দরজা নজরে পড়েছে তার। তার মন চেয়েছে, দরজা খুলে বেরিয়ে যেতে। কিন্তু সাধ থাকলেও সাধ্য ছিল না বলে বেরিয়ে যেতে সে পারে নি। কর্তব্যের নাগপাশ বারবার তার জীবন-পথে প্রতিবন্ধক হয়েছে। এক এক সময় আকুল হয়ে উঠেছে ওয়ালেস্; প্রভূত খ্যাতি-প্রতিপত্তি ও চরম সাফল্যের মধ্যেও সে শান্তি পায় নি। সেই যে মুক্ত ও সহজ-সুন্দর জীবন, শৈশবে একবার সে যার স্পর্শ পেয়েছিল, সেই জীবন তাকে হাতছানি দিয়ে ডেকেছে। সে ডাক এক একবার শুনতে পেয়েছে ওয়ালেস্ কিন্তু তা'তে সাড়া দিতে পারে নি। অসংখ্য কর্তব্যের ভিড়ের মধ্য থেকে মুক্তির পথে এগোতে পারে নি সে। এখানেই তার ট্র্যাজেডী; আমাদের সকলের ট্র্যাজেডী। আমরাও ওয়ালেস্-এর ন্যায় সৌন্দর্য ও আনন্দকে বিসর্জন দিয়ে কলুর বলদের মতোই সংসার-চক্রে ঘুরে বেড়াচ্ছি। আমাদের জীবনের এই রিক্ততাকে প্রতীক ও ব্যঞ্জনার মধ্য দিয়ে লেখক এখানে সুন্দরভাবে পরিস্ফুট করেছেন।

ওয়ালেস্ শৈশবে যে উদ্যানটি দেখেছিল, তা' শান্তিতে ভরা ও আনন্দে ঘেরা। নিষ্পাপ, অকলঙ্ক ও পবিত্র জীবনের প্রতীক সেটি। উদ্যানের মধ্যে অহিংস চিতাবাঘ, সহৃদয় ছেলের দল আর সেই সুন্দর মেয়েটি জগতের মাধুর্য ও প্রেমকে ব্যঞ্জিত করেছে। তবে এই প্রতীক ও ব্যঞ্জনার কথা ভুলে গেলেও গল্পটির রসাস্বাদনে কোনো বাধা জন্মে না। বরং প্রথম পরিচয়ের পর অনেকেই ওই সাদা দেওয়াল, সবুজ দরজা ও সুন্দর উদ্যানের মধ্যে ভৌতিক রহস্যের স্বাদ পেতে পারেন। গল্পটির গোড়ার দিকে অনেকেরই মনে হতে পারে যে এই অতি-প্রাকৃতের অভিজ্ঞতাই ওয়ালেস্‌কে সারা জীবন ধরে ব্যাকুল করেছে। কিন্তু গল্পটি যত এগোয়, অতিপ্রাকৃত জগতের কথা ততই ভুলে যাই আমরা। ততই প্রাকৃত জগতের নগ্ন সত্যকে প্রত্যক্ষ করি। দেখতে পাই, ভৌতিক উদ্যানটিকে লেখক এখানে প্রতীক হিসেবে ব্যবহার করেছেন। অবশেষে গল্পের একেবারে শেষাংশে পৌঁছুই যখন, দেখি রেল-স্টেশনের একটি নিষিদ্ধ দরজাকে ওয়ালেস্ সেই উদ্যানের প্রবেশ-পথ বলে ভুল করেছে এবং সেই দরজা দিয়ে ঢুকতে গিয়ে নিজের মৃত্যু ডেকে এনেছে, তখন এই সিদ্ধান্তেই পৌঁছুই আমরা যে জীবনযুদ্ধে ক্লান্ত অবসন্ন ও দিশাহারা মানুষকে মৃত্যুর মধ্য দিয়েই বুঝি শেষ অবধি মুক্তির দেশে মহাপ্রস্থান করতে হয়।

সামগ্রিকভাবে আলোচনা করলে মনে হয়, ব্যঞ্জনায়, প্রতীক-নির্বাচনে ও আবে-দনের দিক থেকে এ গল্পটি অনন্য বিশিষ্টতার দাবি রাখে। আর মনে হয়, উদ্যানটির অভিনবত্বের মধ্যেই এর অলৌ-কিক রস প্রমূর্ত। ওয়ালেস্ স্বীকার করেছে, যে মুহূর্তে দেওয়ালের গায়ে দরজা খুলে গেল, উদ্যানের মধ্যে ঢুকল সে, অমনি তার মনে হল, যেন সে এক নতুন জগতে এসেছে। আগেকার চেনা সব পথঘাটের কথা মনে থাকল না তার। বাড়ির বাধানিষেধ ও নিয়মানুবর্তিতার কথা সে ভুলে গেল। ভয়-ডর, সন্দেহ-শঙ্কা যা' কিছু আমাদের দৈনন্দিন জীবনকে পীড়িত করে, সেই সব কিছুই দূর হল তার মন থেকে। মুহূর্তের মধ্যে সে অত্যন্ত প্রফুল্ল হয়ে উঠল। যেন খুব সুখী ছেলে সে; অন্য এক জগতের ছেলে।

ওয়ালেস্ বারবার বলেছে, বড় সুন্দর জগৎ ছিল সেটা। সেখানকার আকাশ-আলো, জল-বাতাস সব কিছুই ছিল আনন্দময়। সেখানকার প্রশস্ত ও মনোরম এক পথ ধরে সে এগোল। পথের দু'পাশে ছিল রাশি রাশি ফুল। আর ছিল বিরাট দু'টো চিতাবাঘ। নির্ভয়ে

চিতাবাঘের গায়ে হাত বুলিয়ে দিল ওয়ালেস। অনেকক্ষণ ধরে খেলল ওদের সঙ্গে। বাঘ দু'টো ওকে দেখে বিরক্ত হয়েছে বলে মনে হল না। বরং মনে হল, খুব খুশি হয়েছে। অনেকদিন পর বন্ধুকে ফিরে পেয়ে যেন আনন্দে আত্মহারা হয়েছে ওরা। ওয়ালেস-এর মনে হল, দীর্ঘদিন পর সে যেন তার চির-পরিচিত আনন্দকুঞ্জে ফিরে এসেছে। এর পরেই পথে দীর্ঘাঙ্গী ও সুন্দর একটি মেয়েকে দেখা গেল। ওয়ালেস-এর দিকে হাসতে হাসতে এগিয়ে এল সে। ওকে কোলে তুলে নিয়ে চুমু খেল, আদর করল। ওয়ালেস ভয় পেল না এতটুকু; এতটুকু অবাক হল না। বরং তার সমস্ত-মন-প্রাণ আনন্দে, শান্তিতে ভরে গেল।

এই যে আনন্দ ও শান্তিময় আলৌকিক উদ্যান, সদিচ্ছা ও সৎ-বুদ্ধি থাকলে লৌকিক জীবনের মধ্যে দাঁড়িয়েই এর সুধাটুকু পান করা যায়, এই হল আলোচ্য গল্পের মূল বক্তব্য।

ওয়েল্স-এর বক্তব্যপ্রধান ও প্রতীক-ধর্মী অন্যান্য অতিপ্রাকৃত গল্পের মধ্যে উল্লেখযোগ্য 'দি অ্যাপ্ল্', 'দি টেম্প্টেশন অব হ্যারিংগে' ও 'দি রেড রুম্'।

প্রথমোক্ত গল্পটি অভিনব প্রকৃতির, সন্দেহ নেই; কিন্তু শিল্প হিসেবে কতদূর সার্থক সে সম্বন্ধে সন্দেহ আছে। হলদে রঙের একটি ঝকমকে সুন্দর আপেলকে কেন্দ্র করে ওয়েল্স এখানে আদম ও ইভের সঙ্গে জড়ান সেই স্বর্গোদ্যান-ইডেন ও সেখানকার সেই নিষিদ্ধ ফলের প্রতি ইঙ্গিত করেছেন। কিন্তু অস্বীকার করা চলে না যে, এই ইঙ্গিত যতটা উদ্দেশ্যপ্রণোদিত হয়েছে, ততটা শিল্পোৎকর্ষমণ্ডিত হয় নি। অবশ্য বিস্ময়ের উপকরণ এ গল্পে অনেক আছে। অপরিচিত সেই প্রৌঢ়টি, সাসেক্সের ট্রেনের তৃতীয় শ্রেণীর কামরায় যা'কে প্রথম দেখি, লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের নতুন ম্যাট্রিকুলেট হিন্চ্ক্লিফ্-এর সঙ্গে আলাপ জমাতে যে ব্যস্ত, তার হাবভাব চাল-চলন প্রথম থেকেই আমাদের বিস্মিত করে। তারপর যখন দেখি, তার হাতে রয়েছে সেই আপেল, যা'কে সে জ্ঞানবৃক্ষের ফল বলে দাবি করছে, তখন বিস্ময়ের সঙ্গে সঙ্গে কৌতূহল এবং অবিশ্বাসও আমাদের ঘিরে ধরে। আপেলটি বিদ্যার্থী হিন্চ্ক্লিফ্কে দান করতে চায় সে; কিন্তু আমরা ভেবে পাই না, অপরিচিত এক ছাত্রের প্রতি তার এ ধরণের অনুকম্পার কারণ কি!

গল্পটির পরবর্তী অংশে আপেল-সংগ্রহের চাঞ্চল্যকর বিবরণ পাই আমরা। ওই বিচিত্র লোকটির কথা থেকে জানতে পারি, আপেলটি সে এক আর্মেনীয়র কাছ থেকে সংগ্রহ করেছে। আর্মেনীয়টি কেমন করে এই ফল পেল, সে কাহিনীও ট্রেনের ওই লোকটির কথা থেকেই জানা যায়; এবং আমাদের মনে হয়, ওই কাহিনীটুকুর মধ্যেই এ গল্পের যা' কিছু বিশিষ্টতা।

ট্রেনযাত্রীটির বর্ণনা থেকে আমরা জেনেছি, একবার আর্মেনীয়ার কিছু লোক প্রবল শত্রুর হাত থেকে আত্মরক্ষার জন্যে এক দুর্গম পার্বত্য অঞ্চলে আশ্রয় নিয়েছিল। সেখানকার আরণ্যক পরিবেশ ছিল অদ্ভুত ও বিচিত্র; আর ছিল মানুষের প্রতিকূল। আশ্রয়প্রার্থীদের প্রায় সকলেরই মৃত্যু হয়েছিল ওখানে। বেঁচেছিল মাত্র দু'জন। সেই দু'জনের একজন হল ওই আর্মেনীয় লোকটি, অদ্ভুতদর্শন আপেলটি যার হাতে পড়ে। আর্মেনীয়টি নিজেই স্বীকার করেছে, আপেল যখন সে পায় তখন একেবারেই ক্লান্ত ও অবসন্ন ছিল সে। তার দেহের নানা জায়গা থেকে তখন রক্ত ঝরে পড়ছিল। এমন অবস্থায়, ওই ভীষণগম্ভীর পরিবেশে গাছে স্বর্গ-রাজ্যের সেনালী আপেল ঝুলে থাকতে দেখা অস্বাভাবিক কিছু নয়। সন্ধ্যার অন্ধকারে দূরের প্রান্তরে আলোর ঝলমলানি দেখে সমগ্র অঞ্চলটিকে ইডেন বলে ভেবে নেওয়ার কারণও বুঝতে পারি। বর্ণনার গুণে ওয়েল্স যে সম্পূর্ণ অবিশ্বাস্য ঘটনাকে বিশ্বাসের প্রায় কাছাকাছি টেনে আনেন, একথাও মেনে নেবার জন্যে প্রস্তুত হই আমরা; কিন্তু তবু সব মিলিয়ে দেখলে মনে হয়, গল্পটি পাঠ করে মন ভরে নি।

এ গল্পের শেষ দিকে দেখি, ট্রেনের সেই অপরিচিত লোকটি হিন্চ্ক্লিফ্কে আপেলটি দিয়ে দিল। হিন্চ্ক্লিফ্ ওই আপেল নিয়ে হল্ম্উড্ স্টেশনে নামল। এদিকে শেষ মুহূর্তে আপেল ফিরিয়ে নিতে চাইল ট্রেনের সেই লোকটি। কিন্তু ট্রেন ছেড়ে দিল। হিন্চ্ক্লিফ্ও নিজের কাছে রাখতে পারল না ওই আপেল। এক বাগানে ছুঁড়ে ফেলে দিল। কয়েকদিন পর আপেলটির সন্ধানে সে ওই বাগানে গেল আবার। কিন্তু অনেক অনুসন্ধানেও সেই দুর্লভ বস্তুটিকে আর পেল না। জ্ঞানবৃক্ষের ফল মানুষ যে পেয়ে হারায় এবং হারিয়ে আবার পেতে চায়, আপেলের প্রতি ট্রেনের সেই লোকটি এবং হিন্চ্-ক্লিফের আকর্ষণ-বিকর্ষণের মধ্য দিয়ে লেখক তার ইঙ্গিত দিয়েছেন। কিন্তু যথার্থ শিল্পোৎকর্ষের অভাবে সেই ইঙ্গিত আমাদের মনে গভীর কোনো রেখাপাত করে না।

'দি টেম্প্টেশন অব হ্যারিংগে' প্রসঙ্গেও ঠিক এই একই কথা প্রযোজ্য। এ গল্পের বক্তব্য হল সত্যিকারের শিল্পীকে নিজের শিল্প সম্বন্ধে নির্লিপ্ত থাকতে হবে। এই বক্তব্যটিকে লেখক এখানে একটি অতিপ্রাকৃত দৃশ্যের মধ্যে দিয়ে উপস্থাপিত করেছেন।

হ্যারিংগে একজন শিল্পী। এক ইতালীয় আরগ্যান-গ্রাইণ্ডারের ছবি আঁকছিল সে। আঁকবার সময় নিজের শিল্প সম্বন্ধে সে ছিল অতিমাত্রায় সচেতন। ছবিটিকে একেবারে নিখুঁত করবার জন্যে আকাঙ্ক্ষার অবধি ছিল না তার।

এমন সময় হঠাৎ সেই ছবিটি নড়েচড়ে উঠল। অরগ্যান-গ্রাইণ্ডারের প্রেতাত্মা আবর্ভূত হল সেখানে। তারপর শিল্পীকে সে বোঝাতে চাইল, যিনি নিজের শিল্পকে কতকগুলো সূত্রের মধ্যে বাঁধতে চান, তাঁকে শিল্পী বলা চলে না; বলা চলে সমালোচক। সত্যিকারের শিল্পী হবেন যিনি তাঁকে নিজের শিল্প সম্বন্ধে সারাক্ষণ সচেতন থাকলে চলবে না।

হ্যারিংগে তার শিল্প সম্বন্ধে বড় বেশি সচেতন এবং বস্তুনিষ্ঠ। এ কারণেই তার শিল্পসাধনা ব্যর্থ হয়েছে।

সামগ্রিকভাবে আলোচনা করলে মনে হয়, এ গল্পের অতিপ্রাকৃত ঘটনা বক্তব্যকে উপস্থাপিত করার একটা ফর্ম মাত্র।

এই ফর্মের দোহাই 'দি রেড রুম' গল্পের বেলায়ও দেওয়া চলে। বক্তব্য এখানেও কিছু আছে। তবে এ কাহিনীতে ভৌতিক পরিবেশ খুব সুন্দরভাবে [illegible] চিত্রিত। অতিপ্রাকৃতের [illegible] নিবিড় ও ঘনীভূত [illegible] বিশ্বাসের কথা নেই এ[illegible] ভয় থেকেই যে অতিপ্রাকৃতের [illegible] আসলে অতিপ্রাকৃত বলে যে কিছু নেই, এ কথাই গল্পটির উপসংহারে দৃঢ়তার সঙ্গে বলা হয়েছে। তা' সত্ত্বেও বক্তব্য প্রাধান্য পায় নি এ গল্পে। অলৌকিকের রহস্য এবং তা' থেকে সঞ্জাত রোমাঞ্চই এ গল্পের মূল সুর।

এ কাহিনীর সুরু থেকেই পাঠক বিচিত্র এক রহস্যের স্বাদ পায়। অন্ধকার রাত্রি, নির্জন বাড়ি, বাড়ীটির কোণের এক ঘরে আগুনের সামনে বসে-থাকা অদ্ভুতদর্শন তিন বৃদ্ধ, দোতলার সেই কুখ্যাত 'রেড রুম' যা' ভূতুড়ে বলে পরিত্যক্ত, যার সঙ্গে এক ডিউক যুবক ও তার যুবতী স্ত্রীর মৃত্যু জড়িয়ে আছে,—এই সব কিছুই রহস্যকে আরও ঘনীভূত করে। সে কারণেই এ গল্পের দুঃসাহসী নায়ক যখন বৃদ্ধদের কাছ থেকে বিদায় নেয় এবং তারপর যখন অন্ধকার 'করিডোর' ও সিঁড়িপথ ধরে রেড রুমের দিকে এগিয়ে

চলে তখন অজানা এক আশঙ্কা পাঠকদের পেয়ে বসে। প্রতি মুহূর্তেই সাংঘাতিক একটা কিছু অঘটনের জন্যে প্রস্তুত হয়ে থাকে তারা। এর ফলেই নায়ক রেড রুমে প্রবেশ করলে পাঠকরা অতি সাধারণ ঘটনার মধ্যেও অসাধারণত্ব খুঁজে পায়। প্রাকৃত ঘটনার মধ্যেও অতিপ্রাকৃতের বিস্ময় অনুভব করে। এই বিস্ময় আরও নিবিড় হয়ে ওঠে যখন দেখা যায়, অন্ধকারে দিশাহারা হয়ে নায়ক একের পর এক প্রদীপ জেবলে চলেছে। তারপর প্রদীপ যখন নিভতে সুরু করে তখন এ গল্পের নায়ক যেমন পাঠকরাও তেমনি বিস্ময়ে আতঙ্কে বিমূঢ় হয়ে পড়ে। এদিকে প্রদীপ জ্বালিয়ে রাখবার প্রাণান্তকর প্রয়াস চলে রেড রুমে। প্রদীপ একদিকে যেমন নিভতে থাকে অপরদিকে নায়ক তেমনি ওদের জ্বালাবার জন্যে উন্মত্তের মতো ছুটে বেড়ায়। প্রায়ান্ধকার অতিকায় রেড রুম, তার পুরনো আমলের ফার্নিচার, কালো কালো অস্পষ্ট ছায়া, মুহুর্মুহু প্রদীপ নিভে যাওয়া—এই সব কিছু মিলে এক মূর্তিমান বিভীষিকা নায়কের অস্তিত্বকে গ্রাস করবার উপক্রম করে। তারপর রেড রুমের সমস্ত প্রদীপ নিভে যায় যখন, যখন নিবিড় অন্ধকার চারিদিক থেকে অক্টোপাসের মতো নায়ককে ঘিরে ধরে অতি সতর্ক ও সাহসী পাঠকেরও নিশ্বাস তখন রুদ্ধ হবার উপক্রম হয়। সে কারণেই পরদিন দিনের আলোতে নায়ককে দেখি যখন, যখন অশরীরীর অস্তিত্বকে দৃঢ়তার সঙ্গে সে অস্বীকার করে,—বলে যে, ভয় থেকেই অতিপ্রাকৃতের কল্পনা করি আমরা, তখন তার কথায় আমরা বিশ্বাস করি বটে, কিন্তু তার পূর্বরাত্রির অভিজ্ঞতার কথা কোনোমতেই মন থেকে মুছে ফেলতে পারি না। এখানেই গল্পকারের কৃতিত্ব। বিশ্বাস নয়, অতিপ্রাকৃতে অবিশ্বাসের মধ্য দিয়েই গল্পরসকে তিনি এখানে জমিয়ে তুলেছেন।

ওয়েল্স-এর কয়েকটি গল্পে অতিপ্রাকৃতকে বে-আব্রু অবস্থায় তুলে ধরা হয়েছে। এই প্রসঙ্গে প্রথমেই উল্লেখযোগ্য 'দি লেইট্ মিঃ এল্ভেসাম্' বা 'পরলোকগত মিঃ এল্ভেসাম্।' গল্প হিসেবে ঠিক সার্থক সৃষ্টি এ নয়। বৃদ্ধের আত্মা কেমন করে এক যুবকের দেহে প্রবেশ করল এবং যুবকটি কেমন করে বৃদ্ধের দেহ লাভ করল, এই আজগুবি ঘটনার উপর নির্ভর করে গল্পটি গড়ে উঠেছে। অবশ্য অপ্রত্যাশিত বিষয় নিয়ে লেখা এই ধরণের রহস্য-গল্পে আজগুবি ঘটনা কিছু থাকা স্বাভাবিক। এইচ্. জি. ওয়েল্স-এর অনেক গল্পে তা' আছেও। কিন্তু অন্যান্য গল্পে আজগুবি ঘটনাকে বিশ্বাসযোগ্য করে তোলার যে প্রচেষ্টা দেখা যায়, যে বৈজ্ঞানিক যুক্তি ওয়েল্স-এর অনেক গল্পকেই প্রায় সম্ভাব্যের কোঠায় এনে দেয়, এখানে তা' একান্তই অনুপস্থিত। অসম্ভবকে এখানে আবরণহীন অবস্থাতেই খুঁজে পাই আমরা। বিস্ময়ের সঙ্গে লক্ষ্য করি, অসম্ভবকে সম্ভবের রাজ্যে পৌঁছে দেবার জন্যে কোনো যুক্তির অবতারণা করেন নি লেখক, গল্পের শেষদিকে মূল ঘটনাকে লঘু প্রতিপন্ন করে কৌতুকের হাসিও হাসেন নি, বিস্ময়কর যা'কিছু ঘটেছে তা' ব্যাখ্যার ভার পাঠকদের উপর ছেড়ে দিয়ে তিনি ছুটি নিয়েছেন। সে কারণেই গল্পটি পাঠ করে পাঠকরা যতটা রস উপভোগ করে, ধাঁধার জটিলতার মধ্যে পড়ে বিরস হয় তার চেয়েও বেশি। কেন হয়, সে কথা বলি এবার। প্রথমে সংক্ষেপে গল্পটি বলে রাখি। এড্ওয়ার্ড জর্জ ইডেন নামে এক যুবক গল্পটি বলেছে। তার কাছ থেকেই জানি আমরা, একদিন পথে অদ্ভুতদর্শন এক বৃদ্ধের সঙ্গে হঠাৎ তার সাক্ষাৎ হল। বৃদ্ধটি আগে থাকতেই তাকে চিনত। কিন্তু ইডেন অনেক চেষ্টা করেও বৃদ্ধটিকে কোথাও দেখেছে বলে স্মরণ করতে পারল না। পরে অবশ্য জানল যে, ওই বৃদ্ধটি হলেন প্রখ্যাত দার্শনিক মিঃ এল্ভেসাম্। এদিকে এল্ভেসাম্ তাঁর সমস্ত সম্পত্তি ইডেনকে দেবেন বলে স্থির করেছেন। বলেছেন, প্রতিদানে ইডেনকে তার নাম গ্রহণ করতে হবে। হোটেলে বসে খাবার সময় ইডেনের যৌবনদীপ্ত দেহের দিকে লোভীর দৃষ্টি নিয়ে তাকিয়েছেন তিনি, উত্তরাধিকারী করবেন বলে তার স্বাস্থ্য সম্বন্ধে পুঙ্খানুপুঙ্খ অনুসন্ধান করেছেন। তারপর উত্তরাধিকার-পর্বের মাহেন্দ্র-লগ্ন এসেছে। এল্ভেসাম্ ও ইডেন একসঙ্গে বসে মদ খেয়েছেন এবং মদের সঙ্গে কী একটা চূর্ণ মিশিয়েছেন এল্ভেসাম্। তারপর সেই চূর্ণ-মেশান মদ উভয়েই পান করেছেন; এবং এর পরিণতি কী রকম সাংঘাতিক হয়েছে, গল্পটির পরবর্তী পর্বে সে বর্ণনা আছে। সেখানে দেখি, ইডেন এল্ভেসামের জরাজীর্ণ দেহ লাভ করেছে এবং নিজের বাড়ি ফিরে না এসে ফিরেছে ওই দার্শনিকের বাড়ি। ধীরে ধীরে চরম নৈরাশ্য ঘিরে ধরেছে তাকে এবং এই ভেবে সে আতঙ্কিত হয়েছে যে, এমনি করেই হয়তো এল্ভেসাম্ একের পর এক যুবকের দেহ আশ্রয় করে অনাদি-অনন্তকাল ধরে বেঁচে থাকবেন। সকলের সাবধান করে দিয়েছে ইডেন এবং প্রার্থনা করেছে, তার মতো শোচনীয় অবস্থায় কাউকে যেন কোনোদিন পড়তে না হয়। মূল গল্পটি এখানেই শেষ হয়েছে এবং এই অবধি ইডেনের বর্ণনা। এর পরেই এ কাহিনীর নাটকীয় উপসংহার। এ থেকে আমরা জানতে পারি, এল্ভেসাম্ আত্মহত্যা করেছিলেন এবং তার মৃতদেহটি যে টেবিলে বসে তিনি লিখতেন, তার ঠিক সামনেই পাওয়া গিয়েছিল। ইডেনের সঙ্গে এল্ভেসামের যোগাযোগ ছিল এবং সম্পত্তিও দান করা হয়েছিল ইডেনকেই। কিন্তু সে সম্পত্তি ইডেন ভোগ করতে পারে নি। কেন না, এল্ভেসামের আত্মহত্যার চব্বিশ ঘণ্টা আগেই পথে দুর্ঘটনায় তার মৃত্যু হয়। এদিকে এল্ভেসাম্-এর টেবিলের উপর পেন্সিলে লেখা কিছু কাগজ পাওয়া যায়। সে কাগজের হস্তাক্ষরের সঙ্গে এল্ভেসাম্-এর লেখার বিশেষ কোনো সাদৃশ্য ছিল না। এইভাবে ধাঁধার আকারে গল্পটির উপসংহার করা হয়েছে। এই ধাঁধার উত্তর দিতে গেলে বলতে হয়, এল্ভেসাম্-এর টেবিলের উপর যে লেখাটি পাওয়া গেছে, তা' আসলে ইডেনের। জীবনের মর্মান্তিক ঘটনার কথা লিপিবদ্ধ করে সকলকে সাবধান করে দেবে বলেই সে এ কাহিনী লিখেছিল। এ ছাড়া আত্মহত্যা করেছিল যে মানুষটি, তিনিও এল্ভেসাম্ নন, ইডেন। জীবনের প্রতি বীতশ্রদ্ধ হয়েই এল্ভেসাম্-এর টেবিলে পাওয়া বিষ পান করেছিল ইডেন। কিন্তু তখন এল্ভেসামের দেহ লাভ করেছে সে। সে কারণেই লোকে ভাবল, দার্শনিক এল্ভেসাম্ই বিষ খেয়ে আত্মহত্যা করেছেন। অপরদিকে পথে ইডেন নামে যে মানুষটির দুর্ঘটনায় মৃত্যু হল, তিনি আসলে এল্ভেসাম। অবশ্য ইডেনের দেহ আশ্রয় করে এল্ভেসাম্-এর কি প্রতিক্রিয়া হল, সে সম্বন্ধে কিছুই এ গল্পে বলা হয় নি। কিন্তু তাই বলে পথে দুর্ঘটনায় নিহত ইডেনই যে আসলে এল্ভেসাম্, এটুকু অনুমান করে নিতে পাঠকদের কষ্ট হয় না।

এইভাবে গল্পের নাটকীয় পরিসমাপ্তি ঘটিয়ে একটি গূঢ় বক্তব্যের প্রতি লেখক আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন বলে মনে হয়। সে বক্তব্যটি হল এই যে, অনেক চেষ্টাতেও যৌবনকে আর ফিরে পাওয়া যায় না। মানুষ পেতে চায় অনেক কিছু, নতুন করে উপভোগ করতে চায় জীবনকে; কিন্তু কোথা থেকে সর্বনাশা মৃত্যু এসে মানুষের আশা-আকাঙ্ক্ষা চুরমার করে দেয়। এল্ভেসাম্-এর স্বপ্নও সফল হয় নি। অসম্ভবের পিছনে ছুটতে গিয়ে তাঁর নিজের জীবন তো বটেই, আর একটি সুন্দর জীবনও নষ্ট হয়েছে।

অবশ্য এই বক্তব্যের কথা ভুলে গেলেও গল্পটির রসগ্রহণে কোনো বাধা জন্মে না।

এল্‌ভেসাম্‌-এর সঙ্গে ইডেনের হঠাৎ পরিচয়, উভয়ের আলাপ-আলোচনা এবং পরিশেষে এল্‌ভেসাস্‌-এর দেহধারী ইডেনের মর্মবেদনা—এই সব কিছুই সুন্দর ফুটেছে। কিন্তু তা' সত্ত্বেও রস-সৃষ্টির দিক থেকে সামগ্রিকভাবে গল্পটি সার্থক হয় নি বলেই মনে হয়।

এ গল্পের সবচেয়ে সুন্দর অংশ ইডেনের এল্‌ভেসামে রূপান্তর মুহূর্তটি। ইডেনের আত্মকথা থেকে আমরা জানতে পারি,—

"এবং তার পরেই আমার জীবনে এমন এক অদ্ভুত ও ভয়ঙ্কর ঘটনা ঘটল, যার কথা মনে পড়লে আমি এখনও কেঁপে উঠি। আমি চীৎকার করে উঠলাম। বললাম, 'কোন্‌ শয়তানের কারসাজিতে আমি এখানে এসেছি'?

এবং এই কণ্ঠস্বর আমার নিজের ছিল না।

আমার কণ্ঠস্বর ছিল না সেটা। সে স্বর ছিল সরু। স্পষ্টভাবে উচ্চারিত কথাগুলো অস্পষ্ট শোনাচ্ছিল; এবং আমার মুখের হাড়-গুলোতে ওদের অনুরণন অন্যরকম মনে হচ্ছিল। তারপর নিজের ধারণা সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত হবো ভেবে আমি এক হাতের উপর অন্য হাত রাখলাম এবং অনুভব করলাম, আমার চামড়ার ভাঁজগুলো থলথলে হয়ে গেছে"......

ওয়েল্‌স-এর আর একটি স্মরণীয় সুভৌতিক গল্প 'দি স্টোলেন্‌ বডি' বা 'অপহৃত দেহ'। এ এক বিচিত্র রসের গল্প। চিন্তার স্থানান্তরণ এবং অপচ্ছায়া সম্বন্ধে কৌতূহলী এক মনোবিজ্ঞানীর দেহ থেকে কিছুদিনের জন্যে কেমন করে প্রাণ বেরিয়ে এল এবং কেমন করে সেই দেহে একটি দুষ্ট আত্মা সাময়িকভাবে ভর করল, এই গল্পে তা' বলা হয়েছে।

বলার ভঙ্গীটি খুবই আকর্ষণীয়। গল্পটির প্রধানত দু'টি অংশ। এক অংশে অত্যাশ্চর্য ঘটনাগুলোর বর্ণনা; অপর অংশে ব্যাখ্যা। মনোবিজ্ঞানী মিঃ বেসেলের পরিচয় দেওয়া হয়েছে প্রথমেই। বলা হয়েছে, জীবিত ব্যক্তির অপচ্ছায়া সম্বন্ধে তিনি দীর্ঘকাল ধরে গবেষণা করছিলেন। ইচ্ছাশক্তির বলে কেউ তাঁর অপচ্ছায়াকে শূন্য দিয়ে চালনা করতে পারে কি না, তা' দেখার জন্যে একবার তিনি তাঁর বন্ধু মিঃ ভিন্‌সের সহযোগিতায় পর পর কয়েকটি পরীক্ষা করেন। ওঁরা যে যার বাড়ির নিভৃত কক্ষে ছিলেন। ভিন্‌সে থাকতেন বেসেলের বাড়ি থেকে দু' মাইল দূরে। কিন্তু পরীক্ষার শেষ দিকে ভিন্‌সে হঠাৎ একবার বেসেলকে দেখতে পেলেন যেন। যেন মনে হল, বেসেলের অপচ্ছায়া ক্ষণিকের জন্যে তাঁর সামনে আবির্ভূত হয়েছে।

বিচিত্র এই ঘটনা-সংস্থানের গুণে গল্পটি গোড়া থেকেই জমে ওঠে। বেসেল নিজেকে সম্মোহিত করতে জানতেন এবং সম্মোহনের মধ্য দিয়েই তিনি তাঁর দেহের অপচ্ছায়া ভিন্‌সের কাছে প্রক্ষেপ করতে চেয়েছিলেন, একথা জানা থাকায় পাঠকদের কৌতূহল আরও বেড়ে যায়। তারপর যখন দেখি, বেসেল তাঁর ঘরে নেই এবং ঘরের সব কিছু বিপর্যস্ত তখন ভয়ঙ্কর একটা কিছুর আশঙ্কা আমাদের পেয়ে বসে। এরপর চাকরের মারফৎ আমরা শুনি বটে যে, বেসেল উন্মত্ত অবস্থায় বাড়ি থেকে বেরিয়ে গেছেন, কিন্তু এ থেকে আসল রহস্যের সমাধান কিছু হয় না। বরং রহস্য আরও জট পাকিয়ে ওঠে।

গল্পটির পরবর্তী পর্বে আতঙ্কিত ও দিশাহারা ভিন্‌সেকে দেখি আমরা। দেখি, কিছুতেই ঘুমুতে পারছেন না তিনি। বেসেলের বিকৃত মুখ ও অদ্ভুত অঙ্গভঙ্গী দুঃস্বপ্নের মধ্য দিয়ে অহরহ তাঁকে দগ্ধ করছে। ভীত-সন্ত্রস্ত ভিন্‌সের চিত্রটি এখানে খুব সুন্দর ফুটেছে। তারপর রাত্রির অন্ধকারে তিনি যখন রাজপথ ধরে এগিয়ে চলেন, তখন তাঁর অসহায় অবস্থাও সহজেই কল্পনা করতে পারি আমরা।

অবশেষে পথেই বেসেলের দেখা পেলেন ভিন্‌সে। কিন্তু এ বেসেল তখন অন্য মানুষ। তাঁর দেহে অন্য একটি দুষ্ট আত্মা আশ্রয় নিয়েছে তখন। প্রকৃত বেসেলের আত্মা তখন নিরালম্ব অবস্থায়। ভিন্‌সে এ কথা জানতেন না। এ সম্বন্ধে গোড়াতে পাঠকদেরও অবহিত করেন নি লেখক। রহস্যকে জমিয়ে তুলবেন বলে সঙ্গত কারণেই বোধ করি করেন নি। তাই যখন দেখা যায়, বেসেল ভিন্‌সেকে চিনতে পারেন নি, উপরন্তু লাঠির আঘাতে তাঁকে ধরশায়ী করে পরক্ষণেই অদৃশ্য হয়েছেন, তখন অদ্ভুত এক উৎকণ্ঠা পাঠকদের ঘিরে রাখে। "জীবন জীবন" বলে কেন যে বেসেল চিৎকার করলেন তাও প্রথমটায় আমরা বুঝতে পারি না। পরে বুঝি, এ কীর্তি অশরীরীর। জীবনের মোহে বেসেলের দেহকে সে আশ্রয় করেছে এবং খল-প্রকৃতির বশে সে মারমুখী হয়ে উঠেছে। পথে-ঘাটে লোকজনকে অযথা মারধোর করছে সে। ধনসম্পত্তির অশেষ ক্ষতি করছে। কিন্তু কেউ তাকে ধরতে পারছে না। প্রতি রাতেই সাড়ে বারোটা থেকে পৌনে দু'টো অবধি তার দেখা মিলছে। কিন্তু তার পরেই রহস্যজনকভাবে সে অন্তর্ধান করছে।

এদিকে বেসেলের অপর এক বন্ধু হার্ট এ সবের কিছুই জানতেন না। অথচ তিনিও স্বপ্নে বেসেলকে দেখেছেন। যে অবস্থায় দেখেছেন, তার সঙ্গে ভিন্‌সের বর্ণনা মিলে যায়। এদের স্বপ্নে দেখা অভিজ্ঞতার এই সাদৃশ্য দেখিয়ে ওয়েল্‌স রহস্যকে এখানে গাঢ়তর করেছেন। স্বপ্নে আবির্ভূত হয়ে বেসেল অসহায়ভাবে ভিন্‌সের সাহায্য চাইছেন—বারবার এই ইঙ্গিত দিয়ে পাঠকদের যেন সাংঘাতিক একটা কিছু অঘটন সম্বন্ধে সচকিত করা হয়েছে। তারপর প্ল্যাণ্ডেটে পারদর্শী ডঃ উইলসন প্যাগেট নামে লণ্ডনের এক মনোবিজ্ঞানীর পরিচয় পাই আমরা। সবিস্ময়ে জানতে পারি, মিসেস বুলব নামে এক মিডিয়ামের সহায়তায় তিনি বেসেলের প্রেতাত্মার সঙ্গে যোগাযোগ করেছেন। তারপর একটি শ্লেট এনে ডঃ প্যাগেট যখন বেসেলের হস্তাক্ষর প্রদর্শন করেন, তখন অতি সতর্ক পাঠকও বোধ করি প্রেতাত্মার অস্তিত্ব সম্বন্ধে সন্দেহ প্রকাশ করার অবকাশ পান না। বরং নিঃসন্দিগ্ধচিত্তেই সকলে লক্ষ্য করেন, ওই শ্লেটে প্রদর্শিত সূত্র ধরে বেসেলকে শেষ অবধি উদ্ধার করা হয়েছে। এখানেই লেখকের কৃতিত্ব। অবিশ্বাস্য ঘটনাকে তিনি সম্পূর্ণ বিশ্বাসযোগ্য করে তুলেছেন। তারপর ধীরে ধীরে সুস্থ হয়ে উঠেছেন বেসেল এবং তাঁর অত্যাশ্চর্য অভিজ্ঞতার বর্ণনা দিয়েছেন। তাঁর সেই বর্ণনাকে এত চিত্তাকর্ষক করে এখানে তুলে ধরা হয়েছে যে আমরা পাঠকরা তা' এক নিশ্বাসে পাঠ করি। আমাদের মনে হয়, যেন এক অদ্ভুত ও অতীন্দ্রিয় জগতের রুদ্ধদুয়ার খুলে গেছে। যেন অনুভব করি আমরা, বেসেলের দেহ থেকে তাঁর প্রাণ বেরিয়ে এল এবং তারপর যেন মেঘের আকারে তা' ভেসে চলল মহাশূন্যের পথে। অদ্ভুত সেই শূন্যতা। কোনো শব্দ শোনা যায় না সেখানে। কিন্তু সেখান থেকে পৃথিবীর ঘরবাড়ির অন্দর-মহল অবধি দেখা যায়। সেখান থেকে পৃথিবীর সব পরিচিত মানুষকেই চেনা যায়, কিন্তু ধরা যায় না। ধরতে গেলেই একটুকরো কাচের মতো কী যেন এক বাধা এসে মাঝখানে দাঁড়ায়। এই যে অলৌকিক অতীন্দ্রিয় জগৎ, এর বর্ণনায় ওয়েল্‌স এখানে আশ্চর্য সূক্ষ্মদর্শিতার পরিচয় দিয়েছেন।

অলৌকিক জগতের বায়বীয় অশরীরীদের বর্ণনাও বিস্ময়কর। বেসেল অনুভব করেছেন, অনুক্ষণ যেন সেই অশরীরীদের ভয়ঙ্কর মুখ ঘিরে রেখেছে তাঁকে যেন তারা ভয়াবহ দৃষ্টিতে তাঁর

দিকে তাকিয়ে আছে। জীবনের স্বাদ পাবার জন্য অশরীরীদের ব্যাকুলতা এবং তাদের কবল থেকে বেরিয়ে আসবার জন্যে বেসেলের প্রচেষ্টার চিত্রটি সংক্ষিপ্ত হলেও মর্মস্পর্শী। অবশেষে বেসেলের অপচ্ছায়া ভিন্‌সের কাছে আবির্ভূত হল কেমন করে, কেমন করে অশরীরী বেসেল ভিন্‌সের মস্তিষ্কে প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করলেন, গল্পটির পরবর্তী অংশে তা' দেখান হয়েছে। বলা হয়েছে, ভিন্‌সের দেহের বাইরেটা যেমন ভিতরটাও তেমনি দেখতে পাচ্ছিলেন বেসেল। এবং পাচ্ছিলেন বলেই বাইরের দেহটা স্পর্শ করতে না পারলেও ভিতরের মস্তিষ্ককে তাঁর স্পর্শাতীত সূক্ষ্যাতি-সূক্ষ্ম দেহের সাহায্যে উদ্দীপ্ত করতে পেরেছিলেন।

এদিকে ঠিক সেই মুহূর্তেই অনুভব করলেন বেসেল, যে তাঁর দেহে কোনো দুষ্ট অশরীরী অনুপ্রবেশ করছে। তাড়াতাড়ি তিনি ছুটলেন তাঁর বাড়ির দিকে। সঙ্গে সঙ্গে আরও অনেক অশরীরী তাঁর পিছু নিল। তিনি যখন বাড়ি পৌঁছুলেন, তখন বড় দেরি হয়ে গেছে। এক দুষ্ট অশরীরী অনুপ্রবেশ করেছে তাঁর দেহে। বেসেল অবাক হয়ে লক্ষ্য করলেন, যে দেহটি খানিক আগেই মরে যাওয়া কোনো ব্যক্তির দেহের মতো নিশ্চল হয়েছিল, এইবার তা যেন উঠে দাঁড়াল। তারপর চলতে শুরু করল ধীরে ধীরে। বেসেলে আরও বিস্মিত হলেন এই ভেবে যে, দেহটির কার্যকলাপের সঙ্গে তাঁর নিজের ইচ্ছের কোনো যোগই ছিল না। অর্থাৎ, এইখানেই বেসেলের দেহ অপহৃত হল। অপহরণ করল দুষ্ট কোনো এক অশরীরী।

ঘটনাটি অসম্ভব, সন্দেহ নেই। কিন্তু এই অসম্ভবকেও বর্ণনানৈপুণ্যে ওয়েলস যেন এখানে সম্ভব করে তুলেছেন। সে কারণেই অপহৃত দেহটির পরবর্তী কার্যকলাপের ব্যাখ্যা শুনব বলে আমরা উন্মুখ হয়ে থাকি। এবং যখন দেখি, বেসেল তাঁর দেহে প্রবেশ করতে গিয়ে বারবার ব্যর্থ হচ্ছেন, তখন অপ্রত্যাশিত আরও অনেক কিছু শুনব বলে আমরা প্রস্তুত হই।

এদিকে জীবনভিক্ষু অশরীরীটি বেসেলের দেহকে আশ্রয় করতে পেরে আনন্দে দিশাহারা। জীবনকে বুভুক্ষুর মতো উপভোগ করতে গিয়ে উন্মত্ত হয়ে গেছে সে। জিনিসপত্র তছনছ করছে, মানুষজনকে করছে আঘাত। গল্পটির এই অংশে এসে বুঝতে পারে পাঠকরা, যে উপদ্রব ও অত্যাচার যা' কিছু হয়েছে তার মূলে বেসেলের দেহধারী অন্য কোনো শক্তি, বেসেল নয়। পাঠকরা আরও বুঝতে পারে যে, এইখান থেকেই অদ্ভুত কৌশলে ওয়েলস গল্পটির রহস্যজাল ধীরে ধীরে গুটিয়ে আনছেন।

কিন্তু রহস্যের ঘোর তখনও কাটে না। তখনও আশ্রয়ের আশায় অসহায়-ভাবে ঘুরে বেড়াচ্ছে বেসেলের আত্মা। বন্ধু ভিন্‌সে ও হার্টকে বোঝাবার চেষ্টা করছে, কিন্তু পারছে না। এ ছাড়া বেসেলের আশেপাশেই রয়েছে আরও অনেক আত্মা। মুখ-চোখের করুণ ভঙ্গি দেখলেই বোঝা যায়, এদের অবস্থাও বেসেলের মতো। এরা কারা?—এ প্রশ্নেরও উত্তর দিয়েছেন ওয়েলস। মনো-বিজ্ঞানী প্যাগেটের দোহাই দিয়ে বলেছেন, এরা হল পৃথিবীর উন্মাদ হয়ে-যাওয়া মানুষদের বিবেকবুদ্ধি।

অবশেষে প্যাগটের সাহায্যেই বেসেল মুক্তির পথ খুঁজে পেলেন। কেমন করে পেলেন, সে কাহিনীও অদ্ভুত রোমাঞ্চকর। প্ল্যাঞ্চেটের আয়োজন করছিলেন প্যাগেট। মিডিয়াম ছিলেন মিসেস বুলক। অনেক দূর থেকে বেসেল তা' লক্ষ্য করলেন। কিন্তু তখন বুলককে আশ্রয় করার জন্যে আরও অনেক আত্মাই ব্যাকুল। তাই দেখতে দেখতে প্রেতাত্মাদের মধ্যে হুড়ো-হুড়ি লেগে গেল। সেই ভিড়ে মিডিয়ামে ভর করবার পথ খুঁজে পেলেন না বেসেল। অগত্যা তিনি তাঁর অপহৃত দেহের সন্ধান করলেন। অনেক খোঁজাখুঁজির পর জানলেন, বেকার স্ট্রীট স্টেশনের কাছে তাঁর দেহটি পড়ে আছে। বুলককে আশ্রয় করবেন বলে মরীয়া হয়ে আবার তিনি চেষ্টা করলেন এবং এবার সাফল্যলাভ করলেন। তারপর তাঁরই দেওয়া সূত্র ধরে কেমন করে তাঁকে খুঁজে বের করা হল, সে কাহিনী আমরা আগেই জেনেছি। এখানে, গল্পের এই শেষ পর্বে জানি, দুঃখে যন্ত্রণায় কাতর হয়ে বেসেলের দেহ থেকে সেই শয়তান অশরীরীটি কেমন করে প্রস্থান করল এবং কেমন করে বেসেলের আত্মা তাঁর অপহৃত দেহটিকে খুঁজে পেয়ে তার মধ্যে প্রবেশ করল। ক্লান্ত, জীর্ণ ও ভগ্ন-দেহটিকে ফিরে পেয়ে বেসেল পৃথিবীকে নতুন করে ভাল-বেসেছেন এবং তাঁর এই ভালবাসার মধ্য দিয়ে জীবনরসিক ওয়েল্‌সকেই খুঁজে পেয়েছি আমরা।

এদিক থেকে 'দি স্টোরী অব দি ইনএক্সপিরিয়েন্সড ঘোস্ট' এক উল্লেখ-যোগ্য ব্যতিক্রম। এখানে জীবন নয়, মরণের ভূমিকাই প্রধান। গল্প হিসেবেও এটি উচ্চাঙ্গের কিছু নয়। ক্লেটন নামে এক যুবক তার কয়েকজন বন্ধুর কাছে এক ক্লাবঘরে বসে এই গল্পটি বলেছে। ক্লাবে রাত কাটিয়েছিল সে এবং এক অশরীরীর সান্নিধ্যলাভ করেছিল।

অশরীরীটি ।   লণ্ডনের এক স্কুল-শিক্ষক।

শহরের ' নপাইপের কোথাও ছিদ্র হয় একবার। স্কুল-শিক্ষক ওই ছিদ্রটি খুঁজে বের ক বেন বলে স্থির করেন। রাতের আঁধারে নামেন মাটির তলায়; এবং শেষ অবধি ওই ছিদ্রের সন্ধান করতে গিয়েই ওঁর মৃত্যু হয়। জীবনযুদ্ধে মোটেই সাফল্য অর্জন করতে পারেন নি তিনি। পরলোকে এসেও পদে পদে ব্যর্থ হয়েছেন। ক্লাববাড়িতে সাময়িকভাবে আশ্রয় নিয়েছেন: কিন্তু কেমন করে অন্তর্ধান করতে হয় সে পদ্ধতি তাঁর ভাল জানা নেই; এবং এ নিয়েই গড়ে উঠেছে এ গল্পেয় মূল সমস্যা। ক্লেটনের সঙ্গে কথোপকথনের পর অন্তর্হিত হবার চেষ্টা করেছেন তিনি। কিন্তু অন্তর্হিত হতে গেলে অদ্ভুত যে সব অঙ্গভঙ্গি এবং বিশেষ করে হাতের যে সব মুদ্রা দরকার, তা' তিনি ঠিকভাবে অনুসরণ করতে পারছেন না। অবশেষে তাঁর বর্ণনা ও নির্দেশ অনুযায়ী ক্লেটন ওই সব ভঙ্গির অনুকরণ করে তাঁকে কীভাবে অদৃশ্য হতে সাহায্য করল, এই গল্পে তা' বলা হয়েছে।

ক্লেটন নিজেই স্বীকার করেছে যে, সে অত্যন্ত মদ্যপ অবস্থায় ছিল। অতএব তার পক্ষে রাত্রির নিভৃত পরিবেশে ক্লাব-বাড়ির এক জনমানবহীন জায়গায় এ ধরণের অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করা অস্বাভাবিক কিছু নয়। কিন্তু অস্বাভাবিক মনে হয় ক্লেটনের মৃত্যু। গল্পটি বলবার পর সে যখন অশরীরীর অন্তর্ধান করবার অঙ্গ-ভঙ্গি অনুকরণ করে তার বন্ধুদের দেখাচ্ছিল তখন হঠাৎ তার মুখচোখ ফ্যাকাশে হয়ে যাওয়া, মাথা ঝুলে পড়া এবং পরিশেষে তার মৃত্যু আমাদের কাছে অবিশ্বাস্য ও অস্বাভাবিক মনে হয়। লেখক মানববুদ্ধির অসম্পূর্ণতার দোহাই দিয়ে এবং ক্লেটনের পূর্বরাত্রির অভিজ্ঞতার সঙ্গে এর একটা যোগসূত্রের ক্ষীণ ইঙ্গিত দিয়ে এই মৃত্যুকে বিশ্বাস্য প্রতিপন্ন করবার চেন্টা করেছেন। কিন্তু পাঠকের মনে এই যুক্তি বিশেষ কোনো রেখাপাত করে না। বরং যেখানে ক্লেটনের বলা গল্পটি তার বন্ধুরা প্রায় বিশ্বাস করে ফেলবার উপক্রম করেছিল, পাঠকরা সে জায়গাটুকুতেই শুধু ভৌতিক গল্পের শিহরণ অনুভব করে।

তবে সামগ্রিকভাবে দেখলে মনে হয়, ভৌতিক গল্প হিসেবে এটি একটি অসার্থক রচনা। রচনাটির গোড়ার দিকে লেখক যখন হাল্কা সুরে ক্লেটনের অলৌকিক অভিজ্ঞতার কথা বলেন, পাঠকরা তখন গম্ভীর হয়; আর শেষদিকে ক্লেটনের মৃত্যুর গুরুগম্ভীর প্রসঙ্গ আসে যখন, পাঠকরা তখন হাল্কা চালে অবিশ্বাসের হাসি হাসে।

কোনো কোনো গল্পের এই ধরণের দোষত্রুটি সত্ত্বেও ভৌতিক গল্প রচনায় ওয়েল্‌স যে সিদ্ধহস্ত, একথা অকুণ্ঠিত-চিত্তে বলতে পারি আমরা। বলতে পারি, বিচিত্র সব ঘটনা-দুর্ঘটনা ও সম্ভব-অসম্ভবকে নিয়ে আশ্চর্য এক ভৌতিক জগৎ সৃষ্টি করেছেন তিনি।

চার ভূমিকায়—

'বাংলা বন্ধ'

অমৃতসন্ধান

বেদব্যাস

বিশ্বম্ভরবাবু বুড়ো হয়েছেন, কিন্তু আশ্চর্য, ভীমরতি ধরে নি এখনো। ছোকরাদের মতো উনিও ৪৮ ঘণ্টার 'বাংলা বন্ধ'কে fait accompli বলেই ধরে নিয়েছিলেন। 'এ-বাবদে অবশ্যি হুজ্জুতটা তাঁকে কিছু কম পোয়াতে হয় নি। ধাক্কাটা গুঁতোটাও ভারী ওজনেই খেতে হয়েছে। কিন্তু তা সত্ত্বেও থলে ভর্তি করে যখন বাজার থেকে বেরিয়ে সিগারেট-টিতে টান দিলেন, তখন স্বস্তি আর শান্তিতে চোখ দুটো তাঁর বুজে গিয়েছিল।

পাঁউরুটির দোকানে গিয়ে কেন যেন সতীশবাবুর কথা মনে পড়ে গেল বিশ্বম্ভরবাবুর। মাসের শেষ, পাঁচটি টাকা চেয়েছিলেন বিশ্বম্ভরবাবুর কাছে, দুদিনের বাজারটা সেরে রাখবেন। পাঁচ দেন নি, দুই দিয়েছিলেন বিশ্বম্ভরবাবু। আরো দুটো টাকা দিতে পারতেন, কি জানি বলা যায় নাকি, দুদিনের জের ক'দিনে মেটে শেষ পর্যন্ত।

—আপনারা পারেন মশাই, দুদিন কেন, দশ দিন হরতাল হলেই বা আপনাদের কী, হাজার হোক, মাস-মাইনের বাবু আপনারা......বিশ্বম্ভরবাবুর স্ফীতোদর থলেটা দেখে বসন্ত দত্ত একটা বহুল প্রচারিত পোস্টার মুখস্থ বলে যাচ্ছিল...

কপাল ভাঙলো আমাদেরই...দেখুন না দেড় কিলো আলু আর পাঁচ শো চ্যাঁড়শ...মুদিখানা থেকে মুসুর ডাল কিলোটাক আর পোস্ত না নিলে খাবো কী? শিয়ালদায় গামছা বিক্রি করে বসন্ত দত্ত, দিন আনে দিন খায় বৌ-ছেলে-পুলে নিয়ে। সারা দিনে দু-তিনটে টাকা লাভ থাকে কি থাকে না, খদ্দেররা যা সেয়ানা হচ্ছে আজকাল—

—ও বাবা, এই রাত এগারোটায় তোর বাদাম কে খাবে রে ছোঁড়া—লোক্যাল ট্রেনে ভদ্রলোক বলেই ফেললেন। কিন্তু যাত্রী ভদ্রলোকের দুশ্চিন্তা হলেও ছেলেটির মুখে বিরক্তির ছাপ নেই কোন, বরং ফুর্তিতে ফেটে পড়ছে যেন। নিয়ে যান ...দুদিন পাবেন না বাবু...বাংলা বন্ধ্ বাদাম বন্ধ...বোঝা গেল দুদিনের রোজগার ও একদিনেই সেরে ফেলতে চায়।

মনীষাও বোধ হয় দুদিনের দেখা দুঘণ্টা ধরে দেখে নিতে চাইছিল। প্রশান্ত ভুলে গিয়েছিল, মনীষাই মনে করিয়ে দিয়েছিল ঃ কাল-পরশু তো আসছো না, আজ আর একটু বসে যাও।

দশ দিন ধরে হাসপাতালে পড়ে থাকলে কী হয়, খবর রাখে সব, মনীষা পাশের বেডের পেশেন্টের কাছ থেকে রোজ খবরের কাগজটি চেয়ে নিয়ে পড়ে যে। সারা দিন তো চরকিবাজীর মতো সংসারের কাজ নেই, খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে তাই গিলে খায় কাগজখানা। প্রশান্ত কিছু বলার আগেই মনীষা আবার বলে... বেরিয়ো না যেন দুদিন...না, অফিসও যেতে হবে না...কাটুকগে মাইনে...শেষ কালে চাকরী রাখতে গিয়ে কিছু হয়ে যাক আর কি, পুলিশ কি আর দেখে-শুনে গুলী ছোঁড়ে বাপু......

আরে এ কি! বাহবা বা বা যাত্রা নয়তো অপেরা পার্টি নির্ঘাৎ... অতো হ্যাজাক দিয়েছে...কৈ, জানতাম না তো...গিন্নীকে নিয়ে আসতে হবে......অনেক দিন থেকে বায়োস্কোপের কথা বলছে বেচারী যাক, বন্ধ-এর দুদিন ভালোই কাটবে...কাছে গিয়ে গৌরবাবু দেখলেন যাত্রা নয়, স্থিতি...রেশন নিচ্ছে লোকে লাইন দিয়ে। দোকানদার পাপের ভাগী হতে নারাজ...দুদিন বন্ধ থাকবে...দোকানে জিনিস থাকতে না খেতে পেয়ে মরবে লোকে...তাই রাত এগারোটা অবধি হ্যাজাক জেলে রেশন দেবার ব্যবস্থা।

তর্ক জুড়ে দিয়েছিলেন সন্তোষবাবু। তাঁর মতে ৪৮ ঘণ্টা হরতাল কিছুতেই সফল হতে পারে না। কিন্তু প্রাতর্ভ্রমণে তাঁরই সঙ্গী ভুবন দেবশর্মা এ ব্যাপারে একেবারে নিঃসংশয়, নিরুদ্বিগ্ন। উনি বলছিলেন ঃ আরে ঘোষ, আজকাল যে-কেউ একবার হাঁক দিলেই হলো, দেখবেন সব ঝাঁপ বন্ধ, সব আপিসে তালা ঝুলছে। এ তো তবু সব বামপন্থী দল মিলে হরতাল ডেকেছে।...কেন আটচল্লিশ নয় ঘোষ...যে পেন্সন তুমি পাচ্ছো তাতে আটাত্তর হলেও ক্ষতি ছিল না...কত লেখালেখিই তো করলে, বাড়লো কিছু তোমার পেন্সন...

—হ্যাঁ, সারাজীবন গাভমেন্টের গোলামী করেই গেলাম, বিদেশী-স্বদেশী—দুটো সরকারই দেখলাম-রায়, ও একই, তফাৎ শুধু ওপরের চামড়াটুকুর—

কিন্তু সরকার যে বলছে, ৪৮ ঘণ্টা বন্ধ হতে দেবেন না...ট্রাম-বাস চালাবেন ...ট্রেন চালাবেন...অফিস খোলাবেন...তিন মাইলের মধ্যে যাদের বাড়ি—সন্দেহ দূর হয় না ঘোষের।

—আরে রেখে দাও...গাভমেন্ট অমনি বলে...মানে বলতে হয়, নইলে তার ইজ্জত থাকে কী করে...গাভমেন্ট মেশিনারী ফেল করেছে, এটা প্রমাণ হয়ে যায় যে...

কিন্তু আর পাঁচজনের যেমন-তেমন, সামন্তবাবুর দেখা গেল সরকারের ওপর আস্থা অটুট। অন্যান্য দিনের মতো সেদিনও তিনি খেয়ে-দেয়ে পানের ডিবেটি নিয়ে শ্যামবাজারের দিকে ছুটলেন, সরকার বাসের ব্যবস্থা নিশ্চয়ই করবেন। কিন্তু গিয়ে দেখলেন কী সেখানে? বিড়ির দোকানটি ইস্তক বন্ধ...পাঁচ রাস্তার মোড়ে যেন হাজার লোকের মেলা... অফিসযাত্রী মনে হলো না কাউকে দেখে ...যেন শীতের দিনে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে রোদ পোয়াচ্ছে...সামন্তবাবুর মনে এবার সত্যি সন্দেহ দেখা দিল, দেশে সরকার আছে কিনা...

—মাপ করবেন দাদা, দোকান খুলতে পারবো না...সিক্যুরিটি কোথায়? প্রোটেকশন দেবেন আপনারা? শোভাবাজারে অমনি জোর করে একটা ফলের দোকান খুলিয়ে সব লুঠ করে নিয়েছে...তার পরেও?...চায়ের দোকানের মালিক হাত-জোড় করে বলে।

স্থানীয় কাউন্সিলরের নেতৃত্বে মিছিল এগিয়ে আসছিল একটা...সরে পড়াই ভালো......ভাবলেন রমণীবাবু......লালার দোকানে এসে দুমদাম ঘা লাগাতে লাগলো কাউন্সিলরের দলটি...পাড়ার বৃদ্ধ মাস্টারমশাই বলছিলেন...থাক না, ও নিজে যদি নিরাপদ মনে না করে ওকে জোর করে...

কাউন্সিলর বলছিলেন ঃ সে নিরাপত্তাই তো দিতে এসেছি আমরা......

—বাবু ম্যাঁয় হরতালী হুঁ...ভেতর থেকে সীতারামের গলা শোনা গেল... আর সঙ্গে সঙ্গে যেন দোকানের ওপর টর্নেডো বয়ে গেল...মাস্টারমশাই আবার বললেন...দেখো নরেশ, তোমাকে কিন্তু দায়িত্ব নিতে হবে লুঠপাট হলে...

—আমিই কি এটা চাই মাস্টারমশাই, কিন্তু করবোটা কি, ওপরের নির্দেশ রয়েছে...নমিনেশন পাবো না যে নইলে—

সকালের সুখবরটা রথীন একটু দেরিতেই পেয়েছিল। তবুও আশায় ভর করে রথীন গেল হাতীবাগান বিমল দাসকে নিয়ে। ওরে বাবা, এ যে ব্রাহ্মমুহূর্ত... জনতা-পুলিশ দু দলই প্রস্তুত...মজা

লাগছিল ওর পুলিশের হাতে ঢালগুলি দেখে...ছেলের জন্যে একটা কিনে নিয়ে যাবে ঠিক করে ফেললো ও।...লঙ্কাকান্ড বাধতে দেরি নেই বুঝে বিমল দাস এ্যাবাউট টার্ন করছিল, কিন্তু রথীনই আবার টেনে নিয়ে চলতে লাগলো...আরে ৫' না, সকালে অর্জুন ঘোষ ফ্রী দই-মিষ্টি বিলিয়েছে সবাইকে......

অর্জুনের সায় ছিল না, আগের দিন একটা বড় গাড়িতে কয়েকজন বাবু এসে বিস্তর বোঝাতে চেষ্টা করলে সে বলেছিল ঃ রাজা-উজির তো স্যর আমার দোকানে রোজ আসবে না কো ...যারা আমার রোজকার খদ্দের তারা সকলে বলছে হরতাল...কাজেই ও আমি দুদিন বন্ধই রাখবো...আর ছানা নিলেন, দুধ নিলেন...এখন আমার দইয়ের ভক্ত সাজলে হবেটা কি...

—আরে শোনো শোনো ঘোষের পো ...বলে নেতাটি অর্জুনের কানে কানে কী যেন বলে দিলেন...সে-মন্তর শোনা না গেলেও অর্জুনের মুখ চোখ চিক্ চিক্ করতে দেখা গেল...এ্যাঁ, ফটো...এডভেটাইজ...

রথীন-বিমল শুধু বাইরে থেকে কাঁচের ঘরে রাখা খাবারগুলো দেখেই ঘন ঘন ঢোক গিললো...বিনিপয়সার ভোজ তো হলোই না, কনসেশনের আশাও গেল—পুলিশ ভেতরে ঢুকতে দেয় নি ওদের।

'মার, মার শালাকে'...একটা লোক প্রায় ক্ষেপে উঠলো...বিড়ির দোকানে প্রচুর লোকের জমায়েত...দোকান বন্ধ, কিন্তু রেডিও বাজছে...লোকটা রেডিও বন্ধ করার পক্ষপাতী...সব শালা মিথ্যে কথা...ঢিল মেরে ও রেডিও ভেঙে দেবে... গতিক সুবিধের নয় বুঝে দোকানীও তাড়াতাড়ি বন্ধ করে দিতে যাচ্ছিল...

একজন উৎসাহী শ্রোতা বলছিল...মশাই, প্রত্যেকেরই বলবার অধিকার আছে, এটাই ডেমোক্র্যাসি...

—রেখে দিন মশাই আপনার ডেমোক্র্যাসি...ডেমোক্র্যাসি মানে মিথ্যে কথা বলার অধিকার নয়...সারা কলকাতা ঘুরে এলাম, নিজের চোখে সব দেখলাম, এখন আমার শুনতে হবে দোকান-পাট বাজার সব খোলা, গাড়ি-ঘোড়া চলছে...অফিসে হাজিরা...মশাই আমার মেজ শালা ওই মিলে কাজ করে...লক আউট হয়ে আছে আজ তিন মাস ধরে...আর আজ আমায় শুনতে হবে যে ওখানে জোর মেশিন চলছে...হৈ হৈ করে শ্রমিকেরা সব কাজ করছে...ও সব গল্প করবেন ইয়েদের কাছে ...বলে একটা প্রকাশ-অযোগ্য কথা বললেন ভদ্রলোক।

— মা, বলো না, আজকেও 'বাংলা বন্ধ' নাকি—বুলবুল নাকী সুরে ওর মাকে জিজ্ঞেস করছিল, হাতে ওর ফার্স্ট বুক জাতীয় একখানা বই।

—হ্যাঁ, বন্ধ্ই তো...নে তুই পড়ে নি গে যা, তুলতুলদের বাড়ি যেতে হবে এখুনি...

—না, মা, কাল তো 'বাংলা বন্ধ্' গিয়েছে, আজ ইংরিজি আর অঙ্ক বন্ধ, এ্যাঁ?

—ও মেয়ে, তোমার বুঝি ইংরিজি ফাঁকি দেবার মতলব—এই দ্যাখো, তোমার মেয়ের নাকি আজ 'ইংরিজি-অঙ্ক বন্ধ্'—

কাগজগুলোর ওপর চোখ বুলিয়ে নিচ্ছিলাম, এখুনি আবার দেবুরা আসবে তাসের আড্ডায় টেনে নিয়ে যেতে, দুদিনের ছুটি নইলে ওরা কাটাবে কী করে? শ্রীমতী দেখলাম একটা চুবড়িতে একগাদা আনাজ নিয়ে চললো। কী ব্যাপার?

—আর বলো কেন? ফিসফিস করে শ্রীমতী বলেছিলোঃ দোতলার বিষ্টুবাবু বিশ্বাসই করেন নি যে ৪৮ ঘণ্টার হরতাল সাকসেসফুল হবে, তাই বাজার করেন নি ভদ্দরলোক, তা কাল তো যেমন-তেমন করে কাটিয়ে দিয়েছেন, আজ সকালে তুলতুলের মা এসে...

—ওমা, কাঁচকলা দিলে না? বলে বুলবুলই এক জোড়া কাঁচকলা চুবড়ির ওপর নৈবেদ্যের চূড়োর মত সাজিয়ে দিলো...দুটো ডিমও নিয়ে যাবার কথা বললাম আমি।

সমন আসতে দেরি হলো না, গিয়ে দেখি জম-জমাট। চারপ্রস্থ বসে গিয়েছে মাইতির বৈঠকখানায়। আরে আসুন, প্রেসম্যান আসুন...আপনার তো বেরুতেই হবে...তা অফিসের গাড়ি এলে আমরাই কি অফিস কামাই করি—

—আপনি আর বলবেন না ননীবাবু, ১৩ই তারিখ ট্রাম-বাস সবই ছিল, গিয়েছিলেন আপনি...

—এ কি, সিংগলটন হার্টস নিয়ে আপনি গেম ইন্ নো ট্রাম্পস্ ডেকেছিলেন...উঠুন...উঠে পড়ুন...আসুন, বেদব্যাসবাবু আসুন তো দাদা—কোণের দল থেকে ডাক দিলেন শৈলেশবাবু।

যাঁরা ভেবেছিলেন সন্ধ্যার দিকে শহর কলকাতা গায়ে কাদারঙ মাখবে, তাঁদের হতাশ হতে হয়েছে, ঘটনা বলতে যা বোঝায় তেমন কিছুই ঘটে নি। এতে অবশ্য জগদীশবাবুর আপশোষের সীমা নেই, কিছু হলে শনিবার অবধি ছুটিটা টেনে নিয়ে যেতে পারতো। তা তো হলো না, বাংলা দেশের যুবকেরা আর যেন সে-রকমটি নেই, উস্কালেও যখন এরা মুচকি মুচকি হাসে তখন কি আর এদের মধ্যে কোন পদার্থ আছে?

সন্ধ্যার সময় অফিস থেকে ফিরে মোড়ে জমতে হয়েছিল খানিকটা, লেটেস্ট খবর জানবার জন্যে সকলেই উদগ্রীব দোকানটা আছে এখনো...উঃ, হোপলেস্ ইয়ুথস অফ বেঙ্গল, ফাই আপন ইউ... জগদীশই রাগে দাঁত কিড়মিড় করতে থাকে...কাল আবার অফিস ছোটো এখন...

চলুন, চলুন সোমনাথবাবুদের রোয়াকে, বাংলা খবরটা শোনা যাক—

খবর পড়া সবে আরম্ভ হয়েছিল, এমন সময় রিণ্টু কোথা থেকে ছুটে এসে বললোঃ বন্ধ করুন রেডিও, প্লীজ, খবর আমার কাছে শুনুন, বলে সে রেডিওর গলা নকল করে গম্ভীর গলায় বলতে সুরু করলো। এখনকার বিশেষ খবর হলো আজ দুদিনব্যাপী ক্রিকেট খেলা শেষ হয়েছে। স্টুডিওতে রেকর্ডে গৃহীত ধারাবিবরণীটি আপনাদের পড়ে শোনাচ্ছি।

—হাউজ দ্যাট—

বিশ্ব-সাহিত্যে বসুমতীর অমর অবদান

শ্রীঅরবিন্দের

ANANDAMATH

ঋষি বঙ্কিমচন্দ্রের অমর আনন্দমঠের অমর ইংরাজী অনুবাদ

● আনন্দমঠে—স্বাধীনতার সক্রিয় সংগ্রামের পূর্বাভাষ
● আনন্দমঠে—'বন্দেমাতরম' মন্ত্রের পূত-প্রকাশ
● আনন্দমঠে—ঋষি বঙ্কিম ও ঋষি অরবিন্দের আদর্শ সমন্বয়।

আনন্দমঠের এই মহামন্ত্রের অর্ধশতাব্দীর সাধনে
ভারতের স্বাধীনতা অর্জিত

ভারতের প্রতি গৃহে এই পবিত্র গ্রন্থ শোভা পাউক

দাম—তিন টাকা

বসুমতী প্রাইভেট লিমিটেড

১৬৬, বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১২

—আউট, পণ্টু সেনের তে-কাঠি ফাঁক! সাবাস, ওয়েল ডান্, দীপক! রাজপথ ফাঁকা পেয়ে ক্রিকেট খেলা হচ্ছিল। দু'পাড়ার মধ্যে দুদিনব্যাপী ক্রিকেট ম্যাচ, পণ্টু সেনের একাদশ বনাম দীপক বোসের একাদশ। সুবিধে করতে পারে নি পণ্টু সেনের দল, তোড়জোরটাই সার কেবল। ভি-ছাপ মারা জার্সি, সার্টিন জীনের ট্রাউজার, দামী ব্যাট-প্যাড-গ্লাভস —সাজ-সরঞ্জামের ত্রুটি রাখেন নি ক্যাপ্টেন পণ্টু সেন। কিন্তু তাহলে হবে কি, অল আউট ফর ফরটি নাইন। পণ্টু সেন নিজে ডাক করে প্যাভিলিয়নে মানে ব্যানার্জীদের রোয়াকে ফিরে গিয়েছেন গজরাতে গজরাতে। আর দীপক বোসের দলের হলো ইনিংসে ভিক্টরী। এ-জয়লাভের মূলে অবশ্য বোলিং-এ দীপক বোসের হ্যাট-ট্রিক আর ব্যাটিং-এ অতীন চক্রোত্তি—নিরঞ্জন রায়ের পার্টনারশিপে সেঞ্চুরি। আর সামগ্রিকভাবে দলের নিখুঁত ফিল্ডিং তো ছিলই।

—এই দে তো একটা সিগারেট।

—মাপ করো রাজা। নিখিল প্যাকেট থেকে একটা সিগারেট তুলে নিজের ঠোঁটে গাঁথলো। তারপর পকেটে হাত দিয়ে বললো ঃ পয়সা চাস দিচ্ছি, 'কিন্তু সিগারেট চাহিয়া লজ্জা দিয়ো না', বৎস। স্টকে আর প্যাকেট তিনেক রয়েছে, এখনো ৩২ ঘণ্টা যুঝতে হবে, মনে রেখো।

বুদ্ধদেববাবুদের বৈঠকখানায় গানের আসর বসেছে। ভাটিয়ালীর টান শুনে আনচান করে উঠলো প্রাণ আমার...... পায়ে পায়ে এগিয়ে গেলাম। বেশ লোক হয়েছে...মেয়েরাও...ওয়ার্কিং গার্লসই হবে সাজগোজ দেখে তাই মনে হচ্ছিল...কমলবাবু সাগ্রহে তাঁর পাশে বসতে দিলেন...ভালো ধ্রুপদ গাইতে পারেন কমল সরকার... কিছুক্ষণ না যেতেই দেখলাম সকলেরই দৃষ্টি নিবদ্ধ একজনের ওপর...গায়ক সে নয়, বাটিকের শাড়ি-পরা একটা উজ্জ্বল সুন্দর তরুণীর দিকে...চিনি বলে মনে হলো না, কিন্তু ভারী মিষ্টি চেহারা—মনে হলো, হরতালের নীট লাভ ও-ই। অশোক তখন গাইছে...

আমার ছুটি ফুরিয়ে গেছে,
কখন অন্যমনে—

বেচারা!

* * *

—মশাই, আপনি তো দেখছি আমার লাইফটা হেল্ করে দিলেন।! একটা ছোঁড়ার কান ধরে হিড় হিড় ক'রে টেনে নিয়ে যাবার ছবি ছেপে ভাবছেন খুব কীর্তি করলেন আপনারা। আরে মশাই, পুলিশটি কে জানেন? আমারই শালা, দূর সম্পর্কের হলেও বৌ তো এখন আমায় ছিঁড়ে খাচ্ছে...ছেলে বলছে মামা ওর পাবলিক এনিমি হয়ে গিয়েছে

ইউ বি আই-তে

আপনার সঞ্চয়

বহুগুণ হয়

আমাদের রেকারিং ডিপোজিট স্কীমে

নিম্নলিখিত টাকা মাসে মাসে জমা রাখলে	আপনি পাবেন ৪৫ মাস পরে	আপনি পাবেন ৬০ মাস পরে	আপনি পাবেন ৮০ মাস পরে
টা. ৫	টা. ২৫২.৫০ প.	টা. ৩৫৫	টা. ৫০০
টা. ১০	টা. ৫০৫.০০ প.	টা. ৭১০	টা. ১,০০০
টা. ২৫	টা. ১,২৬২.৫০ প.	টা. ১,৭৭৫	টা. ২,৫০০

বিশদ বিবরণের জন্য স্থানীয় অফিসে খোঁজ নিন

ইউনাইটেড ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়া লিঃ

রেজিষ্টার্ড অফিস ঃ ৪, ক্লাইভ ঘাট ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১

পশ্চিমবঙ্গে ৮০টিরও অধিক শাখা আছে

আমরা সেবার সাথে দিই আরও কিছু

লিফট

ত্রিশঙ্কু

শ্বেত কপোতীর "মেইনটেইনেন্স" রাজা-মহারাজাদের পক্ষেই সম্ভব।

লণ্ডনের মেয়ে ডরোথিকে নিয়ে কলকাতা এসে ঘর বাঁধবার কয়েক মাসের মধ্যেই এই প্রকট সত্যটাকে বুঝতে পারলেন নবীন ইঞ্জিনীয়ার অরিন্দম স্যানিয়াল। হাজার টাকা মাইনে পাওয়া ইঞ্জিনীয়ারের দামটা বুঝি ডরোথির ছোঁয়ায় অনেক বেড়ে গেল। উচ্চমার্গে বিচরণকারী পয়লা নম্বরের এ্যারিস্টো-ক্রাটসদের অতি বিখ্যাত ক্লাব "এ্যাডামস্ এ্যান্ড ইভস্"। ওখানকার মেম্বারশিপ দুর্লভ। ওয়েটিং লিস্টে সারিবন্ধ হয়ে সাজানো আছে একটি নামের মস্তবড় "কিউ"। এ্যাডামস্ এ্যান্ড ইভসের মেম্বারশিপ হাজার টাকা তলবপ্রাপ্ত ইঞ্জি-নীয়ার অরিন্দম স্যানিয়াল চান নি—তবুও মিসেস ডরোথি স্যানিয়ালের স্পর্শে সেই ক্লাবের প্রবেশপথটা খুলে গেল। স্বামীকে বগলদাবা করে নিয়ে ডরোথি নিজেই এ্যাডামস্ এ্যান্ড ইভসের আসরে জায়গা করে নিলো।

লণ্ডনের মেয়ে ডরোথি। একেবারে নির্ভেজাল শ্বেতাঙ্গিনী। হোমের সাহেবরা অনেককাল এই দেশে রাজত্ব করে গেছেন। জাল, জুয়াচুরি আর যাদু-বিদ্যার অনেক খেলাই প্রদর্শন করে ইংরেজের ভারত শাসনের ইতিহাসটাকে দৈর্ঘ্যে, প্রস্থে আর ওজনেও ভারী করে গেছেন। গোলাবারুদ নিয়ে অনেক হিম্মৎ দেখিয়েছেন—সিভ্যালরি দেখিয়ে কেউ কেউ ইতিহাসখ্যাত নায়কও হয়েছেন। শোষণ যন্ত্রটাকে কায়েম রেখে অনেক "সেলাম"ও আদায় করেছেন সাহেবরা। শেষ পর্যন্ত অবশ্য চলে গেছেন হোমে। পদচিহ্নের স্মৃতি হিসেবে রেখে গেছেন দগদগে বিষাক্ত কতকগুলি ঘা। আর রেখে গেছেন একদল "কালা সাহেব"। ওদের প্রতিনিধিত্ব করছেন "কালা সাহেব"রাই। রাজযোটকের মতই ওদের বন্ধন আর মিতালী। অতএব রাজার দেশের মেয়ে সুন্দরী ডরোথির দাম কালা সাহেবদের কাছে অনেক। সেই দামটাই পেয়ে গেলেন ডরোথির স্বামী ইঞ্জিনীয়ার অরিন্দম স্যানিয়াল।

কিন্তু উচ্চমার্গে ধাবমান এ্যারিস্টো-ক্রাটস্ মহারথীদের সঙ্গে চলতে গিয়ে প্রতি পদক্ষেপেই হোঁচট্ খেয়ে চলতে হচ্ছে অরিন্দমকে। রং, ঢং আর ঠাট বজায় রাখতে গিয়ে যন্ত্রণাটা অরিন্দমের ক্রমেই বেড়ে গেল। আর ডরোথির বেড়ে গেল "ডাঁট"। অরিন্দমের মাসকাবারি মাত্র হাজার টাকা। কিন্তু সে টাকাতে ডার্লিং ডরোথির চলে না। ডেফিসিট্‌টা অরিন্দমকেই ম্যানেজ করতে হচ্ছে। সেটা করতে গিয়ে প্রতি মাসেই কর্জ করতে হয়। লোন এ্যাকাউন্ট বেড়েই চলেছে। মাঝে মাঝে পরিশোধ না করলে চলবে কেন?

ডার্লিংকে বুকের কাছে টেনে নিয়ে অরিন্দম নিজের অসুবিধের কথাটা বলেও ফেললেন : "তুমি তো সবই জানো। চন্দ সাহেবের কাছ থেকে অনেক টাকাই লোন করেছি। এবার মাইনে পেয়ে ওকে কিছু দেব—লজ্জা করে আমার। এবার পুরো টাকা তোমাকে দিতে পারব না। একটু কষ্ট করে এই মাসটা চালিয়ে নিও ডার্লিং"—স্ত্রীর চিবুকখানা ধরে আদরও করলেন মিস্টার স্যানিয়াল।

মা মনসার বরপুত্রীর মতই একেবারে ফোঁস্ করে উঠলো ডরোথি। স্বামীর আলিঙ্গন আর আদরটুকুও সহ্য হ'ল না। লাল টুকটুকে ঠোঁট দু'খানা বাঁকা হয়ে গেল। চোখে-মুখে নেমে এলো বিরক্তির ছায়া আর কণ্ঠে বিদ্রূপ : "লুক হিয়ার অরিন্দম, আই ওন্ট লাইক টু সি ইওর এ্যাকাউন্টস, দ্যাট ইজ ইওর বিজিনেস, নট মাইন—চন্দ সাহেবের লোন পরিশোধ কিভাবে করবে সেটা তুমিই জান। আই ক্যান্ট হেল্প ইউ ইন দ্যাট রেসপেক্ট—আই অ্যাম নট ইওর নেটিভ ওয়াইফ—তোমার দুঃখের কথা আমাকে বলতে তোমার লজ্জা করে না? তোমার জন্য দুশো টাকা বরাদ্দ করে দিয়েছি। আর আটশো টাকা আমার চাই। এর পরও যে ডেফি-সিট পড়বে সেটাও তোমাকে ব্যবস্থা করতে হবে—হোয়েদার ইউ বেগ অর বরো, আই ওন্ট এনকোয়ার এ্যাবাউট দ্যাট—এসব কথা বলে আমার মেজাজ আর মুড্ নষ্ট করে দিও না"—রাণীর দেশের মেয়ের মুখে স্বামী অরিন্দম শুনতে পেলেন সারমনের মতই কতকগুলি কথা।

গলাটা শুকিয়ে কাঠ হয়ে গেল। মুখখানাও পাংশুবর্ণ ধারণ করলো। থুতুটা গিলে গলটা ভিজিয়ে নিয়ে আর একটা যুক্তিও প্রদর্শন করলেন ইঞ্জিনীয়ার অরিন্দম স্যানিয়াল : "বাট ইউ নো ডার্লিং, লোন এ্যামাউন্ট এ্যারেঞ্জড্ বাই মি ওয়াজ স্পেন্ট বাই ইউ ইন ফুল, সো ইউ শুড এ্যাকোমোডেট......" প্রার্থনাটা পুরোপুরি পেশ করতে পারেন নি অরিন্দম।

"আই টেল ইউ, প্লিজ্ স্টপ নাউ, ইউ মাস্ট ডিসচার্জ ইওর ডিউটিজ টু ইওর ম্যারেড ওয়াইফ"—ধমক দিয়ে কর্তব্যের কথাটাই শুনিয়ে দিলো রাণী-সাহেবা ডরোথি।

অতএব ঋণের বোঝাটা হ'লো ভারী। পরিশোধ করে বোঝাটাকে একটুও হাল্কা করতে পারেন নি। অরিন্দম কর্জ চাইলেই চন্দ সাহেব দরাজ হাতেই টাকাটা দিয়েছেন। পরিশোধ না করেই কর্জ নিয়েছেন আবার—মুক্তহস্তে চন্দ সাহেবও দিয়েছেন। এক পাইও পরিশোধ করেন নি অরিন্দম। মুখোমুখি দেখা হলেই লজ্জায় মুখটা ঘুরিয়ে নিয়েছেন। চন্দ সাহেব একদিন শুধু টাকার কথাটা স্মরণ করিয়ে দিয়ে বললেন : "রিয়্যালি আই ফিল ফর ইউ অরিন্দম, নেভার মাইণ্ড—একসঙ্গে দিতে অসুবিধে তোমার হবে, বাই ইনস্টলমেণ্টস না দিয়ে দিও।"

ডরোথির স্বামী হয়েও সেদিন অরিন্দম লজ্জা পেয়েছিলেন খুব বেশি। লজ্জা পেলেও আংশিক কর্জও শোধ করতে পারেন নি। তারপরও কেটে গেল কয়েকটা মাস। অরিন্দমের মনে হ'লো টাকার কথাটা ভুলে গেছেন চন্দ সাহেব। মুখোমুখি দেখা হলে নিজেই অরিন্দমের হাতখানা টেনে নেবেন, হেসে হেসে কথাও বলেন। এমন কি ড্রিংকও অফার করেছেন—পাওনাদার হয়ে দেনাদারকে বুঝি ইজ্জতটাও দিয়েছেন। আকস্মিক চন্দ সাহেবের এই রংয়ের পরিবর্তনের হিসেবটা মেলাতে পারেন নি নবীন ইঞ্জিনীয়ার অরিন্দম স্যানিয়াল।

সন্ধ্যার আগেই নীয়ন লাইটগুলো জ্বলে ওঠে দপ্ দপ্ করে। জমে ওঠে "এ্যাডামস্ এ্যান্ড ইভস্"। দামী দামী গাড়িতে আসেন এ্যাডামস্‌রা—সাথে থাকেন কণ্ঠলগ্না, বাহুবন্ধনে আবদ্ধা অথবা বক্ষলগ্না ইভস্‌রা।

আসেন যুগল পারাবতের মতই আদম আর ইভের প্রতিনিধিরা। ভাড়া করা বেহালাবাদক ছড়ায় দেয় টান—থেকে থেকে বেজে ওঠে ব্যাঞ্জো। মুখোমুখি বসে পানাহারে প্রমত্ত হয়ে ওঠেন সবাই। ওঁদের মধ্যে হাজার টাকা মাইনেপ্রাপ্ত ইঞ্জিনিয়ার অরিন্দম স্যানিয়াল বড়ই বেমানান—এটা তিনিও বোঝেন। তবুও ওঁকে আসতে হবে। সঙ্গে থাকে ডার্লিং ডরোথি। অরিন্দম জানেন ওঁর চেয়ে ডরোথির দামটাই এখানে বেশি। সোসাইটির "কেষ্টো-বিষ্টু"-দের মধ্যে নামগোত্রহীন একটি নগণ্য মানুষের মতই হারিয়ে যায় বিলেত ফেরৎ ইঞ্জিনীয়ার অরিন্দম স্যানিয়াল। তবুও অরিন্দম না এসে পারেন না—আসেন ডরোথির জন্যই। ক্লাবে এসে না বসলে ডরোথির মনের মিটারের নাগালও অরিন্দম পাবেন না। প্রিয়তমা ডরোথিকে একা ছেড়ে দিতেও ভয় পান তিনি। ভয় আর ভীতিটা সঙ্গে থাকলেও কমে না।

অরিন্দমের চোখটা একদিন ঠিকরে পড়লো চন্দ সাহেবের উপর। চন্দ সাহেবের দৃষ্টিতে দেখেছিলেন নতুন রং—আর ডরোথির বুকে বুঝি নেমে এসেছিলো নব বসন্তের গান। নতুন প্রাণের চঞ্চল আবেগে একেবারে প্রমত্ত হয়ে উঠেছিল ডরোথি। মুখোমুখি বসেছিলেন চন্দ সাহেব আর ডরোথি। পরস্পরের স্বাস্থ্য পান করে চলেছেন ওঁরা। খিল খিল করে হাসছে নীলনয়নী ডরোথি।—বুঝি জলতরঙ্গ বেজেই চলেছে। দুজনের চোখে-মুখেই দেখেছিলেন নবরসের আধিক্যের উন্মাদনা।

রংয়ের সঙ্গে রং মিলিয়ে দিলেন চন্দ সাহেব আর ডরোথি। রংটা গাঢ় থেকে গাঢ়তর হ'লো। চন্দ সাহেব আর ডরোথির বন্ধুত্বটা গেল বেড়ে। দেনা-পাওনার হিসেবটাও বুঝি ক্লোজ-আপ করে দিয়েছেন, অ্যারিস্টোক্রাট কুলতিলক মিস্টার বিনায়ক চন্দ। ডেফিসিটের টাকাটা অরিন্দমকে জোগাড় করতেও হয় না।

স্বামীকে ছাড়াই ডরোথিকে অ্যাটেণ্ড করতে হয় কত পার্টি—কত 'বুফে' আর 'বল'-এর স্পেশাল ইনভিটেশন—বড় বড় মহারথীদের ফোন আসে ভেসে, কত রং-বেরংয়ের কার্ডও আসে। কার্ডের উপরে সোনালী অক্ষরের লেখাগুলো পড়তে পড়তে বুকের মধ্যে কিসের যেন একটা ঈর্ষাকাতর যন্ত্রণা অনুভব করেন হিগিন-বোথামস কোম্পানীর ইঞ্জিনীয়ার মিস্টার অরিন্দম স্যানিয়াল। ডরোথির স্বামী স্যানিয়ালকে কোম্পানীর ডেপুটি ম্যানেজার মিস্টার ড্যাডলি বোথাম খাতির করে কথা বলেন। ঐ খাতিরটুকুই প্রাপ্তিযোগে জমা করে যাচ্ছেন।

মুখর হয়ে উঠছে। আর অরিন্দম হয়ে যাচ্ছেন মূক-বধির। সেই মূক-বধিরতার যন্ত্রণাও মাঝে মাঝে চরমে উঠে যায়। সেদিন ক্লাবে আর যায় নি—অফিস থেকে বাড়িতে ফিরে এসে ডরোথিকেও পায় নি। আগেই বেরিয়ে গেছে বিবি সাহেবা। স্বামীর কাছে অবশ্য একটা ফোন করেছে ডরোথি।

"ডয়ার! আই র‍্যাংগ ইউ টুআইস ইন ইওর অফিস, ইউ ওয়েয়ার রিয়েলি সো বিজি, আই কুড নট কনটাক্ট ইউ—লক্ষ্মীটি তোমার জন্য ওয়েট করতে পারলুম না। একটি বিশেষ ডিনারে আমাকে যেতেই হবে। ডিনারের আমন্ত্রণ কি ফিরিয়ে দিতে পারি? বিগ মেন-রা সব আসবেন—চন্দ সাহেবের বান্ধবী বলেই বিশেষভাবে আমাকে যেতে বলেছেন মিস্টার বোথাম। ইয়েস্! ইয়েস দ্যাট বোথাম দি ম্যানেজার অফ ইওর কোম্পানী। রাত একটু বেশি হলে তুমি চিন্তা কর না কিন্তু। সময় মত ডিনার খেয়ে নিও—আমি এসে সব বলবো। কেমন"—চোংটা কানে লাগিয়ে বোবার মত বসে ছিলেন স্যানিয়াল সাহেব।

"দ্যাটস রাইট ডার্লিং"—অনেক কণ্ঠেই উত্তরটা দিলেন তিনি। আবার বিভক্ত হয়ে গেলেন দুজনে। স্যানিয়াল সাহেবের ফ্লাটে নেমে এলো অখণ্ড নীরবতা। একটু আধটু ড্রিংক স্বামীকে অভ্যেস করিয়ে নিয়েছে ডরোথি—রোজই একটু-আধটু পান করে মেজাজটা সরিফ রাখার চেষ্টা তিনিও করেন। সেদিন একটা পুরো বোতল ডরোথির রিজার্ভ স্টক থেকে নামিয়ে নিলেন—পুরো বোতলটাই নিঃশেষিত করে ঢলে পড়লেন শূন্য শয্যায়। ডিনারের প্লেটগুলো সাজানোই ছিলো—বেয়ারা আর বাবুর্চি এসে সাহেবকে বার বার ডেকে গেল। কিন্তু স্যানিয়াল সাহেব সেদিন আর মাথাটা তুলতে পারেন নি।

শ্রীউপেন্দ্রচন্দ্র মল্লিক প্রণীত

অ-আ-ক-খ

মূল্য : বার আনা

শিশু মনোবিজ্ঞানে নিপুণ লেখক এই গ্রন্থে শিশুদের বর্ণবোধ ও যুক্তাক্ষরসহ বানান শিক্ষা যেরূপ অতুলনীয় ছন্দের সাহায্যে করিয়াছেন, তাহাতে শিশুদের শিক্ষারম্ভ সহজ হইয়াছে। এ সম্বন্ধে বাজারে যতগুলি বই আছে তাহার মধ্যে শীর্ষস্থানীয় বলিয়া কলিকাতা কর্পোরেশনের শিক্ষাবিভাগ এই বইখানিকে প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলিতে পাঠ্য-পুথিরূপে নির্বাচিত করিয়াছেন।

চিত্রে চিন্ময়—রঙ্গীন আর্ট পেপারে বড় হরফে ছাপা।

বসুমতী প্রাইভেট লিমিটেড
১৬৬, বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী স্ট্রীট, কলিকাতা—১২

কিসের একটা তীব্র যন্ত্রণা আঁকে-পাঁকে জড়িয়ে ধরেছিলো ওঁকে—নেশায় ডুবে সেই যন্ত্রণাটাকে বুঝি কেটে দিয়েছেন মিস্টার অরিন্দম স্যানিয়াল।

রাত বারটার পর বাড়ি ফিরে এলো ডরোথি। চন্দ সাহেবই নিজের গাড়ি করে ওকে বাড়ির দরজায় নামিয়ে দিয়ে গেলেন। সেদিন ডরোথির মন আর মেজাজ দুই ছিলো প্রাণমাতানো। মুখে ছিল চটুল হাসি। লাল টুকটুকে ঠোঁটের ফাঁকে বসানো যেন ধারালো একখানা ছুরি। চোখে বিদ্যুতের কটাক্ষ—ঢুলু ঢুলু নীল আঁখির পাতায় নেমে এসেছিল দুনিয়াকে জয় করবার দুরন্ত নেশা। এসেই পতি-প্রাণা সতীসাধ্বীর মত বেহোঁস হয়ে পড়ে-থাকা স্বামীর বুকে লুটিয়ে পড়লো।

গানের সুরেই গুনগুন করে কত কথা বলে গেল ডরোথি। অর্ধেক কথা অরিন্দমের কানে ঢুকছিলো। বাকী অর্ধেক নেশাচ্ছন্নতার জন্য বুঝতে পারেন নি। ঘরে জ্বালানো ছিল হাল্কা আলোর সবুজ বাতিটা। সেই স্বপ্নালোকেই ডরোথিকে দেখেছিলেন অরিন্দম। ঘোলাটে আর তেরছা দৃষ্টিটা দিয়েই সেদিন ডরোথির মধ্যে আবিষ্কার করেছিলেন একটা চুম্বক শক্তি। যে চুম্বকের টান অনস্বীকার্য।

গুঞ্জনধ্বনি শুনতে পাচ্ছিলেন অরিন্দম।

নিশুতি রাতের ঐ গুঞ্জনধ্বনিগুলি শুনতে শুনতে মন্ত্রমুগ্ধ হয়ে গেলেন অরিন্দম। বশীকরণী মন্ত্রের মতই কত-গুলি আধখ্যাচড়া কথা শুনতে শুনতে "বেহোঁস-প্রায়" অরিন্দম বুঁদ হয়ে গেলেন।

"মাই ডিয়ার, ডিয়ার অরিন্দম। তুমি নিশ্চয় খুব রাগ করেছো? সত্যিই রাত একটু বেশি হয়েছে। আমি কি ইচ্ছে করে দেরি করেছি ডিয়ার? সবই তোমার জন্য। অ্যাডামস অ্যান্ড ইভসের মেম্বারশিপটাকে সার্থক করে তুলতে হবে যে। হাজার টাকার সীমানাটা ছাড়িয়ে যেতে হবে। তবেই আমার স্বপ্ন হবে সার্থক। জান তো ডিয়ার, তোমাদের কোম্পানী হিগিনবোথামস-এর ক্যালকাটা ম্যানেজার মিস্টার ড্যাডলি বোথাম আমাদের চন্দ সাহেবের ঘনিষ্ঠ বন্ধু। আজকের ডিনারে ড্যাডলিও ছিলেন। ড্যাডলিও ইংলিশম্যান। আমার সঙ্গে কত কথাই হলো। চন্দ সাহেবকে দিয়েই আমি 'পুস্' করবো তোমাকে। ডেপুটি ম্যানে-জার জ্যাকসন নাকি কয়েক মাস বাদেই হোমে চলে যাচ্ছেন। ওখানেই ধাক্কা মেরে তোমাকে তুলে দেব আমি। তখনই স্কেলটা আঠারশো থেকে আরম্ভ হবে। আঠারশো থেকে আড়াই হাজার পর্যন্ত এক ধাক্কায় ল্যাডার বেয়ে উঠে যাবে তুমি। ডেপুটি হতে পারলে ম্যানেজারও হবে। একেবারে তিন হাজারের 'লিফট্'। ড্যাডলি দেখছি খুব খোসমেজাজি লোক" —ডরোথির গুঞ্জন থামলো।

অরিন্দমও নেশাকাতর হয়ে পড়েছিল। বিবিকে বুকের মধ্যে টেনে নিয়ে থাকেন অরিন্দম স্যানিয়াল। ওর মধ্যেই বুঝি খুঁজে পেয়েছিলেন "লিফট্" আর "ল্যাডার"।

কয়েকদিনের মধ্যেই বুকের যন্ত্রণাটা কমে গেল অরিন্দমের। চোখের সামনে দেখতে পাচ্ছিলেন শুধু একটা ল্যাডার। চন্দ সাহেবের দেনাটা পরিশোধ করেন নি বলে অরিন্দমের দুঃখটাও আর নেই। বরং উল্টো কথাই মনে হলো : আরও হাজার তিনেক টাকা নিলে মন্দ হত না। প্রেমটাও উবে গেছে। ঈর্ষা আর জ্বালাও নেই অরিন্দমের। ডার্লিং ডরোথি হয়ে গেল 'ল্যাডার'—দাবার ঘুঁটি—ট্রাম্ফ কার্ড —একটি শুভ গ্রহতারকা। অতএব প্রিয়তমা ডরোথিকে নিয়ে আর ভাবেন না অরিন্দম। ওর গতিবিধি নিয়ে প্রশ্নও করেন না। মাঝে মাঝে স্ত্রী ডরোথির কাছে নির্লজ্জের মত একটি প্রশ্নই করেনঃ "ডার্লিং! প্রমোশনের ব্যাপারে কতদূর এগুলে তুমি?"

স্বামীর মুখে ওরকম প্রশ্ন শুনলেই আঁতকে ওঠে ডরোথি। কেন যেন একটা যন্ত্রণাও হয়। একটা লজ্জাও ওকে চেপে ধরে। তবুও ঐ যন্ত্রণা আর লজ্জা দীর্ঘ-স্থায়ী হয় না। স্বামীকে আরও উঁচু মসনদে বসিয়ে দেবে ডরোথি। নিজেও হয়ে বসবে রংয়ের বিবি। ড্রিমল্যান্ড তৈরি করছে ডরোথি আর সেই ল্যান্ডে প্রবেশ করবেন স্যানিয়াল সাহেব। সঙ্গে থাকবে প্রিয়তমা ডরোথি স্যানিয়াল। সার্থক করে তুলবে অরিন্দমের জীবন। অসার্থক অরিন্দমকে সার্থক করে তুলবে ডরোথি।

সেই সার্থকতার পথেই এগিয়ে চলেছে মিসেস ডরোথি স্যানিয়াল। ম্যানেজার ড্যাডলির সঙ্গে পাখা মেলে উড়ে বেড়াচ্ছে ডরোথি। দিলদরিয়া ম্যানেজার ড্যাডলি বোথামের প্রথমা বিবি ঘরে এসে বছর দুয়েক ছিল। তারপর বন্ধন ছিন্ন করে "হোমে" চলে গেছে। দ্বিতীয়া নীরাকে বিয়ে করে কয়েক মাস নিজের কাছে রেখে-ছিলেন। তার পর নিজেই হোমে পাঠিয়ে দিয়েছেন। নীরার শূন্য স্থানটা মাঝে মাঝে পূর্ণ করছে অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ অফিসার ইঞ্জিনীয়ার অরিন্দমের বিবি ডরোথি স্যানিয়াল।

ডরোথি আর ড্যাডলিকে নিয়ে আকাশে বাতাসে ভেসে-আসা কত কেচ্ছাই শুনতে পায় অরিন্দম। কিন্তু কর্ণবধির অরিন্দম মূকবধির থেকে একেবারে পাথর হয়ে গেলেন। অরিন্দমের কামনা, বাসনা, স্বপ্ন, প্রেম, ভালবাসা, সব কিছু গিয়ে মিশেছে একটি বিন্দুতে। একটি "লিফট"।

লিফটে বসে হু হু করে অনেক দূরে উঠে যাবে ইঞ্জিনীয়ার অরিন্দম। হিগিন-বোথামসের ক্লাস ওয়ান অফিসার। অ্যাডামস অ্যান্ড ইভসের ক্লাস ওয়ান অ্যারিস্টোক্রাট। ক্লাস ওয়ান বাংলো অ্যান্ড?

একের স্বপ্ন অপরে বোঝে না। একের মন অপরে দেখে না।

দুজনের লক্ষ্যস্থান একই বস্তুর উপর নিবদ্ধ। লিফট।

মাসের পর মাস কেটে গেল। বছরটাও শেষ হলো।

লন্ডন অফিস থেকে সিলমোহরাঙ্কিত চিঠিটাও এসে গেল। ম্যানেজার ড্যাডলির সুপারিশের দাম অনেক। সেই সুপারিশের জোরেই এক লাফে ডবল প্রমোশন পেয়ে গেছেন অরিন্দম। বিদায়ী ডেপুটি ম্যানেজার মিস্টার জ্যাকসনের কাছ থেকে চার্জটা বুঝে নেবেন প্রমোশনপ্রাপ্ত ডেপুটি অরিন্দম স্যানিয়াল।

সার্থক হলো ডরোথির জড়িবুটি। আনন্দে উল্লসিতা ডরোথি ছুটে গিয়েছিল স্বামীর কাছে। একটা দামী সুট পরে নতুন একটা পাইপ মুখে লাগিয়ে জানালার সামনে চিত্রার্পিতের মত দাঁড়িয়েছিলেন লিফটপ্রাপ্ত ডেপুটি ম্যানেজার অরিন্দম স্যানিয়াল।

"ডিয়ার অরিন্দমের" গলাটা জড়িয়ে ধরে ঝুলে পড়লো ডরোথি।

"আঃ কি হচ্ছে? ছাড়ো আমাকে। তুমি একটা থার্ড ক্লাস ফ্লার্ট গার্ল। আমার বাবা ছিলেন ধর্মভীরু এক ব্রাহ্মণ। সে কি তুমি জান না? তুমি নর্দমা অনেক ঘাঁটিয়েছো। সহ্য আমি অনেক করেছি। আর তোমাকে সহ্য করতে পারব না আমি। বন্ধনের খেলাটাও শেষ। এবার কর্তনের পালা। এর পর মুক্ত বিহঙ্গিনীর মত ডানা মেলে উড়ে বেড়াবার জন্যই মুক্তি দেব তোমাকে।"

সজোরে একটা ধাক্কা মেরেই ফেলে দিলেন ডরোথিকে।

অরিন্দম বড় বেশি নিষ্ঠুর হতে পেরেছিলেন। ডেপুটি ম্যানেজার অরিন্দমের শক্তিটাও বেড়ে গেছে অনেক।

অরিন্দমের বুক থেকে ছিটকে পড়ে গেল ডরোথি।

লিফটের শক্তি অনস্বীকার্য। লিফট-প্রাপ্ত সিংহাসনারূঢ় ডেপুটি ম্যানেজার অরিন্দম স্যানিয়ালকে মেঝের উপর মুখ থুবড়ে পড়ে থাকা ডরোথি বুঝি চিনতেও পারছে না।

ডেপুটি সাহেবকে নিয়ে লিফটটা অনেক দূরে উঠে গেছে।

রঙ্গমঞ্চ ওদেশে এবং এদেশে

শিলালি

নাট্যমন্দিরে 'তপতী'র প্রথম অভিনয়ের তারিখ ২৫শে ডিসেম্বর ১৯২৯ সাল। এ অভিনয়ের আলোচনা শুরু করবার আগে নাটক এবং রবীন্দ্র-নাট্য সম্বন্ধে দু-একটি কথা বলা দরকার।

মানুষ একক জীবন যাপন করতে অভ্যস্ত নয়। আর পাঁচজনের সুখদুঃখ, হৃদয়াবেগ, কর্মধারা প্রভৃতি নিজের মধ্যে অনুভব করে দেখতে ভালবাসে বলেই প্রত্যেক মানুষের ভেতর অন্য মানুষের জীবনের গতি-প্রকৃতি সম্বন্ধে অবহিত হবার একটা তীব্র কৌতূহল এবং বাসনা দেখা যায়। হয়তো এই কৌতূহল পোষণের নিমিত্ত বা উপায় হিসাবেই সাহিত্যের একটা সার্বজনীন আবেদন আছে। আবার সামাজিক বিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে সাহিত্য নানারূপে—যথা মহাকাব্য, কাব্য, দৃশ্যকাব্য, উপন্যাস—রসিকজনের চিত্তবিনোদন করে থাকে।

নাট্যসাহিত্য আলোচনার আরম্ভেই একটা কথা মনে রাখা দরকার। সাহিত্যের অন্যান্য মাধ্যমের মত নাটক স্বয়ংসম্পূর্ণ শিল্প নয়। কয়েকটি উপাদানের সংমিশ্রণেই নাটক পূর্ণাঙ্গ হয়ে ওঠে। এই উপাদানগুলো হচ্ছে ঃ

(১) নাটকের সাহিত্যিক রূপ
(২) মঞ্চ, দৃশ্যপট ইত্যাদি
(৩) অভিনেতা এবং অভিনয়
(৪) দর্শক

উপাদানগুলো পরস্পরের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গিভাবে যুক্ত করতে না পারলে আসল নাটকের জন্ম হয় না। মঞ্চকে বাদ দিয়ে নাটকের সাফল্য পরিকল্পনা করা এ বিষয়ে অজ্ঞতারই পরিচায়ক। এই প্রসঙ্গে Dr. B. Ifor Evans তাঁর 'A Short History of English Drama' বইতে লিখেছেনঃ

To the creation of a play the author is only one contributor. For success Co-partnership is essential, and in it actors, producers, designers and technicians must also be constituents.

এলিজাবেথীয় ইংলণ্ডে এই সব উপাদানের একটা আদর্শ সংযোগ এবং সমন্বয় ঘটেছিল বলেই বোধ হয় সে সময় নাট্যসাহিত্য এতটা চরম উৎকর্ষ লাভ করেছিল। সে সময়ের নাট্যকার এবং পরিচালকেরা শুধু নাট্য প্রযোজনাই নয়, এমন কি অভিনয়েও অংশ গ্রহণ করতেন। সেক্সপীয়ার নিজেও অভিনেতা ছিলেন এবং মঞ্চ সম্বন্ধেও তাঁর যথেষ্ট জ্ঞান ছিল। রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধেও ঠিক এই কথাই বলা চলে। তিনি নিজে উচ্চশ্রেণীর অভিনেতা ছিলেন এবং নাট্য প্রযোজক হিসাবে আত্মপ্রকাশ করে এ বিষয়ে নিজের পারদর্শিতার পরিচয় দিয়ে গেছেন। মঞ্চপ্রয়োগ ব্যতিরেকে নাটকের সার্থকতা যে বোঝা যায় না, এ কথা জানা ছিল বলেই নিজের নাটকগুলো প্রথমে পারিবারিক সহযোগিতায় এবং পরে বিশ্ব-ভারতীর ছাত্রছাত্রীদের দ্বারা তিনি বার বার অভিনয় করিয়েছেন এবং নিজেও বহু বয়স অবধি এই সব অভিনয়ে অংশ গ্রহণ করেছেন।

মঞ্চকে বাদ দিয়ে শুধু নিছক সাহিত্য হিসাবেই নাটকের সৌন্দর্য উপভোগ করা যায়—এ ধরণের একটা সম্পূর্ণ ভ্রমাত্মক ধারণাও কারোর কারোর আছে। কয়েকজন বড় সাহিত্যিকও এই ভুলের ফলে নাট্যরচনা করতে গিয়ে সম্পূর্ণ ব্যর্থতার পরিচয় দিয়েছেন। উদাহরণ স্বরূপ মিল্টনের 'স্যামসন এ্যাগোনিস্টিস' এবং টমাস হার্ডির 'দি ডাইন্যাস্টস'-এর কথা উল্লেখ করা যেতে পারে। টমাস হার্ডির ক্ষেত্রে একটা মজার ব্যাপার ঘটেছিল। তিনি নিজের কয়েকটি উপন্যাসের নাট্যরূপ দিয়ে ওগুলি মঞ্চস্থ করান—কিন্তু কোনটিই সাফল্যলাভ করে নি। বিরক্ত হয়ে তখন হার্ডি প্রচার করতে থাকেন যে, ভবিষ্যতের নাট্য-রসিকেরা 'মেন্টাল পারফরমেন্সের' সাহায্যেই ভাল নাটকের রস উপভোগ করবেন—মঞ্চরূপায়ণের দরকারই হবে না। শুধু সমসাময়িক জীবন এবং হাল্কা ব্যাপার নিয়ে লেখা নাটকই মঞ্চস্থ হবে।

মঞ্চ সম্বন্ধে জ্ঞান ছিল না বলেই কোলরিজ, ওয়ার্ডসওয়ার্থ এবং সুইন-বার্নের লেখা নাটকগুলোও অভিনয়ের অযোগ্য বলে আখ্যালাভ করেছে। রোমান্টিক কবিদের ভেতর এক শেলীরই নাটক লেখবার হাত ছিল। তাঁর বিখ্যাত নাটক 'চেন্‌চী' এই কিছুদিন আগেও ইংলণ্ডে মঞ্চস্থ হয়েছিল যথেষ্ট সাফল্যের সঙ্গে।

বিখ্যাত ইংরাজ অভিনেতা স্যার হেনরী আরভিং তাঁর একটি বক্তৃতায় বলেছিলেন ঃ যে কোন নাটকের অভিনয় দেখে যা শেখা যায়, তার থেকে ভালভাবে পড়ে ও সম্বন্ধে অনেক বেশি জানা যায় —এ ধরণের একটা ভুল ধারণা কারোর কারোর আছে। আচ্ছা, নাট্যকারদেরই প্রশ্ন করে দেখুন না, তাঁরা কি চান? প্লে-গোয়িং পাবলিকের বদলে রিডিং পাবলিক পেলেই কি নাট্যকার বেশি খুশি হবেন? নাটক ছাপা হোক—প্রকাশিত হোক—লোকে পড়ে তাঁর নাটকের সাহিত্যিক মূল্য ইত্যাদির প্রশংসা করুক —এ সর্বদিক তো আছেই। কিন্তু নাট্যকার আরও বেশি খুশি হবেন, আরও বেশি গর্ব অনুভব করবেন, যখন নাটকটি মঞ্চ-জগতে প্রবেশাধিকার লাভ করবে এবং নাটকের চরিত্রগুলি নটের সুকৌশল অভিনয়ে জীবন্ত মানুষের সুখ-দুঃখ, ভাব, আবেগের দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে মঞ্চের ওপর প্রাণবন্ত হয়ে উঠবে। এই প্রসঙ্গে জর্জ এলিয়টের চিঠি থেকে কিছুটা তুলে দেওয়া গেল—

"In opposition to most people who love to read Shakespeare, I like to see his plays acted better than any others, his great tragedies thrill me, let them be acted how they may."

সেক্সপীয়ারের অনেক অনুরাগী পাঠকই তাঁর নাটকের মঞ্চাভিনয় দেখতে গিয়ে আবিষ্কার করবেন যে, এমন অনেক জিনিস যা আগে তিনি কল্পনাও করতে পারেন নি, নাটকের এমন অনেক জায়গা যা তাঁর কাছে খুব অস্পষ্ট বলেই মনে হোত, অভিনয়ের সময়—অভিনেতার চোখের ভাষা, জেসচার, মূকাভিনয়, স্বর-নিক্ষেপের কৃতিত্বে তা সুপরিস্ফুট হয়ে উঠছে এবং নাটকের উপর নতুন আলোক-পাত করছে।

অবশ্য এমন লোকও আছেন যাঁরা মনে করেন তাঁদের অন্তরে এমন সুরের লহরী আছে যা বেটোফেন বা মোৎসার্টের সুরসৃষ্টিতেও ধরা পড়ে নি। আবার কেউ কেউ ভাবেন যে, তাঁরা ইচ্ছা কর-লেই ছবি আঁকতে পারেন, কবিতা লিখতে পারেন, অর্থাৎ এমন কিছুই নেই যা তাঁরা নিজের ইচ্ছা হলে করতে পারেন না। এ ধরণের লোকেরা মনে করেন যে পাকা অভিনেতা তাঁর অভিজ্ঞতা এবং শিল্প-কৌশলে যেভাবে মঞ্চের উপর চরিত্রের প্রাণসঞ্চার করেন, সে ব্যাপারটাও অত্যন্ত সহজ এবং সাধারণ। কিন্তু গানের বেলাতেও যেমন সঙ্গীতবিদ্যার কলা-কৌশল জানা না থাকলে স্বরলিপিকে সঙ্গীতে রূপায়িত করা যায় না, তেমনি নাট্যশাস্ত্রের কলাকৌশল আয়ত্তে না থাকলে লিখিত নাটকের পাত্র-পাত্রীকে মঞ্চে রক্তমাংসের জীবন্ত মানুষ হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করা সম্ভব হয় না। কাজে করা, শুধু স্বপ্ন দেখা নয়, এই থেকেই

ত' জীবনে যা কিছু চরিতার্থতা আসে। নটের কাজ হচ্ছে অভিনয় করা—অভিনয়ে চরিত্রকে সত্যিকার ফুটিয়ে তোলাটা ত' খুব সহজ ব্যাপার নয়। তীক্ষ্ম মেধা-সম্পন্ন ছাত্রকে প্রশ্ন করি—'হ্যামলেট কর্তৃক ওফেলিয়ার প্রত্যাখ্যানের দৃশ্যটির সম্বন্ধে একবার ভালভাবে মনে মনে চিন্তা করে দেখুন। সমস্ত নাট্যসাহিত্যে এ ধরণের জটিল দৃশ্য আর বিশেষ দেখা যায় না। বলুন, এ দৃশ্যটি পড়ে বা চিন্তা করে-যা ধারণায় আনতে পারলেন, তার থেকে ঢের বেশি সুস্পষ্ট এবং গভীর-তর অর্থ কি ও-দৃশ্য থেকে পান না, যখন কোন ভাল অভিনেতা দৃশ্যটি অভিনয় করেন?'

উপন্যাসে কিন্তু নাটকের মত অতিরিক্ত উপাদান এবং উপকরণের সাহায্যের প্রয়োজন হয় না। সজ্জা, দৃশ্যপটাদি, স্থান-কাল-পাত্র প্রভৃতি যা কিছু নাটকে চোখের সামনে উপস্থিত করতে হয়, অতি সহজেই বর্ণনার সাহায্যে ঔপন্যাসিক সেই কাজ সুচারুভাবে সম্পন্ন করেন। মঞ্চের সঙ্গে নাটকের প্রাণের যোগ—এই কারণে সব সময়েই নাট্যকারকে কয়েকটি মঞ্চসম্বন্ধীয় নিয়মকানুন বা অনুশাসন মেনে চলতে হয়। সেই জন্যই নাটক ও মঞ্চের ভেতর একটা বাধ্য-বাধকতার সম্বন্ধ গড়ে ওঠে। উপন্যাসের বেলায় এ সব নিয়মের কথা ওঠে না। এই জন্যই উপন্যাসের আকৃতি এবং গতি অবাধ, ক্ষেত্র বিস্তৃত এবং প্রকৃতি নমনীয়। নাটকের বহিরঙ্গ—রচনাকৌশল বা প্রণালী আয়ত্ত করা খুবই কষ্টসাধ্য—কিন্তু উপন্যাসের বেলায় তা অত্যন্ত সহজ। অবশ্য যে কোন শিল্পসৃষ্টিতেই আঙ্গিকের রচনার দিকটাই যে একমাত্র দিক নয় তা বলাই বাহুল্য।

এমন কয়েকটি উপাদান আছে যেগুলো উপন্যাস এবং নাটক এই উভয় সাহিত্যেই সমানভাবে দরকার। যেমন—চরিত্র বা পাত্র-পাত্রী, তাদের কর্মধারা এবং গতি-প্রকৃতি, চরিত্রদের আশ্রয় করে কতকগুলো ঘটনার সূচনা, বিকাশ এবং পরিণতি।

চরিত্রদের নিজেদের কথাবার্তা থেকেই সংলাপের সৃষ্টি হয়। সংলাপ শুধু যে নাটকেরই অপরিহার্য অঙ্গ এবং উপন্যাসে এর তেমন প্রয়োজনীয়তা নেই—এ অতি ভুল ধারণা।

বরং আজকাল সব দেশের উপন্যাসেই সংলাপের প্রাধান্য দেখা যায়। আবার নাটকেও অনেক সময়ে বর্ণনারীতির সাহায্য-প্রয়োজন হয়। স্থান সঙ্কোচনের ব্যাপারে এই রীতি সময় সময় অপরিহার্য। যেমন 'রাজা ও রাণী' বা 'তপতী' নাটকে রাণীর কাশ্মীরী আত্মীয়বর্গের বিদ্রোহের ব্যাপারটা নাট্যকার বর্ণনার সাহায্যেই পরিস্ফুট করেছেন। অভিনয়ের সাহায্যে দেখাতে গেলে সময় লাগত বেশি এবং সেই সঙ্গে নাটকের আসল ব্যাপারে মনঃসংযোগের ব্যাঘাত ঘটত।

নাটকের কাহিনীর গঠনে একটা ঠাস বুনানীর বাঁধন চাই— এর অভাবে অনেক সময়েই আখ্যায়িকার ভেতর একটা আল্গা আল্গা ভাব থেকে যায়। কাহিনীর বিভিন্ন অংশের ভেতর যদি সমতার অভাব থাকে, বা সামঞ্জস্যপূর্ণ সংযোগের অভাব দেখা যায়, তবে আখ্যায়িকা কখনই একটা স্বাভাবিক পরিণত রূপ নিতে পারে না। শ্রেষ্ঠ নাট্যকারেরাও অনেক সময় এই ত্রুটির জন্য নিজেদের রচনাকে অসুন্দর করে ফেলেন। 'রাজা ও রাণী'তে এই দোষ আছে। বিক্রম সুমিত্রার কাহিনীর ক্রমিক বিকাশ এবং পরিণতির ব্যাপারটাই আখ্যায়িকার প্রতিপাদ্য বিষয়। কুমারসেন ও ইলার দৃশ্য ক'টি অত বিস্তৃত ও দীর্ঘ হওয়াতে নাটকের ব্যালান্স যে নষ্ট হয়েছে এ কথা নাট্যরসিক মাত্রেই স্বীকার করবেন। বার্নার্ড শ'য়ের 'ম্যান এ্যান্ড সুপার-ম্যান' নাটকেও দেখা যায়, হঠাৎ আসল কাহিনীর গতিকে ব্যাহত করে নাট্যকার 'ডন্ জুয়ান্' আখ্যান নিয়ে এত ব্যস্ত হয়ে পড়েছেন, অথচ নাটকের প্লট ডেভেলোপমেন্টের পক্ষে এ কাহিনী সম্পূর্ণ অপ্রাসঙ্গিক। রবীন্দ্রনাথ অবশ্য 'রাজা ও রাণীর' গলদ বেশ ভালভাবেই বুঝতে পেরেছিলেন এবং তারই ফলে রচিত হয়েছিল 'তপতী' সম্পূর্ণ পরিমার্জিত রূপে।

লেখক যদি খাঁজকাটা ঘরে (ছাঁচে ফেলে) চরিত্রগুলোকে নিজস্ব মতামতের সঙ্গে যুক্ত করে অতি সহজে আমাদের সামনে উপস্থিত করেন—তবে সে সব চরিত্রকে বুঝতে হয়তো আমাদের কষ্ট হয় না। কিন্তু ঐ জাতীয় চরিত্রের মধ্যে অন্তরস্পর্শী আবেদনের অভাব থাকে। তারা সত্যিকার প্রাণবন্ত চরিত্র হতে পারে না। হ্যামলেট, ইয়াগো এবং ক্লিওপেট্রা চরিত্রের জটিলতাই সাহিত্যরসিকের কাছে তাদের এত প্রিয় করে তুলেছে। উপন্যাসের মাধ্যমে যদি ঐ সব চরিত্রের বিশ্লেষণ শুরু হোত এবং সেই সঙ্গে রচয়িতা নিজস্ব মতামত যুক্ত করে দিতেন তা'হলে তার ফল কি হোত তা' সহজেই অনুমান করা যায়।

'বিসর্জন' নাটকের রঘুপতি চরিত্রের বিপরীতধর্মী নানা গুণ এই চরিত্রের মহত্ত্ব সৃষ্টি করতে সমর্থ হয়েছে। এ সম্বন্ধে রচয়িতার নিজস্ব মতামত দেওয়া নিষ্প্রয়োজন, তাতে চরিত্রের প্রাণশক্তি অনেকটাই কমে যায়। 'রাজর্ষি'র রঘুপতি এবং 'বিসর্জনের' রঘুপতির তুলনা করলেই এ সত্যকে সম্যকভাবে উপলব্ধি করা যাবে।

নাটকের প্লট থেকে চরিত্রকে বিচ্ছিন্ন করে দেখতে যাওয়াটা ভুল। যেমন প্লটকে অবলম্বন করেই চরিত্র গড়ে ওঠে, তেমনি আবার চরিত্র থেকেই প্লটের সৃষ্টি। ম্যাকবেথের চরিত্রে যদি পাপের বীজ আগে থাকতেই না থাকতো, তার চরিত্র যদি ব্যাঙ্কোর মতই নিস্পৃহ হত, তাহলে ডাইনীদের আলাপ এবং ভবিষ্যদ্বাণীতে তার মনে কোনই প্রতিক্রিয়া দেখা দিত না। এবং ম্যাকবেথ নাটকের আখ্যায়িকাও ঐভাবে কিছুতেই গড়ে উঠতে পারতো না। বিসর্জন নাটকে রঘুপতি ও গোবিন্দমাণিক্য এই দু'টি চরিত্রে যে মানসিক দৃঢ়তার পরিচয় পাওয়া যায় তার থেকেই নাটকটির কাহিনী আকৃতি পেয়েছে। এই দু'টি চরিত্রের একজনের ভেতরও যদি দৃঢ়তার অভাব দেখা দিত তবে নাটকের কাহিনীও দুর্বল হয়ে পড়তো। আবার রাজা ও রাণী বা তপতীর পাত্র-পাত্রীর ভেতর যে ভাব এবং আদর্শের সংঘর্ষ তাও সম্ভব হয়েছে বিক্রম-সুমিত্রা চরিত্রের আন্তরিক অসামঞ্জস্যের ফলেই। এ নাটকটিতেও পাত্র-পাত্রীর চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের থেকেই আখ্যায়িকাকে রূপায়িত করা হয়েছে।

আখ্যায়িকা থেকেই পাত্র-পাত্রীর ক্রিয়াকলাপের দিকটা প্রতিভাত হয় এবং তাদের চরিত্র সম্বন্ধে একটা মোটামুটি ধারণা করা সম্ভব হয়। ক্রিয়াকলাপ বলতে শুধু কতকগুলো বাহ্যিক ঘটনার সংঘটনকেই বোঝায় না। মানসিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার আলেখ্য এবং বিবরণীর মধ্যেও শক্তিশালী নাট্যকার character in action-এর চমৎকার রূপ দিতে পারেন। এর শ্রেষ্ঠ উদাহরণ 'হ্যামলেট' নাটক। 'ম্যাকবেথ,' 'ওথেলো' প্রভৃতি নাটকেও সেক্সপীয়ার এই পদ্ধতির দ্বারা চরিত্রগুলিকে সুস্পষ্টরূপে পরিস্ফুট করেছেন। ইউজিন ও'নিলও তাঁর 'স্ট্রেঞ্জ ইন্টারলুড,' 'মোর্নিং বিকাম্স ইলেকট্রা,' 'ডাইনামো' প্রভৃতি নাটকে পাত্র-পাত্রীর মানসিক ক্রিয়া ও প্রতিক্রিয়ার দিকটাতে বিশেষ দৃষ্টি দিয়েছেন। এই জন্যই তাঁর নাটকের চরিত্র এত প্রাণবন্ত, মর্মস্পর্শী এবং শক্তিশালী। জয়সিংহের আত্মবিসর্জনে রঘুপতির যে মানসিক প্রতিক্রিয়া তার সাহায্যেই তো রঘুপতি চরিত্রের অন্তরের একটা গভীর দিককে প্রতিভাত করেছে। এ প্রতিক্রিয়া যদি একটা পরম পরিণতিতে না পৌঁছত তবে একই সঙ্গে রঘুপতি চরিত্র এবং বিসর্জন নাটকটির সর্বনাশ হোত। 'রাজর্ষি' উপন্যাসে জয়সিংহের মৃত্যুর প্রতিক্রিয়া প্রথমটায় বিকৃতভাবে দেখানো হয়েছে।

গ্রন্থমেলা

বঙ্গীয় লোক-সংগীত রত্নাকর (প্রথম খণ্ড)—ডক্টর আশুতোষ ভট্টাচার্য সম্পাদিত। পশ্চিমবঙ্গ লোক-সংস্কৃতি গবেষণা পরিষদ: ২৩, বেচারাম চ্যাটার্জী রোড, কলকাতা-৩৪ থেকে প্রকাশিত। পরিবেশক : ডি. এম. লাইব্রেরী, ৪২ বিধানসরণী, কলিকাতা-৬। মূল্য : ৬·০০

বাংলা সাহিত্যক্ষেত্রে ডক্টর আশুতোষ ভট্টাচার্য গবেষণালব্ধ পাণ্ডিত্যের দ্বারা স্বীয় আসন চিরস্থায়ী করেছেন। অবশ্য পাণ্ডিত্য ছাড়াও বাংলা ভাষা ও তার উপভাষাগুলির প্রতি এমন অনুরাগ ও ভালবাসা আর ক'জনেরই বা আছে? বাংলার সমগ্র লোকসঙ্গীতকে তিনি শুধু উদ্ধারের সংকল্প গ্রহণ করেই ক্ষান্ত থাকেন নি, সেই লোকসংগীতকে স্বমর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করেছেন। সেই কারণে বিদেশ থেকে ডক্টর আশুতোষ ভট্টাচার্য লোকসাহিত্যের উপর আলোচনার জন্য প্রায়শই যে আহূত হন, সে আহ্বান প্রমাণ করে যে বিশ্ব-দরবারে তিনি বাংলার লোক-সাহিত্যকে প্রতিষ্ঠিত করতে সক্ষম হয়েছেন. এইজন্য একালের যে কোনো বাংলা ভাষাভাষী ডক্টর ভট্টাচার্যের কাছে নিজেকে ঋণী বোধ করবেন। আর একটি কথা এই প্রসংগে মনে রাখা দরকার, নাগরিকতার আঁচে লোকসাহিত্যগুলি যখন ধ্বংস হতে বসেছে, ঠিক সেই মুহূর্তে সমগ্র লোক-সংগীতকে অভিধানের মধ্যে ধরে রাখার মহৎ কৃতিত্ব অনন্যসাধারণ।

বর্তমান আলোচ্য সুবৃহৎ প্রথম খণ্ডটিতে রয়েছে বর্ণানুক্রমিক 'অ' থেকে 'ছ' পর্যন্ত লোক-সংগীতের সুবিপুল সংগ্রহ। এই সংগ্রহ কাজ যেমন কঠিন, তেমনি পরিশ্রমসাপেক্ষ; সেই সংগে লোক-সংগীতগুলি বাছ-বিচার করে যথাস্থানে সন্নিবেশ করার জন্যেও দরকার হয়েছে অসামান্য গবেষণাশক্তির সঙ্গে সুনিপুণ রসজ্ঞান। তাছাড়া, এই ধরণের কোষগ্রন্থ বা লোক-সংগীতের অভিধান ইতোপূর্বে কোনো ভাষায় প্রকাশিত হয়েছে বলে জানা নেই। সুতরাং যাবতীয় পরিকল্পনা ডঃ ভট্টাচার্যকে গ্রহণ করতে হয়েছে। গ্রন্থটির আলোচনাপ্রসংগে একথা বলা প্রয়োজন মনে করি যে, গ্রন্থটির সরাসরি নাম "বাংলার লোক-সংগীতের কোষ-গ্রন্থ বা অভিধান" থাকাই উচিত ছিল, তাহলে এর বৈশিষ্ট্যটুকু গ্রন্থটির নাম শোনামাত্র ধরা পড়তো। গ্রন্থটি "বঙ্গীয় লোক-সংগীতের

জয়ন্তী সেন

রত্নাকর" ত বটেই, কিন্তু আরো কিছু—একথা পাঠকদেরও জানা উচিত। "বাংলাদেশকে জানিতে হইলে গানের মধ্য দিয়া ইহাকে জানা যত সহজ, অন্য কোন বিষয়ের মধ্য দিয়াই তাহা তত সহজ নহে।" আমরাও মনে করি, বাংলাদেশের পাঠকের কাছে "বঙ্গীয় লোক-সঙ্গীত রত্নাকর" উপরিউক্ত কারণে সমাদৃত হবে, অভ্যর্থনা লাভ করবে, এবং তাঁরা সানন্দে সংগ্রহ করে রাখবেন। বাংলাদেশ, তার মানুষ-পরিবেশ-ইতিহাস-সমাজ জানতে গেলে এই গানগুলির মূল্য অপরিসীম। প্রসঙ্গত স্মরণীয়, ডক্টর ভট্টাচার্য তাঁর অন্যান্য গ্রন্থে লোক-সংগীতের মাধ্যমে জনজীবনের ইতিহাস আবিষ্কার করে বাংলাদেশের গৌরব বৃদ্ধি করেছেন। কিন্তু সেই সব গ্রন্থে লোক-সঙ্গীতের সামগ্রিক রূপ প্রকাশ করা সম্ভব না হওয়ায় বঙ্গীয় লোক-সংগীত রত্নাকরের" পর পর চারটি খণ্ডের পরিকল্পনা। ২য়, ৩য় ও ৪র্থ খণ্ডটি শীঘ্রই প্রকাশিত হবে বলে আমরা মনে করি। পল্লীসঙ্গীত সংগ্রহ ও সংরক্ষণের একটি পরিকল্পনা দিয়েছেন ডঃ ভট্টাচার্য। আর কেউ না পারুক, বাংলাদেশের বিশ্ব-বিদ্যালয়গুলি ও আকাশবাণী এই পরিকল্পনা গ্রহণ করে টেপ রেকর্ডের মাধ্যমে পল্লীসঙ্গীত সংরক্ষণের ব্যবস্থা অবশ্যই করতে পারেন এবং তা করা একান্তভাবে উচিত। তা নইলে রেডিও মারফৎ নাগরিক কণ্ঠের নকল পল্লী-সংগীত শুনেই শ্রোতাদের সন্তুষ্ট থাকতে হবে। দূর পল্লী অঞ্চলে নিরক্ষর পল্লী-গায়কের কণ্ঠে পল্লীসংগীত যিনি শুনেছেন, তিনিই জানেন হালের নামজাদা শহুরে পল্লীগায়কের সংগে তাদের স্বরের এবং সুরের কতো তফাৎ!

প্রথম খণ্ডটিতে লোকসংগীতের সংগ্রহ দেখে আমরা আর একটি বিষয়ে স্থির-নিশ্চিত হলাম যে, পূর্ব বাংলার মতো পশ্চিম বাংলাও লোক-সঙ্গীতে কম সমৃদ্ধ নয়। 'আখ্যানগীতি' অংশের শিব-দুর্গার আখ্যানগীতিও আমরা বাঁকুড়ার পল্লী অঞ্চলেও বিজয়াদশমীর দিন গাইতে শুনেছি।

বলা বাহুল্য, গ্রন্থটি অভিধানের সমগ্র লক্ষণযুক্ত হওয়ায়—এর ব্যাপ্তি, সার্থকতা ও প্রচার অধিকতর হওয়াই বাঞ্ছনীয়। সেই কারণে এর প্রতিটি সংগীতের বৈশিষ্ট্যের সঙ্গে পরিচয় থাকাও একান্ত প্রয়োজন। সে-পরিচয় আছে, কিন্তু একটু সংক্ষিপ্ত নয় কি? অবশ্য ডঃ ভট্টাচার্যের বাংলার লোক-সাহিত্যের পাঁচটি খণ্ডে সে পরিচয় প্রচুর পরিমাণে দেওয়া হয়েছে। জানি না, ডক্টর ভট্টাচার্য তাঁর পরিকল্পিত কাজ মাত্র চারটি খণ্ডেই সমাপ্ত করতে পারবেন কি না? তবে আশার কথা এই যে, দিল্লীর সঙ্গীত নাটক আকাদেমি প্রথম খণ্ডটির মুদ্রণের সমস্ত ব্যয়ভার বহন করেছেন। আমাদের মনে হয়, আকাদেমি আর একটু উদারহস্ত হলেই গ্রন্থটির বাইণ্ডিং মলাট দীর্ঘস্থায়ী হবার উপযুক্ত হোত। অভিধানের মলাট অভিধানের মতোই হওয়া দরকার তবে ৷৷৵০+৫৯২ পৃষ্ঠার গ্রন্থ মাত্র ছ' টাকায় বিক্রির ব্যবস্থা করা পশ্চিমবঙ্গ লোক-সংস্কৃতি গবেষণা পরিষদ-এর মতো দরদী প্রতিষ্ঠানের পক্ষেই সম্ভব।

উপন্যাসের শেষদিকে রঘুপতি হঠাৎ যেন আবার নতুন করে শোকাপ্লুত হয়ে উঠলেন। ফলে এই শোকের ব্যাপারটা অস্বাভাবিকভাবে অত্যন্ত দেরিতে ঘটল।

চরিত্রের সূক্ষ্ম দিকগুলি সুন্দরভাবে ফুটে ওঠে সংলাপের ভেতর দিয়ে। পাত্র-পাত্রীর অন্তরের ভাবাবেগ, অনুভূতি, উদ্দেশ্য, মনের দ্বন্দ্ব ও সংঘর্ষ প্রভৃতি কথোপকথনের ভেতর দিয়েই প্রকাশিত হয়ে পড়ে। এইজন্যই কাহিনীর গতির সঙ্গে পাত্র-পাত্রীর সংলাপের একটা আন্তরিক যোগ দেখা যায়। সংলাপের সাহায্যেই ধীরে ধীরে কাহিনী গড়ে ওঠে, সংলাপের সাহায্যেই পূর্ণাঙ্গ পায় নাটকের সমস্ত চরিত্র। [ক্রমশঃ]

রঙ্গজগৎ

সিনেমায় অচল অবস্থা

গত ১৯শে সেপ্টেম্বর হতে কলকাতা ও পশ্চিমবঙ্গের সিনেমাগুলি বন্ধ হয়ে আছে। চলচ্চিত্র দর্শক ও জনসাধারণ আশা করেছিলেন সিনেমা কর্মচারীদের একদিনের প্রতীক ধর্মঘটের পরে যথারীতি সিনেমাগুলিতে ছবি দেখান চলবে। কিন্তু প্রায় এক পক্ষকালের মধ্যেও শ্রমিক-মালিক বিরোধের নিষ্পত্তি না হওয়ায় আনন্দ উপভোগের এই সহজ উপায় থেকে জনসাধারণ বঞ্চিত হচ্ছেন। জনসাধারণের এখন চিন্তা করার প্রয়োজন আছে কাদের অন্যায় জিদে সারা পশ্চিমবঙ্গের সিনেমাগুলি বন্ধ হয়ে আছে।

সারা পশ্চিমবঙ্গ ব্যাপী সিনেমা বন্ধ থাকলেও দেখা যাচ্ছে বিদেশী ছবির প্রদর্শক সিনেমাগুলি মেট্রো, এলিট, লাইট হাউস, নিউ এম্পায়ার, গ্লোব এবং টাইগার-এ ছবি প্রদর্শিত হচ্ছে। এই সিনেমাগুলির মালিকপক্ষ শ্রমিকদের সঙ্গে আপোষ করে নিয়েছেন।

যদি ছয়টি সিনেমার মালিক শ্রমিকদের সঙ্গে আপোষ করতে পারেন তবে অন্যান্য সিনেমার মালিকদের বাধা কোথায়? সিনেমাগুলি বন্ধ হবার জন্য শ্রমিকদের দায়ী করা চলে না। শ্রমিকরা মাত্র একদিনের জন্য প্রতীক ধর্মঘট করেছিলেন। দাবিদাওয়া আদায়ের জন্য প্রত্যেক শিল্পসংস্থায় যেমন করা হয়। কিন্তু মালিকপক্ষ গোড়া থেকে হুমকী দিয়ে আসছে একদিনের প্রতীক ধর্মঘট করলে তার জবাবে তাঁরা অনির্দিষ্টকালের জন্য লক আউট করবেন। বর্তমানে যে সিনেমাগুলি বন্ধ আছে সেটা মালিকদের লক আউটের জন্য। শ্রমিকদের জব্দ করার জন্য মালিকপক্ষ এই ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে। বাস্তবিক পক্ষে এই লক আউটে শ্রমিকদের কর্মবিরতি ঘটছে বটে, কিন্তু প্রকারান্তরে চলচ্চিত্র দর্শকদের শাস্তি দেওয়া হচ্ছে। প্রেক্ষাগৃহের মালিকদের অনমনীয়তার দরুণ সারা পশ্চিমবঙ্গে চলচ্চিত্র শিল্পে এক অচল অবস্থা সৃষ্টি হয়েছে। শ্রমিকদের যে দাবি মেনে নিতে বিদেশী ছবিঘরের মালিকদের বাধে না, দেশী ছবির মালিকদের পক্ষে তা গ্রহণযোগ্য না হবার কি কারণ থাকতে পারে আমরা বুঝি না। প্রেক্ষাগৃহের মালিকরা কয়েক বছর যাবৎ অতিরিক্ত পরিমাণে ভাড়াবৃদ্ধি করেছে। যে ভাড়াবৃদ্ধির দরুণ প্রযোজকদের পক্ষে ছবির মুক্তি ঘটান প্রায় অসম্ভব হয়ে উঠেছে। প্রেক্ষাগৃহের মালিকরা আজ এত শক্তিশালী যে ছবি নির্মাণের সময় থেকে তাদের সঙ্গে চুক্তিবদ্ধ হতে হয় এবং ছবির শিল্পী নির্বাচন থেকে চিত্রনাট্যের রদবদল পর্যন্ত অনেক সময় তাদের মতামতের ওপর নির্ভর করতে হয়। ছবির হিট হওয়া বা ফ্লপ হওয়ায় প্রযোজক ও পরিবেশকের পক্ষে ঝুঁকির কারণ হয়, কিন্তু প্রেক্ষাগৃহের মালিকরা হাউস গ্যারান্টি নামে তাদের পাওনার বিষয়ে নিশ্চিন্ত থাকে। যখনই সরকার প্রমোদকরের হার বাড়িয়েছে তৎক্ষণাৎ সিনেমার মালিকরা সেই অঙ্ক সম্পূর্ণ দর্শকদের ওপর চাপিয়ে টিকেটের হার বৃদ্ধি করেছে। মালিকদের লাভের অঙ্ক থেকে এক পয়সাও ছাড় দিতে হয় নি। সুতরাং এ পরিস্থিতিতে অচল অবস্থা সৃষ্টি করার জন্য জনসাধারণ সিনেমা মালিকদেরই দায়ী করবে।

এই অচল অবস্থার ফলে দর্শকদের যেমন আনন্দ উপভোগে এবং অবসর বিনোদনের বাধা হচ্ছে, তেমনি বাংলার চলচ্চিত্র শিল্পের ক্ষতি হচ্ছে। যেসব ছবি মুক্তি প্রতীক্ষায় ছিল সেই ছবিগুলির মুক্তি পিছিয়ে যাচ্ছে। এই পিছিয়ে যাবার ফলে ঋণ করে, ছবির প্রিন্ট বন্ধক দিয়ে যারা ছবি করেছিল তাদের সুদের বোঝা বাড়ছে। বছরে যে দেশে মাত্র ৩০।৩২টি ছবি মুক্তি লাভ করে এই অন্যায় জিদের ফলে সেই সংখ্যা আরো কমে আসছে। আমরা দীর্ঘকাল থেকে লক্ষ্য করে আসছি এক দল স্বর্থপর ব্যবসায়ী বাংলা ছবির ক্ষেত্রকে সংকুচিত করার, বাংলা চলচ্চিত্র শিল্পকে দুর্বল করার জন্য চেষ্টা করে আসছে। এদের চক্রান্তে বাংলা দেশে বাংলা ছবি মুক্তির জন্য সিনেমার সংখ্যা কমে আসছে। লক আউট এই চক্রান্তের আর একটা পদক্ষেপ কি না কে জানে?

এভাবে অচল অবস্থা চলতে দিলে বাংলা চলচ্চিত্র শিল্পের ভয়ানক ক্ষতি হবে। পশ্চিমবঙ্গ সরকার প্রমোদকর বাবদ যে দেড় লক্ষ টাকা পেয়ে থাকে তা থেকেও বঞ্চিত হচ্ছে। দর্শকদের একমাত্র আনন্দ উপভোগের পথে অন্তরায় সৃষ্টির কথা পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে। এই অচল অবস্থা অবসানে সিনেমার মালিকদের শুভবুদ্ধি জাগ্রত হোক। নতুবা পরিণতি আরো খারাপের দিকে যেতে পারে।

—সুজন।

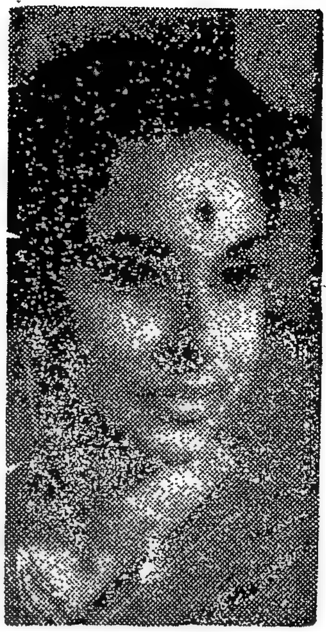

— মাধবী মুখার্জী

নাটকের কথা

মেলবোর্নে রবীন্দ্র-নাটকের অভিনয়

গত ১৬ই এবং ১৭ই সেপ্টেম্বর মেলবোর্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের আর্কিটেক্চার থিয়েটার হলে মেলবোর্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের ভারত বিদ্যা বিভাগের ছাত্র-ছাত্রীদের উদ্যোগে এবং সহযোগিতায় রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের "বিসর্জন" নাটকের ইংরাজি তর্জমা 'সেক্রিফাইস' বিশেষ সাফল্যের সঙ্গে অভিনীত হয়ে গেছে। অস্ট্রেলিয়ায় ভারতীয় তথা রবীন্দ্র-নাটকের অভিনয় এই প্রথম অনুষ্ঠিত হওয়ায় স্থানীয় পত্র-পত্রিকায় এবং টেলিভিসনে এই নাটক সম্পর্কে ধারাবাহিক আলোচনা এবং প্রচার চলে। টেলিভিসনে এবং রেডিওয় ও পত্রিকাগুলির সাংবাদিক সম্মেলনে এই নাটক তথা রবীন্দ্রনাথের অন্যান্য নাটকগুলি সম্পর্কে আলোচনা করেন এই নাটকের প্রযোজক পরিচালক এবং সংগীত উপদেষ্টা মেলবোর্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের ভারত বিদ্যা বিভাগের অধ্যাপক অতীন্দ্র মজুমদার। তিনি এই নাটকাভিনয়ের মাসাধিককাল পূর্বে টেলিভিসনে রবীন্দ্র-কবিতার আবৃত্তি শোনান এবং রবীন্দ্র-সংগীতের একটি অনুষ্ঠানের ব্যবস্থাও করেন—সেই অনুষ্ঠানে গান গেয়ে শোনান তাঁর স্ত্রী মণিকা এবং কন্যা সুদেষ্ণা মজুমদার।

এই অভিনয়ে মেলবোর্নের যাঁরা সবচেয়ে খ্যাতিমান ফিল্ম এবং স্টেজ অভিনেতা তাঁরা স্বেচ্ছায় আন্তরিক সহযোগিতা করেন। রঘুপতির ভূমিকায় বার্ট কুপার, গোবিন্দমাণিক্যের ভূমিকায় মাইকেল হানা, গুণবতীর ভূমিকায় সিরিয়াম মান্, জয়সিংহের এবং অপর্ণার ভূমিকায় যথাক্রমে রেমণ্ড্ রিচ্ এবং স্যু রাসেল—মেলবোর্নের মঞ্চে রবীন্দ্র-নাটকের যে রূপদান করেন তা নানাদিক দিয়ে অবিস্মরণীয়। মেলবোর্নের বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় এই নাটক সম্পর্কে যে প্রশংসামুখর সমালোচনা প্রকাশিত হয়েছে, অন্য কোন বিদেশী নাটকাভিনয়ের ভাগ্যে আজ পর্যন্ত তা জোটে নি।

এই নাটকাভিনয়ের প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত সাংগঠনিক ব্যাপারে ভারতীয় হাইকমিশনার ডক্টর ডি এন চ্যাটার্জী, প্রেস এ্যাটাশে শ্রীমৌলিক; মেলবোর্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের ভারত বিদ্যা বিভাগের বিভাগীয় প্রধান, অধ্যাপক শিবনারায়ণ রায়, তাঁর স্ত্রী গীতা রায় এবং এয়ার ইণ্ডিয়ার শ্রীব্রুস্ ম্যাক্লীনসে্র সাহায্য ও সহযোগিতা বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

রঘুপতির ভূমিকায়—বার্ট কুপার

চলচ্চিত্র সমিতির সংবাদ

সিনে সেণ্ট্রাল, কলকাতা

সিনে সেণ্ট্রাল, কলকাতা আগামী ৪ঠা এবং ৫ই অক্টোবর ত্যাগরাজ হলে কয়েকটি নির্বাক আমেরিকান চলচ্চিত্র—'আমেরিকা', 'রোড টু ইয়েস্টার ডে', 'অরফ্যান অফ দি স্টোর্ম', 'অরফ্যান অফ দি স্টর্ম,' 'থিফ অফ বাগদাদ' ও 'ফল অফ ব্যাবিলন' এবং ১১ই অক্টোবর দুটি বিখ্যাত জার্মান চলচ্চিত্র 'দি ক্যাবিনেট অফ ডক্টর ক্যালিগরি' ও 'লাস্ট লাফ' প্রদর্শনীর আয়োজন করেছেন।

এ ছাড়াও ডাচ দূতাবাসের সহযোগিতায় সংস্থার উদ্যোগে আগামী ৮ই ও ৯ই অক্টোবর অ্যাকাডেমী অফ ফাইন আর্টস্ হলে ডাচ চলচ্চিত্র উৎসব আয়োজিত হয়েছে। ১৯৬৪ সালের বার্লিন চলচ্চিত্র উৎসবে তিনটি পুরস্কার বিজয়ী 'দি হিউম্যান ডাচ্' ও আরও ৮টি খণ্ড চিত্র, 'ডেল্টো ফেজ্ ওয়ান,' 'প্রেইজ দি সী,' 'দি হাউস,' 'সেইলিং,' 'দি রুলিং অফ কারেল আপেল,' 'এ সানডে অন দি আইল্যাণ্ড অফ গ্রাণ্ড জ্যাটে,' 'বিল্ডিং গেম' ও 'গ্লাস' এই উৎসবের অন্তর্ভুক্ত। সব ক'টি ছবিই ৩৫ মি. মি. এবং তিনটি ছবি ভারতে প্রথম দেখান হবে।

ক্যালকাটা মিউজিক আর্ট সেণ্টারের নববার্ষিক অনুষ্ঠানে 'বাসবদত্তা' নাটকের নাম-ভূমিকায় কুমারী গোপা পাল ও শ্রীমতী স্বাতী লাহিড়ী (চিত্রলেখা)।

গোবিন্দমাণিক্য ও গুণবতীর ভূমিকায় মাইকেল হানা ও সিরিয়াম মান

অভিনয় করবেন অনিল চ্যাটার্জী, অনুপ-কুমার, কালী ব্যানার্জী, দীপ্তি রায় প্রমুখ। সংগীত পরিচালনার দায়িত্ব নিয়েছেন সলিল চৌধুরী ও দীপক দাস।

তীরভূমি

শচীন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'তীরভূমি' কাহিনীর চিত্ররূপ দিচ্ছে নবগঠিত চিত্র-ভারতী প্রতিষ্ঠান। ছবিতে অভিনয়ের জন্য নির্বাচিত হয়েছেন বিকাশ রায়, মঞ্জু দে, মাধবী মুখার্জী, অনিল চ্যাটার্জী, রবি ঘোষ, রুমা গুহঠাকুরতা।

বোম্বাই রাত্ কি বাহোঁ মে

বোম্বাইয়ের কে, এ, আব্বাসের নতুন ছবি 'বোম্বাই রাত কি বাহোঁ মে'র স্যুটিং শুরু হয়েছে।

দিলাকাশ

সত্যেন বসু 'মেরে লাল'-এর সার্থকতার পরে আর একটি ছবির কাজে হাত দিচ্ছেন। এই ছবির কাহিনী লিখেছেন তাঁর স্ত্রী রুবী বসু। চিত্র-নাট্য লিখেছেন নবেন্দু ঘোষ। ছবির নাম হবে 'দিলাকাশ'।

সঙ্গীতকথা

অপেরার ইতিবৃত্ত

মধ্যযুগের প্রাক্কাল থেকেই সংগীত ও নাটকের সমন্বয়ে এক ধরণের গীতি-

স্টুডিও খবর

প্রথম বসন্ত

জানা গেল 'কাল তুমি আলেয়া'র পরে দেবেশ ঘোষের পরবর্তী ছবি 'প্রথম বসন্ত'। ছবিটি পরিচালনা করবেন স্বদেশ সরকার। তিনিই ছবির কাহিনীকার। উত্তমকুমার ও সুপ্রিয়া চৌধুরী এ ছবির প্রধান দুটি ভূমিকায় অভিনয় করবেন।

নতুন পুরুষ

জীবন গাঙ্গুলীর পরিচালনায় ফিনিক্স পিকচার্স 'নতুন পুরুষ' নামে ছবির কাজ করছে। ছবির প্রধান চরিত্রে

'ত্রিস্তান ও ইসোলদা'

নাট্যের অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হ'ত। এসব গীতাভিনয়গুলিকে আধুনিক গীতি-নাট্যের (অপেরা) আদিসংস্করণ বা পূর্বপুরুষরূপে অভিহিত করা যায়। সপ্তদশ শতককে অপেরার জন্মকালরূপে গণ্য করা হয়। ইতালীই ইউরোপীয় অপেরার জন্মস্থান।

গোড়ার দিকে মুখোশাভিনয়, কৃষি-মূলক নাট্যাভিনয় এবং রহস্যমূলক বা মায়াময় নাট্যানুষ্ঠান সম্পাদিত হ'ত। রেনেসাঁসের সময় প্রাচীন গ্রীসীয় প্রথার অনুকরণে গীতি-নাট্যের বিষয়গুলি স্বারিক আবৃত্তি ও সম্মেলক মন্ত্রোচ্চারণের ঢঙ-এ রচিত হ'ত।

ইউরোপীয় অপেরার প্রথম যুগে গীর্জা ও ধর্মযাজকদের প্রভাব অতি প্রবল ছিল। প্রাথমিক স্তরে অপেরার বিষয়-গুলি ধর্মসাহিত্যানুগ ছিল এবং এর যান্ত্রিক (সংগীত) সহযোগিতা খুবই সরল প্রকৃতির হ'ত। কথার প্রাধান্যই প্রথম বেশি বিবেচ্য হ'ত। যান্ত্রিক সংগত কথার দাস মাত্র ছিল। কিন্তু কাল-ক্রমে যখন অপেরার বৈচিত্র্য ও নানা সম্পদের দিগন্ত উন্মোচিত হ'ল—তখন যন্ত্র-সংগীত এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে লাগল। বাদকমণ্ডলীর (অর্কেস্ট্রা) উন্নতি ও প্রসার সাধিত হ'ল।

অনুরূপভাবে গায়ক-গায়িকার সুল-লিত কণ্ঠ ক্রমশ প্রাধান্য পেতে লাগল। এবং এক ধরণের বিশেষ কণ্ঠসংগীতের ভঙ্গিমার প্রবর্তন হ'ল। এর নাম 'Coloratura', এতে গলার কারুকার্য, স্বরালঙ্কার (Decoration) ও স্বর-কম্পন (Trill) প্রদর্শন করার অফুরন্ত সুযোগ পাওয়া যায়। এই অংশটি সাধা-রণত সুরকার বেঁধে দেন না; গায়ক-গ্যায়িকাগণ এতে স্বেচ্ছাস্বরবিহার (Improvisation) করে থাকেন।

সপ্তদশ শতাব্দীর দিক্‌পাল অপেরা-গুরুদের মধ্যে ইতালীর মন্তেভের্দি ও আলেসেন্দ্রো স্কারলেত্তির নাম বিশেষ উল্লেখের দাবি রাখে। এই প্রসঙ্গে ফরাসী দেশের লুলির নামও সবিশেষ উল্লেখযোগ্য।

কালক্রমে সংগীতশিল্পের অগ্রগতির ফলে গায়কবর্গ অপেরার কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত হ'ল। এরূপে কণ্ঠ-গীতি অপেরার প্রধান উপজীব্য বিষয়রূপে গণ্য হ'ল। গীতি-নাট্য বা অপেরা রচনায় গায়নশিল্পীদের মতামতকে ও সুবিধা-অসুবিধাকে সুরকারবৃন্দ প্রাধান্য দিতে লাগলেন। গায়ক-গায়িকার কণ্ঠসীমার উপযোগী না হ'লে তাদের পক্ষে অপেরার

রিগোলেত্তো'র একটি দৃশ্য।

গান গাওয়া সম্ভব হ'ত না; কাজে কাজেই সুরকার বা অপেরা-রচয়িতাদের তাদের মুখ চেয়ে সংগীত রচনা করতে হ'ত।

অষ্টাদশ শতাব্দীতে অপেরার গান পরিবেশকদের এক প্রকার একক গানের (সোলো) সংগে হার্পসিকর্ড বাদিত হ'ত। এতে শিল্পীর গীতাবলী প্রাণবন্ত ও সুশ্রাব্য হ'ত। এগুলি ছাড়া তখন দ্বৈত (ডুয়েট), ত্রয়ী (ট্রিয়ো), চতুর্বর্গ (কোয়ারটেট) প্রভৃতি নানা অংগের গীতাদিও সম্পন্ন হ'ত।

তখনকার দিনে দরবারের রাজা-মহা-রাজা ও অভিজাত সম্প্রদায় কর্তৃক অপেরা-শিল্প পৃষ্ঠপোষকতা পেত। কোন বিশেষ উৎসব উপলক্ষ্যে অপেরা রচিত হ'ত। জন্মদিন, রাজ্যপ্রাপ্তি, সিংহা-সনারোহণ ইত্যাদি উপলক্ষ্যে সাধারণত অপেরা অনুষ্ঠিত হ'বার সুযোগ লাভ করত। তখনও পূর্ণাংগ পেশাদারী অপেরা দল গড়ে ওঠে নি। অপেরার এ সকল প্রারম্ভিক বিকাশ সাধিত হয়েছিল ইতালী ও ফ্রান্সের বিভিন্নাংশে।

১৬৩৭ খৃস্টাব্দে প্রথম পাবলিক অপেরা গঠিত হয় ভেনিস শহরে। ঐ শহরের গুটিকয়েক ধনীপরিবার এর অর্থের জোগান দেয়। ঐ অপেরা সম্পূর্ণ-রূপে লাভালাভের ভিত্তিতেই অনুষ্ঠিত হয়েছিল। এর কিছুদিন পর বাণিজ্যিক ভিত্তিতে প্যারিসে একটি ইতালীয় অপেরা দল গঠিত হয়েছিল। পরবর্তীকালে অস্ট্রিয়াতেও অনুরূপ অপেরা-সংস্থা স্থাপিত হয়েছিল।

সপ্তদশ শতাব্দীর শেষ ভাগে ইংলন্ডেও অপেরার সূচনা দেখা দেয়। সুরকার পর্সেল গোড়ার দিকে ইংলন্ডে নানা ধরণের অপেরা-সংগীত রচনা করেন। পরে স্বনামধন্য জার্মান সুরকার হান্দেল ইতালীয় ধরণের সুরম্য অপেরা রচনা করে জগদ্‌বিখ্যাত হ'ন। তিনি তাঁর শেষ জীবন ইংলন্ডেই কাটিয়েছিলেন।

সেরাগ্লিও'র একটি দৃশ্য

হান্দেল প্রায় চল্লিশখানি রমণীয় অপেরা গ্রন্থনা করেছিলেন।

অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে দুই প্রকার অপেরা প্রচলিত হয়। একটি গম্ভীর ধরণের (যা প্রায়শই বিয়োগান্ত) ও অপরটি প্রহসন জাতীয়।

ক্রিস্তফ্ গ্লুক [১৭১৪-১৭৮৭] অপেরা রচনায় যুগান্তকারী পরিবর্তন আনেন। ১৭৪১ খৃস্টাব্দে মাত্র সাতাশ বৎসরে গ্লুক তাঁর প্রথম অপেরা রচনা করেন। পরপর তিনি আরও সাতটি অপেরা লিখে বিশেষ লোকপ্রিয়তা অর্জন করেন। তিনি অপেরার বহুমুখী সংস্কার সাধন করেছিলেন।

বিশ্ববিখ্যাত জার্মান সুরস্রষ্টা মোৎসার্টও অপেরার উন্নতিকল্পে প্রভূত অবদান রেখে গেছেন। তিনি অবশ্য গ্লুকের ধারাই অনুসরণ করেছিলেন। অপেরার সঙ্গীতকে তিনি কাব্য-সুষমায় মণ্ডিত করার প্রয়াস পেয়েছিলেন। ইউরোপীয় অপেরার ইতিহাসে মোৎসার্টের নাম চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে।

ফ্রান্স অপেরার জন্য বিশেষ খ্যাত। ফরাসী দেশে অপেরা যথেষ্ট বিকাশ প্রাপ্ত হয়। সম্রাট নেপোলিয়ানের সময় 'গ্র্যান্ড অপেরা' বিশেষ জনপ্রিয় হ'য়ে উঠেছিল। 'অপেরা কমিক' নামে এক প্রকার অপেরা অনুষ্ঠানও ফরাসী দেশে প্রচলিত হয়। মেয়ারবিয়ার, অবার্, গুনো প্রমুখ সুরকার-বৃন্দ অপেরার জন্য বহু রম্য সঙ্গীত রচনা ক'রে গেছেন।

ঊনিশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে অপেরার ইতিহাস প্রখ্যাত কবি-সুরকার ভাগনার্ এবং ভের্দি কর্তৃক সুচিহ্নিত হয়ে আছে। ভাগনার্ ও ভের্দি যথাক্রমে জার্মান ও ইতালীর সুরকার। এই সুরকারদ্বয় অপেরার ক্ষেত্রে নতুন নতুন সুর-সৃষ্টি করে অপেরামোদীদের কৃতজ্ঞতা-ভাজন হন।

ইতালীতে অপেরাচার্য ভের্দির সময় থেকেই অপেরায় বাস্তবতাবাদের সূচনা দেখা দেয়। এই মতবাদের পোষক ও উৎসাহদাতাদের মধ্যে জনপ্রিয় অপেরা-স্রষ্টা ম্যাস্কাগানি, লিঁয় কাভেলো গির-দানো পুসিনি প্রমুখ গুণীবর্গের নাম উল্লেখযোগ্য।

অপেরায় প্রতীকবাদেরও প্রভাব দেখা দেয় ফ্রান্সে। যশস্বী ফরাসী সুরকার দোবুসী এই মতবাদীদের অন্যতম অগ্রণীর ভূমিকায় আবির্ভূত হন। তাঁর প্রবর্তিত বৃন্দবাদনে সংধ্বনি সঙ্গীতের প্রাবল্য পরি-লক্ষিত হয়।

বিংশ শতাব্দীতেও অপেরার বিকাশ সম্পর্কে নানা দিক থেকে প্রচেষ্টা চালান হয়। দিক্‌পাল সুরকার স্ত্রাভিন্‌স্কি, প্রকোফিয়েফ্, সস্তাকোভিচ্, হিন্দেমিত্ প্রভৃতি গুণীজনেরা অপেরার জন্য অনেক ললিত-মধুর সঙ্গীত রচনা করেছেন।

অষ্টাদশ শতাব্দীতে ইতালীতে এক প্রকার স্বল্পকায় অপেরার প্রচলন ছিল। একে বলা হ'ত 'অপেরত্যা'। কিন্তু বর্তমানে 'অপেরত্যা'র আঙ্গিক পরিবর্তন সাধিত হয়েছে। এতে গান, সংলাপ, চিত্তহারী যন্ত্রসঙ্গীত, সুদৃশ্য নৃত্য ও একটি আখ্যানভাগ থাকে।

আমাদের দেশে সংস্কৃতি-গুরু বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ইউরোপীয় অপেরা অনুসরণ করে ভারতীয় পরিবেশে এক প্রকার অভিনব গীতি-নাট্যের (অপেরা) প্রবর্তন করেন। আধুনিক যুগোপযোগী গীতি-নাট্যের রীতি-পদ্ধতি উদ্ভাবন করে রবীন্দ্রনাথ অন্যান্য বিষয়ের ন্যায় এই বিষয়েও পথপ্রদর্শকের সম্মান লাভ করেন। তাঁর রচিত গীতি-নাট্যগুলির মধ্যে 'বাল্মীকি প্রতিভা', 'মায়ার খেলা', 'শ্রাবণ-গাথা', 'কালমৃগয়া' ও 'শাপমোচন' প্রভৃতি বিশেষ সমাদৃত হয়েছে। দেশী-বিদেশী অগণ্য দর্শক-শ্রোতৃবর্গ কর্তৃক রবীন্দ্রনাথের অপেরা প্রশংসিত হয়েছে।

আমাদের দেশে অনেকে 'যাত্রাভিনয়কে'ও অপেরা নামে অভিহিত করেন। যাত্রাদলের কর্তৃপক্ষও তাঁদের দলকে প্রায়শই অপেরা পার্টিরূপে নামকরণ করেন। যেমন 'গণেশ অপেরা', 'অরুণ অপেরা', 'ক্যালকাটা অপেরা' ইত্যাদি। প্রকৃতপক্ষে যাত্রাগান ও অপেরা একেবারে ভিন্ন বস্তু।

আলোচ্য নিবন্ধে অনুল্লিখিত কয়েকজন বিখ্যাত ইউরোপীয় অপেরা রচনাকার ও সুরকারের নাম দেয়া হ'ল। যথাঃ বেলিনী, বিজেট, স্ট্রাউস, বিথোভেন্, মেসেনেট্, মুসর্গস্কি, চাইকভ্‌স্কি, রোসিনী, বের্‌লিয়জ্ প্রভৃতি।

বিশ্ববিখ্যাত কয়েকটি অপেরা ভবনের নাম এখানে দেয়া গেল। যথাঃ 'কভেন্ট গার্ডেন', 'লা স্কেলা', 'প্যারিস অপেরা', 'মেট্রোপলিটান অপেরা', 'বাভেরিয়া স্টেট অপেরা'—মিউনিক, 'বার্লিন স্টেট অপেরা', 'ড্রেসডেন্ স্টেট অপেরা', 'হামবুর্গ স্টেট অপেরা', 'মস্কো স্টেট অপেরা', 'ভিয়েনা স্টেট অপেরা', 'রয়েল অপেরা হাউস'—স্টক্‌হল্‌ম, 'থিয়েটার দ্য' লা মনিই'—ব্রুসেলস্ ইত্যাদি।

কয়েকটি জনপ্রিয় অপেরার নামঃ 'রিগোলেত্যো' (ভের্দি), 'ত্রিস্তান ও ইসোলদা' (ভাগনার), 'ম্যাজিক ফ্লুট' (মোৎসার্ট), 'রবার্ট দি ডেভিল' (মেয়ারবিয়ার), 'সেরাগ্লিও' (মোৎসার্ট), 'টেল্‌স অব হফ্‌ম্যান' (অফেন্‌বাখ্) প্রভৃতি।

—নীহারবিন্দু চৌধুরী

পাঠক মন

অভ্যুক্তি নয়, স্তুতিবাদ নয়, রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিতও নয়, গত অর্ধ শতাব্দীর ভিতর বাংলাদেশে এরূপ মনোজ্ঞ সাহিত্যিক সাপ্তাহিক পত্রিকা দেখিয়াছি কি না সন্দেহ। আত্মশক্তি, নবশক্তি, ভগ্নদূত, অবতার, জংগীপুর সংবাদ, হিতবাদী প্রভৃতি থেকে আধুনিককালের সাহিত্য-সাপ্তাহিক পর্যন্ত এরূপ মন-ভরানো বিচিত্রতার সমাবেশ, দুর্নীতির বিরুদ্ধে সুতীব্র আক্রমণ, কুশাসনের বিরুদ্ধে তীব্র কশাঘাত, স্বার্থপরতা ও সর্বপ্রকার নীচতার বিরুদ্ধে কঠোর সমালোচনা, কোথায়ও দেখি নাই। একদিকে বাংলার স্বদেশী আন্দোলন তথা ভারতের স্বাধীনতালাভের জন্য আন্দোলনে পথপ্রদর্শক বাঙালী যুবকদের অদ্ভুত দেশপ্রীতি ও অপূর্ব আত্মত্যাগের জ্বলন্ত বর্ণনা, চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠনের বিস্তৃত প্রামাণ্য ইতিবৃত্ত, অন্যদিকে বাঘা যতীন, রাসবিহারী প্রভৃতি মহামানবের জীবনের ত্যাগদীপ্ত পূত কাহিনী—পড়িয়া মনে হয় বুঝি জাহ্নবীর পবিত্র সলিলে অবগাহন করিয়া ধন্য হইলাম। প্রথিতযশা লেখিকা শ্রীআশাপূর্ণা দেবীর ধারাবাহিক উপন্যাস 'সুবর্ণলতা'ও লেখিকার একটি অনবদ্য কীর্তি। বাংলাদেশের প্রতি ঘরে যদি এই কাগজ স্থান না পায়, তবে উহা বাংলাদেশেরই দুর্ভাগ্য।

এখন দু-একটি বিষয়ের সংক্ষেপে অবতারণা করিতেছি। "বন্দে মাতরম্" সঙ্গীত ভারতের জাতীয় সঙ্গীত, উহাতে বঙ্কিম লিখিয়াছেন—"সপ্ত কোটি কণ্ঠ কলকল নিনাদ করালে, দ্বিসপ্তকোটি ভুজৈর্ধৃত খরকরবালে"। ভারতের লোকসংখ্যা ৭ কোটি নয়, তাই ইহার পরিবর্তিত রূপ দাঁড়াইল 'ত্রিংশ কোটি কণ্ঠ কলকল নিনাদ করালে' ইত্যাদি। লোকসংখ্যা বছর বছরই বাড়িবে, সেই সঙ্গে যদি কোটির ঘরের পরিবর্তন চলিতে থাকে তবে উহার শেষ কোথায়? কাজেই ঐ ... দুটি যদি এইভাবে পরিবর্তন করা ... কোটি কণ্ঠ কলকল নিনাদ ... কোটি ভুজৈর্ধৃত খরকরবালে" একটা স্থায়ীরূপ পায় না কি? ... জাতীয় সঙ্গীতটিতে আছে ... গুজরাট-মারাঠা দ্রাবিড় উৎকল ... অথচ সিন্ধু অন্য রাষ্ট্রের অন্তর্গত। একটি স্বাধীন রাষ্ট্রের জাতীয় সঙ্গীতে অন্য স্বাধীন রাষ্ট্রের কোন দেশের অন্তর্ভুক্তি ইহা উদ্ভট ও হাস্যকর নয় কি? পাকিস্তান কি তার রাষ্ট্রের কোন অংশের এই ভারতভুক্তি স্বাগত করিবে? কাজেই এই ক্ষেত্রে যদি আমরা বলি—"পাঞ্জাব-আসাম-গুজরাট-মারাঠা-দ্রাবিড়-উৎকল বঙ্গ" তবে এই সমস্যার সমাধান হয় না কি? আমি এই উভয় বিষয়ের উপর আপনাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি। আর একটি ছোট্ট কথা—স্টেট বাসে আমরা লেখা দেখি, 'Wait till the Bus stops' অর্থাৎ যে পর্যন্ত না বাস থামে সে পর্যন্ত অপেক্ষা করুন, বাস থামিলেই বাসে চড়িবেন। কিন্তু সেই একই বাসে উক্ত ইংরেজীর বঙ্গানুবাদ দেখি—"বাস থামা পর্যন্ত অপেক্ষা করুন" যতক্ষণ বাস থামিয়া থাকিবে ততক্ষণ বাসে চড়িবেন না, বাস চলিতে আরম্ভ করিলেই চলন্ত বাসে চড়িবেন। এই বঙ্গীকরণও হাস্যকর নহে কি? ইহারও অনতিবিলম্বে পরিশোধন দরকার।

—শ্রীঅনাথবন্ধু বোস,
১১।৩৯, মল রোড্ কলি-২৮।

* * *

৫ই আশ্বিন, বৃহস্পতিবারের বসুমতীর বঙ্গদর্শনে প্রকাশিত "ছাত্র উচ্ছৃঙ্খলতার আর একটি দিক" স্তম্ভটি প্রতিবাদের দাবি রাখে।

শিবপুরে বি, ই, কলেজের 'সাম্প্রতিক' ঘটনাবলী সম্বন্ধে লেখক যা লিখেছেন তা নিতান্ত একদেশদর্শী। মনে হয় সংবাদপত্রে ঘটনার যে সংবাদ বেরিয়েছিল তা এবং স্থানীয় অধিবাসীদের অভিযোগের উপর ভিত্তি করেই তিনি উক্ত স্তম্ভটি রচনা করেছেন, আর সেই জন্যেই সত্যের অপলাপ হয়েছে।

বর্তমান যুগ বিশৃঙ্খলার যুগ। মানুষের নৈতিক মূল্যবোধ আজ শিথিল। ছাত্রসমাজের উচ্ছৃঙ্খল আচরণ তারই স্বাভাবিক পরিণতি। কিন্তু লোকে কি লক্ষ্য করেছেন এই প্রতিষ্ঠানের ছাত্ররা কখনো কোনো রাজনৈতিক আন্দোলনে যোগদান করেন নি। যখন দেশের সর্বত্র ধর্মঘট, ট্রাম-বাস পোড়ানো ইত্যাদির তাণ্ডব চলছে, তখনো তাঁরা নিয়মিত ক্লাশ, পড়াশোনা চালিয়ে গেছেন। অন্যান্য সরকারী কলেজে এর সম্পূর্ণ ব্যতিক্রমই চোখে পড়ে। কলেজজীবনে রাজনৈতিক দলগুলির অনুপ্রবেশ সমগ্র প্রতিষ্ঠানের পরিবেশকেই ক্লেদাক্ত করে তোলে, একথা ভুক্তভোগীমাত্রেই জানেন। বি, ই কলেজ এর একটি উজ্জ্বল ব্যতিক্রম। সেখানেও ইউনিয়ন আছে। কিন্তু তার নির্বাচন-উপনির্বাচন সম্পূর্ণভাবে কলেজের মধ্যেই সীমাবদ্ধ। ছাত্র ফেডারেশন প্রভৃতি রাজনৈতিক দলের সঙ্গে তার কোনো যোগ নেই।

প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যেতে পারে তাঁরা তাঁদের অধিকারের প্রতিকারের জন্য যে আশীঘণ্টাব্যাপী অনশন করেছিলেন সেই সময় কোনো কোনো রাজনৈতিক নেতা এই পরিস্থিতির সুযোগ নেবার চেষ্টা করেছিলেন। তাঁরা ছাত্রদের সাহায্য করতে চেয়েছিলেন। ছাত্ররা অশেষ বিবেচনার সঙ্গে তাঁদের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেছিলেন। যদিও তাতে হয়তো তাঁদের অভিযোগের দ্রুত প্রতিকার হোতো। এই অনশন উপলক্ষ্যে তাঁরা যে শৃঙ্খলা ও সততার পরিচয় দিয়েছেন সমাজের কোনো স্তরেই তার তুলনা হয় না। ১৬ থেকে ২১-এর মধ্যে যাঁদের বয়স তাঁরা এতদিন অনশন করেও সমানে ক্লাশ করেছেন এমন কি পরীক্ষা দিতেও প্রস্তুত ছিলেন। অবশ্য সহৃদয় কলেজ কর্তৃপক্ষ এই অবস্থায় পরীক্ষা থেকে তাঁদের অব্যাহতি দিয়েছেন। ছাত্রদের ব্যবহার শেষ পর্যন্ত বিনয়পূর্ণ ছিল। কেউ ধৈর্যচ্যুত হয় নি।

আজকের যুগ মিথ্যাচরণের যুগ। কিন্তু এই অনশন উপলক্ষ্যে ছাত্ররা অসাধারণ সততা ও মনোবলের পরিচয় দিয়েছেন। আশী ঘণ্টা তাঁরা শুধু লেবুজল খেয়ে কাটিয়েছেন। একটি অসুস্থ ছাত্রের ঘরে তাঁর অভিভাবকরা ফল মিষ্টি প্রভৃতি অনশন আরম্ভ হওয়ার আগেই রেখেছিলেন, তিনি একক ঘরের বাসিন্দা, তা সত্ত্বেও সেগুলি চোখের সামনে নষ্ট হতে তিনি দেখেছেন, এই প্রলোভন জয় করা কতখানি সংযমের পরিচয় তা লেখক একবার ভেবে দেখবেন কি? আর এই উপলক্ষ্যে আর একটি ঘটনারও উল্লেখ করতে পারি, ওই অনশনরত অবস্থায়ই কয়েকটি ছাত্র একটি বিশেষ প্রয়োজনে এক বন্ধুর বাড়ি গিয়েছিলেন, সেখানে সকলেই তাঁদের কিছু আহারের জন্য অনেক অনুরোধ-উপরোধ করেছিলেন। আর সেখানে ব্রতভঙ্গ করলেও কারোরই জানবার কিছু সম্ভাবনা ছিল না। তা সত্ত্বেও এঁরা প্রতিজ্ঞাভঙ্গে সম্মত হন নি। এ ঘটনা সেই পরিবারের কাছ থেকেই শোনা, এরকম দৃষ্টান্ত শুধু একটি নয়, আরো অনেকই আছে, এ সম্বন্ধে লেখক কিছু বলবেন কি?

বি, ই, কলেজের ছাত্রসংখ্যা দু' হাজার। এর মধ্যে অবশ্য কিছু উচ্ছৃঙ্খল ছাত্র স্বাভাবিকভাবেই আছে, কিন্তু অধিকাংশ ছাত্রই তা' নয়। একথা সবাই জানেন শ্রেষ্ঠ ছাত্রেরাই এই প্রতিষ্ঠানে প্রবেশের সুযোগ পায়। অনুমোদনপ্রাপ্তির পরীক্ষাও খুব কঠিন, তাঁদের আচার-

আচরণও সাধারণভাবেই অন্যদের চেয়ে উন্নত। সেক্ষেত্রে তাঁদের এই বিক্ষোভের কারণ সাংবাদিকের সংস্কারমুক্ত দৃষ্টি দিয়ে অনুসন্ধান করা উচিত ছিল। কিন্তু এই প্রবন্ধলেখক সে দায়িত্ব পালন করেন নি।

আজকাল একশ্রেণীর লোক আছেন যাঁদের সন্তানেরা বিদ্যা-বুদ্ধির উৎকর্ষে এই সব প্রতিষ্ঠানের যোগ্য নয়, ফলে জীবনে সাফল্যের সম্ভাবনাও তাঁদের কম। তাই এঁরা স্বাভাবিকভাবেই এই সব প্রতিষ্ঠান ও তাঁদের ছাত্রদের প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করেন। এই প্রবন্ধে তাঁদের মনোভাবেরই প্রতিফলন দেখে বিস্মিত হলাম। এই ছাত্রদের সঙ্গে "রকবাজ" ছেলেদের তুলনা এরই পরিচায়ক। আর এই কলেজের সব ছাত্রই যে প্রতিপত্তিশালী ধনীর সন্তান এ ধারণা ঠিক নয়। অনেকেই মধ্যবিত্ত গৃহস্থের সন্তান। কাজেই খুঁটির জোর তাঁদের এমন কিছু নয়। তা থাকলে আরো আগেই তাঁদের সমস্যার সমাধান হত, ৪০ ঘন্টা অনশনের প্রয়োজন হত না।

বর্তমান শিক্ষাসংকোচন নীতি সম্বন্ধে তিনি যা বলেছেন একথা সম্বন্ধেও সম্পূর্ণ একমত হতে পারলাম না। একথা ঠিকই উচ্চশিক্ষা খুব ব্যয়বহুল, কিন্তু তবু বর্তমানে দারিদ্র ও মেধার জন্য নানারূপ বৃত্তির ব্যবস্থা আছে। যেগুলি আগে একেবারেই ছিল না। বহু ছাত্র এর উপর নির্ভর করেই শিক্ষা চালিয়ে যেতে পারেন (যদি অবশ্য সে যোগ্যতা থাকে)। আর গৃহশিক্ষক ছাড়া হায়ার সেকেন্ডারীতে ভালভাবে উত্তীর্ণ হওয়া যায় না এই মূল্যবান তথ্যটি লেখক কোথা থেকে সংগ্রহ করলেন জানতে পারি কি? হায়ার সেকেন্ডারীতেই যাঁদের গৃহশিক্ষক লাগে তাঁরা উচ্চশিক্ষালাভের ব্যর্থ চেষ্টা না করে শারীরিক পরিশ্রম করে জীবিকা অর্জন করুন। তাতে দেশেরও উপকার, নিজেরও উপকার। অথবা শরীর তেমন সবল না হলে তথাকথিত সস্তা সাংবাদিকতা করুন তাতে বেশ বাঁধা বুলি কপ্চে বাহবা কুড়াতে পারবেন। পড়াশোনার মত কষ্টসাধ্য ব্যাপারে আসার প্রয়োজন কি?

—চিন্ময় দাশগুপ্ত, এম-এ
৫২এ, হিন্দুস্থান পার্ক

* * *

২২শে সেপ্টেম্বর 'বঙ্গদর্শনে' বি, ই, কলেজের অনশন ধর্মঘট নিয়ে যে ব্যাপারটা ঘটেছিল তার উৎস কি সেটা নিয়ে শিক্ষিত সমাজে উদ্বেগের অন্ত ছিল না। শিবপুর ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের সব ব্যাপারই যেন ঘটে আয়রন কার্টেনের পেছনে। ওখানে কি ঘটনা ঘটছে, কারা দোষী কারা নির্দোষ এ সব জানা প্রায় অসম্ভব। পুলিশের সঙ্গে বি, ই, কলেজের ছাত্রদের সংঘর্ষের খবর শুনে একটি দৈনিক পত্রিকার অফিস থেকে কলেজের ছাত্র ইউনিয়নের প্রেসিডেন্টের কাছে ফোন করা হ'য়েছিল ব্যাপার কি জানতে। ফোনে খবর দিতে রাজী হ'লেন না প্রেসিডেন্ট। বললেন লিখিত বিবৃতি দেবেন। দৈনিকটি কোন লোক পাঠাতে পারেন বা তাঁরাই লোক মারফৎ এটা দৈনিক পত্রিকা অফিসে পাঠিয়ে দেবেন। পত্রিকা অফিস থেকে যিনি ফোন করেছিলেন চটে গিয়ে ফোন নামিয়ে রাখলেন। পরে পুলিশের কাছে ফোন ক'রে যেটুকু বিকৃত খবর পেলেন সেটুকুই ছাপিয়ে দিয়ে দায় সারলেন। সঠিক খবর জানতে না পেরে ছাত্র ফেডারেশনের জেনারেল সেক্রেটারী প্রথমে বি, ই, কলেজের ছাত্রদের নিন্দা ক'রে একটা বিবৃতি দিয়েছিলেন। উল্লিখিত দৈনিক পত্রিকাটি পরে আসল খবর জানতে পেরে, নিজেদের সংশোধন ক'রে নিয়েছিলেন। সব পত্রিকাই তাই করলেন। ছাত্র ফেডারেশনের জেনারেল সেক্রেটারী পরে নিজের অজ্ঞতার জন্য ক্ষমা চেয়ে নিলেন।

আসল ব্যাপার কি হ'য়েছিল, শালিমার ইয়ার্ডের রেল ওয়াগন-ভাঙা গুন্ডাদের সংগে কি কারণে ছাত্রদের গোলমাল বাধে এবং কিভাবে পুলিশ কেবলমাত্র ছাত্রদের ওপর আক্রমণ করে ও তাদের মাথা ফাটিয়ে ব্যাপারটার নিষ্পত্তি করতে চেয়েছিল তার বিস্তৃত বিবরণ অপর একটি বিখ্যাত দৈনিক পত্রিকা কিছুদিন আগে দিয়েছেন।

নির্ভীক নিরপেক্ষ মতবাদের জন্য 'বঙ্গদর্শন' আমাদের অভিনন্দন পেয়ে থাকে। কিন্তু অসাবধানতাবশতঃ যদি কোন ভুল বা অসম্পূর্ণ তথ্য পরিবেশন করা হয় তবে প্রতিবাদ না করে পারবো না। এতে 'বঙ্গদর্শনের' জনপ্রিয়তা বাড়বে বৈ কমবে না।

—শিশির নিয়োগী
হাবড়া (২৪ পরগনা)

* * *

গত ৬ই সেপ্টেম্বর সাপ্তাহিক বসুমতীতে প্রকাশিত সমীর বসুর 'পেশাদারত্ব ও অপেশাদারত্বের প্রশ্ন' শীর্ষক লেখার প্রতিবাদ করেছেন ২২শে সেপ্টেম্বরের পত্রিকায় জ্যোৎস্না ভট্টাচার্য, মায়া ভট্টাচার্য ও লিলি ভট্টাচার্য।

দুঃখের বিষয়, পত্র-লেখিকাগণ যেভাবে লেখক সমীরবাবুকে আক্রমণ করেছেন, তা কোন মতেই সমর্থন করতে পারছি না। 'বিশিষ্ট ফুটবল তারকার ওপর কলঙ্ক রটনায়' লেখিকাগণ বড়ই বিচলিত হয়েছেন। অপেশাদারত্বের নামাবলী গায়ে দিয়ে, তাঁদের কেউ সিনেমায় নামছেন, কেউ কেউ দৈনিক কাগজে নিজেদের নাম দিয়ে লিখে অর্থ উপার্জন করছেন। সুতরাং এঁরা অপেশাদারত্বের সংজ্ঞা হারিয়েছেন,—এই অভিযোগ করে এঁদেরকে আসামীর কাঠগড়ায় দাঁড় করিয়েছেন রাজস্থান ক্লাবের বি পি হিম্মৎসিংকা। অপেশাদার খেলোয়াড় হয়ে যদি অপেশাদারত্বের আড়ালে পেশাদারীসুলভ আচরণ করেন, তাহলে তাঁরা নিশ্চয়ই দণ্ডনীয়। সুতরাং পত্র-লেখিকাগণ অযথা 'কলঙ্ক রটনা'র কি দেখলেন বুঝতে পারলাম না। অথচ আমাদের এই পশ্চিম বাংলায় একজন উদীয়মানা তরুণী এ্যাথলেট অনিতা মুখার্জীর ছবি কোন ব্যবসায়ী সংস্থা কর্তৃক যখন বিজ্ঞাপিত হলো, তখন তাঁকে চিরজীবনের মত সাসপেন্ড করা হলো। এর বেলায় তো পত্র-লেখিকাগণ কোন উচ্চবাচ্য করলেন না।

পত্র-লেখিকাগণ আরও যুক্তি দেখিয়েছেন যে, উক্ত খেলোয়াড়গণের বিরুদ্ধে পেশাদারত্ব ও অপেশাদারত্বের প্রশ্ন নিয়ে আন্তর্জাতিক ক্রীড়াসংস্থার সভাপতি মিঃ আভেরী ব্রান্ডেজের নিকট অভিযোগ করলে তিনি চুপ করে ছিলেন। একথা সম্পূর্ণ অসত্য। কারণ মিঃ হিম্মৎসিংকার পত্রের জবাবে মিঃ ব্রান্ডেজ গত ৯।৯।৬৫ তারিখের পত্রে স্পষ্টই বলেছেন, "..are all contrary both to the Olympic rules and the Olympic spirit."

পরিশেষে শ্রীহিম্মৎসিংকাজীর প্রস্তাব অনুযায়ী আমাদের দেশে ফুটবলে পেশাদারত্ব চালু করার জন্য সমীরবাবুর যুক্তি সমর্থন করছি। কারণ এই প্রথা চালু করলে আমাদের ফুটবলের মান উন্নত হবে এবং আন্তর্জাতিক [illegible] আসরে আমাদের সুনাম [illegible] সর্বোপরি আমাদের খেলোয়াড়রা [illegible] জানবেন যে, খেলাধুলাই তাঁদের জীবন ও জীবিকার ব্যাপার তখন তাঁরা খেলাধুলায় পূর্ণভাবে আত্মনিয়োগ করবেন। এ বিষয়ে স্বনামধন্য ক্রীড়া-সমালোচক বেরী সর্বাধিকারীর মন্তব্য প্রণিধানযোগ্য—"To adopt soccer as a profession, the person concerned must be assured."

(*HINDUSTHAN STANDARD*
২৮শে আগস্ট, ১৯৬৬)

—কাজী জহর আলী
সাং—চক কমলা
পোঃ—ওড়ফুলী
হাওড়া

ইস্টবেঙ্গলের আই, এফ, এ শীল্ড বিজয়

ভারতীয় ফুটবলের অন্যতম শ্রেষ্ঠ সম্মান আই, এফ, এ শীল্ডের বুকে ১৯৬৬ সালে খোদিত হল আবার সেই সর্বজনপ্রিয় ইস্টবেঙ্গল ক্লাবের নাম। এবার শীল্ড বিজয়ের ফলে ইস্টবেঙ্গল ক্লাব লাভ করল মরশুমের ডাবলের দুর্লভ সম্মান—কারণ ইতিপূর্বে তারা করায়ত্ত করেছে এ বছরের লীগের সম্মান। অবশ্য ভারতীয় ফুটবলের অন্যতম প্রাচীন এবং ঐতিহ্যশালী ইস্টবেঙ্গল ক্লাবের ইতিহাসে এই সম্মান প্রথম নয়, কারণ ইস্টবেঙ্গল ক্লাবের ইতিহাস স্বর্ণময় নানা গৌরবময় বিজয়ের কাহিনীতে পূর্ণ।

ইস্টবেঙ্গল ক্লাব প্রথম শীল্ডের সম্মান লাভ করে ১৯৪৩ সালে। এরপর ১৯৪৫ সালে, ১৯৪৯ সাল থেকে ১৯৫১ সাল পর্যন্ত পরপর তিনবার, ১৯৫৮ সালে, ১৯৬১ সালে মোহন-বাগানের সঙ্গে যুগ্মভাবে এবং ১৯৬৫ সালে পরপর দুবার আই, এফ, এ শীল্ড লাভ করে ইস্টবেঙ্গল মোট ন'বার বিজয়ীর গৌরব অর্জন করেছে। আজ পর্যন্ত ইস্টবেঙ্গল ক্লাব শীল্ডের ফাইন্যালে উন্নীত হয়েছে মোট পনেরোবার, জয়ী হয়েছে ন'বার, পরাজিত হয়েছে পাঁচবার এবং একবার জয়ী হয়েও ইস্টবেঙ্গল বিজয়ীর সম্মান লাভ করতে পারে নি। ১৯৫৩ সালে ফাইন্যালে ইস্টবেঙ্গল বোম্বাইয়ের ইন্ডিয়া কালচার লীগকে পরাজিত করে, কিন্তু বোম্বাই দল ইস্ট-বেঙ্গলের বিজয়ের বৈধতা সম্বন্ধে আই, এফ, এ-র টুর্নামেন্ট কমিটির কাছে প্রতিবাদ করে এবং সেই প্রতিবাদ গ্রাহ্য হয় এবং জয়ী হয়েও ইস্টবেঙ্গল শীল্ডের সম্মান হারায়। চারবার ডাবল বিজয়ী ইস্টবেঙ্গল ক্লাবের এবারের বিজয়ে জানাই আন্তরিক অভিনন্দন; জয়তু ইস্টবেঙ্গল, সাবাস ইস্টবেঙ্গলের ফুটবল বীরেরা।

ইস্টবেঙ্গলের এবারের বিজয়ে বিরাট অবদান হল সর্বজনপ্রিয় সেই প্রাণচঞ্চল খেলোয়াড় পরিমল দের। পুনরনুষ্ঠিত ফাইন্যাল খেলায় বি, এন, রেলের বিপক্ষে প্রথমার্ধের ছাব্বিশ মিনিটের সময় সুযোগ-সন্ধানী পরিমল দে দলের পক্ষে একমাত্র বিজয়সূচক গোলটি করেন।

শীল্ডের প্রথম দিনের খেলাটি গোল-শূন্যভাবে শেষ হয়। খেলার ধারা অনু-যায়ী সেদিন ইস্টবেঙ্গলের জয়ী হওয়া উচিত ছিল। কিন্তু ইস্টবেঙ্গল দলের পুরোভাগের খেলোয়াড়েরা প্রাপ্ত সহজ সুযোগগুলি অপচয় করার ফলে কোন গোল হয় নি। শুকনো মাঠে দু'দলের খেলাই তেমন উন্নত হয় নি, বলতে গেলে প্রথম দিনের ফাইন্যাল খেলা দেখে কারুরই মন ভরে নি। ইস্টবেঙ্গল গোলের সুযোগ পেলেও, বলতে গেলে

বস্ফোরাস প্রণালী সন্তরণের পূর্বে প্রস্তুত হচ্ছেন মিহির সেন

বি, এন, রেলের খেলা এইদিন ভালই হয়েছিল। বিশেষ করে উল্লেখ করতে হয় রেলদলের গোলরক্ষক দীপক দাসের কথা। দীপক দাস এইদিন কয়েকটি অবধারিত গোলের সুযোগ ব্যর্থ করেছেন। এইদিন খেলার পরিচালনা খুবই নিম্ন-

---

শ্রীঅমিতাভ

মানের হয়—অবশ্য তার জন্য দিল্লীর রেফারী ইক্রামুল হকের চেয়ে বেশি দায়ী লাইন্সম্যান স্বিজেন সেন।

পুনরনুষ্ঠিত ফাইন্যালে, যোগ্য দল হিসাবেই ইস্টবেঙ্গল ক্লাব বিজয়ী হয়। বর্ষণসিক্ত পিচ্ছিল মাঠে খেলোয়াড়দের যথেষ্ট অসুবিধা হয়, তাছাড়া ছিল এলো-মেলো হাওয়া। সেন্টার ফরোয়ার্ডের স্থানে গুরুকৃপাল সিং যোগদান করায় দলের মনোবল বৃদ্ধি পায়। ইস্টবেঙ্গল ক্লাবের পুরোভাগের আক্রমণধারা রচনার মূল উৎস ছিলেন পরিমল দে। ইস্ট-বেঙ্গল দলের হীরো ছিলেন রক্ষণভাগে প্রবীণ খেলোয়াড় রামবাহাদুর এবং পুরো-ভাগে পরিমল দে। রক্ষণভাগে চন্দন ব্যানার্জী, শান্ত মিত্র ও প্রশান্ত সিংহের অবদানের কথাও উল্লেখযোগ্য। গুরু-কৃপাল সিং তাঁর খ্যাতি অনুযায়ী মোটেই খেলতে পারেন নি। তিনি দিনের কয়েকটি গোলের সহজ সুযোগ নষ্ট করেন।

অপর পক্ষে বি, এন, রেল দলের পক্ষে সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন রক্ষণভাগে অরুণ ঘোষ এবং পুরোভাগে বি সুর। যদিও অরুণ ঘোষ সারা খেলায় মাত্র দুটি ত্রুটি করে-ছেন এবং একটির ফলে পরিমল গোল করেছেন। কল্যাণ সাহা ও টি চৌধুরীর খেলাও ভাল হয়।

বি, এন, রেল দল ইস্টবেঙ্গলের কাছে

ন্যূনতম গোলের ব্যবধানে পরাজিত হয়েছে বটে কিন্তু তারা খেলার শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত তীব্র প্রতিদ্বন্দিতা করে গিয়েছে। প্রথমার্ধের ছাব্বিশ মিনিটের সময় অরুণ ঘোষের একটি ত্রুটির ফলে একটি বল পেয়ে পরিমল দে কয়েকজন রক্ষণভাগের খেলোয়াড়কে সুন্দরভাবে কাটিয়ে বিজয়সূচক গোল করেন। এরপর দ্বিতীয়ার্ধে ইস্টবেঙ্গল কয়েকটি গোলের সুযোগ পেয়ে অপচয় করেছে এবং খেলার শেষভাগে বি, এন রেল দল আপ্রাণ চেষ্টা করেছে গোল পরিশোধ দেবার।

খেলার শেষে সমর্থকদের বাঁধভাঙা আনন্দের বন্যায় প্লাবিত হয় ইস্টবেঙ্গল ক্লাব প্রাঙ্গণ। হাজার হাজার লোকের ভিড়ে ইস্টবেঙ্গল মাঠ এক নতুন রূপ পরিগ্রহ করে। অবশ্য প্রতিকূল আবহাওয়া সমর্থকদের আনন্দ উৎসবে কিছুটা বাধার সৃষ্টি করে বটে কিন্তু ম্লান করতে পারে নি এক কণাও।

হেরম্ব মৈত্র শীল্ডের খেলায় মজার ঘটনা

২৪শে সেপ্টেম্বর বিশ্ববিদ্যালয় মাঠে হেরম্ব মৈত্র শীল্ডের ৪র্থ রাউণ্ডের একটি খেলায় অদ্ভুত পরিস্থিতির উদ্ভব হয়। এই খেলায় কে বসু সেণ্ট্রাল দল স্যার গুরুদাস কলেজকে ৬—১ গোলে পরাজিত করে কোয়ার্টার ফাইনালে খেলার যোগ্যতা অর্জন করে। খেলার শেষে বিজয়ী দলের জনৈক খেলোয়াড়ের যোগ্যতা সম্বন্ধে প্রতিবাদ ওঠে এবং ফটোযুক্ত আইডেণ্টিটি কার্ড দাখিল করে খেলোয়াড়কে সনাক্ত করার দাবি ওঠে। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে বেশ একটা জটলা ও হৈ-হল্লার সৃষ্টি হয়। গোলমাল থামলে যখন অভিযুক্ত খেলোয়াড়ের অনুসন্ধান করা হয় তখন দেখা যায় গোলমালের সুযোগে শ্রীমান উধাও হয়েছেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিযোগিতায় এই ধরণের অবাঞ্ছিত ঘটনা লজ্জাকর। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলি এই ধরণের আপত্তিকর কার্যকলাপ থেকে বিরত থাকবে আশা করি।

গ্যারফিল্ড সোবার্স

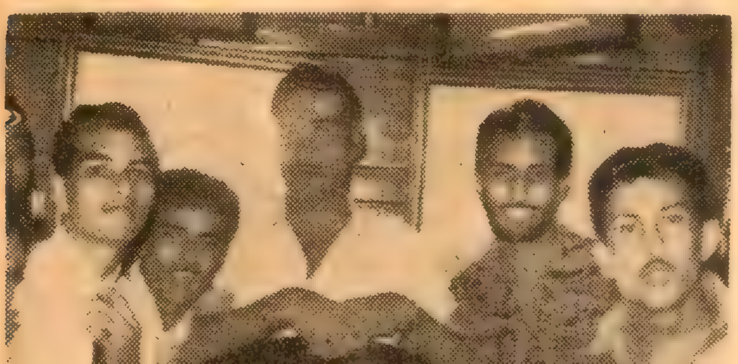

আই, এফ, এ, শীল্ড সহ বিজয়ী ইস্টবেঙ্গল দলের কয়েকজন খেলোয়াড়

অস্ট্রেলিয়ান অধিনায়ক সিম্পসনের সমালোচনার কশাঘাত

অস্ট্রেলিয়ার বর্তমান ক্রিকেট অধিনায়ক ববি সিম্পসন তাঁর নতুন বই "অধিনায়কের গল্পতে" ওয়েস্ট ইণ্ডিজের ফাস্ট বোলিংকে বেশ জোরালো খোঁচা মেরেছেন। তিনি মন্তব্য করেছেন ওয়েস্ট ইণ্ডিজ দল যদি বিশ্ব ক্রিকেটে তার শ্রেষ্ঠত্ব বজায় রাখতে চায় তাহলে অস্বাস্থ্যকর দুষ্ট বীজাণুগুলি যা ফাস্ট বোলিং-এর মধ্যে লুক্কায়িত আছে তাদের সমূলে বিনাশ করতে হবে। দৈহিক শক্তির সুযোগ নিয়ে ব্যাটসম্যানকে ভয় দেখানো যুদ্ধের সময় বিপক্ষের বিরুদ্ধে জীবাণু বোমা

শীল্ড ফাইন্যালে কে শর্মার একটি হেড প্রতিহত করছেন রেলদলের গোলরক্ষক দীপক দাস

নিক্ষেপ করার সমতুল। ক্রিকেট খেলায় এই ধরণের দূষিত প্রচেষ্টাকে দূর করতে হবে। এই বইতে তিনি ইংলণ্ডের ক্রিকেটকেও রেহাই দেন নি। এর ফলে ইংলণ্ডে এই বইটি নিয়ে বেশ আলোড়নের সৃষ্টি হয়েছে।

ইংলণ্ডের একটি খ্যাতনামা সংবাদপত্রের একজন প্রতিনিধি তীব্র প্রতিবাদ ...ছেন সিম্পসনের এই বইয়ের বিরুদ্ধে। ...ম্পসন তাঁর এই বইয়ে লেন হাটন, ফ্রাঙ্ক ওরেল, গ্যারফিল্ড সোবার্স এমন কি কলিন কাউড্রেকে পর্যন্ত অব্যাহতি দেন নি। কয়েকজন ক্রিকেট সমালোচক বলেছেন যে, আগামী মার্চ মাসে বার্বাডোজে একটি প্রদর্শনী ক্রিকেট খেলায় অবশিষ্ট বিশ্ব একাদশের নির্বাচিত অধিনায়ক ববি সিম্পসনকে দল থেকে বাদ দেওয়া উচিত।

ববি সিম্পসন বলেছেন যে অবশিষ্ট বিশ্ব একাদশের খেলায় তাঁর পক্ষে খেলা সম্ভব নয় এবং তাঁর এই অনিচ্ছার কথা তিনি কয়েক মাস পূর্বেই জানিয়েছেন। তিনি আরও বলেছেন যে, তাঁর লেখা বইয়ের বিরুদ্ধে সমালোচনা থেকে উদ্ভূত পরিস্থিতির জন্য কিন্তু তিনি খেলতে অনিচ্ছুক নন, তাঁর এই সিদ্ধান্ত বহু পূর্বের।

সমাচার দর্পণ

পশ্চিমবঙ্গ এ্যামেচার এ্যাথলেটিক ফেডারেশনের কার্যকরী সমিতির সভায় কুমারী অনিতা মুখার্জীর বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা প্রত্যাহার করেছেন। এক বছর পূর্বে একটি ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানের বিজ্ঞাপনে নিজের ফটো ব্যবহার করার অনুমতি দেবার জন্য পশ্চিমবঙ্গ এ্যামেচার এ্যাথলেটিক ফেডারেশন অনিতার বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করেন। কুমারী অনিতা মুখার্জী জানান যে, তাঁর ফটো ব্যবহারের অনুমতি দেবার পরিবর্তে তিনি কোন অর্থ ওই প্রতিষ্ঠানের কাছ থেকে গ্রহণ করেন নি এবং তাঁর বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা প্রত্যাহারের আবেদন করেন। আলোচনা এবং পুনর্বিবেচনার পর ফেডারেশন পূর্বের সিদ্ধান্তের পরিবর্তন করেন।

* * *

আগামী ভারত সফরের জন্য দশজন খেলোয়াড়ের নাম ওয়েস্ট ইণ্ডিজ ক্রিকেট কণ্ট্রোল বোর্ড কিছুদিন পূর্বেই ঘোষণা করেছিলেন। এবার অবশিষ্ট দুজন খেলোয়াড়ের নাম প্রকাশ করেছেন তাঁরা। এঁরা হলেন লেস্টার কিং, উইকেট রক্ষক ডেরেক মারে, রায়ান ডেভিস, রবিন বাইনিয়ো, ক্লাইভ লয়েড এবং রেক্স ফলিমোর। দলের পক্ষে দুজন নবাগত খেলোয়াড় হলেন ন্যাটা ব্যাটসম্যান লয়েড এবং স্পিন বোলার ফলিমোর। দলের সর্বকনিষ্ঠ সদস্য ২১ বৎসর বয়স্ক লয়েড হলেন সম্পর্কে ল্যান্স গিবসের ভাই।

ক্রিকেট সমীক্ষা

ভারতীয় ক্রিকেটের কর্ণধার বরোদার মহারাজা হাল ছেড়ে দিলেন। নতুন কর্ণধার হলেন এল, আর, ইরানী। বিদায় ভাষণে মহারাজা ভারতীয় ক্রিকেটের প্রতি

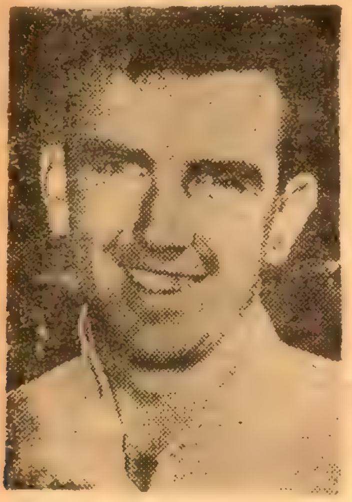

ববি সিম্পসন

সরকারের চরম অবহেলাকে তীব্র ভাষায় সমালোচনা করেন। গত বছর ভারতীয় তরুণ খেলোয়াড়দের নিয়ে গঠিত কোল্টস্ দলের ইংলণ্ড সফর বাতিল সরকারী উপেক্ষার একটি জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত। ভারতীয় ক্রিকেটের মর্যাদাকে উচ্চাসনে প্রতিষ্ঠিত করতে হলে তরুণ প্রতিভার উন্মেষের পথ প্রশস্ত করতে হবে। যদি গত বছর উদীয়মান খেলোয়াড়ের দল ইংলন্ডের মাটিতে ক্রিকেট অনুশীলনের সুযোগ পেত, তাহলে আগামী গ্রীষ্মকালীন ইংলণ্ড সফরে এই তরুণ দলের অভিজ্ঞতা ভারতীয় দলকে শক্তিশালী করত। কিন্তু অতি তুচ্ছ অজুহাতে ভারত সরকার এই সফরের জন্য বৈদেশিক মুদ্রা মঞ্জুর করতে রাজী হন নি। এর ফলে ভারতীয় ক্রিকেটের যথেষ্ট ক্ষতি হয়েছে। এই প্রসঙ্গে তিনি উল্লেখ করেন যদি ভারত সরকার যথেষ্ট সময় থাকতে কি পরিমাণ বৈদেশিক মুদ্রা মঞ্জুর করা সম্ভব তা ফেডারেশনকে জানিয়ে দেন তাহলে ফেডারেশন সেইভাবে সফরাদির ব্যবস্থা করতে পারেন। তা না হলে ফেডারেশন কর্তৃক আয়োজিত সফর শেষ মুহূর্তে ভারত সরকারের অনমনীয় মনোভাবের জন্য বাতিল করতে হলে আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে ভারতের সুনাম নষ্ট হওয়ার সম্ভাবনা। নব-নির্বাচিত সভাপতি ইরানীর হাতে ভারতীয় ক্রিকেট কণ্ট্রোল বোর্ডের দায়িত্ব-ভার দিয়ে বরোদার মহারাজা তাঁর তিক্ত অভিজ্ঞতা জোরালো ভাষায় ব্যক্ত করেন।

পেছনের দিকে তাকালে ভারতীয় ক্রিকেটের একটা পরিপূর্ণ রূপ চোখে পড়ে। ১৯৬৪ সালে মাইক স্মিথের নেতৃত্বে ভারত সফরকারী ইংলণ্ড দলের বিরুদ্ধে ফলাফল হয়েছিল সমান সমান। তারপর এল অস্ট্রেলিয়ার ক্রিকেট দল ববি সিম্পসনের পরিচালনায়। এই শক্তিশালী দলের বিরুদ্ধে বোম্বাই টেস্টে ভারতের জয় উল্লেখযোগ্য। তারপর ভারত শক্তি পরীক্ষা করল সিংহল দলের সঙ্গে। তিনটি টেস্টের মধ্যে ভারত দুটি জিতল এবং সিংহল একটি। সিংহলের কাছে ভারতের পরাজয় অনেকটা আকস্মিক এবং বিপক্ষের শক্তির প্রতি অবহেলা দেখিয়ে দল গঠনও কিছু পরিমাণে দায়ী। এর পর ভারত অতি সহজেই নিউজিল্যান্ড দলকে পরাজিত করে। এক ওয়েস্ট ইণ্ডিজ দল ছাড়া আর সব দলের বিরুদ্ধে ভারত গত দু-তিন বছর খেলেছে এবং ভাল ফলাফল দেখিয়েছে।

ভারতের সবচেয়ে দুর্বলতা ফাস্ট বোলারের আক্রমণের মুখে। ভারতে সত্যিকারের কোন ফাস্ট বোলার নেই। তাই ভারতীয় খেলোয়াড়রা প্রকৃত ফাস্ট বোলিংকে রুখতে পারে না। সব দেশের খেলোয়াড়ই জোরালো ফাস্ট বোলিং-এর বিরুদ্ধে খেলতে বেশ অস্বস্তি অনুভব করে। কিন্তু ভারতের খেলোয়াড়রা ফাস্ট বোলিং-এর মুখে কোনরকমে আত্মরক্ষামূলক ভূমিকা গ্রহণ করে। এবং এই রক্ষণমূলক খেলার ফলে সহজেই আউট হয়ে যায়। ভারতীয় দল গুগলী বোলিং-এর দিক দিয়ে বেশ শক্তিশালী। তা ছাড়া ভারতীয় দলে বেশ কয়েকজন অলরাউণ্ডার থাকায় শেষ খেলোয়াড় পর্যন্ত ব্যাটিং-এর দিক দিয়ে বেশ নির্ভরযোগ্য। বোলিং-এর দিক দিয়ে মাদ্রাজের ভেঙ্কট রাঘবন এবং মহীশূরের চন্দ্রশেখরের ভবিষ্যৎ খুব উজ্জ্বল। ক্রিকেট খেলায় ফিল্ডিং-এর গুরুত্ব খুব বেশি। উন্নত ফিল্ডিং শুধু রানই বাঁচায় না বিপক্ষের উইকেটের দ্রুত পতন ঘটায়। সামান্যতম সুযোগও যদি হাতের মুঠোর মধ্যে থেকে স্খলিত না হয় তাহলে বোলাররা বিপুল উৎসাহে আঘাতের পর আঘাত হানতে পারে। আশার কথা বর্তমানে ভারতীয় টিমের ফিল্ডিং যথেষ্ট সম্ভাবনাময়। শেষ কথা ভারতীয় পিচগুলি বড্ড মন্থর খেলার উপযোগী। বোলাররা হাজার চেষ্টা করেও আক্রমণে প্রাণ সঞ্চার করতে পারে না। ফলে পাঁচ দিনের খেলায় জয়-পরাজয়ের কোন নিষ্পত্তি হয় না। সমস্ত সুবিধা-অসুবিধার হিসাব-নিকাশ করলে

পতৌদির নবাব

এ কথা নিঃসন্দেহে বলা যায়—ভারতীয় ক্রিকেট আজ পূর্ণতার পথে দৃঢ় পদক্ষেপে এগিয়ে চলেছে।

—শ্রীকাশীনাথ মজুমদার

সম্পাদিকা—জয়ন্তী সেন

বসুমতী (প্রাঃ) লিঃ-এর পক্ষে ১৬৬, বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী স্ট্রীটস্থ কলিকাতা-১২
বসুমতী প্রেস হইতে শ্রীসুকুমার গুহমজুমদার কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

সাপ্তাহিক বসুমতী

নেপাল সফরে প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী

র্ষ : ১৯শ সংখ্যা, বৃহস্পতিবার, ২৬শে আশ্বিন, ১৩৭৩ বঙ্গাব্দ   13th Oct., 1966 * Vol. 71. No

ফেমিলো স্নো

একালের রূপ-কথায় শেষ কথা

সূচীপত্র

বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা
সম্পাদকীয়		১১৫৫
আজকের মানুষ		১১৫৬
ভারতদর্শন		১১৫৭
আন্তর্জাতিক		১১৫৯
ঋষি শ্রীঅরবিন্দ (প্রবন্ধ)	— শ্রীদিলীপকুমার রায়	১১৬০
সুবর্ণলতা (ধারাবাহিক উপন্যাস)	— আশাপূর্ণা দেবী	১১৬৭
অস্ট্রেলিয়া থেকে লিখছি	— সুরেশচন্দ্র সাহা	১১৭০
রৌদ্রসুরভি (কবিতা)	— মাণিক মুখোপাধ্যায়	১১৭২
অগ্নিযুগের একটি অধ্যায়	— অনন্ত সিংহ	১১৭৩
বেদব্যাস-এর রস-রচনা : অমৃতসমান		১১৭৮
বঙ্গদর্শন		১১৮১
বিশ্বসাহিত্যের আদিপর্ব	— ডঃ নরেন ভট্টাচার্য	১১৮৩

শ্রীমদ্ভাগবত

প্রাচীন ভক্তদের রচিত সুললিত বাংলা পয়ারে

মূল্য পাঁচ টাকা মাত্র

এই সুবৃহৎ গ্রন্থে আছে—শ্রীল সনাতন গোস্বামীর 'ভাগবতামৃত' গ্রন্থের কবিচন্দ্রের বঙ্গানুবাদ এবং শ্রীগৌরাঙ্গের প্রিয়তম ভাগবতাচার্য্য রঘুনাথ পণ্ডিতের প্রেমতরঙ্গিণী।

ইহাতে আছে দুইখানি অমূল্য গ্রন্থ

শ্রীল সনাতন গোস্বামীর ভাগবতামৃতের অনুবাদ

কবিচন্দ্রের

শ্রীবৃহদ্ভাগবতামৃত

এবং

ভাগবতাচার্যের বিশ্বপ্রসিদ্ধ

শ্রীকৃষ্ণ প্রেমতরঙ্গিণী

সমগ্র ভারতে প্রথম বঙ্গানুবাদ

"...শুনিয়া তাহার ভক্তিযোগের পঠন।
আবিষ্ট হইল গৌরচন্দ্র নারায়ণ॥"

ইহা কৃত্তিবাসী রামায়ণ এবং কাশীরাম দাসের মহাভারতের ন্যায় বাংলার প্রতি গৃহস্থের অবশ্যপাঠ্য হউক, এই নিবেদন। এই মূল্যবান গ্রন্থ বাংলার প্রতি ঘরে প্রতিষ্ঠিত করুক।

সাহিত্য-সম্রাট—বন্দেমাতরম্ মন্ত্রের ঋষি

বঙ্কিমচন্দ্রের গ্রন্থাবলী

—উপন্যাস—

প্রথম খণ্ড :—রাজসিংহ, বিষবৃক্ষ, দুর্গেশনন্দিনী... (সচিত্র) — মূল্য—৩, টাকা।

প্রথম খণ্ড :—রাজসিংহ, বিষবৃক্ষ, যুগলাঙ্গুরীয়, মৃণালিনী, রজনী। [সচিত্র] মূল্য—৩, টাকা।

দ্বিতীয় খণ্ড :—দুর্গেশনন্দিনী, কৃষ্ণকান্তের উইল, ইন্দিরা, রাধারাণী, সীতারাম। মূল্য—২, টাকা।

তৃতীয় খণ্ড :—আনন্দমঠ, চন্দ্রশেখর, কপালকুণ্ডলা, দেবী চৌধুরাণী। [সচিত্র] মূল্য—৩, টাকা।

—সাহিত্য—

প্রথম খণ্ড :—কৃষ্ণচরিত্র, লোকরহস্য, বিবিধ প্রবন্ধ (১ম)। মূল্য—২, টাকা।

দ্বিতীয় খণ্ড :—(১ম ভাগ অনুশীলন), মুচিরাম গুড়, বিবিধ প্রবন্ধ (২য়), বিজ্ঞান রহস্য। মূল্য—২, টাকা।

তৃতীয় খণ্ড :—শ্রীমদ্ভগবদগীতা, কমলাকান্ত, সাম্য, সাহিত্য-প্রসঙ্গ, মানস, ললিতা। মূল্য—২, টাকা।

বসুমতী প্রাইভেট লিমিটেডঃ ১৬৬, বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী স্ট্রীট, কলি-১২

সূচীপত্র

বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা
ঈশ্বর (গল্প)	প্রিয়ব্রত মুখোপাধ্যায়	১১৮৮
এইচ, জি, ওয়েলস্-এর গল্প	ডঃ বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য	১১৯০
বিপ্লব প্রচেষ্টার একটি বিস্মৃত অধ্যায়	সত্যেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়	১১৯৪
বিজ্ঞান ও বিশ্বের অন্তর্লোক (প্রবন্ধ)	আশিসকুমার সিংহ	১১৯৮
অন্য চোখে (অনুবাদ-গল্প)	কল্পনা বন্দ্যোপাধ্যায়	১২০১
রঙ্গমঞ্চ—ওদেশে এবং এদেশে	শিলাদিত্য	১২০৩
পাঠকমন		১২০৫
রূপজগৎ		১২০৬
প্রাচীন সাহিত্যে ভারতীয় সংস্কৃতি (প্রবন্ধ)	চিত্তরঞ্জন দেব	১২১১
খেলাধুলা	শ্রীঅমিতাভ	১২১৩

সর্বপুরাণ, সর্বতন্ত্র, সর্ব উপনিষদ, সমস্ত ভক্তিগ্রন্থ হইতে সঙ্কলিত

স্তবকবচমালা

(পঞ্চম সংস্করণ)

যে ঋষির যে স্তবে যে দেবতা আকৃষ্ট হইয়া বর প্রদান করিয়াছিলেন—পুরাণ, উপনিষদ, তন্ত্র, ভক্তিগ্রন্থরাশি মথিত করিয়া সেই সকল শ্রেষ্ঠ ভক্তিনিবেদন অতি যত্নে সুনির্বাচন—সঙ্কলন করিয়া স্তবকবচমালারূপে গ্রথিত। স্তব—ভক্তির উচ্ছ্বাস—দেবতার বন্দনাগীতি। আত্মনিবেদিত প্রাণে তন্ময় হইয়া স্তব পাঠে যে লাভ হয়—জাগতিক শক্তি তাহার নিকট অতি তুচ্ছ। স্তবকবচমালায় প্রায় ৫০০ দেব-দেবীর স্তব-সন্নিবেশিত।

মূল্য পাঁচ টাকা।

পৃথিবীর তরুণ-সমাজের হৃদয়জয়ী

স্যার ওয়াল্টার স্কটের গ্রন্থাবলী

দ্বিতীয় ভাগ

শরৎচন্দ্র মিত্র অনূদিত

আইভানহো, হাইল্যান্ড উইডো, কেয়ার মেড অফ পার্থ, সার্জনস্ ডটার

মূল্য—২·০০

তৃতীয় ভাগ

সরোজনাথ ঘোষ অনূদিত

দি ব্রাইড অব ল্যামারমুর, লিজেন্ডস অব মনট্রোজ, দি এ্যান্টিকোয়ারি

মূল্য ১৷৷০ টাকা।

সাহিত্য-জগতের গৌরবপ্রভা—হাস্যরসাবতার—নাট্যসাহিত্যের প্রবর্তক—রস-সাহিত্যের স্রষ্টা—রায় দীনবন্ধু মিত্র বাহাদুরের

দীনবন্ধু মিত্রের গ্রন্থাবলী

১ম ভাগে—জীবনী ও কবির সমালোচনা, নীলদর্পণ, জামাই বারিক, বিয়ে পাগলা বুড়ো, নবীন তপস্বিনী, কমলে কামিনী।

২য় ভাগে—সধবার একাদশী, যমালয়ে জীবন্ত মানুষ, পোড়ামহেশ্বর, কুড়ে গরুর ভিন্ন গোঠ, লীলাবতী, সুরধুনী

[illegible]

কবি বিহারীলাল চক্রবর্তীর গ্রন্থাবলী

রবীন্দ্রনাথ বলেন—"আধুনিক বঙ্গসাহিত্যে প্রেমের সংগীত এরূপ সহস্রধারে উৎসের মত কোথাও প্রোৎসারিত হয় নাই। এমন সুন্দর ভাবের আবেগ, কথার সহিত এমন সুরের মিশ্রণ আর কোথাও পাওয়া যায় না।"

বাঙ্গালার নব গীতিকবিতার এই প্রবর্তক, রবীন্দ্রনাথ, অক্ষয় বড়াল, রাজকৃষ্ণ রায় প্রভৃতির এই কাব্যগুরু ঋষি কবি বিহারীলাল চক্রবর্তীর রচনার সমাবেশ।

কবির জীবনী, সুবিস্তৃত সমালোচনা সহ সুবৃহৎ গ্রন্থ

মূল্য তিন টাকা

বসুমতী প্রাইভেট লিমিটেড, ১৬৬ বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী স্ট্রীট, কলিকাতা—১২

CALCU
CENTRAL
LIBRARY
UNIVERS

৭১ বর্ষ : ১৯শ সংখ্যা—মূল্য ২৫ পয়সা
বৃহস্পতিবার, ২৬শে আশ্বিন, ১৩৭৩ বঙ্গাব্দ

বাংলা ভাষায় দ্বিতীয় সর্বাধিক প্রচারিত
সাপ্তাহিক পত্রিকা

Price : 25 Paise
Thursday, 13th Oct., 1966

সমাগত শারদোৎসব

শারদোৎসবের আর বেশি দেরি নেই। রোদের রঙে নতুন আমেজ লেগেছে। আকাশে শুরু হয়েছে হাল্কা মেঘের খেলা। বাতাসে আন্দোলিত কাশফুলের নৃত্য-চপল ছন্দে দিগন্ত আলোড়িত। সন্ধ্যায় পল্লীর নিভৃত পথে পথে শিউলি ফুলের গন্ধ। সেকালের সেই আগমনী গান আজ আর শোনা যায় না, তবু একালের সাহিত্যও নিঃশব্দ নয়।

এতদ্‌সত্ত্বেও যে পূজাকে অবলম্বন করে আমাদের শারদোৎসব, সেই উৎসব যেন ধীরে ধীরে প্রাণহীন হয়ে উঠছে। সারা বছরের দুঃসহ কর্মক্লান্তিকে দূর করার জন্যে উৎসবের মধ্য দিয়ে যে অভিনব জীবন-জাগরণ শারদোৎসবে লক্ষ্য করা যায়—তা যেন প্রায় অপসৃয়মাণ।

কিন্তু কেন এই অবস্থা?

এই অবস্থার জন্য এখন আর প্রকৃতিকে দোষ দেওয়া নিরর্থক। কারণ সমাজ-জীবনে ও রাষ্ট্র-জীবনে যে ভেদাভেদ ও অকরুণ পার্থক্য আজ দৃষ্টিগোচর হচ্ছে, তা সাধারণ মানুষের নিকট অভিশাপ-স্বরূপ। একদিকে নৃশংস মুনাফাবাজারী, মজুতদারী ও কালোবাজারী; আর এক দিকে অসহায় মানুষের এক মুষ্টি অন্নের জন্য করুণ হাহাকার। তাই শরতের মাঠে মাঠে হরিৎ ধান্য শীর্ষের তরঙ্গাভাস দেখে তাদের সে সুখ কই, কোথায় সে আনন্দ?

শরতের আগমনে তাদের মন উৎসবকে গ্রহণের জন্য সর্বদাই উন্মুখ থাকলেও, ভয়ে শিহরিত হয় সারা শরীর। কি ...য়ে পালন করবে তারা উৎসব? কোথায় ...দের উদরান্ন, কোথায় বা পরণের বস্ত্র। ...ন প্রাত্যাহিক সংসারযাত্রা নির্বাহ ...এক অকল্পনীয় ব্যাপার, সেখানে ... জন্য উন্মত্ত হওয়া কি উচিত? ...ীর ঘরে অভাব ত' কোনো-দিনই এমন ছিল না। তবে আজ কেন বাঙালীর এই দশা?

এই দশা থেকে মুক্তিরই বা পথ কই? অথচ বয়স্করা যা বোঝেন, বালকেরা ত' তা বোঝে না। তারা চায় নতুন জামা, নতুন কাপড়, নতুন জুতো। অন্তত পূজার কটা দিন ভরপেট খাদ্যও আশা করে—সে খাদ্য সুখাদ্য না হোক, অখাদ্য যাতে না হয়: তবু মাতাপিতার সাধ্য নেই তাদের কামনা পূর্ণ করেন। কৃষক আজ মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়েছে, শ্রমিক ন্যায্য পাওনার দাবিতে মিছিলভুক্ত এবং নিম্নমধ্যবিত্ত সমাজের কেরানী পিতা নিরুপায় জননীও এখন সওদাগরী বা সরকারী অফিসে কলম চালিয়েও অসহায়।

এই অবস্থা আজ আর কারো অজ্ঞাত নয়, এর প্রতিবিধানও অসম্ভব নয়, তবু এমন কোনো বিধান রচিত হচ্ছে না যদ্দ্বারা অসুবিধন করে সমাজে ও রাষ্ট্রে সার্বিক কল্যাণকে চিরপ্রতিষ্ঠিত করা সম্ভব হয়।

সাধারণ মানুষের আর্থিক ক্লেশই বা কেন? এই ক্লেশের কারণ দ্রব্যমূল্যবৃদ্ধি, অথচ সে অনুপাতে বেতন বৃদ্ধি হয় নি। মাত্র একটি উদাহরণ দিলেই উপলব্ধি করা সম্ভব হবে যে, সাধারণ মানুষ আজ কেন এমন আর্থিক সংকটাপন্ন? এই পূজায় নতুন বসনে সজ্জিত হওয়া কোনো রকম বিলাস নয়, এটি আনন্দ-উদ্দীপনার একটি অবলম্বন মাত্র। কিন্তু সেই বসনের দাম ১লা অক্টোবর থেকে সরকার আরো বেশি বাড়িয়েছেন। ১লা অক্টোবরের পূর্বেও কিন্তু সুতি বস্ত্রের দাম কম ছিল না। বিগত পনের বছরের আগেকার ও পরের দামের তুলনামূলক আলোচনা করলে দেখা যাবে যে, মূল্য প্রায় ১৫।২০ গুণ বৃদ্ধি পেয়েছে। কিন্তু সেইভাবে কোনো চাকুরিয়ার বেতনের তুলনামূলক বৃদ্ধি যদি বিচার করা যায়, তাহলে দেখা যাবে যে, বেতন ঐ পনের বছরের হিসাবে বড় জোর দেড় গুণ কি দু' গুণ বেড়েছে। সুতরাং প্রতিটি জিনিসের দাম যেখানে বহুগুণে বৃদ্ধি পেয়েছে সেখানে নামমাত্র বৃদ্ধিপ্রাপ্ত বেতনে সামাল দেওয়া অসম্ভব। তাই, শারদোৎসবের আবির্ভাবে মন যতই প্রসন্ন হয়ে উঠুক, অভাবের তাড়নায় মানুষ যে আরো উদ্‌গ্রীব, চঞ্চল এবং ছন্নছাড়া। তাই আগমনী গান এখন কণ্ঠে কণ্ঠে লুপ্ত। আর একালের যে সাহিত্য তাও বা কতটুকু তাকে মুক্তির পথ দেখাতে পারে? মহৎ সাহিত্যিক একালেও রয়েছেন, যাঁরা সামাজিক সমস্যার প্রতি সচেতন থেকে তা থেকেই চিরকালের সাহিত্য সৃষ্টি করছেন। কিন্তু আর এক দলের হাত থেকেই বা নিস্তার কই? তাঁরা অক্ষম সাহিত্যিক হতে পারেন কিন্তু দলের ভার তাঁদের কম নয়। অর্থলিপ্সায় বাংলার সাহিত্যক্ষেত্রটিকে এঁরাই বিকৃত রুচির সাহিত্যের লীলাভূমি করে তুলতে আপ্রাণ প্রয়াসী।

সাধারণ মানুষ খুঁজছে এখন মুক্তির পথ। সে পথ তাঁরা দেখতে পাবেনই। উৎসবের মধ্য দিয়ে যে মিলনক্ষেত্র রচিত হবে—তারি মধ্য দিয়ে খুঁজে পাবেন তাঁরা সেই পথ। সার্থক হবে তাঁদের শারদোৎসব।

সম্পাদকীয়

আজকের মানুষ

আফ্রিকা জাগছে। এ-জাগরণ অবশ্য মাত্র আজ সুরু হয় নি, তিন বছর আগে ১৯৬০ সালে আফ্রিকার অনেকগুলি উপনিবেশ স্বাধীনতা লাভ করলে ওই বছরটি 'আফ্রিকা বছর' বলে খ্যাতি অর্জন করে। সেদিন যে মুক্তিধারা প্রবাহিত হতে আরম্ভ করে আজ বাসুতোল্যান্ড (লেসোতো) ও বেচুয়ানাল্যান্ডের (বটসোয়ানা) মুক্তিলাভে তা অব্যাহত রইলো। বৃটিশ হাই কমিশনার শাসিত বটসোয়ানা স্বাধীনতা পেলো। আর তার প্রথম প্রেসিডেন্টের পদলাভের সম্মান পেলেন সেরেৎসি খামা।

বস্তুত বেচুয়ানাল্যান্ডের রাজনৈতিক ইতিহাসের সঙ্গে যাঁদের কিঞ্চিৎ পরিচয়ও আছে তাঁরাই জানেন যে, রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ পদের দাবিদার একজনই এখন হতে পারেন এবং তিনি যে সেরেৎসি খামা ছাড়া দ্বিতীয় কোন ব্যক্তি নন, এ-বিষয়েও কোন মহলেই সন্দেহের অবকাশ থাকতে পারে না। অন্য সব কিছু বাদ দিলেও সেরেৎসি খামা বেচুয়ানাল্যান্ডের প্রধান-মন্ত্রী হিসেবে যে কর্মদক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন তার কথা মনে রাখলেই তাঁর যোগ্যতা সম্পর্কে আর কোন প্রশ্ন ওঠার সুযোগ থাকে না।

কিন্তু "অন্য সব কিছু" বাদ দেওয়াই বা কেন? অতীতকে বাদ দিয়ে বর্তমান দাঁড়াতে পারে নাকি, কিংবা সেরেৎসি খামাকে বাদ দিয়ে বটসোয়ানাকে চেনা সম্ভব কি? অপরপক্ষে যদি বলা যায় যে, বটসোয়ানা মানেই সেরেৎসি খামা, আর সেরেৎসি খামা মানেই বটসোয়ানা—তবে খুব অন্যায় করা হয় না। আজ ক্ষমতা হস্তান্তরিত হয়েছে বলেই নয়, জন্মসূত্রেই বটসোয়ানার রাষ্ট্র-প্রধানের গদীটি সেরেৎসি খামারই প্রাপ্য। এখানকার চীফ বা প্রধান মেগোমার (দ্বিতীয়) তিনি ছেলে আর প্রধান খামার (তৃতীয়) তিনি নাতি যে। বেচুয়ানাল্যান্ডের প্রধান উপজাতি বামাং-ওয়াতোর শাসকের পদে সেরেৎসি খামা যখন প্রতিষ্ঠিত হয়েছিলেন, তখন তাঁর বয়স মাত্র চার বছর। সন তখন ১৯২৫।

বামাংওয়াতোর রাজপদেই সেরেৎসি খামার প্রতিষ্ঠিত হবার কথা, কিন্তু ইংরাজদের শাসকচক্রের চক্রান্তে সে-সাধ তাঁর অপূর্ণ থেকে গিয়েছে। কিন্তু চক্রীর মতলব সাময়িকভাবে হাসিল হলেও শেষ পর্যন্ত যোগ্য ও ন্যায্য ব্যক্তিকে সেলাম ঠুকতে হয়েছে তার। প্রেসিডেন্ট-পদ রাজপদ থেকে কম কিসে?

আফ্রিকা মহাদেশকে সাম্রাজ্যবাদীরা 'অন্ধকার মহাদেশ' বলে অবজ্ঞা করতো। এখানকার কৃষ্ণাঙ্গদের অসভ্য, বর্বর বলে প্রচার করতো, এবং সেই সুযোগে একথাও বলতো যে এদের সুসভ্য ও শিক্ষিত করার বোঝা পড়েছে শ্বেতাঙ্গ ইংরেজদের ওপর। আসলে ওটা যে একটা মহাদেশকে দাবিয়ে রাখার ঘৃণ্য অপকৌশল—বহির্বিশ্ব একথা বুঝতে পেরেছিল অনেক দেরিতে। অন্ধকার মহাদেশকে আলোকিত করার নামে সাম্রাজ্যবাদী, উপনিবেশবাদী শাসকেরা আফ্রিকার স্বাভাবিক জ্যোতিকে পর্যন্ত হরণ করতে চেয়েছিল, পরাধীনতার শৃঙ্খল যাতে কৃষ্ণাঙ্গরা কোনদিন না

সেরেৎসি খামা

ভাঙতে পারে তার ব্যবস্থা পাকা করতে চেয়েছিল, যেমনটি চেয়েছিল তারা ভারত-বর্ষেও। আসলে বর্ণাভিমানী শ্বেতাঙ্গরা কৃষ্ণাঙ্গদের মানুষ বলেই গণ্য করতে চায় নি, গায়ের রঙ দেখে তারা মানুষের বিচার করতো এবং সেই সঙ্গে মনুষ্যত্বেরও। যত উঁচু পদই দখল করুন না কেন, দেশের বা জাতির যত সম্মানিত ব্যক্তিই হোন না কেন, যেহেতু তিনি কৃষ্ণাঙ্গ অতএব শ্বেতাঙ্গের পাশে আসন নেবার কোন যোগ্যতা তাঁর নেই—এই ছিল ইংরেজদের ন্যায় বিচার। এই ন্যায় বিচারের শিকার হয়ে কত আফ্রিকানকে যে লাঞ্ছনা ভোগ করতে হয়েছে এবং আজো হচ্ছে। তার কি ইয়ত্তা আছে? সেরেৎসি খামাও বাদ যান নি, হোন না কেন তিনি জাতির প্রধানের পদাধিকারী।

চার বছরের শিশু রাজ্য শাসন করতে পারে না, সেরেৎসি খামার অভিভাবক নির্বাচিত হলেন তাঁরই কাকা সেকেদি খামা, বয়স তাঁর ২০। সেকেদি জানতেন ইংরেজদের সঙ্গে যুঝতে হলে শুধু বাহু-বলে কুলোবে না। কিছু বিদ্যেবুদ্ধিও দরকার। তাই ভাইপোর সর্বোত্তম শিক্ষার ব্যবস্থা করলেন তিনি। সেরেৎসি পড়া-শুনো করলেন লাভডেল-এ, পরে ফোর্ট হেয়ার বিশ্ববিদ্যালয় কলেজে। এখান থেকে পাশ করে সেরেৎসি গেলেন দক্ষিণ আফ্রিকার উইটওয়াটারস্যান্ড বিশ্ব-বিদ্যালয়ে। সবশেষে এলেন খাস ইংরেজ-মুলুকে, অক্সফোর্ডে এসে সেরেৎসি পাঠ নিতে লাগলেন।

কিন্তু ২৭ বছরের যুবক সেরেৎসি বিলেত এসে জীবনে প্রথম ধাক্কাটি খেলেন। আর খেলেন সেই ইংরেজ-শাসককুলেরই কাছে। অপরাধের মধ্যে সেরেৎসি রুথ উইলিয়ামস বলে এক তরুণীর প্রতি অনুরক্ত হয়েছিলেন। ব্যস, আর যায় কোথায়। ইংরেজ রক্ত টগবগ করে উঠলো কালা আদমীর স্পর্ধা দেখে—শ্বেতাঙ্গিনীকে প্রেমনিবেদন করা! 'গেল গেল' রব উঠলো ইংলণ্ডে, তার ঢেউ গিয়ে আছড়ে পড়লো বেচুয়ানাল্যান্ড-উপকূলেও। সেকেদি খামা নিজেও অবশ্য সেরেৎসির ইংরেজ মহিলা বিয়ে করা অনুমোদন করতে পারেন নি, ওঁদের উপজাতীয় কাউন্সিলও না। কিন্তু সেরেৎসি যখন সে বিচার গ্রাহ্য করলেন না, তখন বৃটিশ সরকার সেরেৎসির ইংরেজ বৌ নিয়ে দেশে প্রত্যাবর্তনের পথে বসালেন কাঁটা, নিষিদ্ধ করলেন ঘরে-ফেরা। কিন্তু অভিভাবক এভটা হতে দেবেন কেন? সেকেদি খামাও স্বেচ্ছায় দেশত্যাগ করলেন।

মাত্র ১৯৫৬ সালে খুড়ো-ভাইপো সেকেদি-সেরেৎসি যখন বেচুয়ানাল্যান্ডের প্রধানের পদ বর্জনের প্রতিশ্রুতি দিলেন মাত্র তখনই তাঁদের দেশে ফেরার অনুমতি মিললো। সেকেদি রাজনীতি থেকে অবসর গ্রহণ করলেন, সেরেৎসি তাঁর দেশবাসীর জন্যে ঝাঁপিয়ে পড়লেন রাজনীতিতে।

সেরেৎসির সাংগঠনিক শক্তির পরিচয় পাওয়া গেল ১৯৬৫ সালে যখন তাঁর দল বেচুয়ানাল্যান্ড ডেমোক্র্যাটিক পার্টি নির্বাচনে সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করলো। সেই থেকে প্রধানমন্ত্রীর গদী তাঁরই। প্রেসিডেন্টের পদ গ্রহণ করে সেরেৎসি খামার দায়িত্ব হাজার গুণ বেড়েছে। কারণ একদিকে দক্ষিণ আফ্রিকা, রোডেশিয়া ইত্যাদির বর্ণবিদ্বেষপরায়ণ সরকার অন্যদিকে বটসোয়ানার জাতীয়তাবাদী প্রগতিশীল জনতা—এ দুয়ের মধ্যে ব্যালান্স করতে হবে।

দিল্লীতে ছাত্রবিক্ষোভ সম্পর্কে আলোচনা বৈঠক

আর ঝড়াঝাড়ি নয়

মা.দের প্রাণ সন্তানের প্রথম চোট দেখেই কাঁদে। শাসক মায়েরা প্রথম পিটিয়ে পরে সান্ত্বনার প্রলেপ দেন। বিমাতা নতুন করে নির্যাতনের কৌশল সৃষ্টি করেন।

ভারতের উত্তরাঞ্চলে ছাত্র বিক্ষোভের ফলে নিষ্ঠুর পুলিশী মারণযজ্ঞে যাঁদের বুকের সন্তান পুড়ে ঝলসে, হাত-পা গুঁড়িয়ে এবং চোট খেয়ে ধুঁকছে কিম্বা পৃথিবীর আলোকস্পর্শ থেকে চিরকালের মত বিদায় নিয়েছে, তাদের মায়েরা আজ বুকভাঙা কান্নায় ভেঙে পড়েছেন। এবং সেই পুত্রহারা সন্তানের জনক-জননীর ঊর্ধ্বতন কয়েক পুরুষের সৌভাগ্য যে স্বয়ং প্রধানমন্ত্রী (যিনি নিজে ভারত-ললনা এবং মাতা) পুত্রহারা জনক-জননীকে দরদ এবং সহানুভূতি জানিয়েছেন।

শুধু তাই নয়, শ্রীমতী গান্ধী নেপাল থেকে প্রত্যাবর্তন করে সাংবাদিকদের কাছে সাম্প্রতিক ছাত্র বিক্ষোভের ওপর মন্তব্য প্রসঙ্গে বলেছেন, "আপন সন্তানের দৃষ্টি নিয়ে" ছাত্র বিক্ষোভের মোকাবিলা করতে হবে চূড়ান্ত সংযমের সঙ্গে। অর্থাৎ অবাধ নিষ্ঠুরতার পর প্রধানমন্ত্রী উপলব্ধি করেছেন, সংযম ব্যবহার করা শান্তিরক্ষকদের পক্ষে করণীয় কর্তব্য। প্রধানমন্ত্রীকে ধন্যবাদ, তিনি ছাত্র সম্প্রদায়ের কঠিন কঠোর শাসক মাতাই বটেন।

কিন্তু শ্রীমতী সুচেতা কৃপালনী, যাঁর মুখ্যমন্ত্রিত্বের আমলে উত্তরপ্রদেশ প্রায়শই লগুড়াহত হয়ে আসছে তাঁর কার্যকলাপ বিমাতৃসুলভ একথা বলতেই হ'ল। তিনি ঠেঙিয়ে তৃপ্তি পান নি, ডি আই আর-এর চোটে বিলকুল দেশসুদ্ধ লোককে ঠান্ডা করবেন বলে নতুন বায়না ধরেছেন। শ্রীমতী কৃপালনীর পুলিশবাহিনী অত্যাচারী হিসেবে যথেষ্ট সুনাম অর্জন করেছেন। এদেশের সি সি আর—এ পুলিশী কোয়ালিফিকেশন তাতে তাঁদের বাড়-বাড়ন্ত হয়েছে এ বিষয়েও সন্দেহ নেই, কিন্তু উত্তরপ্রদেশ প্রায় ভুলতে বসেছে যে, ছাত্র মেরে শিক্ষা দেওয়ায় বিপদ আছে অনেক। আর এই বিপদের সুযোগ একদিন বর্তমান শাসকবর্গ গ্রহণ করেছিলেন বলেই আজকের পুলিশী লাঠি তাঁদেরই অঙ্গুলি হেলনে অবাধে ব্যবহৃত হচ্ছে।

বলা বাহুল্য, স্বাধীন দেশের স্বাধীন পুলিশ এ পর্যন্ত স্বাধীন শিক্ষা পান নি, বস্তা পচা ঔপনিবেশিক শান্তিরক্ষার ফরমুলাগুলো আজও উদরাময়ের চাপে বমন করে যাচ্ছেন। এ ব্যাধির চিকিৎসা প্রয়োজন, অন্যথা অনর্থ স্বাভাবিক। পরাধীন ভারতের পুলিশ ছিলেন ইংরেজের গোলাম। গোলামীর পুরস্কার প্রভুর মনোরঞ্জনে। তাই সেদিন গোলাম পুলিশবাহিনী যা করেছে তা গোলামেই সম্ভব ছিল। আজকের পুলিশবাহিনী স্বাধীন ভারতের দায়িত্বশীল শান্তিরক্ষক। আজ তাঁদের ভূমিকা সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। আজ তাঁদের স্বার্থ দেশবাসীর স্বার্থের সঙ্গে ওতপ্রোত। আজ তাঁদের ভূমিকা কল্যাণধর্মী, সহনশীল, সহানুভূতিপূর্ণ হবে। আজ তাঁরা দেশসেবক। দায়িত্বশীলতার সঙ্গে তাঁরা তাঁদের অবশ্য কর্তব্য সুসম্পন্ন করে আজ অর্জন করবেন অকুতোভয় নাগরিকবৃন্দের শ্রদ্ধা ও পরম আস্থা। স্বাধীন দেশের শান্তিরক্ষকগণের ওপর দেশসেবার সবচেয়ে বড় দায়িত্ব অর্পিত আছে। লাঠিবাজি এবং হাঙ্গামার উত্তরে গুন্ডামী নয়, পরন্তু বিপথগামিতা থেকে, বিশৃঙ্খলা থেকে জনতাকে পথ প্রদর্শন করা ও সহনশীলতার দ্বারা জনগণের আস্থা অর্জন করাই তাঁদের প্রকৃত ভূমিকা। এ চিন্তা বর্তমান স্বাধীন ভারতের পরিস্থিতিতে অত্যন্ত বেদনাদায়ক যে আমাদের শান্তিরক্ষকগণ সেই ইংরেজ আমলের ঠ্যাঙাড়েবাহিনীত্বেই নিজেদের কলঙ্কিত করে রাখবেন। গণতান্ত্রিক স্বাধীন রাষ্ট্রের পুলিশ তো প্রতিবাদীর শত্রু নন, শত্রু তাঁরা অন্যায়ের, শত্রু তাঁরা অপরাধীর পুলিশ শান্তিরক্ষক, রাজনীতির গোলাম নয়। স্বাধীন নাগরিক পুলিশ দেখলে নাসিকা কুঞ্চিত করবে না, আস্থা ও বিশ্বাসের সঙ্গে সন্নিকটে এগিয়ে আসবে সাহায্যের দাবি নিয়ে। আমাদের দেশের শিক্ষাব্যবস্থা আজও যেমন পুরোনো পঙ্গুত্ব লঙ্ঘন করে নতুন আলোকের সন্ধান পায় নি, আমাদের দেশের পুলিশবাহিনীকেও তেমনি স্বাধীন পুলিশবাহিনীর কর্তব্য সম্পর্কে সচেতন করা হয় নি। এজন্য দায়ী স্বাধীন ভারত পরিচালনার যে গুরুদায়িত্ব ক্ষমতাসীন দল ও ক্ষমতাহীন বিরোধী দলের নেতাদের ওপর ন্যস্ত, সেই সব নেতাদেরই অক্ষম অকৃতকার্যতা।

ইংরেজ আমলে যে গোলামী মনোবৃত্তি নিয়ে সারমেয়-স্বভাবী মানুষ শাসককুলের মনস্তুষ্টিই প্রাণধারণের পক্ষে একমাত্র করণীয় কর্তব্য বলে জ্ঞান করতেন, দুর্ভাগ্যত তাঁদের চেতনায় ভারতের মুক্তি আন্দোলন ও পরবর্তীকালে স্বাধীনতা কোনও আলোড়ন সৃষ্টি করে নি, রেখাপাতও করতে পারে নি। তাই গণতান্ত্রিক দেশের নাগরিক হয়েও শাসকসমাজকে তোষণ করাটাই উন্নতির উপায় বলে আমরা ধারণা করে বসে আছি। যদিচ গণতান্ত্রিক চেতনায় সর্বদা মনে থাকা উচিত যে, যা চিরস্থায়ী, তা হ'ল রাষ্ট্র। শাসনযন্ত্র আজ এ'র, কাল অপরের দায়িত্বে আপন কাজ করে যেতে পারে।

গণতন্ত্রে শাসকের স্থায়িত্বের কোন স্থিরতা নেই, মর্যাদা আছে সুশাসনের। আর সেজন্যই গণতন্ত্র রক্ষা করার জন্য তো তোফা তোফা বক্তৃতা শুনতে আমাদের একঘেয়ে লাগে না। কিন্তু গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের পুলিশবাহিনীকে আজও আমরা কিসের জন্য শাসক সম্প্রদায়ের ঠ্যাঙাড়েবাহিনী বলে ভাবব। কেনই বা তাঁরা মনে করবেন শান্তিরক্ষা নয়, আকণ্ঠ দমনই তাঁদের কর্তব্য। কেন তাঁরা ধরে আনতে বললে বেঁধে আনার জন্য সুরু করবেন দাপাদাপি। এ বড় দুর্জ্ঞেয় রহস্য। এই রহস্যকে সাবধানে আমাদের নেতারা টিকিয়ে রাখছেন রাজনৈতিক সুবিধের জন্য। মাঝে পড়ে স্বাধীন শান্তিরক্ষকরা পাচ্ছেন ঘৃণা ও কটূক্তি! তাঁরা না শাসকপক্ষের দ্বারা প্রশংসিত, না জনসাধারণের মনের দ্বারে প্রতিষ্ঠিত। আজও কোন প্রতিবাদ আন্দোলনে পুলিশকেই আক্রমণের লক্ষ্য এবং হাতিয়ার হতে হয়। যদিচ পুলিশ শুধু শান্তিরক্ষায় ব্যস্ত থাকবেন, তাঁদের সঙ্গে সাধারণের অথবা আন্দোলনকারীর শত্রুতার সম্পর্ক কেন সৃষ্টি হবে। কেন পুলিশী অতিরেকের জন্য দেশের গুণীজনসহ সাধারণ মানুষ প্রতি মুহূর্তে তাঁদের বিকৃত করবেন। ইট-পাটকেল পড়বে তাঁদের লক্ষ্য করে!

এই ভ্রান্তিই আমাদের দেশে অশান্তির আগুনকে ইন্ধন যুগিয়ে যাচ্ছে। প্রতিটি আন্দোলন দেখা দিচ্ছে পুলিশের সঙ্গে জনতার ক্রুদ্ধ যুদ্ধরূপে। অথচ আন্দোলনের লক্ষ্য পুলিশ নয়, পুলিশের কর্তব্যও আন্দোলনকে পিটিয়ে দমন করা নয়। আন্দোলনের লক্ষ্য কোনও সরকারী নীতির প্রতি অনাস্থা জ্ঞাপন, পুলিশের কর্তব্য দেশে যাতে বিশৃঙ্খলা উপস্থিত না হয় তারই প্রতি জাগ্রত লক্ষ্য রাখা, বিশৃঙ্খলা সৃষ্টিতে সাহায্য করা বা ইন্ধন যোগানো নয়।

প্রধানমন্ত্রী যথার্থই বলেছেন, শৃঙ্খলা রক্ষায় সংযম প্রয়োজন, বাড়াবাড়ি নয়। তাঁর বক্তব্য সাধারণভাবে কি পুলিশী অতিরেকেরই নিন্দাবাদ নয়? পুলিশ এই নিন্দাকে তার ললাটলিপি, তার প্রফেশনের পক্ষে একমাত্র উন্নতির সোপান হিসেবে সেই মান্ধাতার আমলের মনোভাব নিয়ে কেন আঁকড়ে থাকবে। সমস্ত দমন নিপীড়নে তাঁরা কেন হবেন দমনকারীর শিখণ্ডীস্বরূপ। যত দুষ্কার্যের অপবাদ মাথায় নিয়ে স্বাধীন শান্তিরক্ষকের প্রাপ্য মর্যাদা কেনই বা অবহেলায় ত্যাগ করবেন তাঁরা।

তাঁদের কর্তব্য সম্পর্কে নেতারা কখনো যথার্থ উপদেশ দান করেন না। গোলামী যে তাঁদের প্রফেশন নয়, এই সাদা কথাটা কেউ উচ্চারণ করেন না, যত দোষ ঐ নন্দ ঘোষের ওপর শেষবেশ চাপিয়ে দিয়ে সকলেরই দায়িত্ব খালাস। যা কিছু ঘটছে, গিন্নি বলেন, পুলিশ বেটাই চোর! কে পুলিশকে মাথার

শ্রীমতী কৃপালনী

দিব্যি দিয়েছে স্বাধীন ভারতেও চোর সেজে থাকতে। তাঁরা আপন কর্তব্যের অতিরিক্ত বোঝা কাঁধে নিয়ে অপবাদকে শিরস্ত্রাণ করবেন কোন দুঃখে। মালিক তাঁদের রদবদল হতে পারে, কর্তব্য তাঁদের অপরিবর্তনীয়। সৌজন্যের অভাব পুলিশের ক্ষেত্রে তাই প্রফেশন বিরোধী। এই কথাটা আমাদের শান্তিরক্ষকদের বুঝতে হবে যে, দেশের লোকে দেশরক্ষক জওয়ানদের যেমন মাথায় করে রাখেন; শান্তিরক্ষকও তেমনি স্বাধীন নাগরিকের শ্রদ্ধা ও প্রীতিরই পাত্র। অকারণে তাঁরা তাঁদের সুনামকে প্রতিষ্ঠা না দিয়ে ইংরেজ আমলের মত কলঙ্কিত করতেই বদ্ধপরিকর। এ শুধু তাঁদেরই নয়, গোটা দেশের দুর্ভাগ্য, গণতন্ত্রের দুর্ভাগ্য, পুলিশী প্রফেশনের দুর্ভাগ্য।

আর বাড়াবাড়ি নয়। পুলিশ নিজেকে চিনুক। নিজের কর্তব্য সম্পর্কে সচেতন হয়ে দেশবাসীর প্রীতি ও শ্রদ্ধা আকর্ষণ করুন!

দ্বিতীয় নন্দ ঘোষ

নিপীড়নের অতিরেকের জন্য যাবতীয় দোষে দোষী হলেন ভারতের হুকুমে মারমুখী পুলিশবাহিনী।

যে কোন আন্দোলনের তীব্রতা বৃদ্ধির জন্য শাসক সম্প্রদায়ের অনেক স্থূলবুদ্ধি হোমরা-চোমরা তেমনি দায়ী করে থাকেন কম্যুনিস্ট দলকে। ভারতের আজ এমনই 'প্রগতিশীল' অবস্থা যে, সমস্ত বিক্ষোভ আন্দোলনের পেছনে কম্যুনিস্ট হাতকেই ক্রিয়াশীল বলে গণ্য করা হয়। তা সে আন্দোলন রাজনৈতিক অথবা উত্তেজনাপ্রসূত যা-ই হোক না কেন।

সম্প্রতি শ্রীমতী সুচেতা কৃপালনী তাঁর রাজ্যে ছাত্র আন্দোলনের দায়িত্ব কম্যুনিস্ট স্কন্ধে চাপিয়ে দিয়ে খুব বড় রকম একটা রাজনৈতিক মন্তব্য করার পরিতৃপ্তি লাভ করছেন। তাঁর মত এমন পরিতৃপ্ত রাজনীতিজ্ঞান আরও কতিপয়ের আছে এ কথাও সকলেই জানেন। অথচ বিক্ষোভ আন্দোলন ও নির্বিচার খুনজখমের পর যখন বিচারবিভাগীয় কমিশন বসে তখনই দেখা গেছে বিচারে এই সব ভারি ভারি রাজনৈতিক মন্তব্য আদৌ স্বীকৃতি লাভ করে নি। সরকারের নির্দেশে পুলিশের উত্তেজনাই যে আগুন জ্বালতে প্রধান সহায়ক, সে কথাও তদন্তে প্রমাণিত বলে সাব্যস্ত হয়েছে। শ্রীমতী কৃপালনী আর একবার ডি আই আর হাতে নিয়ে কম্যুনিস্ট তাড়ন ও কম্যুনিস্টদের জেল প্রেরণের সুযোগ নিতে চান নিন, কিন্তু তাতে যে দেশব্যাপী ছাত্র অসন্তোষের ইতি হবে এমন নয়। যদি কারও লাভ হয় তবে সেটা হবে ঐ কম্যুনিস্টদেরই। জেলে যাওয়ার যে একটা সুফল আছে, ইংরেজ আমলে কংগ্রেসী করেও কি তিনি তা টের পান নি।

অসন্তোষ কোন্ পথে

ছাত্র অসন্তোষ আজ যে দ্রুততা ও ব্যাপকতা লাভ করে বিভিন্ন রাজ্যে ছড়িয়ে পড়ছে তাতে দেশের সামনে গভীর আশঙ্কা ও ভীতির কারণ দেখা দিয়েছে। অথচ বিভিন্ন ক্ষেত্রে অসন্তোষের সঠিক উৎস নির্ধারণ করা আর সম্ভবপর

হচ্ছে না। যে কোন কারণেই ছাত্ররা বিক্ষুব্ধ হয়ে উঠছেন। একটি সাধারণ ছাত্রের সঙ্গে বচসা থেকেও বিরাটাকার ছাত্র বিক্ষোভ ফেটে পড়ছে; কোথায় কোন স্কুল হেড মিস্ট্রেস তাঁর ছাত্রীর মুখে সেলোটেপ আটকে দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন, তাই নিয়ে ছাত্রসমাজ বেরিয়ে পড়ছেন পথযুদ্ধে। কোন কিছু তাঁদের মনঃপূত না হলেও ছাত্ররা উঠছেন ক্ষেপে। এই উত্তেজনাকেও খুবই দুঃখের সঙ্গে ছাত্র-আন্দোলন বলে অভিহিত করতে হচ্ছে, কেন না ছাত্রদের ক্ষেত্রে আন্দোলনের প্রকৃত স্বরূপ যা হওয়া উচিত, আজকের উত্তেজিত সামাজিক, আর্থিক পরিবেশ তার থেকে ছাত্রগণকে বিচলিত করেছে। অন্ধ যা বিক্ষোভ মাত্র তাকেও আন্দোলন বলে অভিহিত করতে আমরা বাধ্য হচ্ছি উত্তেজনার ব্যাপকতার জন্য।

ছাত্রদের মধ্যে ঐক্যবদ্ধ শক্তি অপচয়িত নাহলে দেশ ও সমাজ গঠনে বিশেষ এক মর্যাদাপূর্ণ ভূমিকায় বর্তমানে তাঁরা অবতীর্ণ হতে পারেন। সামান্য ঘটনাকে কেন্দ্র করে ছাত্রদের মধ্যে ঐক্যবদ্ধ সংগ্রামী মনোভাব লক্ষ্য করে সে আশা আমরা রাখতেও পারি। ভারতের মুক্তি আন্দোলনে ছাত্রদের মহান ভূমিকার কথাও আজ প্রসঙ্গত স্মরণ করা যায়। ছাত্র সম্প্রদায় সেদিন মানুষের প্রতি অবিচারের প্রতিবাদী ছিলেন। কিন্তু আজ তাঁদের মধ্যে সেই তীব্র গঠনেচ্ছা লক্ষণীয় হয়ে উঠছে না। ছাত্র-আন্দোলনের সঙ্গে মহৎ কোন উদ্দেশ্য ক্রমশ বিবিক্ত হয়ে পড়ছে। এটা খুবই দুঃখের ও আশঙ্কার কথা। দুঃখের কথা এই যে, ছাত্র-আন্দোলনের ধারা আজ বিক্ষোভ প্রদর্শনের পথ গ্রহণ করেছে যে বিক্ষোভের উৎস সন্ধান করলে অবাক হতে হয় যে, অর্থহীন লঘু আরম্ভেও অনেক ক্ষেত্রে প্রচন্ড বিক্ষোভ যথেষ্ট ক্ষতির কারণ হয়ে দাঁড়াচ্ছে। হাঁ, জাতীয় ক্ষতির কথাই বলব। ছাত্রদের জীবন হানির চেয়ে বড় জাতীয় ক্ষতি কি হতে পারে! আজ যাঁরা ছাত্র আগামী কাল তাঁরাই দেশ সংগঠক। বিক্ষোভ দমনে অন্যদিকে মার ছাড়া সমস্যা সমাধানের অন্য উপায় যে শাসনব্যবস্থা জানে না, তাঁদের হাতে দেশের ভবিষ্যৎকে এইভাবে প্রতিদিন নিহত হতে দেখে দেশের দুর্ভাগ্যকে অসহায়ের মত শুধু চোখ মেলে দেখে যেতে হচ্ছে। দেশের যাঁরা শাসক, তাঁরা অবশ্য কতকগুলি স্থাবর-অস্থাবর সম্পত্তিকেই জাতীয় সম্পত্তি ভেবে হাহাকার করেন। মানুষের মনে মালিকানা মনোভাব গড়ে উঠলে তাই হয়। তখন সে প্রাণের চেয়ে ধনের প্রতি আকৃষ্ট থাকে সমধিক। আমাদের নেতারাও প্রাণবিনাশকে জাতির সম্পত্তি ধ্বংস বলে মনে করেন না, হা-হুতাশ করেন প্রাণহীন কতকগুলি স্থাবর অস্থাবর সামগ্রীর ক্ষয়-ক্ষতিতে। অর্থাৎ আসল ছেড়ে আমরা সর্বস্তরেই নকলের প্রতি তীব্র আকর্ষণ অনুভব করছি। এ যদি অবক্ষয়ের রূপ না হয় তবে, আর কী! এই অবক্ষয় ও তজ্জনিত ক্ষয়ক্ষতি জাতির জীবনে সবচেয়ে বড় ক্ষতি। দুচারটে কেন, গণ্ডা গণ্ডা প্রাসাদ ভেঙে চুরমার হয়ে গেলেও এ ক্ষতির সঙ্গে তার কোনরকম তুলনাই চলতে পারে না।

ছাত্র সম্প্রদায়ের কতকাংশ আজ যদি বিপথগামী হ'ন; যদি তাঁরা উত্তেজনাকে আন্দোলন মনে করে তাঁদের সাংগঠনিক ক্ষমতার অপব্যয় করেন ও প্রকৃত আন্দোলনকে পঙ্গু করে দেন; যদি দাঙ্গা-হাঙ্গামার স্বার্থসন্ধিৎসুর উস্কানিতে দূরদৃষ্টিশূন্য বিক্ষোভের পথ ধরেন, তবে ভবিষ্যতে প্রকৃতপক্ষে জনহিতকর আন্দোলনে তাঁদের ভূমিকা গৌণ হয়ে পড়বে। রাজনৈতিক সুবিধাবাদ তাঁদের এই উত্তেজনাতে ইন্ধন যোগান দিয়ে সেই মহত্তর আন্দোলনের সম্ভাবনাকে পুরো-পুরি খতম করে দিতে চায়। তাঁরা একবার গভীরভাবে চিন্তা করে দেখুন, তাঁদের ওপর কী অপরিসীম দায়িত্ব ন্যস্ত আছে। গণতান্ত্রিক দেশে সমস্ত রকম শান্তিপূর্ণ গণতান্ত্রিক আন্দোলনে ছাত্রদের অগ্রণী সহায়তা যেক্ষেত্রে অপরি-হার্য, সেখানে ছাত্র সম্প্রদায়কে বিভ্রান্ত করে সেই অমূল্য শক্তি থেকে জাতিকে বঞ্চিত করার জন্য ফ্যাসিস্ট মনোবৃত্তি ছাত্রদের বিপথগামী উত্তেজনাকে সর্বদাই কাজে লাগাবে। এ বিষয়ে ছাত্র সম্প্র-দায়কে বিশেষভাবে সচেতন হতে হবে। অন্যথা জাতির জীবনে ছাত্র-আন্দোলনের ভূমিকা বিপথে চালিত হয়ে জাতীয় অবক্ষয়কেই আলিঙ্গন করে নেবে। মনে রাখতে হবে, সেই সুবর্ণ সুযোগের অপেক্ষারও সমাজের আত্মগোপনকারী ফ্যাসিস্টরা ওৎ পেতে বসে থাকে।

ছাত্রদের বিপথগামী উত্তেজনাকে রাজনৈতিক দলবিশেষের কারসাজি বলে চিহ্নিত করে অন্যতর স্বার্থচক্র গণতান্ত্রিক রাজনৈতিক আন্দোলনের পক্ষচ্ছেদনেরও সুযোগ গ্রহণ করবেন। সমাজ-বিরোধীদের কবলিত হবে ক্রমশ দেশের ও জাতির ভবিষ্যৎ। সুতরাং ছাত্রসমাজকে আজ কোন আন্দোলনের পথ বেছে নিতে হলে তার উদ্দেশ্য সম্পর্কে বিশেষভাবে সচেতন হতে হবে। বিভ্রান্তি যেন দেশকে ফ্যাসিজমের লোভী মুষ্টিতে অর্পণ না করে এজন্য দেশের ভবিষ্যৎ নায়কদেরই সর্বাপেক্ষা সচেতন থাকার প্রয়োজন। রাজনীতি, বিশেষত শক্তিশালী নেতৃত্বহীন রাজনীতি, জাতীয় মঙ্গল অপেক্ষা সাময়িক দলস্বার্থকেই বড় করে দেখে। ছাত্ররা সেই কুটিল কূটনীতির আবর্তে আপনাদের নিমজ্জিত করবেন না, সতর্কতার সঙ্গে জাতীয় মঙ্গলের প্রতি লক্ষ্য রেখে অগ্রসর হবেন, আজকের ছাত্র বিক্ষোভের পরি-প্রেক্ষিতে এই কামনাই করব।

পরিশেষে সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ রাখতে চাই যে, ছাত্রদের বিভিন্ন দাবি-দাওয়ার বিপরীতে বর্তমান আলোচনা উপস্থাপিত নয়; উদ্দেশ্যহীন উত্তেজনা যেখানে ছাত্র-বিক্ষোভকে ব্যাপকতা দান করে ফ্যাসিস্ট মনোভাবের দ্বারা পরিচালিত হচ্ছে এবং তদ্দ্বারা ছাত্রস্বার্থ এবং জাতীয় মঙ্গলের পথে বাধাস্বরূপ হয়ে দাঁড়াচ্ছে, ছাত্রগণকে সেখানেই বিশেষ সাবধানতার জন্য আহ্বান জানাচ্ছি আমরা।

আমাদের প্রতিবেশী সমাজ

প্রতিবেশীর উন্নতিতে চোখ টাটায় নিতান্ত কূপমণ্ডুক স্বার্থান্ধ সাংসারিকের। বিরাটের থেকে নিজেকে বিচ্ছিন্ন করে দেখার বিষম কুশিক্ষা আপনাকে অপরের অপেক্ষা সুখী দেখে মুগ্ধ হয়। অথচ

শিল্পী শ্রীজ্যোতিরিন্দ্র রায়ের
দুখানি অভিনব উপন্যাস

* প্রণয় এক প্রাণ-শিল্প *
দামঃ ছয় টাকা
= প্রাপ্তিস্থান =
॥ রূপা অ্যাণ্ড কোম্পানী ॥
১৫ বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট
কলকাতা-১২

* দ্বি স্রো তা *
দামঃ চার টাকা
= প্রাপ্তিস্থান =
॥ কথা শিল্প ॥
১৯ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট
কলকাতা-১২

সমগ্রতাকে এইভাবে সীমিত করলে সেই সীমার বাঁধনে একদিন নিজেকেই শৃঙ্খলিত দেখে সে। তখন তার আপন সমৃদ্ধিও স্ফুরিত হওয়ার অবকাশ পায় না।

রাজনীতির প্রাঙ্গণেও সেই একই সমস্যা। প্রতিবেশী রাষ্ট্রকে পূর্ণ বিকশিত হয়ে ওঠার জন্য সাহায্যের বাহু প্রসারিত করে এগিয়ে না গেলে, আপন বিকাশও যথার্থ মুক্তির পথ খুঁজে পায় না। ভারতের লোকান্তরিত প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহরুর সে বিশ্বাস ছিল। তিনি একদা প্রতিবেশী নেপালের প্রসঙ্গে বলেছিলেন, "ভারত দুটি বিষয়ে গুরুত্ব আরোপ করে। এক, নেপালের পূর্ণ স্বাধীনতা, দুই, নেপালের পরিপূর্ণ বিকাশ ও সমৃদ্ধি। আর এগুলির যে মাত্রায় নেপালে বর্তমান থাকবে, ভারতও সেই মাত্রায়ই লাভবান হবে।"

কেবলমাত্র প্রতিবেশী সমাজই নয়, স্বাধীনতা-পূর্ব আমল থেকেই ভারতের নেতৃবর্গ তথা ভারতবাসী দুনিয়ার মানুষের বিকাশ ও স্বাধীনতা একান্ত-ভাবে কামনা করে আসছেন। তাই বিশাল ভারতকে প্রতিবেশিনী হিসেবে পেয়েও নেপাল ভূটান প্রভৃতি ক্ষুদ্র রাষ্ট্রগুলি কিছুমাত্র শঙ্কিত হওয়ার কারণ অনুভব করে না। বরং ভারতের বিশ্বমৈত্রীর উদার চিন্তাধারায় তারাও অভিষিক্ত হয়। অবস্থার পাকচক্রে নেপালের সঙ্গে ভারতের সম্প্রতিকালে যে সামান্য বিচ্ছিন্নতার সম্ভাবনা দেখা দিয়েছিল, তার জন্য অন্যপক্ষের চাপই ছিল প্রধান কারণ। চিড় ধরে নি আবহমানের নেপালী ভারতীয় সখ্যতায়। তাই সুযোগমাত্র দুই রাষ্ট্র পুনরায় পরস্পরের সান্নিকটে খুব সহজেই এগিয়ে আসতে পেরেছে।

শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী ভারতের প্রধানমন্ত্রী রূপে এই প্রথম নেপাল সফর করে এলেন। নেপালী ভাইবোনদের জন্য রেখে এলেন ভারতের আন্তরিক মঙ্গল-কামনা ও শুভেচ্ছা।

নেপালের বৈষয়িক উন্নতির জন্য ভারত যে সাহায্যের বাহু প্রসারিত করে ধরেছে, তাকে কোনরকমভাবে অভিমান আহত না করার জন্য ভারত সাহায্যকে সহযোগিতা নামে উল্লেখ করতে মনস্থ করে, সাহায্যের অন্তর্নিহিত অর্থকে সুস্পষ্টভাবে তুলে ধরেছে। নেহরুজীর উল্লিখিত বক্তব্য এই শিক্ষাই দান করে যে, সাহায্যের প্রকৃত অর্থই হল সহযোগিতা। একের উন্নতিই হবে অপরের প্রসারতার কারণ।

ঠিক এই উদ্দেশ্যেই নেপালের সার্বিক উন্নয়নে ভারতের সবিশেষ আগ্রহ। নেপালও এ বিষয়ে আজ পূর্ণ সচেতন। ভারতের প্রধানমন্ত্রীকে সিধে সরল নেপাল-বাসী যে স্বতঃস্ফূর্ত অভিনন্দন জানিয়েছেন তার দ্বারা ভারতের সঙ্গে নেপালের আবহমানের মৈত্রীই সপ্রমাণিত হয়েছে।

ভারতের মতো নেপালও একটি নিরপেক্ষ রাষ্ট্র। ভারতের মতো সে-ও চায় সংঘাত এড়িয়ে সদ্ভাবে বসবাস করতে। ভারতের সঙ্গে এখানেই তার ঐকান্তিকতা।

নেপাল-ভারত যুক্ত ইস্তাহার তাই উভয় দেশের ভৌগোলিক স্বাতন্ত্র্য, সমৃদ্ধি ও ক্রমবিকাশকে স্বীকৃতি দেয় উচ্চকণ্ঠে।

এশিয়ার শান্তি ও স্বাভাবিক বিকাশকে অবরুদ্ধ করার জন্য যে বৈদেশিক উৎপাত ভিয়েতনামে অশান্তির আগুনকে ধূমায়িত করে রেখেছে, যুক্ত-ইস্তাহার সে বিষয়ে গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করে অবিলম্বে বোমাবর্ষণ বন্ধ করার জন্য অভিমত ব্যক্ত করেছে।

নেপালের তৃতীয় যোজনায় ভারতের চল্লিশ কোটি মুদ্রার সহযোগিতা উভয় রাষ্ট্রের পারস্পরিক কল্যাণকে সম্প্রসারিত করুক। এবং সেই মনোভাব ইতিমধ্যেই সুস্পষ্ট। নেপালও সানন্দে অপেক্ষাকৃত কম মূল্যে ভারতীয় ভাইবোনদের জন্য চার হাজার টন চাল প্রেরণে স্বীকৃত হয়েছে। এছাড়াও বাণিজ্যের ক্ষেত্রে উভয় রাষ্ট্রের মধ্যে বন্ধন উন্নততর উপায় সন্ধান করছে।

নেপালের নেতৃবর্গকে ভারত সফরে আহ্বান জানানোয় উভয় রাষ্ট্রের মৈত্রী গভীরতর হওয়ার সুযোগ লাভ করবে।

সাধারণের স্তরে নেপালী ও ভারতীয়গণ পরস্পরকে ভিন্ন রাষ্ট্রের নাগরিক বলে যেন ভাবতেই পারেন না। নেতৃত্বের ক্ষেত্রেও সেই সৌভ্রাতৃত্ব অক্ষয় হয়ে থাক।

বৈষ্ণব-সাহিত্যের অমূল্য অবদান

ভক্তিজগতের কৌস্তুভরত্ন, ভগদ্ভক্তগণের সাধনার ধন, ভক্তের তুলসী-মালা সদৃশ মহাপবিত্র ভক্তিশাস্ত্র সমন্বয়

বৈষ্ণব গ্রন্থাবলী

শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রলাপ ও শিক্ষাষ্টক

শ্রীচৈতন্যদেবের শ্রীকৃষ্ণলাভের জন্য যে উৎকণ্ঠা, এই 'প্রলাপে' তাহা অভিব্যক্ত। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শ্রীমুখনিঃসৃত 'শিক্ষাষ্টক শ্লোকই' তাঁহার একমাত্র রচনা। শ্রীল কৃষ্ণদাস গোস্বামীর সুললিত পদ্যানুবাদে এই অমিয় মাধুরী লীলায়িত।

নরোত্তম বিলাস

বৈষ্ণবগণের পরম উপভোগ্য উপজীব্য ভক্তিচরিতামৃত।

দুর্লভসার

শ্রীচৈতন্যমঙ্গল-রচয়িতা শ্রীল লোচনদাস বিরচিত, বৈষ্ণবগণের সংপূজিত।

আত্মতত্ত্ব

বৈষ্ণব দর্শনের সূক্ষ্মতম অনুসরণ।

মনঃশিক্ষা

শ্রীপ্রেমানন্দ দাস ঠাকুর বিরচিত। বৈষ্ণব-সিদ্ধান্ত সাধন-ভজনের নিগূঢ় মর্মসমাহিত।

শ্রীচমৎকার চন্দ্রিকা

পরম পণ্ডিত শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী প্রণীত সংস্কৃত গ্রন্থ হইতে তাঁহার সুযোগ্য শিষ্য পরম বৈষ্ণব শ্রীল কৃষ্ণ-দাসের সুললিত পদ্যানুবাদ।

পাষণ্ড-দলন

মূর্তিমান বৈরাগ্য শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর বিরচিত প্রেমভক্তির লহর-লীলা।

ভক্তিতত্ত্বসার

হাটপত্তন, শ্রীশ্রীগুরুবন্দনা, নাম-সংকীর্তন, চৌত্রিশ পদাবলী, শ্রীকৃষ্ণের অষ্টোত্তর শতনাম, নরোত্তম দাসের প্রার্থনা, প্রেমভক্তি চন্দ্রিকা। সুলভে নামমাত্র মূল্যে বিতরিত।

মূল্য : ৩. টাকা।

বসুমতী প্রাইভেট লিমিটেড : ১৬৬, বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী স্ট্রীট, কলি-১২

রাষ্ট্রসংঘ ঃ

৮ই অক্টোবর একটি অপ্রত্যাশিত ঘটনা ঘটেছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রপতি লিনডন বি জনসন নিজে রাষ্ট্রসংঘ সদর দপ্তরে এসে রাষ্ট্রসংঘের সেক্রেটারী-জেনারেল উ থান্টের সংগে সাক্ষাৎ করেন, এবং দীর্ঘ সময় ধরে তাঁর সংগে ভিয়েতনাম সমস্যা ও সেক্রেটারী-জেনারেল পদে উ থান্টের থাকার বিষয়ে আলোচনা করেন।

এর আগে কখনও কোন মার্কিন রাষ্ট্রপতি কেবলমাত্র সেক্রেটারী-জেনারেলের সংগে সাক্ষাতের উদ্দেশ্য নিয়ে রাষ্ট্রসংঘ সদর দপ্তরে আসেন নি। জনসন প্রায়ই নিউ ইয়র্ক আসেন, কিন্তু তিনিও কখনও আগে এভাবে আসেন নি। রাষ্ট্রসংঘে স্থায়ী মার্কিন প্রতিনিধি আর্থার গোল্ডবার্গ এই সাক্ষাৎকারের ব্যবস্থা করেন। ৮ই অক্টোবর সকালে যখন জনসন ওয়াশিংটন থেকে নিউ ইয়র্ক এসে পৌঁছান, তখনও এই সাক্ষাৎকারের কথা কেউ জানতেন না, বোধ হয় কোন ব্যবস্থাও আগে থাকতে হয় নি। মধ্যাহ্ন আহারের সময় গোল্ডবার্গ উ থান্টকে টেলিফোন করেন এবং তার পরই জনসন রাষ্ট্রসংঘ দপ্তরে গিয়ে থান্টের সংগে সাক্ষাৎ করেন।

আন্তর্জাতিক রাজনীতির বর্তমান পটভূমিতে এই সাক্ষাৎকারের গুরুত্ব খুব বেশি। উ থান্ট দ্বিতীয় বারের জন্য রাষ্ট্রসংঘের সেক্রেটারী-জেনারেলের পদ গ্রহণ করবেন না বলে ঘোষণা করেছেন, এবং তাঁর এই পদে থাকার অনিচ্ছার প্রধান কারণ ভিয়েতনাম সঙ্কট ও এই প্রসংগে মার্কিন নীতি। এই অবস্থায় জনসনের উপযাচক হয়ে থান্টের সংগে সাক্ষাৎ এবং এই দুটি বিষয় নিয়ে আলোচনা কূটনৈতিক মহলে রীতিমত কৌতূহলের সৃষ্টি করেছে।

আলোচনার পর জনসন বলেছেন, তিনি সেক্রেটারী-জেনারেলের কাজের ভূয়সী প্রশংসা করেছেন। তিনি একথা থান্টকে জানিয়েছেন যে, বর্তমান অবস্থায় তাঁর সেক্রেটারী-জেনারেলের পদে থাকার প্রয়োজন খুব বেশি।

জনসন নিজে এসে অনুরোধ করা সত্ত্বেও থান্ট তাঁর রাষ্ট্রসংঘ-দায়িত্বভার ত্যাগের সিদ্ধান্ত পুনর্বিবেচনা করবেন কিনা তা এখনই বলা শক্ত। জনসনের সংগে সাক্ষাতের পর থান্ট সাংবাদিকদের বলেন, কোন বিষয়েই বেশি আশাবাদী বা নিরাশ হওয়া উচিত নয়।

থান্টের মন্তব্য থেকে এমন মনে হবার কারণ আছে যে, থান্টের সিদ্ধান্ত পরিবর্তনে সহায়ক হবার মত কিছু আলোচনা হয়তো জনসন করেছেন। না হলে তিনি নিরাশ হতে নিষেধ করলেন কেন?

জনসন—থান্ট আলোচনা

ভিয়েতনাম যুদ্ধের অবসানের জন্য থান্ট যে চেষ্টা করে আসছেন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র তাতে সহায়তা করে নি, থান্টের এটা একটা বড় অভিযোগ। এবার জনসন কি এই ব্যাপারে সহযোগিতার মনোভাব দেখিয়েছেন?

সত্যি যদি জনসন উ থান্টের কাছে ভিয়েতনাম সম্পর্কিত মার্কিন নীতির পরিবর্তনের কোন আভাস দিয়ে থাকেন এবং শান্তির জন্য কার্যকরী কিছু করার প্রতিশ্রুতি দেন, তার গুরুত্ব খুবই বেশি। এখনও এ বিষয়ে স্পষ্ট করে কিছু জানা যায় নি। তবে নিজ উদ্যোগে জনসনের থান্টের সংগে সাক্ষাৎ ও আলোচনার ফলে কূটনীতিক মহলে এইরূপ জল্পনা শুরু হয়েছে। নিছক সৌজন্যমূলক সাক্ষাৎ এ নয়।

তবে জনসন সুনির্দিষ্ট ও কার্যকরী কিছু বলুন আর নাই বলুন, এই জনসন-থান্ট সাক্ষাৎকারের পর থান্টের মর্যাদা ও শান্তিপ্রয়াসের ক্ষেত্রে তাঁর ভূমিকার গুরুত্ব অনেকখানি বেড়ে গেছে। এখন ভিয়েতনামের প্রশ্নে তিনি আরও সক্রিয়ভাবে উদ্যোগ গ্রহণ করতে পারবেন।

বৃটেন ঃ

ব্রাইটনে ক্ষমতাসীন শ্রমিক দলের বার্ষিক সম্মেলনে বক্তৃতা দেবার সময় ৫ই অক্টোবর বৃটেনের নতুন পররাষ্ট্রমন্ত্রী জর্জ ব্রাউন ঘোষণা করেন, ভিয়েতনামের সমস্যা বৃটিশ সরকার একটি নতুন ছয় দফা প্রস্তাব উদ্ভাবন করেছেন। আগামী সপ্তাহে রাষ্ট্রসংঘে গিয়ে সোভিয়েট ইউনিয়নের পররাষ্ট্রমন্ত্রী আন্দ্রে গ্রোমিকো এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রপতি লিনডন জনসন ও পররাষ্ট্রমন্ত্রী ডিন রাস্কের সংগে ব্রাউন এই প্রস্তাব নিয়ে আলোচনা করবেন।

বৃটেন জেনেভা সম্মেলনের যুগ্ম সভাপতি। অপর যুগ্ম সভাপতি সোভিয়েট ইউনিয়নের প্রতি বৃটেন এই নতুন প্রস্তাব কার্যকরী করার জন্য সহযোগিতার আহ্বান জানিয়েছে।

বৃটেনের এই নতুন শান্তি প্রস্তাবে বলা হয়েছে, অবিলম্বে ১৯৫৪ সালে অনুষ্ঠিত জেনেভা সম্মেলনে যোগদানকারী রাষ্ট্রগুলির সম্মেলন ডেকে ভিয়েতনাম সমস্যা আলোচনা করতে হবে; সাইপ্রাসের মত ভিয়েতনামের জন্য একটি আন্তর্জাতিক তদারকি কমিশন গঠন করতে হবে; এবং সমস্ত পরিকল্পনা কার্যকরী করার সময়সীমা বেঁধে দিতে হবে।

কিন্তু এই প্রস্তাব নিয়ে জর্জ ব্রাউনের বড় রকমের কোন আলোচনা শুরুর পূর্বেই সোভিয়েট ইউনিয়ন প্রস্তাবকে বিবেচনার অযোগ্য বলে প্রত্যাখ্যান করেছে। ৬ই অক্টোবর মস্কো বেতারে ঘোষণা করা হয়েছে, সোভিয়েট সরকারের মতে এটি পুরোনো মার্কিন প্রস্তাবের কার্বন কপি ছাড়া আর কিছু নয়। সুতরাং, রাষ্ট্রসংঘে উপস্থিত হয়ে ব্রাউন এ ব্যাপারে বিশেষ সুবিধা করতে পারবেন বলে মনে হয় না।

ব্রাইটন সম্মেলনে শ্রমিক দলের চরম-পন্থী অংশ উইলসন সরকারের ভিয়েত-নাম নীতির তীব্র সমালোচনা করেন। বৃটিশ সরকার ভিয়েতনামের ব্যাপারে মার্কিন নীতি সমর্থন করায় তাঁরা খুবই ক্ষুব্ধ। মার্কিন ভিয়েতনাম নীতির সঙ্গে বৃটেনের সকল সম্পর্ক ছিন্ন করার জন্য চরমপন্থীরা যে প্রস্তাব এনেছিলেন তা শেষ পর্যন্ত ২,৪৭০,০০০—৩,৮১১,০০০ ভোটে পরাজিত হয়। তবে ভিয়েতনামে যুদ্ধ অবসানের জন্য মার্কিন সরকারের ওপর চাপ সৃষ্টি এবং উত্তর ভিয়েতনামে মার্কিন বোমাবর্ষণ বন্ধ করার জন্য আর একটি প্রস্তাব ৩,৮৫১,০০০—২,৬৪৪,০০০ ভোটে গৃহীত হয়। ভিয়েতনাম প্রশ্ন নিয়ে আলোচনার সময় চরমপন্থী ও নরমপন্থীদের মধ্যে তীব্র বাদানুবাদ ও উত্তেজনার সৃষ্টি হয়।

রোডেশিয়ার ব্যাপার নিয়েও সম্মেলনে এই দুই পক্ষের মধ্যে তীব্র মতভেদ দেখা দেয়। চরমপন্থী সদস্যরা অভিযোগ করেন, আইয়ান স্মিথের বিদ্রোহ দমনের জন্য উইলসন যথেষ্ট দৃঢ়তার পরিচয় দিচ্ছেন না। শেষ পর্যন্ত সহকারী পররাষ্ট্রমন্ত্রী শ্রীমতী হোয়াইটের উত্থাপিত যে প্রস্তাবটি ৪,৬৬৪,০০০—১,৫১১,০০০ ভোটে সম্মেলনে গৃহীত হয়, তাতে বলা হয়েছে: স্মিথকে 'শেষ সুযোগ' দেয়া হচ্ছে। এই বৎসরের মধ্যে যদি স্মিথরা রোডেশিয়ায় বিদ্রোহের অবসান ঘটিয়ে বৃটেনের 'সাংবিধানিক কর্তৃত্ব' স্বীকার না করেন, তবে কঠোরতর ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

উইলসন নেতৃত্ব এখনও দ্বিধাগ্রস্ত হলেও শ্রমিক দলের অভ্যন্তরে প্রগতিশীল চিন্তাধারার সমর্থকদের শক্তি ক্রমবর্ধমান। ভিয়েতনাম ও রোডেশিয়া সম্পর্কে গৃহীত প্রস্তাব দুটি তারই প্রমাণ।

নেপাল:

ভারতের প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী রাজা মহেন্দ্রের আমন্ত্রণে নেপালে ৫ দিনব্যাপী রাষ্ট্রীয় সফরের পর গত ৬ই অক্টোবর নয়াদিল্লীতে ফিরে এসেছেন।

শ্রীমতী গান্ধী এই সফরকালে শ্রীথাপা ও রাজা মহেন্দ্রের সঙ্গে বিভিন্ন বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা করেন। শ্রীথাপার সঙ্গে তিনি দীর্ঘসময় ধরে আন্তর্জাতিক রাজনীতি, ভিয়েতনাম সমস্যা, নেপাল-ভারত সম্পর্ক, নেপালের বৈষয়িক উন্নয়নে ভারতের সাহায্য প্রভৃতি বিষয়ে আলোচনা করেন। শ্রীমতী গান্ধী সংযুক্ত আরব প্রজাতন্ত্র, যুগোশ্লাভিয়া ও ভারত সরকারের প্রধানদের আসন্ন দিল্লী বৈঠকের কথাও শ্রীথাপাকে বুঝিয়ে বলেন। পৃথকভাবে নেপালের স্বরাষ্ট্র-মন্ত্রী শ্রীবেদানন্দ ঝা এবং বাণিজ্য ও শিল্পমন্ত্রী শ্রীনগেন্দ্রপ্রসাদ রিজালের সঙ্গে শ্রীমতী গান্ধীর আলোচনা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

নেপালের উন্নয়নমূলক কার্যে ভারত বরাবর সাহায্য করে আসছে। শ্রীমতী গান্ধী তাঁর এবারের সফরে ভারতের সাহায্যে নির্মিত ১ কোটি ২৬ লক্ষ টাকার পানীয় জল প্রকল্প 'সুন্দরী জল প্রকল্পের' উদ্বোধন করেন। এ ছাড়াও তিনি ঘোষণা করেন, নেপালের তৃতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় ভারত চল্লিশ কোটি টাকা সাহায্য করবে। উভয় দেশের মধ্যে বাণিজ্য সম্পর্কেরও প্রসার করা হবে বলে স্থির হয়েছে। এ বিষয়ে সরকারী পর্যায়ে আরও আলোচনা চালানো হবে।

ভারত ও নেপালের মধ্যে গভীর বন্ধুত্বে সম্পর্ক রয়েছে। মাঝে রাজনৈতিক কারণে এই সম্পর্কের অবনতি ঘটে, এবং নেপাল ভারতের বিরুদ্ধে চীন ও পাকি-স্তানের দিকে ঝোঁকে। শ্রীলালবাহাদুর শাস্ত্রীর বিশেষ চেষ্টার ফলে নেপালের সঙ্গে ভারতের ভুল বোঝাবুঝির অবসান ঘটে, এবং দুই দেশের মধ্যে আবার স্বাভাবিক সম্পর্ক গড়ে ওঠে। ইতিহাস, সংস্কৃতি, ধর্ম, আচার-ব্যবহার—সব দিক দিয়েই নেপাল ও ভারত অভিন্ন। উভয়েই হিমালয়-আশ্রিত। দুই দেশের অধিবাসীর মধ্যেও ঘনিষ্ঠ মৈত্রী সম্পর্ক বিদ্যমান। ভারত ও নেপাল উভয়ের স্বার্থেই এই সম্পর্কের উন্নতি কাম্য। ভারত সরকার এই কথা উপলব্ধি করেন বলেই নেপালের উন্নয়নে সাধ্যের অতিরিক্ত সাহায্য করছেন।

আর্জেন্টিনা:

২৭শে সেপ্টেম্বর 'এল কনডর' নামে পরিচিত ১৮ জন চরমপন্থী জাতীয়তা-বাদী যুবক ও তাদের দলনেত্রী ২৭ বৎসর বয়স্কা নাট্যকার শ্রীমতী মারিয়া ক্রিস্টিনা ভেরিয়ার বুয়েনস এয়র্স বিমানবন্দর থেকে আর্জেন্টিনা এয়ার-লাইনসের একটি স্কাইমাস্টার বিমানে আরোহণ করেন। বিমানটি বুয়েনস এয়র্স থেকে রিও গ্যালেগস যাচ্ছিল। হঠাৎ মাঝপথে এই দলের কয়েকজন পিস্তল বের করে পাইলটকে বিমানের গতি পরিবর্তন করতে বাধ্য করেন, এবং আর্জেন্টিনা উপকূল থেকে ৩০০ মাইল দূরবর্তী ফকল্যান্ড দ্বীপপুঞ্জে অবতরণ করতে বাধ্য করেন।

ফকল্যান্ড দ্বীপপুঞ্জ বৃটেনের অধীন। দক্ষিণ মেরুর কাছাকাছি ঠাণ্ডা এই দেশে পেঙ্গুইন ও ভেড়া ছাড়াও ২২০০ কৃষকের বাস। ১৮৩৩ সালে বৃটিশ নৌবহর এই দ্বীপপুঞ্জটি দখল করে। কিন্তু আর্জেন্টিনার অধিবাসীরা এই দ্বীপপুঞ্জ আর্জেন্টিনার অন্তর্ভুক্ত বলে মনে করে এবং এখান থেকে বৃটিশ শাসনের অবসান দাবি করে। আর্জেন্টিনার লোকের কাছে এই দ্বীপপুঞ্জের নাম 'মালভিনাস'। এই প্রশ্ন নিয়ে আর্জেন্টিনা 'মার্কিন রাষ্ট্রসমিতি' (O.A.S.) রাষ্ট্র-সংঘ প্রভৃতির কাছে বহু দরবার করেছে। কিন্তু কোন ফল হয় নি।

বিমান থেকে অবতরণের পর মারিয়া ক্রিস্টিনা ভেরিয়ারের নেতৃত্বে যুবকের দল ফকল্যান্ডের রাজধানী পোর্ট স্ট্যানলিতে আর্জেন্টিনার জাতীয় পতাকা উত্তোলন করেন। তাঁরা আর্জেন্টিনার বীর যোদ্ধা বিভেরোর নামে পোর্ট স্ট্যানলির নতুন নামকরণ করেন 'পোর্ট বিভেরো'। দখল করা বিমানেই স্থাপিত হয় তাঁদের বিপ্লবী পরিষদের সদর দপ্তর।

এদিকে খাস আর্জেন্টিনাতেও বৃটিশ বিরোধী বিক্ষোভ শুরু হয়। ২৮শে সেপ্টেম্বর রোজারিওতে বৃটিশ কনসালের অফিসে ঢুকে বিক্ষোভকারীরা রাণী ভিক্টোরিয়ার প্রতিকৃতি পুড়িয়ে ফেলে।

আর্জেন্টিনা প্রজাতন্ত্রের ১৫০তম বার্ষিকী অনুষ্ঠানে যোগদানের জন্য বৃটেনের রাণীর প্রতিনিধিরূপে তাঁর স্বামী প্রিন্স ফিলিপ তখন বুয়েনস এয়র্সে। ২৮শে সেপ্টেম্বর রাত্রে যখন তিনি বৃটিশ দূতাবাসে একটি ভোজ অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন তখন চরম-পন্থী জাতীয়তাবাদীরা দূতাবাস লক্ষ্য করে গুলীবর্ষণ করে। গুলীবর্ষণের ফলে প্রিন্স ফিলিপ বা অপর কারও কোন ক্ষতি হয় নি। তবে জোর গুজব জাতীয়তাবাদীদের উদ্দেশ্য ছিল প্রিন্স ফিলিপকে অপহরণ করা এবং ফকল্যান্ড দ্বীপের জন্য তাঁকে 'মুক্তিপণ' হিসাবে ব্যবহার করা।

আর্জেন্টিনা সরকার ফকল্যান্ডের ওপর আর্জেন্টিনার দাবির দৃঢ় সমর্থক হলেও, চরমপন্থীদের দ্বারা এরূপ প্রত্যক্ষ ব্যবস্থা গ্রহণ তাঁরা সমর্থন করেন নি। আর্জেন্টিনার রাষ্ট্রপতি জেনারেল কার্লোস ওনগানিয়া বলেছেন, এই যুবকদের বিদ্রোহী বলে গণ্য করা হবে এবং এ'দের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। তিনি ইতিমধ্যেই সৈন্য পাঠিয়েছেন ফকল্যান্ড থেকে মারিয়া ক্রিস্টিনা ভেরিয়ার ও তাঁর সঙ্গীদের ধরে আনবার জন্য। কিন্তু এ'দের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করা ওনগানিয়ার পক্ষে শক্ত হবে। পেরনপন্থীরা এ'দের প্রতি সমর্থন জানিয়েছে। শক্তিশালী শ্রমিক সংঘও এ'দের সমর্থক। জাতীয়তাবাদের বিচারে ভেরিয়াররা আজ 'বীর'। জাতীয় বীর-দের ঘাঁটাতে গিয়ে ওনগানিয়ার শাসন না শেষ হয়!

ঋষি শ্রীঅরবিন্দ

শ্রী দিলীপকুমার রায়

শ্রীঅরবিন্দ সাবিত্রীর প্রথম সর্গ লেখেন ত্রিশ-পঁয়ত্রিশ বৎসর আগে। Letters on Savitri-র ভূমিকায় অমল কিরণ লিখেছেন যে, তিনি ১৯২৭ সালে তাগাদা দিয়ে গুরুদেবের কাছ থেকে আদায় করেন সাবিত্রীর "It was the hour before the Gods awake"......ইত্যাদি। অর্থাৎ আদিকাণ্ডের প্রথম কয়েকটি চরণ। তারপর গুরুদেব তাকে মাঝে মাঝে সাবিত্রীর আরো নানা সর্গ পাঠাতেন, সে টাইপ ক'রে তাঁকে ফেরৎ পাঠাত।

সাবিত্রী প্রথম প্রকাশিত হয় ১৯৪৬ সালে—কয়েকটি সর্গ। আমি প্রথম দুই সর্গের অনুবাদ করি মহোল্লাসে। আমার অনুবাদ প্রথম দিকে তাঁর মনঃপূত হয় নি। তিনি আমাকে লিখেছিলেন যে, সাবিত্রীতে তিনি সাধ্যমত ইংরাজী অমিত্রাক্ষরের প্রবহমাণতা (enjambement) এড়িয়ে চলেছেন, কারণ তিনি চেয়েছেন এর ছন্দে বৈদিক মন্ত্রের রূপ দিতে—প্রতি চরণই স্বয়ংসম্পূর্ণ করে। সর্বত্র নয় অবশ্য, কিন্তু ইংরাজী অমিত্রাক্ষরে প্রবহমাণতা যেমন স্বচ্ছন্দে আসে, অপর্যাপ্ত স্রোতে সে-রূপ তিনি দিতে চান নি সাবিত্রীর। তাই আমাকে তিনি বলেন যে, অনুবাদেও এই কদম তথা সংযম বজায় না রাখলে সাবিত্রী-র ভাবধ্বনি ব্যাহত হবে। আমি তাঁর নির্দেশ অনুসারে আবার অনুবাদ করি সাবিত্রীর প্রথম স্কন্ধের প্রথম দুই সর্গ, চতুর্থ সর্গের Only the immortals..till the work is done—প্রায় দু পৃষ্ঠা, এবং চতুর্থ স্কন্ধের শেষ সর্গ। তিনি আমার এ নবতন অনুবাদের নানা চরণের ত্রুটি-বিচ্যুতি দেখিয়ে দেবার পরে যে শুদ্ধ রূপ দাঁড়াল তার তিনি প্রশংসা করেছিলেন মন খুলেই। চতুর্থ স্কন্ধের চতুর্থ সর্গ শ্রীঅরবিন্দ আশ্রম প্রেসে ছাপা হয় ১৯৪৬ সালের জুন মাসে।

এ অনুবাদ আমি বহুবর্ষ পরে অনামীর দ্বিতীয় সংস্করণে প্রকাশ করি—তবে সবটা নয়, কিছু কিছু বাদ দিয়ে। ইচ্ছা আছে পরে প্রথম এ কয় সর্গ, ও আরো দু-একটি সর্গ বই করে ছাপাব মূলের পাশাপাশি। এ ছাড়া অনামীতে দিয়েছি কয়েকটি নির্বাচিত অংশমাত্র—যেগুলি শ্রীঅরবিন্দ দেখেন নি। পরে আরো নানা চরণের অনুবাদ করেছি—নানা নিবন্ধে, তথা আমার "স্মৃতিচারণ" দ্বিতীয় ভাগে।

এ প্রবন্ধে আমি এ অনুবাদগুলি থেকে কিছু কিছু উদ্ধৃত করব, যেহেতু আমার বক্তব্য গোড়াতেই বলেছি যে, অনুবাদের খুঁৎ সত্ত্বেও তার আয়নায় আসল রূপের কিছুটা অন্ততঃ প্রতিবিম্বিত হয়। বলা বাহুল্য, শ্রীঅরবিন্দ আমার সাবিত্রীর অনুবাদকে "very beautiful" বলে ছাড়পত্র না দিলে আমি শুধু যে এ অনুবাদ ছাপাতাম না তাই নয়, আর অনুবাদও করতাম না। কারণ, তিনি প্রশংসা করলেও আমি তো জানি—কোথায় তাঁর সাবিত্রীর লোকোত্তর প্রেরণা আর কোথায় আমার ক্ষুদ্র সাধ্য। শুধু তাই নয়, বাংলা অমিত্রাক্ষরের (বিশেষ করে আঠারো মাত্রার ছন্দের) শক্তি আজ আগের চেয়ে সমৃদ্ধতর হলেও ইংরাজী অমিত্রাক্ষরের—বিশেষ করে শ্রীঅরবিন্দের অপ্রতিদ্বন্দ্বী অমিত্রাক্ষরের—কাছাকাছিও আসতে পারে নি—যদিও ভবিষ্যতে পারবেই পারবে, যদি আমরা এ ছন্দের সাধনা করি কেবল অতিলালিত মিষ্টতার বেসাতি না করে। অর্থাৎ যাকে শ্রীঅরবিন্দ বলেন austerity—ভাবধ্বনি—যে সুর সাবিত্রী মহাকাব্যের বাদী সুর—তার তপস্যা করলে আমাদের অমিত্রাক্ষরও অদূর ভবিষ্যতে ইংরাজী অমিত্রাক্ষরের প্রতিস্পর্ধী হতে পারবে এ বিশ্বাস আমার আছে—অবশ্য শ্রীঅরবিন্দের সাবিত্রীর ছন্দ ছাড়া। সাবিত্রীর ছন্দ-গরিমা কেবল তারই হাতে ফুটতে পারে যে তাঁর ভাবধ্বনির প্রেরণারও নাগল পেয়েছে। কিন্তু শ্রীঅরবিন্দের কাব্যপ্রতিভা তথা যোগসাধনালব্ধ দিব্য প্রেরণার যোগাযোগ হবে যাঁর মধ্যে এমন মহাপুরুষ আবার অবতীর্ণ হতে পারেন কেবল পরম-পুরুষের নির্দেশে। এ স্মৃতিচারণী তর্পণে আমার নানা অনুবাদ আমি পরিবেশন করব বলেই এটুকু ভূমিকা করলাম—বৈষ্ণব বিনয়মুখর হতে নয়—(আমি সত্য কথনে বিশ্বাস করি) আমার নিজের ত্রুটি-চ্যুতির সম্বন্ধে আমি যে পূর্ণ সচেতন একথা বলে রাখতে।

আমি অনামীর পরিশিষ্টে লিখেছি যে, শেক্ষপীয়র মিলটনের অমিত্রাক্ষরের গাম্ভীর্য আনতে হলে প্রতি চরণে মাত্র চারটি করে প্রস্বন আনলে চলবে না—

সম্মুখ স।মরে পড়ি।বীর চূড়া।মণিঃ

চাই পাঁচটি প্রস্বন

Then sud |denly |there rose |a sa |cred stir

সাবিত্রী

সহসা চ।ঞ্চল হ'ল।এক পুণ্য।লগ্ন চাঞ্চ।ল্যের

আমাদের এই আঠারো মাত্রার উদাত্ত অক্ষরবৃত্তেই কেবল সাবিত্রীর অনুবাদ সম্ভব, মধুসূদন-প্রবর্তিত চোদ্দ মাত্রার অমিত্রাক্ষরে নয়।

গৌরচন্দ্রিকা ছেড়ে, এবার পালাগান শুরু করার সময় এল :

*　　*　　*

শ্রীঅরবিন্দ সাবিত্রীর নাম দিয়েছেন "a legend and a symbol"—পুরাকথা ও প্রতীক। পুরাকথাটি অতি পুরাতন। রামায়ণে সীতা বলছেন (অযোধ্যাকাণ্ডে):

দ্যুমৎসেনসুতং বীরং সত্যবানমনুব্রতাম্।
সাবিত্রীমিব মাং বিদ্ধি ত্বমাত্মবশবর্তিনীম্॥

অর্থাৎ দ্যুমৎসেন পুত্র বীর সত্যবানের অনুগামিনী সাবিত্রীর

মতনই আমাকে জেনো—আমি তোমার তেমনিই ঐকান্তিকা অনুব্রতা।

মহাভারতে বনপর্বে বেদব্যাস প্রথম সাবিত্রীর কাহিনী বলেন, মহামুনি মার্কণ্ডেয়ের মাধ্যমে সাতটি অধ্যায়ে—২৪৭-২৫৩। এ পুরাকাহিনীটি বহু মনীষীকেই মুগ্ধ করেছে—ম্যাক্সমুলার, উইণ্টরনিট্‌জ প্রভৃতি। কারণ এর মধ্যে শুধু পাতিব্রত্যই নেই—সে তো অন্য দেশের নানা মহীয়সীর মধ্যেও পাওয়া যায়—আছে অনুপম সাহস ও তেজ—যে মৃত্যুর সামনে দাঁড়িয়েও মৃত্যুর বিধানকে উল্টে দেবার জন্যে সর্বস্ব পণ করতে পারে। যাহোক গল্পটি এইঃ

মহারাজ অশ্বপতির ঔরসে মহারাণী মালবীর গর্ভে সাবিত্রী জন্মগ্রহণ করেন—অশ্বপতি আঠারো বৎসর তপস্যা করার পর। সাবিত্রী অপরূপা হলেও এমন তেজস্বিনী ছিলেন যে কোনো পাণিপ্রার্থীই সাহস পেল না কাছে আসতে। অগত্যা অশ্বপতি কন্যাকে বললেন নিজের বর খুঁজে নিতে। সাবিত্রী রথে চ'ড়ে বর খুঁজতে খুঁজতে অবশেষে বনে গিয়ে পেলেন সত্যবানের দেখা। রাজা দ্যুমৎসেন অন্ধ হয়ে শত্রু কর্তৃক বিতাড়িত হয়ে মহিষী শৈব্যা ও সত্যবানকে নিয়ে বনবাসী হন। স্বয়ম্বরা সাবিত্রী সেই বনে সত্যবানকে বাগ্‌দান করে গৃহে ফিরে পিতাকে বলেন সত্যবানের কথা। সে সময়ে ত্রিকালজ্ঞ দেবর্ষি নারদ সেখানে উপস্থিত ছিলেন বললেন সখেদে যে, সত্যবান সর্বগুণান্বিত হলেও তার "এক এবাস্য দোষো হি গুণানাক্রম্য তিষ্ঠতি—স চ দোষঃ প্রযত্নেন ন শক্যঃ পরিবর্তিতুম্‌"—সত্যবানের সব গুণ ডুবেছে এই এক দোষে যার কোনো প্রতিবিধান নেই—যে, সে এক বৎসর বাদে মরবেই মরবে—অলঙ্ঘ্য ভবিতব্য।

রাজা রাণীর মাথায় আকাশ ভেঙে পড়ল। রাজা সাবিত্রীকে বললেন—অন্য কোনো বরকে বরণ করতে। উত্তরে মহীয়সী কন্যা বললেনঃ

দীর্ঘায়ুরথবাল্পায়ুঃ সগুণো নির্গুণোহপি বা।
সকৃদ্‌বৃতো ময়া ভর্তা ন দ্বিতীয়ং বৃণোম্যহম্‌॥

আয়ু-গুণ তার থাক বা না থাক—করেছি বরণ যাহারে স্বামী তাত, একবার—তারে ছাড়া আর কারো গলে মালা দিব না আমি।

অশ্বপতি অগত্যা বনে গিয়ে সত্যবানের হাতে কন্যাকে দিয়ে ফিরে এলেন।

ঠিক এক বৎসর বাদে সাবিত্রী তিনদিন উপবাস ও ধ্যান ক'রে স্বামীর সঙ্গে বনে গেলেন। সত্যবান যেতেন প্রতিদিন কাঠ কাটতে। তিনি ভবিতব্যের কথা জানতেন না, কিন্তু সাবিত্রী তো জানতেন, তাই সেদিন জোর ক'রেই বনে গেলেন—শ্বশুর শাশুড়ী ও স্বামীর নিষেধ সত্ত্বেও।

বনে গিয়ে সত্যবানের মাথায় বেদনা সুরু হ'ল। তিনি সাবিত্রীর কোলে মাথা রেখে চেতনা হারাতেই সাবিত্রী দেখলেন সামনে দাঁড়িয়ে ভয়াবহ যম। "আপনি কে?" জিজ্ঞাসা করতে যম বললেন ঃ "আমি যম, সত্যবানের আয়ু শেষ হয়েছে—ওর আত্মাকে বেঁধে নিয়ে যেতে এসেছি।" ব'লে তার দেহ থেকে অঙ্গুষ্ঠমাত্র প্রাণপুরুষকে পাশবদ্ধ ক'রে প্রস্থান করলেন।

সাবিত্রী পিছু নিলেন। যম বারণ করলেন, কিন্তু সাবিত্রী তো নিরস্ত হবার পাত্রী নন—মিষ্টিকথায় তাঁর মন ভুলিয়ে একের পর এক পাঁচটি বর পেলেন—যম খুশি হয়ে দিতে চাইলেন বলেই অবশ্য। প্রথম বর—অন্ধ শ্বশুর যেন দৃষ্টি-শক্তি ফিরে পান। দ্বিতীয় বর—তিনি যেন হৃতরাজ্য ফিরে পান। তৃতীয় বর পিতা অশ্বপতি ও মাতা মালবীর যেন পুত্র-সন্তান লাভ হয়। চতুর্থ বর—সাবিত্রী যেন নিজেও পুত্রবতী হন। সবশেষে বললেন (যমকে প্যাঁচে ফেলে) যে সত্যবানের ঔরসে তাঁর গর্ভে সন্তানের আবির্ভাব হ'তে হ'লে সত্যবানের পুনরুজ্জীবন আবশ্যিক—তাহ'লেই "তবৈব সত্যং বচনং ভবিষ্যতি"—কেবল তাহ'লেই আপনার কথা ফলবে। তাছাড়া—বললেন সাবিত্রী গাঢ়কণ্ঠে ঃ

ন কাময়ে ভর্তৃবিনাকৃতা সুখং ন কাময়ে
ভর্তৃবিনাকৃতা দিবম্‌।
ন কাময়ে ভর্তৃবিনাকৃতা প্রিয়ং ন ভর্তৃহীনা
ব্যবসামি জীবিতুম্‌॥

স্বামী বিনা আমি চাহি না স্বর্গ,
স্বামী বিনা সুখ জানি না আমি,
স্বামী বিনা প্রিয় জানি না কাহারে,
চাহি না বাঁচিতে হারায়ে স্বামী।

যম মুগ্ধ হ'য়ে সাবিত্রীকে বর দিয়ে চ'লে গেলেন—সত্যবান প্রাণ ফিরে পেল, অলংঘ্য নিয়তি হার মানল সাবিত্রীর মহীয়সী প্রতিজ্ঞার কাছে। যুগ যুগ ধরে সাবিত্রীর আদর্শ ভারতে অম্লান শিখায় জ্বলেছে কি সাধে?

* * *

শ্রীঅরবিন্দ জন্মেছিলেন বীর্য ও জ্ঞানের সহজাত কবচকুণ্ডল নিয়ে। তাই গভীর আনন্দ পেতেন মেয়েদের মধ্যে সাহস দেখলে। প্রায়ই বলতেন নিবেদিতার কথা—যে, তিনি ছিলেন মহীয়সী—a living flame ! সাধে কি তিনি সাবিত্রীর কাহিনীতে মুগ্ধ হয়েছিলেন, গ্রহণ করেছিলেন তাকে অসাধ্য-সাধনের প্রতীকরূপে, যার জীবনসাধনা—নিয়তির রায় পাল্টে দেওয়া? সাবিত্রীতে তিনি এই কথাই বার বার ঘুরিয়ে ফিরিয়ে বলেছেন যে, ভগবৎ প্রেমী যদি নিঃস্বার্থ অনুকম্পায় ক্লিষ্ট মানুষের দুঃখ ঘুচাতে চেয়ে নিয়তিরও মোড় ফিরিয়ে দেবার প্রার্থনা করে তবে সে পারে এ পরম সিদ্ধি লাভ করতে। ওমরখৈয়মের অশ্রুল অদৃষ্টবাদে তিনি হাসতেন যে হার মেনে বিজ্ঞ বনতে চায় ঃ

The Moving Finger writes; and having writ
Moves on : nor all thy Piety nor wit
Shall lure it back to cancel half a line,
Nor all thy tears wash out a word of it.

শ্রীঅরবিন্দ সাবিত্রীর মধ্যে দিয়ে মুখ্যত দেখাতে চেয়েছিলেন একটি ভাগবত সত্যেরই দ্বিবিধ রূপায়ণ ঃ এক, ভগবানের কাছে মানবাত্মার নত হওয়া, দুই ভগবানের কর্ম-কর্ত্রী নিয়তির বশ্যতা স্বীকার না-করা। মহাভারতের সাবিত্রী যমের কাছে নত হয়েছিলেন কেন না মহাভারতের যম করাল কৃতান্ত নন, তিনি মোহান্তের দীক্ষাদাতা, দেবতা—নচিকেতার গুরু হ'য়ে যিনি তাকে জিজ্ঞাসু ("প্রস্টা") বলে বরণ করে পরলোকতত্ত্ব ("সাম্পরায়") বুঝিয়ে দিয়েছিলেন। শ্রীঅরবিন্দের সাবিত্রী-তে মৃত্যুর ব্যক্তিরূপে যমরাজের এ-দেবত্ব ফুটে ওঠে নি, ফুটেছে তার এক দুর্ধর্ষ বাগ্মীরূপ যে আধা-নাস্তিক, কেন না নির্গুণ ব্রহ্মের কিছু খবর রাখে, শোনা কথা, কিন্তু বাক্‌-পটু কুতার্কিক কিন্তু দৃশ্যত বুদ্ধিমান—অনেক আধুনিক বিজ্ঞ বস্তুতান্ত্রিকের মত। তাই তার জাঁককে খর্ব করে তাকে অপদস্থ করতে তার প্রতি ঢিলের উত্তরে সাবিত্রী অকুণ্ঠে পাটকেল ফিরিয়ে দিতে কসুর করেন নি। কিন্তু ভগবানের কাছে তিনি নত হয়েছিলেন (কীভাবে সে কথা পরে বলছি)। কারণ সাবিত্রী অন্তরে পেয়েছিলেন অনুকম্পার আলোকবাণী—যাকে ভাগবতী করুণারই মানবিক তর্জমা বলা চলে। তাই তিনি গভীরে অনুভব করেছিলেন যে, এ-অনুকম্পার প্রেরণায় ভগবানের মৌখিক অনুজ্ঞাকে অমান্য করলে ভগবান অসুখী হবেন না, কেন না ভগবান তাঁকে এই পরীক্ষা করতে চেয়ে-

ছিলেন বলেই নিয়তিকে নাকচ করতে চান নি প্রথম দিকে। বটে, তবু "ভগবানের আজ্ঞাবাহী নিয়তির হুকুম তামিল করব না" বলতে হলে আগে ভাগবতী শক্তি পাওয়া চাই—যার পাঞ্জায় নিয়তি নাকচ হতে প'রে—অসুর হলে চলবে না। অসুরের স্বধর্ম কী? না,

Heavenward he clambers on a stair of storm..
He matches himself against the Eternal's calm
And feels in Himself the greatness of a god.
(Savitri 6/2)

দ্যুলোকে অসুর চায় উত্তরিতে ঝঞ্জার সোপানে,
প্রতিস্পর্ধী হতে চায় চিরন্তনের প্রশান্তির
আপনারে মনে করি দেবতার সম মহীয়ান্।

তাই না সাবিত্রীর আগে জগন্মাতা অশ্বপতিকে সাবধান করে দিয়েছিলেন ঃ

Let not the impatient
Titan drive thy heart.

অসহিষ্ণু দৈত্য তব না হোক নিয়ন্তা হৃদয়ের (৩।৪)

সাবিত্রীর মধ্যে শ্রীঅরবিন্দ এ-স্পর্ধার আমেজ আনেন নি। আত্মবিশ্বাস তার অটল কিন্তু তার উদ্ভব আপনার দেবতাত্মার উপলব্ধি থেকে। তাই সে নিয়তিকে অতিক্রম করতে চেয়েছে অহঙ্কারে নয়, ভাগবতী করুণার প্রতিনিধি হয়ে ঐশ্বরিক আলোর তৃষ্ণা বরণ করেঃ

I am a deputy of the aspiring world
(যে-জগৎ ঊর্ধ্ব-আশী আমি যে তাহারি প্রতিনিধি)

এই আত্মপ্রত্যয়ে।

এ-আত্মপ্রত্যয়ের মূল কী? না, পিতা অশ্বপতির তপস্যালব্ধ বর। তিনি আদ্যাশক্তির কাছে বর পান (মহাভারতে আদ্যাশক্তিকেই বলা হয়েছে সাবিত্রী দেবী) যে, অশ্বপতির কন্যা নিয়তির অলংঘ্য বিধানও লংঘন করবে ঃ

One shall descend and break the iron law
Change Nature's doom by the lone Spirit's power.

(লভিবে জন্ম সে-বালা আত্মার অনন্য শক্তিবলে
করিবে যে চূর্ণ নিয়তির মৃত্যু-বিধান অটল।)

অশ্বপতি কে? না, ধরায় অধরা আলোর উদ্গাতা। শ্রীঅরবিন্দ স্বীকার করেছেন আমাদের আর্য দৃষ্টির বাণী যে, পৃথিবীর মহাজন যখন চাইবেন অপার্থিব অবতরণ কেবল তখনই হবে অবতরণ। ভাগবতে গোপীরা কৃষ্ণকে বলেছিলেন গান গেয়ে বরণ করে ঃ

ন খলু গোপিকানন্দনো ভবান্
অখিল দেহিনাম্ অন্তরাত্মদৃক্।
বিখনসার্থিতো বিশ্বগুপ্তয়ে
সখ উদেযিবান্ সাত্বতাং কুলে॥

(গোপিকানন্দন নহ তো নাথ, তুমি চেতনা
আঁখি যে গো নিখিল অন্তরে,
ধাতার প্রার্থনে অনাথা অবনীরে করিতে
সনাথা হে এসেছ তনু ধ'রে।)

চৈতন্যদেব অবতীর্ণ হয়েছিলেন অদ্বৈত গোস্বামীর প্রার্থনায়, আরো নানা অবতারের অবতরণের ভিত্তি গাঁথতে হয়েছে পার্থিব কোনো না কোনো তপস্বীকে। সাবিত্রী কে? না, মানবিক প্রার্থনার প্রতীক অশ্বপতির আবেদনের উত্তর। সাড়া দিলেন কে? না, বিশ্বমাতা আদ্যাশক্তি ওরফে দেবী সাবিত্রী নব-জীবনদাত্রী অলোকসূর্যসম্ভবা। দেবীর তো মানবীর মতন চলনবলন নয়। তাই সাবিত্রীকে তার সখীরা স্বজনেরা কেউই তাকে বুঝতে পারত না। আকৃষ্ট হ'ত বৈ কি, কিন্তু ভয়ও পেত তার কাছে আসতে। মহাভারতে ব্যাসদেবও সাবিত্রীর এই ঐশ্বরিক তেজের ইঙ্গিত করেছিলেন ঃ

তাং তু পদ্মপলাশাক্ষীং জ্বলন্তীমিব তেজসা।
ন কশ্চিদ্বরয়ামাস তেজসা প্রতিবারিতঃ॥

অর্থাৎ কুমারী সাবিত্রীকে ঘিরে থাকত এমন একটি দৈবী প্রভা যে কেউ তার কাছে ঘেঁষতেই সাহস করত না—তার পাণিপ্রার্থী হবে কোন্ মুখে?

শ্রীঅরবিন্দ অনুপম কবিত্বে সাবিত্রীর এই দৈবী রূপ বর্ণনা করেছেন শুধু প্রথম দুটি সর্গেই নয়—যত্র তত্র, নানা সুরে, নানা ভঙ্গিতে, নানা প্রস্বনে ঃ

Immortal rhythms swayed in her time-born steps;
Her look, her smile awoke celestial sense
Even in earth-stuff, and their intense delight
Poured a supernal beauty on men's lives.
A wide self-giving was her native act;
A magnanimity as of sea or sky
Enveloped with its greatness all that came
And gave a sense of a greatened world;
Her kindly care was a sweet temperate sun,
Her high passion a blue heaven's equipoise......
At once she was the stillness and the word,
A continent of self-diffusing peace,
An ocean of untrembling virgin fire :
The strength, the silence of the gods were hers. (1.2)

(দুলিয়া উঠিত তার কালজাত চরণসম্পাতে
চিরন্তনের ছন্দ। স্মিতহাসি, চাহনি তাহার
পার্থিবের মর্মকোষে স্বর্গস্বাদ তুলিত জাগায়ে।
সে-নিবিড় উল্লাসের ধারাসারে ঝরাত সে এক
অলোক-লাবণ্যমধু সকলের জীবনের পরে।
মহীয়ান্ আত্মদান ছিল তার স্বভাবসাধনা।
অম্বুধি অম্বর সম ঔদার্য তাহার আপনার
মহত্ত্বে রহিত বেষ্টি' তাদের—আসিত যারা কাছে।
দিত দিশা যেন এক ব্যাপ্ততর অলোক-ছন্দের।
স্নিগ্ধ পরিচর্যা তার ছিল কান্ত বালারুণ-প্রভা,
উত্তুঙ্গ উচ্ছ্বাস—এক নীলিমার অচলায়তন।...
নৈঃশব্দ্য সে, বাণীও সে ছিল একাধারে ধরাতলে,
স্বয়ম্প্রসারিণী প্রশান্তির ধারয়িত্রী মহীয়সী,
বিনিষ্কম্পা অনাহতা, পাবকপ্রোজ্জ্বলা সাগরিকা ঃ
দেবতার মহাবলে, গাঢ়মৌনে যার স্বাধিকার।)

এ না হ'য়ে পারে? সাবিত্রী যে

Ambassadress twixt eternity and change...
A glamour from the unreached transcendence
Iridescent with the glory of the Unseen...
(1.1)

(কালাতীত-কালাধীন মাঝে বাণীবাহিনী দূতিকা...
লোকোত্তরলোক হতে অবতীর্ণ একটি গরিমা,
অলক্ষ্য উদ্ভাসরাগে ইন্দ্রধনুকান্তি দ্যুতিময়ী)
তাই তো

Earth felt the Imperishable's passage close :
The waking ear of Nature heard her steps
And wideness turned to her its limitless eye,
And, scattered on sealed depths, her luminous smile
Kindled to fire the silence of the worlds. (1.1)

লভিল ভরসা পৃথ্বী—আসন্ন অমর অভ্যুদয় ঃ
প্রকৃতি শুনিল তার পদধ্বনি জাগন্ত শ্রবণে,
ফিরাল দেবীর পানে ব্যাপ্তি তার অনন্ত নয়ন,
নিরুদ্ধ অতলে দেবী বিছায়ে প্রোজ্জ্বল স্মিতহাসি
করিল দেদীপ্যমান অগণ্য বিশ্বের মৌনিমায়।

হবে না কেন? যার তনু মন মৃন্ময়তাকে ছাপিয়ে গেছেঃ
Her mind, a sea of white sincerity,
Passionate in flow, had not one turbid wave..
A body like a parable of dawn (1.1)
(মানস দেবীর ছিল শুভ্র সরলতার সাগর,
উচ্ছ্বাস-ঊর্মিলা চিন্তা—বিনা আবিলতার লহরী,
তনুবল্লীখানি মরি, অহনার অরুণকাহিনী!)

আরো নানা সর্গেই শ্রীঅরবিন্দ সাবিত্রীর মহিমা কীর্তন করেছেন সমুচ্ছ্বাসে। বলতে গিয়ে যেন তাঁর সাধ মেটে নি! বলতে কি, সাবিত্রী মহাকাব্যে মাত্র দুটি চরিত্র ঃ অশ্বপতি ও সাবিত্রী—পিতাপুত্রী। পিতা মহৎ মানুষ, কন্যা মহীয়সী দেবদূতী যাঁকে "মানুষীং তনুমাশ্রিতাং" দেখে অনেকেই চিনতে পারত না, অথচ না মেনেও মানতে হ'ত—এম্‌নিই তাঁর তনুর অগ্নিপ্রভা কান্তি, মনের অচিন্তনীয় দীপ্তি। "To see her was a summons to adore"* তার দর্শন মানেই অন্তরে পূজারী জেগে ওঠা—কিন্তু "finding her touch desired too strong tt bear"-আশেপাশের লোক চাইত তার পরশ কিন্তু সে স্পর্শপ্রভা যেন সইতে পারত না। "They blamed her for a tyranny they loved"—সাবিত্রী যে তাদের উদ্দীপনা দিত ঊর্ধলোকের পানে মৃন্ময়তার মায়া কাটিয়ে চিন্ময় হ'তে--কিন্তু মৃৎপঙ্কিল মানুষের কাছে এ যে অত্যাচার, তাই না তারা চাইত তাকে টেনে এনে নিজেদের মতন মৃন্ময়ীরূপে কাছে পেতে—"They yearned to draw her down to their own earth."

বস্তুতঃ দৈবী চারিত্রমহিমা নিয়ে উচ্ছ্বাসরঙিন হ'য়ে ওঠা সহজ কিন্তু বর্ণনা করতে হ'লে দৈবী প্রেরণা চাই। শ্রীঅরবিন্দ যে পেয়েছিলেন এ-প্রেরণা সে সম্বন্ধে সন্দেহ থাকে না সাবিত্রীর চরিত্রের অতুলনীয় চিত্রণের বর্ণাঢ্যতায়।

(ক্রমশঃ)

*চতুর্থ খণ্ড দ্বিতীয় সর্গ দ্রষ্টব্য—সাবিত্রীকে দেখে সবাই উজিয়ে উঠত উল্লাসে, আবার পেছিয়ে যেত সভয়ে—এম্‌নিই তাঁর দৈবী দীপ্তি! আরো নানা সর্গেই সাবিত্রীর চারিত্রদীপ্তির বর্ণনা ঝিকমিকিয়ে উঠেছে ম্লানিহীন সুষমায়।

দাওয়াই —

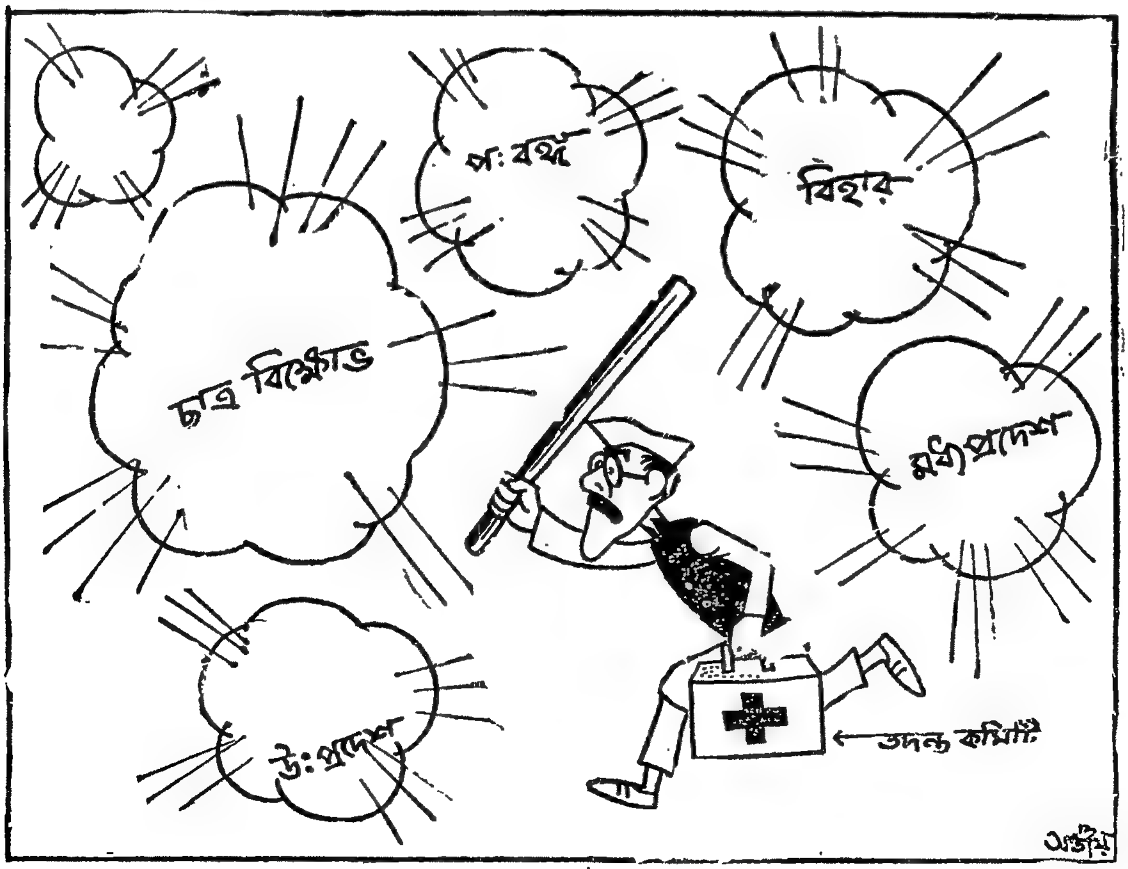

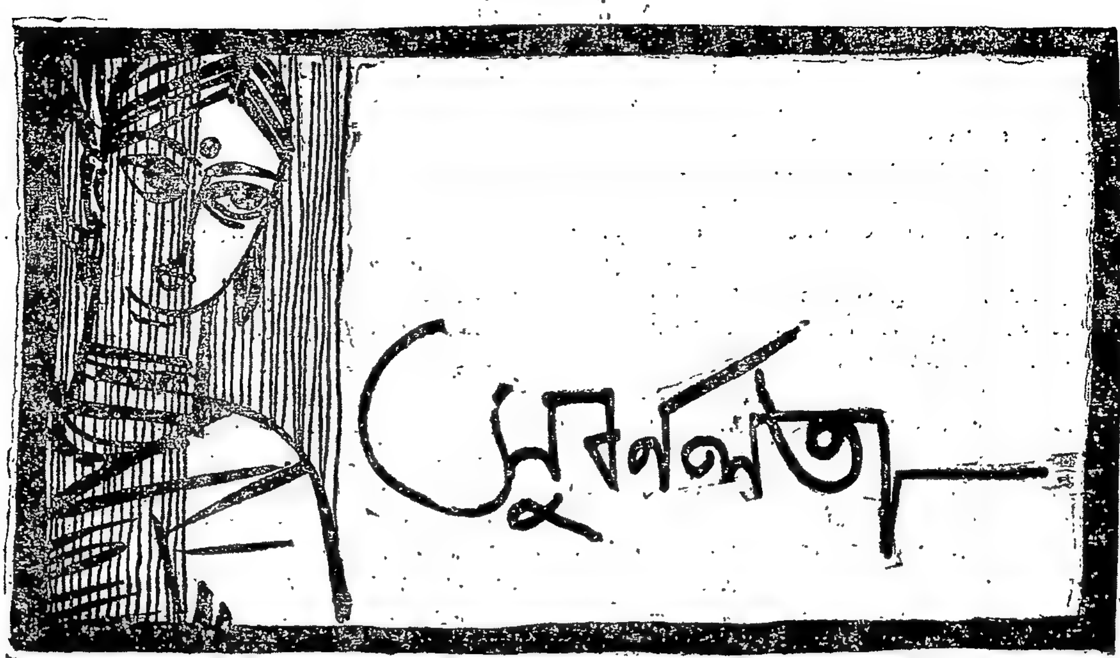

ধারাবাহিক উপন্যাস

আশাপূর্ণা দেবী

(পূর্ব-প্রকাশিতের পর)

এবার জগু মারমুখী হয়।

'জাত নিয়ে কী হবে পিসি? জাত নিয়ে কী হবে? নাতজামাই করবে?'

'শোনো. কথা!' মুক্তকেশী বলেন, 'এই তোকে আর আমার মেজবৌকাকে এক বিধাতায় গড়েছে দেখছি! কথা করেছ কি অগ্নিমূর্তি! ঘরে দোরে ঘুরে বেড়াবে জাত দেখবি না?'

'না দেখবো না। ঘরে দোরে মশা-মাছি পিঁপড়েটাও বেড়ায়! নর্দমা থেকে উঠে এসে বেড়ায়। তখন তো তোমাদের জাতের বিচার দেখি না!......এই নিতাই চল আমরা অন্যত্র যাই। দুটো বুড়িতে মিলে কুট কচালে গপপো করুক। ওঁরা আবার ধম্মকথা কইতে আসেন! মানুষ কেষ্টর জীব। অতিথি নারায়ণ! যত ফক্কিকারি কথা! মুখের ওপর যে অপমানটা তোমরা ওই অভাগা নারায়ণটাকে করলে বসে বসে, নেহাৎ 'নারায়ণ' বলেই সহ্য করলো! যতই হোক বেটাছেলে। এ লক্ষ্মীঠাকরুণ হলে মনের ঘেন্নায় পাতাল প্রবেশ করতো! মানুষের ছানা দুটো খাবে, সেই নিয়ে খোঁটা দেওয়া!'

জগু গট গট করে বেরিয়ে যায় নিতাইয়ের হাত ধরে।

মুক্তকেশী পিছন থেকে সাবধান করেন, 'কাজটা কিন্তু ভাল করলি না জগু। কে বলতে পারে ছোঁড়া 'স্বদেশী' কি না। শুনি পুলিশের ভয়ে নাকি অমন কত ছোঁড়া ন্যাকা সেজে—'

কথা থামান।

জগুর কানে প্রবেশ করাবার আশা আর যাবে না!

শ্যামাসুন্দরীর কানে যেটুকু গেছে তাতেই যথেষ্ট। তাচ্ছিল্যভরে বলেন, 'তোমার ভাইপোর জন্যে ভেবো না ঠাকুরঝি। পুলিশই ওর ভয়ে দুগ্‌গা নাম জপবে! ...এই বুড়ো বয়সে একটা কচি খোকা এনে আমার গলায় চাপালো, আপত্তি দেখিয়েছি তাতেই রাগ দেখছো তো। যাকগে। তোমার খবর কি? অনেক দিন তো আর আসো না!'

মুক্তকেশী বলেন, 'আর আসবো কি! কোমরটা যে দিন দিন শত্তুরতাই সাধছে। হাঁটতে পারছি না আর। ওই যো সো করে গঙ্গাচ্ছানটুকু বজায় রাখা! এসেছি একটা খবর দিতে। মেয়ে দুটোর বিয়ের ঠিক করে ফেলেছি, তাই তোমায় বলতে আসা একদিন যাবে, ছেলেদের সঙ্গে একত্র বসে পরামর্শ হবে!'

শ্যামাসুন্দরী বোঝেন কোন মেয়ে দুটো।

মল্লিকা আর চাঁপা আর কে!

বলেন, 'তা' বেশ! কোথায় সম্বন্ধ হলো?'

'বিরাজের শ্বশুরবাড়ির সম্পর্কে। ঘর বর ভালো, দুই জ্যাঠতুতো খুড়তুতো ভাই—।'

শ্যামাসুন্দরী সকৌতুকে বলেন, 'তা তোমার মেজবৌ তো ছোটকালে বিয়ে পছন্দ করে না, রাজী হয়েছে?'

'ছোটকালে?' মুক্তকেশী একটু চাপা ঝঙ্কার দিয়ে ওঠেন। 'ছোট আবার কোথায় বৌ? তোমার কাছে তো কিছু অছাপা নেই? এগারো বলে চালাচ্ছি, তেরো ভরে গেল না? তা মেজবৌমা আমার মুখে চুন-কালি লেপেছে। বিরাজের সেই সম্পর্কে ননদ কুটুম্বু সূত্র ধরে এসেছিল কনে দেখতে। তুই বৌমানুষ চুপ করে থাক, বড়বৌমা তো মুখে রা কাড়ে নি। মেজবৌমা তাদের সঙ্গে গলা গলিয়ে গপপো করে করে বলে বসেছিল, 'ওমা এগারো আবার কি? সে তা দু বছর আগে ছিল। দুজনেই ওরা তেরো পুরে গেছে! মা বোধহয় ভুলে গেছেন। নাতি-নাতনীর সংখ্যা তো কম নয়! ছেলের ঘর মেয়ের ঘর মিলিয়ে কোন না পঞ্চাশ!' ...সেই নিয়ে কী হাসাহাসি। বোঝো আমার বৌয়ের গুণ!'

শ্যামাসুন্দরী বলেন, 'একটু সত্যিবাদী আছে কি না—'

'ওগো সত্যিবাদী আমরাও। তবে অত সত্যিবাদী হলে তো আর সংসার চালানো যায় না! সব দিক বজায় রাখবে তুমি কিসের জোরে? মানমর্যাদা রক্ষে রাখবে কিসের জোরে? মিথ্যেই ঘরের আচ্ছাদন, মিথ্যেই চালের খুঁটি! সংসার তো করলে না কখনো—'

শ্যামাসুন্দরীর এই মুক্ত জীবনের প্রতি মুক্তকেশীর বরাবরের ঈর্ষা!

শ্যামাসুন্দরী বোঝেন এখন প্রসঙ্গ পরিবর্তনের প্রয়োজন। বলেন, 'বোসো

ঠাকুরঝি ডাব কেটে আনি। তা বিয়েটা কবে নাগাদ হবে?'

'হবে, এই শ্রাবণের মধ্যেই দিতে হবে। নচেৎ তিন মাস হাত-পা গুটিয়ে বসে থাকতে হবে। যেও তা হলে।'

'থাক। তুমি বোসো।' ডাব কাটতে চলে যান শ্যামা।

কিন্তু ভাগ্নেদের মেয়ের বিয়ের পরামর্শ দিতে এসে যে এমন দিশেহারা দৃশ্যের সামনে পড়তে হবে, এমন ধারণা কি ছিল শ্যামাসুন্দরীর?

দেখতে হবে এমন ধারণা তো ছিল না, বিষয়বস্তুটাও ধারণাতীত।

তবু দেখতে হলো।

দেখলেন সুবর্ণলতা ছেলে পিটোচ্ছে। বরাবর শুনে এসেছেন সুবর্ণলতা নাকি ছেলেমেয়েদের গায়ে হাত তোলে না। না কি ছেলে ঠেঙানো তার দু-চক্ষের

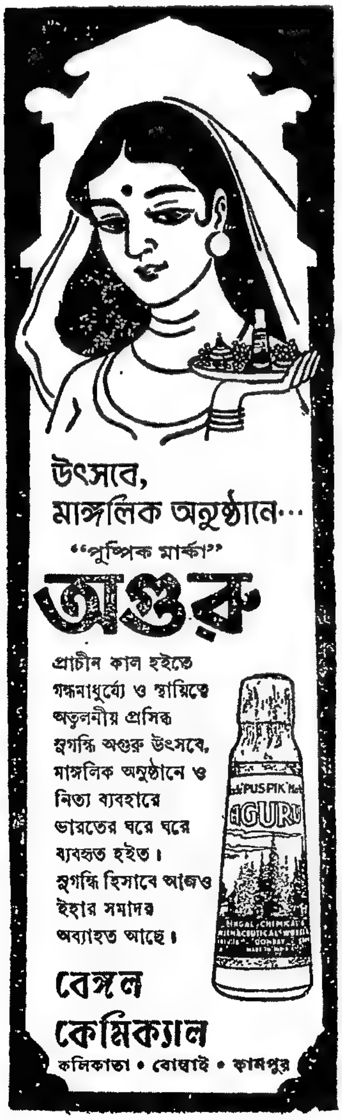

বিষ। অন্য জায়েরা ছেলে মারলে রাগ করে। বলে 'তোমার অধীনের প্রজা বলেই তুমি মারবে? তাহলে আর তুমি যার প্রজা, সেই বা তোমায় ছেড়ে কথা কইবে কেন?'

সেই সুবর্ণলতা ছেলে পিটোচ্ছে।

অথবা শুধু পিটোচ্ছে বললে কিছুই বলা হয় না। ক্ষ্যাপা জন্তুর মত ছেলেটার উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে বন্য আক্রমণে তাকে যেন শেষ করে দিতে চাইছে।

বিধ্বস্ত হয়েছে নিজের কেশবেশ, চেঁচাবার শক্তিও বুঝি নেই। শুধু হাঁপাচ্ছে আর মারছে। উল্টেপাল্টে মারছে।

উমাশশী ছাড়িয়ে নিতে পারে নি, পারে নি ছোট বৌ বিন্দু, মুক্তকেশী তারস্বরে চেঁচাচ্ছেন 'মেরে ফেলবে না কি ছেলেটাকে? মেরে ফেলবে না কি? ও-মা এ কী খুনে মেয়েমানুষ গো! ওগো বেটাছেলেরা যে কেউ বাড়ি নেই গো, আমি এ বৌকে নিয়ে কী করি? অ সেজবৌমা—'

'সেজবৌমা', অর্থে গিরিবালা।

প্রভাসচন্দ্রের স্ত্রী।

তা তাকেই কি বেটাছেলের স্থলাভিষিক্ত করতে চাইছেন মুক্তকেশী?

কিন্তু গিরিবালা শাশুড়ীর এই কাতর আহ্বানে সাড়া দিচ্ছে না। গিরিবালা আগুন ঠিকরোনো দু' চোখ মেলে নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে আছে, বুঝি শ্বাস-প্রশ্বাসও পড়ছে না তার। মনে হচ্ছে ছেলেটা মরে যাওয়ারই অপেক্ষা করছে সে! ওর হাত-পা ছোঁড়া থেমে গেলে, আর চীৎকারটা শান্ত হয়ে গেলেই কর্তব্যের আসরে নামবে গিরিবালা।

কিন্তু শ্যামাসুন্দরী প্রথমটা ঢুকেই বুঝে উঠতে পারেন নি, ছেলেটা সুবর্ণর নিজের নয়, গিরিবালার।

পারেন নি, কারণ, ওটাও ধারণা বহির্ভূত বস্তু।

পরের ছেলেকে এমন মার মারে কেউ?

অবশ্য ছেলেটাই যে নীরবে পড়ে মার খাচ্ছে, এমন নয়। চারখানা হাত-পায়ের সাহায্যে যুদ্ধ জয়ের চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে সে। তাতেই সুবর্ণলতার কাপড় ছিঁড়েছে, চুল খুলে গেছে, গুঁড়ো হয়েছে হাতের শাঁখা।

প্রহারের শব্দ, ছেলেটার চীৎকারের শব্দ, বাড়ির অন্যান্য ছোটছেলেদের ভীত ক্রন্দন শব্দ, আর সুবর্ণলতার অনমনীয় মনের তীব্র ঘোষণার শব্দ। 'মেরেই তো ফেলবো, খুনই করবো। এমন কুলাঙ্গার ছেলের মরাই উচিত।'......

এমনি এক অদ্ভুত পরিবেশের সামনে এসে দাঁড়ালেন শ্যামাসুন্দরী।

তারপর ব্যাপারটা বুঝে ফেলার পর ছুটে এসে সেই মল্লযুদ্ধের দুই যোদ্ধার মাঝখানে পড়ে বলেন, 'কী হচ্ছে, মেজবৌমা? খুনের দায়ে পড়তে চাও?'

বললেন।

তবু 'ব্যাপারটা'র কতটুকুই বা বোঝা হয়েছে তাঁর।

ছেলেটা যে সুবর্ণর নয়, গিরিবালার, তা বুঝতে পারেন নি।

তবু বলে উঠেছিলেন, 'ছেলেটাকে কি খুন করবে মেজবৌমা!'

'হ্যাঁ, তাই করবো।' সুবর্ণলতা ছেলেটাকে ছেড়ে দিয়ে হাঁপাতে থাকে। ওকে একেবারে জন্মের শোধ খুন করে ফেলে ফাঁসি যাবার বাসনাটা ঘোষণা করে।

আর এই সময়ই 'ব্যাপারটা' বুঝে ফেলেন শ্যামাসুন্দরী। বুঝে চমকে ওঠেন।

ছেলেটা গিরিবালার।

আর মানে এই প্রাণঘাতী প্রহারটা দিচ্ছে সুবর্ণ, নিজের ছেলেকে নয়, পরের ছেলেকে।

সুবর্ণ কি তাহলে সত্যই বিকৃত মস্তিষ্ক?

শ্যামাসুন্দরী এ পরিস্থিতির জন্যে প্রস্তুত ছিলেন না! তবু শ্যামাসুন্দরী নিজেকে প্রস্তুত করে নেন। ছেলেটাকে কাছে টেনে নিয়ে বলেন, 'বুঝেছি কোনো ঘোরতর অন্যায় করেছে ছেলেটা, তবু আমিই ওর হয়ে মাপ চাইছি মেজবৌমা!'

এবার, এতক্ষণে, গিরিবালার মুখে বাকস্ফূর্তি ঘটে, 'আপনি মাপ চাইলেই তো হবে না মাসীমা, থানা-পুলিশ করে ছাড়বো আমি।'

শ্যামাসুন্দরী নিতান্তই বাপের বাড়ির সম্পর্কে একমাত্র এবং নিতান্তই নিকটজন, তাই মুক্তকেশী তাঁকে যথেষ্ট পদমর্যাদা দিয়ে থাকেন, তবু আজ আর দিয়ে উঠতে পারলেন না।

শ্যামাসুন্দরীর বিরূপ মন্তব্যের উপর ছুরি চালান, 'তুমি থামো বৌ। থানা-পুলিশের নাম সেজবৌমা সহজে করে নি। ও তো মা, না কি? এতক্ষণ যে দাঁড়িয়ে সহ্য করেছে, তাতেই বাহাদুরী দাও ওকে! ওই ঘরজ্বালানী পরভোলানীকে বুঝতে তোমার এখনো দেরি আছে বৌ। এতখানি বয়েস হলো, এমন জাঁহাবাজ মেয়ে দেখলাম না কখনো। ছেলেপুলে কোথায় কি খেলা করছে, সেদিকে তোর নজর দেবার দরকার কি?...আর দোষের খেলাই বা কি খেলেছে? বড়বৌমার ছেলেরা সম্প্রতি দারোগা মেসোর বাড়ি ঘুরে এসে গপ্পো-গাছা করেছে, তাই শুনে 'দারোগা' সেজে খেলবার বাসনা হয়েছে এই তো কথা? খেলায় ছেলেপুলে কখনো রাজা হয়, কখনো মন্ত্রী হয়,

কখনো চোর হয়, কখনো জল্লাদ হয়, সেটা কর্তব্য?'

ঘটনাটা ইতিমধ্যে জানা হয়ে গেছে শ্যামাসুন্দরীর!

দারোগা বাড়ির গল্প শুনে, গিরিবালার ওই বীর সন্তানটি দারোগা সেজে 'স্বদেশী পাজী'দের শায়েস্তা করা করা খেলা করছিল। নিরীহ দু'চারটে কুচো-কাচাকে 'স্বদেশী' সাজিয়ে নিজে জামা টুপি ও 'বুটজুতো'য় সাজ সম্পূর্ণ করে সেই সবুট পদাঘাতের সঙ্গে স্বদেশীদের প্রতি যথেচ্ছ কটূক্তি করার খেলাটা নাকি ইতিপূর্বে দু'একদিন হয়ে গেছে, এবং সুবর্ণলতা না কি সে কথা শুনে কড়া নিষেধ করে দিয়েছিল।

তথাপি অমন মনোমত খেলাটি সে ছাড়তে পারে নি, আবার আজ তোড়জোড় করে সুরু করেছিল, আর পড়বি তো পড় খোদ মেজজ্যেঠিরই সামনে।

একেবারে বুটপরা পা তোলার মহামুহূর্তে।

পরবর্তী দৃশ্য ওই।

শ্যামাসুন্দরীর জানা হয়ে গেছে ঘটনাটা, তাই শ্যামাসুন্দরী বলেন, 'তা' ওকেও বলি, জ্যেঠি যখন দু'তিন দিন নিষেধ করেছে, তখন ওই খেলাটিই বা খেলা কেন?'

মুক্তকেশী বিকৃতকণ্ঠে বলেন, 'ভারী আমার মহারাণী এসেছেন সংসারে; তাই সংসারসুদ্ধু লোক ওঁর নির্দেশে ওঠ-বোস করবে।...বেশ করেছে ও ওই খেলা খেলেছে। ওই স্বদেশী মুখপোড়াদের অমনিই শাস্তি হওয়া উচিত। ওই মুখপোড়াদের জন্যেই তো দেশে যত অশান্তির ছিষ্টি হয়েছে।'

তা'ছাড়া অপরের ছেলে কি করেছে, না করেছে, তাতে তোর নাক গলাবার দরকার? তুই মারবার কে?

শ্যামাসুন্দরীর চিরদিনের দোষ, শ্যামাসুন্দরী ন্যায়পক্ষ সমর্থন করে বসেন।

অন্তত ওঁর কাছে যেটা ন্যায় মনে হয়। তাই শ্যামাসুন্দরী অসন্তুষ্ট গলায় বলেন, 'এ তোমার কি কথা ঠাকুরঝি? ছেলের দোষ করলে জ্যেঠি, খুড়ি, ঠাকুমা, পিসিতে শাসন করবে না?'

'করবে শাসন। তাই বলে খুন করে নয়। সেজবৌমা ঠিক কথাই বলেছে, ওর হাতে দড়ি পরানোই উচিত!

হ্যাঁ সেই কথাই বলেছে গিরিবালা। বলেছে 'ওঁর হাতে যদি আমি দড়ি পরাতে না পারি তো আমার নাম নেই আমিও একটা উকিলের পরিবার। কিসে কি হয় জানতে বাকি নেই আমার!'

কিন্তু উকিলের পরিবারের সেই দম্ভোক্তি কি সত্যিই কার্যকরী হয়েছিল?

সুবর্ণলতা নামের বৌটার হাতে দড়ি পড়েছিল?

তা যদি হয়, তা'হলে নিশ্চয়ই চাঁপা ও মল্লিকা নামের মেয়ে দুটোর বিয়ে হয়ে ওঠে নি?

সংসারে একটা ভয়াবহ তচ্‌নচ্‌ কান্ড ঘটে গেছে?

তা সেদিনের সেই পরিস্থিতি মনে করলে, তাই মনে হয় বটে।

কিন্তু সে সবের কিছুই হয় নি, যথারীতিই সর্ববিধ অনুষ্ঠান সহকারে বিয়ে হয়ে গেছে।

না হবে কেন?

একেই তো 'জন্ম, মৃত্যু, বিয়ে, তিন বিধাতা নিয়ে।'

তাছাড়া বাঙালী মধ্যবিত্ত ঘরের মানুষগুলোর মত এমন মজবুত জীব অল্পই আছে।

এরা জলে ডোবে না, আগুনে পোড়ে না, খাঁড়ায় কাটে না। মনে হয় 'গেল গেল সব গেল—' আবার দেখা যায়, কই কিছুই হল না।

আবার যথারীতি সংসারে ভাত চড়ে, ডাল চড়ে, খাওয়া শোওয়া হয়, কচিগুলো বড়ো, এবং বড়গুলো বুড়ো হতে থাকে, এবং 'তিন বিধাতা' ঘটিত ওই জীবনলীলা অব্যাহত গতিতে চলতে থাকে।

মুক্তকেশীর সংসারেও তার ব্যতিক্রম ঘটে নি।

বিয়েতে শাঁখ বেজেছে, উলু পড়েছে, লোকজন খেয়েছে, জগু এসে বিরাট হাঁক-ডাক সহযোগে যজ্ঞি দেখেছে ও পরিবেশন করেছে, এবং শ্যামাসুন্দরীও অন্তঃপুরের অনেক কাজ সমাধা করেছেন। এবং মুক্তকেশী নাতজামাইদের নিয়ে রঙ্গরস করেছেন।

মোটের মাথায় অনুষ্ঠানের ত্রুটি হয় নি।

শুধু বিরাজ তখন আর একবার মৃত সন্তানের জের টেনে আঁতুড়ঘরে বসে থেকেছে। আসতে পারে নি, আর আসা হয় নি সুবালার।

সুবালার সংসারে তখন দু'দুটো বিপৎপাত।

একে তো ফুলেশ্বরী হঠাৎ মারা গেলেন, তার উপর, হঠাৎ ওই অসময়েই ঘাড়ের উপর উঁচোনো খাঁড়াখানা ঘাড়ে পড়লো সুবালাদের।

অম্বিকা ধরা পড়লো।

অম্বিকার জেল হলো!

হবারই কথা।

আশঙ্কার প্রহরই তো গুণছিল। সে যাক—বিয়েতে যে আসা হল না সেটাই হচ্ছে কথা।

তবে সব শূন্যতার পূরণ হয়ে গিয়েছিল মুক্তকেশীর সুরাজের আসায়।

বিয়েতে সুরাজ এসেছিল!

অবস্থা আরো ফিরেছে, স্বামীর আরো পদমর্যাদা হয়েছে। দুই ভাইঝিকে দু-দু'খানা গহনা দিয়েছে।

আর তারপর?

তারপর দিন গড়িয়ে যাচ্ছে।

অনেকগুলো বর্ষা, বসন্ত, শীত, গ্রীষ্মের আসা-যাওয়ার সূত্র ধরে মানুষের চেহারাগুলোর পরিবর্তন ঘটছে।

চেহারা?

তা' শুধু চেহারাই।

স্বভাব নামক বস্তুটার তো মৃত্যু নেই। ও নাকি মৃত্যুর ওপার পর্যন্ত ধাওয়া করে নিজের খাজনা আদায় করে নেয়।

তাই কাঁচা চুলে পাক ধরে, চোখ, কান, দাঁত আপন আপন ডিউটি সেরে বিদায় নিতে তৎপর হয়।

শুধু স্বভাব তার আপন চেয়ারে বসে কাজ করে চলে।

(ক্রমশঃ)

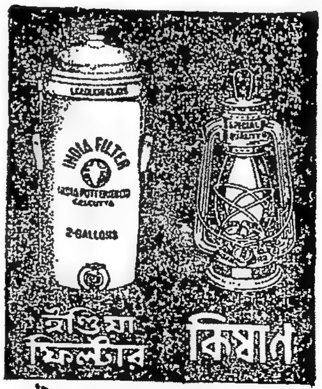

গৌর মোহন দাস এণ্ড কোং
২৩৩, ওল্ড চীনা বাজার স্ট্রীট
কলিকাতা-১
ফোন: ২২-৬৫৮০

অস্ট্রেলিয়া থেকে লিখছি

সুরেশচন্দ্র সাহা

জিরাল্ডটনে গিয়েছিলাম গমের চাষ দেখব বলে। এক বিশেষ ধরণের গম চাষ। অল্প জল, অল্প বৃষ্টির মাঠে গম চাষের এক নতুন কায়দা। ছোট ছোট সব গাছ; এ-জাতীয়, সে-জাতীয়ের মিশ্রণে গম গাছের বর্ণসংকর। অল্প বৃষ্টিতেই গাছ গজায়, ফসল ফলে। বড় জাতের গাছ এ সব অঞ্চলে জন্মে না বলেই এমন চাষের প্রবর্তন।

জিরাল্ডটন ছোট জায়গা। গাছপালা প্রায় নেই-ই। লোকসংখ্যা বার হাজার। সামনে ভারত মহাসাগরের নীল জল। একটু এগোলেই দেখা যায় ধূ-ধূ করা প্রান্তর, বালুগর্ভ ভূমি, উপলময় মাঠ যেন একেবারে শূন্য হাতে দাঁড়িয়ে আছে। মাথার উপর মেঘহীন আলোময় রোদের চেহারাতে সকাল-বিকালের পার্থক্য কম; মেঘে মেঘে বেলা হওয়ারও আভাস নেই আকাশে আকাশে।

জিরাল্ডটন অঞ্চলে বাৎসরিক বৃষ্টিপাত দশ ইঞ্চির বেশি নয়। সে কথা বোধহয় রাস্তায় গুলিখেলা ছোকরারাও জানে। শুধু জিরাল্ডটন নয়, বৃষ্টিপাতের হিসাব সারা অস্ট্রেলিয়ার সবারই যেন মুখস্থ। এই অঞ্চলে আট-দশ মাইল দূরে দূরে এক-একটি কৃষকের হাজার, দুই হাজার একরের খামার। এখানে জমি আমাদের দেশের মত উর্বর নয়, দুই-ফসল, তিন-ফসলেরও নয়। তবে হাজার, দুই হাজার একর জমি থেকে একএকটি কৃষক যে পয়সা পায় তাই যথেষ্ট। কৃষকদের বেশির ভাগ বাস করে জিরাল্ডটনে, গাড়ি হাঁকিয়ে গিয়ে জমির কাজ করে; কলে জমি চাষ করে, কলে গম কাটে—মাঠের মধ্যে কলে গম-মাড়াইয়ের পর সেখান থেকে লরি ভরে সোজা চালান দেয় জিরাল্ডটনের জাহাজ ঘাটায়। বিশ্বের বাজারে ছড়িয়ে পড়ে সে গম।

জিরাল্ডটনের উপকূলে বার শ' মাইল উত্তর পর্যন্ত যে সব লৌহখনি আবিষ্কৃত হয়েছে তা আগামী দিনের অস্ট্রেলিয়ার আর্থিক জগতে যুগান্তর আনবে। জাপান-আমেরিকার সহযোগিতায় লৌহ উত্তোলনের কাজ শুরু হয়ে গেছে। জিরাল্ডটন থেকে লৌহ বহনের জন্য জাপান বিশেষ ধরণের জাহাজ পর্যন্ত তৈরি করে ফেলেছে।

জিরাল্ডটনের আসল গর্ব লৌহ নয়, গম নয়—গলদা চিংড়ি; এরা বলে ক্রেফিশ। তীরভূমি থেকে পঞ্চাশ মাইল পশ্চিমে ভারত মহাসাগর এই রঙীন গলদা চিংড়ির উৎস; সোনার খনির মত। শ' দুয়েক মোটর বোট রোজ সকালে সাগরে গিয়ে বিকেলে ফিরে আসে নাওভরা মাছ নিয়ে। প্রতিটি গলদা চিংড়ির দাম আমেরিকার তিন থেকে চার টাকা। গম, লৌহ, ক্রেফিশের অঢেল সম্পদের মধ্যে বাস করে জিরাল্ডটনের বার হাজার মানুষ মহা-ঐশ্বর্যবান। তাই এত ছোট শহরে এত বড় বড় মোটর গাড়ির দোকান, ভাল ভাল হোটেল। পোশাক আর খাদ্যের রকমারি স্টোর।

জিরাল্ডটনের দক্ষিণ দিকে এগোলে পশ্চিম অস্ট্রেলিয়া রাজ্যের মহাসম্পদের অন্য একদিক চোখে পড়ে। দক্ষিণের জমি অনুদার নয়, প্রকৃতিও কৃপণোকরুণ নয়। সমুদ্র বরাবর পাঁচ-ছ' শ' মাইল দক্ষিণ-পশ্চিমে ক্রমশ উৎকৃষ্ট জমি। কোথাও বা উপকূল থেকে শ' চারেক মাইল পূব দিকে তার বিস্তার। এই দিকে পশ্চিম অস্ট্রেলিয়ার যত ফল, গম, টাটকা সব্জীর চাষ, যত ডেয়ারি, ক্যানারি, গোচারণভূমি।

ফ্রিম্যান্টেলের ফেব্রুয়ারীতে পশ্চিম অস্ট্রেলিয়া গ্রীষ্মাবসানের প্রহর গুণছে। শরৎ আসন্ন। আকাশে-বাতাসে স্নিগ্ধতার অভাব নেই। চারদিকে তাকিয়ে মনে হল, এখানে ফুল ফোটে, পাতা গজায়, গাছ-পালাও শাখা-প্রশাখায় বিস্তার লাভ করে। ফ্রিম্যান্টেলের পশ্চাদপটে একটি উচ্চ পার্কে দাঁড়িয়ে সামনে দেখলাম ভারত মহাসাগর যেন অটল প্রশান্তিতে ধ্যানমগ্ন; আর ফ্রিম্যান্টেল সমস্ত কোলাহল নিয়ে তার তীরে স্তব্ধ হয়ে আছে। যদি কোন মিথ্যাবাদী তখন অভিনয় করেও বলত—এইখানে অস্ট্রেলিয়ার এই পশ্চিম সাগর তীরে মধুক্ষরান্তি সিন্ধবঃ বাণী দিক থেকে দিগন্তে সর্বপ্রথম উৎসারিত হয়েছিল, হয়ত তাকে বলতাম—তুমি মহাসত্য জেনেছ, বন্ধু! মনে হল, ফ্রিম্যান্টেলের এ ঐশ্বর্য, নীলিমায় নীল সাগরের এই মধুময় রূপ যেন জন্ম জন্মান্তর দেখি। ভারত মহাসাগর থেকে সেদিনের মত চোখ ফিরিয়ে পার্কের উচ্চ আসন থেকে উঠে এলাম। এ যেন নেমে আসার নামান্তর।

আলাপ হল আব্দুল হকের সঙ্গে। ভারতীয় ব্যবসায়ী। ষাট বছর আগে তাঁর বাপজান ফ্রিম্যান্টেলে এসে দোকান খুলেছিলেন। এন্তেকাল করার আগে হাওড়ার বাড়ি থেকে আব্দুল হককে এনে গদিতে বসিয়ে যান। সে ব্যবসায়ের এখন অনেক প্রসার হয়েছে। জন তিনেক সহকারিণী এখন হক সাহেবের মাইনে খেয়ে দোকানে কাজ করে—যন্ত্রে ওজন করে, কলে পয়সার হিসেব করে, সওদা বেচে। আপিসের লোকের মতই তারা বিকাল পাঁচটায় ছুটি পায়। শনিবারে হাফ, রবিবারে মাফ। দু' বছর পর পর হক দেশে গেলে এরাই আবার তার হয়ে কারবার চালায়।

হাওড়া জেলার লোক হলেও হকের চেহারাতে একটি শের-ই-বাঙাল ছাঁদ আছে, স্বভাবে একটু পূর্ববঙ্গীয় গোঁ আছে। রাজনীতির আসরে অবতীর্ণ হলে ফজলুল হকের মত কুশলী জননেতা হতে পারতেন কিনা জানি না। তবে ফ্রিম্যান্টেলের বণিকমহলে তাঁর একটু বিশেষ স্থান দেখে মনে হল, আপন ভোট কেন্দ্রে হক হয়ত সেই সুবিখ্যাত মনোভাবটি সৃষ্টি করতে পারতেন—খামু-দামু নবাব সাহেবের, ভোট দিমু হক সাহেবরে।

আব্দুল হক অস্ট্রেলিয়াতেই শাদি করবেন ভেবেছিলেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত কি কারণে যেন বিদেশিনী বান্ধবীর কথা ভুলে হাওড়ার মেয়েকেই বিয়ে করেছেন। নীল নয়নের কয়েক ফোঁটা লোনা জল তাঁকে বিচলিত করতে পারে নি; ভারত মহাসাগরের অনন্ত জলে পাড়ি জমিয়েই তো তাঁকে একদিন ফ্রিম্যান্টেলে আসতে হয়েছিল।

হক সাহেবকে বললাম—অনেক পয়সা তো কামালেন। এখানে থেকে গিয়ে বিবি ব্যাটাদের দিলে আর কেন চোট দিচ্ছেন? এইবার দেশে গিয়ে একটা ব্যবসা ফাঁদলে হয় না? হক সাহেব গর্জে উঠলেন—ক্ষেপেছেন মশাই, দেশে কি আর ব্যবসা করার উপায় আছে? ক্ষুদে মুদিখানার মালিককে রাত দশটা পর্যন্ত সওদা বেচে তহবিল মিল করতে হবে, জিনিসের স্টক মিলিয়ে বোর্ডে চক দিয়ে লিখতে হবে কাল কত ছিল, কত আজ বিক্রি হল, কত রইল। এসব কাজ একা পেরে উঠবার আবার উপায় নেই; সুতরাং সামর্থ্য না থাকলেও মুহুরী রাখতে হবে। সমস্ত কাজের সূক্ষ্ম হিসেবের জন্য ফাইল চালু করতে হবে। ভোরে দোকানে স্টক লেখা না থাকলে ধরপাকড়ের ভয়ে ভীত হয়ে থাকতে হবে। শুধু কি তাই? হেলথ অফিসার, এনফোর্সমেণ্ট পুলিশ আসবে।

তাদের সঙ্গে হেসে কথা বলতে হবে, চা-সিগ্রেট দিয়ে খাতির করতে হবে, মাসের শেষে যার যার হাতে মাথট গুঁজে দিতে হবে। নতুবা চাল চেক করতে এসে যদি কোন কসুর না পায়, তবে ডাল সিজ করে তারা চলে যাবে। এ-সবের উপরে আছে আবার ইনকাম ট্যাক্সের ঝামেলা। আপনি মুটো করে খাচ্ছেন দেখে বন্ধুর দল আয়কর আপিসে বেনামী চিঠি পাঠিয়ে জানাবে আপনার আয়ের সীমা নেই। সুতরাং আয়কর বসবে। পরের বছর আয় না হলেও বার্ষিক চাঁদার মত কর দিয়ে যেতে হবে। হক এমনভাবে কথাগুলি বললেন যেন পুলিশ, এনফোর্সমেণ্ট, আয়করের লোকেরা আমার পরামর্শমত চলে। আর তাদেরই একজনকে একা পেয়ে ঝাল মেটাচ্ছেন। হক হাঁপাতে লাগলেন। আমি বিব্রত বোধ করলাম।

সেদিন হক সাহেবের বাড়িতে দাওয়াদ খেলাম। মোগলাই মটন, চিকেন বিরিয়ানি, আমের চাটনি, দৈ। সঙ্গে পাঁপড় ভাজা। হক নিজে রেঁধেছিলেন। খেতে খেতে বললেন—বড্ড খরচ হচ্ছে। কি করে কমানো যায় বলতে পারেন? আমি তাঁকে চা-বাগানের গল্প বললাম—দার্জিলিঙের চা-বাগানে বিলেতি সাহেব মালিকের গল্প। ছুটিতে দেশে গিয়ে সাহেব ছেলেকে পাঠিয়েছেন কারবার দেখতে। বিশেষ করে বলে দিয়েছেন খরচপত্র সম্বন্ধে হুঁসিয়ার থাকতে। সাহেব-পুত্র বাগানে এসেই কুলিদের নিয়ে পড়লেন। তাদের ডেকে বললেন—তোমাদের খাওয়ার খরচ বড় বেশি পড়ছে। এবার কমাতে হবে। কুলিরা করজোড়ে নিবেদন করল—হুজুর, বেশি পড়বে ক্যানে? আমরা তো দু' টাইম সেরেফ ডাল-ভাত খাচ্ছি। হুজুর বিগড়ে গেলেন। কি, দু' টাইম ডাল-ভাত খাচ্ছ? এখন থেকে এক টাইম ডাল খাবে, এক টাইম ভাত খাবে!

হক সাহেব হো হো করে হেসে বললেন—না মশাই, খরচ কমিয়ে আমার কাজ নেই। এখানে দিব্যি খাচ্ছি-দাচ্ছি, বিকেলে দোকান বন্ধ করে নাস্তা খেয়ে নিজের গাড়ি নিয়ে টো-টো কোম্পানীতে বেরিয়ে পড়ছি। দেশে যাওয়া মাথায় থাক, এখানে আমার মুর্গী পোলাউ বজায় থাক।

বিদায় নেওয়ার আগে কিন্তু অবাক হয়ে জানালাম মাঝে মাঝে মুর্গী মটন খেলেও হক সাহেব প্রায় নিরামিষাশী। কারণ জানতে চাইলাম। তিনি বললেন—এখানে যে এম-কে মার্কা গোস্ত বেশি মেলে না। প্রশ্ন করলাম—সেটা কি পদার্থ? হক সাহেব বললেন—মুসলমান কসাইরা যে সব গরু-ভেড়া আপন হাতে জবাই করে তাতেই শুধু ছাপ মারা থাকে এম-কে অর্থাৎ মুসলিম-কিল্ড্। খাঁটি মুসলমান তো এসব ছাড়া দুসরা চীজ ছোঁয় না। হক আজ তিরিশ বছর অস্ট্রেলিয়াতে আছেন, আর এই তিরিশ বছরই এম-কে মার্কা মাংস খুঁজে বেড়াচ্ছেন।

অস্ট্রেলিয়ার পশ্চিমভাগে কলোনী চালু হয়েছিল ১৮২৯ সালে। সোয়ান রিভার কলোনী; বর্তমান নাম পশ্চিম অস্ট্রেলিয়া। রাজধানীর নাম পার্থ। সোয়ান নদীর তীরে। ঘন চকোলেট রঙের জল এই সোয়ান নদীর, দূর থেকে মনে হয় মনোহারী নীল।

সুদানের রাজধানী খার্টুমের কাছে নীল নদের জলেরও এমনি রঙ। সোয়ানের জলে অজস্র কালো হাঁসের বাস। প্রথম যুগের অভিযাত্রীরা এই কালো হাঁস দেখেই নদীর নাম দিয়েছিলেন সোয়ান।

রাজধানী পার্থে বাস করে রাজ্যপাল আর মন্ত্রীরা পশ্চিম অস্ট্রেলিয়ার শাসন পরিচালনা করেন; এইখান থেকেই যত সব কলকাঠি চলে। তবু মনে হয় পার্থ যেন কত নিঃসঙ্গ, বার মাইল দূরের ফ্রিম্যাণ্টেল গৌরবে, ঐশ্বর্যে, আভিজাত্যে তাকে আড়াল করে রেখেছে। পার্থ যেন শুধুই আপিস পাড়া; ফ্রিম্যাণ্টেল সেই আপিস-মানবদের হাসি-গান মুখরিত বাসভূমি। এদের পার্থক্য অনেকটা বালীগঞ্জ-টালীগঞ্জের মত। যত রাজ্যের ছায়া-ছবি তৈরি হয়ে আসছে টালীগঞ্জের স্টুডিওতে; তবু আভিজাত্যের দাবি যেন বালীগঞ্জেরই বেশি—ফিল্মী শিল্পীদের বাসভূমি যে বালীগঞ্জ।

অস্ট্রেলিয়ার সমাজজীবনের বিবর্তনের ধারায় যথেষ্ট বৈশিষ্ট্য আছে। রাশিয়ার মত এখানে বিপ্লব ঘটে নি, বিপ্লবের মাধ্যমে সকলের অবস্থা এক করারও চেষ্টা হয় নি।—রাশিয়ার মত পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা নেওয়া হয় নি, যে পরিকল্পনা রূপায়ণে বড় ও ছোটকে সমানভাবে স্বার্থত্যাগ করতে হয়েছিল। আবার ভারতের মত অ-বিপ্লবের মধ্য দিয়ে আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার পেয়েও পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা চালু করতে হয় নি—যে পরিকল্পনার রূপায়ণে সকলের দান সমান নয়, সকলের দামও অসমান। ভারতের মত ভাগ হয়ে বার প্রদেশের লোকের অবহেলার ভার হয়ে অস্ট্রেলিয়াতে রেফুজি আসে নি। আন্দামানের কয়েদীদের মত কালাপানি পার করাবার চাইতে বিলেতের কনভিক্ট অপসারণে অশেষ পার্থক্য। যে দেশের কয়েদী, সেই দেশের অনেক স্বাধীন নাগরিকও এখানে এসেছিল অর্থ, সম্পদ, গরু, ভেড়া এবং ফল-ফুলের বীজ নিয়ে।

ফ্রিম্যাণ্টেল থেকে চলেছিলাম আর্মাডেলের পথে। মধ্য পথে এক যুগোশ্লোভিয়ার কৃষকের ক্ষেতে আলুর চাষ দেখলাম। এক হাজার-দেড় হাজার একরের ডেয়ারি বা মেষ ফার্মের মত বড় নয়, মাত্র দশ একরের আলুর ক্ষেত। কিছু গাজর আছে। মধ্য ক্ষেতে বৈদ্যুতিক পাম্প বসিয়ে পাতালের জল টেনে এনে আট-দশ গজ পর পর বসানো ধারাযন্ত্রের যোগে জলসেচ করছে। এতেই সংসার চলে যাচ্ছে। তিরিশ বছর আগে এই কৃষক পরিবার যুগোশ্লাভিয়া থেকে ভাতের অভাবে এদেশে এসেছিল। এখন অবস্থা ফিরেছে। কৃষকটির মায়ের মনে কিন্তু

শ্রীহিরণ্ময় বন্দ্যোপাধ্যায়,
উপাচার্য, রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয় রচিত

ঠাকুরবাড়ীর কথা

ঠাকুরবাড়ী আমাদের জাতীয় ইতিহাসের ধারাকে দুইভাবে প্রভাবান্বিত করেছে। প্রথমত, পাশ্চাত্য সংস্কৃতির সহিত সংঘাত আমাদের জরাগ্রস্ত সংস্কৃতির মধ্যে যে আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল, তাকে জাতীয় স্বার্থের অনুকূলে প্রবাহিত করেছে। দ্বিতীয়ত তা এমন একটি পরিবেশ সৃষ্টি করেছিল, যা এই বাড়ীর সন্তান রবীন্দ্রনাথের অনন্যসাধারণ প্রতিভার ঠিক পথে বিকাশের সহায়তা করেছিল। ভাল ফল পেতে যেমন উপযুক্ত সেবা ও যত্ন প্রয়োজন তেমনি প্রতিভাবান মানুষের বিকাশের জন্যও অনুকূল পরিবেশের প্রয়োজন। রবীন্দ্রনাথের অগ্রজ ভ্রাতা, ভগিনী ও ভ্রাতৃজায়াগণ সেই পরিবেশটি রচনা করেছিলেন।

এই গ্রন্থের আলোচ্যসূচী ঃ পূর্বপুরুষ, দ্বারকানাথ, দেবেন্দ্রনাথ, মহর্ষির পরিবার, রবীন্দ্রনাথ, পরিবারের উত্তরপুরুষ, বাঙলার সমাজজীবনে ঠাকুরবাড়ীর ভূমিকা। রবীন্দ্রচর্চায় একটি অপরিহার্য বই। উৎকৃষ্ট প্রকাশন-সৌষ্ঠব। [১২·০০]

সাহিত্য সংসদ

৩২এ আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড ঃঃ কলিকাতা-৯

রৌদ্রসুরভি

মাণিক মুখোপাধ্যায়

সেদিন সমুদ্র কূলে
যে প্রসন্ন রৌদ্রের মহিমা
তোমাকে আমাকে গেলো
দীপ্ত থেকে দীপ্ততর ক্ষণে
আমরা তাকেই আরো
বারবার খুঁজে ফিরি
পূর্ণতার পাশে,
জীবনের বৃন্ত থেকে
শ্যামলিম দিগন্ত শিখরে;
প্রতিটি কর্মের সুর
সময়ের প্রতি পদক্ষেপে
শস্যঘ্য বাতাসে॥

আমরা এখানে তাই
ঘর বাঁধি কামনার রঙে,
আমাদের জিজ্ঞাসার তন্ময়গতিতে
দেশে দেশে ঝড় ওঠে
অনিরুদ্ধ সঙ্গীত সভায়।
আমরা পাবোই তাকে
আমাদের ঐকতান সুরে।
এ পৃথিবী মমতার মালঞ্চে আবার
যৌবনের উচ্ছল ঝংকারে
তাকে নিয়ে হাস্যময়ী লাস্যময়ী হবে।

চেতনার সে সুরভি
জীবনের রৌদ্রে গানে
আমাদের শ্রমের গরিমা॥

শান্তি নেই। আলাপের প্রসঙ্গে বৃদ্ধা বললেন—যুগোশ্লাভিয়ার মত অমন দেশ কি পৃথিবীতে আছে? সোনার দেশ। একথা নিশ্চিত, বৃদ্ধার নাতি-নাতনীরাও আর কিছুদিন পরে অন্য অস্ট্রেলিয়ানদের মতই বলবে—অস্ট্রেলিয়ার মত দেশ কি পৃথিবীতে আর আছে? সোনার দেশ!

সোয়ান নদীর কলোনী যখন চালু হল তখন তার লোকসংখ্যা আর কতই বা হবে। প্রথম পঞ্চাশ বছর ঝিমিয়ে চলল। ১৮৯২ সালে কুলগার্ডিতে সোনা আবিষ্কার হল; ১৮৯৩ সালে কালগুর্লীতে। ভাগ্যান্বেষীর দল ছুটল পশ্চিম অস্ট্রেলিয়ার দিকে, যেমন করে স্বর্ণভিক্ষুরা একদিন ছুটেছিল মেলবোর্ন-বেন্ডিগো, ব্যালারাটের দিকে। স্বর্ণযুগই আসলে অস্ট্রেলিয়ায় লোকবৃদ্ধির যুগ। যখনই সোনার কারবার কমে এসেছে, তখনই ঐ-সব অঞ্চলের লোক গমের চাষ, ডেয়ারি, ফলের চাষ, পশমের কারবারের দিকে ঝুঁকেছে। পশ্চিম অস্ট্রেলিয়াতেও তাই হল। সোনার খনিতে কাজ ভাঁটা পড়তেই শুরু হল গমের চাষ। তিরিশ বছরের মধ্যে পশ্চিম অস্ট্রেলিয়া গমের উৎপাদন আর রপ্তানীতে এক বিশেষ স্থান অধিকার করল।

অস্ট্রেলিয়ায় বিঘাপ্রতি গমের ফলন খুব বেশি নয়—বর্তমানে মণ ছয়েক। জোর চেষ্টা চলছে কানাডা, আমেরিকার ফলনের সমান করতে। খুব বেশি পরিমাণ জমি গম উৎপাদনে ব্যবহার করা উচিত কিনা অস্ট্রেলিয়াতে এখন সেই প্রশ্ন উঠেছে। ১৯৬৪-৬৫ সালে অস্ট্রেলিয়ার আশি লক্ষ টন বাড়তি গম বিক্রির অপেক্ষায় ছিল। বাঁধা খদ্দের বাদেও চীন ও রাশিয়ার কাছে অনেক গম বিক্রি হয়েছিল। তবু কিন্তু পঁচিশ লক্ষ টন গম অবিক্রিত থেকে গিয়েছিল। এখন তর্ক উঠেছে উৎপাদন কমাবার প্রয়োজনীয়তা নিয়ে।

কেউ কেউ বলছেন, উৎপাদন কমান উচিত নয়। বেশি শস্য হলে ক্ষতি কোথায়? চীন কিনবে, এশিয়ার অনেক দেশই কিনবে। ওদিকে চীনের প্রসঙ্গেই উঠেছে রাজনীতির প্রশ্ন। চীন যখন অস্ট্রেলিয়ার গমের বড় খদ্দের, তার গোঁসা হতে পারে এমন কথা ব্যবসায়ীরা বলতে নারাজ। কিন্তু তবু প্রশ্ন থেকে গেছে। চীন কি চিরদিনই বিদেশ থেকে গম কিনবে? খাদ্যে স্বাবলম্বী একদিন চীন হবেই। ওদিকে ১৯৬৪ সালে পৃথিবীর নানা দেশে খাদ্য উৎপাদনে ঘাটতির সুযোগে গম বিক্রির যে মওকা মিলেছিল তাই কি চিরদিন মিলবে? সুতরাং উৎপাদন-কমাও গোছের একটি বাণিকী মনোভাবও দেখা দিয়েছিল। অন্য কারণও অবশ্য ছিল। পৃথিবীর জনসংখ্যা শতকরা কুড়ি ভাগ বাড়লেও গমের ব্যবহার বেড়েছে মাত্র পনের ভাগ। কারণ, লোকবৃদ্ধি বেশির ভাগ অন্নভোজী অঞ্চলে। ওদিকে গত পাঁচ বছরে আমেরিকা এবং অস্ট্রেলিয়াতে শতকরা তিন ভাগ গমের ব্যবহার করেছে। যদিও অস্ট্রেলিয়ায় লোকবৃদ্ধি হয়েছে দশ লক্ষ। কি মুস্কিল, আবার সেই ফলনবৃদ্ধিজনিত সমস্যা।

ভোগ প্রাচুর্যের মধ্যে বাস করে জীবনের গভীরে তলিয়ে দেখবার অবকাশ যেন অস্ট্রেলিয়ানদের অনেকদিন হয় নি; বাহিঃপৃথিবীর প্রতি তারা অনেকদিনই উদাসীন ছিল। আজ হাওয়া বদলাচ্ছে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে আমেরিকার ঐশ্বর্য-শক্তি সাহায্যের পরিচয় পেয়ে যে শ্রদ্ধা আমেরিকার উপর বেড়েছিল, আজ তা উচ্চ শিখরে। আজ অস্ট্রেলিয়া জাপানকেও শ্রদ্ধা করে, চীনকে ভয় করে, ইন্দোনেশিয়াকেও উড়িয়ে দেয় না। আর ভারতবর্ষ? অস্ট্রেলিয়া বলতে শুরু করেছে—আমরা শাদা চামড়ার লোক হলেও এশীয়। ভারত আমাদের প্রতিবেশী। প্রশান্ত মহাসাগরের এই দিগন্তে প্রতি-চীনা-প্রাচীর গড়ে তুলতে হলে ভারতের সুস্থ অস্তিত্বের যে প্রয়োজন, সেই ধারণা আরও দৃঢ় হচ্ছে। ভিয়েৎনাম থেকে চীন, চীন থেকে গমের প্রশ্নে পার্লামেন্টে প্রবল বিতর্ক চলছে। পার্লামেন্টের সদস্যরা স্পষ্ট ভাষায় বলছেন—প্রতিবেশী ভারতের উপর শত্রুর খড়্গ উদ্যত হয়ে আছে। অনাহারের ছিদ্রপথে সাম্যবাদের পতাকা হাতে সে শত্রু এগিয়ে আসবে। ভারতের পতন হলে অস্ট্রেলিয়া কি পারবে টিকে থাকতে? তাই সদস্যরা আজ দাবি জানাচ্ছেন—চীনের সঙ্গে বাণিজ্য বন্ধন ছিন্ন হোক; যে গম চীনের কাছে বিক্রি হত, তা ভারতের পথে চালান হোক।

অগ্নিযুগের একটি অধ্যায়

অনন্ত সিংহ

বোমা নির্মাণের শেষ কাজটুকু

আগেই বলেছি সতেরোটি হাত-বোমার (Hand grenade) ঢালাই লোহার তৈরি খালি খোল আমাদের কাছে রক্ষিত ছিল। এই ঢালাই লোহার (cast-iron) খালি খোলগুলি চট্টগ্রামে আমাদের দলের হাতে যখন আসে, তখন আমি ১৯২৪ সালে, অর্ডিন্যান্সে বন্দী হয়ে জেলে আছি। cast-iron এ তৈরি হাত-বোমার খালি খোলগুলো আমরা পেয়েছিলাম হরিদার (হরিনারায়ণ চন্দ্র) কাছ থেকে। ভারতের গণতন্ত্র-বাহিনীর চট্টগ্রাম শাখা, ১৯৩০ সালে যুব-অভ্যুত্থানের জন্য যে পরিকল্পনা করেছিল তার জন্য অপর্যাপ্ত পরিমাণে হাত-বোমার প্রয়োজন অনুভব করে নি। আকস্মিকভাবে প্রথম আক্রমণ চালিয়ে শত্রুর প্রধান প্রধান অস্ত্রঘাঁটি দখল করে নিতে পারলে অস্ত্রের অভাব থাকে না। তাই আমাদের প্রয়োজন ছিল প্রথম আক্রমণের জন্য কতগুলো tactical arms—অর্থাৎ কতগুলো রিভলবার ও পিস্তল। যেহেতু ইউরোপীয়ান ক্লাব আক্রমণ সামগ্রিক প্ল্যানের অন্তর্ভুক্ত ছিল সেই জন্য আমরা হাত-বোমার প্রয়োজন অনুভব করি। এই একটি বিশেষ লক্ষ্যবস্তুর জন্য সতেরোটি হাত-বোমাই যথেষ্ট ছিল। ইউরোপীয়ান ক্লাব আক্রমণের জন্য দশটির বেশি হাত-বোমা দেওয়া প্রয়োজন মনে করি নি। বাকি সাতটি অন্যান্য গ্রুপের সঙ্গে দিয়েছিলাম।

এই পরিপ্রেক্ষিতে আমরা সতেরোটি হাত-বোমাই আমাদের সামগ্রিক প্ল্যানের জন্য পর্যাপ্ত বলে মনে করি। সেই কারণে আরও বেশি বোমার খোলের জন্য আমরা ব্যগ্র হই নি। তবে এই সতেরোটি শক্তিশালী হাত-বোমা আমাদের অবশ্যই চাই-ই। ঐ সব ঢালাই লোহার খালি খোল যত শক্তিশালী বিস্ফোরক পাউডার দিয়ে ভর্তি করা যায় তত শক্তিশালী হাত-বোমা তৈরি হতে পারে। T. N. T. পাউডার পিক্রিক্ পাউডারের চাইতে বেশি শক্তিশালী। কিন্তু তখন আমাদের T. N. T. পাউডার তৈরি করবার ব্যবস্থা ছিল না। সেই হেতু অন্তত পিক্রিক্ পাউডার দিয়ে সেই হাত-বোমার খোলগুলি ভর্তি করতে চাইছিলাম। পিক্রিক্ অ্যাসিড্ তৈরি করা আমাদের পক্ষে সহজ ছিল।

দশটি হাত-বোমা নির্মাণ করবার জন্য যে পরিমাণ পিক্রিক্ অ্যাসিড্ (অর্থাৎ পিক্রিকের মিহি গুঁড়ো) প্রয়োজন তা' ইতিমধ্যেই তৈরি করা হয়েছিল। রামকৃষ্ণের দুর্ঘটনায় আহত হবার পর যখন পুলিশের তৎপরতা বহুল পরিমাণে বেড়ে গেল তখন প্রস্তুতিপর্ব ত্বরান্বিত করতে চেষ্টা করি। বহু পরিশ্রমের পর দশটা হাত-বোমার জন্য পিক্রিক্ অ্যাসিড্ আমাদের হাতে জমা হ'ল। আমরা যেরূপ প্রতিকূল অবস্থার মধ্যে দিন কাটাচ্ছিলাম তা'তে আমাদের সত্যিই ভাবনা হয়েছিল যে প্রস্তুত হওয়ার সময় পাবো কিনা! এইরূপ সন্ধিক্ষণে আমরা আলোচনা করে সিদ্ধান্ত নিয়েছি যে দশটা হাত-বোমা পিক্রিক্ পাউডার দিয়ে ভর্তি করব, আর বাকী সাতটা বন্দুকের smokeless (ধোঁয়াবিহীন) বিলেতী পাউডার দিয়ে ভর্তি করা হবে।

পিক্রিক্ অ্যাসিডের সঙ্গে পটাস্ ক্লোরাস সংমিশ্রণের সময় শোচনীয় দুর্ঘটনায় তারক ও অর্ধেন্দু আহত হ'ল। প্রথম দিনই, পিক্রিক্ পাউডার তৈরি করার সময় এই দুর্ঘটনা ঘটে। পিক্রিক্ পাউডার তৈরি করা মোটেই কঠিন কাজ নয়, যদি পিক্রিক্ অ্যাসিড্ তৈরি করা সম্ভব হয়। অ্যামন-পিক্রেট্ তো জমাই আছে। অর্ধভাগ পটাস্ ক্লোরাসের সঙ্গে মেশালেই শক্তিশালী বিস্ফোরক পাউডারে পরিণত হবে। কিন্তু অ্যামন-পিক্রেট ও পটাস্ ক্লোরাস পড়ে রইল—বিস্ফোরক পাউডারে পরিণত হওয়ার আগেই তারক ও অর্ধেন্দু গুরুতরভাবে আহত হ'ল এবং মুমূর্ষু অবস্থায় গোপন স্থানে আশ্রয় নিতে বাধ্য হ'ল।

আমাদের সময় আরও সংকীর্ণ হয়ে পড়েছে। গণেশের রাসায়নিক বিদ্যা সম্বন্ধে পারদর্শিতা ছিল। তারই ওপর "পারকাশান ক্যাপ", পিক্রিক্ অ্যাসিড্, পিক্রিক্ পাউডার, হাত-বোমা প্রভৃতি প্রস্তুতির কাজ তদারক করা ও তা সমাপ্ত করার ভার ছিল। দলের বাছাই করা সদস্য—তারক, রামকৃষ্ণ, অর্ধেন্দু, প্রমথ বিজ্ঞানের ছাত্রদের সঙ্গে নিয়ে বিস্ফোরক দ্রব্য ও হাত-বোমা নির্মাণের কাজ প্রায় শেষ করে আনা সত্ত্বেও পিক্রিক্ পাউডার তৈরি করবার সময় যে মারাত্মক অ্যাক্সিডেন্ট হ'ল তাতে আমরা একেবারে হতবুদ্ধি হয়েছি। কারণ আমাদের অতীতের প্রচুর অভিজ্ঞতা থেকে আমরা নিশ্চিতভাবে জানি যে ঐরূপ পাউডার তৈরি করার সময় কখনও অ্যাক্সিডেন্ট হতে পারে না।

একটার পর একটা অ্যাক্সিডেন্ট।

পারকাশান ক্যাপ্ তৈরি করবার সময় রামকৃষ্ণ সাংঘাতিকভাবে আহত হ'ল। তারপর পারকাশান ক্যাপের পরিবর্তে বোমা ফাটাবার জন্য আমরা বিকল্প ব্যবস্থা করলাম—বিলেতী টাইম ফিউজের সাহায্যে। দ্বিতীয় অ্যাক্সিডেন্ট হওয়ার পরে আমাদের মধ্যে প্রশ্ন এল—পিক্‌রিক পাউডার ব্যবহারের পরিবর্তে দশটি হাত-বোমার খোলগুলি কি কম শক্তিশালী 'ধোঁয়াবিহীন বন্দুকের কাল পাউডার' (Smokeless Black Gun Powder) দিয়ে ভর্তি করে নেব? কিন্তু অহেতুক ও ভৌতিক অ্যাক্সিডেন্টের ভয়েও আমরা পিক্‌রিক পাউডার তৈরির কাজ বর্জন করবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করি নি। দশটি খোল আমরা পিক্‌রিক পাউডার দিয়ে ভর্তি করাই ঠিক করলাম।

অ্যামন-পিক্‌রেট্ ও পটাস ক্লোরাস সংমিশ্রণের সময় আমাদের বিগত অভিজ্ঞতাকে হতবুদ্ধি করে যে ভৌতিক অ্যাক্সিডেণ্ট হয়ে গেল তার নিগূঢ় কারণ আমরা শেষ পর্যন্ত আবিষ্কার করেছিলাম। প্রচুর মূল্যে আমরা যে রাসায়নিক প্রতিক্রিয়ার তথ্য শেষ পর্যন্ত জানতে পেরেছিলাম সেটি রসায়নবিদ্-দেরও জেনে রাখা প্রয়োজন। তারকেশ্বর দস্তিদার একটু সুস্থ হওয়ার পর নানা কেমিস্ট্রীর বই থেকে অনুসন্ধান করে বিস্ফোরণের কারণটা জেনেছিল এবং আমাদের জানিয়েছিল যে, অ্যামন-কার্বের সঙ্গে পিক্‌রিক্ অ্যাসিডের কৃস্টাল (খুব মিহি গুড়ো) জলে ফুটিয়ে ধোয়ার প্রণালীতে ছোট ছোট গন্ধকের (Sulpher) ঢেলার মত (Clod) আকার পরিগ্রহণ করে। গন্ধকের ছোট ছোট টুকরোগুলি পিকরিক অ্যাসিড বা অ্যামন-পিকরেটের মত একই রকম হলদে দেখতে হয়। রাসায়নিক প্রতিক্রিয়ার এইটুকু তথ্য জানবার পর সেই ভৌতিক অ্যাকসি-ডেন্টের কারণ মুহূর্তে আবিষ্কার করতে পারলাম। এ আমরা সবাই জানি যে গন্ধক ও পটাস ক্লোরাস দিয়ে পটকা তৈরি হয়। তাই মর্টার পেসেলসে যেমনি পটাস ক্লোরাসের সঙ্গে গন্ধকের টুকরো-গুলিকে অজান্তে ঘষা হয়েছে তখনই মিশ্রিত বা অর্ধমিশ্রিত পিক্‌রিক্ পাউডার সশব্দে বিস্ফোরিত হয়ে বিভ্রাট ঘটাল।

গণেশ, অর্ধেন্দুরা কেমিক্যাল ইঞ্জি-নীয়ারিং-এর ছাত্র। তাদের Theoritical ও Practical বিদ্যে ছিল। আমার সামান্যই প্র্যাক্‌টিক্যাল জ্ঞান ছিল—হাতে-কলমে বহু ধরণের Explosives আমি ব্যবহার করতে শিখেছি। বিস্ফোরক দ্রব্য ব্যবহার করবার সময় তিন তিনটি মারাত্মক অ্যাকসিডেণ্ট হওয়ার পর দলের আর কোন অনভিজ্ঞ ছেলেদের হাতে যা মজুদ পিক্‌রিক্ অ্যাসিড ছিল তার সঙ্গে পটাস্ ক্লোরাস সংমিশ্রণে পিক্‌রিক্ পাউডার তৈরির কাজ দিতে সাহস হ'ল না। গণেশ ও আমি নিজে আমাদের কাছে যে রাসায়নিক দ্রব্য সংরক্ষিত ছিল তা' দিয়ে দশটি হাত-বোমার প্রয়োজন অনুপাতে পিক্‌রিক্ পাউডার তৈরি করার সব ভার নিলাম।

পিকরিক পাউডার তৈরি করবার পদ্ধতিতে সামান্যতম ত্রুটির পথও রুদ্ধ করে নানা ব্যবস্থা ও সাবধানতা অবলম্বন করলাম। টিন দিয়ে বর্ম তৈরি করা হ'ল। বুক, বাহু, মাথা ও মুখ সব টিন প্লেট দিয়ে ঢাকা; কেবল দেখবার জন্য দু'টো খুব সরু পেরেকের ছিদ্র রাখা হয়েছে। ইলেক্‌ট্রিকের কাজ করবার সময় যেরূপ খুব মোটা রাবারের প্লাবস হাতে পরা হয়—তাই ব্যবহার করলাম।

টিলার ওপর আনন্দদের পড়বার ঘরটিকে সাময়িকভাবে ল্যাবরেটারীতে পরিণত করা হ'ল। টেবিলের ওপর পুরু কাঁচের চাদর পেতে দিলাম। আকস্মিক দুর্ঘটনার আশঙ্কায় দু' বালতি ভর্তি জল রাখতেও ভুলি নি। স্টকে রক্ষিত পটাস ক্লোরাসের প্যাকেট ও পিকরিক ভর্তি পাত্র আলাদা করে অন্য কামরায় রাখা হয়। ভিন্ন দুটি পাত্র থেকে প্রতি-বার অর্ধ আউন্স করে পিকরিক অ্যাসিড ও পটাস ক্লোরাস টেবিলের ওপর আনা হোত এবং খুব হালকা হাতে পোস্ট কার্ডের মত পাতলা পেস্ট বোর্ডের দুই ইঞ্চি সাইজের একটি টুকরো দিয়ে ঐ দুই রসায়ন দ্রব্যের সংমিশ্রণ করি। পাউডার তৈরি হওয়ার পর ঐগুলি একেবারে আলাদা করে কাঁচের বোয়ামে রাখা হয়। যাঁরা নিজে পিকরিক পাউডার তৈরি করেছেন তাঁরা আমাদের এইরূপ অহেতুক সাবধানতার কথা শুনে হাসবেন —কারণ, অতখানি সাবধানতার কোনই প্রয়োজন ছিল না। আমরা এইসব রসায়ন দ্রব্যের প্রতিক্রিয়ার সম্বন্ধে অনভিজ্ঞ নই। তবু অতখানি সাবধানতার প্রয়োজন নেই জেনেও তা নিয়েছিলাম নীতিগতভাবে—কারণ Explosiveকে কখনও বিশ্বাস করতে নেই।

বিস্ফোরক পাউডার তৈরির কাজ এইভাবে নির্বিঘ্নে সমাপ্ত হল। এখন পরের অধ্যায়ের জন্য সব রকম সতর্কতা অবলম্বন করে কাজ শুরু করলাম। হাত-বোমার খালি খোলগুলি এখন পিকরিক পাউডার দিয়ে ভর্তি করতে হবে আর বোমায় টাইম ফিউজ জুড়তে হবে। খালি খোলে প্রথম টাইম ফিউজ জুড়বার সময় কোন অ্যাকসিডেন্টের সম্ভাবনা নেই। কারণ ধীরে ধীরে পাঁচ বা সাত সেকেণ্ড ধরে যদি বারুদের পলতে জ্বলতে থাকে তবে ভয়ের কিছুই থাকে না। তারপর যখন ঢালাই লোহার খালি খোল শক্তিশালী বারুদ ঠেসে ভর্তি করা হয় তখন প্যাঁচ কসে লোহার ছিপি বন্ধ করবার সময় পিকরিক পাউডার বা অন্য কোনরূপ বারুদ হয়ত ফেটে যেতে পারে। পিকরিক পাউডার তৈরি করার সময় ঘষা লেগেই তো বিস্ফোরণ হল এবং তাতে তারক ও অর্ধেন্দু আহত হয়। সেই একই জাতীয় তৈরি পাউডার দিয়ে হাত-বোমার খালি খোল ভর্তি করে লোহার ছিপি কসতে হবে। যদি কোনমতে খালি খোল ভর্তি করার সময় ঘর্ষণে বোমাটি ফেটে যায় তবে অবশ্য সেই ঘরে জীবন্ত কারোকে খুঁজে পাওয়া যাবে না। এই ভয়াবহ পরিণতির কথা ভেবে শুধু শুধু ঘাবড়াবার কারণ নেই। যাঁরা Explosive নাড়াচাড়া করতে অভ্যস্ত এবং Explosive-এর বিভিন্ন গুণ ও প্রতিক্রিয়া সম্বন্ধে জানেন ও বোঝেন, তাঁরা যদি সতর্ক ও সচেতন থাকেন তবে বিস্ফোরক দ্রব্যের ব্যবহারের সময় তাঁদের অনাবশ্যক আতঙ্কগ্রস্ত হওয়ার কোন কারণই থাকে না।

হাত-বোমার খালি খোলগুলিকে পিকরিক পাউডারে ভর্তি করা আমাদের কাছে কোন সমস্যাই নয়। তবে এতদিন যেমন অ্যাকসিডেণ্টের বিরুদ্ধে চূড়ান্ত ব্যবস্থা অবহেলা করে বিস্ফোরক দ্রব্যের প্রয়োগ ও ব্যবহারকার্য সমাপ্ত করেছি তা' আর করতে প্রস্তুত ছিলাম না। আনন্দদের পড়ার ঘরে টেবিলের সঙ্গে একটা 'ভাইস' (Vice) ফিট্ করি। এই যন্ত্র দিয়ে কোন জিনিষ খুব শক্ত করে চেপে ধরা যায়। পাউডার ভর্তি হাত-বোমাটিকে ভাইসের চাপে স্থির করে রাখা হল। পাউডার ভর্তি করবার পর পেস্ট বোর্ডের গোলাকার করে কাটা চাক্‌তি দিয়ে পাউডার ভাল করে ঢেকে দিই। আর লোহার খোলের সঙ্গে ছিপি আঁটবার জন্য যে প্যাঁচ কাটা ছিল তা অতি সযত্নে তুলি দিয়ে ঝেড়ে পরিষ্কার করে দিই যেন পাউডারের সামান্যতম পরিশেষও প্যাঁচের মধ্যে না থাকে। তার-পর খুব আস্তে আস্তে প্যাঁচ কসে ছিপি আঁটতে থাকি। শেষ কটি প্যাঁচ 'রেঞ্চ' দিয়ে খুব জোরে কসতে হয়। এই সময় জোর ঘষা পড়বার বা fiction-এর ভয় এবং অ্যাকসিডেণ্টের সম্ভাবনা থাকে। সেইরূপ সম্ভাবনাকেও নির্মূল করার ব্যবস্থা করলাম।

প্যাঁচ কসার জন্য বেশ বড় একটি 'রেঞ্চ' ছিপির মাথায় লাগালাম। 'রেঞ্চের' হাতলের শেষ দিকে দড়ি দিয়ে

বাঁধা হল। সেই দড়ির অপর মাথা পাশের কামরায় নিয়ে যাই। তারপর নিজেকে দেওয়ালের আড়ালে রেখে দড়ি ধরে টান দিয়ে একটি একটি করে প্যাঁচ কসি—প্রতিবারই একটি প্যাঁচ ঘোরার পর 'রেঞ্চটি' পুনরায় ঠিক করে বসিয়েছি পরের প্যাঁচটি কসার জন্যে।

এইভাবে 'দুর্বোধ্য ভৌতিক' অ্যাক্সিডেণ্টকে আমরা পরাস্ত করেছি। ডাক্তার জগদাবাবুর উক্তি—'ভগবানের ইঙ্গিতে অমঙ্গল সূচনা দেখা যাচ্ছে, তাই তোমরা এই পথ পরিহার কর'—আমরা মানতে পারি নি। ঐশ্বরিক, অলৌকিক শক্তি, প্রভৃতির মিথ্যা দার্শনিকতাকে উপেক্ষা করে আমরা হাত-বোমা তৈরি করেছি।

অপ্রত্যাশিত বিরুদ্ধতা

চট্টগ্রাম যুব-অভ্যুত্থানের প্রায় ছ' মাস পূর্ব থেকে আমাদের ব্যায়াম কেন্দ্রগুলি একটু শিথিল হয়ে পড়ল। তার কারণ, আমাদের সশস্ত্র প্রস্তুতির জন্য মোটর শিক্ষা, ঘোড়ায় চড়া, চাঁদমারি প্র্যাক্‌টিস্ বোমা তৈরির কাজ, রিভলভার প্রভৃতি কেনা, তিনজন বিস্ফোরণে আহত বন্ধুকে লুকিয়ে রাখা, পুলিশের তৎপরতার বিরুদ্ধে পাল্টা গোয়েন্দাগিরি (counter espionage) চালু রাখা, সামরিক ঘাঁটিগুলির তথ্য সংগ্রহ করা এবং নানা জাতীয় যন্ত্রপাতি, পেট্রোল, জাহাজ বাঁধার দড়ি প্রভৃতি জোগাড় করা ও গোপনে ঐগুলির বিধি ব্যবস্থার কাজে আমাদের প্রথম শ্রেণীর কর্মীদের নিযুক্ত করতে হয়। আমরা এই সব ষড়যন্ত্রমূলক কাজে রাত্রে ও দিনে নানাভাবে ব্যাপৃত হয়ে পড়লাম। অভিভাবকরা আমাদের উপর ক্রমেই বিরক্ত হতে লাগলেন। তাঁরা ইতিপূর্বে আমাদের নিষ্ঠার সঙ্গে ব্যায়াম করতে দেখেছেন; খুব নিয়মানুবর্তিতার সঙ্গে চলাফেরা করতাম তা লক্ষ্য করেছেন; লেখাপড়া সবাই মনোযোগের সঙ্গেই করত, স্কুলে, পাড়ায়, ও নিজ বাড়িতে আমাদের যুবক সাথীরা তাদের ব্যবহারে ও চলাফেরার বৈশিষ্ট্যের মাধ্যমে সবার কাছ থেকে প্রচুর সুনাম ও প্রশংসা অর্জন করেছে এতদিন। কিন্তু শেষের কয়েক মাস আমাদের চলাফেরার কোন উপযুক্ত কৈফিয়ৎ ছিল না—আত্মপক্ষ সমর্থন করার মত কিছুই যে ছিল না আমাদের। যখন তখন বাড়ি থেকে বেরিয়ে পড়ছি, বিভিন্ন পোষাক ব্যবহার করছি—কখনও টাই-স্যুট, কখনও বা ধুতি-সার্ট আর কখনও হয়ত সামরিক খাকী পোষাকে সুসজ্জিত হয়েছি। মোটর গাড়ি ও সাইকেলে তড়িৎবেগে যখন-তখন ছুটে চলেছি, যেন সদা সর্বদাই অতি ব্যস্ত। কোন কোন দিন ছেলেরা রাত্রেও বাড়ি থাকত না; লেখা-পড়ায় কারও মন নেই, শারীরিক শিক্ষা কেন্দ্রেও আমরা আগের মত নিয়মিত যাচ্ছি না আর অভিভাবকদের সমানে অমান্য করে চলেছি। কেন হঠাৎ এইরূপ বদলে গেলাম তার কারণ আমরা ছাড়া আর কেই বা জানবে! যুব-বিদ্রোহের আগে কয়েকটি মাসে আমরা এমন অবস্থার সম্মুখীন হলাম যে তাতে অভিভাবক ও জনসাধারণের কাছে আমাদের সুনাম অক্ষুণ্ণ রাখা একেবারে অসম্ভব হয়ে উঠল। চারিদিকে আমাদের বিরুদ্ধে অনেক কুৎসা রটতে লাগল কিন্তু কোন নির্ভরযোগ্য কৈফিয়ৎ দেওয়া গেল না! অভিভাবকেরা প্রতিবাদ জানালেন, কঠোর হলেন, বাধা দিলেন—আমরা তা মানতে পারলাম না, উপেক্ষা করলাম! সারা শহরে আমাদের বিরুদ্ধে তীব্র সমালোচনা চলতে লাগল। আমাকে নিয়ে যা তা বলেছে—বিরুদ্ধপক্ষীয় অনেকে এমন কি গুণ্ডা নামে অভিহিত করে আত্মপ্রসাদ লাভ করেছে। তাও আমাদের মুখ বুজে সহ্য করতে হয়েছে। এ এক কঠোর পরীক্ষা! নিষ্ঠার সঙ্গে মহান আদর্শকে রূপ দেবার জন্য বদ্ধপরিকর ছিলাম বলেই হয়ত ঐসব কুৎসা অপবাদ উপেক্ষা করা আমাদের পক্ষে সম্ভব হয়েছিল।

যতক্ষণ আমাদের অবস্থা সাধারণ বলাবলি ও বিরুদ্ধ সমালোচনার মধ্যেই নিবদ্ধ ছিল ততক্ষণ অসহ্য হলেও মুখ বুজে সব সহ্য করেছি। তবে সমস্যা খুব জটিল হয়ে দেখা দিল যখন আমাদের বিরুদ্ধে নানাদিক থেকে সক্রিয়ভাবে আঘাত আসতে লাগল।

পুলিশও এই অবস্থার সুযোগ নিল। তারা কোন কোন অভিভাবকদের জানাল যে তারা যেন তাদের ছেলেদের আমাদের প্রভাব থেকে দূরে সরিয়ে রাখে। আমাদের বিরুদ্ধে মামলায় যে জাজমেণ্ট দেওয়া হয়, সেখান থেকে উল্লেখ করছি,—

"...From the beginning of 1930 the activities and movements of the six ex-detenus and their associates began to increase in a manner which intensified the suspicions of the police. They were seen to be constantly meeting together at all hours of the day at Ganesh Ghosh's shop, the Congress office and the Sadarghat Club and also moving about the town either on foot or in Ananta Lal Singh's Baby Austin Car No. 24666...... Members of the Party were seen from time to time wearing different styles of dress, sometimes Khaki uniform, sometimes European dress and sometimes Indian dress. ....The D.I.B. Inspector Sarada Bhattacharya spoke to several parents and guardians about the undesirability of allowing their boys to abandon their studies and spend their days associating with these six ex-detenus. Among those whom he thus warned were Jogendra alias Mona Gupta, father of accd. Ananda Gupta and and Debu Gupta (killed at Julda), Rasik Nandy, father of Amarendra Nandy (killed on 24th April) and uncle of accd. Phanindra Nandy and Jatra Mohan Das uncle of Haripada Mahajan (absconding accd.), Siddik Dewan (P.W. 220) similarly warned Ranjan Lal Sen, pleader, about his son Rajat Sen (subsequently killed at Julda). On 27th February, Ganesh Ghosh and Ananta accompanied by Jiban Ghoshal and Bidhu Bhattacharji came to Sarada Babu and remonstrated with him for warning guardians against them (P.W. 70, 220 and 149)." [Page—9; Chittagong Armoury Raid Case No. I, 1930].

জজসাহেব তাঁর রায়ে যেরূপ মন্তব্য করেছেন তার সারমর্ম এইরূপ দাঁড়ায়—১৯৩০ সালের প্রথম দিক থেকেই ছয়জন প্রাক্তন ডেটিনিউ (গণেশ ঘোষ, অম্বিকা চক্রবর্তী, লোকনাথ বল, নির্মল সেন, অনন্ত সিং ও সূর্য সেন) তাঁদের কর্মতৎপরতা খুব বাড়িয়ে ফেলল। তাতে তাদের ওপর পুলিশের সন্দেহও অনেকগুণ বেড়ে গেল (যুব বিদ্রোহের তখন মাত্র সাড়ে তিন মাস বাকি আছে)। সাক্ষ্য প্রমাণ থেকে জজসাহেব পেয়েছেন যে দলের সভ্যরা সবাই রাতে ও দিনে গণেশ ঘোষের দোকানে, কংগ্রেস অফিসে ও সদরঘাট ক্লাবে মেলামেশা করত

তাছাড়া দলের যুবকেরা পায়ে হেঁটে বা অনন্ত সিং-এর ২৪৬৬৬ নম্বর বেবী অস্টিন করে সারা শহর চষে বেড়াত।... তাদের দলের সভ্যদের বিভিন্ন স্টাইলে পোষাক পরতে দেখা যেত—কখনও খাকী সামরিক পোষাকে, কখনও বা ইউ-রোপীয়ান বেশে আর কখনও হয়ত ভারতীয় পরিচ্ছদে।......এই সব দেখে শুনে ডি, আই, বি, ইন্সপেক্টর সারদাবাবু কোন কোন অভিভাবক ও পিতা-মাতাদের হুঁসিয়ার করে দিলেন যেন তাঁরা তাঁদের ছেলেদের লেখাপড়ায় মনোযোগী হতে চাপ দেন আর তাঁদের ছেলেরা যেন সেই ছয়জন প্রাক্তন রাজবন্দীদের সংসর্গ পরিত্যাগ করে, সেই দিকে দৃষ্টি রাখেন। সারদাবাবু, আনন্দ ও দেবু গুপ্তের বাবাকে, অমরেন্দ্র নন্দীর বাবা ও ফণীন্দ্র নন্দীর বাবা রসিক নন্দীকে, হরিপদ মহাজনের মামা যাত্রা-মোহন দাস মহাশয়কে, ওঁদের ছেলেদের সম্বন্ধে হুঁসিয়ার করে দেন। এই দিকে আবার সাব-ইন্সপেক্টর সিদ্দিক দেওয়ান রজত সেনের পিতা—উকিল রঞ্জনলাল সেনকে তাঁর পুত্র সম্বন্ধে সচেতন করে দেন। যে সব ছেলেদের কথা জজসাহেব উল্লেখ করেছেন তাদের প্রত্যেকের সম্বন্ধে গুরুত্ব আরোপ করার উদ্দেশ্যে একটু রেফারেন্স দিয়েছেন। যেমন নাকি বলেছেন—আনন্দ, ফণীন্দ্র এই মামলার আসামী, অমরেন্দ্র পুলিশের গুলীতে নিহত হয়, হরিপদ মহাজন এই মামলার আসামী আত্মগোপন করে আছে; আর রজত সেন ও দেবু গুপ্ত জুলুদা (কালারপোল) রণক্ষেত্রে প্রাণ দিয়েছে। তারপর জজসাহেব লিখলেন যে ২৭শে ফেব্রুয়ারী, গণেশ ঘোষ এবং অনন্ত মাখন ঘোষাল ও বিধুকে সঙ্গে নিয়ে সারদাবাবুর বাড়ি গেল। তাদের বিরুদ্ধে সারদাবাবু অভিভাবকদের হুঁসিয়ার করেছেন বলে তারা ঘোর প্রতিবাদ জানিয়ে এল।

থানায় গিয়ে বা পুলিশের বাড়ি গিয়ে মাঝে মাঝে বিরক্তি ও প্রতিবাদ জানান প্রয়োজন বলে আমরা মনে করতাম। আমাদের ক্রোধ তাদের ব্যক্তিগত জীবনের আশঙ্কার কারণ বলে তারা অনুধাবন করুক তাই আমাদের ইচ্ছে ছিল। তাতে ফল কি হয়েছিল বলা শক্ত। উপরমহল থেকে যদি কোন সরকারী নীতি প্রবর্তিত হয় তবে জেলা পুলিশ যে তা প্রতিপালিত করবেই এটা অবশ্য আমরা জানতাম। তবে স্থানীয়ভাবে প্রথম আরম্ভ করার ভার (Local initiative) নিতে যেন জেলা পুলিশ কর্তৃপক্ষ বিশেষভাবে ভেবে কাজ করে সেই উদ্দেশ্যে আমাদের প্রতিবাদ জানান ও বিক্রম জাহির করা হত মাঝে মাঝে।

৩ মাসের জন্য বিনামূল্যে উপহার

স্ত্রীলোকের সৌন্দর্য, কাশ্মীর আর্ট শাড়ী। সর্বাধুনিক মনোরম ডিজাইন এবং রং লইয়া মরশুমের নূতন নূতন মাল আসিয়াছে। আমাদের কাছে কেবলমাত্র বড় সাইজের কাপড় পাওয়া যায়। ১টি ডিল্যাক্স শাড়ীর মূল্য ১১৲ টাকা; ২টি ২০৲ টাকা; ৩টি ২৮৲ টাকা; ৪টি ৩৬৲ টাকা। দুইটি বা তদধিক শাড়ীর অর্ডারের সহিত বিনামূল্যে ব্লাউস পীস। পোস্ট পার্শেলযোগে অর্ডারের মাল পাঠান হয়।

Arvind Agencies (DBM-22)
Post Box 1408, Delhi-6.

রূপকথার গল্প নয়

বর্তমানে আমার লেখা পড়ে সেদিন আমাকে একজন প্রশ্ন করলেন—"আচ্ছা, রিভলভার সাইজে কত বড়? পুলিশের কাছে যা দেখা যায় তাতো বেশ বড় বলে মনে হয়। তোমরা কি করে তা তোমাদের পোষাকের মধ্যে লুকিয়ে রাখতে? পুলিশের চোখে পড়ত না? তাছাড়া তোমরা কোতয়ালীতে ও আই-বি-ইন্সপেক্টরের বাড়িতে গিয়ে তাঁদের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাবার সময়েও সঙ্গে রিভলভার নিয়ে যেতে। তোমাদের আশঙ্কা হয় নি যে তোমাদের সঙ্গের রিভলভারের অস্তিত্ব তাদের নজরে পড়তে পারে?"

আর একজন আমাকে অন্য ধরণের প্রশ্ন করেছেন। তাঁর জিজ্ঞাসা হ'ল—"রামকৃষ্ণকে অর্ধদগ্ধ অবস্থার চিহ্ন থাকা সত্ত্বেও, সকালবেলা আপনারা তাকে সাদা পোষাক পরিহিত পুলিশ watcherদের সামনে দিয়ে নিয়ে এলেন আর তারা চুপ করে রইল?—আপনাদের বাধা দিল না? ধরতে চেষ্টা করল না?"

যখন এই ধরণের প্রশ্ন কারও মনে একবার উদয় হয়েছে, তখন আমার বিশ্বাস আরও অনেক পাঠক-পাঠিকাদের কাছেও অনুরূপ প্রশ্ন দেখা দেওয়া স্বাভাবিক। আমি বুঝতে পারছি বাস্তব অবস্থার একটা চিত্র সামনে না থাকলে এইরূপ প্রশ্ন অজ্ঞতাবশত সরল মনে উঠবেই। এ যেন ঠাকুরমার ঝুলির রূপ-কথা—বিস্ফোরণে আহত রামকৃষ্ণকে সাদা পোষাক পরিহিত পুলিশ পাহারাদারদের উপেক্ষা করে তাদের চোখের সামনে দিয়ে উধাও হলাম! আবার সঙ্গে লুকিয়ে রিভলভার নিয়ে কোতয়ালী ও পুলিশ অফিসারদের বাড়ি গিয়ে চোটপাট করে চলে এলাম! এই সব 'গল্প' রূপকথার মত শোনালেও তা একেবারে বাস্তব সত্য।

বিভিন্ন আকারের পিস্তল ও রিভলভার আছে। Colt বা Webly-র আর্মি রিভলভার আমরা সচরাচর পুলিশদের কোমরে চামড়ার খাপে (Holster) বেল্টের সঙ্গে বাঁধা দেখতে পাই। এই মার্কা "পুলিশ পোস্টিভ" রিভলভার আকারে ছোট হয়—বোধ করি ইঞ্চি দশেক হতে পারে। "পুলিশ পোস্টিভ" রিভলভারের চাইতে বড় আকারের রিভলভার আমাদের কাছে ছিল না। তবে তার চাইতে অনেক ছোট রিভলভারও আমাদের কাছে ছিল। পিস্তল এমনিতেই আয়তনে ছোট হয়—চেপ্টা নোট বইয়ের মত। যেমন নাকি ছোটদের খেলার জন্য পিস্তল বাজারে পাওয়া যায়। আমাদের কাছে তখন নয়-শট্‌ওয়ালা মাঝারি ধরণের ৫" বা ৫½" ইঞ্চি লম্বা পিস্তল ছিল। এইরূপ পিস্তল বা রিভলভার চামড়ার ব্যাগ্ ছাড়া আমরা কোমরের সঙ্গে বেল্ট দিয়ে চেপে বেঁধে রাখতাম। গেঞ্জি ও সার্ট দিয়ে এই কোমরে বাঁধা পিস্তল বা রিভলভার ঢেকে রাখতাম। শীতকাল হলে তো কোন কথাই ছিল না! গ্রীষ্মকালে চেপে বেল্ট বেঁধে ভালভাবেই ঐগুলিকে শরীরের সঙ্গে রাখা যেত—পুলিশের নজরে পড়া সম্ভব ছিল না। তাছাড়া প্রয়োজন হলে বাঁ হাতটি এমনভাবে লুকানো রিভলভারের ওপরে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে রাখতাম যে পুলিশের নজরে পড়া অসম্ভব ছিল। পুলিশ অবশ্য গণৎকার বা জ্যোতিষী হলে খড়িগুণেই আমাদের সঙ্গে গোপনে রক্ষিত রিভলভারের সন্ধান তক্ষুণি পেয়ে যেত! পুলিশ যখন ব্রহ্মজ্ঞানী নয় এবং আমাদের যুবক বন্ধুদের মধ্যেও কেউ যখন পুলিশের চর নয়, তখন সঙ্গে রিভলভার রাখা কোন সমস্যাই নয়। তাছাড়া তখন রিভলভার-পিস্তল আমাদের কাছে সব সময়ের খেলার সামগ্রী। বাড়িতে ছোট ছেলেরা যেমন টয়-রিভলভার, পিস্তল নিয়ে খেলাধুলো করে, আমরা তেমনি বে-আইনী অস্ত্র নিয়ে সব সময় বে-পরোয়াভাবে চলাফেরা করেছি। সেইজন্য আমাদের হাব-ভাব, চোখ-মুখ ও চাহনিতে কখনও কোন অস্বাভাবিক জিনিস ফুটে উঠত না। ধরা না পড়ে

রিভলভার, পিস্তল সঙ্গে বহন করার মূল মন্ত্র হ'ল—খুব সহজ ও স্বাভাবিকভাবে চলতে পারা।

দ্বিতীয় প্রশ্ন—সাদা পোষাকের পুলিশ আমাদের বাধা দিল না কেন? চট্টগ্রামে আমাদের দলের প্রভাব বা প্রতাপ ছিল অপ্রতিহত ও অপরাজেয়। এমন দিন হয়ত যায় নি যখন সাদা পোষাকের পুলিশ ওয়াচারদের আমরা ধমকাই নি। বাড়িতে বসবার ঘরে হয়ত বসে আছি, এমন সময় দেখতে পেলাম যে দুজন সাদা পোষাকের পুলিশ বাড়ির সামনে ঘোরা-ফেরা করছে। আর যায় কোথায়? তক্ষুণি তাদের ডাকলাম—"এই, কে তোমরা? কি করছ এখানে? এদিকে এস"। সুড় সুড় করে সুবোধ বালকের মত তারা আমাদের ডাকে বাড়িতে এসেছে। তারপর আরও গলা চড়িয়ে ধমকের সুরে হয়ত বললাম—"দেখ, এইরকম বোকার মত পেছু লেগেছ কেন? মারও খাবে চাকরিও যাবে। পালাও এখান থেকে!" কেউ হয়ত কখনও বলেছে—"না বাবু, আমি পুলিশের লোক নই।" আবার কেউ কাতরকণ্ঠে নিবেদন করেছে—"বাবু আমরা গরীব, হুকুমের চাকর! আমাদের মাপ করবেন।"

কখনও হেঁটে চলার সময় যদি বুঝতে পারলাম যে আমাদের কেউ অনুসরণ করছে, তখন হঠাৎ একটা রাস্তার মোড় ঘুরে দাঁড়িয়ে রইলাম, আর যেমনি অনুসরণকারী, সাদা পোষাকের পুলিশ, সামনে এসে পড়ল তখনই তাকে ধমক দিয়েছি—"খবরদার পেছু নেবে না! যাও ফিরে যাও! কারও প্রতিবাদ করবার মত সাহস বা শক্তি দেখি নি। আমাদের হুকুম তাকে মানতেই হয়েছে। শহরে প্রায় সকলেই আমাদের চিনত। শারীরিক শক্তির ক্রিয়া-কৌশল তারা দেখেছে। আমাদের দেখেছে চলন্ত মোটরের গতিরোধ করতে, বুকের ওপর দিয়ে বড় রোলার চালাতে; লোহার পাত দুমড়ানো, লাঠি-খেলা, ছুরিখেলা, মুষ্টিযুদ্ধ ও জাপানী কুস্তি প্রভৃতি ক্রিয়া-কৌশলের বিশেষ অধিকারী যে আমরা তাও জানত। ঐদিকে আবার আমরা বৃটিশ সৈন্যের অনুকরণে খাকী পোষাক পরিহিত ভলান্টিয়ার বাহিনী সংগঠন করেছি। তা'ছাড়া জেলা কনফারেন্স ও কংগ্রেস নির্বাচন প্রতি-যোগিতায় আমাদের অখণ্ড প্রতাপের সংবাদ পুলিশ মহলের কাছে অবিদিত ছিল না। পুলিশ আরও জানে যে আমাদের লাঠি আর ঘুষি চট্টগ্রামের গুণ্ডা সম্প্রদায়কে সায়েস্তা করেছে। পুলিশের ফর্দে আরও আছে—রেলের টাকা ডাকাতি, নাগরখানা যুদ্ধ ও আমাকে যে সাব-ইনস্পেক্টর (প্রফুল্ল রায়) গ্রেফতার করেছে তার হত্যা! এক কথায়, আমাদের দাপটে চট্টগ্রামের রাজশক্তি সত্যিই ভয় পেত। চট্টগ্রামের পুলিশ প্রবল বৃটিশ সরকারের একটি অংশ হলেও আমাদের প্রচণ্ড শক্তি ও প্রভাব তাদের ক্ষমতাকে সাময়িকভাবে নিশ্চল করতে সফল হয়েছিল।

আমাদের সম্বন্ধে তাই ট্রাইব্যুনালের প্রেসিডেন্ট মিঃ জে ইউলী লিখেছেন,—

"This incident and that of Radhika Dutta indicate according to the prosecution the existence of a mentality prone to violence and that even then these ex-detenus had gathered round them a number of followers and were prepared to deal violently and summarily with anybody offering any kind of opposition to them, either individually or collectively."

সাহেব জজ এক হাজার সাক্ষীর বহু জবানবন্দী ঘেঁটে অনেক তথ্য আবিষ্কার করে তাঁর মন্তব্যে বলছেন যে, সরকারী অভিযোগ অনুসারে রাধিকা দত্তের ঘটনা ও এই ঘটনা হতে প্রকাশ পাচ্ছে আমাদের হিংসাত্মক কার্যকলাপের মনোভাব। তবুও বহু যুবক আমাদের অনুগামী হল। 'এই ঘটনা' বলে জজ সাহেব যা বলছেন এখানে সেই সম্বন্ধে তিনি আগে উল্লেখ করেছেন। রহিমদাদ প্রমুখ ক'জন আমাদের এক যুবক বন্ধুর সাইকেল কেড়ে নেয়। সেই সাইকেল তারা আবার কোতয়ালীতে জমা দেয়। কাজেই আমাদের লাঠি ও ঘুষির শিকার হল রহিমদাদেরা। তারপর আমরা কোতয়ালীতে গিয়ে যথারীতি আমাদের সাইকেল দাবি করি। কোতয়ালীর ভারপ্রাপ্ত অফিসার আমাদের দাবি প্রত্যাখ্যান করতে সাহস পেলেন না—সাইকেলটি তৎক্ষণাৎ দিয়ে দিলেন। আমরা কারও কাছ থেকে কোন প্রকার বিরুদ্ধতা সহ্য করতে প্রস্তুত ছিলাম না। সেইরূপ একক বা সমষ্টিগত বাধা যখনই এসেছে তখনই সঙ্গে সঙ্গে বলপ্রয়োগ করে তা ধ্বংস করবার জন্য আমরা সদাসর্বদা প্রস্তুত ছিলাম, এই বলে জজসাহেব তাঁর বক্তব্য শেষ করলেন।

চট্টগ্রামে যুব-বিদ্রোহের পূর্বে রাজশক্তির বিরুদ্ধে আমাদের সাংগঠনিক শক্তি এবং ভারতীয় গণতন্ত্র-বাহিনীর চট্টগ্রাম শাখার সভ্যদের বেপরোয়া ও আপোষহীন মনোভাব এবং তাদের সক্রিয় প্রতিক্রিয়ার বাস্তব চিত্রটি চোখের সামনে না থাকলে ধারণা করা কঠিন হয়ে পড়ে—কি করে সব সময় সব জায়গায় আমরা রিভলভার নিয়ে চলাফেরা করতাম ও কি কারণেই বা বেচারা সাদা পোষাকধারী পুলিশরা সব দেখেও, না দেখার ভান করে নিষ্ক্রিয় হয়ে থাকাটাই বিবেচকের কাজ বলে মনে করতো।

এই পরিপ্রেক্ষিতে বোঝা যাবে কি করে আমাদের বিরুদ্ধে অভিভাবকদের কাছে নালিশ করার জন্য আমরা তক্ষুণি আই-বি-ইনস্পেক্টর, সারদাবাবুর কাছে জোর প্রতিবাদ জানাতে পারলাম। আমাদের ঐ ধরণের প্রতিবাদের অর্থ তিনি ঠিকই বুঝেছিলেন যে, আমরা ঐ সব বাড়াবাড়ি মুখ বুজে সহ্য করতে প্রস্তুত নই। সারদাবাবু কিছুটা শঙ্কিত হলেন—ভবিষ্যতে হয়ত আমাদের বিরুদ্ধে সেইরূপ পন্থা নিতে বিবেচনা করবেন।

(ক্রমশঃ)

সুশীতল আরামদায়ক হাওয়া পরিবেশনে সুপার ডিল্যুক্স
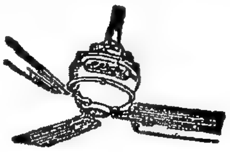
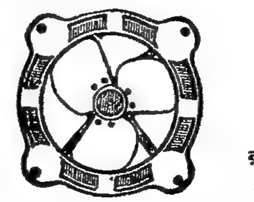
মার্কনী ফ্যান
মার্কনী ইলেকট্রিক করপো (প্রাঃ) লিঃ
১১৭, কেশব সেন ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৯
ফোন ঃ ৩৫-৩০৩৮
শনিবার অর্দ্ধ দিবস ও রবিবার ব্যতীত প্রত্যহ সকাল ১০টা হইতে রাত্রি ৭টা পর্যন্ত খোলা থাকে

অমৃতসমান

বেদব্যাস

শিক্ষক ধর্মঘট

অপরাধ নেবেন না তো প্রথমেই একটু নিজের কথা বলে নিতে গেলে? এখন না বললে পরে আবার ফুরসৎ মিলবে না পরের ভাবনা ভাবতে গিয়ে। তাই নিজের ঢাকটা আগে পিটিয়ে দেওয়াই বুদ্ধিমানের কর্তব্য; দিনকাল যা পড়েছে, দেখছেনই তো!

হ্যাঁ, যা বলছিলাম। ছোটবেলায় একবার এক প্রবন্ধ রচনা প্রতিযোগিতায় আমি একেবারে ফার্স্ট হয়ে গিয়েছিলাম। রচনার বিষয়বস্তু ছিলঃ 'তোমার আকাঙ্ক্ষা (ambition) কি?' জবাবে 'আদর্শ শিক্ষক' বলে তার সম্বন্ধে এ্যায়সা একখানা জব্বর 'এসে' ঝেড়েছিলাম যে বিচারক-মণ্ডলী কলমটি ছোঁয়াবার আর জায়গা পান নি! উত্তরকালে অবশ্য, আমাদের দেশনেতাদেরই অনুকরণে বোধ হয়, যা বলেছি তা করি নি, মাস্টার আমি হই নি। কিন্তু আজ মাস্টারমশাইদের জেল-যাত্রা দেখে আমার জীবনের সেই ঘটনাটি মনে পড়ে গেল।

সে ঐতিহাসিক প্রবন্ধে আমি কী লিখেছিলাম আজ আর তা মনে রাখা সম্ভব নয়, তবে মাস্টারেরা নিরীহ, শান্ত ও নির্বিবাদী প্রাণী এবং জাতিগঠনের ব্যাপারে তাঁরাই হলেন সাক্ষাৎ বিশ্বকর্মা—এ ধরণের চোখা কিছু বুলি নিশ্চয়ই সে প্রবন্ধে ছিল, নইলে মশাই, মুখ দেখে ফার্স্ট করে দেবার লোক সে যুগে অন্তত ছিল না। যে বিশেষণগুলি ব্যবহার করে আমি কেল্লা ফতে করেছিলাম, আজ ১৯৬৬ সনের ২৬শে সেপ্টেম্বরের পর সেগুলো কোন স্কুল-ছাত্রের রচনায় স্থান পাবে কি না এ বিষয়ে আমার মনে ঘোরতর সন্দেহ রয়েছে। এবং শুধু আমার নয়, দেশের অনেক কেষ্ট-বিষ্টু ব্যক্তিরও মাস্টারদের সম্পর্কে ধারণা পাল্টাচ্ছে।

—আরে চল, চল, আর পাপের বোঝা বাড়াস নে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ওই দেখে। রিজার্ভ ব্যাঙ্কের বেয়ারা হরিপদ তার সঙ্গীকে এসপ্লানেড ইস্ট থেকে প্রায় খেদিয়ে নিয়ে যাচ্ছিল। জেলযাত্রা নয়তো যেন যুদ্ধযাত্রা করছেন, হুঃ! মাস্টার তোরা, তোদের কাজ হল গিয়ে ছেলে পড়ানো, তা না করে এখন লেবারদের মতো চেল্লাচেল্লি; ধর্মঘট ছিঃ ছিঃ—

—যা বলেছিস—সঙ্গী উত্তর করে। বি-এ এম-এ পাশই শুধু করেছে আসলে ওরা আমাদের চেয়েও মুখ্যু, জানিস তো, ওরা আমাদের চেয়েও কম মাইনে পায়...

কিন্তু ওই চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারীর চেয়েও কম মাইনের কাজ পাবার জন্যে সুনীল বিশ্বাসকে কম কাঠখড় পোড়াতে হয়েছিল?

—দেখুন মশাই, হাতে পাবেন ৭০ টাকা কিন্তু খাতায় সই করতে হবে ১০৫ টাকা...স্কুলের সেক্রেটারী সাফ কথার লোক—দেখুন যদি রাজী থাকেন...ডি-এ? তা হ্যাঁ...ওই তো সাড়ে সতেরো করে ৩৫ টাকা স্কুলের ফাণ্ডে দিতে হবে...বলুন রাজী...গুড, এই তো চাই...ইয়ং ম্যান... হ্যাঁ বি-টিটা এখানে থেকেই দিয়ে নিন, তারপর আর আপনাকে পায় কে...

থার্ড ক্লাশ পাওয়ার লাঞ্ছনা যে কতখানি সে বুঝেছিল দুর্গাদাস পাড়াগাঁয়ে মাস্টারী করতে এসে। ইতিহাসের সিনিয়র মাস্টার চুকলি কাটলেন, ছাত্রেরা প্রকাশ্যে বলাবলি করতে ছাড়লো না, আরে দূর দূর, থার্ড ক্লাশ এম-এ আবার কী পড়াবে রে! তার চেয়ে বরং চ' ঘোষেদের লিচু বাগানে...মাইনে নিতে গিয়ে দুর্গাদাসের আরো জ্ঞানোদয় হলো...টাকা কি গুণতে ভুল করলেন না কি হাজরাবাবু...

ভুল তো মাস্টারমশাই গত ২৭ বছরে একদিনের তরেও করি নি, আজ আপনি যখন ভুল ধরেছেন—অত্যন্ত অমায়িক কেরানীবাবুর ভাষা—না আমি বলছিলাম যে এখানে ৮০ টাকা দেখছি, কিন্তু আমার তো পাবার কথা—

—আপনার কী পাবার কথা তাতো আমার জানার দরকার নেই মুখুজ্যে-মশাই, আমার কী দেবার কথা—

পাশ থেকে ইতিহাসের সিনিয়র মাস্টার টিপ্পনি কাটলেনঃ ইউ আর লাকি ইয়ংম্যান, আপনিই হাইয়েস্ট পেইড স্টাফ আমাদের...অফ কোর্স হেড মাস্টার, এ্যাসিস্ট্যাণ্ট হেড মাস্টারের পরে—

—কিন্তু কেন, আমার স্কেল তো... কাগজের বিজ্ঞাপনেও আপনারা—দুর্গাদাস যুক্তি দেখাতে চেষ্টা করে...

—হ্যাঁ বিজ্ঞাপনে থাকে বটে পাকা চুল কাঁচা হয়...হেঁ হেঁ...আপনি না মশাই নন-ট্রেণ্ড থার্ড ক্লাশ—

প্রায় একই অভিজ্ঞতা সুসেনজিতেরও। পাশ কোর্সে বি-এ পাশ করে পাড়াগাঁয় মাস্টারী নিয়ে গিয়েছিল, ইচ্ছে গ্রামের শান্ত পরিবেশে পড়াশুনো করে প্রাইভেটে অনার্সটা দেবে। বাড়িতে বৃদ্ধা মা ও ছোট ভাইকে আশ্বাস দিয়ে গেল মাসে ৭০ না হোক ৬০ টাকা করে সে পাঠাবেই। ক্লাশ নিচ্ছিল সে, লাস্ট পিরিয়ড, প্রাণ ঢেলে, আবেগভরে ছাত্রদের বোঝাচ্ছিল সে এ্যাটিলার কথা। এমন সময় হঠাৎ সতীশবাবু ক্লাশে ঢুকে দুর্গাদাসের কানে কানে বললেনঃ আজ ব্রহ্মযোগ আছে, অফিসঘর হয়ে যাবেন... দুর্গাদাস বুঝতে পারে নি...কিন্তু ব্যাখ্যা চাইবার জন্যে সতীশবাবুর পেছনে ছুটতেও মন চায় নি...কিন্তু ফার্স্ট বেঞ্চিতে বসা বিকাশই বলে দিল, আজ আপনাদের মাইনে হবে, স্যর...শুক্রবার না আজ...হাটে-হাটে মাইনে আপনাদের—

—নতুন মাস্টারমশায়ের আজ দরকার নাকি? পণ্ডিতমশাই দুর্গাদাসকে অফিস ঘরে দেখে বলে বসলেন।

—না না, উনি ব্যাচেলর মানুষ, ওঁর সোমবারের হাটে নিলেই চলবে'খন। সহকারী প্রধান শিক্ষক রজনীবাবুই দুর্গাদাসের হয়ে জবাব দেন।

—আমার আজ চাল কিনতে হবে মাস্টারমশাই, যোগেনবাবু বলছিলেন, ব্রহ্ম কিছু বেশি দেবেন...

—বেশি কোত্থেকে দেবে...আদায় কোথায় যে বেশি দেবে...

—কত কালেক্ট করেছেন আপনি দেখি ...রজনীবাবুই খাতাটা পেড়ে দেখছিলেন ...হুঁ তিন টাকা সাতাশী...তা ব্রহ্ম কি মশাই ওপর থেকে খসে পড়বেন...

চারটি হাটবার যাবার পর দুর্গাদাসের হাতে যখন সাতটি টাকা গুঁজে দিয়ে রজনীবাবু বললেনঃ আপনার পড়ানো কিন্তু ভালো হচ্ছে নতুন মাস্টারমশাই...তখন চোখ ফেটে ওর জল এসে গিয়েছিল।

—আরে কী করছো শিশিরবাবু, এইবার একটা কাজে-কম্মে লেগে যাও... বয়স হয়ে যাচ্ছে না?

—কেন কেষ্টকা', আমি তো হাই স্কুলে মাস্টারী করছি দু' বছর হয়ে গেল...

—আরে ছ্যাঃ ছ্যাঃ মাস্টারী কি আবার একটা কাজ হলো...শোনো বাপু...এই বেলা রেলে-টেলে ঢুকে পড়ো দিকিনি... কাঁচা পয়সা আছে...

ট্রামটা হঠাৎ থমকে দাঁড়িয়ে যেতে বিরক্তই হলাম একটু। ও আর বলতে হবে না; মিছিল-শোভাযাত্রা নিশ্চয়ই! পাক্কা দুটি ঘণ্টার জন্যে নিশ্চিন্ত ভেবে নেমেই পড়েছিলাম। না, ঝাণ্ডা উড়িয়ে শ্রমিক-শোভাযাত্রা নয়: আঁচল উড়িয়ে

মহিলা-পদযাত্রা। না, মহিলা নয় তো সব, সামনের দিকে বাচ্চা মেয়ে যে। স্কুলের ইউনিফর্ম পরে চলেছে। আরে, লিলি না? হ্যাঁ, লিলি চক্রবর্তীই তো, বাব্বা, কী সীরিয়স দেখাচ্ছে। এগিয়ে গিয়ে সটান জিজ্ঞেস করলামঃ কী হচ্ছে কি, পাবলিকের অসুবিধের সৃষ্টি করে... মুখে মুচকি হাসি টানতে ভুলি নি...

—কিসের অসুবিধে...আরে তুমি?

—তোমার কী ব্যাপার বলো?

—আমার? এই যে মেয়েদের নিয়ে যাচ্ছি পরেশনাথে—

—হুঁ, ভালো আছো...

—ভালোই তো...বেশ চলে যাচ্ছে... মাস্টারী সত্যি ইণ্টারেস্টিং—

—যাক, এই প্রথম শোনা গেল—

—অফিসের কলম-পেষার চেয়ে তো ভালো স্বীকার করবে, তাছাড়া সব অফিসের এ্যাটমসফিয়র তো এক নয়—

বাণীকেই কি অলোক বিয়ে করতে রাজী হয়েছিল প্রথমে। বলেছিল, কুরূপা না হলে কী হয়, কিম্বা এম-এ পাশ করলেই বা কী...একার রোজগারে আজ-কাল সংসার চালানো যায় কি?—ওর দাদাও বলেছিলেন, বেশ তো স্কুল-মাস্টারী করুক ও, ধেই ধেই করে ড্যালহাউসিতে রানিং ট্রামে ওঠার কসরৎ না দেখিয়ে ছেলে ঠ্যাঙাক—ও অনেক সম্মানের কাজ—

দেবব্রতবাবুর নাওয়া-খাওয়ার সময় নেই, রাউন্ড দা ক্লক সার্ভিস তাঁর, ছ' শো টাকা তাঁর আউট-ইনকাম।

—আপনার তো মশাই এটা পার্ট-টাইম জব, নগেন ভটচায বলছিলেন—নমো নমো করে পাঁচটা ক্লাশ নেওয়া ও আপনার কিছুই না—লক্ষ্মী তো আপনার ট্যুইশনিগুলো—

—যা বলেছেন, কী ভুলই না করেছি আমরা আর্টস পড়ে—শুধু শেক্সপীয়র-শেলীই মুখস্থ করলাম, বিশ্বরঙ্গমঞ্চে মূর্খের ভূমিকায়ই অভিনয় করে গেলাম সারা জীবন—অবিনাশবাবু বলছিলেন, না, দেবব্রতবাবু ও ট্যুইশনি কোচিং আপনা-দেরই জন্যে ভাই—সায়েন্সের যুগ এটা, আর্টস পড়ার বিলাসিতা নেই কারুর—তাও আবার প্রাইভেট টিউটর দেবার ক্ষমতা ক'জনের আছে বলুন—

—আরে দাদা, আপনারা কেবল আমাকেই দেখছেন, সুরেশবাবু, পাঁচকড়ি-বাবুকে চোখে পড়ছে না আপনাদের? নোট লিখে বাড়ি করে ফেললেন দুই ভদ্রলোক আমি তো কোন্ চুনোপুঁটি—

মাস্টারমশাইরা বিলক্ষণ দেখেছেন ওই দুই ভদ্রলোককেও। দুই পাবলিশারকে ধরে একজন কনট্রাক্ট নিয়েছেন ওদের হয়ে নোট লিখে দেবার টেক্সট বইয়ের। অন্যজন পরীক্ষার্থীদের জন্যে হিস্ট্রীর 'শর্ট কাট' লিখে দেন। কিন্তু যাঁদের নিয়ে স্টাফ রুমে এই উত্তপ্ত আলোচনা ও চোখ-টাটানো তাঁদের কিন্তু এ বাবদে ক্ষোভের অন্ত নেই। তাঁদের দুজনেরই বক্তব্য পাবলিশার ওঁদের রক্ত চুষে খাচ্ছে ভ্যাম্পায়ারের মতো, কিন্তু ঠেকাচ্ছে কলাটি। কিম্বা, রসটি নিঙড়ে নিচ্ছে ওই প্রকাশক ভদ্রলোকেরাই, আঁটিটি চুষতে দিচ্ছে সুরেশ সেন পাঁচকড়ি বাঁড়ুজ্যেকে।

—ও মশাই, বরুণবাবু, আপনি নাকি কাজ ছেড়ে দিচ্ছেন, তা এলেন তো তিন মাসও হয় নি—

—তিন দিনই বা উনি এখানে 'রট' করতে যাবেন কেন...দিলীপই জবাব দিচ্ছিল মিহিরের হয়ে...কোন ইয়ংম্যান চিরদিন থাকার জন্যে মাস্টারী করতে আসে?

—আসে না, আসে না গাপ্পুলি। মাস্টারী হচ্ছে জাস্ট একটা হপিং গ্রাউন্ড —এটাকে বেস করে মগডাল ধরে ঝুলে পড়ো—কালীবাবু বিষয়টি আরো পরিষ্কার করেন।

পণ্ডিতমশাইকে নিয়ে সেদিন স্কুলে কী কাণ্ড! 'সাধু' শব্দরূপ মুখস্থ বলতে পারে নি বলে একটা ছেলেকে তিনি এমন মেরেছিলেন যে ছেলেটা অজ্ঞান হয়ে গিয়েছিল। মাথায় দু' কলসী জল ঢেলেও যখন তার জ্ঞান ফেরানো গেল না তখন ডাক্তার ডাকা হলো। এদিকে খবর পেয়ে ছেলের মা ও দিদি এসে হাউ হাউ করে কান্না জুড়ে দিয়েছে। ছেলেরা বাইরে শুরু করে দিয়েছে, শ্লোগান উঠেছেঃ ছাত্র বধের শাস্তি চাই, যদু পণ্ডিতের পদত্যাগ চাই। ছেলেটির অচিরে জ্ঞান ফিরলো বটে কিন্তু পণ্ডিতমশাই চেয়ারে বসে তখনো ম্যালেরিয়া রোগীর মতো কাঁপছেন। তারপর ছেলেটি যখন উঠে দাঁড়ালো, পণ্ডিতমশাই ছুটে গিয়ে ছেলেটিকে জড়িয়ে করলেনঃ বাবা, সুব্রত, তুই লক্ষ্মী ছেলে বাবা, 'সাধু' শব্দরূপ মুখস্থ বলা অসাধু লোকেদেরই কর্ম, তুই সৎ বাবা। এই বুড়ো বয়সে চাকরী গেলে না খেতে পেয়ে মারা পড়বো—আমি বুঝতে পারি নি বাবা তখন—।

পরে জানা গিয়েছিল, পণ্ডিত-মশাইয়ের আগের রাত থেকে খাওয়া জোটে নি, পাঁচটা ছেলে-মেয়ে আর ব্রাহ্মণীকে নিয়ে ভদ্রলোক উপোস রয়েছেন দুদিন—

—একটা কিছু করা দরকার, বলাই বোস বলছিল, এ মাইনেতে আর সংসার চালানো যায় না।

—কী করবেন, কী করতে চান? পারবেন রাস্তায় নামতে, ঝাণ্ডা হাতে নিয়ে ইনকিলাব করতে?

—আলবৎ! মাস্টার বলে কি আমাদের পেট নেই নাকি, না বাকল পরে বনে জঙ্গলে থাকতে হবে—

অমিয়বাবুর মনে দ্বিধা ছিল, বংশী-বাবুকে বলতে উনিও সন্দেহ প্রকাশ করলেন। সম্মেলনে বললেনও ওঁরাঃ এ সময়টা অনির্দিষ্ট কালের জন্যে ধর্মঘটের

দেশ সেবায় নিয়োজিত,

এ্যালবার্ট ডেভিড লিমিটেড

কলিকাতা—৫০

নীতি ও বিজ্ঞানানুযায়ী ঔষধ

প্রস্তুতকরণের অগ্রণী

—ব্রাঞ্চ সমূহ—

বোম্বে - মাদ্রাজ - দিল্লী - নাগপুর

বেজওয়াডা - শ্রীনগর - গৌহাটী

ঝুঁকি নেওয়া ঠিক হবে না, সামনে পুজো তার পরেই ছেলেদের পরীক্ষা—

কিন্তু সম্মেলনে মেজরিটির ভোটে ধর্মঘটের সিদ্ধান্তই পাকা হলো। অমিয়বাবু-বংশীবাবু নির্দ্বিধায় সে সিদ্ধান্ত মেনে নিলেন, ধর্মঘটের সপক্ষে প্রচার করলেন স্কুলে-স্কুলে গিয়ে শিক্ষকদের কাছে।

—যাক্ আপনি তাহলে ট্যুইশনিতে স্ট্রাইক করেন নি, মিঃ সান্যাল তাঁর ছেলের টিউটরকে বলছিলেন। রাধাকান্তবাবুই লাভবান হয়েছেন, স্কুলগুলো বন্ধ হয়ে গিয়ে তাঁর আরো তিনটি ট্যুইশনি করার ফুরসৎ পাওয়া গিয়েছে।

‘ও শালারে—অমিতাভ গাড়ি টার্ন নিতে গিয়ে বাধা পেল, মাস্টাররা সব স্কোয়াট করছে...যত্ত সব...কিছুতেই শালাদের খিদে মরে না যতই দাও না কেন—

—গভর্মেণ্টের উচিত এখানে একটা ওভারব্রিজ করে দেওয়া, ওর পাশের সীটে-বসা তরুণ মিত্র বলছিল...অবস্থান ধর্মঘট তো এসপ্লানেড ইস্টের একটা পার্মানেণ্ট ফীচার হয়ে উঠলো—আজ মাস্টাররা, কাল কর্মচারীরা, পরশু আবার অমুক ইউনিয়ন, লেগেই আছে রোজ—

আচমকা ঘুম ভেঙে যেতেই দীপুর মায়ের মেজাজ গেল বিগড়ে। বারান্দায় প্রচণ্ড সোরগোল। জানালা খুলে দেখেন রাজ্যের সব ছেলে ব্যাট-বল পিটছে। আর থাকতে পারলেন না ভদ্রমহিলাঃ হ্যাঁ রে তোদের স্কুল নেই, এখানে এসে হামলা করছিস, কী রকম তোদের মায়ের শিক্ষা—

—না মাসিমা, বাচ্চু ব্যাট উঁচিয়ে বলে আমাদের মাস্টারমশাইরা সব জেলে চলে গেছেন—

পিণ্টু বিরক্ত হয়ে ওঠে, পাড়ার সব ছেলেরা দুপুরে বেশ ক্রিকেট খেলে আর ওকে ন্যাপস্যাকটি পিঠে ফেলে ছুটতে হয় স্কুলে। মিশনারী স্কুল ওর। ছোট বোন পিকুকে একদিন বলেই ফেলেঃ তোরা খুব লাকি রে! আমাদের টিচাররা তোদের দিদিমণিদের যুগ্যিও না। এই, বরঞ্চ একটা কাজ কর তো—তোদের দিদিমণিদের বল তো কিছু শাড়ি আর চুড়ি কিনে আমাদের টিচারদের জন্যে পাঠাতে—

গয়লা কিন্তু এবার নাছোড়বান্দা। রোজ ওকে শুনতে হয় বাবু বাড়ি নেই, বাবু বেরিয়েছে। দু’ মাসের দাম বাকী পড়ে গেলো, ও সোজা জানিয়ে দেয় পরের দিন থেকে সে আর দুধ দেবে না। কিন্তু মুন্নির মা তো বলতে পারে না যে স্বামী ওর ২৬ দিন ধরে রাস্তায় পড়ে আছে, স্কুল বন্ধ, রোজগার বন্ধ—

ট্যাক্সি থেকে নামতেই নমিতাকে ছেঁকে ধরলো সব বৌ-ঝিয়েরা। হাতে ওর একগাদা ছোট-বড় কাপড়ের প্যাকেট। দেখি দেখি বৌদি কী কী কিনলে—

—টেরিকট কিনেছেন নিশ্চয়ই—চন্দনের মা নমিতাকে নিয়ে গিয়ে ব্রজেন মাস্টারের বারান্দায় বসালো।

—ইস্ টেরিকট শুধু, কী বলছিস রে তুই, নতুন বিয়ে হয়েছে, বাটিক-ক্যালিকুথ কিনে দিয়েছেন নিশ্চয়ই ভাই আপনার বর।

—সুধীরবাবুরা ছ’ মাসের বোনাস পেয়েছেন, জানেন মাসীমা—

মাসীমা মানে ব্রজেন মাস্টারের গৃহিণী চেষ্টা করেও দীর্ঘশ্বাস চেপে রাখতে পারে না...কেন পাবেনা, কোন তেল কোম্পানীতে কাজ করে না?—

গেল বছরে পিণ্টুর মা সুমিত্রা নীলগিরি শাড়ি কিনেছিল, ৭০ টাকা দাম শুনে আঁৎকে উঠেছিল গিন্নিরা সব। পরে অবশ্য নিজেদের সান্ত্বনা দিয়েছিল এই বলে যে কেন কিনবেন না ভাই, আপনাদের দুজনের রোজগার—হাইস্কুলে মাস্টারী করেন নিজে দ্যাওর-ননদদের দেখতে হয় না, যা হোক ওরাও উপায় করছে—

—আছা, বাবা বুড়ো বয়সে এটা কী করছেন বল তো মা—স্ট্রাইকের দরুণ মাইনে কাটবে যে স্কুলে—সমর একটু বিরক্তই হয়।

—তা ওঁকে কে বোঝাবে বল। বলেন যে ওঁরা ৬৫ হাজার মাস্টার। মাইনে কাটলে ওনার তো একার কাটবে না—এক সঙ্গে যখনই ওঁরা লড়ায়ে নেমেছেন, একই ভাগ্য নিয়ে ফিরবেন—

বিশ্বনাথবাবু একদিন রাত্রের অন্ধকারে গুটি গুটি শ্যামল রায়ের বাড়ি গিয়ে হাজির। হেড মাস্টারমশাইকে এ অসময়ে আসতে দেখে নলিনীবাবু একটু বিস্মিতই হয়েছিলেন। তবে কি উনিও ধর্মঘটে নামবেন? চুপি চুপি হেড মাস্টারমশাই পকেট থেকে টাকা বার করে বললেনঃ পুজোর মাস, খরচ-খরচা আছে, এটা রাখুন।

—কী করছেন, মাস্টারমশাই—

—ঠিকই করছি নলিনীবাবু। শুনুন। টাকাটা গিন্নীর হাতে দিয়ে আপনি বেরিয়ে পড়ুন...আমি দূরে থাকবো...কাল স্কুল খুলতেই হবে... গভর্নমেণ্ট অনেক টাকা দিচ্ছে স্কুলের ডেভালাপমেণ্টের নামে...অনেক টাকা... কিন্তু স্কুল খুলতে হবে—আপনি সব টিচারদের বাড়ি-বাড়ি গিয়ে খবরটা দিন যেন কাল ওঁরা কাজে জয়েন করেন...

—না মাস্টারমশাই, এ টাকা আমি নিতে পারবো না—আপনি আমায় মাপ করুন...আমি লীডার হলেও স্টাফদের মত না নিয়ে একা কোন সিদ্ধান্ত নিতে পারি না—

কৈলাসবাবুকে সেদিন রাস্তায় পেয়ে শ্যাম চাটুজ্যে যেন ঝাঁপিয়ে পড়লেন তাঁর ওপর। কী ভেবেছেন কি মশাই, এতে কি ছাত্রদের ক্ষতি হচ্ছে না?—আমরা মানে গার্জেনরা যদি ছেলেদের ট্যুইশন ফী দেওয়া বন্ধ করি কিছু করতে পারেন আপনারা—

—না, কিছুই করতে পারি না, সবিনয়ে মোহিনীবাবু বলছিলেন—আর স্ট্রাইক পিরিয়ডে যে ক্ষতি ছাত্রদের হয়েছে তাও আমরা পুরিয়ে দিতে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলাম—

—জানেন মশাই, আগেকার দিনে টিচিং প্রফেসনটা কত অনেস্ট ছিল—কেন ছিল...বুনো রামনাথ...

—হ্যাঁ, সরকারকে বলুন এবার বন মহোৎসবে কিছু তেঁতুল চারা পুঁততে, তাই চিবিয়ে থাকবো আমরা—

সন্তুও সারা দুপুর একদল ছেলে নিয়ে পাড়ায় ঘুরে বেরিয়েছে ; হাতে হাতে পোস্টার ছিলঃ হয় স্কুল খুলুন, নয় সিনেমা খুলুন।

—ও মা, কোথায় যাচ্ছো মা, ব্যাগ-ভর্তি জামা-কাপড় নিয়ে—রুমা ওর মাকে জড়িয়ে ধরে বলছিল, তুমি যে বলছিলে, আজ আমার পুজোর জামা কিনে দেবে, ড্যালনের ফ্রক—

অনীতা চোখ মুছে মেয়েকে আদর করে, বলেঃ ছোটমার কাছে থাকবে, দুষ্টুমি করো না—

মীনাক্ষীর চোখের জলও বাধ মানে নি ...কী দরকার ছিল সেজদি তোমার জেলে যাবার...আর লোক নেই...

সত্যবাবু মিসেস দাশগুপ্তকে দেখে অবাক। ‘আপনি আবার এ বয়সে লপসি খেতে এখানে এলেন কেন দিদিমণি’...

—নতুন আসি নি মাস্টারমশাই আমি ...সেই বিয়াল্লিশ সালেও একবার আসতে হয়েছিল...এই জেলেই ছিলাম...এতো আমার চেনা ঘরবাড়ি...

* * *

তুমি তো খুব খুশি, বড় হয়ে মেয়ে মাস্টারী করবে শুনে...শ্রীমতী বলছিল... কেন রে মেয়ে, তারপর একহাতে বুলবুলের কানটি ধরে আরেক হাত কোমরে রেখে বললে, তোর জেলে যাবার সখ হয়েছে নাকি...

৬।১০।৬৬

বঙ্গদর্শন

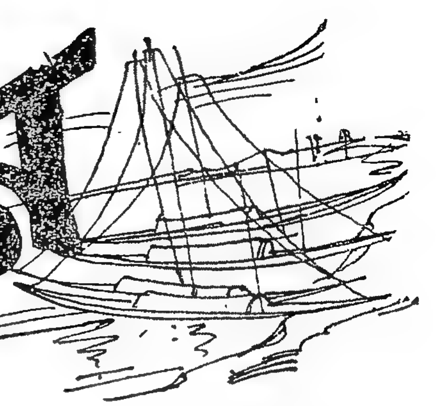

শিক্ষক আন্দোলনে ফলশ্রুতি

অনেক আশা নিয়ে শিক্ষকমশাইরা পথে নেমেছিলেন, অনেক নিরাশা নিয়ে তাঁদের আন্দোলন প্রত্যাহার করে নিতে হল। বর্তমান ধর্মঘট ও আইন অমান্য আন্দোলন করতে গিয়ে শিক্ষকমশাইদের কম অভিজ্ঞতা হয় নি। তাঁরা বাস্তবে কি পেলেন সেটা খুব বড় কথা নয়, কিন্তু এবারে তাঁদের যে অভিজ্ঞতা হল, তাতে তাঁদের অসংখ্য মোহমুক্তি ঘটেছে, সেইটেই পরম লাভ।

তাঁদের সবচেয়ে বড় যে অভিজ্ঞতা লাভ হয়েছে সেটা হচ্ছে সরকার সম্বন্ধে মোহমুক্তি। সরকার যখন বলেন যে, শিক্ষার দাবি জাতীয় দাবি, শিক্ষকের অবস্থার উন্নতি করার বিশেষ প্রয়োজন, ইত্যাদি বহুরকম আপ্তবাক্য শুনে শুনে এই ধারণাই শিক্ষকমশাইদের মনে ঠাঁই পেয়েছিল যে, সরকার শিক্ষাব্যবস্থার উন্নতি চান, শিক্ষকদের অবস্থার উন্নতি চান, শিক্ষার উন্নতি চান। তাই তাঁরা সরকারকে আন্দোলনের মারফৎ নিজ দায়িত্ব সম্বন্ধে সজাগ করে দিতে চেয়েছিলেন। তাঁরা বিশ্বাস করতে পারেন নি যে সরকারী প্রতিশ্রুতিগুলি নিছক কথার ফুলঝুরি মাত্র, বিশ্বাস করতে পারেন নি যে, অনৃত ভাষণই সরকারের পেশা, বুঝতে পারেন নি শিক্ষার প্রতি সরকারের অনুরাগ কপট প্রণয়ীর অনুরাগের মতই বিপজ্জনক। তাঁরা বিশ্বাস করতে পারেন নি লক্ষ লক্ষ টাকা ব্যয়ে গঠিত কোঠারী কমিশন একটা বিরাট ধাপ্পা, বিশ্বাস করতে পারেন নি রাষ্ট্রপতির জন্মদিনকে শিক্ষক দিবস ঘোষণা করা একটা তৃতীয় শ্রেণীর রাজনৈতিক চাল। তাঁরা বিশ্বাস করতে পারেন নি শুধু চার সপ্তাহ কেন, যুগ যুগ ধরে ইস্কুলগুলি বন্ধ থাকলেও তাতে সরকারের উদ্বেগ নেই, ছেলেমেয়েদের লেখাপড়া হল কি না হল তা নিয়ে কোন মাথাব্যথা নেই। কেন না চার সপ্তাহ ধরে বসে থাকতে শিক্ষকেরাও চান নি, প্রত্যহই তাঁরা আশা করেছিলেন যে আজ বুঝি সরকার কিছু ঘোষণা করবেন, এবং তিক্ত অন্তিম পর্যন্ত তাঁরা এই আশাই করেছিলেন। কিন্তু যখন দেখা গেল, শিক্ষার উন্নতিতে সরকারের কোনই মাথাব্যথা নেই, তখন তাঁরা ছাত্রদের মুখ চেয়ে বাধ্য হয়েই আন্দোলন প্রত্যাহার করলেন।

সেই সব অভিভাবকেরা, সেই ফ্যাসনেব্‌ল সমাজের মানুষেরা, কোথায় গেলেন যাঁরা এতকাল 'শিক্ষা গেল' 'শিক্ষা গেল' বলে তারস্বরে বিলাপ করছিলেন, সংবাদপত্রে চিঠিপত্র ছাপাচ্ছিলেন, অভিভাবক সভা করে ছেলেমেয়েদের ইস্কুলের মাইনে দেবেন না বলে জানাচ্ছিলেন, আর শিক্ষকমশাইদের উদ্দেশ্যে অজস্র কটূক্তি করছিলেন? শিক্ষকমশাইরা (তাঁদের ভাষায় মাস্টারেরা) এখনো এতদূর ছোটলোক হয়ে যান নি। শিক্ষকসমাজ সর্বাগ্রে ঘোষণা করেছেন যে, এই ধর্মঘটে ছাত্রদের যে ক্ষতি হল তা তাঁরা পূরণ করে দেবেন লক্ষ্মীপুজার পরদিন থেকেই ইস্কুল চালু করে। আমরা পূর্বে বহুবার লিখেছি মাস্টারমশাইরা বে-আইনীভাবে ছাত্রদের একটি দিনও অপহরণ করেন নি। গত বছরের ঊনিশদিন নষ্ট হয়েছিল, তা তাঁরা পূরণ করে দিয়েছিলেন গ্রীষ্মাবকাশ ও পুজাবকাশের ছুটি থেকে। এ-বছরের গোড়ায় সরকারের দোষে যে ইস্কুলগুলি বন্ধ হয়ে রইল, সে ক্ষতিও স্বেচ্ছায় শিক্ষকমশাইরা পুষিয়ে দিয়েছেন গ্রীষ্মের ছুটি কর্তন করে। এবারের শিক্ষক আন্দোলনজনিত ক্ষতিও তাঁরা স্বেচ্ছায় পূরণ করে দেবার ঘোষণা করেছেন। অথচ বিনা দোষে অভিভাবক শ্রেণীর একাংশ তাঁদের লোকচক্ষে হেয় করার যে হীন প্রচেষ্টা করলেন, এবং কয়েকটি প্রথম শ্রেণীর সংবাদপত্র যেভাবে তাতে ইন্ধন দিল, তার জন্য কি তাঁরা শিক্ষকমশাইদের কাছ থেকে ক্ষমা প্রার্থনা করবেন?

শিক্ষকমশাইদের অপরাধ, তাঁরা লরীওয়ালা বা সিনেমাহল মালিক নন। কাজেই সরকারী নেকনজর লাভের যোগ্যতা তাঁদের নেই। আমরা আগে একথা বহুবার বলেছি যে, সরকার শক্তের ভক্ত নরমের যম। লরীওয়ালারা চাঁদির জুতো মেরে তাদের প্রত্যেকটি দাবিদাওয়া আদায় করে নিয়েছে। যারা দিনের পর দিন ধর্মঘট করে, পরিবহনব্যবস্থায় অচল অবস্থা সৃষ্টি করে, জনজীবনে অশেষ দুর্ভোগ সৃষ্টি করে দেশের আর্থিক অবস্থার ক্ষতিসাধন করল, প্রত্যক্ষভাবে মূল্যবৃদ্ধিতে সাহায্য করে জাতীয়তা-বিরোধী অপকর্ম করল, তাদের শাস্তি দেওয়া দূরে থাক, বরং সরকার সেই দুর্বৃত্তদের পুরস্কৃত করলেন। সিনেমাওয়ালারা লক-আউট ঘোষণা করে প্রত্যহ সরকারের দুই লক্ষ টাকা লোকসান ঘটাচ্ছে সেখানে সরকার তাদের প্রশ্রয় দিচ্ছেন। কিন্তু দরিদ্র শিক্ষক বা সরকারী কর্মচারীদের প্রাথমিক দাবিদাওয়াটুকু মিটিয়ে দেবার কোন সদিচ্ছাই সরকারের নেই। শিক্ষকদের বঞ্চিত করে সরকার যে কি থেকে জনসাধারণকে বঞ্চিত করলেন তা অনুধাবন করার শক্তি সরকারের নেই।

শিক্ষকমশাইরা এইটুকুই উপলব্ধি করলেন যে এই দুর্ভাগা, স্বার্থপর ও সুবিধাবাদী দেশে বেঁচে থাকতে হলে সকল নৈতিক মূল্যবোধকে অস্বীকার করতে হবে। এদেশে অপকর্ম করলে হাততালি পাওয়া যায়। ছাত্রদের পড়াশোনার কোন ক্ষতি হোক শিক্ষকমশাইরা তা চান নি, তাঁদের এই দুর্বলতাটুকুর সুযোগই সরকার নিয়েছেন, শুধু তাই নয় অভিভাবকদের একাংশকে দিয়ে শিক্ষকহৃদয়ের এই দুর্বলতম স্থানে ক্রমাগত খোঁচা দিয়েছেন (ছাত্রের দোহাই দিয়ে কোন কথা বললে শিক্ষক স্বভাবতই চঞ্চল হয়ে উঠবেন, কেন না একথা দিবালোকের ন্যায় সত্য যে ছাত্রের প্রতি নৈতিক দায়িত্বের অস্বীকৃতি প্রাণান্তেও শিক্ষকেরা করতে পারেন না, কারণ ছাত্রেরা তাঁদের মূলধন, তাঁদের তালুকের খাস প্রজা, জীবনের অন্যান্য দিকে রিক্ত হলেও এদিকে তাঁরা পূর্ণ। ছাত্রের প্রতি তাঁদের নৈতিক দায়িত্বের অস্বীকৃতি মানেই তাঁদের নিজের সত্তারই অস্বীকৃতি)।

শিক্ষক আন্দোলনে 'স্ট্রাটেজিক অভাব' এইখানেই। যদি তাঁরা গোড়া থেকেই জোর গলায় বলতে পারতেন যে, শিক্ষা চুলোয় যাক, ছাত্রের পড়াশোনা শিকেয় উঠুক, তাদের ভবিষ্যৎ গোল্লায় যাক, আমাদের দাবি না মেটা পর্যন্ত আমরা ক্ষান্ত হব না, তাহলে সরকার তথা দেশবাসী কেঁপে উঠত, সরকার শিক্ষকদের দাবি তৎক্ষণাৎ মেনে নিতেন এবং আজ যারা শিক্ষকদের কটূক্তি করছে তারাই দন্তবিকশিত করে বলত, 'হ্যাঁ মাস্টারেরা জানে কিভাবে দাবি আদায় করতে হয়।'

পশ্চিমবঙ্গের নয়া খাদ্যনীতি

পশ্চিমবঙ্গ সরকার ঘোষণা করেছেন যে, বিধিবদ্ধ রেশন এলাকা, আন্তঃ রাজ্য সীমান্ত এবং পশ্চিমবঙ্গ-পূর্ব পাকিস্তান সীমান্ত ছাড়া আর কোথাও কর্ডনিং ব্যবস্থা থাকবে না। সাময়িকভাবেই এই ব্যবস্থা অবশ্য অবলম্বিত হয়েছে। মন্ত্রিসভার বক্তব্য হচ্ছে যে, এখন যখন আর ধান ও চাল সংগ্রহ করা হচ্ছে না, তখন কর্ডনিং ব্যবস্থা চালু রাখার কোন সার্থকতা নেই। তা ছাড়া ঘাটতি জেলাগুলিতে আংশিক রেশনের স্বাভাবিক সরবরাহ অক্ষুণ্ণ রাখা সম্ভব হচ্ছে না। কর্ডনিং ব্যবস্থা প্রত্যাহৃত হলে উদ্বৃত্ত জেলাগুলি হতে ঘাটতি জেলাতে ধানচাল যাবে। যার ফলে ঘাটতি জেলাগুলির মানুষের দুর্দশা বহুলাংশে হ্রাস পাবে। তদুপরি সকল জেলাতেই কর্ডনিং ব্যবস্থা ব্যর্থ হয়েছে, হাজার হাজার মণ চাল কালোবাজারে পাচার হয়েছে। আর একটি বিষয় মন্ত্রিসভায় আলোচিত হয়েছে কিনা জানি না, এই কর্ডনিং-এর কৃপায় সমাজে একটি নতুন শ্রেণী তৈরি করা হয়েছে, যারা হচ্ছে চালের স্মাগলার।

আপাতত এই কর্ডনিং প্রত্যাহারের ফলাফল কি হবে এখন থেকে তা বলা শক্ত। আপাতদৃষ্টিতে মনে হয় এই সময় কর্ডনিং নিয়ে বাড়াবাড়ি করা উচিত নয় যেহেতু এখন সরকার আর ধানচাল সংগ্রহ করছেন না, নতুন মরশুম না আসা অবধি। কিন্তু এই প্রসঙ্গে যে কথাটি এসে পড়ে সেটি হচ্ছে খাদ্যনীতির মৌলিক দিকটির কথা। আমাদের আগামী বছরের এবং তৎপরবর্তীকালের খাদ্যনীতি কি হওয়া উচিত সেটা বর্তমান বছরের অভিজ্ঞতার পরিপ্রেক্ষিতে বিচার করে দেখা প্রয়োজন এই মুহূর্তে অনুভূত হচ্ছে।

আগামী বছরের খাদ্যনীতি সম্বন্ধে মুখ্যমন্ত্রী ঘোষণা করেছেন যে, ২৪ পরগনা, নদীয়া হাওড়া ও দার্জিলিং এই চারটি জেলা ছাড়া আগামী মরশুমে পশ্চিমবঙ্গের আর কোন জেলাতেই আংশিক রেশনিং আর থাকবে না। অবশ্য বিধিবদ্ধ রেশন ব্যবস্থা যথারীতি বর্তমান থাকবে। সেচ ও সেচবিহীন এলাকায় যথাক্রমে সাত একর ও তদূর্ধ্বে এবং দশ একর ও তদূর্ধ্বে জমির মালিকদের উপর লেভি ধার্য করা হবে। চালকলের উপর পঞ্চাশ শতাংশ লেভি ধার্যের পুরাতন নীতিই আবার নতুন করে চালু করার কথা ঘোষণা করা হয়েছে।

কিন্তু আসল কথা হচ্ছে যে, যদি একটা সার্থক খাদ্যনীতি অনুসরণ করতে হয় তাহলে তার রূপ কি হওয়া উচিত। পূর্বে বহুবার আমরা বঙ্গদর্শনে একথা বলেছি যে, বর্তমান অবস্থায় রেশনিং অপরিহার্য। যেহেতু খোলাবাজার এবং বাজার দর নিয়ন্ত্রণের ক্ষমতা রাজ্য সরকার এবং কেন্দ্রীয় সরকার কোন সরকারেরই নেই সেই হেতু খাদ্যের ক্ষেত্রে স্টেট ট্রেডিং তথা কণ্ট্রোল ইত্যাদির প্রয়োজন আছে। যাঁরা খোলাবাজারের পক্ষে ওকালতি করেন, তাঁদের এটুকু বোঝা উচিত যে পশ্চিমের ধনতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলিতে ব্যবসায়ী তথা উৎপাদকদের যেটুকু সামাজিক দায়িত্ববোধের ঐতিহ্য গড়ে উঠেছে সেই ঐতিহ্যের একান্ত অভাব আছে আমাদের দেশে। পশ্চিমবঙ্গে রেশনিং চালু হবার আগে কিভাবে বাজার থেকে সমুদয় চাল অদৃশ্য হয়ে গিয়েছিল, সেটা বোধ হয় এত তাড়াতাড়ি অনেকেই ভুলে যান নি। এই কারণেই রেশনিং অপরিহার্য। এবং অপরিহার্য বলেই রেশনিং ব্যবস্থা এমনভাবে গড়ে তোলার প্রয়োজন আছে, যাতে ব্যবস্থাটি জনসাধারণের পক্ষে কল্যাণকর হয়। বর্তমানে রেশনে মাথাপিছু যে বরাদ্দ আছে তাতে চার থেকে পাঁচদিনের মত খাদ্য পাওয়া যায়, বাকি দু'তিনদিনের খাদ্য প্রত্যেককেই কালোবাজার থেকে কিনতে হয়, আর সেই কালোবাজারের চাহিদা মেটানোর জন্যই এত স্মাগলিং যার ধাক্কা সামলাতে সরকারকে হিমসিম খেতে হচ্ছে। কিন্তু যদি সরকার রেশনে মাথা পিছু চালের বরাদ্দ কিছুটা বাড়িয়ে দেন তাহলে কোন লোকেরই কালোবাজার থেকে চাল কেনবার প্রয়োজন হবে না, যার ফলে চালের স্মাগলিং বন্ধ হবে। সরকারকে কোনরকম কর্ডনিং-এর জন্য মাথা ঘামাতে হবে না। গ্রাম থেকে চাল পাচার বন্ধ হলে গ্রামের চাল গ্রামেই থাকবে, সেখানে চালের জন্য হাহাকার পড়বে না। উদ্বৃত্ত গ্রাম, উদ্বৃত্ত মহকুমা ও উদ্বৃত্ত জেলার চালের ঘাটতি অঞ্চলে অবাধে যাবার সুযোগ থাকলে চালের বাজার দরও নেমে যাবে।

সরকার আরও ঘোষণা করেছেন যে কেন্দ্র থেকে চাল না পেলে আগামী বৎসর রেশনিং বজায় রাখা সম্ভব হবে না। এই ঘোষণাতেই সরকারী নীতির ব্যর্থতার স্বীকৃতি রয়েছে। পশ্চিমবঙ্গে চালের অভাব নেই, থাকলে চোরাচালানের অফুরন্ত যোগান অব্যাহত থাকে কি করে? আসলে ত্রুটি সরকারের সংগ্রহ নীতির। যদি কৃষককে সরকার লাভজনক দর দেন, তাহলে সে স্বেচ্ছায় সরকারের কাছে ধানচাল বিক্রয় করবে। সরকারের তরফে যারা কৃষকদের নিকট থেকে ক্রয় করে তাদের অসাধুতাও অনেক ক্ষেত্রে বিক্রয়ের জন্য কৃষকের আগ্রহকে নষ্ট করে দেয়। টাকাকড়ি দিতে অনাবশ্যক হয়রানি করা হয় এমন অভিযোগও বহু এসেছে।

সহজ কথায় রেশনিং ব্যবস্থাকে সার্থক করে তুলতে গেলে সরকারের পক্ষে নিম্নলিখিত পন্থাগুলি অবলম্বন করা উচিত। প্রথমত ধানকলগুলির জাতীয়করণ, যার দ্বারা সরকার জোতদারদের শায়েস্তা করতে পারবেন। দ্বিতীয়ত কৃষককে অধিকতর লাভজনক মূল্য প্রদান, যার দ্বারা সরকার কৃষকদের সরকারকে অধিকতর পরিমাণে ধান বিক্রয়ে উৎসাহিত করতে পারবেন। এবং তৃতীয়ত রেশনে মাথাপিছু চালের কোটা কিছুটা বাড়িয়ে দেওয়া, যার দ্বারা সরকার চালের কালোবাজার এবং স্মাগলিং বন্ধ করতে সক্ষম হবেন।

সরকারের যদি উদ্দেশ্যের সততা থাকে তাহলে পশ্চিমবঙ্গের জন্য একটা কল্যাণকর খাদ্যনীতি গ্রহণ করা সম্ভব। কিন্তু যদি উদ্দেশ্যের সততা না থাকে, যদি সরকার জনস্বার্থের চেয়েও জোতদারদের স্বার্থের মুখ চেয়ে নীতি নির্ধারণ করেন, তাহলে কোনদিনই পশ্চিমবঙ্গের খাদ্য-সমস্যা মিটবে না একথা হলফ করে বলা যায়।

সুপার মার্কেট

কয়েক মাস আগে যখন কলকাতায় সুপার মার্কেট খোলার পরিকল্পনা কাগজে কলমে ঘোষণা করা হয়, তখন বঙ্গদর্শনে লিখেছিলাম 'সুপার মার্কেট না সুপার তামাসা'। সেই সুপার মার্কেটের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন হল লিন্ডসে স্ট্রীটে গত ৩০শে সেপ্টেম্বর তারিখে। এই সুপার মার্কেটে নাকি সস্তা দরে সাধারণ মানুষ জিনিসপত্র কিনতে পারবেন। এই বিষয়ে কেন্দ্রীয় সরকার সাড়ে আট লক্ষ টাকা দিয়েছেন মূলধন হিসাবে। এরকম নাকি আরও সুপারবাজার খোলবার পরিকল্পনা সরকারের আছে।

কিন্তু একটা ধাঁধার কিছুতেই জবাব

পাওয়া যায় না যে, দোকান খুলে কিভাবে জিনিসের দাম কমানো সম্ভব? এর জবাবে হয়ত এ কথা বলা হবে যে, এখানে লাভের পরিমাণ কম রেখে ক্রেতাকে কিছুটা সুবিধা দেওয়া যেতে পারবে। দোকানদারেরা যে লোভের বশবর্তী হয়ে অন্যায়ভাবে দাম বাড়ায় না তা নয়, কিন্তু আসল যারা দাম বাড়ায়, বা এদেশে দাম বাড়িয়ে চলেছে তারা হচ্ছে উৎপাদক। এদের শায়েস্তা না করা গেলে সার্বিক-ভাবে মূল্যবৃদ্ধিকে প্রতিরোধ করা যাবে না। সুপার মার্কেটে হয়ত দু'চার পয়সা কম দামে জিনিস পাওয়া যেতে পারে, কিন্তু মোট মূল্যবৃদ্ধির মোকাবিলা এর দ্বারা করা অসম্ভব। একটা উদাহরণ দিলে বিষয়টি বোঝা যাবে। নারকেল তেলের দাম গত তিন বছরে দ্বিগুণ হয়ে গেছে, দু' টাকার কৌটোর দাম চার টাকা হয়েছে। এ দাম বাড়িয়েছে নিঃসন্দেহে উৎপাদক, দোকানদার নয়। সুপার মার্কেট চার টাকা না নিয়ে তিন টাকা নব্বুই পয়সায় হয়ত জিনিসটা দেবে। কিন্তু এর দ্বারা আসল মূল্যবৃদ্ধির গতিকে রোধ করার সম্ভাবনা নেই।

সুপার মার্কেটকে উৎপাদক প্রতিষ্ঠানগুলির উপরেই নির্ভর করতে হবে এবং তারা নিজেদের এজেন্টদের বা পাইকার-দের যে দামে জিনিস সরবরাহ করে সেই দামেই হয়ত সুপার মার্কেটকে জিনিস সরবরাহ করবে। সেই হিসাবে সুপার মার্কেটে হয়ত দু'চার পয়সা সস্তায় মাল পাওয়া যাবে, কিন্তু যেভাবে ঘোষণা করা হচ্ছে, সেভাবে মূল্যবৃদ্ধির সঙ্গে লড়াই করা যাবে না। মূল্যহ্রাসের যদি কোন আন্তরিক ইচ্ছা সরকারের থাকে তাহলে সরকারের কাছে অনুরোধ তাঁরা যেন উৎপাদকদের উপর একটু বেশি করে নজর দেন এবং এদেশে কিভাবে ব্যবসায়ীরা মুনাফার উপর অতি মুনাফা লোটে সেটা খেয়াল করে যেন কোন কার্যকরী ব্যবস্থা অবলম্বন করেন।

এখানে একটি উদাহরণেই কাজ হবে আশা করি। কর্ডনিং প্রথা উঠে যাবার সঙ্গে সঙ্গে খোলাবাজারে তথা কালো-বাজারে চালের দাম রাতারাতি প্রায় অর্ধেক কমে গেছে। আড়াই টাকা থেকে দাম দেড় টাকায় নেমে এসেছে। তাহলে অতি মুনাফা লোটার কি খেলাটাই না চলছিল এতদিন ধরে এতক্ষণে তা বুঝতে পারা যাচ্ছে। মূল্যবৃদ্ধির আসল কারণটা এই অতি মুনাফার উপরেই নির্ভর করছে, উৎপাদনের অপ্রতুলতার জন্য নয়।

সরকারী কর্মচারী প্রসঙ্গ

পাঠকদের স্মরণ আছে বিগত ১৩ই সেপ্টেম্বর সরকারী কর্মচারীরা একযোগে গণছুটি নিয়ে সরকারের বধির কর্ণে নিজেদের অভাব-অভিযোগগুলিকে তোল-বার চেষ্টা করেছিলেন। তাঁদের এই অভিনব পদ্ধতি সরকার ভাল মনে হজম করতে পারেন নি। ওই একদিনের বেতন সরকার কর্তন করেছেন। সরকারের এই বেতন কর্তনের সিদ্ধান্তের পিছনে একটি-মাত্রই উদ্দেশ্য আছে, তা হচ্ছে প্রতিহিংসা-বৃত্তি।

সরকারী এই নির্দেশের প্রতিবাদে কর্মচারীরা মাসের প্রথম দিনে বেতন বয়কট করেছিলেন। এ ব্যাপারেও তাঁরা অভূতপূর্ব ঐক্যের নজীর সৃষ্টি করেছেন। শুধু তৃতীয় বা চতুর্থ শ্রেণীর কর্ম-চারীরাই নয়, নন-গেজেটেড পর্যায়ের অফিসারেরা পর্যন্ত নির্দিষ্ট দিনে বেতন গ্রহণ না করে সরকারের ভ্রান্তনীতির প্রতিবাদ করেছেন।

সরকারী কর্মচারীদের অবিচলিত সংহতি দেখে সরকার বোধ হয় কিছুটা শিক্ষালাভ করেছেন। সরকার বুঝতে পেরেছেন যে, রক্তচক্ষু দেখিয়ে কর্মচারী-দের আনুগত্য আদায় করা যায় না। পর পর দুটি অভিনব প্রতিবাদের দ্বারা সরকারী কর্মচারীরা তাঁদের সামগ্রিক ঐক্যের যে নিদর্শন দেখিয়েছেন তাতে সরকারকে পুনরায় মাথা ঘামাতে হচ্ছে। সংবাদে প্রকাশ যে ইতিমধ্যে আর একটি পে-কমিশন নতুন করে বসানো হচ্ছে সরকারী কর্মচারীদের বেতনাদি সম্বন্ধে নতুন ধরনের সিদ্ধান্ত নেবার জন্য। পরোক্ষভাবে এক্ষেত্রে সরকারী কর্মচারী-দের আন্দোলনের জয় হয়েছে।

সরকার যদি গোড়া থেকেই একটু সহানুভূতির সঙ্গে তাঁর কর্মচারীদের বিষয়গুলি বিবেচনা করতেন তাহলে জল এত দূর গড়াত না।

পূজো ও কাপড়ের দাম

আমাদের দেশে সাধারণ মানুষের কাপড়-চোপড় কেনবার একমাত্র সময় হচ্ছে পূজার প্রাক্কালে। ধনীদের কথা বাদ দেওয়া গেল, সাধারণ দরিদ্র মানুষের পেটের দাবি মিটিয়ে জামাকাপড় কেনবার অবস্থা বছরে আর কোন মাসে থাকে না। পূজার সময় বোনাস পেয়েই হোক, আগাম নিয়েই হোক, কিংবা ধার করেই হোক সাধারণ মানুষ কিছুটা কেনাকাটা করে এবং সেই কাপড়-চোপড়েই সারা বছর চালায়।

অথচ প্রতিবারেই দেখা যায় ঠিক পূজার পূর্বমুহূর্তে মিলজাত কাপড়ের দাম বাড়িয়ে দেওয়া হয়। আর এবারে যিনি তা বাড়াবার ফতোয়া দিয়েছেন, তিনি হচ্ছেন খোদ কেন্দ্রীয় বাণিজ্যমন্ত্রী মানুভাই শাহ।

আমাদের দেশে তাঁতবস্ত্রের দাম অত্যধিক। বেশির ভাগ দরিদ্র মানুষের মিলের কাপড়ই ভরসা। তাই আকস্মিক-ভাবে মিলের কাপড়ের মূল্যবৃদ্ধির কথা প্রতিটি দরিদ্র সংসারেই দুশ্চিন্তা এনে দিয়েছে।

কাপড়ের কলওয়ালাদের অবস্থা এমন কিছু শোচনীয় হয় নি যার ফলে এই মুহূর্তেই দাম বাড়ানোর কোন প্রয়োজন আছে। বাংলার কাপড়ের কলগুলি অবশ্য টিম টিম করে জ্বলছে, আমরা পূর্বে, যুগদর্শনে এ বিষয়ে আলোচনা করে সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলাম। কিন্তু পশ্চিম ভারতের মিলওয়ালাদের তো এখন বাড়বাড়ন্ত। তারা ভারত জোড়া সর্বত্র নিজেদের এজেন্সি ও বিক্রয়কেন্দ্র খুলেছে, তাদের কাঁচামাল ও বৈদেশিক মুদ্রারও কোন অভাব নেই, ডিভ্যালুয়েশনের চোটে তাদের বিশেষ কিছু ক্ষতি হয়েছে বলে মনে হয় নি, কেন না মিল-জাত কাপড় রপ্তানী পণ্যের তালিকার অন্তর্ভুক্ত এবং সেই হিসাবে বিশেষ ধরণের সাবসিডিও পাচ্ছে।

কিন্তু এই অযৌক্তিক মূল্যবৃদ্ধি দরিদ্র ও নিম্নমধ্যবিত্ত পরিবারে যে বিপর্যয় এনে দিয়েছে কিভাবে তার সঙ্গে মোকাবিলা করা যায় তা এখনি ভেবে দেখার প্রয়োজনীয়তা আছে। এখানে বস্ত্রবিক্রেতা ও পশ্চিমবঙ্গ সরকারেরও বিশেষ দায়িত্ব আছে। এটুকু বিশ্বাস করার যথেষ্ট কারণ আছে যে, বিক্রেতারা এবারকার পূজার মরশুমের জন্য যে কাপড় মজুত করেছেন, তা কেন্দ্রীয় সরকারের মূল্যবৃদ্ধির কথা ঘোষণা করার আগেই করা হয়েছে। আমরা আশা করব যে তাঁরা যেন পূর্বেকারই দাম নেন, এই সুযোগে যেন অতিমুনাফা লোটার চেষ্টা না করেন।

অন্ধকারের জীব

পশ্চিমবঙ্গে বিগত দুটি মাস ধরে জনজীবনে অজস্র ঘটনা ঘটে গেল, আন্দোলন, ধর্মঘট, আইন অমান্য, বন্ধ সব কিছু মিলিয়ে যখন সমস্ত আবহাওয়াটাই অন্যরকম, জীবনধারণের ন্যূনতম দাবিতে যখন সারা দেশ রাজপথে এসে দাঁড়িয়েছে, তখন কিন্তু একটি শ্রেণী নীরবে আপন মনে কাজ গুছিয়ে যাচ্ছে।

কাদের কথা বলছি বোধ হয় পাঠকের এখনো তা বোধগম্য হয় নি। হিন্দী-ওয়ালাদের কথা। সারাটা দেশ যখন অন্নবস্ত্রের ধান্ধায় ব্যস্ত, যখন দেশবাসী-দের দৃষ্টি অন্য দিকে নিবদ্ধ তখন

এই অন্ধকারের জীবেরা প্রতিটি রেলওয়ে স্টেসনে নিজেদের অভিসার শুরু করেছে। স্টেসনের সাইনবোর্ডগুলিতে বড় বড় হরফে নাগরী লিপি শোভা পেতে আরম্ভ করেছে। শিয়ালদহ সেক্সনে ইতিমধ্যেই প্রায় কাজ শেষ হয়ে এল।

এর আগের বারে লক্ষ্য করেছিলাম যে, হিন্দীওয়ালাদের এই নষ্টামির বিরুদ্ধে স্থানীয় মানুষ সচেতন হয়েছিলেন এবং বৃহদাকার নাগরী হরফে লেখা স্টেসনের নামগুলির উপর আলকাতরা লেপন করে দিয়েছিলেন। এবারেও কোন কোন স্টেসনে তা লক্ষ্য করা যাচ্ছে, যদিও সব স্টেসনে নয়।

বাংলা দেশের বুকে বসে স্টেসন, সরকারী দপ্তর প্রভৃতির সাইনবোর্ডে বাংলা অক্ষর অবলুপ্ত হয়ে নাগরী লিপি বজায় থাকবে, মাতৃভাষার এই অপমান বরদাস্ত করা অনুচিত। এই বিষয়ে পূর্ব পাকিস্তান আমাদের চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিয়েছে, সে কথা আমরা বঙ্গদর্শনে পূর্বে লিখেছি। বৃটিশ আমলেও বাঘা বাঘা বিলাতী কোম্পানীর অফিসগুলির গেটেতেও বাংলায় প্রতিষ্ঠানের নাম লেখা থাকত, সেই ঐতিহ্যের কিছু কিছু নিদর্শন এখনো পর্যন্ত ডালহৌসী অঞ্চলে ও চৌরঙ্গী পাড়ায় টিকে আছে। কিন্তু লালদীঘির পাশে সরকারী টেলিফোন ভবনের নেম-প্লেটে বাংলার ঠাঁই হয় নি, সেখানেও নাগরী হরফ।

এ অন্যায় কি চুপচাপ হজম করে যেতে হবে? হিন্দী ভাষাকে আমরা ঘৃণা করি না, কিন্তু বাংলা দেশের বুকে বাংলা ভাষার মাথায় হিন্দীভাষা চেপে বসবে, বাংলা হরফের মাথায় নাগরী হরফ জ্বলজ্বল করবে এটা সহ্য করা অসম্ভব।

সিনেমায় লক-আউট

এক হাত দেখিয়েছে লরীওয়ালারা আর এক হাত দেখাচ্ছে সিনেমাহল-ওয়ালারা। এই দুর্মূল্যের বাজারে যেখানে প্রত্যেকে শুধুমাত্র প্রাণধারণের জন্য পরিত্রাহি ডাক ছাড়ছে, সেখানে সিনেমা-হলের কর্মীরা কিছুটা বর্ধিত বেতন দাবি করেছিলেন। কেন না দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির সঙ্গে তাল রেখে তাদের বেতন বাড়ে নি। আর তাছাড়া সিনেমাহল-কর্মীদের বেতনহারও বড় কম এবং সর্বত্র একইরকম বেতনহার অনুসরণ করা হয় না। সিনেমাহল-কর্মীরা বহুদিন ধরেই তাঁদের দাবিদাওয়া নিয়ে আবেদন-নিবেদন করছিলেন। শেষ পর্যন্ত আলাপ-আলোচনা মালিকপক্ষের একগুঁয়েমির জন্য ব্যর্থ হওয়ায় তাঁরা ধর্মঘটের পথ অবলম্বন করতে বাধ্য হয়েছেন।

এদিকে মালিকপক্ষও একেবারে চরম-পন্থার আশ্রয় নিয়েছে। তারা সোজা-সুজি হলগুলিকে লক-আউট করে দিয়েছে, ভয় দেখিয়ে তারা হলকর্মীদের জব্দ করতে চায়। এতে অবশ্য সিনেমাকর্মীদের মনোবল ভেঙে পড়ে নি। তাঁরা ভীতির মুখেও বশ্যতা স্বীকার করেন নি, বা ধর্মঘটও প্রত্যাহার করেন নি।

কিছুকাল পূর্বে বঙ্গদর্শনে লিখে-ছিলাম যে, সিনেমা শিল্পের সঙ্গে সংক্রান্ত যে সব পার্টি আছে তাদের মধ্যে হল-ওয়ালাদের মুনাফার হার সর্বাধিক। আমাদের 'বঙ্গজগৎ' পর্যায়ে 'সুজন' একদিন বিস্তৃত আলোচনা করে দেখিয়ে-ছিলেন যে, প্রযোজক এবং পরিবেশকদের প্রদর্শকদের মুখ চেয়ে থাকতে হয় এবং ফলে প্রদর্শকই সর্বাধিক দাঁও মারে। অথচ নিজেদের কর্মীদের শোষণে এদের কোন অসুবিধা নেই, কেন না সিনেমা-হলগুলিতে বেশি কর্মচারীর দরকার হয় না। এই কারণে তারা খুশিমতই কর্মী-দের বেতন দেয়, এবং কোন কোন জায়গায় এই বেতনের হার এতই অল্প যে, তা বলা যায় না। কর্মীদের দাবিদাওয়ার উত্তরে হলগুলিকে লক-আউট করে তারা ঔদ্ধত্যের চরম নিদর্শন দেখিয়েছে।

সিনেমা থেকে প্রতিদিন যেখানে দুই লক্ষ টাকা করে প্রমোদকর সরকারের তহবিলে যায়, সেখানে প্রত্যহ এত ক্ষতি হওয়া সত্ত্বেও সরকার নিশ্চুপ কেন? লরীওয়ালাদের মত সিনেমাওয়ালারা টাকাওয়ালা পার্টি বলেই কি সরকারের এত কুণ্ঠা? সরকার তাঁর নিজের কর্ম-চারীদের বেতন কর্তনে এত পটু, শিক্ষার জাতীয় দাবির প্রতি বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ প্রদর্শনে এতই তৎপর, কিন্তু শক্ত খুঁটির হাত থেকে নিজের ন্যায্য পাওনা বুঝে নেবার বেলায় সরকার প্লীহারোগীর মত কম্পমান কেন? সরকার কেন মালিকদের একথা বলছেন না যে, তোমাদের একগুঁয়েমির জন্য আমার প্রতিদিন দুই লক্ষ টাকা ক্ষতি হচ্ছে। আমার এই ক্ষতি পূরণ করে যা ইচ্ছা তাই কর।

এই মুহূর্তে একটিমাত্র সঠিক পথ চোখের সামনে আছে। তা হচ্ছে সিনেমা-হলগুলির জাতীয়করণ। তাহলে সিনেমা-কর্মচারীরাও সরকারী কর্মচারীরূপে কিছুটা সুযোগ-সুবিধা পাবেন, সরকারও এর থেকে মোটা লাভ তুলে সেই অর্থ জাতীয় কল্যাণে ব্যয় করতে পারবেন।

কলকাতায় সরকারী কলেজ বন্ধ

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের শিক্ষা বিভাগ কলকাতার চারটি সরকারী কলেজ—প্রেসিডেন্সী, মৌলানা আজাদ, গোয়েঙ্কা এবং সংস্কৃত—৬ই অক্টোবর থেকে বন্ধ করে দিয়েছেন আপাতত পূজার ছুটি দিয়ে। এই চারটি কলেজের আবাসিক ছাত্রদের ইডেন হোস্টেলও এই সঙ্গে বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে।

পূর্বে বঙ্গদর্শনে ইডেন হিন্দু হোস্টেল সংক্রান্ত অনেক কথাই আলোচনা করেছিলাম। বর্তমান বন্ধ তারই ফলশ্রুতি। ইডেন হোস্টেলের গত মাসের ঘটনাবলীর ব্যাপারে ওই হোস্টেলের আবাসিক পাঁচজন ছাত্রকে হোস্টেল ও সংশ্লিষ্ট কলেজগুলি থেকে বহিষ্কারের সিদ্ধান্ত কর্তৃপক্ষ গ্রহণ করেছেন। এই সিদ্ধান্তের প্রতিবাদে গত ৫ই অক্টোবর রাত্রে প্রেসিডেন্সী কলেজের অধ্যক্ষকে ঘেরাও করে রাখা হয়। এই বিষয় নিয়ে ছাত্ররা যাতে পরে আর গন্ডগোল না করতে পারে সেই জন্য কলেজগুলি পরদিন থেকেই বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে।

এই বিষয় নিয়ে ছাত্রমহলে বিশেষ উত্তেজনা দেখা দিয়েছে। ঘটনার পরিণতি কোন দিকে যাবে তা এখন থেকে বলা যায় না। ইডেন হোস্টেলের ঘটনাবলী সম্বন্ধে আমাদের ধারণাসমূহ আমরা পূর্বেই বঙ্গদর্শনে ব্যক্ত করেছি। আমরা আশা করব যে কলকাতার প্রাচীনতম এবং ঐতিহ্যমণ্ডিত প্রেসিডেন্সী কলেজ ও অন্যান্য কলেজগুলি, যেগুলির খ্যাতির মূলধন বহুদিনের প্রচেষ্টায় গড়ে উঠেছে, তা যেন লোকচক্ষে অধিকতর হেয় না হয়, কলেজ কর্তৃপক্ষ ও ছাত্রদের নিকট আমাদের এই নিবেদন।

শ্রীউপেন্দ্রচন্দ্র মল্লিক প্রণীত

অ-আ-ক-খ

মূল্য ঃ বার আনা

শিশু মনোবিজ্ঞানে নিপুণ লেখক এই গ্রন্থে শিশুদের বর্ণবোধ ও যুক্তাক্ষরসহ বানান শিক্ষা যেরূপ অতুলনীয় ছন্দের সাহায্যে করিয়াছেন, তাহাতে শিশুদের শিক্ষারম্ভ সহজ হইয়াছে। এ সম্বন্ধে বাজারে যতগুলি বই আছে তাহার মধ্যে শীর্ষস্থানীয় বলিয়া কলিকাতা কর্পোরেশনের শিক্ষাবিভাগ এই বইখানিকে প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলিতে পাঠ্য-পুঁথিরূপে নির্বাচিত করিয়াছেন।

চিত্রে চিত্রময়—রঙ্গীন আর্ট পেপারে বড় হরফে ছাপা।

বসুমতী প্রাইভেট লিমিটেড
১৬৬, বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী স্ট্রীট, কলিকাতা—১২

বিশ্বসাহিত্যের আদিপর্ব

ডঃ নরেন ভট্টাচার্য

॥ ৭ ॥

প্রাচীন মিশরীয় সাহিত্যঃ দ্বিতীয় পর্ব

দ্বাদশতম রাজবংশের রাজত্বকালকেই মিশরীয় ইতিহাসের সুবর্ণযুগ বলা হয়। এই যুগের রচিত সাহিত্যের কিছু কিছু নিদর্শন যা পাওয়া গেছে তা থেকে তৎকালীন মিশরের সমাজ-জীবনের অনেকগুলি দিকের পরিচয় পাওয়া যায়। প্রাপ্ত সাহিত্য-গত নিদর্শনসমূহের সংখ্যাও বড় অল্প নয়। সমাধিগাত্রে রচিত প্রশস্তি ও সঙ্গীত, মৃতের কফিনের উপর উৎকীর্ণ কবিতা, তা ছাড়া প্যাপিরাসের পাতায় লেখা দার্শনিক কবিতা, হাল্কা প্রেমের কবিতা, গল্প ইত্যাদিতে এ-যুগের সাহিত্য সমৃদ্ধ হয়েছে।

একালের পণ্ডিতদের কাছে সবচেয়ে অসুবিধাকর হচ্ছে রচনা-সমূহের মূল সুরটি ধরতে না পারার অসুবিধা। অপরিচিত বিশ্বাস ও আচারব্যবহার, অপরিচিত প্রবাদ এবং অপরিচিত রূপক-সমূহ ব্যবহৃত হবার দরুণ অনেক সময় রচনাগুলি বুঝে ওঠা কষ্টকর হয়ে দাঁড়ায়। ফলে সেগুলির অনুবাদের বড় বেশি অসুবিধা এবং অনূদিত অংশগুলির অর্থও আমাদের কাছে অবোধ্য। মিশরীয় কবিগণ শব্দ নিয়ে খেলা করতে ভালবাসতেন, বিশেষ করে যমকের ব্যবহারে তাঁদের বড় বাড়াবাড়ি ছিল। ভিন্ন ভিন্ন অর্থে একই শব্দের বারবার ব্যবহারকে যমক বলে, যেমন 'আনা দরে আনা যায় কত আনারস'। পঞ্চম রাজবংশের আমলের একটি কবরে উৎকীর্ণ কবিতার নমুনা দেওয়া যাকঃ "একটি মেষপালক মাছের সঙ্গে জলে রয়েছে, সে একটি সীট মাছের সঙ্গে কথা বলছে, সে বল্লমটিকে প্রণাম করছে পশ্চিমদিক থেকে—মেষ-পালক এসেছে পশ্চিমদিক থেকে।" এটি একটি শোকসূচক কবিতার আক্ষরিক অনুবাদ!

অবশ্য সকল কবিতাই এই রকম দুর্বোধ্য নয়। কোন কোন কবিতায় তৎকালীন সামাজিক জীবন, বিশেষ করে খেটে খাওয়া মানুষের জীবনযন্ত্রণা আশ্চর্যভাবে ফুটে উঠেছে। একটি কবিতায় একজন কাঠের মিস্ত্রীর দুঃখময় জীবনের কাহিনী তুলে ধরা হয়েছেঃ

যে লোক সারাদিন মাঠে চাষ করে
তার চেয়েও একজন ছুতোর মিস্ত্রীকে বেশি ক্লান্ত হতে হয়;
কেন না তার ফসলের মাঠ হচ্ছে কাঠ
যার উপর তার র‍্যাঁদা লাঙল দেয়।
সে কোন বিশ্রাম নিতে পারে না
যেহেতু তাকে আলো জ্বেলেও কাজ করতে হয়।
ততক্ষণ তাকে কাজ করতে হয়
যতক্ষণ না তার দুটি হাত ক্লান্তিতে ঝুলে পড়ে॥

আর একটি কবিতায় একজন কামারের জীবনযন্ত্রণা অদ্ভুত বাস্তবতার সঙ্গে প্রতিফলিত হয়েছেঃ

কামার কোন রাজদূত নয়
তার কাজকে লোকে কৃপার চক্ষেই দেখে,
আমি এ পর্যন্ত কোন স্যাকরাকে দেখিনি
যার খবর এখানে দিতে পারি।
হায়, আমি দেখেছি কামারকে কাজ করতে—
তার সামনের আগুন ফুল্কি দিয়ে উড়ছে হাপরের হাওয়ায়,
তার নখগুলো হয়ে গেছে কুমীরের নখের মত
তার গা দিয়ে বেরুচ্ছে মাছের আঁশের গন্ধ॥

একটি মানুষ ও তার আত্মার মধ্যে কথোপকথন

সম্ভবত মিশরীয়রা নিঃসঙ্গ থাকতে ভয় পেত। সেই নিঃসঙ্গতার বেদনা মূর্ত হয়ে উঠেছে একটি আশ্চর্য রচনায়। রচনাটির নাম 'একটি মানুষ ও তার আত্মার মধ্যে কথোপকথন।' প্যাপি-রাসের পাতায় লেখা এই কাহিনীর গোড়ার এবং শেষের অংশ নষ্ট হয়ে গেছে।

কাহিনীটি একটি নিঃসঙ্গ মিশরীয়ের, জীবনের আনন্দ থেকে যে বঞ্চিত। তার ভাইরা তাকে ত্যাগ করেছে, বন্ধুরা তাকে প্রবঞ্চিত করেছে। জগতে সে সম্পূর্ণ একা, জীবনের কোন মূল্য তার কাছে নেই, অথচ সে মৃত্যুর অন্ধকার আর কবরের নির্জনতা কল্পনা করতে পারছে না। সে আত্মহত্যা করতে চায়, অথচ তা করতে ভয় পায়। তার মনের এই দ্বন্দ্ব আশ্চর্যভাবে প্রকাশিত হয়েছে তার নিজের আত্মার সঙ্গে কথোপকথনের মধ্য দিয়ে।

তার আত্মাকে উদ্দেশ্য করে লোকটি বলছে, "আমার দুঃখের দিনে তোমার কর্তব্য হচ্ছে আমার সহানুভূতিপূর্ণ বন্ধু হওয়া। তবে তুমি কেন আমায় তিরস্কার করছ, আমি জীবনে ক্লান্ত হয়ে গেছি বলে? আমাকে মরতে বাধ্য কোরো না, কেননা মৃত্যু কোন উজ্জ্বল সম্ভাবনা আমার কাছে আনছে না। মৃত্যুর পরে পর-লোকের কোন আনন্দের ছবি আমার সামনে তুলে ধোরো না। এ জীবন পুনরায় যাপন করা যাবে না, কেননা পরলোকে দেবতারা ইহজীবনের কাজগুলিকে কঠোরতার সঙ্গে বিচার করে।"

প্রত্যুত্তরে আত্মা ক্রুদ্ধ হয়ে বলল, "তুমি একটি মূর্খ। তুমি কি এমন গণ্যমান্য লোক যে মরতে ভয় পাচ্ছ?"

তবু লোকটি বিলাপ করে যায়। তখন তার আত্মা তাকে পুনরায় ধমক লাগায়। আত্মা আবার বলে, "মৃত্যুর চিন্তা স্বাভা-বিকভাবেই দুঃখের, এতেই মানুষ কাঁদে, কেননা মৃত্যুই মানুষকে গৃহ থেকে টেনে নিয়ে গিয়ে ধূলায় নিক্ষেপ করে। যে মানুষ সব কিছুতেই অবিশ্বাসী, সে কখনোই কোন কিছু উপভোগ করতে পারে না, মৃত্যুও তার কাছে নিষ্ফল। তার পাথরের মূর্তি

নির্মিত হতে পারে, তার বন্ধুরা তার জন্য পিরামিড তৈরি করতে পারে, তবুও সেই সন্দেহবাদীর ভাগ্য হবে যেন কোন তৃষ্ণার্ত ব্যক্তি নদীর তীরে এসে মরেছে।"

এই সব কথা বলে লোকটির আত্মা তাকে নৈরাশ্যমুক্ত করার চেষ্টা করে। সে নিঃসন্দেহে নির্বোধ যে জীবন সম্বন্ধে নিরাশ হয়ে মৃত্যুর চিন্তা করে। কাজেই তার কর্তব্য জীবন থেকে নৈরাশ্য দূর করে জীবনকে পুনরায় উপভোগ করার চেষ্টা করা। এই কথা বোঝানোর জন্য আত্মা তাকে একটি গল্প বলেঃ

একজন কৃষক তার কর্তিত শস্য একটি নৌকায় বোঝাই করে নীলনদের উপর পাড়ি দিয়েছিল। তার হৃদয় আনন্দে পূর্ণ, সেই শস্য বিক্রয় করে তার কতই না লাভ হবে। হঠাৎ নদীর উপর প্রচন্ড ঝড় এল। তখন সে তাড়াতাড়ি তার নৌকাটি তীরে সংলগ্ন করল এবং নিজে তীরে নেমে তার শস্য আগলাতে লাগল। কিন্তু তার স্ত্রী ও ছেলেমেয়েদের ঘটল এক দুঃখজনক পরিণতি। তারা সেই কৃষকের সংগে দেখা করতে আসছিল নৌকায় চেপে। ঝড়ে সেই নৌকা ডুবে যায় এবং তাদের সকলকে কুমীরে খেয়ে ফেলে। হতভাগ্য কৃষকের নিশ্চয়ই শোক করার মত যথেষ্ট কারণ ছিল। তবুও সে চেঁচিয়ে বলল, "আমি আমার প্রিয় পত্নী ও অধিকতর প্রিয় সন্তানদের জন্য দুঃখ করব না, কেননা যারা গেছে তারা আর ফিরে আসবে না।"

প্যাপিরাসে লেখা কাহিনী এখানেই আকস্মিকভাবে সমাপ্ত হয়েছে। কাহিনীর পরবর্তী অংশটুকু প্যাপিরাসের ছিন্ন অংশের সঙ্গেই খোয়া গেছে। এই রচনাটির উদ্দেশ্য কি ছিল তা বলা খুবই শক্ত। আমার মনে হয় কোন ধর্মবিশ্বাসের প্রচার করাই হয়ত এই কথোপকথনের উদ্দেশ্য ছিল।

বাঁশিওয়ালার গান

প্রাচীন মিশরের সর্বাধিক জনপ্রিয় কবিতার নাম। এই কবিতাটি ধনীদের ভোজসভায় বিশেষ করে গাওয়া হত। এই কবিতাটির কথা বিখ্যাত ঐতিহাসিক হেরোডোটাস তাঁর গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন। কবিতাটির আক্ষরিক অনুবাদ নিচে দেওয়া হলঃ

এ ভালই হয়েছে রাজকুমারের পক্ষে, তাঁর দিন গেছে
সৌভাগ্যের পূর্ণমাত্রায়......সকলেই চলে যায়
আরো অনেককে রেখে, সনাতন এ রীতির ব্যতিক্রম নেই।
বৃদ্ধ রাজারা ঘুমান পিরামিডের নিচে
ধনী এবং পন্ডিতরাও তাই। কিন্তু কেউ কেউ,
যাঁরা একদা সমাধিমন্দির গড়েছিলেন, তাঁদের বিশ্রামের স্থান নেই।
যদিও তাঁদের কীর্তি ছিল মহৎ......ওগো, আমি শুনেছি
যে কথা বলেছেন ইমহোটেপ আর হোরডাডফ—
তাঁদের কথা লোকে আজও বলে......তাঁদের সমাধি কোথায়?
সেগুলি গুঁড়িয়ে গেছে......ধরাপৃষ্ঠ থেকে লুপ্ত হয়েছে
মনে হয় কেউই যেন ছিলেন না কোনদিন।

কোন আত্মা কখনোই ফিরে এসে তার কোন কথা বলে না—
আমাদের যাবার আগে কোন সান্ত্বনার বাণী সে শোনায় না,
একা সে কোথায় গেছে সে সন্ধান বৃথা......অতএব,
সব ভুলে চলে এস বৃহত্তর জীবনের পথে
যতটুকু প্রাণময় জীবনের পানপাত্র পূর্ণ করে নাও।
মুকুটে বসাও তবে পদ্মরাগ মণি, দেহ কর সুসজ্জিত
শ্বেতশুভ্র কোমল রেশমে। দেবতার মত অভিষিক্ত হও।
ক্লান্তিহীন দুঃসহ আগ্রহে হৃদয়ের সব তৃষ্ণা যতটা সম্ভব
মিটিয়ে নাও......চূড়ান্ত শোকের দিন সমাগত হলে
সে বিলাপে কর্ণপাত একান্ত অসার হবে জেনো।
তার কোন অর্থ নেই শান্ত স্থির মৃতের নিকটে।

সম্ভোগের এ মুহূর্ত অহেতুক ব্যর্থ কেন হবে?
কেউই পারে না তার সম্পদ কবরে নিয়ে যেতে—
আর একবার গেলে সে আর কখনোই ফেরে না॥

ভাবতে অবাক লাগে যে জাতি একদা পিরামিড বানিয়েছিল, সেই জাতির পক্ষে কিভাবে এই রকম চার্বাকবৃত্তির বন্দনা গাওয়া সম্ভব? কেন না পিরামিড গড়ার মূলেই আছে পরলোক-প্রবণতা। তবে মিশরীয়রা যে জাতি হিসাবে ভোগবাদী ছিল তার প্রমাণ পাওয়া যায় পিরামিডের ভিতরে সংরক্ষিত ধনসম্পদ ও ভোগ্যবস্তুর সমাবেশ দেখে। উপরি উক্ত কবিতাটির সঙ্গে বাঙালী কবি মোহিতলাল বিরচিত একটি কবিতার ভাবগত সাদৃশ্য আছে, বলার ভঙ্গিও প্রায় একই রকম। এখানে সেটির কিয়দংশ উদ্ধৃত করার লোভ সংবরণ করা গেল নাঃ

দেহ ভরি কর পান কবোষ্ণ এ প্রাণের মদিরা
ধুলো মাখি খুঁড়ি লও কামনার কাচ মণি হীরা,
অন্ন খুঁটি লব মোরা কাঙালের মত
ধরণীর স্তনযুগ করি দিব ক্ষত
নিঃশেষ শোষণে—
ক্ষুধাতুর দশন আঘাতে করিব জর্জর
আমরা বর্বর॥ (মোহমুদ্গর ঃ বিস্মরণী)

একটি ইতিহাসধর্মী উপন্যাস

১৮৯৮ খৃষ্টাব্দে মিশর থেকে হাইনরিখ স্যাফার একটি উপন্যাসের পান্ডুলিপি আবিষ্কার করেন। প্যাপিরাসের মোট ছয়টি পৃষ্ঠা। এই তথাকথিত উপন্যাসটি রক্ষিত আছে বার্লিন মিউজিয়ামে। পারস্যের সঙ্গে মিশরের যুদ্ধের ঐতিহাসিক কাহিনী অবলম্বনে এই উপন্যাসটি রচিত। সেই হিসাবে মিশরীয় সভ্যতার শেষ পর্বায়ে এই কাহিনী রচিত হয়েছে। লেখকের নাম, বলা বাহুল্য, অজ্ঞাত।

মোট ছয় পৃষ্ঠার উপন্যাসের মূল্যবিচার কখনোই সার্থক হতে পারে না, তদুপরি যা সম্পূর্ণ উপন্যাস নয়, উপন্যাসের ছেঁড়া পাতা। বিষয়বস্তু ঐতিহাসিক হলেও লেখকের ইতিহাসজ্ঞানের শোচনীয় ঘাটতি ছিল। উপন্যাসের প্রতিনায়ক পারস্যরাজ ক্যাম্বাইসেসকে লেখক ব্যাবিলনের নেবুচাডনেজারের সঙ্গে গুলিয়ে ফেলেছেন।

কাহিনীর শুরু হচ্ছে মিশররাজ অ্যাপ্রাইয়েসের (অ্যামোসিস?) রাজত্বকাল থেকে। পারস্যরাজ ক্যাম্বাইসেসের মিশর জয়ের ইচ্ছা বহুদিনের। সেই ইচ্ছা পূরণ করার জন্য তিনি মিশররাজ অ্যাপ্রাইয়েসের বশ্যতা দাবি করে একদল দূত পাঠালেন। তাদের দেখে মিশরবাসীরা এতই উত্তেজিত হয়ে উঠল যে সব কটা দূতকে তারা মেরে ফেলতে চাইল, এবং রাজা অ্যাপ্রাইয়েসও তা অনুমোদন করলেন। কিন্তু বোথর নামক জনৈক ভূয়োদর্শী সভাসদ রাজাকে উপদেশ দিলেন যে এই দূতদের হত্যা না করে, বরং অপমান করে তাড়িয়ে দেওয়া হোক। শেষ পর্যন্ত তাঁরই প্রস্তাব গৃহীত হল। দূতেদের রীতিমত অপমান করে দেওয়ার পর তাদের জানিয়ে দেওয়া হল যে প্রতিটি মিশরীয়কে শৈশবকাল থেকেই যুদ্ধবিদ্যায় বিশেষ ধরণের শিক্ষা দেওয়া হয়। মিশরের নারীরাও জানে কি করে তীর ছুঁড়তে হয়, কি করে শত্রুকে চরম আঘাত দেওয়া যায়। মিশরের প্রতিটি লোকই রাজভক্ত। এ পর্যন্ত কোন বাইরের শক্তি এসে মিশর জয় করতে পারে নি। অতএব যে বা যারা মিশর জয়ের স্বপ্ন দেখছে রণক্ষেত্রেই তাদের সেই স্বপ্নভঙ্গ হবে।

ক্যাম্বাইসেসের দূতেরা এই বার্তা নিয়ে স্বদেশে ফিরে গেল। দূতগণের মুখে সব কথা অবগত হয়ে সম্রাট ক্যাম্বাইসেস

উত্তেজিত হয়ে পড়লেন। তিনি স্থির করলেন যে, সোজা-সুজি মিশর আক্রমণ করবেন। কিন্তু তাঁর একজন প্রবীণ সভাসদ তাঁকে অন্য উপদেশ দিলেন। তিনি বললেন যে, যেখানে একটি জাতি আত্মরক্ষায় দৃঢ়সংকল্প সেখানে যুদ্ধের দ্বারা কোন লাভই হবে না, বরং সেখানে আক্রমণ চালাতে গেলে পরাজিত হবার সম্ভাবনাই বেশি। এর চেয়ে বরং কোন কৌশলের দ্বারা কার্যসিদ্ধি করতে হবে। মিশরে বিভেদের বীজ বুনতে হবে। সেই কূটবুদ্ধি সভাসদ আরও পরামর্শ দিলেন যে পারস্য থেকে একদল দূত মিশরীয় সেজে মিশরের সর্বত্র ফারাও ও দেবতা অ্যাপিসের নামে একটি বিশেষ স্থানে আমন্ত্রণ জানিয়ে সমবেত করতে হবে। সেখানে এক প্রতিদ্বন্দ্বী ফারাও (মিশরের রাজার উপাধি) খাড়া করে অন্তর্বিদ্রোহ ঘটাতে হবে।

এই পরামর্শ ক্যাম্বাইসেসের মনঃপূত হল। সেই হিসাবে দূত পাঠানো হল অজস্র, এবং তারা মিশরীয় জনপদসমূহে এই আমন্ত্রণবার্তা পৌঁছে দিতে লাগল। এই সভায় যোগদানের আগে প্রতিটি মিশরীয় রীতি অনুযায়ী দৈবজ্ঞদের কাছে পরামর্শ নিতে গেল এবং দৈবজ্ঞরা গণনা করে দেখলে যে এই আমন্ত্রণ জাল, তার সঙ্গে প্রকৃত মিশরের ফারাও এবং দেবতা অ্যাপিসের কোন সম্পর্ক নেই।

ছয় পৃষ্ঠার উপন্যাসের মাত্র এইটুকুই পাওয়া গেছে। আগেই বলেছি লেখকের স্বদেশপ্রেম প্রশংসনীয় হলেও তার ইতিহাস-জ্ঞানের কিছুটা অভাব ছিল। ক্যাম্বাইসেস মিশর আক্রমণ করেন ৫২৫ খৃস্টপূর্বাব্দে, তখন মিশরে সম্রাট অ্যামোসিস রাজত্ব করছেন। ওই বছরেই তিনি মারা যান এবং তৃতীয় সামটেক মিশরের সম্রাট হন। পেলুসিয়ামের যুদ্ধে তিনি পরাস্ত হয়ে মেমফিসে পালিয়ে যান এবং সেখানে ক্যাম্বাইসেস আবার তাকে পরাস্ত করে মিশর দখল করে নেন।

সম্রাট কবি

এ পর্যন্ত আমরা মিশরীয় সাহিত্যের টুকরো টুকরো অনেক-গুলি নিদর্শন তুলে ধরলাম, কিন্তু কোন কবি বা লেখকের নাম বা পরিচয় দেওয়া সম্ভব হয় নি। কেন না প্রাপ্ত নিদর্শনগুলি থেকে কোন কবি বা সাহিত্যিকের নাম বড় একটা পাওয়া যায় নি।

তবে একজন কবির কথা আমরা বিশেষভাবে জেনেছি যিনি হচ্ছেন সম্রাট চতুর্থ আমেনহোটেপ। তিনি ছিলেন মিশরের অশোক, দেবতা অ্যাটনের পূজা প্রতিষ্ঠা করে তিনি নিজের নাম গ্রহণ করেছিলেন অ্যাখেন্যাটন বা 'অ্যাটনের প্রিয়'। পুরাতন পুরোহিততন্ত্রের বিরুদ্ধে রীতিমত জেহাদ ঘোষণা করে তাঁকে তাঁর প্রিয় দেবতার পূজা প্রবর্তন করতে হয়েছিল। দেবতা অ্যাটনের (সূর্যদেব) উদ্দেশ্যে তিনি যে স্তোত্রগুলি লিখেছিলেন সেগুলি মিশরীয় সাহিত্যের অমূল্য সম্পদ। তাঁর রচিত একটি স্তোত্রের আক্ষরিক অনুবাদ নিচে দেওয়া হল:

পূর্ব দিগন্তে তোমার উদয়ের সঙ্গে সঙ্গে
তোমার রূপ গলানো রূপোয় পৃথিবী ভরে ওঠে;
তোমার আঁধারে পৃথিবীর প্রচ্ছদ
মৃতের মতই কালো হয়ে যায়।
লাবণ্যের তরঙ্গে ফেটে পড়া দিনে,
হে অ্যাটন, তোমার রশ্মিজালে অন্ধকার বিদূরিত,
তোমার বহুধা প্রচেষ্টার আমাদের অবগত অংশটুকু দিয়ে
তোমার শক্তির স্বরূপ আমরা বুঝেছি।
তুমি নিজের ইচ্ছায় গড়েছ এই জগৎ
যখন তুমি একা ছিলে।
তোমার হাতে ধরা এই জগতের অস্তিত্ব
তোমার উদয়াস্তের মধ্যেই নিহিত
জীবনে অথবা মৃত্যুতে।
একমাত্র চিরন্তন সত্তা সে তুমি।
তোমার বাহুর সীমানার মধ্যেই
মানুষের ভূত ভবিষ্যৎ।
সুন্দরের হে মহাকারক
তুমি আছ আমার হৃদয়ে।

উপসংহার

প্রাচীন মিশরীয় সাহিত্যের প্রাথমিক উপাদানসমূহকে পণ্ডিতেরা পিরামিড টেক্সট আখ্যা দিয়েছেন। এগুলি পিরামিডের অভ্যন্তরে প্রাচীরগাত্রে অথবা প্রস্তরফলকে ক্ষোদিত, এবং বহু ক্ষেত্রেই প্যাপিরাসের পাতায় রচিত। ২৬২৫ খৃস্ট-পূর্বাব্দ থেকে ২৪৭৫ খৃস্টপূর্বাব্দের পিরামিড টেক্সট-গুলির সম্পাদনা ও অনুবাদ করেছিলেন ফরাসী প্রত্ন-তত্ত্ববিদ মেসপারো এবং জার্মান প্রত্নতত্ত্ববিদ সেঠি। অন্ত্যেষ্টি-ক্রিয়ার পদ্ধতি, যাদু বিশ্বাসমূলক মন্ত্র, আচার-অনুষ্ঠান পদ্ধতি, দেবতাদের উদ্দেশ্যে স্তোত্রমালা এবং প্রাচীন কথা ও কাহিনী এই পিরামিড টেক্সটগুলির বিষয়বস্তু।

আর এক ধরনের আদিম সাহিত্যের নিদর্শন পাওয়া যায় তথাকথিত বুক অফ ডেড বা মৃতের পুস্তকগুলিতে। এগুলি কফিনের গায়ে অথবা পৃথকভাবে মৃতদেহের সঙ্গে দেওয়া থাকত। এগুলির বিষয়বস্তু ছিল পরলোক, পরলোকে যাত্রার পথ, স্বর্গ বা নরকের দ্বারসমূহ, পাপপুণ্য ইত্যাদি। এই জাতীয় একটি রচনার নিদর্শন এখানে দেওয়া হল ঃ "আমি আছি, আমি বেঁচে আছি, আমি বাড়ছি, আমি শান্তিতে জেগে উঠব, আমার দেহে জড়ানো কাপড়ে আমি ধ্বংস হব না। আমি তৃষ্ণামুক্ত হব, আমার চোখ দৃষ্টিশক্তি হারাবে না, আমার চামড়া অদৃশ্য হবে না। আমার কর্ণ বধির হবে না, আমার স্কন্ধ থেকে মস্তক বিচ্যুত হবে না, আমার জিহ্বা কর্তিত হবে না। আমার মাথার চুল ও চোখের ভুরু একই রকম থাকবে, আমার কোন ক্ষতি হবে না। আমার দেহ শক্ত থাকবে। আমি চিরকালের জন্য পৃথিবী থেকে বিলুপ্ত হব না।" এই জাতীয় মানসিকতার অধিকারী ছিল বলেই হয়ত মিশরীয়দের মৃতদেহ পোড়ান হত না বা সমাধিস্থ করা হত না. মমি করে রেখে দেওয়া হত।

ঃ ওদের সবাইকে আমি পুড়িয়ে মারতে পারি এখনই—এই মুহূর্তে। ওদের সকলের প্রাণ আমার হাতের মুঠোয়। যদি একবার মাত্র ক্রেনটাকে—বেশি নয়—সামান্য একটু দুলিয়ে দিই—তাহলেই সব ক'টি লোকের অগ্নিসৎকার হয়ে যাবে—নিখরচায়। ওরা পালাবার পথ পাবে না। গলিত ইস্পাতের ফুলঝুরি ওদের শরীরের রন্ধ্রে রন্ধ্রে ঢুকবে—তিলে তিলে মারবে ওদের। ওই আহাম্মকটা ত' আগে মরবে যে ঝুঁকে পড়ে দেখছে ছাঁচটা পূর্ণ হয়েছে কি না। ওরা জানে না আমি ওদের ঈশ্বর। ওদের প্রাণ এখন আমার হাতের মুঠোয়—যাকে ওরা ড্রাইভার বলে—গাড়োয়ান বলে উপহাস করে থাকে।

মাটি থেকে পঁচিশ ফুট ওপরে ক্রেনের কেবিনে বসেছিল সে—গদি-আঁটা কুশনে। হাত দুটো কণ্ট্রোলারের কালো 'নবে'র ওপর। এবং সেই কারণে শরীরের ঊর্ধ্বাংশ ঈষৎ অবনত। দৃষ্টি তার ডান দিকে। সেদিকে তাকিয়ে এবং কণ্ট্রোলারগুলোর দিকে না তাকিয়ে সে শুধু হাত দিয়েই বলে দেবে কোনটা কিসের কণ্ট্রোলার। অন্ধের মত তারও দৃষ্টিশক্তির প্রয়োজন নেই অন্ততঃ ঐ বিষয়ে।

কেবিনের প্রায় দশফুট নিচে প্ল্যাটফর্ম। প্ল্যাটফর্মে সারিবদ্ধ লোক। সবাইয়ের মুখ গম্ভীর—হাসপাতালে অপারেশন-কালে যেমন গাম্ভীর্যের অ্যাপ্রন পরে থাকে ডাক্তারেরা। প্রায় প্রত্যেকের চোখে নীলাভ কাচের দামী চশমা। হাতে চামড়ার দস্তানা। পরণে অ্যাসবেসটসের অ্যাপ্রন।

ক্রেনটা দুই বাহু দিয়ে ধরে আছে এক ছিদ্রবিশিষ্ট বিশেষ ধরণের প্রকাণ্ড বালতি। প্রায় দুশো টনের গলিত ইস্পাত রয়েছে ওর উদরে। তার ঐ নীলমণি ছিদ্র দিয়ে বেরিয়ে আসছে গলিত ইস্পাতের ধারা। জমা হচ্ছে নিচের ছাঁচের মধ্যে। প্ল্যাটফর্মের ওপরে দণ্ডায়মান সব ক'টি প্রাণী গভীর আগ্রহে সেদিকে তাকিয়ে। নীল চশমার মধ্যে দিয়ে তারা শ্যেন-দৃষ্টিতে দেখছে। কেবিন থেকে সে ঐ লোকগুলোকে দেখছিল।

ও ভাবছিল—ওরা জানে না আমি ওদের ঈশ্বর। এখনই ওদের আমি যমের দক্ষিণ দুয়ারে পাঠাতে পারি। ক্রেনটা একবার দুলিয়ে দেব? ঐ ইঞ্জিনিয়ারটা যে নতুন ফোরম্যান হয়েছে—ফুলঝুরি দেখছে নীল কাচের মধ্য দিয়ে—দোব ওটাকে পুড়িয়ে? শালা কি না আমাকে সেদিন শুয়োরের বাচ্চা বলেছিল! অবশ্য নিচে থেকে বলেছিল—কিন্তু আমি ঠিকই শুনেছিলাম। যদি একজন কেউ সাক্ষী থাকত তাহলে দেখে নিতাম। বাপের নাম খগেন করে ছাড়তাম। দু' পাতা পড়ে ভেবেছ লাট হয়ে গেছ। না? আমাদের মানুষই ভাবে না!

চালকটি বিমর্ষ হল। আমি কি অশিক্ষিত? এতদিনে আমি এম-কম্ পাশ করে যেতাম—যদি না পাঁচ বছর আগে বি-কম্ পড়া ছেড়ে এই চাকরিতে ঢুকতাম! বি-কম্ পড়েই বা কি হত! মাছিমারা কেরানী হতে হত। বাদুড়-ঝোলা হয়ে কলকাতার ট্রাম চড়ে অফিসে যেতাম! অবশ্য এক-আধটা মাস্টারীও কি আর জুটত না? মাস্টারীতে এখন শুনেছি পয়সা দিচ্ছে।

চালকটি মজা পেল মনে মনে। হাসল—মৃদু হাসিতে ওর মুখটা ছেয়ে গেল। একটা ছাঁচ পূর্ণ হচ্ছে দেখে ও সিগন্যালম্যানের দিকে গভীর দৃষ্টিতে তাকাল। সিগন্যাল দেখে পরবর্তী ছাঁচে ও বালতি নিয়ে গেল।

ঃ হাড়িয়া—আউর থোড়া—থোড়া হাফিজ—ঠিক হ্যায়। সিগন্যালম্যান বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দেখালে। তার অর্থ—ঠিক আছে। সিগন্যালম্যানের প্রতিটি সিগন্যাল অনুসরণ করে ক্রেন চালাল সে। একটুও ভুল হল না। কোনদিন ভুল হয় না কাজে। সাধে কি ওরা আমায় এক্সপার্ট বলে?

ঈশ্বর

প্রিয়ব্রত মুখোপাধ্যায়

শক্ত কাজ এ শর্মা ছাড়া হবে না। ওরা তাই ত' আমায় খাতির করে। চালকটি আপন মনে এই সব ভাবছিল আর ফুলছিল গর্বে।

ওর কুশনের পাশেই একটি ছোট টুল রাখা ছিল। এক লাল-মুখো সাহেব তাতে এসে বসল। খাস-বিলাতী সাহেব। সাহেব একটু চঞ্চল। পকেট থেকে একটা চকোলেট বার করে বললেঃ হে ড্রাইভার—

ঘাড় ফিরিয়ে দেখল ও। এক ফাঁকে চকোলেটটা নিয়ে মুখে পুরে দিল। তারপর বাংলাতে বলল সাহেবটির দিকে চেয়েঃ ড্রাইভার বল, কেন? অপারেটার বলতে খুব কষ্ট হয়?

সাহেবটি বলল—ইয়েস্—অপারেটার—ইয়েস্ অপারেটার। ও বলল—বুঝেছে দেখছি। সাহেবটা লোক ভাল। আর মেমটা আরও ভাল। মাইরি মেমটা দেখতে কী সুন্দরী। সাহেবটা ওকে ছেড়ে নাইট ডিউটি করে কি করে?

সাহেবটি আরও কিছুক্ষণ বসল টুলটায়। যাবার সময় আর একটা চকোলেট বাড়িয়ে বলল—হে ড্রাইভার—

এবার ও হাত বাড়িয়ে নিল। আর বলল—শোধরান যাবে না। অসম্ভব। ড্রাইভার বলতে পার—ক্রেন অপারেটার বলতে কি জিভ খসে যায়?

এরা কেবলই বড় বড় বুলি আওড়াবে—শ্রমিক বলতে শ্রদ্ধায় মাথা নুইয়ে ফেলবে। কিন্তু ড্রাইভারের বদলে অপারেটার বলতে বল—ব্যস্—বিগড়ে গেলেন! ড্রাইভার কথাটা কেমন ইয়ে ইয়ে শোনায়। ভদ্র ছাপ একেবারেই যেন নেই এমনই বোঝায় ড্রাইভার কথাটা উচ্চারণ করলে!

ঐ জন্যেই ত' আমার বিয়ে হচ্ছে না। বুঝতে পারছি। বুঝি সবই। এত টাকা রোজগার করি। ব্যাঙ্কে ত' নেহাৎ কম জমল না। ইন্সিওরেন্স, প্রভিডেন্ট ফান্ড এসবও রেগুলার জমছে। তবু আজও ত' ভাল বিয়ের সম্বন্ধ আসছে না। যা দু-একটা এসেছে তাকে ঠিক সম্বন্ধ বলে না। খেঁদি পেঁচি আমি বিয়ে করব না। একবার বিয়োলেই সব রূপ ঝরে যাবে। তখন আঁটি নিয়ে কি করব?

খেঁদি পেঁচির কথায় ওর মনে পড়ল কোয়ার্টার্সের সামনেই থাকে একটি মেয়ে। ক'দিন ধরে ঘুরঘুর করছে বাড়ির সামনে। দেখতে নেহাৎ মন্দ নয়। বেশ চটক আছে একটা। প্রথম যৌবনের জৌলুষ!

স্বাস্থ্যটা ভালই। বেশ জেল্লা আছে একটা তবে ধোপে টিকবে কি? মেটালের চেয়ে স্ল্যাগের চেকনাই বেশি সবাই জানে।

তার চেয়ে বৌদির বোনটাকে বিয়ে করে নিলে কেমন হয়। বেশ চেহারা। ফর্সা! চোখ দুটো ভাল।

কিন্তু আমার সঙ্গে কি বিয়ে দেবে? বি এ পড়ছে! এখন ত' স্কুল পেরোলেই বি এ।

—আমার সঙ্গে কি দেবে? শালার ড্রাইভারি করি আমি—ক্রেন ড্রাইভার। যতই মাইনে পাই না কেন কখনও কুলীন নয়। আর মাছি-মারা-কেরানীগুলো মাইনে পায় একশো টাকা; আর মেয়েও পায় মাইরি। ভদ্রলোকের মেয়ে!

আমার মত ড্রাইভারের কপালে ভদ্রলোকের মেয়ে ত' জুটবে না!

চালকটি বেশ গম্ভীর হয়ে পড়েছে। নিচের দিকে তাকিয়ে আছে আর ইশারা দেখছে—শুনছে—সেইমত কাজও করছে।

ঃ থোড়া ডাইনে—থোড়া হাড়িয়া—থোড়া হাফিজ—

সিগন্যালের মত কাজ হল। চালকটি বিমর্ষ হয়ে পড়েছিল। শরীরটাও ভাল লাগছিল না। মাথার একটা শিরা দপ্-দপ্ করছিল।

চালকটির ওপরওলা এল। ও উঠে দাঁড়াল না। কোন সম্ভাষণও করলে না। ও দুদিন আগে ত' এই চেয়ারে বসে লিভার দাবিয়েছে—তা অত গুমর কিসের?

ও কেবল সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল।

ঃ আজ নাইটে থাকতে হবে।

ঃ ওভারটাইম? হরি সিংকে বল না—

ঃ ওদের অনেকগুলো করে হয়ে গেছে।

শরীরটা বিশেষ ভাল লাগছিল না। কেমন এক প্রকারের অস্বস্তি হচ্ছিল ওর। তার ওপর রাত্রিতে থাকতে হবে জেনে মেজাজটা বিগড়ে গেল।

এই জন্যেই ত' ভদ্রলোকে ড্রাইভারকে মেয়ে দেয় না। বলা নেই কওয়া নেই—ওভারটাইম। বছরে চার মাস নাইট ডিউটি ত' আছেই তার ওপর ওভারটাইম। ভদ্রলোকের মেয়ের সঙ্গে বিয়ে হলে ত' সে দুদিনেই ভাগলবা।

মনটা ঈষৎ বিক্ষিপ্ত হওয়ায় চালকটি ইশারা অনুসরণ করছিল না ঠিকমত। এদিকে সিগন্যালম্যান হাত নেড়ে ইশারা দিচ্ছে। মুখেও বলছে। চালকটির অসাবধানতায় একটি ছাঁচ পূর্ণ হয়ে কিছু গলিত ইস্পাত উপছে পড়ল।

প্ল্যাটফর্মে দাঁড়িয়ে থাকা লোকগুলো একসাথে হৈ হৈ করে উঠল। ইঞ্জিনীয়ারটি নীল কাচের মধ্যে দিয়ে তন্ময় হয়ে দেখছিল ছাঁচটি। পূর্ণ হওয়ায় তার টনক নড়ল। সে কেবিনের কাছে এসে চালকটের বাপান্ত করে ছাড়লে হিন্দী ভাষায়।

হিন্দী ভাষায় খিস্তি মানায় ভাল। চালকটি ভাবল। দেব-শালাকে পুড়িয়ে? দেব-ক্রেনটাকে বেশি নয়—সামান্য একটু দুলিয়ে? শালার সব পাঁয়তারা শেষ হয়ে যাবে। জানিস্—আমি তোর ভগবান। তোর প্রাণ এখন আমার হাতে। জানিস্।

সেই সাহেবটা আবার টুলে এসে বসেছে। এবার সে দিল চিউয়িং গাম্। হে ড্রাইভার—সাহেবটা বলল।

—ড্রাইভার বল কেন? অপারেটার বলতে পার না?

ইয়েস্—অপারেটার—ইউ মাস্ট্ বি অ্যাটেনটিভ।

বালতিতে আর ইস্পাত নেই। আছে কেবল যৎসামান্য ধাতুমল—স্ল্যাগ্। ধাতুমলকে ছাঁচের মধ্যে ঢালা চলবে না। তাই সিগন্যালম্যান ইশারা দিল বালতিটাকে দূরে নিয়ে যেতে।

ঃ হাড়িয়া—

চালকটি এখন সিগন্যালম্যানের ইশারা মত কাজ করছে।

ঃ হাড়িয়া—

নির্দেশমত হুকটা নামাল চালকটি। বিশেষ ধরণের দড়ি বেঁধে দেওয়া হয়েছে ক্রেনের হুকের সঙ্গে বালতির। এখন বালতির ভিতরকার ধাতুমল মাটিতে রাখা একটি পাত্রে ঢালা হবে।

ইশারা মত কাজ হচ্ছে। বালতির উপরাংশ ক্রমে নিচে নামছে। তারপর—

হঠাৎ ক্রেনের দড়ি ছিঁড়ে গেল। আর প্রকাণ্ড বালতিটা প্রচণ্ড আর্তনাদ তুলে ঘুরে গেল।

চতুর্দিকে হৈ হৈ চীৎকার শুরু হল। নিচে মাটিতে দণ্ডায়মান সিগন্যালম্যান প্রাণের ভয়ে ঊর্ধ্বশ্বাসে দৌড়ল। বালতিটা ক্রমাগত ঘুরপাক খাচ্ছে। ক্রমে নিচে নামছে। বেশ কিছুটা ধাতুমল কাচ ভেঙে কেবিনের মধ্যে ঢুকে চালকটির জামায় অগ্নিসংযোগ করল। চালকটি কুশন ছেড়ে উঠে দাঁড়াল। যন্ত্রণায় তার সারা শরীর জ্বলে যাচ্ছিল। জামাটা পুড়ছে দাউ দাউ করে। ও কি করবে স্থির করতে না পেরে পিছন ফিরে দাঁড়াল। সার্কিট-ব্রেকারের সুইচ অফ করে দিল। তখনই আবার কিছু পরিমাণ ধাতুমল তার পিঠে এসে বিঁধল ছুঁচের মত। ও কেঁদে উঠল শিশুর মত। বালতিটা সশব্দে দুলছে তখনও। সেই সময় সাহেবটি দৌড়তে দৌড়তে কেবিনে এল।

ঃ হে ড্রাইভার—হোয়াটস্ রং?

ঃ সেভ মি। সেভ মি। সেভ মি সাহেব।

এইচ. জি. ওয়েলস-এর গল্প

বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য

চতুর্থ অধ্যায় ঃ অলীক কল্পনার রাজত্বে

বলেছি আগেই যে ওয়েলস-এর ছিল স্বপ্ন-দেখা চোখ। কোথাও ভৌতিক জগতের আবার কোথাও অন্ধের দেশের স্বপ্ন দেখেছেন তিনি; বিচিত্রের মায়াজাল রচনা করেছেন। কিন্তু তাঁর স্বপ্ন সবচেয়ে মর্মস্পর্শী হয়ে উঠেছে অলীক কল্পনাকে ঘিরে লেখা কোনো কোনো গল্পে। সেখানে হ্যালুসিনেশানকে তিনি প্রায় বিশ্বাসের কোঠায় পৌঁছে দিয়েছেন এবং সেই সঙ্গে জীবনের যে ছবি এঁকেছেন তা' বেদনা-সংশয় ও সন্দেহ-শঙ্কার স্পর্শে একেবারে জীবন্ত।

এই প্রসঙ্গে প্রথমেই উল্লেখযোগ্য 'দি মথ' গল্পটি। এক পতঙ্গবিজ্ঞানীর মনোবিকারকে কেন্দ্র করে এর কাহিনী গড়ে উঠেছে। কাহিনী-অংশে একটি মথের ভূমিকা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। মথ বলতে বুঝি রাত্রিচর পতঙ্গবিশেষকে। এরা প্রজাপতি জাতীয়।

এই রকম একটি পতঙ্গ কেমন করে হ্যাপলে নামে এক বিজ্ঞানীর মানসলোকে বিচিত্র প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করল, এ গল্পের তা' প্রধান উপজীব্য। গল্পটির সমস্ত রহস্য ও রোমাঞ্চ, দুঃখ ও যন্ত্রণা একটি মথকে ঘিরেই আবর্তিত হয়েছে। এদিক থেকে এর নামকরণ সার্থক।

এ গল্পের ভূমিকা-অংশটি সুদীর্ঘ। দুই প্রতিদ্বন্দ্বী পতঙ্গবিজ্ঞানী হ্যাপলে ও পকিন্সের বাদ-প্রতিবাদের সুদীর্ঘ বিবরণ সেখানে আছে। আমাদের মনে হয়, গল্পটির রসসৃষ্টির খাতিরেই এ বিবরণটুকুর প্রয়োজন ছিল। যদি না জানতাম আমরা যে এই দু'জন বিজ্ঞানী দীর্ঘকাল ধরে কলহে লিপ্ত ছিলেন, এঁরা একে অপরের আবিষ্কারকে ভুল প্রতিপন্ন করতে চাইতেন, তবে এ গল্পের পুরোপুরি রসসম্ভোগ থেকে বঞ্চিত হতাম।

এ কাহিনীর শুরুতেই লেখক এই দু'জন বিজ্ঞানীর পরিচয় ও আচার-আচরণ সম্বন্ধে আমাদের অবহিত করেছেন। বলেছেন, এঁরা উভয়েই বিশ্রুত পতঙ্গ-বিজ্ঞানী। বিজ্ঞানীসমাজে নামডাক আছে উভয়েরই। তবে এঁদের মধ্যে যে রেষারেষি চলে, এঁরা একে অপরকে ভুল প্রতিপন্ন করবার জন্য সে বদ্ধপরিকর, এসব কথাও কারও অজানা নয়। সবাই জানে, বিন্দুমাত্র সুযোগ পেলেই হ্যাপলে পকিন্সকে বা পকিন্স হ্যাপলেকে হেয় প্রতিপন্ন করার চেষ্টা করেন। এই দ্বন্দ্ব-কলহে হ্যাপলে শেষ অবধি পকিন্সকে চরম আঘাত হানলেন। গবেষণামূলক প্রবন্ধ প্রচার করে প্রমাণ করলেন যে, পকিন্সের মতবাদ সম্পূর্ণ ভ্রান্ত। এই আঘাতে পকিন্স একেবারে ভেঙে পড়লেন। দু-এক দিনের মধ্যেই মৃত্যু হল তাঁর।

এদিকে প্রতিদ্বন্দ্বীর মৃত্যুর পর হ্যাপলে কেমন যেন অসহায় বোধ করলেন। পকিন্স না থাকায় গবেষণায় উৎসাহ হারিয়ে ফেললেন তিনি। সমস্ত পৃথিবী তাঁর কাছে শূন্য মনে হল। এই শূন্যতাকে ভরাবেন বলে তিনি স্থান-পরিবর্তন করলেন। গেলেন পল্লীর এক নিভৃত অঞ্চলে। কিন্তু পকিন্সের স্মৃতি কোনোমতেই মন থেকে মুছে ফেলতে পারলেন না। এমন কি দাবা খেলতে বসেও তাঁর মনে হত, রাজা বা মন্ত্রীর মধ্যে তিনি যেন পকিন্সকে দেখছেন। নিরুপায় হয়ে আবার গবেষণায় মন দিলেন হ্যাপলে। আবার একনিষ্ঠ বিজ্ঞানসাধনায় আত্ম-নিয়োগ করলেন। কিন্তু কিছুতেই পকিন্সের দুঃস্বপ্ন থেকে মুক্তি পেলেন না।

ঠিক এই রকম যখন তাঁর মনের অবস্থা তখন একদিন রাত্রের ঘটনা;—

হ্যাপলে ছিলেন তাঁর গবেষণাগারে। অণুবীক্ষণ যন্ত্রটি নিয়ে কাজ করছিলেন। শেড-দেওয়া ছোট্ট একটি টেবললাম্প ছাড়া অন্য কোনো আলো ছিল না সেখানে। তাই ঘরের প্রায় সমস্ত অংশই ছিল অন্ধকারে আচ্ছন্ন। এমন কি হ্যাপলের টেবিলেরও খানিকটা অংশে মাত্র আলো পড়ছিল।

বড় সুন্দর এক ঢাকনা ছিল ওই টেবিলটির গায়ে। বড় রঙচঙা আর ঝকমকে। প্রধানত সোনালী রঙের ছিল সেটি। সোনালীর সঙ্গে জায়গায় জায়গায় টকটকে লাল ও ফিকে-নীল মিশে ছিল। আর এই বর্ণবৈচিত্র্যের সমস্তটাই গড়ে উঠেছিল ছাইরঙের উপরে।

সেদিকে হঠাৎ চোখ পড়তেই আঁৎকে উঠলেন হ্যাপলে। তাঁর মনে হল, টেবিলের ঢাকনার বিশেষ একটা জায়গার খানিকটা নকসা যেন স্থানবদল করেছে। যেন সেখানকার বিভিন্ন রঙের মধ্যে চাঞ্চল্য লেগে গেছে; নড়াচড়া করছে সব।

ওই অদ্ভুত দৃশ্যের দিকে আর একবার তাকাতেই বিস্ময়ে বিমূঢ় হলেন হ্যাপলে। দেখলেন, প্রজাপতি জাতীয় একটি বড় পতঙ্গ। মৌমাছির ঢঙে ডানা দুটো মেলে আছে সে।

হ্যাপলে ভেবে পেলেন না, পতঙ্গটি ঘরে ঢুকল কেমন করে। সমস্ত দরজা-জানালা বন্ধ থাকা সত্ত্বেও কেমন করে সে ওখানে আশ্রয় নিল।

হ্যাপলে আরও অবাক হলেন এই ভেবে যে, পতঙ্গটি টেবিলের ঢাকনার উপর আশ্রয় নেবার আগে নিশ্চয় ঘরময় দাপাদাপি করেছিল। তাঁরই চারপাশে উড়ে বেড়িয়েছিল নিশ্চয়। অথচ তিনি তো কই কিছুই টের পান নি।

দেখতে দেখতে রাজ্যের বিস্ময় ও আতঙ্ক বিজ্ঞানীকে ঘিরে ধরল। পতঙ্গটির সঙ্গে টেবিলের ঢাকনার অদ্ভুত মিল দেখেও আশ্চর্য হলেন তিনি। আর সবচেয়ে তাঁর আশ্চর্য লাগল প্রাণীটির বৈচিত্র্য দেখে। ভাবলেন, এত বড় পতঙ্গ-বিজ্ঞানী তিনি! এত বিরাট তাঁর অভিজ্ঞতা! কিন্তু এমন অদ্ভুত ধরনের প্রাণী তিনি জীবনে দেখেন নি।

এদিকে পতঙ্গটি ধীরে ধীরে হ্যাপলের দিকে এগিয়ে আসছিল। যেন টেবিলের ঢাকনার উপর সন্তর্পণে হামাগুড়ি দিচ্ছিল ওই মূর্তিমান রহস্য।

হ্যাপলে ভাবলেন, এ নতুন কোনো প্রাণী নিশ্চয়! নিশ্চয় এ যাবৎ অনাবিষ্কৃত কোনো বিশেষ শ্রেণীর পতঙ্গ। হঠাৎ পকিন্সের কথা মনে পড়ল তাঁর। ভাবলেন, পকিন্স এই পতঙ্গের সংবাদ শুনে যে অত্যন্ত উত্তেজিত হতেন, এ বিষয়ে সন্দেহ নেই কিছু।

কিন্তু কোথায় পকিন্স। অনেক আগেই মৃত্যু হয়েছে তাঁর। মৃত পকিন্সের কথা মনে পড়তেই শিউরে উঠলেন হ্যাপলে। তাঁর চোখ চটে

বিস্ফারিত হল। স্পষ্টই মনে হল তার যে ওই পতঙ্গটি পাকিন্সের রূপ ধরে এসেছে। পতঙ্গের মুখ, দেহ—সব কিছুই তাঁকে পাকিন্সের কথা স্মরণ করিয়ে দিল।

হ্যাপলে ভাবলেন, যেমন করে হোক ওই অদ্ভুত জীবটিকে তিনি ধরবেনই। খানিকক্ষণ ধরে তিনি তাকিয়ে রইলেন ওর দিকে। ধরবার কোনো একটা উপায় খুঁজতে লাগলেন; এবং তারপর ধীরে ধীরে চেয়ার থেকে উঠলেন।

এদিকে হঠাৎ পতঙ্গটিও টেবিল ছেড়ে উঠল, 'টেবল-ল্যাম্পের' শেডের এককোণে আঘাত করল এবং তার পরেই ছায়ার মধ্যে অদৃশ্য হয়ে গেল।

মুহূর্তের মধ্যে শেডটা সরিয়ে ফেললেন হ্যাপলে। সমস্ত ঘর আলোকিত হয়ে উঠল। একবার মনে হল তাঁর যে পতঙ্গটি বুঝি অদৃশ্য হয়েছে। কিন্তু পরমুহূর্তেই দরজার কাছে আগন্তুককে খুঁজে পেলেন তিনি। তারপর ধীরে ধীরে এগোলেন সেদিকে। পতঙ্গকে বন্দী করবেন বলে 'টেবল-ল্যাম্পের' শেডটি হাতে নিয়ে এগোলেন। কিন্তু খানিকটা যেতেই নজরে পড়ল তাঁর, পতঙ্গটি উঠে পড়েছে; উড়তে শুরু করেছে ঘরময়। সবিস্ময়ে লক্ষ্য করলেন তিনি, সে বিশেষ এক-একটি জায়গা থেকে এক-একবার অদৃশ্য হচ্ছে; কিন্তু পরমুহূর্তেই অন্য এক জায়গায় আবির্ভূত হচ্ছে ।

হ্যাপলে তাকে আঘাত করবেন বলে উন্মাদের মতো ছুটে বেড়ালেন। তাকে বন্দী করবার বৃথাই চেষ্টা করলেন বার-বার।

একবার ভুল করে অণুবীক্ষণ যন্ত্রে আঘাত করলেন তিনি। যন্ত্রটি দুলে উঠল; উল্টে গেল পর-মুহূর্তেই। তারপর মেঝেতে আছাড়ে পড়ল। অণুবীক্ষণের ধাক্কায় 'টেবল-ল্যাম্প'টিও নিভে গেল। হ্যাপলে এবার অন্ধকারের মধ্যে নির্বাসিত হলেন। একবার মনে হল তাঁর, ওই অদ্ভুত পতঙ্গটি তাঁকে যেন মুখে-চোখে আঘাত করছে।

এবার ভয়ে-বিস্ময়ে দিশাহারা হলেন হ্যাপলে। আলো নেই তাঁর ঘরে। এদিকে ঘরের যে দরজা খুলবেন, তারও উপায় নেই। কেন না আগন্তুকটি তাহলে পালিয়ে যেতে পারে।

অন্ধকারের মধ্যে অসহায় অবস্থায় দাঁড়িয়ে রইলেন হ্যাপলে। হঠাৎ দেখলেন, পাকিন্স তাকিয়ে আছেন তাঁর দিকে। তাকিয়ে তাকিয়ে কেমন এক অদ্ভুতভাবে হাসছেন।

এই ভয়ঙ্কর দৃশ্য দেখে হ্যাপলে উন্মত্ত হয়ে উঠলেন। শত্রুকে আঘাত করবেন বলে গর্জন করতে লাগলেন তিনি। প্রচণ্ড জোরে মেঝের উপর লাথি মারলেন।

এমন সময় দরজায় কে যেন করাঘাত করল। কয়েক মুহূর্ত পরেই দরজা খুলে গেল খানিকটা। এক মহিলাকে দেখা গেল। হাতে একটি প্রদীপ ছিল তাঁর। স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছিল, দাপাদাপি ও চীৎকার শুনে তিনি খুব ভয় পেয়েছেন।

মহিলাটি ছিলেন হ্যাপলের বাড়ির মালিক। বিস্ময়ে ও আতঙ্কে দিশাহারা হয়ে তিনি ভাড়াটের খবর নিতে এসেছিলেন।

কিন্তু ভাড়াটে তখন অন্য জগতের মানুষ। পতঙ্গটিকে ধরবেন বলে তিনি তখন মরীয়া হয়ে উঠেছেন। দরজা খুললে পাছে সেটি পালিয়ে যায়, এই ভয়ে তিনি আর্তনাদ করে উঠলেন। উন্মত্তের মতো ছুটে এলেন মহিলাটির দিকে। বললেন, দরজাটা বন্ধ করুন।

হ্যাপলের এই অদ্ভুত আচরণ দেখে মহিলার বিস্ময় সীমা ছাড়িয়ে গেল। তাড়াতাড়ি দরজাটি বন্ধ করে দিলেন তিনি। ছুটলেন নিজের ঘরের দিকে।

হ্যাপলে আবার জমাট অন্ধকারের মধ্যে নির্বাসিত হলেন। প্রদীপ জ্বাললেন একবার। কিন্তু কিছুতেই পতঙ্গটিকে ধরতে পারলেন না। বরং মনে হল, ওটা যেন তাঁর মাথার চারিদিকে ঘুরে বেড়াচ্ছে।

অগত্যা ঘুমুবার চেষ্টা করলেন তিনি। কিন্তু ঘুম ঠিক হল না। পতঙ্গ ও পাকিন্সের দুঃস্বপ্ন দেখে বারবার জেগে উঠলেন।

পরদিন দিনের আলোতেও এই দুঃস্বপ্ন ঘিরে ধরল তাঁকে। পথে বেড়াতে গিয়ে মনে হল, পতঙ্গ পিছু নিয়েছে তাঁর। পাকিন্স তাঁকে লক্ষ্য করছে। একবার পতঙ্গটিকে তিনি স্পষ্ট দেখলেনও। পথের পাশে এক প্রাচীরের গায়ে দেখলেন। মনে হল, যেন ডানা মেলে নিশ্চিন্তে প্রতীক্ষা করছে সেই অদ্ভুত পতঙ্গটি।

এগিয়ে গেলেন ভীত ও সন্ত্রস্ত হ্যাপলে। কাছে যেতেই ভুল ভাঙল তাঁর। চোখে পড়ল পতঙ্গ নয়, রঙীন পাথর। কিন্তু তবু অলীক কল্পনার কবল থেকে কোনোমতেই মুক্তি পেলেন না তিনি। বারবার তাঁর মনে হল, পতঙ্গটি খুব কাছেই ঘুরে বেড়াচ্ছে।

বিকেলের দিকে পল্লীযাজকের দ্বারস্থ হলেন হ্যাপলে। দুজনে ঈশ্বরতত্ত্ব নিয়ে আলোচনা শুরু করলেন।

বেশ চলছিল আলোচনা। এমন সময় হঠাৎ আর্তনাদ করে উঠলেন হ্যাপলে। কাঠের টেবিলের এক প্রান্তের দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করে বললেন, ওই পতঙ্গটির দিকে তাকান! পল্লীযাজক অনেক চেষ্টায়ও ওখানে কোনো পতঙ্গ খুঁজে পেলেন না। কিন্তু হ্যাপলে নাছোড়বন্দা। বারবার বোঝাতে চাইলেন তাঁকে যে পতঙ্গটি ঠিক সামনেই আছে।

সেই রাত্রে হ্যাপলে আবার বিভীষিকা দেখলেন। আবার মনে হল তাঁর, পতঙ্গটি যেন এগিয়ে আসছে।

সারা রাত জেগে বসে রইলেন তিনি। নিজেকে নানারকমভাবে বোঝাবার চেষ্টা করলেন। ভাবলেন, এটা কি শুধুই অলীক কল্পনা? কিন্তু তা কি করে হয়! পতঙ্গটি স্পষ্ট চোখে পড়ছে তাঁর। তাঁরই চোখের সামনে যখন-তখন সে ঘুরে বেড়াচ্ছে।

পতঙ্গটিকে ধরবার আশায় ঘরময় ছোটা-
পতঙ্গটিকে ধরবার আশায় ঘরবয় ছোটা-
ছুটি করলেন। কখনও জিনিষপত্র ছুঁড়ে মারলেন। কখনও আবার তীব্র এক আক্রোশে ওই রহস্যময় জীবটার দিকে ধীরে ধীরে এগিয়ে গেলেন।

অবশেষে ঘরের দরজা খুললেন তিনি। রাত্রির অন্ধকারে পতঙ্গের পিছনে ছুটলেন। লাফিয়ে উঠলেন কখনও; পতঙ্গটিকে ধরতে চাইলেন। কখনও আবার শত্রুকে আঘাতের নেশা তাঁকে পেয়ে বসল।

পরদিন প্রভাতে স্বাভাবিক হবার চেষ্টা করলেন হ্যাপলে। বাড়ির মালিক মিসেস কল্‌ভিলের কাছে রাত্রির বিসদৃশ আচরণের জন্যে ক্ষমা চাইলেন। বললেন, ঘুমের ঘোরে হেঁটে বেড়াবার রোগ আছে তাঁর; গত রাত্রে সেই রোগ খুব বেড়েছিল।

মিসেস কল্‌ভিল এসব অজুহাতে কান দিলেন না। কিন্তু হ্যাপলে যেন কিছুই হয় নি, ঠিক এই রকম একটা ভাব দেখিয়ে সহজভাবে পথ চলতে লাগলেন।

এমন সময় হঠাৎ আবার শুরু হল সেই মরীচিকার সঙ্গে যুদ্ধ। হ্যাপলের মনে হল, পতঙ্গটি তাঁর সামনেই আছে। ক্ষণে ক্ষণে তাঁর চোখে-মুখে আঘাত করছে সে। এবার আত্মরক্ষার জন্যে উতলা হলেন তিনি। টুপি দিয়ে মেরে শত্রুকে হটিয়ে দিতে চাইলেন। অদ্ভুত এক বিদ্বেষ ঘিরে ধরল তাঁকে। সেই পুরনো বিদ্বেষ—যা তিনি পাকিন্সের ক্ষেত্রে পোষণ করতেন তা আবার তাঁকে আচ্ছন্ন করল।

প্রাণপণ চেষ্টায় বারবার অগ্রসরমান পতঙ্গটিকে আঘাত করতে চাইলেন হ্যাপলে। কিন্তু এর ফল দাঁড়াল ভয়াবহ। হঠাৎ পড়ে গেলেন তিনি। পা ভেঙে গেল তাঁর। পতঙ্গটি তখনও চোখে পড়ছিল। স্পষ্ট অনুভব করছিলেন হ্যাপলে যে প্রতিদ্বন্দ্বী তাঁর খুব কাছেই ঘুরে বেড়াচ্ছে।

এমন সময় গ্রামের এক ডাক্তার এসে পড়ায় ভাগ্যক্রমে সে যাত্রায় রক্ষা পেলেন হ্যাপলে। কিন্তু রাত্রে জ্বর হল তাঁর। জ্বরের ঘোরে তিনি ভুল বকতে লাগলেন। কখনও বা বিছানার চারিদিকে কি যেন

খুঁজলেন। একবার টেবিলের ঢাকনার উপরে পতঙ্গটিকে স্পষ্ট দেখলেন তিনি। সঙ্গে সঙ্গেই গর্জন করে উঠলেন। ঘুষি বাগিয়ে মারতে গেলেন শত্রুকে।

চীৎকার শুনে নার্স জেগে উঠল। কিন্তু কিছুই দেখতে পেল না সে। ওদিকে আতঙ্কিত হ্যাপলে বিভীষিকা দেখছেন। পতঙ্গের দুঃস্বপ্ন প্রতি মুহূর্তে তাঁকে উন্মাদ করে দিচ্ছে।

ভোরের দিকে সর্বনাশের নেশা হ্যাপলেকে পেয়ে বসল। বিছানা ছেড়ে উঠলেন তিনি। পতঙ্গটিকে ধরবেন বলে বাইরে যেতে চাইলেন। নার্স এগিয়ে এসে অনেক কষ্টে তাঁকে নিবৃত্ত করল।

এরপর থেকে বিছানার সঙ্গে বেঁধে রাখা হল হ্যাপলেকে। কিন্তু এর ফল দাঁড়াল ভয়াবহ। হ্যাপলের মনে হল, শত্রু এবার তাঁকে বাগে পেয়েছে। প্রতিদ্বন্দ্বীকে অসহায় ভেবে প্রবল বিক্রমে আক্রমণ চালাচ্ছে সে।

আর্তনাদ করে উঠলেন হ্যাপলে। মরিয়া হয়ে শূন্যে ঘুষি চালালেন। এই ঘটনার পর থেকে তাঁর হাত দুটিও বেঁধে রাখা হল। এর ফলে আরও শোচনীয় হয়ে উঠল হ্যাপলের অবস্থা। শত্রু এবার যেন তাঁর মুখের উপর দিয়ে হাঁটতে লাগল।

কেঁদে উঠলেন হ্যাপলে। যন্ত্রণায় আতঙ্কে চীৎকার করতে লাগলেন। উপস্থিত সকলের কাছে মিনতি জানালেন, এই দুঃস্বপ্ন থেকে তাঁকে মুক্তি দেবার জন্যে। কিন্তু মুক্তি তিনি পেলেন না। পতঙ্গের দুঃস্বপ্ন তাঁকে তিলে তিলে দহন করল।

পা সারতে সময় লাগল কয়েকদিন এবং প্রতিদিনের প্রতি মুহূর্তে তিনি এক বিভীষিকাময় জগতে নির্বাসিত রইলেন।

সেরে উঠেও মুক্তি মিলল না তাঁর। পতঙ্গের স্মৃতি শয়নে-স্বপনে তাঁকে ঘিরে রাখল। হ্যাপলের স্থির-বিশ্বাস হয়ে গেল, পকিন্স্ আজও ভুলতে পারেন নি তাঁকে। তাই পতঙ্গের মূর্তি ধরে অনুক্ষণ প্রতিদ্বন্দ্বীকে ভয় দেখাচ্ছেন তিনি। গল্পটি এখানেই শেষ হল। এ গল্পে অলীক কল্পনার যে মর্মান্তিক চিত্র উদ্ঘাটন করেছেন লেখক, শিল্পোৎকর্ষের দিক থেকে তার তুলনা নেই।

হ্যাপলের মনোবিকারের এক বিশ্বাসযোগ্য চিত্র আঁকা হয়েছে এখানে। দেখান হয়েছে, কেমন করে তিনি চরম সর্বনাশের মুখোমুখি হলেন। সর্বনাশ কোনো বিশেষ মুহূর্তের মধ্যে পুঞ্জীভূত হয় নি এখানে; কতকগুলি ঘটনার মধ্যে ছড়িয়ে রয়েছে। বিভিন্ন ঘটনাকে উপস্থাপন করার ব্যাপারে লেখক অসাধারণ সূক্ষ্মদর্শিতার পরিচয় দিয়েছেন। প্রায়ান্ধকার ঘর, নিভৃতে গবেষণারত হ্যাপলে, টেবিলের ঢাকনার রঙের সঙ্গে পতঙ্গটির রঙের মিল বিচিত্র এক রহস্যালোকে নিয়ে যায় আমাদের। অলীক কল্পনার এমন এক দেশে পৌঁছে দেয়, যেখানে পতঙ্গের রূপ ধরে পকিন্সের আবির্ভাব বিসদৃশ ঠেকে না।

অলীক কল্পনার চিত্রটিকেও এখানে বিজ্ঞানসম্মতভাবে তুলে ধরা হয়েছে। স্পষ্টই বলা হয়েছে, পতঙ্গটিকে হ্যাপলে ছাড়া আর কেউ দেখেন নি। বাড়ির মালিক মিসেস কল্‌ভিল, পল্লীযাজক, ডাক্তার, নার্স—এদের কারও চোখে পড়ে নি ওই পতঙ্গ। ফলে, এ গল্পের ট্র্যাজেডি আরও জমে উঠেছে। মরীচিকার সন্ধানে একাই ছুটে গিয়েছেন হ্যাপলে। বিরুদ্ধ শত্রুর সঙ্গে একাই সংগ্রাম করেছেন। মিসেস কল্‌ভিলের আতঙ্ক ও ডাক্তারের অজ্ঞতা হ্যাপলের বিকৃতিতে ইন্ধন যুগিয়েছে। অবশেষে হ্যাপলে যখন দিনের আলোকে পথ চলতে গিয়েও ওই পতঙ্গটিকে দেখেন, হাত-পা-বদ্ধ অবস্থায় থেকেও যখন তাঁর মনে হয়, পতঙ্গটি তাঁর মুখে-চোখে আঘাত করছে, তখন তাঁর অসহায় অবস্থার জন্যে করুণা অনুভব করি আমরা। আমাদের মনে হয়, মানসিক বিকৃতির যে স্তরে তিনি পৌঁচেছেন, সেখানে এ ধরনের ঘটনা অসম্ভব কিছু নয়।

শেষ অবধি মৃত্যুর দ্বারদেশে দেখি হ্যাপলেকে। তবে মৃত্যু হয় নি তাঁর। চিকিৎসা ও সেবা-শুশ্রূষার গুণে কোনোরকমে তিনি সেরে উঠেছেন।

সাক্ষাৎ মৃত্যুর কবল থেকে হ্যাপলের এই পুনর্জীবন লাভ আমাদের কাছে কিছুটা অসঙ্গত ঠেকে। আমাদের মনে হয়, বিকৃতি বেদনা ও হতাশার যে চরম স্তরে তিনি পৌঁছেছিলেন, সেখান থেকে কারও পক্ষে জীবন নিয়ে ফিরে আসা সম্ভব নয়। বস্তুত গল্পটির একমাত্র ত্রুটি এখানেই। এ ছাড়া গোড়ার দিকে দুই বিজ্ঞানীর কলহের বিস্তৃত বিবরণ কোনো কোনো পাঠকের ধৈর্যচ্যুতি ঘটাতে পারে; কিন্তু পাঠকরা যখন দেখেন, মূল গল্পের রসসৃষ্টির খাতিরে এই বিবরণটুকুর প্রয়োজন ছিল, তখন ওই প্রাথমিক বিরূপতার জন্যে লেখককে নয়, নিজেদেরই ওঁরা দোষী সাব্যস্ত করেন।

সামগ্রিকভাবে আলোচনা করলে মনে হয়, 'দি মথ' একটি অসাধারণ গল্প। জীবনের খ্যাতি-প্রতিপত্তি, দ্বন্দ্ব-কলহ, আশা-নিরাশা ও দুঃখ-বেদনাকে ঘিরে এমন মর্মস্পর্শী কাহিনী ওয়েল্‌স খুব অল্পই লিখেছেন।

গল্পটি পড়া হয়ে গেলেও হ্যাপলের কথা মনে থাকে আমাদের। আমরা যেন দেখতে পাই, পকিন্সের হাত থেকে বাঁচবার জন্যে আজও লুকোচুরি খেলছেন তিনি। সামান্য একটা পতঙ্গ তাঁর আলোকোজ্জ্বল গৌরবঘেরা জীবনে বিভীষিকার অন্ধকার ঘনিয়ে তুলেছে। আর সেই বিরাট অন্ধকার পুরীতে একা দাঁড়িয়ে আছেন অসহায় বিজ্ঞানী জীবনের রূপরস নিয়ে আর দশজন মানুষের মতোই বাঁচতে চাইছেন তিনি কিন্তু বিভীষিকার অনলে প্রতি মুহূর্তে তাঁর মৃত্যু হচ্ছে।

'পোলক অ্যান্ড্ দি পোরো ম্যান' গল্পের মূল ভিত্তিও অলীক কল্পনা। এর কবলে পড়ে এ গল্পের নায়কও ধীরে ধীরে সর্বনাশ ও ধ্বংসের দিকে এগিয়ে গেছে। এদিক থেকে গল্পটির সঙ্গে মথের মিল আছে। তবে 'মথ'-এ নায়কের শেষ অবধি মৃত্যু হয় নি। কিন্তু এ গল্পের নায়ক আত্মহত্যা করেছে। অল্প উপকরণে রহস্য জমে উঠেছে মথে। এখানে রহস্য-সৃষ্টির উপাদান আরও ব্যাপক, তবে মথের মতো সে উপাদানের সব ক'টিই হয়তো বিশ্বাসযোগ্য নয়। বিভীষিকা আরও অনেক নগ্নভাবে আত্মপ্রকাশ করেছে এখানে। অতিপ্রাকৃতে বিশ্বাস না দেখিয়েও রহস্যকে এখানে রোমহর্ষক করে চিত্রিত করা হয়েছে। তবে জীবনরসের গভীরতার দিক থেকে মথ যে আরও অনেক উচ্চাঙ্গের গল্প, এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। মথ পড়ে অদ্ভুত এক বিষণ্ণতার আনন্দে অভিভূত হই আমরা; কিন্তু এ গল্প আমাদের ভয়ঙ্করের মুখোমুখি দাঁড় করিয়ে দেয়। এর রক্তাক্ত ছিন্নমুণ্ড আমাদের সৌন্দর্যবোধকে পীড়িত করে।

এই পীড়ন গল্পটির প্রথম দৃশ্য থেকেই সুরু হয়। আফ্রিকার আদিম অধিবাসী 'পোরো ম্যান' তার স্বজাতীয় একটি নারীকে হত্যা করল। পোলক গুলী ছুঁড়ল পোরো ম্যানের হাত লক্ষ্য করে। পোরো ম্যান নীচু করে হাতের তলা দিয়ে পোলকের দিকে তীব্র দৃষ্টিতে তাকাল। দেখে মনে হল, তার মুন্ডটা যেন উল্টো অবস্থায় আছে। সন্দেহ নেই, আদিম মানুষটির এই দৃষ্টি ও হিংস্রতার সঙ্গে মূল গল্পের গূঢ় সংযোগ আছে, কিন্তু তবু বলবো, এই সব ঘটনা থেকে পোরো ম্যান আমাদের কাছে জীবন্ত হয়ে ওঠে নি। তার জিঘাংসাপরায়ণ আদিম মনোবৃত্তিটুকুই স্পষ্ট হয়েছে শুধু। এই দিক থেকে পোলকের চরিত্রটি অপেক্ষাকৃত জীবন্ত। ওয়াটার হাউস্ ও পেরেরার সঙ্গে তার কথোপকথনের মধ্য দিয়ে এই জীবনধর্মিতার পরিচয় পাই। ঘটনার জালেও এমন করে জড়িয়ে পড়েছে সে, যে গল্পটি পড়বার সময় মুহূর্তের জন্যেও তার অস্তিত্বকে আমরা ভুলে থাকতে পারি

না। প্রতিহিংসা নেবে বলে পোরো ম্যান তাকে লক্ষ করে তীর ছুঁড়ছে ও নানাভাবে তাঁকে শায়েস্তা করার চেষ্টা করছে। সুযোগ পেয়েও তাকে একেবারে মেরে ফেলছে না, তিলে তিলে মারবার আয়োজন করছে। পোলক বুঝছে এগুলোর সবই, কিন্তু প্রতিকার করতে পারছে না। যেন নিয়তির কাছে অসহায়ভাবে আত্মসমর্পণ করছে। পোলকের এই অসহায় চিত্রটি এখানে সুন্দর ফুটেছে। তার দুঃস্বপ্ন এবং আশেপাশে সাপের আবির্ভাব এই চিত্রটিকে আরও করুণ করে তুলেছে।

অবশেষে একজন আদিবাসী মেণ্ডি একটি বন্দুকের লোভে যখন পোরো ম্যানকে হত্যা করল, গল্পটি তখন জমে ওঠে। মেণ্ডি পোরো ম্যানের ছিন্নমুণ্ড এনে পোলককে উপহার দিল। পোলক প্রথমটায় আঁৎকে উঠল এই ভয়াবহ দৃশ্য দেখে। কিন্তু পরমুহূর্তেই জিঘাংসার প্রবৃত্তি তাকে পেয়ে বসল। সে হঠাৎ পা দিয়ে আঘাত করল ওই মুণ্ডটিকে। রক্তাক্ত মুণ্ডটি গড়িয়ে গিয়ে এক জায়গায় স্থির হয়ে দাঁড়াল। মুখ উল্টো করে পোরো ম্যান যেভাবে দাঁড়িয়েছিল, দাঁড়াল ঠিক সেইভাবে। সঙ্গে সঙ্গেই পোলকের সারা দেহ রোমাঞ্চিত হয়ে উঠল। মুণ্ডটিকে সরিয়ে দেবার জন্যে ব্যাকুল হল সে। কিন্তু কোনোমতেই ওই ভয়াবহ ছিন্নমুণ্ডের কবল থেকে সে মুক্তি পেল না। কবর দিয়ে, সমুদ্রে বিসর্জন করে, আগুনে পুড়িয়ে কোনোমতেই মুণ্ডটিকে নিশ্চিহ্ন করতে পারল না সে। ঘটনাচক্রে ওই ছিন্নমুণ্ড ঘুরে-ফিরে আবার তারই ধারে-কাছে এসে পৌঁছুতে লাগল।

অবশেষে ঘরে ফিরল পোলক। ইংল্যাণ্ডে এল। মুণ্ড পড়ে রইল জাহাজে। কিন্তু তার স্মৃতি অনুক্ষণ তাকে অক্টোপাসের মতো ঘিরে রাখল। ফুটবলকে ছিন্নমুণ্ড বলে ভ্রম হল তার। টুপি দেখে মনে হল, পোরো ম্যান মাথা উল্টো করে তার দিকে তাকিয়ে আছে। এইভাবে পোরো ম্যানের বিভীষিকা দিনের পর দিন ধরে বেড়ে চলল। উল্টান ছিন্নমুণ্ডের অলীক কল্পনা পোলককে একেবারে আচ্ছন্ন করে ফেলল। শেষ অবধি আহত হল সে; মুমূর্ষু অবস্থায় গিয়ে পৌঁছুল এবং আত্মহত্যা করে মুক্তির পথ খুঁজল। পোলকের এই মানসিক বিকৃতির চিত্রটি মর্মস্পর্শী। এদিক থেকে তার মৃত্যুও অস্বাভাবিক কিছু নয়। কেন না বিকৃতির যে স্তরে গিয়ে সে পৌঁছেছিল, সেখান থেকে কেউ সুস্থ অবস্থায় ফিরে আসে না।

সামগ্রিকভাবে আলোচনা করলে মনে হয়, অলীক কল্পনাকে ঘিরে বিচিত্র সব গল্প লিখেছেন ওয়েল্‌স। তাঁর 'দি মথ' ও তাঁর 'পোলক অ্যান্ড্ দি পোরো ম্যান' আজকের পৃথিবীর অসংখ্য ছোট গল্পের ভিড়েও হারিয়ে যাবার নয়।

সাধনা দশন নিয়মিত ব্যবহার করিলে কোন দন্তরোগের ভয় থাকে না। দন্তরাজী সুস্থ, সবল ও সুন্দর হয়।

দেশীয় গাছগাছড়া হইতে ইহা প্রস্তুত হয়।

সাধনা ঔষধালয়, ঢাকা

৩৬, সাধনা ঔষধালয় রোড, সাধনা নগর, কলিকাতা-৪৮

অধ্যক্ষ যোগেশচন্দ্র ঘোষ, এম,এ, আয়ুর্বেদশাস্ত্রী, এফ,সি,এস (লণ্ডন), এম,সি,এস (আমেরিকা) ভাগলপুর কলেজের রসায়নশাস্ত্রের ভূতপূর্ব অধ্যাপক।

কলিকাতাকেন্দ্র-ডাঃ নরেশচন্দ্র ঘোষ, এম,বি,বি,এস (কলিঃ) আয়ুর্বেদাচার্য্য

বিপ্লব প্রচেষ্টার একটি বিস্মৃত অধ্যায়

—সত্যেন্দ্র নাথ গঙ্গোপাধ্যায়

মসজিদবাড়ি স্ট্রীটে সি-আই-ডি হত্যা

"বীরের এ রক্তস্রোত, মাতার এ অশ্রু-
ধারা
এর যত মূল্য সে কি ধরার ধূলায়
হবে হারা।
স্বর্গ কি হবে না কেনা।
বিশ্বের ভাণ্ডারী শুধিবে না
এত ঋণ?"
(২৩ কার্তিক ১৩২২, রচিত ৩৭নং
কবিতা—বলাকা)

রাওলাট সাহেব বর্ণিত "notable leaders Jatin Mukherjee and Bipin Ganguli" বিপ্লবের রঙ্গমঞ্চ থেকে কিভাবে অপসারিত হয়েছিলেন, একজন চিরতরে আর একজন সাময়িক-ভাবে পাঁচ বছরের জন্য, অন্যত্র সেই আলোচনা করা হয়েছে। কিন্তু বিপ্লবের আগুন যে তাতে বিন্দুমাত্রও উপশমিত হয় নি, আর সরকারের বলপ্রয়োগ সেই কাজে যে তিলার্ধও সক্ষম হতে পারে নি, তার প্রমাণ পাওয়া যায় বর্তমান আলোচনায়। অন্যত্র দেখা গেছে, ১৯১৫ সালের ৯ই সেপ্টেম্বর, রাত ৮টা-৩০ মিনিটের সময় যতীন্দ্রনাথকে বালেশ্বরের হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছিল, আর ১০ই সেপ্টেম্বর ভোর ৫টার সময় তিনি শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করেছিলেন। আরো দেখা গেছে ২০শে সেপ্টেম্বর, ১৯১৫ সালে আগড়পাড়ার ডাকাতি সংক্রান্ত ব্যাপারে, পাকেচক্রে বিপিনবিহারী ডাকাত সাব্যস্ত হয়ে পাঁচ বছরের জন্যে সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত হয়েছিলেন।

এইরূপ পরিস্থিতিতে তখনকার শাসনিক ক্ষমতাসম্পন্ন ছোট-বড় পুলিশ কর্মচারীরা সেদিন সবে একটি মাস হয়তো সামান্য স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে বাংলার বিপ্লব প্রচেষ্টার পরিসমাপ্তির স্বপ্ন দেখছিলেন। এমন সময় ২১শে অক্টোবর, ১৯১৫ সাল এসে উপস্থিত হয়, অনেকটা এক মাস আগে যেদিন আর যে সময় পরাধীনতার জ্বালায় কাতর বীর যতীন্দ্রনাথকে বালেশ্বরের হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছিল এক ভয়াবহ আহত অবস্থায়। সংবাদে প্রকাশ—

"বৃহস্পতিবার রাত্রে ১১টার সময় ৯৯নং মস্‌জিদ্‌বাড়ি স্ট্রীটে একটি বাঙালী সি-আই-ডি ইন্সপেক্টরের গৃহে একতলার ঘরে চারজন অফিসার বসে যখন আলাপ-আলোচনা করছিলেন সেই সময় দরজার সামনে একটি বাঙালী যুবকের আবির্ভাব হয়......এবং তিনি গুলী চালাতে থাকেন......একটি বুলেট গিরীন্দ্রকে লাগে......তিনি তৎক্ষণাৎ সেই স্থানেই মারা যান। উপেন্দ্র গুরুতরভাবে আহত হয়েছিলেন......আবার অফি-সারেরা অন্য একটি ঘরে পালাতে সক্ষম হন......।" (এ, বি, পত্রিকা—২৯।১০।১৯১৫ থেকে উদ্ধৃত)

নির্ভরযোগ্য সূত্রে শোনা, উক্ত চারজন পুলিশ কর্মচারী আলোচ্য সময়ে বিদেশী রাজ-সরকারের অধীনে নিজেদের দৈনিক কৃত্য শেষ করে সন্ধ্যার দিকে ৪নং নীলমণি সরকার লেনের একটি ঘরে সেই সময়ে সমবেত হতেন গান-বাজনার মাধ্যমে চিত্তবিনোদনের অভি-লাষে। কলকাতার বিপ্লবীগোষ্ঠীর কাছে এই খবর অজানা ছিল না। উক্ত পুলিশ কর্মচারীদের মধ্যে সতীশ ব্যানার্জীর হীন স্বার্থ-নিবন্ধন দেশদ্রোহিতার কথাও বিপ্লবীরা ভুলতে পারেন নি। ভুলবেনই বা কেমন করে? সমস্ত কথা বাদ দিয়েও, পরদেশীয় অনুগ্রহ লাভের জন্যে এই ধুরন্ধর সতীশবাবুই তো এক মাস আগে বীর যতীন্দ্রনাথকে খুঁজে বার করা এবং তাঁর দেহান্তরের কারণ হয়েছিলেন। তাই সতীশবাবুর জীবন যে বিপ্লবীদের লক্ষ্য একথাও তাঁরা গুপ্ত রাখেন নি। ২১শে তারিখে দিনের বেলায়, পুলিশ কর্তৃপক্ষ সতীশবাবুকে ঐ বিষয়ে সতর্কও করে দিয়েছিলেন বলে জানা যায়।

২১শে তারিখের সন্ধ্যায় উক্ত পুলিশ কর্মচারীরা ৪নং নীলমণি সরকার লেনের সামনে এসে হাজির হয়েছেন, এমন সময় একটি বিপ্লবী যুবক সাইকেলযোগে তাঁদের সামনে থেকে চলে যাওয়ায় জীবন-বাবুর মনে সন্দেহ জাগে এবং সেদিন আর উক্ত ঘরে গান-বাজনার জন্যে সমবেত হতে তাঁর মন চায় নি। তিনি নাকি বন্ধুদের তখন আহ্বান জানান তাঁর ৯৯নং মস্‌জিদ্‌বাড়ি স্ট্রীটের গৃহে গিয়ে কিছু জলযোগ সেরে, যে যার বাড়ি ফিরে যাওয়ার জন্যে। এইভাবেই তাঁরা শেষে সমবেত হয়েছিলেন—উক্ত বাড়ির বৈঠকখানায়, সন্ধ্যা ৮টা—৯টা আন্দাজ সময়ে। বিপ্লবীরাও সুযোগের জন্যে তৈরি ছিলেন। তখন তাঁদের অন্তরে সদাই প্রতিধ্বনিত—

"খড়্গসম তোমার দীপ্ত শিখা
ছিন্ন করুক জরার কুজ্‌ঝটিকা।"
(৪ চৈত্র ১৩২২ সালে রচিত—৪৪নং
কবিতা—'বলাকা')।

এমনই অবস্থায় হয়েছিল, জোড়া মন্দিরের মধ্য দিয়ে রুদ্ধ পথ ৯৯নং মস্‌জিদবাড়ি স্ট্রীটের সরু গলিতে পূর্বোক্ত সশস্ত্র বাঙালী যুবকের আবির্ভাব। আর সেটা হয়েছিল অনেকটা একই সময়ে, এক মাস আগে যখন বিপ্লবীবীর যতীন্দ্রনাথকে শত্রুর হাতে গুরুতর আহত অবস্থায় বালেশ্বরের হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছিল। সময় ও ঘটনার আশ্চর্য সাদৃশ্য যা সেদিন নিয়ন্ত্রিত হয়েছিল ভাগ্যবিধাতার অনি-বার্য ইঙ্গিতে। তবে লক্ষ্যভ্রষ্ট হওয়ায় অথবা যে কারণেই হোক, নীচ স্বার্থা-ন্বেষী সতীশ ব্যানার্জীর বদলে সেদিন প্রথম গুলীবিদ্ধ হয়েছিলেন গিরীন-বাবু ও পরে উপেনবাবু। আর একটু বলা প্রয়োজন। এই গিরীনবাবু নাকি বিপ্লবীমহলেও জামাইবাবু বলে পরিচিত ছিলেন। কারণ শোনা যায় তিনি ছিলেন তখনকার বিখ্যাত টীকাকার মধ্য কলকাতার 'ক্রীক্-রো' অধিবাসী পণ্ডিত নৃসিংহ মুখোপাধ্যায়ের জামাই। প্রকাশ সতীশচন্দ্রের বদলে গিরীন্দ্রের মৃত্যুতে বিপ্লবীরা পরে দুঃখ প্রকাশও করেছিলেন। ভাগ্যের পরিহাস। কুলা-ঙ্গার সতীশ ব্যানার্জী সম্ভবত, যতীন্দ্র-নাথের গ্রেপ্তার সম্পর্কে ঘোষিত পুরস্কার সহ রায়বাহাদুর ইত্যাদি উপাধি লাভ করে অপেক্ষাকৃত সুরক্ষিত স্থান দিল্লী প্রদেশে তখন নিযুক্ত হয়েছিলেন অধিক বেতনযুক্ত পদে। তা' ছাড়া তিনি এখনও বোধ হয় স্বাধীন ভারতের পেন্-সন্ ভোগ করছেন। আর প্রাক্-স্বাধীনতা যুগে স্বদেশের মুক্তিকল্পে উৎসর্গীকৃত প্রাণ, বীর যতীন্দ্রনাথের সম আদর্শের পথিকদের কেউ কেউ আজও অভাবের জ্বালায় উৎপীড়িত অবস্থায় নিঃশব্দে হয়েছেন তিলে তিলে মৃত্যু-পথের যাত্রী।

বাংলার বিপ্লব প্রচেষ্টার লুপ্ত কথা আলোচনা প্রসঙ্গে এখন ইতিহাস-অনুরাগী হয়ত জানতে চাইবেন উপ-রোক্ত বিপ্লবী বাঙালী যুবকের পরিচয়। সংবাদে একটি বাঙালী যুবকের উল্লেখ

থাকলেও উভয় পক্ষ থেকেই শোনা—তাঁরা সংখ্যায় ছিলেন একাধিক। তা' ছাড়া ৯৯ নং বাড়ির বৈঠকখানায় প্রবেশ-দ্বারের সামনে একটি তক্তপোশের ওপরে গোয়েন্দারা তখন যথাক্রমে বসেছিলেন—দরজার সামনে গিরীন্দ্রবাবু, তাঁর দক্ষিণে উপেনবাবু, তাঁর পাশে সতীশবাবু, আর অন্তঃপুর থেকে জলযোগের ব্যবস্থা করে এসে বাড়ির ভিতর দরজার প্রায় সামনে বসেছিলেন জীবনবাবু। কাজেই সমাগত বিপ্লবী যুবকের রিভল্‌বারের গুলী সামনের লোককেই প্রথম লাগা স্বাভাবিক। এই সময় আতঙ্কিত চিত্তে জীবনবাবু বন্ধুদের ওপরের ঘরে চলে আসতে অনুরোধ জানিয়ে, নিজে সেখানে পৌঁছেছিলেন সব প্রথম। সঙ্গে সঙ্গেই তাঁর অনুগমন করেন সতীশবাবু। তারপরে রক্তাক্ত দেহে উপেনবাবুও সেই ঘরে পৌঁছে মেজেতে লুটিয়ে পড়েন। সব শেষ গিরীনবাবুও নাকি গুলীবিদ্ধ অবস্থায় সেই ঘরে গিয়েই পৌঁছেছিলেন—কিন্তু তৎক্ষণাৎ তাঁর মৃত্যু ঘটে।* শোনা যায় গোয়েন্দাদের কাছেও অস্ত্র ছিল, কিন্তু তাঁরা তা ব্যবহার করার সময় পান নি।† আরো শোনা যায় বিপ্লবীরা গুলী ছুঁড়তে ছুঁড়তে বাড়ির ভিতর পর্যন্ত ঢুকে পড়েছিলেন ও পরে উধাও হয়ে যান এবং ফেরবার পথে তাঁরাই আবার বটতলার থানায় খবর পৌঁছে দিয়েছিলেন যে, ৯৯নং মস্‌জিদবাড়ি স্ট্রীটে গুলী চলছে বলে। বটতলার থানা তখন ছিল কর্ণওয়ালিশ স্ট্রীটের ওপর (এখন বিধান সরণী) বর্তমান রূপবাণী সিনেমার প্রায় সামনে। সেই বাড়ির একদিকে ছিল এখনকার হেমন্ত সেন স্ট্রীট আর অপর পাশে ছিল অভয় গুহ রোড। (ক)

তবে কে বা কারা সেদিন 'বীরের রক্তস্রোত' দেখে দেশের শত্রুর ওপরে 'খড়্গসম' হয়ে উঠেছিলেন তার সোজা উত্তর এখনও পাওয়া শক্ত। কারণ—এই-গুলি সবই হচ্ছে গুপ্ত সমিতির লুপ্ত পাতা। যে সমিতির সভ্যদের প্রতিজ্ঞার প্রথম সর্তই ছিল লুকিয়ে রাখা, লুকিয়ে থাকা, আর তিলে তিলে জীবনপণ করে গুপ্তভাবেই দেশের মুক্তিপথে বহুদিনের সঞ্চিত কালিমাকে নিজেদের প্রতিটি রক্তবিন্দু দিয়ে ধুয়ে, মুছে, স্বচ্ছ করার চেষ্টা করা। তাই দেশকে স্বাধীন করার পরিকল্পে, তাঁরা কি দিয়েছিলেন, কি

শহীদ কুন্তল চক্রবর্তী

দেন নি—কি করেছিলেন, আর কি করেন নি—কেন করেছিলেন, আর কেনই বা করেন নি অথবা করতে পারেন নি, এই সমস্ত কথার হিসেব-নিকেশ আজও তাঁরা করতে নারাজ। তাঁদের জীবনগুলি সত্যই ছিল দেশের পায়ে, দেশের জন্য সম্পূর্ণ বিলিয়ে দেবার বস্তু। তাই দেখা যায় ১৯৪২ সালের অন্তত পঞ্চাশ বছর আগে থেকেই বাংলার যৌবন ছিল—'ডু অর ডাই' মন্ত্রে উদ্বুদ্ধ। স্বার্থের খাতিরে, অর্থের লোভে, সেদিন যাঁরা বিদেশীর শাসননীতির সাহায্য করতেন, তাঁরাও তাই বিপ্লবীদের হাতে রক্ষা পেতেন না। বালেশ্বরের যুদ্ধে যতীন্দ্রনাথের মারণ-আঘাত বিপ্লবীদের মনের আগুনে সেদিন কোন ইন্ধন যুগিয়েছিল আলোচ্য ঘটনা তারই একটি পরিচয় মাত্র। তাঁরা তখন দৃঢ়প্রতিজ্ঞ, নীরবে আর কোন অন্যায় সহ্য করা হবে না।

শোনা যায় ৩নং ছিদাম মুদি লেনে সেদিনকার সন্ধ্যায় কয়েকজন বিশিষ্ট বিপ্লবী উপস্থিত ছিলেন, এমন সময় কলকাতার উত্তরাঞ্চলের একজন প্রখ্যাত বিপ্লবী এসে খবর দেন—'ওরা জমা হয়েছে, টেগার্টও আসবে বোধ হয়,' এই বলে। অমনি ব্যবস্থা হয়ে যায়। 'কুন্তল' ও 'ঠাকুর' নাকি রিভলবার হাতে এগিয়ে যান 'ডু অর ডাই' প্রতিজ্ঞায় প্রাণ সঞ্চার করতে। সঙ্গে আরো কেউ কেউ ছিলেন হয়ত, যেমন মৈমনসিং-এর মঙ্গলা রায় ওরফে দুর্গাপ্রসন্ন রায় প্রমুখ বিপ্লবীরা, কিন্তু এখনও বাকি বিপ্লবীদের আত্মপ্রকাশে আপত্তি থাকায় সেই সকল নামোল্লেখে বিরত হতে হল। অবশ্য এখান থেকে আন্দাজ করা হয়ত অপ্রাসঙ্গিক হবে না যে, পূর্বোক্ত ৪নং নীলমণি সরকার লেনে, সেদিন সন্ধ্যায় গোয়েন্দাদের সামনে থেকে সাইকেল-যোগে যিনি পাশ করে গিয়েছিলেন, তিনি সম্ভবত ছিলেন বিপ্লবী অতুল ঘোষ নিজে অথবা তাঁর কোন বিশ্বস্ত সহচর, আর সেই কারণেই উক্ত ঘটনার পরে পুলিশ প্রথমেই গিয়ে হানা দিয়েছিল ৩নং ছিদাম মুদি লেনে সর্ব প্রথম।*—"Three Bengalies.... arrested on Thursday night are Amarendra Nath Ghose, Jnan Chandra Ghose and Haridas (Haridas Chakrabarty)..." (A. B. Patrika —25. 10. 1915). অর্থাৎ বৃহস্পতি-বার রাত্রে যে তিনজন বাঙালী গ্রেপ্তার হয়েছিলেন তাঁদের নাম অমরেন্দ্রনাথ ঘোষ, জ্ঞানচন্দ্র ঘোষ এবং হরিদাস (হরিদাস চক্রবর্তী)।

এই বিষয়ে যথাযথ খবর সংগ্রহ করে যা জানার সুযোগ হয়েছে তারই সারমর্ম এখানে উদ্ধৃত করা গেল। শ্রদ্ধেয় অমর ঘোষ বলেন—সঠিক কিছুই মনে নাই ইত্যাদি। শ্রদ্ধেয় সতীশ চক্রবর্তী (খুলনা) বলেন—জানলেও এই সকল কথা প্রকাশ করতে মন চায় না।

শ্রদ্ধেয় শ্রীযতীনলোচন মিত্র বলেন—"৩নং ছিদাম মুদি লেনে সেদিন সন্ধ্যার দিকে 'যাদুদা', 'সতীশদা' প্রমুখ কয়েকজন বিশিষ্ট বিপ্লবী উপস্থিত ছিলেন, এমন সময় অতুল ঘোষ এসে বলেন যে, 'ওরা জমা হয়েছে, টেগার্ট-ও আসবে বোধ হয়।'......তখনই 'কুন্তল'

---

*এই বর্ণনা পাওয়া গেছে কোন আক্রান্ত ব্যক্তিরই স্বমুখ থেকে।

†অপরপক্ষে শোনা উক্ত গৃহে যাওয়ার আগে, স্ব স্ব আরদালির সাহায্যে তাঁদের রিভলবারগুলি নিজ নিজ বাড়িতে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। আর জীবনবাবু তাঁর রিভলবার ওপরের ঘরে রেখে এসেছিলেন।

(ক) শ্রীগঙ্গানারায়ণ চন্দ তাঁর 'অবিস্মরণীয়' নামক গ্রন্থের প্রথম খণ্ডে লিখেছেন—"গৃহস্বামী সতীশ ব্যানার্জী সরে পড়লেন।" (পৃঃ ৪৩।)

শ্রীসুপ্রকাশ রায় তাঁর 'ভারতের বৈপ্লবিক সংগ্রামের ইতিহাস' নামক গ্রন্থে লিখেছেন—"২১শে অক্টোবর রাত্রি সাড়ে দশ ঘটিকার সময় মস্‌জিদবাড়ি স্ট্রীটের এক ঘরে বসিয়া পুলিশ ইন্সপেক্টর সতীশ ব্যানার্জী দুইজন দারোগার সহিত বিপ্লবীদের বিরুদ্ধে পরামর্শ করিতেছিলেন" (পৃঃ ২০৩)।

*শ্রদ্ধেয় শ্রীনলিনী কর বলেন বাড়ির নম্বর ৩ নয় ২ নম্বর হবে।

আর 'ঠাকুর' রিভলবার নিয়ে রওনা হয়ে যান।" (ক)

শ্রদ্ধেয় ডাঃ যাদুগোপাল মুখোপাধ্যায় তাঁর ৩০।৭।৬৪ তারিখের পত্রে লিখেছেন—"যতীনলোচন মিত্র......যে সংবাদ দিয়েছেন সে সম্বন্ধে আমার কিছু মনে পড়ছে না। ৩নং ছিদাম মুদি লেন ছিল অতুল ঘোষদের বাড়ি।"

অতঃপর উপরোক্ত 'ঠাকুরের' পুরো নাম সম্বন্ধে শ্রদ্ধেয় সতীশচন্দ্র চক্রবর্তী বলেন—"সে ছিল কুমিল্লার নেপাল ঠাকুর।"

বিপ্লবী সুধীন্দ্রনাথ বসুরায় বলেন—"মৈমনসিংহের মংলা রায় ওরফে দুর্গাপ্রসন্ন রায় তখন আত্মগোপন অবস্থায় অনেক সময় তাঁর সঙ্গেও থাকতেন। সেই সময় তিনি (সুধীন্দ্র) দুর্গাপ্রসন্নের নিজমুখে যা' শুনেছিলেন তার সারমর্ম হচ্ছে—চার-পাঁচজন বিপ্লবী এই শত্রু-নিধন যজ্ঞে অংশ গ্রহণ করেছিলেন। সেই দলে দুর্গাপ্রসন্ন তথা মংলা রায়-ও ছিলেন।

অতঃপর কোন স্বনামধন্য বিপ্লবীর প্রথম গুলীটি, লক্ষ্যভ্রষ্ট হওয়ার জন্যই হোক অথবা যে কোন কারণেই হোক, ঘরের আলোতে লাগে। তারপরে তাঁরা বেপরোয়াভাবে গুলী চালাতে চালাতে গোয়েন্দাদের তাড়া করে ঐ বাড়ির দু'তলা পর্যন্ত উঠে যান।"

প্রসঙ্গত শ্রদ্ধেয় শ্রীললিতমোহন বসাকের বিবৃতির কিয়দংশও এখানে উল্লেখ করা গেল।—"৯৯ নং মস্‌জিদ্‌বাড়ি স্ট্রীটের হত্যাকাণ্ডে......কুন্তল চক্রবর্তী ছিল। পরদিন সকালবেলায় ২টি রিভল্‌বার সে ললিত বসাকের কাছে রাখিয়া চলিয়া যায়। কুন্তল চক্রবর্তী অ্যাব্‌স্‌কণ্ড্‌ করিল। সি আই ডি অফিসারেরা তাহার কোন সন্ধান না পাওয়াতে ব্রিটিশ গভর্নমেণ্ট কুন্তল চক্রবর্তীর নামে দুই হাজার টাকা পুরস্কার ঘোষণা করিলেন।"—(স্বাঃ ললিতমোহন বসাক, তাং ২।৮।৬০)।

অতঃপর নিক্‌সন্‌ সাহেবের ১৯১৭ সালের রিপোর্টে দেখা যায়—"..there is distinct evidence to show that members of the Barisal Party were concerned in the Musjidbari murder of 21. 10. 1915 (p. 79)"—। অর্থাৎ বরিশাল পার্টির সভ্যদের যে ২১।১০।১৯১৫ তারিখে মসজিদবাড়ির হত্যাকাণ্ডে সংযোগ ছিল তার স্পষ্ট সাক্ষ্য বিদ্যমান রয়েছে। এই অংশটি শ্রদ্ধেয় মনোরঞ্জন গুপ্তের সামনে উপস্থাপিত করায় তিনি তিনটি নামের উল্লেখ করেছিলেন—"মনোরঞ্জন, ভূপতি মজুমদার, আর ব্রজেন দত্ত (এখন ডাক্তার)" এই বলে।

উপরোক্ত তথ্য থেকে বুঝবার অবকাশ থাকে না যে, বিপ্লবী শ্রীসুধীন্দ্রনাথ বসুরায় কথিত শ্রদ্ধেয় শ্রীদুর্গাপ্রসন্নের উক্তির সঙ্গেই আসল ঘটনার অনেকটা মিল পাওয়া যায়। অর্থাৎ উক্ত সংঘটনে একাধিক বিপ্লবী যুক্ত ছিলেন, আর ঐ শত্রু-নিধন যজ্ঞে যাঁরা অংশগ্রহণ করেছিলেন তাঁদের মধ্যে (১) কুন্তল চক্রবর্তী, (২) ঠাকুর তথা কুমিল্লার নেপাল ঠাকুর, (৩) মৈমনসিংহের শ্রীদুর্গাপ্রসন্ন রায় ওরফে মংলা রায়, (৪) শ্রীমনোরঞ্জন গুপ্ত, (৫) শ্রীভূপতি মজুমদার, ও (৬) শ্রীব্রজেন দত্ত ওরফে জগা দত্ত অন্যতম। এখন এই সম্পর্কে কবির ভাষায় বলতে ইচ্ছা হয়—

"উন্মত্ত সে অভিসারে
তব বক্ষোহারে
ঘন ঘন লাগে দোলা—ছড়ায় অমনি
নক্ষত্রের মণি;"

(৩ পৌষ ১৩২১ সালে রচিত ৮নং কবিতা—'বলাকা')

পরিশিষ্ট—শোনা যায় এই ঘটনার পরে যাদুগোপাল (পরে ডাক্তার), নলিনী কর, মন্মথ বিশ্বাস, পাঁচুগোপাল ব্যানার্জী, (ওরফে লম্বু), নেপাল ঠাকুর প্রভৃতি মৈমনসিংহ অঞ্চলে আত্মগোপন করেন। এ হ'লো শ্রদ্ধেয় সতীশ ঠাকুরের উক্তি, ২৯।৮।৬৪ তারিখে শোনা। (এই সম্বন্ধে শ্রদ্ধেয় নলিনী কর বলেন, ঐ সময়ে তিনি মন্মথ বিশ্বাস মৈমনসিংহ অঞ্চলে ছিলেন না। তাঁরা মৈমনসিংহ অঞ্চলে গিয়েছিলেন ১৯১৬ সালের শেষের দিকে চন্দননগরে পুলিশের হামলার পরে।

অতঃপর কুন্তল চক্রবর্তী সম্বন্ধে শ্রদ্ধেয় শ্রীললিতমোহন বসাকের এক স্বাক্ষরিত বিবৃতিতে প্রকাশ যে, কুন্তল ছিলেন ললিতবাবুর প্রতিবেশী আর থাকতেন শ্যামপুকুরের ৩নং নবকুমার রাহা লেনে। গড়পারের এথিনিয়ম্‌ স্কুলে তাঁর বিদ্যারম্ভ। ১৯১২ সালে কৃতিত্বের সঙ্গে ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে বিদ্যাসাগর কলেজ থেকে তিনি প্রথম বিভাগে আই এস-সি পাশ করেন। ললিতমোহনের সান্নিধ্যেই তাঁর প্রথম জীবন অতিবাহিত হয়েছিল এবং প্রথম দিকে দামোদর বন্যা ইত্যাদিতে সেবার কাজেও কুন্তল আত্মনিয়োগ করেছিলেন। ১৯১৪ সালে ললিতমোহনই কুন্তলকে 'মহামায়া জিমনাস্টিক ক্লাবের' গুপ্তশালায় নিয়ে যান। শ্রদ্ধেয় হরিশচন্দ্র দাসগুপ্ত বলেন—১৯০৭ সাল বরাবর সময় থেকেই হরিশচন্দ্র, ললিতমোহন, হেমন্তকুমার বসু প্রভৃতি ৪২নং গ্রে স্ট্রীটের অনুশীলন সমিতিতে যাতায়াত করতেন। ১৯০৯ সাল আন্দাজ সময়ে কলকাতা অনুশীলন সমিতি বে-আইনী ঘোষিত হওয়ার পরে 'মহামায়া জিম্‌নাস্টিক ক্লাবের' মাধ্যমে তাঁরা একটি গুপ্ত সমিতি প্রতিষ্ঠা করেন। মহামায়া জিম্‌নাস্টিক্‌ ক্লাবের কর্ণধার ছিলেন জাস্টিস্‌ সারদাচরণ মিত্রের ভ্রাতুষ্পুত্র সুশীলকুমার মিত্র। সুশীলকুমারকে অবশ্য গুপ্ত সমিতির বিষয় কিছুই জানান হয় নি। ১৯১৩ সাল আন্দাজ সময়ে সমিতির ইঙ্গিতে ললিতমোহনই কুন্তলকে সমিতিতে আনেন। হরিশচন্দ্র আরো বলেন যে, তাঁদের এই এই নব-প্রতিষ্ঠিত গুপ্ত সমিতি স্বাধীনভাবেই চলত, তবে অনুশীলনের প্রধান সতীশচন্দ্র বসুর সঙ্গে যোগাযোগ ছিল। এইভাবে সতীশবাবুই ললিতমোহন ও হরিশচন্দ্রের যোগাযোগ ঘটান যতীনলোচনবাবুর সঙ্গে।

(ক) ১৯।৭।৬৪ তারিখে সকাল ৯·৩০ আন্দাজ সময়ে শ্রদ্ধেয় হরিশচন্দ্র দাশগুপ্তের উপস্থিতিতে লোচনবাবুর বাড়িতে বসে শোনা।

শ্রীগোলোকেন্দু ঘোষ-এর
দশচক্র
বিষ্ণুশর্মার পঞ্চতন্ত্রের কয়েকটি গল্প নিয়ে ছোটদের উপহারোপযোগী ও অভিনয়োপযোগী নাটিকা। সুধীবৃন্দ কর্তৃক উচ্চপ্রশংসিত। [১·৫০]
চতুর্দোলা
পুশকিন, ডস্টয়েভস্কি, চেখভ, টলস্টয়-এর বিশ্বশ্রেষ্ঠ চারটি গল্পের সার্থক অনুবাদ। [৩·০০]
অগ্রণী প্রকাশনী
এ-১, কলেজ স্ট্রিট মার্কেট, কলকাতা—১২

অতঃপর ললিতমোহন ও হরিশ্চন্দ্রের সহায়তায় কুন্তল সংস্পর্শে আসেন সতীশ বসুর। কুন্তলের বৈপ্লবিক কাজ প্রধানত পরিচালিত হয় সতীশচন্দ্র চক্রবর্তীর দ্বারায়। প্রকাশ, ২১শে অক্টোবর ১৯১৫ সালে মসজিদবাড়ি স্ট্রীটের ঘটনার পরে কুন্তল স্বাধীনভাবেই চলাফেরা করেছিলেন প্রথম কিছুদিন। তবে অন্যত্র বর্ণিত সালখিয়ার খণ্ডযুদ্ধের পরে তিনি আত্মগোপন করতে বাধ্য হয়েছিলেন। (ব্যক্তিগত শোনা ১৫।৮।৬৪ তারিখে)।

ললিতমোহন ও হরিশ্চন্দ্র দু'জনই বলেন যে, সরকারের গোয়েন্দা বিভাগ প্রথমে এই কুন্তল চক্রবর্তীর সন্ধান নির্ণয় করতে পারেন নি। কিন্তু ভাগ্যের বিধিলিপি লেখা ছিল অন্যভাবে। লোভের উলঙ্গ মত্ততায় তাঁরই এক সম্পর্কীয় ভাই বিশ্বাসঘাতকতা করে শেষে তাঁকে তুলে দিয়েছিলেন পুলিশের হাতে। শোনা যায়, আলোচ্য সময়ে কুন্তল আত্মগোপন করেছিলেন তিলজলা অঞ্চলে রেল লাইনের ধারে এক রেল কর্মচারীর আশ্রয়ে। আত্মগোপনের দুঃসহ কষ্টে তিনি এই সময় ক্ষয়রোগে আক্রান্ত হয়ে পড়েন। রোগের জ্বালায় তিনি এই সময় পত্রের সাহায্যে 'বিজলী' নামে তাঁর এক সম্পর্কীয় ভাই-এর কাছে খবর পাঠান। অপরদিকে পুলিশ তখন কুন্তলের সন্ধান না পেয়ে তাঁর গ্রেপ্তারের জন্যে পুরস্কার ঘোষণা করেছিলেন। হীনচেতা, অর্থের কাঙাল ভাই বিজলী ঐ দুঃস্থ বীরের সন্ধান পেয়ে সেই খবরটি পোঁছে দেন পুলিশের কানে। আর এইভাবেই শেষে কুন্তলের গ্রেপ্তার সম্ভব হয়। তারপরে কারাগারের অন্তরালে তিলে তিলে সেই রোগ ভীষণ আকার ধারণ করার পরে, শেষ অবস্থায় সরকার তাঁকে মুক্তি দেন। এইবারে মুমূর্ষু কুন্তলকে প্রথমে তুলে নিয়ে যান শ্রদ্ধেয় অমর ঘোষ তাঁর নিজের আশ্রয়ে। সুরু হয় তাঁর চিকিৎসা ও শুশ্রূষা। এই সম্পর্কে কুন্তলের তিনটি বিপ্লবী বন্ধুর ঐকান্তিক সেবার কথা উল্লেখযোগ্য। এই সেবারত বন্ধুরা ক্রমে যক্ষ্মাক্রান্ত হয়ে পর পর দেহত্যাগ করেন কুন্তলের আগেই। অতঃপর শেষ অবস্থায় কুন্তলকে নিয়ে যাওয়া হয় উত্তরপাড়ার বিপ্লবীবীর শ্রদ্ধেয় অমর চট্টোপাধ্যায়ের আশ্রয়ে। এই স্থানেই তিনি শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করেন। শেষের দিনে ঐ রোগশয্যার পাশে ছিলেন তাঁর বিপ্লবী জীবনের প্রথম সুহৃদ শ্রদ্ধেয় শ্রীললিতমোহন বসাক আর অন্তরঙ্গ বিপ্লবী সাথী শ্রদ্ধেয় শ্রীহরিশ্চন্দ্র দাশগুপ্ত। আর তাঁদেরই সৌজন্যে লুপ্ত পাতার এই পর্বটি আজ উদ্ধার করা সম্ভব হয়েছে। এ যেন কবির ভাষায়—

"সযত্ন-সেচন-সিক্ত নবোন্মুক্ত এই গোলাপের
রক্ত পত্রপুটে
কম্পিত কুণ্ঠিত কত অগণ্য চুম্বন-ইতিহাস
রহিয়াছে ফুটে।"

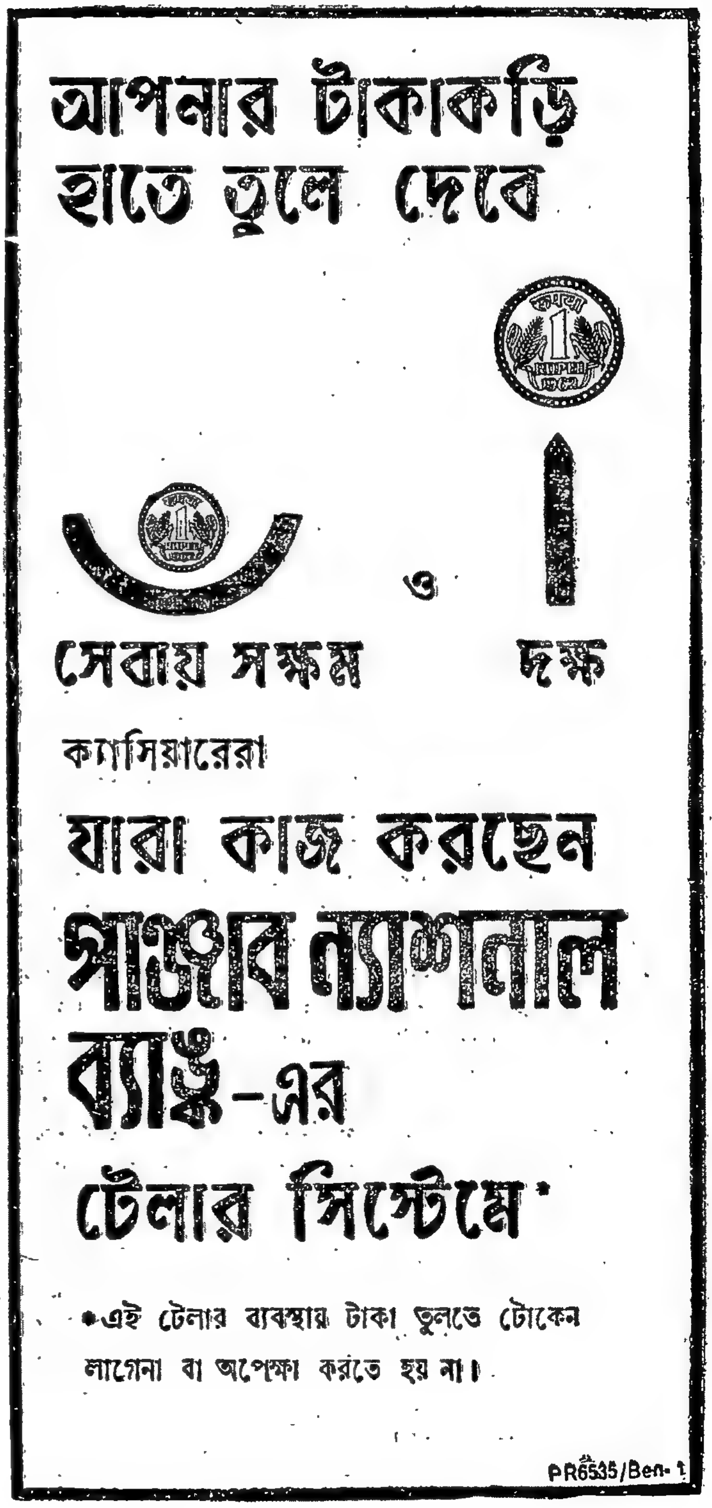

বিজ্ঞান ও বিশ্বের অন্তর্লোক

আশিস কুমার সিংহ

এ-বছর ৬ই সেপ্টেম্বর পরমাণুবাদের প্রবক্তা জন ডালটনের ২০০-তম জন্মদিন পূর্ণ হয়েছে। দৃশ্যমান জগতের অন্তর্লোকে যাঁরা বিজ্ঞানের দৃষ্টিতে তাকিয়েছেন, অষ্টাদশ শতকের এই ইংরেজ বিজ্ঞানী তাঁদের পুরোধা। কিংবা, আরও যথাযথ হয় যদি বলি, অন্যতম পুরোধা। কারণ, প্রায় উনবিংশ শতাব্দী পর্যন্ত আবিষ্কৃত বিজ্ঞানের বড় বড় তত্ত্বগুলি প্রধানত দর্শন-চিন্তার উত্তরাধিকারে উদ্ভূত হয়েছে। তাই শেষ পর্যন্ত যিনি কোন তত্ত্বকে একটি নির্দিষ্ট আকারে উপস্থিত করেছেন, তত্ত্বটি তাঁর নামে পরিচিতি লাভ করলেও তাঁর সমসাময়িক বিজ্ঞানীরাও প্রায় একই ধরণের চিন্তা করেছেন দেখা যায়। যেমন, বিবর্তনবাদের জনক হিসেবে আমরা ডারউইনের নাম করে থাকি। বিপুল অধ্যবসায়ের সঙ্গে পড়াশুনা এবং পরীক্ষা-নিরীক্ষার দ্বারা ডারউইন এই যুগান্তকারী তত্ত্বটিকে একটি নির্দিষ্ট আকার দান করেছিলেন বলে তাঁর নামে এর পরিচিতি অত্যন্ত স্বাভাবিক ও সংগত হয়েছে। কিন্তু পাশাপাশি মনে রাখা উচিত যে ডারউইনের সময়ে এবং তাঁর পূর্বেও অনেক দার্শনিক ও বিজ্ঞানী একই ধরণের চিন্তার দ্বারা বিবর্তনবাদের উপযুক্ত ক্ষেত্রটি প্রস্তুত করেছিলেন। ঠিক তেমনি, জন ডাল্‌টনের পরমাণুবাদের ক্ষেত্র প্রস্তুত হয়েছিল তাঁর পূর্বসূরী ও সমসাময়িক বিজ্ঞানীদের হাতে। অষ্টাদশ শতকের এই বিজ্ঞানীদের প্রয়াসে যার শুরু, বিজ্ঞানের সেই অন্তর্লোকযাত্রা পরবর্তীকালে কতদূর এগিয়েছে, ডাল্‌টনের দ্বিতীয় শতবার্ষিকী উপলক্ষে তার একটা ছোট্ট বিবরণ দেওয়া যাক।

আমাদের চারপাশে যে জড় পৃথিবীকে আমরা দেখতে পাই তার মূলে কি আছে এ-জানার ইচ্ছা মানুষের চিরন্তন। একেবারে গোড়ার দিকে শুধু চিন্তার দ্বারা সে এ প্রশ্নের উত্তর দিতে চেষ্টা করেছিল। প্রাচীন ভারতীয় ও গ্রীক দার্শনিকদের একটা ধারণা ছিল এই যে, জগতের সব কিছুই চোখে দেখা যায় না এমন সূক্ষ্ম এই কণাকে অণু আখ্যা দিয়েছিলেন। গ্রীকেরা এই কণাকে বলতেন অ্যাটম্‌। ভারতবর্ষ ও গ্রীক উভয় স্থানেই আর একটি ধারণাও প্রচলিত ছিল। তাঁরা প্রধানত চারিটি বস্তুকে বিশ্বের মূল উপাদান রূপে নির্দিষ্ট করেছিলেনঃ ক্ষিতি বা মাটি, অপ্‌ বা জল, তেজ বা আগুন এবং মরুৎ বা বাতাস। ভারতবর্ষে ব্যোম বা আকাশকেও একটি মৌলিক উপাদান রূপে ধরা হত, বৌদ্ধ দার্শনিকেরা অবশ্য প্রথমোক্ত চারটি পদার্থকেই মূল উপাদান রূপে স্বীকার করেছেন।

লক্ষ্য করলেই দেখতে পাবেন চারপাশে যে পদার্থগুলি অফুরন্তভাবে দেখা বা অনুভব করা যায় বিশ্বের মৌলিক পদার্থ বলতে মানুষ প্রথমে সেইগুলিকেই ধরে নিয়েছে। আরও দ্রষ্টব্য যে, এদের প্রত্যেকটিই বেঁচে থাকার জন্যে অপরিহার্য। আমাদের অস্তিত্বের স্বাচ্ছন্দ্যে যে বিঘ্ন ঘটায়, তাকেই আমরা জটিল বলি। তাই মানুষ এদেরই সবচেয়ে সরল প্রকৃতির পদার্থ বলবে তাতে আর আশ্চর্য কি? সেই গোড়া থেকেই মানুষের চিন্তা যে, তার জীবনকে ভিত্তি করেই গড়ে উঠেছে এটা তার একটা নিদর্শন।

যাঁদের চিন্তা ছিল আরও গভীর প্রসারী, তাঁরা কিন্তু ব্যাপারটিকে আর একটু ঘোরালো করে ফেললেন। এ্যারিস্টটল্‌ বললেন, ক্ষিতি, অপ্‌, তেজ বা মরুৎ—পদার্থের এই চারিটি মৌলিক উপাদান পরস্পরের থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন নয়। অন্তরে এরা নির্গুণ এক, সেই একের সঙ্গে বিভিন্ন ধর্ম যুক্ত হয়ে আমাদের চোখে পদার্থগুলিকে ভিন্নরূপে প্রকাশিত করে। তিনি সেই আদি পদার্থের সঙ্গে যুক্ত হতে পারে এমন চারিটি ধর্মের নাম করলেনঃ উষ্ণতা, শৈত্য, শুষ্কতা এবং আর্দ্রতা। তাঁর মতে, আদি পদার্থটি যখন উষ্ণ এবং শুষ্ক হয়, তখন আগুনের রূপে প্রকাশিত হয়, উষ্ণ এবং আর্দ্র হলে হয় বাতাস, শীতল এবং শুষ্ক হলে রূপ পায় মাটির, আর শীতল এবং আর্দ্র হলে প্রকাশিত হয় জলের রূপে। এ্যারিস্টটলের এই চিন্তাটি ছিল শুধু চিন্তাই, উপযুক্ত পরীক্ষার অভাবে এর পক্ষে কোন প্রমাণ ছিল না। প্রমাণহীন বিশ্বাসের এই যে বীজ রসায়নে বপন করা হল, পরে তার কুপ্রভাব কাটাতে প্রায় দু' হাজার বছর লেগেছে।

এ্যারিস্টট্‌লের মতটিকে তাঁর পরবর্তী দার্শনিকেরা জীবন সংক্রান্ত দর্শনচিন্তার সঙ্গে মিশিয়ে একটা অদ্ভুত নতুন জিনিস দাঁড় করালেন। জড় জগতের 'আদি' পদার্থটিকে তাঁরা মেশালেন জীবের আত্মার সঙ্গে; আর বললেন, বস্তুর আভ্যন্তরীণ 'আদি পদার্থ' যখন আত্মার মত নির্গুণ, তখন স্বভাবের উন্নতি সাধন ক'রে যেমন আত্মার উন্নতিসাধন করা যায়, তেমনি বাজে ধাতুর বাজে গুণগুলি কোন উপায়ে উন্নত ক'রে তুলতে পারলেই তাদের সোনা ক'রে ফেলা যাবে। এই সোনা করার ব্যর্থ সাধনায় ইউরোপ সারা মধ্যযুগ এবং তারপরেও বেশ কিছুদিন মাথা ঘামিয়েছে।

এর বিরুদ্ধে প্রথম বাধা এল ষোড়শ-সপ্তদশ শতকে। এই সময়ে বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখা পরীক্ষা-নিরীক্ষার দিকে ঝুঁকছিল ক্রমাগত। তারই প্রভাবে রসায়ন শাস্ত্রের বয়সে তরুণতর একদল বিজ্ঞানী স্বর্ণ-সন্ধান ত্যাগ করে জীবদেহের রাসায়নিক গঠন নিয়ে গবেষণা শুরু করলেন। ইতিহাসে এঁদের ইয়াট্রোরসায়নবিদ বলা হয়। কিন্তু এতে বিশ্বের মূল উপাদান সম্বন্ধে ধারণার কোন পরিবর্তন হল না। বরং স্টল নামে একজন জার্মান রসায়নবিদ সতের-আঠারো শতকের সন্ধিতে দাঁড়িয়ে এমন একটি অদৃশ্য বস্তুর ধারণা ও প্রচার করলেন, যাকে মৌলিক পদার্থ আগুনের গুণাবলীর মূর্ত প্রতীক বলা যায়। বস্তুটির নাম ফ্লজিস্টন্‌। তাঁর মতে, দহনের পরে এই বস্তুটি পদার্থকে ত্যাগ ক'রে চলে যায় বলেই তার ছাই পড়ে থাকে। ছাইকে আমরা স্বভাবত খুবই অকেজো বলে মনে করি। তাই দহনের ফলে খুবই দামী কোন জিনিস পদার্থকে ছেড়ে চলে যায় এটা ধারণা হওয়া স্বাভাবিক। স্টলের ফ্লজিস্টন এই রকম একটি কল্পিত দামী পদার্থ। পরে যখন দেখা গেল যে, মূল বস্তুটির চেয়ে তার ছাই-এর ওজন বেশি, তখন বোঝা গেল, মূল বস্তু থেকে দহনের ফলে কোন পদার্থ চলে যায় না, আসলে যুক্ত হয়। এখন আমরা জানি, নতুন যুক্ত এই বস্তুটির নাম অক্সিজেন। কিন্তু অষ্টাদশ শতকের আগে এটা জানা ছিল না।

মৌলিক পদার্থের পুরোনো ধারণাকে সর্বপ্রথম সার্থকভাবে আঘাত করলেন অষ্টাদশ শতাব্দীর ডঃ ব্ল্যাক। ইনি গ্লাসগো বিশ্ববিদ্যালয়ের রসায়নের অধ্যাপক ছিলেন। অত্যন্ত সাধারণ একটি পরীক্ষার দ্বারা এ-কাজ সম্ভব করেছিলেন ইনি।

ইনি দেখলেন, খানিকটা চূণজলকে খোলা বাতাসে রেখে দিলে সেটা দুধের মত সামান্য ঘোলাটে হয়ে যায়, কিন্তু বন্ধ বোতলে রাখলে আর ঘোলাটে হয় না। এর দ্বারা প্রমাণিত হল যে, বাতাসের কিছুটা অংশ চূণজলকে ঘোলা করার কাজে লাগে, বাকিটা যেমন থাকার তেমনিই থাকে। তার মানে, বাতাস তাহলে অন্তত দুটি পদার্থের সমবায়ে গঠিত; কোন মৌলিক পদার্থ নয় এটি। বাতাসের যে-অংশটি চূণজলে বাঁধা প'ড়ে তাকে ঘোলা করে, ব্ল্যাক তার নাম দিলেন বন্ধ বাতাস বা 'ফিক্সড্ এয়ার'। এই বন্ধ বাতাসের বর্তমান নাম কার্বন-ডাই-অক্সাইড। সাধারণ বাতাসে এর পরিমাণ খুব কম। ১০০০ সি-সি বাতাসে মাত্র ৩ সি-সি। শ্বাস-১০০০ সি-সি'তে এর পরিমাণ ৫০ সি-সি'র প্রশ্বাসে আমরা যে-বাতাস ছেড়ে দিই তার কাছাকাছি। তাই চূণজলের মধ্যে একটি ফাঁপা নলের সাহায্যে ফুঁ দিলে সেটা বেশ ঘোলাটে ভাব ধারণ করবে—শুধু খোলা বাতাসে রেখে দিলে যা হত তার চেয়ে অনেক বেশি।

ব্ল্যাকের পরীক্ষার প্রায় কুড়ি বছর পর প্রিস্টলি নামে এক ইংরেজ বিজ্ঞানী বাতাস নিয়ে পরীক্ষা করতে করতে এর মধ্যে এমন একটি বায়বীয় বস্তুর সন্ধান পান, যেটি জীবের বেঁচে থাকার জন্যে ও দহনের কাজে অপরিহার্য। এই সময় আকস্মিকভাবে একদিন একটি থার্মো-মিটার ভেঙে ফেলেন তিনি। নিষ্ক্রান্ত পারদ বাতাসের সংস্পর্শে এসে সামান্য রূপান্তরিত হচ্ছে লক্ষ্য করে তিনি পারদের একটি লাল যৌগ পদার্থকে (যে পারদ বাতাসে পুড়িয়ে প্রস্তুত হয়েছিল) আতস কাঁচের সাহায্যে গরম করেন। কাঁচ-টির ব্যাস ছিল বার ইঞ্চির মত। শিশুর মত ল্যাবরেটরীর সব জিনিসের উপরে এর কাজ পরীক্ষা করা তখন প্রায় তাঁর খেলার মত দাঁড়িয়ে গিয়েছিল। উত্তাপে পারদের লাল যৌগ থেকে যে বায়বীয় পদার্থটি বেরিয়ে এল, তাই হল মানুষের আবিষ্কৃত প্রথম অক্সিজেন। প্রিস্টলি স্টলের খুব ভক্ত ছিলেন। তাই তিনি এর নাম দেন "ফ্লজিস্টনমুক্ত বাতাস।" কেন না, অক্সি-জেন নিজে চলে না দেখে তিনি ভেবে-ছিলেন, এর মধ্যে আগুনের গুণসমন্বিত ফ্লজিস্টন একেবারেই নেই। ১৭৭৪ খৃস্টাব্দের, ১লা আগস্ট আবিষ্কারটি ঘটে। সুইডিশ বিজ্ঞানী শিলীও প্রায় একই সময়ে এই আবিষ্কার করেন। পরে ফরাসী বিজ্ঞানী ল্যাভয়সিয়ের এর নাম দেন অক্সিজেন। ওদিকে ইতিমধ্যে ১৭৬৬ খৃস্টাব্দে—অর্থাৎ ঠিক দশ' বছর আগে ক্যাভেণ্ডিশ নামে আর এক ইংরেজ বিজ্ঞানীর হাতে হাইড্রোজেনের বিভিন্ন ধর্মের আবিষ্কার ঘটে। তিনি এও দেখান যে, জলও কোন মৌলিক পদার্থ নয়, দুভাগ হাইড্রোজেন এবং এক ভাগ অক্সিজেনের সমবায়ে গঠিত এটিও একটি যৌগিক পদার্থ।

অস্টাদশ শতকের এই রসায়নবিদদের হাতে রসায়ন যখন তার পুরোনো বিশ্বাসের সংস্কার ত্যাগ ক'রে নতুন পরীক্ষামূলক বিজ্ঞানে রূপান্বিত হচ্ছে সে-সময় ডাল্টন কৈশোর অনুত্তীর্ণ। পরবর্তী জীবনে তিনি যে-গবেষণাগুলি করেন তার মধ্যে পরমাণুবাদের আবিষ্কার সবচেয়ে কৃতিত্বপূর্ণ। পরমাণুবাদ ছাড়া অন্যান্য আবিষ্কারের মধ্যে বর্ণান্ধতার আবিষ্কার উল্লেখযোগ্য। তিনি নিজে বর্ণান্ধ ছিলেন, অর্থাৎ বর্ণের কোন বোধ তাঁর ছিল না। রসায়নে পূর্বসূরীদের পথে গবেষণা ক'রে বিভিন্ন বস্তু তাদের ওজনের কি অনুপাতে পরস্পরের সঙ্গে রাসায়নিক মিলনের দ্বারা নতুন বস্তুর জন্ম দেয় সে-সম্বন্ধে তিনি গুরুত্বপূর্ণ নিয়মের আবিষ্কার করেন। এই গবেষণার সময় পদার্থের চরম কণা সম্বন্ধে তাঁর চিন্তা জাগে। অবশেষে তাঁর রসায়ন-গবেষণার ফলাফলকে দার্শনিক পরমাণু-বাদের সঙ্গে মিলিয়ে প্রায় মধ্য বয়সে পরমাণুবাদ নামে বিখ্যাত তত্ত্বটি প্রচার করলেন। তত্ত্বটিতে তিনি বললেন:

প্রত্যেক পদার্থই পরমাণু নামক খুব ছোট ছোট কণার দ্বারা গঠিত। ভিন্ন পদার্থের পরমাণুর ওজন ও অন্যান্য ধর্ম ভিন্ন, কিন্তু একই পদার্থের পরমাণুর ও অন্যান্য ধর্মের ওজন একই। রাসায়নিক মিলন পরমাণুদের মধ্যেই সংঘটিত হয় এবং পরমাণু অবিভাজ্য।

তত্ত্বটিতে একটি প্রধান ত্রুটি ছিল এই যে ডালটন মৌলিক ও যৌগিক উভয় প্রকার পদার্থের ক্ষুদ্রতম কণাকেই পরমাণু নাম দিয়ে অবিভাজ্য ব'লে ঘোষণা করে-ছিলেন। কিন্তু মৌলিক পদার্থের পরমাণু তখন অবিভাজ্য হলেও যৌগিক পদার্থের ক্ষুদ্রতম কণা নিশ্চয়ই অবিভাজ্য ছিল না। তাকে রাসায়নিক বিক্রিয়ার সময় ভেঙে মৌলিক পদার্থের একাধিক পরমাণু পাওয়া যেতে পারত। অ্যাভোগাড্রো নামে এক ইতালীয় বিজ্ঞানী এই ত্রুটিটি দেখিয়ে দিয়ে যৌগিক ও মৌলিক পদার্থের মধ্যে একটি পার্থক্য টানলেন এবং যৌগিক পদার্থের ক্ষুদ্রতম কণাকে তফাৎ করবার জন্যে তাদের নাম দিলেন অণু।

এইভাবে ঊনিশ শতকের মধ্যে মানুষ অণু এবং পরমাণুর ধারণা লাভ করেছে। চোখে দেখা যায় না বস্তুর এমন ক্ষুদ্র কণাকে শুধু দর্শনের চিন্তা দিয়েই নয়, বিজ্ঞানের পরীক্ষা দিয়েও কয়েকটি নিয়মে বাঁধা গেল এভাবে। কিন্তু আমরা সকলেই জানি, স্বাভাবিকভাবেই বিজ্ঞান এখানেই তার বিশ্বের অন্তর্লোকে যাত্রা থামিয়ে রাখে নি। পরবর্তী শতকেই পরমাণুকেও ভেঙে তার রহস্য উদ্ঘাটন করতে সে সক্ষম হয়েছে। পরমাণুর সেই অন্তর্লোকে একবার উঁকি দিয়ে দেখা যাক।

বর্তমান ধারণা অনুযায়ী একটি কেন্দ্র এবং তার চারদিকে বিভিন্ন কক্ষপথে আবর্তনশীল এক বা একাধিক ইলেকট্রন যা বিয়োগতড়িৎ নিয়ে পরমাণু গঠিত। কেন্দ্রে থাকে যোগতড়িৎ। ডালটনের সমসাময়িক বিজ্ঞানী প্রাউট এই যোগ-তড়িতের কল্পনা করেছিলেন বলে তাঁর সম্মানার্থে একে নাম দেওয়া হয়েছে প্রোটন। ইলেকট্রনের নামকরণের কারণ পরে বলছি। একটি পরমাণুতে যতগুলি প্রোটন, ঠিক ততগুলি ইলেকট্রন থাকে; ফলে পরমাণুটি সামগ্রিকভাবে যোগ-বিয়োগে কাটাকাটি ক'রে তড়িৎ শূন্য হয়। ইলেকট্রনের তুলনায় প্রোটন অত্যন্ত ভারী, ইলেকট্রন এত হাল্কা যে তার ভর নেই বললেই চলে। একটি প্রোটনের ওজন একটি হাইড্রোজেন পরমাণুর ওজনের সমান। এই পরমাণু সবচেয়ে সরল, এতে একটি প্রোটন ও একটি ইলেকট্রন বর্তমান। সব মিলিয়ে পরমাণু জগৎ আমাদের সৌর জগতের সঙ্গে তুলনীয়।

কেন্দ্রে প্রোটন ছাড়া আর একটি পদার্থও থাকে যার যোগ বা বিয়োগে কোন তড়িৎ নেই বলে নাম হয়েছে নিউট্রন বা নিরপেক্ষ কণিকা। এদের ওজন প্রোটনের সমান। পরমাণুকে এরা শুধু ভারী করে। এখন, কোন পদার্থের রাসায়নিক ধর্ম তার পরমাণুর প্রোটন সংখ্যার উপর নির্ভর করে বলে পরমাণুতে শুধু নিউট্রনের যোগে রাসায়নিক ধর্মের পরিবর্তন হয় না, যদিও ওজন বেড়ে যায়। যেমন ধরুন, হাইড্রোজেনের কেন্দ্র-বর্তী প্রোটনটির সঙ্গে যদি আর একটি নিউট্রন এসে হাজির হয় তবে নতুন পদার্থটির ওজন হাইড্রোজেন পরমাণুর চেয়ে বেশি হলেও তার রাসায়নিক ধর্ম হাইড্রোজেনের অনুরূপ থাকবে। এ-রকম একটি ভারী হাইড্রো-জেন সত্যিই আছে। তার নাম ডয়টেরিয়াম। দুটো হাইড্রোজেন পরমাণুর সঙ্গে একটি অক্সিজেন পরমাণুর রাসায়নিক মিলনে উৎপন্ন হয় জল, হাইড্রোজেনের স্থানে দুটি ডয়টেরিয়াম পরমাণু বসালে পাওয়া যাবে যাকে বলে ভারী জল। জলের সঙ্গে এর রাসায়নিক ধর্মের কোন তফাৎ নেই। পান করলে শরীরেও এ জলের মতই কাজ করে। এ-রকম যে-সব মৌলিক পদার্থের রাসায়নিক ধর্ম এক, অথচ পরমাণুর ওজন

আলাদা তাদের বলা হয় পরস্পরের আইসোটোপ।

খুব সাদা কথায় পরমাণু সম্বন্ধে এই হল বর্তমান ধারণা। পরমাণুকে কি ক'রে ভাঙা যায় এবার দেখা যাক।

পরমাণুর বাইরে ইলেকট্রনকে ভেঙে বার ক'রে আনা খুব কঠিন নয়। ধাতুর পাতে আলো ফেললে ইলেকট্রন বেরিয়ে আসে। একটি শূন্য কাচপাত্রের মধ্য দিয়ে খুব চাপে বিদ্যুৎ-চালনা করতে চেষ্টা করলে বিয়োগতড়িৎপাত (ক্যাথোড) থেকে ইলেকট্রনের রশ্মি নির্গত হয়, একে বলে ক্যাথোড রশ্মি। একটি এ্যাম্বার দণ্ডকে রেশমী বস্ত্র দ্বারা ঘর্ষণ করলে এ্যাম্বার দণ্ডটি যে বিয়োগতড়িৎ ও বস্ত্রটি যোগতড়িৎ-যুক্ত হয় এই ঘটনাটি প্রায় ৭০০ খৃষ্ট পূর্বাব্দে থেলস্ নামে গ্রীক পণ্ডিত দেখেছিলেন। এখন জানা গেছে রেশমী বস্ত্র থেকে ইলেকট্রন এ্যাম্বার দণ্ডে চলে আসায় এটা ঘটে। এ্যাম্বারকে গ্রীক ভাষায় বলে ইলেকট্রন। এর থেকেই ইলেকট্রন নামটা চলে এসেছে।

পরমাণুর কেন্দ্রকে ভাঙা কিন্তু এত সহজ নয়। তেজস্ক্রিয় পদার্থের বিকীর্ণ কণার সাহায্যে পরমাণুর কেন্দ্রকে আঘাত করলে তবেই তাকে ভাঙা যায়। যে পরমাণুকে ভাঙা হবে তার ওজন যত বেশি হয় ততই ভাঙা সহজ। ইউরেনিয়াম পরমাণুকে ভাঙা সহজ বলেই অ্যাটম বোমায় এর ব্যবহার।

বিজ্ঞানের অন্তর্লোক যাত্রার এই কাহিনী থেকে আমরা দর্শন ও বিজ্ঞানের পারস্পরিক সম্পর্ক সম্বন্ধে একটা ধারণা করতে পারি। ডালটনের আগে যা ছিল শুধুই দার্শনিক বিশ্বাস—ডালটন তাকে একটা বিজ্ঞানসম্মত রূপ দিয়েছিলেন—তাঁর কৃতিত্ব এইখানে। পরবর্তী সময়ে সেই পরমাণুকে যখন আরও ভেঙে ফেলা গেল তখন কিন্তু এমন অনেক তথ্য দেখা গেল যা দর্শনচিন্তাকে প্রভাবিত করছে। উদাহরণস্বরূপ অনিশ্চয়তাবাদের কথা বলা যায়। হাইসেনবার্গ নামে এক তরুণ জার্মান বিজ্ঞানী দেখিয়েছেন যে বিশ্বের অন্তর্লোকের অধিবাসী ইলেকট্রনের অবস্থান এবং ভরবেগ একই সঙ্গে নির্ভুল-ভাবে মাপা সম্ভব নয়। একটাকে নির্দিষ্ট-ভাবে মাপতে গেলে মাপার পদ্ধতিতেই অন্যটা পরিবর্তিত হয়। এই তথ্যটি জড়জগৎ সংক্রান্ত বর্তমান দর্শনচিন্তাকে প্রভাবিত করছে। এবং ফলত দেখা যাচ্ছে জড়সংক্রান্ত দর্শন কল্পনাকে ত্যাগ করে ক্রমাগত পরীক্ষালব্ধ তথ্যনির্ভর হয়ে উঠছে।

আবার, জড়জগৎ সংক্রান্ত দর্শন-চিন্তার সঙ্গে প্রাণ সংক্রান্ত দর্শনের চিন্তা যে যুক্ত তার কিছু নিদর্শন আমরা উপরের আলোচনাতেই পেয়েছি। আমরা দেখেছি, কিভাবে মৌলিক পদার্থের আদি ধারণা জীবনকে ভিত্তি করেই গড়ে উঠেছিল। আত্মার সঙ্গে অ্যারিস্টটলের কল্পিত "বিশ্বের মূল পদার্থ"কে কিভাবে মেলানো হয়েছিল সেও দেখা গেছে। ইতিহাসে এখনও অবধি এ অবস্থার কোন পরিবর্তন হয় নি। তাই আধুনিক বিজ্ঞান যে জীবন সংক্রান্ত দর্শনকেও প্রভাবিত করতে চলেছে সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই।

কিন্তু জড়জগতে যে-তত্ত্ব খাটে তাকে আদ্যোপান্ত সেই অবস্থায় জীবজগতে প্রয়োগ করতে গেলে গুরুতর ভুল হতে পারে। জীবদেহকে নিছক জড়যন্ত্র বলে প্রচার করতে গিয়ে সতের শতকে রেনে দেকার্তে কি রকম ভুল করেছিলেন এর আগের আলোচনায় আমরা তার উল্লেখ করেছি।

এই কারণে জড়বিজ্ঞানকে সরাসরি জীবনের তাৎপর্য আলোচনায় আনা বিজ্ঞানসম্মত নয়। জড়বিজ্ঞানের সাহায্যে জীববিজ্ঞানের উন্নতি হলে তবেই আমরা জড়ের পরিপ্রেক্ষিতে জীবনের মানে বুঝতে পারব। বলা বাহুল্য মানুষের সব দর্শন-চিন্তার উদ্দেশ্য এই-ই। বিজ্ঞান আজ জড়বিশ্ব ও জীববিশ্বের অন্তর্লোকে প্রবেশ করে তার রহস্য উদ্ঘাটনের দ্বারা এই উদ্দেশ্যকে সফল করতে চলেছে। প্রাণবিজ্ঞান স্নায়ুতন্ত্র ও অন্যান্য কাজের এই উদ্দেশ্য সাধন করার দিকে অনেক দূর এগিয়ে গেছে বর্তমানে। তার ফলে অনেক আধিভৌতিক বিশ্বাস থেকে প্রাণ-দর্শনেরও মুক্ত হওয়ার বিপুল সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে আজ। জন ডালটনের জন্ম তথা অষ্টাদশ শতকের "রসায়ন শাস্ত্রের বিপ্লবে"র মাত্র দুশ' বছরের মধ্যে এতদূর বিজ্ঞানসম্মত হয়েছে মানুষের দৃষ্টি।

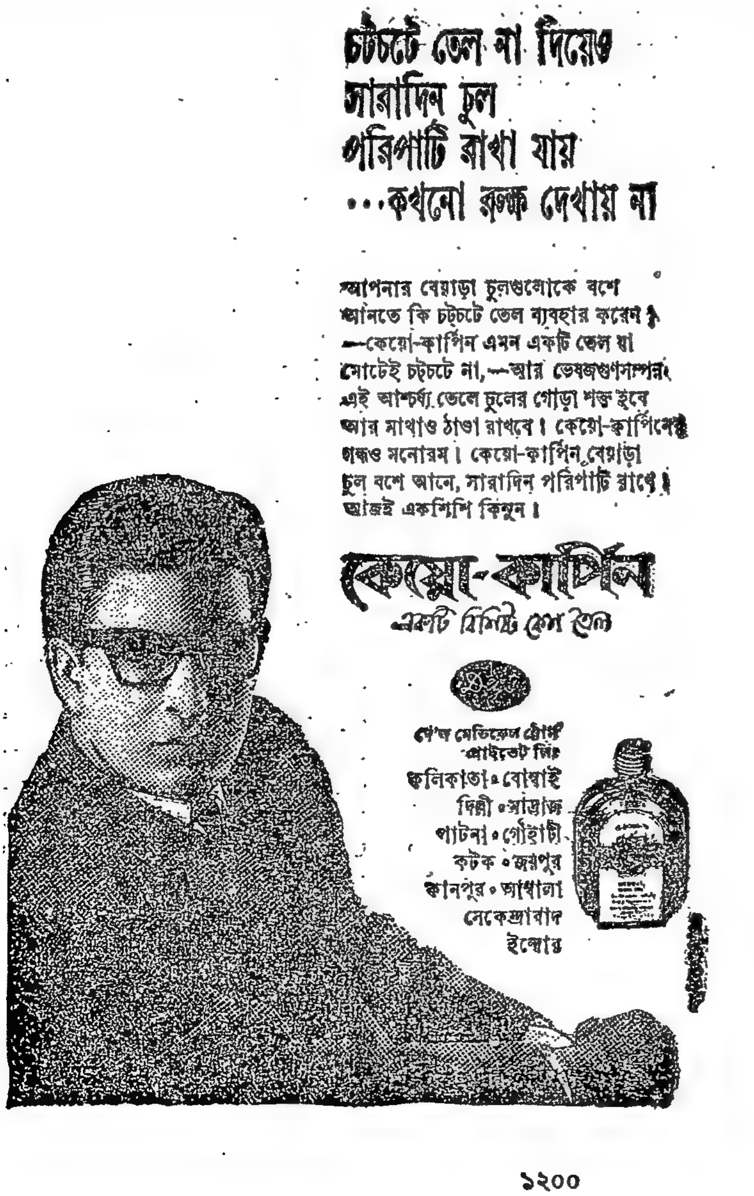

অন্য চোখে

কল্পনা বন্দ্যোপাধ্যায়

অ্যানা জানলা থেকে চোখ সরিয়ে স্বামীর বিছানার দিকে দেখল। গত রাত্রিতে পাতা পরিষ্কার টান টান বিছানার দিকে তাকিয়ে অ্যানা একটু অবাক হলো। কারণ ওর স্বামী আজ বিছানাটা অগোছালো করে রাখতে ভুলে গিয়েছে। নিজের ঘরে রাত না কাটালে ভদ্রলোক সকালে নিজের বিছানাটা একটু এলোমেলো করে রাখেন। চাকর-টাকরদের জানতে দিতে চান না আর কি! বিছানার কাছে ঝুঁকে এসে অ্যানা স্বামীর বালিশে মুখ রাখল। নরম ঠান্ডা বালিশে মাথা রেখে চোখ বুজে স্বামীর আদর অনুভব করল।

আজ বিকেলেই ওর স্বামী কর্মোপলক্ষে ক'দিনের জন্যে বাইরে যাবে। তাই অ্যানা জিনিসপত্র গুছিয়ে দেওয়ার জন্য এই ঘরে এসেছে। আলমারিটা খুলে অ্যানা দেখল ভিতরের একটা পাল্লা একেবারে এঁটে বসে আছে। একটা ছড়ি টেনে এনে সে পাল্লাটায় চাপ দিল, কিন্তু কপাট খোলার বদলে ঐ ছড়ির ভিতর থেকে একটা সরু ধারালো চকচকে ছোরা বেরিয়ে এলো। ভীষণ চমকে উঠে ও লাঠিটা হাত থেকে ফেলে দিল। একটু টানতেই ভিতরের পাল্লাটা খুলে গেল। যত রাজ্যের পুরোনো ময়লা জামা-কাপড় জড়ো হয়ে রয়েছে তার ভিতর। সেগুলি গুছিয়ে রাখতে গিয়ে একটা পুরোনো জ্যাকেটের পকেটের মধ্যে অ্যানা তার স্বামীর প্রথম স্ত্রীর ফোটোটা আবিষ্কার করল। উত্তেজনায় সাদা হয়ে গিয়ে এই অপরিচিতাকে ভালোভাবে দেখবার জন্য ফোটো হাতে ও জানলার কাছে ছুটে এলো। পুরোনো ফ্যাশানের একগাদা জামা-কাপড় পরে থাকার জন্য ছবির মেয়েটি যে কত সুন্দর তা বুঝতে একটু অসুবিধে হলো অ্যানার। কিন্তু ঐ সুন্দর মুখের দিকে তাকিয়ে ওর চোখ দুটিতে ঈর্ষা-মিশ্রিত ঘৃণা নেমে এলো। অ্যানা যে লোকটিকে এত ভালোবাসে তার প্রতি এই মেয়েটি যে কি করে ঐ রকম ব্যবহার করতে পারে তাই ভেবে ও অস্থির হয়ে উঠলো। অ্যানার বিরক্তির আর একটা কারণ ওর সঙ্গে ব্রিভিয়োর বিয়েতে ওর বাবা-মায়ের মত ছিল না। ওঁদের ধারণা ব্রিভিয়োর প্রথম স্ত্রীর বীভৎস মৃত্যুর জন্য ব্রিভিয়োই দায়ী।

ফোটোর পিছনটা উল্টোতেই চোখে পড়ল—"To my darling Victor, from his Almira—" বিশ্রী একটা অনুভূতিতে অ্যানার সর্বাঙ্গ ছেয়ে গেল। "Darling Victor" আর "his Almira"—এই কথা দুটো যেন মেয়েটি ভিক্টর আর আলমিরার ভালোবাসা যে কত নিবিড় ছিল তা অ্যানাকে জানিয়ে দেওয়ার জন্যেই লিখে রেখে গিয়েছে।

মেয়েলীসুলভ কৌতূহল নিয়ে আর একবার ছবিটা উল্টেপাল্টে দেখল অ্যানা। মেয়েটির মুখের সঙ্গে অ্যানার মুখের কত অমিল। তার থেকে সম্পূর্ণ অন্যরকম একটি মেয়েকে তার স্বামী যে কি করে ভালোবেসেছিল তা ভেবে অ্যানা বিস্মিত হলো। কত সুন্দর মেয়েটির মুখ! নরম গোলাপী ঠোঁট দুটি কতবার তার স্বামীর অধরে সোহাগ চুম্বন এঁকে দিয়েছে! কিন্তু ঠোঁটের পাশে কেন ঐ বিষণ্ণ রেখা? ক্লান্ত চোখ দুটিতে কেন বিষাদের ছায়া? শান্ত নরম মুখটিতে অ্যানা যেন হঠাৎ তার নিজের ছায়া দেখতে পেল। সারা রাত স্বামীর সঙ্গে কাটানোর পর সকালে আয়নায় অ্যানা নিজের যে ক্লান্ত প্রতিবিম্ব দেখেছিল তার সঙ্গে এই ছবিটির এত মিল দেখে অসোয়াস্তিতে অ্যানার মনটা ভারাক্রান্ত হয়ে উঠলো।

হঠাৎ স্বামীর গলা শুনতে পেয়ে ফোটোটা চটপট পকেটে পুরে ফেলল অ্যানা।—'কি করছ তুমি এখানে? জিনিষপত্র গুছিয়ে রাখছ নাকি? রক্ষে করো, তাহলে তো আমি কোনোদিনই আর কিছু খুঁজে পাবো না।' কৌতুক-ভরা গলায় কথাগুলো ছুঁড়ে দিল অ্যানার স্বামী। মাটিতে পড়ে থাকা ছোরাটার দিকে নজর পড়ায় ও বলল—'আরে তুমি কি জামা-কাপড়ের সঙ্গে যুদ্ধ করছিলে নাকি?'

ভিক্টর ব্রিভিয়ো তার স্ত্রীকে আস্ত একটি ছেলেমানুষ বলে মনে করে। এই ছেলেমানুষটির ভালোবাসায় মাঝে মাঝে তার বিরক্তি আসে। ও যেন বলতে চায়—'ঠিক আছে, মাঝে মাঝে আমিও তোমার মতো ছেলেমানুষ হবো। কিন্তু একটা মানুষের জীবনে আরো অনেক কাজ করবার আছে। তাই এই ভালোবাসার মতো বাজে ব্যাপারে আমি যে বেশি সময় নষ্ট করব তা আমার কাছে আশা করো না।'

অ্যানার হাত থেকে যে পুরোনো জ্যাকেটটি পড়ে গিয়েছিল সেটি তার স্বামী লাঠির ডগায় তুলে জানলা দিয়ে ছুঁড়ে বাগানে ফেলে দিয়ে চাকরকে ডেকে বলল—'এই নে, এটা তোর জন্য।' তারপর স্ত্রীর দিকে ফিরে একটু হাসবার চেষ্টা করল—'নাও এবার তোমায় কম ধুলো ঝাড়তে হবে।'

অ্যানার স্বামী প্রায়ই বাইরে যায়। মাঝে মাঝে বাইরে রাতও কাটিয়ে আসে। ফোটোটি আবিষ্কার করার পর থেকে কেন জানি না অ্যানার ভীষণ ভয় করছে। নিঃসঙ্গতার বেদনাবোধ তার চোখ দুটিকে অশ্রুসজল করে তুলছে। স্বামীর

বুকে মাথা রেখে অ্যানা বলল—'ওগো, আজ তুমি আমাকে একলা রেখে যেয়ো না!'

ভিক্টর নিজের চিন্তায় মগ্ন। বেরোনোর সময় এইসব বাজে ঝামেলায় ওর মেজাজ বিগড়ে যায়।—'কি হলো আবার? ছেলেমানুষি করো না।' রেগে ভিক্টর ঘর থেকে প্রায় ছুটে চলে যায়—অ্যানাকে একটা বিদায় সম্ভাষণ না জানিয়েই। জলভরা চোখে ও নিজের ঘরে দৌড়ে আসে। বিছানায় যাবার জন্য জামা-গুলো খুলতে শুরু করে। আর সঙ্গে সঙ্গেই তার পকেটে লুকিয়ে রাখা ছবিটার কথা মনে পড়ে যায়। ঐ বিষণ্ন চোখদুটি যেন অসীম করুণা নিয়ে ওর দিকে তাকিয়ে আছে। তাড়াতাড়ি মাটি থেকে জামা-কাপড়গুলো তুলে চেয়ারের ওপর ছুঁড়ে ফেলল ও। এমনি করেই যেন অ্যানা ঐ মরে-যাওয়া মেয়েটার দৃষ্টি থেকে রেহাই পাবে।

বিছানায় শুয়ে চোখ বন্ধ করে ও স্বামীর কথা চিন্তা করতে চেষ্টা করল। বিয়ের পর পুরো তিন বছর সে এই বাড়িতে একটা বিরাট শূন্যতার মাঝে বাস করছে। কিন্তু এই শূন্যতা সে এর আগে আর এমন করে কখনও উপলব্ধি করে নি; কারণ সে নিজের ভালোবাসা দিয়েই সব কিছু ভরিয়ে রেখেছিল। কিন্তু আজ সে সারাদিন ধরে তার স্বামীর আচরণ লক্ষ্য করেছে।—'যাবার সময় ও একবার আমাকে বিদায় সম্ভাষণ জানালো না' এ কথা মনে করে আবার কান্না শুরু করল অ্যানা। বিছানায় উঠে বসে হাত বাড়িয়ে রুমাল নিতে গিয়ে এবার সে ছবিটাকে আর একবার না দেখে পারলো না। হাত বাড়িয়ে সুইচ টিপে আলো জ্বালালো। স্বামীর প্রথম স্ত্রী সম্বন্ধে মোটামুটি একটা ধারণা অ্যানা মনে মনে গড়ে তুলেছিল। মনে করেছিল একটা মোটাসোটা মেয়ে-মানুষ—যার মনটা নোংরামিতে পরিপূর্ণ। কিন্তু বিষাদমগ্ন এই ছোটো মেয়েটির মুখের দিকে তাকিয়ে অ্যানা ভাবলো এই মুখ যেন কোনোদিন হাসে নি। কিন্তু কেন, কেন এই মুখ এত বিষণ্ন? হঠাৎ একটা সাংঘাতিক চিন্তা তার মনকে একটানে এই মেয়েটির কাছ থেকে সরিয়ে নিলো। যে স্বামীর ভালোবাসা নিয়ে ওর এত গর্ব সেখানে যেন একটা গভীর ক্ষতের সৃষ্টি হলো। সে শুনেছে মেয়েটির একটি প্রেমিক ছিল। কিন্তু এই মেয়েটির বিষাদের কারণ কে স্বামী না ওর প্রেমিক, ছবিটা ছুঁড়ে টেবিলের ওপর ফেলে দিয়ে তাড়াতাড়ি অ্যানা শুয়ে পড়লো। কিন্তু চোখ বুজেতেই সেই মরা মুখটি একরাশ বিষণ্নতা নিয়ে তার সামনে ফুটে উঠলো।

'না, না স্বামীর জন্য নয়, স্বামীর জন্য তার এই বিষাদ নয়' বিড়বিড় করে বলল অ্যানা, যেন এই বলে মৃত প্রতি-দ্বন্দ্বীকে অপমান করতে চাইল সে। মেয়েটির প্রেমিকের কথা ভাবতে চেষ্টা করল। বেশি কথা সে জানে না। শুনেছে তার নাম আর্থার ভ্যালি। আলমিরার মৃত্যুর কয়েক বছর পরেই নিজেকে নির্দোষ প্রমাণ করার জন্য আর্থার বিয়ে করে ফেলে। তাকে মেরে ফেলবে বলে ভিক্টর ভয় দেখিয়েছিল, তাই সে তার স্ত্রীকে নিয়ে ঐ শহর ছেড়ে চলে গিয়েছে।

সমগ্র ছবিটা অ্যানার চোখের সামনে ভেসে উঠলো। দুঃখভরা করুণ চোখ দুটি যেন বলছে—'তোমরা সবাই বেঁচে আছ! একা শুধু একা আমি মরে গিয়েছি।'

হঠাৎ অ্যানার নিজেকে ভীষণ একা মনে হলো, ভয় পেলো সে। এ কথা সত্যি সে বেঁচে আছে, কিন্তু কতদিন হলো সে তার বাবা, মা ভাইবোনকে দেখে নি। ভিক্টরকে বিয়ে করার জন্যে ও ক্ষেপে উঠেছিল। বাবা-মা'র মত ছিল না এ বিয়েতে। ভিক্টরের প্রতি তার ভালোবাসা একদিন তাকে অসুখে ফেলে দিল, বেশ শক্ত অসুখ। ডাক্তার বললেন বাবাকে বিয়েতে মত দিতে। বাবা মত দিলেন না বটে, তবে বিয়ে হলো, কিন্তু বাবার কাছে তার অস্তিত্ব চিরদিনের মতো মুছে গেল।

শুধুমাত্র অ্যানা আর তার স্বামীর বয়সেরই তফাৎ ছিল না, তার বাবার আপত্তি এই কারণে যে, ভিক্টরের আর্থিক অবস্থার কোনো স্থিতি ছিল না। তার বাবার মতে নিজের ওপর আর ভাগ্যের ওপর বড় বেশি বিশ্বাস করে ভিক্টর।

কিন্তু এই তিন বছরের বিবাহিত জীবন অ্যানা বেশ বিলাসিতার মাঝেই কাটিয়েছে। সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের কোনো অভাবই ঘটে নি তার। আর এই বয়সের তফাৎও কোনোদিন অ্যানা উপলব্ধি করে নি। ভিক্টরের দেহ এখনও বেশ শক্ত সমর্থ—উত্তাপে ভরা। তাই অ্যানা তার বাবার মতকে কোনোদিনই মেনে নিতে পারে নি।

কিন্তু আজ প্রথম এই মৃত মেয়েটির চোখ দুটি দিয়ে সে তার জীবনটাকে ভালো করে দেখতে পেলো। আর সঙ্গে সঙ্গেই স্বামীর বিরুদ্ধে অনেক অভিযোগ তার মনে বাসা বাঁধলো। এ কথা সত্যি যে, সে তার স্বামীর উদাসীনতায় মাঝে মাঝে আঘাত পেয়েছে। কিন্তু সে আঘাত আজকের মতো এত প্রবলভাবে আর কোনোদিনই আঘাত করে নি। আজ সর্বপ্রথম সে নিজেকে ভীষণভাবে নিঃসঙ্গ মনে করলো। তার মনে হলো ভিক্টরকে বিয়ে করে সে প্রমাণ করেছে ঐ মৃত মেয়েটির সঙ্গে ওর অনেক মিল। সে আর কারো সঙ্গ পাবার যোগ্য নয়। এই কারণে হয়তো তার বাবা-মাও তাকে পরিত্যাগ করেছে। অ্যানা তার সমগ্র পরিবারের স্নেহ-ভালোবাসা ফেলে ভিক্টরের কাছে নিজেকে বিলিয়ে দিতে চেয়েছে। কিন্তু এই ত্যাগস্বীকারকে তার স্বামী কোনো রকম গুরুত্বই দিতে চায় নি। যার জন্যে অ্যানা পৃথিবীর সকল সুখ ও স্বাচ্ছন্দ্য ছেড়ে এসেছে সে মনে করে এর মাঝে অ্যানার যেন কোনো কৃতিত্বই নেই; কোনো পাওনাই নেই তার স্বামীর কাছে। তবে কেন, কেন অ্যানা সব ছেড়ে এই ভালোবাসায় নিজেকে বিকিয়ে দিয়েছিল! তার স্বামীর কোনো কর্তব্যই কি নেই ওর ওপর? হঠাৎ অ্যানার মনে হলো ঐ মৃত বিষণ্ন ঠোঁট দুটি যেন বলে উঠলো—'এই তো সব সময় হয়।' অ্যানা আবার আলো জেলে ছবিটা তুলে নিল। ঐ মৃত চোখের দৃষ্টি তাকে অভিভূত করে তুললো।

'তুমি, তুমিও তাহলে এই নিয়ে দুঃখ পেয়েছ? ভালোবাসা না পেয়ে তুমিও কি এই হৃদয়বিদারক শূন্যতা অনুভব করেছ? সত্যি সত্যি!' কান্না-ভরা গলায় অ্যানা বার বার ছবিটিকে প্রশ্ন করল।

মনে হলো ঐ বিষণ্ন কোমল চোখ দুটি যেন তার এই অসহায় নিঃসঙ্গ জীবনকে করুণার দৃষ্টি নিয়ে দেখছে। তার এই আত্মত্যাগ আর ভালোবাসা যা নাকি সারা জীবন ধরে সে অমূল্য রতনের মতো বুকের মাঝে সযত্নে রক্ষিত করেছে—তা কোনোদিনই কাজে লাগলো না। এ যেন অনেকটা এক সিন্দুক-ভরা ধন-রত্নের মতো, যার চাবি আছে এক কৃপণের হাতে, যে কোনোদিনই সে ধন ব্যবহার করল না। ছবির ঐ করুণ বিষণ্ন মুখটির মাঝে অ্যানা তার নিজের ছায়া দেখতে পেলো।

Luigi Pirandello-এর লেখা—*"With Other Eyes"* অবলম্বনে। অনুবাদ আক্ষরিক নয়।

রঙ্গমঞ্চ ওদেশে এবং এদেশে

শিলালি

দুরকমের সংলাপের দ্বারা চরিত্রচিত্রণ করা হয়। প্রথমত, পাত্রপাত্রীর কথাবার্তার দ্বারাই তাদের চরিত্র আমাদের কাছে প্রতিভাত হয়। অবশ্য সর্বক্ষেত্রে সব চরিত্রই যে সরল সত্য মনোভাবের প্রকাশ করে থাকে একথা ঠিক নয়। সে সব সময় স্থান, কাল, পাত্র বুঝে চরিত্রের উক্তির সত্যাসত্য নির্ণয় করতে হবে। এমন কি কোন কোন চরিত্র নিজের মনকেও ঠকাতে চেষ্টা করে—নিজের কুৎসিত মনোবৃত্তি এবং ক্রিয়াকাণ্ডকে যুক্তির দ্বারা, কর্তব্যের দোহাই দিয়ে নির্দোষ বলে প্রতিপন্ন করবার প্রয়াস পায়। বাস্তব জীবনেও সময় সময় এই ধরণের চরিত্রের দেখা পাওয়া যায়। সেক্সপীয়ারের 'ইয়াগো' চরিত্রটি এই জাতীয় চরিত্রের একটি প্রকৃষ্ট উদাহরণ। নানা প্রকারের অসত্য উক্তির দ্বারা অন্যান্যদের মনেই শুধু নিজের সম্বন্ধে ভ্রান্ত ধারণার উদ্রেক করে সে ক্ষান্ত হয় নি, নিজের অন্তরের পৈশাচিক বৃত্তি-গুলোর নগ্নরূপ দেখতে পায় বলেই সে নিজের নারকীয় এবং বীভৎস ক্রিয়াকর্মকে অদ্ভুত অদ্ভুত যুক্তির দ্বারা সমর্থন করবার চেষ্টা করেছে।

প্রত্যক্ষভাবে কথাবার্তার ভেতর দিয়ে যেমন পাত্র বা পাত্রীর চরিত্র ফুটে ওঠে, তেমনি আবার সময় সময় অপ্রত্যক্ষ উপায়েও কোন কোন চরিত্রের বিশেষ বিশেষ দিক বর্ণনা করানো হয় অন্যান্য চরিত্রের সাহায্যে। অবশ্য একথা বলা বাহুল্য যে, যে-চরিত্র অন্য চরিত্র সম্বন্ধে কিছু বলছে তার ভেতর একটা নিরপেক্ষ ভাব থাকা উচিত। এ ধরণের বলার মধ্যে ভ্রান্তি বিদ্বেষ বা স্নেহান্ধতার স্পর্শ থাকলে ঐ বলাটা বর্ণিত-চরিত্রে কোন আলোকপাত করতে পারবে না। যেমন ধরুন, 'ওথেলো' নাটকের পাত্রপাত্রীরা ভুল ধারণার বশবর্তী হয়ে প্রায় শেষ পর্যন্ত নিজেদের কথাবার্তায় ইয়াগো সম্বন্ধে 'সাধু', 'সরল' প্রভৃতি বিশেষণের ব্যবহার করেছে। তবে কোথায় এ-ধরণের উক্তি নিরপেক্ষভাবে চরিত্র বুঝবার সাহায্যের জন্য ব্যবহার করা হচ্ছে, তা পাঠক বা দর্শক, স্থান-কাল-পাত্রের বিবেচনা করেই ঠিক করতে পারবেন।

এইবার এই প্রসঙ্গে ডব্লিউ. এইচ, হাড্‌সনের 'এ্যান ইন্ট্রোডাক্‌সন টু দি স্টাডি অভ্ লিটরেচার' বইটি থেকে কিছুটা তুলে দিচ্ছি ঃ

A dramatist who is anxious to throw some particular figure into clear relief is likely to avail himself freely of this method of cross-lighting, Shakespear often employs it with great effect. He employs it, for example, with Antonio in the Merchant of Venice to deepen our feeling of horror at Shylock's nefarious scheme against his life; his nobility and purity of nature are repeatedly impressed upon us by the attitude of the other characters towards him. Bassanio's praise of him in Act 3, sc. 2-lines 287—291 is cunningly introduced for emphasis at a critical moment; and we feel that this is no mere heated expression of friendship and agitation, because nearly everybody else in the play catches the same tone of admiration and affection :—Salanio calls him 'the good Antonio'; Lorenzo refers to him as a 'true....gentleman'; Gratiano 'loves' him; the chief men in Venice respect him; the gaoler, as Shylock complains grants him unusual privileges; while even Shylock's own sneer at his 'low simplicity' is only another bit of testimony—and it is not the less significant because it is oblique—to the merchant's goodness of heart. In the case of Brutus in Julius Caesar, again, the measure of the man is continually suggested by his associates, both friends and foes; the cynical Casca is bound to acknowledge his probity. Cassius lays stress upon his nobility and influence; Ligarius shows blind faith in him; Portia's devotion brings out the tender side of his nature; and as a final stroke, his enemy mark Antony, in the last important passage in the play, pronounces an eloquent eulogy upon him as 'the noblest Roman of them all."

এই পরোক্ষ প্রথার অবলম্বনে চরিত্র বর্ণনের রীতির ব্যবহার হিসাবে 'রাজা ও রাণী' ও 'বিসর্জন' নাটক থেকে দু'টি জায়গা তুলে দিচ্ছি ঃ

'রাজা ও রাণী'তে ত্রিবেদী সম্বন্ধে দেবদত্ত বলছেন ঃ

'শাস্ত্রহীন ব্রাহ্মণের প্রয়োজন যদি,
আছেন ত্রিবেদী; অতিশয় সাধুলোক
সর্বদাই রয়েছেন জপমালা হাতে
ক্রিয়াকর্ম নিয়ে; শুধু মন্ত্র উচ্চারণে
লেশমাত্র নাই তাঁর ক্রিয়াকর্মজ্ঞান।'

আবার দেখুন কি চমৎকারভাবে দেবদত্ত রাণীর কাছে তাঁর আত্মীয়বর্গের চরিত্র বর্ণনা করছেন ঃ

সুমিত্রা—কী বলিলে, রাজা কি নির্দয় তবে? দেশ অরাজক?

দেবদত্ত—অরাজক কে বলিবে। সহস্রং রাজক।

সুমিত্রা—রাজকার্যে অমাত্যের দৃষ্টি নাই বুঝি?

দেবদত্ত—দৃষ্টি নাই? সে কী কথা। বিলক্ষণ আছে। গৃহপতি নিদ্রাগত, তা বলিয়া গৃহে চোরের কি দৃষ্টি নাই? সে যে শনিদৃষ্টি। তাদের কী দোষ? এসেছে বিদেশ হতে রিক্তহস্তে, সে কি শুধু দীন প্রজা-দের আশীর্বাদ করিবারে দুই হাত তুলে?

সুমিত্রা—বিদেশী? কে তারা? তবে আমার আত্মীয়?

দেবদত্ত—রাণীর আত্মীয় তারা, প্রজার মাতুল, যেমন মাতুল কংস, মামা কালনেমী।

সুমিত্রা—জয়সেন?

দেবদত্ত—ব্যস্ত তিনি প্রজা-সুশাসনে। প্রবল শাসনে তাঁর সিংহগড় দেশে যত উপসর্গ ছিল অন্নবস্ত্র আদি সব গেছে—আছে শুধু অস্থি আর চর্ম।

সুমিত্রা—শিলাদিত্য?

দেবদত্ত—তাঁর দৃষ্টি বাণিজ্যের প্রতি। বণিকের ধনভার করিয়া লাঘব নিজ স্কন্ধে করেন বহন।

সুমিত্রা—যুধাজিৎ?

দেবদত্ত—নিতান্তই ভদ্রলোক অতি মিষ্ট-ভাষী। থাকেন বিজয়কোটে, মুখে লেগে আছে, 'বাপু বাছা।' আড়চক্ষে চাহেন চৌদিকে, আদরে বুলান হাত ধরণীর পিঠে, যাহা কিছু হাতে ঠেকে যত্নে লন তুলি।

সুমিত্রা—এ কী লজ্জা! এ কী পাপ! আমার আত্মীয়! পিতৃকুল-অপযশ।

ছি ছি, এ কলঙ্ক, করিব মোচন।
তিলেক বিলম্ব নহে।'

আবার 'বিসর্জন' নাটকে রঘুপতি সম্বন্ধে অপর্ণা ও জয়সিংহের সংলাপ শুনুন ঃ—

জয়সিংহ—ওই আসিছেন মোর গুরুদেব।

অপর্ণা—আমি তবে সরে যাই অন্তরালে। ব্রাহ্মণেরে বড়ো ভয় করি। কী কঠিন তীব্র দৃষ্টি! কঠিন ললাট পাষাণ সোপান যেন দেবীমন্দিরের!

[অপর্ণার প্রস্থান]

জয়সিংহ—কঠিন? কঠিন বটে। বিধাতার মত কঠিনতা নিখিলের অটল নির্ভর।

রঘুপতি সম্বন্ধে গোবিন্দমানিক্য একজায়গায় বলছেনঃ

গোবিন্দ—এ সংসারে বিনয় কোথায়। মহাদেবী, যারা করে বিচরণ তব পদতলে তারাও শেখেনি হায় কত ক্ষুদ্র তারা। হরণ করিয়া লয়ে তোমার মহিমা আপনার দেহে বহে এত অহংকার।

আবার কি সুন্দরভাবে অপর্ণার বর্ণনা করলেন জয়সিংহ, যখন রঘুপতি তাঁকে আদেশ করলেন ঃ

রঘুপতি—দূর করে দাও ওই বালিকারে মন্দির হইতে।—মায়াবিনি, জানি আমি তোদের কুহক।—দূর করে দাও ওরে।

জয়সিংহ—দূর করে দিব? দরিদ্র আমারি মতো মন্দির-আশ্রিত, আমারি মতন হায় সংগীহীন, অকণ্টক পুষ্পের মতন নির্দোষ নিষ্পাপ শুভ্র সুন্দর সরল সুকোমল বেদনাকাতর, দূর করে দিতে হবে ওরে? তাই দিব গুরুদেব।—চলে যা অপর্ণা। দয়ামায়া স্নেহ প্রেম সব মিছে। মরে যা, অপর্ণা। সংসারের বাহিরেতে কিছুই না থাকে যদি, আছে তবু দয়াময় মৃত্যু। চলে যা, অপর্ণা।

সময় সময় আবার নাটকে এমন ধরণের এক-একটি চরিত্র দেখা যায় যাদের চলন-বলন অন্যান্য পাত্রপাত্রীদের থেকে সম্পূর্ণ আলাদা ধরণের। গ্রীক নাটকে কোরাসের একটা বিশেষ স্থান ছিল—কারণ নানাভাবে নাটককে সম্পূর্ণ করে তোলাই ছিল কোরাস ব্যবহারের উদ্দেশ্য। নাটকের সারমর্ম উদ্ঘাটন করা ছিল কোরাসের একটা প্রধান কাজ। যে ধরণের চরিত্রের কথা বলছিলাম গ্রীক কোরাসের এই দিকটা যেন তাদের মধ্যে রূপায়িত দেখা যায়। যেমন ধরুন 'এ্যাণ্টনি এণ্ড ক্লিওপেট্রা' নাটকের এনোব্যারবাস্ চরিত্র বা রবীন্দ্রনাথের ঠাকুর্দা বা ধনঞ্জয় বৈরাগী।

এক সময়ে নাটকে চরিত্রের পূর্ণ প্রস্ফুটনের জন্য দরকার মত 'স্বগতোক্তি' করা, বা 'জনান্তিকে', অথবা 'একান্তে' পাত্রপাত্রীকে দিয়ে কথা বলানোর প্রচলন ছিল। নাটকে বাস্তবতা আনতে গিয়ে অনেক নাট্যকার এই সব উপায়কে অস্বাভাবিকতার পর্যায়ে ফেললেন এবং ক্রমে ক্রমে এ সবের ব্যবহার বর্জন করার দিকেই আধুনিক নাট্যকারেরা মনোযোগ দিলেন। কিন্তু আমেরিকার শ্রেষ্ঠ নাট্যকার ইউজিন ও'নিল আবার আধুনিককালেই তাঁর কয়েকটি বিখ্যাত নাটকে এই সব পদ্ধতির পুনঃপ্রবর্তন করলেন। ও'নিল বললেন—

'My people speak aloud what they think and what the others aren't supposed to hear.'

একথা মানতেই হবে যে ও'নিলের মতো নাট্যকারের হাতে পড়ে 'স্বগতোক্তি' প্রভৃতি পদ্ধতি নতুন রূপ নিয়েছে এবং চরিত্রচিত্রণে এরা যে কতোটা সহায়ক হতে পারে তা আমরা নতুন করে বুঝতে শিখেছি। যে কোন চরিত্রের অন্তরের গভীরের যে কোন চিন্তাভাবনা সম্বন্ধে আমরা এই 'স্বগতোক্তি' প্রভৃতির সাহায্যে অবহিত হতে পারি। [এই প্রসঙ্গে ও'নিলের দুটি নাটকের কথাই—'মোর্নিং বিকাম্স ইলেকট্রা' এবং 'স্ট্রেইঞ্জ ইণ্টারলিউডের' কথাই—বিশেষভাবে মনে পড়ছে।]

যে সব জায়গায় 'স্বগতোক্তি' প্রভৃতিকে বর্জন করে শুধু চরিত্রের সংলাপের ভেতর দিয়েই নাট্যকার নিজের বক্তব্য প্রকাশ করতে সমর্থ—আমার মনে হয়—সে সব জায়গায় 'সলিলকি' 'এ্যাসাইড্' প্রভৃতির সাহায্য নেওয়াটা দূষণীয়। তবে সময়ে সময়ে—যেমন আধুনিক সমস্যাসংকুল জগতের জটিলতাপূর্ণ চরিত্রের মনঃসমীক্ষণে—এই সব পদ্ধতির সাহায্যে চরিত্রের মানসিক গতিপ্রকৃতি বুঝবার যথেষ্ট সহায়তা হয়। সুতরাং যখন সাধারণ সংলাপের সাহায্যে পাত্রপাত্রীর চরিত্রের কোন কোন প্রয়োজনীয় দিক পাঠক বা দর্শকদের কাছে উপস্থিত করা সম্ভব হয় না। সে-ক্ষেত্রে 'স্বগতোক্তি' প্রভৃতির সুচারু ব্যবহারে নাটকের সমৃদ্ধি বাড়ে বই কমে না।

সময়ে সময়ে নাটকের প্রতিপাদ্য বিষয়কে ঠিকভাবে ফুটিয়ে তোলবার জন্য আসল কাহিনীর সঙ্গে সঙ্গে নাট্যকার আর একটি সমান্তরাল কাহিনীর সৃষ্টি করে থাকেন। কাহিনী দুটি পরস্পরের পরিপূরক—একে অন্যকে পরিপূর্ণ, সার্থক এবং শক্তিশালী করে তোলে। একে অন্যের সমগ্রতা এনে দেয়। শেক্সপীয়ার তাঁর বহু নাটকে এই পদ্ধতির আশ্রয় নিয়েছেন। যেমন ধরুণ 'দি মারচেণ্ট্ অভ্ ভিনিসের' পরিসমাপ্তিতে পোর্সিয়া ও নেরিশার আংটি নিয়ে দুটি সমান্তরাল হাসির কাহিনীর সৃষ্টি হয়েছে। 'কিং লিয়ার' নাটকেও দুটি সমান্তরাল কাহিনীর অবতারণা করা হয়েছে। প্রধান আখ্যায়িকায় দেখান হয়েছে বৃদ্ধ রাজা লিয়ার তাঁর ১মা এবং ২য়া কন্যার পিতৃভক্তির ব্যাখ্যানে যেমন অভিভূত হয়ে পড়লেন, তেমনি আবার কনিষ্ঠা কন্যার সত্যভাষণে রুষ্ট হয়ে নিজের সমস্ত রাজ্য-সম্পদ বড় দুই কন্যাকে বণ্টন করে দিলেন এবং কনিষ্ঠা কর্ডেলিয়াকে করলেন সর্বদিক থেকে বঞ্চিতা। অথচ ভাগ্যের এমনই খেলা যে আসল বিপদের সময় এই কর্ডেলিয়াই তাঁর পাশে এসে দাঁড়ালো এবং অন্য দুজনের কাছ থেকে সাহায্য পাওয়া দূরের কথা, তিনি বরং পদে পদে প্রতারিতই হলেন। সমান্তরাল বা পরিপূরক কাহিনীতে দেখানো হয়েছে লিয়ার যেমন নিজের মেয়েদের চরিত্র সম্বন্ধে সম্পূর্ণ ভুল ধারণার বশবর্তী হয়ে কাজ করেছিলেন, তেমনি গ্লস্টারও নিজের দুই ছেলের ভেতর যেটি আসলে ভাল তার সম্বন্ধেই বিরূপ হলেন অন্য অসৎ ছেলেটির চক্রান্তে। এই দুই কাহিনীর সংযোগে সারা নাটকটিতে যে বিষাদঘন ভাবের সৃষ্টি হয়েছে তার তুলনা হয় না। রবীন্দ্রনাথের 'রাজা ও রাণী' এবং 'তপতী' নাটকেও সুমিত্রা-বিক্রম কাহিনীর পাশাপাশি গড়ে উঠেছে পরিপূরক কাহিনী হিসাবে 'কুমার সেন-ইলা' এবং 'নরেশ-বিপাশার' কাহিনী। প্রেমের বিভিন্ন দিক দেখাতে গিয়ে 'শেষরক্ষা' নাটকে রবীন্দ্রনাথ তিনটি নায়ক-নায়িকার চরিত্র সমান্তরালে রেখে তুলে ধরেছেন দর্শকদের সামনে—চন্দ্রকান্ত-ক্ষান্তমণি, বিনোদ-কমল এবং গদাই ও ইন্দুমতী। 'চিরকুমার সভাতেও' এই পদ্ধতির আশ্রয় নেওয়া হয়েছে। পূর্ণ নির্মলা, বিপিন-নীরবালা ও শ্রীশ-নৃপবালার সমান্তরাল কাহিনীর সাহায্যে দরকার মত সহজ সরল হাস্যরসের সৃষ্টি করেছেন রবীন্দ্রনাথ এই নাটকে। নাট্য গঠনে বৈষম্য বা কনট্রাস্ট পদ্ধতির একটা বিশেষ স্থান আছে। নাটকে কোন না কোন ধরনের সংঘাতের অবতারণা একরকম অপরিহার্য। তা সে ভাবগত সংঘাতই হোক বা চরিত্রে চরিত্রে বৈপরীত্য হেতু সংঘর্ষই হোক, কিংবা চরিত্রের সঙ্গে ভাবের বৈষম্যর কারণেই হোক। মোট কথা সংঘাতের সৃষ্টিই হয় বৈষম্য থেকে। এই বৈষম্যের উপরই ভিত্তি করে গড়ে ওঠে নাটকের কাহিনী।

(ক্রমশঃ)

পাঠকমন

১১শে আশ্বিন, বৃহস্পতিবারের সাপ্তাহিক বসুমতীতে "পাঠকমন" বিভাগে প্রকাশিত "ছাত্র উচ্ছৃংখলতার আর একটি দিক" স্তম্ভটির প্রতিবাদে জনৈক লেখিকা তাঁর চিঠির শেষার্ধে যেভাবে কিছু সীমা ছাড়িয়ে উক্তি করেছেন, তা তীব্র প্রতিবাদের দাবি রাখে। আমরা জানতে চাই—"হায়ার সেকেণ্ডারিতেই যাঁদের গৃহশিক্ষক লাগে তাঁরা উচ্চশিক্ষা লাভের ব্যর্থ চেষ্টা না করে শারীরিক পরিশ্রম করে জীবিকা অর্জন করুন।" এই কথাগুলি কে বলবার অধিকার লেখিকাকে দিয়েছে?

যে যাই বলুন না কেন বর্তমানে উচ্চ-মাধ্যমিক পরীক্ষাতে সব বিভাগেই বিশেষ করে বিজ্ঞান বিভাগে গৃহশিক্ষকের সাহায্য ছাড়া ভালো ফল করা খুবই অসুবিধা। কারণ গত দুই-তিন বৎসর ধরে উচ্চমাধ্যমিক বিজ্ঞান বিভাগে বিশেষ করে 'পদার্থ বিজ্ঞানে' এমন সব কঠিন প্রশ্ন এবং অঙ্ক প্রশ্নকর্তাগণ করছেন, যাতে অনেক সময় ঐ-সব প্রশ্নের জবাব দেওয়া খুবই কঠিন হয়ে দাঁড়ায়। পশ্চিম-বঙ্গ মধ্যশিক্ষা পর্ষৎ বাংলার মাধ্যমে বিজ্ঞান পড়াবার অনুমতি দিয়েছেন। কিন্তু লক্ষ্য করবার বিষয় যে, সব সময় প্রশ্ন হচ্ছে ইংরেজীতে এবং প্রশ্নকর্তাগণ এমন সব বৈজ্ঞানিক 'টার্মস' সময় সময় প্রশ্নে ব্যবহার করেন যা সমস্ত বাংলা মাধ্যমের বিজ্ঞান বই খুঁজলেও পাওয়া যাবে কি না সন্দেহ আছে। কিন্তু বেশির ভাগ ছাত্র বাংলার মাধ্যমে পড়াশুনা করে থাকে, অনেক সময় তারা ঐ সব প্রশ্ন ভালো করে বুঝতে পারে না এবং যথাযথ উত্তরও দিতে পারে না।

কিন্তু বিজ্ঞানে শুধু তো দ্বিতীয় বিভাগে উত্তীর্ণ হলেই চলবে না, গ্রুপ সাবজেক্টে শতকরা ৫৫ পাওয়া চাই এ-দাবিও অনেক কলেজ কর্তৃপক্ষ করে থাকেন, বিজ্ঞানে তৃতীয় বিভাগে উত্তীর্ণ হলে যে অনেক ছেলের জীবন ব্যর্থ হয়ে যায় তা বোধ হয় লেখিকা ভালো করেই জানেন। হায়ার সেকেণ্ডারিতে গৃহশিক্ষক রাখলে সুবিধা হয়; কারণ অজ্ঞাত এমন সব প্রশ্ন আসে যার সংজ্ঞা বইয়ে পাওয়া যায় না, কিন্তু তা শিক্ষকরা ছাত্রদের বুঝিয়ে দিতে সক্ষম হন।

আলোক বিজ্ঞানে মাঝে মাঝে এমন সব প্রশ্ন প্রশ্নকর্তাগণ মুখে মুখে বানিয়ে দেন, যা গৃহশিক্ষকের সাহায্য ব্যতীত যে কোন সাধারণ ছেলে তার সমাধান করতেই পারবে না। হয়তো দু-একজন পারবে, কিন্তু বাদবাকিরা অসমর্থ হবে। যেখানে দেশে শিক্ষা বিস্তারের আজ এত প্রয়োজন, সেখানে নিশ্চয়ই শতকরা ৭০ জন পাশ করা দরকার ভালোভাবে। কোন মাতাপিতাই চাইবেন না—তাঁদের সন্তান তৃতীয় বিভাগে উত্তীর্ণ হয়ে হা-হুতাশ করে ঘুরে বেড়াক।

লেখিকার বোধহয় স্মরণে আছে যে, এবারে উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষাতে একমাত্র থার্ড ডিভিসনের সংখ্যাই আঠার হাজার। এর মধ্যে কলকাতা শহরেই চার হাজার। এবারের পদার্থ বিজ্ঞানের প্রথম পত্রে শব্দ-বিজ্ঞানের প্রশ্নটির অঙ্কটি কতজন সাধারণ ছাত্র করতে পেরেছে তা সন্দেহের অপেক্ষা রাখে। যেখানে ছাত্রগণ জীবনের প্রথম পরীক্ষা দিতে যাচ্ছে এবং শিক্ষা-জীবনের এক নব ধাপে অগ্রসর হচ্ছে, সেখানে যদি বেশির ভাগ 'থার্ড ডিভিসনে' পাশ করে তাহলে ছাত্রসমাজে ভবিষ্যৎ কি দাঁড়াবে তা একবার লেখিকা বিবেচনা করে দেখেছেন কি?

'হিউম্যানিটিজে' হয়তো তিন মাস পড়েও কোনক্রমে ভাগ্যবশত থার্ড ডিভিসনে পাশ করা যায়, কিন্তু বিজ্ঞান বিভাগে যদি এভাবে ক্রমাগত থার্ড ডিভিসনে (যা বেড়েই চলছে) পাশের সংখ্যাই বাড়তে থাকে, তাহলে ছাত্রদের ভবিষ্যৎ তো বটেই, কিন্তু তার সাথে সাথে যে বিজ্ঞানের অগ্রগতিতে দেশ পিছিয়ে যাবে—তা কি লেখিকা একবারও বিবেচনা করে দেখেছেন? আমরা লেখিকার ঐ ধরণের উক্তি অসম্মানজনক বলে মনে করি। লেখিকাকে এ-কথাও বলতে চাই ঐভাবে সীমা ছাড়িয়ে ছাত্রদের প্রতি ব্যঙ্গোক্তি করবার অধিকার তাঁকে কেউ দেয় নি। শারীরিক শ্রম করলে যে দেশের উপকার হবে, এই নূতন বাণীটিকে শোনাবার কোন্ মানে থাকতে পারে? যদি কোন ছাত্রভাই শারীরিক শ্রম দেশের স্বার্থে করে, তা কি লেখিকাকে জিজ্ঞাসা করে করতে হবে? এর দ্বারাই কি প্রমাণ হয় না—লেখিকা কোন এক বিশেষ রাজনৈতিক দলের মুখপাত্র হয়ে উক্ত উক্তি করেছেন?

এই প্রসঙ্গে একটা কথা আমরা আরও বলছি যে, লেখিকা সাংবাদিকতার প্রতি যে বক্রোক্তি করেছেন, তা সম্পূর্ণভাবে নিন্দনীয়। কারণ, সাংবাদিকতার প্রথম কথাই হলো, "জার্নালিস্ট মাস্ট বি এ্যাবাভ অল পার্টি পলিটিক্স এন্ড আনট্রুথ।" আমরা কয়েকটি বিশেষ সংবাদপত্র ছাড়া এমন কোন বেশি স্বার্থান্বেষী সাংবাদিক দেখছি না এবং সব সাংবাদিকরাই যে "সস্তা সাংবাদিকতা করেন এবং বাঁধা বুলি কপ্‌চে বাহবা কুড়ান" এইসব নিন্দনীয় তথ্য কোথা থেকে সংগ্রহ করেছেন, তা বুঝতে পারলাম না। সাংবাদিকতা মানেই যে বাঁধা বুলি কপ্‌চানো, এমন কোন অকাট্য প্রমাণ লেখিকা দিতে পারবেন?

আমরা মনে করি লেখিকা যে উক্তি করেছেন, তা এক বিশেষ স্বার্থপ্রণোদিত। তা না হলে শুধু শুধু এভাবে সাংবাদিকতার মহান আদর্শে কালিমা লেপনের কোন মানে হয় না।

অনেকে অভিজাত ও নিরপেক্ষ সাংবাদিকতার প্রতি বিদ্বেষবশত এ-রকম কথা মাঝে মাঝে বলে থাকে তা আমরা জানি, এই প্রসঙ্গে লেখিকাকে স্মরণ করিয়ে দিতে চাই, যদি গৃহশিক্ষকের বিকল্প কোনো উপায় বাতলে দিতে পারেন—যা নানা রকম কৌশলপূর্ণ কঠিন প্রশ্ন থাকা সত্ত্বেও সাধারণ ছাত্রদের 'হাই সেকেণ্ড ডিভিসনে' পাশ করাতে সাহায্য করবে। তাহলে তিনি ত্রিপুরার ছাত্রদের অনেক শ্রদ্ধার পাত্রী হবেন।

দ্যুতি বসু, বি-এ, রাহুল বর্মণ, রক্তকমল বর্মণ, এম-এ, পি-এইচ-ডি, সুবর্ণা বসু, বি-এ।
৬, রামনগর রোড, আগরতলা (ত্রিপুরা)।

• • •

সাপ্তাহিক বসুমতীতে ধারাবাহিক লেখা "অগ্নিযুগের একটি অধ্যায়"-এর জন্য শ্রীঅনন্ত সিংহ মহাশয়কে অসংখ্য শ্রদ্ধাযুক্ত ধন্যবাদ। বলিতে গেলে একদিন এই লেখা পড়িবার পর হইতে আমি এই সাপ্তাহিকীর নিয়মিত ক্রেতা। যাঁহাদের নাম ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে মুদ্রিত হওয়া আবশ্যক, তাঁহাদিগকেই দেশ ভুলিয়া যাইবার জন্য কর্তাদের এখন সর্বদা চেষ্টা। নিজ স্বার্থসিদ্ধির ও দেশের সর্বনাশ করিয়া দেশপ্রেমিক সাজার চেষ্টা। এই ঘোর দুর্দিনে যাঁহারা দেশকে জাগ্রত করিতেছেন, সেই বীরদের একজন হিসাবে শ্রীঅনন্ত সিংহ মহাশয়কে সশ্রদ্ধ ধন্যবাদ জানাই। পরে এই লেখা বই আকারে প্রকাশিত হইলে খুব সুখী হইব।

শ্রীবিধুভূষণ চক্রবর্তী
আলিপুর বার এ্যাসোসিয়েশন
কলিকাতা—১৭

রঙ্গজগৎ

উৎপল দত্ত
সঙ্গীত নাটক একাদেমি কর্তৃক পুরস্কৃত

আনন্দের দিনে লক-আউটের কালোছায়া

শারদীয় উৎসব সমাগত। চারদিকে সাজ সাজ রব পড়ে গেছে। পাড়ায় পাড়ায় পূজোর প্যান্ডেল তৈরির জন্য বাঁশ বাঁধা হচ্ছে। দোকানে দোকানে ভিড় জমছে। পথে পথে নরনারীর যাতায়াত বেড়ে গেছে। ট্রাম-বাসে ওঠা প্রায় অসম্ভব হয়ে উঠেছে। বৃহস্পতিবার মহালয়া। মহালয়ার পরে শারদীয় উৎসবের প্রধান দ্বার উন্মুক্ত হয়ে গেল। তখন চারিদিকে হাসিখুশি অবস্থা। যার দুঃখের অন্ত নেই, যার কেনাকাটার শক্তি নেই, যে সংসারের প্রয়োজন মেটাতে পারছে না, সেও এ সময় সবার আনন্দে নিজে আনন্দ লাভ করে।

আজকের এই আনন্দের দিনে শহরের সিনেমাগুলি নিষ্প্রদীপ। মানুষের আনন্দকে মুখর করে তোলার এক প্রধান ভূমিকা থাকে সিনেমাগুলির। যারা সারা বছর ছবি দেখে না, তারাও আনন্দময় পরিবেশে প্রিয়জন নিয়ে দু-একটা ছবি দেখে আসে। কিন্তু এ বছর শরতের খুশির মেলায় সিনেমার কোন ভূমিকা নেই। সিনেমাগুলির দ্বার বন্ধ।

এরই সঙ্গে একদল মানুষ এই আনন্দস্রোতে নিজেদের মেলাতে পারছে না। প্রতি বছর এমন দিনে তারা বোনাস নিয়ে ছেলেমেয়েদের জামাকাপড় কিনে দিত, দুটো ভালমন্দ খেতো। সাজগোজ করা নরনারীকে সিনেমায় অভ্যর্থনা করে নিজেদের জীবনের বহু গ্লানি ভুলে যেত। এবার তারা দুশ্চিন্তায় পড়েছে, সিনেমার লাক-আউট চলছে। সবার আনন্দের মাঝে ওরা নিরানন্দ; যাদের ভূমিকা ছিল সবার জন্য আনন্দ পরিবেশন।

শরতের আনন্দমেলায় বাংলার জাতীয় উৎসবের দিনে এদের আনন্দ, জনসাধারণের আনন্দের উপাদান কেড়ে নিয়েছে একদল ব্যবসায়ী। এদের সম্পর্কে আমরা ইতিপূর্বে দুদিন লিখেছি। আজ শরৎ-উৎসব প্রাক্কালে আবার এদের ধিক্কার না দিয়ে পারছি না। একদিন সিনেমা ব্যবসায়ী কর্মচারীদের ট্রেড ইউনিয়নের অধিকার খর্ব করার জন্য, ওদের নৈতিক শক্তি ভেঙে দেবার জন্য অনর্থক সিনেমাগুলিতে লক-আউট করে রেখেছে। এই কুচক্রী ব্যবসায়ীদের চক্র থেকে বিদেশী ছবির প্রদর্শকরা বার হয়ে গিয়ে আলাদা সংস্থা গড়েছে। কিন্তু বাংলা ছবির প্রদর্শকদের মধ্যে কি এমন কেউ নেই যারা এই কুচক্রীদের চক্রান্তকে ব্যর্থ করে দিতে পারে? আমরা শুনেছি ছবির প্রদর্শকদের অনেকেই শ্রমিকদের সঙ্গে মীমাংসা করতে উদ্‌গ্রীব। কেবলমাত্র দু-তিনজন ব্যবসায়ীর জিদের জন্য এই আপোষ সম্ভব হচ্ছে না। আমরা এমন অনেক বাঙালী চিত্রপ্রদর্শকের কথা জানি যাঁরা ইতিপূর্বে শ্রমিকদের সঙ্গে সহযোগিতায় উৎসাহ দেখিয়েছেন। আজ তাঁরা কোথায় গেলেন? এমন একজন অবাঙালী (নামেমাত্র) প্রেক্ষাগৃহ মালিকের কথা জানি যিনি শ্রমিকদের সঙ্গে মীমাংসায় অগ্রণীর ভূমিকা গ্রহণ করতেন। আজ তিনি অসুস্থ বলেই কি এই অচল অবস্থা?

আমরা কামনা করি সিনেমা শ্রমিকদের ন্যায্য দাবি অবিলম্বে স্বীকার করে শরতের আনন্দোৎসবকে মালিকপক্ষ সার্থক করার সুযোগ দেবেন। সিনেমাগুলিতে আবার বাতি জ্বলুক, উৎসবের উজ্জ্বল দিনগুলির উপর লক-আউটের কালোছায়া দূর হোক।

—সুজন

চিত্র আলোচনা

দি হিরোজ অব টেলিমার্ক

গত মহাযুদ্ধের বাস্তব ঘটনানির্ভর ছবি 'দি হিরোজ অব টেলিমার্ক' এলিট সিনেমায় প্রদর্শিত হচ্ছে।

১৯৪২ সালে হিটলারের ফ্যাসিস্টশক্তি আণবিক বোমা প্রস্তুতের উপাদান তৈরির প্রস্তুতি প্রায় শেষ করে এনেছিল। মিত্রশক্তির পূর্বে ফ্যাসিস্টশক্তি যদি আণবিক বোমা প্রস্তুত করতে পারত, তবে পৃথিবীর ইতিহাস অন্যরকম হত। স্বাধীনতা, গণতন্ত্র, শান্তি কথাগুলির কোন অর্থ আর থাকত না। মিত্রশক্তির যুদ্ধ দপ্তরে এই খবর পৌঁছাবার পর বিজ্ঞানী আইনস্টাইন প্রমুখ মাইক্রোফিল্মের এই তথ্য সমর্থন করেন। তৎপরতার সঙ্গে জার্মানদের আণবিক বোমার উপাদান হেভিওয়াটার প্রস্তুতের কারখানা ধ্বংস করার কর্মসূচী গ্রহণ করা হয়। একজন বিজ্ঞানীসহ দুজনকে এ কাজে নরওয়েতে পাঠান হয়। তাঁদের সহযোগী হয় এক নারী গেরিলা-যোদ্ধা; তাঁর কাকা এবং সাতজন নরওয়েজিয়ান। কিভাবে সেই দুঃসাহসিক কাজ সম্পাদিত হল, তা ছবিতে দেখান হয়েছে। গত যুদ্ধের এই দুঃসাহসিক ঘটনা দর্শকদের কাছে প্রত্যক্ষ হয়ে উঠে।

এই হেভিওয়াটার প্রস্তুতের কারখানা ছিল নরওয়ের তুষারময় জনহীন পার্বত্য অঞ্চলে। ছবির চিত্রনাট্যের অবলম্বন লেফটেন্যান্ট কর্নেল নাট হকলিড রচিত 'স্কিজ এগেনস্ট এটম' নামক তাঁর নিজের জীবনের অভিজ্ঞতামূলক কাহিনী। গত যুদ্ধে নরওয়েস্থিত ভেমোর্কের এই হেভিওয়াটার কারখানা ধ্বংসের কাজে তিনি অংশ গ্রহণ করেছিলেন এবং এজন্য যুদ্ধ পরবর্তীকালে তাঁকে ডি এস ও সম্মানে ভূষিত করা হয়। লেফটেন্যান্ট কর্নেল নাট ছবিটির টেকনিক্যাল পরামর্শদাতা হিসাবে কাজ করেছেন এবং তাঁরই তত্ত্বাবধানে ছবির সেট তৈরি ও দৃশ্য গ্রহণ করা হয়েছে। এই ছবির অধিকাংশ দৃশ্য নরওয়ের তুষারমণ্ডিত অঞ্চল জুকানে তোলা হয়েছে।

ডাঃ পেডারসন এবং নাট স্টড কয়েকজন সহকর্মীর সহায়তায় রিভলবারের ব্যারেলের নির্দেশে নরওয়ের জাহাজের গতি পরিবর্তন করতে বাধ্য করে। সমুদ্রে মাইন সরিয়ে তারা ইংল্যান্ডে আসে। মাইক্রোফিল্মে প্রাপ্ত তথ্য থেকে নরওয়েতে

হেভিওয়াটার কারখানার কথা জানা গেলে তাঁদেরই পাঠান হয় নরওয়েতে। সেখানে গোপন প্রতিরোধ যোদ্ধাদের সঙ্গে মিলিত হয়ে তাঁরা জীবনের ঝুঁকি নিয়ে অত্যন্ত সুকৌশলে কারখানা বিকল করে দেন। কিন্তু দু-সপ্তাহের মধ্যে জার্মানরা তা মেরামত করে। একজন বিশ্বাসঘাতকের কাছে জার্মানরা এই চক্রান্তের খবর পায়। পালাতে গিয়ে ডঃ পেডারসন সেই বিশ্বাসঘাতককে খতম করে কিন্তু নিজে ধরা পড়ে। তারপরে বাস থেকে আবার পালিয়ে যায়। এ সময় মিত্রশক্তির বিমান আক্রমণ ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়। কিন্তু জার্মানরা হেভিওয়াটার বার্লিনে নিয়ে যাবার পরিকল্পনা গ্রহণ করলে টাইম বোমা দিয়ে ফেরী জাহাজ ধ্বংস করা হয়। এই জাহাজ ধ্বংসের সময় তাঁদের সহকর্মীর স্ত্রী সিগ্রিড ও তার নবজাত সন্তানকে এবং জাহাজের শিশুযাত্রীদের বাঁচাবার জন্য পেডারসনের মানবিকতা বোধ, এবং গেরিলাযোদ্ধা অ্যানের উপকাহিনী হৃদয়স্পর্শী।

প্রধান চরিত্র ডাঃ পেডারসনকে রূপ দিয়েছেন কার্ক ডগলাস। 'স্পার্টাকাস' ছবিতে যাঁর অভিনয়ের কথা এখনো অনেকের মনে আছে। তাঁর সহকর্মীর ভূমিকায় রূপ দিয়েছেন রিচার্ড হ্যারিস। অ্যানের চরিত্রে অভিনয় করেছেন সুইডিস অভিনেত্রী উল্লা জ্যাকবসন, অ্যানের কা… চরিত্রে মাইকেল রেডগ্রেভ।

ছবিটির ঘটনাবৈচিত্র্য ও উদ্বেগপূর্ণ পরিস্থিতি ছাড়াও প্রধান বৈশিষ্ট্য নৈপুণ্যপূর্ণ চিত্রগ্রহণ। তুষার অঞ্চলের, বরফের উপর স্কী করার, জাহাজের মাইন অতিক্রম করা ও জাহাজডুবির দৃশ্যগুলিতে ক্যামেরার বাহাদুরি প্রশংসনীয়।

এই বৃটিশ ছবিটির পরিচালক এন্থনী মান। 'দি হিরোজ অব টেলিমার্ক'-এর সার্থকতায় তাঁর পরিকল্পনা শক্তির পরিচয় রয়েছে। ছবিটি উপভোগ্য।

কার্ক ডগলাস : ১৯৪৫ সালে 'স্ট্রেঞ্জ লাভ অব মার্থা আইভর' ছবিতে প্রথম আত্মপ্রকাশ। তারপরে একে একে চ্যাম্পিয়ন, দি বেড এন্ড দি বিউটিফুল, লাস্ট ফর লাইফ, ডিটেকটিভ স্টোরী, দি জাগলার, দি ভাইকিং, পাথস অব গ্লোরী, সেভেনডেজ ইন মে, ইন হারমওয়ে, স্পার্টাকাস ছবিতে অভিনয় করেছেন। আমস্টারডমে জন্ম। বাল্যকাল কেটেছে চরম দারিদ্র্যের মধ্যে সংবাদপত্র বিক্রেতারূপে। নিউইয়র্ক ড্রামাটিক আর্ট একাডেমির স্নাতক হয়ে ১৯৪১ সালে গায়ক বার্তাবাহীরূপে মঞ্চে যোগদান করেন। স্ট্যানলি ক্রেমারের 'চ্যাম্পিয়ন' তাঁকে চিত্রনায়করূপে প্রকাশ করে।

উল্লা জ্যাকবসন : আফ্রিকার পটভূমিতে 'জুলু' ছবিতে মিশনারী কন্যার ভূমিকায় ইতিপূর্বে অভিনয় করেছেন। তার আগে আর্নেম্যাটসন ও ইঙ্গমার বার্গম্যানের ছবিতেও অভিনয় করেছেন। এই সুইডিস

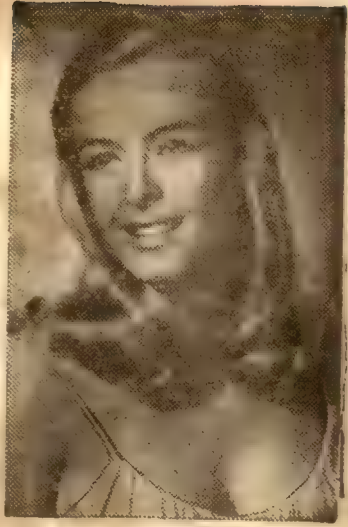

মেট্রোর 'দি লাইভলি সেট' ছবিতে ক্যারল ওয়েলস

এলিটে 'দি হিরোজ অব টেলিমার্ক' ছবিতে নরওয়ের তুষারাচ্ছন্ন অঞ্চলে নাৎসী পাহারা…

নিউইয়র্কের লিঙ্কন সেন্টারে মেট্রোপলিটান অপেরা হাউসে চার হাজার দর্শকের সামনে অভিনীত 'এ্যান্থনি ও ক্লিওপেট্রা' সঙ্গীত নাটকে সাফল্যপূর্ণ অনুষ্ঠানের পর মিস লিওনটাইন প্রাইসকে অভিনন্দন জানাচ্ছেন নায়ক জাস্টিন ডায়াজ।

অভিনেত্রী জার্মান, ফরাসী, ইতালীয় এবং ইংরেজী ভাষা চমৎকার বলতে পারেন। ব্যক্তিগত জীবনে অধ্যাপক উইনফ্রিড রোসম্যানের স্ত্রী, দুই সন্তানের জননী। ভিয়েনায় বাস করেন। 'দি হিরোজ অব টেলিমার্ক'এ একমাত্র প্রধান নারী চরিত্র অ্যানের ভূমিকায় সার্থক অভিনয় করেছেন।

উৎপল দত্তের সম্মান ...

নাট্যকার ও অভিনেতা শ্রীউৎপল দত্ত ১৯৬৫ সালের শ্রেষ্ঠ নাট্যপরিচালক হিসাবে সঙ্গীত নাটক একাদেমীর পুরস্কার লাভ করেছেন। গত ৪ঠা অক্টোবর একাদেমীর পক্ষ থেকে শ্রীদত্তকে এক তারবার্তায় এ খবর জানিয়ে দেওয়া হয়েছে।

শ্রীউৎপল দত্ত এই পুরস্কার পেয়েছেন 'কল্লোল' নাটক পরিচালনার জন্য। 'কল্লোল' নাটক মিনার্ভা থিয়েটারে ১৯৬৫ সাল থেকে চলছে। 'ফেরারী ফৌজ' নাটকের জন্য ইতিপূর্বে তিনি একাদেমী পুরস্কার পেয়েছিলেন এবং সেই পুরস্কার তিনি গ্রহণ করেছিলেন।

এই পুরস্কারে শহরের সাংস্কৃতিক-মহলে রীতিমত বিস্ময় সৃষ্টি হয়েছে। কারণ 'কল্লোল' নাটকে জনসাধারণ উৎসাহিত হলেও পশ্চিমবঙ্গের শাসকদল মোটেই সন্তুষ্ট ছিলেন না। নাটকটি বন্ধ করার জন্য সর্বপ্রকারে চেষ্টা হয়েছে। এমন কি সংবাদপত্রে বিজ্ঞাপন ছাপা পর্যন্ত বন্ধ করে দেওয়া হয়েছিল। শ্রীউৎপল দত্তকে দীর্ঘদিন বিনা বিচারে আটক করেও রাখা হয়েছিল। দেশ স্বাধীন হবার পর স্বদেশী শাসকদের দ্বারা আর কোন নাটক ও নাট্যকার এত বিরোধিতার সম্মুখীন হন নি। কিন্তু শেষ পর্যন্ত দেখালেন কেন্দ্রীয় সরকারের সঙ্গীত নাটক একাদেমীর বিচারে এই নাটকেরই পরিচালক ১৯৬৫ সালের শ্রেষ্ঠ পরিচালক।

স্টুডিও খবর

অভিশপ্ত চম্বল

মঞ্জু দে পরিচালিত 'অভিশপ্ত চম্বল' এর নৃত্যাংশে থাকছেন বোম্বাইয়ের নর্তকী অভিনেত্রী মধুমতী। এ মাসের ১৪ই ও ১৫ই ক্যালকাটা মুভিটোন স্টুডিওয় তাঁর নৃত্যাংশের ছবি গ্রহণ করা হবে।

জীবনমৃত্যু

হীরেন নাগ পরিচালিত 'জীবনমৃত্যু' ছবির চিত্রগ্রহণ সম্প্রতি শেষ হয়েছে। উত্তমকুমার ও সুপ্রিয়া চৌধুরী ছবির নায়ক-নায়িকা।

তীরভূমি

গুরু বাগচীর পরবর্তী ছবি 'তীরভূমি'। শচীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের রচিত কাহিনী অবলম্বনে চিত্রনাট্য রচিত হয়েছে। ছবির প্রধান চরিত্রে থাকবেন বিকাশ রায়, মঞ্জু দে, রুমা গুহঠাকুরতা, রবি ঘোষ।

উকিল দাদুর নাতনী

অজিত গাঙ্গুলীর পরবর্তী ছবি 'উকিল দাদুর নাতনী'। কাহিনী পরিচালকের স্বরচিত।

সংবাদবন্যা

মস্কো উৎসবে তেলেগু ছবি

মস্কো চলচ্চিত্র উৎসবে প্রদর্শনের জন্য ভারত সরকার এবারে একটি তেলেগু ছবি

পাঠাচ্ছেন। ছবিটির নাম 'পদাদি মনডুক'। পরিচালনা করেছেন মধুসূদন রাও। ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের পটভূমিতে একটি উদ্দীপক বিষয় নিয়ে ছবিটি নির্মিত হয়েছে। এই ছবিটি অন্ধ্র রাজ্য সরকারের ৫০ হাজার টাকা পুরস্কার পেয়েছে।

সানফ্রান্সিসকোয় আলি আকবর খাঁ

বিখ্যাত সুরকার আলি আকবর খাঁ সানফ্রান্সিসকো সংগীতানুষ্ঠানে বিপুলভাবে অভিনন্দিত হয়েছেন। তাঁর সংগীত আলোচনা করতে গিয়ে 'সানফ্রান্সিসকো ক্রনিকল'-এর সংগীত সমালোচক তাঁকে এ যুগের অন্যতম শীর্ষস্থানীয় সংগীত-শিল্পিরূপে অভিনন্দিত করেছেন। আর একজন সমালোচক লিখেছেন সংগীতে যাঁর বিন্দুমাত্র অনুরাগ আছে তাঁর আলি আকবরের সংগীত অবশ্য শ্রোতব্য।

দিলীপকুমার-সায়রা বানু

চলচ্চিত্রাভিনেতা দিলীপকুমারের সঙ্গে সায়রা বানুর বিয়ে ঘোষিত হয়েছে। সায়রা বানু গত যুগের বিখ্যাত অভিনেত্রী নাশিমের কন্যা। এই বিয়ে সম্পর্কে সায়রা বানু বলেন, দিপীলকুমারের প্রতি আমার ভালবাসা দীর্ঘদিনের। তিনি আমাকে কয়েকদিন আগে বিয়ের প্রস্তাব করার সঙ্গে সঙ্গেই আমি আনন্দে অভিভূত হয়ে সম্মতি জানাই। বিয়ের পরে এঁরা তেহেরানে মধুচন্দ্রিকা যাপনের কথা চিন্তা করছেন।

অর্ফেন ছাত্র-ছাত্রীদের সাহায্যকল্পে "মায়ামহল"

প্রতি বছরের ন্যায় এবারও দুঃস্থ পিতৃ-মাতৃহীন ছাত্র-ছাত্রীদের সাহায্যার্থে "সোস্যাল ওয়েলফেয়ার এসোসিয়েশন"-এর সভ্য-সভ্যাদের উদ্যোগে আগামী ১৩ই অক্টোবর বৃহস্পতিবার মহালয়ার সন্ধ্যায় ৬-৩০ মিনিটে যোগীযাদুকর মৃণাল রায়ের 'মায়ামহল' প্রদর্শিত হবে। এই যাদুনাটকটি ইতিমধ্যে সার্থক প্রয়াসরূপে দর্শকমন্ডলীর প্রশংসা লাভ করে।

ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক বঙ্গীয় লোকসংস্কৃতি পরিষদের অধ্যক্ষ ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য দিল্লীর সংগীত নাটক একাডেমির ফেলো নির্বাচিত হয়েছেন বলে সংবাদ পাওয়া গেছে। বাংলা নাটক ও লোকসংগীত বিষয়ে তাঁর বহু গ্রন্থ বাংলার পাঠকসমাজে সুপরিচিত। সম্প্রতি তিনি বাংলা লোকসংগীতের কোষগ্রন্থ প্রকাশ করেছেন। কয়েক বৎসর পূর্বে তিনি সোভিয়েট রাশিয়ার আমন্ত্রণ লাভ করে সেখানে গিয়ে বঙ্গীয় লোকসংগীত ও নাটক বিষয়ে কয়েকটি বক্তৃতা করেন।

সায়রা বানু ও দিলীপকুমার

ভগিনী নিবেদিতা জন্মশতবার্ষিকী সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা

ভগিনী নিবেদিতার পূণ্য জন্ম-শতবার্ষিকী উপলক্ষে যুব ও ছাত্রগণের জন্য একটি সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতার আহবান করা হয়েছে। এই প্রতিযোগিতার মাধ্যমে পথিকৃৎ নিবেদিতার আদর্শ, বাণী, ধ্যান-ধারণা ও মতবাদ সংক্রান্ত সমুদয় বিষয় ছাত্রগণকে অবহিত করার চেষ্টা হয়েছে। নিচে প্রতিযোগিতার বিষয়গুলি দেওয়া হল—

ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য (১) ভগিনী নিবেদিতার রচনা থেকে ১০ লাইনের উধৃতি পাঠাবার জন্য বলা হচ্ছে। শ্রেষ্ঠ উধৃতিকারী পুরস্কৃত হবে। (২) স্বামী বিবেকানন্দের ভগিনী নিবেদিতা বিষয়ক রচনা থেকে অংশবিশেষ আবৃত্তি। (৩) ভগিনী নিবেদিতা বিষয়ক প্রশ্নোত্তর প্রতিযোগিতা (৪) আলোচনা প্রতি-যোগিতা (ক) আমাদের জীবনে ও ধর্মে ভগিনী নিবেদিতার স্থান (বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য), (খ) নবযুগের বাংলা ও ভগিনী নিবেদিতা (মহাবিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য)। প্রতিটি বিষয়ের জন্য মূল্যবান পুরস্কার দেওয়া হবে। যোগাযোগের ঠিকানা—ইয়ং ইন্ডিয়া—১১৪এ, বিধান সরণী কলিকাতা-৪।

তিনজন শিল্পী

সম্প্রতি উত্তরপ্রদেশে অনুষ্ঠিত তিনটি সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে অংশ গ্রহণ করে এলেন কলকাতার তিনজন শিল্পী। এঁরা হলেন তরুণ সংগীত শিল্পী সলিল মিত্র, মূকাভিনেতা যোগেশ দত্ত এবং যন্ত্রশিল্পী হিমাংশু বিশ্বাস। যথাক্রমে এলাহাবাদে, লক্ষ্ণৌয়ের চারবাগে এবং জামালপুরের রেলওয়ে এ্যাপ্রেন্টিস ইনস্টিটিউটে এই তিনটি সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়। সলিল মিত্র রবীন্দ্রসংগীত, লোকগীতি এবং আধুনিক সংগীত পরিবেশন করে দর্শকদের অকুণ্ঠ প্রশংসা অর্জন করেন। হিমাংশু বিশ্বাস রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'বীরপুরুষ' কবিতাটি যন্ত্রের সুরে ফুটিয়ে তুলে দর্শকদের মুগ্ধ করেন। মূকাভিনেতা যোগেশ দত্ত মূক এবং কৌতুক অভিনয় পরিবেশন করে দর্শকদের ভূয়সী প্রশংসা অর্জন করেন।

একক অভিনয়

শাহাদত নামের এক তরুণ সিরাজউদ্দৌলা নাটকটি একক অভিনয় করেন। সামান্য পারিশ্রমিকে তিনি বিভিন্ন অনুষ্ঠানে অংশ গ্রহণে আগ্রহী। তাঁর ঠিকানা : ৩৫ এফ, ব্রাইট স্ট্রীট, কলিকাতা-১৭।

নিকোলাই চেরকাশোভ

আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন সোভিয়েত অভিনেতা নিকোলাই চেরকাশোভের জীবনাবসান হয়েছে গত ১৪ই সেপ্টেম্বর। সিনেমার পর্দায় আমরা তাঁর অভিনয়ের সঙ্গে পরিচিত হয়েছি; এবং তাঁকে দেখার অনেকের সৌভাগ্য হয়েছে ১৯৫১ সালে, যখন তিনি বিখ্যাত পরিচালক ভি পুডোভকিনের সঙ্গে ভারতে এসেছিলেন।

চেরকাশোভ এক রেলওয়ে কর্মচারীর ঘরে ১৯০৩ সালে জন্ম গ্রহণ করেছিলেন। তাঁর মা-বাবা এবং তাঁর নিজের ইচ্ছা ছিল ডাক্তারী পড়ার। ডাক্তারী পড়তে পড়তে অপেরা থিয়েটারে চালিয়াপিনের অভিনয় দেখে এত অনুপ্রাণিত হন যে, তিনি জীবনের গতি পরিবর্তন করে দেন। ডাক্তার না হয়ে অভিনেতা হবার সিদ্ধান্ত করেন।

প্রথমে তিনি একজন এক্সট্রা হিসাবে কাজ আরম্ভ করেন, কিছুদিনের মধ্যে তাঁকে সংলাপহীন অভিনেতাদের মধ্যে গ্রহণ করা হয়। সে সময় তিনি যেমন ছিলেন লম্বা তেমন পাতলা ছিপছিপে। তাঁকে শারীরিক ক্রীড়াকৌশল দেখাবার ভূমিকা দেওয়া হয়েছিল। তিনি এসব কাজে বেশ ওস্তাদ ছিলেন। এভাবে মঞ্চে নামতে নামতে তাঁকে 'দি ইভিল-ফোর্স' অপেরায় এক ক্লাউনের ভূমিকা দেওয়া হয়, কিন্তু চরিত্রলিপিতে নাম দেওয়া হয় না। কিন্তু এই নামহীন ক্লাউন দর্শকদের হাসি আনন্দে মাতিয়ে তোলে, তার প্রতি হাততালিতে প্রেক্ষাগৃহ মুখর হয়ে ওঠে। এক অভিনয় রজনীতে চালিয়াপিন কর্মকার এরেনকার চরিত্রে অভিনয় করছিলেন। কিন্তু দর্শকদের দৃষ্টি ছিল চেরকাশোভের প্রতি। চালিয়াপিনের এটি নজরে আসতেই তিনি চিৎকার করে ক্লাউনকে সরিয়ে নেবার নির্দেশ দিয়েছিলেন এবং তাকে সরিয়ে দেওয়া হয়েছিল। এটা খুবই অপমানজনক ঘটনা। তা সত্ত্বেও সেই অনামী ক্লাউন খ্যাত গায়ক চালিয়াপিনের ভক্ত ছিলেন। সম্ভবত এই কারণে যে চালিয়াপিনের কাছ থেকে তিনি মঞ্চাভিনয়ের গুপ্ত কৌশল শিক্ষা পেয়েছিলেন।

কয়েক বছর মঞ্চাভিনয়ে অভিজ্ঞতা লাভ করলেন। মারিনিস্কি অপেরা থেকে ইয়ং ব্যালে স্টুডিওতে অভিনয় করলেন। এখানে তিনি ডন কুইক্সোটের কঠিন ভূমিকায় অভিনয় করলেন। এরকম ভূমিকায় অভিনয় করার পরও চেরকাশোভ ভাবছিলেন সত্যিকার অভিনেতা হতে গেলে তাঁকে আরও শিখতে হবে। তাঁর সামনে তখন দুটি প্রশ্ন—থিয়েটার আর্ট শিক্ষালয়ে ভর্তি হবেন, অথবা সিনেমা আর্ট শিক্ষালয়ে ভর্তি হবেন। এই দুটি শিক্ষায়তন তখন নতুন এবং দুটিই লেনিনগ্রাডে অবস্থিত। চেরকাশোভ স্থির করলেন দুটিতেই ভর্তি হবেন। কিন্তু সিনেমা ইনস্টিটিউট তাঁকে ভর্তি করার ব্যাপারে উৎসাহ দেখাল না, সুতরাং তিনি থিয়েটার ইনস্টিটিউটে ভর্তি হলেন।

ইতিমধ্যে চরিত্রাভিনেতা, বিশেষ করে কৌতুক চরিত্র অভিনয়ে তাঁর নাম হয়েছে। লেনিনগ্রাডের তরুণ দর্শকদের থিয়েটারে অভিনয়ের জন্য তাঁকে আমন্ত্রণ করা হয়। এই থিয়েটারে তিনি চার বছর অভিনয় করেন এবং জীবনের এক সৌভাগ্যময় সময় বলে এই দিনগুলির কথা বলতেন।

যে অভিনেতা জুলেভার্নের 'ক্যাপ্টেন গ্রান্টস চিলড্রেন'-এ কৌতুকাত্মক ও খেয়ালী ফটোগ্রাফারের চরিত্রে অভিনয় করতেন, সেই অভিনেতা 'ডেপুটি অব দি বল্টিক'-এ নাটকীয় চরিত্র বিজ্ঞানী পলেঝিয়েভের ভূমিকায় রূপদান করেন। এ সময় তাঁর বয়স ৩২ বছর, তিনি অভিনয় করছিলেন ৭০ বছরের প্রবীণ বিজ্ঞানীর চরিত্রে। একই সময়ে তিনি 'পিটার গুয়ান' ছবিতে পিটারের ছেলের চরিত্রে অভিনয় করছিলেন। অসাধারণ প্রতিভাসম্পন্ন চলচ্চিত্র পরিচালক সের্গেই আইজেনস্টাইন তাঁকে বিশ্বের সেরা অভিনেতাদের সারিতে উপস্থিত করেন তাঁর 'ইভান দি টেরিবল' ছবিতে অভিনয় করার জন্য নির্বাচিত করে। 'ইভান দি টেরিবল'-এ চেরকাশোভ বিশ্বের চলচ্চিত্র দর্শকদের কাছে এক আশ্চর্য অভিনেতারূপে উপস্থিত হন।

আবার তাঁকে 'আলেকজান্দার নেভস্কি' ছবিতে অভিনয়ের জন্য নির্বাচিত করা হলে তিনি বলেন, আইজেনস্টাইনের সঙ্গে কাজ করার আবার সুযোগ পেয়ে আমি উৎসাহিত। আমি সঙ্গে সঙ্গে এই প্রস্তাব গ্রহণ করি।' 'ইভান দি টেরিবল' এর দ্বিতীয় ভাগ কাজের সময় যুদ্ধ সুরু হয়। একদিকে প্রচণ্ড যুদ্ধ চলেছে, সোভিয়েত ইউনিয়নকে ফ্যাসিস্টরা ঠেসে ধরেছে, এই সময়ও 'ইভান দি টেরিবল'-এর কাজ চালিয়ে যাবার জন্য বলা হল। ১৯৪৩ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে কাজাক প্রজাতন্ত্রের আলমাআতায় নবনির্মিত 'কালচারাল সেন্টার' এ কাজের জন্য ছেড়ে দেওয়া হয়েছিল।

'১৯১৮ সালে লেনিন' ছবিতে তিনি ম্যাক্সিম গোর্কীর চরিত্রে অভিনয় করেন।

পরবর্তীকালে আরো বহু ছবিতে তাঁর অসাধারণ অভিনয় দেখার সুযোগ বিশ্বের চলচ্চিত্র দর্শকদের হয়েছে। তখন চেরকাশোভের অভিনয়খ্যাতি কেবলমাত্র সোভিয়েত ইউনিয়নে সীমাবদ্ধ নয়, সারা বিশ্বে পরিব্যাপ্ত। সোভিয়েতের জনসাধারণ তাঁর সম্পর্কে শ্রদ্ধার সাথে বলেন: তিনি 'হাজার মুখোসধারী অভিনেতা'।

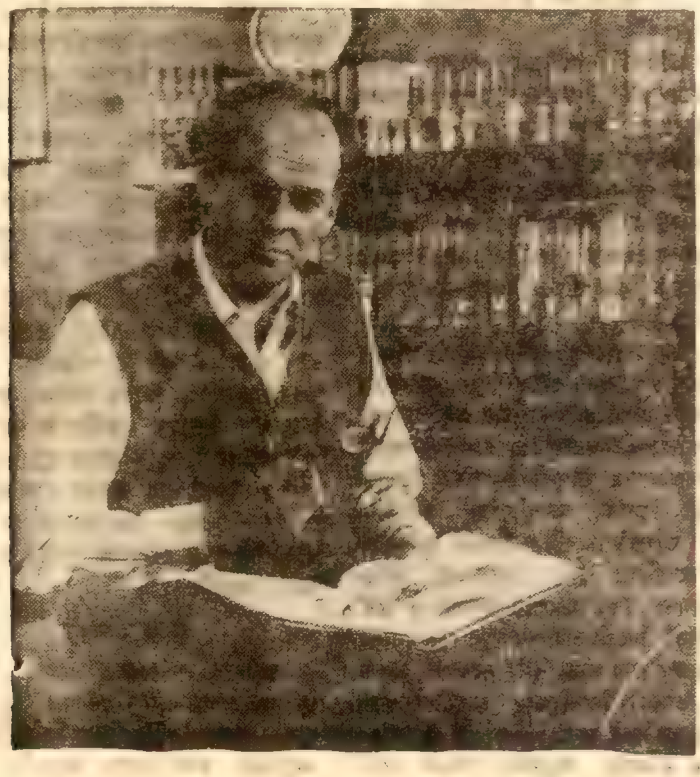

নিকোলাই চেরকাশোভ

প্রাচীন সাহিত্যে ভারতীয় সংস্কৃতি

চিত্তরঞ্জন দেব

অদ্ভুত মিল এই বাংলার প্রচলিত ধাঁধা ও প্রবচনের সঙ্গে মহারাষ্ট্রের প্রচলিত ধাঁধা ও প্রবচনের। ভারতের একপ্রান্তে অবস্থিত মারাঠী ভাষাভাষী দেশ নাগপুর ও তার পার্শ্ববর্তী অঞ্চল ইয়ৎমল, আকোলি, অমরাবতী, ওয়ার্দা, বুলডাণ্ডা, চাঁদা, বেতুল প্রভৃতি আর অপর প্রান্তে অবস্থিত বাংলা দেশ (পূর্ব ও পশ্চিমবঙ্গ একত্রে)।

আহার, বিহার, পোশাক, পরিচ্ছদ সব বিষয়েই এই দুই অঞ্চলের অধিবাসীদের ভিতর পার্থক্য রয়েছে যথেষ্ট পরিমাণে, কিন্তু তাদের লৌকিক জীবনযাত্রা-প্রণালী ঠিক একই খাতে প্রবহমান। ফলত লোক-সংস্কৃতির যে ফল্গুধারা বাংলার লোক-সংস্কৃতির ভিতর দিয়ে বয়ে চলেছে যেন তারই আর একটি শাখা হল মারাঠী ভাষাভাষী অঞ্চলের লোক-সংস্কৃতি।

উদাহরণস্বরূপ ধরা যাক মারাঠী ভাষার একটি অতি প্রচলিত ধাঁধাঃ—

ডালে বর ডালে, উর ডালে হাত
নাহী পুরত বোবল্যা ভারে।

[একটি ডালার উপর আরেকটি ডালা, এই প্রকার অনেক ডালা রাখলেও ঘর হাতে ছোঁয়া যায় না।]

এর উত্তর হল—আকাশ।

এ কথা বলাই বাহুল্য, এই ধাঁধাটি এ অঞ্চলের কিশোরদের ভিতরই সমধিক প্রচলিত। এর সঙ্গে অনায়াসে তুলনা করা চলে বাংলার অতি প্রচলিত এক কিশোরসমাজের ধাঁধাঃ—

একগাছি দড়ি
গুছাইতে না পারি। =পথ।

ধাঁধা যে সব সময় কিশোরসমাজের ভিতরই সীমাবদ্ধ থাকে তা নয়। যুবা, বৃদ্ধ সকল সমাজের মধ্যেই সমান আদৃত। তবে লক্ষ্য করবার বিষয় এর ভিতর সব সময়েই একটি পরিণত মনের শিল্পবোধের পরিচয় মেলে। তবে এই ধাঁধার বিষয়বস্তু সকল সময়েই আমাদের সমাজের বা পারিপার্শ্বিক জীবনের অতি পরিচিত বিষয় বা বস্তুকে অবলম্বন করেই রচিত হয়ে থাকে,—সম্ভবত একথা সকল দেশের ধাঁধা সম্পর্কেই প্রযোজ্য। উদাহরণস্বরূপ ধরা যাক একটি প্রচলিত মারাঠী ধাঁধা ঃ—

ওরুসা গড়ু ত্যাল পাহু পাহু রড়ু

[এইটুকু ছোট্ট ঘটি, তাকেও দেখে দেখে কাঁদতে হয়]

এর উত্তর হল,—পিঁয়াজ।

এই পিঁয়াজ নিয়ে বাংলা দেশেও ধাঁধার অন্ত নেই। উদাহরণস্বরূপ ধরা যাক ঃ—

বন থেকে বেরুল টিয়ে
লাল গামছা গায়ে দিয়ে।

সমাজজীবনে পাদুকা বা জুতোর ব্যবহার নেহাৎই আবশ্যিক। কাজেই এই জুতোকে অবলম্বন করেও যে মারাঠী ভাষায় ধাঁধা রচিত হবে এ-আর একটা বেশি কথা কী? ঃ—

কালী গায় কাটে খায়
পান্যাল্যা পাহুন উবিরায়।

[কালো গরু কাঁটা খায়, কিন্তু জল দেখলেই ভয়ে দাঁড়ায়]

এর উত্তর হল,—জুতো।

পূর্ববঙ্গ কৃষিপ্রধান দেশ। তাই, সেখানকার অনেক ধাঁধার ভিতরই কৃষি-কর্মের সরঞ্জামের কথা থাকাটা অস্বাভাবিক নয়। উপরোক্ত মারাঠী ধাঁধার অনুরূপ একটি ধাঁধা পূর্ববঙ্গেও প্রচলিত আছে ঃ—

এটটু এটটু পোলাপান
দুধু ভাতু খায়,
বড় বড় মাইনষের লগে
যুদ্ধু করবার যায়।
=কুঠার (কুড়ুল)

বাংলায় যেমন পান, মারাঠী অঞ্চলে তেমনি এলাচীর বড় সমাদর। কাজেই এই অঞ্চলের ধাঁধার ভিতর এরও আবির্ভাব একেবারে অপ্রত্যাশিত নয় ঃ—

অম্বা খাল্লা অম্বারাইত,
সাল ফেক্‌লা বাজারাত,
বাস্ আনলা দরবারাত।

[আমগাছের কাছে আম খেলাম, আঁটি ফেললাম বাজারে, কিন্তু গন্ধ এল দরবার পর্যন্ত]

এর উত্তর হল,—এলাইচী (এলাচ)।

এই ধরনের একটি ধাঁধা বাংলায়ও প্রচলিত আছে ঃ—

ও পারেতে বুড়ি মরেছে,
এ পারে তার গন্ধ ছেড়েছে।
=কাঁঠাল।

ভারতীয় সমাজের গৃহস্থালীতে লঙ্কা একটি অত্যন্ত সুলভ বস্তু। কাজেই এর উপরও ধাঁধা রচিত হওয়া নেহাৎই স্বাভাবিক ঃ—

লাল পাল্‌খী হিরক দণ্ডা,
ত্যাত্ বস্‌তাত বোরখ্যা রোণ্ডা।

[লাল পাল্কী সবুজ হাতল, কিন্তু ভিতরে আছেন ন্যাড়া মাথার লোক।]

এর উত্তর হল,—পিক্‌লেলী মিরচী (পাকা লংকা)।

এর সঙ্গে বাংলায় প্রচলিত ধাঁধাটি স্মরণযোগ্য ঃ—

একটুখানি গাছে
রাঙা বৌটি নাচে। =লাল লঙ্কা।

এ কথা বলাই বাহুল্য ধাঁধার প্রচলন সাহিত্যে নতুন কিছু নয়। প্রকৃত ও পুরাতন সাহিত্যের বহু স্থানেই এর উল্লেখ আছে। এর ভেতর যেমন অবসর বিনোদনের খোরাক আছে, তেমনি অনেক সময় অনেক চিন্তার বিষয়ও থাকে। উদাহরণস্বরূপ নাগপুর অঞ্চলে প্রচলিত

একটি মারাঠী ধাঁধার কথা উল্লেখ করা চলে ঃ—

তিন ডোরে আহে পন বাঁকর নন্ হে,
ভগবে কপড়ে আহে পন সন্ন্যাসী নন হে,
শেণ্ডী আহে পন ভট্ট নাহী হে,
পানী আহে পন গে নন হে।

[দাড়ি রয়েছে কিন্তু শঙ্কর নন,
গেরুয়া বসন কিন্তু সন্ন্যাসী নন,
টিকি আছে কিন্তু ছোটখাট ব্রাহ্মণ নন
জল আছে কিন্তু তাতে মেঘ নেই।]

এর উত্তর হল,—নারল (নারিকেল)।

একটি খোসা ছাড়ানো শুকনো নারকেলকে দেখতে যে অনেকটা যোগী ঋষি বা সন্ন্যাসীর মতন এ-বিষয়ে বাংলা বা মারাঠী ভাষাভাষী অঞ্চলের সকলেই একমত। উপরোক্ত ধাঁধাটির মত ঝুনো নারিকেলকে উপলক্ষ করে বাংলায়ও প্রচলিত একটি ধাঁধার উল্লেখ করা চলে ঃ—

বৃক্ষ-অগ্রে বৈসে সেই নহে পক্ষজাতি।
ত্রিলোচন জটাভার নহে পশুপতি॥
নদনদী নয় তার অঙ্গময় কায়।
রক্তমাংসে জড়িত নয় নারী বলয়॥

নারকেল যেমনি একটি পরিচিত বস্তু উভয় দেশের বাসিন্দাদের কাছেই তেমনি এর চাইতেও আমাদের সকলের কাছে যে বস্তুটি অতি পরিচিত সে হল আমাদের মুখমণ্ডল বা মুখ। কাজেই একে বাদ দিয়ে কি আর ধাঁধা রচনা সম্ভব? তাই মারাঠী বালক-বালিকাদের ভিতর ধাঁধার ছলে প্রশ্ন করতে শোনা যায় ঃ—

গুরসা গড়ু ত্যাত্ বত্তিশ্ লাড়ু।
[একটুখানি গাড়ু তাতে বত্রিশ (৩২)টি নাড়ু।] =মুখ।

পূর্ববঙ্গে অনুরূপ একটি ধাঁধার সন্ধান পাওয়া যায় ঃ—

আঁধার পুকুর গড়ান মাঠ।
বত্রিশটা কলাগাছ একখানা পাট॥
=দাঁত ও জিহ্বা।

ধাঁধা যে সব সময় অতি পরিচিত বিষয় বা বস্তুকে অবলম্বন করেই রচিত হয় তা নয়। অনেক সময় অনেক স্বল্প পরিচিত জিনিসকে অবলম্বন করেও এরা ধাঁধা বানায় ঃ—

ইকডুন আলী উগী মুগী—
তিকডুন আলী গাল ফুগী।
[এদিকে এলেন এদিক ওদিক থেকে,
ওদিকে এলেন গাল ফুলিয়ে।]
=জলের বুদ্বুদ্।

একদিকে যেমনি জলের বুদ্বুদ্ অপর দিকে তেমনি ধোঁয়া। একে অবলম্বন করেও বাংলায় ধাঁধা রচিত হয়েছে ঃ—

লতা নাড়িতে যায়,
লতা চোখের মাথা খায়।

এই ধরনের আর একটি ধাঁধা হল বিজলী বা বিদ্যুৎকে নিয়ে। তবে মারাঠী ভাষায় বিদ্যুৎকে অবলম্বন করে যেখানে বলছে ঃ—

ঘর ঘর পাহুনে
চমক চমক চমকতে।
[প্রতি ঘরেই এই অতিথি ঘর উজ্জ্বল করে।]

বাংলাদেশের ধাঁধা-রচয়িতারা সেখানে বলছেন ঃ—

এই দেখি, এই নাই,
তারা বনে বাঘ নাই।

কাজেই এটি অধিকতর চিন্তাযোগ্য সন্দেহ নেই, বরং এর চাইতে বাংলায় প্রদীপের আলো সম্পর্কে যে ধাঁধাটি রচিত হয়েছে সেটি বোধ হয় অধিকতর সহজবোধ্য এবং পূর্বোক্ত মারাঠী ধাঁধাটির সমপর্যায়ভুক্ত ঃ—

এক গাছ খেড়ে।
সকল ঘর বেড়ে॥

বিজলীর আলো যেমন সকল আঁধার ঘরই আলো করে তেমনি মাটির প্রদীপের স্নিগ্ধ আলোও সকল অন্ধকার দূর করে দেয়।

পূর্বেই উল্লেখ করেছি, ধাঁধা হল বুদ্ধির খেলা কিন্তু তা নির্দিষ্ট কতকগুলি জিনিসের মধ্যেই সীমাবদ্ধ—এর উত্তরও পূর্বাহ্নেই স্থিরিকৃত। কিন্তু প্রবাদ বচন বা প্রবচন তা নয়—এ হল বহুদর্শী লোকের দীর্ঘদিনের অভিজ্ঞতা-প্রসূত বাণীবিশেষ। অনেকটা জ্যামিতির স্বতঃসিদ্ধ প্রমাণের মতই বৈজ্ঞানিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ একটি জিনিস যে, কোন দিনই লোকের মন থেকে মুছেও যায় না বা বহুবার প্রয়োগের পরও এর প্রয়োজনীয়তা ফুরিয়ে যায় না। একথা শুধুমাত্র আলোচ্য এই দুই অঞ্চলের প্রবাদ সম্পর্কেই নয়—পৃথিবীর সকল দেশের প্রবচন সম্পর্কেই বলা চলে। আপাতত এ স্থলে আমরা মারাঠী প্রবাদের সঙ্গে বাংলার প্রবাদের মিল সম্পর্কেই যৎকিঞ্চিৎ আলোচনায় প্রবৃত্ত হচ্ছি।

বাংলার একটি অতি প্রচলিত প্রবাদ ঃ—

ভাত ছড়ালে কাগের অভাব হয় না।

অর্থাৎ পয়সা থাকলে তার আর কোন কিছুরই অভাব হয় না। মারাঠী ভাষায়ও ঠিক এই ধরনের একটি প্রবাদের প্রচলন দেখতে পাওয়া যায় ঃ—

অস্তীল শিতে
তরং জমতীল ভুতে।
[যেখানে এ'টো থাকে, সেখানেই ভূত আসে।]

এই রকম আর একটি মারাঠী প্রবাদ ঃ—

অথরূণ পাহুন পাঁয় পসর ওয়ে
[অর্থ দেখিয়া পা বাড়াও]

এর সঙ্গে বাংলায় প্রচলিত প্রবাদটি লক্ষণীয় ঃ—

ভাবিয়া করিও কাজ
করিয়া ভাবিও না—।

মারাঠী ভাষায় একটি সুন্দর প্রবাদের প্রচলন রয়েছে, কোন এক ব্যস্তবাগীশ লোককে উপলক্ষ করে ঃ—

উতাওয়ালা নওরা গুধগ্যালা
বাশীংগে।

[যে জামাই অত্যন্ত তাড়াহুড়া করে, সে তাড়াহুড়ার চোটে কনেকে না দেখতে পেয়ে নিজের হাঁটুতেই মুকুট পরায়।]

এর সঙ্গে অনায়াসেই মিলিয়ে নিতে পারেন ঃ—

হারা পথে দৌড়াদৌড়ি
কুঁদ ঘাটায় গড়াগড়ি।
কিংবা—সোনা ফেলে আঁচলে
গেরো।

বাংলা প্রবাদের ভিতর যেখানে বলছে ঃ—

অল্পজলের তিতপুঁটি
ফটাং ফটাং করে।

মারাঠী প্রবচনে ঠিক এই জিনিসটিই দেখতে পাই ঃ—

উথল প্যান্যালা খলখল করে।
[একটুখানি জলেই বেশি খল্ খল্ ধ্বনি।]

একটি মারাঠী প্রবাদে বলছে,—মূর্খের যে-কোন কাজই ব্যর্থ ঃ—

পাট বাচ্যা গোধল আলি লথাণ্ডা
সুচাল।
[অনেক মূখের এক জায়গায় হওয়া মানে, গাধার লাথি আর তামাসার মত।]

এর সঙ্গে বাংলায় প্রচলিত প্রবাদ ঃ—

অর্বাচীনের নেমন্তন্ন না আঁচাইলে বিশ্বাস নাই—

এর ভারি সুন্দর মিল রয়েছে।

"জলে থেকে কুমীরের সঙ্গে ঝগড়া"—কোনমতেই যুক্তিসংগত নয়—একথা বাংলার প্রবাদ-রচয়িতারাও যেমন বুঝেছেন, মারাঠী প্রবাদ-রচয়িতাগণও ঠিক তেমনটিই বুঝেছেন ঃ—

পানয়াত রাহুন মাশাশী বৈর।
[জলে থেকে মাছের সাথে ঝগড়া]

এই ধরনের উদাহরণ আরও অনেক আছে, সময়ান্তরে এ সম্পর্কে বিস্তৃত আলোচনা সাপেক্ষ।

ভারত ডেভিস কাপের সেমি-ফাইন্যালে

রং বেরং-এর ফুল ও পাতায় ভরা টোকিওর শহরতলী। ছবির মতন টেনিস খেলার মাঠ তার বুকে। ডেনেন কলিস্যিয়ামের ক্লে কোর্ট। টেনিস মাঠের আশপাশে সবুজের সমারোহ, দর্শকদের পোষাকে রং-এর বাহার কিন্তু খেলার মাঠটিতে সবুজের চিহ্ন নেই। ঘাস বর্জিত কাদায় লেপা কোর্ট।

৩০শে সেপ্টেম্বর শুক্রবার থেকে ডেভিস কাপের খেলা—ভারত ও জাপানের মধ্যে। ভারতের পক্ষে রমানাথন কৃষ্ণান ও প্রেমজিৎলাল ও জাপানের পক্ষে ওসামু ইশিগুরো ও কোজি ওয়াতানাবে। জাপানের প্রধানমন্ত্রী খেলার তালিকা তৈরি করলেন। প্রথম দিনের খেলায় রমানাথন কৃষ্ণান ওসামু ইশিগুরোকে সহজেই হারিয়ে দিয়ে ভারতকে জয়ের পথে এগিয়ে দিলেন। কৃষ্ণান ও ইশিগুরো দুজনেই পুরোনো অভিজ্ঞ খেলোয়াড়। তাদের খেলায় যৌবনের উন্দামতা ছিল না বটে তবে টেনিসের সূক্ষ্ম কলাকৌশলের স্বাক্ষর ছিল যথেষ্ট। কৃষ্ণান প্রথম সেটটি জেতেন ৬—৩ গেমে। দ্বিতীয় সেটটি ইশিগুরো দখল করেন ২—৬ গেমে। ৩য় সেটটিতে কৃষ্ণান ইশিগুরোকে দাঁড়াতেই দিলেন না। অতি সহজেই ৬—২ গেমে তাঁকে হারিয়ে ২—১ সেটে এগিয়ে গেলেন। সকলেই ভাবল ৪র্থ সেটে কৃষ্ণানকে বিশেষ গা ঘামাতে হবে না! কিন্তু জাপানী খেলোয়াড়ের ঝুলিতে ছিল কিছু গোপন কৌশল। সেগুলির প্রয়োগ করে ইশিগুরো খেলায় সৃষ্টি করলেন নতুন উত্তেজনা। ১৮ গেম পর্যন্ত খেলা চলল এবং ৪র্থ সেটটির নিষ্পত্তি হল ১০—৮ গেমে কৃষ্ণানের পক্ষে।

দ্বিতীয় খেলায় ভারতের পক্ষে নামলেন প্রেমজিৎ ও জাপানের পক্ষে ওয়াতানাবে। প্রথম থেকেই তরুণ খেলোয়াড়দ্বয় খুব ক্ষিপ্রতার সঙ্গে পরস্পরকে আক্রমণ করে চললেন। জাপানী দর্শকরা প্রচণ্ড করতালি দ্বারা ওয়াতানাবেকে উৎসাহিত করতে লাগলেন। অনুপ্রাণিত ওয়াতানাবের আক্রমণে প্রেমজিৎ ব্যতিব্যস্ত হয়ে পড়লেন। প্রেমজিৎ এক-একটি পয়েন্ট হারছেন আর দর্শকরা তুমুল করতালি দ্বারা তাঁকে নার্ভাস করে দিচ্ছে। আত্মবিশ্বাস ও দৃঢ়তা খেলায় ফুটিয়ে তুলবার আগেই প্রেমজিৎ দেখলেন তাঁর মুঠোর মধ্যে থেকে সেটটি হাতছাড়া হয়ে গিয়েছে। দ্বিতীয় সেটে তিনি অবশ্য প্রতিশোধ নিলেন ৬—১ গেমে জিতে। ওয়াতানাবে নবীন উৎসাহে আরম্ভ করলেন ৩য় সেট এবং ৬—৪ গেমে জিতলেন। ৪র্থ সেটে প্রেমজিৎ মুছে ফেললেন ৩য় সেটের পরাজয়ের গ্লানি।

ডেভিস কাপে জাপানের বিরুদ্ধে সিংগলস খেলায় একটি শট মারছেন কৃষ্ণান

দুজনেই ২টি করে সেট জিতেছেন। প্রেমজিতের পেশীর ব্যথা তাঁকে কাবু করে ফেলল। কিন্তু প্রেমজিৎ সমানে লড়াই করে চললেন। আলোর অভাবে প্রথম দিনের খেলা বন্ধ হল। শেষ সেটে ফল হল ৪—৪ গেম। কিন্তু শেষ পর্যন্ত ওয়াতানাবে জাপানকেই জয়ী করল।

ভারতের পক্ষে খেলার ফলাফল নিষ্কলঙ্ক হত যদি না প্রেমজিৎ পরাজয় স্বীকার করতেন। কারণ ডাবলস ও পাল্টা সিংগলস খেলায় ভারত সব কটি খেলায় জিতেছে। কৃষ্ণান ও প্রেমজিৎ জুটি ইশিগুরো ও ওয়াতানাবেকে দ্বৈত খেলায় সহজেই হারিয়ে দেন। জাপানের আশা ছিল তরুণ ওয়াতানাবে প্রবীণ কৃষ্ণানকে সিংগলস খেলায় কাবু করে ফেলবেন এবং ফলে খেলার মোড় জাপানের পক্ষে ঘুরে যাবে। কিন্তু সে আশা ব্যর্থ হল। কৃষ্ণানের নিখুঁত ভলি এবং সুচতুর নেট ঘেঁসা মারগুলি ওয়াতানাবেকে দিশাহারা করে দিল। কৃষ্ণান সরাসরি জিতলেন ৬—২, ৭—৫, ৬—০ সেটে। প্রেমজিৎও প্রথম পরাজয়ের শোধ নিলেন ইশিগুরোকে ২—৬, ৮—৬, ৭—৫, ১০—৮ গেমে হারিয়ে। এই জয়ের ফলে ভারত পশ্চিম জার্মানির সঙ্গে খেলবে ইন্টার জোন সেমি-ফাইন্যালে। নভেম্বরের ১২, ১৩ ও ১৪ তারিখে দিল্লীতে এই খেলা অনুষ্ঠিত হবে বলে ঘোষণা করা হয়েছে।

শ্রীঅমিতাভ

ভারতীয় হকি দলের জাপান সফর

ভারতীয় হকি দল ৩ সপ্তাহব্যাপী জাপানে শুভেচ্ছা সফর শেষ করে হংকং-এ একটি প্রদর্শনী খেলায় স্থানীয় দলকে ৪—০ গোলে পরাজিত করে। জাপান

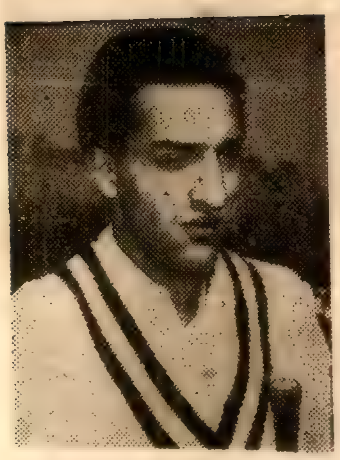

পতৌদির নবাব

প্রাচ্যদেশ সেই জন্য হকির প্রতি তার আকর্ষণ স্বাভাবিক। এই সফরে ভারতকে ১০টি খেলায় অংশ গ্রহণ করতে হয়। ২টি খেলায় ভারতকে জাপানের কাছে পরাজয় স্বীকার করতে হয় যদিও অবশিষ্ট ৮টি খেলায় ভারত জাপানকে পরাজিত করে। হকিতে ভারতীয় দলকে পরাজিত করা যে কোন দেশের পক্ষে গৌরবজনক। সুতরাং হকির দিক দিয়ে জাপান যে ক্রমোন্নতির পথে সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। তাছাড়া হকি খেলায় শক্তির চেয়ে স্টিকের চালনা ও কৌশল বেশি ফলপ্রসূ। কব্জির সুনিপুণ কৌশলে জাপানীরা সিদ্ধহস্ত এবং টেবিল টেনিসে তার প্রাধান্য বর্তমানে অনস্বীকার্য। ভারত যদি হকিতে প্রাধান্য বজায় রাখতে চায় তাহলে তার সর্বস্তরের দুর্বলতা দূর করতে হবে। দলকে এমন সুগঠিত করতে হবে যাতে যে কোন অবস্থায়, যে কোন অসুবিধায় শ্রেষ্ঠত্ব বজায় রাখতে পারে। জাপান সফরের শিক্ষা ভারতীয় হকি দল গঠনে যথেষ্ট সাহায্য করবে।

সারা বছর যাতে হকির অনুশীলন অক্ষুণ্ণ থাকে তার জন্যে বিভিন্ন প্রতিযোগিতা চালু করা হয়েছে। জবাহরলাল হকি প্রতিযোগিতা এর অন্যতম। এ বছর এই প্রতিযোগিতা ৫ই অক্টোবর দিল্লীতে সুরু হয়েছে। এই সব প্রতিযোগিতায় নব নব প্রতিভা আত্মপ্রকাশ করে ভারতীয় হকিকে শক্তিশালী ও সমৃদ্ধ করুক এই আমাদের কামনা।

দুই তারকার মিলন

টেস্ট অধিনায়ক পতৌদির নবাব মনসুর আলি খাঁ বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হতে চলেছেন। ক্রিকেট তারকা পতৌদি চিত্রতারকা শর্মিলা ঠাকুরকে বিবাহ করার কথা জানিয়েছেন। আগামী জানুয়ারী মাসে পতৌদি এবং শর্মিলা বিবাহে চুক্তিবদ্ধ হবেন এবং এক বছর পরে তাঁদের বিবাহ হবে।

পতৌদি বলেন যে, কয়েক মাস পূর্বে পূর্ব আফ্রিকায় তাঁদের দুজনের মিলন হয় এবং পরস্পর পরস্পরের প্রতি আকৃষ্ট হন। শর্মিলা ঠাকুর জানিয়েছেন যে, এখন নতুন কোন সিনেমার জন্য তিনি চুক্তিবদ্ধ হবেন না, পূর্বের চুক্তিবদ্ধ ছবিগুলি তিনি এক বছরের মধ্যে শেষ করবেন। কারণ বিবাহের পর আর চিত্রজগতের সঙ্গে সম্পর্ক না রাখার ইচ্ছা তিনি মনে মনে পোষণ করেন:

একেই বলে ক্রিকেটার

সম্প্রতি দক্ষিণাঞ্চলের একটি রঞ্জী ট্রফির খেলায় ভারতীয় টেস্ট ক্রিকেট অধিনায়ক পতৌদির নবাব উদার খেলোয়াড়ী মনোভাবের এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন। হায়দ্রাবাদ এবং মাদ্রাজ দলের রঞ্জী ট্রফির খেলায় ব্যাট করছিলেন হায়দ্রাবাদের পক্ষে পতৌদির নবাব। একটি বল পতৌদি খেলতে গেলে ব্যাটের কানায় লেগে বলটি উইকেটের পেছনে গেলে মাদ্রাজের উইকেট-রক্ষক বেলিয়াপ্পার প্লোভসের মধ্যে স্থান পায়। বেলিয়াপ্পা আউটের আবেদন জানান, কিন্তু ক্যাচটি সম্বন্ধে সন্দেহ থাকায় আম্পায়ার সত্যজিৎ রাও পতৌদিকে আউট দেন না। কিন্তু আম্পায়ার রাও এবং খেলোয়াড়দের অবাক করে পতৌদি ব্যাট হাতে প্যাভেলিয়ানের পথে পা বাড়ালেন, আম্পায়ার আউট না দিলেও তিনি বুঝেছিলেন তিনি আউটই হয়েছেন; একেই বলে সত্যকারের ক্রিকেটার।

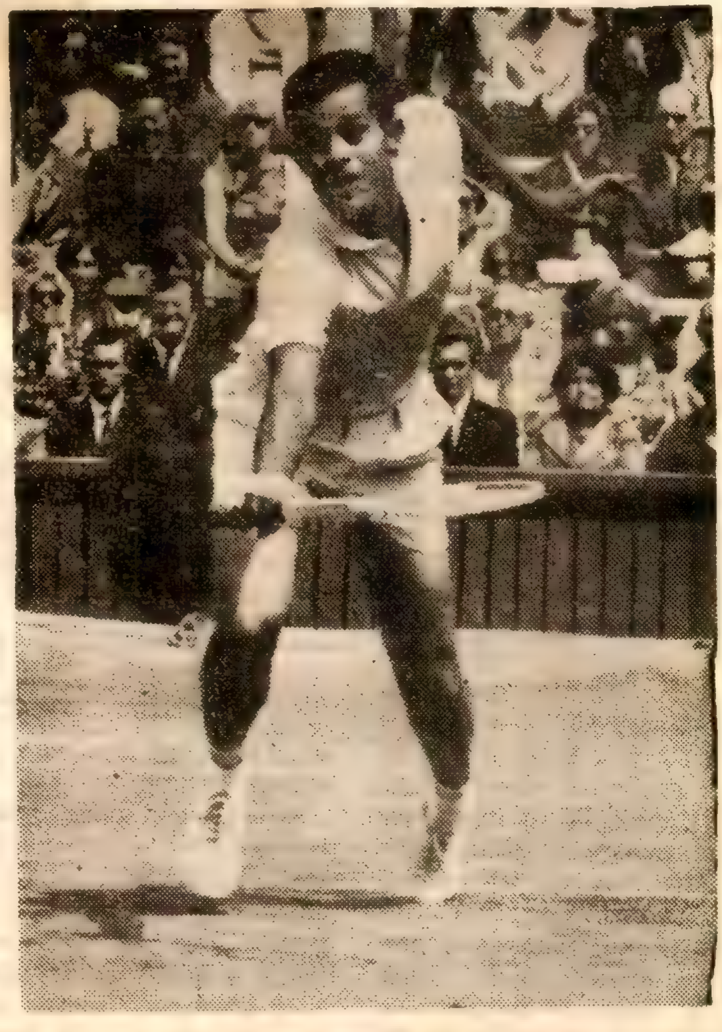

প্রেমজিৎ লাল

মাইকেল জ্যাজী

ইশিগুরো

সমাচার দর্পণ

ফ্রান্সের দূরপাল্লার দৌড়বীর মাইকেল জ্যাজী আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতার আসর থেকে অবসর গ্রহণ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন। কিছুদিন পূর্বে তিনি শেষ আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতায় যোগদান করেন ইংল্যান্ড এবং ফিনল্যান্ডের বিপক্ষে। এই প্রতিযোগিতায় মাইকেল জ্যাজী প্রথম স্থান দখল করেন।

* * *

জাপানের ডেভিস কাপ খেলোয়াড় ওসামু ইশিগুরো টেনিস কোর্ট থেকে বিদায় গ্রহণ করলেন। বর্তমানে ইশিগুরোর বয়স ত্রিশ বৎসর। শেষ প্রতিনিধিমূলক খেলায় প্রেমজিৎ লালের কাছে ইশিগুরো পরাজিত হন। অবসর গ্রহণের পর ইশিগুরো টেনিস শিক্ষক হবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন।

* * *

আগামী ২৬শে অক্টোবর আজাদ হিন্দ বাগে শুরু হচ্ছে তিনদিনব্যাপী আন্তঃবিশ্ববিদ্যালয় সন্তরণ প্রতিযোগিতা। এবারের আন্তঃবিশ্ববিদ্যালয় সন্তরণ প্রতিযোগিতায় মোট ষোলটি বিশ্ববিদ্যালয় অংশ গ্রহণ করবে। এই বিশ্ববিদ্যালয়গুলি হল কলকাতা, বেনারস, রাজস্থান, মহীশূর, বরোদা, দিল্লী, বেনারস সংস্কৃত বিশ্ববিদ্যালয়, যাদবপুর, লক্ষ্ণৌ, ইন্দোর, পাঞ্জাব, বোম্বাই, নাগপুর, পুনা, ওসমানিয়া এবং গুজরাত।

* * *

ব্যাংকক এশিয়ান গেমসের প্রস্তুতি পর্বের প্রথম পর্বে এ্যামেচার এ্যাথলেটিকস ফেডারেশান অফ ইণ্ডিয়া বিভিন্ন রাজ্যে কৃতী আশীজন এ্যাথলেটকে একটি শিক্ষা শিবিরে আমন্ত্রণ করেছেন। তিন সপ্তাহের এই শিক্ষা শিবির পাঞ্জাবের পাতিয়ালায় বসবে। পাতিয়ালার আন্তঃআঞ্চলিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় বিভিন্ন বিষয়ে স্থান প্রাপ্ত প্রথম ছজনকে দিল্লীতে একটি চূড়ান্ত ট্রায়ালে অংশগ্রহণ করতে দেওয়া হবে। এই দিল্লীর ট্রায়ালের পরই ব্যাংককের এশিয়ান গেমসের জন্য চূড়ান্ত ভারতীয় এ্যাথলেটদল গঠন করা হবে।

হায়দ্রাবাদের বিশ্ববিদ্যালয় ক্রিকেট ট্রায়াল প্রসঙ্গে

প্রবাল নাগ

মরসুমের ফুটবল বিদায় নিয়েছে ময়দান থেকে, শোনা যাচ্ছে ক্রিকেটের পদধ্বনি; মাঠে মাঠে প্রস্তুতি পর্ব শুরু হবে এবার ক্রিকেটের আগমনের জন্য। আগামী শীতের অতিথি আমাদের দেশে বিশ্বজয়ী ওয়েস্ট ইণ্ডিজ ক্রিকেট দল। ওয়েস্ট ইণ্ডিজের দল-নির্বাচনপর্ব সম্পন্ন হয়েছে এবং নেতৃত্বের ভার অর্পিত হয়েছে গ্যারফিল্ড সোবার্সের ওপর। সোবার্সের নেতৃত্বে ওয়েস্ট ইণ্ডিজ দল ভারতে এসে উপনীত হবে আগামী নভেম্বর মাসের শেষে। সফরের উদ্বোধনী খেলায় সম্মিলিত ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয় একাদশ মিলিত হবে ওয়েস্ট ইণ্ডিজ দলের সঙ্গে।

সম্মিলিত ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয় দল গঠনের জন্য বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের বাছাই খেলোয়াড়দের ট্রায়ালে আহ্বান জানান হবে নভেম্বর মাসের শেষ সপ্তাহে। ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয় স্পোর্টস বোর্ড বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের কাছ থেকে বাছাই খেলোয়াড়দের নাম চেয়ে পাঠাবেন। গত বছর বিশ্ববিদ্যালয়ের খেলাগুলিতে উক্ত খেলোয়াড়দের ব্যক্তিগত সাফল্যের বিচারে হায়দ্রাবাদের ট্রায়ালে বিশ্ববিদ্যালয় স্পোর্টস বোর্ড খেলোয়াড়দের আহ্বান জানাবেন।

এখন আমাদের কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের খেলোয়াড়দের সম্ভাবনার কথা এখানে আলোচনা করা যাক। প্রথমেই অবশ্য উল্লেখ করছি ১৯৬৪ সালে সিংহল দলের বিপক্ষে ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয় একাদশের খেলার কথা। মাদ্রাজের মাঠে সিংহল দলের বিপক্ষে দুজন তরুণ খেলোয়াড় সম্মিলিত বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষে অসামান্য ক্রীড়ানৈপুণ্য প্রদর্শন করেছিলেন এবং বড়েই গর্বের সঙ্গে উল্লেখ করা যায় যে এই দুজন খেলোয়াড়ই ছিলেন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের। এই খেলোয়াড়দ্বয় হলেন অম্বর রায় এবং দেব মুখার্জী। বলতে গেলে মাদ্রাজের মাঠে ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয় একাদশের সম্মান রক্ষায় গুরুদায়িত্ব তরুণ অম্বর রায় এবং দেব মুখার্জী যোগ্যতার সঙ্গেই সম্পন্ন করেছিলেন।

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এবার কয়েকজন খেলোয়াড়ের হায়দ্রাবাদের ট্রায়ালে স্থান পাওয়া উচিত। এঁরা হলেন দেব মুখার্জী, সুব্রত গুহ, কল্যাণ সেন, রবীন মুখার্জী, সুপ্রকাশ সোম এবং তপনজ্যোতি ব্যানার্জী।

সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে বাংলার ছেলেরা একটু বেশি করে অবহেলিত বলে মনে হয়। ১৯৬৪ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে মাত্র দুজন খেলোয়াড় প্রথম

একাদশে স্থান পেয়েছিলেন। কিন্তু এ বছর কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বেশ কয়েকজনের স্থান পাওয়া উচিত। অবশ্য একথা ঠিক আমাদের কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছেলেদের ট্রায়ালে উপস্থিত হতে হয় একেবারে অপ্রস্তুত অবস্থায়। কারণ একটি সর্বভারতীয় প্রতিনিধিত্বমূলক খেলার ট্রায়ালে যোগদানের পূর্বে উপযুক্ত অনুশীলনের প্রয়োজন তা আমাদের স্থানীয় খেলোয়াড়দের পক্ষে করা সম্ভব হয় না। ক্রিকেটের আয়ু আমাদের রাজ্যে মাত্র চার মাস, আর সেইজন্য মার্চের পর থেকে আমাদের স্থানীয় খেলোয়াড়েরা ক্রিকেটের সঙ্গে সেই যে সম্পর্ক ছেদ করেন আবার পরবর্তী ক্রিকেট মরশুমের অব্যবহিত পূর্বে অনুশীলন করা আর সম্ভব হয়ে ওঠে না। উচ্চাভিলাষী খেলোয়াড়েরা ব্যক্তিগতভাবে কেউ কেউ অনুশীলনের ব্যবস্থা করে নেন।

এবার আমাদের কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের তরুণ খেলোয়াড় দেব মুখার্জীকে সম্মিলিত বিশ্ববিদ্যালয় একাদশের অধিনায়কত্বের ভার দেওয়া উচিত। কোন

দেব মুখার্জী

সুব্রত গুহ

কারণে বোধহয় অম্বর রায়ের পক্ষে সর্বভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের এই ট্রায়ালে উপস্থিত হওয়া এবার সম্ভব হবে না। স্কুল জীবন থেকে দেব মুখার্জী সর্বভারতীয় ক্রিকেটে ক্রীড়ামোদীদের দৃষ্টি আকর্ষণে সমর্থ হয়েছেন। স্কুল জীবনে দেব মুখার্জী একবার শ্রেষ্ঠ ভারতীয় স্কুল ক্রিকেটারের সম্মান লাভের গৌরব করেন এবং স্কুল জীবনেই তিনি বাংলার রঞ্জী ট্রফি দলে স্থান লাভ করেন। গত কয়েক বছর এই তরুণ খেলোয়াড়টি বাংলার রঞ্জী ট্রফি দলের এবং দলীপ ট্রফিতে পূর্বাঞ্চল দলের নিয়মিত এবং নির্ভরযোগ্য খেলোয়াড়। গত তিন বছর দেব মুখার্জী কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষে উল্লেখযোগ্য নৈপুণ্য প্রদর্শন করেছেন বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের বিপক্ষে। আশা করা যায় যে দেব মুখার্জীকে এবার সম্মিলিত ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিনায়কত্বের ভার অর্পণ করে তরুণ প্রতিভার যোগ্য স্বীকৃতি দেবেন বিশ্ববিদ্যালয় স্পোর্টস বোর্ড, হায়দ্রাবাদের ট্রায়ালে।

এর পরই উল্লেখ করতে হবে উদীয়মান বোলার সুব্রত গুহর কথা। গত বছর দলীপ ট্রপি এবং রঞ্জী ট্রফির খেলায় প্রথম অবতীর্ণ হয়ে তরুণ খেলোয়াড় সুব্রত গুহ সর্বভারতীয় ক্রিকেটে যথেষ্ট পরিচিতি লাভ করেছেন। গত বছর রঞ্জী ট্রফির খেলায় বোম্বাইয়ের বিপক্ষে ব্রাবোর্নের মাঠে সুব্রত গুহ এবং তপনজ্যোতি ব্যানার্জীর উচ্চাঙ্গের বোলিং পর্যুদস্ত করেছিল টেস্ট খেলোয়াড়পুষ্ট বোম্বাই দলকে। সুব্রত গুহ সাতটি উইকেট দখল করেছিলেন তাঁর মারাত্মক বোলিংয়ের সাহায্যে।

এ ছাড়াও আরও দুজন ব্যাটসম্যান এবং একজন বোলারকে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় স্পোর্টস বোর্ড হায়দ্রাবাদের ট্রায়ালে প্রেরণ করলে মনে হয় এ'রা নিজেদের যোগ্যতার সাহায্যে স্থান লাভ করতে পারেন। এ'রা হলেন কল্যাণ সেন, রবীন মুখার্জী এবং সুপ্রকাশ সোম। তরুণ ব্যাটসম্যান কল্যাণ সেনের ফিল্ডিং খুবই উচ্চাঙ্গের এবং তাঁর দৃঢ়তাপূর্ণ ব্যাটিংও যথেষ্ট নির্ভরযোগ্য। রেলের প্রাক্তন রঞ্জী ট্রফি খেলোয়াড় রবীন মুখার্জী বর্তমানে ব্যাটসম্যান হিসাবে বাংলা দেশে প্রথম সারিতে স্থান পান। ১৯৬৪ সালে সিংহলের বিপক্ষে মাদ্রাজের ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের ট্রায়ালে রবীন মুখার্জী অংশগ্রহণ করেছিলেন।

এই সব তরুণ খেলোয়াড়দের হায়দ্রাবাদের ট্রায়ালে উপস্থিত হবার সুযোগ

কল্যাণ ঘোষ

দিলে মনে হয়, নিজেদের যোগ্যতার বলে এ'দের কয়েকজন দলে স্থান করে নিতে পারবেন। এ'দের সাফল্যে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়েরই গৌরব বৃদ্ধি হবে।

সম্পাদিকা—জয়ন্তী সেন
বসুমতী (প্রাঃ) লিঃ-এর পক্ষে ১৬৬, বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী স্ট্রীটস্থ কলিকাতা-১২
বসুমতী প্রেস হইতে শ্রীসুকুমার গুহমজুমদার কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

সাপ্তাহিক
বসুমতী

অসুর-দলনীর আগমনে
আনন্দ আজ সবার মনে

৭১ বর্ষ : ২০শ সংখ্যা. বৃহস্পতিবার, ৩রা কার্তিক, ১৩৭৩ বঙ্গাব্দ   20th Oct., 1966 * Vol. 71, No.

ফেমিলা
স্নো
একালের রূপ-কথায় শেষ কথা
বোরোলীন হাউস, কলিকাতা-৩

বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা
সম্পাদকীয়	...	১২১৯
আজকের মানুষ	...	১২২০
ভারতদর্শন	...	১২২১
আন্তর্জাতিক	...	১২২৫
যোগীন্দ্রনাথ সরকার স্মরণে	— পরিমল গোস্বামী	১২২৮
অনশনের গান (অনুবাদ-কবিতা)	— নিখিল সেন	১২৩১
ভাগ্য-গণনা (অনুবাদ-কবিতা)	— নিখিল সেন	১২৩১
সুবর্ণলতা (ধারাবাহিক উপন্যাস)	— আশাপূর্ণা দেবী	১২৩২
অগ্নিযুগের একটি অধ্যায়	— অনন্ত সিংহ	১২৩৬
প্রকৃতি-মানুষ (কবিতা)	— সুব্রতকুমার চট্টোপাধ্যায়	১২৪১
বেদব্যাস-এর রস-রচনা : অযুতসমান	...	১২৪২

ডক্টর পঞ্চানন ঘোষাল এম, এস, সি প্রণীত

আমার দেখা মেয়েরা

(রহস্য রোমাঞ্চের স্বর্ণখনি)

'রক্তনদীর ধারা', 'অপরাধ বিজ্ঞান' ও 'বিখ্যাত বিচার মূপেদান। মেয়েদের মন আর মতি স্বয়ং দেবাঃ ন জানন্তি। কাহিনী' নামক সুপ্রসিদ্ধ গ্রন্থগুলির লেখকের সত্যঘটনামূলক বিভিন্ন ও বিচিত্র নারী-চরিত্রের রহস্য উদ্ঘাটন ও যথাযথ অভিজ্ঞ ও দক্ষ লেখকের রচনার বৈশিষ্ট্যে বাংলা দেশের নারী-সমাজের এক অজানা অংশ সাধারণের চোখে সুস্পষ্ট প্রতিভাত হয়েছে। পড়তে পড়তে বই শেষ না করে ওঠা যায় না। বইয়ের আদ্যোপান্ত রুদ্ধশ্বাস উদ্বেগ ও অনিশ্চয়তা। উপন্যাসের চেয়েও সুখপাঠ্য।

মূল্য চার টাকা

মাইকেল মধুসূদন দত্তের

মাইকেল গ্রন্থাবলী

প্রথম ভাগ :—মেঘনাদবধ কাব্য, বীরাঙ্গনা কাব্য, পদ্মাবতী নাটক, বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রোঁ. একেই কি বলে সভ্যতা? (বোর্ড বাঁধাই)—সাড়ে চার টাকা।

দ্বিতীয় ভাগ :—কৃষ্ণকুমারী নাটক, শর্মিষ্ঠা নাটক তিলোত্তমা-সম্ভব কাব্য, ব্রজাঙ্গনা কাব্য, চতুর্দশপদী কবিতাবলী, বিবিধ কাব্য, মায়া কানন, হেক্টর বধ। (বোর্ড বাঁধাই)—চার টাকা।

উপন্যাস-সাম্রাজ্যের রত্নমুকুট,—সেই সর্বজনপ্রমোদন—অমর-কীর্তি ঔপন্যাসিক—লব্ধপ্রতিষ্ঠ নাট্যকার—শক্তিমান রস-শিল্পী 'ভারতী' সম্পাদক শ্রীমুক্ত সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়ের—

সৌরীন্দ্র গ্রন্থাবলী

৫ম ভাগে :—বাদলা, মমতা, নির্ঝর, অতঃপর, পরদেশী সুরা, যবনিকার অন্তরালে, লেখার গলদ, পারিবারিক উপন্যাস, প্রগতি, অনাগত যুগ, আদর্শ এডিটোরিয়াল, আদর্শ সমালোচনা, সম্পাদকের দপ্তর, সংবাদপত্রের দৌলতে, মো কাশ্মীর এক যাত্রায়, কুলকাটা, দুঃখীরাম, পান-সুপারি। মাত্র ১৸৹ টাকায়।

ডঃ মতিলাল দাশ প্রণীত

মতিলাল গ্রন্থাবলী

মূল্য—দুই টাকা

—ইহাতে আছে—

১। চলার পথে (উপন্যাস)
২। মনীষা (উপন্যাস)
৩। বিদ্যুৎশিখা (১১ খানি গল্প সমষ্টি)
৪। দীপশিখা (কবিতা সঙ্কলন)
৫। চার্বাক (নাটক)

বসুমতী প্রাইভেট লিমিটেডঃ ১৬৬, বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী স্ট্রীট, কলি-১২

বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা
গ্রন্থমেলা	জয়ন্তী সেন	১২৪৪
রঙ্গদর্শন		১২৪৫
গ্রামবাংলার কথা	পারুল ভট্টাচার্য	১২৪৯
দৃষ্টি (গল্প)	বীরু চট্টোপাধ্যায়	১২৫৫
এইচ, জি, ওয়েলস্-এর গল্প	ডঃ বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য	১২৫৯
বিশ্বসাহিত্যের আদিপর্ব	ডঃ নরেন ভট্টাচার্য	১২৬৩
রাতের গাড়ি (কবিতা)	মলয়শঙ্কর দাশগুপ্ত	১২৬৫
রঙ্গমঞ্চ—ওদেশে এবং এদেশে	শিলালি	১২৬৬
পাঠকমন		১২৬৯
রঙ্গজগৎ		১২৭১
খেলাধূলা	শ্রীঅমিতাভ	১২৭৭

কলিকাতার ভূতপূর্ব মেয়র—প্রসিদ্ধ আইনবিদ

শ্রীসনৎকুমার রায়চৌধুরী প্রণীত

হিন্দুধর্ম্ম পরিচয়

দ্বিতীয় সংস্করণ—মূল্য দেড় টাকা

বাংলার বিদ্যালয়গুলিতে হিন্দু সংস্কৃতি প্রতিষ্ঠা যেদিন লুপ্ত হইল, সেইদিন হইতে হিন্দুর ব্যক্তিগত, পারিবারিক ও সামাজিক জীবনের ভিত্তি নষ্ট হইয়া গেল। তাহারই সুযোগ লইয়া আমাদের গৃহসমাজ ধ্বংস করিয়াছে যুনানী সভ্যতা। বাংলার অন্যতম শ্রেষ্ঠ হিন্দু নায়ক বাংলার বালগোপালদের কচি করকমলে যে পবিত্র নৈবেদ্য তুলিয়া ধরিয়াছেন, তাহাতে জাতি কৃতার্থ হইয়াছে

প্রতি বিদ্যালয়ে এই গ্রন্থ অবশ্যপাঠ্য হওয়া উচিত।

কয়েকটি বিশিষ্ট অভিমত—

বিহারের প্রাক্তন প্রদেশপাল শ্রীমাধব শ্রীহরি ইনি লিখিয়াছেন—

"...চমৎকার বই। ঋষিদের প্রচারিত হিন্দুধর্ম সম্বন্ধে স্পষ্ট ধারণা হবে বইখানি পড়লে। প্রত্যেক কিশোর ও কিশোরীদের হাতে এই রকমের একখানি করে বই শোভা পাক; এ আমার বড় ইচ্ছে।"

সুবিখ্যাত মাসিক পত্রিকা 'প্রবাসী'র অভিমত—

"স্বধর্মের মূল ও সার কথার সঙ্গে পরিচিত না হওয়ায় সন্তান-সন্ততিগণ ক্রমে বিভ্রান্ত ও আদর্শভ্রষ্ট হইয়া উঠে। ইহার ফল ইদানীং আমরা বিশেষভাবে প্রত্যক্ষ করিতেছি। এ সময় এইরূপ একখানি পুস্তকের প্রয়োজনীয়তা আছে।"

কিশোর-সাহিত্যের অভিনব আকর্ষণ

হেমেন্দ্র রায়ের গ্রন্থাবলী

শ্রীহেমেন্দ্রকুমার রায় প্রণীত

যাঁহার চাঞ্চল্যকর কাহিনীগুলি পাঠ করিয়া বাংলার কিশোর-কিশোরীরা আতঙ্কে, বিস্ময়ে ও কৌতূহলে হতবাক হয়, আমরা বাংলার সেই প্রখ্যাত প্রবীণ কথাশিল্পী শ্রীহেমেন্দ্রকুমার রায়ের শ্রেষ্ঠ রচনাগুলি চয়ন করিয়া এই গ্রন্থাবলী প্রকাশ করিলাম।

—গ্রন্থাবলীতে আছে—

১। যকের ধন, ২। প্রদীপ ও অন্ধকার, ৩। রহস্যের আলোছায়া, ৪। ক্ষুদিরামের কীর্তি, ৫। যেসা দেওগে তেসা পাওগে, ৬। বুড়োর খামখেয়ালী, ৭। গোয়েন্দা কাহিনীর সঞ্চয়ন—চাবি ও খিল, একরত্তি মাটি, চোরাই বাড়ি, ছেলেবেলার একদিন ও বন-বাদাড়ে। ৮। ভৌতিক কাহিনী সঞ্চয়ন—এক রাতের ইতিহাস, কংকাল সারথি, বিজয়ার প্রণাম, কাণকাটা হাঁচ, শয়তান, ভেলকির হুমকী, ভূতের রাজা, শয়তানী জায়া। ৯। নতুন বাংলার প্রথম কবি, ১০। জগন্নাথদেবের গুপ্তকথা, ১১। হলিউডের টাকার পাহাড়।

মূল্য তিন টাকা।

বসুমতী প্রাইভেট লিমিটেড: ১৬৬, বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী স্ট্রীট, কলি-১২

৭১ বর্ষ ঃ ২০শ সংখ্যা—মূল্য ২৫ পয়সা
বৃহস্পতিবার, ৩রা কার্তিক, ১৩৭৩ বঙ্গাব্দ

বাংলা ভাষায় দ্বিতীয় সর্বাধিক প্রচারিত
সাপ্তাহিক পত্রিকা

Price : 25 Paise
Thursday, 20th Oct., 1966

অশান্ত ছাত্রসমাজ

অশান্ত ছাত্ররা এবার সত্যি সত্যি ভারত সরকারের মনোযোগ আকর্ষণ করতে পেরেছেন। ভারত সরকার একাধিক কমিটি বসিয়েছেন, অনেকের সঙ্গে সলা-পরামর্শ করেছেন—যাতে ছাত্রদের বিক্ষোভ প্রশমিত করা সম্ভব হয়।

ছাত্রদের বিক্ষোভ কেন, তাদের সঙ্গে রাজনৈতিক দলের কোনো যোগাযোগ আছে কি না—এসব প্রশ্নও এবার উঠেছে। উত্তরপ্রদেশ এবং পশ্চিমবঙ্গ সরকারের অভিমত ছিল যে, রাজনৈতিক দলের উস্কানিতেই ছাত্রসমাজ আজ উচ্ছৃংখল। কেন্দ্রীয় সরকারের অভিজ্ঞ মহল ঐ দুই রাজ্য সরকারের অভিমত নস্যাৎ করে দিয়ে বলেছেন যে, ছাত্রদের অভাব-অভিযোগের জন্যই আজ ছাত্রসমাজ অশান্ত। ছাত্র-সমাজের বিক্ষোভ যখন বাস্তবে রূপায়িত হয়ে ওঠে তখনই রাজনৈতিক দলের তৎপরতা লক্ষ্য করা যায়, তার আগে কদাপি নয়।

কেন্দ্রীয় সরকারের অভিজ্ঞ মহলের তথ্য অনুযায়ী এ বিষয় স্পষ্টতর হয় যে, ছাত্রদের অভাব-অভিযোগের প্রতি রাজ্য সরকারগুলি উদাসীন হওয়ার ফলেই তাঁরা অমূলক তথ্য প্রচার করতে বাধ্য হন। দ্বিতীয়ত, যে দমননীতি বিক্ষুব্ধ ছাত্রদের বিরুদ্ধে রাজ্য সরকারগুলি এযাবৎকাল গ্রহণ করে এসেছেন, সেই ব্যাপারেও কেন্দ্রীয় সরকার সন্তুষ্ট নন। এমন কি, কংগ্রেস সভাপতি শ্রীকামরাজও বলেছেন যে, বিক্ষুব্ধ তরুণদের সঙ্গে মোকাবিলার ব্যাপারে নিপীড়নের আশ্রয় গ্রহণ করা অনুচিত। কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী শ্রী জি এল নন্দা পুলিশের ইন্সপেক্টার জেনারেল-দের এক বৈঠকে বলেছেন যে, ছাত্রদের আন্দোলন দমনের জন্য ন্যূনতম বলপ্রয়োগ করা উচিত। এছাড়া তাঁর আর একটি প্রস্তাবও মূল্যবান। ছাত্রদের আন্দোলন দানা- বাঁধার আগেই তিনি অভাব-অভি-যোগের প্রতিকারসাপেক্ষ আন্দোলন নিবা-রণের উপায় নির্ধারণ করতে বলেছেন।

আমাদের মনে হয়, ছাত্রদের অভাব-অভিযোগের প্রতি সরকার একটু সদয় হলেই আন্দোলন প্রশমিত করা সম্ভব। আর অশান্ত ছাত্রসমাজকে শান্ত করার জন্যে পুলিশের গুলী, কাঁদুনে গ্যাস ও লাঠি যখন এই আঠারো বছরে ব্যর্থ বলে প্রমাণিত হয়েছে, তখন প্রতিকারের জন্য পুলিশদের আহ্বান করা নিরর্থক। বিশেষত খাস পশ্চিমবঙ্গে ছাত্রদের উপর পুলিশের গুলী চালনার পর ছাত্রসমাজ বারবার আবেদন করেও যখন বিচার-বিভাগীয় তদন্তের অনুমতি সরকারের কাছে পায় না সেখানে প্রতিকারের আশা কোথায়?

অশান্ত ছাত্রদের শান্ত করার জন্যে আজ অভিভাবকদেরও হয়তো আহ্বান করা হবে। কিন্তু কোন ধরণের হবে এই সব অভিভাবক? সাধারণ অভিভাবকের দল ত' আজ নিজেরাই দিশেহারা। তবে যে সব অভিভাবক দীর্ঘ আঠারো-উনিশ বছরের মধ্যে ছাত্রদের কল্যাণের জন্য একটি কথাও বলে নি, বরং ছাত্র ও শিক্ষকদের সম্পর্ককে যাঁরা বিষিয়ে তুলতে চায়, সেই ধরণের অভিভাবক কখনোই ছাত্রদের কল্যাণকামী নয়।

একথা সত্য যে, অশান্ত ছাত্রদের শান্ত করার পক্ষে শিক্ষকসমাজই যথেষ্ট। এ'রা ছাত্রদের পড়াশুনার প্রতি লক্ষ্য রাখতে যেমন সমর্থ, তেমনি তাদের অভাব-অভিযোগও এ'দের অজ্ঞাত নয়। তবু সেই শিক্ষকসমাজের প্রতি সরকার স্বয়ং উদাসীন। এ'রা শুধু স্বল্প বেতনেই 'বেগার' সারেন না, সামাজিক মর্যাদাই বা এ'রা কতটুকু পান? এই অসুখী শিক্ষক-সমাজ নিয়ে কি আদর্শের কল্পনা করা যায়? আর যাঁদের উপর জাতির ভবিষ্যৎ নির্ভর করছে, ছাত্রদের চরিত্র গঠনের সুকঠিন দায়িত্ব যাঁদের উপর অর্পিত—তাঁদের প্রতি উদাসীনতার ভাব থাকলে কি সুখী সমাজের পরিকল্পনা করা যায়? তাছাড়া ছাত্রদের যে অভাব-অভিযোগ-জনিত আন্দোলন, তা যদি দূরীকরণে শিক্ষকসমাজের সামান্যতম শক্তি না থাকে, তা হলে ছাত্রদের তাঁরা কোন মুখে আদর্শের শিক্ষা দেবেন?

মোদ্দা কথা, আমাদের সরকারের পক্ষপাতিত্বমূলক শিক্ষানীতির ফলে অশান্ত ছাত্রদের শান্ত করা সম্ভব হচ্ছে না।

সমাজের চারিদিকে আজ নৈরাজ্য। একদিকে ধনী যেমন ক্রমাগত ধনী হচ্ছে এবং দরিদ্র আরো দরিদ্র হচ্ছে, ঠিক শিক্ষার ক্ষেত্রেও সেই দশা। অথচ আমরা সকলের জন্য সমান সুযোগের কথা বলি এবং গণতন্ত্রের বড়াই করি।

ছাত্রদের আন্দোলন সম্পর্কে কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির জনৈক সদস্য যথার্থই বলেছেন, পাশাপাশি ধনীদের বিদ্যালয় ও গরীবদের বিদ্যালয় থাকার ফলেই ছাত্র-সমাজ আজ বিক্ষুব্ধ। এ কথার তাৎপর্য এই যে, একালে ধনীদের বা সরকারী বিদ্যালয়গুলিই যাবতীয় সুযোগ-সুবিধা লাভ করে। আর সেই সব বিদ্যালয়েই আজ দু-একটি মেধাবী গরীব ছাত্র ছাড়া ধনীদের তথা আমাদের নেতৃবৃন্দের সন্তানরাই ঠাঁই পায়। ফলে, গরীবদের বিদ্যালয়ের প্রতি সরকারী অর্থকোষ প্রায় শূন্য। নানা পরিকল্পনার নামে শিক্ষায়-তনের সংখ্যা বৃদ্ধি পেলেও সেগুলিকে উচ্চমানের করে তোলার জন্য কোনো সর-কারী চেষ্টা নেই। এই সব কারণে ছাত্র-সমাজের অভাব-অভিযোগের প্রতিকার করার চেষ্টা আজ পর্যন্ত হয় নি। শিক্ষক-সমাজেরও সেই এক দশা। এই অবস্থার যদি অবসান করতে কেন্দ্রীয় সরকার সক্ষম না হন তাহলে অশান্ত ছাত্রসমাজ কি মিষ্টভাষণে তুষ্ট হবে?

সম্পাদকীয়

আজকের মানুষ

ফেব্রুয়ারী থেকে এপ্রিল পর্যন্ত খাদ্যের দাবিতে বাংলাদেশে আন্দোলনের যে উত্তাল তরঙ্গ বয়ে গেল, যার ফলে পুলিশের গুলীতে প্রায় ৫০টি জীবন-দীপ নির্বাপিত হলো, জনতা তার প্রকৃত কারণ জানতে চেয়েছিলো। দেশে কি সত্যি খাদ্যসংকট ছিলো? সরকারের খাদ্যনীতি কি অভ্রান্ত? পুলিশ কি কেবল আত্মরক্ষার খাতিরে গুলীবর্ষণ করেছিলো, না, গুলীবর্ষণটা বাড়াবাড়ি হয়ে পুলিশী অত্যাচারে পরিণত হয়েছিলো—এমনিতরো হাজারো প্রশ্ন বাংলাদেশের মানুষের মনে। এ-প্রশ্ন বামপন্থীদের শুধু নয়, এ-প্রশ্ন উচ্চারণ করেছিলেন সর্বস্তরের সকল পন্থার সাধারণ মানুষ।

কিন্তু নিরপেক্ষ তদন্ত মানেই তো বিচারবিভাগীয় তদন্ত, ওই একটি বিভাগ ছাড়া প্রশাসনের বা গোটা রাষ্ট্রদেহের কোন্ অংশটিতে দুর্নীতির দুষ্ট কীট প্রবেশ করে নি আজ? তা নয় হলো, কিন্তু কে, কারা চালাবেন ওই তদন্ত? দেশবাসী ভাগ্যবান, এখনো কিছু সৎ, নিষ্ঠাবান লোক দেশে অবশিষ্ট রয়েছেন সেই পুরোনো আমলের লোকেদের মধ্যেও। মশাল জেলে খোঁজাখুঁজি করতে হলো না, নাম প্রস্তাব করতেই রাজী হয়ে গেলেন আসাম ও রাজস্থানের প্রাক্তন বিচারপতি সরযূপ্রসাদ, এলাহাবাদ-লক্ষ্ণৌর মুল্লা; আর ঘরের ছেলে এন-সি তো রয়েছেনই। যাই বা হলো সরকারী, বেসরকারী তদন্ত কমিশন বসানো আটকায় কে?

লক্ষ্ণৌ বলতেই বাঙালীর মানসপটে প্রথমেই একটা নবাবীয়ানার প্রাচুর্য ও ভোগবিলাসের চিত্র ভেসে ওঠে। কিন্তু নবাবী করতে পান নি মুল্লা, চানও নি অবশ্য। জাতিতে হিন্দু তিনি, নবাব খেতাব তাঁর পূর্বপুরুষকে দিচ্ছেই বা কে? মধ্যবিত্ত পরিবারেই জন্ম তাঁর।

মূলত কাশ্মীরের অধিবাসী হলেও মুল্লারা পুরুষানুক্রমে লক্ষ্ণৌতেই বসবাস করে আসছেন। এখানেই বিদ্যারম্ভ, কার্যারম্ভও এখানকার হাইকোর্টে। আইন পাশ করে তরুণ মুল্লা যখন এ্যাডভোকেটের গাউন ও কলার চাপিয়ে কোর্টে উপস্থিত হলেন তখন তাঁর মামলার বিচারপতি হয় তো ভাবতেই পারেন নি যে ওই বিচারপতির বহু আকাঙ্ক্ষিত আসন একদিন মুল্লারও হবে। একটানা কুড়ি বছর (১৯২৬-৪৬) চুটিয়ে প্র্যাকটিস করলেন মুল্লা, নামযশের সঙ্গে পসারও হলো প্রচুর। না হবার কোনো কারণও ছিলো না অবশ্য। তাঁর তীক্ষ্ণ বুদ্ধি, তাঁর মন-জয়-করা বাচনভঙ্গী শুনে যে জজসাহেব মন্ত্রমুগ্ধ হয়ে পড়তেন। মুল্লার ক্যাপিট্যালই ছিল তাঁর সুগভীর পাণ্ডিত্য, যুক্তিজাল বিস্তারে তাঁর অনকরণীয় ক্ষমতা।

জজ নিযুক্ত হলেন যখন এ-এন-মুল্লা তখন তাঁকে দেখা গেলো সম্পূর্ণ অন্য মূর্তিতে। গভীর অন্তর্দৃষ্টি, সূক্ষ্ম বিচারবোধ, সর্বোপরি তাঁর অন্তহীন মানবতাবোধ অচিরেই তাঁকে খ্যাতি এনে দিলো সুবিচারক হিসেবে। জজিয়তি করেছেন মুল্লা লক্ষ্ণৌ হাইকোর্টে, তাঁর যোগ্যতাকে পুরস্কৃত করেছিলো এলাহাবাদ হাইকোর্টও তার বিচারক নিযুক্ত করে।

দেশ বিভাগ করে কোন সমস্যার তো সমাধান হয় নি, বরং নিত্যনতুন সমস্যার

এ-এন-মুল্লা

ভারে নুয়ে পড়েছে দু-দেশেরই সরকার। তেমনি একটা জটিল সমস্যা দেখা দিয়েছিলো দু'দেশের সামরিক পেন্সন নিয়ে। ডাক পড়লো এ-এন-মুল্লার। ভারত-পাক মিলিটারী পেন্সন ট্রাইবুনালের চেয়ারম্যানের পদ অলংকরণের গৌরব পেলেন তিনি; ১৯৫৪-৫৮ পর্যন্ত তিনি যথেষ্ট প্রশংসা ও সুনামের সঙ্গে ও দায়িত্বভার বহন করলেন।

লক্ষ্ণৌ হাইকোর্টের সিনিয়র জজের ভূমিকা এবার মুল্লার, ১৯৫৮ সালেই। সকলজনের শ্রদ্ধা ও ভালোবাসা কুড়িয়ে তিন বছর বাদে গৌরবের শীর্ষে উঠে অবসর নিলেন মুল্লা বিচারকের পদ থেকে। কিন্তু কাজ থেকে অবসর নেবার পাত্র তিনি নন, কাজ-পাগল লোক যিনি, যাঁর মধ্যে রয়েছে অফুরন্ত কর্মক্ষমতা ও কর্মচাঞ্চল্য অলস, কর্মহীন জীবন কি তাঁর জন্যে? আবার ফিরে এলেন তিনি 'ব্রীফ' হাতে, লক্ষ্ণৌ হাইকোর্টেই। কৌশলী মুল্লা আবার বিরোধীপক্ষের যুক্তিকে খণ্ড খণ্ড করে ফেললেন দক্ষ সার্জন যেমন করে 'ডিসেকশন' করেন মানবদেহের। এবং শুধু খণ্ডই নয়, যুক্তিকে করলেন খণ্ডনও, তারপর নিজের বক্তব্যকে বিরোধীপক্ষের কৌশলীর যুক্তির চেয়ে অধিকতর যুক্তিগ্রাহ্য বলে প্রতিষ্ঠাও করলেন মুল্লা।

আইনবিদেরা নাকি রসহীন, আইনের পুঁথি ঘাঁটতে ঘাঁটতেই নাকি তাঁদের জীবনের যা কিছু রসবোধ, মাধুর্য নিঃশেষিত হয়, বড় ম্যাটার-অফ-ফ্যাক্ট, নিতান্তই শুষ্কং কাষ্ঠং জীবন তাঁদের। কিন্তু মুল্লা এ থিয়োরীর এক উজ্জ্বল ব্যতিক্রম। তাঁর নীরস আইনের লৌহ-সিন্দুকে রয়েছে ঐশ্বর্যের এক আশ্চর্য মণিকোঠা, সে মণিকোঠা অমূল্য সম্পদে পরিপূর্ণ। সে সম্পদ কাব্যের, সে সম্পদ সাহিত্যের। ইংরেজী কাব্য দিয়েই মুল্লা তাঁর কবি-জীবন শুরু করেছিলেন, স্থায়ী আসন নিলেন শেষ পর্যন্ত উর্দু সাহিত্য-সমাজে। তিনখানা কাব্য সংগ্রহ রয়েছে তাঁর সুধী ও সমালোচক মহলে যা আশাতীত সুনাম অর্জন করেছে। বস্তুত উর্দু সাহিত্যের ক্ষেত্রে তাঁকে অমরত্ব দান করেছে তাঁর 'মেরি হাদিছে উমরে গুরেজা' কাব্যগ্রন্থখানি, এটিই তো ১৯৬৪ সালে সাহিত্য আকাদেমী কর্তৃক পুরস্কৃত হয়েছিলো। এ ছাড়াও 'মাজামিন-এ নেহরু' নাম দিয়ে জওহরলাল নেহরুর বহু মূল্যবান প্রবন্ধেরও উর্দুতে অনুবাদ করে উর্দু সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করেছেন।

দীর্ঘ দিন সরকারের আইন ও বিচার ব্যবস্থার সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত থেকে মুল্লা সরকারকে চিনে নিয়েছেন তার ভেতরের স্বরূপটিকে, শাসনের নামে যে উৎপীড়ন প্রজাপুঞ্জের ওপর অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে তার প্রতিবাদ না করে তাই তিনি পারেন নি। এবং সে প্রতিবাদ শুধু সংবাদপত্রে বিবৃতি ছেপে নয়, রাস্তায় নেমে, অত্যাচারী শাসকের বিরুদ্ধে কণ্ঠ তুলে। উত্তর-প্রদেশ সরকার ও তার পুলিশ ছাত্রদের ওপর, নিরীহ জনতার ওপর যে নিপীড়ন চালিয়েছে তার প্রতিবাদ জানাতে তিনি রাজপথে নেমেছেন, কিশোর ছাত্রদের নেতৃত্ব দিয়েছেন অন্যায়ের বিরুদ্ধে দাঁড়াতে এই ৬৭ বছরের বৃদ্ধ-তরুণ।

রাজপথেই মুল্লা তাঁর কর্তব্য শেষ করতে চান না, তিনি দিল্লীতেও দরবার পরিচালনা করতে প্রয়াসী। আগামী সাধারণ নির্বাচনে বামপন্থী কমিউনিস্ট পার্টির সমর্থন নিয়ে তিনি লক্ষ্ণৌয়ের এক নির্বাচনী কেন্দ্র থেকে পার্লামেন্টের আসনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে চান। মুল্লা যদি জয়লাভ করেন '৬৭ সালের পার্লামেন্টের অধিবেশন তবে জম-জমাট হয়ে উঠবে, সন্দেহ নেই।

ছাত্র-বিক্ষোভ প্রসঙ্গে

উত্তর ভারতে সাম্প্রতিক ছাত্র-বিক্ষোভ প্রসঙ্গে এবং তৎসহ গণতান্ত্রিক মনোভাবে বঞ্চিত পুলিশী অতিরেকের ওপর আমরা পূর্ববর্তী সংখ্যায় আলোচনা করেছি। আশা করি আমাদের আলোচনার প্রতি উভয় পক্ষের দৃষ্টিই আকৃষ্ট হবে। প্রসঙ্গত আমরা উত্তরপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী শ্রীমতী কৃপালনীর রূঢ়তার প্রতি আমাদের অসন্তোষও প্রকাশ করেছি এবং আশা করি শ্রীমতী কৃপালনীর ক্রূরতা তাতে বাড়বে বই কমবে না। 'আইরন ম্যান' শব্দটি বহুল প্রচারিত, ভারতের ইতিহাসে শ্রীমতী কৃপালনী 'আইরন উওম্যানে'র 'এক্-জামপল' হয়ে রইলেন এবং থাকবার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করছেন। এই সঙ্গে একটা কথা বলা হয় নি যে, মধ্যপ্রদেশের মুখ্য-মন্ত্রী শ্রী ডি পি মিশ্র তাঁর পুলিশ বাহিনীর জন্য যে দরদ প্রকাশ করেছেন তা-ও স্মরণীয় হয়েই থাকবে। শ্রীমিশ্রের দুঃখ এই যে, বিরোধীরা পুলিশের প্রতি একটিও 'নরম শব্দ' ব্যবহার করেন নি। তথাচ শ্রীমিশ্রকে শ্রীমতী কৃপালনীর সঙ্গে পঙ্‌ক্তিবন্ধ করতে চাই না, এমন কি পশ্চিমবঙ্গের পুলিশী জবরদস্তি যথেষ্ট খ্যাতিলাভ করে থাকলেও রাজ্য মুখ্য-মন্ত্রীকেও শ্রীমতী কৃপালনীর উন্মাদনার অংশীদার বলে উল্লেখ করব না, কারণ শ্রীমতী কৃপালনীর রোষানল দিগ্‌বিদিক জ্ঞানশূন্য হয়েছে। তিনি শুধুমাত্র ডি আই আর-কেই হাতিয়ার করে সুখী নন, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে সরকারী সাহায্য বন্ধ করার হুমকীও জারি করেন। তাঁর দাপটে উত্তরপ্রদেশ কিন্তু নিরুত্তর নয়; শ্রীমতী কৃপালনীর এ দাপট তাই ধোপে টিকবে না সে কথাও অনেকেই ভালভাবে জানেন। তবে ক্ষমতালাভের পর দিশাহারা বোধ করলেই সাময়িকভাবে ক্ষমতায় প্রতি-ষ্ঠিত ব্যক্তি, 'আইরন হ্যান্ড' হওয়ার অদূরদর্শিতায় ভোগেন। শ্রীমতী কৃপা-লনীর আরও ভোগ আছে, তাই উত্তরপ্রদেশ যথেষ্ট দুর্ভোগে ভুগল।

এটুকু ভূমিকার পর আমরা একটি সংক্ষিপ্ত সমীক্ষায় আসব, কেন না সাম্প্র-তিক ছাত্র-বিক্ষোভ দেশের মাথা মাথা মানুষগুলির মাথা প্রায় ঘুরিয়ে দিয়েছে, আর সেকারণেই ব্যাপারটার গুরুত্ব একাধিক আলোচনার দাবি রাখে। স্মরণকালের মধ্যে তো নয়ই, ভারতের ইতিহাসে এমন চরিত্রের ছাত্র-অসন্তোষ কখনো আত্মপ্রকাশ করে নি। ইংরেজ আমলেও বিক্ষোভ ভারতের এক কোণ থেকে আর এক কোণে ছড়িয়ে পড়েছে বটে, কিন্তু সে ছিল অন্যকথা, অনন্য উদ্দেশ্যের ফলশ্রুতি। অথচ আজ যা হয়ে গেল এদেশের ইতিহাসে তা দ্বিতীয় রহিত। তাই উপর্যুপরি একই বিষয়ে আলোচনার অধিকার দাবি করছে।

ভারতদর্শন

ছাত্র-বিক্ষোভ সম্পর্কে আলোচনারত কংগ্রেস নেতৃবৃন্দ

যেখানে পুলিশী বর্বরতা শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানের মধ্যে প্রবেশ করে ডি, এস, এস, ডি কলেজ হস্টেলের সীমানার মধ্যে গুলী-বর্ষণ করেছে; কলেজ অধ্যক্ষের অনুমতি ব্যতিরেকেই কলেজ কম্পাউন্ডে ঢুকেছে মারমূর্তি ধরে; আর সীমাহীন বর্বরতাকে প্রকট করে তুলেছে ডি, এস, এস, ডি কলেজের অধ্যক্ষকে তাঁর অফিস ঘরে প্রবেশ করে প্রহারেণ অজ্ঞান করে, সেই উত্তরপ্রদেশে তখন বাস্তবিকই 'পুলিশ-রাজ প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। উত্তরপ্রদেশের এ বদনাম রাজ্যের হাইকোর্ট জজেরাও দিয়ে থাকেন। বলেন, সেখানকার পুলিশ দুষ্কর্মের বৃহত্তম প্রতিষ্ঠান। প্রাক্তন বিচারক শ্রী এ এন মুল্লা লক্ষ্ণৌ-এ পুলিশী তান্ডবে বিক্ষুব্ধ একটি পথ-মিছিলের পুরোভাগে নেতৃত্বও দান করে-ছেন। পি, পি, এল কলেজেও পুলিশ অনধিকার প্রবেশ করে (কোনও শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানে অধ্যক্ষের অনুমতি ভিন্ন ইংরেজ-গোলাম-রাও প্রবেশে সাহস পেত না) ছাত্র-ছাত্রী এবং শিক্ষকদের ওপর অত্যাচার করে। পুলিশী বর্বরতার প্রতিবাদ ধ্বনিত হয় অধ্যক্ষদের সভায়—যেখানে সভাপতিত্ব করেন রাজ্যের প্রাক্তন শিক্ষামন্ত্রী এবং কানপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য আচার্য যুগলকিশোর স্বয়ং। শ্রীমতী কৃপালনী তখনও সমান গর্বিতা! ইনি এর পরও মুখ্যমন্ত্রীর অধিকারবলে মাগনা উপদেশ কী করে বিতরণ করবেন কে জানে। কেন না ছাত্রদের সামনে এঁরই অনুগ্রহপুষ্ট পুলিশবাহিনী শিক্ষকসমাজকে এমন কি উপাচার্যকেও চরম অপমানের গহ্বরে নিক্ষেপ করেছে।

এর পর প্রধানমন্ত্রীর মুখে যখন ফ্যাসীবাদের আশঙ্কার কথা শুনি, তখন স্বভাবতই হৃৎকম্প হয়, ঐ ফ্যাসীবাদের অঙ্কুর কোথায় গজিয়ে উঠছে, সন্দেহ জাগে সে বিষয়েও। উত্তরপ্রদেশে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলিতে অবাঞ্ছিত ক্ষমতাসীন রাজনীতির শাসন চোখ রাঙাচ্ছে বলেও গুরুতর অভিযোগ শোনা যাচ্ছে। তার ওপর ক্ষমতাসীন রাজনীতি তো আবার ত্রয়ী শক্তিজোটের টানা-পোড়েনে হাঁসফাঁস করছে। সুতরাং এই রাজ্যে সমস্যার ফাঁসটা ঠিক কোনখানে ঝুলছে, ছাত্র-সমস্যা নিয়ে আজ যাঁরা মাথা ঘর্মাক্ত করে তুলছেন, চোখ খুললেই সে ফাঁস তাঁদের কাছে দৃশ্যমান হয়ে উঠতে পারে। কিন্তু যেহেতু উত্তরপ্রদেশ কেরালা নয়, সেজন্য এ রাজ্যের চরম প্রশাসনিক ব্যর্থতাকে আয়ত্তে আনার জন্য বহুজন আকাঙ্ক্ষিত রাষ্ট্রপতির শাসনব্যবস্থা প্রবর্তন করা যায় নি। এর পর দায়িত্বশীল নেতাদের নরম-গরম বক্তৃতা নিতান্তই ম্যাড়মেড়ে ঠেকে। কিম্বা যখন শ্রীমতী কৃপালনী হেঁকে ওঠেন,—সব নষ্টের মূল ঐ কম্যুনিস্টরা—বলে, তখনও সেই হাঁক-ডাক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত সস্তা রাজনীতি বলেই সাধারণের ধারণা হয়। স্পষ্টতই উত্তরপ্রদেশের ছাত্র-বিক্ষোভের পেছনে কোনও রাজনৈতিক উদ্দেশ্য সক্রিয় ছিল না। অবস্থা আয়ত্তের বাইরে চলে গেলে দায়িত্ববোধবশতই রাজনৈতিক নেতারা ঘটনাবলীর ওপর তাঁদের স্ব-স্ব মন্তব্য রেখেছেন। শিক্ষকসম্প্রদায় উত্তেজিত হয়ে উঠেছেন, নাগরিকবৃন্দ হতবাক এবং অবশেষে তথাকথিত জনদরদী নেতারাও বলতে বাধ্য হয়েছেন, নাঃ, পুলিশ মাত্রা ছাড়িয়ে গেছে। আহা একটু সামলে-সুমলে চললেই তো হোতো বাপু। আসল কথা কিন্তু অন্যরকম। সামাল দিতে না পেরে সামলে চলার উপদেশ প্রদান করা হয়েছে। আর হয়ও তাই, পিষব বললেই পেষা যায় না, জাঁতারও ওজন থাকা প্রয়োজন।

বক্তৃতায় কেউ কেউ অবশ্য বেশ ওজন রেখেছেন। মহারাষ্ট্রের বোম্বে কংগ্রেসে এঁদেরই রুদ্রমূর্তি দেখা গেছল এবং এঁরাই বম্বে বন্ধ ও ঘেরা ডালো দিবসে কেন পিটিয়ে ঠান্ডা করা হয় নি তার জন্য ভয়ানক গোঁসা করেছিলেন।

কেন্দ্রীয় রেলমন্ত্রী ছাত্রদের বিক্ষুব্ধ হওয়ার কোন অর্থই বোঝেন না। তিনি মনে করেন, জিনিসের দাম বাড়ুক কি শিক্ষায় খরচ বাড়ুক এ সব অভিভাবকদের চিন্তা, গন্ডাকায় 'ভবঘুরে' ছাত্র কেন তাই নিয়ে হৈ-চৈ করবে। আগে পড়াশুনাটা সুবোধ বালকের মতো সমাধা কর, পরে আন্দোলন করার ঢের টাইম পাবে বাপু। বলা বাহুল্য, কথাগুলো আরও পঞ্চাশ বছর আগে বা পরে শুনলেও হয়ত ছাত্ররা কান বাড়িয়ে উপদেশ গ্রহণ করত; কিন্তু এখনও কংগ্রেসের পতাকাতলে ছাত্র-আন্দোলনের ইতিহাস স্মৃতিতে টাটকা সবুজ হয়ে আছে; এই মুহূর্তে পাতিল সাহেবের উপদেশ কতদূর কার্যকরী তাতে যথেষ্ট সন্দেহের অবকাশ আছে।

শ্রীমোরারজী দেশাই কঠোর হাতে বিক্ষোভ দমনের পক্ষপাতী।

স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী শ্রী জি এল নন্দার অট্টালিকায় কংগ্রেস এম-পি'গণের যে সভা বসে তাতে কিন্তু তাঁরা পুলিশের দ্বারা ছাত্রদের বিরুদ্ধে গুলীগোলা ব্যবহারের মাত্রা কমিয়ে আনার পক্ষেই মত প্রকাশ করেছিলেন। শ্রীনন্দাও সমস্যাটিকে কেবলমাত্র শৃংখলা রক্ষার সমস্যা বলে গণনা করতে গররাজি। তিনি মনে করেন, যৌবন জলতরঙ্গ মন্দ বাতাস পেলেই স্ফীতিলাভ করে এবং সে তরঙ্গ পুলিশী গুলীতেই রোধ করার বিষয়মাত্র নয়। তবে বিক্ষোভ মারমুখী হয়ে উঠলে তাকে দমন করতেই হবে। এই সঙ্গে তাঁরা প্রশাসনিক ব্যর্থতা ও রাজ্যান্তরে কংগ্রেসকর্মীদের সাধারণের সঙ্গে সংযোগ শিথিলতার নিন্দাও করেছেন।

কংগ্রেস সভাপতি শ্রীকামরাজ কঠোর হাতেই উচ্ছৃংখলতা দমনের পক্ষপাতী। সেই সঙ্গে তিনি পুলিশকেও যথাসম্ভব সংযম ব্যবহার করার জন্য আহ্বান জানিয়েছেন। তিনি শিক্ষাবিদদের সঙ্গে ছাত্র সম্প্রদায়ের মানসিক ব্যবধান উত্তরোত্তর বেড়ে যাচ্ছে বলে আশংকা প্রকাশ করেন। তিনি বলেছেন, ছাত্রদের দাবি সম্পর্কে তাদের দৃঢ়তা নেই, অর্থাৎ তাদের কাছে যেন তাদের অভিযোগের চেহারাটাই স্পষ্ট নয়। কেন না ক্রমে তাদের অভিযোগের কথা ভুলে গিয়ে তারা বিচার বিভাগীয় তদন্ত ও ছাত্রমুক্তির দাবিতে এসে উপনীত হ'ল। ছাত্র উত্তেজনাকে যাতে কোন রাজনৈতিক দল অপব্যবহার না করে, সুতরাং, সে বিষয়ে দৃষ্টি রাখা উচিত ছাত্রদের। সত্য বটে, সমগ্র উত্তরাঞ্চলীয় ছাত্র-বিক্ষোভের মূলে প্রতিক্ষেত্রে সর্বত্র অসন্তোষের কারণ সুস্পষ্ট নয়, যে জন্য ছাত্ররা তাদের অভিযোগ সম্পর্কে অনবচেতন। কিন্তু এটাই যদি ক্ষমতাসীন দলের পক্ষে একটা বড় তৃপ্তির ব্যাপার বলে ধরে নিতে হয়, এবং নেতৃত্বহীন ছাত্র-অসন্তোষকে এই বলেই কাত্ করা যাবে ভেবে যদি দেশের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিরা রাজনীতির ক্রূর হাসি হাসেন—তবে তার থেকে দুঃখের কারণ আর কিছুই হয় না। ছাত্রবৃন্দের মধ্যে অস্থির উত্তেজনাই প্রমাণ করে যে তাদের বিক্ষোভ স্বতঃস্ফূর্ত এবং কোন কুটবুদ্ধি রাজনীতির দ্বারা পরিচালিত নয়। সেজন্যই তারা তাদের অভিযোগগুলিকে সম্যকভাবে উপস্থাপিত করতে পারে নি। আজ সে কারণেই নেতৃবর্গের উচিত অসন্তোষের মূল কারণ নির্ণয় করা। তা না করে ছাত্রদের বেকায়দা দেখে রাজনৈতিক কূটবুদ্ধি যদি দন্তুর হাসির আশ্রয় নেয় তবে ভবিষ্যতে তার ফল মারাত্মক হতে পারে। কিম্বা পাতিল সাহেবের মত তৃপ্তি অনুভব করার পেছনেও যথেষ্ট শুভলক্ষণ দেখতে পাই না। শ্রীপাতিল উপদেশ দান করেছেন এই বলে যে, যাদের পিতামাতা দারিদ্র্যের নিষ্পেষণে বুভুক্ষু, তাদের আন্দোলন করা সাজে না। বলা বাহুল্য, পাতিল সাহেবের যুক্তিতে যুগপৎ সহানুভূতিহীন রূঢ়তা এবং তর্কশাস্ত্রীয় 'ফ্যালাসি' বর্তমান—নেতাদের মধ্যে যে মনোভাব সাধারণের ভীতির কারণ।

কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর সঙ্গে বিভিন্ন রাজ্যের আই-জি'দের যে বৈঠক তাতেও দেখা যাচ্ছে যে, আই-জি'রাও ছাত্র-বিক্ষোভের মূলে শিক্ষাব্যবস্থার ত্রুটিকে প্রাধান্য দিয়েছেন। শিক্ষার দোষ-ত্রুটিই বিক্ষোভের ব্যাপকতা দান করেছে বলে তাঁদের অভিমত।

দৈনিক বসুমতীর সংবাদে প্রকাশ, উত্তরপ্রদেশের আই-জি নাকি এই মর্মে অভিযোগ করেন যে, রাজ্যের সাম্প্রতিক ছাত্র-বিক্ষোভের পেছনে রাজনৈতিক দলের উস্কানি অবশ্যই ছিল তবে সে দল কতিপয় কংগ্রেসীর প্রভাবান্বিত। সুতরাং রাজ্য মুখ্যমন্ত্রী এবং আই-জি'র বক্তব্যের এই পূর্ব-পশ্চিম ফারাকই প্রমাণ করে যে, সব ক্ষেত্রে অনর্থের উৎস হয়ত বা খতিয়ে দেখারও প্রয়োজন অনুভূত হয় না। দোষ 'নন্দ ঘোষে'র ওপর চাপান দিয়েই দায়িত্বশীল নেতৃত্ব কর্তব্য করেন। কিন্তু এইভাবে বালির মধ্যে মুখ গুঁজে আসল দুর্যোগ এড়ানো যায় না, রাজ্য মুখ্যমন্ত্রীর ফলাও প্রচারের পরও আই-জি'র অভিমত সেকথাই প্রমাণ করে।

আই-জি'রা শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে প্রবেশের প্রতি কোনরূপ বাধানিষেধ পুলিশের ওপর আরোপিত রাখতে চান না। খুবই দুঃখের কথা সন্দেহ নেই। পুলিশের এই দমনপ্রীতি দেশের গভীর অকল্যাণের কারণ হয়ে দাঁড়াচ্ছে ও দাঁড়াবে। এ সম্পর্কে পূর্ববর্তী 'ভারত দর্শনে' দীর্ঘ আলোচনা রেখে পুলিশের সুবুদ্ধির প্রতি আমরা আবেদন জানিয়েছি।

পুলিশকে প্রশ্রয়দান যে তরফই করুন; পরিণামে তা তাঁদের নিজেদের পক্ষেই একদিন ভয়াবহ হয়ে উঠতে পারে। পুলিশেরও জনমত ও দেশের শ্রদ্ধেয় গুণিজনদের অভিমতকে উপেক্ষা করার মনোভাব ত্যাগ করা উচিত, পরিণাম হয়ত

রমণীয় হবে বলে পুলিশের পক্ষেও আশা রাখা আকাশকুসুম রচনামাত্র।

উত্তরপ্রদেশে প্রধানমন্ত্রী

সমস্যাসঙ্কুল রাজ্য উত্তরপ্রদেশের রাজনৈতিক সম্মেলনে প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী গান্ধী রাজ্যের তিনটি মুখ্য সমস্যার ওপরই তাঁর বক্তব্য রেখেছেন। (১) প্রাক নির্বাচনী আবহাওয়া কংগ্রেসের পক্ষে খুব অনুকূল না হওয়ায় শ্রীমতী গান্ধী এই বলে জনমনে ভীতির সঞ্চার করার প্রয়াস পেয়েছেন যে, কংগ্রেস ভিন্ন অন্য কোন দল ক্ষমতা পেলে, তার পতন বিপ্লবের মধ্যেই ঘটবে। যুক্তিটি অবশ্য যথাযথ অনুধাবন করা কষ্টকর বোধ হোল। প্রথমত বিপ্লব বলতে যা বোঝায় তা কেবলমাত্র বিরোধী দলের ক্ষমতা লাভের অপেক্ষায় কেন উত্তর-প্রদেশে গা ঢাকা দিয়ে অপেক্ষমাণ আছে, আমাদের ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে সেটুকু ধরতে পারলাম না। কিন্তু যদি রাষ্ট্রপতির শাসন অবধারিত হবে বলে তিনি ভবিষ্যদ্বাণী করতেন তাহলে সে যুক্তির সারবত্তা গ্রহণে আপামর জনসাধারণ কাকেও বিশেষ বেগ পেতে হত না নিশ্চয়।

তাছাড়া, উত্তরপ্রদেশের কংগ্রেসী দলাদলি যে বেসামাল অবস্থায় কংগ্রেস সরকারকে ব্যতিব্যস্ত করে রেখেছেন—তার অবসান না হলে নতুন করে ক্ষমতালাভের পর উত্তরপ্রদেশে যে কংগ্রেসী ঘরেই ক্ষমতা কাড়াকাড়ির 'বিপ্লব' শুরু হয়ে যাবে, সম্ভবত সে চিত্রও প্রধানমন্ত্রীর মানসনেত্রে উজ্জ্বলই থাকবে। সেজন্য দ্বিতীয় মুখ্য সমস্যারূপে তিনি রাজ্যের কংগ্রেসী কোন্দল অবসানের জন্য আবেদন জানিয়েছেন এবং কংগ্রেস কর্মি-বৃন্দকে জনসংযোগ বৃদ্ধি করার নির্দেশ দান করেছেন। পর পর দুটি যুক্তি ঘেঁটে দেখে স্বভাবতই প্রধানমন্ত্রীর বাণীকে যথার্থ উপলব্ধি করতে অসমর্থ হয়েছি তাই।

তৃতীয় সমস্যা উত্তরপ্রদেশের সাম্প্রতিক ছাত্র-সমস্যা। ছাত্রদের উদ্দেশ্যে তিনি মামুলি বাণীর আশ্রয় গ্রহণই সুবিবেচনার কাজ বলে মনে করেছেন। অন্যথা উপায়ই বা কি। পুলিশের ক্ষেত্রে নরম ব্যবহারের প্রস্তাব তাঁর তরফ থেকে ওঠা মাত্র কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটিতে তা প্রত্যাখ্যাত হয়ে যায় এবং শ্রীদেশাই দৃঢ়তার সঙ্গে বলেন, যে বিশৃঙ্খলাকে সব সময়ই কঠোর হাতে দমন করতে হবে, তা সে বিশৃঙ্খলা যে দিক থেকেই উত্থিত হোক। সুতরাং শ্রীমতী গান্ধী অতঃপর শিক্ষা সংস্কারে সরকারের আর্থিক অক্ষমতার দোহাই দিয়ে এবং বিরোধী দলের ওপর বিশৃঙ্খলার দায়িত্ব চাপিয়ে পুরো ব্যাপারটার ওপর মামুলি আচ্ছাদনই টেনে দিয়েছেন।

উড়িষ্যা ঃ

মুখ্যমন্ত্রীর গদী

মুখ্যমন্ত্রী শ্রীসদাশিব ত্রিপাঠীর নেতৃত্বে উড়িষ্যার মন্ত্রিসভায় যেদিন মন্ত্রিমহোদয়গণ একযোগে বিদ্রোহ ঘোষণা করেছিলেন সেদিনই বোঝা গেছল ব্যাপারটার শিকড় বহুদূর থেকেই পরিপুষ্টির রস সংগ্রহ করেছে এবং বেশ কিছুদিন থেকেই এই পুষ্টিসাধনপর্ব চলে আসছিল। শ্রীত্রিপাঠী নিজ দায়িত্বে মন্ত্রিসভায় রদবদল করেছেন বলে অভিযোগ তুলে তাঁর নেতৃত্বে আস্থাহীন মন্ত্রিগণ প্রথম সুযোগকেই কাজে লাগালেন। আর ভীষণভাবেই কাজে লাগল উপ-মুখ্যমন্ত্রী শ্রীনীলমণি রাউথরায়ের প্রচেষ্টা। বিদ্রোহ পাকা হয়ে দাঁড়াল হাইকমাণ্ডের আবেদন-উপরোধ সত্ত্বেও। তাই কেন্দ্রীয় পরিবহনমন্ত্রী শ্রীসঞ্জীব রেড্ডি উড়িষ্যার শাসনতান্ত্রিক সঙ্কট মোচন করার উপায় সন্ধান করতে এসেও বিফল হলেন। রাউথরায় গোষ্ঠী মুখের ওপর জবাব দিয়ে দিয়েছেন, শ্রীত্রিপাঠীকে সরানো ছাড়া সঙ্কটের অবসান অসম্ভব। শ্রীরেড্ডি বেগতিক দেখে দিল্লী প্রত্যাবর্তন করতে বাধ্য হলেন। চেষ্টার ত্রুটি হয়

ীন। বিবদমান ত্রিপাঠী-রাউথরায় ছাড়াও রাজ্যের প্রভাবশালী নেতৃবৃন্দসহ রাজ্যপালের সঙ্গেও বৈঠক করেছেন তিনি, কিন্তু বৃথাই।

রাজ্য পরিস্থিতির মোকাবিলায় আজ হাইকমান্ডও যে বেশ নাস্তানাবুদ তা স্পষ্টত লক্ষণীয় হয়ে উঠেছে অন্যত্রও। উড়িষ্যা, উত্তরপ্রদেশ, আসাম সর্বত্রই হাইকমান্ড হালে পানি পাচ্ছেন না; [illegible] রাজ্যের নেতারা এখন স্ব-স্ব প্রধান হয়ে উঠেছেন শক্ত কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের অভাবেই হয়ত বা।

আসাম ঃ

উত্তরপ্রদেশের আলোচনা ইতিপূর্বেও ধারান্বয়ে আমরা করেছি। আসামের সংকট তীব্রতা লাভ করেছে মুখ্যমন্ত্রী শ্রীচালিহার অবিচল প্রতিজ্ঞায়। তিনি শ্রীকামরাজকে জানিয়ে দিয়েছেন যে, রাজ্য শিক্ষামন্ত্রী শ্রীদেবকান্ত বড়ুয়াকে তাঁর মন্ত্রিসভা থেকে অপসারিত করার বিষয়ে হাইকম্যান্ড সম্মতি না দিলে পদত্যাগ ভিন্ন তাঁর গত্যন্তর নেই। শ্রীবড়ুয়ার সঙ্গে শ্রীচালিহার মতবিরোধ বেশ কিছুকাল যাবৎ চলছিল। সে বিরোধ বর্তমানে এসপার-ওসপার সমাধানের জন্য উন্মুখ হয়ে উঠেছে। নির্বাচনের আগে সংকটকে সমঝোতায় না নিয়ে গিয়ে তাকে তীব্র করে তুলে পরিস্থিতির সুযোগ গ্রহণই সংকটপূর্ণ রাজ্যগুলিতে প্রধান দলীয় রাজনীতি হয়ে উঠেছে। হাইকম্যান্ডকে এভাবে বিব্রত করে ব্যক্তিগত ক্ষমতায় আস্থা অর্জনের জন্যই যেন হুড়োহুড়ি পড়ে গেছে সমধিক। শ্রীবড়ুয়া বলছেন, তাঁর কাছে, কংগ্রেসের স্বার্থই মুখ্য। হাইকম্যান্ড যে আদেশই দিন তাই তাঁর শিরোধার্য। পদত্যাগেও আপত্তি নেই। সাংগঠনিক কাজে আত্মনিয়োগ করবেন তিনি। শ্রীবড়ুয়ার ঔদার্য আছে। শ্রীকামরাজ তাঁকে দিল্লীতে আহ্বান করেছেন। শ্রীবড়ুয়ার সাংবাদিক বৈঠকে ঔদার্য প্রকাশ তাঁর দলে মনে প্রভাব বিস্তার করবে নিশ্চয়; তবে বর্তমান নির্বাচনী আবহাওয়ার পরিস্থিতিতে সংকটপূর্ণ রাজ্যগুলিতে হাইকম্যান্ড কী নীতি অনুসরণ করবেন সেটাই আজ অধৈর্য অপেক্ষায় রেখেছে রাজনীতি-সচেতন সমাজকে।

কেরালা ঃ

নির্বাচনে ধর্মের হাত

গত তেরই অক্টোবর কংগ্রেসবিরোধী দলগুলির মধ্যে একশত পঁচিশটি বিধানসভা আসন বন্টনের ক্ষেত্রে একটি যুক্ত নির্বাচনী চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়ে গেছে। বাকি বিধানসভার আটটি ও লোকসভার উনিশটি আসন সম্পর্কে সিদ্ধান্ত গৃহীত হবে আগামী বারই নভেম্বর। যুক্ত ফ্রন্টে যোগ দিয়েছেন দুই পক্ষ কম্যুনিস্ট পার্টিসহ এস, এস, পি, আর এস পি, কে এস ও, কে টি পি এবং মুসলীম লীগ। মুসলীম লীগকে নিয়ে এতোদিন যুক্ত ফ্রন্টকে বেশ বেগ পেতে হয়েছিল এখন কংগ্রেস ও কেরালা কংগ্রেসকে টানাছেঁড়া করতে হচ্ছে ক্যাথলিক চার্চের সমর্থন নিয়ে। কেরালার

শ্রীদেবকান্ত বড়ুয়া

মতো একটি রাজ্যে ধর্ম সম্প্রদায়ের প্রভাব নির্বাচনের মোড় ঘুরিয়ে দেওয়ার ক্ষমতা রাখে। ক্যাথলিক চার্চের সমর্থনের ওপর সে কারণেই কেরালা কংগ্রেসের তথা কংগ্রেসেরও নির্বাচনী সাফল্য অনেকাংশেই নির্ভরশীল।

এর্নাকুলামে অনুষ্ঠিত কেরালা বিশপ সম্মেলনকে ঘিরে কেরালা কংগ্রেসী ও কংগ্রেসী প্রভাবশালী পত্রিকাগুলিতে জোর বাকবিতণ্ডার সৃষ্টি হয়েছে। দুই পক্ষই বিশপদের সমর্থন একান্তভাবে তাঁদেরই ওপর বর্তাবে বলে বিতর্ক চালিয়ে যাচ্ছেন। কেরালা কংগ্রেসী প্রভাবান্বিত পত্রিকা কেরালা ভূষণম একদিকে এবং কংগ্রেসী প্রভাবাধীন মালায়লাম মনোরমা অপর পক্ষে।

কেরালা কংগ্রেস ইতিমধ্যে বাছা বাছা প্রতিক্রিয়াশীল দলের সঙ্গে আঁতাতে আসতে সমর্থ হয়েছেন। স্বতন্ত্র, জনসঙ্ঘ এবং ডি এম কে কেরালা কংগ্রেসের সঙ্গে জোটবদ্ধ হতে এগিয়ে এসেছেন। এমন কি সর্বভারতীয় ভিত্তিতে একটি ডেমোক্রাটিক কংগ্রেস গঠনের স্বপ্নও কেরালা কংগ্রেসের আছে। বিভিন্ন রাজ্যের বিদ্রোহী কংগ্রেসীদের নিয়ে এই ফ্রন্ট গঠনের অভিপ্রায় আছে তাঁদের। কিন্তু কেরালা কংগ্রেসের এসমস্ত সাজসজ্জা কত দূর ধোপ-সই হবে তা অনেকাংশেই কেরালার ক্যাথলিক ক্রিশ্চান সম্প্রদায়ের ওপর নির্ভরশীল। কংগ্রেসী "মালয়ালাম মনোরমা"-য় প্রকাশ—বিশপগণ নাকি কংগ্রেসকেই ভারতবর্ষের একমাত্র রক্ষক বলে বিবেচনা করেন এবং কেরালা কংগ্রেসকে তাঁরা ইতিমধ্যে এই মর্মে নাকি এক বার্তা পাঠিয়েছেন যে, হয় তোমরা কংগ্রেসের সঙ্গে যোগদান কর, নয় বিশপ সম্প্রদায়ের সমর্থন হারাতে হবে তোমাদের।

কেরালা কংগ্রেস কিন্তু এই প্রচার ভিত্তিহীন বলে দাবি করছেন। তাঁরা বলেন যে, চাঙ্গানাসেরির বিশপ, যিনি কেরালা বিশপদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা প্রভাবশালী—কেরালা কংগ্রেস তাঁরই সমর্থনপুষ্ট।

কিন্তু একটা জিনিস বেশ স্পষ্ট হয়ে গেছে যে, চার্চের অনিচ্ছার দরুণই কেরালা কংগ্রেস শেষ পর্যন্ত বাম জোটে নাম লেখাতে সাহসী হয় নি। চার্চ বাম কম্যুনিস্টদের ঘেঁষ সইবেন না এটা সাদা কথা। সুতরাং কেরালা কংগ্রেসের কর্মিগণের মধ্যে বাম জোগে নাম লেখানোর ইচ্ছা থাকলেও তা পূরণ করা সম্ভব হয় নি। অন্যদিকে তাঁরা কংগ্রেসের দাবি মত বিনা শর্তে কংগ্রেসে প্রত্যাবর্তন করতেও পারেন না। চার্চ ও কেরালা কংগ্রেসের বিনা শর্তে প্রত্যাবর্তন যে সম্ভব নয় তা উপলব্ধি করেছেন। ফলত সমস্যা বেশ জটিল আকার ধারণ করেছে।

কিন্তু কেরালা কংগ্রেসের প্রতি নমনীয় মনোভাব প্রদর্শন করাও অন্যদিকে কংগ্রেসের পক্ষে অসম্ভব। একে তো কেরালায় ভাঙনই প্রথম, তার ওপর কেরালা কংগ্রেস বিভিন্ন রাজ্যের বিদ্রোহী কংগ্রেসীদের সঙ্গে দহরম-মহরম বাড়িয়ে যেতে চান। গোঁড়া কংগ্রেসীরা এতে কেরালা কংগ্রেসের প্রতি অত্যন্ত রুষ্ট হয়ে উঠেছেন।

কংগ্রেসের ইউথ লীগ ও সোস্যালিস্ট ফোরামও কেরালা কংগ্রেসকে পুনঃ প্রবেশপত্র দানের বিরোধী। তাঁরা দলের মধ্য থেকে সমস্ত রকম ধর্মীয় গোঁড়ামির অবসান চান। সেদিক থেকে কেরালা কংগ্রেস পুনশ্চ প্রত্যাবর্তন না করলেই তাঁরা সুখী।

কিন্তু যে সমুদয় কংগ্রেসীরা নির্বাচন জেতাটাই মুখ্য বলে মনে করেন, তাঁরা কেরালা কংগ্রেসকে স্থান দিতে বিশেষ গররাজি নন।

শুবান্দ্রিওর বিচার

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রঃ

রাষ্ট্রপতি লিনডন বি জনসন ভিয়েতনাম সমস্যার সমাধানের উদ্দেশ্যে যে নতুন প্রচেষ্টা শুরু করেছেন, তা এখনও অব্যাহত রয়েছে।

রাষ্ট্রসংঘ সদর দপ্তরে গিয়ে সেক্রেটারী-জেনারেল ইউ থাণ্টের সঙ্গে এই ব্যাপারে জনসন আলোচনা করেছেন। গত সপ্তাহে জনসন সোভিয়েট ইউনিয়নের পররাষ্ট্রমন্ত্রী আন্দ্রে গ্রোমিকোর সঙ্গে দীর্ঘ সময় ধরে আলোচনা করেছেন। জনসন-গ্রোমিকো সাক্ষাৎকার কূটনীতিকমহলে বিশেষ কৌতূহলের সৃষ্টি করেছে।

ভিয়েতনাম সম্পর্কে আলোচনার জন্য ম্যানিলায় যে 'এশীয় শীর্ষ বৈঠক' আহূত হয়েছে, সেখানে যাবার আগে জনসনের এভাবে ইউ থাণ্ট ও গ্রোমিকোর সঙ্গে সাক্ষাৎ ও আলোচনা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। ঠিক কি কথা জনসন বলেছেন তা জানা না গেলেও, ভিয়েতনাম সম্পর্কে নতুন কিছু যে তিনি বলেছেন এ বিষয়ে সন্দেহ নেই। দেশ ও বিদেশের জনমতের চাপে সন যদি সত্যি যুদ্ধের পথ থেকে সরে রি পথ খোঁজা শুরু করেন, তবে তার চেয়ে ভাল আর কিছু হতে পারে না। তবে এখনও তাঁর মনোভাব খুব স্পষ্ট নয়।

জনসনের নতুন শান্তি-প্রস্তাবের কিছুটা আভাস পাওয়া গেছে ১৪ই অক্টোবর সাংবাদিক সম্মেলনে তিনি যে মন্তব্য করেছেন তার থেকে। টেলিভিশনে প্রচারিত এই সাংবাদিক সম্মেলনে জনসন বলেছেন, অপর পক্ষও যদি সাড়া দেয় তবে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র উত্তর ভিয়েতনামে বোমাবর্ষণ বন্ধ করতে প্রস্তুত আছে। এই প্রসঙ্গে তিনি বলেছেন, এর পূর্বেও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ৩৭ দিন বোমাবর্ষণ বন্ধ রেখেছিল। কিন্তু উত্তর ভিয়েতনাম থেকে দক্ষিণ ভিয়েতনামে ভিয়েত কং গেরিলাদের অস্ত্র, রসদ ও লোক দিয়ে সাহায্য বন্ধ না করার জন্য তারা আবার বোমাবর্ষণ শুরু করেছে। সুতরাং, জনসনের বক্তব্য, এবার যদি উত্তর ভিয়েতনাম এই সব সাহায্য বন্ধ করে তবে তাঁরাও বোমাবর্ষণ বন্ধ করবেন।

ভিয়েতনামে শান্তির জন্য ইউ থাণ্টের তিন-দফা প্রস্তাব মোটামুটি শান্তিকামী মানুষ কর্তৃক সমর্থিত। এই প্রস্তাবের প্রথম কথাই হল, উত্তর ভিয়েতনামে মার্কিন বোমাবর্ষণ বন্ধ করতে হবে। তারপর, ভিয়েতনাম থেকে মার্কিন সৈন্য অপসারণ, এবং ভিয়েত কং সহ সকলের সঙ্গে মীমাংসার জন্য আলোচনা।

সর্ত আরোপ করা সত্ত্বেও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র আজ উত্তর ভিয়েতনামে বোমাবর্ষণ বন্ধ করার কথা ভাবছে। এ নিশ্চয়ই সুসংবাদ। দেখা যাক, জনসন সত্যিই শান্তির জন্য অগ্রসর হন, না এখানেই থেমে থাকেন।

১৪ই অক্টোবরের সাংবাদিক সম্মেলনে জনসন আর একটি বিষয়ের ওপর গুরুত্ব আরোপ করেছেন। মার্কিন-সোভিয়েট সম্পর্কের উন্নতির জন্য তিনি আগ্রহ প্রকাশ করেছেন। তিনি সোভিয়েট ইউনিয়নের নেতৃবৃন্দকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সফরের জন্য আমন্ত্রণ জানিয়েছেন। পরমাণু বোমার প্রসার বন্ধের জন্য মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও সোভিয়েট ইউনিয়নের মধ্যে একটি চুক্তি সম্পাদনের জন্যও তিনি প্রস্তাব করেছেন।

ব্ল্যাকপুলে বৃটেনের রক্ষণশীল দলের বার্ষিক সম্মেলনে বক্তৃতা প্রসঙ্গে বৃটেনের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী ও বর্তমানে দলের পররাষ্ট্রনীতির মুখপাত্র স্যার আলেকজান্ডার ডগলাস হিউম বলেছেন, আন্তর্জাতিক রাজনীতির ক্ষেত্রে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও সোভিয়েট ইউনিয়নের সহযোগিতার সম্ভাবনা ক্রমেই বৃদ্ধি পাচ্ছে। তিনি এ কথাও বলেছেন, ভবিষ্যতে কোন বিশ্বযুদ্ধ হলে তার একদিকে থাকবে চীন, আর তার বিপক্ষ দলে একত্র থাকবে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও সোভিয়েট ইউনিয়ন।

এখনই এতটা মার্কিন-সোভিয়েট আঁতাতের সম্ভাবনা না দেখা গেলেও ভিয়েতনাম সমস্যার সমাধানের জন্য যদি

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সোভিয়েট ইউনিয়নের সংগে আপোষের চেষ্টা করে, তবে তা সব দিক থেকেই মঙ্গলকর হবে।

ইন্দোনেশিয়াঃ

গত সপ্তাহ থেকে দশজন সামরিক অফিসার নিয়ে গঠিত এক বিশেষ সামরিক আদালতে ইন্দোনেশিয়ার প্রাক্তন পররাষ্ট্রমন্ত্রী ডঃ সুবান্দ্রিও-র বিচার চলছে।

সুবান্দ্রিও-র বিরুদ্ধে অভিযোগ, তিনি গত বৎসর ৩০শে সেপ্টেম্বরের ব্যর্থ কমিউনিস্ট অভ্যুত্থানের সংগে যুক্ত ছিলেন, তিনি ইন্দোনেশিয়ার কমিউনিস্টদের সংগে যোগসাজসে দেশে কমিউনিস্ট শাসন প্রতিষ্ঠার জন্য চেষ্টা করেছেন, এবং এই উদ্দেশ্যে তিনি চীন ও বিশেষ করে চীনের প্রধানমন্ত্রী চৌ-এন-লাই-এর সংগে গোপন চক্রান্ত করেছেন।

ইন্দোনেশিয়ায় কমিউনিস্ট প্রভাব বৃদ্ধি ও চীনের সংগে ঘনিষ্ঠ সম্পর্কের নীতির জন্য সোয়েকার্নোর চেয়েও বেশি দায়ী তাঁর দীর্ঘকালের পররাষ্ট্রমন্ত্রী সুবান্দ্রিও। তাই সুবান্দ্রিও-র ওপর নতুন শাসকগোষ্ঠী, সামরিক বাহিনী ও বিদ্রোহী ছাত্রসমাজ অত্যন্ত ক্ষুব্ধ। ছাদের অভিযোগ, ৩০শে সেপ্টেম্বরের অভ্যুত্থানের চক্রান্তের সমস্ত খবর সুবান্দ্রিও জানতেন, তিনি ইচ্ছা করেই কোন ব্যবস্থা অবলম্বন করেন নি। কেবল তাই নয়, এই অভ্যুত্থানের সময় তিনি কমিউনিস্টদের শক্ত ঘাঁটি সুমাত্রায় গিয়ে পালিয়ে ছিলেন।

সুবান্দ্রিও খুব দৃঢ়তার সংগে আদালতের সম্মুখীন হতে পারেন নি। রাষ্ট্রদ্রোহিতার অপরাধ অস্বীকার করলেও তিনি যে অভ্যুত্থানের সংগে একেবারে জড়িত নন, তা জোরের সংগে বলতে পারেন নি। ৩০শে সেপ্টেম্বরের অভ্যুত্থানের সংবাদ তিনি আগেই জেনেছিলেন, এ কথা তিনি স্বীকার করেছেন; তবে 'বাং কর্ণ' সোয়েকার্নোকে তা বলার সাহস তাঁর হয় নি। এর আগে ইন্দোনেশীয় শাসন উচ্ছেদের জন্য যে বৃটিশ-মার্কিন চক্রান্ত হয়েছে, এই আদালতের সম্মুখে সুবান্দ্রিও সে কথা নতুন করে তোলার চেষ্টা করেন, কিন্তু তা বিশেষ প্রভাব বিস্তার করতে পারে নি।

তবে সুবান্দ্রিও-র বিভিন্ন উক্তি এবং অন্যান্য সাক্ষীর কথায় সোয়েকার্নোর বিরুদ্ধেও অভিযোগ উঠেছে। সোয়েকার্নো কমিউনিস্ট পার্টি ও চীনের সংগে গোপন চক্রান্ত করেছেন, এমন কথা বলা হয়েছে। সুবান্দ্রিও ইন্দোনেশীয় সরকারের গোপন পুলিশ বিভাগেরও প্রধান ছিলেন। তাঁর অধীনস্থ এই বিভাগের তিন নম্বর প্রধান বলেছেন, ইন্দোনেশিয়ার কমিউনিস্ট নেতা (অভ্যুত্থানের পর তিনি নিহত হয়েছেন) ডি এন আইদিত সোয়েকার্নোকে এক গোপন চিঠিতে জানান, তাদের প্রস্তাবিত অভ্যুত্থান কেমন হবে, এবং আইদিত এ ব্যাপারে সোয়েকার্নোর সমর্থন আশা করেন। এছাড়া চৌ-এন-লাই নাকি একবার সোয়েকার্নোর কাছে শ্রমিক ও কৃষককর্মীদের জন্য এক লক্ষ অস্ত্র সরবরাহের প্রস্তাব করেছিলেন।

সোয়েকার্নোর বিরুদ্ধে এই সব অভিযোগ শুনে ছাত্ররা অত্যন্ত উত্তেজিত। তারা প্রকাশ্যে সোয়েকার্নোর বিচার দাবি করছে। সোয়েকার্নোর বিরুদ্ধে ছাত্রদের বিক্ষোভ এত তীব্র আকার ধারণ করেছে যে, সোয়েকার্নোর সরকারী আবাসস্থল 'মারডেকা প্রাসাদ' সৈন্যবাহিনী দিয়ে ঘিরে রাখতে হয়েছে।

সোয়েকার্নো অবশ্য এসব অভিযোগই অস্বীকার করেছেন। কেবল তাই নয়, অবস্থা এমন দাঁড়িয়েছে যে, তিনি ৩০শে সেপ্টেম্বরের ব্যর্থ অভ্যুত্থানের পর, এই প্রথম প্রকাশ্যে সেই অভ্যুত্থানের নিন্দা করেছেন।

সামরিক আদালতের বিচারের পরিণতি কি হবে তা বোঝা এমন কিছু শক্ত নয়। বিচারে সুবান্দ্রিও দোষী সাব্যস্ত হবেন, এবং হয়তো তাঁর মৃত্যুদণ্ড হবে। চীনের প্রভাবে ইন্দোনেশিয়ার রাজনীতি যেমন হয়েছিল, তাতে এই সব অভিযোগ সত্য হওয়া অসম্ভব নয়। আবার বর্তমানে ইন্দোনেশিয়ার ক্ষমতা যাদের হাতে আছে সেই দক্ষিণপন্থী সামরিক নেতার দল, এবং সাম্প্রদায়িকতাবাদী রাজনৈতিক দল ও ছাত্রসমাজ সোয়েকার্নো-সুবান্দ্রিও-র ঘোর বিরোধী। এই অবস্থায় মিথ্যা অভিযোগ এনে বিচার করাও সম্ভব। আর এই সব ক্ষেত্রে আদালতের নিরপেক্ষতা বলেও কিছু থাকে না। সুতরাং, প্রকৃত অবস্থা যে কি তা জোর করে বলা শক্ত। তবে সুবান্দ্রিওর বিচার ইন্দোনেশিয়ার ভেতরে ও বাইরে বিশেষ কৌতূহল সৃষ্টি করেছে।

তিউনিসিয়াঃ

বিশ মাস ধরে কার্যত তিউনিসিয়ার সংগে সংযুক্ত আরব প্রজাতন্ত্রের কোন রকম কূটনৈতিক সম্পর্ক নেই। গত সপ্তাহে তিউনিসিয়া আনুষ্ঠানিকভাবে সংযুক্ত আরব প্রজাতন্ত্রের সংগে সকল সম্পর্ক ছিন্ন করেছে।

আরব জগতের দুই প্রধান আবদুল গামেল নাসের ও হবিব বরগুইবার মধ্যে দীর্ঘদিনের বিরোধের পরিণতি এই সম্পর্কচ্ছেদ। ১৯৫৪ সালে যখন তিউনিসিয়া স্বাধীনতা লাভ করে তখনও বরগুইবা নাসেরের বিরুদ্ধে ছিলেন। নাসের তিউনিসিয়ার মুক্তিসংগ্রামীদের কোন সাহায্য করেন নি, এই তাঁর অভিযোগ। বিপরীত দিকে নাসেরও বরগুইবার প্রতিদ্বন্দ্বী সালা বেন ইউসুফকে তিউনিসিয়ার রাষ্ট্রপতি পদে নির্বাচিত করার জন্য চেষ্টা করেছেন। শেষ পর্যন্ত সালা বেন ইউসুফ তিউনিসিয়া ত্যাগ করে কায়রোয় রাজনৈতিক আশ্রয় গ্রহণ করেন, এবং পরে তিনি আততায়ীর হাতে নিহত হন। ইউসুফ হত্যার ঘটনায় নাসের তথা মিশরীয় জনগণ বরগুইবার ওপর অত্যন্ত ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠেন। দুই দেশের মধ্যে তিক্ততা বিশেষভাবে বৃদ্ধি পায়। ১৯৬১ সালে তিউনিসিয়ার বন্দর বিজার্তে থেকে ফরাসী নৌ-ঘাঁটি অপসারণের দাবিতে যে সংগ্রাম হয় তাতে নাসের বরগুইবাকে সাহায্য করেন, এবং এর ফলে উভয় দেশের মধ্যে সম্পর্কের উন্নতি হয়। নাসের তিউনিসিয়া সফরে গেলে তাঁকে বিপুলভাবে সম্বর্ধনা জানানো হয়, এবং বেলগ্রেডে নিরপেক্ষ শীর্ষ বৈঠকে নাসের ও বরগুইবা দুজনেই যোগ দেন। কিন্তু এই সদ্ভাব বেশি দিন থাকে নি। আবার বিরোধ শুরু হয়।

বরগুইবা আরব লীগ ত্যাগ করেছেন। তাঁর অভিযোগ, আরব লীগ নাসেরের হাতের ক্রীড়নক। বরগুইবা ইসরায়েলের সংগে আরব জগতের আপোষের প্রস্তাব করেছেন। তাঁর অভিমত, দীর্ঘকাল ধরে ইসরায়েলের সংগে বিরোধ জিইয়ে রেখে লাভ নেই। ইসরায়েলকে স্বীকার করে বিরোধের অবসান ঘটানো উচিত। এই প্রস্তাবে আরব জগতে তীব্র বিক্ষোভের সৃষ্টি হয় যে, গত বৎসর বরগুইবাকে তাঁর আরব রাষ্ট্র সফর মধ্যপথে বন্ধ করে দেশে ফিরে আসতে বাধ্য হন। আরবরা ইসরায়েলকে মানতে প্রস্তুত নয়। সম্প্রতি তিনি সৌদি আরবের রাজা ফয়জালের নেতৃত্বে গঠিত ঐস্লামিক জোটকেও সমর্থন করেছেন। নাসের-বিরোধী এই জোটে সৌদি আরব ছাড়া ইরান ও তুরস্ক রয়েছে। ধর্মনিরপেক্ষতার সমর্থক হওয়া সত্ত্বেও তিউনিসিয়া এই জোটে যোগ দেয়ায় বিস্ময়ের সৃষ্টি হয়েছে।

এই সব দেখে মনে হয়, বিরোধ কেবল মাত্র নেতৃত্বের নয়, আদর্শের প্রশ্নও আছে। নাসেরকে কেন্দ্র করে আরব জগতে যে সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী শক্তি গড়ে উঠেছে, বরগুইবা আজ তার সংগে থাকতে পারছেন না। তিনি ইসরায়েলকে সমর্থন করছেন, ইঙ্গ-মার্কিন সমর্থনপুষ্ট ফয়জালের ঐস্লামিক জোটে যোগ দিচ্ছেন। জাগ্রত আরব জাতীয়তাবাদের সংগে এর কোন সামঞ্জস্য নেই।

যাই হোক, তিউনিসিয়ার সংগে সংযুক্ত আরব প্রজাতন্ত্রের এই বিরোধের ফলে আরব জগতের ঐক্যে ফাটল দেখা দিয়েছে।

নির্মল বার সাবানে কাচলে
আপনার কাপড়-জামা হবে
ধবধবে ফরসা
হালকা সুগন্ধে ভরপুর
নির্মল
যার সাবানে কাচা কাপড়-জামা দেখতে
ঝকঝকে পরিষ্কার হয়,
আর সদ্য ধোয়ার সুগন্ধে ভরে ওঠে।
নির্মল বার সাবানে চটপট দেদার ফেনা হয় আর সেই ফেনায় তেলকালি ও ধুলোময়লা জড়সুদ্ধ বেরিয়ে যায়। আপনার কাপড়-জামা ঝকঝকে তকতকে দেখায়, সদ্য ধোপ দেওয়ার সুগন্ধে ভরে থাকে। নির্মল দিয়ে কাচলে পয়সারও সাশ্রয় হয়। ঢের বেশী দিন চলে—সাবানটি শক্ত থাকে, তাড়াতাড়ি ক্ষয়ে যায় না।
কুসুম প্রোডাক্টস লিমিটেড, কলিকাতা-১
Nirmal
BAR SOAP
JWTKPN 3098A
নির্মল
পূর্ব ভারতে এই বার সাবানই
কাটতিতে সবার ওপরে

যোগীন্দ্রনাথ সরকার স্মরণে

(১৮৬৬—১৯৩৭)

পরিমল গোস্বামী

অজগর প্রথমে তেড়ে এসেছিল, মন ভুলিয়েছিল, সেই ষাট বছর আগে। আজও হাসিখুশির সেই অজগর, সেই আম, সেই ইঁদুরছানা, সেই ঈগল, মনের মধ্যে মহা সুখে সহঅবস্থান করছে! কিন্তু আরও কিছুদিন বাদে 'হাসিরাশি' বইখানা যখন হাতে এলো তখন সমস্ত মন কেড়ে নিল এই বইখানা। এর প্রত্যেকটি পাতা আমাকে কি পরিমাণ আকর্ষণ করেছিল তার প্রমাণ আজও রয়েছে আমার স্মৃতিতে। এখনও, সেই এতদিন পরেও হাসিরাশির অনেকগুলি কাহিনীই মুখস্থ আছে। শত শত বার পড়েও পড়া শেষ হয় নি যা, তার স্মৃতি আজ আরও মধুর মনে হচ্ছে। কারণ এতদিন পরে আবার যোগীন্দ্রনাথ সরকারের কথা আলোচিত হচ্ছে তাঁর জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষে।

সমস্ত বাংলার শিশুচিত্তে একই ছন্দ একই আনন্দের হিল্লোল বইয়ে দিয়েছিলেন তিনি। তখন দূর পল্লীতে থাকি। তখন মনকে বিক্ষিপ্ত করতে পারত একমাত্র পল্লী প্রকৃতি। খোলা মাঠ, প্রশস্ত পদ্মানদী, স্বাধীনভাবে যতদূর ইচ্ছা ছুটে বেড়াই। সে উন্মাদনাকে সংহত করে, সুস্থির করে, ঘরে বসিয়ে রাখতে পারত ঐ একখানা বই—হাসিরাশি। ওর মধ্যে যে কাহিনীগুলিতে কাহিনী ও ছন্দ একত্র মিলে ছোট ছোট গল্পের চেহারা পেয়েছে সেইগুলি আমাকে সবচেয়ে বেশি আকর্ষণ করত। বীরশিশু, সাপ নয় তো—যম, পেটুক দামু, দুষ্টু তিনু প্রভৃতি। এবং অন্যগুলিও যে কিছুমাত্র কম ভাল লাগত তা মনে হয় না। অনেকের জন্যই মনে একটা দুঃখ জাগত। মেহের আলী, কোচম্যান, বোকা সিংহ, যে টমাস সাহেবকে খেতে পারল না, এদের জন্য মন খারাপ হত। 'কাজের ছেলে' নামক কাহিনীটি সব চেয়ে মজার মনে হত তখন। একটি ছেলে বাজারে যেতে যেতে কি কি আনতে হবে সব গুলিয়ে ফেলল, তখন তার চেয়েও ছোট আমরা, তাকে নিয়ে কত হেসেছি, বার বার পড়ে শুনিয়েছি সমবয়সীদের।

যোগীন্দ্রনাথ প্রকৃত শিশুপ্রেমিক ছিলেন এখন তা ভাল বুঝতে পারি। আমাদের ঠিক কোন্ জিনিসটি ভাল লাগবে তা নানা স্থান থেকে আহরণ করে এনে আমাদের ঠিক মনের মতো করে পরিবেশন করেছেন। ছন্দোরচনায় তাঁর সহজাত ক্ষমতা ছিল, এবং বিদেশী কাহিনীকেও তিনি যেভাবে সম্পূর্ণ স্বদেশী করে তুলেছেন তা ভাবলে তাঁর পরিকল্পনা, কল্পনা এবং ক্ষমতায় অবাক হতে হয়।

যোগীন্দ্রনাথ সরকার

তিনি যা রচনা করেছেন ও যে সব ছড়া সংগ্রহ করেছেন তা প্রেরণা ছিল তাঁর অন্তরেই। তাঁর রচনার অনেক অক্ষম অনুকরণ হয়েছে এবং অসাধু ব্যবসায়ী প্রকাশক তাঁর কথা কিছু কিছু বিকৃত করে, তাঁর বইয়ের নাম পর্যন্ত অপহরণ করে অপাঠ্য, অযোগ্য, এবং অক্ষম সব বিকার বাজারে ছেড়েছে। একদিন হঠাৎ এমন একখানা বই হাতে পড়েছিল, দেখে দুঃখ হল।

ছোটদের জন্য এখন অনেকেই লেখেন, কিন্তু তার মধ্যে তাদের প্রতি প্রকৃত মমত্ব-বোধের পরিচয় অল্পক্ষেত্রেই পাওয়া যায়। ছোটদের ভাল না বাসলে শুধু ব্যবসার জন্য শিশুসাহিত্য রচনা করা চলে না। শুধু ভালবাসার অভাব নয়, দায়িত্ববোধের অভাবই সবচেয়ে বেশি পীড়িত করে।

যোগীন্দ্রনাথ আমাদের অভাব কোথায় আমরা কি পেলে খুশি হব তার জন্য প্রধানত ইংরেজী শিশুসাহিত্য মন্থন করে, যে সব কাহিনীকে বাংলা করা যায় তা বেছে নিয়েছেন। এই বাংলা করা অনুবাদ করা নয়, 'অ্যাসিমিলেশন' বা আত্তীকরণ যাকে বলে, তাই। তার ইংরেজী চেহারা আর নেই। ইংরেজকে ধুতিচাদর পরানো নয়, ইংরেজকে বাঙালী ধর্মে রূপান্তরিত করা, দীক্ষা দেওয়া। হঠাৎ শুনলে মনে হবে এ কাজ বুঝি খুব সহজ। কিন্তু আমি প্রথমে একটি রচনা সম্পূর্ণ উদ্ধৃত করছি, 'ইংরেজ' ও 'বাঙালী'কে পাশাপাশি রাখছি আমার কথার সমর্থনে। এতে দেখা যাবে ইংরেজ কিভাবে চেহারায় পোশাকে এবং চালচলনে সম্পূর্ণ বাঙালী হয়ে গেছে।

"কাজের ছেলে" নামক কবিতার কথা উল্লেখ করেছি। সেটি এই—

"দাদ্‌খানি চাল মুসুরির ডাল
চিনি-পাতা দৈ,
দু'টা পাকা বেল, সরিষার তেল
ডিম-ভরা কৈ।"

"পথে হেঁটে চলি, মনে মনে বলি
পাছে হয় ভুল,
ভুল যদি হয় মা তবে নিশ্চয়
ছিঁড়ে দেবে চুল।

"দাদ্‌খানি চাল মুসুরির ডাল
চিনি-পাতা দৈ,
দু'টা পাকা বেল, সরিষার তেল
ডিম-ভরা কৈ।"

"বাহবা বাহবা—ভোলা ভূতো হাবা
খেলিছে ত বেশ।
দেখিব খেলাতে কে হারে কে জেতে
কেনা হ'লে শেষ।"

"দাদ্‌খানি চাল মুসুরির ডাল
চিনি-পাতা দৈ,
ডিম-ভরা বেল, দুটো পাকা তেল
সরিষার কৈ।"

"ওই ত ওখানে ঘুড়ি ধরে টানে
ঘোষেদের ননী;
আমি যদি পাই তা হলে উড়াই
আকাশে এখনি।

"দাদ্‌খানি তেল ডিম-ভরা বেল
দু'টা পাকা দৈ,
সরিষার চাল চিনি-পাতা ডাল
মুসুরির কৈ!

এসেছি দোকানে—কিনি এইখানে,
যত কিছু পাই;
মা যাহা বলেছে, সব মনে আছে,
তা'তে ভুল নাই।!

"দাদ্‌খানি বেল মুসুরির তেল
সরিষার কৈ,
চিনি-পাতা চাল, দু'টা পাকা ডাল,
ডিম-ভরা দৈ!"

মডেল ইংরেজী কবিতাটি এই-

"A pound of tea at
one-and-three
And a pot of raspberry jam
Two new-laid eggs,
a dozen pegs
And a pound of
rashers of ham."

I'll say it over all the way,
And then I'm sure
not to forget,
For if I chance
to bring things wrong,
My mother gets in such a pet.

"A pound of tea at
one-and-three
A pot of raspberry jam,
Two new-laid eggs,
a dozen pegs,
And a pound of rashers
of ham."

There in the hay
the children play
They're having such jolly fun;
I'll go there, too,
that's what I'll do,
As soon as my errands
are done.

"A pound of tea at
one-and-three
A pot of—er—new-laid jam,
Two raspberry eggs,
with a dozen pegs,
And a pound of rashers
of ham."

There's Teddy White
a-flying his kite
He thinks himself grand,
I declare;
I'd like to try to fly it sky-high
Ever so much higher
Than the old church spire,
And then—and then—
but there—

"A pound of three-and-one
at tea,
A pot of new-laid jam,
Two dozen eggs,
some raspberry pegs,
And a pound of rashers
of ham."

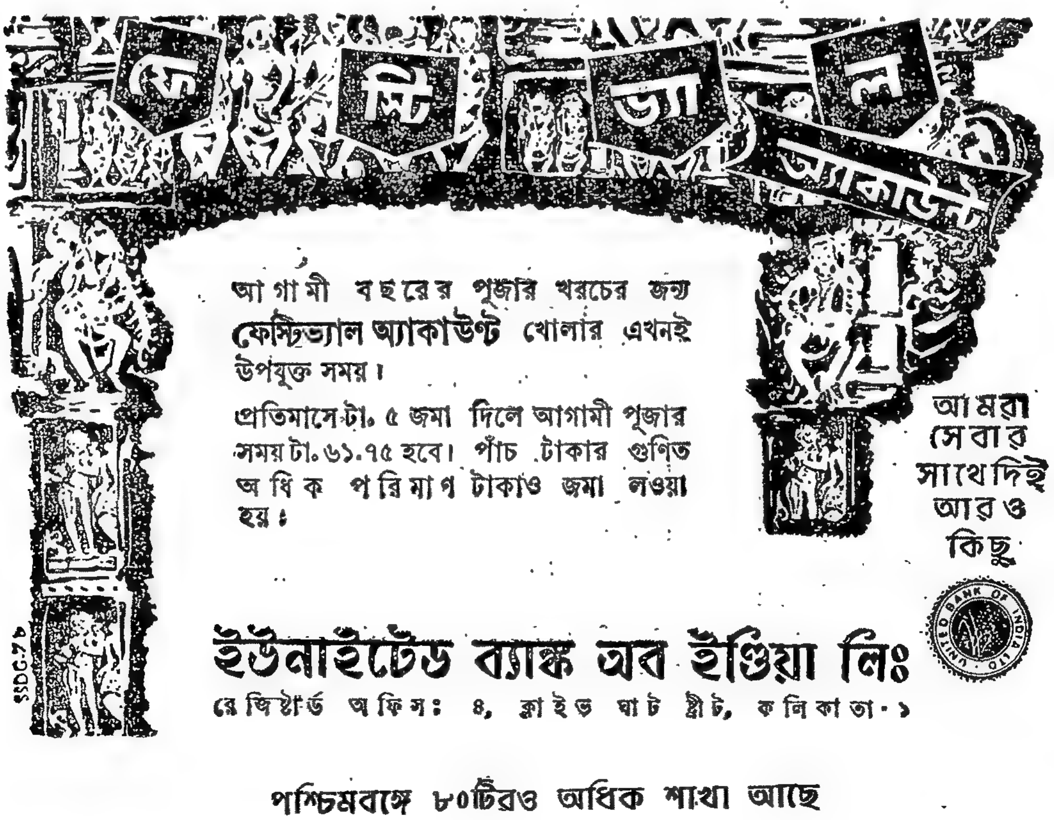

Now here's the shop,
outside I'll stop,
And run through
my orders again
I haven't forgot—no,
ne'er a jot—
It shows I'm pretty 'cute,
that's plain.

"A pound of three at
one-and-tea,
A dozen of raspberry ham,
A pot of eggs,
with a dozen of pegs,
And a rasher of new-laid jam."

ইংরেজীতে নয়টি স্তবক, বাংলাতেও তাই। ইংরেজী কবিতার ষষ্ঠ স্তবকে ছয়টি লাইন, কিন্তু দাদখানি চালের কবিতায় প্রতি স্তবকে সমান সংখ্যক চার লাইন। উদ্ধৃতি চিহ্ন দুটিতে ঠিক এক রকম। কিন্তু বিষয়, দুটিতে দুরকম। একটিতে বিলেতের বাজার, অন্যটিতে বাংলাদেশের বাজার। কাজেই দাদখানি চালের কবিতা বাংলার শিশুদের জ্ঞানে ও চেতনায়, চিরদিনের জন্য গাঁথা হয়ে গেছে। যোগীন্দ্রনাথ তাঁর হাসিখুশি, হাসিরাশি, মজার গল্প, ছবির বই, ছড়া ও পড়া প্রভৃতি বইতে যে সব শিশুজনপ্রিয় বিষয় নানা ভাণ্ডার থেকে আহরণ করেছেন, তার ভিতর দিয়ে তাঁর একটি বিশিষ্ট স্নেহশীল এবং আপন দায়িত্ব বিষয়ে সম্পূর্ণ সচেতন মনের পরিচয় পাওয়া যায়। একই সঙ্গে আনন্দ, কৌতুক, শিক্ষা এবং শুচিতার মিলন তিনি তাঁর সমস্ত রচনায় ঘটিয়েছেন।

হাসিখুশি প্রথম ভাগে যোগ বিয়োগ শিক্ষার জন্য যে দুটি ছড়ার ব্যবহার করা হয়েছে, তার মধ্যে হারাধনের দশটি ছেলে সবচেয়ে বিখ্যাত, এবং কোনো বাঙালী ছেলে—আমাদের কালের বা একালের হারাধনের ছেলেদের খবর জানে না এ কথা কল্পনাই করা যায় না। যে ইংরেজী ছড়া থেকে এটি বাংলায় রূপান্তরিত করা হয়েছে তার সঙ্গে এটিও একত্র উদ্ধৃত করে যোগীন্দ্রনাথের আত্তীকরণের আশ্চর্য ক্ষমতার পরিচয় দিচ্ছি।

দশটি ছেলে

হারাধনের দশটি ছেলে
ঘোরে পাড়া ময়,
একটি কোথা হারিয়ে গেল
রইল বাকি নয়।

হারাধনের নয়টি ছেলে
কাটতে গেল কাঠ,
একটি কেটে দুখান হ'ল
রইল বাকি আট।

হারাধনের আটটি ছেলে
ব'সলো খেতে ভাত,
একটির পেট ফেটে গেল,
রইল বাকি সাত।

হারাধনের সাতটি ছেলে
গেল জলাশয়,
একটি সেথা ডুবে ম'ল
রইল বাকি ছয়।

হারাধনের ছয়টি ছেলে
চ'ড়তে গেল গাছ,
একটি ম'ল পিছলে প'ড়ে
রইল বাকি পাঁচ।

হারাধনের পাঁচটি ছেলে
গেল বনের ধার,
একটি গেল বাঘের পেটে
রইল বাকি চার।

হারাধনের চারটি ছেলে
নাচে ধিন ধিন,
একটি ম'ল আছাড় খেয়ে,
রইল বাকি তিন।

হারাধনের তিনটি ছেলে
ধরতে গেল রুই,
একটি খেলে বোয়াল মাছে
রইল বাকি দুই।

হারাধনের দুইটি ছেলে
মারতে গেল ভেক,
একটি ম'ল সাপের বিষে
রইল বাকি এক।

হারাধনের একটি ছেলে
কাঁদে ভেউ ভেউ,
মনের দুঃখে বনে গেল,
রইল না আর কেউ।

যে ইংরেজী নার্সারি রাইম থেকে এটির প্রেরণা সেটাও এই সঙ্গে উপহার দিচ্ছি।

Ten little Nigger boys
went out to dine;
One choked his little self
and then there were nine.

Nine little Nigger boys
sat up very late;
One overslept himself
and then there were eight.

Eight little Nigger boys
travelling in Devon;
One said he'd stay there
and then there were seven.

Seven little Nigger boys
chopping up sticks;
One chopped himself in halves
and then there were six.

Six little Nigger boys
playing with a hive
A bumblebee stung one
and then there were five.

Five little Nigger boys
going in for law;
One got in Chancery
and then there were four.

Four little Nigger boys
going out to sea;
A red herring swallowed one
and then there were three.

Three little Nigger boys
walking in the Zoo;
A big bear hugged one
and then there were two.

Two little Nigger boys
sitting in the sun;
One got frizzled up
and then there was one.

One little Nigger boy
left all alone
He went and hanged himself
and then there were none.

বাংলা ও ইংরেজী পাশাপাশি পড়লেই বোঝা যাবে ঐ ইংরেজী ছড়া বাংলায় এসে কেমন বাঙালী হয়ে গেছে। মূল ছড়ায় দশটি নিগার ছেলের পিতৃপরিচয় ছিল না, কিন্তু বাংলায় তারা হারাধনের দশটি ছেলে। এই হারাধন নামটি তস্য পুত্রদের ভাগ্যের সম্পর্কে এমন সুন্দর ইঙ্গিতপূর্ণ হয়েছে যে, এ বিষয়ে যোগীন্দ্রনাথের উচ্চদরের কল্পনাশক্তির প্রশংসা না করে পারা যায় না। হারাধন নামটি যে তাঁর কিভাবে মনে এসেছিল, এবং মনে

জিপসী কবিতা

[আচার, দেশাচার, রীতি-নীতির কথা বাদ দিলেও পৃথিবীর সর্বত্র ছড়িয়ে থাকা বিচিত্র বেশ-ভূষা পরা জিপসীদের সঙ্গে ভারতীয়দের আকৃতিগত সামঞ্জস্যও রয়েছে অনেক। চাষবাদ তাদের পেশা নয়। পেশা হল নাচ-গান, বাদ্য-গীতি, হাত-দেখা, ভাগ্য-গণনা ইত্যাদি পরগাছা বৃত্তির। জিপসী কবিতা তারই প্রতিফলন। —লেখক]

অনশনের গান

এক দানা খাবার পেটে পড়ে নি
কাচ্চা-বাচ্চাগুলোর
খিদের জ্বালায় করছে ওরা ট্যাঁ ট্যাঁ ট্যাঁ।
ঠক্ ঠক্ করে কাঁপছে ঠান্ডায়।
ঘরেতে খাবার নেই এক কণা;
চোঁ চোঁ করছে খালি পেট।
আর মরছি অভাব-অনটনে।
তাঁবুর উপরটা গেছে টুটে।
খান খান শত ছিদ্র মেলে
পত্ পত্ লট্ পট্ করছে এখন
হাওয়ায়।
শীতের হাওয়া যাচ্ছে বয়ে শন্ শনিয়ে
ঝন্ ঝন্ করছে হাড়গুলো,
আর কাঁদছি বসে চাপড়ে খালি বুক।
শক্ত কালো এক টুকরো রুটি জুটবে
কোথায়?
মা-টাও যে নেই কোলের বাচ্চাটির,
নেই বুঝি বাপ-মা কেউ?
মরতে আমি ভয় করি না বড়ো,
কিন্তু রেহাই কই?

[অনুবাদ—নিখিল সেন

ভাগ্য-গণনা

এক দানি চাঁদি সোনা দিন গুঁজে দিদিমণি,
গরীব বুড়ী জিপসীর হাতে;
জানবেন, ভাগ্যলক্ষ্মী আপনার পয়মন্ত।
হস্ত-রেখা বিচার করেই বলেছি দিদিমণি,
গ্রহ-সন্নিবেশ আপনার ভালই।
সুন্দর এক যুবক প্রেমে পড়েছে, আপনায়
হাবুডুবু খাচ্ছে বেচারা,
আপনিও ঠিক মজে গেছেন দিদিমণি।
সাদী হবে কিন্তু আপনাদের।
বিয়ের পর আপনি হবেন পয়লা
নম্বরের গিন্নী;
দুদু ছেলের হবেন মা।
সুখে-শান্তিতে কাটবে আজীবন।
হাত দেখা আমার সঠিক কিনা
প্রমাণ পাবেন সঙ্গে সঙ্গেই।
মনের মানুষের সঙ্গে আপনার
সাক্ষাৎ হবে আজই।
ওই দেখুন, এ দিক পানে আসছে কে?
আমার ভবিষ্যদ্বাণী ফলল কি না
প্রমাণ পেলেন হাতে হাতে।

[অনুবাদ—নিখিল সেন

এসেছিল বলেই এটি যে একটি সর্বাঙ্গসুন্দর মূলে বাংলা কবিতার চেহারা পেয়েছে, সে কথা ভাবলে অবাক লাগে। ওরা হারাধনের ছেলে না হয়ে অন্য কারো ছেলে হলে এ কাহিনীর দাম কতখানি কমে যেত, এখন আর তা অনুমান করবার উপায় নেই।

(নিগার কথায় আপত্তি হওয়াতে পরে ওটি "টেন লিটল ইন্ডিয়ান বয়েজ" করা হয়েছিল ইংরেজীতে।)

প্রথম জীবনে যোগীন্দ্রনাথ মাত্র পনেরো টাকা বেতনের স্কুল-শিক্ষক ছিলেন। এবং শিবনাথ শাস্ত্রী সম্পাদিত (১৮৯৫ থেকে ১৯০০ খৃঃ পর্যন্ত সম্পাদক) মুকুল নামক মাসিকপত্রের সঙ্গে কোনো এক সময়ে সংশ্লিষ্ট ছিলেন। (এর বছর দশেক পরে আমি এই কাগজের সঙ্গে পরিচিত হই, এবং ধাঁধার উত্তর দিয়ে প্রথম বাংলা অক্ষরে নাম ছাপা দেখে পুলকিত হই। সেটি অনুমান ১৯১০, যখন সম্পাদক হেমচন্দ্র সরকার। এবং তখন আমার হাসিখুশি হাসিরাশির যুগ সদ্য গত হয়েছে)।

সে যুগের বাংলা দেশের শিশুদের শিক্ষার পরিপ্রেক্ষিতে যোগীন্দ্রনাথের কৃতি বিচার করলে তবে তাঁর মূল্য বিচার যথার্থ হওয়া সম্ভব।

যোগীন্দ্রনাথ নিজে প্রকাশক হয়ে নিজের বই ছাপিয়েছিলেন, এবং ১৯২৩ সালে অক্ষম হয়ে পড়া সত্ত্বেও ছোটদের জন্য বই রচনা বন্ধ করেন নি। তিনি শিশুচিত্তের বিশেষজ্ঞ ছিলেন, তাঁর সব বই ছোটদের জন্য, বয়স হিসাবে পর পর মাত্রা ভাগ করা আছে। উপেন্দ্রকিশোর বা সুকুমার রায়ের লেখাও ছোটদের জন্য। কিন্তু যোগীন্দ্রনাথ একেবারে অজগর থেকে আরম্ভ করেছিলেন। তিনি নানা দেশের উপকথা সংগ্রহ করেছেন, দেশী ছড়া সংগ্রহ করেছেন। ছবি ও গল্প নামক বইয়ের গোড়ায় লিখেছেন—

কুসুমিত বন করিয়া চয়ন
ভরিয়া কুসুম-ডালা,
নবীন মুকুলে হাসিমাখাফুলে
গাঁথিয়া এনেছি মালা।...

এবং এই চয়নের জন্য শেষ পর্যন্ত তিনি বনে-জঙ্গলেও প্রবেশ করেছেন। অর্থাৎ বনে-জঙ্গলে আমাদের যে সব প্রতিবেশী বাস করে সেই সব জীব-জন্তুদের নানাজনের রচনা এ বইতে সঙ্কলিত হয়েছে। চয়নের বৈচিত্র্য চয়নকারীর শিশুপ্রীতির ছাপ এঁকেছে প্রতিটি পৃষ্ঠায়। এ সব বই হাতে স্পর্শ করা মাত্র সহসা শৈশবে ফিরে যাই, আবার নতুন করে পড়ি সেই বহুবার পড়া বই, নতুন করে চারিদিকে মুগ্ধ দৃষ্টিতে চেয়ে থাকি—ক্ষণকালের জন্য হারানো আনন্দের মধ্যে ডুবে যাই। চেয়ে চেয়ে দেখি সেই অজগর সেই মেহের আলী, সেই দুষ্টু তিনু, সেই বীর ফটিকচাঁদ, আবার জীবন্ত হয়ে চোখের সামনে ঘুরে বেড়ায়। যাঁর বহু রচনার ভিতর দিয়ে প্রথম শিক্ষা আরম্ভ করেছি, সেই আমাদের পরম প্রিয় চির কল্যাণাকাঙ্ক্ষী যোগীন্দ্রনাথের উদ্দেশে, তাঁর শত জন্মবর্ষে প্রণাম নিবেদন করি।

(যোগীন্দ্রনাথ সরকারের জন্ম ১২ই কার্তিক ১২৭৩, শতবর্ষ পূর্তি ১১ই কার্তিক ১৩৭৩)

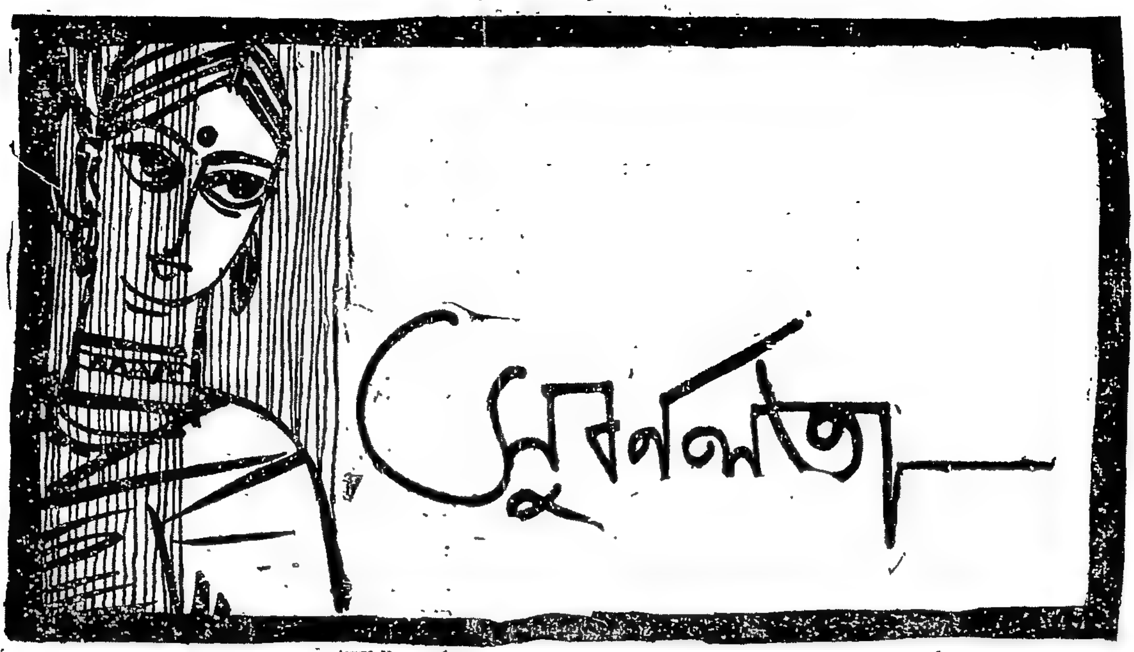

ধারাবাহিক উপন্যাস

আশাপূর্ণা দেবী

(পূর্ব-প্রকাশিতের পর)

দিন আর রাত্রির অজস্র আনাগোনায় অনেকগুলো বছর কেটে গেছে, কেটে গেছে অনেক বিষণ্ণ প্রহর, অনেক দুঃসহ দণ্ড আর পল। সেদিন যারা জীবন নাটকের খাতাখানা খুলে ধরে মঞ্চে ঘোরা-ফেরা করছিল, অনেক অঙ্ক, অনেক গর্ভাঙ্ক পার হয়ে গেল তারা।

'স্বদেশী' নামের যে দুরন্ত ক্ষ্যাপামিটা তছনছ করে বেড়াচ্ছিল শৃঙ্খলা আর শৃঙ্খল, সেই ক্ষ্যাপামিটা যেন নিজেরাই তছনছ হয়ে গেল গুলীর বারুদে, ফাঁসীর দড়িতে, অন্তহীন কারাগারের অন্ধকারে। হারিয়ে গেল অন্য শাসনের আশ্রয়ে পালিয়ে গিয়ে, চালান হয়ে গেল কালাপানি পারের 'পুলি পোলাও' নামের মজাদার দেশে!...সুরু হলো পাকা মাথার পাকামি। আলাপ আর আলোচনা, আবেদন আর নিবেদন, এই পথে আসবে স্বাধীনতা!

এঁরা বিজ্ঞ, এঁরা পণ্ডিত, এঁরা বুদ্ধিমান।

এঁরা ক্ষ্যাপার দলের ক্ষ্যাপা নন।

অনেক ক্ষ্যাপার মধ্যে একটা ক্ষ্যাপা অম্বিকা নামের সেই ছেলেটা নাকি কোথাকার কোন্ গারদে পচছে, কিন্তু তার জন্যে পৃথিবীর কোথাও কিছুই কি আটকে থাকলো?

নাঃ, আটকে থাকলো না কিছুই।

শুধু অবহেলা আর অসতর্কতার অবসরে হারিয়ে গেল সুবর্ণলতার জীবনের অনেকগুলো অধ্যায়। ছড়ানো ছেঁড়া পৃষ্ঠাগুলো বার বার উল্টেপাল্টেও কোথাও সেই ইতিবৃত্তের সূত্রটা খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না যেখানে সুবর্ণলতার 'ঘরভাঙা'র বর্ণনা লিপিবদ্ধ আছে।

অথচ দেখা যাচ্ছে, সুবর্ণলতা ঘর ভেঙে বেরিয়ে এসে আবার ঘর গড়েছে।

কিন্তু অধ্যায়গুলোতে কি নতুনত্ব ছিল কিছু? চাঁপার পর চন্দনের বিয়ে হয়ে গিয়েছিল উল্লেখযোগ্য শুধু এই-টুকুই। কারণ মানুষের ইতিহাসের বিশেষ তিনটি ঘটনার মধ্যে ওটা নাকি অন্যতম!

তা' শুধু ঐ চন্দনের বিয়ে।

তা ছাড়া আর কি?

সুবর্ণলতার বাকি ছেলেমেয়েগুলোর গায়ের জামার মাপ বাড়তে বাড়তে প্রমাণ সাইজে গিয়ে ঠেকেছিল, এটাও যদি খবর হয় তো খবর। অথবা মুক্তকেশীর ছেলে-দের চুলে পাক ধরেছিল, মুক্তকেশীর কোমরটা ভেঙে ধনুক হয়ে যাচ্ছিল আর মুক্তকেশীর বৌরা আর শাশুড়ীর দরজায় গিয়ে 'মা, আজ কি কুটনো কুটবো?' এই গুরুতর প্রশ্নটা করতে মাঝে মাঝেই ভুলে যাচ্ছিল, এসবকেও খবরের দলে ফেলতে চাইলে ছিল খবর!

কিন্তু সবচেয়ে বড় খবর তো 'স্বভাব' নামক জিনিসটা নাকি মরে গেলেও বদলায় না? তাই বাকি ঘটনাগুলোর ছাঁচ খুব বেশি বদলেছিল বলে মনে হয় না।

হয়তো সুবর্ণলতা তেমনিই অবিশ্বাস্য অবিশ্বাস্য দুঃসাহসিক সব ঘটনা ঘটাচ্ছিল, হয়তো মুক্তকেশীর মেজছেলে তেমনিই সর্বসমক্ষে একবার করে তেড়ে উঠে বৌকে শাসন করছিল, আর একবার করে আড়ালে গিয়ে নাক-কান মলছিল আর পায়ে ধরছিল।......

হয়তো সুবর্ণলতা সেই ঘৃণায় আর ধিক্কারে আবারও ভাবতে বসছিল কোন্‌টা সহজ? কোন্‌টা বেশি কার্যকরী? বিষ না দড়ি? আগুন না জল? আর শেষ পর্যন্ত কোনোটাই সহজ নয় দেখে রান্না-ঘরে নেমে গিয়ে বলছিল, 'বামুনদি, আমায় আগে চারটি দিয়ে দাও তো! শুয়ে পড়ি গিয়ে।'

আর কি হবে?

দরজিপাড়ার ঐ গলিটার মধ্যে আর কোন্ স্বাদের বাতাস এসে ঢুকবে? আর কোন্ বৈচিত্র্যের বাণী উচ্চারিত হবে?

তবে বৈচিত্র্যের কথা যদি বলতে হয় তো বলা যায়—মুক্তকেশীর বড়জামাই কেদারনাথ মুক্তকেশীর মুখরক্ষার চিন্তা না করেই দেহরক্ষা করেছেন, আর পেট-রোগা সুশীলা হঠাৎ আলোচাল মটরডাল-বাটার খপ্পরে পড়ে গিয়ে রক্ত অতিসারে ভুগছেন। আর বৈচিত্র্য—ঊনিশ বছরের মল্লিকা বিধবা হয়ে এসে ঠাকুমার হেঁসেলে ভর্তি হয়ে ইস্তক শুদ্ধাচারের বহর বাড়াতে বাড়াতে হাতে-পায়ে হাজা ধরিয়ে বসেছে।

মুক্তকেশী আক্ষেপ করে বলেন, 'মনে করেছিলাম পোড়াকপালী সর্বখাকি এসে তবু আমার একটু সুসার হলো

আমার হাত-নুড়কুৎ হবে, আমাকে এক ঘটি জল দেবে। তা নয়, আমি এই তিনঠেঙে বুড়ি ঐ দস্যির ভাত রেঁধে মরছি।'

বড় দুঃখেই বলেন অবশ্য!

বৌদের 'পিত্যেশ' জীবনে কখনো করেন নি, এখনও চান যে অহঙ্কারের মাথায় নিজের ভাত নিজে ফুটিয়ে খেতে খেতে চলে যাবেন, কিন্তু কোমরটা বড়ই বাদ সাধছে।

এখন টের পাচ্ছেন যেন বলে, 'কোমরের বল আসল বল।'

মল্লিকাটার কপাল পোড়ায় নিজের কপাল ছেঁচেছিলেন সত্যি, তবু ভেবে-ছিলেন, এ তো পরের মেয়ে নয়, ঘরের মেয়ে, এর কাছে একটু পিত্যেশ করলে অহঙ্কারটা খর্ব হবে না। তা' উল্টো বিপরীত। তার ভাত নিয়েই ডেকে ডেকে মরতে হয়, স্নান আর শেষ হয় না তার!

তা' ছাড়া বৌরাই বা কে কোথায়?

সেই বাঁধানো সংসার তো আর নেই এখন। বড়বৌয়ের শরীর ভেঙেছে মন ভেঙেছে, মেজবৌ বরের পয়সার দেমাকে এ বাড়ির ভাগ ছেড়ে দিয়ে অন্যত্র বাড়ি হাঁকড়েছেন, সেজ, ছোট দুই বৌ একই রান্নাঘরে ভিন্ন হাঁড়ি।...মুক্তকেশী এখন ভাগের মা।

তবু মেজটারই চোখের চামড়া আছে, দূরে থেকেও মুক্তকেশীর ব্যয়ভার বহন করে সে সময়-অসময়ে দেখে, মুক্তকেশীর ইচ্ছেপূরণের খাতে যা খরচাপত্র হয়, তার দায় পোহায়।

সুবোধের সামান্য ক'টি টাকা পেনসন, করবেই বা কি? আর দুটো তো কঞ্জুষের একশেষ!...নিজের সেই জমজমাট সংসার আর দাপটের দিনগুলোর কথা মনে পড়ে নিশ্বাস পড়ে মুক্তকেশীর... নিতান্ত রাগের সময় ঘরে বসে আঙুল মটকানো আর গাল দেওয়া ছাড়া আর কিছু করার নেই। এমন কি গলাটা সুদ্ধ বাদ সেধেছে, চেঁচিয়ে কাউকে বকতে গেলেই কাশতে কাশতে দম আটকে আসে। ...মুক্তকেশী অতএব আঙুল মটকান আর ভাঙাগালায় থেমে থেমে বলেন, 'মরছেন সব চক্ষুছরদের—অহঙ্কারে মরছেন! আমিও মুক্তকেশী বামনী, এই বাসিমুখে বলে যাচ্ছি, যে দুগ্গতি আমার হচ্ছে, সে দুগ্গতি তোদেরও হোক।'

কিন্তু সেই 'ওরা' কারা?

শুধু কি মুক্তকেশীর বৌ ক'টা?

তা বললে অবিচার করা হবে। মুক্তকেশী অত একচোখো নন। মুক্তকেশী তাঁর নিজের মেয়েকেও বলেন। বিরাজ যখন বেড়াতে এসে ভাই-ভাজদের কাছে সারাক্ষণ কাটিয়ে চলে যাবার সময় একবার এ ঘরে এসে ঢোকে, 'মা কেমন আছ গো?' তখন মুক্তকেশী ভারীমুখে বলেন, 'খুব হয়েছে। আর মা'র সোহাগে কাজ নেই বাছা! যাদের চক্ষুছরদ আছে, তাদের কাছেই বোসো গে!'

আর চলে গেলে, বিড় বিড় করেন।

কিন্তু সে তো শেষের দিকে'

সুবর্ণর যখন ঘর ভাঙলো তখন কি মুক্তকেশীর কোমর ভেঙেছিল?

নাঃ, তখনও মুক্তকেশীর কোমর ভাঙে নি।

তখনও মুক্তকেশী কিছুটা শক্ত ছিলেন।

তখন মুক্তকেশীর শাপ-শাপান্তর গলা আকাশে উঠেছে। তখন মুক্তকেশী বৌ 'ভেন্ন' হয়ে যাওয়ায় বুক চাপড়েছেন, নেচে বেড়িয়েছেন, এবং ভবিষ্যদ্বাণী করেছেন, 'আবার মাথা হেঁট করে ফিরে আসতে হবে। থোঁতামুখ ভোঁতা হবে!'

হবেই।

কারণ ভেন্ন হয়ে বুঝবে কত ধানে কত চাল। এখন পাঁচজনের ওপর দিয়ে সংসারের দায় উদ্ধার হচ্ছে।

কিন্তু মুক্তকেশীর সে 'বাণী' সফল হয় নি।

সুবর্ণ ফিরে আসে নি।

সুবর্ণ সেই ভাড়াটে বাড়ি থেকে 'নিজের বাড়ি'তে উঠে গিয়েছিল।

এজমালি এই বাড়িটার নিজের অংশের ঘরখানা চাবি বন্ধ করে রেখে যায় নি সুবর্ণ, তার জন্যে টাকাও চায় নি। এমন কি ধীরে ধীরে যে দু-চারটে আসবাবপত্র জমে উঠেছিল 'কাঁচা-পয়সা'-ওলা প্রবোধের সে-সবেরও কিছু নিয়ে যায় নি।

নিয়ে যায় নি নিজের বাসনপত্র।

শুধু পরবার কাপড়-চোপড় আর শোবার বিছানা এই সম্বল করে বেরিয়ে পড়েছিল এই গলি থেকে। একদা যে গলিতে ঢুকে মর্মান্তিক রকমের ঠকেছিল সুবর্ণ! নতুন চুনের আর নতুন রঙের গন্ধে ভরা কাঁচা-একখানা বাড়ির গোলক-ধাঁধায় ঘুরে বেড়িয়েছিল দক্ষিণের বারান্দা খুঁজতে!

অবশেষে দক্ষিণের বারান্দা হল সুবর্ণলতার! বড় রাস্তার ধারে।

সবুজ রেলিং-ঘেরা, লাল পালিশ-করা মেঝে, চওড়া বারান্দা!

সেই বারান্দার কোলে টানা লম্বা বড় ঘর।

পূবে জানালা দক্ষিণে দরজা!

ঐ পুবটাকে আচ্ছন্ন করে কোনো বাড়ি ওঠে নি। খোলা একখানা মাঠ পড়ে আছে। ঘরের মধ্যে বিছানায় শুয়ে ভোরবেলার সূর্য-ওঠা দেখতে পাওয়া যায়।

আর কি তবে চাইবার রইল সুবর্ণ-লতার?

আর কি রইল অসন্তোষ করবার? অভিযোগ করবার? উত্তাল হবার? বিষণ্ণ হবার?

সুখী সন্তুষ্ট সব আশা মিটে যাওয়ায় 'সম্পূর্ণ' আর পরিতৃপ্ত সুবর্ণলতার জীবনকাহিনীতে তবে এবার 'পূর্ণচ্ছেদ' টেনে দেওয়া যায়?

এরপর আর কি?

বাঙালী গেরস্তঘরের একটা মেয়ে এর বেশি আর কি আশা করতে পারে? আর কোন্ প্রাপ্যের স্বপ্ন দেখতে পারে?

চরম সার্থকতা আর পরম সুখের মধ্যে বসে একটির পর একটি ছেলের বিয়ে দিয়ে ঘরে বৌ আনা, আর বাকি মেয়ে-দুটোকে পার করা! এই তো?

তা' তাতেই বা কোথায় ঠেক খেতে হবে?

তিনটে ছেলে তো মানুষ হয়ে উঠলই, ছোটটাও হবে নিশ্চিত। লেখা-পড়ায় রীতিমত ভালো। শেষের দিকের মেয়েদুটো পারুল আর বকুল, দেখতে-শুনতে তো দিব্যি সুন্দরী, কাজেই ওদের নিয়ে ঝামেলা নেই। যে দেখবে পছন্দ করবে। 'পণে'র টাকা দিতেও পিছপা হবে না প্রবোধ।

টাকা সে রোজগারও যেমন করে অগাধ, খরচেও তেমনি অকাতর এখন। হয়তো এ নেশা ধরিয়ে দিয়েছে সুবর্ণই। ...কিন্তু হয়েছে নেশা!

অতএব?

অতএব সুবর্ণলতাকে নিয়ে লেখার আর কিছু নেই।

গৌর মোহন দাস এণ্ড কোং
২৩৩, ওল্ড চীনা বাজার স্ট্রীট
কলিকাতা-১
ফোন: ২২-৬৩৮০

কিন্তু তা'হলে তো একটা প্রশ্ন নিরুত্তর থেকে যায়।

সুবর্ণলতা নামের 'বামুনদের মেয়েটা' সারাজীবন কেন কেবলই মৃত্যু-ইচ্ছে করেছিল, চিত্রগুপ্তের এই প্রশ্নটার তো সমাধান হয় না!

প্রশ্নটা যে বিস্ময়ের!

প্রশ্নটা যে গোলমেলে।

তবে কি আবার একবার উল্টে দেখতে হবে সুবর্ণলতার জীবনের ঐ খাতাখানা?

যেখানা চকচকে মলাট নিয়ে জ্বল-জ্বল করছে সকলের চোখের উপর। উল্টে দেখতে গেলে তো সবই ভাগ্যের স্বাক্ষরে স্বাক্ষরিত।

কোন্ পরিচ্ছেদের কোন্ পৃষ্ঠাখানা খুললে উত্তর মিলবে?

এই পরিচ্ছেদটা কি?

যেখানে দেখা যাচ্ছে সুবর্ণলতা অনেক ঘটা করে, অনেক লোকজন খাইয়ে কুল-গুরুর কাছে দীক্ষা নিচ্ছে?

গৃহপ্রবেশের সময় কিছু হয় নি, তাই তার কাছাকাছি সময়ে এই উপলক্ষটা নিয়ে লোকজন খাইয়েছিল প্রবোধ!

কিন্তু এ ঘটনার মধ্যে সে প্রশ্নের উত্তর কোথা?

এ তো রীতিমত সুখাবহ ঘটনা!

তবে সুবর্ণলতার রীতি অনুযায়ী হয়তো দুঃখের। ওর তো সবই বিপরীত। যারা ওকে নিয়ে ঘর করেছে, আর জ্বলে পুড়ে মরেছে তারা সবাই বলেছে, 'বিপরীত! সব বিপরীত? বিপরীত বুদ্ধি, বিপরীত চিন্তা, বিপরীত আচার-আচরণ!'

অতএব ঘটনাটাকে লিপিবদ্ধ করেই দেখা যাক!

প্রথমে নাকি প্রস্তাবটা তুলেছিল প্রবোধই। আর সে-ই প্রথমে নাকি সুবর্ণলতা বলেছিল, 'গুরু-মন্ত্রতন্ত্র নিচ্ছি না এখন। যদি কখনো তেমন ইচ্ছা হয়, যদি কাউকে এমন দেখি, মাথা আপনি নত হতে চাইছে 'গুরু' বলে, তখন দেখা যাবে।'

আলাদা হয়ে আসার পর কিছুটা দিন চক্ষুলজ্জায় 'ওবাড়ি' যেতে পারে নি প্রবোধ, কিন্তু সুবর্ণলতার প্ররোচনাতেই যেতে হয়েছে শেষ পর্যন্ত। মায়ের 'হাত-খরচ' বলে তিরিশ টাকা করে মাসিক দিয়ে পাঠিয়েছে সুবর্ণ একরকম জোর করে।

প্রবোধ বলেছে, 'অত ধাষ্টামো করতে আমি পারবো না। ও টাকা মা পা দিয়ে ছুঁড়ে ফেলে দেবেন!'

সুবর্ণ বলেছিল, 'একবার ফেলে দেন, তুমি বারবার পায়ে ধরে নিইয়ে ছাড়বে। মায়ের পায়ে ধরায় তো লজ্জাও নেই, অসম্মানও নেই।'

তা' শেষ পর্যন্ত যেতে হয়েছিল।

যদিও ছোট ভাইরা বাঁকা-হাসি হেসে, 'তুমি যে হঠাৎ?' বলে উত্তরটা না নিয়েই চলে গিয়েছিল, এবং সুবোধ গম্ভীর গম্ভীর বিষণ্ণ বিষণ্ণমুখে বলেছিল, 'ভাল আছ তো? ছেলেপুলে সব ভালো?' আর বাড়ির ছেলেমেয়েগুলো আশপাশ থেকে উঁকিঝুঁকি মারছিল, কথা বলে নি, তবে মুক্তকেশী দেখেই ডুকরে কেঁদে উঠেছিলেন। তথাপি টাকাটার সদ্গতি হয়েছিল।

পা দিয়ে ছুঁড়ে ফেলে দেন নি মুক্তকেশী। শুধু ভারী মুখে বলে-ছিলেন, 'তুমি যখন লজ্জার মাথা খেয়ে আগ্রহ করে দিতে এসেছ, তখন আর তোমার মুখটা ছোট করবো না। দিচ্ছ, রাখছি! তবে কেন আর ছেঁড়াচুলে খোঁপা বাঁধার চেষ্টা? তুমি তো সব সম্পর্ক তুলেই দিয়েছ!'

উঁচানো খাঁড়া ঘাড়ে পড়ে নি। ঐ পর্যন্তই হয়েছে।

তা' সে দিনের সেই নিশ্চিন্ততার পর থেকে প্রবোধ নিত্য ওপাড়ার যাত্রী।

ওপাড়ার তাসের আড্ডাও 'প্রবোধহীন' হচ্ছে না।

আর মজা এই—বাড়িতে থাকাকালে দিনান্তে মায়ের সঙ্গে যতটুকু গল্প হতো, মায়ের কাছে যতটুকু বসা হতো, তার 'চতুর্গুণ' হচ্ছে এখন। আর সেই অবসরেই মুক্তকেশী তাঁর অন্য ছেলে-বৌদের সমালোচনা করে করে মনের ভার মুক্ত হয়ে একদিন ঐ গুরুমন্ত্রের কথা তুলেছিলেন।

ওটা না হলে তো আর 'হাতের জল' শুদ্ধ হবে না। এতখানি বয়েস হলো, অদীক্ষিত শরীরে নিয়ে থাকা! ছিঃ!

তা ছাড়া মরণের তো ধরণ ঠিক করা নেই। কাজেই হঠাৎ একদিন যদি দেহই রক্ষা করে বসে সুবর্ণলতা, তো সেই অদীক্ষিত দেহের গতি হবে?

সুবর্ণলতা বরের মুখে শুনে হেসে উঠেছিল। বলেছিল, 'গতিটা কি দেহের? না আত্মার? তোমাদের ঐ কুলগুরুর বংশধর বলেই যে ঐ গাঁজাখোর শুঁটকো ছেলেটাকে গুরু বলে পা পুজো করতে বসবো, সে আমার দ্বারা হবে না।'

এ কথা শুনলে, ঘরে পরে কে না ছি-ছিক্কার করবে সুবর্ণলতাকে? করেছিল তাই।

বলেছিল, 'এ সব হচ্ছে টাকার গরম!'

এমন কি যার টাকার উত্তাপে এত গরম সুবর্ণলতার, সেই প্রবোধই বলেছিল, 'দুটো টাকা হয়েছে বলেই তার গরমে ধরাকে সরা দেখো না মেজবো! সেই যে মা বলে, ভগবান বলে—'দেব ধন, দেখবো মন, কেড়ে নিতে কতক্ষণ?' সেটাই হচ্ছে সার কথা। ভগবান মানুষকে দেন, দিয়ে পরীক্ষা করেন!'

সুবর্ণলতা হেসে ফেলেছিল।

'তোমার মুখে ভগবানের বাণী! এ যেন ভূতের মুখে রামনামের মত। কিন্তু কি করবো বল। যাকে গুরু বলে মন সায় না মানে—'

প্রবোধ রেগে উঠে বলেছিল, 'তা' তোমার গুরু হতে হলে তো, মাইকেল, নবীন সেন, বঙ্কিমচন্দ্র কি রবিঠাকুরকে ধরতে হয়। তাঁরা আসবেন তোমার দেহ-শুদ্ধির ভার নিতে? দীক্ষাহীন দেহের হাতের জল শুদ্ধ হয় না, তা জানো?'

'এই কথা!'

কেন কে জানে, 'এই কথা!' বলে সুবর্ণ যেন একটু মাত্রা-ছাড়া হাসি হেসে-ছিল। তারপর হাসির চোখমুখ সামলে বলেছিল, 'শুদ্ধ দেহ? তার জন্যে এত দুশ্চিন্তা? তা' নেব তা' হলে 'মন্তর'! ঐ তোমাদের গেঁজেল গুরুপুত্তুরের কাছেই নেব! দেহটার মালিক যখন তুমি, তখন তোমার মনের মতন কাজই হোক।'

প্রবোধ অবশ্য ঐ হাসি আর কথার মানেটা খুব একটা হৃদয়ঙ্গম করে নি, তবে চেষ্টাও করে নি হৃদয়ঙ্গম করতে! বোঝা যাচ্ছে রাজী হয়ে গেছে! আর ভয় নেই।

কারণ একবার যখন কথা দিয়েছেন মেজগিন্নী, আর সে কথার নড়চড় হবে না! এইবেলা লাগিয়ে দেওয়া যাক!

অতএব—

অতএব গুরুমন্ত্রে দীক্ষা হলো সুবর্ণ-লতার। এ উপলক্ষে সমারোহের কথা তো আগেই বলা হয়েছে। বিস্তর খরচ করে ফেললো প্রবোধ, বিস্তর গুরুদক্ষিণা দিলো। বললো, 'এতটা কাল ধরে এত রোজগার করছি, সে রোজগারে ভূতভোজন ছাড়া, কখনো সৎকাজ হয় নি। এ তবু একটা সৎকাজে, একটা মহৎ কাজে লাগলো।'

মুক্তকেশীই এসে 'যজ্ঞের হাল ধরে-ছিলেন। যজ্ঞশেষে হৃষ্টচিত্তে সকলকে বলে বেড়াতে লাগলেন, 'জানি, আমার 'পেবো' যা করণ-কারণ করবে, মানুষের মতনই করবে। মেজবৌমারও স্বভাবটাই ক্ষ্যাপাটে, নজর উঁচু! আর চিরকালের ভক্তিমতী। দেখেছি তো বরাবর, গো-ব্রাহ্মণ, গুরু-পুরুত, কালী-গঙ্গা যখন যাতে খরচ করেছি, সব খরচ মেজবৌমাই জুগিয়েছে! যেচে যেচে সেধে সেধে! তা' ভগবানও তেমনি বাড়বাড়ন্ত বাড়া-চ্ছেন! মনের গুণে ধন!'

মেয়েদের বিয়ের সময় যখন ঐ পেবোই একটু খরচপত্তর বেশি করে ফেলে-ছিল, মুক্তকেশী ন ভূতো, ন ভবিষ্যতি

করেছিলেন! বলেছিলেন, 'চাল-চালিয়াতে দেখানো এসব।'

কিন্তু এখন অন্য কথা বললেন।

এখন কি তাঁর সেই ভবিষ্যদ্বাণীর পরাজয়ে লজ্জিত হয়েছেন মুক্তকেশী? না কি ছেলের এই বাড়িঘর, ঐশ্বর্য, বিভূতি সব দেখে অভিভূত হচ্ছেন?

তাই মুক্তকেশীর মুখ দিয়ে বেরোয় 'কী খাসা ঠাকুরঘর মেজবৌমার, দেখলে প্রাণ জুড়োয়।'

পেবো অবশ্য অনেকবার চুপিচুপি অনুরোধ জানিয়েছিল মাকে এই থাকাতেই থেকে যেতে!

সুবর্ণলতাও তার স্বভাবগত উদারতায় বলে ফেলেছিল সেকথা! 'তা বেশ তো—এখানেই কেন থাকুন না? এটা তো আপনারই বাড়ি।'

কিন্তু কেন কে জানে মুক্তকেশী রাজী হন নি।

মুক্তকেশী 'খজ্জি' তুলে দিয়েই চলে গিয়েছিলেন!

আর সেকথা নিয়ে কথা ওঠে নি।

শুধু সুবর্ণলতার বড়মেয়ে চাঁপা, যে না কি এই উপলক্ষে এসেছিল, সে বলেছিল, 'ঢের ঢের বেহায়া মেয়েমানুষ দেখেছি বাবা, আমার মা'টির মতন এমন বেহায়া দু'টি দেখি নি। আবারও সাহস হলো ঠাকুমাকে এখানে থাকার কথা বলতে?'

কিন্তু সেটা একটা ধর্তব্য কথা না কি? চাঁপা তো চিরটাকালই তার মায়ের সমালোচনা করে! ওটা কিছু নয়।

তবে?

তবে কি? সেই পারুর স্কুলে ভর্তি করার কথাটাতেই?

তা' হতেও বা পারে।

চিরকালই তো তিলকে তাল করা সুবর্ণলতার স্বভাব।

'পারু বকুকে ইস্কুলে ভর্তি করার কি হলো? কতদিন ধরে বলছি যে—'

ভানুর কাছে এসে আবেদন জানিয়েছিল সুবর্ণলতা। বড়ছেলে, তার ওপর আস্থা এনেছিল। বলেছিল, 'তোদের বাপের দ্বারা তো হবে না, তোরা বড় হয়েছিস, তোরা নিবি ভার।'

ভানু 'আজ কাল' করে এড়াচ্ছিল। একদিন ভুরু কোঁচকালো! ঠিক ওর সেজকাকা যেমন ভঙ্গীতে ভুরু কোঁচকায়।

ভুরু কুঁচকে বলেছি, 'পারুকে এখনো ইস্কুলে ভর্তি করার সাধ তোমার? আশ্চর্য মা! অত বড় ধিঙ্গী মেয়ে ইস্কুলে যাবে?'

'যাবে!'

স্থিরস্বরে বলেছিল সুবর্ণলতা।

ভানু তথাপি কথা কেটেছিল, 'গিয়ে তো ভর্তি হতে হবে সেই ক্ষুদে ক্ষুদে মেয়েদের সঙ্গে? লজ্জা করবে না?'

সুবর্ণলতা একবার ছেলের ঐ বিরক্তি-কুঞ্চিত মুখের দিকে নির্নিমেষ দৃষ্টি হেনে বলেছিল, 'লজ্জা তো ওর করবার কথা নয় বাবা, লজ্জা করবার কথা ওর বাপ-ভাইয়ের। কিন্তু একের অপরাধের লজ্জা অপরকে বইতে হয়, এই হচ্ছে আমাদের দেশের রীতি। তাই হয়তো করবে লজ্জা! কিন্তু উপায় কি? একেবারে ঘরে বসে থাকলে তো সে লজ্জা আরো বেড়েই চলবে।'

ভানু যে মাকে ভয় করে না, তা নয়। ভিতরে ভিতরে যথেষ্টই করে।

কিন্তু অতটা ভয় করে বলেই হয়তো বাইরে 'নির্ভয়'য়ের ভাব ফোটাবার চেষ্টা করে। তাই অগ্রাহ্যভরে বলে, 'লজ্জার কি আছে? দিদি চন্নন, ওবাড়ির সব মেয়েরা, সবাই লজ্জায় একেবারে মরে আছে? আর এই বুড়োবয়সে তোমার পারুলের ইস্কুলে ভর্তি হয়ে হবেটা কি? রাতদিন তো নাটক-নভেল গেলা হচ্ছে মেয়ের, আবার শুনি পদ্য লেখেন, আর দরকার?'

সুবর্ণলতা আজকাল অনেক আত্মস্থ হয়েছে বৈ কি! অনেক নিরুত্তাপ! তাই ফেটে না পড়ে সেই নিরুত্তাপ গলায় বলে, 'মনের অন্য কোনো খোরাক নেই বলেই নাটক-নভেল পড়ে। লেখাপড়ার চাপ থাকলে করবে না। যাক তুমি পারবে কি না সেটাই বল।'

'পারা না পারার কথা হচ্ছে না!' ভানু বিরক্ত গলায় বলে, 'এরকম বিশ্রী কাজ করতে যে কী মুস্কিল লাগে সে ধারণা নেই তোমাদের। তোমরা স্রেফ্ হুকুম করেই খালাস! তালগাছের মত এক মেয়ে নিয়ে ভর্তি করাতে যেতে হবে প্রাইমারী স্কুলে! মাথাটা কাটা যাবে না?'

সুবর্ণলতার বড় সাধ ছিল যে তার ছেলেরা বাড়ির ঐ অকালবৃদ্ধ কর্তাদের ভাষা থেকে অন্য কোনো পৃথক ভাষায় কথা বলবে। যে কথার ভাষা হবে মার্জিত সভ্য সুন্দর! যাতে থাকবে তারুণ্যের ঔজ্জ্বল্য, কৈশোরের মাধুর্য, শৈশবের লাবণ্য!

সুবর্ণর সে সাধ মেটে নি।

পাগলের সব সাধ মেটাও শক্ত বৈকি! তা ছাড়া 'কথা শেখা'র সমস্ত বয়েসটা পার করে ফেলে তবে তো ঐ অকাল-বৃদ্ধদের আবেষ্টন ছেড়ে আসতে পেরেছে সুবর্ণলতার ছেলেরা।

তা' ছাড়া একখানি বড় রকমের 'আদর্শ' তো চোখের সামনেই আছে।

তাই ভানু কর্তাদের ভাষাতেই কথা বলে।

বলে, 'মাথাটা কাটা যাবে না?'

সুবর্ণলতা ঐ মাথা কাটার কথাটা নিয়ে আর কথা কাটাকাটি করে না।

সুবর্ণলতা শুধু ঠোঁটটা কামড়ে বলে, 'প্রাইমারী ইস্কুলে ভর্তি করতে হবে কেন? বলেছি তো অনেকবার পারু নিজের চেষ্টায় যতটা শিখেছে, তাতে চার-পাঁচটা ক্লাসের পড়া হয়ে গেছে। সেই বুঝে উঁচু ইস্কুলেই দেবে।'

ভানু অগ্রাহ্যের হাসি হেসে বলে, 'হ্যাঁ, মেয়েরা তোমার ঘরে বসে অরু দত্ত তরু দত্ত হচ্ছে! তাই এখন থেকেই পদ্য!'

কথা শেষ করতে পারে না।

সুবর্ণলতা তীব্রস্বরে বলে ওঠে, 'চুপ চুপ!' আর একটাও কথার দরকার নেই। মিথ্যেই আশা করে মরেছিলাম! চিনেছি তোদের সবাইকে। বুঝেছি জীবনের সর্বস্ব 'সার' দিলেও আমড়াগাছে আম ফলানো যায় না!'

হ্যাঁ, সুবর্ণলতা বুঝেছে আমড়াগাছে আম ফলানো যায় না।

তিল তিল করে বুঝেছে'

বুঝে বুঝেও চোখ বুজে অস্বীকার করতে চাইছিল এতদিন। যেমন অন্ধকারে ভূতের ভয়কে ঠেকিয়ে রাখতে চায়, লোকে খোলা চোখকে বন্ধ করে ফেলে।

কিন্তু ক্রমশই ধরা পড়ছে আর মনের সঙ্গে মন ভোলানো খেলা চলবে না!

আর 'ছেলেমানুষের মুখের শেখা বুলি' বলে উড়িয়ে দেওয়া যাবে না।

ভানুর বিদ্রূপব্যঞ্জক মুখভঙ্গিমায়, চোখের পেশীর আকুঞ্চনে আর ঠোঁটের বঙ্কিম রেখায় স্পষ্ট দেখতে পেয়েছে সুবর্ণলতা এদের বংশের প্রথম গ্র্যাজুয়েট প্রভাসচন্দ্রকে! সুবর্ণলতাকে ব্যঙ্গ করাই ছিল যার প্রধানতম আনন্দ।

আর সব ভাজেদের আর বোনেদের এবং জানাশোনা সব মেয়েদেরই সুবর্ণলতার সেজদ্যাওর অবজ্ঞা করে এসেছে বারবার, কিন্তু সুবর্ণলতাকে অবজ্ঞা করে যেন সম্যক সুখ হত না তার।

তাই অবজ্ঞার সঙ্গে মেশাতো বিদ্রূপ।

সেই বিদ্রূপ অহরহ প্রকাশ পেতো চোখের আকুঞ্চনে, ঠোঁটের বঙ্কিম রেখায়, আর ধারালো হাসির ছুরিতে।

ভানুর প্রকৃতিতে সেই বীজ!

সুবর্ণলতার সারাজীবনের সর্বস্ব 'সার' দেওয়া গাছ।

সুবর্ণলতার আর বুঝতে বাকি নেই সে গাছ কোনো মহীরুহ হয়ে ওঠার প্রতিশ্রুতি বহন করছে না। সে গাছ বাঁশঝাড় মাত্র।

যে বাঁশঝাড় বংশধারার অতুলন তুলনা।

তবে কি কানু, মানু আর সুবলও এই একরকমই হবে? দরজিপাড়ার সেই গলিটা এসে বাসা বাঁধবে সুবর্ণলতার এই হালকা ছিমছাম ছবির মত গোলাপী-রঙা বাড়িটার মধ্যে?

[ক্রমশঃ]

অগ্নিযুগের একটি অধ্যায়

অনন্ত সিংহ

অভিভাবকদের বিরূপ প্রতিক্রিয়া

আমাদের বিরুদ্ধে পুলিশের চক্রান্তকে সাময়িকভাবে হলেও ঠেকিয়ে রাখার জন্য নানাপ্রকার পাল্টা ব্যবস্থা করেছিলাম—কিছুটা সক্ষমও হয়েছিলাম।

কিন্তু অভিভাবকদের অপ্রত্যাশিত বিরূপ মনোভাবের সক্রিয় প্রতিক্রিয়ার জন্য একেবারেই প্রস্তুত ছিলাম না। আমরা মহা বিপদে পড়লাম যখন অভিভাবকরাও সক্রিয়ভাবে তাঁদের সন্তানদের মঙ্গলের জন্য আমাদের বিরুদ্ধে আসরে নামলেন। সত্যিই আমরা তাঁদের কোন দোষ দিই না। কি করবেন তাঁরা? ছেলেরা রাত্রে দিনে কোন সময়েই বাড়ি থাকে না, স্কুল-কলেজের সঙ্গে তাদের সম্পর্ক চুকিয়ে দিয়েছে, বাড়ি থেকে যে যা পারছে—টাকা বা গয়নাপত্র, সব নিয়ে আসছে। বাড়ির সব অপহরণ হাতেনাতে ধরা না পড়লেও অভিভাবকদের সন্দেহ উদ্রেক করার যথেষ্ট কারণ ছিল। এই অবস্থায় যাঁরা একদিন আমাদের প্রতি অত্যন্ত শ্রদ্ধাবান ছিলেন তাঁরা যদি আজকের উচ্ছৃঙ্খলতার জন্য তাঁদের ছেলেদের ভবিষ্যৎ মঙ্গলের দিকে লক্ষ্য রেখে আমাদের বিরুদ্ধে কর্তৃপক্ষের কাছে নালিশও করেন তবু দোষ দেওয়া যায় না। আমরা তাঁদের দোষী না ভাবলেও তাঁরা আমাদের মূল উদ্দেশ্য না জেনে যখন কর্তৃপক্ষের কাছে নালিশ করলেন তখন আমাদের অবস্থা আরও সঙ্কটজনক হ'ল।

তখন যুব-বিদ্রোহের আর মাত্র দশ দিন বাকী। মাধববাবু একেবারে অতিষ্ঠ হয়ে তাঁর ছেলে ফকির সেনের বিরুদ্ধে পুলিশে খবর দিলেন এবং ছেলের বিরুদ্ধেই ৩৮০ ধারায় এক মামলা রুজু করলেন। আমাদের মামলার রায়ের একটা অংশ থেকে উদ্ধৃত করছি,—

"Then on 8th April Madhab Sen (P.W. 306), father of accd. Fakir Sen, made a complaint to the Deputy Superintendent of Police (P.W. 52) which was treated as a first information (Ex. 46) and case under section 380 I.P.C. was instituted against Fakir. The complaint runs thus :—

'I am a comparing clerk in the District Judge's Court, Chittagong. My son Fakir Chand Sen alias Khoka, aged 16 years has left off his studies from January last and has joined the gang of Ganesh Ghosh, Ananta Singh, Lokenath Bal and others and is associating with them in the shop of Ganesh Ghosh at Sadarghat. He also visits the houses of Ananta Singh and Lokenath Bal. I see 40 or 50 youths to assemble in Ganesh Ghosh's shop. I see there Ganesh, Ananta, Lokenath and his brother Harigopal, and the sons of Nanda Lal Guha, pleader Ranjan Lal Sen and of Rasik Chandra Nandi, Copyist, District Judge's Office. The other youths are not known to me. My boy has stolen 8 or 10 times money from my wife's box to the extent of Rs. 300 during the period. For the past one month he generally remains away from my house. I asked my boy what he did with the money but he never gave me any satisfactory reply. I believe that my boy made over the amount to Ananta, Ganesh and Lokenath."

জজ সাহেবের উপরোক্ত রায় থেকে মোটামুটি জানতে পারছি যে ফকির সেনের পিতা মাধববাবু পুলিশের ডেপুটি সুপারিন্টেন্ডেন্টের কাছে তাঁর ছেলের বিরুদ্ধে অভিযোগ জানালেন এবং এইটিকে প্রথম সংবাদের ভিত্তি করে ফকির সেনের বিরুদ্ধে ভারতীয় দণ্ডবিধির ৩৮০ ধারা অনুসারে তিনি মামলা রুজু করলেন।

মাধববাবু তাঁর বিবৃতিতে জানালেন যে তিনি জজকোর্টে একজন কম্পেয়ারিং ক্লার্ক। তাঁর ছেলে ফকিরচাঁদ সেনের ষোল বছর বয়স। সে জানুয়ারী থেকে লেখাপড়ায় ইস্তফা দিয়েছে। তারপর তিনি খুব রেগে গিয়ে জানালেন যে তাঁর ছেলে গণেশ ঘোষ, অনন্ত সিংহ, লোকনাথ বল প্রমুখ ব্যক্তিদের কুদলে (gang-এ) যোগ দেয় এবং তাদের বাড়িতেও যাওয়া-আসা করত। তিনি আরও বললেন যে গণেশ ঘোষের দোকানে ৪০।৫০ জন যুবককে দেখেছেন। গণেশ ঘোষের দোকানে অনন্ত সিংহ, লোকনাথ বল ও তার ভাই

হরিগোপাল বলকেও মেলামেশা করতে দেখতে পেয়েছেন। তিনি আরও জানালেন যে উকিল নন্দলাল গুহ, রঞ্জনলাল সেনের ছেলেদের এবং জজকোর্টের copyist রসিক নন্দীর পুত্রকেও সেখানে দেখতে পেয়েছেন। অন্যান্যদের তিনি চিনতে পারেন নি। তাঁর ছেলে তাঁর স্ত্রীর বাক্স থেকে ৩০০৲ টাকা প্রায় আট-দশ দফায় চুরি করেছে। প্রায় এক মাস ধরে তাঁর ছেলে বাড়িতে থাকে না। তিনি অভিযোগে আরও জানান যে টাকা নিয়ে কি করেছে, এই প্রশ্নের কোন সদুত্তর তাঁর ছেলে দেয় নি। শেষ পর্যন্ত তিনি জানালেন যে তাঁর বিশ্বাস তাঁর ছেলে সেই টাকা লোকনাথ, গণেশ ও অনন্তকে দিয়েছে।

আমাদের মামলার রায়ে জজসাহেব উল্লেখ করেছেন—'গণেশ ঘোষের দোকান'। আরও অন্যান্য স্থানে 'গণেশ ঘোষের দোকানের' উল্লেখ আছে ও পরে আরও পাওয়া যাবে। সরকার পক্ষ 'গণেশ ঘোষের দোকানটিকে' আমাদের হেড কোয়ার্টার বলে বর্ণনা করেছে। কংগ্রেস অফিস—যেখানে মাস্টারদা থাকতেন, সেটিকে আমরা সেন্ট্রাল হেড কোয়ার্টার বলে মনে করতাম। আর গণেশের এই ঐতিহাসিক দোকানটিকে আমাদের Field Head Quarter (যুদ্ধক্ষেত্রের সন্নিকটে অস্থায়ী হেড কোয়ার্টার) হিসাবে দিনে রাত্রে ব্যবহার করেছি।

এই ঐতিহাসিক 'গণেশ ঘোষের দোকানের' সামান্য একটু পরিচয় দেওয়া প্রয়োজন। গণেশের পিতা বিপিনবিহারী ঘোষ, সিনিয়র স্টেশন মাস্টারের পদে নিযুক্ত ছিলেন। স্টেশন মাস্টার হিসাবে রেল কর্তৃপক্ষের কাছে তাঁর খ্যাতি ও সুনাম ছিল প্রচুর এবং সেই জেন্য ডবল-মুড়িং-এর মত গুরুত্বপূর্ণ রেল স্টেশনের চার্জ তাঁর ওপরেই ন্যস্ত ছিল।

১৯২১ সালে, ভারতপ্রসিদ্ধ আসাম-বেঙ্গল রেল ধর্মঘটের সময়, গণেশের বাবা স্ট্রাইকে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করেন। তিন মাস ধরে প্রতিদিন তিনি ধর্মঘটীদের কাছে গিয়ে উৎসাহ দিয়েছেন যেন তাঁরা অবসাদে ভেঙে না পড়েন। প্রতিদিন দেশপ্রিয় যতীন্দ্রমোহনের বাড়িতে স্ট্রাইক পরিচালনা করার বিষয় নিয়ে কেন্দ্রীয় কমিটিতে তিনি আলোচনা করেছেন। প্রায় দিনই তিনি ধর্মঘটীদের সভায় ও সাধারণ সভায় বক্তৃতা দিয়েছেন। ভারী, উচ্চকণ্ঠে তিনি অপূর্ব বক্তৃতা দিতেন। সবল সুস্থ দেহ তাঁর। চালচলন কথাবার্তায় অসামান্য ব্যক্তিত্ব ফুটে উঠত। সে যুগে চট্টগ্রামবাসীর কাছে তিনি অত্যন্ত প্রিয় ছিলেন। কংগ্রেস আন্দোলনে তাঁর স্বার্থত্যাগ কারও থেকে কম নয়।

গণেশের বাড়িতে আমার অবাধ গতি। গণেশের মা-বাবা আমাকে অত্যন্ত স্নেহ করতেন। তাঁদের আমি মাসিমা ও মেসোমশাই বলতাম ও খুব শ্রদ্ধা করতাম। আমার মনে হ'ত আমি যেন তাঁদের পরিবারেরই একজন। বাবার সঙ্গে মতের অমিল হওয়ায়, বাড়ি ছেড়ে পালিয়ে যাওয়ার পর, একবার মাসিমা ও মেসোমশাই আমাকে বাড়িতে ফিরিয়ে নিয়ে গেলেন—আমার মা-বাবার কাছে। সেই সময় থেকে আমাদের দুই পরিবারের মধ্যে খুব মধুর সম্পর্ক ও ঘনিষ্ঠতা হয়ে উঠল।

মেসোমশাই (গণেশের বাবা) আমার সঙ্গে খুব রাজনৈতিক আলোচনা করতেন। রেল ধর্মঘট আর যখন মিটবার নয় মনে হচ্ছিল, তখন মেসোমশাই আমাকে বলতেন—"বুঝলে অনন্ত, যখন চাকরী একবার ছেড়েছি তখন গোলামীতে আর ফিরে যাব না।" তাঁর দৃঢ় মনোভাব ও বেপরোয়া কথা শুনে আমার খুব ভাল লাগত। সত্যি সত্যি একদিন দেখা গেল আসাম-বেঙ্গল রেল ধর্মঘট সফল হ'ল না। মেসোমশাই পরাজয় মেনে নিলেন না—মাথা নত করতে তিনি কোনমতে প্রস্তুত নন—আরও বেপরোয়া, আরও অনমনীয় মনোভাব নিলেন। তিনি আর গোলামী করতে ফিরে গেলেন না। ছোট করে হাঁটু পর্যন্ত ধুতি পরতেন, গায়ে খদ্দরের চাদর, হাতে শক্ত মজবুত একটি লাঠি ও পায়ে সাধারণ একজোড়া শক্ত জুতো। এই ছিল তাঁর সব সময়ের বেশ।

মেসোমশাই অদম্য উৎসাহে ১৯২১ সালে এই খদ্দরের দোকান প্রতিষ্ঠা করলেন। সামনের দিকে রাস্তার ওপরে দোকান আর ভেতরের দিকে চার-পাঁচটি ঘরে নিজেরা থাকতেন। পরে তাঁতের দেশী কাপড়ও রাখতেন। চাকরি ছেড়ে খুব যে আর্থিক অসুবিধা হয়েছিল তাতে সন্দেহ নেই। তার জন্য কোনদিন তাঁকে বা মাসিমাকে আক্ষেপ করতে দেখি নি। কার্তিকদা (গণেশের দাদা) ও গণেশ মেসোমশাইয়ের অনুপস্থিতিতে দোকানে বসে কেনাবেচার তদারক করত। তারাও অসহযোগ আন্দোলনে কলেজ ছেড়েছে। তাই তাদের তখন দোকান দেখাশোনা করবার সময় ছিল।

পরে ১৯২৮—৩০ সালে, এই দোকানটি এক ঐতিহাসিক দোকানে পরিণত হ'ল। সামনের দিকে দোকান—খদ্দর আসছে, কেনাবেচা হচ্ছে, আমাদের ছেলেরাও যাওয়া-আসা করছে এবং পুলিশও সব সময় পাহারা দিচ্ছে; আর ঘরের ভেতর আমরা নানাপ্রকার রিভলভার, পিস্তল ও বন্দুকের ব্যবহার শিখছি, নানা ষড়যন্ত্রমূলক কাজ চালাচ্ছি। সদর কোতওয়ালী এই দোকান থেকে পাঁচ মিনিটের মধ্যে পায়ে হেঁটে যাওয়া যায়। শত্রু শিবিরের যত কাছে থাকা যায় এবং কাজকর্ম যতই পুলিশের নাকের ডগায়

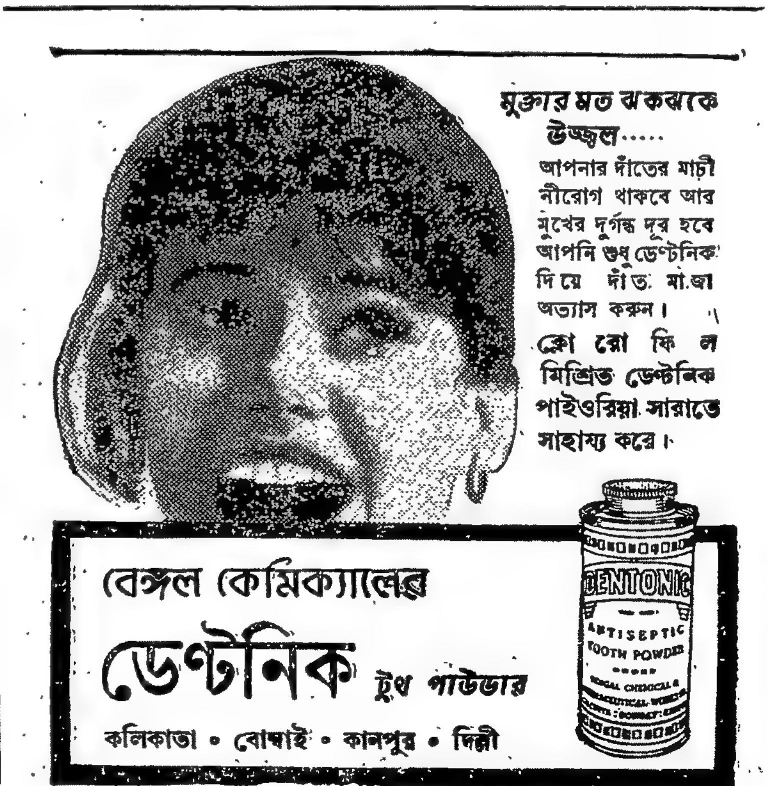

চালাকির সঙ্গে করা যায় ততই তাদের বোকা বানানো সম্ভব। "গণেশের দোকান" বলে জজ সাহেব যে দোকানটিকে আখ্যা দিয়েছেন সেটি ছিল সদর কোতওয়ালীর খুব নিকটে এবং সেই কারণেই পুলিশ বিভ্রান্ত হ'ল—তারা ভাবতে পারল না যে তাদের এত কাছে বসে আমরা এক ভয়ানক ষড়যন্ত্র চালিয়ে যাচ্ছি। আমাদের হেড কোয়ার্টার এই দোকানটি অভিভাবকদের অনুযোগের কারণ হয়ে দাঁড়াল।

এই দোকানের মালিক সেই সময় গণেশ একা। তার বাবা-মা কার্তিকদার কাছে চলে গিয়েছিলেন। কার্তিকদা বোধহয় তখন আসামের কোন স্থানে ডাক্তারের পদে নিযুক্ত ছিলেন।

শেষ পর্যন্ত আমাদের প্রধান ঘাঁটি—এই দোকান সম্বন্ধে ও আমাদের মেলা-মেশা এবং আনাগোনার বিরুদ্ধে এল আঘাত। ফকির সেনের বাবা আর সহ্য করতে না পেরে ভারতীয় দণ্ডবিধির ৩৮০ ধারা অনুযায়ী তাঁর ছেলের বিরুদ্ধে মামলা রুজু করে দিলেন।

এইভাবে চারিদিক থেকে বিপদ ক্রমেই ঘনিয়ে আসতে লাগল। কোন্ দিক সামলাব? পুলিশকে না হয় ধমকান গেল, কিন্তু অভিভাবকদের গিয়ে কি বলি? যদি তাঁদের সব কথা খুলে বলা সম্ভব হোত, তবে হয়ত তাঁরা আমাদের ক্ষমা করতেন। কিন্তু বাহ্যিক উচ্ছৃঙ্খলতার অন্তরালে আমাদের যুব-বিদ্রোহের যে আয়োজন চলছে তার বিন্দুমাত্র আভাসও যখন তাঁদের দেবার উপায় ছিল না তখন আমাদের ঐরূপ অস্বাভাবিক চালচলন সম্বন্ধে বিরক্তি ও রাগ ছাড়া আর কি হতে পারে?

এই তো গেল একজন সরকারী কর্মচারী, যিনি তাঁর ছেলে সম্বন্ধে অন্যদের জড়িয়ে অভিযোগ আনলেন। আমাদের পক্ষে তবু না হয় কিছু কৈফিয়ৎ দেওয়ার ছিল যে উনি একজন সরকারী কর্মচারী—অনেক কিছুই বলতে পারেন! কিন্তু আমাদের আত্মপক্ষ-সমর্থনের কিছুই আর রইল না যখন সদরঘাট ক্লাবের প্রেসিডেন্ট সুরেশ বন্দ্যোপাধ্যায় খুব বিরক্তির সঙ্গে তাঁর পদত্যাগপত্র দাখিল করার ভয় দেখালেন। গণেশ এই শক্তিচর্চা ক্লাবের সম্পাদক ছিল। ১৯২৭ সালে এই ক্লাব প্রতিষ্ঠিত হয়। সেই সময় থেকেই সুরেশবাবু ক্লাবটির সভাপতি। তিনি চট্টগ্রামে একজন প্রসিদ্ধ ব্যবসায়ী। বহু প্রগতিশীল প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে তাঁর যোগাযোগ ছিল। যুবকদের শরীর ও শক্তিচর্চার দিকে তাঁর সক্রিয় সমর্থন আমরা সব সময় দেখেছি। তিনি যখন আমাদের প্রতি বিরূপ হলেন এবং তীব্র প্রতিবাদ জানিয়ে তাঁর পদত্যাগের কারণ দেখিয়ে গণেশকে চিঠি দিলেন তখন সত্যিই আমাদের দুঃখ রাখার জায়গা ছিল না। সুরেশবাবুর মত লোকেও যখন আমাদের বিরুদ্ধে মত পোষণ করছেন তখন কোন অভিভাবকদের সমর্থন আমাদের প্রতি থাকা খুব শক্ত। এটা আমরা জানতাম যদি একবার যুব-বিদ্রোহ প্ল্যান অনুযায়ী ঘটাতে সক্ষম হই তবে তাঁদের সবার কাছ থেকে কেবল যে ক্ষমা ও সমর্থন পাবো তা নয়, তখন ভুল বুঝে যে রূঢ় ব্যবহার তাঁরা আমাদের প্রতি করেছেন, সেইজন্য নিজেরাই অনুতপ্ত হবেন।

কিন্তু যুব-বিদ্রোহের আসন্ন ঝড়ের পূর্বে সুরেশবাবুর বিরূপ মনোভাব ও তাঁর সেই চিঠি আমাদের খুব বেগতিকে ফেলে। তবু আমাদের মুখ বুজে সব সহ্য করতে হয়েছে। আর দিন গুণেছি কবে আমরা সাম্রাজ্যবাদী বৃটিশ শত্রুর বিরুদ্ধে প্রকৃত মূর্তি প্রকাশ করতে পারব! সুরেশবাবুর সেই চিঠি যুব-বিদ্রোহের পূর্বে অভিভাবকরা আমাদের বিরুদ্ধে ব্যবহার করতে কসুর করেন নি। আবার মামলার সময় আমাদের বিরুদ্ধে সেই চিঠি উপস্থিত করল সরকারী পক্ষের উকিল। শেষে ট্রাইব্যুনালের প্রেসিডেন্ট ফলাও করে সেই চিঠির উল্লেখ করলেন তাঁর জাজমেন্টেঃ—

"The letter (Ex. CCCXL) runs as follows:—

'It has been brought to my notice by the guardians of a number of members of the Institution that their wards do not attend schools and colleges, do not obey their guardians, do not even stay at home at night and sometimes do such things which are against principles of morality. Some of guardians directly accused me and institution for the present state of affairs with regard to their wards. Personally and as President of your institution I am not prepared to accept the above accusations. Although I have every sympathy for physical culture, I have no sympathy for indiscipline, disobedience to parents and guardians and leaving present schools and colleges before such time as it may be absolutely necessary for the interest of the country or until educational institutions have been established on national needs.

'I do therefore ask you to call a general meeting of the institution at an early date to explain my position and if need be to tender my resignation which of course I shall do with very heavy heart'." (P.10, Judgement in Armoury Raid Case No. I of 1930).

গণেশের কাছে সুরেশবাবু তাঁর চিঠিতে লিখলেন যে ক্লাবের বহু সভ্যদের অভিভাবকেরা তাঁর দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন এই বলে যে, ছেলেরা স্কুল-কলেজে যাওয়া ছেড়ে দিয়েছে, অভিভাবকদের প্রতি অবজ্ঞা প্রকাশ করছে, তারা রাত্রিতেও বাড়ি থাকে না এবং সময় সময় এমন সব কাজ করে যা নৈতিক নীতি-বিরুদ্ধ। কোন কোন অভিভাবক এইরূপ বিশৃঙ্খলার জন্য তাঁকে ও ঐ প্রতিষ্ঠানকে প্রত্যক্ষভাবে দায়ী করছে। সুরেশবাবু তাই জানালেন যে ব্যক্তিগতভাবে ঐরূপ দোষারোপ তিনি নিজ স্কন্ধে বহন করতে প্রস্তুত নন। তিনি চিঠিতে আরও লিখলেন, যদিও যুবকদের শক্তি ও শরীরচর্চা সব সময় তিনি পছন্দ করেন, তাই বলে বিশৃঙ্খলা ও পিতামাতার অবাধ্যতার প্রতি তাঁর কোন সহানুভূতি নেই। আর এই অল্প বয়সে ছেলেদের স্কুল-কলেজ যাওয়া বন্ধ করা কোন প্রকারেই সমর্থনযোগ্য নয়—যতদিন না জাতীয় আদর্শে ও প্রয়োজন অনুযায়ী আর কোন শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান দেশে গড়ে না উঠছে।

সুরেশবাবু সেই হেতু গণেশ ঘোষকে অনুরোধ জানালেন যে, যত শীঘ্র সম্ভব তিনি যেন ক্লাবের সাধারণ সভা আহ্বান করেন। সেখানে সুরেশবাবু পদত্যাগের কারণ জানাবেন এবং প্রয়োজন হলে অতি বেদনার সঙ্গে তাঁকে পদত্যাগপত্র দাখিল করতে হবে।

সংকট একেবারে চরম পর্যায়ে পৌঁছেছে। সমস্যার পর সমস্যা, বাধার পর বাধা, বিপদের পর বিপদ এসেছে। প্রস্তুতির চরম মুহূর্তে, যখন আমরা আমাদের পক্ষে প্রবীণ ও গণ্যমান্য ব্যক্তিদের কাছ থেকে নৈতিক সমর্থন লাভের চেষ্টা করব বলে ঠিক করেছি, তখন সদরঘাট ব্যায়াম প্রতিষ্ঠানের প্রেসিডেন্ট, প্রসিদ্ধ ব্যবসায়ী ও প্রগতিশীল প্রখ্যাত নাগরিক—সুরেশবাবুর পদত্যাগের হুমকি ও আমাদের বিরুদ্ধে তাঁর লিখিত তীব্র সমালোচনা, এতদিনের সাধনা ও নিষ্ঠার দ্বারা অর্জিত আমাদের ব্যক্তিগত এবং সমষ্টিগত সুনামের ওপর কঠোর আঘাত

আফগান স্নো

আপনার গায়ের রঙের সন্তোষজনক পরিবর্তন আনে। ফুলের পাপড়ির মত কোমল আফগান স্নো আপনার মুখের সকল দাগ মুছে ফেলে—কোঁচকানো দাগ এবং ব্রণর জন্য কোন ভাবনা থাকে না। আফগান স্নোকে ধন্যবাদ, আপনার মুখ সারাদিন পরিষ্কার ও সতেজ থাকে। আফগান স্নো—আপনার প্রিয় সৌন্দর্যবর্ধক প্রসাধনী!

ই, এস, প্যাটানওয়ালা, বম্বে—৭

হানলো। আমাদের বিরুদ্ধে সুযোগ নিলেন অভিভাবকেরা। পুলিশ, তাদের সমর্থনে সুরেশবাবুর চিঠি ব্যবহার করতে সুরু করল।

যুব-বিদ্রোহের পূর্বাহ্নে—আসন্ন ঝড়ের প্রাক্কালে, এই সব ছোট বড় বিভিন্ন ধরণের বহুমুখী আঘাত ও আক্রমণ জোট বেঁধে আমাদের বিরুদ্ধে যে প্রবল প্রতি-কূল অবস্থার সৃষ্টি করল, তার নিষ্পেষণে সাংগঠনিক অস্তিত্ব বজায় রাখা কঠিন হয়ে পড়ল। বুঝতে পারছি এক-একটি দিন গত হচ্ছে আর আমরা অধিকতর বিপদের সম্মুখীন হচ্ছি। সময়ের জন্য তীব্র প্রতিযোগিতা! সরকারী পুলিশ-দপ্তর প্রস্তুত হওয়া বা আমাদের সামগ্রিক প্ল্যান সম্বন্ধে আন্দাজ পাবার আগেই আমরা আঘাত হানতে পারব কি?

দ্বিধা, বিলম্ব, দীর্ঘসূত্রতা, অকারণ আশঙ্কার চিন্তা, ইত্যাদি যদি এইরূপ সন্ধিক্ষণে মনের ওপর প্রভাব বিস্তার করে তবে সুনিশ্চিত জয়ের পরিকল্পনাও শোচনীয়ভাবে অকাল-মৃত্যুর অভিশপ্ত ক্রোড়ে চির-নিদ্রা লাভ করবে তাতে সন্দেহ নেই। অবস্থার গুরুত্ব; সংক্ষিপ্ত সময়ের চেতনা, যে কোন মুহূর্তে শত্রুর আক্রমণ প্রতীক্ষা—এই সব যে কি পরিমাণে স্নায়-বিক শক্তির ওপর প্রতিকূল প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করে তা বলে বোঝান যায় না। নিজের অজান্তে ঐ সব দুর্বলতা মনের ওপর প্রভাব বিস্তার করে—আর একটু দেরি করি, আরও একটু প্রস্তুতির কাজ চালাই, আরও কিছুদিন বাদে চরম মুহূর্তটি আসুক—আরও কিছুদিন বিপদের মধ্যেও বেঁচে থাকি!

আমাদের যখন এত বিপদ চারিদিকে, তখন যে কোন সময়ে, ধরা পড়তে পারি ও আমাদের ব্যাপক আয়োজন ব্যর্থ হয়ে যেতে পারে। তবু আমরা তখনও অভ্যু-ত্থানের জন্য একটি দিন ধার্য করছিলাম না কেন? সত্যিই খুঁটিনাটি প্রস্তুতির কাজ কিছু না কিছু বাকি ছিল। যদি দিন ধার্য করা হ'ত এবং স্থির হ'ত যে সেই বিশেষ দিনটিতেই আমাদের আক্রমণ করতে হবে, তবে ঐসব ছোট ছোট কাজ, যেমন না কি—তেলের টিন, ঝকমকে ব্যাজ, তরবারিগুলি ধার দেওয়া, রেল-লাইন উপড়ে ফেলবার জন্য 'ক্রো-বার' (crow-bar) তৈরি করা প্রভৃতি নির্ধারিত সময়ের মধ্যেই যে সমাপ্ত হ'ত তাতে কোন সন্দেহ নেই। আসল কথা, যদিও আক্র-মণের দিনটি ধার্য করা একান্ত প্রয়োজন ছিল, তবু কোন্ এক অদৃশ্য হস্তের ইঙ্গিতে নিজ জীবনের অন্তিম দিনটি স্থির করতে কোথায় যেন বাধা পাচ্ছিলাম।

যারা তরুণ, যাদের সংসারের প্রতি আকর্ষণ ও লোভ অপেক্ষাকৃত অনেক কম—তাদের পক্ষে আদর্শের জন্য প্রাণ দেওয়া যত সহজ আমাদের মত যারা একটু বড় যাদের অতীত বৈপ্লবিক কাজে কিছু খ্যাতি হয়েছে, যারা প্রাক্তন রাজবন্দী বা রাজনৈতিক বন্দীর মর্যাদা অর্জন করেছে তাদের পক্ষে মরণের নেশা ক্ষ্যাপা তরুণ দলের চাইতে অনেক কম। এই সূক্ষ্ম মনস্তাত্ত্বিক তারতম্য নিজ বিশ্লেষণী মন দিয়েই বুঝতে হয়। আমি আমার নিজ মন দিয়ে পর্যালোচনা করে নিজেকে বুঝতে চেষ্টা করেছিলাম। আরও বুঝেছিলাম আমার মন দিয়ে অন্যের মনো-ভাব। আমাদের সব প্রস্তুতির কাজ প্রায় সমাপ্ত হয়েছে জেনেও আমরা কয়েকবার অভ্যুত্থানের দিনটি ধার্য করার কর্মসূচী নিয়ে আলোচনা করেও শেষ পর্যন্ত বিষয়টি এড়িয়ে গেছি—সিদ্ধান্ত স্থগিত রেখেছি।

১৯২৩ সালে রেলওয়ে ডাকাতির আগে ঠিক এমনি ধরণের নিষ্ক্রিয়তা দেখা দিয়েছিল—সব আয়োজন থাকা সত্ত্বেও দিনটি স্থির করতে কোথায় যেন বাধা ছিল। এখন ১৯৩০ সালে, আমাদের সেইরূপ নিষ্ক্রিয়তার অবশ্য কোন প্রশ্নই ওঠে না। তবু যেন কোথায় কি একটা

দীনেশচন্দ্র সেনের
জন্মশতবর্ষপূর্তিতে জিজ্ঞাসার শ্রদ্ধার্ঘ্য
অমূল্য গ্রন্থাবলীর পুনর্মুদ্রণ

দীনেশচন্দ্রের সাহিত্য-সাধনা জাতির গৌরবের ধন, সাহিত্যের ভাণ্ডারে চিরকালের সম্পদ। রামায়ণ, পুরাণ, গাথাকাব্য ও মঙ্গলকাব্য হইতে চয়িত উপকরণের মাধ্যমে দীনেশচন্দ্র যে মহত্তর জীবনাদর্শ তুলিয়া ধরিয়াছেন বিভ্রান্ত জাতি ও সমাজকে তাহা নতন করিয়া পথের নির্দেশ দিবে।

প্র কা শি ত

পৌরাণিকী ৬·০০ ॥ রামায়ণী কথা ৪·০০
ফুল্লরা ১·৪০ ॥ বেহুলা ১·৬০ ॥ সতী ১·৩০
জড়ভরত ১·৫০ ॥ ধরাদ্রোণ ও কুশধ্বজ ১·২০

অ চি রে প্র কা শি ত ব্য

বাংলার পুরনারী। ঘরের কথা ও যুগসাহিত্য।
রাখালের রাজগি। রাগরঙ্গ। কানু-পরিবাদ।
মুক্তাচুরি। শ্যামলী-খোঁজা। সুবলসখার কাণ্ড।

লীলাশুক শ্রীবিল্বমঙ্গল-বিরচিত
শ্রীকৃষ্ণকর্ণামৃতম্

ডঃ বিমানবিহারী মজুমদার ভাগবতরত্ন সম্পাদিত। ষোড়শ শতাব্দীর গোপালভট্ট, চৈতন্য-দাস ও কৃষ্ণদাস কবিরাজের সারঙ্গরঙ্গদা টীকার ভাবার্থ এবং সপ্তদশ শতাব্দীর যদুনন্দনদাস-কৃত পদ্যানুবাদ সংবলিত। মূল্য ঃ ১২·০০

বড়ু চণ্ডীদাসের
শ্রীকৃষ্ণকীর্তন

অধ্যাপক শ্রীঅমিত্রসূদন ভট্টাচার্য সম্পাদিত। তথ্যসমৃদ্ধ আলোচনা, পদ ও পদের অনুবাদ, ভাবাতাত্ত্বিক টীকা-টিপ্পনী ও পৌরাণিক প্রসঙ্গের পরিচিতি সংবলিত। মূল্য ঃ ১০·০০

মহাপ্রভু গৌরাঙ্গসুন্দর ৮·০০
সুধা সেন প্রণীত

জিজ্ঞাসা ১এ ও ৩৩ কলেজ রো। কলিকাতা ৯
১৩৩এ রাসবিহারী অ্যাভিনিউ। কলিকাতা ২৯

প্রকৃতি-মানুষ

সুব্রতকুমার চট্টোপাধ্যায়

গোলাপ সুন্দর কতো। শুধু দোলে ব্যাকুল বাতাসে।
শিশিরের মুক্তাবিন্দু শিহরিত সমস্ত শরীরে।
বৈদুর্যমণির মতো সূর্যরশ্মি নামলে ধীরে ধীরে
মানুষ তখনই করে সৌন্দর্য-জগতে সমর্পণ

নিজেকেও। সব লোভ দূর হয়, সমস্ত সংশয়
যায় মুছে পরিচিত সীমা থেকে। এবং অতীত
শোনায় কি দূর থেকে বেদনার আবহসংগীত?
প্রকৃতি-মানুষ যেন বোধিচিত্তে হয় দ্যুতিময়॥

পেছুটান আছে, যার জন্য মৃত্যুর চরম দিনটি স্থির করতে গিয়েও বার বার ফিরে আসছি!

এই সময় একদিন দুপুর বেলা আমি মাস্টারদার কাছে একা গেলাম। দুপুর বেলাটাই মাস্টারদাকে একান্তে পাওয়ার সম্ভাবনা ছিল বেশি। অন্য সব সময়েই মাস্টারদার কাছে কেউ না কেউ থাকত। দুপুর বেলা ঐরূপ বিশেষ সময়টিতে আমি সাধারণত মাস্টারদার কাছে যেতাম না। আমাকে দুপুর বেলা দেখতে পেয়ে তিনি অনুমান করলেন যে, আমি কোন বিশেষ পরামর্শ করতে তাঁর কাছে গেছি। তিনি প্রশ্ন করলেন,—"কি হে, ব্যাপার কি, কোন বিশেষ খবর আছে?" আমি বললাম—'খবর কিছু নেই, তবে কিছু আলোচনা করতে চাই।'

আমার ভাব দেখে মাস্টারদা বুঝেছিলেন যে আমি কোন গুরুতর বিষয়ের সমাধান চাই। মাস্টারদা শুয়েছিলেন, উঠে বসলেন। কথাটা আমি পাড়লাম। এইভাবে কথাগুলি বলতে শুরু করি,—

"সবার আগে আলোচনা আমার নিজকে নিয়ে—আমার মনের গভীরতম প্রতিক্রিয়া সম্বন্ধে।" আমার কাছে মাস্টারদা এই ধরণের ভূমিকা আগেও অনেক বার শুনেছেন। তাই এই ভূমিকার বিশেষত্ব তাঁকে আকৃষ্ট করে নি। তিনি অপেক্ষা করতে লাগলেন আমার মূল বিষয়টি শোনবার জন্য। আমি বলে গেলাম—"মাস্টারদা, যতই সাহস থাকুক না কেন, যতই না কেন মৃত্যু সংকল্প নিয়ে এগিয়ে যাই, তবু যেন, 'আরও কিছু দিন বিপদ ও দুঃসাহসিকতার (adventure) মধ্যে থেকেও বাঁচতে ইচ্ছে করে!' মনের অতলে 'বাঁচবার লোভ'—'ক্ষণিক বেঁচে থাকার লোভও' নিজেদের অগোচরে প্রভাব বিস্তার করে নি! তা' আমার বিশ্বাস হয় না। প্রত্যেক বারই বিপদসংকুল কাজের আগে দ্বিধা, দ্বন্দ্ব, জড়তা আমাদের মনে এসেছে। একেবারে প্রথমে, পরাইকোরা রাজনৈতিক ডাকাতির আগে, তারপর কোম্পানীর টাকা হস্তগত করার ব্যাপারে সশস্ত্র প্রস্তুতির পথে আমাদের মধ্যে দেখেছি হতাশা, নিষ্ক্রিয়তা, দ্বিধা ও সংশয়। এই সমস্ত অতীত অভিজ্ঞতা ও বর্তমানে আমার মনের অতি সূক্ষ্মতম প্রতিক্রিয়া বিশ্লেষণ করে মনে হচ্ছে, "মরণের শেষ দিনটি" চূড়ান্তভাবে স্থির করতে যেন আমরা ইতস্তত করছি।

মাস্টারদা খুব মনোযোগের সঙ্গে আমার কথাগুলো শুনছিলেন। দেখছিলাম মাঝে মাঝে তিনি সম্মতিসূচকভাবে মাথা নেড়ে যাচ্ছেন আর কখনও বা চক্ষু বিস্ফারিত করে আমার মুখের দিকে তাকাচ্ছিলেন—যেন আমার অন্তরের কথা বুঝতে চেষ্টা করছেন। তখনও তিনি কোন কথা বলেন নি। আমার কথাও শেষ হয় নি। আমি বলতে লাগলাম,—

"মাস্টারদা, বিপদ খুব ঘনিয়ে এসেছে এত আয়োজন সব ব্যর্থ হয়ে যাবে যদি শত্রুকে সুবিধে না দিয়ে আমরা আগেই আক্রমণ চালাতে না পারি। আমার মনে হয় দ্বিধা বা বিন্দুমাত্র বিলম্ব করা আমাদের পক্ষে অপরাধ। আমাদের নিশ্চিত মৃত্যুর দিনটি ধার্য করা ও বৃটিশ শত্রুকে আক্রমণ করা সম্বন্ধে বিলম্বের আর অবকাশ নেই। ...(একটু থেমে কি একটা ভেবে নিয়ে আবার বলতে লাগলাম)...এই মুহূর্তে আমার মনে হচ্ছে সেই দিনটির আর দেরি নেই। ভবিষ্যতের আশা, আনন্দ, প্রিয়জনের স্নেহ মমতা সব এই মুহূর্তে ত্যাগ করতে হবে! জীবনের শেষ দিনটির সঙ্গে এই সবই শেষ হয়ে যাবে। মাস্টারদা, বেঁচে থাকার লোভ খুব বেশি। সব শেষ হয়ে যাবে?—আর কিছুই অবশিষ্ট থাকবে না, কিছুই আর জানতে পারব না? মনটা যেন কি রকম করে উঠল!...আমি আপনাকে আমার মনের কথা বলতে পারলাম কিনা জানি না। তবে এই সম্বন্ধে আপনার আত্ম-বিশ্লেষণ শুনতে খুব ইচ্ছে করছে।"

মাস্টারদা কিছুক্ষণ চুপ করে রইলেন। আমিও কোন কথা বলি নি। ঘরে মাত্র আমরা দুজন। এবার নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করলেন মাস্টারদা। বেশি কথা তিনি বললেন না। কেবল এই বলে সমর্থন জানালেন,—

"খুব ভাল হ'ল তোর কথা শুনে। আমার অবচেতন মনের খোঁজ নিলাম। তোর সঙ্গে আমিও একমত। বর্তমানে বিলম্বের একমাত্র কারণ—অবচেতন মনে বাঁচবার বাসনা!"

আমি উৎসাহ পেয়ে মাস্টারদাকে বল্‌লাম,—"চলুন শপথ গ্রহণ করি, পরের সভায় আমরা যুব-বিদ্রোহের দিনটি স্থির করবই। তারপর আর একদিনও অপেক্ষা করা চলবে না।"

আবার সব নিস্তব্ধ। দুজনেই নীরব। তারপর আমরা শপথ নিলাম, দুদিনের মধ্যে আমাদের কেন্দ্রীয় কমিটির (হেড কোয়ার্টারের) সভার অভ্যুত্থানের zero hour (সামরিক আক্রমণ আরম্ভের নির্দিষ্ট সময়) ধার্য করা হবে।

এই শপথ গ্রহণ করার সঙ্গে সঙ্গে আমার চোখের সামনে একেবারে বাস্তবতার রূপ নিয়ে ভেসে উঠল একটি ছবি—রক্তপাত, মৃত্যু, তারপর সব শেষ! সমস্ত শরীরে শিহরণ জাগল। আসন্ন মৃত্যুর ছবি আতঙ্ক সৃষ্টি করে নি কখনও। মরণ পাগল হয়েও মরণটাকে আর একটু ধীরে আসতে দিলে মন্দ কি? সেই বাঁচার শেষ ক'টি দিনের আশ্বাস থেকে বঞ্চিত করে যখন শপথ নিলাম তখনই ভেসে উঠলো, মনের গভীর পর্দায়, আসন্ন যুদ্ধের বাস্তব ছবি—রক্তপাত মৃত্যু তারপর সব শেষ!

মাস্টারদাকে ধীরে ধীরে প্রশ্ন করলাম—"এখন কেমন মনে হচ্ছে?"

মাস্টারদা বল্‌লেন—"সব কিছু শেষ হয়ে যাবে! এত তাড়াতাড়ি! ঠিক বোঝাতে পারছি না কি রকম মনে হচ্ছে!—তারপর...তারপর...আমাদের কাজ শেষ হয়ে যাবে। ভবিষ্যতে কি হবে আর কিছু জানতে পারব না...জীবন কত মধুর! কিন্তু দেশের জন্য প্রাণ দেওয়া আরও মধুর!"**

**[পুলিশ ইনস্‌পেকটার সঞ্জীবচন্দ্র নাগের ভাইপো সম্বন্ধে এক ভদ্রলোক আমাকে একটি চিঠি দিয়েছিলেন। দুর্ভাগ্যবশত আমি সেই চিঠিটি হারিয়ে ফেলেছি। পত্রলেখক যদি অনুগ্রহ করে চিঠিতে বা টেলিফোনে আর একবার আমার সঙ্গে যোগাযোগ করেন তাহলে বিশেষ বাধিত হব। আমার টেলিফোন নম্বর: ৪৬-৫৮৭০—অনন্ত সিংহ] [ক্রমশঃ]

অমৃতসমান

বেদব্যাস

চাঁদা অভিযান

চিঁচিঁ করে হলেও আগমনী সুর কানে ভেসে আসছে ঠিকই। পার্কে পার্কে, রাস্তায় রাস্তায় মেরাপ বাঁধার আয়োজনও জোর কদমে এগিয়ে চলেছে। বাপের ঘাড়ির অবস্থা যত খারাপই হোক উমা কি বছরের পাব্বনি না নিয়ে ছাড়বে? না কি সন্দেশ-রসগোল্লা না থাকলেও কার্তিক গণেশের মামার বাড়ি আসা কেউ ঠেকাতে পারবে! কাজেই যা অনিবার্য তাকে সহজভাবে গ্রহণ করার প্রস্তুতিই চলছে দিকে-দিকে, ঘরে-ঘরে। পাড়ায়-পাড়ায় চাঁদা অভিযানের মধ্যেও তার অভ্রান্ত পরিচয় পাচ্ছি।

—দু' টাকা কী দাদা দিচ্ছেন মশাই, পাঁচ টাকার কমে বিলই কাটতে পারবো না এবার—ছোকরাটিকে আমি চিনি না কিন্তু ও নিশ্চয়ই আমাকে চিনে থাকবে, নইলে অমন জোর সে পায় কোথায়। আমি মৃদু আপত্তি জানিয়েছিলাম, কিন্তু জবাবে শুনতে হলো : —বে-পাড়া আর বলছেন কেন দাদা, জানেনই তো এটা ইণ্টার-ন্যাশনালিজম-এর যুগ, পাড়ায়-পাড়ায় আর্টিফিসিয়্যাল ব্যারিয়ার তুলে আমাদের পর করে দিচ্ছেন কেন। কাজেই যুক্তি আমার ধোপে টিকলো না, নগদ পাঁচটি টাকা খসাতে হলো।

সকাল থেকেই মেজাজটা খিঁচড়ে ছিল, ভোর চারটে থেকে চারপাশের বেতার-অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছিলাম, তার ওপর ন'টা না বাজতেই গাঁট-গচ্চা সুরু হয়ে গিয়েছে। দিনটা যে ভালো যাবে না বেশ মালুম পাচ্ছিলাম।

আধ-ঘণ্টার মধ্যেই নাক-খত দিতে হলো দ্বিতীয়বার। প্রথমটা পরিতোষ হালদারকে দেখে বুঝতে পারি নি ভদ্রলোকের মনে এত পাপ ছিল। এক পাড়ায় ছিলাম আগে, বিয়ে করে ভদ্রলোক নেপাল ভট্টাচার্য লেনে উঠে গিয়েছেন। ট্রামে-বাসে দেখা-টেখা মাঝে-মধ্যে হয় না যে তা নয়, তবে রাজনীতি করে বলে যোগাযোগটা রাখেন ভদ্রলোক আমার সঙ্গে। সেই পরিতোষবাবু এসেছেন আরো দু'জন সঙ্গী নিয়ে। ভেতরে ডাকতেই হলো, কিন্তু ভদ্রলোক প্রবল-বেগে মাথা ঝাঁকিয়ে বললেন যে মেলা কাজ রয়েছে, বসার সময় হবে না। ব্যাপার বুঝতে না পেরে আমি জিজ্ঞেস করে বসেছিলাম, আপনাদের লেফ্‌ট ইউনিটির কন্দুর কী হলো, এ্যালায়েন্স হচ্ছে তো—

—আ রে মশাই সেজন্যেই তো আপনার কাছে আসা, পুজোটা তো এবার ভালো-ভাবে করিয়ে দিতে হবে—তারপর সঙ্গী দুজনকে দেখিয়ে দিয়ে বললেন, এরাই তো এবার ইলেকশনে আমাদের হয়ে খাটবে—দিন, আপনার চাঁদাটা দিন—

পরিতোষ হালদার, যাকে বামপন্থী কমিউনিস্ট বলে আমি মনে মনে একটু ভয়ই করি—উনি কি না পুজো নিয়ে মেতেছেন, তাও আবার ইলেকশনের স্বার্থে—আর বাক্যব্যয় না করে আমি, হ্যাঁ আবারও ওই দুটো টাকা দিতে

সবিনয় নিবেদন

শারদোৎসব উপলক্ষে সাপ্তাহিক বসুমতীর প্রকাশ এক সপ্তাহ বন্ধ থাকবে। আগামী ৩রা নভেম্বর থেকে সাপ্তাহিক বসুমতী যথারীতি প্রকাশিত হবে।

—সম্পাদিকা

গেলাম। তো মশাই পরিতোষবাবুকে দেখলাম সে টাকা নিতে গিয়ে যেন আগুনের ছ্যাঁকা লাগলো হাতে তাঁর। দু' টাকায় কি পুজো হয় মশাই, ষোল হাজার টাকার বাজেট, আপনারা মশাই সব বুঝে-সুঝেও যদি—

—ওদের তো পাঁচ টাকা দিয়েছেন স্যার—সে-ও তো বে-পাড়া—

সঙ্গী মুখ খুললো এবার। মুখ না বলে কামান দাগলো বলাই ঠিক। সার্থক এদের সন্ধানী দৃষ্টি। এরা খবরের কাগজে রিপোর্টারি করলে রোজ দু-পাঁচটা করে স্কুপ নিউজ দিতে পারবে, বছরে তিনটে ইনক্রিমেণ্ট আদায় করতে পারবে। পুলিশ লাইনে গেলে এ্যাওয়ার্ড আর প্রেসিডেণ্ট গভর্নরের মেডেলে দু' বছরে ঘর ভর্তি করে দেবে। এমন কি ফার্নিশড কোয়ার্টার্স আর গাড়ি টেলিফোন দিয়ে সি-আই-এ'ও এদের নির্ঘাৎ লুফে নেবে, সি-বি-আই'র অফার এরা অম্লানবদনে প্রত্যাখ্যান করতে পারে!

অর্থাৎ পরিতোষবাবুর সঙ্গে পরিচয়ের খেসারত—আমায় পাঁচ টাকাই গুণতে হলো।

রবিবার যখন নিজ পাড়ার উদ্যোগী পুরুষেরা এসে পড়লো তখন ঝামেলা না পাকিয়ে পাঁচ টাকার নোটই বাড়িয়ে দিয়েছিলাম। মশাই, কী বলবো আমার দিকে ওরা এমন করুণার দৃষ্টিতে চাইলো যে মনে হচ্ছিল যে যেন আমি ফাঁসীতে ঝুলবার আগে ঠাকুর-দেবতার নাম নিচ্ছি।

জিনিসপত্তরের দাম বেড়ে গিয়েছে চার গুণ—ডিভ্যালুয়েশনের বিরুদ্ধে আপনারা এত লিখেও তো সরকারকে কাবু করতে পারলেন না, পাঁচ টাকায় হবে কী করে, যেখানে বাজেট হচ্ছে—

—তা বাজেট একটু কমান না, সভয়ে বলেছিলাম।

—কী বলছেন বেদব্যাসবাবু, কোন্‌টা কমাবেন আপনি, ঠাকুরের দাম তিন হাজার, কমাতে পারবেন এক পয়সা গণেশ পালের কাছ থেকে?

তপন এক-এক করে হিসেব দিচ্ছিল—আচ্ছা তারপর ডেকরেশন, লাইটু, মাইক-য়্যামপ্লিফায়ার, ফল-ফুল, মশাই ১০৮টি নীল পদ্মই তো নেবে আপনার কম করে—কী বললেন, নীল পদ্মের বদলে......ছি ছিঃ আপনি কম্যুনিস্ট হয়ে গিয়েছেন......ফর ইয়োর ইনফরমেশন ওর কোনো সাবস্টিটিউট হয় না—প্রিন্স অফ ডেনমার্ককে বাদ দিয়ে হ্যামলেট করারই মতো, বুঝলেন না বলে দেঁতো হাসি হাসলো মাধব।

—একটা দশের পাতি ছাড়ুন দাদা, পাড়ার ইজ্জত রাখুন। বুঝলাম, পাড়ার নয়, দশ টাকার কমে নিজের ইজ্জতটুকু বাঁচানো যাবে না। কারণ দোতলার কল্যাণবাবু চার টাকা দিয়েছেন বলে তাঁকে কিভাবে খাতির করা হয়েছে, এবং আগামী দিনেও হবে তার মোটামুটি আভাসও চাঁদাওয়ালারা আমাকে দিতে ভোলে নি।

কল্যাণ বলেছিল সে বোনাস পায় নি, 'বাংলা বন্ধ' ইত্যাদির জন্যে মাইনে কাটা গিয়েছে, ইচ্ছে থাকলেও ওর সামর্থ্যে কুলোচ্ছে না বেশি দেবার, অফিসে সংগ্রামী তহবিল ইত্যাদিতে চাঁদা দিতে হয়েছে—কিন্তু কে কার কথা শোনে! শেষে চারটি টাকা দিয়ে করজোড়ে ও নিবেদন করেছিল, সামনের মাসেই এ-পাড়া ছেড়ে ও পালাবে তখনো নাকি মা'র ভক্তেরা রূঢ় কথা বলতে ছাড়ে নি, বিদ্রূপ করতে ছাড়ে নি।

দুলালবাবুর ওপর যে-অত্যাচার হলো তার সঙ্গে বোধ হয় বর্গী আক্রমণের সঙ্গেই তুলনা করা চলে কেবল। নিতান্তই ছা-পোষা মানুষ দুলাল মিত্তির, বৌ ও সাতটি ছেলে-মেয়ে নিয়ে একপাশে পড়ে

থাকেন ভদ্রলোক, কারুর সাতেও থাকেন না পাঁচেও না। নিরীহ গোবেচারী, টিপিক্যাল কেরাণী, দশটা-পাঁচটা অফিস করেন, তারপর শ্যামবাজার-বেলেঘাটায় দুটো ট্যুইশনি সেরে যখন বাড়ি ফেরেন তখন রুটি শুকিয়ে কাঠ। এহেন ভদ্রলোক যখন বৌয়ের সঙ্গে ঝগড়া করে দুটো টাকা ছেলেদের কাছে এগিয়ে দিতে পেরে গর্বভরে মুখ তুলে তাকান তখন অপর-পক্ষ থেকে তাচ্ছিল্যের ভাষাই শোনা যায়।

—আপনি কি ভিখিরি-বিদেয় করছেন না কি দুলালবাবু—বিল বইয়ে টাকার অঙ্ক লিখতে গিয়ে ছেলেটি কলম নামিয়ে বলে।

—ছিঃ ছিঃ ভিখিরি হতে যাবে কেন বাবা তোমরা, ভিখিরি তো এই আমি, সরকারের কাছে, ট্যুইশনি-বাড়িতে ভিক্ষা-পাত্র নিয়ে আমিই তো ঘুরে ঘুরে ফিরি—

বোষ্টমী রাখুন দাদা, পাঁচটা টাকা ফেলুন—

—অসম্ভব, এক বেলা খেয়ে আছি, একেবারে না খেতে পেয়ে মারা যাবো—দুলালবাবু আর্তনাদ করে ওঠেন।

—হ্যাঁ, তা আর মরবেন না, কাল একগাদা জামা-কাপড় কিনে রিকসা চেপে বাড়ি ফিরেছেন—

—একগাদা কাপড় কোথায় দেখলে, বাবারা, বৌয়ের জন্যে পাঁচ সিকে দামের ব্লাউজ, সাড়ে ছ'টাকার শাড়ি, ছেলে-মেয়েদের জন্যে বারো আনা দামের ইজের, আর তোমার-গিয়ে, এক টাকা চল্লিশ করে তিনটে হাফ সার্ট আড়াই টাকা করে দুটো ফ্রক, আর বড় মেয়ের জন্যে সাত টাকা ষাট পয়সা দিয়ে একখানা কলকা পাড়ের শাড়ি—শেয়ালদার ফুটপাথ থেকেই সব কেনা বাবা—পয়সা কোথায় পাবো দোকানে যাবার—

—তাহলে কি পুজো হবে না, বলতে চান—

—কেন হবে না বাবা, আলবৎ হবে, মায়ের পুজো না হলে চলে, পাপে ডুবে মরবো যে—

—হুঁ, সে জ্ঞানটা তো টনটনে রয়েছে, চাঁদা দেবার বেলাতেই যত সব বুজরুকি, কাঁদুনি—

দুলালবাবুর স্ত্রী বেরিয়ে এসেছিলেন হৈ-চৈ শুনে। ভদ্রমহিলাও স্বামীর অক্ষমতার কথা বোঝাতে চেয়েছিলেন, জোর করে কী হবে বাবা, পারলে কি আমরা না করতাম—

—আপনি যান না মাসিমা, যান হাঁড়ি ঠেলুন গে—জ্ঞান দিতে হবে না আপনাকে—

দুলালবাবুর মেজ ছেলে টুটুন তখন সবে প্যাণ্ডেল থেকে বিজয়ীর ঢঙে ঘুরে এসেছে। বাপের কার্পণ্য দেখে সে আর স্থির থাকতে পারছিল না, বলে ফেললে; আমাদের যেমন ঠকালে, মা দুর্গাকেও তেমনি ঠকাবে, বাবা?

দুর্গাপূজা : ১৩৭৩

গ্রন্থমেলা

অন্তরাল—জীবন দে। ন্যাশনাল পাবলিশার্স, ২০৬ বিধান সরণি, কলিকাতা—৬। দাম ঃ সাড়ে চার টাকা।

বাংলা দেশে যখন বাংলা ভাষায় একালের গল্প পড়তে গিয়ে দেখি গল্প নেই, তখন মনে খেদ হয়, কিন্তু গল্পে গল্প-না-থাকার কারণটি ক'জনই বা ভেবে দেখেন। অবশ্য সবাই বলেন গল্পের পরীক্ষা-নিরীক্ষা চলছে। এ যেন সেই পা দুটো উপরে তুলে মাথায় হাঁটার পরীক্ষা।

মোট কথা গল্প ছাড়া গল্প যাঁরা লেখেন তাঁরা জনজীবনের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে মেশা ত দূরের কথা, তাদের সঠিকভাবে ভাবতেও জানেন না। ফলে অভিজ্ঞতা-হীন অসরল জমিতে তাঁরা আগাছার উপবন সৃষ্টি করেন। উপবন বলছি এই কারণে যে, তাঁদের মেধার জোর না থাকলেও মেদের ভার আছে, দলেও ভারী।

ঠিক এই মুহূর্তে অভিজ্ঞতার মন্থনে মন্থিত, জীবনরসে অভিসিঞ্চিত, ব্যথায়, দরদে, ভালবাসায় ও অকৃপণ প্রতিবাদে ভরপুর এমন কতকগুলি আশ্চর্য সুন্দর গল্প পেলাম, যা একালের তথাকথিত সাহিত্যিক মেজাজের সঙ্গে একেবারেই খাপছাড়া—কিন্তু পূর্ব ও পশ্চিম বাংলার মানুষের সঙ্গে তাঁদের মিল বড় বেশি। চমৎকার গল্প "অন্তরাল"। 'অন্তরালে' রয়েছে "সে ইংরেজ আমলের কথা। আজ ইংরেজ নেই, আছেন হাল আমলের স্বদেশী সরকার আর আই-এ-এস আর ডবলু-বি-সি-এস স্টাফ।" ইংরেজ আমলের মিঃ এফ এ করিম, আই সি এস' এক বিস্ময়কর চরিত্র। করিম জনতার সত্যিকারের সেবক। আর এ যুগে কতই না ভান, কতই না গোঁজামিল। আর গ্রামের পশু হাসপাতালের অবস্থা? দুরবস্থার বিরুদ্ধে দাঁড়ালেই সেখানে সং মানুষের বিরুদ্ধেও পাশবিক চিকিৎসা। 'ওস্তাদ' গল্পে জেলের কাহিনী। একটা 'সেলে' মানুষের মনের কি প্রতিক্রিয়া ঘটে তার করুণ বিবরণ! মোট ১১টি গল্পের সংকলন। প্রতিটি গল্প আমাদিগকে যেমন অভিজ্ঞতার জগৎ থেকে বিচিত্র পটভূমিকায় উপস্থাপিত করে তেমনি প্রতিটি গল্পের চরিত্র সৃষ্টিতে লেখকের নৈপুণ্য অসাধারণ। কেশব, মাধবী, লক্কাদা এই ধরণের চরিত্র। এই গল্পগ্রন্থটির ভূমিকা লিখেছেন শ্রীনারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়। তিনি শ্রীদে'র গল্প রচনার দক্ষতায় ও চরিত্র অঙ্কনে প্রভূত শক্তির পরিচয় পেয়ে তাঁকে আগামীদিনের প্রথম শ্রেণীর সার্থক গল্প লেখক হিসেবে অভিনন্দন জানিয়েছেন। আমরাও মনে করি,'মন্বন্তর' গল্পটিতেই তাঁর সে-শক্তির পরিচয় আছে। এখনো যেন কানে বাজে "মেয়েটার সর্বনাশ করতে চেয়েছিলেন এ'টে উঠল না। আমি কিন্তু মেয়ে নই। মন্বন্তরে মরে যাওয়া ভূত পেত্নী, সাবধান!" এতে শুধু মন্বন্তরের ছবিই নেই, তার সঙ্গে আছে মনুষ্যত্ব ও অমনুষ্যত্বের অবিকৃত ছাপ। গ্রন্থটির প্রচ্ছদপটও 'অন্তরাল' নামের সঙ্গে তাৎপর্যমণ্ডিত।

জয়ন্তী সেন

সন্দেশ—লীলা মজুমদার ও সত্যজিৎ রায় সম্পাদিত। ১৭২/৩, রাসবিহারী অ্যাভিনিউ, কলিকাতা-২৯, দাম ঃ তিন টাকা।

শরতের হাসিতে যখন বাংলাদেশ হেসে ওঠে, তখন ছোটদের মুখে হাসি ফোটাতে "সন্দেশ" আসে নতুন সাজে সজ্জিত হয়ে। সন্দেশের 'ভাদ্র-আশ্বিন' সংখ্যাটির পাতায় পাতায় তাই এতোরকম লেখা আর হরেকরকম ছবি। একটা লম্বা ছুটি, বোধহয়, চোখের সামনে দেখতে দেখতে শেষ হয়ে গেলেও, এতো গল্প, গান, রহস্য উপন্যাস, উপকথা, নাটিকা প্রবন্ধ পড়ে কখনই শেষ করা সম্ভব নয় একটা ছুটিতে। উপেন্দ্রকিশোর রায়ের ঘড়ির গান ত' ছেলেরা মুখস্থ করে রাখবে। সেই সঙ্গে আছে স্বরলিপি। অর্থাৎ গলা ফাটিয়ে ছেলেরা গাইতেও পারে। পুজোর সময় তাড়াহুড়োর মধ্যে ছেলেরা ভালো নাটিকা খুঁজে পায় না। কিন্তু সন্দেশে আছে পুরো সাতটা নাটিকা। অর্থাৎ পুজোকে সোরগোল করার পক্ষে যথেষ্ট। এ ছাড়া শিশুদের প্রিয় কুলদারঞ্জন রায়ের উপন্যাস, নলিনী দাশের সম্পূর্ণ উপন্যাস, সত্যজিৎ রায়ের রহস্য উপন্যাস 'বাদশাহী আংটি' ছোট থেকে বড় পর্যন্ত কেই বা হাতছাড়া করতে চায়। এ ছাড়াও আরো উপন্যাস আছে। **"শব্দের গুঁড়ো"। যেমন নাম তেমনি** মজাদার উপন্যাস। তারপর আছে আন্দামানের উপকথা, মহীশূর—ভ্রমণ কাহিনী, বিজ্ঞানের আসর, খেলার উপর প্রবন্ধ, ধাঁধা, গল্প, প্রতিযোগিতা—আরো কতো কি! গল্প এবং কবিতাও প্রচুর। আর পরিমল গোস্বামীর প্রবন্ধ যেন হাসির গল্পকেও হার মানায়। "সন্দেশে" লেখকদের মধ্যে আছেন মোহনলাল গঙ্গোপাধ্যায়, সুকুমার রায়, নরেন্দ্র দেব, নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, সুখরঞ্জন রায়, স্বপন বুড়ো, লীলা মজুমদার, উমা দেবী, ধীরেন্দ্রলাল ধর প্রমুখ অনেকেই। নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের "একটা জানলা খুলতে" পড়তে পড়তে আমরা যেমন অবাক হয়ে যাই, তেমনি সন্দেশের উপর চোখ মেলতে মেলতে আমরা যেন পৌঁছে যাই সব পেয়েছির দেশে। পত্রিকাটি দামেও কিন্তু বেশ সস্তা।

নর-নারী—সম্পাদক ঃ সুবোধ মিত্র। সহ-সম্পাদক ঃ মোহন মিত্র। ৬ ডি, আশু বিশ্বাস রোড, কলিকাতা-২৫, দাম ঃ তিন টাকা।

'নর-নারী'র শারদীয় সংখ্যাটি অন্যান্য বছরের চেয়ে এবার আরো বৃহদাকারে প্রকাশিত হয়েছে। সংখ্যাটিকে সুন্দর করে তোলার জন্য যে পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছিল তার জন্যে সম্পাদকগোষ্ঠী কৃতিত্বের দাবি করলেও নর-নারীর রচনার মূল কথা হচ্ছে, তা হবে বিজ্ঞানসম্মত এবং বিজ্ঞানের কারবার যেখানে, সেখানে রুচিবাগীশদের কোনো রকম জুলুম খাটানো অন্যায়। তবু সেই জুলুম সত্যিকার বলে মনে হয় তখনই, যখন দেখা যায় কোনো রচনার লেখক বিজ্ঞানের ধার ধারেন না, এবং স্বেচ্ছাকৃতভাবে তিনি তাঁর রচনাকে অশ্লীল করে তোলেন। 'নর-নারী'র একটি গল্পে সেই জাতীয় হওয়ায় পাঠকরা নিঃসন্দেহে মর্মাহত হবেন। এতদ্‌সত্ত্বেও কয়েকটি রচনা 'নর-নারী'র গৌরব বৃদ্ধি করেছে, তন্মধ্যে অন্নদাশঙ্কর রায়ের "উলট পুরাণ" ও বিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায়ের "বিবাহ প্রসঙ্গে" বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এ ছাড়া নন্দগোপাল সেনগুপ্ত, দক্ষিণারঞ্জন বসু, ডঃ আদিত্য ওহদেদারের প্রবন্ধ পড়ে পাঠকরা উপকৃত হবেন। "শান্তনু" উপন্যাসটিতে যজ্ঞেশ্বর রায় সমাজচিন্তার সঙ্গে বৈজ্ঞানিক বুদ্ধির মেলবন্ধন ঘটিয়ে কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন। গল্প লিখেছেন নরেন্দ্রনাথ মিত্র, জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী ও মোহন মিত্র। "মনস্তত্ত্ব ও চিকিৎসা বিষয়ক" বিভাগটি অত্যন্ত সুপরিকল্পিত। অবশ্য 'নর-নারী'র বৈশিষ্ট্য এখানেই। দু-একটি রচনা বাদ দিতে পারলে 'নর-নারী'কে সব দিক দিয়েই সুরুচিপূর্ণ বলা সম্ভব হোত।

বঙ্গদর্শন

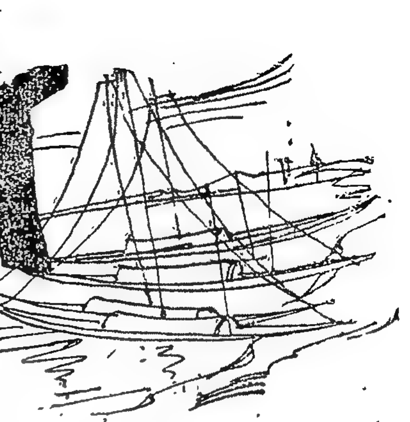

॥ ১ ॥

বঙ্গদর্শন লেখকের কাজটা একান্তই গদ্যময়। রাজনীতি, অর্থনীতি ও সমাজনীতির যাবতীয় জঞ্জাল ঘাটতে ঘাটতে মাঝে মাঝে প্রাণ ওষ্ঠাগত হয়ে ওঠে। তা ছাড়া ফেব্রুয়ারী মাসের খাদ্য আন্দোলনের পর থেকে আজ পর্যন্ত সমাজজীবনে প্রচণ্ড টেনসন, একের পর এক আন্দোলন, মিছিল, ঘেরাও, ধর্মঘট, বিক্ষোভ, লাঠিচার্জ প্রভৃতি ঘটনা এত দ্রুততার সঙ্গে ঘটে যাচ্ছে যে স্থির হয়ে একমুহূর্ত দম নেবারও সময় নেই। ঘটনার গতির সঙ্গে আমাদেরও ছুটতে হচ্ছে। এ সংখ্যার বঙ্গদর্শন যখন লেখা হচ্ছে তখন উত্তর ভারতের ছাত্রবিক্ষোভের ঢেউ পশ্চিমবঙ্গেও পৌঁছে গেছে। কলকাতার চারটি সরকারী কলেজে তালা পড়েছে, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়েরও দরজা ছাত্ররা বন্ধ করে দিয়েছে। অবশ্য পুজোর ছুটি এসে পড়ায় ব্যাপারটায় আপাতত ধামাচাপ দেওয়া হল বটে, কিন্তু শেষ পর্যন্ত কোথাকার জল কোথায় গিয়ে দাঁড়াবে সেকথা বলা শক্ত।

॥ ২ ॥

সে যাই হোক, সেদিন আকাশের দিকে তাকিয়ে হঠাৎ মনে হল যেন আকাশটা আশ্চর্যরকম নীল, আর সেই অসীম নীলিমায় পুঞ্জ পুঞ্জ সাদা মেঘের সারি দেখে মনে হল—

গগনে গগনে বর্ষণ শেষে
মেঘেরা পেয়েছে ছাড়া,
বাতাসে বাতাসে ফেরে ভেসে ভেসে
নাহি কোন কাজে তাড়া।

অর্থাৎ পশ্চিমবঙ্গে শরৎ এসেছে। কবির কবিতায় অবশ্য বসন্তেরই বাহার বেশি, কিন্তু বাংলা দেশে বোধ হয় শরতেরই বেশি খোলতাই। কিন্তু আমরা একালের মানুষ, উই হ্যাভ নো টাইম টু স্ট্যান্ড এন্ড স্টেয়ার। কবে যে শিউলিফুল ফুটল আর করে যে তা ঝরে গেল সে খোঁজ কে রাখে? বাতাসে যে হিমের পরশ লেগেছে, এই ব্যস্ত যুগে সেটুকু বোঝারও বোধশক্তি আমরা হারিয়ে ফেলেছি, একমাত্র ইনফ্লুয়েঞ্জা হলেই তা বোঝা যায়। কবিগুরুর 'বঙ্গে শরৎ' কবিতার চিত্র বাংলায় আজ অনুপস্থিত। বর্ধমান থেকে হাওড়ায় রেলে চেপে আসতে যতগুলি নদীর সেতু পার হতে হয়, কোন নদীতেই জল নেই, সেগুলি নালায় রূপান্তরিত হয়েছে। 'পারে না বহিতে নদী জলভার', পর পর তিনটি পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার চোটে কবিদৃষ্ট এই চিত্র মিথ্যায় পরিণত হয়েছে, এমন কি গঙ্গানদীও এই শরতেই আধখানা হয়ে গেছে, বোধ হয় এবারই গ্রীষ্মের আগে শুকিয়ে মরুভূমি হয়ে যাবে। কবিগুরু কথিত 'মাঠে মাঠে ধান ধরে নাকো আর'—এ কথাও আজ মিথ্যায় পরিণত। এত সেচ পরিকল্পনার ডংকানিনাদ সত্ত্বেও জলের অভাবে আজ ধান গাছের পাতাগুলি ইতিমধ্যেই গৈরিক বর্ণ ধারণ করেছে। বৃষ্টি পর্যাপ্ত পরিমাণে হয় নি এ বছর, কৃষকের ভাণ্ডার শূন্য, গ্রামাঞ্চলে জাগছে হাহাকার। আজ যদি কবিগুরু বেঁচে থাকতেন তিনি বোধ হয় শরতের মনোহর চিত্র আঁকতে সাহস করতেন না। কবি যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্তের প্যারোডিটাই বরং সত্য হয়েছেঃ

দিবসে শেয়াল গাহিছে খেয়াল
তোমার পল্লী সভাতে
মাঝখানে তুমি কাঁদিছ জননী
শরৎকালের প্রভাতে।

॥ ৩ ॥

কিন্তু শরৎ যে কারণে বাংলায় বিশেষ আকর্ষণীয় তা হচ্ছে দুর্গোৎসব, যার অপর নাম শারদোৎসব। দেবী দুর্গা বাঙালীর জীবনে ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে আছেন। মূর্তিতে যদিও তিনি দশপ্রহরণধারিণী অসুরনাশিনী, এ কল্পনা বাঙালীর নয়। দেবী দুর্গা যেন বাঙালীর ঘরের মেয়ে, বৎসরান্তে তিন দিনের জন্য তাঁর পিত্রালয়ে আসা। এই বাৎসল্যরসকে কেন্দ্র করেই রচিত হয়েছে অজস্র আগমনী গীতি। আজ অবশ্য নাগরিক জীবনের কোলাহলে আগমনী গানের ক্ষেত্র অত্যন্ত সীমাবদ্ধ হয়ে গেছে, কিন্তু কিছুকাল আগে পর্যন্তও আগমনী গান ও শরৎ একসূত্রে বাঁধা ছিল। কবি নজরুল শরৎকালের বঙ্গদেশের বর্ণনা করতে গিয়ে লিখেছিলেন—

শাপলা শালুকে সাজাইয়া সাজি
শরতে শিশিরে নাহিয়া
শিউলি রঙীন সাড়ী পরে ফের
আগমনী গীতি গাহিয়া।

আদ্যাশক্তির প্রতীক অসুরনাশিনী দুর্গা কিভাবে বাঙালী-হৃদয়ের এত নিকটে এসেছেন, বাঙালী মায়ের মনের কোন তন্ত্রীতে দেবী দুর্গা এমনভাবে নাড়া দিয়েছেন একথা বলা খুবই শক্ত। পিতৃতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থার দাপটে যে-কালে অসহায় বালিকাকে ততোধিক অসহায় মায়ের কোল থেকে ছিনিয়ে নিয়ে অপাত্রে সমর্পণ করা হত, সেই হতভাগিনী কন্যার জন্য হতভাগিনী মাতার শাশ্বত বেদনা ও উদ্বেগ, বাৎসরান্তিক একবার কন্যার পিতৃগৃহে আসার দিনটির মুখ চেয়ে কোন গতিকে চাপা থাকত। তাই দেবীর তিন দিনের জন্য পিত্রালয়ে আসার কাহিনীটি বাঙালী মায়ের কাছে এতই তাৎপর্যপূর্ণ। আগমনী গানে রামপ্রসাদ গেয়েছেন মেনকার হৃদয়ের ভাষায়—

এবার আমার উমা এলে
আর আমি পাঠাব না।
এবার মায়ে ঝিয়ে করব ঝগড়া
জামাই বলে মানব না।

কিন্তু পিতৃতান্ত্রিক সামাজিক কাঠামোর মধ্যে মায়ের কি সে জোর আছে? মেয়েকে তো পাঠাতেই হবে। মায়ের বুক থেকে অব্যক্ত কান্না বুঝি ফেটে পড়তে

হায়ঃ নবমীর নিশি পোহায়ও না। 'বিজয়াদশমী' নামক সনেটে কবিবর মাইকেল মা মেনকার মনের এই বেদনাকে যেভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন তা বুঝি অতুলনীয়ঃ

যেওনা রজনি আজি লয়ে তারাদলে
তুমি গেলে দয়াময়ি, এ পরাণ যাবে।
উদিলে নিদয় রবি উদয় অচলে
নয়নের দীপ মোর নয়ন হারাবে।

॥ ৪ ॥

বাঙালীর কাছে বিজয়াদশমী কোন বিজয়ের বার্তা বহন করে আনে না, বরং তা নিয়ে আসে বিচ্ছেদ-বেদনার করুণ অনুভূতি। অথচ উত্তর ভারতের অন্যত্র ওই দিন পালিত হয় 'দশেরা' উৎসবে, রাম কর্তৃক রাবণ বিজয়ের স্মৃতিচিহ্ন হিসাবে।

আমাদের শারদীয়া দুর্গাপূজায় জানি না কিভাবে রামায়ণের কাহিনী ঢুকিয়ে দেওয়া হয়েছে। শারদীয়া দুর্গাপূজাকে বলা হয় অকালবোধন। কথিত আছে, রাবণ বধের নিমিত্ত রামচন্দ্র নাকি অকালে দেবীর বোধন করেছিলেন। এই কাহিনী আজ বহুল প্রচলিত।

কিন্তু বাল্মীকি রচিত সংস্কৃত রামায়ণে কোথাও এ কাহিনী নেই, থাকার কথাও নয়। কেন নয়, সেকথা পরে বলব। এই কাহিনী আছে কয়েকটি অর্বাচীন উপপুরাণের মধ্যে। মনে হয় কোন দেবীভক্ত, দেবীর মহিমাকীর্তন করার উদ্দেশ্যে ওই কাহিনী রচনা করে দু-একটি উপপুরাণের মধ্যে তা ঢুকিয়ে দিতে সক্ষম হয়েছিলেন।

দুর্গাদেবীর পূজা বাংলাদেশেই উদ্ভূত হয়েছিল, এবং কালক্রমে তা ভারতের সর্বত্র প্রচলিত হয়েছিল। বিভিন্ন স্থানে, স্থানীয় লৌকিক ঐতিহ্যের প্রভাবে, পূজার ধরণ পৃথক পৃথক রূপ পরিগ্রহ করেছে। অকালবোধনের কাহিনীর উদ্ভব উত্তর ভারতের কোন স্থানে, এবং কয়েক জায়গায় সেই কাহিনী ঘুরে শেষ পর্যন্ত বাংলার নরম মাটিতেই তা শিকড় গেড়েছে।

॥ ৫ ॥

দুর্গাপূজার উদ্ভব যে বাংলার মাটিতেই হয়েছিল, তার প্রমাণ বাংলাদেশে যতগুলি গণপূজা বা পাবলিক ওয়ারশিপ আছে তা সবই কোন না কোন ধরণের দেবীপূজা। দুর্গাপূজা, লক্ষ্মীপূজা, কালীপূজা, সরস্বতীপূজা, অন্নপূর্ণা পূজা, বাসন্তী পূজা ইত্যাদি। কিন্তু সার্বিকভাবে কোন দেবপূজার প্রচলন এখানে নেই। বিষ্ণু বা শিবের পূজা ব্যক্তিগত বা সম্প্রদায়গত, জাতীয় নয়। ঘটা করে প্যান্ডেল বেঁধে বিষ্ণু বা শিবপূজা হচ্ছে দিন-তারিখ-তিথি মিলিয়ে—এ কথা কল্পনাও করা যায় না।

দুর্গাপূজা যে বাঙালীরই নিজস্ব সৃষ্টি তার আর একটি প্রমাণ হচ্ছে যে দুর্গাদেবীর চরিত্র বৈদিক নয় অবৈদিক। বাংলা দেশের মানুষের দেহে আর্যরক্ত নেই, প্রাচীন বৈদিক গ্রন্থসমূহে বাংলা দেশ ও বাঙালীর প্রতি বিরূপ মন্তব্য করা হয়েছে, কোন বিশুদ্ধ রক্তের আর্য (এই রকমই মনে করা হত বা আজও হয়, যদি আর্য কোন জাতি নয়, ভাষা) বাংলাদেশের মাটি মাড়ালে তাকে দেশে গিয়ে প্রায়শ্চিত্ত করতে হত।

বেদে কয়েকটি দেবীর উল্লেখ আছে যথা অদিতি, ঊষা ইত্যাদি; পরবর্তী বৈদিক গ্রন্থসমূহে অম্বিকা, কাত্যায়নী দুর্গা (?) প্রভৃতি কয়েকটি দেবীর উল্লেখ আছে, কিন্তু সব দেবীদের যে সব বৈশিষ্ট্যগুলি বৈদিক সাহিত্যে আছে তার সাথে আমাদের দুর্গার কোন মিলই নেই। ঋগ্বেদের যে স্তোত্রটিকে দেবীসূক্ত আখ্যা দেওয়া হয় তা অনেক পরবর্তীকালে রচিত এবং বেদে প্রক্ষিপ্ত হয়েছে, একথা প্রতিটি দায়িত্বশীল বেদচর্চাকারীই বলেন, যদিও কিছু গোঁড়া পণ্ডিত এ কথা স্বীকার করতে নারাজ।

কিন্তু সংস্কৃত গ্রন্থসমূহের মধ্যেই এমন কোন কোন অংশ আছে যা থেকে দেবীর অবৈদিক চরিত্রটিই বিশেষ করে প্রস্ফুটিত হয়েছে। মহাভারতের দুর্গা-স্তোত্রে 'সীধুমাংসপশুপ্রিয়া' এই দেবীর বাসস্থান কল্পিত হয়েছে বিন্ধ্যপর্বতে। হরিবংশে বলা হয়েছে দেবী শবর, বর্বর ও পুলিন্দদের দ্বারা পূজিতা হন। এই তিনটি জাতিই অবৈদিক। বাকপতির গৌড়বহো গ্রন্থে দেবীকে শবরী আখ্যা দেওয়া হয়েছে। আজ থেকে কিছুকাল আগে দুর্গাপূজা উপলক্ষে একটি বিশেষ ধরণের উৎসব করা হত, যার নাম শারদোৎসব, যার বৈশিষ্ট্য ছিল যৌনবিষয়ক ছড়া ও অশ্লীল শব্দের প্রয়োগ। এই রকম অজস্র উদাহরণ দেখিয়ে প্রমাণ করা যায় দেবীপূজার অস্তিত্ব এমন কয়েকটি জাতির মধ্যে পাওয়া যাচ্ছে যারা বৈদিক আর্য ছিল না, এবং দেবীপূজার সঙ্গে সংশিলষ্ট আচার অনুষ্ঠানগুলির চরিত্রও বৈদিক নয়। আগে দুর্গাপূজায় আনুষ্ঠানিক উদ্বোধনের দায়িত্ব পড়ত, একজন তথা-কথিত নীচজাতীয়ের উপর, ব্রাহ্মণের উপর নয়।

খোদ পুরাণগুলির মধ্যেও দেবীর অবৈদিক চরিত্রের প্রমাণ রয়েছে। যে দেবী শুম্ভ-নিশুম্ভকে বধ করে বিখ্যাত হয়েছেন, তাঁর নাম কৌষিকী, তিনি পার্বতীর দেহের কৃষ্ণবর্ণ কোষসমূহ থেকে উদ্ভূত হয়েছেন। কৃষ্ণবর্ণ কেন? কৃষ্ণবর্ণ কাদের প্রতীক? নিশ্চয়ই অনার্যদের। সেই কৌষিকী দেবীকে ইন্দ্র বলছেন, "তুমি অতঃপর বিন্ধ্যপর্বতে গিয়ে বাস করে বিন্ধ্যবাসিনী নামে বিখ্যাত হও।" আমরা পূর্বেই দেখেছি মদ্যমাংসপশুপ্রিয়া এক দেবী ইতিমধ্যেই বিন্ধ্যপর্বতে বাস করছেন, যাঁর সম্বন্ধে কৃষ্ণবর্ণ দেবী কৌষিকী সহজেই মিশে গেছলেন।

॥ ৬ ॥

উপরি উক্ত বিবরণগুলি থেকে স্পষ্টই প্রমাণিত হয় যে দেবী দুর্গার চরিত্রে অবৈদিক উপাদান প্রচুর বর্তমান। কিন্তু বাংলার মাটির সঙ্গে দেবীর আত্মিক সম্পর্ক প্রমাণ করার জন্য বোধ হয় আরও কিছু কথা বলার প্রয়োজন আছে।

একটি দেশের মানসিক সংস্কৃতির বিভিন্ন দিকগুলি গড়ে ওঠে সেই দেশের অর্থনৈতিক পরিবেশের নিরিখে। বেদে দেবীদের বিশেষ দাপট নেই এই কারণেই যে আদি ঋগ্বেদীয় আর্যগণের অর্থনীতির ভিত্তি ছিল পশুপালন। নৃতত্ত্ববিদেরা বলেন যে, কোন পশুপালক সমাজে দেবীর কল্পনা বিশেষ খাপ খায় না। জগতের সব জায়গায় দেবী উদ্ভিদ জীবনের সঙ্গে সম্পর্কিত। সর্বত্রই দেবী কৃষির অধি-ষ্ঠাত্রীরূপে কল্পিতা। কৃষিপ্রধান সমাজেই মাতৃদেবীর পরিকল্পনাটা খোলে ভাল।

শ্রীশ্রীচণ্ডী গ্রন্থে দেবী অপরাপর দেবতাদের উদ্দেশ করে বলছেন যে, 'এর পর যখন অনাবৃষ্টির বছরগুলি আসবে, তখন আমি আমার 'আত্মদেহসমুদ্ভূত' শাকাদির দ্বারা জগৎকে প্রতিপালন করে 'শাকম্ভরী' নামে বিখ্যাত হব।' তাহলে দেবী শাকম্ভরী নিঃসন্দেহে ধরিত্রীদেবী যাঁর দেহ থেকে উদ্ভূত হয় প্রাণধারক শাকাদি। এই কাহিনীটি সম্ভবত অতি পুরাতন, কেন না বৈদিক যুগেরও আগে সিন্ধু উপত্যকায় যে অনার্য সভ্যতা ছিল, সেখান থেকে একটি 'শীল' পাওয়া গেছে যেখানে একটি দেবীর মূর্তি আঁকা আছে, পা দুটো উপর দিকে এমন মাথাটা নিচের দিকে এবং দেবীর যোনিপ্রদেশ থেকে উদ্ভূত হয়েছে একটি গাছ। নিঃসন্দেহে এই চিত্রটি পৃথিবীদেবীর প্রতীক যাঁর গর্ভ থেকে উদ্ভূত হয়েছে সমগ্র উদ্ভিদ জগৎ। তাহলে দেখা যাচ্ছে মার্কণ্ডেয় পুরাণের দেবী শাকম্ভরী ওই পুরাণের চেয়ে অনেক বেশি পুরাতন, অন্তত সিন্ধু অনেক বেশি পুরাতন, অন্তত সিন্ধু উপত্যকার সভ্যতার যুগে তাঁর পরিচয় অস্পষ্ট ছিল না। আর তাছাড়া হরপ্পা

দ্বিতীয় দেখায় প্রথম
ভালো সাজগোজ তখনি উৎরবে যখন পায়ে থাকবে ভালো একজোড়া জুতো। নইলে পরিপাটি বেশভূষা নিরর্থক। আর এই জুতো নিরেস হলে চলবে না, নকশায়, গঠনে আর ফিটিঙে হতে হবে উৎকৃষ্ট। এক কথায় বাটার জুতো, আধুনিক পাদুকাশিল্পে যা অদ্বিতীয়। বাটার জুতো ভালো সাজগোজের একান্ত সহায়, প্রতি পদক্ষেপে উত্তম রুচির পরিচায়ক।
প্রেটি ১০.৯৫—১৪.৯৫
পম্পা ১২.৯৫—১৬.৯৫
অঞ্জনা ১০.৯৫
সুলেখা ১৮.৯৫
শীলা ১১.৯৫
Bata

মোহেঞ্জদরোতে খনন-কার্যের ফলে পাওয়া গেছে অজস্র ছোট ছোট মাতৃকা-মূর্তি, যা থেকে প্রমাণিত হয় যে সিন্ধু উপত্যকার লোকেরা মাতৃপূজক ছিল, এবং দেবীপূজার উৎস বেদে অনুসন্ধান না করে প্রাক-বৈদিক সিন্ধু উপত্যকায় তা করতে হবে।

সিন্ধু উপত্যকার সভ্যতা ছিল নগর-কেন্দ্রিক যা খনন-কার্যের ফলে প্রমাণিত হয়েছে। নগর-সভ্যতার ভিত্তি নিশ্চয়ই কৃষি, কেন না ব্যাপক কৃষিব্যবস্থা প্রচলিত না থাকলে নগরে খাদ্যের যোগান দেওয়া সম্ভবপর নয়। সিন্ধু সভ্যতার ন্যায় মিশর, মেসোপটামিয়া ও ঈজিয়ান সভ্যতাও ছিল কৃষিকেন্দ্রিক, এই কারণে ওই সকল স্থানের প্রধান প্রধান দেবতা পুরুষ নন, নারী। কেন না দেবী কল্পনার সঙ্গে উদ্ভিদজগতের নিবিড় সম্পর্ক সকল স্থানেই বর্তমান। মিশরের আইসিস, ব্যাবিলনের ইস্তার, ফ্রিজিয়ার সিবিলী, ক্রীটের রীহা, হেলেনীয়দের ডিমিটার, রোমকদের সেরেস সকলেই শস্যের দেবী।

॥ ৭ ॥

বাংলা দেশের অর্থনীতি ছিল কৃষি। অজস্র নদীনালা সমন্বিত, সুবৃষ্টির অধিকারভুক্ত এই বাংলাদেশের মত উর্বর ভূমি জগতে খুব কম জায়গাতেই আছে। সেই কারণে বাংলার অধিকাংশ মানুষ আজও কৃষিজীবী এবং সেই উদ্ভিদজগতের সঙ্গে সংযুক্তা দেবীপূজার এত বেশি প্রচলন এই দেশে।

তাহলে স্বাভাবিকভাবেই এই প্রশ্ন মনে জাগবে দুর্গা কি শস্যের দেবী? উত্তরে হ্যাঁ বলা ছাড়া আর কোন উপায় নেই। দুর্গাপূজা আসলে শস্যেরই পূজা, দেবীর দেহের রং আর পাকা ধানের রং তো একই। দুর্গা আসলে নবপত্রিকারই প্রতীক, প্রকৃতপক্ষে এ-পূজা নবপত্রিকারই পূজা। নবপত্রিকা অর্থাৎ নয়টি বিভিন্ন ধরণের চারাগাছ—

রম্ভা কচ্চী হরিদ্রা চ জয়ন্তী
বিল্বদাড়িমৌ।
অশোক মানকশ্চৈব ধান্যঞ্চ নবপত্রিকা।

অতএব দেখা যাচ্ছে দেবীর সঙ্গে উদ্ভিদজগতের কী অদ্ভুত যোগাযোগ। এখন আর দুর্গাকে শস্যের দেবী বলতে আপত্তির কোন কারণ থাকতে পারে না। তবুও কেউ কেউ প্রশ্ন করতে পারেন যে, তাহলে দেবীর এই অসুরনাশিনী দশভুজা মূর্তি কেন? এরও উত্তর খুব সহজ। যে-সব শক্তি প্রাকৃতিক দুর্যোগ ঘটায়, অনাবৃষ্টি, অতিবৃষ্টি ইত্যাদির দ্বারা ফসলের ক্ষতি করে জগতের সবগ্রহ এইসব শক্তিগুলি কোথাও অসুর, কোথাও দানব, কোথাও ড্রাগন ইত্যাদি রূপে পরিকল্পিত হয়। সেই দিক থেকে অনাবৃষ্টি-রূপী অসুরকে বধ করে শস্যের দেবী জগতের কল্যাণ করছেন, কাজেই দেবীর পক্ষে মহিষাসুরমর্দিনী হতে কোনই অসুবিধা নেই। (অসুর বলতে আগে একটি জাতিকে বোঝাত, এখন যে-কোন কারণেই হোক কথাটির অর্থাবনতি ঘটেছে)।

দুর্গা নামটির কিভাবে উদ্ভব হল সে সম্পর্কে দেবীভাগবত নামক পুরাণে এমন একটি কাহিনী আছে যা আমাদের বক্তব্য প্রমাণ করতে সাহায্য করবে। দুর্গম নামক এক অসুর দেবতাদের পরাজিত করার জন্য চেষ্টা করেছিল। সে প্রথমেই বেদ অপহরণ করল, যার ফলে দেবতারা প্রথমেই শক্তিহীন হয়ে গেলেন। বেদ অপহৃত হবার ফলে পৃথিবীতে বর্ষণ বন্ধ হয়ে গেল, ফসল না হওয়াতে দেবতারা যজ্ঞভাগ থেকে বঞ্চিত হলেন। তখন তাঁরা সকলে মিলে দেবীর শরণাপন্ন হলেন। তখন দেবী সেই দুর্গম নামক অসুরকে বধ করে দুর্গা নামে খ্যাত হলেন। এখানে অসুরের সঙ্গে অনাবৃষ্টির গভীর সম্পর্ক দেখানো হয়েছে।

তবে 'চন্ডী'-তে যিনি মহিষাসুরকে নিহত করেছেন তিনিই যে দুর্গা এ-কথা হলফ করে বলা যায় না; যিনি শুম্ভ ও নিশুম্ভকে বধ করেছিলেন তিনিও সম্ভবত দুর্গা নন। শোষোক্ত জন কৌষিকী বা চণ্ডিকা, যিনি পার্বতীর কোষ থেকে উদ্ভূত। কবে এবং কিভাবে এইসব দেবীরা দুর্গার সঙ্গে একাত্ম হলেন, সেটা বিচার দায়িত্ব ঐতিহাসিকদের, বঙ্গদর্শন লেখকের নয়।

॥ ৮ ॥

এবারে পূজোর ক'দিন আগে থেকেই বর্ষণ শুরু হয়েছে। এ বর্ষণের মেয়াদ ঠিক কতদিন থাকবে তা অবশ্য বলা শক্ত। এ সময়ের বর্ষণটা হয়ত অনেকেই পছন্দ করছেন না, হয়ত অনেকেরই কেনাকাটার অসুবিধা হচ্ছে। কিন্তু এই বর্ষণ যদি সারা দেশ জুড়ে ক'দিন ধরে হয়, তাহলে কৃষকের মুখে হাসি ফুটবে। জলের অভাবে ধানগাছগুলি বিবর্ণ হয়ে যেতে শুরু করেছিল, পর্যাপ্ত জল পেলে আবার হয়ত আশার আলো দেখা দেবে।

আপনাদের এবারের পূজোর দিনগুলি আনন্দে পূর্ণ হয়ে উঠুক, বঙ্গদর্শন লেখকের এই প্রার্থনা।

দেশ সেবায় নিয়োজিত,

এ্যালবার্ট ডেভিড লিমিটেড

কলিকাতা—৫০

নীতি ও বিজ্ঞানানুযায়ী ঔষধ প্রস্তুতকরণের অগ্রণী

—ব্রাঞ্চ সমূহ—

বোম্বে - মাদ্রাজ - দিল্লী - নাগপুর

বেজওয়াড়া - শ্রীনগর - গৌহাটী

গ্রামবাংলার কথা

কাঁঠালপাড়া

কাঁঠালপাড়ার অতীত একীভূত হয়েছে একটি মাত্র নামে—বঙ্কিমচন্দ্র। নৈহাটী থেকে কাঁঠালপাড়া যাবার অন্তরীক্ষচারী একমাত্র সোজা পথ নৈহাটী রেল ওভার-ব্রীজ পার হয়ে মাটিতে নামলে দূর থেকেই নজরে পড়বে পঞ্চরত্ন এক শিবমন্দিরের চূড়া—কতক ভগ্ন, কতক জীর্ণ। চট্টোপাধ্যায় প্রাসাদের প্রকাণ্ড অবশেষ গৃহদেবতা রাধাবল্লভের মস্ত মন্দির—আন্দাজ সাত থেকে দশ ফুট পিতলের রথ একখানি, আর এক পাশে সুন্দর ছোট্ট পুরাতনের ওপর নতুনের পালিশ চড়ানো বঙ্কিম সংগ্রহ ভবনের একাংশ।

এরাই বঙ্কিমচন্দ্রের স্মৃতির বাহক। আজকের পুরাতন পরিবর্তিত না-গ্রাম, না-শহরের মিক্‌শ্চার মেশানো কাঁঠাল-পাড়ার অনেক অনুচ্চারিত স্মৃতির সঞ্চয় নিয়ে ওরা দাঁড়িয়ে আছে একখানি আস্ত সমগ্র অনুক্ত ইতিহাসের প্রতীক, জরা আর জীর্ণতার শিকার—কালকরক্ষেপে সর্বাঙ্গ জুড়ে যাদের প্রাচীনত্বের সুস্পষ্ট স্বাক্ষর।

চট্টোপাধ্যায়রা আদিতে কাঁঠালপাড়ার অধিবাসী ছিলেন না। মাতামহের সম্পত্তির অধিকারী হয়ে এঁরা আসেন এখানে। কাঁঠালপাড়ার আদিবাসী শ্রীরঘুদেব ঘোষাল ব্রাহ্মণ ভঙ্গ, অকুলীন। পুত্র ছিল না, তাঁর দুই কন্যা। এক কন্যার বিবাহ হয় হুগলী জেলার দেশমুখো গ্রামের কুলীন কাশ্যপগোত্র শ্রীরামচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের সঙ্গে। এই রামচন্দ্রই কাঁঠালপাড়ার চট্টোপাধ্যায় বংশের আদি-পুরুষ। রঘুদেবের মৃত্যুর পর রামচন্দ্র পুত্র রামহরি মাতৃকুলের সম্পত্তির অর্ধাংশের উত্তরাধিকারী হয়ে চলে আসেন কাঁঠালপাড়ায়। রামচন্দ্র থেকে বঙ্কিমচন্দ্র পর্যন্ত ছকে ফেললে এঁদের বংশতালিকা দাঁড়ায় মোটামুটি এরূপ।

রঘুদেব কন্যা—স্বামী রামচন্দ্র
|
রামহরি
|
জয়চন্দ্র — শিবা
|
যাদবচন্দ্র
|
শ্যামচন্দ্র সঞ্জীবচন্দ্র বঙ্কিমচন্দ্র পূর্ণচন্দ্র

পাণ্ডিত্য মনীষা এবং যুগোপযোগী-চিন্তাধারার অধিকারী ছিলেন চট্টোপাধ্যায় বংশ চিরদিনই। প্রকাণ্ড সম্পত্তির মালিকানা সূত্রে অসার জমিদারিত্বে দিন কাটাবার নজির এখানে কম। বঙ্কিম পিতা যাদব ছিলেন ভারতের প্রথম ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট গোষ্ঠীর অন্যতম। পুত্রগণের মধ্যে বঙ্কিমচন্দ্র স্বনামখ্যাত, শ্যাম, সঞ্জীব এবং পূর্ণ বিদ্বান, বিদগ্ধ এবং স্ব স্ব জীবনে সুপ্রতিষ্ঠিত ছিলেন। পরবর্তী-কালেও ঐতিহ্যের এই অঙ্কুর চট্টোপাধ্যায় বংশ থেকে একেবারে অন্তর্হিত হয়েছে এমন কথা বলা যাবে না।

জন্ম ১৮৩৮ খৃস্টাব্দের ২৭শে জুন, বাংলা ১৩ই আষাঢ়, মৃত্যু ১৮৯৪ খৃস্টাব্দের ৯ই এপ্রিল (১৩০০ সাল ২৬শে চৈত্র)। বাল্য কৈশোরের মুষ্টিমেয়

পারুল ভট্টাচার্য

আদি জনক, দ্রষ্টা, স্রষ্টা, বন্দেমাতরমের অর্ধ শতাধিক বৎসরের কর্মজীবনের বঙ্কিমচন্দ্রের যে স্মৃতিটি বাঙালীর মানস-দর্পণে উজ্জ্বল ছায়া ফেলে আজও স্থির হয়ে আছে, তা বাংলার প্রথম গ্র্যাজুয়েট বঙ্কিমচন্দ্র নন। দক্ষ প্রশাসক বঙ্কিমচন্দ্রও নন। তিনি বাংলা সাহিত্যের আসি জনক, দ্রষ্টা, স্রষ্টা, বন্দেমাতরমের ঋষি, নবভারতের নতুন রূপকার, জাতির জীবনে অগ্নিমন্ত্রের আহ্বায়ক বঙ্কিমচন্দ্র। যুগান্ত জীর্ণ সংস্কার আর জড়ত্বের জঞ্জালে আবদ্ধ পয়ার ছন্দ মিল আর যতির শৃঙ্খলে আষ্টে-পৃষ্ঠে বাঁধা বাংলা সাহিত্যের বদ্ধ দলদলায় নবযুগের নতুন প্রাণবেগ, তীব্র স্রোতে বইয়ে দেবার কৃতিত্বই শুধু নয়, শতাব্দীর স্তব্ধ, প্রাণ-হারা, নিশ্চুপ, নিশ্চেতন জাতির মস্তিষ্কে আর মর্মকোষে আকস্মিক এক অশনি প্রহারে তাকে সচেতন করার, জাগিয়ে তোলার যে দুরূহ সাধনা, সে বোধকরি একমাত্র তাঁর পক্ষেই সাধ্য ছিল। আর সেই সুকঠোর সাধনাই ঋষিত্ব দিয়েছে তাঁকে, আরোপ করেছে অমরত্ব। যুগে যুগে কালে কালে বাংলা ভাষা, বাংলা সাহিত্য, আর বাঙালী জাতির চোখে স্বাধীন স্বতন্ত্র সুস্থ আত্মচেতনার স্বপ্ন মাত্রও অবশিষ্ট থাকবে যতদিন—ততদিন কিংবা বোধকরি তার চেয়েও বেশি।

প্রথম যৌবনেই প্রবল একটি আঘাত পেয়েছিলেন বঙ্কিমচন্দ্র। সংসার শুরুর সূত্রপাতেই জীবনের সবচেয়ে মদির মধুর স্বপ্নময় দিনগুলিতে তাঁর প্রথমা স্ত্রীর আকস্মিক অকালমৃত্যুতে।

মাত্র চোদ্দ বৎসর বয়সে বিবাহ হয়েছিল তাঁর নারায়ণপুরের চক্রবর্তী পরিবারে। পত্নীর নাম মোহিনী। বালিকা

রাধাবল্লভের মন্দির (কাঁঠালপাড়া)

বধূ পিত্রালয়েই ছিলেন দীর্ঘকাল। কৈশোর উত্তীর্ণ হয়ে যৌবনে পা দিয়েছেন তখন সবেমাত্র। বাইশ বছরের বঙ্কিমও নিজের পাঠজীবন শেষ করে প্রবেশ করেছেন চাকুরীতে। পোস্টিং হয়েছেন যশোরে ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট পদে। বিধি অনুযায়ী দিন, ক্ষণ, তিথি দেখে দ্বিরাগমন করে বধূ আনতে উদ্যোগী হলেন যাদবচন্দ্র। ছুটি নিয়ে বঙ্কিম এসেছেন। বৌ আনতে যাবেন শ্বশুরবাড়ি। এমন সময় অকস্মাৎ বজ্রপাতের মতই এসে পড়লো সংবাদ। কি এক দুরারোগ্য ব্যাধিতে মারা গেছেন মোহিনী। শোকের ছায়া নামলো চাটুজ্যে পরিবারে। স্তব্ধমূর্তি বঙ্কিম ফিরে গেলেন কর্মস্থলে। বাইরে নিঃশব্দ, চাঞ্চল্যের কোনও প্রকাশ নেই। অন্তরে কি ছিল তা একমাত্র তিনিই জানতেন।

দ্বিতীয়বার বিবাহ করেন রাজলক্ষ্মী দেবীকে। ইনি দীর্ঘজীবিনী ছিলেন। বঙ্কিমচন্দ্রের মৃত্যুর পরে আরও প্রায় সাতাশ-আটাশ বৎসর জীবিত ছিলেন এবং জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত বাস করে গেছেন কাঁঠালপাড়াতেই।

বঙ্কিম পিতা যাদবচন্দ্র প্রথম জীবনে তীক্ষ্ণধী ছাত্র এবং পরবর্তীকালে কুশলী প্রশাসকরূপে খ্যাত হয়েছিলেন দেশে। এছাড়াও পারিবারিক জীবনেও একটি কঠোর গাম্ভীর্য ব্যক্তিত্ব এবং সুদূরপ্রসারী সচেতন অন্তর দৃষ্টির অধিকার ছিল তাঁর। চাটুজ্যে বাড়ির প্রকাণ্ড দেউড়ী দিয়ে ভিতরে ঢুকে সামনেই চোখে পড়ে মস্ত উঁচু চৌকোণা ঠাকুরদালান। এই দালানেই একধারে সকাল-বিকেল বসবার ব্যবস্থা ছিল তাঁর। সামনে দেউড়ী সংলগ্ন সারি সারি ঘরগুলিতে ছেলেদের পড়াশুনো, ওপাশে কুলদেবতা রাধাবল্লভের মন্দির এবং সংলগ্ন প্রাঙ্গণ ও আর একদিকে অন্দরমহলের কর্মচাঞ্চল্য। সবই নজরে পড়তো এখান থেকে। এককথায় এইখানটিতে বসে আপন শাসিত সাম্রাজ্যের সবটুকুই নখদর্পণে রাখতে পারতেন তিনি। শৈশবে, কৈশোরে, বাল্যে কর্মজীবন শুরু করার আগে পর্যন্ত নিজেদের খুব আশেপাশে পিতার এই গম্ভীর অস্তিত্বের উপস্থিতি একটা প্রকাণ্ড প্রভাব সৃষ্টি করেছিল বঙ্কিম, সঞ্জীব প্রমুখ ভ্রাতৃগণের মধ্যে। বিশেষত বঙ্কিমচন্দ্রের চরিত্রে যাদবচন্দ্রের এই গাম্ভীর্য ও ব্যক্তিত্বের প্রভাব খুব সুস্পষ্ট। পিতার মনীষাও প্রতিবিম্বিত হয়েছিল তাঁর মধ্যে।

যে কোন কারণেই হোক জ্যেষ্ঠপুত্র শ্যামচন্দ্রকে তেমন পছন্দ করতেন না যাদব। নিজের জীবৎকালেই তাই পৈত্রিক ভিটা থেকে কিছুটা দূরে বাড়িঘর করিয়ে তাঁকে প্রায় পৃথকই করে দিয়েছিলেন। বঙ্কিমচন্দ্র—তিন কন্যার পিতা অপুত্রক। তাঁকে সম্পত্তি দিলে দৌহিত্রকুলে অর্শাবে। বিশেষত তাঁরা দুজনেই উপার্জনশীল এবং সুপ্রতিষ্ঠিত। শ্যামচন্দ্র সিনিয়র ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট। বঙ্কিমচন্দ্রও ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট হয়েছেন। এদিকে সঞ্জীব ঋণগ্রস্ত এবং পূর্ণচন্দ্র উপার্জনক্ষম হন নি তখন। তাই বড় শ্যাম ও মেজ বঙ্কিমকে বাদ দিয়ে বিপুল সম্পত্তি সঞ্জীব ও পূর্ণের মধ্যেই বেঁটে দিলেন যাদবচন্দ্র। পিতার এই বিচারে অভিমানে ক্ষুব্ধ বঙ্কিম কাঁঠালপাড়া ছেড়ে হুগলীতে গিয়ে বাসা বাঁধলেন। কাঁঠালপাড়ায় আর যাবো না। এই মর্মে সঞ্জীবচন্দ্রকে এক সুদীর্ঘ পত্রও লিখেছিলেন সেই সময়ে। অশেষ স্নেহপাত্র সহোদরকে শেষ পর্যন্ত সঞ্জীবও ফিরিয়ে নিয়ে আসেন কাঁঠালপাড়ায় আপন সম্পত্তির সমগ্র অংশই বিনাসর্তে তাঁর নামে লেখাপড়া করে দিয়ে।

সঞ্জীবচন্দ্রের এই স্নেহ ও শ্রদ্ধার কথা বঙ্কিমচন্দ্র স্মরণ রেখেছিলেন চিরকাল। কোন এক সময়ে কিছুদিন আর্থিক দুর্দশায় পড়েছিলেন সঞ্জীব। বঙ্কিমচন্দ্র তাঁকে প্রথমে এক শত ক্রমে ষাট এবং শেষের দিকে ত্রিশ টাকা করে অর্থ সাহায্য করতেন। তাছাড়াও ব্যক্তিগত এবং সাংসারিক জীবনেও বঙ্কিম ও সঞ্জীব প্রায় অভিন্ন অভেদাত্মা ছিলেন। একাধারে পরস্পরের স্নেহ শ্রদ্ধা ও চিন্তাধারার অংশীদার ভাই এবং বান্ধবও বটে। আদর করে বঙ্কিমচন্দ্র সঞ্জীবকে মধ্যমবাবু বলে ডাকতেন।

স্বভাবে সঞ্জীবচন্দ্রও তীক্ষ্ণধী, সুচতুর, সদালাপী এবং অত্যন্ত কৌতুকপ্রিয় ছিলেন। তাঁর কৌতুকপ্রিয়তার যতগুলি গল্প আছে তার মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য বোধকরি—রাস্তার নাম প্রসঙ্গে জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের মিটিং হলের গল্পটি। গল্পটি নির্দোষ গল্প মাত্র হয়ে থেমে থাকে নি। শেষ পর্যন্ত একটি প্রবল পরিণতি নিয়েছিল এবং সঞ্জীবের জীবনে এক বিপর্যয়ের সূত্রপাত ডেকে এনেছিল বললেও চলে।

তখন অস্থায়ী ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেটের পদে নিযুক্ত ছিলেন সঞ্জীব। প্রশাসনিক পরীক্ষাটি দেওয়া বাকী। পড়াশুনো চালিয়ে যাচ্ছেন, পাশ করলেই পুরোপুরি প্রশাসক হবেন এমন আশা।

দেশের নতুন পুরনো রাস্তাঘাট সারিয়ে, সংস্কার করিয়ে এবং নতুন করে নির্মাণ করে তাদের নতুন নতুন নামকরণের এবং পুরনো নামকে সরকারীভাবে নথিভুক্ত করার একটা হুজুগ চলছিল এই সময়ে। অত্যুৎসাহী জেলা ম্যাজিস্ট্রেট একটি মিটিং ডেকে বোঝাচ্ছিলেন—রাস্তার ধারে কাঠের, কিংবা পাথরের ফলকে রাস্তার নাম লিখে রাখতে হবে। এবং এই নাম শুধু বাংলাতে রাখলে চলবে না ইংরাজীতেও রাখতে হবে। এই বাবদে পঁচাত্তর টাকা সরকারী ব্যয়ও মঞ্জুর করেছিলেন তিনি।

এতদূর পর্যন্ত ভালই ছিল। গোল বাধলো ইংরাজী অনুবাদ করতে গিয়ে। গ্রামাটিক বিধানে রাস্তার নাম প্রোপার নাউন। তার কোন অনুবাদ হয় না। কিন্তু সাহেব করাতে চাচ্ছিলেন আক্ষরিক অনুবাদ। যেমন—উদাহরণ দিয়ে তিনি বললেন: বোমার গলির তলায় ইংরাজীতে লিখতে হবে ডটার-ইন-লজ লেন। রসিকতাপ্রিয় সঞ্জীব এতক্ষণ চুপ করেই বসেছিলেন। আর পারলেন না। তাঁর চরিত্রের কৌতুকপ্রিয়তা মাথা চাড়া দিয়ে উঠলো। হঠাৎ উঠে দাঁড়িয়ে বললেন—স্যার পঁচাত্তর টাকায় হবে না। আমি প্রস্তাব করছি আরও তিন শো টাকা মঞ্জুর করা হোক।

সাহেব বললেন—কেন?

সঞ্জীব বললেন—অনেক লিখতে হবে। তাছাড়া ব্যাকরণ বহির্ভূত এ রকম কটোমটো অনুবাদ যাকে তাকে দিয়ে করানো যাবে না। বিস্তর পড়াশোনা জানা লোক চাই এর জন্য। যেমন ধরুন—কালীপদ মিত্র গলি লিখলে চলবে না। ব্ল্যাক ফুটেড ফ্রেন্ড লেনও লিখতে হবে তার সঙ্গে। কাজেই—

সাহেব বুঝলেন। অন্তর্নিহিত শ্লেষটুকুও অজানা রইলো না তাঁর। রাগে, আপেল মুখ টম্যাটো বর্ণ করে প্রস্থান করলেন তিনি। হাসতে হাসতে কপালে ব্যথা। সঞ্জীব অবাক। সভাজন হতভম্ব। তারপর অদৃশ্য কার্যকারণ যোগে কোথা দিয়ে কি হলো বোঝা গেল না। বারবার পরীক্ষা দিয়েও কৃতকার্য হতে পারলেন না সঞ্জীব। ডেপুটির তালিকা থেকে নাম কাটা গেল তাঁর। অবশ্য পরে ঐ বেতনেই বর্ধমানে স্পেশ্যাল সাব-রেজিস্ট্রারের পদে নিযুক্ত হয়েছিলেন তিনি। কিন্তু দুর্ভোগ যা তা পুরোই ভুগতে হয়েছিল, আর প্রশাসনিক পরীক্ষায় পাশ করে ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেটও হয়ে ওঠা হয় নি জীবনে।

বঙ্কিমচন্দ্রের তিন কন্যা, প্রথমা শরৎকুমারী, স্বামী রাখালচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়। ইনি ঘরজামাই ছিলেন। শরতের চার ছেলে দিব্যেন্দুসুন্দর, পূর্ণেন্দুসুন্দর, শুভেন্দুসুন্দর ও ব্রজেন্দ্রসুন্দর। শুভেন্দুর সঙ্গে স্যার আশুতোষের কন্যা কমলার বিবাহ হয়।

দ্বিতীয়া নীলাব্জকুমারী, বিবাহ হয়েছিল উত্তরপাড়ার মুখোপাধ্যায় পরিবারে—স্বামী শ্রীসুরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়। তিন পুত্র নীলাদ্রি, হিমাদ্রি ও বিন্ধ্যাদ্রি। কনিষ্ঠা

এবং বঙ্কিমের সবচেয়ে আদরের কন্যা উৎপলকুমারীর বিবাহ হয়েছিল কলিকাতায়, স্বামী যতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। বন্ধ্যা ছিলেন, সন্তানাদি হয় নি। নিতান্ত অল্প বয়সে বঙ্কিমের জীবনৎকালেই আত্মহত্যা করেন। প্রথম জীবনে স্ত্রী-বিয়োগের পর পরিণত বয়সে উৎপলের এই আকস্মিক মৃত্যু কঠিন শোকের একটি আঘাত হেনেছিল বঙ্কিমচন্দ্রের বুকে। এবং সম্ভবত তাঁর মৃত্যুকেও ত্বরান্বিত করে এনেছিল। এরপর যতদিন জীবিত ছিলেন চাপা এক মনোবেদনা চিরসঙ্গী হয়েছিল তাঁর।

প্রথম উপন্যাস দুর্গেশনন্দিনী ছাড়াও আরও অনেকগুলি খ্যাত-বিখ্যাত উপন্যাস এই কাঁঠালপাড়ায় বসেই রচনা করেছিলেন বঙ্কিম। প্রথম উপন্যাস দুর্গেশনন্দিনী সম্বন্ধে একটি ধারণা প্রচারিত আছে প্রায় সর্বত্রই। বঙ্কিমচন্দ্র নাকি চাকুরীসূত্রে কিছুদিন আরামবাগে ছিলেন। সেই সময়েই গড় মান্দারণের জমিদারবাড়ির কীর্তিকলাপ লোকমুখে শুনে, বৃহৎ প্রাসাদ-দুর্গ আর প্রকাণ্ড গড় খাতের ধ্বংসাবশেষ নিজের চোখে দেখে তিনি দুর্গেশনন্দিনী রচনায় অনুপ্রাণিত হন এবং কতকাংশ রচনাও করেন। আরামবাগের এস ডি ও-র বাংলোয় এই মর্মে একটি শ্বেতপাথরের ফলকও লাগানো আছে দীর্ঘকাল।

কিন্তু অনুসন্ধানে যতদূর জানা যায় বঙ্কিমচন্দ্র আরামবাগে ছিলেন না কোনদিন। বরং সঞ্জীবচন্দ্র চাকুরীসূত্রে আরামবাগে ছিলেন কিছুকাল।

দুর্গেশনন্দিনী রচনার কাল এবং তার কাহিনী সংগ্রহ প্রসঙ্গে বঙ্কিম অনুজ শ্রীপূর্ণচন্দ্র লিখেছেন—

"আমাদের খুল্লপিতামহ ১০৮ বৎসর বয়ঃক্রম পর্যন্ত জীবিত ছিলেন। তিনি আমার পিতামহের মধ্যম ভ্রাতা। তাঁহার নিকট আমরা সকলে গল্প শুনিতাম।... তাঁহার নিকট বঙ্কিমচন্দ্র প্রথম গড় মান্দারণের ঘটনা শুনিয়া ছিলেন। আমাদের মেজ ঠাকুর্দার মধ্যে মধ্যে বিষ্ণুপুর অঞ্চলে যাতায়াত ছিল। মান্দারণ গ্রাম জাহানাবাদ ও বিষ্ণুপুরের মধ্যস্থিত। ঐ অঞ্চলে মান্দারণের ঘটনাটি লোকমুখে উপন্যাসের ন্যায় কিংবদন্তীরূপে চলিয়া আসিতেছিল। মেজ ঠাকুর্দা উহা ঐ স্থানে শুনিয়াছিলেন এবং মান্দারণের গড় ও বৃহৎ পুরী ভগ্নাবস্থায় দেখিয়াছিলেন।... এই গল্পটি বঙ্কিমচন্দ্র ২৮-২৯ বৎসর বয়ঃক্রমে শুনিয়া ছিলেন। তাহার কয়েক বৎসর পরে দুর্গেশনন্দিনী রচিত হইল।"

চট্টোপাধ্যায় ভবনের বিস্তীর্ণ প্রাঙ্গণ পার হয়ে ক'পা সামনে এগোলেই ডান হাতি প্রকাণ্ড পুকুর অর্জুনা। বঙ্কিম সাহিত্যে দুটি পুষ্করিণীর বিশেষভাবে স্থান এবং প্রভাব বিস্মৃত হন নি পাঠক। একটি বারুণী (কৃষ্ণকান্তের উইল) যেখানে নাকি বঙ্কিমের ভাষায় 'রোহিণী ডুবিতে গিয়াও ডুবিল না, ডুবিলেন গোবিন্দলাল'। আর অপরটি ভীমা। চন্দ্রশেখরের সেই কুখ্যাত ফস্টার শৈবলিনী সাক্ষাতের অশুভ ক্ষণটি ঘনিয়ে এসেছিল যেখানে।

এই বারুণী এবং ভীমার পরিকল্পনা করতে গিয়ে অর্জুনার স্মৃতি ছায়া ফেলেছিল তাঁর মনে এমন অনুমান করে থাকেন কেউ কেউ। অনুমান হয়তো খুব অসংগতও নয়—যদিও এ সম্বন্ধেও ১৩২২ সালের বৈশাখের বঙ্কিম-স্মৃতি সংখ্যা নারায়ণে পূর্ণচন্দ্র লিখেছেন—

"অনেকে এই পুষ্করিণীকে বঙ্কিমচন্দ্রের কৃষ্ণকান্তের উইলের বারুণী পুষ্করিণী বলিয়া স্থির করিয়াছেন তাহা ঠিক নহে। বারুণী পুষ্করিণী বঙ্কিমচন্দ্রের কল্পনার সৃষ্টি মাত্র"...কিন্তু আবার বর্ণনা প্রসঙ্গে তিনি নিজেই লিখেছেন অর্জুনার চারিদিকের পাড় আম্রকাননে সুশোভিত। এই আম্রকাননের গাছে গাছে অসংখ্য পাখি বাস করিত। প্রাতে বৈকালে ও সন্ধ্যায় সকল সময়েই তাহাদের কলরবে এই নির্জন সরোবরের চির নিস্তব্ধতা ভঙ্গ হইত। অর্জুনার উত্তরে বঙ্কিমচন্দ্রের ফুলবাগান ছিল। উহাতে একটি বাগানবাটীও ছিল। এক ব্যক্তি উহাতে বাস করিতে পারিত। কোনোরূপ কষ্ট হইত না।"

পাঠক স্মরণ করুন নির্জন বাগানবাটীতে এককবাসী গোবিন্দলালের চিত্তচাঞ্চল্য কিংবা অকস্মাৎ ফস্টার দর্শনে বিস্মিত বিপন্ন শৈবলিনীর চকিত মুখচ্ছবির আবছা আভাস হয়তো পেতে পারেন আজও।

বঙ্কিমচন্দ্রের নিজস্ব খাস বৈঠকখানাটি মূল ভবনের ঠিক সামনেই। পঞ্চরত্ন শিবমন্দিরের গা ঘেঁসে রাধাবল্লভের ও রাস ও নাটমঞ্চের মুখোমুখি। এটি ছিল বঙ্কিমচন্দ্রের একেবারে নিজস্ব। তাঁর বন্ধুবান্ধবদের সঙ্গে সাক্ষাৎ, ক্রীড়া-কৌতুক বিশ্রাম এবং নিভৃত চিন্তার একান্ত নিজস্ব নিকেতন। নানা উপন্যাসের পরিকল্পনা ও পটভূমি প্রস্তুত হয়েছে এখানে। এসেছেন হেমচন্দ্র, নবীনচন্দ্র, ভূদেব মুখোপাধ্যায় প্রমুখ প্রখ্যাত মনীষীকুল। বিষ্ণু ঘরানার বিখ্যাত গায়ক যদু ভট্টও এইখানেই বাস করে গেছেন মৃত্যুকাল পর্যন্ত। বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর কাছ থেকে সঙ্গীত শিক্ষা করতেন। এই বৈঠকখানা ও তার সংলগ্ন ফুলবাগান সম্বন্ধে মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী ১৩২০ সালের বৈশাখ সংখ্যা 'নারায়ণে' লিখেছিলেন—

"রাধাবল্লভের গেটের বাহিরেই একখানা খুব বড় পাঁচচালা ঘর, এই ঘরের সামনে একটি প্রকাণ্ড আটচালা...এই আটচালায় রথের সময় যাত্রাগান, নাচ, কীর্তন কথকতা প্রভৃতি হইত। ...... আটচালার পশ্চিমে একটি মন্দির, মন্দিরটির দক্ষিণদিকে বঙ্কিমবাবুর বসিবার ঘর ও পশ্চিমদিকে আর একটি ঘর। যাহাকে বঙ্কিমবাবু আদর করিয়া তোষাখানা বলিতেন। সেখানে তামাক খাওয়ার সব সরঞ্জাম রাখা থাকিত।......সেই ঘরের অধিষ্ঠাতা দেবতা বঙ্কিমবাবুর চাকর শ্রীমান মুরলী।...... দক্ষিণদিকে শিবমন্দির সংলগ্ন একটি বড় দালান। পশ্চিমের ঘরটিতে ১খানি খাট থাকিত, পূবের ঘরটিতে একটি ফরাস

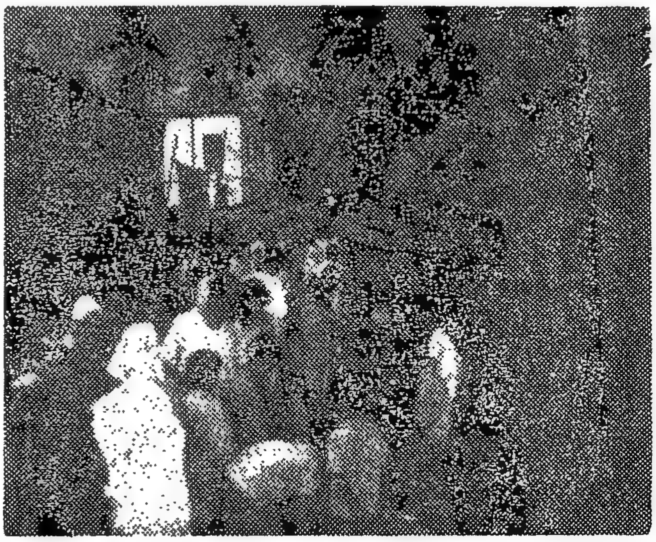

রথের মেলা (কাঁঠালপাড়া)

কাঁঠালপাড়ার কেন্দ্রস্থল—ঋষি বঙ্কিম গ্রন্থাগার সংগ্রহশালা ও সংলগ্ন চট্টোপাধ্যায়দের প্রাসাদ ও শিবমন্দির।

থাকিত। পশ্চিমের ঘরটিতে বঙ্কিমবাবু দিনের বেলায় শুইতেন। পূবের ঘরটিতে একা বসিয়া লেখাপড়া করিতেন। দুই-একজন বিশেষ আত্মীয়েরও সেখানে যাইবার অধিকার ছিল। কখনও কখনও সেই ঘরটিতে দুই-একখানি চেয়ার-টেবিলও দেখিয়াছি। দালানটিতে দালানজোড়া একটি ফরাস পাতা থাকিত। অনেকগুলি তাকিয়া থাকিত। হারমোনিয়াম থাকিত। সময় সময় অন্যান্য অনেকরকম বাজনাও থাকিত। দালানের উত্তরদিকে একটি দরজা ছিল। সেই দরজা দিয়া তোষাখানায় যাওয়া যাইত।

একটি ছোট ফুলের বাগান। দু'কাঠাও পুরা হইবে না। ঘর দুটি একত্রে যতখানি লম্বা বাগানটিও ততটাই। আড়েও প্রায় ঐরূপ। তিনদিকে পাঁচিল দিয়ে ঘেরা। তা পাঁচিলের আগায় একটি আলসে ও তাহার নিচে একটি বেঞ্চি। চারিদিকেই এইরূপ। বাগানের ঠিক মাঝখানে একটি ছোট চৌকা হাতখানেক উঁচা। তাহার মাঝখানে আর একটি চৌকা হাতখানেক উঁচা। চারদিকে যেন গ্যালারীর মতো। এই সমস্ত গ্যালারীর চারিদিকেই টব সাজানো থাকিত। টবে নানারূপ রঙীন ফুল ও পাতার গাছ। বাগানে আর যেটুকু জমি ছিল তাহাতে সুরকীর কাঁকর দিয়া রাস্তা করা। মধ্যে জমিতে যুঁই জাতি কুঞ্জ মল্লিকা ও নবমল্লিকার গাছ। বর্ষাকালে ফুল ফুটিয়া সব সাদা হইয়া যাইত। এবং বৈঠকখানাটি গন্ধে ভরপুর হইয়া থাকিত। বঙ্কিমবাবু বাগানটিকে বড়ই ভালবাসিতেন। যতদিন তিনি বাড়ি থাকিতেন বাগানটি খুব সাবধানে পরিষ্কার রাখিতেন ও মাঝে মাঝে সময় পাইলে আলসেটিতে হেলান দিয়া বেঞ্চের উপর বসিয়া ফুলের বাহার দেখিতেন।

সেই বাগান আজও আছে। কিন্তু যুঁই জাতি নবমল্লিকার বাহার আর নাই। কয়েকটি পাতাবাহার। একটি-দুটি বিষণ্ণ গোলাপ আর একসারি পুষ্পিত বোগেনভিলিয়ার অজস্র রঙোচ্ছ্বাসে বাগানটির অস্তিত্বমাত্র রক্ষিত হয়েছে।

বৈঠকখানা ভবনটিও দীর্ঘদিনের অযত্নে অবহেলায় অবলুপ্তির দ্বারপ্রান্তেই পৌঁছে গিয়েছিল প্রায়। শোনা যায় প্রথমদিকে পদ্মনাথ ভট্টাচার্য নামে বঙ্কিম-অনুরাগী এক আগন্তুক বিদেশী ভদ্রলোক সাধ্যমতো আপন অর্থ ব্যয় করে গৃহটির সংস্কার ও সংরক্ষণ করেছিলেন। তার পরে ১৯৩৮ সনে নৈহাটী তথা কাঁঠালপাড়ার জনসাধারণ উদ্যোগী হয়ে বঙ্কিমচন্দ্রের দৌহিত্রদের কাছ থেকে কিনে নিয়ে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের হাতে সমর্পণ করেন ভবনখানি। সাহিত্য পরিষদ সংস্কার এবং সংরক্ষণের বন্দোবস্ত করলেন বটে, কিন্তু অন্য কোনো কাজকর্ম আর কিছু হয় নি দীর্ঘকাল। তারপর উত্তর-স্বাধীন দেশে পূর্তমন্ত্রী শ্রীবিমলচন্দ্র সিংহ যখন বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের ভাইস চেয়ারম্যান ছিলেন সেই সময়ে তাঁরই উদ্যোগে এই বাড়ি সরকারের হাতে সমর্পণ করা হয়। এবং সরকারী ব্যয় ও তত্ত্বাবধানে একটি গ্রন্থাগার ও সংগ্রহশালা প্রতিষ্ঠিত হয় এখানে।

গ্রন্থাগারে সমগ্র বঙ্কিম সাহিত্য-সম্ভার ও আরও কিছু কিছু দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থরাজি সংরক্ষিত আছে। সংগ্রহশালায় বঙ্কিমচন্দ্রের শাল, পাগড়ী, আলো, আলোয়ান, আলবোলা, ছড়ি, বঙ্কিম ও সঞ্জীবের দাবাখেলার ঘুঁটি, চাটুজ্যে পরিবারের বহু প্রাচীন তৈলচিত্র এবং বঙ্কিমচন্দ্র লিখিত প্রায় আড়াই শতাধিক চিঠিপত্র আছে। যার মধ্যে পিতা যাদব-চন্দ্র ভ্রাতা সঞ্জীব এবং সঞ্জীবের পুত্র জ্যোতিষচন্দ্রকে লেখা চিঠির সংখ্যাই সর্বাধিক।

বইগুলির পাণ্ডুলিপি নেই। কিন্তু কোনো কোনো ইংরাজী বইয়ের স্বহস্তে-লিখিত নোট আছে। বঙ্কিমচন্দ্রের নিজস্ব দুখানি ইংরাজী অভিধান, বঙ্কিম সম্বন্ধে কোথাও কিছু প্রকাশিত হয়েছে এমন অনেক পত্র-পত্রিকার ছিন্নাংশ, ছাত্র-জীবনে ভাটপাড়ার প্রখ্যাত পণ্ডিত শ্রীরাম ন্যায়বাগীশের গৃহে তুলোট কাগজে লেখা সংস্কৃত শকুন্তলা পড়ে মুগ্ধ হয়েছিলেন বঙ্কিমচন্দ্র সেই বইখানি এবং বঙ্কিমের উইলের প্রতিলিপি। প্রতিলিপিটির কিছু কিছু অংশ এখানে উদ্ধৃত করে দেওয়া গেল—

লিখিতং শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র চট্টো। সাং কাঁঠালপাড়া, থানা নৈহাটী, জেলা ২৪ পরগণা, মোকাম শহর কলিকাতা ৫ নং প্রতাপচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের গলি। কস্য উইলপত্র মিদং কার্যাঞ্চাগে—যেহেতু আমার প্রাচীন বয়স উপস্থিত এক্ষণে আমার সম্পত্তি সম্বন্ধে উইল করা বিধেয়। এজন্য স্বেচ্ছাক্রমে সুস্থ শরীরে সজ্ঞানে নিম্নলিখিত মত উইল করিতেছি।

১। আমার মৃত্যুর পর আমার যে কিছু স্থাবর অস্থাবর, পুস্তকের কপি-রাইট বা অপর যে কিছু সম্পত্তি আছে বা থাকিবে তাহাতে আমার বনিতা শ্রীমতী রাজলক্ষ্মী দেবী সম্পূর্ণ অধিকারী হইবেন। এবং তাহাতে দান বিক্রয় ও হস্তান্তর করায় তাঁহার সম্পূর্ণ অধিকার থাকিবে। এবং ঐ সকল সম্পত্তি সম্বন্ধে তিনি নিজে উইল করিতে পারিবেন।

২। কেবল এই সকল সম্পত্তির মধ্যে শহর কলিকাতার পটলডাঙ্গায় অবস্থিত প্রতাপচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের গলিতে ৫ নম্বরের যে খরিদা পাকাবাড়ী ও ৪ নম্বরের যে জমি আছে তাহা আমার উক্ত বনিতা শ্রীমতী রাজলক্ষ্মী দেবী দান বিক্রয় বা হস্তান্তর করিতে পারিবেন না। বা তৎসম্বন্ধে উইল করিতে পারিবেন না। তাঁহার মৃত্যুর পর ঐ ৫ নম্বরের বাটী ও চার নম্বরের ভূমি আমার কন্যা শ্রীমতী শরৎকুমারী দেবী প্রাপ্ত হইবেন। এবং তাঁহার উহাতে দান বিক্রয় বা অন্য প্রকারের হস্তান্তর করিবার ক্ষমতা থাকিবে। যদি আমার বনিতা রাজলক্ষ্মী দেবীর মৃত্যুকালে (ঈশ্বর না করুন) আমার জ্যেষ্ঠা কন্যা বর্তমান না থাকেন,

হবে উক্ত পাঁচ নম্বরের ভবন ও চার নম্বরের ভূমি শরৎকুমারী দেবীর জ্যেষ্ঠ পুত্র প্রাপ্ত হইবেন।

৩। যদি আমার মৃত্যুর পর আমার বনিতা রাজলক্ষ্মী দেবী বিবেচনা করেন যে, উক্ত পাঁচ নম্বরের বাটী ও চার নম্বরের ভূমি বিক্রয় করা আবশ্যক, তবে আমার কন্যা শ্রীমতী শরৎকুমারী দেবীর লিখিত সম্মতি লইয়া করিতে পারিবেন নচেৎ পারিবেন না। ঈশ্বর না করুন যদি ঐ সময়ে শরৎকুমারী দেবী বিদ্যমান না থাকেন তবে, রাজলক্ষ্মী দেবী আপন স্বেচ্ছাক্রমে ঐ ভূমি ও ভবন বিক্রয় করিতে পারিবেন, কাহারও সম্মতির অপেক্ষা করিতে হইবে না।

৪। যদি আমার মৃত্যুর পূর্বেই আমার উক্ত বনিতা শ্রীমতী রাজলক্ষ্মী দেবীর মৃত্যু হয়, তবে আমার মৃত্যুর পরে আমার সম্পত্তিতে যে যে প্রকারে স্বত্ববান ও অধিকারী হইবে তাহা নিম্নে লিখিলাম—

(ক) আমার সমস্ত সম্পত্তির মধ্যে যাহা স্থাবর সম্পত্তি তাহাতে আমার জ্যেষ্ঠা কন্যা শ্রীমতী শরৎকুমারী দেবী সম্পূর্ণ স্বত্বাধিকারিণী হইবেন। তাঁহার দান বিক্রয়ের অধিকার থাকিবে। ইহার মধ্যে আমার কাঁঠালপাড়ার যে পৈতৃক ভদ্রাসন আছে তাহাতে আমার দ্বিতীয়া কন্যা শ্রীমতী নীলাব্জকুমারী এবং আমার কনিষ্ঠা কন্যা শ্রীমতী উৎপলকুমারীর যাবজ্জীবন বাস করিবার অধিকার রহিল।

(খ) আমার অস্থাবর সম্পত্তির মধ্যে আমার শাল, রুমাল, ইলবাম, পোষাক, গাড়ি, ঘোড়া, ঘড়ি ঝাড়লণ্ঠন আসবাব ও লাইব্রেরী আমার জ্যেষ্ঠ জামাতা শ্রীমান রাখালচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় প্রাপ্ত হইবেন। অবশিষ্ট অস্থাবর সম্পত্তি আমার তিন কন্যা তুল্যাংশে পাইবেন।

(গ) আমার লিখিত পুস্তক কপিরাইটে আমার যে স্বত্ব তাহা আমার জ্যেষ্ঠা কন্যা শ্রীমতী শরৎকুমারী দেবী প্রাপ্ত হইবেন......

(ইতি তারিখ সন ১৮৬৭, ২১শে ফেব্রুয়ারী)

ইতি—

শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

গ্রন্থাগার দেখাশুনায় গ্রন্থাগারিক আছেন শ্রীসন্তোষকুমার চট্টোপাধ্যায়। সংগ্রহশালা দেখাশুনা করেন কিওরেটর শ্রীগোপালচন্দ্র রায়। যোগ্য ব্যক্তি সন্দেহ নেই। মনীষীদের জীবন এবং জীবনী নিয়ে—বিশেষত শরৎচন্দ্র এবং বঙ্কিমচন্দ্র সম্বন্ধে বিস্তর পড়াশুনা এবং গবেষণা করেছেন তিনি। বাইরের দেওয়ালে শ্বেত মর্মর ফলকে ভবন সংস্থাপকরূপে শ্রীঅতুল্যচরণ পুরাণরত্নের নাম পাওয়া গেল। কিন্তু আদি সংরক্ষক শ্রীপদ্মনাথ ভট্টাচার্যের উল্লেখ দেখতে পাওয়া গেল না কোথাও। থাকা উচিত। ভুললে চলবে না সংস্কারের অভাবে সমগ্র ভবনখানিই যখন ভূমিসাৎ হতে বসেছিল, তখন সেই বহিরাগত ভদ্রলোকই আপন শ্রম সময় ও অর্থ ব্যয় করে রক্ষা করেছিলেন তাকে।

শোনা গেল বঙ্কিমচন্দ্রের সমস্ত বাস-ভবনখানি নিয়ে একটি গবেষণাগার, একটি রঙ্গমঞ্চ, দর্শকগৃহ ও জেলা গ্রন্থাগার স্থাপিত হবে। পরিকল্পনা নিয়েছেন কর্তৃপক্ষ, কাজ এখনও এগোয় নি কিছু। আপাতত বাড়িখানি জীর্ণ, জঙ্গল গজিয়েছে এদিকে ওদিকে, ছাদের ফাটলে পাঁচিলের খাঁজে বট-অশ্বত্থে-নির্মম সমারোহ। কিছু করতে হলে খুব তাড়াতাড়িই করা দরকার। নইলে হয়তো কিছুই করা হয়ে উঠবে না শেষ পর্যন্ত।

চট্টোবংশের গৃহদেবতা রাধাবল্লভ কালক্রমে এখন প্রায় গ্রাম দেবতাতেই পরিণত হয়েছেন। আদিতে কিন্তু ইনি চট্টোপাধ্যায়দের ঠাকুর ছিলেন না। মাতামহ রঘুদেব ঘোষালের আমল থেকে এঁর আবির্ভাব এখানে।

বৈষ্ণব সন্ন্যাসী রামরঞ্জন গোস্বামীর ঠাকুর। বিগ্রহ বুকে করে গোস্বামী যাচ্ছিলেন গঙ্গাসাগর তীর্থে। পথে অসুস্থ ও অবসন্ন হয়ে আশ্রয় নেন কাঁঠালপাড়ায়। রঘুদেব তাঁকে আশ্রয় আহার ও বিশ্রাম দিলেন, বৈদ্য ডেকে

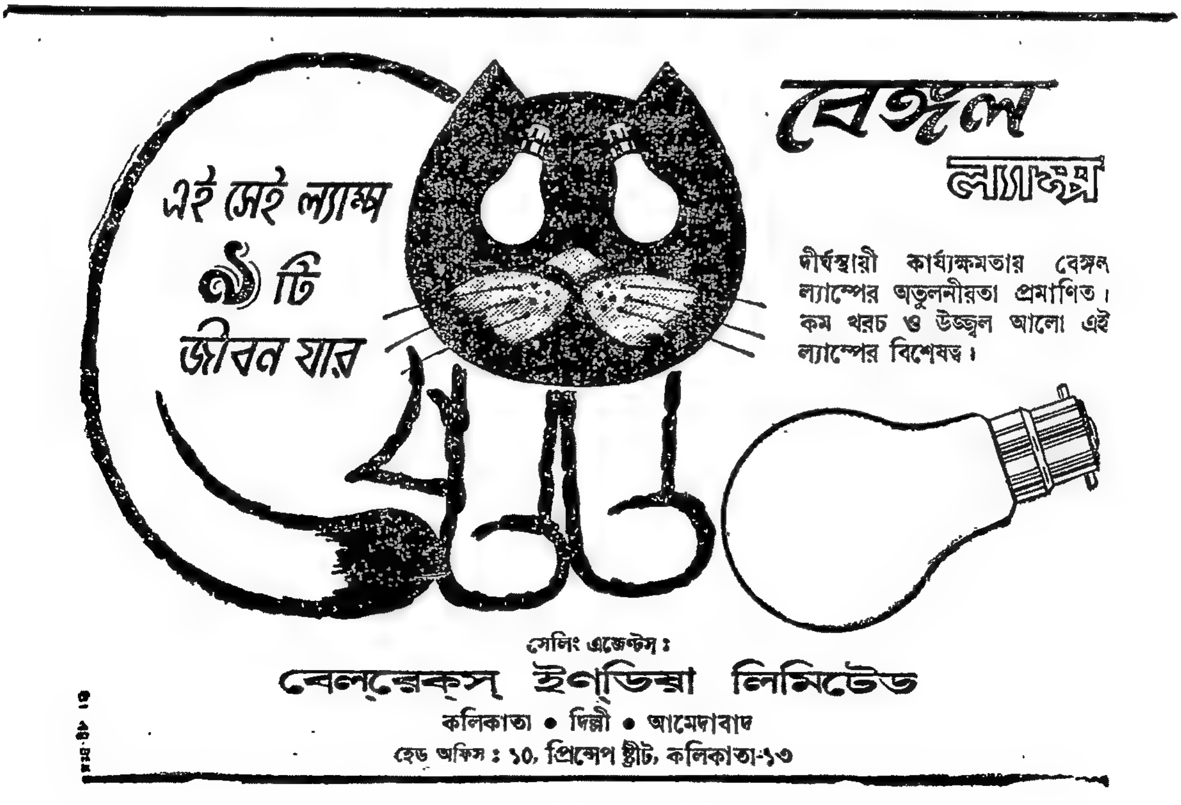

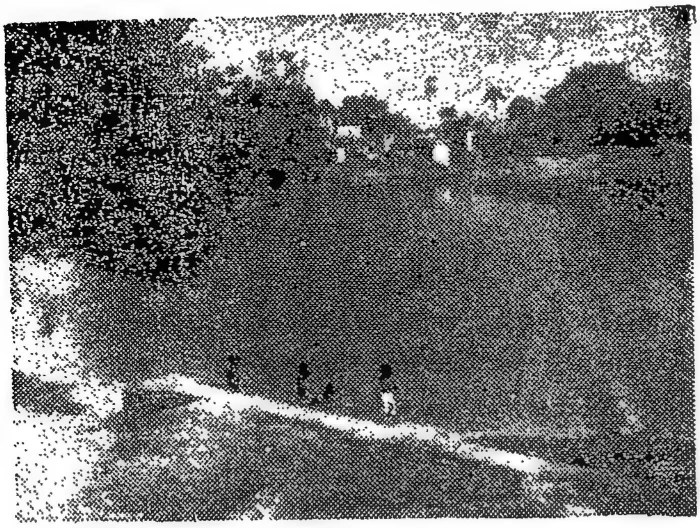

অর্জুনদীঘি (কাঁঠালপাড়া)

উপযুক্ত চিকিৎসারও বন্দোবস্ত করে দিলেন। আরোগ্যান্তে সুস্থ সন্ন্যাসী বললেন আমি বৃদ্ধ হয়েছি, সাগর তীর্থ দুর্গম ফিরে আসবো কিনা জানি না। বিগ্রহ তোমার কাছে গচ্ছিত রইলো। যদি ফিরে আসি আমি পুনঃ গ্রহণ করবো, অন্যথায় এই দেবতার সেবাপূজার ভার তোমার।

সন্ন্যাসী চলে গেলেন, আর ফিরে আসেন নি। পুরুষানুক্রমে রাধাবল্লভও রয়ে গেলেন কাঁঠালপাড়ায়। আদিতে কেবল কৃষ্ণমূর্তি ছিলেন। রাধিকা ও বলরাম পরে নির্মাণ করিয়ে নেওয়া হয়। বহুদিন যাবৎ পৃথক মন্দির ছিল না রাধাবল্লভের। রঘুদেবের গৃহবিগ্রহ অনন্তদেব শীলার সংগে বাড়ির মধ্যেই পূজিত হতেন তিনি। বর্তমান মন্দির যাদবচন্দ্রের আমলে নির্মিত। মন্দিরের গায়ে মর্মর ফলকে উৎকীর্ণ আছে—

এই মন্দির যাদবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক সন ১২৫৮ সালে নির্মিত; পরে তাঁহার তৃতীয় পুত্র বঙ্কিমচন্দ্র ও কনিষ্ঠ পুত্র শ্রীপূর্ণচন্দ্র কর্তৃক সংস্কৃত।

সন ১৩৪০ সালে পূর্ণ-পুত্র বিপিনচন্দ্র কর্তৃক সু-সংস্কৃত। তৎপরে পঙ্কজকুমারের মধ্যম পুত্র (বিপিনচন্দ্রের পৌত্র) শ্রীমিহির চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক পুনঃ সু-সংস্কৃত। সন ১৩৬৮ সালে। পঞ্চরত্ন শিবের মন্দিরটিও যাদবচন্দ্র কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত। নাম যাদবেশ্বর শিব। মন্দিরের অবস্থাও জীর্ণ। চূড়ায় চূড়ায় শ্যাম সমারোহ অলংঘ্য কালের নির্দেশ জানাচ্ছে।

রাধাবল্লভের রথযাত্রা ও রথের মেলা খুব ধুমধামের উৎসব এখানে। মেলা সুরু হয় যাদবচন্দ্রের আমল থেকে। ধুমধাম যাত্রা কীর্তন কথকতা খুব ছিল আগে। এখন সে সব নেই। তবু ঠাকুর আছেন, চিরকালের মিলন-মুখো মন মানুষ আছে। আর আছে দোকানপসার, হাট-বাজার। সওদা আর সওদাকারীর ভিড়। রাধাবল্লভের রথের মেলা আকারে ছোট বটে কিন্তু প্রকারে দীন নয় মোটেই। আর তাই যদিও একটু আগেই ঠাকুর দেখতে গিয়ে আমার জুতো জোড়াটি খোয়া গেছে ভিড়ের গণ্ডগোলে তথাপি খালি পায়েই মেলার ভিড়ে মিশে যেতে একটুও অসুবিধা হলো না আমার। (বিশেষত শোনা গেল কোন এক সম্মেলনে এসে শ্রদ্ধেয় সাহিত্যিক শৈলজানন্দেরও নাকি এক পাটি জুতো হারিয়ে গিয়েছিল। কাজেই আমার দু'পাটি হারানো খুবই স্বাভাবিক। দুঃখ করবার কোন সঙ্গত কারণ নেই।)

সওদা অনেক আসে মেলায়। ব্যাপারিদের মতে এবারে বরং কিছু কম। তবু যা এসেছে তার পরিমাণ সংখ্যা এবং বৈচিত্র্যও কিছু কম নয়। খেলনা পুতুল কাঁচের চুড়ি মেলার সেই চিরকালের সস্তা মনোহারী তো আছেই, কাটা-কাপড়ের পোশাক, সস্তার জুতো, কাচের বাসন, কাঠের সাজ, তেলেভাজা পাঁপড়, ঘুগনী, বাদাম বিক্রি হচ্ছে। বড় বড় ফজলী আম টাকায় দুটো, একপাশে কিছু কাঁঠাল গাদা করা আছে, গন্ধে মেলাতলা ম-ম—ঔৎসুক ক্রেতার ভিড়ে উঁকি মারবারও জায়গা নেই সেখানে। ছোট ছোট নার্সারী এসেছে গোটা দুই-তিন। দি এন্ কে নার্সারী, নসীবপুর মীরপুকুর নার্সারী। আম, নারিকেল, পেয়ারা, জামরুল, কাগজীলেবু, পাতিলেবুর কলম পাওয়া যাচ্ছে। যুঁই মালতী গোলাপ বেল্য গন্ধরাজ ফুলের চারারও অভাব নেই।

বিক্রিবাটা তেমন নেই—বিষণ্ণমুখে বললেন মীরপুকুর নার্সারীর মালিক। গাছ-পালা ঘাড়ে করে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে হবে বলেই মনে হচ্ছে।

মানুষ চাল কিনতেই পরেসান, গাছ কিনবে কি করে বলুন। ওপাশ থেকে মুখ বাড়ালেন নসীবপুরের মালিক। আমি বিষণ্ণ হলাম ভেবে দেশজুড়ে যে সমস্যার শিকড় শক্ত হয়ে আষ্টেপৃষ্ঠে ছড়িয়ে পড়েছে তার হাত থেকে মুক্তি নেই কারও। মানুষের নয়, ঐ তাজা সবুজ জলে ধোওয়া জড়ো করা চারাগাছগুলিরও না, পসরা আর পসারী বাঁধা পড়েছে একই বাঁধনে।

বিকেল প্রায় গড়িয়ে এসেছে। বেলা শেষের নিভু নিভু সূর্য মুঠো মুঠো আবীর গুলেছে অর্জুনা দীঘির জলে। মেলার মানুষ ঘরমুখো। এতদূর থেকেও তাদের পথ-চলতি ব্যস্ততা লক্ষ্য করা যায়। সকলের সব সওদা সারা হলো এবার ঘরে ফেরার পালা।

সেই ঘনিয়ে আসা সন্ধ্যায় আলো-আঁধারী আবছায়ায় গা ডুবিয়ে বসে-ছিলুম অর্জুনা পুকুরের জলের একেবারে ধার ঘেঁসে। সারাদিন ঘুরেছি। মন স্মৃতিভারে মন্থর। সকালের সব সওদা সারা হলো আমার শুধু খালি হাত।

ভাবছিলাম কাঁঠালপাড়া লিখতে গিয়ে বঙ্কিমচন্দ্রের কথাই কেবল লিখতে হবে। বৃন্দাবনে কানু ছাড়া গীত নেই। বঙ্কিম ছাড়া কোনো অতীত নেই কাঁঠালপাড়ার ইতিহাসে। সর্ব চেতনা সমগ্র হৃদয় দিয়ে সেই একটি তীব্রোজ্জ্বল দৃপ্ত মূর্তি অশরীরী সত্তাকে যেন অনুভব করতে পারছিলাম আমি।

দিনের আলোর শেষ রেশটুকুও মিলিয়ে গেছে। রাস্তা দিয়ে মানুষ চলেছে তখনও ঘরমুখো। দূর থেকে ভেসে আসছে পথ-চলতি কোনো শিশুর হাতের খেলনা বাঁশীর টিঁ টিঁ আওয়াজ।

এবার উঠতে হয়—

[আলোকচিত্র লেখিকা কর্তৃক গৃহীত। পরবর্তী সংখ্যায় কাঁঠালপাড়া আজকের—]

দৃষ্টি

বীরু চট্টোপাধ্যায়

—সিস্টার?

ছোট্ট কেবিনটিকে গোছাতে গোছাতে নার্স মণিকা বিশ্বাস মুখ তুলে স্নিগ্ধ-কণ্ঠে বললে, বলুন?

—আজ তো আমার ব্যান্ডেজ খোলার দিন, তাই না সিস্টার?

—হ্যাঁ, মিস্টার বোস। আর আধ ঘণ্টার মধ্যেই ডাক্তার সাহেব এসে যাবেন।

পেসেন্ট সদানন্দ বোস একটি কুশান চেয়ারে বসেছিল। সামনেকার ফ্রেঞ্চ উইন্ডো দিয়ে শরৎকালের কাঁচা সোনা রোদ্দুরের কিছুটা কেবিনের মধ্যে এসে পড়েছে।

নার্সিংহোমের একটি শ্বেত-শুভ্র ছোট্ট কেবিন। একপাশে সুকোমল বিছানা সহ একক খাট। পাশে একটি আলমারী ও টিপয়। খান দুই চেয়ার। ডান-দিকের দেয়াল ঘেঁসে একটি ড্রেসিং-টেবিল।

নার্স মণিকা একটি পালকের ঝাড়ন দিয়ে আসবাবপত্রগুলির, মৃদু হস্তে, ধুলো সাফ করছিল। তারপর ড্রেসিং টেবিলের ওপরকার চীনেমাটির চিত্র-বিচিত্র ফুলদানী থেকে শুকিয়ে-যাওয়া ফুলগুলিকে ফেলে নতুন একগুচ্ছ ফুল তাতে ভরে দিল। ফুল পাল্টাবার মুখে কিছুটা জল ছলকে পড়ল ড্রেসিং টেবিলের ওপর। হাতের কাছে কোন কিছু মোছবার না পেয়ে কি যেন বারেক ভাবলে। একবার নিজের কড়া মাড়-দেওয়া দুধশাদা পোশাকের পানে তাকাল। অতঃপর হাঁটুর ওপর শাড়িটাকে তুলে অন্তর্বাসের শেষসীমা দিয়ে মুছতে লাগল ড্রেসিং টেবিলের জলসিক্ত স্থানটি। ফর্সা হাঁটুর দিকে চেয়ে সহসা সলজ্জভাবে মণিকা পেসেন্টের দিকে ফিরে চাইল। লজ্জা পাবার অবশ্য কোন কারণ ছিল না। অন্য পেসেন্ট হলে এ ব্যাপার কখনই সম্ভব হত না। কিন্তু ঐ যে কুশান চেয়ারে সুন্দর সুগঠিত যুবক পেসেন্টটি বসে আছে, তার নজরে এসব কিছুই আসছে না। কেন না তার দুটি চোখ সহ কপালের কিছুটা নিয়ে মাথা ঘিরে রয়েছে নিপুণ একটি ব্যান্ডেজ।

সুকঠিন অস্ত্রোপচার হয়েছে তার চোখে।

—সিস্টার।

ঝট্ করে শাড়িটা নামিয়ে ফেলল মণিকা, নেহাৎ অভ্যাসবশতই। তারপর এগিয়ে গেল সদানন্দ বোসের কাছে। সুমিষ্টকণ্ঠে বললে,—বলুন, মিস্টার বোস!

—বড্ড আনন্দ হচ্ছে. আমার আজ ব্যান্ডেজ খোলা হবে, আর তারপর...... উঃ, ভাবতে পারছি না।

—আর বেশি দেরি নেই। আর একটু ধৈর্য ধরে থাকুন। ডাক্তার সাহেব এলেন বলে।

কেবিনের চতুর্দিকে ভালভাবে চোখ বুলিয়ে দেখল মণিকা। কোন অসঙ্গতি, কোন ত্রুটি যেন নজরে না পড়ে। বিখ্যাত ডাক্তার, শুধু কলকাতা নয়, সারা ভারতের চোখের অসুখে, চোখের অস্ত্রোপচারে ধন্বন্তরী বিশেষ। এতবড় সার্জন এই ধরণের ছোটখাটো নার্সিংহোমে কদাচিৎ পদার্পণ করেন। বড় বড় মানুষের বড় বড় ব্যাপার। কোন ত্রুটি-বিচ্যুতি হলে, মুখে হয়ত কিছু বলবেন না, কিন্তু ধারণা খারাপ হয়ে যাবে এবং সেটা হবে খুবই লজ্জার। মণিকা তাই সদা সন্ত্রস্ত থাকে। আজ ডাক্তার সাহেবের আগমন প্রতীক্ষায় তাই সে শশব্যস্ত হয়ে আছে।

সদানন্দ বোস। বয়স কতই বা হবে, বছর ছাব্বিশ-সাতাশ। সুন্দর সুগঠিত গৌরবর্ণ চেহারা। যেন চিত্রাভিনেতা নায়ক। মুখের নিম্নাংশ যা দেখা যাচ্ছে তার মধ্যে কোথাও যেন একটা শিশুর লাবণ্য প্রচ্ছন্ন হয়ে আছে। এ দেহে ঐ মুখ যেন বেমানান। সপ্রশংস দৃষ্টিতে তার দিকে তাকিয়ে মণিকা বললে,

...ক, সমস্ত ...ঝামেলার আজই অবসান হয়ে যাবে। আনন্দ হবার কথাই, খুবই খুশির দিন আজ। আর কিছুক্ষণের মধ্যেই আপনার সমস্ত দুশ্চিন্তা, সমস্ত কষ্টের লাঘব হবে।

সদানন্দ বোস, একটি ইস্পাত কারখানার দক্ষ কর্মী। সাংঘাতিক এক দুর্ঘটনায় ক'দিন পূর্বে পুরোপুরি অন্ধ হয়ে গিয়েছিল। তারপর প্রখ্যাত বিশেষজ্ঞ ডাক্তার অস্ত্রোপচার করেছেন ওর চোখে দৃষ্টিশক্তি ফিরিয়ে আনবার মানসে। আজ ব্যান্ডেজ খোলার দিন।

—ঠিকই বলেছেন সিস্টার, হাসিমুখে সদানন্দ উত্তর দেয়, তবে এটা ঠিক আমি এতটুকু ভাবছি না। কোনরকম দুশ্চিন্তা আমার নেই। এ বিষয়ে আমার কোনপ্রকার সন্দেহই নেই যে......।

—মিস্টার বোস, মণিকা খানিক ইতস্তত করে বললে, সামনে হলেও একথা বলতে বাধা নেই যে, আপনি বড় ভাল পেসেন্ট। আপনার ধৈর্য-স্থৈর্য চমৎকার। অন্যান্য বহু পেসেন্ট দেখেছি, বড় বেশি নার্ভাস হয়ে যায়। আপনি কিন্তু সে ধরণের মোটেই নন।

—না, না, আমি নার্ভাস হব কেন। আমি ভাগ্যবান, নয়ত এত বড় ডাক্তারের যোগাযোগই বা হল কি করে। এতবড় মানুষ, কিন্তু কি চমৎকার ব্যবহার, মনে হয়েছে, আমি যেন একজন ভি, আই, পি, গোছের মানুষ। অবশ্য যোগাযোগটা হয়েছে সুমিত্রার জন্যে। সুমিত্রার এক সহপাঠিনীর মেসোমশাই হন এই ডাক্তারবাবু।

—তা ঠিক। ডাক্তারবাবু অতি অমায়িক মানুষ।

—আচ্ছা সিস্টার, ডাক্তারবাবুকে কেমন দেখতে?

—আর কিছুক্ষণ অপেক্ষা করুন, নিজেই দেখতে পাবেন। বহুদিনই অপেক্ষা করেছেন, আর একটু অপেক্ষা করুন, তাহলে হয়ত চক্ষুকর্ণের বিবাদ ভঞ্জন হয়ে যাবে।

—তা ঠিক। যখন তিনি ব্যান্ডেজটি খুলে নেবেন, প্রথমেই তো দেখব তাঁকে। আপনি 'হয়ত' বলছেন কেন? 'নিশ্চয়' বলুন। অবশ্যই দেখতে পাব। এর মধ্যে আর কোন সংশয় নেই।

—এই তো চাই। আশায় বুক ভরুন, মণিকা স্নেহমাখা কণ্ঠে বললে, এসব ব্যাপারে ইচ্ছাশক্তি প্রবলভাবে কাজ করে। আপনার মনোবল আছে স্বীকার করি।

—হতাশ হতে যাব কেন? সদানন্দ সোজা হয়ে বসল, ইনি সেই ভারতবিখ্যাত সার্জন নয়, যাঁর হাতে সেন্ট পার্সেন্ট রোগী ভাল হয়ে যায়? এঁর হাতে যদি দৃষ্টি ফিরে না পাই, তো কার হাতে পাব?

—ঠিকই বলেছেন।

—ভারতবর্ষের বিভিন্ন স্থান থেকে যে লোকেরা ওঁর কাছে আসে, তা কি শুধু দেশ ভ্রমণের জন্যে?

—আমিও তা জানি। 'হয়ত' বললাম এমনি। ওটা একটা কথার কথা।

—চোখে না দেখলেও আমি বলে দিতে পারি, কত ভাল, কত অমায়িক, কত সুন্দর মানুষ এই ডাক্তারবাবু। কি বলেন?

সহসা সদানন্দ ডান হাত বাড়িয়ে দিল। হয়ত মণিকার একটা হাত ধরবার বাসনায়ই। মনের আনন্দে হয়ত স্থান-কাল-পাত্র, সবই ভুলে গেছে। মণিকা ত্রস্তে হাতের নাগালের বাইরে একপাশে সরে গেল।

—আপনি কোথায় সিস্টার?

—এই তো কাছেই রয়েছি।

—আচ্ছা, সুমিত্রা কি ফুল দিয়ে গিয়েছিল?

—হ্যাঁ, সেগুলো ফুলদানীতে সাজিয়ে রেখেছি।

একটু চুপ করে থেকে তারপর সহাস্য কৌতুকভরা মুখে সদানন্দ বললে,

—আচ্ছা সিস্টার, আপনি তো জিগ্যেস করলেন না 'সুমিত্রা' কে?

—কি আর জিগ্যেস করব, মণিকা বললে, জানি কেউ হবেন আপনার?

—ঠিকই, ঠিকই, তেমনি সহাস্যমুখে কথাটাকে চাখতে চাখতে বললে সদানন্দ, ঠিকই বুঝেছেন সুমিত্রা আমার......।

সহসা থেমে চুপ করে রইল সদানন্দ। কি এক সুখচিন্তায় বুঝি মগ্ন হয়ে গেল সে।

চিন্তাজাল ছিন্ন হল নার্সের সন্ত্রস্ত ঘোষণায়।

—ডাক্তারবাবু এসে গেছেন।

বাইরে মোটর থামার ও দরজা খোলা ও বন্ধের আওয়াজ শোনা গেল। চকিতে মণিকা চারদিকে একবার চোখ বুলিয়ে দেখে নিল সবকিছু ঠিক আছে কি না। সদানন্দ সোজা হয়ে বসল।

নার্স মণিকা দরজার কাছে এগিয়ে গেল।

—আসুন ডাক্তারবাবু। আপনার পেসেন্ট রেডি হয়ে বসে আছেন। আমি বাইরে করিডোরে আছি। ডাকলেই আসব। বলে বেরিয়ে গেল।

ডাক্তার সাহব সদানন্দের কাছে এগিয়ে এলেন। তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে একবার চাইলেন তার দিকে। তারপর কোন কথা না বলে ফ্রেঞ্চ উইন্ডোর কাছে গিয়ে কালো মোটা পর্দা টেনে ঘর অন্ধকার করে দিয়ে এলেন। অনতিদীর্ঘ স্থূলকায় মানুষ তিনি। পুষ্ট হাত, বাহু এবং মোটা আঙুল। বাহু দুটি লোমশ। ভাবতে অবাক লাগে, এমন মোটা মোটা আঙুলে কিভাবে চোখে অত সূক্ষ্ম অপারেশন করেন। চোখ দুটি বড়, স্নেহ-কোমল দৃষ্টি। ভ্রূ দুটি জোড়া।

—নমস্কার ডাক্তারবাবু, সদানন্দ হেসে বলে উঠল, আপনার বিষয়েই আলোচনা করছিলাম আমরা এতক্ষণ। আমি আর সিস্টার। ওকে আমি আপনি কিরকম দেখতে তাই বলবার চেষ্টা করছিলাম।

একটা চেয়ার টেনে এনে ডাক্তারসাহেব পেসেন্টের মুখোমুখি বসলেন।

তারপর বললেন, আশা করি নার্স আমার চেহারা সম্বন্ধে ভাল রিপোর্টই দিয়েছে। খুব প্রশংসাই করেছে নিশ্চয়।

—না, সে কিছু বলে নি, সদানন্দ খুশি খুশিভাবে বললে, বলবার প্রয়োজনও নেই। না বলে দিলেও আপনি কেমন দেখতে তা আমি জানি।

—বেশ, আপনার ধারণাটা শুনি, তারপর বুঝতে পারব সঠিক বলতে পারলেন কি না, বলে ডাক্তার সাহেব উঠে গিয়ে টেবিল ল্যাম্পটা জেলে তাঁর মনোমতভাবে সেটাকে বাঁকিয়ে দিলেন।

—বলা খুবই সোজা, সদানন্দ বলে গেল, খুব অভিজাত চেহারা আপনার, চুল একেবারে শ্বেতশুভ্র। আর আপনি খুবই লম্বা। আপনার চোখদুটি নীলাভ, দয়ার্দ্র দৃষ্টি, কিন্তু প্রয়োজন হলে, অন্যায় দেখলে সে চোখই আগুনের মত জ্বলে ওঠে। আপনার মধ্যে একবিন্দু নীচতা নেই, আর আপনি নীচতা সহ্যও করতে পারেন না।

ডাক্তার সাহেব দয়াকোমল আঙুলকয়টি দিয়ে নিজের চোখমুখের ওপর একবার বুলিয়ে আনলেন।

হেসে বললেন, উঁহুঁ, আপনার ধারণা বাস্তবের ধারে-কাছেও যেতে পারল না।

টেবিল ল্যাম্পটা এবার নিভিয়ে দিলেন। ঘরটা অন্ধকারে ডুবে গেল। নিজের কণ্ঠের সঙ্গে একটা রিফ্লেক্টর ফিট করে নিয়ে এবার পুরোপুরি প্রফেসনালভাবে রোগীর দিকে দাঁড়ালেন।

—ঘরটা এখন সম্পূর্ণ অন্ধকার। এর পর আস্তে আস্তে চোখ-সইয়ে সইয়ে আলো বাড়াব। এটা বলে নিই আমি, নয়ত অনেক পেসেন্ট অহেতুক ভয় পেয়ে যায় প্রথমটা।

—হা ঈশ্বর, সদানন্দ খেদের স্বরে বলে উঠল, বলেন কি ডাক্তারবাবু, আমি কি আপনাকে অবিশ্বাস করি? আপনি কাছে আছেন, আমার আর ভয়ডর বলে কিছু নেই।

নড়াচড়া করবেন না। এবার আমি আপনার চোখের ব্যান্ডেজটা খুলে ফেলব।

খুলুন। আমি প্রস্তুত।

আচ্ছা, এবার বলুন তো শুনি কিভাবে এ দুর্ঘটনা হল। জানি তবু আবার শুনব, ডাক্তার সাহেব ব্যান্ডেজে হাত দিয়ে বলে উঠলেন, এর উদ্দেশ্য হচ্ছে মনটা কিছুটা অন্যদিকে থাকবে। অবশ্য সে সময় ভালভাবে সব ঘটনা আমার শোনাও হয় নি।

—বেশ বলছি। সামান্য ঘটনা, কিন্তু কি অসামান্য বিপদ। আমাদের সংসারে বৃদ্ধা মা ও নাবালক দুভাই আর বিবাহযোগ্যা এক বোন। সংসারে আমিই একমাত্র রোজগেরে। চাকরিও খুবই ছোট। আয়ও যৎসামান্য! দরিদ্রের সংসার। তাই ওভারটাইমও খাটতে হয়। কঠোর পরিশ্রম করে থাকি। অনেক সময় মরণক্লান্তি আসে, তবু উপায় নেই, আমার মা, ভাই-বোনদের দুবেলা পেটভরে খাওয়াতে পারব এই আগ্রহে প্রবল উদ্যমে কাজ করে যাই।

—হাতদুটি নিচে নামান, কোমলকণ্ঠে ডাক্তার সাহেব বলেন, কথা যত খুশি বলুন কিন্তু হাতদুটিকে কোলের উপর থেকে ওঠাবেন না।

—তাহলে না হয় চুপ করে থাকি।

—না, না, কথা বলে যান।

—হ্যাঁ, সেদিন ওভারটাইমের মুখে সহসা ড্রিলটা ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে ছিটকে পড়ল চতুর্দিকে। সে আঘাতে মুহূর্তে রক্তাক্ত অন্ধ হয়ে গেলাম। প্রথমটা অবশ্য সবকিছু আমি বুঝতে পারি নি। তার পরের সব ঘটনা আপনি জানেন ডাক্তারবাবু।

—বড়ই ভয়াবহ ঘটনা, সাংঘাতিক আঘাত ছিল, ডাক্তারবাবু ছোট্ট একটি দীর্ঘশ্বাস সহকারে বললেন।

—ডাক্তারবাবু, এবার যা বলতে চাই শুনতে হয়ত সেটা হাস্যকর বা নাটকীয় হবে। তবু একথাগুলি না বললে আমি শান্তি পাচ্ছি না। আপনি আমার যা করলেন, এ আমি আজীবন ভুলব না। যখন যেখানে প্রয়োজন বোধ করবেন আমায় ডেকে পাঠাবেন, আদেশ করবেন, আমি যে অবস্থায় থাকি ছুটে যাব আপনার সেবা করতে এবং আজ্ঞাবহন করতে। যদি দরকার হয় আমার নিজের......নিজের প্রাণের বিনিময়েও তা করব।

—ধন্যবাদ মিস্টার বোস, শুনে প্রীত হলাম। ডাক্তারবাবু দৃশ্যতই খুশি হলেন, আমি জানি আপনার কথা আন্তরিক।

তারপর একটু থেমে জিগ্যেস করলেন, আচ্ছা মিস্টার বোস, সুমিত্রা নামে মেয়েটি আপনার কে হয়?

আধা ব্যান্ডেজ-বাঁধা মুখটিও যেন লালাভ হয়ে উঠল সদানন্দের. সলজ্জস্বরে বললে, সুমিত্রা? মানে... মানে ডাক্তারবাবু, ওর সঙ্গে আমার...আমার বিয়ে হবে বলে ঠিক হয়েছে। আপনি জানেন সব। ওরা অবস্থাপন্ন। ওরই অর্থানুকূল্যেই এই দামী নার্সিং হোমে আমি রয়েছি আর আপনাকেও পেয়েছি। ও এখনই বিয়ে করতে চায়। কিন্তু আমি ঠিক করেছি মিলির, মানে আমার বোনের বিয়ে আগে দেব, তারপর আমাদের হবে। সুমিত্রা চাকরি করে, ভাল আয় ওর, ও বলে—

বাধা দিয়ে ডাক্তারবাবু বলেন, উঁহুঁ নড়বেন না। একটু স্থির থাকবেন। হ্যাঁ, ভাল কথা, একটা কথা বলে রাখি, মানুষের সাধ্যে যা কুলোয়, সেভাবে সব কিছু আমি করেছি। সুতরাং এ অপারেশন সাকসেসফুল হয় নি এমন কথা ভাবা ঠিক হবে না। কিন্তু অনেক সময় দেখা যায়, মানুষ যত ত্রুটিহীনভাবেই কাজ করুক না কেন, ঠিক যথাযথ সুফল পাওয়া যায় না।

—আমি সে বিষয়ে এতটুকু ভাবছি না, সদানন্দ শান্তকণ্ঠে বললে, আপনার উপর আমার অগাধ বিশ্বাস। আমি এও জানি, যে মুহূর্তে আপনি চোখ থেকে ব্যান্ডেজটা খুলে দেবেন অমনি আমি আপনার মুখ দেখতে পাব।

—হয়ত হতাশও হতে পারেন, ডাক্তার সাহেব ধীরে ধীরে বললেন, সে সম্ভাবনার কথাও মনে রাখবেন। খুব বেশি উচ্চাশা করবেন না।

—না, না, ওটা আমি পরিহাস করছিলাম ডাক্তারবাবু, সদানন্দ হেসে বললে, আপনার চেহারা যা-ই হোক না কেন

মাঢ়ী সুস্থ ও সবল রাখতে
এবং মুখের গন্ধ দূর করতে

নিম অদ্বিতীয়

নিমের উপকারিতা হাজার হাজার
বছরের পরীক্ষিত সত্য

যুগযুগান্ত ধরে' প্রতিষ্ঠিত এই মহোপকারী নিমের সক্রিয় উপাদানগুলিই নিম টুথ পেস্টের প্রধান উপকরণ। এর সঙ্গে বৈজ্ঞানিক উপায়ে মিশ্রিত রয়েছে ফ্লুরাইড ও আধুনিক দন্ত বিজ্ঞানসম্মত অন্যান্য উপকরণাদি।

- নিম টুথ পেস্টের প্রচুর বীজাণুনাশক ফেনা দাঁতের ফাঁকে ফাঁকে ঢুকে বীজাণু ধ্বংস করে।
- নিম টুথ পেস্ট মুখের দুর্গন্ধ দূর করে' শ্বাসপ্রশ্বাস সুরভিত করে।
- নিম টুথ পেস্ট পাইওরিয়া নিবারণে সাহায্য করে, মাঢ়ী সুদৃঢ় এবং দাঁতকে পরিষ্কার ঝকঝকে করে।

ক্যালকাটা কেমিক্যাল
কর্তৃক প্রস্তুত

CNF-2DAI-66

তাতে আমার শ্রদ্ধাভক্তির এতটুকু তারতম্য হবে না। ওকথা ভুলে যান ডাক্তারবাবু।

ডাক্তার এবার বসে পড়েছেন সামনের চেয়ারে। তাঁর মোটা মোটা আঙুলসমেত হাত দু'খানি কোলের উপর ন্যস্ত। তিনি তীক্ষ্ণ অনুসন্ধানী দৃষ্টিতে পেসেন্টের চোখ দু'টিকে পর্যবেক্ষণ করতে লাগলেন। অন্ধকারটা এখন থিতিয়ে এসেছে। আবছাভাবে তিনি সদানন্দের চেহারাটা দেখতে পাচ্ছেন। এবারে তিনি টেবিল ল্যাম্পটা জেলে হাতের তেলো দিয়ে আলোটা আড়াল করে রাখলেন। তারপর বেরিয়ে এল তাঁর একটা বিরাট দীর্ঘশ্বাস। তিনি বাঁ হাত নিজ কপাল ও চোখমুখের ওপর বুলিয়ে আনলেন। ভ্রূ দু'টি কুঁচকে কপালে চিন্তার রেখা দেখা দিল।

ডাক্তার সাহেব উঠলেন, এগিয়ে গেলেন জানালার দিকে।

—আপনার ক'টি ছেলেপিলে ডাক্তারবাবু?

ডাক্তারবাবু নিঃশব্দে জানালা থেকে মোটা পুরু কালো পর্দা সরিয়ে দিতে দিতে বললেন, দু' মেয়ে এক ছেলে।

—বেশ। তারা সব পড়াশোনা করছে বুঝি?

—না, দু' মেয়ের বিয়ে হয়ে গেছে। ছেলে ইঞ্জিনীয়ার হয়ে বেরিয়েছে এবার। চাকরিও পেয়েছে একটা।

—বাঃ সুখবর।

জানালার পর্দা সরাতে শরতের সোনালী আলোয় ঘর উদ্ভাসিত হয়ে উঠল। সদানন্দের হাঁটু পর্যন্ত সকালের রোদ্দুরও এসে পড়ল।

ডাক্তারবাবু পুনরায় ফিরে এলেন সদানন্দের সামনে। কেমন যেন ক্লান্ত-কণ্ঠে বললেন, এবার আপনি যদি ইচ্ছে করেন, হাত নাড়াচাড়া করতে পারেন মিস্টার বোস।

সদানন্দ মৃদু কম্পমান দু'হাত তুলে দু' কানের পাশে বারেক বোলালো। তারপর বিস্ময়ভরাকণ্ঠে বলে উঠল, আ রে, ব্যান্ডেজ সব খুলে নিয়েছেন দেখছি।

—হ্যাঁ।

ডাক্তারবাবু হতাশাব্যঞ্জক মাথা নেড়ে একপাশে সরে গেলেন, অমনি শরতের নীল আকাশের যত আলো সব যেন এসে ভরিয়ে দিল সদানন্দের সারা দেহ আর মুখ। মুখটি ভারি সুন্দর। সদানন্দ রূপবান যুবক।

—আমি তাহলে এবার চোখের দৃষ্টি ফিরে পেলাম ডাক্তারবাবু, তাই না? একটা কথা বলি তাহলে, মুখে বলতাম বটে আমি ভয় পাই নি। কিন্তু আসলে ডাক্তারবাবু ভয়ে আতঙ্কে আমার সারা দেহমন কুঁকড়েছিল এতদিন। আশা করি আপনিও সেটা বুঝতে পেরেছিলেন। তাই তো আনন্দের আমার সীমা নেই আজ তাই তো আমি আজ নিতান্ত ছেলেমানুষের মত ব্যবহার করে যাচ্ছি।

উঃ কি আনন্দ, কি স্বস্তি, একথাটায় যে আমি ফের আজ থেকে দেখতে পাব। ঠিক আছে ডাক্তারবাবু, আপনি এবার যখন খুশি আলো জ্বালতে পারেন, জানালা খুলতে পারেন, আমি প্রস্তুত আছি।

ডাক্তার সাহেব নীরব রইলেন, কোন জবাব দিলেন না।

—আমার ভাই এসেছিল কালকে। ও বললে, অফিস থেকে জানিয়েছে, চাকরি আমার আছে এবং থাকবে। আমি বলেছি সামনের সোমবার থেকেই আমি জয়েন করব। কাজ না করলে আমার চলবে না। কাজেই আমার আনন্দ।

ডাক্তার সাহেব এখনও নীরব রইলেন।

—আমার প্রতি প্রত্যেকেই সদয়। অফিস, এই নার্সিংহোম, সিস্টার, আর আপনি, সবাই। আমি ভাগ্যবান। আমার কাজে যোগ দিতেই হবে। বুঝলেন তো ডাক্তারবাবু, আমার কত দায়িত্ব। গরীব সংসার। আমি রোজগার না করলে আমার মা, ভাই, বোন সবাই অনাহারে থাকবে। না খেয়ে মারা যাবে। আমি কি বেশিদিন সময় নষ্ট করতে পারি। এ ক'দিনেই কত টাকা লোকসান হয়ে গেল। কাজের মানুষ কি বসে থাকতে পারে। আপনিই বলুন না, ডাক্তারবাবু?

ডাক্তারবাবু এসব কথার উত্তর না দিয়ে দরজার কাছে এগিয়ে গিয়ে ডাকলেন, নার্স, এবার তুমি ভেতরে আসতে পার।

নার্স সঙ্গে সঙ্গে ঘরে ঢুকল, তারপর এগিয়ে গিয়ে ড্রেসিং টেবিলটার কাছে দাঁড়াল। সদানন্দের মুখের পানে চাইল। ব্যান্ডেজ সরিয়ে নেওয়ায় চেহারা যেন একেবারে পাল্টে গেছে মিস্টার বোসের। বাঃ, কি রূপ, আর বয়স আন্দাজে কত কমবয়সী মনে হচ্ছে। মুখটি যেন একটি অপাপবিদ্ধ কিশোরের। চোখদুটির গড়ন সুন্দর, দীর্ঘপক্ষ, ভ্রূ কি ঘন, দৃষ্টিতে রাজ্যের সারল্য, সব মিলিয়ে কচি শিশুর মত লাবণ্য।

সদানন্দ হাসল, জিভ দিয়ে নিচের ঠোঁট বারেক চেটে নিল, তারপর ডাক্তারের দিকে ফিরে বললে, কি ব্যাপার হল আপনার ডাক্তারবাবু? পরিহাসতরল কণ্ঠ তার, কিসের অপেক্ষা করছেন? আসুন, আসুন ডাক্তারবাবু আমায় আর উদ্‌গ্রীব প্রতীক্ষায় রাখবেন না। লাইট জেলে দিন, জানালা খুলে দিন, আপনাকে সর্বপ্রথম নয়নভরে দেখি।

ডাক্তারবাবু এখনও কোন জবাব দিলেন না।

সদানন্দ হাত তুলে আড়মোড়া ভাঙল। হাই তুলল একটা, তারপর প্রায় নার্সের মুখোমুখি ঘুরে বসল। নার্সের কাছ থেকে হাতখানেক দক্ষিণের দেয়ালের দিকে চেয়ে বললে, কি খবর সিস্টার?

নার্সের মুখ থেকে কোন কথা বের হল না।

উত্তর এল ডাক্তার সাহেবের কণ্ঠ থেকে। কেমন অপার্থিব গলায় ধীর-গতিতে তিনি বললেন, শুনুন মিস্টার বোস, আমি পাঁচ ফুট ছয় ইঞ্চি লম্বা, দেহ বেশ স্থূল, সুতরাং বুঝতে পারছেন আমার কি রকম চেহারা। আমার বয়স পঞ্চান্ন, মাথায় বেশ টাক পড়েছে। আমি পরে আছি সাদা জিনের প্যান্ট ও সিল্ক টুইলের সার্ট, কালো একটা নেকটাইও আছে।

কথাগুলোর অর্থ সদানন্দের কাছে কেমন হেঁয়ালি গোছের মনে হল। সে বুঝতে পারছে না, কিছুই বুঝতে পারছে না। বিস্ময়বিমূঢ় নিভে যাওয়া সুন্দর চোখ নিয়ে নিষ্ফল দৃষ্টিতে সে তাকিয়ে রইল যেদিক থেকে ডাক্তারের কণ্ঠ ভেসে আসছে।

[বিদেশী গল্পের ছায়ায়]

৩ মাসের জন্য বিনামূল্যে উপহার

স্ত্রীলোকের সৌন্দর্য, কাশ্মীর আর্ট শাড়ী। সর্বাধুনিক মনোরম ডিজাইন এবং রং লইয়া মরশুমের নূতন নূতন মাল আসিয়াছে। আমাদের কাছে কেবলমাত্র বড় সাইজের কাপড় পাওয়া যায়। ১টি ডি ল্যুক্স শাড়ীর মূল্য ১১৲ টাকা; ২টি ২০৲ টাকা; ৩টি ২৮৲ টাকা; ৪টি ৩৬৲ টাকা। দুইটি বা তদধিক শাড়ীর অর্ডারের সহিত বিনামূল্যে ব্লাউস পীস। পোস্ট পার্শেলযোগে অর্ডারের মাল পাঠান হয়।

Arvind Agencies (DBM-22)
Post Box 1408, Delhi-6.

এইচ. জি. ওয়েলস-এর গল্প

বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য

পঞ্চম অধ্যায় :
অসম্ভবের দেশে

দেখতে দেখতে অনেকদূরে চলে এলাম। ভৌতিক জগৎ ও অলীক কল্পনার রাজত্ব পেরিয়ে এবার এসে পৌঁছুলাম অসম্ভবের দেশে। এ দেশ অনেক আগে থাকতেই চোখে পড়ছিল আমাদের। কিন্তু তবু আগে যে দেশগুলো দেখেছি আমরা, তাদের কোনোটিতেই অসম্ভবকে বে-আব্রু অবস্থায় পাই নি। সর্বত্রই সম্ভবকে কম-বেশি পরিমাণে বিশ্বাস ও যুক্তি-তর্কের রঙ ছড়াতে দেখেছি। কিন্তু এ জগতে সম্ভবের বালাই প্রায় অনুপস্থিত বললেই হয়। এখানে যে কোনো মুহূর্তে যে-কোনো ঘটনা ঘটতে পারে। এজন্য জবাব দিতে হয় না কারও কাছে। কেউ কখনও কৈফিয়ৎ তলব করে না। এ দেশে ওষুধ খেলে বেলুনের মতো হাল্কা হওয়া যায়, এখানকার জলে অদ্ভুতদর্শন প্রায়-মানুষ-জাতীয় জীবদের বাস, আর স্থলে রাজত্ব মানুষখেকো উদ্ভিদের। এখানে দাঁড়ালে স্বর্গলোককে স্পষ্ট দেখা যায়; আবার পাতালপুরীর রহস্যও গোপন থাকে না।

ওই পাতালপুরীর গল্পই বলি আগে। আগে বলি 'অতল গহ্বরে'র কাহিনী। মর্তভূমি ও স্বর্গলোকের প্রসঙ্গে পরে আসছি।

'ইন্ দি অ্যাবিস্' গল্পটির কথা মনে পড়ছে। মনে পড়ছে, অতল গহ্বরকে দেখেছি সেখানে। সে গহ্বর আছে গভীর সমুদ্রের তলদেশে। সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে পাঁচ মাইল তলাকার সেই দেশ বহু-বিচিত্র রহস্যের আকর। সেখানে এক অভিযাত্রী গেল কেমন করে এবং কেমন করে অদ্ভুত সব অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করল, তার এক আকর্ষণীয় বর্ণনা এ গল্পে আছে।

গল্পটির প্রধানত দু'টি অংশ। প্রথম অংশে যাত্রার উদ্যোগ-আয়োজন এবং ফিরে আসার কথা। অপর অংশে সমুদ্রগর্ভের কাহিনী।

উদ্যোগ-আয়োজন পর্বের কিছু অংশ যথাসম্ভব বিশ্বাসযোগ্য করে চিত্রিত। লেখকের বিজ্ঞান-বুদ্ধির পরিচয়ও সেখানে দুর্লভ হয়। গভীর সমুদ্রে জলের চাপ সম্বন্ধে প্রথমেই তিনি যে তথ্য উপস্থাপিত করেছেন, আজকের দিনের পাঠকদের কাছেও তা' অসংগত ঠেকবে না। সমুদ্র যেখানে পাঁচ মাইল গভীর, সেখানকার প্রতি ইঞ্চি জায়গায় জলের চাপ সাড়ে সাত টন—আধুনিক বিজ্ঞান নিশ্চয় অস্বীকার করবে না এ কথা।

সমুদ্রগর্ভে অভিযানের বিভিন্ন অসুবিধা সম্পর্কে ওয়েলস্ সচেতন ছিলেন। এ গল্পের গোড়াতেই অতিকায় এক লোহার গোলকের কথা বলেছেন তিনি। বলেছেন, গোলকটির দেওয়াল ৯ ফুট পুরু। অভিযাত্রী বসবে সেই বজ্রকঠিন লৌহবর্মের মাঝখানে। সমুদ্রের তলদেশে আধঘণ্টা থাকবে সে। বিরাট পুরু কাচের জানালা দিয়ে বাইরের দৃশ্য দেখবে। এ ছাড়া জানালা যাতে জলের প্রচণ্ড ভার বইবার শক্তি রাখে, অভিযানের উদ্যোক্তারা সেদিকে লক্ষ্য রাখবেন।

কিন্তু কাচ যদি একবার ভেঙে যায়, উদ্যোক্তাদের একজন প্রশ্ন করেছিল, 'কি হবে তখন?'

—...'জল তখন বুলেটের মতো প্রচণ্ড বেগে আঘাত করবে অভিযাত্রীকে। তাকে ছিন্নভিন্ন ও নিষ্পেষিত করে দেবে...', বলল এক সহকর্মী।

—'লোহার গোলকটির কি হবে?'

—'কয়েকটা বুদ্বুদ ছড়িয়ে দেবে শুধু এবং পরম নিশ্চিন্তে তলাকার কাদামাটির উপর নেমে এসে শেষ-বিচারের দিনটির জন্যে প্রতীক্ষা করবে। আর হতভাগ্য এলস্টেড্ তার বিপর্যস্ত গদির উপরে ছড়িয়ে থাকবে রুটির গায়ে মাখনের মতো।'

এই সব কথোপকথনকে কেন্দ্র করে গল্পটির গোড়া থেকেই রহস্যের স্বাদ পাই আমরা। অজানা এক আতঙ্কে শিহরিত হই। কিন্তু এর একটু পরেই যখন গোলকটিকে সমুদ্রগর্ভে পাঠাবার ব্যবস্থা হয়, যখন বিরাট এক রজ্জুর সঙ্গে বাঁধা হয় সেটিকে আর গুরুভার কিছু পদার্থ যুক্ত করে ডোবাবার আয়োজন হয় তখন সমগ্র পরিকল্পনার স্থূলত্বটাই আমাদের কাছে প্রকট হয়ে ওঠে। মনে হয়, এ বর্ণনা আজকের দিনের পাঠকদের কাছে কিছুটা সেকেলে।

অবশ্য গল্পটির এ অংশেও আধুনিকদের খুশি করার মতো অনেক উপকরণ রয়েছে। যেমন অভিযাত্রীর যাত্রারম্ভের মুহূর্তে লোহার গোলকটির বর্ণনা—

মুহূর্তের জন্যে স্থির মনে হল ওটা। তারপরেই ও যেন খুব অল্প সময়ের মধ্যে ক্রমে ক্ষুদ্রকায় হয়ে গেল। জলে ঢেকে ফেলল তাকে এবং প্রতিসরণ হেতু জলের উপরিভাগের ঠিক তলাতেই তাকে অপেক্ষাকৃত অস্পষ্ট ও বড় দেখাতে লাগল। কেউ তিন অবধি গোণবার আগেই অদৃশ্য হয়ে গেল গোলকটি। জলের তলায় অনেকটা নিচুতে অস্পষ্ট শাদা আলো দেখা গেল। সে আলো বিন্দুতে পর্যবসিত হল দেখতে দেখতে এবং তারপরেই অদৃশ্য হল। তখন চোখে পড়ল, নিচের অন্ধকারের মধ্যে হারিয়ে-যাওয়া গভীর জলরাশি শুধু। আর চোখে পড়ল, একটি হাঙর ঘুরে বেড়াচ্ছে সেখানে।

এই বর্ণনা থেকে একদিকে যেমন লেখকের অসাধারাণ কল্পনাশক্তির পরিচয় পাওয়া যায়, অপরদিকে তেমনি সমুদ্র-পুরীর অপার রহস্যেরও স্বাদ মেলে।

এদিকে পাঠকরা যখন দেখে, নির্দিষ্ট সময় পেরিয়ে যাবার অনেক পরেও এল্-স্টেড্ ফিরে আসছে না, পরম উৎকণ্ঠা নিয়ে তার জন্যে প্রতীক্ষা করছে জাহাজের সবাই, তখন রহস্য আরও ঘনীভূত হয়ে ওঠে।

প্রতীক্ষার অবসান হল শেষ অবধি। এল্স্টেড্ ফিরে এল। কিন্তু রহস্যের সমাধান এ থেকে হল না। বরং সমুদ্র-গর্ভের যে বর্ণনা সে দিল, তা' থেকে অদ্ভুত রহস্যময় এক অসম্ভবের দেশকে খুঁজে পেলাম আমরা; এবং এইখানেই আসল গল্প। এল্স্টেড্ বলল, "তোমরা ভেবেছিলে, কাদামাটি ছাড়া আর কিছুই খুঁজে পাবো না আমি। সবাই আমার অভিযানকে ঠাট্টা করেছিলে: কিন্তু আমি নতুন এক দেশকে আবিষ্কার করেছি।"

এরপর সেই দেশটির বর্ণনা দিয়েছে এল্‌স্টেড্‌ এবং সেই সঙ্গে তার যাত্রা-পথের ভয়াবহ অভিজ্ঞতার কথা তুলে ধরেছে। বলেছে, প্রথমটায় ফুটবলের মধ্যে ব্যাঙ্‌ বলে মনে হল নিজেকে।

গোড়ার দিকে এল্‌স্টেড্‌ আকাশ, ক্রেইন এবং জাহাজের রেলিং ধরে দাঁড়িয়ে-থাকা লোকজনদের মাঝে মাঝে দেখতে পেয়েছিল। খানিক পরেই হঠাৎ মনে হল তার মাথা যেন নিচের দিকে নেমে আসছে; আর পা উঠে আসছে উপরের দিকে। মরীয়া হয়ে চলবার চেষ্টা করল সে; কিন্তু পারল না। গোলকটির মধ্যে গড়াতে লাগল।

খানিকক্ষণ চলল এইরকম। তারপর দোলন বন্ধ হল। অনেকটা স্বাভাবিক হয়ে দাঁড়াতে পারল এল্‌স্টেড্‌। দেখল, তার চারিদিকের জল সবজে-নীল। দেখতে দেখতে সেই জল ক্রমেই কালো হতে লাগল। উপরের দিকে তাকিয়ে মনে হল, যেন মধ্যরাতের আকাশ। নিচের জল ঘনকৃষ্ণ রঙ্‌ ধরেছিল তখন। অনেক স্বচ্ছ ছোটখাটো পদার্থ জলের মধ্যে ঘুরে বেড়াচ্ছিল। স্বয়ংপ্রভ ছিল ওরা। ওদের থেকে সবুজে রঙের আলো ঠিকরে বেরুচ্ছিল।

সেকেন্ড পঞ্চাশেকের মধ্যেই এল্‌স্টেডের মনে হল, চারিদিকে ঘনান্ধকার রাত্রির মতো কালো। কালিমার পরিমাণ স্বল্প ছিল শুধুমাত্র একটি অংশে; যে অংশে গোলকটি থেকে আলোক পড়ছিল।

ক্ষণে ক্ষণে নানারকম মাছ এবং ডুবে-থাকা অদ্ভুত সব পদার্থ নজরে পড়ল এল্‌স্টেডের। অতি দ্রুত পেরিয়ে গেল ওরা। এত দ্রুত যে, কোন্‌টা কি জাতের পদার্থ তা' ঠিক স্পষ্টভাবে নজরে পড়ল না। একবার মনে হল এল্‌স্টেডের, যেন একটা হাঙর গোলকটির গা ঘেঁষে চলে গেল।

এদিকে গরম বাড়তে লাগল ক্রমেই। জলের সঙ্গে ঘর্ষণে গোলকটি তেতে উঠল। ঘাম বেরিয়ে এল এল্‌স্টেডের গা থেকে। উত্তপ্ত গোলকের সংস্পর্শে বাষ্পের সৃষ্টি হল। ছোট ছোট বুদ্‌বুদের আকারে সেই বাষ্প স্পষ্ট নজরে পড়ল অভি-যাত্রীর। কাচের জানালা দিয়ে সে দেখল, রাশি রাশি বুদ্‌বুদ উপরের দিকে উঠছে।

অস্বস্তি বোধ করল এল্‌স্টেড্‌। বিশ্রী এক দুশ্চিন্তা তার সমগ্র সত্তাকে আচ্ছন্ন করল। জানালায় হাত পড়তেই আঁতকে উঠল সে। অনুভব করল, খুবই উত্তপ্ত হয়েছে সেটা।

এল্‌স্টেড্‌ ভাবল, যদি এইরকম আরও কিছুক্ষণ ধরে চলে, তবে তার মৃত্যু অবধারিত। তবে নিচের শীতল জলের স্পর্শে ফাটল ধরবে জানালার গায়ে। হঠাৎ উত্তাপের বৈষম্য-হেতু কাচ ফেটে চুরমার হয়ে যাবে।

কিন্তু শেষ অবধি এল্‌স্টেডের আশঙ্কা অমূলক প্রমাণিত হল। কাচ ফাটল না। মৃত্যু হল না তার। দেখা গেল, উত্তাপের পরিমাণ ক্রমশই কমে আসছে। গোলকের গা বেয়ে বুদ্‌বুদ ছড়িয়ে পড়ছে না আর। গভীর সমুদ্রকে দেখাচ্ছে, কালো কুচকুচে ভেলভেটের মতো। আর গোলক থেকে ভেলভেটের গায়ে খানিকটা আলো ছিটকে পড়েছে শুধু। সেই আলো-আঁধারিতে অদ্ভুত সব দৃশ্য নজরে পড়ল এল্‌স্টেডের।

একবার সে দেখল, বিকট-দর্শন কয়েকটা মাছ। আলো ঠিকরে বেরুচ্ছে ওদের গা থেকে। বিরাট বিরাট মাথা ওদের; চোখগুলো অতিকায়। এল্‌স্টেড্‌ বুঝল, সমুদ্রের ঐ বাসিন্দারা তাকে অনুসরণ করছে।

এতক্ষণে সমুদ্রের তলদেশে নেমে এসেছে সে। ধূসর ও শাদাটে রঙের কাদামাটির এক বিরাট রাজ্য তার চোখে পড়ছে। সামুদ্রিক লিলিরা জটলা করছে এখানে-সেখানে। অতিকায় সব স্পঞ্জ দেখা যাচ্ছে। আর দেখা যাচ্ছে, বুকে ভর দিয়ে এগিয়ে আসা চিংড়ি-জাতীয় এক ধরণের জীব।

প্রদীপ্ত মাছ সে রাজ্যের সর্বত্র। ওদের গায়ের আলোক থেকেই এল্‌স্টেড্‌ সমুদ্রের তলদেশের অনেকখানি একসঙ্গে দেখতে পাচ্ছিল।

তন্ময় হয়ে দেখছিল সে। হঠাৎ এক-ঝাঁক মাছ তার দিকে এগিয়ে এল। তারপরেই মুহূর্তের মধ্যে অদৃশ্য হয়ে গেল ওরা। আর ওদের ঠিক পিছনেই আশ্চর্য এক প্রকার জীব দেখা গেল।

জীবগুলোকে অস্পষ্ট মনে হচ্ছিল প্রথমে। তবে এটুকু বেশ বোঝা যাচ্ছিল যে, ওদের চলার সঙ্গে মানুষের মিল আছে। যেন মানুষের মতোই ওরা হাঁটছিল। জীবদের একটি এগিয়ে এল গোলকটির কাছে। আসা মাত্রই তীব্র আলোকে চোখ ধাঁধিয়ে গেল তার। নিরুপায় হয়ে সে চোখ বুজল।

বিস্ময়ে বিমূঢ় হল এল্‌স্টেড্‌। এমন বিচিত্র মেরুদণ্ডী জীব জীবনে সে কোনোদিন দেখে নি। জীবটির কপাল, মাথা ও মুখের সঙ্গে মানুষের অদ্ভুত সাদৃশ্য। তার দেহটা প্রায় গোলাকার। দ্বিপদ জন্তু সে। পা দু'টো দেখতে অনেকটা ব্যাঙের মতো। বেশ লম্বা আর মোটা লেজ আছে জন্তুটার। ঐ লেজ আর পায়ের উপর সে তার দেহের ভারসাম্য রক্ষা করছে। তার দেহের সামনের দিকে অদ্ভুত দু'টো প্রত্যঙ্গ চোখে পড়ল। এল্‌স্টেডের মনে হল, মানুষের হাতের বিকৃতি যেন।

জন্তুটার গায়ে বিভিন্ন রঙের ছোপ ছিল। তার মাথা, হাত ও পা ছিল রক্তবর্ণ। আর দেহের অন্যান্য অংশ ছিল রুপালী। আলোক ঠিকরে বেরোচ্ছিল তার দেহ থেকে এবং এল্‌স্টেড অবাক হয়ে দেখছিল, সেই ভয়ংকর তার ঠিক সামনেই চোখ বুজে দাঁড়িয়ে।

অবশেষে চোখ খুলল সে। হাত দিয়ে ঐ ইন্দ্রিয়টিকে আড়াল করে চীৎকার করে উঠল। এত প্রচণ্ড সেই চীৎকার যে, ইস্পাতের প্রাচীর ভেদ করেও এল্‌স্টেডের কানে এসে তা' পেঁছুল। একটু পরেই গোলকের আরও কাছে এগিয়ে এল জন্তুটি। এল্‌স্টেড্‌ স্পষ্ট অনুভব করল, কী যেন এক নরম পদার্থের আঘাতে তার জলযানটি দুলছে।

তারপরেই চীৎকার শোনা গেল আবার এবং বেশ বোঝা গেল, অনেক দূর থেকে কারা যেন সাড়া দিচ্ছে।

দূরের দিকে তাকাতেই আঁৎকে উঠল এল্‌স্টেড্‌। দেখল, প্রায়-মানুষ জাতীয় ঐ ভয়ংকর প্রাণীরা দল বেঁধে তার দিকে এগিয়ে আসছে।

কিছুক্ষণের মধ্যেই ইস্পাতের গোলকটিকে ঘিরে ফেলল ওরা। তারপর সেটিকে টেনে নিয়ে চলল।

ভয়ে বিস্ময়ে দিশাহারা হল এল্‌স্টেড্‌। এই দুঃস্বপ্নের হাত থেকে রেহাই পাবার আশায় এবার সে জল-যানটির আলো নিভিয়ে দিল। সঙ্গে সঙ্গেই গাঢ় অন্ধকারে ঢেকে গেল চারি-দিক। প্রথমটায় কিছুই দেখতে পেল না সে। কালো ভেলভেটের মতো অন্ধকারের যবনিকা সব কিছুকে আড়াল করে রাখল। কিন্তু তারপর অন্ধকার গা-সহা হয়ে গেল তার। চারিদিকের দৃশ্য অস্পষ্ট ও ভাসা-ভাসা আকারে চোখে পড়ল। স্পষ্টই বুঝল এল্‌স্টেড্‌ যে, গভীর সমুদ্রের ভয়ংকররা তাকে সমুদ্রের তলদেশ বরাবর টেনে নিয়ে চলেছে। সে দেখল, আশ্চর্য এক নিমজ্জিত দেশ তার সামনে-পিছনে অনেকদূর অবধি প্রসারিত। দেশটা জায়গায় জায়গায় উঁচু-নিচু। পথঘাটের অনুকরণে চলার নির্দিষ্ট সব জায়গা আছে ওখানে। ঘর-বাড়ি আছে। তবে ছাদ নেই কোনো ঘরেরই। দেখলে মনে হয়, ধ্বংস হয়ে-যাওয়া মঠ বা গীর্জা যেন।

ঘর-বাড়ির প্রতিটিই দেওয়াল দিয়ে ঘেরা। হাড়-গোড় দিয়ে তৈরি করা হয়েছে ওদের। আলো ঠিকরে বেরোচ্ছে ওদের থেকে। মনে হচ্ছে, যেন নিমজ্জিত চন্দ্রালোকে চারিদিক ভেসে যাচ্ছে। আর মনে হচ্ছে এল্‌স্টেডের, যেন সে এক

বেলুনে করে অদ্ভুত চকোনো শহরের উপর দিয়ে ভেসে চলেছে। বিচিত্র-দর্শন সামুদ্রিক জীবদের হাতে ঐ বেলুনের দড়ি বাঁধা। চলমান বহু জীবকে নজরে পড়ল তার। কিন্তু ওরা দলে দলে ছিল বলে কাউকেই আলাদা করে চেনা গেল না।

এদিকে ধীরে ধীরে পাতালপুরীর শহরের খুব কাছে এগিয়ে এল এল্‌স্টেড্‌। দেখল, বিরাট ও চকচকে সব স্পঞ্জ। অদ্ভুত সব লিলি। খোলা জায়গাগুলোতে প্রায়-মানুষ-জাতীয় অনেক জীবকে দেখা গেল। ওদেরই কয়েকজন এলস্টেডের জলযানটিকে টেনে শহরের দিকে নামিয়ে আনছিল।

অদ্ভুত সেই শহর। তার সুপরিসর স্থানগুলোর এখানে-সেখানে জাহাজের মতো এক ধরণের পদার্থ এল্‌স্টেডের চোখে পড়ল। স্পষ্টই দেখল সে, শহরের ঠিক মাঝখানে একটি বিরাটকায় বাড়ির দিকে তাকে টেনে নামানো হচ্ছে। সেখানে ছিল জাহাজের আকৃতিবিশিষ্ট একটি আশ্রয়স্থল। প্রায়-মানুষ-জাতীয় জীবগুলো জটলা করছিল সেখানে; এবং ওদের অনেকেই নানারকম অঙ্গভঙ্গী করে এল্‌স্টেড্‌ ও তার জলযানটির প্রতি সম্মান দেখাচ্ছিল।

এ ছাড়া সমগ্র জায়গাটি ছিল দেওয়াল দিয়ে ঘেরা। সে দেওয়ালে কাঠ চোখে পড়ল এল্‌স্টেডের। জলে-ভেজা কাঠ। এত ভেজা যে ভাসতে অক্ষম। আর চোখে পড়ল মোচড়ানো তার, তামা ও লোহার সব দণ্ড এবং মৃত মানুষদের হাড় ও মাথার খুলি।

এল্‌স্টেড তন্ময় হয়ে দেখছিল এসব। এমন সময় বিকট এক চীৎকার শুনতে পেল সে। মনে হল, একসঙ্গে অনেকগুলো শিঙা বাজছে। আর মনে হল, যেন একসঙ্গে অনেকে সুর করে আবৃত্তি করছে।

এল্‌স্টেড্‌ বুঝল, সমুদ্রের অধিবাসীরা স্তবস্তুতি করছে তার। খানিক পরেই সবিস্ময়ে লক্ষ্য করল সে, গোলকটিকে এক বেদীর উপর বসানো হয়েছে। আর সেই বেদীটি আছে জলজন্তুদের এই হেড্‌-কোয়ার্টারের ঠিক মাঝখানে।

জলজন্তুরা উপুড় হয়ে বসল কখনও। কখনও আবার হাঁটু গেড়ে বসল। দীর্ঘ তিন ঘণ্টা ধরে এল্‌স্টেড্‌কে পূজা করল ওরা।

তারপর কেমন করে বেদীর গায়ে ঘষা লেগে গোলক-ধাঁধা দড়িটি ছিঁড়ে গেল, এবং কেমন করে সে যাত্রায় এল্‌স্টেড্‌ ভাগ্যক্রমে রক্ষা পেল, গল্পটির শেষদিকে তার চাঞ্চল্যকর বর্ণনা আছে।

এ গল্পে ওয়েলস্‌ প্রায়-মানুষ-জাতীয় এক প্রকার মেরুদণ্ডী ও বুদ্ধিমান প্রাণীর অস্তিত্বকে প্রায় বিশ্বাসযোগ্য করে তুলেছেন। তাদের বিচিত্র আচার-আচরণ, নগর-পরিকল্পনা এবং ছাদবিহীন ঘর-বাড়িগুলোকে এমন নিখুঁতভাবে চিত্রিত করেছেন যে, আজকের দিনের পাঠকদেরও গল্পটি পড়তে বসে এক এক সময় মনে হবে, যা' পড়ছি, তা' বুঝি সত্যি; যা' দেখছি, তা' বুঝি বাস্তবেও সম্ভব। এখানেই লেখকের কৃতিত্ব। অসম্ভবকে সম্ভব করে তুলেছেন তিনি। অবাস্তবকে বাস্তবের আসনে বসিয়েছেন। এ কারণেই অতিকায় একটি ইস্পাতের গোলককে করে এল্‌স্টেডের সমুদ্র-গহ্বর অভিমুখে যাত্রা আমাদের কাছে বিশ্বাসযোগ্য বলে মনে হয়। সমুদ্রতল থেকে তার ফিরতে দেরি হচ্ছে দেখে তার সঙ্গীদের উৎকণ্ঠা আমাদেরও অভিভূত করে। গভীর সমুদ্রে গিয়ে সে যে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেছে, তার সঙ্গে আমরাও যেন একাত্মতা অনুভব করি। আমাদের মনে হয়, মহাকাশের মতো মহাসমুদ্রের রহস্যকেও পুরোপুরি ভেদ করা কোনোদিনই বোধ করি সম্ভব হবে না; এবং হবে না বলেই গভীর সমুদ্র সম্বন্ধে এক অদম্য কৌতূহল আমাদের মনে চিরকালই জাগরূক থাকবে। এ ছাড়া সমুদ্র-গহ্বরের অধিবাসীদের সম্বন্ধে ওয়েলস্‌ এ গল্পে যে বৈজ্ঞানিক যুক্তির অবতারণা করেছেন, তাও একেবারে উড়িয়ে দিতে পারি না আমরা। বরং তাঁর সঙ্গে সুর মিলিয়ে আমরাও যেন স্বীকার করতে চাই, 'নিউ রেড্‌ স্যান্ডস্টোন্‌ এইজ্‌'-এর অদ্ভুত জীবদের শেষ বংশধররা এখনও সমুদ্রের তলায় আছে। কোনোদিন আকাশ দেখে নি ওরা; কোনোদিন বাতাসের স্পর্শ পায় নি। এল্‌স্টেডের মতো পৃথিবীর মানুষকে দেখলে দেবতা বা ভৌতিক কিছু বলে ভুল করা ওদের পক্ষে স্বাভাবিক।

তবে বৈজ্ঞানিক তথ্য নয়, সাহিত্যিক সত্যই এ গল্পে বড় হয়ে উঠেছে। সমুদ্রের তলদেশের যে কবিত্বময় বর্ণনা লেখক দিয়েছেন, কল্পনায় ডুবুরী সেজে অজানা ও অবিশ্বাস্য এক জগৎকে আমাদের কাছে যেভাবে জীবন্ত করে তুলেছেন, আগামী-দিনের পাঠকরাও তা' থেকে সাহিত্যরস আস্বাদন করবেন। এ ছাড়া এল্‌স্টেডের জন্যে অনেকেরই হয়তো করুণা হবে। দ্বিতীয়বার সমুদ্রতলে অভিযান করে সে আর ফিরে এল না, একথা স্মরণ করে অনেকেই বেদনা অনুভব করবেন হয়তো।

বেদনার সঙ্গে বিস্ময় গাঁটছড়া বেঁধেছে 'ইন্‌ দি অ্যাবিস্‌' গল্পে। কিন্তু অসম্ভবকে ঘিরে লেখা অপর এক গল্প 'দি ট্রুথ্‌ অ্যাবাউট্‌ পাইক্র্যাফট্‌'-এ বিস্ময় ও কৌতুকরসের মণিকাঞ্চন যোগ লক্ষ্য করবার মতো। উদ্ভটত্বই এ গল্পের প্রধান আকর্ষণ। অসম্ভবকে এখানে একেবারে বে-আব্রু অবস্থায় তুলে ধরা হয়েছে। এর নায়ক পাইক্র্যাফট্‌ অত্যন্ত স্থূলকায় ও পেটুক। সে চায় আরও একটু ক্ষীণকায় হতে। অবশেষে কেমন করে সে তার বন্ধুর সহায়তায় অদ্ভুত এক ওষুধ পান করল এবং কেমন করে ওজন হারিয়ে একেবারে হাল্কা হয়ে গেল, এ গল্পে তার কৌতুকপ্রদ বিবরণ দেওয়া হয়েছে। বলা হয়েছে, ওষুধটি পাইক্র্যাফ্‌টের বন্ধু পেয়েছিল তার

বি, সি, মাইতি এণ্ড কোং
—ইলেকট্রো প্লেটিং সামগ্রী—
নিকেল ভ্যাট ও ব্যারেল * ডাইনামো * পালিশিং মেসিন এবং প্লেটিং করিবার জন্য যাবতীয় সামগ্রীর আদি সরবরাহক।
শো রুম ঃ—৯৪, প্রেমচাঁদ বড়াল স্ট্রীট, কলি ১২। ফোন ঃ ৩৪-৩১৭৩
৩, রাধামোহন পাল লেন, কলি-১২ ঃ অফিস-ফোন—৩৪-৪৮৪৬

বৃদ্ধা প্রপিতামহীর কাছ থেকে। ওজন কমিয়ে দেবার বিস্ময়কর ক্ষমতা ছিল সেই ওষুধের। তারই ফলে পাইক্র্যাফট্ সেটা পান করে আর চেয়ারে বসে থাকতে পারে নি; বেলুনের মতো ভেসে গিয়ে ঘরের সিলিঙ্-এর সঙ্গে আটকে ছিল। তারপর সেই অবস্থাতেই সাময়িকভাবে পাইক্র্যাফটের থাকা-খাওয়ার ব্যবস্থা হল কেমন করে এবং কেমন করেই বা দস্তার ভারি পোশাক পরিয়ে পাকাপাকিভাবে তাকে এই বিপদ থেকে উদ্ধার করার আয়োজন হল, গল্পটির শেষদিকে তার কৌতূহলোদ্দীপক বর্ণনা আছে। কিন্তু দুঃখের বিষয়, সে বর্ণনা আমাদের কাছে স্থূল হাস্যরসই শুধু পরিবেশন করে; গভীর কোনো জীবনরসের স্বাদ দেয় না।

জীবনরসের অভাব 'ট্রাইঅ্যাম্ফ্স্ অব এ ট্যাক্সিড্যারমিস্ট' গল্পেও সুস্পষ্ট। অবশ্য বিস্ময়ের উপাদান এখানে অনেক ছিল। কিন্তু অতি দ্রুত গল্প-বলার ফলে কাহিনীটি ঠিক জমে ওঠে নি। ট্যাক্সিড্যারমি বলতে বুঝি মৃত পশুর চামড়ার মধ্যে খড় প্রভৃতি পুরে তাকে জীবজন্তুর ন্যায় দেখানোর কৌশল। সেই কৌশল আয়ত্ত করেছিল এক ব্যক্তি। গল্পটি প্রধানত আমরা তার কাছ থেকেই শুনেছি। আমরা জেনেছি, কেমন করে সে হাতী থেকে শুরু করে পতঙ্গ পর্যন্ত পণ্যদ্রব্য উৎপন্ন করেছিল। এমন কি মানুষের চামড়াকেও কাজে লাগাতে জানত সে। জানত, কেমন করে চামড়ার সাহায্যে মৃত মানুষকেও জীবিতের মতো রূপ দেওয়া যায়। এ ছাড়া দোদো, অক্, নিউজিল্যান্ডের লুপ্ত পাখি মোয়া ইত্যাদিও নির্মাণ করেছিল সে। এদের কোনো কোনোটিকে একেবারে এমন সব পাখিকেও সে জীবন্ত রূপ দিতে পারে, যাদের কোনোদিন কেউ দেখে নি। কেমন করে সে এই সব অদ্ভুত কাজে পারঙ্গম হয়ে উঠল, গল্পকার এখানে সংক্ষেপে তার ইঙ্গিত দিয়েছেন। সেই সঙ্গে এ কথাও বলেছেন যে, কৃত্রিম উপায়ে প্রাণী-নির্মাণে সিদ্ধহস্ত এই ব্যক্তিটি তার জীবনকাহিনী বলবার সময় মদ্যপান করেছিল। যদিও ঠিক মাতাল অবস্থায় সে ছিল না, তবু নেশার আমেজ তাকে পেয়ে বসেছিল। অতএব, মেনে নেওয়া চলে যে, তার পক্ষে কোনো কিছুকে ফুলিয়ে-ফাঁপিয়ে বর্ণনা করা অস্বাভাবিক কিছু নয়।

কিন্তু তবু বলব, রস এ গল্পে ঠিক দানা বাঁধতে পারে নি। স্বল্প পরিসরের মধ্যে বহু বিচিত্র ঘটনার অবতারণা করার ফলে কাহিনীটি সর্বদিক মিলিয়ে আকর্ষণীয় হয়ে ওঠে নি। এ গল্পে ট্যাক্সিড্যারমিস্টের পোশাক-পরিচ্ছদ ও আচার-আচরণের বর্ণনা আমাদের মুগ্ধ করে, কিন্তু তার কাছ থেকে শোনা টুকরো ঘটনাগুলো আমাদের মনে স্থায়ী কোনো রেখাপাত করে না।

বিস্ময় ও রহস্য-সৃষ্টির দিক থেকে 'দি ম্যাজিক সপ্' গল্পটি স্মরণীয় হয়ে থাকবে। 'দি ম্যাজিক সপ্' বলতে বুঝি যাদুর দোকান। এমন সব পণ্যের একটি দোকান, যাদের দিয়ে সহজেই যাদু দেখানো চলে। এই যাদু-রহস্য গল্পটির প্রথম থেকে শেষ অবধি ছড়ানো। বিস্ময়ের টুকরো টুকরো অনেক উপাদান রয়েছে এখানে। গল্পকারের কৃতিত্ব, টুকরো উপাদানগুলোকে মিলিয়ে তিনি এখানে একটি ইন্দ্রজালের পরিবেশ সৃষ্টি করেছেন। বলেছেন, এক ছোট্ট ছেলে তার পিতাকে নিয়ে যাদুর দোকানে গেছে। কিন্তু দোকানের বৈচিত্র্য এবং দোকানীর অদ্ভুত কাণ্ডকারখানা দেখে পুত্রই শুধু নয়, পিতাও বিস্মিত হয়েছেন। ম্যাজিক দেখাবার মতো অজস্র জিনিস ছিল ওখানে। ওগুলো দেখে মুগ্ধ হয় পাঠকরা; ক্রমেই যেন এক রহস্যময় ইন্দ্রজালের মধ্যে জড়িয়ে পড়ে। ভাবে, যাদুর দোকানের পণ্যগুলো ছোটদেরই নয় শুধু, বড়দেরও মন ভোলায়।

গল্পটির শেষদিকে কঠিন বাস্তব জগতে ফিরে এসেছেন লেখক। কিন্তু তার আগেই পাঠকরা ম্যাজিক দেখার সুখ উপভোগ করে নেয়।

'এ ভিজন্ অব জাজ্মেন্ট' গল্পে ম্যাজিক নেই; আছে রূপক ও রূপকথা। এখানে শেষ-বিচারের দিনটির কথা কল্পনা করা হয়েছে। ভাবা হয়েছে, যেন ভগবান বিচারকের ন্যায়দণ্ড হাতে নিয়ে বসে আছেন। আর একজন দেবদূত (আমাদের চিত্রগুপ্তের মতো) প্রতিটি মানুষ সম্বন্ধে তাঁর রিপোর্ট পেশ করছেন। আলাদা-ভাবে ডাকা হচ্ছে সবাইকে। সবাই নিজ নিজ বক্তব্য পেশ করছে।

তবে সামগ্রিকভাবে আলোচনা করলে মনে হয়, শেষ-বিচারের এই স্বপ্নে বিশেষ একটি বক্তব্যের প্রাধান্য। বক্তব্যটি হল এই যে, লোভের বশবর্তী হয়ে কেউ কোনো কাজ করলে পুণ্যফল পেতে পারে না। এই লোভ ও কামনার দিক দিয়ে ক্ষমতাপ্রিয় অত্যাচারী রাজা যেমন দোষী, ঠিক তেমনি দোষী সেই সন্ন্যাসীটি, স্বর্গসুখ লাভের আশায় যে পুণ্যকর্ম করেছে।

বক্তব্যকে অত্যধিক প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে এই গল্পে। সে কারণেই এটি ঠিক গল্প হয়ে ওঠে নি' বক্তব্য নয়, গল্পের খাতিরেই গল্প বলা হয়েছে সেখানে, অসম্ভব সেখানে আমাদের ধরা-ছোঁয়ার মধ্যে। এই শ্রেণীর একটি সার্থক ছোট-গল্প হল 'দি ফ্লাওয়ারিং অব্ দি স্ট্রেঞ্জ অর্কিড্'। উদ্ভিদ জগতের বৈচিত্র্যকে কেন্দ্র করে এ কাহিনীটি লেখা।

উইড্ডারবার্ন নামে এক ব্যক্তির অর্কিড সংগ্রহের খেয়াল ছিল। নানা জাতের নানারকম অর্কিড ছিল তার সংগ্রহশালায়। অর্কিড নিয়েই তার দিন কাটত। দূর সম্পর্কের এক বোন তার দেখাশোনা করত। ঐ বোনের বাড়িতেই থাকত অবিবাহিত উইড্ডারবার্ন।

একবার আন্দামান-জাত অদ্ভুত-দর্শন একটি অর্কিড কিনে আনল সে। খুব যত্ন করে সেটিকে তার সংগ্রহশালায় রাখল।

ধীরে ধীরে বেড়ে উঠল সেই অর্কিড। শাখা বেরিয়ে এল তার গা থেকে। মাথায় ফুলের একটি কুঁড়ি দেখা গেল। তারপর তা' থেকে ফুল ফুটল কেমন করে এবং কেমন করে সেই ফুলের গন্ধে উইড্ডারবার্ন সংজ্ঞা হারাল, এই গল্পে আশ্চর্য বিচক্ষণতার সঙ্গে তা' বলা হয়েছে।

বলা হয়েছে, ফুলটি ফেটে গেল হঠাৎ। হঠাৎ তা' থেকে অদ্ভুত একটা গন্ধ বেরিয়ে এল। মুহূর্তের মধ্যে চেতনা হারাল উইড্ডারবার্ন; এবং তারপর রক্তচোষা অর্কিড শাখাগুলো দিয়ে তার রক্ষককে জড়িয়ে ধরল।

অর্কিডের ঘরে উইড্ডারবার্নকে খুঁজতে গিয়ে তার বোনও বিপদ ডেকে আনল শেষ অবধি। ওখানকার ঐ অদ্ভুত গন্ধে তারও সংজ্ঞা হারাবার উপক্রম হল। কিন্তু ঘটনাচক্রে গোড়াতেই সতর্ক হয়েছিল সে। তাই মানুষখেকো উদ্ভিদটি শাখা-জাল দিয়ে তাকে বন্দী করতে পারে নি। উপরন্তু উইড্ডারবার্নকে অর্কিডের মৃত্যু-বন্ধন থেকে সে মুক্তি দিয়েছে। খুনী অর্কিডের লতাজালকে কেটে তাড়াতাড়ি উদ্ধার-পর্ব সমাধা করেছে সে। তার প্রত্যুৎপন্নমতিত্বের এক বিশ্বাসযোগ্য চিত্র গল্পটির শেষদিকে আমরা খুঁজে পাই। সেই সঙ্গে অর্কিড-পাগল উইড্ডারবার্নের শোচনীয় অবস্থা আমাদের অভিভূত করে। রহস্য ও রোমাঞ্চ-সৃষ্টির দিক দিয়ে তো বটেই, চরিত্র-সৃষ্টির দিক দিয়েও 'দি স্ট্রেঞ্জ অর্কিড' একটি সার্থক গল্প। উইড্ডারবার্ন ও তার বোনের চরিত্র নিজ নিজ বিশিষ্টতা নিয়ে এখানে সুন্দরভাবে ফুটে উঠেছে। আর সবচেয়ে জীবন্ত হয়ে উঠেছে সেই অর্কিডটি, খুনীর নৃশংসতা যার মজ্জায় মজ্জায়; যা'কে অসম্ভবের দেশের সবচেয়ে সম্ভব চরিত্র বলে মনে হয়।

বিশ্বসাহিত্যের আদিপর্ব

ডঃ নরেন ভট্টাচার্য

॥ ৮ ॥

ব্যাবিলন ও আসিরিয়ার প্রাচীন সাহিত্য

যে ভূখন্ডটিকে একালে মেসোপটেমিয়া বলে চিহ্নিত করা হয়, সেই ইউফ্রেতিস ও তাইগ্রীস নদীর অববাহিকায় সুপ্রাচীনকালে গড়ে উঠেছিল যথাক্রমে সুমেরীয়, ব্যাবিলনীয় ও আসিরীয় সভ্যতা। এই তিনটি সভ্যতার মধ্যে সুমেরীয় সভ্যতাই সর্বাপেক্ষা প্রাচীন, এবং পরবর্তী দুইটি সভ্যতা নিজেদের বৈশিষ্ট্যে সমুজ্জ্বল হওয়া সত্ত্বেও সেগুলির মূল উৎস যে সুমেরীয় সভ্যতা সেকথা অস্বীকার করা যায় না। যেমন ব্যাবিলন এবং আসিরিয়ার ভাষা সুমেরের ভাষার চেয়ে পৃথক, কিন্তু ব্যাবিলনীয় ও আসিরীয় লিপি চরিত্রের দিক থেকে সুমেরীয় লিপির সঙ্গে অভিন্ন। শিল্পকলা ও সাহিত্যের ক্ষেত্রে এই বিষয়টি বিশেষভাবে চোখে পড়ে।

গিলগামেশ মহাকাব্য

গিলগামেশ মহাকাব্য প্রাচীন মেসোপটেমিয়ার জাতীয় সাহিত্য যা সুমেরীয়, ব্যাবিলনীয় এবং আসিরীয় এই তিনটি সভ্যতার প্রচ্ছদপটে গড়ে উঠেছে। যে আকারে আমরা বর্তমানে মহাকাব্যটিকে পেয়েছি সেটি হচ্ছে আসিরীয় সংস্করণ। সম্রাট আসুরবানীপালের সময়ে রচিত বারটি বৃহদায়তন ট্যাবলেটে কিউনিফর্ম লিপিতে এই মহাকাব্য ক্ষোদিত হয়েছে। পণ্ডিতেরা এই মহাকাব্যটির সুমেরীয়, ব্যাবিলনীয় ও আসিরীয় এই তিনটি পর্যায় পৃথকভাবে আবিষ্কার করতে সক্ষম হয়েছেন।

মহাকাব্যের নায়ক গিলগামেশ কোন কাল্পনিক চরিত্র নয়, অন্তত ওই নামের একজন রাজার উল্লেখ পাওয়া যায় যিনি ইরেখে রাজত্ব করেছিলেন। কিন্তু বিভিন্ন পৌরাণিক উপাদানের ক্রমিক প্রয়োগের ফলে গিলগামেশ চরিত্র অর্ধ-দেবত্বে উন্নীত হয়েছে।

গিলগামেশ মহাকাব্য শুরু হয়েছে একজন অর্ধমানব ও অর্ধ পশুকে দিয়ে, যার নাম ইয়াবানি। রামায়ণবর্ণিত হনুমানের সঙ্গে এই ইয়াবানির যথেষ্ট সাদৃশ্য আছে। ইয়াবানির শক্তির কাহিনী ছিল সমগ্র ইরেখ শহরের আতঙ্কের বস্তু। একজন অসমসাহসী শিকারী এই ইয়াবানিকে ধরবার জন্য অরণ্যে অরণ্যে অনুসন্ধানরত ছিল। দীর্ঘ প্রচেষ্টার পর তার সঙ্গে ইয়াবানির সাক্ষাৎ হল। ইয়াবানি তখন ঘাস খাচ্ছিল অপরাপর পশুর মতই, তার দেহটাকে মনে হচ্ছিল শিশিরে ভেজা, তার দেহের লোমগুলিকে মনে হচ্ছিল যেন ঈগলের পালক।

শিকারী বুঝল যে, শক্তিতে এর সঙ্গে পেরে ওঠা অসম্ভব, তাই সে পাঠালো একটি পরমাসুন্দরী রমণীকে। ত্যাগ করল। তখন সেই মায়াবিনী প্রেমে পড়ে সে অপরাপর পশুর সঙ্গ ত্যাগ করল। তখন সেই মায়াবিনী তাকে অনুরোধ করল ইরেখ নগরীতে যাবার জন্য যেখানে আছে দেবতা আনু এবং দেবী ইস্তারের মন্দির, এবং যেখানে বাস করেন মহাবীর গিলগামেশ। ইয়াবানি পূর্বেই শিকারীর কাছ থেকে গিলগামেশের নাম শুনেছিল। সঙ্গে সঙ্গেই তার ইচ্ছা হল যে সে মহাবীর গিলগামেশকে একক দ্বন্দ্বযুদ্ধে আহ্বান করবে। কিন্তু সূর্যদেবতা খামাশ ইয়াবানিকে জানালেন যে গিলগামেশ তাঁর আশ্রিত এবং গিলগামেশকেও তিনি স্বপ্নে জানিয়ে দিলেন যে ইয়াবানিকে যেন বন্ধুভাবেই গ্রহণ করা হয়।

নগরজীবন ইয়াবানির পছন্দ হল না। সে ফিরে যেতে চাইল তার অরণ্যে। কিন্তু দেবতা খামাশ তাকে পুনরায় উপদেশ দিলেন গিলগামেশের বন্ধু হিসাবে নগরে থাকতে, এবং তাতেই তার মঙ্গল হবে।

প্রথম ট্যাবলেটের লিপিগুলি এর পর থেকে কিছুটা অস্পষ্ট। আবার যেখান থেকে তা স্পষ্টতর হচ্ছে সেখানে দেখা যায় যে এলামরাজ চুম্বাবা ইরেখ আক্রমণ করেছে। দুই বন্ধু, গিলগামেশ ও ইয়াবানি শত্রুর আক্রমণ প্রতিরোধ করছে। তারা একটি দীর্ঘ ও ঘন সিডার বৃক্ষের অরণ্যপথ দিয়ে অগ্রসর হচ্ছে।

এইখানে ট্যাবলেটের লিপিগুলি ভেঙেচুরে গেছে। অনুমানে যা মনে হয় এই যুদ্ধে গিলগামেশ ও ইয়াবানি জয়লাভ করেছিল, এবং ইরেখ শত্রুর হাত থেকে মুক্ত হয়েছিল।

ইতিমধ্যে গিলগামেশের জীবনে আর একটি উপসর্গ দেখা দিল। গিলগামেশের বীরত্ব ও দৈহিক সৌন্দর্যে আকৃষ্ট হয়ে দেবী ইস্তার তাঁকে প্রেম নিবেদন করে বসলেন। কিন্তু দেবীর প্রেমে যে খুব ভরসা করা যায় না সেটা গিলগামেশ ভাল করেই বুঝতেন। তাই দেবী ইস্তারের প্রেম নিবেদনের উত্তরে গিলগামেশ তাকে বললেন, “হে দেবী, তুমি তোমার কোন স্বামীর প্রতি বরাবর বিশ্বস্ত আছ? তোমার যৌবনের প্রেমিক তম্মুজের বরাতে কি হয়েছে? তুমি আল্লালা পাখীকে ভালবেসে তার পক্ষচ্ছেদন করেছ। তোমার এক প্রেমিক সিংহকে তুমি নখদন্তহীন করেছ, অপর এক প্রেমিক অশ্বকে শত যোজন ক্রমাগত দৌড়িয়ে হত্যা করেছ। তোমাকে ভালবাসত এক মেষপালক, তাকে তুমি চিতাবাঘে পরিবর্তিত করেছ। তোমার আর এক প্রেমিক ছিল ইসুল্লানু, দেবতা আনুর বাগানের মালী: তাকে তুমি পাথর করে দিয়েছ। হে দেবী, তুমি আমাকে ভালবাসলে কি আমার ভাগ্য এদের থেকে কিছু ভাল হবে?”

গিলগামেশের এই উত্তরে প্রকুপিতা হয়ে ইস্তার গিলগামেশকে হত্যার জন্য একটি ভয়াল ভয়ঙ্কর বৃষকে প্রেরণ করলেন। কিন্তু ইয়াবানি ও গিলগামেশ উভয়ে মিলে সেই বৃষকে বধ করলেন। তখন দেবী ইস্তার গিলগামেশকে অভিশাপ দিলেন যে অতঃপর

তিনি রোগগ্রস্ত হয়ে তিলে তিলে মৃত্যুর পথে এগিয়ে যাবেন। ইয়াবানি তখন দেবীকে হত্যা করবে বলে শাসাল ফলে ইয়াবানিও অভিশপ্ত হল। এখানে আবার ট্যাবলেটের লিপিগুলি অস্পষ্ট, ফলে পরের ঘটনাগুলি জানবার উপায় নেই।

পরবর্তী ট্যাবলেটে যে কাহিনী পাওয়া যাচ্ছে, তাতে ইয়াবানি মারা গেছে এবং গিলগামেশ রোগগ্রস্ত হয়ে মৃত্যুর প্রতীক্ষারত। তিনি বিলাপ করছেন, "আমাকে যেন ইয়াবানির মত মরতে না হয়, কেন না মৃত্যু বড়ই ভয়াবহ। আমি আমার বংশের আদিপুরুষ পীর-নাপিশতিমের সন্ধানে যাত্রা করব, তিনি নিশ্চয়ই আমাকে কোন মৃতসঞ্জীবনীর সন্ধান দিতে পারবেন।"

এরপর শুরু হল গিলগামেশের মহাযাত্রা। সে পথ অতি দুর্গম, ভয়াবহ সিংহেরা সেই পথের মোড়গুলি পাহারা দিচ্ছে। গিলগামেশ তখন চন্দ্রদেবতার কাছে প্রার্থনা জানালেন এবং তাঁরই সাহায্যে শেষ পর্যন্ত সূর্যাস্তের পাহাড় অতিক্রম করলেন। এখানেই পৃথিবীর সীমানা শেষ স্বর্গের সীমানা শুরু। উভয়ের যোগসূত্র একটি সরু সুড়ঙ্গ। গিলগামেশ তার মধ্যে প্রবেশ করলেন।

কিন্তু ভিতরে ঢুকে তিনি আতঙ্কে প্রায় অজ্ঞান হয়ে গেলেন। বৃশ্চিকাকৃতি অথচ বিশালকায় একটি দানব ও দানবী সেই সুড়ঙ্গ পাহারা দিচ্ছে। ভয়ের ঘোরটা কেটে যাবার পর তিনি দেখলেন যে তারা তাঁর কোন ক্ষতি করবার চেষ্টা করছে না। তখন তিনি সাহস করে তাদের নিজের মনোবাসনা জানালেন। তখন তারা বলল যে, এই সুড়ঙ্গের অন্তে আছে বারো মাইলব্যাপী সূচীর অন্ধকার, তার পরে আছে এক আশ্চর্য উদ্যান এবং তার পর মৃত্যুর সমুদ্র। কোন মানুষ সেখানে যেতে পারে না।

তবু গিলগামেশ সাহসে ভর করে সেই সূচীভেদ্য অন্ধকার পার হলেন, তারপর সেই মায়াময় উদ্যান পেরিয়ে তিনি হাজির হলেন মৃত্যুর সমুদ্রের তীরে। এই সমুদ্রের অধিষ্ঠাত্রী ছিলেন দেবী সবিতু। তিনি বললেন, "গিল-গামেশ তুমি ব্যস্ত হচ্ছ কেন? যে জীবন তুমি সন্ধান করছ তা তুমি কখনোই পাবে না। কেন না যখন দেবতারা মানুষকে সৃষ্টি করেন তখন তাঁরা মানুষের জন্য মৃত্যুও নির্দিষ্ট করেন। অতএব তুমি ফিরে যাও।"

কিন্তু গিলগামেশ ফেরবার পাত্র নন। দেবী সবিতু পুনরায় বললেন, "কোন মরণশীল মানবের পক্ষে এ সমুদ্র পার হওয়া সম্ভব নয়। গিলগামেশ তুমি ফিরে যাও।"

শেষ পর্যন্ত গিলগামেশের অনুনয়ে দেবীর হৃদয় গলল। তিনি আরদ-ইয়া নামক একজন নাবিককে ডেকে দিলেন। সে গিলগামেশকে নৌকায় তুলে সেই মহাসাগর পাড়ি দিল। সাগরপারে সেই বাঞ্ছিত দ্বীপে থাকেন গিল-গামেশের আদি পূর্বপুরুষ পীর-নাপিশতিম ও তাঁর স্ত্রী। তাঁরা গিল-গামেশের নৌকা দেখে অবাক হলেন। এখানে আবার গল্পটি বাধাপ্রাপ্ত হয়েছে।

গিলগামেশ তাঁর বংশের আদি-পুরুষকে জানালেন তাঁর অভিপ্রায়। সব শুনে পীর-নাপিশতিম বললেন, "প্রত্যেকটি মানুষকে একদিন না এক-দিন মরতে হবে। ভাগ্যের দেবতা প্রত্যেকের জীবনের পরিধি মেপে রেখেছেন, কাজেই কোন মৃতসঞ্জীবনীর সন্ধান তোমায় আমি দিতে অপারগ।" তারপর তিনি তাঁর স্ত্রীকে সম্বোধন করে বললেন, "এই লোকটি রোগগ্রস্ত দেহ নিয়ে এতদূর এসেছে, যা দেখে আমার কষ্ট হচ্ছে। তুমি এর অসুখ ভাল করে দাও।"

গিলগামেশ অতঃপর রোগমুক্ত হলেন। রোগে কালো হয়ে যাওয়া চামড়া তাঁর দেহ থেকে অপসৃত হল। তখন তাঁর বংশের আদিপুরুষ তাঁকে বললেন, "তুমি পৃথিবী থেকে এখানে এসে মানুষের অসাধ্য কাজ করেছ। তাই তোমাকে খালি হাতে এখান থেকে ফিরতে দেব না। তোমাকে আমি একটি যাদুশক্তিসম্পন্ন গাছ দিচ্ছি, মানুষের লুপ্ত যৌবন ও স্বাস্থ্যকে ফিরিয়ে আনার ক্ষমতা এই গাছের আছে। তোমাকে অমরত্ব দিতে না পারলেও আমি তোমাকে সুদীর্ঘ যৌবনে অভিষিক্ত করব।"

সেই অলৌকিক শক্তিসম্পন্ন গাছটি হাতে নিয়ে গিলগামেশ যাত্রা করলেন পৃথিবীর দিকে। মন তাঁর আনন্দে পরিপূর্ণ। কতক্ষণে তিনি ইরেখে ফিরবেন।

কিন্তু মানুষ ভাবে এক, হয় আর। পথিমধ্যে ক্লান্ত হয়ে যখন গিলগামেশ জল পানের জন্য গাছটিকে পাশে রেখে-ছেন সেই ফাঁকে সিংহরূপী এক দানব এসে গাছটিকে অপহরণ করে নিয়ে গেল। গাছটিকে হারিয়ে গিলগামেশ শিশুর মত ক্রন্দন করতে লাগলেন, তিনি প্রায় উন্মাদ হয়ে গেলেন। তিনি গাছটাকে ফিরে পাবার অনেক চেষ্টা করলেন, কিন্তু তাঁর সব চেষ্টা ব্যর্থ হল।

অবশেষে ক্লান্তদেহে ভগ্নহৃদয়ে গিলগামেশ ইরেখে ফিরে এলেন। তাঁর নিঃসঙ্গ নিরুত্তাপ দিনগুলিতে শুধু একজনের কথাই তাঁর বিশেষ করে মনে পড়ত। সে হচ্ছে ইয়াবানি। গিল-গামেশ আকুলভাবে দেবতাদের নিকট প্রার্থনা করতেন, যেন ইয়াবানিকে তাঁরা আবার তাঁর কাছে ফিরিয়ে দেন। শেষ পর্যন্ত দেবতা নগল গিলগামেশকে জানান যে, তিনি ইয়াবানির প্রেতাত্মাকে তাঁর কাছে পাঠিয়ে দিতে পারেন। গিলগামেশ রাজী হলে, দেবতা নগলের প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী, ইয়াবানির আত্মা তাঁর সামনে হাজির হল।

গিলগামেশের মৃত্যুভয় তখনো বিদূরিত হয় নি। ইয়াবানির প্রেতাত্মাকে তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, "তুমি এখন যেখানে আছ সে জায়গা কি রকম?"

ইয়াবানির প্রেতাত্মা জবাব দিল, "ও কথা জানতে চেও না, কেন না তা শুনলে তোমায় আবার কাঁদতে হবে।"

গিলগামেশ বলল, "তা হোক তবু আমি শুনব।"

ইয়াবানি গিলগামেশকে কি বলে-ছিল তা বলা আপাতত সম্ভব নয়। গিলগামেশ মহাকাব্যের এইটুকু অংশই বর্তমান আছে। এই মহাকাব্যের কাহিনীর সঙ্গে গ্রীক অরফিউসের কাহিনী, ভারতীয় নচিকেতার কাহিনী প্রভৃতির সঙ্গে সাদৃশ্য আছে।

ইস্তারের অবতরণ

গিলগামেশ মহাকাব্যের মতই মাটির টাবলেট বা টালির উপর কিউনি-ফর্ম লিপিতে রচিত আর একটি বিখ্যাত আসিরীয় কাহিনী পাওয়া গেছে, যার নাম ইস্তারের অবতরণ। এই কাহিনী-টির ব্যাবিলনীয় ও সুমেরীয় সংস্করণও আছে। এই ট্যাবলেটগুলি বর্তমানে বৃটিশ মিউজিয়মে রক্ষিত আছে। ইংরাজীতে আমাদের আলোচ্য কাহিনীটি সর্বপ্রথম অনুবাদ করেন ল্যাংডন এবং তার পর জন স্মিথ।

'ইস্তারের অবতরণ' কাহিনীটি বলার আগে একটু ভূমিকা করার প্রয়োজন আছে। সমগ্র পশ্চিম এশিয়া, মিশর ও গ্রীকভূমি জুড়ে একজন শস্যদেবতা ও তাঁর প্রণয়িনীর কাহিনী প্রচলিত ছিল, কাহিনীর বিষয়বস্তু হচ্ছে যে দেবতা আকস্মিকভাবে কোন শত্রুর দ্বারা নিহত হবে, এবং দেবতার প্রণয়িনী অনেক সাধ্য-সাধনা করে দেবতাকে মৃত্যুর জগৎ থেকে সাময়িক-ভাবে, বছরে একটা নির্দিষ্ট সময়ের জন্য, তাকে আবার পৃথিবীতে ফিরিয়ে আনবে। আসলে ফসলের বার্ষিক

রাতের গাড়ি

মলয়শঙ্কর দাশগুপ্ত

অস্থিরতা চতুর্দিকে, ছায়া কাঁপছে চতুর্দিক জুড়ে।
ছড়ানো টেবিলে কাগজ কলম খাতা
এ-পাশে ও-পাশে ভাবনা স্তূপীকৃত
সময়ের কাছে হঠাৎ অপহৃত
শিথিল ভাবনা ওড়ায় স্মৃতির পাতা
ভালোবাসা প্রণয়প্রীতি শোক
উপায় কোথায় যাবো যে হৃদয়পুর!

হৃদয়পুর হৃদয়পুর হাঁকে
মাতাল ঝোঁকে উঁচিয়ে লণ্ঠন;
ছেড়ে যে যাবে রাতের শেষ গাড়ি
মিলিয়ে যাবে কুয়াশাঘেরা বাঁকে,
চলে যে যাবার ফিরে না আসার পাড়ি
এখনো সময় হয় নি বণ্টন?

উদাস হাওয়া বাঁধার গোলযোগ॥

জন্মমৃত্যুর ঘটনা থেকেই দেবতার মৃত্যু ও পুনরুত্থানের কাহিনীর সৃষ্টি হয়েছে। মিশরের অসিরিস ও তাঁর প্রণয়িনী আইসিস, গ্রীসে অ্যাডোনিস ও অফ্রোদিতি, ফ্রিজিয়ায় অ্যাটিস ও সিবিলী, ব্যাবিলী, ব্যাবিলনে তম্মুজ ও ইস্তার প্রভৃতির কাহিনী হুবহু এক।

আমরা মেসোপটেমীয় কাহিনীতেই ফিরে আসি। এই কাহিনীর নায়ক দেবতা তম্মুজ, নায়িকা দেবী ইস্তার, সুমেরীয় সংস্করণে তম্মুজের নাম দুমুজকা বা দুমুজি এবং ইস্তারের নাম ইনান্না। (দেবী ইনান্নার পূজা একদা বিস্তৃতভাবেই চালু ছিল পশ্চিম এশিয়া থেকে ভারত পর্যন্ত। ইরেখের ইনান্না, পরবর্তীকালে নানাইয়া, চালডিয়ায় হয়েছে নানে, কুষাণ রাজাদের মুদ্রায় ননা, বেলুচিস্তানে বিবি নানী, নৈনি-তালে দেবী নৈনি)। কাহিনী অনুযায়ী দেবী ইস্তারের প্রণয়ী দেবতা তম্মুজ আকস্মিকভাবে নিহত হবার পর দেবী শোকে উন্মাদ হয়ে যায় এবং প্রতিজ্ঞা করে যে, মৃত্যুর রাজ্য থেকে সে তম্মুজকে পুনরায় উদ্ধার করে নিয়ে আসবে। মৃত্যুর রাজ্যে ইস্তারের যাত্রাকে অবলম্বন করেই 'ইস্তারের অবতরণ' কাহিনীটি রচিত হয়েছে।

মৃত্যুর রাজ্যে দেবী ছিল অল্লাতু। সুন্দরী ইস্তাহারের প্রতিদ্বন্দ্বিনী ছিল আল্লাতু। কাজেই যখন সে খবর পেল যে ইস্তার তার রাজ্যে এসে তম্মুজকে নিয়ে যাবে তখন সে ক্রোধে এবং প্রতি-হিংসায় চঞ্চল হয়ে উঠল। এতদিনে সে ইস্তারকে মুঠোর মধ্যে পেয়েছে।

মৃত্যুর রাজ্যে প্রবেশের পথেই ইস্তার দ্বাররক্ষীদের দ্বারা বাধা পেল। তারা জানাল যে সেখানে প্রবেশ করতে গেলে দেবী আল্লাতুর আদেশ মেনে চলতে হবে। সেই অনুযায়ী প্রথম দুয়ারে ইস্তারের মাথার মুকুট খুলে নেওয়া হল, দ্বিতীয় দুয়ারে খুলে নেওয়া হল তার কর্ণভূষণ, তৃতীয় দুয়ারে গলার হার, চতুর্থ দুয়ারে অপরাপর অলঙ্কার, পঞ্চম দুয়ারে কটিবন্ধন, ষষ্ঠ দুয়ারে হাতের অলঙ্কার, এবং সপ্তম দুয়ারে সমগ্র পরিধেয় বসন।

ক্ষোভে-দুঃখে এবং ক্রোধে দেবী ইস্তার সম্পূর্ণ নগ্নদেহে মৃত্যুর রাজ্যে হেঁটে চলল। আল্লাতুর পুরুষ অনুচরেরা তাকে সেই অবস্থায় দেখে অশ্লীল বাক্যসমূহ প্রয়োগ করতে লাগল। এই অবস্থায় দ্বাররক্ষীরা তাকে নিয়ে চলল আল্লাতুর কাছে।

আল্লাতু আশা করেছিল যে, ইস্তার এই অপমানে ভেঙে পড়বে। কিন্তু তার এই আশা পূর্ণ হল না। বিবস্ত্রা ইস্তার পুরুষদের কুটিল কটাক্ষ ও অশ্লীল মন্তব্যসমূহকে উপেক্ষা করেই দৃপ্ত ভঙ্গীতে আসন্ন অবস্থার সঙ্গে মোকাবিলা করবার জন্য এগিয়ে চলল।

তখন ক্রোধে ক্ষিপ্ত হয়ে আল্লাতু বলল, "ইস্তারের এই অনন্ত যৌবন আমার অসহ্য।" সে তখন প্লেগের দানব নামতারকে আদেশ করল ইস্তারের দেহ যেন রোগজীর্ণ করে দেওয়া হয়।

এদিকে মৃত্যুর রাজ্যে যে ইস্তারকে চরম নিগ্রহ ভোগ করতে হচ্ছে এ কাহিনী প্যাপ-সুকুল নামক একজন দেবদূত স্বর্গে পৌঁছে দিল। তখন দেবতারা সূর্য দেবতা খামাশকে সভাপতি করে ইস্তারকে উদ্ধার করার একটি পরিকল্পনা করল। তারা একটি বিশালকায় সিংহকে পাঠিয়ে দিল মৃত্যুর রাজ্যে। সে সেখান থেকে ইস্তারকে উদ্ধার করে নিয়ে এল। এই-খানে টালি লিপি শেষ হয়েছে।

কিন্তু ইস্তার কি তার প্রণয়ী তম্মুজকে উদ্ধার করে আনতে পেরে-ছিল? এ বিষয়ে 'ইস্তারের অবতরণ' কাব্যে কোন স্পষ্ট ইঙ্গিত নেই। পরবর্তীকালের ট্যাবলেটগুলিতে অবশ্য এই প্রশ্নের উত্তর দেওয়া হয়েছে। কোন উত্তর অস্তিবাচক, কোন উত্তর নেতি-বাচক। সুমেরীয় কাহিনী অনুযায়ী, মৃত্যুর দেবী মোটা মুক্তিপণ নিয়ে তম্মুজকে একটা নির্দিষ্ট সময়ের জন্য পৃথিবীতে ফিরে আসার অনুমতি দিয়েছিল।

অপরাপর সাহিত্যগত নিদর্শন

আসুরবানি পালের গ্রন্থাগারে আরও যে সব টালি-লিপির নিদর্শন রয়েছে তা থেকে আরও দুটি কাহিনী উদ্ধার করা সম্ভব হয়েছে। একটি কাহিনী হচ্ছে বাইবেলোক্ত নোহর জাহাজের কাহিনীর মতই এক বন্যার কাহিনী। এই বন্যায় সমগ্র মেসোপটেমিয়া ডুবে গেছল কেবল রক্ষা পেয়েছিল গিল-গামেশের বংশের আদিপুরুষ পীর নাপিশাতিম ও তাঁর পত্নী। সম্ভবত বাইবেলে-কথিত প্লাবনের কাহিনীর উৎস এখানেই।

দ্বিতীয় যে কাহিনীটি পাওয়া গেছে সেটি হচ্ছে সৃষ্টিতত্ত্বের কাহিনী। আদিতে জগৎ জলরূপী ছিল এবং তার অধিষ্ঠাত্রী দেবী ছিল দানবী টিয়ামত। দেবতা মেরোডখ (বাইবেল ও কোরানের মারডুক) এই টিয়ামতকে পরাস্ত করে অশান্ত জলরাশিকে শান্ত করে।

এ ছাড়া আরও আছে ছন্দে রচিত অজস্র মন্ত্র। সেগুলির কোনটি দেবতাদের উদ্দেশ্যে রচিত, কোনটি ভূত-প্রেত তাড়ানোর উদ্দেশ্যে রচিত আবার কোনটিতে শত্রুনিধন, প্রেম সাফল্য প্রভৃতির জন্য বিশেষ ধরণের ব্যবস্থাপত্র দেওয়া আছে। মোটের উপর লোকসাহিত্যের স্তর পেরিয়ে মেসো-পটেমীয় সাহিত্য আর বেশি অগ্রসর হতে পারে নি। তবে একথাও ঠিক যে মেসোপটেমীয় লোকসাহিত্যের প্রভাব পরবর্তী হিব্রু ও আরবীয় সাহিত্যের উপর যথেষ্ট পড়েছে।

রঙ্গমঞ্চ ওদেশে এবং এদেশে

শিলালি

নাট্যকাহিনীর সরল বিশ্লেষণে দেখা যায় বেশির ভাগ নাটকের আখ্যায়িকাই ভাল এবং মন্দের সংঘাত নিয়ে লেখা। এই ভাল এবং মন্দকে অতটা স্পষ্টভাবে নাটকে প্রতিভাত না করে তাদের পরিমার্জিতভাবে নাটকে তুলে ধরেন আধুনিক নাট্যকারেরা। ভালর দিকটাকে স্পষ্টভাবে ভাল না বলেও এমনভাবে রূপায়িত করা হয়, যার ফলে আমাদের অন্তরের সহানুভূতি সেইদিকেই যায়। তেমনি আবার অন্য দিকটির প্রতি আপনা থেকেই আমাদের বিরাগ জন্মায়। পুরানো প্রথায় রচিত ভাল এবং মন্দ চরিত্রের সমাবেশ ও সংঘর্ষ রবীন্দ্রনাথের নাটকে প্রায় নেই বললেই চলে। গোবিন্দমাণিক্য এবং জয়সিংহ ভাল এবং রঘুপতি মন্দ বা সুমিত্রা, কুমার সেন, ইলা, নরেশ, বিপাশা প্রভৃতি ভাল এবং বিক্রম মন্দ এ ধরণের সমালোচনা 'বিসর্জন', 'রাজা ও রাণী' বা তপতী সম্বন্ধে কল্পনাই করা চলে না। রঘুপতির চরিত্রের এমন অনেক দিক আছে যা আমাদের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করে। হোক না বিক্রমের প্রেম সর্বগ্রাসী, তবু তাঁর একটা নিজস্ব মহত্ব এবং ঔদার্য আছে যা প্রত্যেকেরই সহানুভূতি আকর্ষণ করে।

আবার একই চরিত্রের মধ্যে এই ভাল এবং মন্দের সংঘাতে বৈষম্যের সৃষ্টি হয়। যেমন ধরুণ 'ম্যাকবেথ'-এ। ম্যাকবেথ চরিত্রে যদি এই অন্তর্দ্বন্দ্ব না থাকতো তবে তাকে কোনরকমেই 'ট্র্যাজিক হিরো' প্রতিপন্ন করা সম্ভব হত না। কারণ ট্র্যাজেডি রচয়িতার প্রধান উদ্দেশ্য হল যে নায়কের পতনে দর্শক বা পাঠকের মনে সহানুভূতির উদ্রেক করা। 'ওথেলো' নাটকের ট্র্যাজেডি ইয়াগোর পতনে নয়, ওথেলোর শোচনীয় পরিণতিতে। রঘুপতি বা বিক্রমের চরম পরাজয়ে আমরা মনে মনে ব্যথা অনুভবই করে থাকি।

ক্ষেমঙ্কর এবং সুপ্রিয়ের চরিত্রের বৈষম্য অতি সহজেই চোখে পড়ে। দুজনের প্রতিই আমরা সহানুভূতিশীল হয়ে উঠি। তবুও এদের নিয়ে নাটকে যে সংঘর্ষের সৃষ্টি হয়েছে তার ভেতরেও কোন অস্বাভাবিকতা নেই।

অনেক নাটকেই দেখা যায় যে, অভিনয় শুরু হল বেশ সুষ্ঠু—সুন্দর পরিবেশের মধ্যে—কিন্তু কাহিনী যতই এগিয়ে যায় ততই দেখা দিতে থাকে জটিলতা, বিষাদময় এবং বীভৎসতাপূর্ণ ঘটনাবলীর সমাবেশ। অথবা এর একেবারে বিপরীত প্রথাতেও রচিত নাটক দেখা যায়। জটিলতা এবং সংঘর্ষ দিয়ে শুরু হয়ে পরিণতিতে শান্ত, সুন্দর পরিস্থিতির উদ্ভব হয়। উভয় ক্ষেত্রেই বৈষম্যরীতির ওপর নির্ভর করেই নাট্যকার আদি এবং অন্তে এই বৈপরীত্যভাবের সৃষ্টি করে নাট্যবস্তুকে হৃদয়গ্রাহী করবার চেষ্টা করেন। বহু চরিত্রকে নাটকের আরম্ভে দেখা যায় একরকমের—কিন্তু কাহিনীর গতির সঙ্গে সঙ্গে তাদের চরিত্রের রূপ বদলাতে থাকে। এও এক ধরণের বৈষম্য পদ্ধতি। 'ম্যাকবেথ' নাটকের আরম্ভে নায়কের চরিত্রের নানাবিধ গুণাবলী সম্বন্ধেই আমরা পরিচিত এবং অবহিত হই। তাঁর চরিত্রগত বৈষম্য তাঁকে কি ভয়ঙ্কর এবং নারকীয় পরিণতির পথে নিয়ে গেল তা সুপরিস্ফুট করবার জন্যই নাট্যকার বৈপরীত্য পদ্ধতির অবলম্বনে নাটকের আরম্ভে নায়কের সাহস, পৌরুষ, বীর্য প্রভৃতি গুণকে স্পষ্ট করে তুলেছেন পাঠক এবং দর্শকদের কাছে। 'ওথেলো' নাটকের প্রথমদিকে ডেসডিমোনার প্রতি ওথেলোর যে সম্পূর্ণ নির্ভরতা এবং স্থির বিশ্বাসের ছবি নাট্যকার এঁকেছেন—তারই ফলে অত চমৎকার ভাবে শেষের দিকে নাটকটি বিষাদঘন হয়ে উঠেছে। ইবসেনও তাঁর বহু নাটকে এই বৈপরীত্য পদ্ধতির অনুসরণ করেছেন। ভীষণ ঝড় ওঠবার আগে যেমন কিছুক্ষণের জন্য প্রকৃতির বুকে এক শান্ত, স্তব্ধ ভাব বিরাজ করতে থাকে, তেমনি ইবসেনের বহু নাটকেই আরম্ভের সময় দেখা যায় একটা ধীর, স্থির, সমাহিত ভাব। তারপরই শুরু হয় পাত্রপাত্রীর জীবনে রুদ্রের তাণ্ডব নৃত্য।

বৈষম্যরীতি শুধু কাহিনীর ঊর্ধ্বগতি এবং অধোগতির মধ্যেই নিবদ্ধ হয়ে থাকে না। যে কোন ভাল নাটকের চারিত্রিক বৈষম্যের দিকটাও লক্ষ্য করে দেখবার মত জিনিস। ব্রুটাস ও ক্যাসাস চরিত্রের বৈপরীত্যই উভয় চরিত্রকে সুন্দররূপে পরিস্ফুট করেছে। ঠিক এই ধারাতেই শেক্সপীয়ার আবার ওথেলো এবং ইয়াগো ও ম্যাকবেথ এবং লেডী ম্যাকবেথের চরিত্র চিত্রণ করেছেন। 'রাজা ও রাণী' বা 'তপতী'র বিক্রম এবং সুমিত্রা চরিত্রেও এই রীতির ব্যতিক্রম হয় নি। বিক্রমের হৃদয়াবেগ উদ্দাম উচ্ছ্বাসপূর্ণ এবং বাধা বন্ধহারা। সুমিত্রা সংযত এবং সংহত। একটি চরিত্র যেন অন্যটিকে সুস্পষ্ট করবার জন্য সৃষ্ট। নাটকে অনেক সময়েই বিভিন্ন গুণাবলীকে বিভিন্ন চরিত্রের দ্বারা রূপায়িত করা হয়। এর ফলে চরিত্রগুলো একে অন্যের foil হয়ে দাঁড়ায়।

অনেক সময় এই চরিত্রের বৈপরীত্যের ফলেই এক ধরণের নৈতিক পরিবেশের সৃষ্টি হয়ে থাকে। যেমন ধরুণ, 'রাজা ও রাণী'তে বিক্রম যখন হৃদয়াবেগের প্রাচুর্যে যৌবনের প্রথম মিলনের দিনগুলির বর্ণনায় বলছেনঃ

বিক্রম ঃ হায় প্রিয়ে, আজ কেন স্বপ্ন মনে হয় সে সুখের দিন? সেই প্রথম মিলন—প্রথম প্রেমের ছটা ইত্যাদি।

সুমিত্রা উত্তর দিলেন—

সুমিত্রা ঃ তখন ছিলাম শুধু ছোট দুটি বালক-বালিকা; আজি মোরা রাজা রাণী।

বা

বিক্রম ঃ চাহ না আমার প্রেম?

সুমিত্রা ঃ কিছু চাই নাথ·
সব নহে। স্থান দিয়ো হৃদয়ের পাশে, সমস্ত হৃদয় তুমি দিয়ো না আমারে।

বিক্রম ঃ আজো রমণীর মন নারিনু বুঝিতে।

সুমিত্রা ঃ তোমরা পুরুষ, দৃঢ় তরুর মতন আপনি অটল রবে আপনার পরে স্বতন্ত্র উন্নত; তবে তো... ইত্যাদি।

এই সব জায়গায় চারিত্রিক বৈপরীত্যের ভেতর দিয়ে দাম্পত্য সম্বন্ধ সম্পর্কে একটা নৈতিক ইঙ্গিত রয়েছে।

নাটকে আর এক ধরণের বৈষম্যের ব্যবহার দেখা যায়—একে বলে নিয়তির পরিহাস। বাস্তব জীবনেও অনেক সময়েই আমরা এই নিয়তির পরিহাসের পরিচয় পেয়ে থাকি। একভাবে আমরা কোন ব্যাপারের স্বাভাবিক পরিণতির কথা ভাবছি—কিন্তু আসল সময় দেখলাম যা ঘটল তা আমাদের পক্ষে কল্পনা করাও অসম্ভব ছিল। যেমন ধরুণ, 'বিসর্জন' নাটকে রঘুপতি জয়সিংহকে রাজরক্ত আনতে আদেশ দিলেন। তাঁর ধারণা গোবিন্দমাণিক্যকে হত্যা করে জয়সিংহ এই রাজরক্ত এনে দেবে। জয়সিংহ কিন্তু নিজের রক্ত দিয়েই প্রতিশ্রুতি রক্ষা করলেন—কারণ তাঁর দেহেও প্রবাহিত হচ্ছিল এই রাজরক্ত। অথচ এভাবে যে তাঁর আদেশ পালিত হবে এ রঘুপতি ধারণাতেও আনতে পারেন নি।

ইবসেনের 'ওয়াইল্ড ডাক' নাটকে গ্রেগার্স ভার্ল ভাবল যে 'সত্য ভাষণের সাহায্যে' সে ইকডল পরিবারে ন্যায়ের ওপর প্রতিষ্ঠিত সংসার গড়ে তুলবে। কি তার এই 'সত্যভাষণের' ফলে ইকডল পরিবারটির সমস্ত সুখশান্তি চিরতরে নষ্ট হয়ে গেল। নিয়তির পরিহাসের কি অপূর্ব দৃষ্টান্ত।

একটিমাত্র শব্দের ব্যবহারের দ্বারাও নিয়তির পরিহাসের ইঙ্গিত দেওয়া যায়। যেমন 'ওথেলো' নাটকে প্রায় সবাই ইয়াগোর বর্ণনায় 'অনেস্ট' শব্দটির ব্যবহার করছেন। অথবা 'জুলিয়াস সীজার' নাটকে ফিউন্যারাল স্পীচে এ্যান্টনী যখন বলছেন—'For Brutas is a honourable man.' এখানে 'অনারেবল্' শব্দটিতে যথেষ্ট নাটকীয় শ্লেষের ভাব যুক্ত রয়েছে। আবার নিয়তির পরিহাসের এক চমৎকার দৃষ্টান্ত দেখুন 'ম্যাকবেথ' নাটকের প্রথম অঙ্কের চতুর্থ দৃশ্যে। থেন্ অভ কডরের বিশ্বাস-ঘাতকতায় মর্মাহত হয়ে ডানকান বলছেনঃ

"There is no art
To find the mind's construction in the face;
He was a gentleman
on whom I built
An absolute trust."

এমন সময় ম্যাকবেথ প্রবেশ করলেন। এই উক্তিটি ম্যাকবেথ সম্বন্ধেও সমানভাবেই প্রযোজ্য। অথচ ডানকানের ধারণা ম্যাকবেথের মত হিতাকাঙ্ক্ষী তাঁর আর নেই। এই নাটকেরই প্রথম অঙ্কের ষষ্ঠ দৃশ্যে ম্যাকবেথের প্রাসাদে প্রবেশ করবার সময় ডানকান বলছেনঃ

"This castle hath
a pleasant seat,
The air nimbly and sweetly
recommends itself
Unto our gentle senses."

অথচ এই প্রাসাদেই তাঁর শোচনীয় হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হবে। বাস্তব জীবনেও কত সময়ে এই ধরণের নিয়তির পরিহাসের দৃষ্টান্ত দেখা যায়। জীবনের সব কিছুকে বিসর্জন দিয়ে সুমিত্রার প্রেমে বিক্রম উন্মত্ত হয়ে উঠলেন।

সেই প্রেমের উৎসস্থল থেকেই এল প্রচণ্ড আঘাত। এও নিয়তির পরিহাসেরই ইঙ্গিত। গোবিন্দমাণিক্যের পালিত পুত্র ধ্রুবকে হত্যা করে রাজার প্রাণে মৃত্যুশেল হানতে চাইলেন রঘুপতি। কিন্তু নিয়তি ব্যাপারটাকে ঘটালো অন্যভাবে। আত্মদান করলেন জয়সিংহ, রঘুপতিরই পালিত পুত্র এবং প্রাণাধিক প্রিয় শিষ্য।

'গৃহপ্রবেশে' যতীনের সমস্ত হৃদয় মন স্ত্রীর প্রেমে মাতোয়ারা। অথচ তার স্ত্রী কিছুতেই রুগ্ন স্বামীর সামনে আসতে চায় না। এ জন্য যতীনের মাসীকে কত মিথ্যা অজুহাত, কত কৌশল অবলম্বন করতে হয়। শেষ পর্যন্ত যখন সে আসে তখন যতীন আর সজ্ঞানে নেই। সমস্ত নাটকটিতে বার বার যেন নিয়তির পরিহাসেরই নানা ধরণের ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছে।

নাটকের কাহিনীকে আকর্ষণীয় করবার জন্য অনেক সময়ে নাট্যকার বিবিধ উপায়ে বিস্ময় উদ্রেক করবার চেষ্টা করেন। যেমন ধরুন, কোন চরিত্রের সত্যিকার পরিচয় গোপন করে পরে তার আসল পরিচয় প্রকাশ করা হয়। দু'রকম উপায়ে এই পরিচয় গোপন করবার চেষ্টা করা হয়ঃ—

(১) চরিত্রের আসল পরিচয় নাটকের অন্যান্য চরিত্র, দর্শক, পাঠক সবার কাছেই গোপন রাখা হয়। এ ধরণের এপ্রোচে হয়তো খানিকটা রহস্য-রোমাঞ্চের ভাব আছে। কিন্তু শিল্পপদ্ধতি হিসাবে এটা নিকৃষ্ট প্রকৃতির। সস্তা নাটকীয়তা এবং স্টান্ট দেবার ভাবটাই এতে বেশি।

সাজাহান নাটকের দিলদার চরিত্রটি এই ধরণের। পঞ্চম অঙ্কের পঞ্চম দৃশ্যে যখন দিলদার আত্মপরিচয় দিলেন, "আমি মির্জা মহম্মদ নিয়ামত খাঁ!" এবং ঔরংজীব আশ্চর্য হয়ে বললেন,—"নিয়ামত খাঁ হাজী! এশিয়ার বিজ্ঞতম সুধী নিয়ামত খাঁ!" তখন ব্যাপারটা যে অত্যন্ত নাটুকে হয়ে দাঁড়ায় এ কথা সত্যিকার নাট্যরসিক মাত্রেই স্বীকার করবেন।

আর এক উপায়ে নাটকের চরিত্রের পরিচয় গোপন করা হয়ে থাকে। এ ক্ষেত্রে দর্শক বা পাঠকের কাছে চরিত্রের আসল পরিচয় অব্যক্ত থাকে না। অন্যান্য চরিত্রের কাছ থেকেই এই পরিচয় গোপন করা হয়। এই পদ্ধতিটিই বড় দরের নাট্যশিল্পীরা ব্যবহার করে থাকেন। যেমন 'শেষরক্ষা' নাটকে কমলের আত্মগোপন শুধু বিনোদের কাছে। দর্শক, পাঠক এবং অন্যান্য পাত্রপাত্রীর কাছে তার কিছুই গোপন করবার নেই। এই দ্বিতীয় পদ্ধতিটি বেশ সহজ, সরল এবং স্বাভাবিক। প্রথম পদ্ধতিটি যে নাটকীয়তায় ভরা একথা অস্বীকার করা যায় না। শেক্সপীয়ারও দ্বিতীয় পদ্ধতিটির প্রয়োগ করেছেন তাঁর কয়েকটি নাটকে। পোর্সিয়া এবং নেরিশার পুরুষবেশে বিচার সভায় আসবার সময় দর্শক বা পাঠকের কাছে তাঁদের পরিচয় অজ্ঞাত থাকে না। শুধু অন্যান্য পাত্রপাত্রীর কাছেই ও'দের আসল পরিচয় লুকোনো থাকে।

নাটকের প্রধান উদ্দেশ্য হল পাত্রপাত্রীর কার্যধারার ভেতর দিয়ে তাদের চরিত্রের বিভিন্ন দিক ফুটিয়ে তোলা। যে পরিমাণে চরিত্রকে ঘাত-প্রতিঘাত এবং সংঘাতের বেগ সহ্য করতে হয় সেই অনুপাতে নাট্যসাহিত্যে তার কদর হয়ে থাকে।

সংঘাত ব্যাপারটা নাটকে একেবারে অপরিহার্য। হয় চরিত্রে চরিত্রে, নয় বিপরীত ভাবধারাকে অবলম্বন করে বা বিভিন্ন স্বার্থের পরস্পর বিরোধী আচরণ, অনুভূতি এবং কার্যকলাপের দ্বারাই এই সংঘাতের সৃষ্টি হয়। এই সংঘাতকে আশ্রয় করেই কাহিনী গড়ে ওঠে।

চরিত্রে চরিত্রে সংঘাত—যেমন ওথেলো এবং ইয়াগোতে বা 'ম্যান এ্যান্ড সুপারম্যান' নাটকের ট্যানার ও এ্যান হোয়াইটফিল্ডে, বিক্রম ও সুমিত্রায়, গোবিন্দমাণিক্য ও রঘুপতিতে, অথবা ক্ষেমঙ্কর মালিনী বা ক্ষেমঙ্কর-সুপ্রিয়াতে। পারিপার্শ্বিক ঘটনাবলীর সঙ্গে অসামঞ্জস্যের জন্য যে বৈষম্য এবং সংঘাতের সৃষ্টি হয় তাও নাটকীয় উপাদান। এর উদাহরণ পাওয়া যায় 'দি থ্রি সিস্টার্স' (চেখভ), 'জাস্টিস' (গলসওয়ার্দি) বা 'দি হেয়ারী এইপ' (ও'নিল) নাটকে। বিসর্জনের জয়সিংহ চরিত্রেও এই ধরণের দ্বন্দ্ব দেখা যায়। পারিপার্শ্বিক ঘটনাবলী তাকে যেন একেবারে হতবাক করে ফেলেছে। নিজেকে সে কিছুতেই এ সবের সঙ্গে খাপ খাওয়াতে পারছে না। মনের বিভিন্ন দিকের যে দ্বন্দ্ব এবং সংঘাত তাই সুন্দরভাবে রূপায়িত হয়েছে ম্যাকবেথ চরিত্রে।

আবার ওপরে আলোচিত সব রকমের অন্তর্দ্বন্দ্ব এবং বহির্দ্বন্দ্বের সমাবেশ হয়েছে হ্যামলেটে। আবার এই নানা ধরণের সংঘাতের থেকেই ইঙ্গিত পাওয়া যায় জীবনে নিয়তির পরিহাসের প্রাধান্যের সম্বন্ধে। হ্যামলেটের মত দার্শনিক মনোবৃত্তিসম্পন্ন লোকের ওপর ভার পড়ল কি না পিতৃহত্যার প্রতিশোধ গ্রহণের একে ভাগ্যের পরিহাস ছাড়া আর কি বলা যেতে পারে! জয়সিংহকে রঘুপতি নিয়োগ করলেন রাজরক্ত এনে দিতে। সত্যভাষণের দ্বারা গ্রেগার্স ভার্ল চাইলেন ইক্‌ডল পরিবারে পবিত্রতা ফিরিয়ে আনতে—আর অলক্ষ্যে থেকে ভাগ্যদেবতা কৌতুক উপভোগ করলেন।

যাই হোক সংঘাত থেকেই কাহিনীর চরিত্র এবং নাটক গড়ে ওঠে। ঘটনার ঘাত-প্রতিঘাতে চরিত্রের ওপর যে প্রতিক্রিয়া হয় তা থেকেই চরিত্রের বৈশিষ্ট্য রূপায়িত হয়।

সংঘাতের শুরুতেই নাটকের শুরু এবং সংঘাতের পরিসমাপ্তিতেই নাটকের পরিসমাপ্তি হয়। সংঘাতের আদি এবং অন্ত আবার একটা বিশেষ ধারা অবলম্বন করে চলে। প্রথমেই এমন একটি পরিস্থিতি উপস্থিত হয় যার ফলে সংঘর্ষের সূচনা করা হয়ে থাকে। এর পরই কাহিনী ঊর্ধ্বমুখী হতে থাকে। অর্থাৎ সংঘর্ষের মধ্যে একটা ঊর্ধ্বগতির

ভাব স্ফুট হয়ে ওঠে। সমস্যা ক্রমশ জটিলতর হয়ে দাঁড়ায়। সংঘাতের ফলাফল কোনদিকে যাবে এ অবস্থায় তা নিরূপণ করা সম্ভব হয় না। সুতরাং এই সময়ে নাটকে একটা সাস্পেন্সের ভাব সহজেই অনুভূত হয়। এর পরে আসে 'ক্রাইসিস' বা 'ক্লাইমেক্স'। অর্থাৎ বিরুদ্ধবাদী শক্তিগুলো একটা সন্ধিস্থলে এসে যায়। এখন থেকে আভাসে বোঝা যায় সংঘর্ষের গতি কোন দিকে যাবে। এর পর কাহিনীতে নিম্নগতি দেখা দেয়। সংঘর্ষের গতি স্পষ্টভাবে একটা নির্দিষ্ট পথে চলতে থাকে এবং ক্রমশ পরিণতিতে বা ক্যাটাসট্রফিতে এসে পৌঁছয়।

কাহিনীর সংঘর্ষের এই যে পাঁচটি ভাগ, অর্থাৎ সূচনা, ঊর্ধ্বগতি, চরম অবস্থা, নিম্নগতি এবং পরিণতি—এগুলোর সঙ্গে যোগ রেখেই বোধ হয় পঞ্চাঙ্ক নাটকের রচনার রীতি প্রবর্তিত হয়েছিল। তবে শেক্সপীয়ার প্রমুখ অনেক বড় নাট্যকারই অঙ্ক হিসাবে ভাগগুলোকে সাজিয়ে নাটক রচনায় প্রবৃত্ত হন নি। আবার বর্তমানকালে চার অঙ্কের এবং অতি আধুনিক একাঙ্ক নাটকেও কাহিনীর এই বিভিন্ন দিকগুলোকে পাশাপাশি থাকতে দেখা যায়।

[ক্রমশঃ]

"মাথাধরায় সব ট্যাবলেটই একরকমের ফল দেয়"
যদি আপনি তাই মনে করেন

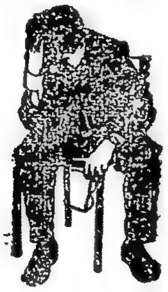

তাহলে পরীক্ষা ক'রে দেখুন

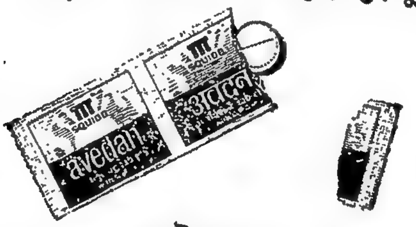

স্কুইব-এর

অবেদন®

আশ্চর্য্যজনক 'অ্যাপেপ'যুক্ত ট্যাবলেট
আপনাকে দ্রুত, নিরাপদ, নিশ্চিত আরাম এনে দেবে।

'অ্যাপেপ'যুক্ত অবেদন কয়েক মিনিটের মধ্যেই কাজ করে—বহুক্ষণের জন্যে আরাম দেয়!

মাথাধরায়, দাঁতব্যথায়, পিঠের ব্যথায়, পেশীর বেদনায়, সর্দিতে, ফ্লুতে, বিশেষ যন্ত্রণাদায়ক দিনগুলিতে ও অন্যান্য সাধারণ পীড়ায় অবেদন ব্যবহার করুন।

SQUIBB® সারাভাই কেমিক্যালস্

® হচ্ছে ই. আর. স্কুইব এণ্ড সন্স, ইনকর্পোরেটেড-এর রেজিষ্টার্ড ট্রেডমার্ক। করমচাঁদ প্রেমচাঁদ প্রাইভেট লিমিটেড উহার লাইসেন্সপ্রাপ্ত ব্যবহারকারী।

[Shilpi SC 31A-Beng

পাঠক মন

[কিছুদিন আগে বঙ্গদর্শনে আমরা নার্সজীবনের বিড়ম্বিত দিকগুলির কথা তুলে ধরেছিলাম। তারপর থেকে আমরা তাঁদের কাছ থেকে অনেক পত্র পাচ্ছি যেগুলির বিষয়বস্তু দেখে সত্যই শিউরে উঠে ভাবতে হয় এ আমরা কোন দেশে বাস করছি। পত্রগুলি আমরা ক্রমে ক্রমে প্রকাশ করব যা পড়ে পাঠকেরা স্তম্ভিত হয়ে যাবেন এই কথা জেনে যে মেয়েদের অসহায়তার সুযোগে কী অন্যায়ই না তাদের উপর দিনের পর দিন করা হচ্ছে।

বর্তমানে আমরা যে চিঠিখানি প্রকাশ করছি সেটি একজন ভয়বিহ্বলা সেবিকার রচনা—যিনি আমাদের কাছেও নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক, কেন না তিনি আশংকা করেন যে ঘুণাক্ষরেও যদি তাঁর নাম প্রকাশিত হয়ে যায় তাহলে তাঁকে সর্বনাশের মুখে পড়তে হবে। তাঁর চিঠিটি আমরা হুবহু উদ্ধৃত করছি কেন না তার সত্যতা সংশয়ের অতীত বলেই মনে হচ্ছে।]

সাপ্তাহিক বসুমতীতে আমাদের হতভাগিনী সেবিকাদের কিছু খবর সাধারণের সামনে হাজির করেছেন সেজন্য আমরা আপনার কাছে চিরকৃতজ্ঞ থাকব। লোকচক্ষুর অন্তরালে আমাদের অসহায়তার সুযোগে যে কত অন্যায় অবিচার করা হয়, আর তা আমাদের মাথা পেতে নিতে হয়, তা যদি সাধারণের সামনে কোনদিন প্রকাশ পায় সেদিন বোধ হয় আপনারা শিউরে উঠবেন।

"সমাজ সেবার মোহে আমরা ভদ্রঘরের মেয়েরা একদিন এখানে এসেছিলাম (এবং এখনো আসছে) আর এসে যে অভিজ্ঞতা লাভ করেছি তার জ্বালা বোধ হয় তিলে তিলে ভোগ করতে হবে। এ সম্বন্ধে হয়ত অনেক কিছুই শুনেছেন বা যদি কোনদিন সত্যিকারের অনুসন্ধান করেন তাহলে শুনতে পাবেন।

"আমি শুধু একটি ঘটনা জানাচ্ছি তাহলেই বুঝতে পারবেন কর্তৃপক্ষের আমাদের উপর কতখানি দরদ। এবার মেডিকেল কলেজ থেকে শিক্ষানবীশ যারা পাশ করেছে তাদের মধ্যে অনেকের পোস্টিং অর্ডার জানিয়ে দেওয়া হল ১০ই সেপ্টেম্বর বিকালে। বলা হল ১১ তারিখে সকালে (মানে বেলা চারটে পর্যন্ত) কাজ করে বিকেল থেকে হোস্টেলের ঘর ছেড়ে দিতে হবে। অনেকের পোস্টিং অর্ডার হয়েছে উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন জায়গায় যেমন কোচবিহার, মালদহ, বালুরঘাট প্রভৃতি স্থানে। এসব জায়গায় যেতে বিকেলে গাড়ি নেই। তার উপর জিনিসপত্র নিয়ে যেতে হলে এই ভিড়ের গাড়িতে সিট রিজার্ভেশনেরও প্রয়োজন। বেলা ৪টায় ডিউটি থেকে কঠোর পরিশ্রম করে এসে ঘর ছেড়ে দিয়ে জিনিসপত্র নিয়ে এরা কোথা খাওয়াও বন্ধ করে দেওয়ায় (এমন কি এককাপ চা-ও নয়) কোথায় থাবে সেকথা কেউ ভেবে দেখল না। বাড়িতে খবর দেওয়াও সম্ভব নয় কারণ অধিকাংশই মফস্বলের মেয়ে। এই অসহায় মেয়েদের কথা কেউ ভেবে দেখবার নেই, অথচ এই মেয়েরা শিক্ষানবীশ হয়ে গত ৪।৫ বছর এই মেডিকেল কলেজে স্টাফ নার্সের কাজ করে এসেছে সামান্য খাওয়া ভাতার বিনিময়ে। কতখানি অমানুষিক ব্যবহার একবার ভেবে দেখুন।

"আর একটি খবর দিয়ে চিঠি শেষ করছি। মাস ছয়েক আগে আমাদের বন্ধু বিনীতা রায় নিউ নার্সেস কোয়ার্টারে আত্মহত্যা করে কর্তৃপক্ষের নানা অবিচারের প্রতিবাদে। এ সম্বন্ধে তার একটি দিনপঞ্জী আমরা পুলিশের হাতে তুলে দিয়েছি। জানি না সে দিনপঞ্জী কোথায়। যদি কোনদিন আলোর মুখ দেখতে পায় তাহলে অনেক অজ্ঞাত তথ্য আপনারা জানতে পারবেন এবং যদি কোন প্রতিকার হয় আমাদের বান্ধবীর অতৃপ্ত আত্মা শান্তি লাভ করবে।

"আমি আমার নাম সঙ্গত কারণেই প্রকাশ করতে চাই না। আমার বক্তব্য সত্য কিনা আপনারা অনায়াসেই যাচাই করে দেখতে পারেন। মেট্রন অফিসে পোস্টিং অর্ডার-এর কপি দেখতে পাবেন। আর বিনীতার খবর আনন্দবাজার, যুগান্তরে বের হয়েছিল। বৌবাজার থানা থেকে পুলিশের ডায়েরী দেখতে পাবেন বা আমাদের হোস্টেলে এসে খোঁজ করেও জানতে পারেন। আপনাকে ধন্যবাদ দিয়ে চিঠি শেষ করছি।"

"পুনশ্চঃ যারা বিকেলের ডিউটিতে নার্সারী এবং লেবার রুমে থাকে, নানা ঝামেলায় ঠিক সময় মত অর্থাৎ ৯টার মধ্যে খেতে আসতে পারে না, অমানুষিক পরিশ্রম করে নোংরা পোষাকে তারা যদি এসে শোনে খাবার নেই তখন কি অবস্থা হয়? এ সব দেখার কেউ নেই। বিনীতার মৃতদেহ দুই দিন ঘরে রইল, মেয়েটা হোস্টেলে এল না সে খবরও নেবার কেউ নেই, যদিও নামে একজন হোমসিস্টার আছে এবং হোস্টেলেই থাকে।"

একজন হতভাগিনী সেবিকা—

২৯শে সেপ্টেম্বর, ১৯৬৬ তারিখ সাপ্তাহিক বসুমতীতে 'বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাচার' শিরোনামায় একটি সংবাদ প্রকাশিত হয়েছে। সংবাদটি একপাক্ষিক এবং উদ্দেশ্য-প্রণোদিত বলে মনে হওয়ায় বর্তমান পত্রের অবতারণা। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাচীন ভারতীয় ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগের প্রধান অধ্যাপক এবং একই সঙ্গে বিশ্ববিদ্যালয়ের মঞ্জুরী কমিশন প্রদত্ত ঐ বিভাগের উচ্চতর গবেষণা কেন্দ্রের অধ্যক্ষের বিরুদ্ধে অপপ্রচার চলা সংক্রান্ত যে সংবাদ আপনাদের পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে, আমরা সে সম্পর্কে অবহিত নই। কোন মহল থেকেই তাঁকে লোকচক্ষে হেয় করার অপচেষ্টা হচ্ছে বলে জানি না। আপনাদের সংবাদ অনুসারে উচ্চতর গবেষণা কেন্দ্রের আয়োজিত বক্তৃতামালা ও সেমিনারসমূহের ধারাবিবরণীগুলি আশ্চর্য দ্রুততা ও ত্রুটিবিহীনতার সঙ্গে প্রকাশিত হচ্ছে। এই প্রসঙ্গে প্রকৃত তথ্য এই যে, ঐ ধারাবিবরণীগুলির সম্পাদনা আদৌ ত্রুটিমুক্ত নয়। উপরন্তু অদ্যাবধি যে তিনটি ইউ-জি-সি'র সেমিনার হয়েছে, তার দুটি পূর্বতন বিভাগীয় প্রধান ও কেন্দ্রের অধ্যক্ষের পরিচালনায় অনুষ্ঠিত হয়েছে। আলোচ্য উচ্চতর গবেষণা কেন্দ্রটির প্রতিষ্ঠা ও বিবর্ধনের মূলে শ্রম ও কৃতিত্ব সর্বজনবিদিত। বর্তমান বিভাগীয় প্রধান এবং কেন্দ্রের অধ্যক্ষ ডক্টর রায়ের শ্রম ও সাধনার ফলভোগী মাত্র।

দ্বিতীয়ত ডক্টর রায় অধ্যক্ষ থাকাকালীন গবেষণা কেন্দ্রের যে সংহতি ছিল, বর্তমানে তা আছে কি? তাঁর পদত্যাগের পর থেকেই ঐ কেন্দ্রে ভাঙন ধরে এবং এগারোজন গবেষকের মধ্যে তিনজন গবেষণাকর্মে ইস্তফা দেয়। গবেষণাকর্মের জন্য যে ধরণের পরিবেশ প্রয়োজন, বর্তমান অধ্যক্ষ তা আদৌ রচনা করতে পেরেছেন কি?

এই সূত্রে আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ তথ্যের প্রতি আপনাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিঃ মঞ্জুরী কমিশন এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন অনুসারে কেন্দ্র সংক্রান্ত কাজকর্ম বিশ্ববিদ্যালয় ভবনেই অধ্যক্ষকে সম্পাদন করতে হয়। বর্তমানে ঐ কেন্দ্রে প্রাচীন ভারতের 'শিল্পশাস্ত্র অভিধান' ও 'প্রাচীন ভারতের ভৌগোলিক অভিধান' এই দুখানি গ্রন্থের সংকলনকার্যে ব্যাপৃত। দ্বিতীয় গ্রন্থখানি বর্তমান অধ্যক্ষের তত্ত্বাবধানে সংকলিত হচ্ছে। কিন্তু দুঃখের বিষয় তাঁর অধীনে যে গবেষকরা ঐ সংকলনকার্য করছেন, তাঁদের তিনি প্রতি সপ্তাহে সংকলিত তথ্যাদি নিয়ে তাঁর বাড়িতে যেতে বাধ্য করেন। আইন অনুসারে ঐ তথ্যাদি বিশ্ববিদ্যালয় ভবনের মধ্যেই অধ্যক্ষকে অর্পণ করার কথা। আরও আশ্চর্যের বিষয় এতাবৎকাল সংকলিত সমস্ত তথ্যই, যা অধ্যক্ষের ভাষায় 'ওজনে কয়েক মণ', তাঁর

বাড়িতে রয়েছে। এইসব তথ্য বিশ্ববিদ্যালয়ের সম্পত্তি এবং বছরের পর বছর এই সম্পত্তি ব্যক্তিবিশেষের বাসস্থানে থাকা কি নিরাপদ এবং আইনসংগত?

কিছুদিন আগে মঞ্জুরী কমিশনের তরফ থেকে ডক্টর এইচ, ডি সাংকালিয়া গবেষণা কেন্দ্রের কার্যক্রম পরীক্ষান্তে যে সমস্ত মন্তব্য করেছেন বলে প্রকাশ দুঃখের বিষয় তাদের কোনটিই বর্তমান অধ্যক্ষের তথাকথিত সুনামের অনুকূল নয়। অন্য পক্ষে "প্রাচীন ভারতের শিল্পশাস্ত্র অভিধান" সংক্রান্ত কাজকর্মের তিনি যে উচ্চ প্রশংসা করে যান তা উক্ত অভিধান সংকলনকারী গবেষকদের বিশেষ উৎসাহের কারণ হয়েছে। প্রসংগত উল্লেখযোগ্য, ডক্টর সাংকালিয়া ভৌগোলিক অভিধান সংকলিত সমগ্র তথ্যাবলি দেখতে চান। কিন্তু তার সুযোগ ঘটে নি। প্রশ্ন এইঃ অন্য এক অধ্যাপকের শিল্পশাস্ত্র অভিধান সংক্রান্ত সংকলনকার্য যে প্রশংসা অর্জন করেছে সেই প্রশংসা কি কেন্দ্রের অধ্যক্ষের প্রাপ্য।

আপনাদের অবগতির জন্য জানাই সম্প্রতি ঐ কেন্দ্রের অধ্যক্ষ একজন ছাত্র এবং একজন ছাত্রীকে কোনরূপ কারণ না দেখিয়ে সাসপেণ্ড করেছেন। সাসপেণ্ড করার পর কারণ দেখিয়েছেন যে তারা নাকি অবাধ্য। তাদের অপরাধ তারা একটি সপ্তাহে তাঁর বাড়িতে হাজিরা দেয় নি। উচ্চতর গবেষণার ক্ষেত্রে এই ধরণের শাস্তি বোধ হয় এই প্রথম। শোনা যাচ্ছে যে তাঁর এই কাজের ঔচিত্য বা যৌক্তিকতা সম্পর্কে ব্যাপক অনুসন্ধানের জন্য কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় একটি কমিটি নিয়োগ করেছেন।

এই তথ্যের আলোকে আপনাদের সম্পাদকীয় মন্তব্যের সংগে আমরাও একমতঃ "এককালে জগদ্বিখ্যাত শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান আজ দলাদলি, ঘরোয়া কোন্দল ও ব্যক্তিগত স্বার্থসিদ্ধির পীঠস্থান হয়ে দাঁড়িয়েছে।" বর্তমান প্রাচীন ভারতীয় ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগের প্রধান অধ্যাপক ও গবেষণা কেন্দ্রের অধ্যক্ষের অসৌজন্য, খামখেয়ালী মনোবৃত্তি এতই সুবিদিত যে, এ সম্বন্ধে নতুন করে কিছু বলার অপেক্ষা রাখে না। এই বিভাগের যে-কোন অধ্যাপক (তাঁর দলের দু-চারজন ছাড়া) ছাত্র-ছাত্রী ও অন্যান্য বিভাগের কোন কোন সহকর্মী অধ্যাপকদের কাছ থেকে এ-সম্পর্কে আরও তথ্য জানা যেতে পারে।

আলোচ্য অধ্যাপক হয়ত 'অতুলনীয় পাণ্ডিত', কারণ এদেশে পাণ্ডিত্যের খ্যাতি নানা কারণে গড়ে ওঠে। তবে রচনার সংখ্যাধিক্য যে কখনোই পাণ্ডিত্যের একমাত্র মাপকাঠি হতে পারে না, আশা করি এ-সত্যের সংগে আপনারাও একমত।

প্রাচীন ভারতীয় ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগের জনৈক শুভানুধ্যায়ী।

* * *

গত ১২ই আশ্বিন তারিখে বঙ্গ-দর্শন শীর্ষক প্রবন্ধে কলিকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয়ের প্রাচীন ভারতীয় ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগ সম্পর্কে কয়েকটি মন্তব্য প্রকাশের জন্য আপনাকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাইতেছি। আশুতোষ কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত এই বিভাগটির বর্তমান কর্ণধার তাঁর প্রগাঢ় পাণ্ডিত্য, প্রজ্ঞা এবং মনীষার জন্য দেশে এবং বিদেশে বিদ্বৎমহলে একটি শ্রদ্ধার আসন অধিকার করিয়া আছেন। তাঁর পাণ্ডিত্যের স্বীকৃতিস্বরূপ এশিয়াটিক সোসাইটি (কলিকাতা), এশিয়াটিক সোসাইটি অব গ্রেট বৃটেন এণ্ড আয়ারল্যাণ্ড প্রভৃতি বহু প্রতিষ্ঠান তাঁকে ফেলো নির্বাচিত করিয়াছে। রাজনীতির কলুষমুক্ত এই কর্মযোগী মানুষটি এখনও বহু মূল্যবান গবেষণা-গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়া চলিয়াছেন এবং প্রায়ই নানা বিশ্ববিদ্যালয়ে আমন্ত্রিত হইয়া পাণ্ডিত্যপূর্ণ বক্তৃতাদানে অতীতের অন্ধকার হইতে ভারতীয় ঐতিহ্যের বহু লুপ্তধারাকে উদ্ধার করিতেছেন। এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে, তাঁর অধুনা রচিত Indian Epigraphy এবং Indian Epigraphical Glossary সম্পর্কে মন্তব্য করিতে গিয়া প্রখ্যাত ভাষাতত্ত্ববিদ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় এবং ঐতিহাসিক রমেশচন্দ্র মজুমদার বলিয়াছেন যে, এরূপ পুস্তক রচনা করিবার ক্ষমতা সমগ্র পৃথিবীতে দু-একজনের বেশি নাই। অত্যন্ত দুঃখের কথা যে, শিক্ষার পাদপীঠ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের জনৈক অধ্যাপক সমস্ত শালীনতা বর্জন করিয়া এই জ্ঞানতপস্বীকে হেয় প্রতিপন্ন করার হীন চক্রান্তে লিপ্ত হইয়াছেন। শোনা যায় যে, ঐ অধ্যাপকটি নাকি M.A. পরীক্ষা দিয়া প্রথমবারে তৃতীয় শ্রেণীতে একটি স্থান লাভ করেন এবং অপর একটি বিষয়ে দ্বিতীয়বার পরীক্ষা দিয়া কলঙ্কমোচন করেন। শিক্ষানুরাগী প্রত্যেকটি ব্যক্তিই উক্ত অধ্যাপকটিকে সনির্বন্ধ অনুরোধ জানাইবেন যাহাতে তিনি স্বার্থসিদ্ধি করিতে যাইয়া বঙ্গদেশ তথা ভারতের অপূরণীয় ক্ষতি না করেন।

অধ্যাপক অমলেশ সিংহরায়
১৫, চৌধুরীবাগান লেন
কলিকাতা—৩৪

'সাপ্তাহিক বসুমতী' বর্তমান বাংলা সাহিত্যের একটি সময়োপযোগী প্রয়াস, কারণ যখন বাংলা ভাষায় প্রকাশিত প্রায় সব পত্রপত্রিকাই গতানুগতিক ভাবধারায় প্রবাহিত, তখন আপনাদের পত্রিকা নূতনত্বের দাবি করিতে পারে। আপনাদের নিরপেক্ষ ও নির্ভীক সমালোচনা (যাহা গণতন্ত্রী রাষ্ট্রের পক্ষে একান্ত প্রয়োজনীয়) দেশবাসীর কাছে সমাদর লাভ করিয়াছে। আপনাদের বলিষ্ঠ লেখনী সরকারের অন্যায় এবং অত্যাচারের নগ্নরূপকে প্রকাশ করিতেছে এবং এজন্যই সাপ্তাহিক বসুমতী এমন কি অসমীয়া পাঠকদের নিকটেও সমাদর লাভ করিতেছে। এই সৌভাগ্য সম্ভবত বাংলা ভাষায় প্রকাশিত আর কোনও পত্রিকার ভাগ্যে জোটে নাই।

বিভিন্ন ধরণের এবং বিভিন্ন বিষয়ের রচনা প্রকাশে আপনাদের স্বাতন্ত্র্য বিশেষভাবে লক্ষণীয়. "মার্কিন সাম্রাজ্যবাদীদের কোপে পড়িয়া ফরমোসা প্রভৃতি দেশ কিভাবে নিজেদের স্বাধীন সত্তা হারাইয়া আমেরিকার ক্রীড়নক হইয়াছে এবং বর্তমান ভারত সরকার আমেরিকার শিকার হওয়ায় কি ফল হইতে পারে" তাহা লইয়া চিন্তাশীল লেখকদের রচনা প্রকাশ করিলে পাঠকদের দ্বারা অভিনন্দন লাভ করিবেন।

আপনাদের পত্রিকার ক্রমবর্ধমান প্রচার আমাদের কাম্য, কিন্তু পরিশেষে আমার অনুরোধ অন্যান্য পত্রিকার মত বহুল প্রচারের সাথে সাথে আপনারা নিরপেক্ষ নীতিভ্রষ্ট হইবেন না।

শ্রীজয়ন্ত ভট্টাচার্য
২৫৪/বি সেন্ট্রাল গোটানগর
গৌহাটী-১১

শ্রীগোলোকেন্দু ঘোষ-এর

দশচক্র

বিষ্ণুশর্মার পঞ্চতন্ত্রের কয়েকটি গল্প নিয়ে ছোটদের উপহারোপযোগী ও অভিনয়োপযোগী নাটিকা। সুধীবৃন্দ কর্তৃক উচ্চপ্রশংসিত। [১·৫০]

চতুর্দোলা

পুশকিন, ডস্টয়েভস্কি, চেখভ, টলস্টয়-এর বিশ্বশ্রেষ্ঠ চারটি গল্পের সার্থক অনুবাদ। [৩·০০]

অগ্রণী প্রকাশনী

এ-১, কলেজ স্ট্রিট মার্কেট, কলকাতা—১২

রূপজগৎ

রাজেন তরফদারের আকাশ ছোঁয়া ছবিতে সন্ধ্যা রায় দেবী।

সিনেমা লক-আউটের অবসান

শারদীয়-উৎসব-প্রাক্কালে সুখবর—দীর্ঘদিনের সিনেমা লক-আউটের অবসান হয়েছে। মালিকপক্ষ সিনেমাকর্মীদের সঙ্গে আপোষ করে লক-আউট প্রত্যাহার করে নিয়েছেন। এই মীমাংসায় শ্রমিকদের দাবি নাকি সম্পূর্ণ না হলেও আংশিক মেনে নেওয়া হয়েছে। লক-আউট-কালীন অর্ধেক সময়ের বেতন শ্রমিকরা পাবেন না, এটাই তাঁদের ক্ষতি। শ্রমিকদের এই আংশিক সাফল্যে আমরা তাঁদের অভিনন্দন জানাচ্ছি। শারদীয়-উৎসব-দিনে জনসাধারণের আনন্দ উপভোগে বাধা অপসারণের জন্য মালিক-পক্ষের শুভবুদ্ধিরও আমরা প্রশংসা করছি। তবে কথাটা তিক্ত হলেও একথা না বলে উপায় নেই যে, সিনেমা মালিকদের অদূরদর্শিতার জন্য দীর্ঘদিন জনসাধারণ সিনেমা দেখার সুযোগ থেকে বঞ্চিত হয়েছেন, শ্রমিকরাও অভাবে, অনিশ্চয়তায় কষ্ট পেয়েছেন। আজ যে সর্তে মালিকপক্ষ আপোষ করে লক-আউট প্রত্যাহার করেছেন—অন্তত ১৫ দিন আগেও তাই করতে পারতেন। তাছাড়া একদিনের প্রতীক ধর্মঘটের পাল্টা অনির্দিষ্ট-কালের জন্য লক-আউটের যুক্তি কি থাকতে পারে? একমাত্র সামন্ততান্ত্রিক মনোভাব ছাড়া!

এই লক-আউটের ফলে জনসাধারণ আনন্দ উপভোগ থেকে বঞ্চিত হয়েছেন, কর্মীদের কষ্ট হয়েছে, সিনেমা মালিকদের ৫০ লক্ষ টাকার মত আয় হয় নি, পঃ বঃ সরকারের ৭।৮ লক্ষ টাকার মত প্রমোদ কর বাবদ আয় বন্ধ থেকেছে। শুধু তাই নয়, এই লক-আউটের ফলে বহু ছবি মুক্তির প্রতীক্ষায় জমে থাকায়, স্টুডিওর কাজ ঢিলা হয়ে যাওয়ায় প্রযোজকদের উপর অর্থাৎ চলচ্চিত্রশিল্পের উপর একটা ধাক্কা আসছে। মুক্তি প্রতীক্ষিত ছবির সংখ্যা বেশি হওয়ায় মুক্তির জন্য প্রতিযোগিতা বাড়বে এবং কালো টাকায় মুক্তির চেষ্টা হবে। এভাবে প্রদর্শকরা হয়ত তাদের লোকসান মিটিয়ে নেবে। কিন্তু হতভাগ্য প্রযোজকরা পথে বসবেন। ছোট প্রযোজকদের ক্ষেত্রে এই পরিস্থিতি সর্বস্বান্ত হবার মত। এই লক-আউটের ফলে চলচ্চিত্র প্রযোজনার ক্ষেত্রে কি যে ক্ষতি হয়েছে সেটা আজ হয়ত অনেকে বুঝতে পারছেন না, কিন্তু এক বছর পরেই বোঝা যাবে যখন বাংলা ছবির সংখ্যা এবং মান নিতান্ত নিম্নমুখী হবে। এ কারণে আমরা মনে করি বাঙালী চলচ্চিত্র প্রযোজক, দর্শক এবং স্টুডিও টেকনিশিয়ানদের যুক্ত উদ্যোগে একটি তদন্ত কমিটি গঠিত হওয়া দরকার। যে তদন্ত কমিটি বিচার করবে—সিনেমা লক-আউটে উদ্যোগীদের মানসিকতা কি ছিল এবং এর উদ্যোক্তা কারা, তাদের সঙ্গে বাংলা এবং হিন্দী ছবির মধ্যে কোনটির সঙ্গে সম্পর্ক বেশি, সে সব মালিকের প্রেক্ষাগৃহে কোন ভাষার ছবি প্রদর্শিত হয়, তাঁদের সঙ্গে বাংলা চলচ্চিত্র শিল্পের কোন সম্পর্ক আছে কি না ইত্যাদি। কেবলমাত্র বে-সরকারী তদন্ত নয়, আমরা মনে করি সরকারী তরফ থেকেও বাংলা ছবির স্বার্থে এরূপ তদন্ত হওয়া দরকার। বাংলার চলচ্চিত্র-শিল্প পঃ বঃ সরকারের কেবল মর্যাদার জিনিস নয়, এর দ্বারা সরকারের যে আয় হয় তা নগণ্য নয়। বহু লোকের পেশা ও জীবিকা এর সঙ্গে জড়িত। সুতরাং এ ব্যাপারকে উপেক্ষা করা চলে না। আমরা আশা করি এরূপ একটি তদন্ত কমিটি সম্পর্কে সরকারী এবং বে-সরকারী উভয় পক্ষ থেকে বিবেচনা করা হবে। —সুজন।

নাটকের কথা

কাজলরেখা

[গ্রামীণ লোকশিল্পী সংস্থার অনুষ্ঠান]

গত বৃহস্পতিবার মহালয়ার দিন সকাল সাড়ে নয়টায় মহাজাতিসদনে গ্রামীণ গীতি সংস্থার দ্বি-বার্ষিক অনুষ্ঠান সম্পন্ন হয়েছে। অনুষ্ঠানে লোক সমাগম, স্মারক পুস্তিকায় সুপাঠ্য লেখা এবং শিল্পীসমাবেশ এই সংস্থার শক্তির পরিচয় প্রকাশ করেছে। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেছেন ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য। প্রারম্ভে সংস্থার সম্পাদক শ্রীমনোরঞ্জন চৌধুরী সমবেত ব্যক্তিদের অভ্যর্থনা জানিয়ে গ্রামীণ গীতি-সংস্থার উদ্দেশ্য ব্যক্ত করেন।

তারপর গ্রামীণ গীতির আসর বসে। একে একে শিল্পীরা আসরবন্দনা, ব্রত-কথা, বাউল, বিচ্ছেদ, দেহতত্ত্ব ধামাইল, ভাটিয়ালী, সারি, ভাওয়াইয়া, চটকা, হোলী গান পরিবেশন করেন। পল্লীর গানগুলির নির্বাচন প্রশংসনীয়। এই গানগুলি গেয়েছেন—দীনেন্দ্র চৌধুরী, দীপালি চৌধুরী, তৃপ্তি মিত্র, সুকুমার মিত্র, মঞ্জু বন্দোপাধ্যায়, শ্যামলী ধরচৌধুরী, বিনয় চট্টোপাধ্যায়, রাণা চৌধুরী, সুনীতা ঘোষ, নিখিল চক্রবর্তী, প্রমথ ঘোষ, নরেন্দ্র চক্রবর্তী, শুকদেব চক্রবর্তী। এই সংস্থার সদস্য হিসাবে গায়করা পল্লীগীতির অনুরাগী এবং তাঁরা বাংলার এই লোক-সংস্কৃতির ধারাকে সযত্নে ধরে রাখার পক্ষপাতী—এরূপ অনুমান করা হয়েছিল সম্পাদকের বক্তব্য শুনে। কিন্তু গীতি পরিবেশনের সময় দেখা গেল তিন-জন ব্যতীত গান মুখস্থ কারো নেই। পল্লীগীতি গাইছেন সামনে খাতা বা কাগজ ধরে। সুতরাং অধিকাংশ গানে না ছিল আবেগ, না কণ্ঠের বলিষ্ঠতা। এ'দের মধ্যে একমাত্র দীনেন্দ্র চৌধুরীকে নিষ্ঠাবান মনে হল; মেয়েদের মধ্যে তৃপ্তি মিত্র।

এই অনুষ্ঠানে বিশেষ আকর্ষণ ছিল 'কাজলরেখা' নৃত্যনাট্য। ময়মনসিংহ গীতিকার লোকগাথা 'কাজলরেখা'কে নৃত্যনাট্যের রূপ দিয়েছেন নৃত্য-শিল্পী অসিত চট্টোপাধ্যায়। এই নৃত্যরূপের অবলম্বন ভাস্কর বসু কৃত নাট্যরূপ। নৃত্য রূপায়নে অসিত চট্টোপাধ্যায় সাধারণভাবে কথাকলির ছায়ায় বা রবীন্দ্র-নৃত্যনাট্যের চলিত ধারা এবং তার সঙ্গে

বি-বি-সি'র শ্রোতাদের সুপরিচিত ডাস্টি স্প্রিংফিল্ড তাঁর নতুন গান 'ভালবাসা বলো না [illegible]' গেয়ে খ্যাতির শীর্ষে উঠেছেন। পপুলার সঙ্গীতের ক্ষেত্রে তাঁকে পুরোধা মনে করা হয়।

লোকনৃত্যের রীতি অনুসরণ করেছেন। এই নৃত্য রূপায়ণে যথেষ্ট কল্পনাশক্তির পরিচয় রয়েছে এবং বিভিন্ন রীতির নৃত্য-সমন্বয়ে বৈচিত্র্য সৃষ্টি হয়েছে। পল্লীগীতির সহজ সুরের সাথে সমতা রেখে নৃত্য সহজ গতি ও রীতিতে অগ্রসর হওয়ায় রূপকথার মেজাজে উপভোগী হয়েছে। প্রসঙ্গত বলা দরকার যে, নৃত্যরূপ কিছুটা সংক্ষিপ্ত হতে পারত। প্রথমত কয়েকটি দৃশ্যে খুটিনাটি কাজ না দেখালে এবং কয়েকটি ছোট চরিত্র বাদ দিলে হয়ত সময় সংক্ষেপ হত এবং নৃত্যনাট্যের অঙ্গহানি হত না। এ ছাড়া নৃত্য রূপায়ণে রেডিওর জন্য লিখিত নাট্যরূপ শুধুই অনুসরণ না করে যদি (কথাকলি ও লোকনৃত্যের রীতিতে) স্বাধীন বিকাশ ঘটত, এবং আরো কিছুটা মূকাভিনয় বা প্যান্টো-মাইমের সুযোগ নেওয়া হত তাহলে নতুনত্বপূর্ণ হত, আরো উপভোগ্য হত।

নৃত্য রূপায়ণে কাজলরেখারূপে গায়ত্রী চট্টোপাধ্যায় এবং কাঙ্কনদাসীরূপে চিত্রা বন্দ্যোপাধ্যায় বিশেষ প্রশংসার দাবি রাখেন। এ'দের ছন্দজ্ঞান, মুদ্রা ও বিশেষ-ভাবে অভিনয়ের কাজ প্রশংসনীয়। একজন দাসীবেশী সদাগরকন্যাকে আর একজন রাণীবেশী দাসীকে চমৎকারভাবে প্রকাশ করেছেন। শুক পাখীর রূপকনৃত্যে সুতপা বন্দ্যোপাধ্যায়কে সকলের ভাল লেগেছে। গ্রাম্য রমণীর বিভিন্ন নৃত্যে জয়শ্রী লাহিড়ী, পদ্মিনী দাশগুপ্তা, শিবানী দাশগুপ্তা, ইন্দ্রাণী দাশগুপ্তা অমিতা দত্ত ও সুমিতা মুখোপাধ্যায়

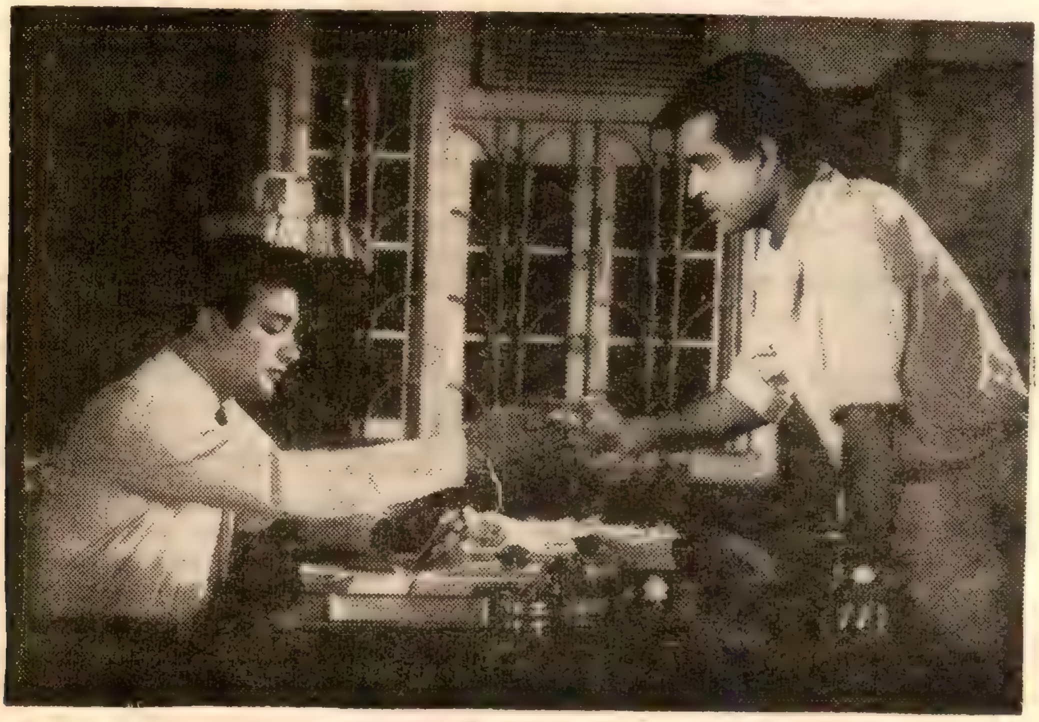

হীরেন নাগ পরিচালিত 'জীবন মৃত্যুর' একটি দৃশ্যে উত্তমকুমার ও প্রশান্তকুমার

প্রশংসনীয়। রাজপুত্রের নৃত্যাংশের রূপ দিয়েছেন অসিত চট্টোপাধ্যায়। এবং অন্যান্য ভূমিকার নৃত্যরূপ দিয়েছেন বরুণ মুখোপাধ্যায়, রমেশ দত্ত, সুরেশ দত্ত, ধ্রুব মিত্র, প্রদীপ বন্দ্যোপাধ্যায়। শেষাংশের মিলনোৎসবে আলোর নৃত্য-পরিকল্পনা বিশেষ প্রশংসনীয়।

এই নৃত্যনাট্যে ময়মনসিংহের প্রচলিত কথায় ও সুরে গ্রন্থিক উপাখ্যানের সূচনা ও যোগসূত্র করেছেন, এবং বিভিন্ন চরিত্রের সংলাপ আঞ্চলিক বৈশিষ্ট্য বজায় রেখে গীত হয়েছে। এই সুর-সংযোজনার জন্য দীনেন্দ্র চৌধুরীর প্রচেষ্টা অভিনন্দনীয়।

এরূপ অনুষ্ঠানের জন্য আমরা উদ্যোক্তাদের অভিনন্দন জানিয়ে একথা না বলে পারলাম না যে, তাঁদের স্মারক পুস্তিকায় মূল্যবান রচনার মধ্যে পঃ বঙ্গের মুখ্যমন্ত্রীর বাণী প্রকাশ সুশোভন নয়। তার জবাব অবশ্য ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্যের ভাষণেই পাওয়া গেছে। গ্রামীণ লোকশিল্পীরা যে-রাজ্যে উপেক্ষিত, যেখানে গিরীন চক্রবর্তীর মত পল্লীসংগীত গায়কের মৃত্যুর পর স্ত্রী-কন্যার বাঁচার নিশ্চয়তা থাকে না, সে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীর শুভেচ্ছাজ্ঞাপন আন্তরিক কি না সে বিষয়ে মতান্তরের অবকাশ আছে। এরূপ মুখমন্ত্রীদের লোকসঙ্গীতের পৃষ্ঠপোষকরূপে জাহির করার সুযোগ করে দিয়ে জনসাধারণকে বিভ্রান্ত করা হয়। গ্রামীণ গীতিসংস্থা ভবিষ্যতে এরূপ দুর্বলতা না দেখালে আমরা খুশি হব।

জাতীয় ফিল্ম সংরক্ষণাগার

ভারতে নির্মিত সকল ছবি সংগ্রহের সিদ্ধান্ত

ভারতের জাতীয় ফিল্ম সংরক্ষণাগারের বিষয় নির্বাচনী কমিটির বোম্বাইতে অনুষ্ঠিত সাম্প্রতিক সভায় সংরক্ষণাগারে রক্ষার জন্য ভারতে নির্মিত ছবিগুলি সংগ্রহের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে। এই সভায় উপস্থিত ছিলেন জে বি এইচ ওয়াদিয়া, চিদানন্দ দাশগুপ্ত, বি ডি গর্গ, এস কৃষ্ণস্বামী, সতীশ বাহাদুর, পি কে নায়ার প্রমুখ।

কমিটির মতে ভারতে প্রস্তুত প্রত্যেকটি ছবি সংরক্ষণাগারে রক্ষা করা প্রয়োজন।

সি, তেজস্বিনি রাও গত ১০ই অক্টোবর রসিক রঞ্জনী সভা গৃহে ভরত নাট্যম প্রদর্শন করে প্রশংসা লাভ করেছেন।

এই সিদ্ধান্ত কার্যকরী করার জন্য সেন্সরশিপ বিধির ধারায় সংশোধনের সুপারিশ করে বলা হয়েছে যে, সেন্সর করার সময় প্রযোজককে এক কপি ছবি সংরক্ষণাগারের জন্য দিতে হবে। তা' ৩৫ মিঃ অথবা ১৬ মিঃ হতে পারে।

আর এক প্রস্তাবে বলা হয়েছে আন্তর্জাতিক ফিল্ম সংরক্ষণাগার ফেডারেশনের মাধ্যমে ভারতের ছবি পৃথিবীর সব দেশে প্রচারের ব্যবস্থা করা হবে এবং একইভাবে ভারতে বিদেশী ছবি দেখানো হবে।

দার্জিলিঙে নটনাট্যম্

আগামী ২৫শে ও ২৬শে অক্টোবর দার্জিলিঙে নটনাট্যম্ তিনটি নাটক অভিনয় করবে। প্রথম দিনে 'দার্জিলিঙের মেয়ে' ও আন্তন চেকভের দি প্রপোসাল থেকে রমেন লাহিড়ীকৃত 'রাজযোটক' অভিনীত হবে।

দ্বিতীয় দিনের নাটকের নাম 'পাখীর বাসা'। প্রথম ও শেষ নাটকটি রচনা ও নির্দেশনায় আছেন জগমোহন মজুমদার।

'রাজযোটক' অরুণ মুখোপাধ্যায় নির্দেশিত।

'ভারত-ভূমি' নৃত্যনাট্য

ভারতীয় নৃত্যকলা মন্দিরের উদ্যোগে নভেম্বর মাসে মহাজাতিসদনে নৃত্যবিদ্ নীরেন্দ্রনাথ সেনগুপ্তের পরিচালনায় 'ভারত-ভূমি' নৃত্যনাট্য প্রদর্শিত হবে। সহকারীরূপে অংশ গ্রহণ করবেন—অনুপশঙ্কর ও শ্রীমতী স্বপ্না সেনগুপ্ত।

স্টুডিও খবর

মহরৎ: অসামাজিক

গত ১০ই অক্টোবর ক্যালকাটা মুভিটোন স্টুডিওয় কেডী পিকচার্সের 'অসামাজিক' কাহিনীচিত্রের মহরৎ অনুষ্ঠিত হয়েছে। এফ, জি, শর্মা রচিত কাহিনী অবলম্বনে এই ছবির চিত্রনাট্য রচনা ও পরিচালনার দায়িত্ব নিয়েছেন পীযূষ বসু। সংগীত পরিচালনা করবেন ওস্তাদ বাহাদুর খান। সম্পাদনা করবেন রমেশ যোশী। চিত্র গ্রহণের কাজ সম্পাদন করবেন দিলীপরঞ্জন মুখার্জী। শিল্প-নির্দেশনায় থাকবেন কার্তিক বসু। অভিনয়াংশে থাকবেন রবীন ব্যানার্জী, অরুণ মুখার্জী, সমিতা বিশ্বাস এবং প্রশান্ত চ্যাটার্জী প্রমুখ।

গোরা

ফিল্ম ইন্টারন্যাশনাল চিত্র সংস্থা রবীন্দ্রনাথের গোরা উপন্যাসটি চিত্ররূপ গ্রহণে উদ্যোগী হয়েছে।

ছুটী

শ্রীমতী অরুন্ধতী দেবীর 'ছুটী' ছবির কাজ যথারীতি অগ্রসর হচ্ছে। বিমল করের 'খড়কুটো' অবলম্বনে ছবিটির চিত্রনাট্য রচিত হয়েছে। বিভিন্ন ভূমিকায় অভিনয় করছেন—নন্দিনী মালিয়া, মৃণাল মুখার্জী, অজিতেশ ব্যানার্জী, আরতি সেন, বাণী হাজরা, টিঙ্কু।

মহরৎ: লগ্ন এলো

গত ১৩ই অক্টোবর ইন্দ্রপুরী স্টুডিওর গীতাঞ্জলী ফিল্মসের প্রথম প্রচেষ্টা 'লগ্ন এলো' ছবির মহরৎ অনুষ্ঠান সম্পন্ন হয়েছে।

সংবাদ বর্ণনা

রম্যা র'লার জীবনী-চিত্র

সোভিয়েত ইউনিয়নের স্টেট ডকুমেন্টারি ফিল্ম স্টুডিও রম্যা র'লার জীবনের একটি বিশেষ সময় অবলম্বনে একটি প্রামাণিক চিত্র নির্মাণে উদ্যোগী হয়েছে। ছবির নাম 'আওয়ার ফ্রেন্ড রম্যা র'লা'। পরিচালনা করছেন আইওসিফ পসেলিস্কি। ১৯৩৫ সালে রম্যা র'লা সোভিয়েত ইউনিয়নে গিয়েছিলেন। সে সময় তিনি ক্রেমলিন, স্পোর্টস প্যারেড, শিশুদের শিক্ষালয় পরিদর্শন করেছিলেন, এবং ম্যাক্সিম গর্কী প্রমুখ বিশিষ্ট ব্যক্তিদের সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎ ঘটেছিল। সেই সকল ঘটনার সংবাদ চিত্রসমূহ সন্নিবেশিত করে, তার সঙ্গে চিত্র-শিল্পীর অঙ্কিত ছবি সহযোগে এই প্রামাণিক চিত্র নির্মিত হচ্ছে।

পাকিস্তানে 'টেন কম্যান্ডমেন্টস' প্রদর্শনে আপত্তি

এক সংবাদে প্রকাশ—পাকিস্তান সরকার 'দি টেন কম্যান্ডমেন্টস' ছবিটি প্রদর্শন করতে দিতে আপত্তি জানিয়েছে। কারণ হিসাবে বলা হয়েছে ইস্লামিক রাষ্ট্রে মুশার ন্যায় পয়গম্বরদের প্রতিমূর্তি প্রদর্শন ধর্মীয় বিধি অনুযায়ী উচিৎ নয়।

লেনিনগ্রাডে মার্কিন ছবির চিত্র গ্রহণ

সোভিয়েত মার্কিন সহাবস্থান নীতির আর এক ধাপ অগ্রসর হয়েছে। এবার মার্কিনরা লেনিনগ্রাডে যাচ্ছে ছবির চিত্র গ্রহণ করতে। এতকাল পূর্বে ইউরোপীয় গণতান্ত্রিক দেশ এবং ভারত সহ কয়েকটি বন্ধুরাষ্ট্র ব্যতীত কোন সাম্রাজ্যবাদী দেশকে সোভিয়েত ইউনিয়নে চিত্র গ্রহণ করতে দেওয়া হয় নি। বর্তমানে সোভিয়েত নীতির যে পরিবর্তন হয়েছে তারই ফলে 'দি গ্রেট ক্যাথারিন' ছবির

শ্রীবিষ্ণু পিকচার্স পরিচালিত '৮০তে আসিও না' ছবির একটি দৃশ্যে রুমা দেবী, জহর রায় ও ভানু বন্দ্যোপাধ্যায়।

শ্রীমতী শুভলক্ষ্মী ও তাঁর সহযোগিগণঃ শ্রীমতী রাধাবিশ্বনাথম, শ্রীমতী বিজয়া রাজেন্দ্রম, শ্রীসুব্রমনিয়ম, শ্রী টি, কে, মূর্তি, শ্রীবিনায়করম।

চিত্র গ্রহণের জন্য প্রযোজক জুলেস বাক শীঘ্র লেনিনগ্রাড যাচ্ছেন সদলবলে। জর্জ বার্নার্ড রচিত একাঙ্কিকা অবলম্বনে ছবিটির চিত্রনাট্য লেখা হয়েছে।

নির্বাচন প্রচারের জন্য চলচ্চিত্র তারকা

এক সংবাদে প্রকাশ, আগামী সাধারণ নির্বাচনে চলচ্চিত্র তারকাদের প্রচার কাজে নামাবার জন্য প্রতিষ্ঠান এবং ব্যক্তিগতভাবে কোন কোন প্রার্থী এখন থেকে চেষ্টা সুরু করেছেন। এ ব্যাপারে কংগ্রেসই উদ্যোগ নিয়েছে সবার আগে। প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীর পক্ষে প্রচারের জন্য নার্গিস, দিলীপকুমার, বৈজয়ন্তীমালা, পদ্মিনী, ধর্মেন্দর, ওয়াহিদা রহমান এবং নন্দাকে অনুরোধ করা হয়েছে। তাঁরা নাকি সম্মত হয়েছেন।

আমেরিকায় শ্রীমতী শুভলক্ষ্মীর সঙ্গীত-সফর

ভারতের বিখ্যাত গায়িকা শ্রীমতী শুভলক্ষ্মী জাতিসংঘের জেনারেল এসেম্বলিতে আগামী ২৩শে অক্টোবর বেলা তিনটায় সংগীত পরিবেশন করবেন।

এই উপলক্ষে শ্রীমতী শুভলক্ষ্মী গত ১৮ই সেপ্টেম্বর জেনেভার দিকে রওনা হয়েছেন। দু-সপ্তাহকাল পশ্চিমের বিভিন্ন স্থান পরিদর্শন করে ২রা অক্টোবর হতে তাঁর সংগীত-সফর সুরু হবে আমেরিকায়। আমেরিকার কলগেট, সিরাকাস, বাফালো, ওয়েসলেয়ান, স্টানফোর্ড, মেশৌরি, কানসাস পেনসিলভানিয়া প্রভৃতি বিশ্ববিদ্যালয় এবং বোস্টন, চিকাগো, ওয়াশিংটন, সিয়াটল, লসএঞ্জেলস, বার্কলে প্রভৃতি শহরে তিনি সংগীত পরিবেশন করবেন। ২রা অক্টোবর হতে ১৮ই নভেম্বর পর্যন্ত তিনি আমেরিকার বিভিন্ন শহরে সংগীত পরিবেশন করে ১৯শে নভেম্বর লন্ডনের পথে রওনা হবেন। আগামী ২৫শে ও ২৬শে নভেম্বর লন্ডনে কমনওয়েলথ ইনস্টিটিউটে শ্রীমতী শুভলক্ষ্মী সংগীত পরিবেশন করে কয়েকদিন রোমে থেকে আগামী ৫ই ডিসেম্বর ভারতে ফিরে আসবেন।

শ্রীমতী শুভলক্ষ্মীর এই দীর্ঘ সংগীত সফরে তাঁর সংগে থাকছেন শ্রী ভি ভি সুব্রমনিয়ম (বেহালা), শ্রী টি কে মূর্তি (মৃদঙ্গ), শ্রী টি এইচ বিনায়করম্‌ (ঘাটস), তাঁর দুই কন্যা শ্রীমতী রাধা বিশ্বনাথম এবং শ্রীমতী বিজয়া রাজেন্দ্রম। জ্যেষ্ঠা কন্যা কণ্ঠসংগীতে এবং কনিষ্ঠা তাম্বুরায় তাঁর সহযোগিতা করবেন। এই সঙ্গে থাকছেন শ্রীমতী শুভলক্ষ্মীর স্বামী শ্রী টি সদাশিবম্‌। তিনি মাদ্রাজের তামিল সাপ্তাহিক 'কল্কি' এবং ইংরেজী সাপ্তাহিক 'স্বরাজ্যে'র মালিক।

এই সংগীত সফরের জন্য শ্রীমতী শুভলক্ষ্মী ৬০টি সংগীত বাছাই করেছেন। এই গানগুলি তামিল, তেলেগু, কানাড়ী, সংস্কৃত, হিন্দী ভাষায় রচিত। গানগুলি ত্যাগরাজ, শঙ্করাচার্য, জয়দেব, মীরা, নারায়ণতীর্থ, রামলিঙ্গ স্বামী, সুব্রমান্য ভারতী, কবির, সতী তিরুপাল, ভদ্রাচলের রামদাস গোপালকৃষ্ণ ভারতী প্রমুখ সাধকগণের রচিত। তাঁর এই সংগীত-সম্ভারে একটি বাংলা গান রয়েছে। সেই গানটি রবীন্দ্রনাথের 'হে নূতন'।

এই সফর উপলক্ষে শ্রীমতী শুভলক্ষ্মীর পক্ষ থেকে যে পুস্তিকা প্রকাশিত হয়েছে তা পশ্চিমের শ্রোতাদের পক্ষে খুবই সহায়ক হয়েছে। ৬০টি গানের কলি, রাগ, তাল, রচয়িতার নাম এবং রাগের পরিচয়, এবং গানগুলির মর্মার্থ ইত্যাদি পুস্তিকায় [illegible]

সংগীত কথা

কুন্তলারা ঝুমরী গাহে

সেবারে ঠিক হল আমাদের—'লোক-গীতি গবেষণা কেন্দ্রে' ঝুমরী গানের ব্যবস্থা করা হোক। তদনুযায়ী মালদহ জেলার রাধাকান্ত সরকারের ঝুমুরে দলকে আহ্বান করা হলো।

রাধাকান্ত এই ঝুমুরে দলের দলপতি। তিনি এককালে একজন নামকরা কবি-য়াল ছিলেন, এখন বৃদ্ধ। দলে একজন ঢুলী, একজন বেহালাবাদক, একজন কাঁসি বাদক এবং নয় জন যুবতী মহিলা রয়েছেন। ঢুলী একজন যুবক, মাথায় লম্বা লম্বা কেশ। মহিলাদের বয়স ১৬ হ'তে ২০ বৎসরের মধ্যে। কুন্তলা মহিলাদের মধ্যে মধ্যমণি, প্রধানা গায়িকা এবং নর্তকী। আর আটজন মহিলা, লতিকা, মালতী, ছায়া প্রমুখ সহকারী গায়িকা ও নর্তকী।

ঝুমুরে গানের সংবাদ চতুর্দিকের গ্রামে গ্রামে প্রচারিত হয়েছিল। কাজেই সন্ধ্যা থেকেই গানের আসরে শত শত শ্রোতারা জমায়েত হ'তে লাগল। রাত্রি নয়টায় গান সুরু হ'লো।

প্রথমেই ঢুলীদের যন্ত্র-সংগীত আরম্ভ হল। নর্তকীরা সারি-বদ্ধভাবে নৃত্যের তালে তালে আসরে প্রবেশ করল। প্রথমে কুন্তলা, তার পরে লতিকা, মালতী প্রমুখ। নর্তকীদের পরিধানে লাল ব্লাউজ ও নীল শাড়ি, মাথায় লম্বা বেণী। নর্তকীদের পায়ে নূপুর। কুন্তলারা ঢুলীদের চারিদিকে বৃত্তাকারে নৃত্য করতে লাগল। নর্তকী-দের নৃত্যকুশলতায় শ্রোতারা উল্লাসে মুগ্ধ হয়ে গেল। প্রায় পনের মিনিট এই সুন্দর নৃত্য চলল। কুন্তলারা নৃত্যের মাধ্যমে ঝুমুরের উদ্বোধন করল।

ঢুলীদের সঙ্গে আটজন মহিলা বসল। নৃত্যসহকারে প্রধানা গায়িকা কুন্তলা "শ্রীকৃষ্ণের ব্রজলীলা" পালা আরম্ভ করল। কুন্তলা একাকী সুবলের উক্তি, শ্রীকৃষ্ণের উক্তি, শ্রীরাধিকার উক্তি প্রভৃতি গাইতে লাগল।

শ্রীকৃষ্ণের উক্তিতে কুন্তলা গাইতে লাগল—

চম্পকের হার পরাইলি কেনে।
চম্পকরাণী রাধা উদয় হৈল মনে॥
মালা গেঁথে অন্য ফুলে
কেন ভাই না দিলে গলে।
চাঁপার ফুলে হিয়া জ্বলে
যাতনা হয় পরাণে॥

তারপরে সুবলের উক্তিতে কুন্তলা গাহে—

ওরে কানাই বল মোরে
রাধা কোথা পাই।
গাছের ফল নয় যে
তোরে তুলে দিব ভাই।

শ্রীরাধিকার উক্তিতে কুন্তলা গাহে—

কি কথা শুনালি সুবল মোরে
জীবনকৃষ্ণ কষ্ট পায়
এ ছার দাসীর তরে।
ভেটিবারে রসরাজে পাই না খুঁজে
জ্বলছে আগুন বুকের মাঝে
মরি গুমরে।
শাশুড়ী ননদী ঘরে
কিরূপে যাই বাহিরে।

এইভাবে কুন্তলা সনৃত্যে একাকী সুবল, শ্রীকৃষ্ণ এবং শ্রীরাধিকার উক্তিগুলি গাইতে থাকে। কুন্তলার কণ্ঠস্বর সুমিষ্ট। গানের সঙ্গে সঙ্গে কুন্তলা নিতম্ব দোলায়ে দোলায়ে নৃত্য করে। কুন্তলার কণ্ঠে গান, চোখে-মুখে চটুল ভঙ্গী। কুন্তলার ঝুমুরী নৃত্য ও সংগীত গণ-মানসে এক অনিন্দ্য আনন্দ পরিবেশন করে।

একঘেয়েমি কাটানোর জন্য কুন্তলা মাঝে মাঝে লঘু সংগীতও গেয়ে থাকে—

ও সুন্দর কানু
তোমার মনের কথা বলতে পারে।
তুমি কেনে চাও আমার পানে
বারে বারে।
—ইত্যাদি।

শ্রীকৃষ্ণের ব্রজলীলা পালা যখন শেষ হলো, তখন আবার নয়জন যৌবনবতী নর্তকী বৃত্তাকারে ঝুমরী নৃত্য করল।

গভীর রাত্রে সংগীতের সমাপ্তি হলো। কুন্তলার নয়নাভিরাম রূপ দেখে শ্রোতারা বিমুগ্ধ হয়ে গেল। কুন্তলার নৃত্যকলা লোক-জীবনে আনন্দ পরি-বেশনের কাজ করল। কী চিত্তহারী, মনোরঞ্জক ও উল্লাসকর কুন্তলার ঝুমরী নৃত্য!

পরদিন সকালে দলপতি রাধাকান্ত সরকার আমাদের নিকট বিদায় নিতে এলেন। সঙ্গে ছিল কুন্তলা। কুন্তলাকে বললাম—তোমার নৃত্য ও সংগীত খুব সুন্দর হয়েছে। আমরা সত্যি খুশি হয়েছি।

লোক-গীতি গবেষণা কেন্দ্রের তরফ থেকে কুন্তলাকে কিছু টাকা পুরস্কার দিলাম। দলপতির কাছে প্রস্তাব করলাম—আপনি যদি রাজী থাকেন, তবে কুন্তলাকে চলচ্চিত্রে নামানোর চেষ্টা করা যেতে পারে। কুন্তলাকে তৈরি ক'রে নিলে কলকাতা বা বম্বের যে-কোনও চলচ্চিত্রে সে একজন লোক-প্রিয় চিত্রতারকা হ'তে পারে।

দলপতি সরকার মহাশয় বললেন—আপনাদের অশেষ ধন্যবাদ। কিন্তু এতে গ্রাম অঞ্চলের নরনারীর যথেষ্ট ক্ষতি হবে—এ অঞ্চলের গ্রামের মানুষ ত' সিনেমা দেখার সুযোগ পায় না। কুন্তলারাই এ সব মানুষের মধ্যে আনন্দ পরিবেশন করে।

মনে মনে ভাবি—গ্রামের প্রাকৃতিক সভ্যতার মাঝে কুন্তলারা খাঁটি ও বিশুদ্ধ আছে। ওরা নাগরিক জীবনে যান্ত্রিক সভ্যতার চাপে পড়লে জ্বলন্ত যৌবন হারিয়ে কৃত্রিম যৌবনের মূর্তি হয়ে দাঁড়াবে। গ্রামীণ পরিবেশেই কুন্তলারা সত্য, সুন্দর ও কল্যাণকর।

কুন্তলারা বিদায় নিল।

ঝুমরী সংগীতের কথা "সংগীত দামোদর"। "ভক্তি রত্নাকর" প্রভৃতি গ্রন্থে দেখা যায়। শৃঙ্গাররস বহুল, মৃদু ও লঘু গীতিকে বলা হতো ঝুমরী সংগীত। পদাবলী সাহিত্যেও ঝুমরী গীতের উল্লেখ আছে। যেমন—

"যুবতী যূথ শত গাও ত' ঝুমরী।"
"ঝুমরী গাহিছে শ্যাম বাঁশী বাজাইয়া।"
—ইত্যাদি।

ছয় সাত শত বৎসর আগে থেকেই বাংলা ভাষায় ঝুমরী শব্দ প্রচলিত আছে। আদিতে এক প্রকার লঘু সংগীতকে ঝুমরী গীত বলা হতো। যুবতী মেয়েরা ঝুমরী গীত গাইত। পরবর্তীকালে ঝুমরী গীতের সঙ্গে নৃত্যও প্রচলিত হয়েছে। ঝুমরী শব্দ পরবর্তীকালে ঝুমুর শব্দে পরিণত হয়েছে। আধুনিককালে ঝুমুর অর্থে নাচ ও গান উভয়ই বুঝায়।

আদিতে ঝুমরী গীতের বিষয়বস্তু ছিল রাধাকৃষ্ণ বিষয়ক পদকীর্তন। পরবর্তীকালে ঝুমরী গীতের মধ্যে পল্লী-কবিরা সমসাময়িক সমাজের কাহিনীও ঢুকিয়েছেন। পূর্বে ঝুমরী গীতের পৃষ্ঠ-পোষকতা করত সামন্ত রাজা, ভূম্যধি-কারীরা। আধুনিককালে পৃষ্ঠপোষকতা করে গ্রামের জনসাধারণ। বিবাহ, অন্নপ্রাশন, উপনয়ন, দোল দুর্গোৎসবে ঝুমুর গানের আসর বসে।

—সুরেন্দ্রনাথ [illegible]

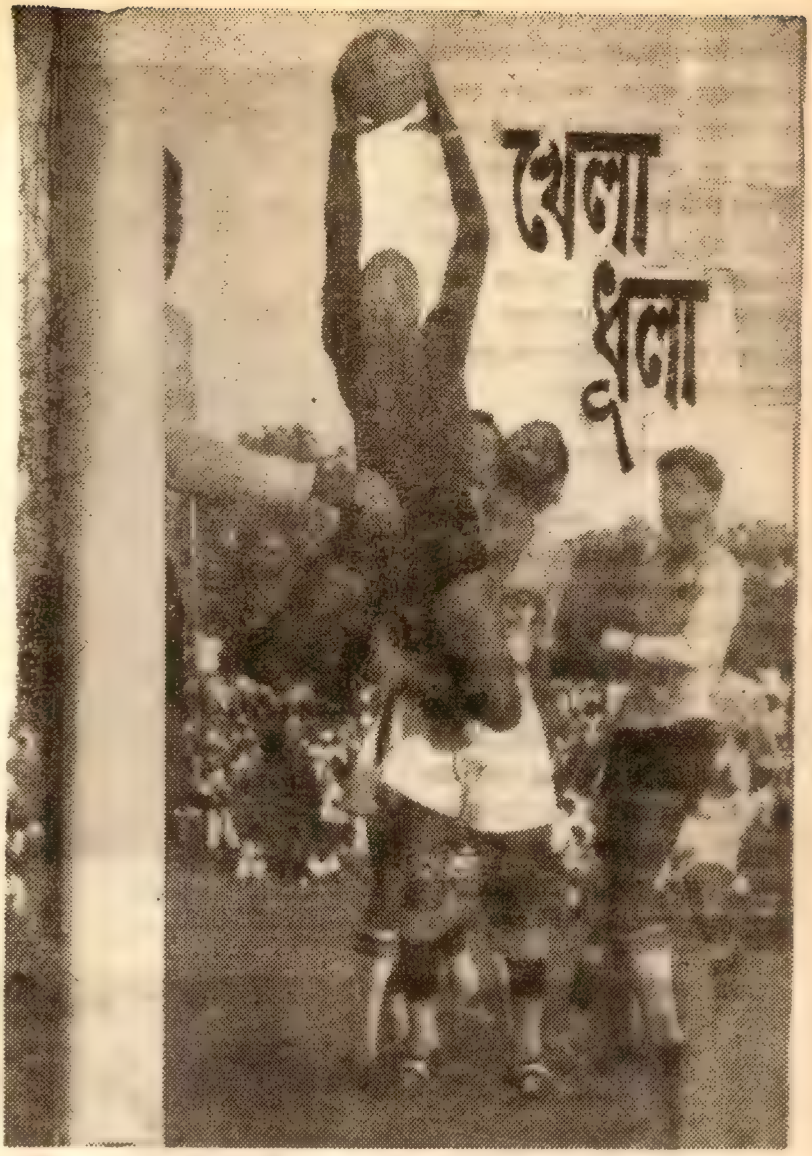

দিল্লী ক্লথ মিলস ফুটবল প্রতিযোগিতার কোয়ার্টার ফাইনালে ইস্টবেঙ্গল ও শিখ রেজিমেন্টাল সেণ্টারের প্রথম দিনের খেলায় একটি বল ধরছেন বলাই দে।

ডি-সি-এম প্রতিযোগিতায় কলকাতার দলগুলির ব্যর্থতা

এ বছর দিল্লীর ডি-সি-এম প্রতিযোগিতা থেকে কলকাতার নাম মুছে গেল। ফুটবলের প্রাণকেন্দ্র কলকাতার এ বছরের সেরা টীম ইস্টবেঙ্গলের বিদায় বেদনাদায়ক। লীগ ও শীল্ড বিজয়ের গৌরব দীপ্ত শিখ রেজিমেন্টাল সেন্টারের কাছে ম্লান হয়ে গেল। কলকাতার অন্যতম সেরা দল মহমেডানকেও মাথা নত করতে হল বিকানীরের সশস্ত্র পুলিশ দলের কাছে। কলকাতার বিদায়ের সাথে সাথে দক্ষিণ ভারতের বিদায়ও উল্লেখযোগ্য। গতবারের বিজয়ী অন্ধ্র পুলিশ দলও প্রতিযোগিতার আকাশ থেকে অকালে খসে পড়ল। উত্তর ভারতের দলগুলিই শেষ পর্যন্ত টিকে রইল। জলন্ধরের লীডারস্ ক্লাব সেমি-ফাইনালের প্রথম পর্যায়ে বিকানীর দলকে ২—১ গোলে পরাজিত করে এগিয়ে চলেছে। অন্যদিকে পাঞ্জাব পুলিশ ও শিখ রেজিমেন্টাল সেন্টার সেমিফাইনালে.

পুলিশ ও জলন্ধরের লীডারস ক্লাব উভয়েই আই, এফ, এ শীল্ড-এ অংশ গ্রহণ করেছিল। কিন্তু কলকাতার মাঠে তাদের নৈপুণ্য পরিপূর্ণভাবে আত্মপ্রকাশ করতে পারে নি। খুব সম্ভব ভিজে কর্দমাক্ত মাঠে তারা স্বাভাবিক খেলা খেলতে গিয়ে পদে পদে বাধা পেয়েছে—তাছাড়া নতুন পরিবেশও তাদের চলার পথকে বিঘ্ন সঙ্কুল করে তুলেছিল। কিন্তু দিল্লীর মাঠে পাঞ্জাবের দলগুলি যথেষ্ট কৃতিত্ব দেখানর সুযোগ পেয়েছে। এই কৃতিত্বের মূলে অবশ্য তাদের দীর্ঘ দিনের অনুশীলন এবং বিভিন্ন প্রতিযোগিতায় অংশ গ্রহণ করে মূল্যবান অভিজ্ঞতা সঞ্চয়। কলকাতার দলগুলি সবরকম মাঠের সঙ্গেই পরিচিত—শুকনো ও ভিজে মাঠে তারা পর্যায়ক্রমে খেলে থাকে। সুতরাং কলকাতার ব্যর্থতা বিরাট প্রশ্নের সৃষ্টি করেছে। কলকাতার দলে ভারতের বাছাই করা খেলোয়াড় থাকে। পরাজয়ের জন্যে তারা যদি নানা অজুহাত আওড়ায় তাহলে বুঝতে হবে কোথায় কোন বিরাট গলদ আছে—এবং সে গলদ দূর না করলে কলকাতার খেলার মানের কোন মূল্য থাকে না।

পূর্বাঞ্চল ক্রিকেট দল

দলীপ ট্রফিতে পূর্বাঞ্চলের ক্রিকেট দলের নাম ঘোষণা করা হয়েছে। অধিনায়ক নির্বাচিত হয়েছেন বিহারের রাজেন সান্যাল। গত বারের অধিনায়ক পঙ্কজ রায় এই প্রতিযোগিতায় অংশ গ্রহণে অক্ষমতা প্রকাশ করায় দল গঠনের সময় তাঁর নাম বিবেচনা করা হয় নি। ১৫ জন নির্বাচিত খেলোয়াড়ের মধ্যে বাংলা থেকে মনোনয়ন পেয়েছেন—সর্বশ্রী এস,

---

শ্রীঅমিতাভ

এস মিত্র (ভাইস-ক্যাপ্টেন), এ, রায়, দেব মুখার্জী, এস গুহ, চুণী গোস্বামী, টি ব্যানার্জি, আর জি জি ভয়। বিহার থেকে আছেন পাঁচ জন যথা—রাজেন সান্যাল (অধিনায়ক), রমেশ সাকসেনা, দলজিৎ সিং, আনন্দ শুক্লা, গোবিন্দ চৌহান। আসাম ও উড়িষ্যা থেকে স্থান পেয়েছেন যথাক্রমে এম পি বড়ুয়া, এ জেনা, বি সিকদার। অতিরিক্ত খেলোয়াড় হিসাবে নেওয়া হয়েছে বাংলার আর মুখার্জি, জে সরকার ও এস সোমকে। এই দল ১৬ই অক্টোবর দিল্লী অভিমুখে রওনা হবে। খেলার তারিখ নির্দিষ্ট হয়েছে ২১, ২২ ও ২৩শে অক্টোবর। আশা করা যায় উত্তরাঞ্চলের বিরুদ্ধে পূর্বাঞ্চল ভাল ফলই দেখাবে।

মৈনুদ্দৌলা গোল্ড কাপ

হায়দ্রাবাদে এখন চলছে মৈনুদ্দৌলা গোল্ড কাপ ক্রিকেট প্রতিযোগিতা। এই

প্রতিযোগিতায় বাংলার চারজন খেলোয়াড় অংশগ্রহণের সুযোগ পেয়েছেন। হায়দ্রাবাদ ব্লুজের পক্ষে খেলেন দেব মুখার্জী, অম্বর রায় এবং শ্যামসুন্দর মিত্র। অল ইন্ডিয়া স্টেট ব্যাঙ্ক দলে স্থান পেয়েছেন সুব্রত গুহ। হায়দ্রাবাদ ব্লুজ ইন্ডিয়ান স্টারলেট দলের কাছে পরাজিত হয়। বাংলার উদীয়মান খেলোয়াড় দেব মুখার্জী হায়দ্রাবাদ ব্লুজের পক্ষে ৮২ রান করার কৃতিত্ব অর্জন করেন।

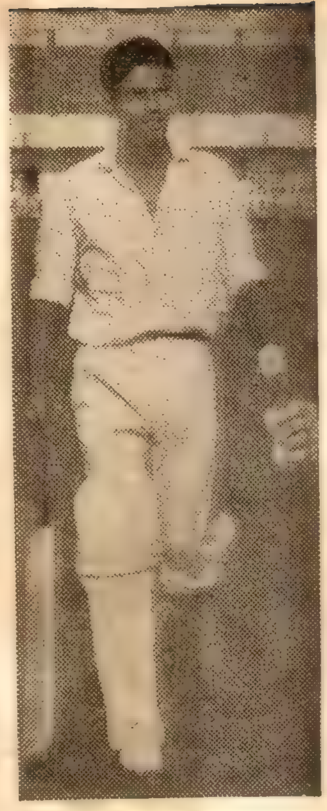

সমাচার দর্পণ

অলিম্পিক লং জাম্প চ্যাম্পিয়ান ইংলন্ডের লীন ডেভিস বছরের শ্রেষ্ঠ এ্যাথলেটের সম্মান অর্জন করেছেন। ২৪ বৎসর বয়স্ক এ্যাথলেট ডেভিস কয়েক বছর বিভিন্ন আন্তর্জাতিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় ইংলন্ডের প্রতিনিধিত্ব করছেন। বৃটিশ এ্যাথলেটিকস রাইটার্স এ্যাসোসিয়েসনের জোটে পুরুষদের মধ্যে লীন ডেভিস এবং মহিলাদের মধ্যে মিসেস পাম পিয়াসী এই শ্রেষ্ঠত্বের সম্মান লাভ করেন। লীন ডেভিসের জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ জাম্প হচ্ছে ২৬ ফুট ১০ ইঞ্চি।

আগামী অলিম্পিক গেমসের প্রস্তুতিপর্ব হিসাবে মেক্সিকো সিটিতে অনুষ্ঠিত হচ্ছে লিটল অলিম্পিক গেমস। বিভিন্ন দেশের প্রতিযোগী এবার এই লিটল অলিম্পিকে যোগদান করেছেন, উদ্দেশ্য হল মেক্সিকো সিটির পরিবেশ এবং আবহাওয়া বুঝে নেওয়া। মেক্সিকো সিটির উচ্চতা হচ্ছে প্রায় সাড়ে সাত হাজার ফুট। এই সর্বপ্রথম এত উঁচুতে অলিম্পিক গেমস অনুষ্ঠিত হবে। অনেক বিশেষজ্ঞর মতে অন্যান্য দেশের এ্যাথলেটরা দারুণ অসুবিধার সম্মুখীন হবেন ওই উচ্চতার জন্য। এই বিশেষজ্ঞদের জল্পনার-কল্পনার গুরুত্ব বেড়েছে লিটল অলিম্পিকে ডেনমার্কের সাইক্লিস্ট পার নরুপের আকস্মিক অসুস্থতার জন্য। ষাট কিলোমিটারের সাইক্লিং ট্রায়ালের উনিশ কিলোমিটার অতিক্রম করেই হঠাৎ নরুপ অসুস্থ হয়ে পড়েন অস্বাভাবিকভাবে।

* * *

ধারওয়ারে অনুষ্ঠিত দক্ষিণাঞ্চলের আন্তঃবিশ্ববিদ্যালয় ফুটবল প্রতিযোগিতার ফাইন্যাল খেলাটি দর্শকদের উশৃঙ্খল আচরণের জন্য পরিত্যক্ত হয়। ওসমানিয়া বিশ্ববিদ্যালয় এবং মহীশূর বিশ্ববিদ্যালয়ের ফাইন্যাল খেলাটিতে ওসমানিয়া দল এক গোলে অগ্রগামী ছিল।

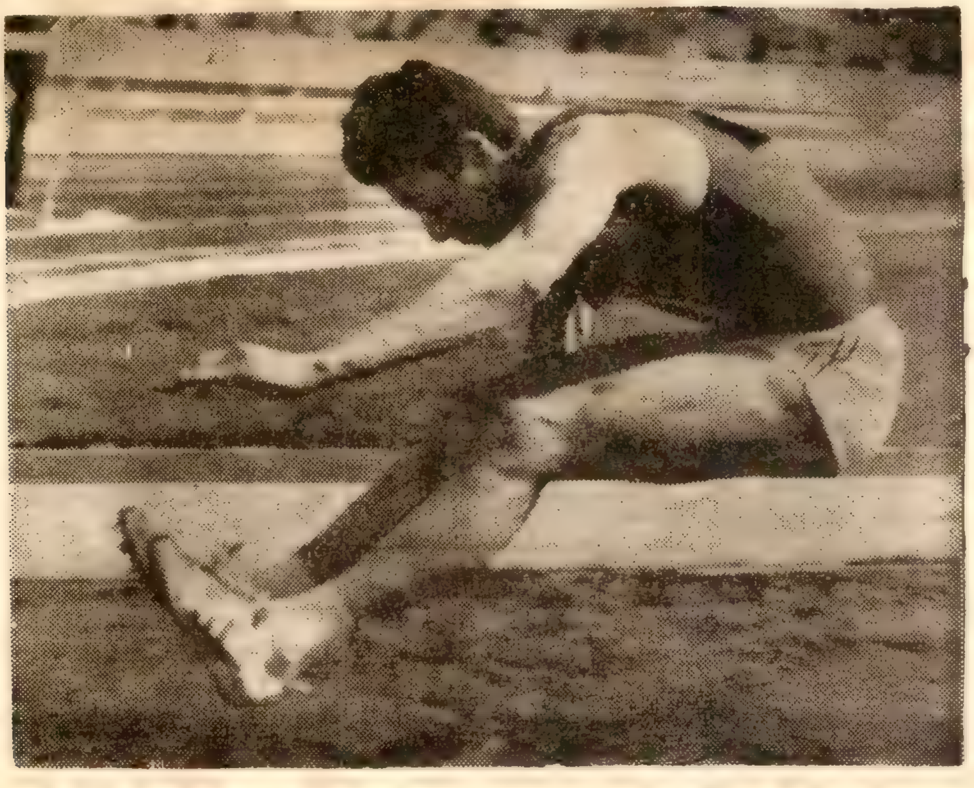

ইংলন্ডের অলিম্পিক চ্যাম্পিয়ান লীন ডেভিস লং জাম্প দিচ্ছেন

॥ বাংলার ক্রিকেট আজ কোন্ পথে ॥

খেলোয়াড়দের দর্শক এবং শিক্ষার্থী দুই-ই বলা যায়। উচ্চমানের খেলোয়াড়দের খেলা দেখে, শিক্ষার্থী খেলোয়াড় ব্যাটিং, বোলিং ও ফিল্ডিং সম্বন্ধে অনেক কিছুই শিখতে পারে। উচ্চাকাঙ্ক্ষী শিক্ষার্থীরা উচ্চস্তরের খেলোয়াড় হওয়ার অনুপ্রেরণা পেতে পারে। কিন্তু বছরের পর বছর এইরূপ খেলা দেখে, বাংলা দেশে ক'জন উচ্চস্তরের খেলোয়াড় হতে পেরেছে?

'উন্নতি' এবং 'অবনতি' দুই-ই আপেক্ষিক। উন্নতি, অবনতির কথা উত্থাপিত হলেই, অন্য কোনও মানের সংগে তুলনা করে বিচার করতে হয়। আসাম, বিহার ও উড়িষ্যার ক্রিকেট দলের সংগে খেলা হলে বাংলার দল সাধারণত সহজেই জয়ী হয়। এই জয়ের ফলে প্রমাণিত হয় যে, এই সব প্রদেশের ক্রিকেট মান অপেক্ষা বাংলার ক্রিকেট মান বেশি উন্নত। অন্যদিকে বোম্বাই দলের বিরুদ্ধে খেলা হলে, বাংলা দলের পরাজয় অবধারিত। বহু বছর এই দুই দলের খেলার ফলাফল এই রকম হয়ে আসছে

ক্রমাগত জয়ের ফলে প্রত্যেক দলেরই একটা ঐতিহ্য গড়ে ওঠে। ঐতিহ্য বজায় রাখবার জন্য সাধারণত খেলোয়াড়েরাও সক্রিয় থাকেন। ফলে খেলোয়াড়েরা ভাল ফলাফল প্রদর্শনের জন্য উৎসাহী হন। এই ঐতিহ্যের জন্যই বিহার, আসাম বা উড়িষ্যার বিপক্ষে বাংলার খেলোয়াড়েরা ভাল ফলাফল প্রদর্শন করতে সক্ষম হন। এই ঐতিহ্যের অভাবেই বোম্বাইয়ের বিরুদ্ধে বাংলা দলের খেলার ফলাফল হয় অন্যরূপ। প্রথম দলগুলির বিপক্ষে বাংলার খেলোয়াড়দের মনে "আমরা জয়ী হব" এই মনোভাব থাকে, কিন্তু বোম্বাই দলের বিরুদ্ধে "পরাজয় নিশ্চিত" এই মনোভাব প্রাধান্য লাভ করে। বাংলার খেলোয়াড়দের এই হার মেনে নেওয়ার মনোভাব দূর করতে হবে। মনে বল থাকলে অঘটন ঘটান যায়, এ ধরণের দৃষ্টান্ত ক্রিকেটের ইতিহাসে অনেক আছে।

বোম্বাই দলের বিরুদ্ধে পরাজয়ের অবশ্য আরও কারণ আছে। তার মধ্যে একটি প্রধান কারণ হচ্ছে, বোম্বাই দলের বোলারদের বোলিং-এর নৈপুণ্য এবং বৈচিত্র্য। এইরূপ বোলিংয়ের বিরুদ্ধে বাংলার খেলোয়াড়েরা খেলার সুযোগ সাধারণত একবারের বেশি পায় না। ফলে এই ধরণের বোলিংয়ের বিরুদ্ধে অনভ্যস্ততা বাংলার খেলোয়াড়দের অত্যন্ত অসুবিধার সম্মুখীন করে।

বাংলা দলের পরাজয়ের আর একটি কারণ হচ্ছে এই যে, বোম্বাই দলের ব্যাটসম্যানরা বেশি অভিজ্ঞ। বোম্বাইয়ের শীর্ষস্থানীয় ব্যাটসম্যানরা, দেশীয় ও বিদেশীয় বিশিষ্ট বোলারদের নানা রকম বোলিং-এর বিরুদ্ধে খেলবার অনেক বেশি সুযোগ লাভ করে। ফলে তাদের অভিজ্ঞতাও বাড়ে এবং মনে দৃঢ় আত্মবিশ্বাস জন্মায়। বাংলার অনেক খেলোয়াড়ের মধ্যেই উচ্চমানের খেলোয়াড় হবার উপযুক্ত প্রায় সকল রকমের গুণই আছে। বাংলার খেলোয়াড়দের একটি দোষ হচ্ছে এই যে, তারা অতি অল্পে তুষ্ট। ভারতীয় দলের পক্ষে খেলবার উচ্চ আশা ক'জন পোষণ করে? পোষণ করলেও, সুযোগের অভাবে ততদূর

পঙ্কজ রায়

উঠে উঠবার যথার্থ উপযুক্ত হতে পারে না। এইরূপ যথার্থ উপযুক্ত খেলোয়াড় বাংলা দেশে এই পর্যন্ত মাত্র দু'জন জন্মেছে—পঙ্কজ রায় ও সুঁটে ব্যানার্জী।

প্রকাশ্যে, সুযোগের অভাব বলতে কুণ্ঠিত হতে হয়। অনেকেই বলবেন, এইরূপ বলা অন্যায়। কলকাতায় এত ক্লাব, স্কুল, কলেজ ও অফিস খেলার সুযোগ করে দিয়েছে; এত প্রতিযোগিতামূলক খেলার প্রচলন হয়েছে; 'ট্রায়াল ম্যাচ', 'ট্রায়াল প্র্যাকটিস' ও 'ইণ্টার প্রভিন্সিয়াল' ম্যাচ খেলার সুযোগ রয়েছে; কোচের অধীনে শিক্ষালাভেরও বন্দোবস্ত রয়েছে। এ-সব থাকা সত্ত্বেও সুযোগের অভাব বললে মিথ্যা বলা হয় না কি? মোট কথা সুযোগের এই তালিকাটি সম্পূর্ণ নয়।

সব খেলাই মুখ্যত "প্র্যাকটিক্যাল"। ক্রিকেট খেলাও তাই। "হাতে-কলমে" অনুশীলন করে খেলা শিখতে হয়। অনুশীলনই খেলা শেখবার একমাত্র উপায়। অনুশীলনের পদ্ধতির ত্রুটির জন্যই আশানুরূপ ফললাভ হয় না। এখন অনুশীলন সম্বন্ধে দু-একটা কথা আলোচনা করা যাক। বই পড়ে এবং কোচের কাছ থেকে সাধারণত যে শিক্ষালাভ হয়, তা মুখ্যত থিওরিটিক্যাল এবং এই থিওরিটিক্যাল শিক্ষাকে ভিত্তি করে "হাতে-কলমে" অনুশীলন করে, খেলোয়াড়কে ব্যক্তিগতভাবে খেলাটিকে আয়ত্ত করতে হয়। এই অনুশীলনের সময়ই খেলোয়াড়কে বিচার করে, সমালোচনা করে নিজের দোষ-ত্রুটি দূর করতে হয়। ম্যাচ খেলাটা হচ্ছে পরীক্ষার সামিল। প্রকৃত বিজ্ঞানসম্মত পদ্ধতিতে অনুশীলনের দ্বারা যথেষ্ট শিক্ষালাভ না করে পরীক্ষা দিতে গেলে অর্থাৎ ম্যাচ খেলতে গেলে বিফল হওয়ার সম্ভাবনাই বেশি। উপর্যুপরি কয়েকবার বিফল হওয়াটা শিক্ষার্থী খেলোয়াড়ের পক্ষে বিশেষ মারাত্মক। এই কথাটা শিক্ষার্থী বোলারদের সম্পর্কে বিশেষভাবে প্রযোজ্য।

উচ্চমানের বোলিং শিক্ষা করা খুব কষ্টসাধ্য। ইহার জন্য যথেষ্ট ধৈর্য ও একাগ্র অনুশীলন আবশ্যক। অনেকে বছরের পর বছর অনুশীলন করে, কিন্তু তবুও উন্নতির বিশেষ কোনও লক্ষণ দেখা যায় না। ইহার অনেক কারণ থাকতে পারে; যথা—অনুশীলনের সময় বিজ্ঞানসম্মত উপায় অবলম্বন না করা; অনুশীলনের সময় মনের একাগ্রতার অভাব, মন ও দেহ (বিশেষভাবে হাত) সমবেতভাবে কাজ না করে।

বোলিংকে মার্বেল খেলার সঙ্গে তুলনা করা যেতে পারে। শিক্ষার্থী 'মার্বেল' খেলোয়াড়, সামনে একটা মার্বেল রেখে, তার ওপর দৃষ্টি রেখে সামনের মার্বেলটাকে আঘাত করবার জন্য মনে বাসনা নিয়ে, আঙুলের সাহায্যে হাতের মার্বেলটাকে নিক্ষেপ করে। তারপর হাতের মার্বেলটা কতখানি লক্ষ্যভ্রষ্ট হল তা লক্ষ্য করে। পরেরবার হাতের মার্বেলটাকে নিক্ষেপ করবার সময় একটু চিন্তা করে আঙুলটাকে একটু ভিন্নভাবে চালনা করে। মনই আঙুলকে নিয়ন্ত্রিত করে। এইরূপ মনের দ্বারা আঙুলকে নিয়ন্ত্রিত করে অনুশীলন করবার ফলে অল্প সময়ের মধ্যে খেলোয়াড় খেলাটাকে মোটামুটি আয়ত্ত করতে পারে। বোলিং শিক্ষারও এই একই পদ্ধতি। শিক্ষার্থী বোলার তার

বিপরীত দিকের স্টাম্পের সামনে তার বোলিং-এর ধরণের উপযুক্ত লেংথের স্থানে একটা বড় বল রেখে, তাকে আঘাত করবার জন্য মনে বাসনা নিয়ে, হাতের বলটাকে নিক্ষেপ করতে হবে। বল করবার পর বলটা কিভাবে লক্ষ্যভ্রষ্ট হল তা বিশেষ-ভাবে লক্ষ্য করে পরেরবার বল নিক্ষেপের সময়, একটু চিন্তা করে, অঙ্গ সঞ্চালন নিয়ন্ত্রিত করতে হবে। অবশ্য ইহা বলা বাহুল্য যে এইরূপ অনুশীলনের সময় কোনও ব্যাটসম্যান থাকবে না। একাগ্রতার সংগে বোলিং অনুশীলনের জন্য কোনও ব্যাটসম্যান আবশ্যক হয় না। বরং ব্যাটস-ম্যানের উপস্থিতি ও তার 'মার' বা 'স্ট্রোক' নতুন শিক্ষার্থীর মনের একাগ্রতা নষ্ট করে। প্রত্যেকবার এইরূপ অনুশীলনের পর নিজেকেই বিচার করে দেখতে হবে, উন্নতি হচ্ছে কি না। উন্নতির লক্ষণ পেলে মনে উৎসাহ আসবে এবং একটু একটু করে আত্মবিশ্বাস জন্মাবে। ফলে, উন্নতিলাভ দ্রুততর হবে।

মোটের ওপর বোলিং অনুশীলনের মূলকথা আগে মন স্থির করবে, কি রকম বল দেওয়া হবে এবং পরে মনের ইচ্ছানু-যায়ী "হাত" কাজ করবে। 'হাতকে' মনের আয়ত্তে রাখার কৌশল শিখতে পারলেই 'বোলিং'-এর স্থিরতা (consistency) আসে। "আজ ভাল, কাল মন্দ" এইরূপ হবার সম্ভাবনা কম।

এইবার শিক্ষার্থী ব্যাটসম্যানের অনু-শীলনের কথা কিছু আলোচনা করা যাক। ব্যাটিং অনুশীলন করার জন্য প্রথমেই আবশ্যক হয় একজন উপযুক্ত বোলারের সাহায্য। যে বোলার আবশ্যক মত উপর্যু-পরি 'good length, short pitched, over pitched বল, সোজা স্টাম্পের দিকে কিম্বা 'off side' এবং 'leg side'-এ দিতে পারে, সেই বোলারই ব্যাটিং অনুশীলনের পক্ষে উপযুক্ত বোলার। উপর্যুপরি একই ধরণের অনেকগুলি 'বল' মারবার সুযোগ না পেলে, শিক্ষার্থী ব্যাটসম্যান কোনও এক ধরণের বিশেষ 'মার' অপেক্ষাকৃত অল্প সময়ের মধ্যে ভাল শিখতে পারে না।

কিন্তু অনুশীলনের সময় ব্যাটসমানের সর্বপ্রথম ও সর্বপ্রধান 'কাজ' হচ্ছে বলটা শূন্যে থাকার সময়ই বলটার 'প্রকৃতি' বিচার করার শিক্ষা করা। অর্থাৎ বোলারের হাত থেকে বলটা বাহির হয়ে আসা মাত্রই মুহূর্তের মধ্যে জানবার চেষ্টা করতে হবে, বলটা কোন্ দিকে আসছে (সোজা না বাঁকা), বলে কোনও রকমের স্পিন দেওয়া হয়েছে কিনা (off break বা leg break), বলের গতিবেগ (জোরে না আস্তে), বলটা কতদূরে মাটিতে পড়বে (good length, short pitched না over pitched)। এই বিষয়গুলির জ্ঞান শুধু চোখের সাহায্যেই লাভ হয়। চোখ এই বিষয়ে রীতিমত trained না হলে, বিচারে ভুল হয়। বিচারে ভুল এবং দেরী হওয়াটা ব্যাটসম্যানের পক্ষে মারাত্মক।

ব্যাটসম্যানকে নানা রকমের বোলিং-এর বিরুদ্ধে খেলে অনুশীলন করতে হবে যথা fast bowling, spin bowling, googlie bowling, swing bowling। এর ফলে অভিজ্ঞতা বাড়ে। বাংলা দেশে

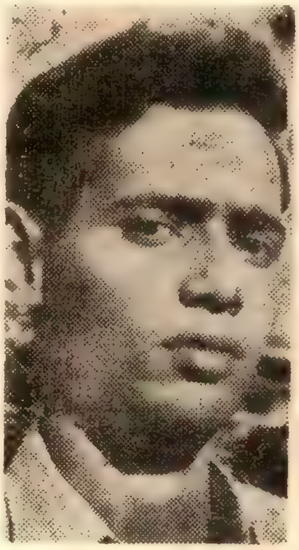

অম্বর রায়

বিভিন্ন ধরণের বোলারের খুবই অভাব। যে কয়েকজন আছে, তারাও বিভিন্ন ক্লাবে ছড়িয়ে আছে। "ক" ক্লাবে হয়ত ভাল fast bowler আছে, কিন্তু ভাল spin bowler নেই। "খ" ক্লাবে হয়ত ভাল spin bowler আছে, কিন্তু ভাল ফাস্ট বোলার নেই। কাজেই 'ক' ক্লাবের খেলো-য়াড়রা ভাল spin bowling-এর বিরুদ্ধে এবং 'খ' ক্লাবের খেলোয়াড়েরা fast bowl-ing-এর বিরুদ্ধে রীতিমত অনুশীলনের সুযোগলাভ করে না। ফলে ক্লাব দুটির ব্যাটসম্যানদের আশানুরূপ উন্নতিলাভের সম্ভাবনা কম। এইরূপ ক্ষেত্রে দুই ক্লাবের মধ্যে পারস্পরিক সহযোগিতার ভাব থাকলে, দুই ক্লাবের ব্যাটসম্যানদের এই অসুবিধা খানিকটা দূর করা যায়, যদি মাঝে মাঝে এক ক্লাবের খেলোয়াড়কে অন্য ক্লাবের net-এ অনুশীলন করবার সুযোগ দেওয়া হয়। তা ছাড়া বিভিন্ন ক্লাবের কয়েকজন প্রকৃত 'উদীয়মান' খেলোয়াড়কে মনোনীত করে, তাদের জন্য যদি সপ্তাহে একদিন 'trial practice'-এর মত খানিকটা বাধ্যতামূলকভাবে, কোনও এক মাঠে, অনুশীলনের বন্দোবস্ত করা হয়, তবে বাংলা দেশের খেলোয়াড়দের মনে উন্নতি করবার যথেষ্ট প্রেরণা আসবে। আর যদি প্রতি বছর কয়েক মাসের জন্য দুই রকমের দুইজন পেশাদার বোলার (একজন fast ও আর একজন spin bowler) আমদানী করে অনুশীলনের বন্দোবস্ত করা হয়, তাহলে তিন-চার বছরের মধ্যে বাংলার ক্রিকেট মান যে পরি-মাণ উন্নতি লাভ করবে, তাতে এই ব্যয়-সাধ্য বন্দোবস্ত সার্থক হবে।

বাংলার ক্রিকেট খেলা প্রায় পাঁচ মাস স্থায়ী হয়। খেলোয়াড়েরা বছরে সাত মাস অনুশীলনের সময় যেরূপভাবে হাত ও একাধিকক্রমে এত দীর্ঘ সময় ধরে অনুশীলন না করার ফলে, অনুশীলনের ফল স্থায়িত্ব লাভ করতে পারে না। ইহা উন্নতির পথে একটা বড় অন্তরায়। ইহা খানিকটা দূর করবার একটা উপায় আছে।

উৎসাহী খেলোয়াড়রা সুবিধামত ছাদে কিম্বা ঘরের মধ্যে 'shadow practice' করতে পারে। হাতে ব্যাট নিয়ে এক এক রকমের 'পিচের' বা 'লেংথের' বল কল্পনা করে, ব্যাটসম্যান বিভিন্ন মারের ভঙ্গীমায় অঙ্গ সঞ্চালন করতে পারে। বোলার, প্রকৃত অনুশীলনের সময় যেরূপভাবে হাত ও দেহ চালনা করে, ঠিক সেইরূপভাবে অঙ্গ সঞ্চালন করবে। হাতে একটা বল থাকলে আরও ভাল। স্পিন বোলার, হাতে একটা বল নিয়ে, বলে স্পিন দিয়ে ওপরদিকে শূন্যে ছেড়ে দেবে। বলটা বেশ ঘুরবে, কিন্তু এক হাতের বেশি ওপরে উঠবে না। একটা টেনিস বলকে দেওয়ালের দিকে ছুঁড়ে মারলে সেটা জোরে কিংবা আস্তে ফিরে আসে। তখন সেটাকে 'ধরবার' চেষ্টা করলে, 'ক্যাচ' ধরার শিক্ষার সাহায্য করে। এইরূপ 'shadow practice'-ও নিষ্ফল হয় না। এতে অনুশীলনের ধারাটা বজায় থাকে। খেলোয়াড়ের মূলমন্ত্র—অনু-শীলন, অনুশীলন, অনুশীলন।

বাংলার খেলোয়াড়েরা বাংলার গৌরব বৃদ্ধির জন্য দৃঢ়-প্রতিজ্ঞ হোক!

—শ্রীশৈলজারঞ্জন রায়

সম্পাদিকা—জয়ন্তী সেন
বসুমতী (প্রাঃ) লিঃ-এর পক্ষে ১৬৬, বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী স্ট্রীটস্থ কলিকাতা-১২
বসুমতী প্রেস হইতে শ্রীসুকুমার গুহমজুমদার কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

সাপ্তাহিক বসুমতী

নয়াদিল্লীতে নিরপেক্ষ ত্রিরাষ্ট্র নেতৃ-সম্মেলন

CALCUTTA UNIVERSITY CENTRAL LIBRARY

বর্ষ ঃ ২১শ সংখ্যা, বৃহস্পতিবার. ১৭ই কার্তিক, ১৩৭৩ বঙ্গাব্দ 3rd Nov., 1966 * Vol. 71, No. 2

বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা
সম্পাদকীয়	... ...	১২৮৩
আজকের মানুষ	... ...	১২৮৪
ভারতদর্শন	... ...	১২৮৫
আন্তর্জাতিক	... ...	১২৮৯
ভগিনী নিবেদিতা ও শ্রীঅরবিন্দ (প্রবন্ধ)	— সুদীপা ভাদুড়ী	১২৯০
সহানুভূতি (গল্প) ...	— আশা দেবী	১২৯৩
বিশ্বসাহিত্যের আদিপর্ব ...	— ডঃ নরেন ভট্টাচার্য	১২৯৮

বেনারসী
সিল্ক ও তাঁত বস্ত্র
ছিট কাপড়

শৈললাল মনিলাল
বড়বাজার শ্যামবাজার
ফোন-৩৪-২১২৬ ট্রামডিপোর দক্ষিণে

লেপ তোষক
বিছানা
শাল ও আলোয়ান

শ্রীমদ্ভাগবত

প্রাচীন ভক্তদের রচিত সুললিত বাংলা পয়ারে

মূল্য পাঁচ টাকা মাত্র

এই সুবৃহৎ গ্রন্থে আছে—শ্রীল সনাতন গোস্বামীর 'ভাগবতামৃত' গ্রন্থের কবিচন্দ্রের বঙ্গানুবাদ এবং শ্রীগৌরাঙ্গের প্রিয়তম ভাগবতাচার্য্য রঘুনাথ পণ্ডিতের প্রেমতরঙ্গিনী।

ইহাতে আছে দুইখানি অমূল্য গ্রন্থ

শ্রীল সনাতন গোস্বামীর ভাগবতামৃতের অনুবাদ
কবিচন্দ্রের
শ্রীবৃহদ্ভাগবতামৃত
এবং
ভাগবতাচার্যের বিশ্বপ্রসিদ্ধ
শ্রীকৃষ্ণ প্রেমতরঙ্গিনী
সমগ্র ভারতে প্রথম বঙ্গানুবাদ

"...শুনিয়া তাহার ভক্তিযোগের পঠন।
আবিষ্ট হইল গৌরচন্দ্র নারায়ণ॥"

ইহা কৃত্তিবাসী রামায়ণ এবং কাশীরাম দাসের মহাভারতের ন্যায় বাংলার প্রতি গৃহস্থের অবশ্যপাঠ্য হউক, এই নিবেদন। এই মূল্যবান গ্রন্থ বাংলার প্রতি ঘরে প্রতিষ্ঠিত করুক।

সাহিত্য-সম্রাট—বন্দেমাতরম্ মন্ত্রের ঋষি

বঙ্কিমচন্দ্রের গ্রন্থাবলী

—উপন্যাস—

প্রথম খণ্ড :—রাজসিংহ, বিষবৃক্ষ, যুগলাঙ্গুরীয়, মৃণালিনী, রজনী। [সচিত্র] মূল্য—৩, টাকা।

দ্বিতীয় খণ্ড :—দুর্গেশনন্দিনী, কৃষ্ণকান্তের উইল, ইন্দিরা, রাধারাণী, সীতারাম। মূল্য—তিন টাকা

তৃতীয় খণ্ড :—আনন্দমঠ, চন্দ্রশেখর, কপালকুণ্ডলা, দেবী চৌধুরাণী। [সচিত্র] মূল্য—৩, টাকা।

—সাহিত্য—

প্রথম খণ্ড :—কৃষ্ণচরিত্র, লোকরহস্য, বিবিধ প্রবন্ধ (১ম)। মূল্য—তিন টাকা

দ্বিতীয় খণ্ড :—(১ম ভাগ অনুশীলন), মুচিরাম গুড়, বিবিধ প্রবন্ধ (২য়), বিজ্ঞান রহস্য। মূল্য—তিন টাকা

তৃতীয় খণ্ড :—শ্রীমদ্ভগবদগীতা, কমলাকান্ত, সাম্য, সাহিত্য-প্রসঙ্গ, মানস, ললিতা। মূল্য—তিন টাকা

বসুমতী প্রাইভেট লিমিটেডঃ ১৬৬, বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী স্ট্রীট, কলি-১২

সূচীপত্র

বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা
বেদব্যাস-এর রস-রচনা : অমৃতসমান		১৩০৩
ফলবান বৃক্ষ (কবিতা)	মৃত্যুঞ্জয় মাইতি	১৩০৪
গ্রন্থমেলা	জয়ন্তী সেন	১৩০৫
ছোট্ট নাবিকটি (অনুবাদ-গল্প)	রত্না গঙ্গোপাধ্যায়	১৩০৭
বঙ্গদর্শন		১৩০৯
সাহিত্য সাধক দীনেশচন্দ্র সেন (প্রবন্ধ)	রজত রায়চৌধুরী	১৩১৩
অগ্নিযুগের একটি অধ্যায়	অনন্ত সিংহ	১৩১৯
সুবর্ণলতা (ধারাবাহিক উপন্যাস)	আশাপূর্ণা দেবী	১৩২৬
ঋষি শ্রীঅরবিন্দ (প্রবন্ধ)	শ্রীদিলীপকুমার রায়	১৩২৯
রঙ্গপট—স্বদেশে এবং বিদেশে	শিলাদিত্য	১৩৩৩
চিত্রজগৎ		১৩৩৫
পাঠকমন		১৩৪০
খেলাধুলা	শ্রীঅমিতাভ	১৩৪২

সর্বপুরাণ, সর্বতন্ত্র, সর্ব উপনিষদ, সমস্ত ভক্তিগ্রন্থ হইতে সঙ্কলিত

স্তবকবচমালা

(পঞ্চম সংস্করণ)

যে ঋষির যে স্তবে যে দেবতা আকৃষ্ট হইয়া বর প্রদান করিয়াছিলেন—পুরাণ, উপনিষদ, তন্ত্র, ভক্তিগ্রন্থরাশি মথিত করিয়া সেই সকল শ্রেষ্ঠ ভক্তিনিবেদন অতি যত্নে সুনির্বাচন—সঙ্কলন করিয়া স্তবকবচমালারূপে গ্রথিত। স্তব—ভক্তির উচ্ছ্বাস—দেবতার বন্দনাগীত। আত্মনিবেদিত প্রাণে তন্ময় হইয়া স্তব পাঠে যে লাভ হয়—জাগতিক শক্তি তাহার নিকট অতি তুচ্ছ। স্তবকবচমালায় প্রায় ৫০০ দেব-দেবীর স্তব-সন্নিবেশিত।

মূল্য পাঁচ টাকা।

পৃথিবীর তরুণ-সমাজের হৃদয়জয়ী

সার ওয়াল্টার স্কটের গ্রন্থাবলী

দ্বিতীয় ভাগ

শরৎচন্দ্র মিত্র অনূদিত

আইভানহো, হাইল্যান্ড উইডো, ফেয়ার মেড অফ পার্থ, সার্জনস্ ডটার

মূল্য—২·০০

তৃতীয় ভাগ

সরোজনাথ ঘোষ অনূদিত

দি ব্রাইড অব ল্যামারমুর, লিজেন্ডস অব মনট্রোস, দি এ্যান্টিকোয়ারি

মূল্য ১॥৹ টাকা।

সাহিত্য-জগতের গৌরবপ্রভা—হাস্যরসাবতার—নাট্যসাহিত্যের প্রবর্তক—রস-সাহিত্যের স্রষ্টা—রায় দীনবন্ধু মিত্র বাহাদুরের

দীনবন্ধু মিত্রের গ্রন্থাবলী

১ম ভাগে—জীবনী ও কবির সমালোচনা, নীলদর্পণ, জামাই বারিক, বিয়ে পাগলা বুড়ো, নবীন তপস্বিনী, কমলে কামিনী।

২য় ভাগে—সধবার একাদশী, যমালয়ে জীবন্ত মানুষ, পোড়ামহেশ্বর, কুঁড়ে গরুর ভিন্ন গোঠ, লীলাবতী, সুরধুনী কাব্য, দ্বাদশ কবিতা, পদ্য সংগ্রহ।

প্রতি ভাগ দুই টাকা

কবি বিহারীলাল চক্রবর্তীর গ্রন্থাবলী

রবীন্দ্রনাথ বলেন—"আধুনিক বঙ্গসাহিত্যে প্রেমের সঙ্গীত এরূপ সহস্রধারে উৎসের মত কোথাও প্রোৎসারিত হয় নাই। এমন সুন্দর ভাবের আবেগ, কথার সহিত এমন সুরের মিশ্রণ আর কোথাও পাওয়া যায় না।"

বাঙ্গালার নব গীতিকবিতার প্রবর্তক, রবীন্দ্রনাথ, অক্ষয় বড়াল, রাজকৃষ্ণ রায় প্রভৃতির কাব্যগুরু, ঋষি কবি বিহারীলাল চক্রবর্তীর রচনার সমাবেশ।

কবির জীবনী, সুবিস্তৃত সমালোচনা সহ সুবৃহৎ গ্রন্থ মূল্য তিন টাকা

বসুমতী প্রাইভেট লিমিটেড, ১৬৬ বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী স্ট্রীট, কলিকাতা—১২

CALCUTTA UNIVERSITY CENTRAL LIBRARY

৪১ বর্ষ : ২১শ সংখ্যা—মূল্য ২৫ পয়সা | বাংলা ভাষায় দ্বিতীয় সর্বাধিক প্রচারিত সাপ্তাহিক পত্রিকা | Price : 25 Paise
বৃহস্পতিবার, ১৭ই কার্তিক, ১৩৭৩ বঙ্গাব্দ | Thursday, 3rd Nov., 1966

শুভ ৺বিজয়া

আমাদের গ্রাহক, গ্রাহিকা, পৃষ্ঠপোষক, বিজ্ঞাপনদাতা ও শুভানুধ্যায়ীদের—৺বিজয়া উপলক্ষে জানাই আমাদের আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন। সমাজে অর্থনৈতিক বৈষম্যের মধ্যে চূড়ান্ত দূরবস্থার মধ্যেও জনসাধারণ এবার সাধ্য-মতো শারদোৎসব পালন করেছে। জন-জীবনে সারা বছর ধরে যে ঝড় বয়ে গেছে, তাতে শারদোৎসবের সাময়িক আনন্দ তাদের নতুন চেতনা ও প্রেরণায় যে আরো প্রাণবন্ত করে তুলেছে—তা বলাই বাহুল্য।

একথাও প্রসঙ্গত মনে হওয়া স্বাভা-বিক যে, আগামী দিনগুলিও আমাদের দায়িত্ব ও কর্তব্য অধিকতর দাবি করছে। কারণ, কী সংস্কৃতি, কী মনন, কী অর্থ-নীতি কী রাজনীতি—প্রায় সর্বত্রই এমন এক প্রতিক্রিয়াশীল চক্র খেলা করছে যা সমাজ বা রাষ্ট্রের পক্ষে কোনো মতেই কল্যাণকর নয়। সুতরাং জনসাধারণের সত্যিকার যাঁরা শুভাকাঙ্ক্ষী তাঁরা উপযুক্ত দুষ্টচক্রের ক্রিয়াকলাপ সম্পর্কে সচেতন থাকবেন; এবং তাঁরা সমাজের মধ্যে শুভ বুদ্ধি জাগ্রত করার আপ্রাণ প্রয়াস করবেন। আমরা আশা করি ৺বিজয়া উপলক্ষে আসু-রিক শক্তির পরাজয়জনিত যে জয়ের আনন্দ সেই আনন্দের মধ্যে আমাদের নতুন যাত্রা সুরু হবে।

এই যাত্রার পথে আমাদের পূর্বগামী-দের কর্মধারাও আজ স্মরণ করা উচিত। সাহিত্য, সংস্কৃতি, ইতিহাস সম্বন্ধে আমাদের জ্ঞান সম্পূর্ণ নয় বলে কেউ যদি অপবাদ দেন, তাহলে তা কি খুব দোষের ব্যাপার? এই অপবাদ দেবার কারণ এই যে, বর্তমানকালে বিকৃত চিন্তাই সমাজে স্থান দখল করতে চাইছে। অথচ সেটাই সত্যি নয়, আর মিথ্যা নয় আমাদের পূর্ব-সাধকদের শুভ ইচ্ছা ও কার্যকর প্রচেষ্টা। তাঁরা সমাজের হিতার্থে যা করে গেছেন এবং যে কর্মের সুরু করেছিলেন—তা বিনষ্ট হবার নয়। তাঁদের আদর্শ অবলম্বন করেই আমরা আমাদের উদ্দেশ্য-উদ্দিষ্ট পথের পথিক হবার সংকল্প গ্রহণ করতে পারি।

বর্তমান বছরে যাঁদের জন্মশতবার্ষিকী পালনের জন্য আমরা উম্মুখ হয়েছি—তা সার্থক হতে পারে যদি তাঁদের কর্ম-ধারা বহন করার যোগ্য আমরা হই। ভগিনী নিবেদিতা, যোগীন্দ্রনাথ সরকার, দীনেশচন্দ্র সেন, প্রিয়নাথ সেন প্রমুখের জন্মশতবার্ষিকী পালন করার সময় আমরা যেন মনে রাখি দেশের কল্যাণের জন্য এঁরা যা করে গেছেন—তার তুলনা আজো মেলা ভার। এঁদের কর্মধারার বিকাশ ঘটেছিল পরাধীন ভারতে। তাঁদের জন্যে স্বাধীন ভারত আজ গৌরবান্বিত। তবু সে গৌরব অক্ষুন্ন রাখার জন্যে ক'জন যোগ্য উত্তরসাধকই বা আজ রয়েছেন?

আমরা মনে করি, এঁদের অক্ষয় অবদান আজ আমরা বিস্মৃত হবো না। দেশের ও দশের স্বার্থের জন্যেই এঁদের গুণাবলী জনসাধারণের সামনে তুলে ধরতে হবে। স্বাধীনতা অর্জনের জন্যে যে স্বার্থত্যাগ ও কর্ম প্রচেষ্টার কথা আমরা জানি—স্বাধীন ভারতে সাধারণ মানুষকে স্বাধীনতা বোধে উদ্দীপ্ত করতেও তা একান্ত প্রয়োজনীয়। অথচ নিবেদিতার সত্যস্বরূপ প্রকাশ করতে একালের ইতি-হাস ততোটা মুখর নয়, বরং নির্বিকার বললেও অত্যুক্তি করা হয় না।

আমাদের বাংলা ভাষা ও সাহিত্য সম্পর্কে আমাদের দরদ কতোটাই বা সত্য —এ প্রশ্নও কেউ করলে তাতে বিস্মিত হবার কারণ নেই। কারণ শিশুসাহিত্যে যোগীন্দ্রনাথের বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের ইতিহাসে দীনেশচন্দ্র সেনের ও কাব্যে প্রিয়-নাথ সেনের যে অবদান—তা বাঙালী জাতি প্রায় বিস্মৃত হতে বসেছে। এই-ভাবে বিস্মৃত হবার কারণ একালের বিদেশী ভাবাপন্ন ও বিকৃত রুচির সাহিত্যের অনুপ্রবেশ। স্বীয় ভাষা ও স্বীয় সাহিত্যই জাতিকে আত্মসচেতন করে তোলে। আমরা আশা করবো সেই আত্ম-সচেতনতার পথ থেকে কোনোভাবেই আমরা যাতে বিচ্যুত না হই। নিজেদের স্বার্থেই আজ সত্যের পথে আমাদের সদা জাগ্রত থাকতে হবে।

সম্পাদকীয়

আজকের মানুষ

পাঞ্জাব কংগ্রেসে কোন্দল আজ নতুন নয়, প্রতাপ সিং কায়রোঁ যখন এখানকার মুখ্যমন্ত্রী ছিলেন তখন এখানকার কংগ্রেস দল কার্যত দ্বিধাবিভক্ত হয়ে পড়ে। দাশ কমিশন কয়েকটি বিষয়ে কায়রোঁর বিরুদ্ধে মন্তব্য করলে তিনি মুখ্যমন্ত্রীর গদী ত্যাগ করেন। এরপরে আততায়ীর গুলীতে কায়রোঁকে প্রাণ দিতে হয়, কিন্তু উপদলীয় কোন্দলের অবসান ঘটে নি তবুও। রামকিষেণ পরবর্তী মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে কিছুকাল কাজ করেছিলেন বটে, কিন্তু তাঁকেও দেখতে হয়েছিল মুখ্য-মন্ত্রীর ও-আসন অত্যন্ত উত্তপ্ত, তাতে দীর্ঘদিন শান্তিতে উপবেশন করা দুঃসাধ্য।

কিন্তু তাহলে কী হয়, এই আসনের দাবিদার তাই বলে কিছু কম নয়, কম হবার কারণই বা কী থাকতে পারে, ক্ষমতা কে না চায়! পাঞ্জাব যখন দ্বিতীয়-বার দুভাগ হলো পাঞ্জাবী সুবা ও হরিয়ানায়, তখন আবার খোঁজ পড়লো মুখ্যমন্ত্রীর। এখানকার আইনসভার কংগ্রেসী দলের যিনি নেতা হবেন, মুখ্য-মন্ত্রীর গদীটি তাঁরই প্রাপ্য। প্রার্থীর তো অভাব নেই। কিন্তু যাঁর নাম সেই মেজরিটি-মাইনরিটি—কোন দলের লিস্টি-তেই স্থান পায় নি, বা এ-পদে যাঁর কথা কেউ কখনো চিন্তাও করে নি বরং যিনি নিজে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী স্বরণ সিং-এর সঙ্গে মশাল জেলে নেতা খুঁজে বেড়াচ্ছিলেন, সেই গিয়ানি গুরুমুখ সিং মুসাফিরই শেষ পর্যন্ত নেতৃপদে অভিষিক্ত হলেন; মুসাফির—যিনি পাঞ্জাব কংগ্রেসের প্রেসি-ডেণ্টের পদে বর্তমানে অধিষ্ঠিত।

মুসাফিরের যোগ্যতা সম্পর্কে প্রশ্ন উঠতে পারে না, বিরুদ্ধচারী নেতা দরবারা সিং-ও মুসাফিরের নাম দ্বিধা-হীনচিত্তে সমর্থন করেছেন। বস্তুত মুসাফির অজাতশত্রু, নিতান্তই ভালোমানুষ তিনি। আজীবন অন্যায়, অত্যাচার ও অবিচারের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে এসেছেন, কিন্তু দেশে-বিদেশে অসংখ্য মিত্রই পেয়েছেন, শত্রু সৃষ্টি করেন নি কোথাও। দল-নেতা হয়ে যদি তাঁকে শত্রুর সম্মুখীন হতে হয় তবে তার জন্যে তাঁকে দোষ দেওয়া শক্ত হবে।

কারণ, মুসাফির কেবল বাইরেই প্রিয়দর্শন নন, তাঁর মনের ভেতরটাও সাদা-সরল। দীর্ঘদেহী, ধবধবে-সাদা দাড়ি নিয়ে এই ৬৮ বছরের বৃদ্ধ-জোয়ানকে দেখলে প্রথমে সাধু-সন্ত বলেই মনে হবে। রাজনীতির পাঁক-জলে জন্ম তাঁর, চেহারার তাই শোভাধারি বৈশিষ্ট্য। চেহারা দিয়ে মুসাফির লোকের মন অর্ধেকটাই জয় করে ফেলেন, তার ওপরে তো রয়েছে তাঁর চরিত্র-মাধুর্য, তাঁর অমায়িক ব্যবহার, তাঁর কর্তব্যনিষ্ঠা।

রাজনীতির রঙ্গমঞ্চে মুসাফিরের আশ্চর্য আবির্ভাব। কারখানায় সামান্য ফাই-ফরমাস খাটতেন ছেলেবেলায়, কিন্তু অধ্যবসায় ছিল বিস্ময়কর। তারই ফলে পড়াশুনো চালিয়ে গেলেন কাজের ফাঁকে ফাঁকে। এর পরে শিক্ষকতাজীবন। মুসাফিরের ভাবাবেগ ছিল প্রচণ্ড, কবিতা

গিয়ানি গুরুমুখ সিং মুসাফির

লিখতে সুরু করলেন, দেশপ্রেমের রসে সঞ্জীবিত সে-কবিতা। শুধু কবিতাই নয়, গল্প-কাহিনীও লিখলেন মুসাফির, যাঁরা অবাঞ্ছিত সেগুলো একই সুরে। রাজনীতিক ছাড়াও মুসাফিরের অন্য পরিচয় রয়েছে তাই, সে-পরিচয় কাহিনী-কার হিসেবে। নেহাৎ কম নয় তো, ডজন দুয়েক বই তাঁর সাহিত্যরসিকমহলে জনপ্রিয়তা অর্জন করেছে।

কেবল মাত্র গল্পে লিখেই দেশ সেবার কাজ শেষ করতে পারেন নি মুসাফির, বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে, দেশমাতৃকার শৃংখল মোচনের জন্যে ঝাণ্ডা হাতে রাজ-পথেও নেমেছিলেন তিনি। অসহযোগ আন্দোলনের সময় থেকেই মুসাফির সক্রিয় রাজনীতিতে অংশ গ্রহণ করছেন। অবশ্য পূর্বসূরী প্রতাপ সিং কায়রোঁর মতই গোড়ায় আকালী মতবাদে বিশ্বাসী ছিলেন মুসাফির, পরে যখন সাম্প্র-দায়িকতার বিষবাষ্প আকালী দলকে কলুষিত করতে উদ্যত হলো, মুসাফির তখন কংগ্রেস দলে যোগ দিলেন। স্বাধীনতা আন্দোলনে মাতামাতি করার "অপরাধে" ইংরেজের কারাগারে নিক্ষিপ্ত হলেন তিনি। তাঁর জীবনের দশটি বছর কেটেছে কারান্তরালেই।

দেশ যখন স্বাধীন হলো তখন গিয়ানী গুরুমুখ সিং একজন পুরো-দস্তুর নেতা, ১৯৩০ সাল থেকেই তো তিনি এ-আই-সি-সি'র সদস্য। পার্-লামেন্টের সদস্য নির্বাচিত হতে তাঁর তাই কোন বাধা ছিল না, ১৯৫০-৫২ সালের অস্থায়ী পার্লামেণ্টের তিনি সদস্য ছিলেন। লোকসভায় তিনি অমৃতসরকে প্রতিনিধিত্ব করে আসছেন ১৯৫২ থেকে। তাঁর সাংগঠনিক কর্মকুশলতার পুরস্কার হলো পাঞ্জাব প্রদেশ কংগ্রেসের প্রেসিডেণ্ট পদে দুবার নির্বাচন।

বয়সটাই মুসাফিরের সব নয়, বয়স হয়েছে বলে তাঁকে তরুণ দল থেকে বাদ দেওয়া যায় নি, পাঞ্জাবের যুব-আন্দোলনকে তিনি সেদিন পর্যন্ত নেতৃত্ব দিয়েছেন। মনে-প্রাণে যে তিনি এখনো তরুণ তার একটি জাজ্বল্য প্রমাণ হলো তাঁর আদর্শ। মুসাফির আন্তরিকভাবে বিশ্বাস করেন যে যুদ্ধ মানেই তারুণ্যের সর্বনাশ, কামানের খাদ্য তো তরুণরাই হয় আগে। সেইজন্যে তিনি যুদ্ধের বিরুদ্ধে, শান্তির স্বপক্ষে আন্দোলন করে আসছেন, একাত্ম হয়েছেন বিশ্বশান্তি আন্দোলনের সাথে। নিখিল ভারত শান্তি সংসদের কর্মকর্তা হিসেবে মুসাফির একাধিকবার স্টকহোম, ফিনল্যাণ্ড বিশ্বশান্তি সম্মেলনে গিয়েছেন, বিশ্ববাসীর কাছে বহন করে নিয়ে গিয়েছেন ভারতের মর্মবাণী, শান্তি ও মৈত্রীর ইতিহাস-প্রাচীন আদর্শ।

শান্তিসৈনিক, আদর্শবান ও পূত-চরিত্রের এই মানুষটির ওপর অর্পিত হয়েছে রাজ্যশাসনের গুরু দায়িত্ব। যে-জীবন দীর্ঘ চৌষট্টি বছর ব্যর্থতা জানে নি, তাকে কি আজ নতুন করে ব্যর্থতার গ্লানি স্পর্শ করবে? যদি প্রতিকূল অবস্থার মুখোমুখি তাঁকে হতেও হয়, যদি বাধার সম্মুখীন হতে হয়, তবে সে তাঁর ব্যর্থতার কারণে নয়, ক্ষমতালিপ্সার সঙ্গেই তাঁকে মোকাবিলা করতে হবে। তাকে শক্ত হাতে দমন করতে গেলে মুসাফির কিছু ছোটো হবেন না, ছোটো হবেন যাঁরা মহতের বিরুদ্ধাচরণ করে নিজেদের স্বার্থসিদ্ধি করতে চান তাঁরাই।

নিরপেক্ষ ত্রিরাষ্ট্র নেতৃ সম্মেলনে—তিন রাষ্ট্রপ্রধান

ত্রিরাষ্ট্র নেতৃ সম্মেলন

ব্রিয়নি থেকে কায়রো, কায়রো থেকে দিল্লী। মাঝে দশটি গোটা বছর অতিক্রান্ত হয়ে গেছে। ভারত ইতিমধ্যে তার দুই প্রধান এবং সুযোগ্য নেতাকেও হারিয়েছে। কিন্তু জওহরলাল নেহরুর গোষ্ঠীনিরপেক্ষ শক্তিজোটের স্বপ্ন পথিমধ্যে উপবেশন করে নি, নতুনতর কর্তব্যের আহ্বানে তার চলিষ্ণু সত্তা বিগত একুশে অক্টোবর রাজধানী দিল্লীতে উপনীত হয়ে তৃতীয়তম বৈঠক সাফল্যের সংগে অনুষ্ঠিত করতে সক্ষম হয়েছে।

জুলাই মাসের ঊনিশ তারিখে ১৯৫৬ সালে নেহরুজী লন্ডনে কমনওয়েলথ কনফারেন্স সেরে দিল্লী প্রত্যাবর্তনের মুখে ব্রিয়নিতে নামলেন। 'ইউ-এ-আর'-এর রাষ্ট্রপতি গামাল আব্দেল নাসের তখন যুগোশ্লাভিয়ায় সফররত। মিলন হ'ল তিন রাষ্ট্রের তিন জনপ্রিয় নেতার।

সেদিন রাজনীতি হিসেবে গোষ্ঠী-নিরপেক্ষতা একটি কল্পনীয় বিষয় মাত্র। প্রবীণ কূটনীতি তাই বাঁকা চোখে মুখব্যাদন করেছিল সম্পূর্ণ ব্যাপারটা নিয়ে। কিন্তু টিটো-নাসের-নেহরু বুঝেছিলেন উন্নয়নশীল দেশগুলির চিন্তা ও নীতির স্বাধীনতা রক্ষার জন্য এবং বিশ্বশান্তির প্রয়োজনে গোষ্ঠীনিরপেক্ষ শক্তিজোটের আবশ্যকতা অনিবার্যরূপে দেখা দিয়েছে।

দিল্লী বৈঠকের প্রাক মুহূর্তে ইউ এ আর-এর কূটনৈতিক প্রতিনিধি দিল্লী বৈঠককে স্বাগত জানিয়ে মন্তব্য করেছেন: নিরপেক্ষতাবাদ এবং সক্রিয় নিরপেক্ষতা আন্তর্জাতিক ঘটনাবলীর মধ্যে এক ঐতিহাসিক ভূমিকা গ্রহণ করেছে এবং লক্ষ লক্ষ মানুষের স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষা পূরণে, বিশ্বশান্তি প্রতিষ্ঠায়, শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান ও সহযোগিতায় সক্রিয় সহায়তা দান করে আসছে।

যুগোশ্লাভ কূটনৈতিক প্রতিনিধিও আশা প্রকাশ করেছেন যে, নতুন দিল্লীর ত্রিপক্ষীয় বৈঠক বিশ্বশান্তির পক্ষে নতুন বিঘ্নসৃষ্টিকারী শক্তিসমূহের মোকাবিলায় নবতম উদ্যোগে শান্তি ও প্রগতিশীল দৃষ্টিভঙ্গির প্রভাব বিস্তারে সচেষ্ট হবে।

ভারতের প্রতিরক্ষামন্ত্রী ত্রিপক্ষীয় সম্মেলন সম্পর্কে বলেছেন: বিভিন্ন কোণ থেকে নিরপেক্ষ রাষ্ট্রগুলির ওপর চাপ ও আকর্ষণ সৃষ্টির চেষ্টা চলেছে। কিন্তু ভারত, সংযুক্ত আরব সাধারণতন্ত্র, যুগোশ্লাভিয়ার যৌথ প্রচেষ্টায় এবং শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান ও নিরপেক্ষ দৃষ্টির সম্মিলনে এই ত্রিশক্তি উল্টো প্রতিপত্তির মোকাবিলায় নিশ্চিতভাবে সফল হবে।

বস্তুতপক্ষে হিংস্র যুদ্ধ সামরিক জোটবদ্ধ সম্প্রসারণশীল সাম্রাজ্যবাদী অগ্রগতি জোটনিরপেক্ষ শান্তিবাদী শক্তির কাছে বেশ কাহিল ও পরাভূত বোধ করেছে। নিরপেক্ষ রাষ্ট্রের সংখ্যাও দিনের দিন বেড়ে চলেছে। আজকের আন্তর্জাতিক পরিস্থিতিতে, বিশেষত ভিয়েতনাম কেন্দ্রিক রাজনৈতিক পরিবেশে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় যে শঙ্কা ও ভীতির ছায়া প্রলম্বিত হচ্ছে তাতে নয়াদিল্লীর তিন প্রধানের বৈঠক নতুন আশা ও আশ্বাসের সঞ্চার করবে।

বিদেশী নখরে ভিয়েতনাম

সাত সমুদ্দুর পেরিয়ে এসে ভিয়েতনামের মাটিতে যে বিভীষিকাময় দানবীয় দাপাদাপি শুরু হয়েছে, জেনেভা চুক্তিকে উপেক্ষা করে যে নৃসংশতা আজ এক যুগের ওপর দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া তথা সমগ্র বিশ্বের শান্তিকে বিপর্যস্ত করে তুলেছে, ত্রিশক্তি সম্মেলন সংগত কারণেই তার ওপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেছে।

নিঃশর্তভাবে উত্তর ভিয়েতনামে অবিলম্বে বোমাবর্ষণ বন্ধ করা ও জেনেভা চুক্তির প্রতি মর্যাদা প্রদর্শন করে সেখান থেকে সমস্ত বিদেশী সৈন্য অপসারণ করা এবং ভিয়েতনাম শান্তি আলোচনায় প্রধানপক্ষগণের মধ্যে জাতীয় মুক্তিযোদ্ধা ভিয়েত কংদের স্বীকৃতি দান, ত্রিশক্তি

সম্মেলনের যৌথ ইস্তাহারে ভিয়েতনাম সমস্যা সমাধানের উপায়স্বরূপে বর্ণনা করা হয়েছে।

কিন্তু এরই প্রত্যুত্তর শোনা গেছে ম্যানিলা সম্মেলনে। প্রেসিডেন্ট জনসনের উপস্থিতিতে সাবশেষ গুরুত্বপূর্ণ এই বৈঠক উত্তর ভিয়েতনামের ওপর শর্ত চাপিয়ে সমস্যার একটি অসম্ভব সমাধান চাইছে। অন্যভাবে বললে, সমস্যাকে জিইয়ে রাখারই ইচ্ছা অন্যভাবে ব্যক্ত করেছে ম্যানিলা বৈঠক। সুতরাং দিল্লীর ত্রিশক্তি বৈঠকে গৃহীত যৌথ বিবৃতি শুভ ইচ্ছা প্রকাশের ও সত্যকার সমাধানের পথ প্রদর্শনের নজীর মাত্র হয়ে রইল।

দিল্লীর ত্রিনেতৃ সম্মেলনকে অবশ্য এশিয়ার অন্যান্য রাষ্ট্র নানা প্রকারে অভিনন্দিতই করেছে। জনমতের সৃষ্টিতেও টিটো-নাসের-ইন্দিরা বৈঠক যথেষ্ট কার্যকরী হবে বলে আশা করা যায়।

অন্যান্য রাষ্ট্রের ওপর সরাসরি খবরদারির বিষয়টিকে প্রধান গুরুত্ব দান করার পর, ইস্তাহারে অর্থনৈতিক চাপের দ্বারা উন্নয়নশীল দেশগুলির ওপর উন্নত রাষ্ট্রের আর্থিক মালিকানা-খবরদারির তীব্র নিন্দা করা হয়েছে।

প্রেসিডেন্ট নাসের বৈদেশিক অর্থনৈতিক চাপের পয়লা নম্বর বৈরী। আপন দেশে তিনি বিদেশী মূলধনকে শেকড়-সুদ্ধ বিদেয় করেছেন। প্রেসিডেন্ট নাসের তাই ঐতিহাসিক গুরুত্বপূর্ণ সাংবাদিক সম্মেলনে দৃঢ়তার সঙ্গে ঘোষণা করেছেন যে, সাহায্যের নামে উন্নত দেশগুলি চাপ সৃষ্টির চেষ্টা করলে তা প্রত্যাখ্যান করার চেষ্টা করতে হবে। এজন্য উন্নয়নশীল দেশগুলির মধ্যে অর্থনৈতিক সমবায় গঠন করার প্রয়োজনীয়তা আছে।

আজকের দুনিয়ায় ক্রীতদাস প্রথা রহিত হয়েছে বটে, কিন্তু ক্রীতদাসত্ব এসেছে হাতে পায়ে স্বর্ণবলয় পরে। আজ চাবুকের বদলে মানুষকে মানুষ শাসন করছে চাঁদির চাটি দিয়ে। অর্থনৈতিক অবস্থাই মানুষকে করেছে নয়া দাসত্বের শিকার। সাধারণ জীবনে যেমন, মানুষের ওপর মানুষ, আন্তর্জাতিক জগতে তেমনি রাষ্ট্রের ওপর অন্যতর স্বচ্ছল রাষ্ট্রের প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠিত আছে। আর্থিক চাপের দ্বারা একে অপরকে পদানত করে রাখছে; তার সামাজিক, আর্থিক ও রাষ্ট্রিক জীবনকেও নিয়ন্ত্রিত করছে উন্নততর আর্থিক বনিয়াদের ওপর প্রতিষ্ঠিত বৈদেশিক শঠতা। প্রেসিডেন্ট নাসের বা প্রেসিডেন্ট টিটোর দেশ এই নয়া উপনিবেশবাদকে তাদের দেশের মাটিতে স্থান দেন নি। কিন্তু ভারতে বৈদেশিক পুঁজির অবাধ অনুপ্রবেশ এবং বহুতর বিষয়ে ভারতের পরমুখাপেক্ষিতা ভারতকে যুগোশ্লাভিয়া বা সংযুক্ত আরব সাধারণতন্ত্রের সমতুল আর্থিক স্বাধীনতার স্তরে আজ প্রতিষ্ঠা দান করে নি। তথাপি নবলব্ধ স্বাধীনতার চেতনা নিয়ে আফ্রো-এশীয় ভূখণ্ডে যে সমস্ত দেশ আজ বিদেশী পাশমুক্তির স্বপ্ন দেখছে তারা ত্রিরাষ্ট্রীয় যুক্ত ইস্তাহারে নতুন উদ্দীপনার ও আশার আলোক দেখতে পাবে।

সাম্রাজ্যবাদ, নয়া সাম্রাজ্যবাদ এবং বর্ণবিদ্বেষপ্রথার প্রতি সম্পূর্ণ অনাস্থা প্রকাশ করে ইস্তাহারে শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের নীতিকে পুনরায় দৃঢ়ভাবে ঘোষণা করা হয়। এখানে উল্লেখ্য এই যে, প্রেসিডেন্ট টিটো ও প্রেসিডেন্ট নাসের পুনরায় জওহরলাল নেহরুকেও শান্তির পক্ষে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ অবদান বলেও অভিহিত করেছেন।

ঐতিহাসিক সাংবাদিক সম্মেলন

তিনটি রাষ্ট্রের নেতা প্রেসিডেন্ট নাসের প্রেসিডেন্ট টিটো এবং শ্রীমতী গান্ধীর একত্র সাংবাদিক বৈঠকে যোগদান ও অবাধ-প্রশ্নের উত্তর প্রদানে নয়া দিল্লীতে অনুষ্ঠিত সাংবাদিক সম্মেলনটি ঐতিহাসিক গুরুত্ব লাভ করে। ইতিপূর্বে এ জাতীয় সম্মেলন কখনো অনুষ্ঠিত হয় নি।

সম্মেলনে নেতৃত্রয় একবাক্যে দিল্লীর শীর্ষ বৈঠককে সাফল্যপূর্ণ বলে অভিহিত করেন। এই সম্মেলনে গুরুত্বপূর্ণ কয়েকটি প্রশ্নে দৃঢ়তাব্যঞ্জক মন্তব্য রাখেন সংযুক্ত আরব সাধারণতন্ত্রের প্রেসিডেন্ট শ্রীগামাল আব্দেল নাসের। উন্নয়নশীল দেশগুলির চিন্তার স্বাধীনতা উন্নত দেশগুলি আর্থিক সাহায্যের নামে হরণ করছে। প্রেসিডেন্ট নাসের এই অবস্থার অযৌক্তিকতা সম্পর্কে তীক্ষ্ণ মন্তব্য করে বলেন যে, যেহেতু উন্নত দেশগুলি ঔপনিবেশিক শোষণের দ্বারাই নিজেদের সম্পদ সঞ্চয় করে থাকে, এজন্য স্বাধীনতা-প্রাপ্ত দেশগুলিকে সাহায্য প্রদান তাদের ক্ষেত্রে নৈতিক দায়িত্ব। প্রসঙ্গত বৃটেনের উল্লেখ করে শ্রীনাসের বলেন, বৃটেনে বৃটিশ মূলধনের যে সমাবেশ ঘটেছে তার একাংশ ভারতের সম্পদ থেকে সংগৃহীত। সুতরাং ভারতের উন্নয়নে অংশ গ্রহণ করা বৃটেনের কর্তব্য। আর একথা একইভাবে অন্যত্রও সকল উন্নতদেশগুলির ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য।

প্রেসিডেন্ট নাসের "বৈদেশিক সাহায্য" নামক বস্তুটিকেই একটি চূড়ান্ত শঠতা বলে প্রমাণ করে দিয়েছেন। সাহায্য-দানকে সাহায্যকারীর বদান্যতা না বলে, চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিয়েছেন যে, সাহায্য প্রদানটা তাদের কর্তব্য, কেন না আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে "হ্যাভস"রাও লুণ্ঠেল-মাত্র এবং লুণ্ঠিত "হ্যাভ নটস"দের উন্নত-দেশগুলির স্তূপীকৃত সম্পদে যথার্থ ভোগাধিকার আছে।

প্রেসিডেন্ট টিটো একটি আশার বাণী শুনিয়েছেন। তিনি বলেন, দূর প্রাচ্যের শান্তি আজ য়ুরোপের বহু সাধারণ মানুষেরই কাম্য। তিনি বলেন, (সামরিক শক্তিজোট) ন্যাটোর ধার ভোঁতা হয়ে গেছে, সক্রিয় সদস্য হিসেবে যখন থেকে ফ্রান্স কার্যত সরে দাঁড়িয়েছে। তিনি শীর্ষ বৈঠকের ফলাফল সম্পর্কে কতদূর আশান্বিত তাও সাংবাদিক বৈঠকে তাঁর সুস্পষ্ট উক্তি থেকেই বোঝা যায়। এক প্রশ্নোত্তরে প্রেসিডেন্ট টিটো বলেন, ত্রিরাষ্ট্র শীর্ষ বৈঠকের সুনিশ্চিত ফল আত্মপ্রকাশ করবে অদূর ভবিষ্যতেই।

একই নীতিতে বিশ্বাসী ভারত-যুগোশ্লাভ-সংযুক্ত আরবের ত্রিনেতৃ বৈঠক বিশ্বের সম্মুখে আর একবার শান্তি সহাবস্থান ও স্বাধীনতায় বিশ্বাসকে সুদৃঢ় করল। তিন দেশের নেতৃ সম্মেলন পারস্পরিক সম্পর্ককে করল আরও ঘনিষ্ঠ আরও হৃদ্যতাপূর্ণ। এবং দুনিয়াব্যাপী অর্থনৈতিক দাসত্ব যে আজ নয়া উপনিবেশ-বাদকে জায়গা ছেড়ে দিতে ঘটনাচক্রে একান্তভাবে বাধ্য নয়, ত্রিপক্ষীয় সম্মেলন সে সত্যকেও পুনরুচ্চারিত করে উন্নয়নশীল দেশগুলির মনে নতুন আস্থার সৃষ্টি করল। আর রাজধানী দিল্লী দুই মহান দেশের নেতার পদার্পণে উৎফুল্ল এবং উৎসাহী হয়ে উঠল।

আবার দুর্ঘটনা

ভারতের রেলপথে এখন শনির দশা। অত্যল্প সময়ের মধ্যে দ্রুতহারে ট্রেন দুর্ঘটনা ও প্রাণহানির যে ইতিহাস শ্রীপাতিলের মন্ত্রিত্বকালে সৃষ্টি হল তা অভূতপূর্ব। গত সপ্তাহে বিহারের লক্ষ্মীসরাই স্টেশনে ২২ ডাউন নর্থ এক্সপ্রেসের তলায় বত্রিশ জন যাত্রী প্রাণ হারিয়েছেন। তাঁরা লাইন অতিক্রম করে প্যাসেঞ্জার ট্রেন ধরবার কালে অতর্কিতে এক্সপ্রেসের চাকার তলায় প্রাণ দেন। একে দুর্ঘটনা বলাই ভালো। কিন্তু অপ্রতি-রোধ্য দুর্ঘটনা বলা যাচ্ছে না এই কারণে যে রেল কর্তৃপক্ষ যখন জানতেন যে ঐ লাইনেই একটি রাক্ষুসে এক্সপ্রেস এসে উপস্থিত হবে এবং সে গাড়ির লক্ষ্মী-সরাই-এ থামবার কোন সূচী নেই, তখন অতগুলি মানুষকে পারাপার করতে দেখে কেন সাবধানতা অবলম্বন করেন নি তার সপক্ষে কোন যুক্তি মেলা ভার। আসলে মানুষের জীবন ভারতের মাটিতে বড় অল্প মূল্যে বিকোচ্ছে। পাতিল সাহেব-সহ তাঁর কর্মচারিবৃন্দ তাই যাত্রী-নিরাপত্তা

সম্পর্কে একেবারেই কোন তৎপরতা অবলম্বনের কারণ দেখেন না। পাতিল সাহেব অবশ্য আগামী নির্বাচন নিয়ে ব্যস্ত আছেন, ট্রেনের চাকার ধার অপেক্ষা চাটের পাতার ধার তাঁর কাছে অধিকতর লোভনীয় প্রসঙ্গ; কিন্তু রেলকর্মীরাও সাহেবদের মতো বে-পরোয়া কেন। এদেশে গো-হত্যা নিবারণের জন্য দিক্‌-দিকে আন্দোলন হচ্ছে, কিন্তু যথেচ্ছ মানব-হত্যা নিবারণে কারও টনক নড়ে না। গো-পাল ও মানব-পালেও যে এহেন মূল্যের তারতম্য ঘটবে তা পাতিল সাহেবের রেলদপ্তর গ্রহণের পূর্বে বোধগম্য ছিল না। বর্তমানে বেশ টের পাওয়া যাচ্ছে যে, হালযুগের মূল্যেও দেশের রেলদপ্তর বস্তুজাতো টিকেটধারী মানব-বৃন্দের মূল্য গণনা করছেন না। এহেন রেল-মানস-বিকার আজ একান্ত আশঙ্কার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে, এ বিষয়ে পাতিল সাহেব সুখনিদ্রায় কালাতিপাত করলে তাঁর তন্দ্রা ভঙ্গের জন্য কোন জাগ্রত প্রহরীও কি নেই!

প্রধানমন্ত্রী এমন কি শ্রীকামরাজও হয়ত গভীর দুঃখ প্রকাশ করবেন হতাহতের জন্য, কিন্তু জনসাধারণ বারম্বার গভীরতর দুঃখ প্রকাশ করছেন, ভারতীয় রেলপথে যমরাজের পাইক-বরকন্দাজের উৎপাতের জন্য। সে দুঃখের কাহিনী তাঁদের কর্ণগোচর হলেই নেতৃবর্গের মুখেও দুঃখপ্রকাশ কিছু মূল্য পেতে পারে।

লজ্জা লজ্জা!

সাধারণতন্ত্রী ভারতের মাটিতে সংযুক্ত আরব সাধারণতন্ত্রের প্রেসিডেণ্ট নাসেরকে ছাব্বিশে অক্টোবর পালামে সাড়ম্বর সম্বর্ধনা জানানো হ'ল সাড়ম্বরে। কিন্তু সংযুক্ত আরব সাধারণতন্ত্রের জাতীয় সঙ্গীতের বদলে বাদ্যযন্ত্রে যে সঙ্গীত বেজে উঠল তা হ'ল পুরোনো পচা রাজতান্ত্রিক মিশরের জাতীয় সঙ্গীত।

ভুল ধরা পড়লে লজ্জায় ম্রিয়মাণ কর্তৃপক্ষ সচকিত হয়ে উঠলেন। তদন্তও সঙ্গে সঙ্গে সুরু হয়েছে। কিন্তু লজ্জাটা রয়েই গেল। শুধু লজ্জা বললে ভুল হবে, ভারতের মর্যাদাহানিকর এ লজ্জার কলঙ্ক তদন্তের দ্বারা প্রক্ষালন করা সম্ভব নয়। প্রশাসনিক শৈথিল্য যে কোথায় গিয়ে বাসা বেঁধেছে এই মারাত্মক ভুল তারই অন্যতম পরিচায়ক। এ ভুলের প্রায়শ্চিত্ত তাঁদের অবশ্যই করতে হবে যাঁরা গুরুতর বিষয়কে যথাযোগ্য মর্যাদা দান করতে অক্ষম।

শস্যহানি

যে ভারতবর্ষ দুই মুষ্টি অন্নের জন্য অপর দেশের মুখ চেয়ে অপেক্ষায় থাকে সেই ভারতেই প্রতি বছর কী পরিমাণ শস্যহানি হয়ে থাকে সম্প্রতি ভারতীয় কৃষি গবেষণা পর্ষদের সমীক্ষায় তা প্রকাশ পেয়েছে।

গুদামে গাড়িতে ও খাদ্যশস্য আদান-প্রদানে মোট উৎপাদনের গড় ক্ষতি হয় ১৪।১৫ শতাংশ। শস্য কাটার আগেই কৃষিক্ষেত্রে নষ্ট হয় আট শতাংশের মতো।

প্রকাশ, ১৯৬৫ সালে এগার সহস্রাধিক টন নষ্ট খাদ্যশস্য গড়ে চল্লিশ লক্ষ টাকা ক্ষতি স্বীকার করে বিক্রি করতে হয়েছে।

এই সমীক্ষার পর শস্য সংরক্ষণে সম্ভাব্য তৎপরতা গ্রহণ করার দায়িত্ব রাজ্য সরকারগুলির ওপর ন্যস্ত হওয়া উচিত। অবশ্য সমস্যা তাতে যে কিয়ৎ পরিমাণ কমবে এমন ভরসা আমাদের নেই। সরকারি গুদাম থেকেই টন টন খাদ্যশস্য পচিয়ে নষ্ট করার সংবাদ আমরা পেয়েছি। কষ্ট করে যাদের খাদ্য সংগ্রহ করতে হয় নষ্ট হওয়ার সংবাদে সে দেশের সাধারণ মানুষ উত্তেজিত হয়ে উঠবেন বৈকি।

কিন্তু যে দেশে পতিত জমি উদ্ধার হয় না, ক্ষেত ডুবিয়ে খরার মোকাবিলা করা সম্ভব হয় না, সেখানে নষ্ট শস্য নিবারণও যে সমীক্ষা অন্তে সম্ভব এ বিশ্বাস কারও নেই।

খরা : অনাহার : সাহায্য

বিহার, উত্তরপ্রদেশ এবং উড়িষ্যা অনাবৃষ্টিজনিত দুর্ভিক্ষের কবলিত হয়েছে। বিহারের অবস্থা সঙ্কটের শেষ সীমা অতিক্রম করলে কেন্দ্রীয় সাহায্যের ব্যবস্থা করা হয়েছে। দীর্ঘস্থায়ী ব্যবস্থা হিসেবে সাহায্যদান বিহারের ক্ষেত্রে অব্যাহত রাখতে হবে। প্রকাশ, খরার দরুণ প্রায় তিন কোটি লোক গবাদি পশু তীব্রভাবে দুর্ভিক্ষ ও জলাভাবের সম্মুখীন।

উত্তরপ্রদেশের পূর্বভাগ, রাজস্থান, উড়িষ্যাও খরার প্রকোপে মুহ্যমান। রাজস্থান তার গবাদি পশুর জন্য উপযুক্ত পরিমাণ খাদ্য চেয়ে পাঠিয়েছে কেন্দ্রের কাছে। পার্বত্য প্রদেশে পানীয় জলেরও অভাব সংকটকে জটিলতর করে তুলেছে।

উড়িষ্যার মধ্যপ্রদেশের জেলায় চাষের অবস্থা সঙ্গীন। জলাভাবের দরুণ 'বাহাল' না কিছু জমিতে কৃষিকাজ অসম্ভব হয়ে দাঁড়িয়েছে।

পশ্চিমবঙ্গেও প্রধান খাদ্য চালের মূল্যমান ক্রমাগত বৃদ্ধি পাওয়ায় এবং প্রতি মণ পঞ্চাশ-ষাট টাকা চড়ে যাওয়ার ফলে মফস্বল বাংলা দুর্গতির শেষ সীমায় উপনীত হয়েছে। অবস্থা এতদূর খারাপ যে উদ্বৃত্ত জেলা বর্ধমানও মোটা মূল্যে চাল কিনতে বাধ্য হচ্ছে। যদিও এ মন্বন্তর পেছনে ব্যবসাদারী লুব্ধতাও অনেকাংশে দায়ী।

বিহার সফরকালে কংগ্রেস সভাপতি শ্রীকামরাজ অস্বাভাবিক অবস্থার সুযোগ গ্রহণের জন্য দুই শ্রেণীর জীবকে দায়ী করেছেন, সমাজবিরোধী ও রাজনীতিক। বলা বাহুল্য কংগ্রেসী রাজত্বে একা কংগ্রেসী ছাড়া অপর রাজনৈতিক দলগুলি কংগ্রেসী খাতায় সমাজবিরোধী বলেই পরিচিত। এই পরিচয়মালায় আজ নতুন এক দলও জুটেছেন, তাঁরা কংগ্রেস-ছেড়ে-আসা প্রবীণ বিদ্রোহী কংগ্রেসিগণ। শ্রীকামরাজ তথা কংগ্রেসের এঁরা সকলেই মতলববাজ এবং খরার ও খাদ্যাভাবের সুযোগে এঁরা দেশবাসীকে বিভ্রান্ত করার ফিকিরে অহরহ ঘুরে বেড়াচ্ছেন। কংগ্রেস সভাপতি এইভাবে খুব সহজ উপায়ে আসল সমস্যাকে এড়িয়ে গিয়ে রথ দেখা কলা বেচা দুই-ই করেছেন। অর্থাৎ একসুরে বলেছেন, নির্বাচন ভুলে এখন অনাহারের মোকাবিলায় এগিয়ে আসা প্রয়োজন। অন্যমুখে নির্বাচনী চাল চেলে বিরোধী রাজনীতির ওপর সমাজ-বিরোধিতার দোষ চাপাতে চেয়েছেন। কিন্তু অন্যান্য অনেক ব্যাপারের মতোই এর দ্বারা কোনও ফললাভ হয় নি। আসল পচা ডিমটি যে কোথায় পচন ধরাচ্ছে জনসাধারণ তাও সঠিক উপলব্ধি করতে ভুল করেন নি।

প্রকৃতির ওপর কারও হাত নেই, একথা আজকের বৈজ্ঞানিক যুগে মানুষের মুখে শোভা পায় না। খরার মতো প্রাকৃতিক দুর্যোগের কেমনভাবে মোকাবিলা করতে হয় তা উন্নয়নশীল দেশগুলির অনেকেই জানে এবং সেই পথে দেশের কৃষি ব্যবস্থাকে গঠন করার দায়িত্বও উন্নত দেশগুলি গ্রহণ করেছে। ভারতবর্ষে তেমন প্রচেষ্টা হল আসলে অতি সম্প্রতি শুরু হয়েছে; তাও অধিকাংশ ক্ষেত্রে অর্থাভাবের দোহাই তো প্রথমেই আছে।

সম্প্রতি ভারত সরকারের কৃষিবিভাগ খরার সময়ও মাটিকে চাষের উপযোগী করে রাখার জন্য বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা-

ভারতদর্শনের পাঠকবর্গকে বিজয়ার আন্তরিক প্রীতি ও শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করার মুহূর্তে রচনাসূত্রে দীর্ঘকাল যাবৎ পাঠকবর্গ লেখকের সঙ্গে যে মানসিক ঐকান্তিকতা রক্ষা করে আসছেন লেখক কৃতজ্ঞতার সঙ্গে সেই সহৃদয়তাকে স্মরণ করছেন।

নিরীক্ষা চালানো হচ্ছে বলে জানিয়েছেন। বৈজ্ঞানিক উপায়ে মাটিকে নাকি দীর্ঘ-স্থায়ীভাবে আর্দ্র করে রাখা সম্ভব হবে। মাটির আর্দ্রতা রক্ষার ক্ষেত্রে 'নিউটন' ব্যবহার প্রচলন করা হবে যার সুফল ফলবে আগামী দু-এক বছরের মধ্যেই। কৃষিকাজে পারমাণবিক শক্তির ব্যবহার করে ফসল ফলুক খুব সুখের কথা, কিন্তু বর্তমান অবস্থার মোকাবিলায় তা কোন কাজে আসছে না। বিহার মৃত্যু-মুখে উপস্থিত হলে কেন্দ্রীয় সাহায্য ছুটছে ঠিকই, কিন্তু দেশের অভাবগ্রস্ত অঞ্চলে এইভাবে সাহায্য প্রেরণের ধারা কতদূরই বা অবস্থাকে আয়ত্তে আনতে পারে। তাছাড়া খরা শুধু এ বছরই নয়, বছর বছর আমাদের ভাবিত করে তুলছে। এ-হেন অবস্থায় অনাবাদী জমি উদ্ধার, কৃষির উন্নতি প্রভৃতি ছাড়াও বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি প্রয়োগ অনতিবিলম্বে গ্রহণ করার প্রয়োজন। সর্বনাশ দ্বারদেশে উপনীত হলে এসব বিষয়ে আমরা কিঞ্চিত হাঁক-ডাক করে থাকি বটে, কিন্তু সমস্যার সাময়িক সমাধানের পর পুনশ্চ গড্ডালিকা প্রবাহে গা ভাসিয়ে দিই। উপর্যুপরি দুরবস্থার কথা স্মরণে রেখে অতঃপর আমরা সচেতন হলে প্রকৃতির খেয়ালের হাত থেকে মা অন্নপূর্ণা রক্ষা পেতে পারেন।

প্রকৃতি ছাড়াও মানুষের পৈশাচিক হীনমনোবৃত্তিকে রুখবার ব্যবস্থাও সঙ্গে সঙ্গেই করতে হবে। কোন রাজনৈতিক দল মানুষকে অভুক্ত রেখে নির্বাচনের মওকা লুঠে নেওয়ার জন্য নর্তন-কুর্দন করছেন বলে আমাদের কাছে অবশ্য কোন সংবাদ নেই। অন্যপক্ষে প্রশাসনিক দুষমনী কিভাবে ক্ষুধার অন্ন নিয়ে ছিনিমিনি খেলছে, উড়িষ্যা থেকে সে সংবাদ সংগ্রহ করেছেন দৈনিক বসুমতীর স্টাফ রিপোর্টার। তিনি জানাচ্ছেন :

দুর্নীতির অভিযোগ

"প্রকাশ, গত বৎসর খরার পর আর-ই-ও (রুরাল ইঞ্জিনীয়ারিং অর্গানাই-জেশন) নামে একটি সরকারী সংস্থার ওপর রাজ্যের খরাপীড়িতদের সাহায্যের ভার অর্পিত হয়। স্থানীয় অধিবাসীদের অভিযোগ—এই সংস্থা 'খরা তহবিলের' টাকা খরাপীড়িতদের সেবায় নিয়োগ না করিয়া নতুন নতুন জীপ গাড়ি, গৃহ-নির্মাণ প্রভৃতিতে ব্যয় করিতেছে। ফলে 'মাইনর ইরিগেশন' ও 'মিডিয়াম সাইজড ইরিগেশন অবহেলিত হইতেছে বলিয়া অভিযোগকারীরা মনে করেন।

"আরও অভিযোগ উঠিয়াছে, ১৯৬৬ সালে পাম্প বসাইবার জন্য যে টাকা মঞ্জুর হইয়াছে উহা এখনও ব্যয় হয় নাই। ইহা ছাড়া আর-ই-ও সংস্থা নাকি জব কাজের জন্য কোন টেণ্ডার ডাকিতেছে না। তাহাদের পেটোয়া পার্টিগুলো কাজের অর্ডার পাইতেছে বলিয়া প্রকাশ। টেস্ট রিলিফের কাজও কিছু কিছু এই সংস্থার মাধ্যমেই হইতেছে বলিয়া জানা গেল। অনেকের অভিযোগ—বিলে শ্রমিকদের মজুরির যে অঙ্ক দেখানো হয় প্রকৃতপক্ষে তাহারা উহা অপেক্ষা অনেক কম পাইয়া থাকে।

কালোবাজারে গম পাচার

"সম্বলপুর জেলার খরাপীড়িতদের মধ্যে বিতরণের জন্য গমের বস্তাগুলি কালোবাজারে পাচার হয় বলিয়া বিভিন্ন মহল হইতে অভিযোগ উঠিয়াছে। অভি-যোগকারীরা মনে করেন, সরকারী লাইসেন্সপ্রাপ্ত একদল চাউল কল ব্যবসায়ী এই বেআইনী কার্যে লিপ্ত আছে।"

দুঃখের বিষয় এই লুব্ধ সমাজ-বিরোধীদের হদিশ না করে সরকার ও ক্ষমতাসীন দল সাধারণের দৃষ্টি অন্যত্র আকর্ষণ করে রাজনৈতিক উদ্দেশ্য সিদ্ধির অপচেষ্টা করে থাকেন। শ্রীকামরাজ রাজ-নৈতিক দলগুলিকে যখন অপচেষ্টায় সক্রিয় বলে তাঁর সফরসূচীর অন্যতম বক্তব্য হিসেবে তুলে ধরেন, তখন স্বতঃই প্রশ্ন জাগে, নেতারা তবে কি জেগে ঘুমান, না কি ঘুমানোর ভান করেন।

ছাত্র অসন্তোষের
শুভ ফল

সম্প্রতি উত্তর ভারতের ছাত্র অসন্তোষ তথা ভারতব্যাপী ছাত্র উত্তেজনার ফলে যত ক্ষতিই হয়ে থাক, দেখা যাচ্ছে—লাভও কম হয় নি। কেন না ক্ষমতাসীন দল আজ ছাত্রদের হাতে একটি মহাসত্য ঠেকে শিখলেন।

সম্প্রতি কংগ্রেস সংসদীয় দলের আলোচনা সভায় ছাত্র-অসন্তোষের মূল কারণ সম্পর্কে শিক্ষামন্ত্রী শ্রীচাগলার মন্তব্যে অধিকাংশ সদস্য একমত হতে বাধ্য হয়েছেন। শ্রীচাগলা সুস্পষ্টভাবে বলেছেন যে ছাত্র-অসন্তোষের সঙ্গে আইন ও শৃংখলার প্রশ্ন জড়িত নেই, অসন্তোষ সৃষ্টিকারী হলেন ক্ষমতাসীন দল স্বয়ং। বস্তুতপক্ষে শ্রীচাগলার বক্তব্যের নির্গলি-তার্থ অর্থ তাই। শ্রীচাগলা বলেছেন, রাজনৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করে এদেশের বিশ্ববিদ্যালয়ে উপাচার্য নিয়োগ করা হয়। এঁদের সঙ্গে শিক্ষার সম্পর্ক যতটুকু রাজনীতির কূট সম্পর্ক তার থেকে ঢের বেশি। এঁরা নিযুক্ত হন শাসকদলেরই একটি ক্ষমতাশালী উপদলের মন্ত্রিসভার পরামর্শে এবং রাজ্যপালের সুপারিশে। ফলত ছাত্র সম্প্রদায়ের সঙ্গে এঁদের হৃদ্যতার সম্পর্ক কখনোই গড়ে ওঠে না। ছাত্রদের প্রতিকারও তাই সম্ভব হয় না।

শ্রীমতী গান্ধীর অনুপস্থিতিতে সভায় সভাপতিত্ব করছিলেন শ্রীরঘুনাথ সিং। তিনি শ্রীচাগলাকে সমর্থন করে আরও স্পষ্টভাবে বলেন, পরাজিত মন্ত্রী, অবসরপ্রাপ্ত অফিসর ও হাইকোর্টের বিচারপতি এবং রাজনীতিবিদদের উপাচার্য হিসেবে সত্যিই নিয়োগ করা অনুচিত। বলা বাহুল্য কর্তাদের ক্ষেত্রে এই ঔচিত্য বোধ বড় দেরিতে এসেছে। এতকাল আমরা শুনে আসছিলাম, বাড়ির ফটক পার হয়েই স্কুল-কলেজের ছাত্র-ছাত্রীরা গণ্ডায় গণ্ডায় রাজনীতি করতে শুরু করে দেয়। রাজনৈতিক দলগুলির হাতে ক্রীড়নক হয়ে দলে দলে তারা জাতীয় সম্পত্তি ধ্বংস করে আর সেজন্যই পুলিশের গুলী লাঠি কাঁদুনে গ্যাসের প্রয়োজন হয়; প্রয়োজন হয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে দেওয়াল টপকে ভেতরে গিয়ে ছাত্রদের সঙ্গে পুলিশের দাঙ্গা করার। নেতারা ছাত্রদের বুঝিয়ে আসছিলেন, তোমাদের আবার অভিযোগ কি হে। ওসব গার্জেনরা বুঝবে। ঘরে যাও। লেখা-পড়া শেখো। ফাজলামি কোর না। অদৃষ্টের পরিহাস। মাসখানেকও ঘুরল না, সেই ক্ষমতাসীন দলের সংসদ কার্য-করী সমিতি শিক্ষামন্ত্রীর সদুপদেশ এক-বাক্যে স্বীকার করে নিলেন। এই স্বীকৃতির মধ্যেও স্বীকৃত হয়ে থাকল আর একটি সত্য যে, ছাত্ররা ফাজলামি করতে বা ভবঘুরে স্বভাবী হয়ে অথবা বিরোধী রাজনীতির খপ্পরে পড়ে খামোকা হাঙ্গামা সৃষ্টি করে না, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে গলদ ঢুকিয়ে দেওয়ার জন্য ক্ষমতাসীন রাজনীতিই মুখ্যত দায়ী।

বলা বাহুল্য, শ্রীচাগলা কোন নতুন তথ্য পরিবেশন করেন নি। এদেশের পত্র-পত্রিকার (পোঁ-ধরা কাগজগুলি ছাড়া) বারম্বার শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে রাজ-নীতির হাত সর্বাধিক নিয়ন্ত্রণ চালাচ্ছে বলে অভিযোগ উত্থিত হয়েছে। কর্তারা তখন কানে তুলো দিয়েছিলেন। ছাত্ররা কর্তাদের কথামৃতে তিলমাত্র কাবু না হয়ে সমগ্র ভারতের টনক নড়িয়ে দিলে। আজ কংগ্রেস সংসদীয় দলের কার্যকরী কমিটি সেই সত্যকেই ঠেকে শিখলেন।

তাই বলছিলাম, ছাত্র-অসন্তোষ দেশের যা ক্ষতি করেছে করেছে, কিন্তু একচক্ষু দৃষ্টির চিকিৎসা করে ক্ষমতাসীন দলের নেতৃবর্গের দুই চক্ষু উন্মীলিত করার যে সাহায্য করল, মুক্ত দৃষ্টির প্রভাবে অতঃপর শিক্ষার অঙ্গন থেকে রাজনৈতিক জবরদস্তি যদি দূরীভূত হয়, তবে তার দ্বারা শিক্ষাক্ষেত্রে নতুন ইতিহাস বিরচিত হবে এবং যার সুফল সমগ্র দেশ ও ভবিষ্যৎকাল ভোগ করে অশেষ উপকৃত হবে।

আন্তর্জাতিক

ম্যানিলায় সপ্তজাতি শীর্ষবৈঠক

ফিলিপাইনস:

২৪শে ও ২৫শে অক্টোবর, দু'দিন ধরে ম্যানিলায় সপ্তজাতি শীর্ষ বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়েছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রপতি লিনডন বি জনসন নিজে এই বৈঠকে যোগ দেবার জন্য এসেছিলেন।

ভিয়েতনামে শান্তি প্রতিষ্ঠা সম্পর্কে নতুন কোন আশার বাণী ম্যানিলা বৈঠক শোনাতে পারে নি। যাঁরা ভেবেছিলেন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র শান্তির পথ খুঁজছে এবং ম্যানিলায় সপ্তজাতি বৈঠকের মাধ্যমে শান্তির সম্ভাব্য পথ সন্ধান পাওয়া যাবে, তাঁরা হতাশ হয়েছেন।

জনসন ছাড়া আর যাঁরা এই বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন, তাঁরা হলেন: ফিলিপাইনসের রাষ্ট্রপতি ফার্দিনান্দ মার্কোস, দক্ষিণ কোরিয়ার রাষ্ট্রপতি চুং হি পার্ক অস্ট্রেলিয়ার প্রধানমন্ত্রী হ্যারল্ড হল্ট, নিউজিল্যান্ডের প্রধানমন্ত্রী কিথ হোলিয়োক, থাইল্যান্ডের প্রধানমন্ত্রী থানম কিটিকাচরন এবং দক্ষিণ ভিয়েতনামের রাষ্ট্রপ্রধান লেফটেনান্ট জেনারেল নেগুইন ভান থিউ ও প্রধানমন্ত্রী এয়ার ভাইস মার্শাল নেগুইন কাও কাই। এ ছাড়া ভিয়েতনামে মার্কিন সৈন্যবাহিনীর অধ্যক্ষ জেনারেল ওয়েস্টমোরল্যান্ড ও অন্যান্য সামরিক অফিসাররাও বৈঠকে যোগ দিয়েছিলেন।

শীর্ষ বৈঠকের পূর্ব-প্রস্তুতি স্বরূপ মার্কিন রাষ্ট্রপতির বিশেষ পরামর্শদাতা বিল ময়ার্স যোগদানকারী রাষ্ট্রগুলির রাজধানীতে গিয়ে বিভিন্ন দেশের রাষ্ট্রনেতাদের সঙ্গে আলোচনা করেছেন। মার্কিন প্রতিরক্ষাসচিব রবার্ট ম্যাকনামারা নিজে দক্ষিণ ভিয়েতনামে গিয়েছিলেন। বৈঠক বসার আগে মার্কিন পররাষ্ট্রসচিব ডিন রাস্ক, ফিলিপাইনসের পররাষ্ট্রসচিব নারসিসো রামোজ, দক্ষিণ কোরিয়ার পররাষ্ট্রমন্ত্রী লি টন উওন, দক্ষিণ ভিয়েতনামের পররাষ্ট্রমন্ত্রী ত্রান ভান দো ও অস্ট্রেলিয়ার পররাষ্ট্রমন্ত্রী পল হ্যাজলাট ম্যানিলায় এক মন্ত্রণাসভায় মিলিত হয়ে নেতৃবৃন্দের আলোচনার সূত্র নির্ধারণ করেছিলেন।

২৪শে অক্টোবর 'হোটেল ম্যানিলায়' শীর্ষ বৈঠক সুরু হয়। প্রকাশ্য অধিবেশন ছাড়াও কয়েকটি রুদ্ধদ্বার বৈঠক হয়। বিভিন্ন রাষ্ট্রনেতা বৈঠকে যে সব বক্তৃতা করেন, তার মধ্যে জনসন, কাও কাই ও ওয়েস্টমোরল্যান্ডের কয়েকটি মন্তব্য উল্লেখযোগ্য। জনসন বলেছেন, সাতটি রাষ্ট্রের প্রধানদের এই বৈঠক নতুন শক্তির উৎসরূপে প্রতীয়মান হবে। একের বিপদে অন্য বন্ধুরা এগিয়ে আসবে, এই ঘোষণাই এখান থেকে করা হচ্ছে। দক্ষিণ ভিয়েতনামের প্রধানমন্ত্রী কাও কাই-এর বক্তব্য: সমস্ত কমিউনিস্টকে দক্ষিণ ভিয়েতনাম ছেড়ে উত্তর ভিয়েতনামে যেতে হবে, কেবলমাত্র এর ভিত্তিতেই শান্তি স্থাপন হতে পারে। তাঁর মতে যুদ্ধক্ষেত্রে ভিয়েত কং ও উত্তর ভিয়েতনাম প্রতিহত হয়েছে। ভিয়েতনামে মার্কিন সেনাবাহিনীর প্রধান ওয়েস্টমোরল্যান্ড বলেছেন, শীঘ্র যুদ্ধ শেষ হবার কোন সম্ভাবনা নেই; যুদ্ধ চালাবার জন্য আরও সৈন্য চাই।

দু'দিনব্যাপী ম্যানিলা বৈঠকে আলোচনার মূল সুর ছিল এই। অন্যান্য নেতাও প্রায় একই কথা বলেছেন। ভিয়েতনামের যুদ্ধে প্রয়োজনমত আরও সৈন্য, অস্ত্র, রসদ ও অর্থ সাহায্যের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন সবাই।

এই আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে বৈঠকের ঘোষিত সিদ্ধান্তের বিচার করতে হবে। বৈঠকে সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত একটি 'যুক্ত ইস্তাহার' ও দু'টি 'ঘোষণাপত্র' প্রচার করা হয়েছে। 'শান্তির লক্ষ্য' এবং 'এশিয়া ও প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলে শান্তি ও প্রগতির নীতিসমূহ' শীর্ষক ঘোষণাপত্র দু'টিতে অনেক শূন্যগর্ভ ভাল ভাল কথা বলা হয়েছে। ক্ষুধা, নিরক্ষরতা ও রোগের

বিরুদ্ধে 'মহৎ সংগ্রামের' সংকল্প ঘোষণা করেছেন নেতৃবৃন্দ। ভিয়েতনাম সম্পর্কে যুক্ত ইস্তাহারে বলা হয়েছে, উত্তর ভিয়েতনাম দক্ষিণ ভিয়েতনাম থেকে সৈন্যাপসারণ ও অন্তর্ঘাতমূলক কার্যকলাপ বন্ধ সুরু করার ছ'মাসের মধ্যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও অন্যান্য বন্ধু রাষ্ট্র দক্ষিণ ভিয়েতনাম থেকে তাদের সৈন্য সরাবে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও অপর পাঁচটি রাষ্ট্রের শাসক-প্রধান ঘোষণা করেছেন, ভিয়েতনামের জনসাধারণকে রক্ষা করার জন্য যতদিন প্রয়োজন সামরিক ও অন্যান্য সাহায্য দিতে তাঁরা প্রস্তুত। তবে সঙ্গে সঙ্গে তাঁরা এ কথাও বলেছেন, সংঘর্ষ বন্ধ করার জন্য যে কোন উদ্যোগকে তাঁরা স্বাগত জানাবেন।

উত্তর ভিয়েতনামে বোমাবর্ষণ বন্ধের বিষয়ে ম্যানিলা বৈঠকে কোন কথা বলা হয় নি। বৈঠকের পূর্বে যোগদানকারী রাষ্ট্রসমূহের পররাষ্ট্রমন্ত্রীদের সভায় স্থির হয়েছিল, উত্তর ভিয়েতনামে বোমাবর্ষণের ব্যাপার একান্তভাবে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নিজস্ব বিষয়, সুতরাং এ বিষয়ে পূর্ণাঙ্গ বৈঠকে কোন আলোচনা হবে না। ভিয়েতনাম থেকে মার্কিন ও অন্যান্য সৈন্যাপসারণের জন্য যে সর্ত আরোপ করা হয়েছে, তা থেকে স্পষ্টই বোঝা যায় সৈন্যাপসারণের কোন উদ্দেশ্য এ'দের নেই। উত্তর ভিয়েতনামের কোন 'নিয়মিত' সৈন্য দক্ষিণ ভিয়েতনামের কোথাও নেই, এ অবস্থায় তাদের অপসারণের প্রশ্ন ওঠে কি করে? লুকিয়েচুরিয়ে আত্মগোপন করে যদি কেউ কোথাও থাকে, তবে আনুষ্ঠানিকভাবে তা তুলে নেবার কোন সম্ভাবনা নেই। ভিয়েত কং গেরিলাদের আচরণকে উত্তর ভিয়েতনামের আন্তর্ঘাত-কার্যরূপে অভিহিত করারও কোন সুযোগ নেই। সুতরাং এই সর্ত পালন সম্ভব নয়। উত্তর ভিয়েতনামে মার্কিন বোমাবর্ষণ বন্ধ হবে না, ভিয়েতনাম থেকে মার্কিন ও সহযোগী সৈন্য অপসারণ হবে না, ম্যানিলা বৈঠকের পরেও অবস্থা এই।

ম্যানিলা শীর্ষ বৈঠকে ভিয়েতনামের যুদ্ধ বন্ধ ও শান্তি প্রতিষ্ঠার বিষয় নিয়ে কোন গুরুত্বপূর্ণ আলোচনাই হয় নি। বরং এই যুদ্ধকে কি ভাবে আরও জোরদার করা যায়, সেই বিষয়ে সলা-পরামর্শ হয়েছে।

দিল্লীতে জোটনিরপেক্ষ ত্রিশক্তি শীর্ষ বৈঠকে সমবেত নেতৃবৃন্দ মার্শাল জোশেফ ব্রজ টিটো, আবদুল গামেল নাসের ও শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী ম্যানিলা বৈঠকের সিদ্ধান্তে খুশি হতে পারেন নি—তাঁদের বিরূপ প্রতিক্রিয়ার কথা জানা গেছে। চীন মন্তব্য করেছে, ম্যানিলার সিদ্ধান্ত 'বারুদের গন্ধে ভরা'।

শান্তির উদ্দেশ্য নিয়ে নয়, নভেম্বরের মার্কিন নির্বাচনের দিকে তাকিয়ে জনসন এই বৈঠকের আয়োজন করেছিলেন। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র একা নয়, এশিয়া ও প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলের অন্যান্যরাও ভিয়েতনাম যুদ্ধের সম-অংশীদার, এই চিত্রটি জনসন সযত্নে তুলে ধরার চেষ্টা করেছেন। একই উদ্দেশ্য নিয়ে জনসন ফিলিপাইনস ছাড়াও নিউজিল্যান্ড, অস্ট্রেলিয়া, থাইল্যান্ড, মালয়েশিয়া, দক্ষিণ কোরিয়া ও দক্ষিণ ভিয়েতনাম সফর করেছেন। কিন্তু এতে কি কেউ ভুলবে?

জনসনের দূর-প্রাচ্য সফরও নির্বিঘ্ন হয় নি। অস্ট্রেলিয়ার মেলবোর্ন ও সিডনিতে জনসনের বিরুদ্ধে, ভিয়েতনামে যুদ্ধ বন্ধের দাবিতে বিক্ষোভ হয়েছে। ম্যানিলায় যে হোটেলে জনসন ছিলেন, সেখানে তিন হাজার ফিলিপাইন ছাত্র এত তীব্র বিক্ষোভ প্রদর্শন করেছে যে, পুলিশকে লাঠিচার্জ করতে হয়েছে। 'জনসন ফিরে যাও', এই ছিল ছাত্রদের দাবি। মালয়েশিয়ায় আগে থাকতেই বহু ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে।

দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া:

ভারতের উপরাষ্ট্রপতি ডঃ জাকির হোসেন এক পক্ষকাল ধরে চারটি প্রতিবেশী

কম্বোডিয়ার প্রধানমন্ত্রী প্রিন্স সিহানুকের সঙ্গে আলোচনারত ভারতের উপরাষ্ট্রপতি ডঃ জাকির হোসেন

তেল আহার যোগাতে সাহায্য করে

দুপুরবেলার ডাব্বাওয়ালার দৌড়োদৌড়ি, বোম্বাইয়ে একটি সুপরিচিত দৃশ্য। আহার্যবহনকারী হিসেবে এই শহরে তারা একটি প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়েছে। বিভিন্ন শহরে বিভিন্ন উপায়ে আহার্য নিয়ে যাওয়া হয়। এই আহার্যের অধিকাংশই উৎপন্ন হয়েছে তেলের সাহায্যে—সার এবং বীজাণুনাশকের সহায়তায়। রান্না হয়েছে তেলের দ্বারা নানাভাবে জ্বালানো স্টোভের উপর। তারপরে বিভিন্ন গন্তব্যস্থানে নিয়ে যাওয়া হয়েছে ট্রেন, ভ্যান, ট্রাক, ঠেলাগাড়ি অথবা সাইকেলে—যার সবই তেলের দ্বারা চলে অথবা লুব্রিকেশন হয়। প্রকৃতপক্ষে তেল আমাদের দৈনন্দিন জীবনের সকল দিককেই স্পর্শ করে এবং ইণ্ডিয়ানঅয়েল কৃষি, শিল্প ও পরিবহণের জন্য বহু রকমের পেট্রোলিয়ামজাত দ্রব্য সরবরাহ করে।

INDIANOIL —*অর্থনৈতিক সমৃদ্ধিকল্পে জাতীয় ন্যাস*

ইণ্ডিয়ান অয়েল কর্পোরেশন লিমিটেড

ulka-IOC-6101A BEN

সাথে থাইল্যান্ড, কম্বোডিয়া, সিঙ্গাপুর ও মালয়েশিয়ায় শুভেচ্ছা-সফর করে স্বদেশ প্রত্যাবর্তন করেছেন।

উপরাষ্ট্রপতি সর্বত্র বিপুল সম্বর্ধনা লাভ করেছেন। সরকারী নেতৃবৃন্দ ও জনসাধারণ ছাড়াও এই সব দেশে অবস্থানকারী ভারতীয় বংশোদ্ভূতরা ডঃ জাকির হোসেনকে সম্বর্ধনা জানিয়েছে।

এই সব দেশের সঙ্গে ভারতের ঘনিষ্ঠ মৈত্রী সম্পর্ক রয়েছে। উপরাষ্ট্রপতির শুভেচ্ছা-সফরের ফলে এই সম্পর্ক আরও ঘনিষ্ঠ হল। উপরাষ্ট্রপতি তাঁর সফরকালে ভারতের সঙ্গে এই সব দেশের সুপ্রাচীন সাংস্কৃতিক যোগের উল্লেখ করেন এবং বাণিজ্যের প্রসার ও প্রতিবেশী সম্পর্কের উন্নতির বিষয়ে আলোচনা করেন।

ডঃ জাকির হোসেন বিভিন্ন দেশের নেতৃবৃন্দের সঙ্গে আলোচনাকালে বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সমস্যা ও বিশেষ করে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া প্রসঙ্গে ভারতের বক্তব্য স্পষ্টভাবে তুলে ধরেন। ভিয়েতনামের ব্যাপারে তিনি বলেন, অবিলম্বে উত্তর ভিয়েতনামে মার্কিন বোমাবর্ষণ বন্ধ ও শান্তির জন্য আলোচনার ব্যবস্থা করা প্রয়োজন। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার শান্তির পক্ষে বিপদস্বরূপ চীনের কথাও তিনি বলেন। চীনের পরমাণু বিস্ফোরণের বিরুদ্ধে তাঁর তীব্র অভিমত বিশেষ প্রাধান্য পায়। ইন্দোনেশিয়ার রাজনীতির পরিবর্তন ও মালয়েশিয়ার সঙ্গে তার সম্পর্কের উন্নতিতে উপরাষ্ট্রপতি বিশেষ সন্তোষ প্রকাশ করেন। সর্বত্র জোটনিরপেক্ষ নীতির ব্যাখ্যা করেন উপরাষ্ট্রপতি। ভারত কোনরূপ সামরিক জোটবন্ধনে বিশ্বাস করে না, অত্যন্ত জোরের সঙ্গে তিনি এই কথা বলেন।

যে চারটি দেশে উপরাষ্ট্রপতি সফর করেছেন, তার মধ্যে থাইল্যান্ড মার্কিন জোটভুক্ত, কম্বোডিয়া নিরপেক্ষ ও কিছুটা কমিউনিস্ট ঘেঁষা এবং মালয়েশিয়া ও সিঙ্গাপুর মার্কিন বা বৃটেনের তাঁবেদার না হলেও এদের দিক ঘেঁষেই আছে। তবু সব ক'টি দেশের সঙ্গেই ভারতের সম্পর্ক ভাল। প্রত্যেকেই ভারতের নীতির সপ্রশংস সমর্থক।

চীনঃ

পাকিস্তানের পররাষ্ট্রমন্ত্রী সৈয়দ সরিফুদ্দিন পিরজাদা সপ্তাহব্যাপী শুভেচ্ছা-সফরে বর্তমানে চীনে রয়েছেন।

২৩শে অক্টোবর পিকিং-এ চীনের পররাষ্ট্রমন্ত্রী মার্শাল চেন ঈ পিরজাদার সম্মানে এক ভোজসভার আয়োজন করেন। এই অনুষ্ঠানে বক্তৃতা প্রসঙ্গে চেন ঈ বলেন, পাকিস্তানের 'জাতীয় স্বাধীনতা রক্ষার জন্য' 'বহিঃশত্রুর আক্রমণ প্রতিরোধের জন্য' চীন সর্বদা পাকিস্তানকে সাহায্য করবে। এই বক্তৃতার উদ্দেশ্য যে ভারত, এ কথা কাউকে বুঝিয়ে বলার প্রয়োজন হয় না। চেন ঈ আর এক ধাপ এগিয়ে বলেন, "আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার রক্ষার জন্য কাশ্মীরীদের সংগ্রামে চীনা সরকার ও চীনা জনসাধারণ সর্বদাই পাকিস্তানের পক্ষে থাকবে"। চেন ঈ আরও বলেন, চীন-পাকিস্তান আঁতাত ভাঙার জন্য মার্কিন 'সাম্রাজ্যবাদী', সোভিয়েত 'শোধনবাদী' ও ভারতীয় 'প্রতিক্রিয়াশীলরা' অনেক চেষ্টা করেছে, কিন্তু তারা সবাই ব্যর্থ হয়েছে। পাক-চীন আঁতাত দীর্ঘজীবী হবে।

কাশ্মীরের সমর্থনে পাকিস্তানের

চেন ঈ

পক্ষে চীনের নেতাদের বক্তৃতার প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই লাহোরে আয়ুব খাঁ আবার ঘোষণা করেছেন, কাশ্মীর সমস্যার সমাধান না হওয়া পর্যন্ত ভারতের সঙ্গে পাকিস্তানের বন্ধুত্ব সম্ভব নয়। ২৭শে অক্টোবর আয়ুবের ক্ষমতা গ্রহণের অষ্টম বার্ষিকী উদ্‌যাপন উপলক্ষে লাহোরে মৌল গণতন্ত্রীদের এক সমাবেশে আয়ুব এই কথা বলেন।

ভারতের বিরুদ্ধে চীন ও পাকিস্তান কি নতুন কোন চক্রান্ত সুরু করেছে?

নাইজেরিয়াঃ

নাইজেরিয়ায় হাউসা ও ইবো উপজাতিদের মধ্যে যে রক্তক্ষয়ী দাঙ্গা-হাঙ্গামা শুরু হয়েছে, তাতে শেষ পর্যন্ত পশ্চিম আফ্রিকার বৃহত্তম রাষ্ট্র নাইজেরিয়ার ঐক্য ও সংহতি রক্ষা করা সম্ভব হবে কি না, সে বিষয়ে গুরুতর সন্দেহ দেখা দিয়েছে।

উপজাতীয় কলহ নাইজেরিয়ায় অনেক দিন ধরেই চলছে। গত জানুয়ারী মাসে নাইজেরিয়ার প্রধানমন্ত্রী হাউসা উপজাতিভুক্ত স্যার আবু বকর তফাওয়া বালেয়াকে হত্যা করে সৈন্যবাহিনীর প্রভাবশালী ইবো অফিসাররা ক্ষমতা দখল করেন। ইবো উপজাতির জেনারেল আগুই-ইরনসি শাসনের দায়িত্ব গ্রহণ করেন। কিছুদিন পরে আবার ইরনসিকে হত্যা করে উত্তরের হাউসা উপজাতির লেফটেনান্ট কর্নেল ইয়াকুবু গাউন ক্ষমতা গ্রহণ করেন। গাউনের হাতে ক্ষমতা আসার পর থেকেই উত্তরের হাউসারা ইবোদের উচ্ছেদের জন্য উঠে পড়ে লেগে গেছে। হাউসারা ধর্মে মুসলমান আর ইবোরা ক্রিশ্চিয়ান—এর ফলে এই উপজাতীয় কলহ সাম্প্রদায়িকতার রূপও গ্রহণ করেছে।

সেপ্টেম্বরের শেষে কানো বিমানবন্দর থেকে বর্তমান দাঙ্গার সূত্রপাত হয়। নাইজেরিয়া সৈন্যবাহিনীর পঞ্চম ব্যাটেলিয়ানের সৈন্যরা এই দাঙ্গা শুরু করে। এই ব্যাটেলিয়ানের সৈন্যদের প্রায় সবাই হাউসা মুসলমান। কানো বিমানবন্দরে একটি বিমান থেকে সৈন্যরা প্রায় একশজন ইবোকে নামিয়ে হত্যা করে। এর পর সারা কানো শহর জুড়ে চলতে থাকে ইবো হত্যা। উন্মত্ত সৈন্যদের সঙ্গে সাধারণ হাউসা নাগরিকরাও এই 'হত্যা উৎসবে' যোগ দেয়। কানো থেকে উত্তরাঞ্চলের অন্যান্য শহর ও গ্রামেও ছড়িয়ে পড়ে এই দাঙ্গা। ক'দিনের মধ্যে তিন হাজারের ওপর ইবো নিহত হয়। রেল গাড়ি, বিমান ও অন্য যানবাহনের সাহায্যে দলে দলে ইবোরা উত্তরাঞ্চল ত্যাগ করে পালাতে থাকে।

এই ঘটনার প্রতিক্রিয়া তীব্রভাবে দেখা দেয় ইবোদের প্রদেশ পূর্বাঞ্চলে। সেখানে গভর্নর ওজুমেগুই ওজুকুই অন্য উপজাতিদের লোককে পূর্বাঞ্চল ত্যাগ করার নির্দেশ দেন। তিনি বলেন, উত্তেজিত ইবোদের হাত থেকে তিনি তাদের রক্ষা করার ভরসা দিতে পারছেন না। শুধু ওজুকুই এ কথাও বলেন, তাঁরা যুক্তরাষ্ট্র থেকে বিচ্ছিন্ন হবেন কি না সে কথা ভাবার সময় উপস্থিত হয়েছে।

চারটি প্রধান উপজাতি অধ্যুষিত চারটি পৃথক অঞ্চল নিয়ে নাইজেরিয়া যুক্তরাষ্ট্র গঠিত। বিভিন্ন অঞ্চলের উপজাতি-অধিবাসীদের মধ্যে যদি পারস্পরিক সহযোগিতা ও সহনশীলতা না থাকে, তবে এই যুক্তরাষ্ট্রকে টিকিয়ে রাখা অসম্ভব। ঐক্যের মনোভাবের ওপর আজ এখানে উপজাতীয় বিরোধ প্রাধান্য লাভ করেছে।

ভগিনী নিবেদিতা ও শ্রীঅরবিন্দ

সুদীপা ভাদুড়ী

অক্টোবর, ১৯০২।
স্থানঃ বরোদা।

প্রথম সাক্ষাতেই নিবেদিতা নিবেদন করলেনঃ 'কলকাতা আপনাকে চায়। আপনার উপযুক্ত স্থান বাংলা দেশ।'

অরবিন্দ ঘোষঃ 'না, আমি অন্তরালে, অর্থাৎ পশ্চাতে থাকিব। আমার কাজ মানুষ তৈরি করা।'

নিবেদিতাঃ 'আপনি আমার উপর নির্ভর করিতে পারেন। আমাকে আপনার বন্ধু বলিয়া জানিবেন।'

স্বামী বিবেকানন্দের দেহত্যাগের পর ভগিনী নিবেদিতা গুরুর নির্দেশ মতো কাজ করতে চাইলেন। কিন্তু তাঁর কাজকর্ম মঠের গেরুয়াধারীদের খুশি করতে পারলো না। কারণ বিবেকানন্দকে তিনি 'ন্যাশনাল হিরো' আখ্যা দিয়ে আত্মনিয়োগ করেছেন জাতিকে জাগ্রত করার কাজে। এ হেন ব্যাপার মঠবাসীদের কিভাবে খুশি করতে পারে? তাছাড়া ধর্মস্থানে রাজনীতির গন্ধ পেলে ত' ইংরেজ সরকার ছেড়ে কথা বলবে না। নানা রকম বিচারে মঠ কর্তৃপক্ষ নিবেদিতাকে যেমন মঠের সঙ্গে সংস্রব ত্যাগ করতে বাধ্য করলেন, নিবেদিতাও যেন মঠের হাত থেকে মুক্তি পেয়ে স্বস্তির নিশ্বাস ফেললেন।

এই ঘটনার পর নিবেদিতাকে আমরা দেখি রাজনীতির প্রত্যক্ষ নাট্যমঞ্চে। এবং সে রাজনীতিতে অনুপ্রবেশ করা যা তা ব্যাপার নয়। তিনি মনে প্রাণে অনুভব করলেন যে, সন্ত্রাসবাদ ছাড়া ইংরেজ রাজশক্তিকে এ দেশ থেকে তাড়ানো দুঃসাধ্য ব্যাপার। সেই পথেই জাতীয় মুক্তি।

কিন্তু সমগ্র ভারতবর্ষ দুচোখ দিয়ে না দেখলে কি সমগ্র জাতিকে জানা যায় কল্পনা করা যায় জাতীয় মুক্তির। এই উদ্দেশ্যে তিনি ভারত ভ্রমণে বের হলেন। অবশ্য ভ্রমণের সাহায্যে দৃষ্টি কি রকম সম্প্রসারিত হয়, তার শিক্ষা তিনি লাভ করেছিলেন গুরু বিবেকানন্দর কাছ থেকেই।

স্বামী বিবেকানন্দ যখন ইহজগতে নেই, উদ্দেশ্য সাধনের জন্য নিবেদিতা যখন মনে মনে দৃঢ়সংকল্প গ্রহণ করেছেন, তখন দেশভ্রমণকালেই দেখা হোল বরোদায় অরবিন্দের সঙ্গে। অরবিন্দের সঙ্গে নিবেদিতার সাক্ষাতের সময় যে কথোপকথন তা উপরে উল্লিখিত হয়েছে। এই কথোপকথনের দ্বারা বুঝা যায় যে, অরবিন্দ ও নিবেদিতার ভবিষ্যৎ কর্মপ্রণালী কি—তা তাঁরা পরস্পর জানতেন। এতোদিন, তাই, যেন দুজনেই সাক্ষাতের অপেক্ষায় ছিলেন।

নিবেদিতা কি ছিলেন এবং কি হবেন

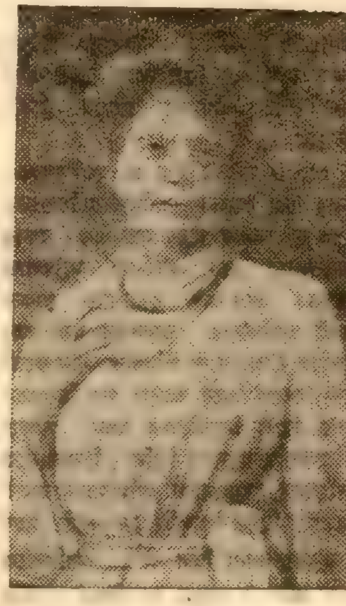

ভগিনী নিবেদিতা

—তা অনুমান করা তখনকার দিনে দুঃসাধ্য হলেও অসাধ্য ছিল না।

নিবেদিতা যখন মিস মার্গারেট নোবল নামে পরিচিত ছিলেন তখন তিনি ক্রোপার্টকিনের সংস্পর্শে বিপ্লবপন্থী। আইরিশ হোমরুল আন্দোলনেও তাঁর একটি বিশিষ্ট ভূমিকা ছিল। এ ছাড়া তাঁর বংশ পরিচয় গ্রহণ করলে এ সিদ্ধান্ত সহজেই করা যায় যে, এক অগ্নিগর্ভ পরিবেশে বিপ্লবের পদধ্বনি শুনতে শুনতেই তিনি ভূমিষ্ঠ হয়েছিলেন। সুতরাং নিবেদিতার পক্ষে মঠই সর্বস্ব ছিল না। শেষ পর্যন্ত ভারতের স্বাধীনতা লাভের উদ্দেশ্যে আত্মোৎসর্গ করেছিলেন।

অন্যদিকে, অরবিন্দ ঘোষ শিক্ষা-দীক্ষায় শ্রেষ্ঠ, তাঁর মাতামহের মধ্যে ছিল স্বদেশ-প্রেমের অগ্নিস্ফুলিঙ্গ। বরোদায় অরবিন্দের অবস্থানকালে গুজরাটে একটি গুপ্ত সমিতি ছিল। এটি ছিল সন্ত্রাসবাদীদের। ঠাকুরসাহেব এই গুপ্তচক্রের সভাপতি ছিলেন। ঠাকুরসাহেব জাপানে গেলে এই গুপ্ত সমিতির সভাপতি হন অরবিন্দ। এই সময় অর্থাৎ ১৯০২ খৃস্টাব্দের প্রথমভাগে অরবিন্দ বাংলা দেশে গুপ্ত সমিতি প্রতিষ্ঠার পরিকল্পনা গ্রহণ করেন। সেই উদ্দেশ্যে তিনি নিজেও তখন কলকাতায় আসেন। বরোদা থেকে ফিরে আসার পর নিবেদিতা কলকাতায় অরবিন্দ প্রতিষ্ঠিত গুপ্ত সমিতিতে যোগদান করেছিলেন। এই গুপ্ত সমিতিকে তিনি তাঁর লাইব্রেরীর গ্রন্থগুলিও উপহার দিয়েছিলেন।

১৯০২ সালে নিবেদিতা বরোদায় অরবিন্দের সঙ্গে প্রথম সাক্ষাতের সময় তাঁকে কলকাতায় আসতে অনুরোধ জানিয়েছিলেন। অরবিন্দ সেই অনুরোধ ভোলেন নি। ১৯০৬ সালের ৭ই আগস্ট তিনি কলকাতায় এসে 'বন্দে মাতরম্' কাগজে যোগদান করেন। এজন্য অরবিন্দকে আর্থিক কৃচ্ছ্রতাও স্বীকার করে নিতে হয়। কারণ বরোদা কলেজে অধ্যাপক হিসেবে তিনি মাসিক সাড়ে সাত শত টাকা মাইনে পাচ্ছিলেন। অথচ 'বন্দে মাতরম্'-এ কাজের জন্য কোনো মাইনে ছিল না। তবে জাতীয় শিক্ষা পরিষদ-এর অধ্যক্ষ নিযুক্ত হওয়ায় মাসিক পঞ্চাশ টাকা মাইনে পেতেন। একমাত্র দেশের কল্যাণ এবং নিবেদিতার আহ্বানেই তিনি অর্থমোহ হেলায় ত্যাগ করতে পেরেছিলেন।

সুপ্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক গিরিজাশঙ্কর রায়চৌধুরী বলেছেন, "স্বামীজীর সহিত

সাক্ষাতের গুরুত্ব নিবেদিতার ব্যক্তিগত জীবনে অধিক। আর অরবিন্দের সহিত সাক্ষাতের গুরুত্ব নিবেদিতার রাজনৈতিক জীবনে সমধিক। অরবিন্দ আদর্শে বিপ্লবী (থিওরিটিক্যাল), আর নিবেদিতা হাতে-কলমে কাজে বিপ্লবী (প্রাক্‌টিক্যাল)। অরবিন্দের বয়স এখন ত্রিশ বৎসর। নিবেদিতা অরবিন্দ অপেক্ষা বয়সে পাঁচ বৎসর বড়।"

অবশ্য নিবেদিতা ও শ্রীঅরবিন্দের জীবনে স্বদেশপ্রীতিও একাভিমুখী। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, "সিস্টার নিবেদিতা হ্যাজ্‌ আটার্ড দি ভাইট্যাল ট্রুথ্‌স্‌ এবাউট ইণ্ডিয়ান লাইফ।" অরবিন্দ 'কর্মযোগিন'-এ নিজের সম্বন্ধে লিখেছেন, "আই এ্যাম এ হিন্দু, আই এ্যাম এ ন্যাশনেলিস্ট।" অথচ এমনি চমকপ্রদ ব্যাপার যে, দুজনেরই শিক্ষা-দীক্ষা সমুদ্রের পরপারে এবং দুজনেই বাংলা ভাষা অপেক্ষা ইংরেজী ভাষাতেই সুপণ্ডিত ছিলেন।

যে সময়কার কথা বলছি, তখন বাংলা দেশে দুটি দল। একদল নরমপন্থী, আর একদল চরমপন্থী। এই চরমপন্থী দলের নেতৃত্বে আছেন নিবেদিতা ও অরবিন্দ। সন্ত্রাসবাদ, গেরেলা যুদ্ধ এবং তাতেও সম্ভব না হলে শেষ পর্যন্ত সশস্ত্র প্রকাশ্য বিদ্রোহের দ্বারা ইংরেজদের দেশ থেকে উৎখাত করে পূর্ণ স্বাধীনতাই এ'দের কাম্য। অরবিন্দ ও নিবেদিতার সেই সময়ে প্রকাশিত রচনাসমূহই একথার প্রমাণ দেয় এবং ফুলার বধের চেষ্টার মধ্যে সন্ত্রাসবাদের সুস্পষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়।

১৯০৭ সালে নিবেদিতা যুগান্তর দলের যুবকদের এই শিক্ষাই দিয়েছিলেন যে, সশস্ত্র বিদ্রোহের পথেই ভারতের মুক্তি। এই উদ্দেশ্যে গ্রামে গ্রামে তিনি গুপ্ত সমিতি প্রতিষ্ঠার প্রস্তাব করেছিলেন। এমন কি শাখা সমিতিগুলিতে মহিলাদের সভ্য হওয়ার অধিকার পর্যন্ত দিয়েছিলেন। নিজেদের কর্ম-ব্যবস্থার প্রচার উদ্দেশ্যে রাজদ্রোহমূলক কাগজও নিজেই লিখে বিলি-ব্যবস্থা করেছিলেন। বোমা তৈরির উদ্দেশ্যে বিজ্ঞানাচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের সহায়তা গ্রহণ করতেও পশ্চাৎপদ হন নি এবং তাঁর মনস্কামনা পূর্ণও হয়েছিল।

অবশ্য অরবিন্দ নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধ সম্বন্ধে 'বন্দে মাতরম্‌' পত্রিকায় সাতটি প্রবন্ধ লিখলেনও ঐতিহাসিকের বিচারে, "অরবিন্দের মতে প্রতিরোধ প্রথমে নিষ্ক্রিয় থাকিবে। পরে অবস্থা বুঝিয়া সক্রিয় হইবে, সক্রিয় হইলেও আক্রমণাত্মক হইবে না। পরের ধাপে অত্যাচার হইলে সক্রিয় প্রতিরোধ আক্রমণাত্মক হইতে পারিবে, এবং শেষ ধাপে সশস্ত্র বিদ্রোহে গিয়া পৌঁছিবে। এবং উহা দ্বারাই ইংরেজকে তাড়াইয়া দেশ স্বাধীন হইবে।"

নিবেদিতা ও অরবিন্দের সন্ত্রাসবাদ সম্পর্কে যদি বা কিছুটা পার্থক্য লক্ষ্য করা যায়, সেই পার্থক্যের কারণ অরবিন্দ রাজনীতিক্ষেত্রে থিয়োরিটিক্যাল এবং বিপ্লবী ক্রোপাটকিনের শিষ্যা মার্গারেট হাড়ে হাড়ে প্রাক্‌টিক্যাল।

যা হোক ১৯০৭ সালের আগস্ট মাসে বন্ধুদের অনুরোধে নিবেদিতা নিরুপায় অবস্থায় ইংরেজ শাসকের অত্যাচারের হাত থেকে রক্ষা পাবার জন্য লণ্ডনে যান। বিদেশে দু' বছর অবস্থানের পর আবার তিনি ভারতে ফিরে আসেন।

কিন্তু যে দু' বছর তিনি বিদেশে অবস্থান করেন—সেই দু' বছরে দেশের মধ্যে অনেক ঝড় বয়ে যায়। কারণ সন্ত্রাসবাদের পক্ষপাতী হিসেবে তখন অনেক বিপ্লবীকে দেখা গেলেও এবং ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনে তাঁদের অবদান চিরস্মরণীয় হয়ে থাকলেও সন্ত্রাসবাদের রীতি-নীতি সম্পর্কে তাঁদের বাস্তব অভিজ্ঞতা ছিল না। তাই একে একে জীবন দিলেন প্রফুল্ল চাকী, ক্ষুদিরাম......।

১৯০৮ সালের ২রা মে অরবিন্দকেও গ্রেপ্তার করা হোল। ব্যারিস্টার চিত্তরঞ্জন দাশের সওয়ালের গুণে মাত্র এক বৎসর কারাভোগের পর অরবিন্দ মুক্তিলাভ করলেন। তবে এই কারাগারে থাকার কালেই অরবিন্দের ভাবান্তর হয়—পরে যা তাঁকে শ্রীঅরবিন্দে পরিণতি দান করে। বিদেশ থেকে ফিরে আসার পর চিত্তরঞ্জন দাশের সঙ্গে নিবেদিতার যখন সাক্ষাৎ হয় তখন ভাবাবেগে তিনি চিত্তরঞ্জনকে বলেছিলেন, "আপনাকে আমি মহান বলেই জানতাম, কিন্তু আপনি যে এতো মহৎ তা আমার জানা ছিল না"। অরবিন্দকে রক্ষার জন্য চিত্তরঞ্জন যে বিরাট কাজ করেছিলেন, তারই স্বপক্ষে উপরি উক্ত কথা বলে তিনি তাঁকে শ্রদ্ধা জানিয়েছিলেন।

নিবেদিতা যখন কলকাতায় এসে পৌঁছেচেন তার মাত্র তিন মাস আগে অরবিন্দ আলিপুর মামলা থেকে খালাস পেয়েছেন। কিন্তু অরবিন্দের মানসিক পরিবর্তনের তুলনা হয় না। কারাগারে তিনি শ্রীকৃষ্ণ দর্শন করেছেন। তবু রাজনীতির খোলামঞ্চ থেকে এখনো তিনি বিদায় গ্রহণ করেন নি। যদিও দেশের অবস্থা তখন স্বাভাবিক ছিল না। কারণ ইংরেজ রাজশক্তির অত্যাচার চরমে উঠেছে। সমস্ত লোক ভীত সন্ত্রস্ত। পদে পদে জুজুর ভয় এবং অরবিন্দকে গ্রেপ্তারের ঘন ঘন গুজব রটনা। তিনিও দেশবাসীকে জানালেন যে গ্রেপ্তারের জন্য সর্বদা প্রস্তুত।

ঠিক এই মুহূর্তে নিবেদিতার কলকাতায় আকস্মিক উপস্থিতি যেন অলঙ্ঘ্যই ছিল। আর অরবিন্দও মনে-প্রাণে তাঁর আগমনের প্রতীক্ষা করছিলেন।

এই সময় তদানীন্তন ভাইসরয় লর্ড মিণ্টো এক বক্তৃতার দ্বারা জানালেন যে, বৃটিশ রাজশক্তি এখন এনার্কিস্টদের মুখোমুখি।

রাজনীতির মঞ্চ থেকে অরবিন্দের বিদায় গ্রহণ আসন্ন। তবু তিনি মিণ্টোর মুখের উপর জবাব ছুঁড়ে মারলেন। তিনি বললেন, "ভারতের সন্ত্রাসবাদীরা এনার্কিস্ট নয়। তারা অরাজকতা চায় না। সুশৃঙ্খলাপূর্ণ রাজ্যশাসনই তারা চায়।" 'ধর্ম' পত্রিকায় তিনি বাঙালীদের উদ্দেশ্যে লিখলেন, "কিন্তু আর উদ্দাম উত্তেজনার বশে যেন কোন কার্য না কর।"

এরপর সারা দেশময় সেই এক খবর—কোথায় গেলেন অরবিন্দ? কোনো দিকেই কোনো খবর নেই। অথচ ইংরেজ সরকারের গ্রেপ্তারী পরোয়ানা তাঁর নামে বের হয়েছে।

অরবিন্দ কোথায়—তা নিশ্চয়ই নিবেদিতার অজানা ছিল না। কারণ অরবিন্দর অকস্মাৎ আত্মগোপনের পর তৎ সম্পাদিত "কর্মযোগিনে"র ভার নিবেদিতাই গ্রহণ করেন। এবং কর্মযোগিনে নিবেদিতা লেখেন যে, "শ্রীঅরবিন্দ ইজ্‌ হিয়ার।" তবে অরবিন্দ নির্জনতার মধ্যে থাকতে চান বলে তার ঠিকানা গোপন রাখা হয়েছে একথাও তিনি লেখেন। অরবিন্দকে সম্পূর্ণ বিপদ মুক্ত বা তাঁর জীবনরক্ষা করাই ছিল হয়তো নিবেদিতার উদ্দেশ্য। তাই শ্রীঅরবিন্দর পণ্ডিচেরীতে পৌঁছানর সংবাদ পাবার পরই তিনি শ্রীঅরবিন্দের ঠিকানা কাগজে প্রকাশের জন্য পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। এবং প্রসঙ্গক্রমে একথাও উল্লেখযোগ্য যে, যে-নিবেদিতা বিবেকানন্দের দেহত্যাগের সময় অশ্রুপাত না করে গুরু নির্ধারিত পথের দিকে দৃষ্টি নিপাতিত রেখেছিলেন, সেই নিবেদিতাই অরবিন্দের পণ্ডিচেরী পৌঁছানর সংবাদে অশ্রুর বন্যা রোধ করতে পারেন নি।

সহানুভূতি

আশা দেবী

রেশনের থলিটা হাতে করে বনমালী একে একে তিনটে বাজার ঘুরলো। গোটা কতক মাছি ছাড়া মাছের একটি পুচ্ছও সে দেখতে পেল না। মাছের সংগে—মেছুনীরাও উধাও হয়েছে—নইলে কিছু বেশি পয়সা কবলে বনমালী চুনো-চানা যা পেত জোগাড় করতো। কিন্তু বাজারে বাঁধানো বেদীগুলোর ওপরে বন্ধ বাক্সগুলো সাজানো,—বঁটিগুলো খোয়া; ত্রিশ বছর বয়েস হলো কলকাতার বাজার এমন পরিচ্ছন্ন আর জনহীন সে কখনও দেখে নি। তারই মত দু-চার জন অতিলোভী মৎস্যাশী খালি হাতে ঘুরছে—কিন্তু মনের নৈরাশ্য একে অন্যের মুখে আয়নার মত প্রতিফলিত দেখে বেগে প্রস্থান করছে।

অবস্থা তার ভাল নয় মোটেই। দুশো কুড়ি আর পনেরো এই সর্ব-সাকুল্যে দুশো পঁয়ত্রিশ টাকা আয়। তার মধ্যে বাড়িভাড়া কম হলেও পঞ্চাশ টাকা—ধোপা, নাপিত, অতিথি, লোক-লৌকিকতা কি থাকে হাতে? জানে বেশি দাম দিয়ে মাছ কিনলে অন্যায়কে প্রশ্রয় দেওয়া হয়—লোভকে ইন্ধন দেওয়া—তবু—

করুণা পোয়াতী। রক্তশূন্যতায় ভুগছে তার ওপর কিছুদিন আগে দেশ থেকে না কোথা থেকে ম্যালেরিয়া নিয়ে এসে প্রায় দু' মাস বিছানায়। মুখে নিদারুণ অরুচি। কিছুই খায় না। খেতে পারে না। জোর করে খেলে বমি করে দেয়। তার ওপর ভুগে ভুগে এমন খিটখিটে হয়ে গেছে যে কিছু বলবার উপায় নেই—রেগে, কেঁদে, চিৎকার করে এমন অনর্থ বাধায় যে কিছু বলতে গেলে, রেগে গিয়ে আবার অজ্ঞান হলে দাঁত লেগে যাবে। তাহলে?

তাহলে—আজ যদি শোনে, এক টুকরোও মাছ পাই নি? তাহলে? করুণাকে দেখেশুনে বনমালী নিজেই বিয়ে করেছিল। মামার সংসারে সারাদিন হাড়ভাঙা খাটুনী খাটত করুণা। মা-বাপ-মরা মেয়েটির স্নিগ্ধশ্রী দেখে আপনার থেকেই প্রস্তাব করেছিল বনমালী। শাঁখা সিঁদুরে দিয়ে বিয়ে দিন—আমি ওর সব সখ মিটিয়ে দেব।

সব সখ তোমার মেটাবো আমি?—কি চাও বলো করুণা। বিয়ের পর বনমালী সস্নেহে জিজ্ঞেস করেছিল করুণাকে।

সারা মুখ লাল হয়ে গিয়েছিল লজ্জায়। মনের সব জায়গাগুলো অনেক করে খুঁজে খুঁজে হাতড়ে হাতড়ে দেখতে চাইলো সত্যিই তো কি ওর সখ আছে? কই, কিছুই তো নেই? এমন একটা অবান্তর কথা হঠাৎ যে কেউ তাকে জিজ্ঞেস করতে পারে এ কথা সে স্বপ্নেও ভাবে নি কখনও।

ঃলজ্জা কি, বলো না—বনমালী আবার জিজ্ঞেস করে।

বড় বড় চোখ মেলে অবাক-বিস্ময়ে করুণা তাকিয়ে থাকে বনমালীর মুখের দিকে, কোন কথাই সে বলতে পারে না।

বনমালী ভাবে। নতুন কি না, তাই লজ্জাটা বেশি। একটু পুরোনো হলেই তখন মুখ খুলবে করুণা। কিন্তু করুণা কখনও কিছু চায় না। ছেঁড়া কাপড় পরে বেড়ায়—জামা ছিঁড়ে যায়—পায়ে চটি নেই খালি পায়েই সে সিনেমায় চলল।

ঃএ কি চটি কই? বিস্মিত বনমালী জিজ্ঞেস করে।

ফিক করে একটু হেসে বলে ঃ ছিঁড়ে গেছে।—ফেলে দিয়েছি।

ঃবল নি কেন যে ছিঁড়ে গেছে? যা দরকার হবে—বলবে তো?

ঃএখন না হলেও চলবে। অপরাধীর মত করুণা বললো।

ঃচলবে মানে? কলকাতার রাস্তায় কেউ খালি পায়ে হাঁটে?—আলসার হবে যে!

ঃহবে না—হবে না। আমার পায়ে আলসার হওয়া অত সোজা নয়।

ঃকেন? তোমার কি এমন পদমর্যাদা যে তাতে কোনো রোগ হবে না? বাজে বোকো না, চলো আগে চটি পরে অন্য কথা।—

এমনি করে দিনের পর দিন দেখে দেখে বনমালীই তাকে দরকারী সব দিয়েছে—কিন্তু বনমালী কিছু না বললে কিছুই কখনো চায় না করুণা।

বনমালী ভাবে জীবনে দাবি করবার জায়গা হারিয়ে করুণা বুঝি চাইতেই ভুলে গেছে।

আজ দীর্ঘদিন রোগে ভুগে ভুগে আর এই অসুস্থ অবস্থায় করুণা যেন কেমন হয়ে গেছে। রাতে শুয়ে শুয়ে ভাবে বনমালী এই তো ন'মাস—তাড়াতাড়ি বিপদ কাটলে বাঁচি। ডাক্তার তো বলছে হয় ছেলে, নয় মা—দুজনকেই পাওয়া শক্ত হবে এ-যাত্রা।

যা রেশন পায় বনমালী তাতে দু'বেলা ভাত জোটে না, রুটি খেতে হয়। আগে রুটি করুণাই খেতো—বলতো রুটি আমার খাওয়া অভ্যেস। বনমালী জানতো করুণা কস্মিনকালেও রুটি খেতে পারে না। তবু এ ছলনাটুকু সে সর্বদাই করে—যে কোন উপায়ে চাল জোগাড় করে বনমালীকে প্রায় দু'দিনই ভাত খাইয়েছে। সর্ষের তেলের বদলে সবাই বাদাম তেল খেয়েছে, বনমালী জানে না কী মন্ত্র বলে করুণা সর্ষের তেল জোগাড় করেছে। আর আজ একটু মাছ—কতদিন পর দুটি পথ্য করবে করুণা—! নিজের মুখ ফুটে মাছ খেতে চেয়েছে, আর সেই মাছই সে জোগাড় করতে পারছে না?

যদি এই চাওয়াই তার প্রথম আর শেষ চাওয়া হয়—বনমালীর গা শিউরে উঠলো। হাতের থেকে থলিটা মাটিতে টপ করে পড়ে গেল।

কুড়িয়ে নিয়ে উঠে দাঁড়াতেই সামনের ভদ্রলোক বললে ঃ পয়সা পড়ে গেছে তো?—আর খুঁজবেন না। যতদিন নয়া পয়সা ছিল সে আর এক জ্বালা ভিখারীকে দিলে গাল খেতে হয় পড়ে গেলে খুঁজে পাওয়া যায় না। সে যদি উধাও হলো তবে সেই দু' পয়সা যেন পালক। পড়লে—

হঠাৎ তাঁর হাতের থলের দিকে লক্ষ্য পড়লো বনমালীর—চকচক করছে লেজ—গন্ধ সন্দেহ জনক। "ইলিশ মাছ কোত্থেকে পেলেন?"—বনমালী বেতের মত সোজা হয়ে দাঁড়িয়েছে—চোখগুলো যেন একশো পাওয়ারের বালবের মত জ্বলছে।

ঃশেয়ালদা বাজারে স্যার। ঘাপটি মেরে বসেছিল—। এক ব্যাটা জেলে গুটি গুটি নামাতেই খপ করে ধরেছি—আর বাকীটা শোনবার অবকাশ হলো না বনমালীর!

—সে একেবারে ধাক্কাধাক্কি করে ছুটতে লাগলো। কেউ বললে ঃ ধাক্কা দিয়ে চলছে যে বড়—কানা নাকি?

ঃবোধ হয় পাগল—দেখছো না কেমন ছুটছে।—কিন্তু এ সব কথার জবাব দেবার সময় ছিল না বনমালীর।

মাছের বাজারে বেশি ভিড় নেই। ব্যর্থ মনোরথে ফিরে যাওয়া মৎস্যাশীরা এখনও ইলিশের খবর পেয়ে এসে পৌঁছুতে পারে নি।—তবে কলকাতার খবর—আর মাছ। এখুনি ঝাঁকে ঝাঁকে এসে পড়বে মাছির মত।

টানা বাঁধানো জায়গাটার ওপর বসে আছে জনা কয়েক লোক। ইলিশ মাছ আছে—রুপোর পাতের মতো!—পাশে একটি অল্প বয়সী মেয়ে কতকগুলো পচা ল্যাটা মাছে জল ছেটাচ্ছে—আর হাঁকছে—প্যাঁজ দিয়ে খান বাবু, মুখে লেগে থাকবে—

বনমালী বললে ঃ ইলিশ দেখি। কত করে কে-জি?

ঃদশ—আর বারো।

ঃকিছু কম হবে?

ঃল্যাটা মাছ নিন! মাছওলা অন্য দিকে তাকালো।

ঃশুনুন—। এই যে।

তবু অন্যমনস্ক। মাছওলার কোনো লক্ষ্যই নেই।

ঃদিন বারো টাকারই একটা—। ওজন করুন।

এদিকে পিলপিল করে থলে হাতে লোক ছুটে আসছে। বেশি দেরি করলে আর পাওয়া যাবে না। তা ছাড়া যখন বাজারে বাজারে বেশি দামের মাছের জন্যে প্রতিরোধ চলছে, তখন দেরি করলে হয়তো গণ্ডগোল হয়ে এও ফসকে যাবে।

ল্যাটা মাছওয়ালী বিষচোখে একবার জেলে আর একবার বনমালীর দিকে তাকাচ্ছে যেন দৃষ্টি দিয়ে ভস্ম করে দেবে।

ঝগড়া সে একটা বাধাতো কিন্তু—একজন খদ্দের এসে বাধা দিলো। নিলো না, কেবল গোলমাল বাধিয়ে ঝগড়াটা মাটি করে দিলে। সে উদ্যত ফণা ধরে আছে ছোবলের সুযোগের প্রত্যাশায়।

মাছটার ওজন হলো এক কে-জি।

ঠাস করে শানের ওপর মাছটা ফেলে দিলে জেলে ঃ দিন বারো টাকা, পুরোই আছে।

নিটোল মাছ—বেঁটে, পেটটা চওড়া, ছোট মাথা। যেন কৃষ্ণনগরের অর্ডারী পুতুল।

কিন্তু মাসের ছাব্বিশ তারিখ পকেটে মাত্র পাঁচটা টাকা আর কিছু খুচরো পয়সা। এত হলো ওজন? পাঁশুটে মুখে বনমালী চেয়ে রইলো।

ঃকী হলো বাবু?

ঃকি যে বলি—টাকা কম পড়ছে। একটা ছোট দিন।—কিন্তু ওই টাকায় ছোটও হয় না। ছোট হলেও বেশি ছোট ছিল না মাছ।

বনমালী ম্লান হয়ে গেল। থাক আজ—। অনেক লোক এসে গেছে—। পাশের লোকটি বললো ঃ ভারি ভালো মাছটা ছিল, আপনি নিলেন না?

ঃনা ভাই,—টাকায় কম পড়লো। বৌটা পোয়াতী তায় রোগা, ডাক্তার বলেছে—বাঁচবে না এ যাত্রা—

ল্যাটা মাছওয়ালী কান পেতে শুনছিল। আর মাছের মত সাদা সাদা চোখ মেলে পাশের জেলেটাকে দেখছিল। মাছের ওপর জল ছিটিয়ে ছিটিয়ে তার পরিচর্যা করছিল। আর চোখে চোখে খদ্দের দেখছিল। জেলের বাড়ির মেয়ে সে—আজ দশ বছর ধরে দেওরের সংগে বাজারে আসছে। খদ্দের সে চেনে। কাপড়-চোপড় সাজ-পোষাক হাবভাব দেখে ওরা বোঝে কে কোন দরের খদ্দের। বনমালীকে সে দেখেই বুঝেছিল বারো টাকা কিলো মাছ নেবার খদ্দের সে নয়। তবু কেন ওটা নয় ওটা—এটা নয় সেটা ওজন করাচ্ছে বনমালী? শুধু সময় নষ্ট করছে—! কৌতূহলী চোখ মেলে ল্যাটা মাছওয়ালী লক্ষ্য করছিল অসহায় বনমালীর অবস্থা।

দশ আঙুলে দশটা আংটি পরা লক্ষ্মীর প্রসাদপুষ্ট কে একজন এগিয়ে এলেন। মাছটা কত ওজন হবে?—

ঃদেড় কে-জি।

ঃদিন আমাকে। থলে বার করে জেলের কাছে। ছুঁড়ে দিলে। তারপর করকরে আঠারো টাকার নোটগুলো গুনে গুনে দিতে লাগলো জেলেকে। আর বনমালী বিস্ফারিত দৃষ্টি মেলে

তাকিয়ে রইলো। ল্যাটা মাছওয়ালী মাছের মত সাদা চোখ দিয়ে তাকিয়ে দেখছিল বনমালীকে। আহত জন্তুর মত তার দৃষ্টিতে কাতরতা।

ঃদে তো ভাই ওটা আমাকে; ল্যাটা মাছওয়ালী ইলিশ মাছওয়ালার বৌদি। ওদের একই দোকান। মাছটা থলে থেকে বের করে নিয়ে সে সরিয়ে রাখলো।—বড়বাবুকে আর একটা বড় আর ভাল মাছ আমি বেছে দিচ্ছি।

বনমালী তার পছন্দ করা মাছটার পরিণতি তখনও দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখছিল আর মনে হচ্ছিল করুণো ইলিশ মাছ ভীষণ ভালোবাসে।—তার হতাশ দৃষ্টি দেখে পাশের ভদ্রলোকের বোধ হয় সহানুভূতি হলো। ভদ্রলোক মধ্যবিত্ত বলেই মনে হলো। বনমালী তার পাড়ারই লোক। পথে প্রায়ই দেখা হয় দুজনের। সামান্য কুশল প্রশ্নও হয় বৈকি?

ঃআ হা মাছটা আপনার বড় পছন্দ হয়েছিল না?

ঃআমার স্ত্রীর অসুখ—খেতে চেয়েছিল।

ঃকি অসুখ—; মাছ থেকে আলোচনা স্ত্রীর অসুস্থতার ওপর সন্নিবন্ধ হলো।

ঃরক্তশূন্য—বাঁচারই কথা ছিল না। তার ওপর অন্তঃসত্ত্বা—এই ন'মাস ডক্তার জবাব দিয়েছে।—বলেছে যা খেতে চায় দেবেন। ক'দিন ধরেই ইলিশ মাছ—ইলিশ মাছ করছে। মুখে অরুচি। কিছু খেতে পারে না। আছে আপনার কাছে—? তা হলে পরে দিয়ে দিতাম।

আপনার জন্যে আমার ভারি কষ্ট হচ্ছে। টাকা থাকলে চাইতে হতো না। আমি নিজেই আপনাকে দিতাম। আমারও একটা নিতে হবে কি না—

তাহলে—এক মুখ শুকনো হাসি হাসবার চেষ্টা করলো বনমালী।

না পারবো না ভাই। আমার বাড়িতেও সবাই ইলিশ মাছ খুব ভালো বাসে কি না।—ভদ্রলোক এবার পাশ কাটাতে চাইলেন।

শুধুই সহানুভূতি! নিছক অন্তরঙ্গ আলাপ বৈ তো আর কিছু নয়। প্রতিবেশী কি না—এদের ধর্মই মিষ্টি আলাপ করা। প্রয়োজনের বেলায়। থাকগে—

বনমালী হাঁটতে আরম্ভ করলো অলস পায়ে।—ওকে দেখে মনে হলো শরীরে বুঝি ওর শক্তির এতটুকুও অবশিষ্ট নেই।

বাবুগো—ওবাবু। শোন গো শোন—সেই ল্যাটা মাছওয়ালী।

বনমালী দাঁড়ালো ঃ ল্যাটামাছ আমরা খাই না।—বলেই সে বিরক্ত হয়ে আবার এগোতে গেল।

ঃনা খাও শুনতে বাধা কি? মেছুনী আবার ডাকছে মাছের মত সাদা সাদা চোখ মেলে ওর মুখের ওপর ধরে।

ঃবাবা মুখের চেহারা কি ভয়ানক। যেন মা মনসা। এবার বুঝি দাঁড়িয়ে মাছ ওজন করানর জন্যে গালাগালি করবে। করলেই হ'ল! বনমালী ভাবলে।

মেছুনী হাতে একটা ইলিশ মাছ নিয়ে এগিয়ে এসেছে। বাবু তোমার থলেটা দাও। বলেই জোর করে থলেটা সে বনমালীর হাত থেকে কেড়ে নিলো। ও আমাদেরই মাছ। ও মেছো আমার দেওর। আমিও পোয়াতী বাবু—দেখ না শরীর কিছু খেতে পারি না মেয়ের কষ্ট মেয়ে বোঝে। এর ওপর ছেলে হয় আর মরে বাঁচে না। শুধু কষ্ট—ভগবানের দান—

ঃযাও বাবু পরে টাকা দিও। ওই হোথায় আমি রোজ বসি—নয় আমার দেওর বসে।—আশীর্বাদ কর বাবু এবার যেমন ছেলেটা—

কি বলবে যে বনমালী ভেবে পেলো না। সে যেন জমে বরফ হয়ে গেছে। সেই বরফের মূর্তিরও চোখে জল এলো—ঝর ঝর করে যখন দেখলো—ঃ শীর্ণ রক্তশূন্য সাদা হাড়ের মত রং-ওলা পা নিয়ে গর্ভভারে জর্জরিতা একটি অপরূপা নারী হেঁটে চলে যাচ্ছে। পরণে ময়লা ছেঁড়া শাড়ি—শীর্ণ কঙ্কনের মত মেয়েটিকে কি যে বলবে ভেবে পেল না।

"Beauty is but skin-deep"

Oatine GOES DEEPER

A SOFT UNBLEMISHED SKIN IS THE ENVY OF ALL. IN OUR RIGOROUS CLIMATE YOU OWE IT TO YOURSELF TO TAKE CARE OF YOUR SKIN. IN OLDEN DAYS SKIN LOTIONS WERE THE CLOSELY GUARDED SECRETS OF BEAUTICIANS. TODAY YOU SHARE THE SECRET WHEN YOU USE OATINE SNOW AND OATINE CREAM. OATINE SNOW IS THE LIGHTEST, LOVELIEST POWDER BASE AND OATINE CREAM MAKES YOUR SKIN HEALTHY AND PETAL-FRESH.

'BEAUTIFY WITH Oatine SNOW & CREAM

MARTIN & HARRIS PRIVATE LTD.

CALCUTTA-1

বিশ্বসাহিত্যের আদিপর্ব

ডঃ নরেন ভট্টাচার্য

॥ ১ ॥

রোমক সাহিত্য ঃ খৃষ্ট-পূর্ববর্তী যুগ

রোমক জাতীর সাহিত্য দীর্ঘদিনের বিবর্তনের ফলে এবং নানান ধারার সমন্বয়ে গড়ে উঠেছিল। এই সকল ধারার মধ্যে প্রধান ছিল ফেসকোনিন উৎসবের লোক-সঙ্গীত এবং লোকনৃত্যের কাহিনীসমূহ। কিন্তু স্বতঃস্ফূর্ত বুদ্ধির প্রেরণাজাত কাব্যসাহিত্য গড়ে তোলার মত মানসিক প্রবণতা সম্ভবত আদি রোমকদের ছিল না। এই কারণে দেখা যায় যে আদি রোমক কবিতা গ্রীক কবিতার অনুকরণেই গড়ে উঠেছে। এখানে একটা কথা বলে রাখা ভাল। সাহিত্যের যে ধারাটি সর্বপ্রথম রোমে প্রচলিত হয়েছিল তা কিন্তু হচ্ছে নাটক। কিন্তু রোমক আদি নাটকের মধ্যে কোন মৌলিকতা নেই। আসলে গ্রীক নাটকের সঙ্গে রোমকদের পরিচয় দীর্ঘকালের, এবং সেই সূত্রে গ্রীক নাটকের ধরণটি রোমকরা খুব তাড়াতাড়ি আত্মসাৎ করতে পেরেছিল। এ বিষয়ে যাঁর কৃতিত্ব সর্বাধিক—তিনি হচ্ছেন লিভিয়াস অ্যান্ড্রো-নিকাস, যিনি জাতিতে ছিলেন গ্রীক, কিন্তু জন্ম দক্ষিণ ইতালীতে। তিনি গ্রীক নাটকের রোমক অনুবাদসমূহ মঞ্চস্থ করিয়েছিলেন। তবে তাঁর অনুবাদ মূলানুসারী হলেও অত্যন্ত ত্রুটিবহুল। তাঁর প্রথম নাটক মঞ্চস্থ হয়েছিল ২৪০ খৃস্টপূর্বাব্দে। তিনিই প্রথম হোমারীয় কাব্যকে রোমে আনয়ন করেন। স্যাটার্নিয় ছন্দে তাঁর ওডিসির অনুবাদ বিশেষ উল্লেখযোগ্য। লিভিয়াস অ্যান্ড্রো-নিকাসকেই রোমক সাহিত্যের জনক বলা চলে।

নেভিয়াস

লিভিয়াস অ্যান্ড্রোনিকাসের সমকালীন ছিলেন নেভিয়াস, যিনি জন্মগ্রহণ করে-ছিলেন ২৭০ খৃস্টপূর্বাব্দে ক্যাম্পানিয়ায়। তিনি শুধু গ্রীক নাটকের অনুবাদ করেই ক্ষান্ত হন নি, তিনিই প্রথম নাট্যকার যিনি রোমক নাটকে মৌলিকতা আনয়ন করেন। তাঁর মৌলিক নাটক হচ্ছে দুটি রোমুলাস বা লুপাস এবং ক্লাস্টিডিয়াম। প্রথম নাটকটির বিষয়বস্তু হচ্ছে রোমুলাস এবং রেমাসের যৌবনের ঘটনা, এবং দ্বিতীয় নাটকের কাহিনী গড়ে উঠেছে লেখকের সমকালীন রাজনৈতিক অবস্থার পরি-প্রেক্ষিতে। এ ছাড়া তিনি সাতটি গ্রীক নাটকের অনুবাদ করেছিলেন যেগুলির অংশবিশেষ এখনো পর্যন্ত পাওয়া যায়। এক্ষেত্রেও তাঁর মৌলিকতা আছে, অনুবাদে তিনি যথেষ্ট স্বাধীনতা নিয়েছেন, অনেক ক্ষেত্রে ঘটনা ও চরিত্রগুলিকেও তিনি নিজের মত করে নিয়েছেন। নেভিয়াস কবি হিসাবেও সে যুগে খ্যাতি অর্জন করেছিলেন। তাঁর একটি মাত্র কাব্যগ্রন্থের অংশবিশেষ এ পর্যন্ত পাওয়া গেছে। তা হচ্ছে প্রথম পিউনিক যুদ্ধ অবলম্বনে রচিত বেলাম পিনিকাম। এই কাব্যটিকেই রোমের প্রথম জাতীয় মহাকাব্য বলা হয়। কিন্তু কাব্য বা মহাকাব্য হিসাবে এই রচনাটি মোটেই সার্থক নয়। ঘটনা ও সাল তারিখের চাপে এই গ্রন্থের কাব্যগুণ বলতে গেলে অদৃশ্যই হয়েছে। নেভিয়াস রচিত কতকগুলি কমেডির উল্লেখ আছে তবে সেগুলি মাত্র নামেই।

নেভিয়াস পরবর্তী কবি ও নাট্যকারগণ

নেভিয়াসের উত্তরাধিকারী ছিলেন এন্নিয়াস যিনি তাঁর পূর্ববর্তীদের মত একাধারে কবি ও নাট্যকার ছিলেন। তিনি জন্মগ্রহণ করেছিলেন ২০৯ খৃস্টপূর্বাব্দে ক্যালাব্রিয়া নামক স্থানে। তাঁর পূর্বসূরী নেভিয়াসের মত তিনিও ছন্দে রোমের জাতীয় বীরদের কাহিনী বর্ণনা করেছেন। অষ্টাদশ খণ্ডে রচিত তাঁর এই অ্যানালস কাব্য-সৌন্দর্যের দিক থেকে ভার্জিলের সঙ্গেই একমাত্র তুলনীয়। ল্যাটিন ভাষায় এন্নিয়াস হোমারের স্টাইল, অর্থাৎ ষষ্ঠ-মাত্রিক ছন্দের প্রবর্তন করেন। তাঁর মহাকাব্যে এই ছন্দই ব্যবহৃত হয়েছে। তাঁর নাটকাবলী ইউরিপিডিসের অনু-করণে রচিত হয়েছিল। তাঁর কুড়িটিরও অধিক ট্রাজেডির নাম এবং সেগুলির কিছু কিছু অংশ এ পর্যন্ত পাওয়া গেছে, তাঁর রচিত কমেডির সংখ্যাও অনেক, কিন্তু দুঃখের বিষয় সেগুলির প্রায় সবগুলিই লুপ্ত হয়েছে। তাঁর একটিমাত্র নাটক অক্ষত অবস্থায় আছে যার নাম অ্যামব্রাসিয়া। এ ছাড়া তিনি মূল গ্রীক থেকেও অনেক অনুবাদ করেছিলেন।

এন্নিয়াসের বয়ঃকনিষ্ঠ সমকালীন ছিলেন পাকুভিয়াস যিনি জন্মগ্রহণ করেছিলেন ২২০ খৃস্টপূর্বাব্দে। তিনিই প্রথম রোমক নাট্যকার—যিনি শুধুমাত্র ট্রাজেডি রচনার মধ্যেই নিজেকে সীমাবদ্ধ রেখেছিলেন। এ পর্যন্ত তাঁর তেরটি নাটকের নাম ও অংশবিশেষ পাওয়া গেছে। বস্তুত পাকুভিয়াস ও একিয়াসই রোমের আদি ট্রাজেডিকারদের মধ্যে পরিগণিত হন। একিয়াসের জন্ম ১৭০ খৃস্ট-পূর্বাব্দে। মাত্র ৩৬ বছরের জীবনে একিয়াস প্রায় পঞ্চাশটি নাটক লিখেছিলেন, কিন্তু এ পর্যন্ত তাঁর দুটি নাটকের অংশবিশেষ পাওয়া গেছে, ব্রুটাস এবং ডেসিয়াস। ব্যাকরণ, সাহি-ত্যের ইতিহাস ও নাট্যতত্ত্ব সম্বন্ধে তিনি দুখানি বই লিখেছিলেন, ডিডাস্কালিকা ও প্রাগমেটিকা। এই দুটি গ্রন্থেরও কোন চিহ্ন বর্তমানে নেই।

এন্নিয়াস, পাকুভিয়াস ও একিয়াস যেমন ছিলেন রোমের ত্রয়ী ট্রাজেডিকার, তেমনি প্লটাস, সেকিলিয়াস ও টেরেন্স ছিলেন রোমের ত্রয়ী কমেডি লেখক। এই ত্রয়ীর মধ্যে শ্রেষ্ঠ ছিলেন প্লটাস। তিনি জন্মগ্রহণ করেছিলেন ২৫৪ খৃস্টপূর্বাব্দে সারসিনা নামক স্থানে। প্লটাস লিখেছেন অজস্রধারায়, এ পর্যন্ত তাঁর ১৩০টি রচনার উল্লেখ পাওয়া গেছে। তাঁর বিখ্যাত কয়েকটি কমেডির নাম হলঃ অ্যামফিট্রুয়ো, অ্যাসিনারিয়া (গাধাদের কমেডি), অউলুলারিয়া (একটি পাত্রের কমেডি) ক্যাপটিভিটি, কুরকুলিও, কাসিনা, সিস্টেলেয়ারিয়া (একটি সিন্দুকের কমেডি) মেনেচমি ইত্যাদি। এই নাটকগুলি পরবর্তী যুগের লেখকদেরও প্রেরণা

টিনোপাল সবচেয়ে সাদা ধবধবে করে!

জামা কাপড় কাচবার পর ধোবার সময় সামান্য মাত্র টিনোপাল দিয়ে দিন। দেখবেন, আপনার সাদা কাপড়গুলি—সার্ট, শাড়ি, তোয়ালে, চাদর, সবই উজ্জ্বল ধবধবে সাদা হয়ে উঠবে।
আর এইরকম সাদা ধবধবে করতে খরচই বা কত? কাপড় পিছু এক পয়সা ও নয়। চায়ের চামচের চার ভাগের এক ভাগ টিনোপাল এক বালতি কাপড়কে সাদা ধবধবে করে দেবে।
সব সময়ই বৈজ্ঞানিক উপকরণ-টিনোপাল ব্যবহার করুন। এতে কাপড় জামার ক্ষতি হওয়ার কিছু নেই।

টিনোপাল বন্ধ করা অ্যালুমিনিয়াম ফয়েল প্যাকেট পাবেন।
(এক প্যাকেট টিনোপাল বালতি ভরে কাপড়কে সাদা ধবধবে করে) ব্যবহারে কত সুবিধা, একটুও অপব্যয় হবার আশঙ্কা নেই। এক বালতি কাপড়ে মাত্র এক প্যাকেট টিনোপাল। কম কথা নয়।

টিনোপাল এদের রেজিষ্টার্ড ট্রেডমার্ক
জে. আর. গায়গী, এস. এ. বাল, সুইজারল্যাণ্ড।

সুহৃদ গায়গী লিমিটেড পোষ্ট অফিস বক্স—৯৬৫, বোম্বাই-১ বি-আর

Shilpi/SG-223A Ben

দিয়েছে। যেমন অউলুলারিয়া নাটক অবলম্বনে গড়ে উঠেছে মলিয়েরের আভারে; মেনেক্‌মি নাটকের বিষয়বস্তু অবলম্বনে সেকসপীয়ারের কমেডি অফ এরারস রচিত হয়েছে। প্লটাসের অপরাপর নাটক হচ্ছে: এপিডিকাস ব্যাকিডেস, মস্টেল্লারিয়া, মিলেস গ্লোরিওসাস, মার্কাটর, সিউডোলাস পেনুলাস, পার্সা, রুডেনস, স্টিকাস, ট্রিনুমাস, ট্রুকুলেন্টাস এবং বিডুলারিয়া। এতগুলি নাটক ছাড়াও প্লটাস ভাষাতত্ত্ব, সমালোচনা ও সাহিত্যের ইতিহাসের ওপরেও কিছু কিছু লিখেছিলেন। তাঁর রচনার মূল্য কিকেরোর যুগেও প্রচুর ছিল এবং পরবর্তীকালে ভারো তাঁর ওপর বহু আলোচনা করেছেন। কেউ কেউ বলেন যে প্লটাসের নামে প্রচলিত ১৩০ খানি গ্রন্থের লেখক তিনি একা নন। প্লাটিয়াস নামে কোন একজনের লেখার সঙ্গে তাঁর লেখা মিশে গেছে। এবং উভয়ের নামের সাদৃশ্যের জন্য কোনটি কার লেখা বোঝার উপায় নেই।

ত্রয়ী কমেডিকারের দ্বিতীয়জন ছিলেন সেকিলাস, যিনি ছিলেন গলদেশের অধিবাসী। তাঁর জন্মের তারিখ জানা যায় না, তবে তিনি ১৯৪ খৃস্টপূর্বাব্দে বন্দী অবস্থায় রোমে আনীত হয়েছিলেন। তাঁর চল্লিশটি নাটকের নাম পাওয়া যায়, কিন্তু নাটকগুলির কোন চিহ্ন অবশিষ্ট নেই। কিকেরো লিখেছেন যে সেকিলাসের নাটক মীনান্ডারের অনুকরণ এবং তাঁর রচিত ল্যাটিন সর্বদা বিশুদ্ধ নয়। ত্রয়ীর তৃতীয়জন ছিলেন টেরেন্স যিনি জন্মগ্রহণ করেছিলেন কার্থেজে ১৮৫ খৃস্টপূর্বাব্দে। তাঁর প্রথম নাটক অ্যান্ড্রিয়া (অ্যান্ড্রসের কুমারী) মঞ্চস্থ হয় ১৬৬ খৃস্টপূর্বাব্দে। তাঁর দ্বিতীয় নাটক হচ্ছে হেকাইরা (শাশুড়ী) যা বিশেষ জনপ্রিয় নয় বলেই পণ্ডিতেরা মনে করেন। তাঁর অপরাপর নাটক হচ্ছে হউটনটিমরুমেনস বা আত্মপীড়নকারী, অ্যাডেলফি বা ভ্রাতৃবৃন্দ এবং ফোর্মিও। তাঁর নাটকে গ্রীক নাটকের প্রভাব সুস্পষ্ট।

পরবর্তী পর্যায়ের নাট্যকারদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিলেন আফ্রানিয়াস, পম্পোনিয়াস এবং নেভিয়াস, এবং এঁদের অনুসারী ছিলেন ল্যাবেরিয়াস এবং পিউবলিয়াস সাইরাস। আফ্রানিয়াস সম্ভবত ১০০ খৃস্টপূর্বাব্দে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। তাঁর নাটকের আদর্শ ছিলেন মীনান্ডার। কিকেরো তাঁকে চাতুর্যপূর্ণ সংলাপকার বলে অভিহিত করেছেন। তাঁর চল্লিশটি নাটকের নাম ছাড়া আর কিছু পাওয়া যায় নি। তবে নীরোর যুগ পর্যন্ত তাঁর নাটক যে অভিনীত হত তার প্রমাণ আছে। পম্পোনিয়াস ৯০ খৃস্টপূর্বাব্দের লোক। তিনি অ্যাটেল্লানে নামক এক ধরণের জনপ্রিয় নাটকের প্রবর্তন করেছিলেন, এবং তাঁর নাটকসমূহে কথ্য ও গ্রাম্য ভাষার বহুল প্রচলন ঘটিয়েছিলেন। তাঁর ৭০টি নাটকের নামগুলি মাত্র সংগ্রহ করা সম্ভব হয়েছে। তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন নেভিয়াস তাঁরও ৪০টি নাটকের নাম পাওয়া গেছে এবং তিনিও কথ্য ও গ্রাম্য ভাষা ব্যবহার করতেন। কিকেরো তাঁর কয়েকটি সংলাপ নিজ রচনায় উদ্ধৃত করেছেন। ল্যাবেরিয়াস এবং পিউবলিয়াস সাইরাস একটি বিশেষ ধরণের প্রহসন রোমক সাহিত্যে প্রবর্তন করেছিলেন। কিন্তু তাঁদের সেই সকল রচনার চিহ্নমাত্র আজ নেই।

গদ্যসাহিত্য: কেটো

রোমক কাব্য ও কাব্যনাটকসমূহ গ্রীকসাহিত্যের নিকট ঋণী হলেও, তার গদ্যসাহিত্যের ভিত্তি ছিল বিশুদ্ধ স্বদেশী। রোমকগণ নিজেদের জাতীয় উত্তরাধিকারসূত্রে পেয়েছিল গদ্য রচনার ভিত্তি হিসাবে লজ অফ দি টুয়েলভ টেবলস যা অবলম্বনে পরবর্তী রোমক আইন গড়ে উঠেছিল। রোমকরা যখন ২০০ খৃস্টপূর্বাব্দে নিজেদের জাতীয় ইতিহাস রচনার চেষ্টা করল তখন দেখা গেল যে, তাদের ব্যবহৃত ল্যাটিন ভাষা এই কাজের পক্ষে বিশেষ উপযুক্ত নয়। এই কারণেই তারা গ্রীক ভাষাকেই তাদের ইতিহাস রচনার মাধ্যম হিসাবে গ্রহণ করেছিল।

ল্যাটিন ভাষার বন্ধ্যাদশা ঘুচিয়ে যিনি তাকে সর্বপ্রকার ভাবপ্রকাশের উপযোগী করে তুলেছিলেন তিনি হচ্ছেন কেটো। কেটো জন্মগ্রহণ করেছিলেন টাসকালামে ২৩৪ খৃস্টপূর্বাব্দে। কেটোই প্রথম লেখক যিনি ল্যাটিন ভাষায় সর্বপ্রথম রোমের ইতিহাস লেখেন। সাত খণ্ডে রচিত এই গ্রন্থের নাম ওরিজিনেস। এ ছাড়া তিনি লিখেছিলেন দৈনিক আচরণবিধি যার নাম কারমেন ডে মোরিবাস। কেটোর যে গ্রন্থটি সম্পূর্ণ অবস্থায় আমাদের হাতে এসেছে সেটি হচ্ছে কৃষিকর্ম সম্পর্কিত একটি মূল্যবান রচনা যার নাম হচ্ছে ডে রে রাস্টিকা। আইনই হচ্ছে একমাত্র বিজ্ঞান যা রোমকদের মধ্যে স্বাভাবিকভাবেই বিকশিত হয়েছিল। সাহিত্য সমালোচনা, ব্যাকরণ ও অলঙ্কারশাস্ত্রে গ্রীকদের মত আদি রোমক লেখকদের বিশেষ আগ্রহ ছিল না। এ বিষয়ে একমাত্র এলিয়াস স্টিলো কিছু কিছু লিখেছিলেন।

স্বর্ণযুগের পথপ্রদর্শক কিকেরো

এ পর্যন্ত আমরা ২৪০ থেকে ৮০ খৃস্টপূর্বাব্দ পর্যন্ত রোমক সাহিত্যের সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিয়েছি। রোমক গদ্যসাহিত্যের স্বর্ণযুগের সূত্রপাত হয়েছিল কিকেরোর হাতে। কিকেরো ছিলেন রোমের প্রসিদ্ধ বাগ্মী, জন্ম আরপিনাম নামক স্থানে, ৩রা জানুয়ারী ১০৬ খৃস্টপূর্বাব্দে। তাঁর প্রাথমিক শিক্ষা হয়েছিল রোমে। সে যুগের বিখ্যাত বাগ্মীদ্বয় ক্রাসাস এবং অ্যান্টোনিয়াসের বক্তৃতা শুনে তিনি আইনজীবীর পেশা গ্রহণ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছিলেন। প্রথম জীবনে তিনি ব্যক্তিগত মামলা-মোকদ্দমায় সওয়াল করতেন, এবং তাঁর প্রথম বক্তৃতা প্রো-কুইন্টিকো অদ্যাবধি অবিকৃত অবস্থায় রক্ষিত আছে। ৮১ খৃস্টপূর্বাব্দে মাত্র ২৬ বছর বয়সে তিনি সেক্সটাস রোস্কিয়াস নামক এক ব্যক্তির মামলায় আইনজীবীর ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন। ঐ ব্যক্তি পিতৃহত্যার দায়ে বিচারালয়ে নীত হয়েছিল। এই মামলায় সাফল্যলাভ করে তাঁর খ্যাতি প্রভূত বৃদ্ধি পায়।

পরবর্তী বৎসরে কিকেরো গ্রীস এবং এশিয়ার ভ্রমণ করেন। এথেন্সে তিনি প্রখ্যাত দার্শনিকদের নিকট দর্শনশাস্ত্র পাঠ নেন। রোডসে তিনি মোলোর নিকট অলঙ্কারশাস্ত্রে বিশেষ শিক্ষা নেন। ৭৭ খৃস্টপূর্বাব্দে তিনি এথেন্সে ফিরে আসেন এবং পর বৎসর টেরেন্সিয়ার সঙ্গে পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ হন। ওই বৎসরেই তিনি সর্বসম্মতিক্রমে কোয়াস্টার পদে নির্বাচিত হন এবং সিসিলিতে কার্যভার গ্রহণ করেন। সেখানে তাঁর অসাধারণ কর্মদক্ষতার জন্য তিনি ৭০ খৃস্টপূর্বাব্দে কিউরুল এইডিল পদে নির্বাচিত হন। অতঃপর সিসিলিবাসীদের সনির্বন্ধ অনুরোধে তিনি ভেরেস নামক একজন অভিজাত উচ্চপদস্থ দুর্নীতিগ্রস্ত ব্যক্তির বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হন এবং তাঁর অসাধারণ বাগ্মিতার ফলে এই লোকটি পদচ্যুত ও নির্বাসিত হয়। এতে কিকেরোর জনপ্রিয়তা অসাধারণ বৃদ্ধি পায় এবং তিনি ৬৭ খৃস্টপূর্বাব্দে সর্বসম্মতিক্রমে প্রীটর পদে নির্বাচিত হন। ৬৪ খৃস্টপূর্বাব্দে তিনি কনসাল পদে নির্বাচিত হন।

কিন্তু রাজনীতিক্ষেত্রে তাঁর শত্রুর সংখ্যা বড় কম ছিল না। রোমে তখন গণতন্ত্র প্রচলিত থাকলেও একনায়কতন্ত্রী প্রবণতা ধীরে ধীরে আত্মপ্রকাশ করছিল। সীজার, পম্পেই, ক্রাসাস, ক্লডিয়াস প্রমুখ রাজনৈতিক এডভেঞ্চারবাদীরা তখন রোমে নিজেদের একনায়কত্বের স্বপ্ন দেখছিলেন। কিকেরো, যিনি ছিলেন গণতন্ত্র ও আইনের শাসনে বিশ্বাসী, এদের চক্রান্তে শেষ পর্যন্ত দেশ থেকে নির্বাসিত হলেন এবং প্রথমে থেসালী ও পরে ম্যাসিডোনিয়ায় গিয়ে বাস করেন। এই সময়টা তিনি সাহিত্য রচনায় নিজেকে নিয়োজিত করেন।

অবশ্য পরে আবার তাঁকে রোমে ফিরিয়ে আনা হয়। কিন্তু ফিরে এসে তিনি জুলিয়াস সীজারের একনায়কতান্ত্রিক মনোভাবের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ান।

তারপর সীজার ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হলে কিকেরোর রাজনৈতিক কার্যকলাপ বন্ধ হয়ে যায়। ৪৪ খৃস্টপূর্বাব্দে সীজার নিহত হলে কিকেরো রোমে আবার গণতন্ত্র ফিরিয়ে আনার স্বপ্ন দেখতে থাকেন। সীজারের মৃত্যুর পর রোমে যে গৃহযুদ্ধ লাগে তা মেটানোর জন্য তিনি আপ্রাণ চেষ্টা করেছিলেন, কিন্তু তাঁর সে চেষ্টা ব্যর্থ হয়। রোমে তাঁর অবস্থান বেআইনী বলে ঘোষিত হয় এবং তিনি রোম থেকে ম্যাসিডোনিয়ায় পলায়নের চেষ্টা করেন, কিন্তু পথে শত্রুপক্ষের হাতে শোচনীয়ভাবে তাঁর জীবনান্ত হয় এবং তাঁর হত্যাকারীরা তাঁর মাথা ও একটি হাত রোমে নিয়ে আসে। তাঁর হত্যার তারিখ হচ্ছে ৭ই সেপ্টেম্বর ৪৩ খৃস্টপূর্বাব্দ।

ল্যাটিন গদ্য সাহিত্যের কিকেরো একজন অতি সার্থক লেখক। উপরন্তু তাঁর প্রদত্ত বক্তৃতাসমূহও যথেষ্ট সাহিত্যগুণসম্পন্ন। এ পর্যন্ত তাঁর ৫৭টি বক্তৃতা সম্পূর্ণ অবস্থায় পাওয়া গেছে। ব্যবহারজীবী হিসাবে তাঁর যুক্তিশীলতা তাঁর সাহিত্যকেও প্রভাবিত করেছে। এখানে আমরা কিকেরোর রচনাবলীর একটি তালিকা পেশ করছি : (১) ডে ওরাটোর—তিনখণ্ডে রচিত এই গ্রন্থটি ৫৫ খৃস্টপূর্বাব্দে রচিত হয়েছিল। কথোপকথনের ভঙ্গীতে রচিত এই গ্রন্থটির বিষয়বস্তু হচ্ছে একজন বক্তার কি ধরণের শিক্ষার প্রয়োজন, কিভাবে সে তার বক্তব্য বিষয় তুলে ধরবে, তার প্রকাশভঙ্গী কিরকম হওয়া উচিত, ইত্যাদি (২) ব্রুটাস বা ডে ক্লারিস ওরাটোরিবাস গ্রন্থে আদিকাল থেকে তাঁর যুগ পর্যন্ত বাগ্মিতার ইতিহাস বর্ণিত হয়েছে। দর্শনশাস্ত্রের উপর তিনি লিখেছেন : (৩) ডে রে পাবলিকা (৫৪-৫১ খৃঃ পূঃ), (৪) ডে লেগিবাস (৫২ খৃঃ পূঃ), (৫) প্যারাডোকসা স্টোয়িকোরাম (৪৬ খৃঃ পূঃ) (৬) ডে ফিনিবাস বোনোরাম এট ম্যালোরাম (৪৬ খৃঃ পূঃ), (৭) একাডেমিকা (৪৫ খৃঃ পূঃ), (৮) ডে ন্যাটুরা ডিওরাম, (৯) ডে ডিভিনাটিওন, (১০) কেটে মেইওর বা ডে সেনেকটুটে, (১১) ডে লিজিয়াস এবং (১২) ডে অফিসিস। এ ছাড়া আছে তাঁর বিপুলসংখ্যক পত্রাবলী যেগুলি কয়েকটি খণ্ডে সংকলিত হয়েছিল, যেমন এপিস্টুলে এড ফ্যামিলিয়ারেস, এপিস্টুলে এড অ্যাটিকাম, ইত্যাদি।

জুলিয়াস সীজার ও তাঁর সমকালীনগণ

রোমের ইতিহাসের যে কোন ছাত্রই জুলিয়াস সীজারের নাম ও কর্মধারার সঙ্গে পরিচিত। সীজারের জন্ম ১০০ খৃস্টপূর্বাব্দে এবং তিনি নিহত হয়েছিলেন ৪৪ খৃস্টপূর্বাব্দের ১৫ই মার্চ। এই দিগ্বিজয়ী যোদ্ধা শেষ পর্যন্ত স্বৈরাচারী একনায়ক হয়ে উঠেছিলেন, এবং সেই অপরাধেই তাঁকে নিহত হতে হয়েছিল। অবশ্য সীজারের মৃত্যুর পরে রোমে আর গণতন্ত্র ফিরে আসে নি, ধাপে ধাপে রাজতন্ত্রেরই প্রতিষ্ঠা হয়েছিল। এটা অবশ্য রাজনৈতিক ইতিহাসের ব্যাপার, এখানে আমাদের প্রয়োজন সামান্যই।

কিন্তু এই দিগ্বিজয়ী শাসকের সাহিত্যের প্রতিভাও ছিল, এবং একথা বলা অযৌক্তিক হবে না যে, ল্যাটিন গদ্যসাহিত্যে তাঁর দান অপরিসীম। ইতিহাসের উপাদান হিসাবে তাঁর রচনার যথেষ্ট মূল্য আছে। সীজারের প্রথম গ্রন্থ অ্যানালোগিয়া রচিত হয়েছিল তাঁর গলদেশ অভিযানের প্রাক্কালে এবং দ্বিতীয় গ্রন্থ অ্যান্টিকেটোনেস ৪৫ খৃস্টপূর্বাব্দে মুণ্ডার যুদ্ধের সময় লেখা। জ্যোতির্বিদ্যা নিয়ে তাঁর রচিত ডে অ্যাস্টারিস তাঁর ক্যালেণ্ডার সংস্কারের ভিত্তি। তাঁর যে দুটি গ্রন্থ মোটামুটি অক্ষত অবস্থায় পাওয়া গেছে সে দুটি হচ্ছে কমেণ্টারি ডে বেলো গ্যালিকো এবং কমেণ্টারি ডে বেলো সিভিলি। তাঁর বিখ্যাত গলযুদ্ধের ইতিহাসের সামান্য অংশই তাঁর রচিত, অধিকাংশই লিখেছেন অওলাস হিরসিয়াস।

সীজারের বয়ঃকনিষ্ঠ সমকালীন ঐতিহাসিক ছিলেন স্যালাস্টিয়াস ক্রিসপাস, জন্ম ৮৬ খৃস্টপূর্বাব্দে। ইনি সীজারের প্রিয়পাত্র ছিলেন এবং তাঁরই অনুগ্রহে রোমের প্রোকন্সাল পর্যন্ত হতে পেরেছিলেন। ব্যক্তিগত জীবনেও তিনি খুব উচ্চস্তরের লোক ছিলেন না। কিন্তু ইতিহাস লেখক হিসাবে তাঁর প্রতিভা ছিল অনন্যসাধারণ বরং তাঁকে ইতিহাস-শিল্পী আখ্যা দেওয়া যেতে পারে। তাঁর রচনার সংখ্যাও খুব বেশি নয়। তাঁর প্রথম রচনার বিষয়বস্তু হচ্ছে একটি ষড়যন্ত্রের কাহিনী, বেলাম ক্যাটিলিন। দ্বিতীয় গ্রন্থে, অর্থাৎ বেলাম ইউগার্থিনাম গ্রন্থে তিনি ইউগার্থাইন যুদ্ধের নিখুঁত পটভূমিকা অঙ্কন করেছেন। কিন্তু তাঁর সর্বশ্রেষ্ঠ কীর্তি হচ্ছে পাঁচ খণ্ডে রচিত হিস্টোরিয়া, অপরাপর ইতিহাসগ্রন্থের সঙ্গে এই গ্রন্থের পার্থক্য হচ্ছে যে এখানে ঘটনার চেয়ে ঘটনার গতিপথ ও গতি-পদ্ধতির উপরই বেশি গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে।

পূর্বোক্ত লেখকদের সমকালীন ছিলেন কর্নেলিয়াস নেপোস যাঁর কাল ৯৪ থেকে ২৪ খৃস্টপূর্বাব্দ। তিনিই প্রথম রোমক জীবনীলেখক যিনি তাঁর ষোল খণ্ডে রচিত ডে ভিরিস ইলাস্ট্রিবাস গ্রন্থে স্বদেশের ও বিদেশের শ্রেষ্ঠ মানুষদের জীবনী রচনা করেছেন। তাঁর রচিত জীবনীগুলি

দেশ সেবায় নিয়োজিত,

এ্যালবার্ট ডেভিড লিমিটেড

কলিকাতা—৫০

নীতি ও বিজ্ঞানানুযায়ী ঔষধ প্রস্তুতকরণের অগ্রণী

—ব্রাঞ্চ সমূহ—

বোম্বে - মাদ্রাজ - দিল্লী - নাগপুর

বেজওয়াডা - শ্রীনগর - গোহাটী

সুখপাঠ্য কিন্তু সেগুলিতে প্লটার্কের মত শ্রমনিষ্ঠার পরিচয় পাওয়া যায় না। তবে এই ষোল খণ্ডের একখণ্ড, **ডে একসেলেণ্টিবাস ডুকিবাস একস্টেরাম জেনারিটাম,** যে গ্রন্থে তিনি রোমের বাইরের দেশের সেনাপতিদের চরিত্র চিত্রিত করেছেন, বিষয়বস্তু এবং গুণের দিক দিয়ে অত্যন্ত আকর্ষণীয়।

এরপর আমরা বিখ্যাত ল্যাটিন গদ্য-লেখক ভ্যারোর কথা উল্লেখ করব। রোমে দুজন ভ্যারো ছিলেন, এবং তাঁরা দুজনেই প্রায় সমকালীন। এ'দের মধ্যে একজন ছিলেন কবি যাঁর কথা আমরা পরে বলব। গদ্যলেখক ভ্যারোর পুরো নাম মার্কাস টেরেণ্টাস ভ্যারো, জন্ম ১১৬ খৃস্টপূর্বাব্দে। তিনি প্রথম যৌবনে বিখ্যাত ভাবাতাত্ত্বিক এলিয়াস স্টিলোর নিকট শিক্ষালাভ করেন। পম্পেই, সীজার ও অক্টেভিয়ানের আমলে তিনি অনেক উচ্চপদ ভোগ করেছেন। সম্ভবত ভ্যারোই হচ্ছেন রোমের সবচেয়ে উৎপাদনশীল লেখক, তিনি নিজেই একবার জানিয়েছিলেন যে তাঁর গ্রন্থের সংখ্যা ৪৯০টি। তাঁর সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য বই হচ্ছে **ডে লিঙ্গুয়া ল্যাটিনা**। ২৫ খণ্ডে রচিত এই মহাগ্রন্থে তিনি ল্যাটিন ভাষাতত্ত্ব সম্বন্ধে মূল্যবান আলোচনা করেছেন। এই ২৫ খণ্ডের মধ্যে পঞ্চম থেকে দশম খণ্ড পর্যন্ত ছিন্নভিন্ন অবস্থায় পাওয়া গেছে। তাঁর আর একটি উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ হচ্ছে **অ্যাণ্টিকুইটাটেস রিরাম হিউমানারাম এট ডিভিনারাম**। ৪১ খণ্ডে রচিত এই গ্রন্থটির বিষয়বস্তু হচ্ছে রোমের পুরাতত্ত্ব, সামাজিক ও ধর্মীয় অনুষ্ঠানাদির বিবরণ। **ইমাজিনেস** বা **হেবডোমাডেস** নামক গ্রন্থে (রচনাকাল ৩৯ খৃঃ পূঃ) তিনি গ্রীস এবং রোমের ৭০০ জন বিখ্যাত লোকের জীবনী আলোচনা করেছেন। তাঁর অপর গ্রন্থ **ডিসিপ্লিনারাম লিব্রি** সাত খণ্ডে রচিত বিশ্বকোষ। তাঁর ৭৬টি **লিব্রি লোগিস্টোরিসি** প্রাসঙ্গিক দার্শনিক ও ঐতিহাসিক বিষয়বস্তু অবলম্বনে রচিত হয়েছে। তিনি কয়েকটি কাব্যগ্রন্থও রচনা করেছিলেন। তাঁর **স্যাটুরে মিনিপেই** রোমের স্যাটায়ার সাহিত্যে উল্লেখযোগ্য সংযোজন। আশী বছর বয়সে তিনি তিন খণ্ডে কৃষি বিষয়ক একটি গ্রন্থ লেখেন, নাম **রেরাম রাস্টিকারাম লিব্রি**। তিনি ২৭ খৃস্টপূর্বাব্দে পরলোকগমন করেন।

কাব্যসাহিত্য : ভার্জিল থেকে ওভিডের অভ্যুদয় পর্যন্ত

খৃস্টপূর্ব প্রথম শতকের শেষার্ধে রোমক কবিতা ও কাব্যসাহিত্য গদ্যরচনার তুলনায় তেমন বিকশিত হতে পারে নি। পূর্বোল্লিখিত ভ্যারো কবিতায় কিছু স্যাটায়ার রচনা করেছিলেন। এ ছাড়া ছিলেন দার্শনিক কবি লুক্রেসিয়াস (মৃত্যু খৃঃ পূঃ ৫৫) যিনি এন্নিয়াস অবলম্বিত হোমারীয় পদ্ধতিকেই কাব্যরচনার আদর্শ করেছিলেন। তাঁর রচিত কাব্যগ্রন্থের নাম **ডে রেরাম ন্যাচুরা**। মূলত অ্যালেকজেন্দ্রীয় গ্রীক কবিরাই ছিলেন এযুগে রোমক কবিদের আদর্শ।

খৃস্টপূর্ব প্রথম শতকে ল্যাটিন কবিতায় যিনি যুগান্তর এনেছিলেন তিনি হচ্ছেন ভার্জিল। তিনি জন্মগ্রহণ করেছিলেন ৭০ খৃস্টপূর্বাব্দের ১৫ই অক্টোবর তারিখে। রুগ্ন স্বাস্থ্যের জন্য তিনি জনজীবনের সঙ্গে কোন যোগাযোগ রাখেন নি। ৪৩ খৃস্টপূর্বাব্দে তিনি গ্রীক কবি আসিনিয়াস পোলিওর সঙ্গে পরিচিত হন এবং তাঁরই অনুপ্রেরণায় তিনি গ্রাম্যজীবনের পটভূমিকায় দশটি দীর্ঘ কবিতা লেখেন, যেগুলি পরবর্তীকালে **বুকোলিকা** নামে প্রকাশিত হয়। এগুলি থিওক্রিটাসের আদর্শে রচিত। এগুলির মধ্যে পাণ্ডিত্যের পরিচয় আছে, কিন্তু গ্রাম্য পশুপালক জীবনের সহজ স্বাভাবিক ছবি এ কবিতাগুলির মধ্যে ফুটে ওঠে নি। তাঁর পরবর্তী কাব্যগ্রন্থ হচ্ছে **জিওর্জিকা**। এই কাব্যটি ল্যাটিন ভাষায় এক আশ্চর্য সৃষ্টি যদিও বিষয়বস্তু অত্যন্ত সাধারণ। মোট চারটি অধ্যায়ে বিভক্ত এই কাব্যগ্রন্থটির প্রথম অধ্যায়ের বিষয়বস্তু হচ্ছে জমি তৈরি করার পদ্ধতি, দ্বিতীয় অধ্যায় হচ্ছে উদ্যানসৃষ্টি, তৃতীয় অধ্যায় পশুপালন, ও চতুর্থ অধ্যায় মক্ষিকাপালন। তাঁর তৃতীয় ও সর্বশেষ কাব্য হচ্ছে **ইনিড** যা তিনি সম্পূর্ণ করে যেতে পারেন নি। তাঁর ইচ্ছা ছিল যেন কাব্যটিকে সাধারণ্যে প্রচার না করে নষ্ট করে দেওয়া হয়। কিন্তু তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর বন্ধুবর্গ তাঁর শেষ ইচ্ছা না মেনে গ্রন্থটি প্রকাশ করেন। **ইনিড** প্রচুর জনসমাদর লাভ করেছিল। এর বিষয়বস্তু হচ্ছে ট্রয়ের বিখ্যাত বীর ইনিয়াসের কাহিনী। কথিত আছে যে ট্রয়-ধ্বংসের পর ইনিয়াস সেখান থেকে চলে আসেন এবং নানা বিপদসঙ্কুল অবস্থার ভিতর দিয়ে শেষ পর্যন্ত ইটালীতে উপস্থিত হন। রোমের প্রতিষ্ঠাতা রোমুলাস এবং রেমাস তাঁরই বংশধর। সাধারণের মধ্যে প্রকাশিত হবার পরই **ইনিড** রোমের জাতীয় মহাকাব্য রূপে পরিগণিত হয়, রোমের জনজীবনে এই গ্রন্থটির প্রভাবও প্রচুর। কিন্তু কাব্য হিসাবে **ইনিড** খুব উৎকৃষ্ট নয়, কাব্যগুণের দিক থেকে কবির **জিওর্জিকা ইনিডের** চেয়ে শ্রেষ্ঠ। ভার্জিলের পরিকল্পনা ছিল যে এই কাব্যে তিনি **ইলিয়াড** ও **অডিসির** নির্যাসের মেলবন্ধন ঘটাবেন। প্রথম ছয় অধ্যায়ে অডিসিউসের অ্যাডভেঞ্চারের মতই ইনিয়াসের দুঃসাহসিক কার্যকলাপের চিত্র অঙ্কিত করবেন, এবং শেষ ছয় অধ্যায়ে ট্রয়যুদ্ধের মতই ল্যাটিরামের সিংহাসনের জন্য যুদ্ধের বর্ণনা দেবেন। তাঁর এই উদ্দেশ্য সফল হয় নি। আরও বহু কবিতা ভার্জিলের নামে চলে, তবে সেগুলি তাঁর লেখা নয়। ভার্জিল মারা গেছলেন ১৯ খৃস্টপূর্বাব্দের ২১শে সেপ্টেম্বর তারিখে।

ভার্জিলের পর শক্তিমান কবি ছিলেন ওভিড। তাঁর মৃত্যু ১৭ খৃস্টাব্দে, এই কারণেই তাঁর সম্বন্ধে আমরা পরবর্তী অধ্যায়ে আলোচনা করব। বর্তমান অধ্যায়ে খৃস্টপূর্বাব্দের কবি ও সাহিত্যিকদের কথাই বলা হচ্ছে। ভার্জিলের পর এবং ওভিডের পূর্বে তিনজন শক্তিমান কবির নাম পাওয়া যাচ্ছে। তাঁরা হচ্ছেন হোরেস, টাইবুলাস এবং প্রোপারটিয়াস। হোরেসের জন্ম ৬৫ খৃস্টপূর্বাব্দের ৮ই ডিসেম্বর। প্রথম যৌবনে সীজার বিরোধী বিপ্লবে তিনি জড়িত ছিলেন। তাঁর কাব্যপ্রতিভা লক্ষ্য করে ভার্জিল তাঁকে নিজ পৃষ্ঠপোষক মেসেনাসের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেন। ৩৫ খৃস্টপূর্বাব্দে সারমোনেস শিরোনামায় তিনি কয়েকটি স্যাটায়ার প্রকাশিত করেন। তাঁর দ্বিতীয় কাব্য হচ্ছে ইপোডেস, যা আইয়াম্বিক ছন্দে রচিত গীতি-কবিতার পর্যায় ভুক্ত। প্রকৃত ল্যাটিন গীতকবিতা হোরেসের হাতেই পূর্ণতা লাভ করে। এ বিষয়ে তাঁর চার খণ্ডে রচিত **ওডস** বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এ ছাড়া তিনি ব্যঙ্গধর্মী এক অদ্ভুত পত্রসাহিত্যের সূচনা করেছিলেন যার নাম **এপিসচুলা**। হোরেসের মৃত্যু হয়েছিল ৮ খৃস্টপূর্বাব্দের ২৭শে নভেম্বর তারিখে। কবি টাইবুলাসের জন্ম ৫৫ খৃস্টপূর্বাব্দে। তাঁর চারটি কাব্যগ্রন্থ এ পর্যন্ত পাওয়া গেছে। তিনিও হোরেসের মত গীতিকবি এবং তাঁর রচনায় দুঃখবাদের চিহ্ন সুস্পষ্ট। কবির ব্যক্তিগত জীবনের ব্যর্থ প্রেমই তাঁকে দুঃখবাদী করে তুলেছিল। কবি প্রোপারটিয়াস (জন্ম ৫০ খৃঃ পূঃ) প্রেমের কবিতা লিখেই বিখ্যাত হয়েছিলেন। তাঁর সমস্ত কবিতাই সিন্থিয়া নামক তাঁর এক মানসীর উদ্দেশ্যে লিখিত। তাঁরও মোট চারটি কাব্যগ্রন্থ পাওয়া গেছে এবং সবগুলিই টাইবুলাসের কবিতাগুচ্ছের মতই শিরোনামাবিহীন।

অমৃতসমান

বেদব্যাস

বাব্বা, কী পুজো চলেছে, চেনা যায় না যেন শহর কলকাতাকে। চার-পাঁচ দিন আগেও দেখেছি হাজার হাতের মুঠোয় শহরের হৃৎপিণ্ডটা, নিষ্পিষ্ট হচ্ছে মহানগরী। এখানে বেতন বৃদ্ধির; ওখানে ভাতা বাড়ানোর দাবিতে মিছিল, সভা-শোভাযাত্রা। মিছিল এখানে-ওখানে-সেখানে এবং সারা শহর জুড়েই। বোনাসের দাবিতে ঘেরা ডালো, এ্যাডভান্সের জন্যে ম্যানেজারকে ঘর-বন্দী করা—সবই দেখেছি।

আর আজ? সে-মারমুখী চেহারা শহরের নেই, এক পশলা বিষ্টির পর যেমন ধুলো-মাখা কাঁচের জানালার মালিন্য-মুক্তি ঘটে শহরের হয়েছে তেমনি চারিত্রিক পরিবর্তন, গগনভেদী হৈ-হট্টগোলের জায়গায় খুশি-ঝলমল শান্ত কলরোল। কিন্তু আমার বোধ হয় হিসেবে গণ্ডগোল হয়ে যাচ্ছে। প্রাক-পুজো শহরের যে চিত্র, ওই মিছিল-শোভাযাত্রা কিম্বা বিক্ষোভ প্রদর্শন—সে সবের মধ্যে একটা সুর আছে, ছন্দ আছে, তাল-ফেরতা হয়ে সম্ গিয়ে পড়ে তাদের একই জায়গায়; কিন্তু পুজোর ক'টা দিনে সে সিম্ফনি যেন কোথায় হারিয়ে যায়, একের সঙ্গে অন্যের না মেলে তাল, না লয়-তান। কেমন যেন খাপছাড়া উচ্ছৃংখল বোহেমিয়ান ভাব—বারোয়ারী পুজোর কথা মনে রেখেই বলছি আমি।

এই দেখুন না, ষষ্ঠীর দিনে পাড়ার মাতব্বরদের অনুরোধে ঢোঁক গিলেছিলাম, পুজোমণ্ডপে গিয়ে হাজির হয়েছিলাম গুটি গুটি। মায়ের বোধন হবে, মানে উদ্বোধন। তা মেলাই লোকজন হয়েছে পুজোমণ্ডপে, তার সামনের বিস্তীর্ণ অঞ্চল উপছে পড়ছে। একপাশে গদি করা হয়েছে কর্মকর্তাদের জন্যে, তাতে বালিশ, পাশ-বালিশ থেকে শুরু করে পানের ডিবে, পিকদানী, এ্যাশট্রে সবই রয়েছে। টেম্পোরারী টেলিফোনও। ও পাশে পুলিশ ক্যাম্প, শান্তি বাহিনী মজুত রয়েছে। উদ্যোক্তারা সকলে পাড়ারই, আলাপ-পরিচয় কম-বেশি সকলের সঙ্গেই রয়েছে, কিন্তু কেন জানি না, আজ যেন তারা কেউ আমায় চিনতে পারছে না, ব্যস্ত-সমস্ত হয়ে সবাই একবার করে ঘড়ি দেখছে আর এদিক-ওদিক ছুটে বেড়াচ্ছে। উসখুস করছিলাম আমিও, উঠে পড়বো কিনা ভাবছিলাম, এমন সময় হুড়মুড় করে একশো লোক—'এসে গেছে, এসে ... বলে চীৎকার পেড়ে মণ্ডপ ছেড়ে

... হেসে

আর

...কে

ফেললো। মাইকআলা বোধ হয় পাকে নি এখনো, মাইকটা চালু করে দিয়েছিল সভা শুরু না হতেই। ফলে মাইকে মন্ত্রী-মশাইয়ের গলা শোনা গেল দূর থেকেও: ওহে রতন চন্দর, আমি দেরি করতে, পারবো না বাপু, এখনো এগারোটা জায়গায় যেতে হবে, সবই আমার কনস্টিটুয়েন্সি, বাদ দিতে তো পারবো না কোনটা—

মন্ত্রীমহোদয় উদ্বোধক, প্রধান অতিথি হয়ে যিনি এসেছেন এ কেন্দ্রের তিনিই পার্লামেণ্টারী নির্বাচনপ্রার্থী। আর সভাপতি তো আমাদের এম-এল-এ সাহেব, তাঁরই তো পুজো, এটুকু না করলে, নির্বাচনে জেতা অত সস্তা নাকি? সকলেই পাঁচ-দশ মিনিট করে বললেন, চীনা হামলা, পাকিস্তানী ষড়যন্ত্র কিছুই বাদ গেল না—মা দুর্গার নাম উচ্চারণ করতে শোনা গেল না বিশেষ কারুর কাছে, কিন্তু আসন্ন পরীক্ষার সকলকেই সংহত হতে বলা হলো। তা রাজনীতিবিদদের বাদ দিয়ে তো আর সেকুলার স্টেটে ধর্মানুষ্ঠান হতে পারে না, ওঁরা দয়া করে যাই বলেন তাই ধর্ম, তাই শুদ্ধাচার বলে মেনে নিতে হবে।

মহাসপ্তমীর দিন একটু আয়েস করে চা-সেবা করছিলাম, আসলে চা-টা উপলক্ষ মাত্র, খবরের কাগজ গিলছিলাম। তা গিলে খাবার মতোই খবর রয়েছে কাগজে: ব্যাংক কর্মচারীদের মাইনে বেড়েছে, কেন্দ্রীয় সরকারী কর্মচারীদের। ওরে ফাদার! এ যে সাংবাদিকদেরও! বেঁচে থাক ওয়েজবোর্ড! ভাবছিলাম শ্রীমতীকে আরেকখানা টোস্টের কথা বলবো কিনা—ওর হারটা ভেঙে এবার নতুন ডিজাইনের করাতে বলবো। উল্লাসে কখন চীৎকার করে উঠেছিলাম হয়তো, খুন্তিহস্তে শ্রীমতীর ত্বরিত-প্রবেশে তা অনুমান করতে কষ্ট হলো না।

—কী হয়েছে, চ্যাঁচাচ্ছো কেন? চা জুড়িয়ে গেছে তো আমি কী করবো—এখন আমি আর গরম করে দিতে পারবো না, উনুনে কাঁচকলা-বেগুনের—

—আরে না না, চা ঠিক আছে, আমি তোমায় ডাকি নি তো, ডেকেছিলাম নাকি—কৈ—আচ্ছা এসেছোই যখন একটা কাজ করো তো, চট করে এই জিলিপিটা মুখে পুরে দাও তো—হ্যাঁ, এই নাও—

—আহা, রঙ্গ দেখে বাঁচিনে আর—এই আমার ওসব করার সময় কিনা—

—ওকে সুখবরটা দেবো কি দেবো না ভাবছিলাম, হঠাৎ দুম্ করে একশো-দেড়শো টাকার ইনক্রিমেণ্টের কথা শুনে পাছে বেচারী হার্ট ফেল করে সেই জন্যে পাঁচটা আবোল-তাবোল বলে সইয়ে নিচ্ছিলাম এমন সময় তারস্বরে মাইক গর্জন করে উঠলো: জা—পান, লাভ ইন টোকিয়ো...

সন্ধ্যার সময় যথারীতি প্যাণ্ডেলে গিয়েছি, মানে যেতে হলো বুলবুলের প্যানপ্যানানিতে। কে ওর বাবলুদা নাকি ধুনুচি নৃত্য করবে, তাই দেখাতে হবে, দেখতে হবে। দুটো চেয়ার দখল করে সবে বসেছিলাম এমন সময় ধাঁ করে একটা বই পড়লো কোলের ওপর এসে।

—এই যে স্যর নেবেন নাকি, ভালো ভালো পুজোসংখ্যা আছে—দেখলাম এক ব্যাগ ভর্তি পত্র-পত্রিকা, নানা রঙের, নানা ঢঙের। মহালয়া গিয়ে আজ সপ্তমী কাবার হতে চললো এখনো পুজোসংখ্যা! ছোকরাটা সপ্রতিভ বলতে হবে, যেমন পোশাকে-আশাকে তেমনি বোলচালে।

—এই যে, এটি বার করেছেন কয়েকজন লব্ধপ্রতিষ্ঠিত সাহিত্যিক মিলে—রবিঠাকুর থেকে সুরু করে ছোট-বড় সকলেরই লেখা রয়েছে—হ্যাঁ নিশ্চয়ই অপ্রকাশিত বৈকি—মশাই ব্যক্তিগত চিঠি হলেও সে তো রবীন্দ্রনাথেরই রচনা, তার দাম কে দেয় বলুন—বলতে যাচ্ছিলাম যে ইতিমধ্যে না পেয়ে থাকি কমপ্লিমেন্টারী কপি সবই পাবো দু-চার দিনের মধ্যে—রিভিউ করার জন্যেও তো আসবে—তা ছোকরা আরেকখানা বই বার করে কানের কাছে মুখ এনে বললে: এটা নিন দাদা, সায়রা বানুর ইণ্টিমেট ফোটো রয়েছে, শর্মিলা ঠাকুরের—আর পাবেন না এসব—বিয়ে হয়ে গেছে তো আপনি কেঁদে ভাসালেও ওরা আর নামবে না—এ্যাকটিং বন্ধ......

পুজো হচ্ছে কিছু উত্তর কলকাতায় বটে। দু' পা বাড়াতেই ঠাকুর দর্শন—আর সবই যে বারোয়ারী। ভিড় দেখে ভেতরে ঢোকার সদিচ্ছা উবে গিয়েছিল, কিন্তু বন্ধু-পত্নীর আহ্লাদীপনায় দূর থেকে ঠাকুর প্রণাম করার জো নেই। ব্যাঙ্গালোর থেকে এসেছে প্রসেনজিৎ স্ত্রী-কন্যাকে নিয়ে, ওখানে দশহরা উৎসবে

ফলবান বৃক্ষ

মৃত্যুঞ্জয় মাইতি,

প্রতিবার ভালোবেসে আমি আরো ফলবান বৃক্ষ হয়ে উঠি,
আমার ঊষর দিন, বন্ধ্যামাটি ভরে ওঠে শস্যের সবুজে।
আমি তাই মৃত্যু থেকে উত্তীর্ণ প্রাণের দূত। ভালোবেসে, বেসে—
আবার সমুদ্রে যাবো অঙ্কুরিত জীবনের শব্দ খুঁজে, খুঁজে!

অনেক ধূসর বেলা দুঃখদৈন্য কোলাহলে ব্যর্থ প্রার্থনার
প্রতিধ্বনি হয়ে ওঠে; শুধু বেঁচে আছি এই অভিজ্ঞতা, বোধি
চেতনায় অবলুপ্ত তরু-রিক্ততট; যেন শীতের তুষারে
আবৃত অনিদ্র সেই আশ্বিনের পরিচিত পরিপূর্ণ নদী।

কতোবার এই মৃত্যু জীবনের কাছে এসে ডাক দিয়েছিল।
আমিও সকল কাজ বিকেল আসার আগে শেষ করে রাখি,
কেন না এখন আর কোনো ঘরে আনন্দের শীর্ণ আলো নাই।
শুধু ক্লান্ত পড়ে থাকা ক্ষমাহীন অন্ধকারে সম্পূর্ণ একাকী।

হঠাৎ কোথায় বাজে ভোরের রোদের গান প্রতিজ্ঞার মতো,
আমি কান পেতে থাকি; জানালার দৃশ্যপটে উজ্জ্বল প্রত্যাশা
আবার জীবনে আসে; আমি ফলবান বৃক্ষ, আমার শাখায়
অমৃতের স্পর্শ আনে আকাশের মতো শান্ত স্তব্ধ ভালোবাসা।

বণের এফিজি পোড়ানো দেখে-দেখে ওরা কেমন ক্রুড হয়ে গিয়েছে, মাতৃপুজোয় শান্ত স্নিগ্ধ পরিবেশে তাই দীর্ঘ সময় কাটাতে চায়। পার্কের চার দিকে স্টল হয়েছে, ঘুরে ঘুরে দেখছিলাম। গেল বছরে দেখা গিয়েছিল প্যাণ্ডেলে-প্যাণ্ডেলে প্রতিরক্ষা তহবিল; এ বছর দেখা গেল পার্টি ফাণ্ড, আবেদন করা হয়েছে, 'আপনার স্বপ্ন সফল করার জন্যে' বিকল্প সরকার গঠনের জন্যে মুক্ত হস্তে দান করুন......'

আবার করজোড়ে অনুরোধ 'আসবেন বেদব্যাসবাবু সন্ধিপুজো দেখতে, রাত দুটোয়—'

সরাসরি না বলতে পারি নি, জানি সময়টা আমার বিছানা ত্যাগ করার পক্ষে প্রকৃষ্টই বটে। কিন্তু কপালে পুণ্যি অর্জন রয়েছে, ইচ্ছে করলেই আর ঠ্যাকাতে পারছি কৈ! মাইকযোগে গাঁক গাঁক করে বার বার জানানি দিতেই শ্রীমতী দুম্‌দাম্‌ করে কিল-ঘুষি চালালো আমার অপ্রশস্ত পৃষ্ঠদেশে। চোখ কচলাতে কচলাতে যেতেই হলো প্যাণ্ডেলে। গিয়ে দেখি ঢুলি-ধর্মঘট, ওরা ঢাক দুটিকে সামনে রেখে উবু হয়ে বসে আছে, মাথার নিচে কাঁসর দিয়ে ছোকরাটি অকাতরে ঘুমোচ্ছে। জানা গেল ওদের খাওয়া হয় নি, কাজেই ঢাক বাজাতে ওরা পারবে না, তা সন্ধি-পুজো হোক চাই না হোক। আরো জানা গেল ঢাকীদের খাবারের পয়সা দেওয়া হয় নি, পুজো সেক্রেটারী সুনীল চক্রবর্তী ট্রেজারার, জগদীশ ঘোষ মায় এ্যাকাউণ্ট্যাণ্ট হালদার পর্যন্ত নিপাত্তা! এদিকে পুরুত-মশাই চ্যাঁচামেচি শুরু করে দিয়েছেন, ভলাণ্টীয়াররা একে একে মাইকে গিয়ে সুনীলদা, জগদীশদা কিম্বা তপনদা—যে যেখানেই থাকুন অবিলম্বে প্যাণ্ডেলে ফিরে আসার আবেদন জানাচ্ছে। কিন্তু কা কস্য পরিবেদনা, কোথায় সুনীল, কোথায়ই বা টাকার থলে নিয়ে জগদীশ ঘোষ!

—'চলুন তো বেদব্যাসবাবু', পুলক আমাকে নিয়ে টানাটানি করছিল, বেশ বোঝা গেল, রাগ হয়েছে ওর, 'আমি ঠিক জানি, কোথায় আছেন বাবুরা—'

মশাই 'পুজোর উদ্যোক্তা সেই এম-এল-এ মশাইয়ের বৈঠকখানায় উঠলাম গিয়ে ঠেলে। কেউ আসতে সাহস করবে না বা আঁচও করতে পারবে না জেনে দরজা সবই খোলা। দেখলাম সেক্রেটারী-ট্রেজারার সবাই গড়াগড়ি যাচ্ছেন মাটিতে।

পুলকের সাহস কম নয়, ঠেলা মেরে একজনকে বললে, কী হচ্ছে, চলুন ঢাকীদের খাবার টাকা দেবেন চলুন—

—কে বাওয়া, প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই জবাব পাওয়া গেল—কেন ঝামেলি করছো, কেটে পড়ো না—এ্যাই জাগডিস্‌, সালা মাল খেয়ে মারা পড়লি নাকি—

—উঠুন না, পুলক নাছোড়বন্দা, ঢাকীরা না খেয়ে আছে—সন্ধিপুজো—

—কে খাচ্ছে না—কেন বাওয়া—এসো না, কত মাল খাবে খাও—খাও—

—'সালা একদম বিরক্ত করবি নি বলছি', বোধ হয় সেক্রেটারী সুনীলের গলা—'কাল একফোঁটা গলায় ফেলতে পারি নি—মাঠে মারা গেছে মহাসপ্তমী—'

—সালা বেস্পতিবার তো কী হয়েছে—এ্যাকাউণ্ট্যাণ্ট জোর সমর্থন করে—পুজো বলে কথা না—তা না মালের দোকান মাংসের দোকান বন্ধ—সালা সব্বাইকে বিধবা বানিয়ে ছাড়বে গভমেণ্ট—

নবমীর দিন আর্ধেক রাস্তা গিয়ে ট্যাক্সি ছেড়ে দিতে হলো, সারা কলকাতা উদ্দাম-চঞ্চল হয়ে উঠেছে। কলকাতাই শুধু নয়, বাইরে থেকেও লক্ষ লক্ষ লোকের অনুপ্রবেশ ঘটেছে। শেষ দিন তো, সুযোগ হারাতে রাজী নয় কেউ, নবমীর নিশি পোহাবার আগেই মাতৃদর্শন করা চাই।

দশমীর দিন সকাল থেকেই যেন মন ভার হয়ে আছে। ঢাকের বোল শুনে আরো খারাপ লাগছিলঃ

ঠাকুর থাকবে কতক্ষণ
ঠাকুর যাবে বিসর্জন—

তা কে না জানে, কিন্তু অমন নেচে-কুঁদে ঢাকের বাদ্যি তোলার কিবা প্রয়োজন বাপু। ঢাকে কাঠি পড়ছে না তো মনে হচ্ছে যেন বুকের ওপর হাতুড়ি পিটছে......

বিকেলে মাইকে উত্তেজিত গলা শোনা গেলঃ কী হলো, তিনটে থেকে এয়োতীদের বলা হচ্ছে সব, আসুন মাকে বরণ করবেন, কারুর পাত্তা নেই কেন এখনো সন্ধ্যা ৬টা বাজে......নাকি পাড়ার বৌ'রা সব বিধবা হয়ে গেছেন—

ছোক্‌রার দলও উত্তেজিত। তাসা পার্টি হবে না মানে? আমার বাবা পাঁচ টাকা চাঁদা দিয়েছে ওমনি নাকি?...

—'কী দাদা, বিসর্জনে যাচ্ছেন তো—'

আমি কিছু বলার আগেই দেবীবাবু বললেনঃ থাক, ওঁকে আর ডাকতে হবে না, টুয়িস্ট নাচতে তো শেখেন নি উনি—

কথা হচ্ছিল মেয়েরা এবং ছোটোরা বিসর্জন দেখতে যাবে কি না। পরিতোষের বক্তব্য ছিল সিলেক্টেড ক'জন মেয়ে যেতে পারে, মিস্‌ মঞ্জুলা রায় অবশ্যিই যাবেন, উনি গেস্ট, সাউথ ক্যালকাটা থেকে এসেছেন প্রশান্তবাবুর শালী।

হঠাৎ কমিটি মেম্বাররা সব প্যাণ্ডেলের বাইরে চলে গেল, এককোণে গিয়ে উত্তেজিতভাবে তর্ক জুড়ে দিয়েছে। কানে ভেসে এলোঃ নিশ্চয়ই, খান তিরিশ লাঠি, সীতারামের দোকান থেকে গোটা ২০-২৫ সোডার বোতল নিয়ে নে—বোমা আছে, বোমা, আচ্ছা, বিশে, দরজিপাড়ায় চলে যা—নেপালদাকে আমার নাম করে বলিস—

পালবাবুকে নিয়ে বাবুঘাট থেকে যখন ফিরেছি তখন রাত্তির দুটো। কিন্তু বাড়িতে আলো জ্বলতে দেখে অবাক না হয়ে পারলাম না। ঘুম-কাতুরে শ্রীমতী আমার তখনো জেগে......ওর প্রতি ভক্তি আমার একশো গুণ বেড়ে গেল সঙ্গে সঙ্গে—

—এ কি ঘুমোও নি, রাত দুটো বাজে—

ঘুমোব—হা হা হা...রাত দু

ওহো হো হো......

একি

আমার

এ

গ্রন্থমেলা

বার্ষিক
স্পাদিকা ঃ
লাইব্রেরী,
কলিকাতা-

বছরের ... ছেলেদের সেরা বই 'বার্ষিক শিশুসাথী'। নীল আকাশে যখন ছেঁড়া ছেঁড়া মেঘ, উঠোনে উঠোনে শিউলি ফুলের গন্ধ, দিগন্তে নেচে-নেচে ওঠে কাশফুলের গুচ্ছ, শিশুরা তখন বুঝতে পারে পুজো আসছে, মূর্তি গড়া হচ্ছে, ঢাক বাজতে আর দেরি নেই। সেই সঙ্গে তাদের হাতছানি দেয় তাদের প্রিয় আর একজন। প্রতি বছরই সে আসে, তবু প্রতি বছরই নতুন। নতুন গল্প, কবিতা, রূপকথা, নাটিকা ও নানা ছবির রঙ-বেরঙের সাজ পরে লোভনীয় হাতছানি দিতে দিতে শিশুদের রাজত্ব দখল করে যে, সে কে?—তার উত্তরে শিশুরা সবাই একযোগে চেঁচিয়ে বলে ঃ আমাদের 'বার্ষিক শিশুসাথী'। এতো বড় আর এতো সুন্দর বই, কিন্তু দামে কতো সস্তা। আর লিখেছেন তাতে কে? না, বাংলা দেশের সেরা সেরা লেখক। বড় লেখকরা বিশেষ করে লিখেছেন, ছেলেদের মতো করে। আর তা একমাত্র 'বার্ষিক শিশুসাথী'র জন্যেই। এত সুন্দর লেখা আর অন্য কোথাও পাওয়া যায় না। বড়রাও তাই ছেলেদের হাতে 'বার্ষিক শিশুসাথী' এসে পৌঁছলে, কেড়ে নিয়ে পড়তে চায়। বড়-ছোটয় হুড়োহুড়ি। তা নইলে উৎসব কিসের? আর এই উৎসবকে মুখর করে একমাত্র 'বার্ষিক শিশুসাথী।' তাই আশা করি, সকল ছেলেই "বার্ষিক শিশুসাথী" সংগ্রহ করেছে। তবে এতো মোটা বই ছেলেদের পক্ষে এই কদিনে পড়ে শেষ করা অসম্ভব ব্যাপার। মোট সত্তরটা লেখা। গল্প, কবিতা, নাটিকা, রূপকথা, ছড়া ছাড়াও আছে রোমাঞ্চকর সত্য ঘটনা, ভয়ানক অলৌকিক গল্প, রহস্যঘেরা ঐতিহাসিক কাহিনী, বিপজ্জনক বিজ্ঞানভিত্তিক গল্প, রোমহর্ষক অভিযানের কথা, গোয়েন্দা গল্প, ডাকটিকিটের মজার কথা, ম্যাজিক থেকে কতো রকম জীবনী পর্যন্ত। লিখেছেন, কুমুদরঞ্জন মল্লিক, নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, আশাপূর্ণা দেবী, শিবরাম চক্রবর্তী, বিশু মুখোপাধ্যায়, দক্ষিণারঞ্জন বসু, জসীম উদ্দীন, নরেন্দ্র দেব, মনোজ বসু, লীলা মজুমদার, আশা দেবী, মন্মথ রায়, দুর্গাদাস সরকার, সাঁতারু মিহির সেন, অনিলবরণ গঙ্গোপাধ্যায়, কালিদাস রায়, সুনন্দা দাশগুপ্ত প্রমুখ প্রতিষ্ঠিত সাহিত্যিক-সাহিত্যিকা। ছ'টি মূল্যবান আলোকচিত্র, তিনটি কার্টুন, আঁকতে শেখো এবং নন্দলাল বসুর 'হরপার্বতী' এই বার্ষিকীটির বিশেষ গৌরব বৃদ্ধি করেছে। 'বার্ষিক শিশুসাথী'র এই অতুলনীয় সম্পাদনার জন্যে সম্পাদিকা ধন্যবাদার্হ।

সবিতা—সম্পাদিকা ঃ সাধনা সোম। সবিতা কার্যালয়, ৮৬এ, আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু রোড, কলিকাতা-১৪। মূল্য ঃ এক টাকা।

দামে এতো সস্তা একালে যেমন কল্পনা করা যায় না, তেমনি "সবিতা"র আশ্বিন সংখ্যার পরিকল্পনা ও রূপায়ণের জন্যে যে বিশেষ চিন্তার প্রয়োজন হয়েছে—তার প্রমাণ তাঁরাই পাবেন যাঁরা এ সংখ্যাটি পড়বেন। সংখ্যাটি দুই ভাগে বিভক্ত। একদিকে শারদীয় রচনাবলী, আর এক দিকে গান্ধী স্মরণে প্রবন্ধ ও

জয়ন্তী সেন

কবিতা। শারদীয় রচনাবলীর মধ্যে আছে ত্রিপুরাশঙ্কর সেন, ডঃ প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ, চণ্ডিকাপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়, বিনয় ঘোষ, দ্বিজেন্দ্রলাল নাথের মূল্যবান প্রবন্ধ। ঐ অংশে কবিতা লিখেছেন নলিনীকান্ত গুপ্ত, নচিকেতা ভরদ্বাজ সহ চৌদ্দজন কবি। পাঁচটি গল্পও বিশেষ প্রশংসার দাবি রাখে। নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের 'অতল' বিশেষ উল্লেখযোগ্য। মোট কথা, 'দেবী মাহাত্ম্য', মনুষ্যত্বের দীক্ষা, ভারত ও পাকিস্তান, বিদ্রোহে বাঙালী, নব্য ইংরেজীয়ানার ঢেউ, পশ্চিম বাংলার পার্বত্য জাতি এই অংশের অসাধারণ সম্পদ—যা বহু গবেষকের পথানুসন্ধানে সাহায্য করবে। 'গান্ধী স্মরণে' অংশে গান্ধীবাণীগুলি মনে মুদ্রিত করে রাখার মতো। যেমন 'যেখানে শিল্পকলা, সেখানেই জীবন', 'আমার ধ্যানের স্বরাজ দরিদ্রের স্বরাজ।' একালে মহাত্মা গান্ধীর নামটাই গ্রহণ করা হয়, তাঁর আদর্শ এখন দূর অস্ত। যাহোক, "সবিতা"ই আবার স্মরণ করিয়ে দিল গান্ধীবাণী ব্যর্থ হবার নয়। এই অংশে গান্ধী অবলম্বনে দুটি কবিতা উল্লেখ্য। তাছাড়া রয়েছে হরিদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'গান্ধীজী ও বিশ্বরাষ্ট্রসঙ্ঘ', চিত্তরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'দুর্নীতি ও লেখকের দায়িত্ব' এবং পঞ্চানন মণ্ডলের ধারাবাহিক 'ভারতশিল্পী নন্দলাল' এবং দীনেশচন্দ্র লোধের 'আমাদের খাদ্য সমস্যা।' "সবিতা"র সম্পাদকীয়তে আমরা বরাবর নতুন চিন্তা ও বক্তব্য পাই। এবারও তার ব্যতিক্রম নেই। 'দেশ কোন দিকে?' 'অধ্যাপক রমণের উক্তি' অত্যন্ত বলিষ্ঠ ও কল্যাণমুখী বলে মনে হয়।

রাষ্ট্র—সম্পাদক ঃ নির্মল বসু। ৪৭।২এ, বদ্রিদাস টেম্পল স্ট্রীট, কলিকাতা-৪। দাম ঃ এক টাকা (বার্ষিক চার টাকা)।

রাষ্ট্রবিজ্ঞান আলোচনার ত্রৈমাসিক মুখপত্র 'রাষ্ট্র'-এ শারদীয়ার হাঁকডাক নেই। কিন্তু এর অনন্যসাধারণ রচনাগুলি আমাদের মুগ্ধ করেছে। এ ধরণের চিন্তামূলক প্রবন্ধ বাংলাদেশের অন্যান্য পত্রপত্রিকায় নেই। তাছাড়া এই ধরণের প্রবন্ধই রাষ্ট্রের মৌলিক বৈশিষ্ট্য অক্ষুণ্ণ রাখার একমাত্র সহায়ক। যাঁরা রাষ্ট্র, সমাজ, রাজনীতি ও মানুষের কল্যাণের কথা চিন্তা করেন—তাঁদের কাছে অনেক কিছুই শিক্ষণীয় বলে মনে হবে রাষ্ট্রের প্রবন্ধগুলি থেকে। যেমন, 'কলিকাতা কর্পোরেশনের রূপরেখা'য় কলকাতার নানা সমস্যার সঙ্গে সমাধানের পথের ইঙ্গিত দেখানো হয়েছে। এই প্রবন্ধে বাসুদেব চট্টোপাধ্যায় নানা তথ্যের অবতারণা করেছেন। নির্মল বসুর 'কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় আইন, ১৯৬৬' সরকার ও বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের দৃষ্টিভ্রম দূরীকরণের পক্ষে যথেষ্ট সহায়ক, কিন্তু দুঃখের ব্যাপার এই "রাজা কর্ণেন পশ্যতি"। সুতরাং এই মূল্যবান প্রবন্ধের যথোচিত মূল্য দিয়ে তা কার্যকর করার জন্যে শিক্ষাবিদদের এগিয়ে আসা উচিত। এ ছাড়া নির্মলচন্দ্র ভট্টাচার্যের 'ব্রজেন্দ্রনাথ শীল ও তাঁহার প্রশাসন চিন্তা', পবিত্র গুপ্তের 'দক্ষিণ-পশ্চিম আফ্রিকা ঃ আন্তর্জাতিক আদালতের রায়', পরিমলচন্দ্র ঘোষের 'সমাজতন্ত্রের পথে ভারতবর্ষ', হর্ষবর্ধনের 'আন্তর্জাতিক রাজনীতি' ও অনুবাদে জন স্টুয়ার্ট মিলের ধারাবাহিক 'প্রতিনিধিত্বমূলক সরকার' উল্লেখযোগ্য। বাংলা ভাষায় রাষ্ট্রনীতি সম্প্রসারণের জন্য এই পত্রিকা বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের ইতিহাসে বিশেষ স্বীকৃতি লাভের যোগ্য।

শারদীয়া রোশনাই—সম্পাদিকা ঃ গীতা দাশ। এ-১৩২ কলেজ স্ট্রীট মার্কেট, কলিকাতা-১২। দাম ঃ ২·৫০।

অন্যান্যবারের মতো এবারও 'শারদীয়া রোশনাই' কিশোরদের আকৃষ্ট করবে। মূলত এটি মাসিক পত্রিকা। শারদোৎসবের সময় যখন নানা পত্র-পত্রিকার ভিড় এবং মনের মতো পত্রিকা সংগ্রহ করা একটা বিশেষ সমস্যা—তখন কিশোরদের হাতে 'শারদীয়া রোশনাই' তুলে দিলে তারা খুশি হবে। কারণ তারা সূচী দেখেই বুঝতে পারে রুচি মাফিক লেখা পাওয়া যায় এ থেকে। লেখকদের মধ্যে আছেন—অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর, প্রমথ চৌধুরী, যোগীন্দ্রনাথ সরকার, প্রেমেন্দ্র মিত্র, নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, সুভাষ মুখোপাধ্যায়, গোপাল ভৌমিক, শিবরাম চক্রবর্তী, হিমানীশ গোস্বামী, আশা দেবী, মনোজিৎ বসু, অমিতাভ চৌধুরী, দিলীপ দেচৌধুরী, শম্ভুনাথ চট্টোপাধ্যায় এবং অনেকেই। অলঙ্করণে শৈল চক্রবর্তী, রেবতীভূষণ, সুবোধ দাশগুপ্ত, বিদ্যুৎ চক্রবর্তী প্রমুখ উল্লেখযোগ্য।

সাহিত্য ও সংস্কৃতি—সম্পাদক ঃ সঞ্জীবকুমার বসু। চব্বিশ পরগনা জিলা পরিষদ, ১০, হেস্টিংস স্ট্রীট, কলিঃ ১। মূল্য ঃ দু' টাকা।

মাত্র দু' বছরের মধ্যেই ত্রৈমাসিক সাহিত্য ও সংস্কৃতি প্রতিষ্ঠা অর্জন করতে সক্ষম হয়েছে। অবশ্য এই প্রতিষ্ঠালাভের মূলে রচনার উৎকর্ষই মূল কথা। শারদীয় সংখ্যাটিতে সেই উৎকর্ষ বহু গুণ বৃদ্ধি লাভ করেছে। ২৪ পরগনার বৈশিষ্ট্য ও এক-একটি বিষয় বহু প্রবন্ধে যেমন আলোকিত করা হয়েছে, তেমনি শিল্প-সাহিত্য, সংগীত-সংস্কৃতি সম্পর্কিত গবেষণামূলক প্রবন্ধগুলি বিশেষ উল্লেখের দাবি রাখে। এই জাতীয় প্রবন্ধও মনোযোগ আকৃষ্ট করে, যেমন, 'নৌ সাধনায় বঙ্গ,' 'বাংলা গানে রাগ সঙ্গীতের প্রভাব,' 'বঙ্গালী রাগিণী' ও 'বাংলার স্থাপত্যে শঙ্খ-পদ্ম প্রতীকের ক্রমবিকাশ।' পত্রিকাটির একমাত্র উপজীব্য। সুতরাং এ পত্রিকা থেকে একালের বিকৃত রুচির লেখার যারা কামনা করবে তারা ব্যর্থ ও নিরাশ হবে, এবং এই কারণে পত্রিকাটি গুণীমহলে আদৃত হবে। এতে লিখেছেন আশুতোষ ভট্টাচার্য, অর্ধেন্দুকুমার গঙ্গোপাধ্যায়, ভবানী মুখোপাধ্যায়, সুকুমার রায়, গোপাল ভৌমিক, পরেশচন্দ্র দাশগুপ্ত, সঞ্জীবকুমার বসু প্রমুখ বাংলা দেশের মোট একুশ জন খ্যাতিমান সাহিত্যিক। পত্রিকাটির ছাপা, কাগজ, মলাটের ছবি উৎকৃষ্ট রকমের।

শারদীয় চতুষ্কোণ—সম্পাদকমণ্ডলীঃ শিবপ্রসাদ চক্রবর্তী প্রমুখ ৮ জন। ৭৭।১, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিঃ ৯। দাম ঃ দু' টাকা।

উপন্যাস দিয়ে পৃষ্ঠা ভরিয়ে পাঠক আকর্ষণের চেষ্টা নেই। তবে এমন পাঠক আছেন যাঁরা বিচিত্র প্রবন্ধের রাজত্বে জ্ঞানের সীমা বৃদ্ধি করতে চান, জগৎ সম্পর্কে অনিবার্য কৌতূহলে যাঁরা জীবনধর্মী গল্প পড়তে ইচ্ছুক এবং কবিতা থেকে মৃত্তিকাশ্রয়ী রসাস্বাদনই যাঁদের কাম্য—তাঁরা শারদীয় চতুষ্কোণ পাঠ করবেন। প্রবন্ধের বিষয় হচ্ছে বাংলার রূপকথা, রাজস্থানী চিত্রকলা, ভারতীয় অর্থনীতি, বাংলা ছন্দ, অস্তিত্ববাদ, সভ্যতার ভবিষ্যৎ, সীমান্ত বাংলার সমাজ সংস্কৃতি, বন্দে মাতরম্ বিতর্কে রবীন্দ্রনাথ, প্রাচীন বিবাহ প্রথা, পট প্রসঙ্গ, ভারতের স্বাধীনতাকামী ক্যামবেল, সংগীত, নাটক, বিজ্ঞান, রাজনীতি, সাহিত্যপত্র, প্রভৃতি। লিখেছেন হাইন্‌শ্ মোদে, চিত্তরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়, নীহাররঞ্জন রায়, শিশিরকুমার মিত্র, শিশিরকুমার ঘোষ, দিলীপকুমার রায়, প্রবোধচন্দ্র সেন, সুরেশ চক্রবর্তী প্রমুখ ২১ জন খ্যাতিমান প্রাবন্ধিক। ২১টি কবিতা ও ১৪টি গল্পও উল্লেখযোগ্য। অন্নদাশঙ্কর রায়ের চুনো-পুটি ছড়াটির মৌল বক্তব্য ঃ 'হেতের হলে ভোঁতা/ পাত্তা পাব কোথা?' নন্দলাল বসু, ইন্দ্র দুগার ও সজল রায়ের ছবিগুলি চিত্তাকর্ষক।

সপ্তর্ষি — সম্পাদক ঃ ব্যোমকেশ মুখোপাধ্যায়। বাটানগর, ২৪ পরগনা। মূল্য ঃ ২.০০।

'সপ্তর্ষি'র শারদীয়া সংখ্যার ঐতিহ্য পূর্ববৎ বজায় আছে। ঝকঝকে ছাপা, বিপুল আয়তন, খ্যাতিমান শিল্পীদের স্কেচে নয়নলোভন শারদীয়া 'সপ্তর্ষি'র রচনাগুলি পাঠ করে বিশেষ আনন্দ পাওয়া যায়। উপন্যাস 'আজ দুর্গার অধিবাস' লিখেছেন সম্রাট সেন। একালের সমাজ-সমস্যাকে তুলে ধরার জন্য গল্পগুলি পাঠকদের আকৃষ্ট করবে। গল্প লিখেছেন ভবানী মুখোপাধ্যায়, হরিনারায়ণ চট্টোপাধ্যায়, খগেন্দ্র দত্ত, সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ প্রমুখ। কবিতা মোট ছ'টি। 'পদচ্যুত অধীশ্বর' কবিতার শেষ ছ' পঙক্তি বারবার পড়ার মতো। মানুষের জীবন-জিজ্ঞাসার এমন সার্থক উত্তর পেয়ে পাঠকরা চমৎকৃত হবেন। "টাকাকড়ি, অহঙ্কার মানুষের ক'দিন, বল হে,/ পৃথিবীতে যা ঘটে তা আপ্তবাক্যে ধ্রুব হয় যদি—/ হঠাৎ বদলায় গতি কেন তবে শীর্ণকায় নদী? / দিন কিংবা রাত শুধু বৃথা হয় নিরন্তর কলহে। / চাই না কিছুই আমি। দেখতে চাই কতো রক্ত ঝরে/ যখন ইচ্ছার নদী অকস্মাৎ অন্য পথ ধরে।।" কবিতা লিখেছেন গোপাল ভৌমিক, কিরণশঙ্কর সেনগুপ্ত, দুর্গাদাস সরকার প্রমুখ ছ' জন কবি। দুটি বিশেষ প্রবন্ধ ও মঞ্চ ও চিত্র বিভাগের বৈশিষ্ট্যে অভিনবত্ব আছে। শিল্পী অজিত গুপ্তের প্রচ্ছদচিত্র সংখ্যাটির মর্যাদাই কেবলমাত্র বৃদ্ধি করে নি, অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ও তাৎপর্যময়।

সাগ্নিক—সম্পাদক ঃ অনিলকুমার ভট্টাচার্য। ঋষি বঙ্কিম রোড, চাকদহ, নদীয়া। মূল্য ঃ ৫০ পয়সা।

"সাগ্নিক"-এর শারদীয় সংখ্যাটি রূপের ঝলক নিয়ে বের হয় নি; কিন্তু এর বলিষ্ঠ রচনায় চমকে উঠতে হয়। শিক্ষক আন্দোলন প্রসঙ্গে সম্পাদকীয়তে কয়েকটি বিষয় উল্লেখ করা হয়েছে—যা শিক্ষাবিদদের বিশেষ আকর্ষণ ও অনুসন্ধানের দাবি রাখে। নচেৎ দেশের শিক্ষার বারোটা বাজবে। "সাগ্নিক"-এ আছে গল্প, কবিতা ও প্রবন্ধ। লিখেছেন, রণজিৎকুমার সেন, সন্ধ্যা দত্ত, সান্ত্বনা ভট্টাচার্য, সত্যব্রত ভট্টাচার্য, দিবাকর ঘোষ ও নচিকেতা ভরদ্বাজ প্রভৃতি।

নির্মাল্য—যুগ্ম-সম্পাদকঃ নিশীথ ঘোষ ও লক্ষ্মীনারায়ণ মুখোপাধ্যায়, বোড়াই-চণ্ডীতলা, চন্দননগর, হুগলী। দামঃ এক টাকা।

ত্রৈমাসিক সাহিত্য-পত্রিকা 'নির্মাল্য'-এর শারদীয় সংখ্যাটি সুখপাঠ্য গল্প, আধুনিক কবিতা ও মনোজ্ঞ প্রবন্ধে সমৃদ্ধ। এ-ছাড়া সাংবাদিকতার উপর প্রবন্ধটিও তথ্যমূলক। প্রকাশিত পত্রগুলিও সাহিত্য জাতীয়। প্রেমেন্দ্র মিত্রের বহু পঠিত কবিতাটি আবার পড়ে পাঠকরা তৃপ্তই হবেন। এ সংখ্যায় লেখকদের মধ্যে আছেন—আশাপূর্ণা দেবী, প্রাণতোষ ঘটক, জগদীশ ভট্টাচার্য, দক্ষিণারঞ্জন বসু, হরপ্রসাদ মিত্র, গোপাল ভৌমিক, সুশীল রায় প্রভৃতি।

৩ মাসের জন্য বিনামূল্যে উপহার

স্ত্রীলোকের সৌন্দর্যে, কাশ্মীর আর্ট শাড়ী। সর্বাধুনিক মনোরম ডিজাইন এবং রং লইয়া মরশুমের নূতন নূতন মাল আসিয়াছে। আমাদের কাছে কেবলমাত্র বড় সাইজের কাপড় পাওয়া যায়। ১টি ডিল্যুক্স শাড়ীর মূল্য ১১ টাকা; ২টি শাড়ী ২০ টাকা; ৩টি ২৮ টাকা; ৪টি ৩৬ টাকা। দুইটি বা তদধিক শাড়ীর অর্ডারের সহিত বিনামূল্যে ব্লাউজ পীস। পোস্ট পার্শ্বেল যোগে অর্ডারের মাল পাঠান হয়।

Arvind Agencies (WBC—22)
P.O. Box 1408, Delhi-6.

ছোট্ট নাবিকটি

বেঁটে রোগা একটি ছেলে। নাম সাইমন। সে একজন নাবিক। জাহাজে উঠলো আমেরিকা যাবার জন্য।

একলাই এসেছে সে। কেউ আসে নি তাকে বিদায় জানাতে। ছেলেটি অনাথ। তাকে পরানো হয়েছে নাবিকদের নীল সার্ট, চামড়ার প্যান্ট, লাল ফিতে দেওয়া কালো টুপি আর পশমের মোজা।

খুব সুন্দর দেখাচ্ছে তাকে ঐ পোশাকে। কিন্তু নীল বড় বড় চোখ দুটোতে বিষাদ মাখানো। মুখখানা পাণ্ডুর।

জাহাজ কূল ছেড়ে চললো। আর কোথাও মাটি দেখা যাচ্ছে না। সামনে, পেছনে, ডানে, বামে—চতুর্দিকে শুধু জল, আর জল।

বারো বছর বয়স ছেলেটির। জীবনে এই প্রথম সে এরকমভাবে সমুদ্র দেখছে। ঘাবড়ে গেছে। কি রকম অস্বস্তিও লাগছে।

একদিন রাত্তিরে ছোট্ট নাবিকটি ঘুমিয়ে আছে। গভীর ঘুমে ঘুমোচ্ছে। হঠাৎ একটা ভীষণ আওয়াজ সবাইকে জাগিয়ে তুললো।

—হে, হে......ডেকের ওপর, পালের দিকে, পালটা......

তক্ষুণি নাবিকরা নিজের নিজের জায়গা থেকে লাফিয়ে উঠলো। ঝড় উঠেছে তখন। ক্রমশ বেড়েই চলেছে। ঝড়ের সংগে প্রচন্ড যুদ্ধে মেতে গেল সবাই। এমন কি সব চাইতে ছোটটিকে পর্যন্ত তৈরি হতে হবে। সকলের জন্যই কঠিন পরিশ্রম অপেক্ষা করছে। সমস্ত শক্তি নিয়োগ করতে হবে ।

মদ নিয়ে এসো, র‍্যাম্। অফিসার হুকুম করলেন। শোনামাত্রই সব কর্মী এসে জড় হল। প্রথমে বড়রা খেলো। তারপর খেলো পরের দল। সব চাইতে ছোটরা পেল এরপর। তারা প্রত্যেকে এক গ্লাস করে খেলো। পরক্ষণেই আবার অপরজনের জন্য গ্লাসটা ভরে দেওয়া হতে থাকে।

শুধু সাইমনই সেখানে আসে নি। তাকেও ডাকা হল। পরিবেশক এক গ্লাস খেতে অনুরোধও করলো।

মাপ করবেন, মশাই। আমি খাই না। প্রায় ছেলেমানুষী গলায় সে বললো।

কি বোকা! পদস্থ নাবিকটি বললো, গ্লাসটা খালি করে।

ডেক থেকে অফিসার নেবে এলেন। সাইমনের কলার ধরে পেছন থেকে ধাক্কা দিতে দিতে ক্যাপ্টেনের কাছে নিয়ে গেলেন।

—দেখুন স্যার, এই বোকা ছেলেটা মদ খেতে চাইছে না।

ক্যাপ্টেন জিজ্ঞেস করলেন—এই, তোর নাম কি?

—সাইমন।

—তুই যদি প্রকৃতই নাবিক হতে চাস, মদ খাওয়া শিখতে হবে তোকে।

—মাপ করবেন, স্যার। অনুমতি দিন, আমাকে যেন খেতে না হয়।

ক্যাপ্টেন রেগে গেলেন। কি অভদ্র ছেলে। এত সাহস যে ক্যাপ্টেনের হুকুম মানছে না! একে শাস্তি দাও—বললেন তিনি।

রক্ষীর কাজ করছিল যে নাবিকটি ব্যঙ্গের হাসি দেখা গেল তার মুখে। দড়িটা শক্ত করে নিজের হাতে দু-এক পাক জড়িয়ে নিল। বাতাসে চাবুকের মত তুলে বেশ করে সাইমনের পিঠে বসিয়ে দিল।

এক ঘা। দু ঘা। প্রত্যেকটা আঘাতের সংগে সাইমনের বড় বড় নীল চোখ থেকে জল পড়ছে।

এইবার তুই খাবি—বিদ্রূপ করে ক্যাপ্টেন বললেন।

—অনুমতি দিন, দয়া করে আমায় অনুমতি দিন, যাতে না খেলে চলে আমার।

—ওরে গাধা। এত সাহস তোর! দাঁড়া, দেখাচ্ছি। এই বড় মাস্তুলটার ওপরে উঠে যা। রাত্তিরটা ওখানেই থাকবি।

বেচারা! অসহায় ছেলেটি তাকিয়ে দেখছে। চোখ তুলে দেখছে মাস্তুলের ডগাটা। তবু রাজী হল। দড়ির মই বেয়ে উঠে গেল ওপরে।

২

কি ভয়ের রাত! জাহাজটা চলছে। ভীষণভাবে হেলছে, দুলছে। ছেলেটাও মাস্তুলের ডগা আঁকড়ে একবার এদিক একবার ওদিক যাচ্ছে। এমনি করে ঐ রাক্ষুসে ঢেউগুলো আর ভীষণ ঝড় তার সব শক্তি যেন শুষে নিচ্ছে।

পরদিন খুব সকালে ক্যাপ্টেন ডেকের ওপর পায়চারী করছেন। হঠাৎ মনে পড়লো সেই ছোট্ট সাহসী ছেলেটির কথা।

—এ্যাই বাচ্চা—ডাকলেন তিনি।

জবাব নেই।

—নেবে আয়। শুনতে পাচ্ছিস না?

কোন সাড়া নেই।

একজন নাবিক তাড়াতাড়ি মই বেয়ে ওপরে উঠলো। ছেলেটির তখন প্রায় আধমরা অবস্থা। ভয়ে একেবারে কুঁকড়ে গিয়েছে। তার ভয় জাহাজটা যখন বাঁক নেবে তখন সে সমুদ্রে পড়ে যাবে। সমস্ত শক্তি দিয়ে দুহাতে সে মাস্তুলটাকে জড়িয়ে ধরে আছে। হাত দুখানা ঠাণ্ডায় জমে গেছে। এত শক্ত করে ধরেছে যে নাবিকটির পক্ষে খুবই অসুবিধে হচ্ছে মাস্তুলের কাঠ থেকে হাত দুখানা ছাড়াতে। যাই হোক, তাকে ডেকের ওপর আনা হল। সবাই শুশ্রূষা করছে। এক টুকরো গরম কাপড় দিয়ে গা ঘষে দেওয়া হচ্ছে। ধীরে ধীরে জ্ঞান ফিরে এলো ছেলেটির।

উঠে বসেছে সে তখন। ক্যাপ্টেন একটা বড় গ্লাস ভরে মদ ঢাললেন।

—নে রে, এটুকু খেয়ে ফেল এখন। তারপর দেখছি।

—মাপ করবেন, স্যার। আমাকে মদ না খাবার অনুমতি দিন।

—অবাধ্যতা মোটেই পছন্দ করি না আমি। মদ না খাওয়া পর্যন্ত তুই কোন খাবার পাবি না।

—রাগ করবেন না। স্যার, ক্যাপ্টেন। কিন্তু আমি পারবো না......আর কেন পারবো না, তা আপনাকে বলতে ইচ্ছে করছে আমার।

—বল্। দেখা যাক কি বলার আছে তোর।

এক সময়ে আমরা ধনী ছিলাম। বড়-লোকের মতন থাকতাম। কিন্তু আমার বাবা মদ খাওয়া ধরলেন। তাঁর এত বেশি টাকা ছিল না যাতে এর ওপর সব দিক বজায় রাখা যায়। ধার করতেন তিনি। আমরা খাড়ি বিক্রি করলাম। যা কিছু ছিল, সব বেচে দেওয়া হল। মা সইতে পারলেন না এ দুঃখ। অসুখে পড়লেন তিনি। মৃত্যুর আগে আমাকে ডেকে তিনি বলে গেলেন, "সাইমন, তুমি জানো, মদ তোমার অমন ভালো বাবাকে কি করেছিল। প্রতিজ্ঞা কর, বাবা, যে কখনও, কখনও তুমি মদ ছোঁবে না!" ক্যাপ্টেন স্যার, আপনি কি চান যে মায়ের শেষ কথাটা রাখবো না? না, না, আমি পারবো না। স্যার, কিছুতেই পারবো না......

ক্যাপ্টেনের চোখে জল এলো। তিনি ব্যাপারটা বুঝলেন। আদর করে ছোট ছেলেটিকে বললেন,

না, না, খুব ভালো ছেলে। তোমার প্রতিজ্ঞা পালন কর তুমি। যদি কেউ তোমাকে মদ খাওয়াবার জন্য জোর করে, আমার কাছে আসবে। আর তোমাকে বিনা অপরাধে যে শাস্তি ভোগ করতে হয়েছে, তার জন্য এই নাও একশ' ফ্রাঁ। এ তুমি যেভাবে ইচ্ছে খরচ কোর। তারপর নাবিকদের দিকে ফিরে ক্যাপ্টেন সাহেব দাঁত চেপে বললেন,

দু' চোখ খুলে ছেলেটার দিকে লক্ষ্য রাখবে। দেখবে, ভবিষ্যতে তোমাদের মত সামুদ্রিক জন্তুর মাঝখান থেকেও একটা সত্যিকারের মানুষ তৈরি হবে।

[মূল আরমেনিয়ান থেকে অনুবাদ]

অনুবাদ : রত্না গঙ্গোপাধ্যায়

দু'মুখো নীতি—

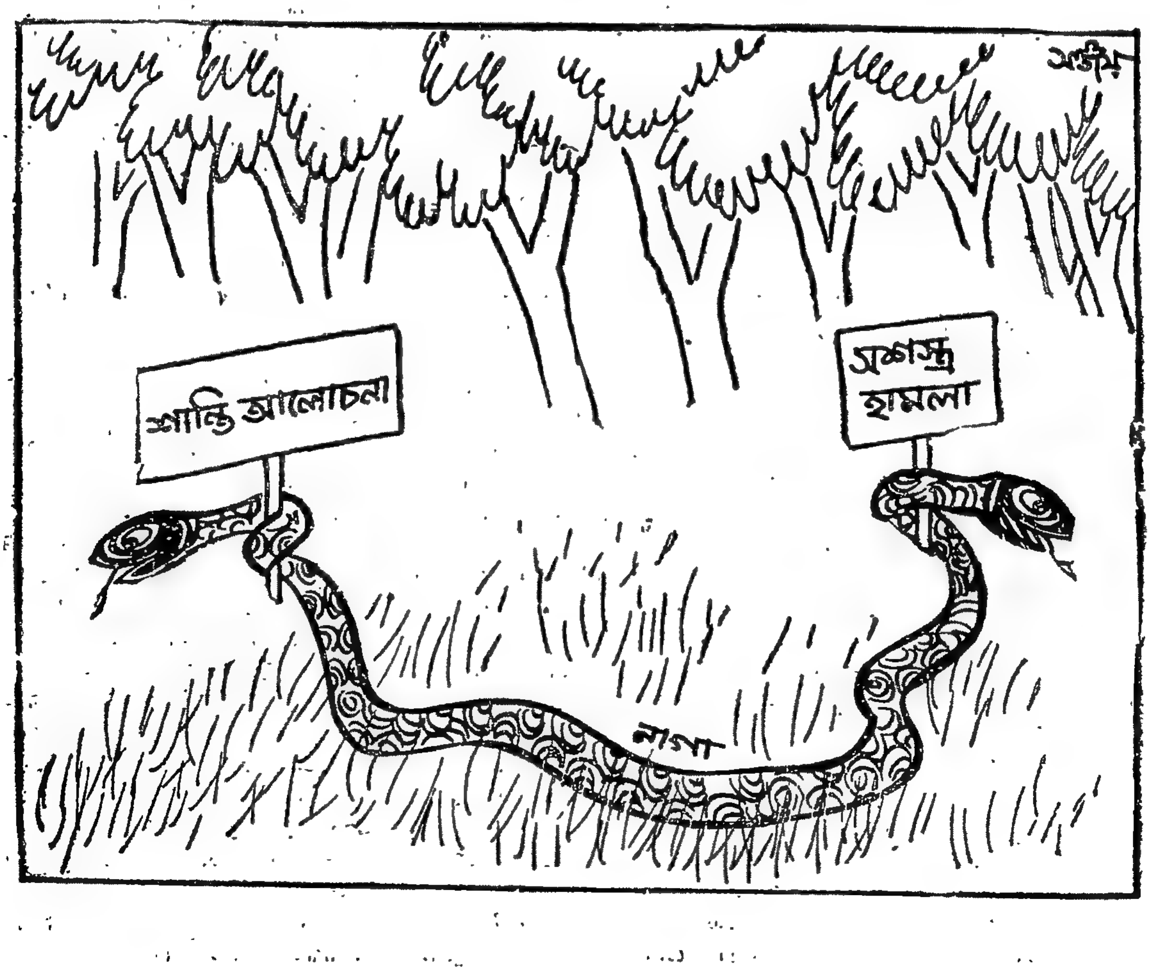

বঙ্গদর্শন

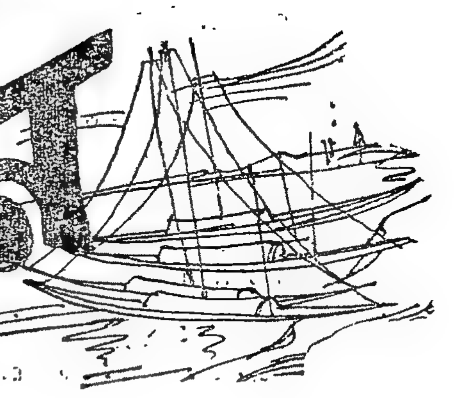

পাঠকবর্গকে প্রথমেই বিজয়ার সাদর সম্ভাষণ জানিয়ে এবারের বঙ্গদর্শন শুরু করা যাক। আশা করি এবারে পূজার দিনগুলি আপনাদের সকলেরই ভাল কেটেছে।

প্রাত্যহিক সমস্যাসংকুল জীবনের বোঝায় ভারগ্রস্ত বাঙালীর কাছে বছরের যে চারটি দিন কিছুটা আনন্দ, আশা ও সান্ত্বনার বাণী নিয়ে আসে সেই ক'টি দিনকে এত তাড়াতাড়ি বিদায় দিতে মন চায় না, তবুও বিদায় দিতে হয়।

এবারে স্থূল কথায় আসা যাক, গত সপ্তাহে সাপ্তাহিক বসুমতী প্রকাশিত হয় নি, তার আগের সপ্তাহের বঙ্গদর্শনে আমরা এমন একটা বিষয় নিয়ে আলোচনা করেছিলাম যা বঙ্গদর্শনের সনাতন ধারার ব্যতিক্রম। গত তিন সপ্তাহের মধ্যে অশান্তিকর ঘটনা (এক ছাত্র-বিক্ষোভ ছাড়া) তেমন কিছু না ঘটলেও, এমন কয়েকটি ঘটনা ঘটেছে যেগুলির তাৎপর্য খুবই সুদূরপ্রসারী। আমরা একে একে সেগুলি আলোচনা করছি।

পশ্চিমবঙ্গের প্রতি ব্যাপক অবিচার

যাঁরা সমগ্র পশ্চিমবঙ্গকে একদা পাকিস্তানের হাতে তুলে দিতে চেয়েছিলেন তাঁরা এবং তাঁদের উত্তরাধিকারীরা পশ্চিমবঙ্গের প্রতি মোটেই কোনদিন সদয় নন, একথাটা কঠিন সত্য হলেও পশ্চিমবঙ্গবাসীরা তা মনের দিক থেকে মেনে নিতে বরাবরই দ্বিধাগ্রস্ত ছিলেন এবং আজও আছেন। তথাপি তিক্ত সত্যের আলোয় এটাই বার বার প্রমাণিত হচ্ছে যে পশ্চিমবঙ্গ গত উনিশ বছর ধরে শুধু যে উপেক্ষিত তাই নয়, রীতিমত প্রবঞ্চিতও ঘটে। পর পর তিনটি পরিকল্পনায় পশ্চিমবঙ্গের প্রতি মোটেই সুবিচার করা হয় নি, এবং চতুর্থ পরিকল্পনায় পশ্চিমবঙ্গের প্রতি অবিচার এতই নগ্নভাবে প্রকটিত হয়েছে যে জনসাধারণের তরফ থেকে এই পরিকল্পিত অন্যায়ের বিরুদ্ধে ব্যাপক প্রতিবাদ আন্দোলন গড়ে তোলা ভিন্ন আর কোন পথ খোলা নেই।

সব দিক বিবেচনা করে ন্যূনতম প্রয়োজনের ভিত্তিতে পশ্চিমবঙ্গের তরফ থেকে ৬৬৯ কোটি টাকার পরিকল্পনার প্রস্তাব করা হয়েছিল। কেন্দ্রীয় সরকারের নির্দেশে তার উপর তিনবার কাঁচি চালানো হয়েছে। প্রথম দফায় ছাঁটাই করা হল ৫১ কোটি টাকা এবং প্রকল্প দাঁড়াল ৬১৮ কোটির। তারপরে এল ডিভ্যালুয়েশন। এতে টাকার মূল্যমান কমে যাওয়ার দরুণ টাকার মোট পরিমাণকে যেখানে আরও বাড়ানো উচিত, তা না করে আরও কর্তিত হয়ে তা দাঁড়াল ৫৭০ কোটি টাকায়। কিন্তু এতেও কেন্দ্রীয় সরকার খুশি হলেন না, ফলে এক কোপে এরও অর্ধেক কেটে দেওয়া হল, এবং পরিকল্পনা দাঁড়াল মাত্র ৩১৮ কোটিতে। এতে একটা বিষয় দিবালোকের ন্যায় স্পষ্ট হয়ে উঠেছে যে পশ্চিমবঙ্গের প্রতি কেন্দ্রীয় সরকারের মনোভাব শুধু যে বিমাতাসুলভ তাই নয়, তা স্বার্থবুদ্ধি প্রণোদিত এবং পশ্চিমবঙ্গকে সুপরিকল্পিত উপায়ে বঞ্চনা করার একটা নির্লজ্জ প্রয়াসমাত্র।

অথচ সমগ্র দেশের নিরিখে পশ্চিমবঙ্গকেই ভারতে সমস্ত অঙ্গ রাজ্যের চেয়ে বেশি ক্ষতি সহ্য করতে হয়েছে। দেশ বিভাগজনিত ক্ষতি, ভিতরকার ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার চাপ, পূর্ববঙ্গ থেকে আসা উদ্বাস্তুদের বোঝা, অন্য প্রদেশ থেকে আসা অজস্র মানুষের ভিড়ে পশ্চিমবঙ্গের আজ নাভিশ্বাস ওঠবার যোগাড় হয়েছে। পশ্চিমবঙ্গের অর্থনীতির কাঠামো আজ বিপর্যস্ত। প্রয়োজনের তুলনায় খাদ্যের উৎপাদন এখানে হয় না। হওয়া অবশ্যই সম্ভব ছিল, কিন্তু সমগ্র ভারতের স্বার্থে, বৈদেশিক মুদ্রার স্বার্থে, পশ্চিমবঙ্গের উর্বর ভূমিগুলিতে পাটের চাষ করানো হচ্ছে। প্রয়োজনীয় খাদ্যোৎপাদন থেকে নিজেদের বঞ্চিত করে সর্বভারতীয় স্বার্থে পশ্চিমবঙ্গকে যে ত্যাগ করতে হচ্ছে তার কোন বাস্তব স্বীকৃতি তথা প্রতিদান কি কেন্দ্রীয় সরকারের তরফ থেকে পাওয়া যাচ্ছে? পশ্চিমবঙ্গের চা কেন্দ্রের জন্য বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করছে, কিন্তু তার কতটুকু প্রতিদান পশ্চিমবঙ্গ পেয়েছে? শিল্পসমৃদ্ধ এই রাজ্যটি থেকে কেন্দ্রীয় সরকার যে পরিমাণ আয়করের মুনাফা লোটেন তার শতকরা কত অংশ পশ্চিমবঙ্গে ঘুরে আসে? ফরাক্কা এবং হলদিয়া প্রকল্প দুটির উপর কেন্দ্রীয় সরকারের বিরাগের লক্ষণ এতই সুস্পষ্ট যে তা নতুন করে ব্যাখ্যার অপেক্ষা রাখে না। কলকাতাকে ধ্বংসের মুখে ঠেলে দিতে কেন্দ্রীয় কর্তাদের কোন আপত্তি নেই, কাজেই এই 'দুঃস্বপ্ন নগরীর' উন্নতির জন্য যৎসামান্য বরাদ্দ করতেও তাঁরা নারাজ।

তদুপরি রয়েছে এখানকার অসহায় শাসকগোষ্ঠীর কথা। কলকাতায় বসে এঁরা কেন্দ্রের বিরুদ্ধে গর্জন করেন, কিন্তু দিল্লীতে হাজির হলেই এঁদের কণ্ঠস্বর নরম হয়ে যায়। এঁদের দুর্বলতাই পশ্চিমবঙ্গের বুকে ছুরি চালাতে কেন্দ্রের হাতে শক্তি যুগিয়েছে। পরলোকগত মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ রায়কে তবু কেন্দ্র কিছুটা ভয় করত, কিন্তু বর্তমান শাসকগোষ্ঠীর অপদার্থতায় কেন্দ্রীয় সরকারের আস্থা এতদূর যে তাঁরা এটুকু ভাল করেই বোঝেন যে এখান থেকে কোনদিনই কোন কার্যকর প্রতিবাদ দিল্লীকে কোন দিন বিব্রত করবে না।

বর্তমান ক্ষেত্রে পশ্চিমবঙ্গের প্রতি যে অবিচার করা হয়েছে এটা এতই চোখে লাগার মত যে এর পিছনকার উদ্দেশ্যটিকে আবিষ্কার করার জন্য কৌতূহল হয়। যদি সামান্য কিছু অংশ, এমন কি এক-চতুর্থাংশ পর্যন্ত কর্তিত হত তাহলে আমাদের মনে অন্য কোন সন্দেহ হয়ত উঁকি মারত না। কিন্তু বরাদ্দ কর্তনের

বছর দেখে মনে হয় যে কেন্দ্রীয় সরকারের মনে আরও কিছু গূঢ় মতলব আছে। তবে কি কেন্দ্রীয় সরকার এই সিদ্ধান্তে এসেছেন যে আসন্ন নির্বাচনে পশ্চিমবঙ্গে কংগ্রেসের ভরাডুবি হবে, এবং সংযুক্ত বামপন্থী ফ্রন্ট যদি ক্ষমতায় আসে তাহলে যাতে তারা ভালভাবে কাজ করতে না পারে সেই জন্য গোড়া থেকেই চতুর্থ পরিকল্পনায় পশ্চিমবঙ্গের বরাদ্দ এমন ভাবে কেটেছেঁটে দাও যাতে নতুন সরকারের পক্ষে কাজ করা একেবারেই অসম্ভব হয়ে ওঠে, এই সম্ভাবনাটিকে একেবারে উপেক্ষা করা যায় না।

মুখ্যমন্ত্রীর আবেদন প্রত্যাখ্যাত

পরিকল্পনা কমিশন কর্তৃক পশ্চিমবঙ্গের প্রতি ব্যাপক অবিচারের বিরুদ্ধে পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী দিল্লীতে তীব্র প্রতিবাদ জানিয়ে রাজ্যের দাবির অনুকূলে কেন্দ্রের হস্তক্ষেপ প্রার্থনা করে প্রধানমন্ত্রীর নিকটে একটি ব্যক্তিগত পত্র লিখেছিলেন বলে শোনা গিয়েছিল। আজ (বৃহস্পতিবার ২৭শে অক্টোবর) সেই চিঠির উত্তর প্রকাশিত হয়েছে, এবং বলাই বাহুল্য প্রধানমন্ত্রী জানিয়েছেন যে বর্তমান অবস্থায় কেন্দ্রীয় সরকার পশ্চিমবঙ্গের চতুর্থ পরিকল্পনার জন্য অতিরিক্ত কোন সাহায্য দিতে অপারগ। প্রধানমন্ত্রীর এই কথায় অবশ্য নতুনত্ব কিছুই নেই, কেন না আমরা আগেই দেখিয়েছি যে পশ্চিমবঙ্গের প্রতি এই বঞ্চনা উদ্দেশ্য-প্রণোদিত এবং সুপরিকল্পিত।

রাজ্য সরকার মনে করেন যে, পশ্চিমবঙ্গে চতুর্থ পরিকল্পনার আয়তন পাঁচশো কুড়ি কোটি টাকার কমে আনা যাবে না। আগামী সপ্তাহে নাকি মুখ্যমন্ত্রী মন্ত্রিসভার এক জরুরী বৈঠকে মিলিত হয়ে নয়াদিল্লীতে পরিকল্পনা কমিশনের নিকট পেশ করার জন্য পশ্চিমবঙ্গের বক্তব্য ঠিক করবেন। নভেম্বর মাসের প্রথম সপ্তাহে তিনি পরিকল্পনা কমিশনের ডেপুটি চেয়ারম্যান শ্রীঅশোক মেটার সঙ্গে সাক্ষাৎ করবেন, এমন কথাও আছে।

আমাদের বক্তব্য আবেদন-নিবেদনে কোনই ফল হবে না, তাতে দিল্লীর মন গলবে না। জগতে প্রত্যেকেই শক্তের ভক্ত নরমের যম। ব্যক্তি, শ্রেণী, জাতি, দেশ সব কিছু সম্বন্ধেই এ কথা খাটে। যদি মুখ্যমন্ত্রীর সে সাহস থাকে তাহলে তিনি দেখিয়ে দিন যে পশ্চিমবঙ্গ এমন একটি বিষয় যাকে উপেক্ষা করা যায় না, এবং করতে গেলে বিপদ আছে। ভীতি প্রদর্শনের দ্বারা কেন্দ্রীয় সরকারকে নত করা ছাড়া পশ্চিমবঙ্গের সামনে বিকল্প কোন পথ খোলা নেই।

এ কথাটা কেন জোর করে কেন্দ্রকে স্মরণ করিয়ে দেওয়া হয় না যে পশ্চিমবঙ্গ কেন্দ্রের বোঝা নয়, সম্পদ? মুখ্যমন্ত্রী কেন এই কথাটা জোর দিয়ে বলতে পারছেন না যে দিল্লী পশ্চিমবঙ্গকে যথোপযুক্ত সাহায্য না করলে, পশ্চিমবঙ্গও দিল্লীর সঙ্গে অসহযোগিতা করবে? তাতে দিল্লীরই সমূহ লোকসানের সম্ভাবনা কেন না ভারতের বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনে যে রাজ্যটি সবচেয়ে বড় সহায় তা হচ্ছে পশ্চিমবঙ্গ। ভারত সরকারের সবচেয়ে বেশি দুর্বলতা ওই বৈদেশিক মুদ্রার ব্যাপারেই, এবং ওই পয়েন্টে সাফল্যের সঙ্গে আঘাত দিতে পারলে, প্রাণের দায়ে কেন্দ্রকেই নরম হতে হবে, পশ্চিমবঙ্গকে নয়।

পশ্চিমবঙ্গ সরকার যেমন প্রতিজ্ঞা করেছেন যে বাস ট্রাম না পুড়লে জনসাধারণের কোন কথাই তাঁরা কানে নেবেন না, তেমনি তাঁদেরও জানা উচিত যে পাটের ক্ষেত আর চায়ের বাগান না পুড়লে কেন্দ্রীয় সরকারের কানেও জল ঢুকবে না।

বৈপ্লবিক খাদ্যনীতির বিজয়াদশমী

দেবীপক্ষের পঞ্চমী তিথিতেই পশ্চিমবঙ্গ সরকারের বৈপ্লবিক খাদ্যনীতির বিসর্জনপর্ব চুকে গেল অনেক ঢাকঢোল বাজার পর। পশ্চিমবঙ্গ সরকার রাজ্যের আগামী মরশুমের খাদ্যশস্য সংগ্রহের ভার ফুড কর্পোরেশনের হাতে দেবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন। একমাত্র বিধিবদ্ধ রেশন এলাকা ছাড়া পশ্চিমবঙ্গে অবিলম্বে খাদ্যশস্যের মূল্য নিয়ন্ত্রণবিধি প্রত্যাহারের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে। অর্থাৎ এক কথায় আগামী মরশুম থেকে রাজ্যে খাদ্যশস্যের অবাধ পাইকারী ব্যবসা চলবে।

সিদ্ধান্ত করা হয়েছে যে পশ্চিমবঙ্গ সরকার অতঃপর ফুড কর্পোরেশনের হাতে সংগ্রহ, সংরক্ষণ, পরিবহন ও সরবরাহের দায়িত্ব তুলে দেবেন।

মোদ্দা কথা হচ্ছে যে পশ্চিমবঙ্গ সরকার দেশের খাদ্যসমস্যার সমাধান করলেন দায়িত্ব এড়িয়ে। দেশবাসীর ভাগ্যে তুলে দিলেন আরও এক প্রস্থ মূল্যবৃদ্ধি, অধিকতর বিড়ম্বনা এবং অধিকতর হাহাকার। আমাদের মনে রাখতে হবে যে, যে পরিবেশে বর্তমান খাদ্যনীতি অবলম্বন করতে পশ্চিমবঙ্গ সরকার আজ দু' বছর আগে বাধ্য হয়েছেন, সেই পরিবেশকে আবার তাঁরা ফিরিয়ে আনলেন।

আমাদের মনে এমন কতকগুলো প্রশ্ন এ প্রসঙ্গে জেগেছে যার জবাব সরকারের বর্তমান সিদ্ধান্তের মধ্যে খুঁজে পাওয়া যাবে না। প্রথমত বলা হয়েছে ধানকলগুলির উপরে শতকরা ১০০ ভাগ লেভি ধার্য করার পুরাতন নীতি বদলে শতকরা ৫০ ভাগ ধার্য করার অধিকতর পুরাতন নীতিতে ফিরে যাওয়া হবে। এবং এবারে লেভি আদায় করবে পশ্চিমবঙ্গ সরকার নয়, ফুড কর্পোরেশন অফ ইণ্ডিয়া। গতবারে প্রচুর ঢাক-ঢোল বাজিয়ে, রাজ্যের সমগ্র পুলিশবাহিনী, হোমগার্ড, ন্যাশনাল ভলান্টিয়ার ফোর্স প্রভৃতির সহায়তায়, অদৃষ্টপূর্ব অশ্রুতপূর্ব ও অভূতপূর্ব অবস্থার সৃষ্টি করে পশ্চিমবঙ্গ সরকার শতকরা ১০০ ভাগ লেভি তুলতে গিয়ে শতকরা ক' ভাগ তুলতে সক্ষম হয়েছিলেন? এত ঢক্কানিনাদের পর পশ্চিমবঙ্গ সরকার তাঁর সর্বশক্তি প্রয়োগ করে যেখানে থোক প্রয়োজনীয় চাল সংগ্রহ করতে ব্যর্থ হলেন, সেখানে ফুড কর্পোরেশন ক' মুঠো চাল সংগ্রহ করতে পারবে? যে পঞ্চাশ ভাগের ছাড় দেওয়া হয়েছে, সেই ছাড়পত্র অবলম্বন করে একশো ভাগই চলে যাবে পাইকারদের গুদামে এবং বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ লেহন করা ভিন্ন ফুড কর্পোরেশনের কিছুই করার থাকবে না।

(ফলন কমের দোহাই দিয়ে 'সরকার' নিজ সংগ্রহ নীতির ব্যর্থতা ঢাকবার অপচেষ্টা করেছেন। দেশে যদি চাল না-ই থাকবে তাহলে এতদিনের চোরাচালান অব্যাহত রাখা হয়েছিল কিভাবে? কর্ডনবিধি শিথিল হবার সঙ্গে সঙ্গে রাতারাতি চালের দাম প্রায় অর্ধেকে কিভাবে নেমে গেল, যদি না দেশে প্রচুর চাল থাকে? আজ বিধিবদ্ধ রেশন এলাকার বাইরে চালের দাম এক টাকা পঁচিশ পয়সা, এবং তা' অপর্যাপ্ত পাওয়া যাচ্ছে, যেখানে প্রায় একই দাম দিয়ে রেশন এলাকার মানুষ খাচ্ছেন শ্যামদেশের চাল, যা আসলে আমদানী করা হয় কাপড়ের কলগুলির প্রয়োজনীয় মাড় তৈরির জন্য।)

আমাদের দ্বিতীয় প্রশ্ন ফুড কর্পোরেশনের হাতে যে সংগ্রহ, সংরক্ষণ, পরিবহন ও সরবরাহের দায়িত্ব তুলে দেওয়া হল, সে দায়িত্ব পালন করা ফুড কর্পোরেশনের পক্ষে কতদূর সম্ভব। ঘাটতি বছরে নিজেদের অধিকার-বহির্ভূত কোন একটি এজেন্সির হাতে সংগ্রহ ও সরবরাহের ভার তুলে দেবার পরিণাম কতদূর মারাত্মক হতে পারে সে কথা সরকার ভেবে দেখেছেন কি? কর্পোরেশন সংগৃহীত চাল কোথায় থাকবে? সে চাল যে অন্যত্র নিয়ে যাওয়া হবে না তার গ্যারান্টি কোথায়? কতখানি চাল পশ্চিমবঙ্গ থেকে সংগৃহীত হ'ল তার হিসাব ফুড কর্পোরেশন পশ্চিমবঙ্গ সরকারকে

দিতে বাধ্য থাকবে কি? সর্বভারতীয় সংস্থা হিসাবে ফুড কর্পোরেশন যদি পশ্চিমবঙ্গের চাল দিয়ে অন্যান্য ঘাটতি রাজ্যের প্রয়োজন মেটায় সেক্ষেত্রে পশ্চিমবঙ্গ সরকার কি করবেন? ফুড কর্পোরেশন কি এমন কোন প্রতিশ্রুতি দিয়েছে যে পশ্চিমবঙ্গের তামাম খাদ্যের ঘাটতি মেটাবার দায়িত্ব তার? পশ্চিমবঙ্গের তীব্রতম প্রয়োজনের সময় ফুড কর্পোরেশন যে হাত গুটিয়ে বসে থাকবে না তার নিশ্চয়তা কি?

আরও বড় প্রশ্ন পশ্চিমবঙ্গ সরকারের সঙ্গে ফুড কর্পোরেশনের সম্বন্ধ কি রকম হবে? যদি ফুড কর্পোরেশন একটি সার্বভৌম প্রতিষ্ঠান হয় তাহলে পশ্চিমবঙ্গ সরকার তার সিদ্ধান্তের উপর হস্তক্ষেপ করতে পারবেন কি? যদি কর্পোরেশনের সঙ্গে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের বনিবনা না হয় তখন পশ্চিমবঙ্গ সরকার কি করবেন? ফুড কর্পোরেশন যদি তাদের ডিকটেশনে পশ্চিমবঙ্গ সরকারকে চলতে বাধ্য করতে চায় সেক্ষেত্রে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের কি রকম দৃষ্টিভঙ্গী হবে?

তদুপরি ফুড কর্পোরেশনের হাতে খাদ্যনীতি তুলে দিয়ে খাদ্যের ক্ষেত্রে পশ্চিমবঙ্গ সরকার যে ডায়ার্কি বা দ্বৈত-শাসনের প্রবর্তন করলেন তার পরিণাম কি হবে? দেশে খাদ্যাভাব হলে লোকে তো আর ফুড কর্পোরেশনকে দায়ী করবে না, দায়ী করবে পশ্চিমবঙ্গ সরকারকে। সরবরাহের দায়িত্ব নিজেদের হাতে না থাকলে আগামী খাদ্য আন্দোলনগুলির সঙ্গে সরকার কিভাবে মোকাবিলা করবেন? মোটের উপর ফুড কর্পোরেশনের হাতে খাদ্যের দায়িত্ব অর্পণ করার ফলে এমন কতকগুলি সমস্যার সৃষ্টি হবে যা সমাধান করতে রীতিমত বেগ পেতে হবে।

একটা সমস্যাকে মেটাবার জন্য আরও বহু সমস্যার সৃষ্টি সরকার করতে চলেছেন। আমরা পূর্বে যে কথা বলেছি, দায়িত্ব এড়িয়ে কখনো দায়িত্ব পালন করা যায় না। পশ্চিমবঙ্গের খাদ্য ব্যবস্থার সমগ্র দায়িত্ব পশ্চিমবঙ্গ সরকারের হাতেই থাকা উচিত এবং অধিকতর কার্যকরী খাদ্যনীতির দ্বারাই বর্তমান খাদ্যসমস্যা দূর করা সম্ভব, যদি অবশ্য সরকারের উদ্দেশ্য এবং অবলম্বিত পদ্ধতির মধ্যে সততা থাকে।

এশিয়াটিক সোসাইটি সমাচার

এশিয়াটিক সোসাইটি বোধ হয় কলকাতা তথা ভারতবর্ষের সর্বাপেক্ষা প্রাচীন শিক্ষা ও গবেষণাকেন্দ্র। যখন চৌরঙ্গীতে ছিল ধানক্ষেত, তখন মাত্র ৩০ জন বিদেশী পণ্ডিতের চেষ্টায় গড়ে উঠেছিল প্রাচ্যবিদ্যার এই বৃহত্তম ও প্রাচীনতম গবেষণাকেন্দ্রটি এবং তার বর্তমান অবস্থা বাইরে থেকে দেখলে বেশ গৌরবজনক বলেই মনে হবে। সোসাইটির কাজকর্মের সঙ্গে একমাত্র ন্যাশনাল লাইব্রেরী, বিশ্ববিদ্যালয়সমূহ, ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন ফর দি কালটিভেশন অফ সায়েন্স এবং ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অফ সায়েন্সের তুলনা করা চলতে পারে। এশিয়াটিক সোসাইটির গ্রন্থাগারে ৫০,০০০ দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থ, চিত্র, পাণ্ডুলিপি, তাম্রশাসন প্রভৃতি আছে; তা ছাড়া আছে ২,০০,০০০-এর উপর মুদ্রিত গ্রন্থ, তিব্বতীয় জাইলোগ্রাফ, চিত্রসংগ্রহ, মাইক্রোফিল্মের মেশিন প্রভৃতি এই প্রতিষ্ঠানের বিশেষ সম্পদ।

কিন্তু প্রদীপের নিচেই অন্ধকার। দেশের যে বিত্তশালী অভিজাত শ্রেণী নামে পরিচিত ব্যক্তিগণ এই প্রতিষ্ঠানের কর্ণধার তাঁদের হাতে ভিতরে ভিতরে এই প্রতিষ্ঠানের সর্বনাশ সাধিত হতে যাচ্ছে। দেশের তথাকথিত বরেণ্য পণ্ডিত এবং প্রাজ্ঞজন পরিচালিত এই প্রতিষ্ঠান অদ্যাবধি তার কর্মচারীদের আর্থিক অবস্থার প্রতি যে মনোভাব পোষণ করে আসছে তাতে এই প্রতিষ্ঠানের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হবার যথেষ্ট কারণ আছে বলেই মনে হয়।

ভাবতে অবাক লাগে ১৯৪৭ সালে এই প্রতিষ্ঠানের কর্মীরা যে বেতন পাচ্ছিলেন আজও তার কোন উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন হয় নি। চাপরাশী, পিওন, মালী, ঝাড়ুদার প্রভৃতির মূল বেতন ২০ টাকা, সাধারণ কেরানী ও টাইপিস্ট ৬০ এবং ৭০ টাকা মূল বেতন পেয়ে থাকেন। গ্রন্থাগারিকের বেতন ৩০০ টাকা; উপগ্রন্থাগারিকের ২০০ টাকা এবং সহকারী গ্রন্থাগারিকের ১২৫ টাকা মূল বেতন। প্রাচ্যবিদ্যার সর্বশ্রেষ্ঠ গবেষণা-কেন্দ্রের কর্মীদের এই হাল।

কর্মচারীরা বারবার কর্তৃপক্ষের কাছে নিজেদের দুরবস্থার কথা নিবেদন করেছেন এবং এখনো করছেন। কিন্তু এই প্রতিষ্ঠানের পরিচালকবর্গ নিজেদের মহাপণ্ডিত বলে জাহির করেন, দম্ভের সঙ্গে কর্মচারীদের নিবেদন বার-বার প্রত্যাখ্যান করেছেন। সোসাইটির কাউন্সিল যেন প্রাণহীন জগদ্দল পাথর। পণ্যদ্রব্যের মূল্যবৃদ্ধির সঙ্গে সমতা রক্ষার জন্য সকল প্রতিষ্ঠানই আজ তাঁদের কর্মচারীদের পারিশ্রমিক যথাসম্ভব বৃদ্ধি করে যাচ্ছেন। কিন্তু অতি দুঃখের বিষয় দেশের তথাকথিত বরেণ্য পণ্ডিতগণ পরিচালিত এই প্রতিষ্ঠান মানবিকতার প্রশ্নেও কর্মচারীদের আর্থিক উন্নতির জন্য কিছুই করছেন না।

সোসাইটির বর্তমান পরিচালকমণ্ডলী সোসাইটির আর্থিক দুরবস্থাকে জীইয়ে রাখতে চান। আয়ের পথ বন্ধ করে তাঁরা কৃত্রিম ঘাটতির সৃষ্টি করছেন। একদিকে কর্মচারীদের মনে অসন্তোষ, অন্যদিকে পরিচালকমণ্ডলীর অযোগ্যতা এই প্রতিষ্ঠানকে এক সঙ্কটের দিকে নিয়ে যাচ্ছে।

অথচ এই প্রতিষ্ঠানের আয়ের উৎস বড় কম নয়। নবনির্মিত ভবনের নিচের তলাটি ভাড়া দেওয়া হয়েছে সেণ্ট্রাল ব্যাঙ্ক অফ ইণ্ডিয়া এবং মেরিট সিংগার কোম্পানীকে। এখান থেকেই বছরে ভাড়া আসে ১,২০,০০০ টাকা। সোসাইটির রিজার্ভ ফাণ্ডে বর্তমানে প্রায় ৪,৭৮,০০০ টাকা আছে। সেই টাকা দিয়ে উপরে আর একটি তলা ওঠালে, অথবা নবনির্মিত ভবনের আর একটি তলা ভাড়া দেবার ব্যবস্থা করলে বছরে আরো লক্ষাধিক টাকা আয়ের ব্যবস্থা হয়। (তবে এই প্রসঙ্গে শোনা যায় যে সোসাইটির নতুন বাড়িটি এতই ফাঁকি দিয়ে তৈরি করা হয়েছে যে পুরাতন ভবনটির যে পরিমাণ বহন ক্ষমতা আছে নতুন বাড়ির তা নেই। পুরোনো বাড়িতে যে সব পুস্তকাদি ও অপরাপর জিনিসপত্র রাখা আছে তার ভার নতুন বাড়ি বহন করতে বোধ হয় অক্ষম। এই কারণে আজো ভগ্ন জীর্ণ প্রাচীন বাড়িটিকেই যাবতীয় বোঝা বহন করতে হচ্ছে। উপরে আরো একটি তলা তুলতে হয়ত সমগ্র ভবনটিই হুড়মুড় করে ভেঙে পড়বে)।

এশিয়াটিক সোসাইটি থেকে প্রতি বছরেই অনেক বই প্রকাশিত হয় এবং সেগুলি গুদামজাত হয়ে থাকে। উপযুক্ত প্রচারের অভাবে ঠিকমত বিক্রয় হয় না, এদিকে দৃষ্টি দিলে প্রতিষ্ঠানের যথেষ্ট উপার্জন হতে পারে। কর্তৃপক্ষের অযোগ্যতায় এদিকে প্রতি বছর কিভাবে সোসাইটির পুস্তক বিক্রয়ের আয় কমে যাচ্ছে তার একটি তালিকা নিচে দেওয়া হল : ১৯৫৮-এ বিক্রি হয়েছিল ৩২,৩৯৬ টাকার; ১৯৫৯-এ ৩০,১৮১; ১৯৬০-এ ৩৪,৮১১; ১৯৬১-তে ৩৫,৬৬০; ১৯৬২-তে ২৯,৮৬৩; ১৯৬৩-তে ২১,৪১৬; ১৯৬৪-তে ২৯,১৩৫; ১৯৬৫ ও ১৯৬৬-র হিসাবটা এখনো পাই নি, তবে বিক্রির পরিমাণ আরও কমেছে। একনজরে তালিকাটি দেখলেই মনে হয় যে কিভাবে কর্তৃপক্ষের অযোগ্যতার দরুণ সোসাইটির অধিকাতর উপার্জনের পথ বন্ধ হয়ে যাচ্ছে।

প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে, যে প্রতিষ্ঠানে সহগ্রন্থাগারিকের বেতন

১২৫ টাকা সেখানে অবৈতনিক সম্পাদক মহাশয় গাড়ির দরুণ ভাতা পান ১৫০ টাকা।

এটুকু বিশ্বাস করার যথেষ্ট কারণ আছে যে এশিয়াটিক সোসাইটির গঠনতন্ত্রের আমূল পরিবর্তন না ঘটলে, এবং পশ্চিমবঙ্গ সরকার প্রত্যক্ষ হস্তক্ষেপ না করলে প্রাতঃস্মরণীয় সার উইলিয়াম জোন্স প্রতিষ্ঠিত এই জগদ্বিখ্যাত প্রতিষ্ঠানটির মৃত্যু অনিবার্য, আর পশ্চিমবঙ্গের গর্বস্বরূপ এই প্রতিষ্ঠানটির দায়িত্ব কতিপয় পণ্ডিতমন্য বাস্তুঘুঘুর নয়, সমগ্র দেশবাসীর।

নিবেদিতা শতবার্ষিকী

পশ্চিমবঙ্গের সর্বত্র এই সপ্তাহে ভগিনী নিবেদিতার জন্মশতবার্ষিকী উৎসব পালন করা হচ্ছে। গত শুক্রবার ২৮শে অক্টোবর মহাজাতিসদনে ভগিনী নিবেদিতার জন্মশতবার্ষিকী উদ্‌যাপন উপলক্ষে দুই দিন ব্যাপী অনুষ্ঠানের সূচনায় বিভিন্ন সাহিত্যিক, শিক্ষাবিদ, বৈজ্ঞানিক, সাংবাদিক ও বিভিন্ন মনীষিবৃন্দ ভগিনী নিবেদিতার জীবনী ও বাণী পর্যালোচনা করে বলেন যে, তিনি বিদেশিনী হয়েও ভারতবাসীর মনের কথা আপনার করে নিয়েছিলেন বলেই তিনি ভারতবাসীর একান্ত আপনজন হিসাবে প্রাতঃস্মরণীয়া হয়ে আছেন।

স্বামী বিবেকানন্দের প্রেরণায় তিনি ভারতে এসেছিলেন ভারতের অধ্যাত্মবাদের স্বরূপ অনুধাবন করার ও প্রাচীন ভারতীয় ঐতিহ্যে আত্মস্থ করার মহৎ উদ্দেশ্য নিয়ে, কিন্তু সেইটুকুতেই এই আইরিশ মহিলা তৃপ্ত থাকতে পারেন নি। মহৎ সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যবাহী হওয়া সত্বেও ভারতের বর্তমান অবস্থা, অর্থনৈতিক দুর্গতি তথা নৈতিক মূল্যমানসমূহের ব্যাপক অবনতি তাঁকে পীড়া দিয়েছিল। তাই তিনি একদিকে যেমন ভারতবাসীকে তার অতীত ঐতিহ্য ও মহৎ সংস্কৃতির মূল সম্বন্ধে অবহিত করার প্রেরণা জুগিয়েছিলেন অপরদিকে তেমনি এটুকুও মর্মে মর্মে উপলব্ধি করেছিলেন যে ভারতের দুর্গতি তথা অবনতির জন্য আসলে বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদই দায়ী।

এই কারণেই নিবেদিতা সাধন-ভজনের চতুঃসীমার মধ্যেই নিজেকে আবদ্ধ রাখেন নি। ভারতীয় বিপ্লববাদের তিনিই ছিলেন অন্যতমা মূল প্রেরণা। দুঃখের বিষয় নিবেদিতা চরিত্রের এই দিকটি বড় বেশি আলোচিত হয় নি। ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে নিবেদিতার যে বিশেষ অবদান আছে সেটা আজও যথাযোগ্যভাবে স্বীকৃত হয় নি। নিবেদিতা যেন শুধুমাত্র ধর্মের ক্ষেত্রেই আবদ্ধ ছিলেন এই জাতীয় প্রচারের একটা ঝোঁকই আজকাল অধিকতর ব্যক্ত।

স্বাধীনতা সংগ্রামে জাতিগঠনের কাজে, স্ত্রীশিক্ষা প্রচারে এবং আরও অজস্র জনহিতকর কর্মে এই মহিলা যে ভারতবাসীর জন্য কতদূর করে গেছেন তা' আমরা ততদিন পর্যন্ত সম্পূর্ণভাবে উপলব্ধি করতে অক্ষম হব যতদিন না পর্যন্ত তাঁর একটি গবেষণামূলক প্রামাণ্য জীবনী প্রকাশিত হচ্ছে। শতবার্ষিকীর দিনে এই কাজটি সুসম্পন্ন করার দায়িত্ব আন্তরিকভাবে গ্রহণ করলেই তাঁর প্রতি প্রকৃত শ্রদ্ধা জানানো হবে।

সমাজবিরোধী ও পুলিশ

নির্বিচারে ডাণ্ডাবাজী, গুলীবাজী ও গ্যাসবাসী করতে সরকারের আদরের পুলিশবাহিনীর জুড়ি মেলা ভার। সরকারবিরোধী যে কোন আন্দোলনকে লাঠি এবং গুলী দিয়ে মোকাবিলা করার জন্য এদের কৃতিত্ব সুবিদিত, বোধ হয় সেই জন্যই সম্প্রতি পুলিশ ইনসপেক্টরদের বেতন বৃদ্ধি করা হয়েছে।

কিন্তু পুলিশ নিশ্চয়ই পশ্চিমবঙ্গ সরকারের রিংসক্রীগ বাহিনী নয়। তার অন্য কাজও আছে। সেই কাজটি হচ্ছে সমাজ থেকে অপরাধ দূর করার উদ্দেশ্যে সক্রিয় থাকা, অপরাধীকে পাকড়াও করা এবং তাকে বিচারালয়ে চালান করা এবং মানুষের জীবন ও সম্পত্তির নিরাপত্তাবিধান।

সম্প্রতি বেশ কিছুকাল ধরে বেলঘরিয়াতে যা চলছে তাতে যে কোন লোকই বিস্ময়ের সঙ্গে এই কথাই বলবেন যে, দেশে পুলিশ আছে কি, এবং থাকলে তারা করছে কি? বছরের পর বছর ধরে একটি বিশেষ স্থানেই লুঠপাট, ছিনতাই, ছুরিকাঘাত এবং হত্যার সংখ্যা যে ভাবে বেড়ে চলছে তাতে যে কোন লোকই আশঙ্কা বোধ করবেন। বেলঘরিয়ার সমাজবিরোধীদের দৌরাত্ম্য প্রায় প্রতিদিনের সংবাদপত্রেরই বিশেষ সংবাদ হয়ে দাঁড়িয়েছে। এই সেদিন একজন সাংবাদিককে তারা লাঞ্ছিত করেছে। আজকের কাগজেও (৩০শে অক্টোবর) একটি খুনের সংবাদ আছে।

কারা এইসব সমাজবিরোধী অপকর্ম করে তা' সকলের জানা, এমন কি পুলিশেরও। কিন্তু কোন কিছুরই সুরাহা হয় না। স্থানীয় জনসাধারণ অভিযোগ করেন যে, পুলিশ জেনেশুনেও কোন ব্যবস্থা অবলম্বন করে না। পুলিশের নিশ্চয়ই এতে কোন বিশেষ স্বার্থ আছে; আমরা একথা পূর্বে বহুবার লিখেছি যে, যে কোন কোতোয়ালীতে হাজির হলেই দেখা যাবে যে সেই অঞ্চলের কোন বিশিষ্ট সমাজবিরোধী থানা অফিসারের টেবিলের উপর শ্রীচরণ দুটি তুলে দিয়ে সিগারেট ফুঁকতে ফুঁকতে রসালাপ করছে। পুলিশের সঙ্গে সমাজবিরোধীদের (এদের মধ্যে অনেকের সঙ্গেই রাজনৈতিক নেতাদের দহরম-মহরম সম্পর্ক আছে) এই রকম বৈষ্ণব পরকীয়া সম্পর্ক দেখে যাঁরা এদের সম্বন্ধে অনেক খোঁজ-খবর জানেন, তাঁরাও তা প্রকাশ করতে সাহস করেন না, কেন না পুলিশ তাঁদের জীবনের গ্যারান্টি দেবে না।

বেলঘরিয়ার ঘটনাবলী দেশে এক আশ্চর্য নৈরাজ্যের সাক্ষ্য দিচ্ছে। অবিলম্বে সেখানে সমাজবিরোধীদের শায়েস্তা না করলে পরিণাম অত্যন্ত খারাপ দাঁড়াবে। পারিপার্শ্বিক সাক্ষ্য থেকে যা বোঝা যাচ্ছে বেলঘরিয়ার সমাজবিরোধী দৌরাত্ম্যের ক্ষেত্রে পুলিশও একটি পক্ষ। কাজেই এ-বিষয়ে আমরা ইনস্পেক্টর-জেনারেলের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। বেলঘরিয়ায় কর্তব্যরত পুলিশবাহিনীকে সমূলে অন্যত্র বদলী করা হোক এবং তাদের ব্যর্থতার কৈফিয়ৎ দাবি করা হোক। নতুন লোক নিযুক্ত করে, সেখানকার সমাজবিরোধীদের গ্রেপ্তার করা হোক। এ বিষয়ে বিলম্ব মোটেই বাঞ্ছনীয় নয়।

David Hare

Peary Chand Mittra

মূল্যঃ এক টাকা মাত্র

প্যারীচাঁদ মিত্র ওরফে টেকচাঁদ ঠাকুরের ১৮৭৭ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত মূল্যবান ইংরাজী ভাষায় লিখিত গ্রন্থখানি বসুমতী সাহিত্য মন্দির জাতির পূর্ণাঙ্গ ইতিহাসের অন্যতম প্রামাণ্য বিবরণী হিসাবে পুনঃ প্রকাশ করিয়াছেন।

বসুমতী প্রাইভেট লিমিটেড

১৬৬, বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী স্ট্রীট, কলিকাতা—১২

সাহিত্য সাধক দীনেশচন্দ্র সেন

◎ রজত রায়চৌধুরী ◎

১৭ই কার্তিক ১২৭৩—৪ঠা অগ্রহায়ণ ১৩৪৬

বাংলা-সাহিত্যে দীনেশচন্দ্র সেই বিরল মানুষ, যিনি, আমৃত্যু সাহিত্য-সাধনায় নিমগ্ন থেকে অবক্ষয় ও অবলুপ্তির হাত থেকে প্রাচীন বাংলা-সাহিত্যের অনেক অমূল্য সম্পদ উদ্ধার করে গেছেন। পর্বতপ্রমাণ বাধা, অর্থকষ্ট ও বহুবিধ অন্তরায় তাঁর সাধনার পথে মাঝে মাঝেই উৎপাত করেছে—কিন্তু কর্মবীর দীনেশচন্দ্র যেন স্বর্ণতৃষ্ণায় কাতর কোন পথিক। প্রাচীন বাংলা-সাহিত্যের সুবর্ণ-খনির সন্ধানে তিনি ত্যাগ করেছিলেন বিশ্রামের সুখনিবিড় মুহূর্ত, অভুক্ত থেকেছিলেন প্রহরের পর প্রহর, ক্লান্তি ও অবসাদকে দূরে রেখে উন্মত্তের মত গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে পুঁথির সন্ধানে ছুটে বেড়িয়েছিলেন দিনের পর দিন। শ্রীরাধার যে ব্যাকুলতা, সেই ব্যাকুলতাই ছিল দীনেশচন্দ্রের কবি-প্রেমিক অন্তরে। তাই, আবিষ্কারের আনন্দের উত্তেজনার স্পর্শ পড়েছে তাঁর রচনায়; তাই, হৃদয়ের সুরতরঙ্গ মূর্ছিত হয়েছে যত্রতত্র; তাই, আবেগোচ্ছ্বাস চণ্ডীদাসের শ্রীরাধিকার 'আকুল করিল মোর প্রাণ'-এর মতন দীনেশচন্দ্রে বর্তমান। তবু, সেই যে দীনেশচন্দ্র বলেছিলেন, 'আমি বাংলার সর্বশ্রেষ্ঠ কবি হইব। যদি তাহা হইতে না পারি, তবে সর্বশ্রেষ্ঠ ঐতিহাসিক হইব।'—১ সেই কবিমন দীনেশচন্দ্রের সকল রচনার ভেতর সহজেই পরিদৃশ্যমান। আজ বাংলা-সাহিত্যের যে ব্যাপ্তি, যে ইতিহাস, যে লোকশ্রুতি তার পথিকৃৎ দীনেশচন্দ্র। বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের ইতিহাসকে আজ যে উচ্চ-মাধ্যমিক থেকে স্নাতকোত্তর শ্রেণী পর্যন্ত পাঠ্যতালিকার অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে—একথা নির্দ্বিধায় বলা চলে দীনেশচন্দ্রই তার প্রথম উদ্গাতা; তিনিই পথপ্রদর্শক—কি গ্রন্থরচনায়, কি পাঠ্যশ্রেণীতে অন্তর্গত করার ক্ষেত্রে। "ধৈর্য, অধ্যবসায়, নিষ্ঠা, শ্রমশীলতা প্রভৃতি গুণাবলীর সমন্বয়ে যে কিরূপ দুঃসাধ্য কর্ম সম্পাদন করা যাইতে পারে, দীনেশচন্দ্রের জীবন তাহার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত।" ২

পুঁথি-পাগল দীনেশচন্দ্র

বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস, গতি-প্রকৃতি ও বৈচিত্র্য যে স্বল্পসংখ্যক পুঁথি-পাগল সাহিত্য-প্রেমিকের অনলস শ্রমশীলতায় ও সাধকোচিত নিষ্ঠায় সুনির্দিষ্ট হয়েছে, দীনেশচন্দ্র নিঃসন্দেহে তাঁদের মধ্যে অন্যতম। দীনেশচন্দ্রের সমসাময়িককালে অপর যে ব্যক্তি পুঁথির সন্ধানে ঘর-বার এক করেছিলেন তিনি মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী। তবে হরপ্রসাদ সংস্কৃত পুঁথির আবিষ্কার-অনুসন্ধানে যতখানি তৎপর, বাংলা পুঁথির বেলায় দীনেশচন্দ্র ততখানি। আত্মহারা পাগলের মত দীনেশচন্দ্র ত্রিপুরা ও চট্টগ্রামের পল্লীতে পল্লীতে পর্যটন করে আবিষ্কার করলেন 'সঞ্জয়কৃত মহাভারত; গোপীনাথ দত্তের দ্রোণপর্ব, রাজেন্দ্র দাসের শকুন্তলা; দ্বিজ কংসারির প্রহ্লাদ চরিত্র; রাজারাম দত্তের দণ্ডীপর্ব; ষষ্ঠীবর ও গঙ্গা দাসের মহাভারতোক্ত উপাখ্যান।'১ এরপর এশিয়াটিক সোসাইটির পণ্ডিত শ্রীযুক্ত বিনোদবিহারী কাব্যতীর্থের সহায়তায় দীনেশচন্দ্রের সংগ্রহশালায় এল পরাগলী মহাভারত; ছুটি খাঁর অশ্বমেধ পর্ব প্রভৃতি। তাছাড়া ত্রিপুরা, নোয়াখালী, শ্রীহট্ট, ঢাকা প্রভৃতি স্থানগুলো (বর্তমানে পূর্ব পাকিস্তানের অন্তর্গত, ত্রিপুরা বাদে) পরিভ্রমণ করে দীনেশচন্দ্র যোগাড় করলেন কবি আলাওল কৃত পদ্মাবতী, রাজা জয়নারায়ণ ঘোষাল কৃত কাশীখণ্ড, রামেশ্বর নন্দীর মহাভারত; মধুসূদন নাপিত প্রণীত নলদময়ন্তী২ ইত্যাদি। এ ছাড়া উদ্ধারণ দত্তের বংশধর হুগলী বদনগঞ্জের হারাধন দত্ত ভক্তবিনোদ দত্ত শ্রীহট্টের অচ্যুতচরণ তত্ত্বনিধিও পুঁথির সংগ্রহে দীনেশচন্দ্রকে যথেষ্ট সহায়তা করেছেন।

প্রাচীন ও মধ্যযুগের বাংলা-সাহিত্যের বিস্তৃত আঙিনায় কত পুষ্প কত সৌরভ—দীনেশচন্দ্র তাঁর সন্ধান দিয়েছেন। আর্দ্র জলবায়ু, কীটগণের উপদ্রব, তুলোট কাগজ—পুঁথি রক্ষা করা এদেশে রীতিমত কষ্টসাধ্য। তাছাড়া "পল্লীগ্রামের হস্তলিখিত পুঁথি খোঁজ করা অতি দুরূহ ব্যাপার—বিশেষতঃ প্রাচীন বাঙ্গালা পুঁথির অধিকাংশই নিম্নশ্রেণীস্থ লোকের ঘরে রক্ষিত; আমাদের সাগ্রহ যুক্তি, তর্ক ও বুদ্ধির কৌশল অনেক সময়েই তাহাদের কুসংস্কারের দৃঢ়ভিত্তি বিচলিত করিতে পারে নাই, তাহারা কোন ক্রমেই পুস্তক দেখাইতে সম্মত হয় নাই; দৈবাৎ পুস্তক ধরা পড়িলে কেহ কেহ ট্যাক্সের ভয়ে নিতান্ত অভিভূত হইয়া পড়িয়াছে।"৩ এমতাবস্থায় দীনেশচন্দ্র বাংলা ভাষার সম্পদগুলোকে আবিষ্কার করে যে অসাধ্যসাধন করেছেন, তার স্বাক্ষর তাঁর গ্রন্থরাজিতে সুস্পষ্ট।

ঐতিহাসিক দীনেশচন্দ্র

বঙ্গভাষা ও সাহিত্যের প্রথম সংস্করণের ভূমিকায় দীনেশচন্দ্র ইতিহাসচর্চার প্রেরণার উল্লেখ করেছেন। "অদ্য ছয় বৎসর গত হইল একদিন আমার পুস্তকাধারস্থিত অতি জীর্ণ, গলিত পত্র, প্রেমাশ্রুর নীরব নিকেতন চণ্ডীদাসের কবিতাখানা পড়িতে পড়িতে প্রাচীন বঙ্গসাহিত্যের একখানা ধারাবাহিক ইতিহাস লিখিতে ইচ্ছা জন্মে।" এই ইচ্ছার কথা প্রকাশ করলে, আরও একজন তাঁর সঙ্গে এগিয়ে আসেন। তিনি ভিক্টোরিয়া স্কুলের পণ্ডিত চন্দ্রকুমার কাব্যতীর্থ।

কুমিল্লার ভিক্টোরিয়া স্কুলের প্রধান শিক্ষকের পদে অধিষ্ঠিত থাকাকালীন ১৮৯১ সালে তিনি তিনটি প্রবন্ধ লেখেন এবং বাংলার পাঠকসমাজে পরিচিত হন। গদ্যরচনার প্রয়াস তাঁর এই প্রথম। কালিদাস ও শেক্সপীয়ার 'জন্মভূমি'তে ও জন্মান্তরবাদ 'অনুসন্ধান' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। প্রথম প্রবন্ধের

১। ঘরের কথা ও যুগ সাহিত্য।

২। সাহিত্য সাধক চরিতমালা (৯০)

১। বঙ্গভাষা ও সাহিত্য (১ম সংস্করণের ভূমিকা)

২। ঐ

৩। ঐ

...সম্পাদক যোগেন্দ্রনাথ বসু পারিশ্রমিক পাঠিয়ে দেন। দ্বিতীয় প্রবন্ধ পড়ে ঈশানচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় "সম্পাদককে একখানা পত্র লেখেন, তাহাতে লিখিত ছিল, আমি ভবিষ্যৎ বাণী করিতেছি, এই লেখক অচিরে বঙ্গ-সাহিত্য ক্ষেত্রে বিশেষ প্রতিষ্ঠা লাভ করিবেন।"১ তৃতীয় প্রবন্ধই তাঁকে যশের মুকুট এনে দিল। কলকাতার স্টীস এসোসিয়েশনের উদ্যোগে এক প্রবন্ধ প্রতিযোগিতায় দীনেশচন্দ্রের 'বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের ইতিহাস' প্রবন্ধটি সর্বশ্রেষ্ঠ পুরস্কার লাভ করল। দীনেশচন্দ্র ইতিহাসচর্চায় দ্বিতীয়বার প্রেরণা পেলেন। তৃতীয় প্রেরণা এল ঢাকা থেকে। সেখানে এক অনুষ্ঠানে তিনি পাঠ করলেন "প্রদাবলীর আলোকে চণ্ডীদাস' সেখানেই কবিকঙ্কণ চণ্ডী' সম্বন্ধে তাঁর তথ্যজ্ঞানপূর্ণ আলোচনা বিদগ্ধ পণ্ডিতমণ্ডলী কর্তৃক উচ্চ প্রশংসিত হল। এরপর একটানা ছয় বছরের সাধনার ফলশ্রুতিঃ বঙ্গভাষা ও সাহিত্য। ত্রিপুরার মহারাজা বীরেন্দ্র মাণিক্যের অর্থানুকুল্যে ত্রিপুরা রাধারমণ প্রেস থেকে বঙ্গভাষা ও সাহিত্যের প্রথম আত্মপ্রকাশ ঘটল ১৮৯৬ খৃস্টাব্দে। আর সঙ্গে সঙ্গে বাংলার পাঠকমহলে দীনেশচন্দ্র স্থায়ী আসন পেয়ে গেলেন।

এই প্রসঙ্গে বাংলা ভাষায় সাহিত্যের ইতিহাসচর্চার পূর্বানুসন্ধানে উনিশ শতকের প্রথম থেকেই সাময়িকপত্রে (সমাচার দর্পণ ও দি ফ্রেন্ড অব ইন্ডিয়া) ইতিহাসের ক্ষীণ ধারা অনুবর্তনের প্রয়াস দেখতে পাওয়া যায়। অবশ্য ইতিহাসচর্চার উপাদানগুলো, যেমন গ্রন্থ ও গ্রন্থকারের তালিকার বিবরণ সংকলিত করে পরবর্তীকালের ইতিহাসকারদের জন্য সহায়তা করে গেছেন রেভারেন্ড লং; জে, ওয়েঙ্গার; জে, মাডাফ প্রমুখ। ১৮৫৩-৫৫ সালে সংবাদ প্রভাকরে কবি ও কবিওয়ালাদের জীবনকথা ও কাব্যপরিচয় ধরে রেখেছেন ঈশ্বর গুপ্ত। তেমনি পরিচয় পাওয়া যায় হরিশচন্দ্র মিত্রের 'কবিকলাপ'১ গ্রন্থে (১ম খণ্ড ১৮৬৬)। এবং হরিমোহন মুখোপাধ্যায়ের ১৮৬৯ সালে প্রকাশিত কবিচরিত' গ্রন্থে। কিন্তু বাংলার সমাজজীবন, তার পারিপার্শ্বিক ও পরিবেশ কবিমানসের সঙ্গে সম্পৃক্ত করে এঁরা কেউ-ই দেখান নি। ফলে ইতিহাসচর্চায় এঁদের গ্রন্থগুলো উপাদানের দিক থেকে মূল্যবান হলেও এ গ্রন্থগুলো পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস নয়। মহেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় ১৮৭১ সালে 'বঙ্গভাষার ইতিহাস' গ্রন্থে বাংলা ভাষার ইতিহাস আলোচনার সূত্রপাত করেছেন। এবং বৈদিক যুগ থেকেই তা আরম্ভ করতে চেয়েছেন। ১৮৭৩ সালে প্রকাশিত হল রামগতি ন্যায়রত্নের গ্রন্থ "বাঙ্গালা ভাষা ও বাঙ্গলাসাহিত্য বিষয়ক প্রস্তাব।" রামগতিই প্রথম বাংলা সাহিত্যের পর্ব সুনির্দিষ্ট করেন। চৈতন্যপূর্ব, চৈতন্য হতে ভারতচন্দ্র পর্যন্ত, এবং ভারতচন্দ্র পরবর্তী। মোটামুটি এই পর্বই আজও প্রতিষ্ঠিত। তবে কারুর মতে, মহেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ই সর্বপ্রথম 'বঙ্গভাষার ইতিহাস' প্রকাশ করেন।'২ ১৮৭৫ সালে প্রকাশিত পদ্মনাভ ঘোষাল ও অবিনশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের 'গোড়ীয় ভাষা-তত্ত্ব গ্রন্থের নাম এ প্রসঙ্গে স্মরণীয়। তবে ১৮৭৭ সালে রমেশচন্দ্র দত্তের 'Literature of Bengal' যতটা ঐতিহাসিক, তার চেয়ে বেশি বাঙালীর মনোজগতের গতি-প্রকৃতি নির্ণয়কারক। এছাড়া রাজনারায়ণ বসু ১৮৭৮ সালে 'জাতীয় সভার', 'বাঙ্গালা ভাষা ও সাহিত্য বিষয়ক বক্তৃতা' দেন, তাতে বাংলা সাহিত্যের মূল্য বিচারের প্রয়াস লক্ষণীয়। আরও দুটি মুদ্রিত পুস্তকের প্রসঙ্গ এসে পড়ে। একটি ঢাকার কলেজ ভবনে প্রদত্ত গঙ্গাচরণ সরকারের 'বঙ্গ সাহিত্য ও বঙ্গভাষা বিষয়ে বক্তৃতা' ১৮৮০ খৃস্টাব্দে এবং 'সাবিত্রী লাইব্রেরী'র বাৎসরিক অধিবেশন উপলক্ষে হরপ্রসাদ শাস্ত্রী কর্তৃক পঠিত 'বর্তমান শতাব্দীর বাঙ্গালা সাহিত্য' ১৮৮১ খৃস্টাব্দে মুদ্রিত হয়।'১ কৈলাসচন্দ্র ঘোষের 'বাঙ্গালা সাহিত্য' প্রকাশিত হয় ১৮৮৫ সালে।

উপরোক্ত বিবরণ প্রমাণ করে দীনেশচন্দ্র ছয় বছরের অক্লান্ত পরিশ্রমে কী অসাধ্য সাধন করেছেন। বঙ্গভাষা ও সাহিত্যের দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হলে রবীন্দ্রনাথ লেখেন, 'এই গ্রন্থের প্রথম সংস্করণ যখন বাহির হইয়াছিল তখন দীনেশবাবু আমাদিগকে বিস্মিত করিয়া দিয়াছিলেন। প্রাচীন বঙ্গসাহিত্য বলিয়া এতবড়ো একটা ব্যাপার আছে তাহা আমরা জানিতাম না। তখন সেই অপরিচিতের সহিত পরিচয় স্থাপনেই ব্যস্ত ছিলাম।......আমরা দীনেশবাবুর গ্রন্থের মধ্যে বাংলা দেশের বিচিত্র শাখাপ্রশাখাসম্পন্ন ইতিহাসবনস্পতির বৃহৎ আভাস দেখিতে পাইয়াছি।' ২

বঙ্গভাষা ও সাহিত্য বিপুলভাবে বঙ্গবাসীকে নাড়া দেয়। বিলাতের Tinees Literary Supplement, June 20, 1912 লেখেন, "He tells more about the Hind mind then we can gather from 50 Volumes of impressions of travel by Europeans. Loti's picturesque account of Travancore temples, and even M. Chevrillon's synthesis of much browsing on Hindu scriptures seem faint records by the side of this unassuming tale of Hindu Literature." ৩

এই প্রসঙ্গে অন্য একটি কথা এসে পড়ে। ইংরেজী ভাষায় হাজার পৃষ্ঠার অধিক History of Bengali Language and Literature গ্রন্থটি ১৯১১ সালে প্রকাশিত হয়। এবং প্রকাশিত হবার সঙ্গে সঙ্গেই য়ুরোপের সুধীমণ্ডল তাকে সমাদরে গ্রহণ করেন। Times Literary Supplement-এ দু' স্তম্ভব্যাপী সমালোচনা প্রকাশিত হয় বিশে জুন ১৯১২। সিলভাঁ লেভি, ১৮ই এপ্রিল ১৯১২ লেখেন, 'One cannot praise too highly the work of Dr. Sen. A profound original erudition has been associated with vivid imagination—the historian, relying on his document of an epic poet. ....The appreciation of life, so rare in our book-knowledge, runs throughout the work." ১ এ ছাড়া Spectator, Athenium, Revue Critique, Frankfurter Zeiting, Dentgotic Rund Schon প্রভৃতি ইংরেজী, ফরাসী, জার্মান ও ইতালী দেশীয় পত্রপত্রিকায় দীনেশচন্দ্রের গ্রন্থরাশির সপ্রশংস সমালোচনা প্রকাশিত হয়। সুতরাং একথা বলা যেতে পারে

১। বাংলার পুরনারী (জীবনকথা)
১। সাহিত্য সাধক চরিতমালা (২৪)

২। বাংলা গদ্যের প্রথম যুগ (পৃঃ ৩)
১। বাংলা গদ্যের প্রথম যুগ (পৃঃ ৪)

২। সাহিত্য * (বড় হরফ আমাদের)
৩। ঘরের কথা ও যুগ সাহিত্য।
১। ঘরের কথা ও যুগ সাহিত্য থেকে উদ্ধৃত।

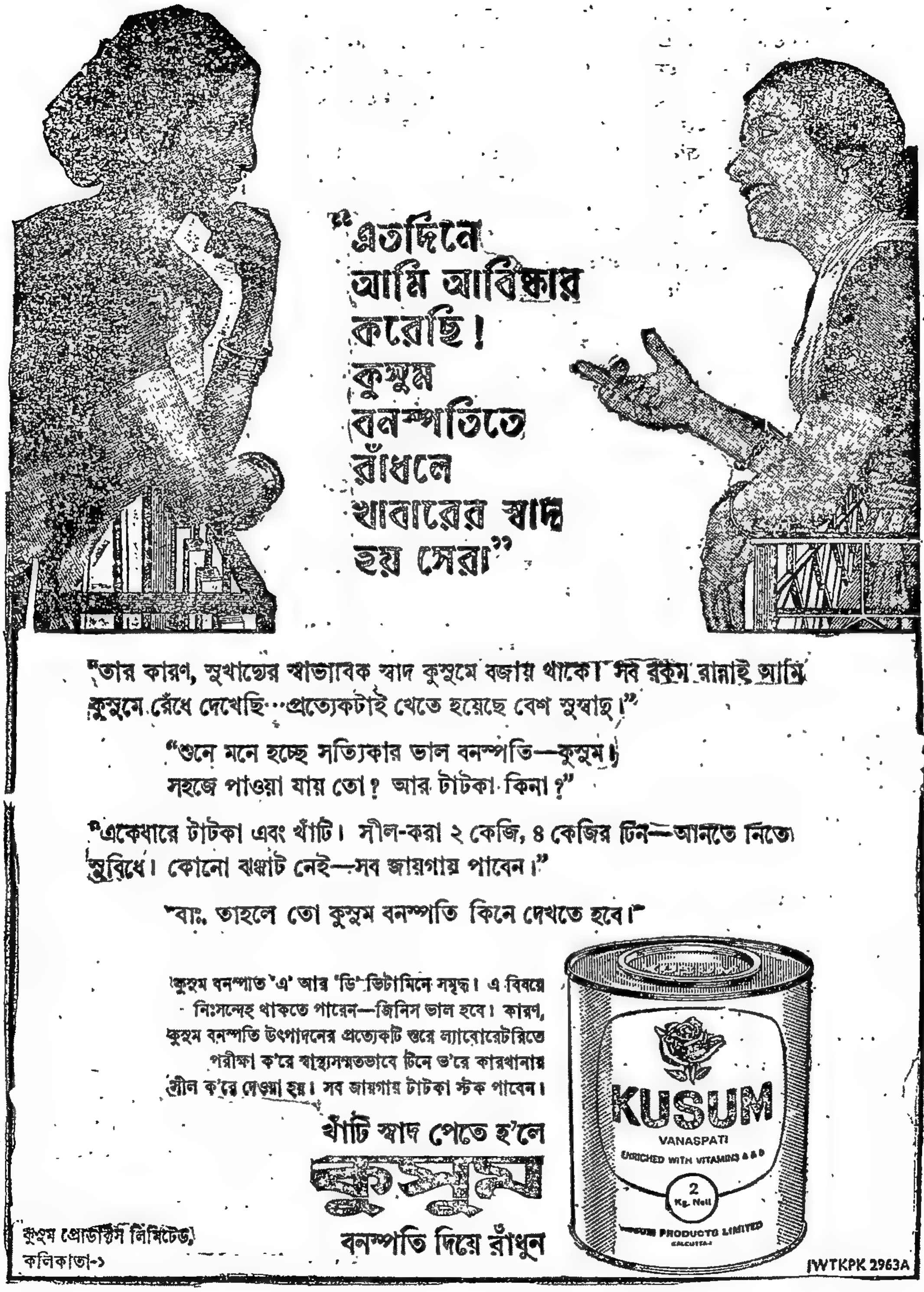
"এতদিনে আমি আবিষ্কার করেছি! কুসুম বনস্পতিতে রাঁধলে খাবারের স্বাদ হয় সেরা"
"তার কারণ, সুখাদ্যের স্বাভাবিক স্বাদ কুসুমে বজায় থাকে। সব রকম রান্নাই আমি কুসুমে রেঁধে দেখেছি···প্রত্যেকটাই খেতে হয়েছে বেশ সুস্বাদু।"
"শুনে মনে হচ্ছে সত্যিকার ভাল বনস্পতি—কুসুম। সহজে পাওয়া যায় তো? আর টাটকা কিনা?"
"একেবারে টাটকা এবং খাঁটি। সীল-করা ২ কেজি, ৪ কেজির টিন—আনতে নিতে সুবিধে। কোনো ঝঞ্ঝাট নেই—সব জায়গায় পাবেন।"
"বাঃ, তাহলে তো কুসুম বনস্পতি কিনে দেখতে হবে।"
কুসুম বনস্পাত 'এ' আর 'ডি' ভিটামিনে সমৃদ্ধ। এ বিষয়ে নিঃসন্দেহ থাকতে পারেন—জিনিস ভাল হবে। কারণ, কুসুম বনস্পতি উৎপাদনের প্রত্যেকটি স্তরে ল্যাবোরেটরিতে পরীক্ষা ক'রে স্বাস্থ্যসম্মতভাবে টিনে ভ'রে কারখানায় সীল ক'রে দেওয়া হয়। সব জায়গায় টাটকা স্টক পাবেন।
খাঁটি স্বাদ পেতে হ'লে
কুসুম
বনস্পতি দিয়ে রাঁধুন
KUSUM
VANASPATI
ENRICHED WITH VITAMINS A & D
2 Kg. Nett
KUSUM PRODUCTS LIMITED
CALCUTTA-1
কুসুম প্রোডাক্টস লিমিটেড,
কলিকাতা-১
JWTKPK 2963A

হয়, রবীন্দ্রনাথের গীতাঞ্জলির প্রথম আত্ম-প্রকাশের (ইংরেজীতে) পূর্বে পাশ্চাত্য গুণীসমাজে বাংলা সাহিত্যকে সুপরিচিত করিয়েছিলেন দীনেশচন্দ্র। Indian Society কর্তৃক ১৯১২ সালে গীতাঞ্জলির প্রথম আবির্ভাব। W. B. Yeats-এর ভূমিকাটি লেখা হয় সেপ্টেম্বর ১৯১২। তাতে জানা যায় এই ভূমিকা লেখার কিছুদিন পূর্বে ইয়েটস রবীন্দ্রনাথের কাব্যপ্রসঙ্গের কথা জনৈক বাঙালী ডাক্তারের কাছে জানতে পারেন।২ অতএব, রবীন্দ্রনাথের নোবেল পুরস্কার প্রাপ্তির পূর্বেই বাংলা সাহিত্যের প্রতিষ্ঠার সূত্রপাত সেখানে হয়েছিল। দীনেশচন্দ্রই সেই বিরল সৌভাগ্যের অধিকারী ব্যক্তি, যিনি বাংলা সাহিত্যকে বিশ্বপ্রাঙ্গণে প্রথম উপস্থিত করিয়েছিলেন। একথা অনুমান করাও বোধহয় অসঙ্গত হবে না, দীনেশচন্দ্রের গ্রন্থটি রবীন্দ্রনাথের নোবেল পুরস্কার প্রাপ্তির ক্ষেত্রে পরোক্ষভাবে য়ুরোপীয় মানসে কিছুটা ভূমিকা প্রস্তুত করে রেখেছিল।

পরবর্তীকালে দীনেশচন্দ্রের কোন কোন তথ্য, বিবরণ ও মন্তব্য নিয়ে পণ্ডিতমহলে বিতর্ক উঠেছে। তাঁর রচনার মধ্যে ইতিহাসবিদদের অন্তরালে আবেগপ্রবণ হৃদয়োচ্ছ্বাসকে বড় করে দেখেছেন কেউ। বিতর্ক উঠেছে কৃত্তিবাসের জন্মবিবরণ নিয়ে, গোবিন্দ দাসের কড়চা নিয়ে, মৈমনসিংহ গীতিকার প্রামাণিকতা নিয়ে। বঙ্গভাষা ও সাহিত্যের অষ্টম সংস্করণে শ্রীপ্রবোধচন্দ্র বাগচি উক্ত গ্রন্থের পরিশিষ্টে কতিপয় ইতিহাসগত ও কালানুক্রমিক ভুলত্রুটির উল্লেখ করেছেন। কিন্তু এই ভুলত্রুটিকে বড় করে দেখতে গেলে দীনেশচন্দ্রের প্রতি ভুল বিচার করা হবে। স্বল্প মাল-মসলা নিয়ে দীনেশচন্দ্র পথ তৈরি করে গেছেন। তখন তিনি ছিলেন একাকী পথিক। আজ সে পথ প্রশস্ত হয়েছে—পথিকের সংখ্যাও বেড়েছে অনেক। কিন্তু নব নব আবিষ্কারে যেমন নব নব মূল্যায়ণ হয়েছে বাংলা সাহিত্যের—তেমনি মতও বদল করেছেন অনেক ইতিহাসকার। একালের ইতিহাসকার ডক্টর সুকুমার সেন নিজেই নিজের মত বদল করেছেন শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের লিপিকার সম্বন্ধে।১ সুতরাং দীনেশচন্দ্রের মতবাদজনিত পার্থক্য থাকলেই তা তাঁর কীর্তিকে বিনষ্ট করে না।

২। Gitanjali (Macmillan & Co., Limited—Introduction).

১। বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস (১ম খণ্ড, পূর্বার্ধ)

অথচ বাংলা সাহিত্যের ক্ষেত্রে এ এক আশ্চর্য ব্যাপার। লেখক গত হলেই তিনি ধীরে ধীরে পাঠকমন থেকে সরে যান। এ ব্যাপারে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোর কর্তৃপক্ষও বোধহয় কিছুটা সহায়তা করে থাকে পরলোকগত লেখকের গ্রন্থগুলো পাঠ্যতালিকার থেকে সযতনে সরিয়ে দিয়ে। অবশ্য দীনেশচন্দ্র, মত একবার প্রকাশ করেছি বলে, অপরবার যুক্তি থাকলেও পরিবর্তন করব না—এমন মনোভাব কখনও দেখান নি। 'আমার পুস্তক ও নিবন্ধমালার কেহ দোষ দেখাইলে আমি তৎক্ষণাৎ তাহা গ্রহণ করিয়া থাকি। ঐতিহাসিক আলোচনায় ভ্রমপ্রমাদ অবশ্যম্ভাবী। উত্তরোত্তর ভাষা ও সাহিত্যের শ্রীবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে প্রাচীনকালের ভুল সংস্কারগুলি সংশোধন করা বাঞ্ছনীয়। আমি ভুলগুলি আঁকড়াইয়া ধরিয়া নিজের জেদ বজায় রাখিব, এমন মতিচ্ছন্ন আমার হয় নাই'২—দীনেশচন্দ্র নিজেই বলে গেছেন একথা।

সাহিত্যের ইতিহাসের কয়েকটি প্রসঙ্গ নিয়ে বাদানুবাদ চলাকালে রবীন্দ্রনাথ পত্রযোগে লিখলেন, 'তর্ক-বিতর্কের আন্দোলনে ক্ষুব্ধ হইবেন না। সাহিত্যক্ষেত্রে নামিয়া কোনপ্রকার কুশের কাঁটা পায়ে ফোটে নাই এমন সৌভাগ্যবান কে আছে? শত্রুরা নিন্দাবাক্যে হাসেন এবং বন্ধুরা ক্ষুব্ধ হন, কিন্তু কুয়াশা দেখিতে দেখিতে কাটিয়া যায়, কাহারো মনে থাকে না।'১

দীনেশচন্দ্রের ইতিহাস চর্চার অপর নিদর্শন 'সরল বাংলা সাহিত্য' ও 'বৃহৎ বঙ্গ' এবং 'প্রাচীন বাংলা সাহিত্যে মুসলমানের অবদান' গ্রন্থে। বৃহৎ বঙ্গ গ্রন্থটি বাংলার সমাজ, রাষ্ট্র, অর্থনীতি, ধর্ম ও সুকুমার কলা সম্বন্ধীয় দলিলস্বরূপ।

লোকসাহিত্যিক দীনেশচন্দ্র

রবীন্দ্রনাথ লিখলেন, "বাংলা প্রাচীন সাহিত্য মঙ্গল কাব্য প্রভৃতি কাব্যগুলি ধনীদের ফরমাসে ও খরচে খনন করা পুষ্করিণী, কিন্তু ময়মনসিংহ গীতিকা বাংলা পল্লীহৃদয়ের গভীর স্তর থেকে স্বত উচ্ছ্বসিত উৎস, অকৃত্রিম বেদনার স্বচ্ছ ধারা। বাংলা সাহিত্যে এমন আত্মবিস্মৃত রসসৃষ্টি আর কখনো হয়নি।

২। গোবিন্দ দাসের কড়চার ভূমিকা (পৃঃ ৮০)

১। বিশ্বভারতী ॥ ২৩ বর্ষ ॥ ২য় সংখ্যা ॥

এই আবিষ্কারটির জন্য আপনি ধন্য।"২ মনে হয় বাংলা সাহিত্যে 'মৈমনসিংহ গীতিকা'ই দীনেশচন্দ্রের সর্বশ্রেষ্ঠ অবদান। পূর্ব বাংলার (বর্তমানে পূর্ব পাকিস্তান) অখ্যাত অজ্ঞাত নর-নারীরা যে এমন প্রাণমাতানো স্নিগ্ধ সজল প্রেমের নিরাভরণ মর্মস্পর্শী কাহিনীকে আশ্রয় করে তাদের রসপিপাসা মেটাত—সেই অলক্ষে গড়ে ওঠা মৌখিক সাহিত্যের অপূর্ব সামগ্রীকে বিশ্বের সামনে টেনে এনেছেন দীনেশচন্দ্র। কাহিনীগুলোর তির্যক দ্রুত গতি, চরিত্রের প্রেম-মাধুর্য-ঈর্ষা-দ্বন্দ্ব-কলহ ক্রুরতা, সমাজ জীবনের বিচিত্র কলরোল, পরিবেশের মাদকতা—গীতিকাগুলোর মধ্যে অনবদ্য রসব্যঞ্জনায় মূর্ত। স্টেলা ক্র্যামরিচ বললেন, 'সারাদিন জ্বরের ঘোরে আমি মহুয়া, নদের চাঁদ ও হোমরাকে যেন স্বপ্নের মত দেখিয়াছি। আমি ভারতীয় সাহিত্য যতটা পড়িয়াছি, তাহার মধ্যে এমন মর্মস্পর্শী, এমন সহজ সুন্দর কোন আখ্যান পড়ি নাই।'৩

স্যার উইলিয়ম রথেনস্টাইন, সিলভাঁ লেভি, লর্ড রোনাল্ডসে ও আমেরিকান সমালোচক এ্যালেন গীতিকাগুলোর উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেন। ১৯৩৮ সালে রমা রোলাঁর ভগ্নী এর ফরাসী অনুবাদ করেন। ফরাসী থেকে সুইডিশ ভাষায় এর ভাষান্তর ঘটে। ডক্টর আশুতোষ ভট্টাচার্য গীতিকাগুলোর চমৎকার ব্যাখ্যা করেছেন।১ বাংলার গীতিকা নিয়ে গবেষণা করে ডি, ফিল, পেয়েছেন কেউ। এবং সম্প্রতি ডক্টর দুশান জ্যাবিটেল মৈমনসিংহ গীতিকার ওপর একটি গ্রন্থ প্রকাশ করেছেন।২ বলা বাহুল্য, এর ইংরেজি অনুবাদ দীনেশচন্দ্রই করেছিলেন।

জহুরী চেনে জহর, দীনেশচন্দ্র চিনতেন বাংলার লোকসাহিত্যের খাঁটি সোনাগুলোকে। আইথর গ্রামের (মৈমনসিংহ জেলার) চন্দ্রকুমার দে, মউস্কা গ্রামের মুসলমান চাষীর মুখে শুনলেন 'মহুয়া'র পালা। টুকে নিলেন তিনি সে পালা—যে পালা পড়ে সিলভাঁ লেভি বলেছেন, "আমাদের শীতার্ত প্রকৃতির ক্রোড়ে বসিয়া মহুয়া পাঠ করিয়া মনে হইল, ভারতের উষ্ণ আবহাওয়ায় শীত ও বসন্ত ঋতুর দৃশ্য উপভোগ করিতেছি—নায়ক-নায়িকার প্রেমকথা অপূর্ব

২। বাংলার পুরনারীতে প্রদত্ত চিঠি।

৩। মৈমনসিংহ গীতিকা—ভূমিকা।

১। বাংলার লোকসাহিত্য (১ম খণ্ড)।

২। Bengali Folk Ballads and the problem of their authenticity.

পরিবেষ্টনীর মধ্যে কি সুন্দরভাবে বিকাশ পাইয়াছে।"৩ মৈমনসিংহের 'সৌরভ' পত্রিকায় প্রকাশিত হল সে পালা। চোখে পড়ল দীনেশচন্দ্রের। দীনেশচন্দ্র যোগাযোগ করলেন চন্দ্রকুমারের সঙ্গে। ডেকে আনলেন কলকাতায়। যে ছিল মৈমনসিংহের কালীপুরের দু' টাকা মাস মাহিনার গোমস্তা, দীনেশচন্দ্র, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্বময় কর্তা আশুতোষ মুখোপাধ্যায়কে বলে, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের লোকসাহিত্য বিষয়ক বিবরণ সংগ্রাহকের পদে নিযুক্ত করে দিলেন। মাস মাহিনা বরাদ্দ হল সত্তর টাকা। নব উৎসাহে চন্দ্রকুমার মৈমনসিংহের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে যে সব পালা ও গীতিকা এবং রূপকথা সংগ্রহ করলেন—দীনেশচন্দ্র সেগুলোর সম্পাদনা করে প্রকাশ করলেন। বাংলার লোকসাহিত্যে সংযোজিত হল এতকালের মৌখিক সাহিত্যের অপূর্ব গীতিকাগুলো।

পরবর্তীকালে 'মৈমনসিংহ গীতিকা'র প্রামাণিকতা নিয়েও কথা উঠেছে। সম্পাদক যত্রতত্র অদলবদল করেছেন শব্দের নামের, ইত্যাদির অভিযোগ উঠেছে। কিন্তু সাম্প্রতিককালে প্রাগের ডক্টর দুশান ব্যাভিটেল সরেজমিনে শুনে-পড়ে ও বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে আলোচনা করে মৈমনসিংহ গীতিকার প্রামাণিকতায় অবিশ্বাস করতে পারেন নি; বরং এই আবিষ্কারকে বিস্ময়কর ও অভিনন্দনযোগ্য বলে মত জ্ঞাপন করেছেন।১

দীনেশচন্দ্র বাংলার লোকসাহিত্যের প্রতি সবিশেষ আগ্রহী ছিলেন। ১৯২০ সালে তাঁর The Folk Literature of Bengal গ্রন্থটি প্রকাশিত হয়। এবং তার তিন বছর পর প্রকাশিত হয় মৈমনসিংহ গীতিকা। নিরক্ষর ও অক্ষরজ্ঞানসম্পন্ন লোকের মুখে মুখে প্রচলিত ও রূপান্তরিত হয়ে কত কথা ও কাহিনী, পালা ও ছড়া প্রভৃতি মানুষের মনের আনন্দবর্ধক হয়ে বাংলার চিত্তলোককে ভরিয়ে রেখেছে। মৈমনসিংহ গীতিকার সম্বন্ধে দীনেশচন্দ্র নিজেই বলেছেন, 'পূর্বে যেমন প্রতি পল্লীতে কুন্দ ও গন্ধরাজ ফুটিত, বিল ও পুষ্করিণীতে পদ্ম ও কুমুদের কুঁড়ি বায়ুর সঙ্গে তাল রাখিয়া দুলিত—এই সকল গানও তেমনই লোকের ঘরে ঘরে নিরবধি শোনা যাইত ও তাহাদের তানে সরল কৃষকপ্রাণ তন্ময় হইয়া যাইত। ফুলের বাগানে ভ্রমরের মত এই গানগুলিরও শ্রোতার অভাব হইত না।'২

৩। বাংলার পুরনারী (জীবনকথা থেকে উদ্ধৃত)।

১। Bengal Folk Ballads from Mymensingh and the problem of their authenticity.

২। মৈমনসিংহ গীতিকা—ভূমিকা।

শিক্ষাব্রতী দীনেশচন্দ্র

আজীবন শিক্ষাব্রতী দীনেশচন্দ্র বাংলা ভাষার ও বাংলা সাহিত্যের চর্চার জন্য ও মাতৃভাষাকে পরম সম্মানদানের জন্য সমস্ত জীবন অতিবাহিত করেছিলেন। একুশ বৎসর বয়সে তিনি বি, এ, পড়বার সময় ছ' মাসের ব্যবধানে মা-বাবাকে হারিয়ে সিলেটের হবিগঞ্জ বিদ্যালয়ে মাসিক চল্লিশ টাকা বেতনে প্রধান শিক্ষকের পদ গ্রহণ করেন। এবং পঁয়তাল্লিশ বছর শিক্ষকতা করবার পর শেষে তিনি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের 'রামতনু লাহিড়ী-অধ্যাপক' পদ থেকে অবসর গ্রহণ করেন।' বিচিত্র তাঁর জীবন-পথ। অতি নগণ্য হবিগঞ্জের বিদ্যালয় থেকে তিনি এলেন কুমিল্লার শম্ভুনাথ বিদ্যালয়ে। মাসমাহিনা হল পঞ্চাশ টাকা। পদটি প্রধান শিক্ষকের। ইতিমধ্যে শিক্ষকরূপে তিনি ইংরেজী অনার্স সহ বি, এ, পাশ করলেন। এবার কবি নবীনচন্দ্র সেন আহ্বান জানালেন ফেনীতে। সেখানকার উচ্চ বিদ্যালয়ে প্রধান শিক্ষকের পদ গ্রহণ করতে। নানা কারণে দীনেশচন্দ্র ফেনীতে যেতে পারলেন না।১ তারপর আবার বদল হল বিদ্যালয়। কুমিল্লার ভিক্টোরিয়া স্কুল। সেখানে থাকাকালীন বেরুল তাঁর প্রথম গবেষণালব্ধ বিপুল কীর্তি 'বঙ্গভাষা ও সাহিত্য।' বিয়ে হয়েছিল ১৮৭৮ সালে। ইতিমধ্যে তিনি সাহিত্যক্ষেত্রে ধীরে ধীরে প্রবেশ লাভ করলেন। নানা পত্রপত্রিকায় প্রকাশিত হল তাঁর প্রবন্ধ। কঠোর পরিশ্রম ও দুশ্চিন্তা তাঁকে শয্যাশায়ী করল। নিদারুণ মস্তিষ্কপীড়ায় আক্রান্ত হয়ে তিনি এলেন কলকাতায়। দু' বছর অসুস্থ থাকার পর তিনি প্লেগের ভয়ে পালালেন ফরিদপুরে। সেখানে থাকাকালীন গ্রীয়ারসনের পরামর্শে বাংলা সরকারের কাছে সরকারী বৃত্তির আবেদন করেন। এবং বাংলা সাহিত্যে তাঁর অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ সরকার পঁচিশ টাকা মাসোহারা বরাদ্দ করেন। দীনেশচন্দ্রের সেই ঘোরতর দুর্দিনে এগিয়ে এসেছিলেন অনেকেই। ময়ূরভঞ্জের রাজা, গগনেন্দ্রনাথ, অবনীন্দ্রনাথ ও সমরেন্দ্রনাথ নানা প্রকারে সাহায্য করেছেন। অযাচিতভাবে ও নিঃস্বার্থ সেবাব্রতে দীনেশচন্দ্র রোগ-পরিচর্যা করে গেছেন দ্বারকানাথ সেন, যোগেন্দ্রনাথ সেন, নীলরতন সরকার ও বিজয়রত্ন সেন। সে যুগেও সাহিত্যের পৃষ্ঠপোষকতায় ধনী ব্যক্তিরা এগিয়ে আসতেন—দীনেশচন্দ্রের দুঃখের দিনের পরম উপকারী সুহৃদবর্গই তার জ্বলন্ত প্রমাণ। ১৯০০ সালের শেষার্ধে তিনি এলেন কলকাতায়। তারপর এল সৌভাগ্যের দিন। ১৯০২ সালে তিনি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে বি, এ, পরীক্ষার পরীক্ষক নিযুক্ত হন। ১৯০৯ সালে রীডার। ১৯১৩ সালে রামতনু লাহিড়ী-অধ্যাপক।

১। ঘরের কথা ও যুগসাহিত্য।

বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের স্বর্ণদীপে আলোকশিখাটি প্রজ্বলিত করবার পরম লগ্ন এল এবার। দীনেশচন্দ্র কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্ণধার আশুতোষকে স্নাতকোত্তর বাংলা ক্লাস খোলবার ব্যবস্থা করতে অনুরোধ করেছিলেন কয়েকবার। এ সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে তাঁর পত্রালাপও চলেছিল। রবীন্দ্রনাথ একটি পত্রে লিখলেন, 'এবারে কলিকাতায় গিয়া আপনার সঙ্গে এবং আশুবাবুর সঙ্গে দেখা করিয়া এম, এ, পরীক্ষায় বাংলা ভাষার ব্যবহার সম্বন্ধে আলোচনা করিব।২ এইভাবে যখন আলোচনা চলছে, তখন একদিন আশুতোষ ডেকে পাঠালেন দীনেশচন্দ্রকে, বললেন, 'এম, এ,-তে বাংলার পরীক্ষা গৃহীত হইবে ঠিক করিয়াছি। আপনি এ্যান্ডারসনকে বিলাতে চিঠি লিখুন, পাঠ্য তালিকা ও অষ্টাহব্যাপী পরীক্ষার বিষয়সূচী প্রস্তুত করিতে—' ১ দীনেশচন্দ্র জানতে চাইলেন, যে প্রস্তাব তিনি এতদিন অগ্রাহ্য করে এসেছেন, তা হঠাৎ মেনে নিলেন কেন? আশুতোষ জানালেন,

'M. A. Examination shall not be confined to Bengali vernacular alone. I have a mind to extend it to other provincial languages...The time is ripe for giving effect to the proposal.' ২

আজকে যে বাংলা ভাষায় গবেষণারত ছাত্রদের সংখ্যা বেড়েই চলেছে—বাংলা ভাষায় ও সাহিত্যের যে নব নব দিগন্ত খুলে যাচ্ছে—তার পশ্চাতে দীনেশচন্দ্রের অবদান অনস্বীকার্য।

২। বিশ্বভারতী ॥ ২৩ বর্ষ ॥ ২য় সংখ্যা।

১। ঘরের কথা ও যুগসাহিত্য।

২। Ibid.

…সম্পর্কে এর জন্য তাঁর জীবিতকালেই বহু নিন্দা ও কটূক্তি শুনতে হয়েছে। ৩ তাঁর প্রতিভার স্বীকৃতি দিতে নারাজ হয়েছেন অনেকে। এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা পাঠ্যসূচী থেকে তাঁর নাম যেমন ধীরে ধীরে সরে যাচ্ছে—তেমনই তাঁর মন্তব্যকেও আর গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে না বা দিতে চাচ্ছেন না অনেকে। এই প্রবণতা ভাল কি মন্দ জানি নে, কিন্তু এমন প্রবণতার কবলে যে আজকের প্রথিতযশা ইতিহাসকার বা গ্রন্থকারও ভবিষ্যতে পড়তে পারেন—সে কথা বোধহয় ভাবা দরকার। মনে পড়বে অনেকের সজনীকান্ত দাসের 'দীনেশনামার' কথা। আরও মনে পড়বে সেই সজনীকান্ত দাসই ১৯৫৩ সালে তাঁর "বাংলা গদ্যের প্রথম যুগ" গ্রন্থটি উৎসর্গ করে ক্ষমা প্রার্থনা করেছিলেন। প্রায়শ্চিত্ত করেছিলেন যৌবনের উদ্ধত চাপল্যের।৪

সাহিত্য-প্রেমিক দীনেশচন্দ্র

"আর একখানা ভাল বই আপনাকে লিখিতে হইবে—আপনার ছেলেবেলার কথা, গ্রামের কথা, ঘরের কথা লইয়া একখানা খুব সত্যকার বই লিখিবেন।" ১ ১৩১১ বঙ্গাব্দের আষাঢ় মাসের একখানা চিঠিতে রবীন্দ্রনাথ এ অনুরোধ করেছিলেন দীনেশচন্দ্রকে। সেই গ্রন্থই ঘরের কথা ও যুগ-সাহিত্য ১৯২২ খৃস্টাব্দে প্রকাশিত হয়ে দীনেশচন্দ্রের আত্মকথাকে লোকসমক্ষে উপস্থিত করল। কাব্যানুরাগ দীনেশচন্দ্রের মনে-প্রাণে সঞ্চার করেছিলেন তাঁর দিদি দিগ্বসনা দেবী। "তিনি যখন মৃদুস্বরে গাহিতে থাকিতেন, তখন আমার মনে যে আনন্দ হইত, তাহা শুধু অশ্রুজল প্লাবিত হইয়া ভাসিয়া যাইত না, তাহা আমার 'কল্পনার ঘরে আরতির ঘিয়ের বাতি জ্বালাইয়া দিত। তাঁহার কণ্ঠের সেই মধুর 'রজনী শাওন ঘন, ঘন দেয়া গরজন, রিমিঝিমি শবদে বরিষে' গান আমার চক্ষে বর্ষাকে এক নূতন সজ্জায় সাজাইয়া উপস্থিত করিত।"২

কাব্যেই তাঁর হল হাতেখড়ি। তেরো বছর বয়সে 'ভারত-সুহৃদ' পত্রিকায় বেরুল 'জলদ' নামে কবিতা। উনিশ বছর বয়সে 'নবজীবন' পত্রিকায় 'পুজার কুসুম' কবিতা।৩ মুদ্রিত প্রথম কাব্য-গ্রন্থ 'কুমার ভুপেন্দ্র সিংহ' (১৮৯০)।' পরবর্তী পুস্তক প্রবন্ধের নাম রেখা (১৮৯৫)।

প্রাচীন বাংলা-সাহিত্যের বিশেষ করে পদাবলী ও মঙ্গলকাব্যগুলির প্রতি বিশেষ আকর্ষণ ছিল দীনেশচন্দ্রের। ফরিদপুরে থাকবার সময়ে স্নায়ুদৌর্বল্যে যখন তিনি কষ্ট পাচ্ছেন, সেই সময় মনসা দেবী স্বপ্নে দেখা দিলেন। মনোবৈকল্য হতে তিনি মুক্ত হলেন। মনসার কৃপায় হারানিধি ফিরে পাওয়া যায়। দেবী প্রসন্না হলে ভক্তের আকাঙ্ক্ষা চরিতার্থ হবার বাধা কোথায়? তা ছাড়া দেবী স্বপ্নে যখন দেখা দেন, তখন মধ্যযুগের কবিরা প্রচার করেছেন দেবীর মহিমা। দীনেশচন্দ্রের ভক্ত মন রচনা করল 'বেহুলা'।৪ এই সময়েই ফুল্লরা, জড়-ভরত, ধরা-দ্রোণ ও কুশধ্বজ, মুক্তাচুরি, রাখালের রাজগি, রাগরঙ্গ, বৈদিক ভারত, কানু পরিবাদ ও শ্যামলী খোঁজা পৌরাণিক কাহিনীগুলি প্রকাশিত হল।' পরম সমাদরের সঙ্গে বাংলার সাহিত্য-সমাজে গৃহীত হয়েছিল রামায়ণী কথা। এই গ্রন্থের ভূমিকায় রবীন্দ্রনাথ লিখলেন, 'কবিকথাকে ভক্তের ভাষায় আবৃত্তি করিয়া তিনি আপন ভক্তির চরিতার্থতা সাধন করিয়াছেন।' এই ভূমিকাটি রবীন্দ্রনাথের 'প্রাচীন সাহিত্য' গ্রন্থে স্থানলাভ করেছে। যদিও রবীন্দ্রনাথ একটি পত্রে বলেছেন, 'রামায়ণের ভূমিকাটি যথেষ্ট মনোযোগের সহিত লিখিতে পারি নাই।' ১ এই প্রসঙ্গে দীনেশচন্দ্রের The Bengali Ramayanas গ্রন্থটির কথা স্বভাবতই এসে পড়ে। বইটি সবিশেষ প্রশংসা লাভ করেছিল সুধীসমাজে। গ্রীয়ারসন বললেন, 'জেকবীর পর রামায়ণ সম্বন্ধে এরূপ উৎকৃষ্ট পুস্তক আর বাহির হয় নাই।'

কবিতার কাছ থেকে বিদায় নিলেও গল্প ও উপন্যাসের কাছ থেকে বিদায় নিতে পারেন নি দীনেশচন্দ্র। তিন বন্ধু, আলোকে আঁধারে, শ্যামল ও কজ্জল প্রভৃতি উপন্যাস ও ভয়ভাঙ্গা ও দেশ-মঙ্গল গল্পগ্রন্থ সুখপাঠ্য কাহিনীরূপে পরিগণিত হয়েছিল।

বাংলা সাহিত্যের নানাদিকে তাঁর রচনা প্রসারিত হয়েছিল। গার্হস্থ্য ধর্ম-মূলক পল্লী চিত্রাঙ্কনে গৃহশ্রী, নীলমাণিক ও গায়েহলুদ, সৎকথা ও পদাবলী মাধুর্য, সন্দর্ভ সংকলনে, শিশুপাঠ্য পুস্তক সাঁঝের ভোগ ও বৈশাখী এবং স্মৃতিকথা-মূলক কাহিনী 'ঘরের কথা ও যুগসাহিত্য' ছাড়া 'আশুতোষ স্মৃতিকথা' তাঁর বিচিত্র লেখনীর স্বাক্ষর বহন করছে। ২

সাময়িকপত্রের সঙ্গেও দীনেশচন্দ্রের যোগাযোগ ছিল। 'বঙ্গদর্শন' সম্পাদনায় রবীন্দ্রনাথকে ও 'ভারতী' পরিচালনায় সরলা দেবীকে তিনি যথেস্ট সহায়তা করে-ছিলেন। বঙ্গদর্শন সমিতি গঠন করবার প্রস্তাব হলে, রবীন্দ্রনাথ লিখলেন, 'আপনি সেক্রেটারি'। ৩ তাছাড়া 'বঙ্গ-বাণী' ও 'বৈদ্য-হিতৈষিণী' পত্রিকাদুটি দীনেশচন্দ্র স্বনামে সম্পাদনা করে গেছেন।

মৃত্যুর সাতাশ বছরের মধ্যে দীনেশ-চন্দ্র কেমন করে বাংলার পাঠকমন থেকে ও বিদগ্ধমণ্ডলীর হৃদয় থেকে দূরে সরে গেলেন, তা ভাবতে বিস্ময় লাগে। যে আমলে দীনেশচন্দ্র সাহিত্য-সাধনায় নেমে ছিলেন, তখন একহাতে তাঁকে গবেষণার উপাদান সংগ্রহ করতে হয়েছে, অপর হাতে তৈরি করতে হয়েছে বাংলা-সাহিত্যের ইতিহাস। দৃষ্টান্ত তাঁর হাতের কাছে ছিল নগণ্য। তিনি নিজেই স্থাপন করেছেন দৃষ্টান্ত। বঙ্গভাষা ও সাহিত্য ও মৈমন-সিংহ গীতিকা খ্যাতির মধ্যগগনে টেনে নিয়ে গেছে। ডি এল রায় সুরেশ সমাজ-পতির গৃহে বঙ্গভাষা ও সাহিত্যের ওপর নিজ হাতে লিখেছিলেন, 'দীনেশচন্দ্র সেন, হবেন আমাদের টেন।' ১ টেন কেন এদিকে ওয়ান হয়েছিলেন তিনি। আজ দীনেশচন্দ্রের কর্মশক্তি, সহিষ্ণুতা, অনু-চিকীর্ষা ও অধ্যবসায় যদি বাংলা সাহিত্যের কোন সাধককে অনুপ্রাণিত করে—তবেই দীনেশচন্দ্রের প্রতি কর্তব্য সুসম্পন্ন হবে।

সাহিত্য-সাধনার খ্যাতি ও সম্মান, পুরস্কার ও খেতাব তাঁর ভাগ্যে যত জুটেছে—তা একজন মানুষের জীবনে বিরল। জে ডি এ্যান্ডারসন, তারা পোর-ভেলিয়াকে লিখেছিলেন, 'মানুষের লেখার মধ্যেই মানুষের প্রকৃতির ও চরিত্রের যতটা ছায়াপাত পড়ে, তার মৌখিক কথায় বোধহয় ততটা পড়ে না। আমার অদেখা বন্ধু দীনেশকে যদি আমি দয়ালু ও শ্রেষ্ঠ মানুষ হিসেবে না দেখি তাহলে বড় ভুল করা হবে। ২ দীনেশচন্দ্র সাহিত্য সেবায় যেমন, মানুষ হিসেবে তেমনি আন্তরিক সহৃদয় ও আর্দ্র।

৩। Folklorists of Bengal (p. 102).
৪। বাংলা গদ্যের প্রথম যুগ—উৎসর্গ পত্র।
১। বিশ্বভারতী ॥ ২৩ বর্ষ ॥ ২য় সংখ্যা।
২। ঘরের কথা ও যুগ সাহিত্য।

৩। সাহিত্যসাধক চরিতমালা (৯১)।
৪। বাংলার পুরনারী (জীবনকথা)।
১। বিশ্বভারতী ॥ ২৩ বর্ষ ॥ ২য় সংখ্যা।

২। সাহিত্যসাধক চরিতমালা (৯১)।
৩। বিশ্বভারতী ॥ ২৩ বর্ষ ॥ ২য় সংখ্যা।
১। বাংলার পুরনারী (১২)।
২। Folklore, vol. IV. No. 9. (ভাষান্তরিতরূপে উদ্ধৃত)।

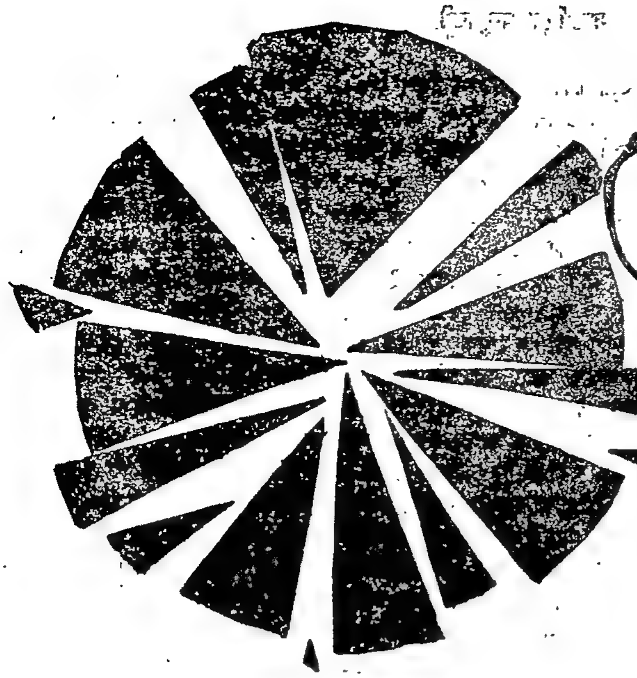

অগ্নিযুগের একটি অধ্যায়

অনন্ত সিংহ

শক্তি সমন্বয়ের নক্সা—দিন ও ঘণ্টা

মাস্টারদার সংগে সামগ্রিক আক্রমণের দিন ধার্য করার ব্যাপার নিয়ে কথাবার্তা হওয়ার পরদিনই বোধহয় হেডকোয়ার্টারে আমাদের গুরুত্বপূর্ণ সভা বসল। উপস্থিত ছিলাম—মাস্টারদা, গণেশ, নির্মলদা, আমি ও অম্বিকাদা। আমাদের সামনে Mobilisation Chart (সৈন্য ও শক্তি সমাবেশের নক্সা) খোলা আছে। দেওয়াল-মানচিত্রের মত বড় কাগজের ওপর এই "নক্সা" বিভিন্ন আলোচনার পর চূড়ান্তভাবে গণেশ প্রস্তুত করে। শেষের দিকে "চূড়ান্ত প্ল্যানের" রিহার্সেলের নক্সা আমাদের হেডকোয়ার্টারের টেবিলের ওপর সামনে রেখে দিয়েছি। যে কোন আক্রমণের পূর্বে সমর বিজ্ঞান অনুসারে সামরিক বাহিনীর পরিচালকবর্গ এইরূপ রিহার্সেল নক্সা সামনে রেখে আক্রমণের প্ল্যান ঠিক করেন। এই অত্যাবশ্যক কাজটি আমরা তখন Military Mannual (সামরিক গ্রন্থ) পড়ে শিখি নি। 'Necessity is the mother of Invention'—তাই এইরূপ রিহার্সেল আমাদের প্রয়োজনের তাগিদেই দিতে হয়েছিল।

এই Mobilisation Chart-টিতে—(১) মোটর গাড়ির সমন্বয়, (২) বিভিন্ন যন্ত্রপাতির সংরক্ষণ ও বিলি-ব্যবস্থা, (৩) অস্ত্রশস্ত্র ও হাত-বোমার উপযুক্ত প্রয়োগের জন্য বিশেষ বিশেষ লক্ষ্যবস্তুর উল্লেখ, (৪) প্রথম শ্রেণীর উপযুক্ত গণতন্ত্রবাহিনীর সভ্যদের প্রথম আক্রমণের জন্য বাছাই ও প্রয়োজনীয় সংখ্যায় তাদের নিয়োগ, (৫) আক্রমণের পূর্বে বিভিন্ন ছোট ছোট দলের নির্ধারিত পথ ও গোপন অবস্থানের নির্দেশ, (৬) গণতন্ত্রবাহিনীর সৈন্যরা কাঁধে ঝোলানো থলিতে করে কি কি জিনিষ সংগে নেবে, (৭) ব্রীচ্‌লোডার বন্দুক কে কখন তাদের বাড়ি থেকে আনবে, (৮) কোন ব্রীচ্‌লোডার বন্দুক কোন সভ্য নেবে—ইত্যাদি ইত্যাদি আমাদের বুঝতে পারার মত সংক্ষেপে শিরোনামা দিয়ে পরিষ্কার আদেশ ও উপদেশ দেওয়া ছিল।

এই Mobilisation Chart আমরা ১৭ই তারিখ রাত্রে পুড়িয়ে ফেলি। এই chart-টিকে একটু একটু করে আমরা প্রায় এক মাস ধরে আলোচনা করে চূড়ান্ত রূপ দিতে সমর্থ হয়েছিলাম। অবশ্য চূড়ান্ত রূপ দেওয়ার আগে পর্যন্ত আমরা ছোটখাটো কাগজে অনেক সময় বিভিন্ন নোট প্রস্তুত করেছি। সেইরূপ নোট লেখা কাগজ আমরা যে সব সময় নষ্ট করেছি তাতে কোন সন্দেহ নেই। কিন্তু শত চেষ্টা থাকা সত্ত্বেও কোথা থেকে যেন কি ভুল হয়ে যায়!

গণেশের সাবধানতা ও সতর্কতার কোন তুলনা ছিল না। আগে আমরা দেখেছি গণেশ কিরূপ সতর্কতার সংগে "প্রচারপত্রগুলি" নিজ তত্ত্বাবধানে গোপন ছাপাখানায় মুদ্রিত করেছে, এবং তারপর বিন্দুমাত্র চিহ্ন না রেখে সব পরিষ্কার করেছে ও গোপন জায়গায় প্রচারপত্রগুলি ছাপা হওয়ার পর নিরাপদে রাখার ব্যবস্থা করেছে। এত সাবধানী গণেশ, যার ষড়যন্ত্রমূলক কাজে প্রতিটি বিষয়ে ও প্রতি পদে পদে সতর্কতা অবলম্বন করা অভ্যাস, তারও কিন্তু অজান্তে সামান্য ত্রুটি হয়ে গেল। কতকগুলো টুকরো কাগজে Mobilisation Chart-এর কিছু খসড়া করা হয়েছিল কোন সময়ে। সেই টুকরো কাগজগুলি কোন এক অসতর্ক মুহূর্তে সে বা আর কেউ হয়ত তার বিছানার তোষকের নিচে রেখেছে কোন সময়ে—আর কথা বলার সময় সেইগুলির ব্যবহার করার হয়ত কোন প্রয়োজনই হয় নি, ফলে, পরে সেই টুকরো কাগজগুলিকে বিনষ্ট করার কথা কারো মনে হয় নি।

চট্টগ্রাম যুব-বিদ্রোহ সংঘটিত হয়ে যাওয়ার অনেক পরে গণেশের বাড়ি তল্লাসীর সময় সেই টুকরো কাগজগুলি পুলিশ সংগ্রহ করতে সমর্থ হয়। সেগুলি থেকে যেসব বিষয়ের উল্লেখ পুলিশ জানতে পেরেছে তা' থেকে তারা ঐ কাগজগুলিকে Mobilisation List বলে মামলার প্রমাণ করবার চেষ্টা করেছে।

ত্রুটি ত্রুটিই। গণেশ তার ত্রুটি কখনও ঢাকতে চেষ্টা করে নি। যে ইতিহাস আজ আমি লিখছি সেটি লেখার জন্য গণেশই সবার চাইতে উপযুক্ত বলে আমার মনে হয়। আমি খুব নিশ্চিতভাবে জানি যে, যদি গণেশ নিজে এই ধারাবাহিক ঐতিহাসিক ঘটনাবলী লিখে যেত তবে সে এইরূপ ত্রুটি-বিচ্যুতির বিষয় সবার আগে সামনে তুলে ধরত। আজ আমাদের জানবার প্রয়োজন—কত সাবধানতা, কত সতর্কতা অবলম্বন করেছি আমরা, কত সচেতন ছিলাম সব সময়—তবু কোথায় একটু ত্রুটি রয়ে গেল! কেবল এইটি বুঝতে পারলেই চলবে না—হৃদয়ঙ্গম করা প্রয়োজন যে গণেশের মত বিচক্ষণ ও সাবধানী ব্যক্তিরও অসতর্ক মুহূর্তে ভুল হয়। গণেশের এই বিচ্যুতির নজির

খাড়া করে আত্মপক্ষ সমর্থন করার চেষ্টা বৈপ্লবিক চরিত্রের পরিপন্থী। এইরূপ ত্রুটির নজির থেকে এই শিক্ষাই গ্রহণ করা উচিত যে, ষড়যন্ত্রমূলক কাজে সতর্কতার কোন সীমা-পরিসীমা নেই। এটা অবধারিত সত্য যে, যে পরিমাণে বা যত বেশি সতর্কতা অবলম্বন করব তত কম ভুল বা ত্রুটির পুনরাবৃত্তি হবে। আমি নিজে এই ত্রুটি হতে শিক্ষা গ্রহণ করেছি এবং পরবর্তীকালে বৃটিশ কারাগারে বছরের পর বছর ষড়যন্ত্রমূলক কাজ সফলতার সঙ্গে চালিয়ে গেছি। যথাস্থানে সম্ভব হলে বিস্তারিতভাবে তা' ব্যক্ত করব।

ষড়যন্ত্রমূলক কাজে ত্রুটির গুরুত্ব, ত্রুটি 'সামান্য' বা 'প্রকাণ্ড' তার ওপর নির্ভর করে না। খুব সামান্য ত্রুটিও বৃহৎ ক্ষতিসাধন করতে পারে আবার খুব প্রকাণ্ড ভুলেও বিন্দুমাত্র অনিষ্টের আশঙ্কা থাকে না। আমাদের সামান্য ভুলের জন্য ঐ ক'টি টুকরো কাগজে যা খসড়া পুলিশ উদ্ধার করেছে তাই দিয়ে মামলার সময় তাদের কৃতিত্বের পরিচয় দেওয়ার উদ্দেশ্যে তারা খুব হৈচৈ করতে চেষ্টা করল। আমাদের পক্ষের উকিল-ব্যারিস্টাররা ভাবলেন আবার কেউ কেউ আমাদের বললেন—"ঐটি আপনাদের বড় ভুল হয়ে গেছে।"

তাঁদের ঐরূপ মন্তব্য করার পক্ষে যে চিন্তাধারা কাজ করেছে তা' কোর্ট-কাছারী, সাক্ষী-সাবুদ, মামলা-মোকদ্দমার গণ্ডীতে নিবদ্ধ ছিল এবং সেই জন্যই বাস্তবতার দিকে তাঁদের লক্ষ্য স্থির থাকা সম্ভব হয় নি। বাস্তব অবস্থার সঙ্গে তাঁদের একটু পরিচয় করাবার সঙ্গে সঙ্গে তাঁরা উপলব্ধি করলেন যে তাঁদের সেইরূপ ধারণা সম্পূর্ণ ভুল—তথাকথিত বা সত্যিকার Mobilisation List-ও যদি সরকার পক্ষ মামলায় উপস্থিত করে থাকে তবু তাতে আমাদের আর বেশি ক্ষতিসাধন করা তাদের পক্ষে সম্ভব ছিল না। কথাটা তাঁদের পরিষ্কার করেই বললাম,—

"দেখুন, আমরা সর্বপ্রকার চেষ্টা করেছি যেন সামগ্রিক আক্রমণ করার আগে আমাদের পরিকল্পনা পুলিশের কাছে ঘুণাক্ষরে প্রকাশ না পায়। নানা বিপদের সম্মুখীন হয়েও আমরা পুলিশকে বিভ্রান্ত ও পরাস্ত করে তাদের অগোচরে সব ব্যবস্থা সম্পূর্ণ করে সামগ্রিক আক্রমণ চালাতে সমর্থ হই। ঘটনা ঘটে যাওয়ার পর পুলিশ যেন কোন হদিস না পায় তার জন্য ব্যবস্থা করেছিলাম পরোইকোরা বা রেল কোম্পানীর টাকা ডাকাতি করে নেওয়ার পর। কিন্তু যুব-বিদ্রোহের পর আমাদের প্রকাশ্য অংশের কার্যকলাপের গোপনীয়তার কোন প্রয়োজন ছিল বলে আমরা মনে করি নি। সামগ্রিক আক্রমণের পর অস্থায়ী স্বাধীন গণতন্ত্রী সরকার একবার স্থাপন করা গেলে, পুলিশ আমাদের আর চিনতে পারবে না—এইরূপ মিথ্যা ধারণা থাকার কোন বাস্তব কারণ তখনও ছিল না। আমাদের প্রোগ্রামই ছিল —"মৃত্যুবরণ"। তাই পরে কে কি করবে, বা কারা স্বীকারোক্তি দেবে, পুলিশ কি সব তথ্য সংগ্রহ করে আমাদের বিরুদ্ধে মামলা সাজাবে তার জন্য অনর্থক ব্যস্ততার কারণ আমরা অনুভব করি নি।

"বিভিন্ন শরীরচর্চার ক্লাবের ছেলেরা সবাই এক রাত্রে বাড়ি ছেড়ে চলে গেল; বাড়ির গাড়ি আক্রমণের কাজে ব্যবহার করলাম। বিভিন্ন বাড়ির বন্দুক নিয়ে ছেলেরা 'অভ্যুত্থানে' অংশ গ্রহণ করতে চলে এসেছে। তিন-চারটি বন্দুক, শেষ মুহূর্তে যখন দেখা গেল যে তাতে কার্তুজ ঠাসা যাচ্ছে না—চেম্বার ছোট, তখন সেগুলি গণেশের বাড়িতে ফেলে যাওয়া হ'ল। একজন ট্যাক্সি ড্রাইভারকে হাত-পা বেঁধে গণেশের বাড়িতেই আমরা রেখে যাই। জালালাবাদ যুদ্ধে এই সব ক্লাবের ছেলেরা, যারা আমাদের সব সময়ের প্রকাশ্য সাক্ষী, তারা অনেকে প্রাণ দিয়েছে ও তাদের মৃতদেহ নিয়েই বৃটিশ সরকারী মহল আনন্দ পেয়েছে—এই ভেবে যে আমাদের বিরুদ্ধে তারা অকাট্য প্রমাণ সহ মামলা রুজু করবেই!! এইসব হতবুদ্ধি পুলিশমহল ঐসব টুকরো কাগজ নিয়ে আজ হয়ত আত্মপ্রসাদ লাভ করছে। বাস্তব ক্ষেত্রে যখন অত সব প্রত্যক্ষ প্রমাণকে আমরা তুচ্ছ মনে করে আমাদের Death Programme-কেই প্রাধান্য দিয়েছি তখন ঐ সব টুকরো কাগজের নজির উপস্থিত করে পুলিশ তাদের মনকে সান্ত্বনা দিলেও আমাদের তাতে ক্ষতি-বৃদ্ধি নেই। আমাদের যখন সমুদ্রে বাস তখন শিশিরবিন্দু তুল্য Mobilisation List-টিকে ভয় পাবার কিছু আছে কি?"

আমাদের উত্তর শুনে সম্মানিত আইন-বিশারদেরা উপলব্ধি করেছিলেন—সশস্ত্র বিদ্রোহ আর বৃটিশ সরকারের আইন-আদালতের প্রহসন এক বস্তু নয়। পরবর্তী অধ্যায়ের জন্য আইন-কানুন বাঁচিয়ে ব্যাপক সশস্ত্র আক্রমণের প্রস্তুতি আমরা করি নি —বরং আইন-কানুনের মতবাদ সম্পূর্ণ বর্জন করে, বৃটিশ সরকারের বিরুদ্ধে সশস্ত্র আক্রমণের জন্য পুলিশী চক্রান্তকে ব্যর্থ করে বিচক্ষণতা, সাহসিকতা ও গোপনীয়তার সঙ্গে প্রস্তুতির কাজ সমাপ্ত করেছি।

এই বাস্তব চিত্রটি থেকে বুঝতে পারা যাবে যে ঐসব টুকরো কাগজে লেখা খসড়া, সশস্ত্র আক্রমণ পর্ব ঘটে যাওয়ার পর সরকারীমহলের মিথ্যা সান্ত্বনা ছাড়া আমাদের বিরুদ্ধে সেগুলি প্রকৃতপক্ষে কোন কাজে আসে নি। আজ, এই সুদীর্ঘ, ছত্রিশ বছর পরে, আমার এই ইতিহাস লেখার সময় এটি কাজে লাগলো। এই পরিপ্রেক্ষিতে বিচার করে দেখলে মনে হবে আমাদের ঐ সামান্য অসতর্কতা ত্রুটি মোটে ত্রুটিই নয়। কিন্তু আমার পরবর্তী জীবনে বৃটিশের শাসন ব্যবস্থার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করার কাজে এই সামান্য ত্রুটি গণেশ ও আমার কাছে এক অসামান্য শিক্ষণীয় বস্তু ছিল। আমরা এই 'সামান্য ত্রুটিকে' ত্রুটি জেনে ভবিষ্যতে এর প্রতিকারের জন্য সজাগ ও সচেষ্ট ছিলাম বলেই জেলে নানা ষড়যন্ত্রমূলক কাজ সফলতার সঙ্গে করতে পেরেছি।

আমাদের আসল Mobilisation Chart-এ কি কি বিষয়বস্তু সন্নিবদ্ধ ছিল পূর্বে তার একটু আভাস মাত্র দিয়েছি। সেইরূপ শুধুমাত্র আভাসটুকুই আমরা পাব সরকারী তথ্য থেকে। কারণ আমাদের প্রকৃত Mobilisation Chart-এর অস্তিত্ব আগুনে পুড়িয়ে নিশ্চিহ্ন করে ফেলেছি। সরকারীপক্ষ Mobilisation Chart-এর পরিবর্তে Mobilisation 'List' বলে উল্লেখ করেছে কেন না ঐসব টুকরো কাগজে কতগুলি তালিকার ওপর Mobilisation List শিরোনামা লেখা ছিল। একশ' থেকে একশ' ছাব্বিশ পৃষ্ঠা পর্যন্ত কেবল Mobilisation List সম্বন্ধে ট্রাইব্যুনালের প্রেসিডেন্ট তাঁর জাজমেন্টে উল্লেখ ও ব্যাখ্যা করেছেন। নিম্নে সেখান থেকে কিছুটা উদ্ধৃত করছি,—

"We turn now to the so-called mobilisation list (Ex. LIX). This consists of a number of loose sheets of paper of various sizes which have already been stated were found lying folded to-gether, on a taktaposh under a quilt at the house of Ganesh Ghosh. ......According to the prosecution they contain notes and memoranda of draft arrangements and dispositions as regards personnel, transport, equipment, etc, to be employed by the conspirators in the execution of their criminal design." (Ibd. p. 118).

জজসাহেব বলছেন যে—আমাদের 'তথাকথিত' Mobilisation List গণেশের

বাড়িতে কোন এক তক্তপোষের ওপরে বিভিন্ন মাপের ছোট টুকরো কাগজের ভাঁজ করা অবস্থায় তোষকের তলায় পড়ে ছিল। জজসাহেবের মন্তব্যে প্রকাশ পাচ্ছে যে, বাদীপক্ষের অভিমতে ঐ টুকরো কাগজগুলিতে আমাদের অপরাধজনিত ষড়যন্ত্রের উদ্দেশ্যে দলের সভ্য, যানবাহন, সরঞ্জাম প্রভৃতির টীকা ও স্মারকলিপির খসড়া দেখতে পাওয়া যায়।

প্রেসিডেন্ট (জজসাহেব) 'M IV' চিহ্নিত Exhibit থেকে copy করে এই-ভাবে সাজিয়ে তাঁর জাজমেন্ট লিখলেন—

"The contents of these papers may be summarised as follows :—

"On the slip (M IV) is written in pencil :—'equipments'

"T. O. Hammer (small) ..4
" (big) ..2
Axe ..1
Petrol ..1 tin

"V. B. Hammer big ..2
Chheni ..4
Gaiti ..2
Axe ..1
Rope ..1
Saw ..2
Blade ..12
Chheni clip ..4
Steel Rod ..2
Petrol ..3 tins"

"C. H. Axe. ..1
P. B. Hammer ..2
Chheni ..4
Axe ..
Saw ..
Blade ..
Chheni clip ..
Steel rod ..
Petrol ..3 tins"

(Ibd. P. 119).

Mobilisation-এর খসড়া যেটুকু ঐ টুকরো কাগজে পেয়েছে সেটিকে আদালত—'M IV' বলে চিহ্নিত করেছে। সেইরূপভাবে আদালত ঐ সবগুলি টুকরো কাগজের ওপর exhibit নম্বর দিয়েছে।

আর একটি টুকরো কাগজের বিষয় জজসাহেব অনুরূপভাবে সাজিয়ে লিখলেন ঃ—

"Again in sheet M VII which is headed 'Mobilisation' we find—

First Mobilisation	Final Mobilisation
T. O. office (scored through in pencil).	At the junction of the T. O. Road in the Katapahar.
V. B. Headquarters (Scored through and Lokanath's house written over it in pencil).	Nizam Paltan corner.

জজসাহেব ব্যাখ্যা করে অভিমত প্রকাশ করলেন,—

"This indicates therefore that first mobilisation in respect of V. B. is to be at Lokanath's house and final mobilisation at Nizam Paltan corner—that is at the point where the Tiger Pass road leads off towards the police lines from the Pahartali road at the corner of the polo ground. This point is quite near the A. F. I. armoury."

(Ibd. P. 120).

'প্রথম মবিলিজেশন' ও 'ফাইনাল মবিলিজেশনের অর্থ বা তাৎপর্য জজসাহেব বিশ্লেষণ করে বোঝাতে চাইলেন যে Volunteer Barracks আক্রমণের জন্য প্রথমে আমাদের মিলিত হওয়ার কেন্দ্রস্থল ছিল লোকনাথের বাড়ি ও সর্বশেষে একত্রিত হওয়ার ব্যবস্থা ছিল সেইরূপ একটি স্থানে যেখানে পুলিশ লাইনের দিকে 'টাইগার পাস' রাস্তাটি বিস্তৃত হয়ে পাহাড়তলীর রাস্তার সঙ্গে মিশেছে। তারপর তিনি মন্তব্য করলেন—এই স্থানটি, অর্থাৎ পোলো খেলার মাঠ, A. F. I. আর্মারীর খুব সন্নিকটে।

নয় নম্বর 'M' চিহ্নিত ছেঁড়া কাগজে কেবল লোকনাথের নাম এইভাবে লেখা ছিল—শিরোনামা ঃ 'Mobilisation' ও নিচে 'V. B.—Lokanath.'

জজসাহেব তারপর নম্বর-বিহীন 'M' চিহ্নিত স্লিপ কাগজটির উল্লেখ করেছেন,—

"Then again in the small slip 'M', at the top of which is written 'Lokanath's house' we find written :—

"2 gaitis (i. e. pick axes),
2 handles
3 chhenis
2 cast steel rods.
2 saws and 12 blades

"And in the small slip M I at the head of which is written 'Already sent' we find written :—

"2 gaitis.
3 chhenis.
2 rods.
2 saws.
12 blades."

জজসাহেব এইভাবে দু'টি তালিকা ভাগ করে দেখিয়ে বল্‌ছেন যে দুটি তালিকাই এক; তবে 'Already sent'-এর অর্থ অনুযায়ী 'M I'-এর তালিকার জিনিষপত্র আগেই লোকনাথের বাড়িতে পাঠানো হয়েছিল।

টেলিগ্রাফ অফিস ধ্বংস করার ব্যাপারে আমরা কিরূপ ব্যবস্থা করেছিলাম তা' দেখবার জন্য জজসাহেব "Mobilisation List"-এর 'M-VIII ও 'M-IX' চিহ্নিত স্লিপ দুটি পর্যালোচনা করেছেন—

First Mobilisation	Final Mobilisation
"C. H. Office	X
"P. B. Debu's	(Part of the sheet torn away)."

(Ibd. P-120).

"And in MVII we have—
Final Mobilisation.
"T. O. Office (scored out).
and in M—IX
"T. O. chaukbazar

First Mobilisation.
At the junction of the T. O Road in the Katapahar.

Again in M VII we find—.
"T. O.—Manindra to escort Binkoo and Biren to the junction of the T. O. Road within the Katapahar."
(Ibd. P. 121)

জজসাহেব তারপর বিশদ পর্যালোচনা করে দেখিয়েছেন যে, 'M-IV' চিহ্ন কাগজে যেসব জিনিষের উল্লেখ আছে সেই সব জিনিষই পুলিশ লাইনে পরিত্যক্ত অবস্থায় পাওয়া গেছে।

ছাপান মামলার রায় পুস্তকটিতে C. H. (অর্থাৎ Club House) সম্বন্ধে চার, সাত ও নয় নম্বরের 'M' চিহ্ন কাগজ তিনটি এইভাবে পরিবেশন করা হয়েছে—

"Again in M IV we have—
C. H.....Axe 1.
"and in 'M' VII

First Mobilisation.
"C. H. office
and in M IX
C. H. office

Final Mobilisation.
X
Near Tea garden."
Ibd. Page 121)

জাজমেণ্ট কপির ১২২ পৃষ্ঠায় M—IX চিহ্ন টুকরো কাগজ উল্লেখ করে জজসাহেব লিখলেন,—

"In M IX there is a pencil note 'to buy four more bhojalis' (dagger)....."

তারপর আমাদের মোটর গাড়ি ও প্রচারপত্র বিলি সম্বন্ধে কিরূপ ব্যবস্থা ছিল, তাও জজসাহেব 'M VII' চিহ্ন তালিকা থেকে উদ্ধৃত করলেন,—

"Then in M VII under the heading 'Car Arrangement' is written :—

T. O. (1) Buick (1)
V. B. (1) Essex (1) easily obtainable.
C. H. (1) * * *
P. B. (1) Chevrolet (1).

"P. distribution
Ardhendu Guha, Sukhendu Dastidar, Dinesh Chakravarti, Saileshwar Chakravarti—to go elsewhere and post it to the different people of the country—

Sadarghat Quarter.
Dewan Bazar, Chandanpura.
Chaukbazar.

400
Village .... 200 } each
Town 400

"T. O.—Essex (Heramba)
V. B.—Buick (or Essex)—to hire at 8 P. M. and to go towards.
C. H.—to engage two coolies and take the articles to some fixed place where the next five men to go and equip themselves.
P. B.—Essex—to hire and take near Chatteswari-bari where to be bound.
"Equipments to carry by coolies before hand to place of final mobilisation.
V. B.—Car to take under hire to Lokanath Babu's house and bind him there.

"And on the back of the same sheet (M VIII) under the heading 'Mobilisation' is written :—
"a group—Crossing of W. W. Road and Chatteswaribari.
b group—Crossing of P. B. Road and Club House Road.
c group—Maiden infront of W. W.
d group—on the road after passing the P. B.
e group—near the tea-garden.

"Bags to take :—
(1) Water carrier (5) Cleaning rods.
(2) Torch (6) Chhenis
(3) Oil phial (7) Bhojali
(4) Bandages (8) Bombs
(9) Cartriges.
(Ibd. P—122)

আট নম্বর টুকরো কাগজ থেকে আবিষ্কার করে জজসাহেব বলতে চাইলেন যে, আমরা T. O. (Telegraph office), V. B. (Volunteer Barrack), C. H. (Club House ও P. B. (Police Barrack বা line) আক্রমণ করবার জন্য 'বুইক', 'এসাক্স', 'সেভ্রোলেট' প্রভৃতি মোটর গাড়ি ব্যবহার করার জন্য মনস্থ করি এবং Club House-এ কোন গাড়ি যাবে সেইটি আমরা সেই খসড়ায় উহ্য রেখেছি। (বুঝবার সুবিধার জন্য T. O., V. B., C. H., P. B. প্রভৃতির ব্যাখ্যা আমি এখানে করে দিলাম। জাজমেণ্টে এই সবের অর্থ অন্যান্য বহু স্থানে পাওয়া যাবে)। এই আট নম্বর তালিকায় আরও আছে কোথায় বা কার কাছ থেকে ঐসব মোটর গাড়ি উদ্ধার করা হবে এবং কোন স্থানে ড্রাইভারদের বেঁধে রাখার ব্যবস্থা হয়েছে, ইত্যাদি।

P. Distribution, অর্থাৎ Pamphlet (প্রচারপত্র) বিতরণ

ব্যাপারে যাদের ওপরে ভার ন্যস্ত করা হবে তাদের সম্বন্ধে এবং কে কোথায় কতগুলো বিলি করবে তারও উল্লেখ খসড়ায় ছিল।

এই আট নম্বর স্লিপটির অপর পৃষ্ঠায় লেখা ছিল—গণতন্ত্রবাহিনীর সভ্যরা a, b, c, d, ও e—পাঁচটা গ্রুপে ভাগ হয়ে পুলিশ লাইনের কাছাকাছি জায়গায় মোতায়েন থাকবে। আর সেই একই পৃষ্ঠায় ব্যাগ ভর্তি করে যেসব জিনিষ নেওয়া হবে তারও একটা তালিকা ছিল।

এইসব বিষয় বিশদভাবে উল্লেখ করার পর জজসাহেব জাজমেণ্টে সংক্ষেপে লিখলেন—

"The prosecution point out that at least four cars were used in the raids, that the drivers of two taxis were seized, bound and left not at the places mentioned in M VIII but at Ganesh Ghosh's house and in the field near Faujdarhat, that the places noted against the five groups are all in the vicinity of the police lines and were apparently the places where all the attacking parties were to meet and that articles of the kind mentioned as to be taken in bags (haversacks) were actually found at the lines."

(Ibd. Page—122)

বহু 'সাক্ষ্য-প্রমাণ' ঘেঁটে জজসাহেব অবশেষে সংক্ষেপে মূল বক্তব্যটি এই-ভাবে রাখলেন—কমপক্ষে অন্তত চারটি মোটর গাড়ি আক্রমণের সময় ব্যবহৃত হয়, ও দুজন মোটর চালককে বেঁধে রাখা হয়। ৮নং খসড়ায় যা লেখা ছিল সেই স্থানে যদিও ড্রাইভারদের বেঁধে রাখা হয় নি, তবু দেখা যায় একজন ড্রাইভার গণেশের বাড়িতে ও অপর জন ফৌজদারহাটের সন্নিকটে কোন এক মাঠে বন্দী অবস্থায় ছিল। আর দেখা যাচ্ছে পাঁচটি গ্রুপ পুলিশ লাইনের চার-পাশের অঞ্চলে যাতে অবস্থান করতে পারে তার ব্যবস্থা করা হয়েছিল। এই সব তথ্য আলোচনা করার পর জজসাহেব স্থির সিদ্ধান্তে পৌঁছলেন এবং মন্তব্য করলেন যে, দৃশ্যত তাঁর মনে হচ্ছে ঐসব স্থানে আক্রমণকারীর সব দলগুলি একত্রিত হয়েছিল এবং সেই সব জিনিষ যা তাদের খসড়ায় উল্লেখিত ছিল সব-গুলিই পুলিশ লাইনে পরিত্যক্ত অবস্থায় পাওয়া গেছে।

সর্বশেষে কারা ব্যাপক আক্রমণে অংশ গ্রহণ করেছিল তা জজসাহেব উদ্ধার করলেন ছয় নম্বর টুকরো কাগজ থেকে। তিনি লিখলেন,—

"Masterda

Jiten.	Pandit	Benode
Binode Chow	Santi	Nani
Dipti	Probhash	Kali
Sitaram	Barkhoka	Pulin
Sushil	Suresh	Malin
Kali Chakra.	Binkoo	
Bhola	Nibaran	
Ranadhir		Sankar
Madhu Sr.		Upendra
		Probodh
		Haran
		Subodh

"Nirmalda

Mati
Sahai
Banbehari
Birendra
Subodh

"Ambikada

Dhona	Debu
Sushil	Toone
Madhoo	Andoo
Durga	Narayan Sen
Bejoy	Lal Mohan
Manindra	Prafulla
Bidhu Sen	

বি, সি, মাইতি এণ্ড কোং

—ইলেকট্রো প্লেটিং সামগ্রী—

নিকেল ভ্যাট ও ব্যারেল * ডাইনামো * পলিশিং মেসিন এবং প্লেটিং করিবার জন্য যাবতীয় সামগ্রীর আদি সরবরাহক।

শো রুম ঃ—৯৪, প্রেমচাঁদ বড়াল স্ট্রীট, কলি ১২। ফোন ঃ ৩৪-৩১৭৩

৩, রাধামোহন পাল লেন, কলি-১২ ঃ অফিস-ফোন—৩৪-৪৮৪৬

"Mobilisation
"(Reverse of M VI).

"Ananta and Ganesh.

"Lokenath.	Rajat.	Naresh.	Tripura.	Subodh Bal.
Phanindra.	Tegra.	Makhan.	Subodh.	Gopal.
Amarendra.	Mona.	Bidhu.	Kshirode.	Aswini.
Saroj.	Fakir.	Sudhangshu.	Narayan.	
Bocha.		Haripada.	Nitai.	

The list contains 71 names altogether." (Ibd. p. 124)

(যেভাবে নামের তালিকা সাজান ছিল ঠিক সেই মত করে জজসাহেব সেইগুলিকে লিপিবদ্ধ করেছেন। প্রায় সব নামেরই এখানে পদবী ছাড়া উল্লেখ হয়েছে, তাই তাদের সঠিক পরিচয় পাওয়ার ইচ্ছা পাঠক-পাঠিকার থাকা স্বাভাবিক। তাছাড়া এঁদের মধ্যে যাঁরা এখনও জীবিত আছেন তাঁদের অনেকে আমার কাছে ইচ্ছা প্রকাশ করেছেন যেন আমি কারও নাম বা পরিচয় দিতে কৃপণতা না করি। এতদিন পরে বন্ধুদের পদবী সঠিকভাবে মনে করতে পারছি না—তাঁদের ডাক নামের সঙ্গেই আমাদের পরিচয় ছিল অনেক বেশি। "অগ্নিগর্ভ চট্টগ্রাম" নাম দিয়ে "বিদ্যোদয় পাবলিশার" বইটি ছাপাতে সুরু করেছেন—প্রায় অর্ধেক সমাপ্তির পথে। ঐ বইয়ের পরিশিষ্টতে যতদূর সম্ভব তাঁদের ও অন্যান্যদের পরিচিতি দেওয়ার ইচ্ছে আছে। ইতিমধ্যে আমার অনুরোধ যাঁরা এই বিষয়ে আমাকে সাহায্য করতে পারেন তাঁরা চিঠিতে জানাবেন)।

দেওয়াল মানচিত্রের আকারে আমাদের Mobilisation Chart সামনে রেখে কথাবার্তা ঠিক হল, সব চেক-আপ করা হ'ল এবং প্রয়োজন অনুযায়ী আরও নতুন ব্যবস্থা করা হ'ল। এইরূপ ভাবে প্রায় আমরা পুনরাবৃত্তি করতাম যেন প্ল্যানটি আরও ত্রুটিহীন করা সম্ভব হয়। যে Mobilisation List আমাদের বিরুদ্ধে প্রমাণ হিসেবে সরকারপক্ষ উপস্থিত করেছিল সেটি যে নেহাৎ একটি খসড়া, তা' তারাও স্বীকার করেছে।

মামলার রায় থেকে উদ্ধৃত করছি,—

"Thus to recaputulate briefly we get details of equipment in MMI and M IV, car arrangements in M VIII, places of mobilisation in M VII and M IX and disposition of groups in M VIII. The prosecution claim, that even apart from the confessions, it has been conclusively established by the other evidence on record that these papers contain draft arrangements for the raids which took place on the night of 18th April 1930. . . . ."

(Ibd. p. 124)

সংক্ষেপে পুনরাবৃত্তি করে জজসাহেব বললেন যে যন্ত্রপাতির যদি M MI ও M IV-এ, মোটর গাড়ির ব্যবস্থা M VIII-এ, একত্র হওয়ার স্থান নির্দেশ M VII ও M IX-এ, এবং দলসমূহের নিয়োগ M VIII-এ পাওয়া যাচ্ছে। জজসাহেব আরও অভিমত প্রকাশ করলেন যে, বাদীপক্ষ দাবি করছে স্বীকারোক্তি ছাড়াও অন্যান্য সাক্ষী-সাবুদ দ্বারা চূড়ান্তভাবে প্রমাণিত হয়েছে যে, ঐ সব টুকরো কাগজে ১৮ই এপ্রিল আক্রমণ চালাবার বিভিন্ন খসড়া করা ছিল।

আজকের সভায় Mobilisation Chart অনুযায়ী final check-up-এর পর আমরা একেবারে নিশ্চিত হলাম যে আমাদের সব বন্দোবস্ত সমাপ্ত হয়েছে। এর আগেও দু-তিনবার আমরা ব্যাপক বন্দোবস্ত সম্বন্ধে সম্পূর্ণ নিশ্চিত হয়েছিলাম এবং দু-তিনবারই আমাদের মধ্যে প্রস্তাব উত্থাপন করা হয়েছে যে সামগ্রিক আক্রমণের দিনটি ও সঠিক ঘণ্টাটি স্থির করা হোক। কিন্তু প্রস্তাব পর্যন্ত হয়েছে—গুরুত্ব দেওয়া হয় নি; তাই কোন সিদ্ধান্ত নেওয়া হল না। আজ সভায় আসবার আগে স্থির করেই এসেছিলাম যে, আক্রমণের দিন ও ঘণ্টা নির্ধারিত না করে যাব না।

আমার সবচেয়ে বেশি জানবার প্রয়োজন ছিল গণেশের মত—যুব-বিদ্রোহের দিন ও ক্ষণ আজই স্থির করতে সে প্রস্তুত আছে কিনা। মাস্টারদা ও আমি অপেক্ষা করছিলাম—যদি কেউ অভ্যুত্থানের দিন ও মুহূর্তটি ধার্য করার প্রস্তাব দেয়। জানি না মানসিক যোগাযোগ কোন কাজ করেছিল কিনা—আমার মনের ওপর থেকে একটি বোঝা মুহূর্তে নেমে গেল যখন গণেশই আজ সর্বপ্রথম খুব দৃঢ়তার সঙ্গে বলল,—

"দিন ও ক্ষণ নির্ভুলভাবে আজই ঠিক করতে হবে—কখন আমরা যুগপৎ সশস্ত্র আক্রমণ করব। যতক্ষণ পর্যন্ত আমরা দিন ও ক্ষণ সম্বন্ধে সঠিক জানতে না পারছি ততক্ষণ এমনিভাবে দিনের পর দিন অতিবাহিত হবে। মাস্টারদা শেষ দিনটি ধার্য করা হোক—সেই দিন আমাদের ঝাঁপিয়ে পড়তেই হবে, তারপর আর একদিনও আমরা অপেক্ষা করব না"

আমাদের একমত হতে আর বেশি সময় লাগল না। মাস্টারদা ও আমার মত তো ছিলই। নির্মলদা ও অম্বিকাদা অমত করেন নি। তখনই আলোচনা আরম্ভ হ'ল—ক'দিন পর আক্রমণের নির্দেশ দেওয়া হবে। যতদূর মনে পড়ছে আমাদের মধ্যে কেউ একজন বৃহস্পতিবার ১৭ই এপ্রিল ১৯৩০ সাল যুব-বিদ্রোহের দিন ধার্য করতে প্রস্তাব করল। কে এই প্রস্তাব করেছিল তা' আজ ঠিক মনে করতে পারছি না। এই দিনটি ধার্য করার সময় আমাদের প্রধান বিবেচনার বিষয় ছিল—খুঁটিনাটি সব প্রস্তুতি শেষ হবে কখন? যখন সব কাজ শেষ হবে তখন কালবিলম্ব না করে আক্রমণ করা সাব্যস্ত করতে হবে—কোন দ্বিধা-সঙ্কোচ থাকলে চলবে না। সেইরূপ দৃষ্টিভঙ্গী সামনে রেখে ১৭ই এপ্রিল আক্রমণের দিন ধার্য করার ব্যাপারে কারও কোন আপত্তি ছিল না—কারণ, তার আগে সবিস্তারে খুঁটিনাটি কাজ যে শেষ হবে, সে বিষয়ে আলোচনা করে নিশ্চিত ছিলাম। কিন্তু তা' সত্ত্বেও আমি প্রস্তাব করলাম, আর একটি দিন পরে, ১৮ই তারিখ—শুক্রবার, দিনটি ধার্য করলে ভাল হয়। কি কারণে

একটি দিন পরে আক্রমণ করলে ভাল হয়, আমার মনে হয়েছিল? আর একটি দিন বেশি অপেক্ষা করার পেছনে সত্যি বলতে কি কোন কারণ বা যুক্তি ছিল না—ছিল আমার পূর্বসংস্কার। অলৌকিক শক্তি, ভৌতিক ক্ষমতা, করুণাময়ী মা'র সব 'পুতুল খেলা', প্রভৃতি সংস্কার থেকে তখন আমি সম্পূর্ণ মুক্ত ছিলাম। অন্ধ ভগবৎ বিশ্বাস থেকে যুক্তিবাদ ক্রমে ক্রমে কিভাবে আমাকে মুক্ত করল তা' আগে লিখেছি। আশ্চর্য! তবু আমি তখনও সামান্য একটি পূর্ব-সংস্কার থেকে মুক্তি পেলাম না। 'শুক্রবার' আমার জীবনে একটি শুভদিন—বহু কাজে সফলতা পেয়েছি সেই দিনটিতে। আর একেবারে ছোটবেলা থেকেই বৃহস্পতিবারটিকে আমি, কাজ-কর্মের জন্য, বর্জ্জন করে চলতাম। কারণ, হয়ত কোন কাজের সূচনা বৃহস্পতিবারে আমার পক্ষে মঙ্গলজনক হয় নি। সেই কারণে মনের অগোচরে এইরূপ সংস্কার বদ্ধমূল হয়েছিল। তাই এই সংস্কারের প্রভাবমুক্ত হতে পারলাম না।

আমার এই সংস্কারের কথা বন্ধুরা প্রায় সকলেই জানতেন। একজন সাথীর যখন এইরূপ একটি সংস্কার আছে এবং তা' যখন হুকুম দিলেই মন থেকে তাড়িয়ে দেওয়া সম্ভব নয়, তখন মাস্টারদা অভ্যুত্থানের জন্য ১৮ই এপ্রিল, ১৯৩০ সাল, এই প্রস্তাবই অনুমোদন করলেন। আমার মতে দলের একজন সৈনিক যদি দ্বিধাগ্রস্ত মনে যুব-বিদ্রোহে অংশ গ্রহণ করতে যায় তবে তা'তে আশানুরূপ ফল-লাভে ব্যাঘাত ঘটতে পারে, বোধহয় এইরূপ ভেবেই তাঁরা সেইদিন বিতর্ক না করে ১৮ই এপ্রিল—শুক্রবার দিনটি অভ্যুত্থানের জন্য স্থির করলেন।

আয়ারল্যাণ্ডের স্বাধীনতা যুদ্ধের ইতিহাসে 'ইস্টার বিদ্রোহ' একটা অবিস্মরণীয় ঘটনা। ইস্টার বিদ্রোহের দিনটিও ছিল ১৮ই এপ্রিল, শুক্রবার—Good Friday. সেই দিনটি যীশুর ক্রুশ-বিদ্ধ হওয়ার স্মরণ দিবস—খৃস্ট-ধর্মাবলম্বীদের কাছে সেই দিনটি যীশুর কবর হতে পুনরভ্যুত্থানের পর্ব-বিশেষ। এই উৎসবের দিনে ইউরোপীয়ান ক্লাবে উচ্চপদস্থ সাহেবদের একসঙ্গে আমোদ-বিভোর অবস্থায় পাওয়া যাবে। যীশুর পবিত্র নামের সুযোগ নিয়ে তারা এতদিন যে পাশবিক অত্যাচারে ভারত-বাসীকে জর্জরিত করেছে তারই প্রায়শ্চিত্ত তাদের করতে হবে নিজেদের বুকের রক্ত দিয়ে এবং তা' করাবো আমরা আমাদের শাণিত তরবারির আঘাতে। সময়, অর্থাৎ আক্রমণের জন্য সঠিক ঘণ্টা, ধার্য হল—রাত আটটা!

Good Friday। রাত আটটা। শুক্রবার—১৮ই এপ্রিল, ১৯৩০ সাল। চট্টগ্রামের বুকে বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে সশস্ত্র যুব-বিদ্রোহের আগুন প্রজ্বলিত হবে। আমরা পাঁচজন পর-স্পরের দৃষ্টি বিনিময় করলাম। প্রত্যেকের চোখে দৃঢ়তা ব্যক্ত হ'ল। কোন উত্তেজনার প্রকাশ ছিল না। ধীর মস্তিষ্কে শান্ত পরিবেশে আমাদের চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত ঘোষণা করলেন মাস্টারদা—"যুব-বিদ্রোহের রণভেরী বেজে উঠবে—শুক্রবার রাত আটটা, ১৮ই এপ্রিল, ১৯৩০ সাল।"

[ক্রমশঃ]

ধারাবাহিক উপন্যাস

আশাপূর্ণা দেবী

(পূর্ব-প্রকাশিতের পর)

কিন্তু সুবর্ণলতাই বা এমন অনমনীয় কেন?

কিছুতেই ভেঙে মাটিতে লুটিয়ে পড়বে না কেন? ভেঙে পড়তে পড়তে আবার খাড়া হয়ে ওঠে কেন? এত প্রতিবন্ধকতাতেও ধাড়ি মেয়ে পারুলকে সে স্কুলে ভর্তি করতে বদ্ধপরিকর কেন?

প্রবোধচন্দ্র বাইরে থেকে ঘরে এসে রাগে গনগন করতে করতে বললো, 'এসব কি শুনছি? পাশের বাড়ির পরিমলবাবুর ছেলেকে দিয়ে না কি পারুকে ইস্কুলে ভর্তি করতে পাঠিয়েছিলে?'

'পাঠিয়েছিলাম তো'—সুবর্ণ সহজগলায় বলে, 'পারু বকু দুজনকেই।'

'চুলোয় যাক বকুল। পারুকে পাঠিয়েছিলে কী বলে?'

'এ পর্যন্ত ওটা ওর হয়ে ওঠে নি বলে!'

'হয়ে ওঠে নি বলে!' প্রবোধ সহসা একটা কুৎসিত মুখভঙ্গী করে ওঠে, 'সেই ভয়ঙ্কর দরকারি কাজটা হয়ে ওঠে নি বলে রাজ্য রসাতলে গেছে? পৃথিবী উল্টে গেছে? চন্দ্র সূর্য খসে পড়েছে? তাই তুমি একটা ছোঁড়ার সঙ্গে ওই ধাড়ি ধিঙ্গী সোমত্ত মেয়েকে—'

'থামো! অসভ্যতা কোরো না!'

'ওঃ বটে! অসভ্যতা হল আমার? আর তোমার কাজটা হয়েছে খুব সুসভ্য? পরের কাছে মুখাপেক্ষী হতেই বা গেলে কোন মুখে? এদিকে তো মানের জ্ঞান টনটনে।'

'অভাবে স্বভাব নষ্ট চিরকেলে কথা—' সুবর্ণ বলে, 'যার নিজের তিন কুলে করবার কেউ না থাকে, সে পরের দরজায় হাত পাতবে এটাই স্বাভাবিক!'

'ওঃ! তোমার কেউ কিছু করে না? আচ্ছা নেমকহারাম মেয়েমানুষ বটে! বলে সারাটা জীবন এই ভেড়াটাকে এক তিল স্বস্তি দিলে না, শান্তি দিলে না, বিশ্রাম দিলে না, নাকে দড়ি দিয়ে ছুটিয়ে মারলে; তবুও বলতে বাধছে না কেউ কিছু করে না?'

সুবর্ণ স্থির স্বরে বলে, 'যা কিছু করেছ সব আমার জন্যে?'

'তা না তো কি? আমার জন্যে? আমার কী এত দরকার ছিল? মায়ের ছেলে মায়ের কাছে পড়ে থাকতাম—'

সুবর্ণ ওই অপরিসীম ধৃষ্টতার দিকে তাকিয়ে বলে, 'শুধু মায়ের ছেলে? আর তোমার নিজের জঞ্জালের স্তূপ? তারা? তাদের কথা কে ভাবতো?'

'তারা তাদের বংশের ধারায় মানুষ হতো! এক-একটি সাহেব বিবি করে তোলবার দরকার ছিল না কিছু! বলে দিচ্ছি বকুল যায় যাক, পারুর কিছুতেই বিনুনি দুলিয়ে ইস্কুলে যাওয়া চলবে না ব্যস!'

'পারু যাবে!'

'কী বললে? আমি বারণ করছি তবু পারু যাবে?'

'তোমার সঙ্গে তর্ক করতে চাই না! আমি যা করেছি বুঝেই করেছি। আর সেটা হবে! এই হচ্ছে আমার শেষ কথা!'

শেষ কথা।

এই শেষ কথার উত্তরে আর কোন্ কথা বলতে পারতো সুবর্ণর স্বামী, কে জানে, কিন্তু সুবর্ণর ছেলে কথা কয়ে উঠল। পাশের ঘর থেকে।

পাশের ঘরে কানু বসে খবরের কাগজ পড়ছিল; এবং দু' ঘরের মাঝখানের দরজা খোলা থাকার দরুণ মা বাপের প্রেমালাপ শুনছিল, হঠাৎ অসহিষ্ণু গলায় বলে উঠলো, 'মা'র মুখে চিরদিনই ঠাকুমাদের সমালোচনা শুনে এসেছি, আর স্বভাবতই

চিত্রাঙ্কন শিখিবার বই
কে আর্টস ড্রইং বুক
বিভিন্ন খণ্ডে প্রকাশিত
আঞ্জেলো পাবলিশার্স
১৪নং রমানাথ মজুমদার স্ট্রীট, কলিকাতা-৯

ভেবে এসেছি দোষ তাঁদের-ই। এখন বুঝতে পারছি গলদটা কোথায়!'

বললো।

এই কথা বললো সুবর্ণর মেজ ছেলে। অসহিষ্ণু হয়ে বলে উঠলো।

বাবা যখন মাকে 'নেমকহারাম মেয়েমানুষ' বিশেষণে বিভূষিত করেছিল, তখন অসহিষ্ণু হয়ে ওঠে নি সে, যখন বাবা নিজের মেয়ে সম্পর্কে শিথিল মন্তব্য করে রাগ প্রকাশ করেছিল, তখনও চুপ করে থেকেছিল, অসহিষ্ণু হয়ে মন্তব্য প্রকাশ করে উঠল মায়ের দুঃসহ স্পর্ধায়!

বলে উঠল, 'এখন বুঝতে পারছি গলদটা কোথায়!'

কিন্তু আশ্চর্য, সুবর্ণলতা ধমক দিয়ে থামিয়ে দিল না তাকে, চীৎকার করে প্রতিবাদ করে উঠল না। সুবর্ণলতা যেন হঠাৎ চড়-খাওয়া মুখে শিথিল স্খলিত গলায় প্রশ্ন করল 'কি বললি! কি বললি তুই!'

বলল, আর মাটিতে বসে পড়ল।

কানু মায়ের সেই নিষ্প্রভ অসহায় মুখের দিকে ক্রুদ্ধ দৃষ্টি হেনে ও ঘর থেকে আরো অন্য ঘরে চলে গেল খবরের কাগজখানা হাত থেকে আছড়ে ফেলে দিয়ে। কানুর চলে যাওয়ার সংগে সংগে ধ্বনিত হল, 'আর কি! জানো তো খালি মূর্ছা যেতে, ওইতেই সবাইকে জব্দ করে রাখতে চাও!'

আর কিছু করল না।

'জল জল, পাখা পাখা' বলে ব্যস্ত হলো মুক্তকেশীর ছেলে।

সুবর্ণলতার জীবনটা যার সংগে আষ্টেপৃষ্ঠে বাঁধা। যে নাগপাশের বন্ধন থেকে মুক্তির উপায় খুঁজে পায় নি সুবর্ণলতা!

সুবর্ণর সংসারত্যাগিনী মা না কি সংসার ত্যাগের প্রাক্‌কালে বলে গিয়েছিল, ওটা 'নাগপাশই' না লতাপাতার বন্ধন তাই দেখবে বাকি জীবনটা।

কিন্তু তাতে সুবর্ণর কি হল?

সুবর্ণ কি পেল তা থেকে?

পেল না।

পায় না।

এইটাই যে নিয়ম পৃথিবীর, অনেক দিনের সাধনা চাই। এক যুগের তপস্যা তার সাধনা পরবর্তী যুগকে এনে দেয় সাধনার সিদ্ধি, তপস্যার ফল। অনেক 'কেন' আর অনেক বিদ্রোহ নিষ্ফল ক্ষোভে মাথা কুটে কুটে মরে, তলিয়ে যায় অন্ধকারে, তারপর আসে আলোর দিন।

তবু—

যারা অন্ধকারে হারিয়ে গেল, তাদের জন্যেও রাখতে হবে বৈ কি একবিন্দু ভালবাসা, একবিন্দু শ্রদ্ধা, একবিন্দু সমীহ।

হয়তো সুবর্ণলতার জন্যেও আসবে তা' একদিন।

হয়তো সুবর্ণলতার আত্মা সেই পরমপ্রাপ্তির দিকে তাকিয়ে একটু পরিতৃপ্তির নিশ্বাস ফেলবে।

বলবে, 'সারাজীবন যার জন্যে জ্বলেছি আর জেবলেছি, পুড়েছি আর পুড়িয়েছি, কোথাও কোনোখানে তবে সার্থক হয়েছে সে?'

কিন্তু কবে সেই পরিতৃপ্তির নিশ্বাসটুকু ফেলতে পাবে সুবর্ণলতার আত্মা?

আজো কি অগণিত সুবর্ণলতা মাথা কুটে মরছে না এই 'আলোকোজ্জ্বল যুগের' চোরাকুঠুরীর ঘরে? রুদ্ধ কণ্ঠে বলছে না, 'তোমরা শুধু সমাজের মলাটটুকু দেখেই 'বাহবা' দিচ্ছ, আত্মপ্রশংসায় বিগলিত হচ্ছ, আত্মপ্রচারের জৌলুসে নিজেকেই নিজে বিভ্রান্ত করছ, খুলে দেখছ না ওর ভিতরের পৃষ্ঠা? দেখ সেই ভিতরের পৃষ্ঠায় কোন অক্ষর, কোন ভাষা, কোন লিপি!'

সেখানে যে অগণিত সুবর্ণলতা আজো অপেক্ষা করছে 'কবে পাপের শেষ হবে, তার প্রতীক্ষায়।'

বলবে—

'কবে অহঙ্কারী পুরুষসমাজ খোলা গলায় স্বীকার করতে পারবে, 'তুমি আর আমি দু'জনেই ঈশ্বরসৃষ্ট। তুমি আর আমি দু'জনেই সমান প্রয়োজনীয়।'

কবে ঈর্ষাপরায়ণ পুরুষসমাজ মুক্ত মনে বলতে পারবে, 'তোমাকে যে স্বীকৃতি দিতে পারি নি সেটা তোমার ত্রুটির ফল নয়, আমার ত্রুটির ফল! তোমার মহিমাকে মর্যাদা দিতে বাধে সেটা আমার দুর্বলতা, তোমার শক্তিকে প্রণাম করতে পারি না সেটা আমার দৈন্য। নিজেকে তোমার 'প্রভু' ভাবার অভ্যাসটা ত্যাগ করতে আমার অভিমান আহত হয়। তাই দাস সেজে তোমায় 'রাণী' করি! আজো তোমাকে মুগ্ধ করে মুঠোয় পুরে রাখতে চাই তাই চাটুবাক্যে তোয়াজ করি। আর আমার শিল্পে সাহিত্যে কাব্যে সঙ্গীতে যে তোমার বন্দনা গান করি, সে শুধু নিজেকে বিকশিত করতে! তুমি আমার প্রদীপে আলোকিত হও, এই আমার সাধ, আপন মহিমায় ভাস্বর হও এতে আমার আপত্তি। তাই তুমি যখন গুণের পরিচয় দাও তখন করুণার হাসি হেসে পিঠ চাপড়াই, যখন—শক্তির পরিচয় দাও তখন বিরক্তির ভ্রূকুটি নিয়ে বলি 'ডেঁপোমি', আর যখন বুদ্ধির পরিচয় দাও, তখন তোমাকে খর্ব করবার জন্যে উঠে পড়ে লাগি।......

'তোমার রূপবতী মূর্তির কাছে আমি মুগ্ধ ভক্ত, তোমার ভোগবতী মূর্তির কাছে আমি বশম্বদ, তোমার সেবাময়ী মূর্তির কাছে আমি আত্মবিক্রিত, তোমার মাতৃমূর্তির কাছে আমি শিশু মাত্র।...কিন্তু এগুলি একান্তই আমার জন্যে হওয়া আবশ্যক। হ্যাঁ আমাকে অবলম্বন করে যে 'তুমি' সেই 'তুমি'টিকেই মাত্র বরদাস্ত করতে পারি আমি। তার বাইরের 'তুমি' হচ্ছ বিধাতার একটি হাস্যকর সৃষ্টি!'

কে জানে কবে এসব বলতে পাবে সুবর্ণলতার আত্মা!

কারণ—হয়তো পাবেই না। এই তো পুরুষের হৃদয়রহস্য!

এই মনের ভাব খুলে বলতে পারবে কোনোদিন পুরুষসমাজ? মনে হয় না আধুনিকতার বুলি আউড়ে আউড়ে দেখাবে 'দেখ আমি কত উদার। আমি কত মুক্ত,' যুগের রং লাগিয়ে লাগিয়ে বলবে 'দেখ তোমাকে কত বর্ণাঢ্য করে তুলেছি!' কিন্তু সে রং পুতুলের রং। প্রতিমার প্রাণ প্রতিষ্ঠা করবার সাধনা নেই তার, পুতুলে রং লাগিয়েই খুশি! সেই রংচঙে পুতুলগুলি তুলে ধরবে বিশ্বসমক্ষে, বলবে 'দেখেছ? দেখ দেখ আমাদের কত ঐশ্বর্য!'

বিদ্যেবতীর আর বাড়ির বিদ্যে কুলোচ্ছে না?'

গৌর মোহন দাস এণ্ড কোং
২৩৩, ওল্ড চীনা বাজার স্ট্রীট
কলিকাতা-১
ফোন: ২২-৬৫৮০

খবরের কাগজখানা আছড়ে ফেলে দিয়ে কানু তীব্র বিরক্তি ভরে এঘরে এসে পারুকে উদ্দেশ করে বলে ওঠে ওই কথাটি!

কানুর এই গায়ে পড়ে ব্যঙ্গ করতে আসায় রাঙা হয়ে উঠলো পারুর মুখ, ঠোঁটটা কামড়ে চুপ করে রইল। সুবর্ণলতার অন্তর প্রকৃতির সঙ্গে হয়তো মিল আছে তার, মিল নেই বাইরের প্রকৃতির। 'চোপা' করবার দুরন্ত ইচ্ছেকে দমন করে চুপ করে থাকে সে।

এখনো চুপ করেই থাকে হাতের খোলা বইখানা মুড়ে।

কানু একবার তার সেই বইখানার দিকে দৃষ্টিপাত করে বলে, 'নাটক নভেলের তো শ্রাদ্ধ করেছো, ওই মাথায় আর যোগ-বিয়োগ গুণ ভাগ ঢুকবে?'

পারুল এবার কথা কইলো।

বললো, 'ঢুকবে কি না সে পরীক্ষা তো করা হয় নি।'

'ইস! কথা শেখা হয়েছে যে দেখছি খুব!' নভেলের যা ফল। লেখাপড়া শেখা তোর কর্ম নয় বুঝলি? আমার একটা বন্ধুর ছোটবোন, মানে তোর মতন একটা মেয়ে আসছেবার এণ্ট্রেন্স পরীক্ষা দেবে বুঝলি? সে সব মাথাই আলাদা।'

'মাথাটা নিয়েই বোধহয় জন্মেছিল তোমার বন্ধুর বোন?

কানু ব্যঙ্গ হাসি হেসে বলে, 'তা ছাড়া? তোমার দ্বারা কিস্যু হবে না, বুঝলে? শুধু মাতৃদেবীর মত বড় বড় কথা শিখবে তুমি!'

পারু তার প্রকৃতিটা লঙ্ঘন করতে চায় না, তবু পারু বলে ফেলে, 'মা ভাগ্যিস ওই বড় বড় কথাগুলো শিখেছিলেন মেজদা, তাই তোমারও, এত 'বড় কথা' বলার সুযোগ হচ্ছে।'

'সত্যি! বাঃ বেশ বুদ্ধি হয়েছে তো দেখছি খেঁদুর! নাঃ ভাল দেখে একটা বর তোকে দিতেই হচ্ছে।'

[ক্রমশঃ]

উপহার সম্বন্ধে সমস্যা?

ইউবিআই গিফ্‌ট চেক দেখুন না...

বিবাহ, জন্মদিন, নববর্ষ, দুর্গোৎসব, দেওয়ালি, বড়দিন, ঈদ—উপলক্ষ্য যাই হোক, দেওয়া চলবে। দেখলে পছন্দ হবে আপনার—সুন্দর চেক, সুন্দর ফোল্ডার। আর নাই থাকল অ্যাকাউন্ট, আপনিই চেক সই করবেন।

ব্যাঙ্কের যে-কোন শাখা অফিসেই কিনতে পারেন।

ইউবিআই গিফট চেক ইউবিআই গিফট চেক ইউবিআই গিফট চেক

ইউনাইটেড ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়া লিঃ
রেজিষ্টার্ড অফিস: ৪, ক্লাইভ ঘাট ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১

UNITED BANK OF INDIA LTD.

J.933/UBI/BEN

পশ্চিমবঙ্গে ৮০টিরও অধিক শাখা আছে

ঋষি শ্রীঅরবিন্দ

শ্রী দিলীপকুমার রায়

(পূর্ব-প্রকাশিতের পর)

এবার অশ্বপতির কথা কিছু বলতে হবে। যেমন খৃস্টের আসন্ন আবির্ভাবের উদ্গাতা ছিলেন জন দি ব্যাপ্টিস্ট, তেমনি সাবিত্রীর আগমনীর উদ্গাতা—অশ্বপতি। না তারও বেশি—তাঁর দুশ্চর তপস্যা ও জ্বলন্ত অভীপ্সার টানেই সাবিত্রীকে আসতে হয়েছিল। মহাভারতের এই তথ্যটি শ্রীঅরবিন্দ রূপান্তরিত করে অশ্বপতিকে করলেন তাঁর সাবিত্রী কাব্যের নায়কই বলব। প্রথম দুই সর্গ সাবিত্রীর বর্ণনা, তার পরের স্কন্ধ কয়টিতে পাই অশ্বপতির তপস্যা ও নানা উপলব্ধির আশ্চর্য ছবি। উপাধিগুলিই বা কি কম আশ্চর্য!—

A colonist from immortality....
A treasurer of superhuman dreams,....
His soul lived as eternity's delegate,
His mind was like a fire assailing heaven,
His will a hunter in the trails of light....
He made of miracle a normal act....
The gifts of the spirit
crowding came to him.... (1.3)

(অমরার পুরবাসী হ'ল ধরণীর নাগরিক......
মানুষ পায় নি যার দিশা সেই স্বপ্নের ভান্ডারী,......
অন্তরপুরুষ তার ছিল চিরন্তনের প্রতিভূ,
মানস তাহার যেন শিখাসম স্বর্গে দিত হানা......
আলোকের দিশাপথে ইচ্ছা তার চলিত সন্ধানে......
অঘটন-ইন্দ্রজাল ছিল তার স্বভাবসাধনা......
অন্তরের অবদান দলে দলে বরিত তাহারে)

বলেছি মহাভারতের অশ্বপতি বিশ্ববারা দেবী সাবিত্রীর কাছে বর পেয়েছিলেন, আঠারো বৎসর ধরে তপস্যা (লক্ষ হোম) করার পরে। দেবী সাবিত্রী তাঁর সুদীর্ঘ তপস্যায় তুষ্ট হয়ে এসে তাঁকে বর দেন যে, তাঁর একটি "তেজস্বিনী" কন্যা হবে। শ্রীঅরবিন্দ এই কাহিনীকে রূপান্তরিত করলেন অশ্বপতিকে ধরণীর তপস্যার প্রতীক রূপে এঁকে—যাঁর সম্বন্ধে বলা হয়েছেঃ

His knowledge shared the Light ineffable
(অবর্ণ্য জ্যোতিকে তিনি লভিয়াছিলেন প্রজ্ঞালোকে)

প্রথম চারটি স্কন্ধে এই প্রজ্ঞার যে বর্ণনা শ্রীঅরবিন্দ দিয়েছেন অফুরন্ত সম্ভারে তার তুলনা নেই। এ বর্ণনার শিখর মাহাত্ম্য পাই তৃতীয় স্কন্ধের চতুর্থ সর্গে—যে-সর্গটি আমি আদ্যন্ত অনুবাদ ক'রে শ্রীঅরবিন্দের আশীর্বাদী সাধুবাদ পেয়েছিলাম—বলেছি। সমস্ত সর্গটির অনুবাদ দেওয়া সম্ভব নয়—অনামী দ্বিতীয় সংস্করণেও সবটুকুর তর্জমা দিই নি—মাত্র ছয় পৃষ্ঠা ছাপা হয়েছে। তাই এ-কয়পৃষ্ঠার পুনর্মুদ্রণ অনাবশ্যক। তবে কয়েকটি চরণের উদ্ধৃতি ও অনুবাদ দিতেই হবে।

অশ্বপতির বিপুল তপস্যার অন্তে বিশ্ববারা আবির্ভূতা হয়ে বললেন (মনে হয় শ্রীঅরবিন্দ তাঁর নিজের কোনো দর্শন শ্রবণের কথাই লিখেছেন—এত জীবন্ত এ-বাণী)ঃ

"O Son of Strength who climbst
creation's peaks,
No soul is thy companion in the light....
Alone thou standest at the eternal doors....
How shalt thou speak for men whose
hearts are dumb
Or lighten the burden of the senseless globe?
Man is too weak to bear the Infinite's weight.

(হে শক্তির বরপুত্র! সৃষ্টির শিখর-অভিসারী!
আলোক সাম্রাজ্যে তব তুমি বিনিঃসঙ্গ। একা আজ
উপনীত তুমি চিরন্তনের দুয়ারে। মূকহৃদি
জীবের কেমনে তুমি হবে বাণীবাহ? বোধহীনা
ধরিত্রীর ভার তুমি করিবে লাঘব কোন্ পথে?
কেমনে বহিবে বলহীন নর অসীমের ভার?

চিরদিন এইজন্যেই না অধরা আলো, অধ্যাত্ম সত্য পারে নি পৃথিবীতে অবতীর্ণ হ'তে। পরমহংসদেবের উপমা মনে পড়ে—ডোবায় হাতী নামলে সে কি পারে ধারণ করতে? উপছে পড়ে। তাই তো হাতীকে আবাহন করতে হ'লে আগে পল্বলকে হ'তে হবে পুষ্কর। নৈলে— Truth born too soon might break the imperfect earth— অকালে দৈব সত্যকে ডাক দিলে তার গুরুভারে হয়ত এ-চ্যুতিভরা পৃথিবী চুরমার হ'য়ে যাবে। মানুষ এখনো তো সে বিকাশের কোঠায় পৌঁছয় নি—তাড়াহুড়ো করলে হবে কি? "ন ত্বরমানেন লভ্যঃ" বলেছে বেদ কি সাধে? আজকের মানুষ? দেখ তো তার কী অবস্থা—উল্টো-পাল্টামিতে ভরা! শ্রীঅরবিন্দ মানুষের হাজারো অসঙ্গতির বড় চমৎকার ছবি এঁকেছেন নিপুণ বাস্তববাদীর ঢঙেঃ

A riddle of opposites is made his field:
Freedom he asks but needs to live in bonds,
He has need of darkness to perceive some light
And need of grief to feel a little bliss;
He has need of death to find a greater life.
All sides he sees and turns to every call;

He has no certain light by which to walk;
His life is a blind-man's-buff, a hide and seek;
He seeks himself and from himself he runs;
Meeting himself he thinks it other than he.
Always he builds but finds no constant ground,
Always he journeys but nowhere arrives;
He would guide the world,
himself he cannot guide;
He would save his soul, his life he cannot save....
His work unfinished,
he claims a heavenly prize.....
His failure is not failure whom God leads;
Through all the slow mysterious
march goes on.....
And how shall the end be vain
when God is guide?....
The goal recedes, a bournless vastness calls......
There is no rest for the embodied soul....
Till he has found himself he cannot pause.

(বৈপরীত্য-প্রহেলিকা জীবনভূমিকা মানবের:
মুক্তি চায়—তবু প্রাণধারণের তরে চাই তার
বন্ধন; চকিত আলো-দর্শনের তরেও তাহার
চাই অন্ধকার; চাই দুঃখ ক্ষণসুখভোগ তরে;
চাই মৃত্যু মহত্তর জীবনের আবিষ্কার তরে।
চারিদিকে দৃষ্টি তার, প্রতি ডাকে দিতে চায় সাড়া,
নাই ধ্রুবালোক তার গতিপথে দিতে সুনির্দেশ।
লুকোচুরি জীবনের লীলাচ্ছন্দ তার—আপনারে
করি' অন্বেষণ ধায় দূরে আপনারি সত্তা হ'তে।
আত্মারে দেখিয়া মনে করে—দেখেছে সে আর কারে।
নিরন্তর করে সৃষ্টি—কিন্তু নাই স্থির ভিত্তি তার।
চির-যাযাবর—তবু পারে না কোথাও উত্তরিতে।
বিশ্বের নিয়ন্তা হবে—পারে না নিজেরে নিয়ন্ত্রিতে।
আত্মার তারণ চায়—পারে না বাঁচাতে স্বীয় প্রাণ।......
সাধনা অপূর্ণ রাখি' করে দাবি স্বর্গীয় যৌতুক......
কিন্তু তাই ব'লে নির্ভরসার কোনো কারণ নেই, যেহেতু—

ঈশ্বর দিশারি যার নয় তার ব্যর্থতাও বৃথা;
চলাচল-মর্মে চলে এক ধীর গূঢ় অগ্রগতি।......
ভগবান যবে গুরু, সিদ্ধি হবে বিফল কেমনে?...
লক্ষ্য যত যায় সরি' ততই সে দেয় হাতছানি......
দেহীর বিশ্রাম নাই ধরণীতে: আত্মবোধ তার
যতদিন না হয়—সমাপ্তি তার হবে না চলার।")

বলেছি, অশ্বপতিকে শ্রীঅরবিন্দ এঁকেছেন ভগবানের এক আশ্চর্য বিভূতিরূপে মানুষের ঊর্ধ্বাশার প্রতিভূ। কিন্তু মামুলি ভঙ্গিতে আঁকেন নি—শুধু বাহ্য কৃচ্ছ্রসাধনে তাঁর তপস্যাকে মহনীয় করতে চেয়ে। শ্রীঅরবিন্দ আমাকে একটি চিঠিতে লিখেছিলেন যে, ভগবানের বিভূতি যাঁরা হন তাঁদের সামনে বাধাও হয় বিশাল। সাবিত্রীর এক স্থানে লিখেছেন:

He measured the difficulty with the might
And dug more deep the gulf that all must cross:

যাহার যেমন শক্তি শক্তিরাজও সেই অনুপাতে
করেন খনন পথে সুগভীর বাধার গহ্বর।

অশ্বপতির মহাপ্রাণের বেদনা—মানুষের নিয়তির দুর্লংঘ্যতা। অমৃতের পুত্র হয়ে অমৃতের জন্মস্বত্ব থেকে সে বঞ্চিত থাকবে আর কতদিন? তাই মহাভাগ গভীর বেদনার আবেদন জানালেন বিশ্বমাতার আশ্বাস-আশীর্বাণী পাওয়ার পরেও। বললেন (৩-৪):

"How shall I rest content with mortal days
And the dull measure of terrestrial things,
I who have seen behind the cosmic mask
The glory and the beauty of thy face?....
How long shall our spirits battle with the Night
And bear defeat and the brute
yoke of Death?...
All we have done is ever still to do.
All breaks and all renews and is the same.
Huge revolutions of life's fruitless gyre,
The new-born ages perish like the old.

(পার্থিব ছন্দের ম্লান দৈনন্দিনতারে বরি' আমি
মর্ত্যদিনগুলি যাপি' রবো তৃপ্ত জীবনে কেমনে—
যে-আমি দেখেছি এই বিশ্বলীলা অবগুণ্ঠনের
আড়ালে প্রচ্ছন্ন তব আননের মহিমা মাধুরী?......
তমিস্রার সাথে আর কত যুগযুগান্তর ধরি'
করিবে সংগ্রাম আত্মা আমাদের? মৃত্যুর পাশব
বশ্যতা সহিয়া রবো আর কতদিন মানি' হার?......
যা কিছু আমরা সাধি—আবার সাধিতে হয় তারে।
সকলি নিশ্চিহ্ন হয়—গড়ি পুনরায়, তবু রহে
অরূপান্তরিত সে। ঘূর্ণমান জীবনের চিরব্যর্থতা
ফিরিয়া আসে—নবজাত কল্প হয় লীন
অতীত কল্পেরই ম'ত।)

কত সত্য কথা! আনাতোল ফ্রাঁস তাঁর বিশ্ববিশ্রুত প্রতীক-উপন্যাস L'ISLE DES PINGOUINS-তেও নিয়তির ঠিক এই পরিহাসের ছবিই এঁকেছেন: যুগ যুগ ধ'রে মনে হয় যেন একই মিথ্যে খেলা চলেছে। প্রাণপাত পরিশ্রমে মানুষ বহুদিন ধ'রে যা গ'ড়ে তোলে এক মুহূর্তের মূঢ় রোষে সব ধ্বংস হ'য়ে যায়: An idiot hour destroys what centuries made. (৬-২) যে-পথে ধ্বংস অনিবার্য সব বুঝেও সেই পথেরই সে পথিক হয়, পেয়েও পায় না, শিখেও শিখে না দেখেও দেখে না! কেন এমন হয়? তবে কি বলব এ-সৃষ্টি-লীলা একটা অবোধ্য উপহাস কোনো খামখেয়ালী স্রষ্টার? না, না—অশ্বপতি তো নাস্তিক নন, তিনি যে চাক্ষুষ করেছেন "The glory and beauty of thy face" (৩.২) মহিমময়ীর সৌন্দর্য যে অপাপবিদ্ধ তিনি যে জানেন প্রত্যক্ষ দর্শনে। তাই জানেন:

"I know that thy creation cannot fail
For even through the mists for mortal thought
Infallible are thy mysterious steps....
This strange irrational product of the mire,
This compromise between the beast and God,
Is not the crown of thy miraculous world.
I know there shall inform the inconscient cells,
At one with Nature and at height with Heaven,
A spirit vast as the containing sky
And swept with ecstasy from invisible founts,
A god come down and greater by the fall.

(আমি জানি—সৃষ্টি তব পারে না মানিতে হার শেষে।
আমাদের চিন্তাকুহেলিরও ফাঁকে ফাঁকে যায় দেখা
রহস্যগুণ্ঠিত তব অভ্রান্ত চরণপাত, দেবী!
পঙ্কজাত অযৌক্তিক অদ্ভুত এ-মানুষ—যে রাজ্যে
পশু ও ভগবানের মধ্যভাগে ত্রিশঙ্কুর ম'ত—
নয় নয় তোমার এ-আশ্চর্য সৃষ্টির শিরোমণি।
জানি আমি—এ-দেহের অচেতন অণুপরমাণু
হ'য়ে স্বর্গসম তুঙ্গ, প্রকৃতির মর্মে অনুস্যূত,
উঠিবে জাগিয়া এক অলোক সম্বিতে—বিশ্বম্ভর
অম্বরের ম'ত যে বিশাল—অলক্ষিত গঙ্গোত্রীর
আনন্দের তরঙ্গে বিপ্লুত—যেথা দেবতা স্বয়ং
অবতীর্ণ হ'য়ে হবে দেবতার চেয়েও মহান্।

শ্রীঅরবিন্দ এ-অপূর্ব কাব্যোল্লাসে এ'কেছেন কোনো

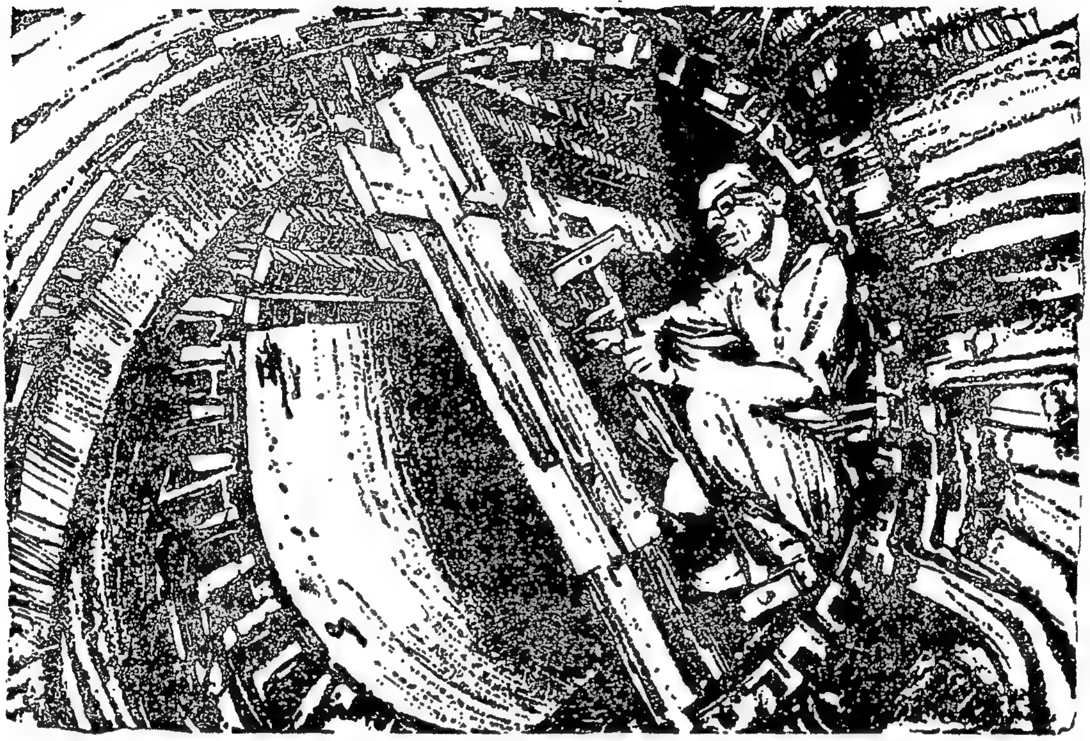

উৎসাহ আর চেষ্টায় সব হয় ...

জামশেদপুরের প্রধান পাওয়ার হাউসে ২৭,৫০০ কিলোওয়াটের তিনটি বিরাট টার্বো-অলটারনেটর আছে। এর মধ্যে একসঙ্গে দুটি চালিয়ে টাটা স্টীল ওয়ার্কস ও অন্যান্য সংশ্লিষ্ট কলকারখানা এবং সারা জামশেদপুর শহরকে চব্বিশ ঘণ্টা বিদ্যুৎ সরবরাহ করা হয়।

১৯৬৫ সালের সেপ্টেম্বর মাসে একটি টার্বো-অলটারনেটরের কয়েল-সিস্টেমে গণ্ডগোল হয়ে হঠাৎ সেটা অকেজো হয়ে পড়ে। কতকগুলো কারণে টার্বো-অলটারনেটর সারিয়ে তাড়াতাড়ি চালু করবার রাস্তা খুঁজে পাওয়া যাচ্ছিল না। মেরামতের জন্য যতগুলো বাড়তি কয়েল দরকার ততগুলো জামশেদপুরে ছিল না। বিদেশ থেকে আমদানী করতে গেলেও প্রায় একবছরের ধাক্কা। তাছাড়া, এতকাল এই বিরাট ও জটিল যন্ত্রগুলোর মেরামতি কাজ বিদেশী বিশেষজ্ঞ কারিগররাই করে এসেছেন।

এ জাতীয় যন্ত্র সম্বন্ধে অনভিজ্ঞতা সত্ত্বেও টাটা স্টীলের ইলেক্‌ট্রিশিয়ানরা মেরামত করার নতুন যন্ত্রপাতি তৈরী করে ফেললেন এবং সাধারণতঃ এগুলোর মেরামতে যত কয়েল লাগে তার মাত্র অর্ধেক বদল ক'রে এক নতুন কায়দায় যন্ত্রটিকে খাড়া করলেন। ১৯৬৬ সালের মে মাসে অচল টার্বো-অলটারনেটর আবার চালু হল। টাটা স্টীলের এই প্রচেষ্টায় দেশের ১ লক্ষ ৫০ হাজার টাকার বৈদেশিক মুদ্রা বাঁচলো। কিন্তু তার চেয়েও বড় কথা, ভারতে এই প্রথম এরকম জটিল বৈদ্যুতিক যন্ত্র মেরামতের কাজ সম্পন্ন ক'রে জামশেদপুর আবার প্রমাণ করল: উৎসাহ আর চেষ্টায় সব হয়।

টাটা স্টীল

The Tata Iron and Steel Company Limited

JWTTN 3439A

স্বকপোলকল্পিত রূপকথার ছাব নয়—ফলিয়ে তুলেছেন একটি সনাতন আর্য দর্শন ঃ যে, এ-পৃথিবীতে ভাগবত অবতারের সঙ্গে সঙ্গে যুগে যুগে দেবতারাও জন্মগ্রহণ করেন শুধু দেবদেবের লীলাসাথী হ'তেই নয়, মানুষকে তার আত্মঘাতী মূঢ়তা থেকে বাঁচাতে—হয় প্রত্যক্ষ আবির্ভাবে, না হয় তাঁদের অলক্ষ্য করুণার পরমস্পর্শে। এ-দেবসংঘ কবিকল্পনা নন, তাঁরা উচ্চকোটির সাধককে এসে আদেশ, ভরসা, বাণী ও শক্তি দেন অসাধ্যসাধনের। তাই সৃষ্টি যে তাঁরা শুধু রক্ষা করেন তাই নয়, ভগবানের আজ্ঞাবাহী হ'য়ে নব নব যুগান্তরেরও প্রবর্তন করেন। কী এ-দর্শন? না—

I saw the Omnipotent's flaming pioneers
Over the heavenly verge
which turns towards life
Come crowding down the amber stairs of birth;
Forerunners of a divine multitude.
Out of the paths of the morning star they came
Into the little room of mortal life.
I saw them cross the twilight of an age,
The sun-eyed children of a marvellous dawn,
The great creators with wide brows of calm,
The massive barrier breakers of the world
And wrestlers with destiny in her lists of will,
The labourers in the quarries of the gods,
The messengers of the Incommunicable,
The architects of immortality.
Into the fallen human sphere they came,
Faces that wore the Immortal's glory still,
Voices that communed still
with the thoughts of God,
Bodies made beautiful by the Spirit's light,
Carrying the magic word, the mystic fire,
Carrying the Dionysian cup of joy....
Lips chanting an unknown anthem of the soul,
Feet echoing in the corridors of Time....
Their tread one day shall change the
suffering earth
And justify the light on Nature's face.

কী অপূর্ব দর্শন বরাভয়! রবীন্দ্রনাথের একটি কবিতা মনে পড়ে ঃ "এ কি সত্য? এ কি সত্য?"

(দেখিয়াছিলাম আমি সর্বশক্তি পরাৎপরের
দীপ্র অগ্রদূতবৃন্দে প্রাণলীলামুখী সীমানায়
আসিতে সদলে নামি' বাহিয়া জন্মের তাম্রপীত
সোপান। প্রভাতী তারকার পথচারী সেই মহৎ
দিব্য জনতার পুরোগামিগণ এসেছিল এই
মর্ত্য জীবনের ক্ষুদ্র অঙ্গনে। দেখেছিলাম আমি
যুগের গোধূলিলগ্নে আশ্চর্য উষার অপরূপ
সূর্যনেত্র জাতকবৃন্দেরে, ব্যাপ্ত ঔদার্যসুন্দর
শান্তিভাল মহীয়ান্ স্রষ্টাদের, বিশ্বের বিশাল
বাধা বাঁধ ভাঙে যারা, নিয়তির সংকল্পের সাথে
রণাঙ্গনে ঘোষে মহারণ, করে সাধনা যাহারা
দেবতার খনিগর্ভে, ভাষা যার পায় না উদ্দেশ
তারি অভী বাণীবাহ, স্থপতি অমরতার, ম্লান
পতিত এ-মর্ত্যলোকে অবতীর্ণ হয়েছিল তারা ঃ
আনন—যে শাশ্বতের আভাবরে নিত্যজ্যোতির্ময়,
কণ্ঠ—করে যে আলাপ নিত্য চিন্তামণি-চিন্তা সাথে,
দেহ—যারে সুষমায় বিমণ্ডিল আত্মার আলোক,
ইন্দ্রজাল-মন্ত্রভাষী, অলোক অগ্নির নচিকেতা
প্রাণোল্লাসী মহেন্দ্রের বিপুলানন্দের পাত্রবাহী....
অধর—যে গায় এক অজানিত কীর্তন আত্মার
চরণ যে প্রতিধ্বনি জাগায় কালের ছায়াপথে......
তাদের চরণপাতে একদিন আর্ত অবনীর
হবে রূপান্তর, হবে পূর্ণসিদ্ধ সে-আলোক ভায়
দীপ্তি যার প্রকৃতির সনাতন অম্লান আননে।)

এ-দর্শন যার হয় নি সে শুধু কল্পনা ক'রে কিছুতেই এমন দীপ্যমান মন্ত্রসাম গাইতে পারে না। অশ্বপতির মধ্যে পাই আধুনিক শ্রেষ্ঠ মনীষীর গূঢ় বেদনার প্রশ্নের সঙ্গে সঙ্গে সনাতন ঋষির ধ্যানলব্ধ দৃষ্টি শ্রুতি- যে অভয়-ওঙ্কার উচ্চারণ করতে পারে জেনেছে দেখেছে চেখেছে ব'লে। শুধু কবির কর্ম নয় এমন লোকোত্তর নবীর ঝঙ্কারে কণ্ঠসাধনা—ঋষির মন্ত্রে মর্ত্যবাসীকে অমর্ত্যের আশ্বাস দেওয়া—"শৃণ্বন্তু বিশ্বে অমৃতস্য পুত্রাঃ।"

তবু সনাতনের বুকেই পুনর্ণব ঃ সত্য এক, অদ্বিতীয় হ'লেও দেশকালপাত্রভেদে তার প্রকাশের ছন্দ ও প্রস্বনে কিছু না কিছু অভিনবত্ব থাকবেই থাকবে। কোনো ঋষি কবি মনীষীর দর্শন ছন্দ চিন্তাই তাঁদের পূর্বসূরীদের অনুভব উপলব্ধির বরেণ্য প্রতিধ্বনি মাত্র নয়। শ্রীঅরবিন্দ এ-যুগের বলিষ্ঠ চিন্তার আবহে গ'ড়ে উঠেছেন। ভারতের তপস্যা ও পাশ্চাত্যের মনীষা দুয়ের এক অভূতপূর্ব সমন্বয় তাঁর মধ্যে ফুটে উঠেছে। তাই দর্শনের পরেও তাঁর মনে প্রশ্ন আসে, তিনি যাচাই করতে চান যা দেখেছেন তা সত্য তো? যে-স্বপ্ন দেখেছেন তা অবশ্যম্ভাবী তো? যে-আলো পেয়েছেন তা সকলের সম্পত্তি তো? বিশ্বমাতা তাঁকে শিরোপা দিয়েছিলেন এই ব'লে (৩-৪)ঃ

I ask thee not to merge thy heart of flame
In the Immobile's wide uncaring bliss

(চাই না আমিও—বহ্নিদীপ্র হৃদি তোমার থাকুক
বিশ্ব-উদাসীন জড় সমাধির মহানন্দে লীন)

কারণ বিশ্বমাতা যে চেয়েছিলেন যে, অশ্বপতির-

Let thy toil be vast....
My light shall be in thee,
my strength thy force

(সাধনা তোমার হোক মহীয়সী—রাজিবে আমার
আলোক তোমাতে, শক্তি আমার তোমাকে দিবে বল।)
কিন্তু "নাল্পে সুখমস্তি"—
তাই ভগবতী চেয়েছিলেন ঐ সঙ্গেঃ

Ask not the imperfect fruit, the partial prize
Only one Boon, to greaten thy spirit demand;
Only one joy, to raise thy kind, desire.

(চাহিও না জীবনে অপরিণত ফল,
অপূর্ব কীর্তির সিদ্ধি। চাহিও কেবল এক বর।
আত্মার প্রসার—শুধু একটি আনন্দ-পুরস্কার
করিও কামনা—তব সাথী মানবের উন্নয়ন।)

(ক্রমশঃ)

রঙ্গমঞ্চ ওদেশে এবং এদেশে

দীপালি

নাটকের সংলাপ পদ্যে হওয়া উচিত গদ্যে হওয়া উচিত এ বিষয় নিয়ে পাশ্চাত্যের নাট্যকার ও সমালোচকদের ভেতর মতদ্বৈধ আছে। টি, এস্‌ এলিয়ট তাঁর 'সিলেক্টেড এসেজের' 'এ ডায়ালগ অন্‌ ড্রামাটিক পোয়েট্রি' প্রবন্ধে একটি কাল্পনিক চরিত্রের মুখ দিয়ে বলিয়েছেনঃ

"People have tended to think of verse as a restriction upon drama. They think that the emotional and the realistic truth of drama is limited and circumscribed by verse. People were once content with verse in drama, they say, because they were content with a restricted and artificial range of emotion.

Only prose can give the full gamut of modern feeling, can correspond to actuality. But is not every dramatic representation artificial? And are we not merely deceiving ourselves when we aim at greater and greater realism? Are we not contenting ourselves with appearance instead of insisting upon fundamentals? Has human feeling altered much from Aeschylus to ourselves? I maintain the contrary. I say that prose drama is merely a slight by product of verse drama. The human soul, in intense emotion, strives to express itself in verse. It is not for me, but for the neurologists, to discover why this is so, and why and how feeling and rhythm are related. The tendency, at any rate, of prose drama is to emphasise the ephemeral and superficial; if we want to get at the permanent and universal we tend to express ourselves in verse.

এই পরিপ্রেক্ষিতে পরীক্ষা করলেই স্পষ্ট বোঝা যায় কেন বহুবিধ দোষ-ত্রুটি সত্ত্বেও শুধু কাব্যের মাধ্যমে রচিত বলেই 'রাজা ও রাণী' নাটক গদ্যে রচিত 'তপতীর' থেকে অনেক বেশি হৃদয়গ্রাহী প্রাণবন্ত এবং মর্মস্পর্শী—যদিও রচনার কলাকৌশলের দিক দিয়ে বিচার করলে 'তপতী' সর্বতোভাবে 'রাজা ও রাণীর' থেকে শ্রেষ্ঠ। বিক্রম বা সুমিত্রার অন্তরের সব গভীর অনুভূতি গদ্যের মাধ্যমে কতকগুলো অসার বক্তৃতার মত শোনায়—প্রাণে রেখাপাত করতে পারে কি? অথচ সেই সব অনুভূতিই যখন কাব্যে পরিবেশিত হয়, তখন তাদের গুরুত্ব গাম্ভীর্য এবং গভীরত্ব স্বতঃস্ফূর্ত হয়ে ওঠে। অনুভূতিলব্ধ চিরন্তন সত্যগুলিকে প্রাণময় করতে হলে আগে তাদের সংগীতময় করে তোলা দরকার। সংগীতের অনুরণন এবং ব্যঞ্জনার ভেতর দিয়েই ঐ সব সত্যের প্রাণপ্রতিষ্ঠা হয়ে থাকে। একথা অনস্বীকার্য যে—রবীন্দ্রনাথ বা শেলীর মত শক্তিশালী কবি যে গদ্য রচনা করেছেন তাকে নিছক গদ্য না বলে গদ্যকাব্য বা সংগীতময় গদ্য নামে অভিহিত করাই উচিত। তবুও বিশুদ্ধ কাব্যে সংগীতের যে পরিণত রূপ পাওয়া যায়, গদ্যকাব্যে তার যথেষ্ট অভাব। সুতরাং বিষয়বস্তু সম্বন্ধে বিশেষ বিবেচনা করে তবেই নাট্যকারের নির্ধারণ করা উচিত যে নাটকের ভাষা পদ্যে রচিত হবে কি গদ্যে রচিত হবে। হাউপ্টমানের 'দি সাঙ্কেন বেল' নাটকটির বা ইয়েট্‌সের নাটকের বিষয়বস্তু থেকেই স্পষ্ট বোঝা যায় যে একমাত্র কাব্যনাট্য হিসাবেই এদের সর্বাঙ্গসুন্দর রূপায়ণ সম্ভব হয়েছে। তেমনি আবার বার্নার্ড শ'র নাটকের বিষয়বস্তু গদ্যে ছাড়া কাব্যে পরিবেশনের কল্পনা করা যায় না। ইবসেনের 'এ ডলস হাউস'-এর কথাই ধরুন না—নোরার সংলাপগুলো যদি কবিতায় বলা হোত তবে নিঃসন্দেহে এই শ্রেষ্ঠ নাটকটি মেলোড্রামায় পরিণত হোত। অতএব এলিয়ট যা বলেছেন, অর্থাৎ—The tendency, at any rate, of prose drama is to emphasise the ephemeral and superficial; if we want to get at the permanent and universal we tend to express onrselves in verse."—খুবই খাঁটি কথা। এই প্রসঙ্গে আর এক ধরণের নাটকের কথা এসে পড়ে। আকৃতির দিক দিয়ে বিচার করলে এদের নাটক সংজ্ঞাই দিতে হয়। কিন্তু প্রকৃতির দিক দিয়ে বিচার করলে এদের কাব্য শ্রেণীতে ফেলাই সমীচীন। কাব্যের যে সব বৈশিষ্ট্য—অর্থাৎ অলঙ্কার উপমা, অনুপ্রাস, নৈর্ব্যক্তিক কল্পনা—এই ধরণের নাটকে সেই সকলেরই বহুল পরিমাণ ব্যবহার দেখা যায়। কাহিনী ঠিক স্বাভাবিক গতিতে পরিণতিতে পৌঁছয় না। স্থানে স্থানে এই গতি অত্যন্ত শ্লথ, অত্যন্ত মন্থর হয়ে পড়ে। সংঘাত বা চরিত্র চিত্রণের দিকগুলো ঠিক নাটকীয় প্রথায় গড়ে ওঠে না। এসব নাটকে এ্যাকসনের অভাবই বিশেষভাবে চোখে পড়ে। উদাহরণ হিসাবে রবীন্দ্রনাথের 'চিত্রাঙ্গদা' বা শেলীর নাটকগুলো এই পর্যায়ে ফেলা হয়।

নাট্যকার জীবনশিল্পী — জীবনের সুখ-দুঃখ, হাসিকান্না, আনন্দবেদনার নানারূপ চিত্রের পরিবেশনের দ্বারাই তিনি পাঠক এবং দর্শকের মানসিক প্রকৃতিকে পরিশোধিত এবং পরিমার্জিত করে তোলবার প্রচেষ্টা করেন। জীবনের নানাদিক সম্বন্ধে যে জ্ঞান এবং অভিজ্ঞতা তিনি লাভ করেছেন, তাকেই রূপায়িত করে তোলেন সৃষ্টির ভেতর দিয়ে। সুতরাং নাট্যসাহিত্যে যে জীবন-দর্শনের পরিচয় পাওয়া যায়, মানুষের জীবনে তার মূল্য নেহাৎ কম নয়। মানুষকে চিন্তা করতে শেখানো, মানুষের অসংযত উচ্ছ্বাসপ্রবণতা, এবং ভাবাবেগকে সুসংহত করা, অপ্রত্যক্ষভাবে জীবনের নানাদিক সম্বন্ধে মানব-মনকে শিক্ষিত করে তোলা প্রভৃতি বিষয়ে নাটকের অবদান যে কতো বিরাট এবং ব্যাপক সে সম্বন্ধে যথেষ্ট অবহিত বলেই ইংলণ্ড, রাশিয়া, আমেরিকা ও অন্যান্য বড় বড় দেশে নাট্যকার এবং রঙ্গমঞ্চের এত সম্মান এবং গৌরব। রঙ্গমঞ্চের প্রকৃতি সম্বন্ধে বর্ণনা প্রসঙ্গে বার্নার্ড 'শ' বলেছেন : "Only the ablest critics believe that the theatre is really important: in my time none of them would claim for it, as I claimed for it, that it is as important as the Church was in the Middle Ages, and much more important than the Church was in London in the years under review. A theatre to me is a place 'where two or three are gathered together.' The apostolic succession from Aeschylus to myself is as serious and as continuously inspired as that

younger institution, the apostolic of the Christian Church.

Unfortunately this Christian Church founded gaily with a pun, has been so largely corrupted by rank Satanism that it has become the Church where you must not laugh; and so it is giving way to that older and greater Church to which I belong: the Church where the oftener you laugh the better, because by laughter only can you destroy evil without malice, and affirm good fellowship without mawkishness. When I wrote, I was well aware of what an unofficial census of sunday worshippers presently proved : that Churchgoing in London, has been largely replaced by playgoing. This would be a very good thing if the theatre took itself seriously as a factory of thought, a prompter of consciense an elucidator of social conduct, an armory against despair and dullness, and a temple of the Ascent of Man. I took it seriously in that way, and preached about it instead of merely chronicling its news and alternately petting and snubbing it as a licentious but privileged form of public entertainment. And this, I believe is why my seemons gave so little offence, and created so much interest."

G. B. Shaw in "The Author's Apology" — 1906. (Dramatic opinions and Essays, Vol. 1. Constable & Co.).

রোমান্টিক ভাবাবেগের অবাধ উদ্দামতাকে ক্ল্যাসিক্যাল অনুশাসনের প্রথায় সংহত করে তবেই নাট্যরচনায় আত্মনিয়োগ করা বিধেয়। খালি ভাবোচ্ছ্বাসের উদ্গিরণে ভাল নাটক রচনা করা যায় না। তেমনি আবার অতিরিক্ত নিয়মের অনুশাসনে নাটকের মধ্যে এমন অসারতার ভাব এসে যায় যে সমস্ত রচনাটি প্রাণহীন হয়ে পড়ে। এ বিষয়ে এ্যালারডাইস্ নিকল্ তাঁর 'ওয়ার্ল্ড ড্রামা' বইতে স্পষ্টভাবেই বলেছেন :

"The classical tempering of romantic enthusiasm seems demanded in the theatre by the severe restrictions that accompany stage representation. Lyrical abandon will not serve the playhouse; the author must ever keep his rational self master of his scenes and characters. When we encountes dramatic greatness the impression we receive is always one of emotional intensity restrained by the rigorous control of the author's mind. Dramas become weak when, on the one hand, excessive control sends a chill through the entire production or when, on the other, the writer so identifies himself emotionally with his creations as to become lost in their midst. The most powerful masters are those who, like God, are transcendent Lords of the world of their imagination, yet immanent in this realm they themselves have wrought."

রবীন্দ্রনাথের নাটকে চিন্তার পর্যাপ্ত খোরাক, শিক্ষণীয় বহু বিষয়, জীবনের নানাবিধ জটিল সমস্যার আলোচনা পাওয়া যায়। একদিকে যেমন প্রেম, ভালবাসা, জীবের প্রতি দয়া প্রভৃতি বিষয় নিয়ে কয়েকটি সেরা নাটক, যেমন 'রাজা ও রাণী', 'বিসর্জন' প্রভৃতি তিনি রচনা করেছেন। তেমনি আবার সূক্ষ্ম আধ্যাত্মিক তত্ত্বগুলোকে সুচারুরূপে রূপায়িত করেছেন 'ডাকঘর', 'রাজা' প্রভৃতি নাটকে। আবার যখন দরকার মনে করেছেন, ধনতন্ত্র, শোষণনীতি, যান্ত্রিকতা ইত্যাদির কদর্য নগ্নরূপ উদ্ঘাটন করে দেখিয়েছেন 'মুক্তধারা', 'রক্তকরবী' প্রভৃতি নাটকের ভেতর দিয়ে।

[ক্রমশঃ]

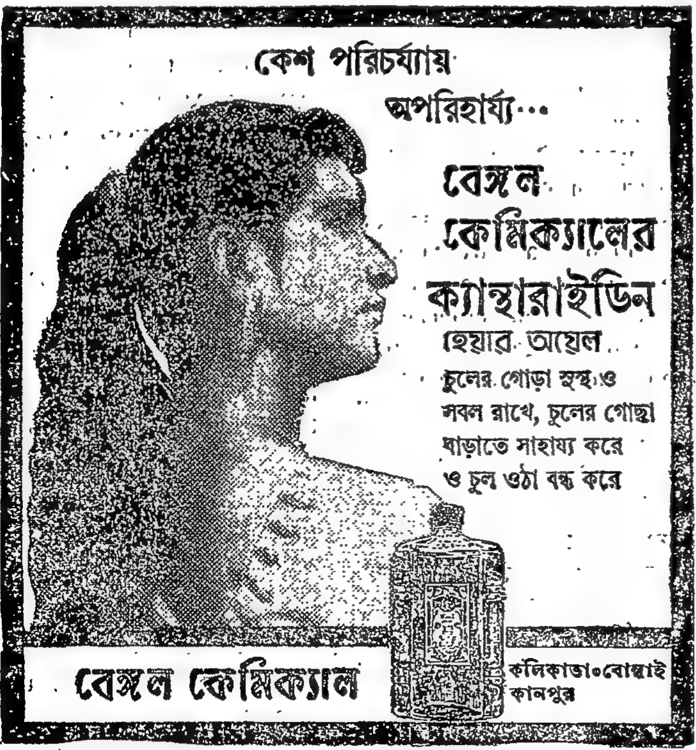

রূপজগৎ

প্রযোজকদের দুশ্চিন্তা

দিলীপকুমার সায়রা বানুর বিয়েতে বোম্বাই-এর প্রযোজকরা নাকি মুখভার করেছে। এমন এক সংবাদ কিছুদিন আগে খবরের কাগজে প্রকাশিত হয়েছিল। এদের বিয়ের খবর সংবাদপত্রে যত ফলাও করে প্রকাশ করা হোক না কেন, প্রযোজকদের মনের শান্তি এতে নষ্ট হয়েছে। এই সংবাদ পাঠ করে সাধারণ মানুষ ভাবতে পারেন দুজন জনপ্রিয় চিত্রতারকার বিয়েতে কারো মুখভার করার এমন কি আছে। সাদা মনে এই দুশ্চিন্তার কারণ বোঝা সত্যিই সম্ভব নয়।

কয়েক বছর আগে নার্গিসের বিয়ে হয়েছে। বিয়ের পরে তিনি বাস্তবিকপক্ষে চিত্রজগৎ থেকে বিদায় নিয়েছেন। আজ তিনি দুই সন্তানের জননী, এবং মা ও স্ত্রী-রূপে নিজের পরিচয় দানে আগ্রহী। নার্গিসের মত অভিনেত্রীর চলচ্চিত্র-জগৎ থেকে বিদায় গ্রহণ প্রযোজকদের পক্ষে বাস্তবিকই দুশ্চিন্তার কারণ। আরো কিছুদিন নার্গিস অভিনয় করলে প্রযোজকরা বেশ কয়েক লক্ষ টাকা কামাই করতে পারতেন। অভিনেতা-অভিনেত্রীরা বিয়ে করলে প্রযোজকরা মুখভার করে এই আশঙ্কায় যে 'তারকা'-রা যদি কল্পনার জগৎ ছেড়ে মাটিতে ঘর বাঁধে, দশজন মানুষের মত স্বাভাবিক জীবন যাপন করে, তবে চলচ্চিত্র ব্যবসার দিকে থেকে ওদের ক্ষতি হতে পারে।

আসলে গ্ল্যামার জিনিসটা প্রযোজকদেরই সৃষ্টি। 'তারকা' কথাটা ধনতান্ত্রিক জগতের চলচ্চিত্রের একটা বিশেষ চরিত্র। চলচ্চিত্র ধনতান্ত্রিক জগতে একটা পণ্য। ধনীরা যেমন কলকারখানায় টাকা ঢালে মুনাফার জন্য, চলচ্চিত্র নির্মাণেও টাকা নিয়োগ করে একই উদ্দেশ্যে। কারখানার তৈরি মাল চালাবার জন্য বিজ্ঞাপন দরকার হয়, মালের আধার সুন্দর ও দৃষ্টি আকর্ষক করতে হয়। বিজ্ঞাপন আর সুন্দর আধার হলে বাজে মালেরও কাটতি বাড়ে। চলচ্চিত্র-জগতের রীতিনীতি একই ধারায় চলছে, কারণ এখানে যাঁরা প্রযোজক তাঁরা শিল্পের পূজারী বা সমাজচিন্তায় অনুপ্রাণিত হয়ে আসে না। তাঁদের মুখ্য উদ্দেশ্য ব্যবসা—মুনাফা। এই উদ্দেশ্যে তাঁরা শিল্পীকে 'তারকা'-য় পরিণত করেন। হাল্কা মেজাজের সিনেমার পত্রিকাগুলির সহযোগিতায় এক নকল গ্ল্যামার সৃষ্টি করেন, চিত্রতারকাদের চারপাশে হাল্কা মনের তরুণ-তরুণীদের ভিড় জমায়, যাদের বলা হয় 'ফ্যান'। ছবি যত বেশি বাস্তবসম্পর্কহীন, যত বেশি জীবনবোধ থেকে দূরে তত বেশি দরকার এই গ্ল্যামারের। তখন কাহিনীর বাস্তবতা শিল্পবোধ এবং সমাজ-সচেতনতা ইত্যাদির পরিবর্তে 'তারকা' সমাবেশ হয় ছবির একমাত্র আকর্ষণ।

আসলে এই 'তারকা'-রা প্রযোজকদের খেলার পুতুল। ওদেরই স্বার্থে গড়ে তোলে 'তারকা'-দের। ওদেরই ব্যবসার প্রয়োজনে তাদের বিয়ে হবে, বিয়ে ভেঙে যাবে। তাদের ব্যক্তিগত জীবন নিয়ে সত্যমিথ্যা নানা কথায় সিনেমা পত্রিকাগুলির পাতা ভরে থাকবে। অর্ধশিক্ষিত পাঠক-পাঠিকারা তা নিয়ে মুখরোচক আলাপ-আলোচনায় মেতে থাকবে। তবেই তো তারকাদের দেখতে লোকের ভিড় জমবে, তাদের অভিনীত ছবি 'হিট' হবে। ইউরোপ ও মার্কিন চলচ্চিত্র-জগতে চিত্রতারকাদের জীবনের এমন দুর্ভাগ্যের কথা ধনতান্ত্রিক জগতের সব দেশে রসালো আলোচনার বিষয়। এই ধনতান্ত্রিক রীতির জন্যই হলিউডে বিয়ে ভাঙার খবর সংবাদপত্রে একটা বিশেষ কলমে পরিণত হয়েছে। সম্প্রতি খবর বেরিয়েছে জিনা লোলোব্রিজিডার ১৭ বছরের বিবাহিত জীবনের শেষ হয়েছে। ব্রিজিডা বার্ডোত কয়েক বছর আগে আত্মহত্যা করতে চেয়েছিল, যখন বুঝতে পেরেছিল যে তার বিবাহিত জীবন ব্যবসার এক অঙ্গ ছাড়া আর কিছু নয়। এতে প্রেম নেই, আছে ব্যবসায়িক সম্পর্ক। এভাবেই এলিজাবেথ টেলরের এক-একটা বড় বড় ছবির সঙ্গে সঙ্গে বিবাহিত জীবনের পরিবর্তন ঘটেছে। এভাবে গত যুগের বিখ্যাত 'তারকা' হার্লোর বিয়ে হয়েছিল এবং সে বিয়ের শোচনীয় পরিণতি ঘটেছিল। শেষপর্যন্ত প্রেমহীন জীবনের দুর্বিষহ যন্ত্রণা ভুগে হার্লোকে মরনত হয়েছে। ছবি যেখানে ব্যবসা মাত্র, মুনাফার জন্য পণ্য, 'তারকা'-র জীবন সেখানে সেই পণ্যের একটি অংশ মাত্র।

ভারতীয় চলচ্চিত্র-জগতে যখন বড় বড় ধনীরা প্রবেশ করেছে, এবং হলিউডের অনুকরণে এদেশে চিত্র ব্যবসায় পরিচালিত হচ্ছে তখন হলিউডের দোষগুলিও আমাদের চিত্র-জগতে অবাধ গতিতেই আসবে। এই কারণে শিল্পীদের সুস্থ স্বাভাবিক জীবনে প্রযোজকদের দুশ্চিন্তা।—সুজন

'আদ্যামা' ছবিতে লিলি চক্রবর্তী

চিত্র আলোচনা

গল্প হলেও সত্যি

নিউ থিয়েটার্স (একজিবিটার্স)
তপন সিংহ

তপন সিংহের এই আধা-বাস্তব, আধা-কাল্পনিক নতুন ছবির কাহিনী, চিত্রনাট্য, সংগীত এবং পরিচালনা—এই চারটি কাজের দায়িত্ব তিনি একাই পালন করেছেন। একক দায়িত্বে আমাদের দেশে এই চারটি কাজ সম্পাদন করে ছবি নির্মাণের ইতিপূর্বে দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন সত্যজিৎ রায়; এবার সে পথে অগ্রসর হলেন তপন সিংহ। চলচ্চিত্র শিল্পের সব বিষয়ে জ্ঞান এবং নিজের ওপর গভীর আত্মবিশ্বাস থাকলেই এতগুলি বিভাগের দায়িত্ব পালন সম্ভব হয়। দর্শকরা অবশ্য বিচার করবেন তাঁদের ভাল লাগা মন্দ লাগা নিয়ে, তার বেশি কিছু নয়।

এই ছবিতে হাল্কা মেজাজে কৌতুকরসের মধ্য দিয়ে চিত্রনাট্যকার ও পরিচালক একটা বক্তব্য উপস্থিত করেছেন। বক্তব্য প্রকাশের জন্য রচিত কাহিনীর পটভূমি বর্তমানকালের একটি একান্নবর্তী পরিবার। যে পরিবারের কর্তা অশীতিপর বৃদ্ধ। ছেলে, ছেলের বৌ, নাতি-নাতনি নিয়ে সংসার। এক হেঁসেলে সবার যদিও রান্না হয়, মনের দিক থেকে সবাই ভিন্ন।

প্রত্যেকের ঘরে নিজের নিজের আলাদা ব্যবস্থা। অবিবাহিত ন'ছেলেও ঘরে ফিরে গোপনে ডিম সেদ্ধ করে খায়, বড় ছেলে দরজা বন্ধ করে নেশা করে। সবাই যে যার মত। বাড়িতে সবার উপেক্ষিতা কৃষ্ণা। বাড়িতে কেউ কোন কাজ করতে চায় না, সবাই মনে করে সে কেন বেশি কাজ করবে; ফলে সব কাজের চাপ পড়ে কৃষ্ণার ওপর। আর ঝি-চাকর ভরসা। এ কারণে সংসারে ঝি-চাকর টেকে না। অথচ আর্থিক অসঙ্গতির জন্য এই একান্নবর্তী পরিবার ভাঙে না। পরিবারের কর্তা ব্যাঙ্কে কিছু টাকা ও অলঙ্কার আগলে আছেন—সংসারের কাজে লাগান না। তাঁর ভয় এই সঞ্চয় হাতছাড়া হলে পরিবারে তাঁর আদর থাকবে না। স্নেহ-মমতা বা ভক্তি সবই আর্থিক শক্তির ওপর নির্ভর করে। বৃদ্ধ সারাজীবনের অভিজ্ঞতায় বুঝেছেন—হাতে টাকা না থাকলে ছেলেরা মানবে না, ছেলের বৌ'রা সেবা করবে না। এমন অবস্থায় এই পরিবারে এক অঘটন ঘটে গেল। ভোরের কুয়াশায় এক অদ্ভুত লোক এসে উপস্থিত। পাচক ও চাকরের যুক্ত কাজের প্রার্থীরূপে। বলা বাহুল্য—হাতে স্বর্গ পাওয়ার মত সকলে তাকে গ্রহণ করল। সে এসেই সংসারের চেহারা পাল্টে দিল। সকলে আয়াসে দিন কাটাচ্ছে, পছন্দমত খাওয়া পাচ্ছে, মন মেজাজ সকলের পাল্টে গেছে। দু-দিন আগে যারা পরস্পরকে সহ্য করতে পারত না—তারা সহৃদয় হয়ে উঠেছে। বুড়ো কর্তা স্বার্থের কুঠরি ছেড়ে সামাজিক হয়ে উঠেছেন। কৃষ্ণার সঙ্গে পাড়ার এক ছেলের যে প্রেম তারও পারিবারিক স্বীকৃতি আদায় করে দিল এই চাকর। সকলের শুভবুদ্ধি জাগিয়ে দিয়ে, কাজের প্রতি আগ্রহ সৃষ্টি করে দিয়ে যেমন অকস্মাৎ এসেছিল, তেমন কুয়াশার মধ্যে সে চলে গেল। একটি একান্নবর্তী পরিবারকে কিভাবে শান্তিতে থাকতে হবে সে পথ দেখাবার জন্যই যেন সে দৈবিক শক্তিতে এসেছিল।

কাহিনীকার ও পরিচালক পারিবারিক বাস্তব পরিবেশের ওপর কল্পনার রঙ চড়িয়ে তাঁর বক্তব্য উপস্থিত করেছেন। এই বক্তব্য বাঙালীসমাজে সহজে গ্রহণীয়, হাল্কা মেজাজ সৃষ্টির দরুণ ছবিটি সুখ-দৃশ্য এবং উপভোগ্য।

প্রধান চরিত্রে চাকরের ভূমিকায় অভিনয় করেছেন রবি ঘোষ। রবি ঘোষের অভিনয় উপভোগ্য। তার পরে ভাল লাগবে স্বল্পভাষী কৃষ্ণার চরিত্রে কৃষ্ণা বসুকে। পরিবারের কর্তার ভূমিকায় যোগেশ চ্যাটার্জী যথাযথভাবে আত্মকেন্দ্রিক বৃদ্ধকে রূপ দান করেছেন। অন্যান্য উল্লেখযোগ্য চরিত্রগুলির মধ্যে ভানু ব্যানার্জী, প্রসাদ মুখার্জী, বঙ্কিম ঘোষ, ছায়া দেবী, ভারতী দেবী, জ্যোৎস্না মুখার্জী, অজয় গাঙ্গুলী, পার্থ মুখার্জী প্রমুখ প্রশংসনীয়। অন্যান্য চরিত্রে পরিচালকের কল্পনাকে যথার্থ রূপ দিতে সাহায্য করেছেন রমা দাস, মমতাজ আহমেদ খাঁ, অরুণ রায় প্রমুখ।

চিত্র গ্রহণে বিমল মুখার্জী এবং সম্পাদনায় সুবোধ রায়ের এবং শিল্প নির্দেশনায় সুনীতি মিত্রের কাজ প্রশংসনীয়। সঙ্গীত পরিচালনার দায়িত্ব তপন সিংহ নিজে গ্রহণ না করলেই ভাল করতেন।

দিল্লীতে এক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের পর মিসেস টিটো নৃত্যশিল্পী যামিনী কৃষ্ণমূর্তিকে অভিনন্দন জানাচ্ছেন।

প্যার কিয়ে জা

চিত্রালয় : শ্রীধর

ছবিটির একমাত্র উদ্দেশ্য ভোলানাথ দর্শকদের আনন্দ বিতরণ। আনন্দদানের সমস্ত রকমের উপাদান এতে রয়েছে, এবং উপাদানগুলি পরিবেশনে যদি কাহিনীর বাস্তবতা উপেক্ষিত হয়ে থাকে তার জন্য প্রযোজক ভ্রূক্ষেপ করেন নি। রামলাল এস্টেটের ছোট ম্যানেজার কেবলমাত্র তার কন্যাদ্বয়ের অকারণ ক্রোধে পড়ে চাকরি হারাল এবং সদলে নেচে-গেয়ে এক নতুন ধরণের আন্দোলন করে, তাঁবু খাটিয়ে বাগানে বাস করে চাকরি দাবি করে। এই আন্দোলনের মধ্য দিয়ে সে এক কন্যার মন জয় করে নেয়। অন্তরঙ্গ বন্ধু শ্যামের সাহায্য গ্রহণ করে রামলালের সঙ্গে বিবাদ নিষ্পত্তিতে। শ্যাম কোটিপতি সেজে এসে বিবাদ নিষ্পত্তি এবং ছোট কন্যার সঙ্গে বিবাহে সম্মতি আদায় করে। তখন জানা যায় শ্যাম পূর্ব থেকে জ্যেষ্ঠ কন্যার পাণিপ্রার্থী। রামলালের পুত্র সিনেমা পাগল। সে নায়িকা সন্ধানে গিয়ে মীনাকে জীবনসঙ্গিনী করে। অনেক রঙ্গ-রসের পর অভিভাবকদের দ্বারা এই মিলনের স্বীকৃতিতে কাহিনীর সমাপ্তি।

'শঙ্খবেলা' ছবির তিনটি চরিত্রে উত্তমকুমার, মাধবী ও বসন্ত

ছবির বিভিন্ন চরিত্রে অভিনয় করেছেন কিশোরকুমার, শশীকাপুর, ওমপ্রকাশ, কল্পনা, মেহমুদ, মমতাজ, রাজশ্রী (দক্ষিণ ভারত) প্রমুখ। ছবিটিতে মার্কিন ছবির টুইস্ট ধরণের নাচ-গান সংযোজিত হয়েছে, তা শ্লেষাত্মক হলেও রসিকজন রসের সন্ধান পাবে।

ডাচ চলচ্চিত্র উৎসব

গত ১৮ই ও ১৯শে অক্টোবর কলকাতা তথ্যকেন্দ্রে সিনে সেণ্ট্রাল ক্যালকাটার উদ্যোগে নেদারল্যান্ড দূতাবাসের সহযোগিতায় ডাচ চলচ্চিত্র উৎসব অনুষ্ঠিত হয়েছে। উৎসব উদ্বোধন করেছেন কেন্দ্রীয় সরকারের উপমন্ত্রী শ্রীমতী নন্দিনী সৎপতি। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেছেন সিনে সেণ্ট্রাল-এর সভাপতি বিখ্যাত চিত্র-প্রযোজক ও পরিচালক শ্রীমধু বসু। দিল্লীস্থ নেদারল্যান্ড দূতাবাসের প্রথম সেক্রেটারী মিঃ বি, এ, নোপার এবং কলকাতার দূতাবাসের কনসাল জেনারেল মিঃ বি, পোজার ডাচ চলচ্চিত্র সম্পর্কে আলোচনা করেন। আনুষ্ঠানিকভাবে ডাচ চলচ্চিত্র উৎসব এই প্রথম।

চলচ্চিত্র জগৎ একমাত্র প্রামাণিক ও সংবাদ-চিত্রের ক্ষেত্রে ডাচ চলচ্চিত্রের বিশেষ স্থান রয়েছে। পূর্ণাঙ্গ কাহিনীচিত্র নির্মাণে ডাচরা তেমন উৎসাহী নয়, তার কারণ চিত্র-প্রদর্শন ক্ষেত্রের সঙ্কীর্ণতা এবং ভাষার অন্তরায়। ডাচ ভাষা সীমাবদ্ধ অঞ্চলের অধিবাসীরাই ব্যবহার করে। ডাচ ভাষা-ভাষী অঞ্চলে ৫৫১টি সিনেমায় মাত্র ২৬৩,০০০টি আসনের ব্যবস্থা আছে। এ কারণে তারা পূর্ণাঙ্গ-কাহিনীচিত্র অপেক্ষা প্রামাণিক, তথ্য ও ক্রীড়াচিত্র নির্মাণে বেশি নজর দেয়। এসব ছবি নিয়ে দেশের বাইরেও ব্যবসা করা যায়। বছরে প্রায় তিন'শ প্রামাণিক ও তথ্যচিত্র নেদারল্যাণ্ডে তৈরি হয়। নেদারল্যাণ্ডের চলচ্চিত্র পরিচালকদের মধ্যে বার্ট হানস্ট্রা বিখ্যাত। তাঁর আন্তর্জাতিক পরিচিতি রয়েছে। আমাদের দেশে যেমন সত্যজিৎ রায়ের—তেমন ডাচদের কাছে তাঁর জনপ্রিয়তা। একথা অনুষ্ঠানে মিঃ নোপার বললেন। হানস্ট্রার নির্মিত প্রামাণিকচিত্র 'গ্লাস' ১৯৫৮ সালে বার্লিনে সিলভার বিয়ার পেয়েছে। উল্লেখযোগ্য কথা—এই ছবিটির ১১১ কপি বিদেশে বিক্রিত হয়েছে। বার্ট হানস্ট্রাকে সহস্রতম কপিটি সম্প্রতি উপহার দিয়ে সম্মান জানান হয়েছে। হরমান ভন্ডর হর্স্ট, ম্যাক্স দে হাস, জান হাল্সকার প্রমুখ সে দেশের বিখ্যাত পরিচালক। যাঁদের প্রামাণিক ও স্বল্প-দৈর্ঘ্যের ছবি আন্তর্জাতিক পুরস্কার লাভ করেছে।

প্রথম দিনের অনুষ্ঠানে কেবলমাত্র বার্ট হানস্ট্রার তিনটি ছবি দেখান হয়েছে। এই তিনটি ছবি যথাক্রমে 'গ্লাস' 'ডেলটা—১' এবং 'এলেম্যান' বা হিউম্যান ডাচ। প্রথমোক্ত দুটি ছবি ইতিপূর্বে কলকাতার ফিল্ম সোসাইটি সমূহের সদস্যরা দেখেছেন। 'এলেম্যান' ছবিটি এদেশে নতুন এবং সবদিক থেকে বৈশিষ্ট্যের দাবি রাখে। ছবিটি আমাদের দেশের তথ্যচিত্র নির্মাতাদের যেমন প্রেরণা জাগাতে পারে, সেই সঙ্গে দর্শকদের দেবে নতুন দৃষ্টি। এই ছবিটি ১৯৬৪ সালে বার্লিন চলচ্চিত্র উৎসবে একই সঙ্গে তিনটি পুরস্কার লাভ করেছে। তথ্যচিত্র হলেও এই ছবির চিত্র গ্রহণ পদ্ধতি থেকে উপস্থাপনা বিশেষ কৃতিত্বপূর্ণ। একটা তথ্যচিত্রকে যে কত কৌতূহলোদ্দীপক ও রসালো করে উপস্থিত করা যায় এই ছবি তার একটি নিদর্শন। এক নতুন দৃষ্টিকোণ থেকে বার্ট হানস্ট্রার ক্যামেরায় নেদারল্যাণ্ডের জীবন ও মানুষের কথা বেরিয়ে এসেছে। প্রচলিত প্রামাণিকচিত্রের তুলনায় ছবিটি দীর্ঘ, অথচ কখনো একঘেয়ে মনে হয় নি। নতুন নতুন দৃশ্য ও গতির দ্রুততায় দর্শকরা মুগ্ধ হয়েছেন। উচ্চমানের শিল্পবোধের সঙ্গে লঘু কৌতুক এবং শতাব্দীর চেতনাসম্পন্ন এক গম্ভীর বক্তব্য এতে রয়েছে। পুরাতন দ্রব্যাদির মধ্যে আবর্জনার মত ইতিহাসের আবর্জনা হিটলারের একটা জীর্ণ মূর্তিকে কেন্দ্র করে নেদারল্যাণ্ডের ওপর নাৎসীদের অভিযান ও জনসাধারণের দুর্দশার ফ্ল্যাশব্যাক চিত্র দর্শকদের মনে করিয়ে দিয়েছে সেই নিষ্ঠুর দিনগুলিকে।

ছোট ছোট সংলাপে দর্শকমনে জাগানো হয়েছে ফ্যাসিজমের প্রতি ঘৃণা, বিশেষ করে এযুগের তরুণ দর্শকদের মনে। চমৎকার শিল্পবোধসম্পন্ন এই দৃশ্য।

১১শে অক্টোবর পরিচালক হরমান ভন্ডর হর্স্টের 'প্রেইজ দি সী' চার্লস ভন্ডর হর্স্টের 'বিল্ডিং গেম' লই ভন গাসটে-রেনের 'দি হাউস' ফ্রাঞ্জ ওয়েইজের 'এ সানডে অন দি আয়ারল্যান্ড অব দি গ্র্যান্ডে জাটে' হাত্রম হোভিং-এর 'সেইলিং' প্রভৃতি ছবি দেখান হয়েছে। এই ছবিগুলি দেখে আমাদের দেশের স্বল্পদৈর্ঘ্যের ছবি নির্মাতারা, বিশেষ করে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের বিভিন্ন বিভাগের তথ্যচিত্র নির্মাতারা উপকৃত হতে পারেন।

'অভিশপ্ত চম্বল' ছবিতে মঞ্জু দে ও প্রদীপকুমার

সংবাদবমনা

জিনার বিবাহবিচ্ছেদ

এক সংবাদে প্রকাশ বিখ্যাত ইতালীয় অভিনেত্রী জিনা লোলোব্রিজিডা ও তাঁর স্বামী ডাঃ মিলকোস্কোফিকের বিবাহ-বিচ্ছেদ হয়েছে। তাঁরা ১৭ বৎসরকাল বিবাহিত জীবন যাপন করেছেন।

সত্যজিৎ রায়ের "মহানগর" সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্রে মুক্তিলাভ করছে

শ্রীসত্যজিৎ রায়ের "মহানগর" সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্রে মুক্তিলাভ করছে। সম্প্রতি "সোভেস্কপোর্ত ফিল্ম" সংস্থা "মহানগর" চলচ্চিত্রটি ক্রয় করেছে এবং ব্যবসায়িক ভিত্তিতে তা' সারা সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্রে প্রদর্শিত হবে। "মহানগর"-ই হবে শ্রীরায়ের প্রথম ছবি যা' সারা সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্রে প্রদর্শিত হতে যাচ্ছে। ছবিটি এখন সোভিয়েট যুক্ত-রাষ্ট্রের বিভিন্ন প্রজাতন্ত্রের ভাষায় "ডাবিং" করা হচ্ছে।

সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্রে তাঁর "মহানগর" ছবিটির আসন্ন মুক্তি প্রসংগে পরিচালক শ্রীসত্যজিৎ রায় কলকাতায় "এ-পি-এন" সংবাদদাতার কাছে বলেন, "মহানগর আমার খুব প্রিয় ছবি। আমি আশা করি এই ছবিটি সোভিয়েট দর্শকরা নিতে পারবে। নাগরিক জীবনের নানা সমস্যা ও জটিলতা ছবিটিতে স্থান পেয়েছে বলে এর একটা নিজস্ব আবেদন আছে।" শ্রীরায় বলেন যে, ছবিটি মুক্তি পেলে সোভিয়েট সংবাদপত্রে সে সম্পর্কে কি আলোচনাদি বের হয়, তা জানার জন্যে তিনি উৎসুক হয়ে থাকবেন।

সম্প্রতি সোভিয়েট চলচ্চিত্র পরিচালক এম, কালাতোজোফ ও চলচ্চিত্র সমালোচক আই, ভেইসফিল্ড যখন ভারতে এসে-ছিলেন তখন "মহানগর" ছবিটি তাঁরা দেখেন।

সাক্ষাৎকারপ্রসংগে শ্রীরায় আরও বলেন যে, ভারতের ব্যবসায়িক ভিত্তিতে আরও বেশি সোভিয়েট চলচ্চিত্র দেখানর ব্যবস্থা করা উচিত বলে তাঁর মনে হয়।

সোভিয়েট ফিল্ম 'সোলজার্স ফাদার'-এর হিন্দী সংস্করণ

সোভিয়েট চলচ্চিত্র 'সোলজার্স ফাদার'-এর হিন্দী সংস্করণ তৈরির কাজ প্রায় শেষ হয়ে এসেছে এবং অদূর-ভবিষ্যতেই তা সারা ভারতে মুক্তি পেতে যাচ্ছে বলে 'সোভেস্কপোর্ত ফিল্ম' সংস্থার এক সূত্রে জানা যায়। ছবিটির হিন্দী সংস্করণের নাম দেওয়া হয়েছে 'মেরা বেটা'। উল্লেখযোগ্য যে, সম্প্রতি মস্কো আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবে এই চলচ্চিত্রের নায়কের ভূমিকায় অভিনয়ের

'অজানা শপথ' ছবিতে জয়নারায়ণ মুখার্জী, মাধবী মুখার্জী, সত্য ব্যানার্জী

জন্য অভিনেতা সেগো জাকারিয়াদজে শ্রেষ্ঠ অভিনেতা পুরস্কার লাভ করেন।

মুকুলবীথির শারদীয়া উৎসব

মুকুলবীথি শিশু বিদ্যালয়ের গান্ধী-জয়ন্তী এবং শারদীয়া উৎসব উপলক্ষে গত ৯ই অক্টোবর, অভিভাবকবৃন্দ ও শিক্ষিকারা বিশ্বরূপা রঙ্গমঞ্চে এক অনুষ্ঠানের আয়োজন করেন। প্রথমে সঙ্গীতের মাধ্যমে গান্ধীজীকে প্রণাম জানালো মুকুলেরা। এর পর মুকুল-বীথির কিশোর সভ্য-সভ্যারা যন্ত্র-সংগীতে বিভিন্ন সুরে ঐকতান বাজিয়ে সকলকে আনন্দ দেয়। শেষে শ্রীবিধায়ক ভট্টাচার্যের হাসির নাটক "সেই তিমিরে" অভিনীত হয়; অংশগ্রহণ করেন মুকুলবীথির সভ্য-সভ্যা, অভিভাবক-অভিভাবিকা এবং শিক্ষিকাগণ।

নাটকের কথা

নতুন নাটক

শহর ও শহরতলীতে নিত্য-নতুন নাটকের দল গঠিত হচ্ছে। এ সব নাটকের দলের বিভিন্ন আদর্শ ও উদ্দেশ্য রয়েছে। নাটককে গণশিক্ষার মাধ্যম হিসাবে গ্রহণ করে কেউ চায় নিজেদের চিন্তানুযায়ী আদর্শ প্রচার, কেউ চায় নিছক আনন্দ উপভোগ। জঙ্গম নামক এক নতুন নাট্যসংস্থা গঠিত হয়েছে শহরতলীতে। সম্প্রতি থিয়েটার সেণ্টার মঞ্চে এঁরা নাটক অভিনয় করেছেন। নাটকের নাম 'নতুন নাটক'। এই নাটকের লেখক ও পরিচালক অমর মুখোপাধ্যায়। এক সৌখীন নাট্যসংস্থাকে অবলম্বন করে নাটক রচিত হয়েছে। এইরূপ সংস্থাগুলি এক-একটা নাটক মঞ্চস্থ করতে গিয়ে কত রকমের সমস্যার সম্মুখীন হয় এবং কয়েকজন লোকের একনিষ্ঠতায় কিভাবে এই দলগুলি শেষ পর্যন্ত টিকে থাকে সে কথা এই নাটকে বলা হয়েছে।

নাটকে বিভিন্ন চরিত্রে যাঁরা অভিনয় করেছেন—তাঁরা প্রত্যেকেই যথেষ্ট নিষ্ঠার সাথে কাজ করেছেন। এঁদের মধ্যে আছেন অমর মুখোপাধ্যায়, সুশান্ত মজুমদার, উৎপল গুপ্তবিশ্বাস, অনিল চক্রবর্তী, শিশির বন্দ্যোপাধ্যায়, শিশির দাশগুপ্ত, প্রদ্যোত চক্রবর্তী, বীণা সেন এবং আরো অনেকে। ভবিষ্যতে আরো ভাল নাটক নিয়ে অনুশীলন করলে এঁরা আরো সার্থক হবেন।

সঙ্গীত কথা

লোকসংগীতের ঘরোয়া অনুষ্ঠান

গত ২৩শে অক্টোবর রবিবার উত্তর কলকাতার উল্টাডাঙা সি আই টি বিল্ডিংসে লোকসংগীতের একটি মনোজ্ঞ ঘরোয়া অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছিল।

সমগ্র বাংলার বিভিন্ন অঞ্চলের লোকসংগীত সেদিনের আসরে খ্যাতনামা বহু শিল্পীর কণ্ঠে পরিবেশিত হয়।

শিল্পীদের মধ্যে বেতার-শিল্পী মণীন্দ্র দাস, বুদ্ধদেব রায়, মণিমালা রায় ও নাট্যকার-শিল্পী সুনীল চক্রবর্তী অবিকৃত লোকসংগীত পরিবেশন করে শ্রোতৃমণ্ডলীর অকুণ্ঠ প্রশংসা অর্জন করেন।

সেদিনের অনুষ্ঠানে উক্ত শিল্পীদের কণ্ঠে অবিকৃত লোকসংগীতগুলি শ্রোতৃ-মণ্ডলীর মনের খোরাক জুগিয়েছিল সন্দেহ নেই।

ব্রজেন্দ্রকিশোর স্মৃতি সংগীত পরিষদ

সম্প্রতি জাতীয় অধ্যাপক শ্রীসত্যেন্দ্র-নাথ বসুর সভাপতিত্বে ব্রজেন্দ্রকিশোর স্মৃতি সংগীত পরিষদের বার্ষিক সম্মেলন রবীন্দ্র সরোবর প্রেক্ষাগৃহে অনুষ্ঠিত হল। অনুষ্ঠানে বক্তাগণ বাংলাদেশের সংস্কৃতির বিভিন্ন ক্ষেত্রে ব্রজেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরীর দানের কথা আলোচনা করেন।

বক্তৃতার পরে একটি মনোজ্ঞ সংগীতানুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছিল এবং তাতে কয়েকজন প্রসিদ্ধ শিল্পী অংশগ্রহণ করেছিলেন। ভি, জি, যোগের আভোগী রাগে বেহালা বাদন শ্রোতাদের পরিতৃপ্ত করে। বিভিন্ন গুণীদের সহচর্যের ফলে যে পরিণতি তাঁর বাজনায় শোনা যায় সেটা সচরাচর দুর্লভ।

অপর্ণা চক্রবর্তী কেদারা ও সোহিনী রাগে খেয়াল গান করেন। সুর ও লয়ের সুষ্ঠু প্রয়োগ-নৈপুণ্যের জন্য এ শিল্পী সাম্প্রতিককালে সংগীত জগতে খ্যাতি অর্জন করেছেন। এদিনের সংগীত পরিবেশনে সে খ্যাতি তাঁর অক্ষুন্ন ছিল।

বুদ্ধদেব দাশগুপ্ত বাগেশ্রী ও নায়েকী কানাড়া রাগে স্বরোদ বাজান। তাঁর বাজনার পরিচ্ছন্নতা শ্রোতাদের তৃপ্তি দেয়। ইমারৎ খাঁ সেতারে যোগকোষ বাজিয়ে শ্রোতাদের চমৎকৃত করেন। কঠিন পরি-শ্রমের ফল তাঁর বাজনায় পরিস্ফুট।

সংগীত পরিষদের ছাত্র-ছাত্রীরা নৃত্য ও নেপথ্য যন্ত্রসংগীতের মাধ্যমে রাগ সৃষ্টির একটি রূপক গীতি-আলেখ্য পরিবেশন করেন। গ্রন্থনা অরুণা বাগচী। আলেখ্যটি মনোরম হয়েছিল। মিনতি চট্টোপাধ্যায়ের নাগার্জুন রাগে খেয়াল শুনে মনে হল এ তরুণ শিল্পীর ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল।

মুকুলবীথির শারদীয় উৎসবে 'সেই তি মিরে' নাটকের দৃশ্যে মায়েরা ও শিক্ষিকারা

পাঠক মন

গত ২৯শে সেপ্টেম্বর তারিখে 'বঙ্গদর্শন' বিভাগে প্রকাশিত 'বিশ্ববিদ্যালয় সমাচার' শীর্ষক স্তম্ভটি পড়ে 'প্রাচীন ভারতীয় ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগের জনৈক শুভানুধ্যায়ী' একটি প্রতিবাদলিপি প্রেরণ করেছেন যা ২০শে অক্টোবর সাপ্তাহিক বসুমতীর 'পাঠকমন' বিভাগে ছাপা হয়েছে। আমার সঙ্গে বিশ্ববিদ্যালয়ের কোন যোগ না থাকলেও প্রাচীন ভারতীয় ইতিহাস ও সংস্কৃতির আজীবন ছাত্র হিসাবে অন্যান্য অনেকের মতই ওই বিভাগটি সম্বন্ধে কিছুটা খবরাখবর রাখি। কাজেই প্রতিবাদলিপিটি পড়ার সঙ্গে সঙ্গেই আমি বঙ্গদর্শনে প্রকাশিত সংবাদটি আবার ভাল করে পড়ি।

বঙ্গদর্শনে একথাই লেখা হয়েছে যে, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাচীন ভারতীয় ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগের বর্তমানে যিনি প্রধান অধ্যাপক এবং একই সঙ্গে যিনি মঞ্জুরী কমিশন প্রদত্ত ওই বিভাগের উচ্চতর গবেষণা কেন্দ্রের অধ্যক্ষ, তিনি একটা চক্রের ভিকটিম হয়েছেন, তাঁকে লোকচক্ষে হেয় করার চেষ্টা হচ্ছে কোন কোন মহল থেকে, এবং বঙ্গদর্শনে এই আশংকা প্রকাশ করা হয়েছে এ কথা যদি সত্য হয় তাহলে ব্যাপারটি খুবই দুর্ভাগ্যজনক হবে।

প্রতিবাদলিপিটি প্রকাশিত হবার পর বোঝা গেল 'বঙ্গদর্শনে' যে আশংকা প্রকাশ করা হয়েছে সেটাই সত্য। 'জনৈক শুভানুধ্যায়ীর' বেনামে যিনি বা যাঁরা (আমার মনে হয় শুভানুধ্যায়ীটি একটি বিশেষ গোষ্ঠীর মুখপাত্র হয়েই প্রতিবাদপত্রটি লিখেছেন) ওই প্রতিবাদপত্রটি লিখেছেন তিনি বা তাঁরা ওই প্রতিবাদলিপিটির শেষ প্যারাগ্রাফটিতেই উম্ঘাটিত হয়ে গেছেন, ধরা পড়ে গেছেন। তর্কচ্ছলে যদি একথা মেনেও নেওয়া যায় যে, প্রাচীন ভারতীয় ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগের প্রধান অধ্যাপকের বিরুদ্ধে তাঁদের অভিযোগগুলি সত্য, তাহলেও ওই প্রতিবাদলিপির শেষ প্যারাগ্রাফে উক্ত প্রধান অধ্যাপকের পাণ্ডিত্য সম্বন্ধে যে শ্লেষাত্মক কথাগুলি লিখেছেন তাতে তাঁদের ব্যক্তিগত আক্রোশের সুরটাই ফুটে উঠেছে। বরং দ্বিতীয় একজন পত্রলেখক শ্রীঅমলেশ সিংহরায় যা লিখেছেন সেটাই বর্ণে বর্ণে সত্য। উক্ত অধ্যাপকের অতি বড় প্রধান শত্রুও, যদি তাঁর পেটে কিছু মাত্র বিদ্যা থাকে, একথা স্বীকার করবেন যে Select Juscriptions Bearing on the History of India বা Indian Epigraphical Glossary-র মত বই লেখার ক্ষমতা খুব কম লোকেরই আছে। অপর একজন পত্রলেখক শ্রীসিংহরায় এ বিষয়ে শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় ও শ্রীরমেশচন্দ্র মজুমদারের মন্তব্য উদ্ধৃত করেছেন। তাঁর অজস্র গ্রন্থের পরিচয় অবশ্য প্রশংসাপত্রের উপর নির্ভর করে না, তাঁর সমুদয় রচনা দেশবিদেশের পণ্ডিতদের কাছে প্রামাণ্য বলেই চিরকাল বিবেচিত হয়ে এসেছে, এবং তাঁর পাণ্ডিত্যের খ্যাতি দেশে এবং বিদেশে এতই প্রতিষ্ঠিত যে এই দিক দিয়ে কুৎসা রটিয়ে তাঁকে কাবু করা যাবে না, পত্রলেখক বড় কাঁচা কাজ করে ফেলেছেন, শেষ প্যারাগ্রাফটা বাদ দিলেই ভাল করতেন।

এইবার তাঁদের স্পেসিফিক অভিযোগগুলির ক্ষেত্রে আসা যাক। উক্ত শুভানুধ্যায়ী লিখেছেন যে অদ্যাবধি যে তিনটি ইউ-জি-সি সেমিনার হয়েছে, তার দুটি পূর্বতন বিভাগীয় প্রধান ও কেন্দ্রের অধ্যক্ষের পরিচালনায় অনুষ্ঠিত হয়েছে। কথাটা শুভানুধ্যায়ী মহাশয়ের একটু খোঁজখবর নিয়ে বলা উচিত ছিল। প্রথম সেমিনারটি পূর্বতন অধ্যক্ষের দ্বারা পরিচালিত হয়েছিল কিন্তু দ্বিতীয় ও তৃতীয় সেমিনার দুটি বর্তমান অধ্যক্ষের দ্বারাই পরিচালিত হয়েছিল। চতুর্থ সেমিনারটির তারিখ ছিল ১০ই মার্চ, ১৯৬৬। তখনকার খাদ্য আন্দোলন জনিত হাংগামা ও হরতালের ফলে সেমিনারটি অবশ্য অনুষ্ঠিত হয় নি। তা ছাড়া মাসিক সেমিনারগুলির কথা শুভানুধ্যায়ী মহাশয়েরা একেবারেই চেপে গেছেন।

শুভানুধ্যায়ী মহাশয়দের তৃতীয় অভিযোগ, ডক্টর রায় অধ্যক্ষ থাকাকালীন গবেষণাকেন্দ্রের যে সংহতি ছিল বর্তমানে তা নেই। একথা প্রমাণ করার জন্য তাঁরা এমন একটি বিভ্রান্তিকর দৃষ্টান্ত দিয়েছেন যার তুলনা মেলা ভার। বর্তমান অধ্যক্ষের আমলে নাকি গবেষণা কেন্দ্রের এগারোজন গবেষকের মধ্যে তিনজন গবেষণা কার্যে ইস্তফা দিয়েছেন। ভাবখানা যেন এই, যেন তাঁরা বর্তমান অধ্যক্ষের কার্যকলাপের প্রতিবাদেই এই মহৎকর্ম করেছেন। এই রকম নীতিনিষ্ঠ মানুষের সংখ্যা কিছু বেশি হলে বরং বাংলা দেশের চেহারাটাই বদলে যেত। প্রকৃতপক্ষে ব্যাপারটা হচ্ছে এই যে তাঁরা তিনজনেই অপেক্ষাকৃত ভাল সুযোগ পেয়ে এখানকার কার্যে ইস্তফা দিয়েছেন। এতে বর্তমান অধ্যক্ষের অপরাধটা কি?

তাঁদের চতুর্থ অভিযোগ গবেষণা কর্মের জন্য যে ধরণের পরিবেশ প্রয়োজন বর্তমান অধ্যক্ষ তা রচনা করেন নি। শুভানুধ্যায়ীরা এ কথার দ্বারা ঠিক কি বোঝাতে চাইছেন জানি না। গবেষকরা মাস গেলে নিয়মিত বেতন পাচ্ছেন, প্রয়োজনীয় পুস্তকাদির সাহায্য পাচ্ছেন, পড়াশোনা করার অফুরন্ত সময় পাচ্ছেন, তাঁদের উৎসাহিত করবার জন্য প্রতি মাসে সেমিনার হচ্ছে, তাঁরা সেখানে পেপার পড়ছেন, বাইরের পণ্ডিতদেরও নিমন্ত্রণ করা হচ্ছে সেমিনারে অংশগ্রহণ করার জন্য তাঁরাও আসছেন, ভাষণ দিচ্ছেন। এ সব যদি গবেষণার পরিবেশ না হয় তাহলে গবেষণার পরিবেশ বলতে আর কি বুঝব?

শুভানুধ্যায়ী মহোদয়দের পঞ্চম অভিযোগ এই যে 'ভৌগোলিক অভিধান' সংক্রান্ত তথ্যসমূহ অধ্যক্ষ মহাশয়ের বাড়িতে থাকে এবং তাঁর অধীনস্থ গবেষকগণ তাঁদের সাপ্তাহিক তথ্যাবলীর সংগ্রহ তাঁর বাড়িতে গিয়ে রেখে আসেন। এই রকম ব্যবস্থা নিশ্চয়ই বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের অগোচরে হয় নি, ব্যাপারটা তিনি বুঝবেন এবং বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ বুঝবেন। যদি এ বিষয়ে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের সম্মতি থাকে সে সম্বন্ধে আমার তথা শুভানুধ্যায়ী ভদ্রলোকদের কিছুই বলার নেই। দুজন গবেষক ছাত্রকে তিনি অবাধ্যতার অভিযোগে সাসপেন্ড করেছেন। আমাদের সাধারণ কাণ্ডজ্ঞান যা বলে পৃথিবীর সকল চাকুরীর ক্ষেত্রেই ইনসাবর্ডিনেশন একটি গুরুতর অপরাধ, তার জন্য শুধু সাসপেন্ড কেন ডিসমিসও করা যায়। শুভানুধ্যায়ী ভদ্রলোক লিখেছেন, "শোনা যাচ্ছে তাঁর এই কাজের ঔচিত্য বা যৌক্তিকতা সম্পর্কে ব্যাপক অনুসন্ধানের জন্য কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় একটি কমিটি নিয়োগ করেছেন।" পত্রলেখক নিজে স্বীকারই করছেন যে তিনি "শোনা কথার" উপর নির্ভর করে একথা বলছেন তখন আমার আর কি বলার থাকতে পারে?

শুভানুধ্যায়ী মহোদয় আরও লিখেছেন যে মঞ্জুরী কমিশনের তরফ থেকে ডঃ সাংকালিয়া গবেষণাকেন্দ্রের কার্যক্রম পরীক্ষা করতে যে সব মন্তব্য "করেছেন বলে প্রকাশ" তাদের কোনটিই বর্তমান অধ্যক্ষের সুনামের অনুকূল নয়। উদ্ধৃতির মধ্যে অবশ্য তিনটি শব্দই প্রমাণ করে যে এক্ষেত্রেও পত্রলেখক হয় শোনা কথার উপর নির্ভর করেছেন, আর না হয় তিনি সেই কর্মটি করেছেন যাকে ইংরাজী ভাষায় বলা হয় ফেব্রিকেশন।

শুভানুধ্যায়ী মহোদয়েরা একটি বিষয়ে বড় ভুল করেছেন। যদি তাঁরা তাঁদের পত্রের প্রথম সোয়া পাতার লাইনেই বক্তব্য শেষ করে দিতেন তাহলে বলার কিছুই ছিল না। কিন্তু অবিবেচনাপ্রসূত

এতগুলি কথা বলে তাঁরা এটাই প্রমাণ করে দিলেন যে বঙ্গদর্শনে প্রকাশিত বিষয়টিই সঠিক, প্রাচীন ভারতীয় ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগের প্রধান অধ্যাপক ও গবেষণাকেন্দ্রের অধ্যক্ষকে জনসমক্ষে হেয় প্রতিপন্ন করার লোকের অভাব নেই এবং তাঁরা সেই কাজই করে চলেছেন।

দূরে থাকলেও কিছুটা খোঁজখবর রাখা আমাদের পক্ষেও সম্ভব। শোনা কথার ওপর নির্ভর করে শুভানুধ্যায়ী মহাশয় এত কথা লিখেছেন, তখন আমিও তাঁদের একটি কথা জিজ্ঞাসা করি। বিভাগীয় প্রধানের পদ এবং গবেষণা-কেন্দ্রের অধ্যক্ষের পদ একই হাতে থাকার দরুণ 'শোনা যায়' কোন কোন মহল একান্তই ক্ষুব্ধ—ইহা কি সত্য? 'শোনা যায়' জনৈক লক্ষপতি শৌখিন ভারততত্ত্ববিদ গবেষণাকেন্দ্রের অধ্যক্ষের গৌরবময় পদটি বহুদিন থেকেই পেতে ইচ্ছুক—ইহা কি সত্য? অনুমানে মনে হয় এটাই সত্য হওয়া সম্ভব কেন না তাহলেই এই কুৎসা রটনার একটা তাৎপর্য খুঁজে পাওয়া যায়।

অজিত দত্ত
মধ্যমগ্রাম, (চব্বিশ পরগনা)

* * *

গত ২০শে অক্টোবরের সাপ্তাহিক 'বসুমতীতে' অধ্যাপক অমলেশ সিংহরায় কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাচীন ভারতীয় ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগ সম্পর্কে যে চিঠি লিখেছেন, তাতে কিছু সচেতন তথ্য-বিকৃতি লক্ষ্য করলাম। আমি ১৯৫৪-'৫৬ সালে ঐ বিভাগের ছাত্র ছিলাম। সেই সূত্রে যে সকল শিক্ষকের সংগে আমার পরিচয় হয়েছিল, তাঁদেরই মধ্যে একজনকে শ্রীসিংহরায়ের এক অশালীন মন্তব্যের লক্ষ্য বলে মনে হয়। আমার এই অনুমান যদি সত্যি হয়, তবে একথা জোর দিয়ে বলতে পারি যে, সিংহরায় মহাশয় বর্তমান অধ্যক্ষের প্রশস্তি রচনা করতে গিয়ে অকারণে তাঁর চাইতে কোন অংশে কম কৃতবিদ্য নন এমন একজন অধ্যাপককে ছোট করেছেন। একজন শিক্ষিত ব্যক্তির কাছ থেকে এ জিনিস আমরা আদৌ আশা করি না।

যে অধ্যাপকের নিন্দা করে সিংহরায় মহাশয় পত্রাঘাত করেছেন, আমি তাঁর কাছে দু'বছর পড়েছি এবং আমার মত আরও অনেকে নিঃসন্দেহ, ঐ অধ্যাপকের তুল্য শিক্ষক এবং পণ্ডিত ব্যক্তি সত্যই দুর্লভ। ভারত-শিল্পে তাঁর পাণ্ডিত্য আজ দেশে ও বিদেশে প্রায় প্রবাদবাক্যে দাঁড়িয়েছে। ভারত-স্থাপত্যে তিনি একালের একজন প্রমাণ পুরুষ। তাঁর রচিত গবেষণামূলক বই ও প্রবন্ধগুলির অনেক কটিই দেশীয় ও বিদেশের বিশ্ববিদ্যালয়ে পাঠ্যরূপে স্বীকৃত। বর্তমানে তিনি ভারতীয় স্থাপত্য ও ঐশ্লামিক স্থাপত্য সম্পর্কিত দুইটি বিরাট প্রামাণ্য গ্রন্থ রচনায় নিযুক্ত।

সিংহরায় মহাশয় যে দুইজন শ্রদ্ধেয় আচার্যের নাম (ডাঃ রমেশচন্দ্র মজুমদার এবং ডাঃ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়) তাঁরাই ঐ নিন্দিত অধ্যাপককে ভারত-শিল্পে প্রমাণ পুরুষের মর্যাদা দেন। আরও উল্লেখযোগ্য, প্রতকীর্তি শিল্পবেত্তা আনন্দকুমার স্বামী, জে পি ফোগেল প্রমুখ বিদগ্ধজন উক্ত অধ্যাপকের রচনার উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেছেন। সুতরাং বর্তমান অধ্যক্ষের পাণ্ডিত্যের অর্থ আলোচ্য অধ্যাপকের পাণ্ডিত্যের অভাব সূচিত করে না।

দ্বিতীয়ত, আলোচ্য অধ্যাপক প্রথম বছর অনিবার্য কারণবশত আটটি পেপারের মধ্যে তিনটিতে পরীক্ষা দিতে পারেন নি; ফলে তিনি এম-এ পরীক্ষায় তৃতীয় শ্রেণীতে স্থানলাভ করেছেন। পরের বছর তিনি সম্পূর্ণ পরীক্ষা দেন এবং প্রথম শ্রেণীতে প্রথম স্থান লাভ করেন। সিংহরায়ের মত সজ্জন অধ্যাপক ঐ অধ্যাপকের প্রথম শ্রেণীতে প্রথম হওয়া সংক্রান্ত তথ্যটি 'পরের বছর পরীক্ষা দিয়ে কলঙ্কমোচন করেন' এই বাক্যবন্ধে যেভাবে চাপা দিয়েছেন তাতে সামান্য একজন শিক্ষাগ্রহী হিসাবে আমি অত্যন্ত লজ্জিত এবং অনুতপ্ত বোধ করছি।

তৃতীয়ত, বর্তমান অধ্যক্ষের মত আলোচ্য অধ্যাপকও এশিয়াটিক সোসাইটির 'ফেলো'। কিন্তু আশ্চর্য লাগে ভাবতে, অধ্যাপক না হয়েও যে তথ্য আমি জানি, সিংহরায় মহাশয় অধ্যাপক হয়ে জানেন না, বছরে চার গিনি চাঁদা দিয়ে গ্রেটবৃটেনের রয়েল এশিয়াটিক সোসাইটির 'ফেলো' হওয়া যায়, এবং সিংহরায় মহাশয়ও ইচ্ছে করলে 'ফেলো' হতে পারেন। যতদূর জানি, পাণ্ডিত্যের স্বীকৃতিস্বরূপ এতাবৎকাল যে চারজন বাঙালী এশিয়াটিক সোসাইটির অনারারী ফেলো (অনারারী 'ফেলো' এবং চাঁদা-দাতা 'ফেলো' এক নন) হয়েছেন, তাঁরা হলেন হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, সুশীলকুমার দে, রমেশচন্দ্র মজুমদার এবং সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়। সুতরাং বর্তমান অধ্যক্ষের মত একজন পণ্ডিত ব্যক্তি যখন বিভিন্ন সরকারী ও বেসরকারী প্রকাশনায় নিজের নামের পাশে এফ-আর-এ-এস প্রভৃতি ব্যবহার করেন, তখন কৌতুকবোধ করা ছাড়া আর উপায়ান্তর থাকে না।

চতুর্থত, সিংহরায়-নিন্দিত অধ্যাপক বর্তমান অধ্যক্ষের কার্যভার গ্রহণ করার অনেক আগে থেকেই এই বিভাগের শিক্ষক ছিলেন। অথচ কোন পূর্বতন অধ্যক্ষ কখনোই তাঁর নিন্দা করেন নি। দুঃখের বিষয়, এই প্রথম বর্তমান অধ্যক্ষের অনুরাগীমহল থেকে এই অপপ্রচেষ্টা হচ্ছে। এই ঘটনা কি কোন তাৎপর্য-মণ্ডিত?

সবশেষে, একজন শিক্ষাগ্রহী এবং আলোচ্য বিভাগের ছাত্র হিসাবে বর্তমান অধ্যক্ষের অনুরাগীদের অনুরোধ করব তাঁরা যেন অনুরাগের আতিশয্যবশত বর্তমান অধ্যক্ষের মত তথাকথিত 'রাজনীতির কলুষমুক্ত' কৃতী পুরুষকে রাজনীতির পঙ্কে অবতীর্ণ না করান এবং অধ্যক্ষ মহাশয়কেও অনুরোধ, তিনি যেন এই ব্যাপারে পণ্ডিতসুলভ সতর্কতা অবলম্বন করেন।

অজিতকুমার সেন
শ্যামলদাস কুটীর, বারাসত
(চব্বিশ পরগনা)

* * *

আমি অনন্ত সিংহের 'অগ্নিযুগের একটি অধ্যায়ের' একজন অনুরক্ত পাঠক। বলিতে কি শুধুমাত্র ঐ কাহিনীটির জন্যই আমি সাপ্তাহিক বসুমতীর নিয়মিত ক্রেতা হইয়াছি। অবশ্য 'বঙ্গদর্শন' প্রভৃতি অন্যান্য লেখাও বর্তমান কালোপযোগী। এগুলিও আমাকে মুগ্ধ করে। অনন্ত সিংহের কাহিনী পড়ে সে যুগের বাংলার যুবকবৃন্দের অদ্ভুত সাহসিকতা, প্রচণ্ড মানসিক দৃঢ়তা, সর্বোপরি অতুলনীয় দেশভক্তির বিষয় জানিতে পারিতেছি। কিন্তু হায়! যাহাদের জীবন বলিদানের অকল্পনীয় কষ্ট, লাঞ্ছনা সহ্যের বিনিময়ে আজ আমরা স্বাধীনতা পাইয়াছি, সেই বীরবৃন্দের প্রতি আজ আমরা কি কর্তব্য করিতেছি? তাহাদের আমরা ক্রমে ভুলিতে বসিয়াছিলাম। অনন্ত সিংহ আমাদিগকে তাহাদের ইতিহাস স্মরণ করাইয়া দিতেছেন। সুতরাং এই দেশভক্ত বীরের প্রতি দেশবাসীর শ্রদ্ধা নিবেদনের জন্য সম্মিলিত বামপন্থীদের নিকট আমার কাতর মিনতি, তাহারা যেন আসনের কচাকচি না তুলিয়া অতুল্যবাবুর নির্বাচিত কেন্দ্রে, তাহার বিপরীতে অনন্ত সিংহকে নির্বাচনী টিকিট দেন। দেশবাসীর প্রতি আমার আবেদন আপনারা ভোট-যুদ্ধের মাধ্যমে প্রকৃত দেশভক্তকে নির্বাচিত করুন।

শ্রীপরেশচন্দ্র সাহা
দুর্গাপুর—৫

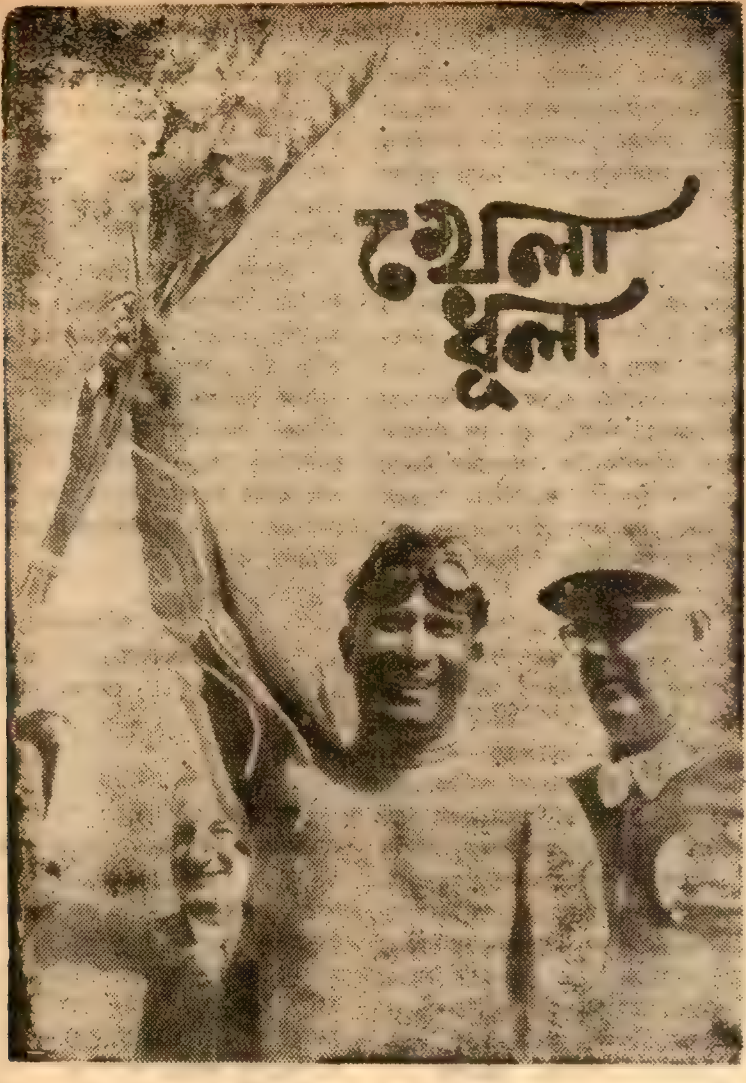

মিহির সেনের নতুন অভিযান

এবার লক্ষ্য পানামা

মিহির সেনের নতুন অভিযান পানামা খাল অতিক্রম। প্রশান্ত মহাসাগর থেকে আটলান্টিক মহাসাগর—ব্যবধান ৫০ মাইল। একের পর এক সমুদ্র বিজয় করে চলেছেন ৩৬ বছরের এই বাঙালী যুবক। ইংলিশ চ্যানেল, দারদানেলেস, বসফরাস, জিব্রালটার, পক প্রণালী জয় শেষ করে দুই মহাসাগরের দ্বারে এসে তিনি অপেক্ষা করছেন। প্রহরী বলল দুয়ার রুদ্ধ—প্রবেশ নিষেধ। কিন্তু কোন বাধা-নিষেধ মানতে মিহির রাজী নন। রুদ্ধ লকগেট খুলে গেল যুক্তরাষ্ট্রের স্টেট ডিপার্টমেন্টের আদেশে। স্বেচ্ছায় এর আগে এই লবণাক্ত জলোচ্ছ্বাসে কেউ আত্মোৎসর্গ করে নি। সাত সমুদ্রের ঢেউ-এর আহ্বান এর আগে কাউকে এত উতলা করে নি। মায়ের বুকে শিশু যেমন আরামে দোল খায়—সাগরের বুকে মিহিরের সেই হিল্লোল। তিনি আশা করছেন আগামী শুক্রবার অর্থাৎ ২৮শে অক্টোবর প্রশান্ত মহাসাগর থেকে পানামা শহর অভিমুখে সাঁতার কাটবেন। লক গেটের মধ্যে দিয়ে নিস্তরঙ্গ জলরাশি ভেদ করে তাঁকে এগুতে হবে। তাঁর ধারণা ৩০ থেকে ৪০ ঘণ্টা সময় লাগবে এই অভিযান সার্থক করতে। এই দুস্তর জলধি তাঁকে অতিক্রম করতে হবে লক গেটের প্রকোষ্ঠের মধ্যে দিয়ে। তিনি বলেন, "আমি লক গেটের মধ্য দিয়েই

শ্রীঅমিতাভ

সাঁতার কাটবো। এতে পরের গেট পর্যন্ত জলের উচ্চতার কোন পরিবর্তন হবে না। আমি যখন লক চেম্বারের মধ্যে থাকবো, যদি জলের উচ্চতার কোন পরিবর্তন হয় —তাহলে সেটা আত্মহত্যার সামিল হবে। যদি সে রকম পরিস্থিতির কোন উদ্ভব হয় তাহলে আমি উঠে পড়বো অথবা রেলিং-এর ওপর আমাকে তুলে ফেলা হবে এবং সেখান থেকে আমি আবার জলে ঝাঁপ দেব।"

বাংলার ছেলের এই সাগর বিজয় অভিযান বিশ্বের ইতিহাসে একটি রেকর্ড সৃষ্টি করতে চলেছে। আমরা প্রার্থনা করি তাঁর যাত্রা শুভ হোক।

পূর্বাঞ্চলের পরাজয়

দলীপ ট্রফির ক্রিকেট প্রতিযোগিতায় তিন দিনের খেলায় পূর্বাঞ্চল টসে জিতে ব্যাট করবার সুযোগ গ্রহণ করে। খেলার প্রথম দিন অর্থাৎ ২১শে অক্টোবর দিল্লীর মাঠে উত্তরাঞ্চলের আক্রমণের বিরুদ্ধে ৫ উইকেটের বিনিময়ে রান ওঠে ২৯৩। দলজিৎ ও বড়ুয়া খেলার সূত্রপাত ভাল-ভাবেই করেন এবং তাঁদের যৌথ প্রচেষ্টায় ৬০ রান সংগৃহীত হয়। তিন দিনের ক্রিকেট খেলায় প্রথম ইনিংসের ফলাফলই খেলার ভাগ্য নির্ধারিত করে। এদিকে লক্ষ্য রেখে পূর্বাঞ্চল যখন ধীরে ধীরে উত্তরাঞ্চলের বোলিংকে বেশ আয়ত্তে আনবার চেষ্টা করছে—তখন ২টি নির্ভর-যোগ্য ব্যাটসম্যানের রান আউট যেমনি অপ্রত্যাশিত তেমনি বিপর্যয়কর। দলজিৎ ৩৮ রানের মাথায় এবং দেব মুখার্জি ১৪ রান করে রান আউট হলেন। এই ভাঙনের মুখে রমেশ সাকসেনা ও অম্বর রায় ধৈর্য ও দৃঢ়তার সঙ্গে দলের সংহতি রক্ষা করেন। নিপুণ মারের সাহায্যে দ্রুত রান সংখ্যা যখন পূর্বাঞ্চলের স্কোরকে বেশ স্ফীত করছে—সেই সময় ঠিক চা পানের বিরতির পূর্বে রমেশ সাকসেনার বিদায় দুঃখজনক। সকলেই যখন সাক-সেনার ব্যাট থেকে সেঞ্চুরি আশা করছে —ব্যবধান যখন মাত্র ১৫ রান—গোয়েলের একটি স্পিন বল তাঁর উইকেটের পতন ঘটাল। অম্বর রায় দিনের শেষ পর্যন্ত অপরাজিত থেকে ৭৬ রান করলেন। দ্বিতীয় দিন অম্বর রায় শত রান পূর্ণ করার পর ১০৪ রানের মুখে বিজয় মেহেরার বলে প্রেম ভাটিয়ার হাতে ক্যাচ আউট হলেন। অধিনায়ক রাজেন সান্যাল ৪২ রান করে গোয়েলের বলে আউট হলেন। প্রথম ইনিংসে পূর্বাঞ্চলের মোট রান সংখ্যা হল ৪০২। দুটি বাজে রান আউট না হলে প্রথম ইনিংসের রান সংখ্যা আরও অনেক বেশি হতে পারত।

পূর্বাঞ্চলের ৪০২ রানের প্রত্যুত্তরে উত্তরাঞ্চল ৬ উইকেটে রান তোলে ৪৮৮ এবং প্রথম ইনিংসের রান সংখ্যার আধিক্যে সেমিফাইনালে খেলার যোগ্যতা অর্জন করে। উত্তরাঞ্চলের এই বিপুল রান সংখ্যার পশ্চাতে দানী ও চৌধুরীর কৃতিত্বপূর্ণ শত রান ও ধারাসীর অপরা-জিত ৭১ রান উল্লেখযোগ্য। খেলার শেষ দিন ৭টি উইকেট হাতে নিয়ে ২৭৬ রান পশ্চাতে থেকে উত্তরাঞ্চল খেলা শুরু করে। লাঞ্চ বিরতির আগে প্রেম ভাটিয়ার উই-কেটের পতন হয়—তখন দলের রান সংখ্যা ২১১। দলের জয়ের পথ সুনিশ্চিত

অম্বর রায়

করে ২২১ মিনিট পিটিয়ে খেলে দানী ১৫৪ রান করেন। ২টি ওভার বাউন্ডারী ও ৮টি বাউন্ডারী মারের কৃতিত্ব দেখিয়ে ১৫৮ মিনিটে ১৪০ রান করেন চৌধুরী। উত্তরাঞ্চলের ইনিংস সমাপ্ত করার আর প্রয়োজন হয় নি কারণ সময় উত্তীর্ণ হবার আধ ঘণ্টা আগেই তাদের রান সংখ্যা পূর্বাঞ্চলের রান সংখ্যাকে অতিক্রম করে।

পূর্বাঞ্চলের ব্যর্থতার কারণ অনুসন্ধান করতে গেলে প্রথমেই চোখে পড়বে অনুশীলনের অভাব। পূর্বাঞ্চলের অধিকাংশ স্থানে ক্রিকেটের মরশুম এখনও শুরু হয় নি। বর্ষা চলতে থাকায় পিচ তৈরি করতে দেরি হয় এবং কলকাতায়, কটক, জামসেদপুরে বা গৌহাটিতে নভেম্বরের আগে ক্রিকেট মাঠে নামে না। খুব অল্প প্রস্তুতিতে পূর্বাঞ্চল পরিপূর্ণ ব্যাটিং বা বোলিং শক্তি ফুটিয়ে তুলতে পারে নি। ক্রিকেটের প্রধান অঙ্গ ফিল্ডিং—সে দিক দিয়ে পূর্বাঞ্চলের দুর্বলতা মারাত্মক। দুটি রান আউটের বিপর্যয় না হলে পূর্বাঞ্চলের পক্ষে ৪০০ রান তোলা বিশেষ কঠিন হত না। পূর্বাঞ্চলের বোলিং শক্তিও সম্যক আত্মপ্রকাশ করতে পারে নি। দ্বিতীয় দিনে এস গুহের বলে বেশ তীক্ষ্ণতা ছিল কিন্তু খেলার শেষ দিনে বোলিং উত্তরাঞ্চলের ব্যাটসম্যানদের ওপর কোন সময়ই প্রাধান্য বিস্তার করতে পারে নি। উত্তরাঞ্চলের ব্যাটসম্যানদের যেই ধারণা হল যে পূর্বাঞ্চলের বোলিং বড়ই দুর্বল—ফিল্ডিং বড়ই কদর্য—ব্যাটসম্যানরা তখনই সকল সতর্কতা ও সমীহভাব ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে বেপরোয়া মারমুখী হয়ে উঠল। উত্তরাঞ্চলের মনোবলই তার জয়ের পথকে সুগম করে দিল।

মৈনুদ্দৌলা গোল্ডকাপ ক্রিকেট

হায়দরাবাদে ক্রিকেটের আর একটি প্রতিযোগিতা সাঙ্গ হল। মৈনুদ্দৌলা গোল্ড কাপের জন্য নাগরদোলার মতন দ্রুত ওঠা-নামা করে শেষ নিমেষপাত পর্যন্ত খেলার মধ্যে একটি অপূর্ব উত্তেজনা ও মাতামাতির সৃষ্টি করেছিল। স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইণ্ডিয়া চমকপ্রদভাবে স্টারলেটস দলকে পরাজিত করে বহু আকাঙ্ক্ষিত এই ট্রফিটি জয় করেছে। স্টারলেটস দলের সেলিম দুরানী ১ম ইনিংসে স্টেট ব্যাঙ্ককে একাই ঘায়েল করে দেয়। চার দিনের প্রতিযোগিতার প্রথম স্টেট ব্যাঙ্কের ১০টি উইকেট ১৩৫ রানে পড়ে যায়। দ্বিতীয় দিনে স্টারলেটস দল ২৪৩ রানে প্রথম ইনিংস সমাপ্ত করে। ১০৮ রানের ঘাটতি নিয়ে স্টেট ব্যাঙ্ক ২য় ইনিংসের খেলা শুরু করে। এবার তাদের খেলায় দৃঢ়তার ছাপ বেশ স্পষ্ট হয়ে ফুটে ওঠে। প্রথম ইনিংসের বিপর্যয়ের শিক্ষা তাদের দ্বিতীয় ইনিংসের বনিয়াদকে বেশ সুদৃঢ় করে। ব্যাঙ্ক দল ৩৬২ রান সংগ্রহ করে ২য় ইনিংস সমাপ্ত করে। তখনও যথেষ্ট সময়

ইন্দার সিং

রয়েছে ২৫৫ রান তুলতে পারলেই খেলা যেত। ব্যাঙ্ক দলের দিবাকর অপূর্ব কৌশলে বল করছেন। স্টারলেটস দলের সেরা সেরা খেলোয়াড়রা একে একে খসে পড়ছেন। এই পতনের মুখে চান্দু বোরদে অপূর্ব দৃঢ়তার পরিচয় দিলেন। বোরদের মারগুলি মাঠের সীমানা পার হয়ে রান সংখ্যাকে ধীরে ধীরে স্ফীত করছে। সাথে রয়েছেন সেলিম দুরানী। দর্শকরা বিপুল উত্তেজনায় ফেটে পড়ছে প্রতিটি বল ছোড়ার সঙ্গে সঙ্গে। খেলা শেষ হতে মাত্র ১৬ মিনিক বাকী এবং ১৬ রান সংগ্রহ করতে পারলেই স্টারলেটস দলের বিজয় অনিবার্য। কিন্তু ছলনাময়ী স্বর্ণ-পাত্র স্টারলেটস দলের ওষ্ঠ ছুঁই ছুঁই করেও শেষ পর্যন্ত স্টেট ব্যাঙ্কের কঠোর প্রহরীদের হাতে বন্দী হল।

বার্মা সফরে ভারতীয় ফুটবল দল

বার্মার আগাসান স্টেডিয়ামে ৩০ হাজার দর্শকের সামনে ভারতীয় ফুটবল দল ২৩শে অক্টোবর বার্মা একাদশের বিরুদ্ধে প্রথম খেলায় ড্র করে। খেলার প্রথমে বার্মা ফুটবল ফেডারেশনের সভাপতি ভারতীয় দলকে সাদর অভ্যর্থনা জানান। ভারতীয় রাজদূত শ্রীকাটারী উভয় পক্ষের খেলোয়াড়দের সঙ্গে করমর্দন করেন। চমৎকার আবহাওয়ায় প্রীতি ও শুভেচ্ছার মধ্যে খেলা শুরু হয়। বার্মা দল প্রথম থেকেই সুন্দর আক্রমণধারা রচনা করে। ভারতীয় দলের রক্ষণভাগ এই আক্রমণধারা ঠিক মত সংযত করতে পারল না। প্রথমার্ধেই ভারতীয় দলের পতন হল। বিশ্রামের পর বার্মা দল আবার ভারতীয় গোলে হানা দেয় এবং আর একটি গোল করে। রেফারী অফসাইডের জন্য গোলটি অগ্রাহ্য করেন। এর পর ভারতের ইন্দার সিং লতিফের একটি পাস সুন্দরভাবে কাজে লাগালেন এবং বিদ্যুৎগতিতে বার্মার গোলকীপারকে পরাজিত করেন। গোল পরিশোধের পর উভয়পক্ষই সমানভাবে আক্রমণ চালায়। খেলার ফলাফল হয় ১—১।

দ্বিতীয় খেলাটি অনুষ্ঠিত হয় ২৬শে অক্টোবর। এদিন বার্মা দলের প্রাধান্য ভারতীয় দলের পতন ঘটায় অতি সহজেই। বার্মা দলের চাতুর্যপূর্ণ খেলার যোগ্য প্রত্যুত্তর ভারতীয় দলের রক্ষণভাগের ছিল না। যদিও বার্মা দল ২—০ গোলে জয়লাভ করে—কিন্তু আরও অধিক গোলে জয়ী হওয়া কিছু বিচিত্র ছিল না। ভারতীয় গোলে থঙ্গরাজ অনেকগুলি কঠিন শট রক্ষা করেন। পুরোভাগে ইন্দার সিং-এর খেলায় কিছুটা দৃঢ়তার পরিচয় পাওয়া যায়।

ভারতীয় দলকে আর একটি খেলায় অংশ গ্রহণ করতে হবে। এই শেষ খেলায় ভারতীয় দল যদি জিততে পারে তাহলে ভারতীয় ফুটবলের সম্মান কিছুটা রক্ষা পাবে।

সেলিম দুরানী

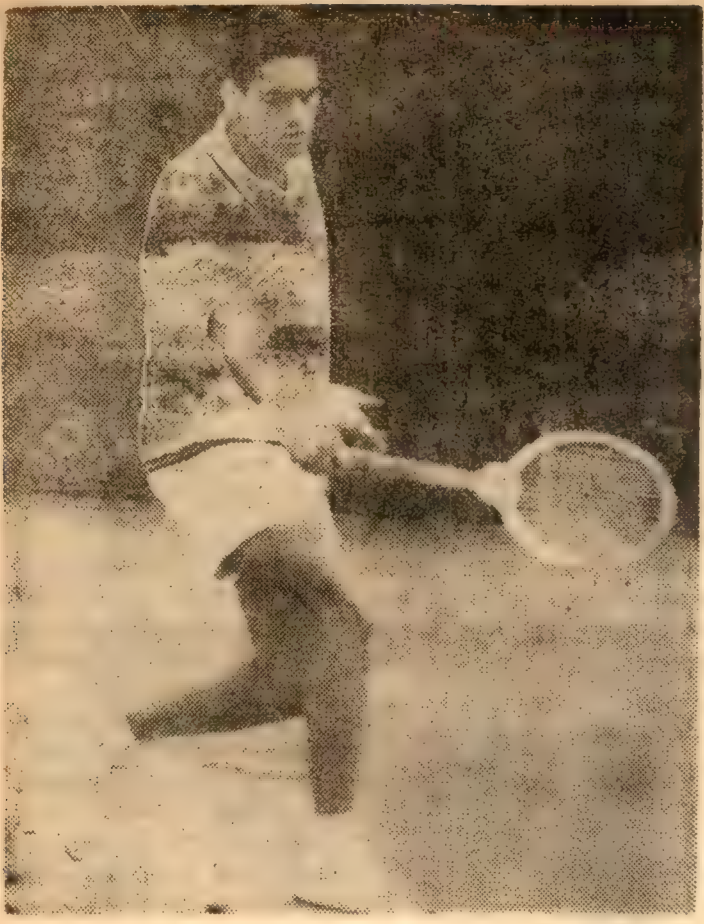

রমানাথন কৃষ্ণান

নেহরু হকি প্রতিযোগিতা

দিল্লীতে অনুষ্ঠিত নেহরু হকি প্রতিযোগিতা সমাপ্তির মুখে। ভারতীয় হকি ফেডারেশনের দুটি দল এই প্রতিযোগিতায় অংশ গ্রহণ করেছে। একটি দল অর্থাৎ "রেড" দল গতবারের বিজয়ী শিখ রেজিমেণ্টাল সেণ্টারকে ১ গোলে হারিয়ে ফাইনালে উঠেছে। অপর দল অর্থাৎ "ব্লুজ" দল বোম্বাই একাদশের সঙ্গে ২৫শে অক্টোবরের সেমিফাইনাল খেলায় চূড়ান্ত নিষ্পত্তি করতে অসমর্থ হয়েছে। খেলার দিক দিয়ে বিচার করলে কোন দলের প্রাধান্যকেই অকুণ্ঠিতচিত্তে স্বীকার করা চলে না। "ব্লুজ" দলের খেলায় সজীবতার চেয়ে ক্লান্তির ছাপ পরিস্ফুট। অবশ্য তাদের দোষ দেওয়া যায় না। পাঞ্জাব পুলিশের সঙ্গে একটানা চারদিন লড়ে তাদের প্রভূত শক্তিক্ষয় হয়েছে যার ফলে তাদের আক্রমণে ক্ষিপ্রতার দ্যুতি ছিল না বললেই চলে। প্রাণহীন খেলার ফলাফল যে শূন্য হবে তাতে বিস্ময়ের কিছু নেই।

অন্যদিকে বোম্বাই দল বিপক্ষের শক্তির প্রতি অহেতুক শ্রদ্ধা ও ভীতি দেখায়। তাদের খেলায় রক্ষণশীল মনোভাব আক্রমণের সুযোগ সৃষ্টির দিকে তত সজাগ ছিল না। বোম্বাই দলের রক্ষণভাগ বেশ নির্ভরশীল বিশেষ করে গোলরক্ষক জোন্সকে পরাজিত করা বেশ দুঃসাধ্য। আগামী খেলায় তারা যদি আক্রমণমূলক মনোভাব নিয়ে খেলা শুরু করে তাহলে "ব্লুজ" দল খুব সহজে তাদের কাবু করতে পারবে না। হকি ফেডারেশনের একটি বাছাই দল অর্থাৎ "রেড" দল ফাইনালে উঠেছে। অপরদিকে বোম্বাই দলের সাফল্যই কাম্য কিন্তু হকি ফেডারেশনের "ব্লুজ" দল বাছাই খেলোয়াড় দ্বারা গঠিত। ২৬শে অক্টোবরের রিপ্লেতে ব্লুজ দল উন্নত ক্রীড়ানৈপুণ্য দেখিয়ে বোম্বাই দলকে ২-১ গোলে পরাজিত করেছে। ভারতীয় হকি ফেডারেশনের রেড ও ব্লুজ দল আগামী ২৮শে অক্টোবর ফাইনাল খেলবে।

ডেভিস কাপ টেনিস

কৃষ্ণান ভারতীয় ডেভিস কাপের অধিনায়ক নির্বাচিত হয়েছেন। আগামী ১২ই নভেম্বর থেকে ১৪ই নভেম্বর পর্যন্ত ইন্টার জোন সেমিফাইনাল খেলা হবে দিল্লীতে। ভারতের বিপক্ষে আছে পশ্চিম জার্মানি। ভারতীয় দলে কৃষ্ণানকে সাহায্য করবেন—জয়দীপ, প্রেমজিৎ ও মিশ্র। কৃষ্ণান আশা করছেন পশ্চিম জার্মানিকে পরাজিত করা সম্ভব হবে। এজন্য ভারতীয় দল কঠোর অনুশীলন চালিয়ে যাচ্ছে। পশ্চিম জার্মানি দলে কয়েকজন উদীয়মান টেনিস খেলোয়াড় আছেন। সুতরাং ৪টি সিংগলস ও একটি ডাবলস ম্যাচ বেশ প্রতিযোগিতামূলক হবে সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই।

যুক্তরাষ্ট্র লন টেনিস এসোসিয়েশন ভারতীয় টেনিস কর্তৃপক্ষের কাছে এক তারবার্তা পাঠিয়ে অনুরোধ করেছেন যদি ভারত পশ্চিম জার্মানিকে পরাজিত করতে পারে এবং যুক্তরাষ্ট্র যদি ব্রেজিলকে ডেভিস কাপের সেমিফাইনাল খেলায় পরাজিত করতে পারে—তাহলে ভারত বনাম যুক্তরাষ্ট্রের ফাইনাল খেলাটি যেন যুক্তরাষ্ট্রে অনুষ্ঠিত হয়। এই প্রসংগে ভারতীয় লন টেনিস এসোসিয়েশনের সেক্রেটারী শ্রীখান্না বলেছেন যে, ডেভিস কাপের নিয়ম অনুযায়ী এই খেলাটি পূর্বাঞ্চলে অনুষ্ঠিত হবে। তবে আমেরিকা এই অনুরোধ করেছেন সম্ভবত এই কারণে যে ১৯৬৩ সালে আমেরিকান দল ভারতের বোম্বাই শহরে একবার খেলে গিয়েছে। এবার ভারতের পালা আমেরিকার আতিথ্য গ্রহণ করা। তবে স্থান নির্বাচনের শেষ কথা নির্ভর করছে সেমিফাইনাল খেলার ফলাফলের ওপর।

পরলোকে হাবুল মুখার্জী

টোকিও অলিম্পিক বিজয়ী ভারতীয় হকি দলের কোচ হাবুল মুখার্জী লক্ষ্ণৌয়ে ২৬শে অক্টোবর পরলোক গমন করেন। ৬৫ বৎসর বয়স্ক হাবুল মুখার্জী ছিলেন অবিবাহিত। ব্যাংককের এশিয়ান গেমসে প্রেরণের জন্য ভারতীয় দলের শিক্ষণের ভার লাভ করেছিলেন হাবুল মুখার্জী।

সম্পাদিকা—জয়ন্তী সেন
বসুমতী (প্রাঃ) লিঃ-এর পক্ষে ১৬৬, বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী স্ট্রীটস্থ কলিকাতা-১২
বসুমতী প্রেস হইতে শ্রীসুকুমার গুহমজুমদার কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

সাপ্তাহিক বসুমতী

বিশিষ্ট অতিথি সমাগমে সরগরম রাজধানী দিল্লীর কয়েকটি চিত্র

র্ষ ঃ ২২শ সংখ্যা, বৃহস্পতিবার, ২৪শে কার্তিক, ১৩৭৩ বঙ্গাব্দ 10th Nov., 1966 * Vol. 71, No. 22

সূচীপত্র

বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা
সম্পাদকীয়		১৩৪৫
আজকের মানুষ		১৩৪৬
ভারতদর্শন		১৩৪৯
আন্তর্জাতিক		১৩৫৪
আমি যাঁদের দেখেছি	পরিমল গোস্বামী	১৩৫৭
শেষ অধ্যায় (গল্প)	তারাপদ রাহা	১৩৬৪
বেদব্যাস-এর রস-রচনা : অমৃতসন্ধানে		১৩৬৯
সময় (কবিতা)	শান্তনু দাস	১৩৭০
এখনো শেফালী (কবিতা)	সুদর্শন রায়চৌধুরী	১৩৭০
গ্রন্থমেলা	জয়ন্তী সেন	১৩৭১
রঙ্গদর্শন		১৩৭৩

ডক্টর পঞ্চানন ঘোষাল এম, এস, সি প্রণীত

আমার দেখা মেয়েরা

(রহস্য রোমাঞ্চের স্বর্ণখনি)

'রক্তনদীর ধারা', 'অপরাধ বিজ্ঞান' ও 'বিখ্যাত বিচার মুপদান। মেয়েদের মন আর মতি স্বয়ং দেবাঃ ন জানন্তি। কাহিনী' নামক সুপ্রসিদ্ধ গ্রন্থগুলির লেখকের সত্যঘটনামূলক বিভিন্ন ও বিচিত্র নারী-চরিত্রের রহস্য উদ্ঘাটন ও যথাযথ অভিজ্ঞ ও দক্ষ লেখকের রচনার বৈশিষ্ট্যে বাংলা দেশের নারী-সমাজের এক অজানা অংশ সাধারণের চোখে সুস্পষ্ট প্রতিভাত হয়েছে। পড়তে পড়তে বই শেষ না করে ওঠা যায় না। বইয়ের আদ্যোপান্ত রুদ্ধশ্বাস উদ্বেগ ও অনিশ্চয়তা।

উপন্যাসের চেয়েও সুখপাঠ্য

মূল্য চার টাকা

মাইকেল মধুসূদন দত্তের

মাইকেল গ্রন্থাবলী

প্রথম ভাগ :—মেঘনাদবধ কাব্য, বীরাঙ্গনা কাব্য, পদ্মাবতী নাটক, বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রোঁ. একেই কি বলে সভ্যতা? (বোর্ড বাঁধাই)—সাড়ে চার টাকা।

দ্বিতীয় ভাগ :—কৃষ্ণকুমারী নাটক, শর্মিষ্ঠা নাটক তিলোত্তমা-সম্ভব কাব্য, ব্রজাঙ্গনা কাব্য, চতুর্দশপদী কবিতাবলী, বিবিধ কাব্য, মায়া কানন, হেকটর বধ। (বোর্ড বাঁধাই)—চার টাকা।

উপন্যাস-সাম্রাজ্যের রত্নমুকুট,—সেই সর্বজনপ্রমোদন—অমর-কীর্তি ঔপন্যাসিক—লব্ধপ্রতিষ্ঠ নাট্যকার—শক্তিমান রস-শিল্পী 'ভারতী' সম্পাদক শ্রীযুক্ত সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়ের—

সৌরীন্দ্র গ্রন্থাবলী

৫ম ভাগে :—বাদলা, মমতা, নির্ঝর, অতঃপর, পরদেশী সুরা, যবনিকার অন্তরালে, লেখার গলদ, পারিবারিক উপন্যাস, প্রগতি, অনাগত যুগ, আদর্শ এডিটোরিয়াল, আদর্শ সমালোচনা, সম্পাদকের দপ্তর, সংবাদপত্রের দৌলতে, সে কাশ্মীর. এক যাত্রায়. কুলকাটা, দুঃখীরাম, পান-সুপারি।

মাত্র ১।।০ টাকায়

ডঃ মতিলাল দাশ প্রণীত

মতিলাল গ্রন্থাবলী

মূল্য—দুই টাকা

—ইহাতে আছে—

১। চলার পথে (উপন্যাস)
২। মনীষা (উপন্যাস)
৩। বিদ্যুৎশিখা (১১ খানি গল্প সমষ্টি)
৪। দীপশিখা (কবিতা সংকলন)
৫। চার্বাক (নাটক)

বসুমতী প্রাইভেট লিমিটেডঃ ১৬৬, বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী স্ট্রীট, কলি-১২

সূচীপত্র

বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা
আগিনযুগের একটি অধ্যায়	— অনন্ত সিংহ	১৩৭৭
সুবর্ণলতা (ধারাবাহিক উপন্যাস)	— আশাপূর্ণা দেবী	১৩৮২
এইচ, জি, ওয়েলস-এর গল্প	— ডঃ বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য	১৩৮৮
নষ্ট-সত্ত্ব (কবিতা)	— ডঃ কল্যাণকুমার দাশগুপ্ত	১৩৯২
কুহেলী উত্তরণ (কবিতা)	— অনিন্দ্যনারায়ণ মজুমদার	১৩৯২
গ্রাম বাংলার কথা	— পারুল ভট্টাচার্য	১৩৯৩
রঙ্গমঞ্চ—ওদেশে এবং এদেশে	— শিলাদিত্য	১৩৯৬
রঙ্গজগৎ		১৩৯৯
পাঠকমন		১৪০৪
খেলাধুলা	— শ্রীঅমিতাভ	১৪০৬

বিশ্বসাহিত্যের সম্রাট—মনস্তত্ত্ব বিশ্লেষণে শাদা-আলোচনা—চরিত্র-সৃষ্টির ইন্দ্রধনু—অনন্যসাধারণ প্রতিভার অধীশ্বর চার্লস ডিকেন্সের

ডিকেন্স গ্রন্থাবলী

অপ্রতিদ্বন্দ্বী কথাশিল্পী—সর্বরসের অনন্ত নির্ঝর—বিশ্বসাহিত্যগৌরব ঔপন্যাসিকের পরিচয় প্রদান অসম্ভব।

২য় ভাগ—নিকোলাস নিকলবি ঃ বার্নাবি রজ, চরিত্র-চিত্র। সাহিত্য জগতের এই পুণ্যপ্রভা মাত্র ১৸৹ টাকা

আত্মজীবনী

স্বর্গীয় অধ্যাপক সুরেশচন্দ্র চক্রবর্তী

মূল্য—দুই টাকা

"এই আত্মজীবনী পাঠ করিয়া বাঙালী পাঠক একসঙ্গে শিক্ষা ও আনন্দলাভ করিবেন"—

—সুপ্রসিদ্ধ হীরেন্দ্রনাথ দত্ত—প্রবাসী

"একাধারে ব্যবহারজীবী, সাহিত্যিক, দার্শনিক ও কর্মী সচরাচর দেখা যায় না। কাজেই তাঁহার আত্মজীবনী অত্যন্ত সুখপাঠ্য গ্রন্থ হইয়াছে।"

—রায় বাহাদুর খগেন্দ্রনাথ মিত্র

শ্রীহেমেন্দ্রকুমার রায় প্রণীত

মোহন মেলা

মূল্য এক টাকা

কিশোর-কিশোরীদের জন্য প্রধান কথা-শিল্পীর রস-সাহিত্য-সম্ভার ছাড়াও গল্পে ভরপুর।

—ইহাতে আছে—

গল্প—বৌনির দিনে, বুদ্ধদেবের বাঁশি, কাঠুরের কপাল, হাঙর মানুষের চোখের জল, ভুলের ভুল, মুর্গী চাচা, বুদ্ধদেবের গল্প, একটার বদলে দুটো, নতুন সিনেমার ছবি, দাদুর গল্প, ইঁদুরের কীর্তিকাহিনী, বাঁদরের মেটুলিচচ্চড়ি।

ছড়া—হট্টমালার যজ্ঞবাড়ী, হোহোহো বৃষ্টি ঝরে, পালোয়ান প্যালারাম, উলটো বাজির দেশে, আজব দেশ, বাঁকা শ্যামের ব্যারাম, হাবুবাবুর মনের কথা, আদ্দি কালের বদ্দি বুড়ি।

প্রসিদ্ধ চিত্রশিল্পী সূর্য রায় কর্তৃক সুচিত্রিত

উপহার দিবার মত বই।

হংসেশ্বর চট্টোপাধ্যায় প্রণীত

মঞ্জুষা ২৷৹

রাজনৈতিক-গগনের দীপ্ত সূর্য—পাঞ্জাব-কেশরী

লালা লাজপৎ রায়ের জীবনী

[ইংরেজীতে]

রাজনৈতিক জীবনের ঘটনার ঘাতপ্রতিঘাত-ময় মহাজীবনী।

জেলের শাস্তি—বিচার-রহস্য পর্যন্ত আমূল ইতিহাস। অসার জীবনী নহে—লালাজীর জীবন-সাধনার — রাজনৈতিক সংগ্রাম—দেশাত্মবোধে যদি সুপরিচিত হইয়া ধন্য হইতে চান ত সত্বর লালা লাজপৎ রায়ের জীবনী পাঠে উদ্দীপিত হউন—স্বদেশমঙ্গলযজ্ঞে আত্মাহুতির জ্বলন্ত আদর্শ দেখিয়া সম্মোহিত হইবেন।

মূল্য—চার আনা

—ঔপন্যাসিক প্রতিভার শ্রেষ্ঠ দান—

দামোদর মুখোপাধ্যায়ের

দামোদর-গ্রন্থাবলী

১ম খণ্ড ১-৫০ ২য় খণ্ড ২-৫০

৩য় খণ্ড ১-০০ ৪র্থ খণ্ড ২-৫০

বসুমতী প্রাইভেট লিমিটেড ঃ ১৬৬, বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী স্ট্রীট, কলি-১২

৭১ বর্ষ : ২২শ সংখ্যা—মূল্য ২৫ পয়সা | বাংলা ভাষায় দ্বিতীয় সর্বাধিক প্রচারিত সাপ্তাহিক পত্রিকা | Price : 25 Paise
বৃহস্পতিবার, ২৪শে কার্তিক, ১৩৭৩ বঙ্গাব্দ | Thursday, 10th Nov., 1966

খরার প্রকোপে পশ্চিমবঙ্গ

পশ্চিমবঙ্গ এখন প্রখর খরার প্রকোপে। কঠোর প্রকৃতি তার প্রতি বিরূপ! উত্তরপ্রদেশ ও বিহার রাজ্যও এখন খরার সামিল। বিহারে প্রকৃতির আর এক নতুন খেলা। সেখানে একদিকে বন্যায় বিরাট অঞ্চল জুড়ে ক্ষয়-ক্ষতি হয়েছে, আর একদিকে প্রখর খরায় জলাশয়গুলি শুকিয়ে গেছে। প্রধানমন্ত্রী স্বয়ং বিহারের বন্যাবিধ্বস্ত অঞ্চল পরিভ্রমণ করে ক্ষতিগ্রস্ত লোকেদের সাহায্য দানের জন্য সদয় হস্ত সম্প্রসারিত করেছেন। উত্তরপ্রদেশ ও বিহারের খরা অঞ্চলগুলিতে সরকারী দৃষ্টি এখন তৎপর হয়েছে।

খরার এই অবস্থায় আমাদের আগামী দিনের খাদ্যাবস্থাকে বর্ণনা করার জন্য কোনো দূরদর্শী ব্যক্তির সন্ধান করার প্রয়োজন নেই; যিনি স্বচক্ষে ঐ সব অঞ্চল দেখেছেন তিনি শুধু ভবিষ্যৎ-কথা ভেবেই উদ্বিগ্ন ন'ন, বর্তমান দুরবস্থাতেই তিনি দুর্ভিক্ষের পদধ্বনি শুনতে পেয়েছেন। আমাদের দেশ খাদ্য আমদানীর নীতিতে সব সময় তৎপর, হয়তো সেই নীতিবাক্যেই আশ্বস্ত করার চেষ্টা করা হবে, কিন্তু সেই নীতির দ্বারা দেশ যে স্বাবলম্বী হতে পারবে না, তা বলাই বাহুল্য। 'জয় কিষাণ' শ্লোগানটি আজ শুষ্ক মাঠে প্রতিধ্বনিত হচ্ছে, অন্নহীন কৃষক আজ লাঙল ফেলে মাথায় হাত দিয়ে বসেছে, এমন চিত্রের পরিকল্পনা ত আমরা কোনো-দিন করি নি। কারণ আমাদের দেশ ভূমিসম্পদে বহু দেশের কাছেই ঈর্ষণীয় হবার যোগ্য, এদেশে খেটে খাবার মতো লোকের অভাব নেই, তবু ভূমিসম্পদ ও জনশক্তি আজ যেন অপ্রয়োজনের তালিকায় এবং আমরা ফি-বছর খাদ্য আমদানী করার জন্য প্রলুব্ধ হচ্ছি! আমাদের শিল্প সংগতি এমন বিরাট নয় যে, সেই শিল্প-জাত দ্রব্যের পরিবর্তে শস্য আমদানী করবো এবং সেই পথেই আমাদের জাতীয় আয় বৃদ্ধি করবো। দুর্ভাগ্যের ব্যাপার, আমাদের জাতীয় আয়ও এখন নিম্নমুখী।

আমাদের দেশে এক এক সময় এক একটা হিড়িক পড়ে, শেষ পর্যন্ত সেটা হুজুগে পরিণত হয়। কিন্তু হুজুগের ফলে কাজের কাজ কিছুই হয় না। প্রসঙ্গত আমরা বলতে চাই 'অধিক ফসল ফলাও' আন্দোলনের কথা। এই আন্দোলন এমন পর্যায়ে পৌঁছেছিল—যেন উঠোনে ধান গাছ ফলানো হবে এবং খড়ো চালে মুলোর চাষ করা হবে! সেই হুজুগ আজ আর নেই; এখন চারদিকে রোদন—খরা আর খরা!! কিন্তু হুজুগে মেতে কাজের কাজ কিছু না করায় এখন অরণ্যরোদনই সার! যদিও আমাদের পশ্চিমবঙ্গ সরকার খরার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করার জন্যে কেন্দ্রের কাছে জরুরী তারবার্তা পাঠিয়েছেন : আরও ৩০ লাখ টাকা চাই।

পশ্চিমবঙ্গের অবস্থা আমরা স্বচক্ষে দেখেছি—সুতরাং এই রাজ্যের খরার কথা আমরা কিছু বলতে পারি। বস্তুত খরার আক্রমণ এই নতুন নয়। সারা পশ্চিমবঙ্গ প্রতি বছর খরায় পতিত না হোক—অন্তত প্রতি বছরই উত্তর রাঢ় অঞ্চল খরার প্রকোপে পতিত হয়। এ বছর বৃষ্টিপাতের পরিমাণ অত্যন্ত কম; সেই কারণে উক্ত অঞ্চলগুলিতে অধিকতরভাবে এ বছর এক দুঃসহ অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে। যাঁরা স্বচক্ষে ঐ অঞ্চল দেখে এসেছেন তাঁদের মুখ থেকেই আমরা প্রকৃতির নিষ্করুণ নিষ্ঠুরতার কথা শুনেছি।

উত্তর রাঢ় অঞ্চল, বিশেষত বাঁকুড়া ও বর্ধমান জেলার এক বিরাট অঞ্চল দামোদর নদ-পরিকল্পনা থেকে কোনো উপকারই লাভ করে নি, বরং দুর্ভাগ্যেরই পরিহাস এই যে, পরিকল্পনার ফল-শ্রুতিতে বর্তমানে তাঁদের দুঃখ বৃদ্ধিই হয়েছে। অথচ দুর্গাপুরে বাঁধ যখন নির্মিত হয় নি তখন যেভাবেই হোক জমিগুলি বন্যার জলে সিঞ্চিত হয়েছে এবং পলিমাটি পড়ার ফলে তাদের উর্বরা শক্তিও বৃদ্ধি লাভ করেছে। আর এখন সেচের জন্যে না আছে কোনো খাল এবং অ-সার জমিতে সার দেবার ব্যবস্থা। আপাতত যে সার সরবরাহ করা হয়—তাও নাকি অসার—সুতরাং তার সরবরাহেও কোনো ফলোদয় হওয়া সম্ভব ছিল না।

এমন এক অসহনীয় অবস্থার সৃষ্টি হওয়ামাত্র পশ্চিমবঙ্গ সরকার এগিয়ে এসেছেন—এতে বিস্মিত হওয়ার পরিবর্তে দেখতে হবে সরকার সেচের জন্যে কী কী স্থায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ করছেন। বর্তমানে আর্তদের সাহায্যকল্পে (গ্রামে গ্রামে কূপ খনন ও পুষ্করিণী খননের দ্বারা?) ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে, সেই সঙ্গে পাম্প কিনে অর্ধেক দামে তা সরবরাহ ও নদীর জল মাঠে ঢালবার ব্যবস্থা গ্রহণ করা হচ্ছে। একই সঙ্গে স্থায়ী ব্যবস্থা হিসেবে গভীর নলকূপ স্থাপন করাও প্রয়োজন। কিন্তু পশ্চিমবঙ্গে অধিকাংশ গ্রামে বিদ্যুৎ সরবরাহের ব্যবস্থা না থাকায় তাতে বিঘ্ন উপস্থিত হতে পারে। কেই কারণে নদী পরিকল্পনাজাত বিদ্যুৎ-ও গ্রামাঞ্চলে প্রেরণ করা দরকার।

এইসব প্রয়োজন মেটাবার জন্য এগুলিকে জরুরী অবস্থার পর্যায়ে বিবেচনা করা উচিত। আমাদের দেশকে খাদ্যে স্বয়ম্ভর করে তোলার ইচ্ছা থাকলে এ ছাড়া অন্য উপায় কি? অন্তত উনিশ বছরের স্বাধীনতায় দেশের খরা দূর করার জন্যে প্রকৃতির করুণার দিকে না চেয়ে নিজেদের কর্মপ্রচেষ্টা নিয়োগ করলে তা অধিকতর সাফল্যজনক হোত—একথা এই বিজ্ঞানের যুগে বলা একান্তই নিষ্প্রয়োজন।

সম্পাদকীয়

আজকের মানুষ

যে যত উঁচু পদেই কাজ করুক না কেন, কেউ যদি তাকে এসে বলে, 'ওহে, তোমার চাকরী নেই আর', তাতে বিচলিত হয়ে পড়ে নি এমন লোকের সংখ্যা খুবই কম। অথচ রেড্ডিকে ঠিক এ কথাই শুনতে হয়েছিল, হয়েছিল সরাসরি horse's mouth, খোদ মালিকের কাছ থেকে। কিন্তু তা সত্ত্বেও তাঁকে দেখা গেল ভয়হীন, ভাবনাহীন।

অন্ধ্রপ্রদেশের ওসমানিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস-চ্যান্সেলর ডঃ দিনপতি সদাশিব রেড্ডি। সাফল্যের সঙ্গে তাঁর দায়িত্ব পালন করে আসছিলেন, খ্যাতিও অর্জন করেছিলেন কর্মক্ষমতা দেখিয়ে। স্বাভাবিক নিয়মেই তাঁর চাকরীর মেয়াদ পূর্ণ হতে আরো প্রায় আড়াই বছর বাকী ছিল, ১৯৬৯-এর আগে কর্মচ্যুতির কোন প্রশ্নই ছিল না। কিন্তু হঠাৎ বলা নেই, কওয়া নেই আরেক ভদ্রলোক এসে দাবি জানালেন, ভাইস-চ্যান্সেলরের গদীটা না কি আসলে তাঁরই প্রাপ্য—হাতে তাঁর চ্যান্সেলরের নাম সই-করা নিয়োগপত্র।

শ্রীরেড্ডি স্বভাবতই এতে কৌতুক বোধ না করে পারেন নি, তিনি স্বপদে বহাল থাকতে অন্য লোক কেমন করে একই পদ দখল করে? এ কেমনতর আইন যা একই চেয়ারে দুজন লোকের বসার ঠাঁই করে দেয়, ডঃ রেড্ডি তাঁর গদী ছাড়বেনই বা কোন্ অপরাধে? আর উট্‌কো কেউ এসে গভর্নরের সীলমোহর দেওয়া অ্যাপয়েন্টমেন্ট লেটার দেখালেই অমনি সুড়সুড় করে নিজের হক্ ছেড়ে গদী থেকে নেমে আসবেন—রেড্ডি সে বান্দাই নন!

তাই কৌতুকবোধই করেছিলেন তিনি ঘাবড়ান নি মোটেই। ঘাবড়াবেনই বা কেন? এ-কান্ড তো রেড্ডির জীবনে এই প্রথম ঘটলো না, এ-ধরণের পরিস্থিতির সম্মুখীন তাঁকে আগেও হতে হয়েছিল। এবং তাও এই ওসমানিয়া বিশ্ববিদ্যালয়েরই ভাইস-চ্যান্সেলরের কার্যভার নিতে গিয়েই। আজ তাঁর পেছনে সমগ্র বিশ্ববিদ্যালয়ের সেনেট, অধ্যাপকমন্ডলী এবং ছাত্রসমাজকে দেখে ডঃ রেড্ডির স্মৃতিপটে সেদিনকার কথাই ভেসে উঠছে, যেদিন এ'রাই তাঁর নিয়োগে ঘোরতর আপত্তি তুলেছিলেন।

ডঃ রেড্ডি যেদিন ভাইস-চ্যান্সেলর হয়ে এলেন সেদিনও দেখেছিলেন অশান্ত ঢেউ। তাঁকে কেউ চায় না, না অধ্যাপকেরা, না ছাত্রেরা। শ্রীভেঙ্কটেশ্বর বিশ্ববিদ্যালয়েই কাজ চেয়েছিলেন ডঃ রেড্ডি, কিন্তু সেখানে না গিয়ে যখন তিনি তার বদলে ওসমানিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে এলেন তখন অনেকেই মনে করেছিলেন এই অবাঞ্ছিত ব্যক্তিটিকে ওসমানিয়ার ওপর চাপিয়ে দেওয়াই হয়েছিল। ছাত্রসমাজ প্রতিবাদে ফেটে পড়েছিল, দিনের পর দিন ছাত্র ধর্মঘটের মধ্য দিয়ে তাদের প্রতিবাদ ভাষা পেয়েছিল। কিন্তু ছাত্রেরা তাদের ত্রুটি বুঝতে পেরেছিল, অধ্যাপকেরাও ধরতে পারলেন তাঁদের ভুল। তাঁরা দেখলেন, ডঃ রেড্ডি আসলে একজন সত্যিকারের শিক্ষানুরাগী ও ছাত্রদরদী। বেশি দিন লাগে নি তাঁর এখানকার ছাত্র-শিক্ষকসমাজের মন জয় করতে। সে-জনপ্রিয়তা তাঁর আজো অটুট, অক্ষুণ্ণ।

ডঃ ডি এস রেড্ডি

কিন্তু শিক্ষক-ছাত্রদের শ্রদ্ধা, প্রীতি বা ভালোবাসাই ডঃ রেড্ডির একমাত্র পুঁজি বা ভরসা নয়, কর্তব্যনিষ্ঠা ও বিদ্যোৎসাহিতাই তাঁর আসল ক্যাপিটাল। অন্য কিছু নয়, দলাদলি, কোন্দল নয়, রেড্ডির ক্ষমতা লাভ তাঁর আন্তরিকতা ও দায়িত্ববোধেরই পুরস্কার। অক্সফোর্ড থেকে ফিরে এসে ডঃ রেড্ডি কুম্বকোনম কলেজে লেকচারার-এর পদ নেন। পরে মাদ্রাজ প্রাদেশিক শিক্ষা সার্ভিসে যোগদান করে এখানকার ডি-পি-আই'র পদ লাভ করেন।

কিন্তু বেশি দিন এ-চাকরী রাখা সম্ভব হলো না, অন্তরায় হলো—তাঁর অযোগ্যতা নয়, তার ভেতরে যে স্বাধীনচেতা সত্তাটি রয়েছে তাই। সাল ১৯৫০। শ্রীচক্রবর্তী রাজাগোপালাচারী তখন মাদ্রাজের মুখ্যমন্ত্রী। কিন্তু কেবল মুখ্যমন্ত্রিত্ব নিয়েই তো ইনি আবার সন্তুষ্ট নন, নানান ব্যাপারে ও বিষয়ে ও'র নিজস্ব থিয়োরী, নিজস্ব মতবাদ এবং ব্যাখ্যা করার নিজস্ব রীতি রয়েছে। তার ওপর রাজাগোপালাচারী আবার দেশের একজন ঝানু কূটনীতিকও। বেসিক এডুকেশন বা 'নঈ তালিম' প্রসঙ্গেও চক্রবর্তী রাজাগোপালাচারী নয়া ভাষ্য দিলেন, যা রেড্ডির ধারণা বা মতবাদের সঙ্গে মিললো না। ফলে দুজনের মতান্তর। জলে নেমে কুমীরের সঙ্গে বিবাদ করবে কে? ডঃ রেড্ডিকে পদত্যাগ করতেই হলো বাধ্য হয়ে।

কিন্তু উপেক্ষিত হলো না যোগ্যতা, ডঃ রেড্ডির কর্মস্থলের দৃশ্যান্তর ঘটলো শুধু। সুদূর লাইবেরিয়ায় অফিস খুলে বসলেন তিনি এখানে অবস্থিত ইউনেস্কো মিশনের প্রধান হয়ে। কাজে যোগ্যতাই যদি তিনি না দেখাতে পারবেন তবে লাইবেরিয়ার প্রেসিডেন্ট ডঃ রেড্ডিকে সে-দেশের শ্রেষ্ঠ সরকারী সম্মানে ভূষিত করবেন কেন?

ইউনেস্কোর চুক্তির মেয়াদ পূর্ণ হলো, দেশে ফিরলেন ডঃ রেড্ডি। অতঃ কিম? আবার অধ্যাপনা? তা উপযুক্ত প্রশাসনিক দায়িত্ব যদি না জোটে অগত্যা তাই করতে প্রস্তুত ছিলেন তিনি। কিন্তু ডাক এলো নবগঠিত অন্ধ্রপ্রদেশ থেকে—এখানকার প্রথম মুখ্যমন্ত্রী টি প্রকাশমের কাছ থেকে। আবারো ডি-পি-আই!

অন্ধ্রপ্রদেশের রাজ্যপাল শ্রীপত্তম থানু পিল্লাই এক আদেশবলে ডঃ নরসিং রাওকে ওসমানিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস-চ্যান্সেলরের পদ নিতে বলেছেন। ডঃ রেড্ডি জানতেন না তাঁর পদটি কখন খালি পড়েছিল। তাই রাজ্যপালের "অন্যায়" আদেশ মানতে তিনি পারলেন না, নতুন ভাইস-চ্যান্সেলরকে দায়িত্ব হস্তান্তর করতে রাজী হলেন না। বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্বময় কর্তৃত্বের ওপর সরকারের হস্তক্ষেপ বরদাস্ত করতে পারলেন না ডঃ রেড্ডি, হাইকোর্টে আবেদন জানালেন। হাইকোর্ট থেকে সুপ্রীম কোর্টে গেলেন তিনি। সুপ্রীম কোর্ট যে পর-পর অন্তর্বর্তীকালীন ইনজাংশন ও আদেশ জারী করলেন তাতে ডঃ নরসিং রাও-এর নতুন ভাইস-চ্যান্সেলরের কার্যভার গ্রহণ নিষিদ্ধ হলো, ওসমানিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস-চ্যান্সেলর হিসেবে কাজ করাও নিষিদ্ধ হলো। শেষ পর্যন্ত ভাইস-চ্যান্সেলর কে হবেন না হবেন, বিষয়টির নিষ্পত্তি হবে সুপ্রীম কোর্টেই। তা হোক, কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখার জন্যে ডঃ রেড্ডি যে সাহসিকতার পরিচয় দিলেন, তার তুলনা এদেশে বেশি পাওয়া যাবে না।

অফুরন্ত ভাণ্ডার

আশ্চর্যের কিছুই নেই, এই ভারতবর্ষই সেই বিশিষ্ট সম্পদের অফুরন্ত ভান্ডার, যার নাম, 'সমস্যা'। আজ পর্যন্ত ঐ বস্তুটিকে বাদ দিয়ে একটি দিনের জন্য ভারতবাসী চিন্তার স্বাধীনতা লাভ করে নি। বলতে পারে নি, বাঃ, দিনটা আজ নমো নমো করে বেশ কাটল! অথচ এই ভারতই নাকি একদিন "ধন ধান্যে পুষ্পে ভরা" এবং সাগরপারের তস্করদের লোভনীয় ভূখন্ড ছিল। আজ সে ধন নেই, ধান নেই, পুষ্পও (আনন্দ) নেই; ভারতের বিশাল মানচিত্র জুড়ে এক সমস্যার অজগর ফুঁসছে।

শীতকালীন অধিবেশনে অনাস্থা প্রস্তাব তুলে বিরোধীরা বলেছেন, সমস্যার বীজ বপন করেছেন ক্ষমতাসীন দলই। খাদ্য, অর্থনীতি, প্রশাসন, রাজনৈতিক কু-চক্রান্ত, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, বাসস্থান কিম্বা কর্মসংস্থান,—সমস্যার অক্টোপাশ তার দাড়া প্রদাড়া বিস্তার করে তেড়ে আসছে। যেখানে সমস্যার নটেগাছটির বাড় কম, সুযোগ-সন্ধানী তথাকথিত দেশপ্রেমিক দলপতি-প্রতিম দেশনেতার আইডেনটিটি কার্ড-হোল্ডাররা সমস্যা-বৃক্ষের মূলে সেখানে সর্বপ্রযত্নে সার জল ইত্যাদি ঢেলে চলেছেন। আর এমনি মজা যে, 'কানা মনে মনে জানা' এই উচ্চাভিলাষী কুটভিপ্রায়ী ছদ্মবেশী নেতারা আপন দোষের ভার স্কন্ধান্তরে চাপিয়ে দেওয়ার জন্য যেমত সোরগোল তুলেছেন, তাতে দেশের সমস্যা কেবলমাত্র দ্বিগুণিত হচ্ছে।

ছাত্র-বিক্ষোভ মিটতে না মিটতেই অথবা ধামাচাপা পড়তে না পড়তেই (কেন না বিক্ষোভের মূলে যে স্তরে সেখানে এখনো পৌঁছানো সম্ভব হয় নি), অন্ধ্রে পঞ্চম ইস্পাত কারখানা নিয়ে আগুন জ্বলে উঠেছে। দেশের লোকের পেটে আগুন এমনিই জ্বলছিল, শুষ্ক মৃত্তিকা সেই অগ্নিতে ঘৃতাহুতি দিয়েছে; প্রকাশ, অনাহার-মৃত্যুর সংখ্যা বিহারে বেড়েই চলেছে; জলাভাবে ধুঁকছে রাজস্থান, উত্তর প্রদেশ, উড়িষ্যা এবং পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রীর স্বীকারোক্তি অনুসারে মালদা, পশ্চিম দিনাজপুর ও বাঁকুড়া, পুরুলিয়ার কিয়দংশের খাদ্য পরিস্থিতি ভয়াবহ, প্রায় বিহারোপম।

হা-অন্ন মানুষের দল খাদ্য খুঁটতে লোটাকম্বল নিয়ে দিগ্বিদিকে পাড়ি দিয়েছে। বিহার থেকে বুভুক্ষু ব্যাটালিয়ান চলেছে কলকাতা সফরে। দানাপানি ঐখানেই মিলবে। বড় দরাজ শহর যা। কে জানে কেন, ঐ কলকাতারই নাম রাখা হয়েছিল, 'দুঃস্বপ্ন নগরী'। সে কি এইজন্য যে কলকাতার বুক বড় চওড়া; সে বাংলার জন্য কিছু চায় নি,

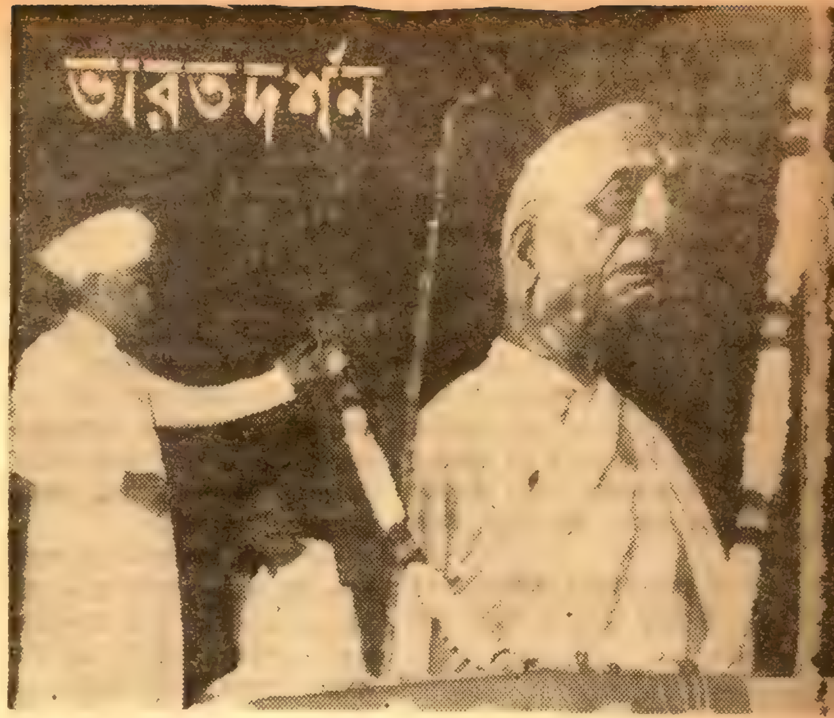

দেওয়ান-ই-আম-এ সর্দার প্যাটেলের প্রতিকৃতিতে পুষ্পমাল্য দিচ্ছেন ডঃ রাধাকৃষ্ণণ

বাংলাকেই বিলিয়েছে আর পাছে চাইতে গেলে বাকি ভারত বলে ওঠে 'প্রাদেশিকতা' তাই মুখ বুজে কেন্দ্রের অবিচার অবিরত মাথা পেতে গ্রহণ করে আসছে। আর সে কি এইজন্যই যে আকাল যেখানেই হোক কলকাতায় দানাপানির আশায় এলে কোন আঞ্চলিক আক্রোশ অভ্যাগতকে আক্রমণ করে না এবং একবেলা জুটলেও অর্ধাহার অন্যের পাত্রে স্বচ্ছন্দে তুলে দেয়! বস্তুত এমন আজব জায়গা ভারতের অন্যত্র দুর্লভ। নচেৎ অস্ত্র নিয়ে সমস্যান্ধ ভারতকে আজ নাকাল হতে হ'ত না। কলকাতা হলে বলত, আকাল যখন ভারতের অন্যত্র 'পঞ্চমা'র মত গাছে কাঁঠাল গোঁফে তেল ভবিষ্যবস্তু নিয়ে এসময় আর রাজনীতির প্যাঁচ কষে কাজ নেই। বরং বেরুবাড়ি বিলিয়ে দাও।

বাংলার বসুধৈব কুটুম্বকম ফিলজফি নিয়ে এখানে কচকচি করার ইচ্ছে ছিল না, প্রসঙ্গত এসে পড়ল কথাগুলি। ভারতের এতদঞ্চলে খাদ্যসমস্যা, বেকার সমস্যা, মজুরী সমস্যা ও মূল্য বৃদ্ধি সমস্যা ছাড়াও চতুর্থ যোজনার আয়তন সংক্রান্ত ব্যাপারে বেশ কয়েকটি রাজ্যের সঙ্গে পশ্চিমবঙ্গেও প্রশাসনিক সঙ্কট দেখা দিয়েছে। টাকা নেই, সুতরাং ট্যাক্স বাড়াও ফতোয়া জারি করে কেন্দ্রীয় সরকার এতাবৎকাল দিব্যি চালিয়ে গেছেন। এখন নির্বাচনের মুখোমুখি ওসব ঝুঁকি নিতে পশ্চিমবঙ্গ কেন, অঙ্গ কলিঙ্গ কেউই রাজী নয়। ভারতের সমস্যাবলীতে এও আর এক সমস্যা। উটের পিঠে (জনসাধারণের ঘাড়ে) ট্যাক্সের বোঝা সরকার যার পর নাই চাপিয়ে এসেছেন, এদেশের বাজেট ট্যাক্স বৃদ্ধিরই ইতিবৃত্ত। কিন্তু ইলেকসন বড় সাঙ্ঘাতিক জিনিস। গন্ডা গন্ডা অনাস্থা প্রস্তাব ফুৎকারে উড়িয়ে দেওয়া যায়, যায় না ইলেকসন। সেই ভূত বর্তমানে আসমুদ্র হিমাচল ভারতবর্ষের ঘাড়ে চেপেছে। সুতরাং এবারের সমস্যাবলী জোর কাবু করেছে দেশের কর্তাব্যক্তি—কর্ণধার সম্প্রদায়কে।

সেই সব সমস্যার কথা তুলেই এবারও অনাস্থা প্রস্তাব ভোটে পড়ল। মা ফলেষু। ইন্দিরা সরকার কেয়ার করেন নি। উল্টে পাছে বিরোধীপক্ষ থেকে গুরুতর সব কথা বেফাঁস হয়ে যায় এজন্য লোকসভার 'লঘু সময়' হ্রাস করে 'বিবিধ বিরোধে'র ওপর বিরোধীপক্ষের গরম বক্তৃতা করার অধিকার বাজেয়াপ্ত করে নিয়েছেন সভাকার্য পরিচালনা উপদেষ্টা কমিটি। তাই নিয়ে লোকসভায় হুলুস্থুল কান্ড হয়েছে এবং বিরোধীরা মানে মানে সভাকক্ষ ত্যাগ করে এই ব্যবস্থার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানিয়েছেন।

এ সমস্ত সমস্যার সঙ্গে পূর্বপরিচয় আমাদের আছে। ক্ষমতাসীন দল বারম্বার বিরোধীপক্ষের ক্ষমতা খর্ব করে এবং বিরোধী রাজনীতিকে এদেশে প্রায় ঠুঁটো করে দিতে অনেক অস্ত্র প্রয়োগও করেছেন। সুতরাং ঐ 'লঘু সময়', 'জিরো আওয়ার'ও দৈনন্দিনের মধ্যেই গণ্য। এমন কি দেশের যন্ত্রতন্ত্র পাতিল সাহেবের আশীর্বাদে যে রেলপথ দুর্ঘটনা অনিবারিত অবস্থায়

টাঙানো আছে, তাও বিস্ময় উদ্রেক করে না। বলা যায়, রেল দুর্ঘটনা আজ আর খবর নয়। আর আসলে পাক অনুপ্রবেশ? প্রশ্ন গভীর হলেও এ-ও বুঝি গা'-সওয়া হয়ে এলো। মিজোদের জন্য হতাহত? সমস্যার সিরিজে ওটাও পুরোনো অধ্যায়েরই অনুস্মৃতি। নাগারা আজও নাছোড়-বন্দা; কি আর করা যাবে, তৃতীয়ে-বৃতীয়ে ওঁদের সঙ্গে তো অনেক টানা-পোড়েনই করা হচ্ছে।

সমস্যাময়ী ভারতের অফুরন্ত সমস্যা ভাণ্ডার সেই মধুসূদনের দই-এর ভাঁড়, কিম্বা দ্রৌপদীর হাঁড়ি, অথবা পাঞ্চালীর শাড়ি। এর পরত খুলছে তো খুলছেই। দুঃশাসনের দাপাদাপি তথাপি অক্লান্ত। এসব নিয়ে অনেক কথা হয়েছে, আরও হবে।

তবে চমকপ্রদ সংবাদ ইতিমধ্যে আরও দু-একটি সৃষ্টি হয়েছে ও সৃষ্টি করা হয়েছে।

রাজধানীতে নার্স ধর্মঘট

সফদরজঙ্গ হাসপাতালের সাড়ে চারশ ধর্মঘটী নার্সের প্রতি সহানুভূতি জ্ঞাপনের উদ্দেশ্যে রাজধানী দিল্লীর হাসপাতালগুলি আজ শুশ্রূষাকারিণীদের সাক্ষাৎলাভে বঞ্চিত হয়। প্রায় তিন হাজার নার্স গত শুক্রবার একদিনের জন্য ধর্মঘট পালন করেন। জরুরী রোগীর সাহায্যের জন্য অবশ্য ওয়ার্ড পিছু প্রতি হাসপাতালে একজন করে নার্স ধাত্রী-সম্প্রদায়ের গুরুদায়িত্ব পালন করে গেছেন।

সফদরজঙ্গ হাসপাতালের জনৈকা নার্সকে কোনরকম অনুসন্ধান ব্যতীতই পুলিশ গ্রেপ্তার করে নিয়ে গেলে সেখানে নার্স ধর্মঘট সুরু হয়। রাজধানী অতঃপর নার্সশূন্য হাসপাতালে মুমূর্ষুর মতো শুধু ধুঁকেছে। একটি ওয়ার্ডে একাধিক নার্সই হিমসিম খেয়ে যান। একজন ধর্ম-ঘটের দিন যে কী পরিমাণ উদ্‌ভ্রান্ত বোধ করেছেন, কিম্বা রোগীর কাতরোক্তি উপেক্ষার কী চূড়ান্ত অগ্নিপরীক্ষা দিয়েছেন তা কল্পনা করা সম্ভব নয়। তবে নার্সশূন্য হাসপাতাল যে কী ভয়াবহ পরিস্থিতির সৃষ্টি করতে পারে, কী কণ্টকর সময় গণনায় ধর্মঘটের দিনটি অতিবাহিত হয়েছে, তা অনুভব করা কষ্টসাধ্য নয়। দাঁত থাকতে দাঁতের মর্যাদা দূরদর্শী ছাড়া অপরের ততখানি না থাকতে পারে, কিন্তু নার্স থাকতেও নার্সের মর্যাদা সম্বন্ধে অসচেতন খুব অল্পই আছেন।

কিন্তু উপলব্ধি সম্ভবত ওপরতলায় কিছু পরিমাণ ভোঁতা হয়ে থাকে। তাই দেখা যায়, গণতান্ত্রিক বিধানসভার নেতা হয়েও ওপরতলার মানুষ যেমন সাক্ষাৎ-প্রার্থীর সঙ্গে সাক্ষাৎ না করে এদেশে সমস্যাকে জটিল করে তোলেন; সফদরজঙ্গ হাসপাতালের সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট কল ঃ আর ডি আয়ারও তেমনি এক দাম্ভিক মনোভাব থেকে পূর্বনির্দিষ্ট সাক্ষাৎ বাতিল করে দিয়েছেন। দিল্লী নার্সেস এ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি সহ এক প্রতিনিধি দলের সঙ্গে তাঁর সাক্ষাতের পূর্বনির্ধারিত ব্যবস্থা ছিল। কিন্তু কল ঃ আয়ার সাক্ষাৎ করেন নি। টেলিফোন পেয়ে জবাবে জানিয়েছেন; সমগ্র ঘটনা এখন তাঁর হাতের বাইরে। কেন না ব্যাপারটা বর্তমানে মহামান্য বিচারালয়ের বিবেচনাধীন।

এরপর এক সফদরজঙ্গ ছাড়া অন্যান্য হাসপাতালে পরদিন নার্সগণ কাজে যোগ দিয়েছেন বটে; কিন্তু দিল্লী হাসপাতাল-নার্স ও সাধারণ কর্মচারী য়ুনিয়নের সাধারণ সম্পাদক জানিয়ে দিয়েছেন যে, ৭ই নভেম্বর পর্যন্ত আলোচনার দ্বার উন্মুক্ত আছে। তারপরও আলোচনা সম্ভব না হলে সমস্ত হাসপাতালের নার্সগণ অনির্দিষ্টকালের জন্য ধর্মঘট করতে বাধ্য হবেন।

সমস্যা পাকিয়ে তোলার এই হল প্রশাসনিক রীতি। আলোচ্য হাসপাতালের সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট অনায়াসেই ব্যাপারটার সহজতর মীমাংসার চেষ্টা আগেই করতে পারতেন বলে অভিযোগ। নার্সদের দাবির অন্যতম হল, নার্স মিস পি ডেভিডের কেসটি সরাসরি পুলিশের হাতে তুলে দেওয়ার আগে, তার বিরুদ্ধে আনিত অভিযোগের ব্যাখ্যা কেন মিস ডেভিডের কাছে চাওয়া হয় নি; তাছাড়া সর্বাগ্রে ঘটনার একটি ডিপার্টমেণ্টাল বিচার হওয়ার প্রয়োজন ছিল। বলা বাহুল্য, হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের প্রতি এই অভিযোগ যুক্তিহীন নয়। কিন্তু ঘটনা-স্রোত এখন মহামান্য বিচারালয়ের সুবিচার প্রার্থী। সুতরাং কোনপ্রকার মন্তব্য থেকে আমরা বিরত থাকলাম।

সর্দার প্যাটেল

সর্দার প্যাটেলসদৃশ লৌহমানবেরই প্রয়োজন ছিল সমস্যাসংকুল ভারতবর্ষে! —বিশেষত ভারতের সঙ্গে পাকিস্তানের খোলাখুলি বিসম্বাদের কালে এই একটি কথা একাধিক স্থানে একাধিক ভারত-বাসীর মুখে উচ্চারিত হতে শোনা গেছে। সর্দার প্যাটেল ছিলেন একরোখা আত্ম-বিশ্বাসী এবং কর্মবীর। কাজের থেকে কথার মূল্য যে-ভারতবর্ষে বাড়ছে, সেই ভারতে আজ অবশ্যই মন্দার যুগ। সর্দার প্যাটেলের পরিচয় যাঁরা কথায় ও কর্মে প্রত্যক্ষ করেছেন, তাঁদেরই একজন, প্রবীণ কংগ্রেসী (বর্তমানে দলত্যাগী) নেতা শ্রী জে বি কৃপালনীও তাই লালকেল্লার দেওয়ান-ই-আম-এ প্যাটেল জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে এক ভাষণ প্রসঙ্গে বলেছেন, যদি সর্দার প্যাটেলের কাছ থেকে আজ বিশেষ করে কারও কিছু শিক্ষণীয় থাকে তবে সে শিক্ষা সর্বাগ্রে গ্রহণ করা উচিত তাঁদের যাঁরা আজ শাসনযন্ত্র পরিচালনা করছেন।

শিক্ষামন্ত্রী শ্রী এম সি চাগলা বলেছেন, সর্দার প্যাটেল ছিলেন ভারতের ঐক্য গঠনকারীদের অন্যতম।

আর দেওয়ান-ই-আম-এ সর্দার প্যাটেলের একটি প্রতিকৃতি মাল্যভূষিত করে রাষ্ট্রপতি ডঃ রাধাকৃষ্ণ সর্দারজীর ন্যায় মহান নেতার প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদনকালে সকলকে আহ্বান জানান জাতীয় ঐক্য অবিচ্ছিন্ন রেখে আপনাকে গঠন করার জন্য।

সর্দার প্যাটেল যে বীর্যবতী এবং ঐক্যবদ্ধ ভারতের স্বপ্ন দেখেছিলেন, বিগত ৩১শে অক্টোবর তাঁর একানব্বইতম জন্মদিবস উপলক্ষে দেশের বিভিন্ন স্থানে সেই স্বপ্নকে মূর্ত করে তোলার আহ্বান জানান হয়।

রাজধানীতে বিশিষ্ট অতিথি সমাগম

রাজধানীর বাজার অবশ্য চিরকালই সরগরম থাকে, তবে বিশেষ করে এবারে নয়াদিল্লীতে রং ও উত্তাপের বিশেষ সংযোগ ঘটেছে।

এবারের শীতকালীন পার্লামেণ্টের অধিবেশনে রাজধানী মুখরিত হচ্ছে। বিরোধীপক্ষের ঝাঁঝালো এবং তীক্ষ্ণ প্রশ্নবাণে সরকারপক্ষ জর্জরিত হচ্ছেন। এ তো প্রভাতী প্রাত্যহিক সংবাপত্রের বাঁধা বিষয়বস্তু।

উত্তাপের প্রসঙ্গ বাদ দিলেও বাইরের অতিথি সমাগমে রাজধানী আবার বেশ রঙীন। এই তো সেদিন গত ৩০শে অক্টোবর নয়াদিল্লীতে ঘটা করে বিশ্ব হৃদ্‌রোগ কংগ্রেস শুরু হল, আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করলেন রাষ্ট্রপতি ডঃ রাধাকৃষ্ণণ।

বাইরের অতিথিদের আসা-যাওয়ার বিরাম-নেই। লাওসের যুবরাজ ভং সাভং রাষ্ট্রীয় অতিথি হিসেবে আসেন গত ৩১শে অক্টোবর। আরও এসেছিলেন ভ্রাম্যমাণ মার্কিন দূত মিঃ হ্যারিম্যান ও নেপালের প্রতিরক্ষামন্ত্রী গিরিপ্রসাদ বরাঠোকি। আরও এসেছিলেন কমন-ওয়েলথের জেনারেল সেক্রেটারী আর্নল্ড স্মিথ।

এ সপ্তাহে নয়াদিল্লীর আরও একটি উল্লেখযোগ্য উত্তপ্ত বিষয় হচ্ছে জনসংঘ কর্তৃক গো-হত্যাবিরোধী বিক্ষোভ প্রদর্শন।

ইন্দিরা গান্ধী সকাশে লাওসের যুবরাজ ও যুবরাণী

মাদ্রাজে ঝড়

ঘণ্টায় একশত কিলোওয়াট যে প্রচণ্ড বেগবান বাত্যাপ্রবাহ মাদ্রাজ নগরীকে ধাক্কা দিয়ে পোতাশ্রয় ও আশ্রিত জাহাজগুলিকে আক্রমণ করে, ঝড়ের এই রুদ্র সংহারলীলার কাহিনী সমগ্র দেশকে স্তম্ভিত করেছে। সমুদ্র-শিলায় আছড়ে ফেলে মাদ্রাজ উপকূলের সন্নিকটবর্তী একটি বিদেশী জাহাজ এস এস প্রোগ্রেসকে এই ঝড় দু-টুকরো করে ফেলেছে। ঝড়ের ফলে প্রাণ হারিয়েছেন ছাব্বিশজন নাবিক। চারখানি জাহাজ নোঙর ছিঁড়ে মাঝ সমুদ্রে আটক আছে। এবং কুভাস নদীর উভয় তটে বন্যার প্রকোপে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে শতখানেক কুটীর। শহরে তিনটি রাসায়নিক অগ্নিকাণ্ডের সংবাদ পাওয়া গেছে।

রুষ্ট প্রকৃতি কোথাও খরায় খটখটে করে মাটিতে ফাট ধরাচ্ছে, কোথাও বা জলোচ্ছ্বাসে ভাসিয়ে নিয়ে যাচ্ছে গো-মহিষ মানুষ-জন।

ঝড় উঠেছে চতুর্দিকে অশান্তির, কোথাও বা অস্থিরতার, যেমন অন্ধ্র। মাদ্রাজের ঝড় এই তালিকার বাইরে, খাস বায়ুমণ্ডলের বিক্ষোভের সংবাদ বহন করে এনেছে সে।

এবার "বোম্বাই" বন্ধ্

ইতিপূর্বে বোম্বে বন্ধ সফল হয়েছিল, ৪ঠা নভেম্বর হল যাকে বলে 'বোম্বাই ব্যাপার', তেমনি "বোম্বাই" বন্ধ্। এ বন্ধের ডাক দিয়েছিলেন মালিকগোষ্ঠী। শ্রমিক ধর্মঘটের জবর প্রত্যুত্তর। এক ডাকে ত্রিশ হাজারের ওপর দোকান-পাটে লক আউট। তালাচাবি বন্ধ্। আর তা হলেই হ'ল 'বন্ধ্' অর্থাৎ হরতাল।

২৪শে অক্টোবর থেকে নাগদেবীর লৌহ ও ইস্পাতের দোকান এবং সংস্থাগুলির হাজার দুই কর্মী ধর্মঘট চালিয়ে আসছিলেন। এই অসহ্য যন্ত্রণার হাত থেকে রেহাই পাওয়ার (অবশ্য ফলাফল ভবিষ্যতের হাতে) জন্য শ্রমিক ধর্মঘটের প্রতিবাদে নাগদেবী ব্যবসায়ী সমিতি বোম্বে বন্ধের ডাক দিলেন। স্বার্থের চোখ এতদিন এমনিই এক আঁধারে আলো খুঁজছিল বোধহয়, এক ডাকে বোম্বের যাবতীয় দোকানপাটে মালিকরা তালা ঝুলিয়ে দিলেন। বিলকুল বন্ধ। পিকেটিং নেই, পুলিশ নেই। অভিনব ব্যাপার। ঐতিহাসিক ঘটনা যাকে বলে আর কি।

জানি না, বোম্বে বন্ধে ও ঘেরা ডালো দিবসে যে জাতীয় স্বার্থ সচেতন নেতারা রাগে নাসারন্ধ্র ফুলিয়ে বলেছিলেন, চাবকে ঠাণ্ডা করো; এরপর, অর্থাৎ ব্যবসায়ী সমিতির বন্ধের আহ্বানের পর, তাঁরা কী বলবেন। বোধ হয়, চাবকানোর চিন্তা তাঁদের আর তেমন করে উদ্বেজিত করবে না।

'দমদম দাওয়াই' কথাটার সৃষ্টি বঙ্গদেশে, 'বোম্বাই দাওয়াই' তৈরি করলেন মহারাষ্ট্র। শুধু যা, এক্ষেত্রে, বাংলা আজ যা ভাবে মহারাষ্ট্র পরদিবস সেকথা ভাবে নি।

ইস্পাতের খেলা

ওসমানিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের অগ্নিগর্ভ পরিস্থিতিকে পোষ মানিয়ে স্বস্থানে সুস্থির করার আগেই রাজ্যব্যাপী দ্বিতীয় দফা রোষানল প্রজ্জ্বলিত হয়ে উঠেছে।

ওসমানিয়ার ছাত্র ও শিক্ষকদের বিক্ষোভ ছিল রাজ্য সরকারের বিরুদ্ধে। আজও তাঁদের প্রতিজ্ঞা অটুট আছে। জনপ্রিয় উপাচার্য ডঃ ডি এস রেড্ডিকে অপসারিত করার অপচেষ্টা শিক্ষিতসমাজ মেনে নিতে চান না। কিন্তু জবরদস্ত সরকার চান তাঁদের মনোনীত ও রাজনৈতিক স্বার্থপুষ্ট জনৈককে উপাচার্যের পদে জোর করে বসিয়ে দিতে। এমতাবস্থায় মহামান্য সুপ্রিম কোর্ট নির্দেশ দিলেন অন্তর্বর্তী সময়ের জন্য ডঃ রেড্ডিকেই উপাচার্যের দায়িত্ব পালন করে

হতে। বিচারালয়ের এমত আদেশকেও কোনরকমে ল্যাং মেরে রাজ্যের রাজ্যপাল, যিনি পদাধিকারবলে বিশ্ববিদ্যালয়ের আচার্যও বটেন, সরকার মনোনীত ব্যক্তিটিকে ওসমানিয়ার স্কন্ধে চাপিয়ে দিতে চাইলেন। রেজিস্টারকে ডেকে তেমন তেমন হুকুমও জারি করলেন তাঁরা। বিপদে পড়লেন রেজিস্টার মহোদয়। তিনি কখনো আটক কখনো ছাত্রদের হাতে বন্দী হয়ে রাজ্যপালের নির্দেশ অনুযায়ী কার্য পরিচালনায় সমূহ বাধা-বিপত্তি সমুপস্থিত দেখলেন। সিণ্ডিকেট সদস্যগণ প্রকৃত শিক্ষাবিদ ও জনপ্রিয় উপাচার্যকে কিন্তু ছেড়ে দিতে রাজী হলেন না। বিক্ষোভ দানা বাঁধল। ছাত্ররাও মারমুখী। সংকল্প তাঁদের আজও ইস্পাতকঠিন।

আর ঠিক এই সময়ই অন্ধ্রে পঞ্চম ইস্পাত কারখানা স্থাপনের দাবিতে আগুন নতুন করে জ্বলে উঠল। অন্ধ্রে সুরু হয়ে গেল জাতীয় সম্পত্তি ধ্বংসের প্রলয় নাচন। আর উনানে আঁচ থাকতে থাকতেই নতুন অঙ্গার চাপান পড়ায় অগ্নি দাউ দাউ করে জ্বলে উঠল। শান্ত্রী সিপাই পুলিশ মিলিটারী নৌ-বহর, হাতের কাছে যতগুলি উপায় ছিল সবকটিই প্রয়োগ করলেন আমাদের জনপ্রিয় সরকার। ফলত গণনা করার মতো প্রাণহানির সংখ্যাও নিত্যদিন স্কোর বোর্ডে ধরা পড়তে লাগল। জনগণের প্রতিজ্ঞাও একই রকম ইস্পাত কঠিন। যুদ্ধ জমে উঠল অন্ধ্র রাজ্যের অন্ধ রাজনৈতিক ঘূর্ণিাবর্তে।

বলা বাহুল্য, ল' এণ্ড অর্ডার রক্ষা করা তারই পক্ষে সম্ভব যার নিজের ঘরে ঐ দুটি বস্তুর অসদ্ভাব নেই। দুঃখের বিষয়, খণ্ড ছিন্ন বিক্ষিপ্ত কংগ্রেসই আজ আপন উপদলীয় ঘা' এবং প্রতি-ঘা'-এর জ্বালায় অস্থির, সুতরাং ঐ বস্তুটিকে টিকিয়ে রাখা কংগ্রেসী শাসনযন্ত্রের পক্ষে খুবই অসুবিধাজনক হয়ে উঠেছে। অন্ধ্রেও কংগ্রেসী দল উপদলের স্বার্থ কোনরকম ল' এণ্ড অর্ডার মানতে নারাজ। দেশে ঐ বস্তুটি মিলবে কোত্থেকে।

উপাচার্য হটানোর ঘটনাটা যে খুব আইনী নয় (বিশেষত মর্যাল আইনে তো নয়ই) সুপ্রীম কোর্টের ইনজাংশনকেও উড়িয়ে দেওয়ার অপচেষ্টাই তার প্রমাণ।

ইস্পাত কারখানা নিয়ে রক্তপাতের মূলেও নাকি ল'-রেকারদের কারসাজি সক্রিয় বলে অভিজ্ঞমহল ধারণা করেছেন। অভিযোগ, কংগ্রেসের দল-উপদলেই ক্ষমতালিপ্সাই বহু বিপত্তির মূলস্থিত কারণ। তাঁদের মতে, পঞ্চম ইস্পাত কারখানা বর্তমানে একটি সুদূরপরাহত প্রশ্ন। যা পরে ভাবলেও চলে। প্রধানমন্ত্রী স্বয়ং বলছেন, ঐ প্রশ্নটি সঠিক ভেবে নেওয়ার মতো পরিস্থিতি এখনো দেখা দেয় নি। তথাপি ঐ ইস্পাতকে কেন্দ্র করেই অগ্নি প্রজ্বলিত হয়ে উঠল। —অর্থাৎ ইন্ধন যাহোক একটা জুটলেই হ'ল। বিক্ষোভ আফসে গজ গজ করছে। তার বিস্ফোরণের রাস্তা এমনি করেই সন্ধান করে নিতে হচ্ছে। তাছাড়া ইস্পাতের আন্দোলন শান্তিপূর্ণ হতে বাধা ছিল না। কিন্তু অশান্তি এসমস্তর অবর্তমানেও যেমন ঘটত, ইস্পাতকেন্দ্রিক অশান্তি—তেমনিভাবেই ঘটেছে। ওসমানিয়ায় সরকারী অন্যায় হস্তক্ষেপ সেই অশান্তির আগুনে উপযুক্ত ইন্ধন যুগিয়েছে মাত্র।

কংগ্রেসের উপদলীয় কোন্দলে প্রতি রাজ্যেই অশান্তি তীব্রতা লাভ করছে। এরই ফলে মন্ত্রিত্ব সঙ্কট পর্যন্ত উপস্থিত হয়েছিল উড়িষ্যায়; আসামে। উত্তরপ্রদেশ তো রীতিমত হাতাহাতির জায়গা।

স্বার্থচক্র অন্ধ হয়েছে। অন্ধ আশাবাদী সারথী হয়েছে। জগন্নাথের রথ তাই আর যথানিয়মে গড়াতে পারছে না।

দ্বিখণ্ড পাঞ্জাব

বিগত পয়লা নভেম্বর চারমাসকাল স্থায়ী রাষ্ট্রপতি শাসনের অবসান ঘটল পাঞ্জাবে এবং ভাষার ভিত্তিতে পাঞ্জাবী পাঞ্জাব ও হিন্দী হরিয়ানা রাজ্য দু'টির জন্ম হ'ল।

রাজ্যপাল ধরমবীর দুই রাজ্যের যৌথ রাজ্যপালরূপে শপথ গ্রহণ করেন চণ্ডীগড়স্থ যৌথ হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতিরূপে শ্রীমেহের সিং মহোদয়ের শপথ গ্রহণ শেষ হলে। হাইকোর্টের অন্যান্য বিচারপতির সংখ্যা হ'ল তের।

এরপর দুই রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী রাজ্য উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের মধ্যে শপথ গ্রহণ করেন। প্রথমজন পাঞ্জাবের মুখ্যমন্ত্রী শ্রীগুরুমুখ সিং মুসাফির; দ্বিতীয় শপথ গ্রহণকারী হরিয়ানা রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী শ্রীভগবৎদয়াল শর্মা।

পাঞ্জাব রাজ্যের অপরাপর মন্ত্রিবৃন্দ হলেন : সর্বশ্রী কৃষ্ণভান, প্রবোধচন্দ্র, মোহনলাল, গিয়ান সিং, বারেওয়ালা, দরবারা সিং, প্রেম সিং, নিরঞ্জন সিং, যশোবন্ত রায় ও মেজর হরিন্দর সিং।

এ ছাড়া পাঁচজন রাষ্ট্রমন্ত্রী ও পাঁচজন উপমন্ত্রী নিয়ে এক বিশাল মন্ত্রিপরিষদ গঠিত হল পাঞ্জাব রাজ্যে।

হরিয়ানা রাজ্যের পূর্ণাঙ্গ মন্ত্রী হলেন : মুখ্যমন্ত্রীসহ সর্বশ্রী চাঁদ রাম, গুলাব সিং, রণবীর সিং, দেবরাজ আনন্দ, দল সিং এবং শ্রীমতী জৈন।

রাষ্ট্রমন্ত্রীর সংখ্যা পাঁচ, উপমন্ত্রীও তাই।

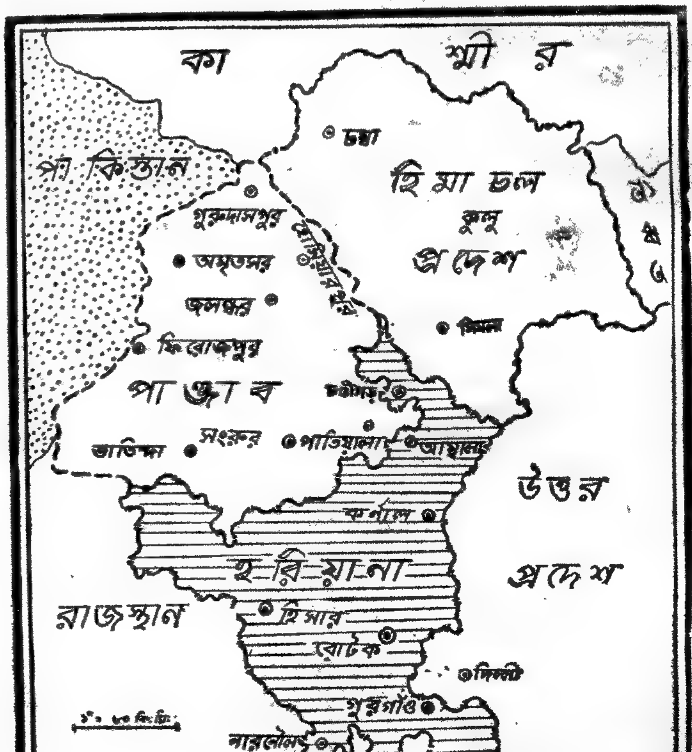

এ ছাড়াও পাঞ্জাবে আরও কয়েকজন পোর্টফোলিও পাবেন।

পাঞ্জাবের আইনসভায় দুটি কক্ষ; হরিয়ানার একটি।

ভাষার ভিত্তিতে রাজ্য পুনর্গঠনের দাবিতে পাঞ্জাব নেহরু আমল থেকেই অগ্নিগর্ভ হয়েছিল। শ্রীমতী গান্ধীর আমলে এই সীমান্তরাজ্যের অসন্তোষকে আরও টেনে নিয়ে যাওয়া হয় নি। এখন দুই রাজ্যে সম্প্রীতি অটুট থাকলে সর্বাঙ্গীণ মঙ্গল।

প্রাক-নির্বাচনী সমস্যা ঘাড়ে নিয়ে এই দুই রাজ্য আগামী নির্বাচনতক কেমনভাবে শাসনতান্ত্রিক দায়িত্ব পালন করেন তা যথেষ্ট কৌতূহল এবং বেশ কিছু পরিমাণ উদ্বেগের সঙ্গেই পরিলক্ষিত হবে। কেন না এ সময়টা সময়ে চলার সময়। ক্ষমতার খেলা এই মুহূর্তে ভারত পরিব্যাপ্ত করেছে। পাঞ্জাব

শ্রীভগবৎদয়াল শর্মা

হরিয়ানায় বিরোধীরা তৎপর আছেন। অন্তর্বর্তী মন্ত্রিসভাকে তাই গুরুদায়িত্ব বহন করতে হবে।

কাজটা হয়ত কম সঙ্কটপূর্ণ হ'ত যদি কংগ্রেসের নিজের ঘরে স্বার্থের দাঁত কিছু কম ধারাল থাকত। কিন্তু অবস্থা তেমন নয়, ভয় তাই সেদিক থেকেও বড় কম নয়। কংগ্রেসের বিবদমান দল উপদল এখন বেশ সক্রিয়। ক্ষমতা গ্রাসের জন্য উপদলীয় নেতাদের তৎপরতা তাই বিরোধী তৎপরতা অপেক্ষা কঠিনতর বাধারূপে দুই রাজ্যের সমস্যাকে জটিল করে তুলবে।

ক্ষমতালাভের সেই আবিল আবর্তে আগামী নির্বাচনের পর আমরা নবগঠিত দুই রাজ্যের পূর্ণাঙ্গরূপ দেখতে পাব।

রাজ্য হিসাবে হরিয়ানা পাঞ্জাব অপেক্ষা ছোট এবং রাজনৈতিক সচেতনার নিরিখেও অনগ্রসর। হরিয়ানার রাজনীতি মুখ্যত জাত্যাভিমানী। বিভিন্ন বর্ণের নেতারাই এখানে রাজনীতির পাণ্ডা। শ্রীভগবৎদয়ালের নির্বাচনেও এই জাতি-বর্ণ প্রধান রাজনীতি সক্রিয় ছিল। তবে শ্রীদয়াল একদিকে যেমন হরিজন নেতা অপরদিকে তেমনি জাঠ নেতাদের সমর্থনও লাভ করেছেন। শ্রীদয়াল উনপঞ্চাশ বছরের সমর্থ পুরুষ এবং একজন প্রবীণ ট্রেড য়ুনিয়নিস্ট। অনেকে তাঁর ওপর বিশেষ ভরসা রাখেন। তবে শ্রীদয়ালের বিপজ্জনক প্রতিপক্ষেরও অভাব নেই। পাঞ্জাবের জনৈক প্রাক্তন মন্ত্রী তাঁর নেতৃত্বের বিরুদ্ধাচরণ করেছিলেন। বিরুদ্ধবাদী অন্যান্য কয়েকজন নেতা পরে তাঁকে সমর্থন জানালেও, শ্রীদয়ালকে বহুক্ষেত্রে এ'দের মন যুগিয়ে চলতে হবে বলে আশংকা করেন অভিজ্ঞ রাজনৈতিক পর্যবেক্ষকগণ।

পাঞ্জাবের মুখ্যমন্ত্রী শ্রীগুরুমুখ সিং মুসাফিরের সমস্যা আরও একটু জটিল। হরিয়ানার তুলনায় এ রাজ্যে বিরোধী দল বলিষ্ঠতর। অন্যদিকে কংগ্রেসের অন্তর্দলীয় বিসম্বাদও প্রবল। চণ্ডীগড় নিয়ে এখনও চটাচটির কারণ বর্তমান আছে। আছে কাঙরা, কারনাল ও হিসার জেলাকেন্দ্রিক সমস্যাবলী। পাঞ্জাবী ভাষী অঞ্চল হিসাবে এগুলির ওপর নতুন দাবি নিয়ে নয়া সংকট ঘনিয়ে তোলা কিছু অস্বাভাবিক নয়। সেক্ষেত্রে বিরোধীপক্ষের সঙ্গে কংগ্রেসী উপদলও যে সংকট ঘনীভূত করতে এগিয়ে যেতে পারেন,

শ্রীগুরুমুখ সিং মুসাফির

অন্ধের ওপর চোখ রেখে সে আশংকাও অমূলক নয়।

উপদলীয় প্রতিপক্ষ হিসেবে মুসাফিরের প্রতিদ্বন্দ্বী দরবারা সিং ও মোহনলালের ক্ষমতা কিছু কম নয়। তাঁর মন্ত্রিসভায় আরও উপদলের অস্তিত্ব বর্তমান, যাঁদের সকলকে একসঙ্গে ঠাণ্ডা রাখাই হবে 'অফিস' বজায় রাখার ব্যাপারে শ্রীমুসাফিরের অন্যতম বড় দায়িত্ব।

সুতরাং দুই রাজ্যের কর্ণধারদ্বয়েরই চক্ষুকর্ণ এখন অতিমাত্রায় সতর্ক রাখার সময়। সামান্য ভ্রান্তি যে কোন মুহূর্তে, যে কোন সংকট সৃষ্টি করে বসতে পারে।

৬।১১।৬৬

শ্রীরামচরিত-মানস

ভক্তকবি তুলসীদাস

অধ্যাপক শিবপ্রসাদ গঙ্গোপাধ্যায় কর্তৃক বঙ্গানুবাদ

শ্রীরামচন্দ্রের বন্দনা-গানে ভারতবর্ষের বহু গুণী ও জ্ঞানীজন লেখনী ধারণ করিয়া আত্মোৎসর্গ করিয়াছেন। সেই সকল অমর লেখনীর প্রতিভা-নির্ঝরে ভারতবর্ষের মহাকাব্য পৃথিবীর সাহিত্যে স্বীয় বৈশিষ্ট্যে সমুজ্জ্বল। ভক্তকবি গোস্বামী তুলসীদাস তন্মধ্যে অন্যতম—যিনি সহজ সরল ভাষায় পতিতপাবন সীতা-রামের চরিত্র বর্ণনা করিয়াছেন সুমধুর সংগীতের মাধ্যমেই। তুলসীদাসের জীবনসর্বস্ব মহামানব শ্রীরামচন্দ্রের সেই বন্দনা-গানের সুললিত বাংলা অনুবাদ এই প্রথম—বসুমতী সাহিত্য মন্দিরের অপূর্ব কীর্তির নূতন এক পরিচয় এই শ্রীরামচরিত-মানস। বহু রঙীন চিত্রে সুশোভিত।

মূল্য—১ম খণ্ড দুই টাকা, ২য় খণ্ড দুই টাকা।

বসুমতী প্রাইভেট লিমিটেড: ১৬৬, বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী স্ট্রীট, কলি-১২

আন্তর্জাতিক

কুয়ালালামপুরে প্রেসিডেন্ট জনসনের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ

রাষ্ট্রসংঘ :

পারমাণবিক অস্ত্র যে কী ভয়ঙ্কর জিনিস তা আর কারো অজানা নেই। কিন্তু জানা সত্ত্বেও অস্ত্রটি সম্পর্কে, তার ব্যবহারের বিপদ সম্পর্কে সকল রাষ্ট্রই যেন সমান সচেতন নয়। তা যদি হতো পারমাণবিক অস্ত্রের প্রসার রোধ করার ব্যাপারে রাষ্ট্রসঙ্ঘে এমন প্রস্তাব গৃহীত হতো যা সকল রাষ্ট্রের পক্ষেই সাদরে গ্রহণ করা সম্ভব হতো, কিন্তু তা আর হলো কোথায়?

রাষ্ট্রসঙ্ঘের রাজনৈতিক কমিটিতে শেষ পর্যন্ত সোভিয়েট-মার্কিন প্রস্তাবটিই গৃহীত হলো অথচ প্রস্তাবটি সকল পক্ষকে খুশি করতে পারে নি, ভারত এবং তার মত জোট-নিরপেক্ষ বহু রাষ্ট্র তো নয়ই। সোভিয়েট-মার্কিন প্রস্তাবে বলা হয়েছে পারমাণবিক অস্ত্রের প্রসার রোধের জন্যে যা সর্বাগ্রে প্রয়োজন তা হলো এমন কোন কাজ থেকে বিরত থাকা যা না কি পারমাণবিক অস্ত্রের প্রসার ঘটাতে পারে। এ-পর্যন্ত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, সোভিয়েট য়ুনিয়ন, ব্রিটেন, ফ্রান্স ও চীন—এই পাঁচটি রাষ্ট্র পারমাণবিক অস্ত্রের অধিকারী হয়েছে। ১৯৬৩ সালের মস্কো পারমাণবিক নিষিদ্ধকরণ চুক্তির দ্বারা স্থলে ও শূন্যে পারমাণবিক অস্ত্রের পরীক্ষা নিষিদ্ধ করা হয়েছিল, কিন্তু ভূগর্ভে ওই পরীক্ষা বে-আইনী ঘোষিত হয় নি বলে তার সুযোগ নিয়ে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও সোভিয়েট য়ুনিয়ন ভূগর্ভে এ-পরীক্ষা চালিয়েছে। ফ্রান্স ও চীন সে-চুক্তিতে স্বাক্ষর দান করে নি, কাজেই তারাও সমানে পরীক্ষা চালিয়ে যাচ্ছে। অর্থাৎ ও ব্রহ্মাস্ত্র যাদের হাতে রয়েছে তারা তার নিত্য নতুন শক্তি পরীক্ষা করতে কোনো কুণ্ঠাবোধ করছে না; আর যাদের নেই তারাই কেবল গলা ফাটিয়ে মরছে বন্ধ করার জন্যে।

সম্মেলনে ভারতের প্রতিনিধি শ্রী ভি সি ত্রিবেদী তাই প্রস্তাব করেছিলেন আরো কয়েকটি জোট-নিরপেক্ষ রাষ্ট্রের সংগে যে পারমাণবিক অস্ত্রের প্রসার রোধের জন্যে যা দরকার তা হলো যারা এ-অস্ত্রের অধিকারী তারা যেমন ভূগর্ভসহ কোথাও তার পরীক্ষা করবে না তেমনি যাদের সে-অস্ত্র নেই তাদের হাতেও তুলে দেবে না। শ্রীত্রিবেদী আরো বলেছিলেন, শুধু পরীক্ষা বন্ধ করলেই হবে না, পারমাণবিক অস্ত্র তৈরি করাও বে-আইনী ঘোষণা করতে হবে। এ-প্রস্তাব চীনসহ সকল পারমাণবিক শক্তি (রাষ্ট্র) গ্রহণ না করলে প্রস্তাবটি মূল্যহীন হয়ে পড়বে বলেও ভারতের রাষ্ট্রদূত মন্তব্য করেছিলেন। কিন্তু কার্যত দেখা গেল কি সোভিয়েট য়ুনিয়ন, কি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র কেউ ভারতীয় প্রস্তাবের ধার দিয়েই গেল না, এমন একটা নিরামিষ প্রস্তাব তাঁরা আনলেন যাতে পারমাণবিক অস্ত্রের প্রসার রোধের সঙ্কল্পটি ব্যর্থ হতে বাধ্য। কারণ, পারমাণবিক অস্ত্রের উৎপাদনে, তার ব্যবহারে কোন বাধা রচনা করা হলো না, এমন কি যে-অস্ত্রসম্ভার ওই পাঁচটি দেশের রয়েছে তার ধ্বংসসাধনের কথাও উচ্চারিত হলো না। এমন কি গত বছর রাষ্ট্রসঙ্ঘের সাধারণ অধিবেশনে যে পারমাণবিক শক্তিসম্পন্ন ও শক্তিহীন রাষ্ট্রগুলির মধ্যে একটা ভারসাম্য রক্ষা করার প্রস্তাব ছিল এবার তাকে পর্যন্ত নির্বিবাদে উড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। অথচ ভারতসহ জোট-নিরপেক্ষ রাষ্ট্রগুলি যে সংশোধনী প্রস্তাব দিয়েছিল তা রাষ্ট্রসঙ্ঘের ১০০টি সদস্য রাষ্ট্রের সমর্থন লাভ করেছিল, একমাত্র রাষ্ট্রসঙ্ঘে চীনের মুখপাত্র আলবেনিয়াই তার বিরোধিতা করেছিল।

* * *

পারমাণবিক অস্ত্রের প্রসার রোধ করার ব্যাপারে রাষ্ট্রসংঘ সন্তুষ্ট করতে না

পারুক, দক্ষিণ-পশ্চিম আফ্রিকা সম্পর্কে যে সিদ্ধান্ত নিয়েছে তা রাষ্ট্রসঙ্ঘের মর্যাদা অনেকখানি বৃদ্ধি করবে সন্দেহ নেই। সাধারণ পরিষদে প্রস্তাব গৃহীত হয়েছে যে, দক্ষিণ-পশ্চিম আফ্রিকার ওপর আর দক্ষিণ আফ্রিকার খবরদারী বা ম্যাণ্ডেটরী ক্ষমতা থাকবে না, থাকবে খোদ রাষ্ট্রসঙ্ঘের। প্রস্তাবটির পক্ষে ছিল ১১৪টি রাষ্ট্র, বিপক্ষে দক্ষিণ আফ্রিকা ও তার সমধর্মী দোসর পর্তুগাল। ব্রিটেন বা ফ্রান্স সম্পর্কে যা আন্দাজ করা হয়েছিল তাই করেছে তারা, অর্থাৎ সভায় হাজির থাকে নি, অনুপস্থিত ছিল মালয়িও। তাজ্জব করেছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ভূমিকা। সোভিয়েট রাশিয়ার সঙ্গে সে-ও প্রস্তাবের পক্ষে ভোট দিয়েছিল।

দক্ষিণ-পশ্চিম আফ্রিকার ওপর দক্ষিণ আফ্রিকার শাসন অবসানে ভারতের ভূমিকা ছিল অত্যন্ত প্রশংসনীয়। ভারতের প্রতিনিধি শ্রীভাগবৎ ঝা আজাদ দ্ব্যর্থহীন ভাষায় বলেন যে, মানবিকতার স্বার্থে, গণতান্ত্রিক আদর্শের স্বার্থে দক্ষিণ-পশ্চিম আফ্রিকা থেকে দক্ষিণ আফ্রিকার অপসারণ আশু প্রয়োজন এবং রাজ্যটিকে রাষ্ট্রসঙ্ঘের প্রত্যক্ষ নিয়ন্ত্রণে আনা দরকার।

স্থির হয়েছে যে, দক্ষিণ-পশ্চিম আফ্রিকাকে আপাতত রাষ্ট্রসঙ্ঘের একটি এ্যাড হক কমিটির অধীনে রাখা হবে এবং ওই ১৪-জাতিবিশিষ্ট এ্যাড হক কমিটির কাজ হবে সাধারণ পরিষদের বিশেষ অধিবেশনে আগামী এপ্রিল মাসের মাসের মধ্যে সুপারিশ করা যে, রাজ্যটিকে কেমন করে আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার এবং স্বাধীনতা দেওয়া যায়।

সিদ্ধান্ত ঐতিহাসিক সন্দেহ নেই, কিন্তু বাধাও যে প্রচণ্ড রকমের আসবে তাতেও কি সংশয় আছে কোনো? প্রথমত দক্ষিণ আফ্রিকা চট্ করে এখান থেকে পাততাড়ি গুটোতে চাইবে না, দ্বিতীয়ত ব্রিটেন, ফ্রান্স, এমন কি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং পশ্চিম জার্মানী প্রভৃতি দেশ যদি তাদের আর্থিক ও বাণিজ্যিক স্বার্থে সাধারণ পরিষদের সিদ্ধান্তকে কার্যকর করতে পরোক্ষভাবে বাধার সৃষ্টি করে তাতেও বিস্ময়ের কিছু থাকবে না। কাজেই ২০ বছর ধরে ৭৩টি নিন্দাসূচক প্রস্তাব গ্রহণ করার পর যে-ফল লাভ করা গিয়েছে তাকে অর্থবহ করতে হলে রাষ্ট্রসঙ্ঘকে যথেষ্ট সাহস ধরতে হবে।

পশ্চিম জার্মানী ঃ

গুরুতর পরিবর্তন আসন্ন এখানে, চ্যান্সেলর এরহার্ডকে পদত্যাগ করতে হচ্ছে। অথচ মাত্র এক সপ্তাহ আগেও তিনি জোর দিয়ে বলেছিলেন যে ১৯৬৯-

এডেন্যুয়ের

এর সাধারণ নির্বাচন পর্যন্ত তক্‌ৎ থেকে তাঁকে কেউ নামাতে পারবে না, এখন নিজেই ছাড়তে পারলে বাঁচেন!

ফ্রী ডেমোক্রাট দলকে নিয়ে কোয়ালিশন সরকার গঠন করেছিলেন লুডউইগ এরহার্ড। এখন সেই শরিকের সঙ্গে বেধেছে বিবাদ। প্রশ্নটি জাতীয়, সেজন্যে জরুরীও বটে। আগামী বছরের জন্যে এরহার্ডের ক্রিশ্চান ডেমোক্রাট দল যে বাজেট রচনা করেছিলো তাতে ৪,০০০ মিলিয়ন মার্ক ঘাটতি পড়েছিল। ডঃ এরহার্ড চেয়েছিলেন এ-ঘাটতিটা জনসাধারণের ওপর ট্যাক্সের বোঝা বাড়িয়ে, সাবসিডি ও কনসেশন কমিয়ে পূরণ করবেন। কিন্তু ফ্রী ডেমোক্রাট দল-নেতা ও কোয়ালিশন সরকারের ভাইস চ্যান্সেলর এরিথ মেণ্ডে এতে ঘোর আপত্তি জানালেন: ট্যাক্স বাড়ানো তিনি বা তাঁর দল কিছুতেই অনুমোদন করবেন না।

এরহার্ড

এদিকে পশ্চিম জার্মানীর বুণ্ডেস্ট্যাগে তিনটি প্রধান পার্টির দলগত অবস্থা হলে ক্রিশ্চান ডেমোক্রাট ২৪৫, উইলি ব্রাণ্ডট-এর সোশ্যাল ডেমোক্রাট ২০২ এবং ফ্রী ডেমোক্রাট ৪৯। অর্থাৎ ফ্রী ডেমোক্রাট যদি কোয়ালিশন ত্যাগ করে বিরোধী দলের সঙ্গে হাত মেলায় তবে এরহার্ড সরকারের স্থায়িত্ব মুহূর্তকালও থাকে না। ডঃ এরহার্ড চেষ্টা করেছেন বিস্তর কিন্তু ফ্রী ডেমোক্রাট দলের মন ভেজাতে পারেন নি। বাধ্য হয়ে তাঁকে পদত্যাগের কথা ঘোষণা করতে হলো।

কিন্তু এরহার্ডের পতন কি কোয়ালিশন সরকারের পতন সূচিত করবে? তার কোনো মানে নেই। তবে একটা বিষয় পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে যে এরহার্ড-বিরোধীরা প্রথম রাউণ্ডে জিতে গেলেন। এই এরহার্ড-বিরোধীদের নেতা হলেন রেনার বার্জেল—ক্রিশ্চান ডেমোক্রাট দলের প্রভাবশালী ও উচ্চাকাঙ্ক্ষী সদস্য।

সব দেখে ডঃ এডেন্যুয়েরের কথাই মনে পড়ছে। যুদ্ধোত্তর পশ্চিম জার্মানীর প্রথম চ্যান্সেলর ছিলেন ডঃ কনরাড এডেন্যুয়ের। একটানা ১৪ বছর শাসন চালিয়ে গিয়েছেন, যুদ্ধ-বিধ্বস্ত জার্মানীকে পুনর্গঠিত করেছেন, নতুন সাজে সাজিয়েছেন। তবে একথা ঠিক যে পশ্চিম জার্মানীর আজ যে অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি সম্ভব হয়েছে তার পেছনে ডঃ এরহার্ডের অবদান ডঃ এডেন্যুয়েরের চেয়ে কিছু কম নয়। ডঃ এরহার্ড ছিলেন তখন ইকনমিক্স মিনিস্টার বা অর্থমন্ত্রী। মিরাকল করেছেন ডঃ এরহার্ড মন্ত্রীর পদে থেকে, চ্যান্সেলর পদে ততটা খ্যাতি অর্জন করতে না পারলে কী হয়! ডঃ এডেন্যুয়ের কোনদিনই মনে-প্রাণে চান নি যে ডঃ এরহার্ড চ্যান্সেলর হোন, তিনি বলতেন ডঃ এরহার্ড রাজনীতি পররাষ্ট্রনীতি বোঝেন কম, অর্থনীতিই তাঁর সাবজেক্ট। আজ ডঃ এরহার্ডের পতনে অসুস্থ এডেন্যুয়ের কি মনে মনে খুশিই হলেন?

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ঃ

প্রেসিডেন্ট জনসন ম্যানিলা কনফারেন্স সেরে কয়েকটি অংশগ্রহণকারী রাষ্ট্রের রাজধানী সফরে গিয়েছিলেন, কিন্তু অভিজ্ঞতা তাঁর সুখের হয় নি। কারণ, প্রায় প্রতিটি রাজধানীতেই এমন কি অন্যান্য শহরেও বিক্ষোভ দেখা দিয়েছিল, ছাত্রেরা, জনসাধারণের একাংশ প্রতিবাদ জানিয়েছিল জনসন সফরের বিরুদ্ধে। সংশ্লিষ্ট সরকারের পক্ষ থেকে নিরাপত্তা ব্যবস্থার কোন ত্রুটি হয় নি, কোন অশোভন দৃশ্য যাতে মাননীয় অতিথিকে না দেখতে হয় তার জন্যেও

সরকারের তীক্ষ্ম নজর ছিল, কিন্তু তা সত্ত্বেও কয়েকটি অঘটন ঘটে গিয়েছে, কুয়ালালামপুরের ঘটনা তো প্রেসিডেন্ট জনসন কখনই ভুলতে পারেন না।

তারই মধ্যে উৎসাহব্যঞ্জক এবং সুখকর স্মৃতি বহন করে নিয়ে গিয়েছেন তিনি দক্ষিণ ভিয়েতনামের। কঠোর নিরাপত্তাব্যবস্থা এবং গোপনীয়তা অবলম্বন করে প্রেসিডেন্ট জনসনকে নিয়ে গিয়েছিলেন মার্কিন সেনানীদের মধ্যে—যাহাদুরি আছে প্রধানমন্ত্রী কাও কাই এবং ওয়েস্টমোরল্যান্ডের। প্রেসিডেন্ট জনসন এখানে যুদ্ধরত মার্কিন সৈন্যদের সঙ্গে লাঞ্চ খেলেন, গল্প করলেন, কয়েকজন অফিসারের বুকে সম্মানসূচক ইনসিগনিয়া এঁটে দিলেন। সৈন্যরাও খুব খুশি। প্রেসিডেন্ট নিজে এসেছেন এতটা পথ বেয়ে, এতটা ঝুঁকি নিয়ে ওদের সঙ্গে মোলাকাৎ করতে—বাড়ির খবর কদিন নাই বা পাওয়া গেল! প্রেসিডেন্ট জনসন কৃতজ্ঞতায় ভিজে গেলেন, তরুণ সৈন্যদের পিঠ চাপড়ে বললেন : 'তোমরাই তো আমাদের ভরসা।' কে কার ভরসা কে জানে!

মালয়েশিয়াকে প্রেসিডেন্ট জনসনের সফরসূচীতে রাখা উচিত হয়েছে কি না তার বিচার করবেন সি-আই-এ কিম্বা পেন্টাগন। টুঙ্কু হয়তো ভেবেছিলেন আজব দেশ আমেরিকার প্রেসিডেন্টকে দেখার জন্যে দেশ তাঁর পাগল হয়ে উঠবে, দেশবাসী পাল্লা দেবে নিজেদের মধ্যে কে কত বেশি শ্রদ্ধা ভালোবাসা আন্তরিকতা দেখাতে পারে মার্কিন প্রেসিডেন্টের প্রতি। কিন্তু হলো উল্টো। অবশ্য এমনটি যে হবে তা তিনি আগেই খানিকটা আঁচ করতে পেরেছিলেন, এবং পেরেছিলেন বলেই বহু লোককে আগে থেকে ফাটকে পুরেছিলেন। কিন্তু ছাত্রদের মতি-গতির সঙ্গে সামাল দেবে কে? তারা ঠিক কুয়ালালামপুর কাঁপিয়েছে। মার্কিন পতাকা, মালয়েশীয় পতাকা পুড়েছে, ইউ-এস-আই-এস দপ্তর আক্রান্ত হয়েছে, প্রেসিডেন্ট-বিরোধী বি ক্ষো ভ ধ্ব নি তে কুয়ালালামপুর, পেনাং, ইপো, মালাক্কা ইত্যাদি শহরের আকাশ চিরেছে। পুলিশ অহিংস থাকে নি, গুলী চালিয়েছে বিক্ষোভকারীদের ওপর। অটোমেটিক রাইফেলের লক্ষ্য ব্যর্থ হয় নি, ভূলুণ্ঠিত হয়ে পড়েছে দুটি তাজা দেহ, একটির জীবনদীপ নির্বাপিত হয়েছে, অপরটি হাসপাতালে যমের সঙ্গে লড়াই করছে!

প্রেসিডেন্ট জনসন ব্যাঙ্কক-সিউলও গিয়েছিলেন দেশে ফেরার আগে।

ঘানা :

আইন নাকি লঙ্ঘন করার জন্যেই রচিত হয়। কথাটা কতটা সত্যি জানি না, তবে দেখা যাচ্ছে আন্তর্জাতিক আইনের প্রতি ঘানা সরকারের বিশেষ শ্রদ্ধা নেই। ঘানার রাজধানী আক্রার বিমানবন্দরে একটা বিদেশী বিমান কিছুক্ষণের জন্যে থেমেছিল, বিমানটির যাবার কথা আরেকটি দেশে, ইথিওপিয়ায়, যাত্রীরাও বিদেশী। কিন্তু সে-সবের তোয়াক্কা না করে ঘানার নিরাপত্তা পুলিশ অম্লানবদনে ওই বিমানে উঠে গিয়ে ১৯ জন বিমানযাত্রীকে জোর করে নামিয়ে নিয়ে আসে এবং বন্দী করে।

গিনি থেকে ১৯ জনের এক প্রতিনিধি দল যাচ্ছিলেন আদ্দিস আবাবায় আফ্রিকা সংহতি সংস্থা (O A U)-র প্রস্তুতি অধিবেশনে যোগ দেবার উদ্দেশ্যে। ওঁদের বাহন ছিল প্যান অ্যামেরিকান এয়ারওয়েজের একখানি বিমান। কিন্তু যেই বিমানটি আক্রার মাটি স্পর্শ করলো অমনি সঙ্গে সঙ্গে ঘানার পুলিশ এসে ওঁদের টেনে নিয়ে গেল।

ঘটনাটা স্বভাবতই সকল রাষ্ট্রেরই দৃষ্টি আকর্ষণ না করে পারে নি। কারণ, ওই প্রতিনিধিদলে ছিলেন গিনি সরকারের পররাষ্ট্রমন্ত্রী মিঃ লানসানা বিভোগুই সহ আরো চারজন প্রথম শ্রেণীর কূটনীতিক এবং অন্য দায়িত্বশীল ব্যক্তি। এ-ব্যাপারে ঘানা সরকারের বক্তব্য এই যে গিনিতে শ'খানেক ঘানাবাসী রয়েছেন তাঁদের ঘানা ফিরতে দিলে গিনিবাসীদের ছেড়ে দেওয়া হবে। ঘানার রাষ্ট্রপ্রধান জেনারেল আঙ্কারা বলেছেন যে প্রেসিডেন্ট নক্রুমার পতনের পর থেকেই গিনি ঘানার সঙ্গে বন্ধুসুলভ আচরণ করছে না, তারা মিঃ নক্রুমাকে তো আশ্রয় দিয়েছেন, উপরন্তু প্রায় ১০৮ জন ঘানাবাসীকে তাঁদের ইচ্ছের বিরুদ্ধে আটক রেখেছে।

গিনির প্রেসিডেন্ট সেকু টুরে অবশ্য ঘানার এ-অভিযোগ অস্বীকার করে বলেছেন যে ঘানাবাসীদের মোটেই আটক করা হয় নি, তাঁরা ইচ্ছে করলেই দেশে ফিরতে পারেন। এদিকে আদ্দিস আবাবার সম্মেলনের উদ্দেশ্যে আগত প্রতিনিধিরাও ঘানার অন্যায় কার্যের তীব্র প্রতিবাদ করেছেন। সম্রাট হাইলে সেলাসীও অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হয়েছেন ঘানা এভাবে আন্তর্জাতিক শিষ্টাচার লঙ্ঘন করেছে দেখে। বলা হয়েছে যে ঘানা আসলে আফ্রিকান সংহতি সংস্থায় ফাটল ধরাতে চায়, তাই সম্মেলন যাতে সফল হতে না পারে তার জন্যে একটা গোলমাল পাকাতে চাইছে আগে থেকে। আগত ঘানা-প্রতিনিধি অবশ্য এ-অভিযোগ অস্বীকার করে গিনিকেই দোষারোপ করেছেন। যাই হোক, আফ্রিকা সংহতি সংস্থারই এক প্রতিনিধিদল আটক গিনি প্রতিনিধিদের মুক্তিকল্পে আক্রা রওনা হয়ে গিয়েছেন। শেষ পর্যন্ত সম্রাট হাইলে সেলাসী ও প্রেসিডেন্ট নাসের গিয়ে ঘানার আঙ্কারার মন ভিজিয়েছেন, বন্দী গিনিবাসীদের ছেড়ে দেবার ব্যবস্থা হয়েছে। সম্মেলন বাঁচলো।

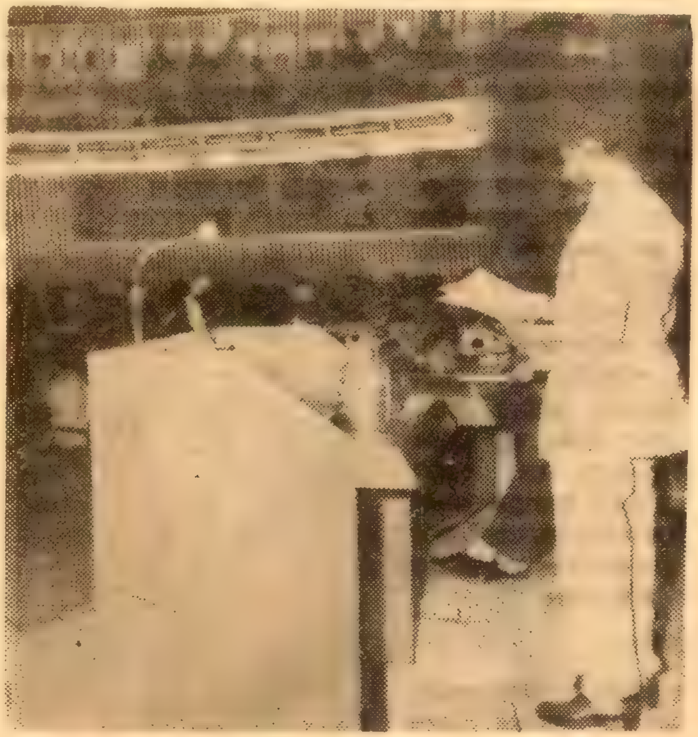

আদ্দিস আবাবায় আফ্রিকা সংহতি সংস্থার অধিবেশনে বক্তৃতারত হাইলে সেলাসি

আমি যাঁদের দেখেছি

পরিমল গোস্বামী

(১৩) শ্রীপ্রভাতচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়

(১৮৯০—`

স্কুলের ষষ্ঠ শ্রেণীর দুই অকালপক্ক বালক গোপনে বসে এক পূজনীয় ব্যক্তির বিচার করছে। কেন তিনি ঐ বৌটাকে বিষ খাওয়ালেন? এ কি তাঁর উচিত হয়েছে?

কিন্তু তা ভিন্ন আর কি করা যেত তাও তো ভেবে পাই না।

অনেক কিছু করা যেত।

কিন্তু বৌটা যখন বুঝতে পারল তারই জন্য সংসারটা নষ্ট হয়ে যাচ্ছে, এবং স্বামীর ভালবাসা যখন সে আর পাবেই না, তার সতীন যখন তার স্বামীকে ষোল আনা দখল করে বসেছে, তখন তার জীবনের আর কি দাম?

তা যদি হবে, তাহলে মরবার আগে স্বামী যখন তার কাছে এসে তার নাম ধরে ডাকল, তখন সে কেন বলল, কাল আমাকে এ নামে একবার ডাকলে না কেন? তাহলে তো আমার এইভাবে মরবার দরকার ছিল না। তার মানে তার বাঁচবার ইচ্ছা ছিল। সতীনের সঙ্গেও বাস করবার ইচ্ছা ছিল।

অত সোজা নয় রে। পরে ভীষণ গণ্ডগোল হত। ও বেঁচে থাকলে দুজনের একজন অসুখী হত তা ছাড়া পিছনে আরও সব ষড়যন্ত্রকারী ছিল, তারা অন্য উপায়ে এদের ক্ষতি করত।

সেই কল্পনা করে একেবারে হাতে বিষ তুলে দেওয়া? আসলে কি জানিস, সব অশান্তির মূলে হচ্ছে ঐ নগেন্দ্রটা। ও একদম মেয়েলি, কোনো রকম পৌরুষ নেই, কথায় কথায় কেঁদে ফেলে, এমন মানুষের সঙ্গে ও টিকতে পারত না। তাই বৌটাকে মারা ঠিকই হয়েছে।

এই জাতীয় গোপন আলোচনা। প্রকাশ্যে ওদের এসব আলোচনার উপায় ছিল না। কারণ তা হলে ধরা পড়ে যেত যে, তারা তাদের নিষিদ্ধ বই গোপনে পড়েছে, অর্থাৎ বিষবৃক্ষ গোপনে পড়েছে। আর সেই সঙ্গে ধরা পড়ে যেত যে, আরও অনেক নিষিদ্ধ বই ওরা ঐ বয়সে পড়ে ফেলেছে। আর তাহলে জংলু ও বুড়ো নামক দুই বালকের একজনের পিঠে অন্তত লাঠি পড়ত। বুড়োর পিঠে। জংলু ও বুড়ো—অর্থাৎ প্রভাতচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় ও প্রেমাঙ্কুর আতর্থী।

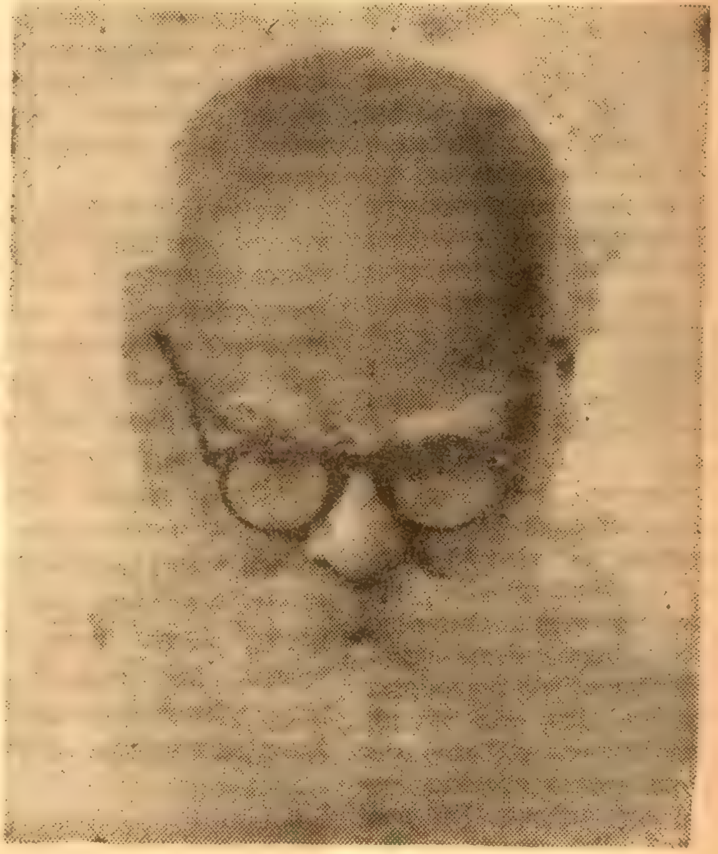

প্রভাতচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়

(ফোটোঃ লেখক)

এঁদেরই দুজনের কথা বলছিলাম। এঁরা বাল্যকালে বঙ্কিমবাবুর বিচার করছিলেন। লেখকরূপে তিনি কুন্দনন্দিনীকে বিষ দিয়ে মারলেন এটি তাঁর পক্ষে উচিত হয়েছে কি না। বঙ্কিমবাবু 'সমাপ্তি' পরিচ্ছেদে লিখেছেন—"কুন্দনন্দিনীর বিয়োগের পর সকলেই জিজ্ঞাসা করিতে লাগিল যে, কুন্দনন্দিনী বিষ কোথায় পাইল। তখন সকলেই সন্দেহ করিল যে, হীরার এ কাজ।"

কিন্তু বালক প্রেমাঙ্কুর ও বালক প্রভাতচন্দ্র আরও একটু বেশি দেখেছেন। তাঁরা নিশ্চিত জানতেন, এ কাজ বঙ্কিমচন্দ্রের। সমালোচক মাত্রেরই এই মত।

বয়সের তুলনায় দুজনেই কত বেশি এগিয়ে গিয়েছিলেন, ভাবলে বিস্মিত হতে হয়। এইভাবে প্রথমে এই দুজন এবং

পরে হেমেন্দ্রকুমার রায় (ও পরে আরও অনেকে) একত্র জুটেছিলেন ঘনিষ্ঠভাবে।

হেমেন্দ্রকুমারের সংগে আমার সখ্য হলেও তাঁর পিতার চরিত্র-বৈশিষ্ট্য আমার জানা নেই, কিন্তু প্রেমাঙ্কুর ও প্রভাতচন্দ্রের পিতৃ পরিচয় আমার জানা আছে। প্রেমাঙ্কুরের কাছে তাঁর পিতার পরিচয় অনেকবার শুনেছি, এবং মহাস্থবির জাতকে পড়েছি। প্রভাতচন্দ্রের পিতার পরিচয় বাংলাদেশে কারো অজানা নয়, কারণ সামাজিক সংস্কারমূলক কাজে, বিশেষ করে স্ত্রীশিক্ষা, স্ত্রীস্বাধীনতা ও স্ত্রীলোকের জন্য সর্বক্ষেত্রে সমান অধিকার প্রসারে তিনি সমস্ত জীবন ব্যয় করে গেছেন।

উভয়েরই পিতা দুঃসাহসিক এবং তেজস্বী পুরুষ ছিলেন। মহেশচন্দ্র আতর্থী একবার নিজে গুন্ডার ভোজালি নিজের মাথায় বিদ্ধ অবস্থায় তার হাত থেকে এক আক্রান্ত মেয়েকে উদ্ধার করতে চেষ্টা করেছিলেন। নিজের জীবন বিপন্ন জেনেও তিনি তা অগ্রাহ্য করেছিলেন। আর একবার এক ধনী গৃহের তেতলা থেকে এক অপহৃতা নারীকে রাত্রে সেই বাড়ির জলের পাইপ বেয়ে উঠে উদ্ধার করে এনেছিলেন। মেয়েটিকে নিজের পিঠে বেঁধে পাইপের পথেই নামিয়ে এনেছিলেন।

প্রভাতচন্দ্রের পিতা দ্বারকানাথ গাঙ্গুলির ধর্মে আঘাত দিয়েছিলেন এক কাগজের সম্পাদক। তাঁর ধর্ম ছিল স্ত্রীশিক্ষা ও স্ত্রীস্বাধীনতার প্রসার। সেই সম্পাদক দ্বারকানাথকে ও তাঁর প্রচেষ্টাকে হীন ভাষায় বিদ্রূপ করেছিলেন। দ্বারকানাথ উত্তেজিতভাবে লাঠি নিয়ে সম্পাদকের বৈঠকে গিয়ে হাজির, পকেটে তাঁর সেই কাগজের বিদ্রূপাংশ। সেটি পকেট থেকে বার করে সম্পাদকের মুখে গুঁজে দিয়ে চিৎকার করে বলছিলেন, Eat your words! Eat your words! বলছিলেন, আর লাঠি দিয়ে সেটি তাঁর মুখে ঠেলে দিচ্ছিলেন। একেবারে আক্ষরিক অর্থে eat your words! 'যে কথা বলেছ, সে কথা আহার কর', বলা হয় ইংরেজীতে। কিন্তু ওর আসল মানে হচ্ছে, কথা "প্রত্যাহার" কর। দ্বারকানাথ ঐ সম্পাদকের কথা তাঁকে প্রথমে আহার করিয়েছিলেন। এবং পরে তাঁকে দিয়েই কাগজে প্রত্যাহার করিয়েছিলেন।

দুই বন্ধুর দুই পিতৃচরিত্রে এদিক থেকে কিছু মিল দেখা যায়।

এবং এঁদের দুই পরিবারও কাছাকাছি বাস করতেন, সে জন্য বন্ধুত্বের সুযোগ বেশি ছিল। পরিবারের পরিচয় প্রভাতচন্দ্রের ভাষাতেই বলি—

"কর্ণওয়ালিস স্ট্রীটে, সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজের মন্দিরের ঠিক উল্টো দিকে লাহাবাবুদের প্রাসাদোপম অট্টালিকা—এখন যেটি ১৩ নম্বর বিধান সরণী,—বাবা ভাড়া নিয়েছিলেন। সেই বাড়ির দক্ষিণ অংশটিতে থাকতাম আমরা, আর আমাদের বড় ভগ্নীপতি উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরীর পরিবার। আমাদের বাড়ির ঠিক দক্ষিণ গায়ে লাগানো ছোট্ট দোতলা বাড়িটাতে ভাড়া নিয়ে থাকতেন বুড়োর [প্রেমাঙ্কুরের] বাবা মহেশচন্দ্র আতর্থী মশায়। আমাদের ভাইবোনের সংখ্যাও ছিল অনেকগুলি...ভাগ্নে ভাগ্নীদের মধ্যে সবাই পরবর্তীকালে বাংলা সাহিত্যে লেখক হিসাবে প্রতিষ্ঠা পেয়েছে। সুকুমার, সুখলতা, সুবিনয়, পুণ্যলতা, এরা তো প্রতিষ্ঠিত সাহিত্যিক।" (যুগান্তর সাময়িকী, ৮-১১-৬৪—"আমার জীবনে প্রেমাঙ্কুর")

প্রভাতচন্দ্রের মা কাদম্বিনী গাঙ্গুলি বাংলার স্ত্রীশিক্ষার ইতিহাসে বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে আছেন। সে এক কাহিনী, পৃথক আলোচনার যোগ্য। তবে তাঁকে উপলক্ষ করেই স্ত্রীশিক্ষার ক্ষেত্রে যুগান্তকারী অনেক পরিবর্তন ঘটেছিল। প্রধানত তাঁকে উপলক্ষ করেই বাংলার মেয়েদের উচ্চশিক্ষার দ্বার খুলে গিয়েছিল। তিনি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম মহিলা গ্র্যাজুয়েট। এবং মেডিক্যাল কলেজের সম্পূর্ণ পাঠ শেষ করে পাস করা সত্ত্বেও যখন শুধু চিকিৎসার লাইসেন্স পেলেন, বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রী পেলেন না (কারণ মেয়েদের মেডিক্যাল কলেজে পড়ার বিধান ছিল না), তখন দ্বারকানাথ এই অন্যায়ের

কাদম্বিনী গঙ্গোপাধ্যায়

প্রতিশোধ নেওয়ার উদ্দেশ্যে কাদম্বিনীকে বিলেত পাঠালেন। তাঁর উদ্দেশ্য সিদ্ধ হল, কারণ সেখান থেকে তিনি L.R.C.P., L.R.C.S. এবং L.F.P. উপাধি নিয়ে গৌরবের সংগে দেশে ফিরে এলেন।

এই সময়ের একটুখানি বর্ণনা উদ্ধৃত করি শ্রীযুক্তা পুণ্যলতা চক্রবর্তীর "ছেলেবেলার দিনগুলি" নামক বই থেকে—

"দিদিমা কবে যে বিলাতে গিয়েছিলেন, সে কথা মনে নেই, কিন্তু তাঁর ফিরবার দিনটি বেশ মনে পড়ে। বাড়িতে ঢুকেই দিদিমা দু-হাত বাড়িয়ে জংলুমামাকে [প্রভাতচন্দ্রকে] কোলে নিতে গেলেন। ছোট্ট এক বছরের জংলুমামাকে তাঁর [কাদম্বিনীর] মায়ের কাছে রেখে দিদিমা বিলাত চলে গিয়েছিলেন, এখন সে ছেলে মাকে চিনতে পারছে না। শক্ত করে ওর দিদিমার গলা আঁকড়ে রইল কিছুতেই মায়ের কোলে গেল না।"

এরপর এই প্রসংগে আরও একটুখানি উদ্ধৃত করি শ্রীমতী লীলা মজুমদারের "উপেন্দ্রকিশোর" নামক বই থেকে—

"সত্যি কথা বলতে কি ভারতের এই প্রথম মহিলা গ্র্যাজুয়েট ও ডাক্তারকে এখনকার হিসাবেও আধুনিক না বলে উপায় নেই।...সমানে বাইরের কাজ করেছেন, নেপালের রাজবাড়িতে পর্যন্ত চিকিৎসা করেছেন, আরো পড়াশুনো করেছেন, কোলের ছেলে নিজের মায়ের কাছে রেখে বিলেত গিয়েছেন। আবার ফিরে এসে ঘরকন্নার ভার নিয়েছেন, হালফ্যাশানে বাড়িঘর সাজিয়েছেন, রোজগারও করেছেন এন্তার, খরচও করেছেন উদারভাবে, অমানুষিক পরিশ্রমও করেছেন। কুঁড়েমি কাকে বলে জানতেন না; সেকালে মোটর ছিল না, রুগী দেখতে যেতেন ঘোড়ার গাড়িতে করে, পৌঁছতে অনেক সময় লাগত। কিন্তু সে সময়টুকু নষ্ট না করে কি সুন্দর সূক্ষ্ম কাজের ক্রুশ কাটার লেস্ বুনতেন, সবাই দেখে প্রশংসা করত।"

এই হল প্রভাতচন্দ্রের বাল্যকালের পরিবেশ ও পরিবার পরিচয়। একই বাড়ির এতগুলো ব্যক্তির নাম সহজেই করলাম বটে, কিন্তু নতুন পাঠকের পক্ষে এঁদের মধ্যে পরস্পর কার কি সম্পর্ক, নিশ্চয় এতক্ষণ ভুল হয়ে যাবার কথা। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর কোথায় যেন ঠাকুর পরিবার সম্পর্কে সকৌতুকে বলেছিলেন, একই পরিবারে এতগুলো জীনিয়াস থাকলে বড় অসুবিধা। এঁদেরও অবস্থা প্রায় তাই। অতএব পটভূমি থেকে প্রভাতচন্দ্রকে এবারে সামনে এনে খাড়া করি।

আশা করি এতক্ষণে প্রভাতচন্দ্রের শৈশব সম্পর্কে অনেকটা ধারণা করিয়ে

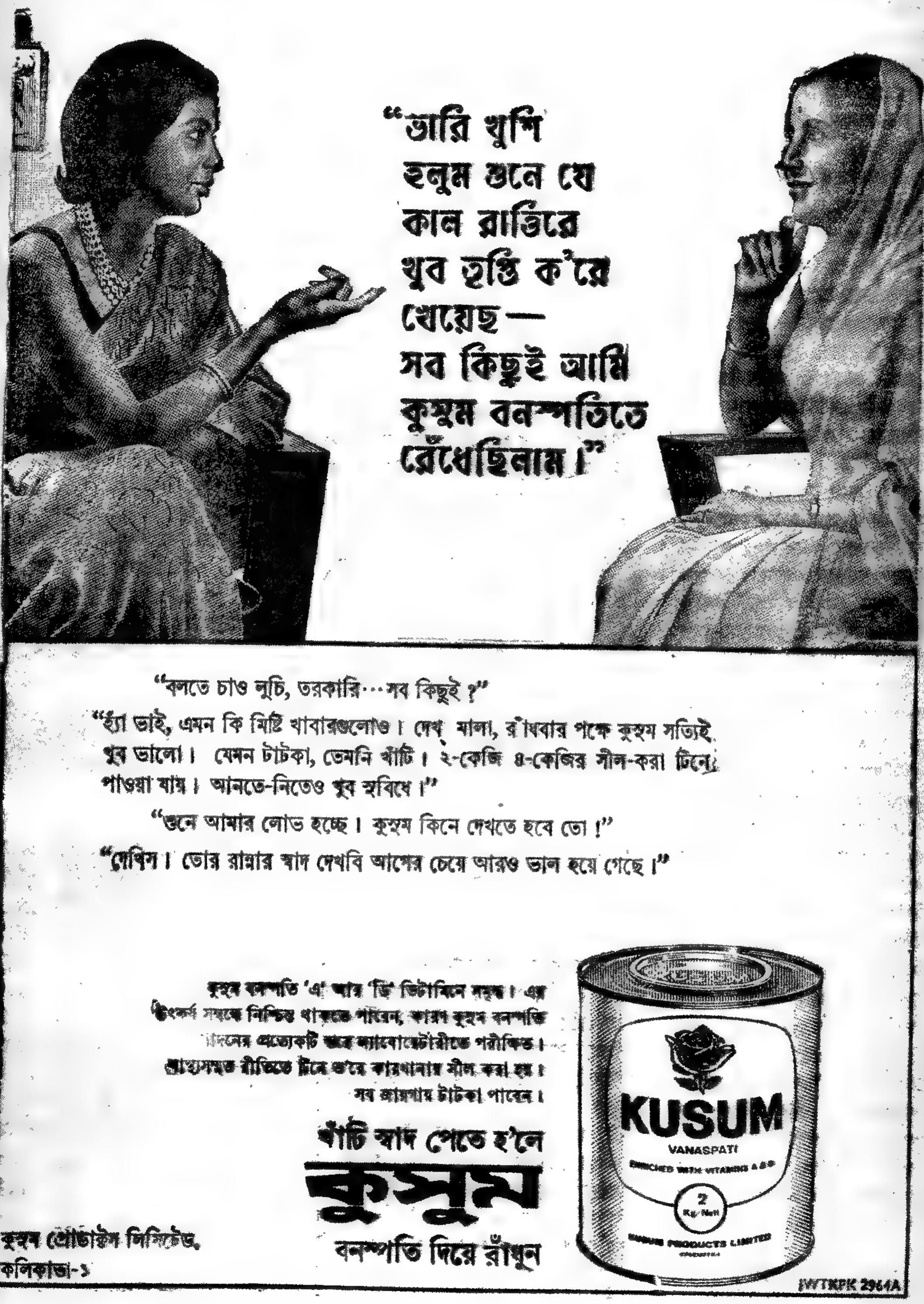
"ভারি খুশি
হলুম শুনে যে
কাল রাত্তিরে
খুব তৃপ্তি ক'রে
খেয়েছ—
সব কিছুই আমি
কুসুম বনস্পতিতে
রেঁধেছিলাম।"
"বলতে চাও লুচি, তরকারি···সব কিছুই ?"
"হ্যাঁ ভাই, এমন কি মিষ্টি খাবারগুলোও। দেখ্ মালা, রাঁধবার পক্ষে কুসুম সত্যিই খুব ভালো। যেমন টাটকা, তেমনি খাঁটি। ২-কেজি ৪-কেজির সীল-করা টিনে পাওয়া যায়। আনতে-নিতেও খুব সুবিধে।"
"শুনে আমার লোভ হচ্ছে। কুসুম কিনে দেখতে হবে তো!"
"দেখিস। তোর রান্নার স্বাদ দেখবি আগের চেয়ে আরও ভাল হয়ে গেছে।"
কুসুম বনস্পতি 'এ' আর 'ডি' ভিটামিনে সমৃদ্ধ। এর
উৎকর্ষ সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত থাকতে পারেন, কারণ কুসুম বনস্পতি
উৎপাদনের প্রত্যেকটি স্তরে ল্যাবোরেটরীতে পরীক্ষিত।
স্বাস্থ্যসম্মত রীতিতে টিনে ভরে কারখানায় সীল করা হয়।
সব জায়গায় টাটকা পাবেন।
খাঁটি স্বাদ পেতে হ'লে
কুসুম
বনস্পতি দিয়ে রাঁধুন
KUSUM
VANASPATI
2
কুসুম প্রোডাক্টস লিমিটেড,
কলিকাতা-১
JWTKPK 2964A

দিতে পেরেছি। আমার এ সবই ইংরেজী আইনের ভাষায় যাকে বলে hearsay evidence, তাই। পড়া কথা, প্রভাতচন্দ্রের মুখে কিছু শোনা কথা। কিন্তু এখন যদি বলি, এই বালককে কল্পনার চোখে দেখার পর যেদিন হঠাৎ তাঁকে প্রথম চোখে দেখলাম, মুখে ঘন দাড়ি নিয়ে আনন্দবাজার পত্রিকা অফিসে কাজ করছেন, তখন মাঝখানের প্রায় চল্লিশ বছরের শূন্যতা পূরণ করতে আবার আমাকে ঐ 'হিয়ারসে এভিডেন্স'-এর আশ্রয়ে যেতে হবে।

কিন্তু তার আগে আর একটি উপভোগ্য ঘটনা বলি। বালক প্রেমাঙ্কুর ও বালক প্রভাতচন্দ্র গোপনে বঙ্কিমচন্দ্র সম্পর্কে যেমন একদিন গুরুত্বপূর্ণ আলোচনায় মেতেছিলেন, ১৯৩২ কিংবা ৩৩ সালে সজনীকান্ত ও আমি তেমনি প্রভাতচন্দ্র সম্পর্কে একটি প্রকাশ্য আলোচনায় মেতেছিলাম। দাড়ির কথা বলেছি, সে দাড়ি তাঁর মুখে ছিল একেবারে জমজমাট। দেখে মনে হত (এবং এখনও হয়) খাবার সময় বোধ হয় মুখে ফানেল বসিয়ে তার ভিতর দিয়ে আহার্য বা পানীয় প্রবেশ করিয়ে দেন। এমনি দাড়ির মধ্যে যখন দেখলাম ছোট্ট একটি অর্ধদগ্ধ সিগারেট ঢুকে বসে আছে, এবং একটিও দাড়ি বা গোঁফের চুল না পুড়িয়ে দিব্যি তা থেকে তিনি ধোঁয়া টানছেন, তখন তা দেখে আমি চমকে গিয়েছিলাম। সজনীকান্তের সঙ্গে এই বিষয় নিয়েই আলোচনা করছিলাম একদিন। আমি বললাম, নিশ্চয় অগ্নিনিরোধক কোনো রাসায়নিক দাড়িতে লাগানো আছে। সজনীকান্ত বললেন, তা নয়, অগ্নি প্রতিরোধ ক্ষমতা আপনা থেকেই উঠেছে ওষ্ঠাধরের চারপাশের দাড়িতে আলোচনা নিতান্তই পরিহাস ছলে। কিন্তু তবু এ সন্দেহ থেকে গেল, কি করে এটা সম্ভব হল। একদিন জিজ্ঞাসা করব ভেবেছিলাম। কিন্ত অতঃপর প্রথম যেদিন তাঁর সঙ্গে কর্নওয়ালিস স্ট্রীটে দেখা, তখন দেখি মুখ সম্পূর্ণ দাড়িগোঁফ শূন্য। জিজ্ঞাসা করলাম, এ কি করেছেন? বললেন, মাঝে মাঝে সব কামিয়ে ফেলি।

প্রভাতচন্দ্রকে পরিবারের পটভূমি থেকে ছাড়িয়ে আনলেও, অতঃপর তিনি সমবয়সীদের নিয়ে যে একটি সাংস্কৃতিক পরিবার গড়ে তুলেছিলেন, তাদের থেকে তাঁকে সম্পূর্ণ পৃথক করে দেখা সম্ভব হবে না। প্রথম বন্ধুর নাম বলেছি। দুজনেরই পড়াশোনার দিকে ঝোঁক, শুধু এইটেই ছিল দুজনের প্রধান গুণ। পরস্পরের প্রতি আকর্ষণের হেতু। এবং বাল্যকালে দুজনেই ডানপিটে ছিলেন। মারামারিতে ওস্তাদ ছিলেন। কিন্তু প্রেমাঙ্কুরের পিতার শাসনটা প্রেমাঙ্কুরের পিঠের উপর অতিরিক্ত বর্ষিত হওয়ায় বালক বয়সেই তিনি গৃহত্যাগী হয়ে কয়েক বছর ভবঘুরে জীবন কাটালেন। তারপর ফিরে এলে আবার দুজনে একাত্মা। দুজনে ইম্পীরিয়াল লাইব্রেরিতে গিয়ে নিয়মিত পড়াশোনা, এবং আলোচনা। সতেরো আঠারো বছর বয়সেই দুজনে ইংরেজী সাহিত্যের সঙ্গে অনেকখানি পরিচিত হয়েছেন, এবং শেক্সপীয়ারও কিছু কিছু পড়েছেন। সবই নিজেদের জানবার শেখবার ঐকান্তিক আগ্রহ থেকে। এবং এই আগ্রহ থেকেই, যখন বিখ্যাত শেক্সপীয়ার অভিনেতা ম্যাথিসন ল্যাঙ দলবল সহ কলকাতা এলেন (অনুমান ১৯০৮

জ্যোতির্ময়ী গঙ্গোপাধ্যায়
ফোটোঃ লেখক (১৯৩৮)

সালে) অভিনয় করতে, তখন প্রেমাঙ্কুর, প্রভাতচন্দ্র ও হেমেন্দ্রকুমার রায় (হেমেন্দ্রকুমার তৃতীয় প্রাণের বন্ধুরূপে এঁদের সঙ্গে এসে মিলেছেন ততদিনে) ম্যাথিসন ল্যাঙের যতগুলো অভিনয় হয়েছিল, হ্যামলেট, মিডসামার নাইটস ড্রীম, কিং লিয়ার, ওথেলো, মার্চ্যান্ট অভ ভেনিস, সবই একে একে দেখলেন কোনোরকমে নিম্নতম শ্রেণীর টিকিট কিনে। ম্যাথিসন ল্যাঙের বয়স তখন সাতাশ-আটাশ হবে। এঁর অভিনয় দেখে তিন বন্ধু বিগলিত। আর চুপ করে থাকা চলে না, এই অভিনেতার সঙ্গে দেখা করতে হবে যেমন করে হোক। লিখে ফেললেন এক চিঠি দেখা করার অনুমতি ভিক্ষা করে। লিখলেন যদিও আমরা বয়সে তরুণ, কিন্তু আমাদের মন সাহিত্য ও শিল্পের তৃষ্ণায় আকুল, অতএব—।

চিঠি পাঠিয়ে ওঁরা ভেবেছিলেন ফললাভের আশা দুরাশা, তবু যদি লেগে যায়। কিন্তু ফললাভ হল আশাতীত। ম্যাথিসন ল্যাঙ শুধু চিঠির উত্তর দিলেন তাই নয়, তিনি তিন তরুণ উৎসাহীকে গ্র্যান্ড হোটেলে মধ্যাহ্নভোজনের নিমন্ত্রণও করলেন, যাতে খেতে খেতে আলাপ করা যায়।

তিন বন্ধু জীবনে একটি বড় প্রেরণা লাভ করলেন, এই শিক্ষিত উদার এবং গুণী অভিনেতার সংস্পর্শে এসে। শিশিরকুমার ভাদুড়িও ম্যাথিসন ল্যাঙের অভিনয়ে প্রভাবান্বিত হয়েছিলেন প্রথম জীবনে। আমি নিজে তাঁকে দেখি নি, কিন্তু তাঁর অভিনীত একটি নির্বাক সিনেমা ছবি দেখেছি গত যুগে। সে এক অদ্ভূত প্লট। শৌখিনরা ওথেলো অভিনয় করবেন। ম্যাথিসন ল্যাঙ নিয়েছেন ওথেলোর পার্ট। এবং তাঁর স্ত্রী হয়েছেন ডেসডেমোনা। এই স্ত্রীর প্রতি গল্পের নায়ক বিরূপ ছিলেন, তিনি ওথেলোরূপে ডেসডেমোনার হত্যা দৃশ্যে এমন বাস্তব অভিনয় করলেন যাতে ডেসডেমোনার ভূমিকায় অভিনেত্রী তাঁর নিজের স্ত্রী দম বন্ধ হয়ে সত্যিই মরে গেলেন। স্ত্রীকে মারবেন বলেই তিনি ওথেলো ও তাঁর স্ত্রীকে ডেসডেমোনা বানিয়েছিলেন। দারুণ ট্র্যাজিডি। সে দৃশ্য আজ চল্লিশ বছরেও মনে গাঁথা হয়ে আছে। এখনও মনে হলে দেহ কণ্টকিত হয়ে ওঠে। সবাই জানল হত্যাটা ইচ্ছাকৃত নয়, নাটকের চরিত্রকে বাস্তব রূপ দিতে গিয়ে অভিনেত্রীর আকস্মিক মৃত্যু ঘটেছে।

যাই হোক ম্যাথিসন ল্যাঙ আমার কোনো ক্ষতি না করলেও ঐ তিন বন্ধুর দুজন শেষ পর্যন্ত সিনেমা থিয়েটারের মধ্যেই নিজেদের জড়িয়ে ফেললেন, এবং প্রভাতচন্দ্র বি-এল (১৯১৯) পাস করে পুলিস কোর্টে অভিনয়ের জন্য চলে গেলেন, অবশ্য অল্পদিনের জন্যই, কারণ এর তিন চার বছর পরে চিত্তরঞ্জনের অসহযোগ আন্দোলনের ডাকে প্রভাতচন্দ্র আর স্থির থাকতে পারলেন না, বেরিয়ে এলেন আদালতের মঞ্চ থেকে। কিন্তু তাঁর আগেই তাঁর দিদি জ্যোতির্ময়ী গঙ্গোপাধ্যায় দর্শনশাস্ত্রে এম-এ (১৯১২) অ্যানি বেসান্টের সভাপতিত্বে (১৯১৭?) কলকাতার কংগ্রেস অধিবেশনে মহিলা স্বেচ্ছাসেবক বাহিনীর নেত্রীরূপে প্রথম দেশের কাজে যোগ দেন এবং দেশের কাজেই জীবন উৎসর্গ করেন। জাতীয় নারী শিক্ষা ক্ষেত্রে তাঁর দান অসামান্য।

প্রভাতচন্দ্রের জীবন শেষ পর্যন্ত সাংবাদিকের জীবন, কিন্তু তার পূর্বপ্রস্তুতিতে বহু জাতীয় অভিজ্ঞতা। এবং ক্রমে মিত্রলাভ এবং মিত্রবৃদ্ধি সে

র মহামনোহর কাহিনী সংক্ষেপে বলতে হবে।

তিন বন্ধুরই জোড়াসাঁকোর ঠাকুর বাড়িতে যাতায়াত ছিল। সুধীন্দ্রনাথ ঠাকুর পরামর্শ দিলেন 'জাহ্নবী' মাসিকে যোগ দিতে। জাহ্নবীর প্রথম সম্পাদক নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত (১৯০৪ থেকে)। তারপর সম্পাদনা করেন গিরীন্দ্রমোহিনী দাসী (১৯০৭ থেকে)। তারপর সুধাকান্ত বাগচী (১৯১১ থেকে)। এই সময়ে সুধাকান্তের সঙ্গে এসে তিন বন্ধুতে যোগ দেন। এই কাগজেই প্রেমাঙ্কুরের প্রথম ছোট গল্প এবং হেমেন্দ্রকুমারের একখানা উপন্যাস ছাপা হয়। কিন্তু সুধাকান্তের সঙ্গে বনল না, কিছুদিন পরে জাহ্নবী ছেড়ে এঁরা তিনজনেই গিয়ে জুটলেন 'যমুনা'য়। তখন যমুনার সম্পাদক ফণীন্দ্রনাথ পাল (১৯১২)। এখানে এসে জমল ভাল। ভাল লেখার সন্ধানে বেরিয়ে শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের সঙ্গে পরিচয় হয়, এবং তখন প্রেমাঙ্কুর ও প্রভাতচন্দ্র খুব উৎসাহের সঙ্গে নতুন লেখক শরৎচন্দ্রের গুণগান প্রচারে লেগে গেলেন। তাঁর লেখা জনে জনে পড়ে শোনানো এঁদের একটা কর্তব্য বলে মনে হয়েছিল তখন।

এই সময় দেড় বছরের মধ্যে যমুনায় শরৎচন্দ্রের অনেকগুলি রচনা প্রকাশিত হয়। ১৯১২ থেকে ১৯১৩-র মধ্যে রামের সুমতি, বোঝা, বিন্দুর ছেলে, পথ-নির্দেশ, পরিণীতা, (অনিলা দেবী ছদ্ম-নামে "নারীর মূল্য"), চরিত্রহীন (আংশিক), চন্দ্রনাথ এবং আলো ও ছায়া।

স্কুলে পড়বার সময় থেকেই (অনুমান ১৯০৮) প্রভাতচন্দ্র বিপ্লবী দলের দিকে ঝুঁকেছিলেন। তিনি তখন দলের নির্দেশে কর্মী রিক্রুট করে বেড়াচ্ছেন। এই সময়ে বাঘাটি গ্রামে এক স্বদেশী ডাকাতি হয়। হীরেন ঘোষ নামক এক তরুণ, তাদের নেতা মোক্ষদাচরণ সামাধ্যায়ীর কাছে বলেন বাঘাটি গ্রামে তার মামারা টাকার মানুষ সেখানে ডাকাতি করা দরকার। ডাকাতি সাফল্যের সঙ্গে সম্পাদিত হল বটে, কিন্তু মামারা ছদ্মবেশী ভাগ্নেকে চিনতে পেরে-ছিলেন, যার ফলে ভাগ্নে ধরা পড়ে গেল। এবং পরে সে রাজসাক্ষী হয়ে বলে দিল প্রভাতচন্দ্রই তাকে রিক্রুট করেছেন। আগে থাকতেই পুলিসের সন্দেহ ছিল, এবারে সুযোগ এলো, তাই ডাকাতিতে জড়াবার সুযোগ হবে আশায় প্রভাতচন্দ্রকে ধরতে এলো পুলিসের দল।

এই উপলক্ষে এক অতি করুণ দৃশ্যের অবতারণা হল প্রভাতচন্দ্রের বাড়িতে সার্চ করার সময়। বাড়ি তখন লাল পাগড়ীতে ঘেরা। ইনসপেকটর জেনিংস সাবইনস-পেকটর নাসিরুদ্দীনের সঙ্গে বাড়ির ভিতর প্রবেশ করলেন সার্চ করার জন্য। বোমা পিস্তল পাওয়া যাবে এই তাঁদের আশা। অবশ্য বাড়িতে একটি পিস্তল ছিল, কিন্তু তা প্রভাতচন্দ্রের সেজদা তাঁর ফোটোগ্রাফির ব্রোমাইড পেপারের প্যাকেটে লুকিয়ে রেখেছিলেন। এ প্যাকেট খুললে কাগজে আলো লেগে নষ্ট হয়ে যাবে, সে জন্য জেনিংস প্যাকেটটি হাতে করেও খোলেন নি, কারণ অতটা সন্দেহ হয় নি। কিন্তু প্রভাতচন্দ্রের খাটের নিচে বোমা!

এবং একটা নয়, অনেকগুলো। নারকলী বোমা। নারকলের খোলের মধ্যে বারুদ পুরেও তখন বোমা তৈরি হত।

"ওরে কে কোথায় আছিস জলের বালতি আন, ঢাল আগে ঐ বোমাগুলোর উপর।" চাকর বালতিতে করে জল নিয়ে এলে সাহেব হুকুম দিলেন ওগুলো খুব সন্তর্পণে ধরে ধরে বালতির জলে ডুবিয়ে দিতে। কিন্তু সাহেব জানতেন না যে ওগুলোর প্রত্যেকটার ভিতরেই জল আছে, বাইরে থেকে জল দেবার কোনো দরকারই নেই।

আসলে ওগুলো যশোর থেকে পাঠানো ঝুনো নারকল, ছোবড়া ছাড়ানো অবস্থায় পাঠানো, খাবার জন্য। প্রভাতচন্দ্র একটি হাতে নিয়ে ডান হাতে ভোঁতা দা দিয়ে কেটে দেখাতে গেলেন, তখন এক বিষম কাণ্ড। সাহেব ভাবলেন বিপ্লবী ছোকরা এবারে হাতে করে বোমা ফাটাবে, ওদের তো মৃত্যুভয় নেই, অতএব তিনি পিস্তল বার করে প্রভাতচন্দ্রের মাথা লক্ষ্য করলেন। কিন্তু সাহেবের হাত ভীষণ কাঁপছিল তাই তিনি নিশানা ঠিক করতে পারছিলেন না। ইতিমধ্যে সাবইনসপেকটর তাঁকে টেনে নিয়ে গেলেন দেয়ালের আড়ালে। ততক্ষণে নার-কলের খোল দুভাগে ভাগ হয়ে গেছে, বেপমান সাহেবেরও বেপথু থেমেছে।

কিন্তু প্রভাতচন্দ্রের বিরুদ্ধে মকদ্দমা চলল। বেঁচে গেলেন শুধু, মেট্রোপলিটান কলেজের এক রসায়নের অধ্যাপকের সাক্ষ্যতে। নিঃসন্দেহ অ্যালিবাই। ঐ ডাকাতির দিন প্রভাতচন্দ্র রসায়নে প্র্যাক-টিক্যাল ক্লাসে ছিলেন।

ল কলেজে পড়তে পড়তে 'প্রবাসী' মাসিকে রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের কাছেও কিছু কিছু শিক্ষানবিসী করেছেন এবং এর পরে নির্মলচন্দ্র চন্দ্রের সম্পাদনায় এবং চিত্তরঞ্জন দাসের পরামর্শে বৈকালী নামক একখানি সান্ধ্য পত্রিকা প্রকাশিত হয়, এই-খানে হেমেন্দ্রকুমার রায়, প্রেমাঙ্কুর আতর্থী ও প্রভাতচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় এই ত্রিমূর্তির আবির্ভাব ঘটল সম্পাদকীয় কাজে সাহায্য করার জন্য। পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায়ও ছিলেন এঁদের সঙ্গে।

১৯২৩ সালের কথা এটি।

সবাই মিলে ছোট কাগজে হাল্কা কাজ। বৈকালী ছাপা হত বসুমতী প্রেসে এবং ঐখানেই সম্পাদকীয় কাজও হত। একদিন মালিক সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ও'দের ঠাট্টা করে বললেন, খুব সুখের কাজ দেখছি, একটুখানি খাটুনি, বেতন বেশ।

এঁরা বললেন, বসুমতীতে বেশি কাজ তো? কিন্তু আমরা সেই বেশি কাজের নমুনা কি, যদি দেখাই তবে কি বলবেন?

সতীশচন্দ্র খুব উদারপ্রাণ ছিলেন, বললেন যদি ত্রুটি বা ভুল বার করতে পারেন তবে এক শ' টাকা দেব।

এঁরা বললেন, বসুমতীর কেরামতি নামে একটি কলমই করব দেখবেন। বসুমতীতে অনুবাদের অদ্ভুত নমুনা বেরুল—The police are patrolling the streets of Dacca—ঢাকায় পুলিসের লোকেরা রাস্তায় কেরো-সিন তেল ঢালছে। ইংরেজিতে ছিল—Mr. Day was shot with a ·32 bore pistol by Gopinath Saha. তার বাংলা হয়েছিল ৩২ নলা পিস্তল দিয়ে ডে'কে গুলি করা হয়েছিল। হোটেলে মহাত্মা গান্ধীর টেবিলে মেনু ছিল, তিনি খেতে খেতে তা দেখছিলেন, এই মেনুর অদ্ভুত বাংলা করা হয়েছিল। যথা, মহাত্মা গান্ধী হোটেলে খাবার সময় মনুসংহিতা পড়ছিলেন।

সতীশ মুখোপাধ্যায় মহাশয় ও'দের এই আবিষ্কার দেখে ভীষণ খুশি। তিনি তাঁর প্রতিশ্রুত এক শ' টাকা তো দিলেনই, উপরন্তু এক মোন সন্দেশ কিনে সকলকে খাওয়ালেন। যাঁরা ভুলের জন্য দায়ী তাঁরাও খেলেন।

হার স্বীকারে এত আনন্দ বাঙালীর মধ্যে বড় একটা দেখা যায় না। সতীশ-চন্দ্রকে এ বিষয়ে ব্যতিক্রম মনে হবে।

এই সময় শিশিরকুমার ভাদুড়ি অধ্যা-পনা ছেড়ে প্রকাশ্যভাবে নিজস্ব থিয়েটারে সীতা মঞ্চস্থ করেছেন। বৈকালী কাগজে তার উচ্ছ্বসিত প্রশংসা লেখা হল। কিন্তু এতে কিছু বিপদ হল। বৈকালীর পরি-চালকদের মধ্যে একজন অন্য থিয়েটারের সঙ্গে সম্পর্কিত ছিলেন, তিনি বললেন এ জিনিস চলবে না। সম্পাদক এঁর সঙ্গে বিবাদ করতে অনিচ্ছুক থাকাতে তিন বন্ধুর জোর কমে গেল। অল্পদিনের মধ্যেই ঐ ভদ্রলোক শচীন্দ্রনাথ সেন-গুপ্তকে দিয়ে শিশিরকুমারের অভিনয়ের কিছু নিন্দাসূচক সমালোচনা লিখিয়ে বৈকালীতে ছাপার ব্যবস্থা করলেন। সম্পাদক এঁদের বললেন, তোমরা তোমা-দের বিভাগ নিয়েই থাক, থিয়েটার সম্পর্কে তোমরা কিছু ভেবো না।

কিন্তু এঁরা তাতে রাজি না হয়ে বৈকালী ত্যাগ করে চলে এলেন এবং

হেমেন্দ্রকুমার রায় ও প্রেমাঙ্কুর আতর্থীর সম্পাদনায় নাচঘর নামক সাপ্তাহিক পত্রিকা প্রকাশ করলেন। এই কাগজের উদ্দেশ্যই ছিল শিশিরকুমারের প্রাপ্য

দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায়

প্রশংসা করা। ১৯২৪ খ্রীষ্টাব্দে নাচঘর প্রথম প্রকাশিত হয়।

প্রভাতচন্দ্র কিছুদিন পরে আনন্দবাজার পত্রিকায় যোগ দেন এবং ১৯৪২ সালে মাখনলাল সেন পরিচালিত 'ভারত' নামক দৈনিকে সম্পাদকরূপে যোগ দেন। এর পূর্বে ১৯৩০ সালে গান্ধীজির লবণ সত্যাগ্রহের বছরে যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্তের নেতৃত্বে, সিভিল ডিসওবিডিয়েন্সের সম্পর্কে প্রভাতচন্দ্র গ্রেপ্তার হন এবং সাড়ে চার মাস জেলে প্রথম শ্রেণীর বিশেষ বন্দী রূপে থাকেন। জেলের অন্যান্য কোঠে এই সময় কিরণশঙ্কর রায়, সুভাষচন্দ্র বসু, যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত, জিতেন্দ্রলাল বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি ছিলেন। মোট ৪৬টি সেল নির্দিষ্ট ছিল এঁদের বিশেষ শ্রেণীতে। ১৯৪২ সালে ভারত সম্পাদকরূপে পথ চলতি অবস্থায় গ্রেপ্তার হয়ে এগারো মাস কারাবাস করেন। তার পরেও মাঝে মাঝে দু-চার দিনের জন্য বন্দী থেকেছেন। যে-কোনো উপলক্ষে ধরে নিয়ে যেত।

এ-সব কাহিনী অল্প দু-চার দিন আগে প্রভাতচন্দ্রের মুখে শুনে নোট করে নিয়েছি। তিনি স্মৃতি থেকে বলেছেন, তবে তাঁর স্মৃতির উপরে আমার বিশ্বাস আছে, তাই যেমন শুনেছি তাই লিখেছি।

তাঁর রচিত বই আমার কাছে কিছু কিছু আছে। সম্পাদিত বই আছে একখানা। তাঁর রচিত বইয়ের সংখ্যা চার—(১) রামমোহন প্রসঙ্গ, (২) বাংলার নারী জাগরণ, (৩) কস্তুরবা গান্ধীর জীবনী, (৪) ভারতের রাষ্ট্র ইতিহাসের খসড়া। সম্পাদনা করেছেন (অধ্যাপক শ্রীদিলীপকুমার বিশ্বাসের সহযোগে) কলেট প্রণীত রাজা রামমোহন রায়, মূল রচনার সঙ্গে আধুনিক গবেষণালব্ধ বহু তথ্য সংযোগে এই সুবৃহৎ গ্রন্থখানি রচিত।

এর মধ্যে বাংলার নারী জাগরণ নামক তাঁর ১০৮ পৃষ্ঠার বইখানি আমার কাছে সর্বজনপাঠ্য এবং অবশ্যপাঠ্য হিসাবে খুব মূল্যবান বোধ হয়। বাংলার নারী জাগরণের (শিক্ষায়, স্বাধীনতায়, রাজনীতিতে) ক্ষেত্রে এদেশে যেসব মহৎপ্রাণ ব্যক্তি প্রাণপাত করে গেছেন তাঁদের ইতিহাস চমকপ্রদ। এ ইতিহাস একবার সবারই পড়া উচিত। আধুনিক বহু শিক্ষিত মহিলাকে আমি জিজ্ঞাসা করে দেখেছি—তাঁরা কাদম্বিনী গঙ্গোপাধ্যায়ের নাম শোনেন নি। দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের নাম শোনেন নি। অথচ আজ তাঁরা যে-শিক্ষা পেয়ে স্বাধীনভাবে পথে ঘুরে বেড়াচ্ছেন তা যাঁদের চেষ্টায় অথবা যাঁদের উপলক্ষ করে সম্ভব হয়েছে, সে সম্পর্কে তাঁদের একেবারে কোনো ধারণা নেই, এটি খুবই অসঙ্গত মনে হয়।

প্রভাতচন্দ্রের পিতা দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায় স্বয়ং এই ইতিহাসে একটি প্রধান স্থান অধিকার করে আছেন। এ বইতে তাঁর ইতিহাসও চমকপ্রদ। বাংলার নারী জাগরণ বই থেকে তার কিছু অংশ উধৃত করছি—

"যখন দ্বারকানাথের বয়স মাত্র সপ্তদশ বৎসর, তখন তাঁহার নিজ গ্রাম মাগুরখণ্ডে (ঢাকা) তাঁহার অত্যন্ত পরিচিত ও প্রিয় এক কুলীন কন্যাকে বিষ প্রয়োগে হত্যা করা হয়। দ্বারকানাথ মানুষের এই নৃশংস বর্বরতার কারণ অনুসন্ধান করিয়া জানিতে পারেন, কুলীন কন্যাদিগকে বধ করা তখনকার দিনে বিরল ছিল না। তৎকালে কুল মর্যাদার হানির ভয়ে অকুলীনকে কন্যা সম্প্রদান করা চলিত না বলিয়া বহু কুলীন কন্যাকে অবিবাহিত জীবনযাপন করিতে হইত, অথবা বহুদার স্বামীকে বিবাহ করিতে এমন কি অতি বৃদ্ধ ব্যক্তিকে বিবাহ করিতে বাধ্য করা হইত। ......দ্বারকানাথ অনুসন্ধান করিয়া জানিতে পারেন তাঁহার স্বগ্রামেই বত্রিশ-তেত্রিশটি কুলীন কন্যাকে বিষ প্রয়োগে হত্যা করা হইয়াছে।......"

এ সম্পর্কে দ্বারকানাথ 'অবলাবান্ধব' নামক নিজ সম্পাদিত ও পরিচালিত পত্রিকায় লিখেছিলেন ('বাংলার নারী জাগরণ' থেকে উধৃত করি)—

......"মানুষের হৃদয় এককালে পাষাণ না হইলে এ অবস্থায় দ্রব না হইয়া পারে না। আমরা বাল্যকালে চাণক্য পণ্ডিতের শ্লোক সকল পাঠ করিয়া স্ত্রীজাতির ঘোরতর বিদ্বেষী হইয়া উঠিয়াছিলাম। তাহাদিগকে সর্বদা বিদ্রূপ ও উপহাস করিতে আমাদিগের আমোদ বোধ হইত। কিন্তু তখন বুঝিলাম, ইহারা উপহাসের পাত্র নহে——তখন ভাবিলাম, যদি বিন্দু পরিমাণেও ইহাদের এই দুঃখ-দুর্গতি দূর করিতে পারি, জীবন সার্থক হইবে। এই অভিপ্রায়েই অবলাবান্ধবের জন্ম হয়।"

গোঁড়া কুলীন ব্রাহ্মণ দ্বারকানাথ ব্রাহ্মণেতরের ছোঁয়া জল খেতেন না, সেই দ্বারকানাথের জীবনের মোড় ঘুরিয়ে দিল একটি নিরপরাধ বালিকা হত্যার ঘটনা। তাঁর জন্মান্তর ঘটল। তিনি হলেন সমাজ বিপ্লবী। তাঁর মতো হৃদয়বান আরও অনেক যুবককে নিয়ে তাঁরা দল পাকালেন। সারদাকান্ত হালদার, বরদাকান্ত হালদার, নবকান্ত, শীতলাকান্ত, নিশিকান্ত চট্টোপাধ্যায়, অঘোরনাথ চট্টোপাধ্যায় প্রভৃতি জুটে এক আশ্চর্য ডাকাতি আরম্ভ করলেন। তাঁর কাজ হল বিপন্ন কুলীন কন্যাদের উদ্ধার করে গোপনে কলকাতা চালান দেওয়া এবং তাদের সুপাত্রে বিবাহ দেওয়া। অতি বিপজ্জনক ঝুঁকির কাজ।

বিধুমুখী হরণ মামলায় খ্যাত বিধুমুখী ও তাঁর স্বামী রজনীনাথ রায়

একটি কাজের দৃষ্টান্ত (বাংলার নারী জাগরণ থেকে) এখানে বিবৃত করি। এটি প্রসিদ্ধ বিধুমুখী হরণ মামলার কথা। বিধুমুখী মুখোপাধ্যায় নামক এক কুলীন বালিকার বিবাহ এমন একটি কুলীনের সঙ্গে ঠিক করা হয় যার তেরোটি স্ত্রী তখন বর্তমান। এই কন্যাটি বরদা হালদারের পিতৃব্য ও কন্যার অভিভাবক স্থির করেন। বরদা হালদার দলবল সহ বিধুমুখীর সঙ্গে গোপন পরামর্শের পর তাকে নিয়ে নৌকাপথে পালিয়ে আসেন। এ পথে না এলে রেলপথে পুলিস ঠিক ধরে ফেলত। মেয়েটিকে বরিশালের পথে কলকাতা আনা হয়। ঢাকা শহরে বরদা হালদার ও তস্য সহকারী রূপে প্রসন্ন গুপ্তের বিরুদ্ধে নারী হরণ মামলা দায়ের হয়। তারপর কলকাতা হাইকোর্টের বিচারে হরণকারীদের এই সৎ কাজের জন্য উচ্চ প্রশংসা করা হয়। পরে বিধুমুখীর বিবাহ দেওয়া হয় সরকারী উচ্চপদে অধিষ্ঠিত বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃতী ছাত্র রজনীনাথ রায়ের সঙ্গে।

এসেছে সে এক দিন। এঁরা ইতিহাস রচনা করে গেছেন বাংলা সমাজের। এই যুগের এবং এই পিতামাতার বিপ্লবী মনোভাবের উত্তরাধিকার পুত্র-কন্যারাও লাভ করেছেন। জ্যোতির্ময়ী গঙ্গোপাধ্যায়ের কথা আগেই বলেছি। তিনি সমস্ত জীবন নানা দিক দিয়ে দেশসেবা করে গেছেন। প্রভাতচন্দ্রও সাংবাদিকরূপে দেশসেবা করেছেন এবং ইংরেজ রাজের বিরোধিতা করে কারাবাস করেছেন। বাংলার নারী জাগরণের ইতিহাস তাঁর পিতার কর্ম ও ধর্ম জীবনের ইতিহাসের সঙ্গে জড়িয়ে আছে, প্রভাতচন্দ্র এ ইতিহাস লিখে গৌণভাবে সমাজেরই সেবা করলেন। নারী-জাগরণই ছিল পিতার কর্ম এবং ধর্ম।

প্রভাতচন্দ্র সম্পূর্ণ নিরহঙ্কার নীরব কর্মী। তাঁর সব কাজই স্থিরমস্তিষ্কজাত। পুরোনো দিনের স্মৃতিকথা বলতে আরম্ভ করলে অনেক চিত্তাকর্ষক কাহিনী পাওয়া যায় তাঁর কাছ থেকে। বয়স ৭৬ পার হচ্ছে। এখনও দৈনিক দু' মাইল হাঁটতে পারেন। তাঁর সমবয়সী আর এক জনের সম্পর্কে ইতিপূর্বে লিখেছি, তিনিও সমান সমর্থ। তিনি নলিনীকান্ত সরকার। এই সব বিপ্লবী মানুষদের স্বাস্থ্যে আজও বিপ্লব ঘটে নি, এটি আনন্দের বিষয়।

প্রভাতচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় বর্তমানে 'জনসেবক' নামক দৈনিকের সম্পাদকীয় বিভাগে নিযুক্ত আছেন। দমদম রোড থেকে প্রতিদিন সুরেন্দ্র ব্যানার্জী রোডে যাতায়াত করেন। তাঁকে অনুরোধ জানাই বাংলার নারী জাগরণের ইতিহাসকে আরও বিস্তারিত ও বড় করে লিখুন। পাঁচ সিকার বই পাঁচ টাকা হলে তবে বেশি প্রচার হবে।

রক্ষা কর!

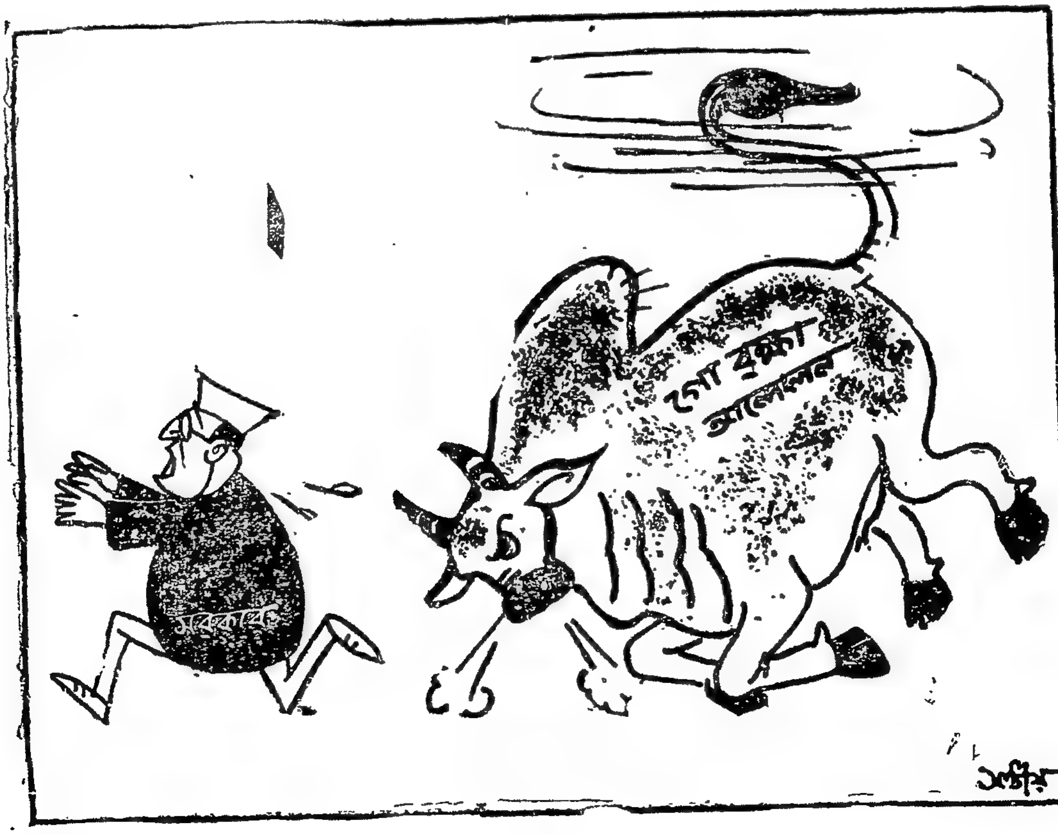

শেষ অধ্যায়

তারাপদ রায়

প্রায় বিশ বছর বিদেশে কাটিয়ে সম্প্রতি দেশে ফিরেছি। মাস দুয়েক থাকতে পাব। বাংলাদেশ খণ্ডিত না হলে যশোরের পল্লী অঞ্চলেই হয়ত মাসখানেক কাটিয়ে আসতে পারতাম, কিন্তু তা ত আর হবার নয়, ওখানকার আপনজন সবাই এখন কলকাতা এবং তার আশেপাশে আশ্রয় নিয়েছেন। দাদা আমাদের দেশের বসতবাড়ি ছেড়ে যাদবপুরের দক্ষিণে তালপুকুরে একটা ছোট্ট বাড়ি করেছেন। সপরিবারে সেখানেই উঠেছেন।

কলকাতা এবং তার আশেপাশে যে সব আত্মীয়-স্বজন বন্ধু-বান্ধব আছেন তাঁদের সঙ্গে দেখা করতে—সকাল সকাল খাওয়াদাওয়া সেরে বেরুই, নানা আফিসে আর বাড়িতে আড্ডা দিয়ে সন্ধ্যার একটু পর দাদার ওখানে ফিরি—৫ নম্বর অথবা ৮ বি বাসে। কয়েকদিন এই রকম যাতায়াত করবার পর হঠাৎ একদিন ইচ্ছা হ'ল—লেকটা একটু ঘুরে যাই। লেকের নাম হয়েছে শুনলাম এখন রবীন্দ্র সরোবর। শুনে' বড় ভাল লাগল ঃ বড় সার্থক নামকরণ হয়েছে। আরও ভাল লাগল একটু ঘুরতেই দূর থেকে যখন রবীন্দ্রসঙ্গীত কানে গেল। কে যেন অতি পরিণত দরদী গলায় গাইছেন—'যখন পড়বে না মোর পায়ের চিহ্ন এই বাটে—।' একবার মনে হল কেউ হয়ত পোর্টেবল রেডিও চালাচ্ছেন, কিন্তু একটু এগিয়ে গিয়ে ভাল করে কান পাততেই বুঝলাম আমার অনুমান ঠিক নয়, কারণ কণ্ঠের সহযোগী কোন তারের যন্ত্র নয়, হারমোনিয়ম। আর একটু এগুলে বুঝলাম গায়ক যৌবনের সীমা অনেকদিন অতিক্রম করেছেন, তবু কণ্ঠ মধুর, দরাজ এবং সর্বোপরি দরদী।

যেখানে গান হচ্ছিল সেখানে বেশ একটু ভিড় জমে গেছে। অতি সাধারণ কৌতূহল নিয়েই সেই ভিড়ের মাঝে একটু জায়গা করে নিতে দেখলাম একটা পুষ্পিত অর্জুন গাছের সামনে দূর্বাদলের উপর একটা কালো চাদর বিছিয়ে সম্পূর্ণ কৃষ্ণবাস দীর্ঘকায় গৌরবর্ণ এক বৃদ্ধ একটা ছোট্ট হারমোনিয়ম সযত্নে কোলের উপর রেখে অর্ধমুদ্রিত চোখে গান গাইছেন। আমি ওখানে যাবার পর তিনি একটু থেমে আবার নতুন করে ধরলেন, 'এই' করেছ ভালো, নিঠুর, এই করেছ ভালো...।

তাকিয়ে দেখলাম—তার পাতা চাদরের উপরে পড়েছে বেশ কিছু সিকি, আধুলি, দশ পয়সা, এমন কি দু'খানা এক টাকার নোটও বটে। বুঝলাম এ দান ভিক্ষার দান নয়, শ্রদ্ধার অর্ঘ্য। আর গায়কের মূর্তিটিও শ্রদ্ধা করবারই মত। গায়ের রঙ বেশই ফরসা, মাথায় রবীন্দ্রনাথেরই মত কিঞ্চিৎ লম্বা চুল, মুখে লম্বা দাড়ি, দু-একটা কালচে রেখা নিয়ে অধিকাংশই সাদা। প্রশান্ত মুখে বুদ্ধি এবং খুব সম্ভব বিদ্যারও দীপ্তি। আমার নিশ্চয় ধারণা হল—লোকটা রীতিমত শিক্ষিত।

এ পর্যায়ের লোককে কিছু দান করতে হলে বেশ ভেবে-চিন্তে করতে হয়, কিছু দিতে গিয়ে অতি সামান্য দিলে সঙ্গে সঙ্গে কিছু অমর্যাদাও দেওয়া হয়, ফলে আর যাই হক, নিজের মনটাই প্রসন্ন হয়ে ওঠে না। এ ব্যাপারে অন্যের না হলেও নিজের মনের প্রকৃতি সম্বন্ধে আমি সুনিশ্চিত। ছাত্রজীবনে যখন দস্তুরমত হিসেব করে পয়সা খরচ করতে হত তখন আমি যে পাড়ায় থাকতাম সেখানে সৌম্যদর্শন গৈরিক পরা আধা-সন্ন্যাসী এক শিক্ষিত প্রৌঢ় মাঝে মাঝে ভিক্ষা করতে আসতেন। তাঁর ভাষা ছিল, বন্ধু, কিছু সাহায্য পাব? পাড়ার লোকে সবাই তাঁর মর্যাদা জানতেন, সুতরাং দু' আনার নিচে কেউ তাঁর হাতে তুলে দিতেন না, আমি দু-একবার চার আনা পর্যন্ত দিয়েছি। শুনেছি আট-দশ আনা হয়ে গেলে তিনি আর অন্য কারো বাড়ি যেতেন না। আর এই সময়েই আর এক বিশিষ্ট ব্যক্তিকে দেখেছি খালি গায়ে খালি পায়ে একটা সছিদ্র বাক্স হাতে স্টেশনে স্টেশনে জাতীয় বিদ্যালয়ের জন্য ভিক্ষা চাইতে। বেশ মনে আছে তখন আমার তেমন অর্থ-সাচ্ছল্য না থাকলেও একবার একটা গোটা আধুলি আমি তাঁর বাক্সে সশ্রদ্ধভাবে ঢুকিয়ে দিয়েছিলাম।

এ গায়ক যদিও সাহায্য বা ভিক্ষা কোন কিছুই চাইছেন না, তবু আর দশ-জন দিয়েছে দেখে বুঝতে বাকী রইল না—মুখে কিছু না বললেও এ'র পাওয়ার প্রয়োজন আছে, সুতরাং মনে মনে আলোচনা করতে লাগলাম এ'কে কত দেওয়া যায়? এমন সময় বৃদ্ধ তাঁর পূর্বোক্ত গানটি শেষ করে আলখাল্লার মত জামার ভিতর থেকে একটা ঘড়ি বের করে সময় দেখে নিয়ে শ্রোতাদের দিকে স্নিগ্ধদৃষ্টিতে চেয়ে মৃদু হেসে চক্ষু মুদ্রিত করে আবার

শুরু করলেন,—'গানের পালা শেষ করে দে, শেষ করে দে রে যাবি অনেক দূর—।'

বৃদ্ধের হাসি দেখে হঠাৎ আমি একটু চমকে উঠলাম ঃ ঠিক এই হাসি কোথায় যেন আমি দেখেছি! কোথায়—তা আমি কিছুতেই মনে করতে পারলাম না,—কিন্তু এ হাসি আমার চেনা।

বৃদ্ধের গানের পালা শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গে পকেট হাতড়ে একটা আধুলি আমি তাঁর বিছানো চাদরের উপর অতি সন্তর্পণে রাখলাম। আরও দু-একজন শ্রোতা সিকি ইত্যাদি রাখলেন! বৃদ্ধ দুই হাত জোড় করে একটা নমস্কার করবার পর ওঠবার জন্য তাঁর জিনিসপত্র ওঠাতে সুরু করলেন ঃ সে নমস্কার সমবেত সব শ্রোতাদের উদ্দেশ্যে কি তাঁর জীবন দেবতার উদ্দেশ্যে—ঠিক বোঝা গেল না,—হয়ত দুয়েরই!

সতেরো-আঠারো বছরের একটি ছেলে হঠাৎ বৃদ্ধকে জিজ্ঞাসা করে বসলে, আচ্ছা, দাদু, আপনি গেরুয়া পরেন না কেন?

বৃদ্ধ মৃদু হেসে উত্তর দিলেন, আমি ত' সন্ন্যাসী নই, ভাই!

তা' হলে, সাদা না পরে কালোই বা পরেছেন কেন?

ময়লা হলে তোমরা কেউ ধরতে পারবে না, তাই নিন্দাও করবে না, হয়ত তাই,—বলে আবার একটু হাসলেন।

এ হাসি বড়ই চেনা চেনা লাগছে,—কিন্তু কিছুতেই মনে আনতে পারছি না।

বৃদ্ধ এবার তাঁর ছোট্ট হারমোনিয়ম আর ব্যাগটা নিয়ে রওয়ানা দিলেন, শ্রোতৃমণ্ডলী ছত্রভঙ্গ হয়ে নিজের নিজের খুশিমত দিকে চলে গেল, আমি বৃদ্ধের কথা ভাবতে ভাবতে লেকে একটা চক্কর দিতে সুরু করলাম।

বৃদ্ধ গৈরিক না পরে কৃষ্ণবাস পরেছেন—এর কারণ কি! ও'র মনে হয়ত কোন দুঃখ আছে, গভীর দুঃখ, আবার এ-ও হতে পারে—এতে করে লোকের দৃষ্টি বেশি আকর্ষণ করা যাবে। কিন্তু বৃদ্ধ এমন জীবনই বা বেছে নিলেন কেন? ইউরোপে শুনেছি—অনেক বোহেমিয়ান কাফে-রেস্তোরাঁর সামনে 'ভায়োলিন' 'গীটার'—ইত্যাদি বাজিয়ে জীবিকা অর্জন করে, এখানে দেখলাম একজন বেদেটাইপের লোক পথে পথে বেহালা বাজিয়ে রোজগার করে বেড়াচ্ছে। কিন্তু বৃদ্ধকে ত' ঠিক তাদের দলে ফেলা যায় না। এ'র চোখেমুখে রীতিমত কালচারের ছোপ। লোকটির যে কি বিশেষণ দেব—ভেবে পাচ্ছিলাম নাঃ লোকটা অসাধারণ, দুঃসাহসী অথবা 'এক্সেণ্ট্রিক',—সর্বোপরি ভাল গায়ক—অন্তত এককালে ছিলেন—সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। হাসিটুকুও মধুর এবং মার্জিত। ওঁর হাসির কথা মনে পড়লেই আমার মাথা কেমন ঘুলিয়ে যায়, —এ হাসি কোথায় যেন আমি দেখেছি,—কিন্তু কোথায়—কোথায়?

ভাবতে ভাবতে বাড়ি এলাম, এবং খাবার পর শুয়েও ভাবতে লাগলাম। তন্ময়তা না তন্দ্রা—ঠিক বলতে পারব না, হঠাৎ মনে হল আমাদের ইংলিশের প্রফেসার পরিতোষবাবু আমার দিকে স্নিগ্ধ-দৃষ্টিতে চেয়ে বলছেন, অন্যায় করেছ তুমি, প্রক্সি দিয়েছ শাস্তি তোমায় পেতেই হবে। তোমার এ জরিমানা আমি মকুব করে দিতে পারি—তিনটি ক্রিটিক্যাল কোশ্চেনের উত্তর লিখে তিন দিনের মাঝে তুমি যদি আমায় দেখাও!—মুখে যেন ঐ হাসি, ঠিক যেন এই বৃদ্ধের হাসি। তবে কি বৃদ্ধ আমার শিক্ষক পরিতোষবাবু? কথাটা মনে হতেই মনটা যেন বিশেষ ভারাক্রান্ত হয়ে উঠল।

বলা বাহুল্য—ছাত্রজীবনে পরিতোষবাবুর সেই শাস্তির ব্যবস্থায় মনটা বিষণ্ন না হয়ে বরং প্রসন্ন হয়েই উঠেছিল, কারণ ঐ শাস্তির মাঝে ছাত্রসমাজের প্রতি তাঁর এক বিশেষ স্নেহের পরিচয় পেয়েছিলাম। ঐ শাস্তিকে কেন্দ্র করেই তাঁর সঙ্গে আমার ঘনিষ্ঠ পরিচয়। তাঁর দেওয়া তিনটি প্রশ্নের উত্তর লিখে দিলাম, তিনি সংশোধন করে ফিরিয়ে দিলেন। সুবিধা পেয়ে সাহস করে আরও কয়েকটি লেখা দেখে দিতে অনুরোধ করলাম, তিনি ঐ রকম হেসে রাজী হলেন। সেই দিন তিনি আমার বাড়ির অনেক খবর জিজ্ঞাসা করলেন, আমি তাঁর বাড়ির ঠিকানা জেনে নিলাম।

সহপাঠী বন্ধু কমলকে নিয়ে পৌষ মাসের এক রবিবারে আমি তাঁর হালতুর বাড়িতে প্রথম যাই। ঢাকুরিয়া স্টেশনে নেমে বেশ কিছুটা হাঁটতে হল। হাঁটতেও বেশ লাগল। রাস্তার দুই দিকেই পল্লীর আমেজ। পরিতোষবাবুর বাড়িতে গিয়ে যখন হাজির হলাম, তখন বেলা প্রায় ন'টা। কোন লোকের বাড়ি দেখে যে কারো মনে রোমাঞ্চ জাগতে পারে—সে অভিজ্ঞতা জীবনে আমার সেই প্রথম। শুধু আমারই বা বলি কেন,—ফেরবার পথে কমল বলছিল তারও ঐ একই কথা।

কাঠা দশেক জমির পিছন ঘেঁষে খান-তিনেক ঘর, 'বার্বড অক্ষরে' ঘেরা বাড়িতে ঢোকবার গেটের উপর পার্টকেলি 'মার্শাল নীলের' মাচা। ওর নিচে দিয়ে বাড়িতে ঢোকবার সময়েই অসংখ্য ফোটা ফুলের গন্ধে নেশা লেগে যায়। তার পরেই ছ' ফুট চওড়া লাল নুড়ি-ঢালা পথের দুধারে ফুল আর ফুল। আড়াই ফুটের মত উঁচু করে ছাঁটা মেহেদি গাছের সবুজ বেড়া নুড়ির পথটাকে দুধারের বাগান থেকে আলাদা করে দিয়েছে। মেহেদির পাশে পাশে চলেছে নানা রঙের ছোট-বড়-মাঝারি আকারের চন্দ্রমল্লিকার মেলা, তার পরেই সুরু হয়েছে ডালিয়া। তার-পর দুধারের কেয়ারিতে—কারনেশান, ডায়েনথাস, য়্যাস্টর, ভার্বেনা, পপি ইত্যাদি কবে সব মরসুমী ফুল। মরসুমী ফুলের এলেকা ছাড়িয়েই সুরু হয়েছে গোলাপের মেলা। শীতের গোলাপ ঃ ঘন সবুজ পাতার মাঝে সে এক অপূর্ব দৃশ্য, চোখ ফেরানো যায় না। এর পর বেড়ার কাছা-কাছি রয়েছে বেল আর যুঁইয়ের ঝাড়, কামিনী, কাঞ্চন, করবী।

আমরা যখন লাল নুড়ির পথে এই বাগানে ঢুকলাম, পরিতোষবাবু তখন একটা কাঁচি হাতে গোলাপের শুকনো ডাল আর ফুল কাটছিলেন। পনের-ষোল বছরের একটি ছেলে নিড়ানি হাতে গাছের গোড়া খুঁচিয়ে দিচ্ছিল। আর বারো-তেরো বছরের একটি মেয়ে একটা ঝারিতে করে গাছের গোড়ায় তরল সার দিয়ে বেড়াচ্ছিল।

আমরা নমস্কার করে দাঁড়াতেই পরি-তোষবাবু বলে উঠলেন, এসেছ, চিনে আসতে পারলে? —মুখে সেই মধুর হাসি।

বললাম, হ্যাঁ, সার, কোন অসুবিধাই হয় নি, সবাই দেখলাম আপনাকে চেনেন। —কিন্তু এ কি দেখছি, সার, এ যে নন্দন-কানন করে তুলেছেন?

মুখে আবার সেই হাসি। তখন পরিতোষবাবুর বয়স সবে চল্লিশ ছাড়িয়েছে। 'ক্লীন শেভড'—মুখ, সুতরাং সে হাসি যেমন স্পষ্ট তেমনি উজ্জ্বল। খুশি হয়ে বললেন, ভাল লেগেছে তোমাদের?

হ্যাঁ, সার, খুব ভাল।

এবার কমলের দিকে চেয়ে বললেন, এও ত' আমার ছাত্র বলে মনে হচ্ছে। কি নাম তোমার বাবা?

কমল, কমল ভট্টাচার্যি।

আবার হাসলেন পরিতোষবাবু ঃ কমল, কমল—বেশ নাম, তোমাকেও ফোটাতে চেষ্টা করছি আমার বাগানেঃ ছোট্ট একটা ট্যাঙ্ক করব ভাবছি।

শুনে কমল ও আমি দুজনেই হাসতে লাগলাম। পরিতোষবাবু বললেন, চলো, ঘরে চলো।

পরিতোষবাবু এর পর তাঁর বসবার ঘরে নিয়ে এলেন। ঘরটি দেখেও আমাদের বেশ একটু আনন্দ লাগল। ঘরের দেয়াল ঘেঁষে কয়েকটা বইয়ের আলমারি। দুই পাশে ইঞ্চি আটেক উঁচু দুটি মোটা পায়ার তক্তপোষ, তাতে গদী-পাতা, তার উপর সাদা চাদর,—তার উপর গালিচা। একটাতে লোক এলে বসতে দেওয়া হয়, আর একটাতে গানের সরঞ্জাম ঃ

হারমোনিয়ম, তবলা ও এসরাজ। দেয়ালে একটা সেতার টাঙানো।

দেখে খুশি হয়ে বললাম, আপনার বাড়িতে, সার, তা হলে বেশ গান-বাজনারও চর্চা আছে দেখছি। একটু শুনতে পাব না, সার?

পাবে।

—বলেই তিনি হাঁক ছাড়লেন—ভারু, বিদু।

বাপের ডাক শুনেই ছেলেমেয়ে দুটি বাগানের কাজ ফেলে ঘরে এল। পরিতোষবাবু বললেন, এ'রা দুজন আমার ছাত্র, তোমাদের দাদা। তোমাদের দুই দাদা গান শুনতে চাইছেন, একটু চায়ের কথা বলে, হাত পা ধুয়ে এসে এদের একটু গান শোনাও।

ওরা বাড়ির ভিতর চলে যাচ্ছিল, পরিতোষবাবু ডাকলেন, ভারু, শোন,—বড্ড ঠাণ্ডা পড়েছে, চা নয়,—কফি।

ওরা চোখের আড়াল হতেই পরিতোষবাবুকে জিজ্ঞাসা করলাম, ওদের ভাল নাম কি, সার?

পরিতোষবাবু উত্তর দিলেন,—ভারতী আর বিদ্যাপতি,—সংক্ষেপে ভারু আর বিদু।

একটু পরেই ভারতী আর বিদ্যাপতি এসে গানের আসরে বসল। ভারতী হারমোনিয়মটা কোলের কাছে টেনে নিয়ে সি-শার্পের রিডটায় সুর তুললে, বিদ্যাপতি তবলার কিনারায় হাতুড়ি পিটাতে লাগল, পরিতোষবাবু নিজে এসরাজের কান মোচড়াতে লাগলেন। এর মাঝে একটা বাচ্চা চাকর এসে আমাদের সামনে একটা টিপয় রেখে গেল। মিনিটখানেক পরে এল গরম কফি আর কাজু বাদাম।

পরিতোষবাবুর জন্যও এক কাপ কফি এসেছিল, তিনি তা খেয়ে নেবার পরই সুরু হল। ভারতী সেদিন তার মধুর কণ্ঠে সুসংগত তানে মানে প্রথমে যে গানটি শুনিয়েছিল তা আজও বেশ মনে পড়ছে। গানটি ছিল অতুলপ্রসাদের—'প্রভাতে যাঁরে নন্দে পাখী, কেমনে বল তাঁহারে ডাকি—,' তার পরে গাইল,—'সে ডাকে আমারে, বিনা সে সখারে, রহিতে মন নারে—'। ভারু সেদিন একখানি মাত্র রবীন্দ্রসংগীত শুনিয়েছিল আমাদের, সেটা হল—'তোমার তরণী আসিবে আশে, বসে আছি একা তটিনী পাশে—'। আমাদের অনুরোধে বিদুকেও এরপর তবলা ছেড়ে হারমোনিয়ম ধরতে হল। সেও শোনালে আমাদের দুটি রবীন্দ্র-সংগীত। তার একটি হল—'জীবনে যত পূজা',—আর একটি 'আগুনের পরশ-মণি...'।

রাত্রে তন্দ্রার ঘোরে যে সন্দেহ আমার মনে জাগল তার সত্যতা নির্ধারণ করতে আমার তখনই মনে হতে লাগল ভোর হলেই পরিতোষবাবুর হালতুর বাড়িতে গিয়ে একবার যাচাই করে দেখে আসব। ভোরে উঠে দেখি যতটা মনের জোর নিয়ে রাত্রে সংকল্প করেছিলাম ততটা জোর আর নেই ঃ তাঁর বাড়িতে গিয়ে তাঁকে কি অবস্থায় দেখব, দেখে মনের কি অবস্থা হবে, তা সহ্য করতে পারব কি না—কিছুই যেন বুঝে উঠছিলাম না। এ অবস্থায় কমলের সংগে একবার দেখা হলে ভাল হত, তার কাছে পরিতোষবাবুর খবর কিছুটা হয়ত পেতে পারি। কমলের ঠিকানা জানি, সে সোদপুরে থাকে,—মাঝে মাঝে দু-একখানা চিঠিপত্র আদান-প্রদান হয়, কিন্তু এসে এ পর্যন্ত দেখাশুনা করতে আর যাওয়া হয় নি। ঠিক করলাম—সেই দিনই সন্ধ্যায় কমলের ওখানে একবার যাব।

সেদিন শনিবার ছিল, কমলের সকাল সকাল ফেরবার কথা। কপাল ভরসা করে সন্ধ্যার আগেই রওয়ানা হ'লাম। তার বাড়ি চিনি এবং সোদপুরে নেমে এক রিক্সাওয়ালার সাহায্যে তার বাড়িতে গিয়ে হাজির হ'লাম। ভাগ্য ভাল কমল বাড়িতেই ছিল। এতদিন পরে দেখে প্রথমে সে আমায় চিনতে পারে নি, তারপর চিনে সে কি আনন্দ! নিজেদের সুখ-দুঃখের কথা আদানপ্রদান, গরম লুচি আর মিষ্টির সংগে চা-পর্ব ইত্যাদি শেষ হলে আমি আমাদের আলোচনাটা কলেজ প্রসংগ নিয়ে এসে হঠাৎ এক সময় কমলকে জিজ্ঞাসা করে বসলাম, আচ্ছা কমল, তোমার পরিতোষবাবুকে মনে পড়ে?—আমাদের ইংলিশের প্রফেসার—যাঁর বাড়িতে তুমি আর আমি একদিন গিয়েছিলাম?

পরিতোষবাবুর নাম শুনেই কমল যেন একটু গম্ভীর হয়ে উঠল, বললে, মনে পড়ে বৈকি, ভোলবার মত লোক ত তিনি ন'ন!

কমল আরও কি যেন বলতে যাচ্ছিল, আমিই তাতে বাধা সৃষ্টি করে বললাম, সম্প্রতি কোনদিন তুমি তাঁর বাড়িতে গেছ?

কমল যেন অনেকটা অপরাধীর মতই বললে, না,—সেই যে ছাত্রজীবনে তোমার সংগে একবার গিয়েছিলাম,—আর না। ঘনিষ্ঠতা ত' তোমার সংগেই বেশি ছিল। আমার আর যাওয়া হয় নি।

যা'ক, তুমি তাঁর কোন খবর রাখো, তিনি কি এখনও কলেজে আছেন,—না—

কমল এবার রীতিমত ভারাক্রান্ত কণ্ঠে বললে, খবর অবশ্য কিছু কিছু রাখি,—অর্থাৎ জানি। আমাদের এই সোদপুরেরই এক ভদ্রলোক ঐ কলেজে প্রফেসরি করেন। তাঁর মুখে শুনেছি পরিতোষবাবু বছর চারেক আগে কলেজ কর্তৃপক্ষের সংগে কি একটা ব্যাপারে রাগারাগি করে চাকরি ছেড়ে দিয়েছেন, আর আমাদেরই এক সহপাঠী—সেই বেঁটে মদনের মুখে যা শুনেছি তা বড় বেশি মর্মান্তিক।

আমি জিজ্ঞাসুনেত্রে চাইলে কমল বললে, তিনি নাকি আজকাল গান গেয়ে ভিক্ষা করে খান।

বুঝলাম—আমি যা সন্দেহ করেছিলাম—তা সত্য। কমলের শেষ উক্তিটা শুনে হয়ত আমার চোখে জল এসে গিয়েছিল, কমল তা লক্ষ্য করে তখনই বলে উঠল, আমরা যারা তাঁর ছাত্র ছিলাম—বুঝি—তাদের হয়ত তাঁর জন্যে কিছু করা কর্তব্য, কিন্তু সবাই আবার একজোট হবার সুযোগ পাচ্ছি কোথায়—বলো? এই দেখ তুমি কোথায় পড়ে রয়েছ, আমি কোথায়,—কে কোথায় ছড়িয়ে পড়ে রয়েছে— তার হদিস পাওয়াই দুর্ঘট,—একজোট হওয়া ত' দূরের কথা।

বললাম, সে সব কথা পরে ভাবা যাবে, আপাতত তাঁর সংগে একবার দেখা করতে চাই আমি, আমার একান্ত ইচ্ছা তুমি আমার সংগে এস, একা যেতে কেন না জানি আমি তেমন মনে জোর পাচ্ছি না।

কমল তখনই রাজী হয়ে গেল, বললে, বেশ, কবে কখন যেতে চাও বলো?

সন্ধ্যায় পরিতোষবাবু হয়ত রুটিন বেঁধে লেকে বা অন্য কোথাও বেরোন, যেটুকু জানবার সুযোগ হয়েছে আমার তাতে আমার তাই ধারণা, তাই কমলের কথার জবাবে বললাম, সকালে। কাল সকাল আটটা থেকে ঢাকুরিয়া স্টেশনে তোমার জন্য অপেক্ষা করে থাকব, তুমি তোমার সুবিধামত যত শীগ্‌গির পারো—এসো।

বেশ তাই।

অন্য প্রসংগে সামান্য আর দু'টি চারটি কথা বলে আমি সেদিনকার মত কমলের কাছ থেকে বিদায় নিলাম।

কলকাতা এসে ভীমনাগের দোকান থেকে পাঁচটাকার সন্দেশ কিনে বাড়ি ফিরলাম ঃ এতদিন পরে 'সারে'র বাড়ি যাব,—একেবারে শুধু হাতে যেতে মন চাচ্ছিল না।

পরদিন সকাল সাড়ে আটটার কাছাকাছি কমল ঢাকুরিয়া স্টেশনে এসে হাজির হ'ল। আমার হাতে সন্দেশের প্যাকেট দেখে সে বলে উঠল, আমার ত' কিছু আনা উচিত ছিল। বললাম, তোমাতে আমাতে তফাৎ নেই, আমরা কিছু মিষ্টি নিয়ে যাচ্ছি—এই হ'লেই হ'ল।

কমল বললে, না, ভাই, মনের তাতে

তৃপ্তি হয় না, চলো আমিও কিছু কিনে নিই।

ঢাকুরিয়া স্টেশনের ধারেই বাজার, সেখানে গিয়ে কমল বেছে বেছে এক ডজন কমলা ও গোটা ছয়েক আপেল কিনলে। এর পর একটা রিকসা করে আমরা হালতুর দিকে রওয়ানা হ'লাম। পথে দেখলাম পল্লীর সবুজ আভা আর বড় নেই, পথের দু'ধারেই ছোট হলেও হাল-ফ্যাশনের অনেক বাড়ি উঠেছে।

রিক্সা পরিতোষবাবুর বাড়ির কাছাকাছি আসতে মনের ভিতর কেমন যেন একটা উদ্বেগ বোধ করতে লাগলাম। বাড়ির সামনে এসে নামতেই দেখি বাগানের মাঝে সেই প'চিশ বছর আগের মত পতিরোষবাবু কাঁচি হাতে গায়ের ডাল কাটছেন, সঙ্গে সেই প'চিশ বছর আগের দেখা বিদু ভারুর মত দুটো ছেলে-মেয়ে। এস, ওয়াজেদ আলির লেখা সেই 'ভারতবর্ষ' প্রবন্ধের কথা মনে পড়ল। পরিতোষবাবু কাঁচি হাতে গাছের ডাল মূর্তি আর নেই। দীর্ঘ শ্মশ্রু কৃষ্ণবাস-ধারী পরিতোষবাবুর সর্বাঙ্গেও যেন কি এক কালো ছায়া এসে নেমেছে, উদ্যানকে অটুট রাখবার সর্বপ্রযত্ন থাকা সত্ত্বেও, আমার মনে হ'ল, তাও যেন ঐ ছায়ার আক্রমণ থেকে মুক্ত রাখা সম্ভব হয় নি। লেকের সেই ভদ্র বৈরাগীই পরিতোষবাবু— স্বচক্ষে স্পষ্ট করে দেখে আমার বুকের মধ্যে কি যেন তোলপাড় সুরু করে দিলে। কোনরকমে আত্মসংবরণ করে আমরা এগিয়ে গিয়ে তাঁকে প্রণাম করলাম।

প্রথমে চিনতে না পেরে জিজ্ঞাসুনেত্রে চাইলেন তিনি আমাদের দিকে।

বললাম আমরা সব আপনার ছাত্র, আমি শঙ্কর, আর এ কমল। ছাত্রজীবনে এ-ও একবার এসেছিল আমার সঙ্গে আপনার বাড়িতে। আপনি একেও ফোটাতে চেয়েছিলেন আপনার বাগানে।

বহুদিনের চেনা মধুর হাসি শ্মশ্রু-বহুল মুখে দেখা দিয়ে পরক্ষণেই আবার মিলিয়ে গেল। পরিতোষবাবুর মুখে— আমার চোখে বড় ম্লান দেখাল সে হাসি; স্বতঃস্ফূর্ত হাসির অফুরন্ত উৎস যেন নিঃশেষ হয়ে উঠেছে তাঁর জীবনে, এ যেন পূর্বাভ্যাসবশে—তা থেকে কিছু নিংড়ে বের করবার চেষ্টা।

বললেন, জীবনের সব সাধ, বাবা, ইচ্ছা থাকলেও পূর্ণ হয় না, আরও বয়স হলে দেখবে জীবনের অনেক কিছুই মানুষের আয়ত্তের বাইরে।

পরিতোষবাবুর জীবনের কোন গভীর দুঃখের ইঙ্গিত এটা—বুঝে আমরা চুপ করে রইলাম। তিনিই আবার মধুরকণ্ঠে স্নেহ ঢেলে বললেন, যা'ক—তোমরা এসেছ, বড খুশি হয়েছি. এখন আর ছাত্রেরা বড় দেখা করতে আসে না। চলো ঘরে চলো।

আমরা যন্ত্রচালিতের মত তাঁর পিছু পিছু সেই পরিচিত বৈঠকখানা ঘরে এসে ঢুকলাম। বসবার আগে আমরা সন্দেশ আর ফলগুলি তাঁর দিকে এগিয়ে দিতে গিয়ে বললাম, সার,—এগুলি...

এ সব আবার আনতে গেলে কেন?

কমলই সপ্রতিভ হয়ে উত্তর দিলে, শুধু হাতে গুরুদর্শনে আসতে নেই, সার, আর কিছু না জুটলেও অন্তত একটা হরতকী নিয়ে আসতে হয়।

পরিতোষবাবু স্নিগ্ধদৃষ্টিতে আমাদের দিকে চাইলেন। একটু চুপ করে থেকে বললেন, একটু চায়ের ব্যবস্থা করি তোমাদের,—কেমন?

না, সার, দরকার নেই।

তা আছে বৈকি,—তোমরা এত ফল-মিষ্টি বয়ে নিয়ে এলে আমার বাড়িতে, একটু চা খাবে না? বসো তোমরা আসছি—বলে আমাদের আনা ফল-মিষ্টি নিয়ে তিনি ভিতরে ঢুকলেন।

একটু পরে তিনি ফিরে এলে আমি বললাম, আচ্ছা সার—একটা কথা জিজ্ঞাসা করব?

বলো।

প'চিশ বছর আগে প্রথম যখন আমরা দু'জন আপনার বাড়িতে আসি তখন আমরা বাগানে আপনার ছেলে ও মেয়ে বিদু আর ভারুকে দেখি, আজও দেখলাম ঠিক সেই রকম দুটি ছেলে-মেয়ে!

ওরা আমার নাতি-নাতনী।

বিদুর ছেলে-মেয়ে?

না, বিদুর নয়, ভারুর।

ভারু এখানে এসেছে বুঝি,—সে এখনও গান গায়?

না, সে আর গান গায় না, ভগবান তার গান গাওয়া ঘুচিয়ে দিয়েছেন, সে বিধবা হয়েছে। সে এখন আমার এই-খানেই থাকে, কারণ থাকবার তার আর জায়গা নেই ঃ আমি ছেলে দেখে তার বিয়ে দিয়েছিলাম, থাকবার জাগয়া দেখে নয়।

বলবার সময় পরিতোষবাবুর মুখের একটি রেখাও বিচলিত হ'ল না দেখে আমরা বিচলিত হয়ে পড়লাম। তিনি আমাদের মুখের দিকে চেয়ে একটু হাসলেন,—সে হাসি আরও মারাত্মক।

ভারুর ছেলে আমাদের চা এবং মেয়ে আমাদের খাবার নিয়ে এল,—সে খাবার আমাদেরই আনা মিষ্টি আর ফলের টুকরো। পরিতোষবাবু আবার হাসলেন ঃ গঙ্গাজলে গঙ্গা পুজো।

বললাম, সার, চা আমরা খাচ্ছি, ও খাবার ওরা নিয়ে যা'ক ওরা খাবে।

পরিতোষবাবু এবার আমাদের মাস্টারের মত ধমক দিয়ে বললেন, বাজে কথা রাখো, খাও,—অনেক এনেছ, ওরা ত' খাবেই, আমরাও খাব।

সুতরাং আমাদের খেতেই হ'ল। ফল মিষ্টি শেষ করে চায়ের পেয়ালায় চুমুক দিয়ে বললাম, সার, বিদুকে দেখছি না, তার খবর কি, সে এখন কোথায় থাকে, কি করে,—ছেলে-পিলেই বা কি?

শুনে পরিতোষবাবুর ভ্রূ দুটি 'ঁঝি কুঞ্চিত হয়ে উঠল, পরক্ষণেই তিনি সামলে নিয়ে নিজেকে যথাসাধ্য নৈর্ব্যক্তিক রেখে বললেন, তার উন্নতি হয়েছে—

কথাটা অনেকটা হে'য়ালির মত শোনাল বলে—আমরা দু'জনেই তাকালাম তাঁর মুখের দিকে। তিনি ম্লান হেসে বললেন, অনেক বছর আগে এখানকার পড়া শেষ করিয়ে পাঠিয়েছিলাম তাকে লণ্ডনে— ডি. লিট. হতে। ডি. লিট. হবার পর সে আর দেশে ফেরে নি, ওখানকারই এক অধ্যাপকের কন্যাকে বিয়ে করে সে— ওখানেই রয়ে গেছে—

বড় দুঃখের কথা!

শান্ত গম্ভীর কণ্ঠে পরিতোষবাবু বললেন, কিছুই দুঃখের নয়, এইটেই স্বাভাবিক। জীবজগতে দেখতে পাও না— সন্তান যতদিন পোষ্য ততদিনই বশ্য, তারপর স্বাধীনভাবে চলাফেরা শিখলে বাপ ত' ভালো, মায়ের দিকেও ফিরে তাকায় না।

পরিতোষবাবুর বৈজ্ঞানিক, দার্শনিক ব্যাখ্যা আমরা বুঝলাম না, বুঝলাম বিদুর আঘাত তাঁর মনটাকে রীতিমত জখম করে দিয়েছে।

কিছুক্ষণ কেউই আমরা কোন কথা বলতে পারলাম না। নিস্তব্ধতা আরও পীড়ন করতে লাগল মন। অবশেষে আমিই নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করে বললাম, কলেজ থেকে ত' শুনলাম অবসর গ্রহণ করেছেন?

হ্যাঁ।

কিন্তু অবসর নেওয়া বয়স ত' বোধ হয় এখনও পূর্ণ হয় নি!

হয় নি, তবে হতে চলেছে, আর মাস কয়েক পরেই পূর্ণ হ'ত।

শুনলাম আপনি নাকি কর্তৃপক্ষের সঙ্গে রাগারাগি করে চাকরি ছেড়ে দিয়েছেন?

মৃদু হাসলেন পরিতোষবাবু ঃ রাগা-রাগি ঠিক নয়, তাঁদের সঙ্গে নীতিতে মিল হ'ল না আমার। কয়েক বছর আগে আমার বয়স ষাট পূর্ণ হলে প্রিন্সিপাল ডেকে বললেন, আপনার ষাট পূর্ণ হয়ে গেল, এবার 'এক্সটেনশনে'র জন্য দরখাস্ত করুন। কলেজের অবশ্য এই-ই নিয়ম ঃ প'য়ষট্টি পর্যন্ত ওঁরা কাজ করতে সুযোগ দেন. প্রতি বৎসর প্রার্থনা করে এই

'এক্সটেনশন' মঞ্জুর করে নিতে হয়। কিন্তু আমি প্রার্থনা করতে রাজী নই। বললাম, আমি 'ফিজিক্যালী' এবং 'মেণ্টালী' দস্তুরমত 'ফিট' আছি, এ দেখে আপনারা যদি আমায় রাখতে চা'ন রাখুন দরখাস্ত করে প্রার্থনা করে আমি থাকতে চাই না।

রেক্টার পাশেই বসেছিলেন, তিনি বললেন, আপনারা শিক্ষিত লোক, নীতি মেনে চলার জন্য আপনাদের সব কিছু করা উচিত। আপনাকে আমরা এত শীগ্‌গির হারাতে চাই না, আপনি দরখাস্ত করুন।

আমি বললাম, দরখাস্ত আমি করব না, কারণ সেটা আমার নিজের নীতিতে বাধে, আমার নিজের জীবন পরিচালনা করবার জন্য আমার নিজস্ব নীতি ঃ ভিক্ষা করতে আমার নীতিতে বাধে, আর আপনাদের যে নীতি—তার ভিত্তি কোন সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত নয়,—স্বার্থের উপর।

রেক্টরের চোখ রোষদীপ্ত হয়ে উঠল ঃ মানে,—কি বলতে চা'ন আপনি?

চাকরির জন্য আমি যখন প্রার্থী নই, তখন তাঁর রাগ দেখে আমার ভয় করবারও নেই—বিনাশে নিয়তে মতি কথং অনুনয়েন মে,—সুতরাং মৃদু হেসেই উত্তর দিলাম, আপনি মিছেই রাগ করছেন, ভেবে দেখুন রাষ্ট্রের যাঁরা কর্ণধার তাঁদের বয়সের গাছপাথর নেই, বয়স তাঁদের সত্তর থেকে আশী-প'চাশী হ'লেও তাঁদের কর্মক্ষমতা নষ্ট হয় না, আপনার বয়স আটাত্তর হ'লেও এত বড় একটা কলেজ চালানোর ক্ষমতা আপনার নষ্ট হয় নি, অথচ শিক্ষকদের ষাট পুরতেই—মানে একটা ক্লাস চালানো রাষ্ট্র চালনা কলেজ চালনার চেয়ে অনেক কঠিন কাজ কি না!

আমার কথা শুনে দুইজনই গুম্ হয়ে বসে রইলেন। একটু পরে প্রিন্সিপাল বললেন, বেশ, আপনার কথা আমরা বুঝেছি, আপনি এখন যেতে পারেন।

এর দিন সাতেক পরেই আমার কলেজ ছেড়ে আসার সময় হয়ে গেল।

কমল বললে, কলেজে কাজ করবার সময় —কিছু টাকা, সার, জমাতে পেরেছিলেন?

বিষণ্ণ হাসি হেসে সার বললেন, সামান্য যা কিছু জমেছিল তা-ও ত' খরচ হয়েই গেল ঃ প্রথম দিকে ছেলের বিদেশে পড়বার খরচ, তার পর মেয়ের বিয়ের খরচ। 'প্রভিডেণ্ট ফাণ্ডে' যা পেয়েছিলাম তা জামাইয়ের চিকিৎসাতেই সব শেষ হয়ে গেল।—একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস বেরিয়ে এল সারের বুক থেকে।

কমল এই সময় চোখ ইশারায় আমায় একবার বাইরে আসতে বললে।

আসছি আমরা সার,—বলে আমরা দুইজনে বাইরে বেরিয়ে এলাম। কমল আমাকে একান্তে পেয়ে বললে, টাকা-পয়সা কিছু সঙ্গে আছে?

হ্যাঁ, কিছু আছে।

দরকার হতে পারে বলে আমিও কিছু এনেছি। দুইজনে মিলে সারকে কিছু প্রণামী দিয়ে গেলে কেমন হয়?

খুবই ভাল হয়। তোমার কাছে কত আছে?

পঞ্চাশ এনেছি আমি।

টাকা-পয়সা প্রায় আমার সঙ্গেই থাকত, আমার কাছে কিছু বেশি ছিল। বেশি দিলে কমলের মনে যদি কোন আঘাত লাগে—এই ভেবে আমিও পঞ্চাশ দিয়ে একশো টাকা পুরিয়ে আবার ফিরে এলাম আমরা পরিতোষবাবুর সামনে। টাকাটা হাতের মুঠোয় নিয়ে বললাম, সার, যদি কিছু অপরাধ না নেন ত' একটা কথা বলতে চাই।

কি ব্যাপার?

বলছিলাম, আমরা দুজনেই আপনার ছাত্র। মায়ের ঋণ এবং গুরুর ঋণ কিছুতেই শোধ দেওয়া যায় না। আমরা কিছু প্রণামী দিতে চাই আপনাকে, আপনি 'না' বলতে পারবেন না।

পরিতোষবাবুর শান্ত চোখ দুটিতে হঠাৎ যেন আগুন জ্বলে উঠল ঃ তোমরা—আর্থিক সাহায্য দিতে এসেছ আমায়, অনুকম্পা, ভিক্ষা?

না, সার, রাগ করবেন না আপনি, কিছু দেবার জন্য আসি নি আমরা। বিদেশে থাকি, প্রায় বিশ বছর পরে এখানে ফিরেছি, ছাত্রজীবনে অনেক কিছু পেয়েছি আপনার কাছ থেকে, তাই স্মরণ করে দেখা করতে এসেছি, প্রণাম করতে এসেছি।

শুনে অনেকটা স্বাভাবিক হয়ে এল পরিতোষবাবুর চোখ ঃ তবে—ও সব বলছ কেন?

মনে মনে একটু রাগও হ'ল ঃ সেদিন লেকে গান গেয়ে ভিক্ষা করছিলেন উনি, তাতে আত্মসম্মানে বাধল না, যত বাধল ছাত্রের শ্রদ্ধার দান নিতে! সে ভাব গোপন রেখে স্বরে যথাসাধ্য বিনয় এনে বললাম, কিছু মনে করবেন না, সার কয়েকদিন আগে লেকে আপনার গান শুনেছি। সেদিন আপনাকে ঠিক চিনতে পারি নি, পরে চিনতে পেরেই ছুটে এসেছি। আপনাকে ওভাবে দেখলে আমাদের কষ্ট হয়।

কষ্ট?—কিসের কষ্ট? তুমি মনে করেছ আমি ভিক্ষা করছি?—হা, হা, হা,—পরিতোষ ব্যানার্জী কারো কাছে ভিক্ষা করে না, প্রার্থনা করে না, ছেলের কাছেও নয়, কলেজের কাছেও নয়, ছাত্রের কাছেও নয়—।

উত্তেজনায় বৃদ্ধ পরিতোষবাবুর মুখখানা যৌবনের মতই রাঙা হয়ে উঠল। আমরা চুপ করে রইলাম। তিনি পূর্ব কথার সূত্র ধরে বললেন, তুমি ত' লেকে দেখেছ আমায় রবীন্দ্রসংগীত গাইতে, কিছু দিয়েছও নিশ্চয় আর পাঁচজনের মত,—দেবেই ত,' আমি দিয়েছি—তোমরাও দিয়েছ। আমি দিয়েছি তোমাদের আনন্দ, তোমরা দিয়েছ অর্থ। রেডিও, সিনেমায় যারা গান গায় তারাও অর্থ পায়, সেটা ভিক্ষা নয়, প্রতিদান, বিনিময়, বুঝলে বাবা, বিনিময়। পরিতোষ ব্যানার্জী কারো কাছে হাত পাতে না, ভিক্ষা নেয় না, সাহায্য নেয় না,—সে ছেলের কাছ থেকেও নয়, কলেজের কাছ থেকেও নয়, ছাত্রদের কাছ থেকেও নয়, সাধারণের কাছ থেকেও নয়।—বলে থর থর করে তিনি কাঁপতে লাগলেন।

এর পর কোন কথা আর আমাদের মুখে জোগাল না। কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে প্রণাম করে আমরা বিদায় নিলাম। পথে এসে কমল বললে, ছেলের ব্যবহার আর জামাইয়ের মৃত্যুতে সারের মাথা একেবারে খারাপ হয়ে গেছে।

আমি বললাম, আমার কি মনে হচ্ছে জানো?—মনে হচ্ছে—অনেক সময় অনেক ভুল ধারণাই মানুষকে প্রকৃতিস্থ রাখে, তাকে বাঁচিয়ে রাখতে সাহায্য করে, ভুল ভাঙলে জীবনের সকল স্বাদ বিস্বাদ হয়ে যায়, জীবনে নেমে আসে মহা বিপর্যয়। **Where ignorance is bliss it is folly to be wise.**

David Hare

Peary Chand Mittra

মূল্যঃ এক টাকা মাত্র

প্যারীচাঁদ মিত্র ওরফে টেকচাঁদ ঠাকুরের ১৮৭৭ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত মূল্যবান ইংরাজী ভাষায় লিখিত গ্রন্থখানি বসুমতী সাহিত্য মন্দির জাতির পূর্ণাঙ্গ ইতিহাসের অন্যতম প্রামাণ্য বিবরণী হিসাবে পুনঃ প্রকাশ করিয়াছেন।

বসুমতী প্রাইভেট লিমিটেড
১৬৬, বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী স্ট্রীট, কলিকাতা—১২

অমৃতসমান

বেদব্যাস

সোনা-কথা

'অ বৌমা', সুহাসিনী বাঁ হাতে খবরের কাগজ ও ডান হাতে পানের ডিবেটি নিয়ে সোজা দালানের দিকে এগিয়ে যেতে যেতে বললেন, 'তোমার বাপকে আসতে খপর দাও তো একবার—' ছেলের বৌ এমনিতেই শাশুড়ীর ভয়ে সব সময় তটস্থ, তায় আবার এ অ-বেলায় বৈঠকখানা, খবরের কাগজ ছেড়ে তাঁকে এদিকে আসতে দেখে সে তো ভয়ে আরো কুঁকড়ে গিয়েছিল। বাবাকে খবর দেওয়া কেন? তবে কি বাপের বাড়ি যাওয়া হবে এবার তার? কুটনো ছেড়ে উঠে পড়ে মিনতি। তাড়াতাড়ি সে মোড়াটা এগিয়ে দেয় স্থূলাঙ্গিনী শাশুড়ীকে। তর্জনী থেকে শাশুড়ী চুনটা দাঁতে চেঁছে নিয়ে সুরু করেন ঃ খপর দাও ধরণী ভট্চাযকে উনি যেন চোদ্দ পাল্টে দিয়ে বাইশ কারেটি গয়না গড়িয়ে দিয়ে যান—

নীরবে পায়ের বুড়ো আঙুল দিয়ে মেঝে ঘসা ছাড়া মিনতির করার কিছুই ছিল না। শাশুড়ী ছাড়বার পাত্রী ননঃ এই দেখ না গো, কাগজে লিখেছে যে বাইশ কারেটি গয়না এবার গড়ানো যাবে, তা তোমার বাপ তো আমায় খুব শুনিয়েছিলেন যে গিনি সোনা পাওয়া যায় নি বলে ওই গিল্টি সোনা দিয়েছিলেন—উঁহু, আমি ছাড়বো না বাপু, আমাকেই কি কেউ ছেড়ে কথা কয়েছে, আমি মেয়ের বিয়ে দিয়েছি না, হাতে-গলায় বত্রিশ ভরি সোনা দিয়ে—

কেউ কাউকে ছাড়ে না, দেখলাম তো গত সাড়ে তিন বছর ধরে। নিজের বৌ-ই ছাড়ে না তো পরের কথা কী বলবো। শ্রীমতী বায়না ধরেছিল ঃ হ্যাঁ গো গিনি সোনা নাকি উঠে যাবে, তা আমায় এই বেলা একটা বিছে হার আর আট গাছা চুড়ি গড়িয়ে দেবে—

—বোকার মতো কথা বলো না—তুমি লেখা-পড়া-জানা, কালচার্ড মেয়ে, ভুলে যেয়ো না—ধমক দিয়ে বলেছিলাম আমি।

—লেখা-পড়ার সঙ্গে গয়না পরার কী সম্পর্ক?

—আমাদের গরীব দেশে সোনা মজুত করা একটা ক্রাইম, কারণ এতে প্রডাকশন হ্যাম্পার করে—তত্ত্বকথা শোনাতে চেয়েছিলাম আমি।

—মজুতের কী প্রশ্ন আসছে?...আর আমি যদি দুর্দিনের জন্যে দু'চার ভরি সোনা রাখিই—

—ওই দুর্দিন আর আসবে না, যদি তুমি সমস্ত সোনা ডিফেন্স ফাণ্ডে জমা দাও—সোনার গয়নার দাম কাঁচের চুড়ির চেয়েও কমে যাবে—সেদিন শীগ্গিরই আসছে—

—হুঁ, তোমার মুণ্ডু আসছে। গড়িয়ে দেবে না তাই বলো, বাজে থিয়োরী কপচাচ্ছো কেন—বলে ঠোঁট উল্টে শ্রীমতী দুমদাম পা ফেলে অন্তর্ধান করেছিল। বলা বাহুল্য, গয়না ওকে আমি গড়িয়ে দিই নি।

মনে আছে বছর দুই আগে হন্তদন্ত হয়ে সুভাষ ঘোষ এসেছিলো আমার কাছে—একটা গুরুতর অভিযোগ নিয়ে। গুরুতর এজন্যে যে অভিযোগটি ছিল তার 'বস্'-এর বিরুদ্ধে। ল্যাণ্ড কাস্টমস-এর ইন্সপেক্টর সুভাষ এসে বলেছিলো ঃ

—বিগ ক্যাচ, বাসুদা, প্রায় সাত কেজি সোনা নিয়ে নেমেছিল—ফরেন পাশপোর্ট ছিল। যদিও বাড়ি ওর বম্বে, ওকে আটক করে সুপারিন্টেণ্ডেন্টকে খবর দিই। ও, শালা সুপার গিয়ে ওর সঙ্গে কী সব কথা বললেন, কী সব বন্দোবস্ত করলেন উনিই জানেন, একগাল হেসে আমায় এসে শোনালেন ঃ ভেরি শার্প নোজ্ তোমার ঘোষ, কিন্তু একটু ভুল হয়ে গিয়েছে, ওর ইন্টারন্যাশনাল পাশপোর্ট রয়েছে, আমরা ওকে আটকাতে পারি নে—তারপর আমার পিঠ চাপড়ে দিয়ে লাউঞ্জে চলে গেলেন ওই স্মাগলারটাকে নিয়ে।

বলেছিলাম যে প্রমাণ নেই, সাক্ষী-সাবুদ নেই ওর, নিউজ করা মুশকিল, তাছাড়া ওর চাকরী নিয়েও ঝামেলা হবে বস্-কে চটালে পর। এ রকম এক-আধটা কেস যে হয় না এমন তো—'

—এক-আধটা কী বলছেন বাসুদা, গোল্ড কন্ট্রোল হবার পর থেকে স্মাগলিং অনেক বেড়ে গিয়েছে—

একটা মফস্বল শহরে গিয়েছিলাম মিটিঙের রিপোর্টিং করতে। কলকাতা থেকে মন্ত্রী গিয়েছেন, মেলা লোক হয়েছে সভায়, বেশির ভাগই নিম্ন ও মধ্যবিত্ত ঘরের মহিলা। উদ্যোক্তাদের একজন মাইকে ঘোষণা করতেই ভলান্টিয়াররা সব মেয়েদের হাতে ধরে বক্তৃতা মঞ্চে নিয়ে আসছে এক এক করে। দেখলাম মশাই, মেয়েরা যাদের সাত চড়ে রা বেরুবে বলে দেখে মনে হয় না, তারা সব হিড় হিড় করে হাত-গলা থেকে সোনার গয়না খুলে মন্ত্রীমশায়ের প্রসারিত দু'হাতে তুলে দিলো। অস্বীকার করবো না আজ, আবেগে চোখে আমার জল এসে গিয়েছিলো। সভার শেষে আমরা ক'জন রিপোর্টার এখানে সংগৃহীত সম্পদ ও গত কয়েকদিনের সংগ্রহ ও আগামী কয়েকদিনের প্রোগ্রাম ইত্যাদি জানার জন্যে মন্ত্রীমহাশয়ের কাছে গিয়েছিলাম। তা উনি জানালেন যে উনি ভয়ানক ক্লান্ত আজ, পরের দিন সকালে যেন সার্কিট হাউসে গিয়ে তাঁর সঙ্গে কথা বলি, সেখানেই চায়ের নেমন্তন্ন। আরো জানা গেল মন্ত্রীমশাই সপরিবারেই এসেছেন এখানে, ওঁর এক শ্যালিকার শ্বশুরবাড়ি নাকি এখানেই। তিনজন রিপোর্টার সেদিন রাত্রেই কলকাতা ফিরে গিয়েছিলেন, বাকী পরের দিন সার্কিট হাউসে গিয়ে থ' বনার জন্যে রয়ে গেলাম আমরা দু'জন। আমাদের দেখে নয়ন সার্থক করতে হলো গরীব মধ্যবিত্তেরা মন্ত্রীমশাইদের এক ডাকে সাড়া দিয়ে তাবৎ সোনাদানা ত্যাগ করলেও মন্ত্রীগৃহিণী ও তাঁর ছোট মেয়ে এ-ব্যাপারে ভোগের মর্মটি বোঝেন ভালো। তা দু'জনের গায়ে কম করে পঞ্চাশ ভরি সোনা তো ছিলোই!

—না মা, এ-হার নিয়ে যাও, একশো টাকায় আমি বন্ধক নিতে পারবো না—পোদ্দারমশাই সুমনের মা'র হারছড়াটা ফিরিয়ে দেন।

—কী বলছেন পোদ্দারমশাই, এ যে সাড়ে তিন ভরি ওজনের হার,—

সময়

শান্তনু দাশ

চতুর্দিকে আর্তনাদ শুনি......
জানলা ভেজিয়ে দিলে দেয়াল গড়িয়ে
অসভ্য স্বপনটা নেমে আসে ঃ

শিয়রে দুঃখ নিয়ে কে কবে ঘুমুতে পারে
নিশ্চিন্ত প্রহরে,
খচিত শিরস্ত্রাণে শাণিত ছুরির মতো
পিছলে পড়ে আলো ঃ

ভয় হয়
কখন নিঃশব্দে আসে শ্বাপদের পায়ে এক অন্তিম সময়।

এখনো শেফালী

সুদর্শন রায়চৌধুরী

মরেও পারি নি আমি ভুলে যেতে তোমাকে, এখনো
বিষণ্ণ আলোকে যাই অনাহূত দু'হাতে উজাড়
বুকের রক্তের ডালি সে কী ছল পুরানো দোহার।

কিশোর খেলার মাঠ ভুলে গেছো অবাক শিয়রে
ফুলগুলি পড়েছিল আমরণ, আঁধার চাতালে
ঘুরেছি দু'চোখে আলো—পরবাসে গিয়ে কী হারালো।

মরেও পারি নি আমি ভুলে যেতে তোমাকে, এখনো
মনে পড়ে বালুচরে খেলা ছিল বাগানে উধাও
সেই যদি যাবে তবে কেন আজো শেফালী ছড়াও।

—হ্যাঁ, তা তো দেখলাম, কিন্তু কী দাম আছে এর বলো, গিনি সোনা বাজারে অচল, ধরা পড়ে মারা পড়বো শেষে—

—কিন্তু আমার সুমন যে নইলে কলেজে ভর্তি হতে পারবে না—

—তা আমি তার 'কী করবো'—তারপর যেন বিরক্ত হয়েই লোহার আলমারীতে হারগাছাটা যেন উপেক্ষাভরে ফেলে দিয়ে আশিটি টাকা গুণে দেন পোদ্দারমশাই।

ক'দিন থেকেই দেবু লক্ষ্য করছিলো লতিকা যেন কী বলতে চেয়ে বলতে পারছে না, জোর করে কিছু চেপে রাখতে চাইছে। শেষে এটা-ওটা ভূমিকা করে বলেই ফেললো ঃ দ্যাখো না গো, নতুন বালাটা কেমন চটে যাচ্ছে। বলে সে দু'হাত বাড়িয়ে বালা দু'খানা দেবুর চোখের সামনে তুলে ধরেছিলো। দেবুও পরিষ্কার দেখলো দু'টি বালারই খাবলা খাবলা চটা উঠে লোহা বেরিয়ে পড়েছে—

—আমি তখনি বলেছিলাম টাকাটা ব্যাঙ্কে রাখতে, গয়না এখন না গড়াতে। চোদ্দ ক্যারেটের সোনা তো এই হবে—

—চোদ্দ ক্যারেট কী বলছো গো, এ তো গিনি সোনার, মান্তুর মা, সুন্দর মা, মিসেস হালদার সবাই তো গড়িয়েছে ওর কাছ থেকে, মান্তুর মা'র জানাশোনা যে—সেই তো বলেছে কে বলেছে গিনি সোনা পাওয়া যায় না—তা মান্তুর মা'রটাই ঠিক আছে, আমাদের সুব্বাই-র এই অবস্থা, কী হবে এখন—

—কী আর হবে, চোরাই সোনা কিনেছো এ তো কাউকে বলতেও পারবে না, মামলাও করতে পারবে না, হাত কামড়াও এখন বসে বসে—

বেঁচে গিয়েছে পাঁচু দত্ত। পুঁজি কিছু করেছিলো, তাই দিয়ে সে দোকান সাজিয়ে ফেললো আবার বেনারসী, মুর্শিদাবাদ, কাশ্মীরী শাড়ি দিয়ে। খদ্দেরও নেহাৎ কম পড়ে না, বিক্রিপত্তরও মন্দ হয় না, খদ্দেরদের সঙ্গে হেসে কথা বলতেও ভোলে নি একেবারে। কিন্তু তবুও বাড়ি ফিরে যেন মন-মরা হয়ে থাকে। বৌ ফোড়ন কেটে বলে ঃ হুঃ, খাদ না মিশোতে পারলে ব্যবসায় সুখ কোথায় তোমাদের! পাঁচুর পৈতৃক ব্যবসার মর্ম তো বৌ বুঝবে না।

গোকুল এমন কাণ্ড করে বসবে বুঝতে পারে নি কেউ। ভেঙে পড়েছিলো সত্যি কথা, পাঁচ ছেলে-মেয়ে আর বৌ নিয়ে কাঁহাতক উপোস থাকা যায়। দেড় শো টাকা মাইনের কাজ করছিলো যখন গয়নার দোকানে তখন তবুও যা হোক একবেলা ভাত জুটেছিল, কিন্তু ছ'মাস ধরে কাজ নেই তার। অন্য কোন কাজও জানে না যে করবে, বিদ্যের দৌড়ও তিন-চার ক্লাস পর্যন্ত। হাল ফ্যাসানের ডিজাইনের গয়না গড়তেই শিখিয়েছিলো বাপ, আর কোন বিদ্যে তো দেয় নি। ঘরে নাইট্রিক এসিড ছিলো, সোনার বিশুদ্ধতা পরখ করার জন্যে, চোখ বুজে তাই গলায় ঢেলে দিলো, বিড়ম্বিত জীবনের পূর্ণচ্ছেদ টেনেছিলো।

খবর শুনে গৌতম লাফ দিয়ে উঠেছিলো—যাক তাহলে মেডেলটা এবার পাওয়া যাবে। পরীক্ষায় ভালো রেজাল্ট করার জন্যে সোনার মেডেল পাবার কথা ছিল, কিন্তু গিনি সোনা বাজারে কোথায়? তাই ওকে জানানো হয়েছিলো যে পরে দেওয়া হবে মেডেল। এখন আইন যখন পাল্টালো তখন মেডেল পেতে বাধা নেই কোনো।

কিন্তু গোকুলের বৌ রমলা? যখন বিশ্বনাথবাবু এলেন খবরটি নিয়ে, দুঃখু করছিলেন, আজ যদি গোকুল থাকতো তাহলে কি কারিগরের জন্যে আমার এখানে-ওখানে ছুটে মরতে হতো, তখন রমলা গোকুলের ফটোটা দেওয়াল থেকে নামিয়ে বুকে চেপে ধরে অঝোরে কান্না সুরু করে দিয়েছিলো।

* * *

বাপী, তামার নোট চালু করেছিলো বলে তুঘলককে পাগলা রাজা বলতো?—বুলবুলের প্রশ্ন ছিলো। আমি কিছু বলার আগেই ও আবার বলতে সুরু করলো তাহলে এখন যে একবার বাইশ ক্যারেট, একবার চোদ্দ ক্যারেট আবার বাইশ ক্যারেট করা হচ্ছে তাকে কী বলবে?

গ্রন্থমেলা

নবজাতক—সম্পাদিকা ঃ মৈত্রেয়ী দেবী। ১৩/১, পাম এ্যাভিনিউ, কলিকাতা—১৯। দাম ঃ দেড় টাকা।

ত্রৈমাসিক পত্রিকা 'নবজাতকে'র রবীন্দ্রসংখ্যা পড়ে আমরা মুগ্ধ হয়েছিলাম, তার আলোচনাও প্রকাশিত হয়েছিল। নবজাতকের শারদীয় সংখ্যাটির আরো অভিনব বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা গেল—যা পশ্চিম বাংলায় অসংখ্য পত্র-পত্রিকার মধ্যে লক্ষ্য করা যায় নি। সম্পাদিকা নবজাতকে পূর্ব বাংলা ও পশ্চিম বাংলার লেখকদের সম্মিলন ঘটিয়েছেন। পূর্ব-বঙ্গের অন্যতম প্রধান কথা-সাহিত্যিক সওকত ওসমানের গল্পে বর্তমান জীবন সমস্যা চমৎকার বিধৃত হয়েছে। এ সমস্যা ত' দুই বাংলারই। পূর্ববঙ্গের কবি কায়সুল হক লিখেছেন, 'ঝড়, বন্যা এমন কি করাল দুর্ভিক্ষ / জানি, কিছুই টলাতে পারে নি কখনো তাকে। / পশ্চিমবঙ্গের কবি লিখেছেন, 'বৃত্তিলোভী লেখকরা কোনো ডাক আজ শুনবে না।' অথচ 'বঞ্চিত মানুষেরাও বনে বে-ওকুফ' সুতরাং দুই বাংলাতেই আজ সত্যিকারের লেখকদের মনে তোলপাড় সুরু হয়েছে। বর্তমান অবস্থার অবসানই এ'দের কাম্য। নবজাতকে আটটি গল্পে যুগ-সমস্যাই প্রতিফলিত। খাজা আহম্মদ আব্বাস, আশাপূর্ণা দেবী, আন্তন চেখফ (অনুঃ) একালের নবীন গল্প লেখকদের কাছে নতুন পথের প্রেরণাদায়ক বলে মনে হবে। আবদুল আজীজ আল্-আমানের উপন্যাসটিও সেই প্রসঙ্গে উল্লেখ্য। শাহেদা চরিত্রটি নতুন দৃষ্টি-ভঙ্গিতে রচিত। একদিকে তার মনের ভয়ঙ্কর শূন্যতা, আর একদিকে কঠিন দায়িত্ব। ১১টি কবিতাই বক্তব্য প্রধান হয়েও রসোত্তীর্ণ। লিখেছেন হরপ্রসাদ মিত্র, গোপাল ভৌমিক, দুর্গাদাস সরকার, কবিরুল ইসলাম প্রমুখ। মন্মথ রায় লিখেছেন একাংকিকা। কান্তিচন্দ্র ঘোষের ধারাবাহিক নাটক 'মোগল বধূ'র ৩য় অঙ্ক বলা বাহুল্য চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌঁছেছে। মৈত্রেয়ী দেবীকে লিখিত রবীন্দ্রনাথের চিঠিতে 'সানাই' ও 'নবজাতকে'র কিছু অজ্ঞাত তথ্য প্রকাশিত হওয়ায় আমরা আনন্দিত। অন্নদাশঙ্কর রায়ের 'যৌবনে বিশ্বাস,' সুজিতকুমার মুখোপাধ্যায়ের 'রবীন্দ্রনাথ ও সংস্কার সমিতি' ও গোলাম ওসমানীর 'রেনেসাঁর আলোকে আলিগড় আন্দোলন' পাঠকদের দৃষ্টিকে খুলে দেবার পক্ষে যথেষ্ট। ব্যঙ্গচিত্রগুলিও বিশেষ উল্লেখ্য। কিন্তু সর্বাপেক্ষা উল্লেখ্য ফটো—আমেরিকায় যুদ্ধবিরোধী জনসভা, ভিয়েতনামে নরক সৃষ্টি ও আমেরিকায় নিগ্রোদের দারিদ্র্য। সেই সঙ্গে সম্পাদকীয়ও সত্য কথাই প্রকাশ করেছে।

শারদীয় বর্ধমানের বার্তা—সরল সেন। বর্ধমান। মূল্য ঃ দেড় টাকা।

সত্যিকারের সাহিত্য পত্রিকা। প্রচুর বিজ্ঞাপন দিয়ে পাঠক ঠকানোও হয় নি। এই শারদীয় পত্রিকাটি পড়ে পাঠকরা খুশি হবেন। রচনার আয়োজনও কম নয়। অর্ধশতাধিক গল্প, কবিতা, প্রবন্ধ ও রসরচনা। সংখ্যায় প্রাচুর্যের চেয়ে বেশি উল্লেখ্য রচনার মান। আর যাঁরা লিখেছেন, তাঁরাও বাংলা সাহিত্যজগতে এক-একটি জ্যোতিষ্কস্বরূপ, যেমন প্রেমেন্দ্র মিত্র, কুমুদরঞ্জন মল্লিক, নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, নরেন্দ্রনাথ মিত্র প্রমুখ। রচনার বৈচিত্র্য সম্পর্কে কিছু উল্লেখ না করলে শারদীয় বর্ধমানের বার্তার বিশেষ বৈশিষ্ট্যটুকু উপলব্ধি করা যাবে না। সেই

জয়ন্তী সেন

কারণে উল্লেখ করতে হয়—'ঢোল গোবিন্দের পাঁচালী', 'ভোজন রসিক', 'গন্ডার কাহিনী', 'বর্ধমান জেলার প্রাচীন বণিক সম্প্রদায়', 'পোস্টার কাব্য', 'পূজা-স্মৃতি' প্রভৃতি মূল্যবান রচনার। অনেক সময় দেখা যায় বর্ধমান থেকে প্রকাশিত পত্রিকায় বর্ধমানের আঞ্চলিক বৈশিষ্ট্যের নাম গন্ধ নেই—সেদিক থেকে এ পত্রিকা উল্লেখযোগ্য ব্যতিক্রম। স্বভাবতই এটি বর্ধমান জেলার অধিবাসীদের কাছেও আদরণীয় হবে। বর্ধমানের বার্তায় বিভিন্ন লেখকদের মধ্যে উপেন্দ্রনাথ সেনশাস্ত্রী, অমরেন্দ্র ঘোষ, দুর্গাদাস সরকার, এস মোহাম্মদ প্রমুখের লেখা বৈচিত্র্যগুণে মনোমুগ্ধকর। ছেলেদের বিভাগটিও সুপরিকল্পিত।

শারদ অরণি—সম্পাদক ঃ নীরেন রায়। ৪/২ এ, নফর কুণ্ডু রোড, কলিকাতা-২৬। মূল্য ঃ ১·৫০।

অন্যান্যবারের মতো এবারও শারদ অরণি আপন বৈশিষ্ট্যে সমুজ্জ্বল। ৪টি প্রবন্ধে চারটি বিষয় সমুপস্থিত, যথা 'ইতিহাস নতুন করে লিখতে হবে', (মণি বাগচি), 'বর্ণবিদ্বেষের প্রশ্নেঃ ৪জন শ্বেতাঙ্গ লেখক' (অমল হালদার), 'সংগ্রাম ও সাহিত্য' (নন্দগোপাল সেনগুপ্ত), 'সমালোচনা ও কবি' (প্রিয়লাল রায়)। প্রবন্ধগুলি অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত বলে মনে হয়েছে, অথচ প্রত্যেকটি প্রবন্ধই আগ্রহ সৃষ্টি করতে সমর্থ হয়েছে। কবিতা মোট তেরটি। লিখেছেন কিরণশঙ্কর সেনগুপ্ত, বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, দুর্গাদাস সরকার, পূর্ণেন্দুবিকাশ ভট্টাচার্য, নচিকেতা ভরদ্বাজ প্রমুখ। একটি আইরিশ নাটিকার ভাবানুবাদ 'প্রগতির গতি' প্রশংসনীয়। গল্প মোট দশটি। লিখেছেন বনফুল, জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী, হরেন ঘোষ, রবীন্দ্র গুহ প্রমুখ।

আভাতি—সম্পাদক ঃ নিত্যগোপাল সামন্ত। বিষ্ণুপুর, ২৪ পরগনা, ভায়া ঃ কলিকাতা-২৭। মূল্য ঃ এক টাকা।

মফস্বল থেকে প্রকাশিত হলেও এই ঝরঝরে পরিচ্ছন্ন পত্রিকাটির শারদীয় সংখ্যা গুণীমহলে সমাদৃত হবে। পত্রিকাটিতে যেমন প্রবীণ লেখকদের উৎকৃষ্ট রচনা প্রকাশ করতে সক্ষম হয়ে পাঠকদের তৃপ্ত করতে পেরেছে, তেমনি কিছু নবীন লেখককে তাঁদের পরীক্ষা-নিরীক্ষামূলক কৌতূহলোদ্দীপক রচনার মাধ্যমে তুলে ধরতে সমর্থ হয়েছে। তাছাড়া আঞ্চলিক বৈশিষ্ট্য প্রকাশে পত্রিকাটির দাবি অগ্রগণ্য। শারদ সংখ্যায় প্রকাশিত হয়েছে সজনীকান্ত দাসের অপ্রকাশিত কবিতা, মোহিতলাল মজুমদারের বাঙালীর ভাষা ও সাহিত্য সম্পর্কিত পত্রাবলী। এ ছাড়া হরপ্রসাদ মিত্রের 'ভক্তিসাধনার গান' অত্যন্ত উচ্চশ্রেণীর গবেষণামূলক প্রবন্ধ। 'আভাতি'তে ধারাবাহিক উপন্যাস লিখেছেন দুর্গাদাস সরকার। গল্প লিখেছেন হরেন ঘোষ, তপন সর্দার প্রমুখ। অজয় সেনগুপ্তের 'আজকের সমাজ চিন্তা' সত্য ভাষণের জন্য অপ্রিয় বলে মনে হতে পারে। কবিতা ও অন্যান্য রচনায় আছেন কুমুদরঞ্জন মল্লিক, প্রেমেন্দ্র মিত্র, সুকুমার সেন, নিখিলরতন মুখোপাধ্যায়, নলিনীকান্ত গঙ্গোপাধ্যায়, কৃষ্ণা রুদ্র, দিলীপ মুখোপাধ্যায় প্রমুখ। প্রচ্ছদপট বিশেষ প্রসংশনীয়।

সৌজাতা—সম্পাদক ঃ অশোক চট্টোপাধ্যায়। ২৯ এ, হরিশ চ্যাটার্জী স্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য ঃ ৫০ পয়সা।

এতে আছে গল্প, কবিতা ও সিনেমা। লেখকদের মধ্যে অনিলবরণ রায়, প্রেমেন্দ্র মিত্র, সঞ্জয় ভট্টাচার্য, রবি ঘোষ উল্লেখ্য।

অভিনব অগ্রণী—সম্পাদক ঃ দিলীপ-কুমার বাগ। ৫৩, গোপাল ব্যানার্জী লেন, হাওড়া। মূল্য ঃ এক টাকা।

কিশোরদের উপযুক্ত পত্রিকা। বৃহদায়তন নয় তবু গল্প, কবিতা ছাড়াও বিভাগ অনেক, যেমন বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ, নতুন যুগের কথা, স্মরণীয় যাঁরা, কচি-কাঁচার বৈঠক, সংবাদ বিচিত্রা প্রভৃতি। যেহেতু ছোটদের পত্রিকা সেই কারণে আরো সুঅলংকৃত হওয়া উচিত ছিল।

বৈরথ—সম্পাদক ঃ বরুণ গাঙ্গুলি। ৪২, হাজারীবাগ রোড, রাঁচী (বিহার)। মূল্য ঃ ৫০ পয়সা।

বহির্বাংলা থেকে প্রকাশিত এই পত্রিকাটি নিঃসন্দেহে অভিনন্দনযোগ্য। সম্পাদকীয় 'ভাঙা বাংলা জোড়া লাগলে' মননশীল প্রবন্ধের সমতুল্য। নির্ঝরিণী দেবরায়ের 'সাহিত্য বনাম সংস্কৃতি' পাঠকদের কিছুটা খুশি করতে পারবে। পত্রিকাটির প্রবন্ধগুলি ভারত সংস্কৃতিকে তুলে ধরছে, বাংলার ঐশ্বর্যকে প্রকাশ করতে সক্ষম হয়েছে। সে তুলনায় গল্প কবিতাগুলি আরো উচ্চস্তরের হওয়া দরকার। আমরা পত্রিকাটির দীর্ঘায়ু কামনা করি।

আরোহী—সম্পাদক ঃ রবিরঞ্জন চট্টোপাধ্যায়। ১৩/এ, মহিম হালদার স্ট্রীট, কলিকাতা। দাম ঃ ১.২৫।

আরোহী শারদীয় সংখ্যায় আছে প্রবন্ধ, গল্প, কবিতা ও সিনেমার ছবি। একালে নাকি সিনেমার ছবি ছাড়া পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করা যায় না—তা যেমনি হোক। যা হোক পত্রিকাটিতে প্রবীণ ও নবীন লেখকদের মধ্যে আছেন ধীরেন্দ্রলাল ধর, সত্যেশ্বর মুখোপাধ্যায়, নন্দগোপাল সেনগুপ্ত, নরেন্দ্র দেব, বনফুল, সমরেশ বসু, সন্তোষকুমার ঘোষ প্রমুখ।

সংশপ্তক—মানস দেববর্মণ কর্তৃক ১এ, মহারাণী স্বর্ণময়ী রোড, কলিকাতা-৯ থেকে প্রকাশিত। দাম ঃ এক টাকা।

গোষ্ঠীকেন্দ্রিক সংকলন। আশা করবো পত্রিকাটি সংশপ্তক গোষ্ঠীর লেখকরাই পড়বেন।

শ্রীচরণেষু—সম্পাদক ঃ ননীগোপাল দত্ত। ৬৪/এ, ধর্মতলা স্ট্রীট, কলিকাতা-১২। মূল্য ঃ ৭৫ পয়সা।

কিশোরদের মনের মতো রচনা দিয়ে শারদীয় শ্রীচরণেষুকে সাজানো হয়েছে। এতে আছে জীবনকথা, উপকথা, বনজঙ্গলের কাহিনী কাব্যনাট্য, ইতিহাসাগল্প, কবিতা গল্প প্রভৃতি। লিখেছেন কুমুদরঞ্জন মল্লিক, ফণীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, গোপাল ভৌমিক প্রমুখ।

কবিতা—সম্পাদনা ঃ সুপ্রিয় বাগচী। ডালগিস হাউস, কলি-৪৭। দাম ঃ ৫০ পঃ।

'আরও কবিতা পড়ুন' আন্দোলনের পক্ষে প্রকাশিত 'কবিতা'র শারদ সংকলনটি বেশ উল্লেখযোগ্য। তবে আন্দোলন করে কবিতা প্রচার করা যায় কি না সে সম্পর্কে মতভেদ থাকা অসম্ভব নয়। যাহোক 'কবিতা'য় যে সব কবিতা উপস্থাপিত করা হয়েছে তার অধিকাংশই সুবোধ্য। সুতরাং পাঠকরা 'কবিতা'র কবিতা পড়তে আগ্রহান্বিত হবেন। মোট চল্লিশজন কবির কবিতা সংকলিত। তবে কয়েকটি কবিতা বর্জিত হলেই ভালো হোত। জীবনানন্দ দাশ, সঞ্জয় ভট্টাচার্য, দুর্গাদাস সরকার, বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায় প্রমুখের কবিতা পড়ে গভীর আনন্দ পাওয়া যায়। কয়েকজন কবির কবিতা না থাকায় সংকলনটিকে অসম্পূর্ণতার দোষেও দুষ্ট বলে মনে হবে। দুটি প্রবন্ধ বেশ মননসমৃদ্ধ।

জয়তী—সম্পাদিকা ঃ শ্রীঅপরাজিতা গোপ্পী। ২।১ শ্রীনাথ দাস লেন, কলিকাতা-১২। মূল্য ঃ এক টাকা।

'জয়তী'তে একমাত্র মহিলাদের রচনাই স্থান পায়। সবচেয়ে বড় কথা, তাঁদের রচনার মধ্যে জীবনসংগ্রামের কাহিনী, আশা-ভরসার আলেখ্যই সুন্দরভাবে প্রতিফলিত। অনেক শিক্ষণীয় বিষয় আছে—যা নারী-পুরুষ নির্বিশেষে সকলেই পড়ে উপকৃত হবেন। 'জয়তী'র শারদীয় সংখ্যায় এমন কয়েকটি রচনা পড়লাম—যা অন্যত্র দুর্লভ; যেমন বীণা ভৌমিকের 'দুর্গং-পথস্তৎ', আগমনী লাহিড়ীর 'আধুনিক সমাজ ব্যবস্থা ও আমরা', গীতা বসু-মল্লিকের 'ইতিহাসের দলিল', প্রজ্ঞা পারমিতা ঘোষালের 'কার্ল মার্কসের মতবাদ ও তার প্রভাব', গৌরী দত্তের 'মেডিক্যাল সোস্যাল ওয়ার্ক' প্রভৃতি। এছাড়া গল্প কবিতাগুলি সুলিখিত। লিখেছেন আশা দেবী, অপরাজিতা গোপ্পী, পুষ্প পাঠক প্রমুখ।

জনসেবক—সম্পাদক ঃ শ্রীঅতুল্য ঘোষ। ১০৫/৭এ, সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জী রোড, কলিকাতা-১৪। মূল্য ঃ তিন টাকা।

'জনসেবক' শারদীয়া সংখ্যার বৈশিষ্ট্য এই যে, এটি সাহিত্যিক রচনায় সমৃদ্ধ। সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণণ 'সাহিত্য ও ধর্ম' প্রবন্ধে বলেছেন 'আমাদের চিন্তা এবং কর্মের মধ্যে অনিবার্য সঙ্ঘাত থাকাই সাহিত্য এবং ধর্মের কাজ'। প্রসঙ্গত, তাই তিনি বলেছেন, "আমরা মুখে বলছি, মুনাফাবাজদের আমরা শাস্তি দেব, কালোবাজারীদের বিতাড়িত করব। পনের-বিশ বছর ধরে আমরা একথা বলছি। কিন্তু কাজে তা করতে পেরেছি কি? বরং আমরা আমাদের কাজের দ্বারা সেই সব দুষ্কৃতিকারীদের আজও প্রশ্রয় দিয়ে চলেছি।" দুঃখের ব্যাপার এই যে, একালের সাহিত্য এ বিষয়ে প্রায় নীরব। 'জনসেবকে' পাঁচটি উপন্যাস লিখেছেন, প্রেমেন্দ্র মিত্র, লীলা মজুমদার, দিলীপ-কুমার রায়, ধনঞ্জয় বৈরাগী, মৃত্যুঞ্জয় মাইতি। বড় গল্প লিখেছেন 'জরাসন্ধ'। নয়টি ছোট গল্প যাঁরা লিখেছেন তাঁদের মধ্যে উল্লেখ্য হচ্ছেন বিমল মিত্র, আশাপূর্ণা দেবী, মনোজ বসু, সুশীল রায় প্রমুখ। দুটি নাটক, রম্যরচনা, প্রমথনাথ বিশীর বিচিত্র সংলাপ সুপাঠ্য। এছাড়া নয়টি কবিতা সুনির্বাচিত। অতুল্য ঘোষের রাজনীতি-নিরপেক্ষ 'একটি দাম্পত্য কাহিনী'তে আচার্য কৃপালনী ও সুচেতা কৃপালনীর ঘরোয়া জীবন পরিস্ফুট হয়েছে। হিরন্ময় বন্দ্যোপাধ্যায়, সৈয়দ মুজতবা আলী ও রেজাউল করীমের প্রবন্ধত্রয় মননজাত ও জনসেবকের প্রচ্ছদপট মনোরম।

শারদীয় জনমত—সম্পাদক ঃ চারুচন্দ্র সান্যাল। পোঃ ও জেলা জলপাইগুড়ি। দাম ঃ দু টাকা।

প্রথমেই উল্লেখ করতে হয় ডাঃ চারুচন্দ্র সান্যালের ভারতের সমস্যা প্রবন্ধটির। এ প্রবন্ধে বর্তমান সময়ের বহু সমস্যার সঙ্গে সমাধানের ইঙ্গিত দেখানো হয়েছে। আর্থিক, রাষ্ট্রনৈতিক, সামাজিক যাবতীয় সমস্যাই যথার্থভাবে উল্লিখিত হয়েছে। অন্যান্য প্রবন্ধগুলি সাহিত্য সম্পর্কিত। গল্পগুলিতে সমাজের বর্তমান রূপ বলিষ্ঠ তরুণ সাহিত্যিকদের কলমে সুপরিস্ফুট। কবিতাগুলিতেও বর্তমান ভাবনা ও জীবন-সত্যের পরিচয় লাভ করা যায়। বিশেষত একটি কবিতায় তথাকথিত রাজনীতিকের মুখোশ খুলে ফেলা হয়েছে। কবিতাটির নাম 'ভানুমতির খেল'। প্রাক্-স্বাধীনতা যুগের হাত কাটা ডাকাত স্বাধীন ভারতে কিভাবে পুরাতন বিপ্লবী সেজে গেছেন, তারই এক সুন্দর আলেখ্য রচিত হয়েছে ঐ কবিতায়। জনমতে ভিন্ন ভাবের ও ভিন্ন স্বাদের রচনা সংখ্যা ৩৯। লিখেছেন ভবানী সান্যাল, হরেন ঘোষ, দুর্গাদাস সরকার, বীরেন্দ্রপ্রসাদ বসু, মুকুলেশ সান্যাল, রাধারমণ প্রামাণিক, শিপ্রা পাল, বেণু দত্তরায়, বিমলকুমার ঘোষ প্রমুখ।

বঙ্গদর্শন

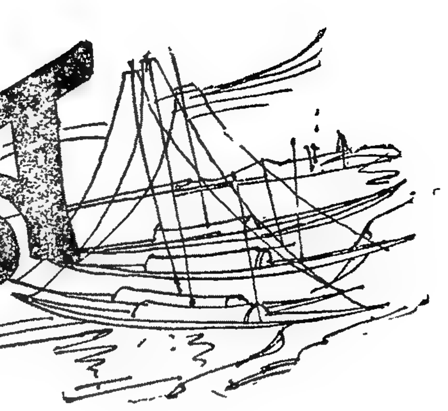

আসন্ন দুর্ভিক্ষের করাল ছায়া

এবারের অনাবৃষ্টির ফলে পশ্চিমবঙ্গে যে অভূতপূর্ব সংকটের সৃষ্টি হতে চলেছে, সে কথাটা খোদ মুখ্যমন্ত্রী সাংবাদিকদের কাছে কবুল করেছেন। অনাবৃষ্টির জন্য ফসল হানির কবলে পড়ে পশ্চিম দিনাজপুর, মালদহ, বাঁকুড়া ও পুরুলিয়ার প্রায় তিরিশ লক্ষ লোক অন্নকষ্টের সম্মুখীন হয়েছে, এ কথা মুখ্যমন্ত্রী মশাই জানিয়েছেন। যে শ্রেণীর লোক আজ নিদারুণ অন্নসংকটের মুখে পড়েছেন, তাঁরা হচ্ছেন ক্ষেতমজুর, দিনমজুর ও যাঁদের অল্প পরিমাণ জমি আছে। মুখ্যমন্ত্রী বলেছেন যে, খরার ফলে পশ্চিম দিনাজপুরে আমন ধান স্বাভাবিক ফলনের চেয়ে শতকরা পঁচাশী ভাগ, মালদহে শতকরা আশী ভাগ, বাঁকুড়ায় শতকরা ষাট ভাগ এবং পুরুলিয়ায় শতকরা ষাট ভাগ কম উৎপন্ন হয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী হিসাবের মধ্যে দক্ষিণবঙ্গকে কেন ধরেন নি বোঝা গেল না।

মুখ্যমন্ত্রী সাংবাদিকদের একথা জানিয়েছেন যে, সরকারের তরফ থেকে এই সব মানুষগুলিকে টেস্ট রিলিফ ইত্যাদি সাহায্য দেওয়া হবে। কিন্তু ক্ষুধিতের হাতে দু-চার টাকা ধরিয়ে দিলেই খাদ্য সমস্যার সমাধান হয় না। কৃষিকার্যের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট যে কোন মানুষই স্বীকার করবেন যে, মাটিতে সার দিলেই ভাল ফসল উৎপন্ন হয় না, যতক্ষণ না পর্যন্ত পর্যাপ্ত জলসেচন করা হচ্ছে। বাংলাদেশের মাটি বোধ হয় ভারতের যে কোন জায়গার মাটির চেয়ে উর্বরতর। শুধু পর্যাপ্ত জল পেলেই এখনো পর্যন্ত এই খণ্ডিত বাংলা ভারতের শস্যাগাররূপে চিহ্নিত হতে পারে। কিন্তু সেচব্যবস্থার চূড়ান্ত ব্যর্থতায় উর্বরা জমিকে বন্ধ্যা জমিতে পরিণত করা হচ্ছে।

আমাদের পিতামহ এবং সম্ভবত প্রপিতামহেরাও পুস্তকে পড়েছেন যে জলসেচ ব্যবস্থার অভাবেই ভারতে খাদ্যশস্যের ফলন সবচেয়ে কম। ভাবতেও অবাক লাগে স্বাধীনতার উনিশ বছর পরেও এ অবস্থার কোন উন্নতি হয় নি। পুষ্করিণীগুলি নষ্ট হয়ে গেছে, সেগুলির সংস্কারের কোন চেষ্টা নেই, বৈদ্যুতিক টিউবওয়েল দুরস্থান, নতুন খালের কথা ছেড়েই দিলাম। পুরাতন খালগুলি সংস্কারের অভাবে অকেজো, নদীমাতৃক বাংলা দেশের প্রাণস্বরূপা নদীগুলিও আজ নালায় পরিণত হয়েছে। সরকার এবং পরিকল্পনাকারেরা এ সব বিষয়ে বোধ হয় একেবারেই চোখ-কানের মাথা খেয়ে বসে আছেন। কৃষিজীবী মানুষের সাধারণ প্রয়োজনটুকুর দিকে দৃষ্টি দেবার অবকাশ সরকার ও পরিকল্পনা কমিশন পান নি। অথচ হাজার হাজার কোটি টাকা ব্যয়ে পরিকল্পনাবিলাস এ সরকারেরই নিজস্ব।

মনে পড়ে মানবেন্দ্রনাথ রায় একবার ভারতের পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা প্রসঙ্গে লিখেছিলেন, **ইউ কাণ্ট বিলড এ হাউস বাই বিগনিং টু বিলড ইট ফ্রম দি রুফ।** অর্থাৎ পরিকল্পনাকারেরা ঘর তৈরি করার জন্য ভিতের কাজ না করে গোড়াতেই ছাদ তৈরি করছেন। কিন্তু কিসের উপর ভর করে ছাদটি যে দাঁড়িয়ে থাকবে সেটা কিন্তু এঁরা চিন্তাতেও আনেন নি।

আমন ধান হবার পক্ষে তিনবার বৃষ্টির প্রয়োজন। প্রথম বারের জলে বীজের থেকে চারাগাছ তৈরি হবে, দ্বিতীয়বারের বৃষ্টিতে চারাগাছগুলিকে আবার নতুন করে রোপণ করতে হবে। এই পর্যায়ে বৃষ্টির পরিমাণ পর্যাপ্ত হওয়া চাই যাতে মাঠে অন্তত এক ফুটের কাছাকাছি জল দাঁড়ায়, এই জল শুকিয়ে মাঠ খটখটে হয়ে যাবার মুহূর্তে আর একবার বৃষ্টির প্রয়োজন নতুবা বেড়ে ওঠা গাছগুলি জ্বলে যাবে, প্রথমেই পাতাগুলির রং বাদামী হয়ে উঠবে তার পরেই শেষ—এবারে বহু স্থানেই যা হয়েছে। কিন্তু দেশে যদি উত্তম সেচব্যবস্থা থাকে তাহলে যে কোন মুহূর্তেই জলের যোগান দেওয়া যায়।

এই অবশ্যপ্রয়োজনীয় কাজটি সরকার উনিশ বছরেও সেরে উঠতে পারেন নি, আগামী কয়েক বছরের মধ্যেও তা হবার কোন সম্ভাবনাই নেই। অথচ মুখ্যমন্ত্রী মশাই যেন কত অবাক হয়েই বলছেন যে এই রকম অবস্থা তিনি তাঁর জীবনে কখনো দেখেন নি। তাঁদেরই শোচনীয় অবহেলায় ও অদূরদর্শিতায় যে অবস্থা আজ সৃষ্ট হয়েছে তার জন্য ভগবানকে দোষ দিয়ে আর লাভ কি?

কেন্দ্র কর্তৃক বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ প্রদর্শন

পশ্চিমবঙ্গের শোচনীয় খাদ্যাভাবের পরিপ্রেক্ষিতে কেন্দ্রীয় সরকার পশ্চিমবঙ্গকে যথাশক্তি খাদ্যশস্যের যোগান দিতে প্রতিশ্রুত হয়েছিলেন এবং বস্তুত কেন্দ্রীয় সরকারের প্রতিশ্রুতির উপর নির্ভর করেই পশ্চিমবঙ্গের বর্তমান খাদ্যনীতির পরিকল্পনা করা হয়েছিল। কিন্তু কেন্দ্রীয় সরকার প্রতিজ্ঞায় কল্পতরু হলে কি হবে, কার্যকালে এক দানা শস্যও পশ্চিমবঙ্গে দিতে রাজী হচ্ছেন না। সংবাদে প্রকাশ যে পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী প্রতিদিনই টেলিফোন, টেলিগ্রাম ও টেলিপ্রিন্টারযোগে কেন্দ্রের কাছে কিছু খাদ্যশস্য পাঠাবার যে আবেদন জানাচ্ছেন, তার বিনিময়ে ভূরি ভূরি প্রতিশ্রুতিই আসছে, খাদ্যের কোন চিহ্নই নেই। 'অন্ন জোটে না, কথা জোটে মেলা'। সরকারী বক্তব্য অনুযায়ী বাঁকুড়া, পুরুলিয়া, মালদহ ও পশ্চিম দিনাজপুরে প্রায় দুর্ভিক্ষের অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে অথচ এই সকল স্থানে রেশনে চিনি ছাড়া আর কিছুই দেওয়া যাচ্ছে না, এমন কি গমও নয়। এদিকে পশ্চিমবঙ্গের সরকারী গুদামগুলিও প্রায় শূন্য হয়ে এসেছে যার ফলে যে কোনদিনই শহরাঞ্চলের রেশনিং ব্যবস্থা ভেঙে পড়তে পারে। তদুপরি দক্ষিণবঙ্গ থেকে ক্ষুধিত অনেক মানুষ দলে দলে কলকাতা ও

শহরতলীর দিকে সপরিবারে চলে আসছেন, যাঁরা বেশির ভাগই ভূমিহীন ক্ষেতমজুর, গ্রামে রোজগার তথা খাদ্যসংগ্রহের কোন সুযোগ নেই। সরকারী ভাষ্য অনুযায়ী বিহারের দুর্ভিক্ষ প্রপীড়িত অঞ্চলগুলি থেকেও কিছু লোক পশ্চিমবঙ্গে আসতে আরম্ভ করেছে। বিহারে চালের দাম আকাশছোঁয়া হয়ে যাওয়ায় পশ্চিমবঙ্গের স্মাগলাররা এখন ওদিকে চাল পাচার করছে। সব মিলিয়ে যে চিত্রটি পাওয়া গেছে তা রীতিমত আশংকাজনক। প্রয়োজনের ক্ষেত্রে কেন্দ্রের উদাসীনতা দেখে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের এই শোচনীয় অবস্থার মধ্যেও কিছু শিক্ষালাভের প্রয়োজনীয়তা আছে। তা হচ্ছে পশ্চিমবঙ্গকে খাদ্যশস্যের ক্ষেত্রে স্বাবলম্বী হতে হবে, যে উর্বর ক্ষেত্রগুলি পাট উৎপাদনে নিযুক্ত হচ্ছে সেখানে ধান চাষ করাতে হবে। তাহলেই কেন্দ্রের টনক নড়বে, আর না নড়লেও কিছু চিন্তা নেই। শাস্ত্রে বলে পরহস্তগত ধন কার্যকালে কোন কাজেই লাগে না। এই শিক্ষাটি পশ্চিমবঙ্গ সরকারের গ্রহণ করা উচিত।

পশ্চিমবঙ্গের ছাত্রসমস্যা

ভারতবর্ষের অন্যান্য স্থানে যখন ছাত্র-বিক্ষোভ তুমুল আকার ধারণ করেছিল, এবং সেই বিক্ষোভের কারণগুলি বোঝা যাচ্ছিল না, তখন পশ্চিমবঙ্গের শিক্ষাক্ষেত্রগুলিতে শান্তিপূর্ণ অবস্থা দেখে এটুকু ধারণা হয়েছিল যে, পশ্চিমবঙ্গের ছাত্র-আন্দোলনসমূহ বোধ হয় কিছুটা উন্নততর সমাজসচেতনতার দ্বারা প্রভাবিত যে কারণে পশ্চিমবঙ্গের ছাত্রসমাজ গড্ডালিকা স্রোতে ভেসে যায় নি।

কিন্তু অত সহজেই যে হিসাব মেলানো যায় না তার প্রমাণ পাওয়া গেল ক'দিন পরেই যখন কলকাতার চারটি সরকারী কলেজে নির্ধারিত সময়ের বেশ কিছুদিন পূর্বে পূজার ছুটি দিয়ে দেওয়া হল এবং ছাত্ররা বিশ্ববিদ্যালয় ভবন ঘেরাও করে বসে রইল, বিশ্ববিদ্যালয়ের কার্যকলাপ বন্ধ করে দিল এবং সেই অবস্থাতেই বিশ্ববিদ্যালয়ে পূজার ছুটি পড়ে গেল।

ছাত্র একটি অত্যন্ত স্পর্শকাতর স্থান, যে কারণে ছাত্রসংক্রান্ত কোন ব্যাপার লিখতে যাওয়ার চেয়ে বিড়ম্বনাকর কাজ আর কিছুই নেই। বয়সের ধর্মে ছাত্ররা অত্যন্ত আবেগপ্রবণ, তারা সামান্য প্রশংসাতেই খুশি হয়ে ওঠে এবং সামান্য সমালোচনাতেই বিচলিত হয়। তবুও আমরা আশা রাখি যে, ছাত্ররা আমাদের এই আলোচনা কিছুটা যুক্তিসহকারে অনুধাবন করার চেষ্টা করবে। দেশের সমগ্র ছাত্রসমাজকে উল্লেখ করেই আমরা এ কথা বলছি। এ কথাও স্পষ্ট করে বলে রাখা ভাল ছাত্রদের অযথা নিন্দা করার কোন অভিপ্রায় আমাদের নেই।

এবারকার ছাত্র-বিক্ষোভের কারণ হচ্ছে কয়েকটি কলেজ হতে কয়েকজন ছাত্র-ছাত্রীকে বহিষ্কৃত করা হয়েছে এবং তারই প্রতিবাদে এই বিক্ষোভ। অবশ্য সর্বক্ষেত্রেই যে বহিষ্কারের ন্যায়সংগত কারণ আছে তা নয়, যেমন একটি ছাত্রীর কথা আমরা জানি যার বিষয় সংবাদপত্রে যা প্রকাশিত হয়েছিল তার ভিত্তিতে এটুকু বলা যায় যে, তাকে বহিষ্কৃত করার কোন কারণ নেই। অন্তত ছাত্রীটি সম্বন্ধে প্রকাশিত বিবরণের কোন প্রতিবাদ যখন সংশ্লিষ্ট কলেজ কর্তৃপক্ষের তরফ থেকে আসে নি তখন আপাতত আমরা তাকে নির্দোষই বলব।

কিন্তু এমন কতকগুলি ক্ষেত্র আছে যেখানে ছাত্রদের প্রকৃতই দোষ আছে। যদি কলেজ কর্তৃপক্ষ ডিসিপ্লিনারি অ্যাকশন হিসাবে স্পেসিফিক কয়েকটি অপরাধে অভিযুক্ত এক বা একাধিক ছাত্রের সম্বন্ধে কোন ব্যবস্থা অবলম্বন করেন, তাঁদের তা করার সম্পূর্ণ বৈধ অধিকার আছে, আশা করি এ কথাটায় কেউ আপত্তি করবেন না। কিন্তু সেই অধিকার কার্যকরী করতে গিয়ে এমন একটা অবস্থার সৃষ্টি হল যা ছিল সম্পূর্ণ অনভিপ্রেত। কিভাবে এই অবস্থার উদ্ভব হল সে বিষয়ে কিছুটা আলোকপাত করার প্রয়োজন আছে।

আমরা বিশ্বস্তসূত্রে যা সংবাদ পেয়েছি তার ভিত্তিতে এ কথা বলা যায় যে কলকাতার সবচেয়ে ডাকসাইটে কলেজের অধ্যক্ষ এবং সরকারী শিক্ষাবিভাগের সংশ্লিষ্ট বড়কর্তামশাই-এর দূরদর্শিতার অভাবেই অবস্থার এতখানি অবনতি হয়েছে। তাঁদের কাছে কয়েকটি ছাত্রের বিরুদ্ধে নির্দিষ্ট কতকগুলি অভিযোগ পেশ করা হয়েছিল। সেই লজ্জাজনক অভিযোগগুলির জন্য গোড়াতেই তাদের বিরুদ্ধে যদি কঠোর ব্যবস্থা অবলম্বিত হত তা' হলে ব্যাপারটা এতদূর গড়াতো না, বা ছাত্রসংগঠনগুলিও অভিযুক্ত ছাত্রদের সমর্থনে এগিয়ে আসত না। কিন্তু কলেজ কর্তৃপক্ষ তথা সরকারী শিক্ষাবিভাগ এ ব্যাপারে গড়িমসি করলেন, তাঁরা ব্যবস্থা অবলম্বন করতে কেন জানি না ভয় পেলেন, এবং অশুভস্য কালহরণম নীতি অবলম্বন করে জগদ্দল পাথরের মত নির্বিকার রয়ে গেলেন। এতে অভিযুক্ত সেই কতিপয় ছাত্রের হিরো হয়ে ওঠা রাতারাতি সম্ভব হয়ে উঠল, এবং অনেকেই ভাবতে আরম্ভ করলেন দোষটা বোধ হয় একতরফা নয়, নতুবা কর্তাব্যক্তিরা কোন ব্যবস্থা অবলম্বন করছেন না কেন?

এর সঙ্গে আবার নতুন আর একটি বিষয় যুক্ত হল, কলকাতার আরও দুটি কলেজ থেকে এমন দু-চারজন ছাত্র-ছাত্রীকে বহিষ্কৃত করা হল যাদের মধ্যে কেউ কেউ সত্যিই হয়ত নির্দোষ। এই রকম একটি সম্ভাব্য উদাহরণ আমরা আগেই দিয়েছি। ফলে বিক্ষোভের অন্যায্য কারণের সঙ্গে কয়েকটি ন্যায্য কারণও জুটে গেল এবং সব মিলিয়ে মুষ্টিমেয় কজনের ব্যাপারটা সার্বিক রূপ পেয়ে গেল। যে কলেজের কর্তৃপক্ষরা গোড়ায় গড়িমসি করেছিলেন শেষকালটায় তাঁরা গোড়া কেটে আগায় জল দেবার মত হঠাৎ তৎপর হয়ে উঠলেন। পূজার ছুটির মধ্যেও তাঁরা আরও দুজনকে বহিষ্কৃত করেছেন। কিন্তু বিলম্বে যে বুদ্ধির উদয় হয় তা সর্বদা সুবুদ্ধি হয় না।

এখন বর্তমানে উদ্ভূত পরিস্থিতির সঙ্গে কিভাবে মোকাবিলা করা যাবে তার একটা পরিকল্পনার প্রয়োজন আছে। কোন বিভাগের আভ্যন্তরীণ কাজকর্মের সকল বিষয়ই বাইরে প্রকাশ করা চলে না একথা ঠিক, তবে বর্তমানে এই জটিল পরিস্থিতি উদ্ভূত হবার দরুণ সংশ্লিষ্ট কলেজ কর্তৃপক্ষ যদি বহিষ্কৃত ছাত্র-ছাত্রীদের বিরুদ্ধে নির্দিষ্ট কি কি অভিযোগ আছে সেগুলি সাধারণ্যে প্রকাশ করেন, এবং যথোপযুক্ত তদন্তের দ্বারা শাস্তিলাভের যারা যোগ্য তাদের শাস্তিদান, এবং যারা নির্দোষ তাদের মুক্তি দিলেই বোধ হয় সমস্যার সমাধান হবে।

আবার প্রাইভেট বাস

কলকাতার রাজপথে প্রাইভেট বাসের পুনরাগমন হচ্ছে, তাতে হয়ত যাত্রীদের সামান্য কিছু সুবিধা হতে পারে, কিন্তু নতুন করে প্রাইভেট বাসকে ডেকে আনার অর্থই হচ্ছে সমাজতান্ত্রিক আদর্শের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ রাষ্ট্রীয় উদ্যোগের নীতি থেকে পিছিয়ে আসা এবং রাষ্ট্রীয় পরিবহন সংস্থার ব্যর্থতার প্রকাশ্য স্বীকৃতি।

কিন্তু এরকম হবার কথা ছিল না। রাষ্ট্রীয় পরিবহন সংস্থার অযোগ্যতার জন্যই যে অবস্থার উদ্ভব হয়েছে তার মোকাবিলার জন্য যে পথ অবলম্বন করা হল তার কুফল সুদূরপ্রসারী হবে।

পশ্চিমবঙ্গ সরকার চেষ্টা করলে রাষ্ট্রীয় পরিবহন সংস্থাকে লোকসানের অতল গহ্বর না বানিয়ে তাকে একটি লাভজনক প্রতিষ্ঠানে পরিণত করতে পারতেন। মাথাভারী শাসনব্যবস্থার জন্যই রাষ্ট্রীয় পরিবহন সংস্থাকে লোকসান সহ্য করে চলতে হয়। কর্মীদের, বিশেষ করে

ড্রাইভার ও কণ্ডাক্টারদের বেতন এত কম যে তারা কাজ করতে নিরুৎসাহ হয়ে পড়ে। প্রাইভেট বাসের একজন ড্রাইভারের বেতন দৈনিক বার টাকা সেখানে স্টেট বাসের ড্রাইভাররা কত পান? প্রাইভেট বাসের কণ্ডাক্টাররা টিকিট বিক্রয়লব্ধ অর্থের উপর কমিশন পান, ফলে তাঁদের দৃষ্টি থাকে যাতে একজন যাত্রীও বিনা টিকিটে না যেতে পারে। কিন্তু স্টেট বাসে এটি হয় না। হওয়া সম্ভবও নয় কেন না একখানি একতলা প্রাইভেট বাসে দুজন কণ্ডাক্টার এবং দুজন ক্লীনার থাকে। কণ্ডাক্টার দুজন টিকিট বিক্রয় করে এবং ক্লীনার দুজন দুই গেটে দাঁড়িয়ে থাকে এবং যাত্রী বাস থেকে নামবার সময় টিকিট চেক করে নেয়। সেখানে দোতলা স্টেট বাসে শুধুমাত্র দুজন কণ্ডাক্টার, তারা যখন ভিতর দিকে টিকিট বিক্রয় করতে যায়, তাদের ফাঁকি দিয়ে যে কোন লোকের পক্ষেই বাস থেকে নেমে যাওয়া সম্ভব।

রাষ্ট্রীয় পরিবহনের সদর দপ্তরের মাথার উপর গণ্ডা গণ্ডা মোটা বেতনের অফিসার না পুষে, বাসগুলিতে ক্লীনার কাম চেকারের সংখ্যা বৃদ্ধি করলে টিকিট বিক্রয়লব্ধ অর্থের পরিমাণ বাড়বে এবং কণ্ডাক্টারদের কমিশনের ব্যবস্থা করলে তারা চেষ্টা করবে যাতে একটিও লোক বিনা টিকিটে না যেতে পারে। এর ফলে স্টেট বাস কর্তৃপক্ষের যে অধিকতর অর্থ লাভ হবে তার দ্বারা অনায়াসে বাসের সংখ্যা বৃদ্ধি করা চলতে পারবে এবং যাত্রীদের স্বাচ্ছন্দ্যের ব্যবস্থাও করা চলবে বাইরে থেকে বেনো জল ঢুকিয়ে ঘর সাফ করতে গেলে ঘরের ময়লা হয়ত ভেসে যাবে কিন্তু পরে থিতিয়ে যাওয়া বেনো জলের কাদা দূর করতে অধিকতর সমস্যায় পড়তে হবে।

বামপন্থী ঐক্য

আসন্ন নির্বাচন ও বামপন্থী ঐক্য সম্পর্কে কয়েকটি পত্র আমাদের হস্তগত হয়েছে। পত্রগুলোর বিষয়বস্তু গুরুত্বপূর্ণ বলে বিবেচিত হওয়ায় আমরা একটি পত্র বঙ্গদর্শনে প্রকাশ করছি এবং এ বিষয়ে 'পাঠকমনে' মতামত আহবান করছি। পত্রটি লিখেছেন চব্বিশ পরগনা জেলার নৈহাটি থেকে শ্রীমণীন্দ্রকুমার দাস। নিম্নে পত্রটি আগাগোড়া উদ্ধৃত করা হলঃ

"দুঃখের সঙ্গে লক্ষ্য করছি যে, বর্তমানে আপনারা আগামী সাধারণ নির্বাচন ও বামপন্থী ঐক্য সম্পর্কে বঙ্গদর্শনে কোন আলোকপাত করছেন না। যেহেতু সংবাদপত্র ও নানান ধরণের পত্রপত্রিকাই জনমত প্রকাশের একমাত্র বাহন সেই হেতু গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের নাগরিক হিসাবে আমার এই বক্তব্যগুলি আপনার পত্রিকায় প্রকাশ করেন, তাহলে একান্তই বাধিত থাকব। কেন না আমার এইটুকু বিশ্বাস যে, বর্তমানে শম্বুকগতিতে বামপন্থী ঐক্যের যেটুকু প্রচেষ্টা চলছে তার মূলে আছে জনসাধারণের চাপ, সংশ্লিষ্ট পক্ষগুলির ইচ্ছা নয়, এবং সেই চাপের প্রকাশ ঘটেছে আপনাদের মত অতি অল্প দু'চারটি পত্রিকার মাধ্যমেই।

"কংগ্রেসী দুঃশাসনের হাত থেকে মুক্তি পাবার একমাত্র উপায় হচ্ছে একটি জনপ্রিয় বামপন্থী সরকার গঠন এবং এটা এমন কিছু একটা অসম্ভব ব্যাপার নয়। কেন না, সার্বিকভাবে বিচার করলে ভোটের বেশির ভাগই কংগ্রেস বিরোধী বাক্সগুলিতেই পড়ে যদিও বামপন্থীদের পারস্পরিক বোঝাপড়ার অভাবেই সেই ভোট বহুভাগে বিভক্ত হয়ে যাবার দরুণ কংগ্রেস দলই ফাঁকতালে বাজি মাৎ করে।

"বিগত খাদ্য-আন্দোলনের পর থেকেই কংগ্রেসী শাসনে বীতস্পৃহ জনসাধারণ একটি বিকল্প বামপন্থী সরকারকে পশ্চিমবঙ্গের শাসনে অধিষ্ঠিত দেখতে চান, এবং আপনাদের ভাষায় বিকল্প বামপন্থী সরকার গঠনের যে সুযোগ এবারে এসেছিল তা শতাব্দীতে একবার আসে। যদি একথাও ধরে নেওয়া যায় যে, বিকল্প বামপন্থী সরকারকে কেন্দ্র বরদাস্ত করবে না, ছলে-বলে, কৌশলে এখানে রাষ্ট্রপতির শাসন কায়েম করবে, তাহলেই আপনাদের ভাষায়, কংগ্রেস অপরাজেয় এই ধারণা দূর করার জন্যও কংগ্রেসকে পরাজিত করা প্রয়োজন এবং তা করতে পারে একটি শক্তিশালী বামপন্থী ফ্রন্ট।

"কিন্তু বামপন্থী দলগুলির মতিগতি দেখে আমরা আশঙ্কা না করে পারছি না। জনসাধারণ তাঁদের হাতে যে ক্ষমতা অর্পণ করতে চান নিজেদের দলীয় স্বার্থে তাঁরা যদি জনসাধারণের ইচ্ছার সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করেন, ইতিহাস তাঁদের ক্ষমা করবে না। আমাদের ছোট মুখে অবশ্য বড় কথা শোভা পায় না, তবে ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে এটুকু বুঝি যে, মার্কসবাদ অনুসারেই, মার্কস ও লেনিনের নামের সঙ্গে পার্টির নাম যুক্ত করলেই, সেই পার্টিই ইতিহাসের জিম্মাদার হয় না, মার্কসের নামাবলী গায়ে জড়িয়েও ক্ষেত্রবিশেষে ইতিহাসের ডাস্টবিনে নিক্ষিপ্ত হবারও সম্ভাবনা থাকে, যদি না সঠিক পদ্ধতি অবলম্বন করা যায়।

"গত নির্বাচনেও বিকল্প সরকারের কথা বামপন্থী দলগুলি বলেছিলেন, কিন্তু গতবারে যে সমস্যা ছিল না, এবারে তা উদ্ভূত হয়েছে। আজ একথা দিবালোকের ন্যায় স্পষ্ট যে, এবারের বামপন্থী ঐক্যের সবচেয়ে বড় বাধা হচ্ছে কমিউনিস্ট পার্টির দুই শরিকে বিরোধ। এদের এই পারিবারিক কলহ, তথা দলীয় স্বার্থবোধের উৎকট উগ্রতা শুধু জনসাধারণের স্বার্থসিদ্ধিরই প্রতিকূল হচ্ছে না আগামী দিনগুলির জন্য জনসাধারণের বরাতে অসীম লাঞ্ছনা নিয়ে আসছে। আজ একথা কে অস্বীকার করতে পারেন যে, যদি আগামী নির্বাচনে কংগ্রেস জয়ী হয় বাম-মনোভাবসম্পন্ন কোন ব্যক্তিই রেহাই পাবেন না, কেন না বর্তমান কংগ্রেসের মধ্যে ফ্যাসীবাদী প্রবণতা যেভাবে বৃদ্ধি পাচ্ছে তাতে আগামী কয়েক বছরে বামপন্থী কর্মী, সমর্থক ও বুদ্ধিজীবীদের সমূহ বিপদের সম্ভাবনা। মনে রাখতে হবে যে, হিটলার ভোটের দ্বারাই ক্ষমতায় এসেছিল, এবং ক্ষমতায় এসেই রাইখস্ট্যাগ ভবন পুড়িয়ে তার দায়িত্ব কমিউনিস্টদের ঘাড়ে চাপিয়েই তাদের কোতল করেছিল।

"আমার যতদূর স্মরণ হয় গোড়ার দিকে বামপন্থী কমিউনিস্ট দল বামপন্থী ঐক্যের প্রতি কোন গুরুত্বই আরোপ করেন নি, শেষ পর্যন্ত অবশ্য জনমতের চাপে তাঁরা কিছুটা নতি স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছেন। এ বিষয়ে বিধান পরিষদের একটি উপনির্বাচনে তাঁদের মনোনীত প্রার্থী শ্রীআমোদ বসুর শোচনীয় পরাজয়ের পর তাঁদের কিছুটা চেতনা হয়। তা ছাড়া বামপন্থী কমিউনিস্ট পার্টির সর্বভারতীয় উপরতলা যখন নির্বাচনী সমঝোতা নীতির কথা ঘোষণা করেন, তখন ইচ্ছায় হোক, অনিচ্ছায় হোক পশ্চিমবঙ্গের বামপন্থী কমিউনিস্ট পার্টিকে সেই তিক্ত বটিকা গলধঃকরণ করতে হয়েছে যদিও এতে তাঁরা খুব স্বস্তি বোধ করছেন একথা বলা যায় না।

"বাম ও দক্ষিণ, কমিউনিস্ট পার্টির এই দুই শরিকের বিরোধের তাত্ত্বিক ক্ষেত্র হয়ত কিছু থাকতে পারে, কিন্তু বর্তমান ক্ষেত্রে সে প্রশ্ন একেবারেই অবান্তর, কেন না মূল কথা হচ্ছে এই যে, কমিউনিস্ট পার্টির দুই শরিকই যখন ভোটের মারফতেই আইনসভায় যেতে চাইছেন, তখন তাঁরা কেউই কমিউনিস্ট নন, কেন না ব্যালট বাক্সের কোন গুরুত্বই মার্কসীয় অনুশাসনে দেওয়া নেই। এ কথার জবাবে তাঁরা অবশ্য তাঁদের নির্বাচনে দাঁড়াবার যুক্তিকে অনেক তত্ত্বকথার প্রলেপে ঢেকে দেবার চেষ্টা করবেন, কিন্তু আমার বৃদ্ধবয়সে অতটা তত্ত্বকথা সহ্য হবে না। বিশেষ করে বামেদের উদ্দেশ্যে আমার নিবেদন যে তাঁরা নিজেদের যতই সাচ্চা কমিউনিস্ট বলে ঘোষণা করুন না কেন, যে মুহূর্তে তাঁরা তথাকথিত বুর্জোয়া

নির্বাচনে অংশগ্রহণ করার নীতি মেনে নিয়েছেন, সেই মুহূর্তেই তাঁরা কমিউনিস্ট হিসাবে তাঁদের চরিত্র খুইয়েছেন। কাজেই দক্ষিণপন্থী ও অপরাপর মার্কসবাদী পার্টিদের ভেজাল এবং নিজেদের সাচ্চা বলে ঘোষণা করে তাঁরা জনসাধারণের চোখে নিজেদেরই খেলো করছেন।

"তবে বুর্জোয়া নির্বাচনে অংশগ্রহণ করার নীতি অবলম্বন করে বামপন্থী কমিউনিস্ট পার্টি যে একান্ত ভুল করেছেন একথা বলা যায় না, কেন না বর্তমান অবস্থায় বিশুদ্ধ শ্রমিক বিপ্লবের দ্বারা রাষ্ট্রক্ষমতা দখল করা সম্পূর্ণ অসম্ভব ব্যাপার। সেই অসম্ভবকে সম্ভব করার ক্ষমতা এবং পরিবেশ যখন তাঁদের নেই তখন নির্বাচনে দাঁড়ানো ছাড়া তাঁদের সামনে আর কোন পথও খোলা নেই। সেই যখন তাঁরা নির্বাচনে দাঁড়াচ্ছেন তখন কেন অপরাপর কংগ্রেসবিরোধী দলের সঙ্গে সমান মর্যাদার ভিত্তিতে আসন বন্টন এবং কমসূচী গঠন করছেন না? আসন বণ্টনের ব্যাপার নিয়ে তাঁরা যে দৃষ্টিভঙ্গীর পরিচয় দিচ্ছেন তা অপরাপর কংগ্রেস বিরোধী দলগুলির নিকট বন্ধুত্ব-সুলভ নয়, গার্জেনসুলভ। এই কারণেই বামপন্থী ঐক্যের অঙ্কুরে বিনষ্ট হবার সম্ভাবনা দেখা গেছে।

"এর জবাবে বামপন্থী কমিউনিস্ট পার্টি বলবেন যে, যেহেতু তাঁদের সাংগঠনিক শক্তি অপরাপর দলগুলির চেয়ে বেশি, অন্তত দক্ষিণপন্থীদের চেয়ে বেশি সেই হেতু গার্জেনগিরির অধিকার তাঁদের মৌলিক অধিকার এবং অপরাপর দলগুলিকেও একমাত্র তাঁদেরই নির্দেশে চলতে হবে। তাঁদের এই যুক্তি প্রমাণ সাপেক্ষ, কেন না যে যুক্তি দিয়ে তাঁরা বাংলা কংগ্রেসকে খাটো করে দেখছেন তাঁরা নিজেরাও সেই যুক্তির শিকার হয়েছেন। বাম কমিউনিস্টদের বক্তব্য হল পশ্চিমবঙ্গের আইনসভায় বাংলা কংগ্রেসের সদস্যরা বাংলা কংগ্রেসের টিকেটে নির্বাচনে জয়ী হয়ে আসেন নি, এসেছেন কংগ্রেসের সংগঠন শক্তির জোরে। ঠিক সেই একই যুক্তি বাম ও দক্ষিণ উভয় কমিউনিস্ট পার্টির ক্ষেত্রেই খাটে। দুই শরিকই এসেছেন, অবিভক্ত কমিউনিস্ট পার্টির তরফ থেকে, এবং সেই কারণেই উভয় তরফের শক্তির কোন তুলনামূলক মূল্যায়ন চলে না।

"এখানে আমি কমিউনিস্ট পার্টির দুই শরিকের উপরেই গুরুত্ব আরোপ করছি, কেন না আসন্ন নির্বাচনে বামপন্থী ঐক্য সার্থকভাবে গড়ে তোলার অথবা তা বানচাল করার দায়িত্ব এই দু' তরফের একটির উপরেই বর্তাবে। এখন আমাদের জিজ্ঞাস্য অতঃপর কোন্ পথ অবলম্বিত হবে? জনগণের প্রত্যাশা কি শেষ পর্যন্ত পূর্ণ হবে? অথবা নিজেদের মধ্যে কোন্দল করে তাঁরা কংগ্রেসী অপশাসনকে নতুন করে টিকে থাকার ইজারা দেবেন? এটাই বোধ হয় পশ্চিমবঙ্গবাসীর বর্তমানে একমাত্র জিজ্ঞাসা।"

আচার্য দীনেশচন্দ্রের জন্ম শতবার্ষিকী

পশ্চিমবঙ্গের সর্বত্রই ক্ষুদ্র এবং বৃহৎ পরিসরে আচার্য দীনেশচন্দ্র সেনের জন্ম শতবার্ষিকী পালন করা হচ্ছে। আচার্য দীনেশচন্দ্র কোন পরিচয়ের অপেক্ষা রাখেন না, বাংলা তথা বাঙালীর বহু পুণ্যের ফলেই দীনেশচন্দ্রের মত মানুষের আবির্ভাব বাংলাদেশে হয়েছে যিনি বাঙালী সংস্কৃতির মর্মস্থলে প্রবেশ করে বিশ্ববাসীর সম্মুখে বাংলা সাহিত্যের গৌরবময় অতীতকে তুলে ধরেছিলেন। বাংলা সাহিত্যের প্রাণশক্তি যুগ যুগ ধরে তার লোকসাহিত্যের মধ্যেই নিহিত রয়েছে এ সত্য জগতের সামনে দীনেশচন্দ্রই তুলে ধরেন। প্রকৃত অর্থে দীনেশচন্দ্রই বঙ্গভাষা ও সাহিত্যের প্রথম সার্থক ইতিহাসকার। তিনি শুধু বঙ্গভাষা ও সাহিত্যের ইতিহাস লিখেই ক্ষান্ত হন নি, স্নাতকোত্তর শিক্ষায় বাংলা সাহিত্যের পঠন ব্যবস্থা করে মাতৃভাষাকে তিনি সেই মর্যাদার আসনে অভিষিক্ত করেছিলেন, যে মর্যাদা বাংলা সাহিত্যের আগে ছিল না। দীনেশচন্দ্রের পদাঙ্ক অনুসরণ করে পরবর্তীকালে বঙ্গভাষা ও সাহিত্যের উপর অনেক গবেষণা হয়েছে, কিন্তু পথিকৃৎ হিসাবে দীনেশচন্দ্র চিরকালই অমর হয়ে থাকবেন। তবে দুঃখের সঙ্গে একথাও স্বীকার করতে হবে যে, যে বাংলাভাষার উন্নতির জন্য দীনেশচন্দ্র প্রাণপাত করেছেন বর্তমানে সেই ভাষার যথাযোগ্য মর্যাদা নেই। আজও স্নাতকোত্তর স্তরে তথা বিজ্ঞান ও অপরাপর ক্ষেত্রে বাংলাভাষার স্থান নেই। বাংলাভাষায় নিজেদের গবেষণালব্ধ ফলাফল প্রকাশ করতে বাঙালী পণ্ডিতেরা আজও কুণ্ঠিত। কাজেই দীনেশচন্দ্রের স্মৃতির প্রতি যদি বাঙালীকে সত্যই শ্রদ্ধা জানাতে হয় তাহলে তাকে মাতৃভাষায় যাবতীয় জ্ঞান-বিজ্ঞানের চর্চা করতে হবে।

কলকাতায় মহাবোধি সোসাইটি হলে আচার্য দীনেশচন্দ্র সেনের জন্মশতবর্ষপূর্তি উৎসবের উদ্বোধন

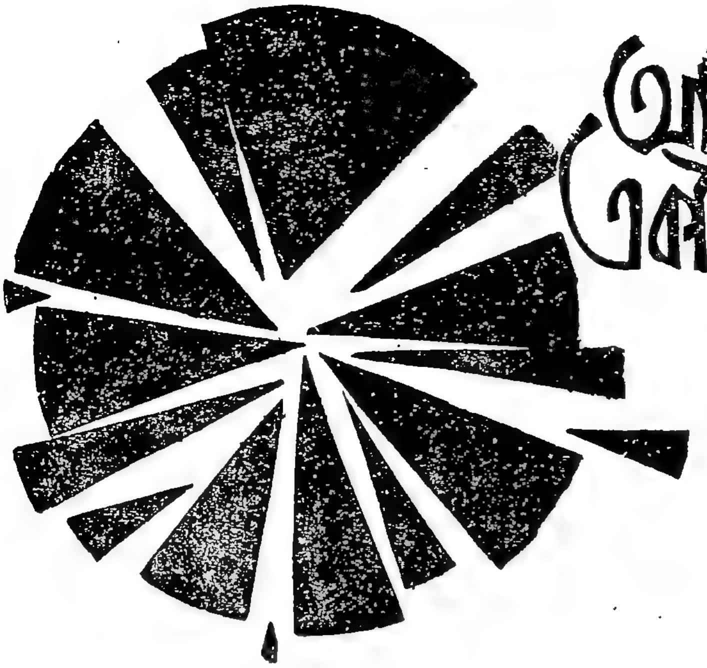

অগ্নিযুগের একটি অধ্যায়

অনন্ত সিংহ

শেষ ক'টি দিন

যে-বৈঠকে আমাদের হেডকোয়ার্টারে, যুব-বিদ্রোহের চূড়ান্ত দিন ও ঘণ্টা ধার্য হয়ে গেল, সেই সময় থেকে অভ্যুত্থানের বাকি আর মাত্র পাঁচদিন। সামনে অসংখ্য খুঁটিনাটি কাজ—খুব শক্ত নয় অথচ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। প্ল্যান অনুযায়ী টিন ভর্তি পেট্রোল কিনে বিভিন্ন নির্ধারিত স্থানে রাখা, অস্ত্রশস্ত্র ও বিভিন্ন সাজসরঞ্জাম গোপন সংরক্ষিত স্থান থেকে বার করে লক্ষ্যবস্তুর সন্নিকটে লোকচক্ষুর অন্তরালে স্থানান্তরিত করা, সবার কাঁধে ঝোলান থলেগুলিতে ফর্দ অনুযায়ী সব জিনিসপত্র ভর্তি করে বিভিন্ন গ্রুপ পরিচালকদের তত্ত্বাবধানে রাখার ব্যবস্থা করা; যে সব সভ্য বাড়ি থেকে বন্দুক নিয়ে আসবে—প্রায় ১২। ১৪টি বন্দুক হবে—সেগুলিকে বিভিন্ন সময় ও সুযোগে বাড়ি থেকে সরানো এবং প্রয়োজন অনুসারে আক্রমণের লক্ষ্যবস্তুর সান্নিধ্যে সেগুলিকে পাঠানো; আগে থেকে মোটর গাড়ি ভাড়া করে রাখা, প্রভৃতি অসংখ্য কাজের সঠিক নিয়ন্ত্রণের জন্য আমাদের কর্ম-চাঞ্চল্যের অন্ত ছিল না। এই শেষ ক'টি দিন আমরা ও আমাদের প্রথম সারির সভ্যরা অস্বাভাবিকভাবে ব্যস্ত হয়ে পড়লাম। আমাদের সদাচঞ্চল সদা-ব্যগ্র ও অধীর গতিবিধির সঠিক কারণ বোঝার ক্ষমতা কারও ছিল না। তাই অভিভাবকেরা হলেন বিরক্ত ও অসন্তুষ্ট, আর পুলিশ হল সন্দিগ্ধ সচকিত ও জাগ্রত।

সেই শেষ ক'টি দিনে পুলিশ ও আমাদের কর্মব্যস্ততার একটি বাস্তব চিত্র দেখতে পাওয়া যাবে সরকারী তথ্যের মধ্যে। ট্রাইব্যুনালের প্রেসিডেন্ট মিঃ জে ইউনীর জাজমেন্ট—ফুলস্কেপ সাইজের পাতায় ২০৪ পৃষ্ঠায় ইংরেজীতে মুদ্রিত হয়েছে। সেই বইয়ের চৌদ্দ থেকে পঁচিশ পৃষ্ঠাব্যাপী, সাদা পোষাক পরিহিত পুলিশ প্রহরীরা দিবারাত্রি আমাদের গতিবিধির উপর সর্বক্ষণ কিরূপ তীক্ষ্ন দৃষ্টি রেখেছে তার কিছুটা নমুনা ঐ বই-এর চৌদ্দ থেকে পঁচিশ পৃষ্ঠা পর্যন্ত পাওয়া যাবে। সেই এগারো পৃষ্ঠার মাঝখান থেকে আমি মাত্র জাজ্‌মেন্ট কপির দু'টি পৃষ্ঠার বিষয়বস্তুর উল্লেখ করে পাঠক-পাঠিকাদের মনে একটি বাস্তব চিত্র উপস্থিত করতে চেষ্টা করছি —পুলিশের কিরকম সজাগ দৃষ্টির সামনে আমাদের সর্বদা সতর্ক হয়ে কাজ করতে হয়েছিল! কোন সামান্য ত্রুটিও উপেক্ষার বস্তু বলে মনে করা আমাদের পক্ষে সম্ভব ছিল না। অতি সামান্যতম ত্রুটির অবহেলাও হয়ত আমাদের সমস্ত আয়োজনকে ব্যর্থ করে দিত!

আমাদের বিরুদ্ধে মামলার রায় থেকে উদ্ধৃত করছি,—

"A. S. I. Sasanka Bhattacharyee (P. W. 82) says :—

'On 14th April 1930 at 7-20 a.m. I saw Surjya Sen, Nirmal Sen and Ambika Chakravarti come to the house of Ganesh Ghosh. Ganesh, Tripura Sen, Amarendra Nandi and Bhabatosh Bhattacharyee were already in the shop. At 7-30 a.m. Rajat Lal Sen and Monoranjan Sen came to the shop. At 7-35 a.m. Ambika Chakravarti, Nirmal and Surjya left the shop and went towards the north in a tikka gharry by Nandan kanan and Paltan road. I followed them. They went to the congress office. At 7-45 a.m. I saw Lokenath Bal, Naresh Roy, Saroj Kr. Guha coming out of the house of Ananta Singh and going south on foot. I saw them as I was following the gharry. At 8-42 a.m. Surjya, Ambika and Nirmal reached the Congress Office. At about 8.50 a.m. I saw Ananta Singh, Makhan Ghosal and Himangshu Bimal Sen going in a car No. 24666 to the Congress Office where they talked with others.

'At 6-30 p.m. I saw Lokenath Bal, Tripura Sen, Bidhu Bhattacharyee, Ardhendu Guha, Makhan Ghosal, Monoranjan Sen, Rajat Sen, Naresh Rai, Harigopal Bal, Saroj Kanti Guha talking together at the Sadarghat jetty. At about 7-20 p.m. Lokenath, Tripura, Bidhu and Naresh Rai left the jetty and went towards the north. At about

7-25 Bhabatosh, Makhan, Monoranjan, Rajat, Harigopal, Sarojkanti and Ardhendu left the jetty and went into the house of Ganesh Gosh'." (Ibd. P—10).

এই উদ্ধৃতি থেকে পাওয়া যাচ্ছে যে, বাদীপক্ষের ৮২ নং সাক্ষী—A. S. I. (অ্যাসিসটেন্ট-সাব-ইনস্পেক্টর) শশাঙ্ক ভট্টাচার্য, ১৯৩০ সালের ১৪ই এপ্রিলের রিপোর্টে বলছে—সকাল ৭-২০ মিনিটে সে মাস্টারদা নির্মলদা ও অম্বিকাদাকে গণেশের বাড়ি আসতে দেখেছে। সে বলছে যে গণেশ, ত্রিপুরা, অমরেন্দ্র ও ভবতোষ আগে থেকেই দোকানে ছিল। আবার সকাল ৭-৩০ মিনিটে সেখানে মনোরঞ্জন সেনকে আসতে দেখেছে। এর পাঁচ মিনিট পরে, ৭-৩৫ মিনিটে, অম্বিকাদা, মাস্টারদা ও নির্মলদা গণেশের দোকান থেকে বেরিয়ে একটি ঘোড়ার গাড়ি নিয়ে নন্দনকানন ও পল্টনের রাস্তার দিকে এগোলেন। সে তাদের পিছু নিতে ছাড়ল না। দেখতে পেল তাঁরা কংগ্রেস অফিসের দিকে অগ্রসর হচ্ছেন। মাস্টারদা-দের ঘোড়ার গাড়ি অনুসরণ করবার সময়, এই A. S. I., শশাঙ্ক, ৭-৪৫ মিনিটের সময় লোকনাথবাবু, নরেশ রায় ও সরোজ-কান্তি গুহকে অনন্ত সিংহের বাড়ি থেকে বেরিয়ে এসে দক্ষিণের দিকে যেতে দেখল। কিছুক্ষণের মধ্যে, ৮-৪২ মিনিটের সময়, মাস্টারদা, অম্বিকাদা ও নির্মলদাকে আবার কংগ্রেস অফিসে এসে পৌঁছাতে দেখেছে। ঠিক আট মিনিট পরে, ৮-৫০ মিনিটে, মাখন ঘোষাল ও হিমাংশুর সঙ্গে অনন্ত সিংহকে ২৪৬৬৬ নম্বরের মোটরগাড়ি করে কংগ্রেস অফিসে আসতে ও অন্যান্যদের সঙ্গে কথাবার্তায় যোগ দিতে দেখেছে।

পুলিশ গুপ্তচর শশাঙ্ক ভট্টাচার্য, তার ১৪ই তারিখের রিপোর্টে আরও বলেছে—সন্ধ্যে ৬-৩০ মিনিটের সময় সে লোকনাথ প্রমুখ আমাদের এগারোজন সাথীকে সদরঘাট জেটির ওপর দেখতে পায়। কিছুক্ষণ বাদে, সন্ধ্যে ৭-২০ মিনিটের সময়, জেটি পরিত্যাগ করে লোকনাথের সঙ্গে তিনজন চলে গেল উত্তরে। পাঁচ মিনিট পর, ৭-২৫ মিনিটে, বাকি সাতজন গণেশ ঘোষের বাড়ির ভেতর প্রবেশ করল।

জজ্‌সাহেব সেই একই দিনের আর একজন সাদা পোষাক পরিহিত পুলিশ প্রহরীর রিপোর্ট উল্লেখ করে রিপোর্টের সত্যতা প্রমাণ করতে চাইলেন।

আবার জাজ্‌মেন্ট থেকে উদ্ধৃতি দিচ্ছি,—

"With this may be compared the evidence of A. S. I. Sanatan Karmakar (P. W. 71) for the same day:—

'On 14th April at 8-45 a.m. Surjya Sen, Ambika Chakravarti and Nirmal Sen came to the Congress Office in a Tikka gharry. At 8-55 a.m. Ananta Singh, Himangshu Bimal and Makhan Ghosal came along the Paltan road to the Congress Office in Car No. 24666. Then at 10 a.m. Ananta Singh, Nirmal Sen, Makhan Ghosal and Himangshu left the Congress Office and went off south by the Paltan Road in the same car. At 4 p.m. Surjya Kumar Sen and Ambika Chakravarti left the Congress Office and went southwards. At 6 p.m. Nanda Lal Singh came along the Paltan Road to the Congress Office in car No. 24666. He had a boy servant with him. He left half an hour later'." (Ibd. P—17).

এখানে বলা হচ্ছে অ্যাসিসটেন্ট-সাব-ইনস্পেক্টর—সনাতন কর্মকার একই দিনে অর্থাৎ ১৪ই তারিখে রিপোর্ট দেয়। সেও সকাল ৮-৪৫ মিনিটের সময় মাস্টারদা, অম্বিকাদা ও নির্মলদাকে ঘোড়ার গাড়ি করে কংগ্রেস অফিসে আসতে দেখেছে। আবার ১০ মিনিট পর, ৮-৫৫ মিনিটের সময়, তার রিপোর্টে বলা হচ্ছে, মোটর-গাড়ি নং ২৪৬৬৬ করে পল্টনের রাস্তা ধরে অনন্ত সিংহ, নির্মল সেন, হিমাংশু ও মাখন ঘোষাল কংগ্রেস অফিসে এসে উপস্থিত হল। তারপর সকাল দশটার সময় সে বলছে এরা চারজন আবার সেই গাড়ি করেই পল্টনের রাস্তা ধরে চলে গেল। বিকেল চারটার সময় মাস্টারদা ও অম্বিকাদাকে কংগ্রেস অফিস থেকে বেরিয়ে দক্ষিণ দিকে চলে যেতে সে দেখেছে। নন্দলাল সিংহ (আমার দাদা) একজন চাকরকে সঙ্গে নিয়ে ছ'টার সময় ২৪৬৬৬ নম্বরের মোটরগাড়ি করে কংগ্রেস অফিসে আসেন ও আধঘণ্টা পরে ফিরে যান।

১৪ই এপ্রিলের মাত্র দুটি-তিনটি পুলিশ রিপোর্ট উল্লেখ করে তাদের তৎপরতার একটু আভাস দেওয়া গেল। এইরূপ বহু পুলিশ প্রহরী আমাদের সব সময় ঘিরে থাকতো। আর মাত্র তিনদিন সময় আমাদের হাতে আছে। তারপর, ১৮ই এপ্রিল, সশস্ত্র আক্রমণের দিন। কাজেই, আমাদের কর্মব্যস্ততা কমবার কথা নয়। অন্যদিকে পুলিশ আমাদের ঐরূপ কর্মচঞ্চলতা দেখে যে খুবই বিচলিত হয়েছিল তাতে কোন সন্দেহ নেই। তবু বৃটিশ আমলের পুলিশ 'Rowlat Committee'-র রিপোর্টের অভিজ্ঞতার বাইরে আমাদের বৈপ্লবিক সংগঠনের প্রকৃত শক্তি ও ব্যাপক পরি-কল্পনা সম্বন্ধে আর বেশি কিছু ভাবতে পারে নি। তাই আমাদের কর্মচঞ্চলতার বাস্তব কারণও তারা হৃদয়ংগম করতে পারে নি। আগেও বলেছি—এখনও বলছি, দলে বিশ্বাসঘাতক না থাকলে পুলিশ খড়ি গুণে কিছু জানতে পারে না।

১৪ই তারিখের গুপ্তচর বিভাগের পুলিশ রিপোর্ট থেকে এইটুকু দেওয়া হল। সেইরূপ ১৭ই তারিখের আর একটু বিবরণ দিচ্ছি। সেখানে দেখতে পাওয়া যাবে পুলিশ আরও কত বেশি তৎপর হয়ে উঠল। তাদের রিপোর্ট থেকেই বোঝা যাবে যে, আমরা কতখানি কর্মব্যস্ততার মধ্যে ছিলাম।

জাজমেন্ট থেকে উদ্ধৃত করছিঃ—

"The watch evidence for 17th and 18th April discloses intense and (regarded in the light of subsequent events) extremely significant activity among the six ex-detenus and their associates, which is best described in the 'watcher's own language.—

"17th April.

'At about 7 a.m. I saw Lokenath Bal and Ardhendu Dastidar coming out of the house of Lokenath Bal on the Patharghata road and going towards the house of Ganesh Ghosh. I followed them. They entered the house of Ganesh Ghosh. At 8 a.m. I saw Lokenath Bal, Ananda Gupta. Harigopal Bal and Tripura Sen taking tea in a Mohammedan tea-shop near the Graduates' High School. After taking tea they returned to Ganesh Ghosh's shop and at 8-30 a.m. Lokenath Bal and Ardhendu Dastidar returned to Lokenath's basha. From Lokenath's house I went back to the fixed point and from there to Ganesh Ghosh's shop about 9

a.m. Inside I saw Ananta Singh, Ganesh Ghosh, Tripura Sen and Harigopal Bal talking together. After 10 or 15 minutes Jiban Ghoshal came to the door of the shop and then Ganesh Ghosh and Ananta Singh came out to him and all three got into the car No. 24666 which was standing infornt of the shop and went along the Court Road and towards the Congress Office. I followed them on a cycle and saw them go inside the Congress Office. I remained standing nearly. About half an hour later they came out and got into the car and went to the house of Lokenath Bal. I followed them on my cycle. Lokenath Bal came out of his house and got into the car and they proceeded towards Ganesh Ghosh's shop. I followed them and seeing the car stop infront of the shop I returned to the fixed point. About 9-45 a.m. I saw Ananta Singh and Ambika Chakravarti come out of Ganesh Ghosh's shop and get into a new car which was standing on the road a little to the west of Ganesh Ghosh's shop. I have not noted the number of the car. They went towards the south.' (P. W. 83).

'At about 4-30 p.m. I saw Bidhu Bhattacharjee going to the Congress Office in car No. 246A. The car was driven by Umesh. At 5 p.m. Bidhu Bhattacharjee and Ambika Chakravarti left the Congress Office and went east in that car along the Empress Road.' (P. W. 71).

'At about 5-10 p.m. Naresh Rai went to Ganesh Ghosh's shop where I saw Ganesh Ghosh, Nanda Lal Singh, Bhabatosh . Bhattacharjee, Harigopal Bal and Bidhu Bhattacharjee sitting talking together. In front of the shop the car No. 24666 was standing waiting.' P. W. 81).

'On 17th April at about 1 a.m. I saw motor car No. 24666 at the junction of Dewanhat and Pahartali Road (i.e. near the A. F. I. armoury). There were three persons in the car of whom I recognised Ganesh Ghosh and Makhan Ghosal. It was coming from Pahartali side and went eastwards towards the Railway Building. I followed it on my Cycle up the Town Inspector's Bunglow when they put on speed and I could not follow further. It went on eastwards in the direction of the Congress Office'." (P. W. 82). (Ibd. P—24).

জজসাহেব তাঁর রায় লিখতে গিয়ে মন্তব্য করছেন, ১৭ই তারিখ ও ১৮ই তারিখ গুপ্তবিভাগের পুলিশ প্রহরীদের রিপোর্ট থেকে পাওয়া যায়—ছয়জন প্রাক্তন ডেটিনিউ ও তাদের দলীয় সহকর্মীদের গতিবিধি কতখানি গুরুত্বপূর্ণ ও তীব্রতর আকার ধারণ করেছিল! তারপর তিনি লিখলেন, প্রহরীদের নিজ ভাষায় তা' প্রকাশ করলেই সব চেয়ে ভাল বোঝা যাবে। প্রথমে তাঁর মন্তব্যে এইটুকু বলে গিয়ে তারপর তিনি চারজন সাদা পোষাক পরিহিত পুলিশ প্রহরীর ১৭ই তারিখের রিপোর্ট তাঁর জাজমেন্টে উল্লেখ করেছেন।

১৭ই এপ্রিলের রিপোর্ট

বিবাদীপক্ষের ৮৩ নম্বরের পুলিশ-সাক্ষীর রিপোর্টে পাওয়া যাচ্ছে সকাল ৭টার সময় সে লোকনাথ ও অর্ধেন্দুকে, লোকনাথের বাসা থেকে গণেশের বাসায় যেতে দেখেছে। সে তাদের অনুসরণ করে তাদের গণেশের বাড়ির মধ্যে ঢুকতে দেখল। এক ঘণ্টা পরে, ৮টার সময়, গ্র্যাজুয়েট স্কুলের সামনে একটি মুসলমানের দোকানে বসে লোকনাথ, আনন্দ, হরিগোপাল ও ত্রিপুরাকে চা খেতে দেখেছে। তারা চা খেয়ে গণেশের দোকানে এল এবং ৮-৩০ মিনিটের সময় লোকনাথ ও অর্ধেন্দু, লোকনাথের বাসায় ফিরে গেল। সেই গুপ্ত-প্রহরী সেখান থেকে তার নির্দিষ্ট স্থানে ফিরে গেল এবং সকাল ৯টা থেকে গণেশ ঘোষের দোকানের প্রতি নজর রাখছিল। সেখানে অনন্ত সিংহ, গণেশ ঘোষ, ত্রিপুরা সেন এবং হরিগোপালকে সে একসঙ্গে কথাবার্তা বলতে দেখেছে। দশ-পনেরো মিনিট পর জীবন ঘোষাল দরজার সামনে এসে দাঁড়াল। সঙ্গে সঙ্গে গণেশ ও অনন্ত সিংহ, মাখনকে নিয়ে ২৪৬৬৬ নম্বরের মোটরগাড়ি করে কংগ্রেস অফিসের দিকে ছুটল। সাইকেলে সে তাদের গাড়ি অনুসরণ করে এবং শেষ পর্যন্ত দেখল যে তারা কংগ্রেস অফিসে ঢুকে পড়েছে। সে সেখানে তাদের পাহারা দিয়ে দাঁড়িয়ে রইল। আধঘণ্টা পর, তার রিপোর্ট অনুযায়ী, আমরা গাড়ি করে লোকনাথের বাড়িতে হাজির হলাম। সে তখনও সাইকেলে অনুসরণ করেছে এবং দেখতে পেল যে, আমরা লোকনাথকে সঙ্গে নিয়ে গণেশের বাসায় এলাম। আমাদের গাড়ি গণেশের দোকানের সামনে দেখে সে তার নির্দিষ্ট স্থানে ফিরে গেল। ৯-৪৫ মিনিটের সময় অম্বিকাদা ও আমাকে সে দেখতে পেল যে, আমরা গণেশের বাড়ি থেকে বেরিয়ে একটু দূরে একটি নতুন গাড়িতে গিয়ে উঠলাম ও দক্ষিণের দিকে রওনা হলাম।

৭১ নম্বরের সরকারী সাক্ষীও একজন গুপ্ত-পুলিশ-প্রহরী। তার রিপোর্টটিতে সে বলছে ৪-৩০ মিনিটের সময় ২৪৬-এ নম্বরের মোটরে করে বিধুবাবু কংগ্রেস অফিসের দিকে গেলেন। আবার আধঘণ্টা পর, ৫টার সময়, তাঁকে অম্বিকাদার সঙ্গে কংগ্রেস অফিস থেকে বেরিয়ে এম্প্রেস রাস্তা দিয়ে পূব দিকে যেতে দেখল। ৮১ নম্বরের বাদীপক্ষের সাক্ষী, পুলিশ প্রহরীর রিপোর্টে পাওয়া যাচ্ছে ৫-১০ মিনিটের সময় সে নরেশ রায়কে গণেশের বাড়িতে যেতে দেখল এবং গণেশের দোকানে নন্দলাল সিংহ, ভবতোষ, হরিগোপাল এবং বিধু ভট্টাচার্যকে আলাপ-আলোচনায় ব্যস্ত থাকতে দেখেছে। আর ২৪৬৬৬ নম্বরের গাড়িটি দোকানের সামনে দাঁড়ানো ছিল বলে তার দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে।

তারপর পাচ্ছি ৮২ নম্বরের সরকারী পুলিশ সাক্ষীর রিপোর্ট। সে বল্‌ছে ১৭ই তারিখ রাত একটায় A. F. I. অস্ত্রাগারের কাছে ২৪৬৬৬ নম্বরের গাড়িতে গণেশ, মাখন ও আরও একজনকে দেখতে পায়। জজসাহেব গুরুত্ব বোঝাবার জন্য ইটালিকস-এ, অর্থাৎ বাঁকা অক্ষরে এই কটা কথা ছাপলেন—at about 1 a.m. সেই গাড়িটি পাহাড়তলীর দিক থেকে এসে রেল-কোয়ার্টার অভিমুখে চলে গেল। টাউন ইন্সপেক্টরের বাংলো পর্যন্ত সে তার সাইকেলে পেছু ধাওয়া করে থেমে পড়ল। আমাদের গাড়ি পূবে, কংগ্রেস অফিসের দিকে যেতে যেতে অদৃশ্য হয়ে গেল।

তারপর ১৮ই তারিখে আমাদের

ওপর পুলিশের কতখানি প্রখর দৃষ্টি ছিল তার কিছুটা বর্ণনা পুলিশ প্রহরীর নিজ ভাষায় দিলেন। ১৮ই এপ্রিল আমাদের অভ্যুত্থানের দিন ছিল। আক্রমণের ঘণ্টাটি নির্ধারিত ছিল রাত আটটায়। পুলিশ পাহারার রিপোর্ট আমরা এখানে সকাল আটটা থেকে বিকেল পাঁচটা পর্যন্ত পাচ্ছি। জজসাহেব এইভাবে রিপোর্টটি উল্লেখ করলেন—

"18th April.

'At 8 a.m. while I was passing along Sadarghat Road I saw Lokanath Bal standing on the threshold of Ganesh Ghosh's shop'. (P. W. 83).

৮৩ নম্বর সাক্ষী, ১৮ই এপ্রিল সকাল ৮টার সময় লোকনাথকে গণেশের বাড়ির দরজায় দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে।

'About 8 a.m. I saw Ananta Lal Singh and Ganesh Ghosh coming out of Ganesh Ghosh's shop. They went north in car No. 24666 along Court Road and Paltan Road. I followed them. They went to the Congress Office and there met Surjya Sen, Nirmal Sen and Ambika Chakravarti. At about 8-50 a.m. Ananta, Ganesh, Nirmal and Ambika left the Congress Office and proceeded south along Paltan Road in car No. 24666. I followed them. They went into the house of Ganesh Ghosh.' (P. W. 82).

পুলিশের গুপ্ত-প্রহরী (৮২ নম্বরের বিবাদীপক্ষের সাক্ষী), গণেশ ও আমাকে সকাল ৮টার সময় গণেশের বাড়ি থেকে বেরিয়ে আসতে দেখে। সদর আদালত ও পল্টনের রাস্তা দিয়ে ২৪৬৬৬ নম্বরের মোটরগাড়ি করে আমাদের যেতে দেখে সে সাইকেলে অনুসরণ করে। সে বলছে আমরা কংগ্রেস অফিসে সূর্য সেন, নির্মল সেন ও অম্বিকা চক্রবর্তীর সঙ্গে একত্র হলাম। তার কথা মত জানা যাচ্ছে যে, ৮-৫০ মিনিট নাগাদ আমরা চারজন—নির্মলদা, অম্বিকাদা, গণেশ ও আমি সেই গাড়িতেই পল্টনের রাস্তা দিয়ে ফিরে গেলাম। যথারীতি সে সাইকেলে আমাদের অনুসরণ করেছে এবং গণেশের বাড়ির ভেতরে আমাদের প্রবেশ করতে দেখে নিশ্চিন্ত হল।

পাঠকদের বোঝবার সুবিধার জন্য একটু বলা প্রয়োজন, নইলে সেই সব পুলিশ রিপোর্টকে নিছক বানানো গল্প বলে মনে হবে যে তারা সাইকেলে মোটরগাড়ি অনুসরণ করেই আমাদের গতিপথ ও গন্তব্যস্থল জানতে সমর্থ হয়েছে।

সাইকেলে অনুসরণ করে গাড়ির গন্তব্যস্থল বিশেষ ক্ষেত্রে; জেনে ফেলা যদি অসম্ভবই হোত তবে সেরূপ মিথ্যা সাক্ষীর বিরুদ্ধে আদালতের বিরূপ প্রতিক্রিয়া দেখা দিত। চট্টগ্রাম শহর খুব ছোট। আমাদের সাধারণ গন্তব্যস্থলগুলি গুপ্ত-পুলিশ দলের প্রায় একেবারে মুখস্থ ছিল। তা'ছাড়া আমাদের সাধারণ গতিবিধির গণ্ডিটিও এক থেকে তিন মাইলের অধিক ছিল না। তাই ছোট শহরের সরু রাস্তা দিয়ে ভিড় ঠেলে খুব দ্রুতগতিতে গাড়ি চালান সব সময় সম্ভব হোত না এবং তার দরকারও ছিল না। এই কারণে পরিচিত পথে এইটুকু দূরত্ব সাইকেলে অতিক্রম করে পূর্ব-চিহ্নিত স্থানগুলির সন্ধান রাখা পুলিশের পক্ষে খুব শক্ত ছিল না।

১৮ই এপ্রিল আবার ৭১ নম্বর সাক্ষী, আর একজন পুলিশ প্রহরী, তার রিপোর্টে বলছে—

'At 9-15 a.m. Jiban Ghosal came to the Congress Office in car No. 24666. Five minutes later he left the Congress Office and went off along Paltan Road with three others in the car. I was at a distance and could not make out who they were.' (P. W. 71) (Ibd. P—24).

এই পুলিশ প্রহরী সকাল ৯-১৫ মিনিটের সময় জীবন ঘোষালকে ২৪৬৬৬ নম্বরের মোটরে করে কংগ্রেস অফিসে যেতে দেখেছে। পাঁচ মিনিটের মধ্যেই সে অন্য তিনজনের সঙ্গে মোটরগাড়িতেই পল্টনের রাস্তা দিয়ে চলে গেল। এই গুপ্ত-পুলিশটি দূরে থাকায় বাকি তিনজনকে চিনতে পারে নি বলে রিপোর্টে উল্লেখ আছে। পনেরো মিনিট পরে আবার ৯-৩০ মিনিটের সময় আর একজন পুলিশ প্রহরী—৮১ নম্বরের সাক্ষী, পল্টনের রাস্তায় নরেশ রায়কে সাইকেলে উত্তর থেকে দক্ষিণে যেতে দেখল।

'At 9-30 a.m. I saw Naresh Rai coming along the Paltan Road from north to south on a Cycle.' (P. W. 81).

৮৩ নম্বর সরকারী পক্ষের সাক্ষী, আর একজন পুলিশ ওয়াচার, তার রিপোর্টে বলছে—সকাল দশটার সময় অর্থাৎ ৮১ নম্বর সাক্ষীর লক্ষ্য করবার আধঘণ্টা পর, সে সদর কোতোয়ালীর পশ্চিমদিকের রাস্তায় দাঁড়িয়ে ছিল। সেই সময় 246-A নম্বরের একটি নতুন মোটরগাড়ি করে অনন্ত সিংহকে উত্তরদিকে যেতে সে দেখেছে।

'At 10 a.m. I was standing on the road to the west of Kotwali when I saw Ananta Singh going north in a new motor car No. 246-A. He was alone in the car.' (P. W. 83).

এই সবই কিন্তু ১৮ই এপ্রিলের রিপোর্ট, যেদিন আমরা সশস্ত্র অভিযান চালিয়েছি। ৮২ নম্বরের সাক্ষী গুপ্ত-পুলিশ, তার রিপোর্ট দিয়েছে। সে বলেছে সাড়ে বারোটার সময় রজত, হরিগোপাল এবং ভবতোষকে সরসীকুঞ্জ থেকে আসতে দেখেছে। তারপর রজত ফিরিঙ্গিবাজারের দিকে চলে গেল, আর হরিগোপাল ও ভবতোষ গণেশের দোকানে অনন্ত সিংহ, জীবন ঘোষাল ও গণেশের সঙ্গে একত্র হল। পাঁচ মিনিট পর হিমাংশু এসে তাদের সঙ্গে যোগ দেয়। প্রায় আরও পাঁচ মিনিট পর গণেশ, অনন্ত, হিমাংশু ও হরিগোপাল ২৪৬এ গাড়ি করে অমরচাঁদ ও পল্টনের রাস্তা ধরে উত্তর দিকে গেল। সেই পুলিশ প্রহরী বলছে যে, হিমাংশুর হাতে একটি ছোট লাঠি ছিল। হিমাংশু সেই লাঠিটি বন্দুকের মত করে তার দিকে বাগিয়ে ধরে। পুলিশ ক্লাবের কাছে সেই প্রহরীটি যখন তাদের অনুসরণ করছিল, তখন হিমাংশু তার দিকে লাঠিটি তুলে তাক্ করে। সে রিপোর্টটি শেষ করেছে এই বলে যে তারা সবাই অনন্ত সিংহের বাড়ি গেল। মামলার রায়েতে উপরের বাংলায় লেখা বিবরণটি এইভাবে ইংরেজীতে মুদ্রিত আছে—

'At about 12-30 p.m. I saw Rajat Lal Sen, Harigopal Bal and Bhabatosh Bhattacharjee coming out of Sarasikunja. Rajat Sen went towards Feringhee Bazar side. Harigopal and Bhabatosh went to the shop of Ganesh Ghosh where Ananta Singh, Ganesh Ghosh and Jiban Ghosal were already sitting. About five minutes later, Himangshu Bimal Sen came to the shop and joined them. About five minutes after that Ananta Singh, Ganesh Ghosh, Harigopal Bal and Himangshu Sen left the shop and went North by Amarchand Road

and Paltan Road in car No. 246-A. Himangshu had a stick in his hand which he aimed at me as if it were a gun he was levelling at me and laughed at me. This was while I was following them—near the police club. They all went into the house of Ananta Singh.' (P. W. 8.2). (Ibd. P-25).

৮১ নম্বরের সরকারী পুলিশসাক্ষী তার ১৮ই এপ্রিলের রিপোর্টে আবার লিখছে—বিকেল ৩-৩০ মিনিটের সময় জীবন ঘোষাল ও ভবতোষ আন্দরকিল্লার রাস্তা দিয়ে ২৪৬৬৬ নম্বরের গাড়ি করে উত্তর দিক থেকে দক্ষিণে যাচ্ছিল। তারা বাঁক ঘুরে টেরীবাজারের দিকে চলে গেল।

ইংরেজীতে মূল বিষয়টি এইরূপ—

'At 3-30 p.m. I saw Jiban Ghosal on the Anderkilla Road coming from north to south in car No. 24666 along with Bhabatosh Bhattacharjee. They went towards the east along Feri Bazar Road.' (P. W. 81). (Ibd. P—25).

আবার ৮৩ নম্বরের সাক্ষীর ভাষ্য থেকে পাওয়া যাচ্ছে যে, আধঘণ্টা পরে বিকেল ৪টার সময় সদর থানার পশ্চিমে কোর্ট রোডে সে দাঁড়িয়ে ছিল। সেই সময় লোকনাথ ও জীবন ঘোষালকে ২৪৬৬৬ নম্বরের মোটরগাড়ি চড়ে গণেশের দোকানের দিক থেকে এসে উত্তরে যেতে দেখেছে।

আসল বিবরণটি এই—

'At 4 p.m. I was standing on the road west of Kotowali (Court Road) and saw Lokanath Bal and Jaban Ghosal going north in a car No. 24666 from the direction of Ganesh Ghosh's shop.' (P. W. 83 ; Ibd. Page—25).

এই বিবরণের প'য়তাল্লিশ মিনিট পরে অর্থাৎ বিকেলে ৪-৪৫ মিনিটের সময় ৮২ নম্বরের সাক্ষীর রিপোর্টটি হচ্ছে, সে জেলাশাসকের পাহাড়স্থিত বাংলোর নিচে অনন্ত সিংহ, নির্মল সেন, অম্বিকা চক্রবর্তী ও ভবতোষকে উপস্থিত থাকতে দেখতে পায়। তারা ২৪৬-এ নম্বরের গাড়ি করে পূর্বদিক থেকে এসে জামাল খাঁ রাস্তা ধরে উত্তরে গেল। সে সাইকেলে অনুসরণ করে দেখতে পেল যে, তারা কংগ্রেস অফিসের অভ্যন্তরে প্রবেশ করেছে। সে আবার দেখতে পায় যে, ৫-৩০ মিনিটের সময় ২৪৬-এ নম্বরের গাড়ি নিয়ে অনন্ত সিংহ ও ভবতোষ পল্টনের রাস্তা দিয়ে উধাও হল। সে কিন্তু অনুসরণ করে দেখতে পায় তারা গণেশের দোকানের ভেতরে ঢুকলো। অবশেষে ৫-৩০ মিনিটের সময় সে চলে গেল। (আর মাত্র আড়াই ঘণ্টা পর আমাদের আক্রমণের জন্য সবুজ আলো জ্বলে ওঠার কথা)।

জাজমেন্ট থেকে উদ্ধৃত করছি—

'At about 4-45 p.m. I saw Ananta Singh, Nirmal Sen, Ambika Chakravarti and Bhabatosh Bhattacharjee at the foot of the hill on which stands the District Magistrate's Bunglow. They were coming from the east and proceeded towards the north by Jamalkhan Road in car No. 246-A. I followed them on my Cycle up to the Congress Office which they entered. At about 5-30 p.m. Ananta Singh and Bhabatosh left the Congress Office and went along Paltan Road in Car No. 246-A. I followed them. They went to the shop of Ganesh Ghosh and entered. I then went away.' (P. W. 82 ; Ibd. P—25).

তারপর জজসাহেব বাদীপক্ষের ৮৩ নম্বরের সাক্ষীর অর্থাৎ সেই গুপ্ত-বিভাগের পুলিশ রিপোর্টটি থেকে ব্যক্ত করতে চাইলেন, ১৮ই এপ্রিল, রাত্রে যে সময়ে আমরা শহর অধিকার করি, তার মাত্র ক'এক ঘণ্টা আগে বিকেল ৫টার সময় সেই পুলিশ প্রহরী যখন উত্তর দিকে টহল দিচ্ছিল তখন লালদীঘির কাছে ট্যাক্সি স্ট্যান্ডে লোকনাথ ও জীবন ঘোষালকে ট্যাক্সিওয়ালার সংগে কথা বলতে দেখে সেই দিকে তার দৃষ্টি আকৃষ্ট হ'ল। যখন তারা কথা বলায় ব্যস্ত তখন সারি দেওয়া ট্যাক্সিগুলিকে ছাড়িয়ে একটু দূরে একটি বাদাম গাছতলায় ২৪৬৬৬ নম্বরের গাড়িটি অপেক্ষা করছিল। ক'এক মিনিট কথা বলার পর ২৪৬৬৬ নম্বরের গাড়িটি করে তারা গণেশ ঘোষের দোকানের দিকে চলে গেল।

মূল ইংরেজী ভাষ্যটি নিচে দেওয়া হ'ল—

'At about 5 p.m. I was walking north along the Court Road when I saw Lokanath Bal and Jiban Ghosal standing at the taxi-stand near the Laldighi, talking with taxiwalla. While they were talking the small car No. 24666 was standing under the almond tree just to the west of the taxi-rank. After a few minute's talk they got into the car No. 24666 and went back in the direction of Ganesh Ghosh's house.' (P. W. 83., Ibd. Page—25).

চৌদ্দ এবং সতেরো ও আঠারো তারিখের পুলিশের সজাগ পাহারার রিপোর্ট আমরা সরকারী তথ্য থেকে একটুখানি পেলাম। পুলিশের এইরূপ তৎপরতার বিষয় তারা প্রকাশ করেছে আমাদের যুব-অভ্যুত্থানের অনেক পরে—মামলার সময়। কিন্তু মামলার সময় তাদের সজাগ পাহারা ও তৎপরতার কথা জানাবার জন্য আমাদের কোন মাথা ব্যথা ছিল না। পুলিশের গতিবিধি জানবার প্রয়োজন ছিল আমাদের ১৯৩০ সালের ১৮ই এপ্রিল যুব-অভ্যুত্থানের পূর্ব-মুহূর্ত পর্যন্ত। পুলিশ আমাদের বাহ্যিক গতিবিধি নিরবচ্ছিন্নভাবে দিবা-রাত্রি লক্ষ্য করে কেবলমাত্র মামলার সময় তাদের তথাকথিত কতকগুলি রিপোর্ট দাখিল করা ছাড়া আর কি করেছিল জানি না, তবে তাদের তৎপরতা ও কার্যকলাপের উপরে আমরা যেভাবে কড়া নজর রেখেছিলাম তাতে তাদের অজ্ঞতার সুযোগ নিয়ে প্রস্তুত হতে পেরেছি ও সশস্ত্র যুব-বিদ্রোহ সফল করতে সমর্থ হয়েছি। তাদের কার্যকলাপের সামান্য বর্ণনা দেওয়া হ'ল। এই পরিপ্রেক্ষিতে পরে বুঝতে সুবিধে হবে আমরা কিভাবে সমানে পাঁয়তারা কষেছি তাদের বিভ্রান্ত করে বিপথে চালিত করতে।

(ক্রমশঃ)

৩ মাসের জন্য বিনামূল্যে উপহার

স্ত্রীলোকের সৌন্দর্যে, কাশ্মীর আর্ট শাড়ী। সর্বাধুনিক মনোরম ডিজাইন এবং রং লইয়া মরশুমের নূতন নূতন মাল আসিয়াছে। আমাদের কাছে কেবলমাত্র বড় সাইজের কাপড় পাওয়া যায়। ১টি ডিলাক্স শাড়ীর মূল্য ১১৲ টাকা; ২টি শাড়ী ২০৲ টাকা; ৩টি ২৮৲ টাকা; ৪টি ৩৬৲ টাকা। দুইটি বা তদধিক শাড়ীর অর্ডারের সহিত বিনামূল্যে ব্লাউজ পীস। পোস্ট পার্শেল যোগে অর্ডারের মাল পাঠান হয়।

Arvind Agencies (WBC—22)
P.O. Box 1408, Delhi 6.

আশাপূর্ণা দেবী

ধারাবাহিক উপন্যাস

(পূর্ব-প্রকাশিতের পর)

ক্রমশ পালকি উঠে যাচ্ছে।

'যাই যাই' করছিল অনেক দিন, এবার মনে হচ্ছে সত্যিই যাবার পথে পা বাড়িয়েছে। রাস্তায় বেরিয়ে যখন তখন তো দূরস্থান, বলতে গেলে চোখেই পড়ে না।

পালকির সঙ্গে সঙ্গে আরো অনেক কিছুই অবলুপ্তির পথ ধরবে তা'তে আর সন্দেহ কি। পালকিই হয়তো বলে যাবে—'মানুষের কাঁধের উপর মানুষ চড়া নির্লজ্জতা।...মরে গিয়ে 'শবদেহ' হয়ে যাবার পর চড়ো মানুষের কাঁধে, তার আগে নয়!'...বলে যাবে—'আস্ত একটা মানুষকে একটা বন্ধ বাক্সয় ঢুকিয়ে ফেলে ঘেরাটোপ ঘিরে নিয়ে যাওয়াটা হাস্যকর, আমি বিদায় নিচ্ছি ওই ঘেরাটোপ আর পর্দার জঞ্জালগুলো কুড়িয়ে নিয়ে। পথ যে পার হচ্ছে, পথটা সে যেন দেখতে পায়।' বলে যাবে, 'দ্রুতযানের সন্ধান কর এবার তোমরা। পৃথিবীটা অনেক বড়, তাকে দেখো চোখ মেলে, ছোটো ঘোড়ার খুরে—ধুলো উড়িয়ে, ছোটো হাওয়ার বেগে হাওয়া গাড়িতে, ওড়ো মাটি ছাড়িয়ে আকাশে!...তাকিয়ায় ঠেস দিয়ে বসে আপন পরিমণ্ডলটিকেই সমগ্র পৃথিবীজ্ঞান করে আলবোলায় সুখটান দেবার দিন গত হলো!

হাজার বছরের ঐতিহ্য আর ইতিহাসের ধারা মুছে নিয়ে যারা চলে যায়, চলে যেতে বাধ্য হয়, তারা কিছু বলে যায় বৈ-কি! চলে যাবার মধ্যেই বলে যাওয়া।

কালস্রোত যে কাউকে কোথাও নোঙর ফেলতে দেয় না, দুর্নিবার বেগে ভাসিয়ে নিয়ে যায়, এইটাই আর একবার বলে যায় সে। বলে যায় আজকের পরম প্রয়োজনীয়, পরবর্তীকালে জঞ্জালের কোঠায় ঠাঁই পায়, এই হলো পৃথিবীর পরমতম সত্য, আর চরমতম ট্র্যাজেডি!

তবু সহজে কেউ মানতে রাজী হয় না সে কথা। তারা সেই বিদায়ী পথিকের বসনপ্রান্তটুকু মুঠোয় চেপে ধরে রাখতে চায়, আর আলবোলার শেষ 'সুখটানটুকু দিতে দিতে বলে, 'এ সব হচ্ছে কি আজকাল?' সব যে রসাতলে গেল!'

যারা দার্শনিক তারা উদাস হাসি হেসে বলে, 'যাবেই তো সবই যাবে!'

মুক্তকেশীও একদা তাঁর ছোট্ট নাতনীটার সঙ্গে বাক্যালাপপ্রসঙ্গে বলেছিলেন একথা, 'পালকি আর কই? ক্রেমশই কমে আসছে। যাবে, সবই উঠে যাবে।'

তবু দেখা যাচ্ছে এখনো মুক্তকেশী তাঁর বয়সের ভারে জীর্ণ দেহখানা নিয়ে চলেছেন পাল্‌কি চড়ে।

একাই চলেছেন।

খানিকটা গিয়ে একখানা গোলাপী রঙের দোতলা বাড়ির সামনে এসে মুক্তকেশী মুখ বাড়িয়ে বেহারাগুলোর উদ্দেশ্যে আদেশ জারি করলেন, 'থাম মুখপোড়ারা, এই বাড়ি! চলেছে দেখো 'হুম্ হুম্ করে।'

যেন বাড়িখানা তাদের চিনে রাখার কথা।

নিমেষে বেহারাগুলোর 'হুম্ হুম্' শব্দ থেমে গেল, পালকিও থামলো। চার-চারটে জোয়ান মর্দ লোক পালকিখানা নামিয়ে কোমরে বাঁধা গামছা খুলে গায়ের ঘাম মুছতে লাগলো।

চারটে দস্যিলোক অথচ একটা বুড়িকে বইতে হিমসিম খেয়ে গেছে। পদ্ধতিটা বুদ্ধিহীন বলেই। রিকশাগাড়িরা তখনও আসরে নামে নি, দেখিয়ে দেয় নি—একটা লোকই টেনে নিয়ে যেতে পারে চারটেকে।

পালকির দরজা ঠেলে নামলেন মুক্তকেশী।

নড়বড়ে কোমরটা কষ্টে টান করে প্রায় সোজা হয়ে দাঁড়ালেন মুহূর্তকাল, তারপর আঁচলের খুঁট থেকে দুটি ডবল পয়সা বার করে চারটে বেহারার মধ্যে একজনের হাতে দিয়ে বললেন, 'নে বা ভাঙিয়ে ভাগ করে নে গে যা!'

কোমরটা দুমড়ে যাওয়া পর্যন্ত মুক্তকেশীর ধারণা হয়েছে পূর্ব সম্মানের সবটুকু আর জুটছে না। তাই অপর পক্ষের মুখোমুখি দাঁড়াতে হলেই প্রাণপণ চেষ্টায় সোজা হন। অনেক সময় হাড়ের খিল ছেড়ে যাওয়ার একটা শব্দ হয়, শিরদাঁড়াটা কনকনিয়ে ওঠে, তবু সাধ্যপক্ষে হেঁট হওয়ার অগৌরব বহন করতে রাজী নন মুক্তকেশী!

তথাপি অপরপক্ষ সম্মান রক্ষায় উদাসীন হল।

বলে উঠলো, 'কে'তো দি'উচ্ছি?'

'যা দেবার ঠিকই দিয়েছি—' ঊনআশী বছরের পুরনো চোখের তারায় একটি সম্রাজ্ঞী জনোচিত দৃপ্তভঙ্গী ফুটিয়ে তুলে মুক্তকেশী সদর্পে তাকালেন, 'আবার কিসের ট্যাঁ ফোঁ? চাস কত? পুরো তঙ্কা?'

লোকগুলো মুখের প্রত্যেকটি রেখায় অসন্তোষ ফুটিয়ে বলে, 'আটো পয়সা দি'য়!'

'কী বললি? আট পয়সা? গলায় ছুরি দিবি না কি? পয়সা গাছের ফল?' মুক্তকেশী সদর্পে বলেন, 'আর এক আধলাও নয়। কার হাতে পড়েছিস তা' জানিস? এখেন থেকে এখেন, আট পয়সা! হুঃ! যা বেরো!'

আশ্চর্য!

আশ্চর্য বৈ কি যে লোকগুলো সত্যিই পালকি তুলে নিয়ে চলে যায় নিতান্ত ব্যাজার মুখে।

তারাও জানছে এ পেশার দিন শেষ হয়ে আসছে ওদের! মুক্তকেশীর মত দু-একটা বুড়োহাবুড়ি ছাড়া এরকম শব-যাত্রার ভঙ্গীতে মানুষের কাঁধে চড়ে শূন্যে দুলতে দুলতে আর যেতে চাইছে না মানুষ.

তাই বেত ছিঁড়ছে, ডান্ডা ভাঙছে, রং চটে দাঁত বেরিয়ে যাচ্ছে, তবু পালকি মেরামতের কথা ভাবছে না ওরা! দলের অনেকেই তো ক্রমশ গলায় একটা করে 'পৈতে' ঝুলিয়ে রাঁধুনী বামুনের চাকরি নিচ্ছে। তার চাহিদা বরং দ্রুতগতিতে বাড়ছে।

বাড়ছেই।

মেয়েরা ক্রমশই 'বাবু' হয়ে উঠছে, রান্নার ভারটা চাপাচ্ছে উড়িয়া কুল-তিলকের হাতে!

বন্ধ দরজা খোলবার জন্যে কড়া নাড়া অথবা দরজায় ধাক্কা দেবার যে একটা প্রচলিত রীতি আছে, সে রীতিকে অগ্রাহ্য করে মুক্তকেশী ভাঙা ভাঙা অথচ সতেজ গলায় ডাক দেন, 'পেবো পেবো—'

হ্যাঁ এ পাড়ার প্রবোধবাবুকেই ডাক দেন তিনি। বাড়ির ছোট ছেলেপুলেদের নাম ধরে ডাক দেবার যে একটা রীতি প্রচলিত সেটাকেও অস্বীকার করে থাকেন তিনি। এ বাড়ি তাঁর ছেলে 'পেবো'র, তাকেই ডাকবেন তিনি। সে বাড়িতে থাক বা না থাক।

অবশ্য যখনই আসেন, প্রবোধচন্দ্রের উপস্থিতির সম্ভাবনা অনুমান করেই আসেন।

তা' এক ডাকেই কাজ হলো।

যদিও 'পেবো' বা সেই জাতীয় কেউ নয়, দরজা খুলে দিল বছর দশেকের একটি মেয়ে। মুক্তকেশী যতটা সম্ভব তীক্ষ্ম দৃষ্টিতে একবার ওর আপাদ-মস্তক দেখে নিয়ে তীব্র গলায় বলে উঠলেন, 'কপাট খুলে দিতে তুই হুট্ করে বেরিয়ে এলি যে? বাড়িতে আর লোক নেই?'

মেয়েটা এই প্রশ্নবাণের সামনে থত-মত খেয়ে বলে, 'সবাই আছে!'

'আছে তো তুই তাড়াতাড়ি আসতে গেলি কেন? আমি না হয়ে যদি অপর কোনো ব্যাটাছেলে হতো? 'পারি'র বিয়ে হচ্ছে না বলে বুঝি তুই কচি খুকী আছিস?'

মেয়েটা তাড়াতাড়ি বলে, 'ছাদ থেকে দেখলাম তুমি এলে, তাই—'

'ছাদ থেকে?'

সেই ঊনআশী বছরের পুরনো চোখ আবার ধারালো হয়ে ওঠে, 'ভরদুপুরে ছাদে কী করছিলি?'

'কাপড় শুকোচ্ছিল, মা বললেন তুলে আন।'

'হুঁ তা বলবেন বৈ কি মা! নে চল। বাবা বাড়ি আছে?'

'আছেন! ঘুমোচ্ছেন!'

'তা' তো ঘুমোবেই।' মুক্তকেশী ধিক্কারের স্বরে বলেন, 'সন্তগুণের মহিমা। বুকের ওপর পাহাড় মেয়ে, আরো একটা ধিঙ্গী হয়ে উঠলো, ছুটিছাটার দিন কোথায় মাথায় সাপ বেঁধে ছুটোছুটি করে বেড়াবে, তা' নয় নাকে সর্ষের তেল দিয়ে ঘুমোচ্ছেন! নে চল!'

মুক্তকেশী আজকাল মাঝে মাঝেই আসেন।

ভেন্ন হওয়া রূপ দুরাচারের জন্যে অনেকগুলো দিন পুত্রবধূর মুখ দেখেন নি মুক্তকেশী কিন্তু পুত্রের আকিঞ্চন ও তোষামোদে সে ভাবটা কেটে গিয়েছিল। তারপর সেই সুবর্ণলতার গুরুমন্ত্র নেওয়ার সময় বাঁধ ভাঙলো। রাগের, তেজের, লজ্জার!

সময়ে সবই সয়। সময় সর্বতাপ-হর!

সময় সবই সহজ করে আনে। এখন বরং মুক্তকেশী 'মেজবৌমা' 'মেজবৌমা'ই বেশি করেন। তার জন্যে ঘরে থাকা অন্য বৌদের হিংসের অবধি নেই, কিন্তু এখন যে প্রবোধচন্দ্রের মাতৃভক্তিটা প্রায় ভরতের ভ্রাতৃভক্তির তুল্য মূল্যবান। আর মূল্যেই তো জগৎ বশ।

অতএব এখন মুক্তকেশী যখন তখন মেজ ছেলের বাড়িতে বেড়াতে আসেন, হুকুম আর শাসন চালিয়ে যান, এবং অপর ছেলে বৌদের সমালোচনায় মুখর হন। হাত-খরচের টাকায় ঘাটতি পড়লেই সে কথা কোনো ছলে মেজবৌমার কর্ণগোচর করেন, এবং নিজের মেয়ে জামাই নাতি নাতনী বাবদ অর্থঘটিত যা কিছু সদিচ্ছা সেও মেজছেলের কাছেই প্রকাশ করে যান।

বলেন, 'ওদের বলি না, জানি তো বোন বলে এতটুকু মন কারো নেই। তোর তবু সে মন একটু আছে, তাই বলা।'

প্রবোধ অবশ্য মায়ের ধারণা অনুযায়ী 'বোনেদের প্রতি মনে'র অভিনয়ই করে চলে তারপর। বলে উঠতে পারে না 'মন' আমারও নেই মা। তারা এখন ভিন্ন মাটিতে শিকড় নামিয়েছে, তাদের সঙ্গে আমাদের যোগ কোথায়? একদা তারা আর আমরা একই আধারে থেকেছি, শুধু এইটুকু সুবাদের জের কতকাল টানা যায়?'

বলে না।

বলে উঠতে পারে না।

অতএব সুবর্ণলতার এই গোলাপী রঙের দোতলাটির মধ্যেও মুক্তকেশী বেশ পুরো চেহারা নিয়েই অবস্থান করেন!

সুবর্ণলতা একবারই পেরেছিল অসাধ্য সাধন করতে। একবারই দেখিয়েছিল 'অসম সাহসিক' শব্দটার মানে আছে।

কিন্তু সে ওই একবারই। যে আওতা থেকে সরে এসে স্বামী সন্তানদের নিয়ে —নিজের ইচ্ছেমত সংসার গড়ে তোলবার বাসনাটা ধূসর হয়ে যাচ্ছে, সেই আওতাটা রয়েই গেছে। হয়তো বা আরো নিরঙ্কুশ হয়েছে।

সুবর্ণলতার জীবনের এ এক অদ্ভুত ট্রাজেডি। কারণ নিজেও সে মুক্তকেশীর সংসারে বসে মুক্তকেশীর যত সহজে বিরুদ্ধাচরণ করতে পারতো, আপন কেন্দ্রে বসে তা' পারে না। ভদ্রতায় বাধে, চক্ষু-লজ্জায় বাধে, আর সবচেয়ে আশ্চর্য মমতায় বাধে!

অস্বীকার করে লাভ নেই, ওই নখ-দন্তহীন মানুষটার প্রতি একটা মমতাবোধ সুবর্ণলতাকে নিরুপায় করে রেখেছে।

মেজের দিবানিদ্রাটি ছেড়ে আস্তে-ব্যস্তে উঠে এসে প্রবোধ মায়ের চরণ বন্দনা করে, নিজে হাতে হাত পাখা তুলে নেয়।

মুক্তকেশী আসন পরিগ্রহ করে বলেন, 'থাক বাতাসে কাজ নেই, বলি নাকে তেল দিয়ে ঘুম দিলেই হবে? মেয়ের বিয়ে দিতে হবে না?'

নখদন্তহীন মুক্তকেশীর কথার জোর কমেছে বলে যে, কথার সুর বদলেছে তা নয়। সুরটা ঠিক আছে, ধরণটা ঠিক আছে, শুধু ভারটা খুঁজে পাওয়া যায় না!

তবু—

তবু সুবর্ণলতা যেন আজকাল হঠাৎ হঠাৎ ওই মানুষটাকে ঈর্ষা করে বসে।

মুক্তকেশী যখন তাঁর ঊনপঞ্চাশ বছরের ছেলেকে বলে ওঠেন 'লক্ষ্মীছাড়া, হতভাগা, পোড়ার-মুখো বাঁদর,' তখন অদ্ভুত একটা ঈর্ষার জ্বালা যেন দাহ ধরায় সুবর্ণলতাকে।

অথচ নিজে কি সুবর্ণলতা কখনো অমন দরাজ ভাষায় ছেলেদের সম্বোধন করবার বাসনা পোষণ করেছে?

এই গ্রাম্যতা কি সুবর্ণলতার অসহ্য নয়?

তবু—

এই 'তবু'র উত্তর নেই, প্রশ্নই জমে ওঠে আরো।

সুবর্ণলতার ছেলেরা কি এদের বংশের ছেলে নয়?

সুবর্ণলতা কি তার মাতৃকর্তব্যে কোনো ত্রুটি করেছে? সুবর্ণলতা তো বরং সেই কর্তব্যের দায়ের কাছেই নিজের সর্বশক্তি বিকিয়েছে বসে বসে।

তথাপি সুবর্ণলতার শ্বশুরবাড়ির মেয়েরা 'বাপের বাড়ি' বলতে—সুবর্ণলতার প্রাণ দিয়ে গড়া এই গোলাপী রঙের দোতলাটাকে বোঝে না, বোঝে সেই দর্জিপাড়ার গলির বাড়িটা। তাদের প্রাণ পড়ে থাকে সেখানেই! সেখানে বসে তারা পুরনো দালানের তেলচিটে দেয়ালে পিঠ দিয়ে বসে তাদের মায়ের চালচলনের ব্যাখ্যানা করে।

আর সুবর্ণলতার ছেলেরা?

তারা অবশ্য সেই দেয়ালে তেলধরা—জানলায় চুনের হাত মোছা, এবং দরজার পিছনে পানের পিক্ ফেলা বাড়িটাকে আদৌ পছন্দ করে না, তার প্রতি এক-বিন্দুও মমতা পোষণ করে না, তবু এই বাড়িটাকেও 'আমাদের' বলে পরম স্নেহে হৃদয়ে নেয় না।

সুবর্ণলতার ছেলেরা যেন বাধ্য হয়ে তাদের এক প্রবল প্রতাপ প্রতিপক্ষের এক্তারে পড়ে আছে, তাই সুযোগ পেলেই ছোবল বসাতে আসে।

ছোটটাকে অবশ্য এখনো ঠিক বোঝা যায় না, সে যেন বড় বেশি নির্লিপ্ত, সেজটাও আমোদ-প্রমোদ বাবুয়ানা বিলাসিতাটুকু হাতের কাছে পেয়ে গেলে তেমন হিংস্র নয়, কিন্তু ভানু কানু?

যারা না কি প্রমাণ সাইজের জামা পরে তবে এ বাড়িতে এসেছে!

তারা যেন ঠিক তাদের কাকাদের প্রতিমূর্তি!

বিশেষ করে ভানু!

হঠাৎ যখন পাশ দিয়ে চলে যায়, কি চান করে এসে গামছাখানাকে জোরে জোরে ঝাড়ে, অথবা মুখ নিচু করে ভাত খেতে খেতে কেমন একটা কঠিন ভঙ্গীতে চোয়ালটা নাড়ে দেখে চমকে ওঠে সুবর্ণলতা!

মনে হয় সেজ দ্যাওর প্রভাসকেই দেখতে পেল বুঝি।

অপর পাঁচজনেও বলে, 'ভানুকে দেখো! যেন অবিকল ওর সেজকাকা।'

শুনে অন্ধ একটা রাগে হাত পা কামড়াতে ইচ্ছে করে সুবর্ণলতার।

সুবর্ণর রক্তে মাংসে গড়া, সুবর্ণর ইচ্ছে চেষ্টা সাধনা শক্তি দিয়ে লালিত সন্তান, সুবর্ণর পরম শত্রুর রূপ নিয়ে, সুবর্ণর চোখের সামনে ঘুরে বেড়াবে, এ কী দুঃসহ নিরুপায়তা!

কী অস্বস্তিকর বড় হয়ে গেছে ভানু কানু।

কী বিশ্রী লম্বা-চওড়া।

গলার স্বরগুলোই বা কী রকম মোটা!

আস্ত দুটো 'লোক' হয়ে গেছে ওরা!

অন্যলোক!

সুবর্ণলতার সঙ্গে যাদের জীবনের আর কোনো যোগ নেই, সুবর্ণলতাকে যাদের আর কোনো প্রয়োজন নেই।

সুবর্ণলতার সাধ্য নেই আর ওদের নাগাল পাবার!

আস্তে আস্তে মানু, সুবলও হয়তো এই রকমই হয়ে যাবে। তাদের মুখের চেহারার প্রকট হয়ে উঠবে মুক্তকেশীর ছেলেদের মুখের কাঠামো!

নিরুপায় সুবর্ণলতাকে বসে বসে দেখতে হবে এই পরিবর্তন!

মুক্তকেশীর ছেলেদের ঘৃণা করা যেত অবজ্ঞা করা যেত, এদের বেলায় কোনো উপায় নেই।

আর এদের সম্পর্কে নালিশেরও কোনো পথ নেই। এরা সুবর্ণলতার ইচ্ছানুরূপ শিক্ষিত হয়েছে, সভ্য হয়েছে, চৌকস হয়েছে! সুবর্ণলতার জীবনের প্রত্যেকটি অণুপরমাণুর ধ্বংসের মূল্যে যে সম্পদ সঞ্চয় করেছে সুবর্ণলতার ছেলেরা, সেই সম্পদের অহঙ্কারেই তারা অহরহ সুবর্ণলতাকে অবজ্ঞা করছে!

হয়তো বা একা সুবর্ণলতার ক্ষেত্রেই নয়, অন্য সব ক্ষেত্রেও এমনিই হয়!

'বোধ' জন্মালেই 'ঋণবোধ'ও জন্মায়, আর সেই ঋণবোধের দাহই ফণা তুলে থাকে ছোবল হানতে। যেখানে ঋণের ঘর হালকা, সেখানে বুঝি আপন হওয়া যায়, সহজ হওয়া যায়!

নচেৎ নয়।

অথচ আজীবনের স্বপ্ন ছিল সুবর্ণলতার তার সন্তানেরা তাকে বুঝবে, তার আপন হবে। কিন্তু তারা আপন হয় নি, তারা সুবর্ণলতাকে বোঝে নি।

হয়তো বুঝতে চায়ও নি।

কারণ সুবর্ণলতার ছেলেরা তার মায়ের সেই মধুর আশার স্বপ্নের সন্ধানটুকু পায় নি কখনো। তারা শুধু যোদ্ধা সুবর্ণলতাকেই দেখে এসেছে, 'দক্ষিণের বারান্দালোভী স্বপ্নাতুর' সুবর্ণলতাকে দেখে নি কখনো!

যুদ্ধ বিক্ষত সুবর্ণলতার বিকৃত আর হিংস্র মূর্তিটা অতএব বিরক্তি আর ঘৃণারই উদ্রেক করেছে তাদের। সন্ধান করে দেখতে যায় নি সুবর্ণলতার ভিতরে 'বস্তু' ছিলো।

ভেবে দেখে নি—বস্তু ছিলো, স্বপ্ন ছিলো, ছিলো—'মানুষের মত' হয়ে বাঁচবার—দুর্দমনীয় সাধ! ছিলো ভব্যতা, সভ্যতা-সৌকুমার্য! শুধু—সে সম্পদ ক্ষয় হয়ে গেছে যুদ্ধের রসদ জোগাতে জোগাতে!

তবে ভেবে দেখবেই বা কখন তারা?

আজো কি যুদ্ধের শেষ হয়েছে সুবর্ণলতার?

হয় নি।

হয়তো যুদ্ধের কারণগুলো আর ততবেশি প্রখর নেই, হয়তো অনুভূতিগুলোও ততবেশি তীব্র নেই, তবু সুবর্ণলতা এক আপোষহীন সংগ্রামের নায়িকা।

নোংরামী আর কুশ্রীতার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করতে করতে নিজে যে সে কত নোংরা আর কুশ্রী হয়ে গেছে, ভব্যতা সভ্যতা শালীনতা সৌন্দর্য বজায় রাখবার লড়াইয়ে যে নিজের চরিত্রের সমস্ত সৌন্দর্য শালীনতা জবাই দিয়ে বসে আছে, সে খবর আর নিজেই টের পায় না সে।

সুবর্ণলতার সন্তানেরা মায়ের এই অপরিচ্ছন্ন মূর্তিটাই দেখতে পাচ্ছে।

অতএব তারা অসহিষ্ণু হচ্ছে।

অতএব তারা মাকে ঘৃণা করছে।

মা'র দিকে ব্যঙ্গের দৃষ্টিতে তাকাচ্ছে।

সারা জীবনের এই সঞ্চয় সুবর্ণলতার।

অথচ সুবর্ণলতার সন্তানদেরও দোষ দেওয়া যায় না। 'মুক্তকেশীর শক্ত বেড়া' কেটে বিরাট পরিবারের মধ্যে থেকে সুবর্ণলতা তাদের শুধু উদ্ধার করেই এনেছে 'আশ্রয়' দিতে পারে নি।

শুধু যেন ছড়িয়ে ফেলে রেখেছে!

তাদের সদ্য উন্মেষিত জ্ঞানচক্ষুর সামনে অহরহ উদ্ঘাটিত হচ্ছে মা-বাপের দাম্পত্যলীলার যুদ্ধ আর সন্ধির বহু কলঙ্কিত অধ্যায়।

তারা জানে তারা সুবর্ণলতার স্বপ্ন-সাধনার বস্তু নয়, যুদ্ধের হাতিয়ার মাত্র।

এই অদ্ভুত যুদ্ধের মাঝখানে পড়ে যত বেশি ধাক্কা খাচ্ছে তারা, তত বেশি বিতৃষ্ণ হচ্ছে, ততবেশি আঘাত হানছে।

পারু পড়তে চায়, কিন্তু পারুর পড়া'কে কেন্দ্র করে সুবর্ণলতা যে ঘূর্ণি-ঝড় তোলে, সে ঝড়ের ধুলো জঞ্জালের দিকে তাকিয়ে পারু পড়ায় বীতস্পৃহ হয়।

পারু নিজেই বেঁকে বসে।

পারু প্রতিজ্ঞা করে 'লাঠালাঠি' করে আদায় করা বস্তুকে গ্রহণ করে কৃতার্থ হবে না সে! পারুর আত্মমর্যাদাজ্ঞান তীব্র গভীর।

কিন্তু প্রবোধের মেয়ের সেই প্রতিজ্ঞা জানার কথা নয়। তাই প্রবোধ মায়ের প্রশ্নে অসহায় দৃষ্টিতে এদিক ওদিক তাকিয়ে বলে, 'তোমার মেজবৌ যে বলে গো, আজকাল আর অত সকাল সকাল বিয়ে নেই! বরং একটু লেখাপড়া—'

মুক্তকেশী অবশ্য এতে বিচলিত হন না। মুক্তকেশী দৃপ্ত গলায় বলেন, 'কী বললি লক্ষ্মীছাড়া বামুনের গরু! মেয়ের এখন বিয়ে না দিয়ে লেখাপড়া শেখাতে বসবি? তা বলবি বৈ কি, তোর উপযুক্ত কথাই বলেছিস! চিরটাকাল তো হালকা বুদ্ধিতেই চললি।'

না, এখন আর 'বৌয়ের বুদ্ধিতে চললি' বললেন না বুদ্ধিমতী মুক্তকেশী। বললেন, 'হালকা বুদ্ধিতে চললি।'

প্রবোধ অবশ্য প্রতিবাদ করে না।

মুক্তকেশী বলেন, 'ও সব কথা বাদ দে, কোমরে কসি গুঁজে লেগে যা! গলার কাঁটা উদ্ধার না হলে তো ছেলেদের বিয়ে দিতে পারবি না? এদিকে মেয়ে নিয়ে লোকে আমায় সাধাসাধি করছে! আমি থাকতে ছেলের বিয়ে দিবি, এই আমার সাধ! সুবোটার তো প্রথম দিকে শুধু মেয়ের পাল।'

কথাটা শেষ হবার আগেই গলার কাঁটা ঘর থেকে বিদায় নেয়, আর সুবর্ণলতা একটুক্ষণ স্তব্ধ থেকে বলে, 'হুকুম তো একটা করে বসলেন। কিন্তু ছেলেদের এক্ষুণি বিয়ে কি? পাশই করেছে, রোজ-গার তো করতে শেখে নি। কানুর তো পড়াও শেষ হয় নি।'

কানু ডাক্তারী পড়ছে, কাজেই তার পাশ করে বেরোতে দেরি! মুক্তকেশী সেই কথার উল্লেখ করে ব্যঙ্গ হাসি হেসে বলেন, 'ছেলে ডাক্তার হয়ে বেরোলে তবে বিয়ে দেবে মেজবৌমা? তার থেকে বল না কেন, ছেলের এখনো চুল পাকে নি বিয়ে দেব কি? ছেলেরা রোজগার না করলে বৌরা এসে তোমার সংসারে দুটি ভাত পাবে না?'

সুবর্ণলতা শান্ত গলায় বলে, 'ভাত কেন পাবে না? তবে ভাতটাই তো সব নয় মা!'

'আহা হল না হয় গহনা কাপড়ই সব', মুক্তকেশী জিদের গলায় বলে, 'সে তুমি ছেলের বিয়ের সময় বেহাইয়ের গলায় গামছা দিয়ে দশ বছরের মতন আদায় করে নেবে। ততদিনে তোমার ছেলে অবিশ্যিই উপায়ী হবে!'

সুবর্ণলতা আরো নম্র হয়। তবু দৃঢ় গলায় বলে, 'সে তো অনিশ্চিত। রোজগার পাতি না করলে—'

'দেখ মেজবৌমা, তক্কে তোমার সঙ্গে জিততে পারব না আমি, তবে গুরুজন হিসেবেই বলছি, বামুনের ছেলে, খেটে খেতে না পারে ভিক্ষে করে খাবে, তাতে লজ্জা নেই। বিয়ে একটা 'সংস্কার' সেটা সময়ে করা দরকার! তবে সব আগে তোমার ওই তালগাছকে পার করা—'

সুবর্ণলতা উঠে দাঁড়ায়।

বলে, 'রোদ থেকে এসেছেন ডাব আনি একটা—'

ডাবে ছোঁওয়া লাগে না, তাই মুক্ত-কেশীর আসার আশায় প্রায়শই ডাব মজুত থাকে। সুবর্ণলতারই ব্যবস্থা।

ডাব গঙ্গাজল, আর তসরের থান।

কাপড় ছেড়ে হাতে মুখে গঙ্গাজল ছিটিয়ে ডাবটি খেয়ে ছেলের সংসারের কল্যাণ করেন মুক্তকেশী।

আজ কিন্তু 'হাঁ হাঁ' করে উঠলেন।

বললেন, 'থাক থাক, আজ থাক—'

সুবর্ণলতা তবু 'থাকবে কেন', বলে চলে গেল।

আর সুবর্ণলতা চলে যাবার সঙ্গে সঙ্গেই সহসা গলা নামালেন মুক্তকেশী। ফিসফিস করে কী যেন বললেন ছেলেকে, ঈষৎ চমকে উঠলো ছেলে, মুখে যেন বিপন্নভাবের ছায়া পড়লো তার, বার কয়েক মাথা নাড়লো 'আচ্ছা' এবং 'না' বাচক, তার পর—সাবধান হয়ে সোজা হয়ে বসলো!

সুবর্ণলতার অঞ্চল প্রান্তের আভাস দেখা গেছে!

প্রসঙ্গ চাপা দেবার জন্যেই যেন গলাটা আবার তুললেন মুক্তকেশী, বললেন, 'আজ আর বসবো না বেশিক্ষণ, 'বুদো'র জন্যে একটা কনে দেখতে যাবার কথা আছে সুবোর, দেখি গে! বললাম একা না ভ্যাকা, বাপ-কাকা যাক, তা' পেকা পেভা দুজনেই ঘাড় নাড়লো। ছেলের বিদ্যে-বুদ্ধি কম, ওনাদের মান্যে আঘাত লাগবে! সুবো আমার ভালমানুষ—'

হঠাৎ ওঘর থেকে পারু এসে উদয় হয়, একটু তীক্ষ্ন হাসি হেসে বলে, 'ঠাকুমা বুঝি এবার ঘটকালি পেশা ধরেছ?'

মুক্তকেশী থতমত খান।

মুক্তকেশী অবাক হন।

কারণ এর জন্য প্রস্তুত ছিলেন না মুক্তকেশী তরে সামলাতে তিনি জানেন। সামলে নিয়ে বলেন, 'ও গো অ মেজবৌমা, এ মেয়েকে আরো বিদ্যেবতী করতে চাও? এখুনি তো উকিল ব্যালিস্টারের কান কাটতে পারে গো তোমার মেয়ে! কথার কী বাঁধুনী। আমি নয় ঠাকুমা, ঠাট্টার সম্পর্ক ঠাট্টা করেছে। তবে অন্যক্ষেত্রে এ রকম বোলচাল নিন্দের।'

'তোমার কাছে কোনটাই বা নিন্দের নয় ঠাকুমা—' পারুল হেসে ওঠে, 'তোমাদের সবই বাবা অনাছিষ্টি। ইস্কুলে পড়লে বাচাল হয়, ইংরিজি শিখলে বিধবা হয়—'

'হয় চোখের ওপর দেখছি লো। তোর বাবার নলিন কাকার নাতনী পান্তির কথা দেখলি না? ঘটা করে মেয়েকে মেম রেখে ইংরিজি শেখানো হয়েছিলো বিয়ের বছর ঘুরল না মেয়ে বিধবা হল না?'

পারু ফট করে বলে বসে, 'কিন্তু জ্যাঠামশাই তো বড়দির জন্যে মেম রাখেন নি ঠাকুমা—'

বড়দি অর্থে মল্লিকা!

মুক্তকেশী মুখ কালি করে বলেন, 'কুতর্ক করার বিদ্যেয় তুই যে দেখছি মা'র ওপরে উঠলি পারু! তোর বাপেরই জীবন অন্ধকার! যাই আজ উঠি।'

ডাব খেলেন না!

বললেন পেট ভার।

কিছু উৎকৃষ্ট গোবিন্দভোগ চাল, এক বোতল গাওয়া ঘী, পোয়াটাক সাগু, এক সের মিশ্রী, গোটা পাঁচেক টাকা, আর— একখানা নতুন গামছা নিয়ে আবার পালকিতে চড়ে বসলেন, মুক্তকেশী। ছেলের বাড়িতে এলেই এসব জোটে তাঁর।

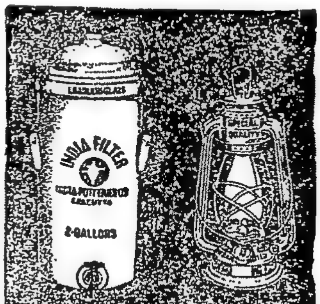

গৌর মোহন দাস এণ্ড কোং
২৩৩, ওল্ড চীনা বাজার স্ট্রীট,
কলিকাতা-১
ফোন: ২২-৬৫৮০

ভাবটাও পালকিতে তুলে দিল সুবর্ণলতা।

পালকি বেয়ারাদের হাতে ছটা পয়সা দিতে যাচ্ছিলো প্রবোধ, মুক্তকেশী ছোঁ মেরে পয়সাটা কেড়ে নিলেন ছেলের হাত থেকে, খরখর করে বলে উঠলেন, 'রেট বাড়াসনে পেবো, বাপের পুণ্যে দুটো পয়সার মুখ দেখতে পেয়েছিস বলেই মা লক্ষ্মীকে অবহেলা করিসনে। চার পয়সায় বরাবর যাচ্ছি—আসছি। দয়া-দাক্ষিণ্য করে তুমি দু' পয়সা বেশি দিলে, অন্যের তাতে—ক্ষেতি করলে, তা' মনে বুঝো! একবার বেশি পেলে আর কমে মন উঠবে?'

এবারের বেয়ারা চারটে কিন্তু প্রতিবাদ করে ওঠে, এবং প্রবোধও মায়ের দিকে করুণ মিনতি নিয়ে তাকায়, কিন্তু মুক্তকেশী অনমনীয়া!

সদর্পে বলেন, 'দূর হ! দূর হয়ে যা পালকি নিয়ে। ভাত ছড়ালে আবার কাকের অভাব? বলি পালকির বেত তো ছিঁড়ে ওয়ার হয়ে গেছে, পড়ে গিয়ে সোয়ারির হাড়গোড় না চূর্ণ হয়, ইদিকে পয়সার লালসাটি তো খুব আছে? যাবি? না যাবি না?'

ওরা হাতের গামছাটা ঘাড়ে চাপাতে চাপাতে ব্যাজার মুখে বলে, 'যিবো না কাঁই?'

'বেশ! ওই চার পয়সাতেই যাবি।'

বীরদর্পে গিয়ে পালকিতে ওঠেন মুক্তকেশী!

পালকি বেয়ারাদের পরিচিত ধ্বনিটা শোনা যায় কাছ থেকে ক্রমশ দূরে!

আরো দূরে থেকে যেন একটা ক্ষুব্ধ হৃদয়ের চাপা আর্তনাদের মত শুনতে লাগে।

মুক্তকেশী যতক্ষণ ছিলেন, প্রবোধের প্রাণে যেন বল ছিল, মা চলে যেতেই মুখটা শুকিয়ে এল, কমে এল বুকের বল।

তবু কর্তব্য করতেই হবে।

তাই সুবর্ণলতার কাছে গিয়ে ইতস্তত করে বলে, 'মা তো একটা বার্তা দিয়ে গেলেন!'

সুবর্ণ অবশ্য এই 'বার্তা' সম্পর্কে বিশেষ উৎসুক হল না, শুধু মুখ তুলে তাকালো।

প্রবোধ 'জয় মা কালীর' ভঙ্গীতে বলে ফেললো, 'তোমার বাবা যে ও বাড়িতে এক খবর পাঠিয়েছিলেন—'

সুবর্ণলতা চমকে ওঠে।

তোমার বাবা!

খবর পাঠানো!

এ আবার কি অভিনব কথা।

সুবর্ণলতার যে একজন বাবা এখনো অবস্থান করছেন এই পৃথিবীতে, সে কথা কে মনে রেখেছে?

সুবর্ণলতা চমকে ওঠে, কিন্তু প্রশ্ন করতে পারে না! প্রবোধই আবার বলে, 'মানে এ বাড়ির ঠিকানা তো জানেন না। তোমারও এক বগ্গা গোঁ, আমারও ইয়ে হয় না, বাপ বলে কথা! সে যাক খবর পাঠিয়েছেন খুব না কি অসুখ, তোমাকে একবার দেখতে চান—'

তোমাকে একবার দেখতে চান!

সুবর্ণর বাবা সুবর্ণকে একবার দেখতে চান।

এটা কি সন্ধ্যাবেলা?

এই একটু আগেই না দুপুর ছিল।

তবে এখন কেন চারিদিক ছায়াচ্ছন্ন হয়ে আসছে?

সুবর্ণ সেই হঠাৎ অন্ধকার হয়ে আসা পারিপার্শ্বিকের দিকে অসহায়ের মত তাকায়।

এ দৃষ্টি বুঝি সুবর্ণলতার চোখে একেবারে নতুন। প্রবোধও তাই অসহায়তা বোধ করে। অতএব তাড়াতাড়ি বলে, 'আরে বেশি ভয় পাবার কিছু নেই, মানে বয়েস হয়েছে তো—মানে অসুখটা বেশি করেছে হঠাৎ, মানে আর কি—ইয়ে তোমার এখুনি একবার যাওয়া দরকার!'

সুবর্ণর চোখে জল নেই।

সুবর্ণর চোখ দুটো যেন ইস্পাতের।

সেই ইস্পাতের চোখ তুলে সুবর্ণ বলে, 'যাবার দরকার কি আছে এখনো?'

'বিলক্ষণ! নেই মানে?' প্রবোধ যেন ধিক্কার দিয়ে ওঠে, 'এই কি মান অভিমানের সময়? যতই হোক জন্মদাতা পিতা—'

'সে কথা হচ্ছে না—' সুবর্ণ যেন কথাও কয় ইস্পাতের গলায়, 'মরা মুখ দেখতে যেতে চাই না আমি!'

বললো এই কথা সুবর্ণ!

কারণ সুবর্ণর সেই কথাটা মনে পড়লো! বহুবার মনে পড়া আর ইদানীং ধূসর হয়ে যাওয়া সেই কথাটা। সুবর্ণ যেদিন জলবিন্দুটি পর্যন্ত না খেয়ে চলে এসেছিল বাবার কাছ থেকে, বাবা বলেছিল, 'আচ্ছা যেমন শাস্তি দিয়ে যাওয়া হলো, তেমন টের পাবে! এই বাপের মরামুখ দেখতে আসতে হবে।'

বলেছিল, বলে সুবর্ণকে নিয়ে ঘোড়ার গাড়িতে উঠেছিল সুবর্ণর বাবা নবকুমার। আর একটাও কথা বলে নি।

সেই শেষ কথা!

সেই কথাটাই মনে পড়লো সুবর্ণর, তাই বলে ফেললো, 'মরা মুখ দেখতে যেতে চাই না আমি!'

প্রবোধ হাঁ হাঁ করে ওঠে, 'কী আশ্চর্য তা কেন ভাবছো! মানুষের অসুখ করে না?'

সুবর্ণ চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকে।

প্রবোধ বলে, 'কানু কলেজ থেকে—'

'কেন, কানু কেন?' সুবর্ণলতা বলে, 'তুমি নিয়ে যেতে পারবে না?'

'আহা পারবো না কেন? তবে কথা হচ্ছে পারু একা থাকবে—'

'একা মানে?' সুবর্ণ সেই ঝকঝকে শুকনো চোখে চেয়ে বলে, 'পারু বকুল দুজনে নেই? মানু সুবল এরাও তো এসে যাবে এখনি—'

'আহা ওরা আবার মানুষ! মানে—মা বলে গেলেন নেহাৎ খবরটা দিয়েছে না গেলে ভালো দেখায় না—'

'থাক, বেশি কথা ভালো লাগছে না, তুমি একখানা গাড়ি ডেকে দাও, আমি একাই যাবো—'

(ক্রমশঃ)

সালফার
গায়েমাখা সাবান

গন্ধক চর্মরোগে বিশেষ উপকারী। সেজন্য এই সাবান নিত্য ব্যবহারে, বিশেষতঃ গরমের দিনে, খোস, ফোড়া, চুলকানি, ঘামাচি প্রভৃতি চর্মরোগ নিবারণ করে।
বেঙ্গল কেমিক্যাল

PR/PN/6628/BEN/2

শুভেচ্ছা

দীপালীর এই উৎসব যেন আপনার
জন্য সুখ ও সমৃদ্ধি নিয়ে আসে।

আজকের এই উৎসবের দিনে এবং
সারা বছর ধরেই আপনার গৃহে
আলো উজ্জলতর হয়ে উঠুক !

পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক

এইচ. জি. ওয়েলস-এর গল্প

বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য

ষষ্ঠ অধ্যায় ঃ দুঃসাহসের নেশায়

অসম্ভবের দেশ সত্যি আছে কিনা জানি নে, তবে একথা নিশ্চয় জানি যে মানুষ নিজের চেষ্টায় বহু অসম্ভবকে অনেক সময় সম্ভব করে তোলে। দুঃসাহস অনেক সময় ঘরছাড়া করে তাকে। অজানাকে জানবে বলে সে সুদুঃসহ সাধনায় নিমগ্ন হয়। সাধনা সফল হয় কখনও; কখনও আবার চরম ব্যর্থতার মধ্যে পরিসমাপ্তি লাভ করে। কিন্তু তবু মানুষের চেষ্টার বিরতি নেই। আবিষ্কারের নেশায় নিত্য নূতনের স্বপ্ন দেখছে সে। অভিযানের স্বপ্নে যুগ যুগ ধরে দুরধিগম্য প্রদেশে পাড়ি দিচ্ছে। মানবপ্রকৃতির এই চিরজিজ্ঞাসু রূপটি ওয়েলস-এর বহু গল্পে প্রতিফলিত। তবে বলেছি আগেই, আমাদের লেখকের ছিল স্বপ্ন-দেখা চোখ। তাই আবিষ্কারের গল্প লিখতে বসে কোথাও ভবিষ্যতে কি ঘটবে, তা' নিয়ে ভেবেছেন তিনি· কোথাও আবার আবিষ্কর্তাদের ব্যর্থতার মর্মস্পর্শী চিত্র এঁকেছেন।

ভবিষ্যতের চিত্র খুঁজে পাই 'দি ল্যান্ড আয়রনক্ল্যাডস' গল্পে। গল্পটির পটভূমি যুদ্ধক্ষেত্র। বিবদমান দুই পক্ষ সামনা-সামনি লড়াই করছে এখানে। এক পক্ষের সম্বল সাবেকী আমলের গুলী-গোলা ও বন্দুক। অপর পক্ষের হাতে মারাত্মক অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত চৌদ্দটি স্থলযান। পুরু লোহায় গড়া সেগুলো। সেগুলোর প্রতিটিই দুর্ভেদ্য। দেখলে মনে হয়, চলমান লৌহদুর্গ যেন।। ওই হল 'দি ল্যান্ড আয়রনক্ল্যাডস'। এরা যে আজকের দিনের ট্যাঙ্কের প্রতিনিধি, এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। সন্দেহ নেই যে, ট্যাঙ্ক আবিষ্কৃত হবার অনেক আগেই ওয়েলস এ বস্তুটির সম্ভাব্য আকৃতি ও প্রকৃতি অনুমান করতে পেরেছিলেন।

আলোচ্য গল্পটি প্রথম প্রকাশিত হয় ১৯০৩ খৃস্টাব্দে; আর ট্যাঙ্ক আবিষ্কৃত হয়েছিল প্রথম মহাযুদ্ধের সময়। ওয়েলস-এর যুগের পরিপ্রেক্ষিতে বিচার করলে অকুণ্ঠিতচিত্তে বলতে পারি আমরা যে লেখক এখানে যথেষ্ট দূরদৃষ্টির পরিচয় দিয়েছেন। এ ছাড়া বিশ শতকের প্রথম দশকের পাঠকরা যে এ থেকে বিস্ময় ও রোমাঞ্চের উপকরণ খুঁজে পেয়েছিলেন, এ কথাও সহজেই অনুমান করা চলে। কিন্তু আজকের দিনের পাঠকদের কাছে গল্পটির আবেদন কতটুকু, তা নিয়ে প্রশ্ন উঠতে পারে। সঙ্গত কারণেই জিজ্ঞাসা উপস্থাপিত করতে পারি আমরা, সমর-বিজ্ঞান ও গুলীবারুদের বর্ণনাকে ছাপিয়েও এ গল্প আমাদের মনে স্থায়ী কোনো রেখাপাত করে কি? সংক্ষেপে এর উত্তর হল, না ; করে না।

এ কাহিনীর বক্তব্য কিছু রয়েছে বটে, 'ওয়ার করিসপনডেন্ট' বা যুদ্ধক্ষেত্রের সংবাদ প্রদানকারীর ভাষায় তা' হল মানুষ বনাম যন্ত্রে যুদ্ধ। এই যুদ্ধ থেকে মানুষের নিজস্ব শক্তির বিচার হয় না, বিচার হয়, কৃত্রিম যন্ত্রশক্তিতে কে কত বড়, তার। 'ওয়ার করিসপনডেন্ট' অবাক হয়ে দেখেছে, যারা অপেক্ষাকৃত বেশি বলিষ্ঠ, যুদ্ধে তারাই হেরে গেল ; আর যারা জিতল, শৌর্যেবীর্যে বিজিতদের চেয়ে তারা অনেক নিকৃষ্ট। অর্থাৎ যন্ত্রশক্তিই শেষ অবধি বিজয়ী করল তাদের। বক্তব্যটি শুনতে সুন্দর। কিন্তু জীবন-রসের অভাব থাকায় এ বক্তব্য হৃদয়স্পর্শী হয়ে ওঠে নি।

এদিক থেকে 'দি আরগ্যান্যটস অব দি এয়ার' গল্পটি অপেক্ষাকৃত উচ্চাঙ্গের। বাংলায় এ কাহিনীর নাম দেওয়া যেতে পারে 'আকাশপথের অভিযাত্রী।' লেখকের দূরদৃষ্টির পরিচয় এখানেও দুর্লভ নয়। মানুষ উড়তে সুরু করার অনেক আগেই এ গল্পটি লেখা হয়েছিল। উড়বার প্রথম কৃতিত্ব রাইট ভ্রাতৃদ্বয়ের। ১৯০৩ খৃস্টাব্দের ১৭ই ডিসেম্বর উইলবার রাইট (১৮৬৭—১৯১২) ও ওরভিল রাইট (১৮৭১—১৯৪৮) সর্বপ্রথম আকাশপথে পাড়ি দেন। ৮৫২ ফুট পথ ৫৯ সেকেন্ডে অতিক্রম করেন ওঁরা। কিন্তু ওয়েলস এ গল্পটি লিখেছিলেন রাইটদের অভিযানের ৮ বছর আগে ১৮৯৫ খৃস্টাব্দে। অতএব তিনি যে তাঁর বর্তমানের ওপর দাঁড়িয়েই ভবিষ্যতের অনেক দূর অবধি দেখতে পেয়েছিলেন, একথা অস্বীকার করা যায় না।

অন্য দিক দিয়েও গল্পটির গুরুত্ব আছে। এ গল্প আকাশযাত্রী পথিকৃৎদের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। স্পষ্টই দেখিয়ে দেয়, প্রথম উড়তে চেয়েছিলেন যাঁরা, তাঁরা ছিলেন যথার্থ দুঃসাহসী। আজ আমরা তাঁদের কথা ভুলে গেছি বটে; কিন্তু সে ভুলের জন্যে তাঁদের গৌরব কিছু লাঘব হয় নি; আমরাই বরং অগৌরবের ভাগী হয়েছি।

এই রকম ভুলে-যাওয়া এক আকাশ-অভিযাত্রীকে নিয়ে লেখা একটি আকর্ষণীয় কাহিনী 'আরগ্যান্যটস অব দি এয়ার'। বলা বাহুল্য, কাহিনীটি কল্পিত। এর সুরু থেকে শেষ অবধি সবটাই লেখকের মনগড়া। তাই বলে এমন কথা বলা যায় না যে, বিমান চালনার গোড়ার দিকে এ ধরণের ঘটনা ঘটে নি। বরং বলা যায়, সাফল্যের সোপান বেয়ে আকাশপথে আজকের মানুষের যে জয়যাত্রা, সে সোপানে প্রথম পা দিতে গিয়ে অনেকেই শোচনীয়ভাবে ব্যর্থ হয়েছেন। বিজ্ঞানে উপেক্ষিত এঁরা। বিজ্ঞানবিদ্যার ইতিহাসে কেউ এঁদের নাম লিখে রাখেন নি। ঠিক এই শ্রেণীর একজন উপেক্ষিত বিজ্ঞানী এ গল্পের নায়ক মনসন।

উড়বার নেশায় তাঁকে পেয়ে বসেছিল। এজন্যে অজস্র ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ সহ্য করেছেন তিনি। প্রচুর বাধা-বিপত্তির মুখোমুখি হয়েছেন। কিন্তু তবু কিছুতেই হাল ছাড়েন নি। নতুনকে জানবার দুর্বার আকাঙ্ক্ষায় প্রাণপাত পরিশ্রম করেছেন।

শেষ অবধি সাফল্যের সিংহদ্বারে পৌঁছেছেন মনসন। আকাশে উড়বার আশায় বিরাট উদ্যোগ-আয়োজন করেছেন। সহকর্মী উডহাউসের কাছ থেকে পেয়েছেন অক্লান্ত সহযোগিতা।

পরিশেষে সাফল্যের মাহেন্দ্রলগ্ন এসেছে। কিন্তু সে লগ্নেই হয়েছে ওঁদের মৃত্যু। এই মৃত্যুর জন্যে আকাশপথে অভিযানের ক্ষেত্রে পথিকৃতের সম্মান ওঁরা পেলেন না; কেউ জানল না ওঁদের সাফল্যের কথা। কয়েকজন কৌতূহলী মানুষ শুধু দেখল, আকাশপথে চলতে

[illegible] গ্রাস [illegible] দিকে অতি [illegible] চোখের পলকে [illegible] লি।

[illegible] টনাকে ব্যর্থতা বলে ধরে নিল সবাই। অভিযানের গোড়ার দিকে মনসন ও তাঁর সহকর্মী উডহাউস যে সাফল্যের সংগে অনেকটা পথ অতিক্রম করেছিল, সে কথা কেউ মনে রাখল না। কেউ জানল না, আকাশপথে উড়ন্ত যন্ত্রযানটিকে নিয়ে বাঁচবার জন্যে কি নিদারুণ সংগ্রাম করেছেন ওঁরা। সবাই দেখল, বিজ্ঞান কলেজের ওপর পড়ে দাউ দাউ করে জ্বলছে একটা অদ্ভুত পদার্থ। কুণ্ডলীকৃত রাশি রাশি ধোঁয়া বেরিয়ে আসছে তা' থেকে। আশেপাশের মানুষেরা ভয় পেয়েছে খুব। যে যেদিকে পারে ছুটছে। কেউ বা আতঙ্কে চীৎকার করছে। দমকল ছুটে আসছে আগুন নেভাবে বলে।

মর্মান্তিক এই দুর্ঘটনার চিত্রটি লেখকের বর্ণনাগুণে সম্পূর্ণ বিশ্বাসযোগ্য হয়ে উঠেছে। এ ছাড়া মনসন ও উডহাউসকে উড়তে দেখে জনসাধারণের প্রতিক্রিয়ার যে ইতিবৃত্ত এখানে উদ্ধার করা হয়েছে তাও সম্পূর্ণ স্বাভাবিক বলেই আমাদের মনে হয়। রেলগাড়ির বিস্মিত যাত্রীদের, হাইড পার্কের সাধারণ মানুষদের কিছুতেই ভুলতে পারি না আমরা। আর ভুলতে পারি না গল্পকারের কথাগুলো,

"যদিও ব্যর্থ হয়েছিল মনসন, ভয়াবহ দুর্ঘটনার জন্যে ব্যর্থ হয়েছিল, তবু তাঁর প্রচেষ্টার ইতিকথা স্মরণীয় হয়ে রইল। ভবিষ্যতে যে সব সাহসী অভিযাত্রীর দল আকাশে ওড়ার বিদ্যা একদিন না একদিন ভালভাবে আয়ত্ত করবেন, এ কাহিনী হবে তাঁদের পথ-প্রদর্শক।"

গল্পটির একেবারে শেষ দিকে মনসনের পরীক্ষাস্থলটির বর্ণনা দিয়েছেন লেখক। বলেছেন, ওই ভুলে-যাওয়া বিজ্ঞানীর বিচিত্র পরীক্ষা-নিরীক্ষার স্মৃতিচিহ্ন আজও উরসেস্টার পার্কের কাছে চোখে পড়বে। এই উপসংহার গল্পটির বাস্তবধর্মিতা অনেকখানি বাড়িয়েছে।

বিজ্ঞানজগতে উপেক্ষিত এই ধরণের এক আবিষ্কর্তার কল্পিত জীবনকাহিনী 'ফিল্মার'। বড় বড় এক একটি আবিষ্কারের পিছনে একের নয়, অনেকের অবদান থাকে। বহুজনের সাধনাতেই বিজ্ঞানবিদ্যার জয়যাত্রা। কিন্তু বিস্ময়ের [illegible] বিজ্ঞানসাধকদের [illegible] রাখে না। অনেকের [illegible] পরীক্ষা-নিরীক্ষার পথ ধরে চরম সাফল্য যে বিজ্ঞানী অর্জন করেন, মানুষ তাঁরই গলায় জয়মাল্য পরিয়ে দেয়। অবশিষ্টদের কথা, সাফল্যের ভিত্তি প্রস্তুত করেছেন যাঁরা, তাঁদের কাহিনী কেউই মনে রাখে না। বিজ্ঞান সাধনায় ব্যর্থ হয়েছেন ভেবে সবাই এঁদের করুণার দৃষ্টিতে দেখে। আলোচ্য গল্পে এমনি এক ব্যর্থ বিজ্ঞানীকে নায়ক হিসেবে মনোনয়ন করা হয়েছে। এখানে ফিল্মার নামে অভিহিত হয়েছেন যিনি, বাস্তব জগতে কোনোকালে তাঁর অস্তিত্ব ছিল না। চরিত্রটি যে লেখকের একান্তই মনগড়া, এ বিষয়েও কোনো সন্দেহ নেই। কিন্তু বহু শত বিজ্ঞানীর ব্যর্থতার মধ্য দিয়েই বিজ্ঞানের সাফল্য, বহু সার্থক বিজ্ঞানসাধককেও ভুলে বসে আছি আমরা, এই কথা যদি স্মরণে রাখি তো দেখব, ফিল্মারের মতো অবহেলিত ও উপেক্ষিত বিজ্ঞানী বিরল নয়। গবেষণায় সাফল্য অর্জন করা সত্ত্বেও সামান্য একটু-আধটু ভুল-ত্রুটির জন্যে আবিষ্কর্তার সম্মান এঁরা পান নি।

বিমান নির্মাণের ইতিহাসে ফিল্মার অন্যতম পথিকৃৎ। অথচ অল্পের জন্যে পথিকৃতের সম্মান তিনি পেলেন না। মেধাবী ছাত্র ও কৃতী গবেষক ছিলেন তিনি। অসাধারণ ছিল তাঁর কর্মনিষ্ঠা। দীর্ঘদিনের সাধনার মধ্য দিয়ে তিনি সাফল্যের দরজায় উপনীত হয়েছিলেন। কিন্তু তবু বিজয়ীর সম্মান যে তিনি পেলেন না, এ জন্যে তাঁর আবিষ্কৃত যন্ত্রের কোনো ত্রুটি দায়ি নয়, দায়ি তাঁর হৃদয়। যন্ত্রটিকে যথাসম্ভব নিখুঁত করেই গড়েছিলেন তিনি, কিন্তু হৃদয়টিকে বাঁধা দিয়েছিলেন লেডী মেরী এলকিংহর্নের কাছে। ফিল্মারের এই হৃদয়ঘটিত দহনই পরিশেষে তাঁর মৃত্যু ডেকে আনল। যন্ত্রকে নিয়ে যেদিন তাঁর আকাশে উড়বার কথা, যেদিন এই দৃশ্য দেখবে বলে অসংখ্য লোক সমবেত হয়েছে, সেদিনই আত্মহত্যা করে জীবনযন্ত্রণা জুড়াতে চাইলেন তিনি। আসল কাহিনী কেউ জানল না; সবাই ভাবল, আকাশ-অভিযানের ব্যর্থতার গ্লানিকে ঢাকবার জন্যই ফিল্মার আত্মহত্যা করেছেন।

ফিল্মারের এই জীবনচিত্র আমাদের মুগ্ধ করে। পতনে-উত্থানে ঘেরা তাঁর জীবনকাহিনীর দিকে সবিস্ময়ে তাকাই আমরা। তাঁর ছাত্রজীবন, গবেষণা, পরীক্ষা-নিরীক্ষা সব কিছুর মধ্যেই অসাধারণত্ব লক্ষ্য করি। আমাদের মনে হয়, বিমান নির্মাণের ইতিহাসে এমন একজন অসাধারণ বিজ্ঞানীর অস্তিত্ব কোনোদিন আবিষ্কৃত হলেও হতে পারে। মনে যে হয়, তার কারণ, লেখক চিঠিপত্র, খবরের কাগজ এবং তৎকালীন পটভূমির নজীর তুলে চরিত্রটিকে সম্পূর্ণ বিশ্বাসযোগ্য করে তুলবার চেষ্টা করেছেন। এ ছাড়া ফিল্মারের অনুপ্রেরণার উৎস বাঙ্খর্স্টের জীবনস্পন্দনও মনেপ্রাণে অনুভব করি আমরা।

দুঃসাহসিক অভিযানকে ঘিরে আরও কয়েকটি বিচিত্র রসের গল্প লিখেছিলেন ওয়েলস। এই প্রসংগে প্রথমেই উল্লেখযোগ্য 'দি ফ্লায়িং ম্যান' বা 'উড়ন্ত মানুষ'। গল্প হিসেবে এটি উচ্চাংগের কিছু নয়। আজকের দিনে এ ধরণের গল্পের আবেদন কতটুকু, তা' নিয়েও প্রশ্ন উঠতে পারে।

এক লেফটেনান্ট তাঁর কিছু সাংগপাংগকে নিয়ে লুসাই পাহাড়ে অভিযানে বেরিয়েছিলেন। কিন্তু স্থানীয় আদিবাসীদের আক্রমণে অভিযাত্রীরা বিপদে পড়লেন। অনেক কষ্টে দুর্গম এক উপত্যকা ধরে এঁরা তখন এগিয়ে চললেন। অবশেষে এক পর্বতশৃংগের কাছাকাছি গিয়ে উপত্যকাটি শেষ হয়ে গেল। লেফটেনান্ট তখন এক দুঃসাহসিক কাজ করলেন। একটি তাঁবুকে প্যারাস্যুট করে তিনি ওই শৃংগ থেকে পর্বতের পাদদেশে নেমে এলেন। স্থানীয় আদিবাসীরা এই দৃশ্য দেখে স্তম্ভিত হল। অনেকেই রঙ চড়িয়ে বলতে লাগল, লেফটেনান্ট একটি উড়ন্ত মানুষ। পাখা আছে তাঁর। ইচ্ছে করলেই যেখানে খুশি উড়ে বেড়াতে পারেন তিনি। একদিকে স্থানীয় অধিবাসীদের এই বিশ্বাসকে এবং অপরদিকে লেফটেনান্টের বর্ণিত প্রকৃত ঘটনাকে এই গল্পে পাশাপাশি তুলে ধরা হয়েছে। এর মধ্যে অসাধারণত্ব কিছু নেই। তবে আরণ্যক উপত্যকার দুর্গম পথ ধরে লেফটেনান্ট তাঁর দলবলসহ এগোন যখন, যখন দুঃসাহসের নেশায় সমস্ত বিপদ-আপদকে তুচ্ছ করে এঁরা সামনের দিকে এগিয়ে চলেন, তখন গল্পটির মধ্যে আমরা রহস্যের স্বাদ অনুভব করি। আমাদের মনে হয়, কাহিনীটির অন্তত এই অংশ রহস্য ও রোমাঞ্চ-সৃষ্টির দিক দিয়ে সার্থক।

দুঃসাহসিক অভিযানকে ঘিরে লেখা আর একটি কৌতূহলোদ্দীপক কাহিনী 'জিম্মি গগলস্ দি গড্' এক অসমসাহসী যুবক নিজেকে ধনী বানাতে গিয়ে কেমন করে ভগবান বানাল, এই গল্পে তা' বলা হয়েছে।

একবার 'ওসান পাওয়ানিয়ার' নামে একটি জাহাজ ডুবে যায়। চল্লিশ হাজার পাউন্ড মূল্যের সোনা ছিল ওই জাহাজে। সেই সোনা উদ্ধার করতে গিয়ে এক

যুবক বিচিত্র অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করল। সোনা সে শেষ অবধি পেল না। কিন্তু ডুবুরীর পোশাক-পরা অবস্থায় ওকে দেখে স্থানীয় অধিবাসীরা ভাবল, ওই বুঝি জলদেবতা। তারপর দেবতা ভেবে ওর পুজোর্চনা সুরু করল সবাই। ডুবুরীর পোশাকটিকে এক রসিক সহ-যাত্রী নাম দিয়েছিলেন জিম্‌মি গগ্‌লস্‌। অভিযাত্রীটিকে জলদেবতা ঠাওরাবার মূলে ছিল এই পোশাকটি এবং এরই নামে গল্পটির নামকরণ হয়েছে।

রহস্যের উপাদান এ গল্পে অনেক আছে। অরণ্য-সমাকীর্ণ ও আগ্নেয়গিরি-অধ্যুষিত নির্জন অঞ্চল, সমুদ্রের তলায় ডুবে যাওয়া জাহাজের ধ্বংসাবশেষ এবং আদিবাসীদের অদ্ভুত আচার-আচরণ—এই সব কিছুর মধ্যেই রহস্যের স্বাদ পাই আমরা।

'দি ট্রেজার ইন্‌ দি ফরেস্ট' গল্পে রহস্যরস আরও বেশি নিবিড় ও ঘনীভূত। কয়েকজন দুঃসাহসী গুপ্তধন সংগ্রহ করতে গিয়ে কেমন করে চরম বিপদকে ডেকে আনল, এই গল্পে তা' বলা হয়েছে। অপরিমিত লোভ যে অনেক সময় সর্বনাশ ও ধ্বংসকে ডেকে আনে, এ কাহিনীর সমস্ত কিছু ছাপিয়ে সেই সুর গুঞ্জরিত। তবে এই বক্তব্যের কথা ভুলে গেলেও গল্পটির রসাস্বাদনে কোনো বাধা জন্মে না। নির্জন সমুদ্রতীর, গিরি-খাতবাহী কলমুখরা নদী, শ্বাপদসংকুল আরণ্যক পরিবেশ, দুর্গম পার্বত্য ভূভাগ এবং সেই বিষাক্ত পাহাড়ী কাঁটাকে কেন্দ্র করে এখানে ষড়যন্ত্র ও স্বার্থান্বেষণের যে রোমাঞ্চকর চিত্র আঁকা হয়েছে, তা' সহজেই পাঠকমনকে অভিভূত করে। গল্পটি জমে উঠেছে প্রথম দৃশ্য থেকেই। সেখানে দেখি, ছোট্ট একটি নৌকো সমুদ্রের তীর-বরাবর এগিয়ে চলেছে। বড় সুন্দর সেই তীর। পাহাড় উঠে গেছে তার গা ঘেঁষে। সবুজ পাহাড়। ঘন-বনাচ্ছন্ন ও রহস্যময় সে। তার বুক চিরে নেমেছে এক খরস্রোতা নদী। সমুদ্রে নেমেছে। নদীটিকে স্পষ্ট চোখে পড়ছে। দূর থেকে দেখা যাচ্ছে তার শ্বেতশুভ্র প্রবাহ-পথটিকে। অনেক দূরে দাঁড়িয়ে আকাশ-ছোঁয়া পর্বতশ্রেণী। মেঘের মতো ধূসর ও অস্পষ্ট ওরা। হঠাৎ দেখলে মনে হয়, জমাট কতকগুলো ঢেউ বুঝি। এদিকে সমুদ্র স্তব্ধ ও গম্ভীর। আকাশে জ্বলন্ত সূর্য। আগুন ঠিকরে বেরোচ্ছে তা' থেকে। গল্পটির আরম্ভেই এই অপূর্ব বর্ণনা পাঠকদের এক রহস্যময় দেশের দিকে নিয়ে যায়। তাঁরা দেখতে পায় যেন, দু'জন অভিযাত্রী ইভান্স ও হুকার অতি সন্তর্পণে এগোচ্ছে সেই দেশের দি…
বলছে ওরা। ক…
ম্যাপ বের করে বিড় বিড়…
আলোচনা করছে। সমুদ্রতীরের …
ধীরে ধীরে এগিয়ে আসছে ওদের নৌকোটি। ইভান্স দাঁড় টানছে কখনও। কখনও টানছে হুকার।

দেখতে দেখতে রহস্যপুরীর খুব কাছাকাছি পোঁছে গেল ওরা। কিন্তু ইভান্সের মনে হল, গুপ্তধনের রাজ্যে এসেও আশানুরূপ আনন্দিত হতে পারছে না সে। বারবার তার তিক্ত কিছু অভিজ্ঞতার কথা মনে পড়ছে। মনে পড়ছে, ম্যাপটি সংগ্রহ করার জন্যে ওকে কি দারুণ উত্তেজনার মধ্য দিয়ে সংগ্রাম করতে হয়েছে। এ ছাড়া রাত জেগে সমুদ্র পাড়ি দিতে হয়েছে তাকে।

ইভান্সের একবার মনে হল, অপরি-সীম ক্লান্তি ক্রমেই যেন তাকে আচ্ছন্ন করে ফেলছে। যেন নিশ্বাস রুদ্ধ হয়ে আসছে তার। দেহ ক্রমেই অসাড় হয়ে পড়ছে।

নিজেকে চাঙ্গা করে তুলবার আপ্রাণ চেষ্টা করল সে। গুপ্ত স্বর্ণ-ভাণ্ডার নিয়ে কয়েকজন চীনার যে আলোচনা শুনেছিল, সে সব কথা ভাববার চেষ্টা করল। কিন্তু কিছুতেই বিক্ষিপ্ত হল না তার মন। সামনেই ছিল যে কলমুখরা নদীটি, মন পড়ে রইল সেখানে।

ইভান্সের তৃষ্ণা পেয়েছিল খুব। তার গলা তখন শুকিয়ে কাঠ। সে চাইছিল, ওই নদীর জল পান করে তৃষ্ণা দূর করতে।

এদিকে অরণ্যে-অর্ণবে মাথামাখি চলেছে তখন। সমুদ্রের জল গিয়ে আছড়ে পড়ছে সামনের শৈলশ্রেণীর গায়ে। অদ্ভুত মিষ্টি একটা শব্দ শোনা যাচ্ছে। শব্দটা খুব ভাল লাগছে ইভান্সের। দেখতে দেখতে তন্দ্রায় জড়িয়ে ধরল তাকে। ঢুলতে লাগল সে। যেন স্বপ্নের ঘোরে হারিয়ে-যাওয়া দু-একটা ঘটনা স্পষ্ট দেখতে পেল।

গল্পটির এই অংশে ইভান্সের স্বপ্নকে কেন্দ্র করে ফ্ল্যাশ-ব্যাকে লেখক গুপ্তধনের ইতিকথা বর্ণনা করেছেন। কাহিনীটিকে জমিয়ে তুলবার খাতিরে এর প্রয়োজন ছিল। কেন না এই স্বপ্ন থেকেই আমরা জানতে পারি, চীনেদের গুপ্তকথা ইভান্স ও হুকারের কাছে প্রকাশ হয়ে পড়েছে। এখানে আমরা দেখতে পাই এক রাত্রিকে। চাঁদের অস্পষ্ট আলোয় সে রাত্রি মায়াময়। তিনজন চীনে নিভৃতে বসে আছে। সলা-পরামর্শ করছে ওরা। ওদের সামনে আগুন জ্বলছে। ইভান্স ও হুকার চুপি চুপি এগিয়ে গেল সেদিকে। দূরে দাঁড়িয়ে ওদের কথাবার্তা শুনল। বুঝল না সব কিছু। কিন্তু …

সাত রা…
সমুদ্রের তীরে পু…
কেমন করেই বা চ্যাং হি…
মাত্র এক বছর আগে সে…
সন্ধান পেয়েছিল।

সমুদ্রের তীরে ঘুরে বেড়াচ্ছিল চ্যাং হি। ঘুরতে ঘুরতে হঠাৎ সে ওই সোনার সন্ধান পেয়েছিল। দু'শ বছর ধরে সমাধিস্থ ছিল ওই গুপ্তধন। চ্যাং হি তাকে মাটির তলা থেকে উদ্ধার করল। কিন্তু অতি সাবধানী ও ধুরন্ধর প্রকৃতির মানুষ সে। তাই স্বর্ণ সম্পদকে সঙ্গে সঙ্গেই সে ঘরে নিয়ে এল না। লুকিয়ে রাখল ওই সমুদ্রতীরেরই কাছাকাছি, কোনো একটি জায়গায়। এমন জায়গায় যা' লোহার সিন্দুকের চেয়েও অনেক বেশি নির্ভরশীল; সহজে সেখানে কেউ যেতে পারবে না।

ঘরে ফিরে এল চ্যাং হি। ফিকির খুঁজতে লাগল, কেমন করে ওই নিষিদ্ধ পুরীতে গিয়ে গুপ্তধনকে নিয়ে আসা যায়। বিশ্বাসী দু-একজন অনুচরের সন্ধান করল সে। দু'জন অনুচর সে পেয়েও গেল।

ওদের সঙ্গেই রাত্রির অন্ধকারে ওর কথাবার্তা চলছিল। দূর থেকে ছায়া-মূর্তির মতো মনে হচ্ছিল চ্যাং হি-কে। ওর হাতে ছিল একটি ম্যাপ।

সেই ম্যাপ চ্যাং হি-র কাছ থেকে কেমন করে উদ্ধার করেছিল ইভান্স, স্বপ্নের মধ্যে তার ইঙ্গিত আছে। কিন্তু সে ইঙ্গিতের চেয়েও বড় হয়েছে ওই চীনেটির ক্রূর চরিত্র। স্পষ্টই অনুভব করি আমরা যে, সাপের মতোই হিংস্র ও কুটিল সে। ইভান্সের সঙ্গে প্রচণ্ড সংগ্রাম সুরু হয়েছে তার। তাল তাল সোনা আগলে সে এক অতিকায় দৈত্যের মতো বসে আছে।

স্বপ্নে চ্যাং হি-কে ক্রমশ বড় হয়ে ওঠা এক মূর্তিমান বিভীষিকা বলে কল্পনা করছে ইভান্স। তার মনে হয়েছে, যেন সে বিভীষিকা ক্রমেই তাকে গ্রাস করতে চাইছে। স্বপ্নের এই অংশটি ভয়ঙ্কর-রসের অবতারণার দিক দিয়ে সার্থক। স্বপ্ন-ভাঙার বর্ণনাও শিল্পশ্রী-মণ্ডিত। হঠাৎ মনে হয়েছিল ইভান্সের, যেন একটা শয়তান, তার নাম ধরে ডাকছে; যেন বলছে, 'ইভান্স, ইভান্স। ঘুমিয়ে পড়া মূর্খ কোথাকার'!

কিন্তু এ ডাক সে শয়তানের নয়, ইভান্সের সঙ্গী হুকারের, পর-মুহূর্তেই

সে কথা জানতে পারি আমরা; এবং সঙ্গে সঙ্গে এ কথাও বুঝে নিতে আমাদের কষ্ট হয় না যে, লেখক গল্পের প্রয়োজনেই স্বপ্নের জগৎ থেকে আবার বাস্তব-রাজ্যে ফিরে এলেন।

বাস্তব-রাজ্যটিও এবার আমাদের কাছে আগের চাইতে অনেক বেশি রহস্য-ময় হয়ে দেখা দেয়। আমরা অনুমান করতে পারি, প্রতিদ্বন্দ্বীর শ্যেন-চক্ষুকে ফাঁকি দিয়ে অভিযাত্রীরা চলেছে।

এতক্ষণে ক্ষুদ্র একটি হ্রদের মুখে এসে পড়েছে ওরা। ওখান থেকে নদীটি স্পষ্ট চোখে পড়ছে। নদীর কাছে আসা মাত্রই আনন্দে চিৎকার করে উঠল ইভান্স। ভাবল এইবার পানীয় জল মিলবে।

খুব দ্রুত নৌকো চালাল ওরা। অল্পক্ষণের মধ্যেই নদীর মুখে এসে পৌঁছুল। সঙ্গে সঙ্গেই হাতে করে জল তুলে নিল ইভান্স। কিন্তু মুখে দিতেই অদ্ভুত বিস্বাদ লাগল তার। জল সে ফেলে দিল।

এদিকে অবস্থা ক্রমেই শোচনীয় হয়ে উঠছে। দুর্দান্ত তৃষ্ণায় বুক ফেটে যাচ্ছে উভয়েরই। তাই বাধ্য হয়ে দ্বিতীয়-বারের চেষ্টায় ওই নদীর জলই ওদের খেতে হল। ইভান্স উপুড় হয়ে পড়ল নৌকোর একেবারে সামনের অংশটিতে। মুখ বাড়িয়ে দিল নদীর জল অবধি। তারপর আকণ্ঠ পান করল।

পাহাড়ী নদীর বিস্বাদযুক্ত জল-পানে নিরত ইভান্সের এই চিত্রটি মর্মস্পর্শী। এর মধ্য দিয়ে অর্থগৃধ্নু নয়, জীবনভিক্ষু মানুষকেই খুঁজে পাই আমরা। আমরা দেখতে পাই, অপ্রয়োজনের স্বর্গসুধার চেয়ে প্রয়োজনের মর্ত-কণিকা মানুষের কাছে বেশি প্রিয়।

কিন্তু তবু আলেয়ার পিছনে ঘুরে বেড়ায় মানুষ। চরম ব্যর্থতা ও অবর্ণ-নীয় দুঃখ-কষ্টের আঘাত সত্ত্বেও সম্পদের নেশা অনেক সময় তাকে উন্মাদ করে তোলে; এবং এইখানেই মানুষের সবচেয়ে বড় ট্র্যাজিডী। আলোচ্য গল্পে এই ট্র্যাজিডীর শিকার হয়েছে কয়েকজন দুঃসাহসী অভিযাত্রী। ইভান্স ও হুকারও মৃত্যু-ফাঁদের দিকে ধীরে ধীরে এগিয়ে গেছে।

গল্পটির পরবর্তী পর্বে দেখি, নদী থেকে আবার সাগরে ফিরে এসেছে ওরা। সাগরের তীর ঘেঁষে চলতে চলতে ম্যাপে-বর্ণিত ঝোপ-ঝাড়ের অন্বেষণ করছে। অবশেষে অভিলষিত অঞ্চলটি চোখে পড়েছে ওদের। নৌকো থেকে নেমে আরণ্যক পার্বত্য পথ ধরে ওরা এগিয়েছে। সে পথ একদিকে যেমন ভয়ঙ্কর ও দুর্গম অপরদিকে তেমনি সুন্দর ও চিত্তাকর্ষক। তার সুরুতেই প্রতিবন্ধক। বিচিত্র সব লতা-পাতার জাল পথ অবরোধ করে দাঁড়িয়েছে। কিন্তু তবু হার মানে নি অভিযাত্রীরা। অনেক কষ্টে পথ চলেছে। পথ প্রশস্ত মনে হয়েছে ধীরে ধীরে। লতা-পাতার অত্যাচার ক্রমেই কমে এসেছে। বড় বড় গাছ চোখে পড়েছে এবার। মনে হয়েছে, অতিকায় এক একটা স্তম্ভ যেন।

খানিক দূর এগোলেই পথ একেবারে ছায়াশীতল। সূর্যের আলোক কোনো-দিন পৌঁছয় নি ওখানে। গ্রীষ্মের দহন কোনোদিন ওখানে সংক্রামিত হয় নি। ওখানে রাশি রাশি সাদা ফুলের মেলা। এক গাছ থেকে অপর গাছ অবধি বিস্তৃত বড় বড় লতার সমারোহ। বড় শীত ওখানে। সে শীতে ইভান্স একবার কেঁপে উঠেছিল।

দেখতে দেখতে অনেকদূর এগিয়ে গেল ওরা। সূর্যালোকে ওরা একখণ্ড জায়গায় এসে পৌঁছুল। বড় কোনো গাছ ছিল না সেখানে। ছিল ছোট-খাটো উদ্ভিদ আর রঙ-বেরঙের ফুল। ওখানে দাঁড়াতেই নদীর গর্জন কানে এল ওদের। ওরা দেখল, নদীর তীর ঘেঁষে অরণ্যের মেলা। মহীরুহেরা অতন্দ্র প্রহরীর মতো দাঁড়িয়ে। আর ওদের গা ঘেঁষে অজস্র সব লতা-পাতা। হাজার হাজার নাম-না-জানা ফুল সেখানে।

দুর্গম বনপ্রদেশ ধরে অভিযাত্রীদের এই যাত্রা-পথের বর্ণনাটি যথার্থই চিত্র-ধর্মী। কিন্তু এর পরবর্তী অংশে পথের যে বর্ণনা পাই, কোনোদিন কোনো চিত্রশিল্পী তা' নিয়ে মাথা ঘামান না। ওখানে দেখি, ছায়ায় ঢাকা পথ ধরে আবার এগিয়েছে অভিযাত্রীরা। এক ভাঙা পাথরের স্তূপ বরাবর এগিয়েছে। খানিক দূর এগোতেই ভয়াবহ এক দৃশ্যের মুখোমুখি হয়েছে ওরা। দেখেছে, বিবর্ণ হয়ে যাওয়া এক 'চীনেম্যান' মুখ থুবড়ে পড়ে আছে। তার দেহে প্রাণের কোনো চিহ্ন নেই। ঠিক তার পাশেই একটি কোদাল। আর খানিকটা দূরে স্তূপীকৃত ভাঙা পাথর। স্তূপের খুব কাছে নতুন খোঁড়া একটি গর্ত।

এই ভয়ঙ্কর দৃশ্য দেখে প্রথমটায় ইভান্স ও হুকার দুজনেই খুব ভয় পেল। কিন্তু তবু ইভান্স দমল না কিছুতেই। সম্পদের নেশায় সে তখন মরীয়া হয়ে উঠেছে। সে দ্রুত এগিয়ে গেল ওই গর্তটির দিকে। উঁকি মেরে দেখল, একটু দূরেই বড় বড় কয়েকটা হলদে রঙের ধাতুখণ্ড। তাড়াতাড়ি মাটি ও পাথর সরিয়ে সে ওই ধাতুখণ্ডগুলোর মধ্য থেকে একটিকে বের করে আনল। কিন্তু ঠিক ওই মুহূর্তেই তার হাতে একটি কাঁটা বিঁধে গেল। নিজের হাতেই কাঁটাটি বের করে আনল সে এবং তারপর ধাতুর পিণ্ডটি তুলে ধরল।

পিণ্ডটিকে সোনা বা সীসে বলে মনে হচ্ছিল তার। কিন্তু হুকারের দৃষ্টি তখন অন্যদিকে। সে তখন চীনেম্যানটির দিকে তাকিয়েছিল আর বলছিল, 'সে এখানে একা এসেছে। বিষাক্ত কোনো সাপের দংশনে মৃত্যু হয়েছে তার।'

দেশ সেবায় নিয়োজিত,

এ্যালবার্ট ডেভিড লিমিটেড

কলিকাতা—৫০

নীতি ও বিজ্ঞানানুযায়ী ঔষধ প্রস্তুতকরণের অগ্রণী

—ব্রাঞ্চ সমূহ—

বোম্বে - মাদ্রাজ - দিল্লী - নাগপুর

বেজওয়াডা - শ্রীনগর - গৌহাটী

নত্ব-সত্ত্ব

কল্যাণকুমার দাশগুপ্ত

রবীন্দ্র-সাহিত্য সাবেক
তাতে কেবল রবিত্ব,
অবনীন্দ্র-নন্দলালের
ছবিতে সেই ছবিত্ব,
নতুন লেখা নতুন ছবি—
নিতুই নব নবীত্ব,
স্বাভাবিক তো সাবেকি, তাই
ঘাঁটেই কেবল কবিত্ব।

দুর্নীতির আজ আত্মপ্রকাশ
বন্দী-বিবর মতিত্ব,
নরলোককে নরক ক'রে
যমরাজ চায় রথীত্ব,
আজও তবু আছে কিছু
সচ্চরিত্র সতীত্ব,
সাবেক মেয়ে চায় আজও তাই
সময় মতো পতিত্ব।

কুহেলী উত্তরণ

শ্রীঅনিন্দ্যনারায়ণ মজুমদার

পথ যদি শেষ হ'তো তা হলেই ছিল আরো ভালো,
কেননা আমার বুকে সানাই-এর বেদনা মন্থর।
অথচ নিষ্ঠুর রাতে পথচলা অব্যাহত রাখ
ছন্দোময়ী, সৌরভে-আনত-মৃগী, সুরেলা সানাই!

সমুদ্রের উপাসনা। কার না প্রেমের মন্ত্র পাঠ;
তবুও নিঝুম রাতে কেন শুনি সারেংগীর মধুর বিলাপ?
জানি না, মৃত্যুর ধ্যানে গড়ি কিনা মৃত্যুহীন তিলোত্তমা এ
দুঃস্বপ্নের অন্ধকারে বুঝি বা মাটির গন্ধ পাই।

বাতিটা নিবিয়ে দাও; ছড়ায়ো না রাত্রির সংলাপ!
বুক পুড়ে জ্বলে গেল, তেল নেই বিশুষ্ক হৃদয়;
স্থির দৃশ্যে অন্ধকার সংশয়িত সামনে আঘাত,
নিষ্ঠুর সমুদ্র ঠেলে বৃথা খোঁজা উজ্জ্বল বন্দর।

এবার নির্মম হবো নিয়তির বৈশাখী ঝংকারে
এ পথ উপাড়ি ফেল; দীর্ঘ হোক আরণ্য উল্লাস।

ওদিকে ইভান্স গুপ্তধন সংগ্রহে ব্যস্ত। এতক্ষণে গা থেকে কোটটি খুলে ফেলেছে সে। হলদে রঙের দু'তিনটে ধাতুখন্ড কোটের উপরে জড়ো করেছে।

এইখানে বলে রাখা দরকার, আর একটি কাঁটা বিঁধেছিল ইভান্সের গায়ে। সে নিজে তা লক্ষ্যও করেছিল। কিন্তু তবু তখন সময় কোথায় এত সব উপসর্গ নিয়ে ভাববার। সোনার পিন্ডগুলো রাজৈশ্বর্যের প্রতিশ্রুতি দিচ্ছে তখন। তখন সাত রাজার ধন মাণিক প্রতি মুহূর্তে হাতছানি দিয়ে ডাকছে।

তবে হুকার দ্বিধাগ্রস্ত হয়েছিল একবার। একবার সে দীর্ঘ গাছগুলোর দিকে তাকিয়েছিল। সূর্যালোকে উদ্ভাসিত আকাশকে মুগ্ধ বিস্ময়ে দেখছিল। অপরূপ বিশ্বপ্রকৃতির মায়ায় সে জড়িয়ে পড়েছিল মুহূর্তের জন্য। মুহূর্তের জন্যে 'চীনে-ম্যানের বিবর্ণ দেহটি দেখে সে কেঁপে উঠে-ছিল। সহজ ও সুন্দর জীবনের সঙ্গে অসুন্দর ও অস্বাভাবিক লোভের দ্বন্দ্ব এই-খানে সুন্দর ফুটেছে। লোভই জয়ী হয়েছে শেষ অবধি। সোনা নিয়ে নিরাপদ স্থানে যাবার জন্যে ইভান্সের মতো হুকারও ব্যস্ত হয়ে উঠেছে। উভয়ে মিলে ধরেছে সেই কোটটিকে, রাশি রাশি সোনা যার উপর জড়ো করা ছিল তার পর নৌকোর দিকে এগিয়েছে ওরা।

কিন্তু বেশি দূরে এগোতে পারে নি। কয়েক পা যেতেই দারুণ বেদনায় অস্থির হয়ে উঠল ইভান্স। তার মুখ ফ্যাকাসে হয়ে গেল। ফোঁটা ফোঁটা ঘাম দেখা দিল তার কপালে। খুব জোরে টেনে টেনে সে নিঃশ্বাস নিতে লাগল; এবং তারপর হঠাৎ হোঁচট খেল।

এবার আর সম্পদ নয়, জীবনের মোহে ইভান্স ব্যাকুল হয়ে উঠল। কোট-টিকে ছুঁড়ে ফেলে দিল সে। অসহ্য যন্ত্রণায় নিজের গলা চেপে ধরল। সামনেকার এক গাছের গুঁড়িতে হেলান দিয়ে বসল।

দেখতে দেখতে অপরিসীম বেদনায় তার সমস্ত মুখ বিকৃত হয়ে গেল। হুকার এগোল তাকে সাহায্য করবে বলে। কিন্তু ইভান্স বাধা দিল। সোনার ছড়ান পিন্ড-গুলো দেখিয়ে বলল,—'আমাকে ছুঁয়ো না, আমাকে ছুঁয়ো না। বরং ওগুলোকে আবার কোটের উপরে উঠিয়ে রাখ।'

তাই করল হুকার। ছড়ান সম্পদ-গুলোকে আবার এক জায়গায় জড়ো করতে লাগল। এমন সময় হঠাৎ আঙুলে খোঁচা অনুভব করল সে। তাকিয়ে দেখল, ইঞ্চি দুয়েক লম্বা একটা কাঁটা বিঁধে আছে।

ওদিকে ইভান্স আর্তনাদ করে উঠল। অসহ্য যন্ত্রণায় তার দেহটা কুঞ্চিত হল কয়েকবার। তার পরেই নিথর হয়ে গেল।

এবার ভয়ে দিশেহারা হল হুকার। নিস্তব্ধ অরণ্য তার কাছে বিভীষিকার মূর্তি ধরে দেখা দিল। আঙুলের যে অংশটায় কাঁটা বিঁধেছিল, প্রাণপণে সেখান-কার রক্ত চুষতে লাগল সে। কিন্তু ফল কিছুই হল না। বিষাক্ত কাঁটার প্রভাবে সে-ও ধীরে ধীরে মৃত্যুর দিকে এগোল। গলায় দারুণ যন্ত্রণা অনুভব করল সে। তার দেহ ক্রমেই অসাড় হয়ে এল। ওদিকে—

"তার থেকে অনেক উপরে মৃদুমন্দ বাতাসে অরণ্য আন্দোলিত হতে লাগল এবং ওই বিষাদময় পরিবেশে অজানা কোনো ফুলের সাদা পাপড়ি ভেসে ভেসে নিচের দিকে নেমে এল।"

এই ফুল যে হুকারের শবাধারের প্রতীক, এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। আর সন্দেহ নেই যে, বাতাসে দোলা ওই অরণ্য জীবনের সহজ-সৌন্দর্যকে প্রকাশ করছে।

এইভাবে দুঃসাহসের নেশায় একদিকে মানুষ যেমন মঙ্গলকে বরণ করে, অপর-দিকে তেমনি অমঙ্গলকেও ডেকে আনে। 'দি আরগ্যানাট্স্ অব্ দি এয়ার' এবং 'ফিল্মার'-এ দুঃসাহস মঙ্গলধর্মকে চিত্রিত করেছে। আর 'দি ট্রেজার ইন্ দি ফরেস্ট'-এ মানুষের অপরিমিত লোভ চরম সর্বনাশ ও অমঙ্গলকে ডেকে আনল।

গ্রামবাংলার কথা

পারুল ভট্টাচার্য

কাঁঠালপাড়া

আজকের কাঁঠালপাড়ায় স্থান যতো মানুষ তার চেয়ে বেশি, সমস্যা আরো অনেক বেশি। মাত্র এক বর্গমাইল এলাকার মধ্যে প্রায় পনেরো হাজার মানুষের বাস। আগে কাঁঠালপাড়াসহ সমগ্র এলাকাটির নাম ছিল শিবদাসপুর ইউনিয়ন বোর্ড। স্বাধীনতা-উত্তরকালে তা' ভেঙে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে চারটি অঞ্চল—শিবদাসপুর, মামুদপুর, দেশবন্ধু ও ঋষি বঙ্কিম অঞ্চল পঞ্চায়েৎ। কাঁঠালপাড়া ঋষি বঙ্কিম অঞ্চল পঞ্চায়েতের অন্তর্গত।

প্রাক্-স্বাধীনতাকালে কাঁঠালপাড়া এবং তৎসংলগ্ন সামান্য লোকবসতি ছাড়া বাদবাকী সমস্ত এলাকাটিই ছিল বন-জংগলে ভরা, চাষ আবাদের ক্ষেত, বড় বড় আম বাগান, দু-চারজন কৃষিজীবী বা দু-চারজন বারুজীবীর বসবাসে প্রায় বিরল বসতি এলাকা। তার পর ১৯৪৮ সনের কার্তিক পূর্ণিমার হিমার্ত এক চন্দ্রালোকিত নিশীথে হঠাৎ ঘটলো পট-পরিবর্তন। সাঁঝের মানুষ বন-জংগল খাল-খামার দেখে রাত্রে শুতে গেল। সকালবেলা ঘুম ভেঙে দেখে আলাদীনের আশ্চর্য প্রদীপের মায়ার মতো রাতারাতিই অন্তর্হিত হয়েছে বন-জংগল, গজিয়ে উঠেছে ইতস্তত অসংখ্য ঘর-বাড়ি, শিশুর কান্না উনুনের ধোঁয়া আর ব্যস্ত মানুষের ইতস্তত আনাগোনায় প্রতিষ্ঠিত এক জনপদের সুস্পষ্ট চেহারা। এরা কারা। কোথা থেকে এল, কেমন করেই বা উদয় হলো রাতারাতি কোন দেও কিম্বা দেবতার মহিমায়—বিস্মিত মানুষ খোঁজ নিতে গিয়ে দেখতে পায় মোড়ের মাথায় বসতিতে প্রবেশ করবার ঠিক মুখটিতে প্রকান্ড কালো কাঠের বোর্ডে শক্ত সাদা খড়ির আঁচড়ে স্পষ্ট করে লেখা আছে "কলোনী বিজয়নগর", পরবর্তীকালে আবার নতুন করে যার নামকরণ হল "ঋষি বঙ্কিম অঞ্চল"।

হাঁ আদিতে বিজয়নগর জবরদখল কলোনীই ছিল এবং আজও আছে। যদিও তার পরেও আরও ১৮ বৎসর হয়েছে বিগত, গঙ্গার অনেক জল বয়েছে, অনেক পরিবর্তন আর পরিবর্ধনের ঝাপটা বয়ে গেছে দেশের উপর দিয়ে। সংক্ষিপ্ত বিজয়নগর সুপ্রতিষ্ঠিত একটি অঞ্চলের আকার নিয়েছে। আদিতে বন কেটে বসতকারী মাত্র পাঁচশত পরিবার বাড়তে বাড়তে পঁচিশ শত ছাড়িয়েছে অনেকদিন, তথাপি আশ্চর্য এই কলোনী সরকারীভাবে স্বীকৃতিপত্র পায় নি আজও। পনের হাজার মানুষের বসবাসে ব্যস্ত এই জনপদ আজও সেই জবরদখল কলোনীই রয়ে গেছে।

আর পায় নি জীবনযাত্রার কোন স্বাচ্ছন্দ্যের অধিকার। কোন এলাকা পুরোপুরি গ্রাম হলে তার একটা নিরিবিলি শান্তি এবং আরাম আছে। পুরোপুরি শহর হলেও থাকে কতকগুলি বিশেষ বিশেষ সুখ-সুবিধা। এই ঋষি বঙ্কিম অঞ্চলে যার সবটুকুই অনুপস্থিত। এটি না গ্রাম না শহর। অধিবাসীরা না ঘরের না ঘাটের। গ্রামের নিরালা প্রসার নেই। হাত-পা ছড়িয়ে বাস করবার আরাম থেকে বঞ্চিত জনসাধারণ, কারণ সীমানা সঙ্কীর্ণ লোকসংখ্যা সমধিক, সর্বত্র ছোট ছোট নিচু নিচু ঘর বাড়ি। অল্প জায়গায় বেশি মানুষ মাথা গুঁজে বাস করবার প্রচেষ্টায় গ্রামাঞ্চলের স্বল্প বসতি নিরালা উদারতার চেয়ে শহরের সরু গলি ও পায়রার খোপ বাসাবাড়ির কথাই স্মরণ করিয়ে দেয় বেশি। রাস্তাগুলি পাকা নয় কিন্তু এই শেষ আশ্বিনে হিমের ছোঁয়ায় ভিজে নরম ঠান্ডা ধুলোয় পা ডুবিয়ে হাঁটবার আরামটুকুও পাবেন না আপনি। উবড়ো-খাবড়ো গর্ত গর্তর উপরে ইতস্তত কতকগুলো রাবিশ ছড়ান। গর্ত তাতে ভরাট হয় নি বটে কিন্তু খালি পায়ে চললে ধারাল কাঁকরে পা কেটে রক্তপাতের সম্ভাবনা রয়েই গেছে। পাশেই এক হাঁটু গভীর কাঁচা নোংরা নর্দমা। কচুবন ও ঘাসের জঙ্গলে আচ্ছন্ন প্রায়, দিনে সূর্যের চড়া রোদে আর তাপে তার ময়লা পচে একটা ভ্যাপসা উৎকট দুর্গন্ধে ছেয়ে যায় চারিদিক। আর সন্ধ্যা হলে সেইখান থেকেই গুন্‌গুন্‌ শব্দে সাড়া দিয়ে উঠে আসতে থাকে অসংখ্য মশা। মশার জ্বালায় মানুষজনের জীবন অতিষ্ঠ, জীবনযাত্রা বিঘ্নিত, ছেলেপুলের পড়াশুনো উঠেছে মাথায়। সন্ধ্যে হতেই কাজকর্মে ইস্তফা দিয়ে মশারির মধ্যে ঢুকতে পারলেই ভাল হয় এখানে।

রাস্তায় কোন আলো নেই, কারণ এলাকাটি গ্রাম্য। কিন্তু যেহেতু একসংগে এত অধিক লোকের বাস, যেহেতু অধিবাসীদের মধ্যে শতকরা প্রায় নিরানব্বই ভাগই উদ্বাস্তু এবং তাদের আর্থিক অবস্থা দারিদ্র্য ছাড়িয়ে প্রায় দৈন্যের কোঠায় দাঁড়িয়েছে। স্থানটি গংগার এপার জেলা ২৪ পরগনা একধারে কাঁকিনাড়া-কাঁচড়াপাড়া ইত্যাদি কুখ্যাত এলাকা অপরদিকে নৈহাটী তথা আশপাশের যত কল-কারখানা অধ্যুষিত অঞ্চল; তাই অসামাজিক মানুষ ও অসামাজিক ক্রিয়াকলাপের প্রায় বার মেসে কিউ লেগে থাকে এখানে। চুরি, ছিনতাই, রাহাজানি ত আছেই, স্মাগলিং কিম্বা জুয়ার আড্ডায় মারপিটও প্রায় নিত্যকৃত্য দৈনন্দিন। এমন একটি রাত যায় না যে রাতে নাকি একটি-দুটি চুরি হয় না অঞ্চলে। পুলিশ কতকটা নিরুপায়, কতকটা নির্বিকার। নিরুপায় এই জন্য যে, অঞ্চলে প্রবেশ করবার কোন সোজাসুজি রাস্তা নেই, আসতে হবে সেই নৈহাটী ওভার ব্রীজ পার হয়ে পায়ে হেঁটে। দেরি স্বাভাবিক। অপরাধীরা সুযোগ নেয় এই অসুবিধার। নির্বিকার পুলিশবিভাগের প্রায় সর্বত্র স্বভাবসিদ্ধ দীর্ঘসূত্রতার নিয়মানুযায়ী। ফলে সন্ধ্যা নামে, সূর্য অস্ত যায়, সারা জনপদ জুড়ে জড়িয়ে আসে ঘুটঘুটে কাল অন্ধকার। আর অধিবাসীদেরও বুক জুড়ে নামে আতঙ্ক, এক কঠিন থমথমে হিমশীতল ভয়। মানুষ নিমেষ গোণে, কখন রাত পোহাবে, দেখা দেবে আলো, আলো নয় অভয়, প্রাণের সাড়া—বেঁচে থাকবার আশ্বাস।

স্বাস্থ্যকেন্দ্র নেই এ তল্লাটে। রোগী নিয়ে যেতে হয় গঙ্গার ওপারে হুগলীতে ইমামবাড়া হাসপাতালে। অনেক ঝঞ্ঝাট, সময় ও অর্থব্যয়ের পর। একটিমাত্র দাতব্য চিকিৎসালয় স্থাপিত হয়েছে ঋষি বঙ্কিম অঞ্চলে। সরকারী সাহায্য কিছু পায় না। অঞ্চলবাসীর চেষ্টায় যত্নে ও দানে এবং অবসরপ্রাপ্ত চিকিৎসক শ্রীতারাপদ মজুমদার মহাশয়ের স্বেচ্ছাদত্ত সেবায় চলছে কোনরকমে। আয় বলতে রোগী পিছু সংগৃহীত ২০ পয়সা। এবং অত্যন্ত গৌরবের কথা এই যে এত য°-

সামান্য সম্বল মাত্র ভরসা হয়েও গত ১৯৬৪।৬৫-তে প্রায় সাত হাজার প্রেসক্রিপশন সার্ভ করেছেন এঁরা। জনসাধারণের সক্রিয় উদ্যোগ এবং সাধু চেষ্টা জনপদের কতখানি কল্যাণ বিধান করতে পারে ঐ ডাক্তারখানাটি তার একটি উল্লেখযোগ্য উদাহরণ। কিন্তু আশ্চর্য এতগুলি মানুষের অশেষ উপকারের হেতু এই প্রতিষ্ঠানটি সম্বন্ধে সরকারী কৃপাহস্ত অত্যন্ত কঠিনভাবেই কৃপণ। কেন তা বুঝে ওঠা গেল না।

স্কুল আছে। মেয়েদের জন্য প্রফুল্ল সেন গার্লস হাইস্কুল দশম শ্রেণী পর্যন্ত, ছাত্রীসংখ্যা কম-বেশি শ' পাঁচেক। হাইয়ার সেকেন্ডারী করবার জন্য চেষ্টা চলছে কিন্তু কি সব বিধি-নিষেধের বেড়াজালে আটক হয়ে পড়ে আছে বলে শোনা গেল।

ছেলেদের জন্য বিজয়নগর জুনিয়র হাইস্কুল। ছাত্রসংখ্যা ২৫০-এর উপর। বয়স বেশি নয়। প্রতিষ্ঠা হয়েছে মাত্র পাঁচ-সাত বছর। পরিচালন ব্যবস্থা আর পাঁচটা বিদ্যালয়েরই মত—খুব ভাল নয়, খুব মন্দও বলা যাবে না।

প্রাথমিক বিদ্যালয় পাঁচটি। সবগুলিই ফ্রী এবং বেশির ভাগ প্রাথমিক বিদ্যালয়েরই অলিখিত নিয়ম অনুযায়ী প্রায় সবগুলিরই দুর্দশাগ্রস্ত অবস্থা। কারও ঘর-বাড়ি ভাল নয়; কারও শিক্ষক-শিক্ষিকা কমতি, কারও বা চেয়ার-বেঞ্চ ভাঙা, টেবিল ব্ল্যাক বোর্ড অব্যবহার্য। আসবাবপত্র ক্রয়ের টাকা অধিবাসীদেরই দিতে হয় চাঁদা তুলে। চাঁদা উঠলো ভাল নইলে বিনা আসবাবেই বিদ্যালয় চলছে বছরের পর বছর। বিশেষ করে ৫ নম্বর বিজয়নগর ফ্রী প্রাইমারী স্কুলটির অবস্থা তো অবর্ণনীয়। ছিটে বেড়ার দেওয়াল ছিল কোন এককালে, অন্তর্হিত হয়েছে এখন। হেলে-পড়া খুঁটির গায়ে টিকে থাকা টিনের চালে যত্র-তত্র বড় বড় ছিদ্র। বর্ষায় জল আটকায় না বটে কিন্তু এই ভরা দুপুরে ভ্যাপসা গরমে ঘামে আমরান চারা গাছের মত কচি কচি মুখগুলি প্রায় সিদ্ধ হয়ে যাবার উপক্রম। ছাত্র-ছাত্রী সাত-আট শো, মাস্টার মশায় মাত্র ৫ জন। পড়াশুনা মাথায় থাক, গোলমাল থামাতেই তাঁরা পাগল। তবু তাঁরা চেষ্টা করেন পড়াতে ছাত্র-ছাত্রীরা চেষ্টা করে মনে রাখতে, আর জাতির ভবিষ্যতের ভিত্তি স্থাপন যে ঐ গোয়ালে বসেই হচ্ছে সে সম্বন্ধে বিশ্বাস এবং আস্থা রাখতে আমরাও চেষ্টা করি প্রাণপণে। দেশ স্বাধীন হয়েছে আর সেই স্বাধীনতার বয়সও যে ১৯ বছর তাতে আর সন্দেহ কি?

এলাকা নিচু, তাই বর্ষার জলে প্লাবিত হয়ে যায় প্রায় সমগ্র অঞ্চল। মাটি ফেলিয়ে উঁচু করা বা নল-নর্দমা নির্মাণ করিয়ে জল নিকাশের ব্যবস্থা করা অঞ্চল কর্তৃপক্ষের সাধ্য নয় কারণ খুব বেশি হবে ত বছরে পাঁচ থেকে ছ' হাজার টাকা মাত্র আয় এঁদের। গ্রামসভা আছে পাঁচটি—নন্দপল্লী বিজয়নগর, রাধাবল্লভ, বিজয়নগর নারকেলডাঙা, দক্ষিণ দেউলপাড়া আর দক্ষিণ কাঁঠালপাড়া। চৌকিদার দফাদার ও অন্যান্য অঞ্চল কর্মচারীদের বেতন যুগিয়ে এবং অপরাপর ব্যয় বহন করে বছরে ঊর্ধ্ব সংখ্যায় সাত শো টাকার বেশি পড়ে না কোন গ্রামসভার ভাগে। রাস্তা-ঘাট মেরামত করান তাই সম্ভব হয় না কারও পক্ষেই।

নলকূপ আছে ত্রিশটি। ১৫ থেকে ২০টিই যার মধ্যে অচল থাকে। মেরামত হয় না সে ঐ আর্থিক কারণেই। এমন গ্রামসভাও আছে যেখানে একটি নলকূপও চালু নেই। বহুদূর থেকে আনতে হয় পানীয় জল। জলকষ্ট চূড়ান্ত।

শোনা গেল গভীর নলকূপ বসিয়ে পাইপ পদ্ধতিতে জল সরবরাহের একটা পরিকল্পনা নিয়েছিলেন কর্তৃপক্ষ। কিন্তু সেটি রূপায়ণের কত দেরি বা আদৌ রূপায়িত হবে কি না তা কর্তৃপক্ষই জানেন। অঞ্চলবাসী কোন আলোকপাত করতে পারলেন না সে বিষয়ে।

চৌকিদার-দফাদারের পোশাক নিয়ে এমনই একটি হয়রানির শিকার হয়ে আছেন এঁরা। পোশাক বাবদ টাকা জমা করা হয়ে গেছে অনেকদিন। কিন্তু তার পরেও অনেক চিঠি-পত্র লেখালেখি, হাঁটাহাঁটি, দৌড়াদৌড়ি করেও পোশাকের হদিস পাওয়া সম্ভব হয় নি এখনও। বোঝা গেল সরকারী লাল ফিতা আঞ্চলিক পরিষদকেও আক্রমণ করেছে এইবার।

পাশ দিয়ে বয়ে গেছে মুক্তাপুরের খাল। প্রাচীন এবং এ অঞ্চলে সুপরিচিত। এই সব এলাকার জল নিকাশ ঐ খাল পথেই হতো বরাবর। এখন খাল মজে প্রায় ভরাট হয়ে এসেছে। বর্ষার জলও তাই মাটিতে পড়তে না পড়তেই বন্যা সৃষ্টি করে জনপদে। খালটিকে একটু কাটিয়ে-কুটিয়ে সংস্কার করালেই জল নিকাশের পাকাপাকি বন্দোবস্ত হয়। শুধু তাই নয় মাদরাল-মামুদপুর প্রভৃতি অঞ্চলের শুকো চাষ জমিগুলি সেচের জলও পেতে পারে এই খাল থেকেই। ধান, পাট, আলু শাক-সবজী এবং পর্যাপ্ত রবি ফসলের সম্ভাবনা আছে এসব এলাকায় জল যদি সরবরাহ করা যায় প্রয়োজন মতো।

কিন্তু এ সব দরকারী অথচ সহজসাধ্য প্রকল্পের প্রতি কর্তৃপক্ষের সুদৃষ্টি খুব কমই পড়ে। তাঁরা থাকেন বড় বড় সব বিদঘুটে পরিকল্পনা নিয়ে। উদাহরণস্বরূপ কাছেই বরুতীর বিলটির কথা উল্লেখ করা যেতে পারে। প্রায় ৬০-৭০ বিঘা জলকরের বিল। লম্বায়-চওড়ায় আদি এলাকা যত তার কিছুটা মজে গেলেও বেশির ভাগটাই এখনও বাকি আছে। মাছের চাষ বলতে কিছু নেই। তবু চুনো-চানা ট্যাংরা চিংড়ি আপনি জন্মানো আ-মাছা যা আছে বিশ-পঁচিশ ঘর জালজীবীর জীবিকা চলে যায় তার থেকেই। জনশ্রুতি এই বিলটিকে সংস্কার করিয়ে মাছের চাষ নয়—ভরাট করিয়ে আবাদী জমিতে পরিণত করার স্বপ্ন দেখছেন সরকার। কত লক্ষ টাকার পরিকল্পনা জানি না, পরিকল্পনা আদৌ বাস্তবে রূপায়িত হবে কি না তাও জানি না, তথাপি স্বীকার করতেই হবে—'সত্য সেলুকাস কি বিচিত্র এই দেশ'।

কলেজ আছে ঋষি বঙ্কিমচন্দ্র

ঋষি বঙ্কিমচন্দ্র কলেজের বিস্তীর্ণ প্রাঙ্গণ ও নবনির্মিত ভবনের একাংশ

...াড়া- ...নে সান্ধ্য ...য় কলেজটির। ...না, ২৩ জন মাত্র ...সম্বল করে কুমার মহেন্দ্র বিদ্যা-লয়ের নিচেরতলায় সন্ধ্যাবেলায় বসতো অধিবেশন। সরকারী স্বীকৃতি পায় ১৯৪৮-এর জানুয়ারীতে। নিজস্ব ভবন নির্মাণ করবার জন্য সাড়ে তিন বিঘা জমি ক্রয় করেন কলেজকর্তৃপক্ষ। জমিটির মালিক ছিলেন মিডল্যান্ড বোস কোম্পানী। একটি কুলি ব্যারাক, কিছু প্রাচীন আমগাছ এবং খানা-ডোবা গর্ত আগাছা সহ জমিটি প্রায় পরিত্যক্ত হয়েই পড়ে ছিল সেকালে। কলেজ কর্তৃপক্ষ কিনে নিয়ে প্রথম দিকে ব্যারাকের ঘর-গুলিই কতকটা সারিয়ে-সুরিয়ে কাজ চালিয়েছিলেন কিছুকাল। তার পর দিন গেছে, কলায় কলায় বৃদ্ধি ঘটেছে প্রতিষ্ঠানটির। নির্মিত হয়েছে কলা, বিজ্ঞান, বাণিজ্য ভবন। গ্রন্থাগার অফিস-ঘর মিটিং হল। প্রসার ঘটেছে পাঠ্য বিষয়ের। এলাকা বেড়েছে, ছাত্র-ছাত্রী সংখ্যাও বেড়েছে সেই সঙ্গে। আড়ং-ঘাটা থেকে খড়দহ, ওপারে হুগলী থেকে পর্যন্ত পড়তে আসে ছেলেমেয়েরা। ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা বাড়তে বাড়তে আজ এসে পৌঁছেছে প্রায় ৪ হাজারে। অধ্যাপক আছেন ৯২ জন। যার মধ্যে ১২ জন মাত্র মহিলা। প্রাতঃ সায়ং দ্বিপ্রাহরিক তিনটি শিফটে ভাগ করে দিতে হয়েছে পাঠ-কাল, কতকটা পাঠার্থীদের সুবিধার জন্য। কতকটা স্থানাভাবে অত্যধিক চাপ কমাতে। ক্রমে ক্রমে শুধু বিশ্ব-বিদ্যালয় নয় সমস্ত পশ্চিমবঙ্গেরই শিক্ষাক্ষেত্রে একটি বিশেষ মর্যাদা অর্জন করেছে ঋষি বঙ্কিমচন্দ্র কলেজ।

তথাপি—অভিযোগও কিছু আছে। যার মধ্যে সবচেয়ে বেশি করে নজরে পড়ে বোধ করি একটি ছাত্রাবাসের অভাব। বহু দূর থেকে নিত্য ডেলী-প্যাসেঞ্জারী করে আনাগোনা করতে হয় ছেলে-মেয়েদের। শারীরিক পরিশ্রম তথা সময় নষ্ট তো আছেই নিত্য নতুন গোলযোগে ট্রেন বন্ধ বাস বন্ধ হয়ে কলেজ কামাইও বড় কম হয় না। একটি ভাল ছাত্রাবাস এই সব সমস্যার নিরসন করতে পারে বরাবরের মতো।

গ্রন্থাগারটি ছোট আয়তনে ও প্রকরণেও। বই আরও অনেক বাড়া দরকার। পড়বার ঘরটি প্রশস্ত এবং আর একটু নিরিবিলি হওয়া প্রয়োজন। ক্যাণ্টিন ভাল নয়, অফিসঘর এত ছোট যে কাজ-কর্ম সুচারুভাবে হওয়া মুস্কিল। গেট দিয়ে ঢুকতেই কলেজের ঠিক প্রবেশ মুখে রাস্তার ধারে ইতস্তত কয়েকটি খোলার ঘর-বাড়ি, উন্মুক্ত নোংরা নর্দমা আর উল্টানো ডাস্টবিন উপচে পড়া ময়লার স্তূপ এক অতি কুশ্রী দৃশ্যের সৃষ্টি করেছে এখানে। জমিটি কলেজেরই ঘরগুলিও কলেজের সম্পত্তি শোনা গেল, পরিচ্ছন্নতা রক্ষার প্রয়োজনেই এগুলি অপসারিত হওয়া দরকার।

আর আছে রাজনীতি। না পাঠ্য বিষয় রাজনীতি নয়। ছাত্রদের মধ্যে দল, দলাদলি আর দলীয় রাজনীতির কথা বলছি। অধ্যয়ন তপস্যা, অধ্যয়নকাল জীবনের এক কঠিন কৃত একাগ্র চিন্তার কাল। আর বিদ্যালয় তারই পৃষ্ঠভূমি; এই পুরানো কিন্তু অত্যন্ত সত্যটিকে ভুলে গিয়ে আজকের ছাত্রসমাজ যে দলীয় রাজনীতির পঙ্কিল আবর্তে ওঠা-পড়া ডুব দেওয়ার নেশায় মেতেছেন, আমি সেই রাজনীতির কথাই বলছি।

না ছাত্রসমাজকে রাজনীতি থেকে দূরে রাখবার তথাকথিত নেতৃবৃন্দের মঞ্চ মুখর বক্তৃতার বুলি কপচানো এ নয়। অথবা সামনে সাবধানবাণী আর আড়ালে সেই তাদেরই হাতিয়ার করে কাজ উদ্ধার করে নেবার কূটবুদ্ধি থেকেও এর উদ্ভব নয়। এ একটি ক্ষোভ, অত্যন্ত তিক্ত অভিজ্ঞতার বেদনা থেকে যার জন্ম। সন্তান সবারই আদরের সামগ্রী, স্বপ্নের সাধের সম্পদ। সেই সন্তানের জীবনের শান্তি, সাংসারিক তথা সামাজিক প্রতিষ্ঠা, আর দেশ তথা জাতির কল্যাণে তার কিছু অবদানের স্বপ্ন দেখে থাকেন সংসারের সকল পিতা-মাতাই। আমিও তাঁদেরই একজন।

স্বাধীন দেশে স্বতন্ত্র চিন্তাশীল সমাজে রাজনীতিতে সক্রিয় অংশ নেবার অধিকার সব মানুষেরই আছে। কিন্তু তারও একটা প্রস্তুতির কাল দরকার, দরকার সংগঠনের অবকাশ। তার আগেই সদ্য কৈশোরোত্তীর্ণ মন বুদ্ধি কিম্বা চিন্তাশক্তির বিকাশের অবকাশ মাত্র না দিয়ে এই যে হানাহানি, তথাকথিত রাজনীতির বেড়াজালে জড়িয়ে এই যে উন্মত্ততা পরস্পরকে নখে-দাঁতে ছিঁড়ে ছিন্নভিন্ন করবার উন্মত্ত অধীর উদ্যত নখ-দন্ত আক্ষেপ—এর মধ্যে কোনো শক্তি নেই, কোনো শুচিতা নেই, নেই কোনো আরোহিণী-ইচ্ছার প্রকাশ। এ শুধুই দৈন্য, শুধুই গ্লানি, শুধুই বীভৎসতা। জানি দেশে অভাব অনেক, অভি-যোগও সীমাহীন, তথাপি তরুণসমাজ জাতির হাতে পাশুপতের শক্তি। আর সেই জন্যই তার ব্যবহারও এমন যত্র-তত্র অকারণে—কিম্বা অ-গুরু কারণে নিষিদ্ধ। হয়তো অভিযোগ করে কোনো লাভ নেই, নিয়তি কারও বাধ্য নয়. তবু আক্ষেপ যায় না। আর যায় না মনের কোণে লুকিয়ে থাকা অতি গোপন মূঢ় অবুঝ বেদনা একটুখানি। তার রূপ নেই, আকার নেই, তবু সে আছে, আর আছে তার বিদ্ধ করবার ক্ষমতাটুকু।

এই লোকালয়, ঐ পথ-ঘাট, ঘর-বাড়ি বিদ্যালয়—মানুষের বাস আর বসতি-স্থাপনের যা কিছু প্রয়োজনীয়, তার প্রায় সবটাই গড়ে উঠেছে দেশ বিভাগের বন্যায় কুটোর মতো ভেসে আসা একদল ছিন্নমূল মানুষের দুর্বার প্রাণশক্তির অমিত প্রভাবে। দেশের রাজশক্তি সেদিনও তাদের পানে কোনো সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেয় নি, আজও প্রায় সেদিনের মতো সমানই উদাসীন। তথাপি—এই কাঁঠালপাড়ার মাটিতে একটি বিপ্লবের বীজ লুকিয়ে আছে। একদা এইখানে বসেই বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর বন্দে মাতরম্ রচনা করেছিলেন। সুর নয়, অশনি সঙ্কেত, সঙ্গীত নয় যুগান্ত নিদ্রিত ভারতাত্মার পুঞ্জীভূত ক্ষাত্র তেজ। মহাকালের করতালধ্বনি লক্ষ লক্ষ বজ্র ঝন্ঝনায় বেজে উঠেছিল যার ঝঙ্কারে ঝঙ্কারে, মাটি ফুঁড়ে ছুটে এসে-ছিল ভূমিকম্প, বহ্নিবন্যা মহাপ্রলয়। যুগান্তের জীর্ণ জড়ত্বে অন্ধকারে সুষুপ্ত জাতির আত্মার দুয়ারে দুয়ারে হেনেছিল সেই আঘাত, যে আঘাতে জড়ের বুকে জীবন জাগে, যন্ত্রণার জ্যোতি জ্বালিয়ে পথ খুঁজে দেয়, আদ্যিকালের মৃতের মিছিলে হয় প্রাণসঞ্চার।

কাঁঠালপাড়ার মানুষ তাই আজ আপন শক্তিতে শক্তিমান হয়ে উঠুক। আপন মেরুদণ্ডে আপনি ভর দিয়ে দাঁড়াবার স্বকীয় মহিমায় হয়ে উঠুক ক্ষমতাশীল। বাইরে তার প্রকাশ হয়তো কিছু কুণ্ঠিত হবে, ক্ষতি নেই, অন্তরে তার আশ্বাসের শিকড়টি মজবুত করেই আঁকড়ে ধরতে পারবে আশার মাটি। যে আশা দুরাশা নয়, আকারহীন উচ্চাশাও নয়। প্রতি দিনান্তের কর্মকাণ্ডের সুতো ধরে প্রতি পদক্ষেপে পলে পলে এগিয়ে চলা আত্মবিশ্বাসের দীপ্তিতে উজ্জ্বল বহ্নিমান আশা।

[আলোকচিত্র লেখিকা কর্তৃক গৃহীত]

পরের বারে—পুরাতন পাণ্ডুয়া।

রং-মঞ্চ ওদেশে এবং এদেশে

দীপালি

রবীন্দ্রনাথের চিন্তার পরিধি ছিল বিরাট এবং ব্যাপক। তাই তাঁর পক্ষে সম্ভব হয়েছিল জীবনের এত দিক নিয়ে আলোচনা করা। একদিকে কল্পনাশক্তির প্রাচুর্য, অন্যদিকে সঙ্গীতের প্লাবন—এই দুইয়ে মিলে যে রসবন্যার সৃষ্টি হল। জগতের সাহিত্যে তার তুলনা মেলা ভার। শেক্সপীয়ারের পর পৃথিবীতে আর এত বড় প্রতিভাবান সাহিত্যিক জন্মেছেন কি না সন্দেহ। বার্নার্ড শ' বড় নাট্যকার এ কথা আজ সর্বজনগ্রাহ্য। কিন্তু একথা তো অস্বীকার করা যায় না যে, তাঁর নাটকের শুধু জড় জীবনের সমস্যারই আলোচনা করা হয়েছে। আর তা ছাড়া বাস্তবটাই তো শুধু মানুষের জীবনের শেষ কথা নয়।

সামাজিক জীবনের ত্রুটিবিচ্যুতির জন্য মানুষের জীবনে যে অসহনীয় দুঃখ-দৈন্য আসে সে সবের সহানুভূতিপূর্ণ জীবন্ত-আলেখ্য পাওয়া যায় গলসওয়ার্দির নাটকে। কিন্তু এ ছাড়াও যে জীবনের অন্যান্য গভীরতর দিক আছে তার পরিচয় কিন্তু তাঁর নাটকে পাওয়া যায় না।

মেটারলিঙ্কের মধ্যে আধ্যাত্মিকতার প্রাধান্য, আর স্ট্রীণ্ডবার্গে মিস্টিসিজমের। আর তাছাড়া এই দুজনের ভেতরই অবচেতন মনের ক্রিয়া সমধিক।

রবীন্দ্রনাথের প্রতিভার পূর্ণতা এঁদের মধ্যে নেই। তাই এক একটা বিশেষ দিক নিয়েই এঁরা নিজেদের সৃজনীশক্তিকে প্রস্ফুটিত করে তুলেছেন। রবীন্দ্রনাথে অধিচেতন মনের প্রাধান্য তাই তাঁর রচনায় সব সময়েই একটা বলিষ্ঠ, স্বাস্থ্যবান প্রাণবন্ততার ভাব। এবং এই কারণেই রবীন্দ্রনাথের 'রাজা' নাটককে অন্ধকারের নাটক বলাটা খুবই ভুল। 'রাজা' নাটকের অন্ধকারের স্তরে স্তরে রয়েছে অদৃশ্য আলোক—যে আলোক অদৃশ্য জ্যোতির জ্যোতি।

ইব্‌সেন এবং স্ট্রীণ্ডবার্গ ছাড়া প্রতিভার ব্যাপকতার দিক দিয়ে এক ইউজিন ও'নিল এবং গের্‌হার্ট হাউপ্টমানই বোধ হয় রবীন্দ্রনাথের সমজাতীয়। একই নাট্যকার অর্থাৎ হাউপ্টমান যে কি করে, 'বিভোরডন', 'দি উইভার্স', 'দি সাঙ্কেন বেল', 'হেনরী অভ্ অ', 'হানেল', 'দি বিভার কোর্ট' প্রভৃতি বিভিন্ন জাতের নাটক রচনা করলেন, ভাবতে গেলে শ্রদ্ধায় মাথা নত হয়ে আসে।

ইউজিন ও'নিল তো আজ জগদ্বিখ্যাত। কখনও নিগ্রো সমস্যা নিয়ে 'অল্ গডস্ চিলানের' মত নাটক রচনা করেছেন। আবার আধুনিক সভ্যতাকে ব্যঙ্গ করেছেন 'দি হেয়ারী এপ' নাটকে, চিররহস্যময় মানব মনের জটিলতাকে নাট্যবস্তু করে মনঃসমীক্ষণের পরাকাষ্ঠা দেখিয়েছেন 'মোর্নিং বিকামস ইলেকট্রা' এবং 'দি স্ট্রেইঞ্জ ইণ্টারলিউড' জাতীয় রচনায়। আবার প্রতিভা এবং সাফল্যের কি আশ্চর্য দ্বন্দ্বের অবতারণা করেছেন 'দি গ্রেট গড ব্রাউন' নাটকে।

সুতরাং শেক্সপীয়ারের পর প্রতিভার বিস্তৃতি, ব্যাপকতা এবং ব্যাপকতার দিক দিয়ে উপরি উক্ত দুজন নাট্যকার ছাড়া বিশ্বসাহিত্যেও রবীন্দ্রনাথের সমতুল্য নাট্যকার পাওয়া শুধু দুষ্করই নয়, একেবারে অসম্ভব। ইবসেনের ভেতরও প্রতিভার ব্যাপকতা আছে। কিন্তু তিনিও এই তিনজনের মত জীবনের সমস্ত দিক নিয়ে নাট্যরচনা করেন নি। বার্নার্ড শ'-এর মত তাঁর নাটকে জড়বাদই প্রাধান্য পেয়েছে। ইবসেন সম্বন্ধে এ্যালারডাইস নিকল্ তাঁর 'ওয়ার্ল্ড ড্রামা' বইতে লিখেছেন ঃ

"His plays, when placed against the greatest achievements of the theatre, are seen to lack that balance and poise out of which alone the highest dramatic achievements can come. Perhaps for this the historical position in which he found himself was to blame. He was forced to devote his energies to the cultivation of the realistic stage, yet the realistic stage could not offer him the scope desired. As a result, his imaginative developement was, to a certain extent thwarted. Had he grown in the poetic concept his spirit would have expanded; as it was, he lived on into old age a strangely adolescent soul. His writings still have power to appeal to us, yet that appeal is waning. Of the measure of Sophoclean and Shakesperian greatness he has none.

সু[illegible]
মাঝে মা[illegible]
১, ২, ৩ এইভা[illegible]
এর দ্বারা বোধ হয় এই [illegible]
চেয়েছেন যে, আর্টের জন্যই টেক[illegible]
টেকনিকের জন্য আর্ট নয়। রবীন্দ্রনাথ প্রধানত গীতিকবি। এই কারণেই তাঁর সবরকম রচনাতেই সংগীত এবং ভাবের প্রাধান্য দেখা যায়। নাটকেও এ নিয়মের ব্যতিক্রম দেখা যায় না। বস্তুর অপে[illegible] ভাব, ঘটনার ঘাত-প্রতিঘাতের থেকে মানসিক সংঘাত-সংঘর্ষের দিকটাই বেশি মর্মস্পর্শী। তাঁর ভাষাও সঙ্গীতময়। এই জন্যই তাঁর গদ্যনাট্যের ভাষাতেও সঙ্গীতের প্রাচুর্য দেখা যায়। ফলে তাঁর গদ্যনাটকগুলোকেও এক বিশেষ ধরণের কাব্যনাট্য বলে অভিহিত করা চলে।

এ্যালারডাইস নিকল বলেনঃ

"It cannot be too strongly stressed that fundamentally the art of the drama is a branch of the art of poetry."

সেরা নাটক হিসাবে বিবেচিত হতে হলে নাটকের একটা নিজস্ব সাহিত্যমূল্য থাকা বিশেষ দরকার। এই গুণটি না থাকলে কোন নাটকই স্থায়ী সাহিত্য হিসাবে পরিণত হতে পারে না। এই দিক দিয়ে বিচার করলে নাট্যসাহিত্যে রবীন্দ্রনাথের দানের যে চিরন্তন মূল্য থাকবে এ কথা নিঃসংশয়ে বলা চলে। এই সাহিত্যমূল্য আছে বলেই কালিদাসের নাটকের আজও এত গৌরব। ইসকাইলাস, সোফোক্লিস, ইউরিপিডিস ও এ্যারিস্টোফিনিসের নাটক এই কারণেই লোকে আজও আগ্রহের সঙ্গে পড়ে থাকে। এলিজাবেথীয় যুগের নাট্যকারেরা এবং বিশেষত শেক্সপীয়ার এই জন্যই নাট্য-অনুরাগীর এত প্রিয়। এই সাহিত্য-মূল্যই সপ্তদশ শতাব্দীর ফরাসী নাট্য-সাহিত্যকে এবং বিশেষভাবে মলিয়ের ও রেসিনের নাটকগুলোকে সর্বজনপ্রিয় করেছে। উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগের নাট্যসাহিত্যে ইবসেন ও স্ট্রীণ্ডবার্গের প্রাধান্যের মূলেও ঐ একই কথা। এই সাহিত্যিক মূল্য আছে বলেই এঁদের নাটকে একটা চিরন্তন আবেদনের সুর অনুভব করা যায়।

ভাষা সম্বন্ধে গভীর জ্ঞান এবং শব্দ-প্রয়োগ বিষয়ে যথেষ্ট পারদর্শিতা না থাকলে ভাল নাট্যকার হওয়া যায় না। ড্রামাটিক স্টাইল বলতে নাট্যকারের নিজস্ব লেখার বৈশিষ্ট্য এবং বলবার ভঙ্গী ও যে লোকের মুখ দিয়ে কিছু বলা হচ্ছে তার চরিত্রের সঙ্গে তার সংলাপের সামঞ্জস্যবিধানের দিকটাকে বুঝিয়ে

থাকে। যেমন ধরুণ, 'রাজা ও রাণীতে' বিক্রমদেব বলছেন :

"মৌনমুগ্ধ সন্ধ্যা ওই মন্দ মন্দ আসে
কুঞ্জবন মাঝে, প্রিয়তমে। লজ্জানম্র
নববধূসম, সম্মুখে গভীর নিশা
বিস্তার করিয়া অন্তহীন অন্ধকার
এ কনক-কান্তিটুকু চাহে গ্রাসিবারে।
তেমনি দাঁড়ায়ে আছি হৃদয় প্রসারি
ওই হাসি, ওই রূপ, ওই তব জ্যোতি
পান করিবারে; দিবালোক-তট হতে
এস। নেমে এস, কনকচরণ দিয়ে
এ অগাধ হৃদয়ের নিশীথ সাগরে।"

পড়বামাত্রই বোঝা যায় এ রবীন্দ্রনাথের রচনা। বিক্রমদেবের কবিচিত্তের এবং প্রেমাবেগপূর্ণ হৃদয়ের সুস্পষ্ট পরিচয় উপরের সংলাপ থেকে ফুটে বেরিয়েছে।

পৃথিবীর সেরা সাঙ্কেতিক নাট্যকারদের ভেতরও রবীন্দ্রনাথের একটি বিশিষ্ট স্থান আছে। পাশ্চাত্যের অনেক দেশেই তাঁর নাম করা সাঙ্কেতিক নাটকগুলি সাফল্যের সঙ্গে অভিনীত হয়েছে এবং যথেষ্ট প্রশংসাও অর্জন করেছে। রবীন্দ্রনাথের আগে আমাদের দেশের সাহিত্যে যে পূর্ণাঙ্গ সাঙ্কেতিক নাট্য রচিত হয় নি একথা নিঃসন্দেহে বলা চলে। সংস্কৃতে অবশ্য রূপক নাট্যের উদ্ভব হয়েছিল এবং এই ধরণের নাটকের টেকনিক নিয়ে নাট্যকারগণ নানা ধরণের পরীক্ষাও চালিয়েছিলেন। এ বিষয়ে ডাঃ প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ "প্রাচীন ভারতীয় সভ্যতার ইতিহাস"-এ লিখেছেন : "প্রবোধচন্দ্রোদয় রূপক নাটক। বিবেক, মোহ, প্রবৃত্তি, শম, দম, ক্ষমা, মানস, সঙ্কল্প, মুদিতা, ধর্ম, বৈরাগ্য, তৃষ্ণা, দম্ভ, বিষ্ণুভক্তি, শ্রদ্ধা, মিথ্যা দৃষ্টি প্রভৃতি নাটকের চরিত্র।

"সাহিত্যদর্পণ (উড়িষ্যার পণ্ডিত বিশ্বনাথ কবিরাজ কর্তৃক একাদশ শতাব্দীতে লিখিত) নাটককে দুইভাবে ভাগ করেছে; (১) রূপক ও (২) উপরূপক। আবার রূপকের দশ ও উপরূপকের আঠারো রকমের বিভিন্ন বিভাগ স্বীকৃত হয়েছে।"

তবে পূর্ণাঙ্গ সাঙ্কেতিক নাট্য সংস্কৃত-সাহিত্যে ছিল বলে মনে হয় না। যদি থেকে থাকে তবে সংস্কৃত-সাহিত্যের পণ্ডিতেরা এ বিষয়ে কিছু আলোচনা প্রকাশ করলে অনেক সাহিত্যানুরাগীই যথেষ্ট উপকৃত বোধ করবেন।

নাটকের ক্ষেত্রে সাঙ্কেতিক শিল্পকৌশল বিকাশলাভ না করলেও ভাব প্রকাশের অন্যান্য ক্ষেত্রে আমাদের দেশে সভ্যতার আদিযুগ থেকে সাঙ্কেতিকতা একটা বিশেষ স্থান অধিকার করে আছে।

ঈশ্বর উপাসনায় আমাদের পৌত্তলিকপ্রথাকে অনেক সময়েই অন্যদেশীয়েরা না বুঝে নানা ধরণের ঠাট্টা বিদ্রূপ করে এসেছেন। কিন্তু এর পেছনে যে গভীর সাঙ্কেতিক অর্থ আছে তাকে উপেক্ষা করলে চলবে কি করে। নিরাকার ঈশ্বরকে অন্তরে উপলব্ধি করা তো সর্বসাধারণের পক্ষে সহজসাধ্য নয়। এই জন্যই আমরা প্রতীকের সাহায্যে সেই অনাদি অনন্ত অতীন্দ্রিয় ঐশ্বরিক শক্তিকে মনে প্রাণে অনুভব করতে চেষ্টা করি। নিরাকারবাদীর দলের মজা হোল এই যে, আপাতদৃষ্টিতে তাঁরা অপৌত্তলিক কিন্তু কার্যত তাঁরাও কম পৌত্তলিক নন্। কৃশ্চিয়ানদের কাছে ভগবানপুত্র সাকার ক্রাইস্ট যতটা জীবন্ত, মূর্ত এবং শ্রদ্ধেয়, স্বয়ং নিরাকার ভগবান ঠিক ততটাই প্রতিভাত এবং অনুভূত কি না এ বিষয়ে যথেষ্ট সন্দেহ আছে।

অপৌত্তলিক মুসলমানদের বেলায় ক্রাইস্টের স্থান অধিকার করেছেন মহম্মদ। আমাদের বহু দেবদেবীর কথা নিয়েও মুসলমানেরা বিদ্রূপ করে থাকেন। এই বহু যে একেশ্বরেরই অমিত শক্তির বিচিত্ররূপের নানাধরণের প্রতীক, এই সহজ কথাটা এই সমস্ত লোক কেন যে বুঝতে পারেন না তা বলা মুস্কিল। চিন্তার রাজ্যে অত্যন্ত উচ্চস্তরে উঠতে পেরেছিলেন বলেই হিন্দুরা বুঝতে শিখেছিলেন, ঈশ্বর অদ্বৈত এবং অসীম—কিন্তু সেই অসীম পরমব্রহ্মই আবার সীমার ভেতর দিয়ে নিজেকে নানাভাবে, নানাদিকে, নানারূপে প্রকাশিত, বিকশিত এবং রূপায়িত করেছেন। সীমার ভেতর দিয়ে আত্মপ্রকাশ না করলে অসীমকে ধারণার মধ্যে আনা সম্ভব হয় না। আবার সীমা কখনও অসীমকে পূর্ণভাবে নিজের ভেতর আয়ত্ত করতে বা ধরে রাখতে সমর্থ হয় না। অসীম ক্রমাগত সীমার মধ্যে রূপায়িত হচ্ছে এবং আবার তৎক্ষণাৎ সীমাকে অতিক্রম করে যাচ্ছে। সীমা অসীমেরই প্রতীক। সাকার নিরাকারেরই সাঙ্কেতিক মাধ্যম। সংস্কৃত-সাহিত্য এবং দর্শনের পাতায় পাতায় এ সব সম্বন্ধে আলোচনা আছে। স্থাপত্য এবং কলাশিল্পের নানা ক্ষেত্রেও আমাদের দেশে সঙ্কেতের ব্যবহার করা হয়েছে। এ সম্বন্ধে ই বি হ্যাভেলের 'ইণ্ডিয়ান আর্কিটেক্চার' বই থেকে কিছুটা তুলে দিলে অপ্রাসঙ্গিক হবে না :

"What a mihrab was to the Musulman, the lotus was to the Buddhist and Hindu. The shining lotus flowers floating on the still dark surface of the lake, their manifold petals opening as the Sun's rays touched them at break of day, and closing again at sunset, the roots hidden in the mud beneath, seemed perfect symbols of creation, of divine purity and beauty, of the cosmos evolved from the dark void of chaos and sustained in equilibrium by the cosmic ether, akasha. Their colours red, white and blue (the lotus in Hindu ritual must be taken to include water-lily as well as the sacred lotus of Egypt), were emblems of the Trimurti, the three Aspects of the One —red for Brahma, the creator; white for Shiva, the Divine Spirit; blue for Vishnu, the Preserver and Upholder of the Universe. The bell-shaped fruit was the mystic Hyranyagarbha, the womb of the Universe, holding the germ of worlds innumerable still unborn. The lotus was the seat and footstool of the Gods, the symbol of the material universe and of the heavenly spheres above it. It was the symbol for all Hinduism, as the miharb was for all Islam.

Closely connected with the symbolism of the lotvs was that of the water pot—the Kalasha or Kumbha—which held the creative element, or the nectar of immortality, churned by Gods and demons from the cosmic ocean....The open lotus flower is used as a sun embem on the Buddhist rails of Bahrut, Sanchi, and, Amaravati; the so called 'horse shoe' arch of early Buddhist gables and windows, derived from bent bamboo, suggested the lotus leaf; Buddhist and Hindu Domes, constructively derived from the bamboo also were made to imitate the bell-shaped lotus fruit and sculptured with the petals of the flower. The combination of the lotus flower, the bell-shaped fruit

and the water-pot forms the basis of the design of most Hindu temple pillars, the prototypes of which were doubtless the carved wooden posts marking the sacrificial area, in the ancient vedic rites, to which the victims were bound."

আমাদের দেশের মনীষীরা আকাশে বাতাসে জলে স্থলে নভোমণ্ডলে সর্বত্র সাঙ্কেতিকতার আবিষ্কার করে গিয়েছেন সেই কোন আদিকাল থেকে। এই জন্যই তাঁরা বলতে পেরেছেন 'ব্রহ্ম সত্য জগৎ মিথ্যা'—জগতের বাহ্যিক রূপটা একটা বিরাট মায়া ছাড়া অন্য কিছু নয়। আর সবের মূলে রয়েছে শব্দ-গন্ধ-স্পর্শের অতীত এক অতীন্দ্রিয় বিরাট শক্তি। বাস্তব জগতের বাস্তব রূপটার যে নিজস্ব কোন অর্থই নেই; যতক্ষণ না, ধ্যান-দৃষ্টির দ্বারা বাস্তবের অন্তরে অন্তরে যে মহাশক্তি আছে তার স্বরূপ উপলব্ধি করতে পারি—এই আধ্যাত্মিক সত্যটাকে বোঝাতে গিয়ে আর্যঋষি উদাত্তস্বরে আবৃত্তি করেছেন:

"ঈশাবাস্যমিদং সর্বং যৎ কিঞ্চ
জগত্যাং জগৎ।
তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জীথা মা গৃধঃ
কস্য স্বিদ্ধনম্।"

অর্থাৎ, ব্রহ্মাণ্ডের সব কিছু অনিত্য বস্তুকেই আবৃত করে রয়েছেন পরমেশ্বর। সেই বিশ্বব্যাপী পরমাত্মাকেই একমাত্র অবলম্বনরূপে বরণ করে আত্মাকে বিকশিত করে তোল। বাস্তবতা বিসর্জন দাও—বাস্তবের নিজস্ব কোন সত্তা নেই —সুতরাং সে কারও আয়ত্তে আসতে পারে না। সমস্ত জগৎকেই এখানে এক বিরাট প্রতীক হিসাবে ধরা হয়েছে। রবীন্দ্রনাথ আমাদের যুগগুরু। তাঁর পূর্ববর্তী ভারতীয় সাধকেরা সমস্ত রূপের ভাবব্যঞ্জনার ভেতর দিয়ে যে অপরূপ অরূপের আভাসকে অনুভব করবার সাধনা করেছেন। কবিও তাঁর সব সৃষ্টির ভেতরই সেই অতীন্দ্রিয়কে সঙ্কেতের সাহায্যে রূপায়িত করতে চেষ্টা করেছেন। গূঢ়ায়িতকে আলোক-সম্পাতে নির্দেশিত করতে চেয়েছেন। অসাড়ের বুকে সাড়া এনে তাকে জাগ্রত এবং প্রাণবন্ত করেছেন। অব্যক্তকে মূর্ত করে তুলেছেন। অরূপকে রূপ দিয়েছেন, মৌনকে মুখর করে তুলেছেন, বাণীহীনকে বাণী দিয়েছেন এবং যার প্রকাশ নেই তাকে প্রকাশিত করেছেন।

রবীন্দ্রনাথ প্রধানত ভাবধর্মী। এই জন্যই তাঁর সৃষ্টির সমস্ত ক্ষেত্রেই ভাবের প্রাধান্য দেখা যায়। রসঘন ভাবের প্রকাশ সঙ্গীতের মাধ্যমেই রূপ নেয়। এই কারণেই তাঁর উপন্যাসগুলো এবং প্রবন্ধাবলীও যেন কাব্য-সঙ্গীত হয়ে দাঁড়ায়। এই তীব্র ভাবানুভূতিই কবিকে শব্দ, গন্ধ, স্পর্শের জগৎকে ছাড়িয়ে অতীন্দ্রিয়তার দিকে টেনে নিয়ে গিয়েছে—বাস্তবকে অতিক্রম করে অতি বাস্তবের দিকে আকর্ষণ করেছে। অতীন্দ্রিয় অতি-বাস্তব, আধ্যাত্মিক সত্যগুলিকে সহজ এবং সাধারণভাবে বলা যায় না—বলতে হয় আভাসে, ইঙ্গিতে এবং ইশারায়! এই জন্যই কবিকে সাহিত্যের নানাক্ষেত্রেই সঙ্কেতের ব্যবহার করতে হয়েছে। এই সব সঙ্কেতই হয়েছে তাঁর ভাবের বাহন। নাটকগুলোতে জমকালো প্লট বলতে যা বোঝায় তেমন কিছুই নেই —প্রতীক-নাট্যে অবশ্য প্লট জমকালো হবার অবকাশও কম। এক-একটি নাট্য যেন স্বর্গীয় সুষমামণ্ডিত এক-একটি সঙ্গীত। চরিত্রগুলো সহজ, সরল, অনাড়ম্বর—যেন একটি পূর্ণ সঙ্গীতের তান, লয়, সুর, মূর্ছনা ইত্যাদি। পরি-বেশের ভেতরও কোন জটিলতা নেই। এক কথায় সবই অতি সহজ এবং সরল শিক্ষা, দীক্ষা, সাধনা, দৃষ্টিভঙ্গী, মনের স্বাভাবিক গঠন প্রভৃতি সব দিক থেকেই রবীন্দ্রনাথ যেন গড়ে উঠেছিলেন সাঙ্কেতিক শিল্প সৃষ্টি করবেন বলে। স্বভাবতই তিনি ছিলেন ভাবগম্ভীর এবং চিন্তাশীল। পিতা মহর্ষির সঙ্গে বহুদিন তিনি হিমালয়ের বুকে এবং প্রকৃতির স্নিগ্ধ আবহাওয়ার মধ্যে কাটিয়েছেন এবং ঔপনিষদিক শিক্ষালাভ করেছেন। ধ্যানের মহিমা তাঁর কাছে অজানা ছিল না—অজানা ছিল না নীরবতার মুখর বীণার সুরঝঙ্কার। সমস্ত বস্তুর মর্মস্থলে প্রবেশ করবার জন্য যে অন্তর্দৃষ্টির দরকার তা অতি সহজভাবেই তিনি আয়ত্ত করতে পেরেছিলেন। জীবনের শেষ বয়স অবধি নিশ্বাসনের প্রারম্ভে কিছু সময় অবধি তিনি ধ্যানমগ্ন হয়ে থাকতে ভাল-বাসতেন। ধ্যানলব্ধ অনুভূতিই সব কিছুর আধ্যাত্মিক পরিচয়কে তাঁর কাছে সহজভাবে প্রতিভাত করতো। এই জন্যই নিজের রচিত সাঙ্কেতিক নাট্যগুলো তাঁর কাছে এত কংক্রিট ছিল। এইজন্যই 'রক্তকরবী' প্রস্তাবনায় তিনি বলেছেন—"এইটি মনে রাখুন রক্তকরবীর সমস্ত পালাটি 'নন্দিনী' বলে একটি মানবীর ছবি। চারিদিকে পীড়নের ভিতর দিয়েই তাঁর আত্মপ্রকাশ।...সেই ছবির দিকেই যদি সম্পূর্ণ করে তাকিয়ে দেখেন তাহলে হয়তো কিছু রস পেতে পারেন। নয়তো রক্তকরবীর পাপড়ির আড়ালে অর্থ খুঁজতে গিয়ে যদি অনর্থ ঘটে তাহলে সে দায় কবির নয়।"

রবীন্দ্রনাথ ও মেটারলিঙ্কের প্রতীক-নাট্যের তুলনা করলে দেখা যায় যে, মেটারলিঙ্ক নাটকের বিকাশের জন্য প্রাকৃতিক পরিবেশ ইত্যাদির যথেষ্ট সাহায্য নিয়েছেন। তাঁর নাট্যে প্রাসাদ, টাওয়ার, নদী, বনানী ইত্যাদির বহুল ব্যবহার দেখা যায় এবং এ সমস্তই সাঙ্কেতিকতার যাদুতে ভরা থাকে। রবীন্দ্রনাথের নাট্যে ভাবের বিকাশের দিকেই বেশি জোর দেওয়া হয়েছে—অস্বাভাবিকতা বা ভয় সঞ্চার করতে পারে এমন কিছুই তিনি ব্যবহার করেন নি। তাঁর রচনায় যাদুর খেলা নেই বললেই চলে। এই জন্যই রবীন্দ্রনাথের সাঙ্কেতিক নাটক যাঁরা মঞ্চস্থ করেন, তাঁদের স্মরণ রাখা উচিত রূঢ়ভাবে রঙের খেলা দেখিয়ে বা অনবরত মরবিড লাইটের সাহায্যে এ সব নাটক প্রডিউস করলে এ সব নাটকের রুলিং আইডিয়াকে ফুটিয়ে তোলা যায় না।

মেটারলিঙ্ক, স্ট্রীণ্ডবার্গ, ইয়েটস্ প্রমুখের লেখায় অবচেতন মনেরই প্রাধান্য দেখা যায়। এ জন্য তাঁদের সব রচনাই যেন স্বপ্নালু, মায়াময়, অস্বাভাবিক এবং সময় সময় একটু মরবিডও লাগে। পড়তে পড়তে শরীর মন আলস্যে ভরে ওঠে। চারদিকে একটা তন্দ্রালু ভাব বিরাজ করতে থাকে—মনের মধ্যে একটা হতাশার ভাবের উদ্রেক হয়।

রবীন্দ্রনাথের চিন্তায় অধিচেতন মনেরই সর্বাধিক প্রকাশ দেখতে পাওয়া যায়। এই জন্যই তাঁর লেখা পড়তে পড়তে পাঠকের মন শিশির-ভেজা-ঘাসের মত সতেজ, সুস্থ এবং রসময় হয়ে ওঠে।

এদিক দিয়ে বিচার করলে তিনি এবং জার্মান নাট্যকার হাউপ্টমান এক জাতীয় প্রতীক-শিল্পী এবং ইয়েটস, মেটারলিঙ্ক প্রভৃতি একটু অন্যজাতের।

রবীন্দ্রনাথ এবং হাউপ্টমানের নাটকের সাধারণ আখ্যানভাগের দিকটাও অসুন্দর বা একঘেয়ে নয়। গভীর অর্থের দিকটাই প্রধান, কিন্তু বাচ্যার্থের দিকটাও মনকে টানে এবং হেলায় অগ্রাহ্য করবার মত নয়। অন্য দলের বেলায় বাচ্যার্থের দিকের নিজস্ব এমন কোন সৌন্দর্য বা গুণ নেই যা পাঠকের মনে ছাপ রাখতে পারে—এই জন্যই বোধ হয় ওদেশের একদল সমালোচক এসব নাট্যকারের নাটককে নো-প্লট প্লেজ নাম দিয়েছেন।

(ক্রমশঃ)

রূপজগৎ

শীতা : রেত্‌নো দেওয়ার্জানি

ডাঃ জিভাগো সমস্যা

'ডাঃ জিভাগো'-কে নিয়ে ভারত সরকার মহা মুস্কিলে পড়েছে! 'ডাঃ জিভাগো'-কে বাতিল করতেও পারছেন না, সম্পূর্ণ রাখতেও পারছেন না। এক দিকে আমেরিকা, আর একদিকে সোভিয়েট রাশিয়া। শ্যাম রাখি না কুল রাখি! আমেরিকা বহু মুদ্রা ব্যয়ে 'ডাঃ জিভাগো' ছবিটি তৈরি করেছে বিখ্যাত পরিচালক ডেভিড লিনকে দিয়ে। ডেভিড লিন এককালে প্রগতিশীল বলে পরিচিত ছিলেন। সময়ের সাথে প্রগতির সংজ্ঞা পরিবর্তন হয়। ডেভিড লিনের প্রগতি চিন্তারও পরিবর্তন হয়েছে, তাই তিনি নভেম্বর বিপ্লব বিরোধী 'ডাঃ জিভাগো' পরিচালনা করেছেন। মার্কিনরা প্যাস্টার নাকের 'ডাঃ জিভাগো'-কে নিয়ে সারা দুনিয়া তোলপাড় করেছিল। নভেম্বর বিপ্লব বিরোধী এমন একটা 'মহাগ্রন্থ' লেখার জন্য প্যাস্টারনাককে নোবেল পুরস্কার পর্যন্ত দিয়ে বসেছিল। মার্কিনদের নভেম্বর বিপ্লব বিরোধী ডুগডুগির তালে তালে বাংলা দেশের একদল সাহিত্যিক ও সাংবাদিকরা নেচেছিলেন। যাঁরা নেচেছিলেন তাঁরা একটা অছিলা পেলেই নাচেন। টাকার টনিক খেলে এরকম নাচার লোক জোটেও। নভেম্বর বিপ্লবের পরে জগতের চিন্তাশীল মানুষ, জ্ঞানীব্যক্তি এবং মেহনতি মানুষ নভেম্বর বিপ্লবকে স্বাগত জানিয়ে এসেছেন; নভেম্বর বিপ্লবের সমর্থনে দেশে দেশে মেহনতি মানুষ নিজেদের বুকের রক্ত দিয়েছেন। অর্ধ শতাব্দী পরে প্যাস্টারনাক যদি যুগান্তকারী বিপ্লবে শুধুমাত্র রক্ত আর নিষ্ঠুরতা দেখে তাতে একমাত্র সমাজতন্ত্রের শত্রু ছাড়া আর কে খুশি হতে পারে? কাজেই মার্কিনরা 'ডাঃ জিভাগো'-র চলচ্চিত্ররূপ দিতে দেরি করে নি। এখন এই ছবিটি দেশে দেশে দেখানো ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থার রক্ষকদের 'পবিত্র' কর্তব্য। ভারতে ছবিটি দেখাবার ব্যাপারে কোন বাধা প্রথমে হয় নি। প্রভুদের অখুশি করা ত চলে না! কিন্তু সোভিয়েট দূতাবাস থেকে আপত্তি জানিয়ে গোলমাল সৃষ্টি করা হয়েছে। কিছুদিন বিবেচনাধীন থাকার পর শোনা গিয়েছিল ছবিটির ব্যাপারে ভারত সরকার মার্কিনদের স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করবেন না। করবেনই বা কেন? অশ্লীল সাহিত্য, নগ্ন নারীদেহ সম্বল মার্কিন পত্র-পত্রিকা, অপরাধমূলক কাহিনীচিত্রের ব্যাপারে সরকার যে উদার নীতি অবলম্বন করে দেশের যুবক-যুবতীদের মার্কিনী-সভ্যতার টনিক গেলাচ্ছেন, সে ক্ষেত্রে 'ডাঃ জিভাগো' আরো ভাল কাজ করবে। পশ্চিমবঙ্গ থেকে উত্তরপ্রদেশ অন্ধ্র পর্যন্ত যেহারে ছাত্ররা বেপরোয়া হয়ে উঠেছে তাতে মার্কিন ধন্বন্তরীর ব্যবস্থাপত্র অনুযায়ী এ সব দাওয়াই প্রয়োগ করে দেখা যেতে পারে।

সরকারী ভাব-গতিক অনুমান করে 'ডাঃ জিভাগো'র পরিবেশক মেট্রো কর্তৃপক্ষ অগ্রিম বুকিং সুরু করেছিলেন। জানা গেছে তাতে তাঁরা ভাল সাড়া পেয়েছেন। এই ব্যবস্থা কেবল যে ব্যবসায়ী দৃষ্টিভঙ্গীজাত তা' নয়; এতে নৈতিক চাপ সৃষ্টির একটা গৌণ উদ্দেশ্য আছে। অর্থাৎ হাজার হাজার দর্শক ছবিটি দেখবার জন্য আগ্রহী—সুতরাং ছবির প্রদর্শন বন্ধ করার অথবা ছবিকে খণ্ডিত করার জন্য এ সব দর্শকের ইচ্ছার ওপর বাধাদান। এভাবে 'ডাঃ জিভাগো'-র মুক্তি প্রায় ঘনিয়ে এসেছিল।

কিন্তু রাশিয়ানদের চাপ নাকি কমে নি। এদিকে মিঃ কোসিগিন আসছেন। সামনে নির্বাচন। এ সময় রাশিয়ানদের বিরক্ত করা বুদ্ধিমানের কাজ হবে না। তাদের প্রশংসাপত্র ত এবার নির্বাচনে ছাড়পত্রের কাজ করবে। নির্বাচন প্রাক্কালে 'ডাঃ জিভাগো' দেখাতে দিলে ভারত যে সমাজতন্ত্রে বিশ্বাসী এবং অকৃত্রিম প্রগতিবাদী তা প্রমাণ করতে অসুবিধা হতে পারে। কারণ মন ভার করে রাশিয়ানরা যে প্রশংসাপত্র দেবে তাতে উচ্ছ্বাস যদি কম থাকে! কাজেই কয়েকমাস আগে যে সুরে কথা বলা হয়েছিল এখন তার একটু পরিবর্তন হয়েছে। সেন্সর বোর্ড 'ডাঃ জিভাগো'-কে সরাসরি বাতিল করতে পারে নি, ২০ জায়গায় কাটতে বলেছে। ডেভিড লিন তাতে রাজী হয় নি। এখন সমস্যা—মার্কিনদের অসন্তুষ্ট না করে কি করে রাশিয়ানদের সন্তুষ্ট করা যায়। ভারতীয় মার্কা নিরপেক্ষ পররাষ্ট্রনীতি থেথে সংস্কৃতির ক্ষেত্রে এভাবে সৃষ্টি হয়েছে ডাঃ জিভাগো সমস্যা!

—সুজন।

ইন্দোনেশীয় রামায়ণ নৃত্যনাট্য

ইন্দোনেশীয় ব্যালেট্রুপের 'রামায়ণ' নৃত্যনাট্য প্রদর্শন সাংস্কৃতিক জগতের একটি উল্লেখযোগ্য খবর। রাজনৈতিক দিক থেকেও এর গুরুত্ব আছে। বেশ কিছুদিন ভারতের সঙ্গে ইন্দোনেশিয়ার সম্পর্ক তেমন সৌহার্দ্যপূর্ণ ছিল না। সম্প্রতি ইন্দোনেশিয়ায় রাজনৈতিক পরিবর্তন ঘটেছে এক ভয়ঙ্কর রক্তকাণ্ডের পর। এই রক্তকাণ্ডের মধ্য দিয়ে ইন্দোনেশিয়ায় যা চলছে, তাতে গণতান্ত্রিক চেতনাসম্পন্ন ব্যক্তিমাত্রেরই উদ্বেগের কারণ আছে। ভারতের সঙ্গে সম্পর্কের দিক থেকে বরফ গললেও সে দেশের সাম্প্রদায়িক ও ফ্যাসিস্ট মতিগতি দেখে ভারতীয়দের উচ্ছ্বাসের কারণ নেই।

ইন্দোনেশিয়ার সঙ্গে ভারতের সাংস্কৃতিক ও আত্মিক যোগাযোগ যে কত দীর্ঘদিনের এই 'রামায়ণ' নৃত্যনাট্য তার একটি নিদর্শন। ভারতীয় দার্শনিকরা জ্ঞানের আকাঙ্ক্ষা নিয়ে একদা দেশে দেশে পরিভ্রমণ করেছিলেন। তাঁরা জ্ঞান নিয়েছেন এবং দিয়েছেন। এই মহাতীর্থ পরিক্রমায় ভারতের রামায়ণ ইন্দোনেশিয়ার মাটির সঙ্গে মিশে গেছে। সে দেশে রামায়ণ অবলম্বনে সৃষ্টি হয়েছে ক্লাসিক্যাল নৃত্যনাট্য। মন্দিরের পটভূমিতে মঞ্চের একদিকে কণ্ঠসঙ্গীতে, আর একদিকে যন্ত্রসঙ্গীতে পাদপীঠে শিল্পীরা এসে 'রামায়ণ'কে রূপায়িত করে নৃত্যে। এই নৃত্যনাট্য যে ইন্দোনেশিয়ায় কোন ধর্মীয় ও সম্প্রদায়ের

ইন্দোনেশীয় ব্যালে দলের রামায়ণ নৃত্যনাট্যে রাবণ ও সূর্পনখা

নৃত্যনাট্যের সঙ্গে বেজেছে ওদের অর্কেস্ট্রা 'গামেলান', ঢোলক, ঢোল, কাঁসর এবং অন্যান্য বাদ্যযন্ত্র। অর্কেস্ট্রার মূল ধ্বনি মন্দিরে আরতি বাদ্যের মত। কণ্ঠসঙ্গীতে কাহিনীকে বিবৃত করেছে নেপথ্য থেকে। এই কণ্ঠসঙ্গীতের সুর আমাদের কাছে ব্রহ্মপুত্র উপত্যকার লোকসঙ্গীতের সমগোত্রীয় মনে হয়েছে।

নাচে অভিনয় অংশ অপেক্ষা হাতের সঞ্চালন এবং পদক্ষেপ প্রধান। মুখোসের কিছুটা ব্যবহার আছে, রাক্ষস এবং বানর ইত্যাদির ক্ষেত্রে। পুরুষদের পদসঞ্চালন, উত্তরীয় ধারণ ইত্যাদিতে কথাকলির সঙ্গে কিছুটা মিল দেখা যায়। মেয়েদের পদসঞ্চালন ওদের নিজস্ব।

এই নৃত্যনাট্যে অংশগ্রহণ করেছে রেতনো দেওয়াজানি (সীতা), রেতনো রুস্মিণী (ইন্দ্রাণী), রেতনো বিদানার্নি (ত্রিজটা) (এই তিনজন শিল্পী অন্যতম পরিচালক প্রিন্স পাকু আলমের কন্যা); রেতনো মারুতি, তানডাঙ সুলকসোনো (রাম), সারজানতো (রাবণ), বি, সুহার্তো (লক্ষ্মণ), মার্সুদি (হনুমান)।

ইন্দোনেশিয়ার নিজস্ব জাতীয় রীতি অনুযায়ী পোষাক-পরিচ্ছদ ও অলঙ্কার-শোভিতা শিল্পীদের রামায়ণ নৃত্যকলা ও সঙ্গীতে আমাদের দেশের শিল্পানুরাগীরা নতুনত্বের স্বাদ পেয়েছেন।

সঙ্কীর্ণতায় আবদ্ধ হয়ে থাকে নি তার প্রমাণ মুসলিম শিল্পীদের অংশগ্রহণ। এই নৃত্যনাট্য দলের অন্যতম পরিচালক যোগ-জাকার্তার গভর্নর শ্রীপাকু আলম। তাঁর তিনকন্যা এই দলে প্রধান ভূমিকায় অংশ-গ্রহণ করেছেন। সাধারণত জুন থেকে অক্টোবর পর্যন্ত ইন্দোনেশিয়ায় রামায়ণ ব্যালে উৎসব অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে। ছয়টি সন্ধ্যায় ছয়ভাগে রামায়ণ কাহিনীর নৃত্য রূপায়ণ হয়ে থাকে। এই নৃত্যনাট্যে সহ-যোগী গামেলন (অর্কেস্ট্রা), গেরং (কোরাস) এবং দালাং (বর্ণনা)।

ইন্দোনেশীয় রামায়ণ যদিও বাল্মীকি রামায়ণের সঙ্গে কাহিনীর দিক থেকে মূলত এক: কিন্তু স্থানে স্থানে বিভিন্নতা রয়েছে। যেমন ইন্দোনেশীয় রামায়ণে স্ববেশে (ভিখারীবেশ ধারণ না করে) রাবণ সীতাকে হরণ করে। এখানে রাবণ অস্ত্র হিসাবে তলোয়ার ব্যবহার করেছে। কুম্ভ-কর্ণ থেকে রাবণ সকলেই নিহত হবার পর রামের আশীর্বাদ লাভ করে পুনরুজ্জীবিত হয়ে স্বর্গে গেছে। রোষ অপেক্ষা ক্ষমা এই ভাষ্যে অধিক। লঙ্কাপুরীর নারীরা রাক্ষসের ঘরণী হয়েও সীতার প্রতি সহানু-ভূতিসম্পন্না।

রবীন্দ্র সদনের অনুষ্ঠান ছয়দিনের পরিবর্তে তিনদিনে সম্পন্ন হয়েছে। প্রথম দিনের অনুষ্ঠানে রাবণের সভায় এসে সূর্পনখা তার দুঃখের কাহিনী বিবৃত করল, মারীচ স্বর্ণমৃগের রূপ ধারণ করে রাম-লক্ষ্মণকে বিভ্রান্ত করল এবং রাবণ সীতাকে হরণ করল, এই কাহিনী রাম-লক্ষ্মণ শুনল জটায়ুর কাছে। দ্বিতীয় দিনে অশোকবনে সীতা, ত্রিজটা তার সঙ্গী। হনুমানের লঙ্কায় আগমন, বিভীষণের সঙ্গে রাবণের মতভেদ এবং লঙ্কাকান্ড। রামের সমুদ্র শাসন এবং সেতুবন্ধন। তৃতীয় দিনের অনুষ্ঠানে অঙ্গদ কর্তৃক রাবণের আত্মসমর্পণ দাবি, কুম্ভকর্ণের সঙ্গে মতভেদ, ইন্দ্রজিৎ এবং তারপরে কুম্ভকর্ণের সঙ্গে যুদ্ধ, রাবণের পতন এবং সীতা উদ্ধার। বিভীষণকে লঙ্কার সিংহাসনে বসিয়ে সীতার অগ্নি-পরীক্ষার পর রাম-সীতার পুনর্মিলন।

অস্ট্রেলিয়ার পাপেট

৩রা ও ৪ঠা নভেম্বর রবীন্দ্র সদনে অস্ট্রেলিয়া থেকে আগত পুতুল নাচের অনুষ্ঠান হয়েছে। উভয় দেশের সাংস্কৃতিক বিনিময়ের এই উদ্যোগ। পুতুল নাচের কথা শুনলেই ছেলেদের মহলে সাড়া পড়ে যায়। সুতরাং রবীন্দ্র সদনে দুদিনের অনুষ্ঠানের টিকেট অগ্রিম বিক্রি হয়ে যায়। শুক্রবার সাড়ে দশটায় চারটি স্কুলের ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য এক বিশেষ শো'র ব্যবস্থা করা হয়েছিল। প্রথম রজনীর অনুষ্ঠানে শিক্ষামন্ত্রী শ্রীরবীন্দ্রলাল সিংহ উপস্থিত ছিলেন।

অস্ট্রেলিয়ার পুতুল নাচের কিছু খণ্ড খণ্ড দৃশ্য দেখাবার পর 'ছোট্ট ছেলে বিন্দার কাহিনী' নামক একটি পুতুল নাচ দেখান হয়েছে। এই পুতুল কাহিনীতে অস্ট্রেলিয়ার বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী এমু, অস্ট্রিচ, কাঙারু প্রভৃতি পাখী, এবং স্থল ও জলের বিভিন্ন জন্তু-জানোয়ারের পাপেট হাজির করা হয়েছে। ছেলেমেয়েরা খুব উপভোগ করেছে।

এই পুতুলের খেলার নেপথ্যে বাজছিল

বাজনা, রূপকথার মেজাজে। পুতুলের পোষাক এবং আলোর ব্যবহারে অনুষ্ঠান মনোরম হয়েছে।

আমাদের দেশে ইতিপূর্বে রাশিয়ান এবং চেকোশ্লোভাক পাপেটের খেলা দেখান হয়েছে। ওদের তুলনায় অস্ট্রেলীয় পাপেট অনেক অনুন্নত। তার সঙ্গে তুলনাই হয় না। এরা সুতো দিয়ে বেঁধে পুতুলের খেলা দেখায়, যা আমাদের দেশে মেলায় মেলায় দেখা যায়।

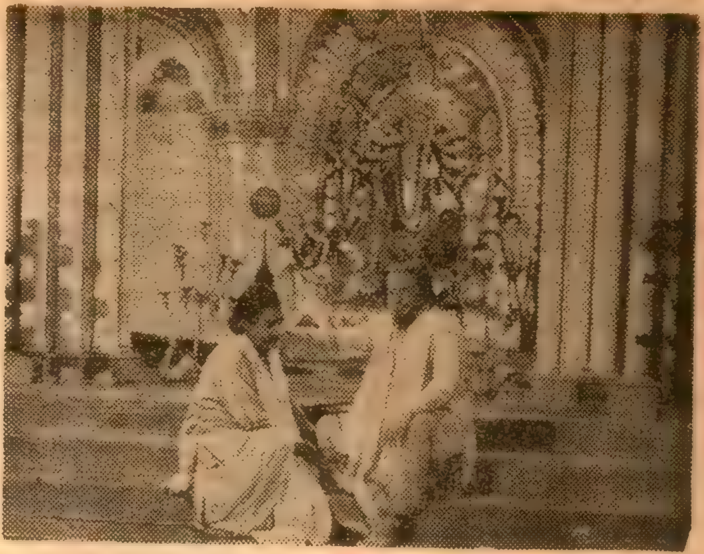

'জোড়াদীঘির চৌধুরী পরিবার' ছবিতে কালী ব্যানার্জী ও অসিতবরণ

নাটকের কথা

উত্তরবঙ্গে নট-নাট্যম্

পূজার পরেই দার্জিলিং শহরে নট-নাট্যম্ চারটি নাটক পরিবেশন করে স্থানীয় দর্শকদের প্রভূত আনন্দদান করেছেন। ২৫শে ও ২৬শে অক্টোবর এন, এন, এইচ, পি হলে নট-নাট্যম্ 'করুণা কোরো না', 'দার্জিলিংয়ের মেয়ে', 'রাজযোটক' সহ পূর্ণাঙ্গ নাটক 'পাখীর বাসা' মঞ্চস্থ করেন। নাটকগুলি বক্তব্যে এবং অভিনয়-গুণে সাড়া জাগাতে সক্ষম হয়। 'রাজযোটক' এই হাসির একাঙ্কটি (মূল রচনাঃ আন্তন চেখব, রূপান্তর রমেন লাহিড়ী) পরিচালক অরুণ মুখোপাধ্যায়ের সুনির্দেশনায় এবং অভিনয়ে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। 'পাখীর বাসা' নাটকের নায়িকার চরিত্রে রুণু দেবীর অভিনয়ে উচ্চাঙ্গের অভিনয়কলার ছাপ পাওয়া যায়। এ নাটকের অন্যান্য চরিত্রগুলি সুঅভিনীত। 'করুণা কোরো না'য় নাট্যকার পরিচালক (তিনটি নাটকই এ'র রচনা) জগমোহন মজুমদার ও কমল মুখোপাধ্যায়ের অভিনয় উচ্চস্তরের। 'দার্জিলিংয়ের মেয়ে' নাটকটি স্থানীয় পটভূমিকায় এক রূপকাশ্রিত একাঙ্ক। নাটকটি সুপ্রযোজিত। বিভিন্ন চরিত্রে অন্যান্য শিল্পীদের মধ্যে গোপী বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রশান্ত মুখোপাধ্যায়, বিজলী মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি কৃতিত্বের পরিচয় দেন।

অরূপ শিল্পী গোষ্ঠী

সুপরিচিত শিল্পী সংস্থা 'অরূপ শিল্পী গোষ্ঠী'র ত্রৈমাসিক সঙ্গীতানুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হ'লো ১৬ই অক্টোবর, মুরলীধর বালিকা বিদ্যালয়ের প্রাঙ্গণে।

এই প্রাক্-পূজা সঙ্গীতানুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেন বাউল পূর্ণ দাস, ভারত-বিখ্যাত 'শ্রীখোল' বাদক গোপাল চট্টোপাধ্যায়, সাগর সেন, হিমঘ্ন রায়চৌধুরী, রুণা মতিলাল, গীতা ভট্টাচার্য, শ্রীকুমার চট্টোপাধ্যায়, গীতালি হোড়, নন্দিতা গাঙ্গুলী, নবীন কয়াল, স্বপ্না গুপ্ত প্রভৃতি। বাদ্য সহযোগিতায় ছিলেন প্রণব শূর ও সত্যেন দেবরায়। 'চিত্রাঙ্গদা' নৃত্যনাট্যের নির্বাচিত দৃশ্যে অংশগ্রহণ করেন ডালিয়া মুখার্জী ও সুমিতা গুইন।

বাংলার নিজস্ব সঙ্গীত বাউলের মূল ভাবটিকে অক্ষুন্ন রেখে, শ্রীপূর্ণদাস যে অননুকরণযোগ্য ভঙ্গীতে এইদিন সঙ্গীত পরিবেশন করেন, শ্রোতাদের তা অনেকদিন মনে থাকবে। 'শ্রীখোলে' শ্রীগোপাল চট্টোপাধ্যায়ের কৃতিত্ব আজ ভারতব্যাপী। সম্প্রতি অন্ধ্র প্রদেশের কালাহস্তীতে অনুষ্ঠিত নিখিল ভারত ধর্মসঙ্গীত সম্মেলনে জগদ্‌গুরু শঙ্করাচার্য এই বাঙালী শিল্পীকে বিশেষভাবে সম্বর্ধিত করেন। শ্রীচট্টোপাধ্যায় শ্রোতৃমণ্ডলীকে মন্ত্রমুগ্ধ করে রাখেন। রবীন্দ্র-সঙ্গীতে সাগর সেন, হিমঘ্ন রায়চৌধুরী ও রুণা মতিলাল যথাযথ হলেও রুণা মতিলাল শ্রোতাদের আকাঙ্ক্ষা সম্পূর্ণরূপে পূর্ণ করতে পারেন নি। নৃত্যাংশে

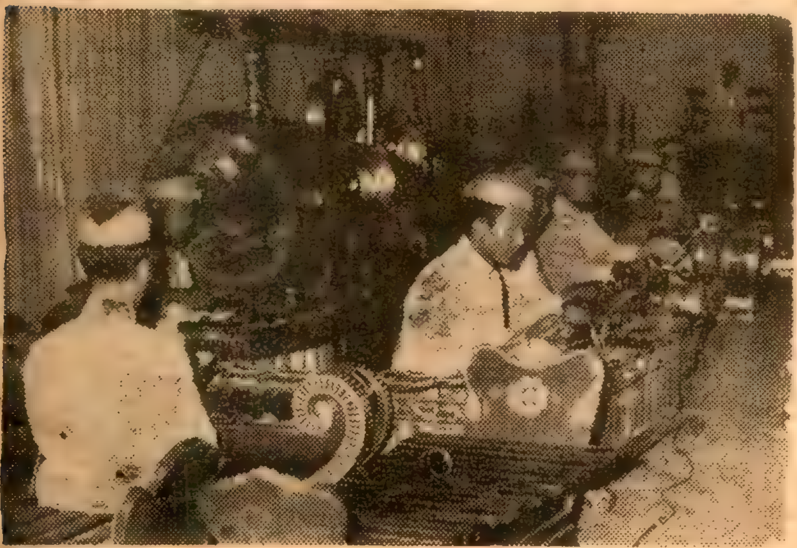

ইন্দোনেশীয় রামায়ণ ব্যালে দলের অর্কেস্ট্রা

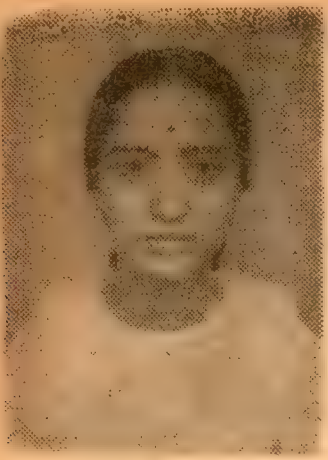

নৃত্যভারতীর ছাত্রী জয়শ্রী দত্ত। সংগীত প্রভাকর পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছে।

আলোক-সম্পাতের কাজ প্রশংসার দাবি রাখে।

উৎপল দত্ত কর্তৃক পুরস্কার প্রত্যাখ্যান

শ্রীউৎপল দত্ত জানাচ্ছেন তাঁকে সংগীত নাটক আকাদেমি ১৯৬৫-৬৬ সালের শ্রেষ্ঠ নাট্য পরিচালনার জন্য যে পুরস্কার দিয়েছিলেন তা তিনি প্রত্যাখ্যান করেছেন। তাঁর মতে কল্লোল-এর স্বপক্ষে যে বিপুল জনমত ব্যক্ত হয়েছে সেটাই তাঁর ও লিটল থিয়েটার গ্রুপের সর্বোচ্চ সম্মান। তাঁর অভিমত হোলো জনগণ ছাড়া আর কাউকে বিচারকের আসনে বসানো কোনো সৃষ্টিশীল শিল্পীর পক্ষে সম্ভব নয়। তথাপি এ-কথাও শ্রীউৎপল দত্ত জানেন—আকাদেমির এই ঘোষণা কল্লোল-এর বিরুদ্ধে যে-সব শক্তি মিথ্যাচার ষড়যন্ত্র, এমন কি গুণ্ডামির আশ্রয় নিয়েছিল তাদের মুখোস আরেকবার খুলে দিয়েছে এবং যে "দেশদ্রোহিতার" রূপকথা প্রচার করে এ রাজ্যে শিল্পীদের বিনা-বিচারে আটক রাখা হয়েছিল সে রূপকথার সমাধি রচনা করছে।

সংবাদবন্দনা

একালের শেখভ

সত্যজিৎ রায়ের 'মহানগর' চলচ্চিত্র সানফ্রান্সিসকো চলচ্চিত্র উৎসবে বিশেষ প্রশংসালাভ করেছে। বিচারকগণ শ্রীরায়কে একালের শেখভ এবং অত্যন্ত উচ্চস্তরের সংবেদনশীল শিল্পী বলে অভিহিত করেছেন।

সোভিয়েটে ভারতীয় চলচ্চিত্র উৎসব

সোভিয়েট ইউনিয়নে এক সপ্তাহব্যাপী ভারতীয় চলচ্চিত্র উৎসবের আয়োজন করা হয়েছে। আগামী ১৫ই নভেম্বর ভারতের উপমন্ত্রী শ্রীমতী নন্দিনী সৎপতি এই উৎসব উদ্বোধন করবেন। এই উৎসবে সত্যজিৎ রায়ের দুটি ছবি প্রদর্শন করা হবে জানা গেছে।

আফ্রো-এশীয় চলচ্চিত্র উৎসব

আগামী ডিসেম্বর মাসে পাকিস্তানে আফ্রো-এশীয় বিষয় সম্পর্কিত পাকিস্তান ইনস্টিটিউটের উদ্যোগে আফ্রো-এশীয় চলচ্চিত্র উৎসব অনুষ্ঠিত হবে। এই উৎসবে ভারত তিনটি প্রামাণ্য চিত্র পাঠিয়েছে।

কলকাতায় রাজেন্দ্রকুমার

আর, ডি, বনশালের হিন্দী ছবি 'ঝুক গয়া আশমান'-এর দার্জিলিঙ-এ চিত্র গ্রহণ উপলক্ষে রাজেন্দ্রকুমার কলকাতায় এসেছিলেন। গত ৬ই নভেম্বর স্পেনসাস হোটেলে তিনি সাংবাদিকদের সংগে সাক্ষাৎ করেন।

কলকাতায় নতুন প্রেক্ষাগৃহ

কলকাতায় আর একটি নতুন প্রেক্ষাগৃহ

হিন্দী ছবি 'ঝুক গয়া আশমান'-এ বহির্দৃশ্যে (দার্জিলিঙ) সায়রা বানু ও রাজেন্দ্র কুমার।

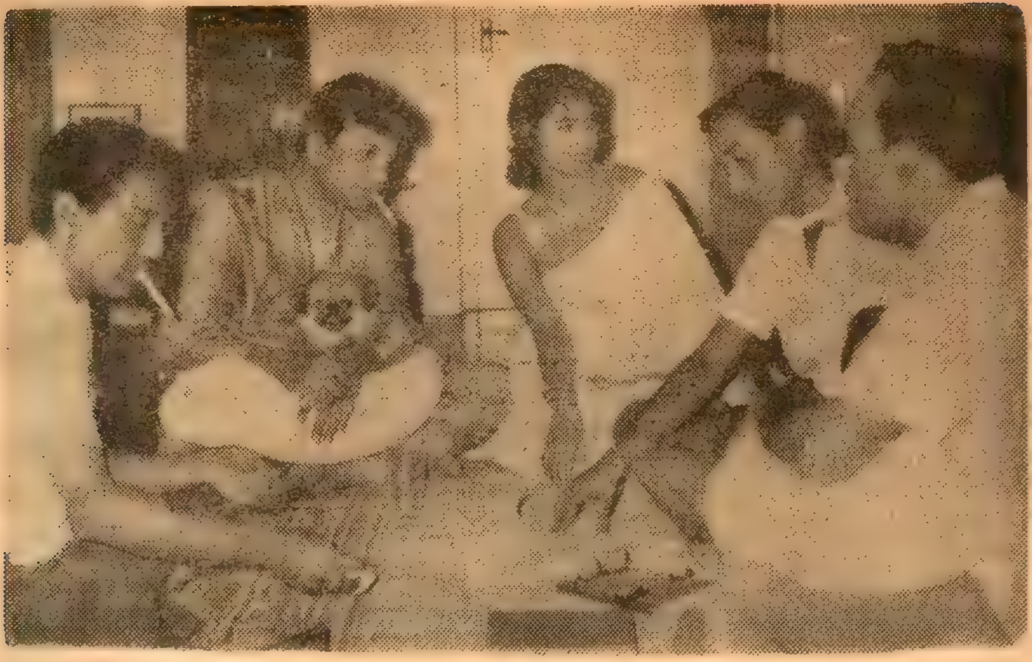

স্বগৃহে সমরেশ বসুর 'বিবর'-এর চিত্রনাট্য শুনছেন উত্তমকুমার, বাঁ পাশে শ্যামল মিত্র, ডানদিক থেকে সুপ্রিয়া চৌধুরী, সহ-পরিচালক রঞ্জন মজুমদার ও পরিচালক জগন্নাথ চ্যাটার্জী।

উদ্বোধন হবে শীঘ্র। ৪০ লক্ষ টাকা ব্যয়ে এই প্রেক্ষাগৃহ নির্মিত হচ্ছে ৪৮ নম্বর সেক্সপীয়র সরণীতে। লোয়ার সার্কুলার রোড আর থিয়েটার রোডের সংযোগস্থলে। এই প্রেক্ষাগৃহে থাকবে দুটি অডিটোরিয়াম। একটিতে ১,১৫০ জন দর্শক বসতে পারবে আর একটি হবে সমতলের নিচে, এই আন্ডার গ্রাউন্ড অডিটোরিয়ামটি হবে ছোট। শিল্পপতি শ্রী বি, কে, বিড়লার সঙ্গীতকলা মন্দিরের এটি নিজস্ব প্রেক্ষাগৃহ। সঙ্গীতকলা মন্দির বছরে ৩০টির মত অনুষ্ঠান করে। বাইরের সংস্থার অনুষ্ঠানের জন্য প্রেক্ষাগৃহ ভাড়াও দেওয়া হবে।

নেপথ্য নায়িকা

এ মাসের শেষ সপ্তাহে 'দি ইউনিট' সংস্থা রণজিৎ বসু রচিত 'নেপথ্য নায়িকা' অভিনয় করবার জন্য তৈরি হচ্ছেন। পরিচালনা করছেন শ্রীমৃত্যুঞ্জয় বন্দ্যোপাধ্যায়।

বিচিত্রানুষ্ঠান

'সপ্তসুর'-এর প্রযোজনায় ও মলয় বসুর পরিচালনায় আগামী ১৮ই নভেম্বর থেকে ২০শে নভেম্বর এই তিনদিন ধরে বাগবাজার গিরিশ এভিনিউ-এর সি, আই, টি পার্কে এক বিচিত্রানুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে। এই অনুষ্ঠানে বোম্বাই ও কলকাতার প্রখ্যাত শিল্পীরা অংশ নিচ্ছেন। প্রমথদিন সারা রাত উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের আসর বসবে এখানে। আসরে অংশ নেবেন : চিন্ময় লাহিড়ী, সুনন্দা পট্টনায়ক, সুশীল বসু, শিপ্রা বসু, বাহাদুর খাঁ, আলি আহম্মদ, মীরা মুখার্জী, শতাব্দী রায় ও লিপিকা গুপ্ত এবং কল্যাণী রায়। পরের দুদিন আধুনিক অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করবেন : মহম্মদ রফি, গীতা দত্ত, মান্না দে, মিনু পুরুষোত্তম, সুবীর সেন, মীরা সীরাজ, প্রশান্ত ভট্টাচার্য, কাঞ্চনমালা, জনি হুইস্কি, আরতি মুখার্জী, শ্যামল মিত্র, প্রতিমা ব্যানার্জী, চন্দ্রাণী মুখার্জী, চিন্ময় চ্যাটার্জী, দ্বিজেন মুখার্জী, বাণী ঠাকুর, শ্রীকুমার চ্যাটার্জী, দ্বীপেন মুখার্জী, জহর রায়, অরুণাভ মজুমদার ও হিমাংশু বিশ্বাস।

ছাত্র-ছাত্রী, শিক্ষক-শিক্ষিকা, বেকার, চাকুরীপ্রার্থী ও শিক্ষানুরাগীদের ভাষা শিক্ষার পক্ষে অপরিহার্য একমাত্র গ্রন্থ
॥ বিদেশী ভাষায় দক্ষতা অর্জনের ক্ষেত্রে শ্রেষ্ঠ সহায়ক ॥
* * স্বল্পশ্রমে পর্যাপ্ত ফল অবশ্যম্ভাবী *
উপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত

রা জ ভা ষা

(ইংরাজী ভাষা সহজে শিক্ষার অদ্বিতীয় সাহায্য গ্রন্থ)
এক আধারে : ভাষা - ব্যাকরণ - শব্দার্থ
ইংরাজী হইতে বাঙলা—৩-৫০ ॥ ইংরাজী হইতে উর্দু—৩·০০

বসুমতী প্রাইভেট লিমিটেড
১৬৬, বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী ষ্ট্রীট, কলিকাতা—১২

পাঠক মন

২৯শে সেপ্টেম্বর সাপ্তাহিক বসুমতীতে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাচীন ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগ সম্বন্ধে আপনাদের মন্তব্য বিশেষ প্রশংসাযোগ্য।

কলেজের শিক্ষক হিসাবে বিশ্ববিদ্যালয়ে নিযুক্ত একাধিক জ্ঞানী-গুণী ব্যক্তির সংস্পর্শে আসার সুযোগও লাভ করিয়াছি, কিন্তু ডাঃ সরকারের ন্যায় অসাধারণ পরিশ্রমী ও জ্ঞানানুসন্ধানীর সাক্ষাৎ খুব কমই মিলিয়াছে। খুব কম অধ্যাপকই আজ ছাত্রদের গবেষণা বিষয়ে ডাঃ সরকারের ন্যায় উৎসাহ দান করেন এবং প্রত্যক্ষ সাহায্য করেন। এই প্রবীণ বয়সেও তাঁহাকে যে কঠোর পরিশ্রম করিতে দেখি তাহা বিস্ময়ের উদ্রেক করে। খুব কম যুবকই তাঁহার সহিত পাল্লা দিতে সক্ষম। সুতরাং যে ব্যক্তি কাজের সময় নিজেকেও ক্ষমা করেন না, সে যে অন্যের ফাঁকি প্রবণতাকেও বরদাস্ত করিবেন না, তাহাতে আশ্চর্য হইবার কারণ নাই। প্রবঞ্চকতা ও চালাকি দ্বারা কার্য সিদ্ধ করার যে ঝোঁক আজকাল প্রবল হইয়া উঠিয়াছে, সেই সময়ে ডাঃ সরকারের মত ব্যক্তিরা শত্রুর সংখ্যা বাড়াইবেন বৈ কি। বিশ্ববিদ্যালয় আজ সমস্ত রাজনৈতিক দলীয় ও উপদলীয় চক্রান্তের একটি আখড়া হইয়াছে। জ্ঞানের পীঠস্থান কলুষিত। অতএব এই আবহাওয়ায় গবেষণামূলক কাজ সম্ভব না হইলে কাগজপত্র বাড়ি লইয়া গেলে মহাভারত অশুদ্ধ হইতে পারে না। নিয়মের দোহাই দিয়া লাভ নাই, কারণ, প্রতিনিয়ত হীন অভিসন্ধি চরিতার্থ করিবার জন্য কর্তাব্যক্তিরা তাহা ভাবিতেছেন। আর ডাঃ সরকার যদি সুষ্ঠুভাবে কাজ করার জন্য সবকিছু বাড়ি লইয়া যান, তাহাতে খুব বড় রকমের পাপকর্ম করেন না। আবার বক্তব্য জোরদার করার উদ্দেশ্যে ডাঃ সঙ্কালিয়াকে টানা হইয়াছে। ডাঃ সঙ্কালিয়া প্রখ্যাত ঐতিহাসিক, কিন্তু ডাঃ সরকারের পাণ্ডিত্য আর কিছু সঙ্কালিয়ার প্রশংসা বা অপ্রশংসা নির্ভরশীল নয়। শুভানুধ্যায়ীটি পছন্দ করুন আর নাই করুন, কঠিন পরিশ্রম ও প্রজ্ঞার ফলস্বরূপ ডাঃ সরকারের পাণ্ডিত্যের খ্যাতি আজ দেশে ও বিদেশে স্বীকৃত। অবশ্য কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় আজকাল পাণ্ডিত্যের বড় একটা দাম দেয় না। দলাদলিই সেখানে বড় কথা। সেই কারণে ইদানীংকালের বহু কৃতী ছাত্র বাংলা দেশের বাহিরের বিশ্ববিদ্যালয়ে কাজ লইতেছে। চক্রান্তের ফলে কোন অশুভ মুহূর্তে ডাঃ সরকার যদি পদত্যাগ করিতে বাধ্য হন তো আশ্চর্য হইব না।

গত সপ্তাহের 'পাঠক মনে' জনৈক শুভানুধ্যায়ী (?) অত্যন্ত অশোভনভাবে ডাঃ সরকারের জ্ঞানের উপর কটাক্ষপাত করিয়াছেন। অজ্ঞানতারই যে দম্ভ বেশি, তাহা সর্বজন বিদিত। ডাঃ সরকার প্রায় এক সহস্রের মত মৌলিক ও জ্ঞানগর্ভ প্রবন্ধ ভারতের সমস্ত গবেষণামূলক কাগজে লিখিয়াছেন। ইহা ছাড়া প্রথম শ্রেণীর জ্ঞানী ব্যক্তিদের প্রশংসিত একাধিক পুস্তক রচনা করিয়াছেন। তাঁহার খ্যাতি যে শুধু প্রবন্ধের সংখ্যার উপর প্রতিষ্ঠিত নয়, উহাদের গুণের উপর প্রতিষ্ঠিত, ইহা জানিবার মত ধৈর্য এবং জ্ঞান এই শুভানুধ্যায়ীটির একান্ত অভাব। অবশ্য তিনি নিজেকে বিলক্ষণ মহাগুণী ও জ্ঞানী মনে করেন। অতএব আমরা আশা করিব যে, দুরভিসন্ধিমূলক প্রচারকার্য না চালাইয়া বিভিন্ন প্রখ্যাত জার্নালে ইনি ডাঃ সরকারের গবেষণামূলক লেখাগুলির অসারত্ব প্রমাণ করুন এবং তাঁহার খ্যাতি যে অমূলক ও ভিত্তিহীন, তাহা আমাদের সামনে তত্ত্ব ও তথ্যের মাধ্যমে তুলিয়া ধরুন। আর যদি যথার্থই ইনি তাহা করিতে সমর্থ হন, তাহা হইলে জ্ঞানজগতে তাহার স্বীকৃতি মিলিবে, অন্যথায় সমস্ত ব্যাপারটিই দুরভিসন্ধিমূলক বলিয়া প্রমাণিত হইবে।

শ্রীচণ্ডীলাল চক্রবর্তী
স্কুল রোড, বনগ্রাম, (চব্বিশ পরগনা)

* * *

গত ২০শে অক্টোবরের সাপ্তাহিক বসুমতীতে প্রকাশিত কোন এক শুভানুধ্যায়ী লিখিত একটি পত্রে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাচীন ভারতীয় ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগের প্রধান অধ্যাপককে কেন্দ্র করিয়া যে-সব মন্তব্য প্রকাশিত হইয়াছে তাহা পাঠ করিয়া চমৎকৃত হইয়াছি। কুৎসা রটনার জন্য মিথ্যা এবং অর্ধসত্যের এরূপ সার্থক প্রয়োগ বোধ হয় গোয়েবল্সও করিতে পারিতেন কিনা সন্দেহ। যাঁহারা ঐ বিভাগটির সামান্যতম খোঁজ-খবর রাখেন, তাঁহারা অবশ্য গোয়েবল্সের এই বঙ্গীয় সংস্করণটির লেখনীচাতুর্যে বিভ্রান্ত হইবেন না। যে ব্যক্তির রচিত গ্রন্থাদির সহায়তা ব্যতীত প্রাচীন ভারতীয় ইতিহাসের কোন একখানি পুস্তক সংকলন সম্ভব নয় (এই উক্তির সত্যতা ভারতবর্ষের প্রাচীন ইতিহাসের উপর রচিত যে-কোন প্রামাণ্য পুস্তকের bibligraphy-ই প্রমাণ করিবে), যিনি ভারত-ইতিহাসের বক্তৃতা দানের জন্য প্রতিনিয়তই বিভিন্ন ভারতীয় এবং বহির্ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক অনুরুদ্ধ হইতেছেন, যিনি রবীন্দ্র পুরস্কারপ্রাপ্ত History and Culture of Indian People গ্রন্থের শতাধিক পৃষ্ঠা লিখিয়া উহাকে সমৃদ্ধ করিয়াছেন, যাঁর ভারতীয় লিপিমালা সম্পর্কিত জ্ঞান প্রতিদ্বন্দ্বীহীন (এ বিষয়ে নীরব সাক্ষী ভারত সরকার কর্তৃক প্রকাশিত Epigraphia Indica ও Indian Historical Quarterly Journal of the Royal Asiatic Society of Great Britain & Ireland প্রভৃতি সাময়িক পত্রাদি এবং Select Inscriptions bearing on the History and Civilisation of India, Indian Epigraphy, Indian Epigraphical Glossery প্রভৃতি গ্রন্থাদি), যিনি প্রাচীন ভারতীয় মুদ্রা বিষয়ে তাঁর অসাধারণ পাণ্ডিত্যের স্বীকৃতিস্বরূপ বারাণসীতে অনুষ্ঠিত Indian Numismatic Society-র অধিবেশনে সভাপতির পদ অলঙ্কৃত করিতে আমন্ত্রিত হন এবং Royal Numismatic Society (Great Britain) এর Fellow নির্বাচিত হন, তিনি কি কেবলমাত্র ঐ শুভানুধ্যায়ীর উদ্দেশ্যপ্রণোদিত বক্রোক্তি "এদেশে পাণ্ডিত্যের খ্যাতি নানা কারণে গড়ে ওঠে" দ্বারাই মূর্খ প্রমাণিত হইবেন?

শুভানুধ্যায়ীর বক্তব্য অনুযায়ী বর্তমান অধ্যক্ষের আচার-আচরণ সহযোগী অধ্যাপক ও ছাত্র-ছাত্রী মহলে বিরূপ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করিয়াছে। এই অভিযোগটি সর্বৈব মিথ্যা। বরং এই অনাড়ম্বর, সহজ এবং সরল মানুষটির ব্যবহারে, তাঁহার প্রতি আকৃষ্ট না হইয়া থাকিতে পারে এরূপ লোকের সংখ্যা খুবই কম। কল্পনাপ্রসূত হীন অভিযোগ সৃষ্টি করিবার এবম্প্রকার প্রচেষ্টা সত্যই তুলনাহীন।

শুভানুধ্যায়ীর অপর অভিযোগ এই যে, বর্তমান অধ্যক্ষের আমলে বিশ্ববিদ্যালয়-মঞ্জুরী কমিশন কর্তৃক কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে স্থাপিত প্রাচীন ভারতীয় ইতিহাস ও সংস্কৃতির উচ্চতর শিক্ষা বিভাগটি গবেষণার অনুকূল পরিবেশ নষ্ট হইয়াছে। কিন্তু ওয়াকিবহাল মহলের খবরে প্রকাশ যে, বর্তমান বিভাগীয় প্রধানের পরিচালনাধীনে প্রাচীন ভারতের যে ভৌগোলিক অভিধানটি সঙ্কলনের পরিকল্পনা রহিয়াছে, তাহার তথ্যানুসন্ধানের মূল কাজ সমাপ্ত এবং আশা করা যায় যে, ১৯৬৭ সালের মধ্যেই উক্ত গ্রন্থটি প্রকাশিত হইবে। এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে, নির্ধারিত সময়ের প্রায় ৪ বৎসর পূর্বেই এই কার্যটি সম্পূর্ণ হইতে চলিয়াছে। বোধ হয় গবেষণার উপযুক্ত পরিবেশের অভাবেই এত দ্রুত গতিতে এরূপ একটি বৃহৎ কার্য সম্ভব হইতেছে।

...ধ্যক্ষের ... গবেষণাকার্যে ... গিয়াছেন। অনেক ...ত্য মিথ্যা অপেক্ষাও সত্যকে বিকৃত করে। বিসমার্ক এইভাবে ফ্রান্সকে এশিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিতে বাধ্য করিয়াছিলেন। আমাদের শুভানুধ্যায়ী একটি কথা সম্পূর্ণ গোপন করিয়াছেন যে, ঐ তিনজন ব্যক্তিই অস্থায়ী গবেষকের পদ (যার আয়ুঃসীমা ১৯৭১ সাল পর্যন্ত) ত্যাগ করিয়া স্থায়ী পদে যোগদান করিয়াছেন। বৃত্তিভোগী গবেষকদের অধিকাংশই অনিশ্চিত ভবিষ্যৎ অপেক্ষা স্থায়ী চাকুরীকে অগ্রাধিকার দান করেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের কয়েক বৎসরের বৃত্তিভোগী গবেষকদের তালিকা পর্যালোচনা করিলেও উপরোক্ত বক্তব্যের সত্যতা প্রমাণিত হইবে।

শুভানুধ্যায়ী বলিয়াছেন যে, বর্তমান অধ্যক্ষ অন্যায়ভাবে গবেষকদের তাঁর গৃহে গবেষণা সংক্রান্ত কার্যে আসিতে বলেন এবং দুইজন ইহাতে অসম্মত হইলে তাঁহাদের বরখাস্ত করেন। প্রসংগত বলা যায় যে, বর্তমান অধ্যক্ষের এই কার্যটি মোটেই আইনবিরুদ্ধ নয়। শুভানুধ্যায়ীর এই তথ্যটি নিশ্চয় অজানা নয় যে, বর্তমান অধ্যক্ষের গৃহে গবেষণা সংক্রান্ত আলোচনা এবং উপযুক্ত নির্দেশ গ্রহণ করার জন্য গবেষকদের প্রতি প্রাক্তন অধ্যক্ষ ডাঃ রায়ের লিখিত নির্দেশ ছিল। সেই নির্দেশ অনুযায়ী গবেষকগণ এতাবৎকাল নিয়মিত তাঁহার গৃহে যাইয়া প্রয়োজনীয় উপদেশ গ্রহণ করিতেন। হঠাৎ এই দুইজন গবেষক একজন অধ্যাপকের গৃহে যাইতে, তাও গবেষণা সংক্রান্ত কার্যে অস্বীকার করিলেন কেন? ইহা কি কোন মহলের প্ররোচনার ফল? কেন ইঁহাদের গবেষক পদ হইতে বহিষ্কৃত করা হইবে না এবং ইঁহারা কোন বিশেষ ব্যক্তি বা গোষ্ঠী দ্বারা প্রভাবান্বিত হইয়া এরূপ করিতেছেন কিনা, এ সম্বন্ধে বিশেষভাবে অনুসন্ধান করার জন্য একটি কমিটি গঠিত হইয়াছে। আমরা অধীর আগ্রহে ঐ কমিটি কর্তৃক উদ্ঘাটিত প্রকৃত সত্য জানার আশায় রহিলাম।

সৌরেন্দ্রমোহন চক্রবর্তী
২৮, স্টেশন রোড, কলিকাতা-৩১

* * *

প্রাচীন ভারতীয় ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগের প্রধান অধ্যাপকের বিরুদ্ধে জনৈক শুভানুধ্যায়ীর অভিযোগগুলি এতই মিথ্যা যে, উহার প্রতিবাদ করিতেও ঘৃণা বোধ হয়। ঐ অধ্যাপকের পাণ্ডিত্য এবং কর্তব্যনিষ্ঠা অনেকেরই ক্ষোভের কারণ হইয়াছে। ফলে নানারূপ মিথ্যা অভিযোগ সৃষ্টি করিয়া তাঁহাকে অপদস্থ করার চেষ্টায় বিস্মিত হইবার কিছুই নাই। বঙ্গদর্শনে নিরপেক্ষভাবে এই প্রসঙ্গটির আলোচনা ইঁহাদের নিশ্চয়ই ক্ষিপ্ত করিয়াছে এবং তাহারই ফলশ্রুতি শুভানুধ্যায়ীর প্রলাপোক্তি। বিশ্ববিদ্যালয়ের ঐ বিভাগটির সহিত পরিচিত সকলেই স্বীকার করিবেন যে, প্রাচীন ভারতীয় ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগের উচ্চতর গবেষণা কেন্দ্রটি বর্তমান অধ্যক্ষের অধীনে অতি সুষ্ঠুভাবে পরিচালিত হইতেছে। ডঃ সাঙ্কালিয়া সম্প্রতি এই কেন্দ্রটি পরিদর্শনে আসিয়া বর্তমান অধ্যক্ষ এবং পরিচালন দক্ষতা সম্পর্কে ভূয়সী প্রশংসা করিয়া গিয়াছেন। দ্বিতীয়ত বর্তমান অধ্যক্ষের সম্পাদনায় এই কেন্দ্র কর্তৃক প্রকাশিত গ্রন্থাদি বিশেষজ্ঞমহলে যথেষ্ট সমাদর লাভ করিয়াছে এবং বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় প্রশংসিত হইয়াছে। নিয়মানুবর্তিতা এবং নিষ্ঠার এই সাফল্যে বিপরীত চরিত্র ব্যক্তিগণ যে ঈর্ষান্বিত হইবেন এবং এই কেন্দ্রটির অগ্রগতিতে বাধার সৃষ্টি করিবেন তাহা তো স্বতঃসিদ্ধ। সম্প্রতি যে দুইজন গবেষককে কেন্দ্র হইতে বরখাস্ত করা হইয়াছে, তাহা বিনা কারণে নহে। বর্তমান পরিচালকের সহিত ক্রমাগত অসহযোগিতা এবং নির্দেশ পালনে অসম্মতি, অবাধ্যতা প্রভৃতি গুরুতর অভিযোগ তাহাদের পদচ্যুতির কারণরূপে দর্শিত হইয়াছে।

পারিজাত চক্রবর্তী
অজিত রায়
৫৭।এ, অনাথনাথ দেব লেন কলিকাতা-৩৭

* * *

সম্প্রতি বঙ্গদর্শনে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাচীন ভারতীয় ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগ সম্পর্কিত কয়েকটি মন্তব্যকে কেন্দ্র করিয়া দুটি পরস্পরবিরোধী পত্র আপনার পত্রিকায় গত ৩রা কার্তিক তারিখে প্রকাশিত হইয়াছে। ঐ বিভাগের একজন প্রাক্তন ছাত্রী হিসাবে অত্যন্ত দুঃখের সহিত লক্ষ্য করিলাম যে, জনৈক শুভানুধ্যায়ীর মতে বর্তমান বিভাগীয় প্রধান তাঁহাব অসৌজন্যমূলক ব্যবহারের ফলে অন্যান্য অধ্যাপক গবেষক এবং ছাত্র-ছাত্রীদের নিকট সমভাবে অপ্রীতিভাজন হইয়াছেন। অন্যান্যদের কথা জানি না, কিন্তু তাঁহার সম্পর্কে ছাত্র-ছাত্রীদের বিরূপ মনোভাবের কথা ঐ শুভানুধ্যায়ী কোথা হইতে আবিষ্কার করিলেন? প্রকৃতপক্ষে, তাঁহার ন্যায় ছাত্রবৎসল অধ্যাপক বর্তমানে বিরল। তাঁহার শিক্ষাদান পদ্ধতি এবং অত্যন্ত জটিল বিষয়কে অতি সহজভাবে উপস্থিত করিবার ক্ষমতা ছাত্র-ছাত্রী মহলে তাঁহাকে অতীব প্রিয় করিয়াছে। ক্লাসের বাহিরেও ছাত্র-ছাত্রীদের সহিত তাঁহার পিতৃসুলভ ব্যবহার প্রাচীন ভারতের গুরু-শিষ্যের সম্পর্কের কথা স্মরণ করাইয়া দেয়। সুতরাং আমাদের এই পরম শ্রদ্ধেয় আচার্যদেব সম্পর্কে ঐ শুভানুধ্যায়ী (?) ব্যক্তিটি যে অসত্য মন্তব্য করিয়াছেন, ছাত্রী হিসাবে তাহার দৃঢ় প্রতিবাদ করা প্রয়োজন মনে করি।

নমিতা দত্ত
ভট্টনগর, লিলুয়া, (হাওড়া)

* * *

আপনার সম্পাদিত ২২শে সেপ্টেম্বরের পত্রিকায় প্রকাশিত শ্রীমতী চিত্রলেখা চৌধুরীর পত্রখানি পাঠ করিলাম। আমার সহিত হেমেন্দ্রকুমার রায়ের পরিচয় আমাদের কিশোর বয়স হইতে এবং পাথুরিয়াঘাটার হেমেন্দ্র তখন তাঁহাদের পৈতৃক বাড়িতেই থাকিতেন। সেখানেই আমার সহিত হেমেন্দ্র কবিরাজ অমরেন্দ্র রায়ের সহিত আলাপ করাইয়া দেন। তাঁহার আত্মীয়-স্বজনদের সম্পর্কে তাঁহার নিকটই শুনিয়াছিলাম যে, অমরেন্দ্র, অধ্যাপক সুহাস রায় ও কলিকাতা কর্পোরেশনের প্রথম এডুকেশন অফিসার সত্যানন্দ রা... তাঁহার নিকট সম্পর্কে জ্ঞাতিভ্রা... হেমেন্দ্রই আমার সহিত সত্যানন্দ প্রমুখে... পরিচয় করাইয়া দেয়। "রবিয়া... প্রভাবে সে সময়ে হেমেন্দ্র রবীন্দ্র-বি... ছিল এবং আমার ও আমার বন্ধু ...ঙ্কুরের সহিত তাহা লইয়া প্রায়ই ঘো... তর্ক-বিতর্ক হইতে হইতে ক্রমে আমা... অপেক্ষা হেমেন্দ্র বেশি রবীন্দ্রভক্ত ও রবীন্দ্র-সাহিত্যের সমজদার হয়েন। আমাদের তর্ক-বিতর্কের কথা হেমেন্দ্র নিজেই "এখন যাঁদের দেখছি" বইখানিতে লিখিয়া গিয়াছে। একদিন কথাচ্ছলে আমিই পরিমলবাবুকে সেইসব কথা বলি। আমি নিশ্চিত যে, পরিমলবাবু ঠিকই লিখিয়াছেন। অমরেন্দ্রবাবু নায়কে ছিলেন বটে, কিন্তু ললিত গুপ্ত পরিচালিত হিন্দুস্থানে হেমেন্দ্র ও প্রেমাঙ্কুর ছিলেন, অমরেন্দ্র ছিলেন না। "অর্চনা" অফিস ছিল সিংহী বাগানে পার্বতীচরণ ঘোষ লেনে, সুবিখ্যাত উকিল তারকনাথ সাধুর বাড়ির কাছে। সে পত্রিকার লেখক উভয়ে ছিলেন বটে, কিন্তু তাহা উভয়ের সখ্যসূত্রে নহে। তাহার বহুপূর্ব হইতেই আত্মীয়তাসূত্রে উভয়ের মধ্যে সদ্ভাব ও সাহিত্যালোচনা হইত। আমার সহিত ও অমরেন্দ্রবাবুর হেমেন্দ্রসহ বহু তর্ক হইয়াছে। অধিক বলা নিষ্প্রয়োজন। শ্রীমতী চৌধুরীর প্রদত্ত তথ্য কোথা হইতে সংগৃহীত এবং কি সূত্রে প্রাপ্ত তাহা তিনি লেখেন নাই। আপ্তবাক্য ইতিহাস নহে।

শ্রীপ্রভাতচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়
১।৩।১৫সি, দমদম রোড,
কলিকাতা-২

পতি ডঃ রাধাকৃষ্ণণ ও ভারতের প্রাক্তন আইনমন্ত্রী শ্রীঅশোক সেনের সঙ্গে নেহরু মেমোরিয়াল হকি প্রতিযোগি ফাইন্যাল খেলায় বিজয়ী ভারতীয় হকি ফেডারেশনের রেড দলের খেলোয়াড়গণ।

নেহরু হকির ফাইন্যাল

শ্রীঅমিতাভ

ভারতীয় হকির শ্রেষ্ঠ খেলোয়াড় নিয়ে গঠিত ফেডারেশনের দুটি দল শক্তির পরীক্ষায় অবতীর্ণ হয়েছিল নেহরু মেমোরিয়াল হকি প্রতিযোগিতার ফাইন্যালে। ২৮শে অক্টোবর নয়াদিল্লীর লেডী হার্ডিঞ্জ মাঠে প্রচুর দর্শক সমাগম হয়েছিল এই উপভোগ্য ফাইন্যাল খেলাটি দেখবার জন্যে। রাষ্ট্রপতি ডঃ রাধাকৃষ্ণণ সুদৃশ্য নেহরু ট্রফিটি ফেডারেশনের "রেড" দলের অধিনায়কের হাতে তুলে দেন। উভয় পক্ষই ১টি করে গোল করায় টসের সাহায্যে ভাগ্য নিরূপিত হয়। মুদ্রা নিক্ষেপে রেড দলই ভাগ্যবান বলে প্রতিপন্ন হল।

ভারতীয় হকির বৈশিষ্ট্য অনবদ্য ড্রিবলিং—নয়নাভিরাম স্টিক চালনা—চাতুর্যপূর্ণ আদান-প্রদান—স্কুপিং-এর তড়িৎগতি—এই খেলায় কিছু কিছু দেখা যায়। শক্তির দিক দিয়ে দুই দলই প্রায় সমান—তবে রেড দলের রাইট-আউট বলবীর সিং-এর উন্নত ক্রীড়ানৈপুণ্য আর সকলের খেলাকে ম্লান করে দেয়। উল্কার মত গতিবেগ, চাতুর্যপূর্ণ স্টিক চালনা—নিখুঁত পাস—বলবীর সিংকে মাঠের সেরা খেলোয়াড় হিসাবে চিহ্নিত করে। তাঁরই নৈপুণ্যে রেড দল গোলটি পরিশোধ করতে সক্ষম হয়।

প্রথমার্ধের খেলায় কোন গোল হয় নি। উভয় পক্ষই পালাক্রমে আক্রমণ চালিয়ে যায়। প্রত্যেকের খেলার মধ্যেই বৈশিষ্ট্য ও নৈপুণ্য ফুটিয়ে তোলার বিশেষ আগ্রহ দেখা যায়। তীব্র উত্তেজনার মধ্যে খেলাটি প্রাণবন্ত হয়ে ওঠে। সামান্যতম দুর্বলতা ও ত্রুটির ছিদ্রপথে এবং উন্নত ক্রীড়া-নৈপুণ্যের সাহায্যে বিপক্ষের রক্ষণ-ব্যূহের মধ্যে অনুপ্রবেশ খেলাটিকে দর্শনীয় করে তুলেছিল। বিরতির পর রেড দলের গোল-রক্ষক ক্রিস্টির ব্যর্থতার জন্যে ব্লুজ দল ১ গোলে অগ্রগামী হয়। ব্লুজ দলের হরবিন্দার সিং রেড দলের গোল লক্ষ্য করে বলটি আস্তে ঠেলে দেন কিন্তু ক্রিস্টি এই দুর্বল শটটি আটকাতে পারেন না। ব্লুজ দল ১ গোলে অগ্রগামী হয়। ব্লুজ দলের এই ক্ষণিক প্রাধান্য রেড দলের বলবীর সিং বলিষ্ঠ আক্রমণধারায় সহজেই মুছে দিলেন। রাইট হাফের কাছ থেকে বল পেয়ে রাইট-আউট বলবীর সিং তড়িৎগতিতে এগিয়ে গিয়ে বিপক্ষের ব্যাককে ফাঁকি দিয়ে বাঁদিক থেকে অপূর্ব এক স্কুপের সাহায্যে দর্শনীয়ভাবে গোল করেন। ব্লুজ দলের গোলরক্ষক লক্ষ্মণ বলটি প্রতিহত করবার কোন সুযোগই পেলেন না।

রেড দলের বলবীর সিং-এর গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকার আর একটি দৃষ্টান্ত। ব্লুজ দল রেড দলের বিপক্ষে একটি শট কর্নার আদায় করেছে। ব্লুজ দলের ধরম সিং বলটি পেয়ে গোলে শট করতে উদ্যত। অপূর্ব ক্ষিপ্রতার সঙ্গে এগিয়ে এসে বলটি কেড়ে নিলেন বলবীর সিং। ব্লুজ দলের গোলের সুযোগ নষ্ট করে দিলেন এই চৌকস খেলোয়াড়টি। এই ঘটনার পরই রেড দল গোলটি পরিশোধ করে এবং এই গোল শোধের পশ্চাতে সবটুকু কৃতিত্বই বলবীর সিং-এর।

নেহরু হকির সমাপ্তির সঙ্গে সঙ্গে এই প্রশ্নই মনে জাগে ভারত আগামী অলিম্পিকে তার শ্রেষ্ঠত্ব বজায় রাখতে পারবে কি না। ভারতীয় দলের বিদেশ সফরে এই তথ্যই উদ্ঘাটিত হয়েছে যে, জাপান, জার্মানি প্রভৃতি দেশ নিশ্চেষ্ট হয়ে বসে নেই। প্রতিবেশী পাকিস্তানের ত চোখে ঘুম নেই, কি করে ভারতের প্রাধান্যকে আবার খর্ব করা যায়। সুতরাং আগামী অলিম্পিকে ভারতের গৌরব অক্ষুণ্ণ রাখতে হলে এখন থেকেই তার চেষ্টা করতে হবে। হকি-যাদুকর ধ্যানচাঁদের দেশে প্রতিভার অভাব হবে না। কিন্তু এই সুপ্ত প্রতিভাকে জাগাতে

শ্দোপাধ্যায়ী আরও অভিযোগ করিয়াছেন যে, তিনজন গবেষক বর্তমান অপ্রয়োজন ব্যবহারে তিক্ত-বিরক্ত হইয়া প্রয়োজন ইস্তফা দিয়া চলিয়া গিয়াছেন, তেমনি সময় অর্থ...

চন্দ্রশেখর

...কির উন্নতির জন্য জাগ্রত রাখতে হবে ন... নব উদ্ভাবনী প্রতিভার। অতীতের ক্রীড়া-কৌশল অন্ধের মত আঁকড়ে ...লেই যে মঙ্গল হবে তা মনে হয় না বরং বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে ক্রীড়াধারার পরিবর্তনকে যাচাই করে দেখতে হবে। অন্যান্য দেশ ভারতের ক্রীড়া-কৌশল লক্ষ্য করে নিজেদের ধাঁচে খেলার পদ্ধতি গড়ে তুলছে। ভারতকে সজাগ থাকতে হবে যাতে হকি খেলার মান বা পদ্ধতি কোন রকমেই যেন নেমে না যায়।

দলীপ সিংজী ক্রিকেট ট্রফি

নয়াদিল্লীতে ২৯শে অক্টোবর থেকে ৩১শে অক্টোবরের মধ্যে উত্তর ও দক্ষিণ অঞ্চলের সেমি-ফাইন্যাল খেলাটি শেষ হয়। ৩ দিনের মধ্যে খেলাটির চূড়ান্ত নিষ্পত্তি না হওয়ায় দক্ষিণাঞ্চল ১ম ইনিংসের রানসংখ্যার আধিক্যে ফাইন্যালে খেলবার যোগ্যতা অর্জন করেছে। চন্দ্রশেখরের মারাত্মক বোলিং-এর ফলে উত্তরাঞ্চলের ভাগ্য-বিপর্যয় হয়। মাত্র ২০৭ রানের মধ্যে উত্তরাঞ্চলের পতন ঘটে। দক্ষিণাঞ্চল অতি সহজেই এই রানসংখ্যা অতিক্রম করে এবং ৬ উইকেটের বিনিময়ে ৪৬২ রান করে ইনিংসের পরিসমাপ্তি ঘোষণা করে। সাবলীল উপভোগ্য আক্রমণাত্মক খেলার সাহায্যে আব্বাস আলি বেগ ২২৪ রান করে অপরাজিত থাকেন। টেস্ট অধিনায়ক পতৌদির নবাবের ৫২ রান ও জয়সীমার ৭৩ রান উল্লেখযোগ্য। এই বিপুল রানসংখ্যার বিরুদ্ধে উত্তরাঞ্চল ২য় ইনিংসের খেলা শুরু করে। ২য় ইনিংসের খেলায় উত্তরাঞ্চল যথেষ্ট দৃঢ়তা দেখায় কিন্তু খেলার ভাগ্য পরিবর্তন করতে সক্ষম হয় নি। এইচ, টি, দানির ব্যাট আর একটি সুন্দর শতরান উপহার দেয়। ধারাসী ও ইন্দার দেব যথাক্রমে ৫৯ ও ৮৭ রান করে প্রশংসা অর্জন করেন। উত্তরাঞ্চলের ২য় ইনিংসে রান ওঠে ৪৪৯ সাত উইকেটের বিনিময়ে। প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যেতে পারে আব্বাস আলি বেগের অপরাজিত ২২৪ রান দলীপ ট্রফির একটি রেকর্ড।

একই সময়ে ইন্দোরে দলীপ ট্রফির ২য় সেমি-ফাইন্যাল খেলা অনুষ্ঠিত হয়। পশ্চিমাঞ্চল ও মধ্যাঞ্চল এই খেলায় শক্তি পরীক্ষা করে। তিন দিনের মধ্যেই এই খেলাটির ফলাফল চূড়ান্তভাবে নিষ্পত্তি হয়েছে। দুর্বল মধ্যাঞ্চল বিশেষ সুবিধা করতে পারে নি। টসে জিতে পশ্চিমাঞ্চল ব্যাটিং গ্রহণ করে। প্রথম ইনিংসে তাদের রান সংগৃহীত হয় ৪৮৫। এই রানসংখ্যার মধ্যে দলীপ সরদেশাই একাই করেছেন ১৫১ রান। চান্দু বোরদের ১০৫ রান এবং ফার্নাণ্ডেজের ৫৮ নট-আউট উল্লেখযোগ্য।

পশ্চিমাঞ্চলের যোশীর মারাত্মক বোলিং মধ্যাঞ্চলের ১ম ইনিংসের সমাধি রচনা করে। তিনি ৩৪ রানে ৬টি উইকেট দখল করে মধ্যাঞ্চলের খেলোয়াড়দের মধ্যে ত্রাসের সঞ্চার করেন। পরাজিত ব্যাটসম্যানদের প্যাভিলিয়ন-মুখী মিছিলের পর

নাদকার্নি

দেখা যায় মাত্র ১২০ রানের ... মধ্যাঞ্চলের ১ম ইনিংস খতম হয়ে... ৩৬৫ রান পিছিয়ে থাকায় মধ্যাঞ্চলকে ফলো-অন করতে হয়। ২য় ইনিংসের রান-

বৈষ্ণব-সাহিত্যের অমূল্য অবদান

ভক্তিজগতের কৌস্তুভরত্ন, ভগবদ্ভক্তগণের সাধনার ধন, ভক্তের তুলসী-মালা সদৃশ মহাপবিত্র ভক্তিশাস্ত্র সমন্বয়।

বৈষ্ণব গ্রন্থাবলী

শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রলাপ ও শিক্ষাষ্টক

শ্রীচৈতন্যদেবের শ্রীকৃষ্ণলাভের জন্য যে উৎকণ্ঠা, এই 'প্রলাপে' তাহা অভিব্যক্ত। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শ্রীমুখনিঃসৃত 'শিক্ষাষ্টক শ্লোকই' তাঁহার একমাত্র রচনা। শ্রীল কৃষ্ণদাস গোস্বামীর সুললিত পদ্যানুবাদে এই অমিয় মাধুরী লীলায়িত।

নরোত্তম বিলাস

বৈষ্ণবগণের পরম উপভোগ্য উপজীব্য ভক্তিচরিতামৃত।

দুর্লভসার

শ্রীচৈতন্যমঙ্গল-রচয়িতা শ্রীল লোচনদাস বিরচিত, বৈষ্ণবগণের সংপূজিত।

আত্মতত্ত্ব

বৈষ্ণব দর্শনের সূক্ষ্মাতম অনুসরণ।

মনঃশিক্ষা

শ্রীপ্রেমানন্দ দাস ঠাকুর বিরচিত। বৈষ্ণব-সিদ্ধান্ত সাধন-ভজনের নিগূঢ় মর্মসমাহিত।

শ্রীচমৎকার চন্দ্রিকা

পরম পণ্ডিত শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী প্রণীত সংস্কৃত গ্রন্থ হইতে তাঁহার সুযোগ্য শিষ্য পরম বৈষ্ণব শ্রীল কৃষ্ণদাসের সুললিত পদ্যানুবাদ।

পাষণ্ড-দলন

মূর্তিমান বৈরাগ্য শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর বিরচিত প্রেমভক্তির লহর-লীলা।

ভক্তিতত্ত্বসার

হাটপত্তন, শ্রীশ্রীগুরুবন্দনা, নামসংকীর্তন, চৌত্রিশ পদাবলী, শ্রীকৃষ্ণের অষ্টোত্তর শতনাম, নরোত্তম দাসের প্রার্থনা, প্রেমভক্তি চন্দ্রিকা। সুলভে নামমাত্র মূল্যে বিতরিত।

মূল্য : ৩, টাকা।

বসুমতী প্রাইভেট লিমিটেড : ১৬৬, বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী স্ট্রীট, কলি-১২

সংখ্যায় ... ...শায়। মাত্র ৯০ রান। ২য় ইনিংসে নাদকার্নির বোলিং মধ্যাঞ্চলকে দাঁড়াতে দেয় নি। তিনি ৬টি উইকেট দখল করেন সামান্য ২০ রান দিয়ে।

মিহির সেনের সাফল্য

মিহির সেন শেষ পর্যন্ত পানামা খাল অতিক্রম করতে সক্ষম হয়েছেন। এই সন্তরণে সময় লেগেছে ৩৫ ঘণ্টা ৩০ মিনিট। মিহির সেনের সন্তরণ-জীবনের এই বোধ হয় শেষ ঝুঁকি। তিনি যা আশা করেছিলেন তার চেয়ে অনেক বেশি দুঃখ যাতনা তাঁকে সহ্য করতে হয়েছে। দীর্ঘ ৪১ মাইল সন্তরণ শেষ করে মিহির পানামা সিটিতে বিশ্রাম করছেন তিন দিন। ভারতীয় রাজদূত নিরঞ্জন সিং গিলের আতিথ্য তিনি গ্রহণ করেছেন।

বহু আমেরিকান ও পানামাবাসী এই

মিহির সেন

ভারতীয় যুবকের সন্তরণ-কৌশল দেখবার জন্যে সমবেত হয়েছিল প্রশান্ত মহাসাগর প্রান্তে। মিহির সেন যখন সন্তরণ শেষ করে ভূমি স্পর্শ করলেন তাঁদের উল্লাস-ধ্বনি তাঁকে সাদর সম্ভাষণ জানাল।

জুনিয়ার ফুটবল

বাংলার ছেলেরা ক্রীড়ামোদীদের নিরাশ করেছে। জুনিয়ার ফুটবল প্রতিযোগিতায় অন্ধ্রের কাছে হার মানতে হয়েছে। যথেষ্ট অনুশীলন, যথেষ্ট যত্ন, যথেষ্ট সতর্কতা দিয়ে গড়ে তোলা হয়েছিল জুনিয়ার টিমকে। আশা ছিল বাংলা ফুটবলে তারা নাম রাখবে। আসামের বিরুদ্ধে সাবলীল ৬টি গোল অনেক আশার সঞ্চার করেছিল। কিন্তু ৩১শে অক্টোবর বাঙ্গালোরের মাঠে সেই আশা-কুসুমের কিছু পাপড়ি ঝরে গেল। অন্ধ্রের কাছে ১ গোলে পরাজয়—সে এক সকরুণ কাহিনী। বাংলার খেলোয়াড়দের পায়ের কারুকার্য প্রশংসা অর্জন করেছে কিন্তু অন্ধ্রের রক্ষণ-ব্যূহ ভেদ করতে পারে নি। বাংলার খেলোয়াড়দের ড্রিবলিং-এর তালিম এত বেশি দেওয়া হয়েছিল যে কোথায় তার পূর্ণচ্ছেদ টানতে হবে সে খেয়াল খেলোয়াড়দের বিশেষ ছিল না। যেখানে গোলে শট নেওয়া যেতে পারে সেখানেও তারা ড্রিবলিং-এর নেশা কাটিয়ে উঠতে পারে নি। অতিরিক্ত শর্ট পাসিং-এর ফলে অন্ধ্রের রক্ষণভাগ অতি সহজেই বাংলার আক্রমণধারাকে বানচাল করে দিয়েছে। কোন সময়েই বাংলার আক্রমণ খুব তীক্ষ্ণ হয়ে অন্ধ্রের রক্ষণভাগকে দ্বিখণ্ডিত করতে পারে নি।

অনেকের আশা ছিল পাল্টা খেলায় বাংলা অন্ধ্রকে পরাজিত করে প্রথম পরাজয়ের প্রতিশোধ নেবে। কিন্তু ২রা নভেম্বরের খেলায় এই শেষ আশাটুকুও নিভে গেছে। বাংলা দল ফিরতি খেলায় উন্নত ক্রীড়াধারা দেখিয়েছে বটে তবে সুযোগমত বিপক্ষের গোলে শট করতে পারে নি। ঠিকমতন সুযোগগুলি ফরোয়ার্ডরা যদি কাজে লাগাতে পারত—গোলের সামনেও তারা যদি ড্রিবলিং-এর জাল না বুনত—তা'হলে গোল করা সম্ভব হ'ত। অন্ধ্র দলও সুযোগ বুঝে দৈহিক শক্তির অজস্র ব্যবহার করতে দ্বিধা করে নি। গোলের মানদণ্ডে যখন খেলার জয়-পরাজয় নির্ধারিত হয় তখন শিক্ষণ শিবিরের লক্ষ্য হওয়া উচিত গোল ভেদ করার মন্ত্রসিদ্ধি।

ডেভিস কাপ

প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীর গৃহে ১১ই নভেম্বর ডেভিস কাপের খেলার সূচী তৈরি হবে। টেনিসের এই আঞ্চলিক সেমি-ফাইন্যালটির খেলা হবে নয়াদিল্লীতে ভারত ও পশ্চিম জার্মানির মধ্যে। ভারতীয় দলের অধিনায়ক নির্বাচিত হয়েছেন রমানাথন কৃষ্ণাণ। জয়দীপ, প্রেমজিৎ ও শিবপ্রসাদ মিশ্র দলভুক্ত হয়েছেন। নভেম্বরের ১২ই তারিখে প্রথম ২টি সিঙ্গলস খেলা হবে। ডাবলস খেলাটি হবে ১৩ই নভেম্বর। অবশিষ্ট সিঙ্গল খেলা দু'টি হবে ১৪ই নভেম্বর।

পশ্চিম জার্মানির খেলোয়াড়রা নয়াদিল্লীর মাঠে অনুশীলন সুরু করে দিয়েছেন। ভারতের যেমন প্রধান আশা কৃষ্ণাণ, জার্মানির পক্ষে তেমনি বুংগার্ট। বুংগার্টকে সাহায্য করবেন ইংগো বাডিং ওয়েনম্যান এবং হ্যারল্ড আইসেনব্রক বুংগার্টই খেলোয়াড়দের মধ্যে বে‍ৗ প্রতিভাসম্পন্ন এবং তৃণাচ্ছাদিত লনে খেলতে অভ্যস্ত। জার্মানির অন্য খেলোয়াড়রা হার্ড কোর্টে সাধারণত খেলে থাকেন। তাই সময় থাকতে এই সব খেলোয়াড়রা টেনিস লনের ওপর অনুশীলন সুরু করে দিয়েছেন। দিল্লীর আবহাওয়া ও তৃণাচ্ছাদিত মাঠ জার্মানির খেলোয়াড়দের সম্মুখে অসুবিধার সৃষ্টি করেছে। দিল্লীর আবহাওয়ার উষ্ণতা জার্মান খেলোয়াড়দের অল্পেই শ্রান্ত করে

দলীপ সরদেশাই

দিচ্ছে। অবশ্য নভেম্বরের মাঝামাঝি দিল্লীর আবহাওয়া আর একটু ঠাণ্ডা হতে পারে। জার্মানির ননপ্লেয়িং ক্যাপ্টেন মন্তব্য করেন যে, এবছরে কৃষ্ণাণ আন্তর্জাতিক কোন প্রতিযোগিতায় অংশ গ্রহণ করেন নি। এর ফলে তাঁর খেলার বর্তমান অবস্থা আমাদের বিশেষ জানা নেই। অজানা বলেই কৃষ্ণাণ আমাদের কাছে শঙ্কা ও রহস্যের কুয়াশা-ঢাকা। সব দিক বিচার করে দেখলে ভারত ও জার্মানির জয়ের আশা সমান সমান।

৪।১১।৬৬

সম্পাদিকা—জয়ন্তী সেন
বসুমতী (প্রাঃ) লিঃ-এর পক্ষে ১৬৬, বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী স্ট্রীটস্থ কলিকাতা-১২
বসুমতী প্রেস হইতে শ্রীসুকুমার গুহমজুমদার কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।